সূচীপত্র

সূচীপত্র
GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

সূচীপত্র
Cooch Behar

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

DESH : 40 Naye Paise.
Saturday, 24th August, 1957.

২৪ বর্ষ ॥ ৪৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৭ ভাদ্র, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

ভাষা কমিশনের মন্তব্য

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গঠিত ভাষা কমিশন কমিটি তাহার যে রিপোর্ট বা মন্তব্য রাষ্ট্রপতির নিকটে বৎসরাধিককাল পূর্বে দাখিল করিয়াছিল সম্প্রতি তাহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে নির্দিষ্ট ছিল যে সংবিধান চালু হইবার পাঁচ বৎসর পরে রাষ্ট্রপতি একটি ভাষা কমিশন গঠন করিয়া তাহার উপরে ভার দিবেন যে কি উপায়ে সরকারী কাজে হিন্দীর ব্যবহার বাড়াইতে পারা যায় ও ইংরাজি ভাষার সঙ্কোচসাধন করা যায় সে বিষয়ে কমিটি সাক্ষী সাবুদ গ্রহণ করিয়া ও সলাপরামর্শ করিয়া স্বীয় মন্তব্য রাষ্ট্রপতি বরাবর দাখিল করিবেন। পরে ঐ মন্তব্য বা রিপোর্ট লোকসভায় উপস্থাপিত করা হইবে। প্রকাশ থাকে যে, সংবিধানে নির্দেশ আছে যে সংবিধান চালু হইবার পরে পনেরো বছর পর্যন্ত সরকারী কাজে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার চলিবে। ১৯৬৫ সাল ঐ সীমা।

কমিশনে কুড়িজন সদস্য ছিলেন, পরলোকগত বি. জি. খের ছিলেন সভাপতি। অপর দুইজন বিশিষ্ট সদস্যের স্বতন্ত্র উল্লেখ বাঞ্ছনীয়—ইঁহারা শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মাদ্রাজের ভূতপূর্ব মন্ত্রী ডাঃ পি সুব্বারায়ণ। মূল মন্তব্যে কুড়িজনসদস্য স্বাক্ষর করিলেও শেষোক্ত দুইজন স্বতন্ত্রভাবে এমন গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাহাকে চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে মাইনরিটি রিপোর্ট না বলিয়া স্বতন্ত্র একটি রিপোর্ট বলিয়া ধরিলে অন্যায় মনে হয় না।

এখন যে দুইটি মূল বিষয়ে বিচারের জন্য কমিশনের নিয়োগ তন্মধ্যে একটি সম্বন্ধে সদস্যগণ একপ্রকার নিশ্চিত। তাহা এই যে গণতান্ত্রিক শাসন দেশে প্রচলিত হইবার পরে ইংরাজী ভাষাকে দেশের সরকারী ভাষারূপে আর রাখা চলে না। অপর বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁহাদের যেন কিছু সন্দেহ আছে। সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরাজীর বর্জন ও হিন্দী গ্রহণ স্বীকৃত হইলেও, ১৯৬৫ সাল এতদুভয়ের শেষ সীমা নির্দিষ্ট হইলেও কার্যত তাহা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে কমিটি কোন সিদ্ধান্তে না আসিতে পারিয়া প্রকারান্তরে 'যদ্ভবিষ্য' নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

অপরপক্ষে পূর্বোক্ত বিশিষ্ট সদস্যদ্বয় যে স্বতন্ত্র মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে, এত দ্রুত হিন্দী গ্রহণের অনিবার্য কুফল হইবে দেশে দুটি স্বতন্ত্র ভাষাভাষী শ্রেণীর উদ্ভব (একটি হিন্দীভাষী অপরটি ইংরাজীভাষী কি?) তাহা ছাড়া হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, হিন্দী গ্রহণ বা বর্জনের ভার রাজ্যসমূহের ইচ্ছার উপরে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

অতঃপর রিপোর্টটি লোকসভায় আলোচিত হইবার পালা।

দুরূহতম সমস্যা

ভারত রাষ্ট্রের সম্মুখে যতগুলি দুরূহ সমস্যা আছে ভাষা সমস্যা অর্থাৎ সরকারী ভাষা সমস্যা তন্মধ্যে দুরূহতম। রাজ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে কিছুকাল আগে দেশে অনেক অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটিয়াছিল—এখনো তাহার জের চলিতেছে—সংযুক্ত গুজরাট বোম্বাই রাজ্যে। কিন্তু ভাষা সমস্যার তুলনায় তাহার গুরুত্ব অনেক কম। ভূখণ্ডের সহিত মানুষের স্নেহ-প্রীতি সংস্কার ও স্বার্থজড়িত—ভাষার সহিত এ সমস্তর যোগ আরো নিবিড়। মানুষ এ সব ক্ষেত্রে সব সময়ে যুক্তি ও বিচার দ্বারা চালিত হয় না। হয়তো এরূপ বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু কার্যত যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহার হিসাব করিয়াই রাষ্ট্রনায়কগণের অগ্রসর হওয়া কর্তব্য নতুবা অনর্থ ঘটা বিচিত্র নয়। বলা বাহুল্য সরকারী ভাষার স্বরূপ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে দেশের কোন কোন অঞ্চলে বিরূপ মনোভাব আছে। এমন কি এই প্রসঙ্গে অনেক সময়ে Hindi Imperialism বা 'হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটাও ব্যবহৃত হইয়াছে—পৃথক মন্তব্যকারী সদস্যদ্বয়ও উহা ব্যবহার করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার যদি খুব বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সহিত পদক্ষেপ না করেন, তবে দেশের কোন কোন অংশে অকারণ অশান্তি ঘটা অসম্ভব নয়।

একযোগে দেশের যাবতীয় সমস্যার সমাধান যদি সম্ভব না হয় (নিশ্চয়ই সম্ভব নয়), তবে প্রধান সমস্যাগুলি সমাধানে অগ্রপশ্চাৎ করিতে হয়। সরকারী ভাষা ১৯৬৫ সাল মধ্যে চালু করা যে দেশের প্রধানতম ও জরুরীতম সমস্যা নয়—ইহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন। তাহা যদি হয়, তবে আমাদের মতে সংবিধানের সামান্য সংশোধন করিয়া ১৯৬৫ সালের সীমাকে আরও ১০।১৫ বৎসর পিছাইয়া দেওয়াই বর্তমান সঙ্কটে মুক্তির একমাত্র পথ। ১৯৬৫ সালের পরে আরও দশ পনের বছর সময় পাইলে ধীরেসুস্থে আবেগরহিত অবস্থায় সকলেই সরকারী ভাষা সম্বন্ধে মনঃস্থির করিবার অবকাশ পাইবেন। আর ইতি-

মধ্যে উদ্বর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে হিন্দীর আরও প্রসার যদি ঘটে, হিন্দী সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব যদি হ্রাস পায়, তবে সুলক্ষণ। আরও এক কথা ঐ সময়ের মধ্যে দেশে অন্নবস্ত্রের স্বাচ্ছল্য ঘটিলে, শিক্ষার সর্বব্যাপী প্রসার ঘটিলে হিন্দী সম্বন্ধে কোন কোন অঞ্চলে যে শঙ্কার ভাব আছে, তাহা বিদূরিত হইবারই সম্ভাবনা। জীবনের অনেক গুরুতর ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও কাল হইতেছে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। আমাদের মনে হয় অযথা তাড়াহুড়া না করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের উপরেই এক্ষেত্রে নির্ভর করা উচিত। তাহাতে সুফল না ফলিলেও অনিবার্য কুফল রোধ হইবে নিশ্চয়। বিজ্ঞজনেরা বলিয়া থাকেন কুফলের নিবারণই সুফল।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সম্মিলন

বাংলা দেশে শীঘ্রই আরও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার আয়োজন চলিতেছে, এই কারণে বিশেষ করিয়া এবং ভারতবর্ষের সর্বত্রই শিক্ষাপদ্ধতির নবরূপায়ণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিকট হইতে স্বভাবতই দেশ যে নেতৃত্ব আশা করিয়া থাকে সেজন্যও বটে—সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালন সংক্রান্ত সভার আলোচনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীযুক্ত দেশমুখ মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় প্রসংগক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অটোনমি'র কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণে যতদূর মনে হয় তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রসংগে অটোনমি কথাটার কথঞ্চিৎ বাহুল্য প্রয়োগ ঘটিতেছে—সর্বজনের প্রতিনিধি যে আইনসভা, তাহার সৃষ্টি যে প্রতিষ্ঠান তাহা এমন স্বাতন্ত্র্য দাবী করিতে পারে না যাহাতে সর্বজন-প্রতিনিধিসভারও আর কোনও কর্তৃত্ব তাহাদের উপর থাকিবে না।

এমন দাবী কোন বিশ্ববিদ্যালয় করিয়াছেন কি না জানি না; কিন্তু এরূপ অবস্থা সম্ভবপরতার অতীত নয় যে, জনপ্রতিনিধি সভার এই কর্তৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপরে যে-সূত্রে যে-প্রণালীতে আপনাকে ব্যক্ত করিতে চাহিবে তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের কর্মোৎসাহ সম্পূর্ণ নির্বাপিত হইতে পারে; এই সম্মেলনে শ্রীযুক্ত সি পি রামস্বামী আইয়্যার যে বলিয়াছেন, The Vice-Chancellor of a university must regard himself "no longer as a mere administrative head but as a missionary bent on revolutionizing university ideals and practice" উপাচার্য নিজেকে কেবল কর্মব্যবস্থার সর্বাধ্যক্ষ বলিয়া মনে করিবেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও কর্মপরিচালনা প্রণালীতে নবযুগের সূচনা করিবেন—অনেকখানি পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ না থাকিলে এ আদর্শের পরিবর্তে 'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের', কোনোরূপে আইন বাঁচাইয়া কাজ চালাইবার আদর্শই বলবত্তর হইয়া উঠিবে এইরূপ আশঙ্কার প্রভূত কারণ আছে। অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃসভার গঠনপ্রণালী, অটোনমির প্রশ্নের সহিত অংগাংগীভাবে জড়িত—এই গঠন পদ্ধতি লইয়াও সম্মিলনে আলোচনা হইয়াছিল।

কর্তৃসভায় শিক্ষাব্রতী নহেন এরূপ সদস্যের প্রাবল্য ও কর্তৃত্ব, সভার সদস্যবাহুল্য, তাহার বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদির যে সকল কুফল দেখা দিয়াছে সে বিষয়ে সম্মিলন আলোচনা করিয়াছেন। এখন যে-সকল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে তাহার অনেকগুলিই পূর্বতন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় স্বল্পায়তন, কোনো কোনোটির অতীতে আছে সুদীর্ঘকালের স্বদেশসেবা, আদর্শনিষ্ঠা ও ত্যাগের ইতিহাস—এ সকল ক্ষেত্রেও যদি কর্তৃসভার গঠন এরূপ না হয় যাহাতে "সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং"—"মন্ত্র এক হউক, সিদ্ধি এক হউক, বিচার ও মীমাংসা ও মন এক হউক" তবে বিশেষ পরিতাপের বিষয়। নিয়মতান্ত্রিক যে সকল ত্রুটির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অগ্রগতি ও বিকাশ ব্যাহত হইতেছে এই সকল আলোচনার ফলে সেগুলি দূরীভূত হইবে আশা করিতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিচালন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সম্মিলনে যে সকল প্রস্তাব ও আলোচনা হইয়াছে, স্বভাবতই উপাচার্য বিষয়ক আলোচনাই গুরুত্বে তাহার মধ্যে সর্বাধিক। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থা উভয়েরই নায়করূপে নিযুক্ত হন, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে দৈনন্দিন কর্মপরিচালনার খুঁটি-নাটির তত্ত্বাবধানেই তাঁহাকে একান্ত ব্যাপৃত থাকিতে হয়—এরূপ ব্যবস্থা কখনো স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। এ সকল রুটিন কাজ হইতে উপাচার্যকে কিরূপে মুক্তি দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে সম্মিলনে আলোচনা হইয়াছিল—আশা করি ক্রমশ তাহা ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থাপনায় ও কর্মপরিচালনায় প্রভূত ত্রুটি আছে একথা সত্য, অগোণে তাহার প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক; ব্যক্তিগত বা দলীয় যে সকল অধিকার আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার অপব্যবহারও ঘটিয়া থাকিতে পারে, সে সম্বন্ধেও আলোচনা হওয়া আবশ্যক; ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ যে পথে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আবিল করিয়া তুলিতেছে তাহাও রুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সর্বোপরি আমরা বিশ্বাস করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্রতার বিকাশই যে আদর্শ, সকল সংস্কার চেষ্টারই ইহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। বর্তমানে সকল বিষয়েই যে কেন্দ্রানুগ শক্তি প্রাবল্য লাভের চেষ্টা করিতেছে এই বিরাট দেশের বিচিত্র প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে তাহা অনুকূল হইতে পারে না। কেন্দ্রবর্তী সকলেই জওহরলাল নেহরু, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বা চিন্তামন দেশমুখ নহেন, ইঁহাদের যে সমগ্রদৃষ্টি আছে তাহার অধিকারীও সকলে নহেন, সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশি, 'ক্ষুদ্রের প্রতাপ অনেক ক্ষেত্রেই ভয়ংকর।'

একলিপির আবশ্যকতা

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ হায়দরাবাদে ভারতের বিভিন্ন ভাষার জন্য একটিমাত্র লিপি বা অক্ষরকে গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা বর্ণনা করিয়াছেন। বিষয়টি নূতন নয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সারদাপ্রসাদ মিত্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এক অক্ষর চালাইবার আশায় 'একলিপি পরিষদ' স্থাপন করিয়াছিলেন। তারপরে বিষয়টি নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। কিছুকাল আগে রোমান হরফের পক্ষে খুব আন্দোলন চলিয়াছিল, আপাতত তাহা মন্দবেগ। বর্তমানে দেবনাগরী অক্ষর গ্রহণ করিবার দিকে অনেকের ঝোঁক। কিন্তু বছর দুই-তিন হইল সে ঝোঁকটাও স্থগিতপ্রায়। ভাষার সহিত আঞ্চলিকতা প্রীতি জড়িত, লিপির সংগেও। নানা কারণে ঠিক বর্তমান মুহূর্তটি এক লিপিবাদ প্রচারের উপযুক্ত সময় নয়। কিন্তু আমাদের ধারণা সুসময় আসিলে একলিপির সম্ভাবনাকে যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে একলিপি গ্রহণের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই মনে হয়—তবে দক্ষিণ ভারতের উপর উত্তর ভারতের লিপি চাপানো উচিত হইবে মনে হয় না। যাহা হোক, সে দূরভবিষ্যতের সম্ভাবনা লইয়া এখনি ব্যস্ত হইয়া উঠিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু সেই সংগে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অন্তত উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে একলিপির সম্ভাব্যতা বিনাবিচারে অগ্রাহ্য করা উচিত হইবে না।

(তের)

বাঘিন কানারানীর ডাক আর শোনা যায় না। মধুকুপির আকাশের বুক কাঁপানো সেই প্রচণ্ড পাশব হুংকারের গরগর শিহর আস্তে আস্তে ক্ষীণ হতে হতে বাতাসে মিলিয়ে যায়। শুধু শোনা যায়, সড়কের নিমগুলি যেন স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে ঝুরঝুর আরামের শব্দ করছে; আর যেন হাই তুলে গা ভাঙছে বাঁশের ঝাড়—কট্ কট্, পট্ পট্, কট্ কট্।

শিশালের রক্তের তীব্র বোট্‌কা গন্ধ মেখে দাশুর যে ভয়ানক উল্লাসের বুকটা বাঘ-বাঘ গন্ধ ছাড়ছে, সেই বুকটাকেই শক্ত করে জড়িয়ে ধরে মুরলীর বুকের থরথর কাঁপুনিও আস্তে আস্তে থিতিয়ে শেষে একেবারে শান্ত হয়ে যায়। দাশুর মুখে সেই অদ্ভুত উল্লাসের হাসিও ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসে। যেন একটা হঠাৎ-মায়ার আবেশে দাশুর গলার স্বরটাও গলে যায়। চীৎকার করতে পারে না দাশু। মুরলীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে আদরের সুরে ফিসফিস করে দাশু—খুব থাকতে পারবি, খুব হাসতে পারবি মুরলী। আমি থাকতে তুর কিসের এত ডর?

মুরলীর থরথর ভয়ের বুকটা এইবার হঠাৎ ঘৃণার জ্বালায় ছটফটিয়ে ওঠে। মধুকুপির মনিষের জীবনটা যেন বাঘ-বাঘ গন্ধের বোট্‌কা নিঃশ্বাস ছাড়ছে। দাশুর বুকটাকে হঠাৎ একটা ঠেলা দিয়ে দু'পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ায় মুরলী।

গামছায় বাঁধা আড়াই সের চাল; পোটলাটার দিকে তাকিয়ে মুরলীর চোখ দুটো দপ্‌দপ্ করে। মুরলীর কল্পনার একটা হিসাবের সুখ নষ্ট করে দিয়েছে এই আড়াই সের চালের পোটলা। মুরলীর জীবনের যে সাধের জেদ কঠোর গর্বে অনড় হয়ে বসেছিল, সেই জেদ চূর্ণ করে দিয়ে পোটলাটা যেন হাসছে আর ঠাট্টা করছে। মিছা এত হিসাব করলি মুরলী, তোর ছাড়া পাওয়ার পথ নাই মুরলী। এখন চুপটি করে মধুকুপির কিষাণী মাগটি হয়ে, কিষাণ ভাতারের বাঘা খাটুনির ঐ উপহার, ঐ চাল এখন হাঁড়িতে চড়িয়ে ভাত রাঁধতে লেগে যা।

দাশু বলে—কি হলো মুরলী?

উত্তর না দিয়ে চুপ করে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুরলী। হেসে ফেলে দাশু। —কানারানীর ধমক শুনে ভয় পেলি, কিন্তুক আমার উপর রাগ করিস কেনে?

রুক্ষস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—বাঘিনটা আমাকে ধমকাবেক কেনে? উটা কি আমার শাশুড়ি বটে?

হো হো করে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে দাশু। দাশুর পাথুরে বুকটা যেন একটা অদ্ভুত খুশির উচ্ছ্বাস সহ্য করতে গিয়ে নাচতে থাকে। রাগ করে কথা বলতে গিয়ে কী চমৎকার একটা কথা বলে ফেলেছে মুরলী। দাশুর হাসি থামতে চায় না। মুরলীর কালো চোখের তারা দুটো আরও রুক্ষ হয়ে দাশুর এই বিনা নেশার উল্লাস দেখতে থাকে।

দাশু বলে—হাঁ রে মুরলী, কানারানী তুর শাশুড়ি বটে। তা না হলে...!

ভ্রূকুটি করে তাকায় মুরলী—তা না হলে কি?

দাশু—তা না হলে উটা আমাকে উয়ার ছেইলার মত মানে কেনে, এত দয়াই বা করে কেনে?

মুখ টিপে হাসে মুরলী, আর মুখ ঘুরিয়ে হাসি লুকায়। দাশু বলে—তু হাসছিস মুরলী, কিন্তু মনে করে দেখ।

মুরলী আশ্চর্য হয়—কি?

দাশু—মনে করে দেখ, যেদিনকে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ঘরে এলাম। আমি তুর উপর মিছা রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হাঁটা দিয়েছিলাম। তু কেঁদেছিলি চিঁচাই-ছিলি: সেদিন কে তুকে দয়া করেছিল? সেদিন আমাকে পাঁলে যেতে পথ দেয় নাই কে?

আবার মুখ ঘুরিয়ে হাসি লুকোয় মুরলী। দাশু বলে—কানারানীকে বাঘিন মনে করিস না মুরলী।

ঠোঁট ফুলিয়ে যেন ঠাট্টা করে মুরলী—বনদেবী বটে।

দাশু—বনদেবী লয়, ডাইন বটে। বরাকরের সেই বুড়িটা। এক রাতের মধ্যেই বুড়ির ছেইলা, ছেইলার মাগ আর নাতি মরে গেল। বুড়িও গাঁ ছেইড়ে দিয়ে সেই যে জংগলের ভিতরে গিয়ে ঢুকলো, আর বুড়িকে কেউ দেখতে পায় নাই।

মুরলী—মরে গিয়েছে বুড়ি।

দাশু—না মরে নাই। আমার কথা বিশ্বাস না করিস, সনাতন লাইয়াকে শুধায়ে দেখিস। ডাইন মন্তর লিয়ে বুড়িটাই বাঘন হয়ে গেল। কানারানীর ছেইলা আছে, ছেইলার বাঘিন আছে আর নাতিও আছে। মুরু পাহাড়ের জংগলে উয়ারা থাকে। বিশ্বাস না হয় বড়বুড়া রতনকে শুধায়ে দেখিস।

গা-ঝাড়া দিয়ে জোরে একটা হাই তুলে হেসে ফেলে দাশু বলে—কে জানে, আমাকেও কেনে উয়ার মানুষ ছেইলা বলে মনে করে কানারানী। আমার ঘরের লেগে কেনে উয়ার এত দয়া?

মধুকুপির কিষাণের এই অদ্ভুত বিশ্বাসের গল্প শুনতে একটুও ভাল লাগে না মুরলীর। সিস্টার দিদি কতবার এসে কত কথা বলে আর হেসে হেসে ঠিক এইসব জংলী বিশ্বাসের ময়লা ধুয়ে ফেলতে বলেছেন। মুরলীও বিশ্বাস করে না। চুপ করে বসে আংগুলের নখ দিয়ে মেজের মাটির উপর দাগ কাটে মুরলী।

দাশু বলে—নে, আর দেরি করিস না মুরলী। অনেক রাত হ'ইছে, এইবার রেঁধে লে না।

মুরলী—না।

বড়কালুর পাথরের চটান যেন সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে গুমরে ওঠে। হাঁক ছেড়েছে কানারাণী। হাঁকের পর হাঁক। মধুকুপির অন্ধকার আর বাতাসকে যেন কামড় দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভয়ানক ধমকের শিহর ছড়িয়ে দিচ্ছে কানারাণী। গর্জনের রেশ যেন সড়ক ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে পাকুড়-তলা পর্যন্ত ছুটে আসছে।

ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী। একটা লাফ দিয়ে সরে এসে দাশুর একটা হাত শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে আর কেঁদে ফেলে।

কিন্তু দাশু হেসে ফেলে—কেনে মিছা রাগ ক'রে না বললি, আর আবার শাশুড়ির ধমক খেলি মুরলী!

মুরলীর মাথায় হাত বোলায় দাশু। তার পরেই হাত ধরে মুরলীকে টেনে নিয়ে এসে উনানের কাছে বসে।—লে, ঝটপট ভাত রেঁধে ফেল। কতক্ষণ না খেয়ে আছিস্, তুর কি নিজের জিউ-জানের লেগেও একটুক ডর নাই?

উনানের কাঠের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে। হাঁড়িতে চাল ছাড়ে মুরলী। আর দাশু ঘরামি তার জীবনের এক নতুন বিশ্বাসের আহ্লাদও যেন দাউ দাউ ক'রে হাসিয়ে মুরলীর কানের কাছে বাজাতে থাকে।—বড় মজা হ'ইছে মুরলী। কানারাণীর ডরে জংগলের সব গার্ড, সব বেটা ঠিকেদার ভেগেছে। কেউ আর এই তল্লাটেই নাই।

মুরলী আশ্চর্য হয়ে তাকায়।—তাথে তুমার মজার কি হলো?

দাশু—টিকিট নিতে হবেক নাই, দস্তুরী দিতে হবেক নাই, ভাগ দিতেও হবেক নাই। জংগলের মাল আনবো আর বেচবো। বড় দয়া কানারাণীর।

দাশুর মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে মুরলী। মুরলীর মুখটা থেকে থেকে কেঁপে ওঠে। চোখে হতাশার জ্বালা। কানারাণীর দয়ার জোরে মধুকুপির কিষাণের একটা বাঘা-বাঘা গর্ব আর সৌভাগ্য মুরলীর অদৃষ্টকে স্বপ্নছাড়া ক'রে এই ঘরের ভিতরেই চিরকাল আটক ক'রে রাখবে।

দাশু বলে—মুখটা সরিয়ে নে মুরলী; মিছা ধোঁয়া লাগিয়ে চোখ জ্বালাস কেনে?

একটা দুটো দিন নয়, পর পর অনেকগুলি দিন, প্রায় একটা মাসে ধ'রে দাশু ঘরামির টাংগ আর পাথুরে শরীরের খাটুনি যেন এক একটা মত্ততার উৎসবের মত মাতামাতি ক'রে মুরলীর আশা হিসাব আর কল্পনা-গুলিকে ভয় পাইয়ে চুপ করিয়ে রাখে। কোনদিন চাল, কোনদিন মকাই, কোনদিন মাষকলাই ঘরের শূন্য সরা ডালা আর ঝোড়া ভরে ফেলে দাশু।

মধুকুপির আকাশে কালো কালো শাওন

মেঘ ভেসে বেড়ায়, আর মাঝে মাঝে খুব জোর বৃষ্টি ঝরায়। বড়কালুর বুকের মরা ঝরনার দাগটা আবার প্রাণ পেয়ে কলকলিয়ে ওঠে। বুঝতে পারে দাশু, বড়কালুর পায়ের কাছে বহেড়ার জংগলে সারা রাত ধরে যে আগুনটা জ্বলেছিল, সেই আগুন শাওনের এক পশলা ঝরানিতেই নিভে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। তাজা বহেড়ার গাছগুলি কালো কাঠকয়লা হয়ে জংগলের বুকে ছড়িয়ে আছে। এই তো সুযোগ।

ভোর না হতেই বের হয়ে যায় দাশু; আর এক ক্রোশ বুনো পথ প্রায় এক দৌড়ে পার হয়ে গিয়ে পোড়া জংগলের বুকের ভিতরে গিয়ে ঢোকে। টুকরো টুকরো কাঠকয়লার প্রকাণ্ড বোঝা শালপাতা দিয়ে জড়িয়ে আর লতা দিয়ে বেঁধে মাথায় বয়ে নিয়ে আসে। সোজা গিয়ে ঈশান মোক্তারের কুঠিতে কাঠকয়লার বোঝা আছাড় দিয়ে ফেলে। এক বেলার খাটুনির জোরেই সের দুই চাল রোজগার করে ঘরে ফিরে আসে দাশু।

তিন-চারটে দিন কাঠকয়লা টেনে টেনে পার করে দেবার পর আবার ভাবতে হয়। মধুকূপির আকাশের মেঘের দিকে, আর মধুকূপির চারদিকের যত জংলা সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। মধুকূপির ডাংগা আর ক্ষেতগুলির দিকেও তাকায়।

মনে পড়ে, বহেড়া জংগলের কাছেই, যেখান থেকে নতুন রেল লাইনের গুমগুমে শব্দ খুব স্পষ্ট করে শোনা যায়, সেখানে শত শত কচি আর বুড়ো খয়ের গাছের মস্ত একটা জটলা লুকিয়ে আছে। কে জানে, গোবিন্দপুরের কোন্ বাবুর ইজারা হয়ে আছে ঐ খয়েরের জটলা?

টাঙিটাকে শানিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় দাশু। আর, পর পর সাতদিন ধরে খয়েরের ডালপালা আর খড়ের বড় বড় বোঝা ঘাড়ের উপর ফেলে ঘরে ফিরে আসে। মুরলী শুধু ঘরের দাওয়ার উপর চুপ করে বসে তাকিয়ে থাকে। দুটো বড় বড় উনান তৈরী করে এবং উনানের উপর বড় বড় মাটির হাঁড়া বসিয়ে খয়ের জ্বাল দেয় দাশু। খয়েরের কালো কাথ টগবগিয়ে ফোটে। দাশু একাই হাত চালিয়ে কাথ ঘাঁটে। আর, দুটো দিন পরেই দুই হাঁড়া চিটা খয়ের ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডারে নিয়ে গিয়ে ফেলে। বেশি দরাদরি করে না দাশু। খয়েরের বদলে আধ মণ মকাই-এর একটা বোঝা কাঁধে বয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

মাঝে মাঝে, টাঙিটাকে অলসভাবে কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে মধুকূপির ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে অলসভাবে ঘুরেও বেড়ায় দাশু। ঘরে চাল আছে, মকাই আছে; ভাবনা করবার কিছু নেই। দাশুর দুই চোখ যেন আবার [illegible] [illegible] [illegible] নেশায় [illegible] [illegible] মধুকূপির মাটি আর [illegible] [illegible] [illegible] ঘুরতে থাকে। কোথায় কালো কালো দো-আঁশ, কোথায় সাদাটে বেলে, আর লালচে এঁটেল? দাশুর চোখের দৃষ্টিও মাঝে মাঝে যেন থমকে যায়, ডরানির বাঁকের উত্তরদিকে কী চমৎকার বেলে মাটির পরতি এই শাওনেও একেবারে নেড়া হয়ে পড়ে আছে। ছিঃ। মুঠি যদি একটা চিটা দিত, আর বীজ লাংগল দিত, তবে দাশু যে একা খেটে ঐ পরতির পাঁচ বিঘাতেই সোনা ফলাতে পারতো।

অলসভাবে হেঁটে হেঁটে, যেন মধুকূপির মাটির গন্ধে নেশা জমাবার জন্য এক অদ্ভুত পিপাসা নিয়ে ঘুরতে থাকে দাশু। অত দূরে কেন, এই তো কত কাছে, পাকা সড়কটারই লাগাও একটা চমৎকার এঁটেল শাওনে বৃষ্টির জলে কেমন সুন্দর লালচে কাদা হয়ে পড়ে রয়েছে। এই জমিটুকু বিঘা পাঁচেক জমা নিলে ভাল হয়। খুব [illegible] আর করলা ফলাতে [illegible]। আর, কার্তিকের শিশির পড়তেই দুদিন হাল [illegible] [illegible] নিয়ে কপি আর মটর কলাই [illegible] [illegible]। চারদিকে ক্ষিরা ছড়িয়ে দিলেও [illegible] [illegible]।

কিন্তু তার আগে ধণ্ডে বনে একবার মাটির ডো পাকিয়ে নিতে হবে, আর চাই গুলঞ্চের বেড়া।

আগে জমা চাল ফুরিয়ে যায়, তারপর মকাই-এর দানা। সেদিন আবার টাঙিতে শান দিতে দিতে মুরলীর মুখের দিকে তাকায় দাশু।—তু কি ভাবছিস মুরলী?

মুরলী—কিছু না।

দাশু—ভাবছিস্, মকাই-এর দানা ফুরাই গেল, এইবার কিষাণটা জব্দ হবেক।

চমকে ওঠে মুরলী। মুরলীর মনের হিসাবও যেন হঠাৎ বোকা হয়ে যায়। মধুকুপির কিষাণের চোখ দুটোকে যত বোকা মনে করেছিল মুরলী, তত বোকা নয়। মুরলীর এই সময়কে মুখভার, ভাঁজ, ভ্রুকুটি আর সারাদিনের আনমনা চাহনি দেখে বুঝতে পেরেছে দাশু, মুরলী এখনও যেন দাশুর এই অহংকারের পতন দেখবার জন্য মনে মনে একটা আশা ধরে রেখেছে।

দাশু হাসে—তু মিছা ভেবে মনটাকে দুখাচ্ছিস মুরলী। আমি জব্দ হব নাই।

অবিশ্বাস করতে পারে না মুরলী। তবুই দাশুর এই নরম ঠাট্টার শক্ত খোঁচা খেয়েও মুরলীর চোখে আর ভ্রুকুটি শিউরে উঠতে পারে না; দাশুর এই প্রচণ্ড খাটুনির মাতলামি দেখে মায়া হলেও চোখে জল আসতে পারে না। কিন্তু দাশুর হাসির সংগে সায় দিয়ে হাসতেও পারে না।

—আমি আসছি। টাঙিটা কাঁধে তুলে ঘর থেকে বের হতে গিয়েই চমকে ওঠে, আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায় দাশু।

কড়কড় করে একটা বাজ ফেটেছে। ডাঙ্গার তালগাছের মাথার উপর চিলের ঝাঁক এলোমেলো হয়ে উড়ছে। আর, কালো মেঘের চাপ গলে গিয়ে জটার মত লম্বা হয়ে কপালবাবার জংগলের উপর ঝুলছে। মধুকুপির ক্ষেত মাঠ আর জংগলের সব সবুজ যেন কালিমাখা হয়ে ঘুটঘুট করছে। মধুকুপির সকাল বেলাটাই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে সন্ধ্যার চেয়েও বেশি কালো হয়ে গিয়েছে।

ডাঙ্গার তালগাছগুলিকে প্রায় শুইয়ে দিয়ে একটা ঝড় ছুটে এল। শিলা ঝরছে। কনকনে ঠাণ্ডা বরফের গোলকের মত এক একটা আধসেরী শিলা। ঈশান মোক্তারের খাটালে গরুর চিৎকার করুণ হয়ে ছটফট করতে থাকে। তার পরেই শাওনের অঝোর বৃষ্টির শব্দে মধুকুপির সব শব্দ চাপা পড়ে যায়।

জামকাঠের দরজার কাছে চুপ করে এক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। আর ঘরের ভিতরে খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর গম্ভীর মুরলী।

এই বৃষ্টি কি থামবে? দাশুর ভাবনার এই প্রশ্নটাকেই যেন ঠাট্টা করে চমকে দিয়ে মধুকুপির আকাশে একটা বিদ্যুতের চমক ঝিকমিকিয়ে উঠলো। তার পরেই আরও জোর বৃষ্টি। দেখতে থাকে দাশু, পাকা সড়কটাও যেন একটা স্রোতের ঢল হয়ে গলে গলে ভেসে যাচ্ছে।

কতক্ষণ চুপ করে জামকাঠের দরজার কপাটে গা ঠেসে দাঁড়িয়ে আছে দাশু, সে-কথা মনে পড়তেই দাশুর ভাবনাটা যেন দুরদুরু করে কেঁপে ওঠে। বেশ বেলা হয়েছে, নিশ্চয় চার-পাঁচ ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে। দেখতে পায় দাশু, একটা মাকড়সা এরই মধ্যে দাশুর হাতের স্তব্ধ টাঙ্গি আর দাশুর মাথার চুলের সংগে একটা জাল জুড়ে দিয়ে তরতর করে আসছে, যাচ্ছে আর নাচছে। দাশুর ভাগ্যটা কি আবার একটা পরীক্ষার ভ্রুকুটি দেখতে পেয়ে ভয় পেয়েছে আর অনড় হয়ে গিয়েছে? তা না হলে এই মাকড়সাটা কেন......।

মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভিতরে তাকায় দাশু। চমকে ওঠে দাশু। ঠাণ্ডা উনানের উপর হাঁড়ি চাপিয়ে উনানেরই কাছে চুপ করে বসে আছে মুরলী। আংগুলের নখ দিয়ে মেঝের মাটিতে দাগ কাটছে মুরলী। মুরলীর জীবনের হিসাব আবার দাশুর ঘরামির অহংকার ভাংগবার আশায় যেন নতুন হাসি হাসছে। বিদ্যুৎ চমকায়; দেখতে পায় দাশু, হাঁ ঠিকই, মুরলী যেন মাথা হেঁট করে মুখ লুকিয়ে হাসছে। আজ দাশু ঘরামির এই সাধের ঘর উপোস করবে। এক দানা চাল আনবার সাধ্য নেই, উপায় নেই দাশুর। আজ আবার মুখ টিপে হেসে দাশুকে প্রশ্ন করতে পারবে মুরলী, কি গো মধুকুপির কিষাণ, মুরলীকে এইবারকার মত না খাইয়ো জানানে দেখাবে ফেরৈবাটা কাঁহাতে হেং?

মাটির কানিয়ে শব্দ ছাপিয়ে আর একটা শব্দ। এই শব্দ যেন বড় কান্না, আর যেন কান্নায় সব পাথর পাঁজরে দাগা দিয়ে, মধুকুপির ডাঙ্গার পাঁজর কাঁপিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটে আসছে।

—হাড়ুপা বান! চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। এই ভয়ানক শব্দের হুড়মুড়ে গর্জানির মধ্যেই চাপাচাপা দাশুর আর্তনাদের মত একটা করুণ হাহাকার শোনা যায়।—হাড়ুপা বান! সারা মধুকুপির আকাশকে মাতিয়ে ডিহেরে কাঁপছে আর টেংগার মাটি মেরে দিন পিটিয়ে হাড়ুপা বানের হুঁশিয়ারী জানান দিতে শুরু করেছে।

হাড়ুপা বান। পাগল হয়েছে ভৈরানি। জানে দাশু, বছরে অন্তত একটি দিনে ভৈরানি এই পাগলাপানা কাণ্ডটি করে। দম করে দশটি পাহাড়ের গা থেকে জলের ঢল গড়িয়ে পড়ে ভৈরানির জলকে হঠাৎ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পাগল করে দেয়। দশ হাত বিশ হাত উঁচু জলের হুড়পা নিয়ে দু-পাশের জংগল ভেঙে ভাসিয়ে গড়িয়ে আর ঠেলে নিয়ে ভৈরানির বান ছুটে আসে। আর ছুটে এসে ঠিক এই মধুকুপির ক্ষেত আর ডাঙ্গার উপর ছড়িয়ে পড়ে। কিষাণের ঘরের আঙিনার ভিতরেও কলকল করে জলের তোড় তেড়ে আসে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবে দাশু। কি-যেন মনে পড়েছে দাশুর। ঘরের ভিতর থেকে চোপের দড়ির একটা পুঁটলি হাতে তুলে নিয়ে বের হয়ে আসে দাশু। তারপর

সেই শাওনে বৃষ্টির অঝোর ধারার ভিতর দিয়ে ছুটে চলে যায়।

ডরানির ছোট পুলের কাছে এসে যখন থমকে দাঁড়ায় দাশু, তখন বৃষ্টির জোর একটু ক্লান্ত হয়ে এসেছে। কপালবাবার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কি-যেন বিড়বিড় করে। তার পরেই সড়ক থেকে নেমে ডরানির জলের কিনারায় এক কোমর জলের উপর শক্ত হয়ে, চোপের দড়ির মুখে ঢেলা বেঁধে নিয়ে মেছুয়া শিকারীর মত তাক ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

এক ঘণ্টাও সময় লাগে না। দাশুর কল্পনার আশাকে যেন অজস্র দানে ভরে দেবার জন্য বানভাসি ডরানির জলের উপর দিয়ে বাঁশের ছোট ছোট পাহাড় ভেসে আসতে থাকে। একবার, দু'বার, তিনবার। দু'বার ব্যর্থ হয়, তিনবারের খেপ ব্যর্থ হয় না। চোপের দড়ি ছুঁড়ে বাঁশের একটা বড় টাল আটক ক'রে ডাঙার উপর টেনে তোলে দাশু।

বাঁশের টাল টেনে নিয়ে ঈশান মোক্তারের ভাণ্ডারে জমা দিতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। তার পর আড়াই সের চাল নিয়ে মধুকুপির সেই জামকাঠের দরজার কাছে গিয়ে আবার দাঁড়াতে আধ ঘণ্টারও কম সময় লাগে।

দাশু বলে—উনানে আগুন দে মুরলী।

উনানে আগুন দেয়, হাঁড়িতে চালও ছাড়ে মুরলী। তার পরেই হাঁটুতে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলে। (ক্রমশ)

রবীন্দ্র সঙ্গীত

কৃষ্ণ ধর

নদীর অনেক কথা, আকাশের রঙ
পলাতক বসন্তের মায়াবী আলোক
কোথা থেকে এসে যেন করবী চাঁপার ডালে ডালে
প্রণয়ের হার হয়ে দোলে॥

অনেক হারানো দিন,
অদেখার কণ্ঠস্বর যেন,
সোনালী রোদের স্রোতে মেলে দিয়ে ডানা,
হৃদয় দেহলীতটে পেয়েছে ঠিকানা॥

পথ চেয়ে বসে থাকে যে শবরী দিন
সন্ধ্যার অঙ্গনে জ্বলে শতভিষা তারা,
সময় সমুদ্রতীরে অনন্তের রূপমুগ্ধ মন,
আজ যেন হয়েছে আপন॥

পলাশ তেমনি আছে,
রক্তমাখা মেলে কৃষ্ণচূড়া,
এ সুরে উতলা হলো আকাশের মেঘের অঙ্গন
বৈশাখেই এলো যে শ্রাবণ॥
জীবনের মুগ্ধ ছবি,
হৃদয়ের মৌন ইতিহাস,
পাতা খুলে পাঠ দেয়, অত্যাশ্চর্য মহত্বের দান
এ তোমার গান॥

একশো বছর পরে,
তেমনি ফুটবে ফুল গান গা'বে পাখি,
এ সুরে উচ্ছল হয়ে, হৃদয়ের উজ্জ্বল ইঙ্গিতে
জীবনেরে অমৃতের স্পর্শ দেবে রবীন্দ্র সঙ্গীত॥

আষাঢ়ে দিন

সানাউল হক

পড়বার নেই লিখবার নেই
মন্থর দিন ফাঁকা--
জমাট সবুজ একঘেয়ে দিন
গিজ্ গিজ্ ঘাসে ঢাকা।

ছাতা চুঁয়ে-চুঁয়ে মাঠ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
জলঝরা অবিরাম--
আলসাঘন অকেজো এদিনে
চোখ ভ'রে দেখলাম।

তাড়াহুড়ো নেই,   হুহু হাওয়া নেই
ঝুপঝুপ জলপড়া--
বায়স-করুণ ভিখিরিনী দিন
একঘেয়ে সুরধরা।

দেখতে কি চাও?   বাইরে তাকাও
ধারাবাহিকতা ছবি--
আবছা সবুজ মাঠের শিয়রে
গুম হ'য়ে আছে সবি।

লতাপাতাপাখি কেউ নেই বাকি
মাথা গুঁজে সব ভিজে
পাখাঝাড়া নেই, শিস দেয়া নেই
রয়েছে ওদের কি যে!

বুক বাঁধবার চোখ মুছবার
সংশয় লাজ নেই;
ভিজবার আর ভেজাবার দিনে
পেলাম না তোমাকেই।

রাধা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

চোখ তার চোখ নয় জলে ভরা হ্রদ,
মুখ তার মুখ নয় যেন কোকোনদ,
ঠোঁট তার ঠোঁট নয় গোলাপের দল,
দেহ তার দেহ নয় নবনী কোমল।

অভিসারে যায় দেখি নিত্যই সে যে,
রঙের প্রলেপ মেখে উন্মেল সেজে,
চোখে তার ভাবে ভরা কাজল গভীর,
ঠোঁটেতে কুন্দ-হাসি চির-অস্থির।

গোপন কুঞ্জে কোন সে যবে দাঁড়ায়,
কে বলবে রাধা নয় সাক্ষিকা রায়।

॥ তিমিরান্তক ॥

শক্তি দাশগুপ্ত

(ভারতীয় দূতাবাস, অস্ট্রেলিয়া)

দশ বছরের কথা।

আর তার বেশ অনেক বছর আগে রণপা বাড়িয়ে এসেছিল পশ্চিম থেকে পূবে যে স্ফীতকায় এক সর্বগ্রাসী লেলিহান ক্ষমতা, ন্যুব্জ হ'ল সে একদিন নিজের ভারে, লোভের সংঘাতে।

ডুবে গেল পৃথিবীর শেষ শক্তিশালী সাম্রাজ্যের সূর্য পশ্চিম সাগরে।

নতুন সূর্যের আলো দেখা দিল ক্ষীণ রেখায় পূবের আকাশে। দশ বছর আগে। ভারতবর্ষে।

অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া পশ্চিম মানল না।

তাই গুমরে গুমরে কেবলই ওঠে এক হতশ্বাস স্তিমিত গর্জন, পূবে যা দেখছ, সে আলো আমারই দেওয়া। আমারই সূর্যের আলো খানিকটা ছিটিয়ে দিয়েছি ওই দেশে, বিদায় নেবার আগে। সেই আলোটুকুকেও আঁকড়ে সে রাখতে পারছে কই?

লোক-ভোলানো দম্ভের কথা নয়। দশ-বছর-আগে-পর্যন্ত-দুশো'-বছরের-রাজত্ব-করা আমাদের প্রভু ইংরেজ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সে কথা। আর সারা দুনিয়াকে চায় বিশ্বাস করাতে।

দু'শ বছর ধরে আমরাও প্রায় সকলে মেনে নিয়েছি নির্বিবাদে, আলোর আভাস যদি পেতে হয়, উত্তাপ যদি অনুভব করতে হয়, তবে তা আহরণ করতে হবে পশ্চিম থেকে।

দু' একজন শুধু বুঝেছিলেন, বাইরের একটা প্রচণ্ড ঐশ্বর্যের জাঁক চোখ দিচ্ছে ঝলসে, ভিতরে ঢুকে আসল জিনিস দেখতে দিচ্ছে না।

ধাঁধাঁ একেবারে আজও কেটে যায়নি। আজও সারা এশিয়ার এবং ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের বহু লোক মনে করেন, সভ্যতামার্গে দ্রুত চলবার ঠিক যানবাহনটির খোঁজ পেয়েছে একমাত্র য়ুরোপ ও আমেরিকা। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার যোগ্যতা আমাদের হবে না কোনদিন।

আমরা আজও নিজেদের বিচার করবার চেষ্টা করে থাকি পশ্চিমী চশমা চোখে লাগিয়ে। চূড়ান্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বজাবাহী পশ্চিমীরা আগে কি বলেছিলেন এবং আজ কি বলেন, সেটাই দেখা দেয় পর্বতপ্রমাণ হয়ে। ইতিহাসের দুর্জ্ঞেয় তুচ্ছতাগুলি আমাদের চোখ যায় এড়িয়ে।

কিন্তু পশ্চিমী সভ্যতা বলতে আমরা কী বুঝি? পশ্চিমের লোক কারা? এবং পশ্চিম থেকে কতটুকু আলো আমরা পেয়েছি?

রুশ বিপ্লবের দশ বছর পরে গর্কীর কথা

মনে পড়ে রুশ বিপ্লবের দশ বছর পরে ম্যাক্সিম গর্কীর লেখা একটি প্রবন্ধ। গর্কী আরম্ভ করেছিলেন এইভাবে: "য়ুরোপ থেকে বিদেশীরা দেখতে আসেন সোভিয়েট য়ুনিয়ন। রুশবাসীদের মধ্যে তাঁরা কাটান দু' তিন সপ্তাহ আর তার পরে ফিরে গিয়ে গল্প করেন কি তাঁরা দেখলেন। তাঁরা তাঁদের গল্প বলেন এমনভাবে যেন অসাধারণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁদের মন—এত অন্তর্ভেদী যে, ষোলো কোটি মানুষের একটা দেশে সাংস্কৃতিক প্রগতি হচ্ছে কতখানি, তার সমস্ত কিছু বুঝে নিতে তাঁদের সময় লাগে এই গোটা কুড়ি দিন; বিশেষ ক'রে সেই দেশের সভ্যতা, যার অতীত সম্বন্ধে তাঁরা জানেন খুবই কম এবং যার বর্তমান সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব ও আবেগ বৈরতাপূর্ণ। ভাল জিনিসের চেয়ে খারাপ জিনিস অনেক বেশি উৎসাহ এবং আনন্দের সঙ্গে করবার এবং বুঝবার সামর্থ্য ইতিহাস জুগিয়েছে মানুষের মনে; সুতরাং এ ত' অতি স্বাভাবিক যে সোভিয়েট গভর্নমেন্টের "ভুল" ও "ভ্রান্তি" রুশীয় জনগণের "অ-সাংস্কৃতিক" অবস্থা ("uncultured" state) এবং সাধারণভাবে তাদের কুৎসিত বহু পাপদোষ—এই সমস্ত লক্ষ্য করা এবং তার উপর জোর দেওয়াতেই আমাদের অভ্যাগত বন্ধুগণ আনন্দ পাবেন বেশি।"

তারপর গর্কী বলেছেন: "আর একটি জিনিস যা রাশিয়া সম্বন্ধে ধারণাকে প্রভাবিত করে, তা হ'ল য়ুরোপীয়দের বহু-

দিনের একটা ব্যাধি; এবং সে ব্যাধি হ'ল রুশদের উপর তাদের আপন শ্রেয়তার অস্বাভাবিক রকম আতিশয্যপীড়িত এবং ক্ষ্যাপাটে আকারের স্ফীতিপ্রাপ্ত একটি সচেতনতা। রুশ জনগণের যাবতীয় সব কিছু সম্পর্কেই গভীর অজ্ঞতাই এই ব্যাধির কারণ। এবং স্বভাবতই, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির প্রতিভূগণের পক্ষে রাশিয়াকে সাধারণভাবে—আর বিশেষ ক'রে বর্তমান রাশিয়াকে—ভুল বুঝবার এই আশ্চর্য ক্ষমতা আরও বেড়ে যায় এই জন্য যে Beraud, London প্রমুখ ওই গোষ্ঠীর সবাই মেনে চলেন তাঁদের প্রেরণ কর্তাদের ইচ্ছা, যদিও আমি মেনে নিতে প্রস্তুত আছি যে এই ধরনের কাজ করতে গিয়ে তাঁদের নিজের ইচ্ছাকে দিতে হয় বলি।

"এই সব কারণে, রুশ জীবনের অনুসন্ধানীগণ যখন খোলাখুলিভাবে ঈর্ষাদ্বেষ না দেখিয়ে তাঁদের গল্প বলেন, তখন হয় ইচ্ছে ক'রে নতুবা না জেনে বা না ভেবেচিন্তে বলবার জন্যে, এবং শ্রেণীগত মনোভাবের ফলে—তাঁরা ভুলে যেতে বসেন যে কী কঠিন ও জটিল অবস্থার মধ্যে দিয়ে সোভিয়েট গভর্মেণ্ট য়ুরোপীয় যুদ্ধ ও গৃহ-যুদ্ধে গুঁড়িয়ে-যাওয়া আর্থনীতিক জীবনই ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা শুধু করছেন না, এছাড়াও একটা নতুন সংস্কৃতিকে গড়ে উঠতে দিচ্ছেন। আর "বাধা প্রদানকারী" শক্তিগুলি রাশিয়াকে লুটে নেবার ও পঙ্গু ক'রে দেবার জন্যে যে কতখানি সক্রিয়, সে বিষয়ে এ সব গল্পকার সম্পূর্ণ নীরব।

"এই দশটা বছরের মধ্যে মাত্র ছ'টা বছর যে সোভিয়েট গভর্মেণ্ট গঠনমূলক কাজে লাগাতে পেরেছেন, সে বিষয়েও তাঁরা সম্পূর্ণ নীরব। বাকী চারটা বছর ত' গৃহযুদ্ধ মেটাতেই গেছে। সে গৃহযুদ্ধ দেশকে আরও অনেকখানি দৈন্যের মাঝে ঠেলে দিলেও সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে স্থিরচিত্ত ক'রে তুলতে সাহায্য করেছে, তাদের বেশ খানিকটা মোহ ভেঙে দিয়েছে, এবং একটা নতুন চেতনাবোধে তাদের উদ্দীপিত করেছে।"

গর্কীর মতে, লেনিন এবং তাঁর সঙ্গীরা যদি সেদিন দুরন্ত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বলশেভিক পার্টিকে একেবারে শীর্ষে ঠেলে না তুলতেন, তবে রাশিয়া একেবারে চুরমার হয়ে যেত, য়ুরোপীয় পুঁজিবাদীদের হাতে তাকে লিখে দিতে হ'ত দস্তখৎ। দেশকে সেদিন বাঁচিয়েছিলেন লেনিন।

গর্কী দেখিয়েছেন বলশেভিক পার্টি যেদিন শক্তি হাতে নিল, দেশের অবস্থা সেদিন কি ছিল। তারপর গর্কী একটার পর একটা প্রায় নম্বর মেরে বর্ণনা ক'রে গেছেন চার বছর দুর্যোগের পরে রাশিয়ার জনগণ কি কি সাফল্য অর্জন করেছে এবং আপন সৃষ্টির শক্তিতে তারা কিভাবে কাজ করছে, নতুন দুনিয়া গড়ে তোলার আনন্দে।

পশ্চিমী শক্তি কারা?

গর্কীর এই "দশ বছর"—শীর্ষক গোটা প্রবন্ধটাই আজ আমাদের প্রত্যেকের পড়ে দেখতে পারলে ভালো। একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রতি পশ্চিমী শক্তি-গুলি যে হাবভাব এবং নীতি গ্রহণ করেছিল, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের প্রতিও প্রায় ঠিক একই নীতি সমানে চলেছে। শুধু অবস্থা-ভেদে তার একটু প্রকারান্তর দেখা যায় মাত্র।

এই অবস্থাভেদের বিশ্লেষণ করার আগে দেখা দরকার পশ্চিমী শক্তি বলতে আমরা কোন্ গুলোকে বুঝতাম এবং আজ কোন্-গুলোকে বুঝি এবং সমগ্র য়ুরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক ব'লে নিজেদের জাহির করবার অধিকার এদের আছে কতটুকু। হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া বা বুলগারিয়া, এমন কি, পোল্যাণ্ডকে পর্যন্ত য়ুরোপীয় শক্তি বা য়ুরোপীয় সংস্কৃতির দিক থেকে কোনদিন গণ্য করা হয়নি। দুনিয়ার ভাগ্যবিধাতা ব্রিটিশ-প্রধান-মন্ত্রীর আসনে বসে য়ুরোপের মানচিত্রে লয়েড জর্জ পোল্যাণ্ডকে হাতড়ে খুঁজেছিলেন রাতকাণার মতো, ইতিহাস সে কথা মনে রাখবে তীব্র শ্লেষের হাসি হেসে। য়ুরোপীয় শক্তি বলতে সবাই বুঝতো তাদেরই, একটা দানবীয় হাঁকডাক ছেড়ে যারা প্রচার করেছে নিজেদের আধিপত্য, ঘটিয়েছে যুদ্ধ-বিপ্লব। যারা অগণিত নরনারী, শিশু হত্যা করেছে, কোটি কোটি মানুষকে পিষে দিয়ে রক্তের উপর গড়েছে আপন মহিমার সৌধ, ছড়িয়েছে চোখ-ধাঁধানো ঐশ্বর্যের দীপ্তি। মনে রাখতে হবে এই কয়েকটি মুষ্টিমেয় জাতি নিজেরাই নিজেদের ছিঁড়েকুটে খেয়েছে শকুনের মতো য়ুরোপ-ইতিহাসের চিরযুগ ধরে। সে হানাহানি হয়ে উঠল তুমুল যখন তাদের চোখে পড়ল বিরাট শবের মতো পড়ে আছে দুটি মহাদেশ—এশিয়া, আফ্রিকা।

এই হানাহানির আদিপর্বান্তে প্রবল হয়ে দেখা দিল গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী আর জার্মানী। রাশিয়াতে জারের সাম্রাজ্য ঘায়েল হয়েছিল জাপানের হাতে, তারপর বিপ্লবের ধাক্কায় পড়ল ধ্বসে। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, পর্তুগাল এবং স্পেন এদের ছোট সাকরেদ। লোভী সাম্রাজ্যবাহী এই কয়েকটি জাতি সংস্কৃতি ও শান্তিরক্ষার নামে শান্তিতে থাকতে দেয় নি কাউকে—না দুনিয়াকে, না য়ুরোপকে। পোল্যাণ্ড খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়েছে বারবার। প্রথম মহাযুদ্ধের পর, যা ছিল একদা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, ম্যাপে আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। করা হল তাকে ঠিক সাত টুকরো। ছিন্নাঙ্গ হাঙ্গেরীর ক্ষোভ সেই সময়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ডাকটিকিট, চিঠির খাম, পোস্টকার্ড, দেয়ালের বিজ্ঞাপন, খাবার প্লেট, সমস্ত কিছুর উপর, এমন কি তকমা এবং বোতামের উপর পর্যন্ত লেখা হত: "Maradhet ez igy?" (এমন কি থাকতে পারে?) "Nem! Nem! Soha!" (না! না! কখনোই না!)

ম্যাপ থেকে চিরদিনের মতো উড়ে গেল

সার্বিয়া আর মন্টেনিগ্রো। দেখা দিল ক্ষুদে ক্ষুদে নতুন রাষ্ট্র—যুগোস্লাভিয়া, ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া লিথুয়ানিয়া। এদের দেওয়া হল ন্যাশনালিটি অর্থাৎ জাতীয়তা অথবা জাতীয় শাসনভার। মধ্য য়ুরোপটাকে খণ্ড খণ্ড করা হল জাতীয়তার মাপকাঠি দিয়ে। কাটাছেঁড়া করা এবং জোড়াতালি দেওয়ার পাণ্ডা ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের অগ্রহানি হল না। ভাগে এ'রা পেলেন কিছু উপরি দক্ষিণা।

তবু ন্যাশনালিটির সমস্যা মিটল না। নতুন চেকোস্লোভাকিয়াতে থেকে গেল তিরিশ লক্ষের উপর জার্মান, পাঁচ লক্ষ ম্যাগায়ার (Magyars—Hungarians) এবং আরও অন্য জাতের কিছু কিছু। নতুন পোল্যান্ডের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ হল পোল; বাকী এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে রইল অনেক য়িহুদী, জার্মান, য়ুক্রেনীয় রুশ, লিথুয়ানীয় এবং আরও অনেক জাত। যুগোস্লাভিয়াতে লেগে রইল কলহ সার্ব (Serbs) এবং ক্রোট (Croats) সম্প্রদায়ের মধ্যে। রুমানিয়াতে থেকে গেল বহু জার্মান, ম্যাগায়ার এবং য়িহুদী। ইতালীর নতুন সীমান্তগুলি আনল কিছু জার্মান, অস্ট্রিয়ান এবং বহু-সংখ্যক স্লাভ। ফিনল্যান্ডের উপকূলে দেখা গেল সংখ্যালঘু কিছু সুইডিশ।

সংখ্যালঘুদের রাষ্ট্রীয় অধিকার যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তার জন্যে মধ্য ও পূর্ব য়ুরোপের এই সব ছোট ছোট রাষ্ট্রকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হ'ল নানা সন্ধিপত্র। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি তাদের মানাতে বাধ্য করার কোন সার্থক উপায় ছিল না। অতএব কাগজের উপর কালির আঁচড় হয়েই তা রইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীও হল দ্বিখণ্ডিত।

বাইরে ভারতের রূপায়ন

য়ুরোপ-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেই বোঝা যায়, ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হ'ল কেন। ভারতীয় নেতৃত্বে দেশীয় রাজাগুলিকে যদি টেনে না নেওয়া যেত, তবে এদেশের প্রায় ছ'শ' টুকরো নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি বাধিয়ে তুলত।

ততখানি না ঘটুক, অন্তত খণ্ডিত ভারতের দু'টি অংশের মধ্যে বিবাদ যে বার বার ঘনিয়ে উঠছে, য়ুরোপের সাম্রাজ্য-শাহীদের কাছে সেটা অনেকটা সান্ত্বনার বস্তু। য়ুরোপ এক হতে পারেনি। কিন্তু য়ুরোপের ওই শক্তিগুলি বুঝেছে যে সাম্রাজ্যার্জনিত অত্যাচারের চাপে এশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে একটা দুর্নিবার ঐক্যের ধারা বয়ে চলেছে। সেটাকে রোধ না করতে পারলে য়ুরোপের শাসক ও শোষক শক্তি-গুলির কয়েক শতাব্দীর যত্নে অর্জিত ক্ষমতা ও সম্পদ হ'য়ে উঠবে বিপন্ন, এমনি একটা দুরন্ত ভয়ে দিশা হারিয়ে ফেলেছে তারা। তাই একটা প্রলয় বাধিয়ে দেওয়া দরকার, তা কোরিয়াতেই হোক, বা কাশ্মীরে।

যে য়ুরোপ শান্তি কাকে বলে জানল না কোনদিন, যেখানে ১৯১৪ থেকে ১৯৪৫ এই একত্রিশ বছরের মধ্যে দশ বছর কেটেছে শুধু মানুষ-মারার যজ্ঞে, সেখানে আজ চলেছে একাত্মবোধ সৃষ্টির চেষ্টা। 'হোয়াইট ম্যানস্ বার্ডেন'-এর নামে দুনিয়াতে অনন্ত-কালের জন্য অখণ্ড নেতৃত্বের অহমিকায় আত্মবিস্মৃত হয়েছে যারা, তারা আজ বিশ্বাস করতে পারে না যে এশিয়ার রাষ্ট্র-গুলি শান্তির মধ্যে দিয়ে শুধু নিজেদের গড়ে তুলতে চায় নির্লোভ শ্রমের মূল্যে। বিশেষ ক'রে কিছুতেই তারা সহ্য করতে পারে না ভারতবর্ষের কোনরকম প্রগতি।

বাইরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে প্রচারকার্য চলে এসেছে, তাতে স্তব্ধ হ'য়ে যেতে হয়। দু'শ' বছরের পরাধীন এই দেশে কোন ভালো হোটেল, এমন কি তেমন কোন বড় শহর আছে কি না, ডাক্তার এবং ওষুধপত্রের সুবিধা আছে কি না, এমন অস্বাভাবিক প্রশ্নও শুনতে হয় তথাকথিত ইংরেজী-ভাষী দেশগুলোতে। দু'শ' বছর রাজত্ব ক'রে গেল যারা আমাদের উপর, সে দেশেরই অনেক শিক্ষিত ইংরেজ শুনলে অবাক হ'য়ে যায় যে আমাদের একটি নিজস্ব জাতীয় সঙ্গীত আছে, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত "গড সেভ দি কুইন" নয়। শুনলে অবাক হতে হয় যে, আমাদের পঞ্চমবর্ষীয় যোজনাতে উন্নতির চেষ্টা চলছে এবং বিজ্ঞান চর্চার ষোলটি ল্যাবরেটরীতে বিশিষ্ট ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করছেন। শুনে প্রথমটা অবাক হতে হয়; কেউ কেউ চাপবার চেষ্টা করে অবিশ্বাসের হাসি হেসে। প্রশ্ন করে স্বাধীনতার পরে নেতারা দেশটাকে ঠিকমতো চালিয়ে যেতে পারছেন কি না। এবং নিজেরই প্রশ্নের উত্তরে, ব্রিটিশ সরে পড়বার জন্যে কোন অসুবিধে হয়নি শুনে ম্লানমুখে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, ভাল, খুবই ভাল কথা। ভিখারীতে ভরা দেশ ভারতবর্ষ এবং এই গরিব ভিখারীর দেশের সমস্যা অগুণতি এবং বড়ই জটিল, অত্যন্ত মুরুব্বিচালে এ জাতীয় কথা ফস্ ক'রে কোন ভারতীয়ের মুখের উপর ছুঁড়ে মারাকে ওরা তিলমাত্র অশোভন মনে করে না, তাতে ওদের তিলমাত্র সংকোচও নেই। কিন্তু সেই ভারতীয়টি যথোচিত জবাব দিতে গিয়ে যদি দেখিয়ে দেয় যে লোকসংখ্যার শতকরা হিসাব নিলে, ভারতবর্ষে ৩৬ কোটি মানুষের মধ্যে যতজন ভিখারী পর্যায়ে পড়ে, পশ্চিমী সভ্যতার শীর্ষে আছে যে সব দেশ তাদের তুলনায় বোধ হয় ভারতবর্ষ অকথ্য কোন একটা খারাপ অবস্থায় পড়ে নেই, আর সমস্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে, ভারতবর্ষের সমস্যা যতই হোক না কেন, ছ'বছরব্যাপী একটা বিশ্বযুদ্ধের সমস্যার চেয়ে যে তা বহু এবং জটিল নয়, এ রকম উত্তর তাদের ভালো লাগে না। তারা মনে করে লোকটি অতি রূঢ়।

ওরা উপদেশ দেবে, জাতিগুলির

পরস্পরকে জানা উচিত, তাহ'লে জাতিগত বিদ্বেষ যাবে কেটে, বাধবে না যুদ্ধবিগ্রহ। কিন্তু এতটুকু ভেবে দেখবে না যে, ওরা নিজেরা আমাদের বিষয়ে সত্য খবর জানবার চেষ্টা ক'রে থাকে কতটুকু! আর অন্যদিকে দু'শ' বছর ধরে আমরা প্রাণপণে পশ্চিমী সভ্যতাকে কীভাবে বুঝে দেখবার চেষ্টা করেছি তন্ন তন্ন ক'রে, আজও করে চলেছি।

ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের অন্য দেশ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা থেকে এই পশ্চিমী দেশগুলির সাধারণ লোকের ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঔৎসুক্যের প্রভেদ অতি গভীর। কোনও নামজাদা বিজ্ঞব্যক্তি ছাড়া যে কোন লোকের কাছ থেকেই কোন দেশ সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছা আমাদের নেই এবং তখনও সেই দেশটি সম্বন্ধে ততটুকুই আমরা জানতে চাই, যতটুকু তার ভালো। কিন্তু পশ্চিমী সভ্যতার ধ্বজাধারী দেশগুলো

•থেকে যে কোন টম, ডিক, হ্যারী তিন চার সপ্তাহ ভারতবর্ষ শফর ক'রে গেলেই বহু জায়গায় বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেয়ে থাকে। মুরুব্বিচালে সে বলে যায়—ভারতবর্ষে ব্রিটিশের অনবদ্য দু'টি দান, একটি তার জাতীয় ঐক্য এবং অপরটি ডেমোক্রেসী অর্থাৎ গণতন্ত্রতার মন্ত্র। তারপর তার মাথায় যতটা ঢুকেছে ভারতীয় সমস্যাগুলির উল্লেখ ক'রে বলে, ব্রিটিশের মন্ত্রে দীক্ষিত নেতারা কাজ ভালই করছেন, ভারতবর্ষের লোক ক্রমশই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে, ভারতীয় মেয়েরা পাশ্চাত্য প্রসাধনদ্রব্যের ব্যবহার করছে বেশি ক'রে—এই রকম আরও অনেক কিছু।

এ সব কথা শ্রোতারা মন দিয়ে শোনে। এই সবই তারা শুনতে চায়। এই সবই তাদের ভালো লাগে।

এইভাবে বিশ্বজনকে আজ তারস্বরে শোনানো হ'য়ে থাকে যে, বিনাদ্বন্দ্বে ভারতের মাটি ছেড়ে গেল ইংরেজ, অর্পণ ক'রে গেল স্বাধীনতা আপন মহানুভবতায়, আর রেখে গেল সে মাটিতে তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি, সবচেয়ে বড়দান—নির্বাচনীয় গণতন্ত্ররাজ অর্থাৎ পার্লামেণ্টারী ডেমক্রেসী।

শোনানো হয়, ভারতবর্ষ যদি দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে থাকে তবে তা ইতিহাসের অমোঘ পন্থানুসরণ, ভিন্নপন্থী জাতীয়তাকামীর পরিতুষ্টি ও পরিপুষ্টি সাধনে সহায়তা মাত্র।

ভারতের বাইরে থেকে না দেখলে বোঝা যায় না যে আমাদের সম্বন্ধে কী অজ্ঞতার তিমিরে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে ব্রিটিশ সারা দুনিয়াকে, আর আজও করছে। আর দেশের মধ্যে বহু দুঃখ, দৈন্য ও সংগ্রামের সান্নিধ্যে বোঝা দুষ্কর যে এই দশটা বছর দুরন্ত ঝড় ঠেলেও আমরা এগোতে পেরেছি কতখানি।

শতাব্দীর ভারে জীর্ণ আত্মম্ভরিতা ও আত্মতুষ্টি আর অতিস্ফীত আত্মশ্রেয়তা-বোধের অনিবার্য পরিণামে দেখা দিয়েছে এক ভয়াবহ ক্ষয়োন্মুখতা। তারই ফলে পশ্চিমী বিদ্বেষবিষ এসে পড়ছে আমাদের উপর।

পাল্টা বিদ্বেষ পোষণ ক'রে লাভ নেই। রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক-জাতীয়তাবাদের প্রতি স্ট্যালিনের মারাত্মক নীতি লক্ষ্য ক'রে লিখেছিলেন লেনিন: "সাধারণভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিদ্বেষ অতিশয় খারাপ জিনিস ("Spite as a rule is a very bad thing in politics."—Note of 30-12-1922).

আজকের জাতীয় আন্তর্জাতীয় কোন ক্ষেত্রেই ঈর্ষা বা বিদ্বেষের কোন স্থান নেই। ইয়োরোপের কোনরকম অবনতি আমাদের কাম্য হ'তে পারে না।

শুধু, যা ঘটে এসেছে এতদিন ধ'রে আর যে বিদ্বেষ বর্ষিত হচ্ছে আজ, তাকে বুঝতে হবে, তার কারণ খুঁজতে হবে, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপক্ষপাত ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে। একমাত্র তবেই হয়তো-বা একদিন প্রভুত্বপরায়ণ পশ্চিম শান্ত হ'য়ে আসবে, ধীর মস্তিষ্কে বুঝবার চেষ্টা করবে আমাদের, ঠিক যেমন আমরা চেষ্টা ক'রে থাকি তাদের সমস্ত কিছুকে বুঝবার।

দু'শ' বছর শাসনের পর

ভারতবর্ষের শাসনভার ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট বস্তুত গ্রহণ করেন আজ থেকে একশ' আশি বছরেরও আগে, ১৭৭৩ সালে। যদিও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা দিয়ে সাম্রাজ্যের ভিত বসানো হয় ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর।

কিন্তু দশ বছর আগে, ব্রিটিশ অপসৃত হওয়ার সময়, জাতিকে দেখা গেল বহুভাবে বিভক্ত। বহু ধর্ম, হিন্দু সমাজে অনেক জাতি ও মুসলমানের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়, প্রাদেশিকতা, সামরিক ও অ-সামরিক জাতি এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া আর দেশীয় রাজ্যের শাসক বনাম প্রজাজনের ভিত্তিতে দেশ খণ্ড বিখণ্ড। ছোট বড় মিলিয়ে এই দেশীয় রাজ্যগুলির সংখ্যা যে ছিল কত, আজও পর্যন্ত তা সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন লেখক ও ঐতিহাসিকের অনুমান পাঁচশ' থেকে ছ'শ'র মধ্যে যে কোন একটা সংখ্যাকে ধরে নিয়েছে। ১৯২১ সালে ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ্ সংখ্যাটিকে ধরেছিলেন প্রায় সাতশ'তে। সাম্প্রতিক মতামত দেখে মনে হয় যে, স্বাধীনতা অর্জনের সময় দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল ৫৬০ থেকে ৫৬৯-র মধ্যে কোন একটা, সম্ভবতঃ ৫৬২।

একশ' বছর আগে এত ভাগ, এজাতীয় এত রেষারেষি ছিল না। দশ বছর আগে খণ্ডিত ভারতের দু'টি অংশ মিলিয়ে চল্লিশ কোটি মানুষের প্রায় এক কোটি ভয় ও মৃত্যুর মিছিল ঠেলে হল বাস্তুহারা। ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা আমরা পাইনি। স্বাধীনতার ইতিহাসে ভারতের বৈশিষ্ট্য শুধু এইখানে যে শাসকের রক্তপাত ঘটেনি একবিন্দু, কিন্তু বিদায়ের মুখে ওই শাসকের ভেদনীতি শাসিতের রক্তক্ষয়ে হল সার্থক।

দু'শ' বছর মাংগলিক শাসনের পর যেদিন বিদায় নিল ব্রিটিশ, সেদিন ভারতে সাধারণ মানুষের দু'বেলা অন্নের সংস্থান ছিল না। আর একশ' বছরেরও আগে (১৮৩৫) মেকলের নির্দেশে, য়ুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে 'নেটিভ'-কে উন্নীত ক'রে তোলার মহৎ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও ১৯৪১ সালে শুধু অক্ষরজ্ঞানের পরিচয় ছিল শতকরা ১৪·৬ জনের এবং ওই গণনায় তাদেরও ধরা হয়েছিল, যারা লিখতে জানত না; কিন্তু পড়তে পারত। এর কারণ হিসাবে দেখানো হ'তো ভারতের সমস্ত সমস্যাই জটিল।

বাস্তুহারা আর খাদ্যসমস্যা মেটাবার চেষ্টাতেই কেটে যাবে অর্ধশতাব্দী, এমন একটা সরব আশাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে ভারতে গঠনমূলক কাজ চলেছে মাত্র ছ'বছর ধ'রে ১৯৫১ থেকে। যারা ছিল দুর্বল, পদানত, তারা হবে স্বাবলম্বী সমর্থ। সেটাই আজ পশ্চিমের কাছে অসহ্য। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকেও এতটুকু শিক্ষা হয়নি সাম্রাজ্যশাহীদের যে প্রবাদগল্পের উটপাখির মতো শুধু মুখ লুকিয়ে কোন লাভ নেই।

বিপ্লবের পর রাশিয়ার সমস্যা

বলশেভিক্ রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যিক প্রচারপ্রণালীর সঙ্গে ভারত-বিরুদ্ধ প্রচারকার্যের তুলনায়, আপাত-দৃষ্টিতে দু'টিকে প্রায় একরকম মনে হ'লেও সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য দেখা যায় পশ্চিম জাতিগুলির প্রাণে কী নিদারুণ ভীতি। আজ তারা দেখছে যে, এই দশ বছর আগেও যেসব আশা তাদের ছিল, তা সবই ধ্বসে যেতে বসেছে। সত্যের মুখো-মুখি হতে আজ তারা ভীত।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সঙ্গে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের একটা বড়ো পার্থক্য এই যে, রাশিয়া কোন বিদেশী শক্তির উপনিবেশ মাত্র ছিল না এবং তাকে কোন বিদেশী শক্তির চাপে দ্বিখণ্ডিত হতে হয়নি। বাস্তুহারার সমস্যা ছিল না রাশিয়াতে। গৃহবিবাদের গলা টিপে দেওয়া হয়েছিল নির্মমভাবে চিরদিনের মতো।

রুশবিপ্লব পশ্চিমী শক্তিগুলিকে বিব্রত করলেও, উদ্বেল করেনি, আতঙ্কে দিশা-হারা ক'রে দেয়নি। মজদুর-রাজ, আর তাও কার্ল মার্কসের ভিত্তিতে হবে রাশিয়ার
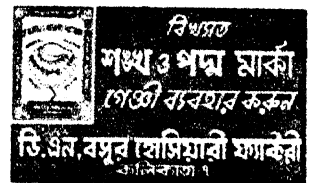
মতো কৃষিপ্রধান দেশে—সমস্ত ব্যাপারটাকে দু'দিনের একটা অসম্ভব এক্সপেরিমেণ্ট, ছেলেখেলা ব'লে মনে হয়েছিল। মার্ক্স কতকগুলি আনুমানিক ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গয়েছিলেন ইংলণ্ডের মতো পুঁজিবাদী শিল্পপ্রধান দেশ দেখে, আর তাঁর প্রফেটিক্ জাগরণী আহ্বান ছিল শুধু ওই পুঁজিবাদী পৃথিবীর শোষিত নিপীড়িত মজদুরজাতির প্রতি। কৃষাণের প্রতি নয়। এই ধারণাটাই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছিল পশ্চিমী পুঁজিবাদীদের মনে, মার্ক্স-দর্শনের সাইকো-সোশ্যাল বিশ্লেষণে।

তবু, যে মারাত্মক ছেলেখেলার আরম্ভ হয় একটা প্রাচীন শক্তিশালী রাজবংশের প্রতিটি নরনারীকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে, তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি না রেখে উপায় ছিল না। রাশিয়ার অভিজাতশ্রেণীর যাঁরা পালাতে পারলেন, আশ্রয় পেলেন য়ুরোপের নানা দেশে, তাঁরা প্ররোচিত করতে লাগলেন ধ্বংসমূলক প্রচারকার্যকে। কিন্তু সে ছেলে-খেলায় এল শৃংখলা, আছাড় খেয়ে খেলোয়াড়দের অবসান ঘটল না। আশা ফলল না।

উল্টে তাদেরই আবার হাসিমুখে সংগী ক'রে নিতে হল নাজি ও ফ্যাসিস্টের বিনাশ-সাধনে। এখানেই বোধ হয় ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরিহাস!

পশ্চিমী শক্তিকে কায়েমী রাখার আশা

একটা বিষয়ে আজও সঠিক কিছু বলার সময় আসে নি, তবে একথা অনুমান করলে বোধ হয় ভুল হবে না যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের মুখেও ব্রিটিশ ঠিক বুঝতে পারে নি যে, শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে ঘনিয়ে এসেছে তার দিন। বুঝতে পারে নি যে, তার নিজের ক্ষমতা হ্রাস যদি নাও পায়, তবু তা ম্লান হ'য়ে পড়বে, বুঝতে পারে নি আমেরিকা আর সেই সংগে রাশিয়া নতুন হ'য়ে দেখা দেবে আধিপত্যরূপে। সেই 'সংস্কৃতি-হীন' রাশিয়া, যার জবাবদিহি করতে হয়েছিল গর্কীকে আজ থেকে মাত্র ত্রিশ বছর আগে।

আর, একথা অনুমান করলেও বোধ হয় ভুল হবে না যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে হবে, তার জন্য বৃটেনকে আমেরিকার তাড়া লাগানোর মূলে ছিল এই যে, ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার অন্যান্য উপনিবেশ স্বেচ্ছাপ্রদত্ত স্বাধীনতা পেয়ে নম্র কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে এবং মেনে চলবে পশ্চিমী দেশগুলির নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব। সাম্রাজ্যের দৈহিক অবসান ঘটলেও, অটুট থাকবে এশিয়াতে পশ্চিম-চালিত রাষ্ট্র-দর্শন। রুজভেল্টের এখানেই বোধ হয় ছিল দূরদৃষ্টির সবচেয়ে বড় পরিচয়।

চীনে কম্যুনিস্ট-বাহিনীকে তখনও ঘোর সংশয়ের চোখে দেখার অবকাশ ঘটে নি। কে সেদিন ভেবেছিল যে, অচিরেই পৃথিবীর বৃহত্তম স্বধর্মগামী কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র হবে চীন?

আর কেই-বা সেদিন জানত, মিশর হ'য়ে উঠবে দুঃসাহসী!

বৃটেন অবশেষে মেনে নিয়েছিল আমেরিকার চাপ, আর ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের চাপ, শুধুমাত্র নিজেরই কল্যাণ-কামনায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রায় সমস্তরকমে লণ্ডন ছিল সারা বিশ্বের রাজধানীস্বরূপ। দুনিয়া-শাসন ও কূট-চালের ফরমান্ জারী হত লণ্ডন থেকে। ইতিহাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃতি ছিল অনন্য। যে-সব ভুলের জন্য অথবা ভৌগোলিক কারণে ভাঙন ধরেছিল রোমক সাম্রাজ্যে, অটোমান্, হ্যাবস্‌বার্গ আর রোমানভ্ সাম্রাজ্যে, তার কোনটাই ঘটে নি বা ঘটতে দেয় নি ব্রিটিশ। অতএব তার বিশ্বাস ছিল যে, মাটি ছেড়ে যাবার পরেও ভারতবর্ষ নম্রশিরে মেনে নেবে তার কথা, যেমন মেনে চলেছে ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু এসব দেশের শাসক-সম্প্রদায় ব্রিটিশ গোষ্ঠিরই জ্ঞাত। ব্রিটিশ শাসকের অভাবে অখণ্ড ভারত হবে হাতছাড়া। অতএব, বহু সাম্প্রদায়িক বিভেদসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে শাসনভার-হস্তান্তর-প্রণালীর গতি হল অতি জটিল ও মন্থর, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সংগে ভারতের শেষ পর্যন্ত একটা নাড়ীর টান চিরস্থায়ী করার আশায়। কংগ্রেসের উচ্ছেদ না ঘটিয়ে ভারতকে স্বাধীনতা দেবে না ইংরেজ, এ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন ব্রেইল্‌স্‌ফোর্ড ১৯৩৭ সালে ("....it seems that the English can bestow freedom on India only by crushing the Congress." —H. N. Brailsford in "The Indian Question," Encyclopaedic of Social Sciences).

তবু ইতিহাসের চক্রান্তে স্বাধীনতাকে বিলম্বিত করা দুঃসাধ্য হল। সাম্রাজ্য-শাসনের শেষ স্বাক্ষর অংকিত হল দ্বিখণ্ডনরেখায়। অখণ্ড ভারতের ক্ষমতাকে রোধ করা ছাড়া এই আশাটাও কি ছিল না সেদিন যে, ওই খণ্ড দু'টিকে বার বার ছুটতেই হবে বিচারের আশায়, আর লণ্ডন ফরমান্ জারী করবে আগেরই মতো?

আশা যাই থাক্, গড়িয়ে গেছে বিচিত্র দশটি বছর, বিশ্ববিপ্লবের ইতিহাসে এক অপূর্ব অধ্যায়। ভয়ে লুটিয়ে ছিল পৃথিবীর যে বিরাট অংশ এশিয়া এবং আফ্রিকায়, ভয় কেটে গেছে সেখান থেকে সম্পূর্ণরূপে।

ভয় আজ হানা দিয়েছে তাদের, ভয়ের ভিত্তিতে যারা বেঁধেছিল সাম্রাজ্যের দেশ-জোড়া বেড়াজাল। ভয়, যদি খণ্ডিত ভারতের দু'টি অংশ মিতালি ক'রে বসে? ভয়, যদি এশিয়াতে কম্যুনিস্ট চীনের সংগে গণতন্ত্রসেবী দেশগুলির লড়াই না বাধে? তাহলে ওই য়ুরোপের ক্ষুব্ধ জাতি-গুলিও হয়তো বা এশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়বে। সাম্রাজ্যিক শক্তিগুলির চরম গৌরবের দিনে য়ুরোপের দীনতম রাষ্ট্র-গুলির মধ্যেও একটি লক্ষ্য ধ্রুব হ'য়ে উঠেছিল, শাসকগোষ্ঠির সেও হবে একজন অংশীদার, সমান হাতে হাত মিলিয়ে। মোহের তিমিরে ডুবে গিয়েছিল সারা বিশ্ব কয়েক শতাব্দীর মতো—একদিকে লোভ আর শোষণের মোহ, আর একদিকে নিষ্পেষণের নীচে তন্দ্রাজনিত মোহ।

তন্দ্রা কেটে গেছে। কিন্তু এই তিমিরান্তক ইতিহাসের গতি কোন্ দিকে?

শোষণের লিপ্সা আর জাতিগত বৈষম্যের মোহ যদি না অচিরে কেটে যায়, তবে ওই অনেক অতৃপ্ত বাসনা, নিষ্ফল কামনার চিত্তদাহে অভিশপ্ত য়ুরোপ থেকে আবার কি ফুলে উঠবে বিশ্বগ্রাসী অশান্ত আক্ষেপ? আর...আর ওই ক্ষুধিত পাষাণের চারদিকে বহু সামরিক চুক্তির বেড়াজাল টেনে ইতিহাসের গতিরোধচেষ্টায় নিজেকে বারবার কি সতর্ক করতে থাকবে অন্তঃ-গতিমহিমা ব্রিটিশ মেহের আলীর মতো; "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সব ঝুট হ্যায়?"

ত্রিদিব চৌধুরী

॥ ১ ॥

গোয়ার মানুষ

গোয়াতে পাহাড় জঙ্গল ডিঙ্গাইয়া লোকালয়ের ভিতর প্রবেশ করার পর এই প্রথম গ্রামটিতে আমরা সেদিন যে অভ্যর্থনা ও আদর যত্ন পাইয়াছিলাম, তাহা মোটের উপর আমাদের কাছে খুব নিরুৎসাহজনক বলিয়া মনে হয় নাই। গোয়ার ভিতরে আমাদের সত্যাগ্রহের পিছনে জনসাধারণের ভিতর হইতে কি পরিমাণ সমর্থন পাওয়া যাইবে না-যাইবে সে বিষয়ে আমাদের মনে গোড়া হইতেই কিছুটা সন্দেহ ছিল। পর্তুগীজ উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন সম্পর্কে গোয়ার ভিতরে গোয়ার স্থানীয় জনসাধারণের আসল মনোভাব কি সে বিষয়ে আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা ধারণা ছিল না। ইহাও আন্দাজ করিতে পারিতেছিলাম যে পুলিসের ধর-পাকড় এবং অমানুষিক অত্যাচারের ফলে সেখানকার সাধারণ লোকেরা নিশ্চয় খুবই ভয়ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিবে; মনে মনে ইচ্ছা বা সহানুভূতি থাকিলেও তাহারা কিছুতেই প্রকাশ্যে আমাদের সমর্থনের জন্য আগাইয়া আসিতে পারিবে না। তাছাড়া গোয়াবাসীদের সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ও চালচলন সম্পর্কে আমরা, অন্ততপক্ষে আমি নিজে—খুব বেশী কিছু জানিতাম না। কাজে কাজেই আমরা তাহাদের মধ্যে গিয়া হাজির হইলে পর আমাদের সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব কি ধরনের হইবে সে বিষয়ে মনে মনে বেশ একটা অনিশ্চয়তা অনুভব করিতেছিলাম। গোয়ার ভিতরকার আন্দোলনের সঙ্গে বাহিরের আন্দোলনের, অর্থাৎ ভারতে যে গোয়ামুক্তি আন্দোলন চলিতেছিল তাহার, খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকিলে অবশ্য এটা হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৫৫ সালের গোড়ার দিক হইতে আর সে রকম যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় নাই।

আমাদের দেশে অনেক সময় লোকে সাধারণত এইটাই ধরিয়া নেয় যে গোয়ার বেশীর ভাগ লোক রোমান ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান এবং কিছুটা আধা-পর্তুগীজ, আধা-ফিরিঙ্গী ধরনের। সুতরাং তাহারা প্রায় স্বতঃসিদ্ধভাবে, বিজাতীয় ভাবাপন্ন এবং পর্তুগীজ শাসনের সমর্থক; অন্তত রোমান ক্যাথলিকেরা তো বটেই। আমি গোয়া হইতে ফেরার পর অনেকেই আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"গোয়ার লোক কি সত্য সত্যই পর্তুগীজ শাসনের অবসান চায়? গোয়ার বেশীর ভাগ লোকই কি রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী নয়?" উত্তর ভারতে এবং কিছুটা পূর্ব-ভারতেও অনেকের মনেই এই ধরনের সংশয় আছে বলিয়া দেখিয়াছি। ইহার পিছনে আমাদের যে প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক মানসিকতা কাজ করে তাহার কথা এখানে না তুলিলাম। তবে গোয়ার ভিতরে ঢোকার পর হইতে উনিশ মাস ধরিয়া (যদিও আমি জেলের ভিতরেই ছিলাম) নানানভাবে, আমাদের সহবন্দী ছাড়াও, গোয়ার অধিবাসী নানান্ ধরনের লোকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার হইয়াছে। আমার সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া জোর করিয়া বলিতে পারি গোয়ার অধিবাসীদের সম্পর্কে উপরোক্ত দুইটি ধারণাই সম্পূর্ণ ভুল। প্রথমত গোয়ার বেশীর ভাগ লোক ক্রিশ্চিয়ান বা ফিরিঙ্গী নয়। হিন্দু সভ্যতা, আচার ব্যবহার ও কৃষ্টির প্রভাব সেখানে খুবই প্রবল; এমন কি রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যেও তাহার প্রভাব কিছু কম নয়। পৃথিবীর আর কোথাও ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ানদের মধ্যে 'বাহ্মন' বা 'ভামন' (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ), 'শরাদ' বা 'ছরাদ'দের (ক্ষত্রিয়) মধ্যে জাতিভেদ আছে বলিয়া আমি জানি না; ভামন বা ছরাদ ক্যাথলিকদের সঙ্গে অন্যান্য ক্যাথলিকদের বিবাহ সম্পর্কে বা অন্য প্রকারের সামাজিক মেলামেশা বা লেন-দেনের কথা কেহ ভাবিতেও পারে না। দ্বিতীয়ত, গোয়ার অধিবাসী রোমান ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ানদের দেশপ্রেম—ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহাদের মর্যাদাবোধ বা আকর্ষণ, বিদেশী শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা—জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতের অন্য যে কোনো অঞ্চলের লোকেদের চেয়ে কম নয়। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়, গোয়ার উচ্চপদস্থ

হিন্দু সরকারী কর্মচারী বা ধনী হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভিতর পর্তুগীজ সমর্থকের অভাব নাই, ক্রিশ্চয়ানদের মধ্যেও নাই। এখানে নাম করা সংগত হইবে না, কিন্তু আমি গোয়ার অধিবাসী অনেক এমন হিন্দু মোহন্ত ও মঠাধীশের কথা জানি যাঁরা পর্তুগীজ শাসনের ঘোরতর সমর্থক। সেখানকার এক সাধু মহারাজকে তো সংস্কৃতে শ্লোক লিখিয়া (তিনি কোঙ্কণী বা মারাঠীতে কথা বলেন না) গভর্নর জেনারেলকে আশ্বাস দিবার কথা শুনিয়াছি যে "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরম্" ভারতের বুকে হইতে পর্তুগীজ শাসনের অবসান হইবে না। পর্তুগীজরা সেই সার্টিফিকেট খবরের কাগজে ছাপাইয়া গোয়াময় প্রচার করিয়াছিল; ইহা বেশী দিনের কথা নয় মাত্র গত বছরের দুর্গাপূজা বা 'দশেরা'-র সময়। মোটের উপর একথা সহজেই বলা যায় যে, গোয়ার মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে ক্রিশ্চয়ান বনাম হিন্দু বলিয়া কোন প্রশ্ন জড়িত নাই। আমি যতটুকু দেখিতে বা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশ (মুষ্টিমেয় ধনী জমিদার ব্যবসায়ী ও কণ্ট্রাক্টরের কথা বাদ দিলে) এবং শিক্ষিত রোমান ক্যাথলিকদেরও অধিকাংশ গোয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমর্থক। তবে সাধারণ রোমান ক্যাথলিক ক্রিশ্চয়ানদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক, সমুদ্র উপকূলের মৎস্যজীবী বা ঐ উপকূলে অথবা এই দরিদ্র কৃষকদের মধ্য হইতে যারা আসিয়াছে, তাহারা রাজনৈতিক দিক দিয়া খুবই অনগ্রসর। ক্যাথলিক পাদ্রীদের ও ধর্মযাজকদের প্রভাব তাহাদের উপর খুবই বেশী। ইহারা জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়; রাজনীতি সম্পর্কেই তাহাদের কোনো ধারণা নাই। বিপদে আপদে তাহারা রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে নানা রকমের সাহায্য পায়; চার্চের স্কুলেই যতটুকু হোক্ লেখাপড়া শেখে। এইসব কারণে প্রত্যক্ষভাবে না হোক, প্রকারান্তরে তাহারা পর্তুগীজ শাসনের সমর্থক হিসাবে থাকে। কারণ গোয়াতে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক চার্চের যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। কিন্তু অপর পক্ষে ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে গোয়াতে গোয়ানীজ ক্যাথলিক পুরোহিতেরা বিশেষ করিয়া নীচের দিকে পর্তুগীজদের উপর খুব বেশী সন্তুষ্ট নন। মুক্তি আন্দোলনের প্রথম দিকে ইঁহাদের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি ও সমর্থনের ফলে আন্দোলনের যথেষ্ট সাহায্যও হইয়াছিল, কিন্তু পরে পর্তুগীজ আর্চ-বিশপ ও প্যাট্রিআর্কের চেষ্টায় বেশী
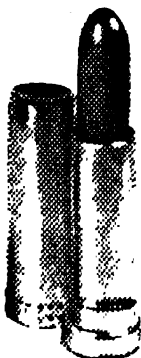
পুরোহিতদের অন্তত আপাত দৃষ্টিতে পুরোপুরি 'রাজভক্ত' বানানো সম্ভব হইয়াছে। গোয়ার বর্তমান প্যাট্রিআর্ক পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের ঘোরতর উৎসাহী সমর্থক; তিনি নিজেও একজন পর্তুগীজ। গোয়াতে ইউরোপীয় জেসুইট ক্যাথলিকদের নানা রকমের মিশনারী প্রতিষ্ঠান আছে; তাহাদের প্রভাব মোটামুটিভাবে পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকতাবাদের সমর্থনে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও গোয়ার শিক্ষিত ক্রিশ্চিয়ান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ভিতর, বিশেষ করিয়া যুবকদের মধ্যে পর্তুগীজ বিরোধী জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রসার বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই।

ক্যাথলিক গোয়াবাসী হইলেই ফিরিঙ্গিয়ানায় অভ্যস্ত এবং পর্তুগীজ শাসনের সমর্থক এইরূপ যাঁহারা ধরিয়া নেন, তাঁহাদের একথা জানানো প্রয়োজন যে এখন গোয়ার ভিতরে যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী আছেন (মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের বিচারে দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা এখন প্রায় ৩৫০-এর মত; এ ছাড়া সকল সময় গড়-পড়তা ৩০০ হইতে ৮০০ রাজনৈতিক সন্দেহভাজন লোক পুলিসের হাজতে আটক থাকে) তাঁহাদের মধ্যে ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ানদের সংখ্যা গোয়ার ক্রিশ্চিয়ান জনসংখ্যার অনুপাতে বেশী ছাড়া কম নয়।* মোট হিন্দু রাজনৈতিক বন্দীদের সংখ্যা ক্রিশ্চিয়ানদের চেয়ে সামান্য কিছু বেশী। গোয়ার ভিতরকার মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ক্রিশ্চিয়ানদের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে বেশী ছাড়া কম হইবে না; ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা দশ-বারো বছর, কেহ চৌদ্দ, পনেরো-ষোলো, কেহ-বা বিশ-একুশ বছর পর্যন্ত জেলে মাথার উপর নিয়া সাজা ভোগ করিতেছেন।

বয়স্ক ও নেতৃস্থানীয় ক্রিশ্চিয়ান রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে এমন সম্ভ্রান্ত অভিজাত ক্যাথলিক পরিবারের লোকও আছেন যাঁহারা নিজেদের বাড়িতেও কথাবার্তায় পর্তুগীজ ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করেন না। যেমন, ডাঃ ফুর্তাদো; প্রায় ৬০ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ, বনিয়াদী গোয়ানীজ ক্রিশ্চিয়ান বংশের লোক। খালি পর্তুগীজ ও কোঙ্কনী ভাষা জানেন; ইংরেজী বা হিন্দি জানেন না (এখন জেলে পরম উৎসাহের সঙ্গে দুই-ই শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন!)। পর্তুগীজ পুলিস অফিসারদেরও তাঁহার সঙ্গে সমীহ করিয়া কথা বলিতে দেখিয়াছি। তিনি নিজে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান রোমান ক্যাথলিক এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ বহুদিন হইতে বনিয়াদী পর্তুগীজ চাল-চলন ও আদব-কায়দায় অভ্যস্ত। কিন্তু এ যুগের দেশ ও রাষ্ট্র-জাতিগত জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ এমনই জিনিস যে, এসব সত্ত্বেও তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও গোয়া মুক্তি-আন্দোলনে যোগ দিয়া দীর্ঘ কারাবরণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। শ্রীযুত ফাবিয়ান্ দা কস্তা মাড়-গাঁওয়ের কাছে সেরাউলিম গ্রামের সম্ভ্রান্ত ক্রিশ্চিয়ান বাড়ির তরুণ যুবক—গ্রামের পাদ্রী এবং আর্চ বিশপের সঙ্গে পর্যন্ত লড়িয়া নিজের তিন ছেলের নামকরণ করিয়াছেন 'জওহর', 'জয়প্রকাশ', 'রবীন্দ্রনাথ'! আট বছর দশ বছর আগে ছেলেদের নামকরণের ভিতর দিয়া যে জাতীয়তাবাদী ভাবপ্রবণতার প্রকাশ দেখা গিয়াছিল, আজ আগুয়াদা দুর্গের জেলে রাজবিদ্রোহের অপরাধে ষোলো বছরের মেয়াদ মাথা পাতিয়া নেওয়ার ভিতর দিয়া তাহার পরিণতি ঘটিয়াছে।

পঞ্জিমের জজ্, অপর এক ডাঃ ফুর্তাদোর কথাও এখানে না বলিয়া পারিতেছি না। গোয়ার পর্তুগীজ বড়লাট হুকুম দিলেন—ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের গোয়ানীতির ঘোষণা সম্পর্কে প্রতিবাদ করিয়া বিবৃতি দিতে হইবে। ডাঃ ফুর্তাদো, বিচারপতি, ন্যায়াধীশ। কিন্তু সালাজারের Estado Novo-র (নূতন রাষ্ট্র; new State) ভিতরে অতি সম্মানভাজন বিচারপতিরও মত ও বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্যের কোন মর্যাদা নাই; সালাজারী শাসনের তাহা নিয়ম নয়। কিন্তু সালাজারের ভ্রূকুটির উপরেও যে কোন মানুষের স্বাধীন মত ও বিশ্বাস পোষণ করার যে সহজাত অধিকার আছে, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া তেজস্বী জজ ফুর্তাদো পর্তুগীজ গভর্নর জেনারেলকে উত্তর দিলেন:

"I can understand that as a representative of a Colonial power.

---

* ১৯৫০ সালের সেন্সাস অনুযায়ী পর্তুগীজ ভারতের মোট জনসংখ্যা ৬৩৭,৫৯১ তাহার মধ্যে গোয়ার জনসংখ্যা ৫৪৭,৪৪৮। গোয়াতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ:—

ধর্ম	জনসংখ্যা	অনুপাত
হিন্দু	৩০৭,১২৭	৫৬·২৮
ক্রিশ্চিয়ান	২৩০,৯৮৯	৪২·১০
মুসলমান	৮,৪২০	১·৫০
পার্সী	২৮	
বৌদ্ধ	৫৬	·১২
অন্যান্য	১৯২	

সারা পর্তুগীজ ভারতের হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত কিছু বেশী শতকরা ৬০·৯; ক্রিশ্চিয়ানদের শতকরা ৩৬·৮। কারণ দিউ, দমন ও দাদ্রা ও নগর হাভেলীতে হিন্দুদের সংখ্যা ক্রিশ্চিয়ানদের তুলনায় অনেক বেশী।

Your Excellency should try to force me not to be against the Power you represent; but I would never allow you to tr[illegible] on my birth-right of being [illegible] India in order that the most beautiful sentiment, which is second only to God's will, might not be defiled."

("আমি একথা বুঝি যে, একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে আপনি সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যাহাতে আমি না যাই সেজন্য আমার বিরুদ্ধে আপনার সর্বশক্তি আপনি প্রয়োগ করিবেন। কিন্তু ভারতীয় হিসাবে, ভারতের পক্ষে থাকার আমার জন্মগত অধিকারকে আপনি যে পদদলিত করিবেন তাহা আমি কিছুতেই সহ্য করিব না। তাহা করিতে দিলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুজ্ঞার পরেই মানুষের সবচেয়ে যে সুন্দর ও মহান্ মনোবৃত্তি—দেশপ্রেম ও জাতিপ্রেম, তাহার প্রতি অসম্মান দেখানো হইবে; আমি কখনো তাহা করিতে পারিব না"।)

জজ্ ফুর্তাদোর জজিয়তী ইহার পরে এক মুহূর্তও যে আর টেঁকে নাই, সে কথা বোধহয় না বলিয়া দিলেও চলিবে। ফুর্তাদোর এই দৃপ্ত প্রতিবাদ বা তাহার পিছনে যে দেশপ্রেমের নিদর্শন আছে তাহা হয়ত আমাদের কাছে এমন কিছু নূতন নয়। কিন্তু এখানে এইটুকুই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করার বিষয়, গোয়াতে একজন ক্রিশ্চিয়ান রোমান ক্যাথলিক সরকারী কর্মচারীর কলম দিয়া কথাগুলি বাহির হইয়া আসিতেছে। গোয়াবাসী ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ানদের বিজাতীয় ভাবাপন্ন এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া আমরা অনেক সময় যে সহজেই ধরিয়া নেই তাহার পিছনে যে কোনো সত্যতা নাই, উপরে যে কয়জনের কথা বলিলাম তাঁহারাই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আর এ খালি এখানে ওখানে দু' একজনের কথা নয়। টোনী ডি'সুজা-র কথা আগেই বলিয়াছি। টোনীর ছোট ভাই হেনরী, ডাঃ জে এফ মার্টিন্‌স, আন্তোন জিয়েগাস, আল্‌ভারো পেরেইরা, আল্‌ফোন্‌সো আলফ্রেড, আলফোন্‌সো আলবের্ত, রক্ ফের্নান্দিস্, জোয়াকিম পিণ্টু, জেম্‌স্ ফের্নান্দিস্ প্রমুখ আরো অনেকের নাম এখানে করা যাইতে পারে। গোয়ার ভিতরে সত্যাগ্রহ ও মুক্তি আন্দোলনের সংগঠক ও নেতাদের মধ্যে ইঁহাদের স্থান নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রে। আমরা মুক্তি পাওয়ার মাস দুই আগে সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে প্রায় ২৫ জন অতি সম্ভ্রান্ত ক্রিশ্চিয়ান পরিবারের লোককে সন্দেহে আটক করিয়া আগুয়াদা দুর্গে আনা হয়। ১৯৫৬ সালে ডাঃ গেগাড়ে এবং শ্রীযুত পুরুষোত্তম কাকোড়করের সঙ্গে যাঁহাদের পর্তুগালে লিস্‌বনে পাঠানো হইয়াছিল—ডাঃ টি ব্রাগান্‌সা কুন্হা, শ্রীযুত জোসে ইনাসিও লয়লা—দু'জনেই সম্ভ্রান্ত ক্যাথলিক পরিবারের লোক। গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রধান সংগঠক ও নেতা পিটার আল্‌ভারিসের কথা বোধহয় সকলেই জানেন। গোয়া মুক্তি-আন্দোলনের একটি অত্যন্ত সুস্থ ও আশাব্যঞ্জক দিক এই যে—এই আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বর্জিত। গোয়ার মুসলমানের সংখ্যা ৮।৯ হাজারের বেশী হইবে না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বেশ কয়েকজন মুসলমান কর্মীও এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করিয়াছেন। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও গোয়াতে জাতীয় আন্দোলনের কর্মীদের ভিতর হিন্দু-ক্রিশ্চিয়ান-মুসলিম বলিয়া কোন ভেদবুদ্ধি জাগে নাই। আমার উনিশ মাস গোয়াবাসের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্য তাহার অস্তিত্ব অনুভব করি নাই।

গোয়াবাসীদের সম্পর্কে আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোক ধারণা করেন বোম্বাই, কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরের প্রবাসী গোয়ানীজদের দেখিয়া। গোয়ানীজ বাট্‌লার, খানসামা, বাবুর্চি এবং জাহাজের খালাসীরা সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া থাকে। ইংরেজ আমলে আমাদের দেশের শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সময় যখন খুব বেশী রকম ফিরিঙ্গিয়ানা বা ইংরেজীয়ানার প্রভাব ছিল তখন তাঁহাদের অনেকের বাড়িতে গোয়ানীজ বাবুর্চি-খানসামা রাখার একটা ফ্যাশন ছিল। বোম্বাই অঞ্চলের বড় বড় হোটেল রেস্তোরাঁয় সে ফ্যাশন আজও আছে; কলিকাতাতেও আছে। গোয়ানীজ বাবুর্চিদের রান্নার, বিশেষ করিয়া ইউরোপীয় সাহেবী রান্নার খুব সুনাম আছে। বোম্বাই বন্দরের ডকে বা জাহাজ-ঘাটায় গোয়ানীজ নাবিক ও ডক শ্রমিকদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। কিন্তু তাই বলিয়া গোয়ার অধিবাসীরা খালি খানসামা, বাবুর্চি এবং জাহাজের খালাসীর জাত নয়। তবে এইসব শ্রেণীর প্রবাসী গোয়ানীজরা অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান; এবং ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক কিছুটা পর্তুগীজ-ইউরোপীয় প্রভাবের ফলে, আর কিছুটা বোম্বাই অঞ্চলের সস্তা ফিরিঙ্গি সাহেবিয়ানার দরুণ সহজেই এদেশে আসিয়া আধা ফিরিঙ্গি সাজেন বলিয়া যায়। রাজনৈতিক দিক দিয়া এইসব প্রবাসী গোয়ানীজরা খুবই অনগ্রসর এবং ভারতবর্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার অনেকদিন পরেও তাহারা সেই আন্দোলনের দ্বারা বড় বেশী প্রভাবিত হয় নাই। বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরে এই ধরনের গোয়ানীজদের দেখিয়াই আমরা গোয়াবাসীদের সম্পর্কে ধারণা করি।

একথা বলাই বাহুল্য, প্রবাসী গোয়ানীজরা সকলেই এই জাতীয় নন। অসংখ্য উচ্চ-শিক্ষিত ও কৃতী গোয়াবাসীর অভাব এদেশে নাই। হিন্দু ও রোমান ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাহার মধ্যে আছেন; গোয়া মুক্তি-আন্দোলনে তাঁহারা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ও করিবেন। ভারতে প্রবাসী গোয়ানীজরা তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাতে এই মুক্তি-আন্দোলনে আশানুরূপ অংশ গ্রহণ করেন নাই—সময় সময় এই ধরনের একটা অভিযোগ বা অনুযোগ শোনা যায়। আমি নিজে এ সম্পর্কে যাহা জানি, তাহা হইতে এই ধরনের অভিযোগের কোনো সত্যকার ভিত্তি আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কিন্তু গোয়ার ভিতরে যাওয়ার পরে, আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, প্রবাসী গোয়ানীজদের দেখিয়া, গোয়ার ভিতরকার গোয়াবাসীদের—অর্থাৎ "Goan Goanese"-দের সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। যাঁহারা সেভাবে গোয়াবাসীদের সম্পর্কে ধারণা করেন, তাঁহাদের পক্ষে গোয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অবস্থা বোঝা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

(ক্রমশ)
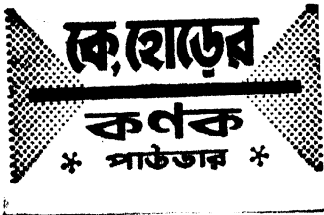
॥ ১৭ ॥

না-বনের না-বাগানের

এক একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে রেশমী বিছানার উপরে উঠে বসে। অসহ্য দুঃখে সমস্ত মনটা টনটন করে। বীণায় তার চড়াতে চড়াতে এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে, সামান্যতম নিশ্বাসে, এমন কি যে নিশ্বাস কেবল মনের মধ্যে দুলে উঠেছে এখনো বাইরে প্রকাশ পায়নি, সেই গুপ্ত নিশ্বাসেও যেন ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। রেশমী ভাবে, দুঃখের এ কি সর্বনাশা মূর্তি। দুঃখের বন্যা প্রবল হয়ে উঠলে কূলের বাধা মানে না, তখন তীরে নীরে এক হয়ে যায়। মানসিক দুঃখ যে শরীরকে বিকল করে দেয়, তা কে জানতো? দুঃখের সঙ্গে রেশমীর নূতন পরিচয়। অবশ্য শৈশবে মস্ত একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল তার জীবনে। হঠাৎ শুনতে পেলো বাপ-মা-ভাই-বোন আর ফিরবে না। তখন ব্যাপারটিকে যথাযথভাবে গ্রহণ করবার বয়স তার হয়নি। পরে সব বুঝেছে। কিন্তু সে-সব হয়ে বয়ে চুকে গিয়েছে, শৈশবের অতি দূর দিগন্তে একটুখানি অশ্রু-বাষ্প এখন তার একমাত্র চিহ্ন। ঐটুকু ছেড়ে দিলে তার জীবন সুখেই কেটেছে বলতে হবে, দিদিমার দিগ্ধ হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা পড়েছিল তার উপরে। কিন্তু তখন কে জানতো যে, এমন এক নিদারুণ বজ্র নির্মিত হচ্ছে তার জন্যে। সে কি অশনি, যেমন অতর্কিত তেমনি নির্মম! শেষ ক'দিনের কথা সে ভালো করে ভাবতে পারে না, ভাবতে চায় না। কিন্তু দুঃখের এ কি বিচিত্র প্রকৃতি, ঘুরে ফিরে তাকে দেখা দিয়ে যায়। আর না যাবেই বা কেন? ঐ একটি অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কোন্ অভিজ্ঞতা আছে তার জীবনে।

কতক্ষণ সে বসে আছে ঠাহর করতে পারে না। খুব সম্ভব দু' চার মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু না, যখন উঠে বসেছিল, ঘুলঘুলি দিয়ে চেয়ে দেখেছিল আকাশটা অন্ধকার, এখন উজ্জ্বল, চোখে পড়ল আকাশের প্রান্তে একটুখানি চাঁদের ফালি। কৌতূহলী চন্দ্রকলা উঁকি মারছে তার মনের মধ্যে।

তার হঠাৎ মনে হ'ল ঘরের বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ। চমকে উঠে রেড়ির তেলের আলোয় দেখে নিল দরজার খিল বন্ধ আছে।

প্রথম যখন এখানে এসেছিল, অনেকদিন পর্যন্ত রাতে তার ঘুম হতো না, দিনে সে কুঠিবাড়ির হাতা ছেড়ে বাইরে যেত না। দিনে রাতে তার চণ্ডী বক্সীর গুপ্তচরের ভয়। তিনুদাদার কথা মনে পড়ে—চণ্ডী সহজে ছাড়বে না, খুব সাবধানে থাকিস দিদি। কিন্তু ছ' মাসের মধ্যে চণ্ডী বক্সীর লোকজনের সাক্ষাৎ না পাওয়ায় সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল, ভেবেছিল চণ্ডী তার সন্ধান হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু জীবনে একমাত্র চণ্ডীই তো ভয়াবহ নয়, আরো ভয় আছে, অন্য ধরনের ভয়, রেশমী বুঝেছে বয়সের ভয় বলতে একটা বিশেষ দুর্বিপাক বোঝায়। মনে পড়ে তার টমাস সাহেবকে। তার মতিগতি দৃষ্টি সে মোটেই পছন্দ করে না।

টমাস একদিন তাকে বলল, রেশমী বিবি তোমাকে আমি বাইবেলের গল্প শোনাবো।

কেরী পরিহাস ক'রে ডাকে রেশমী বিবি। রেশমীর ভালো লাগে—ঠাকুর্দা নাতনির সম্পর্কে এমন এমন পরিহাস চলে। কিন্তু টমাসের মুখে 'বিবি' শব্দটা কেন জানি তাকে ভাবিয়ে তোলে, মনে হয়, ওর মধ্যে লালসার তাত আছে।

টমাস বেছে বেছে বাইবেলের প্রাচীন খণ্ড থেকে এমন সব গল্প বলে, যাতে আছে কামনার দাগা। তার কানের ডগা লাল হয়ে ওঠে। এসব গল্পের কোন কোনটা শুনেছে সে কেরীর মুখে। কিন্তু কি আশ্চর্য! মুখান্তরে এমন রসান্তর ঘটে কিভাবে?

রেশমী বলে এবারে আমি উঠি।

না, না, বিবি আর একটু বসো। যখন তুমি একদিন মহীপালদীঘিতে। মস্ত বড় দীঘি আছে খুব সাঁতার কাটবে।

রেশমী ইতিমধ্যেই বুঝেছে যে, কেরীকে টমাসের বড় ভয়।

সে বলে জিজ্ঞাসা করে দেখি কেরী সাহেবকে।

আরে না, না, কেরীকে এসব কথা বলো না। আচ্ছা এখন যাও।

রেশমী মুক্তি পায়। রেশমী বোঝে জীবনের পর্বে পর্বে দুর্ভাগ্য নূতন নূতন মূর্তিতে দেখা দেয়।

সত্যি কথা বলতে কি একলা ঘরে শুতে তার ভয় করে, কোনদিন অভ্যাস ছিল না। কিন্তু এখানে কে শোবে তার ঘরে? ছিরুর মা জ্যাবেজকে নিয়ে শোয় কুঠি-বাড়ির একটি কামরায়। কুঠির উত্তর-দক্ষিণে এক সার ক'রে কতকগুলো ছোট ছোট কামরা আছে। উত্তরদিকের একটা ঘরে শোয় রেশমী—অদূরে আর একটা ঘরে ন্যাড়া। ন্যাড়া বলে রেশমী দিদি ভয় পেলে ডাক দিয়ো—চণ্ডীর ঘাড়ে চামুণ্ডার মতো লাফিয়ে পড়বো। দক্ষিণ-দিকের ঘরগুলোয় শোয় রাম বসু; পার্বতী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি। কে শোবে রেশমীর সঙ্গে, সে একাই শোয়। মনে মনে বলে ক্ষতি কি? সারা জীবনতো একাই থাকতে হবে—অভ্যাস হয়ে থাক।

হঠাৎ একদিন রাত্রে বাজনাবাদ্যির আওয়াজে রেশমীর ঘুম ভেঙে গেল, চমকে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল; ভাবল এত শোর-গোল কিসের, ডাকাত পড়ল নাকি? জানলার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে হেসে উঠল, বিয়ের শোভাযাত্রাকে ডাকাতের দল ভেবেছিল সে। কিন্তু তখনি আবার মনে হল ও-ও একরকম ডাকাতি বইকি! কোন্ ঘরের মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে কোথায় চলল। নিজের কথা মনে পড়ল। কিন্তু ভাবনা বাধা পায়, আলো, কোলাহল, শানাইয়ের করুণ আলাপ রাত্রির অন্ধকারকে উদ্ভ্রান্ত করে দিয়ে চলেছে। তার চোখে পড়ে পাল্কির খোলা দরজায় ফাঁকে বরের তরুণ মূর্তি। কি সুন্দর! এক মুহূর্তে আনন্দের শিখরে উঠে তখনি আবার গড়িয়ে পড়ে বিষাদের খাদে তার মনটি। সুখ আর দুঃখ পাশাপাশি প্রতিবেশী, কি আশ্চর্য! আর ঐ বধূ পাল্কিখানায় নিশ্চয় আছে। সে-ও কি এমনি সুন্দর হবে? না, না, সুন্দর মেয়ে এত সুলভ নয়। আর হলেই বা কি, রূপ দিয়ে কি দুর্ভাগ্যকে ঠেকানো যায়। তাহলে তার এমন অবস্থা হবে কেন? রেশমী জানে যে, সে অপূর্ব সুন্দরী। কেমন ক'রে জানল? যে-ভাবে সমস্ত নারী জানে। সেই-ভাবে জেনেছে, পুরুষের চোখের দর্পণে আপনাকে প্রতিফলিত দেখে জেনেছে।

আর একটা হঠাৎ ঘুমভাঙা রাত্রির কথা তার মনে পড়ল। রাত্রিটাই বিশেষ করে তার নিজস্ব। শুনেছিল সেদিন, শ্মশান যাত্রীর উচ্চ হরিবোল ধ্বনি। একাকী জেগে জেগে সে ভাবতে লাগলো, ঐ হরিবোল ধ্বনি যেন জীবনের প্রান্তে আঁচড় কেটে সীমান্ত রেখা টেনে দিচ্ছে। কিন্তু এই প্রকাণ্ড অনন্ত মানবজীবনের মধ্যে তার স্থান কোথায়? সে না-সংসারের না পরলোকের। পরলোকের গ্রাস থেকে পালিয়েছে সে, সংসারের পাশ থেকে ছিঁড়ে এসেছে সে, হোমানল, চিতানল কারো সঙ্গে নেই তার সম্বন্ধ। মনে হল সে বড় অদ্ভুত। এমনটি আর আছে কি? একেবারেই কি নেই? হাঁ আর একটিমাত্র আছে। সেটি একটি কুসুম গাছ। মাঠের মধ্যে উদাসীন নিঃসঙ্গ নিরর্থক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দুইজনের একই দশা, তারা দুজনেই না-বনের না-বাগানের। (ক্রমশ)

কলকাতা

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস ১৮৫৭ শতবার্ষিকী উপলক্ষে এ সপ্তাহে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন যাদুঘরে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, যা দেখবো আশা করে গিয়েছিলাম তা দেখতে পাইনি। আগামী শীতের বার্ষিক প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে আঁকা ছবির সংখ্যাই বেশী এ প্রদর্শনীতে এবং গত বছরের প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ছবিও দু' একটি চোখে পড়ল। সবসুদ্ধ ১০১টি ছবি খাটান হয়েছে, তার মধ্যে ১৭টি ছবি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনা অবলম্বনে এখনকার শিল্পীরা রচনা করেছেন, ১৬টি ছবি টমাস উইলিয়াম ড্যানিয়েল অঙ্কিত প্রাচীন চিত্রের প্রিণ্ট এবং বাদবাকি সাধারণ বিষয়বস্তুর ছবি অর্থাৎ স্টিল লাইফ, দার্জিলিঙ-এর দৃশ্য, গরুর গোয়াল, ফুল প্রভৃতি। এহেন প্রদর্শনীকে ১৮৫৭ শতবার্ষিকী প্রদর্শনী বানাবার কাগিদে জনসাধারণের সামনে ধরার সার্থকতা কি বুঝলাম না। যে ১৭টি ছবি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনা অবলম্বনে রচিত তার মধ্যে তিনটি কি বড়জোর চারটি ছবি উল্লেখযোগ্য আর সব আঁকার দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে এবং রচনার দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। উল্লেখযোগ্য ছবি কল্যাণ সেনের 'এইটীন ফিফটিসেভেন', চিন্তামণি করের 'কুইন অব ঝাঁসী', রথীন মৈত্রের 'এইটীন ফিফটিসেভেন' এবং প্রতাপচন্দ্র দেবের 'হোয়েন কান দেয়ার গ্লোরী ফেড'। চিন্তামণি কর মহাশয়ের 'কুইন অব ঝাঁসী'র প্রতিটি টোনটোন পরিণত এবং রচনাও অত্যন্ত পরিণত মস্তিষ্কের। এঁর আঁকার ঢঙ, উনিশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপে যে ঢঙে ছবি আঁকা হ'ত কতকটা সেই রকম। ঝাঁসীর রাণীর যে মুখশ্রী দেখিয়েছেন শিল্পী তা অত্যন্ত ফটোগ্রাফিক বলে মনে হয়। ঝাঁসীর রাণীর প্রকৃতপক্ষে কেমন চেহারা ছিল তা অবশ্যই জোর করে কেউ বলতে পারে না, কেননা, সে সময় ক্যামেরা আবিষ্কার হয়নি; তা হলেও সে সময়ের শিল্পীরা লক্ষ্মীবাইয়ের যা প্রতিকৃতি এঁকেছেন তার ওপর আমরা কিছুটা নির্ভর করতে পারি। কিন্তু চিন্তামণিবাবুর ঝাঁসীর রাণীর চেহারা সেকালের আঁকা কোনও ছবির সঙ্গেই মেলে না। এবং টোনটোনও ইউরোপীয় ঢঙে হওয়ার ফলে ছবিটির রস কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেই আমার ধারণা। এ ছবি যদি রোমাণ্টিক যুগের বা তার থেকে কিছু পরের কোনও ফরাসী শিল্পীর আঁকা হ'ত তা হলে আমাদের আপত্তি করার কিছু ছিল না। ছবিকে একমাত্র রিয়ালিস্টিক করে তোলাই শিল্পীর সবচেয়ে বড় কাজ নয় বলেই আমরা বিশ্বাস করি। অরুণ মৈত্রের 'দি লেডী অব ১৮৫৭' আদৌ প্রদর্শনযোগ্য ব'লে মনে হয় না। অত্যন্ত দুর্বল তুলির টান। বর্ণও অপ্রীতিকর এবং কম্পোজিশন শিক্ষানবিশ-দের মত। শিল্পী হয়ত বলতে পারেন স্টাইলাইজেশন কিন্তু সমালোচকের চোখে তা মনে হয় বোধশক্তির দৈন্যদশা। রথীন মৈত্রের 'এইটীন ফিফটিসেভেন' এবং প্রতাপ-চন্দ্র দেবের 'হোয়েন কান দেয়ার গ্লোরী ফেড' সবাই রসোত্তীর্ণ। কল্যাণ সেনের 'এইটীন ফিফটিসেভেন'-এ ব্যবহারিক

(২)

বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট বোর্ড একটি স্টল খুলেছেন ব্রাবোর্ন স্টেডিয়াম-এ। বিভিন্ন প্রদেশের হাতের শিল্পের নানান রকম নমুনা এঁরা সাজিয়েছেন। ধুতি, শাড়ি, কোটের কাপড়, শার্টের কাপড়, টেবিল ঢাকা, বিছানার চাদর, তোয়ালে, রুমাল, কার্পেট, পর্দা, দড়ি প্রভৃতি এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে। বিক্রীও হচ্ছে, কিন্তু বিক্রী করাই উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য

ঝাঁসীর রাণী — চিন্তামণি কর

প্রতিষ্ঠানটির প্রচার এবং দেশীয় তাঁত শিল্প উন্নয়নের কাজে এ'রা কতটা সাহায্য করতে পেরেছেন সেটা জনসাধারণকে জানানো।

ভারতের কুটিরশিল্পগুলির মধ্যে তাঁত শিল্পই সবচেয়ে বড়। প্রায় ১১২ লক্ষ কারিগর এই শিল্পে নিযুক্ত আছে এবং ১২০ কোটি গজ কাপড় প্রতি বছর এই তাঁত শিল্পে উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক প্রদেশেই তাঁত শিল্পের রেওয়াজ আছে এবং নক্সা বা বোনায় প্রত্যেক প্রদেশেরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন বারাণসীর ব্রোকেড, অন্ধ্রের কলমকারি ছাপা, পাঞ্জাবের খেস, হায়দরাবাদের হিমরু, চান্দেরীর মসলিন প্রভৃতি। এ প্রদর্শনীতে মোটামুটি সব প্রদেশেরই বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু নমুনা রাখা হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য—ঢাকার মসলিন (হবলালকা এণ্ড কোং-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত), বালুচরের শাড়ি (শুভ ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত) এবং বারাণসীর কার্তানিকাত সিল্ক। বালুচর শাড়ি এখন আর পাওয়া যায় না। বহুদিন পূর্বেই এই বিশেষ ধরনের বয়ন শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। এখনকার নিদর্শনটি প্রায় ১৫০ বছরের পুরোন। শোনা যাচ্ছে শুভঠাকুর মহাশয় এই লুপ্ত শিল্পটি পুনরায় চালু করার চেষ্টায় আছেন। কার্তানিকাত শাড়িটি এ প্রদর্শনীর সবচেয়ে মূল্যবান দ্রষ্টব্য। একেকটি কার্তানিকাত শাড়ি বোনা শেষ হতে প্রায় চার মাস সময় লাগে এবং অসাধারণ পটুত্বের প্রয়োজন। হায়দরাবাদের হিমরু, কেরলের জরি ও সুতো মিশ্রিত বোনা এবং বারাণসী ব্রোকেড সত্যই তারিফ করার মত। বিদেশে সবচেয়ে বেশী রপ্তানি হয় হিমরু এবং ব্রোকেড।

যাই হোক প্রদর্শনীটি বেশ উপভোগ্য সন্দেহ নেই। তবে মান অনুযায়ী ডিসপ্লে উপযুক্ত হয়নি বলেই আমার ধারনা।

চিত্রগ্রীব
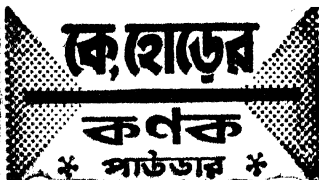
ইস্রায়েল চিত্রকলা : বোম্বাই

মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গীন রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে ছোট দেশ ইস্রায়েল। সে দেশের আধুনিক চিত্রকলা বা সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা এদেশে তেমন কোন খবর পাই না। যারা এই দেশটা দেখেছেন, তাঁদের কাছে যদিও ইস্রায়েলের বিভিন্ন দেশোন্নয়ন পরিকল্পনা ও সংগঠন শক্তির প্রশংসা শুনেছি। মরুভূমির মধ্যে কৃষিকর্ম ও শিল্পে ইস্রায়েলীরা যে অসাধ্য-সাধন করেছে তা অন্য দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ

মাতৃত্ব
—এম ইয়ানকো

করেছে। এসব ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ইস্রায়েলের খবর ত সংবাদপত্রে সর্বদাই পড়তে হয়। এইরকম আবহাওয়ায় সে দেশের শিল্পীরা কি করছে তা জানার আগ্রহ স্বাভাবিক এবং এই কারণে প্রচুর কৌতূহল নিয়ে জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীতে ইস্রায়েলের আধুনিক চিত্রকলার প্রদর্শনীটি দেখতে গিয়েছিলাম।

বম্বের ইস্রায়েল কনসাল ও আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর (২৯শে জুলাই—৪ঠা আগস্ট) উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচাবন। কনসাল মিঃ এ ক্যাস্পী একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাঁর দেশের চিত্রকলার গতি প্রকৃতি আলোচনা করেন। ইস্রায়েলের শ্রেষ্ঠ নয়জন শিল্পীর আঁকা ১২০টি চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল। বেশীর ভাগ ছবিই জলরঙ এবং Gouache-এর কিছু কাগজের উপর আঁকা তেলরঙ, রঙীন উডকাট, সাদা কালো রেখাচিত্র ইত্যাদি। বম্বেতে প্রদর্শিত হবার পূর্বে এই ছবিগুলির এক প্রদর্শনী হয় জাপানে, "ইয়োমিউরী শিম্বুনের" উদ্যোগে। জাপানে ইস্রায়েলী চিত্রকলার দুটো প্রদর্শনী হলেও, ভারতবর্ষে এই প্রথম। পরিবহনের অসুবিধার জন্য আরও ছবি পাঠান সম্ভব হয়নি। সেইজন্যই উদ্যোক্তারা এই প্রদর্শনীকে ইস্রায়েলী চিত্রকলার একান্ত নিদর্শন বা প্রতিনিধি-স্বরূপ বলে ধরতে মানা করেন। জলরঙের ছবি বেশী থাকার কারণ এ নয় যে, সে-দেশের শিল্পীরা অন্য কোন মাধ্যমে ছবি আঁকেননি।

বিশেষভাবে 'ইস্রায়েলী চিত্রকলা' বলা চলতে পারে এমন কোন বিশিষ্ট রূপ এই প্রদর্শনীর চিত্রকলার মধ্যে নেই। বেশীরভাগ শিল্পীই বিভিন্ন দেশ থেকে এসে সে-দেশে বসবাস করছে। ইয়োরোপের বিভিন্ন 'স্কুল' ও শিল্প আন্দোলনের প্রভাবও অনেক স্থলে আছে। তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে, "বিশুদ্ধ চিত্রকলা"র পর্যায়ে এই ছবিগুলিকে ধরা যায়। ইস্রায়েলী শিল্পীরা নিজের দেশের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আলাদা কিছু করছে না, অন্যান্য দেশের শিল্পীদের সহিত যোগাযোগ আছে বা সমগোত্রীয়। চিত্রকলা দ্বিভাষিক, জাতীয় ভাষার প্রকাশভঙ্গীর সহিত মিলিত হয়েছে এক আন্তর্জাতিক ভাষা। ব্যক্তিগতভাবে একজন শিল্পীর সৃষ্টিতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রবহমান জীবন, মানবচরিত্র, নিজের অনুভূতি অনুযায়ী প্রতিফলিত হয়। ইস্রায়েলের শিল্পীদের ছবিতেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইহুদী পুনরভ্যুত্থান, চারুকলার প্রতি তাদের ট্র্যাডিশনাল মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায়। দেশ ও জাতির উন্নয়ন, সংগঠন ও নতুন সমাজ প্রবর্তন করার আকাঙ্খার সহিত, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও সচেতনতা দেখা দেয়, যার প্রভাব চিত্রকলাতেও বিস্তৃত হয়। আধুনিক ইস্রায়েলী চিত্রকলাকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বোরিস শাটজ্ জেরুজালেমে "বেজালাল স্কুল অব আর্টস এণ্ড ক্রাফটস" স্থাপনা করেন। তিনি ছিলেন রুশদেশের "বাস্তবধর্মী স্কুলের" একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি। বাস্তবধর্মী পদ্ধতিতেই তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন এবং কারুশিল্পই প্রাধান্য পেত। তখনকার দিনে অন্যান্য দেশের সহিত ইস্রায়েলের তেমন কোন যোগ না থাকায়, অত্যন্ত সংকীর্ণ বাঁধাধরা এই স্কুলটির প্রভাব চিত্রকলার বিবর্তনে বাধা জন্মায়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে অনেক শিল্পী পূর্বেকার বাস্তবধর্মী চিত্রকলা, রোমান্টিক প্রাকৃতিক দৃশ্য, বাইবেলের গল্প ইত্যাদি পরিত্যাগ করে, নতুনভাবে নিজের দেশের জীবন প্রকাশ করতে চান এবং এ'রাই আধুনিক চিত্রকলার গোড়াপত্তন করেন। সে সময় চিত্রকলার বিষয়বস্তুই ছিল প্রধান, ছবি আঁকার টেকনিক ছিল গৌণ। ১৯২৩ সালে জেরুজালেমের "টাওয়ার অব ডেভিড"এ এ'দের প্রথম প্রদর্শনী রীতিমত

বাক্যা লাপ —এ রুবিন

আলোড়ন তোলে। এই প্রদর্শনীটি এখন বাৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ'রাই প্রথম বিভিন্ন দেশের শিল্প আন্দোলনের সহিত যোগাযোগ ঘটায়। আবেল প্যান, রুবিন, গুটম্যান, লিটভিনোভস্কি, লুবিন, জারিট্স্কি ইত্যাদি শিল্পীরা এই প্রাচীন দেশের দৃশ্য, প্রখর আলো, বাইবেলের কিংবদন্তী ইত্যাদিতে মুগ্ধ হন। এরকম অভিজ্ঞতা তাঁরা পূর্বে যেসব দেশে বাস করতেন সেখানে হয়নি। জনসাধারণের নিকট এদের ছবি জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও এক-দল শিল্প সমালোচকের বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় এ'দের। এ'রা বলেন যে, কারমেল, ট্যাবর বা গিলবোয়ার মোটেও কোন পরিবর্তন হয়নি, এলাইজা, দেবোরা বা সাউলের সময় থেকে। প্রত্যেক রাখাল বালকই যুবক ডেভিড নয় কিম্বা র‍্যাচেল কখনও দুঃখী কৃষককন্যা নয়। কিন্তু এই-সব শিল্পীর মধ্যে দেশের গঠনমূলক কর্মোদ্যম, প্রাচ্যের আরব, ইহুদীদের জীবন, নব অভিজ্ঞতার স্পন্দন তোলে। এরপর শিক্ষালাভের জন্য বহু শিল্পী ইয়োরোপে বিশেষ করে ফ্রান্সে যায়। অপরদিকে ১৯৩৩ সালে হিটলারের অভ্যুত্থানের পর জার্মান দেশ থেকে বহু শিল্পী ইস্রায়েলে আসে। এদের অনেকেই "জার্মান গ্রাফিক আর্টে"র শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশা অত্যন্ত বিশিষ্টতার সহিত এ'রা প্রতিফলিত করেছেন নিজেদের কাজে। এখান থেকেই শুরু হয় ইস্রায়েল চিত্রকলার তৃতীয় পর্ব। রঙের সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ ও ব্যবহার, বিভিন্ন নতুন টেকনিক দেখা দেয় শিল্পী-দের ছবিতে এবং ফরাসী স্কুলের প্রভাব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে শিল্প আন্দোলনের অগ্রগতি ব্যাহত হলেও, বিগত নয় বছরে সে-দেশের শিল্পীরা নতুন ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করছে। শিল্পী-দের এখন নিজের দেশের প্রতি সচেতনতা জেগেছে। বিদেশী বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গী ত্যাগ করে এরাও এখন নতুন পথের অনু-সন্ধান করছেন নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করতে। হয়ত অদূরবর্তী কালে "আধুনিক ইস্রায়েলী চিত্রকলা" বলা চলবে এমন কোন প্রকাশভঙ্গী এ'রা খুঁজে পাবেন।

যে নয়জন ইস্রায়েল শিল্পীর ছবি বম্বে প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল তাঁদের বয়স ৫০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে এবং তরুণ কোন শিল্পীর চিত্র প্রদর্শিত হয়নি। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় প্রবীণতম স্টাইন ভার্ড-এর ১২টি রঙীন উডকাট। 'জার্মান স্কুলে'র গ্রাফিক আর্টের অত্যন্ত সার্থক নিদর্শন। অত্যন্ত বলিষ্ঠতা আছে প্রত্যেকটি ছবিতে। ব্রেজিলের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ১৯৫৫ সালে উডকাটে তিনি প্রথম পুরস্কার পান। এ'র অনেক ছাত্র শিল্পীরূপে খ্যাতিলাভ করেছে, যেমন ইয়াকভ পিনস্ টোকিওর আন্তর্জাতিক 'প্রিণ্ট' প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হন।

শিল্পী ইয়াঙ্কো ১৯১৭ সালে ইয়ো-রোপের 'ডাডা' আন্দোলনের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন এবং হানস্ আর্প, হুলসেন্ বেক্, পিকাশোর সহিত এক-যোগে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

রেস্টিং বেদ্ইন —সাইমন

'ডাডাইজ্ম্' আজ মৃত হলেও, ইয়োরোপের শিল্প আন্দোলনে এর দান নেহাত কম নয় এবং উপেক্ষা করা চলে না। পরবর্তী শিল্প-আন্দোলন ও চিত্রকলার অগ্রগতিতে 'ডাডা'র ঐতিহাসিক স্থান আছে। এ যুগের অতি-আধুনিক ব্যবহারিক শিল্পে, লে-আউটে ও অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে, অনেক কিছু যা আমাদের এখন চমৎকৃত করে তা এই 'ডাডা' আন্দোলন থেকেই উদ্ভূত। 'ডাডা'র জন্যই স্যুরিয়ালিজ্ম সম্ভব হয়েছিল। ইয়াংকোর সাতটি ছবিই রঙীন রেখাচিত্র, অত্যন্ত সাবলীল, ছন্দোময় ও প্রাণবান। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় 'টু উইমেন' ছবিটি।

ইস্রায়েলী শিল্পীদের মধ্যে গুটম্যানই প্রথম একাডেমির পদ্ধতি ত্যাগ করে ইস্রায়েলের জীবন ও আদর্শ অনুযায়ী নতুন ধরনে আঁকতে শুরু করেন। এ বিষয়ে এঁকেই পথপ্রদর্শক বলা চলে। শিশুপাঠ্য পুস্তকের চিত্রকাররূপেও তিনি খ্যাত এবং ছবির সহিত শিশুপাঠ্য কাহিনীও রচনা করেছেন।

হোলজ্ম্যানকে বলা হয় ইস্রায়েলের 'গে পেইণ্টার'। ফরাসী দেশে বহুকাল শিক্ষালাভ করায় ইনিই প্রথম ফরাসী চিত্র-কলার মেজাজ নিয়ে আসেন। সূক্ষ্মভাবে বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণ রয়েছে তাঁর ১০টি ছবিতে। জীবনের আনন্দময় দিকগুলিকেই তিনি দেখাতে চেয়েছেন, তাঁর আলো, বাতাস, রঙের মাধ্যমে।

একমাত্র জীন ডেভিডের ছবিই প্রদর্শনীতে অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্ পর্যায়ে পড়ে। ক্ষুদ্র ছবিগুলির রঙ ও কম্পোজিশন প্রীতি-প্রদ এবং অনেক ছবিতে রঙের উপর পাতলা আঠার প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। অ্যাব্‌স্-ট্রাক্ট্ ছবি আঁকলেও ইস্রায়েলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলংকরণ ও প্রাচীরপত্র শিল্পীরূপে তিনি বাস্তবধর্মী ছবিও আঁকেন।

নিউ ভিনোভ্‌স্কির ১৯টি ছবির বেশীর ভাগই কাগজের উপর তেলরঙে আঁকা। বিচিত্র এবং মৌলিক তার রঙ। বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁর নিজের মনোভাব চিত্রে প্রকাশিত করেছেন, বিষয়বস্তুকে নয়। তাঁর আঁকা সাতটি পোর্ট্রেট 'স্কলার' প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ।

ন্যাটন এককালে বাস্তবধর্মী নৈসর্গিক দৃশ্যচিত্রের শিল্পীরূপে খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালের, প্রদর্শিত ১৪টি ছবি কিউবিস্ট ও জ্যামিতিক ধরনে আঁকা, বাস্তব-ধর্মী মোটেই নয়। লুবিনের ১১টি ছবি বিভিন্ন ধরনে আঁকা। সাইমনের আঁকা সাতটি রঙীন ও তিনটি সাদা কালো ছবির বেশীর ভাগই প্রাকৃতিক দৃশ্য। অত্যন্ত সুন্দর এই ছবিগুলি, কি রঙের ব্যবহারে, কি 'স্টাইলাইজ্ড্' অংকনে। বিষয়বস্তু শিল্পীর নিকট অত্যন্ত বাস্তব। চরিত্রগতভাবে তাঁর ছবি অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্ ধরনের হলেও, ফর্মে নয়। বাস্তবকে তিনি তাঁর নিজের দৃষ্টি-ভংগী দিয়ে প্রতিফলিত করেছেন এবং ছবির মধ্যে এনেছেন প্রাণচাঞ্চল্য। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় 'রেস্টিং বেদুইন' ছবিটি।

একদিক দিয়ে এই প্রদর্শনীতে বঙ্গের শিল্পীরা হয়ত লাভবান হবে। এখানে বহু শিল্পী উৎকটভাবে জোরালো রঙ ব্যবহার করে, হয়ত চোখ ধাঁধিয়ে দেবার জন্য কিম্বা 'Gay' ভাব আনার জন্য। ইস্রায়েলী শিল্পীরাও অনেক স্থলে জোরালো রঙের ব্যবহার করলেও কোন ছবি দৃষ্টিকে পীড়িত করে না, অত্যন্ত স্নিগ্ধ ছবিগুলির রঙ। —চিত্রসেন

নিখিল মৈত্র

বোম্বাই থেকে সুরাতে চলেছি। বোম্বাই দ্বীপ ছাড়ার সঙ্গে রেল লাইনের পাশে পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার শাখা, প্রশাখা দেখা যাচ্ছে। সহযাত্রী গুজরাটী বন্ধু বললেন যে, এইখান থেকেই গুজরাতের সীমারেখা শুরু হয়েছে। তার প্রমাণ ঐ সহ্যাদ্রির দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে। মারাঠী দেশের রাঙ্গা, রুক্ষ ভাব পাহাড়ের গা থেকে মুছে গিয়েছে। চারদিকের শ্যামল, স্নিগ্ধ আবরণ পাহাড়কেও আবৃত করেছে। প্যাসেঞ্জার গাড়ি টিকোতে টিকোতে চলেছে। মাঝে মাঝে স্টেশনে গাড়ি থামছে, লোক নামা-ওঠা করছে। মানুষের দিকে দেখলেও বন্ধুর ঐ কথাই মনে হচ্ছিল যে, মারাঠী অঞ্চল ছাড়িয়ে এসেছি, সবই শান্ত, স্নিগ্ধ।

আরব সাগরের কোল ঘেঁষে গুজরাতের যে সমভূমি অঞ্চলের উপর দিয়ে চলছিলাম তা তাপ্তীর অববাহিকার উপরে সুরাতকে অতিক্রম করে, নর্মদার বিস্তৃত বারিধারা পার হয়ে, ক্ষীণস্রোতা সবরমতীর উত্তর তটের ওপারে সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপে গিয়ে শেষ হয়েছে। পূর্বের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে পশ্চিমে আরব সমুদ্রে প্রবাহিনী বিভিন্ন নদীর দোয়াবে আরব সাগরের সংলগ্ন সংকীর্ণ সমভূমিতে গুজরাতের বিভিন্ন সাম্রাজ্য বিকাশ লাভ করে এবং সেই সব রাজ্যের রাজধানীর স্থাপনাও হয় এইখানে। মৌর্য, ক্ষত্রপ ও গুপ্ত যুগে গিরিনগর ছিল প্রধান কর্মকেন্দ্র। পণ্ডিতদের মতে বর্তমান জুনাগড়ই হচ্ছে প্রাচীন গিরিনগর।

গুজরাতী মৎস্যজীবী

কাথিয়াওয়াড় বালকের দল

তারপরে [illegible] এবং রাষ্ট্রকূট শক্তির উত্থানের সঙ্গে ভরুচ এবং নবসারী ইতিহাস-খ্যাত-নগর রূপে পরিচিত হলো। চালুক্য শক্তির শেষ অধ্যায়ে সরস্বতী ও তার শাখা নদী রূপেনও পুষ্পবতীর দোয়াবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সে যুগে অনহিলওয়াড়া এবং সিধপুর (সিদ্ধপুর) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। পশ্চিম উপকূলে ভরুচ কাম্বে এবং পরবর্তী যুগে সুরাট ও বলভী (বর্তমান ভালা) কর্মচঞ্চল বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। সোমনাথ ও দ্বারকার ভৌগোলিক স্থিতিও এই দুই নগরীর প্রতিষ্ঠা প্রসারে সহায়তা করে।

এককোটি সত্তরলক্ষ গুজরাতী ভাষী মানুষ বোম্বাই রাজ্যে বসবাস করে। তাদের বাসভূমির উত্তর সীমারেখায় শিরোহি আর মারোয়াড়ের রাজস্থান, পূর্বে আরাবল্লীর রুক্ষ পর্বতশ্রেণী এবং ভীল আদিবাসীদের উপনিবেশ, পশ্চিমে অশান্ত আরবসাগর। দক্ষিণে সহ্যাদ্রি পর্বতমালার পশ্চিম অঞ্চল ঘেঁষে গুজরাত গিয়ে মিশেছে প্রতিবেশী মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বোম্বাই নগরীর উপকণ্ঠে।

বর্তমান ভারতে কোনও এক বিশেষ অঞ্চলকে যদি অতীতযুগের বিভিন্ন জাতির [illegible] নিদর্শন করাতে হয় তাহলে গুজরাতের কথাই প্রথমে মনে পড়ে। মধ্য এশিয়ার এক যাযাবর জাতি আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হিন্দুকুশ গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিল। তাদের সঠিক ইতিকথা আজ আর জানার উপায় নেই। এখানে ওখানে যাযাবর জাতির রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষাশেষি তারা রাজপুতানার একাংশের উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং সম্ভবত আরাবল্লীর বাধা অতিক্রম করে নর্মদা-তাপ্তীর দোয়াবে প্রাচীন বন্দর নগরী ভরোচকে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আরও তিন-চারশো বছর পরে সবরমতী নদীর উত্তর অঞ্চলের নতুন নামকরণ হলো গুর্জরমণ্ডল বা গুর্জরদেশ। ইতিহাসের বিচিত্র পট-পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজ গুজরাতী নামে এই বিস্তৃত অঞ্চলের মানুষ নিজেদের পরিচয় দেয়। মধ্য এশিয়ার গুর্জর জাতির সঙ্গে আরও যে কত মানুষের ধারা-উপধারা মিলে বর্তমান গুজরাত সৃষ্টি করেছে তার সংখ্যা নিরূপণ অসম্ভব

গুজরাতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল কাথিয়াওয়াড়, সুরাষ্ট্র বা অধুনা সৌরাষ্ট্র নামে সুপরিচিত। হাজার বছর আগে থেকে এখানেও বহু রাজপুত উপজাতি কচ্ছ হয়ে বা গুজরাতের মধ্যে দিয়ে এসে বসবাস আরম্ভ করে। জেথওয়া, চাওড়া, ওয়ালা, গাহের, বাবারী, জোহেল প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছোট-বড় বিভাগ মুঘল ও মারাঠা সাম্রাজ্যের যুগেও অবলুপ্ত হয়নি। ব্রিটিশ যুগের অবসানের পর এই সামন্ততান্ত্রিক রাজপাট তুলে দেওয়া হয়। সামন্ততান্ত্রিক শাসনে সৌরাষ্ট্রের ভূমিব্যবস্থাও অসম্ভব জটিল আকার ধারণ করেছিল। মধ্যযুগে থেকে বিজয়ী রাজপুত রাজারা নিজেদের সেনাপতি, মন্ত্রী বা অন্য কোনও প্রিয় অনুগতজনকে জমি দান করে গিয়েছেন। এইভাবে সৌরাষ্ট্রের গিরাশিয়া (ভূস্বামী) সমাজের সৃষ্টি। বহু গিরাশিয়া নিজের অংশ অন্য দরিদ্র কোনও ভূস্বামীর কাছে বিক্রয় করে নিজে মূল গিরাশিয়া পর্যায়ভুক্ত হয়েছিল। এ ছাড়া কোনও বিশেষ বৃত্তি বা কাজের বিনিময়ে জীবাইদার নামে জমির আর এক উপস্বত্বভোগী সমাজের সৃষ্টি করা হয়। ইংরেজ আমলে সরকারী এজেন্ট, পলিটিকাল অফিসার বা রেসিডেন্ট—কেউই এই জট ছাড়াবার চেষ্টা করেননি। স্বাধীন ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বিলোপের ফলে বিচ্ছিন্ন বিভক্ত কাথিয়াওয়াড় আবার সৌরাষ্ট্রের নাম ধারণ করে। কিন্তু বহু ভূস্বামী ও জমির উপস্বত্বভোগীরা তাদের বিশেষ সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। নতুন শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কয়েক বছর আগে দস্যু ভূপত যে অনাচার ও অরাজকতার সৃষ্টি করে তার পেছনে সামন্ত সমাজের কোনও কোনও অংশের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা ও সমর্থন ছিল।

গুজরাতিভাষাভাষী মধ্যবিত্ত সমাজ বুদ্ধির প্রাখর্যে সৌরাষ্ট্রবাসীদের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন। আমেদাবাদের এক অধ্যাপক হাসিচ্ছলে বলেছিলেন যে, গুজরাতে প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, কাথিয়াওয়াড়ের লোকের মাথার উপরে পাগড়ির যত রকম পাঁচ আছে, ভেতরে মস্তিষ্কেও ঠিক ঐ রকম ঘোর-প্যাঁচ বাঁধা আছে! দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, মহাত্মা গান্ধী ও কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না দুজনই কাথিয়াওয়াড়ী এবং জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান কর্ণধারও ঐ অঞ্চলের।

দক্ষিণ ও মধ্য গুজরাতের ছোটখাটো ব্যাপার-ব্যবসায়ে কিন্তু বহু কাথিয়াওয়াড়ী দেখেছি। তাদের পোশাকের বৈশিষ্ট্য স্বভাবতই তাদের পরিচয় বহিরাগতদের কাছে সহজ করে দেয়। পুরুষের দরবারী পায়জামা এবং উপরের বহির্বাস অঙ্গরাখা কাথিয়াওয়াড়ীদের স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। গুজরাতে মাথায় উপরে টুপি বা পাগড়ি পরতেই হয়। কাথিয়া-

গুজরাটী বাজার

ওয়াড়ের গ্রামাঞ্চলে বিরাট [illegible] রং-বেরং-এর পাগড়ি পরার রীতি এখনও প্রচলিত। শহরে অবশ্য সাদা খদ্দরের টুপির চলই বেশি।

সৌরাষ্ট্রে হিন্দু, জৈন এবং বৌদ্ধ—এই তিন সম্প্রদায়ের বহু মন্দির আছে। জনপ্রবাদ যে মাধবপুর নগরে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয় রুক্মিণীর সঙ্গে। তুলসীশ্যামের উষ্ণ বারিধারাও পবিত্র। মূল দ্বারকার সঠিক স্থিতি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বহু মত আছে। দ্বারকার জগৎ মন্দির দেখে হয় কোনও প্রাচীন নৃপতির কীর্তি চিহ্ন। বর্তমান পোরবন্দরকেই অনেকে অতীতের সুদামাপুরী বলে মনে করেন। মন্দিরনগরী পালিতানা জৈনদের কাছে অতি পবিত্র তীর্থস্থান। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সৌরাষ্ট্র শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় সোমনাথ পত্তনে। দেব পত্তন, প্রভাস পত্তন, বেরাবল পত্তন বলেও এই স্থানকে অভিহিত করা হয়। লোককথায় জানতে পারা যায় যে, প্রজাপতির অভিশাপে চন্দ্রের মুখ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শাপমুক্তির জন্য সোম (চন্দ্র) প্রভাসপত্তনে জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপনা করেন। ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে মনে হয় যে এই মন্দিরের নির্মাণ পঞ্চম শতাব্দীর আগেই শেষ হয়েছিল। অলবেরুনি এই মন্দির ধ্বংসের ঠিক আগে ও পরে দুবার দেখতে এসেছিলেন। তাঁর বর্ণনা থেকে সোমনাথ মন্দিরের অনুপম স্থাপত্য ও [illegible] পরিচয় পাওয়া যায়। তিন দিক সমুদ্রের অপরূপ উর্মিমালা মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে। মন্দিরের [illegible] উপকূলে [illegible] কাশী ও [illegible]। [illegible] নদীর ধারে টিলার উপর [illegible] মন্দির এবং সোমনাথের [illegible] মন্দির [illegible] উপাসনায় সম্পাদন করছে।

গুজরাটের সামাজিক চেহারা প্রাচীন সময় থেকেই গুজরাটীদের সমুদ্রযাত্রী করে তুলেছে। নর্মদার তীরে ভৃগুকচ্ছ বা ব্রোচ বন্দর অষ্টম শতক থেকে পূর্ব-পশ্চিম দেশের সঙ্গে বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে পরিচিত। এখন অবশ্য এই বন্দর তার প্রাচীন বৈভব হারিয়ে ফেলেছে। পশ্চিম উপকূলের ছোট সাম্পান ও ডাউ ছাড়া অন্য সমুদ্রতরণী আর এখানে ভেড়ে না। ব্রোচ বন্দরের স্থিতি কিন্তু বড় মনোরম। নর্মদার ধারে টিলার উপরে ধাপে ধাপে শহর উপরে উঠেছে। বর্ষা সময়ে নদীর স্ফীত জলধারাকে সংযত ও শৃঙ্খলিত করার জন্যে বহু যুগ ধরে চেষ্টা চলছে। বর্তমানে অবশ্য সে পাহাড়গুলির গা বেয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা তৈরি হয়েছে যানবাহনের জন্যে। ব্রোচে নদীর ধারে দেখেছিলাম দুখানা মাঝারি গোছের কাঠের পালতোলা জাহাজ নোঙর করে থাকতে। জাহাজ এসেছে কেরালা থেকে নারকেল আর নারকেল-এর দড়ি নিয়ে। এখান থেকে কাপড়, গৃহনির্মাণের জিনিসপত্র নিয়ে যাবে। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এমনধারা পণ্যতরণীই আরব ও রোমক নাবিকরা এখানে নিয়ে আসতো।

সমুদ্রের জলধারা মানুষকে দূরেও সরিয়ে দেয় আবার নিকটতরও করে। প্রাচীনকাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে আসাযাওয়ার ফলে যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সেতু রচিত হয়েছিল তাই দিয়ে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবদের মূর্তিপূজাবিরোধী অনুশাসন অস্বীকার করে অগ্নিপূজারী পারশী সম্প্রদায় আসেন গুজরাতের শ্যামলভূমিতে। রানা যাদব তাঁদের ধর্মরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন এবং প্রথম পারশী উপনিবেশ গড়ে উঠে সঞ্জানে। সেই থেকে পারশী সম্প্রদায় গুজরাটী সমাজের এক বিশিষ্ট অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছেন। তাঁদের ভাষা গুজরাটী, যদিও কথাভাষায় পারশীরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। এখন বোম্বাই শহরের বাইরে পারশীদের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা সুরাট, নৌসারী, বিলিমোরা প্রভৃতি।

সমুদ্রপারে ব্যবসা-বাণিজ্য, বসতি স্থাপনা প্রভৃতি ব্যাপারে গুজরাটীরা ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় অনেক বেশি তৎপর। পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিশাস, বর্মা প্রভৃতি অঞ্চলে বহু গুজরাটী নিজের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বিস্তার করেছেন। কিছুদিন আগে সুরাট জেলায় তাপ্তীর তীরে এক গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামে বহু বড় বড় বাড়ি, তার মধ্যে কিছু বাড়ি তালা-বন্ধ। শুনলাম, গ্রামের এই সম্পত্তিশালী অধিবাসীরা আফ্রিকায় কাজকারবার করেন। দেশের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় সবারই আছে। কিছুদিন আগে পর্যন্তও প্রায় সবাই দু-তিন বছর পরে একবার দেশে আসতেন। এমনও হয়েছে যে বর ও কন্যাপক্ষ আফ্রিকা থেকে এসে স্বগ্রামে বিবাহ দিয়েছেন। ক্রমে ক্রমে অবশ্য যাওয়া আসা কমে আসছে। বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে টাকাকড়ি পাঠাবার উপরও নিষেধাজ্ঞা বাড়ছে। ঐ রকম আর একটি গ্রাম কাদোর। সেখানে বহু বর্মার ব্যবসায়ীর বাস। তাঁদের সমস্যা আরও গুরুতর। ক্রমবর্ধমান সরকারী বাধা-নিষেধের ফলে অনেকেই বহুদিনের কাজ-কারবার বন্ধ করে বর্মা ছেড়ে চলে আসছেন।

গুজরাটী গ্রামের শান্ত, স্নিগ্ধ রূপ-এর তুলনা বোধহয় ভারতবর্ষে অন্য কোথাও মেলে না। গ্রামবাসীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহবিবাদ কখনও শোনা যায়নি। গুজরাতের যে অংশ আগে বরোদা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেখানকার লোকেরা বলেন যে, সামন্তরাজশাসনে তাঁদের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল। গুজরাতী অধিবাসীদের কাছ থেকে মারাঠী রাজপরিবার গায়কোয়াড়-এর উচ্ছ্বসিত বহু প্রশংসাই

শুনেছি। ভূতপূর্ব বরোদা রাজ্যের প্রতি তহশীল কেন্দ্রে এক-একটা চোরা বা অতিথিশালা ছিল। তহশীল কেন্দ্র বলতে বর্ধিষ্ণু গ্রামকে বোঝায়। এখন এই সব অতিথিশালা সংস্কারের অভাবে হতশ্রী দেখায়। শুনলাম যে, বোম্বাই সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে এই অতিথিনিবাসের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেবেন। প্রায় প্রতিটি বড় গুজরাতী গ্রামে কোনও না কোনও মাতৃমন্দির আছে। অম্বা, বহুচেরা, কালী, যোগিনী প্রভৃতি মাতৃমন্দিরে গ্রামবাসীরা শ্রীফল বা নারকেল উৎসর্গ করে। দেবীর সামনে পূজারী নারকেল ফাটান এবং ভক্তজন অর্ধেক নারকেল প্রসাদরূপে নিয়ে আসেন।

গুজরাতের প্রধান লোক-উৎসব নওরাত বা নবরাত্রি। দশহরার শুক্লপক্ষে প্রথমা থেকে উৎসব শুরু হয়। সেই সময় বর্ষার বারিধারা শেষ হয়ে আকাশ মেঘমুক্ত। আশ্বিনের এমনি এক স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় গুজরাতী গ্রামের বারোয়ারি আঙিনাতে নবরাত্রির প্রধান অঙ্গ গরবানৃত্য দেখেছিলাম। গুজরাতী রমণীর হাস্যকোলাহলে সমস্ত উৎসবমণ্ডপ মুখরিত। নৃত্য যৌথ, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীলোকের। যুবতী এবং বালিকা দুই দল আলাদা করে নৃত্য আরম্ভ করল। শতছিদ্রের কলস গর্ভদীপ, তার মধ্যে প্রদীপের স্নিগ্ধ আভা। যুবতীর দল গোলাকার হয়ে মাথায় কলস নিয়ে নাচছে আর গাইছে :

গরবে রমবানে গোরী নীসর্যারে লোল......

(গৌরী গরবানৃত্য করতে এসেছে)

চঞ্চল, বলিষ্ঠ নৃত্যের ছোঁয়াচ দেবীদেরও স্পর্শ করে। মাতা অম্বাভবানী, তুলজাভবানী, কালী, বহুচেরা, পার্বতী, ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেবীও অদৃশ্যভাবে এই আনন্দ উৎসবে যোগ দিয়েছেন। গুজরাতী রমণীর দল যৌথ সংগীতে এই ঘোষণাই করছিল বারবার। সমস্ত রাত ধরে এই নৃত্যোৎসব চলেছিল। সংগীতের উপাখ্যান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা। নবরাত্রি উৎসবের শেষে দশহরার আয়ুধ বা শমী পূজা। অজ্ঞাতবাস যাত্রার পূর্বে পাণ্ডবেরা তাঁদের অস্ত্র শমী বৃক্ষে রেখেছিলেন। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে দশহরাব পূজা।

গুজরাতের গ্রামে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষের প্রথমা থেকে পক্ষকাল ধরে মেলা বসে। মেলার প্রথম দিন রাখীবন্ধন এবং শেষ দিন শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে জন্মাষ্টমীও বিরাটভাবে উদ্‌যাপিত হয়। দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির এবং ডাকোরে রণছোড় রায় মন্দিরে জন্মাষ্টমী উৎসব অতি সুবিদিত ঘটনা।

চান্দ্রমাস আশ্বিনের অমাবস্যায় দীপাবলী এবং ধন বা লক্ষ্মীপূজাও গুজরাতী গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। তার পরদিন—পয়লা কার্তিক গুজরাতী ব্যবসায়ীর হালখাতার দিন। রাজস্থানের হোলি উৎসবের মতো গুজরাতের হোলি অত ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হয় না। সমস্ত দিন উপবাস এবং সন্ধ্যায় হোলির পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলন, এই উৎসবের মূল অনুষ্ঠান।

গুজরাতে রেল-ভ্রমণের মধ্য দিয়ে গুজরাতী জনতার একটা বৈশিষ্ট্য বারবার লক্ষ্য করেছি। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে গাড়িতে স্থান সংগ্রহ নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ প্রায় প্রত্যহই হয়। গুজরাতে কিন্তু বহুবার লক্ষ্য করেছি যে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী নিজের স্থান নিয়ে ঝগড়াদ্বন্দ্ব না করে, দাঁড়িয়েই চলেছে বা ঘুমন্ত যাত্রীকে বিরক্ত না করে তারই পায়ের পাশে কোনও রকমে একটু বসার স্থান করে নিয়েছে। উত্তর ভারতের কোনও তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় এইভাবে যাত্রীরা কিছুতেই যাবে না।*

---

*এই প্রবন্ধের ফটোগ্রাফ সুনীল জানা কর্তৃক গৃহীত।

থেকে দূরে—ইরানে; বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী মুসাদিক আবাদানের বিরাট তৈলশিল্প ইংরেজের কবল থেকে মুক্ত করার সংগ্রাম শুরু করেছেন; সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের উৎসুক দৃষ্টি পড়েছে তাঁর প্রচেষ্টার পরিণামে। বেভিন নিয়ে এসেছেন শ্রমিক সরকারের পক্ষ থেকে নতুন এক মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা।

নাহাস প্রথমে দাবী করলেন সুদানের উপর মিশর রাজের পূর্ণ সার্বভৌম অধিকার স্বীকার ও ১৯৩৬-এর চুক্তি নাকচ ক'রে দিয়ে সুয়েজ থেকে ইংরেজ সৈন্যের দ্রুত অপসরণ। ইংরাজ সরকারের প্রতিরক্ষা প্রস্তাব থেকেই পরবর্তীকালে জন্ম নেয় বাগদাদ চুক্তি। একদিকে প্রতিরক্ষার উপর ইংরেজের অন্ধ গুরুত্ব, অন্যদিকে সুদান ও সুয়েজ সম্পর্কে মিশরের অনমনীয় দাবী, উভয়ের দুস্তর ও ক্রমবর্ধমান ব্যবধান ১৯৫১ সালের শেষের দিকে সুয়েজ ও অন্যান্য অঞ্চলে দুই শক্তির মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা করে। অক্টোবর মাসে মিশরের পার্লামেন্ট ফারুককে সুদানের রাজা বলে ঘোষণা করে এবং ১৯৩৬ সালের চুক্তিকে ইংরেজের প্রতিবাদ সত্ত্বেও নাকচ করে দেয়। নভেম্বর-ডিসেম্বরে মিশরে গঠিত হতে শুরু করে বে-সামরিক "মুক্তি-সেনা"; ক্যানাল অঞ্চলে এদের সঙ্গে লেগে যায় ইংরেজ সেনাদের গেরিলা যুদ্ধ। নাহাস অবশ্য তাঁর গভর্নমেন্টকে এ সংঘর্ষ থেকে নিরপেক্ষ রাখতে চাইলেন; মিশরের সৈন্যদল কোন প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করল না; নাহাস ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করলেন না, কূটনৈতিক সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করলেন না। সুয়েজ অঞ্চল থেকে "আত্মরক্ষার" অজুহাতে ইংরেজ সেনা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল কাইরোর দিকে। "সুয়েজ খাল অঞ্চলের শহরগুলি এবং সেখানকার যানবাহন ইংরেজের অধীনে নিয়ে আসা হল; কেউ কেউ বলতে লাগলেন যে, সমস্ত ক্যানাল অঞ্চলই মিশর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেওয়া হোক। এই অঞ্চল সবটাই অধিকার ক'রে নেওয়া, বা সমস্ত মিশরটাই ইংরেজের অধীনে নিয়ে আসা ছাড়া আর কোন সমাধান আছে মনে হল না, কিন্তু বৃটিশ সরকার কূটনীতি ও সামরিক নীতি উভয় ক্ষেত্রেই অসাফল্যের পরিচয় দিলেন।"* ইংরেজের দৃষ্টি থেকে তখনকার সমস্যার পরিচয় এ উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

তেল-অল্-কেবির—যেখানে অনেক বছর আগে আরবী পাশা ইংরেজের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন—সেখানেই নতুন ক'রে বড় রকমের সামরিক সংঘর্ষ শুরু হল। মিশর সরকার লণ্ডন থেকে রাজদূতকে ফিরিয়ে আনলেন প্রতিবাদ ক'রে। ইসমাইলিয়াতে মিশরের সহকারী পুলিস বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ সেনার গুরুতর সংঘর্ষ হল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সেরাগ আল্দিন পাশা এক সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন যে, ইসমাইলিয়ার কবরস্থানে গাছের উপর শূলবিদ্ধ ক'রে ইংরেজরা মিশরীদের হত্যা করেছে। "বলের পরিবর্তে মিশরও বল প্রয়োগ করবে", হুমকি দিলেন সেরাগ, ওয়াফদ দলের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা।

এ হুমকি অগ্রাহ্য ক'রে ইংরেজরা ১৯৫২ সালের ২৫শে জানুয়ারী সহায়ক পুলিসের প্রধান কেন্দ্রকে অবরোধ করল বিরাট সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে। দাবী জানালো, এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কেন্দ্রের প্রধান অফিসার টেলিফোনে কাইরোর নিকট নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। প্রতিরোধ, তিনি জানালেন, ব্যর্থ হতে বাধ্য। শুধু অনেক মিশরীর প্রাণই তাতে যাবে। তথাপি সেরাগ পাশা আদেশ দিলেন, আত্মসমর্পণ চলবে না, প্রতিরোধ করতেই হবে। বীরের মত মিশরীরা ইংরেজের দাবী অগ্রাহ্য করল। আক্রমণ করল ইংরেজ সমস্ত শক্তি দিয়ে। অনেক মিশরী আহত হল। ৪০ জনের প্রাণ গেল।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ল সারা মিশরে। সেরাগ পাশার এই নির্দয় নিষ্ঠুর আদেশে মিশরের পুলিস বাহিনীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা গেল। স্থানে স্থানে পুলিসেরা বিদ্রোহ ক'রে বসল। কাইরো ও অন্যান্য শহরে ইংরেজের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জনতা লুটতরাজ শুরু ক'রে দিল। কাইরোর অনেক বড় বড় বাড়ি, ক্লাব, রেস্তোরাঁ ভস্ম হয়ে গেল। একমাত্র টার্ফ ক্লাবেই নয়জন ইংরেজ ও কানাডার [illegible]

* The Middle East. A Political and Economic Survey. Royal Institute of International Affairs. London, 1954.

প্রতিনিধি মারা গেলেন। সারাদিনের অবাধ লুঠ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও অরাজকতার পর সন্ধ্যাবেলা মিশরী সৈন্যের চেষ্টায় কিছুটা শান্তি ও শৃঙ্খলা উদ্ধার হ'ল।

২৬শে জানুয়ারীর রাত্রে নাহাস পাশা সমস্ত মিশরে সামরিক আইন জারী করলেন এবং নিজেকে ঘোষণা করলেন মিলিটারী গভর্নর।

২৭শে জানুয়ারী ফারুক আবার নাহাসকে পদচ্যুত করলেন!

মিশর তখন গভীর সংকটে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তার স্বাধীনতা বিপন্ন। রাজ-সিংহাসন কলঙ্ক মলিন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব চূড়ান্ত ব্যর্থতায় ভূলুণ্ঠিত। জনতা উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত। হতবুদ্ধি ফারুক আরো স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলেন। একের পর এক মন্ত্রিসভা গঠিত করে তিনি পরিচয় দিলেন নিজের বুদ্ধিনাশের, জাতীয় নেতৃত্বের দারিদ্র্যের।

২৮শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী হলেন আলী মাহের পাশা; ইংরাজের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তিনি "বিবেচনা" করতে রাজী হলেন; সুয়েজ অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ থেমে গেল; অবস্থার সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হ'ল। মার্চের প্রথমেই ফারুক মাহের পাশাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। নতুন প্রধান-মন্ত্রী হলেন হিলালী পাশা; ইংরেজ রাষ্ট্র-দূতের সঙ্গে বোঝাপড়ার আলোচনা শুরু হ'ল। জুনে হিলালীকেও পদত্যাগ করতে হল। হুসেন সিরী পাশা প্রধানমন্ত্রী হয়ে দু' মাসও টিকতে পারলেন না।

২৩শে জুলাই ঝড়ের মত এল বিপ্লব। পুরাতন মিশর উড়ে গেল তার মত হাওয়ায়।

॥ সতের ॥

"নীল নদের জন্ম থেকেই তার তীরে রয়েছে মিশর, রয়েছে সুদান"——নাসের।

বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে কাইরো শহরে বিরাট জনতা সমবেত হয়েছে নাসেরের ভাষণ শুনতে। নাসেরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় একজন বলিষ্ঠ পুরুষ। তিনি উঠে দাঁড়াতেই জনতা তাঁকে মহা উল্লাসে অভিবাদন করে। দীর্ঘ বক্তৃতার শেষের দিকে এই বাঞ্ছিত অতিথির দিকে তাকিয়ে নাসের বললেন,

> "আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত স্বাধীন সুদানের প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ ইসমাইল্ এল্ আজহারী। এঁকে পেয়ে আমরা বড়ই আনন্দিত। এঁর উপস্থিতি নীল উপত্যকার দুটি অংশের পবিত্র বন্ধনের প্রতীক। নীল নদের জন্ম থেকেই তার তীরে রয়েছে মিশর, রয়েছে সুদান।"

দু বছর আগেও মিশর, সুদান বা বৃটেন ভাবতে পারে নি এত শীঘ্র জটিল সুদান সমস্যার সমাধান হতে পারবে; দু বছর পরেই মিশরের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্ব-

পূর্ণ বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে আসবেন স্বাধীন সুদানের প্রধানমন্ত্রী, তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন জাগ্রত মিশরের জননায়ক, তাঁর অভিবাদনে ভেঙে পড়বে উল্লসিত মিশরের জনতা!

দীর্ঘ ত্রিশ বছর সুদান ছিল ইংগ-মিশর সম্পর্কের অন্যতম প্রধান কাঁটা। তার কিছুটা পরিচয় পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা পেয়েছি। ১৯৫২ সালের বিপ্লবের অন্যতম প্রধান সাফল্য এই পুরাতন ক্ষতের দ্রুত আরোগ্য। সুদান আজ মিশরের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। মিশর সুদানের মিত্র।

অবশ্য মিশরের পক্ষে সুদানের উপর সার্বভৌম অধিকার ছিল নিতান্তই মামুলী। সুদান শাসনের খরচ জোগাতো মিশর। শাসন করতো ইংরেজ।

আয়তনে বিরাট দেশ সুদান; লোহিত সাগর থেকে ফরাসী ইকোয়েটোরিয়েল আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রায় দশ লক্ষ বর্গ মাইল। আফ্রিকার মানচিত্রের দিকে তাকালেই সুদানের গুরুত্ব বোঝা যায়। মিশর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে সুদান পূর্ব আফ্রিকায় বৃটিশ উপনিবেশগুলিকে—কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানাইকা, বেলজিয়ান উপনিবেশ কংগো, ইংরেজ ও ফরাসী অধিকৃত ইরিট্রিয়া, মিশর ও ইথিওপিয়া, আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রায় দশ লক্ষ বর্গ [illegible] সমস্যা। উগাণ্ডার প্রায় [illegible] অবস্থিত লেক ভিক্টোরিয়া, পৃথিবীর বৃহত্তম লেক। তার বুক থেকে জন্ম নিয়ে নীল নদ চার হাজার মাইল স্থলভূমি প্রাণসিঞ্চিত করতে করতে মিলিত হয়েছে ভূমধ্যসাগরে। সুদানের রাজধানী খার্তুম পর্যন্ত এর নাম শ্বেত নীল; খার্তুম থেকে পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত নীল নীল। এই চার হাজার মাইল দীর্ঘ নদী থেকে জীবনরক্ষা পেয়েছে সুদান ও মিশর; নীল নদ বন্ধ হয়ে গেলে দুটো দেশই পরিণত হবে কেবল তপ্ত বালু মরুভূমিতে। নীল নদের [illegible] আফ্রিকার বহু দেশ থেকে এসে জমা হয়, ছোট বড়ো নদী পথে। নীল-নদের উৎপত্তি ইথিওপিয়া থেকে; শ্বেত নীলের উগাণ্ডা থেকে। এগারো লক্ষ বর্গ মাইল পরিব্যাপ্ত নীল নদের বেসিন; আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় এক-দশমাংশ।

১৮২০ সালে মিশরের খেদীব মহম্মদ আলী সুদান বিজয় করে তাকে বিস্তীর্ণ তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু সুদানকে মিশরের সঙ্গে সংযুক্ত না করে তার আলাদা সত্তা বজায় রাখা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আফ্রিকা নিয়ে য়ুরোপীয় দেশগুলির মধ্যে যে তীব্র উপনিবেশিক প্রতিযোগিতার শুরু হয়, তারই প্রেরণায় ১৮৯৪ সালে স্যার হারবার্ট কীচেনার (পরে লর্ড কীচেনার) মিশরের পতাকা নিয়ে সুদান আক্রমণ করেন। ইতালি, ফ্রান্স, ও বৃটেনের মধ্যে তখন আফ্রিকার পূর্ব তীরবর্তী দেশগুলির অধিকার নিয়ে প্রচণ্ড রেষারেষি। বিংশ শতাব্দীর ঠিক আগে ফ্রান্স এ প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে নীল উপত্যকায় তার দাবী প্রত্যাহার করে।

১৮৯৯ সালের ১৯শে জানুয়ারী সুদান শাসনের যে ইংগ-মিশর যৌথ ব্যবস্থা হয় লর্ড ক্রোমার তার বর্ণনা দিয়েছেন "একটি জগাখিচুড়ি গভর্নমেণ্ট, পৃথিবীতে যার নজির নেই।" সামরিক ও বেসামরিক শাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হয় ইংরেজ গভর্নর-জেনারেলকে; তাঁকে মনোনীত করবে বৃটিশ সরকার; কিন্তু তাঁর নিয়োগপত্র আসবে মিশরের খেদীবের নিকট থেকে। খার্তুমের প্রাসাদে ইংরেজের পতাকার সঙ্গে উড়বে মিশরের পতাকা।

ইংরেজ সুদানকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে শুরু করে। তাই মিশরে অন্যান্য য়ুরোপীয় শক্তির যে অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল—প্রধানত বাণিজ্যের অধিকার—সুদানে তা অগ্রাহ্য হল। মিশরী আইন সুদানে প্রবেশ করতে পারল না। এমন কি সুদানে অন্য কোন দেশের রাজদূত পর্যন্ত নিয়োগ করতে দেওয়া হল না। ১৯১৪ সালে মিশরকে যখন তুর্কী সাম্রাজ্য থেকে আলাদা করে ইংরেজের সংরক্ষিত দেশ বলে ঘোষণা করা হল, তখন সুদানের ভবিষ্যৎ থেকে গেল অমীমাংসিত। ১৯২৪ সালে কাইরোতে স্যার লী স্টাকের হত্যার পর সুদানে মিশরের অধিকারের প্রতীকটুকুও আর রইল না। শুধু সুদান শাসন করবার জন্য ইংরেজ যে সেনাবাহিনী খার্তুম ও অন্যান্য শহরে মোতায়েন রাখল তার সমুদয় ব্যয় বহন করে যেতে হল মিশরকে। কীচেনার থেকে চার্চিল পর্যন্ত একই নীতিতে ইংরেজ সুদানের শাসন চালিয়ে এলো ৫৬ বছর।

ফারুক ও নাহাস পাশা উভয়েই চেয়েছিলেন নীল উপত্যকার ভৌগোলিক ঐক্যের নামে সুদানকে মিশরের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত করতে। সুদানে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবের একটা অংশ মিশরের সঙ্গে মিলনের অভিপ্রায় রূপে আত্মপ্রকাশ করে; তাকে ঐক্যপন্থী মনে করাটাই নাহাসের সবচেয়ে বড়ো ভুল হয়েছিল। আসলে সুদানের স্বরাজকামনা মিশর ও বৃটেন উভয় দেশের শাসন থেকেই মুক্তির পথ খুঁজছিল। এটা নাসের ও তাঁর সহকর্মীরা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। অথচ জগলুল থেকে নাহাস পর্যন্ত কেউ বুঝতে চাননি। তাই বিপ্লবের প্রথম প্রভাতেই নাগিব ও নাসের সুদানবাসীকে অধিকার দিলেন দেশের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করবার। যদি স্বেচ্ছায় সুদান মিশরের সঙ্গে ঐক্য চায়, সে ঐক্যই হবে নিবিড় ও স্থায়ী মৈত্রীর বন্ধন; অন্য কোন বন্ধনই টিকবে না সুদানবাসীর স্বরাজ-প্রেরণার চাপে। অবশ্য নাসের আশা করেছিলেন যে সুদান স্বেচ্ছায় ঐক্যের পথই

গ্রহণ করলে। এজন্য তিনি চেষ্টারও ত্রুটি করেন নি। প্রধানমন্ত্রী সালাহ্ সালেমকে প্রভূত অর্থ ও ক্ষমতা দিয়ে খার্তুমে পাঠান হয়েছিল ১৯৫৩ সালে সুদানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ঐক্যের মূল্য বোঝাবার জন্য। সালাহ্ সালেম যে সব রিপোর্ট পাঠাতেন তাতে তাঁর সাফল্য সম্বন্ধে নাসেরের বিশেষ সন্দেহ ছিল না। যখন সুদানের পার্লামেন্ট বিপুল ভোটাধিক্যে পূর্ণ স্বাধীনতার পথ বেছে নিল, নাসের নিঃসন্দেহ হতাশ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি এ ব্যর্থতাকে বর্ণনা করেছিল তাঁর প্রথম বিরাট পরাজয় বলে। কিন্তু নাসেরের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও চারিত্রিক উদারতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল যখন তিনি মুক্তহৃদয়ে, মুক্তকণ্ঠে স্বাধীন সুদানকে অভিনন্দিত করলেন। সালাহ্ সালেম মন্ত্রীসভা থেকে পদচ্যুত হ'লেন বটে, কিন্তু সুদান আজও মিশরের সঙ্গে সুদৃঢ় মৈত্রীর বন্ধনে। সে বন্ধন এখনো অটুট।

সুদানের সঙ্গে এই মৈত্রী স্থাপনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন, মহম্মদ নাগিব। তাঁর মা সুদানী হওয়ায়, সুদানবাসীর অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। নাসের সুদানে বহুসম্মানিত। কিন্তু নাগিবের মত অতটা জনপ্রিয় নন।

মিশরীদের সঙ্গে সুদানীদের মিল যেমন অনেক, পার্থক্যও কম নয়। মিশরের আরব বহু সংমিশ্রণে তৈরী; তার দেহে প্রাচীন মিশরী, ককেশীয়ান, মূলে আরব, তুর্কী, সার্কেশিয়ান ও আলবেনিয়ান রক্তের সংমিশ্রণ। আর সুদানীর রক্তে পাওয়া যাবে আরব, নিগ্রো ও কিছুটা ককেশীয় মিশ্রণ। মিশরীরা সাধারণত ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের মানুষ; সুদানীরা খাঁটি আফ্রিকান। দু'দেশের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক রূপও আলাদা। দক্ষিণ সুদানের আদিম অধিবাসীরা এখনো নগ্ন, অথবা সামান্য বস্ত্রে তাদের লজ্জা নিবারিত হয়। এদের মধ্যে ইংরেজ মিশনারীরা একটা স্বতন্ত্রভাবের সৃষ্টি করেছিল বহুদিনের প্রচারের ফলে। তাই উত্তর ও দক্ষিণ সুদানের অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে অনেকখানি পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ। বিস্তীর্ণ বন্ধ্যা মরুভূমি, শস্য সবুজ উপত্যকা, গভীর-[illegible] জঙ্গল, [illegible] বাঘ, [illegible] ও কুমীর [illegible], সুদানের প্রাকৃতিক অস্তিত্বকে যে বৈচিত্র্য দিয়েছে, মিশরের সে বৈচিত্র্য নেই। মানুষের দিক থেকেও বিচিত্র সুদান। অসভ্য পশুপালকেরা এক সাথে বাস করছে অতি-[illegible] শহরবাসীর সঙ্গে। উত্তরের মুসলমান ও দক্ষিণের প্যাগানেরা একই সঙ্গে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে খার্তুমের পার্লামেন্টে। এই পার্লামেন্ট দেখে, মনে হতে হয় উত্তর সুদানের [illegible] [illegible]। আপাত-অসভ্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষজ্ঞ বসেছেন, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ইংরেজ সুদানের সমাজে ঔপনিবেশিক নীতিতেই শাসন করে এসেছিল দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর। এই অর্ধ শতাব্দীর [illegible] মাত্র পাঁচজন নিজের নাম সই করতে শিখেছিল। দক্ষিণ সুদান যা [illegible] দিয়েছে আফ্রিকার মধ্যেকার উপনিবেশগুলির সঙ্গে—উত্তর সুদান থেকে এই দীর্ঘকাল ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অনুমতি ব্যতীত কাউকেই উত্তর থেকে দক্ষিণে যাতায়াত করতে দেওয়া হোত না।

কিন্তু ইংরেজ শাসনের বন্ধন আলগা হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুদান ঘোড়দৌড়ের গতিতে স্বরাজের সিংহদ্বারে পৌঁছে গেল।

বর্তমানকালে এশিয়া-আফ্রিকায় প্রধান সমস্যাই হল বহু যুগের ইতিহাসকে এক লাফে অতিক্রম করার সমস্যা। সময় যে নাই! য়ুরোপের জাতিগুলি বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়ানো উপনিবেশের জীবনরস শুষে নিয়ে ধীরে আস্তে নিজেদের শিল্প ও সভ্যতা গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। একটা কুমারী মহাদেশকে তিনশ' বছর নির্বিবাদে পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্প শক্তিতে পরিণত করবার সুযোগ পেয়েছে আমেরিকা। সে সময়ের সামান্য অংশও আর পাবার সৌভাগ্য নেই ভারতের, চীনের এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলির। তাদের গঠন ও নির্মাণ করতে হচ্ছে অতি তাড়া-

আলী সাহের পাশা

তাড়ি; এবং এমন এক বিশ্ব বাতাবরণে, যেখানে বৃহৎ শক্তিগুলি মারণাস্ত্রের জন্য ক্রমাগতই রেষারেষি চালিয়ে যাচ্ছে, কোন দুর্বল দেশকেই নিজের স্বাধীন নির্বাচিত পথে চলবার মৌলিক অধিকার দিতে রাজী হচ্ছে না।

ইংরেজের অধীনে পঞ্চান্ন বছরে সুদান যে অগ্রসরের সুযোগও পায়নি, দশ বছরের মধ্যে আজ তাকে তা অর্জন করতে হয়েছে। ১৯৪৬ সালে সিদকী পাশা ও আর্নেস্ট বেভিন যখন ইঙ্গ-মিশর সম্পর্ককে '৩৬ সালের চুক্তির সংশোধন থেকে মুক্ত করার জন্য আলোচনা শুরু করেন, সুদানের ভবিষ্যৎ ছিল সে আলোচনার একটা মুখ্য অংশ, কিন্তু সুদানের রাজনৈতিক চেতনা ও স্বরাজ কামনা তখন এতই প্রাথমিক যে, তার কোন প্রতিনিধিকে সে কথাবার্তায় অংশ দেবার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত বিবেচিত হয়নি লণ্ডনে বা কাইরোতে। ১৯৪৭ সালে বেভিন নতুন ইঙ্গ-মিশর চুক্তির যে খসড়া তৈরী করেন, তাতে সুদানের উপর মিশরের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয় সুদানবাসীদের মতামত না নিয়েই! অথচ আট বৎসর পরেই সুদান আত্মপ্রতিষ্ঠা করে আফ্রিকার অন্যতম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র-গৌরবে! ১৯৪৩ সালে দেশশাসনে সুদানবাসীর কোন অধিকারই স্বীকৃত ছিল না। প্রথম বিধানসভার সৃষ্টি হয় ১৯৪৫ সালে ২৮ জন মনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে! প্রথম নির্বাচিত বিধানসভার জন্ম ১৯৪৮-এ! সাত বছর পরেই সুদান সম্পূর্ণ স্বাধীন!!

সাম্রাজ্যবাদ যাই-যাচ্ছি করেও যেতে চায় না। উপনিবেশ-প্রেম তার এতোই গভীর! ১৯৫৫ সালে দক্ষিণ সুদানে অবস্থিত সৈন্যরা খার্তুমের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে তার পিছনে ছিল বৃটিশ স্বার্থের উস্কানি। লণ্ডনের 'ডেইলী মেল' সংবাদপত্র নিজেই স্বীকার করে—"দক্ষিণ সুদানের লোকেরা বিদ্রোহ করেছে মিশরের কর্তৃত্বের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে ইংরাজ শাসনের সমর্থনে।" এমন কি 'টাইমস্' পত্রিকাও বলতে বাধ্য হয়, 'মিশর এই বিদ্রোহের জন্য বৃটিশ সরকারকে দায়ী করবার সুযোগ খুঁজবে। অভিযোগ করবে সুদানের স্বরাজকে পিছিয়ে দেবার এ-এক শয়তানী মতলব।"

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত "ইসলামিক রিভিয়ু'তে এই বিদ্রোহের পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদী মতলবের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যাতে উক্ত পত্রিকা বলেন, "মিশরের সংবাদপত্রগুলির মতে, সুদানবাসী স্বাধীনতা দাবী করবার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ সুদানের ইংরেজ শাসকগণ, মিশনারীদের সমর্থন নিয়ে, সুদানের দক্ষিণভাগকে উত্তর ভাগ থেকে পৃথক করে বৃটিশ উগাণ্ডার সঙ্গে সংযুক্ত করবার একটি পরিকল্পনা তৈরী করেন। বিকল্পে, তাঁরা প্রস্তাব করেন, দক্ষিণ ও উত্তর সুদান আলাদা স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে পরিণত হোক; খার্তুমে কেবল থাকবে একটি ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট এবং তার উপর থাকবে বৃটিশ কর্তৃত্ব।" এ প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্য অতি প্রচ্ছন্ন। কিন্তু ইংরেজের সংকীর্ণ ও ক্ষমতাশালী প্রচার-বিভাগ পৃথিবীর নিকট একে দাঁড় করাতে চেয়েছিল স্বল্পসংখ্যক দক্ষিণ সুদানবাসীর স্বাতন্ত্র্য কামনার চেহারায়।

খার্তুমের একটি রাজপথের নাম সুকুমার সেন রোড। ভারতবর্ষের প্রতি সুদানবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির প্রতীক এ রাজপথ। সুদানের প্রথম স্বাধীন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে নানা দেশের প্রশংসা নিয়ে পরিচালিত হয়েছিল একটি আন্তর্জাতিক কমিশনের পরিচালনায়। ভারতের নির্বাচন-প্রধান শ্রীসুকুমার সেন ছিলেন তার সভাপতি। স্বাধীন সুদানের সঙ্গে ভারতবর্ষের মৈত্রী ও বাণিজ্য বন্ধন তার পর থেকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে। ১৯৫৫ সালে প্রধানমন্ত্রী আজহারী ভারত ভ্রমণে এসে এই মৈত্রীকে আরো সুদৃঢ় করে গেছেন। বান্দুংএ সুদান ভারতের নিরপেক্ষ-নীতির বলিষ্ঠ সমর্থন করেছিল। সুদানে হাজারখানেক ভারতীয় বাস করেন, অধিকাংশই ব্যবসায়ী।* নির্মাণ পরিকল্পনার জন্য সুদান সরকার ভারত থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র প্রভৃতি শিল্প-কুশলীদের সাহায্য পাবার জন্য বিশেষ আগ্রহী। বর্তমান বছরে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে আইসেনহাওয়ার প্রণীত নতুন নীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে সুদান তার মিশর-প্রীতির একান্ত প্রমাণ দিয়েছে। (ক্রমশ)

হুসেন সিরী পাশা

* Sudan Almanac 1952. ভারতীয়দের সংখ্যা ১০১০। বর্তমানে কিছু বেড়েছে।

পাটের জাঁক ধরার মতলবটা এসেছিল হৃদয়ের তিনদিন আগে রাতে।

ঝড়-বাদল-বন্যা। প্রাণ নিয়ে মানুষের টানাটানি। জন খাটাবে কে? দিন দশ কাজকর্ম নেই। দিন তিন-চার কোনরকমে ঘরের মেয়েমানুষে ধারধোর করে চালিয়েছিল। তারপর ভাসা মাছ ধরে—সেই মাছ বিক্রী করে। বন্যায় জল বাড়ল। বন্ধ হয়ে গেল মাছধরা। তারপর উপোস। ছোট ছেলেমেয়ে তিনটের শুধু আর চুনো-মাছ খেয়ে খেয়ে আমাশা ধরে গেল। সে থাক্ গে! ওসব কোনদিন ভাবেনি হৃদয়। সবচেয়ে বড় কথা দিন পাঁচ ভিজে এক ছিটে গংগাজল ঠেকাতে পারেনি। গংগাজল অর্থাৎ তাড়ি। শরীরে জুত নেই। শরীরের গাঁটগুলো কেমন অবশ অবশ।

কাদার প্যাচ্ প্যাচানি। ছোট্ট ছেলেমেয়ে কটার নাকে কান্না। ঘরের মেয়েমানুষের মুখনাড়া। আকাশজোড়া মেঘ। তার মধ্যেই একটু তন্দ্রাবেশ হয়েছিল হৃদয়ের। হঠাৎ ঘুম ভাঙল ছোটবাবুর ডাকে। বন্যার

সময়—কারো পোষ মাস, কারো সর্বনাশ!

ব্যাপার কি?

না, ঘরের তক্তা দিয়ে টিনের চাল ভেসে যাবে, একখানা—ধরতে হবে। কার চাল? কোন্ তল্লাটের চাল?—কে তার খোঁজ রাখে! যে ধরতে পারবে তার। বাবুদের কাজ; ব্যাপার কাজ। তবু করতে হবে। পুকুরপাড়ে বিনাপয়সায় ঘর তোলার জায়গা দিয়েছে। দশ-বারোজনে সেই চাল ডাঙায় তুলতে সন্ধ্যে ঘোর।

হাত-পা মুছে দাওয়ায় বসে মনে মনে বাবুদের বাপান্ত করতে করতে হঠাৎ এই জাক ধরার মতলবটা কেমন করে খেলে গিয়েছিল হৃদয়ের মাথায়। পাটের সময়। খালে-বিলে, পুকুর-ডোবায় এখন সব পাটের জাক থরে থরে সাজানো। বন্যায় ভেসেছে সব। গা-ঝাড়া দিয়ে পাটের জাক পিঠের ওপর থেকে মাটি আর [illegible] পালা। ভার ফেলে হাঁটা ধরেছে স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে। এখন, 'আংটি তুমি কার? না, যার হাতে থাকি তার।' পাটের গায়ে তো আর নাম লেখা নেই। মতলব মগজে আসামাত্র হাতিয়ার তৈরী। দা হাতে কলা-বাগানে গিয়ে কলাগাছ কাটা। ভেলা তৈরী।

রাত্রে আনন্দের আতিশয্যে ঘরের মেয়ে-মানুষের গায়ে একটু হাত দিতে না দিতে ছিট্‌কে সরে গেল। পেটে খেতে দেবার খামতা নেই সে মানুষের আবার অত আদিখ্যেতা কিসের—!

ঘুমের ঘোরে বিছানা নোংরা করল ছেলেটা। ঠাস্ করে এক চড় কষাল হৃদয়। দু-একবার কুঁই কুঁই করেই আবার পাশ ফিরে শুল ঘুমে ভেজা ন্যাতার মত ছেলেটা। বিড় বিড় করে উঠল হৃদয়, আস্তাকুড়ের জঞ্জাল সব—!

—কি বললে? জন্ম দেবার সময় মনে ছেলো না? প্রখর ঝাঁঝে উঠল ঘরের মেয়েমানুষ। তারপর ডুকরে উঠল, এ কি খুনে মানুষের হাতে পড়েলাম। মেরে ফ্যালো সব কটাকে। এমন ভাতারের মুখে আগুন।

—চুপ কর্ মাগী। গর্জে উঠল হৃদয়, দেব গলা টিপে নিকেশ করে। ইনিয়ে-বিনিয়ে আর কাঁদা হল না। কোৎ করে কান্না গিলে ফেলল ঘরের মেয়েমানুষ। ও-মানুষকে বিশ্বাস নেই!

ভোর হবার আগেই বেরিয়ে পড়ল হৃদয়। বেরিয়ে দেখে বাইরে মেঘ, দেখে সে-ই শুধু ঘুমিয়েছিল। ইতিমধ্যে কাজে নেমে পড়েছে অনেকে। ভেলা, ডোঙা—যে যা পারে ভাসিয়েছে। সারাদিনে কাজ হল মন্দ নয়। ছোট-বড় জাক ধরল খান তিন। জাক পুকুরে রেখে পচিয়ে পাট বার করা সে অনেক ঝামেলা। অত তর সইল না হৃদয়ের। দশ টাকায় জাক উঠল ছোট-বাবুর ডোবায়। তারপর দশটা টাকা যখন স্টেশনের [illegible] ভাঙালে, তখন [illegible] হাত দিয়ে দেখে ঠিক [illegible] [illegible]

হৃদয়ের [illegible] দিকে [illegible] [illegible] জানালে।

মনে হয় হৃদয়কে সবাই যেন একটু কেমন চোখে দেখে। [illegible] এর [illegible] যে সব [illegible] একটা যে বন্ধু বুকের মধ্যে থাকে, সেখানে ওই [illegible] এর [illegible] বাটী। অন্য [illegible] না নইলে [illegible] মত [illegible] দিয়ে [illegible] রোজগার [illegible] [illegible] পাবার মাটির [illegible] খাওয়াতে হয় [illegible], ছেলে-মেয়েকে! কখনও কখনও নিজে যদি-বা জল-খাবার খায়, সে পয়সা উড়িয়ে দেয় তাড়ি আর বিড়িতে।

শুনে শুনে কান পচে গেছে হৃদয়ের। নিকুচি করেছে তোর দয়ামায়ার। কে চেয়েছিল সংসার? কে চেয়েছিল ওই এক গণ্ডা আর কোলের ফাউটাকে। আস্তাকুড়ের জঞ্জাল সব।

ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কাটল অনেকক্ষণ। মাথার ওপর আমগাছের ঠাণ্ডা ছায়া। ছোট ছোট ঢেউ-এ ভেলার দুলুনি। ঘুম এসে যায়। কিন্তু ঘুমোলে পাটের জাক হাতে এসে ধরা দেবে না। যতদূর দৃষ্টি যায় ঘুরে ঘুরে দেখল হৃদয়। নজরে ঠেকল না

কিছুই। আমের ছায়ার বাইরে জলের ওপর সূর্যের তাপ আর তেজ দশখানা হয়ে জলছে। বেশীক্ষণ তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে ভেলার দড়ি খুলে দিল হৃদয়।

পেছনে হঠাৎ আওয়াজ হল ঝপ্ করে।

মানুষটা চলে যায় দেখে উদ্ধারের শেষ চেষ্টা করার মত জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কুকুরটা। সাঁতরে আসছে ভেলার দিকে। লগীটা চেপে ধরল হৃদয়। দাঁতে দাঁত চাপল, উঃ শখ কত। ভেলায় চড়ে ধর্মপুরে যাবেন। সা'মশায়ের দোকানের রসগোল্লা খাবেন!

ঘোলা চোখে মারমুখো হৃদয়ের দিকে কুকুরটা একবার তাকাল। তারপর গলায় একটা আর্তস্বর করে ফিরতে চেষ্টা করল মাঠটার দিকে। কিন্তু ততক্ষণে ভাঙ্গার স্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। গঙ্গার দিকে ভেসে গেল খড়কুটোর মত।

ধর্মপুরে [illegible] পড়েছে। ভাঁটির সময়। চর [illegible] ছেড়ে বিল মাঠে এসে পড়েছে হৃদয়। [illegible] ধানের মাঠ। ধানের ওপর জল উঠেছে এক মানুষ। জায়গায় জায়গায় তারও বেশী। বিল-মাঠের গভীর জলে স্রোতের তীব্রতা নেই তবুও। স্রোত ঠেলে এগিয়েছে হৃদয়। ফেরার সময় জল ভাঙতে হবে না। জোয়ারে ভেসে আসবে। জোয়ারের সময় জল ঠেলে আসা অসম্ভব কথা। আর পথের [illegible] একখানা [illegible] পারাপার [illegible] স্রোত ছাড়া গতি নেই। [illegible] সাপ একটা স্রোতে উজিয়ে যাচ্ছিল। হৃদয়ের ভেলা দেখে টুপ্ করে ডুব দিল জলে।

অনেকদূর থেকে ভেসে আসছে একটা কাল বস্তু। অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছিল হৃদয়। দূরত্ব কমলে দেখল কালো গামলা একটা। পুরোনো গামলা। গায়ে কালো শ্যাওলা পড়েছে। ধানের গোলার মাথাকী গামলা বলেই মনে হল। বন্যায় এমন কত কি ভেসে যায়! কিন্তু শুধু গামলাই নয়। ভেতরে সাদা একটা পুঁটলী মতন কি যেন রয়েছে! লোভে চকচক করে উঠল হৃদয়ের চোখ দুটো। বলা যায় না! লগী বাড়িয়ে গামলাটাকে কাছে টেনে আনল হৃদয়। ঘুরতে ঘুরতে ভেলার গায়ে এসে লাগল গামলাটা। ভেতরে দৃষ্টি পড়তেই উৎসাহে লোভে দপ্ দপ্ করে জ্বলা চোখের ওপর কে যেন একদলা কাদা ছুঁড়ে মারল। হৃদয় হতভম্ব। কাঁথায় পাক দিয়ে দিয়ে মোড়া তিন-চার মাসের একটা ছেলে। তলায় বিচুলীর বিছানা। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসে উঠছে নামছে সমস্ত শরীর।

হতবাক্ হৃদয়, হাতের ধরা গামলার কানা আর ভেলাটাকে নিয়ে চলেছে গঙ্গার খলবলে স্রোত। ভেলার গতিটা একটু পর জলের দিকে। অন্যমনস্ক শূন্য দৃষ্টি নিয়ে গামলাটার দিকে তাকিয়ে রইল হৃদয়। বন্যায় সব এমন কি প্রাণটুকু পর্যন্ত যায় দেখে কেউ হয়ত কোলের ছেলেটাকে এমনি করে ভাসিয়ে দিয়েছে জলে। কারো হাতে যদি পড়ে! কেউ যদি বাঁচায়!

বিমূঢ় অবস্থায় কাটল কিছুক্ষণ।

কিন্তু হৃদয়? এক গণ্ডা আর ফাউ একের ওপর আবার শাকের আঁটির ভার চাপাবে নাকি? এমনিতে শালা বাড়িতে টেঁকার উপায় নেই, তার আবার [illegible] ঝামেলা। এতখানি বেলা হল আসল বস্তুর সাক্ষাত নেই। মন-মেজাজ তে-র-র হয়ে আছে। এখন মা গঙ্গার রসিকতাখানা দেখ দিকি!

হাত দুটো হঠাৎ কেমন যেন নিশপিশ করতে লাগল হৃদয়ের। জীবনে এই একটি অভিজ্ঞতা বাকী আছে। চার মাসের শিশু হোক—একটা প্রাণ তো বটে। টাটকা মানুষের প্রাণ। এই অগাধ সমুদ্রে সাক্ষী সাবুদ নেই। অতি সহজেই [illegible] মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। পুরোনো গামলা, লগীর একটা খোঁচাই যথেষ্ট। এদিকে টনটনে আছে ছেলের প্রাণ। দিব্যি অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ও ঘুম আর ভাঙবে না। বড়-জোর গলায় একটু আওয়াজ হবে, হৃদয় ছাড়া সে আওয়াজ শোনার কেউ নেই।

একাগ্রতা নষ্ট হল হৃদয়ের। কিসের শব্দ?

নিথর হয়ে বসল ভেলার ওপর। বাতাসে আসছে দূর থেকে। প্যাঁক প্যাঁক এক সঙ্গে অনেক গলার ডাক। শিকারের সন্ধান পাওয়া বেড়ালের মত চোখের ওপর আড়াল [illegible] করে দূরে সন্ধান করল হৃদয়। হাতের মুঠি থেকে কখন খসে গেছে গামলার কানা। স্রোতে আপন গতিতে ভেসে গেল গামলাটা।

বাঁয়ে ধর্মপুর। তারপর সাহেবগান। আম-জাম-লিচু থেকে নানা বেওয়ারিশ গাছের জটলা। বন্যায় জল উঠেছে গাছের কোমর অবধি। সেদিকে তাকিয়ে চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল হৃদয়। দূর থেকে মনে হল রং-বেরংএর কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরী একখানা বড়সড় কাঁথাই বুঝি ভেসে রয়েছে জলের ওপর। হাওয়ায় ফেঁপে-ফুলে ভেসে রয়েছে। নড়ছে চড়ছে। হাওয়ায় আসছে যাচ্ছে এদিক ওদিক। সঙ্গে আওয়াজ আসছে ক্ষীণ—প্যাঁক্ প্যাঁক্। প্যাঁক্ প্যাঁক্।

বুঝে ফেলল হৃদয় ব্যাপারটা। বন্যায় পুকুর-ডোবা একাকার হয়ে গেছে। কোন্ গাঁয়ের সমস্ত হাঁস একজোট হয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে স্রোতে! সারা শরীরে উত্তেজনায় একটা দারুণ শিহরণ বয়ে গেল হৃদয়ের। গায়ের রোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। হালের বাধা না পেয়ে স্রোতে পেছন

দিকে ভেসে চলেছে ভেলাটা। খেয়াল হল হৃদয়ের। ততক্ষণে মতলবটা ছকে ফেলেছে মাথার মধ্যে। এমনি করে স্রোতে ভেসে যেতে হবে দক্ষিণে। তারপর কোণাকুণি বিলমাঠ পাড়ি দিয়ে উঠতে হবে একেবারে হাঁসের দলের পেছনে। স্রোতের বিপরীতে যাবে না ও প্রাণী। তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হবে ডাঙায়। ধারে-কাছে ডাঙা বলতে দেড় ক্রোশ দূরে ধর্মপুরের ডাঙা। জলের গতিও এখন ওইদিকে। আর একবার ডাঙায় তুলতে পারলে—। রোদেপোড়া শরীরটা মুহূর্তে চাঙ্গা হয়ে উঠল হৃদয়ের। হালটা ধরতে গিয়ে একবার মনে পড়ে গামলাটার কথা। ততক্ষণে বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে গেছে গামলাটা। বিষম বিরক্তিতে বিড় বিড় করে উঠল হৃদয়—যত্তো আপদ।

কোণাকুণি বিল-মাঠ ভাঙতে গিয়ে ভেলাটাকে বেশ খানিকটা পেছনে টেনে নিয়ে গেল স্রোতে। উজানে যেতে হবে খানিকটা। মাথার ওপর একটা আঁশফল গাছ। ডাল-পালা এসে পড়েছে জলের ওপর। সামনেটা আড়াল। তারই ফাঁক দিয়ে দলটাকে বেশ ভাল করে জরিপ করে নিল হৃদয়। গোটা পঞ্চাশ হাঁসহাঁসার দল। কয়েকটার বয়েস দশটা, চীনে গোটা আষ্টেক, আর বাকী সব পাতি। ছোট বাচ্চা থেকে ধাড়ী পর্যন্ত। কয়েকটা বেশ ভর ভর। ডিম দেবার সময় হয়েছে বা দিচ্ছে। হাঁসের দল চঞ্চল হয়ে উঠেছে। টের পেয়েছে হৃদয়ের উপস্থিতি। এদিক ওদিক তাকিয়ে সতর্কতাসূচক ডাক পাড়ছে। হাঁসগুলো দল থেকে বেরিয়ে সন্ধান করছে। কয়েকটা নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে আঁশফল গাছের ঝোপের দিকে। আস্তে আস্তে সাঁতরে এগিয়ে আসছে ঝোপের দিকে। তারপর হঠাৎ ফ্যাসফ্যাসে গলায় চীৎকার করতে করতে দলটার মধ্যে ঢুকে পড়ল হাঁসার দল। অর্থাৎ সন্ধান পাওয়া গেছে! কিন্তু দল নিশ্চিন্ত। এখানে জল ঘাঁটছে। মানুষ জলের আওতাতেই থাকে। মানুষকে ভয় তবু ডাঙা।

একটু একটু করে এগোচ্ছিল হৃদয়। আর একটু কাছে গিয়ে সাড়া দেবে; কিন্তু হঠাৎ সারা শরীরে কে যেন একটা জ্বলন্ত মশাল বুলিয়ে দিল হৃদয়ের। জ্বলে উঠল সর্বাঙ্গ। তাকিয়ে দেখল থোকা থোকা খয়েরী রংএর কাঠ-পিঁপড়েতে থুক থুক করছে সমস্ত শরীর। প্রাণপণে কামড়ে কুঁকড়ে গেছে প্রতিটা পিঁপড়ে।—মলাম্ গো—। আর্তনাদ করে জলে লাফিয়ে পড়ল হৃদয়।

পরিত্রাহী চীৎকারে আকাশ ফাটিয়ে হাঁসের দল গা-ভাসাল স্রোতে। ডুবের ডুব দিয়ে রগড়ে রগড়ে পিঁপড়ে ছাড়াতে লাগল হৃদয়। ভেলাটা আটকে ছিল ডালে। তার ওপর তখনও খয়েরী পিঁপড়ের প্রলেপ। দারুণ আক্রোশে ভেলার গা-ই কামড়ে ধরেছে পিঁপড়েগুলো। জলে চুবিয়ে হৃদয় পিঁপড়ে ছাড়াল। লগী, হাল ভেসে গিয়েছিল এদিক ওদিক। সেগুলো ধরল।

সারাটা শরীর দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠেছে। বিষে জ্বলছে সর্বাঙ্গ। কিন্তু এদিকে দৃষ্টি দিলে এখন চলবে না। হাঁসের দল সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। হৃদয়কে একটু তফাতে তফাতে রাখতে চাইছে। এখন শুধু ভেসে যেতে হবে দলের পেছনে পেছনে। শুধু ডান-বাঁ করে দলটাকে ডাঙার দিকে রাখতে হবে। দল যদি বিগড়োয় সাধ্য কি হৃদয়ের ডাঙায় তোলে!

সাহেববাগান ছাড়িয়ে খানিকদূর আসতেই আবার গামলাটা নজরে পড়ল। বেমালুম-ভাবেই ভেসে চলেছে গামলাটা। হৃদয়ের মনে হল গামলাটা একদিকে যেন একটু কাত হয়ে রয়েছে। ভেতরের ভার বোধ হয় একপেশে হয়ে গেছে। হাঁসের দল ভাসতে ভাসতে ঘিরে ধরেছে গামলাটাকে। গামলাটা মাঝে রয়েছে। চারপাশ ঘিরে চলেছে হাঁসের দল। কয়েকটা হাঁস কৌতূহলী হয়ে কখনো গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে ভেতরে। [illegible] কেঁদে উঠল ছেলেটা। দারুণ ভয়ে চীৎকার করতে করতে গামলাটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল হাঁসের দল। নিরীহ প্রাণী, ভয় পেয়েছে। হৃদয়ের ঘর্মাক্ত ক্লান্ত মুখেও হঠাৎ একটু কৌতুকের ছটা পড়ল। [illegible]—!

গামলাটা এসে পড়েছে হৃদয়ের আওতার মধ্যে। ছেলেটার কান্না থেমে গেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে আবার। একটা হিংস্র আনন্দে চক্ চক্ করে উঠল হৃদয়ের চোখ দুটো। আস্তে আস্তে কোনরকমে গামলাটার গায়ে একটা ফুটো করে দিলে কেমন হয়। এই মহানন্দে একটা মানুষেরও সাড়া নেই। কলকল করে জল ঢুকবে। আর আস্তে আস্তে—। ফুটোটা খুব বড় করলে চলবে না। আস্তে আস্তে জলের ওপর ভেসে থাকা কানাটা জলের তলায় তলিয়ে যেতে থাকবে, যতক্ষণ না—! আচ্ছা, ছেলেটা কি ভেসে উঠবে? উঠবে নিশ্চয়! কিন্তু সে আর কটা নিমেষ। কিংবা—ভেলার ওপর নড়েচড়ে বসল হৃদয়। রোদের তাতে নয়—সারা শরীরের রক্তই যেন তেতে উঠেছে। চোরা উত্তেজনায় কেমন একটা অস্থিরতা দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে রক্তে রক্তে। কিংবা একটু এগিয়ে গিয়ে গামলাটার একটা দিক শক্ত মুঠোতে ধরে আস্তে আস্তে চেপে দিলে—অতি সহজেই সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু হৃদয়ের মনে হল তারও বোধ হয় দরকার নেই। এমনিতে চলকে চলকে ইতিমধ্যে বেশ জল ঢুকেছে গামলাটার ভেতর। মা-গঙ্গা আদর করে বুকে টেনে নেবে।

আকাশে আছে শকুনি। চারিদিকে খাবারের ছড়াছড়ি, তাই এদিকে এখনও নজরটা পড়েনি। কিন্তু ডাঙ্গায় আটকে আছে অভুক্ত শেয়ালের দল। বে-জায়গায় আটকালে তাদের ফলার ভালই জমবে।

এদিকে মন দিতে গিয়ে হাঁসের দলের সঙ্গে ফারাক বেড়েছে। আপনি খেয়ালখুশী মতন ভেসে চলেছে হাঁসের দল। যেতে যেতে জল ঘুটছে। চক্ চক্ আওয়াজ হচ্ছে। ঠোঁটের পাশ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। পোকামাকড় সব যাচ্ছে পেটে। এতখানি দূরত্ব রাখা ঠিক নয়। একটু এগিয়ে যেতে হয়। যাবার সময় লোভ সামলাতে পারল না হৃদয়। হাত দিয়ে একটা ধাক্কা মারল গামলাটায়। অল্প একটা ধাক্কা। দুলে উঠল গামলাটা। কাত হয়ে যাওয়া দিকটা দিয়ে ছলাৎ করে খানিকটা জল উপচে পড়ল ভেতরে। কঁকিয়ে উঠল একটা গলা।

সামনে এখনো ক্রোশটাক পথ। হাঁসের দল চলেছে আপন মনে। চলেছে হৃদয়ের ভেলাও। হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে ভেলার ওপর। কিন্তু স্থির দৃষ্টি হাঁসের দলের গতিবিধির ওপর। হাঁস নয়—হৃদয়কে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে একরাশ লোভ। পঞ্চাশটার আশা করে না হৃদয়। অন্ততঃ গোটা কুড়ি বাগাতে পারলেই হয়। ধর্মপুরের হাটে পড়তে সময় পাবে না। নামমাত্র মূল্যে দিলেও গোটা কুড়ি টাকা। তারপর—। তারপর গ্যাজলা ওঠা তাড়ির হাঁড়ি! ভারিয়ে ভারিয়ে ভাবতে ভাবতে কেমন একটা মাদকতা এসে গেছে হৃদয়ের মাথায়। শরীরে হাজার হাতীর বল।

থমকে দাঁড়াল হাঁসের পাল। সামনে পড়েছে একটা লম্বা ম্যাচ্‌তা পাটের ক্ষেত। গোড়ায় জল জমে মরা ধরেছে ক্ষেতে। ম্যাচ্‌তার পাতাগুলো হলুদে হয়ে নেতিয়ে পড়েছে। সামনে বাধা পেয়ে বিরক্তিতে কল্-কল্ করে উঠল গলাগুলো। সাজানো গোছানো দলটা বিশৃংখল হয়ে গেল। তারপর উজিয়ে চলল ক্ষেতের সীমানার দিকে। ভক্ করে খানিকটা পচা গন্ধ এসে ঘুলিয়ে দিল হৃদয়ের সমস্ত শরীর। পাট ক্ষেতে আটকে আছে একটা শরীর। জলের ওপর ভাসছে লম্বা চুল। মেয়ে মানুষের শরীর দেখে দাঁড়াল হৃদয়। লগী দিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল সোনাদানার চিহ্ন নেই। পরনের বস্ত্র-খানি পর্যন্ত হরণ করেছে—মা গঙ্গা।

অনেক পেছনে পড়েছে গামলাটা। গতিটা একটু বার জলের দিকে। অর্থাৎ গঙ্গার দিকে।

সায়েববাগানের পাশ দিয়ে মোচার খোলার মত তিনটে মাল বোঝাই নৌকা চলে গেল গঙ্গার দিকে। মহাজনী নৌকা। বন্যায় ভারী সুবিধা হয়েছে ধর্মপুরের মহাজনদের। আড়তের একেবারে নীচে থেকে মাল চলে যাচ্ছে বাইশ মাইল দূরে গঞ্জের হাটে। গামলাটা আর দেখা যায় না। বহুদূরে কালো একটা ছোট মালসার মত হেলতে দুলতে চলেছে।

কল্‌কল্ করে জোয়ার এসে পড়ল।

ফুলে উঠল জল। পাটগাছগুলো নুয়ে পড়ল উত্তরে। ইতস্তত ভাসা কচুরিপানার দঙগলগুলো যেদিক থেকে এসেছিল সেদিক ফিরে চলল। আকাশের দিকে তাকাল হৃদয়। মধ্যাকাশে উঠেছে সূর্য। প্রমাদ গুনল। তীরে এসে ভরা ডুবি হয় বুঝি এবার। জোয়ারের স্রোতে আবার উত্তরে গিয়ে ডাঙ্গা ধরা মানে চার ক্রোশ পথ পাড়ি দেওয়া। একটু পুব ঘেঁষে গেলে অবশ্য দূরত্ব কমে যায় অনেকখানি। কিন্তু হাঁসের দল স্রোত পেলে আর পায়ে জল কাটবে না। এখন এক-মাত্র উপায় স্রোতের বিপরীতে কোন রকমে হাঁসের দলকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ডাঙ্গায় তোলা। স্রোতের দিক-পরিবর্তনে বিভ্রান্ত হাঁসের দল মুখ ফিরিয়েছে স্রোতের দিকে।

—হ্যায় হ্যায়...হ্যাটা...হ্যাটা...।

লাঙ্গলের বলদের ল্যাজ মোচড়ানো বিদ্যে দিয়েই হাঁসের পালকে তাড়া দিতে শুরু করল হৃদয়। সঙ্গে সঙ্গে লগীটা জলের ওপর সজোরে আছড়াতে আছড়াতে হাঁসের দলকে স্রোতের বিপরীতে তাড়াতে শুরু করল।

দারুণ ভয়ে এদিক ওদিক ছিটিয়ে পড়ল হাঁসের দল। চীৎকারে আকাশ ফাটিয়ে প্রায় উড়ে চলল স্রোতের বিপরীতে। পেছন পেছন চীৎকার আস্ফালন করতে করতে চলল হৃদয়। কিন্তু এমন করে এগুতে পারা যায় না। স্রোতে পেছন থেকে টেনে ধরছে ভেলা। হাঁসের দল এগুতে পারছে না। ওরা পারছে তো পারছে না হৃদয়। বাওয়া বন্ধ হলেই পেছন দিকে ভেসে চলেছে ভেলা। ডাঙ্গা স্পষ্ট। কিন্তু হাঁসের দল বুঝতে পেরেছে হৃদয়ের মতলবখানা। অনেকক্ষণ থেকে একটু ডান দিকে ঝুঁকেছিল। ফাঁক পেতেই স্রোতে পড়ে তীর বেগে হৃদয়ের নাগালের বাইরে চলে গেল। ধর্মপুরের ডাঙ্গায় তোলার আশা ছেড়ে দিতে হল হৃদয়কে। রাগে জ্বলন্ত কয়লার মত হয়ে উঠেছে হৃদয়। কিন্তু উপায় নেই। এখন শেষ ভরসা পুব চাপতে চাপতে গিয়ে ওদের রেল লাইনে তোলা। এবার আর হাঁসের পালের পেছন

পেছন ভেলা ভাসাল না হৃদয়। চলল পাশে পাশে।

সামনে ডাঙা। ডাঙা মানে এখন একবুক জল। বাবলা, আশশ্যাওড়া, ভেল ভ্যারাণ্ডার অরণ্য ছিল। বাস্তুহারারা এসে জবরদখল করে কলোনী করেছিল। ভাঁবুতেই থাকত অধিকাংশ। পাশে প্যাকাটির বেড়া দেওয়া আর মাথায় খড়ের চাল-চালা উঠেছিল। কচা-রেড়ীর বেড়া দিলে জমি-জায়গা ঘিরে রীতিমত আবাদ পত্তন শুরু করেছিল অনেকে। বেশ একটা গ্রাম জমে উঠেছিল। বন্যায় ধুয়ে মুছে গেছে সব। প্যাকাটির চালা বলে চালাগুলো পড়েনি। মাটির হলে ধুয়ে মুছে যেত। দুপাশে কচা আর রেড়ীর মাথা জেগে আছে। ওইটি রাস্তা। হাঁসের দল সার বেঁধে ঢুকে পড়ল কলোনীর মধ্যে। মুশকিলে পড়ল হৃদয়। স্রোত ঠেলে উজিয়ে এসে রাস্তা ধরতে হবে। হাঁসের দল আড়াল হয়ে গেছে চোখের। হঠাৎ সারা শরীর বিদ্যুৎস্পর্শে চমকে উঠল হৃদয়ের।

—হা—না—র—র্ হায়, হায়...

মানুষের গলা। হাঁসের দলকে তাড়াচ্ছে কেউ। তেড়েছে সেওয়ারিশ হাঁস। তর সইল না হৃদয়ের। ঝপ্ করে জলে নেমে পড়ল। কোমর পর্যন্ত বুকের জল হয়েছে। তলায় মাটিতে পা ঠেকছে না। বুকেতে মা-পেরে নেমে পড়েছে একটা পুকুরের মধ্যে। সাঁতরে কোনরকমে ভেলা নিয়ে কচার বেড়া পার হয়ে রাস্তায় পড়ল হৃদয়। বাবলার কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে কোমরের তলার শরীর। ঠিকই, একটা লোক হাঁসের পাল তাড়াচ্ছে। পরিত্রাহী চীৎকার করতে করতে পালাবার রাস্তা না-পেয়ে বেড়ার ওপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে হাঁসের পাল। একে শরীরের জ্বালা। হৃদয়ের বুকের ভেতরটা যেন ডানা ঝাপটে উঠল রাগে। হাঁক পাড়ল পেছন থেকে, খবরদার রক্তপাত হয়ে যাবে।

চমকে উঠল লোকটা। পেছন ফিরে তাকাল। মুখটা চেনাচেনা মনে হল হৃদয়ের। হয়ত জনমজুরে খাটতে গিয়ে পাট-ধান নিড়োতে পাশাপাশি বসে 'পাই' তুলেছে। লোকটা রুখে দাঁড়াল, ক্যা, আসের গায়ে নাম লেখা আছে নাকি? হক্কের মাল—যে ধরতে পারব—

ভেলা নিয়ে এগিয়ে এল হৃদয়। খুনোখুনি করতে প্রস্তুত। —হ্যাঁ আছে—বাপের হাঁস আমার।

হাঁসের দলের ওপর শর্ত শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা। হৃদয়ের শক্ত মূর্তিতে ধরা লাগল। লোকটা গলা চড়াল—কি ঢোট লাগাও—মারবা নাকি?

—এটা হাঁসের একগাছি পালকে হাত দিলে খুন করে ভাসিয়ে দেব।

ক্ষ্যাপা বাঘের মত হিংস্র হয়ে উঠেছে হৃদয়। ঘাড়, গলা, বগলের তলার পেশীগুলো ফুলে উঠেছে। লোকটা ব্যাপার দেখে তোতলার মুখ ঘোরাল, আইচ্যা এই শ্যাষ না—রাস্তাঘাটে দেখা অইবই। তখন আলাপ অইব।

লোকটার গলার স্বর নকল করে ভেংচে উঠল হৃদয়, আইস্যা আইস্যা দেখা কইরো। এখন মায়ের পোলা শ্বশুরের মাইয়ার আঁচলের তলায় শুইয়া ঘুমাও গিয়া।

নাকালের একশেষ হয়ে কোনরকমে কলোনী থেকে বেরুল হৃদয়। নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে হাঁসের দল। এ-বাগান থেকে ও-বাগানে গিয়ে ঢুকেছে। কলাবাগানে ঢুকে পড়ে হৃদয়কে নামিয়েছে ভেলা থেকে। হয়রানের একশেষ। মন্দের ভাল। হাঁসের দলের গতিটা এখন ভাল। হৃদয়কে উদ্ধার করে দেবার জন্যেই যেন একটু পুব ঘেঁষে চলেছে।

কলোনী থেকে বেরিয়ে আবার গামলাটা নজরে পড়ল হৃদয়ের। জোয়ারে আবার ফিরে চলেছে গামলাটা আপন খুশীমত। হৃদয়ের মনে হল ইতিমধ্যে অনেকখানি জল ঢুকেছে গামলাটার ভেতর। কাত হয়ে যাওয়া দিকটার কানা জলের ওপর আঙুলে দুয়েকের বেশী জেগে নেই। খলখল্ জোয়ারের ঢেউ-এ হেলতে দুলতে চলেছে। গা-বেয়ে বেয়ে ঢেউ উঠে যেন কানা চেপে গামলাটাকে ডুবিয়ে দেবার খেলায় মেতেছে।

দূরে দেখা যায় রেলের লাইনের বাঁধ। খুব বেশী দূরে নয়। ভাটায় কমা জল

জোয়ারে বেড়ে উঠেছে। জলের ওপর মানুষ সমান উঁচু বাঁধ। জল গিয়ে আটকেছে বাঁধের গায়ে। সোনাখালীর খালের ওপর রেলের কালভার্ট। রেললাইনের পূব পাশে নাবাল জমিতে জোয়ারের জল ঢুকছে হু হু করে। জলের টান ধরেছে এতদূর পর্যন্ত। স্রোতটা বেশী। হাঁসের দল স্রোতে ভয় পেয়েছে। একেবারে খালে গিয়ে পড়ছে না।

মধ্যাকাশের সূর্য প্রায় পাটে বসেছে। পেটের ভেতর ক্ষিধের ডাক উঠছে কল্ কল্। রোদে রোদে মাথার ভেতরটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে হৃদয়ের। ডাঙ্গায় ওঠার জন্য ছট্-ফট্ করছে প্রাণটা। ডাঙ্গার মানুষ হাঁফিয়ে উঠেছে জলে।

তীব্র স্রোত। সোনাখালীর খালের ভেতর দিয়ে হুহু করে যাচ্ছে গঙ্গার ঘোলা জল। এখন খালবিল আলাদা করে বোঝার উপায় নেই। সব একাকার, শুধু সোনাখালীর খালের মধ্যে দিয়ে কচুরিপানাগুলো ভেসে যাচ্ছে তীব্র গতিতে। হাঁসের পাল যাচ্ছে খালের পাশ দিয়ে পূব মুখো। হৃদয়ও চলেছে ভেলা বাঁচিয়ে।

বাঁধের কুড়ি হাতের মধ্যে এসে পড়েছে হাঁসের দল। ক্রমশ দূরত্ব কমছে। হৃদয় পেছিয়ে আছে একটু বেশী। ডাইনে বাঁয়ে জলে ঘা দিয়ে দূরত্বটাকে কমাতে লাগল হৃদয়। পেটা ইস্পাতের মত শরীরটা দুমড়ে বেঁকে আবার সোজা হয়ে বসছে। তীরে নোঙর ফেলা নৌকার কাছির মত শরীরটা টানটান হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় কাঁপছে থরথর। সামনের পথ জুড়ে এসে পড়েছে একটা মালগাড়ি। রাস্তা বন্ধ হাঁসের দলের। দাঁতে দাঁতে চাপল হৃদয়, হে মা দুর্গা, হে মা কালী।

হাঁসের দল ডাঙ্গায় উঠেছে। উঠে পাখা ঝাড়ছে। জল ঝরাচ্ছে পাখা থেকে। ঠোঁট দিয়ে দিয়ে গা গলা পালক খসে খসে ফেলাচ্ছে। মাত্র হাত পঁচিশেকের মধ্যে ডাঙ্গা। হৃদয়কে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে হাঁসের দল। বাঁধের ঢালু গা বেয়ে উঠতে শুরু করেছে লাইনের ওপর। সামনে বাধা—চিক্ চিক্ করে যাচ্ছে মালগাড়ি। সারা শরীর ধনুকের ছিলার মত শক্ত হয়ে উঠেছে হৃদয়ের।

পেছনে একটা অস্পষ্ট গোঙ্গানির শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকাল হৃদয়। কয়েক হাতের ব্যবধানে প্রায় পেছন দিয়েই ভেসে চলেছে গামলাটা। তীব্র স্রোতে পাক খাচ্ছে। এতক্ষণ গামলাটার কথা মনেই ছিল না। হঠাৎ হৃদয়ের নজরে পড়ল খালের ওপরের কালভার্টটা। জোয়ারে জল ফেঁপে উঠেছে। প্রায় ভরে গেছে কালভার্টের মুখ। মাত্র হাত-খানেক ফাঁক। অতটুকু ফাঁক দিয়ে ভেসে যেতে পারবে না গামলাটা। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা। তারপর। জলের তলায় ফেলা আছে বড় বড় পাথরের চাঙ্গড়। তার গায়ে দারুণ আঘাতে থেঁতলে যাবে ছেলেটার শরীর। কয়েক ঘণ্টা পরে একটা থেতলানো শিশুর শরীর ভেসে উঠবে কোন অঞ্চলে গিয়ে। মালগাড়ির লম্বা শরীর শেষ হয়ে আসছে। ধারে থমকানো হাঁসের পাল। শেষ হয়ে আসছে সুযোগ।

খল্ খল্ হেসে ছুটে চলেছে জোয়ারের ঘোলা স্রোত। তীক্ষ্ম সুরে ককিয়ে উঠল মালগাড়ির হুইস্ল। আর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের বুকের ভেতরটা কেমন চমকে উঠল। এই মহাসমুদ্রে একটা মানুষ নেই। একটা দৃষ্টি নেই। সাক্ষী-সাবুদ নেই। তবু একটা প্রাণ, একটা অসহায় শিশুর প্রাণ চীৎকার করে যেন তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করে যাচ্ছে হৃদয়কে। কিন্তু কার কাছে? কার কাছে অভিযুক্ত করে যাচ্ছে হৃদয়কে? হঠাৎ দারুণ একটা ভয়ে কেঁপে উঠল হৃদয়। কি কি? হৃদয়ের কাছেই হৃদয়কে অভিযুক্ত করে যাচ্ছে নাকি?

বাঁধের দিকে তাকাল হৃদয়। লাইনের ধারে তেমনি থমকানো হাঁসের দল—এখনো সময় যায় নি! খলখল ছুটে চলেছে জোয়ারের স্রোত। হেলতে দুলতে ভেসে চলেছে গামলাটা—এখনো সময় আছে!

ঝপ্ করে একটা শব্দ হল জলে। সভয়ে প্যাকপোঁকিয়ে উঠল হাঁসের দল। প্রচণ্ড একটা ঠেলা খেয়ে শূন্যে ভেলাটা পাড়ে এসে লাগল।

মালগাড়ির লম্বা শরীর শেষ হয়েছে। হাঁসের দল পরম নিশ্চিন্তে জলে গিয়ে গা ভাসাল।

চক্রদত্ত

রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকরা এক নতুন ধরনের জলযান তৈরী করেছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'জেট প্রাস্ বোট'। অর্থাৎ এটি জেট চালিত নৌকা। সাধারণ বোট এর পেছন দিকে প্রপেলার এবং রাডার থাকে। একটি বোটকে জলে সামনের দিকে ঠেলে আর দ্বিতীয়টি এর গতি ঠিক করে। জেট চালিত বোটে এর কোনটাই নেই। তার বদলে বোটের পেছন দিকে জল বের হয়ে যাবার জন্য কয়েকটা নল থাকে—দু পাশে দুটি এবং মধ্যে একটি। বোটটি চলবার
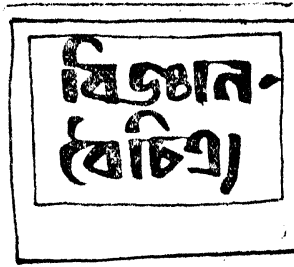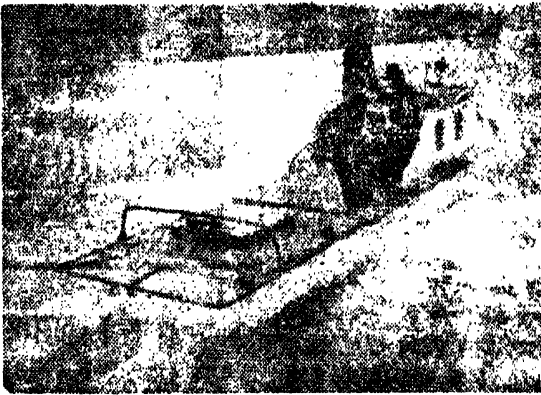
জেট চালিত নৌকা

সময় বোটের দু পাশে মাঝখানে যে জলের কাছে দুটো গর্ত থাকে তার ভেতর দিয়ে জল ভেতরে ঢুকতে থাকে আর সেই জল জোরে বোটের পেছন দিকের নল দিয়ে বের হতে থাকে। এর ফলে বোটটি সামনের দিকে চলতে থাকে। জলের কম বেশী ঢোকা এবং বের হবার ওপর এর গতির তারতম্য নির্ভর করে। বোটটি কোনদিকে ঘোরাতে হলে একদিকের নলে জলের চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। অবশ্য সাধারণভাবে এটা চালাবার চাকার সঙ্গে যোগ থাকে।

*

বর্তমানে সিমেন্ট পাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। ভারত সরকার সর্বপ্রকারে চেষ্টা করছেন যাতে কারে সিমেন্টের খরচ কম করা যায়। সম্প্রতি ভাকড়া বাঁধের ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা এক নতুন উপায়ে সিমেন্ট বাঁচাচ্ছেন। তারা এখন সিমেন্টের বদলে 'পোজলন্' বলে একটি জিনিস ব্যবহার করছেন। পোজলন ব্যবহার করার ফলে আগে যে পরিমাণে সিমেন্ট এখানকার কাজের জন্য ব্যবহার করা হোত সেটা সম্পূর্ণরূপে বেঁচে যাচ্ছে। পোজলন প্রয়োজনের সময় সেই স্থানে তৈরী করে নেওয়া যায়। সিমেন্টের মত সহজে বিশেষ প্রস্তরকে প্রথমে ভাল করে পুড়িয়ে নেওয়া হয় তারপর সেটিকে খুব ভাল করে গুঁড়ো করে, ঢেলে নেওয়া হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বাঁধের কংক্রীটের সংগে পোজলন মিশিয়ে নিয়ে যে সব ঢালাইয়ের কাজ করা হচ্ছে সেটা ঠিক সিমেন্টের মতই শক্ত হচ্ছে।

*

বহু ক্ষেত্রে মানুষকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে দেখা যায়। এই সংগ্রামে মানুষ কখন জেতে কখনও হারে। রাজস্থানে মরুভূমি নিয়ে মানুষ এবং প্রকৃতিতে এই ধরনের একটা লড়াই চলেছে। রাজস্থানে মরুভূমি প্রায় ৮০,০০০ বর্গমাইল। গত তিন বছর ধরে ভারত সরকার এই মরুভূমির জমিকে উর্বর করবার এবং মরুভূমির প্রসার বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন। এর জন্য সরকার মরুভূমিতে গাছ এবং ঘাস লাগাবার জন্য ৯টি নার্শারী স্থাপন করেছেন। চারা গাছ এবং ঘাস মরুভূমিতে লাগাবার জন্য বিভিন্ন স্থানে বিতরণ করা ছাড়াও এই নার্শারীগুলি ৭১,৩৭০ পাউন্ড গাছের বিচি ১৭৭৮টি প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছেন।

*

অস্ত্রোপচারের মধ্যে হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার খুবই শক্ত। অন্তত ১০ বছর আগে এ ধরনের অস্ত্রোপচার প্রায় অসম্ভবই বলা যেত, এর কারণ হৃদযন্ত্রের রক্ত চলাচল চালু রেখে অস্ত্রোপচার করতে হত—ফলে আর চিকিৎসক সমস্ত জিনিসটা ভাল করে দেখতে পেত না। সম্প্রতি ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হৃদযন্ত্রের কার্য ৪৫ মিনিট সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে তবে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। এর জন্য 'হার্ট পাম্পে'র সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এই যন্ত্রটির সাহায্যে হৃদযন্ত্রের এবং সেই সংগে ফুসফুস থেকে সমস্ত রক্ত বার করে নেওয়া হয়েছিল—যার ফলে চিকিৎসক হৃদযন্ত্রটি পরিষ্কারভাবে পরীক্ষা করতে পেরেছিলেন। অবশ্য রক্ত হৃদযন্ত্র এবং ফুসফুস থেকে টেনে বার করে নেওয়া হলেও অন্য উপায়ে শরীরের মধ্যে রক্ত চলাচল করবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

*

বর্তমান আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বছরে ২৭টি দেশের সাগরতত্ত্ববিশারদ ৭০টি জাহাজের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রের খবরাখবর সংগ্রহ করবেন। এর জন্য এরা জাহাজ থেকে, জনমানব শূন্য দ্বীপে অথবা সমুদ্রে ভাসমান বরফের ওপর থেকে দুটি প্রধান সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করবেন। প্রথমটি হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী সমুদ্রের গভীরতার মাপ। একটি আধুনিক সামুদ্রিক পঞ্জিকা তৈরী করবার জন্য সমস্ত সমুদ্রের গভীরতার খবর খুবই প্রয়োজন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার সম্বন্ধে সমস্ত খবরাখবর। এ ছাড়াও বৈজ্ঞানিকরা সমুদ্রের সম্বন্ধে একটি নতুন খবর, যেটি ১৯৫৫ সালে স্ক্রিপ্স ইনস্টিটিউশন অফ ওসেনোগ্রাফির আবিষ্কার করেছিল, তার সম্বন্ধে আরো খবর সংগ্রহ করা হবে। এই ইনস্টিটিউশন লক্ষ্য করেছিলেন যে গরমকালে উত্তর এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে সমুদ্রে জল বৃদ্ধি ঘটে। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মনে এই প্রশ্ন উঠেছে যে সমুদ্রের জল বিষুবরেখা থেকে এদিকে আসে না—সমুদ্রের জল গরম হওয়ার জন্য বেড়ে যায়। বৈজ্ঞানিকরা আশা করছেন যে গভীর সমুদ্রের জলের স্রোতের সম্বন্ধেও তারা সঠিক খবর সংগ্রহ করতে পারবেন। দেখা যায় যে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর নদীর ঠাণ্ডা জল আস্তে আস্তে সমুদ্রের তলদেশে চলে যায় এবং বিষুবরেখার দিকে এগোতে থাকে। এখানে এসে সমুদ্রের জলের ওপরে ছড়িয়ে পড়ে। এই জলের গতির সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের খুবই কম জানা আছে। এটা ছড়াতে ১০০ বছর কি ১০,০০০ বছর লাগে তাও এখন বৈজ্ঞানিকরা বলতে পারেন না। আর এই জন্য বৈজ্ঞানিকরা সমুদ্রের তলদেশের জলের স্রোতের হদিস ভাল করে পেতে চান। এটা জানবার কারণ হচ্ছে যে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা যে এই স্রোতের দরুণ আবহাওয়ার বদল ঘটতে পারে এবং সমুদ্রের উর্বরতার অনেক তফাত হয়।

দুপুর

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

কোথায় শালিক ডাকে, মনে হয় তার চেনা সুর,
অন্তহীন মমতায় ভরে দেয় আশ্চর্য দুপুর।

দূরের চেতনা ছুঁয়ে নিজেরই মনের খুব কাছে
ফিরে আসি বারবার। ঝাউয়ের পাতায় দ্রুত হাওয়া-
বুঝি কার পদশব্দ—ভুল করে কিছুক্ষণ চাওয়া,
তারপর সব চুপ। ফুল ফোটে বসন্তের গাছে:
সবুজ পাতায় যার শ্যামকান্তি দেহের স্মরণ
সে তবু আসে না।

শুধু, মাঝে-মাঝে মায়াবী ছায়ায়
আশ্চর্য দুপুরে হায়ে চুপি-চুপি ভরে দিয়ে যায়
বেদনার তীব্র সুরে মৌন এক বাউলের মন॥

আদল

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

ক্ষণিকা, এ কথা কেউ জানে না জগতে।
তোমার মুখের থেকে ঝরে-পড়া আকাশের স্রোতে,
তোমার কানের যবাঙ্কুরে,
গানের চোখের স্বাতীদূরে,
ধূপছায়া দালানেরা ভেসে গেছে অকূল ভাসানে,
জলের ধ্বনিরা গেছে কাঁপিয়ে নীলিম
তার একবেণী বাতাসের প্রাণে;
দুপুরের ধুলোয় আবির,
রোদে-গলা নয়নের নীর,
নূপুরের অভিসার, কবরীর মল্লিকার চাঁদ,
হৃদয়ের গভীর প্রবাদ;
মন্দিরের সন্ধ্যাময় জ্বরতপ্ত মীরার প্রণাম,
স্মরণীয় সব দুঃখ ঃ উমা, কর্ণ, পুরূরবা, রাধা, সীতা, রাম,
বুকের ভিতরকার নীলাকাশ, ধূপগন্ধ ভোরের বাসর—
ক্ষণিকা, তোমার মুখে অপার খবর।

মনস্তত্ত্ব

আনন্দ বাগচী

চারখানা সাদা তাস একটি ভয়ের গল্প নিয়ে
রোজ রাতে খেলা করে, যখন সবুজ আলোটাও
নিভে যায়, ছাপা সুখ-দুঃখ নিয়ে বইয়ের কপাট
বন্ধ হয়, অন্ধকারে, তখন একটি মেয়ে তার
খোলা বুকে হাত রেখে সোনালী সাপের কথা ভাবে।

মৃগয়ার মত তার মনে মনে সারারাত কার
অশান্ত পায়ের ধ্বনি নগ্ন বেদনায় খেলা করে,
আকাশে জ্বলন্ত চাঁদ লাল অঙ্গারের মত জ্বলে
প্যাঁচা ডেকে যায় দূরে সীমাহীন রোমাঞ্চিত সুরে:
বিছানাটা দিশেহারা লবণসমুদ্র চারপাশে।

এই সমুদ্রের কূলে অমনস্ক আঠার চৈত্রের
একটি পিপাসা ছিল, দ্বীপের মতন এই ঘরে
অরণ্যের সম্মোহন, তবু তার বেলা চলে গেল,
চারখানা সাদা তাসে জীবনের অনেক সঙ্কেত
চোরা আলো ফেলে গেল, বাইরে আঠার অন্ধকার!

শুভ্র বুকে রাঙা নখ আপন আত্মার ছবি দেখে
চমকে গেছে মনে মনে সরীসৃপ আত্মলুণ্ঠনের
রমণীয় ব্যাকুলতা, কান্নার করুণ নদী লীন
তার ভীরু কটির প্রান্তরে। দুঃখ কী যেন না পেলে।
সোনালী সাপের কথা তাই ভাবে একা একা শুয়ে॥

রঞ্জন
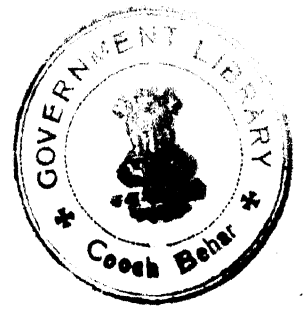
ভারতের সরকারী কর্মপরিচালনায় হিন্দীর আশু প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা অধৈর্য হয়েছেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁদের উদ্দেশে তাঁদেরই ভাষায় বলেছেন—জল্‌দীকা কাম শয়তান্‌কা। খের কমিশনের একুশজন সদস্যের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র বাঙালী এবং যে নির্ভীক যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে তিনি—এবং মাদ্রাজের ডক্টর সুব্বারায়ন—সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে মতদ্বৈধ প্রকাশ করেছেন সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। সুনীতিকুমার হিন্দীবিরোধী নন। বাঙালীকে তিনি হিন্দী শিখতে বলেছেন অনেকদিন আগে। আজ তিনি হিন্দীভাষীদের আগ্রাসী মনোবৃত্তির সদম্ভ প্রদর্শনের সামনে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত হয়ে বলছেন, ধীরে, নইলে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব ভারতের মতো দক্ষিণ ভারতেরও ওই মত।

কালহরণের এই উপদেশ আমার কাছে মন্দের ভালোর বেশি নয়। হিন্দীকে যদি সত্যি অশুভ জ্ঞান করি—এবং আমি করি—তাহলে কথাটা স্পষ্ট করে বলতে বাধা কোথায়? সংবিধানে হিন্দীর বিধান আছে? বেশ তো, কবুল করব তখন ভুল করেছিলাম বাধা না দিয়ে। আজ সংবিধানের সংশোধন চাই। সংবিধানের অংশবিশেষের বিরোধিতা করা, সংশোধন দাবি করা, গর্হিত কোনো কাজ নয়। অস্পষ্টভাষণের সুবিধা এই যে, অত্যুৎসাহীদের হিন্দী-অভিযান চলতেই থাকবে—এবং তার ব্যয়ভার বহন করবে সারা দেশ—আর ক্রমে ক্রমে হিন্দী একটি একটি করে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এমন পরাক্রমশালী হয়ে উঠবে যে তখন অহিন্দীভাষীদের আপত্তি সহজেই অবহেলিত হবে। আজ নয়, আগামীকাল নয়, এমনকি পরশুও হিন্দী চাইনে, একথা বলা দরকার।

•

হিন্দী-উৎসাহীদের একটি যুক্তি আমি মানতে বাধ্য। হিন্দীর বিরুদ্ধে আজ আমরা যে শত সহস্র যুক্তি নিবেদন করছি তার প্রত্যেকটি যুগ দুই পরেও সমান প্রযোজ্য হবে। সেগুলিকে আজ মানলে সেদিনও মানতে হবে। এই রকমের বৃহৎ পরিবর্তন শীতের দিনে জলে নামার মতো। দ্বিধা করলে দৃঢ়তা শিথিল হয়, জলের শীতলতা কমে না। পরে আর স্নান করাই হয় না। আমি যদি রাষ্ট্রকার্যে হিন্দীর প্রচলনের সমর্থক হতাম তবে দৈর্য ধারণের বিরোধিতা না করে আমার উপায় থাকত না। আমি বলতাম, ইংরেজী সরালে আজ যে অসুবিধা হবে কুড়ি বছর পরে তার চেয়ে কম হবে না। বলতাম, ইংরেজীকে বলপ্রয়োগ করে না সরালে সে নিজে কখনোই যাবে না, আর হিন্দীও নাবালক থেকে তার সংবিধানদত্ত ——— স্বীকার করতে পারবে না। হিন্দী-ভাষার বর্তমান অযোগ্যতা ও তার সাহিত্যিক দৈন্যতা? ভারতজাতি সম্বন্ধে কিছুদিন আগে বলা হয়েছে সে স্বাধিকারের যোগ্য নয়। ভাষাও ক্ষমতা পেলে যোগ্যতার পরিচয় দেবে। সাহিত্যসৃষ্টির আইন নেই। বাঙলার মতো হিন্দীতেও একজন বঙ্কিমচন্দ্র ও একজন রবীন্দ্রনাথের জন্ম হলে সাহিত্যই শুধু হবে না, ভাষারও বয়স কুড়ি বছরে বাড়বে দুশো বছর। পুশকিন রুশ ভাষাকে সাবালক করে দিয়েছিলেন প্রায় একক চেষ্টায়। বাইরের চিন্তাধারার সঙ্গে যোগাযোগ? Necessity is the mother of translations. মাদ্রাজী বাঙালীরা হিন্দী বলতে ভুল করবে? চেষ্টা করলে সুনীতিকুমারের রিপোর্টেও দুয়েকটা ভুল বের করা অসম্ভব হবে না। লজ্জা শুধু হিন্দীতে ভুল করতে?

•

উপরের উত্তরগুলিতে যুক্তির পরিমাণ অল্প নয়। সব যুক্তিই শুধু হিন্দীবিরোধিতায় নেই।

তবে দ্বিতীয় স্বীকৃতিতে আসা যাক। ভাষার ব্যাপারে আমরা কেউই পুরোপুরি র‍্যাশনাল বা যুক্তিবাদী নই। তাহলে ইংরেজীর বানান ও উচ্চারণের সংস্কার সাধিত হত অনেকদিন আগে। আছে আবেগ, আছে অভ্যাস। আছে তীব্র মমতাবন্ধন। হিন্দীভাষীদের এই কথাটাই স্মরণ রাখতে অনুরোধ করব। তাঁরা যেমন হিন্দীকে ভালোবাসেন, আমরাও তেমনি ভালোবাসি আমাদের নিজ নিজ ভাষাগুলি। ওদের অবজ্ঞা আমাদেরই অবহেলা। ওদের অপমান আমাদেরই অপমান। ইংরেজীর কাছে কখনো কখনো অবহেলা বা অপমান পেলেও আমাদের মনে আছে, ইংরেজী আমাদের আধুনিক ভাষাগুলি পুষ্ট করেছে। অনুরূপ পুষ্টি আমরা হিন্দীর কাছ থেকে আশা করিনে কেননা সে নিজে ভাষাগুণে দুর্বল। তার বল রাষ্ট্রবল, সংখ্যাবল। ভাষার উন্নতিবিধানে এই দ্বিবিধ বল হয় অন্তরায় নয় অবান্তর। আমরা তো চাইনে হিন্দীর ঊর্ধ্বে ভোটের জোরে আসন, তোমরা কেন চাও হিন্দীকে পাহলা আসনে বসিয়ে আমাদের দুসরা বর্গ নাগরিকে পরিণত করতে? অন্যরূপ উপেক্ষিত হলে বাধ্য হব কঠোরতর ভাষা প্রয়োগ করতে। ফল হবে অপ্রীতি। তাই থেকে অনৈক্য। রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োগ ভাষার উপর ঘটলে তোমার শক্তিই বিপন্ন হতে পারে।

যদি অপরাধ না নাও তো বলি, তোমার আন্তরিকতায়ও আর সবারের আস্থা অপরিসীম না হতে পারে। তুমি নিজেও হয়তো জানো, হিন্দী সত্যি রাষ্ট্রভাষার স্থান নেবার যোগ্য নয়। তোমার রিপোর্টের দ্বিধার অন্যতর ব্যাখ্যা আমার অজ্ঞাত। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ অবশ্য শুধু অজ্ঞানের নয়।

একাধিকবার দেখেছি, হিন্দীর সর্বজনীন গ্রহণে যে-সব মন্ত্রীদের আগ্রহ সর্বাধিক তাঁদেরই মধ্যে অনেকে স্বীয় পুত্র বা পৌত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন বিদেশী ইস্কুলে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাঁর দৌহিত্রদের সুইস্ শিক্ষার আয়োজন করেছেন বলে এককালে সংবাদ ছিল। তবে এই সন্দেহ কি একান্তই অন্যায় হবে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার ব্যবস্থা শুধু তাদের জন্য যাদের সামর্থ্য নেই সুইজারল্যাণ্ড যাবার? সে গুজবটা তাহলে মিথ্যা নয় যে ডিসরেলির ইংল্যাণ্ডের মতো আমরাও ভারতকে Two nations-এ পরিণত করতে উদ্যত?

•

গত দশ বছরের সক্রিয় অপসারণ সত্ত্বেও ইংরেজী আমাদের জীবনের কতখানি স্থান অধিকার করে আছে তা নিয়ে বাগবিস্তার অনাবশ্যক। সহসা ইংরেজীকে নির্বাসন দিলে জাতীয় জীবনে যে শূন্যতা মুখব্যাদান করবে তা ভয়াবহ। আগামী পঞ্চাশ বছরে সব ভারতীয়কে আপন আপন ভাষা ভুলিয়ে দিয়ে শুধুমাত্র হিন্দীতে শিক্ষিত করলে ভারতের কী চেহারা হবে তা কল্পনাও করতে পারিনে, কিন্তু ইতিমধ্যেই দেশের ঐক্যবোধ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের প্রধান উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে ভাষার মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্যসাধন তবে তার নিশ্চিত ব্যর্থতার অগ্রিম প্রমাণ এই মুহূর্তেই প্রচুর। হিন্দীয়ানার উগ্রতার সঙ্গে বাঙালীয়ানার উগ্রতা প্রশ্রয় পেতে বাধ্য।

আমি আমার ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে আত্মবিশ্লেষণের শেষে বিস্ময়কর দুয়েকটি তথ্য আবিষ্কার করেছি। আমি যখন বাঙলা বলি, তখন আমি অসম্পূর্ণ ভারতীয়। হিন্দী বললেও অন্যথা হত না। আমি যখন হিন্দু, তখন আমি ভারতীয় মুসলমানদের থেকে নানা বিষয়ে বিভিন্ন। আহারে, কথনে, বেশে যখন আমি ভারতের কোনো প্রদেশেরই নই একমাত্র তখনই ভারতের সমগ্রতার সত্যতা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। ভারতীয় ঐক্য প্রায় অস্পৃশ্য বলে মনে হয়। তবে কি এই সত্য যে আমরা শুধু সেই পরিমাণেই ভারতীয় যে-পরিমাণে আমরা আংলো [illegible] নই? নেহরুর ভারতীয়ত্বের ব্যাখ্যাও অন্যরূপ না হতে পারে।

॥ মার্কিনী ধোঁকা ॥

ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য যখন কোথাও অস্ত যেত না তখন ইংলণ্ডে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব। সেই সময় শক্তিতে, ঐশ্বর্যে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ব্রিটিশ জাতি অগ্রগণ্য। সারা পৃথিবী ব্রিটিশ সিংহের দাপটে কম্পমান।

রবার্ট লিস্টন তখন লণ্ডনের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্জন। লিস্টন আসলে স্কটল্যাণ্ডের লোক। এডিনবরার সার্জন। সার্জনদের মধ্যে রেষারেষিতে এডিনবরায় স্থান না পেয়ে লণ্ডনে চলে আসেন। লণ্ডনে এসে নিজের দক্ষতা দেখাবার সুযোগ পান। ক্রমে একদিন অভিজাত শ্রেণীর সেরা সার্জন হয়ে ওঠেন।

রবার্ট লিস্টন সুপুরুষ। যৌবনে দেহে তিনি অসাধারণ শক্তি রাখতেন। ছাত্রাবস্থায় শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য কবর থেকে শব চুরির দলের তাই তিনি বড় একজন পাণ্ডা ছিলেন। চল্লিশের উপরে দেহ তাঁর যদিও কিছু মেদ-বহুল হয়, তবু তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন।

গল্প আছে, একবার এক টিউমারের রুগী অপারেশনের আগেই ভয়ে টেবিল থেকে উঠে দৌড়ে পালিয়ে যায়। বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে আত্মরক্ষা করে। লিস্টন নিজে গিয়ে দরজায় কাঁধ লাগিয়ে চাপ দিয়ে ছিটকিনি ভেঙে ফেলেন। রুগীকে ধরে টেবিলে এনে অপারেশন করেন।

তখনকার দিনের অপারেশন এই রকমই ছিল। রুগীকে বেহুঁশ করবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাই জোর করে তাকে টেবিলে ধরে রাখতে হ'ত। ধরে রাখবার জন্য ঘণ্টা বাজিয়ে ছাত্রদের ডাকা হত। টেবিলে শুইয়ে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে রুগীকে বেঁধে রাখা হ'ত।

ফাঁসির আসামীর মত অসহায় রুগী অপারেশনের দিন গুনত। সার্জনের হাতে বলি হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করত। রুগীর কাছে সার্জন তখন বধ্যভূমির ঘাতক।

নির্দিষ্ট দিনে অপারেশন টেবিলে শুয়ে রুগী রাস্তায় সার্জনের গাড়ির শব্দ শুনে চমকে উঠত। ভয়ে আতংকে তার শ্রবণশক্তি প্রখর হত। শুনত, সদর দরজায় এইমাত্র সার্জনের গাড়ি থামল। সার্জন নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠে কলিং বেল টিপলেন। তারপর কানে আসত সার্জনের ধীর মন্থর ভারী পদশব্দ; অপারেশন থিয়েটারের দিকে সগর্বে অগ্রসর। থিয়েটারে ঢুকে গম্ভীর স্বরে রুগীকে দুটি একটি কথা বলা। তারপর যন্ত্রপাতি সাজানোর ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ। সার্জনের প্রস্তুতির শব্দ। ফাঁসির দিনে আসামী যেমন জল্লাদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়, রুগীও তেমনি অপারেশনের আগে সার্জনের হাতে নিজেকে সমর্পণ করত।

তখন ১৮৪৬ সাল। রবার্ট লিস্টন লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতালের বড় সার্জন। এই হাসপাতালে মেডিসিনের
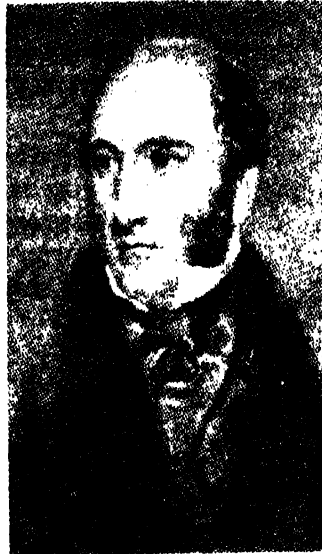
রবার্ট লিস্টন (১৭৯৪—১৮৪৭)

প্রফেসর জন্ ইলিয়টসন তখন দুটি তরুণীকে মেসমারের পদ্ধতিতে মোহাবিষ্ট করে চিকিৎসক এবং ছাত্র মহলে তুমুল হৈ চৈ বাধিয়েছেন। বর্জিত মেসমেরিজম আবার নতুন করে চালু করবার ব্যবস্থা করেছেন। বিজ্ঞানীরা এই মেসমেরিজম কোনদিনই মানতে পারেন নি। তাই হাসপাতালে এই নীতিবিরুদ্ধ বর্জিত পদ্ধতি প্রয়োগ করা নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ শুরু হল।

মেসমেরিজম-এর প্রবর্তক ছিলেন ফ্রানজ অ্যান্টন মেস্‌মার। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মানুষ নিজের হাতে চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি অর্জন করতে সক্ষম এবং সেই শক্তি দিয়ে রুগীকে মোহাবিষ্ট করে তার রোগ নিরাময় করার নাম মেস্‌মেরিজম। এই চুম্বক শক্তিকে মেসমার বলতেন, জৈবিক চুম্বক (অ্যানিমেল ম্যাগনেটিজম্)।

এই পদ্ধতিতে চিকিৎসার জন্যে মেস্‌মার ভিয়েনাতে এক আরোগ্য নিকেতন খোলেন। দলে দলে রুগীরা এই আরোগ্য নিকেতনে মেসমারের কাছে মোহাবিষ্ট হতে আসে। কিন্তু বেশীদিন এ ব্যবসা চলল না। কথা উঠল, মেস্‌মারের এ পদ্ধতিতে পুরুষের চেয়ে রমণীরাই বেশী আকৃষ্ট হয়। একা ঘরে মেসমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তরুণী-দের সম্মোহিত করেন। কাজেই ভিয়েনার রাণী টেরেজা একদিন এক অনুসন্ধানী কমিশন বসালেন। ফলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মেস্‌মারকে আরোগ্য নিকেতন বন্ধ করে ভিয়েনা ছেড়ে পালিয়ে আসতে হ'ল; ১৭৭৮ সালে।

মেস্‌মার ভিয়েনা ছেড়ে প্যারিসে এলেন। সম্মোহন-বিদ্যা এখানে খুব জনপ্রিয় হ'ল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করে মেস্‌মার স্বাস্থ্য দেবতার বিরাট এক মন্দির গড়ে তুললেন। দলে দলে রুগীরা এই মন্দিরে আসতে লাগল।

এই মন্দিরে প্রবেশ করে রুগীরা নীরব নিঃশব্দ পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে যেখানে গিয়ে ঢুকত সেটা প্রকাণ্ড একটি হলঘর। মাঝখানে চুম্বকীকৃত বড় একটি গামলা। চারধারে বসবার বেদী। বাইরের হাওয়া লেগে সংগীত যন্ত্রের ঝম্ ঝম্ আওয়াজ দূর থেকে ভেসে আসত। জানালার ফাঁকে ফাঁকে আলো এসে আয়না দিয়ে ঢাকা দেয়ালে প্রতিফলিত হ'ত। বারান্দা থেকে প্রস্ফুটিত পুষ্পের মৃদু সুবাস হাওয়ার সংগে ঘরে ঢুকত। চিমনির কাছে পুষ্পাধার এবং ধূপদান থেকে উগ্র সুবাস রোগিণীদের মনে মাদকতা এনে দিত।

রোগীরা চুম্বকীকৃত ঐ গামলা হাত দিয়ে ছুঁয়ে পাশের বেদীতে গিয়ে বসতেন। এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই রমণী। তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে একটি করে কন্দর্পকান্তি যুবক থাকত। এরা সব মেস্‌মারের সহকারী। এই যুবকরা এগিয়ে এসে এক একটি রমণীকে স্পর্শ করে চোখে চোখ রেখে অপলক দৃষ্টি হেনে তাকিয়ে থাকত; কোন কথা বলত না। সংগে সংগে পাশের ঘর থেকে যন্ত্রসংগীতের মৃদু ঝংকার বেজে উঠত। নারীকণ্ঠের মিষ্টি স্বর সংগীতের মূর্ছনার সংগে ভেসে আসত। আবেশে রোগিণীদের চোখ বুজে আসত। চুম্বকের জাগ্রত শক্তি নিজের দেহে তাঁরা অনুভব করতেন।

সংগীন মুহূর্তে সম্মোহনের গুরু মেস্‌মার নিজে কক্ষে প্রবেশ করতেন; লাল জমকালো পোশাক পরে। সগর্বে মাথা উঁচু করে রাজকীয় পদক্ষেপে ধীরে ধীরে তিনি এগিয়ে আসতেন, হারমোনিয়ামের তালে তালে পা ফেলে। রোগিণীদের সামনে

দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধ কাঠি দিয়ে একে একে তাঁদের স্পর্শ করতেন। সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক ঘটনা ঘটে যেত। রোগিণীদের পূর্ণ মোহাবেশ (ক্রাইসেস) হত। মেসমার নিজে ঐ পূর্ণ মোহাবিষ্ট রোগিণীকে তুলে তাঁর অন্দরের মোহাবেশ কক্ষে (ক্রাইসেস চেম্বারে) নিয়ে যেতেন। রোগিণীদের কোন সংজ্ঞা থাকত না।

এই সব অনুষ্ঠানে পুরুষদেরও ভিড় হত। কিন্তু তাঁরা আসতেন মেয়েদের দেখতে। সম্মোহিত হয়ে, মোহাবিষ্ট হয়ে বিবশা হয়ে মেয়েরা কি করে তাই দেখতে। এই পূর্ণ মোহাবিষ্ট হওয়া নিশ্চয়ই খুব মধুর এবং সুখের। কারণ দেখা যেত, একবার এই ক্রাইসিস হলে আর একবার এই ক্রাইসিসের জন্য রোগিণীরা ব্যগ্র হতেন, বায়না ধরতেন।

এই মেসমেরিজম তখন প্যারিসে সাংঘাতিক একটা হৈ চৈ লাগিয়ে দিল। এই চুম্বক চিকিৎসার ঠেলায় অন্য সব চিকিৎসা বরবাদ হয়ে গেল। এই চিকিৎসা নেওয়ার জন্য ঘরে ঘরে সবাই ছটফট করতে লাগল।

মেসমার ঘোষণা করলেন, এই পদ্ধতিতে চিকিৎসক প্রতিটি রোগীর স্বাস্থ্য নিমেষে বুঝতে সক্ষম হন। রোগটা কি এবং দেহের কোন্ গুপ্ত স্থানে অবস্থিত তাও সহসা পরিস্ফুট হয়। অতএব চিকিৎসা বিদ্যার চরম উন্নতি এই পদ্ধতিতেই সম্ভব।

তখন মনে হত, সমগ্র পৃথিবীটাই বুঝি

মেস্‌মারের হাতে: মন্ত্রমুগ্ধ হওয়ার জন্য অপেক্ষমান।

ফরাসী গভর্নমেণ্ট মেস্‌মারের এই সুগভীর জ্ঞানের গুপ্ত রহস্যটি প্রকাশ করবার জন্য বার বার অনুরোধ করলেন। বললেন, সারা জীবন মোটা টাকার পেনসন এবং জাতির সর্বোচ্চ সম্মান ক্রশ অফ দি অর্ডার অফ সেণ্ট মাইকেল মেস্‌মারকে দেওয়া হবে।

কিন্তু মেস্‌মার তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এমনিতেই প্রচুর অর্থ তাঁর রোজগার হচ্ছে। তা ছাড়া, এ গুপ্ত জ্ঞান প্রকাশ করা যায় না কিছুতেই।

শেষে একদিন মেস্‌মারের কাছে এক পুলিস কর্মচারী এলেন। মেস্‌মারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যে রিপোর্ট তিনি দাখিল করলেন, তার ফলে ফরাসী গভর্নমেণ্ট ভিয়েনার রাণী টেরেজার মত আবার এক অনুসন্ধানী কমিশন বসালেন। এই কমিশনে আঠারো শতকের নামকরা বড় বড় বিজ্ঞানীরা সব সভ্য ছিলেন। কমিশনের রিপোর্টে সর্বপ্রথম যিনি স্বাক্ষর করেন তিনি ইলেকট্রিসিটির আবিষ্কারক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। সর্বশেষে স্বাক্ষর করেন অক্সিজেনের আবিষ্কারক লাভয়েসিয়ে।

বিজ্ঞানীরা সবাই একমত হয়ে বললেন, এই চুম্বক চিকিৎসার যা কিছু ফল সবই স্পর্শ-জনিত এবং কল্পনাপ্রসূত। যৌনবোধ থেকে উদ্ভূত।

কাজেই ফরাসী গভর্নমেণ্ট মেসমারের এই স্বাস্থ্যমন্দির বন্ধ করে দিলেন। ভিয়েনার মত প্যারিসেও মেসমারের ব্যবসা গোটাতে হল ১৭৭৮ সালে।

তাই বিজ্ঞানীরা এই মেস্‌মেরিজম অবজ্ঞা ও ঘৃণায় বর্জন করলেন। কিন্তু অপারেশনের আগে রুগীকে এই উপায়ে সামান্য একটু মোহাবিষ্টও যদি করা হত রুগীদের অনেক কষ্ট লাঘব হত। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় কেউ কেউ অবশ্য তা করতেন। কিন্তু গোঁড়া সার্জনরা কখনও তা সুনজরে দেখতেন না।

জন্‌ ইলিয়টসন এতদিন পরে লণ্ডন হাসপাতালে ছাত্রদের সামনে দুটি তরুণীকে সম্মোহিত করে আবার একটা হৈ চৈ লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু বেশীদিন এই হৈ চৈ চলল না। সার্জারীতে ইথার ব্যবহার করে রবার্ট লিস্‌টন সব বাদানুবাদ ঠাণ্ডা করে দিলেন। মেসমেরিজম্‌-এর সঙ্গে সঙ্গে ইলিয়টসনেরও পতন হল।

রবার্ট লিস্‌টন ছিলেন সার্জনদের মধ্যে অভিজাত শ্রেণীর। অপারেশনের আগে রুগীকে অজ্ঞান করার কোন উপায় ছিল না বলেই তখনকার সার্জনরা খুব দ্রুত অপারেশন শেষ করতেন। যাঁর অপারেশন যত তাড়াতাড়ি শেষ হত তাঁর সুনাম তত বেশী হত। রবার্ট লিস্‌টন তখনকার দিনের সবচেয়ে দ্রুত সার্জন। বিদ্যুৎ ঝলকের মত

অ্যানেস্থেটিকস্‌ আবিষ্কারের পূর্বে ১৭৯১ সালে অপারেশনের আগে ঘণ্টা বাজিয়ে ছাত্রদের আহ্বান করা হত

তাঁর ছুরি চলত, নিমেষে অপারেশন শেষ হত।

তখন আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স হাসপাতালে মর্টন ইথার শুঁকিয়ে রুগী অজ্ঞান করেছেন। পর পর দুটো অপারেশন হয়ে গেছে। ডাঃ হেনরী জ্যাকব বিজলো বোস্টন মেডিক্যাল এণ্ড সার্জিক্যাল জার্নালে তা প্রকাশ করেছেন।

রবার্ট লিসটন খবর পেলেন, হাসপাতালের কাছেই গাওয়ার স্ট্রীটের এক ডাক্তার আমেরিকার ডাঃ হেনরী জ্যাকব বিজলোর এক চিঠিতে এই খবর পেয়েছে এবং ইথার প্রয়োগ করে বিনা ব্যথায় দাঁত তোলাও হয়ে গেছে। তাই শুনে লিসটন অক্সফোর্ড স্ট্রীটের এক নামকরা কেমিস্টের দোকানে খবর পাঠালেন। বললেন, এই নতুন জিনিসটি তাঁর হাসপাতালে তিনি ব্যবহার করে দেখতে চান।

তখন লিস্‌টনের ওয়ার্ডে বছর তিরিশ বয়সের এক রুগী ছিল। নাম তার ফ্রেডারিক্‌ চার্চিল। বেচারার হাঁটুর নীচে পায়ের হাড় ভেঙে চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। ঘা হয়, জ্বর হয়। কয়েকমাস ঐ ঘায়ের জন্যে জ্বরে ভুগে বেচারা এবার বুঝেছে, এই পচা পা কেটে না ফেললে তার আর নিস্তার নেই।

অপারেশনের দিন ঠিক হল ২১শে ডিসেম্বর, ১৮৪৬। অক্সফোর্ড স্ট্রীটের ঐ কেমিস্টের এক আত্মীয় ডাঃ উইলিয়াম স্কোয়ার একটা অদ্ভুত সাইজের বোতল ও রবারের নল নিয়ে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকলেন। তখনও সার্জন আসেন নি। রুগীকেও আনা হয়নি। শুধু ছাত্ররা, নার্স ও বেয়ারারা আছে।

নতুন অষুধে কি রকম কাজ হয় দেখার জন্য একটা বেয়ারাকে টেবিলে শোয়ানো হল। রবারের নলটা তার মুখে ঢুকিয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বলা হল। কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা হল না। বার কয়েক শ্বাস টেনে, কেশে, হঠাৎ বেয়ারাটা টেবিল থেকে লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে গেল। ছাত্ররা সব হৈ হৈ করে উঠল। হাসতে লাগল।

এমনি সময় রবার্ট লিস্‌টন ঘরে ঢুকলেন। মুহূর্তের মধ্যে ছাত্রদের হৈ চৈ বন্ধ হয়ে গেল। নার্স, বেয়ারা ডাক্তাররা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। অপারেশন থিয়েটার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। লিস্টন পকেট থেকে লম্বা একটা বাক্স খুলে ছুরী বার করলেন, আঙুল দিয়ে ধার পরীক্ষা করলেন। কোটের বোতামের ঘরে লম্বা একটা সুতো ঝুলিয়ে নিলেন। অপারেশনের আগে এইভাবেই তখন সার্জনরা তৈরী হতেন।
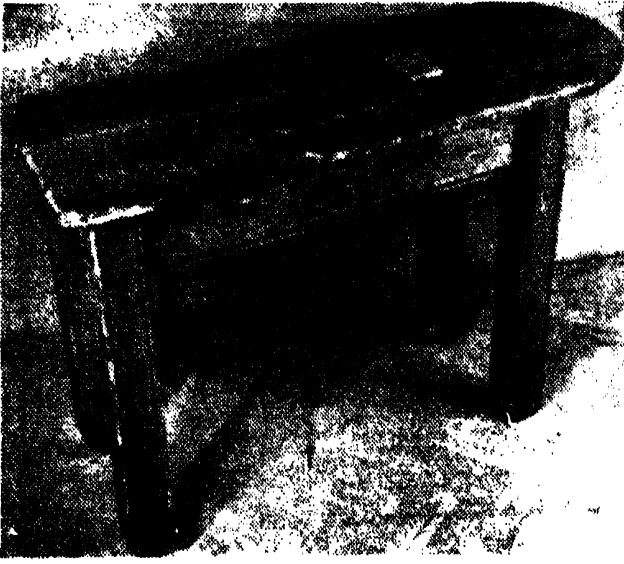
লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতালে এই টেবিলে প্রথম ইথার অ্যানেস্থেটিকস্ প্রয়োগ করে অস্ত্রোপচার হয়

ফ্রেডারিক চার্চিলকে স্ট্রেচারে করে আনা হল, টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হল।

রবার্ট লিস্টন ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ আমরা মানুষকে অচৈতন্য করবার জন্য এক মার্কিনী ধোঁকা ব্যবহার করব। (উই আর গোইং টু ট্রাই এ ইয়াংকি ডজ্ ফর মেকিং পিপল ইনসেন্সিবল্)।

ডাঃ স্কোয়ার রবারের নল চার্চিলের মুখে ঢুকিয়ে নাক বন্ধ করে মুখ দিয়ে শ্বাস টানতে বললেন। ঘর ইথারের উগ্র গন্ধে ভরে উঠল। ছাত্ররা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগল। রুগীর পাশে দাঁড়িয়ে লিস্টন আঙুল দিয়ে তাঁর লম্বা ছুরির ধার পরীক্ষা করতে লাগলেন। চার্চিল লম্বা লম্বা শ্বাস নিতে লাগল। শেষে নাক ডাকাতে শুরু করল। ডাঃ স্কোয়ার লিস্টনকে ইশারা করে জানিয়ে রুগীর মুখ থেকে টিউব বার করে রুমালে ইথার ঢেলে নাকে মুখে চেপে ধরলেন।

রবার্ট লিস্টন আবার ছেলেদের দিকে ছুরি হাতে তাকালেন। বললেন, সময়টা একটু দেখো ভাই।

ছেলেরা অমনি পকেট থেকে ঘড়ি বার করল। আবার এক তড়িৎগতির অপারেশন দেখার জন্যে প্রস্তুত হল। কারণ রবার্ট লিস্টনের অপারেশন দেখতে হলে সর্বদা সতর্ক থাকা চাই। নইলে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে তাঁর অপারেশন শেষ হয়ে যায়।

লিস্টন বাঁ হাতের মোটা বুড়ো আঙুলে রুগীর উরুতে চেপে রক্ত চলাচল বন্ধ করেন। ডান হাত দিয়ে ছুরি চালান। দাঁত দিয়ে করাত ধরে রাখেন। ছুরির কাজ শেষ হলে চট্ করে ছুরি ফেলে করাত টেনে হাড় কাটেন। তারপর কোটের বোতামের ঘরে ঝোলানো সুতো দিয়ে শিরা ধমনী বেঁধে দেন।

ছাত্ররা আজ আবার লিস্টনের ক্ষিপ্রগতির হাত চালানো দেখল। ঘস্ ঘস্ করে করাত চালানো শুনল। টেবিলের নিচে বালুভরা ট্রের ওপর ফ্রেড্রিক চার্চিলের কাটা পা ধপ করে পড়ল।

লিস্টন ধমনী বাঁধা শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন, কতক্ষণ লাগল ভাই?

কেউ বলল, পঁচিশ সেকেণ্ড; কেউ বলল ছাব্বিশ। আটাশ সেকেণ্ডের বেশী কেউ আর বলল না। আধমিনিটেরও কম সময়ে প্রথম ছুরি বসানোর পর অপারেশন শেষ হয়ে গেল। এত কম সময়ে লিস্টন এই অপারেশন আগে কখনও করেন নি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রুগী নড়ে চড়ে উঠল। চোখ মেলে তাকিয়ে এদিক ওদিক দেখে চেঁচিয়ে উঠল। বলল, কখন হবে অপারেশন? না না অপারেশন আমি করাব না। আমাকে ঘরে যেতে দাও।

মেঝেতে ট্রে-র ওপর রাখা কাটা পা দেখিয়ে চার্চিলকে শান্ত করা হল। বোঝানো গেল সত্যি অপারেশন হয়ে গেছে।

রবার্ট লিস্টন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। রুগীকে মদ অথবা আফিং খাইয়ে অপারেশন করা তিনি দেখেছেন। তাতে কিন্তু ব্যথা বোধ রুগীর যেত না; অপারেশনের সময় চীৎকার করত, ছটফট করত। কিন্তু আজ সে মোটেই কিছু জানল না কখন অপারেশন হয়ে গেল। আবেগে অভিভূত হয়ে আমেরিকার মাসাচুসেটস্ হাসপাতালের সার্জন ডাঃ ওয়ারেন যেমন ছাত্রদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, এ জোচ্চুরি নয়; তেমনি রবার্ট লিস্টনও আজ হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ফেললেন, ভদ্রমহোদয়গণ এই মার্কিনী ধোঁকা মেসমেরিজম-এর বারোটা বাজিয়ে দিল। (জেণ্টলমেন দিস্ ইয়াংকি ডজ্ বিটস্ মেসমেরিজম হলো)।

এর পর থেকেই হাসপাতালে জন্ এলিয়টসনের মেসমেরিজম্ বন্ধ হল। এলিয়টসন চাকরী ছেড়ে দিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা চার্চিল কাটা উরুতে বেশ একটা যন্ত্রণা বোধ করল। মনে হল, পায়ের ওপর দিয়ে যেন একটা চাকা চলে যাচ্ছে। কিন্তু আস্তে আস্তে ঘা শুকিয়ে গেল। অপারেশনের মাস দুই পরে চার্চিল সুস্থ হয়ে বাড়ি গেল।

এই মার্কিনী ধোঁকার কথা শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। সব সার্জনরাই ইথার ব্যবহার শুরু করলেন। এই খবর এডিনবরায় পৌঁছল। সার্জারীতে এডিনবরা তখন খুব উন্নত। ডাঃ জেমস্ ইয়ং সিম্পসন এডিনবরা থেকে লণ্ডনে এসে লিস্টনের কাছে সব শুনে গেলেন। নিজের প্র্যাকটিসে এখন থেকে অজ্ঞান করার এই পদ্ধতি চালু করার সঙ্কল্প নিয়ে ফিরে গেলেন।

রবার্ট লিস্টন ইংলণ্ডে সার্জারীর এই নতুন যুগের প্রবর্তক। তিনিই সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে অপারেশনের আগে ইথার ব্যবহার করেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে রুগীকে অচৈতন্য করে সার্জারীর কৃতিত্ব দেখানো লিস্টনের ভাগ্যে আর ঘটে উঠল না।

বছরখানেকের মধ্যেই একদিন তিনি নিজের এক জাহাজ চড়ে সমুদ্রে বেড়াতে গেলেন। জাহাজের ওপর দাঁড়িয়ে সমুদ্রের বিরাট এবং বিচিত্র শোভা দেখে তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন। অতর্কিতে মাস্তুলের দড়ি ছিঁড়ে হঠাৎ একটা বাঁশ তাঁর বুকে এসে লাগল। রবার্ট লিস্টন পড়ে গেলেন। বুকের ভেতরকার বড় একটি ধমনী ছিঁড়ে রক্তপাত হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হল। লিস্টনের তখন মাত্র ৫৩ বৎসর বয়স। অজ্ঞান করবার আর একজন প্রবর্তকের অকালে মৃত্যু হল।

ছোটগল্প

প্র-না-বি'র অমনোনীত গল্প—মিত্রালয় পুস্তক ভবন, ২৮, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। তিন টাকা।

'জগবন্ধুর মোহমুক্তি', 'নহুষের অতৃপ্তি', 'ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র', 'পক্ষিরাজ গাধা' ইত্যাদি গল্পনামের মধ্যেই কৌতুকসিন্ধ প্র-না-বি'র মজি'র ইশারা আছে। 'স্বপ্নাদ্য কাহিনী'তে তাঁর পদ্যাশ্রয়ী গল্পরীতি যেমন উৎরেছে, 'সতীন'-এর 'স্বামীর পত্র' এবং 'স্ত্রীর ডায়েরী'র সমবায়েও তেমনি। 'গণ্ডার'-এর হিতোপদেশী ঢঙও তারিফ করতে হয়। 'শাপে বর' গল্পটিতে দেবরাজ ইন্দ্রের তিরস্কারে স্বর্গচ্যুত জগবন্ধুর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক ঘটনা এবং দুর্ঘটনার সংযোগটি চাতুর্য-প্রণীত তাঁর সমালোচনা। প্র-না-বি'র এই 'অমনোনীত গল্প' সংগ্রহ শুধু লঘুকৌতুকময় নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি বেশ গুরু তিরস্কারে দক্ষ।

২৩৭।৫৭

নীলবর্ণ শৃগাল—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ২০৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। সাড়ে তিন টাকা।

প্র-না-বি'র 'নীলবর্ণ শৃগাল'-এর মোট কুড়িটি গল্পের প্রথমটির নাম 'অবচেতন'। তার শুরুতেই তিনি অলৌকিক, অত্যাশ্চর্য ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে এবং যে শাবাবুর কাছে গল্পটি শোনা গিয়েছিল, তাঁরই মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে বেশ কৌতূহলজনক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। 'সাহিত্যে ভেজালবিদ'তে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য আয়োজন। সেখানে উঠতি কবি অনিরুদ্ধ সেন-এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে খুবই সোজাসুজি এবং ক্রমশ অনিরুদ্ধের উত্থান-পতন সম্বন্ধে পাঠকের আগ্রহ তো বেড়েই যায়, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বাজারদর সম্পর্কে তাঁর কিছু অভিজ্ঞতাও বাড়ে। 'স্ত্রীলোকের হৃদয় যে পরিমাণে কোমল, ফুসফুস সেই পরিমাণ সতেজ'—'গোল্ড ইনজেকশন'-এর প্রথম দিকের এই মন্তব্য তুলে তাঁর বাগ্‌ভঙ্গির নমুনা দেখানো যেতে পারে। একটি লেখার প্রথম বাক্যটি এই-রকম—'কোন দেশে 'অদৃষ্ট-সুখী' নামে এক অন্ধ ব্যক্তি বাস করিত।' এইসব উদাহরণ থেকে প্র-না-বি'র রীতিগত বৈচিত্র্য প্রয়াসের মনোধর্ম অনুমান করা যায়। কিন্তু এতোদিনে বহুকর্মা প্র-না-বি'র এসব লক্ষণ তো সকলেরই চোখে পড়েছে। নতুন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

২৫৬।৫৭

সাগর বেলায়—ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। দাম দুই টাকা আট আনা।

বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের ৯টি গল্পের সমষ্টি 'সাগর বেলায়' নামে গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। লেখক সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। গল্পগুলির বিষয়বস্তু নিতান্ত সাধারণ প্রকৃতির হইলেও লেখকের রচনা-শৈলীর মাধ্যমে প্রত্যেকটি গল্পই বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। সহজ সরল এবং সাবলীল ভাষায় রচিত আলোচ্য গ্রন্থের ছোট গল্পগুলির মধ্যে অভিসারিকা অতিথি এবং চোর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছোট গল্প সৃষ্টিতে লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

৬৮।৫৭
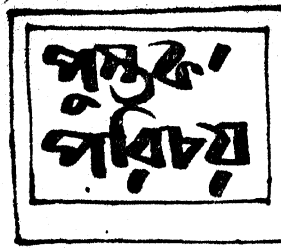
জীবন নদী—শ্রীবিমলজ্যোতি দাস। প্রকাশক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, দেবালয়, ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা বার আনা।

আলোচ্য গ্রন্থ লেখকের সাতটি গল্পের সংকলন। গল্পগুলির বিষয়বস্তু নির্বাচনে লেখকের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিশিষ্ট চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গ্রন্থকারের অক্ষমতার নিদর্শন সুপরিস্ফুট। লেখকের ভাষা মার্জিত এবং সুরুচিসম্পন্ন হইলেও গল্পের নায়ক নায়িকার চরিত্র সৃষ্টিতে বৈশিষ্ট্যের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। এইসব দুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও লেখকের সদাজাগ্রত সাহিত্যবোধ ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির সাক্ষ্য বহন করে। ঘটনা বিন্যাসে বৈচিত্র্য সৃষ্টির কার্পণ্য না থাকিলে গল্পগুলি বাস্তবিকই সুখপাঠ্য হইয়া উঠিতে পারিত।

মুদ্রণের পারিপাট্য থাকিলেও মুদ্রাকর প্রমাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবরণের চিত্রটি মনোমুগ্ধকর।

৫৮।৫২

ভ্রমণ-কাহিনী

রাশিয়া থেকে ফিরে—পরিব্রাজক। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম আড়াই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের 'ক্যাসিয়াস' ছদ্মনামে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে লিখিত দশটি প্রবন্ধের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ—'পরিব্রাজক' ছদ্মনামে পুস্তকাকারে আবির্ভূত। মূল ইংরেজী প্রবন্ধ গ্রন্থকারের নিজের—বাঙলা তর্জমা অন্য লোকের বলিয়া গ্রন্থকারের স্বীকৃতি।

স্বল্পকাল স্থায়ী ভ্রমণ সত্ত্বেও আফগানিস্থান এবং রাশিয়ার বিশেষ কয়েকটি স্থান এবং বিষয় সম্পর্কে লেখক যে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়াছেন, উপরোক্ত উভয় দেশ সম্পর্কে যাহারা কিছুটা ওয়াকিবহাল তাহাদের কাছে উহা অভিনবত্বের দাবী করিতে পারে না। বহু ভারতীয় পর্যটক ইদানীং রাশিয়া এবং আফগানি-স্থান ভ্রমণান্তে তাহাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, বর্তমান গ্রন্থের গ্রন্থকারের বিবৃতির প্রকৃতি তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির নহে। দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য হেতু বিভিন্ন পর্যটকের বিবরণে অল্প-বিস্তর বৈষম্য পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। আলোচ্য গ্রন্থের যাবতীয় বিবরণ নিরপেক্ষ বলিয়াই মনে হয়। তর্জমা হইলেও গ্রন্থখানির ভাষা মার্জিত, সহজ, সরল এবং সাবলীল।

প্রচ্ছদপট, ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। ৫৬।৫৭

প্রয়াগ-তীর্থে—পিয়ারীলাল। প্রকাশনায় গণেশ চক্রবর্তী, ফিরিঙ্গি বাজার রোড, চট্টগ্রাম। মূল্য—বারো আনা।

তীর্থযাত্রী পিয়ারীলালের এই সরলসুন্দর ভ্রমণ কাহিনীটি শুধু ঘটনা-বিন্যাস নয়, ভক্তি-বার্তার পরিচয়বাহী। তথ্যজ্ঞান এবং রসবোধের সমন্বয় এই পুস্তিকাকে তাৎপর্য দান করেছে।

(২০৭।৫৭)

উপন্যাস

নারী ও নিয়তি—গজেন্দ্রকুমার মিত্র। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম আড়াই টাকা।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র আওরংগজেবের ভ্রাতা শাহজাদা মুরাদ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যে গল্প লিখিয়াছিলেন তাহারই ছায়াবলম্বনে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত আকারে আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের এক সুন্দর সৃষ্টি। গ্রন্থকারের স্বীকৃতি অনুসারে বর্তমান গ্রন্থে ইতিহাস হইতে লেখক ইহার মূল উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ইতিহাস যেখানে নীরব সেখানেই তিনি প্রকৃত উপন্যাস সৃষ্টির তাগিদে কল্পনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কাজেই ইহাকে নিছক ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মুরাদের ঐতিহাসিক চরিত্র বাস্তবিকই অতি বিচিত্র এবং এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে কল্পনার যোগাযোগ ঘটাইয়া গ্রন্থকার ইহাতে যে রস-সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত চিত্তা-কর্ষক হইয়াছে। গ্রন্থের প্রধান চরিত্র মুরাদ এবং সরস্বতী বাঈয়ের গতি প্রকৃতি এবং পরিণতির বাস্তবানুগ মর্যাদা রক্ষা করিয়া লেখক গ্রন্থ-খানিতে সবিশেষ শিল্প চাতুর্যের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। ১১৮।৫৭

ঝড়ের আকাশ—বিশ্বনাথ চৌধুরী। প্রদীপ পাবলিশার্স, ৩।২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দুই টাকা।

গ্রন্থকার সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত না হইলেও অপরিচিত নহেন। অভিনব দৃষ্টি-ভঙ্গির মাধ্যমে রচিত আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের রচনাশৈলীর এক অপূর্ব নিদর্শন। মধ্যযুগ-সুলভ আভিজাত্যের সঙ্গে জনসাধারণের সমন্বয় সাধন করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে লেখক যে দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। অভিজাত মনোবৃত্তি কিভাবে সমসাময়িক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব

অতিক্রম করিয়া একটা নূতন ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত হইতেছে তাহা লেখকের অতুলনীয় তুলিকা সম্পাতে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রধান চরিত্রে ভাস্কর রায়, কৃষ্ণা, জয়ন্ত, অশোক, রমলা প্রভৃতির চরিত্র চিত্রণে বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা লেখকের ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির সাক্ষ্য বহন করে। সহজ সরল এবং সাবলীল ভাষায় রচিত উপন্যাসখানা একান্ত মিলনাত্মক হইয়াছে বলিয়া অত্যন্ত সুখপাঠ্য হইয়াছে।

১৩৩।৫৭

ঘূর্ণী হাওয়া—বীরেশ্বর বসু। প্রদীপ পাবলিশার্স, ৩।২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দুই টাকা মাত্র।

আলোচ্য পুস্তকখানা গ্রন্থকারের একখানি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের চরিত্র কিভাবে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে গ্রন্থের বিশিষ্ট ভূমিকায় শান্তির চরিত্রে গ্রন্থকার তাহা সম্যকরূপে পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নানা প্রকারের ভুল-ভ্রান্তি, শহরের বিচিত্র মোহ এবং বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হওয়ার পর শান্তিকে পাড়াগাঁয়ের শান্তিময় আবেষ্টনে পুনঃসংস্থাপিত করিতে লেখক যে শিল্প-চাতুর্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থের অন্যান্য ভূমিকায় কেদারনাথ, সরলা, কাশিনাথ, বিপিন প্রভৃতির চরিত্র চিত্রণে লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সমাজ সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে বিপিনের নির্ভীক বাক-বিতণ্ডা ও দৃঢ় মনোভাবের সুষ্ঠু বিশ্লেষণ লেখকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরিশিষ্টে যদুর চরিত্রে স্থৈর্য ধৈর্য এবং ক্ষমাশীলতার পরিচয় প্রদানে লেখকের প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত।

১৩৯।৫৭

বিবর্তন—অনুরূপা দেবী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য চার টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে লেখিকার উক্তি 'পল্লী সংস্কারে আজকাল সরকারী প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে; বহু পূর্বে প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে তারই একটা ছক আমি কেটেছিলেম এই বইটিতে।' এই উক্তির যৌক্তিকতা সমস্ত উপন্যাসটিতে ছড়িয়ে আছে। লেখিকার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যোগ গভীর। পল্লী চেতনার সর্বাত্মক রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর বর্ণনা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্যে তিনি শরৎচন্দ্রের ধারা বহন করেছেন। কাহিনীটির একাংশ গ্রাম-জীবনের কুশলী উপস্থাপনায় ও অপর দিক চরিত্রগুলির সহজ জীবনানুগ বাস্তবতায়। 'জীবনানুগ বাস্তবতা'র এই সাক্ষ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোবৃত্তিভুক্ত নয়, বলা বাহুল্য। পাত্র-পাত্রীর মধ্যে গতিচ্ছন্দ প্রবল এবং তা সংঘাত পীড়িত নয়। এ অর্থে অনুরূপা দেবীর "বিবর্তন" বাংলা উপন্যাসের বিবর্তনে একটি পরিসমাপ্ত অতীতের অবিস্মরণীয় সাহিত্যকর্ম।

(২৫৩।৫৭)

দ্বিতীয় জন্ম—অসীম রায়, বাক, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। তিন টাকা।

দ্বিতীয় জন্ম বইখানির গল্পবস্তু অসাধারণও নয়, সাধারণও নয়, কিঞ্চিৎ চিত্তাকর্ষক,—কারণ, লেখকের মধ্যে উৎকট কৃত্রিমতার ঝোঁক বিশেষ নেই বলা চলে। আর তাঁর মৌখিক ভঙ্গিটিও অকৃত্রিম। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পের টান না থাক, মসৃণতা আছে। বইয়ের প্রথম দিকে তিনি এ-গল্পের কথকের মুখ দিয়ে জানিয়েছেন যে, হ্যামলেট জাতীয় চরিত্রের চেয়ে ডন কুইক্সট জাতীয় চরিত্র অনেক ভালো। এই দু'রকম মনোধর্মের দৃষ্টান্ত আছে প্রথমত কথক ও তাঁর পিতার জীবনাদর্শে, দ্বিতীয়ত পারিপার্শ্বিক অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে। কথক বলেছেন 'আমার জীবনের বইয়ে আমি যে ছবি দেখতে চাই'—অর্থাৎ ডন কুইক্সটের ছবি! কিন্তু নানা কারণে গল্পের আবেদনটি ঠিক লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি। বাবা ছেলেকে সিগারেট দিচ্ছেন এবং ছেলের জন্য পাত্রী-নির্বাচনের দায়িত্ব পিতা-পুত্রে খুবই অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করছেন—এইসব ব্যাপার আমাদের সমাজে এখনো কেমন যেন বেমানান মনে হয়। তাছাড়া ভবঘুরেমির নমুনাও অনেক দেখা গেল। তবে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সে ভাব কেটে যাবে। জীবনের যথার্থ উপলব্ধি দরকার। তবেই ভালো গল্প বা সার্থক উপন্যাস লেখা সম্ভব।

২১৭।৫৭

THE FIRST DECADE—Edited by Dr. Clifford Manshardt. Published by the United States Information Service.

গত দশ বছরে ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে সে বিষয়ে আমাদের স্বাধীনতার দশম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস The First Decade নাম দিয়ে একখানি তথ্য-বহুল গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

ভূমিকা লিখেছেন ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ এলসওয়ার্থ বাংকার এবং বইটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এর সম্পাদক ডাঃ ক্লিফোর্ড মানশার্ড।

নয়টি অধ্যায়ে বইখানি বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায় এক একজন খ্যাতনামা ভারতীয় বিশেষজ্ঞের রচনা। "স্বাধীন ভারতে গান্ধীজীর ভাবধারা" সম্বন্ধে শ্রী আর আর দিবাকর, "বর্তমান ভারতে ভাষা ও সাহিত্যের ধারা" সম্বন্ধে শ্রী কে এম মুন্সী, "স্বাধীন ভারতে পরিকল্পনা" সম্বন্ধে শ্রীগুলজারীলাল নন্দ, "স্বাধীনতার পর কৃষির উন্নতি" সম্বন্ধে ডাঃ পি এস দেশমুখ, "১৯৪৬—৫৫ সালে ভারতে শিল্পায়ন" সম্বন্ধে অধ্যাপক সি এন ভকিল ও শ্রী বি সি দেশাই, "স্বাধীনতার প্রথম দশকে শিক্ষার অগ্রগতি" সম্বন্ধে শ্রীমতী হংস মেহতা, "স্বাধীনতার পরবর্তীকালে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি" সম্বন্ধে লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল সি কে লক্ষণম, "স্বাধীনতার পর সামাজিক উন্নতির এক দশক" সম্বন্ধে ডাঃ জে এম কুমারাপ্পা এবং "স্বাধীনতার পরবর্তী দশকে নারী" সম্বন্ধে লিখেছেন শ্রীমতী হান্না কে সেন ও শ্রীমতী তারা আলী বেগ।

মহাত্মা গান্ধীর ভাবাদর্শ কিভাবে এখন রূপায়িত হচ্ছে ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তনসহ তা শ্রীদিবাকর সুন্দর বুঝিয়েছেন। ভারতে পরিকল্পনার লক্ষ্য কি এবং দুই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য নিপুণভাবে বিবৃত করেছেন শ্রীগুলজারীলাল নন্দ। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গত দশকে আমাদের দেশের যে উন্নতি হয়েছে তা এই কয়টি অধ্যায়ের লেখকগণ উপযোগী গ্রাফ ও চার্ট দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯৪৭ সালের পর সামাজিক উন্নতির বিশেষ অর্থপূর্ণ দিক সম্বন্ধে ডাঃ কুমারাপ্পা বলেছেন যে, সমাজ-কল্যাণের কাজে রাষ্ট্রের সহযোগিতা উত্তরোত্তর বাড়ছে। এই ক্ষেত্রে যেসব প্রধান কাজ হচ্ছে সে বিষয়ে তাঁর আলোচনা খুব মনোজ্ঞ। স্বাধীনতার পর নারীরা যেসব নূতন অধিকার লাভ করেছেন সে বিষয়ে শ্রীমতী হান্না সেন ও শ্রীমতী তারা আলী বেগের রচনাটিও তথ্যপূর্ণ।

কিশোর সাহিত্য

স্বনির্বাচিত গল্প (ছোটদের জন্য)—গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। এম এন দে এণ্ড কোম্পানি। ১৩।১, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ১২। মূল্য—দেড় টাকা।

উপদেশাদর্শ ও কাহিনীধর্ম একসঙ্গে অক্ষুণ্ণ রেখে গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের স্বনির্বাচিত এই সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। পরিণত পাঠকসমাজ বইটি পড়ে যে রসাস্বাদন করবেন, ছোটরা তত্‌খানি পাবে কিনা সন্দেহ। তবু, সম্ভবত গোয়েন্দা কাহিনীর প্রতিষেধক হিসাবে কিশোর পাঠকের কাছে এই ধরনের গল্পের মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

(৩২৮।৫৬)

কবিতা

শ্যামল প্রান্তরের গান—শিবদাস চক্রবর্তী। প্রকাশক—সজন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭। দাম—১৷৷০।

বিভিন্ন সময়ে লেখা কয়েকটি কবিতার সংকলন। ছন্দে ত্রুটি নেই, রচনাভঙ্গি গতানুগতিক, সুতরাং ভালো, শব্দচয়নে মনোযোগ আছে। সব মিলিয়ে কবিতাগুলো পড়তে পাঠকের ভালো লাগবে। কিন্তু কবির কোনো চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদিও একথা কবি উচ্চারণ করেছেন :

উপর নীচের দ্বন্দ্বে অযথা শক্তি হয়েছে ক্ষয়,
নতুন যুগের শিল্পী, তোমরা নতুনের গাও জয়।

তবুও তিনি উপর-নীচের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা পোষণ করেন না, অন্তত সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো চিন্তার পরিচয় এ গ্রন্থে নেই; এবং তিনি নিজেও নতুনের আবাহন করেন নি, না ভাবনায়, না রচনাশিল্পে। তবুও চিরাচরিত কবিতা হিসেবে অনেক কবিতাই সুন্দর, বিশেষ করে 'মাটির টান' কবিতাটিতো বটেই। এই একটি কবিতা থেকেই কবি খ্যাতি-লাভ করতে পারেন। তথাপি বলবো, বাংলা কবিতা যে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে সে-সম্বন্ধে তাঁর অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ৭৩৫/৫৬

অনুবাদ সাহিত্য

দুরন্ত নদী—আনা লুই স্ট্রং। অনুবাদক: বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলিকাতা-৯। মূল্য—৪॥০ টাকা।

আমেরিকান লেখিকা নিজেই বলেছেন—সোবিয়েৎ ইউনিয়নে তাঁর বিশ বছরের অভিজ্ঞতার নির্যাস এই উপন্যাস। সোবিয়েৎ সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর-প্রক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা এবং পাঁচসালা পরিকল্পনার বিরাট সৃষ্টি নীপার বাঁধের কর্মকাণ্ড নিয়ে এর কাহিনী। কাহিনী কতখানি প্রচারমূলক সুধী পাঠক তা বিচার করবেন, কিন্তু একজন বিদেশিনী, মিশনারীর চোখে সোবিয়েৎ পরিকল্পনার যে জীবন্ত চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে পাঠকের শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় উদ্রেক করবে। নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতীয় সম্পদ রক্ষার জন্য সোবিয়েৎ জাতির দুঃসাহসিক আত্মত্যাগ সর্বাধিক প্রশংসনীয়। অনুবাদকের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। ৩৬০।৫৬

প্রথম প্রেম—ই স তুর্গেনেভ। অনুবাদক—শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। প্রকাশক—ইণ্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানীর পক্ষ থেকে শ্রীদেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৬৪এ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য—এক টাকা আট আনা।

'পেরভাইয়া লুবোভ'-এর ইংরেজি অনুবাদ 'First Love' অবলম্বন করে এ-বইটি অনূদিত হলেও অধিকাংশ অধ্যায়ের ভাষান্তরণকালে মূল রুশভাষা অনুসৃত হয়েছে। তা ছাড়াও লক্ষ্য করবার বিষয়, শৈলেশচন্দ্র সেনগুপ্ত তীক্ষ্ণ সাহিত্যবুদ্ধিসম্পন্ন অনুবাদক। তাঁর অনুবাদকর্মে সাবলীলতা আর সুষ্ঠুতার মিশ্রণ প্রশংসনীয়। ভাষা সম্পর্কে তিনি যে যত্ন নিয়েছেন তার অপূর্ব সাক্ষ্য গ্রন্থময় ছড়ানো আছে। শৈলেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বিদেশী সাহিত্যের আরো অনেক সম্পদ আমাদের দেবেন, এই আগ্রহ অমূলক নয়। (২৬৫।৫৭)

সোনার ঝাঁপি—অনুবাদক : দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও অমিতাভ ভট্টাচার্য। প্রকাশক—কে গাঙ্গুলী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৮বি লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা ১। দাম—৩৲।

মূল রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ করে কয়েকটি মিষ্টি গল্প উপহার দিয়েছেন দুজন বাঙালী লেখক বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের। অনুবাদ, অথচ এত সহজ সরল ভাষা যে খাঁটি বাংলা গল্প ভাবতেও কোন অসুবিধা বোধ হয় না। কয়েকটি কাহিনী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন দেশীয় বলে জানান দিলেও, গল্পগুলোকে বাংলাদেশের কিশোর পাঠক-পাঠিকারা আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করবে। একটানা অসম্ভব বীরত্ব কাহিনী পড়ার মধ্যে সোনার ঝাঁপি এক টুকরো স্বাদ বদলের কাজ করবে আমাদের দেশে। এ-অনুবাদের আর একটি উপকার অনুভব করার মত এই আছে যে, আমাদের দেশের রূপকথার সঙ্গে রুশদেশীয় উপমার চরিত্রগত মিল বা অমিল কতটুকু তা সহজেই ছেলেমেয়েরা ধরতে পারবে এ-গ্রন্থ পড়ে। প্রতিটি গল্পের সঙ্গে একটি করে মূল ছবির প্রতিলিপি জুড়ে দিয়ে বইটিকে আরও মনোহর করা হয়েছে। অঙ্গাবরণ চমৎকার, ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই আনন্দিত হবেন। ৩১০।৫৭

সংগ্রহ

হাসি-অভিধান—অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এম এ—হাসি প্রকাশালয়, ৬৪।১, শান্তিনগর, রমনা, ঢাকা। পাঁচসিকে।

হাসি-অভিধান শুধু কৌতুকবার্তা সংগ্রহ নয়, বাংলা ইণ্ডিয়ম সংগ্রহ হিসাবে এই সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণাঙ্গ বইটির মূল্য ছাত্র জগতে যথেষ্ট। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের সক্রিয় শিক্ষানুরাগ প্রশংসনীয়। ব্যাকরণের একটি দিক এখানে সরলভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এর ফলে অনেকেই উপকৃত হবেন। (২১০।৫৭)

জীবনী

ছেলেদের নিউটন—ধীরেন্দ্রনাথ ধারা। প্রকাশিকা শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী মজুমদার, ৫নং রামহরি ঘোষ লেন, কলকাতা। মূল্য বারো আনা।

সুখের বিষয়, জীবনী-সাহিত্যে বাঙালী লেখক-পাঠকের আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। মানবীয় কৃতিত্বের সম্মাননা অধুনা এভাবে স্বীকৃত হচ্ছে দেখে অনেক আশ্বস্ত হওয়া যায়। আলোচ্য জীবনীটি কিশোর পাঠ্য এবং কিশোর পাঠককে সর্ব উপায়ে এখানে পরিতুষ্ট করার আয়োজন হয়েছে। এ বইয়ের বহুল প্রসার কাম্য বিষয়। (২৪৮।৫৭)

প্রাচীন ফিলাডেলফিয়ার বেন ফ্র্যাংকলীন—অনুবাদক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—দেড় টাকা।

Margaret Coziro রচিত Ben Franklin of old Philodelphia বইখানির সুখপাঠ্য অনুবাদ। রচনাকার হিসাবে বিমলাপ্রসাদের যে-খ্যাতি, এই গ্রন্থে তা অনেক দিক দিয়ে উদ্ঘাটিত হলো। (১১৬।৫৬)

পয়গম্বর-প্রিয়া—এম আব্দুর রহমান। প্রকাশিকা—মোসাম্মাৎ ফিরোজা খাতুন, কাটোয়া (বর্ধমান)। পাঁচসিকে।

'আদর্শ অনেক উপস্থাপিত' করার জন্য এ-গ্রন্থ রচিত হয়েছে। পাঁচটি অংশ 'পতিপরায়ণ রহিমা', 'অতিথিপরায়ণ সারা খাতুন', 'ভাগ্যশীলা হাজেরা' 'পুণ্যময়ী হজরত খদিজা' ও 'আদর্শ নারী আয়েশা' লেখকের ঐতিহ্যবোধে উদ্দীপ্ত। আন্তরিকতায় বইখানি রসোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। (৩৬৩।৫৭)

সারদামণি—শ্রীজয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ মূল্য এক টাকা।

অসামান্যা এই যুগ-মানবীর জীবন-কথা বলবার সময় লেখক তথ্য ও সাহিত্য দুয়ের দিকেই যথোচিত যত্ন নিয়েছেন। অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে তাঁর রচনার সাদৃশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও লেখকের সরস বর্ণন চাতুর্য অবশ্যই মেনে নিতে হয়। এ গ্রন্থের বহুল সমাদর কাম্য। (১৬৯।৫৭)

সমালোচনা

চতুর্দশপদী ও পত্রাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে **শ্রীমধুসূদনের জীবনদর্শন**। বশীর আল-হেলাল। মুর্শিদাবাদ হাউস, জলপাইগুড়ি। মূল্য—আট আনা মাত্র।

অল্প পরিসরে লেখক মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের উপরে নব আলোকসম্পাত করার উদ্যোগ করেছেন। মধুসূদনের জীবন ও সাহিত্য দুয়েরই তৎপর্য এ পুস্তিকায় আলোচিত হয়েছে। সর্বত্রই যে লেখক সার্থক হয়েছেন, একথা বলা যায় না, কিন্তু তাঁর বিষয়-বোধ অনস্বীকার্য। অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে তাঁর আরো লেখা আমরা কামনা করি। মধুসূদনের কাব্যকে এ গ্রন্থে নানা দিক থেকে দেখা হয়েছে এবং সেই দৃষ্টি তথ্য পরিস্রুত। (২৮৯।৫৭)

দেশোন্নয়ন

Electrical Industry work of China.

মূল্য ৬ আনা।

বহু চিত্রিত এই বইটিতে শিক্ষনীয় অনেক দিক আছে। চীন সরকারের নব নব উদ্যোগের প্রামাণ্য ও চিত্রমণ্ডিত তথ্যপঞ্জী হিসাবে এ গ্রন্থ অত্যন্ত মূল্যবান। ন্যাশনাল বুক এজেন্সির পরিবেশন, আমাদের ধন্যবাদার্হ। (২৪৯।৫৭)

পঞ্জিকা

রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ (বাংলা) শকাব্দ ১৮৭৯ (খ্রীষ্টাব্দ ১৯৫৭-৫৮) প্রকাশক—দি ডিরেক্টর জেনারেল অব অবজারভেটরিজ, ইণ্ডিয়া মেটিওরলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট, লোদী রোড, নিউ দিল্লী। মূল্য—২৫ নয়া পয়সা।

এই রাষ্ট্রীয় পঞ্জিকা প্রকাশের ফলে সর্ব-ভারতীয় জাতীয় পঞ্জিকার অনুভূত প্রয়োজন সিদ্ধ হলো। ডিরেক্টর জেনারেল অব অবজারভেটরিজ এর বস্তুর বৈজ্ঞানিক আগ্রহ থাকায় পঞ্জিকাটি সর্বাঙ্গীণ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছে। বর্ষপঞ্জীর বিভিন্নতা এইভাবে দূরী-করণের ফলে ভারতীয় মাত্রই ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাবেন, সন্দেহ নেই। (২৬১।৫৭)

বিবিধ

The Song Celestial: Bhagavad Gita—Sir Edwin Arnold Jaico Books Jaico Publishing House. 125, Mahatma Gandhi Road. Bombay-1.

এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

স্যর এডুইন আর্নল্ডের প্রসিদ্ধ অনুবাদ, ভগবদ্‌গীতার এই ইংরেজি সংস্করণটি সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত অবস্থায় পরিবেশন করে প্রকাশক সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। আর্নল্ডের ভূমিকাটিও দেওয়া হয়েছে। ২৪৩।৫৭

A Record of the Buddhist Countries. By Fa-Lsien—the Chinese Buddhist Association. Peking.

মো চাঙ-চুন্‌-এর মুখবন্ধ সমেত ফা-হিয়েনের এই প্রসিদ্ধ ভ্রমণ কাহিনী বুদ্ধ পরিনির্বাণের ২৫০০তম স্মরণোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। উৎকৃষ্ট কাগজ ও ছাপার আকর্ষণ তো আছেই, তাছাড়া এতো কম দামে এরকম একখানি প্রয়োজনীয় বই দেখে অনুরাগী মাত্রেই খুশি হবেন। ২৪৯।৫৭

Godan—প্রেমচাঁদ রচিত 'গোদান'-এর ইংরেজি অনুবাদ (অনুবাদক জয় রতন ও পি লাল)।

Jaico Publishing House, 125, Mahatma Gandhi Road, Bombay-1

তিন টাকা।

প্রেমচাঁদের সাহিত্যিক খ্যাতির কথা সকলেই জানেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ১৯২০-এ তাঁর সাহিত্য প্রতিভার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তাঁর। হিন্দী সাহিত্যে তিনি গল্প, উপন্যাস এবং নাটক লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'গোদান' তাঁর শেষ উপন্যাস এবং এটিকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা হয়। ২৫১।৫৭

কাব্য কৌতুক। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ৩৭ কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা ১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সাহিত্য ও অলংকার বিষয়ক নিবন্ধগুলি রুচিশীল বিজ্ঞ প্রাচীন সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্র সম্মত তত্ত্বের আলোচনা। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি ও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা বিষয়ে কিছু আলোচনা থাকা সত্ত্বেও, বলা বাহুল্য, সেগুলির একটি প্রাচীন পটভূমিকার প্রতি লেখকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষিত। কবি-মানসের উপর বৌদ্ধ যুগ, শিখ ও মারাঠার জাতীয় অভ্যুত্থান কী রূপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, লেখক যেন এ-সকল প্রবন্ধে তাহার যৌক্তিকতা প্রদর্শনের প্রতি মুখ্যত দৃষ্টি দিয়াছেন। "সাহিত্যে ধ্বনিবাদ" "আনন্দ বর্ধন ও ধ্বন্যালোক" প্রবন্ধ দুইটি এই গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা। (৫৯৮।৫৬)

দার্শনিক প্রবন্ধাবলী। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত। মডার্ন বুক এজেন্সি। ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ১২। মূল্য ৩।০

ভাববাদী ও যুক্তিবাদী দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর আলোচনা হিসাবে নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের "দার্শনিক প্রবন্ধাবলী" গ্রন্থটি বহু পঠিত গ্রন্থ হউক—ইহা আমরা কামনা করি। অপরাপর দেশে সাধারণকে জ্ঞান দানের জন্য সুলভ মূল্যে সুলিখিত গ্রন্থ পড়াইবার জন্য কী অসাধারণ প্রচেষ্টা থাকে, আমাদের দেশে তাহা বিরলই বলা যায়। বিশ্ব-ভারতীর কিছু গ্রন্থ বাদ দিলে এ বিষয়ে আর কাহারও দৃষ্টি ছিল না। নগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থটি হাতে পাইয়া তাই অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। মার্কসবাদের ভূমিকা প্রসঙ্গে লেখক এই ক্ষুদ্র কলেবর গ্রন্থে প্লেটো হইতে হেগেল পর্যন্ত দর্শন শাখার একটি সুন্দর আলোচনা করিয়া শেষে মার্কসীয় দর্শনের মূল বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা মার্কসীয় ডায়ালেকটিকস। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের আবির্ভাবে দর্শন জগতে যে নূতন প্রবাহ সৃষ্টি হয়—মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ তাহার নিকট ঋণী হইলেও বক্তব্য বিষয়ে বিপরীত। ভাববাদী হেগেলীয় দর্শনের সহিত বস্তুবাদী মার্কসীয় দর্শনের এই বৈপরীত্য লেখক যথাসাধ্য সহজ ও সুনিপুণভাবে বোধগম্য করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার অপর প্রবন্ধগুলিও ইহার পরিপূরক। গ্রন্থটির প্রচার কামনা করি। (৪২৫।৫৬)

KADAMBARI: Banbhatta, Translated by C. M. Redding. Jaico Publishing House—125, Mahatma Gandhi Road, Bombay-1. Rs. 3.75.

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা হর্ষ বর্ধনের রাজত্ব-কালে বাণভট্ট কবি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যজ্ঞদের মধ্যে বাণভট্টই সর্বাগ্রগণ্য এবং ক্লাসিক্যাল গদ্য সাহিত্য হিসাবে কাদম্বরীই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। সাহিত্য ক্ষেত্রে কাদম্বরীর খ্যাতি আবহমানকাল অম্লানই থাকিয়া যাইবে। গ্রন্থখানার প্রধান ভূমিকায় রাজা শূদ্রক হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশম্পায়ন, তারাপীড় চন্দ্রপীড় মহাশ্বেতা এবং কাদম্বরীর চরিত্র বিশ্লেষণে বাণভট্ট যে কলাকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সর্বকালের সাহিত্যেই গৌরবদীপ্ত।

কাদম্বরী ১৮৯৬ সালে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রথমে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। উক্ত সোসাইটির সহিত যোগসাজশে বর্তমান জাইকো এডিশন প্রকাশিত হয়। এবম্বিধ প্রচেষ্টার জন্য জাইকো প্রকাশনী সকলের ধন্যবাদার্হ। ১৬৮।৫৭

বিবাহ মঙ্গল—শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য দুই টাকা।

বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে নানা শাস্ত্রে বিবাহ-বিষয়ক যে-সব বাণী বিকীর্ণ আছে, বিধুশেখর তাদের মধ্য থেকে একটি সুনির্বাচিত সংকলন ক'রে উপস্থাপিত করেছেন। বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয়ের বৈদগ্ধ্য অসাধারণ এবং তাঁর মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর মতোই যে একটি প্রণম্য, হিতব্রতী সাধকসত্তা আছে, এই সূত্রে সেটি লক্ষ্য করার মতো। এই গ্রন্থটি সম্পাদনা ক'রে তিনি সেই পরিচয় নতুন ক'রে প্রতিপন্ন করলেন। (৩২৯।৫৭)

শাক্য মুনি চরিত ও নির্বাণতত্ত্ব—সাধু অঘোরনাথ। নববিধান পাবলিকেশন কমিটি, 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির', ৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯।

'বুদ্ধ জয়ন্তী সংস্করণ'রূপে এই প্রখ্যাত গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ পাওয়া গেল। নববিধান সমাজের অন্যতম উজ্জ্বল প্রতিনিধি অঘোরনাথ তাঁর বৈদগ্ধ্য ও ধর্মবোধের সমন্বয়ে মহান। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এ বইটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং বাংলা ভাষায় তখন এ ধরনের গ্রন্থের অভাব প্রকট। জীবনকথা ও জীবনসূত্র দুয়ের গ্রন্থনেই অঘোরনাথের পারদর্শিতা বিস্ময়কর। এই লেখকের নিষ্ঠা ও সাফল্য আমাদের অভিভূত করে। (৩৪৩।৫৭)

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

জীবন তীর্থ—বেলা দেবী।

সংগীতাগম—আর্ট সেণ্টার অফ দি ওরিয়েণ্ট কর্তৃক ১, অপূর্ব মিত্র রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

শেষ প্রান্তর—ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়।

কাজের কথা—আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারত জিজ্ঞাসা—শ্রীত্রিপুরাশংকর সেন।

মুক্তি—শ্রীশীতেশ সেন।

বিজন বনের নিরালা ঘরে—লরা ইংগলস ওয়াইল্ডার অনুবাদক—হিমাংশুকুমার ঘোষ।

নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

পিংগলের প্রেম—বিমল কর।

কবিতার বিচিত্র কথা ও রবীন্দ্র সমকালীন বাংলা কবিতার ধারা—হরপ্রসাদ মিত্র।

যুগকন্যা—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিশোর—শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য।

খাদ্যের নব-বিধান—কুঞ্জরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

আলোচনা

"অবনীন্দ্রনাথের লীলাবাদ"

সবিনয় নিবেদন,

১১ই শ্রাবণে প্রকাশিত সংখ্যায় ডক্টর সুধীর-কুমার নন্দী মহাশয়ের লিখিত "অবনীন্দ্রনাথের লীলাবাদ" নামে প্রবন্ধটি পড়লুম। এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

অপ্রয়োজন থেকে জাত কাব্যই যদি কেবল কালোত্তীর্ণ ও রসোত্তীর্ণ হতে পারবে তবে প্রয়োজনের তাগিদে রচিত কোন কাব্যই (বা শিল্প) কালোত্তীর্ণ ও রসোত্তীর্ণ হতে পারে না। কারুণ্য, স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি বোধ-শক্তিগুলিকে আবেদন করে যে শিল্পবোধ তা সব সময় বস্তু-জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের অন্তরালে লালিত হতে পারে না। বস্তুত এই সব হৃদয়বৃত্তিকে আলোড়িত করে রচিত বহু কাব্যই কালোত্তীর্ণ ও রসোত্তীর্ণ হয়েছে—চিত্রশিল্পেও তা তা ঘটেছে। ভ্যান গগের "পটেটো ইটার্স" প্রমুখ বহু ছবিই কেবল রূপসাধনা নয়—জর্জরিত, লাঞ্ছিত মানবাত্মার ছবি বলে তারা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কিন্তু তারা কালোত্তীর্ণ। "রেনেসাঁ" ও "হাই রেনেসাঁর" যুগে মাইকেল এঞ্জেলো এবং রাফেলের আঁকা ছবিগুলির অধিকাংশই ধর্মবোধে অনুপ্রাণিত কিন্তু আজও যখন সেই সব ছবি দেখি তখনও তা শিল্পীর আবেগ ও আকুতিকে আমরা অনুভব করতে পারি। Rembrandt-এর আঁকা বহু ছবি বা এচিংয়ের বিষয়বস্তু ও "কম্পোজিশন" প্রভু যীশুর মাহাত্ম্য বর্ণনাকে কেন্দ্র করে আর তাই বলেই কি সে সব ছবি কালোত্তীর্ণ ও রসোত্তীর্ণ হতে পারে নি? শিল্পকে কালোত্তীর্ণ করবার জন্য প্রয়োজন-বিমুখতা কোনদিনই অবশ্যপ্রয়োজনীয় নয়। শিল্পীর অবর্তমানেও যে শিল্প তার স্রষ্টার সৃষ্টির আবেগ (বস্তুজগতের ঘাত-প্রতিঘাত সঞ্জাত হলেও) নূতন রসগ্রাহী দর্শকের মনে সঞ্চারিত করে দিতে পারবে, সে শিল্প প্রয়োজনের তাগিদে রচিত হয়ে থাকলেও কালোত্তীর্ণ হতে পারবে বলে মনে হয়।

মানুষের মনের কার্যকলাপ মনস্তাত্ত্বিকের কাছে সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য-বিহীন নয়। রূপ সাধনায় মানুষের ভাঙা-গড়া, মন্দ-ভালোর লীলা তার মানসিক গঠনের উপর নির্ভর করবে আর মানুষের মানসিক গঠন কি তার সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে থাকতে পারে? এ বিষয়ে লেখকের মত জানতে পারলে বাধিত হব। ইতি—পীযূষকান্তি সোম, লণ্ডন।

কৃত্রিম উপগ্রহ

মহাশয়,

৩৯ সংখ্যার দেশে প্রকাশিত সোনাভান চৌধুরীর পত্রের সম্বন্ধে আমার সামান্য কিছু বক্তব্য নীচে জানাচ্ছি:

লেখক আমার পত্রটি বিচার করেছেন অসন্তোষপূর্ণ মনোভঙ্গী নিয়ে, যার ফলে দেখা দিয়েছে নানান কাল্পনিক অভিযোগ। লেখক বলেছেন, আমি নাকি "Christian Science Monitor, Popular Science Monthly ও American Repoter ছাড়া আর কারো উপর শ্রদ্ধা রাখতে নারাজ।" পাঠক-পাঠিকা বিচার করে দেখতে পারেন আমার পত্রের কোন জায়গায় এমন অদ্ভুত উক্তি আছে কি না। আমার কথা হচ্ছে ইংরাজী ভাষায় যতগুলি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তা একজনের পক্ষে নিয়মিতভাবে পড়া মোটেই সম্ভবপর হয় না। আর দেশে তারা খুব কম লোকেরই জানা। সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়ার [illegible] সম্বন্ধে [illegible] সম্ভব নয়। [illegible] আমেরিকার [illegible] কৃত্রিম উপগ্রহটি [illegible] এ বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার [illegible] সম্পূর্ণ [illegible]। লেখক আমাকে ভুল [illegible], আমার পত্রটি ছিল [illegible] একটি [illegible] বিজ্ঞাপিত [illegible]।

[illegible] ২১.৫ পাউণ্ডের ২১ পাউণ্ড [illegible]। American Reporter [illegible] [illegible]। (উপগ্রহটির ওজন সাড়ে একুশ পাউণ্ড, কারণ অনেক পত্রিকায় একুশ পাউণ্ডও দেখলাম।)

Fundamental-এ ভুল আমি মোটেই করি নি। কারণ ১৫ই জুলাই (১৯৫৬)-এর অমৃতবাজার পত্রিকায় কৃত্রিম উপগ্রহের মডেলের যে ছবি দেওয়া হয়েছে তা পুরোপুরি Spherical-ই। কৃত্রিম উপগ্রহের আকৃতির বিবরণেও তারা "Sphere" কথাটিই উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ১লা জুলাই-এর The Statesman নামক পত্রিকাতে Geophysical Year Starts নাম দিয়ে নিউ দিল্লী থেকে যে খবর সরবরাহ করা হয়েছে, তাতেও আছে—"It........has a diameter of 20 inches." তাহলে কি বলবো Dyscovery ভুল লিখেছেন? তাও নয়, কারণ Dysoovery-ও একখানা নামকরা পত্রিকা। তাই আমি বলি এ বিষয়ে আর তর্ক না করে কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকাই সবচেয়ে ভাল।

Television Cameraর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইতিমধ্যে কিছু কিছু পড়েছি আর সোনাভান-বাবু এ বিষয়ে আলোচনা করে আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হলেন। তবে ১লা ও ২রা জুলাই-এর The Statesman পত্রিকায় Zeiss কোম্পানীর খবরটা কিন্তু খুঁজে পেলাম না। ইতি—শ্রীশিবব্রত চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা।

কারাচীর এক সংবাদে জানা গেল মুসলিম লীগ কলোনীর বেগমরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এক সভায় প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। —"কাজের কাজ এতে হবে বলে মনে হয় না। তার চেয়ে মোক্ষম প্রতিবাদ তালাকের হুমকি দিয়ে দেখতে পারেন। স্বীকার করছি আমাদের এখানে হুমকি দিয়ে (অবশ্য সেটা তালাকের নয়, পিত্রালয়ে চলে যাবার) কোন কাজ হয়নি। দামের দাঁও মারার ব্যাপারে হিন্দুস্থান পাকিস্তান এক কি না তাই কোন ফল হবে বলে মনে হয় না। তবে বৌয়ের হুমকি আর বিবির হুমকি এক নয়, এই যা ভরসা" —বলে বিশুখুড়ো।

• • •

ছোরাবর্দি সাহেব শ্রীযুক্ত নেহরুকে 'আন্তর্জাতিক দুর্বৃত্ত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"এতে আমাদের রাগ করার কারণ নেই। ন্যাবাদের চোখে যেমন সবই হলদে দেখায়, এটাও অনেকটা তাই। কলাবাগানের কামলা রোগীর চোখে দেশটাকে দুশমন মনে হয়"!

• • •

ভাষা কমিশন তাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, ১৯৬৫ সালের মধ্যে সরকারী কাজে সর্বাংশিকভাবে ইংরেজীর

পরিবর্তে হিন্দী ব্যবহার করা হইবে। —"কংগ্রেসেও আর কত দূর উঠবে তাই ভাবছি"—সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

এক সংবাদে শুনিলাম বর্ধমান জেলায় [illegible] নাকি একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। সমিতির উদ্দেশ্য [illegible]
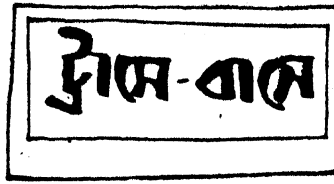
ছিল তা দিয়ে কি আর 'কালীর' পুজো চলবে"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

কলিকাতা কর্পোরেশনের সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে এক অভিযোগে বলা হইয়াছে যে, তাঁরা নাকি পঞ্চাশটি গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য কোন সুপারিশ পেশ

করিতেছেন না। অনেকেই বলিতেছেন যে, ব্যাপারটা রহস্যজনক এবং অবিলম্বে ইহার তদন্ত প্রয়োজন। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন —"কেঁচো খুঁড়ে সাপের আবির্ভাবের পথ প্রশস্ত না করাই ভালো"!!

• • •

কেরলে গভর্নরের খাদ্য সমস্যা নিয়ে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট উভয় দলই নাকি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। —"পড়তেই হবে, অন্ন চিন্তা চমৎকারা। পেট খালি থাকলে আস্তা-চ্যাংগা কোনটারই অস্তিত্ব থাকে না" —বললেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

রাস্তার দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য কলিকাতা পুলিশ নাকি পথের মোড়ে নূতন নোটিশ বোর্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নোটিশে বলা হইবে—ডাইনে

তাকাও, বাঁয়ে তাকাও। তারপর আবার ডাইনে তাকাইয়া রাস্তা পার হও। বিশুখুড়ো বলিলেন—"নোটিশের গোড়ার দিকে ডাইনে এবং বাঁয়ে তাকাবার নির্দেশে সমতা রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু পরে আবার ডাইনে তাকিয়ে পার হতে বলায় বামপন্থীরা ক্ষুব্ধ হতে বাধ্য। সুতরাং দুর্ঘটনার আর শেষ কোথায়"!!

• • • •

একটি সংবাদে শুনিলাম ভারতের সাধুদের নাকি একটি জাতীয় রেজিস্টার প্রস্তুত করা হইবে। তাঁরা সেই রেজিস্টারে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করিবেন। উদ্যোক্তারা মনে করেন ইহাতে ভণ্ডদের বাছাই করা সহজ হইবে। —"কে নাকি কবে ঠগ বাছতে গিয়েছিলেন। ফলে গাঁ উজোড় হয়ে গেল। সুতরাং ঘা কর কেন খুঁচিয়ে" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

স্বাধীনতা দিবসে শ্রীযুক্ত নেহরু আবার সেই বহুবিঘোষিত সংকল্পের কথাই বলিলেন অর্থাৎ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই। বিশুখুড়ো বলিলেন— "দরিদ্ররা বলাবলি করিতেছেন—হেস্তনেস্ত যা-হয় একটা হয়ে যাক, কিন্তু ঠাণ্ডা লড়াই আর ভালো লাগছে না"!!

• • • •

একটি সংবাদে শুনিলাম ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে স্টেশন মাস্টার মহাশয়রা ধর্মঘট করিবেন। শ্যামলাল বলিল—"বটেই তো; আমি শুধু রইনু বাকী বলে আর দুঃখ করে লাভ কি? আমাদের কথাটা না বলাই ভালো—রামের মার আর রাবণের মার দুই-ই আমাদের সমান"।

• • •

কাশ্মীরের বহু হ্রদে ও ঝরনায় ব্যাপক আকারে মাছের মড়ক দেখা দিয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। অনেকেই মনে করিতেছেন যে, তেজস্ক্রিয় বারিপাতই এই মড়কের জন্য দায়ী। মৎস্য বিভাগীয় দপ্তর যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, প্রবহমান গভীর জলে যেসব মাছ ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা আক্রান্ত হয় নাই, যেসব মাছ খাদ্যদ্রব্যের খোঁজে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহারাই আক্রান্ত হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"যুক্তি অকাট্য স্বীকার করলেম, —যে সব মাছ কাশ্মীরে খাদ্যের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের ভবিষ্যৎ — — — কিন্তু দপ্তরের কানে যুক্তি পৌঁছবে কি?"

সিরিয়ার অবস্থা খুব গোলমেলে হয়ে উঠেছে। পশ্চিমাপক্ষের অভিযোগ সিরিয়ায় কম্যুনিস্ট কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হচ্ছে। সাক্ষ্য হিসাবে বলা হচ্ছে যে সেনা বিভাগের কর্তা এবং অন্যান্য উচ্চপদে সম্প্রতি যাঁদের নিযুক্ত করা হয়েছে তাঁরা সকলেই সোভিয়েটের অনুরাগী। এর সংগে যোগ হয়েছে সোভিয়েট সরকারের সিরিয়াকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দানের কথা। অন্যপক্ষের অভিযোগ হচ্ছে যে সিরিয়ার বর্তমান গভর্নমেণ্টকে সরিয়ে দিয়ে সিরিয়াকে ইজেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিনের আওতায় আনার জন্য ষড়যন্ত্র হচ্ছে। অবস্থা যেখানে এসে পৌঁছেছে তাতে আর বেশি দিন ঢাক্‌ঢাক্‌ গুড়্‌গুড়্‌ চলবে না এবং মনে হয় সিরিয়ার অভ্যন্তর ব্যাপারে প্রকাশ্যে একটা বড় রকমের বিদেশী হস্তক্ষেপ আসন্ন। আমেরিকা এ বিষয়ে বোগদাদ চুক্তির অন্তর্গত গভর্নমেণ্টগুলির সংগে সলা-পরামর্শ করছে। বোগদাদ চুক্তির শরিকদের একটা জরুরী বৈঠকও হতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। জর্ডানের বেলায় যে-রকমের মার্কিন চাপ দেওয়া হয়েছিল সিরিয়ার ক্ষেত্রেও সে-রকম হবার সম্ভাবনা। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট সাক্ষাৎভাবে তার প্রতিরোধে এগিয়ে আসবেন কিনা সন্দেহ। যদি না আসেন, তবে সিরিয়াতেও আইজেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিনের অনুগামী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মিশর একলা পড়ে যাবে। আরব রাষ্ট্রগুলির গভর্নমেণ্ট যাই করুক জাতীয়তাবাদী আরব জনমত নিরপেক্ষ নীতির পক্ষপাতী। সুতরাং মার্কিন হস্তক্ষেপে কেউ সন্তুষ্ট হবে না। তাতে সোভিয়েটের পক্ষে প্রোপাগাণ্ডার কিছু সুবিধা হতে পারে। কিন্তু সেদিক দিয়েও একটা মুস্কিল আছে। লোকে যদি দেখে যে সোভিয়েট সরাসরি মার্কিন হস্তক্ষেপে বাধা দিয়ে প্রত্যক্ষ হাংগামায় জড়িয়ে পড়তে অনিচ্ছুক, তাহলে তাদের মনে সোভিয়েটের বন্ধুত্বের কার্যকরী শক্তি সম্বন্ধে সংশয় জাগবে। সুয়েজের ব্যাপারে সোভিয়েটে হুমকি কাজে লেগেছিল, তার কারণ তখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ মায় আমেরিকা পর্যন্ত আক্রমণকারীদের কার্যকে নিন্দনীয় বলে মনে করেছিল। তাছাড়া সমস্ত আরব রাষ্ট্র সে ব্যাপারে মিশরের পক্ষ সমর্থন করেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সে ঐক্য [illegible] পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবর্গের মধ্যেও অনৈক্য হবে [illegible] বোগদাদ চুক্তির শরিকগণও আমেরিকার সংগে থাকবে। সুতরাং সিরিয়াকে আইজেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিনের আওতায় আনার জন্য যে তোড়-জোড় হচ্ছে সেটা ঠেকানো যাবে বলে মনে হয় না। অবশ্য আইজেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিনের আওতায় এসে মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলি শান্ত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে সে ভরসা কিছু নেই।

* * *

ওমানের ব্যাপার সিকিউরিটি কাউন্সিলে উঠেছে। ইতিমধ্যে বৃটিশরা যুদ্ধটা একরকম শেষ করে ফেলেছে। যদি যুদ্ধটা এখনো চলতে থাকত, তাহলে বৃটিশদের পক্ষে বেশি অসুবিধা হোত। এখন বৃটিশরা ব্যাপারটাকে আইনের কূটকচালি তর্কের পথে নিয়ে যেতে সুবিধা পাবে। ওমানের অভ্যন্তর ভাগের উপর আইনত সার্বভৌম অধিকার ক'রে—মস্কটের সুলতানের অথবা ওমানের ইমামের—এই নিয়ে এখন তর্কযুদ্ধ

(সি)

চলবে। এ ব্যাপারে সৌদি আরবের সহানুভূতি ইমামের দিকে, আমেরিকা সৌদি আরবকে চটাতে চায় না, ওমানে ইমামের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে আমেরিকার তৈল ব্যবসায়ীদেরও হয়ত আখেরে সুবিধা হোত। কিন্তু বৃটিশদের বিপাকে ফেলতেও আমেরিকা এখন চায় না। সুতরাং আমেরিকা যদি নিরপেক্ষ থাকার সুবিধা পায় তাহলেই এখন তার পক্ষে ভালো। বৃটিশরাও এর চেয়ে বেশি এখন চাচ্ছে না।

* * *

ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা যেন ক্রমশই বাড়ছে। জাভা এবং অন্যান্য দ্বীপের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ শেষ পর্যন্ত ঠিক কীরূপ নেবে বলা যায় না। কেন্দ্রের ক্ষমতা জাভার বাইরে শিথিল। সুমাত্রা প্রভৃতি বড় বড় দ্বীপগুলি একরকম স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠেছে এবং অর্থনৈতিক জীবনও বহুকেন্দ্রিক হয়ে উঠার পথে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা দিবসের বার্ষিকী উৎসবে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ন যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে দেশের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন সেটা মোটেই আশাজনক নয়। জাতিকে একতায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য হয়ত প্রেসিডেণ্ট সুকর্ন দেশের সামনে যে-বিপদ সেটাকে কিছু বাড়িয়ে বলেছেন, যাতে লোক অধিকতর সচেতন হয়। তাহলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আশংকাজনক। পশ্চিমা ধরণের গণতন্ত্রবাদ ইন্দোনেশিয়ায় কার্যকরী হয়নি এবং আপাতত হবেও না বলে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ন মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ার প্রয়োজন 'গাইডেড ডেমোক্র্যাসি'র অর্থাৎ যে-ডেমোক্র্যাসির অভিভাবক থাকবে যাঁরা তাকে সৎপথে চালিত করে নিয়ে যবেন। পাকিস্তান সম্বন্ধে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জার মতও এই যে পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ ডেমোক্র্যাসি চলবে না, 'কনট্রোলড্ ডেমোক্র্যাসি' চাই অর্থাৎ যে-ডেমোক্র্যাসির রাশ ধরে থাকার জন্য উপরে লোক চাই। প্রেসিডেণ্ট সুকর্নকে কম্যুনিস্ট-ঘেঁষা বলা হয়, প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা কম্যুনিস্ট-বিরোধী বলে পরিচিত, কিন্তু উভয়েই দেখা যাচ্ছে স্ব স্ব দেশের জন্য একই ঔষধের ব্যবস্থা দিচ্ছেন।

* * *

ডাঃ চেদী জগনের আবার বৃটিশ গিয়ানার প্রধানমন্ত্রী হবার সম্ভাবনা হয়েছে। ১৯৫৩ সালে ডাঃ জগন প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হন এবং তদানীন্তন কনস্টিটিউশন রদ করে দেওয়া হয়। পরে বৃটেন থেকে প্রেরিত একটি কমিশন বৃটিশ গিয়ানায় অবস্থা দেখেশুনে এসে যে-রিপোর্ট দেন সেই অনুসারে কনস্টিটিউশন বদলানো হয়। আগের কনস্টিটিউশন তুলনায় নূতন কনস্টিটিউশনে আইনসভার নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা অনেক কম। পূর্বে মনোনীত সদস্যের চেয়ে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বেশি ছিল, এখন নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যের সংখ্যা সমান সমান, তার অর্থ মন্ত্রিমণ্ডলীর ক্ষমতা আগের চেয়ে কমানো হয়েছে, 'রক্ষাকবচের' পরিমাণ বেড়েছে। গত তিন বছর ধরে ডাঃ জগনের পার্টির বিরুদ্ধে অন্য একটা দলকে খাড়া করার চেষ্টাও কম হয়নি। মিঃ বার্নহামের সঙ্গে ডাঃ জগনের মত বিরোধের ফলে পিওপলস্ প্রোগ্রেসিভ পার্টিতেও কিছুটা ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়েছে। মিঃ বার্নহাম আলাদা একটি দল করেছেন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও নির্বাচিত সদস্যের ১৫জনের মধ্যে ১২জন পিওপলস্ প্রোগ্রেসিভ পার্টির লোক এসেছেন। বাকী তিনটা আসন ও মিঃ বার্নহামের দলের লোক পেয়েছেন—বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যাদের খাড়া করতে চেয়েছিলেন তারা পারেনি। পূর্বে শুনা গিয়েছিল যে, ডাঃ জগন মন্ত্রিত্ব নেবেন না। কিন্তু পরে তাঁর মত পরিবর্তন হয়েছে। অধিকাংশ নির্বাচিত সদস্যের নেতা হিসাবে ডাঃ জগনকে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের জন্য গভর্নর ডেকেছেন, না ডেকে উপায় নেই। কিন্তু এই লেখার সময় পর্যন্ত প্রকাশিত সংবাদ থেকে মনে হয় যে, ডাঃ জগনের প্রদত্ত নামের তালিকা গভর্নরের মনঃপূত হয়নি এবং তাই নিয়ে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যা হোক, কী হয় দু এক দিনের মধ্যেই বুঝা যাবে।

২১।৮।৫৭

—শৌভিক—

কাঁচা ফিল্ম সম্পর্কে জল্পনা

কাঁচা ফিল্ম সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত ব্যাপার কি দাঁড়াবে, সেপ্টেম্বর মাস না গেলে বোঝা যাবে না। কারণ আগেকার দেওয়া ও জি এল দরুণ মাল আমদানীর মেয়াদ ঐ মাসেই শেষ হবে এবং তারপর পরিস্থিতি কি দাঁড়ায় তা পর্যালোচনা করে যা ব্যবস্থা করার তা করা হবে। কি হবে বা না হবে তা নিয়ে বাজারে নানারকমের জল্পনা চলেছে। যা জানা যাচ্ছে তা হচ্ছে এই যে, কাঁচা ফিল্মের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা হবে, যে পরিমাণ ফিল্ম আসছিল তার মোট পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ কম আমদানী করা হবে। ফিল্মের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হবে হয়তো দৈর্ঘ্য কমিয়ে, প্রথম মুক্তিকালীন প্রিন্ট সংখ্যা কমিয়ে এবং তোলার সময় নেগেটিভের পরিমাণ কমিয়ে। এটা ঠিক যে গভর্ণমেণ্টের মোটেই অভিপ্রায় নয় উৎপাদিত ছবির সংখ্যা কম করার দিকে। তবে ফিল্মের বণ্টন ব্যাপারটা গভর্ণমেণ্ট নিজেদের তত্ত্বাবধানে না রেখে চলচ্চিত্রশিল্পের সংস্থার উপরে ছেড়ে দেওয়ারই পক্ষপাতী। একটা ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে যে, সেপ্টেম্বরের পর আবার যুদ্ধকালের অনুরূপ কোটার প্রবর্তন করা হবে। এই ধারণার ফলে ফিল্ম পাবার ন্যায্য হকদাররূপে নিজেদের প্রতিপন্ন করিয়ে রাখবার জন্য অনেকে বিএসপিএ জাতীয় সংস্থার সভাভুক্ত হয়ে নিচ্ছেন। ছবি তোলার কোথায় কি তার ঠিক নেই, কিন্তু অনেকে একটা নাম ঠিক করেই একজন প্রযোজককে দেখা গেল নামও ঠিক না করেই মহরৎ করে নিয়েছেন, নমোনমো করে, একটা মহরৎ অনুষ্ঠিত করে রাখছেন এবং সংবাদপত্রে যাতে সে খবরটা বের হয় সে-বিষয়ে বিশেষভাবে তারা তৎপর, কারণ পরে তাদের ফিল্ম পাবার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তারা কাগজে প্রকাশিত সেই খবরকে তাদের দাবীর যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। ও জি এল বন্ধ করে দেবার পর এ পর্যন্ত দু মাসের মধ্যে এক কলকাতাতেই সপ্তাহে গড়ে পাঁচখানি করে ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটা একটা রেকর্ড বলা যায়। কোটা প্রবর্তনের সম্ভাবনা অনুমান করে হয়তো একদল লোক মহরৎ করে নিচ্ছেন এই উদ্দেশ্যে যে, কোটা প্রবর্তিত হলে তারা তাদের ভাগের কাঁচা ফিল্ম বেশ অনায়াসেই কালোবাজারে পাচার করে দিয়ে লাল হয়ে উঠতে পারবেন। নিয়মিত চিত্রনির্মাতাদেরও অনেকে ভবিষ্যতের ছবির জন্য কাঁচা ফিল্ম পাওয়া নিয়ে কোন দুর্গতিতে যাতে পড়তে না হয়, তার জন্যে নামে বা বেনামে ছবির মহরৎ করে রাখছেন। কোটা বা কোন নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হলে নতুন প্রযোজকদের আসার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবার আশংকাও একটা দেখা দিয়েছে। অনেকে মনে করেন

"আলাদীন লয়লা"তে হীরালাল ও সাকিনা

"তাসের ঘর", "নীলাচলে মহাপ্রভু", "মমতা", "পুনর্মিলন" ও "বসন্ত বাহার" বাঙলা ছবি চলছে সেটা যেমন ভালোর দিক, তেমনি চিত্রগৃহের অভাবে তৈরী ছবির মুক্তি-লাভ আটকে পড়ে থাকাটাও ব্যবসায়ে বড়ো অসুবিধার দিক। তবে এখন বছর কতক চিত্রগৃহ সংখ্যার বৃদ্ধিলাভের উপায় নেই, সরকারী আইনেই নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণ নিষিদ্ধ। কাজেই ছবি মুক্তিলাভের পথ না পেয়ে আটকে পড়ে থাকাটা চলতেই থাকবে। উৎপাদন সংখ্যা কমিয়ে মুক্তিলাভের সামর্থ্যের সমান-সমান করে নিতে গেলেও মুশকিল আছে, কারণ তখন চলচ্চিত্রে নিয়োজিত শিল্পী ও কর্মীদের কাজের টান পড়বে। এখনো সব শিল্পী ও কর্মীর সারা বছর ধরে কাজ থাকে না; ছবির উৎপাদন কোনরূপ হ্রাস করলে তাদের বেকারত্ব আরো বেড়ে যাবে।

গত সপ্তাহে তিনটি ছবি মুক্তিলাভ করেছে তিনখানি—'পরশ', 'বড়ে সরকার' ও 'পবনপুত্র হনুমান'। তিন রকমের তিনখানি ছবি। এদের মধ্যে গুণের দিক থেকে 'পরশ'ই যা উল্লেখ করবার মতো, আর বাকি দুখানি সাধারণ বম্বাই ছবির মতো দিশাহারা সৃষ্টি।

ডাকাতির পুরস্কার

বাপ অত্যাচারী জমিদার, প্রজাদের ওপর জুলুম ও লুটপাট করে চলে, আর ছেলে সেই লুটপাটের ওপর ডাকাতি করে প্রজাদের সাহায্য করতে থাকে। ফলে বাপ হলো পাষণ্ড, আর ছেলে হয়ে দাঁড়ালো এক মহাত্মা ব্যক্তি। আইনের কাছ থেকে ক্ষমা তো পেলোই, তাছাড়া এমন প্রেমিকাও পেয়ে গেল সে, তার সম্পর্কে আসার দরুণই নায়কের অন্যরোগে রোগ ভাল হয়ে তাকে দীর্ঘজীবি করে রাখলে। ডাকাত লালপাঞ্জার দৌরাত্ম্য জমিদার ঠাকুরসাহেব বীতশ্রদ্ধ। ঠাকুরসাহেবের বাড়িতে আসার জন্য অন্য এক জমিদার তার কন্যা রশ্মিকে নিয়ে রওনা হলো। অভিপ্রায় ঠাকুরসাহেবের ছেলে সমের সিং ও অজয় সিং, এদের দুয়ের কারুর সঙ্গে রশ্মির বিয়ে দেওয়ার। সমের ও অজয় রশ্মিদের আনবার জন্য সশস্ত্র সিপাইদল নিয়ে এলো। পথে এক স্থলে ওরা বিশ্রাম করার প্রস্তাব করলে এবং সেই ফাঁকেই লাল পাঞ্জার লোক এসে রশ্মিকে অপহরণ করে নিয়ে গেল। ডাকাতরা জানালে সমস্ত টাকাকড়ি ও অলংকারাদি সমর্পণ করলে রশ্মিকে মুক্তি দেওয়া হবে। মুক্তিপণ যা কিছু সমর্পণ করতে রশ্মি মুক্তিলাভ করলে। ওরা বাড়িতে আসার পর পথে ডাকাতের কথা শুনে ঠাকুরসাহেব ক্রোধে ফেটে পড়লো। ইতিমধ্যে জানা গেল ঠাকুরসাহেবের আরো একটি ছেলে আছে, সেই বড়ো। নাম তার প্রতাপ, বাড়িতে থাকে না, বেশীরভাগ সময়ই বাইরে বাইরে ঘোরে এবং ঠাকুরসাহেব তার নাম শুনলেই চটে ওঠে। কদিন পর প্রতাপ এলো এবং রশ্মির ঝোঁক পড়লো প্রতাপেরই ওপরে, প্রতাপও রশ্মির প্রেমে পড়লো। ইতিমধ্যে বাড়ির ডাক্তার মারফৎ জানা গেল যে, প্রতাপের বুকের অসুখ, বারো মাস মাত্র তার আয়ু। আড়াল থেকে সে-কথা শুনলে প্রতাপ এবং নিজেকে রশ্মির সঙ্গে আর জড়িয়ে না ফেলাই সাব্যস্ত করলে। রশ্মি অবশ্য এর মধ্যে জেনে নিয়েছে যে প্রতাপই হচ্ছে লাল পাঞ্জা, এবং জানার পরই প্রতাপকে সে আরো গভীরভাবে ভালবাসতে থাকে। একদিন খবর এলো খাজনার টাকা ভর্তি গাড়ি লাল পাঞ্জা রাস্তায় লুট করবে। এবারে দুই ছেলে নিয়ে ঠাকুরসাহেব নিজেই বের হলো ডাকাত ধরতে। যথাস্থানে এবং যথাসময়ে লাল পাঞ্জার দল গাড়ি আক্রমণ করলে, কিন্তু সিন্দুক খুলতেই তার ভিতর থেকে রিভলবার নিয়ে বেরিয়ে এলো ঠাকুরসাহেব। লালপাঞ্জা কৌশলে ধরা পড়া

থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পালাতে সক্ষম হলো। দলের একজন ধরা পড়লো। ঠাকুরসাহেবের বাড়ির সামনে তার ওপরে অকথ্য নির্মম অত্যাচার চললো লাল পাঞ্জার পরিচয় জানবার জন্যে। হঠাৎ একটা চিঠি উড়ে এলো, লালপাঞ্জার লেখা। চিঠিতে জানানো হয়েছে যে, ধৃত লোকটিকে ছেড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে লালপাঞ্জা ধরা দেবে। ঠাকুরসাহেব প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে দিলে। যথাসময়ে লালপাঞ্জা উপস্থিত হলো, সকলে তখন সবিস্ময়ে দেখলে লালপাঞ্জাই হচ্ছে ঠাকুরসাহেবের বড়ো ছেলে প্রতাপ। ঘরে ফিরে প্রতাপ বুকের ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে পড়লো। ডি এস পি বাড়ি ঘেরাও করার আদেশ দিলে লালপাঞ্জাকে গ্রেপ্তার করার জন্য। মা ও রশ্মির সেবায় প্রতাপ সুস্থ হলো। পরদিন সবায়ের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার মুখে ঠাকুরসাহেব এতোদিনে পিতৃস্নেহে প্রতাপকে জড়িয়ে ধরলে। প্রতাপের যাওয়া বন্ধ হলো। ডি এস পি জানালে মহারাজা প্রতাপকে রেহাই দিয়েছে অপরাধ থেকে। এরপর রশ্মির স্বয়ংবরা। রশ্মি চায় প্রতাপকে, এবং প্রতাপও তাকে চায়, কিন্তু তার আয়ু অল্পদিনেই শেষ হয়ে যাবে বলে প্রতাপ রশ্মিকে প্রত্যাখ্যানে উদ্যত হয়। রশ্মি জানায় যাকে সে একবার মনপ্রাণ সমর্পণ করেছে তার যতো স্বল্পই আয়ু হোক, তাকেই সে বিয়ে করবে। তা-ই হলো, এবং দেখা গেল ডাক্তারের আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে প্রেমের জোরে প্রতাপ ও রশ্মি একেবারে বার্ধক্যকাল পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে।

* * *

একেবারে স্টাণ্ট ছবিরই সমূহ উপাদান, তবে একটু ভাল মাজাঘষা। কিশোর সাহুকে বম্বের সাধারণ চিত্রনির্মাতাদের চেয়ে আলাদা বলেই জানা ছিল এতোদিন, 'বড়ে সরকার' সে ধারণা খণ্ডন করে দেয়। আঙ্গিকের দিকটা পরিপাটি এবং দর্শনীয় করে তোলার ওপরেই যা দৃষ্টি দিয়েছেন তিনি, কাহিনীর নাটকীয় বিন্যাসের ব্যাপারে ত্রুটি বিস্তর। অতি গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিস্থিতীও হাসির উদ্রেক করে। রাজা-মহারাজাদের আমলকে ঘটনাকাল করে রাখায় অনেক জিনিস চালিয়ে নেওয়া যায়, বিশেষ করে একজন ডাকাতকে বড়ো করে তোলা বরদাস্ত করতে হয়, তা নয় তো যেভাবে উপাদানাবলীর উপস্থাপন তা মনে ধরে না মোটেই। কোথাও কোথাও পাশ্চাত্ত্য উপাদানও চোখে পড়ে। পুরনো খানকয়েক ছবির গান এতে সন্নিবেশিত। বিলিতী বাজনার সমারোহ দিয়ে আবহ-সঙ্গীত রচনায় ও পি নায়ার তার নিজস্ব ভঙ্গীর কাজ দেখিয়েছেন। কাজ বেশ ভালো আলোকচিত্রগ্রহণকারীর। কিশোর সাহু নিজেই নেমেছেন নায়ক প্রতাপের চরিত্রে—চড়া মেক-আপে

চিত্ত বসু পরিচালিত "বন্ধু" চিত্রে মালা সিংহ ও উত্তমকুমার

একটা এমন চোয়াড়ে চেহারা যাকে প্রেমিক বলে মনে করাই মুশকিল। কামিনী কৌশল হচ্ছেন রশ্মি। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে আছেন সজ্জন, আগা, কে এন সিং, গোপ, দুর্গা খোটে প্রভৃতি।

থিয়েটার

ছায়াছবির বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি, পৃথ্বীরাজ কাপুর সম্পর্কে এ উক্তি প্রয়োগ করতে যাওয়া ধাষ্টামোর পরিচায়ক, তবে তার 'পয়সা' ছবিখানি দেখে একথাটা না বলে পারা যায় না যে, পর্দার ওপরেও মঞ্চের ঢঙটাই সবরকমভাবে পুরোমাত্রাতেই রক্ষা করার তিনি পক্ষপাতি। ফলে 'পয়সা' তার দল, পৃথ্বী থিয়েটারের সাফল্যমণ্ডিত নাট্যাভিনয়গুলির অন্যতম হলেও ছবি হিসেবে হয়েছে তেমনি ব্যর্থ। একটা বিষয় অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, বম্বেতে যে ধরণের বিষয়বস্তু ও যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হয়, পৃথ্বীরাজের ছবিতে সে-সব কিছু পাবার নয়—একটা প্রগতিশীল মনের জোর তার আছে, মানুষের অন্যায় ব্যাপার নিয়ে লোকের চোখ ফোটাবার দিকে তার নজর আছে, আর আছে শিল্পনিষ্ঠা। সস্তা বা অভব্য আমোদ তার ছবিতে আশা করা যায় না, আর তা নেইও 'পয়সা'তে, তবুও পয়সা যে মাতিয়ে তোলার মতো টান ধরাতে পারে না তার প্রথম কারণ গল্পের মধ্যে বৈচিত্র্যের ও বৈশিষ্ট্যের অভাব; দ্বিতীয় কারণ সম্পূর্ণরূপে মঞ্চানুগ বিন্যাসধারা, তৃতীয় কারণ অভিব্যক্তি ব্যঞ্জনায় মাত্রাধিক্য অতিশয়তা; চতুর্থ কারণ ছবি দীর্ঘ (১৪৭৪৫ ফিট) অথচ দৃষ্টির সামনে রকমারিতার অভাব, সারা অংশ অনর্গল কেবল কথাতেই ভর্তি এবং কথা হিন্দীতে প্রযুক্ত হলেও বলবার ভঙ্গী বেশী সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত রাখার চেষ্টার জন্যে অনেকাংশেই জড়ানো তথা দুর্বোধ্য।

* * *

প্রদীপ প্রডাক্ সন্সের "পুলিস" চিত্রে প্রদীপকুমার ও মধুবালা

পয়সার অভাব, পয়সার প্রতি লোভ এবং শেষে পয়সার প্রাচুর্য মানুষের জীবনে যে অনর্থ নিয়ে আসে তারই গল্প 'পয়সা'। নতুন রকমের কিছু নয়ঃ অল্প আয়ের সংসারের খরচ চালিয়ে মানবোচিত লৌকিকতা ও দানধ্যানের প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করে চালিয়ে যাওয়ায় বাধা পেলে ব্যাঙ্কের কেরানী সৎ ও নিষ্ঠাবান শান্তিলাল। টাকা প্রসঙ্গে স্ত্রীর সঙ্গে একদা তুমুল বাঁধবার পর শান্তিলাল টাকা রোজগারের জন্য সহায়তা নিলে কালিদাসের। অনেক টাকা হলো শান্তিলালের, সেই টাকার প্রতি মায়াও বাড়লো, লোভও। এক শেঠের সন্তান নেই বলে সে চতুর্থ বিবাহে উদ্যত জেনে শান্তিলাল তার মেয়ে ইন্দিরা, বড়ো আদরের হলেও, তাকেই সেই বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিলে এক কারখানার ম্যানেজিং এজেন্ট হবার লোভে। ইন্দিরার জীবন তো বরবাদ হলোই, সেই-সঙ্গে ইন্দিরার সঙ্গে পূর্বেই বিবাহের জন্য নির্বাচিত বিহারীর জীবনও। শান্তিলালের ছেলে মোহন এই বিবাহের প্রতিবাদ করার ফলে গৃহ থেকে বিতাড়িত হলো। মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ শেঠ ইন্দিরাকে বিধবা করে একদিন ইহলোক ত্যাগ করলো। কিন্তু তার আগে, বিয়ের সময়েই শান্তিলাল ইন্দিরার নামে সব সম্পত্তি লিখিয়ে উইল করে রাখে। শান্তিলালের পাল্লায় পড়ে কালিদাস তার সর্বস্ব তো হারালোই, এমন কি মত্তাবস্থায় ও উত্তেজিতভাবে শান্তিলালের বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে মোটর চাপা পড়ে প্রাণও হারালো। প্রচুর অর্থ, কিন্তু শান্তি নেই, কেবলই ধারণা অপরে বুঝি ঠকিয়ে নিচ্ছে। বৃদ্ধ হয়েছে তবুও বৃদ্ধা স্ত্রী শর্মিলার চরিত্রে সন্দেহ। অহোরহ বিবেকের দংশন, কালিদাসের ভূত যেন গলা টিপে দেয়। মোহন আসতে ভয় শান্তিলালের, তাকে মনে করে ইনস্পেক্টর, সবাই যেন তার পিছনে লেগেছে। বিবেকের দংশন অসহ্য হয়ে উঠলো, রাতে অনিদ্রা ও আতঙ্ক। একদিন ভোরে বাড়ির সামনে দিয়ে একদল দেশসেবক গেয়ে চলছিল। তাদেরই দলের নেতা কিশোরী শান্তিলালের প্রাক্তন সদুপদেষ্টা, বিহারীও রয়েছে তাদের মধ্যে। মোহনের ডাকে দলটি উপস্থিত হলো শান্তিলালের সামনে, শান্তিলাল তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে পুত্রকন্যাকে জড়িয়ে ধরলো, বিহারীকে বাহুপাশে রাখলে হয়তো ইন্দিরার সঙ্গে এবার মিলন ঘটিয়ে দেবে বলে। প্রভাতফেরীর মিছিলে মহাত্মাজী, পণ্ডিতজী প্রভৃতির আলেখ্য থাকলেও বিনোবাজীর আলেখ্য এবং তার সম্পত্তিদান সম্পর্কিত শ্লোগানের ওপরই বেশী জোর দেওয়া দেখে মনে করে নিতে হয় যে, শান্তিলাল তার সর্বস্ব দেশসেবায় দান করে দিলে।

• • •

শান্তিলাল সকল সম্পত্তি দান করে শান্তি ফিরিয়ে নিক, তেমন পরিসমাপ্তিতে আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু শেষে মিছিল আনিয়ে তার আত্মসমর্পণ করার দৃশ্য যা হয়েছে তা বড়ো বেমানান। এবং এটাও মনে হলো যে, ওটা যেন কোনরকমে একটা গোঁজামিল দিয়ে গল্প শেষ করার চেষ্টা। বলতে গেলে দুটি মাত্র সেটে সারা ছবিখানি তোলা—একটা সেট শান্তিলালের অভাবের দিনে তার ঘরের, আর অপর সেট বড়োলোক হবার পর তার গৃহাভ্যন্তরের। ছোটখাটো সেট, যেমন কালিদাসের পাল্লায় পড়ে শান্তিলালের বাইজীর বাড়িতে যাওয়া, শান্তিলালের বাড়ীর সামনে কালিদাসের মোটর চাপা পড়া, এমনি টুকরো টুকরো সেট আছে, তবে খুবই কম। কাজেই একই সীমাবদ্ধ পটভূমিতে সম্পূর্ণ হয়েছে দীর্ঘ ছবিখানি। সর্বতোভাবে নাটকের রূপটাই রক্ষিত হওয়ায়, স্বভাবতই বাক্যের প্রাধান্য ঘটেছে। কথা ছাড়া একটি মিনিটও নেই বললেই চলে, কিন্তু কথারও অনেকখানিই স্পষ্ট নয়। ছবি করতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার রকমারি পটভূমি তৈরী করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে তা নয়, একটি সেটেই একখানি ছবি হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে দৃশ্যের বক্তব্য ছায়াছবির বর্ণমালা ধরে রচিত হওয়া দরকার,—চরিত্রের মুখের সংলাপকে প্রাধান্য দিয়ে নয়। 'পয়সা' হয়েছে একই স্থলে দাঁড়িয়ে গল্প বলে যাওয়ার মতো। পৃথ্বীরাজ তার জবরদস্ত ব্যক্তিত্বের ভারটা শান্তিলালের চরিত্রচিত্রণে ছবিময় ছড়িয়ে রেখে দিয়েছেন এবং অভিনয়টা

রেখেছেন মঞ্চের মতো উঁচু পর্দায় ধরে। তাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ক্যামেরার সূক্ষ্ম চোখে তার অভিব্যক্তি ও ভংগী বেশ বাড়াবাড়ি মনে হয়। তবুও তার প্রতিভার একটা দীপ্তি পরিব্যাপ্ত পাওয়া যায়। মঞ্চাভিনয়ে যারা অভিনয় করেন প্রায় তারাই সকলে আছেন স্ব স্ব চরিত্রে এবং সকলেরই অভিনয়ে মঞ্চের অতিশয়তা পরিস্ফুট যা পর্দায় বিকৃত দেখায়। আলোকচিত্রে বিষয়-বস্তুর ভাবগাম্ভীর্য অনুসারে দৃশ্য গঠনে তারা দত্ত যথাযথ কাজ দেখিয়েছেন। রাম গাংগুলী পরিচালিত সংগীতাংশের মধ্যে গানগুলি ভাল, কিন্তু আবহসংগীত ছবির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো উঁচু স্বরে তোলা। আওয়াজ বেশী মাত্রায় খাটানো হয়েছে বিভিন্ন দৃশ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্যে। সংলাপ রেকর্ডিংয়ে স্পষ্টতার দিকে আলাউদ্দীনের আরো বেশী সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

রামায়ণ

পৌরাণিক ছবির বিষয়বস্তু আহরণে রামায়ণকে যে কতভাবে কাজে লাগানো হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। মূল গল্প একই, তবে 'ভরত বিলাপ,' 'সীতা বিবাহ,' 'জয় হনুমান,' 'হনুমান পাতাল বিজয়' ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়ে রামায়নের অজস্র চিত্রায়ণ হয়ে চলেছে। অবশ্য অধিকাংশ ছবিরই উদ্দেশ্য রামায়নের মাহাত্ম্য সামনে তুলে ধরার চেয়ে যতোসব ট্রিক দেখিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেওয়া। যতো সব উদ্ভট ব্যাপারের অবতারণা যার মধ্যে রামায়ণকে অনুসরণ করার চেয়ে কোনরকমের একটা সূত্র আশ্রয় করে কল্পনায় আহৃত আজগুবি জিনিসকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। বসন্ত পিকচার্সের 'পবন পুত্র হনুমান' এই ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। হনুমানের বীরত্ব, নিষ্ঠা ও আনুগত্যের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার চেয়ে স্টাণ্ট ছবি দেখার আমোদ পরিবেশনের দিকেই লক্ষ্য এবং বহুবিধ সম্ভারের সহায়তায় সে লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভবও হয়েছে। নাচগানের দিকটাও জমকালো। ছবিখানি হোমি ওয়াদীয়ার প্রযোজনায় পরিচালনা করেছেন বাবুভাই মিস্ত্রী। সংগীত পরিচালনা করেছেন চিত্রগুপ্ত। বি এম ব্যাস, মহীপাল, সমর রায়, অনিতা গুহ প্রমুখ শিল্পী বিভিন্ন চরিত্রে অবতরণ করেছেন।

সঙ্গীত-নৃত্য

তিনদিনের একটি নৃত্যোৎসব

সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ তহবিলের সাহায্যার্থে গত ১৫ই থেকে ১৭ই আগস্ট বিদ্যালয়ের বালক বালিকাদের সহযোগে একটি নৃত্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কথাকলি, ভারত নাট্যম, কথক ও বিভিন্ন ধারার লোকনৃত্য তিনদিনের উৎসবে পরিবেশিত হয়। সুখ্যাত কথাকলি শিল্পী বালকৃষ্ণ মেনন নৃত্যাবলী পরিচালনা করেন এবং উৎসবে পরিবেশিত নৃত্যনাট্য 'পঞ্চবটি,' 'ভক্ত প্রহ্লাদ,' ও 'গীতোপদেশম'-এ যথাক্রমে জটায়ু, হিরণ্যকশিপু ও কৃষ্ণের ভূমিকায় নিজে অবতরণও করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের অনেকেই বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দেন, যাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে, মোহিনী অট্টম, ভক্ত প্রহ্লাদ, বনমালী বর্ণম ও মণিপুরীতে শ্রীমতী সেনগুপ্ত। সীতা ও দ্রৌপদীর চরিত্রে বুলবুল বসু প্রশংসা লাভ করেন। বালকের মধ্যে বেশী নাম করেন দীপ্তেন্দ্র ও রাধাকৃষ্ণ। এছাড়া স্নিগ্ধা মিত্র, রিনা ঘোষ, শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতা মৈত্র, মীনা রায়, পুতুল পাল, মালা বিশ্বাস, স্বপ্না দাস, বন্দনা সেনগুপ্ত, সুদীপ্তা সান্যাল প্রভৃতির কৃতিত্বও দৃষ্টিতে পড়ে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে অংশগ্রহণকারী মেয়েদের প্রায় সকলেই অল্প-বয়স্কা, বেশীর ভাগেরই বয়েস তেরোর কম এবং এই তাদের প্রথম সাধারণ্যে অবতরণ। তাপস সেনের আলোকসম্পাত নাচকে শিল্পময় করে তোলার সহায়ক হয়। সংগীত পরিচালনা করেন নীরোদবরণ। উদ্বোধন দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি কে পি মিত্র এবং প্রধান অতিথি হন আনন্দীলাল পোদ্দার।

সাংস্কৃতিকীর নতুন প্রচেষ্টা

সাংস্কৃতিকীর সভাবৃন্দ তাদের দ্বিতীয়

সুধীর বন্ধু পরিচালিত "মাথুর" চিত্রে মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি

এফ সি মেহরার "মুজরীম" চিত্রে শাম্মি কাপুর ও রাগিণী

বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে নৃত্যনাট্যে 'ভানুসিংহের পদাবলী' ও 'বিদ্যাপতির পদাবলী' পরিবেশনের পরিকল্পনা করেছেন। বিদ্যাপতি ও ভানুসিংহ দু'যুগের কবি হলেও প্রেমের ব্যাখ্যানে তারা এক ও অনন্য। প্রেমকে ভুলে দিকে দিকে কলহ ও বিবাদের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত বর্তমান সংসারে এই দুই প্রেমিক কবির কাব্য নিবেদনের প্রয়োজন-বোধেই সাংস্কৃতিকীর এই প্রচেষ্টা। নৃত্য-নাট্য দুটি মঞ্চস্থ হবে আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর নিউ এম্পায়ারে।

বিবিধ-সংবাদ

সানরাইজ ফিল্মের নবতম প্রচেষ্টা হচ্ছে তানসেনের জীবনীচিত্র নির্মাণ। গত বুধবার ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিওতে ছবিখানির মহরৎ সম্পন্ন হয়। ছবিখানি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন 'যদু ভট্ট'র পরিচালক নীরেন লাহিড়ী। একটা নতুন ধরণের বাস্তব-ধর্মী কাহিনী নিয়ে পরিচালক অসিত সেন তাঁর পরবর্তী ছবি 'জোনাকীর আলো'র মহরৎ সম্পন্ন করেছেন গত ১৫ই আগস্ট ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে। চিত্রচয়ন নামক এক নবগঠিত প্রতিষ্ঠান ছবিখানির প্রযোজক। কাহিনী রচনা করেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরযোজনায় নিযুক্ত হয়েছেন ভূপেন হাজারিকা, আলোকচিত্রগ্রহণে অজয় মিত্র এবং গান রচনায় গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ১৫ই আগস্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওতে মহরৎ হয় দেবী প্রডাকসন্সের 'লটারী' ছবিখানির। ছবিখানি পরিচালনা করবেন সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, আলোকচিত্র গ্রহণ করবেন তরুণ গুপ্ত, প্রযোজনা করবেন নীতিশ ঘোষ। গত সপ্তাহে আর মহরৎ হয় ১২ই আগস্ট টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে বি এ পি প্রডাক-সন্সের 'অদৃশ্য ইঙ্গিত'। ছবিখানির সংগঠনে আছেন, কাহিনী রচনায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, চিত্রনাট্য রচনায় বিপ্রদাস ঠাকুর, সংলাপ রচনায় পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনায় বিদ্যাপতি ঘোষ, সঙ্গীত পরিচালনায় রথীন চট্টোপাধ্যায়, শিল্প-নির্দেশে সত্যেন রায়চৌধুরী এবং ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, দীপক মুখোপাধ্যায়, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী, অপর্ণা, চিত্রিতা প্রভৃতি।

* * *

সম্প্রতি ফিল্মস ডিভিসনের কাছ থেকে মুগ্ধ হবার মতো দুখানি ছবি পাওয়া গিয়েছে, একখানি লোকমান্য তিলকের জীবনী, আর অপরখানি প্রধানমন্ত্রীর কর্মব্যস্ত দিনের বিবরণ। গত সপ্তাহে মুক্তিলাভ করেছে স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে। ১৮৫৭ সালে আন্দোলনের সূচনা থেকে ১৯৪৭ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পর ছবি-খানি সমাপ্ত হয় রাজঘাটে মহাত্মাজীর স্মৃতি ফলকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ নাটকীয়-ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে ছবিখানিতে। তিনখানিই ফিল্মস ডিভিসনের খ্যাতি ও মর্যাদা বাড়াবার মতো ছবি।

* * *

"বৈতালিক" ছবিখানির মহরৎ সংবাদে নির্মাতার নাম স্পার প্রডাকসন্স বলে মুদ্রিত হয়, আসলে ওটা হবে স্পার্ক প্রডাকসন্স। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা অবলম্বনে চিত্রকাহিনীটি পরিচালনা করছেন ধীরেন্দ্র দত্ত। কুশলীবৃন্দ হচ্ছেন আলোকচিত্র গ্রহণে সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, শব্দগ্রহণে গৌর দাস, শিল্পনির্দেশে গৌর পোদ্দার, সুরযোজনায় সলিল চৌধুরী এবং ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, নির্মলকুমার, নীতীশ মুখোপাধ্যায় ও নবাগত অতুল ভট্টাচার্য।

এল বি ফিল্মস ইণ্টারন্যাশনলের হয়ে সত্যজিৎ রায় 'পরশ পাথর' তোলা অর্ধেক সম্পন্ন করেছেন। এর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন তুলসী চক্রবর্তী ও রাণীবালা এবং অন্যান্য চরিত্রে আছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, মণি শ্রীমানী এবং কতক নবাগত শিল্পী। এ ছবিখানিতেও সুর যোজনা করবেন "কাবুলিওয়ালা"র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুরকার রবিশঙ্কর। সমগ্র ইওরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় সংগীতের সম্মান বাড়িয়ে রবিশঙ্কর এই মাসেই কলকাতায় ফিরছেন।

* * *

চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা হাতে রেখেও চিত্র-পরিচালনা করেছেন, এমন উদাহরণ কলকাতায় আছে। তাঁদের মধ্যে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের মনুজেন্দ্র ভঞ্জের নাম উল্লেখ করা যায়। তবে চিত্র-সাংবাদিকতা হাতে রেখেও চিত্র-প্রযোজনায় অগ্রসর হতে বোধ হয় প্রথম দেখা গেল সরোজকুমার সেনগুপ্তকে, যিনি গত রথের দিন টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে তার প্রথম ছবি "খেলাঘর"-এর মহরৎ অনুষ্ঠিত করেন। তাঁরই অনুজ এবং "পরেবধূ", "সুরের পরশে" প্রভৃতির কাহিনীকার সলিলকুমার সেনগুপ্তের লেখা গল্প "খেলাঘর"। সংগীত পরিচালনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান চরিত্র দুটির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন উত্তমকুমার ও মালা সিংহ।

* * *

বরুণ পিকচার্স' তাদের প্রথম ছবি "কবরী"র নাম বদলে রেখেছেন "জন্মান্তর"। ছবিখানি প্রযোজনা করছেন রেখা দেবী, পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, আলোকচিত্রগ্রহণ সন্তোষ গুহরায়, শব্দগ্রহণ জে ডি ইরানী, শিল্পনির্দেশে গৌর পোদ্দার ও সম্পাদনায় শিব ভট্টাচার্য। অভিনয়াংশে আছেন—অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, পদ্মা দেবী, নির্মলকুমার, অসিতবরণ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, ছবি বিশ্বাস, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

একাঙ্কিকা প্রতিযোগিতা

থিয়েটার সেণ্টার কলকাতার উদ্যোগিত তৃতীয় একাঙ্কিকা প্রতিযোগিতায় মোট ২৯খানি নাটক যোগদান করেছে বলে জানা গেল। আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর চক্রবেড়ে রোডে থিয়েটার সেণ্টারের নিজস্ব হলে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে।

"বৌঠাকুরানীর হাট" চিত্রে নবাগতা স্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণীর নবপ্রচেষ্টা

নিজস্ব ভবনে 'সেবা মিত্র হল' নির্মাণার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য দক্ষিণীর নাট্য বিভাগ আগামী ২২শে থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর নিউ এম্পায়ারে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' মঞ্চস্থ করবার আয়োজন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রখ্যাত গল্পটির নৃত্য, সংগীত ও অভিনয়সমৃদ্ধ নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীজয়দেব বসু এবং নাটকটি সমগ্রভাবে পরিচালনা করবেন শ্রীআশীষ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণীর নাট্য-বিভাগ ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী', 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'নষ্ট-নীড়', 'রবিবার', 'পণ-রক্ষা', 'হালদার-গোষ্ঠী' ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। আশা করা যায় যে, 'ক্ষুধিত-পাষাণ' তাদের সুনাম বর্ধিত করবে।

নতুন রেকর্ড

'এইচ্-এম্-ভি'

এন ৮০১২২—কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুখানি মীরার ভজন "গোবিন্দ কবহুঁ মিলে" ও "সখী মেরী নিন্দ"। এন ৮২৭১৯—নবাগতা শিল্পী পূরবী দত্তের গাওয়া "কে জাগে আজ শেষ প্রহরে" ও "ঐ গোধূলি বধূরে চিনিয়াছে"; দুখানি আধুনিক গান। এন ৭৬০৫৬—'নীলাচলে মহাপ্রভু' চিত্রের দুখানি গান—"জগন্নাথ জগবন্ধু" ও "জনম বিফলে যায়"—গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলম্বিয়া

জি ই ৩০৩৬৪—'নীলাচলে মহাপ্রভু' বাণীচিত্রের আরও দুখানি গান "মধুর বচনে মিনতি করি" ও "কি রূপ হেরিনু"—গেয়েছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। জি ই ৩০৩৬৫—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "শ্যাম অভিসারে" ও "বন্ধু আজি কান্দি কহি"—গান দুখানিও "নীলাচলে মহাপ্রভু" বাণীচিত্রের। জি ই ২৪৮৪৪—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "রুম ঝুম্ ঝুম ঝুম" ও "সাধু এলো ঐ"—দুখানি আধুনিক গান।

মস্কোর লেনিন স্টেডিয়ামে বিশ্ব যুব উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দৃশ্য

তারা এই ফলক লাভ করেছে। কোন কোন সংবাদপত্রে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের এই সাফল্যের জন্য মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তাদের 'হ্যাট্রিক' লাভ হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন। এই সাফল্যের জন্য ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর পরাজিত মোহনবাগান সম্বন্ধে আশা পোষণ করছি আগামী বার তারা যেন এই ফলক লাভের অধিকারী হন—তবে শুধু মোহনবাগান ক্লাব হিসাবে নয়, লীগ চ্যাম্পিয়ান দল হিসাবে। লীগ চ্যাম্পিয়ান দল হিসাবে প্রদর্শনী খেলায় বিজয়ী হয়ে আগামী বারও ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব এই ফলক লাভ করলে আমার আপত্তির কিছুই নেই। আমার আপত্তি সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডাঃ মুখার্জির নামাঙ্কিত এবং স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত খেলায় শুধু দুটি ক্লাবের অংশ গ্রহণে, সে দুটি ক্লাব যতই জনপ্রিয় হোক না কেন।

* * *

স্বাধীনতা লাভের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানে ইতিপূর্বে দুই একজন কীর্তিমান ক্রীড়াবিদকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। গতবার মোহনবাগান ক্লাবের ১৯১১ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী খেলোয়াড় রেভারেণ্ড সুধীর চ্যাটার্জি কংগ্রেস মণ্ডপে সম্বর্ধনা লাভ করেছেন। তার আগের বছর সম্বর্ধিত হয়েছেন দিকপাল ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীগোষ্ঠ পাল। তবে শ্রী পালকে ঠিক কংগ্রেসের তরফ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়নি। দিকপাল খেলোয়াড়কে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য 'গোষ্ঠ পাল অভিনন্দন কমিটি' নামে একটি পৃথক কমিটি গঠিত হয়েছিল। অবশ্য কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শ্রী পালকে অভিনন্দন জানানো না হলেও হিমালয় বিজয়ী বীর তেনজিংয়ের সম্বর্ধনা সভায় শ্রীগোষ্ঠ পালকে সভাপতির আসনে বসিয়ে রাজ্য কংগ্রেস আগেই তাঁকে পরোক্ষভাবে সম্বর্ধিত করেছিলেন। এবার রাজ্য কংগ্রেসের তরফ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে অতীত দিনের খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় অধ্যাপক শৈলজারঞ্জন রায়কে।

স্বাধীন দেশের অধিবাসীর চিন্তাধারার সঙ্গে পরাধীন জাতির চিন্তাধারার কতখানি পার্থক্য কংগ্রেসের সুধীজন সম্বর্ধনার আয়োজন থেকে তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। কংগ্রেসকে জনসাধারণ চিরদিনই জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে মনে করে এসেছে। কিন্তু প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে কংগ্রেসের তরফ থেকে এমনিভাবে গুণীজন সম্বর্ধনার তো কোন আয়োজন হয়নি। শিক্ষায়, দীক্ষায়, শিল্পনৈপুণ্যে, সংগীত সাধনায় সারা দেশের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন, সাধারণের মনের মণিকোঠায় তাদের স্থায়ী আসন পাতা থাকলেও দেশমাতৃকার এই সব সুসন্তানদের প্রতিভা সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেনি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, দেশের হাওয়া বদলেছে, আমাদের চিন্তাধারায় দেখা দিয়েছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। তাই জ্ঞানী, গুণী ও শিল্পী সম্বর্ধনা সভায় খেলোয়াড়েরও ডাক পড়েছে। অবশ্য শিল্পী ও সুধী সমাজে খেলোয়াড়দের একাসনে বসাতে কারো কারো কুণ্ঠা নেই, এমন নয়। স্বাধীনতার মেয়ো প্রতিভার সম্মান দিতে অনিচ্ছুক নাগরিকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হলেও এদের চিন্তাধারার পরিবর্তন প্রয়োজন। স্মরণ রাখতে হবে শুধু বুদ্ধিবলই খেলোয়াড়ের একমাত্র গুণ নয়। খেলাও নয় শুধু দেহমনের আনন্দ লাভের উপকরণ। জাতীয় জীবনে খেলাধুলার প্রয়োজন আজ অনস্বীকার্য। তাছাড়া খেলাও একটা আর্ট, খেলোয়াড়ও শিল্পী।

ক্রিকেট খেলায় অধ্যাপক শৈলজারঞ্জন রায় জীবনভোর এই সত্যেরই সাধনা করেছেন। স্পিন বোলিং সম্বন্ধে তাঁর নিজের কথা,—"স্পিন বোলিং ইজ এন আর্ট। এটা শিল্পকলার মত। মাথা খাটিয়ে কটি আঙুলের সাহায্যে যে শিল্প সম্ভার গড়ে তোলা যায় তার রূপ ও গুণ প্রত্যক্ষ। উন্নততর স্পিন বোলিং করতে হলে সবার আগে চাই সাফ বুদ্ধি" সত্যই সাফ বুদ্ধি আর আঙুলের কারিকুরিই ছিল ক্রিকেট খেলোয়াড় শৈলজারঞ্জনের প্রধান অস্ত্র। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সংবাদপত্রে খেলাধুলোর এত আদর ছিল না। ফলে তখনকার দিনের খেলোয়াড়দের যোগ্যতা এবং কৃতিত্বের তেমন বিচার হয়নি—তাদের কীর্তিকাহিনীও হয়নি যথোপযুক্তভাবে প্রচারিত। সাফল্যের ইতিবৃত্তও সংখ্যাতত্ত্বের বিবরণীতে ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ নেই। এ যুগের সুযোগ সুবিধা এবং প্রচারযন্ত্রের সহায়তা লাভ করলে যারা এ যুগের কীর্তিমান খেলোয়াড়দের বহু উর্দ্ধে আসন লাভ করতে পারতেন শৈলজানন্দ তাদেরই একজন। শুধু ক্রিকেট

করতে সম্মত হননি। সোভিয়েট রাশিয়ার খ্যাতনামা ও খ্যাতনাম্নী প্রায় সমস্ত অ্যাথলীটই লণ্ডন যাত্রা করেছেন। কীর্তিমান দৌড়বীর ভ্যাডিমির কুটস, যিনি অসুস্থ থাকায় বিশ্ব যুব অনুষ্ঠানের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেননি তাঁকেও হোয়াইট সিটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যাবে। ইংলণ্ডের পক্ষে দেখা যাবে ইবটসন, গর্ডন পিরি, কেন উড, ব্রায়ান হিউসন প্রভৃতি খ্যাতনামা অ্যাথলীটকে।

* * *

আগস্ট মাসের ২৬ তারিখ থেকে প্রাচ্যের সুপ্রসিদ্ধ ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হবে। ৪০টি দল নিয়ে এবার আই এফ এ শীল্ডের খেলার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। পাকিস্থানের তিন চারটি ক্লাব আই এফ এ শীল্ডে খেলবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও পাকিস্থানের কোন ক্লাবকে আই এফ এ শীল্ডে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। জানা গিয়েছে পাকিস্থানের কোন প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের যোগদান নিষিদ্ধ করায় পাল্টা ব্যবস্থা মত ভারতের প্রতিযোগিতায় পাকিস্থান টিমকে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

আই এফ এ শীল্ডে অংশ গ্রহণকারী বাইরের কয়েকটি দল যেমন বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান নেভী, হায়দরাবাদ এস এ, মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারীং, ই এম ই সেকেন্দ্রাবাদ, টি ডি ই ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি দলকে শক্তিশালী দল বলে অভিহিত করা যায়। খেলার তালিকায় গতবারের শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাব, রাজস্থান ক্লাব, সেকেন্দ্রাবাদ ও হায়দরাবাদ একদিকে আছে, অপরদিকে আছে লীগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং, লীগ রাণার্স ইস্ট বেঙ্গল, মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারীং, টি ডি ই ব্যাঙ্গালোর ও দিল্লী এফ এ দল। প্রতি অর্ধে ৩৫ মিনিট করে মোট ৭০ মিনিট খেলার স্থায়িত্ব কাল নির্দিষ্ট হয়েছে। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের ফতোয়া অনুযায়ী গতবারও ৭০ মিনিট করে শীল্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নীচে শীল্ড খেলার তালিকা দেওয়া হল:—

প্রথম রাউণ্ড

(১) গ্রীয়ার স্পোর্টিং : কুমারটুলী ইনঃ
(২) উয়াড়ী : ত্রিপুরা রাজ্য দল
(৩) জামসেদপুর স্পোর্টিং এসো : পুলিশ এ সি
(৪) পাটনা এথলেটিক ক্লাব : এরিয়ান
(৫) রেলওয়ে স্পোর্টস : খার্দপুর ইউনাইটেড
(৬) হাওড়া জেলা এসো : কালীঘাট ক্লাব
(৭) হাওড়া ইউনিয়ন : বি এন আর
(৮) ভবানীপুর : রবার্ট হাডসন
(৯) হুগলী জেলা এসোঃ ২৪ পরগণা জেলা এসোঃ
(১০) ক্যালকাটা এফ সি : বালী প্রতিভা
(১১) খিদিরপুর ক্লাব : কটক সম্মিলিত দল
(১২) স্পোর্টিং ইউনিয়ন : চন্দননগর জেলা এসোঃ
(১৩) মহারাণা ক্লাব (গোহাটী) : ডালহৌসী এ, সি
(১৪) বর্নবিহারী জেলা এসোঃ (বর্ধমান) : জর্জ টেলিগ্রাফ

দ্বিতীয় রাউণ্ড

(ক) বিজয়ী (১) : মোহনবাগান এ সি
(খ) বিজয়ী (২) : বিজয়ী (৩)
(গ) বিজয়ী (৪) : বিজয়ী (৫)
(ঘ) বিজয়ী (৬) : রাজস্থান ক্লাব
(ঙ) বিজয়ী (৭) : পাঞ্জাব এফ এ
(চ) বিজয়ী (৮) : বিজয়ী (৯)
(ছ) বিজয়ী (১০) : ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব
(জ) বিজয়ী (১১) : সেণ্ট্রাল সেক্রেটেরিয়াট (দিল্লী)
(ঝ) বিজয়ী (১২) : মহমেডান স্পোর্টিং
(ঞ) বিজয়ী (১৩) : বিজয়ী (১৪)

তৃতীয় রাউণ্ড

(ট) বিজয়ী (ক) : ই এম ই ট্রিমুল্গেরী (সেকেন্দ্রাবাদ)
(ঠ) বিজয়ী (খ) : ভারতীয় নেভী (বোম্বাই)
(ড) বিজয়ী (গ) : বিজয়ী (ঘ)
(ঢ) বিজয়ী (ঙ) : হায়দরাবাদ এফ এ
(ণ) বিজয়ী (চ) : বিজয়ী (ছ)
(ত) বিজয়ী (জ) : টি ডি ই ব্যাঙ্গালোর
(থ) বিজয়ী (ঝ) : দিল্লী এফ এ
(দ) বিজয়ী (ঞ) : মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং

খেলাধূলার টুকরো খবর

সারের চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ

ইংলণ্ডের কাউণ্টি ক্রিকেট লীগে সারে দল এবারও চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে উপর্যুপরি ছয় বছর চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এর আগে আর একবার ১৮৮৭ সাল থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত পর পর ছয় বছর সারে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছিল। ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে গতবার থেকে সারের অধিনায়কত্ব করছে। এবারকার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের মূলে মের কৃতিত্ব অনেকখানি। এ বছর মে সর্বপ্রথম দু হাজার রান পূর্ণ করেছেন। মে ছাড়া টেস্ট বোলার লক, লেকার ও লোডার অনেকখানি কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

কলকাতার ক্রিকেট লীগ—নভেম্বর মাসের ১০ই তারিখ থেকে কলকাতায় সিনিয়র ক্রিকেট লীগের খেলা আরম্ভ হবে। সিনিয়র ক্রিকেট লীগে এবার মোট ২৪টি ক্লাব ৩টি গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। প্রতি গ্রুপে আছে ৮টি করে ক্লাব। কোন কোন ক্লাব কোন গ্রুপে আছে নীচে তার তালিকা দেওয়া হল:

ক বিভাগ : মোহনবাগান রাজস্থান, ভবানীপুর, এলবার্ট, ইউনিয়ন স্পোর্টিং, টাউন, মহঃ স্পোর্টিং ও দক্ষিণ কলিকাতা।

খ বিভাগ : কালীঘাট, ইস্ট বেঙ্গল, স্পোর্টিং ইউনিয়ন, মিলন সমিতি, হাওড়া স্পোর্টিং, এরিয়ান্স, রেঞ্জার্স ও অরোরা।

গ বিভাগ : ডালহৌসী, গ্রীয়ার, তালতলা, কুমারটুলী, ইয়ং বেঙ্গল, ক্যালকাটা পার্শী, সুবার্বন ও পোর্ট কমিশনার।

কাশীপুর ক্লাব টেনিস—কাশীপুর ক্লাব হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় এস আকতার আলি কে মুখার্জিকে ৬—৩ ও ৬—৪ সেটে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছেন। কিন্তু ডাবলসের ফাইন্যাল খেলায় আকতার আলি ও প্রেমজিৎ লালকে দুই বর্ষীয়ান খেলোয়াড় গণেশ দে ও নরেশ কুমারের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ১৯৩৭ সালে গণেশ দে মিসেস মোরের সঙ্গে খেলে যখন ১৯ বছর আগে কাশীপুর টেনিসের ডাবলসে বিজয়ী হয়েছিলেন, তখন আকতার আলি বা প্রেমজিত লাল জন্মগ্রহণ করেননি। ভারতের জুনিয়র টেনিস খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় আকতার আলি প্রথম এবং প্রেমজিত লাল দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী।

সুন্দর ক্লাব বিজয়ী—বোম্বাইর সুন্দর ক্রিকেট ক্লাব পূর্ব আফ্রিকা সফরের তিন দিনব্যাপী প্রথম খেলায় কেনিয়া এশিয়ান স্পোর্টস এসোসিয়েশন ক্রিকেট দলকে ১৬৭ রানে পরাজিত করেছে। কেনিয়া এশিয়ান দলে অধিকাংশ প্রবাসী ভারতীয় খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেন। সুন্দর ক্লাবের পক্ষে ঘোরপাদে ও নরী কন্ট্রাক্টর দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন।

ভারতীয় পোলো টীমের পরাজয়—ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক পোলো চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইন্যাল খেলায় ফ্রান্স ও স্পেনের খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত লিভারসিন দল ৫½—৩ গোলে ভারতীয় পোলো দলকে পরাজিত করেছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১০ই আগস্ট—অদ্য কলিকাতায় ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এস এস শ্যামাপ্রসাদ সাংবাদিকদের বলেন যে, আগামী অক্টোবর মাসের শেষে অথবা নভেম্বরের প্রথম-ভাগে হাওড়া ও শেওড়াফুলীর মধ্যে প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল শুরু করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতের স্বাধীনতার দশম বার্ষিকী এবং ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বন্দীদের মুক্তি-দান সম্পর্কে ভারত সরকার যে নীতি স্থির করিয়াছেন, তদনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেল হইতে মোট ১৮৩৫ জন দীর্ঘ-মেয়াদী বন্দী মুক্তি লাভ করিবে।

১২ই আগস্ট—গত রাত্রে সমাপ্ত নিখিল ভারত রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের (মাদ্রাজ গ্রুপ) বার্ষিক সম্মেলনে "সরকারের বেপরোয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার একমাত্র পথ" হিসাবে "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ আজ ত্রিবান্দ্রমে বলেন যে, কেন্দ্র ও কেরলে দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির দল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া একযোগে কাজ চালাইয়া যাইতেছে। ইহা এক বিরাট "পরীক্ষা কার্য" এবং ইহা শুধু দেশের অবশিষ্টাংশে নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সহ-অবস্থানের এক দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হইবে।

১৫ই আগস্ট—অদ্য অপরাহ্ণে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের এক জনসমাবেশে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীমথুরালিঙ্গম থেবর ঘোষণা করেন যে, "নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু অক্টোবর মাস নাগাদ মুক্তিফৌজ লইয়া ভারতবর্ষে আসিতেছেন।"

১৬ই আগস্ট—১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান স্মরণে আজ নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনারা সংকীর্ণ স্বার্থ, ধর্ম, ভাষা, প্রদেশ ও এই বিরাট দেশ ভারতবর্ষ এই সমুদয়ের মধ্যে কিসের প্রতি অনুগত?' ইহার উত্তরে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'আমাদের দেশ ভারতের প্রতি অনুগত।'

১৭ই আগস্ট—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ লোকসভায় বলেন যে, নায্য মূল্যের দোকান হইতে চাউল ও আটা ক্রয়ের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে পরিচয়পত্র দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, দেশে খাদ্য রেশনিং প্রবর্তন করা হইতেছে।

চাকুরির শর্তাবলী সংক্রান্ত কোন ব্যাপার লইয়া ধর্মঘট বা কোন প্রকার বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ বিহারের রাজ্যপাল সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

১৮ই আগস্ট—শ্রী জি এম সাদিক অপর পাঁচজন সহকর্মীসহ সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, তিনি শীঘ্রই একটি রাজনৈতিক দল গঠন করিবেন।
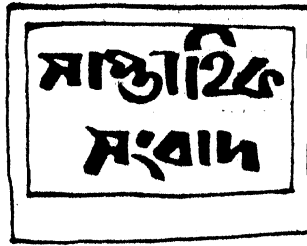
দ্রুত কৃষি সম্প্রসারণের জন্য কি কি জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত তাহা উদ্ভাবনের জন্য সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মহীশূর শহরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষীয় মহলের এক আলোচনা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। রাষ্ট্র-পতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু এবং আচার্য বিনোবা ভাবে আলোচনায় যোগদান করিবেন।

১৯শে আগস্ট—শিলচরের জেলা জজ শ্রী এস কে দত্ত আজ জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৯৮ ধারা অনুসারে করিমগঞ্জ মহকুমার বদরপুর নির্বাচন কেন্দ্র হইতে আসাম বিধান-সভায় নির্বাচিত মৌলানা আবদুল জলিলের (কংগ্রেস) নির্বাচন অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রামাণ্যসূত্রে জানা গিয়াছে যে, টোলেন জান্স ইন্ডো-স্ট্যানভাক পেট্রোলিয়াম পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্ধমানের নিকটে খননকার্য পরিত্যক্ত হইয়াছে; কারণ তথায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আহরণের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ তৈল নাই।

কলিকাতার বস্তী অপসারণের নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সকল পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সামান্য অদল বদল করিয়া উহাদের মধ্যে দুইটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শ্রী আনসার হারবানি এম পি জম্মু ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট বকশী গোলাম মহম্মদ ও তাঁহার সহচরদিগকে জাতীয় সম্মেলন ভাঙিয়া দিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৩ই আগস্ট—চারদিন যাবত ঢাকায় জোর রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও সলাপরামর্শ চালাইয়া পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা প্রধানমন্ত্রী শ্রী সুরাবর্দী এবং রিপাব্লিকান পার্টি নেতা ডাঃ খান সাহেব অদ্য প্রত্যুষে করাচী রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।

১৪ই আগস্ট—এখানে প্রামাণ্যসূত্রে জানা গিয়াছে যে, সিরিয়া সরকারকে উৎখাত করার জন্য এক নূতন ষড়যন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে সিরিয়া সরকার গতকাল তিনজন আমেরিকানকে দামাস্কাস হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিয়াছেন।

১৫ই আগস্ট—অদ্যকার "নিউইয়র্ক টাইমস" পত্রিকায় প্রাগ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউ-নিয়নের বাহিরের কোন কোন কম্যুনিস্ট নেতা জানিতে পারিয়াছেন যে, সোভিয়েট প্রধান-মন্ত্রী মার্শাল নিকোলাই বুলগানিন সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির সভাপতি মণ্ডল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

পাকিস্থান মুসলিম লীগের সভাপতি সর্দার আবদুর রব নিস্তার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় এই মর্মে দেশের শাসকবর্গকে হুঁশিয়ার করিয়া দেন যে, আগামী বৎসর মার্চ মাসে যদি নির্বাচন না হয়, তাহা হইলে জনসাধারণ এই মৌলিক অধিকার লাভের জন্য অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করিতে পারে।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান "তাস" জানাইতেছেন, ভারতের স্বাধীনতার দশম বার্ষিক দিবস এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অদ্য মস্কোর চায়কোভস্কী সংগীত ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৬ই আগস্ট—অদ্য টোকিওতে আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা বিরোধী তৃতীয় আন্ত-র্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। আণবিক এবং নিউক্লিয়ার আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করিবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি করিবার দাবী করিয়া সম্মেলন অদ্য "টোকিও ঘোষণা" বলিয়া অভিহিত একটি ঘোষণা প্রচার করে।

দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে ভারতীয় বংশোদ্ভূতগণের প্রতি আচরণ সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বিতর্কের ব্যবস্থা করিতে ভারতবর্ষ অদ্য অনুরোধ জানাইয়াছে।

১৭ই আগস্ট—গত জুলাই মাসে মস্কোয় শ্রী ম্যালেনকভ, শ্রী মলোটভ এবং শ্রী কাগানো-ভিচের বহিষ্কারের পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নিহত সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সহিত আর তাঁহাদের নামের উল্লেখ করা হইতেছে না।

১৮ই আগস্ট—গতকল্য ওয়াকিবহাল ব্যুরোক্রাট মহল হইতে বলা হয় যে, ক্রেম-লিনের সাম্প্রতিক সংকটে সোভিয়েট প্রধান-মন্ত্রী মার্শাল নিকোলাই বুলগানিন যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

১৯শে আগস্ট—সিরিয়ার সাম্প্রতিক চালচাল দেখিয়া বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি ভাবিতেছে যে, ইহা সিরিয়ার ক্রমবর্ধমান রুশ প্রভাবেরই পরিচয়।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী নানা গুজব রটিলেও মস্কোর সংবাদে কিন্তু তাঁহার মর্যাদা হানির কোনই আভাস পাওয়া যাইতেছে না।

আগামীকল্য নিরাপত্তা পরিষদে ওমান সমস্যা উত্থাপিত হইলে ভারত যাহাতে এ বিষয়ে নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করে, তজ্জন্য বৃটেন বে-সরকারীভাবে ভারতকে অনুরোধ করিয়াছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক [illegible] ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা ষান্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল 'সডাক' বার্ষিক ২২ টাকা, ষান্মাসিক ১১ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্র[illegible]

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

DESH : 40 Naye Paise.
Saturday, 31st August, 1957.

২৪ বর্ষ ॥ ৪৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৪ ভাদ্র, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে বিশেষভাবে চব্বিশপরগণা, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার কোন কোন অংশে পাকিস্থানের কার্যকলাপ ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। সাধারণ নির্বাচন চলিবার সময়ে পাকিস্থানের অনুকূলে, ভারত রাষ্ট্রবিরোধী যেসব ইস্তাহার বিলি হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর মুর্শিদাবাদের একজন বিধানসভা মুসলমান সদস্যের গৃহে যে সব আপত্তিজনক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহার বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছে (মামলাটি এখন বিচারাধীন কাজেই তাহার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য আমরা করিতেছি না—কেবল ঘটনাটি উল্লেখ করিলাম)। সম্প্রতি ২৩শে আগস্টের আনন্দবাজার পত্রিকায় নদীয়ায় ও মালদহে প্রাপ্ত কতকগুলি ভারত-রাষ্ট্রবিরোধী-ইস্তাহার সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা রীতিমত উদ্বেগজনক। শুধু তাহাই নয়, মালদহ জেলার কোন কোন স্থলে "পাকিস্থানী পতাকা উড়িয়াছিল।" এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার মন্তব্য করিতেছেন যে, এ-জাতীয় ইস্তাহার গোয়েন্দা বিভাগের সতর্ক দৃষ্টি (!) (বিস্ময় চিহ্ন আমাদের) এড়াইয়া পশ্চিমবঙ্গে নিয়মিত আসে। আর কেবল আসে না, "ইস্তাহারের নির্দেশ পালিত হয়, পালন করিবার লোক এইখানে সক্রিয় আছে।" এই ইস্তাহারগুলি কিরূপ আপত্তিজনক তাহা বুঝাইবার জন্য কিছু কিছু নমুনা তুলিয়া দিতেছি।

"একটি ইস্তাহারের মাথায় তিনটি সাবধান দিয়া যে ইস্তাহারখানি বিলি হইয়াছে, তাহার বয়ান এইরূপঃ—

হিন্দুস্থানের জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আপনাদের বড় নেতা
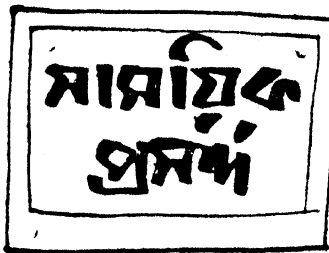
(নেহরুকে) বলিয়া দিন যেন, তিনি কাশ্মীরকে খাকছার লীডার আল্লামা মাশরেকীর হাতে অচিরেই অর্পণ করিয়া দেন। অন্যথায় হিন্দুস্তানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাকিস্তানের নিশান উড়াইয়া দেওয়া হইবে। এবং সমগ্র হিন্দুস্তানই পাকিস্তানে পরিণত হইবে। খাকছার দল আল্লামা মাশরেকী সাহেবের শেষ হুকুমের অপেক্ষায় আছে, তাহার হুকুম পাইবামাত্র দশ দশ লক্ষ খাকছার দিল্লী, কলিকাতা এবং পাঠনাভিমুখে অগ্রসর হইবে।"

নোটিশ

"আরও জানান যাইতেছে যে, তিনি যেন ফরখা বাঁধকে বন্ধ রাখিবার চেষ্টা না করেন। এবং যদি যুদ্ধ না করেন, তাহা হইলে আরামে শুখ শান্তিতে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবেন। প্রচারক—ফৌজী হেডকোয়াটার ইসলাম লীগ এস এম এলাহি নোজমী আলা (পূর্ব পাকিস্তান)।"

অপর একটি ইস্তাহারের নমুনা উদ্ধৃত হইল।

ইস্তাহারের শিরোনামাঃ "১৯৫৭ জিন্দাবাদ" এবং ইহার বয়ান নিম্নরূপঃ—

"ভারতের জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, তাহারা যেন গণআন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুকে অনতিবিলম্বে কাশ্মির আল্লামা মোশরেকী অথবা প্রেসিডেন্ট এস্কেন্দার মীর্জার নিকট অর্পণ করিতে বাধ্য করেন, অন্যথায় গণহত্যা শুরু হইবে তাহার জন্য পণ্ডিত নেহরুই একমাত্র দায়ী হইবেন। সুকৌশলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে মারিয়া ফেলিয়া নিজে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইয়া ভারতবাসীকে কিভাবে অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত করিতেছেন, তাহা আপনাদের অবিদিত নহে। ১৯৩১ সালের উত্তর প্রদেশে খাকছার হামলা বাহিনী ও গত মার্চ মাসের ওয়াগাতে (পাঞ্জাব) যে খাকছার বাহিনী ভারত আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিল, সে সময় পাতিয়ালা, জলন্ধর প্রভৃতি স্থানের হিন্দুদিগের দুর্দশার কথা বিস্মৃত হইবেন না।

"অবিলম্বে ভারতস্থ মুসলমানদিগের উপর জুলুম বন্ধ ও কাশ্মির সমস্যার সমাধান না করিলে ভারতের প্রতি ইঞ্চি মাটি রক্তে প্লাবিত হইবে। ১৯৫৭ জিন্দাবাদ সেখ মঞ্জুর এলাহি নাজেম আলা (পূর্ব পাকিস্তান) ফৌজি হেডকোয়াটার ইসলাম লীগ যশোর।"

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় যে কয়েকদিন আগে একখানি বন্ধকী স্টীমার পাকিস্থানে পলায়ন করিয়াছে।

সমস্ত খবরগুলি পর পর সাজাইয়া অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, পাকিস্থান পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা ও ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে; তাহাতে সাহায্য করিবার লোকের অভাব এদেশে নাই; আর এদেশের পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ যথেষ্ট সক্রিয় ও সতর্ক নয়। শেষোক্ত বিষয়টিই গুরুতর। গোয়েন্দা ও পুলিস বিভাগ যথেষ্ট সক্রিয় হইলে এমন ঘটিবার কারণ ঘটে না। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এ দিকে দৃষ্টি দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। কোনরূপ ভ্রান্তনীতির বসে এ বিষয়ে শৈথিল্য করিলে সরকার রাজ্যরক্ষারূপ মৌলিক কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইবেন স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

পূর্ব পাঞ্জাবে ভাষাকলহ

পূর্ব পাঞ্জাবে হিন্দি রক্ষা সমিতি যে ভাষা আন্দোলন চালাইতেছে, তাহার সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরু বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য একটি উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পাঞ্জাবে হিন্দি প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে শেষ পর্যন্ত হিন্দি ভাষার ক্ষতি হইবে। পণ্ডিত নেহরুর উক্তিটি মূল্যবান। কেন তাহা বলি। হিন্দি রাষ্ট্র ভাষারূপে স্বীকৃত হইবার পরে এক শ্রেণী হিন্দিভাষীর অশোভন ব্যগ্রতায় হিন্দি ভাষিগণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। এমন কি এই অশোভন ব্যগ্রতার মূলে যেনতেন প্রকারেণ হিন্দিকে অহিন্দিভাষী ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া "হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ" প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আছে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। ভাষা কমিশনের মাইনরিটি রিপোর্টেও শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। যখন প্রথমে প্রথমে হিন্দির রাষ্ট্রভাষা পদ স্বীকৃত হইল, তখন কিছু কিছু আপত্তি উঠিলেও তাহার গুরুত্ব খুব বেশী ছিল না। কিন্তু তারপরেই দেখা দিল রাতা-রাতি হিন্দি প্রচারের অশুভ দুঃসংকল্প। ফলে হইল এই, গোড়ায় যে সব অহিন্দি-ভাষী হিন্দি ভাষার পক্ষে ছিল, তাহাদের উৎসাহ অবধি মন্দ হইয়া পড়িল, তাহারা ভাবিল, তাইতো এমন ত্বরা কেন? এখন হিন্দি ভাষার বিপক্ষগণ যে বেশ শক্তি-শালী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য এই সব অতিউৎসাহী হিন্দি প্রচারক দায়ী। পাঞ্জাবে হিন্দি প্রতিষ্ঠার এই কলহাত্মক পন্থাকে ভারতব্যাপী হিন্দি প্রচারের একটি রূপ বলিয়া গ্রহণ করিলে কি অন্যায় হইবে? আমাদের বিশ্বাস অনেকেই সেইভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ক্রমে তাঁহাদের দল বাড়িবে বলিয়াই মনে হয়। এমন অবস্থায় পাঞ্জাবের হিন্দি রক্ষা সমিতির কার্যকলাপ কি সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষার প্রতিষ্ঠার হানি করিতেছে না? আমাদের ধারণা এই কথা চিন্তা করিয়াই পণ্ডিত নেহরু পূর্বোক্ত উক্তিটি করিয়াছেন।

বর্তমান অভাব ও ভাবী সমৃদ্ধি

স্বাধীনতা দিবসের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি একথা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রীয় মুক্তি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় যদি মানুষের অভাব হইতে মুক্তি না ঘটে, জীবনধারণের জন্য যে উপকরণ ও স্বাচ্ছন্দ্যের অনিবার্য প্রয়োজন তাহা পাইবার সুযোগ দেশবাসী প্রত্যেকের না থাকে। প্রধানমন্ত্রীও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন।

কিন্তু ঠিক এই সময়েই প্রাণধারণের জন্য নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর মূল্যের অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে এই কথাগুলি সাধারণের মনে বিশেষ রেখাপাত করিবে কিনা সন্দেহ, এমন কি, অকরুণও শোনাইতে পারে। এই মূল্যবৃদ্ধি এমন স্থানে পৌঁছিয়াছে ইহার ধারা যদি রুদ্ধ না হয়, তবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তির পরে আমাদের সুখসমৃদ্ধি কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, তাহার কল্পনায় সাধারণ মানুষকে তুষ্ট রাখা যাইবে না। ভবিষ্যৎ বংশধরদের সমৃদ্ধির জন্য ত্যাগ স্বীকারের আহ্বানের প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটাকে ঠেকানো যায় না যে, অভাবে অনাহারে অপুষ্টিতে বর্তমানের মানুষ যদি জীর্ণ হইয়া যায়, তবে ভবিষ্যতের মানুষ গড়িয়া উঠিবে কোন ভিত্তিতে?

আর এই ভবিষ্যতের বিষয়টা কি, তাহাও সাধারণ মানুষের চোখে স্পষ্ট হইতেছে না যে, তাহার আশায় তাহারা কোমর বাঁধিবে। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, স্বাধীনতালাভের পূর্বে ভারতবর্ষের নগর ও গ্রামের কি দুরবস্থা ছিল, দশ বৎসরের প্রাণপণ চেষ্টায় কি উন্নতি হইয়াছে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করেন না। অতীত সম্বন্ধে বিস্মৃতি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক—এই দশ বৎসরে যে উন্নতি হইয়াছে তাহা দেশের সর্বসাধারণের সামনে স্পষ্ট করিয়া তুলিবার বিশেষ উদ্যোগের আবশ্যক আছে। তৎসত্ত্বেও সাধারণ মানুষের কাছে বর্তমানের দুঃখদুর্গতির কথাটাই বড় হইয়া দেখা দিবে—বিশেষত যদি প্রাণরক্ষাই প্রশ্নের বিষয় হইয়া উঠে।

যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্থকতা-বিধানের জন্য দেশবাসীকে বর্তমানের দুঃখকষ্ট মানিয়া লইতে বলা হইতেছে, তাহার পরিসমাপ্তিতে দেশের কিরূপ সমৃদ্ধিবিধান হইবে, সে-চিত্রটা, সর্বসাধারণ তো দূরের কথা, অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের নিকটও যে কারণেই হোক অস্পষ্ট, আমাদের তো এইরূপ মনে হয়।

বর্তমানেই যদি সাধারণের আর্থিক দুর্দশা দ্রব্যমূল্যহ্রাস করিয়া অনেকটা দূর করিতে পারা না যায় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে মানুষের কল্পনাশক্তি আকৃষ্ট না হয়, তবে মানুষের মনের সহিত রাষ্ট্রপরিচালকদের কর্মধারায় যে বিচ্ছেদ ঘটিতে থাকিবে, তাহার ফল কখনো শুভ হইতে পারে না।

"ভারত অধিকার"

সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিক উৎসবে দিল্লীতে ১৬ই আগস্ট বক্তৃতাপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ আমাদের প্রত্যেকের একথা বিশেষ করিয়া বুঝিবার ও জানিবার সময় হইয়াছে যে, আমাদের নিজ নিজ পল্লী, প্রদেশ, জাতি, ভাষা প্রভৃতির প্রতি আমাদের যে মমত্ব তাহার সকলের উপরে স্থান দিতে হইবে ভারতবর্ষের প্রতি আনুগত্যের—এই কথাটা যদি আমরা না বুঝি, তবে আমরা স্বাধীনতার মর্মই গ্রহণ করিতে পারি নাই। আর এই ঐক্যবোধ না থাকিলে আমাদের আত্মরক্ষা করাই কঠিন হইবে।

কথাটা স্মরণ করাইয়া দিবার, ভারত-প্রতিজ্ঞা প্রত্যহ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর অকস্মাৎ প্রাদেশিকতাবোধ উগ্র হইয়া উঠিবার মূলে কারণগুলি যদি ভারতরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় নির্ণয় ও সংশোধন করিবার চেষ্টা না করেন, তবে উৎসবে সমবেত জনসংঘকে ভারত-ব্রতের প্রতিজ্ঞা স্বীকার করাইয়া স্থায়ী ফললাভ হইবে এমন আশা করা যায় না।

ভারতরাষ্ট্রসভায় রামমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের স্থান নাই?

ভারতবর্ষের পার্লামেণ্ট ভবনে যে লোকনায়কদের চিত্র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে রামমোহন রায় ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রের স্থান সংকুলান হইতে পারিবে না, এই মর্মে যে সংবাদ প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা অসত্য আমরা এইরূপ আশা করিয়া থাকিব। যদি এই সংবাদ সত্য হয়, তবে প্রাদেশিক উষ্মাবৃদ্ধির অনুকূলে এমন ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। শুধু ভারতের ঐক্যবোধ নয়, রামমোহনের জীবনে বিশ্বাত্মবোধ প্রতিমূর্ত হইয়াছিল; স্যার সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষে রাষ্ট্র চেতনা সঞ্চারের অন্যতম আদি ও প্রধান নায়ক একথা সর্বজনবিদিত তথ্য। ইঁহাদের চিত্রের স্থান যদি রাষ্ট্রসভায় না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, "ভারত আবিষ্কারে" পণ্ডিত নেহরু একক যাত্রী, রাষ্ট্রপরিচালন কার্যে যাঁহারা তাঁহার অনুগামী, তাঁহারা সে দুর্গম পথে তাঁহার সহযাত্রী হইতে পারেন নাই।

(চৌদ্দ)

মুরলীকে একবার শুধাতে ইচ্ছা করে দাশুর; ইটা তুর কি রকমের ঢং বটে?

হাঁ ঢং বটে, কিন্তু ঠিক মুরলীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঢং বলে মনে হয় না। যেন কোন্ এক প্রচন্ড তামাসার আত্মা মুরলীর চোখ আর মুখের উপর খেয়ালের ছায়া ফেলে ফেলে খেলা করছে। তা না হলে এরকম কান্ড করবে কেন মুরলী? মুরলীরই জীবনের মরদ যখন তার ঐ অদ্ভুত রকমের শক্ত-শক্ত হাড়মাসের জাদু দিয়ে তৈরি হাত-পায়ের খাটুনি, পাথরের পাটার মত পোক্ত বুকের বিচিত্র দুঃসাহস, আর শান দেওয়া টাঙ্গির নির্ভয় উল্লাসের জোরে দুর্ভাগ্যের এক-একটা কঠোর মতলব ছিন্নভিন্ন করে এই ঘরেরই প্রাণকে উপোস করা কষ্টের জ্বালা থেকে বাঁচাবার জন্য চাল আর মকাই নিয়ে আসে, তখন কেন কেঁদে ফেলে মুরলী? আর ঘরের ডালা আর সরা যখন শূন্য হয়ে যায়, যখন চাল আর মকাই-এর শেষ দানাও ফুরিয়ে যায়, তখন কেন মুরলীর মুখটা হেসে ওঠে?

নিজেকেও একবার শুধাতে ইচ্ছা করে দাশুর, মধুকুপির কিষাণেরও প্রাণের ঢং এমনতর হয়ে গেল কেন? মুরলী যখন কেঁদে ফেলে, তখন দাশুর মুখটা কেন অদ্ভুত এক অহংকারের আরামে হেসে ওঠে? আর মুরলী যখন মুখ টিপে হাসে, তখন ভয় পেয়ে দুরুদুরু করে কেঁপে ওঠে কেন দাশু কিষাণের পাথুরে বুক?

ছোট মধুকুপির গেঁয়ো প্রাণ আর চেহারার উপরেও ক'দিন ধরে একটা প্রচন্ড তামাসার আত্মা যেন খেয়ালের ছায়া ফেলে ফেলে খেলা করছে। মধুকুপির আকাশ রোদের জ্বালায় পুড়ে পুড়ে হাসে, আর মধুকুপির মাটি বানভাসির জলে ডুবে আর ভিজে গিয়ে ছলছল করে। পুব আর দক্ষিণের দিক সবচেয়ে বেশি ভেসেছে। বাবলা বনে এক বুক, আর ঢালুর ক্ষেত-গুলির উপর এক কোমর জল। উঁচু উঁচু ডাঙ্গায় পিঠগুলি শুধু জেগে আছে। তার উপর শকুনের ঝাঁক জিরোয়। কপাল-বাবার জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাবার উপায় নেই। সব খাত জলে ভরে আছে। সাবাই ঘাসের এত বড় জঙ্গলটা পচেই যাবে বলে মনে হয়। পলাশবনের গা ঘেঁষে ডুবো ডাঙ্গার উপর বড় বড় জয়ঢাকের মত মরা গরুর ফোলা-ফাঁপা লাস ভাসে; আর ডাঙ্গার শকুন উড়ে এসে ডানা ধড়ফড়িয়ে পলাশের পাতা ঝরায়।

শুকনো শুধু পশ্চিমটা আর উত্তরটা। নেড়া নেড়া পাথুরে ঢিবি আর কাঁকুরে ডাঙ্গা ধরে যত খুশি এগিয়ে যেতে পারা যায়, সোজা ভুবনপুরে পেঁছে যাওয়া যায়, পায়ে এক ছিটে কাদা লাগবে না। কারণ কাদাই নেই; ক'টা দিনের শাওনে ঝরানিতে মাটি গলেছিল ঠিকই, কিন্তু এই ক'দিনের রোদের ঝাঁঝে সেই গলানি এখন শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছে।

টাঙ্গিটা কাঁধে নিয়ে মিছে তিনটে দিন এদিক ওদিক ঘুরে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিছে ছুটোছুটি করে ঘরে ফিরে এসেছে দাশু। জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাবার পথগুলি যদি জলে ডুবে না থাকতো, তবে অন্তত এই ক'দিনের মধ্যে মণ দুয়েক বুনো লতা উপড়ে নিয়ে এসে, ছেঁচে পিটে আর পাকিয়ে এক গাদা দড়ি তৈরী করে, আর গিরিমাটি দিয়ে সুন্দর করে রাঙিয়ে নিয়ে ঈশান মোক্তারের ভান্ডারে জমা দিতে পারা যেত। কম করেও পাঁচ সের চাল দিত ঈশান মোক্তারের ভান্ডারী। কিন্তু মিছে আশা। টাঙ্গি হাতে নিয়ে ভরানির ছোট পুলের কাছে দাঁড়িয়ে আর জঙ্গলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ঘরে ফিরে এসেছে দাশু।

চার দিনের পর সেই দিন, শেষ এক পোয়া চাল আধ হাঁড়ি জলে ফুটিয়ে নিয়ে ফেনভাত খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে গিয়েই চমকে ওঠে দাশু; আর, মুরলী যেন ঢেঁকুর চাপা দিতে গিয়ে হেসে ফেলে।

সে রাতের ঘুমটাও যেন বার বার ছিঁড়ে যায়। দাশু ঘরামির চোখের উপর অদ্ভুত এক ভয়ের জ্বালা বার বার ছটফট করে। মুরলীর কোমরের উপর হাত রাখতে ভয় করে। এক পোয়া চালের ফেনভাতের আধা ভাগ খেয়ে মানুষের ভুখ মরে না। মুরলীরও ভুখ মরেনি, মুরলীর পেটটা যেন ভয়ানক এক অভিমানে চুপসে রয়েছে। ঘুমন্ত মুরলীর পেটের উপর হাত বোলাতে গিয়ে যেন ফুঁপিয়ে কেঁপে ওঠে দাশু ঘরামির বুকটা। মুরলীর এই পেটের উপর চুমো খেতে গিয়ে যে সুন্দর ধুকপুকে শব্দ শুনে কাল রাত্তিরেও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল দাশুর হৃৎপিণ্ডটা, সেই ধুকপুকে শব্দও কি চুপসে শান্ত হয়ে গেল? দাশুর ছেইলার প্রাণটাও কি উপোস সহ্য করতে গিয়ে অভিমান করে নীরবে কাঁদছে?

দাশুর চোখের জ্বালা ভিজে যায়। দু' হাত দিয়ে ঘষে ঘষে চোখ মোছে দাশু।

ভোর হয়ে এল বোধ হয়। কাক ডাকতে এখনও দেরি আছে। কিন্তু আর দেরি না করে এখনি বের হয়ে গেলে ভাল। খাটুনি খোঁজবার, একটা উপায় বের করবার জন্য বেশী সময় পাওয়া যাবে। তা ছাড়া, ঠান্ডা উনানের উপর হাঁড়ি চড়িয়ে দাশুর মুখের দিকে অদ্ভুত রকমের একটা দৃষ্টি তুলে তাকাবে মুরলী, সে দৃশ্য দেখবার আগেই বের হয়ে যাওয়া ভাল।

—শুনছিস মুরলী?

—কি বলছো?

—আমি বের হলাম।

মুরলীর হঠাৎ-জাগা চেতনার কোন ধিক্কারের শব্দ শোনবার আগেই, মুরলীর মুখে ঝিক করে সেই রহস্যের হাসি ফুটে ওঠবার আগেই টাঙ্গি কাঁধে নিয়ে বের হয়ে যায় দাশু।

কিন্তু বৃথা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মধুকুপির খোলা সড়কের এক ক্রোশের হাওয়া আর আলোর মধ্যে যেন কয়েদীর মত লোহার বেড়ি দিয়ে বাঁধা একটা শাস্তির ভারে অসহায় হয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায়; ছটফট করে আর মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। বানভাসির জল সবে মাত্র মরতে শুরু করেছে। ডাঙ্গার গা থেকে ঝরণার মত জলের ধারা নেমে খাতের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। কে জানে আর কত-দিন লাগবে, কবে বানভাসির সব জল আবার টেনে নেবে ডরানি, আর জঙ্গলে যাবার পথগুলি শুকিয়ে যাবে?

ঈশান মোক্তারের দশটা গরু ভেসে গিয়েছে, সব আউশ জলে ডুবেছে। বাবু দুখন সিং-এর সাবাই ঘাসের জঙ্গল আর কুলের জঙ্গলও জলে ডুবেছে। লা-এর সব ফেকড়ি পচে যাবে নিশ্চয়। মাথায় হাত দিয়ে বানভাসির জলের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকে ঈশান মোক্তারের সরকার আর বাবু দুখন সিং। এক দল মানুঝি মুনিষ খাটবার জন্য ঈশান মোক্তারের কুঠি আর বাবু দুখন সিং-এর দরজায় ধর্ণা দিয়েছিল। সরকারবাবু আর বাবু দুখন সিং দুজনেই রেগে চেঁচিয়ে মানুঝিদের খেদিয়ে দিয়েছে, ডরানির জল তুদিগে ভাসাই লিয়ে যায় নাই কেনে? জ্বালার উপর তুসব আবার জ্বলাতে আসিস কেনে? কি কাজ দিব? কাজ কই? জলের উপর লাচবি?

পলাশবনের কাছে উড়ন্ত শকুনের ছায়া যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে যায়, তখন আস্তে আস্তে হেঁটে ঘরে ফিরে আসে দাশু। পুরনো জাম কাঠের দরজার উপর হাতের ঠেলা দিয়ে একটা শব্দ করবার সাহস দাশুর হাতের হাড়মাস থেকে আলগা হয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে। হাত কাঁপে বুক কাঁপে দাশুর। পেটের ভিতরে ক্ষুধার জ্বালাটাও যেন ভয় পেয়ে সিরসির করে। আজ হেরে গিয়েছে দাশুর জীবনের প্রতিজ্ঞা। শূন্য হাতে এই ঘরের ভিতরে ঢুকে আজ শুধু চুপ করে তাকিয়ে দেখতে হবে, মুরলীর মুখের সেই রহস্যের হাসিটা একটা কাটারির শান দেওয়া হাসির মত জ্বলছে। আজ একেবারে শূন্য হাঁড়ি আর ঠান্ডা উনানের দিকে তাকিয়ে দাশু ঘরামির এই সাধের ঘরের প্রাণ উপোস করবে, আর ঘুমোতে না পেরে ছটফট করবে।

দরজা খুলে দেয় মুরলী। কিন্তু মুরলীর মুখের দিকে তাকায় না দাশু। খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর অলস জীবনের একটা আহত ও ক্লিষ্ট পিণ্ডের মত অনড় হয়ে বসে থাকে দাশু।

মুরলীও কোন কথা বলে না। কিন্তু নিঝুম হয়ে মেজের উপর বসেও থাকে না মুরলী। দেখতে পায় দাশু, দাওয়ার উপর বসে দাঁতন করছে মুরলী। মুরলীর চোখ-মুখ দেখা যায় না, তাই দেখা যায় না, মুরলীর চোখে-মুখে কিসের উল্লাস আর কেমনতর উল্লাস ছটফট করছে। অনেকক্ষণ ধরে দাঁতন করে আর মুখ ধুয়ে ঢকঢক করে এক ঘটি জল খেয়ে যেন একটা শান্তির হাঁপ ছাড়ে মুরলী। তার পরেই ঘরের ভিতরে ঢুকে শুয়ে পড়ে।

অন্য রেড়ির তেলের মেটে বাতিটাকে জ্বালিয়ে নিয়ে দাশু ঘরামি সেই ঘরেরই দেয়ালের ও চালার ফাঁকে হাতড়ে হাতড়ে কি-যেন খুঁজতে থাকে।

মুরলী বলে—কি খুঁজছো?

দাশু—আমার কাঁড়-বাঁশটা আছে কি নাই?

মুরলী—নাই।

দাশু—কেনে?

মুরলী—পচে গেইছিল, ফেলে দিইছি।

হ্যাঁ, পাঁচ বছর আগের সেই কাঁড়বাঁশ নেই। পাঁচ বছরের সময়ের ঘুন মধুকুপির কত পুরনো সাধ আর জোর কেটে কুরে খেয়ে ফেলেছে, নরম একটা কাঁড়বাঁশ রেহাই পাবে কেন?

তবু কি-যেন খুঁজতে থাকে দাশু। ধামন কাঠের ধনুকের সেই বাঁকটা কি নাই? আর ধনুকের তাঁতটাও কি পচে গিয়েছে? এক গোছা তীরও তো ছিল।

—কি খুঁজছো? আবার মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে মুরলী।

—আমার ধনুকটা আর তীরগুলা কি নাই?

—আছে।

হ্যাঁ আছে। চালার বাঁশের সঙ্গে গোঁজা ধনুকটা আর তিনটা তীর নামিয়ে ধুলো ঝাড়ে দাশু। ধনুকের ছিলার তাঁত ছিঁড়ে গেলেও পচে যায়নি। আর তীরের ফলাগুলি মরচে পড়ে ময়লা হয়ে গিয়েছে, এই মাত্র।

ছিলায় ছেঁড়া তাতে নতুন করে গি'ট বাঁধে দাশ্। থামন কাঠের বাঁকের দুই মুখ টেনে নতুন করে ছিলার ফাঁসে ফাঁসিয়ে ধনুকটাকে জাঁইয়ে তোলে। তীরের ফলার মুখগুলিকে ঘষে ঘষে চকচকে করে।

বাতির কাছে তীরের ফলা এগিয়ে নিয়ে দেখতে থাকে দাশ্; দাশুর চোখের তারা দুটোও যেন তীরের ফলার মত ঝিকঝিক করে জ্বলতে থাকে। যেন জীবনের এক ভয়ানক অভিশাপের কলিজা বি'ধে রক্তের ফোয়ারা ছড়িয়ে দেবার জন্য, আর সেই রক্তের লোনা স্বাদ পেট ভরে খেয়ে নাচবার জন্য দাশ্ কিষাণের চোখের তারায় একটা প্রচণ্ড বুনো আশা নাচতে শুরু করেছে। পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, বুকের একটা নিঃশ্বাস যেন হঠাৎ কিসের গ'ুতো খেয়ে শিউরে ওঠে। কিন্তু উপোসের জ্বালা ভুলে গিয়ে যেন একটা কল্পনার নেশায় খুটখাট করে খেলা করছে দাশ্। অলস জিভটাকে এলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ঠোঁট চাটে।

একটা শব্দ। ঘরের নীরবতার ঘুমোট যেন মুখ লুকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছে। চমকে ওঠে দাশ্। মুরলীর দিকে তাকায়।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে আর পাশমোড়া দিয়েছে মুরলী। দু'হাতে মুখ ঢাকাও দিয়েছে। ঠিক বুঝতে পারে না দাশ্, খিলখিল করে হেসে উঠলো, না খিলখিল করে কে'দে উঠলো মুরলী। কিন্তু......।

কিন্তু মুরলীর কাছে এগিয়ে যেয়ে মুরলীর মুখটাকে দেখবার সাহস আর নেই মধুকুপির সেই গে'য়ো তেজ আর দেমাকের মজবুত কিষাণ দাশ্ ঘরামির বুকে।

বাতি নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে দাশ্। মধুকুপির রাতের প্রহরের সব ক্লান্তি যেন ঝি'ঝির ডাকের সঙ্গে কান্না মিশিয়ে দিয়ে বাজতে থাকে। দাশুও যেন জাগা চোখের একটা আক্রোশ ঘরের অন্ধকারে লুকিয়ে রেখে চুপ করে বসে থাকে। ভোর হতে আর বাকি কত?

ডাঙ্গাটা এদিকে আধ ক্রোশ আর ওদিকে আধ ক্রোশেরও বেশি হবে। মাঝে মাঝে বুড়ো বয়সের এক একটা বট, তা ছাড়া ডাঙ্গার বাকি সব ঠাঁই জুড়ে ফণী-মনসা, বাঘভেরেণ্ডা আর ময়না কাঁটার ঝোপ। এই ডাঙ্গাটা জলে ডোবেনি; আর, পাকুড়তলার কাছ থেকে হাঁটা দিলে এই ডাঙ্গায় পৌঁছতে এক ঘণ্টার বেশি সময়ও লাগে না। পৌঁছতেও খুব বেশি অসুবিধা নেই। পাকুড়তলা থেকে ডাঙ্গার পশ্চিমের গড়ানি পর্যন্ত এক হাঁটুরও কম জল ছপছপ করে।

পাঁচ বছর আগে এই ডাঙ্গায়ই ঝোপের আড়ালে বসে ঢোলক পিটিয়ে একটা ছাগলা হরিণকে ভয় পাইয়ে দিয়ে ঝোপের ভিতর থেকে বের করেছিল দাশ্। কাঁড়-বাঁশ চালাতে হয়নি। একটা পাথর ছু'ড়ে ছাগলা হরিণটাকে ঘায়েল করেছিল। সুরেন মানুঝিও ফাঁদ পেতে এই ডাঙ্গার ঝোপ-ঝাপের ভিতরেই কত খরগোস আর ছাগলা হরিণ কতবার ধরেছিল।

ডাঙ্গার বাকি তিন দিকেই জল; সে জলে ঢালুর আর খাতের সব ঝোপঝাপ ডুবে গিয়েছে। শুধু পূব দিকের জলে টান

ধরেছে। পাথরের চটানের ধাপে ধাপে প্রপাতের মত জল গড়িয়ে পড়ছে। টানের জোর কম নয়; জলের শব্দেরও বেশ রাগ আছে।

ধনুক আর তিনটে তীর; একটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে ডাঙ্গার ঝোপ-ঝাপের ভিতর দিয়ে পা টিপে টিপে ঘুরতে থাকে দাশু। ভোরের ফিকে অন্ধকার মুছে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সকালবেলার লালচে রোদ ঝলক দিয়ে ডাঙ্গার বুকে লুটিয়ে পড়েছে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে দাশু। পাঁচ বছর আগে শত শত বটের আর তিতিরে ছেয়ে থাকতো যে ডাঙ্গাটা, সেই ডাঙ্গার কোথাও একটা পাখির ডাকও শোনা গেল না।

ঝোপঝাপও কত ফাঁকা হয়ে গিয়েছে! এক কণা ধুলোও নেই। শুধু কাঁকর আর কাঁকর, আর ভোঁতা ভোঁতা কালো পাথরের ধড়। মাঝে মাঝে ঘেসো সবুজের ছোট ছোট ছিটা দেখা যায়। শাওনের জলে ধোয়া হয়ে পরিষ্কার কাঁকরগুলি ঝকঝক করে। দাশুর পায়ের চাপে করকর ক'রে বাজে।

ফণী-মনসার চেহারাও কত ফ্যাকাসে; উইঢিবির সঙ্গে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে এক একটা ঝোপ। বাঘভেরেণ্ডার পাতায় মাকড়সার ছেঁড়া জাল সাদা জটার মত গুটলি পাকিয়ে পড়ে আছে। ময়না কাঁটার শুধু কাঁটা আছে, পাতা প্রায় নেই। এই শাওনের জলেও সবুজ হয়ে ওঠেনি ঝোপ-গুলি। ছাগলা হরিণ ধরবার আশা ছেড়ে দেয় দাশু। এখানে ছাগলা হরিণ থাকতে পারে না।

কিন্তু খরগোসও কি নেই? ঝোপঝাপে এত গর্ত; এই সবই যে খরগোসের গর্ত। কিন্তু কই, এতক্ষণ ধরে তাক করে পাথরের আড়ালে বসে থেকেও গর্তের মুখ থেকে একটাও খরগোসের মুখ উঁকি দিয়ে তাকালো না কেন? সবাই কি হুড়পা বানের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছে? কিংবা, এই রুক্ষ আর শুকনো ডাঙ্গাটাকেই ঘেন্না করে চলে গিয়েছে?

রোদের তাত বাড়ে। দাশু ঘরামির আদুড় শরীর ঘামে ভিজে গিয়ে চকচক করে। বটের মাথার দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় দাশু, একটা হরিয়াল ঘুঘুর ছায়াও কোথাও উসখুস করে না।

শক্ত করে ধনুকটাকে এক হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে, আর এক হাতে একটা তীর দোলাতে দোলাতে আবার ঝোপঝাপের যত ছায়া আর যত রন্ধ্রের দিকে অপলক চোখের একটা জ্বালাময় পিপাসা ছুঁড়ে দিয়ে ঘুরতে থাকে দাশু। একটা গর্তের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। এক গাদা শুকনো পাতা জড়ো করে গর্তের মুখে ফেলে দিয়ে আগুন ধরায়। পোড়া পাতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে; চাপ-চাপ ধোঁয়া হেলে-দুলে ভাঙ্গে আর ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বৃথা। গর্তের মুখ থেকে কোন আতঙ্কিত খরগোসের মূর্তি হুট করে বের হয়ে ছুটে পালায় না। ধোঁয়ার জ্বালা লেগে দাশুর চোখ দুটো জ্বলতে থাকে।

বেলা বাড়ে। দাশুর চোখ দুটো ঠিক দিনের বেলার নেকড়ের মতই হিংসুটে ক্ষুধার জ্বালায় কুঁচকে শীর্ণ হয়ে চারদিকের যত ঝোপঝাপের ছায়ার দিকে তাকায়। দাশুর ছায়াটাও যেন লোভী জানোয়ারের মত ঝোপঝাপের গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঘুরতে থাকে। এত বড় ডাঙ্গার মধ্যে কি একটাও মাংসল প্রাণ কোথাও লুকিয়ে নেই? না থাকলে চলবে কি করে? দাশু ঘরামির জীবনের স্বপ্ন যে উপোসের জ্বালায় চুপসে মরে যেতে বসেছে!

ডাঙ্গার ভিতরে এদিকে ওদিকে ছুটতে থাকে দাশু। পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে নীরব ঝোপগুলিকে জখম করে করে ছুটতে থাকে। তার পরেই ক্লান্ত হয়ে একটা উই-ঢিপির কাছে বসে পড়ে ধুঁকতে থাকে দাশু।

কিন্তু বসে থাকতে পারে না। উই-ঢিবির ধুলো গায়ের ঘামের সঙ্গে জড়িয়ে কাদা হয়ে যায়। দাশুর চেহারাটাও একটা আহত জানোয়ারের মত দেখায়। আবার ডাঙ্গার ঝোপঝাপের সব ছায়া আর সব গর্তের দিকে চোখ রেখে এদিক থেকে ওদিকে ছুটতে থাকে দাশু।

থমকে দাঁড়ায় দাশু। দাশুর ঘামে ভেজা মুখের উপর যেন শুভক্ষণে সফল স্বপ্নের আশীর্বাদ ঝরে পড়েছে। সাদা দাঁতের দুই পাটি ঘষা খেয়ে আস্তে একটা শব্দ করে ওঠে, আর যেন সাদা হাসির উল্লাস ঠিকরে পড়ে।

একটা খরগোস। বেশ বুড়ো হয়েছে খরগোসটা। মাথার রোঁয়া অনেকখানি ঝরে পড়ে গিয়েছে। একটা পা খোঁড়া। চোখের কোণে পিঁচুটি। বুড়ো খরগোসটা ফণী-মনসার ছায়ার কাছে মরা ঘাসের অংকুর খুঁড়ে খুঁড়ে বের করছে, আর সামনের দু' পায়ের ছোট দুটি থাবা দিয়ে তুলে ধরে খাচ্ছে। এত বড় ডাঙ্গার ঝোপঝাপের মধ্যে বোধ হয় এই বুড়ো খরগোসটাই একলা পড়ে আছে; ডরানির বানের শব্দ শুনেও পালিয়ে যেতে পারেনি।

ধুলোতে হাত ঘষে নিয়ে হাতের ঘাম মুছে, ধামন কাঠের ধনুকে একটা টোকা দিয়ে আর তীর জুড়ে দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় দাশু। কিন্তু বৃথা ... সেই মুহূর্তে এক লাফ দিয়ে ফণীমনসার ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল খরগোসটা।

কিন্তু যাবে কোথায়? হেসে ওঠে দাশু। বুড়ো খরগোসের পেটও ক্ষিধেয় জ্বলছে যে, নইলে মরা ঘাসের অংকুর খাবে কেন? বের হয়ে আসতেই হবে, আর কতক্ষণই বা কোন্ গর্তে লুকিয়ে থাকতে পারবে?

ধনুকে তীর জুড়ে আর নিথর হয়ে একঠায় দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। দাশুর চোখের চাহনিটাও যেন লালায় ভরে গিয়ে চকচক

করে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটোকে চেটে চেটে ভিজিয়ে তোলে দাশু।

বেলা বাড়ে। দাশুর চোখের আশাও ক্লান্ত হয়ে যেন নেতিয়ে পড়ে। আবার সরে গিয়ে অন্য দিকে তাকায় দাশু। তার পরেই মরিয়া হয়ে ছুটতে থাকে। হ্যাঁ, সেই বুড়ো খরগোসটাই বাঘভেরেণ্ডার ছায়ার কাছে সবুজ ঘাসের একটা ছিটার কাছে বসেছিল। দাশুর ছায়া দেখতে পেয়েই দৌড় দিয়েছে।

খ্যাঁড়িয়ে খ্যাঁড়িয়ে ছুটছে বুড়ো খরগোস। তীর চালায় দাশু। কিন্তু খরগোসটার খাড়া কান দুটো কী ভয়ানক চতুর। কান দুটো দিয়ে মাথা ঢেকে আর মাথাটাকে চকিতে নামিয়ে দিয়ে আর একটা ঝোপের ভিতরে লাফ দিয়ে পড়লো খরগোসটা। ডাঙ্গার পাথরের উপর মিছা আছাড় খেয়ে পড়ে তীরটা দু' টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেল।

কিন্তু সেই ঝোপের কাছে একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে যায় দাশু। আবার ধনুকে তীর জুড়ে দিয়ে ছটফট করে লাফাতে আর হাঁপাতে থাকে দাশু। কিন্তু কই? ঝোপের ভিতরে কোন ভীরু খরগোস মুখ গুঁজে পড়ে নেই। পালিয়েছে ধূর্ত ঠগটা। দাশু ঘরামির ক্ষুধার লালসা আর জ্বালাকে যেন ঠাট্টা করে করে খেলে বেড়াচ্ছে খরগোসটা।

আবার সরে যায় দাশু। চলতে চলতে একটা গর্তের কাছে থমকে দাঁড়ায়। গর্তের মুখের কাছে যেন এইমাত্র হালকা ধুলো উড়েছে; তারই রেশ এখনও রয়েছে। দাশুর সারা মুখ জুড়ে আবার একটা আশাময় সন্দেহের হাসি থমথম করে। বাঘভেরেণ্ডার আগডালের কচি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এসে গর্তের মুখের কাছে ফেলে দিয়ে একটু আড়ালে সরে দাঁড়ায় দাশু। ধনুকে তীর জুড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাতে থাকে।

বিকালের আলো লাল হয়ে এসেছে। আকাশের দিকে চোখ পড়তেই দুরু দুরু করে কেঁপে ওঠে দাশুর কাদাতে ঘামে পিছল হয়ে যাওয়া বুকটা। ঐ খরগোসটাকে বিঁধে নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে; কিন্তু সময় যে আর বেশি নেই। কখন বের হবে খরগোসটা?

আশায় রঙীন হয়ে চমকে ওঠে দাশুর চোখ। গর্তের ভিতর থেকে মুখ বের ক'রে কচি পাতার উপর ছোট থাবা এগিয়ে দিয়েছে খরগোসটা। তীর ছাড়ে দাশু। কিন্তু বৃথা। খরগোসটা যেন মাথা কাত ক'রে একটা লাফ দিয়ে গর্তের মুখ থেকে বের হয়ে দৌড় দেয়। দাশুর তীর গর্তের মুখের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে এক মুঠো ধুলো উড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বুড়ো খরগোসের তিন পায়েও এত জোর ছিল। খ্যাঁড়িয়ে খ্যাঁড়িয়ে ছুটলেও কত জোরে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে যাচ্ছে বুড়ো খরগোসটা! দাশুও যেন প্রাণ মন ও শরীর এক উদ্দাম লোভের নেশায় মাতিয়ে নিয়ে খরগোসটার পিছু ধাওয়া ক'রে ছুটতে থাকে।

একটা পরিষ্কার পাথরের উপর বসেছে খরগোসটা। খোঁড়া পায়ের ধুলো চাটছে। জিরোচ্ছে; হ্যাঁ, জিরোতে থাকুক। দাশুও একটা পাথরের আড়ালে হাঁটু পেতে বসে, আর খরগোসের দিকে অপলক চোখের নজর রেখে হাঁপধরা বুকের ধড়ফড়ানি একটু জুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। এইবার খুব সামলে, খুব সাবধানে, শেষ তীরের মরণ-বিঁধ ছুঁড়তে হবে।

খরগোসটা বুড়ো হলেও বেশ ডাগর। কিন্তু মুড়োটা ফেলে দিতেই হবে, ঘা আছে মাথায়। পিছনের ঠ্যাং দুটো পল্টনী দিদিকে দিলে দু' সের হাঁড়িয়া পাওয়া যাবে নিশ্চয়। পল্টনী দিদির ঘরে আগে তো সব সময় হাঁড়িয়া জমা থাকতো। এখনও কি নাই? আছে নিশ্চয়।

যদি বেলা থাকে, তবে কোনারের কচি পাতা যোগাড় করতে পারা যাবে। কোনারের কচি পাতা সিদ্ধ ভাল, খেতেও মিঠা মিঠা লাগে। একটু দূরে যেতে হবে। হোই পেঁচা টাঁড়ের দিকে, যেখানে অনেকগুলি কোনার গাছ সেদিনও দেখতে পেয়েছে দাশু। এক হাঁড়ি গরম গরম শাক-মাস আর পাঁচ চুমুক হাঁড়িয়া। খুশি হবে না কি মুরলী? হেসে ফেলবে না কি মুরলী?

দু' কান খাড়া ক'রে আকাশপানে তাকিয়েছে খরগোসটা। মরা বিকালের ছায়া-ছায়া আলো আর লালচে আভা মেখে টুকটুক করছে খরগোসটার লাল চোখ। দাঁতে দাঁত চেপে তীর ছাড়ে দাশু।

স্বাধীন মালয়

সরোজ আচার্য

[**পরিচয়-পঞ্জী—**আয়তন—৫০,৬৯০ বর্গ-মাইল। জনসংখ্যা (১৯৫৫)—৬,০৫৮,৩১৭—মালয়ী ২,৯৬৭,২৩০; চীনা ২,২৮৬,৮৮৩; ভারতীয় ও পাকিস্থানী—৭১৩,৮১০। **রাজধানী—**কুয়ালালামপুর (জনসংখ্যা—৩ লক্ষ)। বিদ্যালয় সংখ্যা—৪৫৭২; ছাত্রছাত্রী সংখ্যা—৮০৩,৭০৩; হাসপাতাল সংখ্যা—৭১। **প্রধান উৎপাদন—**রবার চাষ—৩,৭২৭,৫৪০ একর। ধানচাষ—৮৪৫,৯৯০ একর। টিন—পৃথিবীর মোট সরবরাহের ⅓ অংশ—৬২,২৯৫ টন (১৯৫৬)।]

স্বাধীনতার পতাকা উঠল এশিয়ার আরও একটি দেশে; ৩১শে আগস্ট মালয় ফেডারেশন সার্বভৌম জাতিরূপে পূর্ণ স্বীকৃতি পেল। মালয়ের স্বাধীনতা-প্রাপ্তি উৎসবে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে এসেছেন ডিউক ও ডাচেস অব গ্লস্টার। প্রায় একশ বছরের পুরোনো ব্রিটিশ রাজকীয় উপনিবেশ মালয় এখন স্বাধীন মর্যাদা ও ক্ষমতায় কমনওয়েলথের সদস্যপদ গ্রহণ করল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পটভূমিতে মালয়ের স্বাধীনতা লাভ ভারতের পক্ষেও বিশেষ আনন্দের বিষয়। বহুজাতির দেশ মালয়ে ভারতীয়দের সংখ্যা নগণ্য নয়; মালয়ের আর্থিক বিকাশে তাদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। ভারতের পক্ষ থেকে মালয়-বাসীদের স্বাধীনতা উৎসবে প্রতিনিধিত্ব করতে গেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পাটিল।

খুব ছোট দেশ মালয়, আকারে ইংলণ্ডের সমান অথবা সিংহলের প্রায় দ্বিগুণ। ৫০,৬৯০ বর্গমাইল আয়তনের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ অঞ্চল গভীর জঙ্গলে ঢাকা। বাকী একপঞ্চমাংশে আছে রবার ক্ষেত, টিনের খনি, ধানের ক্ষেত, নারকেল বাগান, তৈল-পাম বাগিচা এবং অন্য নানারকম কৃষিকাজ।

এই অরণ্যময়, পর্বতসংকুল সংকীর্ণ উপদ্বীপটি উত্তরে পারলিস থেকে দক্ষিণে সিংগাপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর প্রস্থ কোথায়ও ২৭০ মাইলের বেশি নয়। এক-দিকে ভারত মহাসাগর আর একদিকে দক্ষিণ চীন সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে মালয় উপদ্বীপটি ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক ভূমি-সেতুর কাজ করছে। দুই সমুদ্রপথে ভারতীয় ও চীনা দুটি সংস্কৃতির ঢেউ মালয়ের উপকূলে এসে লেগেছে। এশিয়ার মূল ভূখণ্ড এবং ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বীপময়
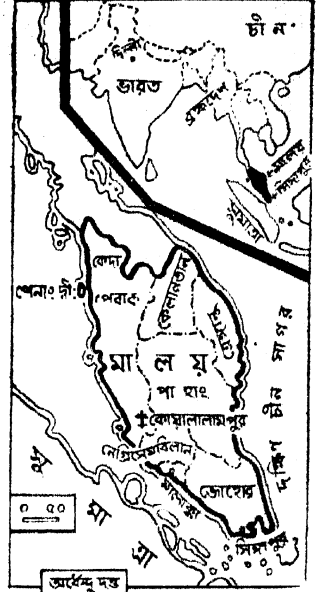
অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ রেখেছে মালয় উপদ্বীপ।

ঐতিহাসিক দিক থেকেও মালয়ের বৈচিত্র্য স্মরণীয়। বহুজাতির দেশ আধুনিক মালয় তার সুদূর অতীতের ইতিহাস প্রায় ভুলেই গিয়েছে। মালয়ের গত একশ বছরের ইতিহাস হ'ল প্রধানত য়ুরোপীয় (ব্রিটিশ)

মালয় ফেডারেশনের প্রধান মন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান

উপনিবেশবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের কাহিনী। এই বিংশ শতাব্দীতে যে মালয়কে আমরা জেনেছি সে হ'ল রবার বাগিচা, টিনের খনি, কুলি কামিন এবং সর্বোপরি প্ল্যাণ্টার সাহেবদের মালয়; সিংগাপুর বন্দরের মারফত পশ্চিম মুল্লুকে কাঁচামালের যোগানদার "ফেডারেটেড্ স্টেট্স অফ্ মালয়" অথবা এফ্ এস্ এম। সুলতানদের ৯টি রাজ্য ও মলাক্কা এবং পেনাং মিলিয়ে মালয় ফেডারেশন গঠিত।

মালয় উপদ্বীপের হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম যুগের ইতিহাস বৃহত্তর ভারতের অংশভুক্ত। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলই ছিল ভারতের রাজনৈতিক প্রভাবাধীন। হিন্দুযুগ থেকেই লবঙ্গ ও সুগন্ধি মশলা ইত্যাদি বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে মালয় সুপরিচিত ছিল। অবশ্য মালয় দ্বীপপুঞ্জ বলতে মালয় উপদ্বীপ ছাড়া সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি ইন্দোনেশীয় দ্বীপগুলিও বোঝাত। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে হিন্দু

মালয়ী ধীবর

বণিকেরা মালয় উপদ্বীপে যাতায়াত শুরু করেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে শ্রীবিজয় ও শৈলেন্দ্র রাজ্যের শক্তি সুমাত্রা এবং মালয় উপদ্বীপে বিস্তৃত হয়। ৯ম শতাব্দীর আরব লেখকরা পালেমবং নামে যে বিরাট বৌদ্ধ রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন তার অবস্থিতি ছিল বর্তমান মালয়ের 'কেদা' রাজ্যে; সিংগাপুরের প্রাচীন ঐতিহাসিক খ্যাতিও শ্রীবিজয় রাজ্যের সংগে জড়িত, এরূপ অনুমান করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়—মালয়ের 'কেদা' রাজ্যে আবিষ্কৃত প্রাচীন বৌদ্ধ নিদর্শন; উত্তর ভারতের নাগরী লিপি খোদিত (৭ম—১০ম শতাব্দীর) মাটির ফলক; গ্র্যানাইট পাথরে গড়া দেবীমূর্তি; সেইরকম মলাক্কা দ্বীপে পাওয়া পাথরের মকর মূর্তি। মালয় ও বৃহত্তর ভারতে হিন্দু প্রভাবের অবনতি শুরু হয় দশম শতাব্দী থেকে। মালয় এবং ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে ইসলামধর্ম আনীত হয় একাদশ, দ্বাদশ শতাব্দীতে। আরব ব্যবসায়ীরাই সম্ভবত ইসলামের প্রচারে অগ্রণী হন। ১৫শ শতাব্দী নাগাদ মালয়ের অধিবাসীরা ইসলামের সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। তবুও যেমন ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দোচীন এবং শ্যামদেশে তেমনই মালয়েও প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি জনজীবনের স্তরে স্তরে সংরক্ষিত রয়েছে। মালয়ের উত্তর অঞ্চলে রামায়ণের কাহিনী সকলেরই জানা। কালী, বিষ্ণু, শিব এবং গরুড় মালয়ী মুসলমান ফকিরদের মন্ত্রে উচ্চারিত। মালয়ী পৌরাণিক কাহিনীতে অর্জুনও আছেন। হিন্দু এবং ঐশ্লামিক ধর্মাচরণের সংমিশ্রণের চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায় পেরাক রাজ্যের সুলতানের অভিষেক-উৎসবে। অভিষেকের সময় আরবী অক্ষর খোদাই করা তরবারি নেন সুলতান; নকীব ঘোষণা পাঠ করে সকলের দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় আর সুলতানের কানে গোপনে শোনান হয় তাঁর প্রাচীন ভারতীয় পূর্ব-পুরুষদের নাম।

মালয়ের হিন্দু ও মুসলিম যুগের অবসান ঘটল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগীজ জলদস্যু এবং বণিকদের আবির্ভাবে। প্রথমে পর্তুগীজ, তারপর ওলন্দাজ, তারপর ইংরেজ; ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে এশিয়ায় সাম্রাজ্য-বাদের প্রতিষ্ঠায় এই তিন জাতিই অগ্রণী। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলবুকার্ক ১৫১১ সনে মলাক্কা দ্বীপ দখল করেন। ১৬৪১ সনে মলাক্কা যায় ওলন্দাজদের অধিকারে; ১৭৯৫ সনে ইংরেজ দখল করে মালয়ের এই গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপটি; ১৮১৪ সনে মলাক্কা ওলন্দাজদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়; তারপর আবার ১৮২৪ সনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পাকাপাকিভাবে মলাক্কার দখল বন্দোবস্ত করে নেয়। এর পূর্বেই ১৭৮৬ সনে "কেদা"র সুলতানের কাছ থেকে পেনাং দ্বীপটি কোম্পানী বন্দোবস্ত করে

নিয়েছিল। অতঃপর খাস মালয়ের রাজ্যগুলিকে ব্রিটীশ কর্তৃত্বের অধীনে আনা হয় চিরাচরিত কায়দায়। সিংগাপুর ইতিপূর্বেই ১৮১৯ সনে ইংরেজরা দখল করেছিল। খাস মালয়ে ৯টি রাজ্যের সুলতানেরা গত শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটীশ কর্তৃত্ব মেনে নেন। প্রথমে ১৮৭৪ সনে পেরাকের সুলতানকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করে ব্রিটীশ রেসিডেন্ট ও ব্রিটীশ পরামর্শ নিতে বাধ্য করা হয়। ক্রমে ক্রমে বাকী সুলতানেরাও ঐরকম শর্তাধীন হন। এইভাবে নামে না হলেও কার্যত মালয় উপদ্বীপ ব্রিটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

মালয়ে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যিক শাসন ব্যবস্থার গড়ন অনেকটা ভিন্ন ধরনের ছিল। সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং ভারতেও প্রাচীন রাজবংশ এবং রাজন্যগুলি ব্রিটীশ আমলে প্রায় সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করা হয়। মালয়ে সুলতানদের শাসন ব্যবস্থা ব্রিটীশ আমলেও মোটামুটিভাবে চালু রাখা হয়েছে। মালয়ী মুসলমানদের সামাজিক জীবনেও ব্রিটীশ শাসন কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেনি, যেমন চেষ্টা হয়েছিল ব্রহ্মদেশে, ভারতে এবং সিংহলে। মালয়ী মুসলমানরা তাই শিক্ষা দীক্ষা রাজনীতিতে দীর্ঘকাল অনগ্রসর হয়ে ছিল।

মালয়ের স্বাধীনতা চুক্তি স্বা—

মালয়ের ব্রিটীশ হাই-কমিশনার স্যার ডোনাল্ড ম্যাক্‌গিলিভার

শাসন ব্যবস্থায় সুলতানদের মারফত পরোক্ষ ব্রিটীশ কর্তৃত্বের ফলাফল সম্ভবত ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের পক্ষে ভালই হয়েছিল। অন্তত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত মালয়ে কোনোরকম স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্ভাবনা নিয়ে ব্রিটীশ কর্তাদের মাথা ঘামাতে হয়নি। খাস মালয়ীদের মধ্যে খুব সামান্যই শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছিল; কোনও মালয়ী রাজনৈতিক দল, খবরের কাগজ এসব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কল্পনার অতীত ছিল।

রাজনৈতিক পরিবর্তনে বিলম্ব ঘটলেও এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই মালয়ের জমিতে এক বিরাট অর্থনৈতিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। এই পরিবর্তনের নিয়ন্তা হ'ল রবার গাছ। ভিকি বাউমের বিখ্যাত একখানি উপন্যাসের নাম হ'ল "উইপিং উড"— রোদনরত বৃক্ষ। রবার গাছের যে রস দিয়ে মোটরগাড়ির টায়ার তৈরী করা হয় সেই রসই আবার অসংখ্য কুলি কামিনের চোখের জলে মেশানো। গাই উইণ্ট তাই বলেছেন, "আধুনিক মালয় গড়া হয়েছে কুলীদের হাড়ের উপর"। প্রথম রবার গাছ মালয়ে আনা হয় ১৮৭৭ সনে। এই গাছগুলির বংশধরেরা এখন মালয়ের প্রায় ৪,০০০,০০০ একর পরিমাণ জায়গা জুড়ে আছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পথরেখা

এক যুগ পূর্বে ঘটলে মালয় উপদ্বীপে নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব বিস্ময়ের সাড়া সৃষ্টি করতে পারত। এশিয়া-আফ্রিকার বিদেশী শাসনের ঐতিহাসিক রূপান্তর এখন প্রায় বিশ্ব-বিধান ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। স্বাধীনতা পাওয়া অথবা দেওয়ায় এখন বিস্ময় অসামান্য। এশিয়া-আফ্রিকার নূতন স্বাধীন দেশগুলির ভাবনা এখন অর্জিত স্বাধীনতাকে সার্থক করা, নিরাপদ দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির উৎসব শেষে মালয়েরও হবে এই ভাবনা।

১৯৪৭ সনে ভারতে ব্রিটীশ শাসনের অবসানে যার শুরু, তারই ধারাবাহী পরিণতি ১৯৫৭ সনে মালয়ের স্বাধীনতা প্রাপ্তি। মূল এশীয় ভূখণ্ড থেকে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অপসরণ হ'ল দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রাণী প্রথম এলিজাবেথের যুগে ব্রিটেনের সামুদ্রিক বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য রচনার সূচনা; রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের যুগে সাম্রাজ্যের গৌরবসূর্য প্রায় বিলীয়মান। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যিক শক্তির ক্ষয় এবং বিলয়ে ক্ষোভের কিছু নেই, তেমনি এর জন্য উল্লাস বোধ

ব্রিটীশ উপনিবেশ সচিব মিঃ অ্যালান লেনক্স বয়েড

করাও শোভন নয় হয়ত। বিদেশী শাসন থেকে যারা দীর্ঘকাল পরে মুক্তি পায় তারা অবশ্য বিদায়ী বিদেশী শাসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে ওঠে না। তবে ফরাসী-ওলন্দাজ-পর্তুগীজ শাসকদের চেয়ে বৃটীশ শাসকেরা অনেক বেশি বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে। তার ফলে ব্রিটেনের সঙ্গে নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব। মালয়ের স্বাধীনতা প্রাপ্তি উপলক্ষে ব্রিটেন দাবী করছে যে, তার উপনিবেশ-নীতির উদ্দেশ্য চিরকালই সাধু ছিল। প্রমাণ? প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত ব্রিটেন তার শাসনাধীন ১১টি দেশকে স্বাধীনতা দিয়েছে।

ভারত, পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও ঘানার (গোল্ড কোস্ট) তুলনায় মালয়ের স্বাধীনতা বিলম্বিত হয়েছে। ব্রিটীশ সরকারের মতে, এর কারণ মালয়কে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছা নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কাল পর্যন্ত রাজনীতির দিক দিয়ে মালয় ছিল খুবই অনগ্রসর। তাছাড়া, মালয়ের জনসংখ্যার তিনটি প্রধান সম্প্রদায়, মালয়ী, চীনা ও ভারতীয়দের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ নাকি আর একটি কারণ। কারণ যাই হোক না কেন, যুদ্ধ-পরবর্তী কালের প্রথম পর্বে ব্রিটীশ কর্তারা মালয়কে পূর্ণ স্বাধীনতা দূরের কথা, পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনও দিতে চান নি। আজ এই মুহূর্তে মালয়ের স্বাধীনতা প্রাপ্তি স্বেচ্ছায় শান্তি-পূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর ব'লে মনে হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে ব্রিটীশ সরকারের ইচ্ছাকে পরিচালিত করেছে গত দশ বৎসরের
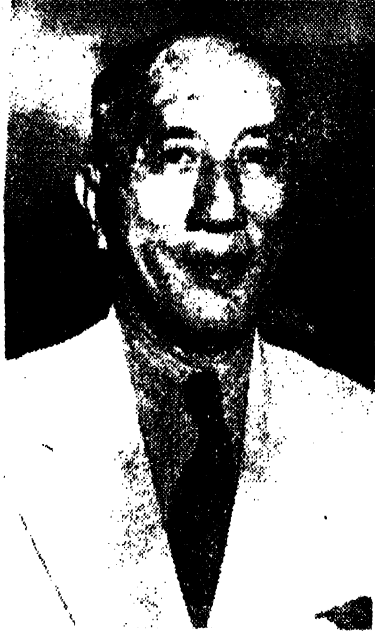
মালয়-চীনা সঙ্ঘের সভাপতি ডাটো স্যার চেং লক টান

কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা ও শক্তি-সমাবেশ। রাজা চার্লসের ছিন্নমুণ্ডের মতো স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে মালয়ে কম্যুনিস্ট পরিচালিত বিদ্রোহের কথা এসে পড়ে। যে ঘটনাবলী ও শক্তি-সমাবেশ মালয়ের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পথ রচনা করেছে তার একটি হ'ল, মালয়ে গত ৯ বৎসরব্যাপী বিদ্রোহ এবং তার বিরুদ্ধে নিযুক্ত ব্রিটীশ সামরিক অভিযানের ব্যর্থতা।

মালয়ের রাজধানী কুয়ালালামপুর

মালয়ের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরিবেশ রচনা শুরু হয় প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম পর্বে। ১৯৪২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিংগাপুরের পতন হ'ল এশিয়ায় ব্রিটীশ সাম্রাজ্যিক শক্তির চূড়ান্ত বিপর্যয়। ভার্জি-নিয়া টম্সন তাঁর "পোস্ট মর্টেম ইন্ মালয়" গ্রন্থে দেখিয়েছেন, উপনিবেশিক শাসন জন-সাধারণকে নিবীর্য করে, এক বিদেশী শক্তির আক্রমণ থেকে বিদেশী প্রভুর নিরাপত্তার জন্য লড়াইয়ে তারা উৎসাহ বোধ করে না। মালয়ে, ব্রহ্মে ব্রিটীশ সামরিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ ছিল এই। প্রায় একইরকম কারণে মালয়ের বিদ্রোহী কম্যুনিস্ট গেরিলাদের বিরুদ্ধে ৯ বৎসর ধ'রে ব্রিটীশ সামরিক অভিযান চূড়ান্তভাবে সফল হতে পারেনি। মালয়ী জনসাধারণ কম্যুনিস্টদের সশস্ত্র বিদ্রোহের সমর্থক নয়, কিন্তু বিদ্রোহী গেরিলাদের পরাজিত করার জন্য ব্রিটীশ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা মালয়ী জনসাধারণ করেনি। মালয়ে ব্রিটীশ-বিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহ সফল হয়নি। তবে এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যদি স্বাধীনতা লাভ হয় তা' অনেক পরিমাণে সফল হয়েছে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২-৫৩ সন পর্যন্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে ব্রিটীশ সামরিক শক্তির প্রবল সংঘর্ষ চলেছে। বিদ্রোহ দমনে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য গত ৯ বৎসর ধরে প্রতি মাসে খরচ হয়েছে এক কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ কোটি টাকা। দুর্ধর্ষ ব্রিটীশ জেনারেল জেরাল্ড টেম্পলার ১৯৫২-৫৩ সনে বিদ্রোহীদের কোণঠাসা করতে পারেন বটে, কিন্তু মালয়ের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। ইতিমধ্যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক ঘটনায় ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের নেতারা মালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নূতন করে ভাবনার তাগিদ অনুভব করলেন। মূল চীন ভূখণ্ড থেকে মালয় পর্যন্ত কম্যুনিস্ট প্রভাবের অগ্রগতি প্রতিরোধ করার সমস্যা সংগীন হ'ল। মালয়ের জনসাধারণকে জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে সংগঠিত করা ছাড়া ব্রিটীশ কর্তাদের আর উপায় ছিল না। ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদী একগুঁয়েমির জন্য ফরাসীদের চড়া দাম দিতে হ'ল, ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অভিভাবকেরা সেটাও রীতিমত অনুভব করলেন ১৯৫৪-৫৫ সন নাগাদ। এদিকে মালয়ী জন-সাধারণ নিষ্ফল বিদ্রোহের উৎপাত এবং ব্রিটীশ ফৌজী শাসনের জবরদস্তিতে ক্রমশ অধীর হয়ে পড়ল। ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনা ও জাতীয় সংগঠন গড়ে উঠেছিল দীর্ঘকালের সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। মালয়ের জাতীয় জাগরণ ও রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব এবং বিকাশ হ'ল মহাযুদ্ধ শেষের গত আট নয় বৎসরে। গাই উইণ্ট তাঁর "স্পট লাইট অন্ এশিয়া" বই-এ মালয়ের রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারাটি বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

"At the end of the war, Malay nationalism was only in its start... The Communist rebellion, which started on 1948, caused many complications, but certainly speeded up the evolution of self-government... Fortunately the British Government, taking stock of the lesson of Indo-China, seems to have decided that the best of hope avoiding being entrapped, as the French were enrapped, is to press on with the setting up of a national government in Malaya."

সংক্ষেপে বলা যায়, সর্বনাশ সমুৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখে ব্রিটীশ কর্তারা মালয়ের শাসনভার মালয়বাসীর জাতীয় গভর্নমেণ্টের উপরে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হন।

১৯৪৮ সনে ব্রিটীশ উপনিবেশ সচিব মালয়ে নামমাত্র শাসন সংস্কার দিয়ে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিশ্রুতিটি কোনো প্রকারে রাখেন। ঐ বৎসরে প্রথম ফেডারেল শাসন-তন্ত্র প্রবর্তিত হয়; তবে শাসনক্ষমতার আসল পনের আনা থাকে ব্রিটীশ সরকারের আমলাদের হাতে; আইন পরিষদেও বেশির ভাগ থাকে সরকারী মনোনীত সদস্য। বিদ্রোহ ব্যাপক আকার নিলে পর ১৯৫১ সনে আর এক দফা শাসন সংস্কার দেওয়া হয়—এই পর্যায়ে ব্রিটীশ অভিভাবকত্বে দেশী মন্ত্রীদের কিছু কিছু দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হয়। অতঃপর ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ সন ধরে প্রস্তুতি চলে স্বাধীন মালয় ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার জন্য। ১৯৫৫ সনে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে মালয় ফেডারেশনের শাসনভার প্রায় পুরোপুরি দেওয়া হয়। ১৯৫৫ সনের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা মালয় ফেডারেশনের স্বাধীনতা লাভের পথে প্রথম সুনিশ্চিত পদক্ষেপ।

স্বাধীন মালয় ফেডারেশনের যে নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে তাতে পাঁচ বৎসরের জন্য রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচন করবেন মালয়ের সুলতানরা। অন্যান্য ভাতা বাদে রাষ্ট্রপ্রধানের বার্ষিক বেতন স্থির হয়েছে প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা। মালয়ী সুলতানরা স্বাধীন মালয় ফেডারেশনের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করেছেন নেগ্রী সেম্বিলান রাজ্যের সুলতান টুয়াঙ্কু আবদুল রহমানকে। মালয় ফেডারেশনের প্রধানমন্ত্রীর নামও আবদুল রহমান, তবে তার সম্মানসূচক পদবী হ'ল টুঙ্কু। অর্থাৎ রাজপুত্র। ওদিকে টুয়াঙ্কু পদবীটি কেবলমাত্র রাজা ও যুবরাজরাই ব্যবহার করতে পারেন। স্বাধীন মালয় ফেডারেশনের রাষ্ট্রপ্রধান টুয়াঙ্কু আবদুল রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী আবদুল রহমান দুজনেই বিলাত-ফেরত, ব্যারিস্টারী পাশ। রাষ্ট্রপ্রধান টুয়াঙ্কু আবদুল রহমান বিশেষ করে ইংরেজ ও ইংরেজী ভাষার খুবই অনুরাগী। পারিবারিক জীবনে তাঁর একটি কাজ ম্যাজি তাঁর ২৭টি নাতি নাতনীর ইংরেজী ভুল লাল কালি দিয়ে সংশোধন করা। সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয়ের অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণী সবচেয়ে বেশি য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন।

স্বাধীন মালয়ের শাসনতন্ত্র ব্রিটীশ পার্লামেণ্টারী প্রথামত গঠিত—পার্লামেণ্টের (মজলিস) ২টি সভা থাকবে—(১) সেনেট (দিওয়ানা নাগারা) এবং (২) হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস্ (দিওয়ান রায়াত)।

স্বাধীন মালয় ফেডারেশনের সম্মুখের পথ মসৃণ, কুসুমাস্তীর্ণ নয়; আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক সর্বদিক দিয়েই স্বাধীন মালয়কে এখনও দীর্ঘকাল নির্ভর করতে হবে ব্রিটীশ সাহায্য ও সমর্থনের উপরে। ব্রিটেনের একটি স্বার্থ মালয়ের রবার বাগিচা ইত্যাদিতে লাভজনক লগ্নীমূলধন। যুদ্ধোত্তর মালয়ের একটি পরিচয় হ'ল "ব্রিটেনের বৃহত্তম ডলার উপার্জনকারী" অথবা "ডলার সঞ্চয়াগার"। মালয়ের আর্থিক ও সামরিক নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব অনেকখানি এখনও ব্রিটেনের হাতে রইল। স্বাধীন মালয় ফেডারেশন ও ব্রিটীশ সরকারের সঙ্গে চুক্তিবলে মালয়ে ব্রিটীশ, অস্ট্রেলীয়, নিউজীলণ্ড সৈন্য, বোমারু বিমান ইত্যাদি মোতায়েন থাকবে। মালয়ীরা শাসনকার্যে এখনও অভিজ্ঞ হয়নি, কাজেই স্বাধীন মালয় সরকারকে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত অনেক ব্রিটীশ আমলাকে কাজে বহাল রাখতে হবে। মালয়ে বিদ্রোহ দমনের মোটা খরচ এখনও বন্ধ হতে দেরী আছে। এই খরচ বাবদ ব্রিটীশ সরকার মালয়ের সৈন্যবাহিনী সম্প্রসারণের জন্য পূর্বের ব্রিটীশ বরাদ্দ ৬৫ লক্ষ পাউণ্ডের বাকী অংশ মালয় সরকারকে দেবেন, এছাড়া মালয়ের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাবদ ব্রিটীশ বরাদ্দ আছে ৪৪ লক্ষ পাউণ্ড। মালয়ের সৈন্যবাহিনীর জন্য আরো ১৩ লক্ষ পাউণ্ড দেবেন ব্রিটীশ সরকার। আর বিদ্রোহ দমনের জন্য ১৯৫৭-১৯৬১ সন পর্যন্ত মোট ২ কোটি পাউণ্ড সাহায্য স্বাধীন মালয়কে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব্রিটীশ সরকার। স্বাধীন মালয় ফেডারেশনের সামরিক নীতি ও বৈদেশিক নীতি ষোল আনাই নিয়ন্ত্রিত হবে ব্রিটীশ সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী। সন্দেহ নাই যে, মালয় ফেডারেশনের কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টকে নানারকম চাপের সম্মুখীন হতে হবে। তবে মালয়ের প্রধান তিনটি সম্প্রদায়ের নেতারা রাজনৈতিক ঐক্য এবং সংহতি প্রতিষ্ঠায় বিচক্ষণতা ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। স্বাধীন মালয়ের শাসকদের সম্মুখে এখনকার সমস্যা হবে মালয়ের জনসাধারণের দ্রুত আর্থিক—সামাজিক উন্নয়ন।

এক ও অন্য

বিষ্ণু দে

একের আনন্দ আজ অন্যের আকাশ
যে আকাশ রাঙা আজ স্মৃতির সপ্তকে
যে আনন্দে ইন্দ্রধনু পেয়েছে বিস্তার।

দিনান্ত ঘনায়, আর তার প্রতিভাস
সিঁথির সিঁদুর, সোনা আর অলক্তকে
দিগন্ত সংহত করে। তন্ময় চিন্তার

এই তো নিয়ম, সত্য জমে ওঠে ধীরে
অনেক বৃষ্টিতে রৌদ্রে অনেক হাওয়ায়
অনেক দুঃখে ও সুখে স্তব্ধ উচ্চারণে।

তাই একে দেখে মুগ্ধ আগামী তিমিরে
তমসার জ্যোতি অন্য চোখের চাওয়ায়,
এর সত্তা কাঁপে ওর চলার ধরণে।

তাই একে ভরে দেয় অন্যের আকাশ
অন্বিত আবেগে স্থির দৈনিক মরণে॥

তার চোখে অশ্রু

অতীন্দ্র মজুমদার

সে কাঁদে আমারই জন্যে। আমি তার দুঃখকে অসীম
অকূল সমুদ্র জেনে ভীত নই। জানি, তার ঢেউ
উত্তাল উন্মাদ হয়ে বার বার করে প্রতিঘাত
কর্কশ বেলার বুকে। স্বেদ-সিক্ত কটু লোনাঝড়
নীরস নিষ্প্রাণ শুধু বালুকারই স্তূপ জমা করে
—তাতে কোন সম্ভাবনা যেন নেই, ভয় হয় মনে,—
এ-সমুদ্রে কোনদিন আবেগের পান্নাচুনিগুলো
ঘোরালো ঘূর্ণির ঘায়ে মাতাল আবেশ আনবে না।

তবু, এই সমুদ্রেও, এই কালো ব্যর্থ সমুদ্রেও
আমি যে ভাসাই ভেলা, অস্থির তরঙ্গে ফেলি দাঁড়,
চূর্ণ করি ষড়যন্ত্র যত; লক্ষ ফণা তুলে হাসে
বন্ধ্যা, ব্যর্থ কটূশ্বাসী হাওয়া, তবু আমার নির্ভর
নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা আছে এ-সমুদ্রে ছায়াকে আনবোই
আকাশের প্রান্তে-ভাসা মেঘ থেকে, রঙ দেব এ'কে
সোনার গোধূলি থেকে, অন্ধকারে তরঙ্গ চূড়ায়
জেবলে দেব কুচি কুচি নক্ষত্রের হীরার প্রদীপ।

তার চোখে অশ্রু। আমি কান্নাতেও জেনেছি সঠিক,
কত দুঃখ-শুক্তি থেকে জন্ম নেয় আনন্দ-মৌক্তিক॥

কবি সমীপেষু

সুশীল রায়

অনেক লোকের ভিড় দেখে আজ
নিবিড়-কাছে যাই নি তোমার।
দেখতে গিয়ে স্মৃতির চিহ্ন
হারিয়ে গেল গঙ্গাকিনার।
পথ না পেয়ে আপনাকে ওই
জনস্রোতে দিলেম সঁপে।
চমকে দেখি, পৌঁছে গেছি
বাড়ি-ফেরার ট্রামের স্টপে॥

সমারোহের ভিড় ডিঙিয়ে
দেখব তোমায় উপায় কি তার,
বৃষ্টিধারার চিকের মাঝে
হারিয়ে গেল গঙ্গাকিনার।
ওইখানে এই ক্ষুদ্র ফুলের
কী দাম আছে, আছে কি দাম?
জায়গা না পাই একটুখানি
রাখব কোথায় আমার প্রণাম॥

মনের মধ্যে মন্ত্রসম ও-নাম ছিল,
যত্নকরে জিম্মা-করা প্রণাম ছিল,
দুই আঙুলে ধরা ছিল
প্রাণের প্রীতি পুরোপুরি—
একটি সবুজ পাতায় ঢাকা
ছোট্ট দুটি বেলের কুঁড়ি॥

নীল কাগজের নক্শা মেলে
নিয়ে স্টিলের লম্বা ফিতে
আপাদ-মাথা মুড়ি দিয়ে
গাম-বুটে আর বর্ষাতিতে
দাঁড়িয়ে আছেন বিরাট মূর্তি
নামজাদা-সব এঞ্জিনিয়ার,
উঠবে নাকি ওই মাটিতে
শ্বেতপাথরের উচ্চ মিনার॥

শ্রাবণশেষের এ-দিনটিতে
উঠল কেঁদে আকাশ আবার,
বৃষ্টিধারার হাত বাড়িয়ে
স্পর্শ করে গঙ্গাকিনার।
দূরের থেকে দেখতে পেলাম
ভক্তি-প্রীতি-প্রেমের প্রলয়—
ভারী ভারী ট্রাক থেকে ওই
নামছে ভারী পুষ্পবলয়।

ধন্য ক'রে গঙ্গাকিনার
উঠুক চূড়া অভ্রভেদী—
সবুজ-পাতার আড়াল-দেওয়া
বেলের কুঁড়ি আজ কাকে দি'॥

শার্ঙ্গদেব
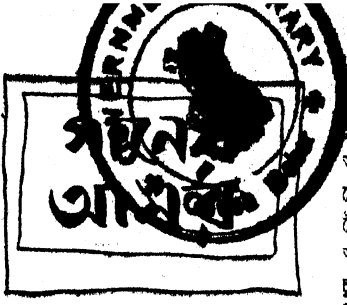
আজকালকার সিনেমার গানে অথবা চলতি গানে রাগসংগীতের প্রয়োগ দেখলে লজ্জা যতটা হয়, দুঃখও হয় ততটাই। লজ্জা হয় হিন্দী গানের ছেলেমানুষি অনুকরণ দেখে আর দুঃখ হয় এই ভেবে যে, এই রাগসংগীতের প্রয়োগে বরাবর বাঙালীর যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে আজ তার সম্পূর্ণ অভাব হয়েছে এই বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিচয়ই আমাদের বর্তমান সংগীত পরিচালকদের জানা আছে কিনা এইটাই সন্দেহ হয়। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, এইসব আদিম প্রথায় প্রস্তুত হিন্দী গানের সালসাকে তাঁরা বাংলা গানের বোতলে পুরে বিশেষ কৃতিত্বের সংগে নিজস্ব প্রস্তুত ব'লে প্রচার করছেন এবং বাংলা গানকে জাতে উঠিয়েছেন ভেবে বোধ হয় প্রভূত আত্মপ্রসাদও লাভ করছেন। তাঁদের এই ভাবধারাটা যে ভ্রমাত্মক এটা বার বার বলেও বোঝানো যায়নি, কেননা তাঁদের চেয়ে তাঁদের পূর্ববর্তীরা এ বিষয়ে অনেক ভেবেছিলেন এবং অনেক বেশি বুঝেছিলেন, এইটা এযুগের এইসব সংগীতবোদ্ধাদের বোঝানোই সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। কেবলমাত্র কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ধ্রুপদ-খেয়াল-ঠুংরিওয়ালাদের নিয়ে এইটাই হয়েছে সবচেয়ে মুশকিল।

কয়েক বছর ধ'রে বাংলা সিনেমার সংগীতকে অবলম্বন ক'রে এক ধরনের ছবি দেখানো হ'চ্ছে যার উদ্দেশ্য এই যে, বাংলা গান হিন্দী গানের চেয়ে খাটো নয় এবং হিন্দী গান যেভাবে গাওয়া হয় হুবহু সেইভাবে বাংলা গান গেয়ে সেইটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। অতিসম্প্রতি "বসন্ত-বাহার" চিত্রেও সেই একই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেল—সেই হিন্দী গানের ছকে ফেলা বাংলা গান। এতে কি আমরা বিশেষ লাভবান হচ্ছি? অনুকরণ করে কি কখনো সার্থকতা লাভ করা যায়? যদি হিন্দী গানের ছকটাকেই পুরোপুরি নিতে হয় তা'হলে হিন্দী গান গাইতেই বা আপত্তি কি? সেও তো আমাদেরই উত্তর ভারতীয় সংগীত এবং সে ভাষাও যে আমরা বুঝি না তা নয়। বরঞ্চ এই নকল করা জিনিস নিয়ে অপরের কাছে হাস্যাস্পদ হবার আশঙ্কা আছে। এই ধরনের একটা সেন্টিমেন্ট অনেককে উত্তেজিত করছে আজকাল কিন্তু এর পশ্চাতে তেমন দৃঢ় যুক্তি নেই। অনুরূপ মনোভাব নিয়েই অনেকে রবীন্দ্রসংগীতে তান-বিস্তার যোগ করবার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রসংগীতে যে ক্ষেত্রে তানবিস্তারের অবকাশ রয়েছে সেখানে সেটা করা হবে না কেন? সেটাই তো আমাদের সংগীতের বৈশিষ্ট্য। অতএব জনকয়েক এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন। এ'দের মধ্যে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েলও কেউ কেউ আছেন। অবশ্য তান-বিস্তারের মতবাদটি মূলত দিলীপকুমারের কিন্তু তাঁর কথা এক্ষেত্রে বল'ছি না, কেননা, তাঁর নিজের গানে যে তান-বিস্তার তিনি প্রয়োগ করেন তাতে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতকে তানকর্তবযোগে রূপায়িত করতে চান তাঁরা ঠিক দিলীপকুমারের আদর্শ গ্রহণ করেন নি —তাঁরা যেভাবে আর পাঁচটা গান গেয়ে আসছেন রবীন্দ্রসংগীতকেও সেইভাবেই গাইতে চান। আমার পাশের ঘরে যখন পল্টু হালদার তাঁর নিজস্ব ঢঙে তানবিস্তার যোগে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে থাকেন তখন সে গানে কবিগুরুর ব্যক্তিত্বটাই গৌণ হয়ে যায় এবং রবীন্দ্রসংগীতকে একটি সাধারণ ধ্রুপদ বা খেয়ালের স্তরে নামিয়ে আনা হয়। রবীন্দ্রসংগীতকে ক্লাসিকাল গান করতে গিয়ে তাঁরা কবিগুরুর সৃষ্টিকে যে একেবারে সাধারণ স্তরে এনে ফেলেন সেটা একবারও

ভেবে দেখেন না। এতে রবীন্দ্রসংগীতের মর্যাদা তো বৃদ্ধি পেলোই না, উল্টে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বটিও তাঁর গান থেকে বিলুপ্ত হলো। ঠিক এইভাবেই যখন বাংলা গানে পুরোপুরি হিন্দী চাল আনা হলো—সেই তান, সেই বিস্তার এবং সেই সরগমও জুড়ে দেওয়া হলো—তখন ফল হলো এই যে, বাংলা গানের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে তা একেবারেই গেল, হলো বড়জোর হিন্দী গানের একটা চলনসই অনুকৃতি। এতে আমাদের গৌরব কিছুমাত্র বাড়ল না কিন্তু শক্তির অপব্যয় হলো আর প্রকট হলো আমাদের চিন্তাশক্তির দৈন্য।

বাংলাভাষাশ্রয়ী রাগসংগীতের এ পর্যন্ত যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে তার সংগে আমাদের পরিচালকদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকবে এটাই সাধারণত আশা করা উচিত কিন্তু সিনেমার সংগীত পরিচালকদের বেলায় তার উল্টোটা দেখা যাচ্ছে—তাঁরা বাংলা গানের ভাবধারাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কিছু হিন্দী গানের পুঁজি নিয়ে বসে আছেন এবং যত্রতত্র তাঁদের সেই মুখস্থ বিদ্যার প্রয়োগ করে চলেছেন। শুধু সুর সংযোজনের ব্যাপার নয়, ঐতিহাসিক ব্যাপারেও তাঁদের এইরকম অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ "নীলাচলে মহাপ্রভু" নামক চিত্রের উল্লেখ করা যায়। এই ছবিতে যে ধরনের কীর্তন প্রয়োগ করা হয়েছে তা কি চৈতন্যের যুগে ছিল? যে গরাণহাটির ঢং আজকাল লুপ্ত হয়ে এসেছে সেই কীর্তনের প্রাচীন ঢংটিও মহাপ্রভুর তিরোধানের কিছুকাল পরে প্রবর্তিত হয়। অতএব আজকালকার কীর্তনকে সেখানে বসিয়ে দিলে সেটা কি বেমানান হয় না? আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্বরূপ-দামোদরের কোন অস্তিত্বই এই ছবিতে নেই। নীলাচলে অবস্থানকালে মহাপ্রভু প্রতিদিন স্বরূপ দামোদরের কণ্ঠে গীত শ্রবণ করতেন। গম্ভীরার গুপ্তকক্ষে তাঁদের সংগীত এবং শাস্ত্রালোচনা হ'ত। স্বরূপ-দামোদর ছিলেন ওস্তাদ গাইয়ে। গীতগোবিন্দের গানগুলি মহাপ্রভু তার মুখ থেকে শুনতেন। অথচ এই ব্যক্তিটি একেবারেই অনুপস্থিত। দক্ষিণ ভারতে আজও যেভাবে জয়দেবের গীতগোবিন্দ গাওয়া হয় তার একটু পরিচয়ও এই ছবিতে দেবার চেষ্টা করা হয়নি। "সেই তো পরিণাম পাইনু, যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু"—এ গানটি ছবিতে আছে কিন্তু স্বরূপ-দামোদরের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয়নি। তাছাড়া, রথযাত্রা উপলক্ষে উদ্দণ্ড নৃত্য-সহকারে কীর্তনের চমৎকার পরিকল্পনাটির কিছুমাত্র পরিচয় এই চিত্রে পাওয়া যায় না। এ থেকে এইটাই অনুমান হয় যে, পরিচালকগণই এ বিষয়ে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টাও করেন নি। পত্রান্তরে দেখছি, একজন সমালোচক লিখেছেন যেহেতু আমরা এ যুগে সিনেমা দেখতে গেছি সেহেতু সিনেমার কীর্তনকে খানিকটা সিনেমার [illegible] করতে হবে। এ যুক্তি মানতে গেলে ইতিহাসের কোন বৈশিষ্ট্যই থাকে না। এ যুগে আমরা যখন গীতা-বাইবেল পড়ি তখন উক্ত গ্রন্থ-দ্বয়ের ভাষা এ যুগের মত পরিবর্তন করা হয় না। করলে খুব দোষ হয়তো হয় না, তথাপি সেটা করা হয় না তার কারণ এইসব গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যকে কেউ ক্ষুণ্ণ করতে চান না। সেইরকম চৈতন্যের যুগকে যখন ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে তখন সে যুগের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যটাও কিয়ৎপরিমাণে বজায় রাখা উচিত বৈ কি এবং সে যুগের সংগীতকে ভালভাবে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করলে তা শুনতে খারাপ লাগবার কোন কারণই নেই, বরঞ্চ এই কারণেই পরিচালক অধিকতর কৃতিত্বের দাবী করতে পারতেন।

যাক,—হিন্দী এবং বাংলা গানের কথা বলছিলাম। বাংলা গানকে হুবহু হিন্দী ঢঙে পরিবেশন করা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়, সেটা অনায়াসেই করা যায়, কিন্তু আমাদের নিজস্ব কি কোন বস্তু নেই? ঊনবিংশ শতাব্দীরও আগে নিধুবাবু বুঝতে পেরেছিলেন যে, অনুকরণটা আমাদের পক্ষে আদৌ শ্রেয় নয়। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেই হিন্দী গান শিখেছিলেন। তাঁরই সমসাময়িক কালী মীর্জা ছিলেন বড় কালোয়াত, তথাপি তিনিও যে বাংলা গান রচনা করেছেন সেটা হিন্দী গানের নকল নয়। এঁদের পরে সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে রাগাশ্রয়ী বাংলা গান রচিত হয়েছে তাতে বরাবর একটি প্রচেষ্টাই দেখা গেছে, সেটি হচ্ছে স্বকীয়তা বজায় রাখা। তারপরে রবীন্দ্রনাথ এলেন। বহু হিন্দী গান ভেঙে তিনি বাংলা গান রচনা করেছেন কিন্তু তার একটিও তাঁর বৈশিষ্ট্যবর্জিত নয়। অতুলপ্রসাদ সেন লখনউ-এ বসে বিস্তর বাংলা গান রচনা করেছেন কিন্তু সেটা হিন্দী গানের নিখুঁত তর্জমা নয়। "ভবানী দয়ানী" নামক পণ্ডিত ভাতখণ্ডে রচিত ভৈরবীটি অনেকেই জানেন। এই গানটি ভেঙে অতুলপ্রসাদ "সে ডাকে আমারে"—এই বিখ্যাত গানটি রচনা করে-ছিলেন। কিন্তু এ গানে তাঁর স্বকীয়তা সুপরিস্ফুট। বস্তুত রাগধর্মী বাংলা গানে এমন কিছু আছে যা হিন্দী গানে পাওয়া যায় না। এই কারণেই কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব তাঁর সংগীতরাগকল্পদ্রুমে বাংলা গানকে পৃথক্‌ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, বহুকাল পূর্ব থেকেই হিন্দী গানের নিছক তর্জমার আদর্শটা আমাদের দেশে পরিত্যক্ত হয়েছে। আজ এতকাল পরে যখন আমাদের অনেক বেশি এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তখন স্বীকার করতে হয় যে, আমরা পশ্চাদপসরণ করছি। আমাদের অশিক্ষা আমাদের কোন্ স্তরে নামিয়ে এনেছে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। প্রাচীন যুগে গৌড়ের শিল্পীরা একটি বিশিষ্ট [illegible]রীতির প্রবর্তন করেন [illegible] নাম গৌড়ী-রীতি। এই [illegible]রূপে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। [illegible] এমন কি, মুসলমান আমলেও এর অ[illegible]ছিল। ক্রমে আমাদের সবই গেছে। গত যুগের রোমান্টিক আন্দোলনের শি[illegible] আমরা ভুলেছি। আজ আমরা ন[illegible] গৌরব অর্জন করতে চাই।

বর্তমানে সিনেমা কাদের লক্ষ্য করে তোলা হচ্ছে বোঝা দুঃসাধ্য। বিশিষ্ট পত্রিকাদিতে আলোচনা এবং বিজ্ঞাপন প্রণালী দেখে মনে হয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বর্জন করা চিত্র-করদের অভিপ্রায় নয়, কিন্তু পর্দায় যখন ছবি দেখি তখন মনে হয়, আমাদের সমস্ত শিক্ষাই নিষ্ফল হয়েছে। আজ পর্যন্ত আমাদের সহযোগীরা সিনেমার সংগীত সম্বন্ধে যেসব সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা পরি-চালকবৃন্দের চক্ষুগোচর বা কর্ণগোচর হয়েছে কিনা জানিনে, তবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোন যুক্তি, অভিমত বা উপদেশ তাঁরা গ্রহণ করেছেন এমনটা মনে হয় না। হলে বারবার একই ভুল কিছুতেই ঘটতে পারত না।

আসলে আমাদের দেশের অধিকাংশ চিত্র এবং সংগীত পরিচালক দেশের সাংস্কৃতিক এবং সাংগীতিক ইতিবৃত্তের পরিচয় খুব অল্পই জানেন এটা বলতে আর দ্বিধা বোধ করি না। এই ইতিহাস যদি তাঁরা জানতেন তবে আখ্যানবস্তুতে সংগীতের এমন অপ-প্রয়োগ ঘটত না এবং স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে এমন অনভিজ্ঞের প্রকাশও হত না। যে অনুকরণ মনোবৃত্তিকে আমরা দেড়শো বছর আগে অনেক ভেবে চিন্তে বর্জন করেছি আজ তারই প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। সাংগীতিক চিন্তার এই দৈন্য আজ অসহনীয় পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সিনেমা জগতে যদি সত্যিই নতুন কিছু দিতে হয় তাহলে উক্ত জগতের বাইরে যে আর একটি চিন্তা-জগৎ আছে তাতে প্রবেশ করা দরকার। কেবলমাত্র গোটাকতক গানের পুঁজি নিয়ে সংগীত জগতে আলোড়ন তোলা অসম্ভব। যাঁরা আমাদের সংগীতশাস্ত্র পড়েছেন তাঁরা জানেন এই শাস্ত্রটি সাহিত্য, অলংকার, দর্শন, ব্যাকরণ এবং অপরাপর বিদ্যার সংগে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। একটি জিনিসের বিচারে আর একটি প্রসংগ এসে পড়েছে। সংগীত শিক্ষা খুব সহজ হয়ে গেছে। অপরাপর বিদ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল সা-রে-গা-মা এবং তানকর্তব করতে জানলেই কার্যোদ্ধার হয়। কিছুদিন তবলায় তেতালাটা প্র্যাকটিস্ করলে তালের দিক থেকে তো কোন গোলমালই থাকে না। আর, মস্তবড় ফাঁকির আর একটি সুযোগ রয়েছে বিলম্বিত একতালে যেখানে ছন্দের বালাই নেই, খুব ফলাও করে বড়-খেয়াল গেয়ে একবার "তেরেকেটে"টা একটু কানে লাগিয়ে নিলেই হলো। এইভাবে গান শিখে তথা-কথিত ওস্তাদ হতে পারা যায় কিন্তু সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধান অসম্ভব।
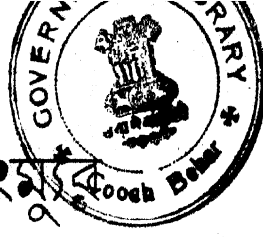
আরভিং ল্যাংম্যুর

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

দাদা আর ভাই বসে বসে বিজ্ঞানের আলোচনা করছে। বাতাস থেকে 'আরগন' নামক একটি নতুন গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে তাই তাদের আলোচনার বিষয়। দাদা বিজ্ঞানের গবেষক, ছোট ভাইয়ের অনু-

আরভিং ল্যাংম্যুর

সন্ধিৎসা মেটাবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করছেন। কথার ফাঁকে দাদা হঠাৎ বললেন,—আরভিং, আমি শীঘ্রই এলিস ডীনকে বিয়ে করছি। ভাইয়ের বয়স তখন মাত্র পনেরো,—দাদার বিয়ের ব্যাপারে সে খুবই উৎসাহী এবং এলিস ডীনকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও পছন্দ করে। খুবই স্বাভাবিক এই সংবাদে ছোট ভাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে লাফিয়ে উঠবে কিন্তু আরভিং এক মিনিট চুপ করে থেকে বললে,—ওঃ, কিন্তু আর্থার তুমি আমাকে এখন আরগনের কথা বলছিলে? লজ্জিত দাদা আর কোন কথাই না বলে আরগনের উপর সদ্য প্রকাশিত একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করতে বসেন।

আরভিং ল্যাংম্যুর আমেরিকার প্রথম শিল্পবিজ্ঞানী, যিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করে বিশ্বজোড়া সম্মান অর্জন করেন। উপরোক্ত ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায়, অল্পবয়স থেকে জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁর কি অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল। বালক ল্যাংম্যুর যে আরগন গ্যাসের গল্প সেদিন তাঁর দাদার কাছ থেকে শুনেছিলেন, আরও সতেরো বছর পরে এই গ্যাসকেই কাজে লাগিয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্যাসপূর্ণ বাল্ব নির্মাণ করেন। এই আবিষ্কারের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আমরা সকলেই উপকৃত হচ্ছি, প্রতি সন্ধ্যায় আপনার আমার বাড়িতে যে আলো জ্বলে তার উত্তাপ লাগে আমাদের পারিবারিক বাজেটে। মাসের শেষে ইলেকট্রিক বিল দিতেই প্রাণান্ত, তার উপর যদি প্রতি মাসেই কয়েকটা করে বাল্ব বদলাতে হতো তাহলে বোধ হয় শহরের বহু ঘরেই জ্বলতো লণ্ঠন। ল্যাংম্যুরের গবেষণার আগে বাল্বে বৈদ্যুতিক শক্তির খরচ হতো খুবই বেশী, আর ভিতরকার সূক্ষ্ম তারটি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পুড়ে যেত। বিজ্ঞানী ল্যাংম্যুরই পরীক্ষা করে দেখেন, বাতাসবিহীন এই বাল্বগুলির ভিতরকার অতি সূক্ষ্ম টাংস্টেন তারকে উত্তপ্ত করা হলে হাইড্রোজেন গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এই গ্যাসের আয়তনও কম নয়, টাংস্টেন তারের আয়তনের প্রায় ৭০০০ গুণ বেশী হাইড্রোজেন গ্যাস মাত্র ২ দিনের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু কোথা থেকে এলো এই হাইড্রোজেন? বাল্বের মধ্যে নিশ্চয়ই জলকণা লুকিয়ে থাকে, কিন্তু কোথায়? অবশেষে বার হলো বাল্বের কাঁচের গাত্রে জলের অণুর একটি আবরণ আকৃষ্ট হয়ে লেগে থাকে এবং উত্তপ্ত টাংস্টেন তাকে ভেঙেই সৃষ্টি করে হাইড্রোজেনের,—আর নিজের অপমৃত্যু ঘটায়। বাতাসশূন্য করার জন্য যে ভেসলীন ব্যবহার করা হয় তাও ঐ হাইড্রোজেন উৎপাদনের জন্য দায়ী। বিজ্ঞানী দেখলেন, জলীয় বাষ্পই বাল্বের সবচেয়ে বড় শত্রু, তাকে বিতাড়িত করতে হলে কেবলমাত্র বাল্ব বাতাসশূন্য করলেই চলবে না, আরও কিছু

ল্যাংম্যুর ও এ্যাডসন

করা দরকার। বাল্বের কাচের মধ্যে গ্যাসপূর্ণ অবস্থায় যাতে এই পদার্থ না থাকতে পারে তাই বাতাসশূন্য করার সংগে সংগে অন্য কোন গ্যাস যদি বাল্বের মধ্যে দেওয়া যায় তাহলে উপকার পাওয়া যেতে পারে। পরীক্ষা করা হলো, দেখা গেল, সাধারণ গ্যাসসমূহের মধ্যে নাইট্রোজেনই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। পরে অবশ্য ল্যাংম্যুরই নিষ্ক্রিয় গ্যাস আরগন নাইট্রোজেনের চেয়েও কার্যকরী দেখান এবং আরগনের ব্যবহার শুরু হয়। এ ছাড়াও উত্তপ্ত হওয়ার ফলে টাংস্টেন পরমাণু, বাল্বের মধ্যে টাংস্টেন তার থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে চতুর্দিকে অবস্থিত গ্যাসের পরমাণু তাকে দেয় বাধা। ধাক্কা খেয়ে সে ফিরে যায় তার পূর্বস্থানে। বিজ্ঞানী ল্যাংম্যুরের এই একটিমাত্র আবিষ্কারের দ্বারাই কেবলমাত্র আমেরিকার জনসাধারণ প্রতি রাত্রেই প্রায় পাঞ্চশ লক্ষ টাকা বৈদ্যুতিক শক্তি সাশ্রয় বাবদ সঞ্চয় করতে সমর্থ হচ্ছে। এবার সমগ্র দুনিয়ার কথা চিন্তা করে দেখুন, প্রতি রাত্রে শক্তির অপচয় রোধে ল্যাংম্যুরের আবিষ্কারের গুরুত্ব কি?

ল্যাংম্যুরের একটি প্রধান গবেষণার কথা আলোচনা করলাম। শিল্পক্ষেত্রে অতি-প্রয়োজনীয় এতো বেশী আবিষ্কার এই বিজ্ঞানী করেছিলেন যে, তার গুরুত্ব এবং বিজ্ঞান জগতে মূল্য নির্ধারণ করা অসম্ভব। কেবলমাত্র টাকা আনা পাইয়ের স্থলে হিসাবও যদি করতে চান তাহলে ফোর্ড রকফেলারও লজ্জা পাবেন। এই রাসায়নিকের বহু আবিষ্কারই বর্তমানকালের বেতার শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে, ধাতু জোড়া লাগাবার ক্ষেত্রেও তার দান অসাধারণ। পদার্থ বিজ্ঞানের ইলেকট্রনিকস্ শাখাও তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। বিজ্ঞানী ল্যাংম্যুর মানব-কল্যাণে প্রকৃতির সংগে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাতের প্রচেষ্টার তিনি প্রধান পথিকৃৎ।

আমেরিকার ব্রুকলীন শহরে ১৮৮১ সালের ৩১শে জানুয়ারী আরভিং ল্যাংম্যুর জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগ ছিল। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। আরভিং-এর দাদা আর্থার ছিলেন রসায়নের ছাত্র, তাঁরই প্রভাবে আরভিং রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন। একটা গল্প বলি শুনুন,—একবার আর্থার তো প্রায় রসায়ন বিজ্ঞানের ধাক্কায় তাঁর ছোট ভাইটিকে মেরেই ফেলে-ছিলেন। আরভিং-এর বয়স তখন মাত্র ৬ বছর। আর্থার নতুন কলেজে পড়ছেন, গবেষণাগারে প্রথম ক্লোরিন গ্যাস প্রস্তুত করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে একটা বোতলে করে ভরে নিয়ে এসে বললে,—নে ভাইটি শুঁকে দেখ।

ভাইটিও যে সে ছেলে নয়। শুঁকে দেখবে কি, একেবারে পুরো বোতলটা খুলে দু'হাতে নাকের কাছে ধরলো। ক্লোরিন সোজা প্রবেশ করলো নাকে, মুখে আর গলায়। দম বন্ধ হয়ে ক্লোরিন গ্যাসে শেষকালে সে মারা যায় আর কি?

খুবই কপাল যে, সে অন্য কোন কঠিন অসুখে পড়েনি। এর পরে তাঁদের বাবা কড়া হাতে রাশ ধরে হুকুম দেন, ভাইয়ের সংগে আর রসায়ন চর্চা করা চলবে না। অবশ্য এই হুকুম বেশীদিন মানা সম্ভব হয়নি, মাত্র ৯ বছর বয়সেই আরভিং তাঁর নিজের বাড়িতে ছোট্ট গবেষণাগার তৈরী করলো,—তিন বছরের মধ্যে এই গবেষণাগার আশ্চর্যরকমভাবে গেল বেড়ে। আরভিং-এর

মা'র একটি চিঠি থেকে জানা যায়, ১৪ বছর বয়সে আরভিং পাকা বিজ্ঞানীর মতো কথা-বার্তা বলতেন। রসায়ন শাস্ত্র এবং বিদ্যুৎ বিজ্ঞানে তাঁর ঝোঁক ছিল খুবই বেশী। বড় ভায়ের সংগে যখন বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করতেন তখন সকলেই এই বালকের বুদ্ধি, বিবেচনা এবং জ্ঞান দেখে অবাক হয়ে যেত। তাঁর মস্তিষ্ক সর্বসময়ে ইঞ্জিনের মতো কাজ করতো। ১৪ বছর বয়সে আরভিং একটি ক্যালকুলাসের বই মাত্র দেড় মাসের মধ্যে আয়ত্ত করেছিলেন।

১৯০৩ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য জার্মানী যাত্রা করেন। জার্মানীতে গটিন-জেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে যোগদান ক'রে এম এ এবং পি এইচ-ডি ডিগ্রীদ্বয় লাভ করেন। এখানে তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী নারনস্ট-এর অধীনে গবেষণা করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

আমেরিকায় ফিরে সামান্য কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর বিজ্ঞানী আরভিং ল্যাঙ্মুর ১৯০৯ সালে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর গবেষণা মন্দিরে যোগদান করলেন। অধ্যাপনা করতে তাঁর মোটেই ভাল লাগতো না, সুতরাং এই নতুন চাকরি তাঁকে এতো উৎসাহিত করে যে, তিনি মনে-প্রাণে শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা শুরু করেন। জীবনের পরবর্তী ৪২ বৎসর তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সংগেই সংযুক্ত ছিলেন। প্রথমেই তিনি আরম্ভ করলেন বাল্ব বিষয়ক গবেষণা। ইলেকট্রিক বাল্বের মধ্যে কার্বনের সূক্ষ্ম তারের পরিবর্তে টাংস্টেন ব্যবহার তখন সবে শুরু হয়েছে। বাল্বের জীবনশক্তি বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য বিজ্ঞানীরা কেবল বাতাসশূন্য করবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আরভিং ধরলেন নতুন পথ। অন্য গ্যাস প্রয়োগ ক'রে বাতাসকে বিতাড়িত করা যায় কিনা? পরীক্ষায় ঘটলো সাফল্য, নাইট্রোজেনের ব্যবহারের সুফল আরভিংকে এনে দিল জগৎজোড়া সম্মান।

বাল্ব বিষয়ক গবেষণার সময়ই আরভিং দেখেছিলেন, বেশী উত্তাপে হাইড্রোজেন অণু-পরমাণুতে বিভক্ত হয় এবং পরে পুনরায় সংযুক্ত হয়ে অণুতে পরিবর্তিত হবার সময় এরা অত্যন্ত বেশী উত্তাপ সৃষ্টি করে। এই পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেই তিনি অ্যাটমিক হাইড্রোজেন ওয়েল্ডিং টর্চ উদ্ভাবন করেন। যে সব ধাতু খুব বেশী উত্তাপে গলে তাদের জোড়া লাগাবার জন্য এই টর্চ ব্যবহার করা হয়। এর পর শুরু হয় একের পর এক আবিষ্কার। শিল্প-বিজ্ঞান ও বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান এই উভয় ক্ষেত্রেই আরভিং ল্যাঙ্মুরের অবদান বিজ্ঞান জগৎকে চমৎকৃত করে তোলে। তাঁর আবিষ্কারের সংখ্যা এবং প্রত্যেকটির গুরুত্ব দেখে বিশ্ব-বিখ্যাত আবিষ্কারক এডিসনও মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—আরভিং, এর পরে কি?

পদার্থের উর্ধপৃষ্ঠের রসায়নে গবেষণা এবং আবিষ্কার করার জন্য এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীকে ১৯৩২ সালে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। টাংস্টেনের পৃষ্ঠে থোরিয়াম, জলের উপর তরল পদার্থের সূক্ষ্ম আস্তরণের প্রভাব বিষয়ক গবেষণা, যে কাজের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন তার প্রধান অংশ ছিল। বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদির টাংস্টেন প্রভৃতি ধাতুর গাত্রের উপর কি প্রভাব তাও বিজ্ঞানী আরভিং ল্যাংমুর ব্যাখ্যা করে গেছেন। তাঁর চাকরি জীবনের প্রথম বাল্ব বিষয়ক গবেষণাই রসায়ন বিজ্ঞানের বিশেষ এই শাখার উদ্ভাবনে তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। 'সারফেস কেমিস্ট্রি'র আবিষ্কারক হিসাবে এই বিজ্ঞানীর নাম মানবসভ্যতার ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের অবস্থিতি ও সংখ্যার ভিত্তিতে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতির উপর তিনি যে থিওরীর সৃষ্টি করেছেন, ল্যাংমুরের বিজ্ঞানী জীবনের তা এক শ্রেষ্ঠতম অবদান।

বিজ্ঞানী আরভিং ল্যাংমুর অত্যন্ত সরল ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন—ভালো-বাসতেন অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে। পর্বতারোহণ, স্কি করা এবং এরোপ্লেন চালান তাঁর বিশেষ প্রিয় শখ ছিল। তিনি এমন বেপরোয়া প্লেন চালাতেন যে, একবার তাঁর সহযাত্রী মিলিটারী বন্ধু কর্নেল লিন্ডবার্গের প্রায় হৃদ্‌ক্রিয়া বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছিল।

১৯৫১ সালে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর গবেষণা মন্দির থেকে পদত্যাগ ক'রে বিজ্ঞানী ল্যাংমুর কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাতের সাধনায় সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এরোপ্লেনের উপর বরফ জমা হওয়ার কারণা-কারণ বিষয়ে গবেষণা করার সময়ে, কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটানো যায় কিনা তা নির্ণয় করতে তিনি উদ্যোগী হন। কোন কোন মেঘের উপর বরফ এবং সিলভার আয়োডাইড ছড়িয়ে দিয়ে তিনি বৃষ্টি ও বরফপাত ঘটাতে সক্ষমও হয়েছিলেন। বিজ্ঞানী আরভিং মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটানো সম্ভব হ'লে মানুষ পৃথিবীর আবহাওয়া বদলে দিতে পারবে।

যে মরুভূমি আকাশের মেঘের দিকে কাতরভাবে চেয়ে থাকে সেখানে ফলবে সোনার ফসল, গড়ে উঠবে মানুষের বসতি। শেষ জীবনে তিনি তাই শুরু করেছিলেন মানবকল্যাণের এই মহাগবেষণা। নিউ মেক্সিকোতে ১৯৪৯ সালের এক পরীক্ষায় মোটামুটি মাত্র ৫৫ টাকার সিলভার আয়োডাইড প্রয়োগ করে তিনি প্রায় ৩২ হাজার কোটি গ্যালন জল বর্ষণ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডাঃ আরভিং ল্যাংমুর গত ১৬ই আগস্ট ম্যাসাচুসেটস্-এর অন্তর্গত ফলমুথের একটি হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুর মাত্র তিনদিন আগে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। অক্লান্তকর্মী এই মানবহিতৈষী কালজয়ী বিজ্ঞানীর অমর আত্মা শান্তিলাভ করুক।

॥ ইতিহাসের মহত্তম প্রচেষ্টা ॥

অশোক মুখোপাধ্যায়

দেশ, ভাষা এবং সংস্কৃতির সীমারেখা উত্তীর্ণ হয়ে সারা পৃথিবীর মানুষ আজ এগিয়ে এসেছে বিজ্ঞানের মহামিলন-তীর্থে। তারই বাস্তব পরিণতি এই আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবর্ষের পরিকল্পনা। আমাদের এই রহস্যে মোড়া পৃথিবী, পৃথিবীকে নিবিড় স্নেহে ঘিরে থাকা নীল আকাশ আর নীল আকাশের সীমানা পেরিয়ে যে বিশাল গ্রহনক্ষত্রের রাজ্য, তাদের সম্বন্ধে যতটুকু আমরা জেনেছি—তারও বেশি রয়ে গেছে অজানা। সেই অজানা রত্নগুলোকে আহরণ করা এবং পূর্ব-আহৃত রত্নগুলোকে বিজ্ঞানের বিশ্লেষণী কাঠি দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। মানবসভ্যতার সমগ্র ইতিহাস হাতড়ে বেড়ালেও সত্যান্বেষণের এমন একটি ঐক্যবদ্ধ এবং ব্যাপক প্রচেষ্টার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাহলেও একথা অনস্বীকার্য যে, এই পরিকল্পনা আঙ্গিক এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে পুরোপুরি মৌলিকত্বের দাবী করতে পারে না। এতটা সুসংবদ্ধ আকারে না হলেও ইতিপূর্বে মেরুবর্ষ নামে দুটি যৌথ পরিকল্পনা সাফল্যের সাথে কার্যকরী করা হয়েছিল। আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে প্রধানত আরোরা-বোরিয়ালিস, আরোরা পোলারিস প্রভৃতি মেরুজ্যোতি এবং ভূ-চৌম্বকত্ব (জিওম্যাগনেটিজম) পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রথম মেরুবর্ষের কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। ক্ষুদ্র বেতারতরঙ্গ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান যথেষ্ট প্রাগ্রসর না থাকায় আয়নমন্ডল (আয়নোসফেয়ার) সম্পর্কিত সমস্যাবলীর উপর নতুন আলোকপাত তখন সম্ভব হয়নি। ১৯৩২-৩৩ সালের দ্বিতীয় মেরুবর্ষের কার্যসূচীতে তাই আয়নমন্ডল সংক্রান্ত বিষয়গুলি প্রাধান্যলাভ করে।

এবারের কর্মসূচীতে ভূতত্ত্বের প্রায় সমস্ত বিভাগই স্থান পেয়েছে। যথাঃ—সমুদ্রতত্ত্ব, ভূকম্পনতত্ত্ব, ভূচৌম্বকত্ব, আবহতত্ত্ব, হিমবাহতত্ত্ব, দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ, সৌর-মন্ডল, আয়নমণ্ডল, মেরুপ্রভা (আরোরা), মহাজাগতিক রশ্মি (কসমিক রে), অভিকর্ষ (গ্র্যাভিটি) এবং রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ (আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট)। বলা বাহুল্য, এত বিভিন্নমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রচুর সময়সাপেক্ষ। তাই আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ-বর্ষের কার্যকাল স্থির হয়েছে—আঠারো মাস; ১৯৫৭ সালের জুলাইতে শুরু হয়ে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে যার সমাপ্তি। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাধীনে এই বিপুল কর্মসূচী

সূর্যক্ষত বা সৌরকলঙ্ক

পরিচালিত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত দেশ, গ্রেটবৃটেন, ফ্রান্স, চীন, জাপান এবং ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর প্রায় সত্তরটি রাষ্ট্র এতে অংশ গ্রহণ করছেন। এই উদ্দেশ্যে যে বিশেষ আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ-বর্ষ সংগঠন সমিতি গঠিত হয়েছে, অধ্যাপক এস চ্যাপম্যান তার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। সমগ্র পৃথিবীকে কতকগুলি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করে বিভিন্ন উপসমিতি সংগঠিত হয়েছে এবং ঐসব উপসমিতির উপর নিজ নিজ অংশের কার্য-ভারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করে তুলতে প্রায় সাত কোটি পাউন্ড অর্থব্যয় হবে। তাছাড়া বিশেষ যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে এবং সেগুলোকে পৃথিবীর দূরদূরান্ত কোণে বহন করে সমস্ত আয়োজন সুসম্পন্ন করে রাখতেও কম সময় এবং শ্রম ব্যয় হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৫১ সাল থেকে যার জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছিল, আজ তারই বাস্তব রূপায়ণ হতে চলেছে।

যে বিষয়গুলোকে ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবর্ষের কার্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি সৌরদেহস্থ নানা ঘটনাবলীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সূর্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ সর্বদা টগবগ করে ফুটছে। এই জ্বলন্ত অগ্নি-কুণ্ড থেকে গরম বাষ্পের মেঘ কল্পনাতীত বেগে পাক খেতে খেতে ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়। ফলে সূর্যের পৃষ্ঠদেশ মানে ফ্রোমোস্ফীয়ারে বিশালাকৃতি গহ্বরের সৃষ্টি হয়। এইসব গহ্বরের ব্যাস কয়েকশ' মাইল থেকে শুরু করে কয়েক সহস্র মাইল পর্যন্ত হতে পারে। এখন যে উত্তপ্ত বাষ্পরাশি এইসব গহ্বর থেকে উঠে এল, তারা উপরে উঠে প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর সৃষ্টি করে। পৃথিবী থেকে এগুলোকে কালো দেখায় বলে এদের নাম দেওয়া হয়েছে সূর্যক্ষত বা সৌরকলঙ্ক। এই সৌরকলঙ্কগুলি অহরহ রূপ পাল্টাচ্ছে। কতগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে

মেরুপ্রভা

ক্ষুদ্রাকার সৌরকলঙ্কের মালা তৈরী করছে। কতগুলো একেবারেই যাচ্ছে বিলীন হয়ে। আবার নতুন কলঙ্কেরও জন্ম হচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা থেকে আরম্ভ করে কয়েক মাস অবধি এদের স্থায়িত্বকাল। সৌরদেহের এই কলঙ্ক-সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়—কখনও বাড়ছে কখনও কমছে। অভিজ্ঞতা হাতড়ে দেখা গেছে যে, এগারো বৎসর পর পর সৌর-কলঙ্কের তৎপরতা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। এই সময় সূর্যদেহে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। তার ফলে সৌররশ্মি এবং সৌরকণিকা (সোলার করপাস্‌ল) যথাক্রমে আলোর গতি (প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল) এবং আলোর গতির ১৫০ ভাগের এক ভাগ গতিবেগে বিভিন্নদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অতি-ক্ষুদ্র একটা অংশ পৃথিবী অভিমুখে ছুটে আসে—এটা বলাই বাহুল্য। ঊর্ধ্ব বায়ু-মণ্ডলের বিদ্যুতায়ন (আয়োনাইজেসন) এতে বৃদ্ধি পায়। ফলে চুম্বকঝটিকা (ম্যাগনেটিক স্টর্ম) ও মেরুপ্রভার আবির্ভাব এবং সেই সাথে ভূচৌম্বকত্ব ও বেতারতরঙ্গের গতি-প্রকৃতির তারতম্য সূচিত হয়। এটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, ভূতত্ত্বের উপরোক্ত বিষয়-গুলি এই সময়ে পর্যবেক্ষণ করলে সর্বশ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যাবে। তাই সৌরকলঙ্কের তৎপরতাকালের সাথে যেন মিলে যায়, এমনভাবে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবর্ষের নির্ঘণ্ট তৈরী করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবর্ষের সমগ্র কর্ম-সূচীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল কুমেরু মহাদেশের (আণ্টারকটিকা) অজানা রহস্য উদ্ঘাটন এবং কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টি। কুমেরু সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে পারলে সেই সঙ্গে ভূতত্ত্বের অন্যান্য শাখারও বহু প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। আর মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী এবং সৌরজগতের বহু রহস্যের দুয়ার আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেবে।

প্রথমেই বলা যাক কুমেরু মহাদেশ অভিযানের কথা। কুমেরু একটি জনমানব-শূন্য ধু ধু করা বরফের রাজ্য। বহুবর্ষ পূর্বে আবিষ্কৃত হলেও এই ষাট লক্ষ বর্গ-মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। প্রকৃতপক্ষে চাঁদকে আজ আমরা যতটা খুঁটিনাটিভাবে জানি, ততটাও জানিনে কুমেরু মহাদেশ সম্বন্ধে। এর আকৃতি, বিস্তৃতি, আবহাওয়া, ওপরকার বরফাবরণের গভীরতা—এসব এখনও বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতার সাথে নিরূপিত হয়নি। এবারকার অভিযান আশা করা যায় আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারের এই শূন্য মণিকোঠাগুলিকে অনেকাংশে পূর্ণ করে দেবে।

ভূমিকম্পের ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, প্রবলতম ভূমিকম্পগুলোর অনেকগুলোই ঘটেছে এই মহাদেশে। সুতরাং কুমেরুতে প্রত্যক্ষভাবে গবেষণা চালালে ভূকম্পনতরঙ্গের গতিপ্রকৃতি (ট্রান্সমিশন অব সিসমিক ওয়েভ) এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধেও অনেক তথ্য জানা যাবে। মূল কুমেরু মহাদেশে অন্তত কুড়িটি এবং পার্শ্ববর্তী দ্বীপ অঞ্চলে প্রায় তেরটি কেন্দ্রে বারটি রাষ্ট্র দ্বারা এইসব পরীক্ষাকার্য পরিচালিত হবে। এতে অংশ গ্রহণ করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত দেশ, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রভৃতি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমী অফ সায়েন্স অতলান্তিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর এবং কুমেরু মহাদেশের নানা স্থানে পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করে ভূকম্পন তরঙ্গের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করবেন বলে জানিয়েছেন। প্রয়োজন হলে তারা ঐসব স্থানে কৃত্রিম ভূমিকম্প সৃষ্টি করতেও প্রস্তুত আছেন। শক্তিশালী ভূমিকম্প সৃষ্টির জন্য কুমেরু মহাদেশে কয়েকটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের প্রস্তাব অস্ট্রেলিয়ার থেকে করা হয়েছিল। কিন্তু তা সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাকার্যের জন্য ঠিক দক্ষিণ মেরুর উপর একটি গবেষণাগার স্থাপন করেছেন।
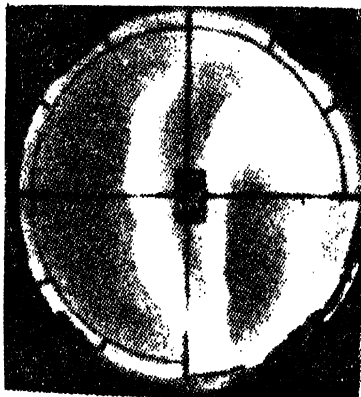
সোভিয়েত দেশ জাহাজ এবং হেলিকপ্টারের সাহায্যে তিনটি কেন্দ্র থেকে পরীক্ষাকার্য চালাবেন। তাঁদের গবেষণার বিষয় হবে—
(ক) কুমেরু মহাদেশে বায়ুমণ্ডলের চাপ এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের আবহাওয়ার উপর তজ্জনিত প্রভাব।

(খ) এই মহাদেশের ভূতত্ত্বগত ইতিবৃত্ত।

(গ) উপরস্থ তুষারাবরণের গভীরতা নির্ণয়।

(ঘ) ভৌগোলিক বিশেষত্বগুলির অনু-সন্ধান।

(ঙ) ভূপ্রাকৃতিক জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে এমনি নিদর্শন সংগ্রহ।

ব্রিটেন থেকেও জন বিস্কো নামে একটি জাহাজ ভূতত্ত্ববিদ, জরীপকার, বেতার-নিয়ন্ত্রক ইত্যাদি চৌদ্দজনের একটি দল নিয়ে কুমেরু মহাদেশে পৌঁছেছে। সেখানে তাঁরা ইতিমধ্যেই দুইটি পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন।

সমুদ্রের চৌম্বকশক্তির উপর গবেষণার জন্য সোভিয়েত দেশ আগাগোড়া কাঠ, ব্রোঞ্জ, পিতল প্রভৃতি চুম্বকত্বহীন উপাদানে বিশেষভাবে নির্মিত একটি ছয়শত টন ওজনের জাহাজ ব্যবহার করবেন। জাহাজটি সর্বপ্রকার আধুনিক সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত এবং একাদিক্রমে পঁচিশ শ' মাইল পাড়ি দিতে সক্ষম। বিগত পঁচিশ বছরে পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে, অতলান্তিক, প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন স্থানে পর্যবেক্ষণ কার্য চালিয়ে তা সঠিকভাবে স্থির করা সম্ভব হবে।

মেরুজ্যোতি—ক্যামেরার পর্দায়

সমুদ্রতত্ত্বের গবেষণায় অংশ গ্রহণ করবেন সাতাশটি জাতি এবং এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে সত্তরটি জাহাজ। এদের কার্যক্রম যতদূর জানা গেছে:—

(ক) পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সমুদ্র সমতলের পরিমাপ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ।

(খ) ১৯৫৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ক্রিপ্‌স ইনস্টিটিউট অফ ওশেনোগ্রাফিতে আবিষ্কৃত হয়েছিল যে, গ্রীষ্মকালে উত্তর

ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে জলপ্রবাহ অথবা গ্রীষ্মের উত্তাপহেতু সমুদ্রজলের প্রসারণ এর কারণ—সে রহস্য আজও সন্দেহাতীতভাবে জানা যায়নি। এই অভিযানে তার উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হবে।

এছাড়া বিভিন্ন সামুদ্রিক স্রোতের গতিপ্রকৃতি এবং মেরু অঞ্চলস্থ বরফের তলাকার অন্তঃসলিলা নদীগুলির স্বরূপ জানবার জন্যও পরীক্ষাকার্য চালিত হবে। সোভিয়েত দেশ সমুদ্রজলের উষ্ণতা, তরঙ্গের কম্পনবেগ প্রভৃতি নিরূপণের জন্য সমুদ্রগর্ভে একটি স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল এবং আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়। আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবর্ষের কার্যক্রম হিসেবে শতাধিক কেন্দ্র থেকে উপরোক্ত বিষয় দুটোর উপর গবেষণা করা হবে। বায়ুমণ্ডলের পরিবেশ থেকে পঞ্চাশোর্ধ্ব মাইলের ঊর্ধ্বাংশের নাম আয়নমণ্ডল। এই স্থানের বায়ুর ঘনত্ব খুবই কম, অর্থাৎ বায়ুর কণিকাগুলির পারস্পরিক ব্যবধান অত্যন্ত বেশী। কিন্তু শুধুই আয়নমণ্ডল এবং নিম্নস্থ বায়ুমণ্ডলের একমাত্র পার্থক্য নয়। আয়নমণ্ডল বিদ্যুৎপরিবাহী কারণ এই স্থানের বায়ুকণিকাগুলি রয়েছে বিদ্যুতায়িত (আয়োনাইজড) অবস্থায়। সূর্য এবং অন্যান্য দূরবর্তী নক্ষত্ররাজি থেকে বিকীর্ণ [illegible] রশ্মি আলট্রা-ভায়োলেট বা ওভাও সূর্যপৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি বিদ্যুদ্বাহী কণিকার স্রোত প্রতিনিয়ত পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে। এইসব সৌরকণিকাগুলি অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। বিদ্যুতায়িত বায়ু-কণিকাগুলির সাথে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য এবং এই সংঘাতের ফলেই অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় আয়নমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সাধারণত মেরুঅঞ্চলে এই আলোকরশ্মির আবির্ভাব দেখা যায় বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে মেরুপ্রভা। এইসব কারণে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবর্ষের কার্যসূচীতে আয়নমণ্ডল সম্পর্কিত সমস্যাগুলি অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে মেরুপ্রভাবলয়ে (অরোরা-বেল্ট) রাত্রিবেলা প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর আকাশের ছবি শক্তিশালী স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার পর্দায় ধরে রাখা হবে।

ভূপদার্থ বৎসরে আবহাওয়া সম্পর্কিত যেসব তথ্য সংকলিত হবে, তার সাহায্যে আকাশপথে গমনাগমনের (এয়ার নেভিগেশন) সুবিধে এবং বহুবিস্তৃত অঞ্চলের আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাষ জ্ঞাপন সম্ভব হবে। তাছাড়া কৃত্রিম উপায়ে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং শুষ্ক বৃষ্টিহীন মরুঅঞ্চলে সমৃদ্ধি সাধনের উপরও নতুন আলোকপাত হবে বলে আশা করা যায়।

আবহাওয়া এবং সমুদ্র-সমতলের উপর হিমবাহের প্রভাব বিদ্যমান। মেরু অঞ্চলের হিমশিলাগুলির আংশিক গলন ও বিস্তৃত অঞ্চলে ভয়াবহ প্লাবন এনে দিতে সক্ষম এবং তাতে পৃথিবীর আবহাওয়ার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। দেখা গেছে যে, হিমবাহগুলির ক্রম-অবক্ষয়ের ফলে প্রতি একশ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় চার ইঞ্চি করে বেড়ে যাচ্ছে। ভূপদার্থবর্ষে 'সীসমিক সার্ভে'র সাহায্যে হিমবাহ ও হিমশিলাগুলির গভীরতা এবং তন্নিম্নস্থ ভূপৃষ্ঠের ভৌগোলিক প্রকৃতি অনুসন্ধান করা হবে।

বিশাল বায়ুস্তরের সাময়িক স্থানচ্যুতির ফলে ভূমেরুরেখা (অ্যাক্সিস অব দি আর্থ) স্বাভাবিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত সরে যায়। এইসব নানা কারণে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার তারতম্য ঘটে। পৃথিবীর চক্রাবর্তনের উপরও এর খানিকটা প্রভাব অনুভূত হয়। এইসব পরিবর্তনের প্রকৃতি গাণিতিক সূক্ষ্মতার সঙ্গে জানবার জন্যও কাজ চালান হবে এই আঠারো মাসের পরিকল্পনায়।

আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবর্ষের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় কীর্তি হবে ঊর্ধ্বাকাশে রকেট এবং কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ। আমরা পৃথিবীর বুকে বসে পৃথিবী সম্বন্ধে যেসব জ্ঞান আহরণ করেছি, সেগুলো যাচাই করা ছাড়াও অনেক অজ্ঞাত তথ্য সংগ্রহ এর উদ্দেশ্য। বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণার মধ্য দিয়ে নানাভাবে পরিবর্তিত হতে হতে সূর্যের বর্ণচ্ছত্র (সোলার স্পেকট্রাম) পৃথিবী-পৃষ্ঠে নেমে আসে। সুতরাং তাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা অনেক খবর থেকেই বঞ্চিত থেকে যাই। তাছাড়া আয়ন-

মণ্ডলের অন্তস্থ এবং বহিস্থ চুম্বকক্ষেত্রে সৌর বিস্ফোরণের সংগে সংগে যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সেগুলো জানতে হলে আয়নমণ্ডলের বহু ঊর্ধ্বে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু জীবিতাবস্থায় মানুষের অত উ'চুতে পৌছানো এখনও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অতএব এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিসহ অসংখ্য রকেটদূত ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরণ। এইসব রকেটের সাহায্যে ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের তাপ, চাপ, ঘনত্ব, বেগুনিপারের রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি, সৌরবিকীরণ (সোলার রেডিয়েশন) উল্কা-কণিকা (মেটিওরাইটস্) ভূপৃষ্ঠের উপাদান, ভূচৌম্বকত্ব, মেরুপ্রভা প্রভৃতির উপর গবেষণা করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ও দক্ষিণ মেরুসহ পৃথিবীর নানাস্থান থেকে একশ'টি ক্ষুদ্র কায় বকুন রকেট (রকুন) এবং মূল আমেরিকা মহাদেশ থেকে ছত্রিশটি বৃহদাকার আরবি-রকেট নিক্ষেপ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ফ্রান্স সাহারা মরুভূমি থেকে বারটি ভেরনিক রকেট ছাড়বেন বলে জানা গেছে। রাশিয়া ব্রিটেনসহ আরও কয়েকটি দেশও রকেট পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করবেন।

রকেট সম্বন্ধে একটা অসুবিধা এই যে, তাকে দীর্ঘ সময় শূন্যে ভাসমান রাখা যায় না। ফলে পরীক্ষাকার্য ব্যাহত হয়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নেবেন বলে স্থির করেছেন। মানুষের গড়া এক একটা ছোট্ট চাঁদ নানা ধরনের অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত হয়ে যাত্রা করবে মহাকাশের উদ্দেশ্যে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন মূল্যবান তথ্য টেলিভিশন এবং টেলিমিটারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবে পৃথিবীতে।

যতদূর জানা গেছে, প্রথম উপগ্রহটি মাটি থেকে তিনশ মাইল উপরে উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে পরিক্রমা করবে। পরিক্রমণের বেগ হবে ঘণ্টায় কিঞ্চিদধিক আঠারো হাজার মাইল অর্থাৎ আসল চাঁদের গতির চাইতেই খানিকটা বেশী। উপগ্রহটি হবে বৃত্তাকার এবং এল্যুমিনিয়ম ও ম্যাগনেশিয়ামের প্রস্তুত স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। তার ব্যাস এবং ওজন যথাক্রমে ত্রিশ ইঞ্চি এবং সাজসরঞ্জামসহ সাড়ে একুশ পাউন্ড। দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টায় সৌরজগতের এই কৃত্রিম দেহটি (সিলেশটিয়াল বডি) পৃথিবীর চারদিকে ষোলবার পাক খেয়ে আসবে।

কি পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণরত অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তাও জানা গেছে। একটি ত্রিস্তর রকেট (থ্রি-স্টেজ রকেট) ব্যবহৃত হবে এই কাজে। রকেট তিনটির ক্রমান্বয়িক বিস্ফোরণের ধাক্কায় উপগ্রহটি পৌঁছে যাবে তিনশ' মাইল উপরে। শেষ রকেট তিনশ মাইল উপরে উঠে একটি স্প্রিংএর ধাক্কায় গোলোকটিকে এমনভাবে শূন্যে ঠেলে দেবে যেন তার গতিপথ হয় পৃথিবীর কক্ষের সাথে সমান্তরাল। এই তৃতীয় রকেটটির গতিবেগই হবে কৃত্রিম উপগ্রহটির গতিবেগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আই জি ওয়াই কমিটি (ইণ্টারন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল ইয়ার কমিটি) আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবর্ষের বিভিন্ন সময়ে বারটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে পর্যটনের জন্য প্রেরণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এদের গতির দিক হবে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। সোভিয়েত দেশও কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করবেন। কিন্তু তাদের গতিপথ হবে উত্তর থেকে দক্ষিণে।

কৃত্রিম উপগ্রহ সংক্রান্ত পরীক্ষায় বিজ্ঞানীদের জ্ঞানভাণ্ডার আর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হলে এবং আণবিক মোটর সৃষ্টির কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহদাকার কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ সম্ভব হতে পারে। এই অনাগত দিনের ঊর্ধ্বাকাশের বিভিন্ন মারণ-রশ্মির হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় এবং কৃত্রিম উপগ্রহটিকে প্রয়োজনমত পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে আনার কৌশল যদি মানুষের আয়ত্ত হয়, তাহলে হয়ত সে নিজেই একদিন কৃত্রিম উপগ্রহে চেপে হবে মহাকাশের যাত্রী। আমাদের গ্রহ অভিযানের স্বপ্ন হয়ত সেদিন আর সুদূরপরাহত থাকবে না।

ত্রিদিব চৌধুরী

॥ ১০ ॥

আমাদের দেশে অনেকেই এ খবর রাখেন না যে, গোয়ার ভিতরে পর্তুগীজ বিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ঐতিহ্য কমপক্ষে দেড়শ-দুইশ বছরের পুরাতন। সে আন্দোলনে ক্রিশ্চিয়ানরা যেমন অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি করিয়াছে হিন্দু। গোয়ার অধিবাসী এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের ভিতর এ বিষয়ে কোনো তারতম্য করা যায় না। উপরে এক জায়গায় ১৭৮৬ সালে গোয়ার দেশী ক্রিশ্চিয়ান ধর্মযাজকদের সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি—Pinto's Rebellion বা Priests' Rebellion নামে যা পর্তুগীজ ভারতের ইতিহাসে পরিচিত। গোয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজপুত বংশজাত 'রানে'দের (রানা হইতে) বিদ্রোহ ও দেশী সিপাহীদের সশস্ত্র সামরিক বিদ্রোহ এক আধবার নয়, ১৮৫২ সাল হইতে পর পর পাঁচবার ঘটিয়া গিয়াছে। 'রানে'-দের শেষ বিদ্রোহ হয় ১৯১১—১২ সালে। বিদ্রোহী 'রানে'রা শেষবার পরাজিত হওয়ার পর তাহাদের ভিতর হইতে কয়েক হাজার তরুণ যুবককে বন্দী করিয়া আফ্রিকার জঙ্গলে চালান দেওয়া হয়। সেখানে গিয়া কয়েক বছরের মধ্যেই তাহারা অর্থাভাবে, অনাহারে, রোগে ও মহামারীতে জীর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

বহুকাল আগে রাজপুতানা হইতে যে সমস্ত রাজপুত সৈনিক আসিয়া মারাঠা সৈন্যদলে যোগ দিত বা চাকুরি নিত (শিবাজীর আমল হইতে পেশোয়াদের আমলে এই রীতি অব্যাহত ছিল) তাহারা মহারাষ্ট্রে নিজেদের 'রানা' বা 'রানে' বলিয়া পরিচয় দিত। পর্তুগীজরা শেষদিকে গোয়ার আশে পাশে যে সব জায়গা দখল করে সেই সব জায়গায় বহুদিন ধরিয়া ভোঁসলে বংশের রাজন্য ও ভূস্বামীদের বসবাস ছিল, যেমন পেড়নে, সাত্তারী, সাঁকলি, সাংগে প্রভৃতি তালুকে। এইসব অঞ্চল গোয়াতে 'Nova Conquistas' ('New Conquests') নামে পরিচিত। ১৭৬৫ সালের আগে পুরাতন গোয়া শহর, জুয়ারী-মাণ্ডভী নদীর মোহনায় কয়েকটি দ্বীপ আর বাড়দেশ ও সালসেট তালুক (পর্তুগীজ ভাষায় তালুককে বলা হয় 'Concelho') ছাড়া পর্তুগীজদের দখলে অন্য কোন এলাকা ছিল না। কিন্তু মারাঠা রাজন্যদের ঘরোয়া ঝগড়ার সুযোগ নিয়া, তাহারা ক্রমে ক্রমে তাহাদের পুরাতন এলাকার আশে পাশে বহু তালুক দখল করে; কোনোটা তস্করবলে, কোনোটা কূটনীতির জোরে। সাত্তারী তালুক তাহারা নাকি সোজাসুজি ভোঁসলেদের নিকট হইতে কিনিয়াই নেয়। রানেরা অনেকে তাহার পূর্ব হইতেই এই সব অঞ্চলে বসবাস করিত; আজও করে। ইহাদের অধিকাংশই এখন কৃষির উপর নির্ভরশীল; যদিও সাঁকলিতে এখনও পুরাতন 'রানে' জমিদার বংশের যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। ব্রাহ্মণ ছাড়া গোয়ার এইসব অঞ্চলে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে ক্ষত্রিয় 'রানে'—ঐতিহ্যের সম্ভ্রম ও ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। এদিককার সকলেই নিজেদের 'রানে' বলিয়া বা কোনো 'রানে' বংশের কাছাকাছি লোক বলিয়া পরিচয় দিতে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করেন। গোয়ার সমসাময়িক কালের জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে যে সব সংগীত অত্যন্ত জনপ্রিয়, তাহার কয়েকটির ছত্রে ছত্রে তাহার সুন্দর নিদর্শন আছে; যেমন :—

"তিবার, মঙ্গল বার! আত্তলা তিবার,
মঙ্গল বার!
স্বাতন্ত্র্যাচী সিংহ-গর্জনা আতাঁ
ইথে উঠনার!
সহ্য পর্বতা, ভার্গব সিন্ধু,
উভারুনী হাথ
লাখ মুখানে' লল্‌কারুনিয়া দ্যা
তিজলা সাথ
হে রান্যাঞ্চা, উঠা সিডানোঁ,
লাবা ক্ষাত্র তিড়ে!
অনুবায়ুনো ফুলবো অমচ্যা
হৃদয়াতীল ইংগাড়ে ..."

"আজ অতি পবিত্র দিন, অতি শুভ দিন! আজ এখন হইতে এখানে স্বাধীনতার সিংহ-গর্জন উঠিবে। ঐ দেখ সহ্যাদ্রি পর্বতমালা আর ভার্গব সিন্ধু (আরব সমুদ্র; ভৃগু-পুত্র পরশুরাম এই সমুদ্র খনন করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বা কিংবদন্তী অনুযায়ী মহারাষ্ট্র ও কোঙ্কন অঞ্চলে আরব সমুদ্রকে ভার্গব সিন্ধু বলা হয়) হাত তুলিয়া আজিকার এই দিনকে স্বাগত জানাইতেছে! এস, আমরাও লক্ষ মুখে ললকার ধ্বনি তুলিয়া তাহার সঙ্গে সুর মেলাই। হে 'রানে' বংশধরগণ! (রান্যাঞ্চা) মাথা তুলিয়া একবার সোজা হইয়া দাঁড়াও, তোমাদের প্রশস্ত ললাটে মুক্তি-মাংগলিকের রক্ত-তিলক গ্রহণ কর! অনুকূল হাওয়ার বেগে তোমার হৃদয়ের ভিতরকার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ স্ফীত হইয়া মুক্তির দীপ্ত হোমানলে পরিণত হইবে......!"

একথা বলা বাহুল্য, যে দেশের এবং যে সমাজের হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে
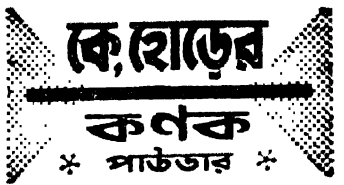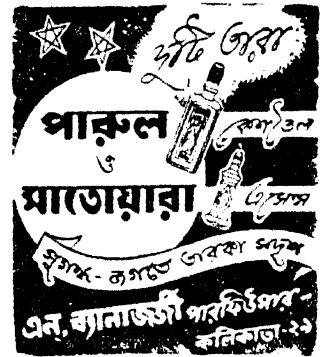
স্বাধীনতার জন্য এইরকম আকুল আহ্বান ধ্বনিত হইয়া ওঠে, সমষ্টিগতভাবে তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা অনগ্রসর এ কথা কিছুতেই বলা চলে না। পাঞ্জিমের পুলিস হাজতে, মানিকোম্ বন্দীশালায়, আগুয়াদা দুর্গে হিন্দু-মুসলমান-ক্রিশ্চিয়ান সকল রাজনৈতিক বন্দীকে দিনের পর দিন এক সাথে এক সুরে গলা মিলাইয়া এই গান গাহিতে শুনিয়াছি। রেইস্ মাগুস্ ও আগুয়াদা দুর্গের ভিতর হইতে চারি পাশের পর্বত-সমুদ্র-অরণ্য কম্পিত করিয়া আজও স্বাধীনতার সেই সিংহগর্জন ধ্বনিত হইতেছে। এত কথা লিখিলাম এইজন্য যে, খালি প্রবাসী গোয়াবাসীদের দেখিয়া গোয়ার ভিতরকার সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে ধারণা করার ভুল আমরা যেন না করি; করিলে যে গোয়াবাসীদের প্রতি অবিচার করা হইবে তাহা আমি খুব জোর করিয়া বলিতে পারি।*

---

* উপরে গোয়ার মুক্তি সংগ্রামের পুরাতন ঐতিহ্যের কথা বলিয়াছি। এখানে এই প্রসঙ্গে একজন গোয়াবাসীর নাম উল্লেখ করা দরকার, যিনি নিজে বিদ্রোহী বা রাজদ্রোহী না হইলেও, ভারতের আধুনিক গণতান্ত্রিক ও জাতীয় ভাবধারার ইতিহাসে যাহার নাম নিশ্চয় গৌরবোজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকিবে—ডাঃ ফ্রান্সিস্কো লুইজ গোমেজ। বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার রচনাবলী ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া তিনি যে উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে অতি সঙ্গতভাবে মহাদেব রানাডে, দাদাভাই নৌরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্রষ্টাদের পাশাপাশি তাঁহার নাম করা যাইতে পারে। পরে সুযোগ ঘটিলে তাঁহার জীবনী বিষয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল। ডাঃ গোমেজ গোয়া হইতে পর্তুগীজ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ পর্যন্ত দুইবার, পর্তুগীজ গোয়া-কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও গোয়ার জনসাধারণের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক লা মার্তিনের নিকট ১৮৬১ সালে লিখিত তাঁহার একটি চিঠি হইতে এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; তাহা হইতেই তাঁহার চিন্তাধারার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইবে :—

"I was born in the East Indies, once the cradle of poetry, philosophy and history and now their tomb.

I belong to that race which composed the Mahabharata and invented chess—two works which bear in them something of the eternal and infinite........

I ask for Indian liberty and light; as for myself, more happy than my countrymen.

(তখন তিনি ফ্রান্সে ছিলেন)

I am free—'civis sum': these titles would suffice to introduce me to you who admire my country and love mankind."

"পূর্ব ভারতে আমার জন্ম, যে দেশ কাব্য, দর্শন ইতিহাসের উৎসস্থল আর আজ তাহার সমাধিস্থান!

"আমি সেই জাতির লোক যাহারা অতীতে মহাভারত রচনা করিয়াছিল; সতরঞ্চ খেলার আবিষ্কার যাহাদের—ভারতের দুই অবদান শাশ্বত সীমাহীন অনন্তের ছাপ যাহাদের উপর পড়িয়াছে...।

আমি আজ ভারতের হইয়া স্বাধীনতার দাবী করিতেছি; নূতন যুগের স্বাধীন চিন্তাধারার আলো ভিক্ষা করিতেছি; যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার দেশবাসীদের চেয়ে সৌভাগ্যবান, কারণ, এখানে অন্তত নাগরিক স্বাধীনতার অধিকারটুকু আমার আছে। আমার দেশের প্রতি আপনি শ্রদ্ধাবান, মানবপ্রেমিক আপনি; আশা করি আমার এই পরিচয়ই আপনার কাছে যথেষ্ট হইবে যে আমি স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী।"

সালাজারের আমলে ডাঃ গোমেজকে কোথায় থাকিতে হইত তাহা সহজেই যে কোনো লোক কল্পনা করিতে পারেন।

আমরা যে গ্রামে প্রথম আসিয়া প্রবেশ করি তাহাও স্বাধীনতাপ্রিয় "রানে"দের দেশ, সাংগে' তালুকের মধ্যে। এই গ্রামে আসিয়া প্রথম গোয়ার ভিতরকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাইলাম। গ্রামটি সম্পূর্ণ হিন্দু গ্রাম; ত্রিশ-চল্লিশ ঘর লোকের বাস। রাজনীতি বা 'রাজকরণ' ঠিক ঠিক মতন বোঝে না; অশিক্ষিত, দরিদ্র কৃষিজীবী গ্রাম। পর্তুগীজ পুলিস বা মিলিটারীর ভয় তাহাদের যথেষ্টই আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা সত্যাগ্রহী হিসাবে 'হিন্দুস্থান' বা ভারত হইতে তাহাদের মুক্তির জন্য আসিয়াছি; বিদেশী ও বিধর্মী পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে তাহাদের হইয়া লড়িব বলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং আমাদের সম্পর্কে তাহাদের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা এবং সম্ভ্রম বোধও রহিয়া গিয়াছে। একদিকে যে কোনো দেশের সাধারণ মানুষের মতো শাসকশক্তির সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হইয়া বিপদে জড়াইয়া পড়ার অনিচ্ছাও মনে মনে কাজ করিতেছে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে অপরদিকে দেশের মুক্তি-যোদ্ধাদের সম্ভব মতন সম্মান দেখানোর বা তাহাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করার আগ্রহ আছে। কিন্তু তাহাদের সাধ্য অল্প; আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়। যে কয়েকটি লোক সেখানে [illegible] জন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল বা আমাদের হাত পা ধোয়ার জলটল আনিয়া দেওয়ার জন্য এদিক ওদিক যাওয়া আসা করিতেছিল, তাহাদের মুখ দেখিয়া তাহাদের মনোভাব বোঝা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন হয় নাই। তাহারা আমাদের সম্ভব মতো সাহায্য করিতে পিছ-পাও নয়। অথচ অযথা পর্তুগীজ মিলিটারী ও পুলিসের হাতে কোনো বেশী বিপদে পড়িতেও চায় না; তাহা এড়াইতে পারিলেই তাহাদের পক্ষে ভালো। এই অবস্থায় আমরাও খুব বেশীক্ষণ সেখানে থাকিয়া তাহাদের আর বেশী বিপদগ্রস্ত করিতে চাহিলাম না। আমাদের নিজেদের তাড়াতাড়িও ছিল। কারণ, শেষ পর্যন্ত আমরা যখন গোয়ার লোকালয়ের ভিতরেই আসিয়া পড়িয়াছি, তখন যত তাড়াতাড়ি হয় আরও বড় গ্রামে বা হাট বাজারে গিয়া সত্যাগ্রহ করার এবং সম্ভব হইলে প্রকাশ্যে সভা-সমিতি করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য গোয়ার জনসাধারণকে জানানোর এবং বোঝানোর সুযোগ নিতে চাহিতেছিলাম। একবার পুলিস সামনাসামনি আসিয়া পড়িলে আমাদের সে মতলব পণ্ড হইবে। কাজে কাজেই এই গ্রামে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করার পক্ষে কোনো যুক্তি দেখিলাম না। এখানে আমাদের আসার বা এই গ্রামে ঢোকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কিছুটা জিরাইয়া নেওয়া আর কিছুটা এদিককার পথ-ঘাটের ভালো করিয়া [illegible] নেওয়া, [illegible] আমরা ওয়ালপই বাজার ও থানার দিকে ঠিক ঠিকভাবে অগ্রসর হইতে পারি। গোয়ার সাধারণ মানুষ আমাদের কিভাবে গ্রহণ করে এবং এদিককার রাজনৈতিক আবহাওয়াটা কি রকম, মানুষগুলি কি রকম তাহা জানার ও বোঝার ইচ্ছাও খানিকটা ছিল। কিন্তু সেখান হইতে যখন আমরা ওঠার উপক্রম করিতেছি সেই সময় কিছু দুধ, চিনি ও পাকা কলার উপচার আসিল। পরিমাণে খুব বেশী নয়; কারণ যে পরিমাণে আসিলে আমাদের একান্নো বাহান্নো জন লোকের সকালের জলযোগের পক্ষে যথেষ্ট হইত তাহা অত ছোট গ্রামে যোগাড় করা সম্ভব ছিল না।

গৃহপতি এই সামান্য উপকরণ দিয়া আমাদের জলযোগের ব্যবস্থা করার জন্য কিছুটা সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আমাদের তো ইহার বেশী আর কিছু নাই; কিন্তু ইহাই কিছু কিছু মুখে দিয়া তবে আপনারা আবার রওনা হইবেন।" বলা বাহুল্য, নিমেষ না ফেলিতে আমাদের স্বেচ্ছাসৈনিকদের কল্যাণে সে দুধ, চিনি, কলা শেষ হইয়া গেল। আমরাও আর অনাবশ্যক সেখানে অপেক্ষা না করিয়া আবার পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, এখন আমরা পাহাড় হইতে উতরাইয়ের পথে নামিতেছি। এই গ্রাম হইতে বাহির হইয়াই, অল্প দূরে আসিয়া, আমরা বেশ চওড়া রাস্তা পাইয়া গেলাম। রাস্তা ক্রমশ ঢালু হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে। গ্রামেই খবর পাইয়াছিলাম, আর বেশীদূর হয়ত আমাদের হাঁটিতেও হইবে না; ক্রোশ দুয়েক আগাইয়া গেলেই নদীর ধারে ভিরোণ্ডে গ্রাম। সেই নদী পার হইলেই ওয়ালপইয়ের দিকে যাওয়ার রাস্তা।
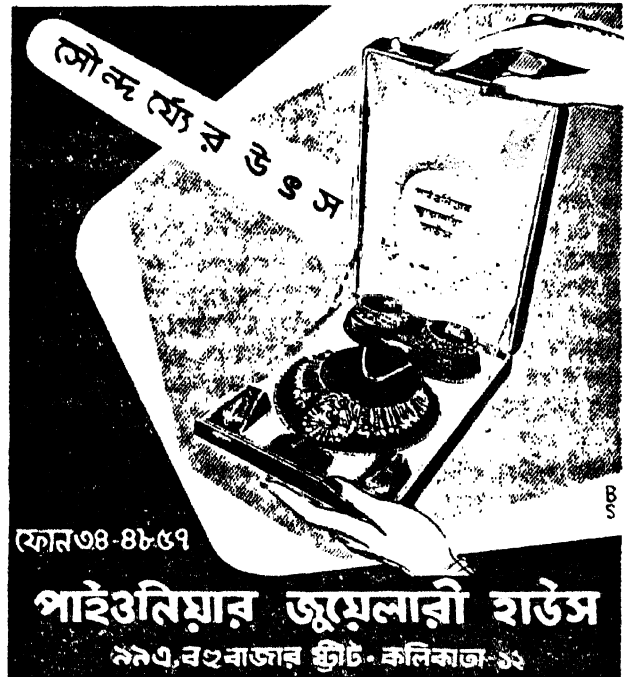
ওয়ালপই পর্যন্ত অবশ্য আমাদের সত্যাগ্রহ করিয়া হাঁটিয়া যাইতে হয় নাই। ভিরণ্ডের কাছে নদীর পারেই পর্তুগীজ মিলিটারী বাহিনী ও পুলিস অফিসারদের একদল আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

(ক্রমশ)

চক্রদত্ত

নিউক্লিয়ার শক্তি চালিত জাহাজ অদূর ভবিষ্যতে একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এই জাহাজের প্রধান সুবিধা যে কয়লা অথবা তেল নেবার জন্য বন্দরে যেতে হবে না। একেবারে না থেমে প্রয়োজন হলে হাজার হাজার মাইল চলতে পারবে। অবশ্য বর্তমানে এই ধরনের জাহাজ যে খুবই ব্যয়সাধ্য হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে কোন দেশের সরকার নিজে তৈরী করে ইচ্ছে করলে নিজেদের অধীনে চালাতে পারেন [illegible] সরকারী প্রতিষ্ঠানের
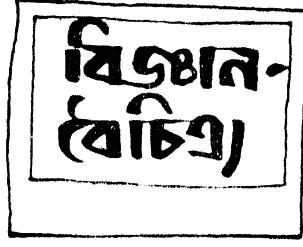
এ্যাটম চালিত জাহাজের নমুনা

হাতে চালাবার ভার দিয়ে দিতে পারেন। জাহাজের ইঞ্জিনের জন্য উরেনিয়ামকে শক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হবে। বিশেষজ্ঞরা হিসাব করে দেখেছেন যে একটি এই ধরনের ১০,০০০ শ্যাফট অশ্বশক্তি বিশিষ্ট জাহাজের জন্য মাত্র বছরে ৩০ পাউণ্ড উরেনিয়াম প্রয়োজন হবে। একটা দু পাউণ্ড ওজনের উরেনিয়ামের তাল ৯৬০,০০০ গ্যালন তেল এবং ৩০০০ টন কয়লার সমান শক্তি উৎপন্ন করবে। বর্তমান জাহাজে যতটা ইঞ্জিনের জন্য জায়গা দরকার নিউক্লিয়ার শক্তি চালিত জাহাজে অবশ্য ততটাই লাগবে। তবে জাহাজের জ্বালানি নেবার জায়গা এই নতুন জাহাজে দরকার হবে না এবং সেই জায়গাটা অন্য কোন কাজে লাগান চলবে।

*

শান্তির জন্য অ্যাটম। পৃথিবীর অনেক জাতই আন্তরিকভাবে চান। অ্যাটমের শক্তিকে ধ্বংসের কার্যে না লাগিয়ে মানুষের উপকারে লাগাবার চেষ্টা চলেছে। সম্প্রতি অ্যাটমকে কলা পচে যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তার কাজে লাগান হচ্ছে। কলা গাছ থেকে কেটে বাজার ঘুরে বেশ কয়েকদিন বাদে আমাদের কাছে এসে যখন পৌঁছয় তখন তার আর পচতে বেশী দেরি থাকে না। দেখা যাচ্ছে যে পচনের হাত থেকে রক্ষা করবার রসায়নিক দ্রব্যকে তেজস্ক্রিয় করে তারপর কলার কাটা ছড়ের অংশগুলো এই রসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয় তাহলে কলাগুলো আর পচে না। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, তেজস্ক্রিয় রসায়নিক দ্রব্যটি কলার ভেতরে কিন্তু কোন কারণেই প্রবেশ করে না। ফলে কলাগুলো মানুষের পক্ষে খাওয়ার আর কোন বাধাই থাকে না।

*

সম্প্রতি পৃথিবীর সঠিক পরিধি কত তা বার করবার চেষ্টা চলছে। বর্তমানের মাপে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর পরিধি আগের মাপের চেয়ে আধ মাইল কম। এটাও দেখা গেছে যে, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ব্যাসার্ধের মাপ আগে ছিল ৬,৯৭৬,৬৩৬ গজ কিন্তু ১৯০৯ সালের পর থেকে মাপ জোখ করে দেখা যাচ্ছে যে এটা আগের থেকে ১৪০ গজ কম। বর্তমানে পরিধি মাপা হয়েছে পশ্চিম গোলার্ধের আলাস্কা থেকে চিলি পর্যন্ত এবং পূর্ব গোলার্ধের ফিনল্যাণ্ড থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত (arc) চাপগুলির মাপ নিয়ে। এই প্রত্যেকটি চাপ পৃথিবীর পরিধির এক তৃতীয়াংশের সমান।

*

সমুদ্রের গভীর তলদেশে অন্ধকারের রাজ্য। কিন্তু এই অন্ধকার রাজ্যেও এমন সব প্রাণী পাওয়া যায় যারা কিছু পরিমাণ আলো বিকিরণ করে। হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই ক্ষীণতম আলোর পরিমাণ মাপবার বন্দোবস্ত করেছেন। তাঁরা আটলাণ্টিক মহাসাগরে এ সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। যে যন্ত্রের সাহায্যে এই আলোর পরিমাণ মাপা হচ্ছে, সেটা দিয়ে ২০০০ ফিট জলের নিচে পূর্ণ সূর্যের আলোর শতকরা এক ভাগের লক্ষ লক্ষ ভাগ পরিমাণ আলো মাপা যাবে। এই আলোর পরিমাণ মাপার কারণ হচ্ছে যে সমুদ্রের তলার প্রাণী এবং উদ্ভিদ-এর ওপর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়। এ ছাড়াও এই যন্ত্রের সাহায্যে জাহাজ থেকে জলের নিচে প্রেরিত শব্দ তরঙ্গেরও সঠিক নির্দেশ দেবে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জাহাজ থেকে শব্দ জলের নিচে পাঠানর পর সেই শব্দ সমুদ্রের ক্ষুদ্রতম প্রাণীদের স্তরের ওপর ধাক্কা লেগে প্রতিফলিত হয়ে আবার জলের ওপরে উঠে জাহাজের গভীরতা নির্দেশক যন্ত্রে নির্দেশ দিতে থাকে। কিন্তু যে নির্দেশ তখন যন্ত্রে পাওয়া যায় সেটা সমুদ্রের তলার ঠিক মাপ নয়—কারণ একেবারে তলায় পৌঁছবার আগে সেটা এই ক্ষুদ্রতম প্রাণীদের স্তরে আঘাত করে ওপরের দিকে ফিরে যায়।

*

'টেলিপ্রিণ্টারস্' আজ সারা পৃথিবীময় কাগজওয়ালাদের খবর পৌঁছাবার প্রধান সহায়। বর্তমানে একটি নতুন টেলিপ্রিণ্টারস তৈরী হয়েছে যেটি এক মিনিটে ১০০০টি শব্দ পাঠাতে পারবে। বর্তমানের যন্ত্রের চেয়ে এই যন্ত্র ১৬ গুণ দ্রুত কাজ করতে পারে। সমস্ত যন্ত্রটি একটি অফিস টাইপরাইটারের সমান। আশা করা যাচ্ছে যে যন্ত্রটি আরো ছোট করে তৈরী করা সম্ভব হবে। সমস্ত খবরগুলি এক বিশেষ ধরনের চুম্বক ফিতের ওপর ধরা হয়। তারপর এই ফিতে যদি বিদ্যুৎ চালিত টাইপরাইটারের ওপর লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অনেকগুলি জায়গায় একেবারে খবরগুলি পাঠান যাবে। আরো পরীক্ষার পর প্রস্তুতকারকরা এটিকে বাজারে চালু করবেন।

*

ছোট ছেলেমেয়েদের খেলনা নিত্য নতুন হওয়া দরকার। নতুন কিছু করবার জন্য সম্প্রতি খেলনাগুলোতে ফ্লোরেসেণ্ট রং লাগাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পাঁচ ধরনের রং এখন তৈরী হয়েছে। খেলনাগুলো যদি ঘরের মধ্যে রাখা যায় তাহলে সাধারণ রং লাগান খেলনার মতই সেগুলো নষ্ট হবে না। ফ্লোরেসেণ্ট রংগুলো বিষাক্ত নয়, সেই জন্য এই রং ছেলেদের খেলনায় স্বচ্ছন্দে লাগান যেতে পারে।

[আঠার]

"সুয়েজ খাল বৃটেনের যতটা প্রয়োজনীয়, ততটাই নীল নদ মিশরের পক্ষে অপরিহার্য"—
আরনল্ড টয়েনবী।

"সুদান প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক দিক থেকে মিশরের অবিচ্ছেদ্য অংশ; মিশর বাদ দিয়ে সুদানের অগ্রগতি অসম্ভব।"—উইনস্টন চার্চিল।

নাসের একটি প্রবন্ধে বলেছেন, মিশর যতদিন সুদানের প্রতি তার সাম্রাজ্যবাদী লোভ ত্যাগ না করতে পারবে ততদিন নিজেও সে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হ'তে পারবে না।

এ কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই মহম্মদ নাগিবের একটি উক্তিতে। "মিশরের প্রজাতান্ত্রিক সরকার সুদানের বেশির ভাগ জনমতের সমর্থন পেলো শুধু এই জন্যে যে, সে সুদানের স্বরাজ অধিকার স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল, যদিও তার পছন্দ ছিল নীল উপত্যকার ঐক্য। সুদানবাসী এবার জানত যে, নতুন মিশর তাদের পূর্ণ সমতার আসনে বসাতে ইচ্ছুক।"

অথচ, আমরা দেখেছি, মহম্মদ আলী থেকে ফারুক বা জগলুল পাশা থেকে নাহাস পাশা কেউ সুদানকে এই সমতার সম্মান ও স্বরাজের অধিকার দিতে রাজী হন নি। বরঞ্চ, এই দীর্ঘকাল ধ'রে মিশরের রাজনীতি থেকে সুদান সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি মিশরের সাংস্কৃতিক মানসকে অধিকার ক'রে ফেলেছিল।

এই মনোভাবের একমাত্র কারণ নীল নদের জল।

১৮২০ সালে মিশরের দক্ষিণস্থ স্থলভূমি মহম্মদ আলী অধিকার করবার আগে বর্তমান সুদানের অস্তিত্ব ছিল না; অস্তিত্ব ছিল কয়েকটি উপজাতীয় রাজ্যের। তাদের রাজারা ও দলপতিরা বাইরের দুনিয়ার কোন খবরই রাখত না। মহম্মদ আলী এই স্থলভূমি অধিকার করেছিলেন অথোমান সুলতানের নামে, তাঁর অনুমতি নিয়ে। সেনার নামক স্থানে উপজাতিপতিদের কাছ থেকে তুর্কী সুলতানের প্রতি আনুগত্যের শপথ তিনি আদায় করেছিলেন; বিজিত অঞ্চলের নাম দিয়েছিলেন "মিশরী সুদান"।

কিসের প্রেরণায় মহম্মদ আলী গিয়েছিলেন এই দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ অজ্ঞাত অসভ্য দেশে? "জাতীয়তাবাদী" মিশরের নেতারা বলতেন, সভ্যতার আলোক পৌঁছে দেবার জন্যে, উপনিবেশলোভী যা চিরদিন ব'লে থাকে। আসলে মহম্মদ আলী শুনেছিলেন, দক্ষিণ সুদানে প্রভূত স্বর্ণ আছে—রাজা সলোমনের সোনার খনি। তাতে তাঁর লোভ হয়েছিল। আর, মিশরে চিরস্থায়ী সেচব্যবস্থার আয়োজন করতে গিয়ে মহম্মদ আলীর পক্ষে প্রয়োজন হয়েছিল নীল নদের উৎস-সন্ধান। অবশ্য, একটা উদ্দেশ্যও মহম্মদ আলীর সার্থক হয় নি। তাঁর পুত্র ইস্মাইল সেনার অধিকার করার পরেই তিনি ফরাসী ও জার্মান বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে স্বর্ণ-সন্ধানী দল পাঠিয়েছিলেন দুর্গম পার্বত্য-অঞ্চলে। পরে, সত্তর বছর বয়সে, নিজেই হাজির হয়েছিলেন সুদানে নানা জাতের পরস্পরবিরোধী বিবৃতির সত্যতা যাচাই করতে। কিন্তু দক্ষিণ মিশর, ইংরেজ যাকে আবদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করেছিল, অনেক খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হ'লেও সোনা তার অন্যতম নয়। নীল নদের উৎসের সন্ধানও মহম্মদ আলী পান নি; য়ুরোপীয় সন্ধানীদের চেষ্টায় শুধু জানতে পেরেছিলেন, সুদান উত্তীর্ণ হয়ে নীল নদ জন্ম নিয়েছে ইথিওপিয়া ও উগাণ্ডার দুটি সুবৃহৎ জলাশয় থেকে।

কিন্তু সুদান থেকে মহম্মদ আলী পেয়েছিলেন দুটি মূল্যবান জিনিস। তাঁর সৈন্যবাহিনীর জন্যে হাজার হাজার সমর্থ সাহসী সৈনিস। আর, ক্রীতদাস। এই ক্রীতদাস-ব্যবস্থা বহুদিন চলে এসেছিল। ১৮৩৯ সালেও দেখতে পাই, সুদানের গভর্নর জেনারেল মিশরের প্রধান অমাত্যকে লিখছেন, সুদানের মরু অঞ্চলে ক্রীতদাস আহরণের অনুমতির জন্যে। "আমি ধ'রে আনতে চাই কালো বর্বরদের, যারা তাদের বর্তমান অবস্থায় না ঈশ্বরের না মানুষের সেবার যোগ্য। তাদের মধ্যে সৈনিক জীবনের উপযুক্তদের রেখে, বাকীগুলোকে বেচে দেওয়া যাবে।"

বিজিত সুদানের উপর প্রথম থেকেই মিশরী শাসকরা এত অত্যাচার করতে থাকে যে, মহম্মদ আলী নিজেই রুদ্ধ বয়সে সুদানীদের দুর্দশা দেখে বিচলিত হয়েছিলেন। সেই প্রথম পর্যায় থেকেই সুদানবাসীর মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে শুরু করে। তখনই সুদানের গ্রামে গ্রামে শোনা যেত, "দশজন বরঞ্চ একসঙ্গে কবরে যাব, কিন্তু অত্যাচারীকে খাজনা দেব না।"

সেনারের দলপতিদের মহম্মদ আলী আহ্বান করলেন তাঁর রাজকীয় তাঁবুতে
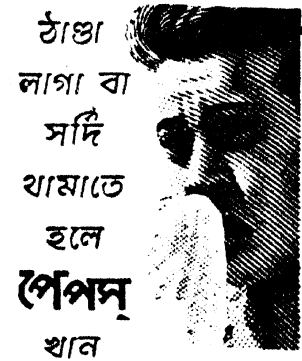
রাজদর্শনের জন্য। বলেন, "পৃথিবীর অন্য দেশের লোকেরাও একদিন অসভ্য, বর্বর ছিল। তারা শিক্ষা পেয়েছে এবং পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সভ্যতা অর্জন করেছে। তাদের মতো তোমাদেরও মাথা আছে, হাত আছে। তোমরাও চেষ্টা করো। মানুষের স্তরে উঠতে পারবে। তোমরা প্রভূত সম্পদ অর্জন করবে, এমন সব সম্ভোগের সন্ধান পাবে যা অজ্ঞান তোমরা আজ কল্পনাও করতে পার না। এর জন্যে যা দরকার সবই তোমাদের রয়েছে। বিস্তর জমি, যথেষ্ট গরু-মোষ, প্রচুর অরণ্য। তোমরা সংখ্যায় অনেক। তোমাদের পুরুষেরা বলিষ্ঠ, মেয়েরা ফলবতী। শুধু এতদিন তোমাদের পথ দেখাবার কেউ ছিল না। এখন তাও তোমরা

পেয়েছ। আমি তোমাদের পথ দেখাব। আমি তোমাদের নিয়ে যাব সভ্যতায়, সম্পদে।"*

এই "আমি-তোমাদের-নিয়ে-যাব" মনোবৃত্তি ১৩০ বছর চেপে ব'সেছিল মিশরী নেতাদের চেতনাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে কীচেনার যখন সুদান পুনরধিকার করেন, মিশরবাসী তখন থেকেই সুদানের উপর বৃটিশ কর্তৃত্ব মানতে অস্বীকার ক'রে এসেছে। দ্বৈত-শাসনের চুক্তি স্বাক্ষর করার অপরাধে প্রধানমন্ত্রী বোত্রাস গালি পাশাকে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই মিশরের চোখের সামনে নতুন এক সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে, যাতে সুদানের প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়ে যায়। আসোয়ান ও অন্যান্য অঞ্চলে কয়েকটি বাঁধ নির্মিত হবার পর নীল নদের জলের উপর মিশরের অধিকারের প্রশ্নটা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। তখন থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত এই প্রশ্নই সুদান সমস্যাকে জটিল ক'রে রেখেছিল। এখনো তার সুষ্ঠু সমাধান হয় নি।

১৯২২ সাল থেকেই, জাতীয়তাবাদের প্রথম বিকাশের আন্দোলন-উজ্জ্বল অধ্যায়ে সুদান সম্পর্কে মিশরের দাবী বলিষ্ঠ হ'তে শুরু করে। জগলুল পাশা চেয়েছিলেন ১৯২৩-এর সংবিধানে মিশরের রাজাকে সুদানেরও রাজা ব'লে অভিহিত করতে। কিন্তু এলেনবীর হুমকিতে এই ইচ্ছা কাজে পরিণত হ'তে পারে নি। তথাপি ১৯২৩-এর সংবিধানে লেখা হয়েছিল, "মিশরের রাজার সিংহাসনের খেতাব নির্ধারিত হবে সুদান সমস্যা সমাধানের পর।" ১৯৩৬ সালে মিশরের পার্লামেণ্ট ফারুককে মিশর ও সুদান উভয়েরই রাজা বানিয়েছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। জগলুল পাশা ও নাহাস পাশা উভয়েই বৃটেনে শ্রমিক মন্ত্রীদের কাছে সুদানে মিশরের দাবী আদায় করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত মিশরে কোন প্রধানমন্ত্রীর রাজত্ব করার উপায় ছিল না "সুদান মিশরের" এই দাবী আঁকড়ে না ধরলে।

অথচ ১৯৫২ সালে নাগিব-নাসের যখন সুদানকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দিলেন, সবচেয়ে উল্লসিত হয়েছিল মিশরেরই জনসাধারণ!

আসল সমস্যা তো জলের!

ইংরেজের সুয়েজ খাল ছাড়া চলতে পারে, কিন্তু নীলবিহীন মিশর শুধু ধূসর মরুভূমি। অথচ এ নদীর উপর মিশরের অধিকারকে প্রকৃতিই সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছে। ছয় হাজার বছর যাবৎ নীল নদ মিশরকে জীবন-রস দান ক'রে এসেছে; অথচ একদিন রাজনীতি ও অর্থনীতি যে এই আপাতঃ-অশেষ প্রাণধারা রুদ্ধ ক'রে দিতে পারে বিংশ শতাব্দীর আগে কোন মিশরীই তা ভাবতে পারে নি। যতদিন মিশরের কৃষি নির্ভরশীল ছিল বন্যা এবং অবৈজ্ঞানিক সেচ ব্যবস্থার উপর, ততদিন কোন ভয় বা বিপদই দেখা দেয় নি। মহম্মদ আলী যখন সেচ ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানের সাহায্যে স্থায়ী ও ব্যাপক ক'রে তুলতে চাইলেন, তখনো বিপদের সংকেত দেখা দেয় নি, কেননা, সুদান ছিল সভ্যতার বাইরে। কিন্তু মিশরের অনুকরণে এবং পাশ্চাত্য দৃষ্টি নিয়ে সুদানের ইংরেজ শাসকরাও যখন সেচ ব্যবস্থাকে বাঁধ, জলাশয় ইত্যাদির সহায়তায় উন্নততর করতে শুরু করলেন, তখন মিশরের নেতাদের কাছে বিপদের উৎস ও সম্ভাব্য গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে ইংরেজ সুদানে বা উগাণ্ডায় নীল নদের উপর বিজ্ঞানের শাসন অনায়াসে এমনিভাবে আরোপ করতে পারে যাতে মিশরের একমাত্র প্রাণরস যাবে শুকিয়ে। অন্ততঃ সুদানে যাতে এই মৃত্যু-দণ্ডের সূচনা না হয়, তাই সুদানকে মিশরের সঙ্গে একত্র ক'রে নীল উপত্যকার ঐক্য প্রতিষ্ঠা মিশর রাজনীতির প্রায় প্রধানতম লক্ষ্য হয়ে উঠল। অবশ্য, ইংরাজের সামরিক ও রাজনৈতিক অপসরণ এর সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও সুদান-মিশরের ঐক্য একই সমস্যার দুটি দিক হয়ে ওঠে।

১৯২৪ সালে কাইরোতে স্যার লী স্ট্যাকের হত্যার সঙ্গে সঙ্গেই এলেনবী মিশররাজাকে যে চরম-পত্র প্রদান করেন, তাতে এমন একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি ও ভয়ংকর ইঙ্গিত ছিল যা প্রত্যেক মিশরী নেতাকে বিচলিত করে। এলেনবী রাজা ফোয়াদকে জানিয়ে দেন যে, সুদান "প্রয়োজন হলে" তার সেচ ব্যবস্থা "যতটা খুশি" বাড়িয়ে চলবে। অর্থাৎ, মিশর যদি ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করে, সুদান থেকেই ইংরেজ এমন ব্যবস্থা করতে পারবে যাতে মিশরকে জলাভাবে শুকিয়ে মরতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই সুদানে সেনার বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়, শেষ হয় ১৯২৫ সালে। মিশরের আতঙ্ক এতে আরো বেড়ে যায়।

আন্তর্জাতিক নদী সম্বন্ধে একটামাত্র প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন বর্তমান জগতে চালু আছে। ওপেনহাইম তাঁর 'আন্তর্জাতিক আইন' নামক বিখ্যাত পুস্তকে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। আইনটি সহজ। "কোন দেশ তার নিজের প্রাকৃতিক অবস্থা এমনভাবে পরিবর্তন করবে না, যাতে অন্য একটি দেশের ক্ষতি হ'তে পারে।" ইথিওপিয়া, উগাণ্ডা, সুদান ও মিশর—এই চারটি দেশের মধ্য দিয়ে নীল নদ প্রবাহিত। এদের কেউ এমনভাবে তার গতিপথ নিয়ে ব্যবস্থা করবে না, যাতে অন্য কোন দেশের ক্ষতি হ'তে

---
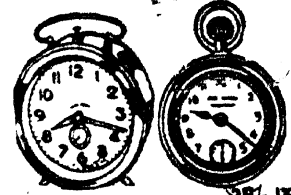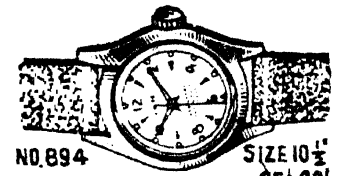
* The African Slave Trade And Its Remedy, By T. F. Buxton, Cairo, 1920.

পারে। অন্যার্থে, নীল নদের জলের বৈজ্ঞানিক সম্ব্যবহার এই চারটি দেশের যৌথ প্রচেষ্টা থেকে হলেই কোন আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হবে না।

ইথিওপিয়ার কাছে শুধু এই নীল-জলের জন্য প্রাচীন মিশরকে যে অধীনের ভূমিকা অবলম্বন করতে হতো তার প্রমাণ পাওয়া যায় হাবসী দেশে প্রচলিত একটি কাহিনী থেকে।* মিশরের রাজা সোলতান উপঢৌকন নিয়ে এসেছেন হাবসী সম্রাটের রাজসভায়।

"মিশরের রাজা সোলতান আনত শির
হাবসী সম্রাটের সম্মুখে, যিনি নীল নদের কর্তা;
যে নদীকে অন্যপথে চালিত করলে,
কাইরো হবে এক মুহূর্তে উপবাসী।"

* The Sudan Question. By Mekki Abbas, London, 1952.

ইংরেজ এখনো উগাণ্ডার অধিকর্তা। যতদিন সুদান ও মিশরে তার আধিপত্য ছিল ততদিন সাম্রাজ্যবাদী দাক্ষিণ্যে, প্রচ্ছন্ন বা আচ্ছন্ন হুমকি দিলেও, নীল নদের জলের একটা মোটামুটি যুক্তিযুক্ত বাটোয়ারা ইংরেজ নিজেই ক'রে নিয়েছিল। তথাপি ১৯২০ সাল থেকেই নীল নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক সমস্যার সূত্রপাত হতে থাকে।

ঐ বছরে স্যার মুরডক ম্যাকডোনাল্ড নীল-শাসনের জন্য একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা তৈরী করেন।* মিশর, সুদান, ইথিওপিয়া ও উগাণ্ডা চারটি দেশে বৈজ্ঞানিক প্রথায় নীল নদকে মানুষের বৃহত্তম সেবায় আনয়ন করার এই পরিকল্পনা আজও পর্যন্ত কার্যকরী হয় নি। স্যার মুরডক প্রস্তাব করেন, ইথিওপিয়ায় "টানা লেকে" (Lake Tana) একটি বাঁধ নির্মাণ করা হোক, উগাণ্ডার লেক ভিক্টোরিয়ায় আর একটি, খার্তুমের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে আরো একটি। তা ছাড়া, ক্ষুদ্রতর বাঁধ নির্মিত হোক নীল-নদের গতিপথে আরো তিন চারটি স্থানে। বর্তমানে উগাণ্ডার সীমান্তে ২০০ মাইলব্যাপী এক অবরুদ্ধ জঙ্গলাকীর্ণ অংশে নীলের যে বিরাট জলাংশের অপচয় হচ্ছে, তার সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থাও এ পরিকল্পনায় তৈরী করা হয়।

* Nile Control, By Sir Murdoch MacDonald, Cairo, 1920.

কোনো বড় কাজ না করার একটা প্রচলিত পন্থা হ'ল তার "বিস্তারিত বিবেচনার" জন্যে একটি কমিটি নিযুক্ত করা। ইংরেজ সরকারও তাই করলেন। মুরডক ম্যাকডোনাল্ডের পরিকল্পনাকে বিবেচনা করবার জন্যে নিয়োগ করলেন "নীল পরিকল্পনা কমিশন", তার সভাপতি হলেন ভারত গভর্নমেন্টের নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি। মার্কিন সরকারের একজন প্রতিনিধিকেও কমিশনে স্থান দেওয়া হল। কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হল মিশর সরকারের কাছে পেশ করতে তাঁদের প্রস্তাব "যাতে ক'রে মিশর ও সুদানের কল্যাণের জন্যে নীল নদের জলকে আরো নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে।"

এই কমিশনের মার্কিন সদস্য অন্য সদস্যদের সংগে দ্বিমত হওয়া সত্ত্বেও এবং মিশরের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তরোত্তর গরম হতে চললেও, মুরডক ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের মূল প্রস্তাব ও কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্ট এই দুই-এর উপর ভিত্তি করে ১৯২৯ সালে নীল নদের জল-বণ্টন নিয়ে একটি ইংগ-মিশর-সুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বৃহত্তম অংশ পায় মিশর। সুদানকে দেওয়া হয় মিশরের প্রাপ্যের বাইশ ভাগের এক ভাগ। তখনকার দিনে সুদানের প্রয়োজনের পক্ষে এই ছিল যথেষ্ট।

এখন অবশ্য প্রয়োজন বেড়ে গেছে, আরো বাড়বে। সংগে সংগে, গত কয়েক বছরে, উগাণ্ডা ও ইথিওপিয়াতেও নীল নদের জলধারা থেকে সেচবারি ও বিদ্যুৎ আদায় করার প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে।

গত বিশ বছরে মিশরী সরকার ইংরেজ ও মিশরী পারদর্শী ইঞ্জিনীয়ারদের সাহায্যে নীল সমস্যার নানাদিক বিচার, অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিয়েছেন। এর ফলে জন্ম নিয়েছে বিরাট এক নীল-শাসন পরিকল্পনা, ম্যাকডোনাল্ড প্ল্যান থেকে অনেক উচ্চাশাপূর্ণ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা: এ পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করবার কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং বর্তমান মিশরের নেতারা এর সার্থকতার জন্যে বিশেষ উৎসাহী।

কাজ শুরু হয়েছে উগাণ্ডায়। নীল যেখানে লেক ভিক্টোরিয়া থেকে উঠে এসেছে, সেখানে "আওয়েন জলপ্রপাত" শাসন করবার

জন্যে একটি বাঁধ ও একটি বিদ্যুৎ কারখানা তৈরী অনেকখানি এগিয়েছে। নাসেরের গভর্নমেণ্ট এজন্য অনেক অর্থ দিয়েছেন। মিশর, সুদান, উগাণ্ডা এবং বৃটেন এই চার দেশের এটা যৌথ প্রচেষ্টা। এর পরে আলবার্ট লেকের সন্নিকটে মুতির নামক স্থানে আর একটি বাঁধ নির্মিত হবে।

মিশরের বিপ্লবী নেতা নাসের ও নাগিব যখন তাঁদের সহকর্মীদের পূর্ণ সম্মতি নিয়ে সুদানের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার অকপটে স্বীকার ক'রে নেন, তখন তাঁদের দৃষ্টি জেগে-ওঠা আফ্রিকা মহাদেশের ভবিষ্যৎ চেহারার দিকেই নিবদ্ধ ছিল; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের য়ুরোপীয় দৃষ্টিতে তাঁরা এ সমস্যার বিচার করেন নি। নীল মিশরের একার নয়, সুদানেরও নয়। নীল আফ্রিকার। আফ্রিকার গর্ভে থেকে জন্মে আফ্রিকার চার হাজার মাইল জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নীল ভূমধ্যসাগরে লীন হয়েছে। আফ্রিকার এক বিরাট অঞ্চলের বর্তমান অনুন্নত চেহারা একদিন নীল একেবারে বদলে দিতে পারবে। এজন্যে সর্বপ্রধান কর্তব্য হ'ল নীল নদ থেকে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টি অপসরণ করা। স্বাধীন মিশর, স্বাধীন সুদান, স্বাধীন উগাণ্ডা, স্বাধীন টাংগানাইকা ও স্বাধীন ইথিওপিয়া নীল নদের বিস্তীর্ণ গতিপথে লুক্কায়িত অপরিমিত সম্পদের সম্ভাবনাকে একদিন কাজে লাগাবে আফ্রিকার সভ্যতার মান বৃদ্ধির প্রয়োজনে। বিরাট ও বর্ধমান লোকসংখ্যার ভারে নিপীড়িত মিশরের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন নীল নদের যথেষ্ট জল, নীল থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ। উভয়ের জন্যই সুদানের মিত্রতা ও সহযোগিতা অপরিহার্য। স্বাধীন, মিত্র সুদান অনেক বড় সহায় পরাধীন অসন্তুষ্ট সুদানের চেয়ে। তাই নাসের, ১৩০ বছরের ইতিহাসের অন্ধ পথে প্রাচীর তুলে দিয়ে, সুদানের স্বাধিকার মেনে নিয়েছেন। তাই তিনি আশাদীপ্ত চোখে তাকিয়ে আছেন উগাণ্ডা ও টাংগানাইকার স্বাধীনতা দিবসের প্রতি। তারও আর বেশি দেরি নেই।

নীল একদিন গ্রীক পণ্ডিত হেরোডোটাসকে বিমুগ্ধ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জেমস্ ব্রুস নীল নদের উৎস সন্ধানে হাবসী সাম্রাজ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন; কুব্লাই খাঁ যেমন মার্কো পোলোকে একটি সোনার পাত্র দান করে বলেছিলেন, 'এ পাত্র তোমাকে বিনা বাধায় সর্বত্র নিয়ে যাবে', হাবসী সম্রাটও ব্রুসকে তেমনি দিয়েছিলেন একটি মনোরম অশ্ব। সে অশ্বকে আগে চালিয়ে যেখানে ইচ্ছা যাবার অধিকার পেয়েছিলেন ইংরেজ ব্যবসায়ী ব্রুস, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা থেকে অনেক দূরে হাবসী সাম্রাজ্যে। কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও তিনি নীল-উৎসের সন্ধান পান নি; শুধু জানতে পেরেছিলেন নীল নীলের উৎস। তথাপি ইথিওপিয়ার সংগে জেমস্ ব্রুসের নাম জড়িয়ে আছে। রাজকুমারীকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য ক'রে তিনি তাঁর প্রেম পেয়েছিলেন। তাঁর বন্দুকের বাহাদুরী দেখিয়ে সহজ সরল নিগ্রোদের অবাক করেছিলেন। যে লক্ষ্যে জেমস্ ব্রুস পৌঁছতে পারেন নি তা আয়ত্তে এসেছিল আর একজন ইংরেজের, বহু বছর পরে। ১৮৫৮ সালে স্যার রিচার্ড বারটনের নেতৃত্বে নীল-উৎস সন্ধানী যে দলটি আফ্রিকার বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার মধ্যে ছিলেন জে এইচ স্পীক। টাংগানাইকার সীমান্তে একা একা সন্ধান করতে করতে তিনি এসে উপস্থিত হন লেক ভিক্টোরিয়ায়, নীল নদের মাতৃক্রোড়ে।

তারপর থেকে প্রায় একশ বছর নীল বহু ইংরেজের অন্তরে সাম্রাজ্যাকাঙ্ক্ষা জাগাতে সাহায্য করেছে। ১৮৯৮এ লর্ড ক্রোমার পররাষ্ট্র সচিব লর্ড সল্সবেরীকে কাইরো থেকে সুদানের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে মেমোরেণ্ডাম পাঠান তাতেই বোঝা যায়, আফ্রিকার উত্তর-পূর্বে তীরভূমিতে পরিব্যাপ্ত এক বিরাট সাম্রাজ্যের পক্ষে নীল নদ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।* নীল নদ সাম্রাজ্য-স্বপ্ন জাগিয়েছিল ঐ সময়ে আর একটি তরুণ ইংরেজের মনে। তাঁর নাম উইনস্টন চার্চিল। সুদান বিজয়কে তিনি নাম দিয়েছিলেন "রিভার ওয়ার"—নদীর যুদ্ধ। নীল উপত্যকার প্রাচীন প্রাকৃতিক ঐক্যের মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়ে চার্চিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ বছরে লিখেছিলেন, "সুদান বিজয়ের এই হ'ল সোজা ও অকপট কারণ। দুইটি অবিভেজ্য রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করা; যাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ নানাভাবে সংযুক্ত, তেমন দুটি জাতিকে একত্রিত করা......" **

মহম্মদ আলী থেকে ফারুক, জগলুল থেকে নাহাস—মিশরের প্রত্যেক নেতাই মিশরী অধিকারের ধ্বনি তুলে ইংরেজ অধিকারকেই কায়েমী ক'রে তুলেছিলেন। নাসের সুদানের সার্বভৌম অধিকারের দাবী মেনে নিতেই সাম্রাজ্যবন্ধন শিথিল হয়ে গেল। সুদানে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন কোন রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা পেলে মিশরের পক্ষে বিশেষ বিপদ। একথা মিশরও জানে, সুদানও জানে। নতুন মিশর যে বন্ধুত্ব, মিত্রতা ও সহযোগিতার সংগে তার পূর্ণ স্বাধীনতার পথ সহজ ক'রে দিয়েছে সুদান তা সহজে বিস্মৃত হবে না। মহম্মদ আলী সুদানী উপজাতিপতিদের একদিন সম্ভাষণ ক'রে যা বলেছিলেন ইতিহাস তাকে সত্যে পরিণত করেছে, কিন্তু কি বিচিত্র, অভাবনীয় পথে!! (ক্রমশ)

* The Sudan Question. Appendix 8.

** The River War—An Account of Reconquest of the Sudan, by Winston S. Churchill. London 1899 adn 1951.

দুই সখীতে

লোকের সঙ্গে মিশবার ক্ষমতা একটি মস্ত সামাজিক গুণ, এই গুণটি রেশমীর প্রচুর পরিমাণে ছিল। গাঁয়ে থাকতে কোমরে কাপড় জড়িয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতো সে, সব খবর সকলের আগে আসতো তার কানে, দিদিমা মোক্ষদা বুড়ী বলতো ও বাতাসে খবর পায়। কার ছেলের বিয়ে, কার নাতনীর বিয়ে, বাড়ির লোকে জানবার আগে জানতো ও। লোকে ঠাট্টা ক'রে বলতো ঘটকি ঠাকরুন। কোমরে কাপড়-জড়ানো মুখে হাসি সর্বত্র অবাধ গতিশীল রেশমী ছিল গাঁয়ের আনন্দলহরী।

তারপরে অকস্মাৎ এল দুঃখের রাত্রি। সংসারের যাবতীয় দুর্দৈব হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ল তার ঘাড়ে। রেশমীর সঙ্গে গাঁয়ের হাসিটুকু গেল এক ফুঁয়ে নিভে। সুখী মানুষ শিশু, চিরসুখী মানুষ চির-শিশু। দুঃখে মানুষের বয়স ভিতরে ভিতরে বাড়িয়ে তোলে। দুঃখের ধাক্কায় এক ধমকে রেশমীর বয়সটা গিয়েছে বেড়ে। তবু পুরনো অভ্যাসটা যায়নি।

মদনাবাটির কুঠিতে পৌঁছে দু'চার দিন পরেই ন্যাড়াকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল গাঁয়ের মধ্যে। বাঁশবনের মধ্যে সোদামিনী বুড়ীর ঘর। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

বুড়ী শুধাল, তোমরা কাদের ছেলে-মেয়ে গো?

রেশমী বল্‌ল—কায়েস্থদের গো।

দেখে ভাই বোন বলে মনে হচ্ছে।

রেশমী বলে, ঠিক ধরেছ দিদিমা।

তা বেশ, বসো বসো।

তারপরে শুধাল, এখানে কোত্থেকে গা?

ঐ কুঠিবাড়িতে এসেছি।

তা বয়স এত হয়েছে, বিয়ে হয়নি কেন?

আমাদের কুলীনদের ঘরে এমন হয়।

হয়ই তো, হয়ই তো। আমার বর জুটতে বয়স দু কুড়ি পেরিয়ে গিয়েছিল, আমরাও কুলীন কিনা।

সোদামিনী বিধবা।

রেশমী বলে, সে কি কথা দিদিমা তোমার বয়স এখনই তো দু' কুড়ি হয়নি।

প্রতিবাদ করে না বুড়ী। তৎপরিবর্তে দন্তলেশহীন মুখগহ্বরে হাসি ফুটিয়ে বলে, এসেছ চাট্টি চালভাজা খেয়ে যাও। চাট্টি চালভাজা খেয়ে যাও।

চালভাজা খেতে খেতে ন্যাড়া শুধায়, চালভাজা খাও কি ক'রে দিদিমা, তোমার দাঁত তো দেখছি না।

মাড়ি দিয়ে খাই দাদা, মাড়ি দিয়ে খাই, (প্রত্যেক কথার দ্বিত্ব ভাষণ বুড়ীর এক মুদ্রাদোষ) মাড়ির জোর কি দাঁতের আছে। দাঁত পড়লে তবে চালভাজা খেয়ে সুখ।

সেই অতিদূর অনাগত দিনের জন্য অপেক্ষা করবার ইচ্ছা দেখা গেল না ন্যাড়ার ব্যবহারে, কায়মনোবাক্যে চালভাজায় আত্ম-নিয়োগ করলো সে।

আর একদিন গেল ছুতোরদের পাড়ায়। আজ সঙ্গে ছিল না ন্যাড়া, মাছ ধরবার মত একটা পুকুরের সন্ধান পেয়েছে সে। ছুতোরের মেয়েরা চিঁড়ে কুটছিল। যে মেয়েটি ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিল সে একটু নামমাত্র বিনা ভূমিকায় রেশমী ঢেঁকিতে পাড় দিতে শুরু করল।

প্রথমে কেউ লক্ষ্য করেনি। তারপরে তার দিকে চোখ পড়তেই সবাই জিজ্ঞাসা করল, তুমি কোথায় থাকো গা?

রেশমী গম্ভীরভাবে বল্‌ল, বাঁশবনে।

ওরা শুধোল, ডোমপাড়ায়?

ডোমপাড়ায় কেন হতে যাবে? বাঁশবনের, আমি বাঁশবনের পেত্নী।

অপ্রত্যাশিত উত্তরে সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল, অনেকেরই তার প্রেতযোনিত্বের দাবীতে বিশ্বাস হ'ল। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ও কানাকানি শুরু করল।

তখন একটি বর্ষীয়সী গিন্নিবান্নি গোছের মেয়ে শুধাল, তা এখানে কেন মা?

আর জন্মে আমার বাপের বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না, চিঁড়ে কুটে, খই মুড়ি ভেজে আমাদের চলতো। তারপরে বিয়ে হ'ল বড় লোকের ঘরে। চিঁড়ে কোটা গেল বন্ধ হয়ে। চিঁড়ে কুটতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠলাম। এক-দিন ছুতোরদের পাড়ায় চিঁড়ে কোটা হচ্ছিল, লুকিয়ে গিয়ে চিঁড়ে কুটে এলুম। কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে শাশুড়ী বাপের বাড়ির খোঁটা দিয়ে গালাগালি করল। সেই দুঃখে গলায় দড়ি দিয়ে মরলাম।

তার গত জন্মের বিবরণে এইজন্ম-বাসিনীরা ভয়ে বিস্ময়ে বসে পড়ল, কারো মুখে কথা নেই।

তখন সেই বর্ষীয়সী মেয়েটি বল্‌ল, তা এখানে কেন মা?

ওই যে বল্‌লাম, চিঁড়ে কোটার শখ, বিশেষ ক'রে ছুতোরদের চিঁড়ে কোটায়।

পেত্নী মাঝে মাঝে ভাজা মাছ দাবী ক'রে উপদ্রব করে এই সংবাদটাই সকলের জানা ছিল, চিঁড়ে-কোটা পেত্নীর বিবরণ কেউ শোনে নি,—তার উপরে আবার পেত্নীটা অত্যন্ত বেয়াড়া রকমের নাছোড়বান্দা।

নিরুপায় দেখে সেই বর্ষীয়সী মেয়েটি গলায় কাপড় দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করল, মিনতি জানাল, মা তুমি দেবী কি মানবী যেই হও, দয়া ক'রে এখন স্বস্থানে যাও।

রেশমী দেখল, তামাশায় আশাতীত ফল ফলেছে, সে রোখের সঙ্গে বলে উঠল, আর

প্রত্যেকটি শব্দের উপরে সানুনাসিক ঝোঁক দিল (কথাটা এতক্ষণ তা'র মনে পড়েনি) না, ক'খখনো যাঁবো না, তোঁদের আঁড়াই মণ চিঁড়ে কুঁটে দিয়ে ত'বে যাঁবো। শাঁশুড়ীর গাঁলাগাঁলির জ্বাঁলায় এ'খনো গাঁ জ্ব'লছে।

প্রণতা মহিলা বলিল, মা আমরা বড় গরীব।

আঁরে সে'ই জন্যেই তোঁ এ'সেছি। রাঁজারা কি চিঁ'ড়ে কোঁটে, তাঁরা তো চিঁ'ড়ে খাঁয়, ক্ষী'র দিয়ে, স'ন্দেশ দিয়ে, কলা দিয়ে মেখে।

পেত্নী বড়ই নাছোড়বান্দা।

দলের মুখপাত্ররূপে সেই মেয়েটি বললে, দয়া ক'রে তুমি অন্তর্ধান কর মা, চিড়ে ক্ষীর সন্দেশ কলা দিয়ে তোমার ভোগ দেব।

কোথায় দিবি? কখন দিবি?

বলা বাহুল্য, শব্দের অনুনাসিক প্রয়োগ চলল, কিন্তু অভ্যাস না থাকায় মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, আবার সংশোধন ক'রে নেয় রেশমী। পেত্নী না হয়ে পেত্নীর অভিনয় করা যে সহজ নয় এই ঘটনাতে তা সকলেই বুঝতে পারবেন।

যেখানে বলো, আসছে শনিবারে অমবস্যা পড়ছে সেইদিন।

পেত্নী বলে, না মানুষের কথা বিশ্বাস করিনে। তারা মানং ক'রে দেয় না।

রেশমীর বিশ্বাসের বিশেষ কারণ আছে, বিপদে প'ড়ে অনেকবার মানং করেছে, বিপদ কেটে গেলে দেয়নি।

আজই দিতে হবে, এখনই এখানে।

সকলের পুনরায় বিস্মিত নির্বাক ভাব।

একজন বললে, বড়গিন্নি দাও না এনে।

বড়গিন্নি, মানে সেই মুখপাত্র, বললে, আমার ঘরে আর সবই তো আছে, কেবল কলাটা নেই।

পেত্নী ক্ষোভে বলে উঠল—(অনুনাসিক উচ্চারণে) তা হবে না, কলা আমার বড় ভালো লাগে। পাকা কলা না পেলে ছেড়ে যাবো না।

একজন বললে, ছিদামদের গাছে বোধ করি আছে।

পেত্নী—(সানুনাসিক) তবে যাও না, নিয়ে এসো না, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? পেত্নী কি কখনো দেখোনি?

সত্য কথা বলতে কি, ইতিপূর্বে তারা কেউ পেত্নী দেখেনি—আর পেত্নীর যে এত রূপ হয় তা-ও কেউ শোনে নি।

দু'তিনজন অগ্রণী হয়ে পেত্নীর ভোগের উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করল, একটা আস্ত পেত্নীকে সশরীরে ক্ষীর, সন্দেশ ও কদলী সহযোগে চিপিটক ভক্ষণ করতে দেখবার দুর্দমনীয় কৌতূহল তাদের পেত্নীভীতিকে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল।

একটা ক্ষুধিত কুপিত পেত্নীর সঙ্গে এই অবকাশে ঠিক কিরূপ ব্যবহার করা উচিত জানা না থাকায় সকলে নির্বাক হয়ে রইল।

এমন সময়ে ছুটে প্রবেশ করল গোল গোল কালো কালো রঙের চুল ছোট ক'রে ছাঁটা একটি মেয়ে, বললে, তোমরা সবাই অমন হাঁ ক'রে বসে আছ কেন? কি হ'য়েছে?

একজন ব'লে উঠল, ফুলকি চুপ কর্, দেখছিস্‌নে পেত্নীর আবির্ভাব হয়েছে।

ফুলকি রেশমীকে লক্ষ্য করেনি, এবারে দেখে চীৎকার ক'রে উঠবে, রেশমী চোখের ইশারায় তাকে নিষেধ করল।

অন্য একজন বললে, এদিকে স'রে আয়, উনি চিড়ে দুধের ভোগ চান, নইলে সর্বনাশ করবেন।

ফুলকির সঙ্গে এই কয়দিনেই রেশমীর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, এরা তা জানত না। কিন্তু ফুলকি বিলক্ষণ জানত, রেশমীর স্বভাব, বুঝল একটা কিছু চলছে। তাই সে বললে, ভোগ চান তো দাও।

আনতে গিয়েছে।

এমন সময়ে চিড়ে ক্ষীর সন্দেশ ও কলা নিয়ে একটি মেয়ে প্রবেশ করল। তখন সমস্যা হ'ল কে এগিয়ে দেবে?

ফুলকি বললে, সেজন্য ভাবনা কি? আমি দিচ্ছি গিয়ে।

তোর হাতে কি উনি খাবেন?

কেন খাবেন না! পেত্নীতে জাতবিচার করে না।

তবে এগিয়ে নিয়ে যা, গিয়ে মর্।

কিন্তু ভয়ের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না ফুলকির আচরণে। সে ভোগের উপকরণ পেত্নীর কাছে নিয়ে যাওয়ামাত্র পেত্নী দিব্য মানুষটির মত এসে বসল। আর সবাই হতচকিত হয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে দেখল যে, শুধু পেত্নী নয়, পেত্নী ও ফুলকি দুজনে যথাশক্তি সেগুলি মেখে চুখে নিয়ে খেতে আরম্ভ করেছে।

ক্রমে আসল রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ল। সব শুনে মেয়েদের কেউ-কেউ হেসে উঠল, অনেকেই রাগ ক'রে চলে গেল। কেবল সেই বর্ষীয়সী মেয়েটি বলল, ও'দের বিষয় নিয়ে অমন ক'রে ঠাট্টা তামাশা করা ভালো নয়, অমনি মরবে।

কুঠিতে আসবার পরদিনেই ফলুকির সংগে রেশমীর দেখা হয় আর অল্পক্ষণের আলাপের পরেই দু'জনে খুব ভাব জমে যায়।

রেশমী শুধাল, তুমি ভাই কোথায় থাক?

ফলুকি বল্ল—আলেডালে।

সে আবার কি?

আজ এখানে, কাল ওখানে।

রেশমী বুঝল, মেয়েটি একটু অন্য ধরনের, শুধাল, কাল রাতে কোথায় ছিলে তাই না হয় বল।

কাল রাতে ছিলাম কালীবাড়ির পোড়ো মন্দিরটায়।

ভয় করল না?

আমার ভয় করবে কেন? ভয় করল ওদের।

কাদের?

মাকালীর ডাকিনী যোগিনীদের।

সে আবার কি রকম?

তারা আমার চেহারা দেখে মাকালী ভেবেছিল তাই কাছে ঘেঁষেনি!

এবারে রেশমী ঠাট্টা ক'রে বল্‌ল, আর শিবঠাকুরটি?

জানতে পারলে অবশ্য তিনি পোড়ো মন্দিরেই দেখা দিতেন।

দেবতারা তো ভাই অন্তর্যামী।

তা আর জানিনে! বলে উঠ্‌ল ফলুকি।

বেশ তো, কাল না হয় কাটালে কালী-বাড়িতে, আজকে কোথায় থাকবে?

ভাবছি, ভোলা বাগদির ঘরেই থাকব।

বিস্মিত রেশমী শুধায়, সে আবার কে?

এই গাঁয়েই থাকে লোকটা। কিছুদিন আগে তার বউ মরেছে—আমার পিছু পিছু আজ ক'দিন ঘুরছে। দেখো না, এই শাড়ি-খানা তারই দেওয়া।

এই স্পষ্ট ইঙ্গিতে রেশমী নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করল, নিজের অজ্ঞাতসারে বসল একটু সরে, এতক্ষণ ঘেঁষাঘেঁষি বসেছিল।

ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে ফলুকি বল্‌ল, এতেই সরে বসলে—

অপ্রস্তুত রেশমী বল্‌ল, না, না।

না ভাই, তোমার আর দোষ কি? স'রে বসাই তো চাই। কিন্তু সব কথা শুনলে বোধ করি দশ রশি দূরে থেকে আমাকে গড় করবে।

মেয়েটির কথায় রেশমীর কৌতূহল বাড়ছিল, অস্ফুট স্বরে বল্‌ল, কি শুনি না।

ফলুকি শুরু করল, পুরুষ বড় লোভী, ঠিক যেন বাড়ির লোভী ছেলেটা। সন্দেশের থালা দেখলেই ছুঁক ছুঁক ক'রে আশে পাশে ঘুরে বেড়াবে। এখন সারাদিন কি ভাই সন্দেশ পাহারা নিয়ে ব'সে থাকা যায়, তাই একটু-আধটু ভেঙে তাদের হাতে দিয়ে দিতে হয়, খুশি হয়ে চলে যায়, নিশ্বাস ফেলবার সময় পাওয়া যায়। সন্দেশ যতই দামী হোক, দিনরাত্রি পাহারা বসিয়ে রাখবার মত দামী নিশ্চয়ই নয়।

রেশমী বল্‌ল, তা কতজনকে সন্দেশ ভেঙে দিলে? এবারে তার কথায় মিশলো একটু ঝাঁঝ!

হেসে উঠে ফলুকি বল্‌ল, তুমি রাগ করেছ দেখছি।

তারপরে গুনগুন সুরে গান ধরল—

'তা গুনেতে গেলে গুণের নাহি শেষ।'

রেশমী তার নির্লজ্জতায় রেগে উঠে বল্‌ল, এ তো গেরস্ত মেয়ের মত কাজ নয়।

নয়ই তো। যার ঘর নেই, দুয়োর নেই, সে আবার গেরস্ত কি?

তোমার কি বাপ মা নেই?

ছিল নিশ্চয়ই, নইলে হলাম কেমন ক'রে?

তবে?

তবে আবার কি?

এই ব'লে আবার সে গান ধরে—

'আমরা যে ভাই মায়ের ছেলে
বাপ চিনিনে কোনকালে।'

তারপরে ব্যাখ্যা ক'রে শোনায়, আমরা তরাই অঞ্চলের লোক। মা সাঁওতাল, বাপ শুনেছি কোন্ জমিদার কি তার নায়েব কি অমনি একটা কেউ। দেখিনি কোনকালে। ওলাওটায় মা ম'রে যাওয়ার পরে ঘুরতে ঘুরতে এদেশে চলে এসেছি, ভালো না লাগলে আবার ভেসে অন্যত্র চলে যাব—ঐ দেখ। এই ব'লে আকাশে একখানা কালো মেঘ দেখায়, ঐ কালো মেঘখানা কেমন জল দিতে দিতে এক দেশ থেকে আর এক দেশে চ'লে যাচ্ছে।

কিছুদিন গেল রেশমীর এই মেয়েটির সম্বন্ধে মনস্থির করতে। একদিকে তার সামাজিক মন বলে, এ অন্যায়, এ অন্যায়, এ ঘৃণার্হ এ ঘৃণার্হ; অন্যদিকে তার আদিম মন বলে, এমন কি হয়েছে, এমন কি হয়েছে; একদিকে আকর্ষণ অন্যদিকে বিকর্ষণ; এ সেই সোনার আপেল দর্শনে আদি রমণী ইভের দ্বন্দ্ব আর কি! ইভের ক্ষেত্রে যেমন রেশমীর ক্ষেত্রেও তেমনি শেষ পর্যন্ত সোনার আপেলেরই হ'ল জয়। দু'জনের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য হয়ে উঠ্‌ল, দুই সখী।

শুধু তাই নয়, গাঁয়ের লোকের সংগেও সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেল্‌ল রেশমী, কেউ মাসি কেউ পিসি, কেউ দিদিমা, কেউ মা ইত্যাকার।

এইভাবে বেশ চলছিল এমন সময়ে কেমন ক'রে রটে গেল রেশমীর জীবনের প্রকৃত বৃত্তান্ত, সে বিধবা এবং চিতাপলায়িতা। অমনি এই অলক্ষণে মেয়েটার প্রতি মাসি পিসি দিদিমা মামার দল সর্বৈব বিমুখ হ'ল। ফলুকির চরিত্র জানা সত্ত্বেও ফলুকিকে তারা ক্ষমা করেছে, কিন্তু এ যে আর এক কথা। হয়তো তাদের দৃষ্টিই যথার্থ, প্রবৃত্তির নিয়ম যে ভঙ্গ করেছে অদৃষ্ট তাকে শাসন করবে কিন্তু সমাজবিধি ভঙ্গের শাসক সমাজ।

গাঁয়ের লোকের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত রেশমীর আরো কাছে এসে দাঁড়ালো ফলুকি, বল্‌ল, বেশ করেছ ভাই, খামোকা মরতে যাবো কেন? বেঁচে থাকবার কত সুখ।

পদ্মদীঘির উঁচু পাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দু'জনে কথা বলছিল, দীঘির কালো জল-রাশি দেখিয়ে ফলুকি বল্‌ল, চলো নেমে খানিকটা সাঁতার কাটি, দেখবে কত আরাম।

তারপরে একটু থেমে বল্‌ল, চিতায় পুড়ে মরতে যাবো—মরণ আর কি?

রেশমীকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে শাড়িখানা খুলে রেখে উঁচু পাড়ি থেকে সবেগে দীঘির বুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ফলুকি, মুহূর্তে মধ্যে জল উথল পাথাল হয়ে উঠ্‌ল।

রেশমী দেখল, মসৃণ কালো জলের মধ্যে কালো দেহ স্নানরসিকা কালীয় নাগিনী।

(ক্রমশ)

আহ্লাদী। সারা গায়ে ঢেউ-তুলে-চলা আহ্লাদী।

মতিলাল তার কথা ভুলতে চায়। কিন্তু পারে না। যখনই চোখে পড়ে কোনও গোল-গাল হাসিখুশী মেয়ে মতিলাল নিজের অজান্তে তার সঙ্গে আহ্লাদীর মুখের তুলনা করে। যখনই শোনে, মেয়েলী গলায় প্রাণ খোলা হাসি, নিমেষের মধ্যে সে আনমনা হয়ে যায়। ভুলতে চাইলেও আহ্লাদী তাকে ভুলতে দেয় না। কি আশ্চর্য।

আর আশ্চর্য লোক নিতাই মণ্ডল। রস-কষহীন শুকনো বাদাম। ভগবান তাকে গড়েছেন বোধ হয় একটু বেশী কড়াপাকে। তা' না হলে অমন করে মতিলালকে সেকথা শোনাতে পারত না।

এ তো কথা নয়, বাক্য যন্ত্রণা।

ভাবতেও মতিলালের বিশ্রী লাগে। চল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতিওয়ালা ভাগলপুরী গয়লার মত ষাড়ছাটা, নিতাই একঘর লোকের সামনে তাকে অপমান করছে, অথচ যার সত্যি মিথ্যে মতিলাল কিছুই জানে না।

মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলে, আমাকে কেন দুষছ ভাই, সে যদি চুরি করে থাকে—

নিতাই মণ্ডল গর্জন করে, যদি নয়, আলবাৎ করেছে। তোমার আসকারা পেয়েই তো এদিকে ঘোরাফেরা করে। সাবধান করে দিচ্ছি মতিলাল, তোমার আহ্লাদীকে সামলো। তা নইলে একদিন এত লোকের সামনে তাকে অপমান করব। রাগে নিতাইএর রগের শির কাঁপে, বিশ্রী থ্যাবড়া নাকটা ফুলে ফুলে ওঠে।

মতিলাল আর সবাইকে সালিশ মানে, দোকানে কত লোক আস্ছে, ভাই, কে চুরি করেছে বুঝবে কি করে? ও মেয়েটা তো সেরকম নয়।

নিতাই আর কাউকে কথা বলতে দেয় না, গলা চড়িয়ে পঞ্চমে তোলে, বাজে কথা রাখো মতিলাল, সে সময় আমার দোকানে আর কেউ ছিল না। বোস্ সাহেবের মেম্ এসেছিলেন, আমি নিজে মাল দেখাচ্ছিলাম ঠিক সেই সময় তোমার আহ্লাদী এসে ঢুক্লো। জিজ্ঞেস করলে, ক্রীম রঙের ব্লাউজ পীস্ আছে? বললাম, একটু দাঁড়ান আমি দেখাচ্ছি। নিজেই ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র দেখছিল প্রায় মিনিট দশেক। মিসেস্ বোসের কাপড় প্যাক করে দিয়ে আসতে না আসতে দেখি তোমার আহ্লাদী দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি হল, ব্লাউজ পীস্ দেখবেন না। কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল। ঠিক তার পরেই মাল গুছিয়ে রাখতে গিয়ে নজরে পড়লো দামী ব্রোকেড্ পীস্‌টা নেই। চল্লিশ টাকা দাম, তিন গজ পড়ে ছিল, সেইটে নিয়ে হাওয়া।

কি জ্বালা ধরানো কথা নিতাইয়ের। মতিলালের কান দুটো লাল হয়ে ওঠে। বলে, আমি আজই ওর সঙ্গে দেখা করব।

নিতাই গজরাতে গজরাতে চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও। মতিলাল চুপ করে দোকানের মধ্যে বসে থাকে।

মার্কেটের বেশ ভেতর দিকে মতিলালের একফালি কাপড়ের দোকান। ফলের বাজার থেকে যে সরু গলিটা বার হয়েছে, তারই ওপর। এ গলিতে সব শুদ্ধ গোটা পনেরো দোকান হবে, বেশীর ভাগই ফ্যান্সী জিনিসের। কাপড়ের দোকান মাত্র দুটি, মতিলাল আর নিতাই মণ্ডলের। আয়তনে নিতাইয়ের দোকান বড় আর ঠিক মোড়ের মাথায় বলে বিক্রী অনেক বেশী। সেই অনু-

পাতে মালও মজুত থাকে সব সময়। দরকার পড়লে মতিলাল খদ্দের বসিয়ে রেখে নিতাই-এর দোকান থেকে দৌড়ী দিয়ে মাল নিয়ে আসে। সেইজন্যেই সে নিতাইকে চটাতে সাহস করে না।
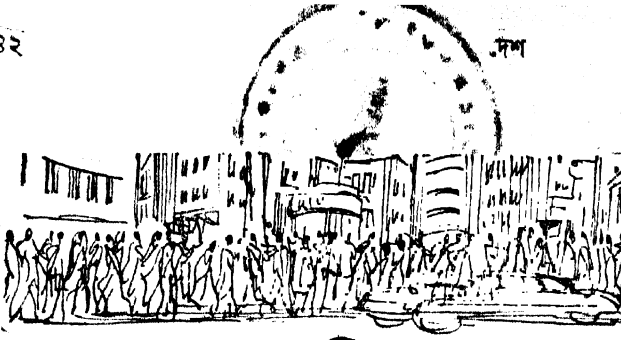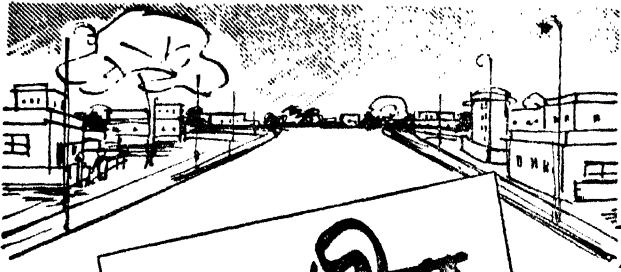
মতিলালের ব্যবসা দু' পুরুষের। ওর বাপ এখানে দোকান দিয়েছিলেন, সে প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। মতিলাল তখন ছোট ছেলে, বাবার হাত ধরে এসে দোকানে বসে থাকত। সেদিনকার অনেক দোকান আজ উঠে গেছে, কিংবা হাত বদলে অন্যলোক মালিক হয়েছে।

মতিলালের দোকানে কোন কর্মচারী নেই। নিজেই কাজ দেখে। অবশ্য আবদুল মিয়া প্রায়ই এসে দোকানে বসে। সে ওর আজকের অভ্যেস নয়। মতিলালের বাবার আমল থেকেই আসে। আবদুল মিয়া আগে এই মার্কেটেই দালালী করত। সাহেব মেম ধরে এনে বেশী দামে মাল বিক্রী করিয়ে দিয়ে দালালীর পয়সা নিত। পরিষ্কার ইংরাজীতে কথা বলার জন্যে বিদেশী খদ্দের জুটিয়ে নিত সহজে। কিন্তু সেদিন আর নেই। কর্পোরেশনের লোক মার্কেটের মধ্যে দালালী করা বন্ধ করে দিয়েছে। আবদুলেরও বয়েস হয়েছে যথেষ্ট তবু মার্কেটের নেশা ছাড়তে পারেনি। ঠিক আগের মতই মতিলালের দোকানের সামনে টুলের ওপর এসে বসে।

আজ আবদুল দোকানে এল অন্য দিনের চেয়ে দেরিতে। মতিলালকে গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করে, এত চুপ-চাপ কেন?

মতিলাল নীরস গলায় উত্তর দেয়, আর বোল না মিয়াভাই, আহ্লাদীর জ্বালায় তো ম'লাম।

—কেন কি হল?

—কাল নিতাইয়ের দোকান থেকে একশ' টাকার মাল চুরি গেছে, ও বলে আহ্লাদী নিয়েছে।

আবদুল বিড়িতে সুখটান দেয়, বলে, হতেও পারে, আশ্চর্য কি?

মতিলাল গলা নামিয়ে বলে, তাহলে ওর সংগে আর কারবার রাখা যাবে না। নয়ত শেষে বদনাম হয়ে যাবে। তাই ভাবছি আজই ওর সংগে দেখা করব।

আবদুল একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, বেশ তো, ঠিক পাঁচটার সময় মেনকা কাফেতে গিয়ে ম্যানেজারের সংগে দেখা কোরো। আমার নাম করে বললেই সাকীনাকে ডেকে দেবে।

আহ্লাদীর কথা আবদুলকে বলার প্রয়োজন ছিল। মাস ছয়েক আগে আবদুলই তাকে নিয়ে এসেছিল মতিলালের দোকানে। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল, তোমার এক বাঁধা খদ্দের নিয়ে এলাম মতিভাই। এ'র সংগে বিলিব্যবস্থা ঠিক করে নাও।

মতিলাল খাতির করে বসিয়ে তার সংগে আলাপ করে। চোখে মুখে কথা বলা মেয়ে।

বছর পঁচিশ বয়েস। নিটোল স্বাস্থ্য। সুন্দরী না হলেও যথেষ্ট আলগা শ্রী আছে।

আবদুল এ মেয়েটির কথা আগেই মতিলালকে বলে রেখেছিল।

মেয়েটি মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করে, কি মতিবাবু আমার কথায় রাজী তো?

মতিলাল সহজ হবার চেষ্টা করে উত্তর দেয়, ঠিক বুঝতে পারছি না। এ ধরনের বন্দোবস্ত তো আগে কখনও করিনি।

—আপনি তো আর কিছু অন্যায় করছেন না—

—তা নয়, তবু—মতিলাল কিন্তু কিন্তু করে।

মেয়েটি মতিলালের চোখে চোখ রেখে বলে, ধরুন আমি যদি কোন বন্ধুর সঙ্গে এসে আপনার দোকান থেকে দাম দিয়ে জিনিস কিনে নিয়ে যাই, তাতে তো আপনার আপত্তি নেই?

—তা নেই।

তারপর মনে করুন যদি ক'দিন পরে একা এসে জিনিসগুলো ঠিক আগের মত প্যাক-করা অবস্থায় ফেরত দিয়ে আপনার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে যাই—

—তাতে আমার লাভ?

মেয়েটি খিল খিল করে হাসে, বাঃ বিনা-পয়সায় করতে বলছি বুঝি? টাকায় চার আনা তো আপনার, আমি বার আনা ফেরত পেলেই খুশী। কি বলুন, আপত্তি আছে?

মতিলাল তখনও কিছু পরিষ্কার করে বলতে পারে না, ইতস্তত করে। মেয়েটি বুঝতে পেরে কাছে উঠে আসে। মিনতিভরা চোখে মতিলালের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলে, বিশ্বাস করুন মতিবাবু, এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।

এর পর আর মতিলাল না করতে পারেনি।

সেই থেকে মেয়েটি কতদিন এসেছে নিত্য নতুন সঙ্গী নিয়ে। লোক দেখিয়ে মাল কেনা আবার ফেরত দিয়ে পয়সা নিয়ে যাওয়া। মাসে অন্তত দশবার। আশ্চর্য মেয়েটার হাসি, দোকানের মধ্যে ঢুকে এমনভাবে হাসে মনে হয় সবাই যেন তার কত আপনার। সঙ্গীটি যেন বহুদিনের পরিচিত। সামান্য কথায় এত হাসে, মতিলালের মনে হয় এ ওর রোগ। চেষ্টা করেও যেন সামলাতে পারে না। সেইজন্যে মতিলাল ওর নাম দিয়েছিল আহ্লাদী।

কাল অবশ্য আহ্লাদী দুপুরবেলা একলাই এসেছিল দুদিন আগে কেনা দুটো শাড়ীর টাকা ফেরত নিতে। দোকানে ঢুকেই চেয়ারের উপর ধপ্ করে বসে পড়ে, উঃ কি গরম বলুন তো? দুপুর বেলা আর বেরুনো যায় না।

মতিলাল ঠাট্টা করে বলে, কিন্তু বাজার যে একেবারে ঠান্ডা—

আহ্লাদী সে কথায় কান দেয় না। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে হাতের মধ্যে রগড়ায়, বলে, এবার আমার চোখটা যাবে।

—কেন?

—রোজ যে সিনেমা দেখছি।

—সিনেমা দেখতে ভাল লাগে না বুঝি?

—লাগে, আবার লাগেও না। কিন্তু কি করব, খোকাবাবু যে সিনেমার পোকা।

মতিলাল হাসে, কোন খোকাবাবু?

—ওর কথা পরে একদিন বলব। এখন শুরু করলে অনেক বেলা হয়ে যাবে। তার চেয়ে যে কথাটা সেদিন বলছিলাম, দেখুন না মতিবাবু, একটা টয়লেটের দোকানে এ-ধরনের ব্যবস্থা করা যায় কি না?

—আমি কথা বলেছি একজনের সঙ্গে। মার্কেটের সামনের দিকে তার দোকান। আমারই বন্ধু, এখনও পাকা কথা জানায়নি।

—ভুলবেন না কিন্তু।

আহ্লাদী দোকান থেকে বেরুল ঠিক একটার সময়। তারপর হয়ত ঢুকেছিল নিতাই মন্ডলের দোকানে। কিন্তু কেন? মতিলালের মনে খটকা লাগে, ক্রীম রঙের ব্লাউজ পীসের কথা তাকে তো জিজ্ঞেস করেনি। তবে কি আহ্লাদী চুরির মতলবেই নিতাই-এর দোকানে গিয়েছিল। সামনা-সামনি কথা না হওয়া পর্যন্ত মতিলাল শান্তি পায় না।

শেয়ালদা ছাড়িয়ে মুসলমানপাড়া লেনে মেনকা কাফে। সারাক্ষণ ভাঙাগলায় সিনেমার গান বাজে। দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধান ক্যালেন্ডারের ছবি। সরু লম্বা ঘর। দু'খানা টেবিল পাতলে মাঝখান দিয়ে যাবার জায়গা থাকে না বললেই হয়। তারই মধ্যে পেছনের দিকে খান দুয়েক কেবিন। কেরোসিন কাঠের নড়বড়ে ফ্রেমের উপর নীল রঙএর পর্দা ঝোলে। ছোকরা বয়রা জল শুধু নোংরা হাত মুছে পর্দার গায়ে হলুদে হলুদে ছোপ লাগিয়েছে। সামনের দিকে চেয়ার পেতে হাঁটুর ওপর লুঙ্গী তুলে বসে থাকে ম্যানেজার।

মতিলাল এসে আবদুলের নাম করতেই ম্যানেজার তাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল একেবারে পেছনের কেবিনে। আপনি একটু বসুন বাবুসাহেব, আমি সাকীনাকে খবর পাঠাচ্ছি।

ম্যানেজার চলে গেলে মতিলাল ভাবে কি করে সে কথাটা পাড়বে। ফস্ করে চুরির অভিযোগ করা বিশেষ করে একটি মেয়েকে, কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে।

মিনিট পনর বাদে আহ্লাদী এল। নীল রঙএর পাড়-না-ওয়লা জর্জেটের শাড়ী পরে। সবেমাত্র প্রসাধন সেরে এসেছে। চোখের কোণে লম্বা করে সুর্মা টানা। মতিলালকে দেখে তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বলে, একি মতিবাবু আপনি, আমি ভেবেছিলাম খোকাবাবু এসেছে।

শুধু কথা বলার খাতিরেই মতিলাল জিজ্ঞেস করে, খোকাবাবুর কথা প্রায়ই বল, সে লোকটি কে শুনি?

আহ্লাদী দাঁত বার করে হি হি করে হাসে, কলেজের ছেলে হোস্টেলে থাকে। তার শ্বশুর পয়সা দিয়ে পাঠিয়েছে কলকাতায় পড়বার জন্যে। আজকাল সন্ধ্যে বেলা আমায় নিয়ে ঘোরে।

—দেখে ফেলার ভয় নেই বুঝি?

—না, কলকাতায় ওর তেমন জানাশোনা কেউ নেই। নিয়ে যাবো একদিন আপনার দোকানে। কিন্তু আপনি কি মনে করে? আমায় নিয়ে বেরুবেন নাকি। আহ্লাদীর হাসি যেন থামতে চায় না। টেবিলের ওপর লুটিয়ে পড়ে বলে, আপনি আমাকে কোন দোকান থেকে জিনিস কিনে দেবেন, আর

কোথাও তো আমার ফেরত দেবার ব্যবস্থা নেই।

—না, সেজন্যে আসিনি।

—তবে কি বউয়ের কাছে নিয়ে যাবেন? আহ্লাদী আবার হাসতে শুরু করে।

মতিলাল গম্ভীর হয়ে যায়, আসল কথাটা তো শোনো—

আহ্লাদী গ্রাহ্যও করে না। মতিলালের হাতটা খপ্ করে ধরে ফেলে, সত্যি করে বলুন না, আপনার বউএর চেয়ে আমি দেখতে সোন্দর কি না।

—হলেই বা—

আহ্লাদী তরল গলায় বলে, আমি জানি যে, যাদেরই বউ আছে আমার কাছে এসে বলে আমি তাদের বউয়ের চেয়ে অনেক সোন্দর।

মতিলাল হাতটা ছাড়িয়ে নেয়, কখন তোমার খোকাবাবু এসে পড়বে ঠিক নেই, তার আগে দরকারী কথাটা সেরে নিই।

—বলুন।

মতিলাল একে একে সব কথা বলে। নিতাইএর দোকানে আহ্লাদীর ঢোকা থেকে শুরু করে ব্রোকেড পার্স চুরি যাওয়া, নিতাইয়ের সন্দেহ, এমন কি অপমান করবে বলে নিতাইয়ের শাসানো পর্যন্ত সব কিছু।

আহ্লাদী কিন্তু হাসতে হাসতেই সব কিছু শোনে। বলে, ওঃ, এই নিয়ে এত ভাবনা। আমি ভাবছি কি না কি ব্যাপার।

মতিলাল মনে মনে আশ্চর্য হলেও প্রকাশ না করে বলে, তোমার উত্তরটা কি শুনি, নিতাইকে বলতে হবে তো।

—নাই বা শুনলেন আমার মুখ থেকে। আপনার কি মনে হয় আমি চুরি করতে পারি, আহ্লাদী হাসি মুখে মতিলালের হাতটা কোলের ওপর টেনে নেয়।

—না।

—তবে তাই বলে দেবেন।

—তা হলেও তোমার নিজের মুখ থেকে শুনলে।

ইচ্ছে করে এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায় আহ্লাদী। দুষ্টুমী করে বলে, আমার নিজের মুখ থেকে না শুনলে বুঝি সাধ মেটে না? বলছি তো।

ম্যানেজার এসে ঠিক এই সময় খবর দেয় খোকাবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

আহ্লাদী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, এ ভীষণ অভিমানী ছেলে, একটু দেরি হলেই রেগে যায়। আমি চলি মতিবাবু, আপনার সঙ্গে তো দেখা হবেই।

মেনকা কাফে থেকে বেরিয়ে মার্কেট পর্যন্ত সারা রাস্তা মতিলাল ভাবতে ভাবতে ফেরে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। আহ্লাদী সারাক্ষণই তার সঙ্গে রহস্য করে গেল, ব্রোকেড পার্সটা সম্বন্ধে ঠিকমত কোন কথা বললে না। মতিলালের পক্ষে যে আর বেশী কিছু জিজ্ঞেস করা সম্ভব নয়, তা যেন সে ভাল করেই জানত; যে রকম জানত তার মনের দুর্বলতার খবর। মতিলাল ভাবে সত্যিই রহস্যময়ী এই আহ্লাদী!

দোকানে ফিরে দেখে নিতাই মণ্ডল তারই অপেক্ষায় বসে আছে। সরাসরি জিজ্ঞেস করে, কি বললে তোমার আহ্লাদী?

মতিলাল দম নিয়ে চেয়ারে বসে, ও চুরি করেনি।

—ফের সেই মিথ্যে কথা! আমি বলেছি আলবৎ করেছে।

মতিলাল রেগে যায়, কে সত্যি বলছে আমি বলব কি করে?

নিতাই মণ্ডলের রগের শির ফুলে ওঠে, দাঁত কড়মড় করে বলে, আজ মিসেস্ বোস্ এসেছিলেন, ওঁকে সব কথা খুলে বল্লাম, আহ্লাদীর কথা শুনেই বল্লেন সেদিন লক্ষ্য করেছিলেন ব্রোকেড পার্স নিয়ে মেয়েটিকে নাড়াচাড়া করতে। আমার কথা বিশ্বাস না হয় চল মিসেস্ বোসের কাছে, উনি তো আর মিথ্যে বলবেন না।

মতিলালের আর জবাব দেবার কিছু থাকে না। নিতাই আবার শাসিয়ে যায়, আমি ছাড়ব না বলে দিচ্ছি, ও ছুঁড়িটাকে বেইজ্জত করে তবে আমার শান্তি।

এর পর দিন কয়েক মতিলাল বেশ ভয়ে ভয়েই ছিল। যদি আহ্লাদী হঠাৎ এসে পড়ে, যদি নিতাই সত্যিই তাকে অপমান করে বসে, কি করে সামলাবে সে! কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে আহ্লাদী এদিকে আসে না। মিথ্যে হাঙ্গামার হাত থেকে বেঁচে মতিলাল স্বস্তি বোধ করে, তবু মনের অন্তঃপুরে কোথায় যেন একটা খোঁচা থেকে যায়। আহ্লাদীর এই না আসা যে নিতাইয়ের অভিযোগকেই স্বীকার করে নিচ্ছে তা ভাবতেই মতিলালের খারাপ লাগে।

বাজার সত্যিই খারাপ পড়েছে। খদ্দের বাজারের টাকাগুলো যে কোথায় চলে গেল মতিলাল তার হদিস পায় না। আগে দাঁড়িয়ে নিজে খদ্দের সামলাতে পারতো না, মাইনে দিয়ে লোক রেখেছিল, এখন একা বসে থেকে দোকানে ঘুম পেয়ে যায়। যা দু'-চারটে খদ্দের আসে তাও বিকেলের দিকে। মতিলাল বিকেল থেকে দোকানের সামনে টুল নিয়ে বসে। অভ্যাসমত কি চাইলেন মেম সাহেব, বলে চেঁচায়। সঙ্গে ছোট ছেলে-মেয়ে থাকলে রঙীন টিকর খেলনার তলে প্রলোভন দেখায়। খোকা আকৃষ্ট হলেও তার মা আকৃষ্ট হন না, তাকে টানতে টানতে নিয়ে যান সামনের বেগের দোকানে। নিতাই মণ্ডলের দোকান থেকে খদ্দের বেরলেই মতিলাল উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। হয়ত কেউ তার দোকানে ঢোকে, দু একটা কাপড় নেড়ে চেড়ে দাম জিজ্ঞেস করে চলে যায়। ফিরে এসে টুলে বসতে বসতে মতিলাল গজ গজ করে, হাতে শুধু ব্যাগই আছে, পয়সা থাকলে তো জিনিস কিনবে। পাশের ফ্যান্সী গুড্‌সএর দোকান থেকে তবু কিছু বিক্রী হয়। কুড়ি টাকার হ্যান্ড ব্যাগ এখন দশ টাকায় নেমেছে, শৌখিন মেয়েরা এ সুযোগ ছাড়ে না। সেই সঙ্গে খেলনা নকল গয়না। একটা জিনিস কিনতে পাঁচটা জিনিস দেখে, আর টুলে বসে দোকানদাররা দেখে মেয়েগুলোকে। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। সব চেয়ে ফাজিল কাঁচের লম্প বিক্রের দোকানের কর্মচারী ছোঁড়া। নিজের দোকানে খদ্দের না থাকলে মেয়েদের সঙ্গে ইয়ার্কী মারবার জন্যে ফ্যান্সী গুড্‌সএর দোকানে এসে দাঁড়ায়।

নানারকম জিনিস দেখিয়ে বিরক্ত করে মারে। কে বুঝি ওকে একদিন বলেছিল, এখানে এসে ভিড় কর কেন দাদু, নিজের চরকায় তেল দাও।

ফটকে পানখাওয়া দাঁত বার করে হাসে, এই জন্যেই তো মার্কেটে কাজ নেওয়া মাইরী, সারা বছরটা যেন বারোয়ারী পুজোর এক্‌জিবিশান চলছে। কি চিত্তির বিচিত্তির সেজেই না মেয়েগুলো আসে।

কথা শুনে অন্যরা ধমকায়, তবে মনের কথা সকলেরই এক, ফটকের সঙ্গে তফাত নেই।

এমনি এক সন্ধ্যেবেলা আহ্লাদী এল এক ছেলেমানুষ ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে। ফলের বাজারের মোড় থেকে ঢুকতেই মতিলালের চোখে পড়েছে। অন্য দিনের মত আজও সারা দেহে ঢেউ তুলে আহ্লাদী এগিয়ে আসে। মতিলাল ভয়ে ভয়ে নিতাইয়ের দোকানের দিকে তাকায়, সে ভেতরে খদ্দের সামলাচ্ছে। আহ্লাদী এসে ঢোকে মতিলালের দোকানে, এলাম আপনার দোকানে, কয়েকটা ভাল রাউজ পীস দেখান তো।

মতিলাল খাতির করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসায়। অনেকগুলো কাপড় নামিয়ে আনে। আহ্লাদীর পিছু পিছু ফটকে দোকান পর্যন্ত এসেছিল। মতিলালকে ইশারায় বাইরে ডাকে।

—কি মতিলাল নিতাইকে খবরটা দেব না কি?

মতিলাল শঙ্কিত হয়, দোহাই তোর ফটকে, তুই বরং টুলে বসে ওদিকে নজর রাখ লক্ষ্মী ছেলে। নিতাই যখন ভেতরে থাকবে এক সময় এদের বার করে দেব।

—কি চেহারা মাইরী, আমার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দাও না।

—দেব দেব। বলে ব্যস্তভাবে মতিলাল দোকানের মধ্যে চলে যায়।

আহ্লাদী ততক্ষণে গোটা আষ্টেক কাপড় বেছেছে। দাম জিজ্ঞেস করে বলে, আপনার দোকানে সব সময় বেশী দাম, এ করলে কি চলে?

মতিলাল ব্যবসায়ী হাসি হাসে, হেঁ, হেঁ জিনিসটা দেখবেন তো?

—এই তো একটা দোকানে সাড়ে তিন টাকা বল্লে—

—আমি বলছি আপনি চার টাকায় নিয়ে যান, যদি কোথাও কম দামে পান আমি পয়সা ফেরত দেব।

আহ্লাদীর সঙ্গের ছেলেটি উস্‌খুস করছিল, বললে, তোমার দরাদরির জ্বালায় অস্থির। যা নেবার নাও। আমি এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসছি।

ছেলেটি বেরিয়ে যেতেই মতিলাল জিজ্ঞেস করে, এই তোমার খোকাবাবু?

আহ্লাদী হেসে সায় দেয়, হ্যাঁ, চার তারিখ কিনা, ওর শ্বশুরে টাকা পাঠিয়েছে।

—কিন্তু তুমি এসে ভাল করোনি, নিতাইকে আমার এখনও ভয় করে।

—মিষ্টি করে হাসলেই ও গলে যাবে, হাজার হোক পুরুষ মানুষ তো? একটু থেমে কি যেন ভেবে নিয়ে বলে, আমার জন্যেও আপনি ভাবেন তাহলে?

—এ-কথা কেন বলছ?

আহ্লাদী হাসতে হাসতে বলে, কত ভাবনা আপনার, দোকানের ভাবনা, বাড়ির ভাবনা,—

খোকা বাবু এসে পড়ায় এ-প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়। মিনিট কয়েক পরে জিনিসপত্র নিয়ে তারা যখন বেরিয়ে গেল, তখনও নিতাই খদ্দের সামলাতে দোকানের ভেতরেই ব্যস্ত ছিল।

মতিলালের পেছনে অনেক দিন ঘুরে ঘুরে করেও আহ্লাদীর ঠিকানা জানতে না পেরে

ফটকে আবদলে মিয়াকে গিয়ে ধরে। আবদলে মিয়া বাইরের টলে বসে মাথায় হাত বোলাচ্ছিল, হেসে জিজ্ঞেস করে, আহ্লাদীকে তোরও মনে ধরেছে।

ফট্‌কে আবদলের গা ঘেঁষে বসে, আবার কার ধরল?

—মার্কেট সুন্ধ সকলেরই, আমাকে তো পাগল করে মারছে। দে আগে দু টাকা কমিশন।

—সব দেব মিয়া ভাই আগে ব্যবস্থা করে দাও।

—তোর অত পয়সা হল কোথায়?

—বিয়ে থা করিনি, এখন ফূর্তি করবো না তো করবো কি তোমার বয়েসে?

—উঁহু, আবদুল ঘন ঘন মাথা নাড়ে, ফূর্তি করা চলবে না, সে মেয়ে-ই নয় আহ্লাদী।

—তবে যে রোজ দেখছি নতুন নতুন ছেলের সংগে?

—ও-সব ভদ্রলোক, কলেজে পড়ে, অফিসে চাকরি করে, তোকে পাত্তাই দেবে না—

ফট্‌কের আত্মসম্মানে লাগে, অংগভংগী করে বলে, আচ্ছা দেখা যাবে! ফটিকচাঁদকে তোমরা আজও চেননি।

ফট্‌কে চলে গেলে মতিলাল এতক্ষণে কথা বলে, আমাকেই পাত্তা দেয় না তো ফট্‌কে। ছোঁড়ার শখ দেখে বাঁচি না।

এর পর মতিলালের বেশ কিছু দিন কাটল অসুখ বিসুখ নিয়ে। হাড়ের বিষ ঢুকেছে হাড়িতে। একটা ছেলে ওঠে তো আরেকটা পড়ে। মতিলাল নিজেও রেহাই পায় না। সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা, সারাক্ষণ মাথা টিপ টিপ করে। মার্কেটে যাওয়া বন্ধ করতেই হল। অসুখের সময় আবদুলে মিয়াই যা ভরসা। সারাদিন দোকানে বসে রাত্রে দোকান বন্ধ করে মতিলালের কাছে হিসেব দেয় কত টাকার কি বিক্রী হল। সেই সংগে প্রত্যেক দিনের খবর—ফট্‌কে কি রকম রোজ জ্বালাতন করে মারছে আহ্লাদীর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে; নিতাই নাকি এখনও ব্রোকেড পাঁসের শোক ভুলতে পারেনি, আর সামনের দিকের দোকান থেকে বিলিতী সেন্টের শিশি চুরি গেছে।

মতিলাল সরু গলায় জিজ্ঞেস করে, কত টাকার মাল?

—সেই নাঞ্জীভাই-এর দোকান থেকে, বলছে তো দু শিশি আশি টাকা দাম।

—আজকাল কি হচ্ছে বলতো আবদুলে ভাই, বিক্রী নেই এক পয়সা তার ওপর চুরি।

—তাই তো দেখছি। নিতাই বলছিল আহ্লাদীর মত মেয়েরাই আজকাল বেশী ঘোরে মার্কেটে।

আহ্লাদীর কথা উঠতেই মতিলাল জিজ্ঞেস করে, ও শেষের বার যে কাপড় কিনেছিল তা ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে গেছে?

—না আসেনি।

দিন দুই পরে মতিলাল খাটের ওপর উঠে বসেছিল। জ্বর ছেড়েছে। এখনও গায়ে পুরো জোর আসেনি। আর দেরি করলে চলবে না, এবার তাকে বেরুতেই হবে। প্রায় দিন সাতেক হয়ে গেল।

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো আবদুল মিয়া। অন্য দিনের চেয়ে সকাল সকালই এসেছে।

—সর্বনাশ হয়েছে ভাই।

মতিলাল চমকে ওঠে, কি হল?

—নিতাই আজ আহ্লাদীকে যাচ্ছেতাই করেছে।

—তার মানে?

আবদুল মিয়া বলে যায়, আহ্লাদী আজ বিকেলে এসেছিল খোকা বাবুর সংগে। নিতাই দেখতে পেয়ে সবাইএর সামনে তাকে অপমান করেছে, চোর, বদমাইশ, কি না বলেছে। চেঁচামেচিতে চার দিকে ভিড় জমে গেল, সবাই দাঁড়িয়ে মজা দেখল, কেউ একটা কথাও বলল না—

মতিলাল উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, আহ্লাদী কি বললে?

—ও বেচারী আর কি বলবে, আর বল্লেই বা শুনছে কে? লজ্জায় মাথা নীচু করে চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেল।

—নিতাইটা যে এত বড় জানোয়ার আগে বুঝতে পারিনি। একটু থেমে মতিলাল আবার জিজ্ঞেস করে, আর সেই খোকাবাবু?

—সে গোলমাল দেখে আগেই পালিয়েছে।

মতিলাল অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, তুমি একবার আহ্লাদীর কাছে যেও আবদুলে মিয়া। আবদুলে মিয়ার চোখে জলভরে আসে। পরিষ্কার করে নিয়ে বলে, আমি আর ওর কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

মতিলাল আবার দোকানে আসতে শুরু করেছে। আহ্লাদীর ব্যাপার নিয়ে কিন্তু কারো সংগে আলোচনা করেনি। সেই এক ঘেয়ে জীবন। বউদির জন্যে খদ্দের ধরে

নিয়ে গিয়ে সস্তায় মাল বিক্রী করা, সুবিধে মত খদ্দের বসিয়ে রেখে পাশের দোকান থেকে মাল নিয়ে আসা, দিশী সিল্ক বিলিতী বলে চালান। সেই চেনা ,অচেনা মুখ। সেই দরাদরি। অভ্যাস মত চেঁচিয়ে খদ্দের ডাকা, আর নীরবে সুন্দরীদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা।

আহ্লাদীর কথা তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু ভরসা করে নিজে তার কাছে যেতে পারে না। আবদুল মিয়াকেও দু'বার বলেছিল, সেও যায়নি।

হঠাৎ একদিন আহ্লাদীর খবর পেল মতিলাল, ফটকের কাছ থেকে। তখন আটটা বেজে গেছে। প্রায় দোকান বন্ধ করে দেবার সময়, মতিলাল জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখছিল। ফটকে এসে চেয়ারে বসলো।

—কি রে ফটকে, কোথা থেকে এলি?

ফটকে মুচকি হাসে, কামাল করে দিয়েছি মতিদা, কাল থেকেই না মাইনে বেড়ে যায়।

—কি রকম?

—দাদাবাবুকে খুব খুশী করে দিয়েছি। ওর গাড়িতে চিড়িয়া তুলে দিয়ে এলাম। একটু থেমে নিজেই জিজ্ঞেস করে, কাকে বল তো?

—কাকে?

—তোমার আহ্লাদী।

মতিলাল সবিস্ময়ে ফিরে তাকায়।

—অমন ড্যাব ড্যাব করে কি দেখছ? সেদিন তো বলেই ছিলাম আমার নাম ফটিক চাঁদ। আহ্লাদীকে নিয়ে আমি ফুর্তি করব না? আজ দাদাবাবুর গাড়িতে তুলেছি দু দিন বাদে আমার ফিটনে তুলব। পানখাওয়া দাঁত বার করে ফটকে হাসতে হাসতে চলে যায়। দেশী মদের উগ্র গন্ধে মতিলালের গা ঘুলিয়ে ওঠে।

মতিলাল বুঝতে পারে না ফটকে কি সত্যি কথা বলে গেল? আহ্লাদীর সঙ্গে ঘোরার ইচ্ছে তার নিজেরও কম ছিল না, কিন্তু আহ্লাদী কোন দিন পাত্তা দেয়নি। একদিন সে হাসতে হাসতেই বলেছিল, মতিবাবু আপনি যা ভাবছেন আমি তা নই।

একেবারে চাবুক। আহ্লাদীর কাছ থেকে এ-ধরনের কথা মতিলাল মোটেই আশা করেনি। কিন্তু তারপর থেকেই ও সাবধান হয়েছে। এমন কি আবদুল মিয়ার কাছেও এ প্রসঙ্গ তোলেনি। তাই এতদিন ফটকের বোকামী দেখে সে মনে মনে হেসেছে। কিন্তু আজ কেমন যেন তার মনে সংশয় জাগে।

এ সংশয় আর বেশী দিন রইল না। লাইট হাউসের নীচে আহ্লাদীর সঙ্গে মতিলালের দেখা হয়ে গেল বিকেলের দিকে।

আগের মতই হেসে জিজ্ঞেস করলে, কি মতিবাবু, দোকানে যাচ্ছেন বুঝি?

হঠাৎ দেখা হওয়ায় মতিলাল কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারে না, হ্যাঁ, তুমি কেমন?

—ভাল আছি। আবার হেসে বলে, না থাকলেই বা কি, আপনি তো আর খোঁজ নিতেন না। মতিলাল লজ্জিত হয়, যাব যাব রোজই ভাবি।

—থাক আর মিথ্যে বলতে হবে না, চলুন একটু চা খাব।

মতিলাল আহ্লাদীকে নিয়ে সামনে চায়ের দোকানে গিয়ে বসে।

—চায়ের সঙ্গে আর কিছু আনাবো?

আহ্লাদী মাথা নাড়ে, আর কিছু নয়, শুধু চা।

মতিলাল ফটকের কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে অস্থির হচ্ছিল। শেষকালে বলে ফেলে, ফটকে তোমার কথা বলছিল।

আহ্লাদী সহজ গলায় বলে, হ্যাঁ, ও আজকাল প্রায়ই আমার কাছে লোক নিয়ে আসে।

মতিলাল বিদ্রূপ করে, তাহলে আগের প্রতিজ্ঞা ভেঙেছো বল?

হ্যাঁ ভাঙলাম। তবে খোকাবাবু চলে যাবার পর। বড় অভিমান নিয়ে চলে গেছে।

আহ্লাদীর কথায় আজ অন্য ধরনের সুর। মতিলাল পরিষ্কার বুঝতে পারে না। এক সময় জিজ্ঞেস করে, তোমার বাড়ির কথা তো আমায় বল না—

আহ্লাদী ম্লান হাসে, বলবার তো কিছু নেই। আমরা সাত ভাই বোন, আমিই বড়। বাবা মেনকা কাফেতে রান্নার কাজ করতেন, এখন খুব অসুস্থ।

—তার মানে তোমার রোজগারের ওপরই সংসার চলে?

—একরকম তাই। আহ্লাদী নিজেকে সামলে নেয়, চলুন উঠে পড়া যাক।

—একটু বস না, কোথায় যাবে?

—না, সিনেমার শো ভাঙছে। একজনের বেরোবার কথা, আমায় নিয়ে যাবে।

—ও। মতিলাল আর বাধা দেয় না। দুজনে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে।

আহ্লাদী হঠাৎ মৃদুস্বরে বলে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব মতিবাবু।

—বল।

—আপনিও কি নিতাই-এর কথা বিশ্বাস করেন?

মতিলাল হঠাৎ উত্তর দেয়, অবিশ্বাস করার তো কিছু পাইনি।

আহ্লাদী আর কোন কথা না বলে নীরবে রাস্তা পার হয়ে লাইট হাউসের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

মতিলাল হন্ হন্ করে মার্কেটে ঢুকে নিজের দোকানের দিকে এগিয়ে যায়। আহ্লাদীর বাড়ির কথা শুনে তার মনটা যা-ও বা নরম হয়েছিল, শেষের নির্লজ্জ উক্তিতে আবার কঠিন হয়ে ওঠে। আহ্লাদী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল বলে মনে ক্ষোভ থাকলেও আহ্লাদীর উপর মতিলালের উঁচু ধারনা ছিল। কিন্তু আজ তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

দোকানে আবদুল মিয়া বসে বসে হিসেবের খাতা মেলাচ্ছিল। মতিলাল নিজে থেকেই বলে, আজ এখুনি আহ্লাদীর সংগে দেখা হল।

—ওঃ। আবদুল মিয়া কোন কৌতূহল প্রকাশ করে না।

—মেয়েটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, আগের মত মোটেই নেই। মতিলাল হড়বড় করে অনেক কথা বলে যায়।

আবদুল চুপ করে সব শোনে। এক সময় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, সে তো চেয়েছিল, কিন্তু আপনারাই তো তাকে ভালো থাকতে দিলেন না।

—তার মানে?

—ছেলেদের সংগে ও বেরুত বটে, কিন্তু কোনদিন তাদের প্রশ্রয় দেয়নি। তাদের দিয়ে জিনিস কিনিয়ে আপনার কাছ থেকে পয়সা ফেরত নিয়ে সংসার চালাত। কিন্তু মার্কেটে ঢোকাই যখন আপনারা বন্ধ করে দিলেন, এ-পথ ছাড়া আর উপায় রইল না।

মতিলাল নিজের মনেই গজরায়, নিতাইটা যা গোঁয়ার। কিন্তু এ ছাড়াও তো অন্য দোকান ছিল, কোথাও একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারতো।

আবদুল মিয়া মাথা নাড়ে, তা হয় না। শুধু মার্কেটে আসাই তো বন্ধ করেননি আপনারা, একজনকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। সাকিনা এতদিন নিজেকে সামলে রাখলেও, একজনের কাছে সে ধরা দিয়েছিল।

—কার কাছে?

—খোকাবাবু।

মতিলাল আশ্চর্য হয়, সে তো দুধের ছেলে।

—ছেলেটা নাকি খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। সাকিনা তাকে ভালবেসে শুধরে ছিল। আবদুল মিয়া বিড়ি ধরায়, ছোঁড়াটা ওকে বুঝলো না, শুনলাম এই মার্কেটে গোলমাল হবার পর সাকিনাকে ছেড়ে চলে গেছে। শুধু মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে পড়ে থাকে। এতেই সাকিনার লেগেছে সব চেয়ে বেশী।

—আশ্চর্য, আহ্লাদীও তাহলে ভালোবাসতে জানে। মতিলালের মনে হয় আজ আহ্লাদীকে নতুনভাবে আঘাত দেওয়া তার মোটেই উচিত হয়নি।

প্রায় মাসখানেক এ প্রসংগ একেবারে চাপা পড়ে যায়। এর মধ্যে আর আহ্লাদীর সংগে দেখা হয় না। আবদুল মিয়াও বিশেষ কিছু বলে না। মাঝে মাঝে ফটকেই যা তার বাহাদুরীর কথা জানায়। নতুন খবরের মধ্যে ফটকেকে খুশী করতে আহ্লাদী নাকি আজকাল তার সংগে ফিটন করে বেড়াতে যায়। ফটকে সেই আগেরই মত পান খাওয়া-দাঁত বার করে হাসে।

আজ শনিবার। মতিলাল সবে খাওয়া সেরে দোকানে ফিরেছে। নিতাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। মুখ বিকৃত করে বলে, কি দাদু বলিনি, তোমার আহ্লাদী তো ধরা পড়েছে।

মতিলালের বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

—রামলক্ষ্মণের গয়নার দোকানে। এখুনি খবর পেলাম, ছেলে চোর নয় মেয়ে চোর। আমি বলছি এ নিশ্চয় তোমার আহ্লাদী। চল একবার রগড়টা দেখে আসি।

মতিলাল অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে বলে, গিয়ে আর কি হবে, মিথ্যে ভিড় বাড়ান—।

নিতাইয়ের চোখে কৌতুক, বলে, দেখি না তোমার আহ্লাদী শ্বশুরবাড়ি যেতে যেতেও হা হা করে হাসছে কি না। কি মেয়েই যোগাড় করেছিলে, মাইরী।

গয়নার দোকানে কিন্তু বেশী ভিড় ছিল না, দূরে দূরে দাঁড়িয়ে সবাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। চেনা লোক দেখে নিতাই সরোজকে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার সরোজ, চোর ধরা পড়েছে।

—আর চোর, সরোজ বিজ্ঞের মত ঠোঁট ওলটায়, হাওয়া—

—সে কিরে, খুলে বল্।

—মেয়েটা ঠিক দুপুর বেলা ঢুকেছিল দোকানে। দোকানদার মাত্র দুজন। মেয়েটা গয়না দেখতে দেখতে একটা দামী নেকলেশ হাত সাফাই করে সোজা ব্লাউজের মধ্যে চালান দেয়।

—কি সর্বনাশ!

—যে দোকানদার গয়না দেখাচ্ছিল বুঝতে পারেনি। কিন্তু অপরজন ধরে ফেলে। প্রথমে কিছুতেই স্বীকার করে না, পরে পুলিসের কথায় ভয় পেয়ে যায়।

নিতাই জিজ্ঞেস করে, তাহলে পুলিস ডাকা হয়নি?

—সে কেলেংকারীর কথা আর বলিস না। ভদ্রমহিলার স্বামীকে ফোন করা হল, তিনি এসে বোঝালেন এটা ঠিক চুরি নয়, এক-রকমের অসুখ, সরোজ গলা নামিয়ে চোখের ইশারা করে বলে, তাছাড়া বেশ কিছু টাকা দোকানীদের হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে। ওরা আর টুঁ শব্দটি করছে না।

—স্বামী! নিতাই আশ্চর্য হয়, সে আবার কে মতিলাল?

সরোজ একটা চোখ ছোট করে বলে, মস্ত বড় ব্যারিস্টার, সবাই ডাকে বোস-সাহেব বলে।

মতিলালের কানে আর কোন কথা যায় না। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একশ টাকা দামের ব্রোকেড পার্স, লাইট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ম্লানমুখী আহ্লাদী, যার আভিজাত্যময়ী মিসেস বোস, যাকে দেখলেই মতিলাল, নিতাইয়ের মত সবাই 'আমার দোকানে মেমসাহেব আমার দোকানে মেমসাহেব' বলে' এতদিন চেঁচিয়েছে।

মনস্বী রাখালদাস

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার পরিচয় হয় ১৯০৬ সালে। তিনি অধিক বয়সে যখন বি এ পরীক্ষা দেন আমি তখন কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়া আসিয়াছিলাম। তিনিও প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষা দেন। তখনই ছাত্র হিসাবে তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়। তিনি ১৯০৭ সালে বি এ পাশ করেন। তাহার পূর্ব হইতেই তিনি মুদ্রাতত্ত্ব (Neumismatics) সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

সিন্ধুনদ উপত্যকার সভ্যতার আবিষ্কার রাখালদাসের প্রধানতম কীর্তি। তিনি ঐ আবিষ্কারে শুধু যে শারীরিক শ্রম দিয়া Dr. Marshallকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাই নহে, এই আবিষ্কারের পশ্চাতে তাঁহার উদ্ভাবনশীল মস্তিষ্ক সক্রিয়ভাবে কাজ করিয়াছিল। ভারতীয় বলিয়া তিনি তাঁহার যোগ্য পুরস্কার এবং প্রধান কর্মকর্তার আসন লাভ করিতে পারেন নাই।

সিমলায় আমি যখন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলাম, তখন দেখিয়াছি Lord Reading ও সৈন্যাধ্যক্ষ Lord Rawlinson একাধিকবার যাদুঘর দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেখানে মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার সভ্যতার পুরাতন চিহ্নগুলি রক্ষিত ছিল। বস্তুত সিন্ধুনদ উপত্যকায় এই সুমেরীয় সভ্যতার বৃত্তান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী ভিত্তি রচনা করিয়া দিল,—যাহার জন্য মহেঞ্জোদরোর প্রাচীন সভ্যতার বিবরণ না হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা সার্থক ও সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

সাহিত্যক্ষেত্রেও রাখালদাসের দান অসামান্য। ১৩২০ সালেরও কয়েক বৎসর পূর্বে সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আর্যাবর্ত নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ঐ আর্যাবর্তে রাখালদাসের একটি রচনা "পাষাণের কথা" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রাখালদাসের প্রথম যৌবন বলিলে অন্যায় হইবে না। তাঁহার সেই বয়সের লেখা "পাষাণের কথা" অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আমার যতদূর মনে হয় তাহাতে আমিই আর্যাবর্তের জন্য ঐ লেখাটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ঐ লেখা যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন তাহার ভূমিকায় রাখালদাস আমার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। অতঃপরে তাঁহার "বাঙ্গলার ইতিহাস" দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাহাতেও তাঁহার প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এই "বাঙ্গলার ইতিহাস" সম্পূর্ণ নূতন ধরনের লেখা। প্রাচীন মুদ্রা ও পুরাতন প্রস্তরলিপি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং অনেক জটিল বিষয়ের উপর ইহা যে আলোকপাত করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার পরে তাঁহার বিস্তৃত "উড়িষ্যার ইতিহাস" তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিল।

ইতিহাস লিখিতে গেলে ঐতিহাসিক প্রমাণ চাই। এ কথা তিনি ভালরূপেই জানিতেন এবং তাহার প্রমাণপত্র ও নজিরের মধ্যে কিছুমাত্র ভেজাল ছিল না বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ঐতিহাসিক প্রমাণের নামে কল্পনার বা ঐরূপ অনিশ্চিত ব্যাপারের আশ্রয় তিনি কখনও লইতেন না। দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমারের ভবনে একদিন দ্বিপ্রহরের পর এক আলোচনা সভা বসিয়াছিল। তাহাতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর নাম উল্লেখ করিয়া রাখালদাসের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিলাম। বসু মহাশয় তাঁহার আবিষ্কৃত কুলজীর পুঁথি অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাস প্রণয়ন করিতেন। এই কুলজীর ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান ছিলেন।

নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতে অনেকবার তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিয়াছে। আমি প্রায়ই মহারাজের ভবনে যাইতাম এবং রানী ভবানী স্কুল ও 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিতাম। যেদিন মহারাজা তাঁহার ভবনে আহার করিবার জন্য বলিতেন সেই দিনই মুশকিল হইত। কারণ মহারাজা রাত্রি ১২টা।১টার পূর্বে আহার করিতেন না। আমাদিগকেও সেই সঙ্গে আহার করিতে হইত। মহারাজা দিন ও রাতের মধ্যে একবার মাত্র আহার করিতেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তাহাতে দেশী পাচকের অন্নব্যঞ্জন থাকিত এবং বাবুর্চি কর্তৃক প্রস্তুত বিলাতী খানাও থাকিত। এই সব উপকরণের প্রতি সুবিচার করিয়া আহার সমাধান করিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া যাইত। তাহার পর মহারাজের ড্রাইভারের ভোজনে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কাটিত। এই ড্রাইভারই আমাদের বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিবে। তখনকার দিনে সেই ড্রাইভার-ভদ্রলোক কৃপা না করিলে অত রাত্রিতে বা রাত্রিশেষে ট্যাক্সিও পাওয়া যাইত না। আমরা যখন মোটর গাড়িতে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিতাম তখন কোন কোনদিন "পূর্বদিকে নানা রঙে করিয়া রঞ্জিত" ঊষা-দেবীর আগমনী শুনিতে পাইতাম। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করি। ঐরূপ দীর্ঘ রাত্রিজাগরণে আমি অনভ্যস্ত। সুতরাং ঐ রাত্রি জাগরণে পরদিন ক্লাসে ছাত্রদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিতাম না।

একদিন মহারাজাকে বলিলাম,—"মহারাজ, আমাকে আর নিমন্ত্রণ করিবেন না। আপনি নিমন্ত্রণ করিলে আমাকে তাহা গ্রহণ করিতেই হয়। কিন্তু আমার পক্ষে ঐভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।"

মহারাজা আমার সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

রাজবাড়িতে এই সব আহারের সময় সাহিত্যালোচনা হইত। মহারাজা বাছিয়া বাছিয়া সাহিত্যিকগণকে আমন্ত্রণ করিতেন। যে সব সাহিত্যিক তাঁহার পরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, রমাপ্রসাদ চন্দ, ব্যারিস্টার মন্মথমোহন বসু প্রভৃতি ছিলেন। রাজবাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ বাদ যাওয়াতে এই সব মহারথিগণের সংসর্গ আমি বেশী-দিন ভোগ করিতে পারি নাই। মহারাজের যৌবনে যে সব খেয়াল ছিল, যথা—ক্রিকেট খেলা, শিকার প্রভৃতি, বিগত যৌবনে ঐ সব খেয়াল ছিল না। তাঁহার ভবনে সাহিত্যালোচনাই হইত এবং এই সব আলোচনায় রাখালদাস মহারাজের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। জগদীন্দ্রনাথ শুধু যে সাহিত্য লইয়াই থাকিতেন তাহা নহে, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। এই সব আলোচনায় তিনি অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন। সুতরাং রাখালদাসের সহিত নাটোর মহারাজের যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই কারণেই রমাপ্রসাদ চন্দ জগদীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আকৃষ্ট হইতেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও রাখালদাসের সহিত এক সঙ্গে কাজ করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তিনি যে সময়ে চিত্রশালার কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন আমি সেই সময়েই ঐ পরিষদে ছাত্রাধ্যক্ষ ছিলাম। সে সময়ে দেখিয়াছি রাখালদাসের কি অপরিমিত প্রভাব! কারণ প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে তখন তাঁহার অভিজ্ঞতা একরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কাজেই সাধারণভাবে তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলেও ঐ বিভাগ সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করিতে পারি না।

কিন্তু সাহিত্যের দিক দিয়া আমার একটি সুযোগ রচিত হইল। এই সময়ে পণ্ডিতপ্রবর বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় বাঁকুড়া হইতে চণ্ডীদাসের একখণ্ড পুঁথি আবিষ্কার করেন। ঐ পুঁথির নাম (তাঁহারই প্রদত্ত) 'কৃষ্ণকীর্তন'রূপে আখ্যাত হয়। সে সময়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ঐ পুরাতন পুঁথি দেখিয়া আনন্দে আত্ম-হারা হইয়া উঠিলেন। ত্রিবেদী মহাশয় 'কৃষ্ণকীর্তনের' ভূমিকায় লিখিলেন—"কৃষ্ণ-কীর্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস তাহা অস্বীকারের হেতু নাই। সেই চণ্ডী-দাসের ভাষাই 'কৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল—সেইভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদা-বলীতে একালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে আমি সন্দেহের হেতু দেখি না।.....গ্রন্থের আবিষ্কর্তা বসন্তরঞ্জনবাবু, ইহাকে খাঁটি চণ্ডীদাসের লেখা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের সেই হারানো বাঁশীর উদ্ধার হওয়ায় সাহিত্য পরিষদের জীবন সার্থক হইল।"

অতঃপর তিনি ঐ পুঁথির রচনার কাল নির্ণয়ের জন্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ভার অর্পণ করিলেন। তাহা অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া লিপিতত্ত্ববিদগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সর্বাংশে উপযুক্ত রাখাল-দাস তাঁহার কার্য প্রত্যাশিত দক্ষতার সহিতই সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

রাখালদাস এক নাতিবিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া এই পুঁথির প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করেন। তিনি বলেন, "অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় 'কৃষ্ণকীর্তনের' যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবত খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হইয়াছিল।"

অনেক পণ্ডিত রাখালদাসের এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু গোল হইল যে, তিনি এই গ্রন্থে তিন রকমের হস্তাক্ষর দেখিতে পাইয়াছেন- (ক) প্রাচীন হস্তাক্ষর, (খ) প্রাচীন হস্তাক্ষর অনুলিপি, (গ) অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর।

প্রাচীন হস্তাক্ষর যে 'কৃষ্ণকীর্তনে' আছে, সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি আধুনিক কালেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক হস্তাক্ষর হঠাৎ আবিষ্কৃত হইল কি করিয়া, সে বিষয়ে রাখালবাবু কোনই আলোকপাত করেন নাই। অনেক লোক এখনও প্রাচীন হস্তাক্ষর অনুকরণ করিয়া লিখিতে চেষ্টা

করেন। কিন্তু সেকালের লোক, ভবিষ্যদৃষ্টি না থাকিলে ত আর আধুনিক লিপি ব্যবহার করিতে পারেন না।* যাহা হউক, অনেকে রাখালদাসের মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহা যে বাংলা ভাষায় লিখিত একখানি প্রাচীনতম গ্রন্থ—সেই মত পোষণ করেন।

আর একটি ঘটনার কথা মনে হইতেছে। সাহিত্য পরিষদের কর্মকর্তাগণের সংগে কি কারণে রাখালদাস ও তাঁহার বন্ধুগণের মত-বিরোধ ঘটিয়াছিল সে মতবিরোধের কারণ এখন আর আমার মনে নাই। কারণ বোধ হয় আমি জানিতামও না। তখন বংগীয় সাহিত্য পরিষদের কর্ণধার ছিলেন সার জগদীশচন্দ্র বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি। রাখালদাস প্রমুখ কয়েকজন ভদ্রলোক এই মতান্তর উপলক্ষে অন্য একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হন। এই উপলক্ষে চিৎপুরের একটি পল্লীতে ইঁহাদের সান্ধ্য ভোজসভার অনুষ্ঠান হয়। সেই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে জগদীন্দ্রনাথ রায় সেই সভায় নেতৃত্ব করেন। আমি ও ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার জগদীন্দ্রনাথের বন্ধু হিসাবেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। বংগীয় সাহিত্য পরিষদের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়াই হউক, অথবা সেখানে ইতিহাস প্রত্নতত্ত্বের জন্য যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায় না বলিয়াই হউক, ইঁহারা আর একটি পরিষদ বা সমিতি গঠন করিতে চাহেন। দেওয়ানজী-দের বাড়ি হইল বহরমপুরের ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের সম্পত্তি। ঐ সেন মহাশয়ের পুত্র বোধিসত্ত্ব সেন এই বিরোধী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর ছিলেন রমাপ্রসাদ চন্দ, কুমার শরৎকুমার রায়, হেমচন্দ্র দাশ-গুপ্ত, এশিয়াটিক সোসাইটির সুরেন্দ্রনাথ কুমার প্রভৃতি। যে সকল লোক ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের নাম মনে না পড়িলেও তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না।

প্রথম সমস্যা হইল, নাম লইয়া অর্থাৎ নূতন যে সমিতি গঠিত হইবে তাহার নাম কি হইবে? যত দূর মনে পড়ে আমি বক্তৃতা করিয়া, ইঁহাদের মতের অনেকটা সমর্থন করিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম, যে সাহিত্য পরিষদ প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসের বহু বিভাগ লইয়া যখন গবেষণা করিতেছেন, তখন অন্য একটি কেন, দশটি পৃথক পৃথক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেও বাধা নাই। মূলে পরিষদের সহিত কোন বিরোধ না থাকিলেই ভাল হয়।

---

* এবিষয়ে আমি আমার "বৈষ্ণব রসসাহিত্য", "কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তাল" নামক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

আমার এ বক্তৃতা সে দিনকার সভায় সকলের মনঃপূত হয় নাই। ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান যত না প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা বিরোধীদলের মন্তব্যে সাহিত্য পরিষদের প্রতি বিদ্বেষই বেশী প্রকটিত হইয়াছিল। নাম সমস্যার অনেক রাত্রি পর্যন্তও মীমাংসা হইল না।

প্রভাতকুমার অতঃপর প্রস্তাব করিলেন, "মহারাজ! সোজাসুজি ইহাকে 'পরিষদ-দলন' বলিলেই ইহার নাম সার্থক হইবে।"

আমি বুঝিলাম যে অতঃপর ইঁহারা যুদ্ধের পথই অবলম্বন করিয়াছেন। তখনও ভোজের পর্বের আরম্ভ হয় নাই। আমি সুযোগ বুঝিয়া "যঃ পলায়তি, স জীবতি" এই উপদেশ অনুসরণ করিলাম। নাটোর মহারাজের কাছে শুনিয়াছি যে, সেই নাম সমস্যারও সমাধান হয় নাই এবং সে সমিতিও শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে।

ভাগলপুরে একবার নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বসে। তাহাতে আমি এবং রাখালদাস উভয়েই যোগদান করিয়াছিলাম। আমার যতদূর মনে আছে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ভাগলপুরের জমিদার সূর্যনারায়ণ সিং তাঁহার একটি বাড়িতে আমাদের প্রতিনিধিবর্গের স্থান নির্দেশ করেন। সে বাড়িতে রাখালদাস ছিলেন না। কিন্তু সারদাচরণ মিত্র মহাশয় আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সে কথা মনে আছে আর মনে আছে যে, তিনি ক্ষীর দিয়া 'খাজা' খাইতে ভাল বাসিতেন। বিদেশ বিভূঁই জায়গা—এইসব গুরুপাক দ্রব্য আমি অবশ্য সযত্নে পরিহার করিতাম।

এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতার গুণে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে, সে বিপুল জনসংঘের অভিনন্দন, রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাকে যেমন করিয়া সম্বর্ধনা করিয়াছিল, সেরূপ আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আমার যতদূর মনে আছে আমিই ঐ বক্তৃতার সারমর্ম লিখিয়া লইয়াছিলাম।

পরদিন সম্মেলনে না গিয়া দাতাকর্ণের রাজধানী চম্পা নগর দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রাচীন চম্পা ভাগলপুরের সন্নিহিত। এখন সে পুরীর কোন চিহ্নই দেখিলাম না। একখানি মোটরে আমরা বোধ হয় চারিজন ছিলাম—নরেশ চন্দ্র সিংহ (ইতিহাসের উচ্চউপাধিসম্পন্ন ব্যক্তি), দীপ নারায়ণ সিংহ (সূর্য নারায়ণ সিংএর পুত্র), রাখালদাস ও আমি। আমরা চারজন সকালবেলা পথ অতিক্রম করিতেছি। চোখে পড়িল যে রাস্তার ধারে এক অপ্রশস্ত খিলানের মধ্যে প্রকাণ্ড এক মূর্তি রহিয়াছে। সে মূর্তি, বোধ হয় কোন বুদ্ধ মূর্তি হইবে। আমরা সকলে গাড়ি হইতে নামিয়া সেই মূর্তিটি দেখিতে গেলাম। আমাদের যাইবার কিছুক্ষণ পূর্বেই, কোন ভক্ত সেই মূর্তির পদমূলে সিঁদুর ও তৈল মাখাইয়া দিয়া গিয়াছে। এই মূর্তি দেখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য ইহা সংগ্রহ করিবার আমাদের ইচ্ছা হইল। কিন্তু কাহার সম্পত্তি, কে দিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আমরা পার্শ্ববর্তী লোকদের প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম যে উহা 'মহাশয়'দের (শ্রীতারকনাথ ঘোষ নামক উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ মহাশয়ের), জমিদারী এবং তৎক্ষণাৎ আমরা ঐ ঐ মহাশয়ের বাড়ি চড়াও হইলাম। 'মহাশয়' দিগের মধ্যে যাঁহার জমিদারী তাঁহার নিকট বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে রাজী করাইলাম। আমরা এইসব সারিয়া ফিরিয়া আসিতে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল। সে দিন মধ্যাহ্নে আমার আহারের নিমন্ত্রণ ছিল প্রমথনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটিতে। ইনি সুবিখ্যাত রেভারেণ্ড প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিকটআত্মীয়। তাঁহার নিমন্ত্রণ-উপেক্ষা করিতে হইল বলিয়া আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

ভাগলপুরের ঐ মূর্তিটি সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালার সৌষ্ঠববর্ধন করিয়াছে। ঐ মূর্তি যে সেদিন রাখালদাসের আগ্রহাতিশয্যেই সংগৃহীত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সিন্দুরচর্চিত মূর্তি সংগৃহীত হইয়া আসিলে আমার একটি পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। লোকে বলিল যে এই দুর্ঘটনার সহিত মূর্তি সংগ্রহের কিছু সংস্রব আছে। সে যাহাই হউক, সাগরদীঘির বিষ্ণুমূর্তি এবং আমাদের সংগৃহীত বৌদ্ধ মূর্তি সাহিত্য পরিষদের গৌরব বর্ধন করিয়াছে।

পরিশেষে আর একটি ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমি যখন কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক রূপে বদলী হইয়া আসি, তখন একদিন সন্ধ্যাকালে বাড়িতে ফিরিয়া দেখি রাখালদাস এবং হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি আমার স্ত্রীকে একখানি নীল শাড়ি উপহার দিয়াছেন। এটি আমার রচিত "নীলাম্বরী" গল্পটির সম্বর্ধনার জন্য। এখন এই পরিণত বয়সে মনে হয়; সেদিন কি আর ফিরিয়া আসে না?

যেতো। শ্রী সুরাবর্দী আশা করছেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দলগুলিকে হাতে রেখে আওয়ামী লীগের প্রাধান্য রক্ষা করা সম্ভব হবে। এই কথাই বোধ হয় তিনি রিপাবলিকান পার্টিকে বুঝিয়েছেন এবং বোধ হয় তাদের এই আশ্বাসও দিয়েছেন যে, সাধারণ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টিকে সঙ্গে রেখে পূর্ববঙ্গে জয়ী হতে পারবে।

কিন্তু শ্রী সুরাবর্দীর এই আশা কতদূর সফল হবে সে সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। কৃষক-শ্রমিক পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশনী কথাবার্তা ব্যর্থ হয়ে গেলেও রিপাবলিকান পার্টি ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির মধ্যে যোগাযোগের চেষ্টা আবার হতে পারে। অন্যদিকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সংগঠন চলছে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এখন পাকিস্তানের একমাত্র পার্টি যার মধ্যে পাকিস্তানের উভয় খণ্ডেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং শ্রদ্ধেয় নেতা আছেন যাঁরা পার্টিকে গড়ে তুলতে পারেন। তাছাড়া, বর্তমানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিই সারা পাকিস্তানের একমাত্র পার্টি যাকে পুরোপুরি গণতন্ত্রবাদী এবং প্রগতিশীল পার্টি বলা যায়। এই পার্টি যদি রীতিমত সংগঠিত হয়ে উঠতে পারে তবে তার প্রতি পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টিও আকৃষ্ট না হয়ে পারবে না। সুতরাং শ্রী সুরাবর্দী যা আশা করছেন তা হবে বলে মনে হয় না।

আপাতত শ্রী সুরাবর্দী একটা যুক্তি কাজে লাগাচ্ছেন। তিনি পাকিস্তানকে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তিনি বিদেশে কাশ্মীর সম্পর্কে প্রভূত সমর্থন সংগ্রহ করে এসেছেন। এখন যদি পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের কোনোরকম ওলট-পালট হয় এবং প্রধানমন্ত্রী বদল হয় তবে সে-সব মাটি হয়ে যাবে এবং পাকিস্তান সম্বন্ধে বাইরের ধারণা আরো নিচে যাবে। কিন্তু এই যুক্তি কতদিন টিঁকবে? সিকিউরিটি কাউন্সিলে বা ইউনোর জেনারেল অ্যাসেম্ব্লীতে এর যাচাই আগামী দু' এক মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। শ্রী সুরাবর্দীর বিদেশী সমর্থন লাভের বড়াই সম্বন্ধে পূর্বে এক প্রবন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। আমেরিকার সমর্থন লাভ সম্বন্ধে শ্রী সুরাবর্দী আমেরিকায় থাকতেই যে-সব বক্তৃতা করেছেন সেগুলি অনেকাংশে অতিরঞ্জিত এবং মিথ্যা। সেজন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হয়েছেন কিন্তু অতিথির প্রতি সৌজন্যের খাতিরে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে পারেন নি। সে যাই হোক, যদি ধরে নেওয়াও যায় যে, সিকিউরিটি কাউন্সিলে বা ন্যাশনাল অ্যাসেম্ব্লীতে এমন প্রস্তাব পাশ হবার সম্ভাবনা আছে যেটা ভারতের পক্ষে প্রীতিকর হবে না, তাহলেও সেটা এমন কিছু হবে না যাতে কার্যত কাশ্মীর পাকিস্তানের হস্তগত হবার পক্ষে কিছু সুবিধা হবে। সুতরাং পাকিস্তান সরকারের বর্তমান নীতির সার্থকতা প্রমাণিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

শ্রী সুরাবর্দী আগামী বৎসরের মার্চ মাসের মধ্যে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তা হবে না। তা সত্ত্বেও তিনি এখনো বলছেন যে, মার্চ মাসের পরে অত্যল্প দিনের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু যত তাড়াতাড়িই সাধারণ নির্বাচন হোক, তার আগেই সিকিউরিটি কাউন্সিল বা জেনারেল অ্যাসেম্ব্লী দেখিয়ে জনমত ভুলানোর সুযোগ খতম হবে। তখন শ্রী সুরাবর্দীর প্রধানমন্ত্রিত্ব আবার সংকটাপন্ন হবে। ততদিন পর্যন্ত যে ভিতরের দলাদলি বন্ধ থাকবে তাও নয়। পাকিস্তানী পার্লামেণ্টের বর্তমান অধিবেশন শেষ হবার আগেও একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। তা নাহলেও সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত যে শ্রী সুরাবর্দীর প্রধানমন্ত্রিত্ব টিঁকে থাকবে সে সম্ভাবনা অতি অল্প।

* * *

ওমানের ব্যাপার সিকিউরিটি কাউন্সিলে উঠেছিল কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক ভোটের অভাবে আলোচ্য বিষয় বলে পরিগণিত হয়নি। অন্তত সাতটি সম্মতিজ্ঞাপক ভোট না পেলে কোনো বিষয় সিকিউরিটি কাউন্সিলের agendaয় স্থান পায় না। ইরাক, ফিলিপিন্স, এবং সোভিয়েট মাত্র সম্মতিজ্ঞাপক ভোট দেয়। বাকীদের অর্ধেক বিরুদ্ধে ভোট দেয় এবং অর্ধেক (তার মধ্যে আমেরিকা) ভোটদানে বিরত থাকে। হয়ত জেনারেল কাউন্সিলেও বিষয়টিকে তোলার চেষ্টা হবে। কারণ, বৃটেন যদিও বুঝাবার চেষ্টা করছে যে, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং যা কিছু হয়েছে সেটাও মস্কটের ঘরোয়া ব্যাপার। আরব দুনিয়ার জনমত তাতে শান্ত হয়নি। ওমান স্বাধীন, এই দাবী করা হচ্ছে এবং এই দাবী সহজে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

এ সম্পর্কে ভারতের পার্লামেণ্টেও কিছু প্রশ্নোত্তর হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, বৃটিশ সরকারের নিকট ভারত সরকার এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শ্রী নেহরুর কথা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি পুরাতন কাগজপত্র পড়েও ঠিক করতে পারেন নি মস্কটের সুলতান ও ওমানের ইমামের মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক কী। ১৯২০ সালে একটি সন্ধি হয় (treaty of Sib), তাতে মস্কটের সুলতানের এক ধরনের সার্বভৌম অধিকার স্বীকৃত হলেও ওমানের অভ্যন্তর ব্যাপারে সুলতানের হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না, এইরূপ নাকি স্থির হয়। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এই সন্ধি প্রকাশ করছেন না। তার কারণ বোধ হয় এই যে, এই সন্ধি প্রকাশ করলে তাঁরা মুশকিলে পড়বেন, কারণ পরবর্তীকালে মস্কটের সুলতানের কাছ থেকে ওমানের ইমামের অজ্ঞাতে এবং বিনা সম্মতিতে ওমানের অন্তর্গত তেলের খনির ইজারা বৃটিশ কোম্পানী নিয়েছে। সিবের সন্ধি যখন হয় তখন ভারতে বৃটিশ রাজ ছিল। পারস্য উপসাগরকূলবর্তী অঞ্চল সম্পর্কে বৃটিশ বৈদেশিক নীতি তখন গভর্নর জেনারেল অর্থাৎ ভারত সরকারের পরিচালনাধীন ছিল। সিবের সন্ধির পরে ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ওমানের ইমামের গভর্নমেণ্টের স্বীকৃতি দানের কথা পাওয়া যায়। সুতরাং সিবের সন্ধির নকল নিশ্চয়ই তদানীন্তন ভারত সরকারের কাছে ছিল। ভারতে বৃটিশ রাজের উত্তরাধিকারী হিসাবে বর্তমান ভারত সরকার কি "পুরাতন কাগজপত্রের" মধ্যে সেই সন্ধির নকল পান নি? যদি পেয়ে থাকেন তবে তা পড়েও কি শ্রী নেহরু মস্কটের সুলতান ও ওমানের ইমামের সম্বন্ধটা বুঝতে পারছেন না? যদি সিবের সন্ধির নকল ভারত সরকারের কাছে থেকে থাকে তবে সেটা ভারত সরকারের পক্ষে প্রকাশ করে দিতে বাধা কী?

• • • •

বৃটিশ গিয়ানাতে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করার ব্যাপারে ডাঃ জগন ও গভর্নরের মধ্যে মতভেদ এখনো দূর হয়নি। খবরের কাগজে দেখছি, একজনকে মন্ত্রিমণ্ডলীতে নেওয়া নিয়েই বিশেষভাবে মতভেদ হচ্ছে। তিন বছর আগে ডাঃ জগনের মন্ত্রিমণ্ডলী বরখাস্ত করার পরে যে এ্যাড্‌ভাইসারী কাউন্সিল নিয়ে গভর্নর শাসন চালান তার একজন সদস্যকে মন্ত্রিমণ্ডলীতে নেবার জন্য গভর্নর জেদ করছেন যাতে ডাঃ জগনের আপত্তি। যাই হোক মনে হয় দু' একদিনের মধ্যেই একটা নিষ্পত্তি হবে। গত সপ্তাহে বৃটিশ গিয়ানা সম্পর্কিত আলোচনায় এবারের নির্বাচন ফল সম্বন্ধে একটু ভুল তথ্য ছিল, সেটার সংশোধন আবশ্যক। ১৪ জন নির্বাচিত সদস্যপদের মধ্যে ডাঃ জগনের পিপলস্ প্রগ্রেসিভ পার্টি নয়টি পেয়েছে। ডাঃ জগনের পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে মিঃ বার্নহাম যে পার্টি গঠন করেন তারা তিনটি আসন লাভ করেছে, বাকী দুটি দক্ষিণপন্থীরা পেয়েছে। গিয়ানার বর্তমান শাসনতন্ত্রে পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা ২৮—তার মধ্যে ১৪ জন নির্বাচিত, ১১ জন গভর্নর কর্তৃক মনোনীত এবং তিনজন (পদাধিকারবলে) সরকারী কর্মচারী। পূর্বের শাসনতন্ত্রে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা মোটসংখ্যার অর্ধেকের বেশি ছিল।

২৭।৮।৫৭

এ কটি সংবাদ-শিরোনামা পড়িলাম—সরকারের নাকের ডগার উপর দিয়া বন্ধকী জাহাজ পাকিস্তানে পাচার। সংবাদটি পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দায়িত্বহীনতায় রাগান্বিত হইয়াছি। শুধু খুড়োকেই দেখিলাম, এ ব্যাপারে শান্ত ও নির্বিকার। আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"ছোটবেলায় পড়নি,—ছাগলছানা লাফিয়ে চলে, জাহাজ ভাসে সাগর জলে?" স্বাধীনতার রংগমঞ্চে আমাদের দাপাদাপির সুযোগ নিয়ে লশ্করেরা একটু মস্করা ক'রে গেলেন আর কি"।

* * *

এ কটি বৈদেশিক সংবাদে প্রকাশ, একটি বিশেষ ধরনের বিমানে চড়িয়া জনৈক ব্যাঙ্ক নাকি স্বর্গের প্রান্তঃ-সীমা পর্যন্ত
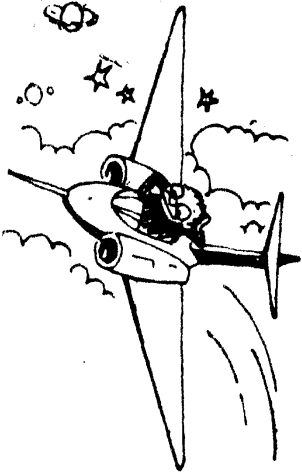
দেখিয়া আসিয়াছেন। —"দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় স্বর্গ-গমন যদি সম্ভব হয়, তবে রম্ভা-তিলোত্তমাদের নাচের একটি ফটো যেন তিনি নিয়ে আসেন এই অনুরোধ রইল"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

অ ন্য এক সংবাদে শুনিলাম—একটি চালকহীন ইঞ্জিন নাকি আপনা হইতেই চলিতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত একটি যাত্রী গাড়িকে ধাক্কা দিয়া এক দুর্ঘটনা করিয়া বসিয়াছে।—"ইঞ্জিন যদি চালকের অধীনেই থাকবে, তাহলে আর স্বাধীনতার দাম কি? ব্যক্তিস্বাধীনতাই শুধু নয়, বস্তু-স্বাধীনতাও চাই,—ভুবে না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *
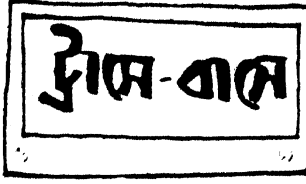
ক লিকাতায় পৌর স্বাস্থ্য উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে বলিয়া একটি সংবাদ শুনিলাম। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"উন্নয়নের কাজটা এবারে হতেও-বা পারে। শুনেছি কলকাতা বন্দরে ২০০ টনের একটি বিরাট ক্রেন স্থাপন করা হয়েছে"!!

* * *

শ্রী যুক্ত নেহরু ঘোষণা করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর রূপায়ণে সরকার সাহসের সহিত সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হইবেন। —"সরকার হয়ত পার পেয়ে যাবেন। আমরা শুধু জনসাধারণের কথাটাই ভাবছি। অসুবিধের রূপ যা দেখেছি আর দেখছি, তাতেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

বা ণিজ্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মোরারজী বলিয়াছেন—বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথে যা-যা অসুবিধা আছে, তা দূর করার ক্ষমতা সরকারের আছে, এই বিশ্বাস যেন জনসাধারণ সরকারের উপর রাখেন। —"রাখব বৈকি। বিশ্বাসের জোরেই বেঁচে আছি। কিন্তু কাল হয়েছে ঐ চাণক্য বাক্য—রাজকুলকে কখনো বিশ্বাস করো না"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

আ মাদের জনৈক সহযাত্রী একটি সংবাদ পাঠ করিয়া শুনাইলেন—নানা স্থানে ধূমকেতু পরিদৃষ্ট হইতেছে। —"হচ্ছে বৈকি,—ঢাকাতে, করাচীতে, মাছের বাজারে, চালের বাজারে, ওষুধের বাজারে—সবখানেই ধূমকেতুর পুচ্ছ-আন্দোলন দেখছি। দেখতে দেখতে চোখে সরষে ফুল ফুটছে"—বলিল আমাদের শ্যামলাল।

* * *

প্র সঙ্গত একটি সংবাদে শুনিলাম কিছু লোক বাজারে বাজারে গিয়া এই ধ্বনি তুলিতেছেন—মাছ কিনিবেন না। —"রাগের কথা হলেও, ভালো কথা। আমাদেরও সায় আছে। কিন্তু আবার ভাবছি—ইথে কি হইবে বল নন্দের পিসির"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

ট্রাম হইতে তাকাইয়া দেখিলাম, ইজারাদারদের নোটিশ বোর্ড কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে—পুকুরের জল শুধু কলকল করিয়া হাসিতেছে!!

* * *

রা জস্থানে বানর রপ্তানির প্রসংগে শ্রীযুক্ত নেহরু নাকি বলিয়াছেন যে, যেসব বানর রপ্তানি করা হইতেছে, তারা বিশেষ ধরনের বাংলার বানর। শ্যামলাল বলিল—"বিদেশে নাম কিনতে হ'লে উত্তর প্রদেশের কুলীন বাঁদর রপ্তানি করাই শ্রেয়"।

* * *

ডে নমার্কের জনৈকা মহিলা সাঁতারু নাকি ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। —তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। মহিলারা পুরুষদের জলে নাবিয়ে দিয়ে তাঁদের হাবুডুবু সাঁতার দেখতে ভালোবাসতেন এইটেই আমরা জেনে এসেছি। ডেনমার্কের কন্যাটি আমাদের ধারণা পাল্টে দিলেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * * *

জ নাব সুরাবর্দি বলিয়াছেন, ভারতের প্রধান মন্ত্রী একজন মহান্ ঐতিহ্যবান এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। —"সুরাবর্দি সাহেবের দেওয়া নেহরুজীর আন্তর্জাতিক দুর্বৃত্ত আখ্যাটি রাতারাতি কী ক'রে খসে গেল, তা ভেবে পাচ্ছিনে বলেই বলছি—সাধু সাবধান, ফের বলি সাবধান"—মন্তব্য বিশু খুড়োর।

* * *

বি লাতের কোন এক মহিলা তাঁর স্বামীর কার্যের যোগ্যতা অনুসারে উপযুক্ত বেতন অফিস হইতে দেওয়া হয় নাই বলিয়া তিনি নাকি একদিন অফিসে গিয়া বড়-

সাহেবের মাথায় লগুড়াঘাত করিয়া আসিয়াছেন। —"অথচ স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের ভাঁওতা দিয়ে গেয়ে গেলেন—সেথায় পুরুষগুলো সব পুরুষ, আর মেয়েগুলো সব মেয়ে"!!!

রঞ্জন

ভারতের আর্থিক স্বাস্থ্যের সত্যকার স্বরূপ বোঝা সহজ নয়। অংশত এটা বিশেষজ্ঞের কাজ এবং আমাদের দেশের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এখনো সহজ বাঙলায় কথা কইতে শেখেন নি। তার উপর আছে রাজনৈতিক প্রলেপ। একদিন কাগজে দেখা যাবে, ভারতের বিদেশী মুদ্রা নিঃশেষিতপ্রায় এবং সব আমদানি বন্ধ। পরদিন নেহরু ঘোষণা করবেন, দেশের বৈষয়িক ভবিষ্যৎ বহুৎ আচ্ছা হ্যায়। রোল তুললে রোগী ভয় পাবে। সাধারণ সংবাদপত্রপাঠক তার আপন আর্থিক সংকটে জর্জরিত, মুষ্টিমেয় ধনীর প্রাচুর্যে বিস্মিত ও ঈর্ষী এবং সমাজতন্ত্র-সম্পর্কিত বাগ্‌বাহুল্যে বীতশ্রদ্ধ। এমনকি, স্বাধীনতার প্রথম দশ বছরে যে সত্যকার সাফল্য হয়েছে তাও সান্ত্বনা আনছে না সাধারণের চিত্তে। দাম বাড়তির মুখে দামোদরের বাঁধ ব্যর্থ পরিহাস। ময়ূরাক্ষী মুছে দেয় না অর্ধভুক্তের অশ্রু। এ অবস্থায় ব্যক্তিগত আর্থিক অস্বাস্থ্য দেশের সমস্যার আগে স্থান নিলে কাউকে দোষ দেয়া শক্ত।

ব্যক্তির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর কোনো দেশের বাজেট তৈরির মধ্যে মূলগত প্রভেদের উল্লেখ অবান্তর হবে না। আমি তিরিশ টাকা মাইনে পাই, তাই বুঝে দিনে এক টাকার বেশি খরচা করিনে। গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থা বিপরীত। সে আগে ঠিক ক'রে এক বছরে তার কত খরচা হবে, সে অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয় করধার্যের পরিমাণ। তবু মিলও আছে দুয়ের মধ্যে অনেক। কোনো ব্যক্তি পারে না অনির্দিষ্টকাল ধারের উপর সংসার চালাতে, কোনো সরকারও পারে না বছরের পর বছর ডেফিসিট বাজেটের উপর নির্ভর করতে। শমন একদিন আসবেই, হয় কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে বা বাইরের বাজার থেকে। জাতির উপর সেই শমনেরই পদধ্বনি কি শোনা যাচ্ছে অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতার অন্তরালে?

•

বিনারক্তে বিপ্লব বলে একটা কথা সম্প্রতি প্রচলিত হয়েছে। অনেকের কাছে এর মানে দাঁড়িয়েছে—বিনামূল্যে বিপ্লব। দুর্ভাগ্যের কথা, অমন বস্তু সংসারে নেই। অথচ স্বরাজপূর্ব প্রচণ্ড প্রতিশ্রুতির কল্যাণে মানুষের চিত্তে ওই মূল্যমুক্তিকাই দৃঢ় স্থান পেয়েছে। [illegible] বেল্ট আঁট করবার সহজ [illegible] প্রস্তুত হতে পারছে না [illegible]। স্বরাজ এলেও সমৃদ্ধি কেন এলো না, এ প্রশ্নের অপ্রীতিকর উত্তরের সম্মুখীন না হলে সংকটের অবসান [illegible]। কাল আমেরিকা থেকে [illegible] থলি উজাড় পেলেও মৌল সমস্যা থেকে যাবে।

[illegible] আবার [illegible] প্রশ্ন আলোচ্য। নেহরুজীর [illegible] সত্ত্বেও এ কথা সত্য হতে পারে যে, দেশের বৈষয়িক উন্নতি সাধনকে আমরা সর্বোচ্চ কাম্য ব'লে গ্রহণ করিনি। মনে রাখতে হবে, এই বছরেই আমরা প্রতিরক্ষার জন্য পঞ্চাশ কোটি টাকা বেশি ব্যয় করছি, অর্থাৎ আমাদের কেন্দ্রীয় বাজেটের অর্ধেকের কাছাকাছি আছে বিমান-বন্দুক কেনবার জন্য। বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশে এর অতি সংগত কারণ থাকা সম্ভব। মার্কিনসাহায্যপুষ্ট প্রতিবেশী, পাকিস্তান, যে ভারতের শ্রেষ্ঠ মিত্র নয়, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ-প্রশ্ন আমার বর্তমান আলোচনার বাইরে। আমার বক্তব্য এই যে, আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য আমরা আমাদের অনধিক সম্বলেরও সবখানি নিয়োজিত করছি না বা করতে পারছি না। ফলে সমৃদ্ধির সামান্যতা ও বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী। যাঁরা ভারতের আক্রমণাতঙ্ক অতিকৃত বলে মনে করেন, তাঁরা অনায়াসে বলতে পারেন, ভারত যা করছে, তা putting the cart before the horse নয়—এর আসল নাম putting the armoured cart before the bullock. ভারতের অর্থনীতির বৃষশকট-ইকনমি নামটা পুরানো। মোদ্দা কথা, যে দরিদ্র গৃহস্থ প্রহরার জন্য লাঠি কিনতে বাধ্য হয়, তার উপায় নেই খাবার ডাঁটা কম না কিনে।

তারপর আছে আমাদের আন্তর্জাতিক উচ্চাশা। এরও সংগতি তর্কাতীত হতে পারে। আমি অন্তত তর্ক করছিনে। তবে আমাদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও উদ্যোগের উপর এর দ্বিবিধ ফল উল্লেখ না করলে বর্তমান আর্থিক সংকটের স্বরূপ বোঝা যাবে না। এক, নিরপেক্ষ নীতির জন্য হয়তো আমরা রাশিয়া ও আমেরিকা দুয়েরই সাহায্য পাচ্ছি, কিন্তু ওই একই কারণে কারো সাহায্যই অতি উদার নয়। দ্বিতীয়ত আমাদের কারো কারো মনে ক্ষুদে সাইজের 'বিগ পাওয়ার' হবার বাসনা হয়তো গোপনে লুকিয়ে আছে। আমরা যে বড়ো বড়ো কারখানা গড়তে উদ্যত হয়েছি, তার কারণের সবখানি অর্থনৈতিক নয়। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষও এর সঙ্গে জড়িত আছে বলে সন্দেহ করি। জার্মান অর্থনীতিবিশারদ হের শাখ্‌ট্ স্পষ্ট করে এ কথাটা বলেননি, কিন্তু বলেছিলেন যে, দারিদ্র্যের আশু উপশম আমাদের উদ্দেশ্য হলে ছোট ছোট পরিকল্পনাতেই প্রথম হাত দেওয়া উচিত ছিল।

•

অর্থনৈতিক বিপ্লবের জন্য দেয় মূল্যের সম্যক্ পূর্বজ্ঞান না থাকাও দেশের বর্তমান নৈরাশ্য ও অনুদ্যমের অন্যতর কারণ। আজ ত্যাগের আহ্বান যে অশ্রুত থাকছে, তার অন্যান্য কারণও আছে অবশ্য। অনেকের নেই-ই কিছু ত্যাগ করবার, দীর্ঘশ্বাস ছাড়া। দ্বিতীয়ত, গত দশ বৎসরে কনসলিডেশনের নামে উচ্ছ্বাসের একটা অলক্ষিত অপচয় ঘটেছে দেশব্যাপী। উচ্ছ্বাসের অর্থনৈতিক মূল্য অপরিসীম নয়। কিন্তু আজ যে নগদ মূল্য—প্রায়শ অনুচিত মূল্য—ছাড়া কোনো কাজ করতে কারো উৎসাহ অবশিষ্ট নেই, তাতে স্বভাবতই নগদের ঘাটতি বৃহত্তর হয়েছে। ১৯৪৭ সালে যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ছিল, তা বহুলাংশে উচ্ছৃঙ্খল ছিল এবং সময়ে দমন না করলে হয়তো বৃহৎ রাজনৈতিক মূল্য দিতে হত। আজ দিতে হবে উবে যাওয়া উৎসাহের অর্থনৈতিক মূল্য।

উচ্ছ্বাসের স্থান যদি নিত সাধারণ সততা—টাকা নিলে কাজ দেব, জিনিস দেব—তাহলেও ক্ষতি পরিমিত হত। তাও হয়নি। সরকারী দুর্নীতি ও অপচয়ের যে কাহিনী প্রতিদিন প্রকাশিত হয়, তা সত্যের অতি সামান্য অংশ মাত্র।

•

আর দুটি দৃষ্টিবিভ্রান্তকারী সমাজতন্ত্র ও কল্যাণ রাষ্ট্রের অবাস্তব—অংশত অনান্তরিক—প্রতিশ্রুতি। নেহরু সেদিন বলেছেন, নিজামের অর্থ কেড়ে নিয়ে বিলিয়ে দিলে সোস্যালিজম্ হবে না। নিশ্চয়ই না। কিন্তু ধনী-লুণ্ঠন বহুর কাছে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন সত্য না হলেও সম্ভব বলে মনে হত। নেহরু যে সে পথ অবলম্বন করেননি, তাও হয়তো একান্ত সংগত। কিন্তু তার ফলে যে গণ-উৎসাহ সঞ্চারিত হত, তা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন এবং তাঁর অভিযোগ করবার অধিকার নেই। নানা কর সত্ত্বেও একথার তো প্রতিবাদ নেই যে, উন্নয়নের জন্য এখন যে টাকাই খরচা হোক, তা প্রথমে গিয়ে পড়বে তাদেরই হাতে, যাদের টাকা আছে।

কল্যাণ রাষ্ট্র? এটা আলোচনার যোগ্য নয়। দারিদ্র্য বণ্টনের নাম কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা নয়, যদিও ধনী রাষ্ট্র কল্যাণ রাষ্ট্র না হতেও পারে। আগে বলেছি, বিনারক্তে বিপ্লবই আর বিনামূল্যে বিপ্লবের কথা। আমরা যা চাইছি, তা প্রায় বিনা বিপ্লবে বিপ্লব। তার আগে নিয়ে এসো তো ওই সুন্দর সোনার পাথরের বাটিটা।
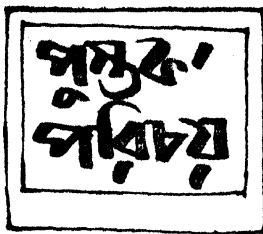
ইতিহাস

The Sepoy Mutiny & Revolt of 1857 by R. C. Majumdar: Agents: Firma K. L. Mukhopadhyay—6/1A, Banchharam Akrur Lane, Calcutta. Price Rs. 15/-.

ভারতের ইতিহাস এক নবতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া আপনার সুনির্দিষ্ট পথে চলিতেছে। ইহা জাতির অগ্রগতির পরিচয়। এবং যে সচেতনতা থাকিলে জাতির ইতিহাস কোন অবাঞ্ছিত রূপ লইতে পারে না—ইহা তাহারই একটি শুভ লক্ষণ। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের অতীতের ইতিহাসে নানাবিধ জটিলতা ইতিহাস-রচনার পদ্ধতির জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিহাসকে একদলে কেহ-কেহ সরকারী বিবরণের চতুঃসীমার মধ্যে বাঁধিতে চাহিতেন। ইহার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের বহু সত্য নিরূপিত হয় নাই, বরং তথ্য চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে বিদেশীর রচিত ইতিহাসের উপলখণ্ড দিয়া আমরা ইতিহাসের ইমারত গড়িয়া তুলিয়াছি। ফলে আমাদের ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্যে কাল-নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অভাব ঘটিতেছে। ইহা সব ক্ষেত্রেই ঘটিয়াছে এমন কথা বলিতেছি না। আমাদের বিশ্বাস ইতিহাসের তথ্যকে তৎকালীন মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করাই সমীচীন। বর্তমানকালের সচেতনতা দিয়া অতীতের ইতিহাসকে বিচার করা বিধেয় নহে। কারণ ইতিহাসের তথ্য কালপ্রসূত এবং ইহার বিভিন্নতা শুধু বিশেষ কোন কালের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। এবং সমাজ কেন্দ্রের সমগ্র ঘটনাবলী হইতে যে গতি বিকাশলাভ করে তাহা ব্যাখ্যাতার দৃষ্টিভঙ্গীর গুণে নূতন ভাব-প্রবাহের সৃষ্টি করে, ইহাকে ইতিহাসের নব জন্ম বলা যাইতে পারে। স্যার যদুনাথের দৃষ্টিগুণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন আমাদের চোখে নূতনরূপে ধরা দিয়াছে। টয়েনবি বিশ্বের সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে এক নৈতিক ভিত্তি খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

আমরা আজ সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস নয়া কষ্টিপাথরে বিচার করিতে বসিয়াছি। তাহার প্রধান কারণ আমরা জাতি হিসাবে একটি রাজনৈতিক চেতনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছি। আমাদের ঐতিহাসিক চিন্তার মূলে জাতীয়তা-বোধই প্রবলভাবে কাজ করিতেছে, অথচ ঐতিহাসিক সত্য অনেক সময় রাজনৈতিক চেতনার ঊর্ধ্বে বিরাজ করে। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস। বিদ্রোহ যে জাতীয়তার আন্দোলন নহে, একথাটা ভাবিতে আমাদের যতই অন্তরে পীড়াবোধ হউক না কেন ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের বর্তমান জাতীয়তার চেতনাবোধ কোন সাময়িক ব্যাপক বিদ্রোহের মধ্যে জন্ম লয় নাই। অতি দুরূহ স্থায়ী ক্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়া জাতীয়তার বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই সামরিক বিদ্রোহের বিকাশকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পূর্বগামী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশেষ করিয়া জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তাহার অনুগামী হিসাবে জাতীয় অর্থনৈতিক আন্দোলনও সৃষ্টি করিয়া থাকে। সিপাহী বিদ্রোহ যে অর্থনৈতিক বিভ্রাট সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার পত্তন হয় লর্ড ডালহৌসীর হাতে। তাঁহার নীতি বিভ্রাটের ফলে মূলত সামরিকবৃত্তিভোগী সম্প্রদায়, হৃতসর্বস্ব আমির-ওমরাহের দল আঘাতপ্রাপ্ত হন। লর্ড ডালহৌসীর নীতির ফলে এই সম্ভোগবিলাসী উচ্চ সম্প্রদায়ের অভিমানজনিত আক্রোশ পরে সিপাহী বিদ্রোহ আন্দোলনে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ইহা বাদে ভারতীয় সৈন্যদের মাঝে চর্বিজাতগুলি ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি ধর্মীয় সংস্কার প্রবল আকার ধারণ করে। ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান সমাজের মধ্যে অযাচিতভাবে অন্য অন্য ধর্মের নিন্দাবাদ, ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস—ইহা যে-কোন দেশে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতে পারে। বস্তুত সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে খৃষ্ট ধর্মের প্রচার ও ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা বহু বার

হইয়াছে। এমন কি সামরিক বিভাগেও এইরূপ চেষ্টার কোন অসম্ভাব ছিল না।

ঐতিহাসিক সত্য দেশ কাল বা বিশেষ কোন রাজনৈতিক চেতনার অপেক্ষা রাখে না। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থে যথেষ্ট ঐতিহাসিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। সমসাময়িক চিন্তাধারার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়াই তিনি ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করিয়াছেন। বৈদেশিক শক্তির প্রভাবে ও পীড়নে ভারতের উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম সংস্কার ও সামাজিক মন যে বিদ্রোহ করিয়াছিল তাহা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। যদি কোন ঐতিহাসিক এই ধর্ম সংস্কার ও ধর্মান্তরিত হইবার আশঙ্কাকে ইতিহাসের কাঠখড় বলিয়া মনে করেন ত করিতে পারেন। এবং ইহা সত্য বটে যে এই সংস্কার ও আশঙ্কার কাঠখড় আগুনে লাগিয়া ভারতের অংশবিশেষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তবুও ইহাকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রথম পর্যায় হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে কিনা সন্দেহ। ধর্মভিত্তিক সংস্কার, সন্দেহ ও আশঙ্কা কত গভীরভাবে তৎকালীন সামাজিক মনে স্থায়ী হইয়াছিল তাহা এই বেনামী দরখাস্ত হইতে পরিস্ফুট হইবে।

"The representation of the whole station is this, that we will not give up our religion. We serve for honour and religion; if we loose our religion, the Hindoo and Mahomedan religions will be destroyed ....The Lord Sahib has given orders, which he has received from the company, to all commanding officers to destroy the religion of the country. We know this as all things are being bought up by Government. This officers in the Salt Department mix up bones with the salt. The officer in charge of the ghee mixes up fat with it; this is wellknown. These are two matters. The third is this: that the Sahib in charge of the sugar burns up bones and mixes them in the syrup the sugar is made of : this is wellknown—all know it. The fourth is this : that in the country the Bura Sahibs have ordered the Rajahs, Thakurs, Zemindars, Mahajans and Ryots, all to eat together, and English bread has been sent to them : this is wellknown. And this is another affair, that throughout the country the wives of respectable men, in fact, all classes of Hindoos, on becoming widows, are to be married again; this is known. Therefore we consider ourselves as killed. You all obey the orders of the Company, which we all know. But a king or any other one who acts unjustly, does not remain" —History of the Sepoy War Vol. I Kaye—Appendix—639-640 pp.

ইহা তৎকালীন সিপাহী জীবনের আশঙ্কা ও উদ্বেগের কথা। এই আশঙ্কাই যে একদিন ব্যাপক বিদ্রোহে পরিণত হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন এই বিদ্রোহই আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়। এই বিষয় ভিন্ন মত পোষণ করিবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আলোচনাসূত্রে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভিন্ন মত পোষণ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। রমেশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানসম্মত। ঘটনার বিশ্লেষণ স্বচ্ছ, গ্রন্থখানি সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসের অপূর্ব সম্পদ।

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

মরসুমী ফুল—রামেন্দ্র দেশমুখ্য।
কবিয়াল এণ্টনী ফিরিঙ্গী—মদন বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রাচীন সাহিত্যে ভারতীয় সংস্কৃতি—পরিতোষ দাস।
প্রিয়-অপ্রিয়—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।
মৌ-চোর—সলিল সেন।
পথ ও পাথেয়—দেবব্রত।
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী।

—শৌভিক—

শয়তানির আখ্যানবস্তু

দিন কয়েক আগে ছোটদের জন্যে তোলা চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটির "জলদীপ" ছবি-খানি দেখার পর কথা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু মন্তব্য করেন যে, বড়োদের জন্যে তৈরী ক্রাইম-ফিল্ম বা শয়তানির ছবি দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, ছোটদের পক্ষে তো বটেই। প্রধানমন্ত্রী ছবি দেখেন অতি ক্বচিৎ এবং তাও যেটি দেখেন সেটি বিশেষভাবে নির্বাচিত কোন ছবিই হয়। কাজেই দেশে ছবির যে ধারা, বিশেষ করে হিন্দী ছবির ধারা বর্তমানে যা চলেছে তা তার অবগতিতে পৌঁছয় না। যদি পৌঁছতো তাহলে, তার যা মনোভাব, ভারতবর্ষে ছবি তৈরী, বিশেষ করে হিন্দী ছবি তৈরী তিনি বোধহয় বন্ধই করে দিতেন। কারণ, যে ধরনের ছবি দেশের পক্ষে ক্ষতিকর বলে তিনি মনে করেন, সেই ক্রাইম-ফিল্মে বা মানুষের বিবিধ শয়তানীর রূপায়ণের যে আধিক্য বর্তমানে দেখা দিয়েছে তা তিনি বরদাস্ত করতেন না নিশ্চয়ই। বর্তমানে এমন হয়েছে যে, অতি নৃশংস ও হিংস্র প্রকৃতির শয়তানীর উপকরণ না হলে কোন বোম্বাই ছবি যেন হয়ই না আজকাল। নিছক আমোদ সরবরাহের নামে গুমোটে ছায়াবিষ্ট আলোকপাতে তোলা চড়া ঝাঁঝের বাজনার সংগতে ছবির পর ছবিতে যে ধরনের সব দৃশ্য পরিবেশিত হয়ে চলেছে, তা যে কোন দর্শকের মনের পক্ষেই যে কি অপরিমেয় ক্ষতিকর, দুঃখের মধ্যে সেন্সর বোর্ড তা মোটেই অনুধাবন করতে পারেন না বা করতে চানও না বলা যেতে পারে। এমন সব দৃশ্য যা বয়ঃপ্রাপ্তদের চেতনাকে পর্যন্ত সম্পূর্ণ গোমরা করে তোলে, নির্বিবাদে সেন্সর থেকে সে সব ছবি অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরও অবাধে দেখবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। ধরা যাক হালফিলের ছবি "নও দো গ্যারহ"র কথা। শয়তানির ব্যাপার নিয়ে পরিকল্পিত গল্পের শেষে একটা খুনোখুনির দৃশ্য রয়েছে: অর্গলবদ্ধ ঘরে শায়িতা হুমের ওষুধে অচৈতন্যা তরুণী; দুই পাষণ্ড পিস্তল নিয়ে লড়ছে: একজন গুলীতে লুটিয়ে পড়লো। ঐ পর্যন্তই নয়, গুলীবিদ্ধ ও রক্তাক্ত কলেবর নিয়ে ঘায়েল ব্যক্তি তার দেহটা মেঝের ওপর দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে টেনে দরজা খুলে বীভৎস রূপ নিয়ে এসে দাঁড়ালো। আর অপর পাষণ্ড শায়িতা মেয়েটির মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল ধরে শাসাতে লাগলো যতোক্ষণ না মেয়েটির প্রেমিক, বলতে গেলে, ছাদ ফুঁড়ে ঘরে ঢুকে পাষণ্ডকে বাগিয়ে ধরতে সক্ষম হলো। এমন-ভাবে তৈরী দৃশ্য যে চেতনা স্তব্ধ হয়ে যায়, আর তীব্রতা আরো বাড়িয়ে তোলা হয়েছে বাজনার ঝালাপালায়। খুন ও গোলা-গুলী নেই এমন হিন্দী ছবি পাওয়াই দুস্কর। পৌরানিক বা আরব্যরজনী জাতীয়

রূপকথার ক্ষেত্রেও কেবল শয়তানির উপকরণই বেছে বেছে পরিবেশন করা হয়। যেমন ধরা যায় "জয়ং" কিংবা "মোহিনী" অথবা "অযোধ্যাপতি"র মতো ছবি যাতে কাটা মাথা থালায় করে সামনে এনে হাজির করার মতো বীভৎস কাণ্ডও থাকে। এ সব ছবির কথা যদি বাদ দিতে হয়, তবুও বেশী দিনের হিসেব নয়, মাত্র গত তিন মাসের হিসেব থেকেই দেখা যায় যে, সরাসরিভাবে ক্রাইম ফিল্মের পর্যায়ে পড়ে এমন দশখানি ছবির নাম করা যায়, যার মধ্যে বাছলা হচ্ছে দুখানি। "শেরু" একখানি ছবি যার আরম্ভতেই নায়ক দীর্ঘদিন উধাও থাকার পর গ্রামে ঢোকে রিভলবার নিয়ে এক পাষণ্ডকে শাসাতে, তারপর রয়েছে গোটাকয়েক খুন, পুলিশকে ধোকা দিয়ে পালানো, আর অতি হিংস্র মারপিট। "মিস ইণ্ডিয়া"র আসল গল্প এক মহা পাষণ্ড বাউণ্ডুলেকে নিয়ে যে তার সাহসিকা পত্নীর সহায়তায় শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায়। "কফি হাউস" এক খুনে মেয়েকে নিয়ে গল্প; নিজের অভিপ্রায় মেটাবার জন্য কোন হীন কাজই তার পক্ষে অসম্ভব নয়; কিন্তু তার জন্য কোন শাস্তি পেলো না সে, মোটর দুর্ঘটনায় দৈবকে দিয়ে তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো পার্থিব বিচারের হাত থেকে। "গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া" আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত জন-কয়েক শয়তানকে নিয়ে গল্প যাদের মধ্যে একজন নাইট ক্লাবের সর্দার, একজন নাচের স্কুল খুলে মেয়েদের নিয়ে কারবার চালায়, একজন চোরাই মদের ব্যবসা করে, একজন এক বৌকে হত্যা করে তার বীমার টাকা আদায় করে আবার বিয়ে করে এবং আবার সেই বৌকে হত্যা করে, আর রয়েছে একজন গুণ্ডা। "জীবন সাথী"র পাষণ্ড ঘরে বৌ থাকতেও এক মেয়েকে দেখে তাকে ভুলিয়ে আবার বিয়েতে উদ্যত হওয়ার ফলে খুনো-খুনি কাণ্ড। "রাত একটা" সরাসরি ক্রাইম ড্রামা। "রাস্তার ছেলে" অনাথ খুদে বয়েসের পাকা অপরাধীদের নিয়ে গল্প যা ছোটদের দেখানো যায় না। এতো গেল মাত্র তিন মাসের হিসেব। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু জানতেই পারেন না যে, যে সব ছবি দেশের পক্ষে ক্ষতিকর বলে তিনি মনে করেন, সারা বছরের তালিকায় সেই সব ছবিই সংখ্যায় বেশী।

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহেও আলোচ্য শুধু হিন্দী ছবি, তাও মাত্র দুখানি। বছরের প্রথম ছ মাসে যে গতিতে নতুন ছবি মুক্তি লাভ করে চলছিল, তা দেখে মনে হয়েছিল, বছর শেষে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যার দিক দিয়ে একটা রেকর্ডই হয়ে দাঁড়াবে। সে গতিটা এখন শ্লথ হয়ে পড়েছে গত কয়েক সপ্তাহ থেকে এবং মনে হয় শেষ পর্যন্ত বছর শেষে ছবির সংখ্যা হয়তো গতবারেরই মতো হয়ে দাঁড়াবে। তবে দেখা যাচ্ছে যে, কিছু ছবি যদি হাতে থেকে যায় সেইটেই হবে ভাল। কারণ কাঁচা ফিল্ম আমদানী কতো কমে যাবে তা অবশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে কমবে ঠিকই এবং তখনকার অবস্থায় ছবির সংখ্যাও হয়তো কমে যাবে। গভর্নমেন্টের মতিগতি দেখে এটা অবশ্য পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ছবির সংখ্যা কম হয় তা তারা চান না, তবুও নতুন ছবি মুক্তি দেওয়ায় যাতে টান না পড়ে সে বিষয়ে চলচ্চিত্রশিল্পেরও এখন থেকেই সতর্ক হওয়া দরকার। মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী ছবি দুখানি হচ্ছে "নয়া দৌর" আর "জন্নতি নিশানী"। "নয়া দৌর" একটি মান বাড়াবার মতো ছবি, হিন্দী হলেও সত্যিই তাই।

অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা

মন খুলে প্রশংসা করার মতো হিন্দী ছবি যখন একেবারে দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময়েই "নয়া দৌর" সৃষ্টির জন্য বি আর ফিল্মস, তথা প্রযোজক-পরিচালক বি আর চোপরা বিশেষভাবে অভিনন্দন লাভের যোগ্য। "নয়া দৌর" বোম্বাই ধারার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম নয়, তবুও দীর্ঘকাল পর বিবিধ চমৎকারিত্বে একখানি মনোময় বোম্বাই ছবি পাওয়া গেল। বোম্বাই ধারার মধ্যে প্রচলিত চটকদার উপকরণ ব্যবহার করে অনর্থক ছবিখানির দৈর্ঘ্য (১৫৫৬২ ফুট) বাড়িয়ে যাওয়া, আর আওয়াজটা বেশী বেশী, এই যা ত্রুটি, তা বাদে সর্বাঙ্গীণ লোকের একটি স্মরণ করে রাখার মতো ছবি। মানুষ আর যন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ে আখতার মির্জার লেখা কাহিনীটির মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য আছে এবং বি আর চোপরার পরিচালনা গুণে তা খুলেছেও ভাল। শান্তি-পূর্ণ একটা গ্রাম যার অধিবাসীদের মধ্যে

কতক টাঙাওয়ালা, আর কতক কাঠুরে। কাঠের ব্যবসায়ী শেঠ মগনলাল ধর্মপ্রাণ, দরিদ্রের প্রতি মমতাময়, তার কাছে কাজ করে গ্রামবাসী খুসী। মগনলাল তীর্থে চলে যেতে তার ছেলে কুন্দন শহর থেকে এসে ব্যবসার ভার নিয়ে বসলো। কুন্দন দেখলে বৈদ্যুতিক যন্ত্র বসালে অনেক বেশী কাজ হতে পারে। প্রস্তাবটা গ্রামবাসী আনন্দের সংগে শুনলো; যন্ত্র বসলো, গ্রামের লোকে ধুমধাম করে পুজো দিলে। কিন্তু ঐ যন্ত্রই যে তাদের শত্রু সেটা বুঝলে কুন্দন যখন জানালে যে তাদের আর প্রয়োজন নেই। সহজ ও সরল মানুষের জীবনে এই এলো হাহাকার। কুন্দন আরো এক অর্থকরী চাল চাললে; গ্রামে এসে উপস্থিত করলে মোটর-বাস। ফলে টাঙাওয়ালারা হলো বেকার। গ্রামবাসীর বক্তব্য, যন্ত্র থাকে থাকুক, কিন্তু তাই বলে তাদেরও কাজ থাকবে না কেন। কাহিনীর প্রতিপাদ্য হচ্ছে মহাত্মাজীর কথা নিয়ে এই যে, "জড় যন্ত্রকে যেন ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের জীবন্ত মানুষের বদলে চাপিয়ে দেওয়া না হয়। যন্ত্রের শুভ প্রয়োগ হচ্ছে মানুষের প্রচেষ্টার সহায়তা করা, সহজ করে দেওয়া।

• • •

গল্প হচ্ছে দুই বন্ধুকে নিয়ে—টাঙা-ওয়ালা শংকর ও কাঠুরে কৃষ্ণ। একেবারে অভিন্নহৃদয় বন্ধু। অনেককাল বাইরে থেকে গ্রামে ফিরে এলো রজনী তার মায়ের সংগে। প্রথম থেকেই রজনীর প্রতি শংকর আকৃষ্ট হলো। কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট শংকরের বোন মঞ্জু। মঞ্জুর বিয়ে ঠিক হয়েছিল ভিন্ন গ্রামে, কিন্তু সে পক্ষ বেশী টাকার লোভে ছেলের বিয়ে অন্যত্র ঠিক করে। শেষে শংকর তার বন্ধু কৃষ্ণের সংগেই মঞ্জুর বিয়ে দেওয়া সাব্যস্ত করে। মঞ্জুর বিয়ে দিয়ে রজনীকে সে ঘরে আনবে। শংকর নিশ্চিন্ত যে কৃষ্ণ আনন্দের সংগেই তার প্রস্তাব গ্রহণ করে নেবে। কিন্তু কথাটা পাড়তে গিয়েই সব ওলোটপালোট হয়ে গেল। শংকর বুঝতে পারলে যে, কৃষ্ণও রজনীকেই চায়। কৃষ্ণও জানলে শংকর রজনীর প্রার্থী। ওরা পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী হলো, কিন্তু কিছুতেই কোন সাব্যস্তে আসতে পারে না। শেষে প্রস্তাব হলো যে, পরদিন রজনী মন্দিরে পুজো দিতে এসে যদি সাদা ফুলে অর্পণ করে, তাহলে সে হবে শংকরের, আর যদি লাল ফুল দিয়ে পুজো করে, তাহলে রজনী হবে কৃষ্ণের। মঞ্জু শুনলে সে কথা। পরদিন মন্দিরের এক পাশে শংকর ও কৃষ্ণ গিয়ে দাঁড়ালো। রজনী এলো ফুলের ডালা নিয়ে, মঞ্জুও এলো ফুল নিয়ে। প্রণাম সেরে ফুল দেবার সময় মঞ্জু হঠাৎ তার ফুলের ডালাটা বদলে নিলে রজনীর সংগে। কৃষ্ণ সেটা লক্ষ্য করলে এবং দেখলে যে, রজনী সাদা ফুলে অর্পণ করছে। রাগে কৃষ্ণ বেরিয়ে এলো মন্দির থেকে। ওর ধারণা, শংকর তার বোনকে শিখিয়ে দিয়ে এই কাণ্ড করেছে। এই নিয়ে হলো বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ। সেই থেকে কৃষ্ণের একমাত্র লক্ষ্য হলো শংকরকে পদে পদে বিপদে ফেলা, তার নিপাত চিন্তা করা। কৃষ্ণ কুন্দনের সংগে হাত মেলালে এবং তারই পরামর্শে কুন্দন গ্রামে মোটরবাসের আমদানী করলে। টাঙাওয়ালারা প্রতিবাদ জানালে কুন্দনের কাছে, তাদের মুখপাত্র শংকর। কিন্তু কোন ফলই হলো না। শংকর একটা অসম্ভব শর্ত উপস্থিত করলো কুন্দনের কাছে। ছোট স্টেশনে যাত্রীর যা কিছু ভিড় হয়, বারো মাইল দূরের মন্দিরে যাবার জন্যেই। শংকর জানালে, সে যদি বাসের চেয়ে আগে যাত্রীদের মন্দিরে পৌঁছে দেয়, তাহলে কুন্দনকে বাস চালানো বন্ধ করে দিতে হবে। রাজি হলো কুন্দন। ঠিক হলো তিন মাস পর এই দৌড় হবে। পাগল মনে করে সকলেই শংকরের সংগ ছাড়লে। শংকর বাসের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে একটা নতুন রাস্তা কাটা ঠিক করলে, যার ফলে ৮' মাইল দূরত্ব কমিয়ে ফেলা যাবে। একাই আরম্ভ করলে রাস্তা কাটা। প্রথমে রজনী এলো তার সাহায্য করতে, মঞ্জুও এলো। শংকরের অটল সংকল্প দেখে একে একে টাঙাওয়ালারা সকলে এলো, ক্রমে সমস্ত গ্রামবাসী যোগ দিলে। গ্রামের লোকে বিরোধ ভুললো। কুন্দন পদে পদে বাধা

দিতে থাকে, আর শত্রুতা করতে থাকে কৃষ্ণ। শংকরের সংকল্প অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললে। দৌড়ের নির্ধারিত দিন এলো। কৃষ্ণ আগের দিন রাতে নতুন রাস্তায় বাঁধা কাঠের সাঁকোটা ধ্বংস করার চেষ্টা করলে। মঞ্জুর কাছে কৃষ্ণ ধরা পড়লো, আর সেই সময়েই কৃষ্ণ জানলো, ফুলের ডালা মঞ্জু শংকরের নির্দেশে বদলে দেয়নি, সে বদলে দিয়েছিল কৃষ্ণ যাতে রজনীকে বিয়ে করতে না পারে, কারণ কৃষ্ণকে সে ভালবাসে! অনুশোচনার অন্ত রইলো না কৃষ্ণর। মঞ্জুকে নিয়ে সাঁকো সারতে আরম্ভ করলে। ওদিকে স্টেশন থেকে দৌড় আরম্ভ হবার ঠিক পূর্বমুহূর্তেই শেঠজী তীর্থ থেকে ফিরে এলেন। কুন্দনকে নিরস্ত হতে বললেন, কিন্তু কুন্দনের জিদ, দৌড় হবেই। শংকর শেঠজীকে রাজী করালো। আরম্ভ হলো দৌড়। বাস চললো পুরনো রাস্তা ধরে, আর শংকর টাঙা নিয়ে ছুটলো নতুন রাস্তা দিয়ে। সাঁকোটা মেরামত হয়েও হয়ে উঠলো না। শংকরের টাঙা ছুটে এসে পৌঁছলো, কৃষ্ণ সব শক্তি প্রয়োগ করে কাঁধে ভর দিয়ে সাঁকোটা কোনরকমে খাড়া করে শংকরের টাঙা পার করে দিলে। তীরবেগে ছুটে চললো শংকরের টাঙা। দারুণ আবেগ ও উত্তেজনাকে উল্লাসে ভরিয়ে শংকরের টাঙা জিতে গেল দৌড়ে। বন্ধুর সঙ্গে আবার বন্ধুর মিলন হলো।

* * *

ছবিখানির পনের আনা ভাগই তোলা বহির্দৃশ্যে। বেশির ভাগ তোলা ভূপালের বোরখেরি ও বুদনি গ্রামে, কিছু কিছু পুনা ও আমেদনগরেও তোলা। বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ পটভূমি। শোভাময় দৃশ্যে চোখ ভরে যায়, আর আলোকচিত্রশিল্পী এম এন মালহোত্রা প্রাণবন্ত করে দৃশ্য রচনায় অনন্যসাধারণ কৃতিত্বও দেখিয়েছেন। দৃশ্য গঠনে, ঘটনার পরিচর্যায় ও বিন্যাসে পরিচালক চোপরা উদ্দীপ্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি সাধারণ অসংগতি চোখে পড়ে, যেমন, কুন্দন আসছে, কিন্তু তার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত না করিয়েই শেঠ মগনলালকে তীর্থে পাঠিয়ে দেওয়া, অথবা রজনীর সঙ্গে তার ছোটভাইকে নিয়ে মন্দিরে গেল শংকর, কিন্তু ফেরবার সময় টাঙাতে বরাবর দেখা গেল কেবলমাত্র ওদেরই দুজনকে, হঠাৎ শুধু একবার ছোট ছেলেটিকে পলকের জন্য দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। যন্ত্রের সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দ্বিতার জন্যে রাস্তা কাটার ব্যাপারটা পরিকল্পনার দিক থেকে জোরালো নয়, তবে ঐ রাস্তা কাটা এবং সেই রাস্তায় দৌড়ের মধ্যে দিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে একতা ও কর্মপ্রেরণার পরিচয় চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কতকগুলি দৃশ্য প্রয়োজনের চেয়েও বেশি বেশি করে দেখানোয় মাঝে মাঝে একটু একঘেয়েমি এসে পড়ে। পরিবেশ অনুযায়ী সংগীত পরিচালনায় ও পি নায়ারের কাজ প্রশংসনীয়। বিদেশী প্রভাবের পরিচয় বাদ নেই, তবে অল্পই আছে। শেষের মোটরবাস ও টাঙার দৌড় পাল্লার দৃশ্যটি দীর্ঘকাল মনে রাখবার মতো। দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে দেখবার ও তারিফ করার মতো আরো দৃশ্য হচ্ছে কটি সম্মিলিত নাচ, যার মধ্যে অপূর্ব হচ্ছে একটি ভাঙরা নাচ, পাহাড়ের ওপরে, মন্দিরে গ্রামবাসীদের দলে দলে পুজো দিতে যাওয়া, জঙ্গলে গাছ কাটা, পঞ্চায়েৎ বৈঠক ইত্যাদি। শব্দগ্রহণ করা হয়েছে চড়া পর্দা ধরে, আওয়াজও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাত্রায়, বিশেষ করে কানে লাগে শংকর ও কৃষ্ণর হাতাহাতির সময় ঘুষির আওয়াজ, প্রায় দো-দমা ফাটার মতো। নৃত্য-পরিকল্পনা ও পরিচালনায় প্রেম ধাওয়ান অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন, নাচের দৃশ্যগুলির কম্পোজিশনেও আলোক-চিত্রশিল্পী অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। অভিনয়ে ছবিখানিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন শংকরের চরিত্রে দিলীপকুমার। অত্যন্ত উঁচু ধাপে তুলে ধরেন অভিনয়নৈপুণ্যকে

এবং দিলীপকুমারের শিল্পী জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে প্রতীয়মান হয়। রজনীর চরিত্রে বৈজয়ন্তীমালাকেও নতুন ধরনের চরিত্রচিত্রণে দেখা যাবে, তবে সব সময়ে দিলীপকুমারের সঙ্গে পা ফেলে চলা সম্ভব হয়নি এবং গ্রামের সরল ও অকৃত্রিম মানুষ-গুলির মধ্যে ঐ একটি চরিত্রই চড়া মাজা-ঘষা। মঙ্গর চরিত্রে চাঁদ ওসমানীকে ভাল লাগবে খুবই। কৃষ্ণর চরিত্রে অজিতের কৃতিত্বও প্রকাশ পেয়েছে। শেষের দিকে সংবাদপত্রের রিপোর্টাররূপে জনি ওয়াকার এসে বেশ মাতিয়ে তোলেন, ছবিখানির উপভোগ্যতা বাড়িয়ে দেন অনেকখানি। নাজীর হোসেন, জীবন, মনমোহন কৃষ্ণ, ডেইজী ইরানী, রাধাকৃষন প্রভৃতিও বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে ফুটিয়েছেন ভালভাবেই। সব চরিত্রই কিন্তু একটু বেশী চেঁচিয়ে কথা বলে, যা কানে লাগে, তবে হয়তো বহির্দৃশ্যে তোলা শব্দ স্পষ্ট রাখতেই অমন করতে হয়েছে।

বিবিধ সংবাদ

রবিশংকর সম্বর্ধনা

আমেরিকা ও ইওরোপে ব্যাপকভাবে দীর্ঘ দশ মাসাধিককাল সেতারের মাধ্যমে অপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর পণ্ডিত রবিশংকর গত ১৭ই আগস্ট বম্বেতে এসে পৌঁচেছেন। বিদেশে তাঁর প্রতিটি অনুষ্ঠানই জনসাধারণ ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ দ্বারা অকুণ্ঠভাবে অভিনন্দিত হয়েছে। পাশ্চাত্যে এ পর্যন্ত আর কোন ভারতীয় সঙ্গীতবিদ এমন সমাদর লাভ করেছেন বলে জানা নেই। বম্বের জনসাধারণের পক্ষ থেকে এই কৃতি ভারতীয়কে বিরাটভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন হয়েছে। আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনি কলকাতায় এলে এখানকার নাগরিক-দের পক্ষ থেকেও তাকে সম্বর্ধনা জানানোর উদ্যোগ করা হয়েছে। সম্বর্ধনা পরিষদের আহ্বায়ক হচ্ছেন ডাঃ মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস, চেয়ারম্যান অর্ধেন্দুশেখর গঙ্গোপাধ্যায়, ভাইস চেয়ারম্যান অশোককুমার সরকার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থশংকর রায়, লালা শ্রীধর এবং পরিষদে অন্যান্যদের মধ্যে আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, ডাঃ পি কে সেন, ডাঃ নীহার মুন্সী, লীলা মজুমদার, সাগরময় ঘোষ প্রভৃতি। সম্বর্ধনা পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ১০১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭।

শিশু রঙমহলের নব-অভিযান

শিশু রঙমহল তাদের জনপ্রিয় নৃত্যনাট্য "অবন পটুয়া"কে অরোরা ফিল্মের সহ-যোগে পর্দায় রূপান্তরিত করায় সচেষ্ট হয়েছে। এই সম্পর্কে গত ১৮ই আগস্ট অরোরা স্টুডিওতে শিশু রঙমহলের ছোট-দের নিয়ে এক প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অরোরার পক্ষ থেকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ছোটদের, অভিভাবকদের এবং অন্যান্য অভ্যাগতদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, শিশু রঙমহলকে তিনি গোড়া থেকেই জানেন; সারা ভারতে আজ ছোটদের সেরা প্রতিষ্ঠান বলে সুখ্যাত। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনও "হাতে খড়ি", "দ্বিতীয় পাঠ", "খেলাঘর"

প্রভৃতি ছোটদের ছবি তুলে নাম করেছে, এই দুই প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় একটি অনবদ্য চিত্র হতে পারবে বলে শ্রী ভদ্র আশা প্রকাশ করেন। শিশু রঙমহলের সভাপতি এন এন ভোস অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রতিষ্ঠাতা অনাদিনাথ বসুর উদ্যোগের কথা স্মরণ করেন। শিশু রঙমহলের সম্পাদক সমর চট্টোপাধ্যায় বলেন, ভালবাসা ও নিষ্ঠার জোরে যেমন শিশু রঙমহল গড়ে উঠেছে তেমনি ছবিখানিও ভালবাসার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে। পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট এই প্রচেষ্টাতে সহযোগিতা করতে স্বীকৃত হওয়ায় শ্রী চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের প্রচার সচিবের পক্ষ থেকে বিজন সেন জানান যে, এই প্রচেষ্টাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য গভর্নমেণ্ট পূর্ণ সহযোগিতা দান করবেন।

শিল্পশ্রীর সাহায্যানুষ্ঠান

নাট্যানুষ্ঠান দ্বারা দুর্গতদের সাহায্যার্থে টাকা তুলে দেওয়ার কাজে শিল্পশ্রী অনুকরণীয় প্রচেষ্টা দেখিয়ে আসছেন গত বছর কতক ধরে। ১৯৫০ সাল থেকে এ পর্যন্ত রাজ্যপাল যক্ষ্মা সাহায্য তহবিল ও দার্জিলিঙয়ের দেশবন্ধু মেমোরিয়েল হাসপাতাল তহবিলে ৯৫৪৪৪ টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছেন। গত তিন বছর ধরে তারা যাদবপুর কে এস রায় যক্ষ্মা হাসপাতালে একটি ফ্রি বেডের জন্য ২৪০০ টাকা করে সংগ্রহ করে দিয়ে আসছেন। এবার এই উদ্দেশ্যে গত ২৫শে আগস্ট সকালে রঙমহলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় যাতে পৌরোহিত্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত হন মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা রায়। সভাপতি ও প্রধান অতিথি উভয়েই শিল্পশ্রীর মহৎ প্রচেষ্টার সুখ্যাতি করেন। নৃত্য, নাটক ও সংগীতের মাধ্যমে রস-নিবেদনের যে প্রচেষ্টা বাঙালী সমাজে চলে আসছে তার বিশ্লেষণ করে শ্রী চৌধুরী বলেন, শিল্পীরা বহু দুঃখকষ্ট বরণ করেন এবং বহু ত্যাগ স্বীকারও করেন। তারা আনন্দ দিয়ে নিজেরা আনন্দ পান, তা ছাড়া এমন কিছুই পান না। প্রধান অতিথি বলেন, দুর্গতদের সেবায় যাঁরাই এগিয়ে আসেন তাঁরাই বরণীয়। সাংস্কৃতিক সংস্থা শিল্পশ্রী শুধু রসিকচিত্তে আনন্দ পরিবেশনই করেন না, রোগ-পাংশু মুখেও হাসি ফোটাবার চেষ্টা করেন। শিল্পশ্রীর সভাপতি শৈলেন্দ্রনাথ দে সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান এবং মেয়রের হাতে সংগৃহীত ২৪০০ টাকার চেক অর্পণ করেন। শিল্পশ্রীর সম্পাদক নিতাইচাঁদ দে দুর্গত মানবের সেবায় তাদের সংস্থার কর্মপ্রচেষ্টা বিবৃত করে বলেন যে, তাদের এই সমাজসেবামূলক কাজে তারা ভারতের বরেণ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে সব সময়েই প্রেরণা লাভ করে এসেছেন। এ বছরও উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ কে এন কাটজু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ কেশকর প্রভৃতির কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক বাণী পেয়েছেন। অনুষ্ঠানে শিল্পী পরিষদ কর্তৃক "রাস-লীলা" নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হয়।

রচনা প্রতিযোগিতা

মাদ্রাজের এ ভি এম স্টুডিও তাদের আগামী ছবি "হম পঞ্ছি এক ডালকে" সূত্রে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে একটি রচনা প্রতিযোগিতার উদ্যোগ করেছেন। তাদের এই প্রতিযোগিতা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ আঠারটি রচনার জন্য মাসিক দশ টাকা হিসেবে একটি পাঠ্যবৎসর ব্যাপী বৃত্তি প্রদান করা হবে। এর মধ্যে ছটি বৃত্তি নির্ধারিত থাকবে কলকাতা ও হাওড়ার ছাত্রদের জন্য।

আগামী ৮, ১০ ও ১১ই সেপ্টেম্বর নিউ এম্পায়ারে গীতবিতান নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থে রবীন্দ্রনাথের "মায়ার খেলা" ও "কালমৃগয়া" নূতনভাবে মঞ্চস্থ করবেন। গীতবিতানের শিল্পিগোষ্ঠী কিছুকাল পূর্বে নৃত্যনাট্য দুটি পরিবেশন করে প্রশংসিত হন।

উত্তর কলকাতার সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় মিলনী তাদের তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায় রচিত "অনুলেখা" আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর রঙমহলে মঞ্চস্থ করবেন। অভিনয়ে থাকবেন বীরেশ্বর সেন, নবকুমার, গীতশ্রী, গীতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। পরিচালনা করবেন ক্ষিতীশ উপাধ্যায় এবং গীত রচনা ও সুরযোজনায় আছেন যথাক্রমে প্রণব রায় ও সুবোধ মল্লিক।

একলব্য

'ওভাল' মাঠে ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে আবার শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে এবং এ টেস্টেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলায় পাওয়া গেছে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয়। আগের চারটি টেস্ট খেলার মধ্যে দুটি খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হওয়ায় এবং দুটি খেলায় ইংলণ্ড জয়লাভ করায় ইংলণ্ডের 'রাবার' লাভের প্রশ্ন আগেই মীমাংসিত হয়ে গিয়েছিল, ফলে ওভাল-টেস্টের আকর্ষণও তেমন ছিল না। তবুও অনেকে আশা করেছিলেন ওভাল মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভাল খেললেও খেলতে পারে। অন্ততঃ একটি টেস্টে তাদের জয়লাভ করাও অসম্ভব নয়। কিন্তু ক্রিকেট খেলা মানসিক অবস্থার উপর বিশেষভাবেই নির্ভরশীল। দুটি টেস্ট খেলায় শোচনীয় পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'রাবার' হারিয়ে যাদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে গেছে, তাদের পক্ষে কি আর দৃঢ়তার সঙ্গে খেলা সম্ভব? বিশেষ উল্লেখযোগ্য, আগের চারটি টেস্ট খেলার যে দুটি খেলায় জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে, সে দুটি খেলাতেই ইংলণ্ড বিজয়ী হয়েছে ইনিংসে। ওভাল মাঠের পঞ্চম টেস্টেও ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ২৩৭ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। এ খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানরা যেমন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন আগের চারটি টেস্ট খেলায় তেমন ব্যর্থতার পরিচয় দেননি। ইংলণ্ডের ৪১২ রানের প্রত্যুত্তরে তাদের প্রথম ইনিংস মাত্র ৮৯ রানে শেষ হয়ে গেছে, 'ফলো অনের' পর দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়েছে আরও কম, অর্থাৎ ৮৬ রানে। ফলে পাঁচ দিনব্যাপী টেস্ট খেলা আড়াই দিনেই শেষ হয়ে গেছে। টেস্ট খেলার ইতিহাসে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এত কম রানে কোন দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস শেষ হয়নি। দুই ইনিংসেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪জন করে ব্যাটসম্যান কোন রান করবার আগে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেছেন। তা ছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক জন গডার্ড অসুস্থ হয়ে কোন ইনিংসে ব্যাটিং করতে না পারায় তার রানের ঘরও শূন্য ধরতে হবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের মধ্যে এক বারবাডোজের ব্যাটসম্যান গারফিল্ড সোবার্স দুই ইনিংসে কিছুটা দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে প্রথম ইনিংসে ৩৯ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৪২ রান করেছেন। সবচেয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন এক সময়ে উপর্যুপরি পাঁচটি টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরীর অধিকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তিন 'ডব্লিউ'র অন্যতম এভার্টন উইকস। এ টেস্টের দুই ইনিংসেই তাঁকে কোন রান না করে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে হয়েছে।
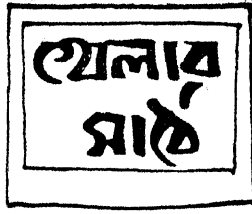
পঞ্চম টেস্টে ইংলণ্ডের কৃতিত্বপূর্ণ জয়লাভের মূলে গ্রেভনি, রিচার্ডসন, সেফার্ড এবং বেলীর প্রশংসনীয় ব্যাটিং আর স্পিন বোলার লক এবং লেকারের মারাত্মক বোলিংয়ের কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। গ্রেভনি এবং রিচার্ডসন দুইজনই এ টেস্টে সেঞ্চুরীর অধিকারী হয়েছেন। সারের কীর্তিমান স্পিন বোলার টনি লক লাভ

ইংলণ্ডের কীর্তিমান স্পিন বোলার টনি লক

করেছেন তার টেস্ট খেলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বোলিং 'এভারেজ'। লক প্রথম ইনিংসে ২৮ রানে ৫টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ২০ রানে ৬টি উইকেট লাভ করে দুই ইনিংসে ৪৮ রানে লাভ করেছেন ১১টি উইকেট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটসম্যানদের লককে অত্যন্ত সমীহ করে ব্যাট চালাতে দেখা যায় এবং এক সময় তিনি প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের ভীতসন্ত্রস্ত করে মাত্র ২ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন। এর মধ্যে পর পর লাভ করেন দুইটি উইকেট।

পঞ্চম টেস্ট খেলায় একদিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটসম্যানদের শোচনীয় ব্যর্থতা অপর দিকে ইংলণ্ডের স্পিন বোলারদের অভাবনীয় সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইংলণ্ডের ক্রিকেট মহলে কিছু কিছু আলোচনা শুরু না হয়েছে, এমন নয়। ইংলণ্ডের টেস্ট খেলার মাঠ তৈরী সম্বন্ধে কেউ কেউ কটাক্ষ করতেও কসুর করেননি। অবশ্য ১৯৫০ সালের তুলনায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এবারের দল যে অনেক শক্তিহীন এ বিষয়ে সকলেই এক মত। কিন্তু এবারের এই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকেও ইংলণ্ডের কোন কাউণ্টি দল এখন পর্যন্ত একটি খেলাতেও পরাজিত করতে পারেনি। টেস্ট খেলায় সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের এ ব্যর্থতারই বা কারণ কি? এ কথাটা অনেকেই বুঝে উঠতে পারছেন না। সাধারণ কাউণ্টি ম্যাচ আর টেস্ট ম্যাচে আকাশজমিন পার্থক্য। তা ছাড়া ইংলণ্ড দল এখন ক্রিকেট খেলায় গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে। এ কথা জেনেও অনেকে ওভাল মাঠের পিচ তৈরী সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন। স্যার জ্যাক হবসের মত ধুরন্ধর ক্রিকেট-বিশারদও বলেছেন, টেস্ট খেলার উপযোগী করে ওভাল মাঠ তৈরী করা হয়নি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক জন গডার্ড, যিনি এই খেলার সময়ই ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে শয্যা গ্রহণ করেছেন তিনিও ওভাল পিচ সম্বন্ধে কটাক্ষ করতে কসুর করেননি। বস্তুত প্রথম ওভার থেকেই বল 'স্পিন' খেতে আরম্ভ করেছে এবং মাঠের অবস্থা ক্রমেই

ব্যাটসম্যানদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় টসে জয়লাভ করে যারা প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পান, তাদের ভাগ্যবান বলতে হবে। এই দিক দিয়ে ইংলণ্ড নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। ইংলণ্ড অধিনায়ক পিটার মে তার টেস্ট খেলার অধিনায়ক জীবনে এই টেস্ট নিয়ে ১৪ বার টসে বিজয়ী হয়েছেন। প্রথম ব্যাটিং করবার সুযোগ পেয়ে ইংলণ্ডের প্রথম দিকের ব্যাটসম্যানরা ভালই খেলেছেন, কিন্তু ইংলণ্ডেরও শেষ দিকের ব্যাটসম্যানরা সুবিধা করতে পারেননি; আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটসম্যানরা তো একেবারেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৫০ সালের তুলনায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল যে এবার অনেক শক্তিহীন খেলার ফলাফল ছাড়া সংখ্যাতত্ত্বের দুই একটি হিসাবই তা প্রমাণ করবার পক্ষে যথেষ্ট। পাঁচটি টেস্ট খেলায় যেখানে ইংলণ্ড দল মোট ৫১ উইকেটে ২৫৬৭ রান সংগ্রহ করেছে, সেখানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সংগ্রহ করেছে ৯৭ উইকেটে ২১২২ রান। ইংলণ্ডের পক্ষে অধিনায়ক পিটার মে, কলিন কাউড্রে টম গ্রেভনি ও পিটার রিচার্ডসন দুইবার করে সেঞ্চুরী করেছেন। এর মধ্যে পিটার মের নট আউট থেকে ২৮৫ রান বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সেঞ্চুরী করেছেন কোলী স্মিথ দুবার আর ফ্রাংক ওরেল একবার। এ ছাড়া ইংলণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্টে এবার যে পার্টনারশিপের বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাও করেছেন প্রথম টেস্ট খেলার চতুর্থ উইকেটে ইংলণ্ডের দুই খেলোয়াড় পিটার মে ও কলিন কাউড্রে। একটি হ্যাট-ট্রিক লাভেরও অধিকারী হয়েছেন ইংলণ্ড খেলোয়াড় পিটার লোডার। অবশ্য প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খর্বাকৃতি স্পিন বোলার শোনী রামাধীনও বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন একটি ম্যাচে ৭৭৪টি বল করে। টেস্ট খেলার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোন বোলারই একটি ম্যাচে এত বেশী বল করেননি।

নীচে ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পঞ্চম টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড দেওয়া হল, আরও দেওয়া হল এই টেস্ট পর্যায়ের সেঞ্চুরী ও বিশ্ব রেকর্ডের খতিয়ান।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৪১২ (টম গ্রেভনি ১৬৪, পিটার রিচার্ডসন ১০৭, ডেভিড শেফার্ড ৪০, গডফ্রে ইভান্স ৪০; শোনী রামাধীন ১০৭ রানে ৪ উইঃ, কোলী স্মিথ ৭৩ রানে ২ উইঃ)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—৮৯ (গারফিল্ড সোবার্স ৩৯, নাইরন আসগর আলি ২৯; টনি লক ২৮ রানে ৫ উইঃ, জিম লেকার ৩৯ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—৮৬ (গারফিল্ড সোবার্স ৪২, ক্লাইড ওয়ালকট ১৯; টনি লক ২০ রানে ৬ উইঃ, জিম লেকার ৩৮ রানে ২ উইঃ)

[ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ২৩৭ রানে বিজয়ী।]

ইংলণ্ডের পক্ষে সেঞ্চুরী—পিটার মে—২৮৫ নট আউট (এজবাসটন মাঠে, প্রথম টেস্ট, দ্বিতীয় ইনিংস) ও ১০৪ (ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠে, তৃতীয় টেস্ট, প্রথম ইনিংস।)

কলিন কাউড্রে—১৫৪ (এজবাসটন মাঠে, প্রথম টেস্ট, দ্বিতীয় ইনিংস) ও ১৫২ লর্ডস মাঠে, দ্বিতীয় টেস্ট, প্রথম ইনিংস।)

টম গ্রেভনি—২৫৮ (ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠে, তৃতীয় টেস্ট, প্রথম ইনিংস) ও ১৬৪ (ওভাল মাঠে, পঞ্চম টেস্ট, প্রথম ইনিংস।)

পিটার রিচার্ডসন—১২৬ (ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠে, তৃতীয় টেস্ট, প্রথম ইনিংস) ও ১০৭ (ওভাল মাঠে, পঞ্চম টেস্ট, প্রথম ইনিংস।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সেঞ্চুরী—কোলী স্মিথ—১৬১ (এজবাসটন মাঠে, প্রথম টেস্ট, প্রথম ইনিংস) ও ১৬৮ (ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠে, তৃতীয় টেস্ট, দ্বিতীয় ইনিংস)

ফ্রাংক ওরেল—১৯১ (ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠে, তৃতীয় টেস্ট, প্রথম ইনিংস)

বিশ্ব রেকর্ড—এজবাসটন মাঠে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ডের পিটার মে ও কলিন কাউড্রের চতুর্থ উইকেটে ৪১১ রান। এই টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সোনী রামাধীনের ১২৯ ওভার বোলিং।

হ্যাটট্রিক—লীডস মাঠে চতুর্থ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসে সারের পেস বোলার পিটার লোডারের হ্যাটট্রিক লাভের কৃতিত্ব সমেত ৩৬ রানে ৬টি উইকেট লাভ।

সর্বোচ্চ ইনিংস—ট্রেণ্ট ব্রিজ মাঠে তৃতীয় টেস্ট খেলায় প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের ৬ উইকেটে ৬১৯ রান।

এজবাসটন মাঠে প্রথম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪৭৪ রান।

• • • •

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় মহিলা সাঁতারু গ্রেটা এণ্ডারসনের প্রথম স্থান লাভ গত সপ্তাহের খেলাধুলোর খবরের মধ্যে সবচেয়ে বড় খবর। মহিলা সাঁতারুর পক্ষে ইতিপূর্বে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা সম্ভব হলেও আজ পর্যন্ত কোন মহিলার পক্ষে প্রথম স্থান অধিকার করা সম্ভব হয়নি। ১৮৭৫ সালের ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব সর্বপ্রথম ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে খেলাধুলোর ইতিহাসের পাতায় যেমন অমর হয়ে আছেন—আমেরিকান তরুণী গ্রেট্রুড ইডার্লি মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে সাঁতারের পূজারীদের মধ্যে যেমন হয়েছেন স্মরণীয় ও বরণীয় তেমন আমেরিকান মহিলা গ্রেটা এণ্ডারসনও ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের দূরত্ব সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে অক্ষয় কীর্তির অধিকারিণী হয়েছেন। গ্রেটা এণ্ডারসন শুধু প্রথম স্থান অধিকার করেছেন বললেই সব কিছু বলা হয় না। পনরটি দেশের চব্বিশজন সাঁতারু এবার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে মাত্র একজন পুরুষ আর একজন মহিলা, ফ্রান্সের 'কেপ গ্রিজ নেজ' থেকে ইংলণ্ডের ডোভার উপকূলের গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছেন। মহিলা প্রতিযোগিনী হচ্ছেন বিজয়িনী গ্রেটা এণ্ডারসন আর পুরুষ প্রতিযোগী হচ্ছেন দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ইংলণ্ডের কেনেথ রে। এই দিক দিয়ে গ্রেটার সাফল্য আরও কৃতিত্বপূর্ণ। গ্রেটা অবশ্য ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে মেয়েদের যে রেকর্ড আছে, তা অতিক্রম করতে পারেননি। তবে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় এবং হাসি মুখে ইনি ডোভারে এসে পৌঁছেছেন এবং ডোভার থেকে উল্টো পথে ফ্রান্সে পৌঁছে রেকর্ড স্থাপনের অভিপ্রায় জানিয়েছেন। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে গ্রেটা এণ্ডারসনের সময় লেগেছে ১৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট আর দ্বিতীয় স্থানাধিকারী কেনেথ রে ১৬ ঘণ্টা ২৫ মিনিট। ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে মহিলা সাঁতারুর রেকর্ড আছে ১২ ঘণ্টা ৪২ মিনিট। গ্রেটা এণ্ডারসন এই রেকর্ড ভাঙবার আশা রাখেন।

ডেনমার্কের প্রাক্তন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন গ্রেটা এণ্ডারসনের বর্তমান বয়স ৩০ বছর। ইনি সম্প্রতি আমেরিকার এক শরীর শিক্ষাবিদের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন এবং ক্যালিফোর্নিয়ার লং বীচে বাস করছেন। ১৯৪৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকে গ্রেটা এণ্ডারসন ১০০ মিটার স্টাইলে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন এবং

প্রধানত গ্রেটার কৃতিত্বেই ডেনমার্ক ৪×১০০ মিটার রিলে রেসে লাভ করেছিল দ্বিতীয় স্থান। লণ্ডন অলিম্পিকে গ্রেটা ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলেও অংশ গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় ২০০ মিটার সাঁতার কাটবার পর গ্রেটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, তার আর ৪০০ মিটারে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যে তরুণী ৮ বছর আগে কুমারী জীবনে ৪০০ মিটার সাঁতার কাটতে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন সেই তরুণীই বিবাহিত জীবনে তরঙ্গ-সংকুল ইংলিশ চ্যানেলের বুকে প্রায় ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করতে বিশেষ পরিশ্রান্ত বোধ করেননি। গ্রেটার স্বামী সব সময়ই নৌকোয় গ্রেটার অনুসরণ করেছেন এবং নৌকো থেকে মাঝে মাঝে কমলা লেবুর রস খেতে দিয়ে বন্ধুর সন্তরণে সহধর্মিণীকে জুগিয়েছেন উৎসাহ ও প্রেরণা। ১৯৪৮ সালে অলিম্পিকের স্বর্ণ পদক পাবার কিছু দিন পরে গ্রেটা এণ্ডারসন সাঁতারে পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করেন। পেশাদার সাঁতারের প্রায় সব বিষয়েই তিনি রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সাঁতার প্রতিযোগিতায় গ্রেটার এই প্রথম অংশ গ্রহণ। গতবার সাঁতারের জন্য নাম দিয়েও তিনি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেননি।

ভারতের সাঁতারু মিহির সেন, যিনি এর আগে দুবার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হয়েছেন, এবার তার তৃতীয় প্রচেষ্টাও ফলবতী হয়নি। গ্রেটা এণ্ডারসন ১৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট সাঁতার কেটে প্রথম স্থান অধিকার করলেন আর মিহির সেন সাড়ে ১৪ ঘণ্টা জলে থেকেও সম্ভাব্য স্থানে পৌঁছতে পারলেন না। মিহির সেনের সত্যই মন্দভাগ্য। এক সময় মিহির সেন ডোভার উপকূল থেকে মাত্র ৭ মাইল পিছনে ছিলেন কিন্তু স্রোতের টানে তাকে আরও পিছিয়ে আসতে হয় এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে জল থেকে তুলে দেওয়া হয়। সাড়ে ১৪ ঘণ্টা সাঁতারে শ্রম কাতরতা অনুভব করেননি, ইংলিশ চ্যানেলের বরফগলা ঠাণ্ডা জলও তার ক্ষতি করতে পারেনি। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমে অকৃতকার্য হবার জন্য মিহির সেন তার অনভিজ্ঞ বোট চালকের প্রতি দোষারোপ করেছেন। বোটচালক তাঁকে ঠিক পথে চালিত করতে পারেননি। ঠিক পথে চালিত করলে মিহির সেনের পক্ষে চ্যানেল অতিক্রম করা মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না।

মিহির সেনের সংগে এবার আর একজন ভারতীয় সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের চেষ্টা করে ব্যর্থমনোরথ হয়েছেন। ইনি ভারতীয় নৌ-বাহিনীর কর্মী এবং চন্দননগরের একুশ বছর বয়স্ক সাঁতারু হিমাদ্রি রায়। দেড় ঘণ্টা সাঁতার কাটবার পর প্রচণ্ড [illegible] কাতর হয়ে হিমাদ্রি রায় জল থেকে উঠে পড়েন। কোন ভারতীয় সাঁতারুর পক্ষে আজ পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি; মিহির সেন এবং হিমাদ্রি রায় ছাড়া আর কেউ চেষ্টা করেন নি। চেষ্টা করলেও যে কেউ কৃতকার্য হতেন এমন কথা বলা যায় না। কারণ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা সত্যই এক দুরূহ কাজ।

ইংলিশ চ্যানেলের যেমন বরফ-গলা ঠাণ্ডা জল তেমন দুরন্ত স্রোত আর উত্তাল তরঙ্গ। তাছাড়া, অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল হচ্ছে ইংলিশ চ্যানেল। এর মধ্যে জেলী ফিসের অত্যাচারই বেশী। লবণাক্ত জলও সাঁতারুর পক্ষে কম ক্ষতিকারক নয়। ফ্রান্সের কেপ গ্রিজ নেজ থেকে ইংলণ্ডের ডোভার উপকূল পর্যন্ত আড়াআড়ি পথে চ্যানেল অতিক্রমের দূরত্ব একুশ বাইশ মাইলের মত। কিন্তু স্রোতের টানে আঁকাবাঁকা পথে চ্যানেল অতিক্রম করতে হ'লে প্রায় ৪০ মাইল সাঁতার কাটতে হয়। হিমশীতল জল আর তরঙ্গ-সঙ্কুল দুরন্ত স্রোতের মধ্যে ইংলিশ চ্যানেলের বুকে ৪০ মাইল সাঁতার কাটা প্রায় অসাধ্য সাধনেরই নামান্তর।

ইংলিশ চ্যানেলের ঠাণ্ডা জল সম্বন্ধে চ্যানেল সাঁতারের টেক্‌নিক্যাল অ্যাডভাইসার স্যাম রকেট বলেছেন—

"Whether you come from the arctic zone or torid zone the water of the channel will bite into your bones."

অর্থাৎ "তুমি শীতপ্রধান অঞ্চল থেকেই আস আর ট্রপিক্যাল দেশ থেকেই আস ইংলিশ চ্যানেলের হিমশীতল জল তোমার হাড় দংশন করবেই।"

সত্যই ইংলিশ চ্যানেলের জল হাড়কাঁপানো শীতল। এই জন্যই সাঁতারের আগে চ্যানেলের জল একটি পুলে ভর্তি করে সেই পুলে অনুশীলন করা হয়। তাছাড়া, ইংলিশ চ্যানেলে প্রবাহিত হয় দু'দিক থেকে দু'রকমের স্রোত। একটি স্রোত আসে উত্তর দিকের নর্থ পোল থেকে যাকে বলা হয় 'ল্যাব্রাডর কারেণ্ট', আর একটি স্রোত আসে দক্ষিণ দিকের গাল্‌ফ্‌ অব মেক্সিকো থেকে। একে বলা হয় গালফ্‌ স্ট্রীম। ল্যাব্রাডর কারেণ্ট একেবারেই হিমশীতল, কিন্তু গালফ্‌ স্ট্রীম ঈষদুষ্ণ। বিপরীত দিক থেকে ঈষদুষ্ণ ও হিমশীতল প্রস্রবণের জন্যই ইংলিশ চ্যানেল প্রায় সব সময় কুয়াশায় ঢাকা থাকে।

জেলী ফিসের অত্যাচারেও সাঁতারুদের খুবই বিব্রত হ'তে হয়। সাঁতারুর গায়ের 'গ্রীজের' লোভে জেলী ফিস প্রায় সব সময়ই হূলের মত গায়ে বিঁধতে থাকে। তাছাড়া, নোনা জলও কম ক্ষতি করে না। নোনা জল থেকে আত্মরক্ষার জন্য চোখে অবশ্য 'গগলস্‌' পরা থাকে, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে জলে থাকার ফলে 'গগলসের' আশপাশ দিয়ে নোনা জল চোখে ঢুকতে বাধ্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগও সাঁতারুদের আর এক মহাভাবনার কথা। কখন যে ঝড় উঠে চ্যানেলের বুকে প্রলয় কাণ্ডের সৃষ্টি করবে তার স্থিরতা নেই। এইসব প্রতিকূল অবস্থা উপেক্ষা ক'রে চ্যানেলের বুকে ৪০ মাইল সাঁতার কেটে পার হওয়া সত্যই অসাধ্য সাধন। জীবন মৃত্যুকে যারা পায়ের ভৃত্য জ্ঞান করেন, —দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, আর দুস্তর পারাবারকে মনে করেন তুচ্ছ, তাদের পক্ষেই ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের অভিযানে অংশ গ্রহণ সম্ভব।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ—সুশীল সেন

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 7th September, 1957

২৪ বর্ষ ॥ ৪৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ২১ ভাদ্র ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ও চাকুরী

সরকারী চাকুরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ আদৌ দরকার কিনা কিম্বা কতখানি দরকার—এই সমস্যা এদেশের শিক্ষিত সমাজকে কিছুকাল হইতে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। মার্কিন মুলুকে সরকারী অধিকাংশ চাকুরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের প্রয়োজন হয় না। বৃটেনে কিছু কড়াকড়ি থাকিলেও উক্ত ছাপ অপরিহার্য নয়—কেরানীর চাকুরির জন্য আদৌ আবশ্যক নয়। এখন তর্ক এই, এদেশের ক্ষেত্রে কি রকম হওয়া আবশ্যক?

এ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া মন্তব্য জানাইবার জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন—Public Services (Qualifications for Recruitment) Committee নামে। এই কমিটি সম্প্রতি স্বকীয় সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতে সরকারী চাকুরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ অত্যাবশ্যক নয়—অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা বর্তমান নিয়ম ঢিলা করিবার পক্ষে। এরূপ ক্ষেত্রে উমেদারের ভিড় বাড়িবে, কাজেই তাঁহারা চাকুরিতে প্রবেশার্থীর বয়স বাঁধিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আবার কমিটির সংখ্যালঘিষ্ঠ সদস্যগণ তন্মধ্যে অধ্যাপক ও উপাচার্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত ও জনাব হুমায়ুন কবির এম পি মহাশয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা টেকনিক্যাল জাতের চাকুরি ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ অনাবশ্যক মনে করেন। শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্ত শিক্ষাব্রতী ও উপাচার্য, জনাব কবিরও শিক্ষাব্রতী, দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের (এদেশের ও বিদেশের) উচ্চ ডিগ্রিধারী। এমন ক্ষেত্রে তাঁহাদের মতের বিশেষ মূল্য দিতে হইবে। তবে একটি বিষয়ে সকলেই একমত; বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের প্রয়োজন অবশ্য নাই, কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। আমরাও ইহা স্বীকার করি। যথোচিতভাবে পরীক্ষা ও যাচাই করিয়া চাকুরিতে গ্রহণ করিলে চাকুরিতে কাজকর্মের মানের অবনমনের আশঙ্কা দূর হইবে। আমরা আশা করি সরকার বিষয়টিকে নীতিরূপে অবিলম্বে স্বীকার করিয়া লইবেন। ইহা নীতিরূপে স্বীকৃত হইলে দুটি আশু লাভ হইবে। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ ডিগ্রিপ্রার্থীর ভিড় কমিবে। (২) ডিগ্রিবঞ্চিত প্রার্থিগণ চাকুরির সুযোগ পাইবেন। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে দুয়েরই স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ হইবে মনে হয়, এখন দুই-ই অস্বাভাবিক অবস্থায় রহিয়াছে অনায়াসে বলা যাইতে পারে।
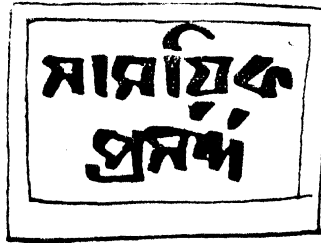
দেশ

শারদীয়া সংখ্যা

১৩৬৪

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় শারদীয়া দেশ পত্রিকা খ্যাতনামা লেখকদের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া বর্ধিত আকারে মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হইবে।

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ হইতেছে রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা 'মীরাবাঈ' ও বিমল মিত্রের সুবৃহৎ গল্প 'রিপু সংহার'। ইহা ব্যতীত অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী ও রামকিংকরের রঙীন ছবি ও বহু স্কেচ প্রকাশিত হইবে।

মূল্য—৩্, রেজিঃ—৩·৫৮ নঃ পঃ

রবীন্দ্র পুরস্কার : গ্রন্থ না গ্রন্থকার ?

কয়েক সপ্তাহ আগে রবীন্দ্র-পুরস্কার সম্বন্ধে আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম। সেই সময়েই বলিয়াছিলাম যে, প্রয়োজনকালে পুনরায় মন্তব্য করিব। আজ এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। বর্তমানে রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে বৎসরের 'শ্রেষ্ঠ' পুস্তককে। এখানে বৎসর অর্থে চলতি বৎসর ও ঠিক তৎপূর্ব বৎসর। প্রথম হইতেই, ব্যতিক্রমবাদে, এই নিয়ম অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। এখন একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, গ্রন্থ বরাবর পুরস্কার দান সুবিবেচনা নয়। কেন তাহা বলি। বাংলা দেশে এমন বিশিষ্ট লেখক অনেক আছেন, দীর্ঘ জীবনের সাহিত্য সাধনায় ও সার্থক সাহিত্য সৃষ্টিতে যাঁহারা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসরে কোন 'শ্রেষ্ঠ' গ্রন্থ তাঁহারা লিখিলেন না বা লিখিতে পারিলেন না। শুধু এই কারণেই তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টি সম্মানিত না হওয়া বিশেষ পরিতাপের বিষয়। তারপরে বাংলা দেশে এমন বিশিষ্ট সাহিত্যিক একাধিক আছেন, যাঁহাদের বয়স ষাট বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। ষাট বৎসর পার হইয়া 'শ্রেষ্ঠ' কিছু রচনা সব সময়ে সম্ভব নয়। শক্তির স্বাভাবিক অবক্ষয়ের ফলে না লেখাই সম্ভব; অথচ এক সময়ে তাঁহারা এমন সব গ্রন্থ রচনা

করিয়াছেন, যাহা অবশ্যই পুরস্কারযোগ্য। কেবল নিয়মের ফাঁকে তাঁহারা ফাঁকিতে পড়িবেন, এমন উচিত নয়। শেষ অবধি দাঁড়াইতেছে এই যে, তাঁহারা অবশ্যই 'শ্রেষ্ঠ' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্র-পুরস্কার সমিতি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রচনা করেন নাই। শুধু এই জন্যই? তামাদি দোষ আর যেক্ষেত্রে চলুক, সাহিত্য ক্ষেত্রে 'তামাদি দোষে বারিত' হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের উক্তির পক্ষে একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বাংলা দেশের একজন বিশিষ্ট প্রবীণ সাহিত্যিক, যিনি বাংলা সাহিত্যের শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য, পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হন দেখিয়া সমিতির সদস্যগণ তাঁহার 'তামাদি দোষ বারিত' অনেক শ্রেষ্ঠ পুস্তক বাদ দিয়া নির্দিষ্টকাল মধ্যে, প্রকাশিত একখানি 'শ্রেষ্ঠ' পুস্তক উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আরো উদ্ধার করা যাইতে পারে। আমাদের পরামর্শ এই যে, পূর্বোক্তরূপ অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে পুরস্কার দানের নিয়মাবলীকে কিছু উদারতর করা উচিত। পুরস্কারের লক্ষ্য কেবল গ্রন্থ না হইয়া গ্রন্থকারও হওয়া আবশ্যক। আমাদের মতে সমিতি ইচ্ছা করিলে যেমন কোন গ্রন্থকে সম্মানিত করিতে পারেন তেমনি প্রয়োজন বোধ করিলে কোন গ্রন্থকারকেও যাহাতে সম্মানিত করিতে পারেন, তাহার বিধান থাকা উচিত। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার দুই-ই পুরস্কারের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইলে এমন অবিচারের যে কারণ বর্তমান, তাহা দূর হইবে বলিয়াই মনে হয়। আমাদের বিশ্বাস, বিষয়টি সম্বন্ধে সমিতি সচেতন, নানা সূত্রে নিশ্চয় এসব কথা তাঁহাদের গোচরে আসিয়াছে। এখন এ বিষয়ে তাঁহারা শীঘ্র মনঃস্থির করিলে সন্তোষের কারণ হইবে।

বাঙালীর প্রাদেশিকতা—অপবাদ

এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের কথা স্বভাবতই আমাদের মনে হয়। প্রাদেশিকতাবুদ্ধি প্রণোদিত বলিয়া বাঙালীর একটা অখ্যাতি অনেকের মনে বদ্ধমূলে থাকিলেও, সুখের বিষয়, নিখিল ভারতের ঐক্যবোধ শ্রেষ্ঠ বাঙালীদের নিকট নূতন কথা নহে। বস্তুত, একথা বলিলেও বোধ হয় সত্যের অপলাপ হইবে না যে, এই বোধ দেশের মধ্যে যতটা জাগ্রত হইয়াছে তাহার মূলে প্রধানত আছে এমন বহু লোকের চেষ্টা যাঁহারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্তত দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহারা যে এই বোধ জাগাইবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন একথা তো ইতিহাসের বিষয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত (১৮৮৫) হইবার পূর্বেই কলিকাতায় যে জাতীয় বা হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা (১৮৬৭) হয়, যাহা অন্তত চৌদ্দ বৎসর চলিয়াছিল, তাহার সূত্রে যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি দেশের মধ্যে সংগীততরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহা নিখিল ভারতবর্ষেরই বন্দনা, ভারতবর্ষের যশোগান—তাহা আপন পল্লীগাথা নহে। ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতির উৎসাহে যে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতসভা স্থাপিত হইয়া দীর্ঘকাল দেশসেবকদের একটি প্রধান কর্মকেন্দ্র হইয়াছিল তাহার কেবল নামটিই লক্ষণীয় নয়, (ইহার কিছুকাল পূর্বে স্থাপিত অপর প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল ইণ্ডিয়ান লীগ) এবং ঐ নাম দৈবক্রমে প্রদত্ত হয় নাই, জানিতে সভার প্রস্তাবিত কর্মসূচী ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়াই এই নাম কল্পিত হইয়াছিল, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ সেকথা তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াও গিয়াছেন—একটি নিখিল ভারত প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের জনমতকে ঐক্যবদ্ধ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল—

"The idea that was working in our minds was that the Association was to be the Centre of an all-India movement. For even then, the conception of a United India ....of bringing all India upon the same common platform had taken firm possession in the minds of the Indian leaders in Bengal. We accordingly resolved to call the new political body the Indian Association.

এই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র উত্তর-ভারত পরিভ্রমণ করিয়া সর্বত্র বিশেষ সম্বর্ধনা লাভ ও উৎসাহের সৃষ্টি করেন। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী ছিল নিখিল ভারতের বিচিত্র সমস্যা লইয়া, বিশেষভাবে বাংলার কথা লইয়া নয়—যাঁহারা বিস্তারিত জানিতে চাহেন তাঁহারা শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস পড়িতে পারেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলা দেশ বিশেষ করিয়া নিজের সমস্যা লইয়া ভাবিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্যা হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখে নাই—নহিলে বাংলার বাহিরের অগ্রগামী দল তাহার সমর্থনে অগ্রসর হইয়া আসিতেন না। বিচ্ছিন্নতার বেদনায় সেদিন বিশেষ করিয়া বাংলার রূপ বাঙালী কবির লেখনীতে রূপ পাইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সেরূপ ভারতমাতার মূর্তিকে আবৃত করে নাই—অন্তত সে আন্দোলনের ভাবনায়ক শ্রীঅরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ভারত-দৃষ্টি কখনো আবিল হয় নাই। বাঙালী বিপ্লবীরাও সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষের মুক্তির চিন্তাতেই ব্যাকুল হইয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া নিজের প্রদেশের মঙ্গল চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হন নাই।

তাহার পর অসহযোগ আন্দোলনের যুগে ও তৎপরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন-যতীন্দ্রমোহন-সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বকালের সহিত বাঙালীর প্রাদেশিকতা-অপবাদ অনেকের মনে অস্পষ্টভাবে যুক্ত হইয়া আছে, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে, ইঁহারা বাংলা দেশকে ভালোবাসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের ভারত-বোধ আচ্ছন্ন হয় নাই—বাংলা দেশ বা বাংলা ভাষাকে তাঁহারা ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চল বা ভাষাকে অতিক্রম করিয়া বিশেষভাবে পুরোভাগে স্থাপিত করিবার কোনো চেষ্টা করেন নাই, ভারতের প্রধান নায়কের সঙ্গে তাঁহাদের মতপার্থক্য ঘটিয়াছিল, তাঁহারা দেশকে—সমগ্র ভারতবর্ষকে—স্বমতে লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই পর্যন্ত। সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ ফৌজের কীর্তি সম্বন্ধে যত মতভেদই থাকুক না কেন এ সম্বন্ধে মতান্তর নাই যে, তাহাতে সমগ্র ভারতের সকল জাতির সম্মিলন ঘটিয়াছিল, প্রাদেশিকতা বুদ্ধি বা হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তাহাতে সমস্যার সৃষ্টি করে নাই। তারপর স্বাধীনতার প্রাক্কালে যখন 'সভারেন বেঙ্গল'এর প্রস্তাব উঠিয়াছিল বাংলা দেশ তাহাও স্বীকার করে নাই—অপরপক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য বঙ্গ বিচ্ছেদে সায় দিয়াছিল।

এ বিষয়ে এত বিস্তারিত লিখিবার কারণ এই যে, বাঙালীরা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাবোধ দ্বারা পরিচালিত একথাটা আজিকার দিনে যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। হয়ত ইহার বিপরীতটাই সত্য—আধুনিক কালে "ভারত-আবিষ্কারে" বাঙালী কবি মনীষী রাষ্ট্রনায়ক ঐতিহাসিকদের দান কত গভীর আশা করি কেহ তাহার বিস্তৃত পর্যালোচনা করিয়া দেখাইবেন।

আমরা এখানে বাঙালী সমাজের শ্রেষ্ঠ অংশের কথা স্মরণ করিয়াই আমাদের বক্তব্য লিখিয়াছি। এই আশা আমাদের মনে আছে যে বর্তমানের দুঃখদুর্দশা যতই উৎকট হোক, উত্তেজনার যতই কারণ ঘটুক, শ্রেষ্ঠ বাঙালীদের এই ভারত-সাধনাই সমগ্র বাঙালী সমাজে ব্যাপ্ত ও স্থায়ী হইবে।

[পনর]

মেঘে ভরাট আকাশ আর বিজলী হানে না; শুধু গরগর করে। আর গুঁড়ো বৃষ্টির ঝরানি অচমকা ঝাপটায় এলোমেলো করে দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে বেড়ায়। জমাট অন্ধকার একটুও কাঁপে না। আকাশ বাতাস আর মাটি একসঙ্গে তাল পাকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছে। পথের কাদা যেন পচা-পচা কালো মাংস; পথের জল ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা কালো রক্ত।

পথ চলতে চলতে দাশুর কানের পাশেই ফিসফিস করে হাসে ভাইসাল—অঃ, বড় মিঠা রাত সরদার!

দাশু বলে—একটুকে জিরাতে হয় ভাইসাল।

—জিরাবে? আশ্চর্য হয় ভাইসাল।

—হাঁ ভাইসাল।

—পিয়াস ধরেছে?

—হাঁ ভাইসাল। একটা গাছের তলায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দাশু আরও হাঁপাতে থাকে।

দাশুর হাতের কাছে হাঁড়িটাকে এগিয়ে দিয়ে হেসে ফেলে ভাইসাল—লাও সরদার, দম তক্ পিয়াস মিটাই লাও।

এক চুমুকে হাঁড়ির প্রায় অর্ধেক খালি করে দিয়ে আবার হাঁপ ছাড়ে আর হেসে ওঠে দাশু—বাঃ, বড় ভাল মাল ভাইসাল। আবগারী জল বটে কি?

ভাইসাল—আবগারী জলে কি এত তেজ আর ফুরতি থাকে রে ভাই? ইটা চোলাই বটে; আধা মেওয়া আর আধা মহুয়া।

দাশু—মজাদার বাস পেলাম যেন।

ভাইসাল—হাঁ রে ভাই; মৌরির রস দিয়ে মজালে মালের বাস এমনটি মিঠা হয়ে থাকে।

দাশু—কুথাথে পেইলে?

ভাইসাল হাসে—জামুনগড়ায় আমার একটা ভক্ত আছে; সে বেটা দিল।

আর বুকে হাঁপ ধরে না দাশুর। আর এক মুহূর্তও জিরিয়ে নেবার দরকার হয় না। ভাইসালের নিঃশ্বাসের শব্দের সঙ্গে নিজেরও বুকের উতলা বাতাসের শব্দ মিশিয়ে দিয়ে প্রায় ছুটে ছুটে চলতে থাকে।

সড়ক ছেড়ে দিয়ে বাঁ দিকের ডাঙার উঁচুপুর নামে ভাইসাল। এইবার ভাইসাল একটা হাঁপ ছাড়ে আর হাঁড়িটাকে মুখের কাছে তুলে নিয়ে চুমুক দেয়। তার পরেই হেসে ওঠে।—একটা কথা শুধাই সরদার?

দাশু—কি কথা?

ভাইসাল—সরদারিন তুমাকে এত ভাটে কেনে?

দাশু—কে বললে?

ভাইসাল হাসে—দরজায় কান পেতে সব শুনেছি সরদার।

দাশু—তবে আর শুধাও কেনে?

ভাইসাল—কালি খাও নাই?

দাশু—দুই দিন।

—সরদারিনও খায় নাই

—না।

—সরদারিনের পেটে ছেইলা আছে?

—হাঁ।

—ছি ছি, তু বড় বেশি দুখী আছিস সরদার।

উত্তর না দিয়ে চুপ করে শুধু শুনতে থাকে দাশু। তার পরেই ব্যস্ত হয়ে বলে—চল ভাইসাল।

ভাইসাল যেন দাশুর এই যন্ত্রণাক্ত ব্যস্ততার তাড়া তুচ্ছ করে আর আনমনা হয়ে একটা স্বপ্নালু আরামের আবেশে গা ঢেলে দিয়ে ডাংগার ঘাসের উপর বসে পড়ে। বেশ কিছু সময় নিঝুম হয়ে বসে থাকে; তারপরেই হাঁড়িতে চুমুক দিয়ে ঢোঁকুর তোলে।

—তুমার ঘরটি বড় ভাল ঘর সরদার। ফিসফিস করে ভাইসাল। দাশুও চুপ করে বসে দু' চোখের মিঠা-মিঠা নেশার জ্বালা নিয়ে ডাংগার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—তুমার ঘরণীও বড় ভাল। আঁখ দুটো বড় মিঠা। তুমার ঘরণী কার বিটি বটে সরদার?

—ঝালদার মহেশ রাখালের বিটি?

আবার যেন নিঝুম হয়ে যায় ভাইসাল। আবার মুখে হাঁড়ি ঠেকিয়ে আর এক চুমুক মাদকতার আরাম টেনে বুক ভরে নেয়। তারপরেই বিড় বিড় করে। —তুমার ছেইলাটাও বড় সুন্দর ছেইলা হবেক সরদার।

দাশু বলে—আর কত জিরাবে ভাইসাল?

ভাইসাল তবু যেন অনমনার মত বিড়-বিড় করে একটা নেশালস [illegible] সংগে বিড়বিড় করে কথা বলতে থাকে। —আঃ, বড় ভাল হবেক সরদার। তুমার ঘরে সুখ হবেক। নিজের মাগ, নিজের ছেইলা, নিজের ঘর, নিজের জমি! তুমি বড় চালাক বটে সরদার।

বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু—ওঠ ভাইসাল।

—কেনে?

—আমাকে টাকা পাওনাটা দিবে না?

হেসে ফেলে ভাইসাল—হাঁথির দাঁতও [illegible] সরদার, কিন্তুক গুপী লোহারের [illegible] না।

[illegible] উঠে দাঁড়ায় গুপী লোহার। [illegible] ভিতর থেকে দুটো হেঁসো [illegible] করে।

—এই লাও, ধর সরদার।

দাশুর হাতের কাছে একটা হেঁসো এগিয়ে দেয় গুপী লোহার। আর দাশুও অদ্ভুত এক জ্বালাময় ভাবের নেশায় যেন [illegible] হয়ে গুপী লোহারের সেই হিংস্র ও [illegible] হাতিয়ার শক্ত করে আঁকড়ে ধরে।

—চল। হাঁক দেয় গুপী লোহার। গুপী লোহারের সংগে প্রায় ছুটে ছুটে হাঁটতে থাকে দাশু।

এক ক্রোশ শেষ হবার আগেই ডাংগা শেষ হয়। মাটির উপর পা ঘসে আর একটু আশ্চর্য হয়ে দাশু বলে—ইটা কেমন ডহর বটে ভাইসাল?

—ইটা রেল লাইন। চল!

আবার চলতে থাকে গুপী লোহার। পিছু পিছু দাশু। জংগল ভেদ করে কে জানে কোন দিকে চলে গিয়েছে নতুন রেল লাইন। এদিক ওদিক তাকিয়ে, আকাশের অন্ধকারের দিকে চোখ রাখিয়ে বুঝতে পারে দাশু, বড়কালুর শরং[illegible] জংগল আর পাথরের চটান খুব কাছেই রয়েছে। বড়কালুর গা বেয়ে ঝরে পড়ছে [illegible]

[illegible]

দু'পাশে [illegible] শালবন, মাঝখান দিয়ে

নতুন রেল লাইন। সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যায় যখন গাড়ি গড়িয়ে যায়, তখন এই লাইনটাই বোধ হয় গুর্ গুর্ করে বাজে, যে শব্দ মধুকুপির মাটির উপর দাঁড়িয়েও শোনা যায়।

চলতে চলতে আবার আশ্চর্য হয় দাশু। একটু দূরে, এই সরকারী শালবনের মাথার উপর যেন একটা আভা থমকে রয়েছে। বৃষ্টিতে ভেজা জঙ্গলটাও কি আগুনে পুড়ছে?

তারপর আর বেশিক্ষণ নয়, এবং আর খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতেও হয়নি, দাশু যেন একটা নতুন জাদুর বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে ভয় পেয়ে গুপী লোহারের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে, আর থমকে দাঁড়ায়। —কুথাকে এলাম ভাইসাব?

গুপী লোহার বলে—চুপ কর।

বড় বড় খুঁটির উপরে বড় বড় আলো। সারি সারি টিনের শেড। থাকে থাকে সাজানো বড় বড় কাঠের স্তূপ। এখানে ইঁটের আর ওখানে কাট পাথরের এক একটা পাহাড়, খুঁটির মত এক একটা বলদাটি এখানে ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। নানা রকমের কাঠের আর লোহার বড় বড় টুকরো ছড়িয়ে পড়ে আছে। ত্রিপলের ঢাকা দিয়ে এক একটা স্তূপ এখানে-ওখানে যেন পাহাড় বাঁটির মত বাঁচিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে।

আস্তে আস্তে, শালের ছায়ার আড়াল দিয়ে পা টিপে টিপে হাঁটতে থাকে গুপী লোহার। পা টেনে টেনে চলতে থাকে দাশু। লাইনের পাশে একটা খাদের অন্ধকারের মধ্যে নামে গুপী লোহার, পিছু পিছু দাশু। উঁকি দিয়ে শুধু চোখ দুটোকে ভাসিয়ে দিয়ে দূরের একটা টিনের এক-চালার দিকে তাকিয়ে থাকে গুপী লোহার।

—কি দেখছ ভাইসাব?

গুপী লোহার বলে—আছে।

—কে?

—ঐই যে লাল কম্বল।

দেখতে পায় দাশু, টিনের একচালার ভিতরে শান-বাঁধানো মেজের উপর ছড়িয়ে রয়েছে হাজার হাজার কাঠের বাক্স; কে জানে কোন্ মাল বোঝাই করা আছে বাক্স-গুলির ভিতর? আর সেই সব বাক্সের সারির ফাঁকে ফাঁকে শুয়ে আছে মানুষ; একটা দুটো নয়, অনেক। হাত-পা গুটিয়ে ছোট ছোট মড়ার মত অসাড় হয়ে পড়ে আছে ঘুমন্ত মানুষগুলি; কুলি-মজুর বলে মনে হয়। হ্যাঁ, লাল কম্বলে ঢাকা হয়ে একটা মানুষও ঘুমিয়ে পড়ে আছে।

দাশু—লাল কম্বলটা কে বটে ভাইসাব?

গুপী—ঠিকাদার। কুলীদিগে কাল সকালে হপ্তা দিবে শালা। শালার মাথার কাছে টাকার থলি আছে।

—ভাইসাব! ডাকতে গিয়ে কেঁপে ওঠে দাশুর গলার স্বর।

—কি বটে? রুক্ষ স্বরে ফিসফিস করে গুপী লোহার।

—টাকা চাই না ভাইসাব? ফুঁপিয়ে ওঠে দাশু।

—কি? গলার স্বর চেপে আস্তে একটা ধমক হানে গুপী লোহার।

ধপ করে বসে পড়ে দাশু। গুপী লোহারের পায়ে হাত রেখে আর গলার স্বরে ঠকঠকিয়ে অসহায়ের মত যেন আবেদন করে দাশু—টাকা চাই না ভাইসাব।

দাশুর মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে স্নেহার্দ্র স্বরে সান্ত্বনা দেয় গুপী লোহার।
—কেনে মিছা গোলমাল করছো সরদার?

—মাপ কর ভাইসাল।

—আমি নিজেকেই মাপ করি না, তুমাকে মাপ করবো কেমন করে সরদার? উঠ, যাও, চুপচাপ আগাই যাও; আস্তে কম্বলটা ঠেলে দিবে, মুখটাকে চেপে ধরবে, আর হাঁসুয়া দিয়ে টুঁটির উপর একটা টান দিবে......।

—না ভাইসাল।

দাশুর মাথায় হাত বুলিয়ে গুপী লোহার বলে—হাঁ সরদার; উয়ার মাথার কাছে হাত চালালেই টাকার থলিটা পেইয়ে যাবে। এতো বড় থলি সরদার! কোন চিন্তা নাই সরদার।

—আমাকে আর ইসব কথা বলো না ভাইসাল।

—কেউ জেইগে নাই সরদার। কেউ দেখতে পাবে নাই সরদার। সব শালা চৌকিদারের বাচ্চা ঘুমে বেহুঁশ হয়ে আছে।

—আমি ঘর ফিরে যাই ভাইসাল।

—আমি তোমার পিছু খাড়া থাকবো সরদার। কোন শালা তুমার পাশে এইসেছে কি আমি উয়ার খবর লিয়ে ছেড়েছি।

—না ভাইসাল।

—কেন?

—মানুষ মারতে বলো না ভাইসাল। এমন কাজ কিষাণের কাজ লয়।

—মানুষ? মানুষ মারতে বলছে কে তুমাকে? উটা যে ঠিকাদার বটে!

—উয়ার জানটা তো মানুষের জান বটে?

—সাপের জান বটে। সাপ সাপ! সাপের যেমন বিষ থাকে, উয়ার তেমন টাকা আছে।

দাশু করুণভাবে হাসে—তবে আর বিষ ছিনাতে বলছো কেনে ভাইসাল?

গুপী লোহারও হাসে—উয়ার বিষ বটে, কিন্তুক তুমার যে ওষুধ বটে গো সরদার। বিষ ছিনে লিয়েই ওষুধ করতে হয়। দেখ নাই, ওঝারা কি করে?

দাশু উঠে দাঁড়ায়।—না ভাইসাল।

দাশুর মাথার চুল যেন একটা থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরে গুপী লোহার। হাতের হোঁৎকা ঝাঁকানো মুখটাকে দাশুর বুকের উপর চেপে ধরে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসের ঝাঁজ দাশুর মুখের উপর ছড়িয়ে দিয়ে গুপী লোহার বলে—চুপ করে দাঁড়াই থাক এখানে। তুমি না পার, আমি টাকা আনছি।

—না, আমি টাকা লিব না ভাইসাল।

—লিতে হবে। লিতে হবে। তু শালা ভুখ মরে জেইলাকে মারবি কেন রে; তু ভুখা থেকে মরু বৌকে মরাবি কেন রে?

গুপী লোহারের গলার স্বর কাঁপতে কাঁপতে ফাঁপিয়ে ওঠে। আর গুপী লোহারের একটা সাপের আক্রোশ হঠাৎ গড়ে গিয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। উন্মাদের মত হাত-পা ছুঁড়ে দাশুর পিঠে বুকে ও পেটের উপর ঘুঁষি, চড় আর লাথি ছাড়তে থাকে গুপী। ঘাসের ভেজা মাটির উপর গড়িয়ে পড়ে যায় দাশু।

গুঁড়ো বৃষ্টি নয়, বেশ জোরে শব্দ করে আর ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে বৃষ্টি। হাঁপাতে থাকে গুপী লোহার।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় দাশু। পাথরের পাটার মত বুক, শক্ত আর দুরন্ত পেশী দিয়ে তৈরী সেই দাশু, সেই লড়াকে কিষাণের মূর্তি। এগিয়ে এসে দু' হাত দিয়ে গুপী লোহারের হাত দুটোকে যেন অদ্ভুত এক আদরের আবেগে কাছে টেনে নিয়ে দাশু বলে—তুমার হাতে মার খেইতে আমার লাজ নাই ভাইসাল। তুমাকে দুখ দিলাম, তুমি মারবে না কেনে? দশবার মারলে।

গুপী লোহারের দু' চোখে বোধ হয় আর একটা দিকে বিস্ময় করুণ হয়ে ছলছল করে। দাশুর মুখের কাছে চোখ নিয়ে দেখতে থাকে গুপী লোহার। তার পরেই হাতের হোঁৎকার উপর ফুঁ দিয়ে হোঁৎকাটাকে শক্ত করে চেপে ধরে দোলাতে দোলাতে ছটফট করে গুপী লোহার।—কিন্তুক টাকা

তুমাকে লিতেই হবেক সরদার। টাকা দিয়ে ছাড়বো আমি।

—দয়া কর ভ'ইসাল ভাই।

—না সরদার। তুমি থাক, আমি এখনই আসছি।

ছুটে চলে যায় গুপী লোহার। গুপী লোহারের ছুটন্ত ছায়ার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ বন্ধ করে দাশু। এবং চোখ মেলতেই দেখতে পায়, টিনের একচালার মেজের উপর সেই লাল কম্বলের কাছে পৌঁছে গিয়েছে গুপী লোহার।

কেঁপে ওঠে দাশু কিষাণের হৃৎপিণ্ড। খাতের ভিতর থেকে একটা লাফ দিয়ে বের হয়ে শালবনের অন্ধকারের দিকে তাকায়। ছটফট করে পা দুটো। যেন রক্তে পিছল একটা অভিশাপের মায়াময় আলিঙ্গন থেকে ছুটে পালিয়ে যাবার জন্য দাশু কিষাণের অন্তরাত্মা শিউরে শিউরে ছটফট করতে থাকে। এই জল, এই কাদা, আর বৃষ্টির এই ঝরানি, যেন একটা গলাকাটা যন্ত্রণার রক্তে লাল হয়ে দাশুর চেতনাকে গুলে ফেলছে। হাঁটু দুটো টলমল করে। টান হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে টলতে থাকে দাশু।

চমকে ওঠে দাশু। একটা ছায়া ছুটে এসে দাশুর পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে কাশে। —চল সরদার।

—কি করলে ভ'ইসাল? কাঁপতে কাঁপতে যেন কান্না চেপে প্রশ্ন করে দাশু।

টাকার থলিটাকে দাশুর পিঠের উপর আছাড় মেরে একবার বাজিয়ে দিয়ে গুপী লোহার আবার কাশে। গুপী লোহারের গলায় যেন রক্তমাখা একটা একটা হাসির শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে। —সাপের বিষ ছিনে নিয়ে এলাম।

দাশু—সাপটার কি করলে ভ'ইসাল?

গুপী লোহার—বাপের বাড়ি রওনা করাই দিয়েছি।

—কি বলছো ভ'ইসাল? দাশু ঘরামির নেশার হৃৎপিণ্ড যেন আস্তে আর্তনাদ করে ওঠে।

হেসে ফেলে গুপী লোহার। —একদিন তুমিও যাবে আর আমিও যাব সরদার। চিন্তা কর কেনে?

রক্তমাখা হেঁসোটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাশুর পিঠে একটা ধাক্কা দেয় গুপী লোহার। —চল।

আর নতুন রেল লাইন ধরে নয়; শালবনের ভিড়ের ভিতর দিয়ে, সরু সরু খাত ধরে, জলকাদা মাড়িয়ে আর বৃষ্টির অঝোর ধারায় যেন একটা ছুটন্ত স্নানের ভয়ানক পুণ্যে গা ভিজিয়ে হনহন করে হেঁটে যেতে থাকে গুপী লোহার আর দাশু।

গুপী বলে—রাত আর বেশি নাই সরদার।

কথা বলে না দাশু। গুপী লোহারই বলে—ডহর ভুল করো না সরদার।

না, ডহর ভুল করে না দাশু। হরতকীর জঙ্গলটা যখন ধরতে পারা গিয়েছে, তখন সেই শুকনো ডাঙার কিনারায় গিয়ে

পৌঁছতে কোন ভুল হবে না, আর পৌঁছতে কতক্ষণই বা লাগবে?

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় গুপী লোহার। —তুমার হিস্যা তুমি এখনই লিয়ে লাও সরদার।

সেই মুহূর্তে যেন এক ঝলক ঠাণ্ডা আগুনের আভা গুপী লোহার আর দাশুর মুখের উপর এসে আছড়ে পড়ে। চোখ ধাঁধানো কটকটে আভা। ক্ষণিকের মত অন্ধ হয়ে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গুপী লোহার আর দাশু।

পরমুহূর্তে দাশুর কানের কাছে যেন ছোট্ট একটা চিৎকার আছড়ে দিয়ে ছটফট করে ওঠে গুপী লোহার। —পলাই যাও সরদার। জলদি পলাও।

রাতের অন্ধকার আর বৃষ্টির ঝমঝম শব্দের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে একটা বন্দুকের শব্দ। গুলিটা ছুটে এসে ঠিক দাশুর পায়ের কাছের মাটিতে বিঁধেছে। কেঁপে উঠেছে মাটি।

চোখ মেলতে চেষ্টা করে দাশু, কিন্তু পারে না। সেই চোখ-ধাঁধানো আলোটা যেন দাশুর চোখের উপর কামড় দিয়ে ঝুলে রয়েছে।

—ভঁইসাল। চিৎবিড় করে ডাকে দাশু। কিন্তু কোন সাড়া শুনতে পায় না দাশু।

গাছের গায়ে হেলান দিয়ে মরা গাছের মত পড়ে থাকে দাশু। আর, সেই বুনো অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা বন্দুকের নল আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ঠিক দাশু ঘরামির বুকের কাছে থামে।

—সরদার! দাশু সরদার! বন্দুকের নলের মুখটাই যেন চমকে উঠে, আশ্চর্য হয়ে, আর দুলতে দুলতে চেঁচিয়ে ওঠে।

চোখ মেলে তাকাতে চেষ্টা করে দাশু, আর পলুস হালদারও তার হাতের টর্চ কাত করে দাশুর চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

যেন একটা হিংস্র জয়ের উল্লাসে হো হো করে হেসে ওঠে পলুস হালদার। —তুমাকে দাগী বলেছিলাম বলে সরদারিন বড় রাগ করেছিল সরদার।

টর্চ ঘুরিয়ে দাশুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত আর একবার যেন তল্লাস করে নিয়ে পলুস হালদার প্রশ্ন করে। —সাথীটা পালাইছে বটি?

দাশু মাথা নাড়ে। পলুস বলে—সাথীটো কে বটে? গুপী লোহার?

দাশু—হাঁ।

পলুস—খুন করেছ?

দাশু—আমি করি নাই।

পলুস—গুপী লোহার?

দাশু—সে তো বলছেক, হাঁ করেছে।

পলুস—কত টাকা পেইলো?

দাশু—পাই নাই।

পলুস—সব গুপী লোহারই নিয়ে ভেগেছে?

দাশু—হ্যাঁ, কিন্তুক আমাকেও হিস্যা দিবে বলেছিল।

—তুমি হিস্যা চেয়েছিলে?

—না।

দাঁতে দাঁত ঘষে হাসতে থাকে পলুস হালদার। —মধুকুপির দাশু সরদার বড় সাচ্চা, বড় ভালমানুষ বটে। হিস্যা নেয় না, কিন্তুক ডাকাতি করে। কি বল সরদার? ঠিক বলি নাই?

উত্তর দেয় না দাশু। পলুস হালদার বন্দুকটাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে, একটু দূরে গাছের মাথার উপর টর্চের আলো ফেলে মাচানটার দিকে একবার তাকায়, তার পরেই আক্ষেপ করে। —নাঃ, বড় ঠকে গেলাম সরদার। তুমার লাস নিয়ে থানায় জমা দিলে পাঁচটা টাকাও পাওয়া যাবে না।......যাও, ঘরে যাও।

তবুও তেমনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। পলুস হালদার ধমক দিয়ে বলে—যাও, আর সরদারিনকে বলবে, পলুস হালদার চোর নয়।

—কি বলছেন আপনি? দাশু ঘরামির অসাড় চোখ দুটো যেন হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠেছে।

পলুস ভ্রূকুটি করে—চোখ বড় করে তাকাও কেনে সরদার? তুমাকে মায়া করে ছেড়ে দিলাম।

দাশু—কেনে মায়া করলেন?

পলুস বলে—তুমার সরদারিনকে মায়া করি, তাই।

(ক্রমশঃ)

ত্রিদিব চৌধুরী

॥ ১১ ॥

সালাজারের পিটনি পুলিস

পথের কথা এখন সংক্ষেপ করিয়া আনা ভালো; কারণ পথও আমাদের প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এবার মার খাওয়ার পালা আরম্ভ হইবে। পথে আরো তিন-চারটি গ্রাম পড়া সত্ত্বেও আমরা আর কোনো গ্রামের ভিতর ঢুকি নাই। প্রথম গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাইল খানেক আগাইয়া যাওয়ার পর দেখিতে পাইলাম একজন কোঙ্কনী হিন্দু যুবক রাস্তার বিপরীত দিক হইতে হন্ হন্ করিয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। বৃষ্টির দিন বলিয়া মাথা ও ঘাড়ের উপর দিয়া আড়াআড়ি দু' পাশের সেলাই কাটা একটা মোটা চটের বস্তা ওয়াটারপ্রুফের মতো করিয়া ফেলিয়া নিয়াছে। সেই চটের একটা কোণা চূড়ার মতো তাহার মাথার উপরে খাড়া হইয়া আছে, আর তাহার নীচে চটের ঘোমটার ভিতর হইতে তাহার মুখ দেখা যাইতেছে। পরনে একটি খাকী হাফ্ প্যাণ্ট আর আধ-ছেঁড়া, আধ-ময়লা গোছের একটি সাদা শার্ট, পায়ে একটা মোটা চামড়ার দেশী সেলাই চপ্পল। বেশ জোর পায়ে সে আগাইয়া আসিতেছিল; সম্মুখে হিন্দুস্থানের তি-রঙা ঝাণ্ডা কাঁধে করিয়া এত-গুলি লোককে মিছিল করিয়া আসিতে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আমরা প্রায় লোকালয়ে আসিয়া পড়িয়াছি এই ধারণায় ছেলেরা মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া শ্লোগান হাঁকিতেছিল—"ভারত গোয়া অলগ্ নহী!"......ইত্যাদি। সেই আওয়াজও হয়ত তাহার থমকিয়া দাঁড়ানর একটি কারণ। যাই হোক, আমরা ক্রমে তাহার কাছাকাছি আসিতে সে কোঙ্কনী ও হিন্দীতে মিশাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা কি বেলগাঁও হইতে আসিতেছেন? আপনারা কি হিন্দুস্থানের সত্যাগ্রহী?" তাহার কথা শুনিয়া আমাদের সেই গাইড দুজন এবং পুড়েগাঁওকার সম্মুখের দিকে আগাইয়া আসিয়া উত্তর দিল—"হ্যাঁ! কিন্তু তুমি কে? তোমার বাড়ি কোথায়? আমরা গোয়া কংগ্রেসের লোক। সত্যাগ্রহ করার জন্য বেলগাঁও হইতে আসিয়াছি, ওয়াল্পইয়ের দিকে যাইতে চাই। এখান হইতে ওয়াল্পই কত দূরে? আমাদের ওয়াল্পই যাওয়ার সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিতে পারে?" ইহার উত্তরে সে যাহা বলিল তাহাতে বুঝিলাম ওয়ালপই পর্যন্ত হয়ত আর আমাদের কষ্ট করিয়া যাইতে হইবে না। তাহার বহু আগেই ডাঃ সালাজারের পিটুনী পুলিস এবং মিলিটারী আমাদের অভ্যর্থনার জন্য পথ আগলাইয়া বসিয়া আছে। শুধু তাই নয়, আমরা হয়ত এই দিক দিয়া গোয়ার ভিতরে আসিয়া পড়িতে পারি সেই আশঙ্কায় এ অঞ্চলে পুলিস ও গোয়েন্দাদের আনাগোনা শুরু হইয়া গিয়াছে। কাজে-কাজেই এখন সম্মুখের কোনো পথে

ঢুকিয়া যে প্রকাশ্যে সভা-সমিতি করিয়া আমাদের কথা জনসাধারণকে বলার সুযোগ পাইব তাহা মনে হইল না। দেড় দিন ধরিয়া যে অবস্থায় আমরা বন-জঙ্গল ও পাহাড়ের চড়াই-ওৎরাই ঠেলিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া চুপসাইয়া, না খাইয়া, পথ চলিয়া আসিয়াছি তাহাতে পুলিসের কথা শুনিয়া আমরা মোটেই দমিয়া গেলাম না। বরং এবার যা হোক, আমাদের একটা 'গতি' হইবে এবং নিরুদ্দেশ যাত্রার শেষ হইবে—মনে করিয়া সকলেই যেন কিছুটা বেশ আশ্বস্ত বোধ করিলাম। সালাজারের পুলিস তাহা হইলে তাঁহার গোয়ার জমিদারী পাহারা দেওয়ার জন্য ঠিকই হাজির আছে! আর যাই হোক, আবার পুরা আর একটা দিন আমাদের পথে-বিপথে প্রায় নিরুদ্দেশ যাত্রায় হাঁটিয়া মরিতে হইবে না!

ছেলেটির সঙ্গে কথাবর্তায় যা খবর পাওয়া গেল তাহার সারমর্ম এই :

আমরা এদিক দিয়া আসিতে পারি বলিয়া গতকাল দুপুর হইতে নদীর ওপারে বিরোন্ডে পুলিস চৌকির আশেপাশে এবং নদীর এপারেও পুলিস কয়েকবার জীপে করিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে এবং গ্রামের লোকেদের শাসাইয়া গিয়াছে যে সত্যাগ্রহীরা আসিলে তাহাদের কেউ যেন থাকার জায়গা

বা খাবারদাবার না দেয় এবং সত্যাগ্রহীদের দেখা গেলেই সঙ্গে সঙ্গে যেন পুলিসে খবর দেয়। আগেই বলিয়াছি, আমরা সীমান্তের যে দিক হইতে আসিতেছিলাম সেটা 'রানে' অঞ্চল এবং প্রধানত হিন্দু অঞ্চল। পর্তুগীজ পুলিস এমনিতেই ইহাদের উপর তত প্রসন্ন নয়। প্রথম গ্রামেই শুনিয়া আসিয়াছিলাম এবং এই যুবকটির কাছেও শুনিলাম, এদিককার কোনো কোনো গ্রামে ধড়-পাকড়, খানা-তল্লাসী এবং লোকেদের উপর কিছু কিছু মার-ধোর ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে। নদীর ওপারে বিরোন্ডে' হইতে ওয়ালপইয়ের রাস্তায় পুলিস ও মিলিটারী জোর টহলদারী চালাইতেছে। বিরোন্ডে' ফাঁড়িতে একদল পুলিস ও মিলিটারী ক্যাম্প করিয়া আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আমরা যেখানে আছি সেখান হইতে নদীর ধারে পৌঁছাইতে আরো মাইল ৬-৭ হাঁটিতে হইবে। পথে আরো দু-তিনটি গ্রাম পড়িবে বটে; কিন্তু সে সমস্ত গ্রামের লোক পুলিসের ভয়ে এত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া আছে যে, আমরা যদি সে সব জায়গায় মিটিং করিতে যাই, বেশি লোক সাহস করিয়া আগাইয়া আসিবে না। তা ছাড়া প্রত্যেক গ্রামেই 'সি-আই-ডি' গোয়েন্দা ('সি-আই-ডি' কথাটা গোয়াতেও বেশ প্রচলিত আছে দেখিয়াছি, যদিও পর্তুগীজরা তাহাদের পুলিসের গোয়েন্দাদের সি-আই-ডি বলে না। আমাদের দেশেও রাজনৈতিক গোয়েন্দা পুলিসের সরকারী নাম সি-আই-ডি নয়, কিন্তু সাধারণ লোকে সি-আই-ডি বলিতে পুলিসের গুপ্তচরদের বোঝে) ঘোরাফেরা করিতেছে। আমরা কোনো গ্রামে গেলেই তাহারা সত্য-মিথ্যা নানারকম রিপোর্ট দিয়া গ্রামবাসীদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করিবে। তাহার চেয়ে আমরা যদি সোজাসুজি ওয়ালপই এবং বিরোন্ডে'র দিকে যাই সরাসরি পুলিসের মুকাবিলা করিতে পারিব।

যুবকটির কাছ হইতে এই রিপোর্ট পাইয়া আমরা পথে কোথাও আর অপেক্ষা না করিয়া যত তাড়াতাড়ি পারি বিরোন্ডে'-ওয়ালপইয়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত করিলাম। আগেই বলিয়াছি তখন আর আমাদের সভা-সমিতি, মিটিং করার মতো উৎসাহও বড় বেশি ছিল না; বরং পর্তুগীজ পুলিসের সঙ্গে তাড়াতাড়ি দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া এসপার-ওসপার একটা হইয়া যাক্, আর হাঁটিতে পারা যায় না—এই মনোভাবটাই তখন সকলের মধ্যে প্রবল।

সোজা কথায় তখন আমাদের নিজেদের মনের অবস্থাও খুব বেশি 'রাজনীতি' করার স্তরে ছিল না। সত্যাগ্রহ করা স্থগিত রাখিয়া আমরা অল্প কয়েকজন যদি এই-ভাবে সঙ্গোপনে গোয়ার ভিতরে আসিয়া আত্মগোপন করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে হাত দিতাম, আমার ধারণা, তাহাতে কাজ হইত বেশি। গোয়ার ভিতরে জনসাধারণের মধ্যে বহুকাল ধরিয়া যে ব্যাপক পর্তুগীজবিরোধী মনোভাব আছে তাহাকে আরো ভালোভাবে সংগঠিত করিতে পারিতাম। ১৯৫৪ সালের টেরেখোল সত্যাগ্রহের পর গোয়াতে পর্তুগীজ পুলিস ভয় পাইয়া যেরূপ ব্যাপক ধরপাকড় ও খানাতল্লাসী চালাইতে শুরু করে তাহাতে গোয়ার ভিতরে ন্যাশনাল কংগ্রেসের যেটুকু সংগঠন গড়িয়া উঠিতে-ছিল তাহা সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। নেতা হিসাবে যাঁহারা সম্মুখে থাকিতে পারিতেন তাঁহারা সকলেই গ্রেপ্তার হইয়া যান। ইংরেজ আমলে ইংরেজদের আইন-কানুন যে ধরনের ছিল, তাহাতে আমরা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন করার ও সংগঠন গড়িয়া তোলার যে সুযোগ ভারত-বর্ষে পাইয়াছিলাম, ফ্যাশিস্ট একনায়কত্বের

দেশে, বিশেষ করিয়া ফ্যাশিস্ট দেশের কোনো উপনিবেশে, যে সে ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় না ও যাইবে না, তাহা আমরা, অর্থাৎ ভারতের গোয়া মুক্তি আন্দোলনের নেতা ও সংগঠকেরা ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি নাই। মহাত্মাজীর অবদান হিসাবে আমরা 'সত্যাগ্রহ'-কে প্রায় সর্বরোগ-হর দাওয়াইয়ের মতো সর্বত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, গোয়াতে তাহার প্রয়োগ কতদূর কার্যকরী হইবে বা হইবে না, অন্য কোনোভাবে সেখানে জন-সাধারণের ভিতর রাজনৈতিক আন্দোলন বা সংগঠন গড়িয়া তোলা সম্ভবপর কি না, এ সব সম্পর্কে আমরা কোনো সময় বেশি মাথা ঘামাই নাই। আজ অবস্থার চাপে পড়িয়া গোয়া-মুক্তি আন্দোলন গুপ্ত সংগঠন ও সন্ত্রাসবাদের পথ নিতে বাধ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ১৯৫৪-৫৫ সালে গুপ্ত সংগঠনের পথে সত্যকার গণ-প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার যে সুযোগ ছিল আজ তাহা নাই। অবশ্য ১৯৫৪-৫৫ সালে সে চেষ্টা যে একেবারেই হয় নাই তাহা নয়। আমি যতদূর জানি, পুণা মহারাষ্ট্রের প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের সংগঠন ও গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের চেষ্টায় গোয়ায় এই ধরনের সংগঠন গড়িয়া তোলার কিছু কিছু চেষ্টা হয়। এই প্রসঙ্গে পুণার প্রজা-সোসালিস্ট পার্টির মহিলা কর্মী শ্রীমতী সিন্ধু দেশপাণ্ডের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সিন্ধু দেশপাণ্ডে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে দুই দুইবার আত্ম-গোপন করিয়া গোয়ার ভিতরে যান এবং ১৯৫৪-র শেষ দিকে ও ১৯৫৫-র প্রথম দিকে গোয়ার ভিতরে আত্মগোপন করিয়া গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে ঘুরিয়া রাজ-নৈতিক সংগঠনের কাজ চালান। গোয়াতে শিক্ষিত হিন্দু ও খ্রিশ্চান মহিলাদের সাহায্যে আন্দোলনে যোগ দেওয়া তাঁহার চেষ্টাতেই সম্ভবপর হয়। অবশ্য দুইবারই শ্রীমতী দেশপাণ্ডে আকস্মিকভাবে গ্রেপ্তার হইয়া যান। [illegible] গ্রেপ্তারের পর [illegible] বিচারে তাঁহার বারো বছরের সাজা হয়। কিন্তু [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া সত্যাগ্রহী দল পিছনে [illegible] দিতে দিতে গোয়ায় ঢোকেন নাই বলিয়া গোয়া মুক্তি আন্দোলনের নেতা ও সংগঠক হিসাবে শ্রীমতী দেশপাণ্ডের নাম অনেক বেশি লোকে জানে না। গোয়ার ভিতরে আর একজন লোকও দক্ষতা ও কৌশলের সঙ্গে বহুদিন আত্মগোপন করিয়া রাজনৈতিক সংগঠনের কাজ চালান। তাঁহার নাম বড় কেউ জানে না, এক গোয়ার ভিতরকার রাজ-নৈতিক কর্মীরা ছাড়া এবং পর্তুগীজ পুলিসেরা ছাড়া। তিনি একজন মারাঠী এঞ্জিনীয়ার-কনট্রাক্টর, শ্রীযুক্ত মোহন নায়ার। পর্তুগীজ পুলিসও বহুদিন পর্যন্ত তাঁহাকে সন্দেহ করে নাই। গোয়াতে উচ্চপদস্থ পর্তুগীজ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁহার খুবই দহরম-মহরম ছিল এবং সরকারী কনট্রাক্টরদের মধ্যে তাঁহার স্থান বেশ উঁচু ছিল। ভদ্রলোক অনর্গল কোঙ্কনী ও পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলিতে পারেন এবং অনেক দিন গোয়ায় ছিলেন। তিনি খুব সঙ্গোপনে কাজ করিতেন এবং গা ঢাকা না দিয়া, প্রকাশ্যে চলাফেরা করিয়াও বহুদিন পর্যন্ত পুলিসকে কোনমতে জানিতে দেন নাই যে, তিনি আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে ১৯৫৫ সালের ৬ই এপ্রিলের সত্যাগ্রহের পর ঐ দিন মাপুসা শহরে শ্রীযুক্তা সুধাবাঈ যোশীর সভাপতিত্বে

গোয়া কংগ্রেসের অধিবেশনের সংগে সংগে সমস্ত গোয়া জুড়িয়া প্রত্যেকটি বড় শহরে প্রকাশ্য সত্যাগ্রহের অনুষ্ঠান হয়) তাঁহার কার্যকলাপ পুলিসের কাছে জানাজানি হইয়া যায়; অবশ্য পর্তুগীজ পুলিস আজও তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। পরে বহু রাজনৈতিক মামলায় পর্তুগীজ পুলিসের চার্জশীটে তাঁহার নাম—'Primeiro Conspirador' বা 'Principal Conspirador'—প্রধান ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মোহন নায়ার ছাড়াও আরো দু-একজন ভারতীয় অধিবাসী এ ব্যাপারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু নানান কারণে এখানে তাঁহাদের নাম করা সংগত হইবে না।

আমাদের পক্ষে তখন যে মাঝপথে এভাবে গুপ্ত রাজনৈতিক সংগঠনের পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব ছিল না এবং নিলেও যে তাহা কার্যকরী হইত না তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ আমরা সে রকম কোনো পরিকল্পনা নিয়া গোয়াতে আসি নাই; আসিয়াছিলাম সত্যাগ্রহ করিয়া পর্তুগীজ পুলিসের হাতে মারধোর খাইয়া ফিরিয়া যাইতে। আমাদের নজর ছিল 'পলিটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনে'-র দিকে। আমাদের সত্যাগ্রহের ফলে পর্তুগীজদের হৃদয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটিবে সে আশা নিশ্চয়ই ছিল না (খাঁটি সত্যাগ্রহীদের অবশ্য তাহাই থাকা উচিত!); কিন্তু আমরা মার খাইয়া ফিরিয়া আসিলে তাহা নিয়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে নিশ্চয়ই পর্তুগীজ সরকারকে খুব গালাগালি করা চলিবে; চারিদিকে হৈ-চৈ হইবে, পর্তুগীজ সরকারের উপর গোয়ার ব্যাপারে চাপ দেওয়ার সুবিধা হইবে— এই সব পরিকল্পনাই আমাদের মনে বেশি ছিল। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি হয় পর্তুগীজ পুলিসের সামনা-সামনি হওয়াই আমাদের পক্ষে সমীচীন, এই ভাবিয়া আমরা যুবকটিকে বলিলাম, আমাদের বিরোকেত'-ওয়ালপইয়ের সোজা রাস্তা ধরাইয়া দিতে। তাহার কথাবার্তা হইতে আমরা ইহাও বুঝিয়াছিলাম যে, সে মোটামুটিভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, সে ঠিক এদিককার লোক নয়; বেশ কিছু দূরে তার বাড়ি। কিছু প্রয়োজনে সামনের কোনো গ্রামে আত্মীয়-স্বজনের সংগে দেখা করিতে যাইতেছে। পুলিস সম্পর্কে তাহার নিজের মনেও যথেষ্ট ভয় আছে; পথের মধ্যে হঠাৎ সত্যাগ্রহে জড়াইয়া পড়ার ইচ্ছা নাই। কিন্তু আমাদের যদি সাহায্য হয় তাহা হইলে আমাদের কিছু দূরে আগাইয়া বড় রাস্তা ধরাইয়া দিতে সে রাজী আছে; তবে নদীর পার পর্যন্ত সে আমাদের সংগে আসিবে না। কারণ, পুলিস যদি কোনো মতে জানিতে পারে তাহা হইলে তাহার আর রক্ষা থাকিবে না; 'পা—পাখলো-রা' তাহাকে হাজতে পিটাইয়া মারিয়া ফেলিবে। এই কথা বলিতে বলিতে সে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিল—"আপনারা হিন্দুস্থান হইতে আসিতেছেন, আপনাদেরকে তাহারা ভয় করে, আপনাদের পিছনে হিন্দুস্থানের সরকার আছে; হয়ত আপনাদের দু-চারবার মারধোর করিয়া ছাড়িয়া দিবে। তাহার বেশি কিছু করিবে না। কিন্তু বেটারা যদি গোয়ার ভিতরের কাহাকেও পায়, মারিতে মারিতে একেবারে মারিয়াই ফেলিবে;

অনেককে এভাবে মারিয়া ফেলিয়াছেও। আমাদের হইয়া তাহার প্রতিকার করার কেহ নাই!" এ কথাটার বাস্তব অর্থ কি, তখন বুঝি নাই। সাত মাস পর্তুগীজ পুলিসের হাজতে থাকিয়া দিনের পর দিন নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছি এ কথা কত সত্য এবং কত মর্মান্তিকভাবে সত্য। কিন্তু তাহার মনে এ ভয় থাকা সত্ত্বেও সে আমাদের সঙ্গে আসিল। আমরাও বড় রাস্তা না ধরিয়া তাহাকে একেবারে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছিলাম না। কারণ, গতকাল ঠেকিয়া শিখিয়া আমাদের সঙ্গের গাইডদের উপর খুব বেশি ভরসা তখন আমাদের আর ছিল না; তাহারা এ দিককার পথ ঠিক ঠিক চেনে কি না কে জানে? তা ছাড়া তাহারাও আর বেশীক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকিবে না; আমাদের বড় রাস্তা ধরাইয়া দিয়াই তাহারা চলিয়া যাইবে, খালি সে রাস্তা তাহারা চেনে না বলিয়া এখনও পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। কাজে-কাজেই পথের মধ্যে এই ছেলেটিকে পাইয়া আমরা পথ সম্পর্কে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। আগেই বলিয়াছি পুলিসের হাতে পড়ার ভয় তখন আমাদের মনে আর ততটা কাজ করিতেছিল না; কিন্তু কোনোমতেই আমরা আবার গতকালের মত পথ হারাইতে রাজী ছিলাম না।

অবশ্য ডাঃ সালাজারের লাঠিয়াল বরকন্দাজদের দেখা পাওয়ার জন্য আমাদের সেদিন আরো ৬।৭ মাইল হাঁটিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখনকার হাঁটায় আর কালকার মত দুর্ভোগ ছিল না। আরো কিছু দূরে গিয়া আমরা একেবারে বড় সড়ক পাইয়া যাই। কোঙ্কন বা মহারাষ্ট্রের পাহাড় অঞ্চলের পথঘাট যাঁহারা দেখিয়াছেন কিম্বা দক্ষিণে মালাবার বা কেরল অঞ্চলের অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন, এ সব অঞ্চলে বাঁধানো পাকা রাস্তার তত দরকার হয় না। পাহাড়ের গা কাটিয়া চওড়া রাস্তা কোনোমতে তৈয়ারী করিতে পারিলেই হয়; খোয়া দিয়া কিম্বা পীচ বা কংক্রীট দিয়া রাস্তা বাঁধানোর দরকার হয় না। কারণ ঐদিককার মাটিও শক্ত আর পাথর-কাঁকর মিশানো চড়া রাস্তায় জল কাদা জমিতে পায় না। আমাদের হঠাৎ পাওয়া পথের সাথী মাইল দুই-তিন এই রাস্তায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মাঝামাঝি এক জায়গায় আমাদের নিকট হইতে বিদায় নিল। যাওয়ার সময় সে বলিয়া গেল, "আপনারা এই রাস্তা কিছুতেই ছাড়িবেন না; এই রাস্তা বরাবর আর কিছুটা গেলেই আপনারা নদীর ধারে পৌঁছিবেন। সেখানে কোনো খেয়াঘাট নাই, কিন্তু ছোট ছোট নৌকা পাওয়া যায়। দু-চার আনা দিলে পার হইতে পারিবেন। নদী পার হইয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা আপনাদের ওয়ালপই যাওয়ার রাস্তা দেখাইয়া দিবে।" আমাদের গাইডরাও আর কিছুদূর গিয়া এই রাস্তা হইতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া দেয়। স্থানীয় যুবকটি নিজের কাজে চলিয়া যাওয়ার পর তাহারা দুজনে আমার কাছে আসিয়া নিজেদের বাড়ির পথে যাওয়ার অনুমতি চাহিল। তাহারা জানাইল, তাহাদের বাড়ি এ অঞ্চল হইতে অনেক দূরে পড়িবে। আমরা যখন বড় রাস্তা ধরিয়া ফেলিয়াছি তখন তাহাদের আর আমাদের সঙ্গে আসার দরকার নাই। তা ছাড়া তাহারাও আচমকা পুলিসের হাতে পড়িতে চায় না। তাহাদের পথ ভুল করার দরুণ যে আমাদের অনেক কষ্ট হইয়াছে সেজন্য বার বার মাপ চাহিয়া তাহারাও ক্রমে বিদায় নিল।

এবার আমরা সম্পূর্ণ রকমে একা একা, নিজেরা-নিজেরা চলিতেছি। সঙ্গে পথ দেখানোর কেউ নাই। আজ পথে তত বৃষ্টিও নাই; মধ্যে মধ্যে রৌদ্রও দেখা দিতেছে, মধ্যে মধ্যে দু-এক পশলা হাল্কা বৃষ্টি আসিয়া আমাদের ভিজাইয়া দিয়া যাইতেছে। আমাদের রাস্তার দু পাশে

এখনও বেশ ঘন জংগল এবং বড় বড় গাছ দেখিতেছি। কিন্তু রাস্তাটা সোজা চওড়া রাস্তা, পাহাড়ের ঢাল দিয়া নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে। আমরা গ্রাম বা লোকালয়ের মত দেখিলেই চীৎকার করিয়া শ্লোগান দিতেছি—"সালাজার গোয়া ছোড়ো! অভী ছোড়ো! জলদি ছোড়ো!" এইভাবে চলিতে চলিতে কখন যে আমরা একেবারে একটি গ্রামের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছি তাহা আমি খেয়াল করি নাই। ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন হঠাৎ "ওই যে নদী, ওই যে নদী!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে আমার চমক ভাঙিগল। তাকাইয়া দেখি, নদীর ধারে একটি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তখন বেলা প্রায় বারোটা। গ্রামের কোনো কোনো বাড়ি হইতে মেয়েরা বা ছোট ছোট ছেলেরা কৌতূহল-ভরে আমাদের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। নিতান্ত ছোট অজ পাহাড়ী পাড়াগাঁ। লোকজনের চেহারা এবং বাড়িঘর দেখিয়া, বিশেষ করিয়া দু-একটি মাছ-ধরা জাল শুকাইতে দেখিয়া আন্দাজ করিলাম নদীর ধারে জেলেদের বসতি হইবে বোধ হয়। নদী পার হওয়ার নৌকা কোথায় পাওয়া যাইবে তাহার খোঁজ করিতে কাহাকেও পাকড়াইব ভাবিতেছি, এমন সময় ভলান্টীয়ারদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, "পুলিস!" "পুলিস!" সম্মুখে এবং আশেপাশে তাকাইয়া দেখি দুজন পর্তুগীজ এবং গোয়ানীজ পুলিস, কাহারও পরনে খাকী উর্দী, কাহারও পরনে নেভী ব্লু জীনের উর্দী, আর কয়েকজনের পরনে গ্রে রংয়ের মোটা ড্রিলের কাপড়ের উর্দী। এইটা পর্তুগীজ মিলিটারী সৈন্যদের সাধারণ পোশাক) স্টেন গান এবং সংগীন চড়ানো রাইফেল হাতে করিয়া দু পাশ হইতে দৌড়িয়া আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া ফেলিতেছে। পুলিস দেখিয়া আমাদের ছেলেদের উৎসাহ যেন বাড়িয়া গেল— "পর্তুগীজ গোয়া ছোড়ো!" "ভারত মাতা কী জয়!" "গোয়া ভারত অলগ্ নহি"! "জয় হিন্দ" যে যাহা পারে শ্লোগান দিতে আরম্ভ করিল। পুলিস তখন দু দিক হইতে সাঁড়াশী গতিতে আমাদের প্রায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু আমরা তখনও চলিতেছি। চলা এখন এই মুহূর্তে বন্ধ হইয়া যাইবে: পিঠে লাঠি এবং বন্দুকের কুঁদা আসিয়া পড়িবে। তবু উহারই ভিতর পুলিসের দলের সংগে অফিসার গোছের কেউ আছে কি না ঠাহর করার জন্য আমি একটু উদ্‌গ্রীব হইয়া সম্মুখের দিকে তাকাইতেছি এমন সময় বেচারী নিতাই গুপ্ত! আমার জ্বর হইয়াছিল বলিয়া নিতাই গুপ্ত আমাকে জাতীয় পতাকা কাঁধে নিতে দেয় নাই; হঠাৎ একজন সম্মুখের দিকের পুলিস বিকট হুংকার করিয়া রাইফেলের কুঁদা দিয়া নিতাইয়ের

হাতে একটি প্রচণ্ড ঘা মারিতেই জাতীয় পতাকা এবং তাহার ডাণ্ডা নিতাইয়ের হাত হইতে নীচে পড়িয়া গেল। নিতাই গুপ্ত তবু গ্রাহ্য না করিয়া পতাকা আবার তুলিয়া নিবার জন্য নীচু হইয়াছেন, আর একজন একটি রাইফেলের বাড়ী মারিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। এমন সময় দেখি, ক্রশ বেল্ট পরা একজন অফিসার জাতীয় লোক আমাদের জাতীয় পতাকাটা ডাণ্ডা হইতে খুলিয়া তুলিয়া নিতেছে ও অপর হাত দিয়া পুলিসের দলকে আমাদের মারিতে বারণ করিতেছে। তাহার পিছনে দেখি একজন মোটা বেঁটে গোছের দো-আঁসলা ফিরিংগী সাহেব, একটু ভদ্র গোছের চেহারা, পরনে খাকী প্যাণ্টের উপর সাদা শার্ট, মাথায় একটা জরীর সাজ লাগানো, তারা লাগানো বারান্দাওয়ালা মিলিটরী টুপি স্টেন গান হাতে দৌড়িয়া আসিতেছে এবং ইংরেজি ও পর্তুগীজ মিশাইয়া চীৎকার করিতেছে—

"Nao! Nao! who, leader? who, leader? Que esta o chefe? o chef da Satyagrahi? O chefe? chefe?"

বলা বাহুল্য, তখনও আমি পর্তুগীজ ভাষা শিখি নাই; কিন্তু অনেক বছর আগে জেলে থাকিতে অল্প কিছু ফরাসী ভাষার চর্চা করা ছিল, তাই আন্দাজ করিলাম যে, সত্যাগ্রহী দলের নেতা বা পরিচালক কে তাহা জানিতে চাহিতেছে। ইতিমধ্যে পুলিস ও মিলিটারী মিলিয়া আমাদের একেবারে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, তবু তাহারই ভিতরে দু'পা আগাইয়া গিয়া ইংরাজীতে বলিলাম, "আমিই এই সত্যাগ্রহী দলের লীডার, আমি ইহাদের নিয়া আসিয়াছি। আমাদের আসা সম্পর্কে আমরা গভর্নর জেনারেলকে চিঠি দিয়া জানাইয়াছি। আমরা মনে করি, বিদেশী পর্তুগীজ সরকারের গোয়াতে থাকার......"। এই পর্যন্ত বলিতে না বলিতেই সেই বেঁটে মোটা লোকটির ইশারায় পিছন হইতে চারজন জোয়ান পুলিস বা মিলিটারী সৈনিক তাহাদের বন্দুক কাঁধে ঝুলাইয়া নিয়া আমাকে চারি-পাশ হইতে ধরিয়া প্রায় মাটি হইতে শূন্যে তুলিয়া নিয়া ভলাণ্টীয়ারদের ভিতর হইতে আলাদা করিয়া কিছু দূরে সরাইয়া একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়া আসিল। মনে মনে তখন প্রমাদ গণিতেছি—"এবার বোধ হয় সকলের সামনে ফেলিয়া আমায় মারিবে"! কিন্তু আমাকে সরাইয়া নিয়া আসিয়া তাহারা কিছু বলিল না। খালি আমাকে মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া চারজন চারদিক হইতে সংগীন লাগানো স্টেন গান খাড়া করিয়া পাহারা দিতে থাকিল।

ওদিকে মারধর তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নিতাই গুপ্ত ইতিমধ্যে উঠিয়া বসিয়াছেন। বাঁ হাত দিয়া ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া আছেন; মুখের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম তিনি দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; হাতটা বোধহয় ভাঙিয়া গিয়াছে। যে বাড়ি তাঁহার হাতের উপর পড়িয়াছিল তাহাতে হাত না ভাঙিলেই আশ্চর্যের কারণ হইত। অন্যান্য সমস্ত ভলাণ্টিয়ারদের একসঙ্গে সার বাঁধিয়া দাঁড় করাইয়া তাহাদের সম্মুখে ও পিছনে দু সারি রাইফেলধারী পুলিস পাহারা দিতেছে। পুলিসপক্ষের হাঁক ডাক এবং লোকজনের আনাগোনা দেখিয়া বুঝিলাম কয়েকটি ডিঙি নৌকা আনিয়া আমাদের ওপারে নিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। আমরা যে একেবারে নদীর কিনারায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম তাহা আগে খেয়াল করি নাই। নদীর ওপারে তাকাইয়া দেখি সেখানে প্রায় দেড়শ দু'শ জনের মত সশস্ত্র পুলিশ এবং মিলিটারী সৈন্য জমা হইয়া আছে। দু'একটি জীপ দাঁড়াইয়া আছে। নদীর বুকে তিনটি চারটি ছোট্টো ডিঙ্গী নৌকা আমাদের পারে আসিতেছে; নৌকার মাঝি ছাড়া প্রত্যেক নৌকায় একজন করিয়া রাইফেলধারী পুলিশ বসিয়া। নৌকা আসিতে আসিতে আমি ভাবিতে লাগিলাম যাহা হোক মার খাওয়ার হাঙ্গামা আমাদের কপালক্রমে বোধহয় অল্পের উপর দিয়া চুকিল! আমাদের যখন বিনা হাঙ্গামায় ধরিয়া ফেলিয়াছে এখন শান্তভাবে ওপারে নিয়া গিয়া হয় কোনো থানায় নিয়া যাইবে কিম্বা দু'চারজন ছাড়া আর সকলকে আবার বর্ডার পার করিয়া ভারতের এলাকায় ফেলিয়া দিয়া যাইবে। নিতাই গুপ্ত ছাড়া অন্য

ভলাণ্টিয়ারদের আর মার খাইতে হইল না মনে করিয়া, মনে মনে অদৃষ্টের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রায় উপক্রম করিতেছি এমন সময় প্রথম ডিঙ্গীতে প্রথম তিন চারজন ভলাণ্টিয়ার যাহারা ওপারে পৌঁছিয়াছিল তাহাদের আর্তনাদে আমার দিবা-স্বপন ভাঙ্গিল। সালাজারের পিটুনী পুলিসকে আমি তখনো চিনি নাই।

এক একটি ডিঙ্গীতে চারজন পাঁচজন করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের ওপারে নিয়া যাওয়ার পর যেই তাহারা মাটিতে পা দিতেছে, মাটিতে তাহারা ভালো করিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই, এক এক ঝাঁক রাইফেলধারী পুলিশ আসিয়া তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে—রাইফেলের কুঁদা, রবারের মোটা 'ট্রাঞ্চিয়ন' (রবারের শক্ত লাঠি), সাধারণ বাঁশের লাঠি, ছোট ছোট লোহার রড্, মোটা চামড়ার হাণ্টার চাবুক যে যাহা পারে তাহা দিয়া নৃশংস ভাবে মারিতে শুরু করিতেছে। কাহারও মাথা কাটিয়া যাইতেছে, কাহারও হাত-পা, হাঁটু ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; বাড়ি খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেও নিস্তার নাই; কাহারও মুখ দিয়া নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে, কেহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে। সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র কিছু লোককে হাতে পাইয়া ঠিক এভাবে কেহ মারে ইহার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। হঠাৎ এক সময় ইহার মধ্যে চাহিয়া দেখি বৃদ্ধ ভগৎ তুলসীরামের কাঁধে পিঠে রাইফেলধারী পুলিস আসিয়া তাহাদের প্রথম ধাক্কাতেই মাটিতে পড়িয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া আমার আর সহ্য হইল না আমি চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম—"Officer! Officer!" আমার চীৎকার শুনিয়া ও উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করিয়া সেই বেঁটে মোটা ইন্সপেক্টরটি (পরে জানিয়াছিলাম তাহার পদমর্যাদা পর্তুগীজ পুলিশের chefe বা ইন্সপেক্টর র‍্যাঙ্কের) আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"Que?" অর্থাৎ "what?" "কী হইয়াছে"। আমি তখন রাগে এবং উত্তেজনায় কাঁপিতেছি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই কি তোমাদের পর্তুগীজ সভ্যতা? আমাদের অপরাধ কি এই যে আমরা বিনা অস্ত্রে আসিয়া স্বেচ্ছায় তোমাদের হাতে ধরা দিয়াছি? একজন ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে না মারিবার মতো সামান্য মানবিকতা-বোধও কি তোমাদের পর্তুগীজ সভ্যতায় বারণ?" বলা বাহুল্য আমার সেই উত্তেজনার মাথায় তাড়াতাড়িতে বলা ইংরাজী বোঝার মতো ইংরাজী জ্ঞান তাহার ছিলনা। কিন্তু বোধহয় নদীর ওপারে হাত দিয়া বারবার দেখানোর দরুণ এবং আমার উত্তেজনার ভাব দেখিয়া সে এটুকু বুঝিয়াছিল যে আমি বোধহয় ভলাণ্টিয়ারদের উপর ওপারে যে মারধোর চলিতেছে সেই সম্পর্কে কিছু বলিতেছি। অন্যের কথা শুনিয়া সে চীৎকার করিয়া একজনকে কাছে ডাকিল। এই লোকটি কাছে আসিতে দেখিলাম সে একজন গোয়ানীজ ক্রিশ্চয়ান ভদ্রলোক; তাহার পরনে সাধারণ ভদ্রলোকের মতো লং প্যাণ্ট বা ট্রাউজার, একটি সাদা হাফ শার্ট, পা দুটিতে জলকাদা হইতে কাপড়-ট্রাউজার বাঁচানোর জন্য রবারের লম্বা গাম বুট ঢোকানো। তাহাকে ইন্সপেক্টর সাহেব পর্তুগীজ ভাষায় আমাকে ইংরাজীতে কিছু বুঝাইয়া বলার জন্য বলিলেন। সে একটু পরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—

"Mr. Chaudhuri, it is no use protesting against these things. You need not look to that direction—"

"মিঃ চৌধুরী এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করিয়া কোনো লাভ নেই। আপনার ওদিকে তাকাইয়া দেখার দরকার নাই।" ক্রমে সে আরো যাহা বলিল তাহার সারমর্ম এই: "যে আপনাদের আসার জন্য এই বর্ষার দিনে দুই দিন ধরিয়া আমাদের কম নাকাল হইতে হয় নাই; আপনাদের খোঁজে আমাদের এই দুই দিন বহু জায়গায় ঘুরিতে হইয়াছে। আমাদের সৈন্যেরা সেজন্য আপনাদের উপর খেপিয়া আছে। আপনারা গোয়া নিতে চান, আর গোয়া পাওয়ার জন্য এটুকু কষ্ট করিবেন না?"

তাহার কথা শেষ হইতে ইন্সপেক্টর সাহেব আসিয়া, তাঁহার সেই গোয়ানীজ যুবক দোভাষীকে আমাকে অন্য কোথাও নিয়া যাইতে বলিল। ইন্সপেক্টর নিজেই গ্রামের দিকে আগাইয়া গিয়া সম্মুখে যে বাড়ীটি ছিল তাহার লোকেদের ডাকিয়া এবং দু-একজন পুলিসকে ডাকিয়া কিছু বলিল। গোয়ানীজ যুবকটিও আমাকে আসিয়া বেশ ভদ্রভাবে বলিল—"চলুন! আমাদের এদিকে থাকার দরকার নাই, আমরা ওই বাড়িতে গিয়া বসি।" আমার চার প্রহরী সহ আমি তাহার পিছন পিছন চলিলাম। আমার মনের উত্তেজনা তখন কিছুটা কাটিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম, কে জানে ভদ্রভাবে তো যাইতে বলিতেছে; কিন্তু এবার বোধ হয় আমার পালা।

(ক্রমশ)

বা লা মৌ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সমীরণ, সমীরণ, যে-চাঁদের তিথি
আজকে তোমার দ্বারে হ'য়েছে অতিথি—
তুমি তাকে শ্রীঅঙ্গের অঙ্গীকারে নাও।

বরুণা তোমার দিঘি বারুণী বিশাল—
প'ড়ে আছে বুকে তার ছায়ার তমাল—
তাকে নয়, তুমি তার ছায়া শুধু পাও।

সমীরণ, সমীরণ বলো তবে, বলো—
বরুণার বুকে কেন হ'লো ছলোছলো—
তাকে ছুঁয়ে বুকে ছায়া-তমাল দোলাও।

বরুণা, বরুণা, আর কেঁপো না অমন
তরুণ তমাল খোঁজে বরুনিম মন
তুমি সখি, বুকে তার তিয়াস জাগাও।

নিশাপতি, নিশাপতি কুমুদের বুকে
চন্দ্রিত যে-চেতনা করে উৎসুক—
বরুণার আছে চেনা সে-নয়নিমাও।

রাত-নদী, রাত-নদী, আমি ভাসি তাতে
গেরুয়া রং মেখে একা মন মাতে,
বলে ওঠে—মোছে না যা সে-রঙে ছোপাও।

চবুতরা, চবুতরা, বিনিদ রাতের
কাঁপে দূরে; সিটি দিলো গাড়ী প্রভাতের—
নিলে যতো রাখো তার একটি কণাও।

বালামৌ, বালামৌ, ভোরে ডাকে পাখি—
যে-পাথেয় দিলে প্রাণে যে-স্মৃতির রাখী—
পেয়েছি কি খুঁজে তার তুলনা কোথাও?

স্ম র ণ

নিজন দে চৌধুরী

যত ভাবি, কিছু ভুলবো না, ভুলাবো না
রুক্ষ-দিনের দুঃখ-প্রহর গোনা
প্রাণের বেদনা—বেদনার সান্ত্বনা
ব্যাকুল গানের অপরূপ ঝংকার।

কত আশাময় বাসনার বিশ্বাসে
দূর-যানী পথ-প্রান্তরে ঘাসে ঘাসে
ক্লান্তি আমার আনন্দ-আশ্বাসে
মুছে দেয় কারা? দীপ জ্বালে প্রেরণার!

তবু বয় চির-বিস্মরণের ঝড়
স্মরণাকীর্ণ হৃদয়ের ছোট ঘর
ভেঙে যায়, নীল আকাশে নিরন্তর
শুধু খোঁজে প্রাণ অফুরান সীমানার।

কিছু ভুলবো না—যত ভাবি মনে মনে
তবু এ ব্যাপ্ত হৃদয়ের বাতায়নে
ক্ষণে ক্ষণে সব শপথের নির্জনে
আলোর শিয়রে ঘনায় অন্ধকার!

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

পরাশর বর্মা

প্রেমেনদার 'ঘনাদার গল্প' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, অদ্ভুত চরিত্র সৃষ্টি করতে প্রেমেনদার জুড়ি নেই 'গল্পজগতে'। ঘনাদার চেয়ে আরও বিস্ময়কর চরিত্র 'পরাশর বর্মা'। পরাশর বর্মা একাধারে সখের কবি ও গোয়েন্দা। পরাশর বর্মার দু একটি গল্প অন্য কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। এবারে পরাশর বর্মার যে গল্পটি প্রেমেনদা পূজো সংখ্যা উল্টোরথে লিখেছেন, তার পৃষ্ঠা সংখ্যা পঁচিশ। অর্থাৎ বিরাট একটি বড়-গল্প। গল্পের নাম 'সাংঘাতিক শিশি ও পরাশর বর্মা'।

রঞ্জনের

অকাল পঠন

প্রেমেন্দ্র মিত্রর যেমন জুড়ি নেই গল্প বলায় 'রম্যরচনা'র কলম তেমন আর কারুর নেই যেমনটি আছে রঞ্জনের। তার প্রমাণ তাঁর প্রথম বই 'শীতে উপেক্ষিতা'র অসংখ্য সংস্করণ। পূজো সংখ্যা উল্টোরথের অন্যতম আকর্ষণ রঞ্জন-এর 'অকাল পঠন'।

পূজা সংখ্যা

উল্টোরথ

-এর প্রধান আকর্ষণ তিনটি উপন্যাস। প্রথম উপন্যাস : বনফুলের 'মহারাণী'। মহারাণী পুস্তকাকারে যখন প্রকাশিত হবে দাম হবে চার টাকা। দ্বিতীয় উপন্যাস : সুবোধ ঘোষের 'শুন বরনারী'। 'শুন বরনারী'র পুস্তকাকারের দাম হবে সাড়ে তিন টাকা। তৃতীয় উপন্যাস : বিমল মিত্রের 'রতিবিলাপ'। বর্তমানে 'রতিবিলাপ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে না। পূজা সংখ্যার অন্যান্য আকর্ষণের মধ্যে আরও চারটি বড় গল্প লিখেছেন : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং প্রতিভা বসু। পূজা সংখ্যা উল্টোরথ প্রকাশিত হবে ৯ই সেপ্টেম্বর। দাম সাড়ে তিন টাকা।

উল্টোরথ কার্যালয় : ২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট : কলিকাতা—৬

বৃষ্টি

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়
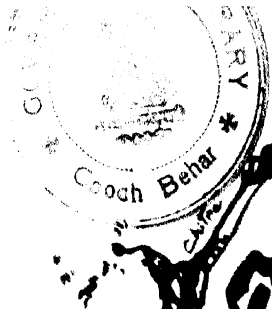
এবার অকালেই বর্ষা নামল। সারাদিন-মান বৃষ্টি আর বৃষ্টি। কদিন হল ওদের আর স্নান করার ভাবনা হয়নি। মনোহর দাস তড়াগের জলে কাল মেঘের ছায়া পড়েছে। বকুল গাছের বুকে সাঁই হাওয়া দিয়ে ফুলগুলি সব ঝরিয়ে দিলে।

বৃষ্টি থামলে লাল সুরকির পথে যে বকুলগুলি লুটিয়ে ছিল, বিজলি সেই বকুল কটি কুড়িয়ে নিলে। ফুলের গন্ধ নিলে নাক ভরে। ওর শাড়ির আঁচল ধুলোয় লুটোচ্ছে। অদূরে চিনেবাদামওয়ালার বিরস মুখের দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করলে। ফুলের গন্ধে ওর সুবাস-সাবানের কথা মনে এল, মনে এল স্নান করবার কথা। চিৎকার করে বলে উঠল—কিরে কুশলি, সাবুন মাখলি না, নাহাবি না?

চিনেবাদামওলা ওকে একটা অশ্লীল গালি দিলে, আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের ভাগ্যকে দুষলে, কেননা তার আজ বর্ষায় বেচাকেনা মন্দ। বললে—বেসরম মাগী, এই বরষাতেও মাগছিস, দেখছিস না একটা পয়সাও বেচা গেল না।

বিজলি ওর ধমক শুনে তাচ্ছিল্যভরে হেসে উঠেছিল হি হি, পয়সা, হেই ভগবান পয়সা নেই কুশলির।

মোহনদাস তড়াগের এই নিরালা কোনটা এখন একলা। বিজলি অন্ধকার ঘরটায় ফিরে এল, এক কোণে হাঁটুর মধ্যে মাথা ডুবিয়ে বসে রইল সে। বুকটার মধ্যে একরাশ ময়লা জমেছে। হাঁটুর ঘাটা ওর দগ দগ করছে। স্নান না করলে ওর শরীরটা নিজের বলে ভাবতে ইচ্ছে করে না। সাবান দিয়ে ডলে ডলে গা মাজলে ও যেন মানুষের শরীর পায়। ওর খড়ি-ওঠা মুখটায় বুঝি কোনও রূপ নেই। ওর মতন জমা পুরুষের বুঝি কোনও নারীও নেই। শানঘাটের শাওলার মত দড় হয়ে গেছে। অথচ শরীরের অহংকার নিয়ে সে এই মাঠের শত বরুনীর নায়িকা হয়ে সন্ধ্যা করেছে।

এক আকাশভরা তারার নিচে, খোলা হাওয়ায় সে হেমন্তের দিন কাটিয়ে এল। জলির মতো কত চিনেবাদামওলা, মালিশ হাঁকে ফেরে, সাহেবপাড়ার মালি নিয়ে টানে যারা তাদের কত মানুষ এল-গেল। বিজলি একটিমাত্র পুরুষের সঙ্গে চিরদিনের ঘর বাঁধতে চায়নি। কিছুতেই না।

অঙ্কুর জেগেছে রামখেলাওনের অন্তরে। ও বিনা বিজলিকে নিজের জানানা করে পেতে চেয়েছে। হো, হো, হি, হি—নিজের মনে হাসে বিজলি—একেবারে বাচ্চা, সংসারের হাল ও কি কিছু বোঝে?

বিলাসপুরের শাল মহুয়ার জঙ্গল থেকে একরাশ অন্ধকার শরীরে জড়িয়ে নিটোল যৌবনে বিজলি শহরে এসেছিল। নাগপুরের বিষ্ণুরামবাবুর মুখে সে থুতু ছিটিয়ে দিয়েছিল, আর একবার সে একই কারণে পাটনায় সখারামের চোখটা গেলে দেয়নি কি? ওরা বিজলিকে পেয়ার করত। ওকে টাকা দিত ঠিকই, কিন্তু ওর কাছে ছিনে জোঁকের মত লেগে থাকত, জোঁক—বাবু আর বান্দী এই নাকি জানানা আর মরদে সম্পর্ক? পোষা মুরগীর জবাই করা অন্ধকার মুহূর্তে একদিন বিজলি ক্ষেপে উঠেছিল। খুন করতে চেয়েছিল সে। চোখ-গেলা সখারামের মুখটা মনে করে ওর দেহ ছেয়ে পৈশাচিক হাসির ঢেউ ওঠে। অন্ধকারে আপন মনে হাসতে থাকে বিজলি। অন্ধকার কাঁপছে, ট্রামের সর্পিল গতির আর শব্দের বিরাম নেই। অন্ধকারকে হঠাৎ হঠাৎ দংশ করিয়ে যাচ্ছে যেন। বিজলি নিজের গায়ের গন্ধে খেপো কুকুরের মত উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যেন।

—ঠুঁটো বা বাচ্চা, কেবল সোহাগ দাও, বাস, দুটো চাল দুটো আনা, এই বাস। তারপর সবাই ঘরে ফিরে যাবে।

চানাচুর বেচে এক কৌটা মুনাফার পয়সা পেলে, মালিশ হেঁকে ছেলেগুলি এক জেব আনি দুয়ানি ভরে নিয়ে যাবে। অন্ধকারে যদি কোনও পথিক ক্লান্ত হয়ে এখানে বসে ধূমপান করে, তবে ওর দিকে লোলুপ হয়ে তাকায়। খুনসুটি করে দুটো চারটা গানের বয়েন গায়।

যদি ওর সঙ্গে দুদণ্ড কাটাতে দুটো ভালবাসার কথা বলেই ফেলে কেউ,—বলে যে বিজলির মত মেয়ের সঙ্গসুখ সে সারা-জীবনে একদিনও পায়নি পরক্ষণে সেই লোক তার থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। লোকালয়ে তাকে চিনতেই চায় না। অথচ বিজলির একটা গন্ধ সাবানের ইচ্ছে কতদিনের। নরম নরম ফেনা গায় জড়িয়ে সে স্নান করবে। শুয়োর, গিধরগুলির গায়ের ময়লা তার শরীরে জড়িয়ে রয়েছে। যেন শুয়োরগুলি ওর সারা গায়ে বিষ্ঠা ঢেলে গেছে। সোহাগ না টাট্টু—হারামি জানোয়ার—। বিজলি গালি পাড়ে।
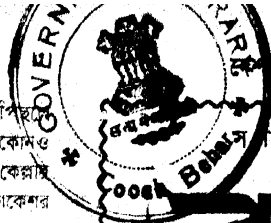
অন্ধকারের গায়ে দূরের গাড়ির পিছলে যাওয়া আলো হঠাৎ যেন হিংস্র কোনও পশুর শাণিত থাবার মত এসে পড়ে। কেল্লার দিকে অন্তহীন অন্ধকার, কাছের নাগকেশর গাছের থেকে গাছে হু, হু, করে হাওয়া উঠছে। বিজলি একা দুঃখের প্রতিমূর্তি হয়ে বসে আছে, কতক্ষণ খেয়াল করতে পারে না। কেউ নেই একলা। চৌরঙ্গীর অন্য পারে পিছল আলো, প্রমোদরঙ্গের পলায়নপরা এক আধটা গানের সুর কেঁপে উঠছে বর্ষার ভিজে হাওয়ায়। হয়তো কাছের হোটেল বাড়িটায় সাহেব-মেমদের গান হচ্ছে।

রাত্রি বেশী নয়। শহরের বুকজোড়া এত মানুষ দুর্যোগ দেখে গৃহস্থ কুকুরের মতো—ঘরের কোণায় ফিরে গেছে। বিরল পথচারীদের কেউ কাছের ট্রাম ট্যাক্সি, বাসের জন্য ছুটে যাচ্ছে। কাছের পুকুরটায় ঝুপ করে লাফিয়ে উঠছে মাছ। খস খস করে একটা কুকুর এসে বসল বিজলির পাশে। ঝুপ, ঝুপ, থুপ—আবার পুকুরটায় শব্দ উঠল। শালা রুইমাছ, অন্ধকারে বিজলি পোকা-খাওয়া দাঁত মেলে আপন মনেই হাসে, শালা রুইমাছ। আঃ একটা যদি পেলে মন্দ হত না, ভাবল বিজলি। মালিশ-হাঁকা ছেলেগুলিও টিনেদামওলোর মতো গায়ে মাদ-ছলো আছে নাকি? না হলে হাফামদীদের একটারও পাত্তা নেই কেন? এমন শুকনো দিন হলে ওরা ফানেল তেলের শিশি হাতে হেঁকে বেড়াত—মালিশ, অন্ধকারেও হঠাৎ হঠাৎ ওদের ডাক শোনা যেত 'মালিশ'। বিজলিকে দেখলে একটু ফ্যানেল তেল ওর হাতে ঢেলে দিয়ে মেয়েলী ঢংয়ে ওরা কেউ আহ্লাদে গলে যেতে চাইত। ওদের কাউকেই এখন দেখা যায় না। চুলোয় যাক্। কাছের কুকুরটাকে ডাকলো বিজলি—পুঃ, পুঃ আঃ। আ। চোখ জেলে জ্বল জ্বল করে উঠল কুকুরটার, ভিজে লোমগুলির ভিতর থেকে কংকাল শীর্ণ শরীরটা দূরের একটা মোটরের আলো পড়ে দপদপিয়ে উঠল, বিজলির হাতের চুড়িগুলিও ঝিলমিল করে উঠল। সেই হাত নেড়ে বিজলি ওর একমাত্র সঙ্গী কুকুরটাকে ডাকছিল—আঃ আয়।

বর্ষা একটু ধরেছে, দমকা হাওয়া বইছে থেকে থেকে। ট্রামের তারে শব্দতরঙ্গ দূর থেকে ভেসে আসছে। অন্ধকারে কারা যেন এই পুকুরটার ধারে উঠে আসছে। দূর থেকে ওদের কথার দু-একটা টুকরো ভেসে এল—এ হি রে মনোহর দাস টাটিক।

বিজলি এবার একটু উৎসাহিত হল। বরষার গাহেক ওরা, অর্থাৎ গ্রাহক। ওদের কাছে নেশার বস্তু মেলে। পাওয়া যায় কিছু, চোলাই না হোক গাঁজা। অনেকে আবার আফিম জ্বালিয়ে খায়। সেই নেশার ধোঁয়ায় ওর শরীরটা ভোঁতা, পেটটা, মাজাটা টান টান হয়ে আসে। বিজলি নেশার কল্পনায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। হে, কোন্ রে, ছিকার

করে ওঠে বিজলি, অন্ধকারে ফলভুক বাদুড়ের মতো ওর চোখটা যেন পট পট করে এগুতে থাকে। হেই ভগবান এই যে সেই রামখেলান। ঠিক চিনেছে বিজলি।

—খেলান তুই কি চরেছিস? বিজলি খেলানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে,—আমার জন্যে সাবুন এনেছিস, এই দেখ সারা শরীরে জানবারের মতো মিট্টি লেগেছে, বলেছিল বিজলি।

খেলান কোন জবাব করেনি ওর কথায়। সমস্ত শরীরে জল সপসপ করছে। সারা মুল্লুকে ও বর্ষায় ভিজে এসেছে। চৌরঙ্গী থেকে বড়বাজার, বড়বাজার থেকে চিৎপুর ঘুরে সে মোট তিন আনা বাঁচিয়ে ফিরেছে। তিনদিন আগে চৌরঙ্গীর ঘড়িবাড়িটার সামনে ওর রুমালের বোঝাসুদ্ধ পুলিস ওকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ফাইন দিয়ে ও খালাস পেল যখন, ওর কাছে তখন মাত্র ছ'আনা পয়সা। একদিন রুটি-ডাল খেয়ে ফুরিয়েছে তিন আনা। সারাদিন বর্ষায় ভিজে আর উপায়ের ফিকির করতে পারেনি। ভিজে ছেঁড়া জামাটা গা থেকে খুলে বার বার গা মুছছে।

তিন আনা পয়সা দিয়ে কি বিজলির জন্যে সাবান কিনবে, না ভবিষ্যৎ রুজির কথা ভাববে? জুতো পালিশের দলে ভিড়বে না মঙ্গল সর্দারের দলে থেকে ভদ্রলোকদের পকেট কেটে পয়সা তুলে নেবে। না, রামখেলান ভাবে সে মরদ, সে হারাম কাজে হাত লাগাবে না। চুরি-চামারি করবে না। চুরি করলে অনন্ত নরক। নরকের ছবি সে দেখেছে গোলকধামের ছক কাটা ঘরে। কি ভয়ানক দেখিয়েছে সে ছবি। গরম তেলে মানুষদের ফেলে দেওয়া হয়। মরে গেলেও যমদূতেরা ধরে নিয়ে যায়, মরে গিয়েও সাজার হাত থেকে ছাড় নেই। বিজলির মুখটা কেবলই তবু ওর কাছে মনোহর মনে হয়। ওর কথায় যাদু আছে। ওর চুলে ফুলেল তেলের গন্ধ, ও সাবুন দিয়ে 'নাহায়', স্নান করে ভদ্রলোকের মত। পাঞ্জাবীদের হোটেলে ও মাংস রুটি খায়। পানওলারা ওকে বিনি পয়সায় পানের খিলি দেয় ডেকে ডেকে। সেই পান খেয়ে ও ঠোঁট রাঙা করে। চিনেবাদামওলা খাতির করে বিজলির সঙ্গে কথা বলে, সাহেববাড়ির বেয়ারা-বাবুর্চীরা ওকে বিড়ি সিগারেট খাইয়ে যায়। রিকসওলারা ভাড়া ফেলে ওকে চৌরঙ্গীর সাহেবদের দেখিয়ে ফেরে। বিজলির শরীরে বিজলি আছে। একবার ও যখন রিক্শায় একগাল পান খেয়ে পা দুলিয়ে উঠে বসেছিল, ওর সারা শরীরটায় যেন আগুন ধরে গিয়েছিল। লাল তাজা রক্তের মত শাড়িতে ওর বুকটা রাণীর মত অহংকারী হয়ে উঠেছিল। বিজলির দিকে তাকাতে হলে হিম্মত চাই, রুজি চাই, মিহমানকে মান দেবার মত ঠাঁই চাই। নাই নাই, খেলানের কিছুই কি নাই—যা সে বিজলিকে দিতে পারে?

বিলাসপুরের উঁচু উঁচু শালগাছগুলির মাথায় শুকনো পাতা ঝরার মর্মর জাগছে বিজলির কানে। বিলাসী যৌবন তার দাগগুলি যেন শুষে নিয়েছে। পায়ের ঘাটা দগ দগ করছে। গন্ধে তার বমি বমি করছে। চুলটা এলো করে সে কটা উকুন টেনে এনেছিল, জটায় আঙুলের চিরুনি কাটতে কাটতে খেলাওনের হাতটা ধরে ফেললে সে, বললে—বুদ্ধু, বাত বলিস না কেন? বোবা হয়ে গেছিস নাকি? ভারী মজা লাগে খেলাওনকে দেখে। কিছু চায় খেলাওন, কিন্তু বলতে পারে না। দিতে চায় কিছু, সাধ্য নেই। খেলাওনের হাতের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে গেল—অন্ধকারে তার শরীরে কামনার বিষ ছেয়ে গেছে। ভিজে গেছে সে। ক্ষুধায় সে জর জর হয়ে গেছে। জ্বরে ছেয়ে গেলে যেমন হয় তার মাথার তালুতে তেমনি একটা বোধ, চোখের মণিতে, মুখের ত্বকে। আগুনে সে পুড়ে যাবে বুঝি।

পুকুরটার পাড় ঘেঁষে ময়দানের পথে ওরা এগোচ্ছিল। খেলান বললে—বিজলি তোর জন্যে পয়সা রেখেছিলুম, কিন্তু পুলিসে সব নিয়ে গেল।

—ধরা পড়ে গেলি? বিজলির গলায় স্নেহ।

—হুঁ, দুনিয়াটা দুশমনের আখড়া, খেতেও পাইনি সারাদিন।

—নেহি? চুক্ চুক্—ঠোঁটে শব্দ করলে বিজলি।

অন্ধকারে ওরা কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। খেলান অনুভব করলে, এই ঘনঘটা বাদলে তার দুঃখের দিনে ভগবান তাকে অনেক দিয়েছে। আজ তাকে বিজলি তার গাহেক বা গ্রাহক করবে।

জলো জলো হাওয়া, এক ঝাঁক বাদুড়ের পাখসাট আকাশে। পায়ের তলায় ভিজে ঘাস।

বিজলি হঠাৎ খেলানের ভিজে চুলগুলি হাতের মুঠির মধ্যে নিয়ে টানতে শুরু করলে। খিল খিল করে সে হাসছিল। অন্ধকারে সে হাসি পিছলে গেল। খেলানের সারা দেহে যেন কটা আরশুলা বাইছে। সহ্য করতে পারছিল না সে বিজলির ছোঁয়া। চমকে উঠেছে সে, পেটের উপর থেকে নিচের দিকে তার শরীরে ধনুকের মতো টান ধরেছে।

—খেলান আমাকে একটা সাবুন এনে দিস, একটা সাবুন। উঃ! হাঁটুর নিচে ঘাটা কি দগদগিয়ে উঠেছে দেখবি? —বিজলি বলেছিল।

সমস্ত সভ্যতার বাইরে দুটি আদিম ইচ্ছার বহুতর স্বপ্ন নেই, বিজলি কেবল একটা গন্ধ সাবানের কথাই মনে রেখেছে।

এক ঝলক চাঁদ উঠেছিল। গায়ে এলো-মেলো মেঘ জড়িয়ে এক ফালি চাঁদ। আবার কালো মেঘ এল, জ্যোৎস্না ভয়ে কালো হয়ে গেল।

দূরে একটা আগুনের কুণ্ডলী দেখা গেল, আর একটা নেশার গন্ধ এল ধোঁয়ায়।

খিদে বাসনার রিক্ততা অন্ধকারের থাবায় লোলুপ হয়ে উঠছে। বিজলির গাহেকরা আসছে। সবুজ ঘাসের পিঠে ওদের বেতাল পাগুলি টলছে।

—বিজলি—এ বিজলি, চলি আও—সাবনে লে আইলে।

অন্ধকারে বিজলি কান মেলে দিলে। কে ডাকল ওকে, কে?

চেনা গলা, চেনা পায়ের শব্দ। তেয়ারী ওকে ডাকছে। ভুলে গেছে যে তেয়ারী, যার ঘরে জেনানা আর বাচ্চা আছে, বিকেলে যে বিজলিকে গালি দিয়ে চলে গিয়েছিল, সে আবার ফিরে এসেছে। এমনি ওরা আসে। শপথ করে সখারামও চলে গিয়েছিল। কিন্তু আবার সে এসেছে। [illegible] করে সে বিজলিকে লাথি মারত, আর ভোর হলে বিজলিকে টাকা দিয়ে বাড়ি ফিরে যেত। ভোর হলে বিজলি সারা শরীরের ক্লেদ আর [illegible] নিয়ে জেগে উঠত। আর, একটা [illegible] মানুষের চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিজলির ঘৃণায় শরীরটা পাকিয়ে উঠত, প্রতিহিংসায় উত্তাল হতে রক্ত।

সখারামেরও স্ত্রী ছিল, সন্তানও। [illegible] এবং সমাজে [illegible] খাতিরও। কিন্তু শুধু টাকার বিনিময়ে বিজলির সমস্ত অস্তিত্ব ঘৃণা, বিকার, প্রহার, পীড়নে জর্জরিত করতে সখারামের একটুও বাধেনি।

তাই সখারামের সে চোখ গেলে দিয়েছিল।

খেলানকেও তাই সে অন্ধকারে ঠেলে দেয়। থুথু ওর সমস্ত মুখে থুতু ছিটিয়ে দেয়। সমস্ত পুরুষ জাতটার প্রতিই ওর ঘৃণা। বেকুফ, বাচ্চা কাহেকা! বিনি-পয়সায় সে বিজলির সঙ্গে মহব্বত বানাতে এসেছে।

খেলানের অর্থ নেই, নেই এক পয়সার রুজি, ছোঃ—বিজলি আর এক মুখ থুতু ছিটিয়ে অন্ধকারে ঠেলে চলে গেল। ইজ্জত, পোশাক আরাম, বিছানা বালিশের বিলকুল ভাল ভাল খাবার সব টাকাতেই মেলে। এছাড়া মনের কোনও দাম নেই, টাকা ছাড়া সব বাচ্চাদের হাতে খেলনার মতো। একবার বিজলির খেলানের জন্যে মনটায় দরদ হয়েছিল। কিন্তু পরমুহূর্তে ও জানতো, সে বিজলির জন্যে দু-আনার একটা গন্ধ সাবানও আনতে পারে না। সেই হিজিবিজি নকশা আঁকা কাগজে মোড়া ছোট্ট গন্ধ সাবান, যার মাত্র দু-আনা দাম, তাও যখন খেলান জোটাতে পারে না—তখন তার ভালবাসার দাম ছেলের হাতের খেলনার মতোই অকেজো নয়তো কি?

খেলানকে সে অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে তেয়ারীর কাছে চলে গেল।

তেয়ারীর চোখটায় কামনার ভোঁতা রঙে কেমন যেন ঘোলাটে। বৃষ্টির ভিজে হাওয়ায় ওর শুকনো শরীরটা কেঁচো-মাটির মতো ফুলো ফুলো বোধ হয়েছে। ঘরের ছেলেমেয়ে, বৌ, দারিদ্র্য দোঁহে ইঁদুর ওর চোখে দুঃস্বপ্নের মতো জেগে থাকে। ঘরে ফিরলে ছেলেমেয়েগুলি তেয়ারীকে চিনে-বাদামের ডালাসুদ্ধ গিলে খেতে চায়। চাই, চাই, খাই, খাই করে বৌমাগিটা সুদ্ধ তাকে চিনেবাদামের শাঁসের মতো চিবিয়ে খায়।

ওর জন্যে কী একটুও আরাম আর স্ফূর্তি জুটতে নেই? তেয়ারী সেদিন আর ঘরে ফিরলে না। পড়ে রইল চিনে-বাদামের ডালা ভুজাওলা মহাজনের দোকানে। এক-পেট তাড়ি খেয়ে নিয়েছিল সে। নেশা হলে সে যেন আকাশের মতো উড়ছিল। শহরের রোশনাই, মুশাওরো আলো ঝলমল বাড়িগুলির পাশ দিয়ে সে সাঁতার কেটে চলেছিল। ময়দানের ভুতুড়ে অন্ধকারে সে সন্ধানী চোখ মেলে চলেছিল। ওদিকে বড়ো মকুন্দের গাছগুলি, এদিকে মোহন-দাসের টালিক, আর কাছেই সাহেবদের লাট খানাপিনার মস্ত বাড়িটার মাথায় দপদপে আলো।

পায়ের কাছে একটা জানোয়ার দৌড়ে গিয়েছিল। উঃ, য়ো, ওটা বিজলির কুত্তা। তেয়ারীর ভুল হয়নি। মাঠের রাণী বিজলিকে সে খুঁজে পেয়েছে এতক্ষণে। বিজলির গরম দেহের বুকের আশ্রয়ে

রোমাঞ্চিত হল তেয়ারীর শরীর। বিজলিকে সে পেয়েছে বুকের মধ্যে। একরাশ মত্ত মেঘ যেমন বিদ্যুৎ বুকে নিয়ে ফেটে যায়, তেমনি তেমনি করে সে বিজলিকে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। বিজলির পায়ের দগদগে ঘাটার উপর তেয়ারীর পাটা ঘিন্ন হয়ে উঠছে। ভয়ানক যন্ত্রণা, তেয়ারী বিজলির হাতে সাবানটা তুলে দিল; আরও কিছু পয়সা দিলে। ওর চোখ যেন অমৃত লেহন করছিল। লোলুপ কুকুর যেমন মাংস দেখে ক্ষুধায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে, তেমনি তেয়ারীর সমস্ত শরীরে ক্ষুধার দাঁত জেগে উঠেছে। আকাশ বিদ্যুতে বিদ্যুতে ঝলসিয়ে উঠছিল। অন্ধকারে বিজলির গ্রাহককে কী ভয়ানক দেখিয়েছে। অন্ধকারের আদিম বীভৎসতা গায়ে মেখে নিয়েছে সে। বিজলির চোখ জ্বলছে, ক্রুর দেবীর মত জেগে উঠেছে ওর মন, কলুষ-মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সে পৃথিবীর মানুষের মত নির্মল মনকে অনুভব করলে একবার। খেলানের করুণ মুখটা তাকে ডাকছে।

বৃষ্টি আসছে, উন্মত্ত মেঘে মেঘে গর্জন, সারা মনকে নতুনকরে জাগাল শকুন বটের ছায়াকায় জেগে উঠল। মাথার উপরে বাদুড়ের পাখনাটা ওদের চমকে দিলে। বিজলির পায়ের ঘাটা, গায়ের ময়লা মাথার উকুন ওকে মনে করিয়ে দিলে বিলাসপুরে শালগাছের ছায়ায় মহুয়া গাছে ফলে ফুটেছিল দিনে সে এক মায়ের বেটী ছিল। আজ সে চিনেমাটির মত বিক্রী হয়ে গেছে। এ কথা শুনার জানোয়ার! বিজলির সঙ্গী কুকুরেরও যে মায়া আছে, এই গাহেকদের তা নেই। ঘাটায় চাপ পড়াতে বিজলি অসহ্য যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার জন্য তেয়ারীর কানটা কামড়ে দিলে। শুয়োর, জানোয়ার......। চিৎকার করে উঠল তেয়ারী,—ওহি ভগবান, ছোড়দে। কাছের কুকুরগুলি আর্তনাদ করছিল। ঘেউ...উ...উ।

বৃষ্টির কঙ্কাল ভেঙে পড়ল ময়দানের বুকে। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সোনালাল উড়ানের কাছে আশ্রয়-ঘরটায় তখন হাজারে মানুষে ঠাসাঠাসি।

ঘরটা নিরন্ধ্র হয়ে উঠল মানুষের ভিড়ে। একটুকু জায়গার, একটু বসার ঠাঁইয়ের জন্যে জড়ো বুরুশওলা ছোট ছেলেগুলি এবং যাযাবর মেয়ে পুরুষগুলি তুমুল ঝগড়া করতে থাকে। চিৎকার, মারামারি। কান্না। বৃষ্টির গলায় ঝন ঝন করে ঘণ্টা বাজছিল। মানুষের কোলাহল বরুণ দেবতার করুণাকে রুদ্ধ ব্যর্থতায় ভেঙিয়ে ওঠে। খেলান দু-চোখ মেলে দিয়ে বসেছিল বৃষ্টির দিকে। আজ বিজলিটা বুঝি সারারাত জলে ভিজবে। খেলান নিজেও ভিজে গেছে। দুদিন খায়নি। মাথাটায় আগুন জ্বলছে, কি জানি ব্যামার হল না কি? বিজলির বুকটায় মাথা দিয়ে সে সুখ পেয়েছিল, বিজলি ওকে ছেড়ে গেল যে, তাতে ও দোষ করেনি কিছু। কিছু, কি বিজলিকে সে দিতে পারে—পেয়েছে? কি দেবে সে বিজলিকে। কি আছে ওর দেবার? এত গরীব ও, ভিখিরীর চেয়েও গরীব। যারা এখানে একটু ঠাঁইয়ের জন্যে মারামারি করছে, তাদের মারামারি করে নিজের দেহটাকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবার আগ্রহ আছে, খেলানের সে ইচ্ছে-টুকুও নেই। কেন সে বাঁচবে। গরীব, যার মাথা বাঁচাবার ঠাঁই নেই, রুজির উপায় নেই, সে তো মরবেই। কিন্তু মরে যাবার আগে সে কিছু দিতে চায়। ভিক্ষুকের থলিতেও কিছু থাকে, যা সে অন্যজনকে দিতে পারে—নিজের সন্তান স্ত্রীর জন্যে যা বায় হয় সেটাও তো দেয়া। কিন্তু খেলানের কিছু নেই—কেউ নেই।

আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে। আশ্রয়-ঘরটায় আরো লোক এসে বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করেছে—অনেকের ঠাঁই হয়নি। ক্ষ্যাপা হাওয়ার আর্তনাদ, বৃষ্টির ঝাপটা এসে আশ্রয়ঘরের দুর্গন্ধিত গোলমালকে তখন ঠাণ্ডা করে দিলে। অন্ধকারে বিজলি লাল শাড়ি ভিজিয়ে, চোখ লাল করে আশ্রয় ঘরটার এক কোণে ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজছিল।

খেলান ওকে চিনতে পেরে ডাকলে—বিজলি ইধার চলি আয়।

আগুনে ইন্ধনের মতো মানুষের দলটা কণ্ঠ দপ করে জ্বলে উঠল। নেহি বস্তি নেহি, নিকাল দো শুয়োরকা বাচ্চাকো। নিজের জোরু না শালাকে ডাকে। আওরাৎকে নিয়ে থাকতে তো মহল বানিয়ে নাও। অসংখ্য প্রতিবাদ আর বিদ্রূপ খেলানকে মাত করে দিলে। কেউ আর এক ইঞ্চি জায়গা দেবে না অন্য আগন্তুককে।

কিন্তু খেলানের পৌরুষ উদ্ধত হয়ে উঠল। বললে—বাঃ, মরদরা বেশ এখানে মজা করে থাকবে, আর একটা মেয়ে সারা-রাত জলে ভিজবে? জলের মধ্যে নেমে গেল খেলান, বিজলির হাত ধরে ওকে টেনে নিয়ে এল নিজের জায়গায়।—দেখি কে বাধা দেবে, কোন মরদকা বাচ্চা ওর ঠাঁই কেড়ে নেবে? চিৎকার করে উঠেছিল খেলান।

একদল মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল খেলানের উপর। কিল ঘুসি চড় গালিতে ওর শরীরটা রক্তাক্ত হল, নীল হল। ওর দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে আশ্রয়ঘরটার বাইরে। সেই কটা মুহূর্তের উন্মত্ততা হিংস্রতার রোল বৃষ্টির পিঠে মাখামাখি হয়ে গেল, তারপর সবাই নিঃশব্দে দেখলে, লোকটা মরে গেল। বিদ্যুৎ ঝলকে খেলানের রক্তমাখা দেহটা চমকে উঠছিল।

বিজলির লাল শাড়িটা শুকিয়ে এসেছিল এক সময়ে, অশান্ত বর্ষণের মতো ওর শরীরটা মমতায় ভিজে উঠেছে, ও হয়তো ভেবেছিল খেলান তাকে একরাশ কান্নায় ধুইয়ে দিয়ে গেল এক অকাল বৃষ্টির মতো।

ছায়াসঙ্গিনী

একা, একা, নিঃসঙ্গ, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ! ভবিষ্যতের দিকে যতদূরে চায় কোথাও এতটুকু সঙ্গ নাই, আশ্রয় নাই, ছায়াতরুর স্নেহ নাই, গ্রামের আভাস মাত্র নাই। নিঃসঙ্গতা এমন সম্পূর্ণ যে, মন ভীত হয়ে ওঠে, অবশেষে ভীতির চরমে এসে ভয়টাও মিলিয়ে যায়—ঐ ক্ষীণ বনান্তের পাড়খানি যেমন কখন্ অজ্ঞাতসারে দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছে।

রেশমী একাকী বসে বসে ভাবে আর দেখে। কখন্ যে তার ভাবনা দেখায় পরিণত হয়, আর দেখা যে কখন্ ভাবনায় রূপান্তরিত হয় টের পায় না।

টাঙন নদীর পশ্চিমে রাঙা মাটির রিক্ত ডাঙা জমির নিস্তব্ধ ওঠা-পড়া একখানি নীরব বেহাগ রাগিণীর মতো দিগন্তে গিয়ে সমে মিশেছে। ঐ জনপ্রাণী তরু-গুল্মহীন নিঃশব্দ ওঠাপড়ার মধ্যে রেশমী নিজ জীবনের ছবি যেন দেখতে পায়—তার নির্জন ভবিষ্যৎ যেন রূপ ধরে সম্মুখে উপস্থিত।

বিকালের দিকে সময় পেলে, সময়ের তার অভাব কি, একাকী চলে আসে এখানে। স্বচ্ছ জলে-ভরা ছোট একটা বাঁধ সে আবিষ্কার করেছে তার একদিকে সেই নিঃসঙ্গ কুসুম তরুটি। এখানে এসে বসে রেশমী, ঠিক জলের ধারে একখানি পাথর, বসে সেই পাথরে, পা দু'খানি ঈষৎ জলে ডুবিয়ে। কাকচক্ষু জলে পড়ে ছায়া, ছোট ছোট পাথরের টুকরো জলে ফেলে ফেলে ছায়াকে চঞ্চল করে তুলে সে আপনার সঙ্গে আপনি খেলা করে। মানুষ যখন আপনার ছায়ার সঙ্গ কামনা করে, বুঝতে হবে তখন তার অবস্থা কৃপার যোগ্য। আগে অনেকটা সময় তার কাটতো গাঁয়ের মধ্যে। কিন্তু তার জীবন-বৃত্তান্ত জানায় গ্রাম দ্বারবন্ধ করেছে—এক সঙ্গী ছিল ঐ রহস্যময়ী ফুলকি বলে মেয়েটা। আজ ক'দিন থেকে সে-ও নিরুদ্দেশ। ভোগা বাগদির বাড়িতে তার রাত্রিযাপন নিয়ে ভোগাদের দুই ভাইয়ে মাথা ফাটাফাটি হয়ে যায়। ভোলা দিয়েছিল তাকে শাড়ি, ভেবেছিল তার ঘরে রাত কাটাবে ফুলকি, কিন্তু ইতিমধ্যে তার কনিষ্ঠ হারু তাকে নাকছাবি কবুল করে ধরে নিয়ে যায়। ভোরে হারুর ঘর থেকে ফুলকিকে বেরুতে দেখে দুই ভাইয়ে লাঠালাঠি শুরু হয়ে যায়—ফলে দুজনেরই মাথা ফাটে। ফুলকি গিয়েছিল থামাতে, রক্তে তার কাপড় গেল রাঙা হয়ে। এসব কথা ফুলকির মুখেই শোনা। দিব্য অনায়াসে সব বৃত্তান্ত সে বলে গেল—বেহায়া মেয়েটার এতটুকু লজ্জা, এতটুকু আব্রু নেই। রেশমী জিজ্ঞাসা করেছিল, এমন করলে কেন ভাই।

ফুলকি বলে আমার কাছে যে ভোলা সে হারু, তফাত কি বলো!

কিন্তু ওরা যে মাথা ফাটাফাটি করল?

ও ওদের অভ্যাস। মাসের মধ্যে একবা করে ওদের মাথা ফাটে, এবারে না হ. আমাকে নিয়েই ফাটল।

তোমার লজ্জা করে না।

লজ্জারও তো একটা সীমা আছে। যে কথা সবাই জানে, তাকে আর লজ্জার বা কেন?

না ভাই, এ ভালো নয়।

প্রসঙ্গান্তর করে ফুলকি বলল, তুমি ভাই একটু সাবধানে থেকো।

ভীত রেশমী শুধাল কেন?

গাঁয়ের দু'চার জন রসিকের চোখ পড়েছে তোমার উপরে।

সে কি ভাই, আমি তো ওরকম মেয়ে নই।

আরে সেইজন্যই তো পড়েছে চোখ।

কিছু বুঝতে পারে না রেশমী, শুধায় সে আবার কেমন?

ফুলকি বলে—যতদিন ওরা জানতো যে, তুমি কুমারী, তোমার দিকে চোখ দেয়নি। কিন্তু পরে যখন জানতে পারল যে, তোমার এ-কূলও গেছে, ও-কূলও নেই, তোমার দিকে ঝুঁকলো, পুরুষগুলোর ভাই ওই স্বভাব, বেওয়ারিশ মেয়ে পেলে লোভের অন্ত থাকে না। একটু সাবধানে থেকো—তোমার আমার মতো মেয়েদের দিকেই ওদের দৃষ্টি।

'তোমার আমার' কথাটা রেশমীর ভালো লাগল না, যতই কেননা বন্ধুত্ব থাক ফুলকির সঙ্গে তবু তার সঙ্গে একত্র উল্লেখে তার আপত্তি ছিল।

এই ঘটনার পরে ফুলকির সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি, গাঁয়ের মধ্যে গিয়ে সন্ধান করতে সাহস হয় না, ফুলকিও আসে না।

রেশমী ভাবে, ফুলকি তবে কি অন্যত্র চলে গেল! তার কথাগুলো মনে পড়ে, মেঘের মতো হাওয়ার টানে এসেছে আবার একদিন হাওয়ার টানে ভেসে যাবে। তবে কি হাওয়ার টানেই ভেসে গেল। রেশমী বুঝিতে পারে না হাওয়ার টানটা কি। ফুলকির প্রতি তার মনোভাব বড় বিচিত্র—একই সঙ্গে ঘৃণা আর ভালোবাসা। দুরন্ত কৌতূহলে ঘৃণা আর ভালোবাসাকে যুক্ত করে রেখেছে তার মনে।

বাঁধের ওপারে নজর পড়তেই চোখে পড়ল কুসুম তরুটা—সরল উন্নত গাছটা আগাগোড়া রক্তিম হয়ে উঠেছে। তার মনে পড়ল ক'দিন এদিকে আসেনি। এর আগে যেদিন এসেছিল দেখেছিল উপরের পাতাগুলোয় লালের আভাস—আজ আর কোথাও এতটুকু সবুজের ছোঁয়া নেই। সমস্ত মাঠের মধ্যে ঐ একটিমাত্র গাছ—ঘন রক্তিম। তার মনে হল ঐ একটি রন্ধ্রপথে মাঠের সমস্ত লাল রঙ ঊর্ধ্বে উৎসারিত। ঐ নিঃসঙ্গ দল ছাড়া খাপছাড়া তরুটির সঙ্গে কেমন এক আত্মীয়তা অনুভব করে রেশমী, মনে মনে ভাবে আমাদের দুজনের এক দশা, আমরা না-বাগানের, না-বনের।

টুপ, টুপ, টুপ। পাথরের টুকরোয় জলে ছায়া চঞ্চল হয়ে ওঠে।

রেশমী মাথা দুলিয়ে শুধোয় কিগো অমন ছটফট করছ কেন?

ছায়া মাথা দোলায় উত্তর দেয় না।

রেশমী মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছায়াটিকে দেখে, মনে মনে ভাবে আহা কি সুন্দর। তার মনে হয় বিশ্বের যাবতীয় রূপ যেন শরতের শিশিরকণার মতো অশথপাতার শির্ষটির শেষ প্রান্তে এসে দোদুল্যমান।

ইস্ খুব যে রূপ।

ছায়া হাসে—স্পষ্ট দেখা যায় তার গালের টোল দুটি।

এত রূপ কার জন্যে লো।

এবারে ছায়া নিস্তব্ধ, বোধ করি তার চোখের কোণ জলে ভ'রে ওঠে, জলে জল এক হয়ে যায়, কিছু বোঝা যায় না।

এবারে রেশমী মাথা নাড়িয়ে বলে, এত রূপ ভালো নয়রে ভালো নয়।

ছায়া মাথা নাড়িয়ে তাকে সমর্থন করে।

শুনেছিস তো দু'চার জনের চোখ পড়েছে তোর উপরে।

ছায়া ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে।

কিছুদিন হ'ল রেশমী বুকের মধ্যে এক অদ্ভুত উতলা ভাব বোধ করছিল—মনটা কেমন যেন যখন তখন অকারণে উন্মনা হয়ে যায় তার। খাঁচার পাখী ক্ষণে ক্ষণে উধাও হয়ে যায় আকাশে, দরজা বন্ধ করতে ভুলে যায় মালিক। কেন এই উদ্ভ্রান্তি বুঝতে পারে না, বুঝতে না পারলেও উদ্ভ্রান্তিটা তো মিথ্যা নয়। তার মনে হয় মনের মধ্যে কোথায় যেন ফুল ফুটেছে—স্বর্গীয় তার গন্ধ, দিব্য তার উন্মাদনা। কি ফুল ফুটল, কোথায় ফুটল, ব্যাকুল হয়ে ওঠে সে, খুঁজতে বের হয়। কিন্তু হায় মনের ফুলের সন্ধান বাইরে পাবে কেমন করে। মনের গহনে কি প্রবেশ করতে পারে সবাই। তাই শুধু সে এখানে ওখানে হাতড়ে বেড়ায়। ক্রমে গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে, রেশমীর জীবন দুর্বহ মনে হয়। কত রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে দুই হাতে বুক চেপে ধ'রে কেঁদেছে—চোখের জলে অন্ধকার ধুয়ে ভোর হ'য়ে গিয়েছে! এই অকারণ আবেগ, অমূলক বেদনা কেন, সে বুঝতে পারে না। যে দুঃখের কারণ স্পষ্ট তার সীমা আছে, অকারণ দুঃখ অনন্ত। সে যখন ধীরভাবে চিন্তা ক'রে দেখতে পায় যে, দুঃখটাও নিশ্ছিদ্র নীরন্ধ্র নয়, তার মধ্যেও আলোক-রশ্মি আছে, একরকম আনন্দ আছে—বেশ একটু মজা আছে। তখন সে দুঃখের সঙ্গে খেলা করে যেমন করে ঐ ছায়াটির সঙ্গে। দুঃখ তার বুকের রক্ত শোষণ ক'রে রস সংগ্রহ করে, সেই রস তার খাদ্য, তার প্রাণ, এটুকু পীড়াদায়ক। কিন্তু মরি মরি, সেই দুঃখের লতায় ফুলের কি অপূর্ব শোভা! মানুষ গাছ, দুঃখ পরগাছা; গাছের ফুলের চেয়ে পরগাছার ফুলের সৌন্দর্য বেশি।

কিন্তু একদিন সে বুঝতে পারল দুঃখের কারণ, বুঝিয়ে দিল ঐ ছায়াসঙ্গিনী। নিজের ছায়া দেখে সে চমকে উঠল, সম্মুখে ও কে? পুরাণে-শোনা অপ্সরীদের কেউ নাকি? এত রূপ তার! রূপ নাকি গৌরব! তার খুশী হওয়া উচিত ছিল, তার বদলে জলের ধারে লুটিয়ে প'ড়ে সে কাঁদলো—সাথের সাথী ছায়াও কাঁদলো নীরবে। সে ভেবে পায় না, কেন এমন হ'ল? রূপ রমণীর গৌরব, গৌরবে আছে গুরুত্ব, সেই গুরুভারে সে পীড়িত—এ কান্না সেই পীড়নের। ফুলের ভারে গাছ পীড়িত, ফলের ভারে শাখা পীড়িত, তারার ভারে পীড়িত শরতের আকাশ, নীরবতার ভার চরাচরের পীড়া, আর আজ রেশমী পীড়িত রূপের দুর্বহ ভারে।

যে-বন্যা এক রাতের মধ্যে এসে চরাচর ডুবিয়ে দেয় তার সন্ধান আগে পাওয়া যাবে কেমন ক'রে? রেশমীর রূপের আবির্ভাবও যে বন্যার অতর্কিত অভিযান! কাল ছিল সে কিশোরী, এখানে ওখানে রূপের কুঁড়ি উঁকি মারছিল, আজ সে পরিপূর্ণ যুবতী। দেহের কানায় কানায় রূপের বান, আর এক অঞ্জলি বেশি হ'লে পড়বে যাবে ছাপিয়ে।

টুপ, টুপ, টুপ।

শোন লো শোন, গায়ে সামলে কাপড় দিস। দেখেছিস তো ফুলকির হেনস্তা।

ছায়া হাসে।

এত হাসির কপাল, তিন কুলে নেই কেউ।

ছায়ার উত্তর কেড়ে নিয়ে নিজেই বলে, ফুলকিরও তো নেই কেউ, তাতে কি তার হাসির অভাব হয়েছে?

তবে কি ফুলকির মতো হ'তে চাস্ নাকি?

আবার ছায়ার উত্তর নিজে দেয়, ছি, ছি, গলায় দড়ি।

এমন সময়ে হাওয়ায় বুকের আঁচল পড়ে খসে। স্খলিত-অঞ্চল বুকের দিকে তাকিয়ে পলক পড়ে না রেশমীর।

কায়া আর ছায়া দুজনে নির্ণিমেষ তাকিয়ে থাকে সৌন্দর্যমেরুর শিখরে।

পুরাণের মতে সৃষ্টির যাবতীয় সুবর্ণ পুঞ্জীভূত হয়েছে মেরুচূড়ায়, এখানেও বুঝি তাই। রেশমী ভাবে, আহা, এক মুহূর্তের জন্য যদি সে পুরুষের চোখ পেতো, দেখে নিতো ঐ দৃশ্যটি।

হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে সে চমকে ওঠে, জলে আর একটি ছায়া পড়েছে। তাড়াতাড়ি বুকে আঁচল তুলে দেয়।

কে কায়েত দাদা নাকি। কখন্ এলে?

রাম বসু বলে, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম তোমাকে। তা এখানে একা বসে কি করছ? সন্ধ্যাবেলা মাঠের মধ্যে একা একা থাকা কিছু নয়।

রেশমীর মনে পড়লো, ফুলকির সতর্ক-বাণী, ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চোর ডাকাতের ভয় নাকি?

মাঠের মধ্যে চোর ডাকাত কি লুঠ করবে? নেকড়ে বেরুতে পারে।

চলো তবে কায়েত-দাদা কুঠিতে ফিরে যাই, সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে খেয়াল ছিল না।

দুজনে কুঠি বলে রওনা হ'ল।

রাম বসুর 'হঠাৎ দেখতে পেলাম' তোমাকে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল সত্য—কিন্তু কিছুক্ষণ রেশমীর অগোচরে দাঁড়িয়ে যে তাকে দেখছিল সে কথাটা বলেনি, এমন ক্ষেত্রে বলা চলেও না।

রাম বসু আজ যেন হঠাৎ নূতন ক'রে রেশমীকে আবিষ্কার করল, দেখল সে অপূর্ব সুন্দরী। বাঁধের ওদিকের রক্তিম কুসুমতরুটির সঙ্গে রেশমীকে মিলিয়ে দেখছিল—তার মনে হচ্ছিল, বা, বা, এরা দুজনে যেন জুড়ি, যেমন একক তেমনি দল-ছাড়া, তেমনি রহস্যময় সৌন্দর্যময়! রাম বসুর কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব।

রেশমী শুধাল, কেরি সাহেব কি মদনাবাটী-পালদীঘিতে রওনা হয়েছেন?

কেমন ক'রে হবেন, মিসেস কেরি যে আরো বেশি উন্মাদ হ'য়ে উঠেছেন।

হবেন না, কোলের ছেলেটা হঠাৎ মারা গেল। মিসেস কেরিই যে ক'দিন বাঁচবেন তাই ভাবছি।

সে ভাবনা ক'রো না, সাহেবী প্রাণ খুব শক্ত। বোঁটা শক্ত হওয়ার আগে ক্যাবেজের মতো ঝরে পড়লে এক কথা। কিন্তু একবার বোঁটা শক্ত হয়ে গেলে যমরাজের পাইক-বরকন্দাজের সাধ্যও নেই লাঠির ঘায়ে পাড়ে। ওদের নিতে হ'লে স্বয়ং যমরাজকে আসতে হবে।

এইরকম কথাবার্তা বলতে বলতে দুজনে কুঠির কাছে এসে পড়ল, এমন সময়ে নৈশ অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে সংগীত ধ্বনিত হ'ল—'ভরা নদী ভয় করিনে ভয় করি সই বানের জল।'

কে গান করে রে?

ফুলকি, চেনো না ওকে কায়েৎ দাদা?

দেখেছি বটে মেয়েটাকে।

তুমি যাও কায়েত দাদা, আমি ওর সঙ্গে দুটো কথা ব'লে আসি, দেখিনি অনেক ক'দিন ওকে। ফুলকি এদিকে আয় ভাই।

অন্ধকারের ভুল

ফুলকি শুধাল, এত রাতে কোথায় গিয়েছিলে?

রেশমী বললে, এত রাতে কোথায়! কেবল ত সন্ধ্যা।

তা বটে, কলির সন্ধ্যা আর কি! তা সঙ্গে উটি কে ছিল?

চেনো না! কায়েত দাদা।

তা কায়েত দাদার সঙ্গে এত রাতে মাঠের দিকে গিয়েছিলে কেন, ব'লে ফুলকি মুচকে হাসলো।

তার হাসি দেখে রেশমীর গা উঠল জ্বলে, সে বেশ একটু তেতে উঠে বললে, যেখানেই যাই, যার সঙ্গেই যাই, তোমার তাতে কি?

ভালোরে ভালো, আমি তোমার হয়ে লড়াই ক'রে মরছি—আর তুমি করছ রাগ।

রেশমীর রাগ কমেনি, গা তখনো জ্বলছিল, তবু রাগ দমন ক'রে শান্তভাবে শুধাল, আমার হয়ে কার সঙ্গে লড়াই করছিলে?

গোপাল নায়েবের সঙ্গে।

আর লড়াইয়ের বিষয়টা কি শুনি?

তবে শোন, শুনে রাখাই ভালো—এই ব'লে সে আরম্ভ করল, আজ অনেকদিন থেকে নায়েব বলছে, ওরে ফুলকি, তোর সঙ্গে তো ঐ কুঠির মেয়েটার খুব ভাব সাব, ওকে জোগাড় ক'রে দে না। আমি বলি, নায়েব

মশাই, ও সেরকম মেয়ে নয়, ওর দিকে নজর দিয়ো না।

নায়েব বলে, রাখ্ রাখ্, তিন কুলে কেউ নেই, ভরা যৌবন, আবার সেরকম মেয়ে নয়! তাছাড়া, কতদিন ওকে রাতের বেলায় মাঠের দিক থেকে ফিরতে দেখেছি—অত রাতে মাঠের মধ্যে যায় পুজো করতে, না?

ফুলকির কথা শুনে রেশমী স্তম্ভিত হ'য়ে যায়, সে স্বপ্নেও ভাবেনি তার যাতায়াত কেউ লক্ষ্য করছে—আর তার এমন কদর্থ সম্ভব।

রেশমীকে নীরব দেখে ফুলকি ব'লে চল্‌ল, আজ আবার নায়েব ধরেছিল, যা ফুলকি, মেয়েটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি ক'রে ফেল্, তাকে বলিস, গহনাগাটি দেব—আর তুইও বাদ যাবিনে।

তারপরে একটু থেমে পুনরায় আরম্ভ করিল, আসছিলাম তোমাকে সাবধান ক'রে দিতে। কিন্তু এখন দেখছি নায়েবের কথা মিথ্যা নয়—ধরা পড়লে তো একেবারে বমাল ধরা পড়লে, তাও আমার আমার চোখে।

রেশমীর ঝগড়াঝাটি করা স্বভাব নয়, জীবনে কখনো ঝগড়া করেছে ব'লে কেউ জানে না—কিন্তু ফুলকির কথায় তার গা এমন জ্বলে উঠ্‌ল যে, ভুলে গেল নিজ স্বভাব।

সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠে বল্‌ল আমি যখন যত রাতে খুশী যেদিকে ইচ্ছা যাব, কারো তোয়াক্কা আমি রাখিনে।

ফুলকিও কখনো রাগে না, তবে খোঁচা দিতে পারে বিলক্ষণ, বল্‌ল, আর যার সংগে খুশী যাবে, কি বলো।

নিশ্চয়।

এবারে ব্যঙ্গ মিশিয়ে বল্‌ল, তবে ভাই একবারটি নায়েব মশাইর সংগে যাও না, আহা বুড়ো মানুষ, বেচারার অনেকদিনের শখ। তাছাড়া, দুটো একটা গহনাগাটি যদি পাই, তোমার ভাগ্যে তো বাজুবন্দ নাচছে।

তবে তাই গড়াতে ব'লে দাওগে তোমার নায়েব মশাইকে—অসহ্য ক্রোধে কাঁপছিল রেশমী।

রেশমীকে ভালো মেয়ে বলে ধারণা হয়েছিল ফুলকির তাই সে গায়ে প'ড়ে এসে মিশতো তার সংগে। এখন সেই ধারণা ভেঙে যাওয়ায় ফুলকির মনের মধ্যে চলছিল আলোড়ন। ফুলকির ধারণা ছিল যে, মানুষের ভালো মন্দ যে চেনে, এখন সেই ধারণা ভঙ্গ হওয়ায় বোকা ব'নে গিয়েছে সে, দেখা গেল যে, রেশমী তার চেয়েও চতুর। তাই সে নিজের প্রতি ধিক্কার অনুভব করছিল। চতুর মানুষের বিপদ এই যে, একবার বোকা প্রতিপন্ন হ'য়ে গেলে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য দায়ী করল রেশমীর সন্দেহটা বাড়িয়ে—তাই গম্ভীর স্বরে বল্‌ল, আর কি কি গহনা পছন্দ ব'লে দাও, এক সংগে গড়ালে নায়েব মশাইয়ের দু' পয়সা সস্তা পড়বে।

খুব যে দরদ নায়েব মশাইয়ের জন্য।

হবে বই কি ভাই, আমিও তো কিছু কিছু পেয়েছি কিনা।

তবে তুমিই যাও না, আবার কুটনীগিরি করতে এসেছ কেন?

এসব জাগ্রত দেবতা, নিত্য নূতন ভোগ চাই, নইলে আমার কি অসাধ।

রেশমীর গালাগালির অভিধান খুব বৃহৎ নয়, কোন্ শব্দ ব্যবহার করবে ভাবছে এমন সময়ে নাড়ু এসে উপস্থিত, রেশমীদিদি,

তুমি এতক্ষণও ফেরোনি দেখে কায়েত দাদা চিন্তিত হয়ে উঠেছেন, আমাকে পাঠালেন শীগ্‌গির চলো।

রেশমী বুঝলো, ঘটনাচক্র আর তার প্রতিকূলে, ফুলকির মন-গড়া ধারণাটাই ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, ভয় ছিল ন্যাড়ার সম্মুখে ফুলকি না জানি কি ব'লে বসে।

ফুলকি এমন কিছু বললো না যাতে ন্যাড়ার সন্দেহ উদ্রেক করে—অথচ অতি-সাধারণ কথায় এমন একটি সুর মিশিয়ে দিল যাতে রেশমীর বুঝতে ভুল না হয়।

যাও ভাই শীগ্‌গির যাও, কায়েত দাদার কথা অমান্য করলে তিনি আবার রাগ করবেন।

রেশমীর উত্তর দেওয়ার সাহস ছিল না পাছে ন্যাড়া সন্দেহ করে, আর উত্তর দেওয়ার ইচ্ছাও ছিল না। সে ন্যাড়াকে অনুসরণ ক'রে হন্ হন্ ক'রে প্রস্থান করল। ফুলকির সন্দেহে তার সর্বাঙ্গ জ্বলছিল। ক্রমঃ-ক্ষীয়মান গানের সুরে বোঝা যাচ্ছিল যে, ফুলকি ক্রমেই দূর থেকে দূরান্তরে চ'লে যাচ্ছে—"ভরা নদী ভয় করিনে

ভয় করি সই বানের জল।"

(ক্রমশ)

রামমোহনের ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ

যোগানন্দ দাস

॥ উপক্রমণিকা ॥

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর প্রায় ১২৪ বছর পার হ'তে চল্‌ল, কিন্তু আজও রামমোহন এদেশে প্রায় প্রহেলিকা হয়েই রইলেন। কতো মনীষী, কতো পণ্ডিত, কতো বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা ক'রে গেলেন, তবু আজও ভুল-বোঝাবুঝির অন্ত নেই।

ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রামমোহনকে বলে-ছিলেন, বহু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বা 'মাল্‌টিপ্‌ল্‌ পার্সন্যালিটি'র মানুষ। একটা মানুষের মধ্যে যেন দশটা আলাদা আলাদা মানুষ রয়েছে।

হিন্দুর কাছে যিনি দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত, মুসলমানের কাছে জবরদস্ত্‌ মৌলবী, ক্রীশ্চানের কাছে যিনি "ক্রীশ্চান্‌ জগতের অদ্বিতীয় পুরুষ" ('উইদাউট্‌ এ পীয়ার ইন্‌ ক্রিস্‌ন্‌ডাম্‌'); পাদ্রীর সঙ্গে যিনি বাইবেল্‌ নিয়ে তর্ক করছেন, ইংরেজীতে বাংলায় পাল্টা কাগজ বার করছেন আর ইংরেজকে বল্‌ছেন 'জোর করে' এদেশের ওপর বাইবেল চাপিয়ো না', আবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ছাত্রের হাতে সেই একই বাই-বেল্‌ দিয়ে বলছেন 'পড়ো' আর সেই বাইবেল্‌ই পড়াবার জন্য বিলেত থেকে পাদ্রী ডাফ্‌কে আনাচ্ছেন; যিনি ফরাসী বিপ্লবের নাস্তিকদের নিন্দে করছেন আবার সেই ফরাসী বিপ্লবের পতাকাকেই সেলাম জানাচ্ছেন এবং সেই একই ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম চিন্তানায়ক ভল্‌টেয়ারের বই নিজের স্কুলে পাঠ্য করছেন; যিনি ইংলণ্ড গিয়ে বেদান্ত প্রচার করছেন আবার এদেশে ক্রীশ্চান্‌ ধর্মের গুণ কীর্তন করছেন ও সঙ্গে সঙ্গে বল্‌ছেন, হিন্দু দর্শনের সমতুল্য সারা য়োরোপে একখানা বই নেই; যিনি পরাবিদ্যায় আচার্যরূপে শঙ্করাচার্যের মতো শাস্ত্রবিচার করছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে অপরাবিদ্যাগুলোর শুধু চর্চাই করছেন তাই নয়, এদেশে তাদের প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করছেন; ব্রহ্মবিদ্যা ও জড়বিদ্যা যাঁর জ্ঞান হাত-বাঁহাত; যিনি আরবি ভাষায় কোরাণও পড়ছেন, ইউক্লিড্‌ পড়ছেন; যিনি কার্ল মার্কসের বহু পূর্বেই ইংরেজীতে ও বাংলায় নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন ও বাংলা ভাষায় 'মধ্যবিত্ত' শব্দ সৃষ্টি করছেন আবার ইংলণ্ডে গিয়ে সমাজতন্ত্রের আদি জনক রবার্ট্‌ আওয়েনকে তর্কে পরাস্ত করছেন; সেই বিচিত্র-কর্মা বহুমুখী প্রতিভার মানুষকে নিয়ে যে ভুল-বোঝাবুঝি আজও হবে, এতে বিস্মিত হবার কি আছে? এই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই একটা মানুষের দশটা ব্যক্তিত্বের আপাত দ্বন্দ্ব-মিলনের মধ্য দিয়েই ইতিহাসের সত্য রূপ প্রকাশিত হবে।

'দেশ' পত্রিকার বিগত দু' সংখ্যায় (৬ই ও ১৩ই জুলাই) দেখছি, দু'জন রামমোহন-বিশেষজ্ঞ অমল হোম ও কাজী আবদুল ওদুদ্‌ মহাশয়দের মধ্যে রামমোহনকে নিয়ে কিছু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে। ১৩ই জুলাইয়ের সংখ্যায় এ-বিষয়ে ওদুদ সাহেবের লেখা প'ড়ে কিছু খট্‌কা লেগেছে। আশা করি, তিনি সন্দেহ দূর ক'রে দেবেন।

রামমোহন রায় সম্বন্ধে ওদুদ সাহেব লিখছেন (পৃঃ ৮৫৬):

রাজা রামমোহন

"নতুনকে রূপ দেওয়ার ব্যাপারে তিনি যা করতে পেরেছিলেন অনেক ক্ষেত্রেই তা পর্যাপ্ত নয়, এমন কি যৎসামান্যও বলা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়—ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাস্টডিডে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে সভ্য ও ভব্য মানুষের এক ধর্ম-মিলন-কেন্দ্র, এক স্রষ্টা ও পাতার ছত্রছায়াতলে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, মানুষ পরস্পরের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হবে ও পরস্পরের হিতসাধন করবে; কিন্তু কাজে তিনি করতে পারলেন একটি কক্ষে প্রাচীন রীতির বেদপাঠের ব্যবস্থা যাতে ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রবেশাধি-কার নেই, আর তার সঙ্গে অপর একটি কক্ষে প্রধানত হিন্দুশাস্ত্র থেকে কিছু পাঠ ও ব্যাখ্যা আর কিছু ধর্মসংগীত, সেই কক্ষে অবশ্য সভ্য ভব্য সব শ্রেণীর প্রবেশাধিকার রয়েছে।"

নতুনকে রূপ দেওয়ার ব্যাপারে রামমোহন রায় কাজে যা করতে পেরেছিলেন, সেটা "পর্যাপ্ত নয়" কি "যৎসামান্য", এগুলো অবশ্য নির্ভর করে কোন্‌ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইতিহাসকে দেখা হচ্ছে অথবা কোন্‌ মাপ-কাঠি দিয়ে রামমোহন ও তাঁর সময়ের পরিমাপ করা হচ্ছে তার ওপর।

॥ ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী ॥

বর্তমান যুগে গত শতাব্দী সম্বন্ধে এক শ্রেণীর আলোচনা দেখা যায় যে-গুলো পড়লেই মনে হয় লেখক বর্তমান শতাব্দীতে, যখন বাংলার, ভারতের ও জগতের সমাজ আগের চেয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছে, সেই বর্তমান পরিবেশে দাঁড়িয়ে ও সেই বর্তমানের যুগমন নিয়ে পিছন ফিরে গত শতাব্দীর বিচার করেন; অর্থাৎ দূরবীণের উল্টোমুখ দিয়ে দেখেন। স্বভাবতই, গত শতাব্দীর অনেক কীর্তিই তখন বর্তমানের তুলনায় "যৎসামান্য" মনে হয়। গত শতাব্দীর ঐতিহাসিক 'কারেক্ট্‌ পারস্পেক্‌টিভ্‌' বা সঠিক চিত্র নিতে গেলে লেখককে পৌঁছিয়ে গিয়ে ১৮শ শতাব্দীর সমাজের মাঝখানে দাঁড়াতে হবে ও সেই যুগের যুগমন নিয়ে সামনে ফিরে গত শতাব্দীর দিকে তাকালে তবে গত শতাব্দীর কীর্তির সঠিকতর ছবি পাওয়া যাবে। তখনই শুধু বুঝতে পারা যাবে, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ও আজকের মন নিয়ে যেটা "যৎসামান্য" মনে হচ্ছিল, সে-টা সত্য সতাই যৎসামান্য ছিল কি না। 'পারস্পেক্‌টিভ্‌' বা পরিপ্রেক্ষিত বদলালে মূলে ছবির চেহারাও অনেক বদলে যায়।

দুটোই অবশ্য 'রিলেটিভ্‌' বা আপেক্ষিক বিচার। কিন্তু শেষোক্তটিই সামনের দিকে ঐতিহাসিক অগ্রগতি বিচারের দিক থেকে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী। ইতিহাস শাস্ত্রে 'এব্‌সলিউট্‌' বিচার ব'লে কিছু নেই।

সুতরাং গত শতাব্দীতে রামমোহনের

প্রত্যেক কীর্তিই (শুধু যা করতে চাইলেন তাই নয়, কাজে যা করতে পারলেন),—ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠাও,—পূর্বতর যুগের সঙ্গে ঐভাবে তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রে দেখতে হবে যে, তাঁর সেই কাজটি পূর্বযুগের তুলনায় প্রগতিমূলক ছিল কিনা, পূর্বযুগের থেকে দেশকে ভাবী যুগের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল কি না, যদি দিয়ে থাকে তবে কতোটা দিয়েছে। তবেই বোঝা যাবে কাজটা যৎসামান্য ছিল কি অসামান্য ছিল।

পূর্বযুগের সঙ্গে এইভাবে তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে না দেখলে রাম-মোহন রায় অথবা যে-কোনো মহাপুরুষেরই কীর্তির বিচারে ও মূল্য নিরূপণে ভুল হ'তে বাধ্য।

উপরে ওদুদ সাহেবের লেখা থেকে যে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিটি দিলাম, তাতে তথ্য ও সিদ্ধান্ত দু'দিক থেকেই এত ভুল রয়েছে যে, আমার মতো একজন ইতিহাসের সামান্য ছাত্রকেও বাধ্য হ'য়ে তাঁর মতো পণ্ডিতের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হ'তে হচ্ছে। আশা করি, তিনি আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। ভুল তাঁর পাণ্ডিত্যের নয়, ইতিহাসের দৃষ্টি-ভঙ্গীর।

॥ বিচার্য ও বিচার ॥

তাঁর বক্তব্যকে নিম্নলিখিতভাবে দিলে বিচারের সুবিধা হবে। ওদুদ সাহেবের বক্তব্য (বিচার্য)ঃ

ক। রামমোহন যা করতে "চাইলেন",—"ট্রাস্টডিড" অনুসারে ব্রাহ্মসমাজ হবে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে "সভ্য ও ভব্য" মানুষের এক ধর্ম-মিলন-কেন্দ্র।

খ। রামমোহন "কাজে" যা করতে "পারলেন",—

(১) একটি কক্ষে "প্রাচীন রীতিতে" দেবপাঠের ব্যবস্থা,

(২) সেখানে ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রবেশ নিষেধ,

(৩) "অপর একটি কক্ষে" (/০) "প্রধানত হিন্দুশাস্ত্র" থেকে (/০) "কিছু" পাঠ ও ব্যাখ্যা (/০) "কিছু" ধর্মসংগীত।

গ। ওদুদ সাহেবের সিদ্ধান্ত,—

রামমোহন যা করতে "চাইলেন"ঃ "কাজে" যা "পারলেন"—"যৎসামান্য"।

এইবার বক্তব্যগুলির ঐতিহাসিক বিচার ক'রে দেখা যাক্।

॥ রামমোহন যা করতে "চাইলেন" ॥

ক। ওদুদ সাহেব বলছেন যে, "ট্রাস্ট-ডিড" অনুসারে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজকে "সভ্য ও ভব্য" মানুষের এক ধর্ম-মিলন-কেন্দ্র করতে "চাইলেন"। "সভ্য ও ভব্য" সম্বন্ধে এ-তথ্য তিনি কোথায় পেয়েছেন? প্রমাণ হিসেবে যে-ট্রাস্টডিডের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন সেই ট্রাস্টডিডে দেখছি লেখা রয়েছে যে, রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-সমাজকে করতে "চাইলেন",

"a place of Public Meeting, **of all sorts and descriptions of men without distinction,** as shall conduct themselves in an orderly, sober, religious and devout manner." (Italics mine). (Collett: **Raja** Rammohun Roy, 1913 edition, p. 152).

"সভ্য ও ভব্য" এবং "all sorts and description" কি এক বস্তু? যদি বলা যায় যে, পরবর্তী অংশে, যেখানে "as shall conduct themselves" ইত্যাদি আছে সেইখানেই সভ্য ও ভব্যের কথা বলা হয়েছে তবে তার জবাবঃ

মস্‌জিদে আমীর ও ফকীরের সমান প্রবেশাধিকার। তাই ব'লে, কোনো আমীরের এই অধিকার আছে কি না যে, সমবেত নামাজের সময়ে মস্‌জিদের মধ্যে মদ খেয়ে বেলেল্লাগিরি ক'রে এবং অন্যরকম অ-"সভ্য" ও অ-"ভব্য" আচরণ ক'রে অন্যদের নামাজে ব্যাঘাত জন্মাতে পারেন? নিশ্চয়ই না। তা

যদি হয় তবে, যে-হেতু মস্‌জিদের মধ্যে নামাজের সময়ে সভ্য ও ভব্য আচরণ করাই বিধেয়, তার মানে কি এই যে, মস্‌জিদ শুধু সভ্য ও ভব্য কেতা-দোরস্ত মানুষ ছাড়া আর কারো জন্য নয়?

"সভ্য ও ভব্য"-দের জন্যই উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং উপাসনাকালীন সেখানে সভ্য ও ভব্য আচরণ করা, এ-দুইয়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ। রামমোহন ট্রাস্টডিড অনুসারে শেষোক্তটিই চেয়েছিলেন, প্রথমটি নয়।

সুতরাং, "সভ্য ও ভব্য" মানুষের জন্যই রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করতে "চাইলেন" ওদুদ সাহেবের এই উক্তি তথ্য ও যুক্তি কোনটাতেই টেঁকে না। কাদের জন্য রামমোহন "চাইলেন" সে-কথা ট্রাস্টডিডে দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে,—"all sorts and descriptions of people without distinction" অর্থাৎ **সর্বসাধারণের জন্য।** এবং সেখানে শুধু "সভ্য ও ভব্য সব শ্রেণীর" লোকেরই প্রবেশাধিকার ছিল একথা সত্য নয়, সর্ব-শ্রেণীর সর্বসাধারণেরই প্রবেশাধিকার ছিল।

এই গেল রামমোহন রায় যা করতে "চাইলেন"। এবার, তিনি "কাজে" যা করতে "পারলেন" সেই বিষয়ে ওদুদ সাহেবের বক্তব্য বিচার ক'রে দেখা যাক্‌।

॥ রামমোহন যা "পারলেন" : "প্রাচীন রীতির ব্যবস্থা" ॥

খ(১)। রামমোহন "কাজে" যা "পারলেন" সে-বিষয়ে ওদুদ সাহেব গোড়ায় বলছেন, "প্রাচীন রীতির বেদপাঠের ব্যবস্থা।" এই উক্তির মধ্যে দু'টি ঐতিহাসিক ভুল রয়েছে।

প্রথম। মার্টিন্‌, বুকানন্‌ প্রভৃতি সম-সাময়িক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, সেই সময়ে বাংলা দেশে বেদ-বেদান্তের পঠন-পাঠন আদৌ ছিল না। সুতরাং, রাম-মোহন কর্তৃক কলকাতা শহরে ব্রাহ্মসমাজে বেদ-পাঠের ব্যবস্থা **বাঙালী সমাজে** একেবারেই "প্রাচীন" রীতির ব্যবস্থা ছিল না, রামমোহন এর দ্বারা বাংলা দেশে সম্পূর্ণ এক **নূতন** ও **অভিনব** ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন।

যুগ যুগ ধ'রে পুরাণ-তন্ত্র-শাসিত বেদ-বর্জিত বাংলায় বেদ-পাঠের প্রবর্তন বিষয়ে তিনি শুধু "চাইলেন" না, "কাজে" যা করতে "পারলেন", পূর্ব যুগের তুলনায় অথবা বাংলার পরবর্তী নবজাগরণের ইতিহাসে তার মূল্য যাচাই করলেই বোঝা যাবে, কাজটা "যৎসামান্য" ছিল কি অন্য কিছু ছিল।

দ্বিতীয়। রামমোহন শুধু বেদপাঠের ব্যবস্থাই করলেন না যে-ভাবে, যে-"রীতি"তে তার ব্যবস্থা করলেন, সেটা শুধু বাংলার নয় (বাংলার তো কোনোকালেই ছিল না), সারা ভারতে বেদপাঠের "প্রাচীন" রীতিকে একেবারে ভেঙে দিয়েছিলেন। পূর্বযুগের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ভবিষ্যুগের অগ্রগতির পক্ষে তার ঐতিহাসিক মূল্য একেবারেই "যৎসামান্য" নয়। "অপর কক্ষে", "কিছু" ব্যাখ্যা ও "কিছু" ধর্মসংগীত বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তার বিচার করব। শুধু বেদপাঠের ঘরে ব্রাহ্মণেতরের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল কি না সেইটেই প্রাচীনতার বা নবীনতার চরম মাপকাঠি নয়।

॥ প্রবেশ নিষিদ্ধ ॥

খ(২)। বেদপাঠের ঘরে ব্রাহ্মণেতরের প্রবেশ নিষিদ্ধ। সে-যুগে বাংলা দেশে বেদের পঠন-পাঠনের রেওয়াজ না থাকায়, তেমন কোনো প্রয়োজন হ'লে কাশী কিংবা দাক্ষিণাত্য থেকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাতে হ'ত। ঐরূপে একজন তৈলঙ্গী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাম-মোহন রায় তাঁর নিজের কাছে রেখেছিলেন।

"প্রাচীন রীতি" অনুসারে (অ) ব্রাহ্মণ ছাড়া বেদের পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ ছিল (আ) বেদপাঠের জায়গায় ব্রাহ্মণেতরের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, এবং (ই) বৈদিক মন্ত্র ব্রাহ্মণেতরের কর্ণে প্রবেশ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল।

এই তিনটি "প্রাচীন" রীতির মধ্যে রাম-

মোহন কেবল দ্বিতীয়টিকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন, প্রথম ও তৃতীয়টিকে ভেঙে দিয়েছিলেন, এবং ঐ দু'টিতে ভাঙবার জন্যই দ্বিতীয়টিকে স্বীকার করেছিলেন।

তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজে বেদপাঠের ঘরে ব্রাহ্মণেতরের প্রবেশ নিষিদ্ধ না করতেন তবে কোনো তৈলঙ্গী অথবা কাশীর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই দেবপাঠে রাজী হ'তেন না, সুতরাং বাংলা দেশে বেদ-বেদান্তের চলনও হ'ত না, পুরাণ-তন্ত্রের রাজত্বই চল্‌তো, বাংলার মানস-ক্ষেত্রে চিন্তা-বিপ্লবও আসতো না বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস অন্যভাবে লিখতে হ'ত।

বেদ পাঠের ঘরে ব্রাহ্মণেতরের প্রবেশ নিষিদ্ধ করাটাই বড়ো কথা নয়। প্রকাশ্য সভায়, বেদপাঠ ও বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যা—বেদ-বেদান্তের জন্মকাল থেকে শুরু ক'রে এই যে সর্বপ্রথম বাংলা দেশে চালু হ'ল, বিশেষ ক'রে বাংলা ভাষার মারফৎ, তার দরুণ রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ ও বাংলার নবজাগরণে, চিন্তায় ও কার্যে কোন্ কোন্ নূতন পথের সন্ধান খুলে দিলেন (শুধু "চাইলেন" না, "কাজে" করলেন), একজন সত্যকারের ঐতিহাসিকের পক্ষে সেইটেই প্রকৃত বিচার্য বিষয়।

॥ "অপর একটি কক্ষে" ॥

খ(৩)। ওদুদ সাহেব বলেছেন, "অপর একটি কক্ষে", কিন্তু বলেন নি যে, সেই কক্ষটি সাতটা ঘর ও তিনটে উঠোনের ওপারে ছিল না, একেবারে গায়ে-লাগাও পাশের ঘর ছিল, মাঝখানে একটি খোলা দরজা ছিল, সেখানে একটি পাৎলা পর্দা টাঙানো থাকতো। এ-সব কথা বলবার উদ্দেশ্য হ'ল যে, ঐ "অপর একটি কক্ষের" অবস্থিতি বা 'পোজিশনের' উপর "প্রাচীন রীতির ব্যবস্থার" ঐতিহাসিক বিচার নির্ভর করে। অবস্থিতিটিরই এখানে প্রধান ঐতিহাসিক মূল্য।

ঘরের এই অবস্থিতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ও-পাশের ঘরে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে বেদপাঠ করছেন, এ-পাশের "অপর একটি কক্ষে" খোলা দরজা দিয়ে তার প্রতিটি দেবভাষার মন্ত্র সমবেত ব্রাহ্মণ-শূদ্র-মুসলমান-ক্রীশ্চানের কানে স্পষ্ট এসে ঢুকেছে। সুতরাং রামমোহন বেদপাঠের এই নূতন ("প্রাচীন" নয়) ব্যবস্থার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে—শুধু চাওয়ার মধ্যে নয়, প্রত্যক্ষ "কাজের" দ্বারা—বহুযুগের "প্রাচীন রীতি"কে এমনভাবে ভাঙলেন যে, সে আর কোনোকালে জোড়া লাগলো না, শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতে।

ঐতিহাসিক বিবর্তনের এই স্তরে, বেদ-পাঠের ঘরে কেউ ঢুকলো কি না ঢুকলো, ইতিহাসের বিচারে সেটা অতি তুচ্ছ কথা। ঘরে না ঢুকেও, বেদপাঠ বিষয়ে "প্রাচীন রীতি" অনুযায়ী অব্রাহ্মণের বৈদিক মন্ত্র না-শোনার যে-পাঁচিল দীর্ঘকাল ধ'রে গ'ড়ে উঠেছিল, তাকে একদম টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙে দেবার ব্যবস্থা করলেন রামমোহন ব্রাহ্মসমাজে। কাজটা কি খুব "যৎসামান্য" —আজকের নয়, তখনকার বেদবিহীন মনু-পরাশর-শাসিত বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে?

॥ প্রধানত হিন্দুশাস্ত্র ॥

খ-৩(/০)। যে-হেতু ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ছিল "বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের" মানুষের "মিলন-কেন্দ্র" হওয়া, সুতরাং সেখানে "প্রধানত হিন্দুশাস্ত্র" থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হ'ত, উদারভাবাপন্ন অসাম্প্রদায়িক ওদুদ সাহেব এটাকে রামমোহন অথবা তাঁর সহকর্মীদের পক্ষে "কাজের" দিক থেকে "যৎসামান্য" ভেবেছেন। এই ভাববার কারণ, রামমোহনের ইতিহাস-জ্ঞান বা সংস্কার-প্রণালীর কথা হিসেবের মধ্যে আনেন নি। রামমোহন কেবল বিবিধ ধর্মের তত্ত্বই জানতেন তাই নয়, এ-দেশের এবং য়োরোপের ইতিহাসের সঙ্গেও যে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তাঁর নিজের লেখা থেকেই তার প্রমাণ আছে।

"প্রধানত হিন্দুশাস্ত্রের" ব্যাপারটা বুঝতে গেলে গোড়ায় জানতে হবে, কেন এবং কাদের জন্য রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে হিন্দু-শাস্ত্রের সম্বন্ধ কি। বিষয়টি বিরাট, সংক্ষেপে লিখছি।

সে-সময়ে এদেশে ক্রীশ্চান ও মুসলমান সমাজে একেশ্বরবাদ ছিল। শুধু হিন্দু-সমাজে, বিশেষভাবে বাংলায়, পুরাণ ও তন্ত্র ধর্মের প্রাবল্য। সুতরাং, ইতিহাসের প্রথম স্তরে এই একেশ্বরবাদের মধ্যে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়গুলিকে মিলিত ও সংহত ক'রে একটা জাতিগঠনের উদ্দেশ্যেই রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

মিলিত সংঘবদ্ধ হিন্দুজাতি একেশ্বরবাদী হ'লে, ইতিহাসের দ্বিতীয় স্তরে, একেশ্বর-বাদী হিন্দুর পক্ষে একেশ্বরবাদী মুসলমান ও ক্রীশ্চানের সঙ্গে মিলন সহজ হবে, এবং তখন, বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের সমন্বয়ে একটি প্রবলশক্তিশালী ভারতীয় মহাজাতি গ'ড়ে উঠবে। এইখানেই রামমোহনের ইতিহাস-জ্ঞান।

ফরাসী বিপ্লবের পরে পাশ্চাত্ত্য দেশে যে নব-জাতীয়তা ও নেশন্-বোধ গ'ড়ে উঠছিল (এ-দেশে সে-সময়ে যার সম্পূর্ণ অভাব ছিল), সে-বিষয়ে ফরাসী-বিপ্লব-ভক্ত ও ভল্‌টেয়ার-ভক্ত অথচ ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় পূর্ণ সজাগ ছিলেন, এবং তাঁর ধর্মসংস্কারের যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য স্থাপন, অর্থাৎ জাতিগঠন, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁর লেখার মধ্যেই রয়েছে।

সুতরাং গোড়ায়, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হিন্দু-

সমাজকে একেশ্বরবাদের মধ্যে মিলিত ও সংহত করবার জন্য যে-ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, সেখানে "প্রধানত হিন্দুশাস্ত্র" থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা হবে, এইটেই স্বাভাবিক ও যুক্তি-সংগত, এবং এইটেই রামমোহনের বিশিষ্ট সংস্কার প্রণালী। একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য তিনি খ্রীশ্চানের কাছে কোরাণ-প্রতিপাদ্য আল্লার অথবা মুসলমানের কাছে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের যুক্তি দিতেন না। যার ধর্ম তার কাছে তারই ধর্মের শাস্ত্রপ্রমাণ, এই ছিল রামমোহনের নিজস্ব এবং ঐতিহাসিক সংস্কার-প্রণালী, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে রামমোহনের আগে অথবা পরে, আজ পর্যন্ত কোনো ধর্ম-সংস্কারকই যে-প্রণালী অবলম্বন করেন নি। অতএব, ব্রাহ্মসমাজে প্রধানত সমবেত হিন্দুদের কাছে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই "প্রধানত হিন্দুশাস্ত্র" পাঠ ও ব্যাখ্যা। এখানে বৎসামান্যের প্রশ্নই অবান্তর।

তাই যদি হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজে যদি প্রধানত হিন্দুদের জন্য হিন্দুশাস্ত্র পাঠই হয়, তবে সে-ব্রাহ্মসমাজ "বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের" মানুষের মিলন-কেন্দ্র হয় কি ক'রে? মনে হয়, এইখানেই অসাম্প্রদায়িক উদার ওদুদ সাহেবের প্রধান খট্‌কা। এই খট্‌কা লাগা খুবই স্বাভাবিক, কারণ পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত ধর্মসংস্কারকদের সঙ্গে রামমোহনের পার্থক্য এবং হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে যে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষের মিলনের কোনো বিরোধ নেই, এই দুটো জিনিস তিনি তলিয়ে দেখেন নি। হিন্দুশাস্ত্র বা হিন্দুধর্ম বল্‌তেই সাম্প্রদায়িকতা বোঝায় না।

॥ হিন্দুশাস্ত্রে বিশ্বজনীনতা ॥

রামমোহন রায়ের ১৭৫১ শকে (১৮২৯ খৃঃ) লেখা একটি ইংরেজী পুস্তিকা আছে, তার নাম, Religious Instructions Founded on Sacred Authorities. বইটির নামের ওপর তিনি নিজেই বড়ো বড়ো অক্ষরে পরিচয় দিয়েছেনঃ UNIVERSAL RELIGION.

পুস্তিকাটির দুটি অংশ। প্রথম অংশে একেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে উপদেশ। তাতে বলছেন, **সব জাতির ও ধর্মের লোকেই** এই উপাসনায় যোগ দিতে পারেন। নবম প্রশ্ন হ'ল, কিভাবে এই উপাসনা করা যায়? জবাবে অন্যান্য কথার মধ্যে বল্‌ছেন, এই দৃশ্যজগতের স্রষ্টা ও পাতাই যে পরম উপাস্য সেই কথা মনে রেখে সেই ধারণাটি যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে যাচিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয় অংশে ঐরূপ অনেকগুলি শাস্ত্রবাক্য আছে।

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল, এই সবগুলি শাস্ত্রবাক্যই সংস্কৃতে ছাপা ও "হিন্দু শাস্ত্র" থেকে নেওয়া, যেমন কঠ, কেন, মণ্ডূক, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, গৌড়-পাদাচার্যকারিকা, গীতামৃত প্রভৃতি। আর কোনো ধর্মের শাস্ত্রবাক্যই এই উপাসনা-বিষয়ক উপদেশে উদ্ধৃত হয়নি। অথচ বলছেন, সকল জাতি ও ধর্মের লোকেই এতে যোগ দিতে পারেন এবং এর পরিচয় দিচ্ছেন, 'ইউনিভার্স্যাল রিলিজ্যন।' সকল জাতি ও ধর্মের জন্য এই উপাসনার উপদেশে যেমন শুধু হিন্দুশাস্ত্রই উদ্ধার করছেন, দেখা যাচ্ছে 'বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের' মানুষের মিলন-কেন্দ্র তাঁর ব্রাহ্মসমাজেও প্রায় সেই একই ব্যবস্থা করছেন।

সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, হিন্দু-শাস্ত্রের সঙ্গে 'ইউনিভার্স্যাল রিলিজ্যন' বা বিশ্বজনীন ধর্মের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, অন্তত সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রামমোহন রায় তাই মনে করতেন। যোগটা কোথায়?

প্রত্যেক ধর্মেরই দুটি দিক আছে। একটি সম্প্রদায়গত ও দেশগত বা 'কমিউন্যাল' ও 'রিজ্যন্যাল', অপরটি বিশ্ব-জনীন বা 'ইউনিভার্স্যাল'। 'কমিউন্যাল' বা 'রিজ্যন্যাল' দিকের মধ্যে নিহিত আছে ধর্মে-

ধর্মে মিলনের আসন বিস্তৃত। রামমোহনের 'ট্রু ক্রীশ্চান' ও গান্ধীজীর 'সৎ-মুসলমান' ও 'সৎ-হিন্দু' হল ধর্মের এই 'ইউনিভার্স্যাল' দিক। রামমোহন গিয়েছিলেন যুক্তি ও শাস্ত্রের দিক থেকে, গান্ধীজী গিয়েছিলেন হৃদয়ের দিক থেকে। লক্ষ্য একই।

আস্তিক হিন্দুশাস্ত্রে প্রধানত বেদান্ত হল তার 'ইউনিভার্স্যাল' দিক। এই বিশ্বজনীন বা একেশ্বরবাদী বেদান্তের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-ক্রীশ্চান, সর্ব ধর্মের মানুষের মিলনের কোনো বাধা নেই। যেজন্য ক্রীশ্চান-আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুর বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদী বেদান্ত-ধর্ম প্রচার করেছিলেন, পৌরাণিক ধর্ম প্রচার করেন নি এবং নিবেদিতার কাছে বলেছিলেন, বেদান্ত-প্রচার বিষয়ে তিনি রামমোহনেরই ছক-কাটা পথ অনুসরণ করছেন।

রামমোহনের ধর্মসংস্কারের মূল সূত্র

সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের ও সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেই জানেন যে, নবাগত ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে স্থানীয় পুরাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির অনেক আচার অনুষ্ঠান মিশে যায়। মহেঞ্জোদাড়ো হরাপ্পা দ্রাবিড় প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনেক আচার-অনুষ্ঠান এইভাবে বহিরাগত বৈদিক ও পরবর্তী ধর্মের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এইচ জি ওয়েলস বলেন, প্রাচীন পারসিক মিত্র-পূজার কোনো কোনো অংশ খ্রীষ্ট-পূজোর কোনো কোনো অনুষ্ঠানের আংশিক হয়ে গিয়েছে।

ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও পারিপার্শ্বিকের দ্বারা প্রভাবিত এই সব স্থানীয় আচার-অনুষ্ঠানকেই কালে কালে সেখানকার লোক 'ধর্ম' বলে ধরে নিয়েছে এবং এদের কেন্দ্র করেই এক-একটা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে ও সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে লড়াই বেধেছে।

সেইজন্যেই রামমোহন রায় দেশকালের দ্বারা আবদ্ধ বৈদিক 'ক্রিয়াকাণ্ড'কে অতিক্রম করে দেশকালাতীত অথচ সর্বদেশের ও সর্বকালের গ্রাহ্য বৈদিক 'জ্ঞানকাণ্ড' বা বিশ্বজনীন বেদান্তকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন; অথবা দেশকালের দ্বারা প্রভাবিত ক্রীশ্চান **মতবাদকে** অতিক্রম করে তার অন্তর্নিহিত সর্বদেশ ও সর্বকালগ্রাহ্য যীশুর যে বিশ্বজনীন উপদেশাবলী, সেই-গুলোই গ্রহণ করেছিলেন।

রামমোহনের ধর্ম-সংস্কারের মূল সূত্র ছিল প্রত্যেক ধর্মের 'কমিউন্যাল' ও 'রিজন্যাল'-এর 'এহ বাহ্য'কে বাদ দিয়ে তার অন্তর্নিহিত 'ইউনিভার্স্যাল'কে উদ্ধার করে দেখিয়ে দেওয়া যে, জগতের সকল ধর্মের সকল জাতির মানুষেই **ধর্মান্তর গ্রহণ না করে** নিজ নিজ ধর্মকে আশ্রয় করেই মনে করতে পারে, তাদের সকলের পৃথক ধর্মগুলি **একই** কেন্দ্রাভিমুখী, সুতরাং তারা সবাই **একই** বৃহৎ মানব পরিবারভুক্ত। এই জগদ্ব্যাপী 'একটি মানব পরিবার' কথাটাই রামমোহন রায় ব্যবহার করে গিয়েছেন আজ একশো পঁচিশ বছর আগে, যেদিকে আজ জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গতি এগিয়ে চলেছে।

সুতরাং রামমোহনের **ব্রাহ্মসমাজে** বিশ্বজনীন **বেদান্ত** প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে **বেদান্ত-প্রধান** "হিন্দু-শাস্ত্র" পাঠ ও ব্যাখ্যার সঙ্গে "বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের" মিলন-কেন্দ্র হওয়ার কোনো অসঙ্গতি নেই।

॥ "কিছু" পাঠ ও ব্যাখ্যা ॥

৩(৵০)। এই বেদান্ত পাঠকে ওদুদ সাহেব 'কিছু' বলে তুচ্ছ করেছেন। কিন্তু কলকাতার শহরে একটি প্রকোষ্ঠে রাম-মোহন রায় প্রায় ১৩০ বছর আগে বেদবর্জিত বাংলায় সেই যে বেদান্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা শুরু করে দিয়েছিলেন, সে-বেদান্ত আজ ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার ঘরে ঘরে, সারা ভারতে, পাহাড় জঙ্গল সাগর নদী ডিঙিয়ে সুদূর ইংলণ্ডে আমেরিকায় ফ্রান্সে জার্মানীতে, সারা দুনিয়ায়।

বিজয়-অভিমানী পশ্চিম সেদিন বাইবেল-হাতে এদেশে এসে এদেশের মানুষকে 'অন্ধকার থেকে আলোকে' নিতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল রামমোহনের হাতে সাগরের তলা থেকে তোলা ঐ অত্যুজ্জ্বল রত্নের দীপ্তিতে, "হিন্দুশাস্ত্রের" বিশ্বজনীন বেদান্তের ঐ ভাস্বরতায়। সেই বেদান্তই সেদিন এদেশে বিজয়-গর্বিত পশ্চিমের খ্রীষ্টানী অভিযানকে বহুল পরিমাণে প্রতিহত করেছিল।

ব্রাহ্মসমাজের "অপর একটি কক্ষে" সেদিন বৈদান্তিক "হিন্দুশাস্ত্র" থেকে পাঠ যদি 'কিছু' হয়, 'যৎসামান্য' হয়, তবে অসামান্য কাকে বলে আমি জানি না।

'কিছু' পাঠ ও ব্যাখ্যার মধ্যে এখানে ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটি কথা বলা দরকার। কারণ ইতিহাসের দিক থেকে এর তাৎপর্য 'যৎসামান্য' তো নয়ই, বরং তার উল্টো। শুধু একটা কথা বললেই যথেষ্ট হবে—ব্যাখ্যাটা বাংলায় হত। তাৎপর্যটা ব্যাখ্যার নয়, ভাষার মাধ্যমের। বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যা দেবভাষা সংস্কৃত না হয়ে প্রকাশ্য সভার মধ্যে লৌকিক ভাষায় হওয়ার দৃষ্টান্ত **বেদ-বেদান্তের জন্মকাল থেকে আজ পর্যন্ত সারা ভারতে সর্বপ্রথম প্রবর্তন করলেন রাজা রামমোহন রায়।**

বুদ্ধদেব তাঁর ধর্ম প্রচারের জন্য লৌকিক ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ঐ ভাষায় বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যা করেন নি। বাংলার অতো বড়ো বিপ্লবী ধর্ম-প্রবর্তক চৈতন্যও কখনো বাংলা ভাষায় বেদান্ত ব্যাখ্যা করেন নি। সর্বসাধারণের বোধগম্য লৌকিক ভাষার মাধ্যমে বেদান্ত প্রচারের জন্য শঙ্কর রামানুজ বল্লভ নিম্বার্ক থেকে শুরু করে

নানক কবীর দাদূ তুলসীদাস অদ্বৈত চৈতন্য পর্যন্ত কেউ যা করেন নি বা করতে পারেন নি, রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজে লৌকিক ভাষায় বেদান্ত ব্যাখ্যার দ্বারা সেই 'কিছু'র প্রবর্তন করে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতরের মধ্যে 'কিছু'র চেয়ে কতো বড়ো মানস-চেতনার উদ্বোধন করে দিয়ে গেলেন, তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে গত শতাব্দীতে বাংলার নব জাগরণের ইতিহাস থেকে।

বাংলা ভাষায় বেদান্ত ব্যাখ্যার ঐতিহাসিক তাৎপর্য খানিকটা বোঝা যাবে য়োরোপে ইংরেজ ফরাসী জার্মান প্রভৃতি লৌকিক ভাষায় লাতিন বাইবেলের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এবং সমসাময়িক ও পরবর্তী খ্রীশ্চান সমাজের ওপর তার গভীর প্রভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য থেকে। ঐ 'কিছুই' য়োরোপে একটি ব্যাপক ধর্মীয় বিপ্লবের গোড়া পত্তন করেছিল।

॥ 'কিছু' ধর্মসংগীত : সাহিত্যে ॥

৩(খ)। পাঠ ও ব্যাখ্যার মতো ব্রাহ্মসমাজে রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মসংগীতকেও ওদুদ সাহেব 'কিছু' বলে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। অথচ বাংলার সংস্কৃতির নব জাগরণের ইতিহাসে ঐগুলির অন্তত দুটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে, যা 'কিছু' বা 'যৎসামান্য' নয়।

ধর্ম এবং ধর্মীয় মনকে আশ্রয় করে যেসব সাহিত্য বাংলা ভাষায় গড়ে উঠেছিল, যেমন দোঁহা, বৈষ্ণব পদাবলী, রামপ্রসাদী, কালী কীর্তন, মনসামঙ্গল প্রভৃতি, সেগুলি সাহিত্য-সমালোচক ও সাহিত্য ইতিহাস-কারেরা সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

গত শতাব্দীতে ঠিক তেমনি একটা নূতন ধর্ম আন্দোলনকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যে আর একটি যে বিশিষ্ট ধারা গড়ে উঠেছে—ব্রহ্মসংগীত—যার পূর্ণ পরিণতি রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদে; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, মহারাজ মহতাব চাঁদ, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত (লোকসংগীত রচয়িতা), কাঙাল হরিনাথ, ভক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বহু বহু রচয়িতা হাজারের উপর একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর সংগীতে কীর্তনে যে বিপুল ধারাকে পুষ্ট করেছেন, কোনো সাহিত্য-সমালোচক সাহিত্যিক দৃষ্টিতে আজ পর্যন্ত এই ধারার আলোচনা করেন নি। সেই আলোচনা হলে তখন এই ধারার গোমুখী রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজের ঐ 'কিছু' ধর্ম-সংগীতের—ঐতিহাসিক মূল্য বোঝা যাবে, সাহিত্যের দিক থেকে। আপাতত সেকথা বাদ দিলাম। এ ছাড়াও ঐ 'কিছু' ধর্মসংগীতের দুটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে :

॥ 'কিছু' ধর্মসংগীত : সমাজ-সংস্কারে ॥

প্রথম। ঐ সংগীত ব্রাহ্মসমাজে গান করতেন, দুজন হিন্দু কেষ্ট ও বিষ্ণু। সংগত করতেন একজন মুসলমান। তাছাড়া 'এশিয়াটিক জার্নাল' পত্রিকার একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজে খ্রীশ্চান ইউরেশীয় ফিরিঙ্গীরা খ্রীশ্চান ভজন—ডেভিডের সাম (psalms) গান করতেন। অষ্টাদশ শতকের পরি-প্রেক্ষিতে রামমোহনের এই 'যৎসামান্য' ব্যবস্থাটি একবার মানস-দৃষ্টিতে দেখতে অনুরোধ করি :

ও-পাশের ঘরে বেদজ্ঞ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ উচ্চারণে দেবভাষায় বেদপাঠ করছেন; মাঝখানে খোলা দরজায় হাওয়ায় দুলছে একটি পাৎলা পর্দা; আর এ-পাশের ঘরে ঐ বেদপাঠক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের পূর্ণ-শ্রুতিগোচরে এবং সমবেত নিষ্ঠাবান হিন্দু-

সমাজের পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, এমন কি, মুসলমান ও কৃশ্চান শ্রোতাদের কাছে লৌকিক ভাষায় বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যা হচ্ছে, অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ব্যঙ্গের ভাষায় "হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান" বিলনো হচ্ছে; হিন্দুতে উচ্চাঙ্গের ব্রহ্ম-সঙ্গীত গান করছে, মুসলমান সঙ্গত করছে, খৃষ্টানে খৃষ্টানী ভজন গাইছে: "প্রাচীন রীতি'র প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে।

জায়গাটা গানের জলসা নয়, হিন্দু উপাসনা মন্দির। সময়টা আজকের নয়, ১৩০ বছর আগে। ব্যাপারটা এতই 'বৎসামান্য' যে, রামমোহনের আগে সারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দুসমাজের বুকের উপর বসে এই অভাবনীয় কাণ্ডটি সংঘটিত করার মতো বুকের পাটা হয়নি হিন্দুসমাজের আর কোনো ধর্মসংস্কারকের। আজ ১৩০ বছর পরেও কাশীতে, হরিদ্বারে, কামাখ্যায়, পুরীতে, কালীঘাটে, দাক্ষিণাত্যে যেসব প্রাচীন হিন্দু মন্দির আছে, তার কটার মধ্যে, বিগ্রহের সামনে বসে মুসলমানে সঙ্গত করতে পারে, খৃষ্টানী ভজনের কথা না-হয় বাদই দিলাম?

॥ বঙ্গসংগীতে রামমোহন ও ব্রহ্মসমাজের স্থান ॥

দ্বিতীয়। সাহিত্যিক দিক থেকে ব্রহ্ম-সঙ্গীতের উল্লেখ আগেই করছি। এবার সাংগীতিক দিক থেকে রামমোহনের ঐ

'কিছু' ধর্ম-সংগীতের কিছু আলোচনা করা যাক্‌।

আজ দেশময় সংগীত প্রতিযোগিতায়, সংগীতের ও সংস্কৃতির আসরে, বৃহত্তর সংগীত সম্মেলনে, সংগীত কনফারেন্সে ও কংগ্রেসে, রেডিওতে, গ্রামোফোন রেকর্ডে 'ক্ল্যাসিক্যাল' সংগীতের ছড়াছড়ি। রেডিওতে রাগসংগীত ও রাগপ্রধান সংগীত আজ একটা 'ফীচার।'

কিন্তু ভুলেও কেউ একবার ভাবে না, উল্লেখও করে না যে, আধুনিক বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় এই 'ক্ল্যাসিক্যাল' ধারার প্রবর্তনে রামমোহন রায়ের এবং ব্রাহ্ম-সমাজের স্থান কোথায়। **বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ সংগীতের প্রথম রচয়িতা ও প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়।** *

বাহাদুর শা বাদশার আমলে সদারং কর্তৃক খেয়াল প্রবর্তিত হবার পরে এদেশ থেকে, এদেশের প্রাচীন সংগীতের ভিত্তি-স্বরূপ যে ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ, তার প্রচলন বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে যেমন জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চাননের মতো মহামহোপাধ্যায়েরা বিদ্যমান থাকতেও বাংলা ভাষার 'মুখবন্ধ' জলাশয়ের মুখ প্রথম খুলে দিলেন "উপপ্লবকর্তা মহাত্মা রামমোহন রায়", ঠিক তেমনি, সদারং-এর পর মুখবন্ধ ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদের মুখ প্রথম খুলে দিলেন ঐ একই রামমোহন রায়, ব্রাহ্মসমাজে ঐ 'কিছু' ধর্ম-সংগীতের দ্বারা।

রামমোহনের গ্রন্থাবলী থেকে দেখা যাবে, তাঁর রচিত সংগীতগুলি পূর্বতন সংস্করণ-গুলিতে ধ্রুবপদ, চিতান ও অন্তরা, এইভাবে শাস্ত্রীয় অঙ্গ ভাগ করা আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে গানগুলিতে যেসব তালের উল্লেখ আছে, তার অধিকাংশই ধ্রুপদের তাল। কিছু খেয়ালের তালও আছে। তা ছাড়া, রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজে ঐ 'কিছু' ধর্ম-সংগীতের সঙ্গে পাখোয়াজ ও তবলা বাজতো। ধ্রুপদেরই সংগত হত পাখোয়াজ।

বাংলার নব জাগরণের সূত্রপাতে, ধর্ম ও ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রামমোহন রায় যেমন বাংলার সমাজে ও সাহিত্যে 'রোমান্টিক' পুরাণ ও 'মিস্টিক' তন্ত্রের ও মরমিয়া ধর্মের জায়গায় নিয়ে এলেন বেদ-বেদান্তের 'ক্ল্যাসিক্যাল' ধারা, বাংলা গদ্যে যেমন সৃষ্টি করলেন একটা 'ক্ল্যাসিক্যাল' গম্ভীর শৈলী, তেমনি ব্রাহ্মসমাজের ঐ 'কিছু' ধর্ম-সংগীতের মারফৎ বঙ্গ-সংগীতের ইতিহাসে রামমোহন কর্তৃক প্রথম সূত্রপাত হল 'ক্ল্যাসিক্যাল' ধ্রুপদের।

রামমোহন কর্তৃক বাংলার রেণেশাঁসের তিন কোণে, শাস্ত্রে, সাহিত্যে, সংগীতে 'ক্ল্যাসিসিজমের' তিনটি 'কর্ণার-স্টোন' বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। ব্রাহ্মসমাজের ঐ 'কিছু' ধর্ম-সংগীতের এই সব কাজকে যদি কেউ 'যৎসামান্য' বলে উড়িয়ে দিতে চান, তবে আমি নাচার।

রামমোহনের পরে বাংলা ভাষায় ব্রহ্ম-সংগীতের এই 'ক্ল্যাসিক্যাল' ধারাকে বজায় রেখেছিলেন পাখোয়াজ সহযোগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে ও ঠাকুর-বাড়িতে। ঐখান থেকেই রবীন্দ্র-সংগীতের যাত্রা শুরু, এবং এই ধারারই অঙ্গ হলেন যদু ভট্ট।

॥ উপসংহার ॥

যদি বিচারে কোথাও ভুল হয়ে থাকে, আশা করি, ওদুদ সাহেব কৃপা করে তা দেখিয়ে দেবেন। ওদুদ সাহেব রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, শুধু ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীটা একটু বদলে নিলেই রাম-মোহনের ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ—যৎসামান্য কি যৎসামান্য নয়—একেবারে বদলে যাবে। যুক্তি ও ঐতিহাসিক বিচারের কষ্টিপাথরে শ্রদ্ধাকে যাচাই না ক'রে নিলে সে-শ্রদ্ধার মূল্য অনেক ক'মে যায়।

আজকের দিনে বেদপাঠ বাংলা দেশের সর্বত্রই হচ্ছে এবং ব্রাহ্মণ শূদ্র সবাই পাশা-পাশি ব'সে শুনছে! আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এ-কাজ নিশ্চয়ই যৎসামান্য। কিন্তু সে-যুগে?

আজকের দিনে বাংলা ভাষায় বেদান্ত-ব্যাখ্যা কলকাতার অলিগলিতে। বাংলা অক্ষরে ছাপা বেদান্তের বইয়ে বাংলার বাজার ছেয়ে গিয়েছে। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এ-কাজ নিশ্চয়ই যৎসামান্য। কিন্তু সে-যুগে?

আজকের দিনে বাংলায় ধ্রুপদ গান খুব সাধারণ না হ'লেও খুব অসাধারণও নয়। কিন্তু সে-যুগে?

রামমোহন সম্পর্কে এরকম বহু উদাহরণই দেওয়া যায়।

এ-যুগের নয়, সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে পাওয়া যাবে, রামমোহনও তাঁর প্রতিটি কাজের—ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার ও তার ব্যবস্থারও—প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ।

এই পরিপ্রেক্ষিত ছাড়াও ইতিহাসের আধুনিক পদ্ধতিতে আরো অনেক কিছু বিচার করবার প্রয়োজন হয়। সেগুলি বর্তমান প্রবন্ধে বাদ দিলাম।

বিশাল বটবৃক্ষের বীজ আকারে অত্যন্ত ছোট বা "কিছু" ব'লেই এবং ভানুমতীর ভেল্‌কীর মতো নিমেষের মধ্যে ডালপালা মেলে তাক্‌ লাগিয়ে দিতে পারে না ব'লেই সে-বীজ "যৎসামান্য" নয়। ইতিহাস ভানু-মতীর খেলা নয়। ব্রাহ্মসমাজে বা দেশের মধ্যে রামমোহনের প্রত্যেকটা "কাজ" বীজাকারে ভাবী নবজাগরণের বহুমুখী উৎস-ধারার মুখ কি-ভাবে খুলে দেবার গোড়াপত্তন করেছিল, সেইটেই বিজ্ঞান-সম্মত "কাজের" প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ।*

---

* লেখক বোধহয় লক্ষ্য করেননি, সংগীত-নায়ক ও ধ্রুপদাচার্য শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আগেই বলেছেন, "বাংলা দেশ এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজ সংগীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রচারে যে সাহায্য করিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। মহাত্মা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসভা'র উপাসনায় সংগীত অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। উপাসনায় গীত ব্রহ্মসংগীত অধিকাংশই ধ্রুপদাঙ্গ। এই সকল গানের রাগরূপ ও তাল শুনিয়া পুরাতন সংগীত-সংস্কৃতির দিকে জনগণের চিত্ত আকর্ষিত হয় এবং শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজে উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রচলন আরম্ভ হয়। সমগ্র ভারতে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী এই মহৎ কার্যে অগ্রণী। বাঙ্গলার আদর্শ অবলম্বনে বোম্বাই ও অন্যান্য প্রদেশ এই কার্যে ব্রতী হয়।" (গীত-প্রবেশিকা, তৃতীয় সং, ১৩৬০, পৃ ১০২)। সম্পাদক, দেশ।

* বর্তমান প্রবন্ধটি গত শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ বিষয়ে ওদুদ সাহেবের বিখ্যাত পুস্তক সম্পর্কে নয়। বইখানি এখনো আমার দেখবার সুযোগ হয়নি। এই প্রবন্ধ শুধু 'দেশ' পত্রিকায় রামমোহন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য প্রসঙ্গে। —লেখক।
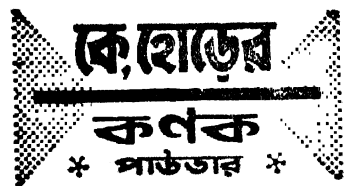
॥ উনিশ ॥

"অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে জন্ম নেয় সামাজিক অবস্থা। সামাজিক অবস্থা থেকেই গড়ে ওঠে রাজনৈতিক কাঠামো।" —জি, এম, ট্রেভেলিয়ন।

"মাত্র এক রকমের রাজনীতি আছে। তার নাম ক্ষমতার রাজনীতি" —জেমস্ বার্ণহাম।

"অমীমাংসিত সমস্যা কোন দেশের ঔদাসীন্যের মুখ চেয়ে সমাধানের জন্য অপেক্ষা ক'রে বসে থাকে না" —এডমাণ্ড বর্ক।

সমস্ত আরবভূমির অন্তর আজ গভীর আলোড়নে অস্থির। ইরাক থেকে আডেন পর্যন্ত, অতলান্তিক থেকে আরব সাগর পর্যন্ত আট কোটি মানুষের এই ক্ষুধার্ত অস্থিরতা বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বারো বছরে এশিয়া মোটামুটি স্থির ও বিবর্তনপন্থী জীবনের সন্ধান পেয়েছে। চীন বেছে নিয়েছে সাম্যবাদের পথ, ভারত শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজবাদের পথ। পরাস্ত জাপান ধীরে আস্তে স্বাধীন জাতিসভায় আপনার স্থান ফিরে পেয়েছে। একদা কোরিয়ায় তৃতীয় মহাসমরের আগুন জ্বলে উঠতে শুরু করেছিল; আজ সে ভয় আর নেই। এ বছরেই সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া থেকে প্রায় পূর্ণ বিদায় গ্রহণ করবে; তার রাজনৈতিক পতাকা উড়বে শুধু বোর্নিও ও সারাওয়া দ্বীপে। সাম্যবাদী চীন ও সমাজ-বাদী গণতান্ত্রিক ভারতের মধ্যে উন্নততর জীবনমানের প্রতিযোগিতাই পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান ঘটনা, একালের ও ভবিষ্যৎ কালের।

পশ্চিম এশিয়া আরবভূমি। এখানে মাটির নীচে বর্তমান সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ারঃ তেল। তিনটি মহাদেশ এখানে আলিঙ্গনা-বদ্ধ। তাই আরবভূমিতে নেমে এসেছে শীতল যুদ্ধের ঘোর কৃষ্ণ ছায়া। একদা যে বৃটিশ শক্তি সম[illegible]আরবদেশে সার্বভৌম ছিল, আজ অস্তমিত। ১৯৫৬ সালের প্রথম শীতে মিশর আক্রমণ ক'রে সে তার সাম্রাজ্য-গৌরবের সমাধি দিয়েছে। কিন্তু অপসৃত বৃটিশ শক্তির পরিত্যক্ত আসন দখল ক'রে বসেছে বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিঃ আমেরিকা। মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ তেল-সম্পদের অধিকাংশ বর্তমানে মার্কিন অধিকৃত। এ অধিকার স্বভাবতই সহজে কোন শক্তি পরিত্যাগ করতে চাইবে না। সোভিয়েত রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের দ্বিতীয় প্রধান প্রার্থী। এখান-কার এক ফোঁটা তেলও রাশিয়া পায় না। কিন্তু রুশ রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমবর্ধমান। যতোটা না শাসকদের উপর, ততোটা শাসিতের।

ইতিহাসের গোড়া থেকেই আরবজাতির নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী দাবী তুলেছে মিশর ও ইরাক। একদা ইসলামের কীর্তিভূমি ছিল বাগদাদ; তার সভ্যতা সম্পদের প্রধান কেন্দ্র। পুরাতন মেসোপটামিয়া বিরাট ঐশ্বর্যময় সভ্যতার ধাত্রী; ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস পৃথিবীর সামান্য কয়েকটি সভ্যতাবাহিনী নদীর মধ্যেও গৌরবময়ী। ইসলামের প্রথম দিকে তার প্রধান কেন্দ্র ছিল ডামাস্কাস; কিন্তু অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু ক'রে সুদীর্ঘ পাঁচশত বছর বাগদাদ আরব-জয়-যাত্রার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেরণার শ্রেষ্ঠ উৎসে পরিণত হয়। ১২৫৮ সালে চেঙ্গিস খাঁর দুর্ধর্ষ বর্বর মঙ্গোল বাহিনী বাগদাদ শহর ভেঙে চুরে জ্বালিয়ে দেয়; অনেক সম্পদ ও শিল্পকলার সঙ্গে ধ্বংস হয় হাজার হাজার মূল্যবান পুঁথি। সেই থেকে আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে গ'ড়ে ওঠে কাইরো।

যতোদিন মিশরে মহম্মদ আলী রাজবংশের
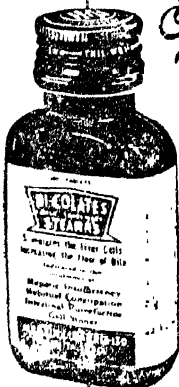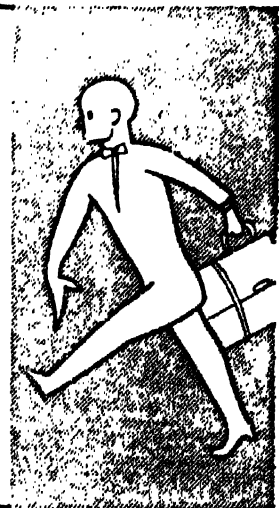
১৯৫৪ সালে প্রধান মন্ত্রী নাসের অ্যাংলো-মিশর চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন। বাঁ দিকে বৃটেনের অ্যাণ্টনী নাটিং

শাসন ঘাঁটি ছিল, আরবভূমির রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রে একটা আপাত-সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। আগেই আমরা দেখেছি, প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে যে আরব জাতীয়চেতনার জন্ম, তার রাজনৈতিক দাবী ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ আরবজাতি ও রাষ্ট্র গঠন, যার নির্বাচিত রাজা হবেন শেরিফ্ হুসেন। হেজাজের এই অসমসাহসী দলপতি ১৯১৬ সালের ২৯শে অক্টোবর "সমস্ত আরব দেশের রাজা" উপাধি পর্যন্ত গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধকালীন যে সমঝোতা হয় তাতে বর্তমান ইরাক থেকে প্যালেস্টাইন পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ ঐক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সৌদী আরবের নৃপতি হলেন আবদুল আজিজ; ইরাকের নৃপতি হলেন হুসেনপুত্র ফয়জল। লেভান্ট, অর্থাৎ বর্তমান সিরিয়া ও লেবানন, রইলো ফরাসী দখলে। প্যালেস্টাইনের গা-ঘেঁষে বেদুইন উপদল অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে ইংরেজের ছত্রছায়ায় আর একটি উপরাজ্য গঠিত হল; ট্রান্সজরডান। তার 'নৃপতি' হলেন শেরিফ হুসেনের অপর পুত্র আবদুল্লাহ্। মক্কাধিপতি শেরিফ্ হুসেন ছিলেন প্রফেট মহম্মদের দৌহিত্র হাসেমের বংশধর; তাঁর দুই পুত্র ও ফয়জল ও আবদুল্লাহ্ ইরাক ও ট্রান্সজরডানের অধিপতি হওয়ায় এই দুইটি রাজাকে বলা হয় হাসেমী রাজা। আবদুল আজিজ ছিলেন হাসেমী-বিরোধী। তাই সৌদী আরবের রাজবংশকে বলা হয় "অ্যাণ্টি-হাসেমী"। বর্তমান যুগের মধ্যপ্রাচ্যেও এই দুটি বংশগত সংজ্ঞা প্রচলিত। তাই মোটা-মুটি এ প্রভেদটা বুঝে রাখা দরকার।

সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ মিশরকে আরব-দেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই একটা বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মিশরের স্বরাজ সংগ্রামের সার্থকতা সমস্ত আরব-ভূমির অন্যতম প্রধান কাম্য হয়ে উঠেছিল। ১৯০৮ সালে নব্য তুর্কী বিদ্রোহ, ১৯০৫ সালে জাপানের হাতে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয়, ১৯১০ সালে বঙ্গভঙ্গ নিয়ে ভারতীয় কংগ্রেসের দেশ-কাঁপানো আন্দোলন; এশিয়ার নবজাগরণের কয়েকটি প্রধান ঘটনা। মিশরের স্বাধীনতা দাবী সমর্থন করে দ্বিতীয় দশক থেকেই ভারতীয় কংগ্রেস বাৎসরিক অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ করতে শুরু করে। মিশরের সংগ্রাম এইভাবে এশিয়ার নবজীবন দাবীর অন্যতম প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়।

আরবদের নির্বাসন দিয়ে, মহম্মদ আলী রাজবংশের দুঃশাসনের উপর যবনিকা টেনে মিশরকে সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রে পরিণত করে নাসের শুধু যে কায়রোকে মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রসরের প্রধান কেন্দ্রে গড়ে তুলেছেন তাই নয়; আরবজাতির হৃদয়ে এনেছেন নতুন প্রেরণা, চোখে নতুন দীপ্তি, বাহুতে নতুন বল। শুধু জনসংখ্যার দিক থেকেই মিশর আরবজাতির এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে ধ'রে রেখেছে। আডেন থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত আরব অঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা সাত কোটিরও কম। তার আড়াই কোটি মিশরে। আলজেরিয়ায় প্রায় এক কোটি; তিউনিশিয়া ও মরোক্কো মিলে আর এক কোটি। লিবিয়ায় পনের লক্ষ। তুলনাক্রমে অন্যান্য আরবদেশের জনসংখ্যা সামান্য: সৌদী আরবে সত্তর লক্ষ, সিরিয়ায় তিন লক্ষ ষাট হাজার; লেবাননে মাত্র এক লক্ষ চল্লিশ হাজার; ইরাকে পঞ্চাশ লক্ষ; জর্ডানে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার; এমেনে প'য়তাল্লিশ লক্ষ এবং সুদানে প্রায় নব্বই লক্ষ।* মিশরের আড়াই কোটি আরব যে পথে চিন্তা করবে, যে জীবন গ্রহণ বা বর্জন করবে, যে লক্ষ্য নিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক লড়াই করবে, সমগ্র আরবভূমিতে তার প্রতিফলন অনিবার্য। যে ঘটনাপ্রবাহ প্লাবিত করবে মিশরের গণমানসে তার ঢেউ নাড়া দেবেই প্রত্যেক আরব দেশের তটভূমি। তাই নাসের তাঁর বিপ্লব দর্শনে বলেছিলেন, "আমরা, শুধু আমরাই, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে, আরব দিগ্‌দর্শনের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারি।"

সুয়েজ সংকটের গোড়া থেকে পশ্চিমী দেশগুলিতে নাসেরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তাঁর উচ্চাশার সীমান্ত স্বশাসিত একটি সুবিশাল আরব সাম্রাজ্য। উত্তর আফ্রিকা থেকে আডেন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। বলা হয়েছে: এই

* New York Time থেকে সংগৃহীত

স্পর্ধার উদ্দেশ্য নিয়েই নাসের আলজেরিয়ার [illegible] ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য ক'রে [illegible] মিশরের [illegible] ব্যর্থ চেষ্টা; [illegible] এনেছেন [illegible] নিচূর্ণ ক'রে। সাম্রাজ্য- [illegible]

[illegible] উদ্দেশ্য।

[illegible]

জায়গায় বলেছেন, "মিশর চায় আরবভূমি থেকে সাম্রাজ্যবাদের ছায়া সম্পূর্ণ অপসৃত হোক; আরবজাতি স্বাধিকারে, স্বনির্বাচিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলুক। মিশর চায় না নেতৃত্ব করতে, সে ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনটাই তার নেই। কিন্তু মিশর চায় তার নিজের চেষ্টায় পাওয়া আত্ম-বিশ্বাস ও আত্মশক্তির বার্তা আরবের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে। যা মিশর পেরেছে, তা সব আরব দেশই পারবে।"

মিশরের আরব-নীতিতে যে উগ্র জাতীয়তাবাদের আগুন রয়েছে তা অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক প্রচারে কাইরো যথেষ্ট তৎপর; কাইরো রেডিয়োর বেতার-ভাষণগুলি বিশেষ ক'রে পশ্চিমী শক্তিদের বিরুদ্ধে আগুন-জ্বালানো উদ্দেশ্যে প্রণীত। শুধু যে ফরাসী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত উত্তর আফ্রিকা—মরক্কো এবং তিউনিশিয়া সমেত—মিশরের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছে তা নয়, আডেন থেকে শুরু ক'রে ইরাক ছাড়িয়ে পারস্য সাগরের গায়ে ছোট ছোট তেল-সমৃদ্ধ বৃটিশ রক্ষিত দেশগুলি পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামীরা কাইরো থেকে পায় প্রেরণা, উৎসাহ এবং হয়তো (বে-সরকারীভাবে) অর্থ ও পরামর্শ। বর্তমান পৃথিবীতে কাইরো সবচেয়ে গরম সাম্রাজ্য-বিরোধী কেন্দ্র; কাইরো বেতার থেকে যতোটা উগ্র ও উষ্ণ সাম্রাজ্য-বিরোধী প্রচার হয় ততটা আর কোথাও থেকে নয়।

এই মারমুখী সাম্রাজ্যবিরোধিতার কয়েকটা বিশেষ কারণ আছে। প্রথমত, মিশরের দীর্ঘ ইতিহাসে নানা বহিঃশক্তির একটানা দাপট; দ্বিতীয়ত, ইংরেজ অকুপেশনে মিশরের সমাজদেহের সর্বনাশা ক্ষয়; তৃতীয়ত, পশ্চিম-সাপেক্ষ নীতি থেকে মিশরের নিরাপত্তার বিপন্নতা; চতুর্থত, বিপ্লবের সীমান্ত দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নেতাদের ঔদার্যে এবং বৃটেনে সহানুভূতিশীল শ্রমিক সরকারের অবস্থিতিতে ইঙ্গ-ভারত সম্পর্ক পুরোনো দিনের বিদ্বেষ ও বিরোধিতার পথ ছেড়ে বন্ধুত্ব ও সমঝোতার পথে চলতে শুরু করে। মিশরে এ রকম নতুন দুটি অধ্যায়ের সূচনা হ'তে পারতো ১৯৫৪ সালের চুক্তির পরে, সুয়েজ থেকে ইংরাজ সৈন্যের পূর্ণ অপ-সরণের সুযোগ নিয়ে। ঐ বছরের অক্টোবরে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কাইরোতে; স্বাক্ষর করেন নাসের নিজে ও বৃটেনের রাষ্ট্রদূত, স্যার রালফ্ স্টিভেনসন। তার বিশ মাসের মধ্যে সুয়েজ, সুদীর্ঘ সত্তর বছর পর, সম্পূর্ণ মুক্ত হয় বৃটিশ সৈনিকের পদভার থেকে। চুক্তির মেয়াদ সাত বছর। পাঁচ বছর চার মাস সুয়েজে অবস্থিত সামরিক ঘাটি রক্ষণা-বেক্ষণ করবে মিশরী সরকার, সাহায্য করবে অনূর্ধ এক হাজার ইংরেজ। এ সময়ে ঘাটি-গুলোকে এমনভাবে তৈরী রাখা হবে যে, যদি কোনো রাষ্ট্র দ্বারা তুর্কী অথবা কোন আরব দেশ আক্রান্ত হয় তাহ'লে বৃটেন আবার সুয়েজ-অঞ্চলে ফিরে আসতে পারে। ১৯৬০ সাল থেকে মিশরের সার্বভৌম অধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

নাসের বিভিন্ন স্থানে বলেছেন যে, ১৯৫৪-এর চুক্তি মুক্তি দিয়েছে মিশরের বহু যুগের শৃংখলিত প্রাণশক্তিকে। সত্তর বছর এ প্রাণশক্তি বায়িত হ'য়ে এসেছিল শুধু বিদেশী শক্তিকে কাস্তিল করবার প্রচেষ্টায়। আজ মুক্তি পেয়ে তা নিযুক্ত হবে নতুন দেশ, নতুন সমাজ, নতুন মানুষ নির্মাণে।
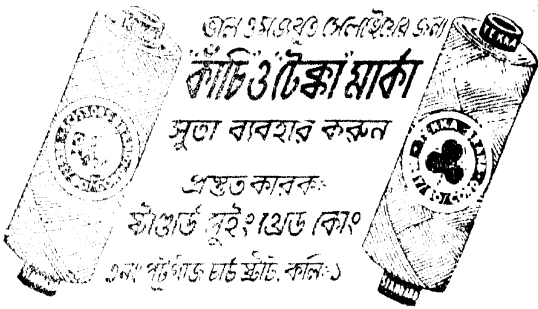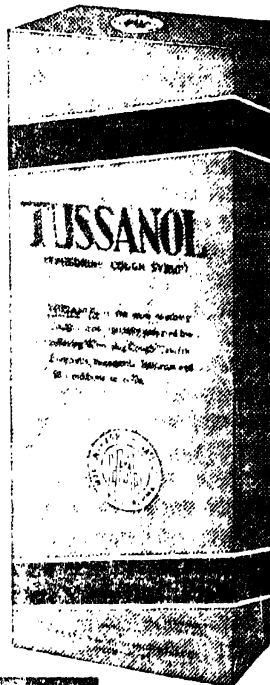
ইংগ-মিশর সম্পর্ক প্রবেশ করতে পারতো ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের রাজপথে। করেনি। তার প্রধান কারণ তিনটি।

প্রথমত, যে শ্রমিক সরকার এ চুক্তির গোড়াপত্তন করেছিল বৃটেনের শাসনাধিকার থেকে তখন সে বঞ্চিত। যে রক্ষণশীল সরকার, চার্চিলের নেতৃত্বে, আমেরিকার চাপে এ চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিল, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মধ্যপ্রাচ্যে মিশরের প্রভাব খর্ব ক'রে এমন একটি প্রতিরক্ষা সংস্থা গ'ড়ে তোলা যা ইংরেজ ও তার মিত্রদের মধ্যপ্রাচ্য স্বার্থ সুরক্ষিত রাখবে। তাই ইংগ-মিশর চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পাঁচ মাসের মধ্যেই বৃটেনের প্রেরণায় তুর্কী ও ইরাক গোড়াপত্তন করলেন বর্তমান বাগদাদ চুক্তির। দ্বিতীয় কারণ, যা প্রথম কারণেরই পরিণতি, নতুন চুক্তির পরবর্তী প্রভাতেই মিশর দেখতে পেল সে আর এক যৌথ প্রতিরোধের সম্মুখীন। ইংরেজ সুয়েজ ছাড়ছে, কিন্তু মিশরকে হুমকি দিচ্ছে বিকল্প এক কেন্দ্র থেকে! মিশর ভেবেছিল, সুয়েজ অপসরণ স্বাগত করবে নতুন এক আরব-ইংরেজ সম্পর্ক। দেখতে পেলো, প্রতিপক্ষ শুধু বদলেছে ঘাটি। তার প্রথা ও নীতি রয়েছে অপরিবর্তিত। তৃতীয় কারণ, সেই ইজরেইল। যতোদিন না ইজরেইল-আরব সমস্যার একটা মৈত্রীপন্থী সমাধান না হচ্ছে ততদিন কোন আরবই পশ্চিমী শক্তিগুলোকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারবে না।

যুদ্ধোত্তর যুগে মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিম-প্রণোদিত প্রতিরক্ষার বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে করবো। এখানে শুধু এটুকু বলা প্রয়োজন যে, বাগদাদ চুক্তির কথা ১৯৫৪ সালেই নাসের বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তুর্কী ও ইরাককে নিয়ে পশ্চিমী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটা প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় তিনি আপত্তি করেন নি। তাঁর ভাষায়, "আমরা মেনে নিয়েছিলাম যে, রাশিয়া থেকে ভৌগোলিক নৈকট্য ও অন্যান্য কারণে তুর্কী ও ইরাক পশ্চিমী শক্তিদের সংগে সামরিক চুক্তিতে যোগ দিতে পারে। কিন্তু ইরাকের দক্ষিণে যাতে এই চুক্তিকে প্রসারিত না করা হয়, সে দাবীও আমরা করেছিলাম। যখন দেখা গেল যে, ইংরেজ সে দাবী মানতে রাজী নয়, যখন জর্ডনকে সে বাগদাদ চুক্তিতে টেনে ভিড়াতে চাইলো, তখন বাধ্য হ'য়ে আমাদেরও প্রতিরোধ করতে হ'ল।"

মিশর ও আরবভূমির অন্যত্র আজ যে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শক্তির বিচিত্র খেলা চলেছে তা বুঝতে হলে আরবসমাজের প্রকৃত চেহারাটা নেওয়া দরকার। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে আরবসমাজের উপর আলোকপাত ক'রে বহু বই লেখা হয়েছে বৃটেন এবং আমেরিকায়। শত শত বছর যে আরব-মানস ছিল চতুর্দিকে অবরুদ্ধ, বাইরের কোন প্রভাব, কোন আলো প্রবেশ করতে পারেনি, আজ হঠাৎ তার সমস্ত দ্বার খুলে গিয়েছে; বিরাট পৃথিবী ভেংগে পড়েছে তার সংকুচিত, তৃষ্ণার্ত, আত্মবিস্মৃত প্রাংগণে। এই-যে অভাবনীয় মানস-বিপ্লব, তা ইসলামের প্রাচীর ভেদ ক'রে নিয়ে এসেছে নানা ভাবের, নানা আদর্শের ভাণ্ডার। সাত কোটি মানুষের হঠাৎ-জাগা মানসে আজ যে সুতীব্র আলোড়ন তার পরিণাম অনেকখানি প্রভাবিত করবে মানব-সভ্যতার অগ্রগতিকে।

ইংরেজ শাসন প্রায় দু'শো বছর যেভাবে ভারতীয় সমাজকে গতিহীন ক'রে রেখেছিল মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা তার সংগে তুলনীয় হ'লেও আরো অনেক খারাপ। ইংরেজ মধ্যপ্রাচ্যে পরোক্ষ শাসনের নীতি অনুসরণ করে। প্রত্যক্ষ শাসনের ভার ছিল ভূমিজ রাজন্যবর্গের উপর, যার চতুর্দিকে ইংরেজ প্রসাদপুষ্ট একটি সামন্ত শ্রেণী উঠো গ'ড়ে, তাদের হাতে ভূমি, অর্থ, সামাজিক প্রাধান্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা; তারা সব-রকমের অগ্রগতির বিরুদ্ধে, গোঁড়া ইসলামের নামে সমাজকে তারা চায় বদ্ধ কূপে আবদ্ধ

হয়েছিল উইলসনের কাছে। আজকের সিরিয়া ও ইরাক স্বেচ্ছায় চেয়েছিল মার্কিন অভিভাবকত্ব: প্যালেস্টাইনকেও আমেরিকার অনুশাসনে রাখতে আরবদের অনিচ্ছা ছিল না। অথচ উইলসন ও আমেরিকান সেদিন আরবদের সম্পূর্ণ বিমুখ করেছিল। উন্নততর মার্কিন গণতন্ত্র বিন্দুমাত্রও প্রভাবান্বিত করতে পারেনি ইংগ-ফরাসী কর্তৃপক্ষকে। যত "দেবতা" আরবদের ব্যর্থ করেছে তার বোধহয় একাংশ করেনি অন্য কোনো দেশের মানুষকে।

আজ এই ব্যর্থতার লাঞ্ছনা আরবভূমির প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি সবচেয়ে "স্থিতিশীল" ও "নির্ভরযোগ্য" মিত্ররাষ্ট্রকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সযত্নে রক্ষা করেছে, সেই ইরাকেই বোধ হয় এ ব্যর্থতা সবচেয়ে প্রচ্ছন্ন জনসাধারণের ও মধ্যবিত্ত সমাজের মনসে। সৌদী আরবের মতো সাবেকী রাজ্যেও এই ব্যর্থতা এনেছে রাজনৈতিক অশান্তি, যদিও মাত্র প্রথম পর্যায়ের। যে আমেন রাজাকে তার ভূতপূর্ব রাজা (বর্তমান রাজার পিতা) বহু বৎসর সযত্নে বহির্বিশ্ব থেকে দূরে রেখেছিলেন, ব্যর্থতা অশান্ত মনের ঢেউ নিয়ে প্রবেশ করেছে তারও রুদ্ধদ্বার ও পর্বত-ঘেরা বাতাবরণে।

আসলে, ইসলাম যেদিন থেকে বিজয়ীর ভূমিকা ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ল, এ ব্যর্থতা তখন থেকেই শুরু। যাঁরা একদিন ইসলামকে সর্বজয়ী ভেবেছিলেন, ব্যক্তিগত ও সমাজজীবন থেকে ঊর্ধ্বে তুলে তাকে রাজধর্মের আসনে বসিয়েছিলেন, তাঁরাও ভোগে পড়লেন ইসলামের রাজনৈতিক অধঃপতনের সংগে সংগে। তুর্কীর সুলতান ছিলেন মুসলমান; তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যের ধর্মও ছিল ইসলাম। অথচ তুর্কী আমলে আরবদের উপর যে অত্যাচার ও শোষণ চলেছে কয়েক শত বছর ধ'রে তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। এমন বন্ধ্যা রাজত্বের নজীর খুব কমই। তুর্কী শাসনে আরবভূমিতে প্রায় কিছুই জন্মায় নি, কেবল মানুষ ছাড়া। পশ্চিম-এশিয়া ও য়ুরোপের একটি বৃহৎ অংশে পরিব্যাপ্ত সাম্রাজ্যে তুর্কীরা ছিল নিতান্তই সংখ্যালঘু; তারা রোমান বা আব্বাসীদ কায়দায় সাম্রাজ্য শাসন করতে গিয়ে প্রত্যেক অঞ্চলে একটি স্থানীয় শাসক ও শোষক শ্রেণীর সৃষ্টি করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্য লোভী য়ুরোপীয় শক্তিগুলি "প্রাচ্য প্রশ্নের" সৃষ্টি করেন। (সে প্রশ্নের শেষ আজও হয় নি)। কত বড় বড় মানুষই না এই প্রশ্নকে জটিল হ'তে জটিলতর করতে সাহায্য ক'রে গেছেন, সেই ১৭৭০ সাল থেকে, যখন মিশরাধিপতি আলী বে এবং ভারতে ইংরেজ শাসক ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রচেষ্টায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুয়েজে প্রথম বাণিজ্য-অভিযান পাঠান। আজ ভাবলে বিস্ময় হয় কত কত শ্রেষ্ঠ মানুষ প্রায় দু'শো বছর ঘাটাঘাটি ক'রে এই "প্রাচ্য-প্রশ্ন"কে কি বিরাট মহামারী ক্ষতে পরিণত করেছেন। এ'দের মধ্যে রয়েছেন পামারস্টোন, ডিজরেইলী, নেপোলিয়ন, তালারে', বিসমার্ক, রাশিয়ার সাম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন!

প্রাচ্য-প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে পশ্চিমী শক্তিগুলি তুর্কী সাম্রাজ্যের শিরা উপশিরায় এমনভাবে প্রবেশ করেছিল যে, প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কীর পরাজয় ছিল নিঃসন্দেহ। পরাজয়ের পর আরবভূমি থেকে অপসৃত হল আর একটি "দেবতার" ব্যর্থতা। ইংরেজ ও ফ্রান্সের নিকট একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্রের আশ্বাস পেয়ে আরবরা যুদ্ধে মিত্রশক্তিকে অনেকখানি সাহায্য করেছিল, প্যারিসে শান্তি বৈঠকে এলেনবী তা প্রকাশ্যে স্বীকারও করেছিলেন; কিন্তু প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগের শুরুতেই বৃটেন ও ফ্রান্স বিশ্বাস-হন্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ল। এর পরিচয় এখন আমাদের কাছে অজ্ঞাত নয়।

তুর্কী সুলতানের সংগে আরবের অন্তত একটা মিল ছিল: ধর্ম। এবার শাসক ও শাসিতের মধ্যে সে মিলটুকুও রইল না। জাতির মানস-গঠন থেকে আরো দূরে নির্বাসিত হ'ল। ইংরেজ ও ফিডিংগীদের তাঁবেদার হয়ে গ'ড়ে উঠল নতুন একটি শাসক-শ্রেণী, জনসমাজ ও গণমানস হ'তে বিচ্ছিন্ন। রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে প্রসাদের টুকরার জন্যে ভিড় জমালো এই নতুন-গজানো শাসকরা। এদিকে ভূমি-ব্যবস্থা সাবেকী শোষণের পথে আরো কায়েমী হওয়ায় জনসাধারণের ভাগ্য দুর্ভাগ্যের নিম্নতম স্তরে দ্রুত নেমে যেতে লাগল। আবার এরই মধ্যে, পশ্চিমী শিক্ষার আলোকে, নতুন আদর্শের উদ্দীপনা নিয়ে, জন্ম নিলো একেবারে নতুন একদল মানুষ—একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যা আরবভূমিতে এর

আগে বর্তমান ছিল না। রাজনৈতিক অসন্তোষ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যর্থতায় এই শ্রেণী অতি সহজেই রাজদ্রোহী হ'য়ে উঠল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে গ'ড়ে উঠল হঠাৎ-ধনী নতুন একদল মানুষ, যাদের মূল্যবোধ কেবলমাত্র স্বার্থবুদ্ধিতে প্রণোদিত। দেখা গেল, এই নবজাত ধনী শ্রেণী সহজেই হাত মেলালো ভূস্বামী সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গে, ফলে শাসনশক্তির যে নতুন বাঁটোয়ারা হ'ল তা থেকেও জনসাধারণ রইল বঞ্চিত। এইভাবে, প্রথম ইসলাম, তারপর তুর্কী সুলতান, আশ্বাসে বড় কিন্তু কাজে ছোট বিদেশী শক্তি, দেশী রাজন্যবর্গ, সামন্ততান্ত্রিক ও "গণতান্ত্রিক" নেতারা, সবাই আরব জনগণকে কেবল ব্যর্থতার এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

চিন্তাশীল গামাল নাসের তাঁর বিপ্লব দর্শনে মিশরী সমাজের যে চিত্র এঁকেছেন, সমস্ত আরব সমাজের চিত্র তারই অনুরূপ। নাসের বলছেন:

"মামেলুক যুগের পর কি হল? এলো ফরাসী অভিযান। তাতাররা আমাদের বুকের উপর যে লৌহ-যবনিকা টেনে দিয়েছিল তা এবার অপসৃত হ'ল। নতুন ভাবনার বন্যা এসে পড়ল আমাদের উপর। অজানা অচেনা নতুন আকাশ হ'ল উন্মুক্ত।

"মহম্মদ আলী বংশ নিয়ে এসেছিল মামেলুক-জীবনের সবটা কাঠামো, শুধু তাকে সাজিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শোভন পরিচ্ছদে। নতুন ক'রে মিশরের সঙ্গে বিশ্বের সংযোগ স্থাপিত হ'ল। বর্তমান যুগের চেতনা নিয়ে আমরা জেগে উঠলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই নতুন এক সংকটের সৃষ্টি হ'ল।

"আমরা ছিলাম একটি রুগীর মতো, বদ্ধ ঘরে দীর্ঘকাল আটকানো। অবরুদ্ধ ঘরের উত্তাপে রুগীর শ্বাসরোধের উপক্রম হয়েছিল। হঠাৎ একটা ঝড় এসে দরজা জানালা সব ভেঙে দিয়ে গেল। রুগীর ঘর্মাক্ত দেহে আছাড় খেয়ে পড়লো শীতল হাওয়া। রুগীর সত্যিই দরকার ছিল এক ঝলক মুক্ত বায়ুর। সে পেল পাগলা ঝড়। তার ক্লান্ত শরীর এবার জ্বরাক্রান্ত হ'য়ে পড়লো।

"ঠিক এই-ই ঘটেছে আমাদের সমাজে। এক ভয়ংকর পরীক্ষার সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। য়ুরোপের সমাজ শান্তিপূর্ণ পথে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে চলবার সুযোগ পেয়েছিল। রেনেসাঁস থেকে ঊনবিংশ শতকের সেতু ধীরে ধীরে সে পার হয়েছিল। এক বিবর্তন এনে দিয়েছিল অন্য বিবর্তনকে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সব-কিছু এল আচমকা। আমরা বাস করিছলাম এক লৌহ-যবনিকার অন্তরালে। হঠাৎ তা ভেঙে গেল। পৃথিবী থেকে আমরা ছিলাম বিচ্ছিন্ন। প্রাচ্যের বাণিজ্য উত্তমাশা পথে যাতায়াত শুরু করতেই আমাদের এই বিচ্ছিন্নতার আরম্ভ হয়েছিল। তারপর দেখা গেল, য়ুরোপের শক্তিগুলি আমাদের দিকে তাকাচ্ছে লালসার দৃষ্টিতে। পূর্বে ও দক্ষিণে—অর্থাৎ এশিয়া ও আফ্রিকায়—তাদের উপনিবেশগুলির আমরা হ'য়ে উঠলাম শ্রেষ্ঠ সংযোগপথ!

"আমাদের উপর নতুন ভাবনার, নতুন মতের বর্ষণ শুরু হ'ল, যার জন্যে ঐ সময় আমরা ছিলাম নিতান্তই অপ্রস্তুত। আমাদের অন্তর ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল নানাভাবে ঊনিশ ও বিশ শতকের ভাবধারা। এগিয়ে-চলা মানুষের পথ থেকে পাঁচ শ বছরের ব্যবধান উত্তীর্ণ হ'য়ে আমাদের অন্তর হাত বাড়াচ্ছে অগ্রগামীদের হাত ধরতে। কী ক্লান্ত প্রচেষ্টা!

"এ জন্যেই আমাদের দেশে জাতীয় ঐক্যের এত অভাব। একের সঙ্গে অন্যের, এক পুরুষের সঙ্গে অন্য পুরুষের দুস্তর ব্যবধান!

"এক সময় আমার নালিশ ছিল, জনতা জানে না সে কি চায়। পাবার পথ নিয়েও সে বিভক্ত। পরে বুঝতে পারলাম, তাদের অসম্ভব দাবী ক'রে ব'সে আছি। আমাদের সমাজের বাস্তব চেহারাকে অস্বীকার করেছি।

"আমরা বাস করছি এমন একটি সমাজে যার পরিচয় এখনো অস্পষ্ট। এখনো সে অন্তর জ্বলছে। অজানা অস্থিরতায় কাঁপছে মরছে। শক্ত, নিশ্চিন্ত হাতে অগ্রগামী মানুষের যাত্রাপথের সমান্তরাল স্বাধীন রাস্তার সন্ধান এখনো পায় নি।

"এই আঁধারকে বিচার ক'রে দেখলে, জন-উদ্দীপনার প্রশংসা না ক'রেও বলতে পারি, মিশর এক অসাধ্য সাধন করেছে। এত বড় চতুর্দিকে বিপদের সম্ভাবনাহীন যে কোন জাতি নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারতো। ঝড়ের দাপটে তার প্রাণবায়ু নিঃশেষ হতে পারতো। কিন্তু ভীষণ ভূমিকম্পের মধ্যেও সে স্খলিত হয়নি। মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়েছে, কিন্তু এগিয়ে পড়েনি।

"কাইরোতে হাজার হাজার মিশরী পরিবারের যে কোন একটির মধ্যে কি দেখতে পাই? বাপ, পাগড়ী-মাথা চাষী, এসেছে গ্রাম থেকে। মা'র দেহে হয়তো বয়েছে তুর্কী রক্ত। ছেলেরা পড়ছে ইংরেজী স্কুলে। মেয়েরা ফরাসী বিদ্যালয়ে। এরই মধ্যে খিচুড়ী পাকিয়ে রয়েছে ত্রয়োদশ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দীর বাইরেকার বেশভূষা। এবার সহজেই বুঝতে পারি কেন আমাদের অন্তর এত সন্দেহ ও বিস্ময়ে, এত জিজ্ঞাসা ও বিহ্বলতায় সমাচ্ছন্ন। তখন আমার মনকে বলি, এ সমাজও একদিন ধীর স্থির পরিষ্কার হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা পাবে। এর বিভিন্ন অঙ্গ সমগ্রকে ধরে রাখবে। এরই থেকে গড়ে উঠবে সংহতিময় ঐক্য। কিন্তু তার জন্যে নির্মাণ-যুগে আমাদের প্রাণপণ পরিশ্রম করতে হবে।"

(ক্রমশ)

৩১এ আগস্ট মালয় "স্বাধীন দেশের" আখ্যা লাভ করেছে। ষোল বছর আগে —১৯৪১ সালে একবার মালয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময়ের মালয়ের কথা ভাবলে আজ আশ্চর্য লাগে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে কিন্তু তখনো জাপান যুদ্ধে নামেনি। যুদ্ধের জন্য মালয়ে বৃটিশ প্রস্তুতি চলছে। তার অংশ হিসাবে ভারতবর্ষ থেকে অনেক সৈন্য মালয়ে পাঠানো হয়েছে। তারা কেমন আছে দেখবার জন্য ভারত থেকে সংবাদপত্রের সম্পাদক একদল আমরা গেছি। দক্ষিণে সিঙ্গাপুর থেকে উত্তরে সিয়ামের (থাইল্যাণ্ড) সীমানায় কেডা পর্যন্ত নানা স্থান বিশেষ করে যেখানে ভারতীয় সৈন্যের শিবির ছিল আমাদের ঘুরিয়ে দেখানো হোল। পেনাঙ-এও কয়েকদিন ছিলাম।

পেনাঙ বলতে একটা ছোট্ট কথা মনে পড়ল। সেটা বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর হলেও এই ফাঁকে বলা যেতে পারে। পেনাঙ দ্বীপটি প্রদক্ষিণ করে একটি রাস্তা আছে, প্রায় পঞ্চাশ মাইল হবে—বেশির ভাগই বনাকীর্ণ পাহাড়ের গা দিয়ে গেছে। একদিক থেকে সমুদ্র দেখা যায়। অতি চমৎকার। মিঃ রাঘবন, পরে যিনি ভারতের রাষ্ট্রদূতের কাজ করেছেন, তিনি তখন পেনাঙএ ব্যারিস্টারি করেন। তিনি আমাদের এই পথের প্রদর্শক ও সঙ্গী ছিলেন। যেতে যেতে একটা জায়গায় তিনি মোটর থামিয়ে পথের পাশে একটা বাড়ির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বল্লেন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এসে এই বাড়িতে ছিলেন। বাড়িটির অবস্থান অতি মনোরম পরিবেশে। পাহাড়ের কোলে বাড়িটি, অদূরেই নীল সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বাড়িটায় নাকি হাওয়া খেলে না। গুরুদেব নাকি বলতেন, এখানে বসে বাইরে হাওয়ার খেলা দেখা যায়, কিন্তু ভেতরে ঢুকে হাওয়ার গায়ে লাগা বারণ।

যা বলছিলাম, আমরা ভারতীয় সৈন্যেরা কী ভাবে আছে দেখতে গিয়েছিলাম, অর্থাৎ ওটা ছিল আমাদের যাওয়ার সরকারী উদ্দেশ্য। কী রকম "প্রস্তুত" করে ভারতীয় সৈন্যদের মালয়ে পাঠানো হয়েছিল তার একটা নিদর্শনের কথা এখনো মনে আছে।

একটা শিবিরে গিয়ে দেখলাম অধিকাংশ ভারতীয় সৈন্যই খুব অল্প বয়েসের—১৭।১৮।১৯।২০ এই রকম সব বয়স হবে। একজনকে একটু আলাদা পেয়ে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে ভারত থেকে পাঠাবার আগে তাদের দল আসল বন্দুক নিয়ে ড্রিল পর্যন্ত করেনি! খাস বৃটিশের প্রস্তুতির প্রমাণও পরে পাওয়া গিয়েছিল যখন জাপানীরা প্রথম ধাক্কাতেই বৃটিশের দুখানা বিখ্যাত রণতরী—"Prince of Wales" এবং "Repulse" ডুবিয়ে দিল। সিঙ্গাপুরে সেই সময়ে বৃটিশ নৌবাহিনীর যিনি বড়োকর্তা ছিলেন তাঁর সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, যাঁকে পরে বৃটিশ পার্লামেণ্টে এক সদস্য "nincompoop" বলে অভিহিত করেন।

যাক সে কথা। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় যুদ্ধ নয়। তখন মালয়ের যে চিত্র দেখেছিলাম সেটা মনে পড়লে বর্তমান সময়ের সংবাদ পড়ে আশ্চর্য লাগে, এই কথাই বলছিলাম। মালয় আজ স্বাধীন। কিন্তু সেদিন মালয়ে মালয়জাতীয় লোকেরা যেন বিদেশীর চোখে পড়তই না, এমন কি "সুলতানদের" অস্তিত্বের খবরও কারো

দেবার কথা মনে পড়ত না। জাঁকজমক, কর্তৃত্ব বৃটিশের। শহরগুলোতে চৈনিক প্রভাব, চীনা ব্যবসায়ী সর্বত্র, কোনো কোনো শহর একেবারে চীনা শহর বলেই মনে হয়। গ্রামাঞ্চলেও দোকান পাট অধিকাংশই চীনাদের। ডাক্তার, উকিল, ব্যারিস্টারের মধ্যে ভারতীয় নাম কিছু আছে। ভারতীয় দোকানদারও কিছু কিছু মেলে। কোনো কোনো ব্যবসায়ে বিশেষ করে লগ্নী কারবারে, মাদ্রাজী চেট্টীদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। বাকী ভারতীয়েরা বেশির ভাগই রবার বাগানের মজুর।

আমরা যখন ওখানে যাই তখন বাগান মজুরদের একটা বড় ধর্মঘট চলছে। আমরা জানতে পারি যে ধর্মঘটীরা [illegible] অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে। একটা বৃহৎ অঞ্চল ঘিরে পুলিস ও সৈন্যের পাহারা বসানো হয়েছে যাতে বাগান ছেড়ে কেউ পালাতে না পারে বা বাইরে এসে ভিতরের অবস্থা জানাতে না পারে। অবশ্য সেই ব্যূহ ভেদ করেও দু'একজন বাইরে বেরুতে সক্ষম হয়। ভারতীয় ধর্মঘটীদের সংস্পর্শে আমরা যাতে আসতে না পারি তার জন্য কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। কুয়ালালামপুর দিয়ে আমরা গেছি, কিন্তু কুয়ালালামপুরে [illegible] দু'একদিন থাকার সুযোগ হয়নি। আমাদের এরূপ সন্দেহ হবার কারণ এবং প্রমাণ ছিল যে, গোপনে কর্তারা ইচ্ছা করেই আমাদের কুয়ালালামপুরে নামার ব্যবস্থা করেননি কারণ কুয়ালালামপুরে গেলে ধর্মঘটীদের প্রতিনিধিদের সংস্পর্শে আসার একটু বেশি সম্ভাবনা ছিল।

কর্তৃপক্ষের এতো সাবধানতা সত্ত্বেও কিন্তু একটা ঘটনা ঘটে গেল, যার স্মৃতি এখনো মনে স্পষ্ট রয়েছে। আমাদের ট্রেন একটা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল যেখানে অনেক ভারতীয় বাগান শ্রমিক ছিল। তারা কী রকম করে খবর পেয়ে গিয়েছিল যে আমাদের গাড়ি অমুক সময়ে অমুক স্টেশন হয়ে যাবে। আমাদের "[illegible]" অথবা ক্ষমতা সম্বন্ধে তাদের কী ধারণা হয়েছিল জানি না কিন্তু সেই স্টেশনে যখন আমাদের গাড়ি এসে পৌঁছাল তখন দেখি স্টেশনের প্লাটফর্ম—ভারতীয় নরনারীতে ভরে গিয়েছে, অবশ্য সকলেই তেলেগু অথবা তামিল-ভাষী। তাদের মুখের চেহারা এখনো চোখে ভাসছে। ভয় ও উদ্বেগ-ভরা অসহায় চাওয়া চাহনি। তারা কিছু বলতে চায়। মাদ্রাজের 'হিন্দু' কাগজের তদানীন্তন সহকারী সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথন আয়ার আমাদের দলে ছিলেন। তিনি তামিলে কিছু বল্লেন। কী বল্লেন বুঝতে পারলাম না কিন্তু বুঝলাম তিনি আবেগ সম্বরণ করতে পারলেন না। তার কণ্ঠস্বর জড়িত হয়ে এল, দেখলাম তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। কয়েক মিনিট মাত্র গাড়ী স্টেশনে থেমেছিল। গাড়ী যখন চলতে আরম্ভ করল তখন বিশ্বনাথন আয়ার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্লাটফর্মে দণ্ডায়মান জনতাকে লক্ষ্য করে ইংরেজিতে কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, আজ তোমাদের কাছে আমাদের যেতে দেওয়া হোল না। আমরা আজ যাচ্ছি কিন্তু আমরা তোমাদের ভুলব না, আমরা আবার আসব।

সে সময়ে শ্রীসুবিমল দত্ত, আই-সি-এস, মালয়ে ভারত গভর্নমেন্টের পক্ষে এজেন্ট ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে দত্ত মহাশয় আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তরে দায়িত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে কাজ করে আসছেন। বিদেশী গভর্নমেন্টের সঙ্গে ভারত সরকারের নামে আজ তিনি যে রকম আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ নিয়ে কাজ-কারবার করতে পারেন তার সঙ্গে মালয়ে ভারত গভর্নমেন্টের এজেন্ট হিসাবে কাজ করার সময়কার তাঁর অবস্থার কথা মনে পড়লে বোঝা যায় ভারতে কী পরিবর্তন ঘটে গেছে। মালয়ে ভারত গভর্নমেন্টের এজেন্ট হিসাবে দত্ত মহাশয়ের কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল প্রবাসী ভারতীয়দের, বিশেষ করে ভারতীয় মজুরদের স্বার্থরক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। কিন্তু কী রকম অসহায়ভাবে তাঁর [illegible] দেখেছি। নিপীড়িত ভারতীয় মজুরদের জন্য তার মন কাঁদত। ওরা ও তিনি একই জাতের মানুষ। কিন্তু ভারত গভর্নমেন্টের এজেন্ট হয়েও, আই-সি-এস হয়েও ভারতীয় মজুরদের প্রতি বৃটিশ বাগান মালিকদের দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের কোনো প্রতিকার করবার সাধ্য তাঁর ছিল না। ভারত সরকারকে রিপোর্ট পাঠাতে পারতেন কিন্তু সেটা ছিল অরণ্যে রোদনের মতো।

সেই সময়ের পরে অনেক কিছু ঘটে গেছে। দশ বছর হোল ভারত স্বাধীন হয়েছে। মালয়কেও বৃটিশ গভর্নমেন্ট স্বাধীনতা দিলেন যদিও অনেক কিছু হাতে রেখে। স্বাধীন মালয়ের সম্মুখে অনেক সমস্যা রয়েছে এবং থাকবে। মালয়ের ভারতীয় অধিবাসীদের সম্মুখের পথও যে খুব সরল এবং সহজ তা নয়। কিন্তু স্বাধীনতার হাওয়া যেভাবেই হোক একবার বইতে আরম্ভ করলে মানুষের ভালো হবেই এ বিশ্বাস এবং আশার আলোকে কোনো সন্দেহ বা দুর্ভাবনার ধোঁয়ায় অস্পষ্ট হতে দেওয়া যেতে পারে না। ২-৯-৫৭

করাচীর এক জনসভায় ছোরাবর্দি ছাহেব তাঁর শ্রোতাদের জানাইয়া রাখিয়াছেন যে সিন্ধুনদের পূর্বদিকের উপনদীর জল যদি ভারত বন্ধ করিয়া দেয় তাহা হইলে

তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। —"মরিব, মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব তাওতো হেন গুণ আমার কারে দিয়ে যাবো"—খুড়োর মুখে গান আর ছোরাবর্দি ছাহেবের প্রাণত্যাগের শাসানি আমাদের কাছে সমান বিস্ময়কর!

• • •

উজীর ছাহেব এই সপ্তাহেই জানাইয়াছেন যে, তাঁর বিদেশ সফরের উদ্দেশ্য ছিল শুধু সংগ্রহ। —"তবেও না। শুনেছি তিনি কটা দিন হলিউডে কাটিয়ে এসেছেন। কিন্তু নেহাৎ ঘরোয়া ব্যাপারে আমরা মাথা গলাতে চাইনে"—বলে শ্যামলাল।

• • •

পাক্ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খাঁ নুন পাক্ গণপরিষদে ঘোষণা করিয়াছেন যে, কাশ্মীরে সোভিয়েত বিমান অবতরণ করিয়াছে। আমাদের নিজস্ব গুজব-রিপোর্টার বলিলেন—"সত্যি সত্যি ওটা বিমান নয়, এক জুজু বুড়ি। বাচ্চাদের ভয় দেখানোতেই তার আনন্দ!"

• • •

কলিকাতার যুবজয়ন্তী উৎসবে শ্রীযুক্ত ঢেবর বলিয়াছেন—শুধু নিজেদের বড় করিলেই চলিবে না। দুর্বল, দরিদ্র ও অশিক্ষিত ভারতবাসীদের বড় করিয়া তুলিতে হইবে। —"ভালো কথাই বলেছেন। শুধু বলেন নি এঁদের বড় করে তোলার ফস্ মন্তরটি। সুতরাং..." মন্তব্য করিতে করিতে একটি যুবক সহযাত্রী ট্রাম হইতে নামিয়া গেলেন। আমরা তাকে "তথাপি চোংড়া" বলিতে পারিলাম না।

• • •

একটি সংবাদে শুনিলাম বিহারের সরকারী দপ্তরখানায় নিযুক্ত কর্মচারীদের গৃহিণীরা নাকি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের বাড়িতে হানা দিয়া তাঁদের স্বামীদের নানারকম দাবীদাওয়া মিটাইবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। শ্যামলাল বলিল—"পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য
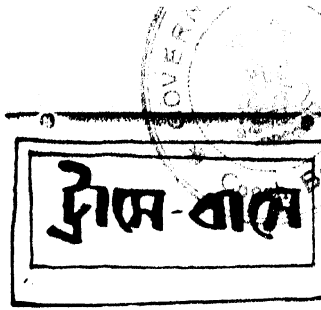
তো করে উবে গেছে। দেখা যাক্ মালক্ষ্মীদের পুণ্যে যদি এবার পতির একটা হিল্লে হয়!"

• • • •

কলিকাতা পৌরসভায় কংগ্রেস দলের দ্বিতীয় পরাজয়—একটি সংবাদ-শিরোনামা। —"সংবাদটি পাঠ করে অনেকে হয়ত মুক্তকচ্ছ হয়ে নৃত্য করছেন। কিন্তু

আমরা শুধু বলি—ইথে কী হইবে বল নন্দের পিসির"—বলে এক সহযাত্রী।

• • •

এক সংবাদে প্রকাশ কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় নাকি প্রায় পনের হাজার ছাড়া-গরু ঘুরিয়া বেড়ায়। খুড়ো বলিলেন—"মাত্র পনের হাজার! মনে হয় পরিসংখ্যানটার কোথায় বুঝি কোন ভুলচুক আছে!!"

* * *

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির পুরাতন রীতিনীতি রক্ষার ব্যাপারে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা আগ্রহশীল নহেন দেখিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী বিমলা দেবী নাকি পরিষদ ভবনে কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। —"কান্নার কথাটা মিথ্যে বলে পরে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সত্যি হলেও ক্ষতি ছিল না—জনালাময়ী বক্তৃতার চেয়ে চোখের জল বিশেষ করে মেয়েদের, আরো সহজেই জনালায়!!"

• • •

২৪ পরগণায় প্রায় ২৪।২৫ হাজার পরিবার চিড়া কুটিয়া জীবিকা অর্জন করে। কিন্তু সম্প্রতি চিড়া কোটা কল স্থাপিত হওয়ায় তাঁহারা বেকার হইয়া

পড়িয়াছেন। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন মহাশয় নাকি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, ব্যাপারটা রাজ্য সরকারের হাতে থাকিলে তাঁরা অবশ্যই উহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। শ্যামলাল বলিল—"আশ্বাস কার্যে পরিণত হোক এই আমরা চাই। মন্ত্রী মশাই নিশ্চয়ই জানেন—শুধু কথায় কিন্তু চিড়ে ভিজে না।"

• • •

একটি সংবাদে জানা গেল পোকামাকড়ের উপদ্রবে পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে নাকি দুই কোটি টাকার শস্য নষ্ট হয়। বিশুখুড়ো বলিলেন—"পোকামাকড়ের চেয়ে উচ্চতর জীবের উপদ্রবে কত কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয় সেটারই শুধু কোন সঠিক খবর পাওয়া গেল না!!!"
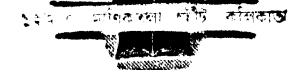
তাঁর রূপের কথা এঁর মুখে ধরে না
—যাঁর কোমল মুখের কমনীয় প্রসাধন
পণ্ড্‌স
কোল্ড ক্রীম
প্রতিবার মুখ ধোয়ার পরই পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম মুখে মাখবেন। এতে ত্বকের স্নেহপদার্থের অভাব পূরণ হয়, মুখশ্রী স্নিগ্ধ ও নির্মল থাকে। পণ্ড্‌স কোল্ড ক্রীম ত্বকের গভীর থেকে ময়লা বার ক'রে মুখত্বক বাস্তবিকই পরিষ্কার রাখে!
বিনামূল্যে পুস্তিকা ঃ
আমাদের প্রসাধন-পুস্তিকা 'লার্ভলিয়ার উইথ পণ্ড্‌স' চেয়ে পাঠান। মুখশ্রী ও সৌন্দর্য রক্ষা সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা ওতে পাবেন। ঠিকানা—পোঃ বক্স ১৬১২, ডিপার্টমেন্ট নং ২৬ সি বোম্বাই ১।
POND'S
cold
cream
P 4440
চেসব্রো-পণ্ডস ইনকোরপোরেটেড (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সীমিত দায়ে সমিতিবদ্ধ)

আমেরিকার ঘরবাড়িতে বৈদ্যুতিক আলোর জন্য বাল্ব ব্যবহার করার প্রথা আর কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে। এর পর থেকে দেয়াল এবং ছাদের থেকে আলোর সাহায্যে ঘর আলোকিত করা হবে। এই নতুন উপায়টির নাম দেওয়া হয়েছে 'ইলেকট্রোনিক স্যাণ্ডউইচ'। এক বিশেষ ধরনের ফসফরাসের গুঁড়া দুটো পাতলা ধাতুর চাদরের ভেতরে এবং বৈদ্যুতিক পরিচালিত কাচের সাহায্যে আলোকিত করা হয়।

•

আমাদের দেশে বন্যার জলে রেলের ব্রিজের ক্ষতিসাধন করার দরুণ বেশ কয়েকটা বড় বড় রেল দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এই দুর্ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে এড়ান যায়, তার জন্য লাক্ষ্মৌএর "রেলওয়ে টেস্টিং রিসার্চ সেন্টার" গবেষণা করছেন। চেষ্টা করা হচ্ছে যে, জল বেড়ে সীমারেখা ছাড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এমন যান্ত্রিক বন্দোবস্ত থাকবে যে, ট্রেনের চালক আগে থেকে এর সম্বন্ধে একটা সংকেত পাবে। পরীক্ষা দুরকম ভাবে করা হচ্ছে। একটি হচ্ছে যে, জলের নির্দিষ্ট সীমারেখা ছাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজের তলায় লাগান যন্ত্রটি খুলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা উজ্জ্বল লাল আলো জ্বলে উঠে জলের ওপর ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় উপায়টিতেও লাল উজ্জ্বল আলোর সংকেত দেয়, তবে এটি বৈদ্যুতিক উপায়ে হয়। এই যন্ত্রটিতে ব্যাটারীর বন্দোবস্ত আছে। জল বাড়ার সঙ্গে একটি সার্কিট পূর্ণ হয়ে যায়, আর ব্যাটারীর সাহায্যে আলোটি জ্বলে। যতদূর পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, এই ধরনের যন্ত্র খুবই কার্যকরী হবে। উজ্জ্বল আলোটি আধ মাইল দূর থেকে নিখুঁতভাবে লক্ষ্য করা যায়। চোদ্দটি ব্রিজে এই নতুন যন্ত্র লাগান হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্রিজে দু-প্রকারের যন্ত্র লাগাবার বন্দোবস্ত হয়েছে, কারণ লক্ষ্য করে দেখা হবে যে, কোনটি কার্যত সুবিধাজনক।

•

হর্মোন মানুষের একটি উপকারী শক্তিশালী ওষুধ। বর্তমানে আমরা আমাদের ব্যবহারের জন্য অনেক ধরনের হর্মোন পাই এর মধ্যে 'হাইড্রোকর্টিজন' একটি। খুব সম্প্রতি আর এক নতুন ধরনের হর্মোন তৈরী করা হয়েছে, যেটি বর্তমানের যে কোন হর্মোনের চেয়ে বেশী শক্তিশালী এবং কার্যকরী। হর্মোনের সাহায্যে শক্ত বাত, ফোলা, হাঁপানি, এলার্জি, হে ফিভার জাতীয় রোগের চিকিৎসা করা হয়। এই সমস্ত রোগের এটি মহৌষধ। নতুন হর্মোনটি আরও একটি বিষয়ে উপকারী এটি রোগের হর্মোনের মত তরঙ্গের সাহায্যে এই গবেষণা করা হচ্ছে,
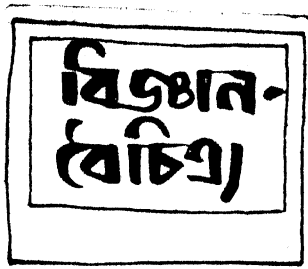
চক্রদত্ত

রোগীর কোনরকম অপকার সাধন করবে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ইনজেকশন দিলে ১২০ গুণ বেশী, আর খাওয়ালে ১৯০ গুণ বেশী ফল বর্তমানের হাইড্রোকর্টিজনের চেয়ে এতে পাওয়া যায়।

•

বর্তমান উড়োজাহাজ আকাশে সোজাভাবে উঠতে বা নামতে পারে না। সমস্ত হেলি-কপটার পারে। একটি উড়োজাহাজের কম্পানী এখন উড়োজাহাজকে আকাশে সোজা ওঠাবার এবং নামাবার বন্দোবস্ত করেছেন। এই নতুন ধরনের উড়োজাহাজের পাখার ওপরে একটা ভাঁজকরা অবস্থায় হেলিকপ্টারের পাখা লাগান থাকে। পাখাটি ঘোরাবার জন্য উড়োজাহাজে আলাদা ইঞ্জিন থাকে। প্রয়োজনের সময় আকাশে উড়োজাহাজ ওড়া অবস্থায় ভাঁজ করা পাখা খুললে উড়োজাহাজের ডানার ওপর চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। এই ঘোরার দরুণ উড়োজাহাজকে সোজা অবস্থায় আকাশে ওঠান যাবে এবং নামান যাবে।

উড়োজাহাজের আকাশে সোজা ওঠানামার বন্দোবস্ত

•

মিনিসোটাতে মেও ক্লিনিক উচ্চ গ্রামের শব্দতরঙ্গের সাহায্যে ক্যানসার সারাবার চেষ্টা করছেন। অবশ্য এই গবেষণা তাঁরা হাড়ের ক্যানসার নিয়েই করছেন। যে শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে এই গবেষণা করা হচ্ছে, সেটা এত দ্রুত এবং এমন ধরনের, যেটা মানুষের কানের সাহায্যে শোনা যায় না।

শব্দতরঙ্গ দিয়ে খরগোসের ওপর পরীক্ষা করে প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ক্যানসারওয়ালা কোষ ধ্বংস করতে পারা যায় দেখা গেছে। এই কোষগুলি ধ্বংস করার কারণ যে, শব্দতরঙ্গ যখন ক্যানসারের ওপর প্রয়োগ করা হয় তখন সেই স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে উত্তাপের সৃষ্টি হয়—এই উত্তাপই ক্যানসার কোষগুলি নষ্ট করে। পরীক্ষার সাহায্যে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, কোষগুলি ধ্বংস করবার জন্য যে পরিমাণ উত্তাপ দরকার এই শব্দ তরঙ্গ ঠিক সেইটুকু উৎপাদন করতে পারে। অন্য কোন উপায়ে এই উত্তাপ ঠিক ক্যানসার কোষের ওপর প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

•

রুরকীতে 'সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট' খুব সহজে হস্তচালিত যন্ত্রের সাহায্যে ইট তৈরীর ব্যবস্থা করেছেন। ইট-খোলাতে এখন যে উপায়ে ছাঁচের সাহায্যে এক একটি করে ইট তৈরী করা হয়, এতে শুধু যে ইট তৈরী করতে দেরি হয়, তা নয়, ঠিক এক ধরনের ইট তৈরী হয় না। ইনস্টিটিউটের তৈরী যন্ত্রটি খুব সহজেই একটি হস্তচালিত লিভারের সাহায্যে চালান হয় এবং একবারে না থেমে এই যন্ত্র পর পর ইট তৈরী করে যেতে পারে। একবারে এর থেকে দুটো করে ইট পাওয়া যায়। সমস্ত যন্ত্রটিতে কাজ করবার জন্য চারজন লোক দরকার। দুজনে লিভারটি চালাবে। একজন ছাঁচে কাদা ভর্তি করবে আর চতুর্থজন ইট বার করে নিয়ে জমা করতে থাকবে। এই যন্ত্রে লোকপিছু ঘণ্টায় প্রায় ৬২টা করে ইট তৈরী করা যায়, আর সমস্ত দিনে ২০০০টি ইট পাওয়া যাবে। কুটির-শিল্প হিসাবে এই ইট তৈরীর যন্ত্র খুবই ভাল।

সাংবাদিকের কথা আলাদা। চাঞ্চল্য তার উপজীবা। আজ এখানে, কাল ওদেশে। পথে কোথাও আগুন দেখলে নেমে পড়ো সেখানেই, দেখো কয়েক মিনিটের জন্য, বিবরণ লেখো কয়েক সেকেণ্ডে, আর তারপর ছোটো টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে। অভিজ্ঞতা আর অভিব্যক্তির মধ্যে অবকাশ অল্প, চিন্তার অবকাশ নেই বললেই হয়। গ্রাবুস্ট্রীটটি তার জন্য নয়। সে সর্বক্ষণ সহস্র লোকের সংস্পর্শে আসবে, পরস্পরবিচ্ছিন্ন ঘটনা সে বিচ্ছিন্নভাবে রিপোর্ট করবে। ছুটতে ছুটতে লিখবে, তারপর আবার ছুটবে নতুন কোনো চমকের সন্ধানে। স্থিতি তার কাছে মৃত্যুর সামিল, অন্তত চাকরি হারানো তো নিশ্চিত। প্রতিদিন সে তার অভিজ্ঞতা বিস্তৃত করবে, বাস করবে স্যুটকেসে আর ভোজন করবে যত্রতত্র। অবিশ্রাম গতিশীলতা তার পেশার পক্ষে অপরিহার্য। সে যত দেখবে ততই সাংবাদিক হিসাবে সে সার্থক হবে। তার লেখার বিষয় আসে বাইরে থেকে, বাইরের পৃথিবীটাকে তাই তার জানা দরকার।

সাহিত্যিকদের, লেখকদের, বোধহয় দুভাগে ভাগ করা সম্ভব। এক জাতকে বলতে পারি ক্রিয়েটিভ এবং অপর জাতকে ক্রিটিক্যাল। প্রমথ চৌধুরী বোধহয় একবার বলেছিলেন, আকাশে বাতাসে তাঁর জন্য বিষয় ছড়িয়ে নেই—যেমন থাকতে পারে কবির বেলায়—তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় বাইরের কোনো প্রভোকেশনের জন্য। একে কল্পনার দৈন্য নাম দিলে অন্যায় হবে। বাইরের অভিজ্ঞতা থাকলেও অনেকে যে লিখতে পারেন না—যদিও না পারলেও কেউ কেউ লেখেন—সে তো জানা কথা। তবু এমন লেখকের পক্ষেও দেশভ্রমণ ও বিদেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা কাজের পক্ষে সহায়ক হতে পারে। বীরবলের মনের পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ বলবর্ধক হয়েছিল, অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যিক মন প্রথম বোধহয় জেগেছিল প্রবাসের স্পর্শে। এমন একাধিক লেখকের নাম করা যেত যাঁরা ঘর না ছাড়লে, বাইরের কোনো ধাক্কা না খেলে, কখনোই লেখকই হতেন না হয়তো।

আমি ভাবছি প্রধানত ক্রিয়েটিভ লেখকের কথা। তারাশঙ্কর রায় সেদিন জাপান গেলেন। কাঁর সুধীন দত্ত এবাও পরে গেলেন আমেরিকা, ফিরবেন মাস পনের পরে গোটা পনের দেশ দেখে। ভ্রমণের উপকারিতা তাঁদের বেলায় কি সমান সত্য? তারাশঙ্কর তিন মাস বা তিন বছরের জন্য মেলবোর্ন বা নিউইয়র্কে বাস করে এলে তাঁর প্রতিভা কি বাঞ্ছিত লাভ করবে?

•

নাও করতে পারে।

শরৎচন্দ্রের "জাপানযাত্রী" বা "রাশিয়ার

রঞ্জন

চিঠি" এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য নয়। এগুলিকে বলতে পারি তাঁর বিশ্বপরিক্রমার বাই-প্রডাক্ট। রবীন্দ্রনাথের উপর নানা দেশের ও নানা জাতির সংস্পর্শে আসার প্রধান প্রভাবটি পরোক্ষ, হয়তো বা তাদের উল্লেখও নেই কোথাও। বরং এক কবি সেদিন আমাকে বলছিলেন, তিনি কেদার-বদ্রী নিয়ে আজ পর্যন্ত এক ছত্র পদ্যও লেখেননি (কিংবা এক-আধ ছত্রই লিখেছেন) কিন্তু সে অভিজ্ঞতা তাঁর কবিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কিন্তু কবির কথাও বাদ দেয়া যাক, কেননা নিয়েছি প্রাবন্ধিক ও ভ্রমণকাহিনীকারের কথা। কবির উপর ভ্রমণের প্রভাব এমন পরোক্ষ যে তা প্রায় বিশ্লেষণের অতীত। অপর দুজনের ভ্রমণের প্রভাব এতই প্রত্যক্ষ ও স্বপ্রকাশ যে তার বিশ্লেষণেরই প্রয়োজন অল্প। গল্প ও ঔপন্যাসিকের উপর বিদেশ ভ্রমণের ফল কী রকম? সোজা কথা বলবার জন্য শরৎ-সাহিত্যের কোনো চরিত্রের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কি?

আবার এখানে দুরকমের রচনাকে আলোচনার বাইরে রাখতে হবে। এক রকমের গল্প আছে যার নায়কনায়িকার নাম বিদেশী, কিন্তু তাদের বিদেশীত্ব শুধুই নামগত। চারুদত্ত আধারকর শুধু চারুচন্দ্র দত্ত হলেও বেমানান হত না, অন্যথা অচেনাপনের প্রয়োজন হত না। অর্ধশিক্ষিত শিল্পী বা কাহারো না হয়ে কলকাতা বা দার্জিলিং হলেই বা কী ক্ষতি হত? এমন রচনাকে বিদেশপ্রভাবমুক্ত বলতে বাধা। স্থান ও নামের পরিবর্তন যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা বিদেশী পরিবেশে স্বদেশী মানুষের আচার নিয়ে লেখা। "সভ্যতা" প্রেমেন্দ্রের একখানি ছোট্ট হাউস দিল-দরিয়ার ইংল্যাণ্ডে। প্রবাসের অভিজ্ঞতা বাদ দিয়ে এ উপন্যাস লেখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই গ্রন্থের মূল চরিত্ররা সবাই বাঙালী এবং বিদেশী চরিত্রগুলির নূপালকা অপ্রতিষ্ঠিত কেননা এরা অপ্রধান। তাই এখানেও লেখকের উপর বিদেশের প্রভাব সম্পূর্ণ নয়। তিনি বিদেশে গিয়েও স্বদেশী চরিত্রেরই অভিনয়কে নিয়েছেন নিয়োজিত করেছেন। হেনরি জেমস বা আর্নেস্ট

হেমিংওয়ে যেমন য়ুরোপবাসী আমেরিকানদের নিয়ে লিখেছেন।

•

মার্কিন লেখকদ্বয়ের নাম করে ভালোই হোলো। শিক্ষিত আমেরিকানদের কাছে য়ুরোপ বিদেশও বটে আবার বিদেশ নয়ও বটে। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তো ভাষাগত ঐক্যও রয়েছে। তবু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে সব আমেরিকান শিল্পী ও লেখক প্যারিসের বাম তীরে ময়লা জামা পরে দাড়ি না কামিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তাঁদের নাম এক্সপ্যাট্রিয়েট। আরো বড়ো কথা, এই ছিন্নমূল ও নির্বাসিত অবস্থা সকলের পক্ষে সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল হয়নি। হেনরি মিলারের অতিকায় প্রতিভা কখনো সংবৃত হোলো না, হেমিংওয়েরও শ্রেষ্ঠ রচনা সৃষ্ট হয়েছে যখন তিনি ঘরে ফিরবার পর। মার্কিন শহর থেকে অনেক দূরে সরে এসে। প্রকৃতি বা এলিমেণ্টের কাছে এসে।

য়ুরোপের অভিজ্ঞতা হেমিংওয়ের মানসকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু তবু সংঘাত ও সফিস্টিকেটেড জীবনের চিত্রণে তাঁর দৃষ্টি ও দক্ষতা সামান্য। নাগরিক জীবনে ভালোবাসা নেই এমন নয়। কিন্তু তার স্থান চিড়িয়াখানার খাঁচার ভিতর। সভ্যতার চিত্রণে দেখতে ও লেখাতে হাত যেতে চায় না, সেসব কাজের প্রাণ যেখানে মানুষ বহুলাংশে বলা হয়ে গেছে। য়ুরোপীয় জীবনে হেমিংওয়ে যে অর্ন্তদৃষ্টি অধিকার করেছেন তা বহুলাংশে আরোপিত বলেই অংশত কৃত্রিম।

হেনরি জেমস চেয়েছিলেন য়ুরোপকে আপন করতে এবং সে চেষ্টা কখনো ত্যাগ করেননি বলেই হয়তো তাঁর প্রতিভা কখনো পূর্ণতা পেল না। তাঁর জীবনের অপূর্ণতাও অজানা নয়। তাঁর নানা উপন্যাস নিউ ইংল্যাণ্ডে বসেও লেখা যেত। ভ্রমণ তাঁর মনে সংঘাতের উৎপাদন করেনি, কেননা তিনি বদলেছেন পরিবেশের সঙ্গে। সংঘর্ষ না হলে প্রমথ তো পাথর মাত্র, অর্থাৎ অগ্নিহীন।

•

বিদেশ ও বিজাতীয়কে আপন শিল্প-সত্তায় আয়ত্ত করে তাকে সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত করা সকলের সাধ্য নয় এবং বিশ্ব-ভ্রমণও তাদের উপকার না হতে পারে। হেমন্তী সেনের স্বপনের ছবিগুলি সার্থক, একথা ভারতীয় শিল্পী আছেন যাঁরা পরধর্মে নিহত হয়েছেন। যামিনী রায় ভ্রমণ থেকে বিশেষ কিছু আহরণ করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি না। জ্যাঁ জিয়োনো মোরিয়াকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি ক্ষুদ্র একটা অঞ্চলে অবস্থিত। বিস্তৃত ভ্রমণ বা দীর্ঘ বিদেশ-বাস তাঁর প্রতিভার বিকাশে হয় অনাবশ্যক না অপকারী।

ভ্রমণ ভালো, কিন্তু সকলের পক্ষে নয়। সব শিল্পীর পক্ষে নয়।

বহু করণীয় তথ্য আছে সেগুলি মূল্যবান। সম্প্রতি বাঙালীর শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতির মত স্বাস্থ্যও সমস্যার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে—এই চমৎকার পুস্তকটি সে সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট সাহায্য করবে। এই পুস্তকটির এক কপি করে প্রত্যেক পরিবারে থাকা ভাল। ১২।৫৭

জ্যোতিষ শাস্ত্র

পরাশরীয় বর্গেই গ্রহের বল—পণ্ডিত শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি-এল—জৈমিনি প্রকাশ কার্যালয়, ২।১, রাণীশঙ্করী লেন, কলিকাতা-২৬। মূল্য ৩, টাকা।

জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে সম্প্রতি প্রায় সার্বজনীন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, অথচ গণনার ফলাফল সম্পর্কে নৈরাশ্যও তেমনি বিস্তৃত। এই পুস্তকের গ্রন্থকার গণনা সাধারণত ভুল হবার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে জন্ম-কুণ্ডলী প্রস্তুত করবার সময় পরিশ্রম করে প্রত্যেক গ্রহের বিশুদ্ধ স্ফুট এবং পরাশর নির্দিষ্ট ষড়বর্গ, দশবর্গ কষবার বিশুদ্ধ নিয়ম পালন করা হয় না। কোন বর্গটি শুভ আর কোনটি অশুভ তাও অনেকের জানা নেই। সপ্তবর্গ আর দশবর্গ কি কি তা বোঝাবার জন্য মহামুনি পরাশর যে শ্লোককটি লিখে রেখে গেছেন সেগুলি অত্যন্ত দুরূহ বলে অনেকেই তার ব্যাখ্যা উদ্ধার করতে পারেন না। তাছাড়া তাঁর মতে "পরাশরীয় বর্গগুলি কি কি সে সম্বন্ধে নানা গ্রন্থকার নানা ভ্রান্তমত প্রচারিত করায় এমন অবস্থা জ্যোতিষকাশে সৃষ্ট হইয়াছে যে লোকে বিভ্রান্ত হইয়া পরাশর নির্দিষ্ট অকৃত্রিম বর্গগুলি পরিত্যাগ করিয়া ভ্রান্তপথে চলিতে চলিতে শেষকালে বর্গ নির্ণয় করা পদ্ধতিটুকু পর্যন্ত কোষ্ঠীতে একরূপ ত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন।" অথচ মহর্ষি জৈমিনীও "হোরাদয়ঃ সিদ্ধাঃ" লিখে পরাশরীয় বর্গের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। আলোচ্য পুস্তকে লেখক পরাশরীয় বিশুদ্ধ বর্গ নির্ণয় প্রণালী, উদ্দেশ্য ও ফলাফল বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। যাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করেন তাঁদের কাছে পুস্তকটি যে অত্যন্ত মূল্যবান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লেখক একমাত্র "মহারাশি" নির্ণায়ক এবং ইতিপূর্বে জৈমিনীর দুই সূত্র অধ্যায়ের অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। এই ধরনের পুস্তকগুলির সাহায্যে ভ্রান্ত গণনার অবসান হলে জনসাধারণ উপকৃত হবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি পরাশরের প্রাসঙ্গিক শ্লোকগুলি উদ্ধার করে দেখিয়েছেন। ৬৫।৫৬

বিবিধ

শ্রীকৃষ্ণ গীতিকা—শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। মূল্য প্রথম খণ্ড ১॥০ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ৩, টাকা। সুবর্ণমণি ললিত সাহিত্য ভবন, ১৩এ ডোভার রোড, কলিকাতা ১৯ হইতে প্রকাশিত।

পুস্তকখানিতে দুই খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা এবং মথুরা ও দ্বারকা লীলা কবিতা ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের অন্তরের ভক্তি-রসে মধুর শ্রীকৃষ্ণলীলা মাধুর্যময়ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ভক্ত এবং রসিক সমাজ পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন এবং আনন্দ লাভ করিবেন।

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

ভাগা বলাকা—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

বর্ষপঞ্জী ১৩৬৪—শ্রীসন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত।

বিষের বাঁশী—কাজী নজরুল ইসলাম।

ভক্তি কুসুমাঞ্জলি—শ্রীহরিদাস নন্দনন্দ।

হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১ম ভাগ—ডক্টর শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়।

Political Philosophy After Hegal And Marx—Narayani Basu.

The Stalin Era—Anna Louise Strong.

অসীমানন্দের পত্র—১ম ও ২য় খণ্ড—অসীমানন্দ।

সিপাহী যুদ্ধে বহরমপুর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

গল্পের মিছিল—অমূল্যকুমার চক্রবর্তী।

মানা সাহেব—মণি বাগচি।

আধুনিক বাংলা কাব্যের গতি প্রকৃতি—শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু।

খাদ্য-কথা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু।

অনুরূপা—শ্রীগোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মহাজন্তুর গল্প—সন্ধ্যা ভাদুড়ী।

উত্তর আকাশ—বনমালী গোস্বামী।

তিমির বলয় ২য় পর্ব—শ্রীসরোজকুমার রায়-চৌধুরী।

রাত্রির বয়স—পৃথ্বীশ সরকার।

অম্বর চরকা—নৃপেন্দ্রনাথ বসু।

আধুনিক ভারতের গল্প সঞ্চয়ন—অনুবাদক বি, বিশ্বনাথম্।

বসন্ত বাহার—অনিলবরণ ঘোষ।

—শৌভিক—

একটি ভুল (?) প্রচার

চেকোশ্লোভাকিয়ার কার্লোভিভারিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার জন্য ভারতের মনোনয়ন সম্পর্কে প্রথম খবর যা বের হয়, তাতে ছিল যে, রাজ কাপুর প্রযোজিত এবং শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত ও পরিচালিত "একদিন রাতে" পাঠানো হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত হবার প্রথম যে খবর বের হয়, তাতেও ছিল ঐ বাংলা ছবিখানিই দেখানো হয়েছে। কিন্তু পুরস্কার পাওয়ার খবরে দেখা গেল, তা নয়—ওরই হিন্দী সংস্করণ 'জাগতে রহো'ই দেখানো হয়েছে। দুটি সংস্করণের যেটিই দেখানো হোক, পুরস্কার যখন পেয়েছে তখন ভারতবাসী মাত্রেরই কাছে সেটা গর্বের বিষয়, কিন্তু তাই বলে আসল ব্যাপারটা চেপে দেওয়াও দুঃখের কম নয়। অনেকেই বলছেন যে, কার্লোভিভারিতে দেখানো হয়েছিল "একদিন রাতে" অথচ পুরস্কার লাভ করা মাত্রই প্রচারিত হয়ে আসছে "জাগতে রহো"র নাম। রাজ কাপুর নিজে গিয়েছিলেন প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থাকতে, তিনিও ফিরে এসে "জাগতে রহো"র কথাই উল্লেখ করে আসছেন প্রতিবারই, কিন্তু তবুও প্রশ্ন উঠছে। আরো একটা লক্ষ্য করার মত বিষয় আছে। "জাগতে রহো"র নামটাই কেবল উল্লেখিত তো হচ্ছেই, কিন্তু তা থেকে ছবির কাহিনী-রচয়িতা ও পরিচালক শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের নাম আশ্চর্যভাবে বাদ পড়ে যাচ্ছে। বম্বের পত্র-পত্রিকায় এমনভাবে বিবরণ দেখা গেল, যেন রাজকাপুরই ছবিখানির যা কিছু সবই করেছেন, আর কেউ কিছুই নয়। আমাদের দেশের ছবি তৈরীর রীতির সঙ্গে যার পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, ছবির প্রকৃত গঠনের কাজে প্রযোজকের কতোটা কৃতিত্ব থাকে। কৃতিত্ব আসলে থাকে চিত্রনাট্যরচয়িতা ও পরিচালকের এবং তারপর নাম আসে কলাকুশলী ও শিল্পীদেরই। রাজকাপুর নিজেও প্রতিভাবান পরিচালক বলে হয়তো এ ছবির প্রকৃত গঠনকার্যে অন্যান্য প্রযোজকদের মতো অসংশ্লিষ্ট ছিলেন না, হয়তো পরিচালকদ্বয়কে বুদ্ধি দিয়েও সাহায্য করে থাকবেন, কিন্তু ছবি-[illegible] দেন নিয়ে চলেছেন যে কি বলা, তার অর্থ বোঝা যাচ্ছে না। দেশে ফিরতেই বম্বেতে তাঁকে যে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়, তাও তিনি একাই গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন না। কথার মাঝে একবার মাত্র শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের নাম উল্লেখ করে বলেন যে, ওঁদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কৃতিত্ব যে আসলে তাঁর চেয়ে ঐ দুই হতভাগ্য ব্যক্তিরই প্রাপ্য, কারণ ছবির যা আসল কাজ, অর্থাৎ চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা তা যে এঁদেরই, তা তিনি একবারও কোথাও উল্লেখ করেছেন বলে কোন কাগজের বিবরণে দেখা গেল না।

চিত্রালোচনা

একজাতি একপ্রাণ একতা

ধর্মের বিভেদ, ভাষার বিভেদ, শ্রেণীর বিভেদ, প্রাদেশিকতার বিভেদ ভুলে একজাতি

এক প্রাণ ও একতার মন্ত্রে ছোটদের উদ্দীপিত করে তোলবার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী এ ভি এময়ের ছবি "হম পনছী এক ডালকে।" ছোটদের নিয়ে তোলা ছবি; শিক্ষালাভ করার উপাদানও আছে যথেষ্ট, আমোদ উপভোগ করারও উপকরণ প্রচুর। বেশ ভাল ছবিও। কিন্তু সমগ্র চেহারাটা এমন বাঁধা ফরমুলায় ছকে নেওয়া যে, দেখতে দেখতে কেবলি মনে হতে থাকে যে, বড়োদের ছবিরই রঙচঙকে যেন একেক কম করে দেখিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে। একটি চড়া পর্দায় বাঁধা এবং স্বাভাবিক বস্তুত্বের মাত্রাধিক্যে এতো, যা ছোটদের সহজ মন ও সরল মগজের পক্ষে গোলমেলেরূপ। ছোটরা দুষ্টুমি করে, পরস্পরের প্রতি মায়া মমতা দেখায়, বন্ধুত্ব দেখায়, তার স্বাভাবিক প্রকৃতি হয় এক রকম, কিন্তু এ ছবিতে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে বড়োদের কল্পনায় ভেবে ঠিক করা ছোটদের আচরণ ও প্রবৃত্তি। গল্পের ভিত্তি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিভেদ নিয়ে, আর সেই সূত্রেই জোর করে দেওয়া হয়েছে ছোটদের স্বাবলম্বী হওয়া এবং শ্রমমর্যাদা, দেশের ও দশের প্রতি কর্তব্য, একতা প্রভৃতি বিষয়ে দেশপ্রেমিক নেতাদের বক্তৃতার বিবিধ ব্যাপার।

* * *

জমিদার বংশের রায়সাহেবের ছেলে রাজেন, আর দরিদ্র বিধবার ছেলে দামু একই স্কুলের ছাত্র। রাজেন আসে মোটরে চড়ে, সঙ্গে থাকে চাকর দামু। রাজেনকে দামু কুটোটি নাড়তে দেয় না, বাপের হুকুম, এমন কি রাজেনের ধারে কাছে যাতে কেউই না আসে সেটিও দামুকে দেখতে হয়। রাজেন কিন্তু মিশতে চায় সব ছেলের সঙ্গে, ওদেরই একজন হতে চায়। স্কুলের সেরা ছেলে নন্দু। সকালে উঠে কাগজ ফিরি করে সংসারও চালায়, নিজের পড়ার খরচও। সব ছেলেই ওকে ভালবাসে; আত্মনির্ভর-শীলতার আদর্শ। স্কুলের ছুটির সুযোগে নন্দু ঠিক করলে সব ছেলেকে নিয়ে এক জনহিতকর বাঁধ পরিকল্পনায় যাবে। শিক্ষকের অনুমতি পাওয়া গেল। সব ছেলেরাই যাবে, রাজেনেরও ইচ্ছে যায়, কিন্তু রায়সাহেব নিষেধ করলেন। রাজেনের জিদ দেখে তার মা সম্মতি দিলেন তবে দামুও সঙ্গে যাবে এই সর্তে। রাজেনের তাতে আপত্তি। সকালে নিজের মালপত্তর নিয়ে রাজেন হাজির হলো আর সব ছেলেদের দলে বাসে চড়বার জন্য, সঙ্গে দামু। ওদেরই দলের একরত্তি ছেলে চটপট এক বুদ্ধি বের করে দামুকে ফেলেই চলে গেল। রাতে ওরা উঠলো এক ডাকবাঙলোয়। দামুও বাড়ি ফিরে রায়সাহেবের কাছে ধমক খেয়ে খোঁজ করতে করতে এসে হাজির। রাজেন আর পাঁচটা ছেলের মতো হতে বাধা পাচ্ছে, সেটা দামুকে বুঝিয়ে দিলে ডাক-বাঙলোর পরিচারক রহমান। রহমান সেকথা রায়সাহেবকে জানিয়ে দেবার জন্যে দামুর মনে সাহস সঞ্চয় করে দিলে। দামু ফিরে গেল এবং রহমানের শেখানো বুলি আওড়ে রায়সাহেবের কাছ থেকে ধমক খেলো। এবার রায়সাহেব পাঠালেন বাড়ির সরকার মির্জা সাহেবকে। ছেলেরা তখন সমাজ উন্নয়ন কর্মীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাস্তা তৈরীতে ব্যস্ত। মির্জা গিয়ে রাজেনের মনে ঈর্ষার ভাব জাগিয়ে ছেলেদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করার চেষ্টা করলে। কিন্তু সফল তো হলোই না, উল্টে ছেলেদের নাচে ভাল্লুক সেজে, আর দেশ ও দশের জন্য ওদের কর্তব্যবোধ দেখে খুসী হয়ে ফিরে এলেন। রায়সাহেব এবার নিজেই যাবার

পথাড! সুবোধ ঘোষের বিখ্যাত ছোটগল্প 'অযান্ত্রিক' অবলম্বনে ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত এল বি ফিল্মস্ ইণ্টারন্যাশনালের ছবির একটি দৃশ্যে গঙ্গাপদ বসু। ছবিখানি বর্তমানে তোলা হচ্ছে রাঁচীর বহির্দৃশ্যে

সংকল্প করে ছেলেরা যে গ্রামে ছিল, সেখানকার মাতব্বরকে তার পাঠিয়ে দিলেন রাজেনকে আটক করে রাখার জন্য। মাতব্বরের লোক আসতেই নন্দু নিজেকে রাজেন বলে পরিচয় দিয়ে ধরা দিলে। মাতব্বর নন্দুকে বন্ধ ঘরে আটক করে রাখলে। ছেলেরা মতলব করলে একটা, ওরা দল বেঁধে সবাই গিয়ে মাতব্বরের কাছে গেল এবং সকলেই নিজেকে রাজেন বলে পরিচয় দিলে। মাতব্বরও কিছু ভেবে না পেয়ে ওদের সকলকেই বন্দী করলে। ছেলেরা সুবিধামতো সময়ে ছাদের টালি সরিয়ে বের হবার জায়গা করে নিয়ে সরে পড়লো। সেখান থেকে ওরা হাজির হলো ওদের গন্তব্যস্থান, বাঁধের জায়গায়। বাঁধ দেখার পর ওরা দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে ছবির একটি প্রদর্শনী করলে এবং গ্রামবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া চাঁদার টাকা একত্রিত করে সেটা ওখানেই দিয়ে গেল দুঃস্থ বিদ্যার্থীদের পড়বার সাহায্যার্থে। রাজেনের খোঁজে রায়সাহেব ওখানে এসে পৌঁছবার আগেই ছেলেরা বাড়ির পথে যাত্রা করে ইতিমধ্যে।

• • •

ফিরে এসে রায়সাহেব ঠিক করলেন, রাজেনকে ঐ স্কুলে আর পাঠাবেন না, বাড়িতে মাস্টার রেখে পড়াবেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে রাজেনেরই স্কুলের তিনজন ছেলে দাড়িগোঁফ প'রে প্রার্থী হয়ে এলো এবং মির্জাকে জমিয়ে কাজে বহালও হয়ে গেল। পড়বার ঘরে ওদের নিয়ে গিয়ে রাজেনের আনন্দ আর ধরে না, কিন্তু ওরা ধরা পড়ে গেল রায়সাহেবের কাছে। এবার রায়সাহেব তাঁর এক বন্ধুকে বললেন, একজন জবরদস্ত মাস্টার পাঠাবার জন্য। বেশ জবরদস্ত চেহারার একজন মাস্টার এলো; নিজের পরিচয় দিলে সার্কাসের রিং-মাস্টার বলে। ওকেই পছন্দ হলো রায়সাহেবের। ওর সর্ত যে, পড়াবার সময় ঘরে কেউ ঢুকতে পারবে না। পড়ার ঘরে তখন ছিল রাজেনের কাছে ওর একরত্তি বন্ধু চটপট। মাস্টার তার ছাত্রকে দেখবার জন্য ঘরে প্রবেশ করবার সময় রাজেন আর চটপট জানলা টপকে বাইরে পালাচ্ছিল, রাজেন টপকে গেল, কিন্তু চটপট পারলে না। মাস্টার চটপটকেই তার ছাত্র মনে করলে, চটপটও তার পরিচয় না জানিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসলো পড়তে। কথা হলো, প্রতিদিন পাঁচটা থেকে সাতটা মাস্টার আসবে পড়াতে। রাজেনের সঙ্গে চটপট পরামর্শ করে ঠিক করলো যে, মাস্টার যে সময়ে আসবে, সে সময়ে রাজেন পিছনের জানলা টপকে পালাবে আর তার জায়গায় এসে বসবে চটপট। একমাস ধরে চললো এই ব্যাপার—চটপট এসে রাজেন সেজে বসে, আর রাজেন স্কুলে গিয়ে খানিকটা সময় পড়ে কাটায়, আর খানিকক্ষণ নাটকের রিহার্সাল দেয়। একমাস পর হতেই মাস্টার রায়সাহেবকে জানালো তার ছাত্রের উন্নতি পরীক্ষা করে দেখতে। দরজা খুলে ঘরে ঢুকেই রায়সাহেবের চক্ষুস্থির। রাজেন ভেবে কাকে পড়িয়ে এসেছে মাস্টার! সেইদিনই স্কুলে নাটকের অভিনয়। রায়সাহেব রাজেনের খোঁজে হাজির হলেন। রায়সাহেবকে পেয়ে সকলে ধরেবেঁধে ওঁকে সভাপতি করে দিলে। পর্দার অন্তরালে এক কাণ্ড ঘটে গেল, রাজেনের অসাবধানতায় মই পড়ে যেতে নন্দু আহত হলো, কাজেই নন্দুর অংশে রাজেনকেই নামতে হলো। বিরাট একটা গীতিনৃত্য যার বক্তব্য হচ্ছে দেশের সকলের এক হওয়া এবং পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখে চলা; সকল ধর্মকে সম্মান

করা। সবাই মুগ্ধ হলো দেখে। নাটক শেষ হলে রাজেনকে পাওয়া গেল না, রাজেন উপস্থিত তখন নন্দুর বাড়িতে তার সেবায়। সারারাত কাটলো সেখানে, ভোরে নন্দুর হয়ে কাগজ ফিরি করে ফেরবার সময় রায়সাহেব তার পিছু নিয়ে নন্দুর বাড়ির সামনে হাজির হলেন। সারারাত বাইরে কাটিয়ে মা-বাপের মনে দুঃখ দেওয়া সম্পর্কে নন্দুর মা রাজেনকে বোঝালেন ভালো কথায়। রায়-সাহেব চমৎকৃত হলেন, এতোদিনে তার চোখ খুললো। সামনে এসে তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন এবং নিজেরই বাড়ির একাংশে নন্দুদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

* * *

বড়ো কৃত্রিম ঘটনাবলী নিয়ে গল্প, তাও গল্পের উপাদান ছাপিয়ে গিয়েছে নাচে আর গানে। সমস্ত কিছুর মধ্যেই বড়োদের হিন্দী ছবির মতো অতি বাড়াবাড়ি ব্যাপার, আর এমনি হাঁফধরানো দ্রুত লয়ের গতি যা ছোটদের উপযোগী নয়। পাঁচ-ছ বছরের চটপটে থেকে পনের-ষোল বছরের নন্দু প্রভৃতি নানা বয়সের নিয়ে জন কুড়ি ছেলের দল—ওরা একই ক্লাসের হতে পারে না, আবার স্কুলের যে ঐ কটি মাত্র ছেলে তাও নয়, তাহলে বাকি ছেলেরা এদের দলে না থাকায় ওরা যে সবাই মিলেমিশে এক হয়ে চলার গান গেয়ে যায়, তার যাথার্থ্য টেঁকে কোথায়? ছোটদের কল্পনায় কুলোয় না এমনি সব উপকরণের সমাবেশ। উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে এমন একটা ছবির প্রদর্শনী খুললো, যা ওদের পক্ষে অসম্ভব। একতা তথা পঞ্চশীলের বাণী নিয়ে চীন, জাপান, রুশ, আমেরিকা, মিশর, ইরাক, পাকিস্তান প্রভৃতি সব দেশ, আর সেই সঙ্গে বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, গান্ধী প্রভৃতিকে দেখিয়ে শেষের নাচটা এতো কড়া ডোজে পরিকল্পিত, যা নন্দুর মতো কোন স্কুলের ছাত্রের পক্ষে স্বপ্নেও পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়, আর কোন স্কুলেরও পক্ষে তা গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। অতো মেয়ের দলই বা হঠাৎ এসে গেল কি করে নাচের মধ্যে? অতো ছোট ছোট ছেলে, কিন্তু গানের ক্ষেত্রে ওদের মুখে আশা ভোঁসলে বা রফি আর মান্না প্রভৃতির গলা। পনের-ষোল বছরের ছেলে তিনজন মাস্টারীর উমেদার হয়ে ছদ্মবেশে মির্জার মতো বুড়ো লোককে ধোঁকা দিলো, মজা লাগে দেখতে শুনতে, কিন্তু এমন অবাস্তব পরিকল্পনাই হাস্যকর। তেমনি অস্বাভাবিক রোমার বাড়িতে মাস্টারের কাছে চটপটের রাজেন সেজে দীর্ঘ একমাস ধরে সবাকার চোখে ধুলো দিয়ে পাঠাভ্যাস করে যাওয়া। এইভাবে ছোটদের ধোঁকা দিতে শেখানো ওদের সহজাত দুষ্টুমীর মাত্রা ছাড়া। তাঁর ঝাঁঝালো বাজনার সংগীতে গান, আর উদ্দাম নৃত্য যা কিছুক্ষণ পরেই ছোটদের অনুভূতির কাছে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠারই সম্ভাবনা। সমগ্রভাবে ছবি-খানিতে সুকুমারমতিদের উপযোগী সরল সৌকুমার্যের অভাবটাই পরিলক্ষিত হয়।

* * *

রোমি, রূপকুমার (ডেইজী ইরানী), যোশী, লালুমাস্টার প্রভৃতি ছোটরা রয়েছে বিভিন্ন চরিত্রে,—আর ছোটদের কার না ভাল লাগে?—ওদেরও দুষ্টুমী দেখে বেশ কিছু মজা উপভোগ করা যায়। বিশেষ করে চটপটের চরিত্রে রূপকুমার সম্পর্কে তো কথাই নেই। বড়োদের মধ্যে মির্জার চরিত্রে ডেভিড আমোদ দেন বেশী। অন্যান্য চরিত্রে আছেন—সপ্রু, মারুতী, অচলা সচদেব প্রভৃতি। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন সন্তোষী এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন এন দত্ত।

জঘন্য

সুরাপান নিবারণী প্রচারের একটা ছুতো করে নিয়ে বহুবিধ অভব্য ও কুরুচীপূর্ণ উপকরণ আর কুৎসিত ভঙ্গীর সমন্বয়ে নটরাজ ফিল্মসের একটা বিশেষ মার্কা

হুইস্কীর নাম দিয়ে তোলা 'জনি ওয়াকার' ছবিখানিকে এক কথায় জঘন্য বলে অভিহিত করতে হয়। বম্বের সেন্সর বোর্ড বেশী মাত্রায় উদারতা দেখাতে দেখাতে এখন এমন একটা ধাপে এসে পৌঁচেছে যে, ছবির নৈতিক মান বিচার বিষয়ে তাদের ওপর আর আস্থা রাখা যায় না। শিল্প-সাহিত্যকে নির্বাসনে দিয়ে অজাত-কুজাতের উপকরণে তো ছেয়ে ফেলা হয়েছে বম্বের হিন্দী ছবিকে, তার ওপর নৈতিক মানের দিকটাও এতো নীচু করে ফেলা হয়েছে যে, অচিরে এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া দরকার। বম্বের মদ্যপান নিবারণী প্রচার সংস্থার সহযোগিতা স্বীকৃত রয়েছে ছবিখানির টাইটেলে, কিন্তু এক জনি ওয়াকার ছবির নামেও যেমন, তেমনি কাহিনীর চরিত্রেও এমনভাবে জমে রয়েছে যে, ছবি শেষ হলে মদ্যপানে কোনরূপ বিতৃষ্ণা আসা তো দূরের কথা, প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়েই লোকে সোজা ঢুকে পড়তে চাইবে কোন পানাগারে জনি ওয়াকারের মতো পানের মজা উপভোগ করতে। আর যাঁরা তা নন, তাঁরা ছবির শালীনতাবিহীন ব্যাপার দেখে রুষ্ট মনে বাড়ি ফিরবেন। হাসির ছবি সম্পূর্ণ-ভাবে, কিন্তু দেখার পর দোষ না হয়ে পারে না। হয়তো মদ্যপায়ীকে পানের অভ্যাস ত্যাগে অনুপ্রাণিত করে তোলার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এই ছবির পরিকল্পনা, কিন্তু কমিক গল্প ফেঁদে মাতলামিকে যেমনভাবে রংগময় করে দেখানো হয়েছে, পানের প্রতিফলটাও তেমনিভাবেই হেসে উড়িয়ে দেবার মতো করে দেখানাতে উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বিপরীত পথে।

• • •

মামুলী গল্প যাতে আখ্যানবস্তুর চেয়ে হাস্যোদ্দীপক ও উচ্ছৃঙ্খল কথার ব্যবহারই বেশী। প্রজুয়েট মনোহরের যুক্তি হচ্ছে সে বেকার বলেই মদাপ। তার পাশের ফ্ল্যাটের শঙ্করই তার মাতলামীর নিত্য সাথী। দাদার কাছে মানুষ, বৌদির বড়ো স্নেহের পাত্র। মদ খেয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফেরে বৌদি লোভা তাকে তার দাদার কাছ থেকে আড়াল করে রাখে। শঙ্করের মতলবে মনোহর চাকরির জন্য হাজির হলো এক শেঠের অফিসে; ম্যানেজারকে ভাঁওতা দিলে শেঠজী তার বন্ধু বলে, অনেক ভাঁট দেখালে তবুও চাকরি তখন হলো না; আসবার সময় মনোহর ঐ অফিসেরই কর্মী মিস চন্দার কলমটি নিয়ে এলো। কলমটি উদ্ধার করার জন্যে চন্দা মনোহরকে মিথ্যে করে চাকরি হয়েছে বলে অফিসে আসবার জন্য চিঠি দিলে। দাদা বৌদির আনন্দের সীমা রইল না। শঙ্করের [illegible] শেঠজীর নামে একটা [illegible] অফিসে [illegible]। [illegible]- ছিল মনোহরের, দ্বিতীয় দিন হলো বন্ধুত্ব!

তারপর ঘনিষ্ঠতা বাড়তে মনোহর চন্দাকে তার ভাবী পত্নী ঠিক করে বৌদিকে জানালে। চন্দা এলো দেখা করতে। দাদা-বৌদির খুবই পছন্দ। চন্দার বাবা পুণা থেকে এলেন পাত্র দেখতে, কিন্তু মনোহর মাতাল অবস্থায় হাজির হয়ে সব গোলমাল করে দিলে। ওদিকে চাকরির ব্যাপারে জালিয়াতি ধরা পড়ায় মনোহর বিতাড়িত হলো। চন্দা কিন্তু মনোহরকে ছাড়তে চাইলে না, সে জানালে যে, প্রেম ও মমতার দ্বারা সে

মনোহরকে শুধরে দেবে। মনোহর কিন্তু চন্দাকে পরিহার করে চলতে চায়। হঠাৎ মনোহরের দাদা-বৌদিকে যেতে হলো ইন্দোরে। মনোহরেরও যাবার কথা, কিন্তু মদ খেয়ে সময় ঠিক রাখতে না পারায় পড়ে রইলো। একা বাড়িতে থেকে একে একে সমস্ত আসবাবপত্তর বেচে বেচে মনোহর কেবলই মদ খেয়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ রাস্তায় দেখা একদিন চন্দার সঙ্গে, কিন্তু মনোহর তাকে না চেনার ভাণ করে পালালো সেখান থেকে। চন্দাও পিছু নিয়ে হাজির হলো মনোহরের বাড়িতে। সেসময়ে লোকজন ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে এলো শংকরের আহত দেহ। মাতালের পরিণাম, শংকর মারা গেল। মনোহরের বুকে বাজলো ঘটনাটা। মদের গ্লাসে শংকরের মুখ ভাসতে দেখে। হঠাৎ একলা বার থেকে বেরিয়ে দেখে চন্দা মাতাল হয়ে রাস্তায় টলছে, দেখেই মনোহরের রাগ। তাই বলে হিন্দুস্তানী মেয়েরা মদ খাবে! মনোহর ক্ষেপে গিয়ে প্রহার আরম্ভ করতে লোকজন জমা হলো, পুলিস এলো, হৈ হৈ কাণ্ড। মনোহর পালাতে পালাতে গোপন মদ বিক্রীর এক একটা ঘাঁটি পুলিসকে ধরিয়ে দিতে দিতে ধরা পড়লো। বিচারে সে রেহাই পেলো প্রথমত, মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছে বলে, আর দ্বিতীয়ত মদ বিক্রীর গোপন আড্ডাগুলি ধরিয়ে দিয়েছে বলে। বিচারকালে সাক্ষ্যদানসূত্রে প্রকাশ পেল যে, চন্দা আসলে মদ খায়নি সেদিন, মনোহরের চোখ ফোটাবার জন্যেই মাতলামির ভান করেছিল। বলা বাহুল্য, এর পর আর মনোহরকে জামাতা করে নিতে চন্দার লাখপতি বাবার আপত্তি থাকবার কথা নয়।

* *

বেকার বলেই মনোহর মাতাল, অথবা লাখপতি বাবা থাকতেও একমাত্র সন্তান চন্দার আফিসে কাজ করা, ইত্যাদি ব্যাপারের মতো বহু অলৌকিকতা অগ্রাহ্য করেও যদি নেওয়া যায়, কিন্তু কমিক ছবি বলেই যাচ্ছেতাই কাণ্ড মাত্রই বরদাস্ত করা যায় না। মনোহরের মেয়েদের হস্টেলে ঢুকে শাড়ি পরে মহিলা সেজে বের হয়ে এসে সেইভাবে পানাগারে গিয়ে হুল্লোড় বাধিয়ে শেষে ঐ বেশেই বাড়িতে হাজির হয়ে কেলেংকারী বাধানোর কাণ্ড হাসির ব্যাপার নিশ্চয়ই এবং হাসতে কেউটেও পড়াতে হয়, কিন্তু রুচির দিক থেকে অশালীন অংগভংগী ও আচরণের নিন্দা না করে পারা যায় না। মনোহরের মেয়েলি বেশই নয়, চন্দাকেও গায়ের সংগে লেপ্টে যাওয়া আঁটসাঁট ট্রাউজার পরিয়ে যেভাবে বারবার দেখানো হয়েছে, প্রকাণ্ড রাস্তায় ওর মাতলামির ভান করা, এগুলো অতি শিথিল রুচীর লোককেও লজ্জিত করবে। পরিচালক বেদ ও মদন সুরুচীকে পদে পদে আঘাত দেবার মতো করেই যেন ছবিখানির বিন্যাস সাধন করেছেন। ও পি নায়ারের তীব্র ঝাঁঝালো বিলিতী সুরের বাজনা সংগীতানুভূতিকে যেন চাবুক মেরে যাওয়ার জন্যেই। হাসির ছবি বলে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে টাইটেলেই ব্যানার্জীকে ইংরিজিতে Benerji এবং সুলোচনাকে Salochna বানান করে। মনোহর ওরফে ওনি ওয়াকার রূপে জনি ওয়াকার বলতে গেলে একাই সব হাসি জুগিয়ে যান তার কথায় ও ভংগীতে। চন্দা রূপী শামা এবং তার এক সহধর্মিনীকে ট্রাউজার পরিয়ে সেক্স আকর্ষণই জুগিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রধানত। অন্যান্য চরিত্রে আছেন রাজ মেহরা, অমরনাথ, টনি ওয়াকার, এস এন ব্যানার্জী, দুলারি, সুলোচনা প্রভৃতি।

সঙ্গীত-নৃত্য

রামায়ণের অভিনব রূপায়ণ

সহজে সাধারণের মনোতুষ্টির জন্যে শিল্পী পরিষদ অভিনবভাবে রামায়ণের এক রূপায়ণ পরিকল্পনা করেছেন। সাধারণ নৃত্যনাট্যের সংগে এর পার্থক্য হচ্ছে যে, এতে মঞ্চনৃত্যের সংগে পশ্চাৎপটে ছায়ানৃত্যের আগাগোড়া সংযোগ রেখে দৃশ্য সাজিয়ে যাওয়া হয়েছে। মঞ্চনৃত্যের সংগে ছায়ানৃত্যের প্রয়োগ অবশ্য এই প্রথম নয়, তবে আগে যা দেখা গিয়েছে তা ছিল দু একটি বিশেষ দৃশ্যেই ছায়ানৃত্যের প্রয়োগ, কিন্তু অতীনলাল পরিকল্পিত এই নৃত্যনাট্যটিতে কায়া ও ছায়াকে পাশাপাশি বা সংগে সংগেও রেখে যাওয়া হয়েছে। এর একটা ভাল ফল এই দেখা গেল যে, সামনে কায়ার অংশ নিবৃত্ত হবার সংগে সংগেই পিছনে ছায়ায় পরবর্তী অংশ প্রতিফলিত হয়ে ওঠে, তাতে ঘটনার একটানা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়, ঘটনায় গতিশীলতা থাকে, আর দৃশ্যকেও রূপপ্রসারি করে তোলা যায়। গত ৩রা সেপ্টেম্বর রঙমহল মঞ্চে জনসাধারণের উদ্যোগে শিল্পী পরিষদ তাদের এই অভিনব রূপায়ন কৌশলের একটি প্রদর্শনী করেন। তাড়কা বধ থেকে আরম্ভ করে অগ্নিপরীক্ষার পর সীতাকে অযোধ্যায় নিয়ে এসে রামের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত অংশ নিয়ে এই নৃত্যনাট্য। নেপথ্য সংগীত, নেপথ্য সংলাপ আবৃত্তি ও নেপথ্য থেকে ধারাবিবরণী এবং নৃত্যাভিনয়ের সংগে স্থানে স্থানে মূকাভিনয়যোগে একটি বিচিত্র সৃষ্টি এই 'রামায়ণ'। আর্টের দিক থেকে বিচার করলে সৌকর্যকে উচুদরের বলে ধরা যায় না, তবে, যাকে বলে 'পপুলার' উপকরণের সমাবেশ, তারই চেষ্টা হয়েছে। ভাষাটা সহজ হিন্দী, সঙ্গে পশ্চিমদেশী নাচের ভংগী এবং গান বাজনায় সুরের পরিকল্পনাও 'পপুলার' হওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে। সংগীত পরিচালনা করেছেন নির্মলেন্দু বিশ্বাস, তার গাওয়াও বেশ ভাল। তবে মাইকে বাজনার আওয়াজটা কিছু নম্র হওয়া দরকার।

সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলন

মধ্য কলিকাতার সদ্যসমাপ্ত মহাজাতি সদনে ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৯টি অধিবেশনে এবার সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এবারকার সম্মেলনে ভারত, পাকিস্থান ও স্থানীয় যে-সব শিল্পীর সমাবেশ হবে তা সংগীতপিপাসুদের তৃপ্তিবিধান করতে পারবে বলে মনে হয়। শিল্পীদের মধ্যে আছেন কণ্ঠসংগীতে: পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুর (কাশী), ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ (বোম্বাই), ওস্তাদ নিসার হোসেন খাঁ (বদাউন), প্রোঃ শিবকুমার শুক্ল (বরদা) ওস্তাদ আমানৎ আলী খাঁ ও ওস্তাদ ফতেহ আলী খাঁ (লাহোর), ওস্তাদ মুনওয়ার আলী খাঁ (বোম্বাই), প্রোঃ বলবন্তরাও ভট্ট (বেনারস), শ্রীমতী জ্যোৎস্না ভোলে (বেনারস), ডাঃ শ্রীমতী

সুমতি মুতাতকর (দিল্লী), শ্রীমতী আহমদীবাঈ চোপড়া (বোম্বাই) এবং শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক (কটক)। স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে কণ্ঠসংগীতে যোগদান করবেন প্রোঃ তারাপদ চক্রবর্তী, প্রোঃ এ কানন, শ্রীমতী মালবিকা রায়, পণ্ডিত জসরাজ, শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় (চট্টোপাধ্যায়), শ্রীমতী শুচিস্মিতা মিত্র এবং শ্রীমতী গোপা রায়। এই অনুষ্ঠানে যন্ত্র-সংগীতে যোগদান করবেন পণ্ডিত রবি-শংকর, ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ, ওস্তাদ ইমরাৎ খাঁ, প্রোঃ শ্যাম গাঙ্গুলী, শ্রীঅরবিন্দ পারিখ এবং শ্রীমতী মায়া মিত্র। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিবেন শ্রীমতী কমলা লক্ষ্মণ (মাদ্রাজ) এবং শ্রীমতী দময়ন্তী যোশী (বোম্বাই)। তবলায় অংশ গ্রহণ করবেন ওস্তাদ আহমদ-জান থিরাকুয়া (রামপুর), পঃ আনোখেলাল মিসির (বেনারস), পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ (বেনারস) এবং স্থানীয় শিল্পী ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ, প্রোঃ কানাই দত্ত এবং শ্রীমান সুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়। সদারংগ সংগীত সম্মেলন উপলক্ষে মহাজাতি সদনে প্রায় দু হাজার দর্শকের আসন ব্যবস্থা হয়েছে।

কটকে ইস্টবেংগল ক্লাব ও কটক সম্মিলিত দলের এক প্রদর্শনী খেলায় ইস্টবেংগল ক্লাব [illegible]—২ গোলে জয়লাভ করে। খেলার আগে উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রীসুখতংকর ও মিসেস সুখতংকরের সংগে উভয় দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের এই ছবি তোলা হয়

এক হকি খেলা ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারত আর কোন বিষয়েই এতদিন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেনি। ভারতীয় পোলো দলের সাফল্যে ভারত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে আর এক গৌরবময় আসন অধিকার করলো। যাঁদের কৃতিত্বে ভারত এই নতুন সম্মানের অধিকারী হয়েছে, তাঁদের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এঁরা হচ্ছেন জয়পুরের মহারাজা, রাও রাজা হনুৎ সিং, বিজয় সিং, ক্যাপ্টেন কিষণ সিং এবং সামরিক খেলোয়াড় চন্দন সিং। সুনিপুণ পোলো খেলোয়াড় জয়পুরের মহারাজাই ছিলেন দলের অধিনায়ক।

ভারতীয় পোলো খেলোয়াড়দের দক্ষতার কথা কারোরই অজানা নেই। এর আগে বেসরকারীভাবে ভারতীয় দল আরও কয়েকবার ইউরোপ সফর করে এসেছে এবং পোলো খেলার উন্নত ক্রীড়াচাতুর্যে অর্জন করেছে ভূয়সী প্রশংসা। এই সময়ে বিশ্ব প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকলে ভারতীয় পোলো দলের পক্ষে হয়তো বিশ্বজয়ীর সম্মান অর্জন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হত না। যাই হক এবারই ভারত সর্বপ্রথম সরকারীভাবে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে এবং প্রথমবারেই অর্জন করেছে বিশ্বজয়ীর সম্মান। বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই ভারতকে বিশ্বজয়ীর সম্মান করায়ত্ত করতে হয়েছে। পোলো খেলার অপরিহার্য এবং প্রধান অংগ হচ্ছে সুশিক্ষিত অশ্ব। অর্থনৈতিক কারণেই ভারতের খেলোয়াড়গণ এদেশ থেকে নিজ নিজ শিক্ষিত অশ্ব ইউরোপে নিয়ে যেতে পারেননি। ফলে বিদেশী বন্ধুদের কাছ থেকে অশ্ব ধার করেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। অবশ্য লণ্ডনে বিশ্বখ্যাত পোলো খেলোয়াড় রাও রাজা হনুৎ সিংয়ের কয়েকটি শিক্ষিত অশ্ব আছে। ভারতের খেলোয়াড়রা এদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হননি।

ফরাসী, স্পেন ও মেক্সিকোর খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত 'সেভারাসিন' দল খুবই শক্তিশালী। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নসিপের ঠিক আগে ডভিলেই অনুষ্ঠিত ফ্রেঞ্চ আন্তর্জাতিক পোলো প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় এই সেভারাসিন দলের কাছেই ভারতকে

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার উদ্বোধন দিনে উয়াড়ী ক্লাব ও ত্রিপুরা স্পোর্টিংয়ের খেলায় [illegible] ফিস্ট করে একটি বল বাঁচাচ্ছেন

৫ই—৩ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নসিপের ফাইন্যালে সেই দুর্ধর্ষ 'লেভারসিন'কে পরাজিত করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। তবে লেভারসিন দলের পক্ষে বলা যেতে পারে, দলের একজন খেলোয়াড় অশ্ব থেকে পড়ে গিয়ে সাংঘাতিকভাবে আহত হওয়ায় তৃতীয় চক্কে লেভারসিন পরাজয় স্বীকার করে নেয়। ভারত ৫—২ গোলে এই সময় অগ্রগামী থাকে এবং এই অবস্থায় খেলার উপর যবনিকা পড়ে। বিশ্ব প্রতিযোগিতার সেমি ফাইন্যালে ভারত ৫—৩ গোলে পরাজিত করে যুক্তরাষ্ট্রের লা সেঞ্চুয়ার্স দলকে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নসিপের পর দ্যভিলে সিদাও লা পাম্পা কাপ নামে যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল, তারও ফাইন্যাল খেলায় স্পেনের লা কার্পিলা দলকে ৯—৬ গোলে হারিয়ে ভারতীয় দল লা পাম্পা কাপ লাভ করেছে। তাছাড়া এবারকার সফরে ইংল্যাণ্ডের দুই বিখ্যাত পোলো প্রতিযোগিতার পুরস্কার—স্মিথ রাইল্যাণ্ড কাপ এবং ডিউক অব সাদারল্যাণ্ড কাপও ভারতীয় দলের করায়ত্ত হয়েছে। সুতরাং নিঃসন্দেহেই ভারত এখন পোলো খেলায় বিশ্বশ্রেষ্ঠ। ভারতকে যারা এই বিশ্বশ্রেষ্ঠের সম্মান দান করেছেন, তারা ফিরে এলে যথোচিতভাবে তাদের সম্বর্ধনা হবে, আশা করি।

* * *

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অধিনায়ক সালাম ভেটারেন্স ক্লাবের বিশেষ কমিটির বিবেচনায় এবার বছরের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। বাঙলার ফুটবল খেলার যে সময়টাকে স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়, সেই যুগের বেশীর ভাগ খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে ভেটারেন্স ক্লাব গঠিত। সুতরাং এদের বিচার বিবেচনার প্রতি ফুটবল খেলোয়াড় তথা ফুটবল ক্রীড়ামোদী সকলেরই যথেষ্ট আস্থা আছে। গতবার এরা রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের খ্যাতনামা খেলোয়াড় এন নন্দীকে বছরের সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান দান করেছিলেন। এবার সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান দিয়েছেন সালামকে।

ভেটারেন্স ক্লাবের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচক কমিটির সদস্যরা কেবল খেলোয়াড়ের ক্রীড়া নিপুণতাই বিচার করেননি। মাঠের মধ্যে এবং মাঠের বাইরে খেলোয়াড়দের আচরণ এবং তাদের ব্যক্তিত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে মরসুমের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচন করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, রাজস্থান ক্লাবের রাইট ব্যাক রহমান এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লেফ্‌ট ব্যাক সালাম নির্বাচক কমিটির সদস্যদের সমসংখ্যক ভোট অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যানের ভোটে চূড়ান্ত নির্বাচন সমাধা করা হয়।

রহমানের ক্রীড়ানিপুণতা, মাঠে ও মাঠের বাইরে তাঁর আচার ব্যবহার এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ না করেও বলা যায় সালামের নির্বাচন সর্বদিক দিয়েই যুক্তিযুক্ত হয়েছে। সালাম যে একজন উঁচু দরের খেলোয়াড়, সেবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মাঠে এবং মাঠের বাইরেও
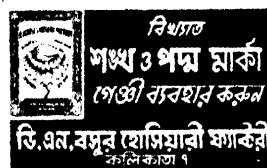
তার আচরণ প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির পরিচায়ক, ব্যক্তিত্বও যথেষ্ট। সর্বোপরি সালামের ধীর স্থির খেলা এবং বিপদের সময় মানসিক স্থৈর্য বিশেষভাবেই প্রশংসা দাবী করতে পারে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের মূলে এবার সালামের দান কম নয়। তার বুদ্ধিপ্রযুক্ত অধিনায়কত্ব এবং মানসিক দৃঢ়তা এবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে লীগ বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে একথা বললে কিছুই অত্যুক্তি করা হয় না।

জাতীয় ফুটবল—ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে এবার ভারতের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হবে বলে ঠিক হয়েছে। দিল্লী, হায়দরাবাদ, অন্ধ্র ও আসাম এই চারটি রাজ্য এসোসিয়েশন এবার জাতীয় ফুটবল খেলা অনুষ্ঠানের অভিপ্রায় জানিয়েছে। কোন এসোসিয়েশনের উপর পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হবে, তা এখনো ঠিক হয়নি।

রুশ-ব্রিটেন অ্যাথলেটিক স্পোর্টস—লণ্ডনের হোয়াইট সিটি স্টেডিয়ামে এবার সোভিয়েট রাশিয়া ও ব্রিটেনের দুই দিনব্যাপী অ্যাথলেটিক স্পোর্টস নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগের স্পোর্টসেই রাশিয়া বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। পুরুষ বিভাগে রাশিয়া ১১৯ পয়েণ্ট এবং ব্রিটেন ৯৩ পয়েণ্ট, আর মহিলাদের বিভাগে রাশিয়া ৭৩ পয়েণ্ট এবং ব্রিটেন ৪০ পয়েণ্ট লাভ করে।

আন্তঃ রেল ফুটবল—পেরাম্বুরের ইণ্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী এবং সাদার্ন রেলওয়ে ফুটবল দল এবার খড়্গপুরে অনুষ্ঠিত আন্তঃ রেল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় যুগ্মভাবে বিজয়ী হয়েছে। অতিরিক্ত সময়ের খেলা সত্ত্বেও ফাইনাল খেলাটি ১—১ গোলে অমীমাংসিত থাকে। ফলে দুই দলকেই যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। তবে ইণ্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী 'টসে' জয়লাভ করায় প্রথম ৬ মাস বিজয়ীর পুরস্কার রেণী কাপ নিজেদের দখলে রাখবার অধিকারী হয়েছে। আন্তঃ রেল ফুটবল প্রতিযোগিতায় দুটি দলের যুগ্মভাবে বিজয়ী হবার ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগে ১৯৫০ সালে জি ই পি ও ই আই আর, ১৯৫৩ সালে সেণ্ট্রাল রেলওয়ে এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং ১৯৫৪ সালে ইস্টার্ন রেলওয়ের (রেড) ও ইস্টার্ন রেলওয়ে (ব্লু) দল যুগ্মভাবে বিজয়ী হয়েছিল।

সেণ্ট্রাল টেবিল টেনিস—চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ হলে অনুষ্ঠিত সেণ্ট্রাল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলায় উঠতি খেলোয়াড় দীপক ঘোষ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ২১—১২, ২৩—২১, ২০—২২ ও ২১—১৫ পয়েণ্টে সরোজ ঘোষকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। মেয়েদের বিভাগে কুমারী উষা আয়েংগার বিজয়িনী হয়েছেন ফাইন্যালে মিস দি কাপুরকে ২১—১৩, ২১—১৭ ও ২১—১৩ পয়েণ্টে পরাজিত করে।

সি সি আই টেবিল টেনিস—বোম্বাইতে ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারত চ্যাম্পিয়ন গৌতম দেওয়ানকে ফাইন্যালে বি থাম্বাট্টার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। উন্নত টেবিল টেনিস নৈপুণ্য দেখিয়ে থাম্বাট্টা ফাইন্যালে গৌতম দেওয়ানকে পরাজিত করেছেন ২১—১০, ১৭—২১, ২১—১৬, ১১—২১ ও ২১—১৪ পয়েণ্টে।

যুক্তরাষ্ট্রের টেবিল টেনিস সফর—৯ সপ্তাহকাল ভারত সফর করবার জন্য ৩জন খেলোয়াড়বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র টেবিল টেনিস টীম সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে কলকাতায় এসে পৌঁছুচ্ছেন। ১১ই ও ১২ই কলকাতায় এদের প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় দল ভারতের ১০টি কেন্দ্রে প্রদর্শনী টেবিল টেনিস খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। কর্বিলন কাপের রীতি অনুযায়ী ৪টি সিঙ্গলস ও ১টি ডাবলসের খেলায় এরা প্রতি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ভারতীয় দলের সংগে। যুক্তরাষ্ট্র দলে আছেন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন বিল গান, ওপেন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন বার্নার্ড বাকেট ও উঠতি খেলোয়াড় ববি ফিল্ডস।

দেশী সংবাদ

২৭শে আগস্ট—অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী অদ্য লোকসভায় সুস্পষ্টভাবে এই আভাস দেন যে, প্রথমে অন্যরূপ স্থির করা হইলেও পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বেশীরভাগই এখন সংগ্রহ করিতে হইবে বিভিন্ন প্রকার করের মধ্য দিয়া। কারণ জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ, বাহিরের সহায়তা ও ঘাটতি বাজেটের সাহায্যে অধিক অর্থ সংগ্রহ করা যাইবে না।

কতকগুলি অভাব অভিযোগ পূরণের দাবীতে উত্তরপাড়ার নিকটে ভদ্রকালী উদ্বাস্তু মহিলা ক্যাম্পের ৪ জন উদ্বাস্তু নারী সোমবার হইতে অনশন ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২৮শে আগস্ট—পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক বিশেষ আইন (অত্যাবশ্যক দ্রব্য সামগ্রী আইন) বলে অদ্য কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ ৬০টি চাউল কলের মজুত চাউল আটক করিয়াছেন এবং সরকারের নির্দেশ ছাড়া এই চাউল বিক্রয় বা স্থানান্তর করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অদ্য সংসদের উভয় সভায় পাবলিক সার্ভিসেস কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয়। কমিটির অধিকাংশ সদস্য এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উচ্চপদের সরকারী চাকুরি ব্যতীত সরকারের অন্যান্য কাজে কর্মীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী হইতেই হইবে এমন কোন বাধাবাধকতা থাকা উচিত নহে।

২৯শে আগস্ট—অদ্য লোকসভায় বিতর্কমূলক সম্পদ কর বিল গৃহীত হইয়াছে। কর ধার্যযোগ্য ব্যক্তিদিগকে আরও সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং প্রাক্তন সামন্ত নৃপতিদিগকে আইনের আওতা হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে যে সকল ঢাকনি থাকে সেগুলি সম্প্রতি "পাইকারী হারে" চুরি যাইতেছে বলিয়া কলিকাতা করপোরেশন খুব ভাবিত হইয়া উঠিয়াছেন।

৩০শে আগস্ট—১৯৫৭-৫৮ সালের জন্য অর্থমন্ত্রীর সাধারণ বাজেট প্রস্তাবে রেলযাত্রীদের উপর নূতন কর ধার্য করা হইয়াছে এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ হইতে উহা কার্যকর হইবে।

বৃষ্টির অভাবে বিপন্ন সুন্দরবনের ক্ষুধার্ত চাষীরা মিছিল করিয়া ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে কলিকাতার রাজপথে আসিয়া পৌঁছিতেছে। প্রত্যহই দশ পনেরটি পরিবার পেটের দায়ে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে এখানে আসিতেছে। এপর্যন্ত ১০০০টি পরিবার আসিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

৩১শে আগস্ট—আজ লোকসভায় দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিল গৃহীত হয়। একটি বিলে রেলযাত্রীদের ভাড়ার উপর কর ধার্য করা হইয়াছে। ৩০ মাইলের বেশী দূরের যাত্রীদের এই কর দিতে হইবে। দ্বিতীয় বিলের নাম বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন।

১লা সেপ্টেম্বর—অদ্য ভোরে কলিকাতা বিমান বন্দরে চার-ইঞ্জিন বিশিষ্ট একটি

হংকং বিমান ছাড়িতে অবতরণের সময় বিমানবন্দরে অপেক্ষমান ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশনের মাল ও যাত্রীবাহী একটি ডাকোটা বিমানের ধাক্কা দিলে ডাকোটার তিনজন টেকনিক্যাল কর্মচারী নিহত ও একজন গুরুতররূপে আহত হন।

পাকিস্থান হইতে নগদ মুদ্রাসহ প্রত্যাবর্তন-পথে নাগবিদ্রোহী ফিজোর সহকারী মাওউ এবং তাহার সঙ্গী কুমা চাক্মাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ, মাওউ পুলিশের সহিত জানাইয়া দিয়াছে যে সে পাকিস্থানের সাহায্যে বন্দুক আনিতে আসেন।

কলিকাতায় ময়দানে সরকারী নীতির সমর্থনে সভা ডাকিয়া, ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা দ্রুত কার্যকরী করার দাবীতে জাতিকে বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রের প্রতিবেদন সম্পর্কে মতবিরোধের ফলে, আজ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন প্রাঙ্গণ ও উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া ওঠে।

১লা সেপ্টেম্বর—কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় ও গোয়া সম্পর্কে ভারতের মূল নীতির কথা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ পুনরায় লোকসভায় ঘোষণা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করিয়া রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট জেলার নির্দিষ্ট অঞ্চলসমূহে সরকারী পারমিট বা লাইসেন্স ব্যতীত ধান-চাউলের আমদানি রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়া এবং ধান-চাউলের পাইকারী ক্রয় বিক্রয় ও পাইকারী দরে চাউল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

কংগ্রেস গঠনতন্ত্র সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের পর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তিনদিনব্যাপী অধিবেশন আজ সন্ধ্যা ১১টায় শেষ হইয়াছে। কংগ্রেসকে "অধিকতর জনপ্রিয় ও শক্তিশালী" করিয়া তোলাই গঠনতন্ত্র সংশোধনের উদ্দেশ্য।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে আগস্ট—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান "তাস" অদ্য রাত্রিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হইয়াছে। প্রমাণিত হইয়াছে যে সামরিক বিমান বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে রকেট প্রেরণ করা সম্ভবপর। এ ধরনের একটি অস্ত্রের পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হইবার সংবাদ রাশিয়াই প্রথম ঘোষণা করিতে সক্ষম হইল।

২৭শে আগস্ট—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, পশ্চিম পাকিস্থানের গবর্ণর শ্রী মুস্তাক আহমেদ গুরমানী আজ সন্ধ্যায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

২৮শে আগস্ট—ইয়েমেন আজ বৃটেনের বিরুদ্ধে ইয়েমেন বাহিনীর উপর এক নতুন ধরনের আগ্নেয় বোমা বর্ষণের অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে। এই বোমার কবলে পড়িলে রক্তবমন ও মৃত্যু ঘটাইবে।

অদ্য রাত্রিতে করাচীর নির্ভরযোগ্যসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্থানের প্রচার এবং বেতার বিভাগের মন্ত্রী সর্দার আমির আজম খাঁ সুরাবর্দী মন্ত্রিসভা ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৯শে আগস্ট—রাশিয়া অথবা সর্বাত্মক-আক্রমণের আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়া অন্যান্য সকল আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিবার জন্য আজ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে এক প্রস্তাব করেন।

৩০শে আগস্ট—ওয়াশিংটনের সরকারী মহল হইতে অদ্য বলা হয় যে, গত দুই মাস সোভিয়েট ইউনিয়ন চারটি (এমন কি ছয়টিও হইতে পারে) দূরপাল্লার রকেট ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান "তাস" অদ্য রাত্রিতে ঘোষণা করেন যে ভূতপূর্ব সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মলোটভ মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েট দূত নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩১শে আগস্ট—অদ্য মালয় যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। টেংকু আবদুল রহমান অদ্য স্বাধীন মালয়ের প্রথম নিয়মতান্ত্রিক মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন।

ওয়াশিংটনের কর্তৃপক্ষ মহল হইতে অদ্য বলা হয় যে, গতকল্য ফ্লোরিডার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা-ক্ষেত্র হইতে প্রায় দশ হাজার মাইল পাল্লার "থর" নামক ক্ষেপণাস্ত্রটি আকাশে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, উহা নির্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় উহাকে উড্ডীন অবস্থাতেই ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হইয়াছে।

১লা সেপ্টেম্বর—গত শুক্রবার ইতালীর সরকার নিহত ফ্যাসিস্ত নেতা বেনিতো মুসোলিনীর দেহাবশেষ তাঁহার পত্নী ডোনা রাকেলের নিকট অর্পণ করেন। আজ রাত্রে একটি বিরাট মার্বেল নির্মিত শবাধারে উহা সমাহিত করা হয়।

২রা সেপ্টেম্বর—অদ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এ নাগা বিদ্রোহী নেতা শ্রী এ জেড ফিজোর একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে তিনি পুনরায় নাগা ভূমির স্বাধীনতা দাবী করিয়াছেন। নাগা নেতা নিজেকে নাগা জাতীয় পরিষদের প্রেসিডেন্ট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পত্রখানিতে তারিখ আছে ৭ই আগস্ট এবং ঠিকানা আছে কোহিমা, ভারত।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা
কলিকাতা বার্ষিক ২০, টাকা, ষাণ্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।
মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২, টাকা, ষাণ্মাসিক ১১ ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড]
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

তেল কোম্পানীর
দাদ ও কাউরের
অব্যর্থ মলম
বরানগর • কলিকাতা

সূচীপত্র
Cooch Behar

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

DESH : 40 Naye Paisa
Saturday, 14th September, 1957

২৪ বর্ষ ॥ ৪৬ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ২৮ ভাদ্র ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

বিপ্লবীর লোকান্তর প্রয়াণ

অল্পদিনের ব্যবধানে বাংলার দুই-জন বিপ্লবীনায়ক পরিণত বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ৩১শে আগস্ট রাত্রিকালে শ্রীহৃষীকেশ কাঞ্জিলাল (পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসী বিশুদ্ধানন্দ গিরি মহারাজ) দেহত্যাগ করেন। বাংলার অগ্নিযুগের প্রারম্ভে যাঁহারা বিপ্লবমন্ত্র গ্রহণ করেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হইলে অগ্নিযুগের বাণী দেশময় ছড়াইয়া দিবার সুযোগ আসিয়াছে বুঝিয়া তিনি সেই পত্রিকায় যোগদান করেন। পরে মাণিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইলে অন্যান্য অনেক কর্মীর সহিত তিনি গ্রেপ্তার হন এবং দীর্ঘকাল আন্দামানে বন্দীজীবন যাপন করিয়া বারো বৎসর পরে মুক্তি পান। মুক্ত হইয়া তিনি কর্মের পথ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসে দীক্ষিত হন। তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তির অল্প কয়েকদিন পরেই অন্যতম বিপ্লবীনায়ক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘ রোগ-ভোগের পরে লোকান্তরিত হন। অমরেন্দ্রনাথ ও হৃষীকেশ সহকর্মী ছিলেন, খুব সম্ভব শ্রীযুক্ত কাঞ্জিলালের মৃত্যু সংবাদ তাঁহার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। তিনি তাঁহার উত্তরপাড়াস্থ বাস-ভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ত্যাগ ও কর্মের মাধ্যমে যাঁহারা দেশের মুক্তি-সাধনাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন সেই বীর সন্তানগণের মধ্যে তাঁহাদের দুই-জনের নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বীর-সন্তানগণের পরলোকগত আত্মার শান্তি-কামনা করিয়া আমরা তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় মনে পড়িতেছে। ১৯০৫ সালে জাতীয়তা উদ্বোধনের জন্য যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, বিচিত্র উদ্দীপনাময় কর্মপন্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া তাহার পূর্ণতা ঘটে ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' বিপ্লবে। তার কয়েক বৎসর পরে দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯০৫ সাল হইতে শুরু করিয়া প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল দেশবাসীর মন, বিশেষত দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মন এই সব আন্দোলনের দ্বারা উদ্দীপ্ত ও দীক্ষিত হইতেছিল। এই সব আন্দোলনই ছিল যেন জাতীয়তা শিক্ষার পাঠশালা। এখন পালা বদল হইয়াছে, পাঠশালারও রূপান্তর অপরিহার্য। কিন্তু তাই বলিয়া জাতীয়তা বোধের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকিবে না এমন হইতেই পারে না। তখন ছিল জাতির আত্মকর্তৃত্ব লাভের প্রয়াস, তাহার পথ এক। এখন জাতি আত্মকর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত —এখন অন্য পথ। পথ ভিন্ন হইলেও জাতীয়তাবোধ এক বই দুই নয়। সেই জাতীয়তাবোধ জাগ্রততর ও উদ্দীপ্ততর করিবার কোন্ প্রয়াস এখন হইতেছে, আদৌ হইতেছে কিনা বিবেচ্য। কোন অবাঞ্ছিত কার্যকারণের ফলে জাতীয়তা-বোধ যদি স্তিমিত হইয়া আসে তবে জাতির পক্ষে শুভ হইবে না। তাহা জাগ্রত করিয়া রাখিবার একটি উপায় লোকা-ন্তরিত বীর বিপ্লবীগণের জীবনকথার স্মরণ। সেইজন্যই আজ আরো বেশি করিয়া সদ্য লোকান্তরিত বিপ্লবীদিগের ও তাঁহাদের সহকর্মী লোকান্তরিত অন্যান্য বীরগণের ত্যাগ মহিমোজ্জ্বল জীবন বিশেষভাবে স্মরণ করিতেছি।
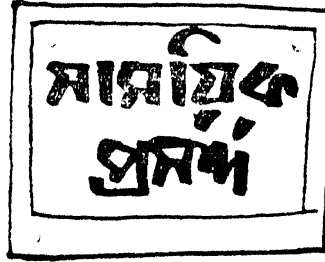
গেঁওখালিতে নূতন বন্দর

ন্যাশনাল হারবার বোর্ড একটি নূতন সামুদ্রিক বন্দর স্থাপনের স্থান সন্ধান করিতেছেন এবং সেই সূত্রে গেঁওখালির প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। প্রকাশ যে, বিশেষজ্ঞ-গণ গেঁওখালির দাবী অস্বীকার করিতে পারেন নাই। আমরা মনে করি যে নূতন বন্দর হইবার পক্ষে গেঁওখালির বিশেষ যোগ্যতা আছে। স্থানটি ভাগীরথীর মোহনায়; নদী এখানে বিস্তৃততর; নদী-গর্ভ সামান্য দু'একটি বাদে বালির চর বা 'স্যান্ডবার' মুক্ত; গেঁওখালি হইতে ২৫।২৬ মাইল রেলপথ তৈয়ারি করিলেই দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের সঙ্গে যোগা-যোগ সম্ভব। আরও কারণ আছে। গেঁও-খালিতে নূতন বন্দর হইলে ভারতের বৃহত্তম বন্দর কলিকাতার উপর চাপ কমিবে। তাহা ছাড়া পূর্ব ভারতে অবস্থিত বিস্তৃত লৌহ কয়লা প্রভৃতির খনির অঞ্চলও নিকটবর্তী। এখানে নূতন বন্দর স্থাপনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যারও আংশিক সমাধান সম্ভবপর। এতগুলি কারণের সমাবেশ গেঁওখালির দাবীকে যে গুরুত্ব দান করিয়াছে তাহা অগ্রাহ্য করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হইবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা।

কেরলে আইন ও শৃঙ্খলা

কম্যুনিস্ট শাসিত কেরল রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হইয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়িয়াছে বলিয়া দায়িত্বশীল অনেক নেতা অভিযোগ করিয়াছেন। অভিযোগগুলি বিশ্লেষণ করিলে তিনটি রূপের খসড়া পাওয়া যায় (১) শ্রমিক ও মালিক বিরোধে পুলিসের নিষ্ক্রিয়তা, (২) রবার ও কফি প্রভৃতির খামার অঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণীর বে-আইনী হামলা এবং (৩) স্থানীয় কম্যুনিস্ট 'সেল' বা ছোট ছোট দলের সরকারী

ক্ষমতা গ্রাস। এখন এই সব অভিযোগ সত্য হইলে সত্যই উদ্বেগের কারণ ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু অভিযোগ সত্য কি না কিম্বা কতখানি সত্য নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। একেত দূরত্ব একটা অন্তরায়, তারপরে স্বপক্ষে বিপক্ষে অভিমতের আধিক্য আর একটা অন্তরায়। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি কেরলে গিয়াছিলেন। তিনি কম্যুনিস্ট শাসনকে 'সহ-অবস্থানের' দৃষ্টান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যদিকে কেরল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীদামোদর মেনন ও কেরল বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা শ্রীচাকো কেরলের পরিস্থিতিকে এমনই গুরুতর মনে করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিরপেক্ষ তদন্তের প্রতিশ্রুতি আদায় করিবার আশায় তাঁহারা দিল্লীতে আসিয়াছেন। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত মেনন কেরলের অবস্থা সরেজমিনে দেখিবার জন্য কেরলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মন্তব্য এখনও জানা যায় নাই। আবার কেরল প্ল্যান্টার্স এসোসিয়েশনের ইংরাজ সভাপতি থামার অঞ্চলে আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ তুলিয়াছেন। অন্যপক্ষে কেরল সরকার সরাসরি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছিলেন। বাস্তবের চাপে পড়িয়া কেরল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদকে সমস্ত অভিযোগ আংশিক স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য সূত্রেও খবর পাওয়া গিয়াছে যে, সম্প্রতি তথায় আইন ও শৃঙ্খলার সামান্য কিছু উন্নতি হইয়াছে। মোটের উপরে সমস্ত অবস্থাটা অস্পষ্ট হইলেও বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, 'কেরল বিজয়ের' আনন্দাতিশয্যে কম্যুনিস্ট পার্টি স্বাধীকার প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তারপরে অনেক পরিমাণে সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া সংযত হইয়াছে। প্রাপ্ত খবরের বলে আমাদের মনে হয় না যে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের সময় আসিয়াছে--তবে সতর্কদৃষ্টি রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। অন্য রাজনৈতিক দল হইলে সে প্রশ্ন উঠিত না, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ইহারা কম্যুনিস্ট পার্টি—গণতন্ত্র ইহাদের ধাতে নাই।

কংগ্রেসের প্রশাসনিক পুনর্গঠন

সম্প্রতি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে কংগ্রেসের প্রশাসনিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে নানা প্রস্তাবের আলোচনা হইয়া গেল। কেবল নিয়মগত পরিবর্তন দ্বারাই যে দেশে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করা সম্ভব এরূপ নিশ্চয়ই কেহ মনে করেন না। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস-সভাপতি প্রতিষ্ঠানে কোথায় দুর্বলতা প্রবেশ করিয়াছে তাহার আলোচনা যেরূপ স্পষ্টভাবে করিয়াছেন তাহা তাঁহার যোগ্য হইয়াছে। 'কোনো সমস্যা নাই' বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন নাই। তিনি বলেন, 'সমাজের প্রধান সমস্যাগুলির সহিত কংগ্রেস যোগ হারাইয়া ফেলিতেছে—ডাক ও তার বিভাগের প্রস্তাবিত ধর্মঘটের সময় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কৃষক শ্রেণী, যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়ের সহিতও কংগ্রেসের যোগ ক্ষীণ। এই প্রসঙ্গে তিনি কেরলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—সেখানে কম্যুনিস্ট কর্মীসংগঠন বিশেষ ব্যাপ্ত, প্রতি গ্রামে তাঁহাদের অন্তত একজন কর্মী আছেন।'

অথচ দেশময় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে প্রদেশে নগরে পল্লীতে এই স্থানীয় কর্মী ও কমিটিগুলির উপরেই। নির্বাচনের সময় কংগ্রেস যে অধিক ভোট পাইয়াছে তাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবার হেতু নাই, তাহার অন্যতম কারণ হয়ত ঐ ঊর্ধ্বতন নেতাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা; এবং অপর দল সম্বন্ধেও নৈরাশ্য, কংগ্রেসের প্রতি বিশেষ উৎসাহ নাও হইতে পারে। স্থানীয় কংগ্রেসী নায়কগণ প্রধান নেতৃবর্গের এই সকল খেদবাক্যে অবহিত হইবেন কি না, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা প্রধানত তাহারই উপর নির্ভর করিবে।

অপরপক্ষে, কংগ্রেসী সরকারের সহিত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কংগ্রেস যে সমাজতন্ত্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বাস্তবে পরিণত করিবার ভার প্রধানত কংগ্রেস সরকারের উপর ন্যস্ত—দেশের অন্নবস্ত্র সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহারা প্রাণপণ উদ্‌যোগ করিতেছেন, দেশবাসীর কাছে একথাটা যদি স্পষ্ট করিয়া তুলিতে না পারেন, তবে কংগ্রেস সরকারের বহির্ভূত কংগ্রেস কর্মীরা যতই ত্যাগব্রতী হউন তাঁহারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে পূর্বতন শ্রদ্ধার আসনে পুনঃস্থাপিত করিতে পারিবেন না।

ভাষা শিক্ষার আদানপ্রদান

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ্যবৃদ্ধির অন্যতম উপায়রূপে পণ্ডিত নেহরু প্রায়শই প্রত্যেক ভারতীয়ের একাধিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়া থাকেন—বর্তমানে যাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে তাহাদের সকলের পক্ষে ইহা সম্ভব না হইলেও, এখনো যাহারা বিদ্যালয়ের ছাত্র তাহাদের সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা অসম্ভব নহে এবং বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের নানা বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ঐক্যসূত্র রচনার অন্যতম উপায়রূপে এই ব্যবস্থা বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

সম্প্রতি যে অফিসিয়াল ল্যাংগোয়েজ বা সরকারী ভাষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মাইনরিটি রিপোর্টে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন (পৃ ২৮৯)। কিন্তু মূল রিপোর্টে 'বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা সর্বত্রই থাকা বাঞ্ছনীয় বই কি' এই ধরনের কথা বলা হইলেও, বিষয়টিতে তেমন কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই (পৃ ৮৭-৮৯)। তাঁহারা কেবল ইহার ব্যবহারিক দিকটা আলোচনা করিয়াছেন, যদিও সে ক্ষেত্রেও মতভেদের প্রভূত অবকাশ আছে। তাঁহারা লিখিয়াছেন, অধিকাংশ ছাত্র স্বীয় অঞ্চলের বাহিরে যাইবে না—তাহাদের অপর অঞ্চলের ভাষা শিখিবার কি প্রয়োজন? হিন্দী অবশ্য শিখিতে হইবে। উত্তরে বলা যাইতে পারে, যদি সকলের স্বীয় অঞ্চলের বাহিরে যাইবার সুযোগ হইত তবে অপর প্রদেশের সংস্কৃতির সহিত অন্যভাবেও হয়ত যোগ স্থাপিত হইতে পারিত—সেই সুযোগ নাই বলিয়াও ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা।

নিখিল ভারত ঐক্য সৃষ্টির জন্য যে হিন্দী শিক্ষার পরিকল্পনা, দেখা যাইতেছে তাহাই ঐক্যের পথে প্রচণ্ড বাধা হইয়া দাঁড়াইতেছে। অ-হিন্দীভাষিগণ আশঙ্কা করিয়াছেন যে, হিন্দী প্রধান আসন পাইলে হিন্দীভাষিগণ তাঁহাদের উপর 'রাজত্ব' করিবেন, তাঁহারা সর্বব্যাপারে অকারণে হিন্দীভাষীদের তুলনায় পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিতে বাধ্য হইবেন। হিন্দীভাষিগণও অপর একটি ভারতীয় ভাষা শিখিবেন, এই ব্যবস্থা হইলে হিন্দীভাষীদের সম্বন্ধে এই সংশয় কতকটা দূর হইতে পারিত, কিন্তু কমিশনের সদস্যগণ সে দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন নাই।

কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে

হরপ্রসাদ মিত্র

মোহিতলাল মজুমদার তাঁর এক ভূমিকায় লিখেছিলেন—

"বিদেশী ভাষার উৎকৃষ্ট রচনা অনুবাদ করিতে হইলে দুইটি বস্তুর প্রয়োজন; প্রথম,—সেই মূল ভাষার শুধু শব্দার্থজ্ঞান নয়, তাহার ইডিয়মের রসবোধ; দ্বিতীয়,—যে ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে সেই ভাষার অনুরূপ ইডিয়ম যোজনা করিবার শক্তি; এই শক্তি আমাদের অনুবাদকের নাই, তার কারণ, ইহারা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য তো পড়েই নাই,—যে-সমাজের যে ভাষায় ইহারা অভ্যস্ত, তাহা একটা কৃত্রিম ভাষা, তাহাতে ইডিয়মের বালাই নাই।"(১)

মোহিতলালের সমকালীন প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন—

"তাজমহল ইঁটে তর্জমা করা একরকম অসাধ্য সাধন করা। বাংলা ভাষায় মন্দাক্রান্তার সুর ও তাল দুই সমান রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। ও ছন্দের তাল রক্ষা করতে গিয়ে সুর আলগা হয়ে পড়ে। এর মূল কারণ—বাংলা ভাষার এক-তারাতে সংস্কৃত রুদ্র বীণার ঝঙ্কার তোলা যায় না।"

প্রমথ চৌধুরীর এই মন্তব্যও তাঁর একটি ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত হলো। হেমেন্দ্রলাল রায়ের 'মণিদীপা' বইখানির সূচনা এই ভূমিকা দিয়ে; তাতে শ্রীহর্ষের 'নাগানন্দ' ও 'রত্নাবলী',—কালিদাসের 'শকুন্তলা', 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব',—ভবভূতির 'উত্তর-চরিত',—রাজশেখরের 'বিদ্ধ শালভঞ্জিকা'—এবং সাঁওতালী, কোচ, হিন্দি ও তামিল কবিতার অনুবাদ সংকলন করা হয়েছিল।

মোহিতলাল এবং প্রমথ চৌধুরীর সমকালীন কবিদের মধ্যে অনুবাদনিষ্ঠ কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবীণদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর নাম স্মরণীয়। তাঁর 'অপরাজিতা' প্রকাশিত হয় ১৩২০ সালের পয়লা আশ্বিন—অর্থাৎ ইংরেজি হিসেবে ১৯১৩ সালে। যতীন্দ্রমোহন বোধ হয় সত্যেন্দ্রনাথের 'ফুলের ফসল'-এর প্রভাবে পড়ে এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের অশোক-গোলাপ-করবী-গুচ্ছের দেখাদেখি তাঁর এই বইখানিতে অপরাজিতা-কাঞ্চন-সন্ধ্যামণির কবিতা লিখেছিলেন। তা ছাড়া এই বইটিতে 'ঘুমহারা', 'কালো' 'অভিমান', 'বরাত', মুরুব্বি', পান্ডা',—এই ক'টি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'-র প্রভাব আছে। এবং তৃতীয়তঃ এ-বইয়ের 'ত্যক্ত গৃহে', রাজকুমারী', শুকনো পাহাড়ে ফুল এবং 'নিরুপায়',—এই চারটি রচনাই হলো টেনিসনের বঙ্গানুবাদ।

সেকালের প্রসিদ্ধ "ভারতী" পত্রিকায়,—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে,—"সম্পাদকের বৈঠক" অংশে বিদেশের স্থায়ী ও সাময়িক সাহিত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ছাপা হতো। "কাব্যজগৎ" অংশে আশুতোষ চৌধুরী বিদেশী বিখ্যাত কবিদের রচনা-পরিচয় দিতেন। বাংলায় অদ্যাবধি সেই অনুবাদ-আগ্রহের ঝোঁকটি চলে এসেছে, কিন্তু একালের কোনো প্রসিদ্ধ পত্রিকাতেই নিয়মিতভাবে বিদেশী কবি বা সাহিত্যিকদের সত্যিকার আলোচনা বা পরিচিতি ছাপা হয়না। "আনন্দবাজার", "যুগান্তর", "বসুমতী" প্রভৃতি দৈনিকের বিশেষ-বিশেষ দিনে, প্রতি সপ্তাহেই বিশ্ব-সাহিত্যের কিছু খবর থাকে বটে—কিন্তু সাহিত্যের আলাপ-আলোচনা আরো বিশদভাবে, আরো ব্যাপকভাবে চলবে, তাই তো বাঞ্ছিত। "চতুরঙ্গ", "সাহিত্যপত্র", "উত্তরসূরী" ইত্যাদি পত্রিকা সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু—একালের এই তিনজন প্রসিদ্ধ কবি অনেক পাশ্চাত্ত্য কবিতার অনুবাদ করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছ থেকেও কিছু অনুবাদ পাওয়া গেছে। সত্যেন্দ্রনাথের এবং "ভারতী" দলের অন্যান্য কবির অনুবাদ-সামর্থ্যের সঙ্গে অন্য পর্বের অন্যান্য অনুবাদকের তুলনা করা হয় তো সংগত নয়; কারণ, সেকালের আগ্রহ আর একালের মনোযোগ, এ দুটি পৃথক অবস্থা; এই দুই অবস্থা মোটেই এক নয়। তবু, তুলনার কথা ওঠে, —মানুষ সম্পর্ক খুঁজতে চায়, সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে চায়। সত্যেন্দ্রনাথের স্বভাবটাই ছিল আহরণ-মনোযোগী—তিনি যতো পরিশ্রমী, ততো অনুভূতিময় ছিলেন না। ফলে তাঁর অনুবাদ কোনো বিশেষ কবিগোষ্ঠী বা কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলেরও যেমন চিহ্ন নেই, আবশ্যক ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম সতর্কতারও তেমনি অভাব চোখে পড়ে। যেমন তরু দত্তের "যোগাদ্যা"র অনুবাদের প্রথম দিকেই মূলের "Red—Red"-এর ভাবটা বাংলাতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে; সত্যেন্দ্রনাথ "রাঙা" কথাটা [illegible] বটে,—যেমন

[illegible] রাঙা [illegible]
রাঙা সেই পথ—[illegible] গেছে চলে...

—কিন্তু মূলের গাঢ় খুশির অনুভূতি তাতে কেমন যেন ফিকে হয়ে গেছে। আবার, বদলেয়ার-এর মূল ফরাসীর ইংরেজি অনুবাদে যেখানে আছে "O swoon of dancing feet......" সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে লিখেছেন—"মূর্চ্ছা-শিথিল নৃত্য-আবর্ত্তন"! "A shrine of Death and Beauty is the Sky"-এর অনুবাদে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেছে—"সুন্দর-ম্লান বেদী সুমহান্ সীমাহীন নীলাকাশ......।" কীট্‌স্-এর "I met a lady in the meads'-এর অনুবাদে তাঁর "মাঠে মাঠে যেতে নারী সনে ভেট" দেখে বড়োই অদ্ভুত ঠেকে। "ভেট" কথাটা যে রসের দিক থেকে ওখানে আপত্তিজনক, সত্যেন্দ্রনাথের সেদিকে

১। বিদেশী ছোট গল্প সঞ্চয়ন—ভূমিকা

খেয়ালই ছিলো না। অথচ কীট্‌সের ঐ কবিতাতেই (La Belle Dame Sans Merci) 'manna-dew' বা 'elfin-grot' অনুবাদ করতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। ঐ দুটি শব্দ তিনি যথাক্রমে 'সুধা-রাশি' এবং 'অপ্সর-বন' বলে বাংলায় ব্যক্ত করেছেন। সবচেয়ে অস্বাভাবিক মনে হয় 'ভালবাসি গো' শুনে! মূলে, কীট্‌স-এর পরী বলেছিলেন—'I love thee, true'।

এ সব অসতর্কতা সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের অনেক উপকার করেছিলেন। সে সময়ে তাঁর দেখাদেখি আরো অনেকে অনুবাদের কাজে এগিয়েছিলেন। তিনিই যে প্রধান অনুবাদক ছিলেন, তা নয়। তাঁর আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ভোলবার নয়। কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, দেবেন্দ্রনাথ সেন ইত্যাদি সত্যেন্দ্র-সমকালীন অনেকেই ছিলেন। নজরুলও হাফিজের অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু পরিমাণে এবং বিভিন্নতায় সত্যেন্দ্রনাথই ছিলেন সে যুগের অনুবাদকদের মধ্যমণি।

একালে যাঁরা বিদেশী কবিতার অনুবাদে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের প্রধানদের নাম বলা হয়েছে। র‍্যাঁবো এবং বদলেয়ার-এর ঠিক-ঠিক অনুবাদ যে হচ্ছে না, ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ এক সাহিত্য-রসিকের মুখে সে কথা শুনেছি। সুধীন্দ্রনাথ এবং বিষ্ণু দে উভয়েই রসিক প্রাজ্ঞ। রুচি এবং সতর্কতা দুই-ই তাঁদের অনুবাদে দেখা যায়; অর্থাৎ, তাঁরা এলোমেলোভাবে নানান দেশ-কালের কাব্যালোকে বাংলা সাহিত্যের আমদানী-উৎসাহী প্রতিনিধি মাত্র হয়ে ঘুরতে নারাজ। বিষ্ণু দে এলিয়টের অনুবাদে বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন। সুধীন্দ্রনাথ শেকস্‌পীয়রে এবং হাইনে-তেই বোধ হয় বেশি উৎসুক। ১৩৬০-এর আষাঢ় মাসে বিষ্ণুদের এলিঅট-কবিতাবলী (মোট ১৭টি) আলাদা বই হয়ে বেরিয়েছে। তারপর তাঁর 'যে বিদেশী ফুল' বেরিয়েছে ১৩৬৩ সালের আশ্বিনে। দ্বিতীয় বই-খানির ভূমিকাতে তিনি জানিয়েছেন 'যথা-সম্ভব চেষ্টা করেছি মূলে কবিতার বিন্যাস, ছন্দ বা নিদেনপক্ষে মেজাজ অনুবাদের আভাসে বহন করতে।' এই 'অনুবাদের আভাস' কথাটি আমার তো খুবই ভালো লাগে। কবিতার অনুবাদ কি 'আভাস' ছাড়া সার্থক হয়? 'ভারতী'-পর্বের অনু-বাদকগোষ্ঠী এই 'আভাস'-এর রসিক ছিলেন না। কিছুদিন আগে Sir H. Idris Bell নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তির একটি লেখা পড়ছিলাম,—প্রবন্ধটির নাম 'The Problem of Translation'। তিনি বলেছেন Yeats-এর কথাই ঠিক—কবিতার ব্যাপারে 'Words alone are certain good.' তারপর তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—'কিন্তু শব্দ কাকে বলে?—কী গুণ বা কী ধর্ম তার?' তিনি নিজেই এই জবাব দিয়েছেন যে, 'Perhaps we may say that the word, in contradistinction to the syllable, is the smallest element in language which has an independent meaning.' কিন্তু 'মানে' তো বটেই, তা ছাড়া শব্দের আরো কিছু কিছু গুণ আছে,—ধ্বনিগুণ, আবেগগুণ, অনুষঙ্গগুণ; শব্দের ব্যঞ্জনার সঙ্গে কোনো বিশেষ দৃশ্য, বিশেষ আওয়াজ অথবা বিশেষ ভঙ্গি বা অবস্থা বা মনোভাব জড়িত থাকতে পারে। যেমন—

বাষ্পে শিরায় জোরে বিজুলি—কলের চাকা, চাকে
কুমোরের, কুমীরের মোটরে উটের গন্ধে, চোখে
দুঃখের, মাছ-খুশি, জাহাজ নৌকো-ডুবি
গঙ্গার পথ ঘাটে গাছে
সৃষ্টির আদি ওঁ, ঢেউ ওঁ, প্রাণী বাণী ওঁ ওঁ,
আছি।

অমিয় চক্রবর্তীর 'খসড়া'র 'কুয়ো-তলা' থেকে এই যে ক'টি লাইন তুলে দেওয়া হলো, এখানকার শব্দগুলোর মধ্যেই কি নানাখানা ছায়া-ছবির রঙ-দেখানো, ঝিম-ধরানো অদ্ভুত আনন্দ লুকিয়ে নেই? 'প্রাণী বাণী ওঁ ওঁ' শুনলে মনটা অর্থবোধে না-পৌঁছেও নিছক ধ্বনিবোধের সাহায্যে বেশ খুশি হয়ে ওঠে না কি? বেল্‌সাহেব বলেছেন—

'Words are three-fourths of any poem; one of the three principal qualities which give value to a word, sense, sound, and emotional quality, only the first is separable, only it is likely to attach to the equivalent word in any other language.'

আরো জোর দিয়ে তিনি এও বলেছেন যে—

It is an illusion to suppose that every word has an exact equivalent in other languages.'

অনুবাদের,—বিশেষ করে কবিতার অনু-বাদকের এই সব অসুবিধার কথা বলে নিয়ে, এতৎসত্ত্বেও অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা এবং সম্ভাবনীয়তার কথা তিনি অস্বীকার করেননি। কবিতার অনুবাদ মূলের তুলনায় নিরেশ হতে পারে, মূলের যা মান বা গুণ,—তা ছাড়িয়ে গিয়ে আরো ভালো হতেও পারে, কিন্তু ঠিক, মূলের হুবহু প্রতিবিম্ব হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, অন্য মনের মননের মধ্য দিয়ে, তাকে নতুন জন্ম নিতে হয়। তিনি অনু-বাদক, তিনি কি নিজের মন-কে এড়িয়ে থাকতে পারেন? সে কথা ঠিক। তবু অনুবাদ দরকার।

মালার্মে, ভালেরি প্রভৃতি প্রতীকী কবি-দের অনুবাদ যে কী কঠিন কাজ, তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দুবার বলতে হয় না। সুধীন্দ্রনাথ, তাঁর 'প্রতিধ্বনি'-র ভাষ্যের মধ্যে বলেছেন—'কবি হিসাবে মালার্মে শুধু বিভিন্ন, এমন কি বিপরীত আবেগের আস্রবণ, অথবা অসমোসিস্ ঘটিয়েই ক্ষান্ত নন, তাঁর নিরবচ্ছিন্ন চিত্রকল্প যে-রকম বহুলাঙ্গ বাক্যের মুখাপেক্ষী, তার অনুকরণ স্বভাব-নির্গন্ধি বাংলায় একেবারে অসম্ভব; এবং স্বয়ং আলডাস্ হাক্সলি বর্তমান কবিতার ইংরেজী তর্জমায় পরিবর্জন ও পরিবর্তন—এ দুটো দোষের কোনওটা এড়িয়ে যেতে পারেননি।' এই সূত্রে পৃথিবীর নানান্ দেশের নানান্ ভাষার মধ্যে কোনো-কোনোটির নিজস্ব এক-এক রকম বিশেষত্বের কথা মনে পড়ে। চীনা কবিতার অনেকগুলি অনুবাদ আছে

বিষ্ণু দে'র 'হে বিদেশী ফুল'-এর মধ্যে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে অন্যান্য নানা গুণের সঙ্গে কিছু ললিত উদাসীনতার ভাব আছে বললে অন্যায় বলা হয় না; সুধীন্দ্রনাথ দার্শনিক মর্জির মানুষ,—কবি-দার্শনিক বলা আরো ভালো। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের গাম্ভীর্যটা চৈনিক নয়,—লেখাপড়া-করা সম্পন্ন বাঙালীরই। তাই চীনা কবিতার অনুবাদে বিষ্ণু দে-র স্বাভাবিক প্রবণতা

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত 'শর্তকিয়া' উপন্যাস এ-সপ্তাহে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। আগামী সপ্তাহ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক দেশ

যতোটা অনুকূল, সুধীন্দ্রনাথের বোধ হয়, ততোটা নয়। এসব কথা হয়তো আরো বুঝিয়ে বলতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু এখানে তা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, অপ্রাসঙ্গিক। কবিতার সূত্র ধরে আমি চীনা-ভাষারই বিশেষ স্বভাবের কথা বলতে চাই। তাতে কয়েকটি মাত্র কথার মধ্যে অনেকটা ছবি ধরানো যায়। এজরা পাউন্ড ইতালীয়, ফরাসী, চৈনিক, ইংরেজি ইত্যাদি অনেক-গুলি ভাষার চর্চা থেকে ভাষাবোধের এক-রকম সমন্বয়ে পৌঁছে ছিলেন বলে বোধ হয়। তিনি যখন চীনা কবিতার তর্জমা করেন, সেই সময়েই জাপানী 'তানাখা' এবং 'হোকু'—কাব্যরূপের চর্চাতে নিযুক্ত ছিলেন। চীনা কবিতার ভাষাগত সংযম ও সারল্য তিনি নাকি বহু পরিমাণে রক্ষা করেছেন বলে শোনা যায়। প্রভেন্সাল ভাষাতেও পাউন্ডের বেশ প্রবেশ ছিল। এলিয়ট লিখেছিলেন—

'He has grasped certain things in Provence, which are permanent' in human nature.'

কবিদের বিচিত্র সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে এই-যে ভাষাগত বিশেষ-বিশেষ পার্থক্যের ইশারা দেওয়া হচ্ছে, এতে ভাষাতত্ত্বের সমর্থন থাকতেও পারে, না থাকলেও ক্ষতি নেই। কারণ, ভাষার ব্যাকরণজ্ঞান এক জিনিস, রসবোধ অন্য জিনিস। বহুকালের বহু কবির মনের ছোঁয়া লেগে-লেগে চীনা-কবিতার ভাষাগত একটা ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে গেছে। এজরা পাউন্ড সেই বিশেষ প্রকৃতিটি সার্থকভাবে আয়ত্ত করে নিয়ে-ছিলেন। একথা অনেক অধিকারী ব্যক্তির কাছে শুনেছি। তাঁর Cathay বেরিয়েছিল ১৯১৫-তে। ইংলন্ডে ১৯৩০ সালেও চিত্রকল্পময় কবিতার সংকলন বেরিয়েছিল, কিন্তু চিত্রকল্পবাদ বা ইমেজিজম্-এর উৎসাহী নেতারা তার বহু পূর্বে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। এজরা পাউন্ড সেই প্রথম দলের নেতৃস্থানীয়। ১৯১৪-তে প্রথম ইঙ্গ-মার্কিন চিত্রকল্পবাদী কবিদের কবিতাসংগ্রহ বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু তারও আগে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে Hulme এবং Flint-এর উদ্যোগে চিত্রকল্পবাদী সংঘ গড়া হয়েছিল। এজরা পাউন্ড তার আগের বছরেই আমেরিকা থেকে ইংলন্ডে এসেছেন। ১৯১২-তে তাঁর Ripostes-এর ভূমিকায় ইমেজিস্ট কবিদের কৃত্য বা পালনীয় আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ঘোষণা ছাপা হয়। পাউন্ড তখন স্যাফো, ক্যাটাল্লাস, ভিলোঁ, হাইনে, গোতিয়ের প্রভৃতি কবিদের অনুবাদের দিকে ইংরেজ কবিদের মনোযোগ দিতে বলেন। ১৯১৪-র চিত্রকল্প কবিতাসংগ্রহের পরে এমি লোয়েলের সম্পাদনায় পর-পর তিন বছর সংকলন বেরিয়েছিল। ইতিমধ্যে 'ইমেজিজম্'-এর নামে এমি লোয়েল রুগ্ন দলের মুরুব্বি হয়ে উঠেছিলেন এই অভিযোগ প্রকাশ করে পাউন্ড নাকি কৌতুকের বশে বলেছিলেন যে, 'ইমেজিজম্' 'এমিজিজম্'-এ (Amygism) রূপান্তরিত হয়েছে।

সে যাই হোক, নিজের ভাষাতে পরের অনুবাদ যেসব কারণে দরকার, তার একটি হলো এই নতুনত্বের সন্ধান। অনুবাদের মধ্য দিয়ে এক দেশ অন্য দেশের মনে জায়গা পায়,—এখানকার আন্দোলন সেখানে যায়, সেখানকার সন্ধান এখানেও কিছু দিয়ে যায়। চীনা কবিতার বাকসংযম আর স্বাদবৈচিত্র্য থেকে পাউন্ড কি ইংরেজি সাহিত্যে কোনো নতুন জিনিস আনেননি? একথা কি জোর করে বলা যায়? এক ভাষার বিশেষ প্রকৃতি অন্য ভাষাতে পুরোপুরি না-হোক, কিছুও যদি চালান দেওয়া যায়, তাহলে সে চেষ্টা করাই তো সঙ্গত। কারণ, সুধীন্দ্রনাথের কথা ধার করে বলা যাক—ভাষার 'ব্যঞ্জনা বাড়ানোর [illegible] উপায় অনুবাদ।'
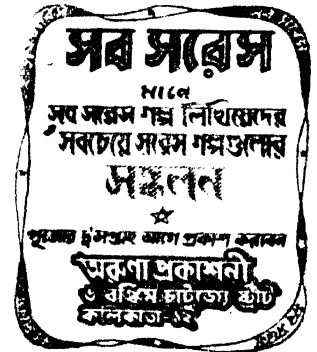
বোধি

আরতি দাস

এতদিন কী জেনেছি তবে
সূর্য ওঠে, আর সূর্য ডোবে;
তারপর, বল তারপর
কী জেনেছি নূতন খবর।

এই দেহ এও ত' আমাকে
হাসি দিয়ে কান্না দিয়ে ঢাকে
নিদাঘ নৈরাশ্যে জ্বলে একা
প্রত্যাশার গূঢ় পাঠ শেখা
প্রত্যেক ঋতুর কাছে তার
অফুরন্ত — কত বার বার।
বল বল এ দেহ আমাকে
কতদূর সঙ্গ দিয়ে থাকে?

মন সে ত' হাতে একতারা
তোমার তীর্থের পথে সারা
বিস্ময় গানের ধূয়ায়
তাল দিয়ে দিগন্তে মিলায়;
সেই গান সমুদ্র কল্লোল
কালো মেঘে মৃদঙ্গের বোল
অরণ্যের ব্যথিত মর্মর
আশ্বিনের আকস্মিক ঝড়।
সেই গান সেই সুর খুঁজে
পেয়েছি কি? —অকারণ যুঝে
চাইনি অশেষ ক্লান্তি; তাই
জেনেছি যে মিতালী পাতাই
দেহে মনে, মিথ্যে মিথ্যে সব
কথার কাকলী, কলরব।

সব শেষে এত অন্ধকার
নিরুত্তর মূঢ় অন্ধতার
এ অরণ্যে নেই কোন পথ
তবু খুঁজি আশ্চর্য শপথ;
যদি খুঁজে নাই পাই তাকে
জানি ভালবেসেছি তোমাকে।

পূর্বে তবু ত

অমলকান্তি ঘোষ

প্রগলভতায় ভুলেছে নিজেকে ভুলে গিয়ে পরিবেশ
গম্ভীর এই জীবনকে অনুনয়—
একটি কথায় আনো নির্মম জানা অজানার শেষ।
সমুদ্র পথে সৈকত দেখা এত অতৃপ্তিময়!
দূরের সবুজে অতি উজ্জ্বল তরু!

একটি কথার মৃদু উচ্চারে ঝড়ের চঞ্চলতা......
মধ্য-সাগরে নেই প্রাঙ্গণ মাটি।
এবারে লিপ্ত অন্বেষণের বিষাদ-কোমল ছটা,
বিষণ্ণ চোখ খুঁজে নেয় নিরালাটি।
পূর্বে তবু ত চোখের তারায় কাঁপত চিকণ তনু!

এক তারা

দিলীপ রায়

লক্ষ জীবনে যোগ ক'রে রাখা মনকে আমার
এনেছি নগর, নাগরীকে ছেড়ে, এ পাহাড়ে বনে
স্বচ্ছ আকাশে নীল আর শীত ঝকঝক করে,
রোদ্দুর যেন ডানা মেলা বক আকাশে উড়ছে।
আমি, শুধু আমি সকলের নই, আমারও নিজেরও
আছি এক আমি। সে আমিকে নিয়ে রূপার মতন
সমস্ত দিন বয়ে যায়, আর, আমি চেয়ে দেখি
আমাকে, যখন পাহাড়ে পাহাড়ে ঝ'রে পড়ে ঝর ঝর ক'রে গুঁড়ো
তুষারে মতো নির্জনতা।

আমি, শুধু আমি
আমারও নইতো, তাই যাব দ্রুত
দৈত্যের মতো ট্রেনে ক'রে ফের নগরে,
যেখানে লক্ষ জীবন লক্ষ তারার মতো;
আমি হবো এক তারা॥
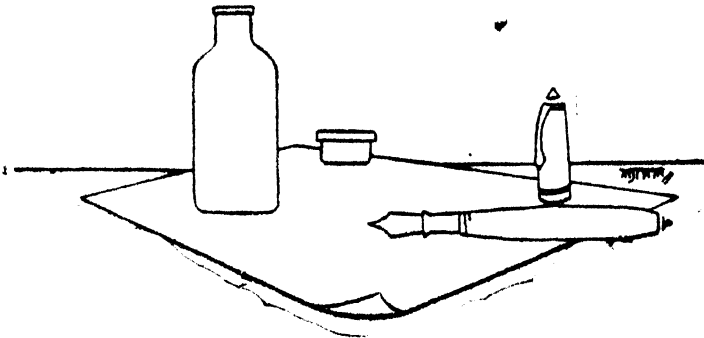
"সঙ্গীত-নাটক-একাডেমি"

(প্রতিবাদ)

বহুলপ্রচারিত জনপ্রিয় দেশ সাপ্তাহিকের চত্বারিংশ সংখ্যার ৩।৮।৫৭ তারিখে পশ্চিম-বঙ্গ সংগীত নাটক একাডেমী (সংগীতভবন) সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব মহাশয়ের সমালোচনা পাঠ করে বিস্ময় বোধ করছি। "আত্মসমর্থন" বা শার্ঙ্গদেব মহাশয়ের সমালোচনার(?) প্রত্যুত্তর দেবার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এই পত্রের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য 'দেশের' বিদগ্ধ পাঠক, অভিভাবক ও শিক্ষিত সমাজ যাতে শার্ঙ্গদেব মহাশয়ের সমালোচনা(?) পাঠ করে পশ্চিম-বঙ্গ সংগীত নাটক একাডেমী সম্বন্ধে এক "ভ্রান্ত এলোমেলো ধারণা" না করেন।

"The object of the Academy is to develop and promote Indian School of Dance, Drama and Music with due regard to the creative traditions of Bengal and its adjacent regions."

আমাদের প্রস্পেক্টাসের প্রথমেই বলা এই মহৎ অবজেক্টকে সামনে রেখে আজ থেকে এক বছর নয় মাস আগে অর্থাৎ ২৫শে নভেম্বর, ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সংগীত নাটক একাডেমীর কাজ আরম্ভ হয়। সমালোচক মহাশয়ের হিসাবে "কয়েক বছর আগে" নয়। তাঁর মতে "হঠাৎ ঝোঁকের মাথায়" নয়—একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়েই এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই শিশু প্রতিষ্ঠানটিকে সুন্দর, সুস্থ ও সবল করে গড়ে তোলবার জন্য আরও নানারকম গবেষণা করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি যাতে প্রকৃত শিক্ষায় উদ্যোগী হয় এবং সংগীতে সর্ব-ভারতীয় এবং বাংলার সংগীত সংস্কৃতির উচ্চতর মান স্থাপন করতে সক্ষম হয় সেজন্য ঐকান্তিক চেষ্টা ও বহু পরীক্ষা নিরীক্ষাও করা হচ্ছে। মাত্র এই এক বছর নয় মাসের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার জন্য সাক্ষাৎকারের গুণী ছাত্রছাত্রীর অসংখ্য দরখাস্ত এসেছিল এবং এখনও আসছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এসব আশার কথা না নৈরাশ্যের কথা! নাকি ঐসব ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদের দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ জাগে। নাকি এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কোন অস্পষ্ট ধারণা তাঁদের আছে!

একটা আদর্শ প্রস্পেক্টাসের অর্থ বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ "outline of a plan", আমাদের একাডেমীর প্রস্পেক্টাসও হচ্ছে ঠিক তাই। যতটুকু বললে দায়িত্বপূর্ণ অভিভাবক একাডেমী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারেন ঠিক ততটুকু পরিষ্কার প্রাঞ্জল ভাষায় বলা হয়েছে। "অভিভাবক তাঁদের ছেলেমেয়েদের এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করবেন কিনা সন্দেহ"—সমালোচক মহাশয়ের এই

ভ্রান্ত ও কাল্পনিক সন্দেহ একেবারে হয়ে যায় যখন দেখি একাডেমীর প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে ২০টি সিটের জন্য যথাক্রমে ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে ভর্তি হবার জন্য শতাধিক দরখাস্ত এসেছিল। তিনি "যে কোনও কলেজের প্রস্পেক্টাসে শিক্ষা পরিষদের বা অন্যান্য বিভাগের মোটামুটি বিবরণ যা থাকে" আমাদের প্রস্পেক্টাসে তা দেখতে পাননি। পাবার কথাও নয়। কারণ একাডেমী ও কলেজ সমগোত্রীয় নয়। যে কারণে য়ুনিভার্সিটি প্রস্পেক্টাসে শিক্ষা পরিষদের বিবরণ, শিক্ষা বিভাগে ক'জন আছেন এবং তাঁরা কি বিষয়ে অধ্যাপনা করেন—ইত্যাদি খবর থাকে না;—ঐ একই কারণে একাডেমীর প্রস্পেক্টাসেও এ সম্বন্ধে কোন বিশদ বিবরণ নেই, কারণ University বা একাডেমীর বিজ্ঞপ্তি দেবার প্রয়োজনীয়তা নেই। এই কারণেই একাডেমীর "তিন বছর কোর্সের বিষয়বস্তু কি, শিক্ষা সম্পর্কে কি রকম প্রণালী অবলম্বন করা হয়, তার কোনও আভাস পর্যন্ত প্রস্পেক্টাসে নেই" আছে আমাদের সিলেবাসে। পশ্চিমবঙ্গের এই একাডেমী Fine Arts University-রূপে শীঘ্রই গঠিত হবে, এবং এখানে সংগীত নাটক নৃত্য ও অন্যান্য শিল্পকলায় Degree অথবা Fellowship দেওয়া হবে। একথা একাধিকবার বিভিন্ন কাগজে ও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের অবশ্যই একটি নির্ধারিত সিলেবাস আছে, এবং সেই সিলেবাসের যাতে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে, যাতে তাকে আরও উন্নত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করা যায় তার জন্য একাডেমীর ডীন মহোদয়গণ ও তাঁদের অধীনস্থ শিক্ষা-পরিষদ অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন এবং নানারকম গবেষণা ও পরীক্ষা করছেন।

সবরকম কাগজে পাঠ করে নানা রকমের সঠিক খবরাখবর সংগ্রহ করার পরই সমালোচনা করা প্রকৃত সমালোচকের কর্তব্য। 'দেশের' বিদগ্ধ পাঠক, অভিভাবক ও শিক্ষিত সমাজ অবশ্য ১৫।৮।৫৬ তারিখের অমৃত-বাজার ও যুগান্তর পত্রিকার বিশেষ পৃষ্ঠায় পশ্চিমবঙ্গ সংগীত নাটক একাডেমী সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেখে থাকবেন এবং ডীন মহোদয়গণ ও শিক্ষা পরিষদের পরিচয়ও পেয়ে থাকবেন। এর পরও যদি সমালোচক মহাশয় প্রচার করেন যে, "সংগীত একাডেমী সযত্নে স্বীয় পরিচয় অনুদ্ঘাটিত রেখেছেন"—তাহলে সে দোষ কার? কিভাবে তিনি আত্মসমর্থন করবেন?

একাডেমির শিক্ষার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে আমাদের প্রস্পেক্টাসে যে বলা হয়েছে—

"Non-matriculate with special aptitude for music and having a good cultured voice will be considered."

অর্থাৎ কোন শিক্ষার্থীর যদি cultured voice এবং প্রতিভা থাকে অথচ তিনি নন্-ম্যাট্রিক, তথাপি একাডেমি অবশ্যই তাঁকে শিক্ষার সুযোগ দেবেন। আর রিসার্চ করার

সুযোগ তাঁরাই পাবেন যাঁরা তার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন, ঠিক যেমন হয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে।

একাডেমির শিক্ষা পরিষদকে প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে তুলনা করে সমালোচক মহাশয় তাঁর অজ্ঞাতসারেই একটা সত্যি কথা বলে ফেলেছেন। একথা খুবই সত্যি যে, একাডেমির শিক্ষা পরিষদ আদর্শ প্রাইভেট টিউটরের মত তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, ছাত্রছাত্রীদের যা শিক্ষা দেওয়া হয় সেই শিক্ষা যাতে তারা তাদের অভিভাবক ও অন্যান্যদের সামনে নির্ভয়ে প্রকাশ করার অভ্যাস করতে পারে সেজন্য মাঝে মাঝে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে উৎসব করার সুযোগ একাডেমি দিয়ে থাকেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, একাডেমির এই সুচিন্তিত ও বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যের যথার্থ অর্থ সমালোচক মহাশয়ের বোধগম্য হয়নি। তাই একাডেমির ছাত্রছাত্রীদের এই প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে উৎসব করার অভ্যাসকে "রিক্রিয়েটিভ একটিভিটি" বলে অত্যন্ত ভুল করেছেন। তাঁর এই ভুল সংশোধন করে বলা প্রয়োজন যে, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মাঝে ঐ উৎসব করাটা "রিক্রিয়েটিভ একটিভিটি" নয়, ওটা "পাবলিক ডিমনস্ট্রেশন"। এইভাবে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে যাতে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় সেইজন্য একাডেমি প্রতি বছরে মাত্র ২০ জন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি হবার সুযোগ দেন। নইলে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে অতি সহজেই একাডেমি ভর্তি করতে পারতেন।

বিদগ্ধ পাঠক অভিভাবক ও শিক্ষিত সমাজের অবশ্য নিশ্চয়ই অজানা নয় যে, পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত নাটক একাডেমি গভর্নমেন্টের শিক্ষা বিভাগের নির্দেশ অনুযায়ী চলে। আর একাডেমির কমিটির মধ্যে আছেন রবীন্দ্র ভারতীর বিশিষ্ট সভ্যগণ, একাডেমির তিনজন ডীন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি। এই কমিটির সভাপতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায়।

পরিশেষে সমালোচক মহাশয়ের নিকট আমাদের অনুরোধ ভবিষ্যতে যখনই তিনি কোন কিছুর সমালোচনায় বসবেন তখন যেন তিনি প্রথমেই সব সাঠিক খবরাখবর সংগ্রহ করে নেন। ইতি। মায়া সেনগুপ্তা এম এ অধ্যাপিকা সঙ্গীত বিভাগ, সঙ্গীত নাটক-নাট্য একাডেমি।

লেখকের বক্তব্য

পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত নাটক একাডেমির পক্ষ থেকে পত্রাঘাত সত্ত্বেও আমার প্রশ্নের কোন উত্তর মেলে নি। একাডেমির নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কী তা জানা গেল না। ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট এবং "other distinctions"-এর "Systematic Course" কিভাবে নির্ধারিত হবে সে সম্বন্ধেও এতটুকু আলোকপাত করা হয়নি।

তাছাড়া, আরও প্রশ্ন মনে জাগে। নন্-ম্যাট্রিকুলেট ছাত্রও কি তিন বছর পরে ডিগ্রি পাবে? ডিগ্রির কোর্স মাত্র তিন বছরই বা হ'ল কেন? এই তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স কি শিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত? পশ্চিমবঙ্গে এখনও কোথাও তিন বছরে ডিগ্রি দেওয়া হয় না।

Special aptitude বলতেই বা একাডেমি কি বোঝেন? এটা যদি শুধু গাইবার দক্ষতা হয় তাহলে কোনরকম বিদ্যালয় সম্পর্কীয় যোগ্যতার প্রশ্নই ওঠে না এবং সেক্ষেত্রে রিসার্চের প্রশ্নও উঠবে না।

প্রস্পেক্টাস অর্থে কেবল outline of a plan না বলে সম্পূর্ণভাবে বলা উচিত—outline of a plan submitted for public approval। প্রস্পেক্টাস অর্থে আরও বোঝায়—an account of the organisation of a school। একাডেমির তথাকথিত প্রস্পেক্টাসে organisation এবং account কোনটাই নেই।

পত্রলেখিকা তাঁর একাডেমিকে ইউনিভার্সিটির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবকে এইভাবে জাহির করবার প্রয়াস ইতিপূর্বে আর দৃষ্টিগোচর হয়নি। যে প্রতিষ্ঠান সাধারণ কলেজের স্তরেও পৌঁছেছেন কিনা সন্দেহ তাঁদের পক্ষে মান-গৌরবে ইউনিভার্সিটির সমকক্ষতা দাবী করা হাস্যকর নয় কি?

লেখিকা আমাকে সংবাদ কাগজ পড়ে প্রেস রিপোর্টের উপর নির্ভর করে আলোচনা করবার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের প্রতিষ্ঠানের বিবরণী তাঁদের প্রতিষ্ঠান থেকেই বা পাওয়া যাবে না কেন? একাডেমি সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ছাপিয়ে বের করলে এদিক দিয়ে কোন গোলযোগ হবার কথা নয়। আমি ভাল করেই জানি, ১৩৬১ সালের প্রথম থেকে একাডেমি সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনা চলেছে অথচ আজ পর্যন্ত শুনেছি গবেষণা ও পরীক্ষার শেষ হয়নি। কবে যে এই গবেষণার শেষ হবে তা অনুমান করা শক্ত।

ভর্তি হবার জন্য দরখাস্ত পাওয়াটাই একটি প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতার একমাত্র নিদর্শন নয়। একাডেমিকে যেভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে কার্য দ্বারা তার সমর্থন পাওয়া যায় না এবং কোনরকম উন্নততর প্রচেষ্টার পরিচয়ও এযাবৎ পাওয়া যায় নি।

অতএব আরও অনেক বেশি উদ্যোগী না হলে এই প্রতিষ্ঠানকে গৌরবান্বিত করা যাবে না এবং অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আমরা পেছিয়ে থাকব।

রাম বসুর আবিষ্কার

রাম বসু হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে যে, রেশমী অপূর্ব সুন্দরী। মহৎ আবিষ্কার মাত্রেই আকস্মিক। দুস্তর সমুদ্রের বঙ্কিম দিগন্তের ভ্রূতোরণশায়ী নবজগতের সঙ্গে কলম্বাসের সেদিন প্রথম চোখাচোখি হয়েছিল সে কি নিতান্ত আকস্মিক ছিল না? পরিচিত সমুদ্র তাকে বহন করে নিয়ে পৌঁছে দিল একটি মহৎ অপরিচয়ের সম্মুখে। রাম বসুরও ঘটল ঠিক সেইরকম অবস্থা। রেশমীকে সে দেখছে আজ দু'বছরের উপরে, তাকে চপল চঞ্চল বালিকা ছাড়া কিছু মনে হয়নি। যখন সে প্রথম ইংরাজি লিখতে পড়তে বলতে শিখলো কৌতূহল অনুভব করেছে মুন্সী। ন্যাড়ার সঙ্গে যখন সে ইংরাজিতে কথা বলতে চেষ্টা করেছে আর ন্যাড়া তার উত্তর দিয়েছে ইংরাজি বাংলা হিন্দির মিশলে, কিছু না বুঝতে পেরে রেশমী জরুরি কাজের অছিলায় পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছে, বিজয়ী ন্যাড়ার হাসিতে সে কৌতূহল অনুভব করেছে। ন্যাড়া বলেছে দেখলে তো কায়েৎদাদা কাজের ছুতো করে পালালো রেশমী দিদি। ও পারবে কেন আমার সঙ্গে ইংরাজি বিদ্যায়।

আরও বলেছে, ও শিখেছে ইংরাজি আমি শিখেছি ইংরাজকে। ওদের ভাষার মধ্যে বারো আনা গায়ের জোর, বুঝলে কায়েৎদাদা হিন্দি বাংলা মিলিয়ে জোরে গর্জন করে উঠলেই ইংরাজি হয়।

দূর্ বোকা বলে বসুজা।

এতদিন তুমি ইংরাজের সঙ্গে কাটালে তুমিও কিছু বোঝো না দেখি।

বেশতো বুঝিয়ে দে না।

অদম্য ন্যাড়া বলে তবে শোনো। শুয়োর বললে বোঝায় শুয়োর নামে জীবটা। কিন্তু যখন সাহেব গর্জন করে ওঠে ইউ শুয়োর ইধার আও। তখন শুয়োরের মানে বদলে যায়।

তখন আবার কি মানে হয়?

তখন মানে হল খানসামা, বাবুর্চি যেটি ঠিক সেই সময়ে সাহেবের দরকার।

রাম বসু হাসে।

ন্যাড়া বলে তোমার হাসি পেলো কিন্তু ঐ গর্জন শুনে খানসামা বাবুর্চিদের প্রাণ উড়ে যায়, তারা সম্মুখে এসে কাঁপতে থাকে।

তারপরে একটু থেমে বলে মাস্টুনি সাহেবের আবার ভাষারও দরকার হতো না, হাতের কাছে যা পেতো ছুঁড়ে মারতো। একদিন পর পর তিনখানা প্লেট আমাকে ছুঁড়ে মারলো আমি পরপর তিনখানা লুফে ফেললাম। তাই না দেখে সাহেব খুশী হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বলে উঠল 'ওয়েল ডান, হ্যাটট্রিক।' আবার প্লেট ভাঙেনি দেখে মেমসাহেবও আমার উপরে খুব খুশী।

আবার রেশমী যেদিন শায়া শেমিজ ধরলো সেদিন ন্যাড়া বলে উঠল কে বলবে রেশমী দিদি বাঙালী? খাস মেম সাহেব বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

রেশমী ঠাট্টা করে বলল তবে এবারে একটা সাহেব বর খুঁজে বার কর।

খুঁজতে হবে কেন হাতের কাছেই হাজির।

কে রে?

কেন ঐ আমাদের টমাস সাহেব, না হয় নাই থাকলো গোটা পাঁচেক দাঁত।

টমাসের নাম শুনে রেশমী একখানা ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করে।

দূরে বসে রাম বসু দেখছে এসব দৃশ্য, মনটা খুশী হতো, ভাবতো, আহা যেমন করে হোক মেয়েটা দুঃখের কথা ভুলে থাকুক।

রেশমী সহজে শায়া-শেমিজ ধরতে চায়নি। কেরি দম্পতির বিশেষ পীড়াপীড়িতেই ধরেছিল। তবু একবার জিজ্ঞাসা করেছিল রাম বসুকে।

তুমি কি বলো কায়েৎ দাদা?

ক্ষতি কি?

ক্ষতি কি? শায়া শেমিজ ধরলে খিরিস্তান হতে আর বাকি থাকলো কি।

দূর বোকা। ঐ যে হিন্দুর মা শায়া-শেমিজ পরে ও কি খিরিস্তান। কোন

সাহেব যদি ধুতি চাদর ধরে তবেই কি হিন্দু হয়ে গেল।

হিন্দু তো হওয়া যায় না, খ্রিস্তান যে হওয়া যায়।

হওয়া যায় বলেই তো হচ্ছিস না।

ওসব পরলে আমাকে যে চেনাই যাবে না।

সে তো ভালই হবে, চণ্ডী বক্সীর লোকে তোকে চিনতে পারবে না, কাছে এসে পড়লেও মেমসাহেব ভেবে পালাবার পথ খুঁজবে।

যুক্তিটা তার মনে ধরলো আর সে ধরলো শায়া-শেমিজ। চণ্ডী বক্সীর চোখে ধুলো দেবার উপায় এত সহজ জানতো না রেশমী।

এহেন রেশমীকে হাটে ঘাটে মাঠে ঘরে বাইরে দিনে রাতে সদাসর্বদা রাম বসু দেখেছে কিন্তু সে যে বিশেষ করে সুন্দরী একথা কখনো তার মনে হয় নি।

সেদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলো তার সৌন্দর্য। সেই গোধূলির আলো-আঁধারি রঙীন প্রচ্ছায়ে, মাঝ বসন্তের খেয়ালে ভরা এলোমেলো বাতাসের অদৃশ্য চামর বাজনের ছন্দে, স্বচ্ছ বারিখণ্ডের পটে সন্নিবিষ্ট নিঃসঙ্গ নারীমূর্তি হঠাৎ রহস্যের চমকে উদ্‌ঘাটিত হ'ল তার চোখে। প্রথম দৃষ্টিতে বুঝতে পারেনি কে এলো এখানে। পর মুহূর্তে মন বল্‌লে রেশমী। কিন্তু বুঝবার ফলে রহস্য ফিকে না হয়ে গাঢ়তর হল। রেশমী! যাকে আগে সহস্রবার দেখা গিয়েছে সহস্রাতীত একবারের জন্য এমন বিস্ময় সঞ্চিত ছিল তার মধ্যে? বিস্ময়ের অন্ত পায় না রাম বসু। নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। পা দুখানি জলের দিকে নামিয়ে দিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে বাম করতলে চিবুক ন্যস্ত করে তন্ময় হয়ে বসে রয়েছে। নিঃসঙ্গ তরুণী—নির্জনতার প্রশ্রয়ে আঁচল পড়েছে খসে, লুটিয়ে আছে ঘাসের উপরে, শুভ্র গ্রীবার উপরে বাতাসে কাঁপছে আলগা চুলের গুচ্ছ, অর্ধাবগুণ্ঠিত পূর্ণিমা চাঁদের আভাস দিচ্ছে অপ্রচ্ছন্ন বাম পয়োধর, সুঠাম নিটোল তনুযষ্ঠি, রেখায় রঙে ছায়াতপে তাল মিলিয়ে সৃষ্টি করেছে নেত্রপেয় একখানি রাগিণীর। রাম বসুর চোখের পলক পড়ে না। সে ভাবলো সৌভাগ্য এই যে ওকে মুখোমুখি দেখিনি তাহলে কি এমন খুঁটিয়ে দেখবার পূর্ণ অবকাশ পেতাম; ভাবে, মুখ দেখলে প্রত্যহের পরিচিত সেই মেয়েটিকে দেখতাম, সংসার যেখানে অঙ্কিত করে দিয়েছে ছোট-খাটো সুখদুঃখের চক্র চিহ্ন; ভাবে, কখনো মনে হয় নি প্রত্যহের অতীত কিছু আছে ওর মধ্যে; এখন বুঝলো সমগ্রভাবে দেখলেই তবে পাওয়া যায় সৌন্দর্যকে, সত্যকেও সেই সঙ্গে। সে নির্বাক দাঁড়িয়েই থাকে যেমন নির্বাক বসে আছে রেশমী, সৌন্দর্য সোনার মিনে-করা লোহার হাতুড়ি, অকস্মাৎ বুকের উপরে নিক্ষিপ্ত হয়ে অতর্কিতে হতচৈতন্য করে দেয় দ্রষ্টাকে।

রাম বসু অতিশয় ধূর্ত, অতিশয় ঘড়েল, অতিশয় প্রাজ্ঞ বাস্তববাদী। ক্ষিপ্র নিপুণ ছিপ নৌকার মতো ডানে বাঁয়ে সাহেব সমাজ ও বাঙালী সমাজের ঢেউ কাটিয়ে ছুটতে সে অভ্যস্ত; পিছে পড়ে থাকে পাণ্ডিত্যের বজরা, ঐশ্বর্যের পান্সী, বানচাল হয়ে যায় নির্বুদ্ধিতার পালোয়ারী সব নৌকা। সংসার তরঙ্গতলে নৃত্য করে ছুটে চলে যায় রাম বসুর লঘুভার ছিপ। সারাজীবন ধূর্তপনা করে তার ধারণা হয়েছিল সে নীতির ঊর্ধ্বে; হিন্দুধর্ম খৃষ্টধর্ম দুয়েরই মাথায় নিরপেক্ষভাবে সে কাঁঠাল ভেঙে এসেছে; টাকার দুর্নিবার আকর্ষণেও তাকে অর্ধগৃধ্নু করতে পারেনি; জ্ঞানের ক্ষেত্রকে পরিণত করেছে সে সরাই-খানায়, আকণ্ঠ পান করেছে সরাব, তারপরে রাত্রিশেষে চলে গিয়েছে নূতন সরাইখানার উদ্দেশে, আর নারীদেহ, তাতে পেয়েছে সে জড়, পায়নি কখনো জাদু, কেবল ঐ টুশকি ছাড়া।

সে কেবল অনুভব করে না, অনুভূতিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে, নিজের অনুভূতিকে বাইরে স্থাপিত করে নিরীক্ষণ করে; একসঙ্গে সে তন্ময় ও মন্ময়; 'প্রাচীন মানুষ' হয় শুধু তন্ময়, নয় শুধু মন্ময়; 'প্রাচীন মানুষ' হরগৌরী, 'নব্যমানুষ' অর্ধনারীশ্বর। রাম বসু প্রাচ্য

ভূখণ্ডের প্রথম 'মডার্ন ম্যান' বা 'নব্য মানুষ'। এ বিষয়ে সে রামমোহনের অগ্রজ।

টুশীকির প্রসঙ্গে বসুজার মনে নিজের যৌন জীবনের ইতিহাস জেগে ওঠে। যৌবনের সূচনা থেকে যত নারী তার জীবনে এসেছে, কেউ এক রাত্রির দীপ জ্বালিয়ে কেউ বা বৎসরকালের মশাল জ্বালিয়ে, তাদের সংখ্যা গণনা করতে গেলে স্বয়ং শুভংকরকে বা আর্য ভট্টকে ডাক দিতে হয়। তারপরে হঠাৎ একদিন এলো টুশীকি, তখন সে বুঝলো জড়ে জীবে প্রভেদ। জীব সত্য তবু জাদু নয়। টুশীকির দেহটার সঙ্গে পেয়েছিলো সে স্নেহ, ঐ দাক্ষিণ্য-টুকুর জন্যে টুশীকি আর সকলের সঙ্গে একাসনে বসে একাকার হয়ে গেল না, স্থান পেলো হৃদয়ের কাছে। গৃহের স্বাদ ও স্বস্তি পাওয়ার যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা পুরুষের মনে তারই আভাস পেলো টুশীকির গৃহে, তখন থেকে সে হল গৃহ-হীন গৃহিণী।

কিন্তু আজ, ঐ যে রহস্যময়ী মূর্তি, গোধূলির পড়ন্ত আলোয় আরো অস্পষ্ট হয়ে উঠে অধিকতর মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে, ওতে আর টুশীকিতে অনেক প্রভেদ। টুশীকি জীব, রেশমী জাদু; জীবে আছে পৃথিবীর প্রাণ, জাদুতে স্বর্গের আভাস; জীবে রূপ, জাদুতে সৌন্দর্য; রূপ রক্তমাংসের সৃষ্টি, সৌন্দর্য সৃষ্টি কল্পনার।

হয়তো-বা গাছের পাতার শব্দ হয়ে থাকবে, হয়তো এগোতে গিয়ে পায়ের শব্দ করে থাকবে রাম বসু, চকিতে মুখ ফিরিয়ে সভয়ে জিজ্ঞাসা করে রেশমী কে? কে ও?

আমি কায়েৎ দাদারে।

তাই বলো! আশ্বস্ত হয় রেশমী।

এত রাতে এখানে একা বসে থাকা ভালো নয়, বাড়ি চল্।

উঠে পড়ে রেশমী, দুজনে অগ্রসর হয় কুঠির দিকে।

স্বভাবতই রাম বসু একটু বেশি কথাপ্রিয়, কিন্তু আজ জোগাতে চায় না তার কথা। বসন্তের খেয়ালে-ভরা আকাশ গান থেমে যাওয়া বীণার তন্ত্রের মতো রী রী করতে থাকে অনুরণনে, আকাশ তারায় তারায় ওঠে মুখর হয়ে। পশ্চিম দিগন্তের মাথা বরাবর ঝামা আলোটুকু ক্রমে আসে আরো ঝিমিয়ে; আরো ক্ষীণ, আরো ম্লান, এবারে দৃষ্টির সঙ্গে অনুমানকে দোসর না করে নিলে আর দেখবার উপায় নেই।

রাত্রে ঘুম এলো না রাম বসুর। আহারটাতেও পড়েছে ফাঁক। অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করে সে, নূতন অভিজ্ঞতার ধাক্কা তার মনকে করে রাখে চঞ্চল। হঠাৎ কানে গেল বাইরে কে গান করে চলেছে—"চণ্ডীদাস প্রেম নিকষিত হেম কাম গন্ধ নাহি তায়।" কতবার শুনেছে সে এই পদটি। আজ মনে হল এতবড় মিথ্যা কোন মহাকবির কলমে আর বের হয় নি। তার মনে হল কামের মধ্যে প্রেম না থাকতে পারে কিন্তু প্রেমে কাম থাকবেই, হয় তো অগোচরে থাকে কিন্তু না থেকে যায় না। তার মনে হল কাম ফুল, প্রেম ফল; ফুল ছাড়া ফল সম্ভব নয়। বিষয়টা নিয়ে মনের সঙ্গে সে বিচারে বসলো। সে বলল আজ বিষয়টা নূতন করে বুঝলাম। মন বলল হঠাৎ আজকে বুঝবার কি কারণ ঘটলো? রেশমীর প্রতি তোমার নজরের বদল হয়েছে কি? সে বলল আরে ছি ছি, সে রকম কিছু নয়, তবু ভুল হলে স্বীকার করবো না কেন? মন বলে বেশ তাই না হয় হল, কাম ফুল, প্রেম ফল, তবে সৌন্দর্যটা কি!

কেন, সৌন্দর্য তরু।

আর যৌবনটা?

ভূমি।

মন বলে বাহবা, এখনো তোমার অবস্থা চিকিৎসার অতীত নয়।

রোগটা কি যে চিকিৎসার প্রয়োজন হবে, তবু শুনি আমার অবস্থা বুঝলে কি করে?

এখনো বেশ গুছিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছ।

না পারবার হেতু কি?

ব্যাধি।

কি ব্যাধি?

মন বলে, যে ব্যাধিতে শীঘ্রই আক্রান্ত হবে।

নাম?

প্রেম

তার মানে মূলে কাম আছে?

মন বলে, নিজেই ভেবে দেখো। বলে রেশমীর সৌন্দর্যে তুমি অভিভূত হয়েছ, ঐ অনুভূতিটুকু কাটলে বুঝতে পারবে প্রকৃত অবস্থা।

বিরক্ত হয়ে রাম বসু বলে, আচ্ছা তখন দেখা যাবে, এখন ঘুমোতে দাও দেখি।

কদিন ধরে চলে রাম বসুর উন্মনা উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা।

কেরি বলে মুন্সী অতিরিক্ত পরিশ্রমে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, বিশ্রাম নাও।

ন্যাড়া বলে চলো কায়েৎদাদা কদিন ঘুরে আসি, কাছেই প্রেমতলীর মেলা, খুব জবর মেলা।

রেশমী বলে কায়েৎদাদা ভেবে ভেবে তোমার শরীর যে গেল। শুধায় কার জন্যে এত ভাবো, কায়েৎ বৌদিদির জন্যে নাকি?

রাম বসু কি উত্তর দেবে সব এড়িয়ে যায়।

সেদিন রাতে ন্যাড়া, পার্বতীচরণ, গোলক শর্মা সবাই গিয়েছে গাঁয়ের মধ্যে যাত্রাগান শুনতে। ডাকাডাকি সত্ত্বেও যায়নি সে, বিছানায় শুয়ে নিজের মনটাকে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করে দেখছে ব্যাপারখানা কি ঘটলো। তখন বাইরে খেয়ালী বসন্তের মাঝ রাতের এলোমেলো হাওয়া বাগানের আম কাঁঠাল গাছগুলোর মধ্যে যথেচ্ছাচার করছে, ঝোপের সুগন্ধী শুল্কলতা উঠেছে ব্যথিয়ে আর ঝাউ গাছ কাটা বহুযুগের পুঞ্জিত দীর্ঘনিশ্বাসে সমস্ত আকাশটাকে করেছে উন্মনা। এতদিনের বিচার বিশ্লেষণে যা স্থির করতে পারেনি হঠাৎ এক মুহূর্তে তা স্থির হয়ে গেল। রেশমীকে তার চাই। রাত্রির অন্ধকারে ভাস্বরতর হীরককঠিন রেশমীর যৌবন দ্যুতি লুব্ধ নাগরাজের মতো সবলে করলো তাকে আকর্ষণ। ত্বরিতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সোজা গিয়ে রেশমীর দরজায় ঘা দিল সে।

(ক্রমশ)
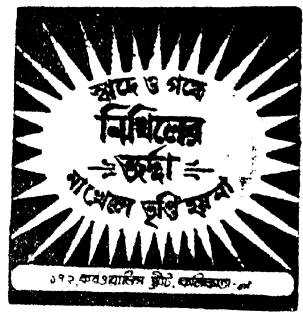
পনের বছর। হ্যাঁ পনের বছরই হবে। মনে মনে হিসেব করলেন উমাপতি। উমাপতি বিশ্বাস। পৃথিবীতে বাঁচবার ইতিহাস থেকে বছর পনেরোর অধ্যায় কম নয়। বাঁচবার পরমায়ু থেকে ওরা অনেক-গুলো বিশ্বাসের বলিষ্ঠ পাতা ঝরিয়ে দিয়েছে। তবু দীর্ঘ এতোগুলো বছর কি ক'রে এতো তাড়াতাড়ি কেটে গেল, ভাবতে আশ্চর্যই লাগে উমাপতির। প্রথম কয়েকটা দিন খুবই অসহ্য মনে হয়েছিল। এক একটা দিন যেন এক একটা বছরের পরমায়ু নিয়ে এসেছে। পেছনে ফেলে আসা পঁচিশটা বছরের প্রতিদিনের একটানা সুর কে যেন হঠাৎ কেটে দিল। রোজকার বাঁধাধরা নিয়ম আর বাঁধন হঠাৎ যেন কে আলগা করে দিল। ছুটি। ফাইল থেকে ছুটি, ড্রাফটের পাতা থেকে ছুটি, লেজারের খাতা থেকে ছুটি। ছুটি হাজিরির খাতা থেকে, বড় সায়েবের কলিং বেল থেকে, ছুটি দশটা পাঁচটার অন্তহীন কঠিন বন্ধন থেকে। এত দিনের কঠিন অন্তহীন বন্ধন থেকে অন্তহীন ছুটি। তবু ছুটির প্রথম কয়েকটা দিন অসহ্যই মনে হয়েছিল। সত্যি, এ যেন আশ্চর্য নতুন। এ যেন এক আশ্চর্য স্বাদ। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের চাকরিতে ছুটি অনেকই নিয়েছেন। এই নতুন নয় ছুটির স্বাদ। কিন্তু এ ছুটির সুর আলাদা। এর পেছনে ফেরবার তাড়া নেই, দশটা পাঁচটার হাতছানি নেই। এর পেছনে আর কিছুই নেই। এ ছুটির পেছনে শুধু ছুটি আর ছুটি। অসহ্য, প্রথম কয়েকটা দিন অসহ্যতার সঙ্গেই কেটে গেল। তারপর সহ্য হয়ে গেল সব একে একে। হপ্তা গেল। মাস, বছর। আশ্চর্য পুরো পনেরটা বছরই কেটে গেল।

পনের বছর। হ্যাঁ পনের বছর পরেই তিনি এখানে এলেন। সেই যে চাকরির মেয়াদ ফুরোলো, সেই সঙ্গে এই শহরে থাকবার মেয়াদ ফুরোলো। এই শহরের সঙ্গে সম্পর্কের সুতো বেঁধেছিলো চাকরিটাই। জোর কিন্তু কম নয় পঁচিশ বছরের পুরোনো সুতোর। টান দিতেই লাগল বুকে এসে। এতো শুধু টান নয়, ছেঁড়ার টান।

বিকেলে ফিরে এসেই বাক্স, বিছানা আর আনুসঙ্গিক বাঁধতে শুরু করলেন উমা-পতি। আদর্শ কেবিনের এই ছোট্ট ঘরটায় আশ্চর্য মায়া পড়ে গেছে। মায়া পড়বে না কেন? এই শহরে থাকার বহু বছরই তো এখানে কাটল। উমাপতি বিশ্বাসের শহর-বাসের ইতিকথা এই আদর্শ কেবিনের ছোট্ট এই ঘরটাতেই দেওয়ালে দেওয়ালে জমা হয়ে আছে।

ম্যানেজার কান্তি সেন একরকম হাত জোড় করেই দাঁড়ালেন। আজই যাবেন উমা-বাবু?

হ্যাঁ, রাতেই যখন গাড়ি রয়েছে, তখন কাল সকাল পর্যন্ত মিছিমিছি আর দেরি করা কেন।

আমি বলছিলাম কি, ছুটিই যখন হ'ল আর দু একদিন থেকে ভাল ক'রে শহরটা বেড়িয়ে যান না। আবার কবে আসবেন তার কি ঠিক আছে।

বল কি হে কান্তি, পঁচিশ বছর থাকবার পরও আরো কিছুদিন এখানে থাকতে হবে শহর দেখার জন্যে? জোরে হেসে উঠলেন উমাপতি বিশ্বাস।

না হয় আরাম ক'রে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করবার জন্যে দু' চার দিন থাকলেনই বা। এ ক'দিনের জন্যে থাকা খাওয়ার চার্জ না হয় নাই দিলেন, আমারই গেস্ট হয়ে থাকবেন।

মনে পড়ে কান্তি সেনকে। আদর্শ কেবিনের ছোকরা ম্যানেজার। অন্তত তাঁর বয়েসের কাছে ছোকরাতো বটেই। ভারি অমায়িক ব্যবহার ওর। মুখে সব সময় হাসি লেগেই আছে। ভাল বল কি গাল দাও, সব অভিনন্দনই হাসিমুখে স্বীকার করে যায় কান্তি।

আপনি হচ্ছেন স্যার আদর্শের পরমন্ত বোর্ডার। আপনি যবে থেকে এসেছেন,

তখন থেকে এর উন্নতি শুরু হয়েছে। প্রায়ই তো বলত কান্তি সেন।

হাসতেন উমাপতি। আমি কেহে, আমিতো নিমিত্ত মাত্র। ও তোমাদের ভাগ্য আর হাতযশ।

আজ পনের বছর বাদে আবার হাসি পেলো ওর কথা মনে পড়তে। ব্যবসায়িক স্তুতিবাদ নয়, সত্যিই শ্রদ্ধা করত কান্তি।

যাবার কথা শুনে তাইত বলল, থেকে যান না আরো দু' একদিন স্যার।

থাকতে পারেননি উমাপতি। পঁচিশ বছর চাকরির মেয়াদ ফুরোতে সেই শহরের সঙ্গে পঁচিশ বছরের সম্পর্কেরও শেষ হ'ল। পঁচিশটা বছরের পুরোনো বাধা ঝরিয়ে দেওয়া তো কম কথা নয়। কতগুলো দিন হয় পঁচিশটা বছরে হিসেব করতে হিমসিম খেলেন উমাপতি। কি হবে থাকবার মেয়াদ আর অকারণে বাড়িয়ে? কি হবে ঘরবাড়ি ছেড়ে এই শহরে পড়ে থাকার দিন আর অকারণে বাড়িয়ে? যার জন্যে ঘরবাড়ি ছেড়ে এতো দূরের কোণে এই শহরে ঘর বাঁধা, তারই যখন শেষ হ'ল? তবু এতদিন ধরে অলক্ষ্যে কোথায় যেন মায়ার বন্ধন মমতার কাজলে গাঁথা হচ্ছিল, যাবার দিনই তা যেন টের পেলেন ঐ উমাপতির বিশ্বাস।

যাবার দিন অনেকেই এসেছিল স্টেশনে। শুধু আদর্শ কেবিনেরই বোর্ডার কজন নয়, অফিসেরও অনেকেই। আশ্চর্য, বড় সাহেবও এসেছিলেন সেই চেনা গাড়িটায়। এতো লোক কখনো স্টেশনে আসেনি ভিড় করতে উমাপতির মত নগণ্য এক কেরানীর জন্যে। আশ্চর্য আরো, চল্লিশ বছর আগে এই শহরের স্টেশনে যখন চাকরির খোঁজে প্রথম নেমেছিলেন উমাপতি, তাঁকে সম্বর্ধনার জন্যে তখন ছিল না একজনও।

স্টেশনে এসেছিল বোর্ডারদের মধ্যে রোগা লিকলিকে অভয়পদ। রোগা লিকলিকে হলেও ওর ভয় ছিল না কোনো কিছুতেই। ওই রোগা চেহারায় ও যে কি করে সবাইকে অভয় দিত, ভাবলেই অবাক হতে হয়। ভয় ছিল না বলেই হয়ত ওর নাম রাখা হয়েছিল অভয়। নামের সঙ্গে মানুষের মিল এমন খুব কম দেখেছেন উমাপতি। আর এসেছিল কানাই। যা মাইনে পেতো তার সবই যেত লটারির টিকিট কাটাতে। ভাগ্যলক্ষ্মীকে ও টেনে বার করবেই। আর সত্যচরণ। মদ খেতো। কেন কে জানে। দুঃখ পেতে কিম্বা দুঃখ ভুলতে। এতদিন সঙ্গে থেকেও বুঝতে পারেননি উমাপতি। এসব পুরোনো কথা। পনের বছর আগের। কম নয় পনেরটা বছরের ব্যবধান। ভেবেছিলেন উমাপতি ছুটির এই অন্তহীন দিনগুলো অনন্ত অলসতায় বাসা বাঁধবে। কিন্তু আশ্চর্য, পনেরটা বছর যেন আশ্চর্য দ্রুততায় সরে গেল সামনে থেকে। মনে হচ্ছে এইতো সেদিন।

অভয়পদ বলল, চললেন? কানাই বলল, মায়া কাটাচ্ছেন তা হলে? সত্যচরণ কিছুই বলল না। বলতে পারল না কি বলতে চাইল না কে জানে। সবার কথার জবাবেই ম্লান একটু হেসেছিলেন উমাপতি। মায়া কাটিয়ে যাবার দিনে হাসতে পারাটাই হয়ত মস্ত কৃতিত্ব। কিন্তু কেঁদে ফেলল আদর্শ কেবিনের পুরোনো চাকর রামলাল। ওর হাতে দুটো এক টাকার নোট গুঁজে দিলেন উমাপতি। ও কিছুতেই নিতে চায় না। জোর করে গুঁজে দিতেই হঠাৎ দু' হাতে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠল রামলাল। অবাকই হলেন উমাপতি। চাকর বলেই ও কান্না ঢাকবার সভ্যতা হয়ত জানে না। পনের বছর আগে এই শহর ছাড়ার সেই রাতটায় অনেকক্ষণ ট্রেনে ওর কান্নাটাই অনেকক্ষণ মনে রইল উমাপতির।

পনেরটা বছর। এইতো সেদিনই যেন। চারদিকে তাকালেন। শহর বদলেছে কিনা, তাকিয়ে দেখলেন। লোক বেড়েছে অনেক, রাস্তায় ভিড় বেড়েছে। নতুন কয়েকটা বাড়ি এখানে ওখানে হঠাৎ মাথা তুলেছে। কি ছিল আগে ওখানে? মনে করবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। হয়ত ফাঁকা জমি পড়েছিল কিংবা ভাঙ্গা বাড়ি। পনের বছর আগেকার শহর এতো নিপুণতায় মনে রাখা শক্ত। বদলেছে হয়ত অনেক। তবু রাস্তা চিনতে ভুল করলেন না উমাপতি। স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ। চারপাশে জনারণ্যের ভিড়ে উদাস চোখ ফেরালেন। সবাই ব্যস্ত। সবাই চলমান। পনের বছর আগে ঠিক যেমনটি ছিল। ওই কাজের মানুষদের ভিড়ে তারই শুধু কোনো কাজ নেই। তার অন্তহীন অফুরন্ত ছুটি।

স্টেশনে বিদায় দিতে অফিসের অনেকেই এসেছিল। কবি সুরেশ্বর, ইউনিয়ন কর্মী

সুনীল, ডেসপ্যাচার হরিপদ, ভাবপ্রবণ কমলাকান্ত, টাইপিস্ট শম্ভু। অনেকেই। সব নাম মনে পড়ছে না উমাপতির। মনে রাখা শক্তই। কেন কে জানে যাবার দিনে মনটা আশ্চর্য উদাস হয়ে পড়েছিল। কেন কে জানে। পঁচিশ বছরের বন্ধন কাটানো কষ্টকর বলেই হয়ত। ওদের ভালবাসা ছাড়ানো শক্ত বলেই হয়ত। ওরা সকলেই বলেছিল, ভুলে যাবেন না যেন একেবারেই, আসবেন মাঝে মাঝে দেখা করতে। ঘাড় নেড়েছিলেন উমাপতি। মিথ্যা আশ্বাস। জানতেন মাঝে মাঝে কেন, এ শহরে ফেরা আর হবে না। তবু পনের বছর পরে কি যে মনে হল, গাড়িতে বসে পড়লেন। স্টেশনে যখন নামলেন, আশ্চর্যই মনে হল নিজেকে উমাপতির। পঁচিশ বছরের মায়া কি পনের বছরের সুদীর্ঘ অজ্ঞাতবাসেও কাটিয়ে উঠতে পারলেন না? মনে কি পড়ল আবার ওদের সবাইকে?

মনে করবার, মনে পড়বার অনেক কিছুই তো রয়েছে পুরোনো খাতার অন্তহীন

অসংখ্য পাওয়া। ক'টা বাজল? হাত ঘড়িটার দিকে তাকালেন উমাপতি। নিজের কেনা নয়। হাতঘড়ি পরবার অভ্যেস তার কোনো কালেই নেই। অফিসের কর্মী বন্ধুরা সবাই মিলে ঘড়িটা যাবার দিনে উপহার দিয়েছে। সেই অনুষ্ঠানটার কথা এখনো বেশ স্পষ্ট মনে আছে উমাপতির। বক্তৃতা দিয়েছিল কমলাকান্ত। ভারি চমৎকার বলতে পারে ছোকরাটা। আর বাংলার জ্ঞানও ওর খুব। তবু নিজের প্রশংসা নিজের কানে শুনতে কেমন যেন অস্বস্তিই লাগছিল উমাপতির। ওদের ভালবাসার জবাবে দু' চার কথার বেশী বলতেই পারেননি উমাপতি। গলাটা কেন কে জানে ভারি হয়ে উঠেছিল। হ্যাঁ, অভিভূতই হয়েছিলেন তিনি।

ওখানে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর চাকরির গর্ব আছে বৈকি তার। অতগুলো বছরের প্রতিটি দিন তিনি অখণ্ড সুনামের সংগেই কাজ করে এসেছেন। পঁচিশ বছর চাকরিতে কে ক'টা কাজে তার ভুল বার করেছে বলুক কেউ? বলুক কেউ কখনো তিনি কাজের ভয়ে অকারণে ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসেছেন কিনা? বলুক কেউ এই লম্বা পঁচিশ বছরে ক'টা দিন তার নামের পাশে হাজিরির খাতায় লেটের লাল দাগ পড়েছে? জানে সবাই যারা এতগুলো বছরে দিনের পর দিন তার পাশে কাজ করেছে। ফাঁকি তিনি দেননি কখনো, ফাঁকি কখনো সহ্য করেননি। কাজ নিজেই শুধু করেননি, কাজ শিখিয়েছেন অনেককেই। নতুন কেউ ভর্তি হলেই তাকে গড়বার ভার পড়তো উমাপতির বিশ্বাসের ওপরেই।

কাজ তিনি শেখাতেন মন দিয়েই। শিখবে যারা তারা সবাই মন কিন্তু দিত না। ভুগবে ওরাই, আমার কি। মনে মনে ভাবতেন উমাপতি। সত্যি, কিইবা তার। তবু ওদের ভালর জন্যেই মাঝে মাঝে উপদেশ দিতেন। বলতেন, যদি এই অফিসে টি'কে থেকে আখের ভাল করতে চাও, তবে এখনই চটপট মন দিয়ে কাজকর্ম শিখে নাও। পরে নইলে পস্তাবে। কেউ শুনত, কেউ শুনত না। না শুনুক, তিনি তার কাজ করে যেতেন।

এই পঁচিশটা বছরে কত লোককে যে কাজ শিখিয়েছেন, গড়েপিটে মানুষ করেছেন, তার হিসেব নেই। সলিল ছেলেটা ভারি হাসিখুশী। কাজ ফেলে সব টেবিলে টেবিলে গল্পগুজব করে বেড়াতো। নিজে তো কাজ করবেই না, অন্যদের কাজেও ডিস্টার্ব করা। এ ভালো নাকি? কাজ পেণ্ডিং পড়ে রয়েছে সেদিকে খেয়াল নেই। মাঝে মাঝে কোথায় যে আড্ডা দিতে ডুব মারত কে জানে। অফিস মামার বাড়ি নয়। এমনি করে কদ্দিন টি'কবে হে? ধমকে দিয়েছিলেন উমাপতি। টি'কতে কি আর পারতো। জবাব তো হয়েই গিয়েছিল। তিনিই তো বাঁচিয়েছিলেন বলতে গেলে। বড় সাহেবকে বলে কয়ে ঠাণ্ডা করেছিলেন। তার পরের দিন এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে হাজির সলিল। আপনার জন্যে। পাগল, এতো মিষ্টি একলা খেলে মারা পড়ব যে হে। উমাপতি হেসেই উঠেছিলেন।

শুধু ওকেই নয়, বাঁচিয়ে ছিলেন আরো অনেককেই। সুশান্ত। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সত্য বাগচী রিমার্ক দিয়েছিলেন, কেয়ারলেস। কাজে অতো অমনযোগী হলে কি চলে। ভুলতো হবেই। কাজ করতে করতে হাজার রকম চিন্তা। কোথায় খেলার মাঠ, কোথায় সিনেমা। তার ওপর বান্ধবীদের চিন্তা। এরপর কাজে ভুলতো হবেই। উমাপতি বুঝিয়েছিলেন কতবার, অফিসের কাজ আগে মন দিয়ে কর, তারপর যা ভাবতে হয় ভাব। কিন্তু কে কার কথা শোনে? টি'কতে কি আর পারত ও বেশীদিন? টি'কিয়ে রেখেছিলেন উমাপতিই। জানতেন বয়েস বাড়লেই কাজে মন আপনা থেকেই বসবে। আর আনন্দ? অমন বোকা উমাপতি তার পঁচিশ বছরের চাকরিতে খুবই কম দেখেছেন। সহজে কিছুই তার মাথায় ঢোকে না। ভাবতেন, নিশ্চয়ই কপি করেই আই এটা পাশ করেছে। এমন না ভেবে আর উপায় কি? বড়সাহেব নোট দিয়েছিলেন, টু স্লো। ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন উমাপতি। ওর কাজ যতদূর সম্ভব নিজেই করে দিতেন। নইলে যেতোই তো কবে চাকরিটা।

চাকরি খাক কারুর, এই পঁচিশ বছরের চাকরিতে কখনো চাননি উমাপতি। কিন্তু চাকরি অনেকেরই তিনি খেতে পারতেন। সামান্য কেরানী হলেও তাঁর ওপর অখণ্ড বিশ্বাস আছে জানতেন তিনি বড় সায়েবের। কারণ কাজের সুনাম আছে তাঁর। এতো দীর্ঘ দিনের চাকরিতে কোথাও তিনি অযোগ্যতা বা অবিশ্বাস দেখিয়েছেন কিনা, তা অনেক খুঁজেই বার করতে হয়। তাই কাউর বিরুদ্ধে কড়া নোট কোনো বড় সায়েবকে পাঠালে তা তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য। জীবনে মিথ্যার আশ্রয় কোনোদিন নেননি উমাপতি বিশ্বাস, জানতেন বড় সায়েব। তা হলেও কোনোদিন কারুর ক্ষতি করেননি তিনি। কি হবে? তা নইলে চাকরি কি থাকত এদ্দিন হরিলালের? রোজ লেট, রোজ লেট। তবু জানতেন তো তিনি সকালে দুটো টিউশানী করে হরিলাল আর বিকেলে কোনো এক প্রেসে পার্ট টাইম কাজ করে। বাড়ির অবস্থা খারাপ, তাইতো টাকা রোজগারের এই প্রাণান্ত পরিশ্রম। তবু কাজে ভারি চটপটে ছিল হরিলাল। হাজিরির সময় ঠিক রাখতে না পারলেও এমন কুইক ওয়ার্কার খুবই কম দেখেছেন উমাপতি। কিন্তু এই পঁচিশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে ইউনিয়ন কর্মী সুনীলকে। আশ্চর্য এক ছোকরা, ব্রাইট আর ব্রিলিয়াণ্ট।

ওদের সকলেরই এই অফিসের কাজে তার কাছেই প্রথম হাতেখড়ি। ওর মধ্যে আশ্চর্য খুঁজে পেলেন সুনীলকেই। সবার মত ওকেও উপদেশ দিয়েছিলেন, এখানে থেকে যদি আখের ভালো করতে চাও, তবে এখন থেকেই মন দিয়ে কাজ শেখো।

এতো ভালো কাজ শিখে আপনার আখেরটাই বা কি এমন ভালো হয়েছে শুনি?

আশ্চর্য হয়েই ওর জবাব শুনলেন উমাপতি বিশ্বাস। তবু শুনেও যেন শুনতে চাইলেন না।

তোমার হবে। তোমার বয়স অল্প, তুমি বুদ্ধিমান, তার ওপর তুমি গ্র্যাজুয়েট।

গ্র্যাজুয়েট হলেই কি দশটা হাত বেরোয় না দশঘড়া বুদ্ধি বাড়ে? কত ননম্যাট্রিক বুদ্ধির খেলায় ডবল এম একে পর্যন্ত ঘোল খাওয়াতো তা কি জানেন না?

জানেন। আর জানেন বলেই চুপ করে রইলেন উমাপতি। বুঝলেন অফিসে আশ্চর্য এক ছোকরা ঢুকেছে। উজ্জ্বল দীপ্তিময়ই শুধু নয়, মূর্তিময় বিদ্রোহীও।

দিনতো একটা রিপ্রেসেন্টেশন ঠুকে উমাবাবু।

কিসের? অবাক হলেন উমাপতি।

যত ইম্পরটেন্ট কাজের বেলায় আপনাকে, আর প্রোমোশনের বেলায় ওদের পেয়ারের লোকেদের। কেন এমন?

কেন এমন। হয়ত একথা সত্যিই। তবু একথা এতদিন কখনো ভাবেননি উমাপতি। ভাবতে পারেননি কি ভাবতে চাননি, তা তিনি নিজেই জানেন না। তবু সুনীলের এই আশ্চর্য কথাই মনে মনে উচ্চারণ করলেন, কেন এমন।

কি জানি। মৃদু হাসলেন উমাপতি। আমার কাজ, কাজ করা। আর প্রমোশন দেওয়ার কাজ ওদের।

তা বলে যা ইচ্ছে তাই করবে? এরকম গ্রেয়ারিং ইনজাস্টিস আপনি মুখ বুজে সহ্য করে আছেন?

কি করব। মৃদু হাসিটাই টানলেন উমাপতি।

দিন দিকি একটা রিপ্রেসেন্টেশন ঠুকে। তারপর দেখছি ব্যাটাদের সব বজ্জাতি।

না না, আমার জন্যে তুমি হাঙ্গামা করবে কেন সুনীল।

আপনি তো উপলক্ষ্য উমাবাবু। আই এম ফাইটিং অন সাম প্রিন্সিপাল্‌স।

রিপ্রেসেন্টেশন কোনো দেননি উমাপতি। ভয়? ভয়ই হয়ত। সবাই তাই ভেবেছিল। কিন্তু ভয় নয়। পঁচিশ বছরের চাকরিতে কাউকে কখনো ভয় পাননি উমাপতি। যোগ্যতার সঙ্গে কাজ যখন করে এসেছেন, তখন ভয় কিসের, ভয়ই বা কাকে? অফিসের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু কাজেরই তো। এতো দিনের চাকরিতে কত রকমের কত মেজাজের সায়েবদের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু যত বদমেজাজী রগচটা অফিসারই হোক, ভয় পাওয়াতে পারেনি কেউই তাকে।

তবু তিনি সুনীলের কথামত রিপ্রেসেন্টেশন দেননি সেদিন। দিতে পারেননি। আর যা কিছু হক, ভয় নয় তাই বলে। হয়ত সুনীলের কথাই ঠিক, এ অন্যায়, এ অবিচার। তবু এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরের চাকরিতে কেউ তাকে অবজ্ঞা করেনি, অশ্রদ্ধা করেনি, সহকর্মীরা তো নয়ই, কোনো অফিসারও নয়। কাজের জন্যে খোদ বড় সাহেবকেও কতবার উমাপতিকে খোসামোদ করতে হয়েছে। এইতো তিনি চেয়েছিলেন। কাজে অখণ্ড সুনাম। তা তো পেয়েছেন তিনি। এর বেশী কিছু তো চাননি। বদনাম আর যে কারণেই দিক, কাজে বদনাম কেউ উমাপতির দিতে পারবে না। হয়ত ম্যাট্রিকটা পাশ থাকলে প্রমোশন আরো পেতেন, আরো উঁচুতে যেতে পারতেন। একটা নন-ম্যাট্রিককে এতো শ্রদ্ধা আর সম্মান কোথায় কোন অফিসই বা দেয় শুনি? তবু উমাপতির গর্ব ননম্যাট্রিক হয়েও অনেক গ্র্যাজুয়েট এমন কি এম একেও তিনি কাজ শিখিয়েছেন। পরে যারা অফিসার হয়ে ওপরে বসেছে তাদেরও অনেকে তারই কাছে কাজ শেখবার হাতেখড়ি নিয়েছে এই অফিসের। ওপরওলারা যদি অন্যায় বা অবিচার করে থাকে তার ওপর, তার বিচার ভগবানই করবেন। সুনাম আর সততার সঙ্গে পঁচিশ বছরের প্রতিটি দিন কাজ করে এসেছেন, কি পেয়েছেন, কি পাননি বা কি পেতে পারতেন, তার হিসেব কখনো করেননি। হয়ত প্রভাব, প্রতিপত্তি, পদ-মর্যাদা যোগ্য পাননি উমাপতি, দুঃখ করেননি তার জন্যে। শ্রদ্ধা আর সম্মান অনেক পেয়েছেন, আনন্দ তার জন্যেই।

তবু আশ্চর্য ভাল লেগেছিল সুনীলকে। দীর্ঘ পঁচিশ বছরে এই অফিসে এমন প্রতিভাময় ছেলে আর তো একটাও চোখে পড়ল না। চাকরি গেল সুনীলের। জানতেনই উমাপতি। অমন সংক্রামক আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেশীদিন কর্তৃপক্ষ রাখবেন না। চাকরি গেলেও কি করে খোঁজ রেখেছিল কে জানে। যাবার দিন ঠিক স্টেশনে দেখা করতে এসেছিল সুনীল। সবার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছিলও, আবার আসবেন মাঝে মাঝে।

আবার আসবার কোনো কথা ছিল না। যাবার দিন আবার ফেরবার কথা একবারও ভাবেননি উমাপতি। তবু পনের বছর পরে আবার কি মনে হল, ট্রেনে চেপে বসলেন। মনে পড়ল হয়ত পঁচিশ বছরের দুরন্ত স্মৃতি। নেমে পড়লেন আবার পনের বছর আগের ফেলে-আসা শহরের চেনা দিন-গুলোয়।

আদর্শ কেবিনের রাস্তাটা চেনা। স্টেশন থেকে কতবার এসেছেন। পনের বছরে

অনেক কিছুই হয়ত হারাতে পারে, চেনা রাস্তাগুলো হারাবে না নিশ্চয়ই। সংগে কিইবা জিনিস। এক দিনের তো থাকা। একটা রিকশা করলেন উমাপতি।

আদর্শ কেবিন নাম লেখা সাইন বোর্ডটা হেলে পড়েছে। তাই নয়, নামও ভাল পড়া যায় না। বেশ কিছুদিন নামটা পেণ্ট করা হয়নি। পনের বছর আগে এমনতো ছিল না। তখন বেশ স্পষ্ট পড়া যেতো আদর্শ কেবিন নামটা ওই সাইন বোর্ডে। হেলে-পড়া অস্পষ্ট ওই বোর্ডটাই আদর্শ কেবিনের বর্তমান দৈনাদশার স্বাক্ষ্য দিচ্ছে। যাবার দিনে ম্যানেজার কান্তি সেন বলেছিল, আপনিই স্যার এই হোটেলের পয় ছিলেন। হেসেছিলেন উমাপতি। সত্যিই কি তাই?

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন উমাপতি। বহুদিনের চেনা জায়গা। সিঁড়ি খুঁজে বার করতে হল না। সিঁড়িটা ঠিক তেমনিই আছে।

ম্যানেজারের ঘরে কান্তি সেনকে পেলেন না উমাপতি। তার জায়গায় অচেনা এক ছোকরা চেয়ারে বসেছে। কান্তি সেনকে না পেলেও তার সেই পুরোনো চেয়ারটা খুঁজে পেলেন উমাপতি।

বললে, কি করতে পারি আমি। ছোকরা বেশ সম্ভ্রমের সংগেই অভ্যর্থনা করল।

আমি কান্তি সেনের সংগে দেখা করতে চাই। এই হোটেলেরই ম্যানেজার ছি কান্তি।

হ্যাঁ ছিলতো।

এখন কোথায়?

গড নোজ।

এখানের চাকরি করে ছাড়ল সে?

ছাড়েনি, ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

কেন? বেশ একটু আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলেন উমাপতি।

কেন আবার, হিসেবপত্তরে গণ্ডগোল করে হোটেলটাকে লাটে ওঠাতে বসেছিল যে কান্তি। এরপর ছাড়িয়ে দেওয়া তো খুবই মাইল্ড হয়েছে—ওকে জেলে দেওয়াই তো উচিত ছিল মশাই।

বিশ্বাস করতে পারলেন না উমাপতি। বিশ্বাস করতে পারলেন না কান্তির এই অধঃপতন। পনের বছরের জানাকে এক মুহূর্তে বদলে ফেলা শক্তই শুধু নয় অসম্ভবও। শুধু বললেন, আশ্চর্য তো।

আশ্চর্য নয়, তাজবই দাদা। যাকগে। তা আপনি হঠাৎ কান্তির খোঁজ করছেন কেন এদ্দিনের পর? চিনতেন নাকি ওকে?

মৃদু হাসলেন উমাপতি। চিনতাম মানে, এই হোটেলে আমি প্রায় বিশ বছর কাটিয়েছি যে।

বলেন কি। ছোকরা উৎসাহিত হল। তা আপনার নামটা জানতে পারি কি।

স্বচ্ছন্দে। নাম বললেন উমাপতি।

— ব্যাস আর বলতে হবে না। আপনার নাম বহুবার শুনেছি কান্তির মুখে। আপনার খুব তারিফ করত ও। তা এদ্দিন বাদে কোনো কাজে নাকি এখানে?

না, না, কাজ আর কি। রিটায়ার করে পনের বছর থেকে দেশেই বসবাস করছি। হঠাৎ কি মনে হল, ভাবলাম যাই একবার পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সংগে দেখা করে আসি। তাই চলে এলাম।

বেশ করেছেন। তা এখানেই উঠছেন তো?

তা আর বলতে। ভাল হোক মন্দ হোক,

আদর্শ কেবিনই আমার ভালো। আর সত্যি বলতে কি, এই শহরে এত বছর কাটিয়েছি আর কটা হোটেল এখানে আছে তার খোঁজ নেবার কোনো দরকারই পড়েনি কোনদিন।

নতুন ছোকরা ম্যানেজার বিনয়ে বিগলিত হয়ে উঠল। হে'হে', এ আপনাদের মহানুভবতা দাদা। আপনাদের মত মানুষদের কৃপাদৃষ্টিতেই তো আদর্শ কেবিন এতদিন টি'কে থাকতে পেরেছে। তারপরই আবার কাজে নামল। ও হারু, হারু, তিন নম্বরের ঘরটা খুলে দে। বেডিংটা রেখে আয়।

চেয়ে দেখলেন উমাপতি। রামলাল নয়, হারু। জিজ্ঞেস করলেন, রামলাল বলে চাকর ছিল না একটা।

ছিলতো। ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছে কান্তির সঙ্গে সঙ্গে। ব্যাটা ধড়িবাজ ছিল মশাই এক নম্বরের।

ধড়িবাজ। হয়ত হবে। ফেলে আসা কাছে পাওয়া অতোগুলো দিনের মধ্যে কখনো দোষ দেখেননি উমাপতি রামলালের। তার যাবারদিনে রামলালের কান্না আজো তো মনে আছে। পনের বছর আগেকার কথা, তবু ভোলাতো যায়নি।

কান্তি সেন চোর, রামলাল ধড়িবাজ। পনেরটা বছরের সুনামের চেনা মানুষগুলোকে পনের বছর পরে আবার নতুন করে দুর্নামের কলঙ্কে নতুন করে চিনতে আশ্চর্যই লাগছে উমাপতির। কার চেনা ভুল কে জানে?

আদর্শ কেবিন পুরো ঘুরে বেড়ালেন উমাপতি। দীর্ঘ পনের বছর পরে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে উঁকি মেরে গেলেন। পনের বছর আগে প্রতিটি দিন যা করতেন। কিন্তু কোথাও চেনামুখ একটাও খুঁজে পেলেন না উমাপতি। পাবেন না জানতেনও। পেছনে ফেলে আসা পনেরটা বছর কমতো নয়।

তবু জিজ্ঞেস করলেন নতুন ম্যানেজার বিলাস সরকারকে পনের বছর আগের সেই সব পুরোনো বোর্ডারদের কথা।

বিলাস সরকার কারুরই খবর দিতে পারল না। রোগা লিকলিকে অভয়পদ, ভয় যে কখনই পেতো না। মাতাল সত্যচরণ। মদ খেতো রাতদিন। কেন খেতো, দুঃখ ভুলতে না দুঃখ পেতে, কোনোদিনই বুঝতে পারেননি উমাপতি।

শুধু খবর দিতে পারল বিলাস কানাইয়ের। বলল, কানাইবাবুর খবর জানি। তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা লটারিতে পেয়ে হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।

এ খবরে খুশী হলেন উমাপতি খুবই। আধপেটা খেয়েও আদ্ধেক মাইনে লটারির টিকিটে নষ্ট করেছে মাসের পর মাস। জানেন না কি উমাপতি? প্রতিজ্ঞা ছিল কানাইয়ের লুকিয়ে থাকা ভাগ্যলক্ষ্মীকে ও টেনে বার করবেই। বার করলই তাহলে। পনের বছর পরে আবার এই চেনা শহরে পা দেওয়ার পর চারদিকের বিবশ বিষন্ন কান্নায় এ খবরটা যেন আশ্চর্য এক খুশীর শিশির। কিন্তু সত্যচরণ আর অভয়পদ—ওরা কোথায় কে জানে। ভাবলেন উমাপতি। মদ টেনে টেনে এখনও কি ও ক্ষয় করে চলেছে শরীরটাকে? আর যেখানেই থাক রোগা লিকলিকে অভয়পদ এখনও কি দুর্জয় সাহসের অভয় বাণী শুনিয়ে চলেছে?

পনের বছর আগের ফেলে আসা আদর্শ কেবিনে আর কিছু দেখবার নেই, আর কিছু খোঁজবার নেই। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে অফিসের দিকে পা বাড়ালেন উমাপতি। পঁচিশটা বছরের পাতা উল্টে ওখানে খোঁজবার অনেক কিছুই তো রয়েছে। অনেক চেনা মুখ, অনেক চেনা সুর।

রাস্তা চিনতে ভুল হল না, বাড়িটা চিনতেও। ফটকের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন উমাপতি। পনের বছর পরে পঁচিশ বছর আগেকার ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে ভয় হয়ত স্বাভাবিকই। তারপর আস্তে আস্তে পা বাড়ালেন ভেতরে। দরজার চৌকাঠটা মাড়িয়ে হলঘরের ভেতরটায় চোখ বোলালেন একোণ ওকোণ। পঁচিশ বছরের চেনার চোখ
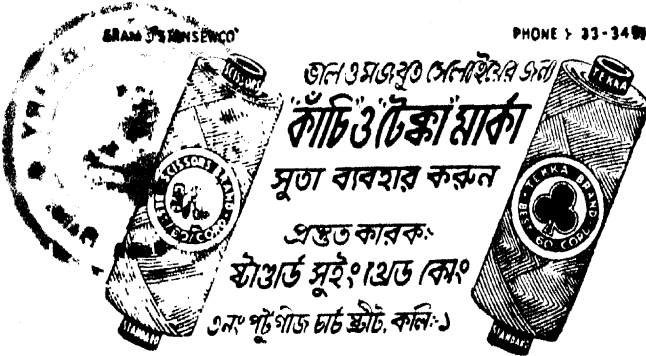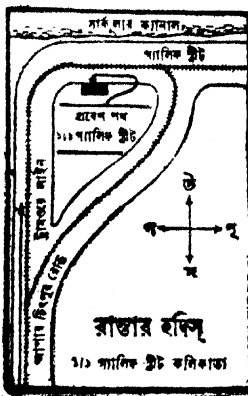
বোলালেন উমাপতি—দরজার পাশেই দুজন ছোকরা বসে রয়েছে। চিনতে পারলেন না। নতুন ঢুকেছে নিশ্চয়ই। এই ফেলে-আসা পনের বছরে এমনি কত নতুন ভর্তি হয়েছে, কে জানে। তবু চেনা মুখ একটাও কি নেই? পনের বছরের দুরন্ত ব্যবধান তারা কেউ কি কাটাতে পারেনি? পঁচিশ বছরের চেনা। এই অফিসে নিজেকে দুঃসহ অচেনা মনে হল আজ উমাপতির।

হয়ত তার অসহায় অবস্থা দেখেই পাশের ছোকরাটি জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই আপনার?

কাকে চাই? মনে মনে হাসলেন উমাপতি। কাকে চাই, এ প্রশ্ন এই অফিসের সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরে কতবার তিনি কত লোককে করেছেন, তার হিসেব নেই। কিন্তু এই অফিসেই কোনোদিন তাকে এ প্রশ্ন শুনতে হবে, ভাবতে কখনো পারেননি উমাপতি।

তবু অবাক হলেন না উমাপতি। দোষ তো নেই এ ছোকরার। ভাবলেন বটে, কাউকে চাই না। পঁচিশ বছর আগের কোনো এক চেনামুখ থেকে মাঝের পনেরটা বছরের গল্প শুনতে চাই। কিন্তু বললেন না। পুরোনো দিনের চেনাদের খোঁজই করলেন শুধু ওর কাছে।

সবার খোঁজ দিতে পারল না ছোকরাটি। নতুন এসেছে, হয়ত সবাইকে চেনেই না এখনো। শুধু বলল, কমলাকান্তবাবু? সোজা চলে গিয়ে ডানদিকের প্রথম ঘরে টার্ন নিন। দরজার কাছেই ফার্স্ট সীট কমলাকান্তবাবুর।

কমলাকান্ত। উমাপতির বিদায় অনুষ্ঠানের দিনও বক্তৃতা দিয়েছিল। চমৎকার বাংলা বক্তৃতা দিতে পারে ছেলেটা। ও এখনও আছে তাহলে। থাকবে না কেন? কিইবা বয়েস ছিল তখন ওর। এরই মধ্যে রিটায়ারের সময় হবে কি করে?

উমাপতিকে দেখে অবাক কমলাকান্ত।

আরে কি আশ্চর্য, অবাক কাণ্ড। আপনি কোত্থেকে, কখন এলেন, কতক্ষণ?

এসে গেলাম। হাসলেন মৃদু উমাপতি। হঠাৎ কি মনে হল, চড়ে বসলাম ট্রেনে। ভাবলাম, যাই, দেখা করে যাই একবার তোমাদের সঙ্গে। আবার কবে দেখা হবে, কে জানে।

বেশ করেছেন, খুব ভালো করেছেন।

হলঘরে দশ মিনিট দাঁড়িয়েছিলাম। চেনা মুখ একটাও খুঁজে পেলাম না কোথাও। ব্যাপার কি হে?

ব্যাপার আর কি। আমাদের দল সবই একে একে বিদায় নিয়েছে। বয়স তো কম হলনা। আপনিই তো রিটায়ার করেছেন আজ বছর পনের হবে।

ঠিক ঠিক। মাথা দোলালেন উমাপতি। [illegible] ...শোনার মধ্যে আর কে কে আছে হে?

আনন্দ আছে আর সলিল। দাঁড়ান ডেকে পাঠাচ্ছি। কলিং বেল টিপল কমলাকান্ত।

সলিল আছে তা হলে? ভালো। মন দিয়ে কাজ করছে নিশ্চই। এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে এসেছিল সলিল। আর আনন্দ? বড় সায়েব কি মার্কা করেছিল? টু স্লো। এখন নিশ্চয়ই খুব চটপটে হয়েছে ও। নিশ্চয়ই।

তা নইলে এখনো টিঁকে আছে।

একটু বাদেই ওরা দুজনে এল। ছুটেই এলো।

ভালো আছেন তো? সলিল শুধালো।

ভালই। হাসলেন উমাপতি। সেদিনের চেনা মুখদের দেখে ভালই লাগল।

আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন উমাদা। আনন্দ বলে উঠল।

হবেনা, শোন কথা? বয়েস কি আর কম হল। আর সব কোথায়? সব্বাই রিটায়ার করেছে নাকি?

সব্বায়ের মধ্যে সুশান্ত চাকরি ছেড়ে দিয়েছে শ্বশুরে মরবার পর সম্পত্তি পেতে। কমলাকান্ত বলল।

আর হরিলাল? শুধালেন উমাপতি। সেই চটপটে ছেলেটা? ও আপনি জানেন না বুঝি? তাও বটে আপনি আর কি করে জানবেন—হরিলাল মারা গেছে।

কর্মঠ হরিলালের এ সমাপ্তি এমন অকালে শোনবার জন্যে তৈরি ছিলো না উমাপতি।

কেন, কি হয়েছিল?

একদিন কাজ করতে করতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল। দু মাসের ছুটি নিল তারপর। জানা গেল টি বি হয়েছে। ছুটির পর আর ফিরল না কাজে।

হরিলালের ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখটা এখনও চোখের সামনে ভাসছে উমাপতির। রোগা বিমর্ষ চেহারায় আশ্চর্য এনার্জি ছিল ছেলেটার। কিন্তু রাতদিন টাকার চেষ্টায় অমন অক্লান্ত পরিশ্রম করলে, টি বি হবে না তো আর হবে কি?

তাহ'লে সেই পুরোনো ব্যাচের তোমরা কজনই রয়েছো?

হ্যাঁ। ঘাড় নাড়ল কমলাকান্ত।

গুড্। ভালো, ভালো। ঘরের চারদিকে চোখ ফেরালেন উমাপতি। সব নতুন মুখ। ইয়ং। আশা ভরসায় দীপ্ত মুখ। তারপর কাজকর্ম কেমন চলছে আজকাল?

ভালই। আনন্দ বললে, আগেকার সেদিন আর নেই উমাদা। এখন আমাদের ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। ওপর থেকে কিছু অন্যায় চাপাবার চেষ্টা হলেই ইউনিয়ন রুখে দাঁড়ায়। মাইনে বাড়াবার জন্যে এজিটেশান চালু হয়েছে ইউনিয়ন থেকে। এখন দশটা পাঁচটা অফিস টাইম—পাঁচটার পর বসতে বলা হয়েছে কি ওভারটাইম দিতে হবে।

গুড্ গুড্। ঘাড় নাড়লেন উমাপতি। খুব ভাল কথা।

দাঁড়ান। সলিল লম্বাচওড়া স্বাস্থ্যবান চেহারা এক ছেলেকে ধরে নিয়ে এল। এ হচ্ছে আমাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারি শ্রীমান সুধীর সরকার।

বেশ ভাই বেশ। খুশিতে ওর পিঠ চাপড়ালেন উমাপতি। ওকে দেখে মনে পড়ে গেল সুনীলকে। সেদিনের সেই বিদ্রোহী অগ্নিশিখাকে। ঠিক এমনিই বলিষ্ঠতা দেখেছিলেন ওরও চোখে। হ্যাঁ হে, আমাদের সেই সুনীলের খবর তোমরা কেউ জানো?

সে তো এখানেই আছে। কমলাকান্ত বলল। সুনীল এখন মস্ত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হয়ে উঠেছে।

হবেই তো, হবেই তো। ওয়ান্ডারফুল ছেলে। খুশী হয়ে বলে উঠলেন উমাপতি। তারপর খুঁজতে চেষ্টা করলেন পনের বছর আগের ফেলে আসা অফিসের সেই জীবনকে। কোথাও পেলেন না। সেই বাড়ি রয়েছে, সেই চেয়ারটেবিল, সেই ফাইলের ভিড়, মাথার ওপর সেই ফ্যানের হাওয়া, টাইপের সেই কর্কশ কান্না। তবু সুরের কোথাও যেন ছন্দপতন ঘটেছে। পঁচিশ বছর আগেকার অফিস জীবনে যে অন্তরঙ্গতার পরশ ছিল, যে স্নিগ্ধ আবেশ ছিল, তা কোথাও খুঁজে পেলেন না। এ পরিবর্তন ভাল কি মন্দ বুঝে উঠতে পারলেন না উমাপতি পঁচিশ বছর আগেকার সেই মন নিয়ে। তবে বুঝলেন তাদের দলের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। নতুনদের জায়গা দিতে হবে। সেদিন একটাই ছিল সুনীল। এখন হাজারে হাজারে সুনীল চেয়ারে চেয়ারে ছেয়ে গেছে। ওরা বাঁচবে, ওরা বাঁচাবে। ওরা মাথা তুলে দাঁড়াবে সব অন্যায় আর

অবিচারের প্রাচীর ভাঙতে। ওদের সাহস আর শক্তিতে সন্দেহ নেই উমাপতির। কিন্তু বিদ্রোহই জীবনের সব কিছু নয়, সংগ্রামই জীবনের সবখানি নয়। আরো আছে অনেক কিছু। মায়া, মমতা, ভালবাসা, সহযোগিতা আর সহানুভূতি। এদের দিয়ে পনের বছর আগে এই অফিসে যে স্নিগ্ধ অন্তরঙ্গতার জগত গড়েছিলেন উমাপতির দল, সে জগতকে গড়তে পারবে কি সুনীলের দল? পঁচিশ বছরের পুরোনো মন নিয়ে এক-কোণে বিস্মৃতির আড়ালে সরে যেতে তাহ'লে কোনোই দুঃখ নেই উমাপতির।

ভাল কথা, এখন বড় সায়েব কে হে? প্রশ্ন করলেন উমাপতি। নতুন বদলী হয়ে এসেছে, আপনি চিনবেন না। সলিল বলল। তবে শ্রীমন্তবাবুকে আপনি চিনতে পারবেন নিশ্চই। উনি এখন ছোটো সায়েব হয়েছেন।

শ্রীমন্ত, কোন্ শ্রীমন্ত? পনের বছর পেছনে ফিরে গেলেন উমাপতি। আমাদের শ্রীমন্ত চৌধুরী না তো?

হ্যাঁ।

গুড্। খুশী হলেন উমাপতি। মনে আছে বৈকি। এম এ পাশ ছোকরা। একেবারে স্পেশ্যাল গ্রেডে ঢুকেছিল। এম এ পাশ তখন আরো দু'চারটে ছিল, কিন্তু শ্রীমন্তের বাড়তি ছিল খুঁটির জোর। সে যাই হোক, ও মন্দ ছিল না কাজকর্মে। তার কাছে প্রায়ই বুঝে নিত। বড় কথা, কাজে মন ছিল ওর। ভক্তিও করত। ওর উন্নতিতে খুশীই হলো উমাপতি। বললেন, যাই, একবার দেখা ক'রে আসি।

আসুন, আসুন, বসুন। খুশীই হ'ল শ্রীমন্ত। শ্রদ্ধা দেখিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠেও দাঁড়াল। কবে এলেন দেশ থেকে?

আজই।

থাকছেন এখন কিছুদিন?

না না। রাত্তিরে গাড়িতেই চলে যাব। দেখা করতে এলাম তোমাদের সকলের সংগে। আবার কবে আসা হবে, কে জানে। হয়ত আর হবেই না।

তা বেশ করেছেন, বেশ করেছেন। দেখলেন সব?

দেখলাম বৈকি। সব অচেনা মুখ। পুরোনো দলের ক'জনই বা টি'কে আছে।

সে তো নিশ্চয়ই। তা কেমন সব দেখলেন?

ভালই। নতুন সব। ওদের সাহস আছে, শক্তি আছে, আদর্শ আছে। ভালই তো লাগল।

অনেক কথাই হ'ল শ্রীমন্তের সংগে। অনেক কথাই কইল ও। বেল টিপে চা আর খাবার আনাল। আপ্যায়নের ত্রুটি রাখল না শ্রীমন্ত। আপ্যায়নই শুধু নয়, শ্রদ্ধারও। উপ্‌চে উঠেছে [illegible] কোথাও অহেতুক গর্ব কি [illegible] নেই, বড় কথা সেইটেই। [illegible] ইচ্ছে করলে ভুলে যেতে কি ও পারত না? নানা কথার পর এক সময় খুশী মনেই বেরিয়ে এলেন ওর ঘর থেকে। পনের বছরে হারিয়ে যাওয়া যত কিছু, পঁচিশ বছরের পুরোনো সুর, তার অনেকখানিই ও ঘরে খুঁজে পেলেন উমাপতি। আশ্চর্যই।

ফেরবার মুখে সিঁড়িতে নামবার কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন ম্লানমুখী এক ছোকরাকে দেখে। পনের বছর পরে এ শহরে ফিরে এসে এমনি ম্লান মুখ অনেকগুলো দেখলেন। বয়েস বা বেদনায় ম্লান নয়, নিরাশায় ম্লান। কেন যেন মনে হ'ল চাকরি খুঁজছে ছেলেটা। জিজ্ঞেস করে জানলেন—তাই। পনের বছরের হারানো মমতা আর দায়িত্বজ্ঞান জাগ্রত হয়ে উঠল উমাপতির। দীর্ঘ পঁচিশ বছরে এই অফিসে কত ছেলের যে তিনি চাকরি করিয়ে দিয়েছেন, তার হিসেব নেই। চাকরি দেবার মালিক সাধারণত ছোট সায়েবই। ছোটো সায়েবের চেম্বারে অনেককেই তিনি সংগে করে নিয়ে ঢুকিয়েছেন। উমাপতির চেয়ে বড় রেকমেণ্ডেশান সেদিন ছিল না। ওয়েল, আপনি যখন বলছেন, উই মে টেক্ হিম্।

নাম ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞেস ক'রে উমাপতি ওকে সংগে করেই আবার ঢুকলেন ছোটো সায়েবের চেম্বারে।

এই যে আসুন। আবার কি মনে ক'রে? তারপর ছোকরার দিকে তাকাল শ্রীমন্ত। এ কে?

চাকরি খুঁজছে। ইয়ং ম্যান। ঘোরাঘুরি করছে দেখলাম। তাই দয়া হ'ল, নিয়ে এলাম তোমার কাছে। তুমি যদি কিছু করতে পার।

তাই বলে বলা নেই কওয়া নেই ফট্ ক'রে এখানে নিয়ে এলেন একেবারে? আচ্ছা আক্কেল তো আপনার। আজকাল এরকম কত ঘোরাঘুরি করছে তা জানেন কি? বয়সের সংগে কি কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়েছেন নাকি। নিয়ে যান এখান থেকে।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন উমাপতি। আস্তে আস্তেই। এই অফিসে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের চাকরিতে কোনোদিন কোনো কাজে কেউ কখনো তাঁকে তিরস্কার করেনি। করতে পারেনি। করলে সেদিন হয়ত দুঃখ হ'ত, অনুশোচনা হ'ত। আরো হয়ত অনেক কিছু। কিন্তু আশ্চর্য, আজ হ'ল না কিছুই। দুঃখ নয়, অনুশোচনা তো নয়ই। সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো উমাপতি। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরে মোট কত লক্ষ বার এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করেছেন তার কি হিসেব রেখেছে কেউ? সিঁড়ির পাথরের ধুলোয় পঁচিশ বছরের পায়ের দাগ এতো তাড়াতাড়িই মিলিয়ে গেল কি? নামতে লাগলেন আস্তে আস্তে উমাপতি বিশ্বাস। নিরাশার ম্লান মুখ আজ অনেক। সেদিন যা ছিল না। সেদিন যা ছিল না। তবু একটা নিরাশ মুখে আশার আলো ফোটাতে চেষ্টা করেছিলেন। পারলেন না, দুঃখ হ'ল বৈকি। চেষ্টা করেছিলেন, আনন্দ সেই তো। দীর্ঘ পঁচিশটা বছরের প্রতিটি দিন ধীরে ধীরে কাজ ও কর্তব্যের সঙ্গে মমতা, ভালবাসা আর সহানুভূতি মিশিয়ে যে পৃথিবী এখানে গড়ে উঠেছে, সেখানে দান তো কম ছিল না উমাপতি বিশ্বাসের, দাবী তো কম ছিল না। পনের বছরের ব্যবধান কি কোনো প্রয়োজনের দাবী করবে না? সব প্রয়োজনই কি ফুরিয়ে গেল এতো তাড়াতাড়ি?
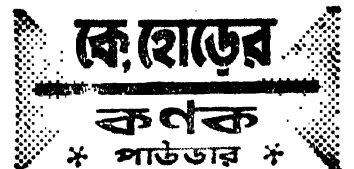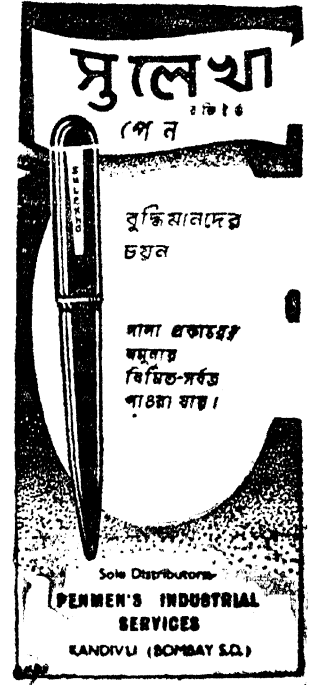
রাগের গঠন বা তার বিশ্লেষণ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আমাদের দেশে অল্প। ভাতখণ্ডেকে অনুসরণ করে ইদানীং কিছু বই লেখা হয়েছে কিন্তু তাতে গ্রন্থকার-গণের স্বকীয় চিন্তার পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না। বাঙালীর দৃষ্টিকোণ থেকেও সে সব বই লেখা হয় নি। রাগসংগীতের এই অনুকরণের যুগে এই সব বই আমাদের চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এর পূর্ব-যুগেও আমাদের যে একটা স্বাধীন চিন্তা-ধারা ছিল তার পরিচয় ক্রমেই লুপ্ত হতে চলেছে। অতএব এদিকে দৃষ্টি দেওয়াও তো দরকার, এদিক থেকে চিন্তা করলে প্রথমেই দক্ষিণাচরণ সেন প্রণীত 'রাগের গঠন শিক্ষা' নামক গ্রন্থখানির কথা মনে পড়ে। বইখানি তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনার ফল এবং বিশেষ পরিশ্রম করে লেখা। রাগের প্রয়োগশিল্প সম্বন্ধে এত সূক্ষ্ম অথচ বিস্তৃত আলোচনা এর আগে আর হয়নি এবং পরেও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। দক্ষিণাচরণ যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা বৈজ্ঞানিক—অনাবশ্যক উচ্ছাস বা গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। দুঃখের বিষয় রাগের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁর যে পরি-কল্পনা ছিল তাকে সম্পূর্ণ তিনি করে যেতে পারেন নি। এই গ্রন্থের দ্বিতীয়-ভাগের মুখবন্ধে শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী মহাশয় জানিয়েছেন যে তিনি ১০৭ খানি রাগের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করবার পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু মাত্র ৩২ খানির বেশি আলোচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। এর কারণ অর্থাভাব এবং অবসরের স্বল্পতা। দক্ষিণা-চরণের পরে ঠিক এইভাবে আর কেউ অগ্রসর হলেন না। ব্রজেন্দ্রকিশোর এইরকম আশংকা প্রকাশ করে লিখেছিলেন—"জানি না অতঃপর কে কবে অধ্যাপক দক্ষিণাচরণের আরব্ধ এই মহানুষ্ঠানের পূর্ণতা সম্পাদন করিবেন—"। অদূর ভবিষ্যতে এই সম্ভাবনা অল্প কেননা আজকাল বিনা আয়াসে মোটা মোটা বই লেখবার সহজ পন্থা অনেকেই আবিষ্কার করেছেন।
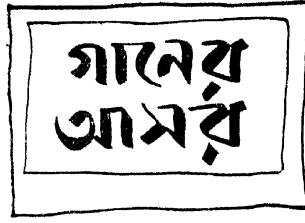
দক্ষিণাচরণ যেভাবে রাগের গঠন প্রণালী নিয়ে আলোচনা করেছেন তার বিষয়বস্তু কি রকম সেটি তাঁর ভাষাতেই উদ্ধৃত করি—

(১) রাগের গঠনে পদের (phrase), সুরান্তরের (interval) ও চতুঃস্বরিক বিন্যাসের (succession of four notes) বিচারের আবশ্যকতা।

(২) রাগের গঠনকালে ইহার উপাদান-গুলির সংশ্লেষণ (synthesis) এবং গঠিত রাগের উপাদানগুলির বিশ্লেষণ (ana-lysis)।

(৩) কোন রাগের সহিত তাহার সম-প্রকৃতিক রাগের সম্বন্ধ বিচার।

(৪) রাগ গঠনের (construction) পূর্বোল্লিখিত নিয়মগুলি প্রয়োগ করিয়া রাগ গঠনের উদাহরণ এবং তৎপরে সেই উদাহরণের বিশ্লেষণ।

(৫) কোন কোন সুরান্তর ও কোন কোন বিন্যাসের ব্যবহারে এবং কোন কোন সুরান্তর ও কোন কোন বিন্যাসের অব্যবহারে রাগের রূপ প্রকাশ পায় তাহার উপদেশ।

(৬) প্রত্যেক রাগ গঠনের প্রণালীর পরে সেই রাগের আলাপ, পরে এক বা একাধিক গৎ ঐ গৎএর উপজ ও তৎপরে এক বা একাধিক গানের স্বরলিপি।

(৭) অনেকগুলি রাগের ষড়জসংক্রমণ প্রণালী (modulation)।

দক্ষিণাচরণ পদবিভাগের আবশ্যকতা যে যুগে বুঝেছিলেন তখনও আমরা রাগসংগীতের এইরকম বিচারে উদ্যোগী হই নি। এক একটি রাগের এক একটি (phrase) আছে যা তাকে অপর রাগ বা সদৃশ রাগ থেকে পৃথক করে রেখেছে—এই জিনিসটি দক্ষিণাচরণ বিশেষ যত্ন-সহকারে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ভাতখণ্ডেও

এই ধরনের বিচার করেছেন। কিন্তু দক্ষিণাচরণ ভাতখণ্ডের বিশ্লেষণ প্রণালী সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা অনুসারেই লিখেছেন।

চতুঃস্বারিক বিন্যাস সম্বন্ধে দক্ষিণাচরণ যা বলেছেন সেটিও খুবই সমীচীন, এই প্রণালীটিও বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত। এ সম্বন্ধে তিনি অনেক আলোচনা করেছেন। তার থেকে একাংশ উদ্ধৃত করি—

"সুরান্তরের বিচারের দ্বারা যেরূপ কোন রাগের গঠন প্রণালী শিক্ষা করা যায়, সেইরূপ কিন্তু সকল রাগের বিচারপ্রণালী কেবল সুরান্তরের বিচারের দ্বারা শিক্ষা করা যায় না। যথা—গৌড় সারঙ্গে স-ঋ ও ঋ-গ এই দুইটি সুরান্তরই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া সা ঋ গ বিন্যাস ব্যবহৃত হয় না। সেইজন্য এই দুইটি সুরান্তরের মধ্যে সা-ঋ ব্যবহৃত হইয়া তৎপরে গ'র স্থলে পুনরায় সা ব্যবহৃত হয়। যথা—সা ঋ সা এবং ঋ গ মা বিন্যাসের ঋ'র পূর্বে সা ব্যবহৃত না হইয়া গ ব্যবহৃত হয়। যথা—গ ঋ গ ম। এস্থলে শিক্ষার্থীরা দেখিবেন যে সা-ঋ ও ঋ-গ এই দুইটি সুরান্তর ব্যবহৃত হইলেও মা ঋ গ'র স্থলে সা গ ব্যবহৃত হয় এবং ঋ গ ম বিন্যাসের ঋ'র পূর্বে সা ব্যবহারের দ্বারা সা ঋ গ ম না হইয়া গ ব্যবহারের দ্বারা গ ঋ গ ম হয়। সুতরাং এখানে শিক্ষার্থীরা দেখিবেন যে গৌড় সারঙ্গে সা-ঋ ও ঋ-গ এই দুইটি সুরান্তর ব্যবহৃত হওয়াতে রাগের কোন দোষ হয় না, কিন্তু অন্য সুরের মিশ্রণে এই সকল সুরান্তরের দ্বারা বিন্যাস বিশেষ গঠিত হইয়া ব্যবহৃত হইলে রাগ ভ্রষ্ট হয়। সুতরাং এইরূপ সকল স্থলে কেবল সুরান্তরের বিচার দ্বারা রাগের গঠনপ্রণালী স্থির না হইয়া চতুঃস্বারিক বিন্যাসের দ্বারা হইয়া থাকে।

অতএব চতুঃস্বারিক বিন্যাসের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, কোন কোন স্বর-বিন্যাস ব্যবহার্য ও কোন কোন স্বরবিন্যাস অব্যবহার্য।

আবার পদের শেষস্থিত সুরের পূর্ব-বর্তী বিন্যাসগুলি গঠনকালে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় স্থির করিতে পারেন না যে, কি প্রণালী অবলম্বন করিলে তাঁহারা নানা প্রকার নূতন নূতন বিন্যাস গঠন করিতে পারিবেন। এরূপ স্থলে তাঁহারা ২৪টি চতুঃস্বারিক বিন্যাস এবং ঐ সকলের পরিবর্তনের দ্বারা বিন্যাস প্রস্তুত করিয়া পদ গঠনকালে উহাদিগকে সম্মুখে রাখিলে এবং ঐ সকলের মধ্য হইতে ইচ্ছামত নির্বাচন করিয়া লইলে, বিবিধপ্রকার বিন্যাস গঠনে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন।"

এই যে ২৪টি বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে এটি হচ্ছে চারটি স্বরের মোট প্রস্তারে সংখ্যা অর্থাৎ চারটি স্বরকে নানাভাবে বিন্যাস করলে মোট ২৪টি বিন্যাস হয়। সংগীতশাস্ত্রেও চতুঃস্বর কূটতানের এইসব বিন্যাস দেখানো আছে।

ষড়জ সংক্রমণের বিষয়টিও তিনি চমৎকার-ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এই বইখানি ভালভাবে পড়লে আমাদের সংগীত সম্বন্ধীয় বহু প্রশ্নের সদুত্তর মিলবে।

রাগের গঠন শিক্ষা ছাড়া দক্ষিণাচরণ আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—ঐকতানিক স্বর সংগ্রহ, গীতশিক্ষা, সরল হারমোনিয়াম সূত্র, হারমোনিয়ামে গান শিক্ষা। গীতশিক্ষা এবং হারমোনিয়ামে গান শিক্ষা এই গ্রন্থ-দুটিতে বহু উত্তম পুরাতন গানের স্বর-লিপি আছে। সেকালে অনেকেই বিকৃত সুরে স্বরলিপি করেছেন কিন্তু দক্ষিণাচরণ সেটি করেন নি। তাছাড়া প্রত্যেক বিষয়ের গান সম্বন্ধেই তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। গীত-শিক্ষার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

এই পুস্তকের প্রায় সমুদয় গীতগুলি রঙ্গালয়ে অভিনীত পুস্তক হইতে নির্বাচিত হইয়াছে। ঐ সকল গানের সুরগুলি যেমন চমৎকার, রচনাও তেমনই মধুর; অতএব লিপিবদ্ধ না করিলে ভবিষ্যতে ঐগুলি বিকৃত ও লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। আর অনেকে এইসব গানের স্বরলিপি পাইবার বিশেষ আগ্রহও প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি সম্প্রতি এইপ্রকারের কতকগুলি উৎকৃষ্ট গান স্বরলিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম। আর এইগুলি রঙ্গালয়ে যেমন গীত হয় অবিকল সেইরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। অনেকের সংস্কার আছে যে থিয়েটারের গান কিছুই নয়; কারণ উহারা দুই বা ততোধিক রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ সংস্কার নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক; কারণ গানে স্থল বিশেষে রাগের মিশ্রণে কোন অনিষ্ট হয় না,

বরং মাধুর্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঐরূপ মিশ্রিত রাগ বিশিষ্ট অনেক ধ্রুপদ খেয়ালও দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন শ্যাম ও কল্যাণের মিশ্রণে শ্যামকল্যাণ, মারু ও কেদারার মিশ্রণে মারুকেদারা, ইত্যাদি।

আজ থেকে চৌষট্টি বছর আগে এই ধরনের উদার মন্তব্য এবং এতখানি দূরদর্শিতা অতিশয় বিরল। কৃষ্ণধন বাবুও অবশ্য উদারমতাবলম্বী ছিলেন কিন্তু অনেক গান তিনিও পছন্দ করতেন না, এমন কি রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধেও তাঁর বিরুদ্ধ মন্তব্য ছিল। দক্ষিণাচরণ কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতেরও স্বরলিপি করেছেন এবং তার সুর ভুল নয়। তাছাড়া পুরাতন জিনিসের সংরক্ষণ সম্বন্ধে একটা বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা এযুগেও কদাচিৎ দেখা যায়। দক্ষিণাচরণের স্বরলিপির জন্যই এখনও গিরিশ ঘোষের বহু গানের যথাযথ সুর পাওয়া সম্ভব।

দক্ষিণাচরণের দেশ ছিল চব্বিশ পরগণার বারাসতের অন্তর্গত অহেশপুর গ্রামে। সেইখানেই তিনি ১২৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নীলমাধব সেন কলকাতার পুলিশ ইনস্পেক্টর ছিলেন। দক্ষিণাচরণ অবশ্য কলকাতাতেই মানুষ হয়েছেন, শোভাবাজারে তাঁদের বাড়ি ছিল। ওরিএণ্টাল সেমিনারিতে পড়বার সময় থেকেই তাঁর গান বাজনার শখ প্রবল হতে থাকে। অল্প বয়সেই তিনি সুন্দর বাঁশি বাজাতে পারতেন। কলকাতায় থাকলে পড়ায় মন বসানো শক্ত অতএব তাঁকে কাণপুরে পাঠানো হল। সেখানে কিছুদিন যেতে না যেতেই পড়লেন টাইফয়েড রোগে। অসুখ সারবার পর আবার ফিরলেন কলকাতায়। আবার বাঁশি শেখা চলল। নন্দরাম সেনের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় বাঁশি বাজাতেন। তাঁর কাছে কিছুদিন তালিম নিলেন। তারপর আহিরীটোলার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সেতার শিখতে আরম্ভ করলেন। বেহালাও শিখেছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাছে। এঁদের কাছ থেকে সেতার এবং বেহালার শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয়ে। ইতিমধ্যে এণ্ট্রেন্স ক্লাশ পর্যন্ত পড়েই স্কুল পরিত্যাগ করলেন।

সে যুগের অনেকের মত দক্ষিণাচরণও ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন। এই সূত্রে গোপাল চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে, তাঁর ঘনিষ্টতা হয়। গোপালবাবু পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত জানতেন। এঁর কাছ থেকেই দক্ষিণাচরণ পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত শিক্ষার সন্ধান পান এবং পরে নিজের চেষ্টায় এবিষয়ে অনেক অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি নাকি অনেক গৎএ হার্মোনির প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৮১ সালে তিনি ব্লুরিবন স্ট্রিং ব্যাণ্ড-এর সংগঠন করেন। পরে এই অরকেস্ট্রার নাম দেওয়া হয় —ব্লু রিবন অরকেস্ট্রা। ১৮৮৯ সালে তিনি ষ্টার থিয়েটারের ব্যাণ্ড পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯১ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্রিং ব্যাণ্ড গঠন করেন এবং ১৮৯৬ সালে বউবাজারে "ফিল হারমনিক ব্যাণ্ড" নামে আর একটি ব্রাস ব্যাণ্ড গঠন করেন। ১৯০৭ সালে তিনি কোহিনুর থিয়েটারে যোগদান করেন। এইখানে কাজ শেষ হবার পর তিনি থিয়েটারের সংস্রবে থাকেন নি।

দক্ষিণাচরণ কিছু অধিক বয়সেই বিবাহ করেছিলেন। দুটি ছেলে মেয়ে হয়েছিল কিন্তু তারা অতি শৈশবেই মারা যায়। ১৩৩১ সালে ৬৫ বৎসর বয়সে দক্ষিণাচরণ লোকান্তরিত হন। তিনি সদাচারনিষ্ঠ এবং সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। সেকালে সাধারণত সঙ্গীতশিল্পীরা যেভাবে জীবন যাপন করতেন দক্ষিণাচরণ সেইভাবে জীবন যাপনের পক্ষপাতী ছিলেন না। এইজন্যেই বোধ করি কিছু সত্যিকারের কাজ করে যেতে পেরেছেন।

"আমি [illegible]!

ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

স্যার ওয়াল্টার স্কটের পর উনিশ শতকে স্কটল্যান্ডে সবচেয়ে বেশী যিনি জনপ্রিয় তিনি স্যার জেম্‌স ইয়ং সিমসন (১৮১১-১৮৭০)। সিমসন তখন এডিনবরা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। ধাত্রীবিদ্যার বিশেষজ্ঞ। কুইন স্ট্রীটে তাঁর বাড়ি। আর বিরাট তাঁর প্র্যাক্‌টিস।

ভারতবর্ষে যেমন তাজমহল আর প্যারিসে যেমন ইফেল টাওয়ার তেমনি এডিনবরায়

স্যার জেমস ইয়ং সিমসন

তখন সিমসন। জেম্‌স সিমসনকে না দেখলে তখন স্কটল্যান্ডের কিছুই দেখা হ'ত না। তাই বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক কি ভ্রমণকারী সবাই দেশবিদেশ থেকে সিমসনকে দেখতে তাঁর কুইন স্ট্রীটের বাড়িতে যেতেন। তাঁর সঙ্গে প্রাতরাশ কি মধ্যাহ্নভোজন করতেন।

এ হেন লোকটি প্রথম যখন এডিনবরায় আসেন, তখন কেউ তাঁকে চিনত না। মাত্র তের বৎসর তাঁর বয়স। নিতান্ত অপরিচিত বিরাট এই শহর। আর নিজে তিনি বন্ধুহীন। কপর্দকহীন।

জেম্‌স্‌-এর বাবা ছিলেন রুটি প্রস্তুতকারক। বাথগেট গ্রামে তাঁর বাড়ি। রুটি তৈরী করে কোনওরকমে সংসার চালাতেন। জেমস তাঁর সপ্তম সন্তান। জেমস-এর জন্মের পর রুটির ব্যবসা আরও মন্দা গেল। সংসার চালানো কঠিন হল। তাই দেখে জেমস-এর মা নিজে এই ব্যবসা হাতে নিলেন। ভরাডুবি থেকে সংসারকে কোনও-রকমে উদ্ধার করলেন।

আট বছর বয়সে জেমস-এর বুদ্ধি ও লেখাপড়ায় আগ্রহ দেখে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করা হল। পরিবারের মধ্যে এই ছেলেটিই লেখাপড়া শিখছে, কাজেই সকলের গর্বের। তের বৎসর বয়সে তাঁকে এডিনবরা ইউনিভার্সিটিতে পাঠানো হল। সমগ্র পরিবার, বিশেষ করে তাঁর বড় ভাই আলেকজান্দার এজন্য আর্থিক কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হলেন। নিজের অনেক সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

এডিনবরায় এসে সিমসন আডাম স্ট্রীটে একখানা ঘর নিলেন। ভাড়া সপ্তাহে তিন শিলিং। কিন্তু ডাকটিকেটের দাম তখন একটি প্রতি সাড়ে ছ পেনি। কাজেই মাসে একবারের বেশী বাড়িতে চিঠি লেখার কোন উপায় তাঁর ছিল না।

সিমসন গ্রীক ও দর্শন ক্লাসে ভর্তি হলেন। কিন্তু বেশীদিন এই নীরস ক্লাস তাঁর ভাল লাগল না। এডিনবরায় তখন ডাঃ রবার্ট নক্সের আনাটমি ক্লাসের খুব নাম। দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে আনাটমি শিখতে আসে। দেখতে দেখতে ছাত্রসংখ্যা পাঁচশ'র ওপর উঠে গেল। সিমসনও তাই গ্রীক এবং দর্শন ক্লাস ছেড়ে এই দিকে ঝুঁকলেন। ডাঃ নক্সের ক্লাসে ভর্তি হলেন।

তখন শব-চোরদের রাজত্ব। চড়া দামে শিক্ষকদের কাছে তারা শব বিক্রী করে। শিক্ষকরাও তাই ছাত্রদের কাছে শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য চড়া দাম ধার্য করতেন। তাই জেম্‌সএর তখনকার হিসেবের খাতায় দেখা যায়—শবের বাবদ দু'পাউন্ড। পায়ের হাড় এক পাউন্ড এক শিলিং।

সিমসন ক্লাসে অসাধারণ কৃতিত্ব কিছু দেখাতে পারেননি। আর ধাত্রীবিদ্যায় ছিলেন সবচেয়ে বেশী কাঁচা। বিকেলের দিকে এই ক্লাস শুরু হতেই ঘুমে তাঁর চোখ বুজে আসত। ক্লাসের পেছনে বসে তিনি ঢুলতেন। ধাত্রীবিদ্যা তখন অবশ্যশিক্ষনীয় একটা বিষয়ও ছিল না।

সিমসন আঠারো বৎসর বয়সে ডাক্তারী পাশ করে প্যাথলজির অধ্যাপকের সহকারী হয়ে অনেকদিন কাজ করেন। এই অধ্যাপকটিই সিমসনকে ধাত্রীবিদ্যা শেখার বুদ্ধি দেন। তাঁর কথায় সিমসন এইদিকে মন দিলেন। এই কাজে তিনি চটপট এত বেশী দক্ষ হয়ে উঠলেন যে, কয়েক বৎসর পরে ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক হ্যামিল্টন যখন অবসর নিলেন তখন এই শূন্য পদের জন্য তিনিও একজন প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন। সিমসনের তখন মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়স।

সিমসনের খাবার ঘর : যেখানে প্রথম ক্লোরোফর্মের গুণ পরীক্ষা করা হয়

অধ্যাপকের এই পদ নির্বাচন তখন এডিনবরা টাউন কাউন্সিলের হাতে। শুধু ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী হলেই এ পদ পাওয়া যায় না। অন্য অনেক কিছু গুণ থাকা চাই। তার মধ্যে সবচেয়ে যা বেশী প্রয়োজন সে হল আভিজাত্য। সিমসনের তা ছিল না। তিনি ছোট এক গ্রামের সামান্য এক রুটি প্রস্তুতকারকের ছেলে। তাই অনেকে তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াল।

টাউন কাউন্সিলের তেত্রিশজন সভ্য। নির্বাচনপ্রার্থীরা ভোট সংগ্রহের জন্য কাউন্সিলারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে লাগলেন। নিজ নিজ যোগ্যতা ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন ছাড়লেন, পুস্তিকা প্রকাশ করলেন, দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার মারলেন। সিমসন নিজের যোগ্যতা, বক্তৃতা ও ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার বিবরণ ছাপিয়ে বিলি করতে লাগলেন। এই নির্বাচন প্রতিযোগিতায় তাঁর খরচ হল তিনশ পাউন্ড। কেউ কেউ বলেন পাঁচশ।

শোনা গেল সিমসনের এক প্রতিদ্বন্দ্বী শুধু একটি বিষয়ে তাঁর চেয়ে বেশী গুণ-সম্পন্ন। তিনি বিবাহিত। তাই তাঁরই এ পদ পাওয়ার বেশী সম্ভাবনা।

শুনে সিমসন এডিনবরা ছেড়ে চলে গেলেন। কয়েকদিন পর লিভারপুল থেকে ফিরলেন, সস্ত্রীক। এসে ঘোষণা করলেন, এই পদের জন্য যদি আমি নিজেকে সবচেয়ে বেশী যোগ্য মনে না করতাম, তাহলে কখনও আমি এই পদপ্রার্থী হতাম না।

লোকেরা সিমসনের এই কথায় খুব খুশি হল। নির্বাচনে এক ভোটে সিমসনের জিত হল।

সেইদিন সিমসন তাঁর শ্বশুরকে লিখলেন—আজ আমি অধ্যাপকের পদে নির্বাচিত হয়েছি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছে ষোল ভোট আর আমি সতেরো। আমার বিরুদ্ধে অধ্যাপক এবং চিকিৎসক সম্প্রদায় সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেও আমাকে হারাতে পারেন নি। কাল থেকে আপনার মেয়ে জেসি এবং আমার মধুচন্দ্রিমা শুরু হবে।

ইতি মঙ্গলবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৮৪০।
আপনার স্নেহের পাত্র জেমস ইয়ং সিমসন।

এত অল্পবয়সে সামান্য এক গেঁয়ো-ঘরের ছেলের পক্ষে এত বড় এক সম্মান সত্যি খুব গৌরবের। কিন্তু এই পদ অধিকার করে সিমসন যাঁর বিরাগভাজন হলেন, তিনি তখন ক্লিনিক্যাল সার্জারীর অধ্যাপক; প্রবল প্রতাপশালী জেমস সাইম। এই সাইম তখন সার্জারীর নেপোলিয়ন নামে বিখ্যাত। এত বিরাট তাঁর নাম এবং এত বিশাল তাঁর প্রতিপত্তি। এত বড় একজন লোক সিমসনের চিরশত্রু হয়ে রইলেন।

তখনকার দিনে সার্জনদের মধ্যে রেষারেষি এবং ঝগড়াঝাঁটি নিত্য লেগে থাকত। একজন আর একজনের বিরুদ্ধে যা খুশি তাই বলতেন। কাগজে কাগজে গালাগালি দিয়ে চিঠি ছাপাতেন। সিমসন অথবা সাইম প্রত্যক্ষে এমন কিছু করেছেন বলে জানা নেই। কিন্তু নেপথ্যে যে নিশ্চয় করেছেন, তাতেও কারু সন্দেহ নেই।

অনেকদিন ধরে গবেষণা করে রুগীর কাটা পায়ের রক্তপাত বন্ধ করার জন্য স্টিল পিন ব্যবহার করার এক উপায় বার করে সিমসন এক পুস্তিকা রচনা করেন। ধাত্রী-বিদ্যার লোক সার্জারীতে অনধিকার হস্তক্ষেপ করেছে বলে সাইম তাতে সাংঘাতিক ক্ষেপে গেলেন।

একদিন অপারেশন থিয়েটারে ছাত্রদের সামনে ট্রেতে করে সিমসনের এই পুস্তিকা সাইম বেয়ারাকে দিয়ে আনিয়ে নিলেন। সাইম ট্রে থেকে পুস্তিকাটি তুলে ব্যঙ্গ ভরে পুস্তিকার নামটি পড়ে ঘৃণা ও অবজ্ঞায় সেটি ছিঁড়ে টুকরো করে ছুঁড়ে ফেললেন। টেবিলের নীচে রুগীর কাটা পা রাখার বালুভরা ট্রের ওপর সিমসনের পুস্তিকা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে রইল। এইবার সাইম লেকচার শুরু করলেন। ছাত্ররা সব বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল।

পরদিন সিমসনের ক্লাস। ছাত্রদের আজ

সাংঘাতিক ভীড়। যথাসময়ে আজও বেয়ারা একটি ট্রে হাতে ক্লাসে ঢুকল। তার ওপর সাইমের লেখা সার্জারীর মোটা পাঠ্যপুস্তক। পেছনে সিমসন নিজে।

ছাত্ররা সাংঘাতিক একটা কিছু দেখার জন্য প্রস্তুত হল। সিমসন মৃদু হেসে বই-খানা খুললেন। মার্কা দেওয়া নির্দিষ্ট একটি পাতা বার করে সাইমেরই লেখা পড়ে শোনালেন, ছোঁড়া শিরা-উপশিরায় রক্তপাত হয় না। ছিঁড়লে কোন ক্ষতি হয় না। (টোরন্‌ভেসেল্‌স নেভার ব্লীড। টরশন ডাজ নো হারম।) এই বলে বই বন্ধ করে সেদিনকার লেকচার শুরু করলেন।

তখন সন্তানের জন্ম সাধারণ একটা প্রাকৃতিক নিয়ম বলেই লোকে জানত। এর পেছনেও যে আবার বৈজ্ঞানিক কোন তথ্য থাকতে পারে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। সিমসন নিজে এ তথ্য অনুসন্ধান করেই শুধু যাননি ছাত্রদেরও শিখিয়েছেন। বুঝিয়েছেন শিশুর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের জন্য তার এবং মার দুজনের প্রতিই আগে থেকে সমান যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

তাঁর কুইন স্ট্রীটের বাড়ির প্র্যাক্‌টিস একটি দেখবার জিনিস ছিল। সব সময় লোকেরা ভীড় করে থাকত। সিমসন তাই খুব ভালবাসতেন। অনর্গল কথা বলতেন। কাজের মধ্যেই তাঁর প্রতিভা খুলত। লোকের সঙ্গে বন্ধুর মত তিনি যেমন ভালবাসতেন, শত্রুর সঙ্গে ঝগড়াও ঠিক তেমনি পছন্দ করতেন। টাকা পয়সার হিসেব তাঁর ছিল না। অনেক সময় জানালার খড়্‌খড়ে আওয়াজ নোট গুঁজে তিনি বন্ধ করতেন।

১৮৬৪ সালের শেষের দিকে অভিজাত সমাজের ধনী এক মহিলা রুগীকে দেখতে তিনি লণ্ডনে এলেন। এখানে এসে রবার্ট লিসটনের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। লিসটন তখন সার্জারীতে সবে ইথার ব্যবহার করেছেন। সিমসন মন দিয়ে লিসটনের অভিজ্ঞতা শুনলেন। তক্ষুনি তাঁর মনে হল, ধাত্রীবিদ্যায় নিজের প্র্যাক্‌টিসে ইথার প্রয়োগ করলে কেমন হয়?

এডিনবরায় ফিরে সিমসন নিজের রুগীদের ওপর ইথার ব্যবহার শুরু করলেন। ইথার শুঁকিয়ে প্রসব-ব্যথা দূর করলেন। দেখলেন, ফল বেশ ভালই হয়। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক বিশেষজ্ঞরা এটা পছন্দ করলেন না। এ জিনিস তাঁদের কাছে নিতান্ত উদ্ভট বলেই মনে হল। আহার-নিদ্রা যেমন জীবের ধর্ম; সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে প্রসব-বেদনাও তাই। তাহলে খাবার আগে মানুষকে বেহুঁশ কর না কেন?

প্রসব-বেদনা কেন হয়? সুস্থ শিশুকে মাতৃগর্ভ থেকে বার করবার জন্যেই তো? সেই ব্যথা দূর করলে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে কি করে? মাকে অজ্ঞান করে বেশীক্ষণ রাখলে শিশুর ক্ষতি হবে না? সেই শিশু যদি নির্বোধ হয়? কাজ কি বাপু অত

ঈভের জন্ম : প্রথম অজ্ঞান করা

ঝঞ্ঝাটে গিয়ে, যেমন আছে তেমনি থাকতে দাও। প্রসব-ব্যথা কমাবার ফন্দি বাদ দাও। এই হল বিশেষজ্ঞদের মত।

সিমসন ইথার ব্যবহার করে নিজেও অনেক অসুবিধা লক্ষ্য করলেন। তাই ইথার ছাড়া অজ্ঞান করার জন্য আর কি ব্যবহার করা যায়, তার খোঁজ নিতে লাগলেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ি লিভারপুলের ওয়াল্ডি নামে এক কেমিস্ট একদিন খবর দিলেন, ক্লোরোফরমের কথা। বললেন, এ জিনিস শুঁকিয়ে বেহুঁশ করা যায়।

ক্লোরোফরম আবিষ্কার হয় ১৮৩১ সালে। একই সময়ে জার্মানীতে লিবিগ, প্যারিসে সুবেরা এবং আমেরিকার স্যামুএল গুথ্‌রী ক্লোরোফরম আবিষ্কার করেন। ইথারের মত ক্লোরোফরমও খুব তাড়াতাড়ি উবে যায়। শুঁকলে প্রথমে নেশা হয়। পরে লোকে অচৈতন্য হয়। কিন্তু এই ষোল বছরে কেউ তা সার্জারীতে ব্যবহার করেনি।

সিমসন ঠিক করলেন নিজে আগে ক্লোরোফরম শুঁকে পরীক্ষা করে দেখবেন। সেদিন নভেম্বর মাসের শীতের এক সন্ধ্যা। ১৮৪৭ সাল। সিমসনের কুইন স্ট্রীটের বাড়ির খাবার টেবিলে সিমসন তাঁর দুই সহকর্মী ডাক্তার কিথ ও ম্যাথু ডানকানকে নিয়ে বসলেন। বোতল থেকে তিনটি গ্লাসে ক্লোরোফরম ঢেলে মুখের কাছে তুলে ধরলেন। সবার আগে শুঁকলেন ডাঃ কিথ। বললেন, বেশ মিষ্টি গন্ধ। খুব মজা লাগছে। বেশ যেন নেশা হচ্ছে। তাই দেখে সিমসন এবং ডাঃ ডানকান তাঁদের গ্লাস নাকের কাছে তুলে ধরলেন। ক্লোরোফরমের মিষ্টি গন্ধ তাঁদের নাকে গেল। রক্তে মাদকতা জাগল। দেহে ফুর্তি এল। হাসি ঠাট্টায় তাঁরা মেতে উঠলেন। দেখতে দেখতে তাঁদের চোখের সামনে পরস্পরের মুখ নাচতে লাগল। টেবিল-চেয়ার, দেয়াল, বাতি সব দুলতে লাগল। কানের ভেতর বোঁ বোঁ শব্দ হতে লাগল। পরে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

সিমসনের যখন জ্ঞান হল, দেখলেন মেঝেয় কার্পেটের ওপর লম্বা হয়ে তিনি পড়ে আছেন। পাশে কিথ এবং ডানকানেরও সেই অবস্থা। তিনি বলে উঠলেন, বাঃ এ তো দেখছি ইথারের চেয়েও অনেক বেশী ভাল!

কিছুক্ষণ পরে ডাঃ কিথ ও ডানকান যখন জেগে উঠলেন, তাঁরাও বললেন, ক্লোরোফরম ইথারের চেয়ে ভাল।

মিসেস সিমসন প্রথম দিকে এই ঘরে ছিলেন। ডাঃ কিথ যখন মেঝেতে শুয়ে
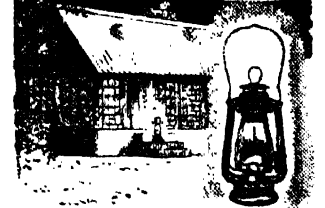
হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন, তাঁর খুব মজা লাগল। কিন্তু যেই কিছু স্তব্ধ হয়ে দুই হাত এবং দুই হাঁটুতে ভর করে টেবিলের সমান সমান উঠে দৃষ্টিহীন দুই চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইলেন অমনি ভয় পেয়ে মিসেস সিমসন ঘর থেকে পালিয়ে গেলেন।

ডাক্তাররা যখন দেখলেন ক্লোরোফরম শুঁকে তাঁদের শরীর খারাপ কিছুই লাগছে না, তখন সিমসনের ভাইঝিও এই ক্লোরোফরম শুঁকতে রাজী হলেন। বুকের ওপর দু'হাত ভাঁজ করে বাহুর ওপর হাত চেপে ক্লোরোফরমের গ্লাস মুখের কাছে নিয়ে শুঁকতে শুঁকতে হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি দেবদূত; ওঃ আমি দেবদূত। বলেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

সিমসন তখন বুঝে ফেলেছেন ক্লোরোফরম কি জিনিস। ইথার বর্জন করে সিমসন এখন প্র্যাকটিসে ক্লোরোফরম ব্যবহার শুরু করলেন। মাত্র এগারো দিনের মধ্যেই পঞ্চাশটি রুগীর ওপর তিনি ক্লোরোফরম প্রয়োগ করলেন। কোথাও কোন বাধা কি বিপত্তি তাঁর ঘটল না।

এইবার তাঁর সমস্ত শক্তি তিনি ক্লোরোফরম চালু করবার জন্য প্রয়োগ করলেন। সার্জারী এবং ধাত্রীবিদ্যায় এই নতুন পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হলেন।

ইংলণ্ডের সার্জনদের কাছে তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন যে, ক্লোরোফরম ইথারের চেয়ে ভাল। লর্ড লিস্টার তা মেনে নিলেন। কিন্তু আমেরিকার সার্জনরা তা মানলেন না। ইথারকেই তাঁরা বেশী ভাল বিবেচনা করলেন।

ধাত্রীবিদ্যায় ক্লোরোফরম ব্যবহার চালু হয়ে গেল। কিন্তু ধর্মযাজকরা ক্ষেপে গেলেন। তাঁরা বললেন, ক্লোরোফরম করে প্রসব-যন্ত্রণা দূর করা নীতিবিরুদ্ধ। ধর্মবিরুদ্ধ।

সিমসন যদিও বাদানুবাদ ভালবাসতেন, কিন্তু নিজে তিনি ধর্মবিশ্বাসী। বাইবেলকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কাজেই ধর্মযাজকদের এই কথায় তিনিও ক্ষেপে গেলেন।

পাদ্রীরা যখন ঘোষণা করলেন, বাইবেলে আছে স্ত্রীলোক দুঃখের সঙ্গে ব্যথার সঙ্গে সন্তান ধারণ করবে, প্রসব করবে। (ইনি সবও লাউ শ্যাল্ লিভ্ ফোর্থ চিলড্রেন) তখন সিমসন বাইবেলের মূল হিব্রু থেকে প্রমাণ করে দেখালেন, এই দুঃখ শারীরিক বাধা অথবা যন্ত্রণা নয়।

তাছাড়া ঈশ্বর নিজে যখন আদমের পাঁজরার হাড় থেকে ইভাকে তৈরী করেন, তখন আদমকে জাগ্রত না রেখে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। এই গভীর ঘুম কি? ক্লোরোফরম মানুষকে এই গভীর ঘুমেই আচ্ছন্ন করে। অতএব ঈশ্বর নিজে অপারেশনের আগে অজ্ঞান করে নেবার পক্ষপাতী। এবং অ্যানএসথেশিয়ার প্রথম প্রবর্তক।

এই প্রবন্ধে সিমসন বলেন, মানুষ যখনি কোন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, তখনই ধর্মের নামে তার প্রতিবাদ হয়েছে। বসন্তের টিকা যখন আবিষ্কার হয়, তখন বলা হ'ত বসন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছায় অথবা অভিশাপে হয়। তার মধ্যেও কল্যাণ আছে। কিন্তু গো-বসন্তের বীজ মানবদেহে ঢোকানো দুষ্ট মানবের কাজ। শয়তানের কাজ। একটি স্ত্রীলোক তখন বলেছিল, টিকা নেবার পর থেকেই তার মেয়ে গরুর মত কাশছে, আর সারা গায়ে তার গরুর মত লোম বেরিয়েছে।

আর একজন সগর্বে ঘোষণা করেছিল, তাদের দেশে টিকা নেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ, দেখা গেছে যারাই টিকা নিয়েছে তাদের স্বভাবও ঠিক ষাঁড়ের মত হয়েছে।

তিনশ বছর আগে প্রসব-যন্ত্রণা দূর করার জন্য কোনো ওষুধ দেওয়া ছিল সাংঘাতিক এক অপরাধ। রাজদ্বারে দণ্ডনীয়। ১৫৯১ সালে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা, ইউফেম ম্যাকালেন তাঁর নাম, এই প্রসব-যন্ত্রণা লাঘবের জন্য অ্যাগনেস স্যামসন নামে এক স্ত্রীলোকের সাহায্য নেন। সেই অপরাধে
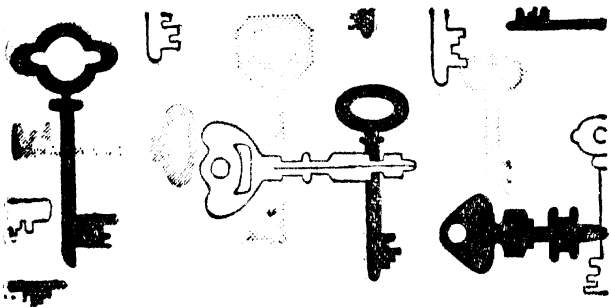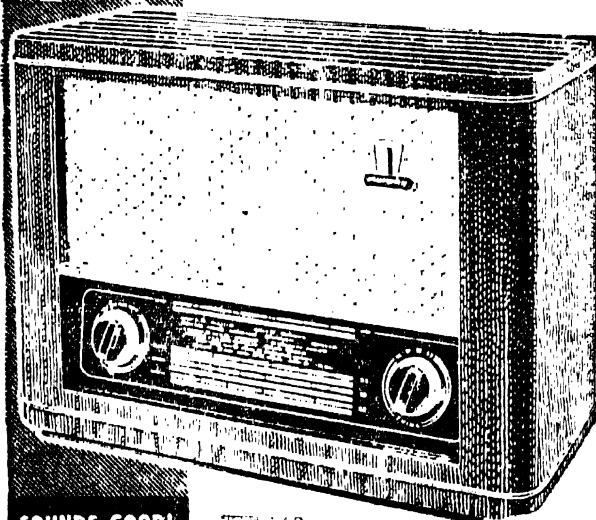
রাজা জেমস্-এর কাছে অ্যাগনেস স্যামসনের বিচার হয়। রাজা অ্যাগনেসকে ডাইনী বলে ঘোষণা করেন। এডিনবরার ক্যাস্‌ল হিলে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।

এতদিন পরে ধর্মযাজকরা আবার সিমসনের ওপর খড়্গহস্ত হলেন। কিন্তু সিমসন তাতে দমলেন না। পাদ্রীদের নিজের অস্ত্রে সিমসন তাদের যুক্তি খণ্ডন করলেন। বাইবেল থেকে বিধান তুলে।

তারপর এক ঘটনা ঘটল, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি, ১৮৫৩ সালে। এই ঘটনায় সব বাদানুবাদ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজে ক্লোরোফরম নিতে রাজী হলেন। তাঁর সপ্তম সন্তান প্রিন্স লিওপোল্ডএর জন্মের সময়। সিমসনের কাজ শেষ হল। ক্লোরোফরম ব্যবহারে আর কেউ আপত্তি তুলল না।

ক্লোরোফরম এত বেশী চালু হয়ে গেল যে, অজ্ঞান করাকেই লোকে বলতে লাগল ক্লোরোফরম করা। আমেরিকার ওএনডেল হোমস্-এর দেওয়া নাম অ্যানেস্থেশিয়া পাঠ্য-বই এবং বিজ্ঞানীদের কাছেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল।

সিমসন ক্লোরোফরম প্রথম শোঁকার মাত্র এগারো দিনের মধ্যেই নিজের প্র্যাকটিসে পঞ্চাশটি রুগীর উপর প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। এই থেকেই বোঝা যায় তখনকার দিনে কি বিরাট তাঁর প্র্যাকটিস। দু'বছরের মধ্যেই সিমসন আবার এক রিপোর্ট বার করলেন। তাতে বললেন, প্রসবকালে এবং সার্জারীতে শুধু এডিনবরাতেই চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার রুগীর ওপর এই ক্লোরোফরম প্রয়োগ করা হয়েছে।

কিন্তু সিমসন যা চেয়েছিলেন, তা হল না। ক্লোরোফরম দিয়ে প্রসব-যন্ত্রণা সমূলে বিনষ্ট করা গেল না। অপারেশনের সময় ক্লোরোফরম ব্যবহার চললেও প্রসবকালে দীর্ঘকাল ধরে তা দেওয়া গেল না। শুধু ক্লোরোফরমের জন্যই অনেকের মৃত্যু হল।

সিমসন ভাবলেন, অন্য কোন নতুন ওষুধ পরীক্ষা করে দেখবেন। একদিন এমনি এক ওষুধ ব্যবহার করে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। তাঁর চাকর এসে দেখল, তিনি মড়ার মত অসাড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। দু'ঘণ্টা পর তাঁর জ্ঞান হল।

তখন কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন স্যার লায়ন প্লেফেয়ার। সিমসন একদিন তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, ক্লোরোফরম ছাড়া ভাল রাসায়নিক দ্রব্য আর কিছু কি নেই?

লর্ড প্লেফেয়ার বললেন, নতুন একটা জিনিস তিনি বার করেছেন, তার নাম ডাই-ব্রোমাইড-অফ-ইথিলিন। সিমসন শুঁকে দেখে বললেন, বাঃ বেশ ভাল গন্ধ। আজই এটা পরীক্ষা করে দেখি।

এই বলে তক্ষুনি লর্ড প্লেফেয়ারের ভেতরের ঘরে গিয়ে নিজের ওপর পরীক্ষার জন্য ব্যগ্র হলেন। কিন্তু লর্ড প্লেফেয়ার তা দিলেন না। বললেন, আগে খরগোসের ওপর পরীক্ষা করি। তারপর কাল আপনাকে দেব।

সিমসন ব্যস্তবাগীশ লোক। অপেক্ষা করতে রাজী হন না। অনেক কষ্টে তাঁকে একটা দিনের জন্য ঠেকিয়ে রাখা হল।

লর্ড প্লেফেয়ার দুটি খরগোসকে এই নতুন জিনিস শুঁকিয়ে রেখে দিলেন। পরদিন সিমসন সস্ত্রীক এসে উপস্থিত। দুটো চেয়ার টেনে, একটির ওপর বসে আর একটির ওপর দু'পা তুলে হেলান দিয়ে বসে লর্ড প্লেফেয়ারকে বললেন, কৈ আনুন আপনার ওষুধ।

লেডী সিমসন বাধা দিলেন। বললেন, আগে খরগোস দুটো আনা হোক। দেখা যাক, ওষুধ শুঁকে ওরা কেমন আছে।

লর্ড প্লেফেয়ার বেয়ারাকে বললেন। বেয়ারা খাঁচা খুলে খরগোস দুটো কানে ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে হাজির হল। দেখা গেল, অনেক আগেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। কাজেই সিমসনকে আর এই জিনিস পরীক্ষা করে দেখতে কেউ দিলেন না।

ক্লোরোফরমের চেয়ে ভাল কোন ভেষজ সিমসন আর খুঁজে পান নি। কিন্তু

তখনকার দিনের সমাজের সংকীর্ণ মন দেখে অজ্ঞান করার ভীতি এবং কুসংস্কার তিনি দূর করতে পেরেছিলেন। তা না হলে পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে লর্ড লিস্টারের হাতে সার্জারীর অত দ্রুত উন্নতি কখনও সম্ভব হত না।

সিমসন চেয়েছিলেন, মাতৃগর্ভ থেকে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে মাকে কোন কষ্ট না দিয়ে। ক্লোরোফরম তাঁর সে আশা পূর্ণ করেনি। এখনও মায়েরা পৃথিবীর সেই আদিমকালের মতই প্রসব-ব্যথায় কষ্ট পান। শুধু মুষ্টিমেয় সামান্য কয়েকটি ছাড়া যাঁদের ফরসেপস কিংবা অপারেশনের জন্য অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয়।

সার্জারী বা ধাত্রীবিদ্যায় ক্লোরোফরম আজকাল আর ব্যবহার হয় না। নাইট্রাস অক্সাইড ইথার এবং অন্য অনেক নতুন ওষুধ দিয়ে রুগীকে এখন অজ্ঞান করা হয়। কিন্তু যা দিয়েই বেহুঁশ করা হোক, রুগীরা কিন্তু এখনও বলে তাদের ক্লোরোফরম করা হয়েছে। এইখানেই সিমসনের কৃতিত্ব।

।। দুই

অরুণ বাগচী

যুবউৎসব সাংগ করে ফিরে এসেছি। মস্কোতে প্রোগ্রাম-পরিকীর্ণ উৎসবপক্ষ কেটেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। লণ্ডন থেকে যাত্রা শুরু করে আবার লণ্ডন ফেরা নিয়ে ট্রেন-ভ্রমণই হয়েছে হাজার পাঁচেক মাইল। যদি মার্কিনী সাংবাদিক হতাম 'রাশিয়ার অভ্যন্তরে' জাতীয় জগদ্দল বই সহজে লেখা চলত। এদেশী হলে শান্তিনিকেতনকে হিমালয়ে পাঠানো ধরনের ভুল তথ্যে ভরা 'সোভিয়েট দেশের ওপর রায়' শীর্ষক গ্রন্থ রচনা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি প্রবাসী বাঙালী ছাত্র। অবকাশ স্বল্প এবং আলস্য সুপ্রচুর। সুতরাং ছোট্ট খাতা নিয়েই পালা শেষ করতে চাই।

দেশ-দেশান্তর থেকে দলে দলে যুবকদের মস্কো যাত্রা নিয়ে বিলিতী কাগজপত্রে কিছুদিন বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে নামমাত্র খরচে এই ভ্রমণ-ব্যবস্থা হল চতুর রাজনীতিকদের চালবাজি এবং টোপ হচ্ছে উৎসবের সমারোহ। আমাদের আমন্ত্রণকর্তাদের আচার আচরণে কথাবার্তায় কিন্তু সে আশংকা কিছুমাত্র সমর্থন পায়নি। আমার 'আই-কিউ' যতই অনুল্লেখ্য হোক, দলীয় আড্ডাধারীদের চালচলন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে সেই স্কুলকলেজের আমল থেকে। তাই নিঃসংকোচে বলতে পারি, আমাদের আদর অভ্যর্থনার সঙ্গে কোনো 'স্ট্রিং' জড়িত ছিল না। ফিরে এসেই যদিও একটি পত্রিকায় দেখলাম রুশীদের তরফ থেকে প্রচারের অভাবই নাকি সব চাইতে কূট প্রচার। ত্রুটিহীন-নিমন্ত্রণ ফেরতা সেই নিন্দুকের উক্তি মনে পড়ল—যিনি বলেছিলেন, 'সব কিছু এত নিখুঁত হওয়াটাও বাড়াবাড়ি বাপু!'

অতীতবাহিনী লণ্ডন পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। মস্কো আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান শক্তিশালী দেশের রাজধানী। দুই শহর। কিন্তু এই দু'শহরের মধ্যে দুই পৃথিবীর ব্যবধান। যার মূলসূত্রটা নিছক রাজনৈতিক নয়। সম্পূর্ণ পৃথক দুই অনুভূতির রাজ্য। পৃথিবীর সব দেশের মানুষ লণ্ডনে রয়েছে। কিন্তু সবার ওপর শহরের একটা অদৃশ্য শাসন বর্তমান। ইংরেজী মতে চলাফেরা, কিম্বা সে চেষ্টা না করে এখানে থাকা শক্ত। স্বল্পসংখ্যক ভিনদেশী যারা মস্কোতে আছে, তারা আপন খেয়ালেই আছে। যদিও রুশীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই। লণ্ডন থেকে কিছু বিলিতী ম্যানারিজম্ না নিয়ে ফেরা শক্ত। সাম্যবাদী না হয়েও মস্কো থেকে ফেরা সম্ভব।

রুশীরা ইংরেজের মত সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে না। পরদেশীদের সম্বন্ধে অনুগ্রহের সঙ্গে অশ্রদ্ধা তারা মেশায় না। বলা বাহুল্য ইংরেজ চরিত্রের অনেক ভাল দিক আছে। কিন্তু তার মস্ত দোষ হল বিদেশী মানুষের প্রতি হিমশীতল উপেক্ষার ভাব। বিলিতী পোশাক পরে স্পষ্ট ইংরিজী উচ্চারণ করতে পারলে ইংরেজ আপনার দিকে তাকাবে। এমনকি খানিকটা আগ্রহও দেখাবে, যদি আপনি জানান, আপনার দেশ সর্বপ্রকারে এদেশের অধম। নেহরু যদি ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর মত বলতে পারতেন, ইংলন্ড যেদিকে যাবে আমরাও সেদিকে চলব, তবে অনুমান করি তাঁর সম্বন্ধে বিলিতী পত্রিকার উক্তি নির্বিষ হত। কতবার বুদ্ধিমান ইংরেজকে বলতে শুনেছি, নেহরু চরিত্রের যতটুকু ভাল সবই হল ইংরিজী-শিক্ষার ফল (অর্থাৎ খারাপ যা তা হল তিনি ভারতীয় বলে)! ভারতবাসী হয়ে ভারতবর্ষের নিন্দে করে ইংরেজের দরবারে পাত্তা পাওয়া সহজ। রাশিয়ায় তা সম্ভব নয়। একাধিক শৌখীন সাম্যবাদীকে সে চেষ্টা করে বিফল হতে দেখেছি। গত দশবছরে আমাদের সরকার কিছুই করেন নি, একথা বলে মস্কোতে পার পাওয়া শক্ত। পরিসংখ্যানের থলি খুলে বসে এক একটা রুশী ছাত্র। শুধু ভারত নয়, বহু দেশ সম্পর্কেই খবর রাখে শিক্ষিত রুশী। বইয়ের চাহিদা আর কোন দেশেই অত নয়। বিভিন্ন ভাষা শেখবার প্রবল আগ্রহ তার। আমাদের বিভিন্ন দলের সঙ্গে যাঁরা দোভাষীর কাজ করতে এসেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই ছাত্র। এই সুযোগে শিক্ষণীয় ভাষার ব্যবহারে খানিকটা রপ্ত হওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন সহস্রাধিক। রাষ্ট্রভাষা নিয়ে কিছু শিক্ষাভিমানী ভারতীয়ের মনে এখনও সংশয় রয়েছে। রুশীরা তার অর্থ বোঝে না। হিন্দীজানা রুশী ভারতীয়ের সঙ্গে অন্য ভাষায় কথা বলবার কথা চিন্তাই করে না। তাকে যদি বলেন আপনি হিন্দী জানেন না, তবে সে বিস্মিত এমন কি আহত বোধ করে। ধুতিপাঞ্জাবি, শেরোয়ানির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। স্যুট পরলে খুশী হয় না একরত্তি।

লণ্ডনে সাহিত্যে অনার্স পাওয়া একাধিক ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, যারা রবীন্দ্রনাথের নাম কখনও শোনেনি। মস্কোতে এমন

লেনিন হিলসে শান্তিসজ্জা

লেনিন-স্ট্যালিন দর্শনার্থী জনতার দীর্ঘ লাইন
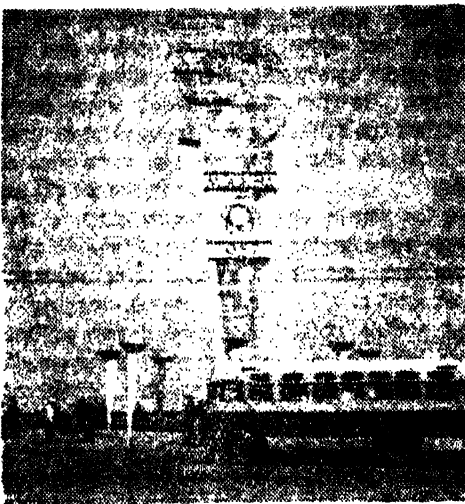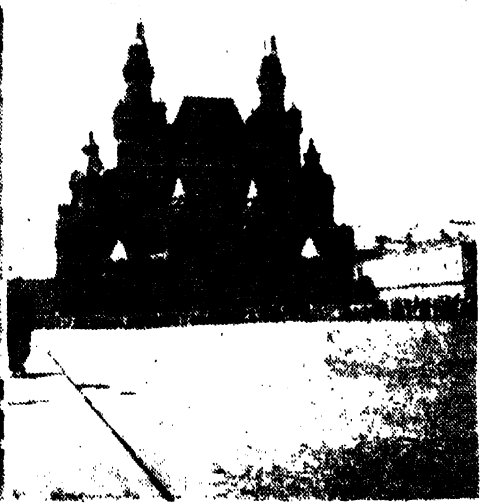
মস্কো মিলিৎসিয়া পুলিস

দূরগ্রাম থেকে লেনিনগ্রাদে হেঁটে এসেছিলেন এই চাষী মহিলা নেহরুজীকে দেখবার জন্য

একজন শিক্ষিত মানুষ দেখিনি যিনি উপরোক্ত সম্মান দাবী করতে পারেন। সাহিত্যের ছাত্রদের কথা ছেড়েই দি। এনজিনীয়রিঙের ছাত্রকেও গুরুদেবের প্রসঙ্গ নিয়ে চোখা চোখা প্রশ্ন করতে শুনেছি। যদিও কবি সম্বন্ধে তার জ্ঞান খানকয়েক রুশী অনুবাদের মাধ্যমে। সে অনুবাদও খুব বিশ্বস্ত একথা মানা কঠিন। আনন্দিত না হয়ে পারিনে যখন শুনি প্রেমিকাকে 'শেষের কবিতা' উপহার দিয়েছে রুশযুবক। উৎসব সূচীতে ৮ই আগস্ট যে 'রবীন্দ্রসন্ধ্যা' অনুষ্ঠান রাখা হয়েছিল তা রুশী সমিতিরই আগ্রহে ও চেষ্টায়। মস্কোতে ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠান 'হিন্দুস্থান সমাজ' এই সমিতিকে যথাসাধ্য সাহায্য করে দেশের মান বাড়িয়েছেন।

ভারতীয়দের সম্বন্ধে ওদের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পেয়েছি। 'ইন্দিস্কি' শোনামাত্র চারপাশে ভিড় করে এসেছে। 'আমি ভারতীয়' এই ঘোষণা মস্কোতে সব-খোল চাবির কাজ করে। চিচিং ফাঁক মন্ত্রের চাইতেও তার জোর বেশি। বন্ধুপত্নী সুপ্রিয়ার শাড়ির পতাকা আমাদের অযাচিত সুবিধের সন্ধান দিয়েছে। ক্রেমলিনের মিলিৎশিয়া (পুলিস) সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দিয়েছে। লেনিন-স্ট্যালিন দর্শনার্থী জনতার অজগরলাইনের শেষপ্রান্ত থেকে একেবারে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে প্রহরারত কর্মচারী। টিকেট নেই —তবু চাইকোস্কী হলে ঢুকে গেছি বিনা ক্লেশে। ভারতীয় শাড়ি-শেরোয়ানীর জয় হোক। একজন বলছিলেন, "আমাদের রাশিয়ার শ্রেণীহীন সমাজে একটা মাত্র বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী আছে, তারা হল ভারতীয়।" রসিকতাচ্ছলে বলা হলেও কথাটার মধ্যে কিছু সত্য রয়েছে। ভারতীয়দের প্রতি আচরণের বিশেষ পক্ষপাতিত্বে মাঝে মাঝে আমাদের অপ্রতিভ হতে হয়েছে। সহ-ডেলিগেটদের বক্র কটাক্ষ এবং উক্তিতে তিক্ততা মিশতে দেখেছি।

কথা হচ্ছে একসঙ্গে এত ভারতীয় এর আগে রাশিয়ার জনসাধারণ কখনও দেখেনি। এইবার তাদের সুযোগ হবে আমাদের সম্বন্ধে তাদের উচ্ছ্বসিত ধারণাকে খুঁটিয়ে বিচার করবার। আমরা কুতার্কিক মোটেই সমঝদারবর্তী নই—এতে ওরা কিছু মনে করবে না। ওরা নিজেরাও তাই (ছোটখাট অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তর্ক জুড়তে ওদের জুড়ি নেই। সে তর্কও এমন ভয়াবহরূপ নেয় যে মনে হয় দুচারটে লোক খুন না হয়ে গেলে তার অবসান নেই)। কিন্তু ওদের মনের ওপর গভীরভাবে রেখাপাত করবার মত কিছু আমরা রেখে এসেছি কি?

উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসংগীতে স্বর্ণপদক পেয়েছেন আলাউদ্দীন-শিষ্যা প্রতিমা কর। উচ্চাঙ্গ নৃত্যে স্বর্ণপদক পেয়েছেন দাক্ষিণী দুই বোন রাগিণী-পদ্মিনী! উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে কলকাতার রিভাইভ্যাল গ্রুপের নাচ। কিন্তু তারপর? সেই প্রশ্নটার সদুত্তর নেই। নেহরুজীর নাম করে কংগ্রেস কতদিন ভোট পাবে? তাঁর নাম করে আমরা আর কতকাল দেশে দেশে সম্মান কুড়োবো?

মস্কোবাসী বাঙালী কবিবন্ধু বলছিলেন, "এই ফেস্টিভ্যালে দুটি জিনিস খুবই নজরে আসছে। এক রাস্তাঘাটে মাতালের অনুপস্থিতি। দুই, প্রকাশ্য প্রেমলীলা। ভোদ্‌কা এক অদ্ভুত পানীয়। দু পাত্র খেলেন। হয়ত কিছুই হল না। তারপর এক চুমুকেই নেশা মাথায় চড়ল। তখনও যদি না ক্ষান্ত হন, তবে অগত্যা ধূলিশয্যা নিতে হবে। পুলিস বা পাবলিক—কেউ আপনাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তারপর নেশা ছুটলে ঘরের ছেলে গুটি গুটি ঘরে ফিরলেন। এই সময়টা সরকার নিশ্চয়ই মাতাল ঠেকাবার কিছু ব্যবস্থা করেছেন। নতুবা সেই সব মহাপুরুষরা হঠাৎ দুর্লভ হবেন কেন? আর প্রেমলীলা! সে আর কী বলব মশায়! জড়াজড়ি গলাগলির বহর দেখে রুশীদের কথা ছাড়ুন, আমরাই লজ্জা পাচ্ছি।"

যুবকদের উৎসবে খানিকটা মাথামাখি হবেই। কিন্তু সব কিছুর মত তারও একটা মাত্রা থাকবে এটা আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। দুঃখের বিষয় যোগদানকারীরা সে কথা বহু সময়েই স্মরণ রাখেননি। আতিথেয়তার সম্মান রাখা সম্বন্ধে অতিথিরা যে খুব সতর্ক ছিলেন, এমন দাবী করা সঙ্গত হবে না। ভারতীয়রা অন্যান্য অনেক বিষয়ে পিছিয়ে থাকলেও এ ব্যাপারে বহু দেশকেই টেক্কা দিতে পেরেছেন। পরিতাপের বিষয় হল এই, অন্যান্য আর দশজনের চাইতে

আমাদের জন্য—বিশেষকরে ভারতীয় বলেই, ওদের দাক্ষিণ্যের দরজা অধিকতর উন্মুক্ত ছিল। সংযত হতে পারলে যে সম্ভ্রমবোধ আমরা অর্জন করে আসতে পারতাম বিবেচনাহীন ব্যবহারে তা নষ্ট করেছি।

উৎসব উপলক্ষে মস্কো শহরের চেহারা বদলেছে বই কি! সুদৃশ্য পতাকা এবং প্রাচীরপত্রে সারা শহর ছেয়ে গেছে। সমস্ত প্রচারের মূল লক্ষ্য হল পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যেকার নিগূঢ় ঐক্যটি তুলে ধরা। শান্তি ও মৈত্রীর জন্য তাদের প্রাণের পিপাসাকে উড়ন্ত শ্বেতকপোতের মত পরিস্ফুট করা। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাড়িঘরের ছবি দেখিয়ে দৃঢ় ঘোষণা: এর পুনরাবৃত্তি চাইনে। আর যুদ্ধ নয়। রুশীরা অন্তর থেকে সমর সম্ভাবনাকে ঘৃণা করে। আমার মনে হয় ওদেশে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর অসামান্য জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হল এই যে, ওরা গভীরভাবে বিশ্বাস করে নেহরু যুদ্ধ চান না। ঈশ্বর জানেন, আজকের সমস্যাসংকুল পৃথিবীতে এর চাইতে বড় প্রশংসাপত্র কোন জননায়ককেই দেওয়া সম্ভব নয়।

রুশ চরিত্র সম্বন্ধে নেহরুজীর বিশ্লেষণ সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি। অত্যন্ত ইমোশন্যাল জাত (কাবুলীওয়ালা দর্শনান্তে কিছু মানুষকে চোখ মুছতেও দেখেছি)। কেউ ব্যবহারে একটু উষ্ণতা মেশালে ওরা চতুর্গুণ করে সেই বন্ধুত্ব ফিরিয়ে দেবে। এই বিষয়ে দুই বিরুদ্ধদেশ রাশিয়া এবং আমেরিকার নাকি আশ্চর্য মিল।

কিন্তু কালাধলার প্রসঙ্গে নয়। বর্ণবৈষম্য আজ কোথায় কোথায় উৎকট তা সবাই জানি। সাদা রঙের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আমাদের দেশেও অত্যন্ত প্রকট। এই প্রথম একটি দেশ দেখলাম যেখানে কালোর প্রতি প্রকাশ্য টান (সুইডিশ-জার্মান মেয়ে ঘোরবাদামীবর্ণে মজে, কিন্তু সে অন্য কাহিনী)। এবং আমার ইংরেজ বন্ধুরা যাই বলুন, তার সবখানিই রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক নয়। রাস্তার লোক—বিশেষত রাশিয়ায়—রাজনীতি নিয়ে থোড়াই মাথা ঘামায়। পরাধীনতার জ্বালা ভুলেছি। কিন্তু মুরুব্বিয়ানার যে নতুন দাহ কালোমানুষের মন নিয়তই বিষাক্ত করে তুলছে তার প্রতিকার ইয়োরোপের এই তীরে হওয়া শক্ত।

অভিভূত হবার মুহূর্ত মস্কোতে অনেকে এসেছে। বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে, লেলিন হিল্‌সের ওপর থেকে (নেপোলিয়নের কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে) মস্কো শহরের দিকে তাকিয়ে, ক্রেমলিনের জারদের সঞ্চিত চোখ-ধাঁধানো সম্পদস্তূপের সামনে, মস্কো-ভল্গা ক্যানালে বেড়াতে গিয়ে, উৎসবশুরুতে লেনিন স্টেডিয়াম থেকে হাজার হাজার পায়রাকে উড়তে দেখে (ওদেশে পায়রাদের চাকরি এমনকি ক্রুশ্চেভের চাকরির চাইতেও নিরাপদ), মসোলিয়মে লেলিনের সান্নিধ্যে

ভারতীয় শোনা মাত্র ভিড় করে আসা রুশী মানুষ ফটোঃ শুভময় ঘোষ

ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সব চাইতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে উৎসব শুরুতে খোলা ট্রাকে করে এবং তারপর পায়ে হেঁটে শোভাযাত্রা করে স্টেডিয়ামে যাওয়া। সারা মস্কো শহর সেদিন রাস্তায় ভেঙে পড়েছিল। ভিড় ভিড় আর ভিড়। তাদের সামলাতে হিমসিম খেয়ে গেছে মস্কোর পুলিস (লণ্ডন পুলিসের বিনয়নম্র কর্মকুশল ব্যবহার নিয়ে অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন। আশা করি রাশিয়া ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে এরাও যথাযোগ্য প্রশংসা পাবে।। যেদিকে তাকাই, কেবল লোক। বাড়ির জানালায়, ছাতে, এমন কি নাতিপ্রশস্ত কার্নিশের ওপরও লোক বসে আছে। তাদের দিকে তাকিয়ে রাস্তা থেকে আমার মাথা ঘুরছে। অথচ তারা ঐ অবস্থায় আবার হাততালি দিচ্ছে। (আমার ধারণা কয়েক হাজার লোক সেদিন পড়ে গিয়ে হাত মাথা ভেঙেছে। হয় তাই, নতুবা জানব মস্কোভাইটরা রোজ দুতিন ঘণ্টা কার্নিশ ধরে ঝোলা প্র্যাকটিস করে!) চারদিকে পুকার উঠছে হিন্দীরুশী ভাই ভাই, নেহরু—নেহরু—নেহরু, শান্তি, বন্ধুত্ব! করমর্দনের জন্য অসংখ্য হাত এগিয়ে আসছে আপনার দিকে (হাতের ব্যথা সারতে সময় লেগেছিল)। অনেকের চোখে জলও দেখলাম। এই ভাবাবেগের অর্থ বুঝিনি পুরো। শুধু যেটুকু অত্যন্তই স্পষ্ট, তা হল এরা যুদ্ধ চায় না। পায়রা ওড়ানো, বেলুন ওড়ানোর মধ্যে খানিকটা খেলা খেলা ভাব আছে। কিন্তু তার পটভূমিকা অত্যন্ত বাস্তব। যুদ্ধ যদি আবার বাধে, তবে এতদিন বাদে ওরা ব্যক্তি স্বাধীনতার যে মনোরম আস্বাদটি পেতে শুরু করেছে, তা বন্ধ হয়ে যাবে। জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর জন্য যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা, তা পিছিয়ে যাবে দীর্ঘদিনের জন্য। দৈত্যের মত ক্রেনগুলো আকাশের সঙ্গে যে প্রীতির সম্পর্ক পাতাতে আরম্ভ করেছে, তার ওপর পড়বে যবনিকা। আকাশে আবার মৃত্যুর হুংকার শুনতে কে চায়? কাবুল থেকে তাসখেন্ত যারা আসেন, দুটি দেশের বৈভবের পার্থক্য তাদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তেমনি যাঁরা সমৃদ্ধিশালী পশ্চিম জার্মানী থেকে হাঙ্গারী পূর্ব জার্মানী বা পোল্যাণ্ড যান, তাঁরাও প্রভেদটা লক্ষ্য না করে পারেন না। পূর্ব ইয়োরোপের এই অনুন্নত দেশগুলোকেও গড়ে উঠতে হলে শান্তির প্রসন্ন অবকাশ চাই।

লণ্ডন শহরে বসে লিখছি। গভীর রাত্রি আমাকে আপ্লুত করে। মস্কো বহুদূরের স্বপ্নের মত। মনে অগণিত স্মৃতি সৌরভ। যে অসংখ্য সরলপ্রাণ মানুষ আমাকে ঘিরে এসেছে, অত্যন্ত নিকট থেকে যাদের দেখবার সুযোগ ঘটেছে, তাদের নিঃশব্দ উপস্থিতি আমার চেতনায়। অনেকদিন আগে একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম। তার মুখ, নাক চোখ আজ স্পষ্ট করে কিছুই মনে পড়ে না। শুধু পরিষ্কার মনে পড়ে, একদিন আমার প্রগলভ প্রার্থনার উত্তরে তার গ্রীবায় সম্মতির নরম ঢেউ উঠতে দেখেছিলাম। হাজার হাজার রুশী অজ্ঞ আমার মনে চোখে ঝাপসা হয়ে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সব হাত এক হাত হয়ে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়। এক চোখে সব চোখের দৃষ্টি ঝলকিত। সব কণ্ঠ এক কণ্ঠ হয়ে মন্ত্রের মত উচ্চারণ করছে 'মীর', 'দ্রুসবা', শান্তি এবং মিত্রতা।

*প্রবন্ধে ব্যবহৃত চিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত

(বিশ)

"মধ্যপ্রাচ্য বর্তমান পৃথিবীর বারুদখানা"
—লেস্টার পিয়ারসন।

"রাজনৈতিক জীবনে সব চেয়ে বেশি সমস্যা আসে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা শক্ত ক'রে আঁকড়ে থাকার জন্যে" —ওয়াল্টার লিপম্যান।

নাসেরের বিরুদ্ধে পশ্চিমের বড়ো নালিশ তিনি সমস্ত আরবভূমিতে এক বিশাল আরব রাষ্ট্র গঠন করতে চান। মিশর আক্রমণের সময় লণ্ডন ও প্যারিসে সরকারী ভাষায় নাসেরকে হিটলারের সম-পর্যায়ে ফেলে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, এই ভুঁইফোড় আরব নেতার লালসার সীমা নেই, তাই আক্রমণকারীকে তোষণ করবার যে কলঙ্কিত নীতি মিউনিকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার পুনরাবৃত্তি থেকে সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে এ লোলিহান ক্ষমতালোভকে এখুনি খর্ব করা দরকার। আজ, সুয়েজ আক্রমণের এক বছর পরে, আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমের প্রধান উদ্দেশ্য মিশরকে আরবভূমি থেকে রাজনৈতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করা। নাসেরকে খর্ব করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সামরিক অভিযান ব্যর্থ হলেও রাজনৈতিক ও আর্থিক অভিযান চলে আসছে। এ উদ্দেশ্যেই জর্ডনে আমেরিকা সুযোগ ও সময়মত হস্তক্ষেপ করে—দেড় বছর আগে বৃটেন যা পারেনি—রাজা হুসেনকে পশ্চিমী শিবিরে নিয়ে এসেছে। এ উদ্দেশ্যেই সৌদী আরবের নৃপতির উপর অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে নাসের-সমর্থন থেকে তাঁকে অনেকখানি নিরস্ত করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই লেবাননকে প্রায় পুরোপুরি মার্কিন আওতায় আনা হয়েছে এবং সিরিয়ার মিশর-মিত্র বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করবার এক বিরাট ষড়যন্ত্রের আয়োজন। এই জন্যেই ইরাককে নিত্য নতুন অস্ত্র সাহায্য, এই জন্যেই বাগদাদ চুক্তিতে আমেরিকার সামরিক যোগদান। সিরিয়া-মিশরে রুশ প্রভাব খর্ব করতে হলে আগে খর্ব করতে হয় সিরিয়ার বর্তমান বামপন্থী গভর্নমেণ্টকে ও মিশরে নাসেরকে। আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন তূণীরে থাকা সত্ত্বেও ডালেস সাহেব ধনুতে তীর সংযোগ করতে পারছেন না; তার জন্যে চাই মিশরে এক রাজা হুসেন; সিরিয়ায় এক রাষ্ট্রপতি শামুন! কোন দেশের চালু সরকার অনুরোধ না করলে এই তীর নিক্ষেপ করা যায় না।

মিশরকে আরবভূমি থেকে যেমন বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না, তেমনি মিশরকে বুঝতে হলে বর্তমান আরব অঞ্চলের বিরোধ-বিচিত্র চেহারার সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয় প্রয়োজন। দরকার মধ্য প্রাচ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও সামরিক পরিচয়; তার প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইতিহাসের ধারা।

আমরা জানি যে, বর্তমান রাষ্ট্রীয় মধ্য প্রাচ্য বহুলাংশে বৃটেনের হাতে তৈরী। একমাত্র লেভাণ্ট ছাড়া প্রায় সমগ্র আরব-ভূমিতে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। আজ যদি এই ভূখণ্ড বারুদখানায় পরিণত হয়ে থাকে তার দায়িত্বও অনেকখানি বৃটিশ রাষ্ট্র-নীতির ব্যর্থতার। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে কিভাবে আরব মানসকে না-বোঝার ফলে বৃটেন প্রত্যেকটি আরব দেশে ত্রিশ বছর ধরে মারাত্মক সংঘর্ষের বীজ বপন করেছে তার কিছুটা তথ্য পরিবেশন করা হবে।

তুর্কী সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে বৃটেন ও ফ্রান্স আরব দেশগুলির উপর কর্তৃত্ব পায় লীগ অব নেশনস্-এর ম্যানডেট অনুসারে। মরু-গ্রাসিত এবং তখনো প্রায় নিঃস্ব বলে পরিচিত সৌদী আরবকেই শুধু দেওয়া হয়েছিল অখণ্ডিত স্বাতন্ত্র্য। মিশর ছিল উপনিবেশ; যুদ্ধের পর হল 'স্বাধীন'; ইংরেজ ম্যানডেট স্বাক্ষর করে পেলো প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্ডন ও ইরাক; ফ্রান্স লেভাণ্ট—বর্তমানের সিরিয়া ও লেবানন। দুই পশ্চিমী শক্তিই নিয়ে এলো জাহাজ বোঝাই করে অস্ত্র, সৈন্য, বিপণি—আর তার সঙ্গে মুঠো মুঠো অভিনব রাজনৈতিক ভাবনা। প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্স তার অত্যাচার ও শোষণদুষ্ট ঔপনিবেশিক নীতির সঙ্গে মিশিয়ে দিল গণতন্ত্রের কিছু কিছু মূল-বিহীন মাল-মসলা। এলো সীমাবদ্ধ নির্বাচন; বাছাই করা লোক নিয়ে তৈরী পার্লামেণ্ট; আর রাশি রাশি বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারা। ইংরেজ অঞ্চলে সিংহাসনে সমাসীন নৃপতি, তার চতুর্দিকে নবজাত সামন্ত তাঁবেদার আর যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ-ধনী নতুন পেশাদার পলিটিশিয়ান; এখানেও গড়ে উঠলো পার্লামেণ্ট, আমদানী হল নির্বাচন, প্রচারিত হল গণতান্ত্রিক শিক্ষা। এক কথায়, আরব মানস, আরব সমাজ ও আরব ব্যক্তিত্বের উপর বৃটেন ও
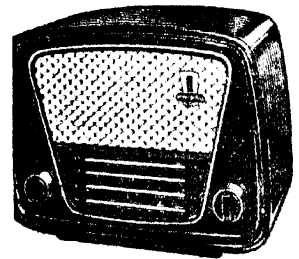
ফ্রান্স বোঝাই করে চাপালো পশ্চিমী প্রতিষ্ঠান, পশ্চিমী চিন্তাধারা এবং পশ্চিমী আশা-আকাঙ্ক্ষা। ফলে, না গড়লো নির্ভেজাল আরব প্রতিষ্ঠান, চিন্তাধারা, ব্যক্তিত্ব—পরাধীনতার ঊষর মরুতে তা গড়তে পারতো না—না স্ফুরিত হল আমদানী প্রতিষ্ঠান, চিন্তাধারা, ব্যক্তিত্ব।

ইংরেজ যে আরব মৈত্রীসৌধ গড়ে তুলেছিল তার অন্যতম নির্মাতা ছিলেন টি ই লরেন্স—যার পরিচিত নাম লরেন্স অব আরাবিয়া। এ'রই উদ্যোগে বিদ্রোহী আরব প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজের সক্রিয় মিত্র হয়ে উঠেছিল এবং তাদের সাহায্য যে মিত্র শক্তির যুদ্ধ বিজয়ে অনেকখানি কাজে এসেছিল শান্তি সম্মেলনীতে অ্যালেনবী নিজেই তা স্বীকার করেছিলেন। লরেন্স তাঁর বৃটিশ ব্যক্তিত্ব পরিত্যাগ করে আরব ব্যক্তিত্ব পরিগ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি

আরব পোশাক পরতেন, আরবী ভাষায় কথা বলতেন, আরব রীতিনীতি মেনে চলতেন। চার্চিলের তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত পরামর্শ-দাতা। বহুদিন বৃটিশ সরকারের আরব নীতি লরেন্সের পরামর্শ অনুযায়ী চলে এসেছিল সিরিয়া-বিতাড়িত ফয়জলকে ইরাকের রাজা বানাবার মূলেও তিনি; আবদুল্লাকে ট্রান্সজর্ডনের আমীর বানানোর পরামর্শও তাঁর কাছ থেকেই চার্চিল পেয়েছিলেন।

লরেন্স তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'সেভেন পিলার্স অব উইজডম'-এ তাঁর স্বকীয় প্রচেষ্টার ব্যর্থতা যে ভাষায় বর্ণনা করেছেন, তা মর্মস্পর্শী। প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদীকে এই বর্ণনা সাবধান করেছে, যদিও তাতে কেউ কর্ণপাত করেনি।

> "বহু বছর আরব পোশাকে বাস করে, আরব মানসের অনুকরণ করে আমি যেন আমার ইংরেজ সত্ত্বা থেকে মুক্তি পেয়ে গেছি। পশ্চিম ও তার নিয়মকানুনের দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাতে পেরেছি। আমার কাছে তা মিথ্যেই হয়ে গেছে। কিন্তু, ঐ সঙ্গে আরব সত্ত্বাও আমি একান্তভাবে গ্রহণ করতে পারিনি; যা করেছি শুধু নকল মাত্র। মানুষকে ধর্মে অবিশ্বাসী করে তোলা সহজ, ধর্মান্তরিত করা বড়ই কঠিন। আমি একটি সত্তা ত্যাগ করে অন্য একটি সত্তা গ্রহণ করেছিলাম......তার ফলে একটা সর্বগ্রাসী একাকীত্ব আমায় পেয়ে বসেছিল। মানুষকে নয়, মানুষের সব কাজকেই আমি তুচ্ছতা ও বিদ্রূপের চোখে দেখতে পাচ্ছি। যে মানুষ দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শ্রম করেছে, তার পক্ষে এই ক্লান্ত ঔদাসীন্য স্বাভাবিক। তার দেহ যন্ত্রের মতো খেটে গেছে; যুক্তিবাদী মনকে সে রেখে এসেছে অনেক পশ্চাতে—সে মন বাইরে থেকে তার কর্মকে নিরীক্ষণ করেছে সমালোচনার চোখে, অবাক হয়ে ভেবেছে ব্যর্থ পরিশ্রম এসব কি করছে, কেন করছে? মাঝে মাঝে আমার এই দুটি বিরোধী সত্ত্বা মহাশূন্যে নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করতো, আর তখন আমি যেন উন্মাদ-প্রায় হয়ে উঠতাম। যে অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে একই সময় দুইটি সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পরিবেশকে বিচার করতে চায়, তার উন্মাদ হওয়া বিচিত্র নয়।" *

টি ই লরেন্সের ব্যর্থতা, তাঁর নির্মম একাকীত্ব, মানুষের সব কর্মের প্রতি বিদ্রূপ এবং তাঁর প্রায়-উন্মাদ ভাব ইংরাজের ত্রিশ বছরের মধ্য-প্রাচ্য নীতির সবচেয়ে কঠিন সমালোচনা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অবশ্য লরেন্স অব আরাবিয়ার মতো রোমান্টিক চরিত্রের স্থান ছিল না। বিশ বছর ইংগ-ফরাসী শাসনের কল্যাণে প্রায় সমগ্র আরবভূমিই কম-বেশি হিটলার-প্রেমী হয়ে উঠেছিল ঃ ফ্যাসীবাদের আকর্ষণে নয়, শৃংখলমুক্তির আশায়। ইরাণে রেজা শা, ইরাকে রাশিদ আলি, মিশরে ফারুক—এই তাঁর ইংরেজ বিদ্বেষের তিন তৎকালীন প্রতীক। অনেকখানি সামরিকবলে এবং কিছুটা ক্ষমতালোভী দেশজ তাঁবেদার স্বার্থের সহায়তায় মিত্রপক্ষ আরবভূমিকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে দেখা গেল বহু বছরের ইংরেজ প্রভাবকে

* Seven Pillars of wisdom—a triumph; by T. E. Lawrence, London, 1943, page 30.

পশ্চাতে রেখে আর একটি প্রভাব আরবভূমিতে আবির্ভূত হয়েছে। মার্কিন প্রভাব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই বারো বছর ইংরেজ ও ফরাসী প্রভাব যতোই অপসৃত হয়েছে, মার্কিন প্রতিপত্তি বেড়েছে তার চেয়েও দ্রুতবেগে। তিন দশকের গোড়া থেকে মার্কিন তেল-স্বার্থ সৌদী আরবে প্রবেশ শুরু করে—আজ সমগ্র মধ্য প্রাচ্যের বিরাট তেল-সম্পদের উপর এই স্বার্থ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজ ইরানের তেলের উপর বহু দিনকার কর্তৃত্ব হারিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ইরান চলে গেছে মার্কিন রাজনৈতিক শিবিরে। তেমনি গেছে জর্ডন। সুয়েজ খাল ছিল একমাত্র সর্বশেষ ক্ষমতার প্রতীক। তাও গেল। তখন ঘটলো ইতিহাসের অন্যতম ব্যর্থতম সামরিক অভিযান, মিশরের বিরুদ্ধে। তারও পরিণতি হল বৃটেনের ব্যর্থতায়। জর্ডন চলে গেল মার্কিন ছায়ায়। সৌদী আরবের সঙ্গে মিত্রতা ছিল না কোনদিনই ; এখন লাগলো সংঘাত পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী ছোট ছোট দেশগুলির তেলসম্পদের অধিকার নিয়ে। সৌদী আরবের পেছনে মার্কিন তেল-স্বার্থের সমর্থন। বৃটেন অসহায়, নির্বান্ধব।

এর উপর, সমস্যাকে ভয়ানক জটিল করে আরব ভূখণ্ডে নেমে এসেছে আর একটি মহাশক্তির ছায়া ; সোবিয়েত রাশিয়া। শীতল যুদ্ধের দুই প্রধান প্রতিপক্ষ ইতিহাসের এই আদি রণক্ষেত্রে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ। আরবদের ভবিষ্যৎ আজও তাদের স্বীয় ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল নয়। বিশ্বব্যাপী সর্বগ্রাসী ক্ষমতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঠিক মাঝপথে আজ এই আরবভূমি।

একদিকে জাগ্রত জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অন্যদিকে অপসৃয়মান বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ। তৃতীয় দিকে জাঁকিয়ে-বসা মার্কিন প্রতাপ। চতুর্থ দিকে আগমনেচ্ছুক রাশিয়া। এই নিয়ে বর্তমান আরব মল্লভূমি।

এবার বিভিন্ন দেশগুলির দিকে তাকিয়ে দেখা যাক।

ইরাক মধ্য প্রাচ্যে অস্তগামী বৃটিশ সূর্যের শেষ ঘাঁটি। যেমন লেবানন উদীয়মান মার্কিন রবির প্রথম ঘাঁটি। ইরাক সবচেয়ে পশ্চিমপন্থী আরব দেশ। আরব নেতৃত্বের দাবীতে মিশরের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী। বাগদাদ ও কাইরোতে চলছে চব্বিশ ঘণ্টা রেষারেষি—বেতারে, সংবাদপত্রে, রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা নীতিতে। ইরাক অন্য যে কোন আরব দেশের চেয়ে বেশী আর্থিক সাহায্য পেয়েছে বৃটেন ও আমেরিকার কাছ থেকে। তেল থেকে পাওয়া অর্থে তৈরী হয়েছে বড়ো বড়ো বাঁধ, জলাধার, সেচপ্রণালী; কৃষি প্রসারিত হয়েছে বিস্তীর্ণ নতুন ভূমিতে। ১৯৫০ থেকে পাঁচ বছরে ত্রিশ কোটি পাউণ্ড বরাদ্দ হয়েছে নির্মাণে ও গঠনে; তার মধ্যে পনের কোটি পাউণ্ড শুধু বন্যানিরোধ ও জল সঞ্চয়ের জন্যে। সত্তর বছর বয়সে নুরী এস্ সৈয়দ, প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করলেও—যা তিনি প্রায় দশ বারো বার পেয়েছেন ও ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন,—ইরাকের স্বৈরাচারী শাসক এবং পশ্চিমের বিশ্বাসভাজন আরব মিত্র। আসলে নুরী এস সৈয়দ পুরোপুরি আরব নন। তাঁর দেহে কিছুটা তুর্কী রক্ত আছে। তুর্কী সুলতানের তিনি ছিলেন একজন জুনিয়র অফিসর; কর্মে উন্নতি না হওয়ায় রাগ করে আরব আন্দোলনে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যোগ দিয়েছিলেন। সাধারণত আরবদের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ নেই। পৃথিবীতে যাঁকে তিনি সবচেয়ে বড়ো শত্রু মনে করেন, তাঁর নাম গামাল অব্দ অল নাসের।

পশ্চিম এশিয়ায় সবচেয়ে বেশী কৃষিযোগ্য ভূমি ইরাকে। মিশরের পাঁচ গুণ। কিন্তু লোকসংখ্যা মিশরের মাত্র চার ভাগের এক ভাগ। ভূমিব্যবস্থা এমনই সামন্ততান্ত্রিক যে, শ্রেণী-পার্থক্য পৃথিবীর মধ্যে ইরাকে বোধ হয় সবচেয়ে মারাত্মক। সমস্ত জমির শতকরা মাত্র সাত ভাগ সমস্ত কৃষিজীবীর শতকরা ৮৮ জন ভোগ করতে পারছে। বাকী জমি নামেই রাষ্ট্রের; কিন্তু নুরীর প্রসাদপুষ্ট এক হাজার শেখের অধীনে। এরাই ইরাকী সমাজের "হাজার স্তম্ভ"; নুরীর সহস্র হস্ত। জমি এদের, নতুন সেচ-সিক্ত জমিও। রাজনৈতিক অধিকারও এদেরই হাতে। নুরীর রীতি-নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অপরাধে দশ হাজার ইরাকী কারারুদ্ধ। প্রায় ৯০ জন প্রাক্তন

৮৪ পৃ

মন্ত্রী ও তাঁদের আত্মীয়-পরিজনবর্গ নিয়ে রচিত "সরকারী" বিপক্ষ দল, যারা নুরীর অনুগ্রহের জন্যে হাঁ করে থাকে এবং যাদের মধ্যে কেউ কেউ নুরীর অনুগ্রহ মাঝে মাঝে পায়ও! পার্লামেণ্টেও এরাই গিয়ে বসে, নুরীর আইন নিয়ে ছোটখাট বিতর্কও হয়, কিন্তু কেউই বিপক্ষে ভোট দেয় না।*

মধ্যে প্রাচ্যে সাম্যবাদের প্রসার নিয়ে গবেষণামূলক একখানা বই লিখেছেন মার্কিন পণ্ডিত ওয়াল্টার লাকিউর।** ইরাক সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য, কেননা ইরাক বাগদাদ চুক্তির প্রধান আশ্রয়। লাকিউর বলছেন:

"আরব দেশগুলির মধ্যে সব চেয়ে নিরাশ হতে হয় ইরাককে দেখে। অন্যান্য আরব দেশ থেকে ইরাকের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অনেক বেশি। ১৯৫৪ সালে তেল থেকে ইরাক রাজস্ব পেয়েছে পাঁচ কোটি বিশ লক্ষ পাউণ্ড; ১৯৫৫ সালে সাড়ে সাত কোটি পাউণ্ড। এ রাজস্ব আরো বাড়ছে। তবু, অদূর ভবিষ্যতে, শহরের বা গ্রামের লোকেদের জীবন-মানের যে বিশেষ উন্নতি হবে তার কোন আশা নেই।

"১৯৪৯ থেকে ইরাকী গভর্নমেণ্ট খোলাখুলি একনায়কত্ব ও প্রগতিবিরোধী পথে চলে এসেছে। রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ক্ষেত্রেই সংস্কারমূলক কোন কাজ করেনি। জাতীয় উন্নতির জন্যে কাজ করার পথ রুদ্ধ করেছে নানা রকমের ষড়যন্ত্র এবং সংগঠিত সামন্ত স্বার্থ। ফলে গভর্নমেণ্ট প্রায় সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও চাষীদের অসন্তোষভাজন হয়ে উঠেছে। বর্তমান রাজত্বের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার; ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থেকে সাম্যবাদকে বর্তমান শাসকরা অপরিহার্য করে তুলছেন।"

আরো উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই যে, নুরী এস্ সৈয়দ ইরাকে এমন একটি রাজনৈতিক আসর তৈরী করেছেন, যার সঙ্গে ও দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের যোগাযোগ অত্যন্ত কম। পুরাতন মেসোপটামিয়া নিয়ে নতুন ইরাক সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে আদর্শ তাঁর নেতাদের প্রেরণা দিতে শুরু করে তার নাম "আরুবা", আরব জাতির ঐক্য। এখানকার জননেতারাই একদিন বৃহত্তর সিরিয়ার দাবীকে সমর্থন করেছিলেন, যার সীমান্ত একদিকে তুর্কী ছুঁয়ে গিয়ে অন্য দিকে প্রসারিত হতো আরব সাগর পর্যন্ত। নুরী সৈয়দই একদা ইংরাজের আশীর্বাদ নিয়ে আরব লীগ গঠনের সবচেয়ে উৎসাহী নেতা ছিলেন; লীগের নেতৃত্ব মিশরের হাতে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উৎসাহও স্তিমিত হয়ে যায়। ইরাক ছিল একদিন সব-চেয়ে ইজরেইল-বিরোধী আরব দেশ। আজ ইরাক আরব জাতীয়তাবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন, ইজরেইল নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতে অনিচ্ছুক এবং পশ্চিমের ঘনিষ্ঠতম আরব বন্ধু।

অবশ্য এ বন্ধুত্ব শাসকগোষ্ঠীর বাইরে কতখানি প্রতিষ্ঠিত তা নিয়ে সবচেয়ে বেশী সন্দেহ পশ্চিমেই। কেননা, ইরাকের দারিদ্র্যপিষ্ট গ্রামীণ জনতা এ মিত্রতা যে মেনে নিয়েছে তার কোন প্রমাণ নেই। গত চল্লিশ বছরে বার বার তারা বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যর্থ বিদ্রোহ করেছে, বার বার হেরে গেছে ইংরাজের সশস্ত্র প্রতিরোধে। ১৯২০ সালে তাদের প্রথম বিদ্রোহ ইরাকের ইতিহাসে "প্রথম মুক্তি যুদ্ধ" নামে পরিচিত। এই জনবিরোধের জন্যেই ১৯২০ সালে নবজাত ইরাক সাতাশ বছর বৃটেনের সঙ্গে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেনি; সাতাশ বছর ইংরেজ বেআইনীভাবে ইরাকে অবস্থান করেছে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে প্রথম ইঙ্গ-ইরাক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—ইতিহাসে যার নাম পোর্টসমাউথ চুক্তি—তখনও ইরাকী জনতার বিদ্রোহের জন্যেই রিজেণ্ট (রাজার অভিভাবক) তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। বাগদাদে শুরু হয়ে যায় ক্ষিপ্ত জনতার সহিংস প্রতিরোধ, পুলিসের গুলী ও লাঠি অগ্রাহ্য করে। চুক্তি সই করে [illegible] প্রধান মন্ত্রী সালিহ্ জবর যখন [illegible] তাঁকে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে বাড়ির [illegible] উপর সর্বক্ষণ একদল সৈন্য মোতায়েন রাখতে হয়েছিল। তবু তিনি টিকতে পারেননি। সমস্ত দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতা তাঁকে বাধ্য করে পদত্যাগ করে ইংলণ্ডে পলাতক জীবন গ্রহণ করতে।

যে হাশেমী রাজবংশকে ইংরেজ ১৯২০ সালে বাগদাদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তার প্রথম নৃপতি ফয়জল ছিলেন বৃটেনের বশংবদ অনুচর। কিন্তু ফয়জল-পুত্র গাহ্‌জী ছিলেন জাতীয়তাবাদী; তাই ২৭ বছর বয়সে একদিন বেশী রাত্রে রাজ-প্রাসাদে ফিরবার সময় তাঁর গাড়ি হঠাৎ এক "দুর্ঘটনায়" পতিত হয় এবং তিনি মারা পড়েন। এই "দুর্ঘটনার" জন্যে বৃটিশ গুপ্তচর বাহিনীকেই ইরাকীরা দায়ী করে এসেছে। বর্তমান রাজা দ্বিতীয় ফয়জল নুরী প্রমুখ সামন্ত নেতা ও বৃটেন ও আমেরিকান স্বার্থের হাতে নিষ্ক্রিয় বন্দী। যদি তাঁর নিজস্ব কোন কামনা থাকে যা তিনি আয়ত্ত করবার চেষ্টার অধিকারী, তা হচ্ছে ইরাক, সিরিয়া এবং জর্ডন নিয়ে একটি হাশেমী রাজ্য গঠন। এরই নাম ফারটাইল ক্রিসেণ্ট।

নুরী এস সৈয়দ বাগদাদ চুক্তিতে হাত মেলালেন সেই তুর্কীর সঙ্গে যে ইরাকের স্বাধীন সত্তাকে দীর্ঘদিন অনুদার নজরে দেখে এসেছে। একজন সুইস লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ইরাক বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল বৃটিশ সামরিক ঘাঁটিগুলি থেকে মুক্তি পাবার এবং ১৯৪৮ সালের ইঙ্গ-ইরাক চুক্তির শৃঙ্খল ভাঙ্গবার জন্য। কিন্তু গত আড়াই বছরে শুধু যে বৃটিশ শৃঙ্খল কঠিনতর হয়েছে তাই নয়, তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে অন্য এক বিদেশী শৃঙ্খল। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে তুর্কী-ইরাক চুক্তি দ্বারা বাগদাদ গোষ্ঠীর গোড়াপত্তন হয়। ইরাকের জনমত যে এই নববিধানের ঘোরতর বিরোধী ছিল, তার প্রমাণ সেই সময় মন্ত্রিসভার পতন। পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিয়ে নুরী এস সৈয়দকে নতুন "নির্বাচনের" পথে বাছাই-করা সদস্যদের নিয়ে নতুন পার্লামেণ্ট তৈরী করতে হয়। তবু, ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরে বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের প্রথম বৈঠক যখন বাগদাদে বসে, লণ্ডনের "টাইমস্" পত্রিকার সংবাদদাতা বলতে বাধ্য হন যে, চুক্তির স্বপক্ষে ইরাকে জনসাধারণের মধ্যে কোন উৎসাহের চিহ্ন নেই, তাদের অন্তরের কোনো স্বতঃজাত প্রেরণা এ চুক্তিতে মূর্ত হয়ে ওঠেনি। "এক অর্থে", এই সংবাদদাতা

* The struggle for the Middle East, by Paul Johnson, The New Statesman, London dated July 6, 1957.

** Communism and Nationalism in The Middle East, by Walter Z. Laquer, New York, 1956.

বলেন, "পশ্চিমী প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় বর্তমানে ইরাককে টেনে আনা ভবিষ্যতের সংগে একরকম জুয়া খেলা ছাড়া আর কিছু নয়।" বাগদাদ চুক্তির দৌলতে ইংরাজ তার তিনটি সামরিক ঘাঁটিকে ইরাকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে; ১৯৪৮ সালের চুক্তির চাইতে অনেক শক্ত করে ইরাককে নিজের সাম্রাজ্যনীতির সংগে বেঁধে নিয়েছে। এ বন্ধন কঠিনতর হয়েছে তেলের প্রয়োজনে। মধ্য প্রাচ্যে একমাত্র ইরাকেই ইংরেজের তেল-সাম্রাজ্য এখনো মোটামুটি অক্ষুণ্ন। ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর চার ভাগের তিন ভাগ অংশ এখনো ইংরাজের; বাকী এক ভাগ অবশ্য আমেরিকা কিনে নিয়েছে।

নুরী এস্ সৈয়দ, এ প্রবন্ধ লেখবার সময়, সুইটজারল্যাণ্ডের কোন এক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের দিয়ে ইরাকের রাজনীতি পরিচালনা করছেন। তিনি জানেন তাঁর সব চেয়ে বড়ো শত্রু ইংরাজ বা রাশিয়া বা আমেরিকা নয়; নাসের। গত বছরের মার্চ মাসে লণ্ডনের "ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার প্রতিনিধি অ্যাণ্টনী মান্-এর সংগে আলাপ-আলোচনায় নুরী নাসেরের আরব-নেতৃত্বের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন ঃ

"নাসেরকে নিয়ে বিপদ এই যে, সে চায় আরব জাতির নেতা হয়ে শোভা পেতে।... কাইরো রেডিয়ো অনবরত আমাকে ও ইরাককে গালাগাল দিচ্ছে।......ইরাকে নানা ব্যক্তিকে প্রভূত অর্থ সাহায্য করে সৌদী আরব আমার কর্তৃত্বকে বিনষ্ট করতে চাইছে। আসলে সৌদী আরবের রাজা মনে করেন এখনো তিনি সেই অতীত কালের বংশগত (হাশেমী ও হাশেমী-বিরোধী) যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইরাক, সিরিয়া ও জর্ডনকে একত্রিত করার প্রয়াসের আগে আমাদের মীমাংসা করতে হবে অন্য দুইটি প্রধানতর সমস্যার—ইজরেইল ও আরবভূমিতে সাম্যবাদ।......পশ্চিমী দেশগুলি যদি কর্নেল নাসের সমস্যার সমাধান করতে চান, তাহলে আগে তাঁদের ইজরেইল সমস্যা দূর করতে হবে। এ সমস্যা মিটলে নাসের সমস্যা আপনা আপনিই মিটে যাবে।"

নুরী বলতে চেয়েছিলেন যে, ইজরেইল-বিরোধী ধ্বনি তুলেই নাসের মিশরে সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং সমগ্র আরবভূমিতে সম্মানিত। ইজরেইল-আরব বিরোধের অবসান হোক, মিশরে নাসেরের আর স্থান হবে না।

গত হেমন্তে বৃটেন ইজরেইলকে দিয়েই নাসেরকে শেষ করতে চেষ্টা করেছিল। তাতে সমগ্র মধ্য প্রাচ্যে যে মানবিক ভূমিকম্প দেখা দিয়েছিল, ইরাকও তার ধাক্কায় নড়ে উঠেছিল গভীরভাবে। নুরী বাধ্য হয়েছিলেন বাগদাদ চুক্তি থেকে সাময়িকভাবে বৃটেনকে সরিয়ে দিতে; তুর্কী, পাকিস্থান ও ইরানের সহযোগিতায় এই চুক্তিকে একটি নির্ভুল মুসলিম সংস্থা বলে দাঁড় করাতে। অবশ্য ইংগ-ফরাসী মিশর নীতি থেকে আমেরিকা দূরে ছিল বলেই নুরীর এই চাল সম্ভব হয়েছিল। তিনি বাধ্য হয়েছিলেন অন্তত মুখে নাসেরকে সমর্থন করতে, যদিও লিবিয়ার মতো তিনি ইংরাজকে সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের সুবিধা দিতে অস্বীকার করবার সাহস সংগ্রহ করতে পারেননি। বাগদাদ চুক্তির সদস্য চার মুসলিম রাষ্ট্রের কাতর অনুনয় ইংরাজ প্রধান মন্ত্রীর কানে গিয়ে পৌঁছেছিল মধ্যপ্রাচ্যে ইংরাজ স্বার্থের শেষ আর্ত আহ্বানের মতো। কিন্তু মিশর থেকে সম্পূর্ণ অপসারণের পর না রইলেন ক্ষমতার গদীতে অ্যাণ্টনী ইডেন, না গাই মোলে, না নুরী এস সৈয়দ। নতুন যে রাজনীতি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ করেছে, নুরীর মতো বৃদ্ধ ইংরেজ-বন্ধুর স্থান সেখানে সীমাবদ্ধ। পেছন থেকে রাজা-বানানো চলতে পারে, কিন্তু রাজত্ব ছেড়ে দিতে হবে অপেক্ষাকৃত কম বয়সী ও বেশী মার্কিন-সমর্থক অন্য কারুর হাতে।

ক্রমশ

ত্রিদিব চৌধুরী

॥ ১২ ॥

বিরোন্ডে'-র পুলিস চৌকী

আমার গোয়ান যুবক প্রহরী পিছন পিছন সম্মুখে, ঘরের দাওয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় মনে মনে যে বেশ অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলাম তাহা এইমাত্র বলিয়াছি; অস্বস্তি এই ভাবিয়া—'এবার বোধ হয় আমার পালা'। ওপারে আমার সহযাত্রীরা নদীর ঘাটের ধারে খোলা মাঠে মার খাইতেছে; আমাকে বোধ হয় ঘরের ভিতর পুরিয়া মারিবে। এক যাত্রায় কি আর পৃথক ফল হইবে? মনে মনে এইরকম আশঙ্কা করিতে করিতে কয়েক পা যখন অগ্রসর হইয়াছি হঠাৎ আমার গোয়ান প্রহরীর কথায় সচকিত হইয়া মুখের দিকে তাকাইলাম—"Mr. Chaudhuri, this is not the way to liberate Goa!" ("মিঃ চৌধুরী, গোয়াকে স্বাধীন করার পথ এ নয়"); আমি তাহার মুখ হইতে এই ধরনের কথা শোনার প্রত্যাশা করি নাই। আমার মুখ দিয়া কতকটা না ভাবিয়া প্রশ্ন বাহির হইয়া আসিল—"কেন" ("Why?") সে পাল্টা প্রশ্ন করিল—"Do you really think Mr. Chaudhuri, the Portuguese will really leave simply because a few hundred unarmed Satyagrahis are coming in?" (মিঃ চৌধুরী, আপনারা কি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন, কয়েক শ' করিয়া নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী ভারত হইতে গোয়ার ভিতরে আসিয়া ঢুকিতেছে বলিয়াই পর্তুগীজরা চলিয়া যাইবে"?)। তাহার এ প্রশ্নের উত্তরে সত্যাগ্রহী হিসাবে আমার যে কথা বলা উচিত ছিল আমি তাহা বলি নাই। তাহার কথা বলার ধরনে আমার মনে তখন প্রশ্ন জাগিয়াছে—কে এই যুবক? এ সুরে এই ধরনের কথা এ লোকটি বলিতেছে কেন? বেশভূষায় তাহাকে ঠিক পুলিসের লোক বলিয়া মনে হয় না। পরনে ভদ্রগোছের ট্রাউজার ও সাদা হাফ্ শার্ট; পায়ে গাম্‌বুট। হাতে পুলিসের রাইফেল বা স্টেনগান নয়, একটা সাধারণ দোনলা পাখী মারা বন্দুক। আমি তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত তাকাইয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কে? আপনি এই পুলিসের দলের সঙ্গে কেন আসিয়াছেন? সে তাহার উত্তরে বলিল, "আমি আসি নাই; আমাকে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু আপনি আমার কথার উত্তর দিন। সত্যই কি আপনারা মনে করেন, এইভাবে অহিংস সত্যাগ্রহের পথে আপনারা গোয়া স্বাধীন করিতে পারিবেন"? বলা বাহুল্য, তখন আমাদের খুব কাছাকাছি কোনো পর্তুগীজ অফিসার জাতীয় কেহ ছিল না; সামনে পিছনে স্টেন্-গান্-ধারী আমার চার গোরা পর্তুগীজ প্রহরী আর পাশে দোনলা বন্দুক কাঁধে পুলিসের কাজে সহযোগিতা করার জন্য আগত এই গোয়ান যুবকটি। চেহারা দেখিয়া বেশ ভদ্র ও মার্জিত ধরনের লোক বলিয়া মনে হইতেছে; কথার ভাবে মনে হইতেছে রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ক্ষীণভাবে হইলেও সহানুভূতিসম্পন্ন—ইহার কথার কি ধরনের জবাব দিলে পর ঠিক হইবে? একটু ভাবিয়া নিয়া আমি বলিলাম—"অহিংস সত্যাগ্রহীদের দেখিয়া পর্তুগীজরা ভয় পাইবে বা ভয় পাইয়া গোয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এমন মনে করার কোনো কারণ নাই বা আমরা তাহা মনে করি না। কিন্তু ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্যায়ের প্রতিরোধে রুখিয়া দাঁড়ানোর অপরিহার্য কর্তব্য আমাদের আছে; একথা বিশ্বাস করি বলিয়াই আমরা আসিয়াছি"। সে কতকটা অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে আর কতকটা প্রচ্ছন্ন সন্দেহের সুরে উত্তর দিল—"হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের আপনারা জানেন না" ("May be, But you don't know these people")! আমার মনে তখন তাহার সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়াছে অনেক বেশী। আমাদের সঙ্গের পর্তুগীজ গোরা সৈন্যেরা যে ইংরাজীতে আমাদের ভিতর এই কথাবার্তা বুঝিতে পারিতেছে না তাহা বেশ আন্দাজ করিতে পারিতেছিলাম। আমি এই সুযোগে আবার তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—"আপনি কি করেন? আপনি পুলিসের সঙ্গে কেন আসিয়াছেন?

আপনাকে দেখিয়া তো পুলিস কর্মচারী বলিয়া মনে হয় না।" উত্তরে সে যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম, সে পুলিসের লোক না হইলেও মোটামুটি সরকার ঘেঁষা পরিবারের লোক। পুলিসের কাজকর্মে হোক, কিংবা সরকারী কাজকর্মে হোক সাহায্য করার জন্য তাহাদের বাড়ির লোকের ডাক পড়ে। সেই হিসাবে তাহাকে তাহাদের বাড়ির প্রতিনিধি হিসাবে আসিতে হইয়াছে। বোম্বাইয়ে তাহাদের আত্মীয়-স্বজন অনেক আছে; সে নিজেও অনেকবার বোম্বাই আসিয়াছে গিয়াছে। সে নিজে রাজনীতির লোক নয় বা তাহার বাড়ির লোকেও নয়। কিন্তু মোটামুটিভাবে সত্যাগ্রহের বা পলিটিক্সের সাধারণ খবর রাখে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ভিতর দিয়া কিছু হইবে বলিয়া সে বিশ্বাস করে না। সে একথাও জানাইল, মোটা বেঁটে মতন যে অফিসারটির কথায় সে আমাকে এখানে এই ঘরের দাওয়ার দিকে নিয়া আসিয়াছে, সে পর্তুগীজ হইলেও এখন কতকটা গোয়ার বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে। সে নাকি সত্যাগ্রহীদের প্রতি খুবই "সহানুভূতিসম্পন্ন" বা "sympathetic"। অবশ্য "সহানুভূতিসম্পন্ন" বলিতে সে একথা বলিতে চায় নাই যে, এই অফিসারটি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল বা আন্দোলনের সমর্থক। পরে জানিয়াছিলাম, ভদ্রলোক একজন Chefe বা ইন্‌স্পেক্টর গ্রেডের লোক। সত্যাগ্রহীদের বেশী মারধোর করা বা নিজের হাতে তাহাদেরকে পিটানো এসব পছন্দ করে না। সেই অর্থে "সহানুভূতিসম্পন্ন"।

আমরা ততক্ষণে কথায় কথায় যে বাড়ির দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, সেখানে আসিয়া গিয়াছি। বাড়ির কর্তাকে সে ডাকিয়া দাওয়ার উপর একটা কিছু বিছাইয়া দিতে বলিল। নীচু দাওয়া; সেখানে কম্বল বিছানো হইলে পর যুবকটি আমাকে সেখানে বসিতে বলিল। আমার চার গোরা প্রহরী স্টেন-গানের মুখ আমার দিকে করিয়া গম্ভীরভাবে আমায় পাহারা দিতে থাকিল। আমরা যে জায়গায় আসিয়া বসিলাম, সেটা নদীর পার হইতে কিছুটা দূরে। সেখান হইতে ওপারের মারধোরের দৃশ্য দেখা যায় না; কিন্তু আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের মার-খাওয়া যন্ত্রণার আর্তনাদ সেখানেও আসিয়া পেঁৗছিতেছে। আমার কিছু করার উপায় নাই; তবে ভাব-গতিক দেখিয়া এটুকু বেশ বুঝিতেছি, আমাকে এখনি বোধ হয় আর মার খাইতে হইবে না। কারণ আমাকে মারিতে হইলে এভাবে এখানে আড়ালে নিয়া আসিয়া ঘরের দাওয়ায় কম্বল বিছাইয়া বসার ব্যবস্থা করিত না। শারীরিকভাবে মনে মনে কিছুটা নির্ভয় বোধ করিতে লাগিলাম। খানিকক্ষণের মধ্যে সেই বেঁটে-মোটা অফিসার ভদ্রলোক নিজেই আসিয়া ইংরাজীতে জানাইলেন—"ইউ গো লাস্ট" ("তোমাকে সবার শেষে যাইতে হইবে")। পরে আমাদের নূতন পরিচিত বন্ধু গোয়ান যুবকটির সঙ্গে পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলিয়া আমায় কিছু বলিতে বলিলেন। তাহার 'Chefe'-এর জবানীতে সে আমায় জানাইল অন্য সকলের নৌকা পার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে এইখানে থাকিতে হইবে। তবে আমি যতক্ষণ তাঁহার চার্জে আছি ততক্ষণ আমার কোনো ভয় নাই, আমাকে কেহ কিছু বলিবে না। কিন্তু আমি ভিন্ন আমাদের দলের অন্যান্যদের সম্পর্কে তাঁহার কোনো দায়িত্ব নাই। খালি আমার যেন গায়ে হাত না দেওয়া হয় এই অর্ডার তাঁহার উপর আছে। অবশ্য পঞ্জিম যাওয়ার পর আমার অদৃষ্টে কি আছে তাহা তিনি বলিতে পারেন না; কিন্তু তাঁহার হাতে অর্থাৎ ওয়াল্‌পই পর্যন্ত আমার কোনো ভয় নাই। আমি যেন গণ্ডগোল না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকি। শোরগোল করার চেষ্টা না করিলে আমার কোনো বিপদের সম্ভাবনা নাই।

যাক্‌, তবু খানিকটা পাকাপাকি আশ্বাস পাওয়া গেল যে, এখনই আমাকে মার খাইতে হইতেছে না! দেখা যাক্‌, এর পরে কি হয়? আমাকে সেখানে স্টেন-গানধারী পাহারাওয়ালাদের জিম্মায় বসাইয়া রাখিয়া যুবকটি ও মোটা শেফ ভদ্রলোক নদীর ঘাটের দিকে চলিয়া গেলেন। আমার সঙ্গী তখন সেই চারজন স্টেন-গানধারী গোরা পর্তুগীজ সৈন্য। তাহারা এক একবার মহা গম্ভীরভাবে কটমট করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে, আর আমি তাহাদের

দিকে তাকাইয়া দেখিতেছি—এইভাবে খানিকক্ষণ চলিল। কিছুক্ষণ বাদে বোধ হয় খানিকটা কৌতূহল আর খানিকটা থমথমে পরিস্থিতিটা কাটানোর চেষ্টায় গোরা সিপাহীদের মধ্যে একজন হঠাৎ পর্তুগীজ ভাষায় প্রশ্ন করিল—"Chef! tu Hindou ou Cristao? Fala Concani? Fala Engles?" ("এই লীডার! তুই হিন্দু না খৃষ্টান? কোঙ্কনী জানিস, ইংরেজী জানিস?")। বলা বাহুল্য, তখন আমি পর্তুগীজ এক অক্ষরও জানি না বা বুঝি না। কিন্তু এই কয়েকটি কথা বোঝা বা তাহার অর্থ আন্দাজ করা এমন কিছু কঠিন ছিল না। বুঝিলাম, আমি জাতে খৃষ্টান না হিন্দু, কোঙ্কনী বলি না ইংরাজী বলি তাহা জানিতে চাহিতেছে। আমি উত্তর দিলাম—"হিন্দু......ইংলিশ......হিন্দুস্তানী......নো কোঙ্কনী"। আমার উত্তর শুনিয়া সে খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল। ইংরাজী সে যে জানে না সেটুকু আন্দাজ করিতে পারিতেছিলাম। কারণ তাহা না হইলে সে সরাসরি আমাকে ইংরাজীতেই কথা জিজ্ঞাসা করিত। কারণ তাহার সম্মুখে গোয়ান যুবকটি এবং আমি দুজনেই ইংরাজীতে কথা বলিতেছিলাম। পর্তুগীজ সৈন্যদের অধিকাংশই প্রায় নিরক্ষর বলিলেও চলে; তাহাদের অনেকেরই পর্তুগীজ ভাষার অক্ষর জ্ঞান

পর্যন্ত নাই। পরে আগুয়াদা দুর্গে থাকার সময় যখন পর্তুগীজ সৈনাদের সংগে আর একটু কাছাকাছি আসার সুযোগ হইয়াছে তখন তাহাদের অনেককে আমাদের পর্তুগীজ ভাষার প্রাইমার (প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ) ধার দিয়া পর্তুগীজ অক্ষর জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টায় সাহায্য করিতে হইয়াছে।* অবশ্য পর্তুগীজ রাজ্যে সেই প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় এতটা জানার সুযোগ যে আমার হয় নাই সেকথা বলার দরকার করে না; ক্রমে ক্রমে জানিয়াছি। যা হোক্, পর্তুগীজ সৈন্যটির আমার সংগে কথা বলার চেষ্টা উপক্রমে থামিয়া গেল; কারণ উভয় পক্ষেই এটা সহজেই বোঝাবুঝি হইয়া গেল, আমাদের মধ্যে কথাবার্তা চালানো যাইবে না। সে কোঙ্কনী বোঝে বা জানে কি না, তাহা জানার সুযোগ হয় নাই। বলা বাহুল্য, মারাঠী ভাষা কিছু কিছু বুঝিলেও কোঙ্কনী তখন আদৌ আমি বুঝি না; পর্তুগীজ গোরার মুখে কোঙ্কনী শুনিলে তাহা যে আমার আদৌ বোধগম্য হইবে না সেটা স্বতঃসিদ্ধ ছিল। সেও ইংরেজী বা হিন্দুস্তানী জানে না। সুতরাং চুপ করিয়া একে অন্যকে দেখা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

সৈনাদের পরনে মোটা সুতীর ছিটের সস্তা অথচ মজবুত গ্রে রংয়ের (বা কালচে ছাই রংয়ের) মিলিটারী শার্ট আর ট্রাউজার; পায়ে শক্ত চামড়ার মিলিটারী বুট। তাহাদের মাথায় ঐ রকম গ্রে রংয়ের কাপড় মোড়া শক্ত পিচ্ বোর্ডের গামলা হেলমেট; কারো কারো মাথায় সবুজে খাকী বার্নিশের স্টীল হেলমেট। ইহার অনেক পরে বিভিন্ন পুলিস হাজতে ও জেলে থাকিয়া পর্তুগীজ মিলিটারী সৈনাদলের থাকা-খাওয়া বেশ-ভূষার ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্রমশ যখন আমাদের আরো বেশী জ্ঞান হইল, তখন অবশ্য জানিতে পারি যে, সালাজারী ব্যবস্থায় সাধারণ সৈনাদলের অবস্থা তত ভালো নয়। পুলিসের থাকা-খাওয়া, বেশ-ভূষার বন্দোবস্ত সাধারণ সৈনাদের যাহা দেওয়া হয় তাহার চেয়ে অনেক ভালো। ১৯৫৪ সালে গোয়ায় সত্যাগ্রহ ও রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ

* সরকারী হিসাব মতে পর্তুগালের অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা শতকরা ৫০-৫১ জনের মতো। কিন্তু সৈন্যদলের ভিতর চাষী শ্রেণীর লোক একটু বেশী বলিয়া নিরক্ষরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী।

হওয়ার পর হইতে গোয়াতে পর্তুগীজ সৈন্যদলের সংখ্যা যে রকম বাড়ানো হইয়াছে; তেমনি বাড়ানো হইয়াছে খাস পর্তুগাল ও লিস্‌বন হইতে আমদানী গোরা পুলিস।* কিন্তু গোরা পুলিশের বেশভূষা গোরা সৈনা-

* খাস পর্তুগাল হইতে গোয়াতে এই সময় তিন শ্রেণীর গোরা পুলিস আমদানী করা হয়। প্রথম, সাধারণ পুলিস বাহিনীর পুলিস কনেস্টবল ও সার্জেণ্ট। ইহাদের সংখ্যা আনুমানিক শ' দুই তিন হইবে। এখন ইহাদের সঙ্গে পর্তুগালের পুলিস বাহিনীর নিম্ন ও উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীও যথেষ্ট সংখ্যায় আমদানী করা হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক থানায় এবং পুলিস চৌকীতে গোয়ান পুলিস ছাড়াও একজন দুইজন করিয়া পর্তুগীজ পুলিস অফিসার এবং গোরা পর্তুগীজ কনেস্টবল রাখা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া আছে পর্তুগাল হইতে আগত PS—Policia Seguranla সোজা কথায় সিকিউরিটি পুলিস। ইহাদের কাজ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা।

সবার উপরে PIDE—Policia International da defesa de Estado; ইংরজীতে "ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস অফ্ স্টেট্ ডিফেন্স"। এই গালভরা নাম দেওয়ার তাৎপর্য কি বা কেন ইহাদের 'ইণ্টারন্যাশনাল' আখ্যা দেওয়া হয় তাহা আমি আজও অনেক পর্তুগীজ অফিসারকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে বা বুঝিতে পারি নাই। তবে মোটামুটি ইহাদের ডাঃ সালাজারের গেস্টাপো পুলিস বলা যাইতে পারে। বেশভূষায় মাহিনায়, সম্মান-সম্ভ্রমে এবং জনসাধারণের মনে ভীতি উদ্রেক করানোর ব্যাপারে ইহাদের উপরে কেহ নয়। মিলিটারী অফিসার ও সাধারণ পুলিস অফিসারদেরও ইহাদের ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

কিন্তু বেতন, বেশভূষা বা সাজসজ্জায় সাধারণ পুলিস কনেস্টবলদের সংগে সৈন্যদের কোন তুলনা হয় না; বেচারা (সৈন্যেরা) মরমে মরিয়া থাকে। সাধারণ সৈনাদের তিনপ্রস্থ কাপড় দেওয়া হয়। দুইটি গ্রেরংয়ের ইউনিফর্ম আর একটি একটু ভাল খাকী হাফ প্যাণ্টওয়ালা ইউনিফর্ম। ডাঃ সালাজার নিজে এককালে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন বলিয়া এসব বিষয়ে তাঁহার হিসাব খুব ভালো। পর্তুগালের স্ট্যাণ্ডিং আর্মি বা স্থায়ী সৈন্যদলের সংখ্যা খুব কম। বেশীর ভাগ সৈন্য দুই বছরের ন্যাশনাল সার্ভিস কনস্ক্রিপট; কারণ পর্তুগালে প্রত্যেক লোককে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে দুই বছরের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে কাজ করিতে হয়। গোয়ায় আগত পর্তুগীজ সৈন্যেরা সাধারণত এই শ্রেণীর; ইহাদের উপর সালাজার খুব বেশী খরচপত্র করেন না। পর্তুগাল প্রথম যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর আর কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই; সালাজার আমলে তো নয়ই। সালাজার দেশ শাসন করেন পুলিশের সাহায্যে। 'পিদে' বাহিনী, 'সেগুরাঞা' বাহিনীর আদর তাই সবার উপরে; স্থায়ী স্টাণ্ডিং আর্মির-ও কতকটা আদর আছে। কিন্তু "Guarda National Republicana" বা জাতীয় সেনা বাহিনীর তত আদর নাই। তাহারা দুই বছরের জন্য সেবার খাটিয়া দিয়া যাইবে, কাজে কাজেই তাহাদের জন্য সালাজার অযথা অর্থ ব্যয় করিতে চান না।

দলের বেশভূষার সংগে তুলনায় সকল সময় বেশী দামী ও বেশী জাঁক-জমকসম্পন্ন বলিয়া মনে হইয়াছে।

বসিয়া বসিয়া এইসব দেখিতেছি ও সাত-পাঁচ নানারকম ভাবনা ভাবিতেছি এমন সময় হুকুম হইল—"আসামীকে নিয়া এসো।" অর্থাৎ সকলে ওপারে পেঁছিয়াছে এবার আমার যাওয়ার পালা। অন্যান্য সকলের মতই ডিঙ্গি নৌকা করিয়া মিলিটারী পাহারায় আমাকেও পার করা হইল। ঘন বর্ষার দিনের ঘোলা লাল জলের খর স্রোতস্বতী পাহাড়ী নদী; বেশী চওড়া নয়। পার হইতে বেশী সময় লাগিল না। বিরোন্ডে" পুলিস চৌকীর পারে ডিঙ্গী আসিয়া পারে লাগিতে দেখি, আমাদের ভলাণ্টিয়ারদের সকলকে উপরে নিয়া গিয়া মাঠে সারবন্দী করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে। কিছু পুলিস ও সৈন্যদল তাহাদের পাহারা দিতেছে; কিছু পুলিসের লোক এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করিতেছে। আমাকে পিটানোর জন্য ঘাটের উপর কেহ খাড়া হইয়া নাই। তখন অফিসারটির কথা মনে পড়িল যে, আমার গায়ে হাত দেওয়ার হুকুম নাই; কথাটার পিছনে হয়ত কোনো সত্যতা আছে এবার তাহা খানিকটা বিশ্বাস হইল। খালি গ্রেপ্তার হওয়ার সময়েই নয়; গোয়ায় আমার উনিশ মাসকালের বন্দীদশার ভিতর আমার গায়ে কখনো হাত পড়ে নাই। অবশ্য 'পিদে'-র লোকেরা অন্যভাবে দুর্ব্যবহার করিয়া তাহার শোধ তুলিয়া নিয়াছে; আমার চোখের সম্মুখে অন্যকে ধরিয়া অমানুষিক' প্রহার করিয়াছে, কিন্তু আমাকে মারে নাই।

আমি ভারত পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য ইহা তাহার একটি পরোক্ষ কারণ বটে। কিন্তু প্রত্যক্ষ কারণ, আমার পূর্বে গোয়াতে ভারত পার্লিয়ামেণ্টের অপর যে সদস্য গিয়াছিলেন, অধ্যাপক বিষ্ণু ঘনশ্যাম দেশপাণ্ডে, তাঁহাকে পুলিস হাজতে ভরিয়া পিটানোর পর পুলিস কর্তৃপক্ষ কিছুটা বেকুব বনিয়া যায়। অধ্যাপক দেশপাণ্ডেকেও প্রথমে তাহারা প্রহার করিতে চায় নাই। তাঁহার স্বেচ্ছাসেবক দল গোয়ার ভিতরে বড় রাস্তায় আসিয়া পেঁছানোর সংগে সংগে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জীপে বসাইয়া সোজা পাঞ্জিমে আনিয়া ফেলে। তাঁহার সংগী স্বেচ্ছাসেবকদের সেখানেই মারধোর করিয়া ট্রাকে করিয়া বর্ডারে পাঠাইয়া দেয়; কিছু লোককে দু' এক দিনের হাজতেও রাখিয়াছিল। পাঞ্জিমে তাঁহাকে প্রথম দিনের পরেই পুলিস হেড কোয়ার্টার হইতে মানিকোমের আল্‌টিনো (Altinho) জেলে নিয়া যাওয়া হয়। আমিও এই জেলে মাস ছয়েক ছিলাম। এই জেলের সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল যে, এখানে কোনো পদস্থ পুলিস কর্মচারী থাকিত না; মিলিটারী পাহারায় একজন পর্তুগীজ সার্জেণ্ট এবং একজন পর্তুগীজ ও একজন গোয়ান

কারা[illegible] [illegible] রাখা হইত। ফলে এই সার্জেণ্ট এবং কনেস্টবলটির খেয়াল-খুশীর উপর রাজনৈতিক বন্দীদের উপর যে কোনো রকম নির্যাতন বিনা বাধায় চলিতে পারিত। দেশপাণ্ডের সংগে সেখানকার এই [illegible] একজন রাজনৈতিক বন্দীর উপর মারধোর করা নিয়া কথা কাটাকাটি হয়। সার্জেণ্টটি তাহাতে রাগান্বিত হইয়া বাহির হইতে দুইজন নিগ্রো সৈন্যকে ভিতরে আনিয়া তিনজনে মিলিয়া তাঁহাকে সেলের মধ্যে অমানুষিক প্রহার করে। দেশপাণ্ডের তখনো পর্যন্ত ভারতের কন্সাল জেনারেলের সংগে সাক্ষাৎ হয় নাই। পর্তুগালের সংগে তখনো ভারত গভর্নমেণ্টের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই। কাজে কাজেই আইনত গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ভারতের কন্সালের সংগে দেশপাণ্ডের দেখা করিতে দিতে বাধ্য ছিলেন। তাহা ছাড়া দেশপাণ্ডে পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার; আমাদের কন্সাল মিঃ মনি তাঁহার নিজের দিক দিয়াও দেশপাণ্ডের সহিত দেখা করার চেষ্টা করিতেছিলেন। গোয়া পুলিসও দেশপাণ্ডের গ্রেপ্তারের পর হইতে তখনো পর্যন্ত দেশপাণ্ডের নিকট হইতে কোনো জবানবন্দী লিখিয়া লয় নাই। মারধোর করার পরের দিন ছিল পুলিশ হেড কোয়ার্টারে তাঁহাকে নিয়া গিয়া তাঁহার জবানবন্দী রেকর্ড করার দিন। মার খাওয়ার পর হইতে দেশপাণ্ডে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন—পরের দিন তাঁহাকে পুলিস হেড-কোয়ার্টারে নেওয়ার পর সকল কথা যখন জানাজানি হইল তখন পুলিস কর্তৃপক্ষ বেশ কিছুটা বিব্রত হইয়া পড়ে।

ভারত পার্লিয়ামেণ্টের একজন সদস্যকে রাজনৈতিক কারণে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিস-হাজতের মধ্যে তাঁহাকে আটক করার পর, তাঁহার উপর শারীরিক অত্যাচার চালানো হইয়াছে, ভারতের কন্সাল জেনারেল সেকথা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই গুরুতর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে—পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের মনে এই ভয় দেখা দেয়। এ গুজবও কাহারো কাহারো মুখে শুনিয়াছি যে, এই সময় গভর্নর-জেনারেল, জেনারেল পাউলো বের্নার্দ গেদীস্-এর সংগে পুলিস কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল না; সুতরাং দেশপাণ্ডের ব্যাপার ভারতীয় কন্সাল জেনারেল যদি জানিতে পারেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই গভর্নর জেনারেলের কাছে পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবেন এবং সেক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেল তাহার জন্য পুলিস কর্তৃপক্ষকে দায়ী করিবেন। সুতরাং এত হাঙ্গামায় দরকার কি? বরং দেশপাণ্ডেকে ছাড়িয়া দেওয়া ভালো—এই মনে করিয়া পর্তুগীজ পুলিস কন্সালের সংগে সাক্ষাৎকার হওয়ার আগেই দেশপাণ্ডেকে ছাড়িয়া দেয়। শুধু তাই নয়, দেশপাণ্ডে যখন পুলিস হেড কোয়ার্টারে আসিয়া সার্জেণ্টটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তাঁহার সামনেই সার্জেণ্ট মেস হইতে তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া সংগে সংগে [illegible] দশ দিনের [illegible] সেলের সাজাও দেওয়া হয়। দেশপাণ্ডে দেশে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে যে বিবৃতি দেন তাহা আমি পড়িয়াছি কারণ আমি তখনো গোয়ায় প্রবেশ করি নাই (দেশপাণ্ডে ১৮ই জুন গোয়ার ভিতরে প্রবেশ করেন; আমি করি ৯ই-১০ই জুলাই। দেশপাণ্ডের ধারণা ছিল যে, তাঁহাকে মারধোর করার পিছনে হয়ত পর্তুগীজ পুলিস কর্তৃপক্ষের প্ররোচনা ছিল এবং তাঁহার সামনে সার্জেণ্টটির যে বিচার হয় তাহা নিতান্ত লোক-দেখানো বিচার। কিন্তু আমি তাঁহার পরে গিয়া নানাভাবে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারি তাহা হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে তাহা মোটেই লোক-দেখানো বিচার ছিল না। পর্তুগীজ পুলিস কর্তৃপক্ষ সে সময় এ ব্যাপারে সত্য সত্যই কিছুটা ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন এবং যদি দেশপাণ্ডের ব্যাপার নিয়া ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে কোনো অভিযোগ হয় বা কোনোরকম আন্দোলন শুরু হয় তাহা হইলে যাহাতে তাহাদের দিক দিয়া এ সম্পর্কে ঠিক ঠিক মতন জবাবদিহি করিতে পারা যায় তাহার যোগাড়যন্ত্র করিয়া রাখিতে তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই। অবশ্য দেশপাণ্ডেকে মুক্তি দিবার পর (ভারতীয় কন্সালের সংগে তাঁহাকে দেখাই করিতে দেওয়া হয় নাই) পুলিস পক্ষ হইতে সরকারীভাবে বলা হয় দেশপাণ্ডের ডায়াবেটিস রোগের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শক্রমে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। আমরা পরবর্তিকালে দুএকজন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলে পর এই উত্তরই পাইয়াছি। সে যাহাই হোক আমার মনে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে দেশপাণ্ডের ব্যাপারে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ কিছুটা সাবধান হইয়া যান এবং গোয়া-অভিযানকারী দ্বিতীয় পার্লিয়ামেণ্ট সদস্য আমার বেলায় যাহাতে আবার এরূপ কোনো অবস্থার সৃষ্টি না হয় তাহার জন্য সর্বরকমে সাবধানতা অবলম্বন করেন। অর্থাৎ সোজা কথায়, আমার উপরে যে মার পড়িতে পারিত তাহা দেশপাণ্ডের উপর আসিয়া পড়ায় আমাকে আর পর্তুগীজ পুলিসের হাতে মার খাইতে হয় নাই। আমি এবং মহারাষ্ট্রের মোদক গুরুজী, ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের ভিতর একমাত্র এই দুই জনকেই পর্তুগীজ পুলিসের হাতে কোনো শারীরিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় নাই। মোদক গুরুজীকে অবশ্য তাহারা গ্রেপ্তারই করে নাই। বর্ডারের নিকট হইতেই ফিরাইয়া দেয়। আমার অব্যাহতি পাওয়ার কারণ কি তাহা উপরেই বলিয়াছি।

ডিঙ্গি নৌকা হইতে নামার সংগে সংগে আমাকেও বন্দী স্বেচ্ছাসেবকদের সংগে [illegible] দেওয়া হইল। সেখানে প্রথম একজন পুলিস কর্মচারী পর্তুগীজ সৈন্যবাহিনীসহ আমাদের সকলের একটি ফটো তুলিয়া নিল। আমাদের সম্মুখে আমাদের যাহারা গ্রেপ্তার করিয়াছিল সেই তিনজন পুলিস ও মিলিটারী অফিসারকে ভারতের জাতীয় পতাকা হাতের মুঠিতে নিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া ফোটোটি তোলা হয়। ফোটো তোলা পর্ব শেষ হইলে আমাদের সম্মুখের পুলিস চৌকীর ঘরের বারান্দায় নিয়া বসাইয়া দেওয়া হইল। এবার আরম্ভ হইবে পুলিসের জেরা ও জবানবন্দীর পালা। আমরা বারান্দায় গিয়া বসিতে না বসিতেই কয়েকটি জীপে করিয়া কোথা হইতে কয়েকজন ইউনিফর্ম পরা উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারীর মতো সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্যান্য পুলিস কর্মচারীদের তাহাদেরকে দেখিয়া সেলাম ঠোকার বহর হইতে বুঝিতে পারিলাম তাহারা নিশ্চয়ই বড়গোছের অফিসার। আন্দাজ করিলাম এবার ইহারা হয়ত আমাদের চার্জ নিবে। আসামী হিসাবে কি ধরনের জীব আসিয়াছে তাহা দেখাও তাহাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে। যাই হোক আমাদের পক্ষে তখন ধৈর্য ধরিয়া নাটকের দৃশ্যান্তরে আমাদের ভাগ্যে কি আছে তাহার অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কিছু করার ছিল না।

(ক্রমশ)

রঞ্জন

নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার, আধ মিনিট। বসুন ও ধন্যবাদ, আধ মিনিট। আসুন, আপনার ওভারকোটটা খুলতে সাহায্য করি, আরো আধ মিনিট। তারপর আবহাওয়া সংবাদ। শীতের দেশে আপনার অসুবিধা হচ্ছে না, আশা করি। না, তেমন আর শীত কই? ধরা যাক আরো দু মিনিট কাটল। তারপর? তারপরই সাত সমুদ্র ও তেরো নদীর বৃহৎ ব্যবধান প্রকট হতে বাধ্য। যে সাহিত্যকীর্তি বা সাহিত্য সম্বন্ধে পারস্পরিক কৌতূহল দূরকে নিকট করে দেবে বলে কল্পনা করা গিয়েছিল, অচিরেই তা কাল্পনিক বলে প্রমাণিত হবে। এশিয়ার সাহিত্যিক আর য়ুরোপ বা আমেরিকার সাহিত্যিকের মধ্যে আলোচনা খণ্ডিত হবে। এক জানে অপরের সম্বন্ধে সব, অপরের প্রায় কিছুই জানা নেই। ক্রমে সন্দেহ হবে, জানার আগ্রহও সত্যি অপরিসীম কিনা। নাকি দু'চারটে প্রশ্ন করা শুধুই সৌজন্যের দাবিতে?

অন্তত আমার অভিজ্ঞতা এই রকমই।। কোনো কোনো বিভাগে প্রশংসনীয় উৎকর্ষ সত্ত্বেও আমরা প্রাদেশিক সাহিত্যের কারবারী। স্বদেশ কথাটা ভুলে থাকা সম্ভব। এখানে আমরা কেউ কাউকে স্মরণ করিয়ে দিইনে যে আমাদের খ্যাতি একান্তই পরিমিত। উড়িষ্যা বা আসামে হয়তো বাঙালী সাহিত্যিকদের কয়েকজনের পরিচিতি আছে। হিন্দীতে অনূদিত হয়ে থাকলে, কোনো অকাদেমির পুরস্কার পেলে বা রাজনৈতিক কারণে। যার সঙ্গে সাহিত্যিক সার্থকতার সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বারা প্রশংসিত হয়ে থাকলে হয়তো তার বাইরেও কারো কারো নাম জানা। এর বাইরে তুমি বিদেশে সাধারণ টুরিস্ট মাত্র। ব্যবসায়ী বা বায়ামবীর বা ম্যাজিশিয়ান হলে বরং সুবিধা হত। তুমি তোমার কৌতূহল বা কৌশলের পরিচয় হাতে হাতে দিতে পারতে। কিন্তু যদি তুমি সাহিত্যিক হয়ে থাকো, বাঙলা ভাষায় কয়েকখানা বই লিখে থাকো, তবে তোমার পরিচয় কী বিদেশে? কেউ তো পড়েনি সে বই। তুমি নিজে বলবে তোমার সাহিত্য কর্মের কথা? এর চাইতে বিড়ম্বনা আর কী আছে? পরভাষায় প্লটের অতিকথন করে কিছু বলতে চেষ্টা করলে কয়েক মিনিট পরেই তুমি হাঁপিয়ে উঠবে। তারও আগে হয়তো দেখবে, শ্রোতা হাই তুলছেন হাতের আড়ালে।

•

দোষ দেয়া মিছে। ভূগোল আর ইতিহাসে মিলে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে যে হীনম্মন্যভাব অবশ্যম্ভাবী। অপরিচয় যদি পারস্পরিক হত তবে আলোচনা অসম্ভব হত কিন্তু নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করবার কারণ ঘটত না। যদিও কার বই পড়োনি, সেও তোমার বই পড়েনি। তখন দু'জনেই আলোচনা করতে পারো তৃতীয় কোনো লেখককে, যে তোমাদের দু'জনেরই জানা; নইলে সাহিত্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে মত বিনিময় করতে পারো বর্ণবৈষম্য বা সাম্রাজ্যবাদ বা রাষ্ট্রসংঘের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে—যদিও তাহলে প্রশ্ন থেকে যাবে, দুই সাহিত্যিকের এমন মিলনের কোনো সাহিত্যিক মূল্য আছে কিনা। কিন্তু তুমি আদৌ শিক্ষিত হলে তুমি নিশ্চয়ই অন্তত ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত এবং হয়তো অনুবাদের সাহায্যে অন্যান্য দু'একটি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গেও। তুমি দেখা করতে গেছ তোমার পঠিত কোনো লেখকের সঙ্গে। হয়তো তুমি তার অনুরাগীও। তুমি তার আধুনিকতম গ্রন্থের কোনো পাত্র-চরিত্রের বিশ্লেষণ করে বললে কোথায় সে তোমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। অপর পক্ষ তোমাকে ধন্যবাদ দিলেন।
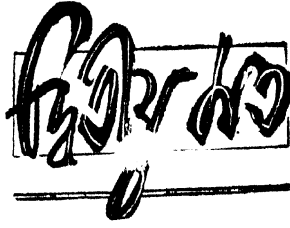
আর কী দিলেন? আর কিছু দেয়া সম্ভবই নয়। তিনি তোমার লেখার এক ছত্রও পড়েননি কখনো। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা আমেরিকার সাহিত্যে জন্মালে তুমি জন্মমুহূর্ত থেকে বিশ্বসাহিত্যের নাগরিক। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে' বলে চিৎকার করবার দরকারই নেই তোমার। তোমার ভাষাই বিশ্বের ভাষা, তুমি কিছু উচ্চারণ করলেই তুমি শ্রুত হবে। প্রাদেশিক সাহিত্যে জন্মগ্রহণ করলে বিশ্বমর্যাদা লাভ করতে তোমার জন্ম জন্ম অপেক্ষা করতে হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বকবি হিসাবে স্বীকৃতিলাভ যে কী দুরূহ ব্যাপার ছিল তা বোঝা যায় তাঁর একত্ব থেকে—একত্ব শুধু প্রতিভার নয়।

•

বেশ, রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। বহির্বিশ্বে তাঁর নাম অজ্ঞাত না হলেও—যদিও এমন শিক্ষিত বিদেশী ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যিনি টাগোরের নাম শোনেননি বা ভুলে গেছেন—তাঁর সাহিত্য আজ বহুর দ্বারা পঠিত নয়। অথচ তিনিই আমাদের একমাত্র গর্ব। তখন কেমন মনে হয় যখন বিদেশীর কাছে এই সূর্যের মতো স্বপ্রতিষ্ঠ রবীন্দ্র প্রতিভাকেও সাবস্ট্যানশিয়েট করতে হয়? তাঁর সৃষ্টির অনুবাদের সঙ্গে হয়তো বিদেশীর পরিচয় আছে, হয়তো নেই। তবু তর্ক বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না। কিছুক্ষণ পরেই রণে ভঙ্গ দিয়ে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথকে বোঝাবার সাধ্য আমার নেই। বিদেশী মনে মনে হাসে, ভাবে, বাঙালীর সাহিত্য বিচার খুব উচ্চ শ্রেণীর না হলেও এদের স্বাজাত্যবোধ প্রশংসনীয় বটে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভালোবাসি তিনি অসামান্য কবি বলে নয়—ভারতীয় বলে, বাঙালী বলে! বলা বাহুল্য, এমন অবস্থায় আত্মমর্যাদাবোধ অক্ষুণ্ণ রাখা শক্ত।

বিজ্ঞানীর স্বীকৃতি বোধহয় অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। এশিয়ায় বা আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করলেও তার ভাষা মূলত আন্তর্জাতিক। অনুবাদে সাহিত্যিক সৌন্দর্য প্রায়শই হারিয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক সত্য অনুবাদকে অতিক্রম করে সহজে। গণিত ও পদার্থবিদ্যার ভূগোল নেই, সীমানা নেই।

•

সাহিত্যের শুধু ভূগোল নয়, ইতিহাসও আছে। ফরাসী সাহিত্যের উৎকর্ষ স্বগৌরবে বিশ্বজনীন। কিন্তু ফরাসী ভাষার প্রভাব যে প্রধানত ফ্রান্সের রাজনৈতিক প্রতিপত্তির উপর নির্ভরশীল, তার প্রমাণ তো এই যে, তার বিশ্বমর্যাদা এখন তার রাজনৈতিক ক্ষমতারই মতো ক্ষীয়মাণ। অপরপক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য সূর্যাস্ত শুরু হলেও ইংরেজী ভাষার প্রভাব নিত্যবর্ধমান, কেননা আমেরিকারও ভাষা ইংরেজী এবং বিশ্বের রাজনৈতিক মঞ্চে তার ভূমিকা আজ প্রধান। গত চল্লিশ বছরে রুশ ভাষার অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে এমন মনে করবার কিছুমাত্র কারণ নেই। বরং অনেকের ধারণা, রুশ সাহিত্য সম্প্রতি দীন হয়েছে। তবু যে চীনে ও পূর্ব য়ুরোপে রুশ ভাষার আজ ব্যাপক প্রয়োগ এবং ভারতেও সে ভাষা সম্বন্ধে আগ্রহবৃদ্ধি হয়েছে, তার কারণ কি সাহিত্যিক না ভাষাগত উৎকর্ষের ফল?

অনুরূপ রাজনৈতিক কারণেই হিন্দী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাভিলাষী। তার এ মনস্কাম পূর্ণ হলে বাঙলা শুধু বিশ্বমানে প্রাদেশিক ভাষা হবে না, ভারতীয় মানেও। সাহিত্যিক উৎকর্ষের প্রশ্ন হবে একান্তই অবান্তর। আজ আমি ফর্স্টার বা হাক্সলের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনায় ভয় পাই, কাল অনুরূপ আশঙ্কার কারণ হবেন হিন্দী সাহিত্যের কর্ণধারগণ।

টোকিওর পি ই এন কনফারেন্স থেকে ফিরে এলে অন্নদাশংকরকে জিজ্ঞাসা করব, তিনি অ্যাংগাস উইলসন, জর্জ মাইকস বা স্টিফেন স্পেণ্ডারের সঙ্গে কী আলোচনা করলেন—হাংগেরি ছাড়া, যেটা রাজনীতি। শেষোক্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কলকাতায় দেখা হয়েছিল। আলোচনার বিষয় আমি সযত্নে অসাহিত্যিক রেখেছিলাম।—যথা, কলকাতায় বড় গরম।

সিরিয়ার গভর্নমেণ্ট কম্যুনিস্টদের হাতে চলে গেছে, সিরিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে—এই রব তুলে কিছুকাল বিলাতী ও মার্কিন কাগজে যেসব খবর বেরোয়, পরে দেখা গেছে যে তার অনেকাংশ অসত্য বা অতিরঞ্জিত। এর ফল হয়েছে এই যে প্রোপাগাণ্ডাবাজরা নিজেদের অস্ত্রেই নিজেরা কিছুটা ঘায়েল হয়েছে। অবস্থা এমন হয়েছে যে মার্কিন হস্তক্ষেপ আসন্ন—এই একরকম একটা ধারণা সৃষ্টির জন্য কতকগুলি বিলাতী ও মার্কিন কাগজের সংবাদদাতারা অনেকাংশে দায়ী। তার ফল হোল এই যে, আমেরিকা তথা পশ্চিমা ব্লকের প্রতি সিরিয়ার মন আরো বিরূপ ও সন্দেহাকুল হোল যাতে আমেরিকা সত্যসত্যই সিরিয়ার বর্তমান গভর্নমেণ্টের উচ্ছেদ করে সেখানে মার্কিনের তাঁবেদার গভর্নমেণ্ট বসাবার ষড়যন্ত্র করছে—এই ধারণা প্রচারের সুযোগ হোল।

সিরিয়াকে একটা বড়ো রকম অর্থনৈতিক সাহায্য দেবার চুক্তি সোভিয়েট করেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া যাবে। কিন্তু সেটা কিছু নূতন নয়, এর আগে থেকেই সিরিয়া সোভিয়েট ব্লক থেকে অস্ত্র-শস্ত্র আমদানী করছিল। যেটা সত্যসত্যই উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে সোভিয়েটের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক সাহায্য। সেটা এতই বেশি যে, তার সামনে আইসেন-হাওয়ার ডকট্রিন দাঁড়াতেই পারে না। আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন যারা মেনে নিচ্ছে তাদেরও কিছু কিছু অর্থনৈতিক সাহায্য পাবার আশা আমেরিকা দিয়েছে কিন্তু তার পরিমাণ সোভিয়েট সিরিয়াকে যে-সাহায্য দিতে চেয়েছে তার তুলনায় নগণ্য। তাছাড়া, আইজেনহাওয়ার ডকট্রিন মেনে নেওয়ার মানেই হচ্ছে নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করে কম্যুনিস্ট-বিরোধী জোটে যোগ দেওয়া। অপরপক্ষে, সোভিয়েটের অর্থনৈতিক সাহায্যদানের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কোনো রাজনৈতিক বা সামরিক বাঁধাধরা শর্ত যুক্ত নেই। যে-রকম সাহায্য সোভিয়েট সিরিয়াকে দিচ্ছে তাতে সিরিয়ার মন সোভিয়েটের অনুকূল নিশ্চয়ই হবে কিন্তু সিরিয়া কম্যুনিস্টদের হাতে গেল বা সোভিয়েটের তাঁবেদার বনে গেল—একথা বল্লে সিরিয়াকে কেবল চটানো হবে এবং তার ফলে আমে-রিকা যা চায় না তাই আরো বেশি করে হবার, অর্থাৎ সিরিয়ার উপর সোভিয়েট প্রভাব কায়েম হবার সম্ভাবনা বাড়বে।

আমেরিকা এদিক দিয়ে বোধহয় হাল ছেড়ে দিয়েছে। আইজেনহাওয়ার ডকট্রিনের দৃষ্টিকটুতা কমাবার জন্য তার প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বাধানিষেধ রাখা হয়েছে। কোনো রাষ্ট্রের উপর যদি বাইরে থেকে কম্যুনিস্ট সামরিক আক্রমণ হয় তবে তার রক্ষার জন্য আমেরিকা স্বীয় সামরিক বল নিয়ে অগ্রসর হতে পারে কিন্তু ভিতর থেকে যদি কোন রাষ্ট্র কম্যুনিস্টকবলিত হবার জোগাড় হয়—যাকে 'সাবভার্শন্' আখ্যা দেওয়া হয়েছে—তাহলে মার্কিন হস্তক্ষেপ চলবে যদি বিপন্ন গভর্নমেণ্ট মার্কিন সাহায্য চায় কিন্তু যদি তা না চায় তবে মার্কিন হস্তক্ষেপ আইজেনহাওয়ার ডকট্রিন সম্মত হবে না।

এইজন্যই যেনতেন প্রকারেণ যদি এমন একটা গভর্নমেণ্ট খাড়া করা যায় যে, বাইরের বা ভিতরের চাপ অনুভব করলেই মার্কিন সামরিক সাহায্য চাইবে তাহলেই আইজেনহাওয়ার ডকট্রিনের অবাধ প্রয়োগ সম্ভব। সিরিয়ায় একটা গোলমাল বাধিয়ে বর্তমান গভর্নমেণ্টের জায়গায় আর একটা গভর্নমেণ্ট খাড়া করতে পারলে তাদের 'আমন্ত্রণে' সিরিয়ায় সৈন্যসামন্ত ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হোত (যেমন কাদার গভর্ন-মেণ্টের 'আমন্ত্রণে' 'সোভিয়েট বিপ্লব' থেকে সোভিয়েট সমরবাহিনী হাঙ্গারীকে 'রক্ষা' করেছিল)। সিরিয়া কম্যুনিস্ট হয়ে যাচ্ছে, এই রব তুলে কয়েক সপ্তাহ পূর্বেকার প্রোপাগাণ্ডা যখন চলে তখন বোধহয় সেই-রকম কিছু একটা করার সম্ভাবনা আছে বলে অনেকে ভেবেছিল। সেদিকে চেষ্টাও কিছু হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু পরে বুঝা গেছে যে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়।

কিন্তু মুশকিল এই যে, মার্কিন কূট-নীতি ও প্রোপাগাণ্ডা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে এখন আমেরিকাকে এই ভিত্তির উপরই চলতে হবে যে সিরিয়া কম্যুনিস্ট আওতায় চলে গিয়েছে। সুতরাং এখন আমেরিকা জোর দিচ্ছে সিরিয়ার প্রতিবেশীদের উপর। তুর্কিতো NATO এবং বাগদাদ প্যাক্টের মধ্যে আছেই। ইরাক বাগদাদ প্যাক্টের মধ্যে। জর্ডন এবং লেবানন আইজেনহাওয়ার ডকট্রিন মেনে নিয়েছে। লেবাননে পশ্চিমা ব্লকের প্রভাব মোটের উপর দৃঢ়মূল। ভয় বেশি জর্ডানকে নিয়ে। রাজা হুসেনের সিংহাসন মার্কিন জোরে এখনো টিঁকে আছে। কিন্তু তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সুতরাং আরো জোর দিতে হবে। তাই উড়ো জাহাজে ট্যাঙ্কের বহর এসে নামছে। উদ্দেশ্য দৃশ্যত সিরিয়া থেকে জর্ডানের ভয় নিবৃত্তি কিন্তু আসলে বোধ-হয় সিরিয়াকে ভয় দেখানো এবং আইজেন-হাওয়ার ডকট্রিনের আওতায় আর যে-সব গভর্নমেণ্ট এসেছে তাদের আশ্বস্ত করা—বহির্বিপদ থেকে ততটা নয় যতটা অন্ত-র্বিপদ থেকে।

কিন্তু আইজেনহাওয়ার ডকট্রিনের বিপদ হবে যদি সিরিয়া সামরিক ভয়ের কথা না ভেবে, অস্ত্রপাতি বাড়াবার দিকে মন না দিয়ে সোভিয়েট থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক সাহায্যের দ্বারা জাতির জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করে চলে। তাহলে সিরিয়ার অবস্থা

দেখে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণের মন আরো চঞ্চল হয়ে উঠবে কারণ তথাকথিত সামরিক নিরাপত্তার উপর জোর দিতে গিয়ে এইসব রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত না হয়ে পারবে না।

আমেরিকার ভরসা এই যে, মধ্যপ্রাচ্যের যেরূপ আবহাওয়া তাতে সিরিয়ারও অস্ত্রপাতির দিকে ঝোঁক না থেকে পারবে না। সুতরাং সোভিয়েট সাহায্যের পুরো অর্থনৈতিক সুবিধা সে আদায় করতে পারবে না। অবশ্য সোভিয়েটও যে নিছক মানবপ্রেমের তাগিদে সিরিয়াকে এতো বেশি অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে আসছে তা নয়। আমেরিকাকে সিরিয়াতে ঢুকতে না দেওয়াই সোভিয়েটের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সিরিয়ার চারদিকে যদি কম্যুনিস্ট-বিরোধী সামরিক ঘাঁটি দৃঢ় হতে থাকে তবে সিরিয়াতেও তার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। সুতরাং সিরিয়াতে অস্ত্রের আমদানী চলতে থাকবে।

* * *

ওমানের ব্যাপারে সিকিউরিটি কাউন্সিলে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট মোকদ্দমা ধামা চাপা দিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্টের জবাব ধাপ্পা ছাড়া কিছু ছিল না। মস্কটের 'স্বাধীন সার্বভৌম' সুলতানের অনুরোধে বৃটিশ সামরিক সাহায্য দিতে বাধ্য হয়েছে—এর চেয়ে বড়ো ধাপ্পাবাজি যে আর কিছু হতে পারে না সেটা সুলতানের 'স্বাধীনতার' বহর একটু পরীক্ষা করলেই বুঝা যায়। আসলে সুলতানের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নেই। সুলতানের 'স্বাধীনতার' কয়েকটা নমুনা দেওয়া যায়। ১৮৯১ সালে সুলতান বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সংগে একটি সন্ধি করেন, এই সন্ধি ১৯২৯ সালে আবার নূতন করে স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে সুলতান মস্কট, ওমান অথবা তাঁর অধীন অন্য কোনো অঞ্চলের কোনো অংশ বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ছাড়া আর কারো কাছে বিক্রি করতে বা হস্তান্তর করতে পারবেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে সুলতানের গভর্নমেণ্টের প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ছিলেন একজন ইংরেজ—বারট্রাম টমাস। বর্তমান সময়ে সুলতানের পররাষ্ট্রদপ্তরের মন্ত্রী একজন ইংরেজ, প্রধান সেনাপতিও একজন ইংরেজ। মস্কটে কোনো বৃটিশ প্রজাকে বিচার করার অধিকার সুলতানের নেই, শুধু বৃটিশের নয় অন্য কোনো খৃষ্টান জাতির লোকদের বিচার করার অধিকারও সুলতানের নেই, এমন কি এদের অখৃষ্টান ভৃত্যদের বিচারও সুলতান করতে পারেন না। মস্কটের ডাক বিভাগ বৃটিশদের হাতে—ডাক টিকিটে রানী এলিজাবেথের ছবি। এই হচ্ছে 'স্বাধীন সার্বভৌম' মস্কট।

মৎস্যজীবী সমবায় পরিকল্পনার উদ্বোধন সভায় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, ১৫।২০জন মৎস্যজীবীর একটি চক্র আছে—তাহারাই মুনাফা লুটিতেছে এবং তাহাদের জন্যই বাজারে মাছের দর এত চড়া হইতেছে। মাত্র ১৫।২০ জনের এই 'চক্র' প্রতিরোধ করা কি এতই অসম্ভব—এই কথা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বাটখারা দিয়ে সংখ্যার বিচার করলে ভুল হবে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী নাকি বঙ্গ বিজয় করেছিল"!!

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম বাজারে আটার অভাব নাই কিন্তু তা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মিলে না। সংবাদে বলা হইয়াছে—সরকারী শৈথিল্যই ইহার কারণ বলিয়া তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। শ্যামলাল বলিল—"শুধু তথ্য কেন, তত্ত্বাভিজ্ঞদের ধারণাও তাই"।

* * *

ভারত বণিক সমিতি এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন—সরকারী চাউল আটকের নীতিতে মিলমালিকরা হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছেন। —"আবার ওদিকে মিল-মালিকরা যখন চাল গুদোমজাত করে রাখার নীতি পালন করেন তখন জন-সাধারণের পিলে স্থানচ্যুত হয়ে গেল"—বলে শ্যামলাল।

* * *

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন যে খাদ্য সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভই আমাদের প্রধান কর্তব্য। আমাদের

জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—" বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার"!

* * * *

আয়কর ফাঁকিরোধে গোপনীয়তার আবরণ ছিন্ন করা সম্ভব হইবে বলিয়া অর্থমন্ত্রী মহাশয় আশ্বাস দিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"মন্ত্রী মশাই ডালে ডালে ফেরার কৌশল আয়ত্ত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারেন; কিন্তু পাতায় পাতায় ফেরার টেক্‌নিকই আলাদা"।
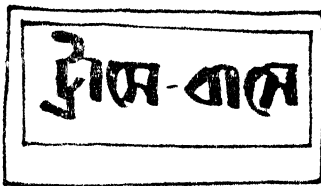
* * *

লোকসভায় আমাদের পররাষ্ট্র নীতি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"পররাষ্ট্র নীতি

সম্বন্ধে আমরা চিরকালই এক মত। মুশকিল শুধু এই স্ব-রাষ্ট্র নীতি নিয়ে। এক্ষেত্রে পথেরও অন্ত নেই, মতেরও অন্ত নেই"।

* * * *

লোকসভার কতিপয় সদস্য শ্রীযুক্ত নেহরুকে নাকি অনুরোধ করিয়াছেন যে ১৯৯০ সালের আগে যেন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা না হয়। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এত দিনকা পর সুবুদ্ধির উদয় হুয়া হ্যায়"!!

* * *

আচার্য বিনবা ভাবে নাকি বলিয়াছেন যে মেয়েদের গহনাই তাঁদের সর্বনাশের কারণ; গহনার প্রতি দুর্বলতা তাঁদের জয় করিতে হইবে। —"আমরাও তাহলে সর্বনাশের হাত থেকে বেঁচে যাই। হাতের নোয়া দিতে আর ভাতকাপড় প্রদানং স্বাহা করতেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে"—মন্তব্য করিলেন অন্য সহযাত্রী।

* * * *

দিল্লীতে কয়জন মেয়ে-পকেটমার ধরা পড়িয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। বিশুখুড়ো বলিলেন—"ধরা না পড়ে কি উপায় আছে? মালক্ষ্মীরা বুঝতে পারলেন না, ঘরের নাথের পকেট আর রাস্তার অ-নাথের পকেটমারা এক কথা নয়"!!

* * *

গান ও কবিতার মাধ্যমে স্বল্প আয় সঞ্চয় পরিকল্পনাকে লোকপ্রিয় করার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। "যাঁদের সঞ্চয়ের প্রশ্নই ওঠে

না তাঁরাও এই ব্যবস্থায় গাইতে পারবেন—মিছে তুই ভাবিস মন, তুই গান গেয়ে যা আজীবন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * * *

পাকিস্তানে নাকি অতিরিক্ত রক্তচাপ ও মনোবিকারের একটি দাওয়াই আবিষ্কার করা হইয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"সরকারী মহলে দিয়ে থুয়ে সাধারণের ভাগে এই দাওয়াই কতটা পড়বে তা বলা শক্ত"!

* * *

এক সংবাদে শুনিলাম দুইজন রেল-যাত্রীকে নাকি শোনপুর স্টেশন হইতে পার্শেলে বুক করা হইয়াছিল। —"রেলযাত্রীরা আজকাল যেভাবে রেল ভ্রমণ করেন তাতে তাদের মাল ব'লে বুক্ করা এমন কিছু মারাত্মক ভুল নয়"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় নেহরুজী নাকি রহস্যচ্ছলে মন্তব্য করিয়াছেন যে, আমরা খাদ্যের চেয়ে সন্তান উৎপাদনই বেশি করিতেছি। বিশু খুড়োও রহস্যচ্ছলে মন্তব্য করিলেন—"তার কারণ সন্তান উৎপাদনের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকীর ওপর নির্ভর করতে হয় না, ওটা কোটি কোটি বার্ষিকীর বনেদের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত—সুতরাং"!!

চক্রদত্ত

ভারতবর্ষে নতুন তেলের খনির সন্ধান-কার্য চালান হচ্ছে। নতুন খনি খ‍ুঁজে বার করবার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। আর মধ্যে এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা হচ্ছে। ভূতত্ত্ব পদ্ধতি। যে সমস্ত পাহাড়ের পাথর খোলা জায়গায় বৃষ্টি এবং হাওয়ার মধ্যে পড়ে থাকে তাদের একটা মানচিত্র তৈরী করতে হবে। এর পর এইসব পাথর-গুলোকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, এদের গা দিয়ে কোনরকম তৈলাক্ত বস্তু চোঁয়াচ্ছে কিনা। যদি চোঁয়াতে দেখা যায় তাহলে ধরে নিতে হবে যে, সেখানে তেল পাওয়া যাবে। এই পরীক্ষার কাজে এখন উড়ো জাহাজ ব্যবহার করা হয়।

এরপর ভূপদার্থ পদ্ধতি—যদি ঐসব পাথরে ওপর থেকে তৈলের কোনও চিহ্ন না পাওয়া যায় তাহলে পাথরগুলো থেকে কিছু কিছু অংশ কুরে নিয়ে সেই অংশগুলি ভূপদার্থবিদ্‌গণ পরীক্ষা করে বলে দিতে পারবেন যে, ঐসব স্থানে তেল পাওয়া সম্ভব কী না। এছাড়া আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপক পদ্ধতি—পাথরের নীচে বিভিন্ন স্তরে আপেক্ষিক গুরুত্ব পরি-মাপ করে বিশেষজ্ঞরা অনেক সময় মাটির নীচের তেলের সন্ধান পেতে পারেন। তবে এ নিয়ম খুব বেশী কার্যকরী হয় না। আর একটি সহজ উপায় আছে। মাটির মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে কম্পনের সৃষ্টি করা হয়, ফলে মাটির স্তরে ফাটল ধরে এবং মাটির নীচে তেল থাকলে ঐ ফাটলের পথে বার হয়ে আসতে পারে। কিন্তু এই উপায়ে কাজ করান সর্বদা সম্ভব হয় না। এর পরিবর্তে পৃথিবীর নীচের স্তরে সহসা আঘাত দিয়ে কম্পনের সৃষ্টি করেন আর ওপরের স্তরে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে থাকেন। কতটা সময়ের মধ্যে এবং কী ভাবে শব্দ তরঙ্গ নীচের স্তরে যাচ্ছে তা লক্ষ্য করেই মাটির স্তরের তারতম্য বুঝতে পারেন এবং মাটির নীচে তেল পাওয়া যেতে পারে কিনা তাও জানতে পারেন। চুম্বকের সাহায্যেও এইসব কাজ করা সম্ভব হয়। খুব বড় একটি চুম্বক পাথরের ওপর বসিয়ে রাখলে ঐ চুম্বক পাথরের নীচের তেল টেনে ওপরে আনতে পারে। এই ব্যবস্থাতেও অসুবিধা আছে। সব পাথরেই একরকম আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না। পাথরের তারতম্য অনুসারে চুম্বকের আকর্ষণের তারতম্য ঘটে। এমন কি কোনও কোনও পাথরের ওপর চুম্বকের আকর্ষণও ঘটে না। এই সমস্ত ব্যবস্থার যে কোনও একটি অবলম্বনে তেলের খনির সন্ধান পাওয়া গেলে তারপর গর্ত করার কথা ভাবতে হবে। ছুতোরেরা যেমন ভোমরা দিয়ে কাঠের ওপর গর্ত করে সেইভাবে জমির ওপরও গর্ত করতে হবে। কাঠের ওপর মাত্র কয়েক ইঞ্চি গর্ত করেই কাজ চালান যায় কিন্তু এক্ষেত্রে বেশ কয়েক হাজার ফুট গভীর গর্ত করতে হবে। গর্ত করার যন্ত্রটির ধারাল অংশটি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকা দরকার। ঐ অংশের ধার সব সময় খুব তীক্ষ্ণ থাকা দরকার আর ঠাণ্ডা রাখাও প্রয়োজন। গর্ত খোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বালি, মাটি, পাথরগুলো সযত্নে লক্ষ্য করা হয়, কারণ জমির নীচের ঐগুলির পরীক্ষা করলেই বোঝা যায় যে, তেলখনির কতটা কাছ পর্যন্ত গর্ত খোঁড়া হয়েছে। তেলের খনির খুব কাছাকাছি আসামাত্র খোঁড়ার যন্ত্রটি উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং তখন ছয় ইঞ্চি থেকে নয় ইঞ্চি মোটা একটি পাইপ খাদের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হয় আর ঐ পাইপের মধ্যে দিয়ে সিমেণ্ট ঢেলে কুয়োটিকে পাকা করে ফেলা হয়। যদি কোনও কারণে তেল ওপর দিকে না ওঠে তাহলে কিছুটা এ্যাসিড্ কুয়োর মধ্যে ঢেলে দিলে নীচের স্তরে পাথরগুলি গলে নরম হয় আর তখন অতি সহজেই তেল ওপর দিকে উঠে আসে। তেল উঠতে আরম্ভ করলে ঐখান থেকে খাল খ‍ুঁড়ে পরিস্রুত করার জন্য কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ স্থানে বিভিন্ন কার্যে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন রকমভাবে তেল পরিশোধনের ব্যবস্থা করা হয়।
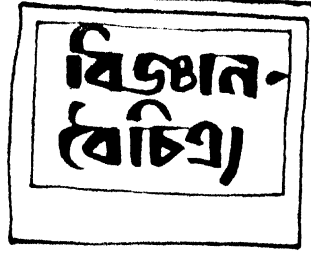
•

আজকালকার দিনে সৌরশক্তির সাহায্যে বহু কাজের ব্যবস্থা হয়েছে। সূর্যের রশ্মির সাহায্যে রান্না করার ব্যবস্থাও আজকাল হয়েছে। কোনও একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম সূর্যরশ্মি থেকে তাপ সংগ্রহ করে তাদের অফিস ঘরটি গরম রাখার ব্যবস্থা করেছে। সাধারণ শার্সির কাঁচের বদলে তারা এমন এক ধরনের কাঁচ ব্যবহার করছেন যাতে সূর্যের রশ্মি থেকে সংগৃহীত তাপ কাঁচের মধ্য দিয়ে গিয়ে বাড়ির চারিধারে রক্ষিত জলের পাইপটি গরম করতে পারে। এই-ভাবে জলের পাইপটি প্রায় ১৫০ ডিগ্রী পর্যন্ত গরম করা সম্ভব হয়। তারপর ঐ গরম জল আরও অন্যান্য পাইপ দিয়ে অফিসের সমস্ত ঘরে সরবরাহ করা হয়। কিছুটা গরম জল বাড়ির নীচে একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে সংগ্রহ করে রাখা হয়। যেসব দিনে সূর্যের তাপ থাকবে না সেইসব দিনে ঐ সংগৃহীত গরম জলই ঘরে ঘরে সর-বরাহ করা হবে। আবার প্রয়োজনের সময় বাড়িটিকে ঠাণ্ডা রাখতে হলে একটি পাম্পের সাহায্যে গরম জল থেকে তাপ বার করে নেওয়া হয়।
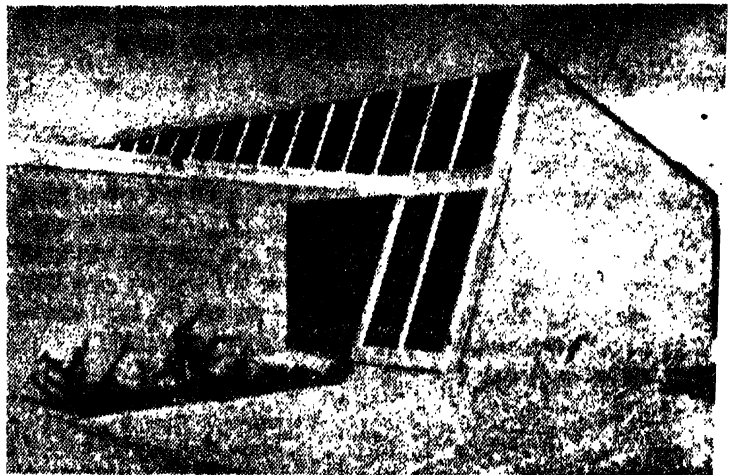
ঘর গরম রাখার উপযোগী নতুনরকম শার্সির কাঁচ

উপন্যাস

অন্তঃশীলা। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। খাক; ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা। সাড়ে তিন টাকা।

অন্তঃশীলা ধূর্জটিপ্রসাদের তিন খণ্ডে রচিত একটি অনন্যসাধারণ উপন্যাসের প্রথম খণ্ড। বছর বিশ আগে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকাল পরে উদ্যোগীজনের চেষ্টায় সম্প্রতি অন্তঃশীলা পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে। আশা করা যায় অপর খণ্ড দুটিও প্রকাশিত হবে।

ধূর্জটিপ্রসাদের মুখ্য পরিচয় চিন্তাশীল পণ্ডিত প্রাবন্ধিক হিসাবে। অন্তত নতুন যে পাঠক-সমাজ গত দশ পনেরো বছর যাবৎ বাঙলা সাহিত্যের আসরে ভিন্ন রুচি, বোধ এবং অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হাজিরা দিতে শুরু করেছেন, তাঁদের কাছে ঔপন্যাসিক ধূর্জটিপ্রসাদের অস্তিত্ব হয়ত লোক পরম্পরায় শ্রুত কিন্তু পঠন দ্বারা স্বীকৃত অথবা গৃহীত নয় বললে অত্যুক্তি হয় না। অন্তঃশীলা পুনঃ প্রকাশের ফলে উক্ত পাঠক সমাজ লাভবান হবেন।

ধূর্জটিপ্রসাদ, বলা বাহুল্য, অধীত বিদ্যা এবং চিন্তা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা যে ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছেন ও মননকর্মের শিল্পী হতে তাঁর রচিত উপন্যাসের ধরণটি যে প্রবহমান বাংলা উপন্যাসের ধারা থেকে কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন হবে তা স্বাভাবিক। 'অন্তঃশীলা' কিংবা 'আবর্ত' ও 'মোহনা' প্রকৃতপক্ষে কিঞ্চিৎ নয়, উপরন্তু অনেকটাই পৃথক—বাংলা উপন্যাসের সাধারণ স্রোত থেকে। প্রধানত এই কারণেই উপন্যাসটি যোগ্য পাঠককে আকর্ষণ করবে।

দ্বিতীয়ত মর্ম। ধূর্জটিপ্রসাদের পূর্বে অন্য কোনো লেখক কাহিনী-বৃত্তের প্রতি মমতা এবং মোহবন্ধ না হয়ে উপন্যাসের বয়ন-রীতিতে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন বা করতে আগ্রহী হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও অন্নদাশংকরকে এ-প্রসঙ্গে ব্যতিক্রম বলে ধরে নিচ্ছি। ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসের ফর্মের এই বৈশিষ্ট্য ও বাংলা সাহিত্য পাঠকের আগ্রহের বিষয় হবে বলে মনে করি।

তৃতীয়ত লিখন ভঙ্গি। ধূর্জটিপ্রসাদের লিখন ভঙ্গি বা রীতি বিদগ্ধজনোচিত। ক্ষুরধার, সংযত, অন্তর্ভেদী, উচ্ছ্বাসশূন্য।

চতুর্থত বক্তব্য। সংকীর্ণ অর্থে বক্তব্য এক জিনিস বৃহৎ অর্থে অন্য। আধুনিক শিক্ষিত মননশীল বুদ্ধিবাদী ব্যক্তি বিশেষ স্বীয় জীবনের তাৎপর্য ও জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হলে যে দুঃসহ, জটিল, বহু খণ্ড-সমস্যার আবর্তে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ওঠে—খগেনবাবু মারফৎ ধূর্জটিপ্রসাদ তেমন একটি ব্যক্তির প্রশ্ন, দ্বিধা, সমস্যা ও মানস জটিলতাকে রূপ দিতে চেয়েছেন। "অন্তঃশীলার" খগেনবাবু অসমাপ্ত, যদিচ অপ্রাপ্ত বয়স্কের মত অপরিণত নন। খগেনবাবুকে অনুভব করতে হলে অপর দুটি খণ্ড পড়ার প্রয়োজন অবধারিত। অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে রমলা এই কাহিনীর দ্বিতীয় মুখ্য চরিত্র যার ভূমিকা 'অন্তঃশীলায়' প্রবল-ভাবে বোধ করা যায়, কিন্তু পরিণতি কল্পনা করা যায় না।

ব্যক্তির অস্তিত্ব কিছু দৈহিক কিছু মানসিক। কোনো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে মানসিক অস্তিত্বটাই এত বেশি যে হাত পা নাড়া বা বিছানায় শোওয়া ইত্যাদি কতকগুলি প্রয়োজনীয় ও অভ্যাসবদ্ধ কর্ম ছাড়া আর কিছু দৈহিক অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। খগেনবাবুকে সেই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দান করতে গিয়ে লেখক যে পরিমাণ অন্তর্বর্ণনা ও মনন সূক্ষ্মতার প্রতি নজর দিয়েছেন তা স্বাভাবিক ও সঙ্গত হলেও বেশি সংখ্যক পাঠকের পক্ষে স্বাদু নয়।

না হোক। ক্ষতি নেই। স্বাদু উপন্যাস বাংলা ভাষায় রচিত হচ্ছে এবং হবেও—অগণিত পাঠক তাতে রস পাবে। অল্প কিছু পাঠকের জন্য, ঈশ্বর সহায় হোন, ধূর্জটিপ্রসাদ অন্তঃ-শীলার পরের দুটি খণ্ড পুনরায় প্রকাশ করতে উদ্যোগী হন—এবং সম্ভব হলে এই পরিণত বয়সে আর কিছু রচনা করুন, যার দ্বারা কিছু কিছু পাঠক লাভবান হন।

প্রবন্ধ-সাহিত্য

বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩.২৫।

তরুণ অধ্যাপক হিসাবে ইতিমধ্যেই আলোচ্য লেখক প্রখ্যাতি লাভ করেছেন। তাছাড়া গবেষকরূপে তাঁর পরিচয় আমাদের অবিদিত নয়। বাংলা গদ্যের গঠনভূমি পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি একটি সার্থক ধারা-বাহিকতা রক্ষা করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ভাব-পথ যাঁরা খনন করেছিলেন, ভাষা-পথ রচনা করার ক্ষেত্রেও তাঁদের দান অবিস্মরণীয়। আবার রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের পাশে নিঃশেষ গদ্য শিল্পীর আসন যাঁদের সেই লেখকেরাও এঁর মনোযোগ এড়ায়নি। বীরবলের গদ্য সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধটি আমাদের নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে। ফরাসী গদ্যের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর রচনা-রীতি কোনখানে আত্মীয় সেই সম্বন্ধের মূল সূত্রটি তিনি দৃষ্টান্ত সহ উপস্থাপিত করেছেন। 'বাংলা গদ্যের শিল্পি সমাজ' রচনাকালে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা সুপরিচ্ছন্ন এবং চিন্তন-শাণিত। এই গ্রন্থের পাঠক-সমাজ সুনিশ্চিত। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সেই নিশ্চিতির একটি ছাড়পত্র, সন্দেহ নেই। (৩৮২।৫৭)

কবিতা

অজ্ঞাতবাস—শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : তারাপদ রায়, পূর্বমেঘ প্রকাশ ভবন। ৩৬, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯। মূল্য দু' টাকা।

'অজ্ঞাতবাস' প্রকাশিত হবার আগেই শংকরা-নন্দের কবিতা আমাদের নামসূত্রে আকর্ষণ করেছে। গ্রন্থস্থ কবিতাবলীতে তাঁর কবি স্বরূপের যে উদ্ভাসন দেখা গেল তা অভিনন্দিত হবার যোগ্য। বিচিত্র কুন্দনের সংগ্রহে তিনি সিদ্ধকাম, অথচ ভারাক্রান্ত হতে তাঁর সম্মতি নেই। জীবনের প্রবাহে তিনি স্নাত এবং একটি বিশেষ দার্শনিক ধারণায় উপনীত। 'ভালো লাগা' 'তুমি আমি ইত্যাদি' 'এক ঘরে' প্রভৃতি কবিতায় কবির সেই মহাশ্চর্য সমবেদনা যা তাঁকে 'উল্লেখযোগ্য' নামাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত করে। 'পুনশ্চ' কবিতার চতুর্দশপদী পরিসরে তাঁর জীবন-দর্শন একটি অনিন্দ্য সুন্দর শিল্প-রূপে সমাদৃত। 'অশেষ' কবিতাটিতেও তাঁর বক্তব্যের অভিব্যঞ্জনা আমাদের মুগ্ধ করে। এই কাব্যগ্রন্থের সর্বশেষ সমাদর একান্ত কাম্য। (৩৯১।৫৭)

কাব্য-বিচার

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী (দ্বিতীয় প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬৪)—অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি লাইব্রেরী, ১০-বি কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য দুই টাকা।

কবি ও অধ্যাপক, একজন অন্তর্মুখী ও অন্যজন বহির্মুখী হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ বিভূতি উভয়েরই জাতিলক্ষণ। যিনি অমিয়রতনের মতো একাধারে কবি ও অধ্যাপক, তাঁর কাছে স্বভাবতই আমাদের প্রাপ্য ও প্রাপ্তি অপরিসীম। দুটি এখানে একই সঙ্গে যুক্তিশাসিত ও রসাশ্রিত। সমালোচনার এই পথ রবীন্দ্র-কথিত। অমিয়রতন তাঁর তথ্যভেদী অন্ত-র্দৃষ্টির সহায়ে এই পথের সুসিদ্ধ সম্ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থ সূচনায় 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের যে সংকেতসার গ্রথিত হয়েছে, যে কোনো অসাবধানী পাঠককেও তা রবীন্দ্র ভাবনায় সচেতন করবে। 'সোনার তরী'র কবিতাবলীর ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে তিনি আমাদের 'সাবজেকটিভ' সমালোচনার অন্যতম প্রণালী এবং আধুনিক আমেরিকায় প্রবর্তিত বিশ্লেষণী রীতি, দুয়েরই সমন্বিত সাফল্য অমিয়রতন উপনীত। সমস্ত কবিতার সত্ত্ব ও রীতি, অন্তঃকরণ ও অলংকরণ, কোনোটিই তাঁর দিদৃক্ষা এড়িয়ে যেতে পারেনি। অমিয়রতন দার্শনিক ভূমিকায় ভারত পথিক এবং অদ্বৈত ও দ্বৈত সাধন পন্থার ফল-শ্রুতিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্তভাবে দেখেছেন। তাঁর এই সুন্দর অতীপ্স সাধন-সাহিত্য ও সাহিত্য-সাধনা দুটিকেই একবৃন্তে ধরতে পারে। তাঁর ভাষা কবিতা ও সমালোচনার নিসর্গদৃষ্টিকে সমীকৃত করেছে। পাঠক প্রথমে মুগ্ধ হয়, পরে সেই আবিষ্টতা তাঁকে বিচারবোধে উদ্বুদ্ধ করে এবং পুনরাবৃত্ত মুগ্ধ প্রত্যয়ে লেখককে অভিনন্দিত করবার জন্য ব্যগ্র হয়। অমিয়-রতনকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন ও স্বাভাবিক প্রত্যাশা জ্ঞাপন করি।

(২২৪।৫৭)

অনুবাদ-সাহিত্য

বসন্ত-প্লাবন—ই স তুর্গেনেভ। অনুবাদক : সরোজকুমার দত্ত। প্রকাশক : ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানীর পক্ষে দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৬৪-এ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য—দুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

তুর্গেনেভের এই গ্রন্থের অনুবাদে সরোজ-কুমার দত্ত অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর ভাষাবোধ এবং বিষয়বোধ সমধিক প্রশংসার্হ। ভূমিকায় লেখক যে ইতিহাস লিখেছেন তার মূল্য স্বীকার্য। এঁর কাছে অধিকতর আশা সমীচীন। সূর্য রায়ের প্রচ্ছদশিল্প অনিন্দ্য-সুন্দর।

(৩৮৪।৫৭)

কথাগুচ্ছ—পুশকিন। অনুবাদক : সুনীল ভট্টাচার্য। প্রকাশক ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানির পক্ষে দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৬৪-এ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য—তিন টাকা।

'কথা গুচ্ছে'র অন্তর্ভুক্ত চারটি গল্প রুশ সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। [illegible] গল্পগুলোর ভাষান্তর করে একটি দায়িত্ব পালন

করলেন। রুশ ভাষায় তাঁর প্রবেশ সর্বশেষ প্রশংসনীয়। বলা বাহুল্য, তাঁকে আমরা উক্ত ভাষার আরো বিবিধ উজ্জ্বল রত্নাবলীর সঙ্গে আমাদের পরিচিত করিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করবো। সূর্য রায়ের চিত্রাঙ্কণ প্রশংসার্হ। ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানীর উদ্যম যে ধন্যবাদার্হ তাতে সন্দেহ নেই। (৩৮৫।৫৭)

বেন হুর—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—দেব সাহিত্য কুটির, ২২।৫বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯, মূল্য দেড় টাকা।

জানি না পুস্তকখানি কতদূর মূল গল্পাংশের অনুসরণ করেছে। পড়ে মনে হয় ভাবানুবাদ। সৌরীন্দ্রবাবু অভিজ্ঞ সুলেখক, কাজেই এই সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের ঘটনা ও চরিত্র সন্নিবেশে যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে পুস্তকটিকে বালক-বালিকাদের কাছে লোভনীয় করে তুলেছেন। আখ্যান ভাগ সাবলীল-গতিতে পরিণতির দিকে ছুটে চলেছে। ছাপা কাগজ ভাল। পুস্তকটি প্রকাশকের সুনাম বর্ধিত করবে। একেবারে হুবহু অনুবাদের চেয়ে এই ধরনের ভাবান্তর সাধন বেশী উপভোগ্য হয়। ৪০৯।৫৬

বিক্রমোর্বশী—মহাকবি কালিদাস, অনুবাদ শ্রীগুড়রাম ভট্টাচার্য অরুণা প্রকাশনী, ৬।১, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। তিন টাকা।

এই লেখকেরই অনুবাদ "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" তিনটি সংস্করণের দ্বারা পাঠক-সমাজের অনুমোদন লাভে সমর্থ হয়েছে। মহাকবির এই পুস্তকটির পদ্যানুবাদ এই প্রথম এবং এই দুরূহ কাজটি লেখক তাঁর কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। শব্দ ও ছন্দের গাম্ভীর্য, শ্লেষযমক, প্রসাদগুণ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার ও সাহিত্যের যা কিছু বৈশিষ্ট্য অনুবাদের মধ্যেও তার আভাস পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত থেকেই তা বোঝা যাবে।

নিতম্বতটে মঞ্জু মেখলা
মণিমালা গ্রীবামূলে—
যৌবন সুরা উচ্ছল চারু অঙ্গে,
ফিরে দেবনটী নন্দনারামে
সন্ধ্যার উপকূলে
চরণ-নূপুরে শিঞ্জিত রসরঙ্গে।

মহারাজ পুরূরবা এবং শাপভ্রষ্টা স্বর্গ-নর্তকী উর্বশীর অমর প্রেম কাহিনী বিচিত্র ছন্দে রূপায়িত হয়ে পাঠকের চিত্তে অপূর্ব রসাভাসের সঞ্চার করে। আশা করি লেখক মহাকবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির অনুবাদেও উদ্যোগী হবেন। পুস্তকটি বহু সুন্দর চিত্রে সুশোভিত, ছাপা ও বাঁধাই নয়নাভিরাম।
৭৭।৫৭

বিবিধ

বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে স্মরণীয় যাঁরা (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীখেলোয়াড়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। দাম—তিন টাকা আট আনা।

অধুনা বাংলা সাহিত্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য বাড়ছে। নানা ধরনের পাঠকের রকমারি পছন্দের সঙ্গে সাম্য রেখে বহুমুখী বইয়েরও অভাব নেই আজকাল। ক্রীড়ারস আহরণের জন্য ক্রীড়ামোদীরা যেমন ময়দানের তৃণময় ক্রীড়াভূমির দিকে অগ্রসর হন,—চলচ্চিত্রের মায়াবী পর্দায় যেমন খেলাধুলার একটা ভগ্নাংশ প্রতিফলিত হতে দেখা যায়,—তেমনি বইয়ের পৃষ্ঠায় ক্রীড়া-জগতের খোরাক পেতে হলে কিছুকাল পূর্বেও দ্বারস্থ হতে হোতো বিলিতি বইয়ের দরজায়।

আলোচ্য গ্রন্থটি বিশ্বক্রীড়া প্রাঙ্গণের চৌকস ক্রীড়াতারকাদের সুখপাঠ্য জীবনী। ইতিপূর্বে এ বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়ে খেলাধুলোয় উৎসাহী বহু পাঠকের প্রশংসা অর্জন করে। বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডেও লেখক প্রথম খণ্ডের রচনামাধুর্য পুরোপুরি সার্থক ভাবে ফুটিয়েছেন, বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের যে-সব সেরা ও কুশলী ক্রীড়া-তারকা এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের বৈচিত্র্যময় জীবনের খুঁটিনাটি খবরাখবর লেখক যেমন একদিকে দক্ষতার সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন, অন্যদিকে তাঁদের যশ বৃদ্ধির ধারাবাহিক স্বর্ণ-সোপানগুলির ইতিবৃত্ত কৌতূহলবাহী করে বিবৃত করেছেন।

হতাশাপাণ্ডুর, ব্যায়াম ও ক্রীড়ানিস্পৃহ, বন্দিজীবী বাঙালী জীবনে এ ধরনের বই যে শুধু তথ্য পরিবেশন করেই খালাস, তা নয়,—নবযৌবনের উৎসমুখ উন্মুক্ত করেও দিতে পারে এ ধরনের বই। বিশ্বক্রীড়াঙ্গনের এইসব বিদ্যুতোজ্জ্বল জীবনালেখ্যের নমুনার মধ্যে দিয়ে যদি আমরা আমাদের জীবনের আনন্দের অবারিত ধারাটিকে আবিষ্কারের সুযোগ লাভ করি তবেই বর্তমান গ্রন্থটির রচনার সার্থকতা। বইটিতে আলোচিত ক্রীড়াতারকাদের একটি করে প্রতিকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের পুস্তক রচনা করে শ্রীখেলোয়াড় সাহিত্য ও দেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

বঙ্গবাসী কলেজ পত্রিকা (৫৭শ সংখ্যা ১৩৬৩-৬৪) সম্পাদক—প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়।

অধ্যাপক ও ছাত্রদের বিভিন্ন রচনার সমাবেশে পত্রিকাটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। প্রাক্তন ছাত্র যাঁরা বর্তমানে সাহিত্যিক মহলে সুপরিচিত তাঁদের কয়েকজনের রচনাও আছে। ইন্দ্র দুগারের স্কেচ সহ পত্রিকাটি বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে।

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

ব্যঞ্জনা ও কাব্য ২য় খণ্ড—হরিহর মিশ্র।
আমার কথা—ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ।
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি—প্রিয়দারঞ্জন রায়।
অমৃত—ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্য দেব।
এবংপরের টিকটিকি—ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়।
অনন্তের পথে—শৈলবালা ঘোষজায়া।
গৃহসন্ধানে—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭—প্রমোদ সেনগুপ্ত।
প্রভাত—শ্রীদীপককুমার সেন।
হুগলী নদীর তীরে—বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।
পিতা ও পুত্র—ভেরা পানোভা। অনুবাদক—শিউলি মজুমদার।
ম্যালেরিয়া দমনে সোভিয়েত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাফল্য—প সের্গিয়েভ।
সর্বহারার এক নায়কত্ব সম্পর্কে আরো বক্তব্য—জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব ও তার সঠিক সমাধান—মাও সে তুঙ।
কাশতানকা—আন্তন চেখভ। অনুবাদক—অনিমেষ পাল।
মানুষের জন্ম—ম্যাক্সিম গোর্কি। অনুবাদক—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।
ক্যাপ্টেনের মেয়ে—আ. স. পুশকিন। অনুবাদক—অমল দাশগুপ্ত।
গুটির ওপর গুটি—ইয়া তাইৎস। অনুবাদক—শঙ্কর রায়।
রুশ দেশের উপকথা—আলেকসেই তলস্তয়। অনুবাদক—শ্রীমতী লীনা বন্দ্যোপাধ্যায়।
তৈমুর ও তার দলবল—আর্কাদি গাইদার। অনুবাদক—শ্রীগিরীন চক্রবর্তী।

—শৌভিক—

[illegible]জয়

গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক—পৃথিবীর মধ্যে চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠতম এই পুরস্কার এবার অর্জন করেছে ভারতীয় ছবি, সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত'। সাতচল্লিশটি দেশ পঁয়ষট্টিখানি ছবি নিয়ে পৃথিবীর প্রাচীনতম, বৃহত্তম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভেনিসের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। প্রাথমিক বিচারে দশটি দেশের মোট চোদ্দখানি ছবি চূড়ান্ত বিচারের জন্য মনোনীত হয়। এই ছবিগুলির মধ্যে পাশ্চাত্যের কয়েকজন যুগান্তকারি চলচ্চিত্র স্রষ্টাদেরও ছবি ছিল, যথা বৃটেন থেকে ছিল ডেভিড মিলারের ইঙ্গ-মার্কিন ছবি 'দি স্টোরি অফ ইস্থার কস্টেলো', আমেরিকা থেকে রিচার্ড ব্রুকের 'সামথিং অফ ভ্যালু' এবং ফ্রেড জিনেম্যানের (দি সার্চ) 'এ হেটফুল অফ রেন', ফ্রান্স থেকে নিকলাস রে'র 'বিটার ভিক্টরি', জাপান থেকে আকিরিয়া কুরশোয়ার ('রসোমন') 'কুমনউ ডোজ' এবং ইতালি থেকে লুচিনো ভিকন্টির 'হোয়াইট নাইটস'। বিচারের জন্য জুরীদের মধ্যে ছিলেন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের অন্যতম 'রেনি ক্লেয়ার' (এবার কান্‌সের প্রতিযোগিতায় জুরীপদ প্রত্যাখ্যান করেন), বৃটেনের চলচ্চিত্র সমালোচক পেনিলোপ হাউস্টোন, আমেরিকার সমালোচক আর্থার নাইট এবং রাশিয়ার পরিচালক আইভান পাইরিয়েভ। এ প্রতিযোগিতায় ছবি বিচার করা হয় সম্পূর্ণরূপে শিল্পসৃষ্টির উৎকৃষ্টতা দেখে, ছবির বক্স-অফিস সাফল্য আদপেই গ্রাহ্য করা হয় না। এতো কড়াকড়ি নিয়ম যে, গত বছর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিযোগিতায় যোগদান থেকে বিরত থাকে। এবার যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় যোগদান করায় প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্যোক্তা ক্যাথলিক নেতা সিনর ফ্লোরিস আম্মান্নাতি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, চিত্রনির্মাতারা অনুধাবন করতে আরম্ভ করেছেন যে, প্রকৃত শিল্পোৎকর্ষে উন্নত ছবিই তাদের উপকার সাধন করে। সেই সঙ্গে তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে, এমন দিন অচিরেই আসবে যেদিন ভেনিসের প্রতিযোগিতায় কোন পারিতোষিক প্রদানের দরকারই হবে না,—এই প্রতিযোগিতায় যোগদানে সক্ষম, এইটেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে বিবেচিত হবে। ভেনিসের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য বর্তমানে পুরস্কার হচ্ছে গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক। গত ক বছর ধরে প্রতিযোগিতায় কোন ছবিই গোল্ডেন-লায়ন পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত না হওয়ায় [illegible] [illegible] সেন্ট

মার্ক (এবার দ্বিতীয় পুরস্কারটি পেয়েছে ইতালীয় ছবি 'হোয়াইট নাইটস')। 'অপরাজিত'র অতিরিক্ত কৃতিত্ব হচ্ছে যে, ছবিখানি কেবলমাত্র এ বছরেরই শ্রেষ্ঠ ছবি নয়, কবছর বাদে গোল্ডেন-লায়ন পাওয়ার অর্থ গত ক' বছরের মধ্যে সবচেয়ে অনিন্দ্য কৃতিত্বপূর্ণ ছবি। বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য আরো বিষয় হচ্ছে যে, সত্যজিৎ রায় দুখানি মাত্র ছবি তুলেছেন এবং পরপর দুবছরে দুখানিই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করেছে—'পথের পাঁচালী' গত বছর ক্যান্‌সে মানবিক

পরিচালক সত্যজিৎ রায়

আবেদনে শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে পুরস্কৃত হয়। এবারও 'পথের পাঁচালী' সেলজানিক গোল্ড মেডেল লাভ করেছে। এমন কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত চলচ্চিত্রের সমগ্র ইতিহাসে আর দেখা যায় না।

* * *

একটা কথার উত্থাপন তাহলে করতে হয় এই প্রসঙ্গেঃ 'অপরাজিত'র সমালোচনায় 'রঙ্গজগতে' ছবিখানিকে বিশ্ববন্দিতার চেয়েও বন্দনীয় বলে অভিহিত করায় নানা মহল থেকে উপহাসিত হতে হয়েছিল। এই বিশেষণে ভূষিত করার যুক্তি ছিল এই যে, 'পথের পাঁচালী' যখন বিশ্ববন্দিত ছবিরূপে পরিগণিত হতে পেরেছে এবং তার [illegible] অপরাজিত আরো উৎকর্ষে অধিকতর বন্দনীয় হবে। দুঃখের সঙ্গে একথাটা উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, উপহাস করাই শুধু নয়, অধিকাংশ সমালোচকও 'অপরাজিত'র তেমন গুণ তো স্বীকার করেনইনি, এমন কি কেউ কেউ কোন নিকৃষ্ট হিন্দী ছবিকেও যেটুকু সহানুভূতির চক্ষে দেখেন, এক্ষেত্রে ততোটুকু সহানুভূতি দেখাতেও কার্পণ্য দেখিয়েছেন, সরাসরি নিন্দেও করেছেন। খুব সম্ভবত, তারই প্রভাবে কেমন যেন শিল্প প্রচেষ্টার বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল একটা প্রতিরোধ ঘোট পাকিয়ে 'অপরাজিত'কে এমন দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করলে যে, বলতে লজ্জা হয়, যে-ছবি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতায় গত ক'বছরের হিসেবে শ্রেষ্ঠ ছবি বলে নির্বাচিত হতে পারলো, সে ছবিখানিকে রাষ্ট্রপতি পদক তো দূরের কথা, একটা সম্মানপত্র পাবার যোগ্য বলেও মনোনয়নলাভে বঞ্চিত করা হয়। শুধু তাই নয়, এমন সমালোচকও আছেন, দুর্ভাগ্যের মধ্যে যাদের কথা বিশেষ বিশেষ মহলে খাটে, তাদের কেউ কেউ 'পথের পাঁচালী'র আন্তর্জাতিক সম্মানলাভের পর বৎসরই ভেনিসের প্রতিযোগিতার জন্য প্রাথমিক নির্বাচনে জয়ী দশখানি ছবির তালিকায় 'অপরাজিত'ও থাকায় এটাকে সত্যজিৎ রায়ের 'লাক্' বলে অভিহিত করেছেন। আশ্চর্য এই যে, পরম শিল্পীমেজাজ ও বিচক্ষণ শিল্পবুদ্ধির প্রয়োগে তোলা অনুপম একটি শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষ স্বীকৃত হওয়াটা কৃতিত্বের চেয়ে শিল্পীর কপালগুণে বলে পরিগণিত হয়! অথচ 'অপরাজিত' কেবলমাত্র গোল্ডেন-লায়নই অর্জন করেনি, ওখানে সমবেত বিভিন্ন দেশের সমালোচকদেরও নির্বাচনে শ্রেষ্ঠ ছবি বলে তাদের পুরস্কারও অর্জনে সক্ষম হয়েছে, তাছাড়া আরো একটা নতুন পুরস্কারেও ছবিখানিকে ভূষিত করা হয়েছে যা ভেনিসের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই প্রথম প্রবর্তিত হলো। ভারতের চলচ্চিত্রপ্রতিভা জগতে একটা ইতিহাসই রচনা করলে। সহস্র রাজনীতিক যে শুভেচ্ছা ও সম্মান গড়ে তুলতে না পারে, একখানি 'অপরাজিত' বা 'পথের পাঁচালী' তার চেয়ে বেশী ক্ষমতার অধিকারি। এদের স্রষ্টার প্রাপ্য বিপুলভাবে জাতীয় সম্বর্ধনা, সে বিষয়ে যেন কোন অবহেলা না দেখা দেয়। সেইসঙ্গে কান্‌স প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত 'গৌতম বুদ্ধ'র নির্মাতা, বার্লিন প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত 'কাবুলিওয়ালা'র নির্মাতা এবং কার্লোভিভারির প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত 'একদিন রাত্রে'র নির্মাতাবৃন্দকেও জাতীয় সম্মানে ভূষিত করা উচিত। [illegible] [illegible] গৌরব। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, গত তিনমাসের পারপরে

আগতপ্রায় বাঙলা ছবি ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত রচিত উপন্যাস অবলম্বনে শিবতীর্থবার চিত্রিত "অভয়ের বিয়ে"-তে উত্তমকুমার ও প্রণতি ঘোষ

অনুষ্ঠিত পৃথিবীর প্রধান চারটি চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার প্রত্যেকটিতেই ভারতীয় ছবি শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার অর্জনে সক্ষম হয়েছে। পুরস্কার পেয়েছে মানবিক আবেদন ও শিল্পোৎকর্ষের জোরে। একই দেশের ছবি একই বছরে সবকটি বড়ো প্রতি-যোগিতায় জয়ী হওয়ার এমন দৃষ্টান্ত আর নেই। ভারতীয় চলচ্চিত্র বিশ্বজয়ের এক নয়া ইতিহাসের সূচনা করলো।

মন্তব্যহীন মন্তব্য

"পথের পাঁচালী" এ পর্যন্ত পাঁচটি শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার লাভ করেছে। ছবিখানি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তহবিলে, শোনা যায়, প্রায় দশ লক্ষ টাকা পাইয়ে দিয়েছে। পরম শিল্পসৌন্দর্য ও মানবিক আবেদনের জন্য ছবিখানি যে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও, নতুন করে সেবিষয়ে বলবার কিছু নেই। ছবিখানি সম্পর্কে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রচার অধিকর্তা শ্রীপ্রকাশ স্বরূপ মাথুরের মত ছিল ভিন্ন। যথার্থভাবে যা পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের প্রাপ্য সে পুরস্কারগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে শ্রীমাথুর নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন কি মন নিয়ে জানা নেই, তবে ছবিখানি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত তার ব্যক্তিগত মন্তব্য যা ছিল সে নোটটি পড়বার মতো। তাতে তিনি বলেন:

"But the story, as it appears, is rather dull and slow moving. It is the story of a typical Bengali family suffering from privation and family embarrasments but at no stage does it offer solution or an attempt to better the lot of people and to re-build the structure of the society. The story ends in the hero withdrawing himself from the field of struggle and leaving home and village to a place outside Bengal. Leaving one's home is no solution. Trying to escape from circumstances is cowardice and that is what we are vitally interested in fighting so that the people can realise that life is to act and work hard and there is nothing in life which cannot be achieved by a person determined to succeed—whatever be the obstacles—social or economic........ But it is a story of tragedy and continuous gloom. My own impression is that even when exploited this picture will not pay as much as is being invested on it.

But if the end is what appears in this picture it conveys no message and brings no hope of a fresh and new start in life......It is considered that this film along with a supplementary shot of about 2500 to 3000 ft. depicting the second part of the story, which unfortunately does not occur in the original "Pather Panchali" to represent what would be the shape of the village community in the present age with the provision of land reforms, of the Community Development Projects, the National Extension Schemes and an all round urge inthe Independent India to rebuild the Society for better living and through self-help rather than one's present condition to fate, circumstances, and certain unknown factors." (Extracts from D.P.'s note dt. 16-2-54).

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

চিত্রালোচনা

হৃদয়স্পর্শীতায় অনুপম

সর্বাঙ্গীন কুশলতায় একটি হৃদয়স্পর্শী অনুপম চিত্র সৃষ্টি বলতে আলোছায়া প্রডাকসেন্সের "হারানো সুর" স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে এর গল্পটি বিলিতী ছবি থেকে অবলম্বন করে নেওয়া এবং স্মৃতিভ্রষ্টের যে কাহিনী এতে রয়েছে তা নিয়ে অনেক ছবিই হয়েওছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু, বেশ একটা রোমাণ্টিক আখ্যানবস্তুর পরি-কল্পনায়, উত্তম বিন্যাসে, এবং অভিনয় ও কলাকৌশলের চমৎকারিত্বে "হারানো সুর" বাঙলা ছবির গৌরব এনে দেবার মতো একটি অনন্যসাধারণ শিল্পপ্রচেষ্টা। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য রচনার ক্ষমতা সম্পর্কে হতাশা যখন কাণায় কাণায় ভরে প্রায় উঠছিলো ঠিক সেই সময়েই "হারানো সুর" তার গুণের নতুন করে পরিচয় এনে দিয়েছে। আখ্যান বস্তু আহরণে, ঘটনার সঞ্চারনে এবং চরিত্রাবলীর উন্মেষের আবেগময় পথ নির্দেশে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় চিত্রনাট্য রচনায়। পরিচালক অজয় কর ছবিখানিকে যে অনন্যসাধারণের পর্যায়ে তুলতে পেরেছেন তার জন্য নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের জোর স্বীকার করতেই হয়। অজয় করের দ্বৈত কৃতিত্ব, পরিচালকরূপে যেমন, তেমনি আলোকচিত্র

গ্রহণে। এমন একটি পরিণত ছৌবিক বিন্যাসে কাহিনীটির পরিচর্যা করেছেন যা তাকে আমাদের দেশের প্রতিভাবান পরিচালকদের পর্যায়ে উন্নীত করে দেবে।

* * *

ছবির আরম্ভে একটু গোলমাল দেখা যায়। মানসিক রোগগ্রস্তদের হাসপাতাল, কিন্তু ওখানকার বড়ো ডাক্তারকে এমন একজন শয়তান ব্যক্তিরূপে দেখানো হয়েছে যে, গল্পের ধর্তাতেই একটা অস্বাভাবিকতা এসে পড়ে। পাগল আসলে কে, রোগীরা না ঐ ডাক্তার, সেইটেই ভেবে ঠিক করে নিতে হয় তখন। তবে ঐ ডাক্তার মজুমদারকে দিয়ে একটা কাজ হয়েছে, সেটা হচ্ছে নায়ক অলকের প্রতি নায়িকা রমার আকর্ষণের একটা হেতু দাঁড়ায় ওরই সূত্র ধরে। অলক একটা ট্রেন দুর্ঘটনায় পড়ে স্মৃতিভ্রষ্ট হবার পর এই হাসপাতালে ভর্তি হয়; রমা এখানকার একজন ডাক্তার। বড়ো ডাক্তার মজুমদার অলকের প্রতি রূঢ় আচরণ করায় রমা তার প্রতিবাদ করে, মজুমদার নালিস করে রমার নামে এবং তারই ফলে রমা কাজে ইস্তফা দেয়। নিজের কোয়ার্টারে ফেরবার সময় রমা শুনলে যে অলক হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে। গৃহে ফিরে অবাক হয়ে রমা দেখলে অলক ঝড়বৃষ্টির

মধ্যে তারই প্রকোষ্ঠে এসে আশ্রয় নিয়েছে। অলকের অসহায়তার প্রতি রমার মমতা জেগেছিল আগেই, অলককে এইভাবে সান্নিধ্যে পেয়ে খুসীই হলো সে। গোপনে রমা অলককে নিয়ে পলাশপুরে তার বাবার কাছে নিয়ে উপস্থিত করলে। রমার পরিচর্যায় অলক কিছুটা সহজ হল এবং একদিন রমা বুঝলে যে, অলককে না হলে তার চলবে না, তাই পিতার অনুমতি নিয়ে রমা অলককে বিয়ে করলে। দিন যায়। রমা এখানে ডাক্তারী করে। অলকের একটা বাতিক চাকরির জন্য দরখাস্ত করা। চাকর দরখাস্ত ঠিকমতো ডাকে দেয় না এই ধারণা করে অলক একদিন নিজেই চললো ডাকঘরের দিকে। পথে একটা লরীর ধাক্কা খেয়ে উলটে পড়ে খানিকটা গড়িয়ে চৈতন্য হারালে। জ্ঞান ফিরতে অলক অবাক হলো অপরিচিত স্থান দেখে। আগেকার স্মৃতি ফিরে পেয়েছে সে। পলাশপুর থেকে অলক ফিরলো কলকাতায়। বিরাট ধনী ব্যবসায়ী। ছেলেকে ফিরে পেয়ে তার মায়ের আনন্দের অবধি রইল না। দীর্ঘদিন স্বামীর কোন সন্ধান না পেয়ে রমা চলে এলো কলকাতায়। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে একদিন একটা বিরাট অফিসের দরজায় অলককে দেখলে গাড়ি থেকে নামতে। অনুসরণ করে রমা ভিতরে পৌঁছে শুনলে অলক সে অফিসের মালিক। দেখা করতে গেল রমা অলকের সংগে, কিন্তু অলক তাকে চিনতে পারলে না। দুঃখে ও হতাশায় মূর্ছা হলো রমা। চাকরির প্রত্যাশী জেনে রমার ঐ অবস্থা দেখে অলক তাকে তার ভাগ্নীর গভর্নেসের পদে বহাল করলে। স্বামী তাকে চিনতে না পারুক, তবু স্বামীর সান্নিধ্যে থাকতে পারবে এইটুকু লাভের আশায় রমা চাকরি গ্রহণ করলে। অলকের বাড়িতে ছোট মেয়ে মালার দেখাশুনা করে রমা। এখানে এসে রমা দেখলে অলকের সংগে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে এক ধনী কন্যা লতার সংগে। অনেকভাবে রমা চেষ্টা করলে অলকের স্মৃতিতে তার জীবন-প্রসংগ জাগিয়ে তুলতে, কিন্তু কিছুতেই যেন সফল হয় না। আড়াল থেকে অলককে যতোটা পারে দেখে তৃপ্তি পায়। অলকের খুব কাছাকাছি আসার জন্য রমার চেষ্টা লতার চোখে পড়লো; অলকও যেন ক্রমে রমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। লতা-রমাকে এ গৃহ থেকে তাড়াবার জন্য অর্থেরও প্রলোভন দেখালে কিন্তু লতা জানতো না রমা কিসের টানে এখানে পড়ে আছে। কিন্তু একদিন লতার মনস্কামনা পূর্ণ হলো। গভীর রাত্রে রমাকে অলকের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে অলকের মা রমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। প্রভাত হবার পূর্বেই ব্যর্থ রমা ওদের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। প্রত্যুষে ম্যানেজার এলো চেক সই করাতে অলকের কাছে রমার পাওনা দেবার জন্য। অলক তখনই শুনলে রমার চলে যাওয়ার কথা। ইতিমধ্যে অলক লতার চেয়ে রমাকেই কাম্য মনে করতে আরম্ভ করেছিল, তার হাবভাবেই সেটা প্রকাশ পাচ্ছিল। রমার চলে যাওয়াটা তাই তার মনে লাগলো। ম্যানেজারের কাছে রমার ঠিকানা নিয়ে আর কোন কথা না বলে সোজা সে মোটর হাঁকিয়ে চললো। অনেকখানি এসে অলকের মনে হতে লাগলো কেমন যেন একটা অতি ঘনিষ্ট পরিবেশে এসে পড়েছে সে। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে স্মৃতি আরো স্পষ্ট হতে লাগলো। দেখতে দেখতে রমার কথা মনে পড়লো; ছুটে গিয়ে হাজির হলো অলক রমার বাড়িতে। ওদের জীবন বীণায় হারানো সুর আবার সুরতাললয়ে ঝংকৃত হয়ে উঠলো।

* * *

একেবারে আধুনিক পরিবেশের মধ্যেই গল্পের বিবরণ হলেও সতী নারীর আদর্শই হচ্ছে এর মূলে যা অতি সহজেই ভারতীয় মনকে অভিভূত করে তোলে। রমা বেশ উচ্চ শিক্ষিতা কিন্তু তবুও একটি অসহায়ের প্রতি তার মানবিক মমতা এবং পরে স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য তার আকুল প্রচেষ্টা দরদী মন মাত্রকেই আকর্ষণ করবে এবং সে আকর্ষণটা প্রবল হয়ে উঠেছে রমার চরিত্রে সুচিত্রা সেনের অভিনয়ে। অত্যন্ত সংযত ও ভরা আবেগের মধ্যে দিয়ে চরিত্রটিকে মনের সংগে নিবিড় করে তোলার ভাবময় যে কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন তা তার শিল্পনৈপুণ্যের একটি নতুন পর্যায়। গল্পের ঝোঁকটা তার ওপরেই নিবদ্ধ এবং সেকারণ তার পাশে অলকরূপী উত্তমকুমারকে কিছুটা নিষ্প্রভ দেখিয়েছে। এই প্রসংগে একটা প্রশংসা

পাওনা হচ্ছে প্রযোজকরূপে উত্তমকুমারের। সাধারণত নায়ক নিজে প্রযোজক হলে চিত্রনাট্য এবং দৃশ্যরচনা এমন করিয়ে নেন যাতে তিনি নিজেই সব দৃষ্টিটুকু জুড়ে থাকেন। উত্তমকুমার গল্পের সম্মান রেখে নায়করূপে নিজে যতোখানি এবং যেভাবে থাকলে মানায় সেইটেই মেনে চলেছেন। আর উত্তমকুমারের এই সুবিচারের মর্যাদাও রেখেছেন সুচিত্রা সেন। নিজে একজন কৃতি এবং আধুনিক শিক্ষিতা তবুও স্বামীকে পাবার জন্য তার আকুল প্রচেষ্টা মর্মের গহনে হৃদয়োচ্ছ্বাসকে আলোড়িত করে তোলে। অলকের অফিসে অলক তাকে চিনতে না পারায় তার অন্তরের নিঃশব্দ করুণ হাহাকার; চাকরি পাওয়ায় অলকের সান্নিধ্যে থাকতে পাওয়ার জন্য আশার দীপ্তি; মাঝে মাঝে অলকের কথার মধ্যে তার স্মৃতি ফিরে পাওয়ার আভাসে আবেগের উন্মেষ, অলকের সঙ্গে শেষ দেখা করে চলে যাওয়া—সুচিত্রা সেনের কোমল ও একাগ্র অভিব্যক্তিতে হৃদয়স্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে। মানসিক হাসপাতালে যেমন, তেমনি পলাশপুরে এসে রমার সঙ্গে থাকবার সময়েও অলকের চরিত্রটিকে উত্তমকুমার এমনেসিয়া রোগীর চেয়ে স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগীরূপেই বেশী প্রতিপন্ন করে তোলেন। কলকাতায় ফিরে আসার পরবর্তী অংশে তার যথার্থ অভিনয় কৃতিত্ব পাওয়া যায়। লতার চরিত্রে কাজরী গুহ প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কৃত্রিমতা ফুটিয়ে তুলেছেন; তেমনি লতার দাদার চরিত্রে দীপক মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ও। এই চরিত্রটিই কেবল কেমন যেন জোর করে প্রবিষ্ট করে দেওয়ার মতো লাগে, যেন তাল কেটে দেয়। রমার স্নেহময় ও উদারচিত্ত পিতার চরিত্রটি পাহাড়ী সান্যাল ভাল ফুটিয়েছেন, অবশ্য এই ধরনের চরিত্রে অভিনয় এই তাঁর প্রথম নয়। অলকের মায়ের চরিত্রটি ফুটিয়েছেন চন্দ্রাবতী দেবী। মানসিক হাসপাতালের অনুপযুক্ত একটা ভেভিল-ডাক্তার রূপ সৃষ্টি হয়েছে উৎপল দত্তের অভিনয়ে ডাক্তার মজুমদারের চরিত্রটি। অন্যান্য চরিত্রে আছেন শিশির বটব্যাল, ধীরাজ দাস, প্রীতি মজুমদার, ডাঃ হরেন, খগেন পাঠক, পারিজাত বসু, বেবী শ্রাবণী চৌধুরী, ইরা চক্রবর্তী প্রভৃতি।

*   *   *

কলাকৌশলের এমন সর্বাঙ্গীন কুশলতা খুবে কমই দেখা যায়। চমৎকার পারিপাট্য। আলোকচিত্র গ্রহণে অজয় কর যে দেশের শ্রেষ্ঠ কৃতিদের অন্যতম সে পরিচয় আগাগোড়া স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। পলাশপুরের ফুলগাছের নীচে রমা ও অলকের প্রণয়োন্মেষের দৃশ্যটি যা একটু সেট-সেট মনে হয়, তা ছাড়া সারা ছবিখানিই অতি মনোজ্ঞ পরিবেশেই রচিত। পরিচালকরূপে অজয় কর বেশ হিসিয়ে মনের অতি কাছাকাছি পথ অবলম্বন করে ঘটনার বিন্যাস করেছেন। সুন্দর কতকগুলি ছোঁয়াচ পাওয়া যায়। একটু কেমন যেন লাগে বার দুই আত্মাবহ ঝড়জলের অবতারণার ব্যাপার, তবে একেবারে অপ্রয়োজনীয় তাও বলা যায় না। রমার সঙ্গে বিয়ের পর অলকের টাইপ করে দরখাস্ত তৈরী করাটাও একটু বিসদৃশ্য লাগে। শব্দ গ্রহণ ভাল, সংগীতাংশও তোলা ভাল। অতুল চট্টোপাধ্যায়, বাণী দত্ত ও নৃপেন পাল সংলাপাংশ গ্রহণ করেছেন এবং সংগীতাংশ তুলেছেন মিনু কাটরাক। সংগীত রচনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পরিবেশ মানিয়ে গিয়েছেন, তবে এ ছবিখানিতে তার চেয়েও বড়ো কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ ছিল। গোড়ার অর্কেস্ট্রাংশের অবহসংগীত বেশ, তারপর মনে হয় যেন পুনরাবৃত্তি এবং এ ছবির পরিবেশ অনুসারে অনুপযুক্ত রকমের তীব্র। দুখানি গান সুপ্রযুক্ত এবং গীতা দত্ত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সুগীত। সুনীতি মিত্রের শিল্প নির্দেশের কাজ ছবিখানির আঙ্গিককে চমৎকার মানিয়ে দিয়েছে; বিশেষভাবে প্রশংসা পাবার মতো কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন। ছবিখানি সুসম্পাদনার জন্য প্রশংসার যোগ্য অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

স্বল্পে ও সুলভে রামায়ণ

কতক আখ্যানবস্তু আছে যেগুলি বিরাট ও আড়ম্বরপূর্ণ আঙ্গিক রচনার মধ্যেই বিকসিত হতে পারে, অন্যথা নয়। পৌরাণিকের মধ্যে

থেকে উদ্ভটত্ব ও অলৌকিকত্ব বাদ দিয়ে তাকে যতোই মানবীয় পর্যায়ে উপস্থাপিত করা হোক না কেন, দৃশ্যের মধ্যে আড়ম্বর না থাকলে তা মোটেই ছাপ দিতে পারে না। "অভিষেক"এর নির্মাতা ম্যাপস সম্ভবত এই নির্ধারণকে উলটে দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই ছবিখানি তোলায় ব্রতী হন। রামায়ণের গল্প নিয়েছেন তারা—রামের রাজ্যাভিষেক নিয়েই আখ্যানবস্তু কেন্দ্রীভূত, কিন্তু এমন স্বল্পে ও সুলভে কাজ সারার চেষ্টা যে রামায়ণের বিরাটত্ব তো নেইই, এমন কি একটা বড়ো রকমের কাহিনী বলেও মনে কোন ছাপই দেয় না। রামের সিংহাসন ত্যাগ ও বনবাসের প্রচলিত হেতুকে কাহিনী রচয়িতা অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সন্তোষজনক মনে করেননি। নামমাত্র একটু উল্লেখকে অবলম্বন করে তিনি ঐ ঘটনার পিছনে আরো খানিকটা লজিক যোগ করার জন্য কৈকেয়ীর পিতা অশ্বপতির রাজ্যলিপ্সার একটা পলিটিকস প্রবিষ্ট করিয়ে সেইটিকে কেন্দ্র করেই একটা গল্প তৈরী করেছেন। রামায়ণের মূল কাঠামোটা আছে, তবে কাহিনীর বিস্তারের অনেক কিছুই মনগড়া। এতে যে ঘটনা দেখা যায়, তা হচ্ছে রাম রাজা হবে শুনে অশ্বপতি তার পুত্র যুধাজিৎকে পাঠালে সৈন্য দিয়ে দশরথের এই চেষ্টা বানচাল করতে। অশ্বপতির অভিপ্রায় তার দৌহিত্র ভরতকে সিংহাসনে বসিয়ে অযোধ্যা সেইভাবে দখল করা। যুধাজিৎ অযোধ্যায় গিয়ে কৈকেয়ীকে দশরথ, রাম প্রভৃতির হত্যার ভয় দেখিয়ে তাকে দশরথের কাছ থেকে বর প্রার্থনা করতে বাধ্য করে তোলে। অবশ্য, এর পিছনে আলাদাভাবে মন্থরারও ষড়যন্ত্র ছিল—মন্থরার রোষ অযোধ্যার লোকে তাকে কুৎসিৎ বলায় সে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায় তাদেরই প্রিয় রামকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করিয়ে দিয়ে। দশরথ ও রামকে বাঁচাবার জন্যেই কৈকেয়ী বর আদায় করে নিলে যার ফলে রামকে বনবাসে যেতে হলো। খবর পেয়ে ভরত উপস্থিত হলো অযোধ্যায়। দশরথ তখন মৃত। ভরত রামকে ফিরিয়ে আনতে গেল, কিন্তু রাম এলো না। ভরত তার পাদুকা এনে সিংহাসনে অভিষিক্ত করলে। এই হলো 'অভিষেক'।

* * *

ছবিখানির সব ব্যাপারের মধ্যেই সংক্ষেপে সারার একটা দুশ্চেষ্টা দেখা যায়। সংক্ষেপের ঝোঁক মন্থরার কুঁজটিও বাদ দিয়ে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তোলা বলে বিজ্ঞাপন যে দেওয়া হয়েছে সেটা দেখা গেল একেবারেই ভাঁওতা। হাজার হাজার হাতি তাও স্টক-সট থেকে কেটে জুড়ে নেওয়া। আকারে প্রকারে আড়ম্বরবর্জিত ও সমারোহহীন এ অযোধ্যাকে একটা বড়ো জমিদারী বলেও মনে হয় না। তার ওপর একেবারে পূর্ণমাত্রায় মঞ্চের মতো করে সাজানো অনড় দৃশ্য, ঠিক তেমনি বিন্যাস, তেমনি সব সংলাপ, আর অভিনয়ও সেই ধাঁচের, তাও নিকৃষ্ট পর্যায়ের। এমন একটাও কোন গুণে নেই ছবিখানিতে যার ওপর মন বসানো যায়। একটানা নিরসতা। পরিচালক চিত্রপালি এবং অন্যান্য কুশলীদের মধ্যে আছেন সংলাপ রচনায় হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আলোকচিত্র গ্রহণে শচীন দাশগুপ্ত, শব্দযোজনায় পরিতোষ বসু, সংগীত পরিচালনায় পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, শিল্পনির্দেশে অনিল পাল ও সম্পাদনায় বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে আছেন, ছবি বিশ্বাস, দীপক মুখোপাধ্যায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার, অতনুকুমার, মিহির ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্তী, বেচু সিংহ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, প্রীতি মজুমদার, চন্দ্রাবতী, সরযূবালা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, দেবযানী, পদ্মা দেবী, অপর্ণা দেবী, মায়া ভট্টাচার্য, চিত্রা, আশা দেবী প্রভৃতি।

অচল

ছ বছর আগে তোলা এবং চার বছর আগে সেন্সর করা বাণী পিকচার্সের 'সন্ধান' ছবিখানি এতোদিনই যখন পড়ে থাকতে পেরেছিল, তখন একেবারেই না এলেই ভাল হতো। এ ছবির চারজন অভিনেতা এখন স্বর্গত, জনকতক লাইন ছেড়ে দিয়েছেন। চিত্র সেন নামক যে ব্যক্তি একাধারে গল্প লিখেছেন, চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ও পরিচালনা করেছেন, তিনিই বা কোথায় এখন? দুই পাষণ্ডকে নিয়ে একে তো একেবারে অচল একটা গল্প, তার ওপর শিল্পবুদ্ধিহীন যতো অনাটকীয় ব্যাপার। পাষণ্ড দুজনের একজন হচ্ছে এক জাল ডাক্তার; গোপনে এক দরিদ্র গ্রাম্য মেয়েকে বিয়ে করে। তার আসল কাজ হচ্ছে একটা নার্সিং হোম নিয়ে, যেটা তার পাপাচারের ক্ষেত্র। স্ত্রীকে কিছুকাল ভাঁওতা দিয়ে রাখে, কিন্তু শেষে স্ত্রী একদিন গ্রাম ছেড়ে হাজির হয়, কিন্তু এখানে বনিবনা না হওয়ায় স্ত্রী সটান থিয়েটারে গিয়ে অভিনেত্রীর কাজ নেয়। অপর এক পাষণ্ড জমিদারের লম্পট ছেলে, তারও বিয়ে হয় দরিদ্র মেয়ের সঙ্গে এবং সেও তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে অভিনেত্রীর প্রেমে পড়ে। জমিদারের ছেলে হঠাৎ শুধরে গেল। ডাক্তারও তার বিবিধ পাপ কাজের জন্য ঠিক ধরা পড়লো না; রিভলবার নিয়ে ধস্তাধস্তিতে নিজেরই গুলীতে প্রাণ হারিয়ে আইনের হাতে সাজা পাওয়া থেকে রেহাই পেয়ে গেল। গল্পটি সম্পর্কে বাজে কথাটা প্রয়োগ করলেও যেন কিছু বলা হয়ে যায়। শয়তান ডাক্তারের চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ে কিছু নৈপুণ্য ছাড়া আর কারুরই অভিনয় খোলেনি, তার কোন সুযোগও নেই। রবি রায়, ফণী রায়, কুমার মিত্র, আশু বোসকে বোধহয় এই শেষবারের মতোই দেখা গেল। প্রধান স্ত্রী চরিত্রে সীতা দেবীর মঞ্চানুগ অভিনয়ের পাশে বরং রেণুকা রায় কিছু পদে আছেন। জমিদার ছেলের চরিত্রাভিনেতা পাহাড়ী ঘটক এখন যে আর কেন ছবিতে নেই তা এই দেখে বোঝা যায়। শ্যাম লাহা, ননী মজুমদার, জীবেন মিত্র, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার প্রভৃতিও আছেন বিভিন্ন চরিত্রে। অজয় করের তত্ত্বাবধানে বিমল মুখার্জির আলোকচিত্রের কাজ একরকম চলনসই, অবশ্য এরা এখন অনেক উন্নততর কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম। শিল্পনির্দেশনায় বীরেন নাগের কাজেও এখনকার তার উন্নত নৈপুণ্যের ছাপ রয়েছে। সংগীত পরিচালনা করেছেন পবিত্র দাশগুপ্ত; সম্পাদক সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়।

মঞ্চাভিনয়

একাঙ্কিকা প্রতিযোগিতা
উদ্বোধন

থিয়েটার সেণ্টারের উদ্যোগে তৃতীয় একাঙ্ক নাটিকা প্রতিযোগিতা গত ৯ই সেপ্টেম্বর সেণ্টারের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে উদ্বোধিত হয়েছে। এবারের তালিকায় রয়েছে মোট সাতাশখানি নাটিকা। গত বছরের চেয়ে সংখ্যায় কম, তার কারণ এবার অবাঙলা নাটকের দিক থেকে তেমন উৎসাহ নেই। সেদিন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ। সেণ্টারের সভাপতি পরিচয় করিয়ে দেবার পর অনুষ্ঠান উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রী ঘোষ বলেন, কলকাতার মতো কসমোপলিটন শহরে সব ভাষাতেই অভিনয় মঞ্চস্থ করতে দেওয়ার

যোগ করে দেওয়ার জন্য থিয়েটার সেণ্টার সাধুবাদার্হ। তাঁর বিশ্বাস, সকল সহৃদয় ব্যক্তির কাছ থেকেই সেণ্টার সহায়তা লাভ করবে। তিনি বলেন, থিয়েটার সেণ্টার যে উদ্যোগ করেছে তার মধ্যে দিয়ে অভিনয়-শিল্পীরা তাঁদের কৃতিত্ব প্রকাশের অবারিত সুযোগ পাবেন। বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী বলেন, পৃথিবীতে যতো কিছু বড়ো কাজ আরম্ভ হয়েছে ছোট আকার থেকেই। সারা পৃথিবীতে একই রীতিতে অভিনয় হতো, শৌখীন সম্প্রদায়ের দৃষ্টি থাকতো সাধারণ রঙ্গালয়ের ওপরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এক এক দেশে এক একটি নাম নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইউরোপের শৌখীন দল মাটির নীচের ছোট ছোট সেলার ভাড়া নিয়ে চাঁদা তুলে থিয়েটার করতো—সাধারণ চাকুরিজীবী লোক। তাদের সাহায্য করার জন্য সরকার এগিয়ে আসেনি, পৌর প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসেনি। ইওরোপের বড়ো বড়ো শহরে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট বিরাট নাট্যপ্রাসাদ আছে—সেলারের ঐসব ছোট ছোট থিয়েটার ঐসব প্রাসাদের প্রতিবাদ। ছোট থিয়েটার, তাদের জন্ম একেবারে মাটিতে। কিন্তু একদিন এদের শিল্পীর ডাক এলো নাট্যপ্রাসাদ থেকে। আঁতোয়ার তখন লিটল থিয়েটারে খুব নাম, তার ডাক এলো কমেডি ফ্রাঁসে থেকে পরিচালক পদ নেবার জন্য। এই হলো লিটল থিয়েটারের ভাঙনের শুরু। ছোট থিয়েটারের শিল্পীর স্বীকৃতি, বড়ো থিয়েটারের প্রতিবাদে ছোট থিয়েটারের জয় আনলো বটে, কিন্তু সেই হলো ছোট থিয়েটারের বিলুপ্তির কারণ। এইভাবেই বড়ো থিয়েটার ছোট থিয়েটারের প্রতিভাকে টেনে নিয়ে ছোট থিয়েটারকেই হজম করে ফেললে। শ্রী চৌধুরী বলেন, ছোট থিয়েটারের শিল্পীরা যেন মাথা ঠিক রেখে চলেন, আসনের মোহে না পড়ে লিটল থিয়েটারের আদর্শ বজায় রেখে চলেন। তিনি বলেন, থিয়েটার সেণ্টারের প্রচেষ্টা ছোট হোক, এরও আদর আছে, এদের জয় একাগ্রতায়। বড়ো করার চেষ্টায় ছোট চেষ্টা যেন ভেঙে না যায়। গত বছরে যাঁরা প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন তাঁদের অনেকে এবার যোগদান করেনি দেখে তিনি বলেন, দল বজায় রাখা একটা বড়ো কথা, নিজের দল বজায় রাখতে না পারলে উৎকর্ষ বাড়ানো, বা পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্ভব নয়। এবার অবাঙালী দল কম হওয়ায় তিনি বলেন, সব সময়ে অবাঙালীদের পক্ষে কলকাতায় থেকে দল রাখা সম্ভব হয় না, নানা অসুবিধেয় তাদের পড়তে হয়। আগামী ২৫শে পর্যন্ত এই একাঙ্কিকা প্রতিযোগিতা প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হবে।

পাঞ্জাবী নাট্য উদ্যোগ

কলকাতা প্রবাসী পাঞ্জাবীদের একটি দল পাঞ্জাবী থিয়েটার নামে একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেছেন সম্প্রতি। গত এপ্রিল মাসে নিউ এম্পায়ারে থিয়েটার সেণ্টারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নাট্যোৎসবে এদের প্রথম আবির্ভাব দেখা যায়। এরপর গত রবিবার রক্সীতে এদের দ্বিতীয় আবির্ভাব হয় তিনখানি একাঙ্কিকা নিয়ে। এর মধ্যে "আদম্বার" ও "পর্দা দা পিছে" নতুন নাটিকা, আর তৃতীয়খানি "মুর্দা দা রেশন" ইতিপূর্বে নিউ এম্পায়ারে পরিবেশিত হয়। তিনটিই সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে। "আদম্বরে"র কাহিনী ছেলেমেয়েদের বিয়ে ব্যাপারে বাপ-মায়ের গোঁড়ামি অবলম্বনে। প্রধানত কৌতুকের মধ্যে দিয়েই বিন্যাস। নাটকের রচয়িতা রমেশ মেহতা। দ্বিতীয় নাটিকা "পর্দা দা পিছে" দুরাত্মাদের প্ররোচনায় পড়ে পথভ্রষ্টা মেয়েদের সমস্যা নিয়ে রচনা করেছেন সারজিত হুন। আর তৃতীয় নাটিকাখানিও কৌতুকপ্রদ—মৃত ব্যক্তির নামে রেশন আদায় করে যাওয়া নিয়ে গল্প লিখেছেন গুরুদয়াল সিং খোসলা। অভিনয়ে সহজ অভিব্যক্তির আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেন এঁরা, তবে অভিব্যক্তির মধ্যে নাট্যরেখা ফুটিয়ে তোলা ব্যাপারে দক্ষতার অভাব দেখা যায়, ফলে যা কিছু রস শুধু সংলাপ শুনেই উপভোগ করতে হয়। এঁদের নাট্য পরিবেশনে একটা গুণ হচ্ছে সাজসজ্জার দিক থেকে বেশ একটা পরিপাটি রূপ ফুটিয়ে তোলেন। যাই হোক, কলকাতায় এ ধরনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাতে হয়।

বিবিধ সংবাদ

গত দেড় মাস ধরে দক্ষিণীর শিল্পী ও কর্মিবৃন্দ আপ্রাণ পরিশ্রম করছেন রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ"কে নৃত্যগীত ও অভিনয়ে সমৃদ্ধ করে একটি উচ্চমানের মঞ্চ-প্রচেষ্টায় পরিণত করার জন্য। দক্ষিণী ভবনে 'সেবা-মিত্র-হল' নির্মাণার্থে অর্থ সংগ্রহের জন্য আগামী ২২শে থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর নিউ এম্পায়ার মঞ্চে নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ হবে। নাট্যরূপ দান করেছেন জয়দেব বসু এবং পরিচালনায় আছেন আশীষ মুখোপাধ্যায়; মঞ্চ ও সাজসজ্জা পরিকল্পনা করছেন সুনীতি মিত্র এবং নৃত্য পরিকল্পনায় গোপীনাথন, নায়ার ও মাধবী চট্টোপাধ্যায়।

• • •

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮-৩০টায় সুর ও শিল্পীর উদ্যোগে গ্রেস সিনেমায় একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। কলকাতার বহু বিশিষ্ট শিল্পী অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন।

• • •

উত্তর কলকাতার নাট্য সংস্থা কৃষ্টিলোক আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর রঙমহলে শরৎচন্দ্রের "শুভদা"র নাট্যরূপ পরিবেশন করবেন। ভূমিকায় থাকবেন কানাই দাস, গিরীশ চক্রবর্তী, রাজকুমার ধীরেন মুখোপাধ্যায়, সুনীল সেন রমেন মাইতি, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ জানা, অজিত বসু, অনিল ধর, শীতল রায়, কৃষ্ণ মিত্র, শিব মজুমদার, রসিক সাহা, গীতা দে, ডলি মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী দাশগুপ্তা, অনিল ভট্টাচার্য। নাট্যরূপদাতা ও পরিচালক—কুমার চৌধুরী, সুর সংযোজক পরেশ চট্টোপাধ্যায় এবং নৃত্য পরিচালনায় শ্রীলেখা মুখোপাধ্যায়।

• • •

পি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত বি এস প্রডাকসন্সের প্রথম ছবি বিমল ঘোষ রচিত "দস্যু রত্নাকর"-এর চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হয়েছে। কুশলীদের মধ্যে আছেন পরিচালনায় বংশী আশ, চিত্রগ্রহণে সন্তোষ গুহরায়, সুর যোজনায় রাজেন সরকার। নাম ভূমিকায় আছেন কমল মিত্র এবং অন্যান্য চরিত্রে গুরুদাস, সন্তোষ সিংহ, হরিধন, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, দীপ্তি, শিখারাণী ও নবাগত অবনীশ।

একলব্য

ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি তাদের ৩৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সাঁতারের মধ্য দিয়ে এবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঋতুরঙ্গ নৃত্য নাটিকার অভিনয়ে আর এক নতুন শিল্প-সৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর আগে এরা জলের উপর ফুটিয়ে তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়ার' নতুন নাট্যরূপ—মনসামঙ্গল কাব্য থেকে বেহুলার উপাখ্যান রূপায়নে একই সঙ্গে দেখিয়েছেন সাঁতারের পটুতা আর শিল্পীর অপূর্ব কলা-কৌশল। গতবারের অভিনয়ে দেখিয়েছেন কালিয়দহে শ্রীকৃষ্ণের লীলা খেলা—'কালিয়দমন'। প্রতিবারই করেছেন মূক অভিনয়, কিন্তু মাইক সহযোগে ধারা বিবরণীর ব্যঞ্জনা আর অর্কেস্ট্রার বাদ্যসম্ভারের মধ্যে ছন্দ লয় তালের সঙ্গে সঙ্গীতের সুরের মূর্ছনা মূক অভিনয়কে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে অভিভূত করেছে—স্বচ্ছ জলের উপর আলোছায়ার খেলা, সাঁতারের বিভিন্ন স্ট্রোক' আর সাঁতারের নানা কসরতের মধ্যে নৃত্যের রমণীয় ভঙ্গিমা।

আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি সাঁতারের মধ্য দিয়ে 'ওয়াটার ব্যালে' বা জল-নাটিকা অভিনয়ের সমালোচনা কোন 'মঞ্চ ও পর্দা' সমালোচকের দ্বারাই হওয়া উচিত। কিন্তু ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির অধিকাংশ সভ্য এটা স্বীকার করতে নারাজ। তাঁদের অভিমত যেহেতু অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন একটি সাঁতার ক্লাবের এবং সাঁতার শেখানো ও নিমজ্জমান ব্যক্তির জীবনরক্ষার উপায় শেখানো ক্লাবের মুখ্য উদ্দেশ্য, আর অভিনয়ের মধ্যেও রয়েছে সাঁতারের প্রচুর কসরৎ সেহেতু অনুষ্ঠানের সমালোচনা ক্রীড়া-সাংবাদিকের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে। তাই বছর বছর ক্রীড়াসাংবাদিকরাই নিমন্ত্রণ পেয়ে আসছেন। ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সদস্যদের যুক্তি আংশিক স্বীকার করতে আমার বাধা নেই, কিন্তু পুরোপুরি স্বীকার করতে ঘোর আপত্তি আছে। সুতরাং আমি আশা করি, ভবিষ্যতে এ ধরনের কোন অনুষ্ঠান করলে সোসাইটি ক্রীড়াসাংবাদিকের সঙ্গে মঞ্চ ও পর্দা সাংবাদিকদেরও আমন্ত্রণ জানাবেন।

'ওয়াটার-ব্যালে' বা জল-নাটিকার অভিনয়ে ঋতুরঙ্গের চেয়ে বেহুলা বা কালিয়দমন যে বিশেষ উপযোগী তা বলাই বাহুল্য। কারণ সপ্তডিঙ্গা মধুকরে করে চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রা, লখীন্দরের মৃতদেহকে জলের উপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া বা কালিদহের কালোজলে শ্রীকৃষ্ণের লীলা খেলা দেখানোর মধ্যে সাঁতার ও জলকেলী দেখানোর প্রচুর অবকাশ আছে। কিন্তু ঋতুরঙ্গের মধ্যে সাঁতারের কসরৎ দেখানোর খুব বেশী সুযোগ নেই। তাই এবারকার অভিনয় দর্শকদের আনন্দ পরিবেশনের দিক দিয়ে বেশী হৃদয়গ্রাহী হলেও সাঁতারের দিক দিয়ে আগের মত নৈপুণ্য প্রকাশ পায়নি। তবুও কয়েকটি দৃশ্যে সোসাইটির শিশু-সভ্যদের সাঁতার নিপুণতা যথেষ্টই প্রশংসার দাবী রাখে।

* * *

ঋতুরঙ্গের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনার আগে অনুষ্ঠান ক্ষেত্রের পরিবেশ এবং পরিকল্পনার একটু পরিচয় প্রয়োজন। ঢাকুরিয়া লেকের একেবারে পূব প্রান্তে সোসাইটির সুইমিং পুল। পাকা ক্লাব ঘর, নানা ফুলের গাছ লাগানো প্রশস্ত লন, আকাশছোঁয়া ডাইভিং বোর্ড আর তারই সঙ্গে রচিত হয়েছে সাঁতার শেখানোর কৃত্রিম জলাশয় বা সুইমিং পুল। বেশ পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। সোসাইটির কর্তৃপক্ষ লেকের খানিকটা জলকে ইট আর সিমেণ্টের মধ্যে আবদ্ধ করে ছোট্ট 'পুল' তৈরী করেছেন। পুলের চারধারে রয়েছে সভ্য এবং দর্শকদের বসবার প্রশস্ত এবং আচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ। জল বাড়ানো কমানোর বন্দোবস্ত আছে। আছে জল পরিশোধন করবার ব্যবস্থা। অর্থাৎ কলিকাতায় সাহেবদের পরিচালিত যে কয়টি সুইমিং পুল আছে, যেমন ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাব পুল, কাশীপুর ক্লাব পুল, মেরিন ক্লাব পুল, অর্ডন্যান্স ক্লাব পুল প্রভৃতি—ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সুইমিং পুলকে তাদেরই ছোট্ট সংস্করণ বলা যেতে পারে। অবশ্য এদের সাঁতার এবং সাঁতারের প্রতিযোগিতা হয় সোসাইটি ভবন সংলগ্ন ছোট লেকে। পুলে সাঁতার শেখানো হয় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের। সাঁতার এবং নিমজ্জমান ব্যক্তিকে জল থেকে উদ্ধার কর-

ঢাকুরে লেকে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সাঁতার-নৃত্যের একটি দৃশ্য
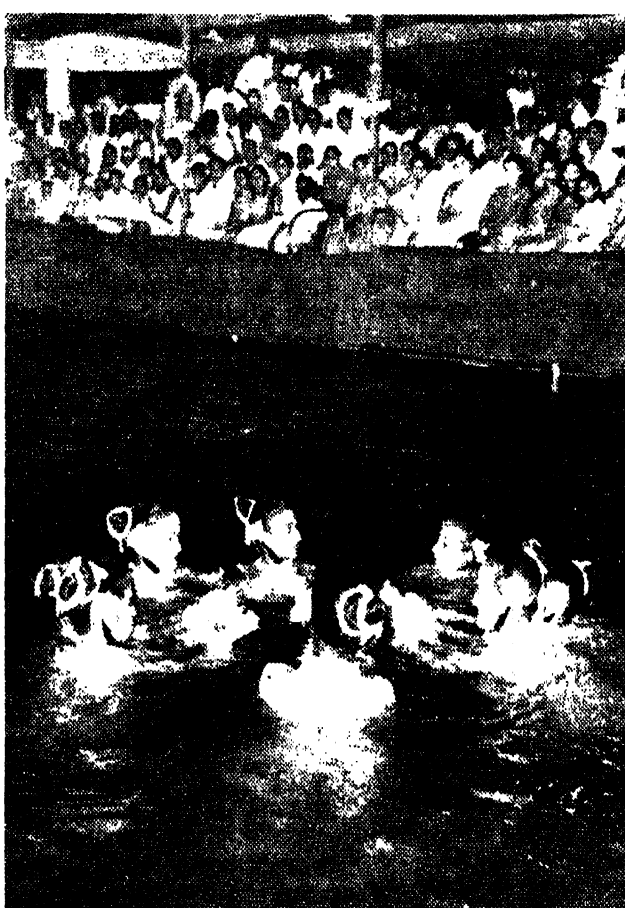
ফটো—দেশ

ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সভ্যাদের ঋতুরংগ জলনাটিকায় বর্ষা আহ্বানের দৃশ্য ফটো—দেশ

বার প্রক্রিয়া শেখাবার জন্য অভিজ্ঞ 'কোচ' রয়েছেন কয়েকজন। সভ্য-সভ্যার অভাব নেই। বেশীর ভাগই অভিজাত পরিবারের। পৃষ্ঠপোষক এবং পরিচালকদের বেশীর ভাগই সভ্য সভ্যাদের অভিভাবক। তবে সব শ্রেণীর সভ্যেরই এখানে সমান অধিকার। নদীমাতৃক এই বাঙলা দেশের ছেলে-মেয়েদের সাঁতার শেখানোর সংগে সংগে জলে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধারের কলা-কৌশল এবং 'ফার্স্ট এড' বা প্রাথমিক শুশ্রূষা পদ্ধতি শেখানো সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই ৩৪ বছর আগে সোসাইটির সৃষ্টি হয়েছে।

সোসাইটির এবারকার প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীপদ্মজা নাইডুর সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করে লাইফ সেভিংয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ সভ্যদের প্রশংসাপত্র বিতরণের কথা ছিল। রাজ্যপাল নাকি ওয়াটার ব্যালে দেখবার জন্যও খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং এজন্য সোসাইটির সভ্যদের সংগে তিনি আড়াই ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। ফলে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সভাপতি স্যার এস এম বসুর সহধর্মিনী লেডি বসু সভ্যদের প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন।

• • •

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সোসাইটি ভবনকে আলোকমালা ও পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হয়। চারদিক থেকে জলের উপর আলো ফেলে রাতকে করা হয় দিন। ছয়টি ঋতুর মধ্যে প্রকৃতির লীলাখেলার বিচিত্র রূপায়নে সোসাইটির সভ্যদের প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। রূপদাতা সাঁতারু-শিল্পীদের অধিকাংশই তরুণ তরুণী। বালক এবং ছোট সাঁতারুদেরও অনেকে [illegible] দুটি [illegible]

খাটানো আছে 'এনট্রান্স' এক্সিটের জন্য। অর্কেস্ট্রার আবহ সংগীতের মধ্যে আর পুরুষ নারীর মিলিত কণ্ঠের রবীন্দ্র সংগীতের সংগে সাঁতারুরা সাঁতারের মধ্য দিয়ে নৃত্যের তালে তালে এক একটি ঋতুকে জলের বুকে ফুটিয়ে তুলছেন—মাইকের মুখ থেকে রেডিওখ্যাত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠ ভেসে আসছে, শোনা যাচ্ছে ষড়ঋতুতে প্রকৃতির বিচিত্রলীলার কাব্যময় ব্যঞ্জনা।

'সুর ও মাল্লার বর্ষ আবাহন আবহ সংগীতের পর সুইমিং পুলের আলো নিভে গেল। সংগে সংগে জলের উপর আরম্ভ হল প্রখ্যাত আলোকশিল্পী তাপস সেনের আলো-আঁধারের খেলা। গ্রীষ্ম ঋতুর রূপায়নে সাতারুরা হস্তপদ সঞ্চালনে জলের উপর বৈশাখী ঝড়ের সৃষ্টি করলেন—অর্কেস্ট্রার গুরুগম্ভীর নিনাদ আর রবীন্দ্র-সংগীতের সুর ভেসে চললো নিদাঘ দিগন্তে—সাতারুদের কাঁধের লাঙ্গল দর্শকমনে জাগিয়ে তুললো হলকর্ষণ উৎ-সবের এক সুখস্মৃতি।

গ্রীষ্ম শেষ হল এল বর্ষা। আলোর খেলায় বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে বর্ষা আবাহন করা হ'ল। সংগীত ভেসে এলো 'নমো নমো নমো করুণাঘন নমঃ হে—'। কয়েকটি মেয়ে সাঁতারু সাঁতার নৃত্যের মধ্য দিয়ে জলের উপর ছায়াঘন পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। এক-তারা হাতে তিনটি বাউল গানের তালে তালে সাঁতার কেটে পার হলেন ছোট্ট সুইমিং পুল।

শরৎকালে 'পুলের' বুকে দেখা গেল নানা রঙীন আলোর ঝিকিমিকি। শরতের সোনালী রোদে সাঁতারুরা 'শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে' আর 'মেঘের কোলে রোদ উঠেছে বাদল গেছে টুটি' এই দুটি গানের তালে চক্রাকারে সাঁতার কেটে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিলেন।

এর পর গান আরম্ভ হ'ল 'হিমেল রাতের ঐ গগনের দীপগুলিরে।' সংগে সংগে কালো জলের বুকে মিট মিট তারা জ্বলতে আরম্ভ করলো। এখানে বলা প্রয়োজন মেয়েদের খোপায় আর ছেলেদের মাথায় ব্যাটারী আর ছোট ডুম ফিট করে তারকার সৃষ্টি করা হয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে জলের উপর এরা যখন ইতস্তত সাঁতার কাটছিলেন তখন সংগীতের ভাব আর সুরের মূর্ছনায় সত্যই মনে হচ্ছিল আকাশে বুঝি তারা জ্বলছে।

শীত ঋতুতে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে তোরা আয়রে আয়—' গানের সুরের সংগে পুরুষ ও মেয়ে সাতারুরা একত্রে জলের উপর সাঁতার নৃত্যের নানা কসরৎ দেখালেন। মেয়েদের সবারই পরনে লাল-পেড়ে শাড়ী, শুভ্র ও স্বচ্ছ প্লাস্টিকের আবরণে মোড়া, হাতে গলায় ফুলের গয়না, খোপায় ফুলের মালা। পুরুষ সাতারুরা নিরাভরণ। শুধু মাথায় পাগড়ী।

এর পর সংগীতের মধ্যে ডাক এলো—'ওরে আয়রে সবে আনন্দে।' সে ডাকে পুরুষ এবং মেয়ে সব সাঁতারু শিল্পীই সাড়া দিল। জলের উপর ভেসে উঠলো প্রস্ফুটিত পদ্মবন—নব বসন্তের আগমনে সকলেই আনন্দে মেতে উঠলো। সুইমিং পুল আবার যখন আলোকিত হয়ে উঠলো তখন দর্শকদের মুখে চোখেও দেখা গেল আনন্দের হাসি। সাঁতারের মাধ্যমে সাঁতারু শিল্পীদের ঋতুরংগ জলনাটিকা অভিনয়ের দক্ষতায় দর্শকরা প্রশংসামুখর হয়ে উঠলেন। 'জনগণ-অধিনায়ক' জাতীয় সংগীতের সংগে অনুষ্ঠান শেষ হল।

• • •

দিল্লী ফুটবল এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রী এস এল ঘোষ শুধু জুনিয়র খেলোয়াড়দের জন্য জাতীয় ফুটবল প্রতি-যোগিতা আয়োজনের এক পরিকল্পনা নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের কাছে পেশ করেছেন। অক্টোবর মাসের শেষাশেষি নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক সভায় এই বিষয়ে আলোচনা হবে বলে আশা করা যেতে পারে। প্রায় দুই বছর আগে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন এই ধরনের এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবার জন্য ভারতীয় স্কুল স্পোর্টস ফেডারেশনকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি।

শ্রী এস এল ঘোষ ফুটবল খেলার উন্নতির জন্য অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করে আসছেন। ইনি শুধু দিল্লী ফুটবল এসোসিয়েশনেরই সম্পাদক নন। দিল্লী হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকারও ক্রীড়া-সম্পাদক। দিল্লী হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় যোগদানের আগে ইনি কল[illegible] ক্রীড়া-সাংবাদিক ছিলেন। [illegible] প্রতিষ্ঠা অ[illegible] শ্রী [illegible]

কম নয়। রাজস্থান ক্লাব প্রথম ডিভিসনে উঠবার পর শ্রী ঘোষ ছিলেন ক্লাবের অন্যতম পরিচালক। যাই হক, ফুটবল নিয়ে ইনি অনেকদিনই নাড়াচাড়া করছেন। সুতরাং এর পরিকল্পনাটা ভেবে দেখবার মত।

শ্রী ঘোষ আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই প্রতিযোগিতা পরিচালনার পক্ষপাতী। কুড়ি বছর বা কুড়ি বছরের কম বয়সের খেলোয়াড়দেরই এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার থাকবে। পরিকল্পনায় শ্রী ঘোষ ভারতকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। ভারতের ১৬টি রাজ্যের মধ্যে প্রতি অঞ্চলেই থাকবে চারটি করে দল। পূর্ব অঞ্চলে থাকবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম। দিল্লী, পাঞ্জাব, রাজপুতনা ও উত্তর প্রদেশ নিয়ে গঠিত হবে উত্তর অঞ্চল। বোম্বে, মধ্য প্রদেশ, মধ্যভারত ও হায়দরাবাদকে পশ্চিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আর কেরল, মাদ্রাজ, মহীশূর এবং অন্ধ্র আছে দক্ষিণ অঞ্চলে। প্রথম ৪ বছর অর্থাৎ ১৯৬১ সাল পর্যন্ত নক আউট প্রথায় প্রতিযোগিতা পরিচালিত হবে। প্রতি অঞ্চলের এক একটি রাজ্য পর্যায়ক্রমে এক এক বছর প্রতিযোগিতা পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে এবং পরে কোন একটি প্রধান কেন্দ্রে চারটি অঞ্চলের বিজয়ীদল নক আউট প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে জাতীয় ফুটবলের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের জন্য। ১৯৬১ সালের পর একই ভিত্তিতে নক আউট প্রথার পরিবর্তে লীগ প্রথায় প্রতিযোগিতা পরিচালিত হবে এবং প্রতি দল নিজ রাজ্যে এবং প্রতিপক্ষের রাজ্যে পর্যায়ক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

এই প্রতিযোগিতার জন্য যে খরচের প্রয়োজন হবে শ্রী ঘোষ তারও এক পরিকল্পনা পেশ করেছেন। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা পরিচালনাকারী রাজ্য অপরাপর রাজ্যের প্রয়োজনীয় খরচের ভার গ্রহণ করতে পারেন এবং প্রতি রাজ্যের স্পোর্টস কাউন্সিল থেকে টাকাটা সংগ্রহ করা যেতে পারে। অন্যথায় রাজ্যগুলি নিজ নিজ ব্যয়ভার নিজেরাই গ্রহণ করতে পারে। আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার পর ৪টি বিজয়ী দলের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ব্যয়ভার নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের গ্রহণ করা উচিত বলে শ্রী ঘোষ মনে করেন।

এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হলে দেশের তরুণ ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে নৈপুণ্য দেখানোর জন্য একটা সাড়া জাগবে সন্দেহ নেই। ফলে তরুণ সম্প্রদায়ের খেলার মধ্যেও দেখা যাবে প্রভূত উন্নতি। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন এবং বিভিন্ন রাজ্য এসোসিয়েশনের পক্ষে প্রতিনিধিমূলক খেলায় খেলোয়াড় বাছাই করাও সহজ হবে। আশা করি নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের কর্ণধারেরা আন্তরিকতার সঙ্গে পরিকল্পনাটি বিচার করে দেখবেন।

• • •

অস্ট্রেলিয়ার ২২ বছর বয়সের টেনিস খেলোয়াড় ম্যালকম এণ্ডারসন ফরেস্ট হিলে অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যাল খেলায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। ফাইন্যালে এণ্ডারসন পরাজিত করেছেন তার দেশেরই কীর্তিমান খেলোয়াড় এই বছরের উইম্বলডন রানার্স আপ্ আসলে কুপারকে। কুপার এণ্ডারসনের কাছে পরাজিত হয়েছেন বললেই সব বলা হয় না—কুপার এণ্ডারসনের কাছে স্ট্রেট সেটেই পরাজিত হয়েছেন এবং খেলার ফলাফল হয়েছে ১০—৮, ৭—৫ ও ৬—৪। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় চ্যাম্পিয়নশিপের 'সিডিং' অর্থাৎ বাছাই তালিকায় এণ্ডারসনের কোন স্থান ছিল না। আরও উল্লেখ করার মত ঘটনাঃ সিডিংয়ের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানের অধিকারী তিনজনকেই একে একে পরাভূত করে এণ্ডারসন বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। বাছাই তালিকার দুই নম্বর খেলোয়াড় প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন সেভিটকে এণ্ডারসন প্রথম দিকে পরাজিত করেন, সেমিফাইন্যালে পরাজিত করেন তিন নম্বর বাছাই খেলোয়াড় সুইডেনের স্বেন ডেভিডসনকে এবং ফাইন্যালে পয়লা নম্বর বাছাই খেলোয়াড় উইম্বলডন রানার্স আসলে কুপারকে। ফরেস্ট হিলে দুই বছর ধরেই অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গতবারের ফাইন্যালে কেন রোজওয়াল লুই হোডকে পরাজিত করেছিলেন।

টেনিস খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফল এমন কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। কল্পনার ক্ষেত্র উদার এবং উন্মুক্ত আর বাস্তবের যাত্রাপথ সত্যই বন্ধুর—টেনিস খেলায় হামেশাই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় চ্যাম্পিয়নশিপে এবার যেভাবে অপ্রত্যাশিত ফলাফল সংঘটিত হয়েছে হামেশা তার প্রমাণ পাওয়া কষ্টকর। ডেনমার্কের খেলোয়াড় কার্ট নীলসেন দ্বিতীয় রাউণ্ডেই আমেরিকার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হ্যামিল্টন রিচার্ডসনকে হারিয়ে প্রথম অপ্রত্যাশিত ফলাফল সৃষ্টি করেছেন। তারপর আমেরিকার অখ্যাত খেলোয়াড় ক্লিফটন মেন তৃতীয় রাউণ্ডে পরাজিত করেছেন অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা এবং পাঁচ নম্বর বাছাই খেলোয়াড় নীল ফ্রেজারকে। এ ছাড়া আরও কয়েকটি খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফল সূচিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলা বিভাগে বিজয়িনী হয়েছেন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন নিগ্রো টেনিস পটিয়সী মিস অ্যালথিয়া গিবসন। মিস গিবসন ফাইন্যালে ৪ বারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন এবং গতবারের বিজয়িনী মিস লুই ব্রাউকে ৬—৩ ও ৬—২ সেটে পরাজিত করেন। এখানে বলা যেতে পারে, নিগ্রো খেলোয়াড়ের পক্ষে আমেরিকার টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয়িনীর সম্মান অর্জন যেমন প্রথম ঘটনা তেমন বাছাই তালিকার বাইরে থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনও প্রথম ঘটনা।

ফরেস্ট হিলে ভারতের একমাত্র প্রতিযোগী ছিলেন খ্যাতনামা খেলোয়াড় রামনাথ কৃষ্ণন। তৃতীয় রাউণ্ডে কৃষ্ণনকে প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ডিক সেভিটের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

DESH
Saturday, 21st September, 1957

২৪ বর্ষ ॥ ৪৭ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ৪ আশ্বিন ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

উদ্বাস্তু-সমস্যা

মানুষ যখন একই কালে বিভিন্ন গুরুতর সমস্যার বা আঘাতের সম্মুখীন হয়, তখন যেমন অনেক ক্ষেত্রে তাহার বেদনাবোধ অন্তর্হিত হয়, অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্য সমস্যায় একান্ত পীড়িত পশ্চিমবঙ্গেও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু মানুষদের সম্বন্ধে সেইরূপ বেদনাবোধ হ্রাস হইয়াছে বলিয়া এক-এক সময় মনে হয়। যাঁহারা উদ্বাস্তুদের পক্ষ লইয়া কখনো কখনো আন্দোলন করেন, তাঁহারাও যে কতটা মানবিকতা বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

এই অবস্থায় একটা ভাল সংবাদ এই যে, জাল মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট লইয়া যে-সকল উদ্বাস্তু ভারতে আসিয়াছেন এবং যে-সকল উদ্বাস্তু আশ্রয়শিবির ত্যাগ করিয়াছেন, সরকার তাঁহাদের সম্বন্ধেও অবশেষে ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। যাঁহাদের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট জাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল, তাঁহারা নিজেরা সেগুলি জাল করিয়াছেন, এমন কথা বোধ করি কেহ বলেন না; নিরক্ষরতা বা বিশ্বাস-পরায়ণতার ফলে তাঁহারা প্রতারিত হইয়াছেন; অপরপক্ষে তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রেই দেশের সমস্ত বন্ধন ও আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, ফিরিবার পথ নাই, ফিরিবেন না বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন—এক্ষেত্রে আইনের বাধার উপরে মানবিকতাবোধের জয়ী হইতে এত বিলম্ব কেন ঘটিল, তাহাতেই আশ্চর্য হইতে হয়।

উদ্বাস্তু আগমন রোধ

উদ্বাস্তুদের আগমন হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া অনেকে সন্তোষ বোধ করেন—পূর্ব-পাকিস্তান তাঁহাদের পক্ষে পূর্বাপেক্ষা নিরাপদ হইয়াছে বলিয়া কি এই সংখ্যা-হ্রাস ঘটিয়াছে? না অনুমতিপত্র লইয়া অতিরিক্ত কড়াকাড়িই ইহার কারণ? দ্বিতীয়টিই আসল কারণ, এই রকম ধারণা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহাতে ভারত সরকার শ্রদ্ধার্হ হইবেন না—আমরা আশা করি যে, এই ধারণার মূলে কোন সত্য নাই; কিন্তু সরকারি মহল হইতে এ সম্বন্ধে স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা সাধারণ মানুষ আশা করে। দুই রাজ্যের সীমা 'সিল' করা হউক, যাহাতে উদ্বাস্তু আগমন রোধ হয়—এই রকম প্রস্তাবও একাধিকবার হইয়াছে, তাহার ফলেও লোকের মনে সংশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাকিস্তান সরকার যাহাই প্রচার করুন, পূর্ববঙ্গ হইতে যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা এখানে স্বর্গ-রাজ্যের আশায় আসিতেছেন, এমন বোধ হয় না—পূর্বে আগত উদ্বাস্তুদের অনেকে কি অবস্থায় আছেন, সেকথা তাঁহারা একেবারেই অবগত হন নাই, এরূপও মনে হয় না। দেশত্যাগ করিবার জন্য উস্কানি দেওয়াও পূর্ব-পাকিস্তানে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এ অবস্থায়ও যাঁহারা আসিতেছেন, পূর্ব-পাকিস্তানে বাস তাঁহাদের পক্ষে আর সম্ভব নহে, এইরূপ মনে করিয়াই আসিতেছেন, অন্তত অধিকাংশের ক্ষেত্রে একথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাজেই উদ্বাস্তু আগমন-সংখ্যা-হ্রাসে নিশ্চিন্ত না হইয়া, যথাকালেই যথোচিত প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা অবলম্বনই বিবেচনার কাজ হইবে বলিয়া মনে হয়—দণ্ডকারণ্য-স্কীম তাহারই স্বীকৃতি বলিয়া আমরা আশা করিতেছি।
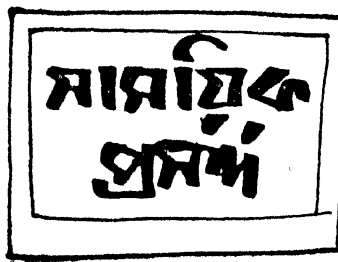
দায়িত্বহীন রাজনীতির প্রহসন

দায়িত্বহীন রাজনীতিকগণের উক্তি স্বভাবতই অসংযত হইয়া থাকে, কেননা, তাঁহারা মনে মনে বেশ জানেন যে, সরকার গঠনের সুযোগ পাইয়া এই সব উক্তির দায়িত্ব তাঁহাদের বহন করিতে হইবে না, কাজেই তাঁহারা যথেচ্ছ হাতী-ঘোড়া বিলাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া যান। কিন্তু দৈবাৎ তাঁহাদের ঘাড়ে সরকার গঠনের দায়িত্ব আসিয়া পড়িলে যে কাণ্ডটি ঘটে, প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়া যে প্রহসনের সৃষ্টি করে, তাহা দেবতাদেরও উপভোগ্য। এই রকম কাণ্ডটি ঘটিয়াছে কেরল রাজ্যে। তথাকার কম্যুনিস্ট পার্টি, বেকারি দূর, অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন, জমি সংক্রান্ত আইনের সংস্কার ও শ্রমিকজনের জন্য স্বাস্থ্যোন্নয়ন প্রভৃতি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ছয় মাসে প্রতিশ্রুতির পর্বত শিক্ষা-সংস্কার-রূপ একটি মূষিক প্রসব করিয়াছে—কেরল রাজ্যের ক্ষেত্রে যাহার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আসল প্রহসন অন্যত্র। তথাকার মুখ্যমন্ত্রী এখন এমন সব বিবৃতি দিতেছেন, যাহা যে কোন "প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সরকারের" মুখ হইতে বাহির হইতে পারিত। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের "প্রতিক্রিয়াশীল, ধনিক-দরদী, বুর্জোয়া সরকারের" বিবৃতি ও শ্রী নাম্বুদ্রিপাদের বিবৃতি এখন ভাষায় ও ভাবে অভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আগে বলিয়া না দিলে বুঝিবার উপায় নাই। ইহাই অদৃষ্টের পরিহাস ও দায়িত্বহীন রাজনীতির পরিণাম।

দুইটি বিবৃতি—

(১) "অদ্য বলেন যে, শিল্পায়ন ব্যবস্থার

জন্য রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, শিল্পক্ষেত্রে যাহাতে শান্তি অব্যাহত থাকে, তদুদ্দেশ্যে দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে তিন হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য একটা ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি বলেন যে, এই ব্যবস্থা অনুসারে কর্মীদের যুক্তিসঙ্গত মজুরীর হার, বোনাস, অন্যান্য ভাতা ও চাকুরির শর্তাবলীর নিশ্চয়তা থাকিবে এবং মালিকদের পক্ষে তাঁহাদের শিল্প-পরিচালনার জন্য এমন শান্তিপূর্ণ পরিবেশের নিশ্চয়তা থাকিবে, যাহার ফলে ধর্মঘট ও লক-আউট উভয়ই এড়ান যাইবে।

(২) দ্বিতীয় বিবৃতিতে আশা করা হইয়াছে যে, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইবে। মালিক-শ্রমিক বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা, ঝগড়া-বিবাদের দ্বারা সম্ভব নয়, তজ্জন্য সকল পক্ষকে আলাপ-আলোচনা চালাইতে হইবে। আরও বলা হইয়াছে যে, ধর্মঘট ও কারখানা বন্ধের দ্বারা শ্রমিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

দুইটি বিবৃতিই একই উপাদানে প্রস্তুত, একই ঘিয়ে ভাজা এবং একই উনুনে রান্না—অর্থাৎ বিশুদ্ধ "প্রতিক্রিয়াশীল ও বুর্জোয়াভাবাপন্ন" কোনটি কম্যুনিস্টের, কোনটি কংগ্রেসের অনুমান সহজসাধ্য নহে বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, প্রথমটি কেরলী সরকারের বিবৃতি, দ্বিতীয় বিবৃতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। ইহাতে কি প্রমাণ হয়? ইহাতে প্রমাণ হয় যে, কাজের রাস্তা এক, প্রপাগাণ্ডার রাস্তা অনেক এবং বলা বাহুল্য, দুই রাস্তার লক্ষ্য ভিন্ন।

কেরল সরকার কাজের পথে নামিয়াছেন, দেখিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইবে এবং সত্যকার কাজ করিতে সমর্থ হইলে আমরা সর্বাগ্রে উচ্চকণ্ঠে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিব। কিন্তু তৎপূর্বে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কেরলী সরকার যদি ভাবিয়া থাকেন যে, নিজ রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া অন্য রাজ্যে অশান্তি ও অরাজকতার সমর্থন করিবেন, তবে গোড়াতেই ভুল করিয়া বসিবেন। দেশের একাঞ্চলের অবস্থা অন্য অঞ্চলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে বাধ্য। আশা করি, ছয় মাসের সরকারী জীবনেই কেরল সরকার তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। কম্যুনিস্ট কেরল আজ ধর্মঘট, সত্যাগ্রহ, ঘেরাও, চড়াও, সরকারবিরোধী শোভাযাত্রা, কালো পতাকা, হরতাল প্রভৃতির দ্বারা যে কোন "প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া রাজত্বের" মতই আক্রান্ত হইয়াছে। তবু আমরা আশা করিয়া থাকিব যে, কেরলের কম্যুনিস্ট সরকার শেষ পর্যন্ত নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া প্রকৃত কাজের পথ ধরিবেন।

ভারতীয় চিত্রপ্রযোজকের সম্মান

বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক শ্রীসত্যজিৎ রায় 'অপরাজিত' ছায়াচিত্রের জন্য ভেনিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার লাভ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে 'পথের পাঁচালীর ছবি তুলিয়া তিনি দেশে-বিদেশে অভিনন্দিত হইয়াছেন। চলচ্চিত্রের উদ্ভব পাশ্চাত্য দেশে, সেই বড় বাজারে তাঁহার কৃতিত্বের যাচাই হইয়া গেল। সত্যজিৎ-বাবুর সম্মান লাভ ভারতীয় ছায়াচিত্র জগতের সম্মান লাভ। তাঁহাকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

লেখক ও প্রযোজকের সহযোগিতা

আমাদের একটি ধারণা আছে যে, লেখকের কলম ও প্রযোজকের বিশেষজ্ঞতা পরস্পরের সহযোগিতা করিলে প্রথম শ্রেণীর চিত্র রচনার সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়া যায়। এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। বিভূতিভূষণের কলম ও সত্যজিৎ বাবুর বিশেষজ্ঞতা পরস্পরের শক্তি বর্ধন করিয়াছে। অধিকাংশ চিত্র ক্ষণজীবী হয়, তাহার প্রধান কারণ, অনেক সময়ই কাহিনীর অকিঞ্চিৎকরতা প্রযোজকের শক্তি বর্ধন করিবার পরিবর্তে শক্তি হরণ করিয়া বসে। এক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ঘটনায় এমন আশ্চর্য সার্থকতা সম্ভব হইতে পারিয়াছে। সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আমরা বিভূতিভূষণেরও উদ্দেশে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সরকারী কর্মচারীর বিচিত্র মন্তব্য

১৩ই সেপ্টেম্বর হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় "Story behind Pather Panchale" বা 'পথের পাঁচালীর গোপন রহস্য' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে, পথের পাঁচালী ছবি তুলিবার জন্য অর্থসাহায্য করা উচিত হইবে কি না, জানিবার আশায় পশ্চিমবঙ্গের প্রচার বিভাগের কোন "High official" বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মন্তব্য চাহিয়া পাঠানো হয়। উক্ত উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী মন্তব্য করেন যে, 'কাহিনী নিরস ও মন্থর'! কাহিনীতে সামাজিক কাপুরুষতার (Cowardice) প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে, কাহিনীটিতে যুগোচিত ও সমাজকে সচেতন করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কাহিনীর শেষভাগে আড়াই-তিন হাজার ফুট কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্ট ও ন্যাশনাল এক্সটেনশন স্কীমের চিত্র জুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। উক্ত মন্তব্যকারক উচ্চ কর্মচারীটির পরিচয় জানিবার জন্য আমরা ব্যগ্রতা প্রকাশ করিব না। শুধু এইমাত্র বলিব যে, সরকারী কর্মচারী চক্রের (Bureaucracy)নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে সাধারণ্যে যে জনশ্রুতি আছে, অন্তত এক্ষেত্রে তাহা সত্য। এই শ্রেণীর কর্মচারীর "অব্যাপারেষু ব্যাপার" হইতে ভগবান সরকারকে রক্ষা করুন।

ভারতবর্ষের এক অঞ্চলে অপর অঞ্চলবাসীর কর্মপ্রাপ্তির বাধা-নিষেধ দূরীকরণ

ব্রিটিশ শাসনকালে কোন কোন প্রদেশে এই নিয়ম বলবৎ ছিল যে, কর্মপ্রার্থী যতই যোগ্য হউন, সেই প্রদেশের লোক বা সেই প্রদেশে দীর্ঘকালের অধিবাসী না হইলে তিনি কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। নিখিল ভারতের ঐক্য-বোধের দিক দিয়া তত্ত্বগতভাবে এই নিয়ম সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না এবং এই নিয়মে যোগ্যতম প্রার্থীর নিয়োগও নিশ্চিত হইতে পারে না, এবং এক অঞ্চলে এইরূপ নিয়ম থাকিলে অপর অঞ্চল যদি অনুরূপ নিয়ম প্রবর্তন করিয়া শোধ লন, তবে প্রাদেশিকতাবোধ কেন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা লইয়া শোক করিবার কোন অর্থ হয় না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সম্প্রতি ভারত লোকসভায় এই বাধা দূর করিবার জন্য একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার ধারাগুলি এখনও সঠিক জানিতে পারা যায় নাই, জানিতে পারিলে ইহার গতি-প্রকৃতি বুঝিতে পারা যাইবে। আপাতত এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, আশা করি, এই আইনের ব্যবহার একতরফা হইবে না; যেমন ধরা যাক, বাংলা দেশে ইহার ফলে অন্য দেশবাসীর নিয়োগ আরও বর্ধিত ও ত্বরান্বিত হইবে, অথচ অপর প্রদেশে বাঙালীর নিয়োগে যদি বর্তমানে অসুবিধা কিছু থাকে, তাহা কার্যত দূর হইবে না, কারণ ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের আবশ্যকতা দূর হইলেও নিশ্চয়ই নিয়োগ-কর্তাদের হাতে আরও অস্ত্র থাকিবে। আগামীকালে হিন্দী ভাষায় সুদক্ষতা, এইরূপ একটি অস্ত্র হইতেও পারে। আইন কেবল বাহ্য বাধাই দূর করিতে পারে, কিন্তু অন্তরের পরিবর্তন যদি না হয়, ভারতবর্ষের এক অঞ্চলকে পশ্চাৎপদ করিয়া অপর অঞ্চলের সাময়িক সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী মঙ্গল হইতে পারে না। সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গল এক সূত্রে গ্রথিত, এই বোধ দ্বারা যতদিন বিভিন্ন অঞ্চলের রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির নায়কগণ সম্যক্ প্রবুদ্ধ না হইতেছেন, ততদিন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ যথেষ্টই আছে।

সালাজারের জেলে উনিশ মাস

ত্রিদিব চৌধুরী

॥ ১৩ ॥

বিরোন্তে হইতে ওয়ালপই

এ অঞ্চলের এই অফিসার কয়জন সকলেই মাপসার পুলিশ হেড কোয়ার্টার হইতে আসিয়াছে। বিরোন্তে ওয়াল্‌পই থানার অধীন বলিয়া মাপ্‌সা হেড কোয়ার্টারের জুরিসডিকশনের মধ্যে পড়ে। কাজে কাজেই সেখানে কর্তৃপক্ষ সশরীরে হাজির হইয়াছেন। ইহাদের দলের ভিতর যাহাকে সবচেয়ে হোমরাচোমরা গোছের বলিয়া মনে হইল সে ব্যক্তির সঙ্গে ঐদিন রাত্রিতেই আবার মাপসা থানার হাজতে দেখা হয়। খানিকক্ষণের মধ্যেই তাহাদের আসার উদ্দেশ্য বোঝা গেল—পুলিশের প্রাথমিক জেরা সরকারী পর্তুগীজ বয়ানে 'perjuntas preneiras'। মিলিটারী এবং সিকিউরিটী পুলিশ তাহাদের এলাকায় ভারতীয় ডাকাতদের ধরিয়া ফেলিয়াছে। বলাই বাহুল্য, পর্তুগীজ সরকারের দৃষ্টিতে আমরা অহিংস সত্যাগ্রহী নই; আমরা "Bandidos Indianos"—Indian Bandit বা ভারতীয় ডাকাত। "সত্যাগ্রহী" বলিয়া কোনো কিছু তাহাদের অভিধানে নাই। কাজে কাজেই মিলিটারী এবং দেশরক্ষা পুলিশের হাতে ধরা পড়িলেও সাধারণ থানা-পুলিশ আমাদের উপর তাহাদের দখল ছাড়িবে কেন? এখন মিলিটারী বা সিকিউরিটী পুলিশের হাত হইতে ক্রমশ এই এলাকার সাধারণ পুলিশ আমাদের চার্জ নিবে। সেইজন্য এই অঞ্চলের জেলা হেড কোয়ার্টার মাপসা হইতে স্বয়ং এ্যাডজুটাণ্ট কমাণ্ডাণ্ট সাহেব নিজে সরেজমিনে তদন্ত করিতে আসিয়াছেন, এ্যাডজুটাণ্ট কমাণ্ডাণ্ট নাম শুনিতে খুব গালভরা হইলেও ভদ্রলোকের পদমর্যাদা আমাদের পুলিশের ডি-এস-পি র‍্যাঙ্কের কাছাকাছি। জাতে যে গোরা পর্তুগীজ, তাহা না বলিয়া দিলেও চলিবে।

এ ভদ্রলোক অবশ্য একটু উচ্চপদস্থ। কিন্তু গোয়াতে "Sub-Chefe" বা সাব্‌-ইন্সপেক্টর গ্রেডের উপরে কালা আদমী গোয়ান এক আধজন ছাড়া বড় বেশী নাই বলিলেও চলে।

উপরে "Chefe", বা ইন্সপেক্টর গ্রেড হইতে সকলেই প্রায় ইউরোপীয় পর্তুগীজ। এ্যাডজুটাণ্ট কমাণ্ডাণ্ট হইলে তো কথাই নাই। অবশ্য পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী, গোয়াতেও প্রথম শ্রেণীর নাগরিক বলিয়া যাঁহারা গণ্য, তাঁহারা সকলেই খাস পর্তুগীজ নাগরিক। ইহাদের ভিতর কে দেশী ক্রিশ্চিয়ান বা দো-আঁসলা ফিরিঙ্গী লুসো-ইণ্ডিয়ান (যাহাদের পর্তুগীজ ভাষায় "misto", মিস্তো বা কোঙ্কনীতে মিস্তী বলে; আমাদের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ট্যাঁশ ফিরিঙ্গী ধরনের), কিম্বা পুরাতন বাসিন্দা ইউরোপীয় পর্তুগীজ তাহা সব সময় চেহারা দেখিয়া তফাৎ করা যায় না। তবু যতটা দেখিয়াছি, "সুব্‌ শেফ্‌" গ্রেডের উপর বেশী গোয়ান, ক্রিশ্চিয়ান বা হিন্দু, আমাদের চোখে প্রায় পড়ে নাই। এ'কথার অর্থ এ নয় যে পর্তুগীজরা খাস গোয়া পর্তুগীজ ছাড়া অন্য কাহাকেও বড় বড় চাকুরী দেয় না। গোয়াতে ঠিক সে হিসাবে ইউরোপীয়

প্রাধান্য নাই; পর্তুগীজরা জাতিগত বা বর্ণগত আভিজাত্যবোধের তত বেশী মর্যাদা দেয় না। ইউরোপীয় বা ভারতীয় গোয়ানীজ—এই হিসাবে জাতিগত বৈষম্য ,বা বর্ণ বৈষম্যের প্রভাব পর্তুগীজ সাম্রাজ্যে প্রায় নাই বলিলেও চলে। কিন্তু পর্তুগাল অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনগ্রসর বলিয়া সেখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত ভদ্রলোকেদের ভিতর সরকারী চাকুরীতে ঢোকার ঝোঁক বেশী থাকে। তাহা ছাড়া চাকুরীর পথ বেশী খোলা নাই। কাজে কাজেই পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সর্বত্র সরকারী কর্মচারীরা পর্তুগাল হইতে আসে একটু বেশী। খাস পর্তুগাল বা লিসবনের ঔপনিবেশিক দপ্তর হইতে, আফ্রিকা হোক, এশিয়া হোক, যেখানে ছোট বড় যেটুকু জমিদারী তাহাদের আছে, সবটা এক জায়গা হইতে শাসন করা হয় বলিয়া খাস পর্তুগালের গোরা পর্তুগীজ অফিসাররা স্বভাবতই সেখানকার চাকুরী-বাকরীর ভাগটা কিছু বেশী পায়। তার উপরে ইদানীং জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের দরুণ গোয়ানদের উপর ততটা ভরসাও পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট করিতে পারিতেছেন না। দলে দলে সাধারণ পুলিশ কনস্টেবল পর্যন্ত লিসবন হইতে আনিয়া ফেলা হইয়াছে। এই-সব কনস্টেবলদের বেতনের হার গোয়ান "সুব শেফ"দের বেতনের চেয়ে বেশী। শেফ বা ইন্সপেক্টরদের তো কথাই নাই। কাজে কাজেই পর্তুগীজ গোরা কর্মচারীদের সংখ্যা গোয়াতে একটু বেশীই; কিন্তু তাহাতে খুব আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

আমাদের গোরা কমাণ্ডাণ্ট সাহেব অবশ্য জীপ হইতে নামিয়াই আমাদের গ্রেপ্তারকারী অফিসারদের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করিয়া, দু'একটা কথাবার্তা বলিয়া গটগট করিয়া সটান পুলিশ চৌকীর ঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন। আমাদের তৎক্ষণে, ফোটো তোলার পরে বারান্দায় আনিয়া সারি বাঁধিয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি অবশ্য সেখানেও "লীডার" সুলভ মর্যাদা ও "মনোযোগ" পাইতেছি; অর্থাৎ আমাকে সেই বারান্দাতেই একটু দূরে আমার সেই চারজন স্টেনগানধারীর জিম্মায় আলাদা বসাইয়া রাখা হইয়াছে। বলা বাহুল্য আমাদের সকলের অবস্থাই তখন বেশ কাহিল। আমি তো তবু মার খাই নাই; কিন্তু আমাদের দলের আর প্রত্যেকে, বৃদ্ধ ভগৎ তুলসীরাম পর্যন্ত, চোরের মার খাইয়া ধুঁকিতেছেন বলিলে চলে। তাহার উপর দু'দিন ধরিয়া খাবার বলিতে গত রাত্রির একমুঠো খিচুড়ি ছাড়া কিছু ভাগ্যে জোটে নাই। কাহারও মাথা কি কপাল কাটিয়া গিয়াছে; গায়ে হাতে-পায়ে সকলেরই দগদগে কালশিরা বা কাটার দাগ; কাহারও কাহারও জামায় কাপড়ে রক্ত। এর পরে অদৃষ্টে আরো কি আছে, কে জানে? আমি আমার জায়গা হইতেই কুমার পিল্লাইয়ের সঙ্গে দু'একটি কথা বলিতে চেষ্টা করিতেই আমার এক গোরা প্রহরী ধমক দিয়া উঠিল—"Chefe! Nao

Falar!"......"লীডারা কথা বলা বারণ!" ভাষাগত অর্থবোধ না হোক, পুলিশের ধমক এবং হুমকীর একটা ভাষার অতীত সার্বজনীন 'আবেদন' আছে। সহজেই বুঝিলাম এখানে এভাবে কথা কওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। এই "Nao Falar" ধমকানি এই দিনের পর হইতে উনিশ মাস ধরিয়া আমাদের সাথী। ধমক খাইয়াই তখনকার-মতো চুপ করিয়া গেলাম। কিন্তু ভলান্টিয়ার-দের মুখের দিকে তাকাইয়া মনে মনে খুবই কষ্ট হইতে লাগিল। সকলেই চোরের মার খাইয়াছে; দুদিন ধরিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া সকলেই নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নিতাই গুপ্তের হাতটা একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে; নিদারুণ যন্ত্রণায় বেচারা সোজা হইয়া বসিতে পারিতেছেন না পর্যন্ত। ইশারায় জানাইলেন একটু জল খাইতে চান। আমার মনে হইল এবার সত্যাগ্রহীদের 'শেফ' বা লীডার হিসাবে এখন আমার 'পদ-মর্যাদা'কে কাজে লাগাইলে বোধহয় দোষ হইবে না। পুলিশের কনেস্টবল সিপাহীদের মধ্যেও আমি "শেফ" বলিয়া ততক্ষণে কিছুটা মার্কা-মারা হইয়া গিয়াছি। একজন দেশী সিপাহীকে কাছা-কাছি আসিতে দেখিয়া ইশারা করিয়া তাহাকে ডাকিয়া হিন্দীতে বলিলাম—'ইন্সপেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চাই, একটু ডাকিয়া দিতে পারো।' গোয়া পুলিশের লোকেরা অনেকেই পুণা-বোম্বাই আসা যাওয়া করিয়াছে, একটু একটু হিন্দী সকলেই প্রায় বোঝে। সে ঘরের ভিতরে গিয়া আমাদের পুরানো পরিচিত সেই মোটা বেঁটে ইন্সপেক্টর সাহেব ও তাহার গোয়ান যুবক সহকারীকে ডাকিয়া আনিল। তাহাদের বলিলাম—'আমার লোকেরা খুবই কাহিল হইয়া পড়িয়াছে, দুদিন তাহাদের কিছু খাওয়া দাওয়া হয় নাই আমি যদি পয়সা দিই তাহা হইলে তাহাদের জন্য কিছু চা রুটি বা কমপক্ষে শুধু জল পাওয়া যাইবে?' ভলান্টিয়ারদের মুখের দিকে একবার তাকাইয়া বোধহয় ভদ্রলোকের মনে একটু দয়া হইল। একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—"...কিন্তু পয়সা? 'শা' এবং 'পাঁও' ('Paon'=রেড বা পাঁওরুটি, মারাঠী এবং কোঙ্কনীতেও 'পাঁও' কথার মানে পাঁউরুটি) কিনিতে তো পয়সা লাগিবে'। আমার পকেট তখনও কয়েকটা টাকা ছিল, সেই ভরসাতেই টাকা দিতে চাহিয়াছিলাম। বলিলাম 'টাকা আমি দিতেছি'; পকেট হইতে যে কয়েকটা টাকা ছিল বাহির করিয়া দিলাম, বোধহয় পাঁচ-ছয়টা এক টাকার নোট হইবে। ভদ্রলোক টাকা কয়টা একজন সিপাহীর হাতে দিয়া কাছে কোনো হোটেলে বা দোকানে চা রুটি পাওয়া যায় কিনা দেখিতে বলিলেন। চা অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমাদের কপালে জোটে নাই। কারণ তখন বেলা প্রায় আড়াইটা তিনটা। চায়ের দোকানে দুধ ছিল না। ইন্সপেক্টর সাহেব টাকা কয়টা ফেরৎ দিয়া বলিলেন—'চা পাওয়া গেল না, তবে তোমরা যদি খাওয়ার জল চাও তো বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি।' পুলিশের হুকুমে এক দোকান হইতে দু'তিন বালতি খাওয়ার জল আসিল। সেই জলও হয়ত এই ভদ্রলোকের মনে দয়ার উদ্রেক না হইলে পাওয়া যাইত না।

ইতিমধ্যে মাপসার এ্যাডজুটান্ট সাহেব একজন একজন করিয়া ভলান্টিয়ারদের ঘরের ভিতর ডাকিয়া নিয়া জেরা আরম্ভ করিয়া

দিয়াছেন। জেরার ধরন অবশ্য সাধারণ রকম ধমক-চমকের সংগে নিম্নলিখিত রূপঃ

—"তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? গোয়া আসার টাকা-পয়সা কে দিয়াছে? দৈনিক কত করিয়া তোমাদের বেতন দেয়? ছাড়িয়া দিলে হিন্দুস্থানে চলিয়া যাইবে না আবার ফিরিয়া আসিবে?"—ইত্যাদি! অফিসার ভেদে জেরার রকম ফের হয়, জেরার সংগে ধমকের মাত্রা কমে বাড়ে; চড়-চাপড়, লাথি-কিল-গুঁতা সবই জোটে। আমাদের দলের লোকেদের কপালে এই সব ফাউ তত জোটে নাই; অল্প সল্প চড় চাপড়ের উপর দিয়াই যায়। এ্যাডজুটাণ্ট পরে মাপসা হাজতে আমায় বলিয়াছিলেন—'আজ নিতান্ত রবিবার, তাই আমার হাত হইতে তোমার লোকেরা সহজে অব্যাহতি পাইয়াছে, নহিলে—!' জানি না ভদ্রলোকের মনে আফশোষ ছিল কি না। কিন্তু এ কথাও সত্য ক্যাথলিক ও ধর্মভীরু রক্ষণশীল জাত বলিয়া নানান রকম পেণ্ডেণ্ট ক্রস, তাগা-তাবিজ মাদুলী ধারণ করার সাথে সাথে, আনুষ্ঠানিকভাবে রবিবার বা সাবাথ পালন করাটা পর্তুগীজদের সাধারণ রীতি: রবিবারের দিন বা ঐ রকমের ধর্ম কর্মের দিনে পর্তুগীজরা পারতপক্ষে কোনো খারাপ কাজ করিতে চায় না। পুলিশের লোকেরাও রবিবারের দিনে হইলে পর দেখিয়াছি মারধোর একটু কম করিত।

যাহা হউক ক্রমে জেরায় আমারো ডাক পড়িল। আমি ঘরে ঢুকিতেই এ্যাডজুটাণ্ট চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিলেনঃ

"তোমরা গোয়া নিতে চাও? গোয়া নেওয়ার দাম কি দিতে হইবে জানো?

আমার উত্তর ঃ "তোমরা গোয়ায় থাকিতে চাও? গোয়ায় থাকিতে চাহিলে কি দাম দিতে হইবে জানো"?

"আমি ওসব কথা শুনিতে চাহি না; কে তোমাকে পাঠাইয়াছে? তোমাকে দেখিয়া শিক্ষিত লোক মনে হয়। জানো, তোমার এ কাজের শাস্তি কি? জানো, তোমাকে আমরা গুলী করিয়া মারিতে পারি"?

"মারো না কেন? একটি বুলেটের বেশী খরচ হইবে না"!

"তোমাকে আমি সাফ বলিয়া দিতেছি গোয়া পর্তুগালের, গোয়া চিরকাল পর্তুগালেরই থাকিবে! তোমরা জোর করিয়া গোয়া নিতে পারিবে না!"

"ইংরেজরাও তাই মনে করিয়াছিল।"

"বটে? বটে?"

"তোমার দোভাষীকে জিজ্ঞাসা কর"।

"তোমার অত লেকচার আমি শুনিতে চাই না। আমরা পাঁচশ বছর ধরিয়া এখানে আছি আমরা চিরকাল এখানে থাকিব।"

"লেকচার আমি দিতেছি না, তুমি দিতেছো। পারো তো থাকো না কেন? আমরা তো তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে আসি নাই। এত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে?

"তোমাকে কে পাঠাইয়াছে? পিটার আলভারিসকে চেনো? সে কোথায়? সে ব্যাটা নিজে আসে না কেন? অন্য লোক পাঠায় কেন?"

গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা বলিয়া পিটারের উপর তখন পর্তুগীজদের খুব রাগ। তাহাদের ধারণা, পিটার নেহরুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এখন গোয়ায় সত্যাগ্রহীদের পাঠাইতেছেন; ইহার পরেই দাদ্‌রা এবং নগর-হাভেলীর মত জোর করিয়া গোয়া দখল করা হইবে। সত্যাগ্রহ তাহার জন্য একটা ছল ছুতা তৈরী করার ফন্দী মাত্র।

এ্যাড্‌জুটাণ্ট পর্তুগীজ ভাষায় প্রশ্ন করিতেছেন, আর সেই পূর্বোক্ত গোয়ান ভদ্রযুবকটি আমাদের দুজনের মধ্যে দোভাষীর কাজ করিতেছে। আমি এ্যাড্‌জুটাণ্টের এই শেষ কথার উত্তরে প্রথম সত্যাগ্রহী হিসাবে একটু সত্য গোপন করিলাম:

"পিটার আলভারিসের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি আমার নিজের দায়িত্বে আসিয়াছি" (এটা সত্য) "আমাকে তোমরা যে কোন শাস্তি দিতে পারো। আমি কেন আসিয়াছি তাহা তোমাদের গভর্নর জেনারেল সাহেবকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছি। আমরা মনে করি, গোয়ায় থাকার তোমাদের কোনো অধিকার নাই।"

"বটে! বটে! বটে অধিকার নাই? অধিকার নাই? এ্যাই কোন্ হ্যায়! একে বাহিরে নিয়া যাও! এখনই মন্তেইরোর কাছে হাজির কর"!

মন্তেইরো কে, সে পরিচয় এখনি দিতেছি। আমার চার প্রহরী পিঠে প্রায় স্টেন্ ঠেকাইয়া ঠেলা দিয়া আমায় ঘরের বাহিরে নিয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া দেখি, একটি প্রকাণ্ড বড় মোটর ট্রাক্ এবং আর একটি সাঁজোয়া ওয়েপন কেরিয়ার জাতীয় মোটর গাড়ি। ট্রাক দেখিয়া আন্দাজ করিলাম, আমাদের ভলাণ্টিয়ারদের বোধহয় আজ রাত্রেই বর্ডারে ফেরৎ নিয়া গিয়া মারধোর করিয়া ছাড়িয়া দিবে। তখনো পর্যন্ত সাধারণ সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রেপ্তারের পর মারধোর করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াই ছিল পর্তুগীজ পুলিশের নীতি; এক ১৯৫৫ সালের ২৬শে জানুয়ারীতে যাহারা গোয়া প্রবেশ করিয়াছিল এমন একটি দল ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকদের তাহারা এইভাবে ছাড়িয়া দেয়। সত্যাগ্রহী নেতাদের মধ্যে গোরে প্রমুখ আমাদের আটজনকে ছাড়া আর কাহাকেও ধরিয়া রাখে নাই। অবশ্য ভারতবর্ষ হইতে গোয়ান সত্যাগ্রহী গেলে তাহার কথা আলাদা। আমাদের দলের ভলাণ্টিয়ারদের সেই রাত্রে হাজতে রাখিয়া পরের দিন ডোডামার্গের দিক দিয়া তাহাদের আর এক দফা পিটাইয়া ছাড়িয়া দেয়। বেচারী নিতাই গুপ্তের ভাঙ্গা হাত বেলগাঁও হাসপাতালে আসিয়া প্রায় দিন পনেরো চিকিৎসার পর জোড়া লাগে। নাসিক হইতে আগত একটি মুসলমান যুবকও এই সঙ্গে ভীষণভাবে আহত হয়। আমি মানিকোম্ পাগলা গারদে বসিয়া প্রায় দেড় মাস দু' মাস বাদে চোরাই পদ্ধতিতে লুকাইয়া জেলে আনা মাদ্রাজের সাপ্তাহিক 'হিন্দু' কাগজে তাহাদের খবর পাই।

জেরা শেষ হওয়ার পর, বারান্দায় আমার নিজের জায়গায় আবার ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়, আমাদের উপর হুকুম হইল—'গাড়িতে চলো'। প্রথমে ভলাণ্টিয়ারদের এক এক করিয়া ট্রাক্‌টিতে উঠানো হইল। তাহাদের মধ্যে বাদ থাকিলেন নিতাই গুপ্ত, ভগৎ তুলসী রামজী এবং নাসিকের একটি খুব অল্পবয়সী ছেলে—তাহার নামটি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু চেহারাটি আজো মনে আছে। খুবই প্রিয়দর্শন, ১৭-১৮ বছর বয়সের ছেলে। মাপ্‌সার এ্যাড্‌জুটাণ্ট সাহেবের কি করিয়া ধারণা হয়, বাচ্চা ছেলে; বোধহয় একটু মারধোর করিলে কিংবা লোভ দেখাইলে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের সম্পর্কে অনেক খবর উহার কাছ হইতে পাওয়া যাইবে! ছেলেটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক দলভুক্ত; বলা বাহুল্য, পর্তুগীজ পুলিশ তাহার মুখ হইতে কোনো খবরই বাহির করিতে পারে নাই। তিনদিন বাদে পঞ্জিমের পুলিশ হাজত হইতে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ভগৎজীকে আলাদা রাখার কারণ, তিনি বয়স্ক লোক এবং হয়ত কোনো 'chefe' বা 'politico' (লীডার বা রাজনৈতিক নেতা) হইতেও পারেন। তাই তিনি আটক পড়িলেন এবং নিতাই গুপ্ত, তাঁহার অপরাধ তিনি আমাদের দলের পতাকাবাহী ছিলেন। এ্যাড্‌জুটাণ্ট এই তিনজনকে বাছাই করিয়া মন্তেইরো-র কাছে হাজির করার হুকুম দিয়া তাঁহার নিজের ল্যাণ্ড রোভারে করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়া আবার মাপ্‌সা ফিরিয়া গেলেন। আমরাও গিয়া আমাদের ওয়েপন কেরিয়ারে উঠিলাম। গাড়িতে আমাদের প্রত্যেকের পাশে একজন করিয়া বা দুজনের মধ্যে একজন এই হিসাবে কাঁধে স্টেন্ গান ঝুলাইয়া এক একজন পর্তুগীজ সৈন্য বসিল। গাড়ি এবার রওনা হইল ওয়াল্‌পইয়ের দিকে, সেখানে গোয়া পুলিশের গোয়েন্দা বড়কর্তা স্বনামধন্য কাসিমির মন্তেইরো আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন—সেই কাসিমির মন্তেইরো যাহার নামে গোয়ায় বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়! আমি অবশ্য তখনো জানিতাম না কে এই মন্তেইরো।

(ক্রমশ)

সারাদিন তার স্বপ্নেই উনি বিভোর,
যার কোমল মুখের কমনীয় প্রসাধন—
পণ্ড্‌স
ট্যালকাম
পাউডার
যেমন হালকা, তেমনি স্নিগ্ধ ও সুগন্ধি। এই পাউডার ব্যবহারে সারাদিন ঠিক 'স্নানের পরের স্নিগ্ধতা' অনুভব করা যায়।
POND'S
DREAMFLOWER TALC
DREAMFLOWER TALC
বিনামূল্যে পুস্তিকা : আমাদের প্রসাধন-পুস্তিকা 'লাভ্‌লিয়ার উইথ্‌ পণ্ড্‌স' চেয়ে পাঠান। মুখশ্রী ও সৌন্দর্য-রক্ষা সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা এতে পাবেন।
ঠিকানা : পোঃ বক্স ১০১২, বোম্বাই-১
P 4444

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

শিবনারায়ণ রায়

"তুমি যে নোটস্ পাঠিয়েছ তার জন্য ধন্যবাদ। এ বিষয়ে আমার সমালোচনা করার কিছু নেই, কেননা, তোমার দৃষ্টি-কোণের সঙ্গে আমার বিশেষ মিল আছে। তুমি যে বইটির কথা লিখেছ, আমি সেটির জন্যে অপেক্ষা করছি। তুমি যদি ইংলণ্ডে আসো, দেখা হলে খুশি হব। ভারতীয় চিন্তার বিকাশ সম্বন্ধে আমি বিশেষ আগ্রহান্বিত। আশা করি, সে চিন্তা মার্কসবাদ এবং হিন্দু গোঁড়ামি—এই দুই বিরোধী অযৌক্তিকতার বিকল্প এড়াতে পারবে।"

কলকাতা ছাড়ার আগেই বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কাছ থেকে এ-চিঠি পেয়েছিলাম। লণ্ডনে পৌঁছে তাই সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে পত্র লিখি। পত্রপাঠ তিনি মেরিওনেথ-এ আসার জন্য আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু মেরিওনেথ্ লণ্ডন থেকে ট্রেনে পাকা সাত ঘণ্টার রাস্তা। যাব-যাব করেও সময় আর হয়ে ওঠে না। ইতিমধ্যে রাসেল খবর দিলেন, 'মে' মাসে তিনি লণ্ডনে আসছেন, যদি কুড়ি তারিখে বিকেলে তাঁর মিলব্যাঙ্কের ফ্ল্যাটে চা খেতে যাই, খুশি হবেন।

পার্লামেণ্ট পেরিয়ে টেমসের ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন উনত্রিশ নম্বর বাড়ির সামনে পৌঁছলাম, তখন বিকেল চারটে। খুঁজতে হল না, বাড়ির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শীর্ণকায় পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ দূরদেশাগত ভক্তের প্রতীক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখে নিজেই নিচে নেমে এসে দরজা খুললেন, পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন দোতলায় তাঁর বসার ঘরে। ঘরে আর কেউ ছিল না। স্বহস্তে চা ঢেলে দিলেন পেয়ালায়, সুগন্ধী ফিকে সোনালী রং চীনে চা। প্লেট সাজিয়ে দিলেন স্যাণ্ডুইচ, কেক, বললেন—শিব, বস, চা খাও।

—আপনি?

—আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। পরশু জন্মদিনে একটু অত্যাচার হয়েছে। আমি শুধু চা খাব। তুমি কি ভারতীয় চা পছন্দ কর, না এই চীনে চা চলবে?

রাসেলের নানা বয়সের ছবি দেখেছি, কিছুদিন আগে টেলিভিশনেও তাঁর আলোচনা শুনেছি। কাছ থেকে ভালো করে দেখলাম। তীক্ষ্ন দীর্ঘ নাক, চওড়া কপাল, রুপোলি পাতলা চুল পিছন দিকে ওল্টানো, কিন্তু বুরুশ করা নয়, অগোছাল, ঘাড়ের কাছে খোঁচা খোঁচা। ত্রিভুজাকৃতি মুখ, কপালের দুই প্রান্ত থেকে হাড়ের সরল রেখা নেমে এসে মিশেছে তীক্ষ্ন কোণের মত ছোট্ট থুতনিতে। না, মুখের ডৌলে কিংবা অঙ্গের সংস্থানে লাবণ্য বা সুষমার খোঁজ মেলা শক্ত। কিন্তু পাতলা ঠোঁটের কোণে, ঈগল চোখের নিচে চামড়ার কোঁচকানো রেখায় এমন এক উজ্জ্বল প্রসন্ন কৌতুকের ঝিলিক, যা দেখে একবার মনে হল, প্রথম বসন্তের সদ্যফোটা ক্রোকাসের কথা, আর তার পরেই শরতের নীল আকাশের নিচে রুপোলি কাঞ্চন-জঙ্ঘাকে।

—তোমার প্রবন্ধের বইটা পেয়েছি, পড়াও হয়ে গেছে। তোমাদের দেশে এ ধরনের লেখা হচ্ছে, আমার জানা ছিল না। তোমার অধিকাংশ বক্তব্যের সঙ্গেই মোটামুটি আমি একমত। তবে তোমার শেষ প্রবন্ধটিতে মনে হ'ল সার্ত্র সম্বন্ধে তুমি একটু যেন দুর্বলতা দেখিয়েছ। তোমার দৃষ্টিভঙ্গী যা বুঝতে পারলাম, তাতে সার্ত্র-এর গলদ আরো স্পষ্ট করে দেখাবে আশা করেছিলাম।
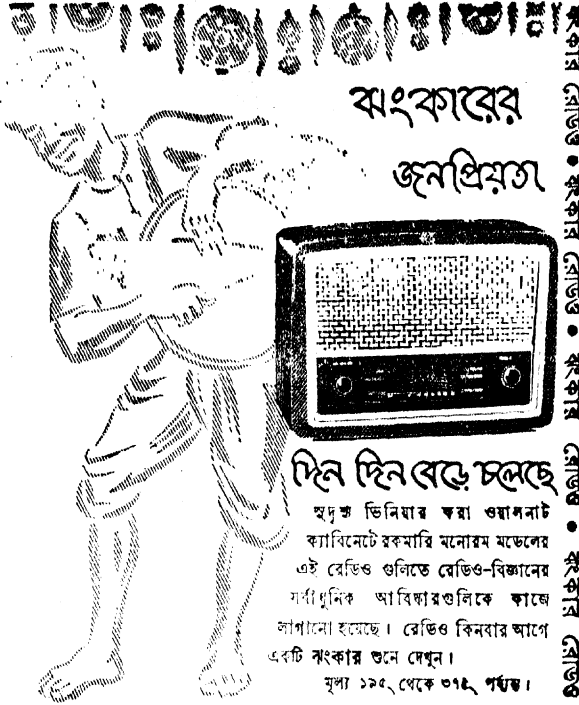
—আমার আরো কোনো কোনো সহকর্মীও এ-অভিযোগ করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, সার্ত্র-এর চিন্তাকে যুক্তিবাদীরা যেভাবে অগ্রাহ্য করতে চান, সেভাবে অগ্রাহ্য করাটা বোধহয় যুক্তিসঙ্গত নয়। সব চিন্তাকেই তার যুগ-কাল-পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে বিচার করা ঠিক নয় কি? আপনিও তো আপনার 'দর্শনের ইতিহাস'-এ তাই করেছেন। আমার মনে হয়েছে, এ-যুগে মানব-সভ্যতার পথে সব-চাইতে প্রথম প্রতিবন্ধক হ'ল সর্বগ্রাসী সমষ্টিবাদ। সার্ত্র তারই বিরুদ্ধে ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এখানেই তাঁর মূল্য। তাঁর সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করতে পারি না, কিন্তু তাঁর প্রতিবাদের প্রতি আমি সহানুভূতিশীল।

—বুঝলাম। কিন্তু প্রতিবাদ করে যদি আমি এমন বিকল্প খাড়া করি, যাতে আমার নিজের পরেই সব আস্থা চলে যায়, তবে জেনে হোক না জেনে হোক, আমি কি শেষ পর্যন্ত সেই সমষ্টিবাদী ধারাকেই সমর্থন করলাম না? অস্তিত্ববাদীরা যুক্তির বদলে উপস্থিত করছে অস্পষ্ট চিন্তার আদর্শ, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আবিষ্কার করেছে অসাহয়তার গ্লানি।
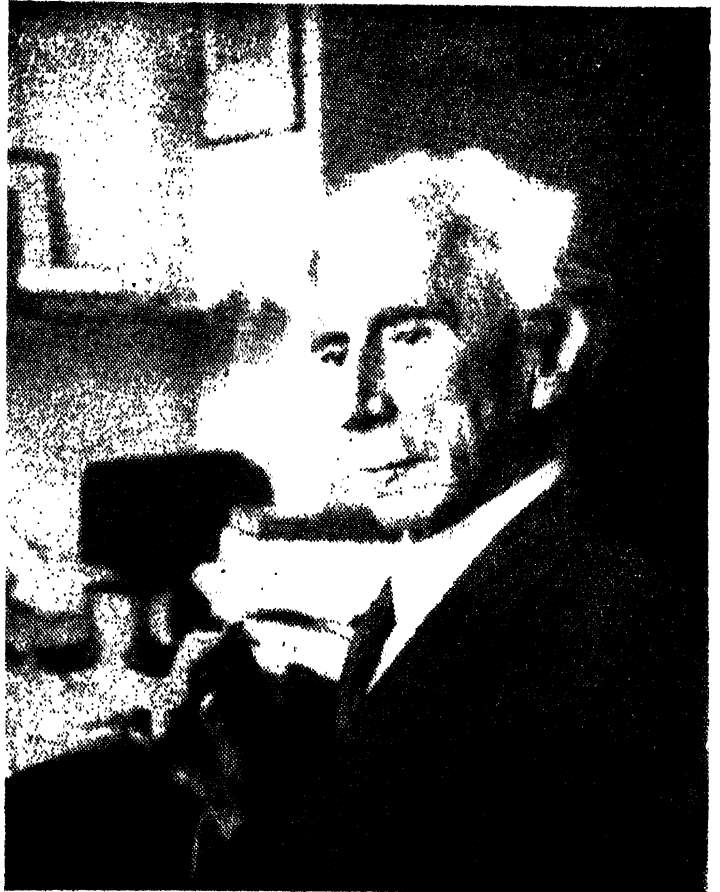
—সেকথা আমি আমার সমালোচনায় বলিনি?

—বলেছ; কিন্তু আমার মনে হ'ল আরও স্পষ্ট করে বললে তোমার যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গতি থাকত। তাছাড়া দেখ, এরা একধারে চায় নীতির ক্ষেত্রে চরম নিশ্চয়তা, অন্য ধারে তা অসম্ভব বলে কাঁদতেও এদের বাধে না। এটা কি নেহাত ছেলেমানুষী নয়?

—কিন্তু নিশ্চিতির সমস্যাটা কি একেবারেই অর্থহীন? আসলে আমরা যখনই কোন কিছুকে ভালো বা মন্দ বলে বিচার করি, তখনই কি আমাদের মাপকাঠিতে সামান্যতা গুণ আরোপ করি না? অথচ আমার বিচারে যা ভালো বা মন্দ, তা যে সকলের পক্ষে ভালো বা মন্দ, এর তো কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু যা ভালো, তা যদি সকলের পক্ষেই ভালো না হয়, তবে তাকে ভালো বলার মানে কি? তাহলে তো আমার ভালো লাগে বললেই চুকে যায়। অথচ আপনিও জানেন, আমিও জানি, আমার ভালো লাগে বলে আমাদের তৃপ্তি নেই। যদি অন্য কোন কারণ না-ও থাকে, আমাদের ব্যক্তিগত ইণ্টেগ্রিটি এবং পারস্পরিক সম্বন্ধের স্টেবিলিটির জন্যে ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের বিচারে সামান্যতার নিশ্চিতি দরকার নয় কি?

—তুমি বোধহয় দুটো স্বতন্ত্র সমস্যাকে গুলিয়ে ফেলেছ। প্রথমটা দার্শনিক, দ্বিতীয়টা মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক। দর্শনের পক্ষে উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ এসব শব্দের খুব যে কোন অর্থ আছে, তাতো মনে হয় না। কথাগুলো আমরা সকলেই ব্যবহার করি বটে, কিন্তু ব্যবহার করি বলেই যে কথাগুলোর কোন দার্শনিক যাথার্থ্য আছে, তা নয়। আমাদের প্রত্যেকেরই নানা আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন আছে। সেগুলো আমরা কমবেশি মেটাবার চেষ্টা করি। মেটাতে পারলে ভাল লাগে। এই ভাল লাগার আবেগগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করি, কোন বিশেষ আকাঙ্ক্ষা কোন বিশেষভাবে মেটানো ভালো। কিন্তু আসলে আকাঙ্ক্ষা নানা, মেটাবার পদ্ধতিও নানা, তারা বদলায়। ফলে ভালোর ধারণাও বিভিন্ন এবং তা-ও বদলায়।

—কিন্তু এছাড়া অন্য দিকও ভাবার নেই কি? ধরুন, আপনি মনে করেন গণতন্ত্র ভালো, সাম্রাজ্যবাদ খারাপ। আপনি যখন একথা মনে করেন, তখন কি ধরে নেন না, এটা সকলে মানুক চাই নাই মানুক, এটা সকলের পক্ষেই সত্যি? যদি তা না মনে করেন, তবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই বা আপনি সারাজীবন লিখে এলেন কেন? এবং গণতন্ত্রের স্বপক্ষেই বা এত চেষ্টা করলেন কেন?

—প্রথম কথা, আমি যখন গণতন্ত্রকে

ভালো মনে করি, তখন তার কারণ আমার অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, যুক্তি, সব কিছুই নির্দেশ দিচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবচাইতে বেশি লোকের সবচাইতে বেশি পরিমাণ আকাঙ্ক্ষার পূরণ ঘটবে, এবং সেই কারণেই তাদের সুখ বৃদ্ধি হবে। কিন্তু দার্শনিক হিসেবে আমি জানি, আমার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কোনো সময়েই সম্পূর্ণ নয়, হতে পারে না এবং সে কারণে তার 'পরে ভিত্তি করে আমি যে সিদ্ধান্তই করি না কেন, তার সীমাবদ্ধতা অবশ্যম্ভাবী। আরও জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা সে সিদ্ধান্ত সমর্থিত হতে পারে, পরিবর্তিত হতে পারে, ভুল প্রমাণ হতে পারে। সুতরাং আমি আমার সিদ্ধান্ত বিষয়ে ফ্যানাটিক হতে পারি না। অন্য সিদ্ধান্ত শুনতে চাই, বুঝতে চাই, তার থেকে শিখতে চাই। তার মানে এ নয় যে, আমার সিদ্ধান্তে আমার আস্থা নেই বা সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি কাজ করতে পারব না। যতক্ষণ না সে সিদ্ধান্ত বদলাবার যথেষ্ট কারণ দেখছি, ততক্ষণ সেই অনুসারে কাজ করব এবং তার বিরোধী সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করব। কিন্তু তা বলে আমার সিদ্ধান্ত চরম বা নিত্য বলে মনে করব না, মন উন্মুক্ত রাখব। কারণ দার্শনিক হিসেবে আমি জানি, নিত্য সিদ্ধান্ত অকল্পনীয়। এবং নীতির ক্ষেত্রে সে নিত্যতা শুধু অসম্ভব নয়, তা স্বীকার করাও মারাত্মক।

—কিন্তু মন উন্মুক্ত রেখেও আপনি ধরে নিচ্ছেন, যাতে বেশি লোকের বেশি পরিমাণ আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়, তাই বেশি ভালো। যাতে আকাঙ্ক্ষা দমিত হয়, খর্বিত হয় তা মন্দ। এবং সেই ধরে নেওয়ার পিছনে কি আরো একটা প্রত্যয় কাজ করছে না যে, এই ভালো এবং মন্দ শুধু আপনার ব্যক্তিগত ভালো-লাগা-না-লাগার ব্যাপার নয়, এটা অন্যদের ক্ষেত্রেও সমান সত্য।

—আমি তা ধরে নিচ্ছি বটে, কিন্তু সেই ধরে নেওয়ার মধ্যে তিনভাবে নিজেকে সতর্ক করেছি। প্রথমত, আমার আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদের আকাঙ্ক্ষা এক না-ও হতে পারে। এবং যে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা এখন আমার কাছে প্রধান, অন্য সময়ে তা অপ্রধান ঠেকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং কোনো বিশেষ আকাঙ্ক্ষা স্বীয় গুণে অন্য আকাঙ্ক্ষা থেকে প্রকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপায় পদ্ধতিতেও নানা অবস্থায় নানা মানুষের ক্ষেত্রে নানা ফারাক ঘটতে পারে। সুতরাং কোন বিশেষ ফরমুলাকে সব সময়ে, সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে আমি জানি না। তৃতীয়ত, আমি সচেতন, আমি যেমন আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চাই, অন্যরাও তেমনি তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায় এবং সে কারণে সেই পদ্ধতিই খোঁজা দরকার, যাতে আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ অন্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণেও বাধা না দেয়। কেননা,

সেক্ষেত্রে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী এবং তাতে আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণেও বাধা ঘটবে। একথাগুলিকে মনে রাখার ফলে আমি কোন নীতিকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে সকলের ঘাড়ে চাপাতে নারাজ। অর্থাৎ মানুষের নিজের ইন্টিগ্রিটি এবং সমাজের স্থিতি-স্থাপকতার জন্যে আমি কোন নীতি-নির্দেশের চাইতে বুদ্ধির সক্রিয়তার উপরেই বেশি নির্ভর করি।

—আপনার কথাটা বুঝলাম। এবং মোটামুটি আমার নিজের চিন্তা যে অনেকটা এই ধারাতেই চলেছে, আমার লেখা যেটুকু পড়েছেন, তা থেকে হয়ত আভাস পেয়ে থাকবেন। কিন্তু এভাবে চিন্তা করে আমরা যে ভালো-মন্দ বিচারের মূলে সমস্যা সমাধান করতে পারছি, এটা আমার এখনও মনে হচ্ছে না। আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা ভালো, নিগৃহীত হওয়া খারাপ, এ ধরনের কথা যে মুহূর্তে ভাবছি, সেই মুহূর্তে আমাদের বিচারে এমন এক সামান্যতা আরোপ করছি, যা আমাদের প্রমাণ করার উপায় নেই। কেউ যদি বলে, না, আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা আমার কাম্য নয়, তবু তাকে বোঝাবার উপায় কি? আপনি ভালো-মন্দ, প্রেয় কাম্য এসবের জায়গায় অন্য শব্দ ব্যবহার করলেও সামান্যতা গুণের প্রশ্নটা থেকেই যায়। তা ছাড়া যখন দুটো আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিরোধ ঘটে, কিংবা একজনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আরেকজনের অথবা অল্প কয়েকজনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বহুজনের আকাঙ্ক্ষার—তখনি বা আমরা শুধু আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার মাপকাঠিতে কি করণীয়, তা কেমন করে ঠিক করব?

—একটা একটা করে ধর। প্রথমত, যে বলবে আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা সে চায় না, সে স্ববিরোধী কথা বলছে, কারণ 'চায় না' এই কথাটাই ধরিয়ে দিচ্ছে, সে-ও তার আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা চায়। তার আকাঙ্ক্ষা আমার আকাঙ্ক্ষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একথা বলা শক্ত যে এমন কোন মানুষ আছে, আকাঙ্ক্ষা পূরণ যার কাম্য নয়। থাকতে পারে না বলছি না, এবং সেই কারণেই আমি ডগম্যাটিক নই। কিন্তু আছে বলে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কোনোভাবেই আমার জানা নেই। সুতরাং আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে আকাঙ্ক্ষা পূরণ যখন সকলেই চায় এবং পূরণে যখন সকলেরই ভালো লাগে, তখন বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা বার করার চেষ্টা করতে পারি, কখন কিভাবে কোন্ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করলে আমাদের অন্য সব আকাঙ্ক্ষা এবং অন্য মানুষদের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয় না। এমন কি, আর একটু এগিয়ে এটাও আমরা ভাবার চেষ্টা করতে পারি, কি করে একের আকাঙ্ক্ষা পূরণ অন্যদের আকাঙ্ক্ষা পূরণকে সুগম করতে পারে। কিন্তু সব সময়ে মনে রাখতে হবে বুদ্ধি খাটিয়ে যে পথই আমরা বার করি না কেন, তা স্বতঃসিদ্ধ নয়, আপ্ত নয়, সামান্য নয়, তা পরিবর্তন সাপেক্ষ, সীমাবদ্ধ নতুন অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে তা বারবার যাচাই হওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত, যে বিরোধের কথা বলছ, সেখানেও এমন কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই, থাকতে পারে না, যা দিয়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমান সাফল্যের সঙ্গে বিচার করতে পারি। প্রত্যেকটি বিরোধের ক্ষেত্রে আমাদের নতুন করে ভাবতে হয়, বুদ্ধি খাটাতে হয়, দেখতে হয় কোনো আকাঙ্ক্ষার পূরণ না ঘটলে আরও অনেক আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ বন্ধ হবে। আমি আগেই বলেছি, কোন নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষাকেই নিজগুণে প্রকৃষ্ট বলা যায় না। অন্য সব আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে তবেই বিশেষ অবস্থার মধ্যে তার বিশেষ সার্থকতা বিচার করতে হয়। ধর, আমার কাছে মাতাল হবার আকাঙ্ক্ষা ক্ষতিকর ঠেকে। কেন? না, মাতাল অবস্থায় সে লোকের অন্য সব আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষমতা থাকে না, নিয়মিত মাতাল হলে ক্রমে তার সে ক্ষমতা একেবারে লোপ পায়। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটতেও পারে। তাছাড়া মদের আকাঙ্ক্ষা এবং মাতাল হবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অনেক ফারাক আছে, এবং সকলেই কিছু আর সমান মদ খেয়ে মাতাল হয় না। এসব খুঁটিনাটি স্মরণে না রাখলে নৈতিক বিচার জুলুমবাজী হয়ে দাঁড়ায়। তারপর ধর, একের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অন্যের আকাঙ্ক্ষার বা অল্প কয়েকজনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বহুজনের আকাঙ্ক্ষার বিরোধের কথা। এখানেও আমরা আমাদের আগের অভিজ্ঞতার ওপরে নির্ভর করে বিচার করি—এবং সে বিচারে ভুল হবার সম্ভাবনা সব সময়েই থাকে। আমরা শুধু বুদ্ধির সাহায্যে চেষ্টা করতে পারি, যাতে একের আকাঙ্ক্ষা পূরণ অন্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাধা না ঘটিয়ে তাতে সাহায্য করে, যাতে মুষ্টিমেয়ের সুখ বহুজনের দুঃখের পরে নির্ভরশীল না হয়। আমাদের চেষ্টা সব সময়ে সফল হয় না, আমাদের সকলের বুদ্ধি সব সময়ে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না। এটা বাস্তব ঘটনা, একে উড়িয়ে দিয়ে লাভ কি? আমরা এই ঘটনাটা ঘটনা হিসেবে স্বীকার করে, চেষ্টা করে যেতে পারি, যাতে একের সঙ্গে অন্যের, অল্পের সঙ্গে বহুর বিরোধ কমে আসে।

—কিন্তু এই চেষ্টা তো খাপছাড়া ব্যাপার নয়। সব মানুষের মধ্যেই আকাঙ্ক্ষা আছে, সব মানুষই আকাঙ্ক্ষা পূরণে সুখ পায়, সব মানুষেরই কমবেশি বুদ্ধি আছে, যার সাহায্যে সে অন্যের সুখে বাধা না দিয়ে নিজের সুখের পরিমাণ, বৈচিত্র্য, গভীরতা বাড়াতে পারে। অন্তত এই রকম কিছু একটা সাধারণ নিয়ম না থাকলে আকাঙ্ক্ষা পূরণ যে কেন ভালো, একের আকাঙ্ক্ষা পূরণের

ন্য অন্যের আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিবন্ধক ানো যে কেন খারাপ, এসব কথার অর্থ াঝা শক্ত। আমার মনে হয়েছে, এসব কথার ান অর্থ করতে হলে হয় মানবপ্রকৃতি লে কিছু কল্পনা করতে হয়, আর না হয় লে-মন্দের কোন মানবোত্তর সূত্র খুঁজতে য়। আমরা প্রথমটা গ্রহণ করেছি, ধার্মিক াক্তিরা দ্বিতীয়টা। কিন্তু এর কোনটাই হণ না করলে সার্ত্র-এর আর্তি কি করে এড়ানো সম্ভব, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—হয়ত তোমার কথাই ঠিক। তবে এই কথাটাও ভাবতে বলি। সব মানুষকে আমরা কোনদিনই জানব না, সুতরাং মানবপ্রকৃতি বলে আমরা যে কল্পনাই খাড়া করি, তার অসম্পূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী। আপাতত মানবোত্তর কোন সূত্রের সম্ভাবনা নিয়ে আলাপ করার দরকার দেখি না, কারণ এজাতীয় কল্পনার যে কোন সার্থকতা আছে তা তুমিও মনে কর না, আমিও মনে করি না। কিন্তু 'মানবপ্রকৃতি' নাম দিয়ে কোন বিমূর্ত কল্পনা খাড়া করে তুমি যদি তোমার নৈতিক বিচারে সামান্যতা এবং নিশ্চয়তা আনতে চাও, তবে এ আশংকা সব সময়েই থাকবে যে সেই 'মানবপ্রকৃতি' সম্বন্ধে তোমার ধারণাকে একদিন স্বতঃসিদ্ধ বলে খাড়া করে তা থেকে অনুমিত নানা নীতি নির্দেশকে তুমি ডগ্‌মা বলে চালাতে চাইবে। তোমাদের 'ইন ম্যানস ওউন ইমেজ' পড়ে তোমাদের ব্যবহারিক আদর্শকে যত তারিফ করেছি তোমাদের এই নিত্য সত্তার জন্যে প্লেটোনিক অনুসন্ধান দেখে তত বিচলিত বোধ করেছি। তবে তোমার এক্সপ্লোরেশনের প্রবন্ধগুলো পড়ে মনে হচ্ছে প্লেটোনিক আওতা থেকে তুমি এখন বেরোবার চেষ্টা করছ। নাকি আমার অনুমান ঠিক নয়?

আমি চুপ করে রইলাম। আমার মনে পড়ল দশ বছর আগে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন আমার প্লেটো-বিমুখতা নিয়ে তিনি রহস্য করেছিলেন। বলেছিলেন, বিশুদ্ধ এম্‌পিরিসিজম্‌-এর ভিত্তিতে বিজ্ঞান বা নীতিবোধ কিছুই দাঁড়ায় না। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল আগে পর্যন্ত এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিস্তর তর্ক হয়েছে। এই তো কিছুকাল আগেও আমার "সাহিত্যচিন্তা" বইটির প্রথম প্রবন্ধে প্লেটোনিক চিন্তাধারার আমি তীব্র সমালোচনা করেছি। অথচ রাসেল বলেন, আমার লেখার মধ্যে প্লেটোনিক প্রভাব লক্ষ্য করে তিনি বিচলিত হয়েছেন। চিন্তার বিচারও তাহলে আপেক্ষিক!

আমি চুপ করে আছি দেখে রাসেল আবার বলতে শুরু করলেন। দেখ, তুমি গোড়াতে একটা কথা বলেছিলে যে ব্যক্তির ইণ্টেগ্রিটি এবং সমাজের স্টেবিলিটির জন্যে নৈতিক নিশ্চয়তার দরকার আছে। এটা দর্শনের কথা নয়, মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্বের কথা। হয়ত এ দরকার আজও অনেক ব্যক্তির এবং প্রায় সব সমাজের আছে। কিন্তু এ দরকারকে সর্বজনীন বা নিত্যকালীন ভাবো কি করে? খোঁড়া মানুষের ক্রাচ্‌ দরকার বলে যার দুটো পা সবল, অক্ষত, সেও কেন ক্রাচকে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মানবে? আমার তো ধারণা পরিণত মানুষের পক্ষে নৈতিক নিশ্চয়তা শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, অনাকাঙ্ক্ষেয়। Certainly in moral judgement is not only unnecessary, it is highly undesirable. এই নিশ্চয়তার খোঁজ মানুষকে ফ্যানাটিক-এ পরিণত করে। সে তখন শুধু একটা দিককে বড় করে বাকি সব দিককে অবহেলা করে। যা কিছু তার নিশ্চিতকে আঘাত করে বা

করতে পারে, তাকে সে জোর করে দমন করতে চায়। যা জটিল, বিচিত্র,, পরিবর্তনশীল তাকে ছাঁচে ফেলে তবে তার শান্তি। আমার কি মনে হয় জান? কোন মানুষ যে মনের দিক থেকে সত্যিই প্রাপ্তবয়স্ক তার বড় প্রমাণ হ'ল সে নিশ্চিতির খোঁজ ছেড়ে তার চিন্তা, অভিজ্ঞতা, ব্যবহারের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং স্পষ্টতা আনার চেষ্টা করেছে। এবং যেহেতু ব্যক্তিদের নিয়েই সমাজ, সে কারণে সে সমাজে এই ধরনের প্রাপ্তবয়স্ক, মানুষ বেশি দেখা যায়, সেই সমাজকেই বেশি সভ্য, সংস্কৃত, বিকশিত বলা চলে!

আমি চুপ করে থাকলেও মনে মনে খুসি হচ্ছিলাম, কারণ রাসেল প্লেটোনিক আওতার অভিযোগ করলেও, আমার নিজের চিন্তা মোটামুটি এই ধারাতেই গড়ে উঠেছে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করে পীড়িত হচ্ছিলাম যে, আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যে সব গভীর সমস্যা প্রায় অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে বলে আমার অন্তত আশংকা, রাসেল তাদের একেবারে অবান্তর বলে অগ্রাহ্য করছেন। তবে কি আমার সে আশঙ্কা ভিত্তিহীন? এ সব সমস্যা কি প্লেটোনিক প্রভাবের দায়ভাগ? অথচ কি নিজের কি রাসেলের যুক্তি দিয়ে আমি তো এ সমস্যাগুলো খণ্ডন করতে পারছি না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সসঙ্কোচে বললাম,আপনি হয়তো বিরক্ত হচ্ছেন, কিন্তু আমার মনে সন্দেহ রয়ে যাচ্ছে যে "প্রাপ্তবয়স্ক" বা ঐ জাতীয় কল্পনার সূত্রে পিছনের দরজা দিয়ে "নিশ্চিতি এবং সামান্যতার" কল্পনাও ফিরে আসছে কিনা। দর্শনের দিক থেকে "নিশ্চিতিকে" বাদ দিয়ে "পরিণতির" কথা কল্পনা করা শক্ত। অন্য দিকে মনস্তত্বের দিক থেকেও আমাদের এই কল্পিত "প্রাপ্তবয়স্ক" মানুষ সচেতনভাবে হোক বা না হোক, সামঞ্জস্যের প্রয়োজনে কোনো না কোনো স্থায়ী মানদণ্ড ধরে নিচ্ছে না কি? তাহলে কি ঘুরে ফিরে গোড়ার সমস্যাতেই ফিরে আসছি না। কোনো সিদ্ধান্ত বা মাপকাঠিকে নিত্য বা চরম বলে মানা অযৌক্তিক এবং ক্ষতিকর, আর সেই কারণে সব সিদ্ধান্ত এবং মাপকাঠিকে বারবার যাচাই করার জন্যে মন খোলা রাখা দরকার। কিন্তু যাচাই করতে গিয়ে আমরা কি কোনো না কোনো মানদণ্ডকে সেই শেষ পর্যন্ত নিত্য এবং সামান্য বলে ধরে নিলাম না?

—ধরে নিলামও বটে আবার তারই সঙ্গে সেটা যে নিত্য নয়, সামান্য নয়, সে বিষয়েও সচেতন রইলাম। এইজন্যেই তো বুদ্ধিরবিকাশ এবং সক্রিয় প্রয়োগের উপরে আমি এতো জোর দিচ্ছি। কিন্তু এ ধরনের সমস্যা কি চায়ের টেবিলে এক বৈঠকে সমাধান হবার কোন আশা রাখে? অবশ্য হাজার বৈঠকেও যে আশা আছে, তাও বলতে পারি না। আসলে দার্শনিকের কাছে সমাধানের চাইতে সমস্যাগুলোকে স্পষ্টতর করাটাই বড় কথা। আমার এ কথায় তুমি খুব কি হতাশ হলে? রাসেলের চোখ, ঠোঁট এবং নাকের পাশ হাসির রেখায় ভরে উঠল। তবে যদি মেরিওনেথ্-এ আসো তাহলে সমস্যাটাকে আরো স্পষ্ট করার চেষ্টা করতে পারি, কি বলো? সে যাক্, এতক্ষণ তো আমার কথা অনেক শুনলে, এবার এদেশে এসে তুমি কি দেখলে শুনলে কিছু বল।

আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। রাসেলের বয়েস প'চাশী, গোড়াতেই শুনেছি অসুস্থ, আমি এসেছি এক ঘণ্টার উপর—আমার এতক্ষণ বিদায় নেওয়া উচিত ছিল। আমি উঠে পড়ে বললাম, "আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম। আর একটু বিরক্ত করার অনুমতি চাই। যদি আপত্তি না করেন, একটা ফটো তুলি।"

—তোমার কি কোনো তাড়া আছে? আমার কিন্তু ভালই লাগছে। যদি তাড়া না থাকে, তাহলে বসো, আরেকটু গল্প করা যাক। ছবি তুলতে তোলো। তবে আমার অসুবিধে হচ্ছে ভেবে এখনি যাবার কোন কারণ নেই।

সুতরাং ছবি তুলে আবার বসা গেল। আমার আবার তাড়া কিসের? রাসেল সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, "চলে তো?" আমি একটু ইতস্তত করে ধরালাম। পেয়ালায় নতুন করে ভেজানো চা ঢেলে রাসেল শুধোলেন, "দেড় মাসে এদেশ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হল?"

আমি বললাম, "এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা দেশ সম্বন্ধে কোন ধারণা করা শক্ত। তবে যতটা সম্ভব ঘুরে ফিরে দেখার চেষ্টা করছি। নানারকম লোকের সঙ্গে মেশবারও চেষ্টা করছি। শুনেছিলাম এদেশের লোক অসামাজিক, আমার অভিজ্ঞতা তো একেবারেই অন্যরকম। যেখানে গেছি, যাঁর কাছে গেছি, আতিথ্য, হৃদ্যতা মুগ্ধ করেছে। এই দেখুন না, এদেশে না এলে বিশ্বাস করাই শক্ত হত যে, আমার মত অখ্যাত সামান্য যুবককে রাসেলের মত মানুষ নিজের হাতে চা তৈরি করে আপ্যায়ন করতে পারেন।"

রাসেল স্মিতমুখে আমার উচ্ছ্বাস শুনছিলেন। হঠাৎ আমি থেমে বললাম, "এসব কথা যাক—একটা প্রশ্ন বহুদিন থেকে আমার মনে ঘুরছে—এদেশে এসে অনেককে সে কথা জিজ্ঞেস করেছি—আপনার কাছ থেকেও শুনতে চাই। আচ্ছা, পশ্চিমের সভ্যতা কি আজ সত্যিই ভাঙ্গার মুখে? স্পেঙ্গলার-সোরোকিনের ডায়াগ্নোসিস্ কি শেষ পর্যন্ত যথার্থ প্রমাণিত হতে চলেছে?"

রাসেল তাঁর কেদারায় সিধে হয়ে বসলেন। আমার চোখের উপরে তাঁর উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চোখ দুটি রেখে প্রশ্ন করলেন, "তোমার এ বিষয়ে নিজের ধারণা কি?"

—আমার এখনও কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। তবে যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপীয় সাহিত্য এবং দর্শন যেটুকু পড়েছি, তাতে মনে হয়েছে, পশ্চিমী বুদ্ধিজীবীরা যেন নিজেদের সংস্কৃতির মূল্য সম্বন্ধে আগের তুলনায় অনেক বেশি দ্বিধাগ্রস্ত, অনিশ্চিত। এদেশে যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁদের কথাবার্তায় ক্লান্তির, হতাশার আভাস পেলাম। এই প্রসঙ্গে আমি ব্রকওয়ে এবং আইসায়া বার্লিনের সঙ্গে আলোচনার কথা উল্লেখ করলাম।

রাসেল কিন্তু মাথা নাড়লেন। "আমার ধারণা একেবারে বিপরীত। ব্রক্‌ওয়েকে মানুষ হিসেবে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করি, ব্রকওয়ে একটা কথা একেবারে ভুলেছেন। ব্রকওয়ে যখন বালক ছিলেন, তখনকার দিনেও বেশিরভাগ ছেলেপুলে খুনেজখমের গল্প ভালোবাসত তাদের আদর্শও ছিল রোমাণ্টিক গুণ্ডা। ব্রকওয়ে স্বয়ং যদি ছেলেবয়সেই অন্যায় অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াই-এর আদর্শ গ্রহণ করে থাকেন, তবে তার কারণ তাঁর যুগের বৈশিষ্ট্য, নয়, তাঁর নিজেরই বৈশিষ্ট্য। তেমন বিশিষ্ট ছেলেমেয়ে আজকের যুগেও আছে বইকি। আমি তো প্রত্যহ নানদেশ থেকে অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের কাছ থেকে অজস্র চিঠি পাই—যেসব চিঠি গভীর আদর্শবাদের সুরে ভরা। আসলে সবযুগেই যারা যুক্তিবাদী, দূরদর্শী তারা সংখ্যায় কম—অধিকাংশ লোক স্বপ্নে, চোখ ঝলসানো নাটকীয় হৈচৈ-তেই সহজে মজে। এত যে সোক্রেটিসের কথা শুনি, সে যুগেই বা যুক্তিবাদী মননতন্ত্রী ক'জন ছিলেন? ব্যাপার কি জানো, যত বয়েস বাড়ে আমরা ফেলে-আসা কালকে ততই রোমান্সে মুড়ে দেখতে শুরু করি। আমি তা করতে রাজী নই, কারণ আমার ফেলে-আসা দিনগুলোর অভিজ্ঞতা আমি আজও একেবারে ভুলতে পারিনি।

কয়েকটা উদাহরণ দিই। আমার ছেলেবয়েসে এই লণ্ডনের কি চেহারা ছিল? দু'একটা অভিজাত পাড়া ছাড়া যেখানেই যাও চোখে পড়ত বস্তি, ছেঁড়া কাপড় পরা স্ত্রী-পুরুষ, বিত্ত এবং বুভুক্ষার ভয়াবহ অসাম্য; একধারে বিবেকহীন অপচয় অন্যধারে কুৎসিৎ দারিদ্র্য। আজও লণ্ডনে দারিদ্রের অভাব নেই, কিন্তু পঞ্চাশবছর আগেকার অবস্থার সঙ্গে কোন তুলনা হয়না। আজ এদেশে প্রতিটি ছেলেমেয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে। বেকার প্রায় নেই বললেই চলে, জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়েছে বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কেনার ক্ষমতাও অনেক বেড়েছে। এ পরিবর্তন স্থূলে উপকরণগত ব্যাপার নয়, আমাদের সামাজিক বিবেক অনেক সূক্ষ্ম, সক্রিয়, সমৃদ্ধ হয়েছে বলেই এ পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। আর ভেবে দেখো, এ পরিবর্তন সবচাইতে ব্যাপকভাবে ঘটেছে কোন সময়ে? যখন আমাদের সাম্রাজ্য গেছে, সমৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে পৃথিবীর প্রধান শক্তিদের আসন থেকে আমরা নেমে গেছি। এতবড় ঘা খেয়েও আমরা যে ডিক্‌টেটরশিপের পথ আশ্রয় করিনি, এর মধ্যে কি আমাদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রাণশক্তির পরিচয় পাওনা?

—তাহলে আজকের বৃটেনের যাঁরা নৈতিক নেতৃস্থানীয় তাঁরা এত ক্লান্ত, নেতিবাদী কেন?

—আমার তো মনে হয় ঐখানেই আমাদের

সাতাকারের জোর। তুমি জান, আমি সারা-জীবন ব্রিটেনের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক জীবনের তীক্ষ্ম সমালোচনা করে এসেছি। আমার মত আরও বহুলোক এদেশে ছিল, আজও আছে। তারা আমার মত সুযোগ সুবিধে পায়নি বলে তাদের নাম হয়ত তুমি কোনদিনই শুনবে না। কিন্তু যেটা তোমার ভাল করে বোঝা দরকার সেটা হল যে নৈতিবাদ আর হতাশবাদ এক জিনিস নয়। আমরা যেটুকু এগোতে পেরেছি, তাতে আমরা কোনদিনই সন্তুষ্ট নই—আর এই অসন্তোষ আমাদের সভ্যতাকে স্থবিরতার হাত থেকে রক্ষা করছে। রকওয়ে খুশী নন, কারণ তাঁর জীবনে তিনি যা প্রগতি দেখলেন, তার চাইতে অনেক বেশি তিনি আশা করেছিলেন, এখনও করেন। বার্লিন খুশী নন, কারণ তিনি চান তাঁর সহকর্মীরা এবং ছাত্ররা চিন্তার দিকে আরও সজাগ—আরও সৃষ্টিশীল হোক। আমি নিজে এই বুড়ো বয়েসেও আমাদের সমাজ এবং সভ্যতাকে পদে পদে সমালোচনা করে চলেছি, তার কারণ আমি চাই কোনো মুহূর্তেই আত্মতৃপ্তির জড়তা যেন আমাদের গতিহীন না করে। কিন্তু এ থেকে সিদ্ধান্ত করো না, প্রগতি হয়নি, বা হচ্ছে না, লোকেরা ঝিমোচ্ছে বা সৃষ্টিশীলতা বন্ধ হয়ে গেছে। এই অতৃপ্তি এবং আত্মসমালোচনাই পাশ্চমী সভ্যতার প্রাণ। সেই প্রাণকে না ছুঁয়ে তুমি যদি এদেশ থেকে যাও, তোমার এদেশে আসা ব্যর্থ হবে।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম আর দেখছিলাম, পঁচাশী বছরের বৃদ্ধের মুখে প্রোজ্জ্বল প্রত্যয়ের আভা। বারান্দার খোলা জানলা দিয়ে এদেশের বিলম্বিত সন্ধ্যালোক তাঁর শুভ্রকেশে প্রতিফলিত হচ্ছিল। ঘরের আবছা আলোয় তাঁর নাক এবং থুতনির তীক্ষ্ম রেখা অনেকটা নরম হয়ে এসেছে।

রাসেল তাঁর পাইপ পরিষ্কার করতে করতে বলে চললেন,—কি জানো, এক ধারে সাম্রাজ্য হারিয়ে অন্য ধারে আমেরিকার কাছে নানা ভাবে খাটো হয়ে গিয়ে আমাদের দেশের বুদ্ধিমান লোকেরা একটু দমে গিয়েছে। সুয়েজের বোকামী তারই ফল। কিন্তু যে মুহূর্তে আমাদের সরকার ইজিপ্টকে আক্রমণ করল, এদেশের প্রচ্ছন্ন বিবেক এক ধাক্কায় জেগে উঠল। প্রায় প্রত্যেকটা কাগজ, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি, এ আক্রমণের প্রতিবাদ করেছে। ব্যক্তিগতভাবে ইডেনকে সকলেই শ্রদ্ধা করত, কিন্তু এত বড় নির্বুদ্ধিতা কেউ মেনে নিতে পারল না। বিশ বছর আগেও এ রকম প্রতিবাদ কল্পনা করা যেত না। আবিসিনিয়া আর হাঙ্গেরীর ব্যাপারে বিশ বছর আগে-পরের এদেশীয় জনমত তুলনা করলে আন্দাজ পাবে এদেশের লোক আগের তুলনায় কতটা বেশি সচেতন হয়েছে।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, "তবু তো হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা বন্ধ করা গেল না।"

রাসেল বললেন, "সত্যি কথা। তুমি জান আমি অ্যাটম বোমার তৈরির বিরুদ্ধে। পরীক্ষার বিরুদ্ধে তো বটেই। তবু কয়েকটা কথা তোমাকে ভাবতে বলি। তুমি নিশ্চয়ই এসে পর্যন্ত এদেশের কাগজগুলো পড়েছ। লক্ষ্য করেছ কি, প্রায় সকলেই এই পরীক্ষার বিরুদ্ধে ছিল—এমন কি রক্ষণশীল টাইমস পর্যন্ত। তবে হ্যাঁ, অ্যাটম বোমার ব্যাপারে এদেশে প্রায় সকলেই একটা দোটানার মধ্যে আছে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি, আমাদের বিবেক, সবই এরই বিরুদ্ধে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে না মেনে উপায় নেই যে, আমরা বোমা তৈরি করি আর না করি, রাশিয়ায় আর আমেরিকায় বোমা তৈরি এবং তার পরীক্ষা তাতে বন্ধ হবে না। অন্য ধারে আত্মরক্ষার জন্যে আমরা আমেরিকার উপরে পুরোপুরি নির্ভর করতে গররাজী। আমরা যে বোমা তৈরি করছি তার প্রধান কারণ বোধহয় এটাই। এর দ্বারা অবশ্য আমাদের বোমা তৈরি করা বা পরীক্ষা করার স্বপক্ষে কোন যুক্তি দাঁড়ায় না। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করা দরকার যে হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষার ব্যাপারে আমরা যতটা ইতস্তত করেছি এবং এখনো করছি, রাশিয়া বা আমেরিকা তার ভগ্নাংশও করেনি বা করবে না। তা ছাড়া যতদূর জানি, আমাদের সরকার এবং বৈজ্ঞানিকেরা আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের উপরেই বেশি মন দিয়েছেন। তবু এ কথা আমি অবশ্যই মানবো যে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করে এবং তার পরীক্ষা করে আমরা মারাত্মক ভুল করছি, এবং এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ আরও প্রবলতর, স্পষ্টতর হওয়া অবিলম্বে দরকার।

হঠাৎ রাসেলের চোখে একটা চতুর হাসির

ঝিলিক খেলে গেল। আমার দিকে একটু ঝ্রুঁকে পড়ে বললেন, "কিন্তু বল ত, রাশিয়া যে একটার পর একটা বোমার পরীক্ষা করে যাচ্ছে, তাতে কেন তোমাদের সরকার বা জাতীয় নেতারা প্রতিবাদ করছেন না? অথচ ব্রিটেন একটা বোমা ফাটানোর আগেই তোমাদের দেশে এত প্রতিবাদ কেন? রুশ-বোমার ফলে আবহাওয়াতে শক্তির ক্ষতি-কর বিকিরণ কি কিছু কম হচ্ছে?"

কথাটা সত্যি, কিন্তু বলার ঢংটা আমার ভালো লাগল না। আমি রাসেলের কাছ থেকে আরো উঁচু সুরে বাঁধা সমালোচনা আশা করেছিলাম। আমি বললাম, "দেখুন, আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি বটে, কিন্তু আমি জাতীয়তাবাদীও নই, সরকারী চাকুরেও নই। সুতরাং ভারতবর্ষের সরকার অথবা রাজনৈতিক নেতাদের ব্যবহারের সমর্থনে ওকালতী করার দায়িত্ব আমার কাঁধে নেই। নেহরু বা অন্য নেতারা রাশিয়ার সমালোচনা একেবারেই করছেন না, একথা সত্যি না হলেও, আনবিক বোমার ব্যাপারে ভারত-বর্ষের প্রতিবাদ যে মুখ্যত পশ্চিমী শক্তিদের বিরুদ্ধে একথা আমি মানি। এর নানা কারণ আছে এবং সম্ভবতঃ সেগুলো আপনার অজানা নয়। তবে আমার মনে হয়, একটা কথা সবসময় হয়ত আপনারা স্মরণে রাখেন না। ইংরেজ দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে অত্যাচার করা সত্ত্বেও ব্রিটেনের সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি ভারতবর্ষে আজো অনেকে শ্রদ্ধাশীল—অন্তত অ্যাটম্‌বোমার ব্যাপারে আমাদের দেশে যাঁরা ভাবছেন তাঁদের অনেকেই আজো ইংরেজের গনতন্ত্রী ঐতিহ্যে আস্থা হারাতে পারেননি।

আমেরিকা আমাদের নানাভাবে সাহায্য করা সত্ত্বেও নানাকারণে মার্কিনী সভ্যতা সে ধরনের কোনো আস্থা বা প্রত্যাশা জাগাতে পারেনি। আমাদের দেশে রাশিয়ার ভক্ত অনেক আছে ঠিকই এবং তারা যে রাশিয়ার কোন অন্যায় দেখতে পারেনা এটা প্রত্যাশিত। কিন্তু বৃটেনের হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষার বিরুদ্ধে শুধু তারাই প্রতিবাদ করছেনা। তারা ছাড়া আরো অনেকেই সে প্রতিবাদ করছে তার কারণ ব্রিটেনের কাছ থেকে তাদের প্রত্যাশা বেশি। রাশিয়ার সরকারের উপরে সে দেশের জনসাধারণের কোনো হাত নেই—যাঁরা সে দেশে বিবেকবান ব্যক্তি, তাঁরা হয় জেলে, নয় নির্বাসিত, নয়তো প্রতিবাদ নিস্ফল জেনে চুপ করে আছেন। কিন্তু ব্রিটেনের জনমত স্বাধীন, সরকার জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারেন না, এবং বিবেকবান ব্যক্তিরা জনমত তৈরী করার ক্ষমতা রাখেন। সুতরাং ব্রিটেন যখন হাই-ড্রোজেন বোমা তৈরী করে অথবা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সে বোমা ফাটায়, তখন আমরা যারা ব্রিটেনের কাছে অনেক আশা রাখি, তারা গভীরভাবে বিচলিত না হয়ে পারিনা। অবশ্য নেহরু সরকার যে শুধু এই কারণেই ব্রিটেনের ব্যবহারে প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছেন আর রাশিয়ার বেলায় গলা নামিয়ে কথা বলছেন, একথা অন্তত আমি বলতে পারব না। কিন্তু সরকারের বাইরে এবং রুশভক্ত নন এমন বহু ভারতীয়কে জানি (আমিও তাদেরই একজন) যাঁরা রুশ বা মার্কিনের চাইতে ব্রিটেনের সভ্যতার উপরে বেশি আস্থা রাখেন, এবং প্রথমে ইডেন এবং পরে ম্যাকমিলানের কাণ্ডকারখানা দেখে তাঁদের সে আস্থায় যে বড় রকমের চিড় ধরেছে তা বলতে পারি।

হঠাৎ খেয়াল হ'ল আলোচনার সুরটা

কখন যেন অজ্ঞাতে কিছুটা চড়ায় উঠে গেছে। আমি লজ্জিতভাবে হেসে বললাম "স্বাজাত্যাভিমানের শেকড় সুদূরবিস্তৃত, কি বলেন?" দার্শনিকপ্রবরও মনে হ'ল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়েছেন। বললেন, "না না, আমার প্রশ্নের ধরনের মধ্যেই ত্রুটি ছিল। অধিকাংশ ভুল বোঝাবুঝির উৎসই তো ওখানে। কিন্তু আমিও তোমার কথা বোধহয় ভুল বুঝিনি এবং আশা করি তুমিও আমার কথা ভুল বুঝবে না। কারণ আমরা দুজনেই যুক্তিবাদী এবং স্বাজাত্যাভিমানের চাইতে বিশ্বনাগরিকতাকে আমরা দুজনেই ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী বলে স্বীকার করি। আসলে তুমি যেমন ইয়োরোপের কাছে আশা করছ, আমিও তেমনি তোমাদের দেশের উপরে অনেক আশা রাখি। জাতীয়তাবাদ পশ্চিমী সভ্যতার প্রভূত ক্ষতি করেছে, আজো করছে। স্বাজাত্যের মন্ত্র ব্যক্তির সহজ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তাকে সক্রিয় হতে দেয় না। একসময় ধর্ম এবং চার্চ এই কাজটা করত, আধুনিক যুগে সে ভারটা নিয়েছে জাতীয়তা এবং রাষ্ট্র। জাতীয়তার মোহে ব্রিটেন ইয়োরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়েছে, ফ্রান্স এবং জার্মানীর সঙ্গে বারবার যুদ্ধ করেছে, এশিয়া এবং আফ্রিকার মানুষদের মানুষ ভাবেনি।

জাতীয়তা এবং গণতন্ত্র পরস্পরের বিরোধী আদর্শ; অথচ আধুনিক সভ্যতার সূচনাকাল থেকে এ দুয়ের মধ্যে একটা গোঁজামিল দিয়ে আমরা আমাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। এই গোঁজামিলই হ'ল পশ্চিমী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল দুর্বলতা। যতদিন সাম্রাজ্য ছিল ততদিন এই গোঁজা-মিল নিয়ে আমাদের অহঙ্কারের অন্ত ছিল না। এখন সাম্রাজ্য হারিয়ে ইয়োরোপ ক্রমেই এই গোঁজামিলের চেহারাটা বুঝতে পারছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে পশ্চিম ইয়োরোপে জাতীয়তা এবং ঔপনিবেশিক শোষণের বন্ধনমুক্ত এক গণতান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। আমার ভাবনা, আমরা যখন শোধরাতে শুরু করেছি, তখন তোমরা না আবার আমাদের ভুলের পুনরাবৃত্তি কর।"

আমি বললাম, "এ নিয়ে আমাদের দেশেও অনেকেই ভাবছেন। এ আশঙ্কা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বহু আগেই সাবধান করেছিলেন—তাঁর সমস্ত বিশ্বভারতী পরি-কল্পনার মূলে ছিল অন্তত মনের জগতে জাতীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় সহজ করে তোলার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা আর আকাঙ্ক্ষা পূরণের মাঝখানে ব্যবধান যে কতখানি তাতো আমার চাইতে আপনি ভাল জানেন। পশ্চিমে উপনিবেশতন্ত্রের সাফল্য জাতীয়তা-বাদকে প্রবল করে তুলেছিল; এশিয়াতেও সেই একই উপনিবেশতন্ত্রের প্রভাবে এবং প্রতিক্রিয়ায় জাতীয়তাবাদের জন্ম। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ তো লোপ পেতে বসেছে, কিন্তু তার মানসিক ব্যবহারিক দায়ভাগ যে কতদিনে যাবে কে জানে? আমাদের দেশে যাঁরা জাতীয়তাবাদের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা অনেকেই তাই চাইছেন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের যোগাযোগ যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে ঘনিষ্ঠতর হয়। তবে সে ঘনিষ্ঠতার ভিত্তি হওয়া চাই সাম্য এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা—আগের মত এক দিকে পিঠথাবড়ানি, অন্য দিকে অনুকরণ নয়।"

—"তোমাদের এই চাওয়া সার্থক হোক। কিভাবে সেই সাংস্কৃতিক সহযোগ সম্ভব-পর হতে পারে, তা নিয়ে আজ বিশেষ করে ভাবা দরকার। পশ্চিমের বিজ্ঞানবুদ্ধি এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য যদি আজ দুর্বল হয়ে পড়ে, তাতে শুধু পশ্চিমের ক্ষতি নয়, পৃথিবীর ক্ষতি। অন্য ধারে এশিয়া এবং আফ্রিকা যদি পশ্চিমের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই নিজে-দের ভাগ্য রচনা করতে চায়, তাতে শুধু এশিয়া আফ্রিকারই ক্ষতি হবে না, পশ্চিমেরও ঘোরতর ক্ষতি হবে। এদেশে যে খুব বেশি লোক এ কথা এখনো বুঝতে পেরেছে তা বলা শক্ত। আমাদের মধ্যে যাঁরা চিন্তাশীল এবং দূরদর্শী তাঁরাও প্রধানত ইয়োরোপীয় সভ্যতার সংরক্ষণ এবং পুনর্গঠনের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু পূব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিমের পুনর্গঠন আজ একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং নিজেদের প্রয়োজনেই পূবের সঙ্গে সহযোগিতার কথা আজ হোক কাল হোক তাদের ভাবতেই হবে। ইতিমধ্যে তোমরা যারা এই প্রয়োজনের কথা এখনি স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছ, তাদের দায়িত্ব অনেকখানি। তোমাদের ভাবনা শুধু তোমাদের দেশের মধ্যেই আবদ্ধ থাকলে চলবে না, পশ্চিমেও তার ঢেউ তুলতে হবে। তোমার লেখা পড়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করার যে আগ্রহ হয়েছিল

তার কারণ আমার মনে হল এই দায়িত্বের কথা তুমি হয়ত বুঝতে পেরেছ।

আমার তো দিন ফুরিয়ে এসেছে। যাদের বয়েস অল্প, তারা যে এ সব নিয়ে ভাবছে, চেষ্টা করছে, জানতে পারলে মনে জোর পাই।

রাসেল চুপ করলেন। মনে হ'ল তিনি ক্লান্ত। বিলীত বসন্তের বিলম্বিত সন্ধ্যা-লোকে ওধারে টেমসের নীল জল এখনও উজ্জ্বল। কিন্তু জলের প্রাণ নেই, চৈতন্য নেই। বয়েসের ভার জল বয় না।

বয়সের, দায়িত্বের, সৃষ্টিশীল নিরন্তর জিজ্ঞাসার।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে রাসেল বললেন, "আশা করি, মেরিওনেথ্-এ আবার দেখা হবে। যদি দেখা না হয়, তুমি কি করছ, কি ভাবছ, যখন ইচ্ছে হবে আমাকে লিখো। যত বাধা, যত দুঃখই পাও, নিজের বিচারবুদ্ধির উপরে আস্থা হারিও না।"

এই বিকেলটি আমার জীবনে অমূল্য হয়ে রইল।

গল্প-সংকলন

ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী—পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত। ইস্ট লাইট বুক হাউস; ২০ স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা-১। মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা।

রঙ্গ-ভরা বাংলা দেশে ব্যঙ্গ রচনার অভাব নেই, কিন্তু ব্যঙ্গ-সাহিত্যের কয়েকটি উৎকৃষ্ট নমুনা নিয়ে একখানি সংকলন-গ্রন্থের নিতান্ত অভাব ছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে কয়জন শক্তিশালী লেখক ব্যঙ্গ রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে পরিমল গোস্বামী শুধু অন্যতম নয়, সম্পাদক হিসেবে বোধ হয় যোগ্যতম। কারণ বুদ্ধি-বিচার, সংযম ও প্রকৃত রসজ্ঞান না থাকলে এ জাতীয় গ্রন্থ-সম্পাদনা সহজ হয় না। পরিমলবাবুর যে মাত্রাজ্ঞান আছে এবং কৌতুক-বোধ তীক্ষ্ণ, তার প্রমাণ ঐ সুলিখিত এবং কয়েকটি চমৎকার মন্তব্যে ভরা ভূমিকাটি।

পরিমলবাবু তেতাল্লিশটি রচনা এখানে সন্নিবেশিত করেছেন, অধিকাংশই গল্প এবং অবশিষ্টগুলি হয় নক্সা নয় রেখাচিত্র। বাংলা সাহিত্যের আদি পর্ব থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত তাঁর নির্বাচনের আয়তি: মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, ভবানীচরণ, টেকচাঁদ এবং হুতোম থেকে রবীন্দ্র মৈত্র, সজনীকান্ত, প্রমথ বিশী, ভাস্কর, শিবরাম এবং কালপেঁচা পর্যন্ত লেখকদের রচনা সংগৃহীত হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যে স্যাটায়ার, বার্লেস্ক, ফান্, উইট ও সাদাসিধে হিউম্যার প্রভৃতি রসরচনার যেমন বিভিন্ন স্বাতন্ত্র্যসূচক পর্যায় আছে, বাংলা সাহিত্যে রস-বিন্যাসের তেমনি বিভিন্ন স্তর-কৌশল থাকলেও পৃথক পৃথক প্রতিশব্দ নেই। তবে ব্যঙ্গ রঙ্গ কৌতুক এই রকম গোটাকয়েক শব্দের সাহায্যে রসবিকাশের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কোন্ ধরনের রসের কি বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে স্যাটায়ারে বিদ্বেষ আছে কি নেই এবং থাকলে সে বিদ্বেষটুকু ক্ষতিকর কি না, পরিমল গোস্বামী তাঁর স্বভাবনৈপুণ্য দিয়ে সে প্রসঙ্গের বিচার করেছেন। আমাদের ধারণা 'আয়রনি'তেই তাঁর কৃতিত্ব। এ গ্রন্থে আয়রনির তিন চারটি নমুনা আছে। এর মাধ্যমে হাসি যত না ফোটে, নির্মম নৈর্ব্যক্তিক আক্রমণ তার চেয়ে অনেক বেশি ফোটে এবং কার্যকরী হয়। ভাল শিল্পী না হলে আয়রনির উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয় না এবং সমাজ-বোধ--প্রসূত সূক্ষ্ম সমালোচনা অথবা ইঙ্গিতময় উদ্ঘাটনও সফল হয় না। উদাহরণস্বরূপ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'নরকের কীট' উল্লেখ করা যেতে পারে। 'আয়রনি'র এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই। আশাপূর্ণা দেবীর 'টেক্কা' গল্পটিও চমৎকার, তবে 'অতি মারাত্মক আয়রনি'র ভালো দৃষ্টান্ত বোধ হয় না—যা সম্পাদক বলেছেন। এ গল্পের শেষ ছাব্বিশ লাইন কি আদৌ প্রয়োজনীয়? ওগুলি বর্জন করলে গল্পের শিল্পসত্তা বজায় থাকত বলেই মনে হয়। আশাপূর্ণা দেবী সাধারণত 'লাইফ্স লিটল আয়রনিস' নিয়েই ভালো গল্প লেখেন। সে দিক থেকে তাঁর আর একটি সার্থক গল্প নিলে বোধ হয় মানাত, বিশেষ করে সেই গল্পটি—যেখানে অনেক কৌশলে স্বামীকে একান্নবর্তী পরিবারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে স্ত্রী মনোমত সংসার পেতে বসেছে। কিন্তু সারাদিন পরিশ্রমের পর ঘরে ঢুকে দেখে তার বয়স্থা কুমারী কন্যাটি মা ও মেয়ের বিছানা

একত্র করেছে! অথচ স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রী কোনও দিন শুতে পারে না, আর মেয়ের কাজও কিছু অবিবেচনার হয় নি!

প্রত্যেক সম্পাদকেরই একটা নির্বাচন-পদ্ধতি থাকে। সে পদ্ধতি যে ত্রুটিহীন এমন দাবি কেউই করেন না। পাঠকের ব্যক্তিগত রুচি, লেখকের নিজ নিজ গল্পের নির্বাচন-রুচি আর সম্পাদকের নিজস্ব বিচার-রুচি যে একই হতে হবে, তার মানে নেই এবং তা হওয়াও সম্ভব নয়। তেতাল্লিশটি ছেড়ে পঞ্চাশটি রচনা নেওয়া চলত এবং কোনও কোনও শক্তিশালী লেখকের রচনা বাদ পড়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এগুলি অমার্জনীয় ত্রুটি নয়। পরিমল গোস্বামী যে পরিসরে যে ভাবে তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন, তা মেনে নিতে কোনও দ্বিধা নেই। সাড়ে পাঁচ টাকায় বৃহৎ আকারের চার শো বারো পৃষ্ঠার একখানা বই দেওয়া খুব সহজ নয় এবং সে বইয়ে যখন মনের খোরাক ভালো ভাবেই মেটে, তখন কি নেই সেই ছল না ধরে, কি আছে তাই দেখে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। তুষার-কান্তি ঘোষ অথবা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের রচনায় অন্য গুণ থাকলেও শিল্প-গুণ যে কমই, এ কথা সমালোচনায় অবশ্য-গ্রাহ্য। কিন্তু গ্রহণ-বর্জনে যে 'ম্যালিস' নেই, সেটুকুও স্বীকার্য। পাঠকের রুচিভেদে মধুর গল্প যেমন বিদ্রূপাত্মক মনে হতে পারে, সম্পাদকের কাছেও তেমনি বিদ্রূপ তরল চাপল্য ঠেকতে পারে। (৩৪২/৫৭)

ছোটগল্প

সপ্তকন্যার কাহিনী—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ; ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় উপন্যাস ও ছোট গল্প দুইই লিখে থাকেন। কিন্তু বিচক্ষণ পাঠক জানেন ছোট গল্পেই তাঁর হাত বেশি খুলেছে। মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ এবং বিড়ম্বনাই তাঁর গল্পের প্রধান উপজীব্য। নতুন কথা হয় তো কিছু নেই, কারণ এ ধরনের জীবনে নতুনত্বের সম্ভাবনা খুবই কম। যেটুকু আছে, বাস্তবে অথবা কল্পনায়, হরিনারায়ণবাবু সেটুকু সুন্দর ফুটিয়ে তুলতে জানেন। ছোট গল্পে আজকাল এত বৈচিত্র্য যে অনেক সময়ে সেই বৈচিত্র্যের মোহে লেখক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিতে প্রলুব্ধ হন। অর্থাৎ অঙ্গ-কৌশল এবং বহিঃসজ্জা অনেক সময়ে বিষয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। আঙ্গিকের চর্চা তাই বলে নিরর্থক আর গল্পই সব—এমন কথা কোনও সুস্থ সমালোচক বলবেন না। কিন্তু দুদিকেই চোখ রেখে যে লেখক অগ্রসর হন, অর্থাৎ কথা ও কথন, এই দুয়ের মধ্যে মাত্রা বা সামঞ্জস্য রেখে যিনি গল্প রচনা করেন, তাঁর লেখাই বোধ হয় উত্তীর্ণ হয়। হরিনারায়ণবাবুর গল্প বলার একটা নিজস্ব রীতি বা সুর আছে। তাতে মননের তীক্ষ্ণতার চেয়ে হৃদয়ের উত্তাপ বেশি। সূক্ষ্ম মন্তব্য আছে, আবার গল্পের গতিও আছে। মনে হয়, একটি চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ বা জীবনের কোনও একটা সমস্যা নিয়ে গভীর অনুধাবন তাঁর মনোধর্ম নয়। একটি বিশেষ ধরনের পরিবেশ এবং সেই পরিবেশের মধ্যে, কথাবার্তার সাহায্যে পাত্র-পাত্রীর স্বরূপ ফুটিয়ে তোলাই তাঁর স্বভাব-নৈপুণ্য। 'সপ্ত কন্যার কাহিনী' বইখানি মনোযোগ দিয়ে পড়ে এই কথাগুলি মনে এল। এখানে প্রতিটি গল্পে এক একটি পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে এবং সেই পরিবেশেই নায়িকাদের এক একটি মানস-মণ্ডল। তারই মধ্যে তাদের যা কিছু উন্মাটন বা বিবর্তন। সাতটি মেয়ের বিভিন্ন জীবন-কথা নিয়ে এ বই লেখা হয়েছে। তবে একটা ঐক্য-সূত্র রয়েছে, সেটা অস্পষ্ট হলেও অদৃশ্য নয়। বাণী, মিস্ রয়, অমিতা দেবী ওরফে সুলেখা, অনীতা, মাধবী, ডলি সেন এবং মালতী—এই সপ্ত কন্যার জীবন-কাহিনী যেমন এক নয়, তাদের চরিত্রেও সেই রকম স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু প্রত্যেকেরই একটি করে ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসই তাদের মনের ও চরিত্রের ব্যাক-গ্রাউণ্ড, বলিষ্ঠতার অথবা দুর্বলতার সূচী। লেখক যেন তন্ত্রধারক, তিনি শুধু পাঠ করে যাচ্ছেন। এই হল মোটামুটি বইখানার কাঠামো। তবে তাঁর ভূমিকা একেবারে নিষ্প্রাণ নয়। মৃদু রসিকতায়, নেপথ্য উক্তিতে এবং কিছু কিছু ব্যাখ্যানে তিনি তাঁর উপস্থিতিকে প্রকট করেছেন। সপ্ত কন্যার সব কটিই ইন্টারেস্টিং বলা চলে, তবে সকলেই সমান ভাবে মনের ওপর রেখাপাত করে না। দু এক জায়গায়, যেমন শেষ গল্পে, নায়িকা সেন্টিমেণ্টাল হব—হব হয়ে সামলে গেছে। চরিত্র হিসেবে মিস রয় এবং অনীতাকে মনে রাখবার মতন। কিন্তু 'ফাঁকি' গল্পটিতে ফাঁকির যা আসল পয়েন্ট, তা দেখাবার জন্য গোড়ার দিকে এতটা বিস্তারের প্রয়োজন বোধ হয় ছিল না। 'সিঁড়ি' গল্পটির বিষয়বস্তু পুরাতন হলেও তার মধ্যে শিল্প-সম্ভাবনা বর্তমান, যদিও এখানে লেখক একটু বেশি সচেতন হয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ কি করে আরও ভালো বা মিষ্টিভাবে কাহিনীটা বলা যায়, সেই চেষ্টা করেছেন। কথার খেলা যেন একটু বেশি, ফলে শেষ লাইনটি দুর্বল ঠেকে। মনে হয়, 'পানে'র খাতিরেই লেখা। 'মানুষ চিনতেও একটুও অসুবিধা হয় নি' শুধু লেখকের নয়, পাঠকেরও। তবে প্রথম গল্প 'বিনিময়' সব দিক থেকেই উত্তীর্ণ। বিজ্ঞানের দাবিতে হৃদয় নিয়ে খেলা চলে। কিন্তু এতখানি মারাত্মক খেলা বাস্তবে গ্রাহ্য কি না এই মেয়েলী প্রশ্ন মুলতুবি রেখে বলা যায়, এ গল্পে ছলনার আশ্রয়ই হল শিল্পবস্তুর ধারক এবং কঠিন অভিনয়ের সঙ্গে তাল রেখে কঠিন শিল্প সংযত সংহত হয়ে নিটোল একটি বিন্দুতে এসে সার্থকতা পেয়েছে। এ গল্পটি সত্যিই চমৎকার—পরিবেশ, ঘটনা এবং চরিত্র সমানভাবে মিশে অখণ্ডতা লাভ করেছে। কোথাও মাত্রাধিক্য ঘটেনি। (৯৮/৫৬)

দর্শনশাস্ত্র

সাংখ্য ও যোগ—শ্রীতারকচন্দ্র রায়—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪৲ টাকা।

মহর্ষি কপিল সাংখ্য শাস্ত্রের পিতা এবং তিনি নিরীশ্বর ছিলেন না। কিন্তু সাংখ্যের যে প্রধান তিনটি পুস্তক "সাংখ্য কারিকা, সংখ্যপ্রবচনসূত্র ও তত্ত্বসমাস" তাদের মধ্যে কোনটিই যে মহর্ষি কপিল প্রণীত নহে, ইহাই পণ্ডিতদের অভিমত। অধ্যাপক গার্বের মতে কপিল বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী। সুতরাং পরবর্তী এই তিনটি গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে স্বীকৃত হয়নি, তার কারণ খুব সম্ভব বৌদ্ধ প্রভাব বলেই লেখক মনে করেন। তবে লেখক নানা বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে "সাংখ্যসূত্রের সহিত অদ্বৈত ঈশ্বরবাদের বিরোধ নাই" এবং সাংখ্যের বহু পুরুষ আসলে জীবের বহুত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। সাংখ্য-শাস্ত্রের উপর এটি যে একটি নূতন আলোকপাত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাংখ্যে পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ, উভয়ের প্রকৃতি, সৃষ্টি রহস্য, প্রভৃতি সর্ববিষয়ে অতি সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের

ও বিস্তারিত আলোচনার উপর পুস্তকটি প্রতিষ্ঠিত। যোগ দর্শন সম্পর্কেও সেই কথা বলা চলে। পাতঞ্জল যোগদর্শনের প্রতিটি সূত্র সম্পর্কে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, সর্বপ্রকার যোগের বিষদ বিবরণ পুস্তকে আছে। উপনিষদের সঙ্গে যোগদর্শনের সাদৃশ্য এবং সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে প্রভেদও তিনি দেখিয়েছেন। যথা— "সাংখ্যে ঈশ্বরের কথা নাই। তাহাতে মাত্র পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত। যোগদর্শনের তত্ত্ব সংখ্যা ২৬। কিন্তু ষড়বিংশ তত্ত্ব ঈশ্বরও পুরুষ। অন্যান্য পুরুষ হইতে তিনি ভিন্ন ধর্মী।" আবার "বিচ্যুতি হইলেই প্রকৃতি হইতে জড় ও মানসিক জগতের উদ্ভব হয়। প্রথমে উদ্ভূত হয় মহৎ অথবা বুদ্ধি। বুদ্ধি হইতে অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্রের উদ্ভব হয়। সাংখ্য মতে কিন্তু পঞ্চতন্মাত্র উদ্ভূত হয় অহংকার হইতে, বুদ্ধি হইতে নহে। এইখানে সাংখ্য ও যোগমতে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে।" পুস্তকখানিতে সর্বত্র এই রকম বিচার ও বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। সাধারণত ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনার সময় বুদ্ধি সংস্কারে আচ্ছন্ন থাকে, তাই তার সঠিক মূল্য নির্ধারণ হয় না। আলোচ্য পুস্তকটি সেদিক দিয়ে মূল্যবান, সাংখ্য ও যোগদর্শন সম্পর্কে বিচার ও বুদ্ধি গ্রাহ্য পরিপূর্ণ সম্যক জ্ঞান লাভ এ থেকে সম্ভব। এ বিষয়ে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা পুস্তকটি পাঠ করে আনন্দ পাবেন ও উপকৃত হবেন।

৫৮৮।৫৫

কিশোর সাহিত্য

নীলচোখের সঙ্কেত — শ্রীমুরারীমোহন বিট—দেব সাহিত্য কুটির, ২২।৫ বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯। দেড় টাকা।

মুরারীবাবু ছেলেমেয়েদের পত্রিকাগুলিতে প্রায়ই লিখে থাকেন এবং প্রকাশকও শিশু সাহিত্য জগতে সুপরিচিত। লেখকের ভাষা ও লেখার ধরনও চিত্তাকর্ষক। তবু এই ধরনের উৎকট ও অবাস্তব সাহিত্য কেন যে লিখিত ও প্রকাশিত হয় বোঝা শক্ত। বিলেতের অনুকরণে প্রাইভেট ডিটেকটিভদের নিয়ে এই সব অসম্ভব কাহিনী, কথায় কথায় খুন ও ডিটেকটিভের চরিত্র এবং অবাস্তব ঘটনার সংস্থান করে বালক-বালিকাদের মস্তক চর্বণ কার্যে এই সব লেখক ব্রতী হয়েছেন। যাদের জন্যই প্রকাশিত হোক না কেন, এগুলি বালক-বালিকারাই সাধারণত পড়ে' থাকে। তাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করবার আরো অনেক সুষ্ঠু উপায় আছে। আশা করি প্রকাশক এ বিষয়ে ভবিষ্যতে অবহিত হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

জীবনী

নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষ—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ সুধীর মুখোপাধ্যায়. রাইটার্স সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ৮৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য এক টাকা প'চাত্তর নয়া পয়সা।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর এই অপূর্ব গ্রন্থে স্কটের রোমাঞ্চকর জীবন বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষা আমাদের আবিষ্ট করে। তথ্যের গভীর প্রাণসঞ্চারের শক্তিতে তিনি আধুনিক গদ্য-শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট। এই গ্রন্থের বহুল সমাদর কামনা করি। শৈল চক্রবর্তীর অংকিত প্রচ্ছদচিত্র প্রশংসার্হ। (৪০৩।৫৭)

কবিতা

Mystic Tales of Taranath—Bhupendra Nath Datta. Ramakrishna Vedanta Math, 19B Raja Rajkrishna Street, Calcutta-6. Rupees four.

বৌদ্ধ ধর্মজগতে লামা তারানাথ অবিস্মরণীয়। সুন্দর ইংরেজিতে তাঁর মূল্যবান মর্মকথা উপস্থাপিত করার জন্য ভূপেন্দ্রনাথ ধন্যবাদার্হ। Gruendwell জার্মান ভাষায় তারানাথের গ্রন্থের Edelsteinmine নামক যে অনুবাদ করেছিলেন সেটি পেট্রোগ্রাড থেকে ১৯১৪-তে প্রকাশিত হয়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথ ইংরেজি অনুবাদ ক'রে আরো বড়ো শ্রোতৃমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হ'লেন। লেখক একই সঙ্গে গবেষক ও বৃহত্তর পাঠকসমাজকে তৃপ্ত করার সুব্যবস্থা করেছেন। এই ধরনের কঠিন গ্রন্থমালা তিনি যদি আমাদের জন্য এভাবে সহজ ক'রে পরিবেশন করেন, আমরা উপকৃত হবো।

(৩১১।৫৭)

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের শ্নাইয়াছেন, সামনেই নাকি দ্র্দিন নাইয়া আসিতেছে। খুড়ো বলিলেন—দুর্দিনের খবর জানবার জন্য সরকারী জ্যোতিষীর গণনার প্রয়োজন হয় না,—হাতের আঙুল আরশি ছাড়াই দেখা যায়। কিন্তু পুরনো নথিপত্রে অন্যরকম ঘোষণা রেকর্ড করা আছে বলেই কী রকম খট্‌কা লাগছে"।

• • •

আইনমন্ত্রী মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা এবং দুঃখদৈন্যের কথা তিনি সব সময়েই ভাবিবেন।—"মিথ্যে ভেবে চুলে পাক ধরিয়ে লাভ নেই; কথাটা আইনে-নেই কিন্তু শাস্ত্রে আছে, যদ্‌ভাবি ন তদ্ভাবি, ভাবিচেন্ন-

তদনাথা"—বলে আমাদের শ্যামলাল।
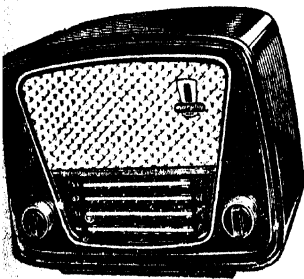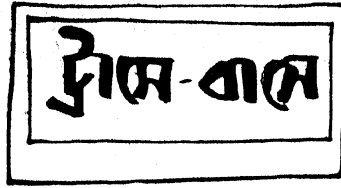
* * *

অস্থায়ী অধ্যক্ষের আসনে অধিষ্ঠিতা থাকাকালে লোকসভায় কোন প্রসঙ্গের উত্তরে শ্রীমতী রেণ্ু চক্রবর্তী এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অধ্যক্ষকে "স্যার" বা "মাডাম" দুই-ই সম্বোধন করা যায়। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এটা হলো অস্থায়ী অধ্যক্ষের মত। স্থায়ী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনন্তশয়নমকে "মাডাম" ব'লে সম্বোধন করলে সেটা তাঁর কাছে শ্রুতি-মধুরও হবে না এবং গ্রাহ্যও হবে না বলেই মনে করি"।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম, লোকসভার শেষের দিনের কয়েকটি অধিবেশনে অনেক সদস্যই নাকি অনুপস্থিত ছিলেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"নাগাড়ে বক্তৃতা শোনা আর "হাঁ" "না" করা একঘেয়ে হতে বাধ্য। তাছাড়া, পুজো সমাসন্ন। দিল্লীতে লাড্ডুর বাজার না ক'রেই বা বাড়ি ফেরা যায় কী ক'রে"!!

• • •

শ্রীযুক্ত গুলজারিলাল নন্দ নাকি বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর খরচের অঙ্ক আরো উপরে চড়িবে। শ্যামলাল বলিল—"চড়তে বাধ্য, এ ব্যাপারে তো আর ন্যায্যমূল্যের দোকানের প্রশ্ন ওঠে না"।

• •

কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে ১৬ হাজার গ্যালন পেট্রোল নাকি উধাও হইয়া গিয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন —"অনুমান করছি, পেট্রোলের টিনের মুখ খোলা ছিল—এমতাবস্থায় গ্যালন গ্যালন পেট্রোল উবে যাওয়া আর এমন বিচিত্র কী"!!

* * *

সাধারণ লোক দামী ঔষধপত্র কিনিতে পারে না বলিয়া শ্রীযুক্ত নেহরুও শুনিলাম দামী ঔষধ ব্যবহার করেন না। সম্প্রতি তাঁহাকে ৩৫, মূল্যের একটি ঔষধ দিলে তিনি তা লইতে অস্বীকার করেন।—প্রয়োজন হলে আমরা তাঁকে আন্তরিকভাবেই তা ব্যবহার করতে অনুরোধ করব। ওষুধের "কিন্তু স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে দামী ওষুধের আমাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিতে আমরা প্রীত হয়েছি। কিন্তু দামী, অ-দামী কোন ওষুধই আমরা সহজে ব্যবহার করিনে। অসুখ-বিসুখে সো' পাঁচ আনার মানতই আমাদের একমাত্র খরচ"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

সোভিয়েৎ চিকিৎসা-বিজ্ঞান পরিষদ নাকি সম্প্রতি একটি অকাল বার্ধক্য নিবারণের ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"এবারে দেখছি ডালেস্‌ এন্ড কোং বড্ড বেকায়দায় পড়ে গেলেন। মরণের ঠান্ডা লড়াইতে পাল্টা জবাব দেওয়াটাই তাঁদের আসে, বাঁচবার ঠান্ডা লড়াইতে যে তাঁরা কাবু"।

• • •

একটি নিগ্রো ছাত্রী নর্থ ক্যারোলিনার কোন স্কুলে যাইতেছেন সেই সময় শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা তাঁহাকে নিয়া অভব্য ঠাট্টা-তামাশা করিতেছেন, তাহারই একটি ছবি সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের এই ব্যবহারে অনেকেই বিস্ময় বোধ করিলে বিশুখুড়ো বলিলেন—"এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই; এটা হলো ছোটদের ডিমোক্রেসির সচিত্র প্রথম ভাগ"!!

• • •

শ্রীযুক্ত নেহরু বলিয়াছেন যে, গণভোটই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান নয়। সমাধান খুঁজিতে হইবে তিনটি প্রশ্নের উত্তরে; যথা—(১) কি অধিকারে পাকিস্তান এই রাজ্যে রহিয়াছে? (২) কোন্‌ অধিকারে পাকিস্তান কাশ্মীরে সৈন্য আমদানী করিয়াছে? (৩) এই রাজ্যের জনগণকে ভীতিপ্রদর্শনের অধিকার তাহারা কোথা হইতে পাইল? শ্যামলাল তিনটি প্রশ্নের দিল—"প্রথম প্রশ্নের উত্তর—পিতৃব্যের অধিকারে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—কাকার অধিকারে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর—চাচার অধিকার থেকে"।—"উত্তর যথাযথ হয়েছে কিন্তু কাশ্মীর সমস্যা যথাপূর্বংই থেকে যাবে"—মন্তব্য করিলেন আমাদের খুড়ো।

• • •

দিল্লীতে সংসদীয় ভীমমণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে। ২৫০ পাউন্ডের উপর যাঁদের দেহের ওজন তাঁহারাই ভীমমণ্ডলের সদস্য হইতে পারিবেন। "খালি কাজ আর কাজ করে সংসদের সদস্যরা "ডাল্‌" ব'নে গেলেন ব'লে যাঁদের ধারণা ছিল তাঁরা ভীম-ভীম খেলার খবরে খুশী হবেন। তবে একটা প্রশ্ন আমাদের মনে থেকে গেল, সেটা হলো—কলির ভীম কি ত্রেতার হনুমানের লেজ তুলতে পারবেন? দ্বাপরের ভীম কিন্তু পারেন নি। চারিদিকে পথে পথে হনুমানের লেজ দেখে ভীমরা ভিরমি যান"—মন্তব্য

অপৌরুষেয় জন্ম

রাত অনেক হয়েছে দেখে কেরী বই আর খাতাপত্র গুছিয়ে রেখে শুতে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে, এতক্ষণ সে পড়বার ঘরে ছিল। এমন সময়ে দরজা খুলে দমকা হাওয়ার মতো ঢুকে পড়ে টমাস।

বিস্মিত কেরী বলে ওঠে একি টমাস যে। হঠাৎ এত রাত্রে।

টমাস হাঁপাচ্ছিল, লক্ষ্য করে কেরী বলল, বসো, বসো, একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছ যে।

দম নিয়ে টমাস বলল, হাঁপাবো না! ঘোড়া ছুটিয়ে হঠাৎ আসতে হলে না হাঁপিয়ে উপায় কি?

হঠাৎ এমন কি ঘটল যে এত রাতে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে হবে?

টমাস আসন গ্রহণ করে বলে, একটা লোকের ওলাউঠো হয়েছে খবর পেয়ে গিয়েছিলাম পঁচিশ মাইল দূরের রামকানাই বলে একটা গ্রামে। সন্ধ্যাবেলায় মহীপালদীঘিতে ফিরে এসে দেখলাম মিঃ উডনীর লোক অপেক্ষা করছে।

কেরী বলে, তাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বার কি আছে?

আগে সবটা শোনো। সেই লোকটি মিঃ উডনীর এজেন্ট রীডারের অগ্রদূত। মিঃ রীডার কাল সকালে এসে পৌঁছবে।

ভালো কথা, অনেক দিন পরে একজন দেশের লোক দেখতে পাওয়া যাবে।

কি মুশকিল! আগে সবটা শুনেই নাও।

দুঃখিত, বলো।

মিঃ রীডার বেরিয়েছে উডনীর বিভিন্ন কুঠির তদারকে। কালকে প্রথমে এসেই সে ক্যাশ মিলিয়ে দেখবে।

বেশ তো ক্যাশ মিলিয়ে দিয়ো।

ক্যাশ যে শর্ট। বলে টমাস নীরব হল। কেরীও নীরব। দেয়ালের ঘড়িটার টিক টিক ধ্বনি স্ফুটতর হয়ে উঠল।

নীরবতা ভঙ্গ করে কেরী প্রথমে কথা বলল, আবার তুমি ক্যাশের টাকা ভেঙেছ।

কি করবো বলো—দুঃস্থ লোক দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না।

দুঃস্থ লোকের সাহায্যের জন্যেও পরের টাকা দান করবার অধিকার তোমার নেই।

তারপরে কিছুক্ষণ নীরব থেকে কেরী বলল, কিন্তু ক্যাশ শর্ট পড়বার আসল কারণ জুয়ো খেলে তুমি টাকা নষ্ট করেছ।

নীরবতার দ্বারা টমাস দোষ স্বীকার করে নিল। অপরাধ করবার চেয়ে অপরাধ স্বীকার করা কঠিন, সেই কঠিন কাজটা করতে হল না, কেরীর মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তাতে টমাসের উদ্বেগের প্রধান অংশ দূরীভূত হয়ে গেল। দ্বিতীয় অংশ আজই টাকা সংগ্রহ। কেরীকে সে বেশ জানতো যে, কেঁদে গিয়ে পড়লে টাকা পাওয়া যাবেই। অনেকবার অনেক বিপদ থেকে সে রক্ষা করে দিয়েছে।

টমাস বলে উঠল, এবারের মতো আমাকে বাঁচিয়ে দাও ব্রাদার কেরী, ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে চলব। আর আমার প্রতিশ্রুতিতে যদি বিশ্বাস না করো তবে ভগবানের নাম করে—

কেরী বাধা দিয়ে বলল, থামো, থামো, বৃথা ভগবানের নাম উচ্চারণ করো না।

টমাস মাথা হেঁট করে বসে রইল। মনে তার অনুশোচনা হচ্ছিল সত্যি, কিন্তু সেই সঙ্গে উদ্বেগ লাঘব হওয়ায় বেশ একটু স্বস্তিও অনুভব করছিল সে।

কিন্তু বিপদে ফেললে যে! আফিস ঘরে আছে সিন্দুক, আফিসঘরের চাবি থাকে মুন্সীর কাছে। সে হয়তো আর সকলের সঙ্গে গাঁয়ের মধ্যে গিয়েছে যাত্রাগান শুনতে।

আমি খুঁজে আনছি বলে টমাস ছুটে বেরিয়ে গেল। টমাসের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় আবার বই খুলে বসল কেরী।

টমাস সোজা গিয়ে উঠল রামবাসুর ঘরের বারান্দায়, দেখল মুন্সীর ঘর বন্ধ। সে জানতো পাশের ঘরটায় থাকে পার্বতী ব্রাহ্মণ, দেখল সে ঘরটাও বন্ধ। বুঝল কেরীর অনুমান মিথ্যা নয়—সকলে যাত্রা শুনতে গিয়েছে গাঁয়ের মধ্যে। সে জানতো না গাঁয়ের ঠিক কোন্‌খানে গান হচ্ছে, ভাবল, ন্যাড়াকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক। ন্যাড়ার ঘরটা অন্য দিকে, রেশমীর ঘরের কাছে। সেখানে গিয়ে টমাস দেখল ন্যাড়ার

ঘরটাও বন্ধ, বুঝল সবাই একসঙ্গে গিয়েছে। তখন সে নিরুপায় হয়ে স্থির করল রেশমীকে ডেকেই জেনে নেবে যাত্রার আসরের সন্ধান—তাই সে রেশমীর ঘরের কাছে গিয়ে পৌঁছল। রাত্রিবেলা একাকী কোন মহিলার ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকাডাকি করা সামাজিক নীতি নয় সত্য, কিন্তু ভোর হওয়া মাত্র যেখানে তহবিল ঘাটতি মিটিয়ে দেওয়া অপরিহার্য, সেখানে ও সব সূক্ষ্ম শিষ্টাচারের বাধা যে কত তুচ্ছ, বিপন্ন ব্যক্তি ছাড়া অপরের পক্ষে তা সহজবোধ্য নয়।

টমাস দরজায় ঘা দিল।

কেউ সাড়া দিল না বা দরজা খুলল না। কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, লোক নিশ্চয় আছে, হয়তো ঘুম ভাঙেনি মনে করে আবার প্রবলতর আঘাত দিল টমাস।

আবার। আবার।

কে এত রাত্রে?

চমকে উঠল টমাস। এযে মুন্সীর কণ্ঠ।

মুন্সী, তুমি এত রাত্রে এখানে।

রামবসুর সাড়া দেওয়া উচিত হয়নি, আর কোন উপায়ে দরজায় ঘা পড়ার প্রতিবিধান করা উচিত ছিল তার। কিন্তু সংসারে উচিতমত কাজ কয়টা হয়! সংকটকালে অতিশয় ধূর্ত ব্যক্তিও অতিশয় স্থূলে ভুল করে বসে বলেই তো জীবনের রস আজো শুকিয়ে যায়নি। সংসারের জমাখরচের পাকা খাতায় কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম হিসাবের গরমিল থেকে গিয়েছে।

সাড়া দেওয়া মাত্র রামবসু বুঝল মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে, হয়তো তার জীবনের প্রকাণ্ডতম ভুল। কিন্তু সেই সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, টমাসের কণ্ঠস্বরে বাস্তবের কেন্দ্রে পুনঃসংস্থাপিত হয়ে—এই কদিনের উদ্‌ভ্রান্তি গেল তার দূর হয়ে, যেমন হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তির কুয়াশায় ঢেকে পড়েছিল, আবার তেমনি হঠাৎ প্রখর প্রোজ্জ্বল কাণ্ডজ্ঞানের সূর্যালোকে এল ফিরে; লুপ্ত হয়ে গেল ক্ষণিকের প্রেমিক ভাবুক রোমান্টিক সত্তা, উঠল জেগে স্বভাবসিদ্ধ প্রত্যুৎপন্নমতি, শ্লেষ রসিক, বাস্তববাদী রামরাম বসু!

মুন্সী, তুমি এত রাত্রে, একাকী, রেশমী বিবির ঘরে! এ যে দুর্বোধ্য!

ভিতর থেকে অবিচলিত কণ্ঠে রামরাম বসু উত্তর দিল তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্বোধ্য প্রভু যীশুর 'Immaculate Conception' বা অপৌরুষেয় জন্মতত্ত্ব!

সে কথা সহস্রবার সত্য, কিন্তু হঠাৎ এত রাত্রে ও কথা উঠল কেন, তা-ও আবার কিনা একটি যুবতী নারীর নির্জন শয়নকক্ষে।

মুন্সী বলে, এ তত্ত্ব যদি বোঝাতেই হয়, তবে যুবতী নারীই প্রশস্ত পাত্রী। বুড়িকে বুঝিয়ে কি লাভ? তাকে এসব কথা বোঝাতে যাওয়া আর মরুভূমিতে লাঙল দেওয়া এক কথা।

টমাস বলে—আমি তো স্থান-কাল-পাত্রের রহস্য কিছুই বুঝতে পারছি না।

তোমার আর দোষ কি ডাঃ টমাস, যখন রেশমীর ঘরে প্রবেশ করলাম, সে-ও ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল।

এখন কি বুঝেছে?

না সাহেব এখনো পুরো বিশ্বাস করতে চাইছে না।

বিশ্বাস করতে চাইছে না যে, অপৌরুষেয় জন্ম সম্ভব!

না, ঠিক সেটা নয়। এত রাত্রে সেই তত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করবার সার্থকতা।

তখন রামবসুতে ও টমাসে চলল উত্তর প্রত্যুত্তর। একজন বাইরে বারান্দার উপরে, ক্রমেই অধিকতর ভক্তিপুলক গদগদ চিত্ত। অপরজন নিভৃত কক্ষে অবস্থিত, ঠিক কি অবস্থায় অবস্থিত অনুমান করতে চেষ্টা না করাই উচিত। তৃতীয়জন একেবারে নিস্তব্ধ নিশ্চুপ, প্রমাণের অতীতপ্রায়।

টমাস শুধায়, আমিও তো তাই বলি, এত রাত্রে ও তত্ত্ব বোঝাবার চেষ্টা কেন?

সাহেব, আমাদের শাস্ত্রে বলেছে এ সব দুরূহ যোগসাধনার প্রশস্ত সময় গভীর রাত্রি।

টমাসকে স্বীকার করতে হয় যে, কথাটা

একেবারে মিথ্যা নয়। তবু বলে, ও যে খুব জটিল তত্ত্ব।

মুন্সী টেনে টেনে বলে, খু-ব জ-টি-ল।

বুঝতে পারছে?

একেবারেই নয়।

তবে না হয় দরজাটা খুলে দাও, দুজনে মিলে চেষ্টা করি।

কি সর্বনাশ! এসব ক্ষেত্রে দুই গুরু অচল।

তবে তুমি একাই চেষ্টা করো!

তারপরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, সত্যি মুন্সী, তুমি খুব সৌভাগ্যবান, নতুবা অপৌরুষেয় জন্মতত্ত্ব বোঝাবার এমন মনোরম সুযোগ পেতে না। আমি কতবার চেষ্টা করেছি সুযোগ পাইনি।

উপযুক্ত সাধনা চাই, সাহেব, উপযুক্ত সাধনা চাই।

এবারে টমাস রেশমীর উদ্দেশে বলে, রেশমী বিবি, তত্ত্বটার মূল রহস্য এই যে, ওতে পাপ স্পর্শ করে না।

উত্তর দেয় রামবসু, বলো তো সাহেব, একবার ভালো করে বলো তো যে, এতে পাপ স্পর্শ করে না। রেশমী পাপভয়ে বড়ই ভীত হয়ে পড়েছে।

রেশমী ও অখৃষ্টান জনগণের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে টমাস বলে ওঠে, মাভৈঃ মাভৈঃ, মিসে ও মাগীগণ পাপ স্পর্শ করে না অপৌরুষেয় জন্মে।

তারপরে মুন্সীর উদ্দেশে বলে, মুন্সী তত্ত্বটা বুঝলে রেশমী বিবি কি খৃষ্টান হতে রাজি হবে?

মুন্সী বলে—তখন খৃষ্টান হওয়া ছাড়া আর কোন্ গতি থাকবে ওর!

তবে বোঝাও মুন্সী, ভালো করে বোঝাও, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে বোঝাও, প্রয়োজন হলে সারা রাত ধরে বোঝাও।

তাই তো বোঝাচ্ছিলাম, হঠাৎ তুমি এসে পড়ে রসভঙ্গ করলে।

কিন্তু আমার কত সৌভাগ্য দেখো—এমন যে পবিত্র কর্ম চলছে হঠাৎ এসে পড়ায় তা জানতে পেলাম।

বেশ তো এখন সরে পড়ো না।

সে কথায় কর্ণপাত না করে টমাস শুধায়, আচ্ছা মুন্সী, তুমি কি আগেও ওকে এসব গূঢ় তত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করেছ?

না সাহেব, এই প্রথম।

আশা করি, এই শেষ নয়।

নিশ্চয়ই নয়, এখন কিছুদিন চলবে।

চলবেই তো, চলবেই তো, উৎসাহে বলে ওঠে টমাস সাহেব, এ রস পেলে কেউ সহজে ছাড়তে চায় না।

তারপরে শুধায়, কিছু সুবিধা করতে পারলে মুন্সী?

কিছু সুবিধা হবে মনে হচ্ছে।

টমাস ভক্তির আবেগে বলে ওঠে, নিশ্চয় হবে, নিশ্চয় হবে।

তারপরে আবার থেমে বলে, উপর-উপর না বুঝিয়ে একেবারে ওর গভীরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করো।

তা নইলে আর বুঝিয়ে আনন্দ কি?

মুন্সী, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

না হয়ে উপায় কি, অনেককাল তোমাদের সঙ্গ করছি।

এবারে টমাস ব্যাকুলভাবে বলে, মুন্সী, দয়া করে একবার দরজাটা খুলে দাও, আমি একবার পরমরমণীয় দৃশ্য দেখে প্রভুর নাম-কীর্তন করি।

না, না, এখন দরজা খোলা চলবে না, রেশমীর এমনিতেই খুব সঙ্কোচ।

স্বীকার করে টমাস। বলে, তা আমি দেখেছি কি না। বাইবেলের একটা সাধারণ গল্পেই ওর গাল লাল হয়ে ওঠে আর এ তো গূঢ়তম রহস্য। সঙ্কোচ হবে বই কি!

একটু থেকে বলে, মুন্সী আমার যে ভগবানের নাম করতে ইচ্ছা করছে!

তা ঐখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নাম কর, আমরা ভিতর থেকে বেশ শুনতে পাব।

না দাঁড়িয়ে নয়, নতজানু হয়ে। মুন্সী, আমি এখানে নাম করি আর তুমি ওখানে ক্রমে রেশমীর গভীরতর অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে নিগূঢ়তম তত্ত্বটি বুঝিয়ে দাও।

তারপরে মুন্সীর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে নতজানু হয়ে যুক্তকরে মুদ্রিত চক্ষুতে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করে চলল টমাস—"নির্জন ও দুর্গম স্থান আনন্দিত হইয়া উঠিবে; মরুভূমি উল্লসিত হইবে, প্রস্ফুটিত হইবে গোলাপ ফুলের মতো। গোলাপ ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হইবে, পুলকিত হইবে, সঙ্গীতে ধ্বনিত হইবে।"

ঘরের ভিতরে থেকে রামবসু সোৎসাহে বলে ওঠে, সাহেব, কি কথাই না লিখে

গিয়েছে তোমাদের বাইবেলের ঋষিরা! স্থান নির্জন ও দুর্গম সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধনার তেমন ঐকান্তিকতা থাকলে গোলাপ ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে যে ওঠে তাতেও নেই সন্দেহ!

উৎসাহিত টমাস বলে ওঠে, তবে বলো ভাই 'আমেন'।

মুন্সী ও পাদ্রী সমকণ্ঠে হেঁকে ওঠে, 'আমেন।'

তারপর মুন্সী বলে, সাহেব এখন ঘরে যাও দেখি।

নিশ্চয়ই যাবো, আনন্দের সংবাদ বহন করে যাবো, কিন্তু তার আগে একবার বলো দেখি, ও বুঝেছে কি না।

বিরক্ত হয়ে মুন্সী বলে বুঝেছে, বুঝেছে, তুমি গেলে আরো ভালো করে বুঝবে।

'জয় হোক প্রভুর' বলে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে টমাস, তারপরে 'পেয়েছি, পেয়েছি স্বর্গের চাবি পেয়েছি' চীৎকার করতে করতে ছুটে চলে যায় কেরীর ঘরের উদ্দেশ্যে।

(ক্রমশ)

[ষোল]

কাক ডাকেনি, ভোরও হয়নি, তবু বেশ ফিকে হয়ে গিয়েছে অন্ধকার। ডাঙগা পার হয়ে সড়কের উপর উঠতেই বুঝতে পারে দাশু, এই সড়কটাই সোজা ভুবনপুর চলে গিয়েছে।

আকাশে মেঘ নেই, দু'তিনটে মর-মর তারা ছাড়া আর কিছুই নেই। সড়কের জল আর কাদাকে জল আর কাদা বলে মনে হয়। আর, সড়কের এক পাশে একই জায়গায় গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে যে গাছ দুটো, সে গাছ দুটোকেও চেনা যায়।

দুটো লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে গাছের গায়ে হাত দেয় দাশু। হ্যাঁ, যা ভেবে লাফিয়ে উঠেছিল দাশুর ক্ষুধাকাতর প্রাণটা, তারই ছোঁয়া লেগেছে দাশুর হাতে। দুটো ডুমুর গাছ। থোকা থোকা ডুমুর যেন থোকা থোকা আঁচিলের মত গাছ দুটোর গা ছেয়ে রয়েছে।

কোমরে জড়ানো গামছাটাকে খুলে নিয়ে মাটির উপর ছড়িয়ে দেয় দাশু। ভোরের ভালুকের মত যেন দু' থাবা দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে ডুমুর ঝরাতে থাকে। গাছের উপর চড়ে দাশু। গাছের ডালের উপর টান হয়ে এলিয়ে পড়ে আর হাতড়ে হাতড়ে ডুমুর ছিঁড়তে থাকে।

দেরি করে না দাশু। আকাশের শেষ তারা নিভে যাবার আগেই রওনা হয়। ডুমুরের রাশ গামছা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে আর কাঁধের উপর তুলে নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে হাঁটতে থাকে।

কাক যখন ডাকে, তখন মধুকুপির সেই মেটে ঘরের জাম কাঠের দরজার কাছে পৌঁছে যায় দাশু। কপাট খুলে দেয় মুরলী।

ঘরে ঢুকেই গামছার গিঁট খুলে মেজের উপর ডুমুরের রাশ ছড়িয়ে দিয়ে দাশু একটা হাঁপ ছাড়তেই মুখ ফিরিয়ে নেয় মুরলী। তারপর খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর এলিয়ে শুয়ে পড়ে।

উনানের মুখে শুকনো বাঁশপাতা ঠেসে দিয়ে আগুন জ্বালে দাশু। জ্বলন্ত আগুনের আভা মুরলীর মুখের উপর ছটফট করে। দেখতে পায় দাশু, মুরলীর চোখ দুটোও যেন মর-মর তারার মত আস্তে আস্তে কাঁপছে। কেঁপে কেঁপে পুড়ছে একটা জ্বালাময় শ্লেষ। আর কিছু নয়, গামছা দিয়ে জড়ানো ডুমুরের একটা বোঝা; রাতের বুকের ভিতর ঢুকে ডাকাতি করে কী অদ্ভুত ঐশ্বর্যের সম্ভার নিয়ে ঘরে ফিরেছে মধুকুপির দাশু কিষাণ! মুরলীর চোখের চাহনিতে একটা ক্লান্ত অভিশাপ হাসছে।

কিন্তু দাশুর হাত-পায়ের ব্যস্ততা যেন সত্যিই একটা নেশার জ্বালায় দুরন্ত হয়ে উঠেছে। কাঁচা ডুমুরের রাশ যেন একরাশ প্রাণময় স্বাদুতার সম্ভার। লালা ঝরছে দাশুর চোখের চাহনিতে। হাঁড়ি ভরে ডুমুর সিদ্ধ করে দাশু। ডুমুরের জাউ কাঠি দিয়ে ঘাঁটে, তার আগে চারটে শুকনো লঙ্কা, চার চিমটি নুন আর গুঁড়ো হলুদ ছড়াতে ভুলে যায় না।

মাটির তেলাই ডুমুরের জাউ-এ ভরে নিয়ে মুরলীর হাতের কাছে এগিয়ে দেয় দাশু। এক ঘটি জলও এগিয়ে দেয়।

খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর উঠে বসে মুরলী। মধুকুপির কিষাণের অদ্ভুত রোজগারের উপহার সেই গরম জাউ স্পর্শ করবার আগে কথা বলে মুরলী, এবং বলতে গিয়েই হেসে ফেলে—সারা রাত ধরে ভিখ মেগে শেষে এই চীজ নিয়ে এলে?

দাশুর গলার স্বরটা যেন একটা গর্জন করে উঠতে গিয়েই হঠাৎ মৃদু হয়ে যায়। দাশু বলে—মধুকুপির কিষাণ ভিখ মাগে না।

মুরলী আবার হাসে—তবে কি ক'রে? চুরি?

—না।

—তবে ডাকাতি?

—না।

—তবে?
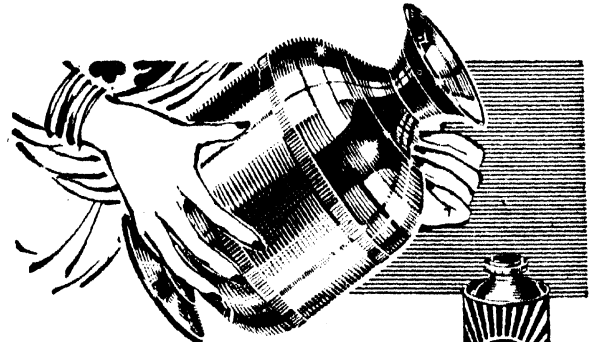
উত্তর দেয় না; উত্তর দিতে পারে না দাশু। মহেশ রাখালের বিটির কালো চোখের ঐ অদ্ভুত চাহনি, কুঞ্চিত ঠোঁটের কুটিল হাসি আর এই কঠোর প্রশ্নের নির্মম আক্রমণে হঠাৎ অভিভূত হয়ে শুধু বোবার মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে দাশু। তার পরেই সরে যায়। জাউ-এর হাঁড়িটাকে হাতে নিয়ে বাইরের দাওয়ার উপর গিয়ে বসে।

দূরের পাকুড়বনের মাথার উপর দিয়ে ভোরের আলো গড়িয়ে এসে দাশুর মুখের উপর পড়ে। হাঁড়ির জাউ চেটে পুটে খেয়ে ঢেঁকুর তোলে দাশু। হাত চাটে আর ঘটি তুলে ঢক ঢক করে জল খায়। মধুকুপির কিষাণের উপোষ করা আত্মাটা যেন এতক্ষণে জ্বালা ভুলতে পেরেছে আর শান্ত হয়েছে।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আর দাওয়ার কিনারায় বসে মুখ ধোয় মুরলী। দাশুও মুখ ধোয়, জল ঢেলে হাত-পায়ের কাদা মুছতে থাকে। আর চড়ুই এর ঝাঁক ঘরের চালার উপর বসে কিঁচির মিঁচির করে। মধুকুপির সকাল বেলার হাওয়ায় বাঁশঝাড়ের জটিল চেহারাটা দুলতে থাকে।

দাওয়ার উপর আবার স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে দাশু। যেন আর উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছা করে না। ব্যস্ত হয়ে উঠবার সাধ ক্লান্ত হয়ে এসেছে। দাশু কিষাণের হাতে-পায়ে এমন অবসাদ কোনদিন দেখা দেয়নি। ঘরের ভিতরের দিকে তাকাতেও যেন আর কোন ব্যাকুলতা নেই। দরজার চৌকাঠের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মুরলী। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে আর দেখতে ইচ্ছা করে না, সকালবেলার আলোতে মহেশ রাখালের বিটির সুন্দর মুখটা কত সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। মুরলীর এই মুখ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবার মানুষ মধুকুপির কাছেই আছে। মুরলীকে মায়া করে পলুস হালদার।

পলুস হালদারের দয়া! কী অদ্ভুত দয়া! মুরলীকে মায়া করে বলে দাশুর বুকের কাছে বন্দুকের নলটাকে এগিয়ে নিয়ে এসেও গুলী মারেনি পলুস। শিকারী পলুসের স্বপনটা একটুও ভীরু নয়। দাশু কিষাণকে একটা দুর্বল কাঠ-বিড়ালীর চেয়েও দুর্বল বলে মনে করে পলুস। তাই অনায়াসে দাশুকে ছেড়ে দিতে পেরেছে।

—তু মিছা কেনে পলুসকে চোর বলেছিস মুরলী, ছিঃ। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

কেঁপে ওঠে মুরলী। —কি বললে?

দাশু—পলুস হালদারের বড় দয়া। তুর লেগে কত মায়া! তাই আমাকেও মায়া করে!

দাশুর কাছে এগিয়ে এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় মুরলী। —কে বললেক? কুথাকে গেইছিলে তুমি?

দাশু হাসে—পলুসের সাথে দেখা হলো। পলুসই বললেক।

মুরলীর নিরুত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। রাগ নয়, হিংসা নয়, কোন ক্ষোভের জ্বালা নয়; মুরলীর কালো চোখের তারা দুটোর মধ্যে একটা দুরন্ত পিপাসার ছটফটানি শুধু দেখতে থাকে দাশু। মধুকুপির কিষাণের ঘরের দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে মুরলী, কিন্তু মুরলীর প্রাণটা যেন এই মুহূর্তে সকাল-বেলার এই আলোতে সাঁতার দিয়ে অনেক দূরে ভেসে গিয়েছে। যেন পলুস হালদারের দু' চোখের পিয়াসের সামনে মাথা নীচু করে মাপ চাইছে মুরলী।

দাশু বলে—পলুসের সাথে যদি আবার দেখা হয়, তবে উয়াকে একটা কথা বলে দিব।

—কি কথা বলবে?

—বলবো, তুমাকে চোর বলে গালি দিয়ে মুরলীর বড় দুখ হ'ইছে। ভুল করেছে মুরলী। তুমার কাছে মাপ চেইয়েছে মুরলী।

—না। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

দাশু আশ্চর্য হয়ে বলে—কেনে মুরলী? বেচারা পলুসের উপর তুর এত রাগ কেনে?

একটা ধূর্ত ঠাট্টার নেশায় নিষ্ঠুর হয়ে কী অদ্ভুতভাবে হাসছে মধুকুপির কিষাণ!

দাশুর চোখের চাহনিটা যেন মুরলীর বুকের উপর কাঁড়বাঁশ ছুঁড়ে মেরেছে। মুরলীর জীবনের গোপন স্বপ্নটা যেন আর্তনাদ করে নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে।

দাশু প্রশ্ন করে। —কি মুরলী? তোর চোখ দুটি কাঁদছেক কেনে?

—শিকারীটাও মিথ্যুক বটে। আর একবার চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী, দাওয়ার মাটির উপর বসে পড়ে, দু হাঁটুর উপর মাথাটা নামিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে দাশু। মুরলী মুখ তুলে তাকায়। —কি হলো? হাসছো কেনে?

দাশু—আজ আর খাটতে বের হব নাই মুরলী।

মুরলী—কেনে? তাহলে খাবে কি?

দাশু—খেতে ইচ্ছা নাই।

মুরলী—আমার তো ইচ্ছা আছে।

দাশু—সে তু ভেইবে দেখ।

মুরলী—আমাকে চলে যেতে বলছো?

দাশু—না।

মুরলী—তবে?

দাশু—এখানকে থাকবি। আমি যেদিন খাব সেদিন খাবি। আমি যেদিন খাব না, সেদিন তু'ও খাবি না।

মুরলী—কেনে?

দাশু—কিষাণের মাগ হলে এমনটি হবেক মুরলী; উপায় নাই।

মুরলী—তুমি মরবে, আর আমাকেও মরাবে, কেমন?

দাশু—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমার ছেইলাটা? সেটা মারবেক কেনে? চেঁচিয়ে ওঠে, মুরলী। মুরলীর চোখে সকালবেলার আলোর ছায়া আগুন হয়ে জ্বলতে থাকে।

—না না না। ছেইলাটা মরবেক না রে মুরলী! বলতে বলতে মাথা হেঁট করে ছটফট করতে থাকে দাশু! মুরলীর একটি প্রশ্নের আঘাতে দাশু কিষাণের সব কথার কৌশল, আহ্লাদ আর উল্লাস যেন ভয় পেয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছে।

কে জানে কেন, মুরলীর চোখে সকাল-বেলার আলোর ছায়া আগুন হয়ে জ্বলতে জ্বলতেই হঠাৎ যেন ছাই হয়ে যায়, আর সেই ছাই ভিজেও যায়। ঝাপসা চোখ দুটো মুছে নিয়ে, দাশুর মাথায় হাত রেখে ডাক দেয় মুরলী—শুনছো?

—কথা বলিস না মুরলী; তুর কথা শুনলে আমার কলিজাতে তরাস লাগে। মাথা সরিয়ে নেয় দাশু।

মুরলীর গলার স্বর আরও কোমল হয়ে যায়। —কেনে? আমাকে ডর লাগে কি?

—হ্যাঁ।

—কেনে গো? আমি কি তোমার দুসমন?

দাশু কিষাণের জীবনের সব আতঙ্কের

নালার উপর যেন বড়কালুর ঝরনার ঠাণ্ডা লের ধারা ঝরে পড়েছে। একটা নতুন ম্ময়ের আবেগে টলমল করে ওঠে দাশু ষাণের বুক। মুখ তুলে, অদ্ভুত রকমের খ করে মুরলীর মুখের দিকে তাকায়।

মুরলী বলে—আমার কথা শুনবে?

দাশু—বল।

মুরলী—তুমি একবার হারাণগঞ্জে যাও।

দাশু—কেনে?

মুরলী—সিস্টার দিদির সাথে ভেট কর।

চমকে ওঠে দাশু—কেনে?

মুরলী—তুমাকে ভাল কাজ পাওয়াই বেন সিস্টার দিদি।

দাশু—ভাল কাজ?

মুরলী—হ্যাঁ, কলের কাজ। হারাণগঞ্জে, াবিন্দপুরে, ভুবনপুরে কত নতুন কল ইছে, সে খবর তুমি জান না। কত কিষাণ ত ভাল কাজ লিয়ে সুখ করছে, সে-কথা মি শুন নাই।

দাশু—সিস্টার দিদি আমাকে কেনে াজ দিবে? উটা আমাকে কাজ দিবার কে?

মুরলী—আমি বলছি, দিবেন। কিন্তুক...।

দাশু—কি?

মুরলী—তুমি খিরিস্তান হবে।

—না। খবরদার মুরলী, তু এমন কথা লবি না। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। দাশুর নিঃশ্বাসও যেন রাগী সাপের মত হিসহিস করে শব্দ ছাড়ে।

মুরলী বলে—তুমার পায়ে পড়ি, আমার কথা শুন। আমার মাথার কিরা, তুমি এক-টুক বুঝে দেখ।

—কি বুঝতে বলছিস মুরলী?

—সেদিন আর নাই। গাঁয়ের মাটিতে সুখ নাই। খেটে মরবে, কিন্তুক বাঁচতে লারবে।

—আমাকে কলের কুলি হতে বলছিস মুরলী।

—পরের মাটির মুনিষ হয়ে তুমার কি মানটা থাকছেক বল?

—কপালবাবা দয়া করলে নিজের মাটি হবে না কেনে? মুনিষ হয়ে থাকবো কেনে? নিজের মাটির কিষাণ হব। একটু সবুর কর মুরলী। আমাকে একটুক দম নিতে দে।

—হবেক নাই। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—কেনে? দাশুর চোখের তারা তীরের ফলার মত চিকচিক করে।

—তুমার কপালবাবা মরেছে।

খবরদার! খিরিস্তানীর মত কথা বলবি কি আমি ত্র......।

—টাঙ্গ মারলে? হেসে ফেলে মুরলী।

চুপ ক'রে, হঠাৎ মেজাজের উত্তাপ সামলে নিয়ে আবার মাথা হেঁট করে দাশু। মুরলী বলে—তবে আমাকে যেইতে দাও।

দাশু গম্ভীর স্বরে বলে—না।

মুরলী—তবে খেইতে দাও।

দাশু—দিব।

মুরলী—কি খেইতে দিবে? জঙ্গলের ডুমুর?

দাশু কিষাণের পাথরের পাটার মত বুকটা হঠাৎ যেন চুপসে যায়। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—বল, কি খেইতে দিবে? কথা বল? কথা বলতে মধুকূপির কিষাণের এত ডর কিসের?

গেঁয়ো মধুকূপির একটা মূক ও বধির আত্মার উপর যেন তীর মেরে খেলা করছে মুরলী। হাত-পা গুটিয়ে একেবারে অনড় হয়ে বসে থাকে দাশু।

কিন্তু একটু পরেই চমকে উঠতে হয়। নিকটের সড়কটা গোঁ গোঁ শব্দ করছে। তারপরে, একেবারে নতুন একটা উল্লাসের উৎসব যেন ধোঁয়া ছড়িয়ে ছুটতে ছুটতে দাশু কিষাণের ঘরের কাছে এসে থেমে যায়।

একটা মালবহ। মোটর গাড়ি। সে গাড়ির চালা নেই। ঝুপঝাপ করে গাড়ির ভিতর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে থাকে এক একটা মূর্তি। হাতে গাঁইতা; কালো কপনি পরা আর কালো ধুলোয় মাথা ছাওয়া এক একটা চেহারা।

দাশু দাদা কবে ফিরে এইলে হে! চেঁচিয়ে ওঠে সুরেন মানঝি।

এগিয়ে আসে সুরেন। মালকাটা মানঝির দল সড়কের উপর বসে জিরোতে থাকে; বিড়ি টেনে ধোঁয়া ছাড়ে আর গল্প করে।

সুরেন মানঝির চেহারার দিকে তাকাতে গিয়ে দাশু কিষাণের চোখের বিস্ময়টাও করুণ হয়ে যায়। এ কি চেহারা! কালো ধুলো মেখে আর গাঁইতা কাঁধে নিয়ে সুরেন মানঝি যেন সখের ডাকাত সেজেছ।

—কেমন আছ দাশু দাদা? সুরেন মানঝি এসে একগাল হাসি হেসে দাশুর চোখের সামনে দাঁড়ায়।

—তুমি কেমন আছ বল।

—বড় সুখে আছি গো দাদা। কয়লা খাদে খাটি। ঈশাণ মোক্তারের জমিতে থুক ফেইলে সব মানঝি মালকাটার কাজ লিয়েছে।

—কেনে? জঙ্গলের শাল ভেঙেগ......।

—হুর্‌র্‌ সেদিন আর নাই দাশু দাদা। টাঙির দিন নাই।

—তবে কিসের দিনটা বটে? বলতে গিয়ে দাশুর গলার স্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে সুরেন—গাঁইতার দিন বটে। গাঁইতা মেইরে এক টব কয়লা উঠাও? মজুরি এক টাকা দুই আনা। দুই টব উঠাও, কত হয় হিসাব কইরে বুঝাও দাশু দাদা। (ক্রমশ)

ফোর্ট গাস্টেভাস ও কুঠির

চারুলাল মুখোপাধ্যায়

হাসি কান্নার এক মিশ্রিত উচ্ছ্বাসে দ্বিজু রায় গেয়েছিলেন, 'অবশেষে পড়ে গেলাম থিয়জফির গর্তে'। আজ চুঁচুড়ার কুঠির মাঠের পুরাতনী গাইতে গিয়ে, আমাদেরও সেই অবস্থা। সামনে আছে কুঠির মাঠ—মহাশূন্য এক ময়দান। কোথায় ছিল ওলন্দাজদের ফোর্ট গাস্টেভাস? কবেই বা গড়ে উঠেছিল তাদের ফ্যাক্টরী প্রাকার? —'পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ-সাল।' অথচ ইতিহাসের পদক্ষেপে এই অধ্যায়টি মাত্র সেদিনের। আর আমরা যেন বহুদিন বিলুপ্ত অ্যাটলান্টিস বা লেমুরিয়া মহাদেশের তত্ত্বের ক্যাঅস্ থেকে কস্মস্ সৃষ্টি করছি।

পুঁথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে সংগৃহীত তথ্যগুলির আলোচনা করে যথাসম্ভব সত্য সন্ধান করা চিত্তাকর্ষক হবে সন্দেহ নেই। প্রথমে শোনা যাক 'হুগলী পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' গ্রন্থ প্রণেতা শম্ভুচন্দ্র দে'র কথা। তিনি এ সম্বন্ধে বলেনঃ

ওলন্দাজদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য; তবু তারা ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে স্থির করল যে একটি দুর্গের সাহায্যে তাদের কুঠি রক্ষা করবে। এজন্য তারা মুঘল রাজের অনুমতি নিয়ে, ১৬৮৭ সালে, চুঁচুড়ায় 'ফোর্ট গাস্টেভাস' দুর্গ নির্মাণ করেন। এর নামকরণ হয়েছিল হল্যাণ্ড-এর তদানীন্তন রাজা গাস্টেভাসের স্মৃতিতে ও দুর্গটি বিস্তৃত ছিল জোড়াঘাট থেকে বর্তমান সরকারী ব্যারাকস পর্যন্ত। এর সব ইমারত-গুলিই একসঙ্গে তৈরী হয়নি, দক্ষিণ-দ্বারের বাড়িগুলো নির্মিত হয়েছিল ১৬৯২ সালের কোন মাসে (৪৮৩ পৃষ্ঠা)।

ফোর্ট গাস্টেভাস যে জোড়াঘাট ঘেঁষা ছিল—শম্ভুচন্দ্র দে'র এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় দুর্গাচরণ রায় প্রণীত 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' পুস্তকে চুঁচুড়া পরিচিতি প্রসঙ্গে। এখানে বলা হয়েছে যে, ওলন্দাজ-দের দুর্গের ঠিক উত্তর দিকেই অবস্থিত আর্মেনিয়ান গির্জা এবং এর কাছাকাছি—তাদের (ওলন্দাজদের) গোরস্থান।

দ্বিতীয় মত পাওয়া যায় শ্রীসুধীরকুমার মিত্র মহাশয়ের 'হুগলী জেলার ইতিহাস' পুস্তকে। ফোর্ট গাস্টেভাস প্রসঙ্গে লেখক বলছেন (পৃঃ ৪৬৯)ঃ 'উক্ত দুর্গ ঘণ্টা-ঘাট হইতে ব্যারাক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।'

এই মত সত্য হলে দুর্গটির অবস্থান পরিবর্তন হয় ও পরিসরও কমে যায় প্রায় এক-চতুর্থাংশ। আয়তন কমাতে আমাদের আপত্তি নেই; তবে এই গ্রন্থে কোন প্রামাণ্য তথ্য (data) না থাকাতে আমরা তিমিরেই থাকলাম।

একমতে জোড়াঘাট অন্যমতে ঘণ্টাঘাট (প্রথমটি হুগলী শহরের কাছাকাছি, দ্বিতীয়টি মহসীন কলেজ সংলগ্ন); সাধারণ লোকের কাছে এই দুর্গ প্রতিষ্ঠার সাল-তারিখ নিয়েও সমস্যার অন্ত নেই। এসব আরো ঘোরাল হয়েছে এভাবে।

কুঠির মাঠের গঙ্গার ধারে বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের বাসগৃহে প্রবেশ করলেই রুপালী অক্ষরে একটি স্মৃতি-ফলক নজরে পড়ে 16 O V C 87 অনেকের ধারণা এটি এই গড় প্রতিষ্ঠার তারিখ। যদিও টয়নবীর* হুগলী জেলার

* ইনি হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন

১৭২১ সালের চুঁচুড়ার একটি নকশা
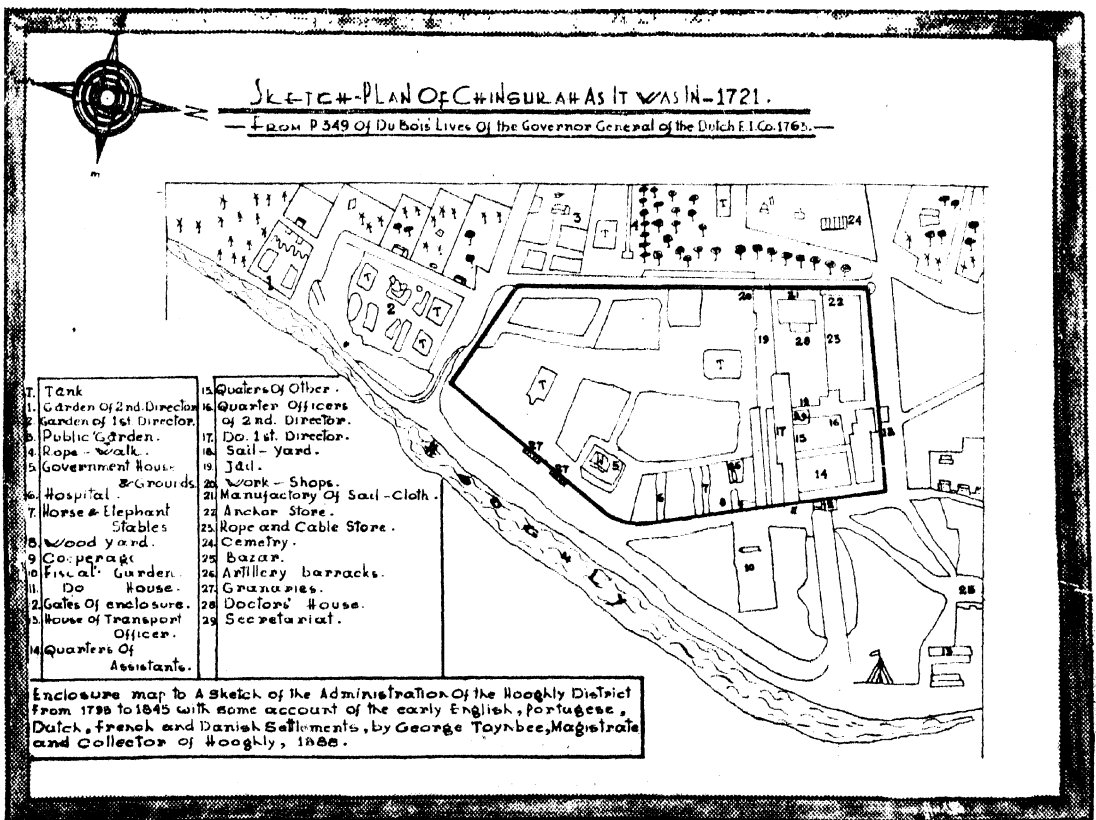
ইতিহাসে সন্নিবিষ্ট (দ্যাবয় প্রণীত "লাইভস অফ দি গভর্নরস জেনারেল অব দি ডাচ" পুস্তক থেকে সংগৃহীত) ওলন্দাজদের ১৭২১ সালের চুঁচুড়ার স্কেচ্ ম্যাপ দেখে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই স্থানেই, এককালে 'গভর্নমেণ্ট হাউস ও গ্রাউণ্ডস' ছিল, উল্লিখিত ফলকটি যে ফোর্ট গাস্টেভাসের স্মারকচিহ্ন, এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ আছে। পূর্বতন কোন (ইংরেজ আমলের) কমিশনার গৃহসজ্জা হিসাবে এটি দিয়ে তাঁর কোয়ার্টারের ঐতিহ্য বৃদ্ধি করেছিলেন মাত্র। তাই সাধারণের মনে এ বিষয়ে একটা ভ্রান্ত ধারণা চলে আসা খুব স্বাভাবিক।

এ বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন ক্রুফোর্ড, তাঁর হুগলী জেলার ইতিহাসে। তিনি বলেন—১৬৯৬ সালে শোভা সিংহ-এর বিদ্রোহের পর, ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায় 'ফোর্ট গাস্টেভাস' নির্মাণ করেন। অবশ্য এর পূর্বে থেকেই এদের দুর্গের মত একটা কিছু ছিল। ১৮৪৫ সালের "ক্যালকাটা রিভ্যু" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের উপর নির্ভর করে তিনি লিখছেন যে, এই দুর্গের উত্তর দ্বারে "১৬৮৭" ও দক্ষিণ দ্বারে '১৬৯২' তারিখ অংকিত ছিল।......ধূসর গ্র্যানিট পাথরের একখণ্ড স্ল্যাব (স্মৃতি-ফলক) এই সেদিনও র‍্যাকেট কোর্টের (গোলন্দাজ ব্যারাকের সংলগ্ন) বাইরের প্রবেশ পথে পড়েছিল। এটি কমিশনারের গৃহে গ্রথিত করা হয়েছে। গেলেই দেখা যায়। একথা সহজেই অনুমেয় যে এই ফলকটি ছিল ওলন্দাজদের দুর্গদ্বারে। এতে O V C—এই মনোগ্রামটি আছে এবং দুদিক মিলে তারিখ দেওয়া আছে ১৬৮২। এটি ওলন্দাজ ইউনাইটেড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর (Ostendiche Verenigde Company) প্রতীক। ওলন্দাজ কোম্পানীর টাকশালে নির্মিত নানা সালের তাম্র মুদ্রায় এই সাংকেতিক চিহ্ন সচরাচর দেখা যায়।

এর পর আসা যাক ওলন্দাজ নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ অ্যাডমির্যাল স্ট্যাভোরিনাসের চুঁচুড়া বর্ণনায়। এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে (১৭৬৯-৭০) ফোর্ট গাস্টেভাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে ওলন্দাজদের কুঠি (lodge) গঙ্গানদী থেকে ৫০০ বা ৫৫০ ফুট দূরে, খুব প্রশস্ত ফাঁকা জায়গায় অবস্থিত। আকারে এটি এক অবলং চতুষ্কোণ। এর উত্তর দক্ষিণের উল্টো দিকের দীর্ঘতম অংশ প্রায় ছ'শ ফুট লম্বা; সবচেয়ে ছোট দিক-এর অর্ধেক হবে। ডাঙ্গার দুর্গদ্বারের তারিখ দেখে প্রতীয়মান হয় যে এ দুর্গ নির্মিত হয়েছিল ১৬৫৬ সালে। পাথরের প্রাচীরগুলোর উচ্চতা পনের ফুট......এর মধ্যে আছে কোম্পানীর গুদামখানা, ডিরেক্টরের গৃহ।......এর তিনটি গেট আছে, একটি নদীর ধারে; ডাঙ্গার দিকে দুটি, একটি উত্তরে, একটি দক্ষিণে।

স্ট্যাভোরিনাসের দেখা '১৬৫৬' তারিখ আর এক জটিলতা সৃষ্টি করল। হেনরী কটন, তার 'ক্যালকাটা ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ' পুস্তকে এ সমস্যা সমাধান করতে চেয়েছেন এই বলে যে, ডাঙ্গার দিকের দুর্গদ্বারে ১৫৫৬ সাল অঙ্কিত প্রস্তর ফলক (যা স্ট্যাভোরিনাস দেখেছিলেন,) কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দুর্গের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন ১৬ O V C ৮৭ কমিশনারের গৃহে পড়ে আছে।

ক্যাথলীন ব্লিচিনডেন, তার রচিত 'ক্যালকাটা পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট' পুস্তকে বলেন যে ফোর্ট গাস্টেভাসের উত্তরে ১৬৮৭ ও দক্ষিণ দ্বারে ১৬৯২ লেখা ছিল।

এর সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় টয়নবীর 'এ স্কেচ্ অফ দি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দি হুগলী ডিস্ট্রিক্ট' পুস্তকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের ইয়োরোপীয়ানদের গাঙ্গেয় উপনিবেশগুলির কাহিনীতে। তিনি বলেনঃ 'র‍্যাকেট কোর্টে যে পাথরটি পড়ে আছে তার তারিখ ১৬৮৭। তবে এটি যে কি ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করছে এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। সম্ভবত এটি ফোর্ট গাস্টেভাস সৃষ্টির তারিখ।'

এরূপভাবে রাশি রাশি মতামত উপস্থিত করা, গন্ধমাদন পর্বত বহন করে নিয়ে আসার মত হাস্যোদ্রেক করতে পারে, তাই 'হুগলী পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট'-এর শম্ভুচন্দ্র দে'রঅভিমত উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ সাঙ্গ করব। তিনি বলেন যে, স্ট্র্যাভোরিনাস যদি ফোর্ট গাস্টেভাসের ডাঙ্গার দিকে গেটে '১৬৫৬' তারিখ দেখে সিদ্ধান্ত করে থাকেন যে ওটি এই দুর্গের প্রতিষ্ঠার তারিখ, তা হলে তার ধারণা নিশ্চিত ভ্রান্তিমূলক। এই তারিখটি ওলন্দাজদের দুর্গ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। নজীর হিসাবে তিনি ১৮৪৫ সালের ক্যালকাটা রিভ্যুতে প্রকাশিত রেভারেন্ড লং-এর 'নোটস অন দি রাইট ব্যাঙ্ক অফ দি হুগলী' প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছেন।

কাঠগড়ায় সাক্ষী দাঁড়ালে যেমন উকিলরা জেরায় তার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় প্রকাশ করিয়ে, তাকে নাজেহাল করে ছাড়ে, তেমনি টয়নবী প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব অ্যাডমিরাল স্ট্র্যাভোরিনাস সম্পর্কে বলছেন ঃ এই অ্যাড-মিরালের মতে বেদ প্রথম লেখা হয়েছিল পারস্য ভাষায়· এঁর বর্ণনায় পাটনা শহর চুঁচুড়া থেকে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত।

আমরাও একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। তবে কি অ্যাডমিরাল ঘণ্টাঘাটের ওলন্দাজ গির্জায় একজন গভর্নরের escutcheon-এ লিপিবদ্ধ মৃত্যু তারিখ '১৬৫৬' দেখে ভুল-ক্রমে তাই চালিয়ে দিয়েছেন, ফোর্ট গাস্টে-ভাসের সৃষ্টির তারিখ বলে?

এখন পুঞ্জীভূত মতামতের গন্ধমাদন থেকে বিশল্যকরণী সন্ধান করা যাক। সাক্ষ্য প্রমাণ-গুলো বিচার করলে বোধ হয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে,

(১) কমিশনারের গৃহে সংশিলষ্ট '16 O V C 87' ফলকটি ফোর্ট গাস্টেভাসের উত্তর দিকের গেটে ছিল ও উহার দক্ষিণ দ্বারের তারিখ ছিল ১৬৯২।

(২) এই অনুমান মোটেই ভিত্তিহীন নয় যে ওলন্দাজদের দুর্গটি জোড়াঘাট থেকে বর্তমান (সরকারী কাছারি) ব্যারাক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

(৩) অ্যাডমির্যাল স্ট্র্যাভোরিনাসের দেখা ১৬৫৬ সাল অঙ্কিত (৩য়?) দ্বার সম্বন্ধে বর্তমানে নীরব থাকাই যুক্তিযুক্ত।

সে যাই হোক, ১৮২৫ সালে আনুষ্ঠানিক-ভাবে ওলন্দাজদের ক্ষমতা চূর্ণ হল ও

বচূর্ণ হল তাদের ফোর্ট গাস্টেভাস প্রতিবন্দ্বী ইংরেজদের হাতে। দেড়শ বছরের প্রাচীন দুর্গের কঙ্কাল স্বরূপ বীমগুলো দেখা গেল এত পাকাপোক্ত যেন নতুন আমদানী হয়েছে। এ সব ছিল ব্যাটাভিয়া থেকে সংগৃহীত 'জাভা টিক্'। কড়িগুলো দীর্ঘতম সাইজের, আজকালকার দুটোর সমান। পরবর্তী কালে, ব্যাটাভিয়ার এই সব কড়ি বর্গা ব্যবহার করে গড়ে উঠল ১৮২৯ সালে ইংরেজদের সৈন্যাবাসের সুদীর্ঘ ব্যারাক।

গুর্খা গ্রাউণ্ডে কুঠির মাঠে পায়চারি করতে পায়ের তলায় ঠেকে সারি সারি ভিত। ইতিহাসের চক্রনেমিতে ওলন্দাজদের দুর্গ-কুঠি আজ নিশ্চিহ্ন। মাঝে মাঝে স্বাক্ষর মেলে, তাদের ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্নের। তারই একটি রূপ রেখা পাওয়া যায় টয়নবীর হুগলীর ইতিহাসে সন্নিবিষ্ট 'স্কচ

প্ল্যান অফ চীনসুরা অ্যাজ ইট ওয়াজ ইন সেভেণ্টিন টুয়েণ্ট ওয়ান'। বর্তমান কুঠির মাঠের সঙ্গে এটি মিলিয়ে দেখে ওলন্দাজ-স্মৃতিমণ্ডিত স্থান ও ইমারতগুলি সনাক্ত করবার ইচ্ছা জাগে।

স্কেচ ম্যাপটির ৫নং নির্দিষ্ট স্থানে 'গভর্নমেণ্ট হাউস ও গ্রাউণ্ডস' বর্তমান কমিশনারের গৃহ বলে ধরে নিতে কষ্ট হয় না। খুব সম্ভব ওলন্দাজী ভিত্তির উপর, নিউ ওয়াইন ইন অ্যান ওল্ড বটল-এর মত, এই ইমারতটি গড়ে উঠেছে, কিন্তু এর সংলগ্ন আস্তাবল ও রান্নাঘরে ওলন্দাজ স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

১৯নং (ওলন্দাজ জেলখানা): এর পার্শ্ববর্তী 'I' চিহ্নিত স্থানটি ট্যাঙ্ক। খুব সম্ভব যে উহা বর্তমান কাছারী ব্যারাক সংলগ্ন 'লালদীঘি'।

২৪নং (গোরস্থান): 'দেবগণের মর্তে আগমন' পুস্তকে দেখা যায় যে, আর-মেনীয়ান চার্চের সন্নিকটে ওলন্দাজদের গোরস্থান ছিল। তাহাদের কুটির পশ্চিম দিককার এই গোরস্থানটি যে ডিরেক্টর টেইলফার্ট বিনষ্ট করে দেন এরূপ ঐতি-হাসিক সাক্ষ্য মেলে। এখানে শুধু ডিরেক্টর Huysman-এর কবরটি থাকে। পরে এই কবরখানাটি শহরের অন্যত্র (ধরমপুর?) সরিয়ে নেওয়া হয়।

২৫নং (বাজার): খুব সম্ভব এই বাজার থেকেই বর্তমান চুঁচুড়ার বড়বাজার নামকরণ হয়েছে।

২৬নং (আর্টিলারী ব্যারাকস): এই র‍্যাকেট কোর্ট সহ অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান ও 'ব্যারাকস অফ দি ডাচ গ্যারিসন' অঙ্কিত ফলকে শোভিত।

কুঠির মাঠের সংলগ্ন আরো কয়েকটি ওলন্দাজ স্থাপত্য ও ঐতিহ্যমণ্ডিত ইমারত আছে। এর মধ্যে প্রথম স্থান দাবী করতে পারে মাঠের মণ্ডলদের বাসগৃহ—সুপরিচিত 'ডাচ ভিলা'। স্বর্গত রাজেন্দ্রলাল সাধু, ডিস্ট্রিক্ট জজ-এর গৃহ, শ্রীনবদ্বীপ বড়ালের সম্পত্তি, প্রাচীন 'গৌরাঙ্গ নাট্য সমাজ'ও এই প্রাচীনত্ব দাবী করতে পারে। যদিও দুবয়-র স্কেচ ম্যাপে এ সবের কোন নিশানা মিলে না।

ওলন্দাজদের চুঁচুড়ার সাধারণ সৌন্দর্য পরিব্রাজকদের মনোহরণ করত। বঙ্গদেশ পরিদর্শন করে (১৬৮৭) হ্যামিলটন এ শহরটি সম্বন্ধে লিখেছেন:

একটি বিরাট ফ্যাক্টরী। চারদিকে ইটের প্রাচীর কুঠিয়ালদের সুরম্য গৃহগুলি নদীর ধারে থরে থরে সাজানো। সব বাড়িতেই ফুলের বাগান।

স্কেচ্ ম্যাপটিতেও দেখা যায় প্রথম ডিরেক্টার, দ্বিতীয় ডিরেক্টার-এ ফুল বাগান (১ ও ২নং), একটি সাধারণের জন্য "পাব্লিক গার্ডেন" ও চারদিকে ছড়ান অন্তত সাতটি জলাশয়।

তাই বোধহয় মুগ্ধ বিস্ময়ে হেজ সাহেব, তার ১৬৭৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর-এর ডায়েরীতে, এই কুঠিটিকে "ম্যাচ্ লাইক্ এ কাণ্ট্রি সীট্ ইন্ ইংল্যাণ্ড" বলে চিত্রিত করেছেন।

এই প্রাচীন চুঁচুড়া ছিল শম্ভুচন্দ্র দে-র ভাষায় "হেস্টিংস-এর সিমলা"। সময় পেলেই অবসর-বিনোদনের জন্য এখানে এসে ওলন্দাজ গভর্নর রস-এর আতিথ্য গ্রহণ করতেন, সঙ্গে থাকতেন তার প্রিয়তমা "অ্যালীগ্যাণ্ট ম্যারীয়ান।"

চুঁচুড়ার এই বিশিষ্ট সৌন্দর্য ১৮৪৫ সালেও "ট্র্যাভেলস্ অফ এ হিন্দু" পুস্তকের লেখক, ভোলানাথ চন্দ্রকে মুগ্ধ করেছে। উপসংহারে তাঁর কথা উদ্ধৃত করে প্রবন্ধ শেষ করব।

১২ই ফেব্রুয়ারী: আজ প্রভাতে চুঁচুড়া। সূর্যের প্রথম রশ্মি গঙ্গাতীরে সুরম্য হর্ম্যগুলির উপর পড়ে শহরটিকে করেছে চমৎকার সৌন্দর্যে ভূষিত। আশী বছর আগেকার রেনেল বর্ণিত চুঁচুড়া থেকে, এ যেন আরো সুন্দরী। ছোট্ট পরিচ্ছন্ন শহর; কলকাতার যে ধুলো আর জঞ্জাল লোককে ক্ষেপিয়ে তোলে, তা এখানে একেবারেই নেই। নেই তার গোলমাল, কানে-তালা-লাগা গাড়ির ঘর্ঘর্ আর দুর্গন্ধ। শহুরে কাকনীজমের চিরন্তন হট্টগোলে ক্ষিপ্ত হলে, সপ্তাহে অন্তত একবার শান্ত সলিলে মুক্তিস্নান করবার চমৎকার স্থান এই চুঁচুড়া। এটি চন্দননগরের মত ম্যালিন্যের মেঘে ঢাকা নয়। এর সড়কগুলিতে চলেছে সাবলীল জন-প্রবাহ। মানবের কর্মতৎপরতা ও জীবন স্রোত (চন্দননগরের তুলনায়) এখানে অনেক বেশী হৃদয়স্পর্শী।

॥ একুশ ॥

"হে আমার প্রিয়া, লেবাননের চূড়ার মতো তোমার সুন্দর গ্রীবা তাকিয়ে আছে ডামাস্কাসের দিকে।"

—"সলোমনের গান।"

সিরিয়া-লেবানন নিয়ে লেভাণ্ট, যার কথা বলতে গেলে ভাবাবেগ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর অতি পুরাতন সভ্যতার ক্রোড়ভূমি এই লেভাণ্ট, যেখান থেকে য়ুরোপ পেয়েছে যীশু খৃষ্টকে, ইসলাম মহম্মদকে। ডামাস্কাসের অনতিদূরে সেকালের সিরিয়ারই মাটিতে যীশু খৃষ্টের জন্ম, এখানেই ইহুদিদের হাতে তাঁর মৃত্যু, এখানেই তাঁর পুনরাবির্ভাব। পুরাতন সিরিয়ার মাটিতেই রয়েছে খৃষ্টানদের "ধরণীতে সব চেয়ে মহান অর্ধ একর জমি"; এখানেই রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন্ একদিন বড়ো বড়ো ইমারতে তাঁর খৃষ্টধর্ম গ্রহণের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন। এই অতীতের সিরিয়াতেই রাজত্ব করেছেন জ্ঞানী ডেভিড ও তাঁর পুত্র সলোমন। সলোমনের গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর দরবারে এসেছিলেন একদিন আফ্রিকার হাবসী রানী সেবা; দীর্ঘদিন বাস করে একটি পুত্র কোলে করে ফিরে গিয়েছিলেন ইথিওপিয়ায়, সে পুত্রই হাবসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এই সিরিয়াতেই জন্ম নিয়েছিলেন আব্রাহাম; এখানেই ফোনেশিয়ানরা আবিষ্কার করেছিল প্রথম লিখিত অক্ষর, যা থেকে রোমান অক্ষরমালার উৎপত্তি। আবার এখানে জন্মেছিলেন ক্লিয়োপাত্রার বংশধরী প্রাচ্যের রানী সেপ্তিমা জেনোবিয়া, ইংরাজ ঐতিহাসিক গিবন যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হোমার ও প্লেটোতে পণ্ডিত এই জেনোবিয়া বীরের মতো যুদ্ধ করে একদিন রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন। এখানেই এ্যাডোনিস নদীর তীরে একদিন সুন্দরী এস্টারটে দেখতে পেয়েছিলেন তরুণ এ্যাডোনিসকে; এখানেই প্রিয়তমার অনুনয় অগ্রাহ্য করে এ্যাডোনিস চলে গিয়েছিলেন শিকারে; আর ফেরেন নি। সেই পবিত্র শোকার্ত ভূমিতে সিরিয়ার মেয়েরা আজও এ্যাডোনিসের জন্যে দুঃখ করে গান গায়! আরবরা বলে যে ডামাস্কাস মরূদ্যানের পরমরমণীয় উদ্যানই বাইবেলের গার্ডেন অব ইডেন; এখানেই বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রথম মানব-মানবী আদম ঈভকে! দূর থেকে এই উদ্যান দেখে হজরত মহম্মদ এতোই বিচলিত হয়েছিলেন যে, কথিত আছে, তিনি সামনে থেকে দেখতে চান নি, বলেছিলেন, "মর্ত্যেই যদি এত সুন্দর জিনিস দেখে নিই, তবে স্বর্গে গিয়ে দেখব কি?" আবার এই ডামাস্কাস দখল করতেই মহম্মদ একদিন হেরাক্লিয়াসকে চরম পত্র পাঠিয়ে হুঙ্কার করেছিলেন; "এমন দিন এসেছে যখন ধরণী ও পর্বত কেঁপে উঠবে। সব পরিণত হবে বালুকায়!......এই আমার সাবধানবাণী।" ৬৩৪ সালের ২৪শে আগস্ট দুর্নিবার ইসলাম বাহিনী ওমায়েদ সাম্রাজ্যের প্রধানতম কেন্দ্র ডামাস্কাস অধিকার করে। স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছিল। খালিফ্ আবু বেকরও তাঁদের সঙ্গেই প্রাণ দিয়েছিলেন।

পুরানো পৃথিবীর সমস্ত সৈনিকের জয়যাত্রার পদচিহ্ন সিরিয়ার তপ্ত বালুতে লীন। সাম্রাজ্য গ'ড়েছে এই বালুর উপর সেই অতীত কাল থেকে শুরু ক'রে বর্তমান কাল পর্যন্ত; এ্যাসিরিয়ান, বেবিলোনীয়ান, পারসিক, গ্রীক, রোমান, আরব, তুর্কী, মিশরী ও ফরাসী সাম্রাজ্য! সব সাম্রাজ্যই আজ নিশ্চিহ্ন! ওমর খৈয়ামের কথা মনে পড়েঃ

"How Sultan after Sultan with
his pomp,
Abode his hour or two, and
went away".

'ভেবে দেখ' এ প্রাচীন পান্থশালা যার
দিন আর রাত্রি শুধু দুটি মাত্র দ্বার,
আসে যায় সেই দুই দুয়ারের মাঝে
প্রভাতে ও সাঁঝে
আকাশের আঁধার-আলোক,
অসংখ্য নৃপতি ল'য়ে অগণিত দাস-দাসী লোক
রাজ্যের ঐশ্বর্য-গর্ব-সমারোহ ভার
যাপিয়া দু'এক দণ্ড এখানে, আবার
বেলা শেষে দূরে চলে যায়!
জানো কি কোথায়?"

শ্রীযুত নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ।

এ প্রাচীন পান্থশালার যে আধুনিক পর্ব নিয়ে আমাদের প্রয়োজন তার শুরু ১৫১৭ সালে, যখন সিরিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে। তুর্কী উপনিবেশ হিসাবে সুলতানের রাজস্ব ভাণ্ডারে কর ও তাঁর "পাশা"দের বেতন ও ঘুষ যোগান ছাড়া সিরিয়ার অন্য কোন মূল্য ছিল না। বার বার তুর্কী অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছোট বড় বিদ্রোহই তার প্রমাণ।

মধ্যপ্রাচ্যের এই লেভাণ্ট অঞ্চলেই য়ুরোপীয় বণিকদের প্রথম আবির্ভাব পঞ্চদশ শতাব্দীতে। সর্বাগ্রে মুসলিম শাসনমুক্ত পর্তুগাল, তার পেছন পেছন ডাচ, ফরাসী, ইংরেজ। আঠারো শতকে এখানে ফরাসী বাণিজ্য ইংরাজী বাণিজ্যের চেয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত; তুর্কী সুলতানও মেনে নিয়েছেন ফ্রান্সকে অমুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অভিভাবকরূপে। উনিশ শতকে সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-ফরাসী স্বার্থের
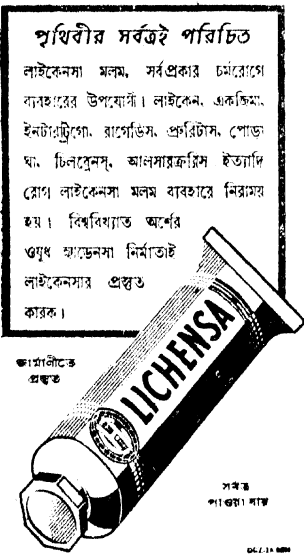
তীব্র সংঘাত; ধীরে ধীরে, একমাত্র লেভান্ট অঞ্চল ছাড়া, সর্বত্রই বৃটিশ রাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। উনিশ শতকের শেষার্ধে একটা সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে লেবাননের উপর ফ্রান্স এক খৃষ্টান গভর্নর নিয়োগের মাধ্যমে অনেকখানি প্রভুত্ব বিস্তার করে। তখন থেকেই লেবাননে ফরাসী "সাংস্কৃতিক" বিজয়াভিযান চলতে থাকে।

আমরা আগেই জেনেছি যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আরব বিদ্রোহীদের মিত্রশক্তিরা আশ্বাস দিয়েছিলেন যুদ্ধোত্তর আরবভূমিতে একটি ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার। যখন কাইরোতে ইংরেজ প্রতিনিধি ম্যাকমোহন এ ব্যাপার নিয়ে শরিফ হুসেনের সঙ্গে পত্রালাপ চালাচ্ছিলেন, তখনই প্যারিসে ইংরেজ ও ফ্রান্সের মধ্যে আরবভূমির ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, কূটনীতির ইতিহাসে যার নাম "সাইক্স্ পিকো চুক্তি"। এ চুক্তির ফলে ইংরেজ সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসী আধিপত্য মেনে নিতে রাজী হয়, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র বৃটিশ প্রভাবের বিনিময়ে। আসলে, যুদ্ধকালে রাশিয়াও এই গোপন ভাগাভাগিতে যোগ দিয়েছিল এবং তুর্কীর অনেকখানি অংশ রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে বৃটেন ও ফ্রান্স রাজীও হ'য়েছিল; কিন্তু রাশিয়ার সাম্যবাদী বিপ্লব হবার পর স্বভাবতই মস্কো অংশীদার হিসাবে পরিত্যক্ত হয়। সাইক্স্-পিকো গোপন চুক্তির তথ্য বিশ্বসমাজে সর্বপ্রথম প্রকাশ ক'রে দেন লেনিন, মিত্রশক্তিদের যথেষ্ট বিব্রত ও আরবদের আশাহত ক'রে।*

বিনা যুদ্ধে কিন্তু ফ্রান্স সিরিয়া-লেবাননে লীগ অব নেশন্স্-এর ম্যাণ্ডেট নিয়েও প্রবেশ করতে পারে নি। ইংরাজের ইচ্ছে ছিল শেরিফ্ হুসেনের পুত্র ফয়জলকে সিরিয়ার রাজা বানাবার। ফরাসী সৈন্যরা তাঁকে সিরিয়া থেকে দিল তাড়িয়ে, অবশ্য সামান্য যুদ্ধের পর। ইংরেজ ফয়জলকে দিল ইরাকের সিংহাসন; তাঁর ভাই আবদুল্লাকে বানাল ট্রান্সজরডনের আমির। আর, সিরিয়া-লেবাননের জনমত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে, বহু বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন ক'রে ফ্রান্স চালিয়ে গেল তার "সভ্যতার শাসন" ১৯২০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত।

সাম্রাজ্যবাদে ফরাসীর সঙ্গে ফরাসীর কোন প্রভেদ নেই। যেমন মার্শাল পে'তা, তেমনি জেনারেল দ্য গল; যেমন লাভাল, তেমনি মোলে। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে ফ্রান্সের পতনের পর, বৃটিশ ও "স্বাধীন ফ্রেঞ্চ" বাহিনী সিরিয়া-লেবানন ভিসী-অনুচরদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করে। ৮ই জুন উদারপন্থী ব'লে পরিচিত জেনারেল কাত্রু (General Catroux) ম্যানডেট-যুগের অবসান ঘোষণা করলেও শাসন ত্যাগের কোন লক্ষণই নতুন ফরাসীরা দেখাতে রাজী হয়নি। ১৯৪৩ সালের নির্বাচনে বর্তমান সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি শুক্রী অল-কোয়াটলির জাতীয় পার্টি (ন্যাশনাল ব্লক) জয়লাভ করার পর আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের নতুন এবং শেষ সংঘাত শুরু হয়। চার্চিল সাহেবের ব্যক্তিগত অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে দ্য গল লেভান্ট আক্রমণ করেন; একমাত্র ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিরোধই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সহিংস পুনঃপ্রতিষ্ঠা থেকে সিরিয়া ও লেবাননকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। ১৯৪৬ সাল গত হবার পূর্বেই সিরিয়া ও লেবানন হ'তে বিদেশী সৈন্য পূর্ণ অপসারণ করে।

লেবাননে ফ্রান্স একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তার সৃষ্টি করেছিল সাম্রাজ্যবাদের সুপ্রাচীন ভেদনীতির অনুসরণে। সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নেবার পর সৃষ্টি হ'ল দু'টি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের। তাদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল, মৈত্রীর চেয়ে বিরোধিতা বেশি।

সিরিয়ার আরবগণ বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী। লেবাননে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব; তাই লেবানন অন্য যে কোন আরব দেশের তুলনায় স্বভাবতই য়ুরোপ-মুখী। উভয় দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা একই প্রকারের—ভূমি বড় বড় জমিদারদের কুক্ষীগত, দরিদ্র চাষী নিয়ে যে সাধারণ জনতা, তার দারিদ্র্য ও দুর্ভোগ ইরাকের অবস্থার সঙ্গেই তুলনীয়। দু'টি দেশই প্রজাতান্ত্রিক; সরকার বাইরে থেকে গণতান্ত্রিক হলেও, বিশেষ ক'রে লেবাননে রাজনৈতিক ক্ষমতা কয়েক শত জমিদার পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উভয় দেশেই স্ত্রীলোকদের অনেকেই ভোট দিতে পারে; যে অধিকার ইরাক, সৌদী আরব, জর্ডন বা এমেনে স্ত্রীলোকদের নেই; মিশরে সবে মাত্র সর্বপ্রথম স্বীকৃত হ'য়েছে।

রাজশক্তি আসে অর্থনৈতিক শক্তি থেকে। সিরিয়ায় বর্তমানে ভূমি-সংস্কার ও শিল্প-গঠন মূলক ব্যাপক পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে। তবু ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয় আতঙ্ককর। সবচেয়ে সুফলা ভূমি হচ্ছে দুমায়—তার চার ভাগের এক ভাগ দখল ক'রে আছেন মাত্র পাঁচজন জমিদার! জার্বা অঞ্চলের সমস্ত জমিই মাত্র একজন ভূস্বামীর! আলয়াই পার্বত্য অঞ্চলে জমিদারদের কথার উপর কোন আইন নেই; গত নির্বাচনে এদেরই ক্ষেপিয়ে তোলবার চেষ্টা হ'য়েছিল বর্তমান বামপন্থী গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে।

রাজশক্তি থেকে জনগণের দূরত্ব এবং মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী সামন্তদের হাতে ক্ষমতার দীর্ঘ অবস্থান সিরিয়াতে গত দশ বছর এক গভীর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি ক'রে তুলেছিল। ১৯৪৮ থেকে

*বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন Syria and Lebanon, by A. H. Hourani, London, 1946.

১৯৫৫ সাল এই সাত বছরে ১৫টি মন্ত্রি-মণ্ডল গঠিত হয়, পাঁচটি 'ক্যু দ' তা অনুষ্ঠিত হয়, তার তিনটি একই বছরে, ১৯৪৯ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে!!**

১৯৫৫ সালের নির্বাচনে শুকরী এল্-কোয়াটলি পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কাইরোতে কয়েক বছর নির্বাসনের সময় তিনি ১৯৫২ সালের বিপ্লব ও নাসের গভর্নমেন্টের দেশীয় ও বৈদেশিক নীতি প্রত্যক্ষভাবে দেখবার ও বিচার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। গত দু' বছরে সিরিয়ার রাজনৈতিক জীবনে যে স্থিরতা এসেছে তার কারণ প্রধানত তিনটি; সমাজবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে নতুন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব, প্রগতিপন্থী কয়েকটি দলের সমবেত সমর্থনে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রি-সভা গঠন এবং নাসেরের আদর্শে অনুপ্রাণিত সৈন্য বিভাগের কয়েকজন ক্ষমতাশালী সেনাপতি দ্বারা এই গভর্নমেন্টের দৃঢ় সমর্থন।

একদা মিশরাধিপতি মহম্মদ আলী সিরিয়া বিজয় ক'রে এক আরব সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করতে চেয়েছিলেন। আর সে সময়, যখন মিশরের সেনাবাহিনী সিরিয়ার বুকে দাঁড়িয়ে, কিংলেক অবজ্ঞাভরে এক অতি সত্য ভাষণে বলেছিলেন, "সিরিয়ায় একান্তভাবে এশিয়াটিক সংঘর্ষের দিন উত্তীর্ণ হ'য়েছে।" এশিয়াটিক সংঘর্ষ বলতে তিনি বুঝেছিলেন মিশর ও তুর্কীর আধিপত্য নিয়ে বিরোধ। কিংলেক বলেছিলেন, "য়ুরোপ এখন এ সংঘর্ষে অংশীদার। যদিও মনে হ'তে পারে একপাল মিশরী সৈন্য সিরিয়া জয় ক'রে তার জমি আঁকড়ে ধরেছে শক্ত মুঠিতে, তবু প্রত্যেক কৃষকও আজ পরিষ্কার জানে যে, ভিয়েনায়, পিটারস্‌বার্গে বা লণ্ডনে চার পাঁচজন ফ্যাকাশে-মুখ মানুষ রয়েছেন ("four or five pale-looking men") যাঁরা এক টুকরো কাগজে এক কলমের আঁচড়ে মিশরী পাশার (অর্থাৎ মহম্মদ আলীর) তারকাকে আকাশচ্যুত করতে পারেন।"

সেদিন ও আজ, শতাব্দীর ব্যবধান। আরব মানস আজ জাগ্রত; স্বাধিকার সচেতন। সিরিয়ার বর্তমান বলিষ্ঠ জাতীয়তা-বাদকে কম্যুনিস্টপন্থী ব'লে গাল দেওয়া হয়ে থাকে। অথচ মন্ত্রিমণ্ডলে একজনও কম্যুনিস্ট নেই; পার্লামেন্টেও প্রায় তাই। কিন্তু সিরিয়া সমাজবাদে নতুনভাবে বিশ্বাসী হ'য়ে উঠছে, এবং নির্মাণকাজে রাশিয়া ও পূর্ব য়ুরোপীয় সাম্যবাদী দেশগুলির বিনা সর্তে সাহায্য গ্রহণ করছে। মিশরের উপর গত বছরের ইঙ্গ-ফরাসী হামলার সময় একমাত্র সিরিয়াই এসে দাঁড়িয়েছে দৃঢ়ভাবে মিশরের পাশে সৈন্যসাহায্যের প্রস্তুতি নিয়ে। পাশ্চাত্য তেলস্বার্থকে পঙ্গু ক'রে দিয়েও মিশরকে সে কম সাহায্য করেনি। সিরিয়াই পাশ্চাত্য শক্তিগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে দেখাতে সক্ষম হ'য়েছে যে, আরব-বিরোধিতার সঙ্গে সহ-অবস্থান ক'রে মধ্যপ্রাচ্যের তেলখনি থেকে সম্পদ আহরণ করা সম্ভব নয়।

বর্তমানকালে সিরিয়ার অন্যতম প্রধান প্রচেষ্টা হ'ল মিশরের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন করা। তাতে উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা বজায় থাকবে, কিন্তু কয়েকগুলি নির্ধারিত বিষয়ে যৌথ নির্দেশনা প্রচলিত হবে। যেমন প্রতিরক্ষা, কিছু কিছু নির্মাণ পরিকল্পনা, বৈদেশিক নীতি। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য হবে অবাধ। এই ফেডারেল পরিকল্পনা এখনো সম্পূর্ণ তৈরী হয় নি, কিন্তু গত বছরে সিরিয়ার পার্লামেন্টে সর্ব-সম্মতিক্রমে এজন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'য়েছে এবং একটি যৌথ কমিটিও তৈরী হ'য়েছে একে কার্যকরী করতে। মহম্মদ আলী বাহুবলে একদা যা করতে পারেন নি আজ হয়ত বন্ধুবলে তা সম্ভব হ'তে পারে, যদিও সম্ভাবনার পথে বাধাও আছে অনেক। সিরিয়ার প্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক। ১৯৩৪ থেকে সিরিয়ার মরুভূমিতে তেলের সন্ধান চলছে, এখনো তা ব্যর্থ। দেশের অন্যতম প্রধান আয় ইরাক-ভূমধ্য সাগর পাইপ লাইনের ২৬৭ মাইল, যা সিরিয়ার মাটি কেটে তৈরী। এ পাইপ লাইন হ'তে ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বাইশ কোটি ডলারেরও বেশি উপার্জন করেছে; কিন্তু ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সিরিয়াকে দিয়েছে মাত্র ছ' লক্ষ ডলার! অনেক দাবী-দাওয়ার পর ১৯৫২ সালের চুক্তিতে সিরিয়ার আয় বাৎসরিক ১০ লক্ষ ডলার নির্ধারিত হ'য়েছে। সৌদী আরব ও ইরাকে লভ্যাংশের আধাআধি যে ব্যবস্থা বর্তমানে চালু, সিরিয়াও বর্তমানে

**মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে লেখা কোন বইতে এই বিচিত্র ও বিস্ময়কর রাজনৈতিক অস্থিরতার তারিখ পরম্পরা বিবরণ চোখে পড়েনি। বর্তমান লেখক তা সংগ্রহ করেছেন। মন্ত্রীসভার পরিবর্তন; ১৯৪৮এ তিনবার—১৯শে আগস্ট, ২৩শে আগস্ট, ১লা ডিসেম্বর। ১৯৪৯এ তিনবার—মে মাসে, আগস্টে, ডিসেম্বরে। ১৯৫০এ একবার—মার্চে। ১৯৫১ সালে তিনবার—৯ই আগস্ট, ১০ই নভেম্বর, ৪ঠা ডিসেম্বর। ১৯৫২ সালে একবার—৯ই জুন। ১৯৫৪এ তিনবার—জুনে, ১৪ই অক্টোবর, ৩১শে অক্টোবর। ১৯৫৫ সালে দুইবার ঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী, ৬ই সেপ্টেম্বর।

।সেনাবাহিনীর অধিনায়করা পাঁচটি 'ক্যু দ' তা' অনুষ্ঠিত করেন ঃ ১৯৪৯ সালের ৩০শে মার্চ,

*১৪ই আগস্ট ও ১৯শে ডিসেম্বর; ১৯৫১ সালের ২৮শে নভেম্বর এবং ১৯৫৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী। নেতাদের নাম ঃ জেনারেল হুসনি জেইম, কর্নেল হিনোয়াই ও কর্নেল সিশাকলি।

তাই দাবী করছে, কিন্তু এখনো আদায় করতে পারেনি।*

মানচিত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যায় এই ২৬৭ মাইল পাইপ লাইনের গুরুত্ব কতো বড়ো। ইরাক থেকে ভূমধ্যসাগরে দ্বিতীয় পথে তেল পাঠাবার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। একমাত্র উপায় হচ্ছে জর্ডানের মধ্য দিয়ে পাইপ লাইন নিয়ে গিয়ে ইজরেইল অতিক্রম করে ভূমধ্যসাগরে পেঁছান। তাতে ব্যয়ও যেমন বেশি, তেমনি জর্ডানের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক চেহারাও যথেষ্ট স্থায়ীভাবে পশ্চিমী স্বার্থের অনুকূলে হওয়া প্রয়োজন। এ কারণেই এ প্রস্তাবে হাত দিতে তেল-পুঁজিবাদীরা ভয় পাচ্ছেন। আর এজন্যই সিরিয়ার বর্তমান জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী সতর্ক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে, তাকে পশ্চিমী স্বার্থের আওতায় আনবার বিরাট প্রচেষ্টা চলে আসছে।

এ প্রচেষ্টার প্রধান ঘাঁটি হল লিবানন। সুবিখ্যাত 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পল জনসন উক্ত পত্রিকার ৬ই জুলাই সংখ্যায় সুয়েজোত্তর মধ্যপ্রাচ্যে মহাশক্তিদের মধ্যে নতুন সংগ্রামের একটি তথ্যবহুল পরিচয় দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেনঃ "যদি মধ্যপ্রাচ্য তার নীতিকে সার্থক ক'রে তুলতে হয়, তবে আজ বা কাল আমেরিকাকে সিরিয়ার বর্তমান গবর্নমেণ্ট সরাতেই হবে। এ নিয়ে কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হ'য়ে গেছে। আমেরিকা এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে তার মিত্র লেবানন সরকারকে; বেরুটের গ্রীষ্মতপ্ত আবহাওয়ায় বেড়ে-ওঠা নতুন ফাসিস্টদের, যাদের সঙ্গে গোপন সংযোগ রয়েছে ডামাস্কাসের বিরোধী দিনগুলির। স্বাধীনতা পাবার পরে কয়েকবারই সৈন্য দলের হাতে সিরিয়ার রাজশক্তি লাঞ্ছিত হয়েছে; প্রয়োজন হ'লে আজও তাই করা হবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।......সিরিয়ার বর্তমান নীতিকেই আমেরিকা নষ্ট করতে চাইছে। একাজ এখন সহজতর, কেননা সিরিয়ার প্রায় চতুর্দিকেই এখন বিরোধী শক্তি। তুর্কী ও ইরাকের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ ক'রে দিয়ে সিরিয়ার দুইটি রপ্তানি-বাজার নষ্ট করা হ'য়েছে। ফ্রান্সের সঙ্গে বিরোধ বন্ধ করেছে আরো একটি রপ্তানি বাজার। দক্ষিণ ইতালিতে উদ্বৃত্ত গম চালান দিয়ে, বিকল্প বাজার থেকেও সিরিয়াকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সিরিয়ার মুদ্রার মূল্য শতকরা বিশ ভাগ কমে গেছে, এবং আরো কমছে। গম উৎপাদন অঞ্চলের প্রধান শহর

---

* Oil in the Middle East, by Longrigg, page 244; The Middle East, Oil and the Great Powers, by Benjamin Shwadran, page 414-16.

আলেপ্পো একটি বিরোধী শহর। ডামাস্কাসে ব্যবসায়ীরা গবর্নমেণ্টের উপর আর নির্ভর করতে চাইছে না......

"সৈন্যদলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসন্তোষের ইন্ধন জুগিয়ে আমেরিকা হয়ত বর্তমান গবর্নমেণ্টকে উৎখাত করতে পারে; কিন্তু সিরিয়ার জাতীয় আদর্শকে বদলাতে পারবে না। কিছুদিন পূর্বের উপনির্বাচন, যাতে সমাজবাদী বাম পার্টি জয়লাভ করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, বর্তমান সরকার জাতীয় আকাঙ্খা মোটামুটি পরিতৃপ্ত রেখেছেন। একে উৎখাত করে আমেরিকা শুধু গণতন্ত্রবাদের সীমানায় জাতীয়তা-বাদকে আটকে রাখার বর্তমান প্রচেষ্টাকে কঠিনতর ক'রে তুলবে।"

লেবাননে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হ'য়েছে। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন প্রধান সম্প্রদায়, বিশেষ ক'রে আরব ও খৃস্টানদের মধ্যে সমঝোতা ও আপোষই লেবাননকে রাজনৈতিক সুস্থিরতা দিতে পেরেছে। পল জনসন বলছেন যে, দু হাজার বছরের ধর্ম নিয়ে কলহের অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম-নেওয়া এই যে নরম পারস্পরিক আপোষ, তা আজ মার্কিন শক্তি ও আরব জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষে বিপন্ন হ'য়ে উঠেছে। লেবাননের সংবিধান পার্লামেণ্টে খৃস্টানদের দিয়েছে ৩৬টি আসন আর মুসলমানদের ৩০টি; অর্থাৎ ধ'রে নেওয়া হ'য়েছে যে, খৃষ্টানরা সংখ্যায় বেশি। পাছে এটা অপ্রমাণিত হয় সেই ভয়ে আজ পর্যন্ত লোক গণনা করা হয়নি। অর্থে, শিক্ষায়, রাজনৈতিক ক্ষমতায় খৃস্টানরাই প্রধান সমাজের সকল স্তরে। কিন্তু পল জনসনের মতে, "নাসেরের উত্থান, গত নভেম্বরের সুয়েজ সংকট এবং লেবাননের পার্লামেণ্ট দিয়ে হুট ক'রে আইসেনহাওয়ার নীতি অনুমোদন করিয়ে নেবার ফলে গ'ড়ে উঠেছে নতুন এক জাতীয় চেতনা, যার রূপ বিশেষ ক'রে মুসলিম, যার দৃষ্টি পূর্বদিকে (অর্থাৎ কাইরোর দিকে), যেমন খৃস্টানদের দৃষ্টি পশ্চিমে।" জনসন নতুন একদল খৃস্টান নেতাদের পরিচয় পেয়েছেন, যারা স্রেফ আমেরিকার সাহায্য নিয়ে মুসলমান আরবদের দাবিয়ে রাখতে চায় এবং এজন্য বড়ো রকমের কাটাকাটি মারামারির জন্যেও প্রস্তুত। গত নির্বাচনে সরাসরি হস্তক্ষেপ ক'রে আমেরিকা তার মিত্র দলকে জয়ী করেছে, যেমন সে করেছিল ইতালিতে ১৯৪৮ সালে। কিন্তু বিরাট এক সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধের বীজ আজ যে বপন করছে লেবাননে। লেবাননে বিরোধী দলের নেতা সাহেব সালাম পল জনসনকে বলেছেন, "লেবাননের কাজ হ'ল মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমের জন্য একটি জানালা খুলে রাখা। কিন্তু জানলাই! পশ্চিমের সামরিক বা রাজনৈতিক ঘাঁটি নয়।" সব দেখেশুনে পল জনসনের বিশ্বাস জন্মেছে যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে রেষারেষি বেড়েই চলবে, এবং তাই যদি হয়, তবে "আমেরিকা দেখতে পাবে যে, সে তার মধ্যপ্রাচ্য শাসন শুরু করছে এমন একটি ঘাঁটি থেকে, যার সঙ্গে তুলনায় সাইপ্রাস হচ্ছে ভার্জিনিয়া স্টেটের নরফক শহরের মতই শান্তিপূর্ণ!"*

(ক্রমশ)

*এই পরিচ্ছেদটি লেখার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সিরিয়াতে "মার্কিন ষড়যন্ত্রের" ও নতুন সংকটের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'য়েছে। সিরিয়াতে সাম্যবাদী প্রভাব কতখানি তা এই প্রবন্ধের শেষের দিকে আলোচিত হবে। প্রথম মার্কিন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'লেও সিরিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা গুরুতর। তবে আপাতত জর্ডন-নাইকের পুনরাবৃত্তি হল না বলেই ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।

বর্ণ · নিশীথ দে *

রোজই পাঁচটার পর অফিস থেকে বেরিয়ে হাতঘড়িটা মিলিয়ে নেয় তপন। তারপর চৌমাথা পেরিয়ে রেস্টুরেণ্টের দিকে পা বাড়ায়। শুধু এক পেয়ালা চায়ের টানেই এই পথটা হেঁটে আসে ও। সুবিধেও হয় খানিকটা। ভিড় ঠেলে ট্রামে ওঠা থেকে বাঁচে। তাছাড়া অফিসের পরই ছুটি হয় না। গ্রে স্ট্রীটের টিউশনি সেরে, তারপর। মাঝে মাঝে ক্লান্ত শরীর নিয়ে বকবক করে বকতেও বিরক্তি এসে যায়। নেহাৎই মাস গেলে কুড়িটা টাকা। কম কি এ-বাজারে, তাই পরিশ্রমের ক্লান্তিকে একটু থমকে দেয়, নাম করা রেস্টুরেণ্টের এক পেয়ালা চায়ে।

চেয়ারটায় বসতে গিয়ে ভাবে, এ ওর অন্যায়, শুধু এক কাপ চায়ের জন্যে এত বড় মজলিসে ভিড় করা। তারপর যখন এই রেস্টুরেণ্টের বয়টা এসে দাঁড়ায়, আর রোজকার মত বোঝাবার চেষ্টা করে—

'একটা চিংড়ির কাটলেট দি বাবু!'

'না, না, শুধু চা দাও। আর কিছু চাই না'। ওর মিষ্টি করে বলার ভঙ্গিটা ভাল লাগলেও জোর করে থামিয়ে দিতে হয় তপনকে। আর ছেলেটাও রেহাই দিতে চায় না। আরও ঝুঁকে পড়ে। আবার বলে, 'ফাউলটা আজ খুব ভাল হয়েছে, খেয়ে দেখুন বাবু।'

এর পর সজোরে বাধা দিতে গিয়েও পারে না তপন।

মৃদু হেসে বোঝাবার চেষ্টা করে— 'আজ থাক, অন্যদিন খাব তোমার ফাউল, আজ শুধু চা দাও।'

একটু পর যখন এক কাপ চা ওর সামনে রেখে সরে যায় ছেলেটা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে ও। একটু চুমুক দিয়ে যেন ক্লান্ত দেহে তৃপ্তির স্বাদ অনুভব করতে পারে তপন। আড়চোখে তাকায় আশপাশের মানুষগুলোর দিকে। কান পেতে শোনে মুখোমুখি আলাপের মৃদু গুঞ্জন। এও যেন আর এক নেশা তপনের।

সেদিনই হঠাৎ চোখদুটো জ্বল জ্বল করে উঠল ওর। এমনি মুখোমুখি দু জোড়া চোখের মৃদু ওঠা-পড়া লক্ষ্য করতে গিয়ে এক মুহূর্তে কেমন যেন অভাবনীয় মনে হল তপনের। সেই একজোড়া ঠোঁট, আর বাঁ-দিকের ঠোঁটের নিচে একটা মিটমিটে তিল। যেন খুব কাছাকাছি মনে হয় ওর। একবার ভাবল একটু এগিয়ে যায়। আবার কেমন একটা সঙ্কোচ......। রমলা কি চিনতে পারবে, হয়ত বা ভুল করে বসবে। না, না, সে আরও বিশ্রী। তার ওপর সঙ্গে ওর স্বামী।

ভদ্রলোক যেন এই মাত্র ওঁর স্ত্রীর কাছে পরাজিত হয়েছেন, এমনি অনুনয় বিনয় করে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন কি একটা। টুকরো টুকরো হয়ে কানে ভেসে এল, 'লক্ষ্মীটি এমাসে আর খরচ বাড়িয়ো না। দেখছতো চারশ পঁচিশের আর মাত্র একশ বাইশ বাকি।'

আরও উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল তপন।

—'তা' হলে বেবীর সুটটাও ফেরত দিলেই পারতে, তোমার টাকাগুলো বেঁচে যেত।'

চিনতে আর একটুও ভুল হয় না ওর। ঘাটশিলার সেই ছোট্ট কুঠুরিটার বারান্দায় যেন ওরা মুখোমুখি বসে আছে। রমলা আর তপন। সেদিনের বাংলা অনার্সের ছাত্র তপন, আর রিটায়ার্ড একাউণ্টাণ্ট রণেন রায়ের মেয়ে রমলা। ওদের মাঝখানে বসে রণেন রায়। প্রথম প্রথম তফাতটুকু প্রায় চোখেই পড়ত না। নীরবতা ভেঙে দিতেন রণেন রায় নিজেই।

'তুমি যদি ইংরিজী অনার্স নিতে তপন। তাহলে ফরেন এডুকেশন পাবার একটা স্কোপ ছিল। বাংলায় অনার্স নিয়ে......না, না ওতে কোন......'

'কিন্তু' কি যেন বলতে যাচ্ছিল তপন।

—'না, না, এখন ওসব মনসা মঙ্গল, জয়দেব নিয়ে রিসার্চ করে বড়জোর একটা প্রফেসারি পাবে ,কিন্তু কোন প্রসপেক্ট নেই। একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—

'এদেশে জানবার, বোঝবার মত স্কোপ পাবে কোথায় তুমি? যাও বিলেতে, সত্যিকারের এডুকেশন আছে সেদেশে। এডুকেশনের জন্যে চিন্তা আছে সেখানে। আর এখানে? সংসারই চলে না তার এডুকেশনের জন্যে মোটা মোটা বই-এর টাকা জোটাবে কোত্থেকে? হ্যাঁ, তবে দেখ যে কজন অক্সফোর্ড কিংবা......'

হঠাৎ প্রায় বাধা দিয়ে বলে উঠলো তপন। "আমি সেই কথাইতো বলতে যাচ্ছিলাম, বিলেত গিয়ে এডুকেশন। সেকথা ভাবাও তো একটা ডিফিকাল্ট ব্যাপার।"

"কেন, কেন ডিফিকাল্ট ব্যাপার কেন?" যেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেরা করলেন রণেন রায়।

'আমাদের অভিভাবকদের ক্ষমতা আছে সে রকম যে, ছেলেকে বিলেতে পাঠাতে পারে।'

এটা একটা প্রব্লেম্ বটে- যেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ঠিক এমনি সময় রমলাও যেন হাঁপিয়ে উঠত এদের আলোচনায়, ছোট্ট মেয়ের মত আদুরে সুরে বলে উঠত 'বাব্বা, ও প্রব্লেম্ আজ থাক কালকে সল্‌ভ্ করো, এখন বেড়াতে যেতে হবে না?'

—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ বেড়াতেতো যেতেই হবে, কিন্তু আমিতো আজকে আর তোমাদের সঙ্গে যেতে পারছি না।'

—কেন, চলুন না। আজ মাইন-এর দিকে যাওয়া হবে।

—আমি এই লেখাটা শেষ করে নি। বেশ লাগছে আর্টিকেলটা।

বাকিটুকু শেষ হবার আগেই তপনের একটা হাত ধরে টানতে থাকে রমলা। দু-জনে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পোঁছয় পাহাড়ের ধারে। আনন্দ-উচ্ছলে একটা ঘাস বিছানো উঁচু জায়গায় গা এলিয়ে দেয় রমলা। একটু যেন অস্বস্তি বোধ করে তপন। মাত্র অল্প ক'দিনের পরিচয় ওদের। কেমন করে এই দূরত্বটুকু কমিয়ে আনবে ও। তবুও, রমলার নরম হাতটার স্পর্শ যেন ওকে আকর্ষণ করে রাখে। এই ওর যৌবনের প্রথম প্রহর। মনে তখন ছড়িয়ে পড়ছে রঙিন স্বপ্নের রেশ। রমলার সরু সরু রক্তাভ আঙুলগুলো জড়িয়ে পড়ছে ওর আঙুলগুলোয়। বালুচরের ওপর সূর্যের রোশনাই লেগেছে তখন।

রমলার দিকে চোখ তুলে তাকায় তপন। হরিণীর মত টানা টানা চোখ একরাশ পশমের মত কালো চুল। আর তারই মাঝখানে একটা খুব সরু সিঁথি। লজ্জায় চোখের পাতা পড়ত তপনের, যখন রমলার ঠোঁট দুটো কেমন ভিজে ভিজে মনে হতো।

ওর বুকের মাঝখানে মাথাটা রেখে সেই প্রথম আবেদন রমলার। কল্পনার ঢেউ যেন আছড়ে পড়ছে ওর বুকের ওপর।

'আমি তোমার সঙ্গে কোলকাতায় চলে যাব।'

—সে কি- তোমার বাবা এখানে একা! আড়ষ্টতা কাটিয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করেছে তপন।

'তাছাড়া উনি অসুস্থ মানুষ, তুমি না থাকলে......'

'কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, বাবার। তুমি চল। শুধু তুমি আর আমি আর কেউ না। কেউ থাকবে না আমাদের মাঝখানে'—যেন সাজানো স্রোতের ঢেউএর মতো শোনাল রমলার কথাগুলো।

'না, না, তা হয় না রমলা। সেখানেও তো আমি একলা। কোথায় থাকবে তুমি?'

—যেখানে তুমি থাকবে। খুব সহজ সরল একটা জবাবের রেশ টেনেছে রমলা। তারপর আর কোন জবাব দিতে পারেনি তপন। নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে দূরের ঝরনার দিকে।

রমলার চোখে লাগত তখন উচ্ছল আনন্দ ভরা রঙিন নেশা। আর দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত
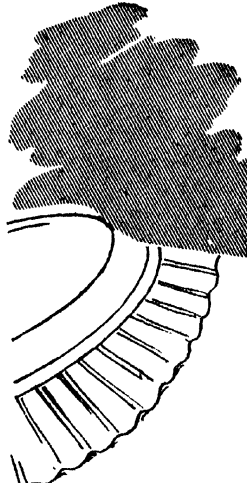
মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত তপনের। স্রোতের মাঝখানে যখন এক টুকরো নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়ত আর মিলিয়ে যেত স্রোতের মধ্যে, চোখ দুটো দপদপ করে উঠত তপনের।

কৈশোর পার হবার শেষ মুহূর্তে মা-বাবা হারিয়ে গেছে, ওর জীবন থেকে। জোর করে যেন মনের মাঝখানে টেনে আনতে চাইল সেই পুরোনো স্মৃতির কণাগুলোকে।

মামার স্নেহের ছায়ায় ইস্কুল পার হয়ে কলেজে ঢুকতে, মামাও কোলকাতা থেকে চাকরিতে বদলী হয়ে দূরে চলে গেলেন। আর তখন বাধ্য হয়েই কলেজ হোস্টেলে আশ্রয় নিতে হয়েছিলো। আই. এস-সি পড়তে পড়তেই দুটো টিউসানি জুটিয়ে, আর মামার পাঠানো পঞ্চাশ টাকায় বাঁধা পড়লো না আর ওর পড়াশুনায়। এত দূরে থেকেও মামার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি ও। মাঝে মাঝে ভাবে, নিঃসন্তান মামার দুর্বলতার যেন সুযোগ নিয়েছে তপন। শুধু অর্থ নয়। স্নেহ, ভালবাসা সবই নিয়েছে। তারপর। আই. এস-সি পাশ করে কলেজ হোস্টেল ছেড়ে এসে উঠল একটা মেস বাড়িতে। অনার্স নিয়ে বি এ পড়া শুরু করবার আগেই আরও নতুন টিউশানিও মিলল। আয়টাও প্রসারিত হলো আরও। প্রয়োজন আর নাই তপনের। কোন পরিধিও রইল না, ওর সারাদিনের চলাফেরা, মেলামেশায়। কলেজ ছুটিতে কখনও গিয়েছে পুরী, কটক কিংবা এমনি কাছাকাছি কোথাও। এবার তাই এসেছিল ঘাটশিলায়। পাহাড়ের দেশে। কিন্তু এমন হঠাৎ স্টেশনেই দেখা হবে রণেন রায়ের সঙ্গে, ভাবতে পারেনি তপন। আর শুধু দেখা নয়, আলাপও।

এত কাছাকাছি। সোজা গিয়ে উঠতে হোল রণেন রায়ের কুঠুরিতে। কয়েক দিনের মধ্যে গড়ে উঠল একটা প্রীতির সম্পর্ক। রণেন রায়ের সময় কাটতে লাগল, তপনের সঙ্গে আলোচনায়। কথায় কথায় প্রকাশ করলেন তাঁর নিজের জীবনকে।

'বার্নএ যখন ঢুকি, তখন আমি একটা সাধারণ কেরানী। বুঝলে তপন, তারপর। বিয়ের পরই কেমন করে যেন আমার ভাগ্যে ফুল ফুটতে লাগল। প্রমোশনের পর প্রমোশন। একবারে একাউণ্টান্ট। বলতে বলতে অনেকক্ষণ নীরবেই কাটালেন। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলতে লাগলেন 'রমলার মা লাবণ্য আমাকে ছেড়ে চলে গেল।'

তপন লক্ষ্য করছিল, চেয়ারের হাতল দুটোর ওপর হাত রেখে কেমন যেন ঝুঁকে পড়লেন রণেন রায়। একটা গভীর অনুভূতিতে।

মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল তপন—কি হয়েছিল তাঁর?

—এ্যাকসিডেণ্ট! গলার স্বরটা আরও ভারি শোনাল রণেন রায়ের। সে আমি ভুলতে পারব না কোনদিন। একটা সামান্য ভুল, আমারই ভুল। একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন। 'এই বছর দুই আগের কথা। আমিও তো রমলার বাবা! তাই খেয়ালখুশীমত চলাফেরা, বিলাসিতাকে বরদাস্ত করতে পারিনি। ওর মা লাবণ্য প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিল একটা ইডিয়টিক ইডিওলজিকে। মেয়েকে সাজপোশাক, আচার-ব্যবহার, বিলাসিতায় করে তুলতে চেয়েছিল একটা সাজানো পুতুল। শুধু রমলার জন্যেই মাসে খরচ দু'শ টাকা। চোখের সামনে যেন একটা চাবুক পড়ল তপনের।

'না, না, তাতেও আমি আপত্তি করিনি। কিন্তু, বেশ জোর দিয়েই বলতে লাগলেন রণেন রায়। 'যখন দেখলাম একমাত্র মেয়ের দোহাই দিয়ে দিনের পর দিন শুধু টাকা-টাকা আর টাকা। বাবা-মা'র সঙ্গে মেয়ের সম্পর্কটাও শুধু টাকায় বিকি হতে লাগল। শুধু স্কার্ট-জ্যাকেট, রুজ-লিপস্টিক আর পার্টি। মাসে প্রায় কুড়ি দিনই পার্টি। আর কতকগুলো ইডিয়ট....' হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন—"থাক সে কথা, আমি সেদিন এসব নোংরামি সহ্য করতে পারিনি।" একটু থেমে তপনের দিকে তাকালেন—"তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে তপন, শুধু রমলার বিলাসিতাকে বাঁচিয়ে রাখতে আমি আজ নিঃসম্বল হতে চলেছি। ব্যাঙ্কে আমার আর সম্বল মাত্র বার হাজার টাকা আর এই আশ্রয়টুকু। যাই হোক, যে প্রতিবাদ সহ্য করতে না পেরে ওর মা সুইসাইড করেছে, আমি সে অভাব কোনদিনই বুঝতে দেব না ওকে। ও যা চায়। ওর জন্যেই এই সব ব্যবস্থা। খেয়ালী মেয়ে আমার, তাই হিসেবের খাতায় প্রায় নজরই পড়ে না।" —শেষটুকু যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন রণেন রায়। তারপর ক্লান্ত হয়ে গা এলিয়ে দিলেন ইজিচেয়ারে।"

তপন শুধু বিস্ময়ে তাকিয়েছিল রণেন রায়ের দুটো কোঁচকান চোখের দিকে। যেন একটা নির্মম হতাশায় নুইয়ে পড়ছে তাঁর দৃষ্টি। অলস হয়ে আসছে সমস্ত দেহ-মন। তারপর যখন দু-জনেই চুপচাপ, হঠাৎ এসে পড়ল রমলা। চোখে-মুখে কৌতূহল। সত্যিই যেন কোন অভাবই ওকে স্পর্শ করতে পারে না, রমলার মত মেয়েকে। খুশিতে উচ্ছল। তেমনিভাবে ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে অভিমানের অভিনয়ে বাবার চুলগুলোর মধ্যে দু হাতের সরু সরু সারস পাখির ঠোঁটের মত আঙুলগুলোকে লুকিয়ে রেখে পুরানো আবদারের সুর তুলত—

—'বাব্‌বা'

—"কি বলছ মা-মণি"—হাত বাড়িয়ে দিলেন রণেন রায়। "দেখেছ তপন, মা-মণি আমার

এখনও ঠিক সে রকম ছোট্টটি আছে। একটুও বদলায়নি"—তপন কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। জবাব দিত রমলা—ও আমাদের গেস্ট বাবা, ওর অনারে তুমি একদিন একটা পার্টিও দিলে না। আড়চোখে তপনের দিকেও তাকাল রমলা। রণেন রায়ও হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—"ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সে' ত বটেই আমার মনে ছিল না।" তপনও যেন একটু অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়েছিল। আমতা আমতা করে বলল—"আমার জন্যে পার্টি কি হবে? না, না, এই তো বেশ আনন্দে কাটছে।" রমলা ওকে থামিয়ে দিয়েছে। "আমি কি সে বিষয়ে তোমার কাছে কোন সাজেসসান চেয়েছি?" রণেন রায় নিজেও কোন সাজেসসান দিতে পারেননি। রমলাই সেই পার্টির ব্যবস্থা করেছিল। এরপর কি করে যাবে তপন। শুধু ভাবছিল কি করে পাশাপাশি আসতে পারে রমলার সঙ্গে। খেয়ালী মেয়ে আমার, তাই হিসেবের খাতায় নজরই পড়ে না রণেন রায়ের হতাশার সুর—। তপনের বুকে অগুণতি ঢেউএর আছাড়। হিসেব ত তপনকে রাখতেই হবে। বড়জোর মাস গেলে একশ কি সওয়া শ টাকা। কি করে মেটাবে রমলার মত মেয়ের খেয়াল-খুশীর হিসাব?

হঠাৎ চমক ভাঙল ওর, রমলার ইশারায়। 'দেখ, দেখ, কি নাইস পাখিগুলো, কেমন দল বেঁধে উড়ে যাচ্ছে, না।' সৌন্দর্যের ছায়ায় মুগ্ধ হয় রমলা। আর নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে তপন, রমলার দিকে। রমলা ওর বুকের মাঝখানটায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'কি ভাবছ! ম্যারেজ লাইফটা কি সুন্দর হবে, না।'

তপন শুধু ওর দিকে চেয়ে মৃদু হাসল।

রমলা তখন ওর বুকের ওপর মাথাটা রেখে উৎসুক হয়ে বলে, "কেউ থাকবে না। শুধু তুমি আর আমি......। পার্ক স্ট্রীটের বাড়িগুলো কিন্তু আমার ভারী পছন্দ হয়।" হঠাৎ মাথাটা তুলে তপনের দিকে তাকিয়ে বলে, "জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, যদি ওখানে হয়; তো বেশ হয় না?"

এর পর রমলা আর প্রশ্নোত্তরের সময় দেয় না তপনকে। নিজের আবেগেই বলে চলে ও "আমাদের বিয়ের পর কিন্তু কোলকাতার বন্ধুদের নিয়ে একটা বেশ বড় পার্টি দিতে হবে। মার্কেটটা আমার সাজেসসান-এ হওয়া চাই, কিন্তু আর হ্যাঁ তোমার জন্যে একটা সুট আর আমার প্রিমরোজ অর্গাণ্ডির...... ও কি তুমি কথা বলছ না যে......" আবেগের মাঝে যেন ভাটা পড়ল।

"না, কি বলব। শুনছি ত তোমার কথা" কোন রকমে যেন সাজিয়ে রাখার মত কথাগুলো বলল তপন।

"বাঃ তা কি হয়! শুধু আমার পছন্দ হলেই তো আর তোমার পছন্দ হয় না। তোমারও তো একটা ফ্যানসি আছে।"

"তোমার পছন্দ হলেই আমার পছন্দ।"

তপনের কথাগুলো সেদিন খুব হৃদয়স্পর্শী হয়েছিল রমলার। কিন্তু তারপর আর একটি সন্ধ্যাও আসেনি তপনের জীবনে, রমলার পাশে। বাড়ি ফিরে সমস্ত মন হতাশায় নুইয়ে পড়েছিলো, কি চেয়েছিলো আর কি পেল। চেয়েছিলো একটা সামান্য মেয়ে। যার থাকবে না কোন আড়ম্বর, অসহায়তা। দু জনে গড়ে তুলবে একটা ছোট্ট নীড়। সুখ-দুঃখের কাহিনীতে ভরে থাকবে দু জনের প্রতিটি মুহূর্ত। কিন্তু রমলা! এমন আকাশছোঁয়া স্বপ্ন যার চোখে। কি করে তাকে কাছাকাছি রাখবে? কতটুকু আনন্দ পাবে ওকে বিয়ে করে? যেন অতি সন্তর্পণে একটা ঠুনকো পুতুলকেই বয়ে বেড়ানো। তা ছাড়া আর কিছু নয়। তপন জানত রণেন রায়েরও কোন আপত্তি থাকবে না, থাকতে পারে না। মেয়েকে তিনি এখন দূরে দূরেই রাখতে চান। তাই তপন সেদিন রাত শেষ হবার আগেই ওদের সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেল। কেউ জানল না। রণেন রায়ও না। রমলাও না। সেদিন রাত্রে একটুকরো চিরকুট ওদের টেবিলের ওপর রেখে, অতি সন্তর্পণে নিজেকে লুকিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। প্রায় ফেরারী আসামীর মত। কোলকাতার মেসে ফিরতেও সাহসে কুলোয়নি। ভয় আর ভাবনা তখন ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। হয়ত বা রমলা ওর খোঁজ করবে। কিংবা রণেন রায় নিজেই। মেয়েকে দূরে দূরে রাখার অজুহাতে। তাই তখনকার মত কিছু ঠিক করতে না পেরে, মামার কোয়ার্টারে গিয়েই দাঁড়াল তপন।

মামীমা একটু ভীত হয়েছিলেন, ওর দিকে তাকিয়ে।

"হঠাৎ কি খবর তপন? চিঠিপত্তরও কিছু দাওনি—"

"আগে থেকে কিছু ঠিক করতে পারিনি, তাই চিঠি দেবার সময়ও পাইনি।"

কোন রকমে থেমে থেমে জবাব দিয়ে দুর্বলতাটুকু ঢাকতে চেষ্টা করল ও।

"মামাবাবু কোথায়?"

"অফিসে ত এখন"—ওর দিকে তাকালেন মামীমা। "বেরিয়েছ কখন? খাওয়া হয়নি ত। এতটা রাস্তা......"

একটা মৌন সম্মতি জানাল তপন। তার পর জামা-কাপড়টা মামীমার হাতে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল ও।

এতক্ষণে যেন ভয়টা একটু হালকা হলো। একটু পর মামীমা চায়ের কাপটা ওর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন—কলেজ ছুটিতে এলে না কেন? তোমার মামা বলছিল একবছর দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে।

'সামনে পরীক্ষা তাই আর......' থেমে থেমে জবাব দিতে লাগল তপন। হ্যাঁ, তোমার মামা তোমাকে চিঠি লিখেছিল পেয়েছিলে?

একটু যেন বিস্মিত হোল তপন, মামীমার প্রশ্নে।

কোন জবাব না পেয়ে মামীমা বলতে লাগলেন আবার, 'এই দু মাসে কত কাণ্ড হয়ে গেল......'

'কি হয়ে গেল?' উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করল তপন। আর মামীমাও যেন ভরসা পেলেন একটু।

'হঠাৎ......ক্যাশ শর্ট দু এক টাকা নয়, একবারে দু হাজার'। তারপর আরও এগিয়ে এল তপন। 'কোন হদিসও মিলল না। হেড অফিস থেকে তোমার মামাকেই অর্ডার দিয়েছে ঐ টাকা বুঝিয়ে দিতে হবে। এতগুলো টাকা কি যে হবে......'

'মামাবাবুকেই দিতে হবে তাহলে? কিন্তু দেবেন কি করে?'

—সেই ত ভাবনা। চাকরিটাই যাচ্ছিল, অনেকে ধরাধরি করে শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, মাইনে থেকে মাসে মাসে কেটে নেবে।

সব শোনার পর তপন যেন স্থির হয়ে বসে রইল। রাত্রে খেতে বসে মামাবাবু হতাশার সুরে প্রশ্ন করলেন—সব শুনিছিস্ তপন।

কোন জবাব দিল না ও। মৌন সম্মতি জানাল শুধু।

'তোর জন্যেই আরও ভাবনা। সামনে পরীক্ষা। কলেজে তিন মাসের মাইনে বাকী।' যেন একটু সহানুভূতি চাইছিলেন মামাবাবু। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ বলে উঠল তপন—আমি পরীক্ষা দেব না ভাবছি।

—সে কি?—একটু যেন বিস্মিত হলেন প্রথমটা। তারপর নিজেই বলতে লাগলেন—মাত্র তিন মাস বাকী, পরীক্ষা না দিয়ে করবিই বা কি।

'আমি ঠিক করেছি আপাতত একটা চাকরি করব, পরে পড়াশুনা করব। একটু থেমে মামাবাবুর দিকে তাকাল ও। আপনি যা বলেন......' অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন সায় দিতে হোল তাঁকে। বললেন—বেশ তাই কর এখন। এছাড়া আমিই বা এখন কি করতে বলব।

সেদিন আর কোন কথা তোলেনি তপন।

তারপর দিন বাইরে বেরুনোর সময় কানে এল মামীমার গলার স্বর—কি যেন একটা সম্মতি দিতে গিয়ে বোঝাতে চাইছিলেন মামাবাবুকে।

কোলকাতার শহর। একা থাকবে—হোটেলে খাবে, মেসে.........না, না সে ঠিক হবে না তার চেয়ে বরং......হঠাৎ মামীমাকে থামিয়ে দিলেন মামাবাবু। গলার স্বরটা আরও অস্পষ্ট হয়ে এল ওদের। আগ্রহ নিয়ে অনেকক্ষণ কান পেতে রইল ও। তবুও শুনতে পেল না কিছুই।

আসবার আগের দিন মামাবাবু দু টুকরো চিরকুট ওর হাতে দিয়ে বললেন—

এ'র কাছে গেলে আপাতত একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারবে, আর এই চিঠিখানা নিয়ে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবি। আমি সব লিখে দিয়েছি। খুব ভাল লোক।

একবার শুধু তাকাল তপন ওঁর দিকে।

তারপর কোলকাতায় এসে চাকরি মিলেছে খুব তাড়াতাড়ি। যা আশা করতে পারেনি তপন। কিন্তু বিভূতিবাবুর বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে মনটা যেন ক্রমশই ভারি হয়ে উঠতে লাগল। একটা ভয় আর ভাবনা। শেষ পর্যন্ত মামাবাবুকে জানাতে হলো বিভূতিবাবুর ইঙ্গিতপূর্ণ প্রস্তাবের কথা। কিন্তু না, একটু ভুলই হয়েছিল। তপনের নিজেরই। সেদিন মামীমার চাপা কণ্ঠস্বরেও এমনি একটা অস্পষ্ট আভাস ছিল। লক্ষ্য করতে পারেনি তপন। আজ স্পষ্ট হয়ে উঠল। মামাবাবুর চিঠিখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেলাতে লাগল অনেকবার। এতটুকু অমিল নেই আর। মামাবাবুর স্পষ্ট হস্তাক্ষর।

তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আমরা মত দিয়েছি বিভূতিবাবুকে। আমাদের বিশ্বাস এ তোমার পক্ষে ভাল ছাড়া......

সারা রাত নিস্তব্ধ ঘরটায় অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে তপন। কিন্তু সম্মতি না দিয়েও পারেনি সেদিন। হয়ত বা মামাবাবুর অবাধ্য হতে পারবে না বলেই। ফুলশয্যার রাত্রেও সেই পুরোনো দুর্বলতাকে চাপা দিতে না পেরে, এড়িয়ে গেছে ইভাকে। কোথায় যেন একটা বাধা কিংবা নিঃস্বম্বলতাকে লক্ষ্য করছে তপন।

তারপর কতবার ভেসে উঠেছে রমলার সেই আবছা স্মৃতি। হরিণীর মত টানা টানা চোখ। সরু সরু আঙুলের সারি।

পিঠের ওপর ছড়ানো একরাশ পশমের মত কালো চুল। সব চাইতে চোখে পড়ল আজ, —বাঁ দিকে ঠোঁটের নিচে মিট্‌মিটে তিলটা। একটু আশ্চর্য হোল। এতটুকু পরিবর্তন হয়নি রমলার। লাল, আভায় ভরা গাল দুটো। আর দেহেও প্রলেপ পড়েনি।

হঠাৎ চমকে উঠেছিল। ছেলেটা সামনে এসে দাঁড়াতেই, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল ও। ইস্ আর মাত্র পনের মিনিট বাকী ছ'টা বাজতে। টিউশনি সেরে হাতীবাগানের বাজারটাও ঘুরে যেতে হবে। রাস্তায় নেমে পড়ে ও। ট্রামের কোণায় একটু জায়গা করে নিয়ে বসে। অফিস বেরুনোর সময় কতবার করে বলে দিয়েছে ইভা। তিন গজ জামার ছিট্। বাজারের ফর্দটা মিলিয়ে দু একটা আনাজপাতিও নিতে হবে। কাল সকালেই আবার অফিস। বাজার করার সময় ও পায় না তখন। রোজই আশপাশের ফ্ল্যাটের ছেলেদের ধরে বাজার করাতে হয় ইভাকে। কিন্তু মন ওঠে না হিসাব দেখে। বেশ দর যাচাই করে বাজার করতে হবে, আর পাই পয়সাটি বুঝিয়ে দিতে হবে ইভাকে। মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগত এরকম ফর্দ মিলিয়ে দর যাচাই করে বাজার করতে। কিন্তু ইভাও রেহাই দেয়নি ওকে। বেশ ভারিক্কি সুরে বোঝাতে চেয়েছে ও।

এই একটু দেখে শুনে জিনিস কিনলে তো আর পয়সাগুলো আজে বাজে যায় না। না কি। হাতে পেলে, আর মাসের কুড়ি তারিখ না পেরুতেই সব ফেলে ছড়িয়ে খরচ করে আসবে? একটু থেমে গলার স্বরটা আরও স্তিমিত করে আনে। তারপর আনাজ বাছতে বাছতে বলে—এখন না হয় আমরা দুজন তাই, কিন্তু......

—কিন্তু কি? উদ্‌গ্রীব হয়ে কাছে এগিয়ে এসে নিচু গলায় প্রশ্ন করল তপন। লজ্জায় ইভার সমস্ত মুখখানা যেন লাল হয়ে উঠল। কোন রকমে যেন জবাবের রেশ টানল ও। 'জানি না যাও।'

ইভার দিকে তাকিয়ে তপন স্থির থাকতে পারেনি। ওকে দু-হাতে কাছে টেনে নিয়ে চিবুকটা তুলে ধরতেই একটা অদ্ভুত আনন্দের নেশায় যেন ওকে আচ্ছন্ন করে তুলল।

বিয়ের এই একটা বছরে, এই দীর্ঘ দিন-গুলোর মাঝে একটা দিনও বোধ হয় ওকে এত অভিমানিনী মনে হয়নি। এ তপনের অবহেলাও নয়। স্মৃতির আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত চোখ দুটোর দৃষ্টি শক্তিই শুধু কমে গিয়েছিল। মামাবাবুর পছন্দের ওপরই, একটা সাধারণ কেরানীর মেয়েকে স্ত্রী বলে স্বীকার করতে হয়েছিল। নিতান্তই একটা সাধারণ মেয়ে ইভা। এর বেশী কিছু মনে হয়নি ওর। এর বেশী কিছু মনে করবার মত কোন আকর্ষণও ছিল না ইভার দেহে। নেহাতই একশ কুড়ি টাকা মাইনের কেরানী তপন চৌধুরীর স্ত্রী জেনেই খুশী ইভা।

রোজই পাশে নিঃসাড়ে ঘুমন্ত স্বামীকে ফেলে রেখে ভোরের পাখী ডাকার সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। উনানে আঁচ ধরিয়ে আর পাঁচটা ভাড়াটে বৌ-এদের মতো কাপড় কাচা, গা ধোয়া তারপর ভিজে কাপড়ে কলসী-বালতি নিয়ে কলে দাঁড়িয়ে জল ভরে নিয়েছে। তারপর পাখার বাতাস দিয়ে উনানে আঁচ উঠিয়ে চায়ের ছোট্ট কেট্‌লিটা চাপিয়ে দিয়ে কাপড় ছাড়তে ঘরে ঢুকেছে। তখনও সাড়া পায়নি তপনের। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অনেক-ক্ষণ তাকিয়েছে ঘুমন্ত স্বামীর দিকে। ডাকতেও মন চাইতো না। থাক্, ঘুম ভাংগলেই আবার অফিসের তাড়া। কি খাটুনি! সেই সকাল ন'টা থেকে একটানা রাত সাড়ে সাতটা অবধি

ক্লান্ত শরীরের ক্লেদটুকু ইভাও বোঝে। তাই ও রোজই চায়ের কাপের সঙ্গে একটু সুজির হালুয়া ছোট্ট টেবিলের ওপর রাখে। তারপর এমনি টুকটাক দু-একটা হালকা আলাপ। বাজারের ফর্দ, ঘুঁটে-কয়লার হিসেব কিংবা লন্ড্রীর বিল। তার বেশী যেদিন, সেদিন হয়ত প্রশ্ন করেছে তপন ওর বাপের বাড়ির চিঠির বিবরণী জানতে। কিংবা ইভার নিজের প্রয়োজনের কথা নিয়ে। এর বেশী নয়।

ইভার দিকে তাকিয়ে অনেকদিনই মনে হয়েছে, ও যেন কিছু বলতে চেয়েছিল ওকে। হয়ত বা মনের দ্বন্দ্ব ওকে বাধা দিয়েছে। কিংবা তপনের আগ্রহ না দেখতে পেয়ে। তাই বলা হয়নি ইভার। সেদিন খেতে বসে লক্ষ্য করল, বাটিটা এগিয়ে দিলো ইভা।

—হঠাৎ পায়েস কেন?—একটু বিস্ময় প্রকাশ করল তপন। আর ইভাও যেন দমে গিয়েছিলো, তাই থেমে থেমে জবাব দিতে লাগলও—এটা তোমার জন্মমাস, তিথিটা তো জানি না......

—'ও'—একটা ছোট্ট জবাব দিয়ে থেমে গেছে!

তারপর নানান অছিলায় ওর মনের ছোঁয়া পেতে চেয়েছে ইভা। ব্যবধানটুকু মাঝে মাঝে তপনও আলগা করে দিতে চেষ্টা করতে গিয়ে দু-একটা প্রশ্নের অবতারণা করেছে।

'দুপুরবেলা কি কর তুমি! ঘুমোও!'

'সব দিন ঘুমোই না, ঘুম আসে না।' স্বাভাবিক সুরে জবাব দিয়েছে ইভা।

—তবে কি কর সেদিন—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আড় চোখে তাকাল তপন। ইভা তখন ব্যস্ত হয়ে জামা-কাপড়, রুমাল, পানের মশলা সব একে একে সামনে এনে রাখছিল। ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিল ও।

'এক একদিন বই টই পড়ি কিংবা......'

'বই, বই কোথায় পেলে?' ভ্রূ কোঁচকাল তপন।

'কেন তোমার বাক্সে অত বই রয়েছে। সব পড়েছি আমি।' নিজের আবেগেই

জবাব দেয় ইভা। তপনও যেন একটু খুশীই হয়।

'ও সব বই তোমার ভাল লাগে!'

—হ্যাঁ, আর বই পাও না? পেলে আনবে? পান দুটো হাত বাড়িয়ে দিলো তপনকে। একবার তাকাল তপন ওর দিকে ওর চোখের ওপর চোখ রেখে। তারপর বলল—'আচ্ছা আনব'খন'

বেরিয়ে যেতে গিয়ে থেমে একটু ঘুরে দাঁড়াল, তারপর আবার বলল—'দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিও, নইলে শরীর খারাপ হবে।'

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে রোজকার মত বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মনটা একটু হালকা করে নিয়ে, আবার ঘরে ফিরে এসেছে ও।

কোন কোন দিন ইভাও একটু ইতস্তত করেছে।

'সারাদিন চাকরি আর টিউশনি।'

হঠাৎ সেদিন একটু চমকে যেতে হোল তপনকেও। সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। আর ইভা যেন একটু ভীত হয়েছিল। ভাবল, হয়ত বা এমন অনুযোগ ওর পছন্দ হয়নি কিংবা এ ওর অনধিকার চর্চা। কিন্তু তা নয়। তপনের সেদিন যেন ইভাকে প্রায় এক আশ্চর্য কেরানীর স্ত্রীর মত মনে হয়েছিল। তখন আর কিছু বলেনি ও। রাত্রে শুতে গিয়ে আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওর চুলগুলোয় হাত বুলোতে বুলোতে খুব নিচু গলায় প্রশ্ন করল—'তোমার খুব কষ্ট হয় ইভা, না?'

'কিসের কষ্ট।' নিজেকে যেন আরও হালকা করে দিতে চাইল ইভা।

—'এই একা একা থাকা। সারাদিন পরিশ্রম.....' কোন জবাব দিল না ইভা।

তপন শুধু অনুভব করছিল ও যেন আরও কাছে আসতে চাইছে।

অনেকক্ষণ পর মৃদু স্বরে বলল ইভা। 'এবার তুমি টিউশনিটা ছেড়ে দাও। শরীরটা কত ভেঙেগ পড়েছে, তুমি লক্ষ কর না।'

—'শুধু আমার কেন, তোমারও তো। আর টিউশনির জন্যে ত শরীর খারাপ হয়নি।' একটু থেমে আবার বলল—'তুমি বরং কিছুদিন তোমার মা'র কাছে ঘুরে এসো—ভাল লাগবে'খন। শরীরটাও সারবে।'

এবারও চুপ করে রইল ইভা।

'আমার জন্যে ভাবছ!'—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইল ইভাকে। ওর মন। ওর ভাবনা-কল্পনা। সব নিখুঁত।

কিন্তু সেই একটা দিন। সেই একটা রাত কিছুতেই ঘুমোতে পারল না তপন। ওর বুকের কাছে মুখ রেখে ইভাই শুধু—নিঃসাড়ে ঘুমোলো।

নিতান্তই একটু মিষ্টি ভালবাসার কাঙাল মেয়েটা। আর কিছু নয়। শুধু চায় আরেক জনের মধ্যে ও বাঁচতে। ভালবাসতে। আর আড়ষ্টতা কাটিয়ে আরেক জনের স্বাদ অনুভব করতে। ঠিক যতটুকু তপন চেয়েছিলো রমলার মাঝখানে।

আজকে ইভার দিকে তাকিয়ে অতীতকে মনে করতে গিয়ে শিহরণ লাগে। আর ইভাকে আরও কাছে টেনে নিতে সমস্ত দেহ-মন যেন এক অদ্ভুত আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়।

মাঝে মাঝে ভাবে। পাশাপাশি দু-জোড়া ফলক।

কল্পনার রঙিন পাখনা। আর শান্ত নীলাভ একজোড়া তারায় অসংখ্য দীপ্তি মাখানো হাসির আলপনা। একটু অবাক হয় ভাবলে। কত ব্যবধান রমলা আর ইভার মাঝখানে।

রঞ্জন
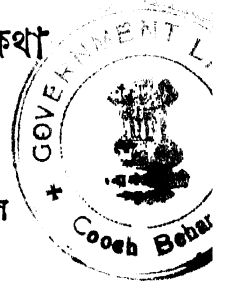
কবির সঙ্গে উন্মাদের যত না সাদৃশ্য তার চেয়ে বেশি বোধহয় শিশুর সঙ্গে। অন্তত দু'টি বিবেচনায় আমার এ প্রতিপাদ্য সত্য হওয়া সম্ভব। এক, বিস্ময়বোধ। নতুন মুখ, নতুন জামা, নতুন কোনো শব্দ, সব কিছু শিশুর কাছে বহন করে আনে বিস্ময়। বোধহয় কবির কাছেও, নইলে সহস্র ক্ষুদ্র বিষয় যা সাধারণ ব্যক্তি পৃথিবীর মৃত আসবাবের অন্তর্গত বলে মনে করে এবং দ্বিতীয়বার ফিরেও তাকায় না সেই সব বস্তুই একেবারে অন্য রূপ নিয়ে কী করে দেখা দেয় কবির চোখে? জল পড়ে পাতা নড়লে কেন কবির চিত্ত মথিত হয় যখন আমরা সবাই থাকি নির্বিকার? শিশুর সঙ্গে কবির দ্বিতীয় সাদৃশ্যে এক জিনিসকে বিনা প্রশ্নে অপর জিনিস বলে গ্রহণ করা। এরোপ্লেন আমার কাছে উড়ন্ত একটা যন্ত্র। ওটা দেখে আমি যদি শৈশবে বিস্ময়াভিভূত হয়ে থাকি তবে তার কারণ যন্ত্রে ওড়ার ক্ষমতা আমরা আরোপ করিনে। শিশুচিত্ত কবির কাছে কী মনে হয়েছিল? বিরাট একটা পাখি বলে, যেমন মনে হয়ে থাকবে আকাশের সত্যকার পাখিদের কাছে, শিশুদের কাছে।

বড়োদের কাছে খেলনা খেলনাই। শিশুর কাছে নকল পুতুল আদৌ পুতুলই নয়। নইলে সে ওকে খাওয়ায় কেন এত যত্ন করে, সাজায় কেন সব কিছু দিয়ে, ঘুম পাড়ায় কেন গান গেয়ে, কাঁদে কেন পুতুলের গায়ে আর কেউ হাত দিলে? কারণ মাটির পুতুল ওর কাছে অতি জীবন্ত—যেমন কবির কাছে জীবন্ত মেঘ, নদী, ফুল। সে কবিই নয় যে প্রেমিকার সম্বন্ধে পদ্য লিখতে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবে, কিসের সঙ্গে তুলনা করব তার চুলের বা চোখের? কবির হরিণ দেখে তৎক্ষণাৎ মনে পড়বে প্রিয়ার চোখের কথা এবং vice versa. শিশুর কাগজের ফুল দেখে একবারও মনে হবে না ওটা কাগজের।

আমার এসব অনতিমৌলিক ধারণা যে আজকের শিশুদের সম্বন্ধে সত্য না হতে পারে, এমন অনতিপ্রীতিকর সন্দেহ জাগল সেদিন সন্ধ্যায়।

*

বন্ধুতনয়- বয়স পাঁচ বছরের কম—সেদিন জন্মদিনে উপহার পেয়েছে একটা খেলার বন্দুক। এসব খেলনা আমার পছন্দ নয়। আমিও বেভারলি নিকলসের মতো সন্দেহ করি যে, শৈশবে নেভির জামা পরা, বুট পরে মার্চ করা, বন্দুক নিয়ে খেলা উত্তরকালে যুদ্ধপ্রীতিতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু সে আলোচনা থাক। আমি কাউবয়-সুট-পরিহিত পিস্তলহস্ত বন্ধুপুত্রকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—কাকে কাকে মারবে এই বন্দুক দিয়ে? যে তালিকা উত্তরে আশা করেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম তাতে থাকবে আয়া (যে ওকে জোর করে স্নান করায়), বাড়ির সম্মুখের দোকানী (যে ওকে বিনা পয়সায় টফি বা চকোলেট দেয় না), গৃহশিক্ষিকা (যিনি ওকে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পড়তে বসান), ইত্যাদি। তারপর, আমি ভেবেছিলাম, ওকে উপদেশ দেওয়া যাবে যে, স্নানটা অন্যায় নয়, বেশি চকোলেট খাওয়া খারাপ আর বই পড়ার মতো আনন্দ জগতে আর নেই। আলোচনা আদৌ আশানুরূপ হতে পারল না, কেননা, সুহৃদনন্দন ক্ষণকাল চিন্তার পরে আমাকে চমকে দিয়ে বলল, "দূর। এটা তো খেলনা মাত্র। শুধু শব্দ হয়, মরে না কেউ।" কণ্ঠে তার অপরিমেয় হতাশা।
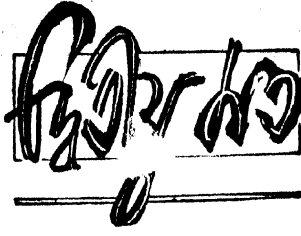
খেলনাকে যে খেলনা বলে জানে, সে শিশু কোথায়? ওর বাবার দিকে বন্দুক উঁচু করলে বাবা যে ভয়ে পালিয়ে যেতে চান, না-মারতে অনুনয় করেন, তার সবটাই যে অভিনয় বলে জানে, তাকে শিশু বলি কী করে? উপস্থিত অপর পিতৃবন্ধু বললেন, ছেলেটি বুদ্ধিমান বটে, খেলনা দিয়ে ভোলাবার উপায় নেই। আমার অস্বস্তি কাটল না। শৈশবেও যে নকলকে নকল বলে জানে, তার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারি, কিন্তু কল্পনায় যে দৈন্য রয়ে গেল তার ক্ষতিপূরণ তো এ জীবনে আর হবে না। অথচ ক্ষতি তো একে বলতেই হবে। শিশুরা যেন আর শিশু নেই। একসঙ্গে ওরা যেন অনেকগুলি বছর লাফ দিয়ে পার হয়ে কৈশোর বা যৌবনে পৌঁছে যাচ্ছে। সব জিনিসের স্বরূপ ঠিক ঠিক জেনে মনের প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হচ্ছে। এটা ভালো না মন্দ? আমাদের শৈশবটাকে কি কতগুলি মূল্যবান বৎসরের অনর্থক অপচয় বলে মনে করতে হবে, কেননা আমরা এমন বোকা ছিলাম যে খেলার বন্দুককে সত্যকার বন্দুক বলে মনে করেছিলাম? আমি নিশ্চিত নই।

*

পরদিন দেখা হোলো অপর এক শিশুর সঙ্গে। তার বয়স আরো কম, তিনও পূর্ণ হয়নি বোধহয়। আমার হাতে ছিল একটা সিগারেট লাইটার, দেখতে একটা ছোট টেবিল-ঘড়ির মতো। মেয়েটি এই অদৃষ্টপূর্ব পদার্থটি হাতে নিয়ে অনেকবার দেখতে লাগল। একবার কানের কাছে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল, বাজে কিনা। বাজে না। অতএব ঘড়ি নয়। (তিন বছর বয়সে আমি কি জানতাম ঘড়ি শুনতে? বোধহয় না। দেখলাম, মেয়েটি টেলিফোন, রেডিও ও রেফ্রিজা-রেটরের সঙ্গে একান্তই পরিচিত। আমার শৈশবে এ সবের নামও শুনিনি।) মেয়েটি চুপ করে আছে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী এটা?

আমি ভেবেছিলাম, ও আন্দাজ করবে এটা ওটা। পরে আমি জ্বালিয়ে দেখালে হয়তো বলবে, কলের দেশলাই। অচিরেই বোঝা গেল, আজকালকার শিশু সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা শোচনীয়। মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে স্পষ্ট বলল—আমি জানি না তো।

*

যে কথা পণ্ডিত বলেন জীবনসায়াহ্নে, জীবনব্যাপী অক্লান্ত জ্ঞানসাধনার শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে, তাই তিন বছরের শিশু আমায় শুনিয়ে দিল এমন সহজভাবে যেন গভীরতম জ্ঞানের সর্বশেষ উপলব্ধি তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়নি। ও বয়সে আমার অজানা কোনো জিনিস ছিল বলে স্মরণ করতে পারিনে। সর্বজ্ঞতার মোহ তো কাটে পরিণত বয়সে, যখন জানা সামান্যের অকিঞ্চিৎকরতা মর্মান্তিক নগ্নতার সঙ্গে দেখা দেয় অজানা বিরাটের সামনে।

কবিত্বের কাল এটা নয়, বলেছিলেন সি ডে লুইস, যখন অভিযোগ হয়েছিল যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোনো মহৎ কাব্য রচিত হোলো না। বলেছিলেন, We defend the bad against the worse. এবং তাতে ভালো ভার্সের জন্ম হয় না। আমাদের সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও লিখেছেন—প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, কেননা ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা। মহৎ কাব্য-সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশের স্বরূপ আমার জানা নেই। তার আবির্ভাব আকস্মিক বলে মেনে নিয়েছি। কিন্তু কবিত্বের সঙ্গে কি বিদায় নিতে বসেছে জীবন থেকে শিশুত্ব?

বিবর্তনের ভবিষ্যৎ কোনো পর্যায়ে শৈশব কি একদিন একেবারে বাদই দেয়া হবে মনুষ্যজীবন থেকে? ওটা কি অ্যাপেনডিকসের মতো একটা আপদ মাত্র? কী জানি! তখন থাকবে না শিশুর বিস্ময়? তখন শিশু খেলনাকে জানবে খেলনা বলে? এরোপ্লেনকে ভুল করবে না পাখি বলে? জানবে সে কী জানে না?

পৃথিবীটা বড়ো বুড়ো হয়ে যাচ্ছে বলে সন্দেহ করি। বার্ধক্য দ্বিতীয় শৈশব না হয়ে শৈশব প্রথম বার্ধক্যে পরিণত হলে তাকে মানবজাতির উন্নতি বলে অভিনন্দন জানাতে আমার বাধছে।

বৈদেশিকী

পশ্চিম জার্মানীর (ফেডারেল জার্মান রিপাবলিকের) পার্লামেণ্ট (বাণ্ডেস্টাগ) ইলেকশনে অ্যাডেনয়েরের ক্রিশ্চান ডেমোক্রাটিক পার্টি জয়লাভ করেছে। সুতরাং অ্যাডনয়ের পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার থেকে গেলেন। ১৯৪৯ সালে জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক স্থাপিত হবার পর থেকেই অ্যাডেনয়েরের কর্তৃত্ব চলছে। এবার নিয়ে তিনবার ইলেকশন হলো। এবারে ক্রিশ্চান ডেমোক্রাটিক পার্টি সবচেয়ে বেশি আসন লাভ করেছে। মোট ৪৯৭টি আসনের মধ্যে ক্রিশ্চান ডেমোক্রাটিক পার্টি ২৭০টি, সোস্যাল ডেমোক্রাটরা ১৬৯টি, ফ্রি ডেমোক্রাটরা ৪১টি এবং জার্মান পার্টি ১৭টি আসন লাভ করেছে। পূর্বের পার্লামেণ্টেও ক্রিশ্চান ডেমোক্রাটিক পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম। পূর্বের অ্যাডেনয়ের গবর্নমেণ্টে ক্রিশ্চান ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রাধান্য থাকলেও নামে কোয়ালিশন ছিল, কারণ জার্মান পার্টির (দক্ষিণপন্থী) সদস্য মন্ত্রিমণ্ডলীতে ছিলেন। এবার হয়ত কেবল ক্রিশ্চান ডেমোক্রাটদের নিয়েই গভর্নমেণ্ট গঠিত হবে। সোস্যাল ডেমোক্রাটরা যদিও মোটের উপর জিততে পারেননি, কিন্তু আগেরবারের তুলনায় তাঁরা ১৬টি বেশি আসন দখল করতে সমর্থ হয়েছেন। জার্মান পার্টি সে ক্ষেত্রে ১৬টি আসন হারিয়েছে। ফ্রি ডেমোক্রাটরা কিন্তু পাঁচটি আসন বেশি পেয়েছেন। ইলেকশনে আরো কতকগুলি ছোটো ছোটো পার্টি নেমেছিল, সেগুলি একেবারেই পাত্তা পায়নি।

বলা বাহুল্য, অ্যাডেনয়ের জয়লাভে পশ্চিমা শক্তিরা খুবেই খুশি হয়েছে। NATO-র সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর যোগ সম্বন্ধে আর কোনো আশঙ্কা রইল না। সোস্যাল ডেমোক্রাটরা জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ ও NATO-র ভিতরে থাকার বিরুদ্ধে এবং নিরপেক্ষ নীতির পক্ষপাতি, কারণ প্রথমত তাঁরা জার্মান মিলিটারিজম-এর পুনরভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকে দূর করতে চান এবং দ্বিতীয়ত কোনো ব্লকের সঙ্গে সামরিক জোটে আবদ্ধ থাকলে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর একীকরণ সম্ভব নয়। জাতীয় একীকরণের জন্য অগ্রহ অ্যাডেনয়েরও অবশ্য ঘোষণা করেন, কিন্তু পশ্চিমা শক্তিজোটের সঙ্গে থাকলে বর্তমান অবস্থায় যে পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানীর একীকরণের কোনো প্রস্তাবে রাশিয়ার সম্মতি মিলতে পারে না, একথাও সকলে জানে।

রাশিয়া ও অন্য কম্যুনিস্টশাসিত রাষ্ট্রগুলি অ্যাডেনয়েরের জয়লাভে অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করছে। কেউ কেউ এমন কথাও বলছে যে, অ্যাডেনয়েরের জয়লাভ পশ্চিম জার্মানীর যে অবস্থা সূচিত করছে সেটা হিটলারের ক্ষমতা লাভের অব্যবহিত পূর্বেকার জার্মানীর অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। তবে রাশিয়া মুখে যতটা রাগ দেখাচ্ছে মনে মনে ততটা নাও হতে পারে। সোস্যাল ডেমোক্রাটরা জয়লাভ করলে পশ্চিম জার্মানী নিরপেক্ষতার দিকে ঝুঁকত এবং হয়ত NATO-র সঙ্গে যোগ শিথিল হতো। কিন্তু জার্মানীর একীকরণ সম্বন্ধে সোস্যাল ডেমোক্রাটরাও যে-সব প্রস্তাব

করতেন তার মধ্যে জার্মানীর পূর্ব সীমানার রদবদলের কথা না থেকে পারত না। কারণ এ বিষয়ে সকল জার্মানেরই মনে ক্ষোভ আছে যদিও পূর্ব জার্মানীর কম্যুনিস্ট গভর্নমেণ্ট বর্তমান সীমানা মেনে নিয়েছেন। পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার সংগে মনান্তর না ঘটিয়ে রাশিয়ার পক্ষে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সংগে জার্মানীর একীকরণের ব্যাপারে কোনো আপোষ করা সম্ভব হতো না। আর তা না হলে সোস্যাল ডেমোক্রাটদের পক্ষেও NATO-র সংগে পশ্চিম জার্মানীর বন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব হোত না। অ্যাডেনয়েরের জয়লাভ হওয়াতে রাশিয়ার সংগে পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দূরে হলো। বরং পশ্চিম জার্মানীর ভয়ে রাশিয়ার উপর পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লাভাকিয়ার নির্ভরতা আরো বেড়ে গেল। পূর্ব জার্মানীর গভর্নমেণ্টের পক্ষেও একথা প্রযোজ্য।

পশ্চিম জার্মানীর ইলেকশন বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত বিতর্কের দ্বারা কতটা প্রভাবান্বিত হয়েছে বলা মুশকিল, হয়ত বাইরের লোক যতটা ভাবে ততটা নয়। এমন কি, জার্মানীর একীকরণ সম্বন্ধেও জার্মানীর লোকেরা হয়ত আপাতত অনেকটা উদাসীন হয়ে গেছে এই ভেবে যে, রাশিয়া ও পশ্চিমা শক্তিদের এ বিষয়ে একমত হবার কোনো আশু সম্ভাবনা নেই। সুতরাং ইলেকশনে আভ্যন্তর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নটির উপরেই বোধ হয় ভোটারদের বেশি ঝোঁক পড়েছিল। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর অর্থনৈতিক অভ্যুত্থান বিস্ময়কর। মার্কিন-পৃষ্ঠপোষিত অ্যাডেনয়ের গভর্নমেণ্টের ক্যাপিটালিস্টপ্রীতি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্যাপিটালিস্টদের সুবিধার সংগে দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার এতো দ্রুত উন্নতি হয়েছে যে অর্থনৈতিক অসন্তোষের কারণ কোথাও ঘনীভূত হতে পারেনি। বিশেষত যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধের অব্যবহিত পরের অবস্থার সংগে তুলনায় সর্বশ্রেণীর জার্মানরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এখন এতো ভালো আছে যে, অ্যাডেনয়ের গভর্নমেণ্টের প্রতি তাদের বিশেষ বিরূপ হবার কারণ দেখা যায় না। ক্রিশ্চান ডেমোক্রাটরা এই অবস্থার পুরো-পুরি সুযোগ নিয়েছে। সোস্যাল ডেমোক্রাটরা ক্ষমতায় এলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা ব্যাহত হবে, জার্মানীর সম্বন্ধে বাইরের লোকের বিশ্বাস কমে যাবে, যার সাহায্যে জার্মানীর এতো তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে সেই আমেরিকা জার্মানীর বিরুদ্ধে যাবে—এই ধরনের প্রোপাগাণ্ডা যথেষ্ট হয়েছে এবং তার ফলও হয়েছে। সাধারণ লোকের অবস্থা যদি ভালো না হতো, তবে এই প্রোপাগাণ্ডায় ফল হোত না।

অ্যাডেনয়েরের কম্যুনিস্ট সমালোচকগণ রব তুলেছে যে, পশ্চিম জার্মানী ফ্যাসিস্ট রাজত্বে পরিণত হতে চলেছে, সেখানকার বর্তমান অবস্থা হিটলারের ক্ষমতা লাভের সময়কার অবস্থার সংগে তুলনীয়। এ সবও বহুলাংশে প্রোপাগাণ্ডা বলে ধরা যেতে পারে! ফেডারেল পার্লামেণ্টে এক-তৃতীয়াংশের বেশি সোস্যাল ডেমোক্রাট সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। কেবল নিজেদের জোরেই তাঁরা ফেডারেল রিপাবলিকের কনস্টিটিউশনের কোনো পরিবর্তনের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে পারেন। নির্বাচনের পরে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক নেতা হার অলেনহয়েরও একথা বলেছেন: সুতরাং অ্যাডেনয়েরের যে কনস্টিটিউশন পরিবর্তন করে পশ্চিম জার্মানীকে নাৎসী-তুল্য রাষ্ট্রে পরিণত করবেন বা করতে পারবেন সে আশঙ্কা নেই। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা তা হতে দেবেন না। অ্যাডেনয়েরের গভর্নমেণ্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে হিটলারী আমলের নাৎসী বা নাৎসী-দরদী কারো কারোর সংগে যে ঘনিষ্ঠতা করেননি তা নয়, কিন্তু সেদিক দিয়ে পূর্ব জার্মানীতেও রাশিয়ানরাও কম দূরে যাননি। অনেক পুরাতন নাৎসী বদমায়েসের সংগে কম্যুনিস্ট কর্তৃপক্ষেরও বনিবনা হয়েছে বলে জানা যায়। অর্থাৎ সুবিধাবাদী কোনোটিতেই কম নেই। তা ছাড়া জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে কম্যুনিস্ট পার্টি তদানীন্তন জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাট গভর্নমেণ্টকে নষ্ট করার জন্য যেভাবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল তার ফলের কথা চিন্তা করলে বর্তমান কম্যুনিস্ট সমালোচকদের আক্ষেপ অনেকের কাছে তেমন গুরুত্ব পাবে না। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। পশ্চিম জার্মানীর কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট অ্যাডেনয়েরের ক্রিশ্চান সোস্যালিস্ট পার্টির হাতে থাকলেও একাধিক প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট ও প্রাদেশিক আইনসভায় সোস্যালিস্ট প্রাধান্য রয়েছে। সুতরাং অ্যাডেনয়েরের জয়লাভে পশ্চিম জার্মানী ফ্যাসিস্ট রাজত্ব হতে চলেছে, এ রকম ভয় করা বা ভয় দেখানো উচিত নয়। সোস্যাল ডেমোক্রাট নেতা অলেনহয়েরের এরূপ ভয় করেন বলে মনে হয় না। ত্রিশ শতকের জার্মানীর ইতিহাসে অন্তত এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, হিটলারিজম্‌ কখন কীভাবে আসে সেটা কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা বেশি বোঝে। যাই হোক, জার্মানীতে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির জয় হলে আমরা বেশি খুশি হতাম, কারণ তা হলে ইউরোপের পরিস্থিতি একটা নতুন হাওয়ায় আন্দোলিত হত।

চক্রদত্ত

একজন আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্ খুব সহজ উপায়ে আবহাওয়ার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করবার বন্দোবস্ত করেছেন। দুটো পিচ-বোর্ডের চাকতি করে ভেতরের চাকতির ওপর ৮ প্রকারের মেঘের ছবি তার ওপর মেরেছেন। আর প্রত্যেক মেঘের ছবির নিচে চাক্তিতে একটা ক'রে গর্ত করা আছে। সেই গর্ত দিয়ে আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্ হাওয়ার গতির নির্দেশ দেন। মেঘের ঠিক উল্টোদিকে ওপরের
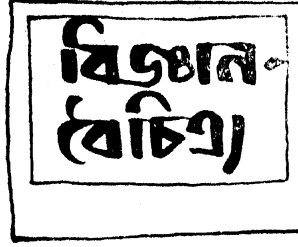
আবহাওয়া নির্দেশক চাকতি

চাকতিটিতে ২৪ ঘণ্টায় আবহাওয়ার বিভিন্ন অবস্থার নির্দেশ আছে। এই দুটো চাকতি ঘুরিয়ে একটা আবহাওয়ার ভবিষ্যতের হদিশ পাওয়া যায়। অবশ্য দুটো আব হাওয়ার গরম এবং শীতের জন্য চাকতি আলাদা আলাদা ভাবে করতে হবে।

গলান কাঁচ থেকে সুতো তৈরী করা নতুন কিছু নয়। এই কাঁচের সুতো দিয়ে আজকাল অনেক শখের বস্তু তৈরী করা হয়। এতদিন এই সুতোতে কোন রং ধরান হতো না। বর্তমানে খুব উজ্জ্বল এবং বিভিন্ন ধরনের রং-এ এগুলো ছোপান হচ্ছে। এজন্য এই রং করা কাঁচসুতো আরো নতুন নতুন ধরনের শৌখিন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। যে রং-এর সাহায্যে সুতোগুলো রং করা হয় সেগুলো সাধারণ রং নয়। এগুলো সাধারণ বালি এবং পেট্রোল থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী করা হচ্ছে।

এরোপ্লেনের শব্দ, বিশেষ করে জেট-চালিত প্লেনের শব্দ, আরোহীদের খুবই অসুবিধার সৃষ্টি করে। জেট প্লেন বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন যে, আগামী ৫ বছরের মধ্যে এই শব্দ মানুষের সহ্যের সীমার মধ্যে আনতে পারবেন। এটা করার একটা উপায় হচ্ছে যে, জেট ইঞ্জিনের থেকে যে প্রধান হাওয়ার স্রোত বের হয়ে আসে সেটাকে ভেঙে ছোট ছোট হাওয়ার স্রোতে চালিত করা হবে। আর এইগুলির সমষ্টি তখন বেশী শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করবে—সমস্ত শব্দটা এতই বেশী হবে যে, মানুষের কানে তা শোনবার বাইরের পর্যায়ে পড়বে।

*

এতদিন মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের রোগের খবরাখবর বাইরে থেকে যন্ত্রের সাহায্যে নেওয়া হোত। সম্প্রতি 'ইনট্রা কার্ডিয়াক ফোনো কারডিওগ্রাফি' নামক যন্ত্রের সাহায্যে হৃদ্‌যন্ত্রের ভেতর থেকে সমস্ত খবর সংগ্রহ করবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। একটা নলের মাথার ওপর এক ইঞ্চির ৬ ভাগের এক ভাগ একটা মাইক্রোফোন বসিয়ে সেটিকে হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারপর যন্ত্রটি হৃদ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন কুঠরীতে চালনা করা হয়। সেই সময় হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে যে সমস্ত শব্দ হয় সেগুলো মাইক্রোফোনের সাহায্যে পরিবর্ধিত হয়ে ওঠে। সেই সময় এমন বন্দোবস্ত করা আছে যে, এই পরিবর্ধিত শব্দ সঙ্গে সঙ্গে একটা ফিতের ওপর দাগ কেটে যেতে থাকবে। পরে বিশেষজ্ঞরা এই ফিতে থেকে দাগের তারতম্য পরীক্ষা করে বলে দিতে পারবেন যে, হৃদ্‌যন্ত্রের কোনরকম রোগ আছে কিনা।

*

ক্লোরোকুইনিন ম্যালেরিয়ার একটি ওষুধ সম্প্রতি কানাডা, রুমেনিয়া এবং আমেরিকার ডাক্তাররা মিলে পরীক্ষা করে দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটি গেঁটে বাত এবং দুরারোগ্য বাত ইত্যাদির একটা উপকারী ওষুধ। দেখা গেছে যে, প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ রোগ ক্লোরোকুইনিনে সারছে। কর্টিজন হচ্ছে গেটে এবং ফোলা বাতের প্রধান ওষুধ। ক্লোরোকুইনিন কিন্তু কর্টিজন রোগীর শরীরে যে উপায়ে কাজ করে তার থেকে একটু অন্য উপায়ে করে। কর্টিজন ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে গাঁটের ফোলা কমে যায়—কিন্তু কর্টিজন ব্যবহার বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার গাঁটগুলো ফুলতে থাকে। ক্লোরোকুইনিন কিন্তু সমস্ত রোগটির মূলে আঘাত করে। ফলে কর্টিজনের মত ওষুধ ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গেই ফোলা ইত্যাদি কমতে থাকে না। কিন্তু যদি ক্রমান্বয় অনেক মাস ব্যবহার করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, ওষুধ ব্যবহার বন্ধ করলেও আর গাঁট ফোলে না বা ব্যথা হয় না।

*

রাত্রিবেলা দাড়ি কামাতে হলে আয়নার সামনে ঠিকমত আলোর প্রয়োজন খুব বেশী। এরকম ধরনের একটা বন্দোবস্ত খুব সহজেই

রাত্রে দাড়ি কামানর ব্যবস্থা

করে নেওয়া যায়। আয়নার ফ্রেমের নিচে দিকে একটা ক্লিপের সাহায্যে একটা কম পাওয়ার বাল্‌ব লাগিয়ে নিতে হবে। বাল্‌বটার পেছন দিকে একটা প্রতিফলক এমনভাবে লাগাতে হবে যে, সমস্ত আলোটা যেন লোকটির মুখের ওপর গিয়ে পড়ে।

*

ভারত সরকার দিল্লীতে একটি ছোটখাট শিল্পশিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করা স্থির করেছেন। দিল্লীর বাইরে ওকলার কাছেই কেন্দ্রটি স্থাপন করা হবে বলেই স্থির হয়েছে। ফেডারেল রিপাবলিক জার্মানী এই পরিকল্পনার জন্য ৫০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দিয়ে ভারতকে সাহায্য করবেন বলে জানা গেছে। যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করা ছাড়াও তারা তাদের দেশের শিক্ষিত কর্মী দিয়েও সাহায্য করবেন। জার্মান কর্মীরা তিন বৎসরের জন্য কাজ করে দেবেন। ভারত সরকার এই সংস্থায় ৪৭ লক্ষ টাকা খরচ করবেন। এখানে কোনও একটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে না নানারকম শিল্পকর্মের শিক্ষা দেওয়া হবে। এখানে শিল্প শিক্ষণের নিয়মাবলী ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই কেন্দ্রে একসঙ্গে ২৪০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারবে এবং বছরে ১৬৫ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করা হবে।

হাবিলদার

প্রীতি দে

সন্ধ্যা শেষ হয়; এমন সময় বারাউনী জংসনে এসে পৌঁছলুম। যে প্ল্যাটফরমে আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়ালো, তারই অপর পাশে সামারিয়া ঘাটে যাওয়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে এবং তারও ছাড়ার বিশেষ দেরি নেই, অতএব এক দৌড়ে প্ল্যাটফরমের এধারে এসে সামারিয়ার গাড়িতে উঠ্‌তে হবে। টাইম টেবিলে দেখেছি, এক ঘণ্টার মধ্যে সামারিয়া পৌঁছাব এবং রেলের জাহাজে গঙ্গা পার হয়ে রাত্রি ৯-৫৪-র সময় মোকামাঘাটের গাড়িতে উঠ্‌লে পরের দিন ভোরে হাওড়া পৌঁছানো যাবে।

কিন্তু উঠি কোথায়? যুদ্ধের সময়। গাড়িটা আগাগোড়া ভর্তি। ওরই মধ্যে একটি গাড়িতে উঠে দেখি, দুধারের বেঞ্চিতে লোক ভর্তি, মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তাও প্রায় চার পাঁচজন। হাতের ব্যাগটা বাঙ্কের ওপর রেখে দাঁড়ানোর দলের অন্যতম হয়ে ডান হাত দিয়ে বাঙ্ক ধরে দাঁড়ালুম। এক ঘণ্টার যাত্রা, ভাবলুম, দাঁড়িয়েই যাওয়া যাবে।

গাড়িটা হুইসিল দিয়ে অল্প এগিয়েছে, এমন সময় দৌড়ে এসে উঠ্‌লো এক বিরাট চেহারার হিন্দুস্থানী, তার হাতে আছে ততোধিক লম্বা এবং সরু করে পাকানো এক কম্বল-মোড়া বেডিং। গাড়ির মধ্যে ঢুকে লোকটা এদিক ওদিক চেয়ে বিছানাটা বাঙ্কের ওপর এমন সজোরে ফেলল যে, আমার ডান হাতের আঙ্গুলগুলো প্রায় চিপ্টে গেল, নেহাৎ বিছানা তাই রক্ষে, বাক্স হলে আঙ্গুল নিয়ে হাসপাতালে ছুটতে হ'ত।

বাঙ্কে বিছানা ফেলেই লোকটা দুধারে দেখে নিলে। দুপাশের বেঞ্চেই যাত্রী সব পাশাপাশি নিরেট হয়ে বসে আছে, কেবল ডান পাশের বেঞ্চিতে একটি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের পাশে এক বিঘত জায়গায় সে তার কচি-বাচ্চাকে শুইয়ে রেখেছিল। বাচ্চাটা শুয়ে আছে, মানে বাচ্চার মাথা এবং দেহ আছে বেঞ্চে, পা দুটো সেই স্ত্রীলোকের কোলের ওপরেই ছিল। নবাগন্তুক সেই স্ত্রীলোকটিকে খুব কর্কশভাবে হুকুম করলে, লেড়কা উঠাও, বৈঠনে হোগা।

স্ত্রীলোকটি কি যেন বললে। বলতেই লোকটা অদ্ভুত রূঢ়ভাবে ছেলেটির মাথায় এমন ঠেলা মারলে যে, ঘুমন্ত ছেলে বিকট-ভাবে চেঁচিয়ে উঠলো। গাড়িশুদ্ধ লোক বকাবকি করে উঠলো, কিন্তু তার মা তখন ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে থামাতে বাধ্য হল এবং লোকটা অবলীলাক্রমে সেই জায়গাটুকুতে বসে পড়লো, এত লোকের চিৎকার সে গ্রাহ্যই করলে না।

খানিকক্ষণ পরে যাত্রীদের বকাবকি থেমে গেল। কেবল মনে আছে, এত লোকের এত চিৎকারের মাঝে একমাত্র আমিই বোধ হয় কোনরকম কথা বলিনি। ভাবলুম, এই শ্রেণীর অসভ্যতার প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। কিন্তু আমার আঙ্গুলের ডগাগুলো তখনও কট কট করছিল।

ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলো। গাড়িতে আলোর বালাই নেই, শুধু যাত্রীদের বিড়ির আগুন এখানে ওখানে জোনাকির মত মিট্‌মিট্ করছিল মাত্র। সেই অসভ্য লোকটাও একটা বিড়ি ধরালে, ধরিয়ে সামনের একজনের সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা কইতে শুরু করলে। অযাচিতভাবে নিজের পরিচয় দিয়ে সে বল্লে যে, সে একজন হাবিলদার, পুলিসের কি মিলিটারীর তা ঠিক বুঝলুম না। সে বল্লে যে, তাদের শিক্ষাই এইরকমের। সব সময় সুবিধে করে নিতে সে খুব পটু। এই যে 'এৎনা আদমি সব খাড়া' হয়ে হয়েছে এর মধ্যে সে একজন বসবার জায়গা করে নিলে ইত্যাদি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যারা কয়েক মিনিট পূর্বে তার বসবার প্রণালীতে মারমুখো হয়ে উঠেছিল তারাই এখন তার কথার তারিফ করতে লাগ্‌লো। উৎসাহিত হয়ে লোকটা বলতে লাগলো যে, সে কলকাতায় যাচ্ছে, কাল সকাল ৯টায় তাকে অফিসে জয়েন করতে হবে এবং সে সামারিয়া ঘাটে রেল পৌঁছালেই এক দৌড়ে চলে যাবে জাহাজে এবং ওপারে মোকামা ঘাটে গিয়ে কলকাতার ট্রেন এলেই সে সেই ট্রেনে যতই ভিড় থাকুক ঠিক শোবার মত জায়গা তৈরী করে নেবে। তার নাকি কখনও কোন ট্রেনে অসুবিধা হয়নি, সব আদ্‌মি বোকা আছে, কেবল সেই নিজের কাজ গুছাতে পারে ইত্যাদি। লোকটা হাবিলদার, কাজেই অন্য হিন্দুস্থানী যাত্রীরা অবাক হয়ে তার কথা শুনে তারিফ করতে লাগলো।

গভীর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ট্রেনখানা ছুটেছে। আমি বাঙ্কের রড্ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। এখানকার গাড়িগুলোর বাঙ্ক কাঠ দিয়ে তৈরী নয়। কয়েকখানা লোহার রড্ ফাঁক ফাঁক করে লোহার পাটী দিয়ে গাঁথা। ঐ বাঙ্কে শোয়া যায় না, ছোট জিনিস রাখলে গলে পড়ারও আশঙ্কা, তবে বড় সাইজের জিনিস রাখা যায় এবং বাঙ্কের রড্ ধরে দাঁড়ানো অপেক্ষাকৃত সহজ।

অন্ধকারের মধ্যে নড়ে-চড়ে দাঁড়াতে লোকটার অভিশপ্ত বেডিংটা হাতে ঠেকলো। অনুভব করে দেখলুম, একটা প্রকাণ্ড লম্বা মোটা নেক্‌লাইন দড়ি দিয়ে বেডিংটাকে আষ্টে-পিষ্টে নিরেট মজবুত করে বেঁধেও আরও অনেকখানি দড়ি বাড়তি হওয়ার জন্যে সেই বাড়তি অংশটা বাঁধার মধ্যে গুঁজে রাখা হয়েছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে দুষ্টা সরস্বতীর কথা পড়েছিলুম, হঠাৎ এই চলন্ত ট্রেনের অন্ধকারে সেই দুষ্টা সরস্বতী আমার বুদ্ধিকে পেয়ে বসলো। দু' হাত দিয়ে বাঙ্ক ধরে ঠিক হয়ে দাঁড়ানোর অভিনয় ক'রে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে ধীরে ধীরে দড়ির বাড়তি অংশটা বেডিং থেকে খুলে নিলুম এবং তারপর সেই অংশটা দিয়ে বাঙ্কের প্রত্যেকটি লোহার সঙ্গে বেডিং-এর দড়ির প্রত্যেকটি প্যাঁচ ভালো করে জড়িয়ে বাঁধতে শুরু করলুম এবং প্রতি ক্ষেপেই ভালো করে ডবল্ গেরো দিয়ে বাঁধতে লাগলুম। বাঁধতে বাঁধতে লম্বা দড়ির একটুও বাকী রইলো

না, গভীর অন্ধকারে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগলো এই মহৎ কর্ম সুসম্পন্ন করতে। তারপর একটু স্থির হয়ে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই ট্রেনখানা সামারিয়া ঘাটে পেঁছে গেল।

স্টেশনে ট্রেন আসামাত্রই যাত্রীরা হুড়মুড়িয়ে নামতে শুরু করলে। অন্ধকারে কে-কুলি কে-যাত্রী সব একাকার। চিৎকার, মালপত্রের টানাটানি, সমস্তই আসুরিক ব্যাপার। আমি আমার হ্যান্ডব্যাগটি নিয়ে চট্ করে গাড়ি থেকে নেমে ধীর পদক্ষেপে জাহাজের দিকে এগিয়ে চললুম। জাহাজের কাছাকাছি পেঁছে কি মনে করে আবার পেছন ফিরলুম। ততক্ষণে এ গাড়ির সমস্ত কামরাই ফাঁকা। যাত্রীরা প্ল্যাটফরম দিয়ে দ্রুত জাহাজের দিকে চলেছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আমার পরিত্যক্ত কামরার সামনে এসে দেখি, বীরপুঙ্গব শ্রীমান্ হাবিলদার একাকী অন্ধকারে অশ্রাব্য হিন্দীতে কুৎসিত গালিগালাজ করছে এবং অমিত বিক্রমে তার সেই বেডিং ধরে একপ্রকার হ্যাঁচকা টান্ লাগাচ্ছে যে, সমস্ত গাড়িখানা যেন টল্‌মল্ করে উঠছে। কান পেতে শুনলুম, তার সেই গালিগালাজ কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নয়, পরন্তু ঐ অবাধ্য বেডিংকেই সে ঐ সমস্ত ভাষা প্রয়োগ করছিল এবং মাঝে মাঝে বাঙ্ক থেকে বেডিংকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যর্থ প্রয়াসে প্রাণপণ শক্তিতে টান দিচ্ছিল। টানের ফলটা ভালোই হচ্ছিল বলে মনে হলো। যে সমস্ত গেরোগুলো আমি খুব শক্ত করে দিতে পারিনি, টানের চোটে বুঝলুম সেগুলো আরো ভালো করে মজবুত হয়ে পড়ছে।

প্ল্যাটফরমে একটা ফাঁকা বেঞ্চে নিরাসক্ত ভাবে বসে পড়লুম। চাপা হাসির অস্ফুট প্রকোপে নাড়ি ছেঁড়ার উপক্রম। সে কিন্তু গলদঘর্ম হয়ে অন্ধকার কামরায় বীরবিক্রমে বেডিং ধরে টানছে এবং হিন্দীভাষায় অজস্র গালাগালি দিচ্ছে। একটু পরে সে দরজা দিয়ে প্ল্যাটফরমে লাফিয়ে পড়লো। প্ল্যাটফরমও প্রায় অন্ধকার। একজন রেলের কুলি একটা হ্যারিকেন নিয়ে দ্রুত চলেছে। লোকটা কুলির কাছে গিয়ে অতি করুণভাবে বল্‌ছে, 'এ ভেইয়া, জেরা লাল্‌টিন দিজিয়ে, মেরা বিস্তারা বাঙ্কমে কেইসে সাঁট্ গিয়া, উও এক দফে দেখ্‌লেঙ্গে'। হ্যারিকেনওয়ালা কুলি কর্কশ ভাষায় 'নেহি নেহি' বলেই দ্রুত এগিয়ে চলে গেল। লোকটা এদিক ওদিক দেখে আবার গাড়িতে ঢুক্‌লো, দেশলাই জেবলে বেডিং-এর অবস্থা দেখে আবার সেই প্রচণ্ড বেগে বেডিং-এ টান দিলে, কিন্তু লাফলাইনের বাঁধন, ছেঁড়েও না, খোলেও না।

এমন সময় জাহাজ ছাড়ার পয়লা বাঁশী শোনা গেল। লোকটা খেপার মত গাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশন-রুমের দিকে দৌড়ে যায়, বলে, মাস্টার সাব, এক দফে চাক্কু দিজিয়ে, মেরা বিস্তারা বাঙ্ক্‌মে সাঁট গিয়া। মাস্টার সাহেব ভেতর থেকে ধমক দিয়ে বল্লেন, কেয়া তুম্ পাগ্‌লা হ্যায়, ভাগো হিঁয়াসে। প্ল্যাটফরমের অপর এক যাত্রীর কাছে দৌড়ে গিয়ে সে বল্লে, ভাই সাব্, চাক্কু হ্যায়, কাইচি হ্যায়। হাম্ হাবিলদার হ্যায়, কাল হামারা জয়েনিং ডেট্ হ্যায়। কিন্তু কেউই আমোল দেয় না। সকলেই বলে, ভাগ্ ভাগ্।

এমন সময় জাহাজের দ্বিতীয় ঘণ্টা। লোকটা সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। সবেগে আর একবার গাড়ির মধ্যে ঢুকে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করে সেই গভীর অন্ধকারে 'হনুমানজী কি জয়' বলে বার বার ভীমবিক্রমে বেডিং ধরে টান দিতে লাগলো, কিন্তু বেডিং ওঠ্‌বার নয়। সে 'সাঁট্ গিয়া'।

আর অপেক্ষা করা চলে না, কারণ আমাকেও জাহাজ ধরতে হবে। তৃতীয় ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজের সিঁড়ি খুলে দেবে, তাই দৌড়ে এসে জাহাজে উঠ্‌লুম। কিন্তু সিঁড়ি খোলার পর পর্যন্ত জাহাজের দরজায় অপেক্ষা করেও হাবিলদারকে দেখতে পেলুম না। কাল তার জয়েনিং ডেট্, সে প্রথমেই ট্রেন ধরে শোবার জায়গা করে নেবে, কিন্তু কোথায় সে, তার বিস্তারা যে সাঁট্ গিয়া।

এরপর যতবারই সামারিয়া ঘাট দিয়ে যাতায়াত করেছি, ততবারই শুন্‌তে পেয়েছি, কে যেন করুণ কণ্ঠে বলছে, কাল হামারা জয়েনিং ডেট্, চাক্কু দিজিয়ে, লাল্‌টিন দিজিয়ে এবং পরক্ষণেই নিজের বেডিং ধরে বীরবিক্রমে টান্ দিচ্ছে।

—শৌভিক—

গানবাজনার সময় বাঁধা

সারা রাতব্যাপী গানবাজনার আসরের বিরুদ্ধে আস্তে আস্তে একটা আন্দোলন সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক শ্রোতার এ বিষয়ে সমর্থন আছে এবং বড়ো বড়ো শিল্পীদেরও কতকজনের সায় রয়েছে এ ব্যাপারে। ক বছর আগেই কথাটা উঠেছিল, তবে সমর্থনের সক্রিয় রূপটা এখন দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। এবার তানসেন সংগীত সম্মেলন ক দিন অবশ্য সারা রাত ধরেই অনুষ্ঠিত হলো, কিন্তু তারপরেই সদারঙ সংগীত সম্মেলন দেখা যাচ্ছে, আরম্ভ থেকে ক দিনই রাত বাকি থাকতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। এতে একটা ভাল হচ্ছে এই যে, শ্রোতা এবং শিল্পী উভয়েরই শরীরটা রাত জাগার ধকল পোয়ানো থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। এই লাভের তুলনায় কিন্তু অলাভের পরিমাণটা বেশী। তার কারণ, আমাদের রাগ-রাগিনীর গড়নই হচ্ছে প্রহর এবং ঋতুর মেজাজ ধরে ধরে। সকালের রাগ এক মেজাজের, সন্ধ্যার আর এক। মাঝরাতের জন্যে যে রাগ রয়েছে, দুপুরে সেটা চলে না, এমন কি সন্ধ্যা আটটার যে রাগ, রাত এগারটায় তা মানায় না এবং আবহাওয়াতেও তা খোলে না। রাত একটায় যদি আসর বন্ধ হয়, তাহলে শেষ রাতের এবং ভোরের রাগ শোনার আর উপায় থাকে না, এবং সারারাত গানবাজনার আসর যদি বন্ধই হয়ে যায় তাহলে, শেষ রাতের এবং ভোরের রাগ-রাগিনীর চলও কমে যেতে বাধ্য হবে, শেষে হয়তো একদিন লুপ্তই হয়ে যাবে। এ আশঙ্কা যথেষ্টই আছে। সারা রাত ধরে গানবাজনা করা বা শোনার জন্যে যে অসুবিধা সেটা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে সংগীত সম্মিলনীর সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করা থেকেই—শ্রোতাদের পক্ষে একটার পর একটা সম্মিলনীতে রাতের পর রাত জেগে জেগে ক্লান্ত দেহমন নিয়ে সংগীত ভালভাবে উপভোগ করাও যায় না, আর শিল্পীদের পক্ষেও রাতের পর রাত জেগে তেমনভাবে প্রাণখুলে সংগীত পরিবেশনও হয়ে ওঠে না। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, রাগ-রাগিনীর সৃষ্টি কিন্তু সংগীত সম্মিলনীর মুখ চেয়ে হয়নি। কাজেই সংগীত সম্মিলনীর বাঁধা ধরা সময় অনুযায়ী রাগ-রাগিনীর বাছাইও সীমাবদ্ধ করে রাখা চলতে পারে না।

* * *

শুদ্ধভাবে একটা রাগ গাইতে বা বাজাতে অনেক সময়ের দরকার হয় না, কিন্তু একটা রাগের মাধুর্য খোলে রকমারি ছন্দ তুলে তুলে তাকে বিস্তৃত করার বাহাদুরীর ওপর। গাইয়ে বা বাজিয়ের ওস্তাদীর পরিচয় বিস্তার সাধনের ক্ষমতার ওপরই নিবদ্ধ। আর ভালভাবে বিস্তার করতে সময় অনেকখানিই দরকার হয়ে পড়ে এবং বাঁধা ধরা সময়ের মধ্যে তা সম্পন্ন হবার নয়। সেদিন নিউ এম্পায়ারে পণ্ডিত রবিশংকরের বাজনা শুনতে শুনতে এটা বেশ উপলব্ধি করা গেল। সম্প্রতি তিনি দশ মাস ইউরোপ ও আমেরিকায় তার বাজনা শুনিয়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে দেশে ফিরেছেন। বিদেশে তিনি যেভাবে আসর করে এসেছেন, এখানকার অনুষ্ঠানেও তিনি তা অনুসরণ করেন। এখানে বলে রাখা ভাল যে, সারা রাত আসর চালানোর যাঁরা বিরোধী পণ্ডিত রবিশংকর তাঁদের অন্যতম। তিনি বলেন যে, মাঝ রাতে, কি শেষ রাতে আসরে গিয়ে

গত রবিবার নিউ এম্পায়ারে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতির প্রযোজনায় পরিবেশিত নৃত্যনাট্য ভানু সিংহ ও বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি দৃশ্য

বসলে বাজাবার তখন আর মেজাজ থাকে না। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, আমাদের দেশে সংগীতের আসর চিরকালই সারা রাত ধরেই চলে আসছে এবং অতি বৃদ্ধ শিল্পীকে মাঝ রাতে বা শেষ রাতে এসে বেশ মেজাজের সংগেই কাজ করে যেতে দেখা গিয়েছে। গানবাজনার ধারাটাই আমাদের দেশে এমন যে, শিক্ষালাভ করার সংগে সংগেই সারা রাতের ধকল সহ্য করার ক্ষমতাও শিল্পীরা আয়ত্তে নিয়ে আসেন, কারণ গানবাজনার আসরের প্রশস্ত সময়টাই হচ্ছে রাত্রিকাল, রাত না হলে জমেও না। আর যতো রাগরাগিনী আছে তার অধিকাংশই রচিত রাতের প্রহর ধরে। পন্ডিত রবিশংকর গত ৫ই তারিখে নিউ এম্পায়ারে যে আসর করলেন, তাতে তিনি বাজনার অনুষ্ঠান করেন দুবার। একবার সন্ধ্যা ছটা থেকে এবং দ্বিতীয়বার রাত সওয়া ন'টা থেকে। দেখা গেল তিনিও প্রহর অনুসারেই রাগ নির্বাচন করে রেখেছেন। যেমন সন্ধ্যার আসরে গোড়াতেই বাজালেন ভীমপলশ্রী, তারপর পুরিয়া কল্যাণ, আভোগী ও মিশ্র পিলু। রাতের অনুষ্ঠানেও তেমনি প্রহর মিলিয়েই তিনি রাগ বাজান, যথা প্রথমে মারুবেহাগ, তারপর দেশ-মল্লার, দরবারি ও মাঝ-খাম্বাজ। এইভাবে প্রহরের সংগে মিল রেখে রাগের নির্বাচন করতে তিনি বাধ্য হয়েছেন, তা না হলে রাগের মেজাজ খুলতে পারে না। সন্ধ্যায় ভৈরবী, কি দুপুরে দরবারি চলে না। কোন ওস্তাদই তা চালাতেও চাইবেন না। পন্ডিত রবিশঙ্করের এক একটি আসর চলে ঘণ্টা আড়াই ধরে, অর্থাৎ মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি আটটি রাগ পরিবেশন করেন। পন্ডিত রবিশংকর যে মহান কৃতিশিল্পী তা তার প্রত্যেকটি রাগের পরিবেশনের মধ্যেই পাওয়া গেল খুব চমৎকারভাবেই। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক একটি রাগ বাজানো সম্পন্ন করার মধ্যে তৃপ্তি যেন অপূর্ণ থেকে যায়। রাগের তিনি কাঠামোগুলোই সামনে তুলে ধরেন, কিন্তু সুরের ও ছন্দের রকমারিতায় রাগের অলংকারময় অংগ পূর্ণাবয়বে পাওয়া গেল না। হিন্দুস্থানী গানবাজনার ভক্ত রসিকজন অতো অল্পতে কিছুতেই খুসী হতে পারেন না। তবে এটা চলে বিদেশীদের কাছে পরিবেশন করতে গেলে। দুটি আসরে তিনি প্রহর অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রাগ বাজালেন, ফলে প্রথম আসরের শ্রোতারা যা পেলেন, দ্বিতীয় আসরের শ্রোতারা তা থেকে বঞ্চিত হলেন, তেমনি বঞ্চিত হলেন আবার প্রথম আসরের শ্রোতারাও। একজন শিল্পীকে নিয়ে পাশ্চাত্ত্যে কনসার্ট অনুষ্ঠানের যে ধরণ প্রচলিত, ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে তা চলে না। কারণ, পাশ্চাত্ত্য সংগীত একই শিল্পী দিনের মধ্যে তিনবার আসর করলে প্রতিবারই একই জিনিস পরিবেশন করতে পারেন, ভারতীয় সংগীতে তা হতে পারে না,—আসরের প্রহর অনুযায়ী প্রতিবারই রাগ বদল করতেই হবে। আমাদের দেশে তাই কেমন গাইলেন বা বাজালেন, সে প্রশ্নের আগে আসে কি রাগ বাজালেন বা কি রাগ গাইলেন। সুতরাং একজন পর পর দুটো আসর করলে একটা আসরের শ্রোতা অপর আসরের রস উপভোগে বঞ্চিত হন। শ্রোতাদের এ ক্ষতিপূরণের কি ব্যবস্থা হতে পারে?

* * *

আসলে যতো ঝামেলার সৃষ্টি হচ্ছে সংগীত সাম্মিলনীর সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়। আগেকার দিনে বছরে দু তিনটি

সম্মিলনী হতো, কাজেই শিল্পীরা ক্লান্ত হতেন কম। এখন গানের মরশুম চলতে থাকলে মাস চার পাঁচ তাদের সপ্তাহে দু তিন দিন সারা রাত ধরে ক্লান্তি ভোগ করতে হয়। এ থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে শিল্পীরা যদি কমসংখ্যক সম্মিলনীতে যোগদান করেন। তা নয় তো সারা রাতের অনুষ্ঠান একেবারে বাতিল করে দেওয়া বা বিলিতী কনসার্ট ধরনে একই শিল্পীকে দিয়ে পর পর কয়েকটি আসর করানো, অথবা গানবাজনার সময় বেঁধে দেওয়া, এর কোনটিই ভারতীয় সংগীত পরিবেশন ক্ষেত্রে খাটানো যায় না। তবে চলে কেবলমাত্র বিদেশীদের কাছে, অথবা সংগীত শোনায় যারা অনভ্যস্ত তাদের সামনে পরিবেশন করতে।

চিত্রালোচনা

আলোচনা করার মতো ছবি নেই বললে বোঝায় গত সপ্তাহে নতুন কোন ছবি তা হলে মুক্তিলাভ করেনি। ঠিক তা নয়। গত সপ্তাহে বাঙলা কোন ছবি অবশ্য মুক্তি পায়নি, তবে দুখানি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করে "আগ্রা রোড", আর "চণ্ডীপুজা"। কিন্তু দুখানিই এমন সব উপকরণের সমাবেশে তৈরী যে, ওদের সম্পর্কে নতুন কথা কিছুই বলা যায় না। যেমন হয় সাধারণ বোম্বাই ছবি এরা ঠিক তাই। প্রশংসা ও অপ্রশংসার যা কিছু আছে সে সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলবার বা বোঝাবার নেই। "আগ্রা রোড" সামাজিক ছবি, অর্থাৎ বম্বের ভাষ্যে ক্রাইম-ড্রামা হতেই হবে, আর উপাদানও সব চড়া ঝাঁঝের সেই রকমই। 'নও দো গ্যারাহ'র অনুসৃতি পদে পদে। রবীন্দ্র দাভে ছবিখানির প্রযোজক ও পরিচালক। প্রধান চরিত্রে আছেন বিজয় আনন্দ, ভগবান, অমরনাথ, সতীশ ব্যাস, বেবি নন্দা প্রভৃতি। ঠিক পুজোর মুখেই "চণ্ডীপুজো"র আবির্ভাব হলেও ছবিখানি ভক্তিপ্রবণ লোকের কাছে যতো না আদরণীয় হোক, অবাককাণ্ড দেখবার জন্য স্টাণ্ট ছবির ভক্তদের কাছে উপভোগ্য হতে পারে। বহু বছর পর শান্তা আপ্তেকে আবার দেখা গেল হিন্দী ছবিতে এর মুখ্য চরিত্রটির অভিনয়ে। তা ছাড়া অভিনয়ে আর আছেন মনোহর দেশাই, প্রেম আদীব, সপ্রু, নিরূপা রায় প্রভৃতি। রমণ বি দেশাই ছবিখানি পরিচালনা করেছেন।

সঙ্গীত-নৃত্য

তানসেন সংগীত সম্মেলন

যে সময়ের যা, তা মেনে না চললে যে কি অবস্থা হয়, এবারের তানসেন সংগীত সম্মেলন তার দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো। আগে সংগীত সম্মেলন হতো ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে। সম্মেলন সংখ্যায় বেড়ে যেতে থাকায় সময় এগোতে এগোতে এখন এদিকে সেপ্টেম্বর, আর ওদিকে এপ্রিল পর্যন্ত
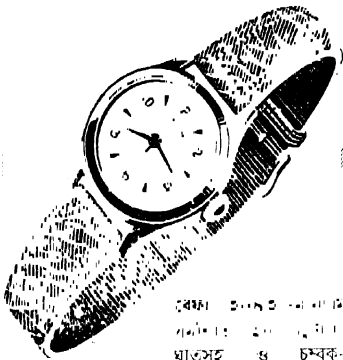
ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ আগে যেখানে মাস দুয়ের মধ্যেই সব কটি সম্মেলন চুকে যেতো, এখন তার জায়গায় দাঁড়িয়েছে আট মাস। তার ওপর হয়েছে রেষারেষি। এবার সম্ভবত সর্বপ্রথম অধিবেশন করার কৃতিত্ব নেবার জন্যই তানসেন সংগীত সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ সম্মেলন এগিয়ে এনে ফেলেন একেবারে সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই। যা শীত বা বসন্তকালের জিনিস তাকে আটাশ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপের মধ্যে এনে ফেললে রাগ রাগিনীরও গা বেয়ে ঘাম গড়াবার কথা। হলোও তাই, শিল্পীরাও যেমন ঘর্মাক্ত, তেমনি শ্রোতাদের মধ্যে গরমের হাঁসফাঁস। ৬ই থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চারদিনে এরা এবার পাঁচটি অধিবেশন রেখেছিলেন, কিন্তু জমলো না মোটে। চারদিনের পক্ষে শিল্পী সমাবেশ যদিও ভালই ছিল, যেমন পণ্ডিত ওঙ্করনাথ ঠাকুর, আলি আকবর খান, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিসকুমার, যতীন ভট্টাচার্য, বিনায়ক পট্টবর্ধন, রতনবাঈ, তারাবাঈ, মুকুন্দ কার্লাভিং (গোয়ালিয়র), ইভা কপকাট (বোম্বে), সারদাবাঈ ধুলেকর (বোম্বে), পদ্মাবতী গোখলে (কোলাপুর), পণ্ডিত প্রাণনাথ (লাহোর), অনোখেলাল, আবদুল করিম (বোম্বে) প্রভৃতি এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে শ্যাম গাঙ্গুলী, চিন্ময় লাহিড়ী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকণা ধর চৌধুরী, দবীর খাঁ, কল্যাণী রায়, মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছানু গাঙ্গুলী, প্রতিমা বসু প্রভৃতি। এদের মধ্যে এবার কলকাতায় প্রথম এলেন এমন শিল্পীও রয়েছেন। তবে অন্যান্য বার অধিবেশনসূচী আকর্ষণীয় করার জন্য যেমন শিল্পী সমাবেশ হয়ে এসেছে, এবারে যে কারণেই হোক, তা হয়নি। তানসেন সংগীত সম্মেলন গত দশ বছরের মধ্যে বেশ নাম করে নিয়েছে এবং আজকের কলকাতার বড়ো পাঁচটি

এবার তানসেন সংগীত সম্মেলনে কথক নৃত্যে প্রশংসা অর্জন করেন মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্মেলনের অন্যতম বলে পরিগণিত। একটা প্রতিষ্ঠা আছে এ সম্মেলনের, কিন্তু এবারের ব্যাপার দেখে নিরাশ হতে হয়েছে। অবহেলাটা বেশী দেখা গেল শিল্পী নির্বাচনেই। বাইরের শিল্পী হলেই ভালো শিল্পী হবেই এবং তার নামে শ্রোতাদের আকর্ষণ করা যাবে, তা হয় না। অন্যবার তানসেন সম্মেলন একটা সাড়া জাগিয়ে তোলে, কিন্তু এবার যেমন অকালে আরম্ভ হয়েছে তেমনি নিঃসাড়ে চলে যেতে হয়েছে। এমন রেষারেষি না করলেই কি নয়!

* * *

২২শে সেপ্টেম্বর বিশ্বরূপাতে "ক্ষুধার" শততম অভিনয় উপলক্ষ্যে একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে। এই সঙ্গে বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানি ও শান্তি গুপ্তা, যারা বিশ্বজয়ী ছবি "অপরাজিত"র ভূমিকালিপিভুক্ত ছিলেন, তাঁদেরও সম্বর্ধনা জানানো হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ, প্রধান অতিথি হবেন চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, উদ্বোধন করবেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং শিল্পীদের সম্বর্ধনা জানাবেন অহীন্দ্র চৌধুরী।

* * *

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর মার্বেল প্যালেসে রবীন্দ্রসংগীত সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নটি মূল গান ও তদাদর্শে রচিত নটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রফুল্লকুমার দাস।

খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের হাতাহাতি

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে লীগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং এবং জর্জ টেলিগ্রাফ দলের খেলায় কলঙ্ক-মলিন ঘটনা কলকাতার ক্লেদপুঞ্জীভূত ফুটবল ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। সামগ্রিকভাবে আই এফ এ শীল্ডের খেলা পর্যালোচনা করা আমার এ সপ্তাহের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। পরের সপ্তাহে আই এফ এ শীল্ডের খেলা নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু এর মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং ও জর্জ টেলিগ্রাফ দলের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় এমন এক ঘটনা ঘটে গেছে যা সদ্যসদ্যই আলোচনার প্রয়োজন।

কলকাতার ফুটবল খেলার মাঠে সমর্থকপুষ্ট কয়েকটি ক্লাবের খেলায় দর্শক ও সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের বহু ঘটনা ইতিপূর্বে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। পুলিসের চোখের সামনে রেফারীকে প্রহার করতে দেখেছি, শান্তিকামী দর্শকের মাথা ফাটতে দেখেছি, দিনের আলোয় দেখেছি ক্লাব-তাঁবু তচনচ হতে। এই সেদিনও

একলব্য

এসপ্ল্যানেড ও চৌরঙ্গী এলাকায় ফুটবল মাঠের উত্তেজিত ও মারমুখী দর্শককে প্রশমিত করবার জন্য পুলিস বাহিনীকে কাঁদুনে গ্যাস ছাড়তে আর লাঠি চালাতে দেখেছি। ফুটবল খেলার ব্যাপারে আরও কত অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হতে দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহমেডান স্পোর্টিং ও জর্জ টেলিগ্রাফ দলের খেলার অপ্রীতিকর ঘটনা কিছুটা অভিনব। এইদিন দর্শক সমর্থকদের মধ্যে অবশ্য তেমন উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়নি। খেলোয়াড়রাই চরম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়েছেন খেলা ছেড়ে মাঠের মধ্যে মারামারি আরম্ভ করে। নির্দিষ্ট ৭০ মিনিট সময়ের মধ্যে জর্জ টেলিগ্রাফ এবং মহমেডান দুই দলই একটি করে গোল করায় অতিরিক্ত সময় খেলান হয়। অতিরিক্ত সময়ে মহমেডান দল আরও দুইটি গোল করে জয়লাভের পথ সুগম করে রাখে। তারপর সমাপ্তির দুই মিনিট বাকি থাকতে মাঠের মধ্যে আরম্ভ হয় খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে হাতাহাতি সংগ্রাম। মহমেডান দলের একজন খেলোয়াড়কেই প্রথম টেলিগ্রাফ দলের একজন খেলোয়াড়ের উপর অহেতুক হামলা করতে দেখা যায়। টেলিগ্রাফের অপর একজন খেলোয়াড়ও মহমেডান দলের খেলোয়াড়ের উপর হামলা আরম্ভ করতে কসুর করেন না। সঙ্গে সঙ্গে দুই দলের প্রায় সমস্ত খেলোয়াড়ই পাইকারী মারামারির মধ্যে লিপ্ত হন। খেলা মাথায় ওঠে, মাঠের মধ্যে আরম্ভ হয় খেলোয়াড়দের খণ্ডযুদ্ধ। পুলিস বাহিনী নির্বাক দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। খেলার পরিচালক, মাঠের মধ্যে যিনি সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী, তিনি স্থাণুবৎ মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। মহমেডান দলের কতিপয় সমর্থক মাঠে প্রবেশ করে মারামারিতে অংশ গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। কিছু সময় অবাধ হাতাহাতি এবং লাথালাথি সংগ্রামের পর রেফারীর সম্বিৎ ফিরে আসে। তিনি মাঠের মধ্যে পুলিস আহ্বান করেন। আর কতিপয় শান্তিকামী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় মারামারি বন্ধ হয়। এখানে বলা প্রয়োজন মহমেডান দলের অধিনায়ক সালাম, যিনি এবার ভেটারেন্স ক্লাবের নির্বাচনে বছরের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি এবং মহমেডান দলের প্রাক্তন অধিনায়ক আবিদ কোন সময় মারামারির মধ্যে লিপ্ত হননি এবং গোলমালের মধ্যে সব সময়ই নিজ দলের এবং প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের প্রশমিত করবার চেষ্টা করেছেন।
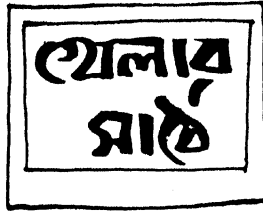
কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, খেলার পরিচালক রমেন বাগচী, যিনি এই বছরই লীগের একটি খেলায় সাধারণ ধরনের ফাউল করবার অপরাধে জর্জ টেলিগ্রাফের একজন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিয়েছিলেন তিনি এইদিন খেলোয়াড়দের পাইকিরি মারামারির পর কোন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করা দূরের কথা, কাউকে সতর্ক করে দেবারও প্রয়োজন বোধ করেন না এবং দ্বিধাহীন চিত্তে পুনরায় খেলাটি আরম্ভ করেন। যথারীতি খেলাটি শেষ হয়, খেলার ফলাফলও বহাল থাকে। মারামারির ফলে কয়েকজন খেলোয়াড় অল্পবিস্তর আহত হন। জর্জ টেলিগ্রাফ দলের দুইজন খেলোয়াড়ের আঘাত ভয়ের কারণ হয়। রাইট আউট টি রায়ের চোখের নীচে

গভীর ক্ষত হওয়ায় প্রাথমিক শুশ্রুষার পর তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

লীগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান দল এইদিন জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে আদৌ খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেনি। খেলা আরম্ভের পর ১৯ মিনিটের সময় টেলিগ্রাফ দলই প্রথম একটি গোল করে বিশ্রাম সময়ে ১—০ গোলে এগিয়ে থাকে। আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও মহমেডান দল সহজে গোল শোধ করতে পারে না। খেলাটি শেষ হতে যখন মাত্র ৩ মিনিট বাকি, তখন তারা গোলটি পরিশোধ করে পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পায়। সঙ্গে সঙ্গে পায় অতিরিক্ত সময় খেলার সুযোগ। আর অতিরিক্ত সময়ে আরও দুইটি গোল করে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

প্রথম থেকেই খেলার মধ্যে খুচখাচ ফাউল চলছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে কয়েকজন খেলোয়াড়কে অন্যায় এবং অহেতুক ফাউলেরও আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখা যায়। প্রথমার্ধে রেফারীও দুই দলের দুইজন খেলোয়াড়কে 'সতর্ক' করে দেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যিনি ফাউলের জন্য খেলোয়াড়কে সতর্ক করবার প্রয়োজন বোধ করলেন তিনি মারামারির জন্য কাউকেই সতর্ক করলেন না। যেখানে মাঠের মধ্যে কটুকাটব্য উক্তির জন্য খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেবার জন্য রেফারীর উপর ফুটবল আইন সীমাহীন ক্ষমতা দিয়েছে সেখানে মারামারির জন্য যদি কোন খেলোয়াড়কে শাস্তি দেওয়া না হয়, তবে তার পরিণতি যা হওয়া উচিত কলকাতার ফুটবলের আজ সেই পরিণতি।

এর আগে মহমেডান স্পোর্টিং ও হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবের লীগের খেলায় মহমেডান দলের একজন খেলোয়াড় সহসা মাঠের মধ্যে 'দিগম্বর' হয়ে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করা সত্ত্বেও আর একজন রেফারী তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। এমন কি, আই এফ এ-র কাছে এই গোলযোগপূর্ণ খেলার যে বিবরণী রেফারী প্রেরণ করেছিলেন তার মধ্যেও এই কুৎসিত ঘটনার কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। অথচ ব্যাপারটি যে সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি কম হ'লেও আই এফ এ-র পরিচালকমণ্ডলী খেলার সময় মাঠের মধ্যে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীর জন্য দোষী খেলোয়াড়কে দুই দিনের জন্য 'সাসপেন্ড' করেছিলেন। তাছাড়া, মাঠের হাজার হাজার দর্শকও চোখ বুজে ছিলেন না। সকলেরই ব্যাপারটা চোখে পড়লো, ঘটনা চোখে পড়লো না শুধু রেফারীর।

ইস্টবেঙ্গল ও জর্জ টেলিগ্রাফের আর একটি লীগের খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফের একজন খেলোয়াড় ইস্টবেঙ্গলের একজন খেলোয়াড়কে অহেতুক ঘুষি মেরেও রেফারী কর্তৃক সতর্কিত বা মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হননি। আবার এই সেদিনও আই এফ এ শীল্ডের তৃতীয় রাউণ্ডের একটি খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফের সেণ্টার ফরোয়ার্ড কে জামান হাত দিয়ে চাপড়ে বল নিয়ে গিয়ে সেই বলে গোল করে নিজের 'হ্যাট্‌ট্রিক' করবার কৃতিত্বের সঙ্গে টেলিগ্রাফ দলকেও বিজয়ী করেছেন। কারণ এই গোলেই খেলার জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে। রেফারীর মারাত্মক ভুলের ফলে মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ার্স গ্রুপ দলকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে আই এফ এ শীল্ডের খেলা থেকে। এসব ঘটনায় রেফারীরাও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যেমন কোনদিন শাস্তি পাননি তেমন খেলার মাঠে অন্যায় আচরণের জন্য দোষী খেলোয়াড়রাও শাস্তি না পেয়ে পেয়েছেন প্রশ্রয়। ফলে খেলার মাঠ প্রায় অরাজকতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কর্তব্যে অবহেলার জন্য রেফারীর প্রতি যদি শাস্তির ব্যবস্থা থাকতো তবে রেফারীরাও এভাবে কর্তব্যের অবহেলা করতে পারতেন না। ফুটবল আইনে দোষী খেলোয়াড়ের উপর যেমন শাস্তির বিধান আছে, তেমন কর্তব্য-কার্যে অবহেলার জন্য রেফারীর বিরুদ্ধেও আছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের বিধান। কিন্তু আই এফ এ-র পরিচালনার ইতিহাসে আছে সমস্ত বিধানবহির্ভূত কাজ করবার অযুত উদাহরণ। এই কলকাতার ফুটবল খেলায় খেলোয়াড় ও ক্লাবের প্রতি কড়া ব্যবস্থা অবলম্বনের কতবার কত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। মুখ চেয়ে মন-রেখে কোনভাবে জোড়াতালি দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের মীমাংসা করা হয়েছে। আর রেফারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বাঙলার ফুটবল কোম্পানীর ডিরেক্টররা আজ পর্যন্ত বোধ

করি চিন্তাই করেননি। অথচ ফুটবল আইনের সুস্পষ্ট বিধান।

...."a Referee who fails to report misconduct which came under his notice may be suspended, if it is proved to the satisfaction of the council that the case of misconduct should have been further investigated."....

REFEREES' CHART: Law-5

অর্থাৎ "মাঠের মধ্যে খেলোয়াড়দের অভদ্র আচরণের কোন ঘটনা রেফারীর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি যদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে তার বিবরণ পেশ না করেন এবং সেই অভদ্র আচরণ সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি আরও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তবে রেফারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করা যেতে পারে।"

রেফারীর দুর্বল পরিচালনা এবং তাদের পরিচালনার ত্রুটি-বিচ্যুতি যে কলকাতার ফুটবল মাঠের গোলযোগের এক প্রধান কারণ, আশা করি এ কথা সবাই স্বীকার করবেন। মারাত্মক ফাউলের অপরাধে অপরাধী এবং অসৎ আচরণের জন্য দোষী খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেবার পর সেই খেলা নিয়ে গোলমাল হয়েছে, এমন নজির নেই। কিন্তু দোষী খেলোয়াড়ের অপরাধকে প্রশ্রয় দেবার ফলে গোলমাল আরও বেড়ে চলছে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। আই এফ এর দুর্বল নীতিও এর জন্য কম দায়ী নয়। কালেভদ্রে রেফারী কোন খেলোয়াড়কে অন্যায় আচরণের জন্য মাঠ থেকে বের করে দিলে আই এফ এ অত্যন্ত লঘুভাবেই তার বিচার করেন। হয় সতর্ক করে ছেড়ে দেন, না হয় এক সপ্তাহের জন্য সাসপেন্ড করেন। তার পরের খেলার তারিখে দেখা যায় আগেই এক সপ্তাহ অতীত হয়ে গেছে। এক বছর বা দুই বছরের জন্য মারাত্মক অপরাধে খেলোয়াড়কে সাসপেন্ড করলে অন্য খেলোয়াড় আর মারাত্মক অপরাধ করবার সাহস পান না।

আই এফ এর আরও দুর্বলতা আছে। মহমেডান স্পোর্টিং আর জর্জ টেলিগ্রাফ দলের চ্যারিটি খেলার কথাই ধরা যাক। এই খেলায় আই এফ এর সম্পাদক সহ প্রায় সকল কর্মকর্তাই উপস্থিত ছিলেন। তাদের চোখের সামনেই দুই দলের খেলোয়াড় খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে; রেফারীর নিষ্ক্রিয়তাও তাদের দৃষ্টি এড়ায়নি অথচ তারা চুপ করেই বসে আছেন। ভবিষ্যতে আবারও খেলোয়াড়রা তাদের চোখের সামনে মারামারি করবেন, রেফারীকেও আর একটি চ্যারিটি ম্যাচের পরিচালনা ভার দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। ফুটবল খেলার পরিচালক সংস্থার এই যদি হাল হয় তবে আর ময়দানের আবহাওয়া কলুষমুক্ত হবার আশা কোথায়!

অর্থনৈতিক কারণও এই সব অপ্রীতিকর ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কারো কারো কানে কটু লাগলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি। জর্জ টেলিগ্রাফের কাছে মহমেডান দলের পরাজয় ঘটলে অর্থাগমের দিক দিয়ে আই এফ একে যথেষ্টই ক্ষতি স্বীকার করতে হত। আই এফ এর পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের প্রতিবাদেই শক্তিশালী রাজস্থান ক্লাব এবার শীল্ডের খেলায় অংশগ্রহণ করেনি। তারপর জনপ্রিয় ক্লাব মোহনবাগানকেও তৃতীয় রাউণ্ডে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। সুতরাং এই দুটি ক্লাবের খেলা থেকে অর্থাগমের সম্ভাবনা আগেই তিরোহিত হয়ে গেছে। এর উপর লীগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং, যদি পরাজিত হয় বা কোন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে খেলতে অস্বীকার করে তবে খুবই ভয়ের কথা। সুতরাং তাদের কিছু অন্যায় আচরণ, কিছুটা আবদার সহ্য করতে হবে বৈকি।

এই খেলারই খুব ছোট্ট একটি বিষয় অনেকের কাছেই বিষদৃশ ঠেকেছে। চ্যারিটি ম্যাচের প্রথম দিনে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হলে অতিরিক্ত সময় খেলার নজির নেই। অথচ মহমেডান স্পোর্টিং ও জর্জ টেলিগ্রাফের আলোচ্য খেলাটি টেলিগ্রাফ দলের আপত্তি সত্ত্বেও অতিরিক্ত সময়ে টেনে নেওয়া হল। স্বয়ং আই এফ এ সম্পাদককেও অতিরিক্ত সময়ের খেলার ব্যবস্থার জন্য তদ্বির তাগাদা করতে দেখা গেল। কেন? আই এফ এর হাতে তো অফুরন্ত সময় ছিল। আর একদিনও তো খেলার ব্যবস্থা করা যেত।

আরও একটা ছোট্ট ঘটনা খেলার শেষে জর্জ টেলিগ্রাফ দল এই খেলাটির ঘটনাবলীর বিবরণ এবং রেফারীর কয়েকটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আই এফ এর কাছে প্রতিবাদ করতে গেলে প্রতিবাদ জানাবার নির্দিষ্ট সময় আধ ঘণ্টা অতীত হয়ে গেছে এই কারণে প্রতিবাদ পত্র গ্রহণ

[illegible]

বলেছেন খেলায় তাদের ৪ জন খেলোয়াড় গুরুতর আহত হন। একজনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়, তারপর গুছিয়ে প্রতিবাদ পত্র লিখতেও একটু সময় লাগে। কিন্তু এই অসুবিধার কথা জানানো সত্ত্বেও আই এফ এ আইন লঙ্ঘন করে 'প্রতিবাদ পত্র' গ্রহণ করেননি। কিন্তু কথা হচ্ছে, আইনের প্রতি যদি পরাকাষ্ঠা দেখাতে হয় তবে সব ক্ষেত্রেই তা দেখানো উচিত। সুবিধা বুঝলে আইনের দোহাই পাড়বো, আর অসুবিধার বেলায়, কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগার বেলায় আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবো এ নীতি আর কতদিন চলবে?

এ বিষয়ে গভর্নমেণ্টকেও কিছু বলবার আছে। তারা স্টেডিয়াম নিয়ে মেতে উঠেছেন এবং ক্রিকেটের জন্য কেউ স্টেডিয়ামের দাবী না করলেও ক্রিকেট আর ফুটবলের 'জগাখিচুড়ী' স্টেডিয়ামের প্রশ্নে মিছামিছি আসর গরম করছেন। কিন্তু বিধানসভায় পাশ হওয়া 'স্পোর্টস বিল' যে শিকেয় উঠছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। 'স্পোর্টস বিল' কেন কার্যকরী হচ্ছে না, আর তা কার্যকরী করবার বাধা কোথায় গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে দেশবাসী তা জানবার দাবী করতে পারে।

ফুটবল মাঠের এইসব অপ্রীতিকর এবং উচ্ছৃঙ্খল ঘটনা শহরের সামাজিক আবহাওয়া কম কলুষিত করে না। এবং এর জন্য গভর্নমেণ্টেরও দায়িত্ব আছে। কিন্তু বিধানসভায় আইন পাশ করেই গভর্নমেণ্ট যদি তার কর্তব্য সম্পন্ন করা হয়েছে মনে করে বসে থাকেন তবে সে আইন কাজে পরিণত করবে কে?

* * *

কলকাতার খেলাধুলোর মধ্যে এখন ময়দানে ফুটবল আর বিভিন্ন পুকুরে ও লেকে সাঁতার। কিন্তু এর মধ্যে কলকাতার ক্রীড়ারসিকদের ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে ভারত সফরকারী আমেরিকার টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের খেলা দেখার সুযোগ ঘটেছে। আমেরিকার খেলোয়াড়রা গত ১১ই সেপ্টেম্বর কর্বিলন কাপের প্রথায় বাঙলা দলের সঙ্গে এবং পরের দিন ইনভিটেশন অর্থাৎ আমন্ত্রণ টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বাঙলার খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রথম দিন ৪টি সিঙ্গলস ও ১টি ডাবলসের খেলার মধ্যে মার্কিন খেলোয়াড়রা ৩—২ খেলায় বিজয়ী হয়। পরের দিন আমন্ত্রণ প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন বার্নার্ড বাকেট পরাজিত করেন বাঙলার খ্যাতনামা খেলোয়াড় জে এম ব্যানার্জিকে।

আমেরিকান দলে ছিলেন তিনজন খেলোয়াড়। বর্ষীয়ান খেলোয়াড় বিল সান। এঁকে দলের নন-প্লেয়িং অধিনায়ক বলা যেতে পারে। বাকী দুজন যুক্তরাষ্ট্রের চ্যাম্পিয়ান বার্নার্ড বাকেট, আর বব ফিল্ডস। বাকেটের জন্মস্থান পোল্যান্ড। কিন্তু এখন আমেরিকার অধিবাসী। বয়স ৩৭ বছর। ফিল্ডস একজন উঠতি খেলোয়াড়। বয়স মাত্র ১৭ বছর। প্যাসিফিক কোস্টের টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন।

বাকেট এবং ফিল্ডস দুজনেই জাপানী খেলোয়াড়দের মত 'স্পঞ্জ' র‍্যাকেটে খেলতে অভ্যস্ত। তবে 'পেনহোল্ড গ্রিপ' নয়; শেক-হ্যাণ্ড গ্রিপ। বাকেট সত্যই একজন সুনিপুণ খেলোয়াড়। মারের চটক আছে। তবে সবই ফোরহ্যাণ্ডে। হাফ ভলি এবং প্যাসিং সট বেশ দর্শনীয়। ব্যাক হ্যাণ্ডের বালাই নেই। আত্মরক্ষায় যেমন পটু, আক্রমণাত্মক খেলাতেও তেমন মারমুখী।

বব ফিল্ডসের খেলা কিছুটা কাঁচা। স্পিনের উপরই বেশী নির্ভরশীল।

আমেরিকার টেবিল টেনিস খেলোয়াড়রা এদেশে এসেছেন 'গুডউইল মিশনে'। অর্থাৎ খেলার ভিতর দিয়ে দুই দেশের মধ্যে সখ্যতা ও সৌভ্রাতৃত্বের বাঁধন দৃঢ় করতে। সুতরাং এঁরা আমাদের সম্মানিত অতিথি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে আমেরিকান খেলোয়াড়রা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে খেলার সময় যে অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন এদেশ সফরকারী অন্য কোন খেলোয়াড় কোনদিন তেমন অখেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন কি না সন্দেহ। বহুক্ষেত্রে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এঁদের তীব্র প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে টেবিলের উপর র‍্যাকেট রেখে কোমর বেঁধেই আম্পায়ারের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। একবার আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে একটি গেমে রাগ করেই বার্নার্ড বাকেটকে হেরে যেতে দেখা গেছে। খেলার আগে বা পরে আম্পায়ারের সঙ্গে করমর্দন করার যে স্বাভাবিক রীতি বা শিষ্টাচার আছে আমেরিকান টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের সে শিষ্টাচারের বালাই নেই। আর মুখের হাসি এঁরা ভারত যাত্রার আগে হয়তো 'প্যাসিফিক ওসানে' ধুয়ে এসেছেন। আমেরিকান চ্যাম্পিয়ন বার্নার্ড বাকেটের খেলা এখানকার দর্শকদের মনে কিছুটা আনন্দ দিয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু খেলার সময় তাদের ব্যবহার দর্শক মনে এঁকে দিয়েছে এক বেদনার স্মৃতি।

দেশী সংবাদ

১০ই সেপ্টেম্বর—শ্রীনগরের সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ইঞ্জিনীয়ার ও বিশেষজ্ঞগণ গিলগিট, চিত্রল এবং কাশ্মীরের অন্যান্য সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অংশে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ঐ সকল অঞ্চলে দ্রুত সামরিক উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে।

১১ই সেপ্টেম্বর—অদ্য শ্রীনগরে জাতীয় সম্মেলনের রাজনৈতিক কর্মীসমাবেশে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন, কিভাবে গণভোট গ্রহণ করা হইবে, তাহা কাশ্মীরের সমস্যা নহে। পাকিস্থান যে আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহাই হইতেছে কাশ্মীরের সমস্যা।

জাহাজযোগে বিদেশে ভারতীয় চা-রপ্তানিকারকদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর নীতিজ্ঞান বিবর্জিত ব্যবসায়ী আছেন যাহাদের কার্যের ফলে বিদেশে ভারতীয় চায়ের ব্যবসায়ীদের উপর আস্থা শিথিল হইতেছে।

১২ই সেপ্টেম্বর—কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এ পি জৈন অদ্য লোকসভায় বলেন, কলিকাতার কেন্দ্রীয় গুদামগুলিতে প্রচুর চাউল মজুত আছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার যে চাউল দিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহার পরিমাণ হ্রাস পাইবার কোন আশঙ্কা নাই।

বোম্বাই সরকার ৪৭ শত কর্মীকে তাহাদের বেকার অবস্থায় সাহায্য দানের ব্যবস্থা হিসাবে শোলাপুরের নরসিং গিরজী মিলের ভার গ্রহণ ও পরিচালনার সিদ্ধান্ত অদ্য গ্রহণ করেন। গত ৮ই আগস্ট হইতে এই সমস্ত কর্মী কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য রাজ্য সভায় শ্রী ওয়ালীউল্লার এক জরুরী প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সরকারের বর্তমান ব্যয়-সঙ্কোচ প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান বৎসরে প্রায় ২২ কোটি টাকা সঞ্চয় হইবে।

অদ্য লোকসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকে। ১১ই নবেম্বর তারিখে পুনরায় লোকসভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১৪ই সেপ্টেম্বর—শ্রী নেহরুর সম্মানার্থ বিদেশী সংবাদদাতা-সঙ্ঘ কর্তৃক প্রদত্ত এক ভোজসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত দাবীসমূহ এবং এই সকল দাবী পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যোপযুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভাব—এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই বর্তমানে ভারতের সমস্যা।

কেরল সরকার রাজ্যের ভূমিহীন ও দুঃস্থ পরিবারবর্গের মধ্যে সরকারী জমি বণ্টনের জন্য আদেশ দিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী তাঁহার বাজেট ভাষণে আনুমানিক ৭ লক্ষ একর জমি বণ্টনের জন্য পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর—যে সব পরিকল্পনা রূপায়ণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন এবং যাহাদের কাজ ইতিপূর্বে আরম্ভ হয় নাই, তাহা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পিছাইয়া দিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন সমস্ত মন্ত্রণালয়কে জানাইয়া দিয়াছেন।

অদ্য অপরাহ্নে মনুমেন্টের পাদদেশে বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে সভানেত্রী ডাঃ শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু এম এল এ বলেন যে, এক শ্রেণীর মজুতদাররাই পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের বর্তমান অগ্নিমূল্যের জন্য দায়ী, উৎপাদনের স্বল্পতা উক্ত মূল্যবৃদ্ধির কারণ নহে।

১৮ই সেপ্টেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের ব্যাঙ্ক কর্মচারিগণ ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে যে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে কলিকাতার ব্যাঙ্ক মালিক সমিতি ও কলিকাতা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কস এসোসিয়েশন অদ্য এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অথবা দেশের গুরুতর ক্ষতি না করিয়া কর্মচারীদের দাবী পূরণ করার ক্ষমতা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের নাই।

কলিকাতার হাসপাতালসমূহে দুর্নীতি, অব্যবস্থা প্রভৃতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কর্পোরেশনের হেলথ স্ট্যান্ডিং কমিটি যে সাবকমিটি গঠন করিয়াছেন, ঐ কমিটি তাহাদের তদন্তকার্য ইতোমধ্যেই শুরু করিয়াছেন। কর্পোরেশন কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতালসমূহেই এই তদন্ত পরিচালিত হইবে।

বিদেশী সংবাদ

১০ই সেপ্টেম্বর—মার্কিন রাষ্ট্রসচিব শ্রী ডালেস অদ্য সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতে কম্যুনিস্টরা নির্বাচনে যে সীমাবদ্ধ সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহা বিবাদের সূচনা বলিয়া আমি মনে করি।

বৃটিশ শ্রমিক নেতা শ্রী বিভান অদ্য ওয়ারসতে বলেন, পশ্চিম এশিয়ায় আইসেনহাওয়ার পরিকল্পনা প্রয়োগের ফলে এমন সকল হাঙ্গামা ঘটিবে, যাহা শেষ পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পর্যবসিত হইবে।

দক্ষিণ কোরিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যরূপে গ্রহণের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ নিরাপত্তা পরিষদে দুইবার উহার 'ভিটো' অধিকার প্রয়োগ করে।

১১ই সেপ্টেম্বর—করাচীর "মর্নিং নিউজ" পত্রিকা অদ্য লিখিয়াছেন, খালের জল লইয়া ভারতের সহিত যে বিরোধ রহিয়াছে, তাহার দ্রুত সমাধানের কোন সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া পাকিস্থান মনে করে না।

"ডেইলী টেলিগ্রাফ"-এর ওয়ারসস্থিত সংবাদদাতা আজ এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, শীঘ্রই সোভিয়েট গভর্নমেণ্টে কয়েকটি পরিবর্তন ঘটিবে।

১২ই সেপ্টেম্বর—পাকিস্থান অধিকৃত কাশ্মীরের আইন-শৃঙ্খলার প্রতিদিনই অধিকতর অবনতি ঘটিতেছে। সমগ্র অঞ্চলটি একটি অস্ত্রাগার এবং পল্লীনিবাসে পরিণত হওয়ায় জনসাধারণ ক্রমেই অত্যধিক বিক্ষুব্ধ হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর—পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী শ্রীসুরাবর্দী অদ্য নারায়ণগঞ্জে বলেন, শ্রী নেহরু জানেন যে, কাশ্মীরকে ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার দিলে কাশ্মীর পাকিস্থানে যোগ দিবে।

সোভিয়েট সরকারী সরবরাহ সংস্থা 'তাস' অদ্য রাত্রে এক সংবাদে জানাইয়াছেন, সিরিয়া সীমান্তে তুরস্কের সৈন্য সমাবেশের সংবাদে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল নিকোলাই বুলগানিন তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী শ্রীআদনান মেণ্ডেরেস-এর নিকট এক পত্রে 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করিয়াছেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর—হাঙ্গেরিতে গণ-অভ্যুত্থান দমনে সোভিয়েট রাশিয়ার কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ আজ এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবের পক্ষে ৬০ এবং বিপক্ষে ১০ ভোট প্রদত্ত হয়।

হিরোশিমার সরকারী কর্তৃপক্ষ অদ্য ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে আণবিক বোমা নিক্ষেপের ফলে হিরোশিমায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার লোক মারা গিয়াছে। পূর্বে অনুমান করা হইয়াছিল যে, মৃত্যুসংখ্যা ৭৯ হাজারের বেশী হইবে না।

১৫ই সেপ্টেম্বর—চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী চৌ এন লাই অদ্য রাত্রিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছে এবং পশ্চিম এশিয়ায় আগুন জ্বালাইবার চেষ্টা করিতেছে।

দামাস্কাসের সংবাদে প্রকাশ, গণ-প্রতিরোধ সংস্থার জন্য যে সমস্ত নতুন লোক সংগ্রহ করা হইয়াছে, অদ্য সিরিয়া সেই সমস্ত লোককে সামরিক শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ করিয়াছে।

১৬ই সেপ্টেম্বর — পোলিশ-যুগোস্লাভিয়া যুক্ত ঘোষণায় বলা হয় যে, পঃ এশিয়ায় যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেখানে সিরিয়ায় অনুসৃত স্বাধীন কর্মনীতির উপর চাপ দেওয়া হইতেছে।

মিশরীয় সংবাদপত্র 'আল আহরাম' অদ্য লিখিয়াছেন, জর্ডান পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং উহার ফলে রাজা হুসেন শেষ পর্যন্ত সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার **সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ**

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা ষাণ্মাসিক ১১ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

ওঃ — কী
চোখ-ঝলসানো আলো
আঃ — আঃ !
আর্জেন্টা
কেমন
চোখ-জুড়ানো
পরিষ্কার
আলো !
PHILIPS
Argenta
PHILIPS
দোকানীকে ফিলিপ্‌স-এর
মূল্যতালিকা দেখাতে বলুন।
উচিত দামে
ফিলিপ্‌স বাতি কিনুন
ফিলিপ্‌স ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিঃ

বিনামূল্যে

আজই
রুকী
সুইটস্‌
খেয়ে দেখুন
এগুলি
খেতে
চমৎকার
RSK-2

সূচীপত্র

গ ল্প

মাসি

মূল্য ২·৫০ টাকা

পথে বিপথে

মূল্য ২·৫০ টাকা

আলোর ফুলকি

মূল্য ২·৫০ টাকা

শি ল্প ও সং স্কৃ তি

EARLY WORKS

॥ চিত্র-সংগ্রহ ॥

কাগজের মলাট ১৩·০০ টাকা

বোর্ড বাঁধাই ১৫·০০ টাকা

ভারতশিল্পে মূর্তি

মূল্য ০·৫০ টাকা

ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ

মূল্য ০·৩০ টাকা

বাংলার ব্রত

মূল্য ০·৫০ টাকা

সহজ চিত্রশিক্ষা

কাগজের মলাট ১·০০ টাকা

বোর্ড বাঁধাই ২·০০ টাকা

স্মৃ তি ক থা

ঘরোয়া

মূল্য ২·৫০ টাকা

জোড়াসাঁকোর ধারে

মূল্য ৩·৫০ টাকা

বিশ্বভারতী

৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন

কলিকাতা ৭

শারদীয় আরোগ্য। শারদীয় আরোগ্য।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জটিল তথ্য-সমৃদ্ধ রচনা কত সহজ ও সরস করে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা যায়, তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত এই সংখ্যাটি।

শারদীয় 'আরোগ্য'র বিশেষ আকর্ষণ • বড় মোটা হচ্ছেন—এবার একটু কমান • ডিপ্থিরিয়া • কাঁদুনে ছেলে • বিচিত্র হৃদয় • উৎকণ্ঠা • হাতীর পায়ে

বিষফোঁড়া • হাসপাতালের আত্মকাহিনী • নিষেধ নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

তা ছাড়া আছে নিয়মিত বিভাগগুলি : প্রশ্নোত্তর বিভাগ, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে স্মরণীয় যাঁরা, টুকরো খবর

শতাধিক পৃষ্ঠার এই অভিনব সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

আপনার সংখ্যা সংগ্রহ করুন।

৩১ ২বি ডিক্সন লেন, কলি:—১৪

(সি ৩২১১)

এর আরামপ্রদ স্নিগ্ধতা মস্তিষ্কের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে অনুভব করবেন। অনুভব করবেন রুক্ষ চুলের গোড়া পর্যন্ত এর নিবৃত্তি ঘটেছে এবং সেই জন্যেই আপনার চুলের গোড়া শক্ত এবং মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছে।

হিমানী
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-২

DESH : 40 Naye Paise
Saturady, 5th October, 1957

২৪ বর্ষ ॥ ৪৮ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ১৮ আশ্বিন ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

গান্ধী দর্শন

গান্ধীজীর প্রসঙ্গে মহামতি আইনস্টাইন একবার বলিয়াছিলেন যে, সুদূর ভবিষ্যতে লোকে যখন স্মরণ করিবে যে, যন্ত্রশাসিত, যন্ত্রচালিত যুগে এই মহাপুরুষ যন্ত্রের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়াছিলেন, যন্ত্রের সর্বময় কর্তৃত্বের উপরে মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তখন তাহারা কথাটা অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিবে—এমন কি এই মহাপুরুষের বাস্তব অস্তিত্বে অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে একটা myth বা রূপকথামাত্র মনে করিবে।

আইনস্টাইনের উক্তির মর্ম যদি বুঝিয়া থাকি, তবে বলিতে হইবে যে, এই প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক নিজেই বর্তমান যুগে গান্ধীজীর আবির্ভাবকে একটা অভাবনীয় ব্যাপার মনে করিতেন। মানুষের প্রতিভা যখন যন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত, সেই সময়ে সেই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ যন্ত্রের প্রাধান্য অস্বীকার করিতেছেন, ইতিহাসের ইহা এক বিচিত্র রহস্য।

আইনস্টাইন ইচ্ছা করিলে নিজেকে যন্ত্রের সীমানায় আবদ্ধ না রাখিয়া বর্তমান যুগের অন্যতম সংকটের প্রসঙ্গও তুলিতে পারিতেন। তিনি বলিতে পারিতেন যে, সার্বজনীন হিংসার যুগে, দুই-দুইটা প্রলয়ংকর বিশ্বযুদ্ধের যুগে, প্রতিদিন যখন আণবিক বোমা অধিকতর ভয়াবহকতার সীমায় পৌঁছাইতেছে, সেই যুগে—সার্বজনীন অহিংসার বাণীমাত্র সহায়ে যে মহাপুরুষ যুযুৎসু বিশ্বকে শান্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতে সাহস পান, সক্ষম হন—তাহা কি কম বিস্ময়কর! তাহা কি কম অবিশ্বাস্য! ভাবী যুগের লোকে যখন 'দশমন ক্ষত' এই যুগের আশ্চর্য কাহিনী পড়িবে, তখন কি অহিংসার মহাপুরুষকে একটি মনোরম পুরাণ কাহিনী মাত্র মনে করিবে না। বলিবে না কি যে, যুগধর্মবহির্ভূত এই পুরুষের ইতিহাস কবিগণের কল্পনামাত্র!
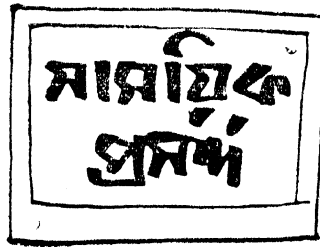
এরূপ মনে করিলে বস্তুত বিস্মিত হইবার কারণ নাই। বিচিত্র দ্বন্দ্বের সমবায়ে মানুষের ইতিহাস গঠিত। যে-বিধাতা একই যুগে রাম-রাবণকে এবং যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনকে সৃষ্টি করেন, তিনি যে যন্ত্রাসুর ও আণবিক বোমার যুগে গান্ধীজীকে সৃষ্টি করিবেন—ইহাই ত স্বাভাবিক। যেখানে শক্তিশেল, সেখানেই বিশল্যকরণী, ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। তাই বর্তমান যুগে গান্ধীজীর আবির্ভাব বিস্ময়কর নয়, সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত—এমন না ঘটিলেই বিস্ময়ের কারণ ঘটিত।

এ-যুগের লোকে গান্ধীজীর পূর্ণ মহিমা দেখিতে সমর্থ হয় নাই—তাহারা খুব কাছে আছে। আবার এ-যুগের ভারতবাসী দেশ ও কালের বিচারে এত কাছে আছে যে, তাহাদের পক্ষে গান্ধী-মহিমার বিচার বোধ করি আরও অসম্ভব। তার উপরে আমরা, ভারতবাসিগণ তৎস্থানিক ও তৎকালিক ঘষা কাচের মধ্য দিয়া তাঁহাকে দেখিতে বাধ্য হইয়াছি, অনেক গৌণ বস্তুর ক্ষণিক মেঘ আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, সংস্কারের ধূলিজাল দৃষ্টির পক্ষে অপর একটি বাধা—সমস্ত মিলিয়া আমাদের গান্ধী-দর্শন খণ্ডিত; গান্ধীবোধ অসম্পূর্ণ। জ্যোতিষ্ককে সম্যকরূপে দেখিবার জন্যে দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিত অত্যাবশ্যক—জ্যোতিষ্ক যত বৃহৎ, দূরত্বের তত বেশি আবশ্যক। কিন্তু মহাপুরুষগণ সমকালে জন্মিয়াও অসাধারণ কল্পনাবলে সেই দূরত্বের সৃষ্টি করিয়া লইতে পারিতেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইন গান্ধীজীকে সম্যক বুঝিয়াছেন। গৌতম বুদ্ধের সমকালে জন্মগ্রহণ না করাকে রবীন্দ্রনাথ সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াছেন তাঁহার ভয় সমকালে জন্মিলে গৌতমের পূর্ণ মহিমা বুঝিতে সক্ষম হইতেন না।

বারংবার বলিতে বলিতে কথার ধার পড়িয়া যায়—তখন তাহার বৈশিষ্ট্য আর অনুভূত হয় না। বর্তমানের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে গান্ধী প্রদর্শিত পথই যে একমাত্র সরণী ইহা লোকে মনে মনে অনুভব করিলেও মুখে সব সময়ে স্বীকার করিতে চায় না। না চাহিবার আসল কারণ, এ-যুগের মনের মধ্যে একটা ফাঁক আছে। লোকে শান্তি চায়—কিন্তু অহিংসা চায় না। শান্তির প্রার্থনায় যখন চারিদিক ধ্বনিত, কোথাও অহিংসার কথা শোনা যায় না। অহিংসা ব্যতীত শান্তি সম্ভব নয়। আর রাজনীতির যোগাযোগে, Tact, Treaty প্রভৃতির দ্বারা তাহা ক্ষণকালের জন্য সম্ভব হইলেও তাহা ক্ষণিকমাত্র। সেরূপ শান্তি, Peace নয় Truce মাত্র, তাহা বৃহত্তর যুদ্ধের প্রস্তুতির ভূমিকা। ইহাই ইতিহাসের রক্তাক্ষরে লিখিত সাক্ষ্য। গান্ধীজী সেরূপ শান্তি চান না, তাঁহার শান্তির বনিয়াদ অহিংসা। এই সত্যটা বর্তমান যুগে সবিনয়ে স্বীকার করিয়া লইলে প্রকৃত শান্তির অধিকারী হইতে সমর্থ হইবে। নতুবা পরিণাম শোকাবহ। তারপরে নির্মলতর ভবিষ্যতের মানুষ গান্ধী সরণীকে পুনরায় আবিষ্কার করিবে, অনুসরণ করিবে—এবং সার্থকতার

পৌঁছিবে। দূরে আছে বলিয়াই তাহারা গান্ধীকে যথার্থ কাছে পাইবে। কিন্তু আমরা যাহারা তাঁহার সমযুগে জন্মিয়াছি তাহারা সত্যই কি তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিব? ভগবান আমাদের শুভবুদ্ধি দান করুন।

প্রতিমা—লক্ষণ

মূর্তিকার-পাড়ার যে খবর কাগজে বাহির হইয়াছে তাহাতে জানা গেল, এবার দুর্গাপূজোর জন্য চিরাগত বাঙ্গালী প্রথার মূর্তিরই ফরমায়েস বেশি—গত কয়েক বছর ধরিয়া প্রতিমার নামে পাড়ায় পাড়ায় যে মূর্তি গড়ার আর্ট কম্পিটিশন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা কমিবার মুখে। এই খবর সত্য হইলে বুঝিব আমরা কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। আমরা যে সকল নয়া ধরনের মূর্তির কথা বলিতেছি তাহা আবার দুই ধরনের। একদল মূর্তিকার (বা তাহার ফরমায়েস-কারীরা) এই উপলক্ষ্যে ভারতশিল্পে তাঁহাদের জ্ঞানের নমুনা সাধারণের নিকট প্রচার করিতে চেষ্টা করেন। সকলেই জানেন ভারতবর্ষের নানাস্থানে মহিষা-সুরমর্দিনীর নানা ভাস্কর্য নিদর্শন আছে অবশ্যই শিল্পতত্ত্বের দিক দিয়া তাহার চর্চা করাও একান্ত আবশ্যক—কিন্তু উৎসব ক্ষেত্রে বিশেষত সর্বজনীন উৎসবে, দীর্ঘকাল ধরিয়া সর্বজনের নিকট মাতৃ-মূর্তির যে একটি বিশেষ রূপ ও ভঙ্গি দুর্গামূর্তির সহিত যুক্ত হইয়া বাংলাদেশে দৃঢ়মূল হইয়া আছে তাহারই অর্চনা স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত নহে কি? অনুমূর্তি যতই ভারতশিল্পসম্মত হোক (দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতির স্বতন্ত্র রক্ষিত মূর্তিও এই পর্যায়ে পড়ে) উপাসকের অন্তর্ভুক্তকে তাহা একইভাবে একই গভীরতায় স্পর্শ করে কি? অপর এক শ্রেণীর মূর্তিতে অবশ্য ভারত-শিল্পের দোহাই নাই—শোনা যায়, মূর্তিকারদের উপর ফরমায়েসকারীদের নির্দেশ থাকে অমুকের সহিত মুখের আদল আনিয়া দিতে হইবে একথা যদি সত্য হয় (মোটেই সত্য না হইবার অবকাশ কম) তবে ইহা হইতে রুচির বিকার আর কি হইতে পারে? এখন যাঁহারা প্রবীণ তাঁহাদের বাল্যকালে মনোমোহন বসুর এই রচনা ভারতবর্ষের পরবশতার চিত্ররূপে জনপ্রিয় ছিল—

> দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন।
> ছুঁচ সুতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
> দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে,
> প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
> কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।

তারপর কালের পরিবর্তন হইয়াছে—নূতন পরিপ্রেক্ষিতে সেদিনকার স্বদেশী ব্রতও নূতন রূপ লাভ করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও বলিব যে, আমরা সম্প্রতি সংবাদপত্রে জানিয়া চমৎকৃত হইলাম যে, রাশিয়া হইতে নাকি বাংলা ছাপার হরফ এদেশে আমদানী হইতেছে। বাংলা প্রকাশনের প্রসার বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা ছাপিবার মতন টাইপ বাংলা দেশের টাইপ তৈরীর কারখানাগুলি প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, আমরা এরূপ শুনি নাই।

রাশিয়ায় বাংলা ভাষার প্রভূত চর্চা হইতেছে শুনিতে পাই রবীন্দ্ররচনাবলী মূল বাংলা হইতে অনুবাদ হইতেছে—ঐ সকলই সুখের বিষয়। রাশিয়ায় মুদ্রিত রুশ পুস্তকের বাংলা বইয়ের অনুবাদ এদেশে অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে সেগুলির সাহিত্য গুণ সম্বন্ধে অবশ্য সকলে একমত হইবেন না। কিন্তু সেকালে বিদেশ হইতে একান্ত আবশ্যক অনেক বস্তু আমদানী হইতে পারিতেছে না সেকালে টাইপ আমদানীর হেতুটা কি ঘটিল স্বভাবতই তাহা জানিবার কৌতূহল হয়। বাংলা দেশের কারখানায় প্রস্তুত টাইপ হইতে কি ইহা উৎকৃষ্ট? না, সুলভ?

ইংরাজি কি অভারতীয় ভাষা?

রাষ্ট্রভাষার সমস্যা এখন দেশবাসীর সম্মুখে একটি সংকটের সৃষ্টি করিয়াছে। শিক্ষিত বাঙালী সমাজ ইংরাজিকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে রাখিবার পক্ষ-পাতী। ইংরাজী অভারতীয় ভাষা এ আপত্তি নানাজনে নানাভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় ভারতীয় নাগরিক, ইংরাজী তাঁহাদের মাতৃভাষা—ইহা নানাজনে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সম্প্রতি আর একটি যুক্তি ইংরাজীর ভারতীয়ত্বের অনুকূলে কেহ কেহ মনে করাইয়া দিয়াছেন। ইংরাজীভাষার সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত অভি-ধান Oxford Dictionaryতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার এক হাজার শব্দ গৃহীত হইয়াছে। সাকুল্য হিসাব ধরিলে ইংরাজী ভাষায় ব্যবহৃত ভারতীয় শব্দের সংখ্যা আরও অনেক বেশি হইবে। ইংরাজীকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে রক্ষা করিবার অনুকূলে অন্যান্য যুক্তির সঙ্গে এই যুক্তিটি গ্রহণ করিলে—ইংরাজীর দাবী আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রায় দুই শতকাল ধরিয়া ভারতে ব্যবহৃত ইংরাজীর ভাষার রূপটিকে "Queen's English" মনে করিলে ভুল হইবে—ইহা ইংরাজী ভাষার ভারতীয় রূপ, যেমন মার্কিন মুলুকে ব্যবহৃত ইংরাজী ভাষার মার্কিনী রূপ। বৃটেনের ইংরাজীর সঙ্গে ইহাদের যোগ মূলের রূপের নয়।

দেশকে জানুন সপ্তাহ

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে শুরু করিয়া এক সপ্তাহের জন্য "দেশকে জানুন" অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে তরুণ সমাজের ভ্রমণ স্পৃহা ও সেই সঙ্গে দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান যাহাতে বর্ধিত হয়, সেজন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। প্রদর্শনী, বক্তৃতা ও বিমান ভ্রমণের আয়োজন প্রভৃতি কর্ম-সূচীর অন্তর্গত ছিল। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুটি ছাত্রদলকে উড়িষ্যা ও বিহার ভ্রমণে পাঠানো হইয়া-ছিল বলিয়া প্রকাশ।

এই আয়োজনকে অবশ্য জরুরী একটি কাজের সূচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রয়োজনের তুলনায় এই আয়োজন ক্ষীণ। ভারতের মতো বৃহৎ ও বিচিত্র দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান বই পড়িয়া হইবার নয়—সেজন্য চোখের দেখা আবশ্যক। ছাত্রদের অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে, তাহারা নিজের খরচে দেশ ভ্রমণ করিতে পারে। অথচ তাহাদের পক্ষেই দেশের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অত্যাবশ্যক। এ হেন অবস্থায় কোন্ কোন্ ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে তাহাদের পক্ষে দেশভ্রমণের পথ সুগম তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। আপাতত একটি ব্যবস্থার কথা আমাদের মনে পড়িতেছে। পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার, পদক ও অর্থদানের ব্যবস্থা অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। কৃতী ছাত্রদের দেশ ভ্রমণের জন্য অর্থদান করা যাইতে পারে। দুইশত টাকাতে আজ-কার দিনেও তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিলে (কনসেশন না পাইবার কারণ নাই) দেশের একটি বৃহৎ অঞ্চল দেখা যাইতে পারে। এ সম্পর্কে অন্যভাবে সুযোগ সুবিধা দানের কথাও সরকারকে ভাবিতে হইবে। নিজের দেশ সম্বন্ধে যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই পরের দেশ সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতা অনিবার্য।

(সত্তর)

অনেকক্ষণ ধরে দুই চোখ অপলক করে সুরেন মানঝির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু। যেন সব নিঃশ্বাসের জোর দিয়ে একটা সন্দেহ জয় করবার চেষ্টা করছে। এ কি বলছে সুরেন? সত্যিই কি কয়লা-খাদের কাজে এত সুখ আছে?

কয়লার ধুলোতে পুরু আর কালো হয়ে গিয়েছে সুরেন মানঝির ধুতি। সেই ধুতিকে আবার একটা কালো গামছা দিয়ে শক্ত ক'রে কোমরবাঁধা করেছে। গামছার প্যাঁকের ভিতর থেকে ছোট একটা ডিবে বের করে সুরেন, এবং ডিবের ভিতর থেকে একটা সিগারেট বের ক'রে দাশুর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়—ধর দাশুদাদা। তুমি আগে পাঁচ ফুঁক দিয়ে লাও।

দাশু কিষাণের বুকের ক্লান্ত হাড়ের উপর যেন একটা নতুন বিস্ময়ের চমক ঠোকাঠুকি করে বাজতে থাকে। প্রাণপণে হিসেব করতে চেষ্টা করে দাশু—তাই তো! দুই টব মাল উঠালে যে দুই টাকা চার আনা মজুরি পাওনা হয়। সুরেন মানঝির কথাগুলিও যে এক ভয়ানক মায়াময় প্রতিশ্রুতির ডাকাত হয়ে দাশুর জীবনের অবসাদের উপর নতুন নেশার জ্বালা ছুঁড়ে মারছে। দিন দুই টাকা চার আনা রোজগার হলে যে দাশু কিষাণের এই ঘরের প্রাণটা দুই বেলা ভরপেট খাওয়ার আনন্দে আবার ঝুমুর গেয়ে উঠবে।

সুরেন মানঝির উপহার, সেই সিগারেটে দুটো লম্বা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে দাশু যেন আনমনার মত বিড়বিড় ক'রে বলে—কিন্তুক, দিন দুই টব মাল উঠাতে পারা যাবেক কি সুরেন? তুমরা কি পার?

হেসে উঠে সুরেন—তেমন তেমন দিন হলে তিন টব মাল উঠাতে পারি দাশুদাদা।

দাশু—কিন্তুক, এখনই গেলে কি উয়ারা কাজ দিবেক আমাকে?

চেঁচিয়ে ওঠে সুরেন—এখনই দিবে। রোজ নতুন মালকাটা ভর্তি করছেক কোম্পানি। তুমি ভাবছো কেনে?

দাশু—আগাম কিছু দিবেক কি কোম্পানি?

সুরেন—না, আগাম লিবার দরকারও হয় না দাশুদাদা। হপ্তা পুরা হয়েছে কি পুরা সাতটি দিনের মজুরী হিসাব ক'রে হাতে হাতে নগদ নগদ দিয়ে দিবে খাজাঞ্চি।

দাশু—কিন্তুক আমার যে সাতটা দিনেরও খোরাক নাই সুরেন। আমি যাব কেমন করে, বল?

সুরেন মান্‌ঝির চোখ দুটো হঠাৎ একটু বিষণ্ণ, এবং একটু বিস্মিতও হয়।—এমন দশাটা তুমার কেনে হলো দাশুদাদা?

দাশু—কপালবাবা জানে।

সুরেন চুপ করে কি-যেন ভাবে, তারপর নিজের মনের আবেগে চেঁচিয়ে ওঠে—হুরুরু, যেইতে দাও দাশুদাদা। উসব ভাবনা এখন রাখ।...সরদারিনের হাতে কত টাকা তুমি দিয়ে যেতে চাও?

নিজের কোমরের গামছায় হাত দেয় সুরেন। তারপর এগিয়ে যেয়ে সব মানঝির কাছ থেকে একটা-দুটো করে সিকি আধুলি বা টাকা তসীল করে। এবং তখনি ফিরে এসে দাশুর হাতের কাছে এক মুঠো টাকা-সিকি-আধুলি তুলে নিয়ে সুরেন বলে—এই নাও দশটা টাকা। হপ্তা পেলেই শুধে দিও দাশুদাদা।

টাকা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু। কেউ যেন হঠাৎ এসে দাশু কিষাণের প্রাণটাকে এই মধুকুপির মাটির বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটা প্রকাণ্ড কালো কবরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। দাশু কিষাণের আত্মার অহংকার এতদিনে মাথা নীচু করে আর হাত পেতে যেন ঘুস নিচ্ছে। মধুকুপির দাশু কিষাণের জীবন কাল থেকে কয়লা খাদের মালকাটা হয়ে গাঁইতা হাতে তুলে নেবে। দাশুর বুকের ভিতরে যে সত্যিই একটা যন্ত্রণার কান্না ছটফট করে উঠতে চাইছে। চোখের কোণের জল মোছে দাশু।

সুরেন মানঝি চেঁচিয়ে ওঠে—হেই দেখ? ইটা আবার কি শুরু করলে দাশুদাদা? কাঁদ কেনে?

জামকাঠের দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে সব কথাই শুনেছিল যে মুরলী, সেই মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুরেন মানঝি এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে—হেই দেখ। সবদাদিন হাসে আর সবদাদ কাঁদে; এমনটি তো কভি দেখি নাই।

ঠিক কথা, মুরলীর মুখের উপর ছোট একটা হাসির ছায়া এতক্ষণ ধরে কে-জানে কিসের জন্য সিরসির করে কাঁপছিল। মধুকুপির কিষাণ এতদিনে মাটির লোভ ছেড়ে দিয়ে খাদের কাজে নেমে যেতে রাজী হলো। হার মেনেছে দাশু। তাই বোধ হয় হেসে উঠেছে মুরলী। সুরেন মানঝির কথায় চমকে উঠে দরজার আড়ালে সরে যায় মুরলী। এগিয়ে আসে দাশু।

মুরলীর হাতের কাছে টাকা রেখে দিয়ে দাশু বলে—চললাম মুরলী

মুরলী গম্ভীর হয়—কোথা চললে?

দাশু—জোর লেগে। আর ছেইসাটার লেগে।

মুরলী—কি বলছো তুমি?

দাশু—তু ঘরে থাক। হপ্তা পরে ঘর ফিরবো।

মুরলী—হপ্তা পরে আবার চলে যাবে তো?

দাশু—হ্যাঁ।

মুরলী—ইয়াকে ঘর করা বলে? মাগে-মরদে এমন ঘর করে?

দাশু—আগে তু বেঁইচে থাকবি, তবে তো তুর সাথে ঘর করবো।

মুরলী—ছিঃ।

দাশু—কি?

মুরলী—মানুষে এমন করে গাইতে পারে না; কিন্তুক মধুকুপির কিষাণ শুধু খোরাক দিয়ে মাগ পুষতে চায়।

দাশু—তু বিশ্বাস কর মুরলী।

মুরলী—আবার কি বিশ্বাস করতে বলছো?

দাশু—আমি মালকাটা হয়ে মরবো না রে মুরলী, আমি মধুকুপির মাটি ছেইড়ে দিব না, কভি না।

মুরলী ভ্রুকুটি করে।—পাগলপারা কথা বল কেনে?

দাশু—না। আমি টাকার লেগে যাচ্ছি। টাকা জমাবো। ফিরে আসবো। জমি কিনবো। তু বিশ্বাস কর মুরলী; আমি কিষাণ হয়ে বাঁচবো, কিষাণ হয়ে মরবো। আউশ আমন ফলাবো; রবি করবো। পাঁচ বিঘা কেনে, দশ বিঘা জমি নিয়ে ছিটাই রোপাই করবো। তু দেখে লিবি মুরলী।

—বেশ, দেখে নিব। খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে চুপ ক'রে মুরলী, আর মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তারপরেই কাঁদতে থাকে। কি কঠিন এই কিষাণের জেদ। এখনও মুরলীর মুক্তির আশা বিনাশ করবার নেশায় মত্ত হয়ে রয়েছে।

সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকা নীরব ট্রাকটা জোরে জোরে হর্ন বাজায়। সুরেন মাঝি চেঁচিয়ে ডাক দেয়—চলে এইসো দাশুদাদা।

ঘর ছেড়ে আস্তে আস্তে হেঁটে ট্রাকের দিকে, যে ট্রাকের উপর মালকাটা মালঝিদের গাঁইতাগুলি বড় বড় লোহার নখের মত হেলে দুলে চিকচিক করছে, সেই ট্রাকের দিকে চলে যায় দাশু। শুনতে পায় দাশু, ঘরের ভিতরে গুনগুনে ক'রে কাঁদছে মুরলী। শব্দটা গুনগুন ক'রে গাওয়া গানের শব্দের মত। যেন মুরলীর অদৃষ্টেরই আক্ষেপের গুঞ্জন। পাঁচ বছর আগে, দড়িবাঁধা কোমর নিয়ে পুলিশের পিছু পিছু চলে যাবার সময়েও দাশু কিষাণের পা-এর জোর এত অলস ও এত নরম হয়ে যায়নি। মনে হয়, এইবার মুরলী সত্যিই দাশু কিষাণের জীবন থেকে ভিন্ন হয়ে গেল

এজরা ব্রাদার্সের কলিয়ারি। মধুকুপির এত কাছে এই পাঁচ বছরের মধ্যে এরকম একটা কালিমাময় রাজ্য গড়ে উঠেছে, কল্পনা করতে পারেনি মধুকুপির দাশু কিষাণ। দু' ক্রোশ দূর থেকে যে খাদের চিমনির ধোঁয়াকে কালো মেঘের গুঁড়ো বলে মনে হয়, আজ একেবারে সেই চিমনির কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু, কি ভয়ানক কালো হলকার মত ধোঁয়া উগরে চলেছে চিমনিটা। চারদিকে কি অদ্ভুত ব্যস্ততা; কত রকমের শব্দ আর কত ঘরবাড়ি। সারি সারি কয়লার পাহাড় ঐদিকে দেখা যায়। সুরেন মাঝি বলে—উটা ডিপো বটে দাশুদাদা।

কয়লা খাদে কাজ চলছে দিনরাত। জোয়ার মধুকুপি সীম, সত্তর ফুট পুরু কয়লার স্তর, হাই গ্রেড কয়লার এক বিরাট ভাণ্ডার হাতের কাছে পেয়েছে এজরা ব্রাদার্স। যেমন ব্যাঙ্কার্স অর্ডার, তেমনই লোকো অর্ডার; কোম্পানীর অফিসের খাতাপত্রও প্রচুর প্রফিটের আশা ও উন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে রয়েছে। নতুন নতুন ম্যাপ নিয়ে ম্যানেজার সর্বক্ষণ ব্যস্ত। কম্পাস বাবুও ব্যস্ত। ওভারম্যান আর সর্দার দিনের শিফ্‌ট্‌ সেরে আবার রাতের শিফ্‌টে যাবার জন্য তৈরী হয়।

নিকটেই লোডিং স্টেশন। ওয়ে ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি চল্লিশ টনী জাহাজী ওয়াগন। দিনরাত ওয়াগনে কয়লা লোড করছে লোডিং ঠিকাদারের কুলির দল। তাড়া দেয় ওয়াগনের পাইলট, আর এক ঘণ্টাও ওয়াগন আটক করে রাখা সম্ভব নয়। লোডিং বাবু, লোডিং ঠিকাদার আর পাইলটের সঙ্গে তর্কাতর্কি চলে, এবং তারপর কে জানে কেমন ক'রে একটা নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

মধুকুপির কিষাণ দাশু শুধু এইসব বিচিত্রতার রূপ দেখে আর শব্দ শুনে সুরেন মাঝির সঙ্গে হেঁটে হেঁটে খাওড়ার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

এজরা ব্রাদার্সের কয়লা খাদ। একটা পিট আর দুটো ইনক্লাইন। যেতে যেতে সুরেন মাঝি বলে—হোই দেখ দাশুদাদা, উটা পিট খাদ বটে।

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখতে থাকে দাশু; খাদের মুখের ভিতর থেকে তার-বাঁধা লোহার ডুলি উঠছে আর নামছে। নামছে মানুষ, উঠছে কয়লা। কি-রকম অদ্ভুত ফোঁস-ফোঁস আর ধক্‌ধক্‌ শব্দ ছাড়ছে ডুলি খাদের মুখের কাছে একটা কলঘর। নীল রং-এর পায়জামা পরা আর মাথায় কালো কাপড়ের ফেটি বাঁধা এক একটা লোক কল-ঘরের কাছে ঘুরে বেড়ায়। সুরেন মাঝি বলে—উয়ারা খালাসী বটে, কেউ পঞ্চাশ, কেউ ষাট, কেউ আশি টাকা মাইনা পায়। উয়ারাও একদিন তুমার আমার মত দেহাতী মানুষ ছিল দাশুদাদা।

আর একটু দূরে, পর পর দুটো খাদের মুখের ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসছে কয়লার সারি সারি চলন্ত স্তূপ। সুরেন মাঝি বলে—ঐ দুটা সিঁড়ি খাদ বটে। মাল ভরা টবগাড়ি কেমন সড়সড় উঠছে নামছে দেখ।

ডিপোর কাছে পড়ে আছে কয়লার বিরাট আকারের এক একটা ঢিবি, কোন্‌টার উপর [illegible] কালো খরগোসের মত হুটোপুটি করছে কারা?

সুরেন মাঝি হাসে—পাথর বাছাই করছে ছোঁড়ারা। এক মণ বাছলে একটা ছোঁড়া দশ আনা মজুরী পাবে দাশুদাদা। ভাবছো কেনে?

দাউ দাউ ক'রে পুড়ছে ছোট ছোট কয়লার পাহাড়। দাশুর চোখের বিমূঢ়তাও যেন সেই

জ্বালার হল্কা লেগে দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে। সুরেন মানঝি বলে—রাঙী কয়লা জ্বলছে দাশুদাদা।

—সেটি কি বটে?

সুরেন—জলের দাগে দাগী রাঙী কয়লা জ্বলায়ে নরম কোক তৈয়ার হচ্ছে।

দুপাশে কয়লার ধুলো বড় বড় ঢিবি করে সাজানো। চলতে চলতে দাশুর মাথার চুল আর ভুরুর উপর কয়লার ধুলোর প্রলেপ কখন্‌ পুরু হয়ে জমে গিয়েছে তা'ও বুঝতে পারেনি দাশু।

হঠাৎ, একটা ঢিবি যেন খিল খিল করে হেসে ওঠে। —হেই মানঝি, ভাল মানুষটিকে কুথাকে নিয়ে এইলে?

সুরেন মানঝি হেসে হেসে ধমক দেয়—তাথে তুদিগের চোখ ফাটে কেনে?

আবার এক ঝলক হাসি খিল খিল করে। —মানুষটি বড় উদাস বটে? দেহাতী বটে কি?

সুরেন বলে—হ্যাঁ।

চোখ মুছে নিয়ে দেখতে থাকে দাশু, একদল মেয়ে ঝাঁটা হাতে নিয়ে কয়লার ধুলোর উপর পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে। যেন গুঁড়ো কয়লা দিয়ে তৈরী এক একটা চটুল মেয়ে-চেহারা সব লজ্জা এলোমেলো করে দিয়ে চলাচলি করছে আর হাসছে।

—ইয়ারা কে বটে সুরেন?

—ইয়ারা ময়লা কামিন। টালিতে কয়লা-গুঁড়া বোঝাই করে। ইয়ারাও রোজ মজুরি পায় বার আনা। ভাবছো কেনে?

একটা খুব লম্বা ও টানা একচালার কাছে এসে থামে সুরেন মানঝি। দেখতে পায় দাশু, এক এক জায়গায় কালো কালো পিণ্ডের মত মানুষের ধড় জড়ো হয়ে রয়েছে। ঘুমোচ্ছে মালকাটার দল

সুরেন বলে—ইটা আমাদিগের ধাওড়া বটে। কাঁচা ধাওড়া। কোম্পানী বলেছে, পাকা ধাওড়া জলদি বানাই দিবে। তখন মানঝিনদিগে আর ছেইলাগুলোকে গাঁয়ে রাখবো না দাশুদাদা।

চমকে ওঠে দাশু—কেনে সুরেন? এই কালা কয়লার নরকের মধ্যে ঘরের মানুষ-গুলোকে আনবে কেনে?

সুরেন হাসে—নরক বলো না দাশুদাদা। যেখানে দানাপানি সেখানেই ঘর। ...হাঁ চল, তুমাকে এখনি ভর্তি করাই দিয়ে গাঁইতা পাওয়াই দিব।

সুরেন মানঝির পিছু পিছু হেঁটে ঠিকেদারের অফিসঘরের কাছে এসে দাঁড়ায় দাশু। দাঁড়িয়ে আছে আরও প্রায় বিশ জন দেহাতী। দুটো ভীত চোখের করুণ দৃষ্টির সব বেদনা নিয়ে দেখতে থাকে, আর বুঝতেও পারে দাশু, এতগুলি মানুষ বোধ-হয় তারই মত দুর্ভাগ্যের যন্ত্রণায় গাঁ-এর বুকের ঠাণ্ডা মাটি, গাছের ছায়া, কাদার

গন্ধ আর সবুজ ঘাসের ছোঁয়া থেকে তাড়িত হয়ে এই কয়লার কালো গহ্বরের কাছে আত্মদান করতে এসেছে।

অফিস ঘরের সামনে ঝুড়িতে মুড়ি আর গুড় সাজিয়ে দোকান করেছে একটা লোক। দুই ঠোংগা মুড়ি আর দুই ঢেলা গুড় কিনে হাঁক দেয় সুরেন—চটপট খেয়ে নাও দাশুদাদা।

তারপর আর বেশি দেরী হয় না। এক ঘটি জল খেয়েই তৈরী হয় সুরেন, সুরেনের সংগে অফিস ঘরের ভিতরে ঢুকে নাম লেখায় দাশু। মধুকুপির দাশু কিষাণ যেন এক নিমেষের অদৃষ্টের নতুন লিখনের কৌতুকে এজরা ব্রাদার্সের মালকাটা হয়ে যায়। একটা ডিবরি, এক ছটাক কেরোসিন তেল আর গাঁইতা হাতে তুলে নিয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে চারদিকে তাকায় দাশু।

ওভারম্যান হাঁক দেয়—বাস্, আর দেরি কেন?

সরদার ডাক দেয়—সব হাজির হ্যায়?

হাঁ, সবাই হাজির আছে। সরদারের পিছু পিছু মালকাটা দলের সংগে নতুন মালকাটা দাশু কিষাণের মূর্তিও চলতে থাকে।

সুরেন বলে হাঁ, বেশ ফুর্তি নিয়ে কাজে লেইগে যাও দাশুদাদা।

দাশু—কুথাকে লিয়ে যাচ্ছে রে ভাই?

সুরেন—ডুলি খাদে নয়, সিঁড়ি খাদে। হুড়বড় করে নেমে যাও, ঝপাঝপ গাঁইতা মার, টব ভর্তি কর। বাস্, ভাবছো কেনে?

কেরোসিনের ডিবরি হাতে ঝুলিয়ে আর গাঁইতা কাঁধে নিয়ে মালকাটা দলের হল্লা-হাসির সংগে একটা নীরব গম্ভীরতার মত হেঁটে হেঁটে যখন সিঁড়ি খাদের মুখের কাছে এসে থামে দাশু, তখন কেঁপে ওঠে বুকটা। গাঁইতা ডিবরি ফেলে দিয়ে সেই মুহূর্তে পালিয়ে যাবার জন্য পা দুটো ছটফট করে ওঠে। যেন হাঁ করে রয়েছে একটা ঘুটঘুটে কালো এক অন্ধ দানবের প্রকাণ্ড মুখ। কে জানে কত নীচে কোন্ ভয়ানক অন্ধ-কারের মধ্যে চলিয়ে গিয়েছে এই মরণের সুড়ঙ্গ। যে মাটির উপরটা এত সুন্দর, সে মাটির ভিতরটা এত কুৎসিত, কোন দিন কল্পনাও করতে পারেনি দাশু। কিন্তু কি আশ্চর্য, সুরেন মান্ঝি বলে এই কুৎসিত সুড়ঙ্গের ভিতরে নাকি পয়সা ছড়ানো আছে।

ডিবরি জ্বালে মালকাটার দল। দাশুও কাঁপা হাতে ডিবরি জ্বালে। তারপর, আবার চলতে শুরু করে। ডাইনে বাঁয়ে আর মাথার উপরে কালো-কালো কাটাছাঁটা নিরেট পাথর

তার উপর নিজেরই প্রকাণ্ড কালো ছায়ার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চলন্ত পা দুটোর দিকে তাকালে মনে হয়, একটা দানব যেন পাশে পাশে হেঁটে চলেছে।

মোটা তারের কাছে, যেটা সুড়ঙ্গের ভিতরে গাঁড়িয়ে গিয়েছে, তারই উপর ঝনঝন্ একটা শব্দ যেন নেচে নেচে বাজতে শুরু করে। আর, অনেক দূরের প্রতিধ্বনির মত একটা ঘণ্টার শব্দও শোনা যায়। সরদার হাঁক দেয়—খবরদার।

অতল থেকে কয়লা বোঝাই টবগাড়ি উঠছে। ঢালুগাড়ি দিয়ে উঠে আসছে ঘড়াং ঘড়াং প্রবল শব্দের এক একটা হল্লা। সিগন্যাল শুরু করেছে নীচের টালোয়ান। মালকাটার দলের সঙ্গে দাশুও সুড়ঙ্গের পাশ ঘেঁষে চলতে থাকে, নীচের দিকে, আরও কালো এবং ভয়ানক রহস্যের দিকে।

—ডাইনে ধুরে। হাঁক দেয় সরদার।

একটা ছোট সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকে মাথা হেঁট করে কুঁজো হয়ে মালকাটার দলের সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে দাশু। পায়ের তলায় পাচ্‌পাচ্ করে কাদা। সরদার বলে—ভয় নাই, আর গ্যাস নাই; খুব কয়লার উপর জল মেরে পাথরের গুঁড়ো বিছাই করা হয়েছে।

—আবার ডাইনে ধুরে, পঁইছা গেছে।

ডাইনে ঘুরে আরও কুঁজো হয়ে হাঁটতে থাকে মালকাটার দল আর দাশু।

—ব্যাস্! সরদারের হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে সবাই থমকে দাঁড়ায়।

কয়লা আর কয়লা, স্তরে স্তরে দাঁড়িয়ে আছে কয়লার নিরেট কালো শরীর। কয়লার খাঁজের গায়ে চিরাগ ঝুলিয়ে দিয়ে জিরোতে থাকে মালকাটার দল। একটু দূরে শাবল মেরে কয়লার গায়ে বিঁধ দিয়ে বারুদ ঠাসছে চারজন মালকাটা। বেঁটে লাঠি আর সেফ্‌টি ল্যাম্প হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ওভারম্যান, পরনে খাকি হাফপ্যান্ট, গায়ে গেঞ্জি আর মাথায় প্রকাণ্ড টাকে কালো ধুলোর আবরণ।

—আওয়াজ হবে। তৈয়ার হও। হাঁক দেয় সরদার।

শিথিলভাবে গাঁইতার গায়ে হাত ঠেকিয়ে দিয়ে তৈরী হয় পুরনো মালকাটার দল। আর নতুন মালকাটা দাশু যেন একটা বিভীষিকার সঙ্গে লড়াই করবার জন্য ভয়ে আক্রোশে হিংস্র হয়ে গাঁইতাটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে।

বারুদ ফাটে। নিরেট কয়লার বুকটা যেন প্রচণ্ড আর্তনাদ তুলে ফাটা-ফাটা হয়ে যায়।

—কাজ শুরু করো গাঁইতি। হাঁক দেয় সরদার।

গাঁইতা হাতে তুলে ফাটল-ধরা কয়লার বুকের উপর লাফিয়ে পড়ে দাশু।

(ক্রমশ)

✯ মাতৃহন্তা ✯
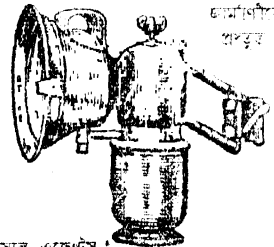
ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী
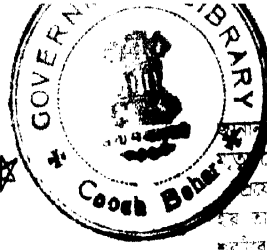
ভারতবর্ষে যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব, তখন ভিয়েনার জেনারেল হাসপাতালে ইগ্‌নাস ফিলিপ সেমেলভিস (১৮১৮—৬৫) সামান্য এক নতুন পাশকরা ডাক্তার। প্রসূতি ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত নতুন এক সহকারী।

সেমেলভিসের বাড়ি হাঙ্গারীর বুডাপেস্টে। বাবা ছিলেন বণিক। বেশ ভাল তাঁর ব্যবসা। ছেলেকে আইন শেখবার জন্যে তিনি ভিয়েনায় পাঠালেন। আইন ক্লাসে কিছুদিন পড়ে সেমেলভিস কৌতূহলী হয়ে এক বন্ধুর সংগে একদিন অ্যানাটমির লেকচার হলে গেলেন। বক্তৃতা শুনলেন, শব-ব্যবচ্ছেদ দেখলেন। অমনি তাঁর মত বদলে গেল। আইনের ক্লাস ছেড়ে হঠাৎ তিনি ডাক্তারীতে ভর্তি হয়ে গেলেন। অবশেষে ডাক্তারী পাশ করে এম ডি ডিগ্রি নিয়ে ধাত্রী বিদ্যায় মন দিলেন। তারপর হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ডে যখন তিনি সামান্য এক সহকারীর কাজ পেলেন, তখন ১৮৪৪ সাল। এপ্রিল মাস। তিনি মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সের এক যুবক।

হাসপাতালে প্রসূতি ওয়ার্ড দুটি। বৃদ্ধ অধ্যাপক ক্লাইনের তত্ত্বাবধানে। প্রথমটি গরীব দুঃখীর। ভিখারী, পরিত্যক্ত এবং অসহায় মেয়েরা এখানে প্রসবের জন্য ভর্তি হয়। এদের অনেকেরই না ছিল স্বামী, না ছিল পিতা, না ছিল কোন অভিভাবক। ভর্তি হওয়ার নিয়ম সপ্তাহে তিন দিন। রবি, মঙ্গল এবং শনিবার। সেমেলভিস এই এক নম্বর ওয়ার্ডে অধ্যাপক ক্লাইনের সহকারী ডাক্তার নিযুক্ত হলেন।

অল্পবয়সী গরীব এই যুবতীরা কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে এই হাসপাতালে আসে না। এরা আসে প্রাকৃতিক নিয়মে গর্ভবতী হয়ে। সন্তান প্রসবের জন্যে। এই তাদের প্রথম সন্তান। সেমেলভিসের কাজ এদের সাহায্য করা।

এক মাস এই কাজ করে সেমেলভিস দেখলেন, দুশ' আশি জন প্রসূতির মধ্যে ছাত্রিশ জনের মৃত্যু হল। সন্তান প্রসবের পর। জ্বরে। প্রসবের পরে দিন দুই এরা বেশ ভাল থাকে। বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে আদর করে। শোয়। আনন্দে, গর্বে চোখে-মুখে খুশির উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে। গালে লাল আভা দেখা দেয়। তারপর জ্বর হয়। পেটে ব্যথা শুরু হয়।

সেমেলভিস সান্ত্বনা দেয়। মায়েরা উদ্বেগে আকুল হয়ে সেমেলভিসের দিকে ভয়-

ইগনাজ ফিলিপ

বিহ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। জিভ শুকিয়ে যায়। বার বার শুধু একটু জল খেতে চায়। তবু পিপাসা যায় না। দিন-চারেক পরে বলে, এইবার যেন একটু ভাল লাগছে। ব্যথা কম মনে হচ্ছে। আর একটু জল দেবেন ডাক্তার? এই বলেই হাঁপাতে থাকে।

শুনে সেমেলভিস মুখ ঘুরিয়ে নেন। বুঝতে পারেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। আর এদের রক্ষা নেই। মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছে। সব কষ্ট এইবার ঘুচে যাবে। এরা আর বাঁচবে না।

সেমেলভিস ভাবেন, কেন এমন হয়? হাসপাতালে যখন এরা আসে, তখন এরা নীরোগ। সবল এবং সুস্থ। পেটে তাদের সন্তান। সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর দুদিনের মধ্যেই কি এদের হয়? সর্বনাশা এই জ্বর কোত্থেকে আসে? ঝড়ের মত অতর্কিতে এসে যৌবনের এই বিরাট প্রাণ-শক্তি নিমেষে উড়িয়ে নিয়ে যায়?

১৮৪৪ থেকে ১৮৪৬। এই দু বছর সেমেলভিস হাসপাতালে এই হতভাগ্য যুবতীদের মৃত্যু দেখলেন। কিন্তু কোন প্রতিকার করতে পারলেন না। প্রফেসর ক্লাইন বৃদ্ধ। অভিজ্ঞ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ। সেমেল-ভিস তাঁরই সহকারী। দিনের পর দিন সেমেলভিস প্রফেসরের কাছে তার অভিযোগ

জানালেন। বলেন, এক নম্বর ওয়ার্ডে এত বেশি মৃত্যু কেন হয়? কি তার প্রতিকার?

প্রফেসর হাসেন। বলেন, কেন মৃত্যু বেশী হয় তা কেউ জানে না। তবে মৃত্যু হয় শরীরে বিষ ঢুকে। এই বিষ হাওয়া থেকে মাতৃদেহে ঢোকে। প্রসবের পর।

সেমেলভিস তর্ক তোলেন। বলেন,

তাহলে সব প্রসূতির দেহেই এই বিষ ঢোকে না কেন? জ্বরে সবাই মরে না কেন?

প্রফেসর উত্তর দেন, সবার শরীর এক নয়। কেউ রোগ প্রতিরোধ করে। কেউ পারে না।

কিন্তু প্রফেসারের এই ব্যাখ্যায় সেমেলভিস সন্তুষ্ট হন না। ভাবেন, পাশেই তো দু নম্বর প্রসূতি ওয়ার্ড। সেখানে তো এত মৃত্যু হয় না? ১৮৪৬ সালে এক বছরে এক নম্বর ওয়ার্ডে মারা গেছে চারশ' উনযাট জন। অথচ পাশেই তো ঐ দু নম্বর ওয়ার্ড। ওখানে মরছে মাত্র নব্বই জন। কেন এত কম? কি করে তা সম্ভব হয়?

প্রসূতিরা সবাই জানত, এক নম্বরে ভর্তি হলে মৃত্যু নিশ্চিত। তাই তারা ব্যথা চেপে রাখত। রবি, মঙ্গল কি শনিবারে ভর্তি হতে চাইত না। হিসেবে ভুল করে হঠাৎ ভর্তি হয়ে যেই কেউ দেখত, ঐ সর্বনাশা এক নম্বরেই সে ভর্তি হয়েছে, অমনি সেমেলভিসের পায়ে পড়ে প্রসূতি কেঁদে উঠত। মিনতি করে বলত, আজ আমাকে ছেড়ে দাও ডাক্তার। কাল এসে ভর্তি হব।

সেমেলভিস হতভাগা, অসহায় এই যুবতীদের কান্না শোনেন। কিন্তু তাঁর হাত-পা বাঁধা। সাহায্য করার কোন উপায় তাঁর হাতে নেই। দু বছর এখানে কাজ করে নিত্য তিনি এ দৃশ্য দেখছেন। কি তিনি করবেন? কতটুকুই বা তাঁর ক্ষমতা?

সেমেলভিস খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন। কফি খেয়ে সকাল বেলা প্রথম যেতেন মর্গ-ঘরে (পোস্ট মর্টেম রুম)। আগের দিন রাতে পাঁচ দিনের শিশুটি রেখে যে হতভাগা যুবতী মায়ের মৃত্যু হয়েছে, তার শব-ব্যবচ্ছেদ করতেন। ছাত্ররা তাঁকে সাহায্য করত।

মৃত্যু ও চিকিৎসক

তারপর এই ছাত্রদের নিয়ে তিনি এক নম্বর ওয়ার্ডে আসতেন। প্রসূতিদের একে একে পরীক্ষা করতেন। কার প্রসবকাল কত বেশি আসন্ন পরীক্ষা করে তা নির্ণয় করতেন। মর্গঘরের মৃতদেহের গন্ধ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। নিজের আঙুলে, নিজের পোশাকে তিনি এই গন্ধ পেতেন।

কিন্তু এই এক নম্বর ওয়ার্ডে মৃত্যু-হার ক্রমশ বেড়ে চলল। একশ' জন প্রসূতির মধ্যে ত্রিশজনের মৃত্যু হতে শুরু হল। এই নিয়ে কথা উঠল। গুজব ছড়াল। শহরের লোকেরা পর্যন্ত বলতে লাগল, এর একটা বিহিত-ব্যবস্থা করা দরকার। কাজেই এক অনুসন্ধানী কমিশন বসানো হল।

প্রাচীন অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা এই কমিশনের সভ্য হলেন। অনেক গবেষণা করে তাঁরা বললেন, এক নম্বর ওয়ার্ডে ভিড় বেশি। তাছাড়া পুরুষ ডাক্তার এবং ছাত্ররা প্রসূতিদের পরীক্ষা করে প্রসব করায়। নারী-সুলভ কোমলতা এঁদের পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। তাই দু নম্বর ওয়ার্ডে, যেখানে স্ত্রীলোক ধাত্রীরা প্রসব করান, সেখানে মৃত্যু-হার কম।

কমিশনের এই রিপোর্ট দেখে সেমেলভিসের হাসি পেল। ভাবলেন, জন্মের সময় শিশু মাকে যে কষ্ট দেয়, দেহাংশে যে ক্ষত করে ডাক্তারের পরীক্ষায় তার কতটুকু বাড়ে কমে?

একদিন রাত্রে হাসপাতালে নিজের ঘরে সেমেলভিস বসে আছেন, এমন সময় বারান্দায় ঘণ্টার শব্দ তাঁর কানে এল। প্রথমে দূর থেকে মৃদু শব্দ। ক্রমশ জোরে এই ঘণ্টা ধ্বনি তাঁর কাছে আসতে লাগল। সেমেলভিস বুঝলেন, পুরোহিতের প্রবেশ-সঙ্কেত। এই নিয়ে আজ চারবার পুরোহিত এলেন। অর্থাৎ আজ এই ওয়ার্ডে চারটি হতভাগা মায়ের মৃত্যু হল।

হঠাৎ একটা সন্দেহ তাঁর মাথায় জেগে উঠল। মনে হল এই যে ঘণ্টাধ্বনি প্রসূতিরা সবাই জানে, এ মৃত্যুর অগ্রদূত। তাহলে কি এই জ্বর ভয় থেকে উদ্ভূত? যে-প্রসূতি যত বেশি ভয় পায়, রোগ কি তাকে তত বেশি আক্রমণ করে? দু নম্বর ওয়ার্ডে এ-ঘণ্টাধ্বনি হয় না। পুরোহিত ভিন্ন দরজা দিয়ে নিঃশব্দে মৃত্যুমুখী মাতার ঘরে ঢোকেন। তাহলে কি এইজন্যেই এক নম্বরে এত বেশি মৃত্যু হয়?

সেমেলভিস ছুটে পুরোহিতের কাছে গেলেন। বুঝিয়ে এই ঘণ্টা বন্ধ করলেন। ঠিক হল, নিঃশব্দে ভিন্ন দরজা দিয়ে তিনি এবার রোগীর ঘরে ঢুকবেন। অন্য প্রসূতিরা কেউ কিছু জানবে না।

কিন্তু তাতেও কোন লাভ হল না। এক নম্বর ওয়ার্ডে আগের মতই মায়েদের মৃত্যু হতে লাগল।

এই সময় একদিন সেমেলভিসের চাকরি গেল। সেমেলভিসের আগে যিনি এই সহকারীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি আবার এসে এই কাজ দাবি করলেন। প্রফেসর ক্লাইন সেমেলভিসকে ছাড়িয়ে পুরনো এই সহকারীকে কাজে নিযুক্ত করলেন।

সেমেলভিস ভাবলেন, এইবার তিনি ইংরেজি শিখবেন। ইংলণ্ড এবং ডাবলিনে যাবেন। দেখবেন, ওখানকার হাসপাতালে প্রসূতিদের মৃত্যু-হার কেন ভিয়েনার চেয়ে কম।

এই ভেবে শীতকালটা কাটাবার জন্য সেমেলভিস ভেনিসে এলেন। ভেনিসে কিছুদিন কাটাবার পর হঠাৎ খবর এল তাঁর পুরনো চাকরি আবার খালি হয়েছে।

যিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন, তিনি অন্য এক কলেজের প্রফেসর হয়ে কাজ ছেড়ে চলে গেছেন। কাজেই আবার সেমেলভিস ঐ এক নম্বর ওয়ার্ডের সহকারী নিযুক্ত হলেন।

এইবার কাজে লাগবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক ঘটনা ঘটল। সেমেলভিস বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

শুনলেন, তাঁর বন্ধু কোলেটস্কার মৃত্যু হয়েছে। কোলেটস্কা ছিলেন প্যাথলজিস্ট। দুজনে একই সঙ্গে কাজ করতেন। শব-ব্যবচ্ছেদ করতেন। ছাত্রদের সেখানে শব-ব্যবচ্ছেদ করবার সময় কোলেটস্কার আঙুল একদিন কেটে যায়। তারপর জ্বর হয়। রক্ত দূষিত হয়ে শেষে মৃত্যু হয়। এই কোলেটস্কারের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ হবে ঐ যমঘরে।

শুনে সেমেলভিস মর্মাহত হলেন। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। যমঘরে যখন তাঁর বন্ধুর শব-ব্যবচ্ছেদ হয়, তখন তিনি পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

দেখলেন, যে-আঙুলে তাঁর বন্ধু কোলেটস্কারের ক্ষত হয়েছিল, সেখান থেকে সমস্ত হাতটাই ফুলে গেছে। ভেতরে স্তরে স্তরে রক্তাধিক্য হয়েছে। রক্ত দূষিত হয়ে অন্ত্র পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। ঠিক যেমনটি তিনি দেখে আসছেন ঐ হতভাগ্য গরীব যুবতীদের। এই এক নম্বর ওয়ার্ডে। প্রসবের পর শবদেহে। এই দু বছর ধরে। কোলেটস্কারের কাটা আঙুলে শবদেহ থেকে বিষ প্রবেশ করেছে। তাহলে কি এই অনাথা তরুণীদের দেহেও এই মৃতদেহের বিষ প্রবেশ করে?

মৃত্যু ও পুরোহিত

বিদ্যুৎ চমকের মত সেমেলভিসের মাথায় খেলে গেল, মাতৃদেহে প্রসবক্লান্ত ক্ষতের মধ্য দিয়েই মৃতদেহের এই সাংঘাতিক বিষ রক্তে প্রবেশ করে। রক্ত দূষিত করে। মৃত্যু ঘটায়।

সেমেলভিসের মাথা থেকে পা পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠল। তিনি বুঝে ফেলেছেন। মনে আর কোন সংশয় নেই। কিন্তু কি নিদারুণ সাংঘাতিক এই উপলব্ধি। সত্যের কি নির্মম এই প্রকাশ। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সেমেলভিস স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

মৃতদেহ থেকে এই সাংঘাতিক বিষ মাতৃদেহে যায় কি করে? সেমেলভিস বুঝেছেন, এ-বিষ বহন করে নিয়ে যান তিনি নিজে এবং তাঁর ছাত্ররা। নিজের হাতে এবং আঙুলে।

ভোরে উঠে তিনি যখন যমঘরে গিয়ে শব-ব্যবচ্ছেদ করেন, তখন তাঁর সে কি গর্ব। তিনি কাজে ফাঁকি দেন না। ছাত্রদের নিজে হাতে শব-ব্যবচ্ছেদ শেখান। সেখান থেকে কাজ শেষ করেই ঢোকেন এক নম্বর ওয়ার্ডে। প্রসূতিদের পরীক্ষা করেন। যে-হাতে তিনি শব-ব্যবচ্ছেদ করে এসেছেন, সেই শবের গন্ধ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। হাতে, আঙুলে, জামায়। এই গন্ধ সেই বিষেরই গন্ধ। যা মাতৃদেহে ঢুকে মৃত্যু ঘটায়। অতএব হত্যাকারী কে? নিশ্চয়ই তিনি নিজে এবং তাঁর ছাত্ররা।

এইবার সেমেলভিস বুঝলেন, কেন দু নম্বর প্রসূতি ওয়ার্ডে মৃত্যু এত কম। ওখানে ধাত্রীরা প্রসব করায়। ধাত্রীরা কেউ শব-ব্যবচ্ছেদ করে না। কাজেই তাদের হাতে মৃতদেহের বিষও থাকে না।

যে-হতভাগ্য যুবতীর প্রসবকাল যত বেশি দীর্ঘ হয়, তত বেশি করে তাকে পরীক্ষা করা হয়। তত তার দেহে বিষ প্রবেশ করে। যার প্রসব নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হয়ে যায়, সে ভাগ্যবতী বেঁচে যায়। কারণ তাকে আর আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করার কোন প্রয়োজন হয় না। এতদিনে সেমেলভিস এই কঠিন সত্য উপলব্ধি করলেন। বুঝলেন, তাঁরই ভুলে হাজারে হাজারে এই অসহায় গরীব

যুবতীরা কেমন করে এতদিন গলা শুকিয়ে মারা গেছে এই সর্বনাশা এক নম্বর ওয়ার্ডে।

তখন মে মাস, ১৮৪৭ সাল। আমেরিকায় ইংলণ্ডে ধাত্রী বিদ্যায় ইথার ব্যবহার শুরু হয়েছে। কিন্তু রোগ যে জীবাণুঘটিত, তা আবিষ্কার হয়নি। সেমেলভিস রোজকার মত মর্গঘরে এলেন। শব-ব্যবচ্ছেদের পর ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুলেন। একবার, দুবার, তিনবার, বার বার। একবার করে হাত ধোন আর শুঁকে দেখেন, হাতে কি আঙুলে শবদেহের গন্ধ আছে কি নেই। নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি এইবার তাঁর দুহাত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের জলভরা এক গামলায় ডুবিয়ে রাখলেন। পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত গামলা থেকে হাত ওঠালেন না। তারপর হাত তুলে আবার শুঁকে দেখলেন। ছাত্ররা সেমেলভিসের এই অবাক কাণ্ড দেখে গুঞ্জন শুরু করল। মাস্টার মশাইর মাথাটি যে বিলকুল খারাপ হয়ে গেছে, তা দেখে মুখ টিপে হাসল। ফিসফাস টিকা-টিপ্পনি ছাড়ল।

কিন্তু সেমেলভিস ছাত্রদের ছাড়লেন না। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিটি ছাত্রের হাত ঠিক অমনি করে ধোয়ালেন। গামলায় লোশনে ডুবিয়ে রাখতে বাধ্য করালেন।

তারপর ছাত্রদের নিয়ে সার বেঁধে তিনি সেই এক নম্বর প্রসূতি ওয়ার্ডে ঢুকলেন। রোজকার মত প্রসব যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভয়-আকুল চক্ষু মেলে ঐ হতভাগা যুবতীরা সেমেলভিসের দিকে তাকিয়ে রইল।

এক মাস আগে অর্থাৎ এপ্রিল মাসে শতকরা আঠারো জন যুবতী-মাতা এই প্রসবজনিত জ্বরে মারা গেছে। মে, জুন—এই দু মাসে শতকরা মাত্র দুটি মাতার মৃত্যু হল। জুলাই মাসে হল একটির। নিরাপদ দুই নম্বর ওয়ার্ডের চেয়ে এক নম্বরে এখন মৃত্যু-হার অনেক কমে গেল।

আজকের দিন হলে সেমেলভিসের এই কীর্তিতে জয়-জয়কার পড়ে যেত। সারা পৃথিবী সেমেলভিসের নাম ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু তখনকার দিন ছিল অন্য। ধাত্রী বিদ্যার অধ্যাপকরা প্রসূতিকে পরীক্ষা করার আগে ভাল করে হাত ধোয়া এবং লোশনে ডুবিয়ে প্রসবজনিত জ্বর প্রতিরোধ করা বিশ্বাস করলেন না। মৃত্যুহার কমে গেছে ঠিক, কিন্তু তার কৃতিত্ব সেমেলভিসের কিছু নয়, এই তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন। হয়ত তখন প্রসূতিদের ভিড় এত বেশি ছিল না কিংবা হাওয়াতে সেই সময় বিষ কম ছিল। এমনিধারা অনেক আজগুবি কারণ নির্ণয় করা হল। সেমেলভিসের ওপর তাঁর বড়কর্তা বৃদ্ধ অধ্যাপক ক্লাইন বিরক্ত হলেন। অসন্তুষ্ট হলেন। শুধু তাই নয়, কি করে তাঁকে এই কাজ থেকে সরানো যায়, তার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, ঊনত্রিশ বৎসর বয়সের এই ছোকরা বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। অতএব তাকে একটু শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

সেই সুযোগ একদিন এসে গেল। মাত্র কয়েক মাস পরেই। তখন সেমেলভিসের বন্ধু, তিনজন নামকরা অধ্যাপক, সেমেলভিসের এই কাজের খুব সুখ্যাতি করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু এঁরা কেউ ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ নন। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ হেবরা, বুক ও পেট আঙুল দিয়ে বাজিয়ে দেহের ভেতরকার অঙ্গের যন্ত্রের রোগ নির্ণয়ের আবিষ্কারক স্কোডা এবং প্যাথলজিস্ট রকিটানস্কি সেমেলভিসের এই কাজ নিয়ে প্রবন্ধ লিখলেন। সেমেলভিসকে বসন্তের টিকা আবিষ্কারক জেনারের সঙ্গে তুলনা করলেন। সেই সময় হঠাৎ একদিন এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ঐ এক নম্বর ওয়ার্ডে।

এক নম্বর ওয়ার্ডে মৃত্যুহার ক্রমশ যখন বেশ কমে আসছে, এমনি সময় অক্টোবর মাসে এগারটি প্রসূতির হঠাৎ একসঙ্গে এই প্রসব-জনিত জ্বরে মৃত্যু হল। সেমেলভিস হাত ধোবার কোন পরিবর্তন করেননি, তবু কেমন করে এই কাণ্ড হল? বৃদ্ধ অধ্যাপক মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন, এইবার ছোকরা জব্দ হবে।

সেমেলভিস দেখলেন, মর্গঘর থেকে শব-ব্যবচ্ছেদ করে ফেরার পর তিনি এবং তাঁর ছাত্ররা ভাল করে হাত ধুয়ে প্রথমে যে প্রসূতিকে পরীক্ষা করেন, তার ছিল ক্যানসার এবং সেই সঙ্গে দুষ্ট ঘা। সেই থেকে শুরু, করে পর পর দশটি প্রসূতিকে তারা পরীক্ষা করেন। কাজেই প্রথমটির থেকেই এই বিষ বাকি দশটি প্রসূতির দেহে সংক্রামিত হয়েছে। বুঝলেন, জীবন্ত দেহের দুষ্ট ক্ষত থেকেও আসতে পারে এই সাংঘাতিক ব্যাধি সংক্রামিত হয়।

নতুন আর একটি তথ্য সেমেলভিস শিখলেন। শুধু মৃতদেহ থেকেই এই বিষ আসে না। জীবন্ত, অসুস্থ দেহেও এই বিষ থাকে। বিপদ থাকতে পারে। সেমেলভিস নিয়ম করলেন, প্রতিটি প্রসূতি পরীক্ষা করার আগে হাত ভাল করে ধুয়ে লোশনে ডোবাতে হবে। হাত ভাল করে না ধুয়ে আর কোন প্রসূতিকেই পরীক্ষা করা চলবে না।

মৃত্যুহার আবার কমে গেল। বৃদ্ধ অধ্যাপক ক্লাইন সেমেলভিসকে জব্দ করবার অন্য উপায় খুঁজতে লাগলেন।

১৮৪৬ সালে এই এক নম্বর ওয়ার্ডে চারশ ঊনষাটটি মাতার মৃত্যু হয়। এখন ১৮৪৮ সালের শেষে তিন হাজার তিনশ ছাপান্নটি প্রসূতির মধ্যে মাত্র ৪৫টির মৃত্যু হল।

অবশেষে একদিন বড়কর্তার উদ্দেশ্য সফল হল। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সুযোগে সেমেলভিসকে বিপ্লবী বলে ঘোষণা করা সম্ভব হল। অধ্যাপক ক্লাইন
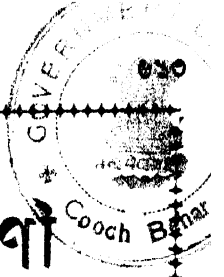
সেমেলভিসের বদলে তাঁর পেটোয়া ব্রনকে এই কাজে নিযুক্ত করলেন। ছাত্রদের পড়াবার জন্য এবং শুধু পুতুল দিয়ে শেখাবার জন্য সেমেলভিসকে রাখা হল।

ক্ষোভে দুঃখে অপমানে সেমেলভিস চাকরি ছেড়ে নিজের দেশ বুডাপেস্টে ফিরে এলেন। ভিয়েনা ছাড়ার এক মাসের মধ্যে আবার ঐ এক নম্বর ওয়ার্ডে কুড়িটি যুবতীর মৃত্যু হল। কিন্তু ক্লাইন তা গ্রাহ্য করলেন না।

বুডাপেস্টে এসে সেমেলভিস সেণ্ট রকাস্ হাসপাতালে বিনা পয়সায় এক কাজ পেলেন। অতিশয় নোংরা হাসপাতাল। খুপরীর মত ঘর। অন্ধকার। দুর্গন্ধ ভরা।

এমনি এক ঘরে ছটি মাতার প্রসব হয়েছে। সেমেলভিস দেখলেন, তার মধ্যে একটি মৃত আর একটি মরণাপন্ন। বাকি চারটির সেই সাংঘাতিক প্রসবজনিত জ্বর।

এদের যিনি চিকিৎসক, তিনিও একজন সার্জন। পচা গলা ঘা ঘেঁটে তিনি এসে প্রসব করান। কাজেই সেমেলভিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, হাত ধোয়ার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিলেন। ফলে এই খুপরীর মত অন্ধকার হাসপাতালে প্রসব হতে এসে এক হাজার মায়ের মধ্যে মাত্র আটটি মাতার মৃত্যু হল। ছ' বছরে।

সেমেলভিস বুডাপেস্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। ১৮৫৫ সালে। এইখান থেকেই তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'প্রসবজনিত জ্বরের কারণ এবং প্রতিকার' প্রকাশিত হল ১৮৬১ সালে। আর একটি বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গ রচনা তিনি প্রকাশ করলেন ঐ একই সালে। এইবার চিকিৎসক মহলে সাংঘাতিক হুলুস্থূল পড়ে গেল। এই রচনার নাম "হরেক রকম ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপকদের কাছে খোলা চিঠি।"

সেমেলভিস দেখালেন, সামান্য একটু পরিষ্কার থাকা এবং প্রসূতিকে পরীক্ষা করার আগে হাত ভাল করে ধুয়ে এই লোশনে ডুবিয়ে রাখা, যেখানে মাতাকে ঐ সাংঘাতিক প্রসবজনিত জ্বরে মৃত্যু থেকে রক্ষা করে, তাই ইউরোপের চিকিৎসকেরা কেউ মানলেন না। উল্টে তাঁকে ঠাট্টা করলেন, ব্যঙ্গ করলেন। এদিকে হাসপাতালে হাজারে হাজারে মাতার মৃত্যু হল। অথচ তাঁর নিজের বুডাপেস্ট ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে এই প্রথা প্রবর্তন করে প্রসবজনিত জ্বরের মৃত্যু তিনি শূন্যে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এই হাসপাতালে এই রোগে আর কোন মাতার এখন মৃত্যু হয় না। তাহলে এই সব হোমরা-চোমরা ধাত্রীবিদ্যাবিশারদরা কি? নিশ্চয়ই মাতৃহন্তা।

সেমেলভিস ক্ষেপে গেলেন। এই সব বিশেষজ্ঞদের নামে নামেই খোলা চিঠি ছাড়তে লাগলেন। বললেন, এই হতভাগ্য প্রসূতিদের এমন অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী

আপনি নিজে। কাজেই আপনি একটি মাতৃহন্তা এবং খুনী।

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এই চিঠির কোন জবাব দিলেন না। এই উপেক্ষায় সেমেলভিস আরও ক্ষেপে গেলেন। এইবার সাংঘাতিক এক কান্ড করে বসলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এক সাময়িক পত্রিকায় সর্বসাধারণের কাছে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে নিজের মনের বিষ ছড়িয়ে দিলেন। লিখলেন, আপনি যদি সন্তানের জন্মদাতা পিতা হন, তাহলে স্ত্রীর প্রসবের সময় ডাক্তার অথবা ধাত্রী ডাকার মানে কি জানেন? তার মানে, আপনার স্ত্রীর জীবন বিপন্ন করা। যদি আপনি বিপত্নীক না হতে চান, আপনার সন্তানদের মাতৃহারা না দেখতে চান, তাহলে দোহাই আপনার নিজে গিয়ে সামান্য কয়েক আনা খরচা করে কিছু ব্লিচিং পাউডার কিনে আনুন। একটা গামলায় রেখে তার ওপর জল ঢালুন। ডাক্তার অথবা ধাত্রীকে আপনার সামনে ঐ জলে ভাল করে হাত ডুবিয়ে না রাখা পর্যন্ত খবরদার তাদের আপনার স্ত্রীকে পরীক্ষা করতে দেবেন না। নিজে দাঁড়িয়ে দেখবেন, ঐ গামলার জলে ডাক্তার অথবা ধাত্রীর হাত যতক্ষণ না পিচ্ছিল হয়, ততক্ষণ তাদের ছাড়বেন না। এখন থেকে সেমেলভিসের সব-সেবায় শুধু একটি শ্লোগান ঘোষিত হল, "খুন বন্ধ করা চাই।"

এইবার চিকিৎসক মহলে আন্দোলন শুরু হল। জার্মানীতে ভিয়েনায় সেমেলভিসের হুমকিতে কাজ হল। বিশেষজ্ঞদের টনক নড়ল। যখন সবাই তাঁর মত মানতে শুরু করলেন, তখনও সেমেলভিস রাস্তায় কোন তরুণ-তরুণীকে একত্র দেখলে এগিয়ে যেতেন। তাদের দাঁড় করিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় সন্তান প্রসবের আগে ব্লিচিং পাউডার জলে ফেলে ডাক্তারদের হাত ধোয়াবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। অপরিচিত, অজানা এই তরুণ তরুণী একথায় কি ভাবতে পারে, সে খেয়াল তাঁর থাকত না।

সেমেলভিসের যুবতী স্ত্রী মেরী স্বামীর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে উদ্বিগ্না হলেন। তিনি দেখলেন সেমেলভিস কেমন যেন ছট-ফটে, অস্থির পায়ে চলেন। কথায় কথায় চটে ওঠেন। শুধু নিজের সন্তানদের প্রতি কখনও রাগ করেন না। একদিন সেমেল-ভিস নিজেই স্ত্রীকে বললেন, আচ্ছা আমার এ কি হল? মাথাটা কি সত্যি খারাপ হয়ে গেল?

তখন ১৮৬৫ সাল। গ্রীষ্মকাল। মেরী তাঁর কোলের বাচ্চাটিকে নিয়ে সেমেল-ভিসকে সঙ্গে করে ভিয়েনায় এলেন। তাঁরা সেমেলভিসের বন্ধু প্রফেসর হেবরার বাড়িতে উঠলেন। ডাঃ হেবরা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। মিসেস হেবরার যখন প্রথম সন্তান হয় তখন সেমেলভিসই তাঁর প্রসব করান। প্রাণ খোলা হাসি হেসে বলেছিলেন ছেলে হবে। আজও সেমেলভিস ৪৭ বৎসর বয়সেই যেন অতি বৃদ্ধ। স্থবির। মুখে হাসি নেই। কথা নেই।

মিসেস হেবরাকে দেখে সেমেলভিস কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। যেন পুরনো কথা হঠাৎ মনে পড়ল। হেসে বললেন, তোমার প্রথম যখন সন্তান হয় আমি বলে-ছিলাম ছেলে হবে মনে পড়ে সে কথা?

কিন্তু সেমেলভিসের এ হাসি আগের সেই প্রাণ খোলা হাসি নয়। নির্জীব মৃতের হাসি।

কয়েক মিনিট তিনি বন্ধু হেবার সঙ্গে বেশ গল্প করলেন তার পরই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। অবশেষে এক বন্ধ গাড়ীতে ডাঃ হেবরা সেমেলভিসকে পাগলা গারদে নিয়ে গেলেন। সেখানে তালা বন্ধ করে তাঁকে রাখা হল।

ভিয়েনায় আসার আগে বুডাপেস্টে শেষ অপারেশন করবার সময় সেমেলভিসের আঙ্গুল ছুরিতে একটু কেটে যায়। সেই ক্ষত থেকে রক্ত দূষিত হয়ে পাগলা গারদে এসে তাঁর মৃত্যু হয়। ক্ষত থেকে রক্ত দূষিত হওয়ার যে রোগ তিনি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন সেই রোগেই তাঁর মৃত্যু হল। আগস্ট মাসে ১৮৬৫ সালে।

ঠিক সেই সময় লুই পাস্তুর সংক্রামক রোগের কারণ আবিষ্কার করলেন। জীবাণুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হল। লর্ড লিস্টার সার্জারীতে জীবাণুনাশক কারবলিক ব্যবহার শুরু করলেন। তখন সবাই বুঝল, সেমেলভিস কত আগে এই তথ্য আবিষ্কার করে প্রসবজনিত জ্বর প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অতএব সেমেলভিসের নিজের দেশ বুডা-পেস্টে তাঁর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হল। এই স্মৃতিসৌধে দেখা যায় সেমেলভিস তাঁর বই বগলে করে দাঁড়িয়ে আছেন। পায়ের কাছে একটি যুবতী মাতা বসে। ছেলে কোলে করে ভক্তি গদগদ চোখে তার ত্রাণকর্তা সেমেলভিসের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। এই স্মৃতি সৌধ সত্যি ভারি সুন্দর। বিশেষ একজন প্রহরী সর্বদা এই সৌধ পাহারা দেওয়ার জন্যে নিযুক্ত আছে।

কিন্তু ধাত্রীবিদ্যার ইতিহাসে সেমেল-ভিসকে নিয়ে ধাত্রীবিদ্যা বিশারদদের যে কীর্তি কলঙ্কে কালিমাখা হয়ে আছে তা কোনদিন মুছবে কি?

✯ গালিনা উলানোভা

শুভময় ঘোষ
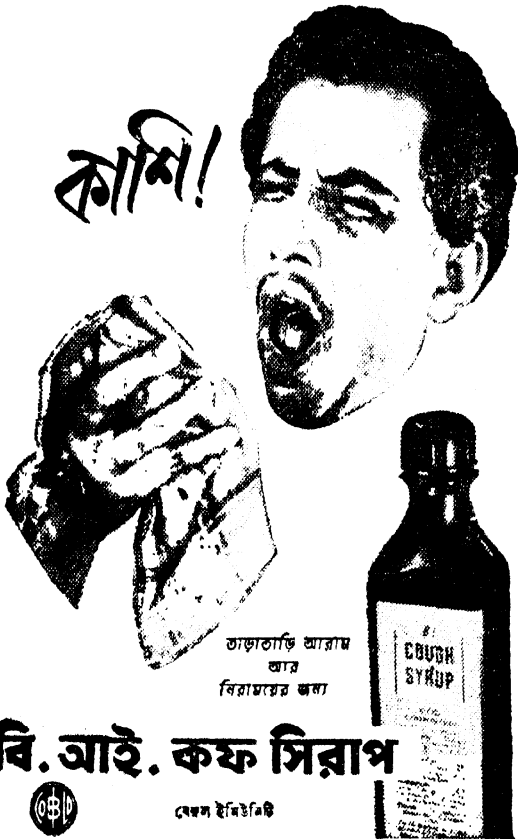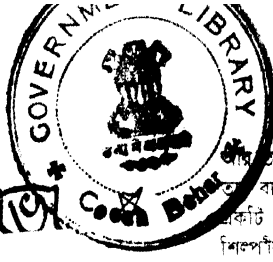
মারিয়া জোরেসেলস্কায়ার কাছে যেতেই তাঁর 'সোভিয়েত নারী' পত্রিকার সাংস্কৃতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্তাকে বলে গালিনা উলানোভার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিলেন। ঠিক হল দুপুরে দুটোয় বলশই থিয়েটার-এর বাঁ-পাশের দরজা দিয়ে উপরের ঘরে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। তারিখটা এখন আর মনে নেই। ইংরেজ মিঃ ডেক্সটর, বিশ বছর এদেশে আছেন রুশ, ইংরিজী দুয়েতেই তাঁর সমান দখল। এদেশে ভারতীয়দের ওঁকেয়ে বড় বন্ধু। তাই তাঁকেই ধরে পড়লাম সঙ্গে গিয়ে দোভাষীর কাজ করতে। দুজনে যখন বলশই থিয়েটর-এর বাঁদিকের দরজা দিয়ে উঠে উপরের একটা ছোট্ট আপিস ঘরে অপেক্ষা করছি, তখন বাইরে সারা শহর স্নান করছে। "উলানোভা অন্য কারো সঙ্গে কথা বলছেন, এখনি শেষ হবে, আপনারা এ ঘরে একটু অপেক্ষা করুন।"

ঘরে থিয়েটরের পুরুষ ও মহিলা কর্মীরা অনবরত ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘুরেছেন, আসছেন, বেরোচ্ছেন। একটি মহিলা, তাঁকে দরজা দিয়ে সিঁড়ির কাছটায় একটু দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখেছি, ঘরে ঢুকে মিঃ ডেক্সটরকে হাত ধরে অভিনন্দন জানিয়ে কী বলতেই, মিঃ ডেক্সটর একলাফে উঠে দাঁড়ালেন—গালিনা উলানোভা। ছোটখাট মানুষটি, রোগাই বলা যায়, মুখটা শুকনো, চিবুকের কাছটা ছুঁচলো, চওড়া কপাল, ছোট্ট তীক্ষ্ণ নাক, চোখ দুটিতে তলোয়ারের দীপ্তি, পাতলা ভুরু, পাতলা ঠোঁট, ডিম্বাকার মুখটিতে বয়সের ছাপ পড়েছে, পরনে অবিশ্বাস্য রকমের সাধারণ একটি খাট গাউন, সবুজের উপর বড় বড় গোল গোল হলদে ছোপ। কপালে, চোখের দৃষ্টিতে, নাকের দৃপ্ত ভঙ্গীতে প্রতিভার ছাপ। পরিচয়ের পর পাশের আরেকটি ঘরে যাওয়া হল। উলানোভার হাঁটার ভঙ্গীটি অত্যন্ত ক্ষিপ্র।

একটা টেবিলকে সামনে রেখে তিনজনে বসলাম, উলানোভা মাঝখানে। কথা শুরু হল। আলাপের সময় উলানোভার চোখ দুটি কখনো অনেক গভীরে ডুবে যায় কখনো উৎসাহে দীপ্ত হয়ে ওঠে। গলার স্বর সরু, কথা বলেন দ্রুত, হাত দুটি সবসময় কথার দ্রুতগতির সমানতালে নানাভঙ্গী গড়ে তোলে। আমার প্রশ্ন শোনেন কৌচে হেলান দিয়ে, চোখ দুটি তখন স্থির, তাতে গভীর একাগ্রতা।

প্রথমে ছিল তাঁর প্রথম জীবনের কথা। নাচের অনুপ্রেরণা কোথায় পেলেন, সেই প্রশ্ন। তাঁর লেখা সদ্য প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করে বল্লেন:

"নাচিয়ে হবার আমার যে খুব একটা প্রবল স্বাধীন ইচ্ছে ছিল তা নয়। নাচ আমার খুব ভাল লাগত, তবে অসাধারণ রকম কিছু না। তোমার প্রশ্ন শুনে মনে হল শিল্পীর 'ক্রিয়েটিভ লাইফ' কখন শুরু হয়, তাই তুমি জানতে চাও। এ প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট, যথাযথ উত্তর দেওয়া অসম্ভব, তাঁর ব্যাখ্যার দরকারও নেই। যা ব্যাখ্যার অতীত, তা ব্যাখ্যা করার আমি চেষ্টা করব না। তবে একটি কথা উল্লেখ করতে হয়। স্রষ্টা বা শিল্পীর সাফল্যের মূল অনুসন্ধান করলে দেখবে তার অবলম্বন হচ্ছে কাজ বা পরিশ্রম। সৎ, নিঃস্বার্থ, অনুপ্রাণিত কাজের সঙ্গে তার ফল যে পুরস্কার, খেতাব প্রভৃতি তাদের নিঃসন্দেহে যোগ রয়েছে। অনেক 'শিল্প প্রেমিক' এই সব পুরস্কার আর খেতাবেই তাঁদের জীবনের তাৎপর্য খুঁজে পান, 'ভাগ্য'-কেই এই প্রাপ্তির জন্য দায়ী করেন।

"নিজের কাজের প্রতি একনিষ্ঠ পবিত্র মনোভাব ও আনুগত্যের ফলেই কেবল শিল্পী সার্থকতা ও সাফল্য অর্জন করতে পারে। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে নিজেকে একেবারে নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করে তুলতে

নৃত্যভঙ্গিমায় উলানোভা

একটা অংশ মাত্র। তখন আমার বয়স পনের বছর।

"ব্যালে নাচের জন্য মা আমায় কখনো নাচ শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করেন নি। তবে তাঁর উপদেশ আর মতামত আমার খুবই কাজে লেগেছিল। শিক্ষকতার ব্যাপারে মা ছিলেন অত্যন্ত কড়া, তাঁর কাছে যারা নাচ শিখত, নাচের আঙ্গিক সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হলে তাদের ছাড়তেন না। তিনি চাইতেন আঙ্গিকের নির্ভেজাল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে। চলাফেরার স্বচ্ছন্দ প্রবহমানতা আর সংগীত উপভোগের ক্ষমতা তাঁর ছাত্রছাত্রী-দের কাছ থেকে তিনি আশা করতেন। শুধু কায়দা দেখাবার চিত্তাকর্ষক পথের বিপদ তাঁর ছাত্রীরা যাতে এড়িয়ে চলতে পারে তার জন্যে মার চেষ্টার বিরতি ছিল না। আঙ্গিকের যতরকম কৌশল আছে মা সে সব আমাদের শেখাতে চেয়েছিলেন। কঠিন বলে যে কোন কিছু বাদ দিয়ে যাব তার উপায় ছিল না।

"চার মাস পরে মারিনস্কি নাট্যালয়ে আমি কাজ নিই। 'সোয়ান লেকের' প্রধান ভূমিকা আমায় দেওয়া হয়। ১৯২৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রথম ওদেৎ আর ওদিলের ভূমিকায় স্টেজে নামি। তখন আমি অত্যন্ত দুর্বল ছিলাম। আমার পা দুটো এত সরু সরু ছিল যে, মঞ্চের কারিগররা অবাক হয়ে ভাবত পা দুটো ভেঙ্গে যায় না কেন। কাজেই প্রথমে দিন দর্শকদের মধ্যে বসে আমার মার মনের অবস্থা কি রকম হয়েছিল তা ভেবে দেখ। তৃতীয় অঙ্কে এক-জায়গায় আঙুলের ডগায় ভর করে আমার [illegible] পাক খাওয়া ছিল। মা সে দৃশ্য সহ্য করতে পারেন নি, এত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন যে, মাঝখানেই উঠে চলে গিয়ে-ছিলেন। আমাদের দেশের অনেক বিখ্যাত ব্যালেরিনা মার ছাত্রী।

"আমার বাবার চরিত্রেও শিল্পের প্রতি এই একই কঠোর নিষ্ঠা লক্ষ্য করেছি। বাবা থিয়েটার ভীষণ ভালবাসতেন। নিজে ছিলেন শিল্পী এবং প্রযোজক দুই-ই। বাবার কাছ থেকে আমি নির্মল আকাশ, গাছের কাঁপন ভালবাসতে শিখেছি, বনের সৌন্দর্য বুঝতে শিখেছি। বাবা বেশি কথা বলতেন না, কিন্তু তবুও তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেতাম। ছোটবেলায় বাবা সবসময় আমাকে তাঁর সঙ্গে মাছ ধরতে বা ভোরবেলায় শিকার করতে নিয়ে যেতেন। ধীর পায়ে সূর্য উঠত; ক্রমশ সকালের আকাশ ঠাণ্ডা কাশের গায়ে আলো ছড়িয়ে পড়ত। মাঠে উঠত বনের নানান পথ, সুন্দর সুন্দর ফুল।

"বনে বনে ঘুরতে যেন আমি ভয় না পাই, শিকারের ছুরি বা বন্দুকের আওয়াজ শুনে আঁতকে না উঠি সেদিকে বাবার খুব নজর ছিল। আমার মধ্যে তিনি আত্ম-প্রত্যয় জাগিয়ে তুলেছেন, খেলাধূলার প্রতি ভালবাসা এবং উৎসাহ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। মানুষ যে সবই করতে পারে তার পরিচয় তিনি আমায় দিতে চেয়ে-ছিলেন। সব রকম কাজেই আমায় অভ্যস্ত করে তোলা তাঁর ইচ্ছে ছিল। বাবাকে দেখে আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে মেয়েদের কাজ আমার জন্য নয়। তাই সবাই যখন আমায় জিজ্ঞেস করত, 'তুমি কী হতে চাও ?' আমি কখনো বলতাম, 'ছেলে হতে চাই' কখনো বা 'খালাসী'।

"ছেলেবেলায় তীরধনুকের প্রতি আমার এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। নানা রকম সব এডভেঞ্চার আমার মাথায় ঘুরত। বোম্বেটে আর ডাকাতের খেলা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়। লেনিনগ্রাদের কাছে গ্রামে বাবা-মা গ্রীষ্মকালে যেতেন। সেখানে গ্রামের গাছ-পালা আমার কল্পনায় ভীষণ দুর্গম বন হয়ে উঠত, সঙ্গে যে ছেলেরা থাকত, তারা সব আমার অনুগত সঙ্গী, তাদের নিয়ে আমি অজানার বিপজ্জনক অভিযানে বেরিয়ে পড়তাম।

বলশই থিয়েটারে 'জিসেল' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

"নাচের ইস্কুলে শেখবার সময়ও আমার ছেলেদের ভূমিকা খুব ভাল লাগত, তাদের অভিনয়ের সবকিছু আমার জানা ছিল— অনেকবার ছেলেদের ভূমিকায় অভিনয় করেছি।

"বাবা আমাকে কখনো নাচ শেখাননি কিন্তু তাঁর মতামত আমায় খুব সাহায্য করেছে। ১৯২৯ সালে [illegible] বছর বাদে নাচিয়ে হিসেবে অভিনয় করার পর তিনি "ডিউটি প্রডিউসর" বা রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষের কাজ নেন। কাজটা এমনই যে মুহূর্তের জন্যে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে কোথাও যাবার উপায় নেই। মঞ্চপ্রস্তুতি থেকে নাচিয়েদের পর্যন্ত [illegible] ক্ষণ নির্দেশ দিতে হয়। কোনটার পর কী হবে; কারা কোথা দিয়ে কী ভাবে, [illegible] ঢুকবে; মঞ্চের কোথায় [illegible] সাজ সব তাঁর নখদর্পণে থাকে। [illegible] কাগজপত্রের বা সহকারীর সাহায্য [illegible] স্টেজে আমি তাঁর কাছে অজানা [illegible] দেরই একজন ছিলাম। [illegible]

দের মত 'আপনি' করে কথা বলতেন। আমার নাচ বাবা কখনো দেখতে পাননি। তাঁকে সব সময়ই চারিদিকে ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত থাকতে হয়। কেবল যুদ্ধের পর, পঞ্চাশ বছর ধরে যে কাজে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সে কাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর মস্কোতে একবার আমার জুলিয়েৎ-এর অভিনয় দেখতে আসেন। সেই প্রথম বাবা আমার নাচ দেখবেন। আমি সেদিন সারাক্ষণ বাবা কী বলেন জানবার জন্য উৎসুক হয়ে আছি। নাটক শেষ হবার পর বাবা বল্লেন, 'নিচিভো', তার ভাবার্থ হল 'মন্দ নয়'। সে কথা শুনে আমার কী আনন্দ। সে রকম আনন্দ এর আগে বা পরে ব্যালেরিনা হিসেবে আর কখনো পাইনি। ঐ 'মন্দ নয়'ই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় প্রশংসা। ১৯৫০ সালে নভেম্বর মাসে বাবা মারা যান।

"তারপর গেলাম লেনিনগ্রাদ কোরিয়োগ্রাফি কলেজে। তখন সারা দেশে ভীষণ দুঃসময়। শুধু যে ক্লাসের ঘর আর ছাত্রাবাসে আগুন ও খাবারের অভাব আর অসুখের প্রাদুর্ভাব তাই নয়। শিল্পের আসরেও তখন আকাল পড়েছে। অবশ্য আমরা সে বয়সে অত বুঝতাম না। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে ব্যালে কোন পথ অনুসরণ করবে তাই নিয়ে ভীষণ তর্কাতর্কি চলেছে। অনেকেই বলেন ব্যালে এখন মৃত, তার আর কোন প্রয়োজন নেই। অনেকে আবার ব্যালেকে 'নতুন রূপ' দিতে চান, 'প্রলেতারীয়' করে তুলতে চান। কারো কারো মত ছিল এক্রোবেটিকস্ আর শারীরিক ব্যায়ামের কসরতকে ব্যালেতে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আমাদের কলেজের কার্যতালিকায় আর আমাদের মনেও এসব মতের ছায়া পড়ত কিন্তু আমাদের নাট্যালয় এসব গণ্ডগোলে যোগ না দিয়ে তার নিজের কাজ করে চল্ল। লোকেরা আগের মতই ভিড় করে দেখতে আসত। ব্যালেতে তাদের উৎসুক্য ও আগ্রহ কিছুমাত্র কমল না। বরং বাড়লই। থিয়েটরে যে সব নৃত্যাভিনয় হত, জাতির রুচি এবং প্রচেষ্টাকে রূপ দেবার পক্ষে তা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ ছিল। কয়েকটি প্রাচীন ক্লাসিক্স নিয়ে অনেকরকম অত্যাশ্চর্য নূতন পরীক্ষা করা হয়েছিল। তারা যে খুব একটা সার্থকতা পেয়েছিল, তা বলতে পারি না। বিশেষ করে এক্রোবেটিকস জিনিসটা ক্লাসিকাল নাচের সঙ্গে মোটেই মানায়নি। অবশ্য তাতে দৈবত নাচের সমৃদ্ধি ঘটেছে। নাচের আসরে এক্রোবেটিকস্ যে বেখাপ্পা মনে হবে তা খুবই স্বাভাবিক। নৃত্য কেবল নৃত্যের দ্বারাই সমৃদ্ধতর হতে পারে। অন্য কোন কায়দার দ্বারা তা সম্ভব নয়। ব্যালে হল নৃত্যাভিনয়, কিন্তু তা বলে নৃত্যের উপর অভিনয়ের ভার বেশি চাপান উচিত নয়। নাচ বাদ দিয়ে ব্যালে সম্ভব নয়, যেমন গান বাদ দিয়ে অপেরা হয় না।"

"নাচ যিনি শেখান বা পরিচালনা করেন, শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রধান কর্তব্য কী?"

"শিক্ষকের কাজও হল, সৃষ্টির কাজ বা স্রষ্টার কাজ। সেও খুব উঁচু দরের সৃষ্টি। শিল্পী এক একটি চরিত্র সৃষ্টি করেন। শিক্ষক সৃষ্টি করেন মানুষকে, এমন মানুষ যে আর্টিস্টিক চরিত্র সাজতে সক্ষম। আমার শিক্ষকরা অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষকতার প্রতি সৎ, পবিত্র এবং সপ্রেম মনোভাবের মূর্ত প্রতীক। একথা ঠিক, নিজের মতামত কখনও অন্যের উপর জোর করে চাপান যায় না। আমাদের শিক্ষকরা তা কখনও করতেনও না। তাঁরা চাইতেন আমাদের সমগ্র প্রয়াস এবং ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ। একই ভঙ্গীর হাজারবার অনুশীলনের ফলে স্বাধীনভাবে একটি কাজই বারবার করার অভ্যাস অর্জন করেছি। আমরা যে শিল্পের সেবা করি,—নৃত্য—তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তাতে অসীম ধৈর্য এবং দৃঢ় আনুগত্যের প্রয়োজন। বড় ছোট সব নাচিয়েদেরই এই দুটি গুণ থাকতেই হবে। আমাদের এই শিক্ষাপর্বে অনেক ব্যালে গড়ে তোলায় আমরা সাহায্য করতাম। অনেক কিছু নিজে হাতে করতাম, মঞ্চের কাজ, সাজের কাজ ইত্যাদি। তার ফলে সব কাজকেই শ্রদ্ধা করতে শিখেছি। সব কিছুর প্রতি আমাদের একটা মমতা গড়ে উঠত, কারণ প্রতিটি জিনিস আমাদের চোখের সামনে তৈরী হতে

দেখতাম, তার ফলে অবহেলা করে কোন সাজ বা উপকরণ আমরা নষ্ট হতে দিতে পারতাম না। ছেলেবেলায় এই যে চমৎকার শিক্ষা পেয়েছিলাম তা চিরজীবন আমার কাজে লেগেছে, কখনও ভুলিনি। নিজের হাতে কিছু করায় যেমন আনন্দ, তেমনি তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও। কোন কিছু বোনা, সেলাই করা, পেরেক মারা এসব আমাদের কাছে মোটেই সমস্যার ব্যাপার নয়। আমাদের শিক্ষকরা আমাদের বহুকাল থেকে জানতেন। আমাদের মানবিক এবং পেশাগত দুর্বলতা এবং ক্ষমতা ও সাফল্যের কথা তাঁদের ভাল করে জানা ছিল। শিক্ষকরা ভবিষ্যতের শিল্পীদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর দিতেন। এর ফলে ভাবীকালের শিল্পী যে শিল্পজগতে তার নিজের পথ খ‍ুঁজে পাবে সে বিষয়ে সবাই নিশ্চিত ছিল। আমাদের শিক্ষকরা তাঁদের ছাত্রীদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য এবং তার বিশেষ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী এবং মানুষ দুজনকেই দেখতে চাইতেন, দেখতে সক্ষম হতেন এ বড় আনন্দের কথা।

"আজ নাচের ইস্কুল ছাড়ার প্রায় আটাশ বছর পরে যখন আমার নিজের ক্ষেত্রে আমার যৎসামান্য সাফল্যের কথা ভাবি—ওদেত্তা বা রেমন্দা, অরোরা বা দিয়ানা, নিকিআ আর সোল্‌ভেইগ্, জিজেল আর জোলুশকা (সিন্দারেলা) প্রভৃতি প্রত্যেকটি চরিত্রের অভিনয়ে আমি যা অর্জন করেছি তার কথা যখন স্মরণ করি, তখন সর্বপ্রথম আমার বিদ্যালয়ের প্রতি, আমার শিক্ষকদের প্রতি এবং আমার মাতৃভূমির প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

"ব্যালের এক একটি চরিত্র শিল্পী কীভাবে ফুটিয়ে তোলে, তোমার এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলতে হয় প্রত্যেক শিল্পীর নিজের নিজের বিশেষ পদ্ধতি আছে। তবে বাইরের পদ্ধতির পার্থক্যের কথা বাদ দিয়ে বলা যায়, সব শিল্পীই যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছেন তার চরিত্রে মগ্ন হয়ে যান, বাইরের জগতকে, এমন কি নিজেকেও একেবারে ভুলে যান। আসল কথা হল, যে চরিত্র তুমি গ্রহণ করেছ তার মূল ধারাটি মানে 'জেনারেল লাইনটি' তোমায় খ‍ুঁজে বের করতে হবে। সব কটি বিচ্ছিন্ন খ‍ুঁটিনাটির মোট ফলটি পেতে হবে, নানা বৈচিত্র্য, বিচিত্র বর্ণসুষমা ভাল করে উপলব্ধি করে সে চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা গড়ে তুলতে হবে।

"সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল দর্শকদের উপস্থিতি একেবারে ভুলে যাওয়া। আমি যখন নাচি তখন দর্শকদের কথা একেবারেই ভুলে যাই, মনে হয় একটা চারদেয়ালী ঘরে আমি একা কাজ করে চলেছি। একা বসে ডায়েরী লেখার মত। দর্শকরা হল অগোণ, নিজের মনেই নাচতে হবে, নিজের জন্যই। অবশ্য শেষপর্যন্ত অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সাধারণের জন্যই নাচা, কিন্তু সাধারণকে ভুলতে পারলেই নাচ সবচেয়ে ভাল হয় আর তখনই দর্শকসাধারণ যথার্থ খুশি হয়।

"এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত কথা। আমি এই ভাবেই কাজ করি। অন্যের বেলা এ পদ্ধতি কাজে না লাগতেও পারে।

"রোমিও জুলিয়েতে সেই ফাদার লরেন্সের কাছে আমার দৌড়ে যাওয়ার যে দৃশ্য, সেই আইডিয়াটি কী করে পেলাম জানতে চেয়েছ। ওটি আমারই আইডিয়া। কী করে মাথায় এল তা বলা বড় কঠিন। আপনা থেকেই এসেছে। জুলিয়েতের চরিত্র এবং ঘটনার ধারণা থেকেই হঠাৎ এসেছে। ডুবন্ত মানুষ যেভাবে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে সেইভাবেই জুলিয়েতের হঠাৎ ফাদার লরেন্সের কথা মনে পড়েছে, যাতে তার বাবার আয়োজিত বিয়ের হাত এড়িয়ে সে বাঁচতে পারে। হয়ত তিনিই এই বিপদ থেকে তাকে কোনরকমে বাঁচিয়ে দিতে পারেন, এরকম ধারণা তার হয়েছে। এই ধারণার জন্ম গভীর হতাশা থেকে। মোট কথা যে চরিত্র তুমি গ্রহণ করেছ, তোমাকে তার সঙ্গে একেবারে একাত্ম হয়ে যেতে হবে—জুলিয়েৎকে তো জুলিয়েতই হয়ে উঠতে হবে, তার মনের অবস্থা, অনুভূতি সব কিছু নিজের করে তুলতে হবে। সেই থেকেই সবরকম ভঙ্গী ও অভিব্যক্তির জন্ম। নৃত্যাভিনয়ের বাইরের নিয়মকানুন আছে; তা মানি, কিন্তু এই তন্ময়তাই হল আসল কথা।"

"'রোমিও জুলিয়েত'-এর অভিনয় করতে

রুশ ব্যালে নৃত্যের একটি মধুর ভঙ্গি

আপনার মানসিক প্রস্তুতির জন্য কত সময় লেগেছে: চরিত্রটিকে গড়ে তুলতে নাটকটিকে আপনি কতভাবে পড়ে দেখেছেন, ভেবে দেখেছেন?"

"সে দীর্ঘদিন, সে এক অবিচ্ছিন্ন ধারা। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত কত পরিবর্তনই না হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে প্রতিবারই মনে হয়েছে আর নতুন কিছু আবিষ্কার করার নেই। কিন্তু আবার নতুন কোন দিক আবিষ্কৃত হয়েছে। শিল্পী যখন অভিনয় করেন তখন তাঁর কাছে প্রত্যেকটি চরিত্র প্রতিবারই নতুন হয়ে ওঠে।

"Part is never finished. তার বাইরের নিয়মকানুনের দিকটা একই থাকে। কিন্তু তার অন্তরের দিকটা নতুন নতুন চেতনার ফলে প্রতিবারই নতুন হয়ে ওঠে। তার কারণ অভিনয় ত আর অংক কষা নয়। আঙ্গিকের প্রকরণ আছে, কিন্তু নতুন বেদনা বা অনুভূতির আবিষ্কারের ফলে অভিনয় বদলে যায়। তা হওয়াই চাই, নইলে অভিনয় একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া মাত্র হয়ে উঠত। নতুন আবেদন, অনুভূতি আবিষ্কার করাটাই হল সবচেয়ে বড় সমস্যা, সফলতার গোপন সত্য রয়েছে এইখানেই।"

"আপনি জোন অব আর্কের জীবনী নিয়ে ব্যালে করতে চান শুনেছি।"

"করতে চাই কি, তার কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। হয়ত এই ডিসেম্বরেই [illegible] দেখান হবে।"

"জোন অব আর্ককেই আপনি কেন বেছে নিলেন? কোন বিশেষ কারণ আছে কি?"

"জোন অব আর্ককে আমার বড় ভাল লাগে। তাঁর সম্বন্ধে অনেক পড়েছি। জোনের চরিত্রের সঙ্গে আজকের দিনের মেয়েদের অনেক মিল আছে। আধুনিক নারী চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি জোনের চরিত্রে রূপ নিয়েছে। তাঁর চারিত্রিক শক্তি, উদ্দেশ্যের প্রতি একনিষ্ঠতা, আধুনিক নারীর প্রতীক। আশা তাঁর জীবনের সবকিছু, যথা-[illegible] না। তাঁর ভগবদ্ভক্তি আর [illegible] শক্তিতে আমাদের প্রয়োজন নেই। তার বদলে আমরা আরো পার্থিব আত্মশক্তি পেয়েছি। ভবিষ্যতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রত্যয় আমাদের রয়েছে। তাই নাটকটিতে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি কম জোর দেওয়া হবে। অবশ্য তাঁর জীবনে এই অলৌকিক দিকটি খুবই প্রাধান্য পেয়েছে, তাঁর কাছে তা গভীর সত্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জোন যে যুগে জন্মেছিলেন, সে যুগটিকে আমাদের একালের চোখ দিয়ে দেখতে হবে। [illegible] তৈরি করেছি। [illegible] চরিত্র [illegible] এর মধ্যেই সম্পূর্ণ [illegible] হয়েছে। জোনের ইতিহাসের ব্যাখ্যা বড় চিত্তাকর্ষক। ফরাসীরা তাঁকে একভাবে দেখেছে, ইংরেজরা [illegible] একেক জাতি তাঁকে একেক ভাবে দেখেছে। আমাকেই ব্যালের প্রযোজক বলতে পার। নাটক রচনা, কম্পোজারকে আহ্বান করা সব আমিই করেছি। নাচে এখন পর্যন্ত জন্য একটি মেয়ে মহড়া দিচ্ছে। সেপ্টেম্বর থেকে আমি শুরু করব।"

"নাচের জন্য আমি এখনও অনুশীলন করি, প্রতিদিন দেড় ঘণ্টাতো নিশ্চয়ই। তা ছাড়া শিক্ষকের কাছে এখনও ক্লাস করি। অবাক হবার কিছু নেই, আমাদের প্রত্যেককেই তা করতে হয়। তাছাড়া আড়াই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা মহড়া তো আছেই। নতুন ভূমিকায় আরও বেশি মহড়া দিতে হয়, তখন শুধু দিনের বেলা নয়, রাতেও অভ্যাস করতে হয়।

"অন্য নাচিয়েদের কথা জিজ্ঞেস করছ? নতুন এবং পুরোনোদের মধ্যে অনেক বড় বড় নাচিয়ে আছে। আমরা তো মনে করি, আমাদের ব্যালে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের ব্যালেও খুব

ভাল। নতুন নাচিয়েদের অভিনয় নানান জায়গায় দেখতে পাবে। খুবই চিত্তাকর্ষক। প্রত্যেকেরই নিজস্ব গুণ আছে। একেবারে নতুনদের মধ্যে তিমোফেরার গায়না আমায় খুবই মুগ্ধ করেছে। এখনও একেবারে নতুন। কিন্তু উজ্জ্বল বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর মায়া প্লিসেৎস্কায়া ত আছেই। পুরনোদের কথা? আমিই হচ্ছি সবচেয়ে পুরনো আর আছে লেপ্রেশেনস্কায়া।

"ছেলেদের নাচের কথা যে বলেছ, কথাটা সত্যি। আমাদের নৃত্যধারা বড় অদ্ভুত। ছেলেরা সেখানে সব সময়ই গৌণ। আমাদের ক্লাসিকাল নাচ মেয়েদের নিয়েই। অবশ্য চাবুকিয়ানির মত পুরুষ নাচিয়েও আছেন। তিনি নাচের মধ্যে তাঁর সারা ব্যক্তিত্ব, মনপ্রাণ ঢেলে দিতেন। অমন নাচিয়ে বড় একটা হয় না। ক্লাসিকাল নাচের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক্সপোনেণ্ট। ভাল পুরুষ নাচিয়ে হতে হলে সুন্দর শরীর, সুদর্শন চেহারা, কমনীয়তা, অভিনয় ক্ষমতা প্রভৃতি গুণ থাকা চাই।"

"সোভিয়েৎ ইউনিয়নের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রে ব্যালের দ্রুত বিকাশ ও উন্নতি ঘটেছে। তোমার প্রশ্ন শুনেই আমার মনে পড়ল বশকিরীয় প্রজাতন্ত্রের কথা। সেখান থেকে কত ছোট ছোট ছেলেরা লেনিনগ্রাদে নৃত্য শিখতে আসে। বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রগুলিতে গত পনের বছর ধরে চর্চা চলেছে। এখন তার ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাশখেন্দে নৃত্য বিদ্যালয় আছে। সেখানে লেনিনগ্রাদ কোরিয়োগ্রাফি কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা শেখাচ্ছেন। মস্কোর নৃত্য শিক্ষায়তনের চেয়েও তা পারেনা। আগে তো ওসব অঞ্চলে অপেরাও দুর্লভ ছিল। এই নৃত্যচর্চার ফল আমরা প্রতি বছর দেখতে পাই—প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রের দশ দিনব্যাপী নাচ গান নাটকের উৎসব মস্কোতে হয়। আগে কেবল পাঁচ ছটি শহরে ব্যালে থিয়েটার ছিল। এখন তার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। কোন কোন শহরে ত নিজেদেরই ব্যালে শিক্ষায়তন রয়েছে। শিক্ষকরা অধিকাংশই মস্কো বা লেনিনগ্রাদ কলেজ থেকে পাশ করা। তবে ব্যালের কাহিনী তাদের নিজেদেরই। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, প্রত্যেক প্রজাতন্ত্র নিজেদের জাতীয় নাচকেই ক্লাসিকাল রূপ দিয়েছে।"

"তোমার এই শেষ প্রশ্নটি সত্যিই ভেবে দেখবার মত। রোমিও জুলিয়েৎ, জিজেল দুয়েতেই আমি যে চরিত্র অভিনয় করেছি, সে দুটিতেই আত্মত্যাগ এবং মহত্ত্বের সুর আছে। গভীর দুঃখ বেদনা দুটি চরিত্রেই রয়েছে। ঠিকই বলেছো। সত্যিই, এ জাতীয় চরিত্র অভিনয় করতে আমার ভাল লাগে। আমার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই চরিত্রগুলির কিছু আত্মীয়তা আছে। প্রত্যেক শিল্পীরই নিজস্ব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। গানের বেলা যেমন কেউ হয় সোপ্রানো, কেউ অন্য কিছু, ব্যালেতেও তেমনি শিল্পীদের একেক জাতের অভিনয় বেশি পছন্দসই হয়। আমি এই ধরনের চরিত্রই বেশি ভালবাসি।"

"বলছ, আমার নাচে তুমি হিউমারের প্রকাশও দেখেছ। হ্যাঁ, জিজেলের প্রথম অঙ্কে আছে।"

"রোমিও জুলিয়েতে সেই নার্সের সঙ্গে খেলা করার দৃশ্যেও আছে।"

"সবার পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব নয়। কাজেই আমি ওদিকে বেশি নজর দিইনি। অন্যদের অন্যান্য ব্যালে আছে তাতে হিউমারের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ দেখতে পাবে।"

আলাপের পর ঘর থেকে বেরতে বেরতে মিঃ ডেক্সটর বল্লেন, "অত্যন্ত কালচার্ড মহিলা, তাই না? নন্দলাল বসুর এলবামটি যেভাবে মুগ্ধ হয়ে দেখলেন, তাতে বোঝা গেল ছবির বিষয় ওঁর অসামান্য জ্ঞান। 'অন্ধ ভিখিরী' (কুর্ণাল) আর 'নন্দিরা নৃত্য' ছবিদুটিই সবচেয়ে ভাল লেগেছে। ল্যাণ্ডস্কেপগুলোও।"

"আচ্ছা লেভান্ত আর শির্শাকিন কে বলুনতো? তাঁদের বন দৃশ্যটি দেখে বল্লেন, এ যেন একেবারে লেভান্ত শির্শাকিনের আঁকা।"

"লেভান্ত আর শির্শাকিন রাশিয়ার দুজন খুব বড় শিল্পী। তাঁরা সারা জীবন শুধু বনের দৃশ্যই এঁকেছেন। রুশ শিল্পের ক্লাসিকাল যুগের লোক তাঁরা। এলবামে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটি তাঁকে পড়ে শোনালে, সেটা কিন্তু তোমার অফিসের কাউকে দিয়ে অনুবাদ করে পাঠাতে ভুলনা। বারবার করে চেয়েছেন। কবিতাটির শেষের কটি লাইন একটু বদল করে উলানোভার সম্বন্ধেও বলা যায়, তাই না?

"বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম
লেখ অক্ষয় বর্ণে!......
চির সুন্দরে করগো তোমার
রেখা বন্ধনে বন্দী।
শিবজটা সম হোক তব তুলি
চিররস নিস্যন্দী।"

"তুলিটা অবশ্য খাটল না। তবে তাতে কিছু এসে যায় না।"

চক্রদত্ত

বিজ্ঞানের যুগের মানুষ সব কাজই যন্ত্রে সম্পন্ন করতে চায়। কোনও কাজ হাতে করে করার কষ্টটুকু স্বীকার করতে নারাজ। বৃটিশ টেকনিশিয়ানগণ একটি অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র বার করেছেন। মানুষ নিজে হাতে ক্ষুর চালিয়ে ধীরে ধীরে যেমন ভাবে দাড়ি কামায়, এই যন্ত্রে ঠিক সেইভাবেই আস্তে আস্তে দাড়িচাঁচা হয়ে যায়। অবশ্য এই উদ্দেশ্যেই যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয়নি। মানুষ কত সূক্ষ্ম
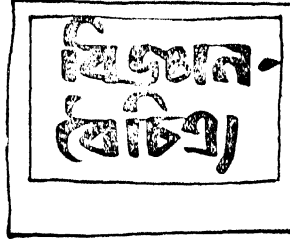
অতি সূক্ষ্ম দাড়ি কামানর যন্ত্র

এবং কলাকুশলী যন্ত্র তৈরি করতে পারে, সেইটুকু দেখানর জন্যই এই যন্ত্রের আবিষ্কার। মানুষ যন্ত্রকে বেতনভোগী ভৃত্যের মতই নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারে।

•

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতবর্ষে ফলমূল সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে। এর জন্যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে ফল এবং সব্জি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করা হবে। এর জন্যে ভারত সরকার অনেক ছোট ছোট "ক্যানারি" স্থাপন করবেন। প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা এর জন্যে আলাদা করে রাখা হয়েছে। এই টাকা ভারত সরকার ভারতবর্ষের প্রায় ২০০টি "ক্যানারিকে" ধার দিবেন। এছাড়াও প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা দিয়ে সরকার পাঁচটি বড় বড় সংরক্ষণাগার প্রতিষ্ঠা করবেন। এগুলো যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে ফল এবং সব্জি জন্মায়, সেই স্থানে স্থাপন করবেন। যেমন পাঞ্জাবে কুলু ভেলী, মহীশূরে কুর্গ, উত্তর-পশ্চিম বাঙলা, বিহার পশ্চিম উড়িষ্যা এবং অন্ধ্র প্রদেশে। এর মধ্যে কলিকাতায় কলেজ অব টেকনলজি এবং ইঞ্জিনীয়ারিংতে ইতিমধ্যে আমের সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ চলছে। এই গবেষণা করবার জন্য 'কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ' টাকা দিচ্ছেন। এই গবেষণায় প্রধান তিন প্রকারের আম যেমন ফজলী, ল্যাংড়া এবং হিমসাগর নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, হিমসাগর আমকে টিনজাত করে রাখায় সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ ঘরের উত্তাপে এই আমকে যদি ছয় মাসও রাখা যায়, তাহলেও এর বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদের কোন তারতম্য ঘটছে না। এবং ঠিক তাজা আমের মতই খেতে লাগে। টিনজাত করবার সময় যদি শতকরা ৫০ ভাগ আখের থেকে তৈরি চিনির রসে রাখা যায়, তাহলে টিনজাত আম আরও ভাল থাকে দেখা যাচ্ছে।

*

একটি টাকার আকারে একটি ছোট্ট ব্যাটারি তৈরি হয়েছে। ইউ এস এ'র নেভাল অর্ডিন্যান্স ল্যাবরেটরী এই ব্যাটারি বার করেন। এই ব্যাটারিতে বারে বারে নতুন করে শক্তি দিয়ে বছরের পর বছর ব্যবহার করা যায়। —সাধারণত একটা শুকনো ব্যাটারির শক্তি দিয়ে বছরের প রবছর ব্যবহার করা দেখে দিলে জিনিসটি নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু এই ব্যাটারি সে ভাবে নষ্ট হয় না। —নৌবহর বিভাগ জলের নীচে মাইন এবং শূন্যে মিসলস্ ছাড়ার জন্য এই ব্যাটারি ব্যবহার করতেন। এখন এই ব্যাটারি জনসাধারণের ব্যবহারে লাগছে। কানে শোনার যন্ত্র, পোর্টেবল রেডিও, বাড়ি কিংবা অফিসে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে টেলিফোনে যোগাযোগ করার জন্য যেসব ব্যাটারি লাগে, এই টাকা প্রমাণ ব্যাটারি সেই সব কাজে লাগছে।

•

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চগ্রাম শব্দ-তরঙ্গ দিয়ে রোগবহন জীবাণু ধ্বংস করা ছাড়াও টীকা প্রস্তুতের জন্যও এই শব্দ-তরঙ্গ ব্যবহার করছেন। শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে জীবাণুদের শরীরের ওপরের পাতলা এবং শক্ত আবরণকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়, ফলে জীবাণুর দেহস্থিত সাইটোপ্লাজম নগ্ন হয়ে পড়ে এবং জীবাণু-গুলি ধ্বংস হয়ে যায়। শব্দতরঙ্গ দিয়ে এগুলি নষ্ট করার জন্য কোনও রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয় না। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া না হওয়ার দরুণ মৃত জীবাণুর সাইটোপ্লাজমের সাহায্যে টীকা প্রস্তুত করা যায়। এই শব্দতরঙ্গের স্পন্দন এক সেকেন্ডে ৪,০০০০০ বার হয়, ফলে মানুষ এটা শুনতে পায় না। পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে যে, এই উচ্চগ্রামের তরঙ্গই সবচেয়ে সুবিধাজনক। এই দিয়েই জীবাণুর দেহের আবরণ সাইটোপ্লাজম থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করা যায়। পুরোনো পদ্ধতিতে এই কাজ এলকোহল এবং অ্যাসিডের সাহায্যে সম্পন্ন হতো বলে সাইটোপ্লাজমগুলিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এখন এই নতুন উপায়ে কলেরা এবং টাইফয়েডের টীকা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

•

দেরাদুনে 'ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট' গবেষণা করে কাঠের গুঁড়ো এবং কৃষিজাত অপ্রয়োজনীয় বস্তুর সাহায্যে এক নতুন ধরনের বোর্ড এবং অন্যান্য জিনিস তৈরী করার পদ্ধতি বার করেছেন। কৃষিজাত বস্তু-গুলি হচ্ছে ধানের গুঁড়ি, জিনজিরের খড়, পাটকাঠি, বাদামের খোলা, চা পাতার ছাটাই ইত্যাদি। এইসব বস্তুকে খুব ভাল করে গুঁড়ো করে মিশিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ উত্তাপ এবং চাপ প্রয়োগ করা হয়। সমস্ত জিনিসটা গুঁড়ো করে মেশাবার সময় কোনরকম এ্যাসিড, কিছুটা চুন কারবোনেট, এবং অন্য কিছু রাসায়নিক বস্তু মেশান হয়। বর্তমানে এই নতুন উপায়ে যে বোর্ড তৈরী হচ্ছে সেগুলি খুবই শক্ত এবং এই বোর্ড ঘরের মধ্যে দেয়াল দেবার জন্য, ঘরের ভেতরের ছাদ, আলমারী, টেবিলের ওপরকার ছাউনি ইত্যাদি তৈরী করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

অসুখী বিড়াল

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সুখে ছিল সেই মেয়েটি।
রোজ রাত্রে—আম জাম আর ঝাউয়ের পাতায়
হাওয়ার খুনসুটি যখন শান্ত হয়ে আসে—
ঘুমে-জড়ান ঝাপসা গলায় সে প্রশ্ন করত,
"আমাকে খুব ভালবাস বুঝি?"
সুখে ছিল সেই মেয়েটি।
সুন্দর এবং ঠাণ্ডা এই প্রশ্নটিকে
জাগিয়ে দিয়েই সে ঘুমিয়ে পড়ত।

বোকা ছিল সেই মেয়েটি
নয়ত বুঝত যে, যত সুন্দর ঠিক ততখানিই ভয়াবহ,
যত ঠাণ্ডা ঠিক ততখানিই বিপজ্জনক
তার প্রশ্ন।
বোকা ছিল সেই মেয়েটি।
নয়ত জিজ্ঞাসার এই আগুনকে
শিয়রে জ্বালিয়ে রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ত না।

দ্যাখো এখন সেই মেয়েটিকে।
চৌকাঠে পা রেখে কী করুণ আর ক্লান্ত,
কী অসহায় আর বিপন্ন চোখে সে তাকিয়ে আছে।
বিছানা থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া
অসুখী এক বিড়ালের মত।

এক দিন, দু দিন, তিন দিন।
তারপর আবার সে তার শয্যায় ফিরে আসবে।
হয়ত আসবে;
কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে—
আম জাম আর ঝাউয়ের পাতায়
হাওয়ার মর্মর যখন শান্ত হয়ে আসে—
কোন প্রশ্নকেই সে আর জাগিয়ে তুলবে না।
তার সমস্ত জিজ্ঞাসাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে
সারারাত সে ঠায় জেগে থাকবে।

কো জা গ রী

গোবিন্দ চক্রবর্তী

কোথাও ফসল কাটা হ'ল
বাতাসে মেদুর গন্ধ তার—
দিগন্ত রাঙিয়ে ওঠে চাঁদ
লক্ষ্মীমূর্তি লক্ষ্মী-পূর্ণিমার।

আয়ুর সম্ভার আসে ঘরে—
কল্যাণীরা শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি করে
—জন্মভূমি উৎসব-মুখর।
স্নেহ আসে, সুধা আসে, আর আসে প্রেম—
দ্বিধাহীন দেবতার বর;
আবার ভুবন হয়—অন্নপূর্ণার।

গাছ-গাছালিতে ঝরে হীরা—
হীরার নয়নে চায় টিয়া আর হীরামন,
সকল পাখিরা।
প্রাণ করে অভ্যর্থনা প্রাণের ধ্বনিরে।
আসে রূপ, আসে রঙ আর জমে রস
জীবনের কোষে-কোষে নীড় থেকে নীড়ে;
হিমঘন আলোকে-তিমিরে
আবার হেমন্ত আসে ফিরে
হেম ঋতু—রূপময়ী বসুন্ধরার।

সম্প্রতি আর্টিস্ট্রী হাউস-এ 'স্টুডিও'র সভ্য-সভ্যা কৃত চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। 'স্টুডিও'র পরিচালক শিল্পী দিলীপ দাশগুপ্ত। দিলীপবাবু কিছুদিন আগে তাঁর কয়েকজন ছাত্রছাত্রীসহ জামশেদপুরে গিয়েছিলেন কিছু স্টাডি করতে। দলে ছিলেন নিপা মৈত্র, সন্তোষ রোহতগী, করুণা সাহা, অমৃত মাথুর, চিত্রা দত্ত, অদিতি সেন, মিন্টু দত্ত, সুজাতা সেনগুপ্ত, সুকান্ত বসু, প্রকাশ কর্মকার, সুদর্শন বেনেগল, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ কর এবং মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের চিত্রকলার সঙ্গে আমার ইতিপূর্বেই পরিচয় ঘটেছে। এঁদের ওপর সত্যিই আস্থা রাখা যায়, সেকথা পূর্বেও বলেছি এবং এখনও বলছি। এঁরা যথেষ্ট শক্তির অধিকারী এবং দিলীপবাবুর শিক্ষাধীনে থেকে এঁরা আরও উন্নতি করবেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এ-প্রদর্শনীর সব কটি ছবিই ছিল জামশেদপুরের ইস্পাতের কারখানার বিভিন্ন কোণ থেকে দৃষ্ট স্টাডি। সব কটিই তৈল-মাধ্যমে রচিত। সব কটিই প্রায় একই মাপের এবং বেশ খরচ করে বাঁধানো। এসব দেখে মনে হয়, প্রদর্শনীটি সুপরিকল্পিত এবং সুপরিচালিত। রচনায়, টানটোনে, বর্ণ-বিন্যাসে এই শিল্পী গোষ্ঠীর সভ্য-সভ্যারা সকলেই বেশ পরিণত। কিন্তু আঙ্গিকে সুস্পষ্ট কোনও স্বকীয়তা এঁদের কারুর মধ্যে লক্ষ্য করা গেল না। এঁরা বিরাট বিরাট যন্ত্রের ছবি এঁকেছেন, কিন্তু ওসব যন্ত্রের চালকদের বাদ দিয়ে, তার ফলে স্টাডি-গুলি বিজ্ঞাপনের কাজে লাগতে পারে বটে, কিন্তু এগুলিতে প্রাণ নেই। কাজেই দু-একটি ছবি দেখার পর একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি দেখতে দেখতে ক্লান্তি আসে। টেকনিকেও যদি মাঝে মাঝে কিছু প্রভেদ দেখা যেত, তাহলেও দর্শক-ইন্দ্রিয় কিছুটা বিশ্রাম লাভ করতো। টাটার কারখানার প্রাণ শুধু কলকব্জাগুলি কলকব্জা, এ-কথাই কোনো সত্য নয়। সেখানকার কর্মীরাই হল আসল প্রাণ। এই কর্মীদের বাদ দিয়ে যতই সুপরিকল্পিত রচনা হোক না কেন, এ-রচনাকে প্রকৃত রসোত্তীর্ণ রচনা বলা যায় না। সুতরাং দিলীপবাবু এবং তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা উদ্দেশ্যকে ঠিক সফল করতে পারেননি বলেই আমার ধারণা।
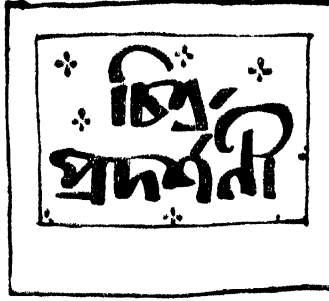
উল্লেখযোগ্য ছবি: নিপা মৈত্রের 'পিট-সাইড', সন্তোষকুমারী রোহতগীর 'স্মোকিং পিট্‌স' এবং 'কনস্ট্রাকশন অ্যাণ্ড কমপ্লিটিং প্ল্যান্ট', করুণা সাহার 'কভার্ড কনভেয়ার', চিত্রা দত্তের 'স্টীল মুভস অন ইটস ওয়ে আউট', অদিতি সেনের 'কোক ব্যাটারিজ', মিন্টু দত্তের 'কোক', সুজাতা সেনগুপ্তের 'ব্লাস্ট ফারনেস' সুকান্ত বসুর 'হুইল সেট' এবং 'কনস্ট্রাকশন সাইট', প্রকাশ কর্মকারের 'শপ বে', 'পাইপস অ্যাণ্ড স্ট্যাকস' এবং 'হিট অ্যাণ্ড লাইট', সুদর্শন বেনেগালের 'নিউ শপ টেকিং শেপ' এবং 'টার্নিং দি হুইলস', দীপক ব্যানার্জির 'স্টীল এক্স-টিরিয়ার', সনৎ করের 'টংসম্যান' এবং 'রিফ্লেকশনস', মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর 'আফটার গ্লো' এবং দিলীপ দাশগুপ্তের 'প্যাটার্ন ইন গ্রে,' 'এণ্ড অব দি রো' এবং 'নাইট লাইটস'।

এ শপ ইন দি মেকিং — দিলীপকুমার দাশগুপ্ত

পূর্ববঙ্গের প্রাচীন লোকসংগীত ও পল্লীকবি পাগলা কানাই

অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন

পূর্ববঙ্গের প্রাচীন লোকসংগীত বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এই সব লোকগাথার জন্ম হয়েছিল বাংলা দেশের অসংখ্য মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, উন্নত মানসিকতা, সমাজ-সংস্কৃতি এবং আচার অনুষ্ঠানের ভেতর থেকে। পল্লীর অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত কবিগণ বাঙালীর চিরন্তন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করে এসেছেন এই পল্লী সংগীতের মাধ্যমেই। সত্যি, গানের দেশ পূর্ববঙ্গ। এখানকার আউল, বাউল, সাধু, কৃষক, মজুর, রাখাল সবাই গান গায়; ঘাটের মাঝি থেকে শুরু করে গৃহস্থ ঘরের বৌ-ঝিরা পর্যন্ত হাতে একটু সময় পেলেই গান গেয়ে মনের সাধ মিটায়। লোকসংগীত বলতে আমরা বুঝি ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত ছেলে-ভুলানো ছড়া, এবং বিভিন্ন রূপকথা, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ব্রত-পার্বণ প্রভৃতি। সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে থাকে গল্পের অংশ বা গল্প। মহুয়া, কাঞ্চনমালা, মধুমালা প্রভৃতি গল্পের মধ্যে রয়েছে প্রচুর গান। সত্যিকথা বলতে কি, পূর্ববঙ্গের প্রাচীন লোকসাহিত্যের বিরাট অংশটাই হ'ল লোক-সংগীত। এক সময়ে গ্রামের মানুষ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আসর বসিয়ে চর্চা করত গানের; এই গান ছিল তাদের সাংস্কারের সম্পদ। তারা মনের আনন্দ প্রকাশার্থে গাইত গান, আবার মনের বেদনা জ্ঞাপনার্থে আশ্রয় নিত গানের। নিখিল জগতের মুসলমান মহরম মাস উপলক্ষে কারবালার মর্মবিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে শোকপ্রকাশ করে থাকে, সেই শোক প্রকাশের জন্য গান রচনা করেছে পল্লীর অশিক্ষিত কবি; এই গানের নাম জারীগান। জারীগান অত্যন্ত করুণ; কারবালার নিহত বীর শহীদানদের অদ্ভুত ঘটনা নিয়ে অতি সুন্দর করে এই গান রচিত। আউল, বাউল, সাধু, সূফী কবি যে গান রচনা করেছেন, তা গভীর অর্থদ্যোতক; তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার আমেজ রয়েছে মেশানো। এদের গানের প্রধান লক্ষণ হ'ল, মনের মানুষের প্রতি সুগভীর আকুলতা। বাউল নিজেই সন্ধান করে মনের মানুষ; তাদের ধর্মভাবও খুব সহজ ও প্রাঞ্জল। জগৎ এবং জীবনের প্রতি বৈরাগ্য নয়, বরং সুগভীর দরদ রয়েছে জন্যই সবাইকে সুন্দর ও মনোরম করে দেখতে তাঁরা প্রয়াসী। জারীগান ও বাউল গান ছাড়াও পূর্ববঙ্গে রয়েছে ভজনগান, সারীগান, ভাটিয়ালীগান, কবিগান, জাগগান, আসানগান, রাখালীগান, ভাওয়াইয়াগান, মেয়ে-গান, পালাগান, বিয়েরগান, ছেলেভুলানো ছড়া বা গান প্রভৃতি। পূর্ববঙ্গের আকাশে-বাতাসে ঘর গৃহস্থালীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, ছড়িয়ে রয়েছে এই সব গান। শুধু কি তাই, পূর্ববঙ্গের রসিক নরনারী মাত্রই উত্তরাধিকারসূত্রে গান গাবার প্রবণতা লাভ করেছে। তাই, আর কিছু না থাকলেও গান থাকে তাদের জীবনের সম্বল হিসেবে। এত গান রয়েছে তা গণনা করা দুঃসাধ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন প্রমুখ পণ্ডিত এবং মনীষিবর্গের অক্লান্ত চেষ্টা এবং সাধনায় পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বহু গান; এবং সে-সম্পর্কে দেশের রসিক সাহিত্যিক ও পাঠক-বর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কত গভীর তত্ত্ব ও কল্পনা রয়েছে পল্লীকবিদের রচিত গাথা ও লোকসংগীতগুলোর মধ্যে, তা আমরা পাঠ করে বিস্মিত না হয়ে পারি না। জীবন ও জগৎ যে এমন অপূর্ব ভাব-রসে শ্রীমণ্ডিত হতে পারে তা তাঁরা যেমন করে বলতে পেরেছেন, তেমন করে বলতে পারেন না আজকের যুগের কোন সুশিক্ষিত ও শালীনতাবোধসম্পন্ন রসিক কবি।

'আমার মনের মানুষ যে রে
আমি কোথায় পাব তারে,
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।'

* * *

আমি মন পাইলাম মনের মানুষ পাইলাম না
আমি তার মধ্যে আছি, মানুষ তাহা চিনল না।'

এই সব লোকসংগীতের অপূর্বতা সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তার আলোচনার কথা। "হঠাৎ শুনিলাম এইগুলি এত ভাল যে, তাহা কখনো নিরক্ষরদের রচনা হইতে পারে না। ইহা এখনকার শিক্ষিত লোকদের ধারনা।" তিনি বলিলেন, "শিক্ষিত লোকদের মুরোদ ত আমার অজানা নাই। এই সব জিনিস যে তাহাদের রচনা শক্তির বাইরে, তাহা আমি খুবই বুঝি। একটা গান পাইলে হয়ত তাহারা কতক অনুরূপ গান করিতে পারেন। কিন্তু মূল রচনা করা কোন শিক্ষিত লোকের কার্য নয়। অন্ততঃ আমার তো তাহার কাছাকাছি শক্তিও নাই।" (পৃষ্ঠা—৬১, "বাংলার বাউল"; এবং "হারামণি", কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪২, পরিশিষ্ট।) পূর্ববঙ্গের প্রাচীন লোকসংগীত সে বিশ্বের যাবতীয় সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ, তার প্রকৃষ্ট পরিচয় দান করে গেছেন দীনেশচন্দ্র সেন মশাই তাঁর "মৈমনসিংহ গীতিকা" এবং "পূর্ববঙ্গ গীতিকা" নামক মূল্যবান গ্রন্থ দুখানিতে। এই পুস্তক দুখানি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রসবস্তু হিসেবেও সুধীব্যক্তিবর্গের স্বীকৃতি পেয়েছে। এ বড় সহজ কথা নয়। প্রাচীন পল্লীর হিন্দু-মুসলিম কবিকুলের রচিত "মহুয়া", "কাজল রেখা," "দেওয়ানে মদীনা", "দেওয়ানে ভাবনা" প্রভৃতি গ্রন্থের চরিত্রগুলো তদানীন্তন সমাজের মানুষের জীবন্ত প্রতীক। এগুলো এত চমৎকার যে পঞ্চমুখে তার প্রশংসা করেও শেষ করা যায় না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই সব পল্লীকবিদের রচনা পাঠে অতিশয় উৎফুল্ল হয়েই বলেছিলেন, "এমন গভীর, এমন সোজাসুজি সত্য, এত অল্পকথায়, এমন অপূর্বভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদেরও নাই। আমার তো ইঁহাদের রচনা দেখিয়া রীতিমত হিংসা হয়।" (পৃষ্ঠা ৫৮, বাংলার বাউল—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।)

পল্লীকবিদের রচনার সৌকর্য এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহাকবির মনে হিংসার উদ্রেক করেছিল, এতেই বুঝতে পারি, তাদের রচনাশক্তি কত উচ্চগ্রামে বাঁধা।

এইবার আমি এমন একজন পল্লীকবি বা সাধককবির জীবন ও কবিত্বশক্তি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব, যার কবিতা ও সংগীত পূর্ববঙ্গবাসীমাত্রই নিজের প্রাণের জিনিস হিসেবে গ্রহণ করেছে। এর কাব্যরস, এর অপূর্ব সুর ঝংকার অধুনা পূর্ব-বাঙলার অন্তর-বীণায় স্পন্দন তুলেছে। কবির নাম পাগলাকানাই। তিনি ছিলেন সুন্নী মুসলমান। হয়ত প্রেমিক অর্থে তাঁকে বলা হত পাগল। মূলত পাগলা-কানাই ছিলেন সাধক কবি ও প্রেমিক। তাঁর জন্ম হয়েছিল যশোর জেলার ঝিনাই-দহ মহকুমার অন্তর্গত বেড়বাড়ি গ্রামে। কবির জন্মের যথার্থ সন তারিখ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে; তথাপি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের ধারনা যে তিনি খুব সম্ভব ১৮২৫ সাল থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অভিভাবকের সাংসারিক অস্বচ্ছলতাবশত কবি বেশীদূর এগোতে পারেন নি লেখাপড়ায়। কিন্তু তাঁর কল্পনাশক্তি এতদূর প্রখর ছিল যে, তিনি মুখে মুখে ছড়া বাঁধতে পারতেন এবং সেই ছড়া এবং গান শুনিয়ে আসরের শ্রোতৃ-মণ্ডলীর পরিতৃপ্তি বিধান করতেন। সত্যি, একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল তার কবিতা ও গানে। কবি আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথাসম্বলিত কবিতা ও সংগীত রচনা করলেও মর্তের মানুষের কথা ভুলে যাননি। তাই তত্ত্বকথার অন্তরালে তিনি যা বিতরণ করেছেন, তা হল সাদামাটা কথা। এ কথাগুলো মানব-জীবন সম্পর্কে সত্যবাণী। মরমী সাধক কবিরাই সাধনভজনের মূলে এক "মালিক-সাঁই" বা আধ্যাত্মিকগুরুকে অবলম্বন করে থাকেন। কবি পাগলাকানাইও যে কোন আধ্যাত্মিকগুরুকে অবলম্বন করে সাধনা করে গেছেন বিভিন্ন গানের মধ্যে তার পরিচয় জানা যায়। পাগলাকানাইয়ের গান-গুলো রত্নের মত ছড়িয়ে রয়েছে পাবনা, বগুড়া, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, ময়মনসিংহ জেলার সর্বত্র। ঐ সব জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের নরনারী অতি শ্রদ্ধার সংগে তাঁর গান গেয়ে থাকে। কবির জীবনের অধি-কাংশ সময়ই অতিবাহিত হয়েছে পাবনা জেলার উল্লাপাড়া, শাজাদপুর, বেরা, কাজি-পুর প্রভৃতি থানার গ্রামে গ্রামে। তাই এ জেলার অধিকাংশ লোক কবিকে পাবনা জেলার লোক হিসেবে দাবী করে থাকে। পাগলাকানাই এক উন্নত মানসিকতার অধি-কারী ছিলেন বলে সাধনার সাহায্যে আধ্যাত্মিকজ্ঞানার্জন করতে পেরেছিলেন। তাঁর গানগুলোর মধ্যে উচ্চভাব প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। এদিক দিয়ে তার সংগে তুলনা চলে প্রাচীন পল্লী সাহিত্যের অপর একজন মরমী কবি ফকির লালন শার। উৎকৃষ্ট পল্লীসংগীতের রচয়িতা হিসেবে শুধু নয়, সাধক হিসেবে দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করে-ছেন ফকির লালন শাহ্; খ্যাতির দিক দিয়ে পাগলাকানাইয়ের মর্যাদা ও স্থান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শাহ্ লালনের ঠিক পরেই। সেকালেই বাংলা দেশের জনমানসে সুফীভাবধারার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়; এবং এই প্রাধান্য পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে পর-বর্তী তিনচার শ' বছর পর্যন্ত বাংলা কবিতা ও গানে স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্য করা গেল। সুফীভাবাদর্শে বাংলা দেশের বাউল, মারফতি এবং দেহতত্ত্বমূলক সংগীতগুলো রচিত হতে লাগল এবং তা বাংলা ভাষা-ভাষী জনগণের অন্তরজয় করে নিলো। কবি পাগলাকানাই যে গীতিকা ও কবিতা রচনা করেছিলেন তা এই সুফীভাবাদর্শের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত। "নিজের আত্মাকে জানো—Know thy self"; এ হলো সুফীর বৈশিষ্ট্য। পারস্য সাহিত্যের দার্শনিক কবি মওলানা জালাল উদ্দীন রুমী (১২০৭—১২৭৩) অহং (Ego) অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি করবার যে তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, বাংলার প্রাচীন পল্লীকবিরা তাকেই অনুসরণ করেছিলেন। কবি পাগলাকানাই কিন্তু তত্ত্বকথার ফাঁকে ফাঁকে মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন স্বীয় হৃদয়ের আকূতি ও অনুভূতি। মানবজীবন একান্তভাবে ক্ষণভংগুর; তাই তিনি কর্ম ও শক্তির ভেতর দিয়ে সত্য উপলব্ধি কর-বার জন্য তাগিদ দিয়েছেন নরনারীকে। তাঁর গানগুলোর মধ্যে যে তত্ত্বের সমাবেশ হয়েছে, তার অর্থ পরিষ্কার করতে পারলে দেখা যায় যে, কবি যথার্থভাবে মানুষকে সহজ ও অভ্রান্ত পথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। পাগলাকানাইয়ের রচিত আমার সংগৃহীত কতকগুলো গান উদ্ধৃত করে আমার কথার সারবত্তা সপ্রমাণ করব।

[দেহতত্ত্বমূলক গান]

(ক)

জাহাজের আট কুঠুরী নয় দরজা
মালকোঠা সোনার
দাঁড়িমাল্লা ছয়জন রিপু জাহাজ চালায় না
জাহাজের কি হবে
পাগলা কানাই বসে এখন তাই ভাবে;
যেদিন জাহাজ হবে কমজোরী ভাই
বান খেয়ে তরী জল নেবে।
দাঁড়িমাল্লা ছয়জন রিপু সব চলে যাবে,
যেদিন শুকনায় তরী তল্ হ'বে।

(খ)

আজব এক জাহাজ গড়ে'
দীনবন্ধু পাঠাইছেন ভবের পরে।
যে জাহাজ পানিতে কখন চলে না
শুক্‌নাতে ভেসে ফেরে।
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু মন মাঝি হাল ধরে
জাহাজ চল্‌তাছে ভাই দুই দাঁড়ে
পাগলা কানাই করতাছে খেয়ান
দুই দাঁড়ে সেই জাহাজ চলে
পানি ছেড়ে চলে শুক্‌নার 'পরে।

(গ)

আত্মার চিজ রথখানি গড়া
জলে স্থলে কবিরে নির্মাণ
চাদের ঘোড়া;

ও তা পাগলা কানাই বলে কি আছে কপালে।
আগাপাছা রথের গড়া
আমি ভাবি তাহাতে কি আছে ললাটে
সাধ ক'রে রথে চড়া।
গঠন সাড়ে তিন হাত চলে ত্রিজগতে
সাধের রথ ফেলে যাবে খাড়াক্কাখাড়া।

উপরি-উল্লিখিত গানগুলোতে কবি পাগলাকানাই মানবদেহকে তুলনা করেছেন জাহাজরূপে। মানব দেহের ছয়টি রিপু দেহরূপ জাহাজের মাঝিমাল্লা। এই রিপুগুলো দেহ ছেড়ে চলে গেলে দেহের মূল্যে থাকবে না; তাই কবি মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আবার কবি মানব দেহকে ঘরের সঙ্গে এবং স্রষ্টাকে ঘরামির সঙ্গে তুলনা করে ধুয়ো বেঁধেছেন। যেমনঃ

পাগলা কানাই বলে, এমন ঘরে
বসত করো তুমি;
আমি দেশবিদেশে ঘুরে এলাম,
না পেলাম তার ঘরামি।

অন্যত্র—
ঘরামির নাই কো দোষ
কজাত এই দুরজন
ঘারতে দেয় না মন।
একলা কানাই কাঁদি ফিরে,
ঘরের নাইক মেঝে
বিছানা পাতা গিদা বালিশ জানে কার
ইচ্ছা হলে পাংকা টেনে হাওয়া খায়
ঘরের মধ্যে শহর কলকাতা
ইচ্ছে হলে
মধ্যে বসে পাগলা কানাই কালকাটায়।

পাগলা কানাইয়ের আধ্যাত্মিকতামূলক গানগুলোর মূলকথা হল স্রষ্টা বা করুণাময়ের প্রতি অটল বিশ্বাস। কবি সুন্নী মুসলমান ছিলেন বলে স্রষ্টার প্রতি ছিল তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা। এর পরিচয় তাঁর গানের মধ্যে পাওয়া যায়। স্রষ্টার প্রতি অবিশ্বাসী মানুষের মুক্তি সম্ভবপর হতে পারে না; মুক্তি লাভ করতে হলে বা মোক্ষ (Salvation) পেতে হলে অটল বিশ্বাস ও নিষ্ঠা রাখতে হবে চিরসুন্দরের প্রতি। মরমী কবি পাগলা কানাই তাই বলেনঃ

(আধ্যাত্মিকতামূলক গান)

(ক)

দুই পুলসিরাত যেদিন হবি পার
তিরিশ হাতি পথ মানিক সঙ্গে পাড়ি কর,
কত ফকির বৈরুব আলেম ফাজেল
তাঁরা পাড়ি করছেন বহুতের,
আমি কানাই সুপথে নাই কি যেন
করেন পরওয়ার
ভোমামন তাই বুঝি কর কারবার।

(খ)

কোন মোমিন মুসলমান।
তোমরা ঠিক রাখো ঈমান,
সাদরের পর সারিয়ে চলো
ছুটবে যেদিন তুফান
ভয় রাখো ভয় রাখো বলে ওরে মন
ভাবতেছে মালেক জোবহন—
তুপার মহিমা যাহার
সে বড় করনেওয়ালা কুদরতে বাহার।

অধ্যাত্মিক ফকিরী গানে দুর্বোধ্য তত্ত্বকথা রয়েছে অনেক; কিন্তু যে কারণে এগুলো এখনও ভাবুক ও রসিকচিত্তকে সহজে বিমুগ্ধ করে তোলে তা হল কবি মনের বিরানুভূতি ও অকৃত্রিম আন্তরিকতা। পাগলাকানাই বেশী দূর লেখাপড়া না শিখলেও নিজের চেষ্টায় মুখে মুখে অনেক কিছু শিখেছিলেন; তিনি এইভাবে কিছু সংস্কৃত ভাষাও আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কবি নিজে ছিলেন প্রেমিক; তাই প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমামৃত পান করবার জন্যে তিনি প্রেমের সাধনা করেছিলেন সারাজীবন। এর পরিচয় নিম্নের কবিতাংশে রয়েছে।

পিরিত সুহৃদ বটে সর্বস্বাদে ঘৃতং
প্রেমভিন্ন মানাগণা ভিন্ন কোথা জিতং
পিরিতং পিরিতং
ধনাপ্রেম মানাকরি ব্রহ্মাস্বরূপে জিতং
তার বংশ নিপাতিতং

পূর্ববঙ্গের কোন এক পল্লী অঞ্চলের এক অশিক্ষিত কবি প্রেমের যে শাশ্বত চিত্র অংকন করেছেন তাতে আমরা বিমুগ্ধ না হয়ে পারি না। দক্ষ কবিকৃতি ও নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে তাঁর শব্দচয়নের মধ্যে। সত্যি, লোকচক্ষুর অগোচরে পাগলাকানাইয়ের ন্যায় কত কবি কুসুম বিকশিত হয়ে উঠে মানব চক্ষুর অগোচরে ঝরে পড়ে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল; ঐ বনকুসুমগুলোর নিঃশ্বাসের চতুষ্পার্শ্বে যে ভরে উঠেছিল তার খবর আমরা জানতে পেরেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর মানুষের সুখদুঃখের সাথী হয়ে শুনিয়ে তাদের জীবনের রহস্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। পাগলাকানাইয়ের রচিত ছড়ায় মানুষের নিত্যদিনের জীবনের সুখ দুঃখ উদ্ঘাটিত হয়েছে। তাঁর নিকট সাম্প্রদায়িক ভেদবৈষম্য ছিল না, কবির দু'একটি গানে এর পরিচয় রয়েছে।

[illegible]
কেউ বলে [illegible]
[illegible]
[illegible]
যাচ্ছিস কেন সব ভোগায়ে।"

শতাধিক বৎসর পূর্বে পূর্ব বাংলার এক অজ্ঞাত অখ্যাত কবি পাগলা কানাই যে বাণী প্রচার করে গেছেন, তা যুগে যুগে পৃথিবীর মহাপুরুষেরা মানুষকে শুনিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানকালের পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে পারলে পাগলাকানাই সহজেই শিক্ষিত হতে পারতেন। কবি কিছু কিছু পালা গান ও কবি গান রচনা করেছিলেন; দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। অন্যান্য সংগ্রাহকদের মধ্যে অধ্যাপক মহম্মদ মনসুর উদ্দীন, জনাব আমীন উদ্দীন শাহ প্রমুখ রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ এগুলো সংগ্রহ করতে পেরেছেন কিনা জানি না। তথাপি পাগলাকানাই বাংলা সাহিত্যের এক অনাদৃত অধ্যায়ের যে সুন্দর পরিচয় তাঁর বিভিন্ন সংগীত ও ছড়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, তার জন্য তিনি চিরদিন বাঙালী পাঠক ও রসজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট সম্মান লাভ করবেন। তদানীন্তন সমাজের চিত্র হিসেবেও পাগলাকানাইয়ের গানের আলাদা মূল্য অনস্বীকার্য।

স্বর্গের চাবি

টমাসের ফিরতে বিলম্ব দেখে কেরী মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল, বেরিয়ে সন্ধান করবে কিনা ভাবছিল, এমন সময়ে সশব্দে দরজা খুলে দমকা হাওয়ার মত প্রবেশ করল টমাস।

পেয়েছি, পেয়েছি, সোল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠল।

টমাসের ভাবালুতার সঙ্গে কেরী পরিচিত কিন্তু আজ কিছু বাড়াবাড়ি মনে হ'ল, তাই কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবেই বললে, পেয়েছ তো দাও, খামোকা অমন চীৎকার করছ কেন?

টমাস বললে, এ দেওয়া যায় না, অনুভব করা চলে মাত্র।

কি সব বাজে কথা বলছ তুমি। সিন্দুক ঘরের চাবি কই?

সিন্দুক ঘর!

বিস্মিত হয় টমাস।

তুমি কি সিন্দুক ঘরের চাবি আনতে যাওনি?

এতক্ষণে সব কথা মনে পড়ে টমাসের, বলে ওঠে, তাই গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু পেয়েছি তার অনেক বেশি!

কি আর এমন পাবে?

কি আর এমন পাব!

বলে বিস্ময়ের সঙ্গে টমাস। তারপরে শুধায়, অনুমান করতো ব্রাদার কেরী, কি পেতে পারি?

স্পষ্ট বিরক্তির সঙ্গে কেরী ব'লে ওঠে, দেখো টমাস, এত রাতে তোমার সঙ্গে ছেলে-মানুষী করবার সময় আমার নেই। সিন্দুক ঘরের চাবি পেয়ে থাকো ত দাও।

ব্রাদার কেরী, সিন্দুক ঘরের চাবি খুঁজতে গিয়ে স্বর্গের চাবির সন্ধান পেয়েছি।

কেরী দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, তবে তুমি স্বর্গে প্রবেশের চেষ্টা কর, আমি শুতে চললাম, বড় ক্লান্তি অনুভব করছি।

ব্রাদার কেরী, স্বর্গে প্রবেশের সাযোগ পেলে কি আর বাইবে থাকি। কিন্তু মুন্সী কিছুতেই রাজি হ'ল না, রেশমীর তাতে নাকি খুব সঙ্কোচ। তারপরে স্বগতভাবেই যেন ব'লে উঠল, মুন্সী এতক্ষণে একাকীই বোধ হয় স্বর্গে প্রবেশ করলো! স্বার্থপর।

রাম বসু ও রেশমীর নাম একত্রে শুনে কান খাড়া করল কেরী, গম্ভীরস্বরে শুধাল, কি ব্যাপার বলো ত।

যথোচিত ভাবানুষঙ্গে আদ্যোপান্ত বর্ণনা ক'রে টমাস বললে, ব্রাদার কেরী, এমন ব্যাপার যে দেখতে হবে আগে ভাবিনি।

কেরী বললে, আমিও আগে ভাবিনি হে, এমন ব্যাপার দেখতে হবে।

কিন্তু আমি বাইরে থেকেও যেটুকু আভাস পেয়েছি তুমি ত সেটুকুও পেলে না। তারপরে বললে—চল না কেন দেখে আসি। এতক্ষণে নিশ্চয় অপৌরুষেয় জন্মের রহস্য রেশমীকে বুঝিয়ে সেরেছে—মুন্সী সত্যই একজন জ্ঞানী পুরুষ!

মুন্সী যেমন জ্ঞানী, তুমি তেমনি ভক্ত! ধিক্কার দিয়ে ওঠে কেরী, তুমি একটি আস্ত গর্দভ।

কেন, এতে নির্বুদ্ধিতার কি দেখলে?

দেখেও যদি না বুঝতে পার তবে আর কেমন ক'রে বোঝাব।

খুলেই না হয় বল না।

গভীর রাত্রে একজন পুরুষ একটি যুবতীর নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করেছে, কি উদ্দেশ্য হ'তে পারে?

আমিও ত প্রথমে সেই প্রশ্ন করেছিলাম, মুন্সী বল্‌লে, অপৌরুষেয় জন্মতত্ত্ব বোঝানোর উদ্দেশ্য।

ও বল্‌লে আর তুমি বিশ্বাস করলে।

ক্ষতি কি? তুমি অন্য কিছু সন্দেহ করছ কি?

অন্য কিছু ত সন্দেহ করবার নেই—এরকম ক্ষেত্রে একটিমাত্র ঘটনাই সম্ভব।

কি সেটা?

নাঃ, তোমাকে নিয়ে পারলাম না। ব'লে ওঠে কেরী। তারপরে—ঐ মেয়েটাকে নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে ঢুকেছে লোকটা। এমন কতদিন ধ'রে চল্‌ছে কে জানে।

...যে বল্‌লে এই প্রথম!

...যা বল্‌ল তাই বিশ্বাস করলে? ও ...লে এই প্রথম, তুমি বিশ্বাস করলে। ও ...অপৌরুষেয় জন্ম-রহস্য বোঝাতে এসেছে, তুমি বিশ্বাস করলে।

টমাসের ভক্তির নেশা কাটতে চায় না। বলে, যদি অসদুদ্দেশ্যেই ঢুকে থাকবে, তবে অপৌরুষেয় জন্ম-তত্ত্বের কথা তুলল কেন?

জানে যে, ভক্তি তোমার ক্রনিক ব্যাধি, তাই সেখানে একটু মোচড় দিয়ে তোমার মনটাকে সন্দেহের পথ থেকে ভক্তির পথে চালিয়ে দিল। তা দেয় দিক, কিন্তু প্রভুর জীবনের প্রসঙ্গ নিয়ে এমন পরিহাস অমার্জনীয়। ব্যভিচারী ব্যক্তির কাছ থেকে আর কি তুমি আশা করতে পারো?

আমি তো মুন্সীকে সৎ ব্যক্তি বলে জানতাম। আমারও সেইরকম ধারণা ছিল, তা ছাড়া লোকটার অন্য অনেক গুণ, ওর সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলা যায়।

এবারে কিছুক্ষণ নীরবে পায়চারী করে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কেরী—মুন্সী মাস্ট গো।

অব কোর্স হি মাস্ট গো! গর্জে ওঠে টমাস। কাঁচা ভক্ত ভক্তির উপরে ব্যঙ্গ ছাড়া আর সব সহ্য করতে পারে—আর একবার ভঙ্গিতে উপহসিত হলে মরিয়া হয়ে ওঠে। মরিয়া হয়ে উঠলে টমাস। আমার সঙ্গে পরিহাস, দেখে নেবো সেই শয়তানটাকে।

সবেগে সে ছুটল রেশমীর ঘরের দিকে।

টমাস, টমাস, হঠাৎ নাটকীয় কিছু ক'রে ব'সো না, ফেরো, ফেরো, ফিরে এসো।

কে কার কথা শোনে। তৎক্ষণে অন্ধকারের মধ্যে উধাও হয়ে গিয়েছে উন্মত্ত টমাস।

ধর্মশাস্ত্রের অপমানে টমাসের এই উষ্মা মনে করলে ভুল হবে। আরো কিছু গূঢ় কারণ ছিল। রেশমীর প্রতি লালসার ভাব দেখা দিয়েছিল টমাসের মনে, যেখানে রাম-বসুকে সফল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখে তার মন গিয়েছিল বিষিয়ে। সেই উত্তেজনা তাকে ভিতরে ভিতরে মারছিল ঠেলা। টমাসকে বললে নিশ্চয় সে স্বীকার করতো

আবার ভাসমান

নৌকা চলেছে টাঙন হয়ে, মহানন্দা হয়ে ভাগীরথীর দিকে।

রাম বসু ভেবেছিল তাকে একাই যেতে হবে। কিন্তু সে কলকাতা রওনা হচ্ছে যাচ্ছে শুনবামাত্র তার সংগীরাও জিনিসপত্র বেঁধে প্রস্তুত হ'ল।

রাম বসু শুধাল, কি ন্যাড়া তুই যাবি নাকি?

ক্ষতি কি?

কায়েত দিদি আমাকে পাঠিয়েছিল তোমাকে দেখাশোনা করবার জন্যে। তুমি গেলে দেখব কাকে?

পার্বতী ব্রাহ্মণ বলল, যেখানে রাম সেখানে লক্ষ্মণ।

তুমি চলে গেলে আমি একাকী এই দণ্ডকারণ্যে থাকতে পারব না।

গোলক শর্মা এই অঞ্চলের লোক।

রাম বসু বলল, তোমার তো না গিয়ে উপায় নেই।

পাগল হয়েছ ভায়া! 'বামুন গেল ঘর, লাঙল তুলে ধর।' তোমরা নৌকায় উঠবে আমিও চরণ পাঁড়ির নৌকায় উঠে পাড়ি দেবো গাঁয়ের দিকে।

রাম বসু সংগীদের মনোভাবে বিস্মিত হল, মোটা বেতনের চাকুরি ছেড়ে চলল সবাই তার আকর্ষণে। কিন্তু তার বিস্ময় চরমে উঠল যখন ছোট পুঁটুলিটি নিয়ে রেশমী এসে নৌকায় চড়ল।

বিভ্রান্ত রাম বসুর মুখ দিয়ে বের হল— তুই যাবি নাকি?

রেশমী নৌকার গলুইয়ে বসে পা ধুতে ধুতে বললে, কি মনে হচ্ছে?

যাবি কেন রে?

কাল সন্ধ্যাবেলা একটা লোককে দেখে সন্দেহ হয়েছে।

কি সন্দেহ হল আবার?

বোধ করি চণ্ডী বক্সির লোক। কাল সন্ধ্যাবেলায় বাগানের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল।

সবাই বলল, তাইতো তাহলে একলা থাকবি কি করে?

রেশমীর কথাটা সত্য নয়। সন্দেহজনক কোন লোক সে দেখেনি। কিন্তু ঐ রকম কিছু একটা না বললে তার যাওয়ার পথ সুগম হয় না, তাই ঐ ছলনাটুকু করতে বাধ্য হ'ল।

নৌকা ছেড়ে দিল।

রাম বসু হঠাৎ কলকাতায় চলে যাচ্ছে শুনে সবাই, কারণ শুধালে রাম বসু একটা কাহিনী বানিয়ে বলল। সে বলল আর ব'লো না ভাই, বেটা টমাসের কাণ্ড। সেদিন রাতে তোমরা সবাই যখন যাত্রাগান শুনতে গিয়েছিলে, পাষণ্ডটা এসে রেশমীর দরজায়

ধাক্কা মারছিল। আমি দেখতে পেয়ে নিষেধ করতেই লেগে গেল আর কি? তারপরে কেরীকে হাত করে এই কাণ্ডটি ঘটাল। লোকটা ভেবেছিল আমি গেলে রেশমী ওর খপ্পরে পড়বে।

পার্বতী ও গোলক বলল তাই বলো আমরা আগেই জানতাম ওর ভাবগতিক ভালো নয়। এখন সব বোঝা গেল।

রাম বসু বলল, যাক কথাটা নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করো না, রেশমীর কানে উঠলে লজ্জা পাবে। এমন ভাব দেখিও যেন তোমরা কিছু জানো না।

তারা বলল, ছি ছি এ সব কি ঐ অটুট মেয়ের সামনে আলোচনা করা যায়!

নৌকা স্রোতের টানে তূর্ণবেগে ভেসে চলেছে।

রাম বসু একা একা শুয়ে বিস্ময়ের অন্ত পায় না, ভাবে আশ্চর্য এই মেয়েটি রেশমী। এতকাল পর্যন্ত যত মেয়ের সঙ্গ পেয়েছে কারো সঙ্গে তার মিল নেই, না, টুশকির সঙ্গেও না। টুশকিতে মায়া মমতা কিছু বেশি কিন্তু নারীসুলভ রহস্য যা আছে ঐ রেশমীতে, আর কোন মেয়েতে সে এমনটি দেখেনি। সে ভাবে অধিকাংশ মেয়েকেই দূর থেকে স্ফটিকের দ্বার বলে মনে হয়, মনে হয় অগম্য, কিন্তু কাছে এসে দাঁড়ালেই দেখা যায় প্রকৃত দ্বার, অনায়াসে খুলে ফেলা যায়। সেই অভিজ্ঞতাতে রেশমীকেও স্ফটিকের দ্বার বলে মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল গলা গলালেই দিব্য গলে যাওয়া যাবে। কিন্তু সেদিনকার রাত্রের অভিজ্ঞতায় দেখল না এ স্ফটিকের দ্বার নয়, স্ফটিকের দেয়াল, দূর থেকে স্বচ্ছতায় দরজার বিভ্রান্তি উৎপাদন করেছিল। দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে অবশেষে বুঝতে পারলো প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

টমাস ফিরে আসবার আগেই রেশমী বিদায় করে দিয়েছিল রাম বসুকে। বলেছিল এবারে যাও কাজেই না।

বসুজা বলেছিল কেনরে এত তাড়া কিসের। এতক্ষণ পাষণ্ডটার সঙ্গে হাঁকা-হাঁকি করলাম একটু জিরিয়ে নিই।

না, না, আর দেরি করো না। টমাস আবার ফিরে আসবে, হয়তো এবারে কেরীকে সঙ্গে নিয়ে আসবে।

কথাটা রাম বসুর মনে হয়নি। সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'ল, জিজ্ঞাসা করল টমাস এসে ডাকাডাকি করলে কি বলবি?

কিচ্ছু বলবো না, দরজা খুলে দিয়ে বলবো দেখো কেউ নেই।

দরজা খুলে দিতে ভয় করবে না।

তোমাকেও তো ভয় পাইনি দরজা খুলে দিতে।

রেশমীর কথা বসুর হৃদয়ে গোপন কশাঘাত করল। তবে কি তারা দুজনে সমান রেশমীর চোখে? তখনি মনে পড়ল। নিশ্চয়ই সমান নয়, বসুর স্থান আজ অনেক নীচে। এই আত্মদোষ স্বীকারেও সান্ত্বনা পেল না তার মন, গম্বুজের মধ্যেকার প্রতিধ্বনির মতো রেশমীর কথাটা মাথা খুঁকে বেড়াতে লাগল তার মনের মধ্যে।

দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে রাম বসু শুধাল, হাঁরে রেশমী আজ যে কাণ্ডটা করলাম কাল বেশ স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারবি আমার সঙ্গে, অপ্রস্তুত হবিনে?

সহজভাবে রেশমী বলল কেন অপ্রস্তুত হবো?

রাম বসুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল সংস্কার।

চিতার আগুনে আমার সব সংস্কার যে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

বলিস কি?

রেশমী পূর্বসূত্র অনুসরণ করে বলে চলল, এখন কোন পুরুষের সাধ্য নেই আমার কাছে আসে, আমাকে ঘিরে জ্বলছে চিতার আগুন।

অপ্রস্তুত হ'ল রাম বসু। সে নীরবে বেরিয়ে এলো। বুঝল এ-মেয়ে সতীই অগ্নিসম্ভবা—রিরংসার গ্রাস এ নয়।

রাম বসু বেরিয়ে চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে দিল রেশমী। কেন জানিনে বারংবার তার মনে পড়তে লাগল ফুলকির কথা। সেদিন সন্ধ্যার ঘটনার পরে দারুণ ঘৃণায় ভরে গিয়েছিল তার মন, চরম শত্রু বলে মনে হয়েছিল ফুলকিকে। তবু আজ এই পরম দুঃখের ক্ষণে ঐ স্বৈরিণী মেয়েটাই থেকে থেকে উদিত হচ্ছিল তার মনে। বিষ দিয়ে বিষ নামাতে হয়। যে-বিষ এই মাত্র সে পান করেছে তার প্রতিকার কেমন করে জানবে সাধ্বী কুলবালারা! তার প্রতিকার জানে ঐ কুলটা নারী যে নিজে আকণ্ঠ পান করেছে বিষ। রেশমী ভাবল হোক সে বিষকন্যা, তবু তার কাছে আজ সে-ই হচ্ছে ধন্বন্তরী।

তার মনে পড়ল একদিন ফুলকিকে জিজ্ঞাসা করেছিল আচ্ছা সই ঐ যে গানটা সব সময়ে তোমার মুখে লেগে রয়েছে 'ভরা নদী ভয় করিনে, ভয় করিনে সই বানের জল' ওর মানে কি? ভরা নদীই বা কি বানের জলই বা কী? ফুলকি বলেছিল ভরানদী ভরা যৌবন তখন ভয় কম, ভয় যখন গাঙে প্রথম বানের জল আসে, তখন কূল ভাসিয়ে দেবার আশঙ্কা। আমি যে তাই প্রথম

বানের জলে কূল থেকে ভেসে গেলাম। তারপরে রেশমীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল তোমার গাঙে এখন সই প্রথম বানের জল ঢুকছে সাবধানে থেকো।

রেশমী বলেছিল তুমি তো ভাই লেখাপড়া শেখনি এত জানলে কি করে?

ফুলকি হেসে বলেছিল পাঠশালায় গিয়ে আর কতটুকু শেখা যায়।

তারপরে বলেছিল যে, পাঠশালায় দশ বছরে যা শেখা যায় মেয়েরা শেখে তা এক রাত্রের পুরুষ সংসর্গে—ঐ হল তার আগুনছোঁয়া।

কথাগুলো সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেনি রেশমী, কিন্তু তখনও যে ফুলকির ভাষায় সে আগুনে ছোঁয়নি।

তারপরে সে রাত্রে আগুনের মশাল নিয়ে এল রাম বসু, রেশমী আগুন ছুঁল না বটে, কিন্তু তাত লাগল গায়ে, সেই তাপে ভিতরে বাইরে হঠাৎ উঠল বেড়ে। সেই তাপের মরীচিকায় তার কল্পনার দিগন্তরে ছুটল স্বপ্নের সোয়ার, কল্পলোকে উঠল তার বুকের গজমোতির মালা, বক্ষের কবচ, মাথার উষ্ণীষ। রেশমী বুঝল সে সোয়ার আর যেই হোক রাম বসু নয়—বড় জোর রাম বসু তার নকীব। নকীবের অভ্যর্থনায় সে ত্রুটি করেনি।

রাম বসু দরজায় ধাক্কা দিয়ে পরিচয় দিতেই বিনা প্রশ্নে দরজা খুলে দিয়েছিল, ভেবে ছিল হঠাৎ কোন প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু রাম বসু যখন বিনা ভূমিকায় বিছানায় এসে বসল, তার চোখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তে সব বুঝল রেশমী, ফুলকির গানটা মনে পড়ল, বুঝল প্রথম বানের দুর্বার গতি নিয়ে এসেছে প্রথম পুরুষ তার জীবনে। কয়েক মুহূর্ত দুজনেই নীরব। নরনারীর যৌন সম্পর্কের এই শেষ বাধাটিই দুর্লঙ্ঘ্যতম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে বাঁধ ভাঙে না, দুজনে দু দিকে আঘাত করে ফিরে যায়। নির্জন রাত্রে নিভৃত কক্ষে একক পুরুষের সঙ্গ তার শরীরে মনে দাবাগ্নি জেলে দিল, সে উঠে গিয়ে দরজা এঁটে দিয়ে ফিরে এসে বসল। আবার দুজনে মূঢ়ের মত নির্বাক। অত্যন্ত চতুর পুরুষ, অত্যন্ত প্রগলভা নারীও যে এ সময়ে নির্বাক হয়, মূঢ়বৎ হয়, তার কারণ সেই আদিম পরিবেশ ওঠে জেগে ভাষা যখন সৃষ্টি হয়নি, সামাজিক চাতুরী যখন ছিল ভবিষ্যতের গর্ভে। এমন কতক্ষণ চলতো বলা যায় না এমন সময়ে আবার দরজায় ঘা পড়ল। এবারে টমাস সাহেব।

টমাসের কণ্ঠস্বরে একমুহূর্তে একশ জন্মান্তর পেরিয়ে রাম বসু ফিরে এল স্বকালে, আর চালাল কৌশলী উত্তর প্রত্যুত্তর। রেশমীও ফিরে পেল সম্বিৎ। সে বালিশে মুখ গুঁজে হাসি চাপা দিয়ে দিয়ে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। বাইবেল পাঠের কল্যাণে অপৌরুষেয় জন্মের রহস্য তার অজানিত ছিল না।

কইগো তোমরা সব খেতে এস, পাত পড়েছে।

পার্বতী ব্রাহ্মণ রাঁধে সবাই খায়। অন্য কেউ রাঁধলে সে খাবে না, তাই এই ব্যবস্থা।

নাড়া শুধোয় আচ্ছা পার্বতী দাদা, এক পাঠাতনের উপরে বসে যে খাচ্ছ জাত যায় না?

পার্বতী বলে, বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেইরে।

আচ্ছা পিঁড়িখানা যদি বড় করে নেওয়া যায়, তবে দোষ হয় কি না।

সে কথার উত্তর না দিয়ে পার্বতী বলে তার উপরে স্বয়ং মা গঙ্গার বুকের উপরে।

দু' বেলা রান্না খাওয়া ছাড়া আর কাজ নেই। রেশমী আর নাড়া দুজনে নৌকার ছইয়ের উপরে ব'সে গল্প করে, উজান ভাটিতে নৌকা যাতায়াত দেখে, সন্ধ্যাবেলায় আকাশের তারা আর গাঁয়ের প্রদীপ গোণে। সময়ের স্রোত নদীর স্রোতের মত দুজনের কাঁচ মনের উপর দিয়ে অবাধে মসৃণভাবে গড়িয়ে চলে যায় এতটুকু বাধা পায় না।

একদিন রাম বসুকে গম্ভীর দেখে পার্বতী শুধোল গম্ভীর হয়ে কি ভাবছ ভায়া?

ভাবছি রেশমী তো সঙ্গে চলল, কিন্তু কলকাতায় নিয়ে ওকে রাখি কোথায়?

পার্বতী বলে ফেলল, কেন তোমার বাড়িতে। তার পরে প্রস্তাবের অসম্ভবতা বুঝে বলল, না, না, তা চলে না।

তারপরে বলল, টুশকির বাড়িতে রাখা চলে না?

বসু বলল, সে কি কথা, ও সব জায়গায় কি ঐ কচি মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়া যায়?

কেন টুশকি তো মন্দ নয়।

মন্দর ভালো, বলল রাম বসু, তবে কি না জায়গা তো ভালো নয়।

তা হলে তো দেখছি মুশকিল। তা ছাড়া রাখতে হবে সাবধানে, চণ্ডী বক্সীর শকুনের জোড়া চোখ বসেছিল তিনু চক্রবর্তী।

রাম বসু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, দেখা যাক কি হয়, আগে তো গিয়ে পৌঁছই। চলো এখন শুতে যাই।

রাম বসুর ঘুম আসে না। সেদিন তার মনে হয়েছিল যে, চণ্ডীদাসের প্রেম নিকষিত হেম কাম গন্ধ নাহি তায় পদটা মিথ্যা। এখন মনে হল না মিথ্যা নয়। তবে কি না সত্য ও মিথ্যার মাঝখানে আরো কয়েকটা অবস্থা আছে, স্থূল বিচারের সময়ে সেগুলো বাদ পড়ে যায়। তবে মনে হল নিকষিত হেম মিথ্যা নয়, কিন্তু খাঁটি সোনায় সংসারের কাজ চলে না; সংসারের উপযোগী করতে হলে একটু খাদ মেশান চাই। তার মনে হল ঐ খাদ মেশানর পরিমাণ-কৌশলের উপরেই স্যাকরার ওস্তাদী। যে তিনটি মেয়েকে খুব কাছে থেকে সে দেখেছে তাদের কথা মনে পড়ল। টুশকিতে খাদে সোনায় ঠিকটি মিলেছে তাই সে সর্বকর্মক্ষম। অন্নদায় খাদের ভাগ কিছু বেশি, নিজের সংসারের বাইরে সে অচল। আর এই রেশমী খাঁটি সোনা—সংসার এখনো খাদ মেশাবার সুযোগ পায়নি তার মনে। (ক্রমশ)

(বাইশ)

"ভাগ্যের আঘাত সহজেই পুষিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু চতুর্দিকের বাস্তব থেকে যে সব ঘাত-প্রতিঘাত অহরহ উঠে আসতে থাকে, তার থেকে রক্ষা করতে পারে কে [illegible]।

কোন এক অজানা অতীতে ধরণী এক সময় ভয়ংকর যন্ত্রণায় মূর্চ্ছা গিয়েছিল। আর তার জঠরগর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছিল বিরাট এক মরুভূমি। মহা-আরব। প্রায় ভারতের মতোই সুবিশাল এই দেশ; তার দশ লক্ষ বর্গ মাইল আয়তনের বেশির ভাগ মরুভূমি। লোকগণনা কোনদিন করা হয়নি, তবে চার বছর আগে প্রকাশিত একখানা পুস্তকে টুইচেল সাহেব অনুমান করেছিলেন এই বিস্তীর্ণ ভূমিতে বাস করে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোক; কলকাতা ও শহরতলীর লোকসংখ্যার চেয়েও অনেক কম। অথচ মুসলমানদের অতি পবিত্র তীর্থ এই সৌদী আরব, হজরত মহম্মদের জন্ম ও মৃত্যু এখানেই। কতো রোমাঞ্চকর কাহিনীই না আরবিয়া নিয়ে রচিত হয়েছে—সেই সহস্র রজনীর কাহিনী! মনুষ্যসৃষ্টির মতোই পুরাতন এই আরবিয়া; বহুদিন তার পরিচয় ছিল 'পরিবর্তনহীন প্রাচ্য'। আজ আর অবশ্য তা নয়। সৌদী আরব এখন পরিবর্তনক্রান্ত পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর তার নৃপতি, সৌদ ইবন আবদুল আজিজ, শুধু পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী নৃপতি নন, মধ্যপ্রাচ্যের দ্রুত পরিবর্তনশীল রঙ্গমঞ্চে এক বিশিষ্ট ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইবন সৌদ তরবারির সাহায্যে সৌদী আরবে নিজের জয়পতাকা উত্তোলন করেন। ত্রিশ বছরের মধ্যে দুর্ধর্ষ উপজাতিদের নিয়ে গড়ে তোলেন একটি ঐক্যবদ্ধ রাজ্য। এ রাজ্য সেদিন ছিল এতই বিত্তহীন, শুধুই মরুপ্রান্তর, যে, ইংরেজ তাঁকে মেনে নিয়ে তাঁর স্বেচ্ছাচার শাসনে কোন বাধা দেয়নি।

এখন সৌদী আরবের চেহারা অন্তত বাইরে থেকে একেবারে বদলে গেছে। বড়ো বড়ো শহর—ডারহান বা রাজধানী রিয়াদ—যে কোন আমেরিকান শহরের প্রতিদ্বন্দ্বী। আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকা, প্রশস্ত রাজপথ আর বহু বড়ো বড়ো আধুনিকতম আমেরিকান মোটর গাড়ি, সুসজ্জিত বাগান ও পার্ক, সাঁতার কাটবার পুকুর, য়ুরোপকে হার-মানানো হোটেল—সৌদী আরবের এই হল শহরের পরিচয়। শহর থেকে দূরে, উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে জীবন এখনো চলছে সেই সাবেকী ঢিমে তালে; চাষী তার ছোট কৃপণ জমি থেকে দুবেলার অন্ন আদায় করতেই জীবনের পর জীবন কাটিয়ে দেয়।

সৌদী আরবের আর এক নাম হওয়া উচিত "সৌদী আরামকো"। শহরগুলির যা কিছু ঝলসানো সমৃদ্ধি, সৌদী আরবের সবটুকু সম্পদ আসে মরুভূমির গর্ভে তেল থেকে. আর এই তেল নিয়ে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার যে মার্কিন সংগঠনের, তার সংক্ষিপ্ত নাম "আরামকো" (Aramco—The American Oil Company)। ১৯৩৩ সালে এই তৈলশিল্পের অতি সাধারণ শুরু; আজ সমগ্র পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প এবং আমেরিকার বাইরে সর্বপ্রধান মার্কিন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে সৌদী আরব থেকে আরামকো চার কোটি একষট্টি লক্ষ টনেরও বেশি তেল উৎপাদন করে; ১৯৩৮ সালের উৎপাদন মাত্রা ছিল মাত্র পঁয়ষট্টি হাজার টন। ১৯৫৪ সালে সৌদী আরবের রাজা তেল থেকে রাজস্ব পান ছাব্বিশ কোটি ডলার; ১৯৩৯-এ পেতেন মাত্র এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার ডলার।

আরামকোই মধ্যপ্রাচ্যে সর্বপ্রথম নেট লভ্যাংশের অর্ধেক স্থানীয় সরকারকে রয়ালটি দিতে রাজী হয়; তার উদাহরণ অনুসরণ করে বর্তমানে ইরান, ইরাক, কুয়াট ও বেহ্‌রিনে এই আধাআধি বাটোয়ারা চালু হয়েছে। আরবভূমির এই

পবিত্র দেশ সৌদী আরবে মার্কিন যান্ত্রিক সভ্যতা একটি "ছোট্ট আমেরিকা" তৈরী করেছে; বিশ হাজার কর্মচারী আরামকোর চাকরি করে, তার মধ্যে কয়েক হাজারই আমেরিকান। সমগ্র আরবভূমিতে একটি মাত্র মার্কিন বিমান ঘাঁটি; তা হচ্ছে সৌদী আরবের ডাহরান শহর। ১৯৫২ সালে যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে আরামকো সৌদী আরবের তেল থেকে লাভ করে বিয়াল্লিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলার। এ ছাড়া পাইপ লাইন ও অন্যান্য খাতেও লাভ হয় কয়েক কোটি ডলার। এবার সহজেই অনুমান করা যায় সৌদী আরব কেন আমেরিকার এত ঘনিষ্ঠ ও মূল্যবান বন্ধু!

কিন্তু এই যে বিরাট বিত্ত সৌদী আরব হঠাৎ পেয়ে গেছে, তাতে তার জনসাধারণের বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি; সমস্ত রাজস্ব জমা হয় রাজার ব্যক্তিগত অর্থ হিসাবে, তার ব্যয়ের কোন হিসাব নিকাশ নেই। রাজশক্তি রাজপরিবারের বাইরে এখনো পৌঁছয়নি; বড়ো জোর প্রধান প্রধান উপজাতিপতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পার্লামেণ্ট বলে কোন বস্তু নেই। ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত বাৎসরিক বাজেট মাত্র তিনবার প্রকাশিত হয়েছিল; তার মধ্যে একবারও তেল থেকে পাওয়া বিরাট অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হচ্ছে তার কোন সমাচার দেওয়া হয়নি।*

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে রিয়াদ থেকে নিউ ইয়র্ক টাইমস্ কাগজের সংবাদদাতা জানিয়েছিলেন কিভাবে নতুন রাজস্বের প্রায় সবটাই রাজপরিবার ও সামন্তদের ভোগে বিলাসেই খরচ হয়ে যায়। অনেকেই আশা করেছিলেন যে, আবদুল আজিজ তাঁর

*H. Philby, "The New Reign in Saudi Arabia", Foreign Affairs, April, 1954.

পিতার চেয়ে উদারতর দৃষ্টি নিয়ে আর্থিক ও সামাজিক সংস্কারে মন দেবেন। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। উক্ত সংবাদদাতা বলেছিলেন, "রাজা সৌদ পুরোনো রাজকীয় ভোগ বিলাসের পথেই চলে এসেছেন।"* লণ্ডনের বিখ্যাত আর্থিক পত্রিকা 'ইকনমিস্ট' ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে লিখেছিলেন, "সৌদী আরবে অনুমিত বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের পরিমাণ আজকাল প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যয়ের কোন নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান তাতে পাওয়া যায় না। আয় বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও, গত কয়েক বছর যাবৎ আয়ের চেয়ে ব্যয়ই বেশি দেখান হচ্ছে। মনে হয়, এই অত্যধিক ব্যয়ের একটি কারণ হচ্ছে যে, রাজস্বের একটা মোটা অংশ রাজপরিবারের সুখসম্ভোগের জন্যে ব্যয়িত হয়ে থাকে, আর খরচ হয় রাজপরিবারের লোকদের বিদেশে স্থাবর সম্পত্তি কেনার জন্যে, রাজকুমারদের ও মন্ত্রীদের সুখ সুবিধার ও অন্যান্য অনুরূপ কারণে।"**

আসলে, আরামকো রাজা সৌদকে সাড়ে তিন বছরের রয়্যালটি অগ্রিম দিয়ে রেখেছে। বৃটেন ফ্রান্স ও ইজরায়েল সুয়েজ আক্রমণ করার পর গত নভেম্বরে সৌদ একটি মহান কাজ করে ফেলেছিলেন, যার জন্যে এখন তিনি অনুতপ্ত। আরামকোর যে পাইপ লাইন বেহ্‌রিন পর্যন্ত তেল নিয়ে যায়, সেটা তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন মিত্র মিশরকে সাহায্য করার সদিচ্ছায়। হাতে এবং জাহাজের অভাবে আরামকোর উৎপাদন শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ কমে গিয়েছে। ফলে, সৌদের রাজস্বেও বিরাট

*The New York Times, December 11, 1953.

**The Economist, London, July 2, 1955.

ঘাটতি পড়েছে। রিয়াদের নিকট যে বিরাট অট্টালিকা তৈরী হচ্ছে তার কাজই ঠিক ভাবে চলতে পারছে না। ফলে, পল জনসন তাঁর পূর্ব পরিচ্ছেদে উল্লিখিত প্রবন্ধে বলেছেন, সৌদ তাঁর এ বছরের বাগদাদ ভ্রমণের সময় ফয়জলকে চারখানা ক্যাডিলাক ও দুখানা রোল্‌স্-রয়েস মাত্র উপহার দিতে পেরেছেন! আর আম্মানে উপস্থিত হয়ে হুসেন মেচারাকে দিতে পেরেছেন মাত্র দুখানা সামান্য পলদ যুক্ত ক্যাডিলাক! সত্যই সৌদ বড়ই দুর্দিনে পড়েছেন!!!

মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিয়ে মার্কিন ও বৃটিশ স্বার্থের তীব্র সংগ্রামের কথা রাজনীতি-পরিচালক নেতারা অস্বীকার করলেও, আজ সর্বজনবিদিত। ঐতিহাসিক কারণে সৌদী আরব ইংরেজ-বিরোধী। ইরাক ও জর্ডানে যে হাশেমী বংশ রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, তার সঙ্গে সৌদী বংশের শত্রুতা অতি পুরাতন। আরবেরা বংশানুক্রমিক শত্রুতা সহজে বিস্মৃত হয় না। সৌদী আরবকে ভিত্তি করেই মার্কিন তেল স্বার্থ ধীরে ধীরে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে যেমন আরব ভূমিতে আমেরিকার প্রধান রাজনৈতিক ঘাঁটি সৌদী আরবও তেমনি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ঘাঁটি। সৌদী আরবকে যেমন আমেরিকা মিত্র রাখতে উৎসুক সৌদী আরবও মার্কিন অর্থ ছাড়া একেবারে অচল। তার সমস্ত রাজস্বের অধিক ভাগই আসছে মার্কিন রয়্যালটি থেকে।*

এ জন্যেই প্যালেস্টাইন যুদ্ধের সময় শক্তিশালী মার্কিন তেলশিল্পীরা তাঁদের গভর্নমেণ্টের উপর অসাধারণ চাপ দিয়েছিলেন সৌদী আরবকে বেশি না

*U. N. Summery, 1952-53, Page 64.

চটাতে।** আবার, সুয়েজ সংকটের দিনেও বৃটেনের স্বপক্ষে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের প্রধান বিরোধী ছিলেন এই সব শিল্পপতিরাই। আবার, মধ্যপ্রাচ্য থেকে বৃটিশ প্রভাবে তিরোহিত হ'য়ে মার্কিন প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সৌদী আরবের রাজার সঙ্গে আমেরিকার নতুন এক আঁতাত পরিলক্ষিত হচ্ছে। আজ সৌদী আরব মোটামুটি আইসেনহাওয়ার নীতি মেনে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের আরব ভূমিতে রাজা বনাম প্রজার একটা সাংঘাতিক শ্রেণীবিভাগের সর্বনাশা আয়োজনে হাত লাগিয়েছেন। মিশরের সঙ্গে যে সম্ভাবনাপূর্ণ মৈত্রী ও সহযোগিতা বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর দেড় বছর ধরে গ'ড়ে উঠেছিল, আজ তা বিপন্ন। মুখোশটাকে উভয় পক্ষ থেকেই বাঁচাবার চেষ্টা চলছে; কিন্তু প্রাণ যে নেই তা দুই দেশেরই জানা। সৌদ মিশরী শিক্ষক, টেকনিশিয়ান ও রাজকর্মচারীদের তাড়াতে শুরু করেছেন। মিশরের বেতার সৌদকে প্রায়ই আক্রমণ করছে।

(তেইশ)

"রোমান সাম্রাজ্য কেন ধ্বংস হয়েছিল না জিজ্ঞেস করে আমাদের অবাক হওয়া উচিত এই ভেবে যে সে এত দীর্ঘ দিন টিকে থেকেছিল"—গিবন।

পুরাকালের রোমের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর জর্ডনের কোন তুলনাই হয় না। তবু এই ক্ষুদ্র দেশটির ইতিহাস ও তার জন্মপত্রিকা বিচার করলে অবাক হ'য়ে ভাবতে হয় কি ক'রে সে এতগুলি বছর দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুত পক্ষে, কোন বৃহত্তর শক্তির সাহায্য ছাড়া জর্ডনের অস্তিত্ব বিপন্ন হ'তে বাধ্য। যে ইংরেজ প্রভুত্ব তাকে জন্ম থেকে ধারণ করেছিল, সে প্রতাপ আজ অস্তমিত। সমবেত আরব সাহায্য ও সমর্থনের উপর দাঁড়াতে গিয়ে জর্ডনের রাজা দেখতে পেলেন সিংহাসন টলায়মান। সুতরাং বর্তমানে তিনি মার্কিন ছত্রছায়ার আশ্রয় নিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করেছেন। কিন্তু এ অস্তিত্বের সঙ্গে তাঁর দেশবাসীর আত্মার যোগাযোগ নেই।

১৯২১ সালের মার্চ মাসে একদিন রাত্রে বৃটেনের উপনিবেশ মন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল জেরুসালেমে ডিনার খাচ্ছিলেন একজন আমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে, তার নাম আমির আবদুল্লা, হেজাজের শেরিফ হুসেনের দ্বিতীয় পুত্র। চার্চিলের সঙ্গে আরব ব্যাপারে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা, টি ই লরেন্স। লরেন্সের নেতৃত্বে প্রথম

** The New York Herald Tribune, February 27, 1948.

মহাযুদ্ধের সময় যে মিত্রশক্তি-সহায়ক আরব গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে, তার দুই প্রধান স্তম্ভ ছিলেন হুসেন-পুত্র ফয়জল ও আবদুল্লা। হুসেনকে তাড়িয়ে শ্রেফ তরবারির জোরে ইবন্ সৌদ সৌদ আরব অধিকার করে বসেছেন। হতাশায় তিক্তচিত্ত হুসেন ম'রে শান্তি পেয়েছেন। ফয়জলকে ইংরেজ দিয়েছে ইরাকের রাজত্ব। একমাত্র আবদুল্লাই বেকার! সেই নৈশ ভোজনের পর দীর্ঘ আলোচনায় চার্চিল ঠিক করলেন ট্রান্সজর্ডন নামে একটি ছোট্ট দেশ সৃষ্টি করে তার "আমির" বানানো হবে আবদুল্লাকে; এখানে থাকবে বৃটেনের সামরিক ঘাটি, বেদুইন উপজাতিদের নিয়ে তৈরী একদল সাহসী সৈনিক গঠিত হবে একজন ইংরাজ সেনাপতির অধীনে বৃটেন আর্থিক সাহায্য দিয়ে রাজকোষের ঘাটতি দূর করবে; বিনিময়ে আবদুল্লা ইংরাজের বিশ্বস্ত ও বশংবদ মিত্র হ'য়ে পরম সুখে রাজত্ব করবেন।

আবদুল্লা তাঁর নতুন রাজত্বে আগন্তুক। তখন ট্রান্সজর্ডনের অধিবাসীদের মধ্যে বেশির ভাগ বেদুইন উপজাতি। এদের যাযাবর জীবনকে পুনর্গঠন ক'রে আবদুল্লা তাঁর নতুন দেশ তৈরী করলেন। এক সীমান্ত অতিক্রম করে সহোদর ফয়জলের রাজ্য ইরাক। উভয়েই সৌদী আরবের ঘোর বিদ্বেষী। আবদুল্লার আর এক চোখের বালি মিশর; মিশর থেকে সযত্নে তিনি তাঁর উপরাজ্যকে দূরে রাখলেন। একটি সুশিক্ষিত বেদুইন সেনাবাহিনী তৈরী হ'ল জেনারেল গ্লাবের নেতৃত্বে; ইনি গ্লাব পাশা নামে পরিচিত। সৈন্য বাহিনীর নাম হ'ল আরব লিজন, যার একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী গ্লাব সাহেব সম্প্রতি লিখেছেন। এই বইতে যেমন রয়েছে তাঁর বিচিত্র জীবনের আত্মকথা—অনেক পাতাই লরেন্সের বই-এর কথা মনে করিয়ে দেয়—অন্যদিকে তেমনি জর্ডনের সুন্দর ইতিহাস। ইতিহাস।

আবদুল্লার রাজত্বের প্রধানতম ভিত্তি ছিল ইংরেজের মৈত্রী ও সাহায্য। আবদুল্লার 'আত্মচরিত' যখন প্রথম ইংরেজী অনুবাদে প্রকাশিত হয়, তা নিয়ে মহা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল সমগ্র আরব ভূমিতে। প্রকাশকরা সমস্ত কপি বাজার থেকে তুলে নিতে বাধ্য হন। বর্তমানে ফিলিপ গ্রেভস্ সম্পাদিত যে 'আত্মকথা' বাজারে চালু, তাতে আবদুল্লার ইংরেজ প্রীতি ও মিশর ও সৌদী আরব বিদ্বেষের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্যালেস্টাইন যুদ্ধের সময় আবদুল্লা তাঁর 'আরব লিজন' নিয়ে ইজরাইল আক্রমণ ক'রে জর্ডন নদীর পূর্বতীরবর্তী

একটি বড়ো অঞ্চল দখল করেন। পরে ইংরেজ সমর্থনে এ অঞ্চল তাঁর উপরাজ্যের অংশ হয়ে ওঠে। ১৯৪৮-এ যখন জর্ডন রাষ্ট্র গঠিত হয়, আমির আবদুল্লা হন রাজা আবদুল্লা। ঐ বছরই আততায়ীর গুলীতে আবদুল্লার মৃত্যু হয়।

তিনটি কারণে আবদুল্লা অন্যান্য আরব দেশগুলির বিশেষ অপ্রীতিভাজন হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম, তাঁর নিঃসঙ্কোচ ইংরেজের তাঁবেদারী; দ্বিতীয়, প্যালেস্টাইন যুদ্ধ থেকে বেশ বড়ো কিছু জমি পেয়েই তিনি সরে পড়েন; তৃতীয়ত, তাঁর অতি প্রিয় উদ্দেশ্য ছিল ইরাক, সিরিয়া ও জর্ডনকে একত্রিত করে একটি বিশাল হাশেমী বংশ-শাসিত আরব রাজ্য গঠন করা, যা সৌদী আরব ও মিশরের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবে। আগেই বলা হয়েছে, এরই নাম ফারটাইল ক্রিসেণ্ট।

আবদুল্লা বুঝতে পারেন নি যে, প্যালেস্টাইন যুদ্ধে তিনি যা লাভ করেছিলেন, তাই তাঁর কাল হবে। জর্ডন আর কোনমতেই ট্রান্সজর্ডন রইল না। যে পরম অনুগত ও বিশ্বস্ত বেদুইন উপজাতি আবদুল্লাকে পিতার মতো মানতো, তারা হয়ে গেল সংখ্যায় নতুন রাষ্ট্রের মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ। বাকী দুই ভাগ প্যালেস্টাইনের আরব, জর্ডন নদীর পূর্বতীরে যাদের বাস; তারা আবদুল্লাকে ঘৃণা করতো, তারা উগ্র জাতীয়তাবাদী, মিশরের প্রতি তাদের পূর্ণ সহানুভূতি তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার জন্য। ১৯৪৮ সালে আবদুল্লা ইংরেজের সঙ্গে যে নতুন চুক্তি করলেন, জর্ডনের লোকেরা তা গ্রহণ করতে রাজী হল না। মারা পড়বার আগেই আবদুল্লা দেখে গেলেন, যে-ভিত্তির উপর তিনি তাঁর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা একেবারেই ভেঙে গেছে।

আবদুল্লার মৃত্যুর পর এই ভাঙন আরো দ্রুত হয়ে উঠল। রাজা হলেন যুবরাজ তালাল; জাতীয়তাবাদী পথে পা বাড়িয়ে মিশর ও সৌদী আরবের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করবার প্রথম প্রয়াসেই তালাল টের পেলেন, জর্ডন-নৃপতির স্বাধীনতার দৌড় কতখানি। জ্যাঠতুতো ভাই গাহজীর মতো বাগদাদে মাঝরাতে তাঁর গাড়ি-দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল না। শুধু তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হল, তিনি 'পাগল', রাজত্ব করবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। অতি যত্নে সুইজারল্যাণ্ডে একটি মানসিক চিকিৎসালয়ে তিনি বন্দী হলেন। রাজসিংহাসনে বসানো হল বালক হুসেনকে। (তালাল বর্তমানে তুর্কীতে। আগস্টের শেষভাগে ভ্রাতা হুসেনের সঙ্গে তুর্কীতে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। রাজ্যচ্যুতির পর তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতির কথা বিশেষ শোনা যায় নি)।

মিশরে ১৯৫২ সালের বিপ্লব কঠিনভাবে নাড়া দিল জর্ডনের ভিত্তি। সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবরা দাবী করল অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার, ইংরেজ তাঁবেদারীর সমাপ্তি; মিশরের সঙ্গে মিতালি। নতুন রাজা হুসেন পড়লেন দুই টানে—একদিকে জনমতের চাপ, অন্য দিকে ইংরেজের চাপ। তিনি দু' দিক বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করলেন বছর তিনেক। বৃটেন জর্ডনকে চাপ দিতে লাগল বাগদাদ চুক্তিতে যোগ দিতে। পার্লামেণ্টে জর্ডন নদীর পূব ও পশ্চিম পারের লোকদের জন্য সমান আসন নির্দিষ্ট; কিন্তু ১৯৫২ সালের পর থেকে পূব পারের আরবরাই অধিকতর প্রভাবশালী হয়ে উঠল। বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কর্মদক্ষতার জোরে তারা সরকারী অফিসে, স্কুল-কলেজে ও সৈন্য-বিভাগে অধিক সংখ্যায় ঢুকে পড়তে লাগল। হুসেনও জনমতের চেহারা দেখে মিশর-সৌদী, আরব-সিরিয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে মিত্রতার আয়োজন শুরু করলেন।

এমনি করে ১৯৫৫ সাল যখন উত্তীর্ণ তখন ইংরেজ একটা প্রকাণ্ড ভুল চালে জর্ডনের এই নতুন সংকটকে অনেকখানি বাড়িয়ে তুলল। সবেমাত্র বাগদাদে বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠক শেষ হয়েছে। মিশর-সৌদী আরব-সিরিয়া-জর্ডনের সামরিক এক জোট ইংরেজ, ইরাক ও প্রাণে সৃষ্টি করেছে আতঙ্ক! বৈঠকে ঠিক হল জর্ডনকে যখন অসামরিক চাপে বাগে আনা গেল না, তখন সামরিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে। বাগদাদ থেকে আম্মানে উপস্থিত হলেন বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল টেম্পলার। হুসেনের সঙ্গে কথাবার্তায় তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন, জর্ডন যদি বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান না করে তবে বৃটেন শুধু আর্থিক সাহায্যই তুলে নেবে না, 'আরব লিজন' ও জর্ডনে অবস্থিত বৃটিশ সামরিক বাহিনীর উপযুক্ত ব্যবহার করতেও সে তৈরী। রেগে মেগে টেম্পলার সাহেব জর্ডনের রাজা যুবক হুসেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সজোরে টেবিল চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, "আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি।"

এই টেবিল চাপড়ানো নীতিটাই হ'ল চালের ভুল। টেম্পলার ভুলে গেলেন তিনি এলেনবী নন, এটা চার্চিলের যুগ নয়, জর্ডন নয় সেই পুরাতন উপরাজ্য, বৃটেন নয় সেই একদা-প্রতাপশালী শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য-শক্তি! এর উপর ঘটলো আর এক অপকাণ্ড। মাস তিনেক পরে বিলাতের একখানা ম্যাগাজিন—'ইলাস্ট্রেটেড'—খুলে হুসেন দেখতে পেলেন জর্ডন বিষয়ে একটি নিবন্ধ-তাতে গ্লাব পাশাকে বর্ণনা করা হয়েছে জর্ডনের মুকুটহীন রাজা বলে। কাটা ঘায়ে নুনের অত্যাচার! বিশ বছরের হুসেন

হঠাৎ ক্ষেপে গেলেন। রাতারাতি মন্ত্রিসভার পতন ঘটল। হুসেন গ্লাব পাশাকে ডাকিয়ে বললেন, "তুমি এখনই বরখাস্ত হলে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে।"

গ্লাব পাশা দেশে চলে গেলেন, লণ্ডনে ও ওয়াশিংটনে কিছু বাকবিতণ্ডা হল, কাইরো ও ডামাস্কাসে উল্লাস; কিন্তু জর্ডনে স্থিতিশীলতার ঘটল দারুণ অভাব। কয়েক মাসের মধ্যেই পর পর পাঁচবার মন্ত্রিসভার বদল এই অস্থিরতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। হুসেন মিশর, সৌদী আরব ও সিরিয়ার সঙ্গে মিতালি করে যৌথ সামরিক কম্যাণ্ডে যোগদান করলেন, মেনে নিলেন মিশরের সামরিক নেতৃত্ব। আবদুল্লার আমল থেকে বৃটেন জর্ডনকে প্রতি বৎসর আরব লিজনের জন্যই এক কোটি পাউণ্ড আর্থিক সাহায্য করে আসছিল। ১৯৩৭ সালে অন্যান্য খাতে বৃটিশ সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৫২ সালে বাড়তে বাড়তে দাঁড়ায় পঁয়ষট্টি লক্ষ পাউণ্ডে। তা

ছাড়াও বৃটেন জর্ডনকে ১৯৪৯ ও ১৯৫১ সালে পঁয়ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড ধার দিয়েছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে; আবার ১৯৫৩ সালে পাঁচশালা পরিকল্পনায় আর্থিক সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়ে বৃটেন আরো সাড়ে বারো লক্ষ পাউণ্ড অর্থ দিয়েছিল। জর্ডন এতোই দরিদ্র যে, বাইরের সাহায্য ছাড়া তার সংসার অচল। বাগদাদ চুক্তিতে জর্ডনকে টানতে না পেরে ১৯৫৬ সালে বৃটেন অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেয়। তখন কাইরোতে মিলিত হয়ে নাসের, সৌদ এবং কোয়াটলি ঠিক করেন যে, জর্ডনের বহিঃসাহায্যের প্রয়োজন যোগাবে মিশর, সৌদী আরব এবং সিরিয়া।

হুসেন বুঝতে পেরেছিলেন যে, জনমতের চাপে যে ব্যবস্থাকে তিনি মেনে নিয়েছেন সেই গোকুলেই বেড়ে উঠছে হাশেমী রাজন্ ধ্বংসের শক্তি। মিশর ও সিরিয়ার প্রভাব মানে একমাত্র পরিণাম আজ বা কাল জর্ডনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা! প্যালেস্টাইন আরব, যারা জর্ডনের জনসংখ্যার তিনভাগের দুই ভাগ, আসলে কামনা করে প্রজাতান্ত্রিক জর্ডনের সঙ্গে মিশর ও সিরিয়ার ফেডারেশন। তাই ১৯৫৬ সালের প্রথম থেকেই হুসেন আমেরিকার সঙ্গে গোপন আলাপ চালিয়েছিলেন জর্ডনকে মার্কিনী আওতায় আনার জন্যে।

নভেম্বরের সুয়েজ সংকট একদিকে জর্ডনে যেমন তীব্র পশ্চিমবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করে এবং নাসেরের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়ে দেয়, তেমনি হুসেনকে করে দেয় তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কিত। ১৯৫৭ সাল অবতরণ করল আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন মাথায় নিয়ে। মার্চ মাসে মিশর থেকে সমস্ত আক্রমণকারী বিদেশী সৈন্যের অপসরণের পর সুয়েজ খালের উপর বিজয়ী মিশরের পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠা হল। আর এপ্রিলেই হুসেন জর্ডনকে মার্কিন ছত্রছায়ায় নিয়ে এলেন। তখনকার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জাতীয় সমাজতন্ত্রী দলের নেতা নাবুলসি। এপ্রিলে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই হুসেন তাঁর পদত্যাগ পত্র দাবী করে বসলেন। নাবুলসিকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে জর্ডনের সর্বত্র গণবিক্ষোভ মাথা নাড়া দিল। কাইরো ও ডামাস্কাস বেতারে হুসেনের উপর তীব্র আক্রমণ শুরু হল। প্রায় বছরখানেক ধরে, ১৯৫৬ সালের বসন্তকালে ইজরাইল-মিশরের এক তীব্র সামরিক সংঘর্ষের পর থেকেই জর্ডনে ইজরেইল আক্রমণের সম্ভাবনায় কিছু সিরীয়, সৌদী ও ইরাকী সৈন্য জর্ডন সীমান্তে মোতায়েন ছিল। হুসেন গণ-আন্দোলন দমন করতে এসব সৈন্যের সাহায্য চাইলেন। দেখতে পেলেন সিরীয় সৈন্যরা বিক্ষোভের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল ও সাহায্যে অনিচ্ছুক। একমাত্র সৌদী সৈন্যরাই আন্দোলন দমনে এগিয়ে এল। আরো আতঙ্কিত হলেন হুসেন এই দেখে যে, নবপর্যায়ের 'আরব লিজন' আর আগের মতো নির্ভরযোগ্য নয়, রাজানুগত্যের স্থানে জন্ম নিয়েছে জাতীয়তাবাদের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা। দেখতে পেলেন আবদুল্লা-গ্লাব পাশার অতি যত্নে গড়ে তোলা এই আরব লিজনের নতুন প্রধান সেনাপতি নিজেই নাসেরপন্থী।

আম্মানের বাইরে ছোট্ট এয়ারপোর্টে হুসেনের জন্যে একখানি ভ্যাম্পায়ার জেট ফাইটার সর্বদাই প্রস্তুত থাকতো, প্রয়োজন হলে যে কোন মুহূর্তে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। বিশ বছরের যুবক হুসেন এবার বুঝতে পারলেন যে সময় দ্রুত তাঁর পায়ের তলা থেকে রাজতন্ত্রকে তাড়িয়ে বিপক্ষ-ক্যাম্পে হাজির করছে। বহুদিনের গোপন আলাপে মার্কিন সরকার সাহায্য দিতে প্রস্তুত তা তিনি জানতেনই। এবার তিনি চেয়ে বসলেন এই প্রতিশ্রুত সাহায্য। এপ্রিলের শেষের দিকে এক সন্ধ্যায় বিদেশী সাংবাদিকদের নিজের অফিসে ডেকে তিনি বললেন, "আমরা এখন বুঝতে পেরেছি যে জর্ডনের বিরুদ্ধে এই যে ষড়যন্ত্র-অভিযান এবং জর্ডনের অভ্যন্তরে অরাজকতার এই সংকট, এরা সবই আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ ও তার অনুচরদের কীর্তি।"

ওয়াশিংটনে বসে পররাষ্ট্রসচিব ডালেস হুসেনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পেয়েই টেলিফোন-যোগে অগাস্টা গল্ফ কোর্সে নিভৃত ছুটির বিশ্রামরত রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে জরুরী আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুনিয়াতে সরব ডালেসের ঘোষণা তার-বেতার যোগে ছড়িয়ে পড়ল: "প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রসচিব উভয়েই জর্ডনের নিরাপত্তা বিশেষ মূল্যবান মনে করেন।" চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ভূমধ্যসাগররক্ষী বিরাট মার্কিন নৌ-বহর, যা সিক্‌স্থ (Sixth Fleet) নামে পরিচিত, ফরাসী রিভিয়েরা ত্যাগ করে জর্ডন অভিমুখে রওনা দিল। এবং মার্কিন রাজধানীতে সরকারী মুখপাত্ররা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, এই রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন অনুসারে। আর্থিক ব্যবস্থাও অচিরে নেওয়া হল। আমেরিকা জর্ডনকে তৎক্ষণাৎ এক কোটি ডলার অর্থ সাহায্য দিয়ে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চাঙ্গা করে তুলল। এবং আশ্বাস দিল আরো সাড়ে তিন কোটি ডলারের।

মে থেকে জুলাইর মধ্যে জর্ডন পুরোপুরি চলে এলো পশ্চিম শিবিরে। হুসেন হঠাৎ "আবিষ্কার" করলেন এক বিরাট গণতন্ত্রবিরোধী ষড়যন্ত্র; যাদের ধরপাকড় ও অত্যাচারে জর্ডনের রাজনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠল; প্রধান সেনাপতি আবু নাওয়ার পালিয়ে গেলেন সিরিয়ায়; সমাজবাদী ও প্রগতিপন্থী নেতারা সবাই হলেন কারারুদ্ধ; মিশর ও সিরিয়ার সঙ্গে শুরু হল তীব্র বিরোধ এবং ইরাক ও সৌদী আরবের সঙ্গে হল এক মিতালি, মার্কিন ডলারের আওতায়। এর মধ্যে নতুন একটা পররাষ্ট্রনীতি অনেক গোপনতা সত্ত্বেও আত্মপ্রকাশ করে ফেলল। জর্ডনের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে তেল সংগ্রহের সনদ পেয়েছেন মার্কিন কোটিপতি ই পলি (E Polly)। কোন কোন অঞ্চলে ইতিমধ্যেই তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে, এবং এই তেলশিল্প যাতে জাতীয়করণ থেকে দীর্ঘদিন রক্ষা পায় তার জন্যে নেকনজর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জর্ডন নয়—মার্কিন সরকার। কোন তেলশিল্পকে এই ধরনের সরকারী গ্যারান্টি দেওয়া আমেরিকার ইতিহাসে এই প্রথম।

আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন প্রথম সোনার ডিম প্রসব করল জর্ডনে।

(ক্রমশ)

বাস-ড্রাইভার
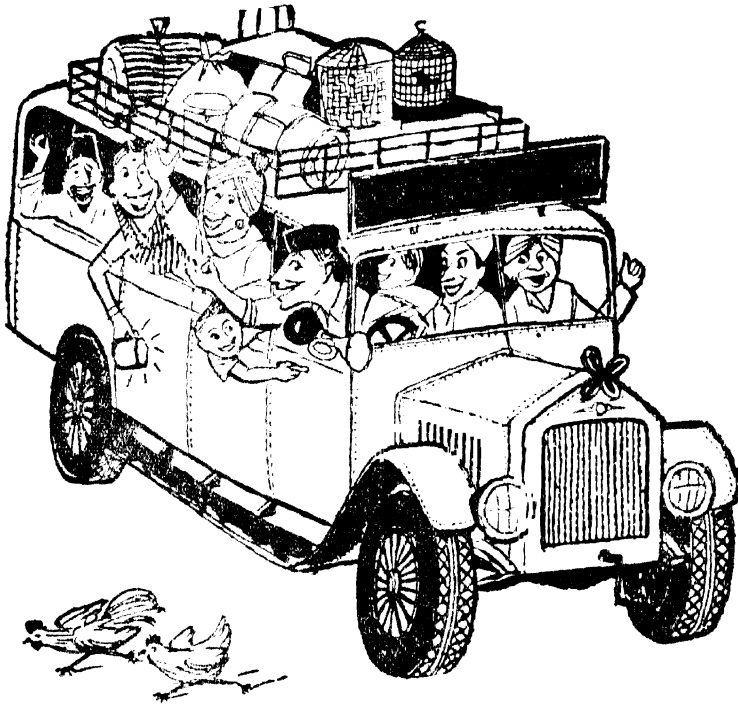
মবিলগ্যাসই

চেয়েছিলেন কেন?
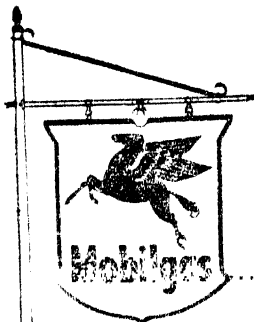
আগে ভোপুরী থেকে নলহাটি যেতে পাক্কা সোয়া ঘণ্টা লেগে যেত—তা-ও কিনা সময়মত যদি বাস স্টার্ট নিত তবেই। যাত্রীরা দাবী জানালেন—'নতুন বাস চাই'। শেষে একদিন হঠাৎ সেই পুরনো, সাবেককালের গাড়ীটাই দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাটে স্টার্ট নিল আর সোয়া ঘণ্টার রাস্তা মাত্র পঞ্চাশ মিনিটে পাড়ি দিল। 'তাজ্জব ব্যাপার' বাস থেকে নামতে নামতে যাত্রীরা বলে উঠলেন। ড্রাইভার শুধু একটু বিজ্ঞের মত হেসে বুঝিয়ে দিলেন যে এর মূলে আছে 'মবিলগ্যাস'।

....ভালোভাবে মোটর চালাবার অত্যাবশ্যক একটি **স্ট্যানভ্যাক** সামগ্রী

স্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী (সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সাথে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

শার্ঙ্গদেব

সম্প্রতি শ্রী রবিশঙ্কর আমেরিকা পর্যটন করে ফিরেছেন। কলকাতায় একটি সম্বর্ধনা সভায় তিনি জানিয়েছেন যে, আমেরিকায় প্রতি কনসার্টের শুরুতে তিনি ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে কিছু কিছু বক্তৃতা করেছেন, নইলে হয়তো বিদেশী শ্রোতাদের পক্ষে আমাদের সঙ্গীতের রসগ্রহণে অসুবিধা হত। খবরের কাগজের রিপোর্টে যা দেখেছি, তাতে মনে হয়, তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, বিদেশীর পক্ষে ভারতীয় সঙ্গীতকে ইনটেলেক্ট দিয়ে বুঝতে গেলে ভুল হবে, তাকে অনুভব করতে হবে হৃদয় দিয়ে। ইংরেজি পত্রিকার রিপোর্ট –

"He told them never to appreciate Indian music through intellect and told them that approach for understanding must come through heart"!

আমাদের আদর্শের দিক দিয়ে এরকম উপদেশ সঙ্গত কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে। এটাও আমরা জানি যে, ইউরোপ, আমেরিকা থেকে অনেকেই আমাদের দেশে এসেছেন কেবলমাত্র আমাদের সঙ্গীতের ইনটেলেক্টের দিকটা বোঝবার জন্য। আমাদের সঙ্গীতের সৌন্দর্য তাঁরা শুনে উপভোগ করেছেন, কিন্তু কোন উপায়ে এই সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে উঠেছে, তার পরিচয়ও তাঁরা পেতে চান।

একদা আমাদের সঙ্গীতকে নিয়ে একটি সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, এই সাহিত্য হচ্ছে সঙ্গীতের ইনটেলেক্টের দিক। কাব্যের সঙ্গে যেমন অলংকার-সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তেমনি সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গীত-সাহিত্য এবং এই সাহিত্যে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো বস্তুকে বুঝতে গেলে বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে হয়, কেবলমাত্র উপভোগ করতে হলে একটু সহৃদয়তাই যথেষ্ট।

আমাদের সঙ্গীতের ইনটেলেকচুয়েল দিকে গুরুত্ব আরোপ না করবার সরল অর্থ এই হচ্ছে, আমাদের সঙ্গীতকে কেবল উচ্ছ্বাস-প্রবণ বলে স্বীকার করা। অর্থাৎ প্রকারান্তরে এইটাই বলা যে, আমাদের সঙ্গীত তরল, মনকে ভিজিয়ে দিতে পারে, সাময়িকভাবে মাদকতা বিস্তার করতে পারে, কিন্তু তার ওপরে উঠতে পারে না। মন্তব্যকারী যন্ত্র-শিল্পী, বহু যত্নে যন্ত্রকে আয়ত্ত করেছেন। তাঁর যন্ত্রোত্থিত সুরলহরী হৃদয়তটে আঘাত করে—অতএব হৃদয় বস্তুটা তাঁর কাছে বড়। সঙ্গীতে রসের ক্ষেত্রে হৃদয়ের দাবী সবচেয়ে বড়, এটা শুধু আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে নয়, সব দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধেই খাটে। অতএব আমাদের সঙ্গীতকে এদিক দিয়ে আলাদা করে হৃদয়গ্রাহ্য বস্তু বলে বিশেষভাবে প্রচার করবার কোন কারণ আছে বলে মনে করি না। সঙ্গীতে ইনটেলেক্টের দিকটা মহৎ, কেননা, বুদ্ধি এবং চিন্তাই প্রয়োগশিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করছে। সঙ্গীতকে নানাভাবে সংগঠন এবং বিন্যস্ত করবার প্রেরণা এসেছে ইনটেলেক্ট থেকে। আমাদের শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা, তান, রাগ, প্রবন্ধ—সব ক্ষেত্রেই বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ হয়েছে। মূল বস্তুকে বুঝতে গেলে বুদ্ধি দ্বারাই বুঝতে হবে—সেটা কেবলমাত্র হৃদয়ানুভূতিতেই সম্ভব নয়।
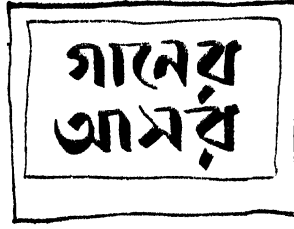
উদাহরণস্বরূপ আলাপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে। গাইয়ে-বাজিয়েরা সাধারণত আলাপকে একটি ইমোশনাল ব্যাপার বলেই মনে করেন। তাঁদের কাছে আলাপের ইমোশন বা আবেগের দিকটা বড়। এই কারণেই বহু গাইয়ে-বাজিয়ে আলাপকে শাস্ত্রানুগভাবে পরিবেশন করেন না, শুধু মিঠে করে খানিকটা বাজিয়ে বা গেয়ে সেরে দেন। কিন্তু, এই আলাপের ব্যাপারটাকেই যখন বুদ্ধির দ্বারা বিচার করা হয় তখন তা সঙ্গীতের মর্মোদ্ঘাটন করে। এই ইনটেলেকচুয়েল আলোচনার পরিচয় বিদেশী বুদ্ধিমান শ্রোতারা পেলে আলাপকে আরও ভালভাবে বুঝতে পারবেন। তাঁদের এ ধারণা হবে না যে আলাপ কেবলমাত্র সঙ্গীতের পুরোভাগে কিঞ্চিৎ মধুর সুরলহরীর আন্দোলন মাত্র।

উদাহরণটিকে পরিষ্কার করবার জন্য আলাপকে কিভাবে বিচার করা হয়েছে সেটা একটু বলা দরকার। সংগীত রত্নাকর আলাপ না বলে আলপ্তি বলবার পক্ষপাতী কেন না এই শব্দটিতে রাগের শুধু আবির্ভাব নয় তিরোভাবেরও সূচনা করে। সংগীত সমালোচক কল্লিনাথ আলপন শব্দটিকেও গ্রহণ করেছেন কেন না এই শব্দটি স্থিতির সূচনা করে। আবির্ভাব এবং তিরোভাব এই দুটিই স্থিতির ভিতর নিহিত রয়েছে। আলাপ, আলপন এবং আলপ্তি নিয়ে উজ্জ্বল এবং চিত্তাকর্ষক আলোচনা সংগীত সাহিত্যে রয়েছে। এই আলপ্তির প্রয়োগ কিভাবে হবে সে সম্বন্ধে রত্নাকরে বলা হয়েছে যে এটি প্রথমে রাগকে কেন্দ্র করেই বিস্তারিত হবে। এই আলপ্তির ক্রম ও স্বর অনুযায়ী নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

এই রকম স্বরালাপের ভিতর দিয়ে রাগালপ্তি সম্পূর্ণ হচ্ছে অর্থাৎ তার আবির্ভাব ঘটছে। তার পরে ধীরে ধীরে নানাভাবে রাগের প্রধান স্বর এবং অপরাপর প্রাধান্যকে প্রকটিত করতে হবে যাতে করে রাগের অবস্থিতি ঘটে। এর পরে আলাপের আর একটি দিক হচ্ছে গানের দিক। সাধারণত গানের কলি আমরা যেভাবে গাই সেইভাবে আলাপ করে যেতে হবে। এইভাবে রাগের আবরণটি প্রস্ফুটিত হবে এবং ধীরে ধীরে তার তিরোভাব ঘটবে। এই আলাপই যে সংগীতকে সম্পূর্ণ করে তুলবে এমন নয়, সম্পূর্ণ সংগীতটি শোনবার আগ্রহ এবং উৎসুক্য জাগরিত করবে। অর্থাৎ আলাপের পরেও সংগীতের জন্য অপেক্ষা থাকবে।

সমগ্র বিষয়টি আলোচনা করে কল্লিনাথ একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিয়েছেন। আলপ্তি এই শব্দটিতে একটি স্ত্রীরূপের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে তাঁর ভাষাই উদ্ধৃত করি—"যথা বর্ণালঙ্কারাদিসম্পন্না কামিনী কামুকদর্শনে কুচাদেশাদিকং স্বাঙ্গং কিঞ্চিদ্দর্শয়িত্ব এবম্ সবিলাসং তৎ তিরোভাবয়তি কদাচিৎ তিরোভাবং তদেবপ্রতিপদ্য-ভঞ্জনীভ্যাং তদ্রাগং প্রকটী করোতি ইতি সহৃদয় প্রতিভাবিষয় এতদ্ অংশের এর সরলার্থ—বর্ণালঙ্কারসম্পন্না কামিনী কামীজনকে দর্শন করলে স্বীয় পয়োধরাদি অঙ্গ কিঞ্চিৎ প্রদর্শনের পর বিলাস সহকারে তাদের আবৃত করে, আবার আবৃত অঙ্গকে সলজ্জভাবে পুনঃ প্রকটিত করে। বর্ণ এবং অলংকারসম্পন্ন আলপ্তিতেও এই লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে। এই প্রক্রিয়াতেও স্বতন্ত্রভাবে একটি রাগের কিঞ্চিৎ প্রকাশের পর তিরোভাব ঘটছে। এই তিরোভূত রাগের কিয়দংশ আবার রূপকালপ্তিতে প্রকটিত হচ্ছে।

বিষয়টি আমি খুবই সংক্ষেপে বললুম—আসলে আলোচনাটি খুব ছোট নয়। এটি বলবার উদ্দেশ্য এই যে পূর্বেকার অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় লাভের যে সুযোগ আজও আছে সেটুকুর সদ্ব্যবহার করা অন্তত আমাদের উচিত; আর উচিত বুদ্ধিমান বিদেশীকে বুদ্ধির খোরাক দিয়ে তার উৎসাহ বর্ধন করা। শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, গীত, রাগ প্রবন্ধ প্রভৃতি সব বিষয় নিয়েই যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে এবং বুদ্ধির দ্বারা বিচারও করা হয়েছে। অতএব শুধু গান বাজনা করা আর ঘাড় নেড়ে শোনার অতিরিক্ত কিছু গভীরতর তত্ত্বের অনুসন্ধানও আমাদের দেশে করা হয়েছে। তাকে বাদ দিলে আমাদের সংগীত চিন্তাকে লঘু করা হয়। সেটাই যদি হয় তাহলে আমাদের সংগীতকে কেন্দ্র করে কিভাবে সংগীত চিন্তা গড়ে উঠেছে সে বিষয়ে বলাই ভাল।

সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বার বার আমার এই কথা মনে হয়েছে যে সংগীতকে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যেভাবে গ্রহণ করা উচিত সেভাবে গ্রহণ করেননি। সংগীতের প্রয়োগবিধি আমাদের যেভাবে আকৃষ্ট করেছে তার চিন্তাধারা আমাদের চিন্তাকে সেই পরিমাণে জাগ্রত করতে পারে নি। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে সংগীতের তত্ত্ব বলতে আমরা কেবলমাত্র রাগের লক্ষণ বিচার বুঝি। অর্থাৎ এই রাগে স্বরের এই রকম প্রয়োগ নির্দিষ্ট হয়েছে, এর বাদী, সম্বাদী এই এই স্বর এবং এর সংগে অপর রাগের তফাৎ এইখানে। ব্যস্, এইখানেই আমাদের সংগীত সম্বন্ধীয় কৌতূহল শেষ হয়ে গেল। বর্তমানে যে সব বই বেরুচ্ছে তাও অধিকাংশ এই ধরনের। বি-এ, এম-এ পাশ করা ছাত্রছাত্রীরাও তাঁদের ওস্তাদের কাছ থেকে এই থোটুকুই সংগ্রহ করেন এবং এর বেশি আর জানবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। সম্পূর্ণ মেকানিকেল দিকটুকু নিয়ে আমরা তৃপ্ত আছি, এসথেটিক দিক সম্বন্ধে ভাববার প্রয়োজনও বোধ করি না। যে সব গ্রন্থে সংগীতের ইনটেলেকচুয়েল দিক নিয়ে আলোচনা আছে সে সব গ্রন্থের খোঁজখবর নেবার অবকাশ আমাদের ঘটে না। সংগীত চিন্তা নিয়ে সরল সুখপাঠ্য বইও ইংরেজি এবং বাংলা দুই ভাষাতেই বিরল। অতএব সংগীতকে আমরা স্বদেশে বিদেশে যেভাবে বিচার বিশ্লেষণ করছি সেটা সম্পূর্ণ নয় এবং যথাযথও নয়।

এখানে একটা প্রশ্ন অনেকেই আমাকে করবেন যে রসের পরিবেশন যেখানে করা হচ্ছে সেখানে তত্ত্ব এনে ফেললে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সেভাবে তত্ত্ব আলোচনার কথা বলছি না, তাকে মানানসইভাবে সহজবোধ্য করেই বলতে হবে কিন্তু তত্ত্বকে বাদ দিয়ে কেবল ইমোশন নিয়ে থাকাটাও তো সংগত নয়। যারা পুডিং

খেতে অভ্যস্ত তাদের কাছে সন্দেশ পরিবেশন করবার প্রারম্ভে যদি কিছু বলতেই হয় তাহলে খুব অল্প কথায় সন্দেশের একটু পরিচয় দেওয়া উচিত। কিন্তু, যদি বলা হয় সন্দেশের আর কোন পরিচয় নেই তাকে রসনা দিয়েই চেখে দেখতে হবে তাহলে সেটা না বললেও ক্ষতি ছিল না কেননা আস্বাদন করবার জন্যই সন্দেশ পরিবেশন করা হয়েছে। যতটুকু পরিচয় যেখানে দেওয়া দরকার ততটুকুই দেওয়া ভাল। আমি এমন কথা বলছি না যে সব ক্ষেত্রেই শ্রুতির বিচার, কূটতান বা খণ্ডমেরুর তত্ত্ব নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সংগীতের উদ্দেশ্যকে যদি বোঝাতে হয় তবে তার ইনটেলেকচুয়েল দিক কিছু পরিমাণে আসতে বাধ্য এবং তাকে বাদ দেওয়াটা যুক্তিসংগত নয়। কোনো বিদেশীর সামনে ভারতীয় চিত্রকলা ধরে যদি বলা যায় তাকে চোখ দিয়ে দেখে হৃদয় দিয়ে বুঝতে হবে তাহলে বিদেশী তাকে চোখ দিয়ে নিশ্চয়ই দেখবে এবং তার হৃদয় নামক বস্তুটি দিয়ে বুঝবেও যা হোক একটা কিছু। কিন্তু আমার ওটুকু না বললেও চলত কেননা এই ধরনের কথা নিছক ফাঁকা সেণ্টি-মেণ্টের প্রকাশমাত্র—ওতে কিছুই পরিষ্কার হয় না। অতএব ইন্টেলেক্ট দিয়ে গ্রহণ করা যায় বলতে হলে এমন কিছু বলা প্রয়োজন, নতুবা শুধু বাক্যলাপ মাত্র।

শ্রীরবিশংকর বলেছেন যে ভারতীয় সংগীতশিল্পীদের সংগীত পরিবেশনের এমন কৌশল জানা দরকার যাতে সংগীত বিদেশী সাধারণের সহজে বোধগম্য হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে প্রোগ্রাম সমাপ্ত হয়। এটি শুধু বিদেশে সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় আমাদের দেশেও সংগীত পরিবেশনের অনুরূপ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এইখানেও ওই একই কথা বলতে হয়—ইনটেলেকট দিয়ে সংগীতকে বুঝলে আপনা থেকেই এই সংস্কৃতিবোধ আসবে। আমাদের গাইয়ে বাজিয়েদের হৃদয়াবেগের কিছু প্রাবল্য আছে বলেই গান বাজনা সহজে থামতে চায় না। সেই পরিমাণ ইনটেলেক্ট থাকলে এতটা বিস্তৃতি ঘটত না। আমাদের যন্ত্রশিল্পীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যখন অবিশ্রান্ত ঝালার কাজ করে যেতে থাকেন এবং তার সঙ্গে ধুড়ুম ধাড়াম তবলার আওয়াজ চলতে থাকে তখন তাঁরা ভেবেও দেখেন না সংযত রুচিসম্পন্ন শ্রোতার কানে সেটা কী পরিমাণ বিরক্তিকর ঠেকে। শাস্ত্র-কার স্পষ্টভাষায় এই ঝালাকে বলেছেন,—"বীণাবাদনে দোষঃ।" শাস্ত্রানুসারে কর্ণের পীড়াদায়ক বা কর্ণবিদারী বাদ্যকে ঝল্লিকা বা ঝালা বলা হয়। আমাদের দেশে যখন বাজানো হয় তখন এই বোধটা অনেকের থাকে না। বিদেশী শ্রোতাদের কাছে আমরা অত্যন্ত সাবধান কিন্তু দেশী শ্রোতাদের রুচি যাতে উন্নত হয় সে চেষ্টা আদৌ করি কি না সন্দেহ। সে ক্ষেত্রে সস্তা হাততালিকে উৎসাহ দিতে আমাদের কিছুমাত্র সংকোচ নেই।

শ্রীরবিশংকর বিদেশী শ্রোতাদের তুষ্টি-বিধানে একটু অধিক পরিমাণে মনোযোগী কেননা তাঁর মতে এর সঙ্গে আমাদের জাতীয় মান-মর্যাদা জড়িত রয়েছে। ভাল কথা। তবে, বিদেশী শ্রোতা সম্বন্ধে আমা-দের অনেকেরই বোধ হয় তেমন মাথা ব্যথা নেই। কেননা, এই কলকাতায় প্রায়ই বিশ্ব-বিখ্যাত বিদেশী সংগীতশিল্পীরা আসেন এবং ভারতীয় শ্রোতাদের তুষ্টিবিধানে তাঁদের কোন ঔৎসুক্যই দেখা যায় না। পাশ্চাত্ত্য সংগীত বোঝো তো শোনো না হয়তো শোনবার দরকার নেই। তাঁদের বক্তৃতা করতেও শুনি নি অথবা কেউ দেশে গিয়ে ভারতীয়দের কানের দিকে নজর দিয়ে সংগীত পরিবেশনের উপদেশ দিয়েছেন এমন উল্লেখও কোথাও দেখিনি। যখনই নিউ-এম্পায়ারে গিয়েছি তখনই দেখেছি বেশির ভাগই বিদেশী শ্রোতা, অল্প দু-চারজন ভারতীয় যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই পুরোপুরি পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন এবং তাঁদেরও অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য সংগীতে অভিজ্ঞ। অতএব শিল্পীরা এখানে এসেও দেশের আবহাওয়াতেই গেয়ে বা বাজিয়ে যান। নইলে হয়তো আসতেনও না।

আসলে সংযম যে কোন সংস্কৃতিরই প্রধান বস্তু। আমাদের দেশের গানের মজলিসে সেই সংযম অভ্যাস করাটা দরকার। গোড়া থেকে সংগীতের শিক্ষাটাই সংযম এবং সুরুচির সহযোগে হওয়া উচিত। বুদ্ধির দ্বারা সংগীতকে গ্রহণ করলে এই সংযম-বোধ স্বতঃই আসবে। সংগীতচিন্তা এবং সংগীতের প্রয়োগ এই দুটির সমন্বয় এখনো আমাদের দেশে হয় নি। সর্বাগ্রে সেইটি হওয়া প্রয়োজন।

আর বিদেশীদের পক্ষে যাঁদের আগ্রহ আছে তাঁদের ইনটেলেকট দিয়ে সংগীতের মর্মগ্রহণ করাই উচিত।

"approach for understanding must come through heart"—

মানে এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। এতে কিঞ্চিৎ আমো-দের বেশি আর কিছু হয় না। বিদেশের আমোদলিপ্সু শ্রোতার কাছে এদেশের রসপরিবেশকের এইরকম বলাটাই বোধ হয় সব চেয়ে নিরাপদ।

ত্রিদিব চৌধুরী

(১৮)

মন্তেইরো সংবাদ

গোয়া পুলিসের গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর কাসিমির মন্তেইরো-র (Casimir Monteiro) সঙ্গে ওয়াসপাই থানায় যখন আমার প্রথম দেখা হয়, এবং তাহার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত, মন্তেইরোকে আমি মন্তেইরো বলিয়া জানিতাম না। পুলিস হাজতে থাকার সময় আরো কয়েকবারই মন্তেইরোর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ আমার হয়। তখনো মন্তেইরোকে চিনিনা। গ্রেপ্তারের প্রায় ৩ মাস বাদে আলতিনোতে পুলিস দুর্গের জেলে থাকার সময় একদিন গোয়ানীজ একজন সহবন্দী আমায় তাহাকে দেখাইয়া চিনাইয়া দেয়—এই লোকটিই স্বনামধন্য মন্তেইরো। তদবধি অবশ্য মন্তেইরো সম্পর্কে এত কথা শুনিয়াছি যে নূতন করিয়া তাহাকে চিনিবার বেশ খানিকটা চেষ্টা অনুভব করিয়াছি বলিলেও চলে। মন্তেইরো একাই যেন গোয়া পুলিসের 'লোম্যান' ও 'চার্লস টেগার্ট'। লোম্যান ও টেগার্ট সাহেবের কথা বাংলা দেশের লোক অবশ্য ভুলিয়া যায় নাই বোধ হয়। আমাদের দেশে ছুটিয়া সেখানেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ইংরেজী ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশের বিপ্লবী ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস হইতে মিঃ লোম্যান ও স্যার চার্লস টেগার্টের কথা সহজে মুছিয়া যাইবার মতো নয়। শুধু কাসিমির মন্তেইরোর সঙ্গে এই দুইজন ইংরেজ পুলিস কর্মচারীর তুলনা করিয়া তাঁহাদের দুইজনের প্রতি একটু অবিচার করিতেছি বলিয়া মনে হইতেছে। বাংলা দেশের সঙ্গে এককালে এই দুইজনের যত বিরোধই থাকুক, দুইজনেই শিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন, পুলিসের চাকুরি নিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া নিজেদের দায়িত্বজ্ঞান এবং ইংরেজ সুলভ দেশপ্রেম ও কর্তব্যবোধ অনুযায়ী নিজের নিজের কাজ করিয়া গিয়াছেন। সেই কর্তব্য প্রতিপালন করিতে গিয়া বাংলা দেশের বিপ্লবী ও রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে বহুবার তাঁহাদের সংঘর্ষ হইয়াছে। ১৯১৬ সালে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় [illegible] অনুশীলন সমিতির খ্যাতনামা বিপ্লবী কর্মী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় [illegible]-এর পাঁচ কমিয়া লোম্যানের ডান হাতটি ভাঙিয়া দিয়াছিলেন। টেগার্ট যখন পুলিসের ইন্সপেক্টর মাত্র ছিলেন তখন বাঙালীদের মধ্যে বাঘা যতীনের সঙ্গে তিনি পুলিসের হইয়া সম্মুখ সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন। পুলিসের গুলীতে আহত যতীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পূর্বে পিপাসার্ত হইয়া যেটুকু জল চাহিয়াছিলেন, টেগার্টই ছুটিয়া গিয়া পুকুর হইতে টুপিতে করিয়া জল নিয়া আসিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর বীর শত্রুর প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সামরিক কায়দায় সম্মান দেখাইতে এই ভদ্র ইংরেজ যুবকের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নাই। ১৯৩০ সালে পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোমান্ সাহেব বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর বিনয়-বাদলের গুলীতে ঢাকায় নিহত হন। টেগার্টের উপর এই সময়ে বোমা পর্যন্ত পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও মিঃ লোমান্ ও স্যার চার্লসের সঙ্গে যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ কখনো হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই এ কথা জানেন যে তখনকার দিনে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের নীতি অনুযায়ী রাজনৈতিক আন্দোলন দমনে 'ডাণ্ডা' প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত এই দুইজন ইংরেজ অফিসার প্রায়ই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসাবে বিপ্লবীদের বা জাতীয় আন্দোলনের কর্মীদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে বা তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় সাধারণ ভদ্রতা রক্ষা করিতে কোনো সময় কার্পণ্য করেন নাই। মন্তেইরোকে ঠিক তাঁহাদের পাশাপাশি তুলনা করিতে গিয়া তাই মনে মনে একটু দ্বিধা বোধ করিতেছি, মন্তেইরো পদমর্যাদায় নিশ্চয়ই তাঁহাদের চেয়ে অনেক নীচে কিন্তু গোয়ার ভিতরে নিষ্ঠুর স্যাডিস্ট ধরনের প্রকৃতি (Sadist) অত্যাচার চালানোর ব্যাপারে তাহার লোক লোম্যান-টেগার্ট-এর তুলনায় অনেক উপরে ছাড়াইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। যেহেতু মন্তেইরো কেন, পুলিসের অন্য কারো আমার উপর কখনো অত্যাচারের দরকার নাই। শুধু দিনের পর দিন জেলের সামনে যাহা দেখিয়াছি এবং বিশ্বস্ত সূত্রে যাহা শুনিয়াছি, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। আর যে অত্যাচার চলিয়াছে প্রধানত কাসিমির মন্তেইরো এবং লিসবন হইতে আগত 'পিদে'র (Pide) ইন্সপেক্টর অলিভেইরার পরিচালনায়। অলিভেইরার সম্পর্কে তাহার অত্যাচারের কীর্তি কাহিনী ছাড়া আর কিছু জানি না; কিন্তু মন্তেইরো সম্পর্কে কিছু কিছু জানি। সে কথা এখানে বলার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি এই জন্য, যে তাহা না জানিলে গোয়াতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মুক্তিযোদ্ধারা কি ধরনের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতেছে তাহা ঠিক ঠিক বোঝা যাইবে না। আর তাহা না জানিলে ফ্যাসিস্ট ঔপনিবেশিক শাসনের স্বরূপ কি এবং পর্তুগীজ সাম্রাজ্যে ডাঃ সালাজারের Estado Novo বা Corporative State-এর স্বরূপ কি সে সম্পর্কে ঠিক ঠিক ধারণা হইবে না। মন্তেইরো গোয়া পুলিসের লোক, খাস পর্তুগালের পুলিস

বাহিনীর কিম্বা 'পিদে' বা সিকিউরিটি ফোর্সের লোক নয়. এখানে গোয়ার ভিতরে তাহার ক্ষমতার পরিমাণ কি তাহার আন্দাজ দিবার জন্য তাহাকে গোয়া পুলিসের টেগার্ট-সোমান্ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। তাহার চেয়ে পিদের লোকেরা বেশী ক্ষমতা রাখে নিশ্চয়ই—কিন্তু সে নিজে মিস্ত্রী বা ফিরিঙ্গী ইন্দো-পর্তুগীজ বলিয়া এবং বহুদিন ধরিয়া গোয়াতে আছে বলিয়া, 'পিদে' এবং সিকিউরিটি পুলিসের কর্তারা, পর্তুগীজ গোয়া সরকারের ক্যাবিনেট সেক্রেটারী, পুলিস কম্যাণ্ড্যাণ্ট এবং স্বয়ং গভর্নর জেনারেল বেনার্দ গেদীস্ সাহেব নিজে মন্তেইরোর উপরেই নির্ভর করেন বেশী। এক কথায় গোয়াতে সালাজারী শাসনের যোগ্য প্রতিনিধি বা প্রতীক কাসিমির মন্তেইরো; গোয়াতে সালাজারী রাজ মানে মন্তেইরো রাজ।

বিরোণ্ডে' ফাঁড়িতে সেদিন মাপসা পুলিসের কম্যাণ্ডান্টের মুখ হইতে মন্তেইরো-র নাম একবার শুনিয়াছিলাম বটে; কিন্তু শুনিয়াই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কারণ, মন্তেইরো কে এবং কি, কিছুই তখনো পর্যন্ত জানিতাম না। 'বিরোণ্ডে' আউট পোস্ট হইতে ওয়েপন কেরিয়ারে করিয়া আমাদের ওল্ডপাই আনিয়া ফেলিতে পুলিসের বেশী সময় লাগে নাই; আধঘণ্টা-খানেক হইবে। ওল্ডপাই আনিয়া আমাদের থানার বারান্দায় পুলিশ পাহারায় বসাইয়া রাখা হইল। আমরা চারজন ছাড়া—অর্থাৎ আমি নিজে, তথা তুলসী রামজী, নিতাই গুপ্ত এবং নাসিকের রামজীর স্বয়ংসেবক সংঘের ছেলেটি ছাড়া—অন্য সকলে দেখিলাম ট্রাকে করিয়া আমাদের আগেই আসিয়া হাজির হইয়াছে। তাহাদেরকে আর নামিতে দেওয়া হয় নাই; তাহাদের সাতচল্লিশজনকেই ট্রাকের উপর বসাইয়া রাখিয়া চারিদিক হইতে সঙগীন-উঁচানো রাইফেলধারী সৈনিক পাহারা দিতেছে। সেইখানে বারান্দায় আমরা বসিয়া থাকিতে থাকিতে প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। মনে মনে অধৈর্য হইয়া উঠিতেছি, যদিও সত্যাগ্রহীদের অধৈর্য হইতে নাই। দু'দিন শরীরের উপর দিয়া যা ধকল গিয়াছে তাহাতে হাত পা টান করিয়া কোথাও শুইয়া পড়ার ইচ্ছা হইতেছে। অথচ রকম সকম দেখিয়া মনে হইতেছে এ জায়গাটা আমাদের রাতের আস্তানা হইবে না—এটা পথের মধ্যে একটা ওয়েটিং স্টেশনের মতো। আমাদের ভলাণ্টিয়ার ভর্তি ট্রাক, যে ওয়েপন কেরিয়ারে করিয়া আমাদের আনা হইয়াছিল, সেটি, আমাদের প্রহরী সৈন্য ও পুলিসের দল সবাই যেন আবার কোথাও রওনা হইয়া যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অথচ যেন একজন কাহারো নিকট হইতে একটা হুকুম পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু হয় লোকটি নাই কিম্বা হুকুম দিতেছে না। বিরোণ্ডের নদীর ওপারে সেই যে মোটা বেঁটে ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক আমাদের গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন তিনি এবং তাঁহার গোয়ান যুবক সঙ্গী, তার দোনলা বন্দুকটি লইয়া, এদিক ওদিক যাতায়াত করিতেছেন। কেহই যেন কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এমন সময় থানার ভিতর ঘর হইতে গম্ভীর জোরালো গলায় কে যেন পর্তুগীজ ভাষায় কি হুকুম করিল। একজন ইন্দো-পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী জাতীয় লোক ভিতর হইতে আসিয়া প্রথমে নাসিকের ছেলেটিকে ইশারায় তাহার সঙ্গে আসার জন্য বলিল। কিছুক্ষণ পরে, বোধ হয় মিনিট দশেক হইবে তাহাকে আবার ফিরাইয়া আনিয়া আমাদের নিকট হইতে কিছুটা দূরে বসাইয়া রাখিল। তাহার পর তুলসী রামজীর ও নিতাই গুপ্তের ডাক পড়িল। বুঝিলাম এবার দ্বিতীয় দফা জেরার পালা চলিবে—ভিতরে বোধহয় 'রক্ত করবী'-র রাজার মতো রহস্যময় কেহ বসিয়া আছে; এই দফা জেরার মালিক সে। তুলসী
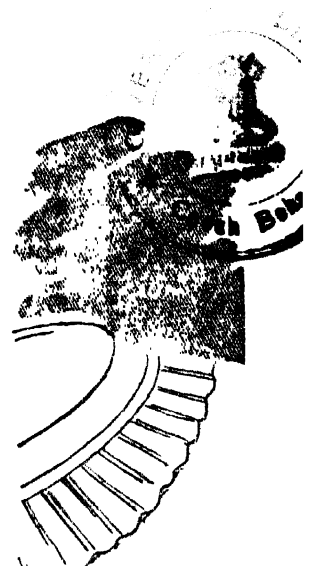
রামজীকে ফিরাইয়া আনিয়া নাসিকের ছেলেটির পাশে বসাইয়া রাখা হইল; নিতাইয়ের বেলাতেও তাহাই ঘটিল। সবার শেষে ডাক পড়িল আমার। ঘরের ভিতর যাইতে দেখি একজন লম্বা শক্ত চেহারার জোয়ান গুণ্ডা গোছের লোক একটি টেবিলের ধারে পায়চারি করিতেছে; হাতে পাইপ টেবিলের উপর একটি মদের গেলাস। অবশ্য এ কথা শুনিয়া কেহ ভুল ধারণা করিবেন না। পর্তুগীজরা জাত হিসাবে খুব ইন্‌-ফর্মাল; ইংরেজদের মত নয়; আর মদ সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব আমাদের চা খাওয়ার মতো। যখন তখন, যেখানে সেখানে অন্তত এক কাপ চা খাওয়া যায়। পর্তুগীজ-দের মধ্যেও কেহ কাহারো বাড়িতে গেলে এক গেলাস মদ খাইতে বলা, পথে ঘাটে তৃষ্ণা বোধ করিলে পকেট হইতে বোতল বাহির করিয়া একটু বিয়ার বা জিন্ দিয়া গলা ভিজাইয়া নেওয়া মোটেই দোষের নয়। গোয়াতে পুলিস হেড কোয়ার্টারে যেখানে সেখানে, যখন তখন পুলিসের বা পুলিস কর্মচারীদের মদ খাইতে দেখিয়াছি। হাজতের সামনে টুলে বসিয়া সিপাহী পাহারা দিতে দিতে, হয়ত তাহার ভাল লাগিতেছে না, একঘেয়েমি কাটানোর জন্য ক্যানটিন (পাঞ্জিমের পুলিস হেড্ কোয়ার্টারে একটি ক্যানটিন ও স্টোর আছে) হইতে কাহাকেও দিয়া বিয়ার আনাইয়া নিল; তার পর যতক্ষণ সে সেখানে থাকিবে মধ্যে মধ্যে এক আধ ঢোক খাইবে। তাহাতে পর্তু-গীজ কর্তৃপক্ষ বা কেহই খুব দোষের কিছু দেখেন না। গোয়াতে মদ 'সুলভ' ও সস্তাও বটে। বিরোণ্ডেতেও দেখিয়াছিলাম মাপুসার ডেপুটি কম্যাণ্ড্যাণ্ট আসার সঙ্গে অন্যান্য অফিসারেরা দৌড়াইয়া নিজেদের গাড়ি হইতে মদ লইয়া আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। পোর্ট মদের জন্য পর্তুগাল প্রসিদ্ধ; তাহার খাস কলোনী গোয়াতে পর্তুগীজ অফিসারদের মধ্যে মদের চলন একটু বেশী থাকিলে, তাহাদের নিজস্ব মাপকাঠি দিয়া বিচার করিয়া তাহা-দের খুব দোষারোপ করা চলে না। এই লোকটিও—অর্থাৎ ভিতরে যাহার সামনে আমায় আনা হইল মধ্যে মধ্যে গেলাস হইতে মদ খাইয়া নিতেছিল বটে; কিন্তু মোটেই মাতাল বা পানোন্মত্ত অবস্থায় ছিল না। পাইপই টানিতেছিল বেশী। পরনে একটা ঢোলা ধরনের খাকী ট্রাউজার যাকে 'বাগী' ট্রাউজার বলা যায়; গায়ে একটা আধময়লা খাকী হাফ শার্ট। পায়ে একটা স্যাণ্ডাল জাতীয় কিছু। তাহাকে দেখিয়া কোনো উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলিয়া মনে করা কঠিন, অথচ তাহার চালচলনে, কথাবার্তায় বেশ একটু কর্তৃত্ব-সুলভ আত্মবিশ্বাস এবং রাস-ভারি ধরণও আছে। তাহা হইতে তাহাকে একেবারে বাজে কেউ বলিয়াও মনে করিতে পারিতেছি না। আমি ঘরে ঢুকিতেই হঠাৎ পায়চারি থামাইয়া দু' হাত দুদিকে মাজার উপরে রাখিয়া—যাহাকে ইংরেজীতে বলে 'আর্মস্ এাকিম্বো' সেইভাবে হাত রাখিয়া—একটু সম্মুখে ঝুঁকিয়া 'বাও' করার অভিনয় করিয়া উপহাসের সুরে বলিল—

"So Mr. Chaudhuri, the great heroic M.P. from India, you have come at last ? Welcome !"

("অবশেষে, ভারত পার্লামেন্টের বীর সদস্য মিঃ চৌধুরী আপনি আমাদের দেশে আসিতে পারিয়াছেন? স্বাগতম্!")

"Say Mr. Chaudhuri ! Why did you prove so troublesome ! We have been anxiously waiting to accord you a hearty welcome for the last two days ! Why did you not turn up yesterday ? An mode is not so for off ?"

("মিঃ চৌধুরী আমাদের মিছামিছি এত কষ্ট দিলেন কেন আপনি? আমরা আপনার অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দু'দিন ধরিয়া এখানে অপেক্ষা করিতেছি! কাল দেখা দিলেন না কেন? অনমড্-তো এখান হইতে এত দূরে নয়?")।

গড় গড় করিয়া লোকটি অনর্গল ইংরাজী বলিয়া যাইতেছে, বোম্বে অঞ্চলের ফিরিঙ্গীদের মতো ইংরাজী কথার উচ্চারণ। তাহার 'ডোণ্ট কেয়ার' বা 'ডেয়ার ডেভিল' ধরণের ভাবসাব দেখিয়া এবং কতকটা তাহার আমাকে ব্যঙ্গ করার চেষ্টার ফলে আপেক্ষা-কৃত লঘু আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়াতে আমিও তাহারই মতন সুরে উত্তর দিলাম;

—"হাঁ আসিয়াছি। তবে আমি তো আশা করিতেছিলাম যে আপনারা বর্ডারের উপরেই আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য হাজির থাকিবেন। কিন্তু সেখানে কাহাকেও না দেখিয়া হতাশ হইয়া দু' দিন ধরিয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে আসিতেছি। কাজে কাজেই একটু দেরী হইয়া গেল।"

"ওহ্! তাই নাকি? তবে তো আপনাদের বড় কষ্ট হইয়াছে! আহা হা! যাই হোক্, বিরোণ্ডে'তে আমার লোকেরা নিশ্চয়ই আপনাদের যথাযোগ্য সমাদর করিতে কোনো ত্রুটি করে নাই?"

—"না, না, সকলেরই অভ্যর্থনা ভালো-ভাবে হইয়াছে। অবশ্য লোক বেশী ছিল বলিয়া ঠিক আমার দিকে ততো নজর দিতে পারে নাই। তবে অন্য অনেকের যা যা পাওনা ছিল ঠিকই পাইয়াছে; ক'জনের মাথা, হাত-পা ভাঙিয়াছে। আমি তো ভাবিয়াছিলাম আপনারা বুলেট দিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিবেন"।

—"ওহ্ বড় বাড়াইয়া বলিতেছেন! আপনাদের জন্য এ-ও কিছু করিতে পারি নাই আমরা? বলুন তো ইংরেজরা আপনাদের সত্যাগ্রহীদের সংগে আমরা যেভাবে ব্যবহার করিতেছি, তাহা হইতে অন্য কোনরকম কিছু করিত?"

পর্তুগীজদের মনের এইটা একটা দুর্বল বিন্দু; বিশেষ করিয়া গোয়ার পুলিস ও সরকারী কর্মচারীদের সকলের বিশ্বাস ইংরেজ আমলে তাহারা ভারতবর্ষের লোকেদের সংগে যেরূপ ব্যবহার করিত, পর্তুগীজদের ব্যবহার দেশবাসীদের সংগে তাহার চেয়ে অনেক ভালো। আর ইংরেজরা সত্যাগ্রহী ও রাজনৈতিক বন্দীদের বিরুদ্ধে যে ধরনের দমননীতি প্রয়োগ করিত বা মারধোর করিত গোয়াতে সেই তুলনায় তাহারা কিছুই করিতেছে না। এটা খালি প্রচারের জন্য নয়। পর্তুগীজরা কতকটা একথা বিশ্বাসও করে। নানান ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজদের প্রভাব পর্তুগীজদের উপর বেশী; ইংরেজদের সংগে তাহারা নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রুচি, ফ্যাশন সব কিছুর তুলনা করিতে ভালবাসে। খালি বৃটিশ পদ্ধতির পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের কথা উঠিলেই তাহারা একটু বিব্রত বোধ করে। যাহারা একটু খোলাখুলিভাবে কথা বলে, তাহারা বলে—"ডেমোক্রেসী আমাদের দেশের (অর্থাৎ পর্তুগালের) অবস্থার সংগে খাপ খায় না"; তাহারা অন্তত পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসীর শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে। অন্যেরা বলে আমাদের "ইস্তাদ নুভো" (সালাজারী শাসনব্যবস্থার সরকারী নাম) পার্লামেণ্টারী প্রথার চেয়ে অনেক ভালো। সাম্রাজ্য শাসনের আদর্শও তাহাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। সালাজার নিজে অবশ্য মনে করেন, এখন ইংরেজদের 'চারিত্রিক' অবনতি ঘটিয়াছে; পৃথিবীতে ইউরোপীয় খৃষ্টীয় সভ্যতার 'মিশন' ভুলিয়া সে নিজের সাম্রাজ্য ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে পিছু হটিয়া আসিতেছে এই চারিত্রিক অবনতির দরুণ। কিন্তু তবু সাধারণ পর্তুগীজ শিক্ষিত ভদ্রলোকরা ইংরেজরা কি করে বা না করে, তাহাদের অবস্থায় অতীতে কি করিয়াছে বা না করিয়াছে সকল সময় তাহার তুলনা দেয়। গোয়ার পর্তুগীজরা তো পদে পদে এই ধরনের তুলনা করিতে চায়; গোয়া ভারতের বুকে এবং এতদিন বৃটিশ রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায় ছিল বলিয়া এটা হইয়া থাকিবে।

আমার কাছে লোকটি হঠাৎ এ প্রশ্ন করিয়া বসিবে, তাহার জন্য তৈরী ছিলাম না; পর্তুগীজদের তুলনায় ইংরেজ আমলের পুলিস ভালো ছিল তাহাও বলা সংগত হইবে কিনা জানি না। আমি কথা এড়াইয়া উত্তর দিলাম—"Comparisons are odious" ("তুলনা করা ভালো নয়")।

কিন্তু সে ছাড়িবে কেন? আমার কাছে আসিয়া আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলঃ

"তুমি বোধ হয় মনে করিতেছ, আমি কিছু জানি না! আমি সব কিছু জানি। বোম্বাই, দিল্লী সব কিছু আমার দেখা আছে।" হঠাৎ বেশ ভালো হিন্দীতে দুবার জোরে জোরে বলিল—"ময় বম্বই থা! জানতে হো, ময় বম্বই থা! ময় সব কুছ দেখা, সব কুছ দেখা"। তারপর আবার ইংরাজীতে—"বিয়াল্লিশে (১৯৪২) কি হইয়াছে আমি সব জানি। ইংরেজদের রাজত্বে তোমরা এইভাবে বাহির হইতে আসিয়া গণ্ডগোল বাধাইতে চাহিলে ইংরেজরা তোমাদের 'লিঞ্চ' করিত। জানো 'লিঞ্চ' করিত (পোড়াইয়া মারিত; ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিত)। পণ্ডিত নেহরু খুব চালাক! তোমাদের উপর গুলী চালাই, আর তখন তিনি সেই অজুহাতে গোয়া কাড়িয়া লইবেন! আমি থাকিতে তাহা হইবে না!"

আমি উত্তরে বলিলাম—"আপনি ভুল করিতেছেন, পণ্ডিত নেহরু আমাদের পাঠান নাই। আমি পার্লিয়ামেণ্টে পণ্ডিত নেহরুর বিরোধী দলের লোক"।

—আমি ওসব চালাকি বুঝি। তোমাদের দেশে এত সমস্যা আছে, তোমাদের দেশে এত বেকারী, এত খাদ্যসংকট, এত গণ্ডগোল সেসব ফেলিয়া তোমরা গোয়াতে আসিতেছ কেন, আমি তাহা বুঝি না"?

ততক্ষণে লোকটি খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, পায়চারী থামাইয়া একটা চেয়ারে বসিয়া গম্ভীর কর্কশ গলায় চীৎকার করিয়া কথা বলিতেছে, টেবিল চাপড়াইতেছে। কিন্তু আমাকে মারধোর করিতে চায় বলিয়া বোধ হইতেছে না। অথচ মারধোর যদি করিতে চায়, তাহার আকার-প্রকার সাইজ দেখিয়া উপযুক্ত লোক বলিয়াই মনে

হইতেছে। কিবিংগীদের কিছুটা ফর্সা-ছুলুদে গোছের রং, কানের কাছে নামানো ল্যাটিন ধরনের জুল্‌ফি। মনে মনে চিন্তা করিতেছি লোকটা কে? ওয়াল্‌পই থানার অফিসার ইনচার্জ কি? অথচ কথাবার্তার ধরনে মনে হইতেছে একটু উঁচুদরের দায়িত্ব ও পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত লোক; কিন্তু বেশভূষা একেবারে গরীব লোফার ধরনের। আমি তখনো পর্যন্ত জানিতাম না, এই ব্যক্তিই কাসিমির মন্তেইরো; কাসিমির মন্তেইরো কে, তাহাও জানিতাম না।

অথচ গোয়ায় সালাজারী সাম্রাজ্য শাসনের নীতির স্বরূপ এবং কতকটা সালাজারী রাজনীতির আসল স্বরূপ বুঝিতে হইলে মন্তেইরোর পরিচয় কিছুটা দরকার। মন্তেইরোর কথা উপরে দু'একবার বলিয়া আসিয়াছি। লঞ্চে করিয়া টেরেখোল দুর্গের সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করার কাহিনী প্রসঙ্গে এবং ১৯৫৪ সালে গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে নির্বিকার দমননীতি প্রয়োগের অন্যতম নায়ক হিসাবে মন্তেইরোর নাম পাঠকদের কাছে করিয়াছি। মন্তেইরো এখন গোয়া পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা; 'Agente' (আজেন্ত) পদে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর-দের উপাধি ('Chefe' (শেফ); 'আজেন্ত' পদের মর্যাদা বা দায়িত্ব আইনত শেফদের চেয়ে বেশী কিনা জানি না। গোয়ায় পর্তুগীজ সরকারের ইংরেজী ইন্‌ফরমেশন বুলেটিনে মন্তেইরোর নাম ইন্সপেক্টর মন্তেইরো নামে উল্লিখিত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু পদমর্যাদা যাহাই হোক পুলিস হেড-কোয়ার্টারে 'পিদে'র অফিসেইরো ভিন্ন তাহার চেয়ে প্রতাপান্বিত কাহাকেও দেখি নাই। মন্তেইরো সম্পর্কে ক্রমে ক্রমে যখন জানিতে পারিলাম, তাহার ব্যক্তিগত ইতিহাস জানার একটা আগ্রহ আমার মনে জাগে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার গোয়া থাকার সময়ে এবং দেশে ফিরিয়া সম্ভবমত সকল জায়গায় খোঁজখবর করিয়া তাহার জীবনী সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। মন্তেইরো ১৯৫৪ সালের গোড়াতেও পুলিস অফিসার ছিল না; তখন সে কয়েকটা ম্যাংগানিজ খনি (গোয়াতে কিছু ম্যাংগানীজ ও লোহার খনি আছে) লীজ নিয়া ম্যাংগানীজ চালানের ব্যবসা করিতেছে এবং ম্যাংগানীজের বাজার দরে মন্দা পড়ায় আর্থিক দিক দিয়া কিছুটা দুরবস্থার মধ্যে আছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় দিত 'mineiro' (খনির মালিক, খনির কাজকর্মে নিযুক্ত লোক)। কয়েকটা ট্রাক তার ছিল; খনির ব্যবসা নষ্ট হইয়া যাওয়ার দিকে ভাড়ায় ট্রাক চালাইয়া নাকি ট্রান্সপোর্টের কাজ করিয়া কোনমতে দিন চালাইতেছিল। আগেই বলিয়া আসিয়াছি, পুলিস ইন্সপেক্টরের চাকরি কেন, সাধারণ পুলিস সার্জেন্টের চাকরি পর্যন্ত পর্তুগালের মধ্যবিত্ত ভদ্র-লোকদের কাছে লোভনীয় চাকরি। কিন্তু তাহার ওটার মধ্যে সামাজিক মর্যাদা কিম্বা শিক্ষাদীক্ষা মন্তেইরোর ছিল না। মন্তেইরো খাস পর্তুগীজ নয়, 'মিস্তো' বা মিশ্রিত পর্তুগীজ গোয়ানীজ; তাহার বাবা কি করিতেন কেহ বলিতে পারে না। তাহার মা গোয়াতেই থাকিতেন; কয়েক বছর আগে মারা গিয়াছেন।

১৯৫৩-৫৪ সালে গোয়াতে যখন নূতন করিয়া রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলন দেখা দিল, তাহাতেই মন্তেইরোর ভাগ্যের মোড় ফেরে। তখন গোয়ার ও পর্তুগীজ ভারতের পুলিস কমান্ডান্ট ক্যাপ্টেন বুম্বা নামে একজন লোক। জেনারেল পাউলো বেনার্দ গেদীস গভর্নর-জেনারেল হইয়া গোয়ায় আসার পূর্বে বুম্বা গোয়ার হর্তাকর্তা বিধাতা ছিল, একথা বলা যায়। বুম্বাও আর এক ভাগ্যানুসন্ধানী এ্যাডভেঞ্চারার। শোনা যায় পর্তুগাল হইতে ফ্রাঙ্কোর জন্য লড়াই করিতে যাহারা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে স্পেনে গিয়াছিল, বুম্বা তাহাদের মধ্যে একজন ছিল। মন্তেইরো কি করিয়া বুম্বার নজরে আসে বলা শক্ত; কিন্তু বুম্বাই যে তাহাকে প্রথমে পুলিসের এজেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডাঃ সালাজারের খাস পর্তুগালে এবং পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের সর্বত্র 'Union Nacionale' (জাতীয় ঐক্য সংহতি) নামে যে দল চলেন—পর্তুগীজ সাম্রাজ্যে এই একটি রাজনৈতিক দল, ভিন্ন অন্য সমস্ত দল বে-আইনী—বুম্বার পরামর্শে সে তাহাতেও যোগ দেয়। গোয়াতেও এই দলের শাখা আছে; মন্তেইরো তাহার স্থানীয় বিভাগে যোগ দেয়। ডাঃ প্রাদেশিক সেক্রেটারী যখন লিসবন হইতে আসিয়া ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ... পুনরুজ্জীবিত করার কথা চিন্তা করিতে থাকেন, তখন বুম্বা মন্তেইরোকে স্পাই হিসাবে পার্টি সেক্রেটারীর পিছনে লাগায়। মন্তেইরোর ইহার পিছনের ইতিহাসও কিছুটা আছে। যুদ্ধের সময় বোধ হয় ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় সে কিছু-দিন বোম্বাই শহরে পুলিসের সার্জেন্টের কাজ করে; তবে মন্তেইরো নামে কিনা তাহা বলা যায় না। ... করে সে বৃটিশের হইয়া ... সৈন্য হিসাবে গিয়াছিল এবং সেখানে লড়াই করিয়াছে; কিন্তু তাহা কোন সময় বা কি চাকুরি নিয়া তাহা বলা কঠিন। গুজব অবশ্যত গোয়াবাসী জাতীয়তাবাদীরা বলেন, মন্তেইরো কিছুদিন সংগ্রামে একটি ছোট কশাইখানার দোকান করিয়াছিল। সেকথা সত্য হইলে বম্বের গোয়েন্দা বিভাগ এবং গোয়ার পর্তুগীজ 'ইউনিয়াম নাশিও-নাল'-এর গুপ্ত বিভাগ যে উপযুক্ত লোক বাছাই করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মন্তেইরো যে ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ সে অনর্গল হিন্দী-হিন্দুস্থানী, ইংরেজী, মারাঠী ও কোংকনী ভাষায় কথা বলিতে পারে। (ক্রমশ)

বন্ধন

শান্তিকুমার মিত্র

কখন টিফিনের সময় হয়ে গিয়েছে। এক একটা টেবিলকে ঘিরে যেন মধুচক্র গড়ে উঠেছে। নবীন, প্রবীণ, বয়সের তারতম্য নেই—মুহূর্তের জন্য এ'রা যে কেরানী সে বোধটা মুছে গিয়েছে। কথার কি আর হিসেব নিকেশ আছে? হেন বিষয় নেই, যে প্রসঙ্গ উঠছে না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তার বেশী নয়। অনাবিল আনন্দ কাকে বলে, তা যদি জানতে চান হলফ করে বলতে পারি, সে রোদ-খাঁ-খাঁ দুপুরেই হোক, আর অবিরাম শ্রাবণ বর্ষণই হোক, দুপুরে ঐ আধঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট টিফিনের সময়ে যে কোনও অফিসে, ফার্মে চলে যান, একটা ধারণা পেয়ে যাবেন।

ডালহৌসী স্কোয়ারের খাস এলাকার বাইরে মিশন রোড-এ দেশী ইলেকট্রিক কোম্পানীর এই অফিসটা কৌলিন্যে হয়ত তেমন সমাদর পাবে না। তা না পাক, অফিসের ঠাট ঠমকের কিছু অভাব নেই; তেমনি যে সব 'মধুকর' শ্যামবাজার টালিগঞ্জ থেকে ট্রামে বাসে করে বেলা দশটায় হাজির হয়েছে, তাদের যা ভাবনা-চিন্তা, হাওড়া শিয়ালদহে সুবার্বন ট্রেনের ভিড় আর বিড়ম্বনার বেড়া পেরিয়ে যারা ছোট্ট খাবারের কৌটো আর ছাতা বগলে করে অফিসের বারোয়ারী সেউড়ি পেরিয়ে তিন তলার এই হল ঘরটায় এসে ঢুকেছে, তারাও এই কঘণ্টা সেই একই নৌকোর যাত্রী। টিফিনে এই নৌকোর পালে দমকা হাওয়া লাগে। এ হাওয়ার রং একটু আলাদা, ঢং ভিন্ন। খোলা হাওয়া। ফাইল পত্র চাপা পড়ে যায়। অবিনাশবাবু একটার পর একটা দোক্তা ভরা পান মুখে দেন আর অর্ধশতাব্দীকালের আগের গল্প বলেন, যেদিন তাঁদের আম-জামের বাগানের সিঁথির মত সরু পথটা ধরে পাল্কি করে দুল্কি চালে হেলে দুলে ছোকরাদের দিদিমা এসেছিল। রসিয়ে রসিয়ে বলেন, দু একটা ঠাট্টার শর ছুঁড়ে মারেন সদ্য বিবাহিত নরেন বা বলাইকে লক্ষ্য করে। বলাই-এর তরুণ মন, মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে। এক মুহূর্তের জন্যে মনেও পড়ে যায়, অতসী কি এখন তার রুমালটা সেলাই করছে?

এ-পিঠ ওপিঠ নয়। তবে এধার ওধার। ওধারে ডলি, রেবা, মঞ্জির দল। পারসোনল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আর স্টেনো টাইপিস্ট বাহিনী। রঙীন শাড়ী গাউন স্কার্ট—রঙের ছড়াছড়ি। গায়ে গা লাগিয়ে হাসিতে হুল্লোড়ে অবকাশ উপভোগ।

সুবিনয় যেন একটা বাক্স থেকে মুখ তুলে তাকায়। বিরাট অফিসের জরুরী চিঠির উত্তরটার খসড়া আধখানা হয়েছে। পেনটা নামিয়ে রাখে। অফিসারের ঠাটঠমক যেন এ ধারটায় এসে কিছু কৃপণ হয়ে পড়েছে। অফিসারদেরও আলাদা পার্টিশন করা কাচের কামরা নেই—তাদেরও ঐ হলঘরেই কাঠের রেলিং দিয়ে একটু ঘেরা মত জায়গা। এইখানেই সুবিনয়ের রাজত্ব। নরম গলায় হাসি ঠাট্টার গমক, কৃত্রিম মান অভিমান, তর্কবিতর্কের ঢেউ ভেসে আসে

ওধার থেকে: ভেসে আসে মিষ্টি কণ্ঠে মিষ্টি কথাবার্তা, রাগবিরাগের রহস্যময় অনুরণন। সুবিনয় মাঝখানে দ্বীপের মত। অফিসার সুবিনয়। একটু চা খেতে ইচ্ছে করে। হাঁকে বেয়ারাকে ডাকতে গিয়ে থেমে যায়। এই টেবিল-চেয়ারের মধ্যেও কাঠের রেলিংটায় মাথা ঠেকিয়ে ঘুমোচ্ছে মানিক। মুখে হাসি ফুটে [illegible] আর প্রশ্রয়ের হাসি। কপালটা [illegible] করছে। না হলে কপালটা টিপে টেবিলের উপর [illegible] রাখে। টেবিলের কাঁচটা বড় ঠাণ্ডা। ভাল লাগে, টেবিলের ভাবটা নেমে আসে: ঘুম ঘুম ভাব।

[illegible] এর নবীনা। সম্মিলিত [illegible] ঘরটা গম গম করে ওঠে। [illegible] হাসি হাসি মুখগুলো [illegible]। নবীনের মুখে হাসি [illegible] একটি [illegible] হয়েছে। কিন্তু [illegible] চলছে। [illegible] সংবাদটা পরিবেশন করেছে।

সুবিনয়ের মুখে হাসির মৃদু [illegible] ওঠে। কিন্তু কে জানে আরও [illegible] ছিল। সুবিনয় অফিসার—দূরের নয় কিন্তু তেমন কাছেরও নয়। কাঠের রেলিং-এর ভেতর বসে ভাবছিল, না দেখছিল। হঠাৎ চমকে উঠেছে সুবিনয়। দুটি কোমল কাজল শোভন চোখ তার প্রতি নিবদ্ধ। ছি, ছি, নিজেকে ধমক দেয়, মাথাটা নীচু হয়ে পড়ে। সামনে অসম্পূর্ণ চিঠির খসড়াটা পড়ে রয়েছে। অফিস হলটা যেন দুলছে: দুলছে আবেগে, আনন্দে, রোমাঞ্চে, ভাল লাগায়—কিছু লজ্জায়ও। নিরোধ জীবনে যেন বিপ্লব ঘটে গেল। মুগ্ধ শান্ত শোভন দুটো চোখের সব মায়া তার অফিসারের খোলস পেরিয়ে তার মনটাকে স্পর্শ করল নাকি? মাত্র কটা মুহূর্ত। অবিনাশবাবুর ডাকে সম্বিৎ ফিরে আসে। 'সুবিনয়বাবু আমরা একটা উৎসব করব ভাবছি।' কাঠের রেলিংটা ঠেলে অবিনাশবাবু ভিতরে আসেন—অফিসারের গণ্ডীর মধ্যে।

সুবিনয় মৃদুস্বরে বলে, বেশ ত!

'উঁহু, বেশ নয়, একেবারে না হোক সামান্য কিছু, আগে ছুটি চাই শনিবার—সকলের, এমনকি আপনারও।'

অবিনাশবাবু বেশ জোর দিয়েই বলেন। কিন্তু সুবিনয় যেন কি বলতে চায়; বলে না, [illegible] নাড়ে। [illegible] সম্মতি [illegible]।

অবিনাশবাবু বিজয়ীর মুখের ভাব নিয়ে মৌচাকে ফিরে যান। টিফিন শেষ হয়ে আসে। আবার কলম চলে, টাইপরাইটার খট খট করে ওঠে। খোদ জেনারেল ম্যানেজারের ঘর—এ অফিসের একমাত্র ঘেরা-কামরায় সুবিনয় কয়বার যাতায়াত করে। মাঝখানে মানিক এক পেয়ালা গরম কফি এনে রাখে। ডলি দিল্লীর অফিসের জরুরী চিঠির উত্তরটা টাইপ করে নিয়ে আসে। সুবিনয় মিলিয়ে দেখে ছোট্ট করে ডলিকে ধন্যবাদ দেয়—টানা সই করে। দায়িত্ব আর কর্তব্যের স্রোতে অফিসার সুবিনয় নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। অফিস ছুটি হয়ে যায়। একে একে সব ঘরে ফেরা মানুষ হলঘরটা ছেড়ে চলে যায়। সুবিনয় তখনও কাজ করে। মানিক গুম হয়ে বসে থাকে। কে বলবে ক'ঘণ্টা আগে এই সুবিনয়ই দুটো শান্ত শোভন চোখের মায়া ও ছায়া দেখে চমকে উঠেছিল, একটা আনন্দে রোমাঞ্চে কর্তব্যময় জীবনটা থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। কই সেই শান্ত শোভন চোখ দুটির মালিক যখন হলঘরের দরজা পার হতে হতে একবার থমকে দাঁড়াল, সুবিনয় তো সেদিকে চোখ ফেরায়নি। তাহলে সে চমক কি মিথ্যা?

'মানিক?'

খাস বেয়ারা অনিচ্ছায় এগিয়ে আসে, 'কি বলছেন?'

'অ্যাটেণ্ডান্স খাতাটা নিয়ে আয় ত।'

বাবুর আবার কি খেয়াল চাপল? তিক্ত-বিরক্ত মনে মানিক খাতাটা এনে হাজির করে। সুবিনয় দ্রুত হাতে পাতা উলটে চলে—টাইপ সেকসন, পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যাণ্টস, কনফিডেন্সিয়াল সেকসন। একটা নামের কাছে এসে চোখ দুটো স্থির হয়ে যায়—অনীতা চন্দ। মাত্র তিনদিন হল জয়েন করেছে। মনে পড়ে জেনারেল ম্যানেজার তাকেই ইণ্টারভিউ নিতে বলেছিলেন সপ্তাহ খানেক আগে। সে নিমরাজী হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জেনারেল ম্যানেজারই ইণ্টারভিউ নেন। অনীতা চন্দ—শান্ত শোভন চোখ দুটির অধিকারিণী অনীতা চন্দ। ত্রিশোর্ধ বয়সের অফিসার সুবিনয় অ্যাটেণ্ডান্সের খাতা দেখে। বাইরে শ্রাবণের ধারা বর্ষণ; ঠাণ্ডা বাতাস আসে। মানিকের মুখে বিরক্তির ভাবটা কেটে গিয়েছে। সে কেমন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, বাবুর জামাটায় অনেকখানি কালি লেগেছে, শার্টের কলারটা ছিঁড়ে এসেছে; কিন্তু মুখে যেন রাঙা গোধূলির আলো। পাঁচ সন্তানের পিতা মানিক এই মুহূর্তে সুবিনয়ের প্রতি অদ্ভুত আপত্যস্নেহ অনুভব করে। কোনওদিন যা সাহস করেনি, আজ তাই করে ফেলে, আরো কাছে এগিয়ে এসে বলে, রাত হল, উঠুন, আজ আর কাজ নয়। সুবিনয় প্রশ্রয়ের হাসি

সামনে ভেসে ওঠে—আজ দোক্তা কিনে নিয়ে যাব ঠিক। দোক্তা-পানে আজও নিবারণের মার ঠোঁট দুটো রাঙা হয়ে পড়ে—লাল টুকটুকে।

সুবিনয় সত্যই সেদিন রাত্রে আবৃত্তির বিচারক হতে গিয়েছিল। সভায় বিচারক-সভাপতিকে বরণ করে একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে অনামিকা ছুঁইয়ে তার কপালে শ্বেত চন্দনের টিপ এঁকে দিয়েছিল। সুবিনয়ের সারা দেহে মনে তখন রাজ্যের যত লজ্জা এসে জড় হয়েছে। লজ্জা কাটিয়ে যদি একটু চোখ তুলে তাকাত দেখতে পেত সেই শান্ত শোভন সুন্দর চোখের মেয়ে কি দুর্দান্ত আবেগে হাসি চাপবার চেষ্টা করছে; চোখে হাসি উপচে পড়ছে, আনন্দে জল এসে পড়ল বলে।

সুবিনয় কখন যে বিচার শেষ করে বাড়ি ফিরে এলো নিজেই বুঝতে পারে না। শুধু এইটুকু মনে আছে, সেদিন বাড়ি ফিরেই মাকে সামনে পেয়ে হঠাৎ খানিকটা আদর করে ফেলেছিল।

সুবিনয় দিনের পর দিন অফিসের রেলিং-ঘেরা নিজের সাম্রাজ্যে বসে সেদিনকার কথা ভাবে, আর আনন্দে শিহরিত হয়ে ওঠে। চোখ কোনও শাসন মানে না, বার বার সেই দিকটায় ছোটে, অনীতা চন্দ যেখানে বসে কনফিডেন্সিয়াল ফাইল ঘাটছে।

একদিন সব ভাললাগা হঠাৎ সুর হারিয়ে ফেলল। কনফিডেন্সিয়াল সেকশনের অনীতা চন্দ পর পর তিন দিন আসছে না। কোনও সিক রিপোর্ট'ও নেই, ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্তও আসেনি; এলে ছুটি-মঞ্জুরের জন্য তার টেবিলেই আসত। একটা চাপা উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় সুবিনয় বিচলিত হয়ে পড়ল—কাকে জিজ্ঞাসা করবে? ডলি, রেবা, মলির দলকে জিজ্ঞাসা করলে হয়ত কিছু কিনারা হতে পারে, কিন্তু কি ভাববে ওরা। মলি হয়ত একটু পরিহাসতরল হাসি হেসে মনে মনে বলবে, ডাউ টু, তুমিও?

সুবিনয় কোনও পথ খুঁজে পায় না। পুজোর পর প্রথম শীত নামছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। অফিসেও কেমন একটু মন্থরতা এসেছে। টিফিন আওয়ারটা তেমনি জমকালো, তবু সুবিনয়ের মনে হয়, কোথায় যেন চাপা উদ্বেগ জাগছে। আর ভাল হয় না। সন্ধ্যে হতে না হতে ফাইলপত্র গুটিয়ে সুবিনয় উঠে পড়ে। মানিক কেমন যেন মন-মরা। সুবিনয় আর গল্প করে না। কম খাটুনি হচ্ছে বলে মানিকের মনে আনন্দ হয় না। নিবারণের মার পান দোক্তায় রাঙা ঠোঁট দুটো দেখবার জন্য দুর্দান্ত লোভও হয় না। সময় অসময়ে সে কনফিডেন্সিয়াল সেকশনটা ঘুরে আসে; সে সেকশনের বেয়ারা জনার্দনের সঙ্গে খোশ আড্ডা জমায়, যদি কিছু খবর পাওয়া যায় অনীতা চন্দের। কিন্তু সব বৃথা। কোনও খবর আসে না। সুবিনয়ের জামায় অন্যায় কালি লাগে, টিফিনের মধুচক্রে গরহাজির হয়। ভাল লাগে না, ভাল লাগে না। বিংশোর্ধ্ব বয়সের পুরুষ সুবিনয় বসে বসে জরুরী চিঠির উত্তর লেখে।

প্রায় পক্ষকাল পর। সবে অফিস শুরু হয়েছে। অফিসার সুবিনয়ের চোখ দুটো উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে; ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপে অভিমানে, প্রগাঢ় অভিমান। অনীতা চন্দ কাঠের রেলিং-এর ভিতর এসে দাঁড়িয়েছে। নম্র আনতমুখী অনীতা চন্দ। সুবিনয় কিছু বলতে পারে না, বলতেও পারে না, চোখ তুলে তাকাতেই পারে না। শান্ত সুন্দর চোখে আজ একি নিদারুণ শঙ্কিত, ক্লান্তি। কোথায় গেল সেই শোভনতা, সেই শান্তি, যা কেবল মনকে আকর্ষণই করে না, পূর্ণ করে, সম্পদ করে; যে চোখ দুটিতে ঐশ্বর্যের আলোক।

'সুবিনয়বাবু' যেন অনেক দূর থেকে কথা বলে অনীতা চন্দ। তারপর হঠাৎ সামনে হয়ে পড়ে, ছোট্ট হ্যাণ্ডব্যাগটা খুলে একটা চিঠি বার, ওপরে সুবিনয়ের নাম লেখা—টেবিলটায় রেখে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে কাঠের রেলিং ঘেরা জায়গাটা পার হয়ে একেবারে হলঘরের দরজার দিকে চলে যায়। চমকে ওঠে সুবিনয়। ব্যথা কান্নায় ভরা চোখ দুটো তুলে দরজার দিকে তাকায়—অনীতা। অস্ফুটস্বরে এই প্রথম সে অনীতার নাম উচ্চারণ করে। অফিসার সুবিনয়। ডলি একটা চিঠি সই করাতে এসে বিস্মিত হয়ে ফিরে যায়। হতাশায় মুহ্যমান হয়ে ড্রয়ারটার খোলা পাতায় মুখ ঢাকে সুবিনয়। ক' মিনিট কাটে। সুবিনয় মাথা তোলে—টেবিলে সামনে তার নাম লেখা মুখ আঁটা খামটা রয়েছে। আস্তে আস্তে তুলে নেয়, মুখে হাসি ফুটি ফুটি করে, যেন ক্ষণিক বর্ষার পর বিকেলের দিকে রোদের একটু আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

খামের মুখটা ছিঁড়তেই টুপ করে একটা রঙীন কার্ড বেরিয়ে পড়ে। সুবিনয়ের চোখে অনুসন্ধিৎসা, বিশ্বাস পড়ে না—শ্রীমতী অনীতা চন্দের শুভ পরিণয়......। হাতটা কেঁপে ওঠে। চোখ কান দিয়ে যেন লাভাস্রোত বেরুচ্ছে। কপালটা টন টন করছে। বিস্ময়, না হতাশা? আঘাত, না নির্বুদ্ধিতার গ্লানি? সুবিনয়ই ঠিক জানে না। অন্যমনস্কভাবে খামটা নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে আর এক টুকরো কাগজ বেরিয়ে পড়ে। ছোট্ট কাগজের টুকরো, চিঠির প্যাড ছেঁড়া চিরকুট একটা। অসীম কৌতূহল আর আগ্রহে সুবিনয় ভাঁজ খোলে; কিন্তু এ কি! কি এর অর্থ? গোটা গোটা অক্ষরে এ কি লেখা! সেদিন বলাবার মতই এও দুটি কথা—কিন্তু কি নিদারুণ!

চিঠির প্যাড ছেঁড়া কাগজে দুটি কথা—আপনি মহৎ। মহৎ, মহৎ, মহৎ। সুবিনয়ের মাথায় যেন স্টিমরোলার চলে, তার প্রতি ঘর্ষণে কেবল এই আওয়াজ উঠছে 'মহৎ, মহৎ, মহৎ'। শান্ত শোভন সুন্দর চোখের মেয়ে অনীতা চন্দ কেবল তার মহত্ত্ব দেখল। সুবিনয়, অফিসার সুবিনয় তার কাঠের রেলিং-ঘেরা সাম্রাজ্যে আপন কুশন-আঁটা চেয়ারে বসে যেন কেঁদে ফেলে। ব্যথা মোচড় দিয়ে যায়। বাধা মানে না, সংযম মানে না। বড় ড্রয়ারটার খোলা পাতায় মুখ গুঁজে অফিসার সুবিনয় কাঁদে—সারা শরীরটা অবসাদে যেন অসার। হিসেবের আঁকিবুকির উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে—দু ফোঁটা জল। টন হন্দর মিটার কিলোমিটার অস্পষ্ট হয়ে যায়। অফিসার সুবিনয় কাঁদে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে মলি একটা ফাইল নিতে এসেছিল, আস্তে আস্তে ফিরে যায়। পাউডার ঘষা মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। রেবা উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। মলি তার স্বভাবসিদ্ধ চাপল্য হারিয়ে অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, 'কিছু না। সুবিনয়বাবু কাঁদছে।'

পুস্তক পরিচয়

কবিতা

সংকলিতা—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম—৪৲।

একশত তিয়াত্তর পৃষ্ঠায় অনেকগুলো কবিতা ও গানের সমষ্টি। রচনাকাল ১৯৩২ থেকে ১৯৫৬ সাল। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে কবি কাব্য রচনায় যে অনুশীলন করেছেন, তার স্পষ্ট স্বাক্ষর আছে এ-কাব্যগ্রন্থে। ছন্দ-লালিত্যে, শব্দচয়নে প্রতিটি কবিতা সুন্দর। বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও বিচিত্র মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন লেখক। তবে একটা কথা, সমগ্র কাব্যগ্রন্থ থেকে তাঁর নিজের কোনো আদর্শ বা বিশ্বাসকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে তাঁকে সৎকবি বলতে পারি, কিন্তু অন্যান্য অনেক ভালো কবি থেকে তাঁকে ভিন্নভাবে চিনে নিতে পারি না। রচনাভঙ্গিতে তিনি প্রাচীনতাপন্থী, তাতে আপত্তি নেই। তবে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে একা-একা গান গাওয়ার দিন শেষ হয় গত হয়েছে। চারপাশের পৃথিবীকে খোলা চোখে দেখে নিলে এই কবিই হয়তো বাংলা কাব্যে একটি নতুন দিকনির্দেশ দিতে পারতেন। ২১৬।৫৭

সীমান্তে—পরেশনাথ সান্যাল। সায়ন্তনী, পোঃ শক্তিনগর, নদীয়া। দু টাকা।

এ-কালের যাঁরা কাব্যপাঠক, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সান্যালের কবিতার সঙ্গে, অনুমান করি, তাঁদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ নয়। না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তার কারণ, যদিও তিনি শক্তিমান কবি, তাঁর কাব্যসাধনার ধারাটি কখনো নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। মাঝে মাঝেই তাতে ছেদ ঘটেছে। মুশকিল এই যে, পাঠকসমাজের স্মরণশক্তি বড় দুর্বল। তাঁদের স্মৃতিতে যাঁরা জাগরূক থাকতে চান, শুধু ভাল লিখলেই তাঁদের চলে না, ক্রমাগত লিখতে হয়। কথাটা তিক্ত শোনাতে পারে, তবু বলাই ভাল যে, ভাল না লিখলেও হয়ত চলে, কিন্তু ক্রমাগত না লিখলে চলে না। পাঠকসমাজের সৌভাগ্য, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক একদা তাঁদের হাতে সত্যিকারের কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা তুলে দিয়েছিলেন। লেখকের দুর্ভাগ্য, ক্রমাগত তিনি লিখতে পারেননি। ফলত, পাঠকরা তাঁকে অক্লেশে ভুলতে পেরেছে।

অনেক কাল বাদে তাঁর এই কবিতার বই প্রকাশিত হল। বইখানি নূতন, কিন্তু কবিতাগুলি নূতন নয়। আজ থেকে প্রায় বছর পনর আগে এগুলি রচিত হয়েছে। বছর পনর আগে, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছে এবং দেশ-কাল-পাত্রের অবস্থা যখন মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। "সীমান্তে"র প্রধান সার্থকতা এই যে, এর কবিতাগুচ্ছ সেই অসুস্থ, অস্বাভাবিক, বিকারগ্রস্ত সময়টিকেই খুব স্পষ্ট-ভাবে আবার স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেকে হয়ত আজ সেই অধ্যায়টিকে ভুলতে পারলেই বাঁচেন। "সীমান্তে"র একাধিক কবিতা পড়ে তাঁরা যে অতিশয় অস্বস্তি বোধ করবেন, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মানবতার বিচ্যুতিগুলিকেও মাঝে মাঝে স্মরণ করা প্রয়োজন। তাতে করে, আর কিছু না হক, অকারণে অতিরিক্ত আশাবাদী হয়ে উঠবার হাত থেকে অন্তত রেহাই পাওয়া যায়। "সীমান্তে"র কবিকে তাঁরা অবশ্যই সাধুবাদ জানাবেন।

এ যা বললাম, এর থেকে মনে হতে পারে, এ-বইয়ের কবিতাগুলি বোধহয় বিষয়নির্ভর। বিষয়বস্তু যে অনেক জায়গাতেই খুব উগ্র এবং নগ্ন চেহারায় দেখা দিয়েছে, সে-কথা অস্বীকার করব না; কিন্তু মাঝে মাঝে এমন অপরূপের সৃষ্টি হয়, আপন বক্তব্যকে যখন ঢেকে-ঢুকে কিংবা খুব মোলায়েম করে বলা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সকলেই আশা করি স্বীকার করবেন যে, আজ থেকে বছর পনর-কুড়ি আগে সেই রকমের একটা অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সান্যালের মনের ভঙ্গিটি আসলে রোমান্টিক। কালদুর্যোগে সেই রোমান্টিক কবিকেও স্পষ্টবক্তার ভূমিকা নিতে হয়েছে। না নিয়ে উপায় ছিল না।

"সীমান্তে" পড়ে আমরা খুশী হয়েছি। আরও খুশী হব যদি দেখতে পাই যে, কবির পরবর্তী বইয়ে তাঁর রোমান্টিক মনের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে। অনুমান করি, মনুভবণেই তাঁর চিত্ত আরও স্ফূর্তি লাভ করবে। ২৯১।৫৭

পাথেয়—শ্রীস্নেহলতা দেবী, ভারতী। শ্রীবিদ্যা পাবলিশিং হাউস, রঘুনাথপুর, পোঃ বাঁড়িশা, কলিকাতা-৮।

আলোচ্য পুস্তকখানি লেখিকার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মনের কোণে' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লেখিকা কাব্য-জগতে যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন 'পাথেয়' প্রকাশে তাঁহার সেই কবি-খ্যাতি সম্যকরূপে পরিস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে।

কবিতাগুলির বিষয়বস্তু নির্বাচনেও লেখিকার বৈচিত্র্য-প্রীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রাণের অন্তস্তল হইতে উৎসৃত ভাব-গাম্ভীর্য যে লেখিকার মর্মস্পর্শী ছন্দের মাধ্যমে সহজ ও সাবলীল ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে, বর্তমান গ্রন্থের 'বঙ্গ-বিধবা', 'রবীন্দ্র প্রণাম', 'সোনার বাংলা', 'চাষী ভাই' প্রভৃতি কবিতা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গ্রন্থখানি সর্ব-স্তরের এবং সকল শ্রেণীর পাঠক পাঠিকার মন আনন্দে ভরপুর করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করি। ২২৬।৫৭

ছোট গল্প

জীবন যৌবন—শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক: সাহিত্য ভবন, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯। দাম—২৲।

ছোট গল্প রচনায় শান্তিরঞ্জনের পাকা হাতের পরিচয় ইতিপূর্বে বাংলা দেশের পাঠকেরা পেয়েছেন। লেখক তাঁর স্বাভাবিক মানসিকতা অনুযায়ীই তাঁর রচনার বিষয়বস্তু বেছে নিয়েছেন সমাজের একেবারে নিচুতলা থেকে। কিন্তু উপর মহলের ভদ্রলোকের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে তিনি সেই নিচুতলার মানুষদের দেখেননি। তাদের পরিচয় পেয়েছেন তিনি একেবারে তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে। ফলে মিথ্যা কল্পনার আশ্রয় করে মনগড়া কাহিনী রচনা করেননি তিনি। ছোট ছোট পরিধিতে ব্যথা-বেদনাও ছোটখাট কিন্তু তাদের জীবনের পক্ষে এই যে এক-এক সময় কত বড় হয়ে দেখা দেয়, তা আমরা সব সময় খবর রাখি না। বিশেষ করে অপত্যস্নেহের সঙ্গে অন্নের প্রশ্ন যদি জড়িত থাকে, তবে তা পরম নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে মুহূর্তেই। মাতৃস্নেহের মহিমময়ী রূপকে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায়ই খুঁজে পাওয়া যাবে; এমন কি বস্তীর ঝুপড়ি ঘরেও তার সন্ধান মেলে।

"এক ইউনিট" ভেঙে দিয়ে চার বা ততোধিক প্রদেশে বিভক্ত করে পশ্চিম পাকিস্থানকে একটি সাব-ফেডারেশনরূপে পুনর্গঠিত করার পক্ষে মত প্রকাশ করে এবং পাকিস্থান গবর্নমেন্টকে সেই মত পাকিস্থান ন্যাশনাল অ্যাসেম্ব্লির গোচরে আনার নির্দেশ দিয়ে গত ১৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাকিস্থান আইন পরিষদ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। ১৭০ জন সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে এবং মাত্র চারজন বিপক্ষে ভোট দেন। রিপাবলিকান পার্টি (যাদের হাতে মন্ত্রিত্ব) এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি একমত হওয়াতেই এরূপ হয়। যদিও তিনজন রিপাবলিকান পার্টির সদস্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। বাকী একটি বিরুদ্ধ ভোট একজন স্বতন্ত্র সদস্য দেন। মুসলিম লীগভুক্ত সদস্যগণ কোনো দিকেই ভোট দেন নি। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্থানের জনমত বলতে "এক ইউনিটের" পক্ষে একরকম কিছুই নেই বলা যেতে পারে। যেরকম গুন্ডামি ও রাজনৈতিক কারসাজি ও ষড়যন্ত্রের ভিতর দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে "এক ইউনিট" করার ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে এই পরিণাম মোটেই বিস্ময়কর নয়। জন্ম থেকে কারুই যে কেউ যদি পারে "এক ইউনিটের" কাজ ভালো করে চলত তাহলেও ফলের মত কিছুটা দিতে পারত কিন্তু তাও হয়নি। সুতরাং গোড়ায় গলদ থেকেই গেছে।

পশ্চিম পাকিস্থানের বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করে "এক ইউনিট" করা হয়। সিন্ধীদের প্রকৃত মুখপাত্ররা প্রায় সকলেই এর বিপক্ষে ছিলেন। তাঁরা খান আবদুল গফফর খানের নেতৃত্বে "এক ইউনিটের" বিরুদ্ধে লড়ে আসছেন, কোনো নির্যাতনই তাঁদের নিরস্ত করতে পারে নি। এখন আর সন্দেহ নেই যে "এক ইউনিটের" আয়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু একেবারে শেষ হবার আগে কিছু ঝামেলা আছে দেখা যাচ্ছে। কারণ ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এবং প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী পৃথক পৃথক বিবৃতি দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান আইন পরিষদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জিগির তুলেছেন। প্রেসিডেন্ট মির্জা বলেছেন যে এই সময়ে—পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে যেটা আগামী বৎসর হবার কথা—"এক ইউনিট" বন্ধ পশ্চিম পাকিস্তানকে খন্ড খন্ড করে দিয়ে পাকিস্তানের কনস্টিটিউশনের গায়ে হাত দেওয়া চলবে না। মিঃ সুরাবর্দীরও সেই কথা। তিনি বলেছেন, সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থায় স্থিতিশীলতা আসবে না। ১৯৫৮ সালে সাধারণ নির্বাচন হবে বলে স্থির হয়েছে কিন্তু "এক ইউনিট" ব্যবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তান আইন পরিষদ যে প্রস্তাব করেছেন সেটা কার্যে পরিণত করতে গেলে ১৯৫৮ সালে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করা যাবে না। অতএব এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করা যায় না।

এই আপত্তির দ্বারা "এক ইউনিটকে" রক্ষা করা যাবে বলে মনে হয় না। কনস্টিটিউশনের যে-সংস্কারের দাবী করা হয়েছে সেটা মানতে হলে সাধারণ নির্বাচন বিলম্বিত হবেই, এমন কথা বলা যায় না। আর যদি এই ওজর টিঁকেও যায় ("এক ইউনিটের" বিরোধী দলগুলিও, বিশেষ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি যথাসম্ভব শীঘ্র সাধারণ নির্বাচন চায়, সুতরাং যদি দেখা যায় যে এই বিতর্কের দরুণ গবর্নমেন্ট সাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে দেবার তালে

আছেন তাহলে হয়ত সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত প্রস্তাবটিকে কার্যে পরিণত করার দাবী স্থগিত রাখতে তারা রাজি হতেও পারে) তাহলেও সাধারণ নির্বাচনের পরে আর "এক ইউনিট" থাকবে না। কারণ সাধারণ নির্বাচন যদি হয় তাহলে তাতে "এক ইউনিট" একটি প্রধান "ইস্যু" হবেই এবং ইলেকশন যদি মোটামুটি "ফ্রি" ইলেকশন হয় তবে "এক ইউনিটের" বিরোধীরা জয়ী হবেই।

যাই হোক ততদিন পর্যন্ত ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দিয়ে রাখা যাবে বলে মনে হয় না। কারণ, তার আগেই অন্যদিক দিয়ে গোল বাধবে। পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান রিপাবলিকান পার্টির মন্ত্রিত্ব ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। এই সমর্থনের শর্ত হচ্ছে এই যে, রিপাবলিকান পার্টি "এক ইউনিটের" বিরোধিতায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সহযোগিতা করবে। ওদিকে কেন্দ্রে যে কোয়ালিশন চলছে তাতে রিপাবলিকান পার্টি দলে ভারী। রিপাবলিকান পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে "এক ইউনিটের" বিরোধ করছে আর কেন্দ্রে অন্য সুর গাইছে এরূপ অদ্ভুত অবস্থা চলতে পারে কি? ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মুখ থেকে পরস্পরবিরোধী কথা বেরুতে আরম্ভ করেছে।

রিপাবলিকান পার্টির কাছে সুরাবর্দী সাহেবের প্রধানমন্ত্রিত্ব খুব সুখকর নয়। সুরাবর্দী সাহেবও রিপাবলিকান পার্টির উপর সুখী নন। সুরাবর্দী সাহেব যখন বিরোধী ছিলেন তখন তাঁর মতের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানে "প্রেসিডেন্টের শাসন" জারি করে রিপাবলিকান পার্টিকে পুনরায় মন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়। এটা মির্জা-সুরাবর্দী দ্বন্দ্বের ফল বলে লোকের ধারণা হয়, কারণ ব্যাপারটিতে রিপাবলিকান পার্টি গঠনের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট মির্জার হাত ছিল এবং রিপাবলিকান পার্টি তাঁর হাতের যন্ত্র অনেকের এই বিশ্বাস ছিল। বর্তমানে বিরোধী মিঃ সুরাবর্দী ও প্রেসিডেন্ট একপক্ষ হয়েছেন দেখা যাচ্ছে এবং রিপাবলিকান পার্টির উপর প্রেসিডেন্ট মির্জার প্রভাব সম্বন্ধেও সন্দেহের উদয় হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদে "এক ইউনিট" বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপিত হবার পূর্বেই প্রেসিডেন্ট মির্জা নিশ্চয়ই জানতেন যে, রিপাবলিকান পার্টি এই প্রস্তাবের সমর্থন করবে এবং ভোট দেবে। রিপাবলিকান পার্টি তাঁর কথা শুনে যদি কাজ করত তাহলে "এক ইউনিট" বিরোধী প্রস্তাব তারা সমর্থন করত কি? অথবা, প্রেসিডেন্ট মির্জা কি ইচ্ছা করেই রিপাবলিকান পার্টিকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সঙ্গে শর্তবদ্ধ হতে বাধা দেন নি? আর তার কারণ কি এই যে তা নইলে অর্থাৎ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সমর্থন না পেলে রিপাবলিকান পার্টির মন্ত্রিত্ব থাকে না আর রিপাবলিকান পার্টির মন্ত্রিত্ব যদি পরিচ্যুত হয় তবে তাতে প্রেসিডেন্ট মির্জার লাভ থাকে না? তাই যদি হয় থাকে তবে হয়ত প্রেসিডেন্ট মির্জার এই আশা ছিল ও আছে যে, পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেলেও সেটিকে অকেজো করে দিতে তিনি পারবেন। কিন্তু ব্যাপারটা তত সহজ নয়।

এই সময়ে সুরাবর্দী সাহেবের সুবিধা হত যদি তিনি রিপাবলিকান পার্টিকে বাদ দিয়ে কেন্দ্রে অন্য দল দিয়ে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিত্ব গঠন করতে পারতেন। কিন্তু তার সম্ভাবনা অল্প। পাকিস্তান আসেমব্লির পূর্ববঙ্গীয় সদস্যদের মধ্যে নতুন করে কাউকেও দলে ভিড়াতে পারার আশা নেই। পূর্ববঙ্গেই সুরাবর্দী চালিত আওয়ামী লীগের মন্ত্রিত্ব রাখা দায় হয়ে উঠেছে। আওয়ামী দলের ভাঙনের পরে কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে দলে টানার চেষ্টা হয়েছিল। কৃষক-শ্রমিক পার্টির মধ্যে ভাঙা-ভাঙি হয়ে একদিক আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনে যোগ দেবে এমন সম্ভাবনাও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা আবার নষ্ট হয়ে গেছে। এখন কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগ-পরিত্যাগকারীরা (যাঁরা বর্তমানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিভুক্ত হয়েছেন) একযোগে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের বিরোধিতা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কৃষক-শ্রমিক পার্টির এবং রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টাও হচ্ছে জানা যায়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে একটা সমঝোতা হয়ে গিয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে [illegible] কৃষক-শ্রমিক পার্টি কেন্দ্রে [illegible] এরই ইঙ্গিতপূর্ণ অবশেষে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে ক্রমশ [illegible] সুরাবর্দী সরকারের বিরোধী হিসাবে সহযোগিতা গড়ে উঠছে।

রিপাবলিকান পার্টিকে হটিয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে দোস্তি করার চেষ্টা সুরাবর্দী সাহেব করবেন [illegible] সুরাবর্দী সাহেব [illegible] না করবেন [illegible] যদি [illegible] সুযোগ দেখা যায়। কিন্তু মুসলিম লীগকে তিনি কিভাবে [illegible] দেখাবেন? রিপাবলিকান [illegible] বাদ দিয়ে কেন্দ্রে মুসলিম লীগকে নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিত্ব ঠেকানো সম্ভব নয়। পশ্চিম পাকিস্তানেও রিপাবলিকান পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সংযুক্ত বিরোধিতার সম্মুখে মুসলিম লীগকে টিকে থাকার কথা উঠেই না। তাছাড়া মুসলিম লীগ যদি এই সময়ে রিপাবলিকান পার্টির জায়গায় সুরাবর্দীর কোয়ালিশনে যোগ দেয় তবে সেটা "এক ইউনিটের" সমর্থন বলে গণ্য হবে।

মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানে এক রকম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, "এক ইউনিটের" পক্ষে দাঁড়ালে আগামী সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং মুসলিম লীগ এই সময়ে তাল থেকে নেমে আসবে কিসের জন্য? মুসলিম লীগ পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদে বিরোধীদল হয়েও "এক ইউনিটের" পক্ষে ভোট দিয়ে কি খারাপ হয়ে গেছে?

১০.৯.৫৭

বিশ্বসম্মানিতের সম্বর্ধনা

২০শে আগস্ট তারিখে সত্যজিৎ রায় যখন ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানের জন্য দমদম থেকে বিমান চড়তে যান তখন নিকট আত্মীয় কয়েকজন মাত্র ছাড়া কেউ উপস্থিত হননি তাঁকে শুভযাত্রা জানাতে। ঠিক তার এক মাস পর ২১শে সেপ্টেম্বর সত্যজিৎ রায়কে আবার দেখা গেল সেই দমদম বিমান-ঘাঁটিতেই; তবে এবার তিনি ভেনিস ফেরতা নামছেন বিমান থেকে এবং কর্মীদের থেকে নূতন দেখা হওয়া মাত্র শত শত লোকের উল্লাস তাঁকে উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনায় বরণ করে নিল। দৃশ্যের এই পরিবর্তনের হেতু ভেনিসের চলচ্চিত্র-উৎসবে "অপরাজিত"র শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার লাভ। রাশি রাশি ফুলের মালা আর স্তবক এবং জয়ধ্বনিতে সত্যজিৎ অভিভূত হয়ে পড়েন। প্রথম মালাটি পরিয়ে দেয় সত্যজিৎ রায়ের পাঁচ বছরের ছেলে, তারপর দেশ - আনন্দবাজার - হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের পক্ষে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে, তারপর এক এক করে অনেকে। বিমান এসে পৌঁছবার কথা ছিল সকাল সাড়ে সাতটায়, [illegible] এসে পৌঁছল ছ ঘণ্টা দেরীতে। সকলে বিমানের এই দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে [illegible] হয়ে, তবুও সম্বর্ধনায় অভিভূত হবার মতো ভীড় ছিল। উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে তিনি জানান, "অপরাজিত" যে পুরস্কার লাভ করবে একথা তিনি আশা করতে পারেন নি। ছবিখানি ইতালীর জনসাধারণ এবং [illegible] নির্বিশেষে সংবাদপত্রগুলোর উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। তবে বেশী প্রশংসা লাভ করে সর্বজয়া চরিত্রে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়। অনেকে ছবিখানি দেখে এতো অভিভূত হয়ে পড়েন যে, ছবি-খানির নাম "দি মাদার" হওয়াই ঠিক ছিল বলে মন্তব্য করেন। এতে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, "অপরাজিত" কোন পুরস্কার না পাক, অভিনয়ের জন্য করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই পুরস্কার লাভ করবেন। তাই প্রথম যখন ইতালীর এক [illegible] পরিবেশক তাঁকে চুপি চুপি জানিয়ে দেন যে, "অপরাজিত" বিচারকদের মতে শ্রেষ্ঠ ছবি বলে নির্বাচিত হয়েছে, তখন তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। পরে খবরটি সত্যি বলে যখন প্রতীয়মান হলো, সে সময়কার তাঁর মনের অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। ইতালীর লোকে অপুর ওপর এতটা দরদী হয়ে ওঠে যে, অপুর পরবর্তী জীবন নিয়ে একখানি ছবি তোলার জন্য সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। সত্যজিৎ রায় এই পর্যায়ের তৃতীয়

—শৌভিক—

ছবি তোলার সিদ্ধান্তও করেছেন; তার নাম রেখেছেন "অপুর সংসার"।

* * *

কলকাতায় পৌঁছবার পরদিনই ছাত্র পরিষদ থেকে সত্যজিৎ রায়কে সম্বর্ধনা জানানো হয়। শিক্ষায়তনগুলি পূজার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে বলে ছাত্রেরা কয়েকদিন আগেই সম্বর্ধনা জানাবেন বলে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু সত্যজিৎ রায় এসে না পৌঁছানয় ছুটি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা অনুষ্ঠানটিকে সম্ভব করে তোলেন। সম্বর্ধনার উত্তরে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রকে একটি চারু শিল্প বলে গণ্য করবার জন্য বলেন এবং বলেন, "অপরাজিত"র সাফল্য তাঁর একার কৃতিত্বে হয়নি, সেজন্য তাঁর সকল সহকর্মীরও সমান অংশ রয়েছে। পরদিন রঞ্জি স্টেডিয়ামে তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনায় সম্বর্ধিত করা হয়। কার্ড দ্বারা প্রবেশ নির্দিষ্ট হলেও কয়েক সহস্র সংখ্যায় গুণগ্রাহীর সমাগম হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি হন শেরিফ শ্রী এস সি রায়। আনন্দবাজার সম্পাদক ও লোকসভার সদস্য শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য নাগরিকদের পক্ষ থেকে সত্যজিৎ রায়কে মাল্যদান করার পর বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে সত্যজিৎ রায়কে মাল্যভূষিত করা হয়। চলচ্চিত্রের কোন সেবক এমনভাবে এর আগে সম্বর্ধনা লাভ করেন নি। পরিচালক দেবকীকুমার বসু তাই অভিভূত হয়ে বলেন, বিশ-তিরিশ বছর আগে সিনেমাতে কেউ কাজ করলে তাকে কুলাঙ্গার বলে অভিহিত করা হতো, কিন্তু আজ তাকে কুলপ্রদীপ বলে সম্মান জানানো হচ্ছে। ডাঃ কালিদাস নাগ যে নির্বাচক-মণ্ডলী "অপরাজিত" রাষ্ট্রীয় সম্মানের অনুপযোগী বলে সিদ্ধান্ত করেন, ডাঃ নাগ তারই একজন সদস্য ছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের পিতা সুকুমার রায় এবং পিতামহ উপেন্দ্র-কিশোর রায়ের প্রতিভার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, পিতৃবন্ধু হিসেবে সত্যজিৎ রায়কে আশীর্বাদ জানান। সভাপতি শ্রী এস সি রায় বলেন, সত্যজিৎ রায় বিদেশে ভারতের গৌরব বাড়িয়েছেন। লোকসভার সদস্য হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার কথা এবং সেই সঙ্গে বিভূতিভূষণের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে সত্যজিৎ রায় ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ সম্মান সমানভাবেই তাঁর সহকর্মীদের প্রাপ্য। বলে তিনি "অপরাজিত"র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপস্থিত কর্মী ও শিল্পীদের মঞ্চে উপস্থিত করে পরিচয় করিয়ে দেন। (এ ব্যাপারে রাজ-কাপুরের সঙ্গে তফাৎ লক্ষ্য করার বিষয়। কাগজে প্রাপ্ত বিবরণাদিতে দেখা যাচ্ছে, "একদিন রাত্রে" কার্লোভিভারিতে পুরস্কৃত হওয়ায় বম্বেতে তাঁকে যে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে সে সকল অনুষ্ঠানে তিনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন ছবিখানি সম্মানিত হওয়ার দরুণ যাবতীয় কৃতিত্ব তাঁর একারই। কাহিনী পরিকল্পয়িতা, চিত্রনাট্য রচয়িতা ও পরি-চালকদ্বয়, শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের যেন তেমন কোন কৃতিত্বই ছিল না। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, "একদিন রাত্রে" কলকাতায় মুক্তিলাভ করবার দিন সংবাদপত্রে এক মধ্যাহ্ন-ভোজে রাজ কাপুরই জানিয়েছিলেন যে, ছবিখানিতে তাঁর কোন কৃতিত্ব নেই, ভাল মন্দ যা কিছুর দায়িত্ব পরিচালকদ্বয়ের। পরে একটি চিত্রপত্রে দর্শকদের সম্পর্কেও তিনি ঐ কথাই পুনরাবৃত্তি করেন। "জাগতে রহো" জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় এক চিত্রপত্রে পরিচয় দিয়েছিলেন রাজ কাপুর যে, ছবিখানিতে তাঁর কিছু করবার ছিল না। অথচ প্রাইজ লাভ করবার পর এমন সৌজন্যবোধও তাঁর হলো না যে, ছবিখানির

জন্য যাঁরা দায়ী বলে তিনি নিজেও ঘোষণা করে বেড়িয়েছেন বরাবর, তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে একখানি চিঠিও লেখেন।) নাগরিক সম্বর্ধনার পর ২৬শে তারিখে ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘের পক্ষ থেকে সত্যজিৎ রায় ও তাঁর সহকর্মীদের উদ্দেশে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। অভিনন্দনের উত্তরে সত্যজিৎ রায় বলেন, সমালোচনার মান উঁচু হলে ছবির মানও বাড়ে। "অপরাজিত" কতককে খুশী করেছে, অনেককে করেনি, কিন্তু ছবিখানি নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, এইটেই বড়ো কথা। তিনি বলেন, এক চ্যাপলিন ছাড়া আর কেউ নেই যার ছবি সকলকেই খুশী করতে পারে। "অপরাজিত" গ্রন্থের অনেক কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে বলে যে অনুযোগ তোলা হয়েছে তার উত্তর প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় বলেন, যাঁরা একথা তুলেছেন তাঁরা বইয়ের প্লটের দিকটাই দেখেছেন, রচনার অন্তর্দেশের কোন বস্তু তিনি বাদ দেননি। সমালোচকদের উদ্দেশে তিনি বলেন যে, আলোকচিত্র, শব্দগ্রহণ, সংগীত, শিল্প-নির্দেশনা প্রভৃতি ছবি তৈরীর নানা দিকগুলি তাঁদের যদি জানা থাকে তাহলে ছবির নানাদিকের দোষ গুণগুলি তাঁরা ভালভাবে দেখিয়ে দিতে পারেন, তাতে চিত্রনির্মাতার সুবিধে হয়।

● ● ●

চলচ্চিত্রে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করে ভারতের গৌরব বাড়ালেও সত্যজিৎ রায়কে প্রাণ খুলে সম্বর্ধনা জানানোয় কোন কোন মহলে দ্বিধা দেখা যাচ্ছে। নাগরিক সম্বর্ধনার উদ্যোক্তাদের নামের তালিকায় বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের বর্তমান কর্ণধারদের নাম দেখা গেল, অথচ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বি এম পি এ'র পক্ষ থেকে কোন মাল্যদান করা হলো না, কিংবা দমদমেও বি এম পি এ'র পক্ষ থেকে কাউকেই স্বাগত জানাতে উপস্থিত থাকতে দেখা গেল না। এর কারণ যা শোনা গেল তা একশ্রেণীর লোকের অদ্ভুত মনোবৃত্তির পরিচায়ক। শোনা গেল, বি এম পি এ'র কার্যনির্বাহক সমিতিতে সত্যজিৎ রায়কে এখানকার চলচ্চিত্রশিল্পের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানোর একটি প্রস্তাব উঠেছিল,

অগ্রগামী পরিচালিত তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা অবলম্বনে নির্মীয়মান ছবি "ডাকহরকরা"তে একটি বাউলের চরিত্রে শান্তিদেব ঘোষ

কিন্তু সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়, হিন্দী ছবির কোন পরিবেশকের এই আপত্তিতে, যে, "অপরাজিত"কে সম্বর্ধনা জানালে "জাগতে রহো"কেও সম্বর্ধনা জানাতে হবে। জানা নেই একথা সত্যি কিনা, কিন্তু নাগরিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে হিন্দী চিত্রব্যবসায়ীদের প্রায় অনুপস্থিতি সেদিন চোখে না পড়ে পারেনি (বম্বেতে চলচ্চিত্র শিল্পের বিবিধ আঞ্চলিক সংস্থার পক্ষ থেকে রাজ কাপুরকে কতো সম্মানই না জানানো হচ্ছে, কিন্তু কোথাও শোনা গেল যে, কেউ সত্যজিৎ রায়কেও সম্বর্ধনা দেওয়ার কথা তুলেছেন। সর্বভারতীয় সংস্থা ফিল্ম ফেডারেশন, জানা গেল, এ মাসের মাঝামাঝি বম্বেতে এদের দুজনকেই সম্বর্ধনা জানানোর উদ্যোগ করছেন।) "জাগতে রহো" সম্মান পাচ্ছে বম্বেতে ওটা ওখানকার ছবি বলে, ওখানকার শিল্প সংস্থার কেউ "অপরাজিত"কে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন না বলে মনে করার কিছু নেই। কিন্তু "অপরাজিত" কলকাতার ছবি, অথচ কলকাতার আঞ্চলিক চলচ্চিত্রশিল্প সংস্থার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানোয় আপত্তি তোলা হবে, এ বড়ো বিচিত্র মনোবৃত্তির পরিচায়ক। অবশ্য, এমন কথা যদি উঠতো যে, "জাগতে রহো" তথা "একদিন রাত্রে"র প্রকৃত স্রষ্টা বলে শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রকে স্বীকার করে তাদেরও সম্বর্ধনা জানানোর কথা, তাহলে সেটা হতো আর এক কথা। কিন্তু সে স্বীকৃতি দানেও দেখা যাচ্ছে এখানকার চিত্রশিল্পের কোন মাথাব্যথা নেই। বাংলার ছবিকে, বাংলার পরিচালককে বাংলা দেশে সম্বর্ধনা জানাতে দেওয়ায় আপত্তি তোলা হবে, এ পরিস্থিতির মোড় নিতে দেখা যাচ্ছে! "অপরাজিত"র গৌরবকে স্বীকৃতি না দেওয়ার দলে কলকাতার অভিনয়শিল্পী-রাও পড়েন। রঙমহল স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠানে সেদিন নামমাত্র দু'একজন ছাড়া দেখা গেল না তাদের কাউকে। কেউ কৈফিয়ৎ দিয়েছেন যে সময়মতো আমন্ত্রণপত্র পাননি বলে, কিন্তু আমন্ত্রণপত্র পেয়েও যে যাননি এমন শিল্পীর সংখ্যাই বেশী। সারাদেশের গৌরবকে নিজেদেরও গৌরব বলে মনে করতে সংকোচবোধ এখানকার অভিনয়-শিল্পীদের এই প্রথম নিদর্শন নয়, "কাবুলিওয়ালা"কে সম্বর্ধনা জানানোর সময়ও। এ অনুষ্ঠানটি হয় বি এম পি এ'র পক্ষ থেকে। শুধু "কাবুলিওয়ালা" নয় সেইসঙ্গে বাংলা দেশে তোলা আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রাপ্ত যাবতীয় ছবির জন্য নির্মাতাদের সম্বর্ধনা জানানো হয়, কিন্তু সে সময়ে কেউ ঐসঙ্গে বম্বের তোলা অনুরূপ সম্মান-প্রাপ্ত ছবির জন্যও সম্বর্ধনা জানানোর কথা তোলেনি।) এখানকার অভিনয়শিল্পীর দল অনুপস্থিত ছিলেন ব্যাপকভাবে নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও এবং নিমন্ত্রণপত্র যথেষ্ট সময় থাকতে হাতে পৌঁছান সত্ত্বেও। মহৎ শিল্পসৃষ্টির ব্যতিক্রম এই সংকীর্ণতা সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্পেরই পক্ষে ক্ষতিকারক।

চিত্রালোচনা

পুজোর মরসুমটা ছবির দিক থেকে এবার বেশ আকর্ষণীয়ই বলতে হবে। বাঙলা এবং হিন্দী দুদিক থেকেই চিত্রগৃহগুলি নতুন ছবির সমাগমে জমজমাট। গত দু সপ্তাহের মধ্যে বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে "অভয়ের বিয়ে" "ওগো শুনছো", "মাথুর", "আমি বড়ো হবো" এবং "শ্রীমতীর সংসার"। হিন্দী ছবি "দো আঁখে বারহ হাত" "কিংনা বদল গায়া ইনসান", বাজার মাৎ করে রেখেছে। গুণে যতো না হোক, লোক টানার মতো জোর আছে ছবি কখানির।

সেকেলে

বছর পঁচিশ-তিরিশ আগেকার লেখা, তারও বছর বিশ-পঁচিশ আগেকার সামাজিক রঙ্গ-তামাসার এমন সব উপকরণ যা এখনকার মনের কাছে "সেঁয়ো" লাগবার কথা, কিন্তু তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এমনধারা উপাদান নিয়ে আজো যারা "অভয়ের বিয়ে"র মতো ছবি তোলার উদ্বুদ্ধ হন তাদের পিছিয়ে-থাকা রুচির কথা। আগেও একবার উপন্যাসখানির একটি চিত্ররূপ হয়েছে, সেও বছর পনের হবে। তারপর দর্শকসাধারণ যে অনেক বেশী বোধশক্তি সম্পন্ন হয়েছে, এবং এখন আর ডি এল সি'র প্রেমী নামকরা বিজ্ঞানের ছাত্রকে তিনবার আছাড় খাইয়ে বাক্স নিয়ে জুতো বইয়ে, খাটো প্যান্ট পরিয়ে কিম্ভূত সাজিয়ে মনকে পীড়ন করে যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয় তা যে দর্শকসাধারণের সুরুচির দ্বারে পৌঁছতে পারেনা, এটা যারা বুঝতে চাননা, তারা দর্শকসাধারণের উন্নত বোধশক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন বলেই মনে করতে হয়। পনের বছর আগেকার চেয়ে কলাকৌশলের নৈপুণ্যে ছবির ওপরের পালিশটার কিছু উন্নতি ছাড়া বর্তমান সংস্করণটির কোন সার্থকতাই উপলব্ধি করা গেলনা। পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত (প্রথম সংস্করণটির পরিচালক ছিলেন সুশীল মজুমদার) কাহিনীটির বিন্যাসে এমন কোনরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করতে পারেননি যাতে ছবিখানির কোন বৈশিষ্ট্য দাঁড়াতে পারে। সেকেলে মাটো জিনিসে হাত দিতে হয়তো সংকোচ এসে থাকবে, তাই চেহারাটার সঙ্গে এক-আধটু বর্তমানের ছোঁয়াচ রাখার জন্যেই বোধহয় এখনকার ট্রাম বাস, বেবি ট্যাক্সী, হাল মডেলের মোটরকার আর স্নানের কলকব্জা প্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অতো সহজেই কি রূপ পাল্টায়?

* * *

ক্যাবলামী, আর বিদ্বান ছেলের আত্মভোলামি ও নির্লিপ্ত ভালোমানুষীকে একাকার করে তৈরী ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের একদা জনপ্রিয় উপন্যাস-চরিত্র অভয় তার রাকির "সেলফ কালচার" পড়া জেঠা রমানাথের তদারকে মানুষ। লক্ষ্ণৌয়ের বন্ধু কান্তিবাবুর মেয়ে মায়ার সঙ্গে অভয়ের বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে এই কথা জানিয়ে রমানাথ মারা গেলেন। কান্তিবাবুরা লক্ষ্ণৌ ছেড়ে কলকাতায় এসে উঠলেন। মায়ের তাড়নায় অভয় গেল ওদের সঙ্গে দেখাও করতে এবং বিয়েরও কথা পাড়তে। প্রথম সাক্ষাতেই মায়ার মন বিরূপ হয়ে উঠলো। ওবাড়িতে তখন আসা যাওয়া করে মায়ার প্রণয়প্রার্থী অজয়। অজয় স্যুট পরে, মায়াকে দামী নয়া মডেলের গাড়ির লোভ দেখায়। তাই দেখে অভয় ভাবলে মায়ার মন পাবার বুঝি ঐ হলো পথ। তাতে ফল হলো উলটো, মায়া আরো বিগড়ে গেল। হতাশ হয়ে অভয় মাকে নিয়ে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লো। অভয় যে মায়াকে সত্যি ভালবাসে সেটা মায়া জানলে তার মামাতো বোন সরমার কাছ থেকে। ভালোমানুষ অভয়কে চিনেছিল শুধু সরমা। অজয়ের বুদ্ধিতে ফাটকা খেলতে গিয়ে কান্তিবাবু সর্বস্বান্ত হলেন; অভয় সে কথা জেনে বেনামীতে টাকা দিয়ে বাড়িটা কিনে রাখলে, অবশ্য ওদের বিপদ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই। ক্রমে মায়ারও মন পড়লো অভয়ের ওপরে, কিন্তু তখন অভয় চাইলে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। ঘটনাক্রমে মায়া অজয়কে বিয়ে করা ঠিক করলে সেটা অভয়ের ওপর অভিমান বশেই। সে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করলে সরমা; অজয়কে ভুলিয়ে নিয়ে পালাবার উদ্যোগ করলে। কিন্তু অজয় শেষ পর্যন্ত একাই নিরুদ্দিষ্ট হলো। সরমারই চেষ্টায় অভয়ের বিয়ে হলো মায়ার সঙ্গে।

* * *

পুরনো প্যাটার্নের গল্প যেমন, তেমনি

টিকিট অনেক আগে থেকেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়। হয়তো টিকিটের জন্য চাপ সহ্য করতে না পেরে, অথবা বিনামূল্যে প্রবেশপত্র দিতে একটা কিন্তু ভাব জেগেছিল। ফলে, অমন একটা অনুষ্ঠান, মঞ্চজগতে যার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে, তার যথাযথ বিবরণী সেদিন উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর বাইরে আর কারুর রেকর্ডে আর রইলো না! মুদ্রিত অনুষ্ঠান-সূচী থেকে জানা যায় যে, অনুষ্ঠানে সভাপতি হন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, নটসূর্য শিল্পজগৎ থেকে অস্তমিত হবার নয়। অভিনেতৃ সঙ্ঘের পক্ষ থেকে নটসূর্যকে এক মানপত্র প্রদান করা হয় এবং সম্পাদক জহর গঙ্গোপাধ্যায় এই কামনা করেন যে, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে নটসূর্যের উপস্থিতির অনুভূতি যেন চিরদিন প্রেরণা দেয়, তাঁর আশীর্বাদ যেন উদ্দেশ্য সাধনের পথকে জয়যুক্ত করে। আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে নটসূর্য আবেগময় কণ্ঠে তাঁর অবসর গ্রহণের সংকল্প জ্ঞাপন করেন। পরিশিষ্টে নামভূমিকায় নটসূর্যকে নিয়ে "সাজাহান" নাটকখানি মঞ্চস্থ হয়, যাতে অভিনয় শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ছবি বিশ্বাস (ঔরংজেব), অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (দারা), মিহির ভট্টাচার্য (সুজা), নীতীশ মুখোপাধ্যায় (মোরাদ), দীপক মুখোপাধ্যায় (সোলেমান), মাস্টার বিভু (সিপার), জীবেন বসু (মহম্মদ), ডাঃ হরেন (জয়সিংহ), কমল মিত্র (যশোবন্ত সিংহ), জহর গঙ্গোপাধ্যায় (দিলদার), কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় (দিলীর খাঁ), পঞ্চানন ভট্টাচার্য (জীবন আলি), বিজয় দত্ত (সৈনিক), তুলসী চক্রবর্তী (মীরজুমলা), চন্দ্রশেখর (সায়েস্তা খাঁ) এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারমণ পাল, মিহির দত্ত, সরযূবালা (জাহানারা), সীতা দেবী (পিয়ারা), অপর্ণা দেবী (নাদিরা), গীতা সিং (জহরৎউন্নিসা) ও সাধনা রায়চৌধুরী (মহামায়া)।

"ক্ষুধা"র শতরজনী অভিনয় উৎসব

গত ২২শে সেপ্টেম্বর বিশ্বরূপায় "ক্ষুধা" নাটকখানির শতরজনী অভিনয় উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন অতুল্য ঘোষ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনুষ্ঠান উদ্বোধিত হবার পর ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে নাটকে অংশ গ্রহণকারী শিল্পী ও কর্মীদের সোনার মেডেল, আংটি ও বিবিধ সামগ্রী স্মারক-উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। এই উপলক্ষ্যে বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে বিশ্বজয়ী চলচ্চিত্র "অপরাজিত"তে অংশগ্রহণকারী শিল্পী কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানি ও শান্তি গুপ্তাকে মানপত্র প্রদান করেন অহীন্দ্র চৌধুরী। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিশ্বরূপার নাট্য প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ একটি অশোকচক্র প্রদানের কথা অনুষ্ঠানে ঘোষিত হয়।

দেবকীকুমার বসু পরিচালিত "সোনার কাঠি"তে ভারতী দেবী, নীতীশ মুখোপাধ্যায় ও অপর এক শিল্পী

দক্ষিণী প্রযোজিত "ক্ষুধিত পাষাণ"

নাট্য প্রযোজনায় দক্ষিণীর নাট্য বিভাগের উন্নততর প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া গেল রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প অবলম্বনে মঞ্চস্থ "ক্ষুধিত পাষাণ" দেখে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রচনার সামান্যই আছে এদের এই নাট্যরূপে, প্রায় সবটুকুই আলাদা তৈরী করে নেওয়া, তবে এই তৈরীর মধ্যে নিবিষ্ট চিন্তার নিয়োগ বেশ লক্ষ্য করা যায়। মোগল আমলের এক পোড়ো প্রাসাদে এক শুল্ক আদায়কারী যুবকের স্বপ্ন দেখা। অতৃপ্ত কামনাগুলো রূপ নিয়ে দেখা দেয় তার স্বপ্নে। আখ্যানবস্তুর চেয়ে আঙ্গিক রূপটাই হয়েছে বেশী আকর্ষণীয়। স্বল্প বিষয়কে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে বিস্তৃত করে দিতে যাওয়ায় দৃশ্যের ও ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, মাঝে মাঝে একঘেয়েমিতেও মন আচ্ছন্ন হয়। শব্দ, সংগীত ও আলোকের নাটকীয় প্রয়োগ এবং মঞ্চসজ্জা চমৎকার একটা ভাবময় পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এদিকের এতো ভাল কাজ কমই দেখা যায়। নর্তকীদের সাজপোশাকটা ঠিক ইতিহাস মেনে চলেনি, তবে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেই যখন সরে আসা হয়েছে সেক্ষেত্রে পোশাকের পরিবর্তন বেমানান নয়। স্বপ্নের দৃশ্য, নাচিয়েদের, বিশেষ করে পুরুষ নাচিয়ের পায়ের আওয়াজ না হলেই ভাল। নাট্যরূপ দান করেছেন জয়দেব বসু। নাটকখানি পরিচালনা এবং প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন আশীষ মুখোপাধ্যায়। উভয় অংশেই মঞ্চে তার আগমন স্বাগত হবে। সংগীত পরিচালনা করেছেন দক্ষিণামোহন ঠাকুর, শিল্পনির্দেশনায় ছিলেন সুনীতি মিত্র এবং আলোকসম্পাতে ছিলেন আশুতোষ বড়ুয়া।

বিবিধ সংবাদ

কলকাতার শব্দযন্ত্রীরা মিলে সম্প্রতি তাদের একটি সংঘ গঠিত করেছেন যার নাম দিয়েছেন সোসাইটি অফ মোশন পিকচার অডিও-ইঞ্জিনীয়ার্স। শব্দযন্ত্রী ও তাদের

একলব্য

কলকাতার ফুটবল মরসুম শেষ হয়েছে কিন্তু কলকাতার সবচেয়ে নামডাকের ফুটবল প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ডের খেলা এখনো শেষ হয়নি। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে শেষ পর্যন্ত আই এফ এ শীল্ডের খেলা এবার শেষ হবে কি না সন্দেহ।

আই এফ এ শীল্ডকে শুধু কলকাতা বা ভারতের নামডাকের ফুটবল প্রতিযোগিতা বললে সব বলা হয় না। আই এফ এ শীল্ড প্রাচ্যের সর্ববৃহৎ এসোসিয়েশনের সর্ববৃহৎ ফুটবল প্রতিযোগিতা। ভারতের ফুটবল খেলার ইতিহাসের সঙ্গে আই এফ এ শীল্ড খেলার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আই এফ এ শীল্ডের সৃষ্টি ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন সৃষ্টিরও আগে। অর্থাৎ আগে শীল্ড পরে এসোসিয়েশন। শীল্ডের খেলার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যই এসোসিয়েশনের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আই এফ এ শীল্ডের মর্যাদা প্রায় ইংল্যাণ্ডের এফ এ কাপের অনুরূপ। তাই আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতাকে বলা হয় ব্লু রিব্যাণ্ড অফ ইণ্ডিয়ান ফুটবল। ভারতীয় ফুটবলের ঐতিহ্যমণ্ডিত সেই শীল্ডের খেলার শেষ হবার সম্ভাবনা এখনো অনিশ্চিত। বর্তমানে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব একে একে বর্নপুর ইউনাইটেড, এরিয়ান, কালীঘাট ও [illegible] স্পোর্টিংকে পরাজিত করে একদিকে সোজা ফাইনালে উঠেছে—অপরদিকে সেমিফাইনালে উঠে বসে আছে লীগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং ও লীগ রানার্স ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সেমিফাইনাল খেলাটি চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে খেলার ব্যবস্থা পাকা করে টিকিট বিক্রী করাও শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্যাংক ধর্মঘট এবং খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি খেলা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। কারণ পুলিসের সাহায্য ছাড়া কলকাতায় কোন বড় খেলার অনুষ্ঠান অসম্ভব। মহাপূজার ডামাডোল এবং শহরের অস্বাভাবিক ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির জন্য পুলিসের সাহায্য পাওয়া যায়নি। ফলে খেলাও অনুষ্ঠিত হয়নি।

অবস্থা যাই হক, আমার ব্যক্তিগত ধারণা কলকাতার পরিস্থিতি কখনো এমন ঘোরালো হয়নি যা খেলা অনুষ্ঠানের পক্ষে প্রতিকূল। সত্য বটে মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গলের চ্যারিটি খেলার নির্দিষ্ট দিন ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে একই সঙ্গে ব্যাংক ধর্মঘট এবং খাদ্যমূল্য প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় কলকাতার পুলিস বাহিনীকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়েছিল। এবং সেদিন পুলিসের পক্ষে ব্যাপকতর কর্তব্য ছেড়ে মাঠে উপস্থিত হওয়া ছিল অসম্ভব। কিন্তু ১৪ই সেপ্টেম্বরের পর থেকে অবস্থা কিছুটা সহজ হতে আরম্ভ করে এবং খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত থাকায় কলকাতার অবস্থা অনেক সহজ হয়ে আসে। এ অবস্থায় আই এফ এ শীল্ডের দুটি মাত্র খেলা অনুষ্ঠানের জন্য পুলিস কমিশনারের পক্ষে তাঁর বিরাট পুলিস বাহিনীর ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ মাঠে নিয়োজিত করা সম্ভব ছিল না একথা বিশ্বাস করা কঠিন। মাঠে পুলিস নিয়োগের কথায় পূজার ডামাডোলের কথাও এসে পড়ে। অর্থাৎ পূজার প্রাক্কালে বা পূজার সময় শহরের হৈ-হুল্লোড়ের জন্য পুলিস বাহিনীকে সব সময়ই প্রস্তুত থাকতে হয়। কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু ইতিপূর্বে মহাষ্টমী পূজার দিন আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যালে পুলিসের পক্ষে যদি মাঠে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়ে থাকে, তবে এখনই বা তা সম্ভব হল না কেন তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য।

২০০ মিটার বুক সাঁতারে নতুন ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী বেনী তালুকদার

অবশ্য মহমেডান স্পোর্টিং ও জর্জ টেলিগ্রাফ দলের কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলায় শেষ সময় মাঠের মধ্যে খেলোয়াড়দের হাতাহাতি সংগ্রামের কথা বিবেচনা করে মহমেডান ও ইস্টবেঙ্গলের সেমি-ফাইন্যাল খেলা সম্পর্কে পুলিস কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। কিন্তু মহমেডান স্পোর্টিং ও জর্জ টেলিগ্রাফের খেলার অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দর্শকের কোনই দোষ দেওয়া চলে না, বরং উত্তেজনার কারণ থাকা সত্ত্বেও উভয় পক্ষের দর্শক ও সমর্থক যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। খেলার অপ্রীতিকর আবহাওয়ার জন্য সমস্ত দায়িত্ব রেফারীর। তাঁর দুর্বল পরিচালনাই খেলাটিকে ফুটবল ইতিহাসের এক কলংক-চিহ্নিত ঘটনায় পরিণত করেছে।

এবার লীগের খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব দুইবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে এবং দুইবার মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে; আর চারটি খেলাতেই জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে। কিন্তু কোন খেলাতেই কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এমন গুরুত্বপূর্ণ খেলা যদি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে থাকে তবে মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গলের খেলাই বা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবার [illegible] পারে না।

রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব ফাইন্যালে উঠে বসে আছে। এর আগে ১৯৪৪ সালে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের ই বি আর নাম থাকা সময়ে আই এফ এ শীল্ড লাভ করেছিল। এবার নিয়ে আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার এটা ছিল দ্বিতীয় সুযোগ। সুতরাং শীল্ড ফাইন্যাল খেলার জন্য এরা খুবই আগ্রহী। লীগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং এবং লীগ রানার্স ইস্টবেঙ্গলেরও ফাইন্যাল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার আগ্রহ কম নয়। আর

নির্বাচিত হয়েও বিশ্ববিদ্যালয় দলের সঙ্গে সফর করতে পারেন নি। এবার চুনীর ক্ষেত্রেও সেই বাধা এসেছিল, কিন্তু চুনী গোস্বামী আই এফ এ টীমের সঙ্গে ব্রহ্মদেশ সফরের চেয়ে নিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়কত্ব করাকেই শ্রেয় বলে মনে করেছেন। এজন্য চুনী গোস্বামীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আরও আশা করছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল যেন এবারও আশুতোষ ট্রফি লাভ করে ফিরে আসে।

আজাদ হিন্দ বাগে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের তিনদিন-ব্যাপী সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনটি বিষয়ে নূতন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া সিনিয়র ও ইণ্টারমিডিয়েট বিভাগে আর ৭ জন সাঁতারু বাঙলার পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।

নতুন ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের উদীয়মান সাঁতারু বেণী তালুকদার, সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যা কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র আর বোম্বাইয়ের খ্যাতনাম্নী মহিলা সাঁতারু কুমারী ডলী নাজির। এর মধ্যে ২০০ মিটার বুক সাঁতারে পঞ্চদশবর্ষীয় স্কুলছাত্র বেণী তালুকদারের নূতন রেকর্ড বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে।

২০০ মিটার বুক সাঁতারে বেণী তালুকদার তার নতুন রেকর্ডের সময় আগের রেকর্ড-সময় থেকে এক বা দুই সেকেণ্ডে উন্নত করেননি—সার্ভিস দলের সাঁতারু সামাসের খাঁর রেকর্ড-সময় থেকে ৭ সেকেণ্ডে উন্নত করেছেন। এই বিষয়ে সামাসের খাঁর রেকর্ড ছিল ৩ মিনিট ০·৪ সেকেণ্ড, আর বেণী তালুকদারের নতুন রেকর্ডের সময় হচ্ছে ২ মিনিট ৫৩·৪ সেকেণ্ড। আরও উল্লেখ করবার মত ঘটনা, বোম্বাইয়ের উদীয়মান সাঁতারু সুরেন হরিয়ানী, যিনি মাত্র কয়েকদিন আগে বোম্বাইতে এই বিষয়ে ২ মিনিট ৫৭·৯ সেকেণ্ডে নতুন ভারতীয় রেকর্ড করেছিলেন তাকে পরাজিত করেই বেণী তালুকদার নতুন রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন।

মেয়েদের ১০০ মিটার পিঠ সাঁতারে ভারতের সাঁতার পটিয়সী কুমারী ডলী নাজিরকে পরাজিত করে বাঙলার মেয়ে সন্ধ্যা চন্দ্রের নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠার ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। সন্তরণ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর ডলী নাজির এতদিন কারো কাছেই এই বিষয়ে পরাজয় স্বীকার করেননি। ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের সাঁতার প্রতিযোগিতায় তাকে সন্ধ্যার কাছে প্রথম পরাজয় স্বীকার করতে হয়। মেয়েদের ১০০ মিটার পিঠ সাঁতারে কুমারী ডলী নাজিরই ছিলেন ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী। সন্ধ্যা চন্দ্র ডলী নাজিরকে পরাজিত করে তার ভারতীয় রেকর্ডকেও ম্লান করে দিয়েছেন। সন্ধ্যা চন্দ্রর নতুন রেকর্ডের সময় হয়েছে ১ মিনিট ৫৩·৩ সেকেণ্ড।

আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ী কুলটি ফুটবল দল

পিঠ সাঁতারে ডলী নাজিরের রেকর্ড ভেঙে গেলেও ১০০ মিটার বুক সাঁতারে কিন্তু ডলী নাজির তার আগের রেকর্ডকে আরও উন্নত করতে সমর্থ হয়েছেন। ১০০ মিটার বুক সাঁতারে ডলীর আগের ভারতীয় রেকর্ড ছিল ১ মিনিট ৩৭·৬ সেকেণ্ড এবং এই বিষয়ে তার রেকর্ড হয়েছে ১ মিনিট ৩৭ সেকেণ্ড।

বোম্বাই এবং দিল্লীর কয়েকজন সাঁতারু এবার ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের বার্ষিক জলক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করায় আজাদ হিন্দ বাগে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। সাঁতার ছাড়া ভারতের শ্রেষ্ঠ ডাইভার বোম্বাইয়ের কে পি ঠক্করের ফিক্সড বোর্ড ও স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং এর উচ্চাঙ্গ কলা-কৌশল দর্শকদের বিপুল আনন্দ দান করে। ফিক্সড বোর্ড ডাইভিং-এ আর যার ডাইভিং দর্শকদের আনন্দ দেয় সে হচ্ছে আট বছরের একটি ছেলে—নাম কান্তি নন্দ। কান্তি ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের সভ্য। ডাইভ দেবার তার চমৎকার ভঙ্গি। ডাইভ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত কান্তি নিয়মিত অনুশীলন করলে তার পক্ষে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করা কষ্টসাধ্য নয়।

খেলাধুলার খবরাখবর

আন্তঃ জেলা ফুটবল—বাঙলার আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় কুলটি দল ২—০ গোলে কুচবিহার জেলা দলকে পরাজিত করে ও মজুমদার কাপ লাভ করেছে। এখানে বলা যেতে পারে আন্তঃ জেলা ফুটবলের সংবিধানে কুলটির মর্যাদা একটি জেলা দলের অনুরূপ।

আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা এবার কুচবিহারে অনুষ্ঠিত হয় এবং এবারকার প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ১৩টি জেলা ফুটবল দল। এক এক বছর এক এক জেলায় এই প্রতিযোগিতার খেলা পরিচালিত হয়ে থাকে।

হার্ডকোর্ট টেনিস—কলকাতার সাউথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হার্ড কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় ভারতের ডেভিস কাপ টিমের অধিনায়ক নরেশ কুমার ৬—১ ও ৬—১ সেটে তরুণ খেলোয়াড় প্রেমজিত লালকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ৪ বছর হার্ডকোর্ট টেনিসের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। গতবারের ফাইনালেও প্রেমজিত লালকে নরেশ কুমারের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল।

আন্তঃ কলেজ নৌকা বাইচ—ঢাকুরে লেকে অনুষ্ঠিত আন্তঃ কলেজ নৌকা বাইচ লীগ প্রতিযোগিতায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। আন্তঃ কলেজ নৌকা বাইচ লীগে মোট ৭টি কলেজ অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে এই গ্রুপে বিদ্যাসাগর কলেজ এবং সাউথ গ্রুপে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ বিজয়ী হয়। দুই গ্রুপ বিজয়ীর ফাইনাল নৌকা বাইচে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে পরাজিত করে বিদ্যাসাগর কলেজকে।

সাংবাদিকদের ফুটবল প্রতিযোগিতা—সাংবাদিক ও সংবাদপত্রসেবীদের ফুটবল প্রতিযোগিতা—প্রফুল্লকুমার সরকার কাপের ফাইনালে খেলায় আনন্দবাজার পত্রিকা দল ২—০ গোলে স্বাধীনতা পত্রিকাকে পরাজিত করে কাপ লাভ করেছে।

মুষ্টিযুদ্ধে প্রাধান্যের লড়াই—[illegible] এঞ্জেলে লাইট হেভি ওয়েট মুষ্টিযোদ্ধার বিশ্ব প্রাধান্যের লড়াইয়ে আর্চি মূর [illegible] পরাজিত করে তার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছেন।

লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইয়ের তিনদিন পরে নিউইয়র্কের ইয়াংকি স্টেডিয়ামে হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন রকি মার্সিয়ানো ১৫ রাউণ্ডব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় [illegible] পরাজিত করে বিশ্বের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নের খেতাব লাভ করেছেন।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

অন্ধকারে
আপনার পথপ্রদর্শক
ESTRELA
BRIGHT LIGHT
LONG LIFE
ESTRELA BATTERIES LTD.
BOMBAY
এষ্ট্রেলা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

DE ... 40 Naye Paise
Saturday, 12th October, 1957

২৪ বর্ষ ॥ ৪৯ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ২৫ আশ্বিন ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

ছাত্র প্রসঙ্গ

পণ্ডিত নেহর, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীদের নিকট সম্প্রতি লিখিত এক পত্রে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ছাত্রেরা যদি অধ্যয়নকালেই অল্প সময়ের জন্য অন্য কোনরূপ কাজ করিয়া অর্থোপার্জন করিতে পারেন, তবে মঙ্গল। কেবল দরিদ্র ছাত্রদের কথা মনে করিয়া তিনি এই উপদেশ দিয়াছেন, এরূপ মনে হয় না—তরুণ বয়স হইতেই আর্থিক সমস্যাসঙ্কুল এই দেশের ছাত্রদের কর্মশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, ভবিষ্যৎ জীবনে যে বাস্তবের সম্মুখীন হইতে হইবে, ছাত্র-জীবন হইতে সেজন্য যাহাতে তাঁহারা প্রস্তুত হন, এইজন্যই তিনি বিশেষভাবে একথা লিখিয়া থাকিবেন। আমেরিকায় অনেক ভারতীয় ছাত্র এই-ভাবে অর্থ উপার্জন করিয়া ব্যয় নির্বাহ করিয়াছেন, উত্তর জীবনে তাঁহাদের অনেকেই দেশে ও বিদেশে কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু কাজ কোথায়? পণ্ডিত নেহরুর পত্রে উৎসাহিত হইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এ বিষয়ে যদি কোন সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে ছাত্রগণ তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে উদাসীন হইবেন না, একথা সুনিশ্চিত। আমরা পশ্চিমবঙ্গের কথা বলিতে পারি, তাঁহাদের একটি অংশ চিরকালই ছাত্রদশা হইতেই নিজের ব্যয়নির্বাহ করিয়া থাকেন —অনেক ক্ষেত্রে সংসারের ব্যয়ও নির্বাহ করিতে হয়—আর্থিক দুর্দশা বৃদ্ধির সহিত এই শ্রেণীভুক্ত ছাত্রের সংখ্যা বাড়িতেছে। কিন্তু তাঁহাদের সম্মুখে কার্যত উপার্জনের একটি পথই কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত, সেটি হইতেছে টুইশনি; সেখানেও স্বভাবতই স্কুল-কলেজের শিক্ষকদেরই অধিক সমাদর। অপর একটি অংশ ব্যয়নির্বাহের কোন পথ সন্ধান করিয়া না পাইয়া, অবশেষে দৈন্য-গ্রস্ত আত্মীয়স্বজনের দৈন্যভার আরও বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হন। এছাড়া এমন ছাত্রও অনেক আছেন, যাঁহাদের ঠিক অভাবগ্রস্ত বলা চলে না, কিন্তু বিশেষ প্রকার আত্মসম্মানবোধবশত ছাত্রবস্থাতেই আত্মনির্ভর হইবার সুযোগ পাইলে সুখী হইবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্র ছাত্রভাণ্ডার

বাংলা দেশে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের জীবনের ট্র্যাজেডির রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'রাসমণির ছেলে' গল্পে যে রূপ দিয়াছেন, তাহা বাংলার ক্ষীয়মাণ মধ্যবিত্ত জীবনের মর্মভেদী চিত্ররূপে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে—পরিতাপের বিষয় কেবল এই যে, এই দীর্ঘকালেও তাহার বাস্তবতা হ্রাস পায় নাই, আজও তাহা 'সেকালের কথা' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিল না। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ-মঞ্জুরী কমিশন যে বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দরিদ্র ছাত্রভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আশান্বিত হইয়াছি। প্রস্তাবটি এই—প্রত্যেক ছাত্র এই ভাণ্ডারে বার্ষিক অন্যূন এক টাকা চাঁদা দিবেন; ছাত্রেরা যত টাকা তুলিতে পারিবেন, অর্থমঞ্জুরী কমিশনও তত টাকা দিবেন, অবশ্য বার্ষিক দশ হাজার টাকার অধিক নয়। বিশ্ব-বিদ্যালয় এই ভাণ্ডারের পরিচালনা করিবেন, তবে পরিচালন সমিতির সহিত ছাত্র প্রতিনিধিদের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিবে।

এই ভাণ্ডার সংগ্রহ প্রসঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি ছাত্রদের অন্তরকে ঠিকমত স্পর্শ করিতে পারেন—তাহা দুরূহ নয় বলিয়াই আমরা মনে করি—যদি তাঁহাদের কল্পনাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন, তবে এই ভাণ্ডার হইতে আমরা বিশেষ সুফল আশা করিতে পারিব—কেবল দরিদ্র ছাত্রদের সংস্থান হইবে বলিয়া নয়, ছাত্রাবস্থায় যে সহানুভূতির প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, বিক্ষিপ্ত না হইয়া সংগঠনের একটি পদ্ধতিতে বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হইবে বলিয়া। শুধু এক টাকা বা তদূর্ধ্ব চাঁদা দিয়া নয়, ছাত্রেরা আরো কোন কোন উপায়ে এই ভাণ্ডারের জন্য অর্থসংগ্রহ সহজেই করিতে পারেন—অভিনয়াদি ছাত্রদের বার্ষিক আনন্দোৎসব-সূচীর অন্তর্গত, সহজেই ইহা হইতে কিছু অর্থসংগ্রহ হইতে পারে—এইরূপ অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা শান্তি-নিকেতনের ছাত্রগণ প্রায় প্রতি বৎসরই দারিদ্র্য মোচনকল্পে ব্যয়ের জন্য কর্তৃপক্ষের হাতে অর্থসংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন; অন্যত্রও অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ আয়োজন হইয়া থাকে; বর্তমান উপলক্ষ্যে সেই সকল উদ্যোগ সংহত ও সুব্যবস্থিত হইতে পারিবে। আমাদের বক্তব্য, কমিশনের প্রস্তাবে তাঁহাদের দেয়-সীমা যে দশ হাজার টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা বর্ধিত করা উচিত; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যতগুলি কলেজ আছে, সর্বত্র ছাত্র-প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎসাহী হইলে প্রতি-বর্ষে লক্ষাধিক টাকাও সংগ্রহ করাও বিস্ময়ের ব্যাপার হইবে না। ছাত্রগণ যত টাকা তুলিতে পারিবেন, অর্থমঞ্জুর

কমিশন তত টাকা দিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইলে ছাত্রদের প্রতিযোগিতা-বৃত্তির সাধু উৎসাহ বর্ধিত ও সুপথে পরিচালিত হইবে।

ছাত্রকল্যাণকল্পে অপর একটি সাধু প্রস্তাব

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে শিক্ষাব্রতীসমাজে 'ছাত্র-অসন্তোষ', ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের অভাব লইয়া নিরন্তর আলোচনা চলিয়াছে; ইঁহাদের মধ্যে অনেকে ছাত্রদিগকে তিরস্কার করেন বা উপদেশ দেন; অপরপক্ষে অনেকে মনে করেন, আমরাও মনে করি যে, ছাত্ররাই যে তপোভ্রষ্ট এমন নয়, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই এমন অসম্পূর্ণতা আছে অংশত যাহার প্রতিক্রিয়াতেই ছাত্রসমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়—তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন অনিশ্চিত, নিত্যপাঠ্যসূচীর মধ্যেও সকল শ্রেণীর ছাত্রের বিচিত্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সৃজনধর্মিতার পূর্ণতা সাধনের অবকাশ সংকীর্ণ। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশন যে আপাতত দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য শখের কারখানা (Hobby Workshop) খুলিবার আয়োজন করিয়াছেন, সেগুলি দ্বারা এই অভাব কতকটা পূর্ণ হইবার সম্ভবনা আছে। কাঠের কাজ, মূর্তিগড়া, ফোটোগ্রাফ তোলা প্রভৃতির এই কারখানায় ছাত্ররা সাধারণ পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত বিষয়রূপে এখানে চর্চা করিতে পারিবে। চিত্রাঙ্কন গীতবাদ্য প্রভৃতিও ইহার অন্তর্গত হইতে পারিবে।

কর্তৃপক্ষ একথা স্পষ্টই বলিয়া দিয়া ভাল করিয়াছেন যে, ছাত্রেরা রোজগার করিবে, এই উদ্দেশ্যে এই কারখানাগুলি স্থাপিত হইতেছে না তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনই লক্ষ্য। অনেক সময় দেখা যায় ছাত্র জীবনে যাহা শখ কর্মজীবনে তাহাই জীবিকা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে দোষাবহ কিছু নাই। কিন্তু জীবনের একটা সময় বৃত্তিনিরপেক্ষ হইয়া শখের চর্চা করিবার সুযোগলাভ প্রাণশক্তিবৃদ্ধির পক্ষে একটা মস্ত লাভ; আর্থিক দৈন্যবশতও বটে, ব্যবস্থার অভাবেও বটে, আমাদের দেশে অনেক ছাত্রেরই এরূপ সুযোগ বড় ঘটিয়া ওঠে না, এই কারখানাগুলিতে সে অভাব মিটিবে। বিশেষভাবে কারিগর বৃত্তি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনেও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ এখন আর উদাসীন নহেন, কিন্তু তাহার ক্ষেত্র সতন্ত্র।

গ্রামদান

সর্বসেবা সঙ্ঘের উদ্যোগে মহীশূরের নিকটবর্তী ইয়েলবাল গ্রামে সম্প্রতি যে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সরকারী ও বেসরকারী উচ্চপদস্থ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। বেসরকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে আচার্য বিনোবাজী ও শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরকারী উচ্চপদস্থগণের মধ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী ও কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নাম করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া কোন কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীও ছিলেন। মোটের উপর সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিগণের উপস্থিতি সম্মেলনকে বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছে।

প্রধান আলোচ্য বিষয়

সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল গ্রামদান। আচার্য বিনোবাজীর ভূদান আন্দোলন একটি নূতন রূপ গ্রহণ করিতেছে গ্রামদান আন্দোলনে। ভূদান ও গ্রামদানের মধ্যে মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। ভূদান আন্দোলনে ব্যক্তি একক, সে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র; গ্রামদান আন্দোলনে ব্যক্তি সমষ্টিগত ও সমষ্টিবদ্ধ। ভূদানে দাতা ও গ্রহীতা একক; গ্রামদানে দাতা ও গ্রহীতা সমষ্টিবদ্ধ। ভূদান পন্থা, গ্রামদান লক্ষ্য। খুব সম্ভব গোড়া হইতেই দুটি ভাবই বিনোবাজীর কল্পনায় ছিল, এখন আত্মপ্রকাশ করিতেছে। একটি অপরটির পরিপূরক। গ্রামদানের পরিকল্পনা এদেশে নূতন নহে। গ্রামের সকল লোকে মিলিয়া যাবতীয় ভূমি গ্রামবাসীর সেবা ও প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে দান করিবে। সকলে মিলিয়া চাষবাস করিবে ও উৎপন্ন শস্য সকলে প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করিয়া লইবে। ইহাই গ্রামদানের অন্তর্নিহিত অর্থ। এভাবে প্রাচীনকালে এদেশে গ্রামীণ জমির ব্যবহার হইত। কোন কোন অঞ্চলে আদিবাসী সমাজে এখনও এই প্রথা বর্তমান। কাজেই গ্রামদানের ভাবটি দেশবাসীর রক্তের মধ্যে আছে বলা চলে। তাহাকে পুনরুজ্জীবিত ও ব্যাপকতর করা যায় কিনা বা কিংবা কিভাবে করা যায়, অনুষ্ঠাতাগণ তাহাই চিন্তা করিতেছেন।

সরকারী ও বেসরকারী সহযোগিতা

কিন্তু ইহার মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী সহযোগিতার ক্ষেত্র কোথায়? সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত Community Development Project —গ্রামদানের অনুরূপ—এবং একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। এখন চেষ্টা চলিতেছে যে, এই দুটি পন্থার মধ্যে সমন্বয়ের কোন উপায় আছে কি না। তাহা সম্ভব হইলে খুব সম্ভব সরকারী "Project" ও বেসরকারী গ্রামদান পরস্পরের সহযোগিতায় অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। গ্রামদানের প্রাণশক্তি ও 'Project' এর যন্ত্রশক্তির মিলনে সুফল ফলিবে বলিয়াই সকলে আশা করিতেছেন।

বিদেশী 'কো-অপ' ও দেশীয় গ্রামদান

চীনের অনুকরণে যৌথ খামার সৃষ্টির কথা সরকার চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু এবারে গ্রামদানের পরিকল্পনাও তাঁহারা একরকম স্বীকার করিয়া লইলেন। এখন এই দুটির মধ্যে কোন্‌টিকে অনুসরণ করা কর্তব্য, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, চীন দেশের যৌথ খামারের সফলতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। দ্বিতীয়ত, চীনের সর্বাত্মক সরকার লোকের উপরে যেমন জোর-জুলুম করিতে পারে, এদেশে তাহার সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়ত, একটি প্রথা বিদেশী, তাহা যতই ফলপ্রদ হোক, এদেশের পক্ষে ভয়াবহ পরধর্ম, অপরটি যতই আয়াসলভ্য হোক, দেশীয় পন্থা। এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া কার্যক্রম স্থির করিতে হইবে। আমাদের ধারণা, এদেশের পক্ষে বিদেশীয় অনুকরণে যৌথ খামার সৃষ্টির চেষ্টার চেয়ে গ্রামদানের পন্থা সহজতর, কেননা, দেশের ধাতে তাহার পূর্ব-ইতিহাস বর্তমান।

সুযোগের হাওয়া

তবে ইহার প্রধান অন্তরায় যুগের হাওয়া। দেশের রক্তে গ্রামদানের ঐতিহ্য থাকিলেও আমাদের আশঙ্কা যুগের হাওয়া ইহার সমর্থক নয়। গ্রামদানের আইডিয়া আর কিছুই নয়, একান্নবর্তী পরিবারের ভাবটিই গ্রামীণ সম্পত্তির উপরে আরোপিত মাত্র। যে-যে-কারণে একান্নবর্তী পরিবার প্রথা ভাঙিয়া পড়িল, সেই সেই কারণ যে গ্রামদানের ক্ষেত্রে কার্যকরী হইবে না, হইলে উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবে না, তাহা কে বলিল! অন্তত সেরূপ আশঙ্কা মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। শুনিতে স্বতো-বিরুদ্ধ হইলেও বর্তমান যুগ মানুষের একক সত্তা প্রতিষ্ঠার সমর্থক—যেমন প্রাচীন যুগ ছিল তাহার সমষ্টি-সত্তার সমর্থক। কারখানার মানুষ একক, কৃষিক্ষেত্রের মানুষ সমষ্টিবদ্ধ। ইহা কল-কারখানার যুগ—একক মানুষের যুগ। কাজেই যুগের হাওয়ায় গ্রামদানের সমর্থন আছে মনে হয় না। তবে গ্রামদানের ভিত্তি যখন যন্ত্র নয়, কৃষিকার্য ও হস্ত-শিল্প—তখন তাহার প্রতি যুগের হাওয়ার বিরূপতা তেমন কার্যকরী না হইতেও পারে এই যা ভরসা।

[আঠার]
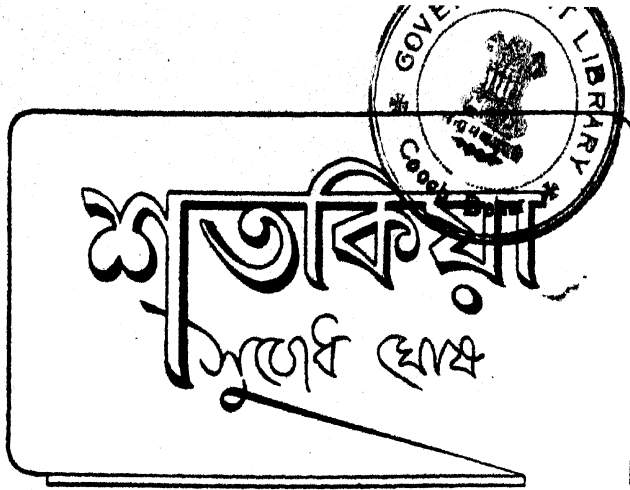
ডরানির বানের জল নেমে গিয়েছে। আবার শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছে মধুকুপির ডাঙ্গা। বানভাসি পলি দশ দিনের রোদেই শুকিয়ে ধুলো হয়ে গিয়েছে; ছোট ছোট ঝড়ো হাওয়ার ফুৎকারে সেই ধুলোও সারা দুপুর ধরে ডাঙ্গার বুকের উপর ছোট ছোট ঘুরনি ছুটিয়ে নেচে বেড়ায়।

যেমন ঈশান মোক্তারের কুঠি, তেমনই বাবু দুখন সিংহের ভাণ্ডার, দু-এরই দুর্ভাবনার মেঘলা ঘোর কেটে গিয়েছে। এই নতুন রোদের ঝাঁজ লেগে যেন নতুন ক'রে হেসে উঠেছে ঐ কুঠি আর ঐ ভাণ্ডার। না, ভাদুই ফসল মরে নাই; আমনটাও নষ্ট হবে বলে মনে হচ্ছে না। শুধু ক্ষেতগুলিকে কাদাটে করে রেখে দিয়ে বড় তাড়াতাড়ি বানভাসি জল নেমে গিয়েছে। ভালই হয়েছে। বাবু দুখন সিংহের কুলের জঙ্গলেও পচন ধরেনি; বেঁচে গিয়েছে লা-এর নতুন ফেকড়িগুলি।

ডরানির স্রোতের হাটুজল আবার ছলছল করে, আর সেই স্রোত পার হয়ে ঈশান মোক্তারের খাটালের গরু আবার ঘাসের গন্ধ খুঁজতে খুঁজতে পলাশবনের ছায়ার দিকে চরতে চলে যায়। কারণ, আর একটা আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পেরেছে মধুকুপির প্রাণ। বাঘিন কানারানী আর এই তল্লাটে নেই। বাবুর বাজার ফাঁড়ির পুলিস এ-গাঁয়ে আর ও-গাঁয়ে ঘুরে আবার জানান দিয়ে চলে গিয়েছে, এইবার একটু হেঁটে ছুটে, একটু ঘরের বার আর গাঁ-এর বার হয়ে কাজ করতে থাক সবাই। আর ভয় নাই। ঈশান মোক্তারের গরুর পাল তাই নির্ভয়ে চরতে চরতে কপালবাবার জঙ্গলের ছায়ার কাছাকাছি চলে যায়।

সড়কের উপর দিয়ে গো-গাড়ির যাওয়া-আসার সাড়াও শোনা যায়। এমন কি, সন্ধ্যা পার হয়ে যাবার পরেও; জামনগাড়ার কাঠুরিয়ারা জানতে পেরেছে, এই পথে বাঘের ভয় আর নেই। থানা বলেছে, বাঘটা এবছর একটু আগেভাগে, শীত দেখা দেবার অনেক আগেই চলে গেল। গোবিন্দপুরের থানার সব ভাড়াটে শিকারী মাচান তুলে দিয়ে আবার যে-যার ঘরে ফিরে গিয়েছে।

কিন্তু আর-একটা ভয়, যে-ভয়ের জন্য ঈশান মোক্তারের কুঠি আর বাবু দুখন সিংহের ভাণ্ডার রাতের বেলায় ঘুমোতে পারে না। বাবুর বাজারের ধানের পাইকার আর ইঁটের ঠিকাদারও সন্ধ্যার পর থেকে আতঙ্কিত বুক আর ঘুমহারা চোখ নিয়ে রাত কাটায়। এবং গোবিন্দপুর থানার বড়বাবু আর ছোটবাবুর তর্কাতর্কিও যখন-তখন আরও তীব্র এবং আরও মুখর হয়ে উঠতে থাকে।

এই আতঙ্কের নাম গুপী লোহার। কোন সন্দেহ নেই, বড়কালু ওয়েস্ট নামে নতুন রেলওয়ের স্টোর ইয়ার্ডের ভিতরেই যে মার্ডার, ঘুমন্ত ঠিকেদারের লাল কম্বলটাকে রক্তে চুবিয়ে দিল আর টাকার থলি নিয়ে সরে পড়লো, সে মার্ডার গুপী লোহারেরই হাতের একটা ভয়ানক হেস্যের শানিত হিংসার কীর্তি। বাবুর বাজারে প্রতিদিন দু'-চারটা ধানের গাড়ি এসে জমা হলেও কোন পাইকার আসে না।

মধুকুপির আতঙ্ক বলতে শুধু এই কুঠি আর এই ভাণ্ডারের আতঙ্ক। কারণ, গুপী লোহার যে মধুকুপির কোন মনিষের মেটে ঘরের ভিতরে উঁকি দিতেও আসতে পারে না, এই সহজ ও সরল সত্য কে না উপলব্ধি করতে পারে? সিন্দুক নামে একটা বস্তু, এবং তার ভিতরে নগদ টাকা নামে আর

একটি বস্তু শুধু এই কুঠি আর এই ভাণ্ডার ছাড়া মধুকুপির আর কারও ঘরে নেই, থাকতেও পারে না।

তাই আতঙ্কিত কুঠি আর ভাণ্ডার শেষ পর্যন্ত তারই অনুগ্রহের শরণ নিয়েছে, যার ইচ্ছায় আর ইঙ্গিতে গোবিন্দপুর থানার বড়বাবু আর ছোটবাবুর বিচার-বিবেচনা, এমন কি ছুটি নেবার চেষ্টাও ওঠা বসা করে। পুলিস মুন্সী চৌধুরীজীর আশ্বাস পেয়েছে ঈশান মোক্তারের কুঠি আর বাবু দুখন সিংহের ভাণ্ডার। কুছ ডর নেই; আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, কুঠিতে আর ভাণ্ডারে ডাকা মারবার কোন মওকা পাবে না খুনেরা পাপী গুপী লোহার।

বাবু দুখন সিংহের বাড়ির সামনে পিপুলতলার ছায়ায় ছোট একটি টাট্টুঘোড়া আজ সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার একটা পা একটা খুঁটোর সঙ্গে বাঁধা দড়ির প্রান্ত দিয়ে বাঁধা। ঘোড়ার সামনে ঘাসের স্তূপ। লেজের ঝালর দুলিয়ে গায়ের মাছি তাড়ায় আর ঘাস খায় পুলিস মুন্সী চৌধুরীজীর ঘোড়া। আর, বনচণ্ডীর ছোট দেউলের পাশে রক্তজবার গা ঘেঁষে একটা খাটিয়া পাতা হয়েছে। তার উপর বসে আছে চৌধুরীজী। রামাই দিগোয়ার মাটির উপর উবু হয়ে বসে চৌধুরীজীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঈশান মোক্তারের কুঠি আর বাবু দুখন সিংহের ভাণ্ডার, উভয়ে মিলে চৌধুরীজীকে খুশী করবার ব্রত সমানভাগে ভাগ ক'রে নিয়েছে। কুঠি পাঠিয়েছে, মস্ত বড় কাঠের থালার উপর সাজানো পরোটার দুটি স্তূপ আর এক হাঁড়ি অড়হরের ডাল। ভাণ্ডার পাঠিয়েছে পিতলের একটি ডেকচি, তার ভিতরে কালো পাঁঠার মাংস, বিনা পেঁয়াজে রাঁধা। কুঠি দিয়েছে একটি নতুন গামছা; গামছার এক কোণে দশ টাকার দুটি নোট গেরো দিয়ে বাঁধা। আর, ভাণ্ডার দিয়েছে দশটা টাকা জড়ানো একটা রুমাল।

জাতপঞ্চের বড় বুড়া রতনকে ডেকে এনে চৌধুরীজীর সামনে হাজির করেছে রামাই দিগোয়ার।

—ভাণ্ডার পাহারার জন্য বিশ জন, আর কুঠি পাহারার জন্য বিশজন বেগার চাই। যেখান থেকে পার, যেমন ক'রে পার সন্ধ্যা হবার আগেই লোক নিয়ে এসে জমায়েত করে ফেল। তা না হলে আমি সবার আগে তুমাকে চালান দিব বুড়া।

রতন বলে—বেগার খাটতে বলছেন কেনে বাবু? কিছু পয়সা দিবার আজ্ঞা করেন।

—চুপ। একটা পয়সাও না। সরকারী কাজে বেগার খাটতে হবেই। পিতল বাঁধানো লাঠিটাকে মাটিতে ঠুকে চৌধুরীজী গর্জন করে উঠতেই বড় বুড়া রতন চুপ করে যায়।

সারা দুপুর আর বিকাল পিপুলের ছায়ায় খাটিয়ার উপর ঘুমিয়ে পার ক'রে দেবার পর সন্ধ্যা দেখা দিতেই আবার ব্যস্ত হয়ে হাঁক ডাক করেন চৌধুরীজী। লোক নিয়ে আসে বড়বুড়া রতন। ভাণ্ডারের জন্য বিশজন, আর কুঠির জন্য বিশজন মানুষ পাহারায় লাগিয়ে দিয়েই চৌধুরীজী একটা হাঁপ ছাড়েন। —এইবার গলাটা একটুক ভিজাতে চাই রামাই; বন্দোবস্ত কর দেখি।

আগেই বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিলেন বাবু দুখন সিংহ। দুখন সিংহের চাকর দুটি মহুয়া সরাবের বোতল আর সরা ভর্তি ছোলা ভাজা নিয়ে এসে চৌধুরীজীর হাতের কাছে রাখে।

টিম টিম ক'রে একটা আলো জ্বলে। চৌধুরীজীর গলা ভিজে যাবার পর এতক্ষণের গম্ভীর মুখটাও নতুন রকমের মেজাজে প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

—লে রামাই। ইটাতে পোয়াভর আর ইটাতে ছটাকভর আছে।

বোতল দুটোকে রামাই-এর হাতে তুলে দিয়ে চৌধুরীজী বলেন—তাড়াতাড়ি পিয়ে লে রামাই; তারপর চল, একটা রাউণ্ড দিয়ে আসি।

বলতে বলতে অদ্ভুতভাবে হাসির ঢেঁকুর তুলতে থাকে চৌধুরীজী। তিন চুমুকে বোতল খালি ক'রে আর গলা ভিজিয়ে নিয়ে রামাই বলে—হুজুর আজ ফাঁড়িতে ফিরবেন কি?

চৌধুরীজী হাসে—তু জানিস। যদি জায়গা ক'রে দিস, তবে থাকবো।

হেসে ওঠে রামাই—তবে চলেন হুজুর।

আর দেরি হয় না। পিপুলতলার অন্ধকার থেকে টলমল ক'রে হাঁটতে হাঁটতে বের হয়ে আসে দুটি ছায়ামূর্তি। ঘোড়ার উপরে চৌধুরীজী, আর ঘোড়ার মুখের লাগামের কড়া ধরে রামাই দিগোয়ার। খুট খুট, ঠুক ঠুক, ঘোড়ার খুরের নাল সড়কের বুকের উপর ছোট ছোট শব্দ ছিটিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে চলতে থাকে। সেই সঙ্গে ছোট ছোট হাসির ঢেঁকুরও বাজে। মাঝে মাঝে নেশাতুর নিঃশ্বাসের বাতাসও যেন তপ্ত হয়ে ফোঁস ফোঁস শব্দ ক'রে ওঠে। যেন মধুকুপির এই সন্ধ্যার ঠাণ্ডা অন্ধকারের গা শুঁকে শুঁকে একটা উষ্ণ মাংসল স্বাদুতা খুঁজে বেড়াচ্ছে দুটি টলমল খুশির ক্ষুধা।

সড়ক থেকে নেমে মেঠো পথ ধরে কিছু-দূর এগিয়ে যায় এই ছায়াময় অভিযান। রাংচিতার ঝোপের উপর জোনাকী জ্বলে; তারই গা ঘেঁষে ছোট একটা মাটির ঘর।

গলা ফাটিয়ে হাঁক দেয় রামাই—খবরদার!

রামাই-এর এই হাঁকের মধ্যে যেন একটা বিভীষিকা আছে। রাংচিতার জোনাকীর দল কেঁপে ওঠে, আর কেঁপে ওঠে মাটির ঘরের ভিতরে লুকিয়ে আর ঘুমিয়ে পড়ে থাকা একটা প্রাণ।

ঘরের দরজার কাছে এসে আর একবার গলা কাঁপিয়ে হাঁক দেয় রামাই—মিঠুয়া ঘাসী আওয়াজ দাও।

ঘরের ভিতরে হাউমাউ ক'রে কেঁদে ওঠে একটা মেয়েমানুষ; যেন মেয়েমানুষটার বুকের সব পাঁজর ভয় পেয়ে এক সঙ্গে আর্তনাদ ক'রে ফেটে গিয়েছে।

রামাই দিগোয়ার হাসে—বের হয়ে এসে কথা বল তেতরি।

দরজা খুলে বের হয়ে আসে তেতরি ঘাসিন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চেঁচাতে থাকে—তু আবার মানুষটার নাম ধরে হাঁক দিলি কেনে রামাই?

রামাই হাসে—তাথে ভয় পাস কেনে?

তেতরি গুনগুন ক'রে কাঁদে—মরা মানুষের নাম ধরে হাঁক দিলে যে বড় ডর লাগে রামাই। তু ইটা বুঝিস না কেনে? তুকে কত বললাম, কত পরবী দিলাম, তবু তুই মানলি না রামাই!

চৌধুরীজী—কি বটে রামাই? মাগি কাঁদে কেনে?

রামাই হাসে—ইয়ার মরা মরদের নাম হেঁকেছি বলে ডর পেয়ে কাঁদছে। কিন্তুক আমার দোষ নাই হুজুর। থানাতে দাগীর খাতায় ইয়ার মরদ মিঠুয়া ঘাসীর নাম আজও লিখা আছে।

চৌধুরীজী হাসে—তু কেনে মিছা এত রস করিস রামাই? যখন জানিস যে লোকটা নাই, তখন উয়ার নাম হেঁকে লাভ কি?

রামাই—থানা যদি নামটা না কাটে, তবে আমিই বা কেনে.....।

চৌধুরীজী—উসব কথা এখন রাখ রামাই। এখানকে এলি কেনে বল?

রামাই ফিসফিস করে। —তেতরির ঘরে থাকবেন কি হুজুর?

চৌধুরীজী—নাঃ।

রামাই—তবে চলেন হুজুর।

আবার খুট খুট, ঠুক ঠুক। ঘোড়ার খুরের নাল পথের কাঁকর পাথরের উপর দিয়ে ছোট ছোট চোরা শব্দের টোকা মেরে মেরে চলতে থাকে। সড়ক ধরে অনেক দূর এগিয়ে আসার পর আবার মেঠো পথে নেমে দূরের একটা ঘুটঘুটে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে চৌধুরীজী আর রামাই দিগোয়ারের অভিযান।

পাকুড়তলার কাছে পৌঁছেই একটা কুঁড়ে ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ে রামাই—খবরদার। ভরত শিয়ালদারীর আওয়াজ দাও।

ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ দেয় এক উগ্র কণ্ঠস্বর। চিৎকার করে রামাই-এর নামে অভিশাপ বর্ষণ করে পল্টনী দিদি।

—মর মর মর, মুখপোড়া খালভরা। তুর ঘরে জোড়া মড়া মরে না কেনে? তুর মাগ দশবার রাঁড় হয় না কেনে?

সেই চিৎকারের সঙ্গে দুটো ছেলেমানুষের কান্নার করুণ শব্দ মেশামেশি হয়ে অদ্ভুত এক বিলাপের মত বাজতে থাকে।

হি হি করে গলা কাঁপিয়ে হাসতে থাকে

রামাই। চৌধুরীজী বলে—ইটা যে একটা ক্ষেপী শিয়ালী বটে রামাই?

রামাই—হ্যাঁ, হুজুর। কিন্তুক এখন আর গতরের সে গমর নাই। মাগি লড়াই-এর সময় অনেক সলজ্জারের অনেক পয়সা খেয়েছে। জিনিসটা ভাল বটে হুজুর।

গলা কেশে নিয়ে বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে আবার চেঁচিয়ে রুক্ষ স্বরে ধমক দেয় রামাই—গালি দিবি না পল্টনী; খবরদার। বের হয়ে এসে মুন্সীজীকে সেলাম দে।

পল্টনীর চিৎকার হঠাৎ ভয়ে যেন রুদ্ধ হয়ে যায়। কাঁপতে কাঁপতে একটা ঢিবরি জ্বালে পল্টনী। তার পরেই দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েই কাঁদতে থাকে। —আপনি ই কসাইটাকে একটুক বলে দিন হুজুর; উ যেনে আর মানুষটার নাম ধরে হাঁক না দেয়।

চৌধুরীজী—কেনে?

পল্টনী—কপালবাবা দয়া করে করে মানুষটাকে নিয়ে গিয়েছে হুজুর। মিছা সেই মানুষটার নাম হেঁকে ই কসাইটা মজা করে কেনে?

রামাই—দাগীর খাতায় ভরতের নাম আজও লিখা আছে; আমি কি করবো বল?

চৌধুরীজীর মুখেও বিচিত্র কৌতুকের হাসি মিটমিট করে। —বেশ বেশ, বলে দিচ্ছি, আর তুর মরদের নাম হাঁকবেক না রামাই।

কথা শেষ করে এবং ঘরের ভিতর উঁকি দিতে গিয়েই চমকে ওঠে চৌধুরীজী—তুর ঘরের ভিতর ও দুটা কি জানোয়ার বটে রে পল্টনী?

পল্টনী দিদির দুই ছেলে, ধবধবে ফরসা আর নীলচে চোখ, কটা আর মোটা ঘরের ভিতরে এক গাদা ছেঁড়া কাঁথার উপর বসে ঠকঠক করে কাঁপছে। চৌধুরীজীর চোখের বিস্ময়কে আরও চমকে দিয়ে হাসতে থাকে রামাই—ও দুটা সলজ্জারের দয়া বটে।

রামাই-এর দিকে কটমট করে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে পল্টনী—তাথে তুর চোখ পুড়ে কেনে রে ডাইনের বেটা।

—চুপ! ধমক দেয় চৌধুরীজী।

পল্টনীও মাটির উপর ধপ করে বসে পড়ে আর কপালে হাত দিয়ে গুনগুন করে কাঁদতে থাকে। —ধমক দিলে আমি মানবো কেনে হুজুর। আমার কটা আর মোটার উপর ডাইনের নজর পড়েছে হুজুর। একবার দেখেন হুজুর, আমার কটা আর মোটার হাড়মাসের কি দশা হইছে।

কটা আর মোটা; একটা সাত বছর, আর একটা ছ' বছর বয়সের ধবধবে সাদা আর রোগা, জির্জিরে অপার্থিব প্রাণী। চৌধুরীজীর সেই বিস্মিত চাহনির রকম দেখে যেন আরও আতঙ্কিত হয়ে কুঁকড়ে যেতে থাকে।

—মরে গেলাম গো মা। চেঁচিয়ে ওঠে কটা।

—তু এখনকে আয় গো মা। ফোঁপাতে থাকে মোটা।

—চল রামাই। বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে চৌধুরীজী।

চৌধুরীজীর কাছে এগিয়ে এসে, আর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে রামাই—পল্টনীর ঘরে থাকেন না কেনে হুজুর।

—না। ভাল জায়গা থাকে তো চল, নয় তো ফাঁড়ি ফিরে চল।

মাথা চুলকোয় রামাই; কি যেন ভাবে। তার পর, যেন একটা নতুন আবিষ্কারের আনন্দে হঠাৎ ছটফট করে ওঠে। —ভাল জায়গা আছে হুজুর। সেটাও দাগীর ঘর বটে। কিন্তুক......।

চৌধুরীজী—কি?

রামাই—দাগীটা যদি ঘরে না থাকে, তবে......তবেও একটুকু বুঝে সুঝে কাজ নিতে হবেক হুজুর।

খটে, খুটে, ঠুক্ ঠুক্! টাট্টু ঘোড়ার খুরের নাল আবার পাকা সড়কের উপর দিয়ে ছোট ছোট শব্দ বাজিয়ে চলতে থাকে।

খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে হয় না। কয়েকটা নিমগাছ, আর একটা বাঁশঝাড় যেখানে পথের দু-পাশে দাঁড়িয়ে রাতের বাতাসে গা দুলিয়ে অন্ধকার নাড়ছে, সেখানে এসেই হাঁক ছাড়ে রামাই—খবরদার!

চৌধুরীজীর নেশার আবেশ একটা বিপুল আশার চমক সহ্য করতে গিয়ে কেঁপে ওঠে। —হাঁ হাঁ রামাই। বড় ভাল জায়গাতে এসেছিস রামাই।

রামাই হাঁক দেয়—দাশু ঘরামি আওয়াজ দাও।

কোন আওয়াজ নেই। একটা নীরব ও নিস্তব্ধ মাটির ঘর; জাম কাঠের জীর্ণ কপাট ভিতর থেকে বন্ধ। এই ঘরের সামনে এসে এই প্রথম হাঁক দিল রামাই। এই পাঁচ বছর ধরে এই ঘরের ভিতরে একটা সুন্দর চেহারার মেয়েমানুষ একলা পড়েছিল; তবু কোন রাতে এই ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াবার সাহস পায়নি রামাই। কিন্তু আজ যে কোন সন্দেহ নেই, এই ঘর দাশু ঘরামি নামে এক দাগীর ঘর। আজ অনায়াসে এই ঘরের দরজার উপর লাঠির বাড়ি মারতে পারে; দাগীর ঘুম ভাঙিয়ে দাগীকে ঘরের বাইরে আনতে পারে রামাই। এবং দাগীর কোন জিনিস যদি দেখে, জোর গলায় সরকারী দাবীও করতে পারে।

—সরদার ঘরে আছ কি, আছ নাই? আবার ডাক দেয় রামাই।

কোন সাড়া শোনা যায় না। ঘরের ভিতর একটা বাতিও জ্বলে ওঠে না।

নিরুত্তর ঘরটার উপর যেন একটা আক্রোশ নিয়ে আবার হাঁক দেয় রামাই—সরদারিন কি নাই?

কপাটের উপর রামাই-এর টাঙ্গির হাতলের বাড়ি ক্ষেপা নেকড়ের কামড়ের মত লাফিয়ে লাফিয়ে আছড়ে পড়তে থাকে।

রামাই বলে—আওয়াজ দাও সরদারিন।

—কে বটে? ঘরের ভিতর থেকে একটা ভীত কণ্ঠস্বর যেন ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে প্রশ্ন করে।

—আমি রামাই দিগোয়ার।

—তুমি এখানে আস কেনে?

—দাগীর হাজিরা নিতে এইসেছি। তুমার মরদ দাশু ঘরামিকে দেখনে ...

—সে নাই।

—কুথাকে গেল?

—কয়লা খাদে।

—তবে তুমি বের হয়ে এস।

—না।

—খবরদার। মুন্সীজী দাঁড়াই আছেন জলদি বের হয়ে এস।

—না।

—তুমার বয়ান নিবেন মুন্সীজী।

—আমি কিছু বলতে পারবো নাই।

—বলতে হবেক সরদারিন।

—না।

—আমরা তুমার বাপের বাড়ির মানুষ লই গো সরদারিন; আমরা থানার মানুষ। যা বলছি, চুপচাপ শুন আর মেনে লাও।

দাগীর ঘরটা এইবার কোন উত্তরই না দিয়ে একেবারে নীরব হয়ে যায়।

জামকাঠের কপাটের উপর মুখ রেখে আস্তে আস্তে ফিসফিস করে রামাই। —বাতিটা জ্বালো সরদারিন। একবারটি বের হয়ে এইসো। মুন্সীজীর কাছে একটুক বইসো। একটুক হেইসে কথা বল। মুন্সীজী তুমার উপর বড় খুশি হবেন সরদারিন।

দাগীর ঘরটা তবু যেন একটা বধির কবরের মত নীরব হয়ে থাকে। ঘরের ভিতরে বাতি জ্বলে না; কোন সাড়াও শোনা যায় না।

দরজার দিকে এইবার আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে স্বয়ং চৌধুরীজী। নেশাক্রান্ত নিঃশ্বাসের জ্বালাটা যেন আহত অজগরের মত ফুঁসে ওঠে। —একটা লাথি মেরে দরজাটাকে ভেঙ্গে ফেল রামাই। তারপর দেখি, সরদারিনের গতর ভাল, না গমর ভাল?

(ক্রমশ)

পুস্তক পরিচয়

নাটক

বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং—মনোজ বসু। প্রকাশক: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২। দাম—১॥০।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের একটি হাল্কা ধরনের প্রহসন। আদর্শ বা উদ্দেশ্য গুপ্ত-ভাবেও নেই। নিতান্তই একটি কাহিনী, অস্বাভাবিকই বটে। ঘটনা পরম্পরায় মধুর মিলনে তার সমাপ্তি। মধ্যে বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনায়, ভুল বোঝাবুঝিতে কাহিনীর জট-পাকানো। লেখার ঢং-এ লেখকের নিজস্ব পরিচয় আছে। কিন্তু ঘটনাবিন্যাস নিতান্তই কাঁচা। অন্তত মনোজ বসুর মতো প্রতিষ্ঠাবান লেখকের উপযুক্ত নয়। তবে নাটকের আসল সার্থকতা মঞ্চে। কথোপকথনের হাস্যকর ভঙ্গিমা দর্শকচিত্তকে পুলকিত করতে পারে হয়তো। কিন্তু সে-আনন্দ গ্রন্থপাঠে থেকে যে পাওয়া যায় না, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। তার জন্য অস্বাভাবিক ঘটনাগুলোই যে শুধু দায়ী তা-ই নয়, অবাস্তব চরিত্রগুলোও অনেকাংশে দায়ী। ৭২২।৫৬

THE WOMEN'S REPRESENTATIVE—Those one-act plays. Foreign Languages Press, Peking Distributors — National Book Agency (Private) Limited, 12, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12.

আধুনিক চীনের পটভূমিকায় রচিত একাংক নাটিকা। রচনা কয়টি সম্বন্ধে প্রথমেই বলবার বিষয় এই যে, ঘটনাগুলোতে অস্বাভাবিকত্ব নেই। সহজ সরল সমতল কাহিনী। কিন্তু সবক্ষেত্রেই কৌতূহল বজায় রাখার কৌশল জানা আছে লেখকদের।

নয়া চীন নানা দিক থেকে নতুন রূপ নিয়েছে। সামাজিক এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে এ-পরিবর্তন যে সহজে আসেনি, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই তিনটি নাটক থেকে। সব দেশে যা হয়ে থাকে, সেখানেও তাই হয়েছে; প্রগতির পতাকা উড়িয়েছে প্রথম দেশের যুবক-যুবতীরাই। কিন্তু তা হলেও প্রতিক্রিয়ার নিজেদের মধ্যেই ভুল বোঝাবুঝির অন্ত নেই। বিবাহযোগ্যা কন্যার সমাজসেবায় বাধা দিচ্ছে প্রতিক্রিয়াপন্থী পিতা, গ্রামের সমবায় সমিতির কর্মনিপুণা নারীকে অত্যাচারে জর্জরিত করছে প্রগতিবিরোধী স্বামী, আর স্বামীস্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রগতিপন্থী হয়েও আত্মমগ্ন স্বামীর কাছে যোগ্য মর্যাদা পায় না তার স্ত্রী; এ-সব ছোটখাটো ঘটনার মধ্য থেকেই বৃহৎ সমাজের রূপটি প্রকাশিত হয় সকলের কাছে। কিন্তু চীনের সরকার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ওপর কিরকম প্রভাব বিস্তার করেছে, তার পরিচয় মিলবে প্রতিটি ঘটনার মিলনাত্মক পরিণতি থেকে। অশরীরী সরকার নেপথ্যে থেকেও যেন প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। নাটকগুলোতে এই প্রচারস্পৃহা যদি না থাকতো, তবে সাহিত্য হিসেবে এ-গ্রন্থটির মূল্য বাড়তো বই কমতো না। ৫৫২।৫৬

উপন্যাস

প্রেমের সমাধি তীরে। রমেশচন্দ্র মজুমদার। প্রকাশিকা শ্রীপ্রভাবতী দেবী (যদু বয়রা)। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের একখানা বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ উপন্যাস। প্রধান চরিত্রে নলিনী, প্রতিমা, মুক্তি এবং বীরেন ডাক্তারের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রেমমুগ্ধ নলিনী প্রতিমার সঙ্গে প্রেম করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া বাপের প্রহারে জর্জরিত হইয়া যখন সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রেমের সমাধি রচিত হইয়াছিল। ইহাই গ্রন্থখানার বৈশিষ্ট্য। পরিণতি যদিও আত্মহত্যা, তথাপি মাঝপথে লাঠির কঠিন আঘাত-স্বরূপ রৌদ্র-রসের অবতারণা অবান্তর। ইহার পরে লেখক আর অগ্রসর না হইলেই ভাল করিতেন।

মিলন, প্রত্যাখ্যান, আত্মহত্যা, দেশান্তর গমন এমন কি বিশেষ ক্ষেত্রে ছুরিকাঘাত প্রভৃতি প্রেমের বহুবিধ দাওয়াই-এর কথা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু প্রেম করিতে গিয়া নিজের বাপের হাতে এ হেন লাঠৌষধির সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাগণের পরিচয় এই প্রথম বলিয়া মনে হয়। রচনা-শৈলী যেমনই হউক, গ্রন্থখানাতে বর্ণ-শুদ্ধির কোন বালাই নাই। ইহাও লেখকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৩৮।৫৭

দুই ধারা। শ্রীহেমাঙ্গিনী ঘোষ সরস্বতী। প্রকাশক—ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানী; ১২।১, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দু' টাকা।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে লেখিকা নেহাত নবাগতা নহেন। 'স্নেহময়ী' নামক গার্হস্থ্য উপন্যাস লিখিয়া লেখিকা খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থের বিশিষ্ট চরিত্র অসীম, নীরা ও সুমিত্রার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখিকার লিপি-কৌশলের মাধ্যমে ইহাদের প্রত্যেকের দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ জীবনের অপূর্ব সমন্বয় সাধন ও সুখী-জীবনে রূপান্তর বিশেষ-ভাবে লক্ষ্যণীয়। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে লেখিকার কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। গ্রন্থখানির ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল, কিন্তু বানানের বেলায় 'করে' 'করছে' 'পার্লেম' প্রভৃতি বর্তমান যুগে অচল। ৪১৮।৫৬

কিশোর সাহিত্য

সিপাহী বিদ্রোহ। মণি বাগচী। প্রকাশক কমলা বুক ডিপো; ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দুই টাকা মাত্র।

ছোটদের উপযোগী করিয়া জীবনী রচনায় লেখক বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ছোটদের পাঠোপযোগী বর্তমান গ্রন্থ 'সিপাহী বিদ্রোহ' রচনায় লেখকের প্রয়াসও তেমনি সার্থকতা লাভ করিয়াছে। নিছক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লেখকের লিপি-চাতুর্যের মাধ্যমে ইতিহাস পাঠের বিশুষ্কতা বর্জিত হইয়া আলোচ্য গ্রন্থখানা বেশ সুখপাঠ্য হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার সকলেরই কাম্য।

মুদ্রণ পারিপাট্য মনোমুগ্ধকর। বাঁধাই ও প্রচ্ছদাবরণ চিত্তাকর্ষক। ১৮৩।৫৭

বিবিধ

বিবাহতত্ত্ব ও জন্মনিয়ন্ত্রণ। ভক্তি সেন। প্রকাশক—চিত্ররথ দত্ত; ২০২, রাসবিহারী অ্যাভেনিউ, কলকাতা-২৯। মূল্য দু' টাকা।

যৌন জ্ঞানাভিজ্ঞ লেখিকার বর্তমান গ্রন্থখানি যৌন-বিজ্ঞান সম্পর্কে বহু মূল্যবান তত্ত্ব-সম্ভারে পরিপূর্ণ। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রজনন সমস্যা, জন্মনিয়ন্ত্রণ, যৌনতত্ত্ব এবং যৌন সমস্যা প্রভৃতি বিষয়-বস্তুর অবতারণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসা সত্ত্বেও যৌনজীবনে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, উভয়ের দেহের ও মনের পরিতৃপ্তি কি ভাবে পরিস্ফূর্তি লাভ করে ইত্যাদি বহু তত্ত্বের আলোচনায় গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ।

দেশে এবং বিদেশে যৌন সম্বন্ধে সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে গ্রন্থকর্ত্রী যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার এই গ্রন্থ পাঠে তাহা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। বিবাহেচ্ছু এবং বিবাহিত উভয়ের পক্ষেই এরূপ গ্রন্থ অপরিহার্য। ৭৩৭।৫৬

শ্রীসুদর্শন—সম্পাদক, ব্রহ্মচারী শিশির-কুমার। কার্যালয়—৫নং অমর নিয়োগী লেন, কলিকাতা—৩; বার্ষিক মূল্য ৪, টাকা।

ধর্ম এবং সংস্কৃতিমূলক পত্রিকাগুলির মধ্যে ত্রৈমাসিক পত্র 'শ্রীসুদর্শন' উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। বাঙলা দেশের বিশিষ্ট চিন্তাশীল এবং মনীষিবর্গের অবদানে এই পত্রের প্রত্যেকটি সংখ্যা সমৃদ্ধ। জন্মাষ্টমী সংখ্যায় এই গৌরব সর্বাংশে রক্ষিত হইয়াছে। সুচিন্তিত প্রবন্ধ এবং কবিতার সংগ্রহ শ্রীসুদর্শনের বৈশিষ্ট্য—পড়িলে অনেক কিছু জানা যায়; অনেক কিছু পাওয়া যায়। সহযোগীর পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীরাধাভাব সুধানিধি—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাস (কর্মকার) কর্তৃক সংগৃহীত ও লিখিত। মাধুকরী ৳০ মাত্র। প্রাপ্তিস্থান: মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২।

বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের একটি সরল তথ্যবহুল ব্যাখ্যা। লেখক অল্পমূল্যে এই গ্রন্থ বিতরণের ব্যবস্থা করে আগ্রহান্বিত পাঠক সমাজকে পরিতৃপ্ত করেছেন। তাঁর বিষয়বোধ ও উপস্থাপনা প্রশংসার্হ। (৩৪৫।৫৭)

The Professor Charlotte Bronte. Jaico Publishing House, 125, Mahatma Gandhi Road, Bombay-1. Price : Rs. 2|-.

বহু কীর্তিত এই বইটির পরিচয় নতুন ক'রে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন নেই। জাইকো কর্তৃক উদ্দেশ্যধর্মী ও সরস এই রচনাটিকে স্বল্পমূল্যে পরিবেশন ক'রে পাঠক সমাজের উপকার সাধন করেছেন। (১৪।৫৭)

শারদীয় পত্রিকা

অর্চনা—ডক্টর প্রতাপচন্দ্র ও রনজিৎচন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত। ৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭ হইতে প্রকাশিত। মূল্য একটাকা।

এবারে শারদীয় পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'অর্চনা' একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন। মননশীল লেখক লেখিকাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প ও ও কবিতায় এ সংখ্যাটি পাঠক মহলে বিশিষ্ট স্থান অধিকারের যোগ্য। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত রঙিন ছবি এ সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

হোমশিখা—সম্পাদক দীলিপন বসু। কৃষ্ণনগর, নদীয়া। মূল্য একটাকা।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনায় এ সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। বিমল মিত্রের গল্প, রঞ্জন-এর রম্য রচনা বনফুল, গোপাল ভৌমিক, নিরুন দে চৌধুরীর কবিতা এ সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

সচিত্র কল্পতরু—ভীমচরণ মাইতি কর্তৃক ৯, গরাণহাটা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য একটাকা।

নবীন লেখকদের রচনায় এ সংখ্যাটিকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

অভ্যুদয়—সম্পাদক নির্মল বসু। ১, রাজা গুরুদাস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৭৫ নয়া পয়সা।

কয়েকটি মনোজ্ঞ রচনায় 'অভ্যুদয়'-এর শারদীয় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। অন্নদাশংকর রায়, অমিয় রতন মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, অশোক সরকার, বাণী রায়, সুধীর করণ, নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত, নির্মল বসু, ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণীয়।

অগ্রণী—সম্পাদক প্রফুল্ল রায়। ১০, শিব নারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য—একটাকা।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও অগ্রণীর শারদীয় সংখ্যা বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের "গান্ধী মানসে পাশ্চাত্য প্রভাব" গুরুদাস ভট্টাচার্যের "ছোট গল্পের ভূমিকা" এ সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। কবিতায় জীবনানন্দ দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অজিত দত্ত, দীনেশ দাস, গোবিন্দ চক্রবর্তী, গোপাল ভৌমিক বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, গল্পে সত্যপ্রিয় ঘোষ ও শিশিরকুমার দাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বন্দর—সম্পাদক শ্রীরজনলাল মুখোপাধ্যায় হাইড রোড ইনস্টিটিউট, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড, কলিকাতা। মূল্য—পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্পে এই শারদীয় সংখ্যাটিকে মনোজ্ঞ ও সুখপাঠ্য করে তোলার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দেব, ভবানী মুখোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, হরপ্রসাদ মিত্র দুর্গাদাস সরকার, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির রচনা উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যুৎ—সম্পাদক অনিলধন ভট্টাচার্য। ২৪, ব্রজনাথ দত্ত লেন, কলিকাতা। মূল্য—৫০ নয়া পয়সা।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনায় বিদ্যুৎ'এর শারদীয় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। ডাঃ রমা চৌধুরী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ'এর প্রবন্ধ, কবি কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতা, ছোটদের জন্য অখিল নিয়োগীর কবিতা, ইন্দিরা দেবীর গল্প এ সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

মঞ্চ কথা—সম্পাদক সুনীল ভঞ্জ ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—একটাকা আট আনা।

সিনেমা সংকলন পত্রিকা মঞ্চ কথা। রঙ্গালয়ের অনেক কিছু জানবার মত বিষয় ও শিল্পী পরিচিতি এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। তাছাড়া বহু ছবি ও স্কেচএ সুশোভনীয়।

উন্মেষ—কান্তি গুপ্ত। সি. আই. টি. বিল্ডিংস ব্লক নং ১।১৫, বেলেঘাটা, কলিকাতা। মূল্য—একটাকা।

উন্মেষের শারদীয় সংখ্যায় বৈশিষ্ট্য লেখক নির্বাচন অপেক্ষা লেখা নির্বাচনে। তাছাড়া কিশোর বিভাগ এ সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

মঞ্জরী (শারদীয়া সংখ্যা)। সম্পাদিকা আরতি সেন।

আশাপূর্ণা দেবী, অমরেন্দ্র ঘোষ, লীলা মজুমদার, হরপ্রসাদ মিত্র, প্রণব মুখোপাধ্যায় আনন্দ বাগচী, বটকৃষ্ণ দে, করুণা চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণের রচনায় সমৃদ্ধ এবং মূল্যবান কাগজে সুমুদ্রিত বর্তমান সংখ্যাখানি বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছে।

কেয়া—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মহামায়া সাহিত্য মন্দির, ৬, চাটার্জি পাড়া লেন, সেওড়াফুলী, হুগলী। মূল্য—ছ' আনা।

মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত আলোচ্য শারদীয় সংখ্যাটি খ্যাত-অখ্যাতনামা কথাশিল্পীদের রচনায় সমৃদ্ধ।

বাসর—পাটনা সাহিত্য বাসরের মুখপত্র। স্টুী প্রেস, পাটনা। মূল্য—চার আনা।

বাঙলার বাইরে এই পত্রিকাটি ছ'টি গল্প, তিনটি প্রবন্ধ ও তিনটি কবিতায় ক্ষুদ্র কলেবরে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সুজনী—প্রভাত ভাদুড়ী। সুজনী কার্যালয়, মালদহ। মূল্য—বার আনা।

মফঃস্বলের এই পত্রিকাটি নবীন লেখকদের রচনার সমাবেশের জন্য উল্লেখযোগ্য।

নিরীক্ষা—অরুণ গাঙ্গুলী। ২৬, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। মূল্য—১,

এ সংখ্যায় ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া, শ্রীভূপতি মজুমদার-এর রাজনৈতিক প্রবন্ধ, আশাপূর্ণা দেবী, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনায় সমৃদ্ধ।

বন্ধু—অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বারুইপুর, ২৪ পরগণা। মূল্য—৬০

ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, কাজী নজরুল ইসলাম, 'যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনায় সমৃদ্ধ। আলোচ্য সংখ্যাটি পাঠকদের আনন্দদানে সমর্থ হবে।

জাগৃহী—জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। কাটজু-নগর, যাদবপুর। মূল্য—বার আনা।

প্রবন্ধে—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, হরপ্রসাদ মিত্র। গল্পে—নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র, কুমারেশ ঘোষ, পুলকেশ দে সরকার। কবিতায়—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের রচনা ছাড়া আরো বহু সুচিন্তিত, সুলিখিত রচনার সমাবেশ জাগৃহি। তা ছাড়া দেবব্রত মুখোপাধ্যায়-এর স্কেচ ও পূর্ণেন্দু শাস্ত্রীর অঙ্কিত কভার এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু।

পরিচয়—গোপাল হালদার। পরিচয় কার্যালয়, ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা। মূল্য—২.৫০ নয়া পয়সা।

গুণী লেখকের রচনার সমাবেশ করা ও সু-লিখিত রচনা পরিবেশন করাই পরিচয়ের

বৈশিষ্ট্য। শারদীয় পরিচয় প্রথম শ্রেণীর শারদীয়া-গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম।

আলোচ্য সংখ্যাটিতে সত্যনাথ ভাদুড়ী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, বিমল কর, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ চিন্তাশীল সাহিত্যিকদের রচনায় সমৃদ্ধ। 'পরিচয়' পাঠকমহলের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হবে। নন্দলাল বসু ও রনেনআয়ন দত্তের স্কেচ দুটিও আকর্ষণীয়। কাগজ ও মুদ্রণ পারিপাট্য প্রথম শ্রেণীর।

গণবার্তা। সম্পাদক—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। দাম ২৷৷৹

গণবার্তা শারদীয় সংখ্যার বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা সংকলন হিসাবে এই পত্রিকার প্রবন্ধগুলি বরাবরই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমান সংখ্যাটিতেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। নির্মল-কুমার বসু, চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ—ত্রিদিব চৌধুরী প্রভৃতির আলোচনা সংকলন এবং অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস ও অন্যান্যের গল্প কবিতায় সজ্জিত 'গণবার্তা' পাঠকের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে।

তরুণ তীর্থ। তরুণ সাথী সম্পাদিত। মূল্য ১, টাকা।

গল্প কবিতা প্রবন্ধে সজ্জিত এই ক্ষুদ্র কলেবর শারদীয় সংখ্যাটি মন্দ হয় নাই। পরিচিত এবং অপরিচিত বহু লেখকের রচনায় তরুণ তীর্থ সমৃদ্ধ।

অঙ্গনা। সম্পাদিকা প্রতিভা রায়। ৫১০২বি, রাসবিহারী এভিনিউ। কলকাতা ২৯। ১·৫০ নয়া পয়সা।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় অঙ্গনার বর্তমান শারদীয় সংখ্যাটিরও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। মহিলা লেখকদের পত্রিকা হিসাবে অঙ্গনার যে স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে—আলোচ্য শারদীয় সংখ্যাটিতেও তাহার ব্যতিক্রম দেখিলাম না। কয়েকজন পরিচিতা লেখিকা ছাড়াও নূতন কয়েকজন লেখিকার রচনা সংগ্রহ প্রশংসার যোগ্য।

নরনারী। সুকান্ত হালদার। ২৬-১ শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম ২, টাকা।

নরনারী পত্রিকার নিজস্ব একটি আদর্শ আছে। মূলত স্বাস্থ্য এবং শরীর সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রকাশ করাই পত্রিকাটির ধর্ম। শারদীয় নরনারীতে কয়েকটি সুন্দর প্রবন্ধ ছাড়াও সাধারণ পাঠকের জন্য যজ্ঞেশ্বর রায়ের উপন্যাস ও অন্যান্যের গল্পেরও আয়োজন করা হইয়াছে। আশা করি পাঠকদের ভাল লাগিবে।

উত্তর সূরী। অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ৬জি, রাজা অপূর্বকৃষ্ণ লেন, কলকাতা ২। দাম ১, টাকা।

উত্তরসূরী পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাটি সাহিত্য-রসিক পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর স্মৃতি-বিচিত্রা রাজেশ্বর মিত্রের 'প্রীতিপ্রসঙ্গ'—নির্বাচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবনানন্দ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কিরণশংকর সেনগুপ্ত প্রভৃতির কবিতায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। অন্যান্য রচনগুলিও প্রশংসার্হ।

গাঙেয়—মদন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৬, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৭। দাম ৬০ নয়া পয়সা।

গাঙেয় সুপরিচিত পত্রিকা। ইহার শারদীয় সংখ্যাটি ক্ষীণ কলেবর, কিন্তু রচনা নির্বাচনে যে উচ্চ শ্রেণীর হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ও গুরুদাস ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্পগুলিও সুলিখিত।

শারদীয় বিশ্ববার্তা। সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত। ৪৪।৪ গড়চা রোড, কলকাতা ১৯। দাম ১, টাকা।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রভৃতির রচনা সম্ভারে বিশ্ববার্তা পত্রিকা একটি সুনির্বাচিত শারদীয়া হিসাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া আশা করি।

সপ্তর্ষি। ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১১, অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা ১২। দাম ১, টাকা।

সপ্তর্ষি একটি নতুন শারদীয় পত্রিকা। সে-হিসাবে পত্রিকাটির কৃতিত্ব আছে। ক্ষুদ্র কলেবরের মধ্যেও যথাসম্ভব উত্তম রচনা সম্ভারে পত্রিকাটিকে মর্যাদা দানের চেষ্টা আছে। নরেন্দ্র-নাথ মিত্র, সুবোধ ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র মিত্র, পঙ্কজ দত্ত প্রভৃতির রচনায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

কথাশিল্প। বীণা চক্রবর্তী সম্পাদিত। ৫৫।১ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। কলকাতা ১৯। দাম ২৷৷৹ টাকা।

কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাসে আলোচ্য পত্রিকাটির শারদীয়া সংখ্যাটি ভালই হইয়াছে। বীণা চক্রবর্তীর উপন্যাস ও শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গল্প ছাড়াও ভবানী মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা ও খ্যাতনামা এবং নতুন লেখকদের কয়েকটি কবিতা উল্লেখযোগ্য।

প্রাচী। সাহিত্য সংকলন। সুচরিত চৌধুরী ও ওয়াহীদ আহমেদ সম্পাদিত। ৫৫৬, চৌরঙ্গীবাজার চট্টগ্রাম। ২, টাকা ৪ আনা।

প্রাচী সাহিত্য সংকলনটি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। দেহসজ্জায় চাকচিক্য না থাকিলেও প্রধানত পূর্ববঙ্গের লেখকদের ও কয়েকজন খ্যাতনামা পশ্চিমবঙ্গের কুশলী লেখকের রচনা সম্ভারে প্রাচী সত্যই উপভোগ্য।

অন্নদাশংকর, মুজতবা আলী, জসীমউদ্দিন সাগরময় ঘোষ গোলাম কুদ্দুস প্রভৃতির রচনা যদিও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, তথাপি অন্যান্য লেখকদের রচনাও আগ্রহে পাঠ করার প্রয়োজন রাখে।

চাষ ও চাষী। নিখিল সরকার সম্পাদিত। ২৮, ওয়াটারলু স্ট্রীট, কলিকাতা-১। দাম ১, টাকা।

চাষ ও চাষীর আলোচ্য সংখ্যাটি খ্যাতনামা ও নবীন লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। সম্পাদকমণ্ডলীর প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। যে উদ্দেশ্য লইয়া গ্রাম উন্নয়নের জন্য এই পত্রিকা প্রকাশ তাহা সফল হইলে আমরা খুশী হইব। কৃষিমূলক রচনাগুলি সত্যই চমৎকার।

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

Micheal Madhu Sudan Datta's The Captive Ladie
রঙ্গিনী—কালীপদ গোবিন্দ পণ্ডিত।
Subhasism—Ramen De
Visvabharati News, Silver Jubilee Number 1957 Editor, Nripendra Ch. Bhattacharya.
The Hundred years of Indian struggle 1857-1957—Prof. Santosh Kumar Ray.
গল্প-সংগ্রহ—শ্রীসরলাবালা সরকার।
আকাশ বিহঙ্গী (নাটক)—অজিত গঙ্গোপাধ্যায়।
রাজগৃহের ইন্দ্রগুপ্ত—জনৈক উদাসীন।
অর্বাচি মঞ্জুষা—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য।
সমকালীন সাহিত্য—নারায়ণ চৌধুরী।
ইতিহাসের আলপনা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।
রত্ন-দীপ—শ্রীহরিদাস ঘোষ।
নব পত্রিকা—দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ
আগুনের পরশ—সুনীল দত্ত।
তাপসীর প্রেম—প্রভাত চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১ম ভাগ—ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাই।
আজব নগরী—শ্রীপান্থ।
অনেক সাগর পেরিয়ে—চিরিতা দেবী।
সমাজ ও ইতিহাস—সুশোভন সরকার।

হিন্দী ইংরেজি ও রাষ্ট্রভাষা *

আবু সয়ীদ আইয়ুব-দত্ত

হিন্দী বনাম ইংরেজি যে বিতর্ক চলেছে তার পরিধি সম্পর্কে কোনো পক্ষের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। আমাদের সংবিধান-পত্রে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হিন্দীকে কেন্দ্রীয় শাসনকার্যের এবং আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের ভাষারূপে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। অহিন্দী-ভাষীদের মধ্যে এতেই আপত্তি উঠেছে; হিন্দীভাষীদের এতেও মন উঠছে না। তাঁরা—অন্তত তাঁদের মধ্যে অনেক প্রোৎসাহী ব্যক্তিরা—চান শুধু সরকারী কাজ-কর্মে কেন, আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যাবতীয় ক্ষেত্রে ইংরেজির বর্তমান যে-আসন সেটা দখল করবে হিন্দী, হিন্দীকেই আমাদের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে, সমগ্র ভারতের একমাত্র জাতীয় ভাষা বলেও এই হিন্দীকেই মেনে নিতে হবে। বাংলা, মারাঠী, তামিল, তেলেগু যেন বিজাতীয় ভাষা। না 'বিজাতীয়' ঠিক বলা হয় নি, খুব নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিকতার ভান করে আমাদের অন্য সব জাতীয় ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা সংজ্ঞা দিয়ে কতকগুলি উপভাষা বা পল্লী অঞ্চলের মৌখিক বোলচালের ভাষার স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে প্রায়।

হিন্দী আমাদের 'জাতীয় ভাষা' অর্থাৎ একমাত্র জাতীয় ভাষা—এটা গায়ের জোরের কথা, স্পষ্টতই তথ্যের অপলাপ। উৎসাহের চোটে যাঁরা তথ্য আর কল্পনার ভেদ লোপ করে বসেননি তাঁরা বলবেন, আজ নয় বটে কিন্তু হবে একদিন। কেমন করে হবে? হিন্দী যদি ভারতবর্ষের অত্যধিকসংখ্যক লোকের, অন্তত অধিকাংশের ভাষা হোত, এবং তার চেয়েও বড় কথা, হিন্দীভাষীরা যদি ভারতময় সর্বত্র সমানে ছড়িয়ে ও মিলেমিশে থাকতেন তাহলেও একটা কথা ছিল। তাহলে আমরা আশা করতে পারতাম যে এদেশে হিন্দী একদিন তেমনি স্বাভাবিকভাবে সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষা হয়ে উঠবে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নানা ভাষা-ভাষীর সমাবেশ থাকলেও ইংরেজিই হয়ে উঠেছে তাদের সকলের একমাত্র জাতীয় ভাষা। কিন্তু এখানে অবস্থা প্রায় বিপরীত। হিন্দী-ভাষীদের সংখ্যা সমগ্র লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অধিক নয়, এবং তাঁদের পরিব্যাপ্তি দেশের উত্তর ও মধ্যভাগেই আবদ্ধ। পক্ষান্তরে, পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে অন্য কয়েকটি ভাষার স্বতন্ত্র বিস্তার, সংখ্যায় সে সব ভাষাভাষীরা পৃথকভাবে হিন্দীভাষীর তুল্য না হলেও তাদের সঙ্গে তুলনীয়, প্রকাশশক্তিতে ও সাহিত্যসম্পদে আমাদের একাধিক ভাষা হিন্দীর চেয়ে প্রাগ্রসর।

না, আমাদের 'জাতীয়' ভাষা হিন্দী এখন নয়, স্বাভাবিকভাবে ভবিষ্যতে হয়ে উঠবার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। তবু হিন্দীর পক্ষপাতীরা বলতে পারেন, আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টার দ্বারা সেটা সম্ভব করে তুলতে হবে। অর্থাৎ তথ্য নয়, ভবিষ্যদ্বাণী নয়, এ হল আমাদের সংকল্প। কিন্তু কেন এই সংকল্প এবং চেষ্টা? উত্তরে যে কথাটা সবচেয়ে আগে শোনা যায় আর সবচেয়ে জোরালো শোনায় তা এই। প্রায় হাজার বছর পর ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে আমরা আবার একটি স্বাধীন জাতিরূপে গড়ে উঠেছি, বিশ্বের দরবারে আমাদের অস্তিত্ব আবার সগৌরবে ঘোষণা করেছি। আমাদের এই নবলব্ধ স্বাধীনতার একাধারে ভিত্তি ও প্রতীক স্বরূপ একটি 'জাতীয় ভাষা' থাকা একান্ত আবশ্যক। হাজার বছর আগে এদেশের জাতীয় ভাষা ছিল সংস্কৃত; নানা কারণে আজ সংস্কৃত সে স্থান পুনর্রাধিকার করতে অক্ষম। বর্তমান কালের কোনো জীবিত এবং চলিত ভাষাকেই সে অধিকার দিতে হবে। কোনো একটি ভারতীয় ভাষাকে যদি সে অধিকার দেওয়া যায় তবে হিন্দীর দাবীই যে সর্বাগ্রগণ্য তাতে আর সন্দেহ কি। আমাদের সন্দেহ অধিকারীকে নিয়ে নয়, অধিকারের অস্তিত্ব নিয়েই।

জাতীয় সত্তার উপাদানে অনেকগুলি উপকরণ দেখা যায়—ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ইত্যাদি। তার কোনোটা মুখ্য কোনোটা বা গৌণ, কিন্তু কোনো উপকরণকেই অপরিহার্য বলা যায় না। ভাষাগত ঐক্য অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ, তবু তার অভাবে যে জাতীয় ঐক্য ভেঙে যাবে এমন নয়। চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি সুইট্জেরল্যাণ্ড, কানাডা, ইয়ুগোস্লাভিয়া তাদের জাতীয় ঐক্য দিব্যি গড়ে তুলেছে বটে না কিন্তু ভাষাকে 'জাতীয় ভাষা' বলে স্বীকার করে। বরঞ্চ কোনো একটি ভাষার প্রতি রাষ্ট্রীয় পক্ষপাত দেখাতে গেলেই তাদের জাতীয় সত্তা হত বিখণ্ডিত। এই সত্যটি আমাদের বেলা

---
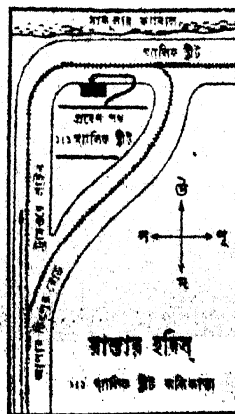
* এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ Hindusthan Standard পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

আরও প্রকট। তা ছাড়া ভারতভূমিকে আমরা মিলন-তীর্থ বলে বর্ণনা করি, এবং তাতে গৌরব বোধ করি। বিভেদ এমন কি বিপরীতকেও গ্রহণ করে আমাদের ঐক্যের সাধনা চলে আসছে, চলবে। আমরা কেন লজ্জা পাব একথা সবাইকে জানিয়ে দিতে যে আমাদের জাতীয় ভাষা একটি নয়, হিন্দী, তামিল, উড়িয়া, মারাঠী ইত্যাদি এই বারো-তেরোটি ভাষাই আমাদের জাতীয় ভাষা।

'জাতীয় ভাষার' সঙ্গে সঙ্গে বা তার বিকল্পে 'রাষ্ট্রভাষা' কথাটাও ইদানীং খুব শোনা যাচ্ছে। হিন্দী সম্পর্কে প্রযুক্ত এই উভয় বিশেষণ-পদেই এক বিশেষ মর্যাদা ও গৌরবের দাবী নিহিত রয়েছে। আমাদের সংবিধানপত্রে কিংবা ভাষা কমিশনের রিপোর্টে ঐ শব্দগুলি অবশ্য অনুপস্থিত, কিন্তু তার পৌনঃপুনিক বেসরকারী ব্যবহার পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রভাষা শুনলে সহজেই রাষ্ট্রধর্ম বা 'স্টেট রিলিজন'-এর কথা মনে আসে। এ-দেশে প্রচলিত পাঁচ ছয়টি ধর্মের মধ্যে কোনো ধর্মকেই 'রাষ্ট্রধর্ম' আখ্যায় বিভূষিত না করে আমাদের সংবিধানকর্তারা খুবই সদ্বুদ্ধি ও প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। কোনো একটি ধর্ম 'রাষ্ট্রধর্ম' অর্থাৎ রাষ্ট্রের দ্বারা বিশেষরূপে সম্মানিত বা রাজানুকূল্য-গর্বিত ধর্ম হলে স্বভাবতই অন্য ধর্মাবলম্বীরা নিজেদেরকে অবহেলিত এবং অবাঞ্ছিত জ্ঞান করতেন। 'রাষ্ট্রভাষা' কথাটাতেও এমনি এক পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং বহুভাষাবিশিষ্ট রাষ্ট্র। 'রাষ্ট্র-ধর্ম' বা 'রাষ্ট্রভাষা' পদগুলি এখানে অনর্থক বিপদ ডেকে আনবে, ঈর্ষা বিক্ষোভ ও অপ্রীতির ইন্ধন জোগাবে।

অবশ্য 'রাষ্ট্রভাষা' মানে যদি হয় কেবল সরকারী কাজকর্মের ভাষা, সে অন্য কথা। কিন্তু সে কথা আলোচনা করবার আগে স্বাধীন ভারতের ভাষা সমস্যাকে আরো একটু বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ফেলা যাক। মানুষের কাজকর্ম চলে ভাষার মাধ্যমে, কিন্তু কর্মজীবনের উপরেও তার একটা জীবন আছে যাকে তার মনোগত জীবন বলা যেতে পারে। সেখানেও ভাষার গুরুত্ব কিছু কম নয়, এবং সেখানেও স্বাধীনতা-লাভের পর কতকগুলো প্রশ্ন উঠেছে। আমাদের মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিদ্যানুশীলন, সাহিত্যসৃষ্টি, পৃথিবীর বিশেষত পাশ্চাত্যের প্রাগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও অন্যবিধ যোগরক্ষা—এসব ক্ষেত্রেও আমাদের ভাষাসমস্যার নতুন সমাধান খুঁজতে হচ্ছে। এতদিন ইংরেজিকেই আমরা খালে খোলে অম্বলে এবং সন্দেশেও লাগিয়ে এসেছি। কিন্তু চিরদিন তো তা চলে না, চলা উচিতও নয়। আমাদের ভাবতে হচ্ছে ইংরেজিকে সরাসরি বিদায় দেব, না কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজির উপকারিতা এখনও পুরোপুরি রয়েছে। ইংরেজি যদি যায় তবে তার শূন্য আসনের সবটুকু জুড়ে কি কোনো একটি ভারতীয় ভাষাকে বসানো যায়? আমাদের মাতৃভাষাও খুব বড় দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সে দাবী অবশ্য মেটাতে হবে, অথচ মাতৃভাষাকে দিয়ে আমাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটবে না। বাংলা কি তামিল তো আর কেন্দ্রীয় শাসনের ভাষা হতে পারে না।

নতুন যুগের নতুন আলো হাওয়া লেগে যে-সাহিত্যসৃষ্টির অনুপ্রেরণা জেগেছিল তার বাহন কী হবে এ নিয়ে মাইকেল মধুসূদনের সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভে একটি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। সে দ্বন্দ্বের মহৎ সমাধান মাইকেল স্বয়ং করে দিলেন বাংলায়

অমিত্রাক্ষর ছন্দে মহাকাব্য রচনা করে। তারপর থেকে মাতৃভাষাই সাহিত্যকর্মের একমাত্র মাধ্যম বলে গণ্য হয়ে আসছে—যদিও এক আধজন ভারতী আজো ইংরিজি ভাষাতেই আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজেন। এ'দের মধ্যে সবচেয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন আমাদের প্রতিভাবান প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। কিন্তু এ'রা নেহাৎই ব্যতিক্রম। সৃজনী সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা যে মাতৃভাষাতেই সম্ভব একথা এখন আর তর্ক-সাপেক্ষ নয়। তবে এও তর্কাতীত যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও চিন্তার রক্তপ্রবাহের সংগে ইংরিজি ভাষা আমাদের যে-নাড়ীর যোগ ঘটিয়েছিল তাকে ছিঁড়তে গেলে ভারতীয় সাহিত্যগুলি রক্তাল্পতা দোষে পাংশুবর্ণ হয়ে পড়বে। প্রাণে মরবে না হয়তো, হয়তো বা হেঁটেও চলতে পারবে, কিন্তু ছুটে চলবার বল আর থাকবে না তাদের দেহে।

মানবিক বিদ্যা বা হিউম্যানিটিজ্ এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্যের কাছে আমাদের ঋণ আরো অপরিমেয়। কিন্তু অতীতের ঋণস্বীকারের কথা শুধু এ নয়। বর্তমানকালে এগিয়ে চলতে হলে আমাদের বিদ্যানুরাগী ও বিদ্বানদেরকে সাহিত্যিকদের অপেক্ষাও তৎপর এবং তৎসাময়িক সম্বন্ধ রক্ষা করতে হবে পাশ্চাত্ত্য চিন্তার দ্রুত প্রবাহের সংগে। তাই ইংরেজি ভাষাচর্চার সংকোচন নয় সম্প্রসারণের কথাটাই বিবেচ্য। এ তো গেল আহরণের দিক। প্রকাশের দিকে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানীদের নিবন্ধ-রচনায় ভাষার স্থান খুবই সংকুচিত, তাতে বারো আনাই পারিভাষিক ও সংকেত নিয়ে কাজ। সুতরাং ইংরিজি-হিন্দী-মাতৃভাষার বিতর্ক সেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোনো ভাষাতেই লিখতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করবেন না কেউ। ঠিক ঠিক জায়গায় লেখাটা পৌঁছতে পারলেই হোল। ঐ ব্যাপারে অবশ্য ইংরেজির উপকারিতা অগ্রাহ্য করা যাবে না। কিন্তু মানবিক বিদ্যার বেলা, বিশেষত দার্শনিক ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে, মনের স্ফুরণ অনেকখানি ভাষা-নির্ভর। ভাষার নিগূঢ় বোধ এবং রচনা-শক্তির সহজ স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ মাতৃভাষার আশ্রয়—আজকে সম্ভব না হলেও দশবিশ বছর পর—আমাদের নিতেই হবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে সাহিত্যে, মানবিক বিদ্যায়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে, অর্থাৎ চিৎ-প্রকর্ষের সকল ক্ষেত্রে পথরেখা চিহ্নিত হয়ে উঠছে (এবং নিঃসন্দেহে তাই হওয়া উচিত) ইংরিজি ভাষা থেকে মাতৃভাষার দিকে—ইংরিজিকে সম্পূর্ণ বর্জন না করে অবশ্য। এসব বিভাগে হিন্দীর সার্থক ভূমিকা কেবল তাঁদের জন্যই যাঁদের মাতৃভাষা হিন্দী। অহিন্দীভাষীরা হিন্দীর কাছ থেকে পাওয়ার মত কিছু পেতেও পারেন না, হিন্দীকে দেবার মত কিছু দিতেও পারেন না।

শিক্ষার বাহনের প্রশ্নে মতভেদের অবকাশ আরো কম। ইস্কুলের শিক্ষা যে মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত এ আজ সর্ববাদী-স্বীকৃত। কালেজী শিক্ষার ব্যাপারেও অধিকাংশের মত তাই। কেউ কেউ অবশ্য (যেমন সরকারী ভাষা কমিশনের সদস্য শ্রী আর কে ত্রিপাঠী) বলছেন বটে যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাধ্যম হিন্দী হওয়া আবশ্যক, নইলে সমমান রক্ষা হবে না। শিক্ষার বাহন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সারগর্ভ প্রবন্ধগুলি আমাদের সকলের পড়া আছে। অন্তত বাঙালী পাঠককে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে, সর্বস্তরের শিক্ষা মাতৃভাষাতে না হলে চিত্তের পূর্ণ উন্মেষ এবং বিদ্যার সম্যক্ আত্মীকরণ সম্ভব নয়। তবু হয়ত আরও কিছুকাল আমাদের ইংরেজি ভাষার উপর নির্ভর করতে হবে—যতদিন না আবশ্যক পাঠ্যপুস্তক এবং বিবিধ বিষয়ে কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থাদি মাতৃভাষায় রচিত হচ্ছে। হিন্দীকে শিক্ষার বাহন করলে আমরা (অহিন্দীভাষীরা) ইংরেজির সমস্ত সুবিধাই হারাব, মাতৃভাষার কোনো সুবিধাই পাব না, এবং উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন অসুবিধার একত্রিত চাপে আমাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাকে বানচাল

ক'রে 'রাষ্ট্রভাষা'র ছত্রছায়াতলে সুখনিদ্রা দিতে পারব। বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে সম-মান রক্ষা করাটা এমন কিছু মহৎ কর্ম নয় যে তার দোহাই পেড়ে উচ্চ-শিক্ষার একেবারে গোড়ায় আঘাত করা যেতে পারে।

জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই পট-ভূমিকার উপর এবার সরকারী ভাষার প্রশ্নটাকে তুলে ধরা যাক। কোনো সন্দেহ নেই যে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান যত ঘুচবে, আমাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের রূপ ততই পরিস্ফুট হবে। সেজন্য রাজার ভাষা আর প্রজার ভাষা অভিন্ন হওয়াই বিধেয়। আমাদের বহুভাষী দেশে কেন্দ্রীয় সরকার এ নীতি পালন করতে পারেন না; কিন্তু রাজ্য সরকার পারেন কারণ রাজ্যগুলি মোটের উপর ভাষার ভিত্তিতেই গঠন করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ভাষা যে সেই রাজ্যের ভাষা হবে এ বিষয়ে সংবিধানে কোনো নির্দেশ না থাকলেও সুস্পষ্ট অনু-মোদন আছে। সদ্যপ্রকাশিত সরকারী ভাষা-কমিশনের রিপোর্টেও এর পক্ষেই রায় দেওয়া হয়েছে। অতএব এ সমস্যাটা নিয়ে নতুন করে ভাববার কিছু নেই। আমাদের ভাষা প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন এখনও তর্কসাপেক্ষ সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় শাসনকার্যের এবং কেন্দ্র-প্রান্ত যোগাযোগের ভাষার প্রশ্ন। এর দুটি উত্তর কার্যকরী বিবেচনার যোগ্য—হয় ইংরেজি ভাষা দিয়েই আমাদের কাজ চলবে, নয় তার স্থলে হিন্দীকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভারতবর্ষের সব ক'টি জাতীয় ভাষাকে সর্ব-ভারতীয় সরকারী ভাষা করতে পারলে গণ-তান্ত্রিক অধিকারের দিক থেকে সবচেয়ে সংগত হ'ত কিন্তু দিনানুদৈনিক শাসন-কার্যের প্রত্যেকটি সরকারী কাগজপত্র যুগপৎ বারোটি ভাষায় প্রস্তুত করার ব্যবহারিক অসুবিধা এত প্রচুর হবে যে, এই প্রস্তাবটির স্বপক্ষে অধিক যুক্তি বিস্তারে কেজো-বুদ্ধি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে।

ইংরেজি ভাষার উপর আমাদের রাগ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। ইংরেজি যে ইংরেজের ভাষা—সেই ইংরেজ যারা এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের উপর প্রভুত্ব করে গেছে। ঐ প্রভুদের দপ্তরে আমরা মুন্সী-মুহুরীর কাজ করব তাই তো আমাদের ইংরেজি শেখান হয়েছিল। আজ স্বাধীন ভারতের উচ্চতম রাষ্ট্রিক প্রয়োজন মেটাবে সেই ভাষা! কিন্তু ইতিমধ্যে ইতিহাসের অনেকগুলি পাতা উল্টে গেছে; এখনও কি আমরা আগের পাতার রাগটাকে পরের পাতায় টেনে চলব? রাগ জিনিসটা সর্বদাই হানিকর, আর শত্রু যখন সাতসমুদ্রপারে তখন পাত্রহীন রাগের ঘায়ে আমরা নিজেদেরই অঙ্গহানি করছি কিনা সেটা বুঝে দেখা দরকার। অবশ্য স্বদেশের কাজে বিদেশের ভাষা খামকা কেউ টেনে আনতে যায় না। কিন্তু আমরা যে দায়ে ঠেকেছি। দায় এই নয় যে, আমাদের নিজের বলতে কোনো ভাষা নেই; দায় এই যে, নিজের ভাষা একটি নয়, একডজন। এদের মধ্যে কোনো একটিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা করতে গেলে সেই ভাষা যাঁদের মাতৃভাষা তাঁদের অযথা অনেকগুলি সুবিধা করে দেওয়া হয়, আর অন্য ভাষা-ভাষীদের জন্য বিনা পাপেই গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা। এহেন সংকটে উভয় সংকট নয়, দ্বাদশ সংকটে যদি ইংরেজি ভাষাতে কেন্দ্রীয় দপ্তরের কাজ চালিয়ে যেতে পারি তবে তাতে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে? শুধু বিদেশী বলেই কি বর্জনীয়? কিন্তু ভাষা কমিশনের হিন্দী পক্ষের সভ্যরা পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন: "ইংরেজি ভাষা বিদেশী বলেই অগ্রাহ্য হতে পারে না। আমরা স্বীকার করি যে, কোনো ভাষা কোনো জাতি-বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়; ভাষা তাদেরই যারা সে ভাষার সদ্ব্যবহার করতে পারে।" আর এমন তো নয় যে শুধু সরকারী কাজকর্মের জন্যই ইংরেজি শিখতে হচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে যে, ইংরেজি শিক্ষার দ্বার দেশের মহত্তর প্রয়োজনের তাগিদেই আমাদের অবারিত রাখতে হবে। সেই প্রয়োজন সাধনের উপরি-পাওনা হিসেবে যদি কেন্দ্রীয় সরকারী কাজও চলে তবে ভারতবর্ষের দুই-তৃতীয়াংশের উপর অতিরিক্ত একটি ভাষা চাপান কেন?

ইংরেজির বিরুদ্ধে আমাদের যে আপত্তি সেটা যুক্তিপ্রসূত নয়, চোদ্দ আনাই সংস্কারগত বা আবেগজনিত। তার আলো-চনায় অধিক সময় নষ্ট না করে বরং হিন্দীর স্বপক্ষের যুক্তিগুলি বিচার করে দেখা যাক। সম্ভবত সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে, হিন্দী এদেশেরই ভাষা এবং এক-তৃতীয়াংশের মাতৃভাষা। যাঁদের মাতৃভাষা নয় তাঁদের মধ্যেও হিন্দীর অল্পবিস্তর চল আছে, "টুটীফুটী" হিন্দীতে কাজ চালিয়ে নিতে পারেন অনেকেই। একথা ঠিক যে, কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত না হলেও তার একটু আগে অবধি একপ্রকার ছন্নছাড়া ব্যাকরণ-ভাঙা শ' দুই শব্দ সম্বল মাত্র একটি ভাষা চলতি আছে যাকে হিন্দুস্থানী বলা হয়ে থাকে। আসলে কিন্তু তাকে লক্ষ্ণৌ-দিল্লী অঞ্চলের আচারনিষ্ঠা কৌলিন্যাভিমানিনী খড়ীবোলী হিন্দীর অপভ্রংশ বলেও বেশি বলা হয়; সেটা কোনো ভাষাই নয়, ভাষার ভেংচিকাটা মাত্র। যে-ভাষায় আইন কানুন ও সংবিধান রচিত হবে, প্রতিবেদন এবং প্রত্যাদেশ লিপিবদ্ধ হবে, হাইকোর্টে জজ রায় শোনাবেন, লোকসভায় রাজ্যসভায় রাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ে শাণিত শোভিত এবং সাবধানী বাক্য বিস্তার হবে—তাকে ঐ অপভাষার সমগোত্রে ভাবতে গেলে কষ্টকল্পনাও ফেল মারবে।

যে-হিন্দী সরকারী ভাষা হবে অহিন্দীভাষী সবাইকে তা শিখতে হবে বহু বৎসর ব্যাকরণ মুখস্থ করে অভিধানে মাথা কুটে মরে। এ অধ্যায়ে লিঙ্গ-বিভ্রাট ঠেকাব এবং অন্যান্য বিভক্তি (যথা ক্রিয়াবিভক্তি)। তারই [illegible] এর নিয়ম ও ব্যতিক্রমের গোলক ধাঁধায় বহুদিন ঘুরেও "রাস্তে মে বড়ী লম্বী লাড়ী খড়ী হৈ" কিংবা "নির্মলাসে বড়া সুন্দর দুপট্টা ওড়া থা" দুরস্ত করে বলতে গিয়ে আমাদের বার কয়েক ঢোক গিলতে হবে। অনেক বছর বাধ্যতামূলক হিন্দী শিক্ষার পরও উত্তর ভারতে পা বাড়ালেই পদে পদে শুনতে পাব "আপ হিন্দী বোলতে হৈঁ য়া হিন্দীকী টাঁগ তোড়তে হৈঁ!" অথবা মাতৃভাষা-ভিমানীদের সৌজন্যপূর্ণ সাধুবাদ এবং অনতিগুপ্ত কৃপাকণা কুড়িয়ে আমাদের দীর্ঘ পরিশ্রমকে সার্থক জ্ঞান করব আমরা। ভাষাশিক্ষায় বিশেষ প্রতিভা আছে যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের তাঁদের কথা অবশ্য আলাদা। সুশিক্ষিত 'অহ্‌লে জবানদের' হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর বাঁকাপন্ আর নজাকত্ আমার প্রশংসা জাগায়, কিন্তু তা নির্ভর করে এমন সব সূক্ষ্ম ও বিশিষ্ট প্রয়োগরীতির উপর যা বিভাষীরা দুচার বছরের চেষ্টায় আয়ত্ত করতে পারবেন—এমন আশার ছলনে যেন তাঁরা না ভোলেন।

হিন্দী রাজভাষারূপে বৃত হলে অহিন্দী-ভাষীরা যে কেবল কর্ম জীবনে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করবেন তাই নয়, জীবনযাত্রা তাঁদের আরম্ভই হবে স্বল্পতর পাথেয় হাতে

নিয়ে। যেখানে হিন্দীভাষীরা দুটি ভাষার সহায়তায়ই (হিন্দী ও ইংরেজি) তাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারবেন সেখানে বেচারী অহিন্দীভাষীর ছাত্রজীবনকে তিনটি ভাষার বোঝা পঙ্গু করে রাখবে। মনে রাখা দরকার যে যেমন তেমন করে হিন্দী শিখলে চলবে না, সে ভাষার উপর উত্তমরূপ দখল থাকা অত্যাবশ্যক হবে, কারণ প্রতিযোগীদের মধ্যে অনেকের মাতৃভাষা হবে হিন্দী। আর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রও দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, যেহেতু সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সংখ্যা এবং তাদের জীবনের বিরাট অংশ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও পরিচালনার (অর্থাৎ যে সরকারের) অধীনে এসে পড়ছে।

অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে এ অসহনীয় অসমতা দূর করবার জন্য কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন হিন্দীভাষী ছাত্রদেরও অন্য একটি ভারতীয় ভাষা শিখতে বাধ্য করা হোক। ভাষা কমিশনের অধিকাংশ সদস্য অবশ্য এতে আপত্তি জানিয়েছেন। বলেছেন, অহিন্দীভাষী ছাত্রদের পক্ষে হিন্দী তো বিঘ্ন নয়, সুযোগ; হিন্দী শিখলে কত সুবিধে তাদের! কিন্তু হিন্দীভাষী ছাত্ররা আর একটা ভারতীয় ভাষা শিখতে যাবে কিসের গরজে? এই বোঝা তাদের উপর চাপান যায় না, স্বেচ্ছায় তারা শিখতে চায় শিখুক। চমৎকার যুক্তি! এ যুক্তি আশা করি পার্লামেণ্ট অগ্রাহ্য করবেন—যদি অবশ্য সাম্য ও সৌভ্রাত্রের সমস্ত অর্থ তাঁদের পক্ষে ইতিমধ্যে অনধিগম্য না হয়ে গিয়ে থাকে। তবে ভেবে দেখা উচিত সকল ছাত্রের উপর তিনটে (সংস্কৃত অবশ্য-শিক্ষণীয় হলে চারটে) ভাষার বোঝা চাপিয়ে তাদের শিক্ষাকে পঙ্গু করে রাখা কি বাঞ্ছনীয়? এতগুলি ভাষা শিখবার পর অন্য কিছু শিখবার সময় ও শক্তি কি তাদের অবশিষ্ট থাকবে?

সম্প্রতি অনেকে বলতে শুরু করেছেন যে ইংরেজির দ্বারা গণসংযোগ (mass communication) সম্ভব নয়, তাই গণতন্ত্রের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ইংরেজিকে সরকারী ভাষা করা যায় না। যদি গণসংযোগ মানে হয় জনগণের সঙ্গে গণনায়ক এবং রাজপুরুষদের সংযোগ তবে ইংরেজির অসুবিধা স্বীকার করি। কিন্তু হিন্দীকে রাজভাষা করলেই বা কোন সুবিধা হবে? অসমীয়া মালয়ালী, মহারাষ্ট্রীয় জনগণের সঙ্গে যদি নেতৃবৃন্দ এবং কর্তৃপক্ষরা আত্মীয়তা স্থাপন করতে চান তবে তাঁদের দয়া করে অসমীয়া, মালয়ালম, মারাঠী ভাষাতেই কথাবার্তা কইতে হবে, বক্তৃতা করতে হবে, পত্রিকা পত্রিকা প্রকাশ করাতে হবে। কোটি কোটি নিরক্ষর সাধারণ তাঁদের মাতৃভাষা ছেড়ে যা তদুপরি আর একটা ভাষা শিখবেন কয়েক হাজার বহুব্যয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত উপর-ওয়ালাদের সুবিধার জন্য—এ যে বড় অকরুণ বিধান! শুধু অকরুণ নয়, অবাস্তবও বটে। যে দেশে আরও কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কল্পিত ও অনুষ্ঠিত হবার পরও জনসাধারণের শুধুমাত্র মাতৃভাষারও অক্ষর পরিচয় হবে কি না ঈশ্বর জানেন, সে দেশে সবাই একটি অতিরিক্ত অপেক্ষাকৃত দুরূহ ভাষাও শিখে ফেলবে কেবল গণ-সংযোগের মন্ত্রোচ্চারণে—এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম!

আর গণসংযোগ মানে যদি হয় জনগণের পরস্পর যোগ, তবে কি সরকার বিনা ভাড়াতে রেলের টিকিট বিতরণ করবার কথা ভাবছেন? যাদের আমরা ম্যাসেস্ বলে থাকি তারা লাখে লাখে দেশভ্রমণ করতে বা স্বদেশবাসীর তত্ত্বতাবাস নিতে বাংলা

থেকে মহীশূর কিংবা গুজরাত থেকে উড়িষ্যায় ঘুরে বেড়ায় না। অল্প সংখ্যক যাঁরা তীর্থ করতে বা জীবিকার অন্বেষণে বেরোন তাঁরা ভাঙাচোরা হিন্দীতেই কিংবা যেখানে গিয়ে বসবাস করবেন সেখানকার বুলি অল্পস্বল্প রপ্ত করে একরকম কাজ চালিয়ে নেন। এরজন্য পঁয়ত্রিশ কোটি লোককে আট বছর ধরে বাধ্যতামূলক হিন্দীশিক্ষা দেবার ফরমানটা একটু তুগলকশাহী শোনায় বই কি।

হিন্দীর সমর্থনে বামপন্থীরা যে যুক্তির উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেন সেটা হিন্দীর পক্ষে ততটা নয় যতটা ইংরেজির বিপক্ষে। অহিন্দীভাষী প্রাচীনপন্থীদের মধ্যেও হিন্দীর পক্ষপাতিত্ব ইংরেজি-বিরোধিতার প্রকারভেদ। এ'দের আপত্তি যে ইংরেজি শিখে আমাদের ছেলেরা স্বজাতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়, দেবদ্বিজে ভক্তি হারায়, ইত্যাদি। একই উদ্দেশ্যে বামপন্থীরা ভিন্ন কথা বলেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে যাঁরা ইংরেজি ভাষা তথা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ভাবধারার সবিশেষ অনুশীলন করেন তাঁরা নিজেদেরকে একটি অভিজাত বা বিদগ্ধ সম্প্রদায় বলে ভাবতে শেখেন, তাঁদের সঙ্গে ইংরেজি না-জানা আপামর সাধারণের মনের অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটে যায়। কেন্দ্রীয় শাসনের ভাষা ইংরেজি থাকলে এরাই সরকারী উচ্চ পদগুলি দখল করে বসবেন, অথচ দেশের লোকের সঙ্গে এ'দের যোগ কতটুকু। এ'রা দেশের সেবক হবেন না, প্রভু হয়েই বিরাজ করবেন।

এর উত্তরে কয়েকটি কথা বলার আছে। প্রথমত, যাঁরা ইংরেজির বিরুদ্ধে এই ধরণের যুক্তি প্রয়োগ করেন তাঁরা অন্ততঃ প্রকাশ্যে সরকারী দপ্তর থেকেই ঐ ভাষাটাকে তাড়াতে চান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে নয়। কিন্তু সে অবস্থায় ইংরেজি-শিক্ষিত বিদগ্ধ গোষ্ঠী বহাল তবিয়তেই থাকবেন, যে ব্যাপারটা নিয়ে আপত্তি তার তো কোনো সুরাহা হবে না। নাকি পূর্বোক্ত যুক্তিকারীদের প্রস্তাব এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি শেখানো চলবে বটে কিন্তু যাঁরা ইংরেজি ভালমত শিখবেন তাঁরা কোনো সরকারী চাকরী অন্তত কোনো উচ্চ পদ পাবেন না—অন্য সব যোগ্যতা থাকলেও? স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই বোধ হয় যে গোখলে গান্ধী নেহরু, চিত্তরঞ্জন—এ'রা সবাই ইংরেজি ভাষা ও ভাবধারার সঙ্গে খুবই পরিচিত ছিলেন, অথচ তার ফলে তো এ'রা দেশের লোকের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন নি, দেশসেবার যোগ্যতাও হারাননি।

দ্বিতীয়ত, ইংরেজির বদলে হিন্দী ভাষায় পারদর্শী হবেন যাঁরা তাঁরা কেমন করে শুধু ঐ ভাষার জোরে তামিল তাঁতী বা উড়িয়া চাষীর মনের খুব কাছাকাছি এসে পড়বেন তা বোঝা গেল না। তামিল বা উড়িয়া ভাষার মাধ্যমেই সেটা সম্ভব, কিন্তু তাহলে ইংরেজি শেখাটা অন্তরায় এবং হিন্দী জানাটা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহাস্ত্র বলে প্রতিপন্ন হল কি? আর তাছাড়া হিন্দী সরকারী ভাষা হলে হিন্দী অঞ্চলের বাইরে হিন্দীতে সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও এক সর্বশ্রেষ্ঠ বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী বা 'এলীট' শ্রেণীতে স্বচ্ছন্দে পরিণত হবেন, কারণ সেখানকার জনসাধারণ তো আর হিন্দী জবানে ফর ফর করে বার্তালাপ করতে পারবেন না।

তৃতীয়ত, ইংরেজ আমলে, বিশেষতঃ অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে, ইংরেজি-পড়া দেশী কর্মচারীরাও শ্বেতকায় রাজপুরুষদের ছত্রচ্ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেশের লোকের কাছে অহেতুক সম্ভ্রম পেতেন, এবং ইংরেজি-না-জানা মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করতেন না। এ সব গ্লানিকর সত্য কিন্তু আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। নিছক ইংরেজি বুলি ঝেড়ে—সে যত বাঁকা উচ্চারণেই হোক—আজকের দিনে সম্মান দাবী করতে গেলে অপমানিতই হতে হয়। বিদেশী ভাষা-শিক্ষার যেটুকু কদর আছে তা ইংরেজি-জার্মান-রুশ-চীন নির্বিশেষেই আছে। তবে একথা সত্য যে রাজকার্যের ঊর্ধ্বস্তরে উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিরাই অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন। এবং উচ্চ-শিক্ষা সারা পৃথিবীতে এক নতুন ধরনের শ্রেণীভেদ তথা এক নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। পূর্বে এই শ্রেণী ধনিক শ্রেণীরই অন্তর্গত ছিল; ইদানিং তাতে সব অর্থনৈতিক শ্রেণীর সমাবেশ দেখা যায়—মধ্যবিত্তদেরই অবশ্য সর্বাধিক। এ'রা অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকের সঙ্গে (কোর্ট-পাত-নিষ্কপর্দক নির্বিশেষে) সহজে মেলামেশা করতে পারেন না, একটু দূরত্ব রক্ষা করে চলেন, নিজেদের অনন্যসাধারণত্বে অভিমানী। সমাজের কাছ থেকে কিছু

মান-মর্যাদা এ'রা পেয়েও থাকেন, এবং সে মর্যাদা উচ্চ বর্ণের বা উচ্চ পদের মর্যাদার মত একেবারে অপ্রাপ্য বা নিরর্থক নয়।

অন্যান্য শ্রেণীভেদের মত এ শ্রেণীভেদও বিদূরিত হওয়া নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। অথচ সমাজের শতকরা একশ' জনই যথার্থ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হবেন এ আশা দুরাশা, দু এক শতাব্দীর মধ্যে হতে পারবেন এটা দিবাস্বপ্ন। আমরা বরঞ্চ আশু প্রত্যাশা রাখতে পারি যে বিভেদটা উপরের দিক থেকে ঘুচবে, উচ্চশিক্ষিতেরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান ত্যাগ করবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রকৃত জ্ঞানী যাঁরা তাঁদের অহংকারবোধ নেই, আকাশ ছুঁয়েও তাঁরা মাটির মানুষ। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য সব ক্ষেত্রে এ বিশ্বাসের অনুকূল নয়। এ শ্রেণীভেদের সমস্যা সর্বদেশকালের সমস্যা। এর সমাধান অর্থনৈতিক পরিবর্তনে কিছু দূর, চারিত্রনৈতিক পরিবর্তনে আরও অনেক দূর পর্যন্ত সম্ভব। পূর্ণ নিরাকরণ কিসে হতে পারে, আদৌ হতে পারে কি না, জানি না। এটুকু জানি যে উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতি অভিমানী 'এলীট' সমস্যার কোনো সমাধান হিন্দী বনাম ইংরেজি বিতর্কে খুঁজতে যাওয়া নিতান্ত পণ্ডশ্রম।

সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই। যে ভাষাগুলি আমাদের দেশের বহুসংখ্যক লোকের মাতৃভাষা (সংবিধানে লেঙ্গুয়েজেস্ অব্ ইণ্ডিয়া শীর্ষে যার তালিকা দেওয়া হয়েছে) তার প্রত্যেকটি ভাষাই আমাদের জাতীয় ভাষা। এদের মধ্যে কোন একটিকে 'রাষ্ট্রভাষা' নামে অভিহিত করে সকলের ঊর্ধ্বে কোনো রাজাসনে বসান যায় না; এক শ্রেণীর নাগরিককে শুধু বিশেষ এক অঞ্চলে তাঁদের জন্ম বলে অতিরিক্ত কোনো ক্ষমতা বা সুবিধা দেওয়া যায় না। দিলে আমাদের সংবিধানস্বীকৃত অধিকার-সাম্য বিধ্বস্ত হবে। সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা হতেই পারে না—শিক্ষার উপরের স্তরে ইংরেজি থেকে মাতৃভাষায় রূপান্তর কিছু সময়-সাপেক্ষ হলেও অবধারিত। রাজ্য সরকারের ভাষা সেই রাজ্যের ভাষাই হবে এই স্বাভাবিক নীতিটাও এখন প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেওয়া হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার অঙ্গরূপে (মাধ্যমরূপে নয়) ইংরেজির চর্চা সর্বদিক দিয়ে বাঞ্ছনীয় যখন তখন সেইসঙ্গে ইংরেজি যদি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্যের ভাষাও থাকে তাহলে সুবিধা অনেক। দুটি বড় সুবিধা এই: তাতে করে সমস্ত নাগরিকের অধিকারসাম্য রক্ষিত হয়, এবং দেশের দুই-তৃতীয়াংশ লোক অতিরিক্ত একটি ভাষাশিক্ষার ক্ষয়কারী পরিশ্রম থেকে বাঁচে। সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই যে একটি বিদেশী ভাষাকে সরকারী ভাষা করলে আমাদের সদ্যপ্রস্ফুটিত জাতীয়তার তীব্র অভিমান খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়। এই ভাবাবেগের কাছে যদি মাথা নত করতেই হয় তবে হিন্দী এবং ইংরেজি উভয় ভাষাকেই কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা করা যেতে পারে। তাতে এইটুকু রক্ষা যে অহিন্দীভাষীদের কেবল শুনে বা পড়ে বোঝবার মত হিন্দী শিখলেই চলবে। সরকারী এবং অন্যান্য কাজে কিছু লিখতে বা বলতে হলে তাঁরা ইংরেজি ভাষাই ব্যবহার করতে পারবেন (মাতৃভাষায় যেখানে কাজ চলে না)। হিন্দীভাষীদের পক্ষে ব্যবস্থা ঠিক উল্টো হবে। এটা সবাই জানেন যে কোনো পরভাষা ঠিকমত বলতে বা লিখতে হলে যতটা শিখতে হয়, তার সিকি ভাগের কম শিখলেই সে ভাষা বোঝা যায়। আমাদের পক্ষে শুধু বোঝবার মত হিন্দীশেখার একটু সুবিধাও আছে, কারণ হিন্দী ভাষা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মত সংস্কৃতজ বলে তার অনেকগুলি শব্দ অহিন্দীভাষীদের জানা থাকবে। এবং হিন্দীভাষার লিঙ্গপীড়িত ব্যাকরণ, তার সূক্ষ্ম ও বিপুল ইডিয়মের ভাণ্ডার বিবেকসম্পন্ন বিভাষী বক্তা বা লেখকের সামনে যে বিভীষিকা রচনা করে, শুধুমাত্র বোদ্ধার কাছে তেমন কিছুই করে না।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

এ ক্লান্তি করে না কোনো কান্নার উদ্বোধ
অন্য এক বোধ
আছে এর গভীর শিকড়ে
যা কেবল ক্লান্ত করে, খালি ক্লান্ত করে।

রোদের প্রহরে
এই ক্লান্তি দিকে দিকে ঝরে।
এই ক্লান্তি রাতের শিয়রে
জগৎ ঘুমায় তবু জেগে থাকে অনিমীল একা।
প্রত্যূষে মেললে চোখ হয়ে যায় মুখোমুখি দেখা।

গীর্জার গম্বুজে মধ্যরাতে বাজে ঘড়ি
এই ক্লান্তি বিশ্রামের নিদ্রার প্রহরী
নিশীথে নিদ্রার আগে
শয়ন কক্ষের যেই বন্ধ হয় দ্বার
এই ক্লান্তি হয়ে ওঠে ঘরজোড়া ক্ষুব্ধ অন্ধকার।
বুকের ওপর নিয়ে শ্বাসরোধী ভার
চেপে থাকে বসে
স্বপ্নের যেটুকু সুধা তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে একা শোষে।

টেবিলে যখন বসি সাহিত্যমননে
মুখোমুখি সেও থাকে একা গৃহকোণে
অসীম বিদ্বেষ নিয়ে শকুনের মতো চোখ
একদৃষ্টে বিতৃষ্ণা ছড়ায়—
ভাবনার খেই ছেঁড়ে, কর্মহীনতায় সারা দুপুর গড়ায়।

বক্ষোলগ্ন কাঁটা তবু ফেলে দিতে পারি
কেবল পারি না একে—এই ক্লান্তি মর্মকোষে মূর্ত মহামারী।
আলিঙ্গনার্পিত শত্রু—এই ক্লান্তি উন্মাদিনী নারী।

প্রণয়-বিমুখ এর সর্বনাশা গাঢ় আলিঙ্গন-
নষ্ট করে সকালের বিকালের দুপুরের
নিশীথের কর্মময় ক্ষণ।

চাই না তবুও চাই যতো ঘৃণা করি
যে-ঘৃণার শেষ নাই তবু তাকে নিত্য বুকে ধরি;
বাধার নেশার মতো হারাবার ভয় নিয়ে বুকে
প্রতীক্ষা প্রহরগুলি সে-ঘৃণার্হ প্রণয়ের ভীষণ কৌতুকে।
স্বপ্নেরো সংবিতে ঠিক অনুভব করে নিতে পারি—
এই ক্লান্তি নিশীথের ক্ষুব্ধ অন্ধকার,
তিমিরে উৎকীর্ণ মূর্তি অমেয় ক্ষুধার;
এই ক্লান্তি মর্মকোষে মূর্ত মহামারী!
উন্মুক্ত খড়্গের মতো রক্ত-মাখা ভয়
কখনো কখনো একে যেন মনে হয়।
মাদকের পূর্ণ পাত্র নিয়ে ভরে নিয়ে আসে যে-কিশোর সাকী
সমরাই নিয়ে তাকে ক্লান্তি বলে জানি।
পাপের শয্যার প্রান্তে তিমির-মোহিনী
কোনো বিবসনা নারী—
সে-বেশেও পাই তাকে; কতো নৈশ প্রান্তরের
অন্তরে একাকী
দীপালোকহীন পায়ে বিচরণ করে—
যতো কালো হাওয়া সব তারার আগুন হাতে ঝরে!
অন্ধকার চিরে-চিরে ক্লান্তি বলে—
দ্যাখো এও চেহারা আমারি!
কিংবা বক্ষোলগ্ন কোনো রক্তাক্ত কণ্টক
কিংবা তীব্রক্ষুধা-ভরা হিংস্র দুটি শকুনের চোখ
হতে পারে এই ক্লান্তি হাহা-করা প্রাণেরও বিক্ষোভ—
নির্নিমেষনির্দেশে যাকে নিত্য বুকে ধরি!
তবুও যা কিছু থাকে মনের প্রাণের,
তবুও যা কিছু থাকে সোনা ধানের,
সব দিয়ে পাত্র তার ভরি।
তবুও পীড়ন চলে, আরো চায় উদরম্ভরি।

ট্র্যাজেডি

মানিক মুখোপাধ্যায়

কিছুতে চোখের আয়নায় দেখে
ভরলো না এই মন,
কলকাতা পুরী সিমলা শিলঙ্
তাই খুঁজলাম তাকে;
আজকে অনেক রোদ্দুরে পুড়ে
নিভে গেছে সব রঙ্
শুনলাম শেষে সেই মেয়ে নাকি
হ্যারিসন রোডে থাকে।

॥ ফেনার ব্রকওয়ে ॥

শিবনারায়ণ রায়

"এসো, এসো", পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল লবীতে ঢুকতেই শুভ্রকেশ দীর্ঘকায় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে হাত ধরলেন, "তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। তোমার পিতাকে আমি বিশেষভাবে চিনতাম এবং শ্রদ্ধা করতাম। তুমি কি ইংল্যাণ্ডে এই প্রথম এলে না আগেও এসেছ?"

আমি একটু বোকা বনে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এঁর নাম ফেনার ব্রকওয়ে, পার্লামেণ্টের অনেকদিনের সদস্য, যতদূর মনে পড়ছে হ্যারো অঞ্চলের প্রতিনিধি। ভারতবর্ষে যাঁরাই একটু আধটু রাজনীতির খবর জানেন, তাঁরাই সম্ভবত এঁর নাম শুনে থাকবেন। যেসব ইংরেজের গুণে ভারতবর্ষ এতদিন শাসন করার পরও ইংরেজজাতের উপরে ভারতবাসীর আস্থা আজও একেবারে লোপ পায়নি, ইনি তাঁদেরই একজন। ছাত্রাবস্থায় এঁর অনেক বক্তৃতা কাগজে পড়েছি, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি এঁর অনুরাগ এবং সমর্থনের কথা শুনেছি। কিন্তু ইনি আমার বাবাকে কি করে চিনলেন? তিনি তো কখনও রাজনীতিও করেন নি, বিলেতেও আসেন নি। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য এবং হিন্দু দর্শনের অধ্যাপক। হিলেব্রান্ট, লেভি প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল জানি, কিন্তু বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা ফেনার ব্রকওয়ের সঙ্গে?

আমি একটু আমতা আমতা করে বললাম, "বাবা তো কখনও এদেশে আসেন নি।" ব্রকওয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, "তা জানি। তাঁর সঙ্গে আমার যখন প্রথম আলাপ, তখন তিনি ইয়োরোপে, সম্ভবত জার্মানীতে। ইণ্টারন্যাশনালের সঙ্গে তখনই তাঁর বিরোধের শুরু হয়েছে। অবশ্য যে কালে তিনি কম্যুনিস্ট, আন্তর্জাতিকের একজন পাণ্ডা ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়া শক্ত ছিল। এবং তিনি ভারতবর্ষে ফিরে যাবার পরও তাঁর সঙ্গে আমার আর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিশেষ ছিল না। কিন্তু তাঁর লেখা আমি নিয়মিত পড়ে এসেছি, বিশেষ করে যুদ্ধের পরে তাঁর লেখাগুলি। তাঁর মৃত্যুতে শুধু ভারতবর্ষেরই ক্ষতি হয়নি, সারা পৃথিবীর গণতন্ত্রী আন্দোলনেরই ক্ষতি হয়েছে।"

ব্যাপারটা বোঝা গেল। আরো অনেক বিদেশীর মত ব্রকওয়ে আমাকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সন্তান বলে মনে করেছেন। কারণ আমার উপাধিও রায়, এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা "র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট" তাঁর পত্নী শ্রীযুক্তা এলেন রায়ের সঙ্গে যুক্তভাবে আমি সম্পাদনা করে আসছি। সসংকোচে স্বীকার করতে হল, আমি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বহু সহকর্মীর একজন মাত্র, এবং মানবেন্দ্রনাথ আত্মগোপনের জন্য রায় উপাধি গ্রহণ করে ছিলেন, নইলে তাঁর আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ব্রকওয়ে মনে হল কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হলেন। মুখে হেসে বললেন, "কি কাণ্ড, তাইতো, এম এন রায়ের ছেলের কথা ত কখনও শুনিনি। অথচ চিঠিতে তোমার নাম দেখে ধরে নিয়েছি তুমি তাঁরই ছেলে।"

আমরা নিচে নেমে গিয়ে ছোট একটা ঘরে বসলাম। পার্লামেণ্টের এ অংশটা গত যুদ্ধের সময় বোমা পড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, পরে আবার গাঁথা হয়েছে নতুন মশলায়, কিন্তু পুরোনো ঢঙে। "আমাদের কাজ করার জন্যে ব্যক্তিগত কামরার ব্যবস্থা নেই", ব্রকওয়ে পাইপ ধরিয়ে বললেন, "এই দেখ করিডরে টেবিল ফেলে আমি আর আমার সেক্রেটারী কাজ করি। আজ থেকে পার্লামেণ্ট ইস্টারের জন্যে বন্ধ থাকবে, নয়তো এঘরে বসার জায়গা মিলত না। এই সুযোগে বসে একটু আলাপ করা যাক, পরে একসময়ে তোমাকে পার্লামেণ্টটা ঘুরিয়ে দেখানো যাবে।"

আমি বললাম, "দেখুন, আপনি ব্যস্ত মানুষ, সুতরাং সময় নষ্ট না করে যে কারণে আপনার সঙ্গে দেখা করা সে কথাই বলি। যে গণতান্ত্রিক সভ্যতা গত কয়েক'শ বছর ধরে পশ্চিম ইয়োরোপে গড়ে উঠেছিল, আজ তার বনিয়াদ সর্বত্র টলমল করছে। ইংরেজের মারফৎ এই সভ্যতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছিল, তার কিছুটা আমরা গ্রহণও করেছি। কিন্তু সে গ্রহণে আমাদের দ্বিধার

শেষ নেই, দ্বিধার কারণও অনেক। এধারে মনে হচ্ছে ইয়োরোপও যেন সে সভ্যতায় আস্থা হারাতে বসেছে। অথচ তার বিকল্প হিসেবে কোন প্রকৃষ্টতর সভ্যতারও তো আভাস দেখা যাচ্ছে না। এ নিয়ে ভারতবর্ষে আমরা কিছু কিছু ভেবেছি, আমাদের মানবতন্ত্রী চিন্তা এবং আন্দোলনের কিছু খবর আপনিও রাখেন। আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি, আধুনিক সভ্যতার এই সংকট নিয়ে আপনারা অর্থাৎ বিলেতের গণতন্ত্রীরা কি ভাবছেন, কি করছেন?"

"আমরা যে খুব একটা কিছু করছি বা ভাবছি, একথা তোমাকে বলতে পারলে খুবই খুসি হতাম", ব্রকওয়ে মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে বললেন। "সত্যি বলতে কি আমরা দার্শনিক চিন্তায় অনভ্যস্ত। আমাদের ভাবনা চিন্তা বড্ড বেশি স্থূলে, বড্ড বেশি ব্যবহারিক। আমাদের পণ্ডিতরা পর্যন্ত নাকের ডগা ছাড়িয়ে বেশিদূর দেখতে রাজী নয়। আর যারা সাধারণ লোক তাদের একমাত্র চিন্তা কি করে আরেকটু মাইনে মজুরী বাড়বে, আরো সস্তায় জিনিসপত্র পাওয়া যাবে। সংস্কৃতির সংকট, নতুন আদর্শ, জীবনদর্শন—এসব কথা এদেশের লোকে কল্পনা-বিলাস ভাবে।"

"তবে কি ব্রিটেনের দশাও রোমের মতন হবে? যতদিন সাম্রাজ্য ছিল, ততদিনই তার প্রভাব, সাম্রাজ্য বিহনে তার স্মৃতি ছাড়া কিছুই সম্বল থাকবে না?"

"ঠিক তা নয়, আমরা চেষ্টা করছি আমাদের সমাজকে নতুন ক'রে গড়ে তুলতে। কিন্তু এটা তো স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, ব্রিটেন আজ আর বিশ্বসভ্যতার কেন্দ্র নয়। এতদিন যে সভ্যতা ইয়োরোপে গড়ে উঠেছিল, পৃথিবীময় তার প্রসারে আমরাই ছিলাম তার প্রধান ধারক এবং কর্মী। আজ আমরা যাই গড়ে তুলি, পৃথিবীর অন্য দেশ তাকে অনায়াসে অবহেলা করতে পারে।"

"একদিক থেকে সেটা কি আপনার ভাল বলে মনে হয় না? জোর করে যা চাপানো হয়, তা বড় একটা শেকড় গাড়ে না। তাছাড়া, গণতান্ত্রিক সভ্যতা জোর করে চাপানোর চেষ্টাতেই তার ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। এখন যদি আপনারা সত্যিই ভাল কিছু গড়ে তুলতে পারেন, তবে অন্য দেশের লোকেরা তাকে ভালো বলেই হয়তো গ্রহণ করবে, আপনাদের শক্তির চাপে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করবে না।"

"এদিক থেকে আমি তোমার সঙ্গে পুরোপুরি একমত। আমি যে আজীবন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে এসেছি, তা শুধু এজন্যে নয় যে, সাম্রাজ্যবাদের ফলে অধীন দেশের মানুষেরা শোষিত হচ্ছে; আমার এ বিশ্বাস ছিল যে, সাম্রাজ্যবাদের ফলে আমাদের নিজেদের মনুষ্যত্ব খণ্ডিত বিকৃত হয়েছে এবং সাম্রাজ্য গেলে আমরা হয়তো ক্ষমতায় এবং সম্পদে দুর্বল হব, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের মনুষ্যত্বের নবজাগরণও সম্ভবপর হয়ে উঠবে।"

"ব্রিটেনের সাম্রাজ্য তো প্রায় গেছে। কিন্তু এই নবজাগরণের কোন আভাস কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন?"

"কিছুই পাচ্ছি না বললে ঠিক বলা হবে না। তবে যা আশা করেছিলাম, যা দরকার, তা এখনও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যখন ভাবি আমাদের জীবনে দুপুরুষের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির কত বদল ঘটেছে, তখন আশা হয়, আমরা এখনও ফুরিয়ে যাইনি। আমার পরিবারের কথাই বলি। আমার বাবা ছিলেন মিশনারী, এদেশে র‍্যাডিক্যাল বলে তাঁর অখ্যাতি ছিল। তারপর তিনি তোমাদের দেশে গেলেন। প্রথম প্রথম তিনি তাঁর র‍্যাডিক্যাল প্রত্যয় অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন—পদে পদে ইংরেজ আমলা ও ব্যবসাদারদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটতে লাগল। কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে নিজেরই অজ্ঞাতে তাঁর চরিত্র বদলে গেল, তিনি ভাবতে শিখলেন বিজয়ী এবং বিজিত কখনও সমান হয়ে মিশতে পারে না, ভারতবাসীর কল্যাণ করতে হলে তাকে নাবালক ভেবে তার ভাল-মন্দের বিচারের ভার ইংরেজকেই নিতে হবে। এক কথায় সাম্রাজ্যবাদের অভিজ্ঞতা তাঁর র‍্যাডিক্যাল বিবেককে ধীরে ধীরে জীর্ণ করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে গোঁড়া রক্ষণশীল করে তুলেছিল।

এরই সঙ্গে তুলনা কর আমার বোনের কাহিনী। আমার বোন যখন তোমাদের দেশে যায়, তখন সে উগ্র কনজারভেটিভ। সে আমাকে "স্টার-গেজার" বলে ঠাট্টা করত। ভারতবর্ষে গিয়ে সে সেখানকার মানুষদের সঙ্গে প্রথমে মেশার চেষ্টা করেনি। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের সাম্রাজ্যের খুঁটি আলগা হয়ে এসেছে—ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসার লাভ করছে। সে বোধহয় নিজের চারপাশের সাদা চামড়ার গণ্ডি বজায় রাখতে পারল না। আস্তে আস্তে তার চোখ খুলতে লাগল। যখন সে ফিরে এল তখন সে বিশ্বাসে, জীবনযাত্রায় পূর্ণ র‍্যাডিক্যাল। আর এই পরিবর্তন তো শুধু তার একার নয়। গত যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ব্যাপকভাবে এই পরিবর্তন না ঘটলে লেবার পার্টি কি ক্ষমতায় আসত? না, এই গত দশ বছরের মধ্যে আমাদের সমাজ জীবনে যে আপেক্ষিক সমতা গড়ে উঠেছে, তা সম্ভব হত?"

আমি সসঙ্কোচে নিবেদন করলাম যে, সেক্ষেত্রে রক্ষণশীল দল আবার ক্ষমতায় এল কি ক'রে? সুয়েজের ব্যাপারটাই বা কি ক'রে সম্ভব হল এবং আণবিক সংগ্রামের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে ব্রিটেনে জ্ঞানীগুণীরা মুখ খুলছেন না কেন?

ব্রকওয়ের পাইপ নিভে গিয়েছিল, পাইপ পরিষ্কার করে তামাক ভরতে ভরতে বললেন, "সেইজন্যেই তো তোমাকে গোড়াতে বলেছি যে, আমাদের এ পরিবর্তন খুব সীমাবদ্ধ, মোটেই আশানুরূপ নয়। প্রথমত, আমরা জাতটাই রক্ষণশীল, দ্রুত বদলানো আমাদের ধাত নয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের মেজাজটা পজিটিভিস্ট, মূলনীতি নিয়ে ভাবতে আমরা অনিচ্ছুক। তৃতীয়ত, ক্রিশ্চিয়ান আদর্শ মুখে মানলেও আসলে আমরা ঘোর জড়বাদী—স্থূলে ব্যবহারিক সুযোগ সুবিধে পেলেই আমরা সন্তুষ্ট। আমি জানি, এখন যদি নির্বাচন হয়, কনজারভেটিভরা হারবে, কিন্তু তাতে আমাদের অবস্থার যে খুব একটা পরিবর্তন ঘটবে, এমন মনে হয় না। হয়তো বুড়ো লোকেরা সরকার থেকে আরো কিছু বেশি সাহায্য পাবে, আড়াই পাউন্ডকে বাড়িয়ে তিন পাউন্ড করা হবে। হয়তো সাধারণ লোকের চিকিৎসা এবং শিক্ষার সুযোগ আরও একটু বাড়বে। কিন্তু যেসব প্রত্যয় এবং অভ্যাসকে আমরা আঁকড়ে এতদিন জীবন কাটিয়েছি তাকে আগাগোড়া নতুন করে যাচাই করার মত মনের জোর আমাদের হবে, এমন আশা করি না। সুয়েজের সময় সত্যিই একবার আমাদের বিবেক চাড়া দিয়ে উঠেছিল—কিন্তু তার মধ্যেও আদর্শের সঙ্গে ব্যবহারিক সুবিধে অসুবিধের ভাবনা কতখানি কাজ করেছিল বলা সহজ নয়। তুমি হয়ত জানো, আমাদের

লেবার পার্টির মধ্যে অনেকেই আণবিক বোমার পরীক্ষা সমর্থন করে। আমরা কয়েকজন অবশ্য এর বিরোধী—কিন্তু আমাদেরও জনমত এবং যুদ্ধ বাধলে দেশের আত্মরক্ষার কথা ভেবে কথা বলতে হয়। এইতো সেদিন এ নিয়ে আমাদের সভ্যদের মধ্যে একচোট বিতর্ক বিতণ্ডা হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আমরা কয়েকজন রফার প্রস্তাব করে বললাম, যে আপাতত আণবিক পরীক্ষা বন্ধ রাখা হোক; এবং ইতিমধ্যে রাশিয়া-আমেরিকা-ফ্রান্সের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানো যাক, যাতে সকলেই আণবিক পরীক্ষা বন্ধ করে। আমাদের এই "আপাতত" বলার ফলে অনেকেই নারাজ হয়েছেন—বিশেষ করে তোমাদের দেশে এবং জার্মানীতে—কিন্তু এটুকু রফা না করলে সম্ভবত আমাদের পার্টির অধিকাংশ সদস্য আণবিক পরীক্ষা স্থগিত রাখার প্রস্তাব সমর্থন করত না।

আমি বললাম, "কিন্তু জার্মানীতে বৈজ্ঞানিকেরা তো স্পষ্ট ভাষায় আণবিক অস্ত্র তৈরী করার বিরোধিতা করেছেন। অথচ জার্মানীতে গণতন্ত্রের ঐতিহ্য আপনাদের দেশের তুলনায় অনেক দুর্বল এবং রাশিয়ার হাতে মার খাবার ভয় জার্মানীর যত বেশি, আপনাদের তার চাইতে কম নয় কি?

—ঠিক, ঠিক। কিন্তু জার্মানীতে এ প্রতিবাদ যাঁরা করেছেন তাঁরা বৈজ্ঞানিক, তাঁরা রাজনৈতিক দলের নেতা নয়। তাছাড়া, জার্মানী যে ট্রাজেডির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, তা আমাদের কল্পনারও বাইরে। মৃত্যুর বহ্নালোকে জার্মানীর মনীষীরা সত্যকে বোঝবার, স্বীকার করার যে সাহস পেয়েছেন, আমরা তা আজও পাইনি। আমাদের যে আজ আর সাম্রাজ্য নেই, আমরা যে আজ আর পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনীতির কেন্দ্রে নেই—এটাই আজও এদেশে খুব কম লোকে বুঝতে পেরেছে। তা না হলে সুয়েজের মারাত্মক নিবুদ্ধিতা কখনও সম্ভব হত? আমরা এখনও অতীতের স্বপ্ন ছাড়তে পারিনি। বর্তমানের সঙ্গে পাল্লা কষতে গিয়ে তাই আমরা বারবার নাজেহাল হচ্ছি।

—আমি আশা করেছিলাম দেখব, সাম্রাজ্যচ্যুত হয়ে ইংরেজ বিশ্বনাগরিকতা, সহযোগ এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তিতে নতুনভাবে গণতন্ত্র গড়ে তোলার সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত করবে। কেননা, আমার ধারণা ছিল দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ফলে এ কাজে ইংরেজের যোগ্যতা যতখানি অন্য কোনো জাতির কাছে ততটা আশা করা যায় না। তাছাড়া, এ পথ ছাড়া ইংরেজের আর কোন ভবিষ্যৎ তো দেখি না।

—তুমি যদি এ দেশে নতুন চিন্তার আশা করে এসে থাক, তবে বোধহয় তোমাকে নিরাশ হতে হবে। নতুন চিন্তা একেবারেই হচ্ছে না তা নয়—নাই বেভানের (Aneurin Bevan) সঙ্গে আলাপ হলে দেখবে, সেও একথা ভাবছে। কিন্তু সাধারণত আমরা ভাবুক নই, এবং যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি, তা নতুন ভাবনার বিশেষ উপযোগী নয়। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাদের লেখা পড়ে মনে হয়েছে, তোমাদের কাছ থেকেই আমরা ভাবনার জগতে নতুন আশা করতে পারি, আমাদের কাছ থেকে তোমরা নও। তাছাড়া, এই যুদ্ধের পরে এমন একটা নৈতিক অবস্থা এসেছে যে কোন মানবীয় আদর্শের চারা এ জমিতে বেড়ে ওঠাই কঠিন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা শ্রমিক এবং স্ত্রীলোকদের অধিকারের জন্যে লড়াই করেছিলেন, আমরা তার সঙ্গে এশিয়া আফ্রিকার মানুষদের অধিকার যোগ দিয়েছিলাম। আজ শ্রমিক এবং স্ত্রীলোক আইনের চোখে সমান অধিকার পেয়েছে, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সাধারণ নাগরিক অভিজাতদের সঙ্গে সমান সুযোগ সুবিধের অধিকার পেয়েছে। এশিয়া আফ্রিকায় একে একে উপনিবেশগুলি স্বাধীন হতে চলেছে। কিন্তু সব মিলিয়ে আমরা কতটা এগিয়েছি বোঝা শক্ত। আমার দশ বছরের ছেলে পড়াশুনো ফেলে টেলিভিশনে মারপিট গুণ্ডামির ছবি দেখতে, কথা শুনতে বেশি ভালবাসে। দুকোমরে পিস্তল ঝোলানো গ্যাঙস্টার তার কল্পলোকের নায়ক। এশিয়া আফ্রিকাতেও ভয়ানক একটা আশার কিছু দেখতে পাই না। ভারতের খবর আজকাল তেমন জানি না—শেষ ওদেশে গিয়েছিলাম ১৯২৮ সালে—গত কয়েক বছর ধরে আফ্রিকার সমস্যা নিয়েই আমি বেশি পড়াশুনা, কাজকর্ম করেছি। কিন্তু সর্বত্রই দেখছি একধারে জাতীয়তাবাদ প্রবল হয়ে উঠছে—আর তার বিকল্প রূপে প্রসারলাভ করছে উগ্রতর কম্যুনিস্ট একনায়কত্বের আন্দোলন।

—সেইজন্যেই কি ইয়োরোপ এবং এশিয়া-আফ্রিকার গণতন্ত্রীদের পারস্পরিক সহযোগিতা আজ একান্ত প্রয়োজন নয়? অন্তত চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা যারা জাতীয়তাবাদী নই, একনায়কতন্ত্রকে অকল্যাণকর বলে জানি, যুদ্ধ বা কোনরকম বলপ্রয়োগের দ্বারা কোনো মানবীয় সমস্যার যথার্থ সমাধান সম্ভব বলে মনে করি না, তাদের মধ্যে কি আজ বিশেষ দরকার নেই ভাবনার আদান-প্রদানের—কি করে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা যায়, কিভাবে তাকে সমৃদ্ধতর জীবনাদর্শ এবং সভ্যতায় বিকশিত করা যায়?

—সেকথা কি বলার অপেক্ষা রাখে? এক কাজ কর। তুমি এখানে কতদিন আছো?

—মে-মাসে কয়েকদিনের জন্যে কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ডে যাবার আমন্ত্রণ আছে। নইলে জুনের শেষ পর্যন্ত, বাকি সময় লণ্ডনেই আছি।

—ভাল, নাই মে মাসের গোড়াতেই ফিরবে, তুমি কেম্ব্রিজ থেকে ফিরেই আমাকে টেলিফোন কোরো। আমি নাই'এর সঙ্গে তোমার আলাপের চেষ্টা করব। তাছাড়া, লেবার পার্টির তরুণদের মধ্যেও অনেকে এসব নিয়ে কিছু কিছু ভাবছে। তাদের সঙ্গে পরিচয়েরও ব্যবস্থা করা যাবে। আমার মনে হয়, তোমাদের চাইতে আমাদেরই বেশি দরকার তোমাদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করা। সেটা সকলে হয়ত বুঝছে না, কিন্তু ক্রমেই বুঝবে। আমি চাই, তুমি এদের কাছে তোমার ভাবনা এবং সমস্যাগুলো হাজির কর। তারপর এরা কিভাবে সাড়া দেয়, দেখা যাক, কেমন? কনজারভেটিভদের মধ্যেও অনেকে ভাবতে শুরু করেছে—তাদের সঙ্গেও তোমার পরিচয় হওয়া দরকার—কিন্তু তাতে আমি বিশেষ কাজে আসবো না। সেটা তোমাকেই চেষ্টা করে করতে হবে।

খুপরী ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম। লক্ষ্য করলাম, ব্রকওয়ে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন। পার্লামেণ্টের দরজায় বিদায় নিয়ে ব্রকওয়ে তাঁর করিডরের টেবিলে ফিরে গেলেন—তাঁর সেক্রেটারীর সঙ্গে আফ্রিকা থেকে সদ্য আগত সংবাদ বিষয়ে আলোচনা করতে।

“সর্বজনীন” এবং “সার্বজনীন” দুই শ্রেণীর পূজাই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। মাইকের ব্যবহার সীমায়িত ছিল বলিয়া ছেলেরা ঘুমাইয়াছে এবং পাড়াও জুড়াইয়াছে; ব্যাঙ্ক ধর্মঘট চলিতেছিল বলিয়া অনেক তাগিদ-বায়নাক্কার হাত হইতে আত্মরক্ষা সম্ভব হইয়াছে,—এমন কি ব্যাঙ্কে যাঁদের কিছুই নাই বা কোনদিন কিছুই ছিল না, তাঁরাও ধর্মঘটের দোহাই পাড়িয়াছেন; বৃষ্টি-বাদলা হয় নাই বলিয়া ছোটরা নূতন জামা-কাপড় পরিয়া, অবশ্য যাদের ভাগ্যে

জুটিয়াছে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাকুর দেখিতে পারিয়াছে। মোদ্দা, পূজো এবারে ভালো-ভাবেই কাটিয়াছে। অসুবিধা হইয়াছে শুধু রেলযাত্রীদের। অবশ্য মানুষে-মালপত্রে গাদা-গাদি, ঠাসাঠাসি করিয়া চলাটা এমন কিছু নূতন নয়, তবে সেটা যেন এবারে একটু মাত্রা ছাড়াইয়াই গিয়াছিল। এই কথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, এত অসুবিধার মধ্যেও একটিমাত্র সুবিধার দরুণ অনেকেই এটাকে শাপে বর মনে করিয়াছেন অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রেই টিকিট কাটার ঝামেলা আনন্দময়ীর আগমনে কর্পূরের মতো উড়িয়া গিয়াছিল। তাছাড়া মায়ের ইচ্ছায় “শ্রেণীহীন” ভ্রমণের মধ্যে কটা দিনের জন্য হইলেও সবার উপরে মানুষ সত্যের সত্যটা অনুভব করার সুযোগ ঘটিয়াছিল—ভীড়ের চাপে মুড়ি আর মুড়কি একসঙ্গে বিকাইয়াছে!!

* * *

প্রসঙ্গত মনে পড়িল শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া এই আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা তিনি করিবেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—“খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু এই সঙ্গে পূজো-বাজারে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী-দের কথাটাও যেন তিনি একটু ভাবেন। আমরা প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিনি বটে, কিন্তু যাঁরা করেছেন, তাঁদের দেখেছি, দেখেছি জলছাড়া মাছের মতো তাঁদের ধড়-ফড়ানি। চড়াদামের টিকিট নিয়েও তাঁরা “সহ-অবস্থান” কাটাতে পারেন নি”!

• • •

এক সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতায় নাকি সম্প্রতি রেল টিকিটের চোরা কারবার চলিতেছে।—“চারিদিকের বাজার-কারবার দেখে তাঁরা ‘আমি শুধু রইনু বাকী’ বলে দুর্গা বলে নেবে পড়েছেন। আর আমরা জনসাধারণও ভাবছি সমুদ্রে যাদের শয্যা তাদের আর শিশিরে ভয় কি”—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।
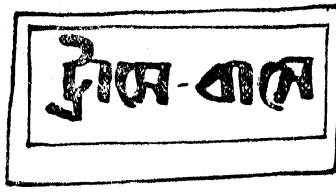
• • •

চীন আগের প্রাক্কালে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বলিয়াছেন যে, যদিও তাঁর অবস্থান স্বল্পকাল স্থায়ী তবু চীন ত্যাগ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ হইতেছে না।—“এটা নিশ্চয়ই টিকিট কাটার অসুবিধের জন্য নয়”—বলেন, আমা-দের জনৈক সহযাত্রী।

• • •

বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণকল্পে পণ্য আমদানীতে কড়াকড়ির সংবাদ আমরা পাঠ করিয়াছি। যে-সব পণ্যের উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হইবে, তাহার মধ্যে “ব্লেড” একটি। অনেকে ইতোমধ্যেই ব্লেডের সম্ভাব্য অভাবে শঙ্কিত হইয়া

“পাঁচ মাথার মোড়ে [illegible] - দু'জনায় [illegible] পাওয়া যেতে পারে”

উঠিয়াছেন।—“আমরাও যে শঙ্কিত হইনি তা নয়। কিন্তু আমাদের শঙ্কাটা ঠিক আমাদের জন্য নয়, আমরা দাড়ি না রেখে শালগ্রাম ছিলাম, দাড়ি রেখেও তাই থাকব। আমরা ভাবছি সিনেমাকাশের চন্দ্র-সূর্যদের কথা। যাঁদের দেহে রূপে মিসিং স্কোয়াড তৎপর ছিল, তাঁদের দেহে চেহারায় হয়ত এম্বুলেন্সকে তৎপর হতে হবে—পথেঘাটে পতন ও মূর্ছা অনিবার্য”!!

• * •

ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারী বলিয়াছেন যে, ভারত দান হিসাবে অর্থ চায় না, চায় ধার হিসাবে।—“আশা করি ঋণদাতা প্রচলিত প্রবাদ স্মরণ করবেন না অর্থাৎ বন্ধুকে কে কবে টাকা ধার দিয়ে পরে তা আদায় করতে গিয়ে দেখেন টাকা তো মার গেলই, মাঝখান থেকে বন্ধুও গেল”—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

ভারতীয় মুসলমানদের “দুঃখ-শোকের” কথা ভাবিয়া মালিক ফিরোজ খাঁ নূন রাষ্ট্রপুঞ্জে আর একদফা বিলাপ করিয়া-ছেন। কিন্তু যাঁদের জন্য বিলাপ, তাঁরা

অর্থাৎ ভারতীয় মুসলমানগণ প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন যে, উহা অসুস্থ চোখের কদর্য অশ্রুপাত মাত্র। শ্যামলাল বলিল—“ঠিক তা নয়, উহা নূন সাহেবের নামের নুন চোখে মেখে জল ফেলা মাত্র”!

* * *

ক্যানবেরার এক সংবাদে প্রকাশ, ৫২৩ রকম শব্দ আছে, যা পার্লা-মেন্টে ব্যবহার করা চলে না।—“অনেকে আবার বলেন, পার্লামেন্টের নিয়ম না থাকলেও কোদালকে কোদাল আমরা বলবই” —বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ফ্রান্সে মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে। সেখানে না কি আবার নূতন প্রধান-মন্ত্রী সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে।—“প্রাচীন ভারতীয় নীতিতে আছে রাজা সংগ্রহের জন্য নাকি পাটহাতি ছেড়ে দেওয়া হতো। রাজোচিত লক্ষণ কারুর থাকলে পাটহাতি তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে আসতো। ফরাসীরা এবারে পাটহাতি ব্যবহার করে দেখতে পারেন”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

হায়দরাবাদের কোন প্রতিষ্ঠান হইতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ মহাশয়কে একটি লাঠি উপহার দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর যোগ্য উপহারই হইয়াছে। কিন্তু দপ্তরের সঙ্গে মিল রাখিয়া উপহার দিতে গেলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে কি দেওয়া হইবে, রেলমন্ত্রীকেই বা কি দেওয়া হইবে? খুড়ো বলিলেন—“এটা কোন সমস্যাই নয়। তেল-ঘি-দুধ হাতের কাছে যা পাওয়া যাবে তা ধরে দিলেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উপহার হবে। রেলমন্ত্রী মহাশয়কে দিতে হবে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে আর সেটা পূজো মরশুমে হলেই হয় যথেষ্ট। আর মধুরভাবে গড়ং অর্থাৎ ফুলের মালা,—স্বরাষ্ট্র থেকে সেচ পর্যন্ত সর্বত্র সমাদৃত”!!

ত্রিদিব চৌধুরী

(১৫)

আরো মন্তেইরো সংবাদ

এ হেন মন্তেইরো কিভাবে ক্রমে ক্রমে গোয়া পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের সর্বময় কর্তা হইয়া দেখা দিল, সে কাহিনী কিছুটা বিচিত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু গোয়াতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের স্বরূপ জানিলে তাহা খুব বিচিত্র বলিয়া মনে হইবে না। ডাঃ সালাজারের শাসনকে সাধারণভাবে ফ্যাসিস্ট শাসন বলিয়া উল্লেখ করা হয় বটে; কিন্তু খালি 'ফ্যাসিস্ট' বিশেষণ দিয়া ইহার বাস্তব স্বরূপ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করা যায় না। পর্তুগাল বা পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের যে কোনো অংশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার সময় মনে রাখা দরকার যে, পর্তুগাল জার্মানী, জাপান বা ইতালীর মত অগ্রসর শিল্পোন্নত দেশ নয়। প্রধানত ক্যাথলিক ধর্মযাজক ও পুরোহিতদের প্রভাবাধীন কৃষিজীবী ও আধা সামন্ততান্ত্রিক ল্যাটিন দেশ। এদিক দিয়া পর্তুগাল স্পেনের চেয়েও পিছনে বলা যায়। ফ্রাঙ্কোর স্পেনের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জমিদার শাসিত গ্রামাঞ্চল কিম্বা দক্ষিণ আমেরিকার পানামা, নিকারাগুয়া ইকোয়াডোর, পেরু, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে পর্তুগালের মিল বেশী। এমন কি যে ব্রাজিল এককালে পর্তুগীজ উপনিবেশ হিসাবে ছিল, তাহার সঙ্গে তুলনাতেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া পর্তুগালকে অনগ্রসর বলা চলে। ষোড়শ সপ্তদশ শতকের পর্তুগাল যে এখনকার পর্তুগাল নয়, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। ১৯১১ সালে পর্তুগালে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হইয়া গেলেও আধুনিক গণতন্ত্র বলিতে আমরা যা বুঝি, তাহা পর্তুগালে কোনোদিনই ভালোভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ১৯১১ সাল হইতে ১৯২৬-২৭ সাল পর্যন্ত সেখানে সাধারণতন্ত্রের নামে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই তিনটি অভিজাত রাজনৈতিক চক্র এবং মিলিটারী জেনারেলদের [illegible] চলে। এখন মিলিটারী জেনারেল বা সৈন্যদলের পরিচালকদের আধিপত্য পূর্বের মতই অব্যাহত আছে; কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে দুই তিনটি অভিজাত চক্রের বদলে ডাঃ সালাজারের হাতে। সালাজারের 'ইউনিয়ন নাসিওনাল' এবং 'আর্মি' বা 'আর্মি'-র সেনাপতি দল এই দুই প্রধান শক্তি এখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সালাজার নিজেও রাজতন্ত্রের ঐতিহ্যে বিশ্বাস করেন; যদিও বর্তমানে পর্তুগীজ রাজবংশের কোন প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী না থাকায় রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বাধা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া সেখানে রাজতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্র চলিতেছে, এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। গণতন্ত্রের বিকাশের কোনো পথ সালাজার খোলা রাখেন নাই। একদিকে মিলিটারী বা সৈন্যদলের জোরে আর অন্যদিকে ফ্যাসিস্ট কায়দায় সমস্ত রকমের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনকে দমাইয়া রাখিয়া, আজ সাতাশ আটাশ বছর ধরিয়া সালাজারের একচ্ছত্র শাসন চলিতেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী 'ইস্তাদো নোভো' ('নয়া রাষ্ট্র' বা 'new State'; সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সরকারী নাম) এই গণতন্ত্র বিরোধী ফ্যাসিস্ট স্বরূপের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ধরনের ঢিলা ঢালা-পনা, ল্যাটিন আমেরিকার ধরনের রাজনৈতিক গুণ্ডাবাজী বা 'club-rule'-ও অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া আছে। আর এসবের সঙ্গে জড়াইয়া আছে—মন্ত্রীদের, সালাজারের অনুগৃহীতজনদের, বড় বড় সরকারী কর্মচারী এবং পুলিসের বড়কর্তাদের ভিতর অনুগত ও আত্মীয় পোষণের ঐতিহ্য। যে যেভাবে পারে, পাড়া হইতে লিসবন পর্যন্ত কোনো-ভাবে মুরুব্বী [illegible] ধরিয়া তাহার সাহায্যে চাকরী-বাকরী বা অন্য ধরনের সুযোগ সুবিধা পাকড়াও করার চেষ্টা করে। এ রেওয়াজ খাস পর্তুগালে, আফ্রিকায় অ্যাংগোলা এবং লোরেঞ্জো মার্কেস-এ কিম্বা গোয়ায় সর্বত্র একই-ভাবে প্রচলিত আছে।

বলা বাহুল্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মন্তেইরোর পক্ষে প্রথম গোয়াতে আসিয়াই চট করিয়া এইরকম কোনো সরকারী মুরুব্বী পাকড়াও করা খুবই মুশকিল ছিল। অথচ তখন তাহার ম্যাংগানীজ খনির ব্যবসার অবস্থা খুবই সঙ্গীন; যে কোনো মতে হোক একজন 'পাদ্রোঁ' (Padron; Patron বা boss; মুরুব্বি) খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিজের জন্য একটা ধান্দা না করিয়া নিতে পারিলেও তাহার পক্ষে বেগতিক ছিল। ভাগ্যান্বেষী মন্তেইরো উপায়ান্তর না দেখিয়া পলিটিক্সের পথ নিল। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী রাজত্বে পলিটিক্সের রাজপথ একটাই—'ইউনিয়ন নাসিওনাল'। 'ইউনিয়ন নাসিওনাল' ছাড়া পর্তুগালে বা সারা পর্তুগীজ সাম্রাজ্যে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল নাই, কোনো দলকে থাকিতে দেওয়াও হয় না। গোয়াতে-ও অনেক দিন ধরিয়া 'ইউনিয়ন নাসিওনাল'-এর একটা ব্রাঞ্চ অফিস ছিল। কিন্তু সেটা নিতান্তই নিয়মরক্ষা গোছের ছিল। তাহার কোনো সত্যকার তোড়জোড় বা 'ধার' বলিতে কিছু ছিল না। গোয়াতে পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে 'রানেদের শেষ বিদ্রোহ' হয় ১৯১৩ সালে। তাহার পর ধীরে ধীরে গোয়া ঝিমাইয়া পড়ে। প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগে পর্তুগালী রাজনীতির দ্রুত পট পরিবর্তন, ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৫১ পর্যন্ত জেনারেল কারমোনা আর সালাজারের যৌথ ডিক্টেটরশিপ, এমন কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল কিছুতেই গোয়ার অলস মন্থরপ্রবাহ জীবনে বিংশ শতাব্দীর গতিবেগ সঞ্চারিত হয় নাই। কেবল উপকূলের ভেজা আবহাওয়ার ভিতর নারিকেল আর আমের বাগানে ঘেরা ভিলায় দুপুরের খানা সারিয়া নিরুদ্বেগে একটু 'সিয়েস্তা' উপভোগ করা; তারপর ঘুম হইতে উঠিয়া বিকাল ক্রমে ক্রমে যখন সন্ধ্যার মধ্যে স্তিমিত হইয়া আসিবে তখন সমুদ্রের ধারে একটু-খানি পায়চারি করিয়া ক্লাবের পথে পা বাড়ানো—এই ছিল গোয়ার রাজকর্মচারীদের জীবনের সাধারণ রুটিন। ১৯৪৫-৪৬ সালে সেই রুটিনে প্রথম ঝাঁকুনি লাগে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে। গোয়ার বাহিরের পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু হোক না কেন গোয়াতে কিছু হইবে না, গোয়ার জীবনের ধীর মন্থর গতি কিছুতেই ব্যাহত হইবে না। এই স্থির বিশ্বাসে ধাক্কা লাগিতেই পাঞ্জিম হইতে লিসবন ও লিসবন হইতে পাঞ্জিম পর্যন্ত পর্তুগীজ সরকারী মহলে আতঙ্কের মহা হৈচৈ শুরু হইয়া গেল—'সামাল! সামাল! পর্তুগীজ সাম্রাজ্য বিপন্ন! সাম্রাজ্য বাঁচাও!' সেই 'সাম্রাজ্য বাঁচাও' ধ্বনিরই ফলেই ক্রমে ১৯৪৬ হইতে ১৯৪৯-৫০ পর্যন্ত আসিয়া গোয়াতে 'ইউনিয়ন নাসিওনাল'কে শক্ত করিয়া গড়িয়া তোলার আয়োজন হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও

১৯৫১-৫২ সালের পর্তুগীজ পার্লিয়ামেণ্টের সাধারণ নির্বাচনে গোয়ার দুইজন প্রতিনিধির মধ্যে, কি করিয়া 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র বাহিরের একজন নির্বাচিত হইয়া যান। অবশ্য সেই ভদ্রলোককে যে শেষ পর্যন্ত পর্তুগীজ পার্লিয়ামেণ্টে আসন গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই, তাহা বোধ হয় না বলিয়া দিলেও চলিবে। 'কমিউনিস্ট' * অভিযোগে তাঁহার নির্বাচন নাকচ হইয়া যায় এবং গোয়ার দুইজন প্রতিনিধিই যথারীতি 'ইউনিয়ন নাসিওনাল' হইতে 'নির্বাচিত' হন। এই রাজনৈতিক অবস্থার ভিতর ১৯৫৩-৫৪ সালে আবার যখন নূতন করিয়া গোয়াতে জাতীয় আন্দোলনের নূতন ঢেউ উঠিল, ভাগ্যান্বেষী মন্তেইরোর সামনে বহু প্রত্যাশিত সুযোগের মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইল। আর খনির ব্যবসার দরকার নাই; সাম্রাজ্যরক্ষী স্বেচ্ছাসৈনিক হিসাবে 'ইউনিয়ন নাসিওনাল'কে মই হিসাবে ব্যবহার করিয়া এবার নিজের অবস্থা চলিবে!

এই সময় পর্তুগীজ ভারতের পুলিস কমান্ডাণ্ট ছিল কাপতেন রুম্বা নামে এক ব্যক্তি। রুম্বা সাধারণ পর্তুগীজ সৈন্য বাহিনীর 'কাপতেন' পদের লোক ছিল কিনা বলা কঠিন। অনেকে বলে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় পর্তুগাল হইতে ফ্রাঙ্কোর পক্ষে স্পেনে লড়বার জন্য যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যায়, রুম্বা তাহারই 'কাপতেন' ছিল। অনেকের বিশ্বাস মন্তেইরোও সেই সময় রুম্বার স্বেচ্ছাসেবক দলে ছিল। কিন্তু যে পন্থায়ই হোক মন্তেইরো গোয়ায় আসার কিছু দিনের মধ্যেই রুম্বার নজরে পড়ে। অবশ্য দুজনের মধ্যে কে কাহাকে খুঁজিয়া বাহির করে তাহা বলা শক্ত। কিন্তু টেরেখোল সত্যাগ্রহ এবং দাদরা ও নগর হাভেলীর ঘটনার পর দেখা গেল যে, বোম্বে পুলিসের ভূতপূর্ব সার্জেণ্ট, আফগানিস্থান সীমান্তে বৃটিশ সৈনাদলের ট্রাক ড্রাইভার, লণ্ডনের কসাই এবং শেষ অধ্যায়ে গোয়ার ম্যাঙ্গানীজ খনির ইজারাদার কার্সিমির মন্তেইরো রুম্বার পৃষ্ঠপোষকতায় ডাঃ সালাজারের 'ইস্তাদো নোভোর' প্রতিভূ হিসাবে হঠাৎ একদিন গোয়ার গোয়েন্দা পুলিসের বড়কর্তা হিসাবে দেখা দিতেছে, যদিও সে কোনো সময়েই গোয়াতে বা পর্তুগালে কোথাও পুলিস বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল না। এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে তাহার শিক্ষানবিশী চলিতেছিল রুম্বার নির্দেশে 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র গুপ্ত রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান সংগঠক হিসাবে। সালাজার রাজত্বে পুলিস বাহিনী এবং সালাজারের দল 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র মধ্যে গণ্ডীর সীমারেখা স্পষ্ট করিয়া টানা সম্ভব নয়। মন্তেইরো সংবাদ সে হিসাবে সালাজারের 'ইস্তাদো নোভো' বা 'নয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা'র স্বরূপ বোঝার পক্ষে অপরিহার্য; কারণ গোয়ায় সালাজারী শাসনের সত্যকার প্রতিভূ মন্তেইরো।

১৯৫৪ সালের গোড়াতেও মন্তেইরো সরাসরি পুলিস বাহিনীতে অফিসার হিসাবে যোগ দেয় নাই। গোয়ার অন্যতম প্রধান জাতীয়তাবাদী নেতা ডাঃ পুণ্ডলিক গাইটোণ্ডের উপর পুলিস ও 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র তরফ হইতে যাহারা 'স্পাই' বা 'ওয়াচার' হিসাবে নজর রাখার কাজে নিযুক্ত মন্তেইরো এবং মন্তেইরোর কয়েকজন সাঙ্গোপাঙ্গ তাহাদের মধ্যে প্রধান। ইহারা সকলেই এখন গোয়ার গোয়েন্দা বিভাগের পদস্থ কর্মচারী। ডাঃ গাইটোণ্ডে ইহার কিছুদিন আগে গোয়াতে মুক্তিকামী জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে লিসবন হইতে পশ্চিম ফিরিয়া আসেন। ডাঃ গাইটোণ্ডে ডাক্তারী ছাত্র হিসাবে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য লিসবনে যান এবং ক্রমে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর সেইখানেই বিবাহ করিয়া প্র্যাকটিস করিতে আরম্ভ করেন। লিসবনেও দক্ষ সার্জন হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন; ১৯৫২ সালে সস্ত্রীক পশ্চিমে আসিয়া সার্জন হিসাবেই প্র্যাকটিস করিতে থাকেন। যদিও তিনি প্রথমেই কোনো প্রকাশ্য রাজনৈতিক সভা-সমিতি আন্দোলন—এসব আরম্ভ করেন নাই। তাহা হইলেও তাঁহার রাজনৈতিক মতামত এবং চলাফেরার ধরনে পর্তুগীজ পুলিস কর্তৃপক্ষের সন্দেহ উদ্রেক হয়। কিন্তু তিনি তখন স্বয়ং পর্তুগীজ গবর্নর জেনারেলের সার্জন ও চিকিৎসক পদে নিযুক্ত। কানাকোনের অতি সম্ভ্রান্ত অভিজাত সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারের লোক তিনি। লিসবনে তাঁহার শ্বশুরও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক; তাঁহার স্ত্রী পর্তুগীজ মহিলা। সালাজারের লিসবনে এবং লিসবনের চেয়ে বেশী করিয়া গোয়াতে এসবের সামাজিক মর্যাদা অত্যন্ত বেশী। পুলিস কমান্ডাণ্ট ক্যাপ্টেন রুম্বা গাইটোণ্ডেকে নিয়া তাই একটু মুশকিলেই পড়িয়াছিলেন। সাধারণ লোক হইলে বা অন্য কেউ হইলে বহু আগেই গ্রেপ্তার করিয়া তাহাকে জেলে পোরা যাইত কিম্বা আফ্রিকায় নির্বাসনে পাঠানো যাইত; কিন্তু গাইটোণ্ডের মত লোককে তাহা করা সম্ভব নয়। কাজে কাজেই তাঁহার উপর নজর রাখার ভার পড়িল মন্তেইরোর এবং 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র গুপ্ত বিভাগের উপর। ডাঃ গাইটোণ্ডে ইতিমধ্যে একবার আসিয়া ভারতবর্ষে ঘুরিয়া গিয়াছেন; পণ্ডিত জওহরলালের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছেন বলিয়াও রিপোর্ট আসিয়াছে। কাজে কাজেই রুম্বার নির্দেশে মন্তেইরোর তৎপরতা আরো বাড়িয়া গেল।

অথচ মন্তেইরো তখনো পর্যন্ত পুলিসের লোক নয়, তাহার ম্যাঙ্গানীজের খনির ব্যবসা তখন প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ট্রাক চালানোর ব্যবসাও ভালো চলিতেছে না। করিৎকর্মা মন্তেইরো সুযোগ বুঝিয়া 'ইউনিয়ন নাসিওনালে'র অর্থাৎ গোয়ায় ডাঃ সালাজারের দলের—কর্মী ও তাহার গুপ্ত বিভাগের in-charge হিসাবে তৎপর হইয়া উঠিল। ডাঃ গাইটোণ্ডের গ্রেপ্তারের সময়েও সে পুলিসের 'Agente' বা গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত হয় নাই। কেহ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিত 'আমি—mineiro' অর্থাৎ 'খনির কাজ করি'। ডাঃ গাইটোণ্ডের গ্রেপ্তারের পর যখন তাঁহাকে পুলিস পাহারায় তাঁহার বাড়িতে আনা হয় (তাঁহার গ্রেপ্তারের কাহিনী আগেই বলা হইয়াছে—৬ই জুলাই, ৩৫শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) মন্তেইরোও একটি গাড়িতে করিয়া পিছন পিছন আসে। ভারতীয় কন্সাল জেনারেল মিঃ কে [illegible]র স্ত্রী, মিসেস গাইটোণ্ডের বন্ধু। তিনি খবর পাইয়া দেখা করিতে গাইটোণ্ডেদের বাড়িতে আসেন। তাঁহার অপরাধের মধ্যে তাঁহার সঙ্গে ফিল্ম তোলার ছোট একটি মুভি ক্যামেরা ছিল। মিসেস কোএলহো গাড়ি হইতে নামিয়া গাইটোণ্ডেদের বাংলোর কম্পাউণ্ডে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মন্তেইরো ছুটিয়া গিয়া ভদ্রমহিলার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ধস্তাধস্তি করিয়া ক্যামেরাটি কাড়িয়া লয়। ডাঃ গাইটোণ্ডেকে পুলিস হেড কোয়ার্টারে আনা হইলে পর তিনি তাঁহার স্ত্রীর বন্ধু ও অতিথি মিসেস কোএলহোর উপর অজ্ঞাতকুলশীল এই লোকটির আক্রমণের বিষয় জানান ও অভিযোগ করেন। বলা বাহুল্য, রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত ডাঃ গাইটোণ্ডের অভিযোগের কোনো প্রতিকার হয় নাই। ভারত রাষ্ট্রদূতে পত্নীর উপর এই আক্রমণ এবং তাঁহার প্রতি অপমানজনক এই ব্যবহারের কোনো প্রতিকার সরকারীভাবে আমাদের ভারত সরকারের তরফ হইতে চাওয়া হইয়াছিল কিনা এবং হইয়া থাকিলেও তাহার প্রতিকার কতদূর কি হইয়াছিল, আমার জানা নাই। কিন্তু এই ঘটনার ফলে পর্তুগীজ গবর্নমেণ্টের কাছে

---

* এ কথাও বোধহয় এখানে বলার দরকার করে না যে 'কমিউনিজম' বা 'কমিউনিস্ট পার্টীর সঙ্গে এই ভদ্রলোকের ক্ষীণতম কোনো সম্পর্ক ছিলনা। গোয়ার ভিতরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টীর কোনোই প্রভাব নাই; বোম্বাইয়ের গোয়াবাসীদের মধ্যে অবশ্য দু' একজন কমিউনিস্ট প্রভাবান্বিত লোক যে নাই তাহা নয়। কিন্তু গোয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা গোয়ার ভিতরে চলতি আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই বলিলেও চলে। তবে পর্তুগাল ইদানীং উত্তর অ্যাটলান্টিক জোট Nato-র অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরেই 'কমিউনিজম' সাচ্ছেন। সালাজারের সরকারী মতে যাঁহারা মত দেন না, পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের সহজ হিসাবে সকলেই 'কমিউনিস্ট'।

মন্তেইরোর কদর যে খুব বাড়িয়া যায়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং বন্ধু রুম্বার সুপারিশে কয়েক মাসের ভিতর তাহাকে গোয়া পুলিসের রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান অফিসার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। মন্তেইরো যে সুযোগের জন্য এত-কাল ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, এখন সেই তাহার সুযোগ আসিল। ইহার অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই দাদরা ও নগর হাভেলীতে গণ-অভ্যুত্থানের ফলে পর্তুগীজরা তাহাদের এই দুই ছিটমহল হইতে বিতাড়িত হয়। তাহার পরেই টেরেখোল সত্যাগ্রহ ও গোয়ার ভিতর জাতীয় আন্দোলনের নূতন পর্যায়ের সূত্রপাত হয়। মন্তেইরোর খনির ব্যবসা শেষ হইয়া গোয়া পুলিসের গোয়েন্দা বড়কর্তার নূতন ভূমিকাও আরম্ভ হয় এই সময় হইতেই।

দাদরা-নগর হাভেলীর পর

দাদরা ও নগর হাভেলীর পর পর্তুগীজ গবর্নমেণ্টের মনে আশঙ্কা জাগে যে, গোয়াতে দাদরা-নগর হাভেলীর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। টেরেখোল সত্যাগ্রহের ফলে তাহাদের সে আশঙ্কা আরো দৃঢ়মূল হয়। টেরেখোল সত্যাগ্রহের পর মন্তেইরো, ভারত গবর্নমেণ্টের মতলব কি এবং ভারত হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার উদ্যোগ আয়োজনের পিছনে কাহারা আছে, এসব ব্যাপারে ভালো করিয়া খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য গোয়া হইতে বোম্বাই আসে। তখনো পর্তুগীজদের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় নাই বা গোয়া হইতে ভারতে আসার ব্যাপারে কোনো প্রকার কড়াকড়ি হয় নাই। সুতরাং তাহার পক্ষে বোম্বাই আসা এবং বোম্বাইয়ে অবস্থিত পর্তুগীজ দূতাবাস মারফৎ বোম্বাই অধিবাসী গোয়ানীজদের রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা মোটেই কঠিন হয় নাই। তাছাড়া বোম্বাইয়ে পুলিসের সার্জেণ্ট হিসাবে সে বহুদিন ছিল; কাজে কাজেই বোম্বাইয়ে আসিয়া এসব কাজ করার পক্ষে মন্তেইরোই সবচেয়ে বেশী যোগ্য লোক বলিয়া বিবেচিত হয়। বোম্বাই হইতে গোয়ায় ফিরিয়া যাওয়ার পর পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের কাছে মন্তেইরোর কৃতিত্ব ও প্রতিপত্তি স্বভাবতই আরো বাড়িয়া যায়। লিসবন হইতে সালাজারের 'ইণ্টার-ন্যাশনাল পুলিস' — 'পিদে'র একদল অফিসারও এই সময়ে গোয়ায় পাঠানো হয়, গোয়ার ভিতরে রাজদ্রোহমূলক সকল ষড়যন্ত্র বন্ধ করার জন্য। তাহারা না জানে কোঙ্কনী-মারাঠী-হিন্দী, না জানে ইংরাজী; কাজে কাজেই গোয়াতে মন্তেইরোর উপর তাহাদের নির্ভর করিতে হইত বেশী। এই সময় হইতে তাই গোয়া পুলিসের রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগে 'পিদে'র অলিভেইরা এবং কাসিমির মন্তেইরো এই দুজনের একচ্ছত্র রাজত্ব আরম্ভ হইয়া যায়। গোয়াতে রাজনৈতিক বন্দীদের ও সন্দেহভাজন লোকদের উপর যেসব ভয়াবহ ধরনের অমানুষিক শারীরিক নির্যাতনের কথা শুনিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের লোক শিহরিয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য প্রধানত দায়ী এই দুজন—মন্তেইরো ও অলিভেইরা।

অলিভেইরা-র পদমর্যাদা অবশ্য মন্তেইরোর অনেক উপরে; কারণ সে 'পিদে'র লোক। অলিভেইরাকে কোন সময় কাহাকেও নিজ হাতে মারধোর করিতে শোনা যায় নাই। অলিভেইরা কারু গায়ে হাত দেওয়ার মতো 'ছোটো' কাজ করিত না; সেসব কাজ ছোট-খাটো অফিসাররা করিবে, অবশ্য তাহার হুকুমে। কিন্তু মন্তেইরোর সে আত্মমর্যাদার বালাই ছিল না। মন্তেইরোর প্রকৃতি পাকা

অ্যাডভেঞ্চারার-এর প্রকৃতি। 'সোলজার অফ ফরচুন' বা ভাগ্যান্বেষী সৈনিক হিসাবে নানা দেশে, নানা জায়গায় ঘুরিয়াছে; নানা ঘাটে জল খাইয়াছে। দুর্ধর্ষ গুণ্ডাগিরি ও পিটুনী বাজিতে চট করিয়া তাহার সমকক্ষ কাহাকেও পাওয়া কঠিন। ইহার ফলেই সে খুব তাড়াতাড়ি পিটুনী পুলিসেরও বড়কর্তা পদে নিযুক্ত হইয়া যায়। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ এই সময় আতংকগ্রস্ত হইয়া গোয়াতে পুলিসের জন্য দু' হাতে পয়সা খরচ করিতে আরম্ভ করেন। সমগ্র গোয়ায় গোয়েন্দা এবং স্পাই নিযুক্ত করার ভার ছিল মন্তেইরোর হাতে। যত বেকার 'মিস্তী' এবং 'মিস্তী'-ঘেঁষা ফিরিংগী স্বভাবের গোয়ানীজ যুবক ছিল, মন্তেইরো তাহাদের কাহাকেও গোয়েন্দা হিসাবে, কাহাকেও পুলিসের জীপ, ল্যাণ্ড-রোভার চালানোর কাজে, কাহাকেও সোজা-সুজি পুলিস কনস্টেবল হিসাবে রিক্রুট করিতে আরম্ভ করে। গোয়ার মত জায়গায় এইভাবে চাকুরি দিবার ক্ষমতার জোরে মন্তেইরোর প্রতিপত্তি ও দাপট বহু গুণে বাড়িয়া যায় এবং আমরা যখন গোয়াতে গিয়াছি, ততদিনে তাকে খালি গোয়েন্দা পুলিসের বড়কর্তা হিসাবেই দেখি নাই; সে তখন গোয়ার সালাজারী রাজত্বে রীতিমত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। 'ইউনিয়ন নাসিওনাল'-এর সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া পর্তুগীজ রাজত্বের স্বপক্ষে সমারোহের সঙ্গে সভা-সমিতির আয়োজন করা; পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের সরকারী জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠানের দিনে হৈচৈ করা; দাদরা-নগর হাভেলীর 'শহিদ'-দের জন্য প্রতি বছর ২১শে জুলাই স্মৃতি-সভার আয়োজন করা; সালাজার ও পর্তুগালের প্রশস্তি গাওয়ার যুব উৎসব ইত্যাদি সংগঠন করা—এইসব কাজও তাহার নির্দেশে তাহার চেলা-চামুণ্ডার দলই করিত। ফলে তাহাকে গোয়ার 'ইউনিয়ন নাসিওনালের' সূত্রধরদের মধ্যে অন্যতম এবং একজন প্রধান 'পলিটিশিয়ান' (পর্তুগীজ ভাষায়, একজন 'politico') বলিলেও খুব ভুল হইবে না। অর্থাৎ সোজা কথায়, যে কোনো আধা-সামন্ততান্ত্রিক অনগ্রসর দেশের ফ্যাসিস্ট শাসন ও তাহার আনুষঙ্গিক পুলিসী ব্যবস্থা যে ধরনের লোক নিয়া গড়িয়া ওঠে, সালাজারী ব্যবস্থা যে তাহা হইতে অন্য ধরনের নয়, মন্তেইরো এবং গোয়ার ভাগ্যাকাশে মন্তেইরোর অভ্যুদয় তাহার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

মন্তেইরোর প্রভাব প্রতিপত্তির কথা এই সময় গোয়াতে লোকের মুখে মুখে। আমি গোয়াতে খালি রাজনৈতিক বন্দীদের মুখ হইতে শুনিয়া এই মন্তেইরো সম্বন্ধে বলিতেছি না। ব্যক্তিগতভাবে, কখনো নতুন রিক্রুট গোয়ান পুলিসদের কাছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই জাতীয় আন্দোলনের প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিসম্পন্ন। তাহার সম্পর্কে অনেক কথা শুনিয়াছি; কখনো মন্তেইরোর প্রতি ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া কোনো কোনো পুলিস অফিসার তাহার সম্পর্কে অনেক কথা জানাইয়াছে। মিলিটারী জেলে দু' একজন ভদ্র পর্তুগীজ মিলিটারী অফিসারের নিকট তাহার সম্পর্কে কিছু কিছু কথা জানার সুযোগ আমার হইয়াছে। তাছাড়া নিতান্ত সংগোপনে জেল হইতে বাহিরের দায়িত্বশীল লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়াও কিছু কিছু জানিতে হইয়াছে। আকস্মিকভাবে একবার অনেকটা লম্বা সময় শ্রীযুক্ত ফাবিয়ান দাকস্তা ও ডাঃ জে এফ, মার্তিনসের সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য হইয়াছিল—তাঁহারাও কিছু কিছু খবর দেন। কিছু খবর ভারতে ফিরিয়া আসার পর ডাঃ গাইটোণ্ডের কাছ হইতে শুনিয়াছি, রাজনৈতিক বন্দীদের ভয় দেখানোর দরকার হইলে সাধারণ পুলিস কর্মচারীরা শুধু নয়, খাস গোরা পর্তুগীজ অফিসারেরাও হুমকী দিয়া বলিতেন—"দাও উহাকে মন্তেইরোর কাছে পাঠাইয়া"। বলা বাহুল্য, এই খ্যাতি সে সহজে বা অযথাই অর্জন করে নাই।

১৯৫৫ সাল হইতে গোয়াতে জাতীয়তাবাদীদের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হওয়ার পরে গুপ্ত বিপ্লবী দলের তরফ হইতে কয়েকবারই তাহার উপর আক্রমণ হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই মন্তেইরো অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে। ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে জীপে করিয়া কোথাও যাওয়ার সময় বিপ্লবীরা রাইফেল, স্টেনগান ইত্যাদি নিয়া তাহার জীপকে আক্রমণ করে এবং কিছুক্ষণ ধরিয়া বিপ্লবীদের সঙ্গে তাহার ও তাহার সঙ্গের লোকেদের গুলী বিনিময় হয়। মন্তেইরো যে এই জীপে ছিল বিপ্লবীরা তাহা জানিত না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মন্তেইরো এই আক্রমণের ফলে গুরুতরভাবে আহত হয় এবং তাহাকে বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকিতে হয়। সারিয়া উঠার পরে আবার সে কাজে জয়েন করে এবং যতদূর জানি, আজও সে পূর্বপদে বহাল আছে। সালাজার গভর্নমেন্টও সাম্রাজ্য রক্ষায় তাহার বীরত্বের জন্য ইতিমধ্যে বহু পদক ও সনদ দিয়া তাহাকে সম্মান-ভূষিত করিয়াছেন।

ডাক্তারের বদলে চা

ওয়াল পই-তে তাহার সঙ্গে আমার কথা-কাটাকাটি হইতে হইতে মাঝখানে সে হঠাৎ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায়। একজন গোয়ান পুলিস তখন আমাকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে আনিয়া বারান্দায় আমার পূর্বের জায়গায় বসাইয়া রাখিল। আমি বারান্দা হইতে দেখিতে লাগিলাম, সে ট্রাকের কাছে গিয়া আমাদের ভলাণ্টিয়ারদের কাহাকেও হিন্দীতে, কাহাকেও মারাঠীতে জেরা করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কাহাকেও এক আধবার ইংরেজী-হিন্দীতে মিশাইয়া চীৎকার করিয়া গালাগালি করিতেও শুনিলাম। এইভাবে তাহাদের জেরা পর্ব শেষ হইলে যখন সে আবার বারান্দা দিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে, আমি তাহাকে ডাকিয়া নিতাইয়ের হাত ভাঙার কথা জানাইলাম এবং বলিলাম—"মারধোর যা করিবার তাহাতো করিয়াছেন, এখন কিছুটা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করুন!" মন্তেইরো উত্তর দিল—"চিকিৎসা? চিকিৎসা এখানে কি করিয়া হইবে? এখানে কোনো ডাক্তার নাই।" আমি বলিলাম—"ডাক্তার যেখানে আছে সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। অন্তত যে কোনো সভ্য দেশের পুলিস হইলে তাহাই করিত; ইংরেজ হইলে প্রথমে আহত বন্দীদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া তারপর তাহাদের সম্পর্কে যা করার করিত"। এই কথা শুনিয়া প্রথমে সে ভ্রূকুটি করিয়া একবার আমার দিকে তাকাইল; পরে কি মনে হইল, নিতাইয়ের কাছে আসিয়া তাহার চোট-লাগা হাতটি টিপিয়া টিপিয়া পরীক্ষা করিয়া আমায় শান্তভাবে উত্তর দিল—"হাতটা ভাঙে নাই; It is not broken, but badly bruised। ভাঙে নাই; একটু খারাপ রকমে ছেঁচিয়া গিয়াছে মাত্র"। তারপর মুখ বেঁকাইয়া বলিল—"কিন্তু কি করা যাইবে, কাছে পিঠে কোথাও হাসপাতাল নাই। তোমরা একটু অপেক্ষা কর, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার ব্যবস্থা হইবে।" এই কথা বলিয়া বলিয়া যাওয়ার সময় তাহার কি মনে হইল, হঠাৎ একজন গোয়ানীজ পুলিসকে ডাকিয়া কোংকনীতে আমাদের চারজনের জন্য চার গ্লাস চা আনিয়া দিতে বলিল। আগেই বলিয়াছি, মন্তেইরোকে মন্তেইরো বলিয়া তখনো আমি চিনি না। পরবর্তীকালে তাহাকে চেনার পরে, আমি তাহার নিতাই গুপ্তের ভাঙা হাত পরীক্ষা করার এবং আমাদের চা দেওয়ার কথাটা অনেকবার ভাবিয়া দেখিয়াছি। আগেই বলিয়াছি, পর্তুগীজদের মনে মনে ইংরেজদের সঙ্গে নিজেদেরকে সকল বিষয়ে তুলনায় শ্রেষ্ঠ, অন্ততপক্ষে সমান সমান বলিয়া প্রমাণ করার একটা কমপ্লেকস আছে; আমি গুপ্তের হাত ভাঙার কথায় তাহার কাছে ইংরেজদের সঙ্গে তুলনা দেওয়াতে, তাহার পর্তুগীজ মানসিকতার সেই দুর্বল কেন্দ্রে আঘাত পড়ে। ইংরেজরা আহত বন্দীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে বা করিত, পর্তুগীজরা তাহা করিবে না বা করিতে পারিতেছে না—একথা শুনিতে সে রাজী নয়। ইংরেজরা যদি চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া থাকে তো পর্তুগীজরাও তাহা নিশ্চয়ই করিতে পারিবে। অথচ কাছেপিঠে হাসপাতাল নাই বলিলেই চলে। সে অবস্থায় অন্য কিছু করা বা ডাক্তার ডাকা সম্ভব নয় বলিয়া তাহার বদলে আমাদের জন্য এক গ্লাস করিয়া চায়ের ব্যবস্থা করিয়া মন্তেইরো সেই ক্ষতিপূরণ করিতে চাহিয়াছিল।

(ক্রমশ)

ষ্টেশন পেরিয়ে অ্যাসফল্টের মাঝারি রাস্তা। প্রথমে বাজার তারপর আরও একটু এগুলে সেই শব্দ। বিশ্রী ঘর্-র্, ঘর্-র্ একটানা শব্দ। প্রথমটায় হকচকিয়ে চমকাতে হয়, কিন্তু আরও একটু এগিয়ে গেলে সেই অস্বস্তি ফিকে হয়ে আসে। সব দেখা যায়। দেখা যায় বলেই চমকাবার আর প্রশ্ন থাকে না, বরং তখন একটা কৌতূহল রৌদ্র-ছায়ার সম্ভাবনায় সতেজ হয়ে ওঠে মনের মধ্যে। বোধ্য, অবোধ্য পাঁচমিশালী কথার অস্পষ্ট গুনগুনানি আর তা ছাপিয়ে দেহাতী ভাষার হুংকার-হুমকি ঝনঝন করে ওঠে। কিন্তু যন্ত্র-দানবের সচল নির্ঘোষের কাছে মানুষের হুংকার বা চিৎকার যেন ফিসফিস করে কথা বলা ছাড়া কিছু নয়।

প্রথমে ঘর্-র্—ঘর্-র্, সর্-র্ সর্-র্, তারপর সরু কণ্ঠে শিস্ দেবার মত টানা একটা শব্দ। সেটা যখন বন্ধ হয়, অনেকগুলো মানুষের কণ্ঠ খানিকটা স্পষ্ট হয়। শোনা যায়। আস্তে-জোরে দেহাতী কথার কলরব, কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর আবার সে শব্দ হারিয়ে যায় মোটর রেগুলেটর, চলন্ত করাতকল আর লগ-বোঝাই ট্রলি চলার শব্দে। এমনি করেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলমুখর প্লাইউড ফ্যাক্টরীর সচল নির্ঘোষে মাত করে রাখে এদিকটা; এই তোর্ষা নদীর কাছাকাছি শান্ত জনপদটা।

যেদিকে তাকাও—ছোট বড় পাহাড়। তা পেরিয়ে বড়, আরও বড়, আরও সুউচ্চ, একের পর এক পর্বতশ্রেণী দুর্বিনীত মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে। তা ছাড়িয়ে দূরে দুর্লংঘ্য অভ্রংলিহ তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী। এ-জায়গাটা বাঙলা-ভুটান সীমান্ত। শৈলপুরী ভুটানের দুয়ার। ইংরেজি ভাষায় ডোর আর তা থেকে ডুয়ার্স। শিলিগুড়ি পেরিয়ে আসাম লিংকের গাড়িতে সেবক বাঁয়ে রেখে তিস্তার ওপারে ছোটখাট দু-একটা টানেল তারপর বাগরাকোট স্টেশন। বাগরাকোট থেকে ওদলাবাড়ি, ডামডিম ছাড়িয়ে, মাল জংশন পেরিয়ে গাড়ির গতি কমে আসবে। চালসা, নাগরাকাটা, চ্যাংমারী, বানারহাট, দলগাঁও ছাড়িয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াবে এখানে, এই মাদারীহাট স্টেশনে।

জ্যাক ম্যাথুজের সঙ্গে এখানেই আমার পরিচয়।

জ্যাক এই প্লাইউড ফ্যাক্টরীর কর্মকর্তা আর আমি টি-চেস্ট কন্ট্রাক্টর, সুতরাং ব্যবসার খাতিরে, মাল কেনাবেচার খাতিরে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার পেছনে কোন রোমাঞ্চ নেই। জ্যাক বিক্রেতা, আমি ক্রেতা। লগ থেকে প্লাইশীট বের করা ওর কাজ আর সেগুলো কিনে নিয়ে চায়ের বাক্স তৈরি করে বাগানে বাগানে বিক্রী করা আমার কর্ম। তাই জ্যাক যেমন অসাধারণ নয়, আমিও এমন কিছু বিখ্যাত নই। কাজেই এ-পরিচয়ের পশ্চাতে কোন রোমান্সের কথা চিন্তা করাও অসম্ভব। তবু ওর চলাফেরা, কথা, গল্প-গুজবে এমন কিছু পেয়েছিলাম, যার জন্য ওকে আমার ভাল লাগত। সম্ভবত জ্যাকও ভালবাসত আমাকে।

বেশ লম্বা-চওড়া দেখতে। ফুট ছয়েক লম্বা। গায়ের রঙ পুরো সাহেবী না হলেও সাহেব বলে চিনতে, ভুল হবার কথা নয়।

আতেলা লালচে মাথার চুল, চোখের তারা দুটো কাঁপশ। চোয়ালভারি থমথমে মুখখানা। ওর মুখের এই সদা-গাম্ভীর্য পেরিয়ে কদাচ হাসির ছিটেফোঁটা-সম্ভাবনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে কিনা সন্দেহ। তবুও কিন্তু জ্যাক ম্যাথুজকে ভাল লেগেছিল আমার। খুবই কাজের লোক ও। যেমন পারে খাটতে, তেমনি কুলি খাটাতে। সেই-জন্যেই বুঝি এই প্লাইউড ফ্যাক্টরীর প্রত্যেকটা কর্মী আর কুলি ভয়ানক ভয় করে ওকে। জ্যাককে ওরা বলে জ্যাকসাহেব, বলে— টেকার দেমাক এখানে চলে কি, জোরকা মাফিক চলতে হে ঠী।

যায় না মেজাজ নাকি কারোর সাথে বন্ধুত্ব হয় না, কিন্তু ওদের ভাষায় এই শ্বেতের সংগে অনায়াসেই মিশতে পেরেছিলাম আমি। শুধু মেলামেশাই নয়, জ্যাকের সংগে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম যে, পরবর্তীকালে একমাত্র আমাকে ভিন্ন আর কাউকে বন্ধু বলে স্বীকার করতে ঘৃণা বোধ করত ও। সে সম্পর্ক হল পরে। আগে, প্রথমে যখন মালবাজার স্টেশনের ওপারে সেই প্লাইউড ফ্যাক্টরীতে ওকে দেখি, মানুষের কথাবার্তা বেশ খানিকটা আমিও যে ভড়কে না

গিয়েছিলাম তা নয়। লোকটা শুধু এখানকার কর্মকর্তাই নয়, পাকাব্যবসায়ীও। খরিদ্দার বশ করবার আশ্চর্য ক্ষমতা জ্যাক ম্যাথুজের। যদিও ওর কথাগুলো এমনিতে নিরস, রূঢ় বলেই মনে হয়।

শুধু ব্যবসায়ীই নয়, ক্রেতা-বিক্রেতার ক্ষেত্রে একটা কথা প্রচলিত আছে—"আজ নগদ কাল ধার।" কিন্তু ধার নয়, পর পর কয়েকবার নগদ লেনদেন করার ফলে জ্যাকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলাম। সেই অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্যই হয়ত ওর বাংলো অবধি আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল একাধিকবার। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ওর স্ত্রীর সঙ্গে। তারপর থেকে বহুবার এসেছি, ডিনার, ব্রেকফাস্ট খেয়েছি জ্যাকের বাংলোয়। গল্প করেছি ওর স্ত্রীর সঙ্গে এক টেবিলে মুখোমুখি বসে। সেই গল্পচ্ছলেই একদিন জ্যাককে জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা জ্যাক, এ-দেশ তোমার কেমন লাগে?"

—"ভারি সুন্দর", জবাব দিয়েছে জ্যাক, কিন্তু যাই বলো গুপ্টা আমার হোমের মত নয়।" কথা বলতে গিয়ে আপনাই চোখ বুজেছে জ্যাক। চোখ বন্ধ করেই বলেছে—"হাই সুইট, সুইট এণ্ড চার্মিং। মাই হোম, সুইট সুইট।" তারপর চোখ খুলে তাকিয়েছে আমার দিকে, বলেছে—"আচ্ছা গুপ্টা, এই সব পাহাড়-পর্বত, শহর সব বরফে ঢেকে গেছে কল্পনা করতে পারো?"

—"না।" অকপটে স্বীকার করেছি।

—"তাহলে তুমি বুঝবে না। ইউ কাণ্ট ইমাজিন বাউট দি চারমিং সিনস্ অফ ইংল্যাণ্ড।"

দুই দেশের তুলনা প্রসঙ্গে জ্যাক আশ্চর্যভাবে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে ওর হোমের প্রশংসায়। বলেছে—"গুপ্টা, তোমাকে বোঝাব কি দিয়ে? কিন্তু এটা সত্য যে, সমস্ত পৃথিবী খুঁজলে এমন একটা দেশ পাবে না। সেই দেশই আমার হোম। আমার হোমের লোকেরা ইণ্ডিয়ানদের মত অলস নয়। একথাও তুমি স্বীকার না করে পারবে না যে, যোদ্ধা বলতে পৃথিবীতে ওই একটা জাতকেই বোঝায়। অ্যাণ্ড ইংলণ্ড ইজ দি সেণ্টার অফ কালচার।"

নির্বাক শ্রোতার মত জ্যাকের উচ্ছ্বসিত কথার স্রোত শুনেছি আমি। অন্য কেউ হলে কতটা সহ্য করতে পারতেন জানি না, কিন্তু মাঝে মাঝে এক-আধটু বিরক্ত হলেও খুব যে খারাপ লাগত তা নয়। শুনতে শুনতে বরং অনেক সময় মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম জ্যাক ম্যাথুজের দিকে। মনে মনে ভাবতাম ওরা ওদের দেশকে কত বেশি ভালবাসতে পারে। সাত সাগর পেরিয়ে এসে তাই ইংলণ্ডের গ্রামের ছেলে জ্যাক ম্যাথুজ একটি মুহূর্তের জন্যও ওর মাতৃভূমির স্মৃতি কণামাত্র বিস্মৃত হয়নি, ভুলে যায়নি স্বজাতি গৌরবের কথা।

এক টেবিলে মুখোমুখি বসেও কিন্তু জ্যাকের স্ত্রীকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখিনি কোনদিন। কোন মুহূর্তেই নয়। খেতে বসে যে হয় খেত, না হয় পরিবেশন করত। দু ক্ষেত্রেই কিন্তু ওর অধিকাংশ সময়েই নির্বাক থাকত। আসর সময় যখন গল্পগুজব হত, মিসেস ম্যাথুজ চুপচাপ সেলাই অথবা উল-বোনার কাজে ব্যস্ত থাকত। কথা বলতে বলতে, হোমের বিবরণ দিতে দিতে যখন উত্তেজিত হয়ে উঠত জ্যাক তখনই মাঝে মধ্যে এক আধবার দু'টো একটা কথা শোনা যেত মিসেস

...থ্যুজের। কিন্তু বড় মেপেজ্যুকে। যেন র বাইরে ওর কিছু বলার নেই অথবা লতে পারছে না। তবুও মিসেসকে দিয়ে ছু বলাবার চেষ্টার কসুর করত না াক। এক একটা কথা বলে প্রায়ই ও ফিরে াকাত স্ত্রীর দিকে, বলত—"তাই না?" কান সময় আস্তে করে মাথা নাড়িয়ে সায় ত মিসেস জ্যাক, আবার সময় সময় মনে ত জ্যাকের কথা আদৌ তার কর্ণকুহরে বেশ করেছে কি না সন্দেহ।

এ সব দেখে মাঝে মাঝে আমার চোখে বস্ময়ের ঘোর লাগত। না লেগেই বা উপায় ী! ওদের স্বামী-স্ত্রী দুটির মধ্যে আশ্চর্য-নক তফাত। জ্যাক উচ্ছল ঝরনার মত ঞ্চল, প্রাণোচ্ছল। ঠিক যেন খরস্রোতা নদী ার ওর স্ত্রী সে তুলনায় অনেক ম্রিয়মাণ, ান্ত, সমাহিত। বর্ষণোত্তর ঘুমন্ত রাত্রির নঃশব্দের সংগে ওর তুলনা করা চলে। ত দেখেছি তত একটা দুর্বার কৌতূহল াথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে। হুত বা এর একটা অন্তর্নিহিত গূঢ় হস্য আমার মনকে আন্দোলিত করেছে কাধিকবার।

ব্যবসার খাতিরে এবং মালপত্র কেনা-বেচার কাজে মাঝে মাঝেই ওদিকে যেতে হয়েছে আমাকে। কাছাকাছি গোটাকতক চা-বাগানে বিলের টাকা আদায় এবং সেই সঙ্গে জ্যাকদের ফ্যাক্টরী থেকে প্লাইশীট কিনতে গিয়ে একাধিক রাত্রিকাল অবস্থান করতে হয়েছে ওদিকে। প্রতিবারেই জ্যাকের আতিথ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। কিছুতেই ছাড়েনি আমাকে। এক রকম টেনেটুনেই নিয়ে গেছে ওর বাংলোয়। বলেছে—"গুপ্টা, হও না তুমি বেঙ্গলী, কী আসে যায় তাতে? আফটার অল ইউ আর মাই ডিয়ারেস্ট ফ্রেণ্ড। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে নেশানের কোন প্রশ্ন না থাকাই বাঞ্ছনীয়।"

অকুণ্ঠভাবে রাজী হয়েছি আমি। যদিও জানি ওর বাংলোতে যাওয়া মানেই ওর হোমের গল্প চুপচাপ হজম করা। তবুও গায়ে পড়ে ওকে উৎসাহ দেবার জন্য বলেছি—"তোমার হোমের গল্প শোনাতে হবে জ্যাক।"

—"ইয়েস, আই মাস্ট।" তারপর এক সময় আমার দিকে চোখ তুলে বলেছে—"আচ্ছা গুপ্টা, ডু ইউ লাইক ইংল্যাণ্ড?"

—"নিশ্চয়ই", জ্যাককে উৎসাহিত করেছি। "কিন্তু তোমার হোম তো কখনও দেখিনি আমি?"

—"তা বটে", বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে জ্যাক বলত—"তোমাকে আমি নিয়ে যাব গুপ্টা। তুমি দেখবে আমার হোম। দেখবে হাউ সুইট ইট ইজ।"

সে দিন বুঝিনি মাতৃভূমির নামে জ্যাকের এত উচ্ছ্বাস কেন! যদিও মাঝে মাঝে শুনতে ভাল লাগত, মন দিয়ে শুনতামও ওর কথা, তবুও মাঝে মাঝে কেন জানি না আমার মনে হত জ্যাকের কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা রয়েছে অথবা নির্ঘাৎ ওর মাথার এক-আধটু গণ্ডগোল হয়ে থাকবে। মিসেস মাথ্যুজের নিশ্চুপ কণ্ঠ সে সন্দেহকে আরও দৃঢ় করত। মনে হত সম্ভবত সেই কারণেই মিসেস মাথ্যুজ এমন করে নিশ্চুপ থাকে। আরও একটা সন্দেহ আমার মনকে মাঝে মাঝে দোলাত। ভাবতাম জ্যাক সুখী নয়। কী একটা গোপন রহস্য ওদের বিবাহিত জীবনে কঠিন কণ্টকের সম্ভাবনায় সমস্ত গোলাপী স্বপ্নকে ম্লান করে তুলেছে আর সেই জন্যই জ্যাকের মাথার ঠিক নেই।

এ রকম সন্দেহ করারও একটা কারণ

ছিল। মিসেস ম্যাথুজকে দেখে মনে হত সে জ্যাকের চেয়ে বেশ কিছু বড়। কত আর হবে জ্যাকের বয়স? বড় জোর পঁয়ত্রিশ বৎসর, কিন্তু এ কথা সত্য মিসেস ম্যাথুজ চল্লিশের কোঠা ছাড়িয়েছেন। খুব বেশি দিন না হলেও দু এক বৎসর আগেই চল্লিশ পার হয়েছে তার। অন্তত সে রকম চিহ্ন ওর চোখে-মুখে-দেহে দেখেছি আমি। শুধু বয়সই নয়, মিসেস ম্যাথুজ আশ্চর্য রকমের মেদ-বহুল। যেন চলাফেরা করাও ওর পক্ষে কষ্টসাধ্য। সে তুলনায় জ্যাক অনেক কৃশ।

একদিন ওদের বাংলোয় থাকাকালীন কাছাকাছি একটা চা-বাগানের ইওরোপীয় ম্যানেজারের ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। জ্যাকের সঙ্গেই গেলাম। এই যাওয়ার পশ্চাতে একটা উদ্দেশ্যও ছিল। জ্যাক বলেছিল তার সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গতা আছে এবং অনায়াসেই ও বাগানের টি-চেস্ট কণ্ট্রাক্টটা ও আমাকে পাইয়ে দিতে পারবে। মোটা টাকার একটা কণ্ট্রাক্ট পেয়েও গেলাম। গল্প-গুজবে অনেকটা রাত হল ফিরতে। তিথি-নক্ষত্র মনে নেই, কিন্তু এটা মনে আছে, সেদিন আকাশের চাঁদ প্রায় পূর্ণ গোলাকৃতি ছিল, আর একটু যেন বাড়া-বাড়ি ছিল জ্যোৎস্নার। ফেরবার পথে একটা ব্রিজের ওপর জ্যাক ব্রেক কষে ওর মরিস এইট কারটা থামাল। দরজা খুলে নামতে নামতে বলল—"গুপ্টা, এসো, দেখে যাও।"

নেমে এলাম ওর পেছন পেছন। ভেবে পেলাম না রাত্রির এই মধ্য প্রহরে এমন কী ও আমাকে দেখাতে চায়!

জ্যাক সোজা নেমে এল ব্রিজের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝরনার পারে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখল আকাশ, পাহাড়, ঝরনা। তারপর এক সময় আমার কাঁধে হাত রেখে বলল—"হাউ ব্রুইট অ্যান্ড চারমিং! গুপ্টা," আমার দিকে তাকাল জ্যাক, "জাস্ট সী। ইটস্ লাইক মাই হোম। ইয়েস সিমিলারলি।"

আমি তাকালাম। দেখলাম এদিক ওদিক। কাছে পিঠে পাহাড়। সুউচ্চ, পাহাড়ের সারি। ঘন জঙ্গল। আর আকাশের সুনীল ব্যাপ্তিতে উজ্জ্বল চাঁদের রোশনাই। নীচে পাহাড়-জঙ্গলের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বয়ে আসা কলনাদিনী উচ্ছল ঝরনার একটানা শব্দ কুলু কুলু শব্দ। পাহাড়ের গায়ে গায়ে অজস্র সূর্যমুখী ফুলের নিষ্করুণ হাসির দ্যুতি যেন আরও সুন্দর করেছে জ্যোৎস্নার সমারোহ। থমথমে ঘন নৈঃশব্দের মধ্যে এই স্রোতস্বিনী ঝরনার অপূর্ব কল-কাকলি কোথায় যেন টেনে নিয়ে যায় বন্দী মনকে। অদূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাহাড়ীদের দু একটা কুটির থেকে নক্ষত্রের দ্যুতি ছড়িয়ে জ্বলে জ্বলে উঠছে আলোর কণিকা। অপূর্ব, অনুপম সেই রাত্রির দৃশ্য।

জ্যাক কথা কইল, বলল—"জানো গুপ্টা, মাঝে মাঝে এমন ভুল হয়ে যায় আমার। মনে হয় এই আমার হোম, দিস ইজ ইংলন্ড। বাট্" ......কি যেন ভাবল জ্যাক, বলল—"বাট হাউ ডু ইউ অ্যাপ্রেসিয়েট ইট?"

—"ওয়ান্ডারফুল," প্রায় গদগদ হয়ে উঠি আমি।

—"লেট'স্ ওয়েট!" তারপর ও বসে পড়ল সেই বড় পাথরটার ওপর। আমার দিকে মুখ তুলে বলল—"বসো গুপ্টা, অ্যান্ড ট্রাই টু ফিল মাই হোম।"

এ যেন জ্যাকের কণ্ঠ নয়। স্বদেশ থেকে নির্বাসিত কোন দেশপ্রেমিকের করুণ কান্নার আকৃতি। আমি বসলাম জ্যাকের পাশে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ নিঃশব্দে কেটে গেল। তারপর দুটো একটা ভাসা ভাসা কথা। অনেকদিন ধরে পুরে রাখা সেই কৌতূহলকে কিছুতেই যেন চেপে রাখতে পারছিলাম না আমি। মনে হল আজই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। এখন কথাপ্রসঙ্গে অনায়াসেই দুটো একটা কথার ঢিল ছুঁড়ে আলোড়নটা বুঝতে পারব, আর হয়তো তা থেকে এই রহস্যের একটা সমাধানের আঁচও পেয়ে যেতে পারি। ভাবছিলাম কোথা থেকে শুরু করব আর কোন কথার সূত্র ধরে আসতে পারব আসল প্রসঙ্গে। এক সময় মনের এই দ্বন্দ্বকে ঠেলে ফেলে দিয়ে জ্যাকের দিকে
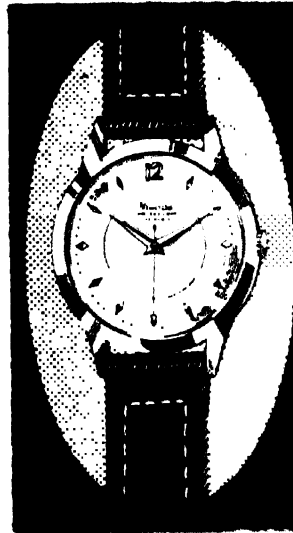
তাকালাম, জিজ্ঞাসা করলাম—"কতদিন আগে তুমি বিয়ে করেছ জ্যাক?"

জ্যাকের দৃষ্টি ছিল স্রোতস্বিনী ঝরনার দিকে। মনে হ'ল আমার প্রশ্নে ও যেন একটু চমকাল। সহসা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল একটা মুহূর্ত, বলল —"বিয়ে? ইউ মীন......তা এই ধর না কেন বছর দুয়েক।"

কেন জানিনা সঙ্গে সঙ্গে আর কোন প্রশ্ন মনে মনে গুছিয়ে উঠতে পারলাম না কিন্তু জ্যাক সম্ভবত আমার কৌতূহল সম্বন্ধে কিছুটা আঁচ করতে পেরে বলল—'ইয়েস, শী ইজ দি গার্ল অফ ইংলণ্ড। আমার হোমের মেয়েও। খাস লণ্ডনে ওর জন্ম, কিন্তু......" জ্যাকের মনেও বোধ হয় একটা প্রশ্ন। ও বলল—"তুমি একটু অবাক হ'য়েছ, না গুপ্টা?"

এ যেন অপ্রস্তুত করতে বসে নিজেই অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লাম। ব্যস্ত হ'য়ে বললাম —"ন্—না, না। ঠিক......মানে—"

মাথা নাড়ল জ্যাক, বলল—"গুপ্টা, তুমি লুকোতে চাইছ আমি জানি। তা হ'লে শোন, শী ওয়াজ মাই—মানে ওর সঙ্গে একটা লভ্ এফেয়ার্স ছিল আমার। বয়স একটু বেশিই বটে বাট্ শী ইজ এ গুড লেডি। ও চায় জীবনে আমি উন্নতি করি, বড় হই। শী ক্যান স্যাক্রিফাইস হার লাইফ ফর মি।"

আরও কিছু অবান্তর কথা নিয়ে সময় কাটল। জ্যাক বলল, ইংলণ্ডের মেয়েরা হচ্ছে যাকে বলে আদর্শ গৃহিণী। ওদের ওপর নির্ভর করা যায় অনায়াসে। আর ইংলণ্ডের ছেলে হ'য়ে হোমের মেয়েই যদি বিয়ে না করল তবে কি সুখী হ'তে পারবে জ্যাক? মোটকথা ইংরেজ হিসাবে ওর নিজেরও একটা দায়িত্ব থাকা উচিত।

জ্যাকের কথা খানিকটা বিস্ময় ছড়াল। অবাক হলাম আমি। শুধু আমি নই, অনেকেই জ্যাকের একথা শুনে অবাক না হ'য়ে পারবেন না। বিয়ের ব্যাপারে কোন ইওরোপীয়ের এ রকম কর্তব্য বলে কিছু আছে বলে এর আগে জানা ছিল না আমার। তাই জ্যাকের এ কথাটা আমাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলল।

আরও দু একটি কথা তারপর জ্যাকের কণ্ঠে আবার সেই উচ্ছ্বাস। জ্যাক বলল— "জানো গুপ্টা, আট বৎসর পার হ'য়ে গেছে অথচ দেশে আর যাওয়া হ'ল না আমার, পারলাম না।"

বললাম—"তোমার আর বাধা কিসের? সহজেই চলে যেতে পার তো।"

—"না-না," মাথা নাড়ল জ্যাক, বলল- "সহজেই যাওয়া যায় না গুপ্টা। এটি কি চারাটিখানি কথা নাকি যে হুট্ করে চলে গেলাম?"

—"নয়তো কি? হাতে-পায়ে ঝরঝরে মানুষ, দিব্যি বউ নিয়ে ফ্লাট করবে।"

—"না-না," মাথা নাড়তে নাড়তেই জ্যাক থেমে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল— "অনেক বাধা আছে গুপ্টা, অনেক বিপদ।"

—"বিপদ!"

জ্যাক চুপ করে থাকল, সহসা কথা বলল না।

তারপর আবার কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দে কেটে গেল। রাত্রির নৈঃশব্দে কান পেতে শুনলাম স্রোতস্বতী ঝরনার কলনাদ। তাকালাম দূরে পাহাড়ের শীর্ষদেশে। কি অপূর্ব অনাবিল শান্তি! আর তার মধ্যে হঠাৎই যেন এক ঝলক কান্না ছড়াল জ্যাক, বলল—"সে অনেক, অনেক কথা গুপ্টা।" সহসা ও সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল—"চল, অনেক রাত হয়ে গেছে।"

নিঃশব্দে উঠে এলাম জ্যাকের সঙ্গে।

আজ আট বছর পর সেই জ্যাক ম্যাথুজের দেখা পেলাম। সেণ্ট্রাল এভেন্যু থেকে খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ম্যাডান স্ট্রীট দিয়ে এগুচ্ছিলাম ধর্মতলার দিকে, হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। প্রথমটা মনে হ'ল ভুল করলাম কি? কে কাকে ডাকছে কে জানে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই ডাক। অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। এমনই পরিচয় যে আট বৎসর পরেও শুনতে ভুল হবার কথা নয়। দ্বিতীয় ডাকের মাথায় ফিরে তাকালাম পেছন দিকে কিন্তু কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না! অথচ

যে নামে ডাকল একমাত্র জ্যাক ম্যাথুজ ভিন্ন ও নামে কেউ ডাকে না আমাকে। আবার মনে হ'ল হয়তো বা ভুলই শুনে থাকব!

—"গুপ্টা," আবার সেই কণ্ঠস্বর। আর সঙ্গে সঙ্গেই সম্মুখে এসে দাঁড়াল জ্যাক। জড়িয়ে ধরলো আবেগে। উচ্ছ্বাসে প্রায় চিৎকার করে উঠল—"গুপ্টা! লঙ্ লঙ্ ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট, বাট্‌ ....."

—"তুমি!" একরাশ বিস্ময় ঝাঁড়য়ে পড়ল আমার কণ্ঠ থেকে।

—"ইয়েস্-ইয়েস্, কাণ্ট্ রিমেম্বার?"

—"কেন নয়? কিছু বলতে গেলাম আমি।

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল জ্যাক একেবারে আচমকা। আমাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে সামলে নিয়ে বলল—"তুমি সেই গুপ্টা আ হাউ স্ট্রেঞ্জ!"

কিন্তু এমনভাবে, এমন অবস্থায় জ্যাককে দেখতে পাব এ কথা ঘুণাক্ষরেও কোনদিন ভাবতে পারিনি। এখন, এই মুহূর্তে যেন নিজের চোখকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। বার বার মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই ভুল দেখছি আমি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম ওকে, দেখলাম পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে বিচার করে। আমার মনে হ'ল আগাগোড়া সবটাই দুঃস্বপ্ন।

একটু যেন সচকিত হ'য়ে উঠল জ্যাক। মনে হ'ল কে যেন ডাকছে ওকে। কী একটা অদ্ভুতরকম নাম ধরে ডাকছে। কান পাতলাম কিন্তু জ্যাক বা ম্যাথুজ কোনটাই নয়! জ্যাক কিন্তু দু' ডাকের মাথাতেই অস্থির হ'য়ে উঠল। প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে যেতে বলল—"জাস্ট্ এ মিনিট গুপ্টা, জাস্ট্ এ মিনিট—"

স্পষ্ট দেখলাম ডানহাতি একটা মটর-গ্যারেজে ঢুকল ও। কয়েকটা ভাঙাচোরা মটরগাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে আর তার সারাইয়ের কাজ করছে জন কয়েক লোক। কেউ বাইরে থেকে, কেউ সেই ভাঙা মটরের নিচে শুয়ে।

সরাসরি ভেতরে ঢুকে গেল জ্যাক। ঢুকবার পূর্ব মুহূর্তেও আবার সেই ডাকটা স্পষ্ট শুনতে পেলাম। জ্যাক নয়, ম্যাথুজ নয়—জন্। জন্ বলেই ডাকছে। জন্! তবে কি ওর আর একটা নাম টাম আছে না কি! হতেও পারে। হয়ত বা জ্যাকের ডাক-নাম জন্। কিন্তু জ্যাক আর জনের প্রশ্ন বাদ দিলেও বিস্ময়ের ঘোরটা কিছুতেই কমছে না আমার। অবশেষে সেই জ্যাক ম্যাথুজকে এমন একটা গ্যারেজে দেখব এ যেন আমার স্বপ্নেরও অতীত। আকাশ-পাতাল ভেবেও কূল-কিনারা পেলাম না। অথচ এমনও তো হ'তে পারে জ্যাক চাকরি ছেড়ে ব্যবসায়ে নেমেছে, খুলেছে এই গ্যারেজটা আর নিজে হাতেও কাজকর্ম কিছু কিছু করছে। অথবা এমনও হ'তে পারে জ্যাকের গাড়িই সারাই হচ্ছে এখানে। একথা ভাবতে গিয়ে আরও কতগুলো প্রশ্ন ভিড় করে এল মনে। অত অত টাকা মাইনের চাকরি, এত সম্মান সে সব ফেলে কোন দুঃখে জ্যাক এমন একটা ছোট্ট গ্যারেজ খুলে বসল! আর সামান্য একটা ডাকে ওর চোখেমুখে অমন করে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল কেন ভয়-ভয় একটা ভাব!

বছর আস্টেক আগে হঠাৎ একদিন মাদারী-হাটের সেই প্লাইউড ফ্যাক্টরীতে গিয়ে শুনলাম জ্যাক নেই। কোথায় গেছে, দেশে? ওর হোমে? না, তা নয়। যা শুনলাম সে আর এক অবাক কাণ্ড। আশ্চর্য সংবাদ। মাদারী-হাট প্লাইউড ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার জ্যাক ম্যাথুজ এখন ডাক্তার। শুধু ডাক্তার বললে ভুল বলা হ'বে, জ্যাক এখন মেটেলী ডিস্ট্রিক্টের গ্রুপ মেডিকেল অফিসার। বারোটা অথবা আরও বেশি কতগুলো চা-বাগান নিয়ে এক একটা ডিস্ট্রিক্ট আর সেই রকম ডিস্ট্রিক্টের মেডিক্যাল ইনচার্জ হয়েছে জ্যাক ম্যাথুজ। ও এখন দণ্ড-মুণ্ড বিধাতা। মেটেলী ডিস্ট্রিক্টের একাধিক চা-বাগানের ডাক্তারদের ভাগ্য-বিধাতা। কিন্তু কী করে সম্ভব! কোন উপায়ে এ রকম একটা আশমান-জমিন পার্থক্য এক হওয়া সম্ভব খুঁজে পাই নি।

মাস দেড়েক পরে একদিন দেখা হ'ল। ইন্ডং, নাগেশ্বরী আর ইয়াটং চা-বাগানের কিছু বাকি টাকা আদায়ের ফিকিরে গিয়ে-মেটেলীতে। মেটেলী বাজার থেকে গ্রুপ মেডিক্যাল অফিসারের বাংলো তেমন দূরে নয়। সামসিংয়ের রাস্তা ধরে খানিকটা এগুলেই বাঁ দিকে পড়বে বাংলো। ইয়াটং যাবারও ওই একই রাস্তা। কি মনে হ'ল সোজা গিয়ে উঠলাম গ্রুপ মেডিক্যাল অফিসারের বাংলোতে।

বেয়ারা নিয়ে গেল আমাকে। সাহেবের অফিসে বসিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে সে চলে গেল। এক্ষুনি এসে পড়বে সাহেব। এক কোণে একটা সোফাতে বসলাম। আরও জন তিনেক লোক রয়েছে। তার মধ্যে একজন বাঙালী, একজন ইওরোপীয়। তাঁরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, জ্যাক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। খুব তরতাজা মনে হ'ল ওকে। কী একটা কাগজ অপেক্ষারত সাহেবের হাতে দিয়ে ফিরে তাকাতেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি। দেখেই জ্যাক প্রায় লাফিয়ে ওঠে আর কি। দ্রুত এগিয়ে এসে আমার একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—"হ্যাল্‌লো, গুপ্টা যে, তারপর?"

—"এই দেখতে এলাম তোমাকে।"

—"বেশ, বেশ।" অপেক্ষারত সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত হ'ল জ্যাক। আমাকে বলল—"এক মিনিট গুপ্টা, আমি কথাটা সেরেনি।"

সাহেব চলে গেল। এবার অপেক্ষারত দুজন বাঙালীবাবুর সঙ্গে কথা বলতে লাগল
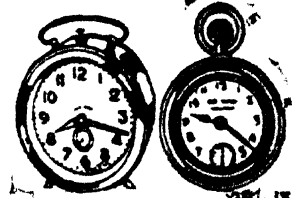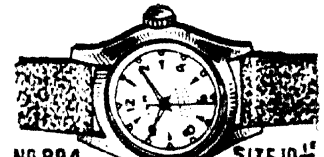
জ্যাক। কথাবার্তায় বুঝলাম দুজন বাঙালীর একজন কোন এক বাগানের ডাক্তার। অন্য বাবুটি সেই বাগানের ফ্যাক্টরী-ইন-চার্জ। ভদ্রলোকের ছেলের টাইফয়েড হয়েছে। বাগানের ডাক্তারটি রোগের কোন সুরাহা করতে না পেরে ম্যাথুজকে নিয়ে গিয়েছিল। গতকাল জ্যাক ম্যাথুজ রোগী দেখে এসেছে এবং আজ তার প্রেসক্রিপশন্ দেবার কথা। সেই সঙ্গে ডাক্তার অতঃপর কিভাবে রোগীর চিকিৎসা করবে সে নির্দেশও দেবে জ্যাক। ডাক্তারের সঙ্গে খানিকটা মেজাজী কথাবার্তা বলে জ্যাক ভেতরে গেল। মিনিট সাতেক পরে ফিরে এসে দুখানা স্লিপ ডাক্তারের হাতে গুঁজে দিয়ে ফিরে তাকাল আমার দিকে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ডাক্তার, জ্যাক তাকে ধমকে বলল—"প্রেসক্রিপশন এবং নির্দেশ দুটো আলাদা করে লিখে দেওয়া হয়েছে।" অগত্যা ওরা পালাল।

ধপ্ করে আমার পাশে বসে পড়ে ওর একখানা হাত প্রায় আমার কাঁধে তুলে দিয়ে জ্যাক বলল—"তারপর গুপ্টা, খবর কি তোমার?"

—"খবর তো সব তোমারই জ্যাক," বললাম আমি।

হোঃ-হোঃ- করে হেসে উঠল জ্যাক, বলল—"ঠিক, ঠিক, খবর সবই আমার কিন্তু তোমার কথা প্রায়ই মনে পড়ে গুপ্টা। যাক, ভালই হ'ল কী বলো? এসো, ভেতরে এসো।"

প্রায় টেনে হিঁচড়ে ও আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। আমাকে হঠাৎ দেখে মিসেস ম্যাথুজ কিন্তু চমকে উঠল। দেখলাম চোখে চশমা দিয়ে কী সব ডাক্তারি বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করছে আর লিখছে। তবুও মুখে একটু হাসির রেশ টেনে উঠে এল মিসেস ম্যাথুজ। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে করমর্দন করে বলল—"তারপর মিস্টার গুপ্টা, আছ কেমন?"

—"ভাল," বললাম আমি।

জ্যাক আমাকে অনুরোধ করেছিল সে রাতটা যাতে ওদের সঙ্গে কাটাই আমি। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। একে হাতে কাজ তার ওপর মিসেস ম্যাথুজকে খুব সুপ্রসন্ন মনে হ'ল না। কেমন যেন অপ্রস্তুত অপ্রস্তুত ভাব। সে অবস্থায় ওদের ওখানে থেকে যেতে বাধল আমার। চলে এলাম ঘণ্টা দুয়েক পরেই। জ্যাক অবশ্য আপ্যায়নের ত্রুটি করেনি। কফি খাওয়াল, সাধাসাধি করল স্যাণ্ডউইচ। কফিটাই খেলাম আমি। যখন চলে আসি জ্যাক অনুরোধ করল একদিন যেন এসে ওদের সঙ্গে রাত কাটাই।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কুয়াশাচ্ছন্ন মনে হ'ল আমার কাছে। টাইফয়েড কেসের রোগী, যার মর-মর অবস্থা সে রোগী কাল দেখে এসে আজ প্রেসক্রিপশন দেওয়া, প্রেসক্রিপসন ভেতর থেকে লিখে আনা, মিসেস্ ম্যাথুজের ডাক্তারি বইপত্র নিয়ে মনোযোগ সহকারে ঘাটাঘাটি এবং আমার উপস্থিতিতে অসন্তুষ্ট হওয়া এর সবটা মিলিয়ে যেন একটা রহস্যের কুয়াশা। সব কিছুর মধ্যেই হয়তো রহস্যের গন্ধ পাওয়া আমার স্বভাব। কিন্তু ভুল ভাঙল আমার। সমস্ত ঘটনাটা পরে জানতে পেরেছিলাম।

আসলে জ্যাক ম্যাথুজ একজন বড় ডাক্তার। বিদেশের অনেকগুলো ডিগ্রীধারী অভিজ্ঞ চিকিৎসক। আগে বর্মা-মুল্লুকে ডাক্তারী করত কিন্তু বোমার ভয়ে জান বাঁচিয়ে পালিয়ে আসে এ-দেশে। চট্ করে পসার করা বা চা বাগানে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পাওয়া কোনোটাই না হ'য়ে ওঠায় প্লাইউড ফ্যাক্টরীতে সাময়িকভাবে চাকরিতে বহাল হ'য়ে চেষ্টা চরিত্র করে তবে গ্রুপ-মেডিক্যাল অফিসার হ'তে পেরেছে। আসলে প্লাই-উড ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের মত সাধারণ লোক নয়। কোন উদ্দেশ্যে বা কেন বর্মা বা ডাক্তারি ব্যাপারের সব কথাই আমার কাছে আগা-গোড়া লুকিয়ে রেখেছিল জ্যাক জানি না। যাই হোক, সেই দেখাই জ্যাকের সঙ্গে শেষ দেখা। আর যাই নি ওদের বাংলোয়। কিন্তু একটা কথা সেদিন জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম জ্যাককে। জ্যাক কি ওর হোমে গিয়েছিল এর মধ্যে? ওর ইংলণ্ডে?

আজ আট বৎসর পর আবার সেই জ্যাক ম্যাথুজের সঙ্গে দেখা এই ম্যাডান স্ট্রীটে। আশ্চর্যভাবে দেখা। মেটেলী ডিস্ট্রিক্টের অতগুলো চা বাগানের ডাক্তারদের হর্তাকর্তা বিধাতা সেই জাঁদরেল গ্রুপ মেডিক্যাল অফিসার আজ একটা ছোটখাটো গ্যারেজের মালিক! এ যেন সত্যিই অবাক কাণ্ড! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরনো কথা ভাবতে গিয়ে যেন সহ্য করতে পারছিলাম না জ্যাকের বর্তমান অবস্থা।

খানিক বাদেই জ্যাক বেরিয়ে এল। কেমন একটা অপ্রস্তুত গাম্ভীর্য ওর চোখে-মুখে ঘুট ঘুট করছে। তা সত্ত্বেও জ্যাক আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বেশ জোর করেই হাসি টেনে আনল ঠোঁটের ডগায়, বুঝতে কষ্ট হ'ল না আমার। ও বলল—"কলকাতায় তুমি কতদিন আগে এসেছ গুপ্টা?"

—"অনেকদিন", উত্তর দিলাম আমি।

—"ওদিকে আর যাওনি?"

—"কোনদিকে?"

—"ডুয়ার্স?"

—"না।"

তারপর চুপচাপ। জ্যাক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

দুই আড়মোড়া ভাঙল অনিচ্ছাসত্ত্বেও। হয়তো চেষ্টা করেও খুঁজে পেল না এরপর ও কি বলবে, কোন্ কথা দিয়ে এই অপ্রস্তুত ভাবটাকে আড়াল করবে।

আমার অবস্থাও তথৈবচ। না পাচ্ছি কিছু খুঁজে, না তাকাতে পারছি আর জ্যাকের দিকে। মাত্র আটটা বৎসরের ব্যবধানে এ কী মানুষ হয়েছে জ্যাক! বুঝতে পারছিলাম, উচ্ছ্বাসের মাথায় আমাকে ডেকে দাঁড় করিয়ে এখন ভয়ানক অপ্রস্তুত মনে করছে ও নিজেকে। এখন যেন আমাকে বিদায় দিতে পারলে ও বাঁচে। সম্ভবত সেই উদ্দেশ্যেই এক সময় মুখ খুলল জ্যাক, বলল—"তারপর এদিকে কোথায়?"

—"একটা জরুরী কাজে।"

—"ও", সরাসরি বিদায় দিতে পারল না জ্যাক।

আমি বিদায় হ'লেই ও বাঁচত। ওর চোখ-মুখের অভিব্যক্তি দেখে তাই মনে হ'ল আমার কিন্তু তবুও জ্যাককে ছাড়তে ইচ্ছা হ'ল না আমার। হয়তো আমি কিছু জানতে চাই ওর কাছ থেকে। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে বললাম—"চল একটু এগোই এদিকে।"

—"সে কী, তোমার কাজ!"

—"অক্ত থাক জ্যাক। এতদিন পরে দেখা পেলাম তোমার, চল একটু গল্পসল্প করা যাক।"

জ্যাক একবার নিজেকে ভাল করে দেখল, বলল—"চল।"

পাশাপাশি এগুতে লাগলাম। একটা ভাল রেস্তোরাঁয় বসে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করব এই ইচ্ছা। যেতে যেতে দেখলাম, জ্যাক আর সেই জ্যাক নেই। কেমন একটা বার্ধক্যের ছাপ ওর সারা দেহে। আগের তুলনায় অনেক ম্রিয়মাণ ও।

বললাম—"হোমে গেলে?"

—"হোম!", অস্ফুটে মৃদু আর্তনাদের মত কথাটা বেরিয়ে এল জ্যাকের কণ্ঠ থেকে। থমকে একবার দাঁড়াতে গিয়েও দাঁড়াল না। চোখ দুটো কুঞ্চিত করে ও বলল—"ইউ মীন হোম? ইংল্যান্ড?"

—"হ্যাঁ।"

আবার খানিকটা অপ্রস্তুত অবস্থা। যতই ঢাকবার চেষ্টা করুক জ্যাক কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দেবে কি করে? স্পষ্টই আমি দেখতে পেলাম—ওর চোখে মুখে যেন এক দোয়াত কালি ছড়িয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ধর্মতলায় এসে গিয়েছি। সামনেই একটা রেস্তোরাঁ। ভাবলাম ওখানেই একটা কেবিনে বসে খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

প্রথমটায় ঢুকতে একটু ইতস্তত করল জ্যাক। আমি তাড়া দিলাম, বললাম—"এসো।"

—"এখানে!"

—"হ্যাঁ।"

—"তার চেয়ে অন্য কোথাও..."

বললাম—"কাছাকাছির মধ্যে এটাই ভাল।"

আর একবার নিজের চোখেই জ্যাক নিজেকে দেখল। ওর চোখ-মুখ থেকে সেই ম্লান কান্তির কালিমা মোছেনি এখনো। উঠে এল ও।

কেবিনে ঢুকে মুখোমুখি বসলাম আমরা। বয়কে খাবার আনতে বলে জুৎসই একটা প্রশ্নের জন্য তৈরী হতে লাগলাম। জ্যাক কিন্তু চুপচাপ স্থাণুর মত বসে রয়েছে। কী এক দুর্বার ঝড় বইছিল ওর মনের মধ্যে। আথালি-পাথালি অনেক চিন্তার জট কতখানি বিপর্যস্ত করছিল ওকে আমার বোঝবার কথা নয় কিন্তু মুখ যদি মনের আয়না হয়, তা হ'লে হলপ করেই আমি বলতে পারি, জ্যাক সশঙ্কিত হয়েই অপেক্ষা করছিল।

খাবার এল। তখনও আমরা মুখোমুখি বসা দুটি প্রাণী নিশ্চুপ। কথার খেই হারিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় এলোমেলো সুতোর প্রান্ত খুঁজে মরছি।

জ্যাক হাসল, বলল—"গুপ্টা, হোয়াট আউট ইউ? সব ভাব তো?"

—"হ্যাঁ।"

"তুমি যেন কি ভাবছ বলে মনে হচ্ছে?"

—"তোমার কথাই ভাবছি জ্যাক", বললাম আমি। "তোমাকে এমন করে দেখতে হবে আশা করি নি।"

জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল জ্যাক।

বললাম—"তোমার হোম, হোমে যাওনি?"

মুহূর্তে আর একবার বিবর্ণ হয়ে গেল ওর মুখখানা। খানিকটা সময় নিল ও, বলল—"থাক, থাক গুপ্টা, সে কথা তুলে আর ব্যথা দিও না আমাকে। নাউ ইট ইজ নাথিং বাট এ ড্রিম টু মী।"

আবার চুপচাপ। বিরিয়ানী আর রেজালার প্লেটে কাঁটা চামচ, ছুরির শব্দ, কাঁচের পেঁয়ালায় টুং টাং এই করেই কাটল আবার খানিকটা নির্বাক মুহূর্ত। আমি তাকালাম, দেখলাম—জ্যাকের আকাশ-ছোঁয়া সেই মাথা যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে এই মুহূর্তে।

জানি না কোন্ কৌতূহল তখনও আমার মনে দুর্বার ঝড় তুলছে আর অনেক, অনেক প্রশ্ন গুনগুনিয়ে উঠছে আমার মনের মধ্যে। তাই এক সময় জ্যাককে বললাম—"তোমার মিসেসের খবর কী?"

জ্যাক মাথা তুলল না।

বললাম—"হোয়াট আবাউট হার?"

ভিজে গলায় এক অবাক কান্না ছড়িয়ে জ্যাক বলল—"ও কথা যেতে দাও গুপ্টা, যেতে দাও। শী ওয়াজ চীট্।"

"চীট্!"

—"হ্যাঁ।"

তারপর জ্যাক সমস্ত ব্যাপারটাই খুলে বলল।

ওর আসল নাম জন প্যাট্রিক, জ্যাক ম্যাথুজ নয়। জ্যাক ম্যাথুজ বলে একজন খুব

নামকরা ডাক্তার ছিলেন ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী চলে আসে কলকাতায়। কিছুকাল পরে জন স্বর্গীয় জ্যাক ম্যাথুজের বিধবা স্ত্রীর নজরে পড়ে এবং দিনে দিনে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। শেষকালে জন বর্ণিত সেই কন্ট্রাক্ট এক্সেপ্টেন্সে এসে দাঁড়ায়। মিসেস ম্যাথুজ সেই সময়ই সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলেছিল জনকে এবং সমস্ত পরিকল্পনা খুলে বলে লোভ দেখিয়েছিল জনকে। যদি সে ম্যাথুজ সাজতে রাজি হয় তো মোটা টাকা বেতনের একটা চাকরি তো মিলবেই, সেই সঙ্গে উপরি পাওনা হিসাবে পাবে মিসেস ম্যাথুজকে গৃহিণীরূপে।

কথা শুনে জন কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করল, বলল—"কী করে তা সম্ভব?"

মিসেস ম্যাথুজ আদ্যোপান্ত পরিকল্পনাটা খুলে বলল, বলল—ম্যাথুজের মৃত্যু সংবাদ ইন্ডিয়াতে কারও জানবার কথা নয়, অথচ তাঁর সমস্ত কাগজপত্র থেকে সব কিছুই মিসেস ম্যাথুজের কাছে রয়েছে। অতবড় ডাক্তারের একটা চাকরি হাত থেকে বিলম্ব হওয়ার কারণ নেই। তাছাড়া, তড়াতাড়ি চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে ধরা-ধরি করবার ক্ষমতা রয়েছে মিসেসের।

জন বলল—"কিন্তু ডাক্তারি? তার তো কিছু জানি না আমি।"

অভয় দিয়ে মিসেস ম্যাথুজ বলল, ঘাবড়াবার কারণ নেই। জন না জানলেও মিসেস ম্যাথুজের কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাছাড়া, এমন চাকরির ব্যবস্থাই করা হবে যাতে শুধুমাত্র পরামর্শ দিলেই চলে যাবে। বইপত্র রয়েছে, একান্ত প্রয়োজন হলে তা থেকে সাহায্য পেতে কষ্ট হবে না।

ছোটখাটো একটা কণ্ট্রাক্টরী ফার্মের সহকারী কার্যাধ্যক্ষের কাছে এ যেন একটা গোটা রাজত্ব আর রাজ-কন্যার লোভ। জন অনায়াসেই রাজি হয়ে গেল। দিন কয়েক ধরে স্বর্গীয় ম্যাথুজের নাম স্বাক্ষর রপ্ত করল তারপরে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে মিসেস ম্যাথুজ বলল—"চল এবার, ব্যবস্থা সব হয়ে গেছে।"

বিছানাপত্র বাঁধা-ছাদা হ'ল, রীতিমত ডাক্তার তৈরী হয়ে জন প্যাট্রিক জন ম্যাথুজ হয়ে রওনা হলেন ডুয়ার্সের দিকে। রাস্তায় বেরিয়ে মিসেস ম্যাথুজ বলল, আগে তারা গিয়ে উঠবে মাদারীহাটে। সেখানে প্লাইউড ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের পদ পেয়েছে জ্যাক ম্যাথুজ। এটা সাময়িক ব্যবস্থা। সহজেই এ চাকরি মেলাতে কষ্ট হয়নি মিসেসের। এর পরের লক্ষ্য যা, তা পেতেও খুব বিলম্ব হবার কথা নয়, কারণ ধর-পাকড় করতে কোনদিকেই কসুর করা হয়নি।

মাদারীহাটের প্লাইউড ফ্যাক্টরীর অধ্যায়-টুকু আমার জানা। তারপর যখন ডিস্ট্রিক্টের গ্রুপ মেডিক্যাল অফিসার হয়ে গেল জ্যাক তখনও আসল বিপদটা মনে আসে নি। মাস ছয়েক কাটবার পর দেখা গেল, ব্যাপারটা যত সহজ মনে করা গিয়েছিল তত সহজ নয়।

ডেটেলী ডিস্ট্রিক্টের বারোটা চা বাগানের মধ্যে সবই বিলিতী কোম্পানীর। ম্যানেজাররাও সকলেই ইওরোপীয়। তাঁদের বাংলোয় কারও অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা করার রীতি গ্রুপ মেডিক্যাল অফিসারের। এছাড়াও কার্যক্ষেত্রে অনেক রকমের বিপদের সম্ভাবনা। সেখানেই বাধল যত গণ্ডগোল। মিসেস ম্যাথুজ তার ছদ্মবেশী স্বামীকে অভয় দিতে লাগল আর সমস্ত বিপদের বাধা পার হতে লাগল এক এক করে। কিন্তু কতদিন? একদিন পালাতে হ'ল ডুয়ার্সের সমস্ত মায়া কাটিয়ে। ফেরারী স্বামী-স্ত্রী উধাও হয়ে গেল।

কিলকট চা-বাগানের জাঁদরেল ম্যানেজার এলবার্ট বুকাননের পত্র-হত্যার দায়। ব্ল্যাক-ওয়াটার-ফিভার রোগে একটা ভুল ইঞ্জেকশনের সত্যটা ধরে ফেলেছিল বানার-হাট ডিস্ট্রিক্টের গ্রুপ মেডিক্যাল অফিসার ডি এস পাণ্ডে। গোপনে তদারক চলতে লাগল আর সে খবর সুচতুরা মিসেস ম্যাথুজকে আবিষ্কার করতে কোনরকম কষ্টই পেতে হয়নি।

এর পরের অধ্যায়ের ইতিবৃত্ত সম্ভবত আরও দুঃখের, আরও বেদনার। সেই মিসেস ম্যাথুজ, একদা সরে পড়ল। ফেরারী অবস্থায় লুকোচুরি খেলতে খেলতেই অন্য এক সাহেবের কণ্ঠলগ্না হয়ে চলে গেল চির-কালের মত। কোথায় গেল সে কথা আজও জানে না জন প্যাট্রিক।

জন বলল—"জানো গুপ্টা, অনায়াসেই ওকে আমি ধরিয়ে দিতে পারতুম, হয়তো তাতে জড়িয়ে পড়তাম নিজেও কিন্তু সে ভয় ছিল না আমার। শুধু ইংলণ্ডের মেয়ে, আমার হোমের মেয়ে ব'লেই ওর সব অপরাধ আমি মেনে নিয়েছি।"

অনেকক্ষণ আগে বেয়ারা বিল দিয়ে গেছে। পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করে টাকাটা দিতে যাব, জন বাধা দিল, বলল—"না-না-না, সে হয় না গুপ্টা। আমি, মানে আমিই দিয়ে দিচ্ছি"। হাঁটু-ছেঁড়া তেল-কালি মাখা জীর্ণ প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢোকাতে গেল জন। কিন্তু ওর কথা শুনিনি আমি। বিলের টাকাটা আমিই দিয়ে দিলাম। কতটুকু উপকার করতে পারলুম জানি না, কিন্তু এ কথা সত্য বিল শোধ করবার মত অত টাকা জনের কাছে ছিল না। থাকলেও, ও টাকা দিয়ে অনায়াসে ওর দিন কয়েকের খাই-খরচা চলে যাবে। কত আর কামাই করতে পারতে পারে সাধারণ একটা মটর গ্যারেজের ক্লিনার জন প্যাট্রিক?

এক সঙ্গে পাশাপাশি বেরিয়ে এলাম দুজনে। জন আজ ফেরারী আসামী কিন্তু তা হলেও ও আমার কাছে জন নয়। যে জ্যাক ছিল ও সেই জ্যাক ব'লেই চিরকাল মনে করব ওকে।

বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আর দেখা হয়নি জন প্যাট্রিকের সঙ্গে। কিন্তু ওর কথাগুলো আমি ভুলিনি। যদিও হোম-হোম করে ও পাগল কিন্তু কোনকালেই ওর হোম ওর দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। জনের বাবা বাঙলা দেশে এসে একটা বুড়ি নেপালী আয়াকে রেখেছিল। সেই আয়ার গর্ভেই জনের জন্ম। কিন্তু তা হোক, জনের বাবার দেহে ছিল খাঁটি ইংরেজের রক্ত। ইংলণ্ডেরই এক গ্রামের ছেলে জনের বাবা। তাঁর জীবিত-কালে ইংলণ্ডের কত গল্পই না শুনেছে জ্যাক। চোখ বুজে বাবা যখন ইংলণ্ডের গল্প, ওঁর হোমের গল্প বলতেন, জনের মনে হ'ত ও যেন চলে গেছে সেই স্বপ্নের দেশে, সেই আকাঙ্ক্ষিত ইংলণ্ডের গ্রামে। বাবার মৃত্যুর পর ও ভেবেছিল, একদিন না একদিন হোমে যাবেই, যাবে ওর মাদারল্যাণ্ডে। মিসেস ম্যাথুজের প্রস্তাবে তাই অতি সহজেই রাজি হয়েছিল জন।

ও গল্প শেষ করে জন আমার একটা হাত চেপে ধরেছিল, বলেছিল—"গুপ্টা, হুট ইজ মিওর। আমি একদিন যাবোই আমার হোমে। যেমন করে লোক ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যায়। আর, হ্যাঁ, তোমাকেও নিয়ে যাবো সেদিন।"

(চব্বিশ)

"আমেরিকা কিছুকাল ধরে চেষ্টা করে আসছে ইরান, সৌদী আরব ও জর্ডনের রাজাদের একটি সামরিক গোষ্ঠীতে একত্রিত করতে" —নিউ ইয়র্ক টাইমস।

"সাম্রাজ্যবাদীরা চায় আরব জাতি বসে থাকুক একটি আগ্নেয়গিরির মাথায়"—আবদ্ সাব, কাইরো।

যুদ্ধ কোন সমস্যারই সমাধান করে না। আরো সমস্যার সৃষ্টি করে। বর্তমান সমস্যাকে জটিলতর করে। মানুষকে আলাদা করে। বিভেদ বাড়ায়। বিদ্বেষে মানুষের মন ও পৃথিবীর বাতাস কলুষিত করে। গরম যুদ্ধের ন্যায় যুদ্ধের ধর্মও এমনি নেতিবাচক। বরং, সোজাসুজি হত্যাযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে ঠাণ্ডা যুদ্ধ চেষ্টা করে মানুষের মনকে কেবলই পৃথক করতে, একত্রিত হ'তে না দিতে। এই যে আলাদা-করা তাতেও ব্যক্তির কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। ডি এইচ লরেন্সের কবিতায় চল্লিশ বছর আগে যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বলিষ্ঠ ঘোষণা অনেককে অবাক করেছিল, আজকার যুদ্ধ-শীতল পৃথিবীতে সে স্বাতন্ত্র্য মৃত।* মিথ্যা, অর্ধ-মিথ্যা ও বিকৃত সত্য নিরপেক্ষ বিচারের পথ অবরুদ্ধ করেছে। পৃথিবী যতোই ভয়ানকভাবে দুই পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হচ্ছে ততোই দুই শিবিরের মধ্যখানকার দেশগুলির চিন্তা, কর্ম ও বিচারের স্বাধীনতা হ'য়ে উঠছে বিপন্ন। মানুষকে সভ্যতাসম্মত পথে বিজ্ঞান যতোই আগ্রাসী করে তুলছে, আমাদের পূর্ব পুরুষরা যে উদাত্ত সাহসী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মুগ্ধকর বিন্যাস দেখতে পেয়েছিলেন উনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত, ততোই দ্রুত তার বিলয় আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের এই হাইড্রোজেন ও কোবাল্ট বোমার যুগে।

শীতল যুদ্ধ নেমে এসেছিল আরব-ভূমিতে দশবছর আগে। ১৯৪৭ সালের ২৩শে মার্চ। সেদিন মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারী ট্রুম্যান আমেরিকার কংগ্রেসের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটা নতুন নীতি ঘোষণা করেন, যার প্রচলিত নাম ট্রুমান ডকট্রিন।

নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যকে য়ুরোপীয় শাসকগণ চিরদিনই পূর্ব ভূমধ্যসাগরের ভৌগোলিক প্রসার হিসাবে দেখে এসেছেন। কয়েক শতাব্দী এখানকার য়ুরোপীয় স্বার্থ রক্ষা করেছে ইংরেজ তার বিরাট সাম্রাজ্যশক্তি দিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও ইংরেজই মধ্যপ্রাচ্যের রণনীতি ও যুদ্ধের পরিচালনা করেছে; মার্কিন সরকার যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, কিন্তু কর্তৃত্ব দাবী করেননি, আর করলেও চার্চিল রাজী হতেন না। কিন্তু বিজয়ী বৃটেন এতোই শ্রান্ত, ক্লান্ত নিস্তেজ ও নিঃস্ব হ'য়ে পড়ল যে যুদ্ধের পরেই গ্রীসে যখন সাম্যবাদীরা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'ল রাজকীয় ক্ষমতা অধিকারের জন্য, চার্চিল সাহেবকে হাত পাততে হল আমেরিকার কাছে সাহায্যের জন্য। তিনি স্পষ্টই আমেরিকাকে জানিয়ে দিলেন যে মার্কিন সামরিক ও আর্থিক সাহায্য না পেলে বৃটেন গ্রীসকে সাম্যবাদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। বৃটেনের সাহায্যে এগিয়ে এসে আমেরিকা বুঝতে পারল এক অতি জটিল সমস্যা-সংকুল ক্ষেত্রে তাকে পা ফেলতে হয়েছে। তেল, সামরিক গুরুত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রসার আমেরিকাকে টানতে লাগল মধ্যপ্রাচ্যের বহিঃশান্তিশূন্য বিস্তীর্ণ ভূমিতে। এ আকর্ষণ আমেরিকা জয় করতে পারল না; আকর্ষণই আমেরিকাকে জয় করল।

আমেরিকার আগমনে আরবদের আপত্তি ছিল না, যদি-না সে আসতো য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পুরাতন পথে। আসলে, যে পথে ইংরেজ বিদায় নিল সে পথেই হল আমেরিকার অনিমন্ত্রিত আবির্ভাব। প্রথম কয়েক বছর আমেরিকা এল দ্বিধাভরে, ইংরেজের সমর্থক গৌণ শক্তি হিসাবে। ট্রুমান তাঁর ডকট্রিনে গ্রীস ও তুর্কীকে রুশ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মধ্যপ্রাচ্য প্রাঙ্গণে মল্লযোদ্ধার বেশে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু মার্কিন মানসে বহুদিনকার পুরানো একটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। ট্রুমানও তাঁর ভাষণে স্বীকার করলেন, "পৃথিবী গতি-হীনা নয়; বর্তমান ব্যবস্থাই যে পবিত্র তাও নয়; কিন্তু সাম্যবাদী প্রসার সবচেয়ে মারাত্মক! গ্রীস যদি এক সশস্ত্র সংখ্যা-লঘু জনতার কবলিত হয়," ট্রুমান বললেন, "তুর্কীর উপর তার প্রভাব হবে ভয়াবহ। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে সারা মধ্যপ্রাচ্যে। গ্রীস যদি কম্যুনিষ্ট হয়, তবে য়ুরোপের যেসব দেশ তাদের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে বাঁচিয়ে তুলবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তাদের উপরও তার প্রভাব হবে মারাত্মক।" অর্থাৎ, ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে, ফুলটন নগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ে চার্চিল সাহেব সগৌরবে বিশ্বব্যাপী শীতল যুদ্ধ ঘোষণা

---

* "Look! We Have Come Through!", by D. H. Lawrence, London, 1917.

করবার প্রায় ঠিক এক বছর পর, আমেরিকা যখন মধ্যপ্রাচ্যে অবতীর্ণ হন, আরব জাতির স্বাধীনতা, প্রগতি ও কল্যাণের ডাকে সে এলো না, এলো য়ুরোপেরই প্রয়োজনে, পশ্চিম য়ুরোপকে সাম্যবাদ থেকে বাঁচাতে!

এর পরের বছরগুলিতে দেখতে পাই দ্রুত মার্কিন অগ্রসর সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে। তার কয়েকটা বড়ো বড়ো তারিখঃ

১৯৪৭ সালের ৬ই অক্টোবরঃ ইরানের সঙ্গে চুক্তি করে সামরিক মিশন প্রেরণ। ঐ মাসেরই ২২শে তারিখে ইরান রাশিয়ার সঙ্গে তেল সম্পর্কিত একটা খসড়া চুক্তি প্রত্যাহার করে।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর থেকে প্যালেস্টাইন সমস্যা রাষ্ট্রপুঞ্জে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের প্রধানতম সমস্যায় মার্কিন নেতৃত্বের শুরু। মার্কিন সমর্থনেই প্যালেস্টাইন বিভাগ ও বর্তমান ইজরেইল সমস্যার সৃষ্টি।

২৫শে মে, ১৯৫০ঃ ইজরেইল ও আরব দেশগুলির মধ্যে নতুন কোন সামরিক সংঘর্ষ হলে তাকে জোর করে থামান হবে, এই মর্মে এক ঘোষণায় বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে আমেরিকার যোগদান। গত বছরের নভেম্বরে বৃটেন, ফ্রান্স ও ইজরেইল যখন মিশরকে আক্রমণ করে, তখন কিন্তু মার্কিন সরকার এই 'ত্রিশক্তি ঘোষণা'র দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করেন।

৩০শে ডিসেম্বরঃ সৌদী আরবের রাজা ও আরামকোর মধ্যে তেল ব্যবসায়ের লভ্যাংশ সমান সমান বণ্টনের নতুন চুক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে সৌদী আরবের তেলের উপর নতুন অধিকার।

১৮ই জুন, ১৯৫১ঃ সৌদী আরবে ডারহান শহরে বিমান ঘাঁটি চালু রাখবার অধিকার নিয়ে নতুন চুক্তি।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৫১ঃ মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সামরিক সংস্থা গঠন প্রয়াসে বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে আমেরিকার যোগদান। এই নতুন মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ড প্রস্তাবই বর্তমান আরবভূমিতে সবচেয়ে বেশি বিভেদ ডেকে এনেছে; এর থেকেই বাগদাদ চুক্তির জন্ম। এই সামরিক প্রচেষ্টাই যুদ্ধোত্তর যুগে সর্বপ্রথম রুশ সরকারকে আরব রাজনীতিতে টেনে এনেছে।

জুলাই, ১৯৫২ঃ মিশরে ফারুক-নির্বাসন ও বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠায় মার্কিন সম্মতি; ফারুকের পক্ষে ইংরাজ হস্তক্ষেপের বিরোধিতা।

২রা এপ্রিল, ১৯৫৪ঃ তুর্কী-ইরান সহযোগিতা চুক্তি, মার্কিন উৎসাহে ও সমর্থনে।

২১শে এপ্রিল, ১৯৫৪ঃ ইরাক-মার্কিন সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর।

২৯শে অক্টোবর, ১৯৫৪ঃ ইরানে নতুন আন্তর্জাতিক তেল চুক্তিতে মার্কিন তেল ব্যবসায়ীদের প্রভূত সুবিধা-লাভ।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৫ঃ মিশরকে আসোয়ান বাঁধের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

১৬ই জুলাই, ১৯৫৬ঃ উক্ত প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার।

৩১শে অক্টোবর, ১৯৫৬ঃ মিশর আক্রমণের বিরোধিতা ও জাতিপুঞ্জের স্বস্তি-পরিষদে ও সাধারণ সভায় বৃটিশ, ফরাসী ও ইজরেইলী বাহিনীর অপসারণ দাবী।

৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৭ঃ আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন ঘোষণা।

আজকালকার মিশরী সংবাদপত্রের প্রধানতম আলোচ্য বিষয় মধ্যপ্রাচ্যে এই যুগব্যাপী বিস্তীর্ণ মার্কিন প্রভাব। বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অনিচ্ছুক পশ্চাৎ-গতির পর আমেরিকা স্বাধীনতাপ্রিয় আত্ম-সচেতন আরবদের কাছে তাদের জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ অন্তরায়রূপে দেখা দিয়েছে। মিশর ও সিরিয়ার সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিন আমেরিকা নিন্দিত হচ্ছে গত দশ বছরের মধ্যপ্রাচ্যে তার রীতি-নীতির জন্য। অপরপক্ষে জর্ডান, লেবানন ও ইরাকের সংবাদপত্রে আমেরিকা প্রতিদিনই প্রশস্তি পাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যকে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ থেকে বাঁচাবার জন্যে। বৃটেন আমেরিকার দিকে তাকিয়ে আছে মধ্যপ্রাচ্যে তার অবশিষ্ট স্বার্থ বাঁচিয়ে রাখবার কাতর অনুনয় নিয়ে। রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশগুলি আমেরিকাকে গালাগাল দিচ্ছে জাতীয় স্বাধীনতার প্রধান দুশমন বলে। পৃথিবীর নিরপেক্ষ দেশগুলিতে আইসেন-

হাওয়ার ডকট্রিন বহুনিন্দিত। অথচ প্রত্যেক মার্কিন জননায়কই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সামরিক হস্তক্ষেপে ইতস্তত করে মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাপ্রবাহের নেতৃত্ব যদি আমেরিকা আজ গ্রহণ না করে, তবে আরবভূমিতে সাম্যবাদী অথবা সাম্যবাদ-সমর্থক স্বার্থগুলির বিজয় অনিবার্য।
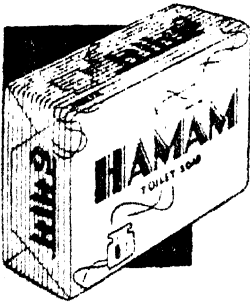
সুতরাং, একথা নিঃসংসয়ে বলা চলে যে, আজকার আরব দেশগুলির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের মোটা দায়িত্ব লণ্ডন ও প্যারিস থেকে সরে গিয়ে জমা হয়েছে ওয়াশিংটনে। যদি একথা বলা যায় যে বহু কোটি সাধারণ আরবের মানসিক রাজধানী আজ মিশর, তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে যে, অন্তত পূর্ণভাবে তিনটি ও আংশিকভাবে একটি আরব দেশের শাসকরা নির্দেশ গ্রহণ করছেন আমেরিকা থেকে। এই নতুন আরব-মার্কিন সংঘাত থেকে সব চেয়ে কম খরচে যার লাভ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, সে হল সোবিয়েত রাশিয়া।

আরব ভূমিতে আমেরিকার ও রাশিয়ার ভূমিকা ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে আমরা পরে বিচার করব। বর্তমানে মার্কিন ভূমিকাকে তিনটি দৃষ্টি দিয়ে আমরা দেখতে চেষ্টা করছি: একটি হল আমেরিকার নিজস্ব দৃষ্টি; অপরটি একজন চিন্তাশীল সমাজবাদী ইংরেজ বার্তাজীবীর দৃষ্টি; আর তৃতীয় হচ্ছে মিশরের দৃষ্টি। এই সমসাময়িক দৃষ্টি-কোণ বিশ্লেষণ আমাদের সাহায্য করবে অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত নজর নিক্ষেপ করতে।

জর্ডানে মার্কিন প্রভাব বিস্তারের অব্যবহিত পরেই নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকা প্রশ্ন করেছিল, "সারা মধ্যপ্রাচ্যে এর প্রতিক্রিয়া হবে কি রকমের?" তার পর লেবাননের নির্বাচনে আমেরিকার প্রভাব আরো পাকা হয়েছে, আমেরিকা বাগদাদ চুক্তির সামরিক কমিটিতে যোগ দিয়েছে এবং নানাভাবে মিশর ও সিরিয়ার উপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করছে। আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের পূর্ণতর বিকাশ চলবে এই পথেই; তবে মধ্যপ্রাচ্যের মতো স্থিতিহীন ও পরিবর্তনসংকুল পরিবেশে এর সার্থকতা বা ব্যর্থতা কখন কি রূপ নেয় বলা খুবই কঠিন। তথাপি নিউ ইয়র্ক টাইমস্ গত এপ্রিলে মার্কিন ভূমিকার ভবিষ্যৎ বিচার করতে গিয়ে আরব ঘটনা প্রবাহের যে চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন কিছুদিন মার্কিন দৃষ্টিতে এটাই মোটামুটি চলতি থাকবে ব'লে মনে করা যেতে পারে।

নিউ ইয়র্ক টাইমস্ বলেছিলেন, "জর্ডান সংকটে মার্কিন ভূমিকা প্রসারের পরিণাম মধ্যপ্রাচ্যের অন্যত্র কি রূপ গ্রহণ করবে? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করবে চারটি ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর উপর: রাজা হুসেনের ভবিষ্যৎ; পুনরায় যুদ্ধের সম্ভাবনা; আরব দেশগুলির ঐক্য; এবং বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে ক্ষমতার জন্যে লড়াই।

"**হুসেনের ভবিষ্যৎ**: ওয়াশিংটনে ধারণা যে, হুসেনের রাজত্বে সমাসীন থাকবার সম্ভাবনাই বেশি। আমেরিকার দৃঢ় সমর্থনে তিনি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার সাহস পেয়েছেন। তাঁর নতুন গভর্নমেণ্ট রাজানুগ; কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে। হুসেন কি তাঁর আরব প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখতে পারবেন? প্রজাদের অধিকাংশকে দাবিয়ে রেখে রাজত্ব করা তো তাঁর পক্ষে চিরদিন সম্ভব হবে না।

"**যুদ্ধের সম্ভাবনা**: সিরিয়া হচ্ছে একমাত্র আরব দেশ যে জর্ডানের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে পারে। কিন্তু সিরিয়া বোধহয় লড়তে অনিচ্ছুক। চার কোটি ডলার রাশিয়ান রসদ সত্ত্বেও সিরিয়ার সৈন্য মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে দুর্বল সৈন্যদের অন্যতম।...যদি সিরিয়া একান্তই জর্ডান আক্রমণ করে, তাহ'লে ইজরেইল নিশ্চয় জর্ডান নদীর পূর্ব তীর পর্যন্ত চট ক'রে অধিকার করবে এবং রাজা সৌদ ও ফয়জলও হুসেনের সমর্থনে সৈন্য পাঠাবেন। ওয়াশিংটনে বিশ্বাস যে, রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে কোন সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে অনিচ্ছুক।...তাই আমেরিকাকেও হয়ত যুদ্ধে নামতে হবে না।" যদি নামতেই হয়, তবে আমেরিকা তার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না, কেননা তার আরব মিত্রদের যদি সে বিপদে সবরকম সাহায্য করতে তৈরী না থাকে, তবে "ওয়াশিংটনের মুখে চুনকালি পড়বে এবং আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন হবে ভয়ানক বিপন্ন।"

"**আরব ঐক্য**: যদি জর্ডানের অবস্থা সম্বন্ধে মার্কিন বিচার নির্ভুল হয় তবে হয়ত আরব দেশগুলির মধ্যে নতুন ধরনের একটা জোট-বাধা দেখা দেবে। হুসেন ও সৌদী আরবের রাজার কার্যকলাপের ফলে আরবভূমিতে নাসেরের নেতৃত্ব অনেকটা আহত হয়েছে। কিছুকাল ধরে ওয়াশিংটন চেষ্টা ক'রে আসছে ইরাক, জর্ডান ও সৌদী আরবের রাজাদের একত্রিত করতে। যদি এই উদ্দেশ্য স্থায়ী সাফল্য অর্জন করতে পারে, তাহ'লে পশ্চিম-বিরোধী এক শক্তিশালী আরব জাতি গঠনের যে স্বপ্ন নাসেরের এত প্রিয়, তার শেষ হবে।

"কিন্তু নাসেরও এই সম্ভাবনার প্রতি পূর্ণ সচেতন এবং একে এড়াবার জন্যে সচেষ্ট।...তাঁর উদ্দেশ্য জর্ডানকে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন গ্রহণ ও বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান হ'তে নিবৃত্ত করা। কিন্তু নাসের তাঁর পুরাতন আরব গোষ্ঠীকে পুনর্গঠিত করতে পারবেন কিনা তা খুবই অনিশ্চিত। একদিকে জর্ডান যেমন আরব দেশগুলির মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের বীজ বপন করেছে, অন্যদিকে তেমনি অধিকাংশ দেশবাসীর বিরাগভাজন হয়ে হুসেনের সিংহাসনচ্যুতির সম্ভাবনাও কম নয়। রাজা সৌদও চেষ্টা করেছেন আরব ঐক্য পুনরুদ্ধার করতে...। সুতরাং অনেকেরই ধারণা, নাসের অন্তত কিছুটা আরব ঐক্য বজায় রাখতে পারবেন। ইজরেইলের প্রতি প্রত্যেক আরবের তীব্র মনোভাব নাসেরের অন্যতম প্রধান সহায়ক হবে।

"**বৃহৎ-শক্তি সংঘর্ষ**: জর্ডানে আজ মধ্যপ্রাচ্যের প্রভুত্ব নিয়ে পশ্চিম ও রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাত চলেছে। আমেরিকার গভর্নমেণ্ট মনে করেন জর্ডানের যুদ্ধে তাঁরাই জয়ী হয়েছেন। তাছাড়া, সাম্যবাদী আক্রমণ থেকে মধ্যপ্রাচ্যকে বাঁচাতে আমেরিকা যে দৃঢ়সংকল্প তাতে এখন কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলির অনেক পুরোনো নানা জাতের সমস্যার সমাধান করতে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন যথেষ্ট কিনা তা এখনো নিশ্চিত বলা যায় না।

"রাশিয়া জর্ডনকে একটা সাময়িক ব্যর্থতা হিসাবে ধ'রে নিয়েছে। সে এখন আরব-ভূমিতে মার্কিন-বিরোধী প্রচার বাড়িয়ে তুলবে। জাতীয়তাবাদী আরব দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন আরো পাকা করবে। আরবদের দারিদ্র্য ও দুর্ভোগকে নিজের কাজে লাগাতে আরো সে এবার তৎপর হয়ে উঠবে। আর ইজরেইলের বিরুদ্ধে আরব দেশগুলিকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে এ বিষয়ে সে অনেকখানি এগোতে পারবে।"*

নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌-এর বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির উপরি-উক্ত বিশ্লেষণ মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিষ্কাররূপে বুঝিয়ে দেয়।

তিন-ধাপ লড়াই চলেছে বর্তমান আরব-ভূমিতে। প্রথম, পশ্চিম বনাম রাশিয়া—পশ্চিমের অধিনায়ক আমেরিকা; দ্বিতীয়, রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র; তৃতীয়, শাসন ও শাসিত। এমন যে সুরক্ষিত সামন্ত-দুর্গ সৌদী আরব, সেখানেও তেল কারখানার কর্মচারীরা বিরাট ধর্মঘট করেছে, দাবী তুলছে রাজার স্বেচ্ছাচার খর্ব ক'রে প্রজার

* The New York Times, International Edition, April 28.

অধিকার বাড়ানো হোক। এই যে তিন-স্তর সংঘাত, এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে, দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমেরিকা আজ এসে দাঁড়িয়েছে প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রের পাশে, শোষিতের বিরুদ্ধে শোষকের পাশে।

পল্ জনসন সুয়েজোত্তর মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রতাপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে বিচার ক'রে যে টীকা লিপিবদ্ধ করেছেন এবার তা বিচার করা যাক:

"মার্কিন শাসনের প্রথম বছরে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। প্রথম, মার্কিন নীতি সাময়িক-ভাবে আরব অঞ্চলে স্থিতিশীলতা এনেছে। দ্বিতীয়ত, মধ্যপ্রাচ্যের জাতীয়তাবাদ বর্তমানে যে রাশিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এই নিঃশ্বাস-ফেলা অবসরে আমেরিকা যে তার গতিরোধ করতে পারবে এমন কোন ভরসাই নেই। আরব দেশগুলির বুর্জোয়া জাতীয়তা-বাদী নেতাদের সঙ্গে রাশিয়ার সহযোগিতার পথ রোধ ক'রে আমেরিকা কঠিনতর এক বিপদকে ডেকে আনছে: সে হচ্ছে আরব সাম্যবাদ। তাই, আমাদের সম্মুখে দীর্ঘ এক সংকটের যুগ। তাতে প্রায়ই হয়তো হিংসা বা হিংসার হুংকার আমরা দেখতে পাবো। এই ভয়ংকর পরিবর্তনের যুগে পশ্চিমী স্বার্থ কমাগতই আহত হবে, সব-চেয়ে বেশি বৃটেনের স্বার্থ। সমগ্র স্টার্লিং এরিয়ার অন্যতম প্রধান সম্পদ মধ্যপ্রাচ্যের তেল কম করতে উৎপাদন ও বিতরণ।...কিন্তু এই যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ, তাও আজ ভয়ানক বিপন্ন।"*

একজন উদার-দৃষ্টি ইংরেজ পর্যবেক্ষকের চোখে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান জটিল সংঘাত মোটামুটি তিনটি দিক থেকে প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা যাই করুক না কেন, অর্থ ও অস্ত্র বাড়াই চালুক আরব জাতীয়তা-বাদের রুশ-নির্ভরতাকে সে অবরুদ্ধ করতে পারবে না। শুধু তাই নয়। সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে আরব দেশগুলিতে শ্রেণী বিরোধ যে ভয়ংকর বাড়িয়ে তুলছে; যার পরিণাম সাম্যবাদের শক্তি বৃদ্ধি। আর, তৃতীয়ত, আমেরিকা হারুক কি জিতুক, বৃটেনের মধ্যপ্রাচ্যরবি আজ একেবারেই অস্তমিত। মার্কিন দাক্ষিণ্যে এখন ক্ষণস্থায়ী গোধূলি চলছে; তাতেও ক্রমেই নেমে আসছে ঘন অন্ধকার।

আজকাল মিশরের সংবাদপত্রে প্রতিদিন আমেরিকা নিন্দিত। জর্ডনে আমেরিকার হস্তক্ষেপ, 'অল্ সাব' পত্রিকার মতে, "আরব ফ্রণ্টকে ভেঙে দেবার চক্রান্ত"। "অল্ আকবর' বলছেন, "যে আরবমুক্তির যজ্ঞ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শুরু হয়েছিল, তা এখনো চলছে। সাম্রাজ্যবাদের নতুন নায়ক আমেরিকা।" অল্ গোমহুরিয়া যোগ দিচ্ছেন, "সেদিন আর নেই যখন কোন একজন নেতা বা উচ্চপদস্থ মানুষ জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যা খুশি করতে পারতেন। সব ক্ষমতা এখন জনগণের হাতে।...কোন অত্যাচারীই আজ আর গণ-ইচ্ছাকে অবহেলা করতে পারে না...মুক্তি-প্রবাহকে রোধ করবার দিন গত হয়েছে।" 'অল্ সাব' পত্রিকার অন্য একটি অভিমত থেকে মার্কিন-বিরোধী মনোভাবের পূর্ণতর পরিচয় পাওয়া যায়:

"আমরা ভেবেছিলাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোন নতুন কায়দায় মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার করতে চাইবে। কিন্তু দেখছি, হুবহু বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পুরনো পথ ধরেই সে এগিয়ে এসেছে, তাদের সব পচা ঐতিহ্য বহন ক'রে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নিরপেক্ষতা এখন একেবারে ঝুটো ব'লে প্রমাণিত। আমেরিকার নাম জড়িত বহু সব গভীর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে—যার উদ্দেশ্য পশ্চিম-মুখাপেক্ষী নতুন এক আরব গোষ্ঠীর সৃষ্টি। এজন্যই বিরাট মার্কিন নৌবহর জর্ডনের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। এজন্যেই বিশ্বাসঘাতক ও দাসবুদ্ধি কিছু কিছু আরবদের ভাড়া করা হয়েছে।

"কিন্তু পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ প্রয়োগ করতেও আমেরিকা আনাড়ীপনার পরিচয় দিয়েছে। এই অপটু ভাব তার আসল উদ্দেশ্য ও কর্মধারাকে প্রকাশ ক'রে ফেলেছে সবার কাছে। কারুরই আর বুঝতে বাকী নেই যে, আরব দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি ও সাম্যবাদ থেকে তাঁদের বাঁচানোর ধুয়ো কতখানি মিথ্যা।

"শুধু তাই নয়। বেচারা আমেরিকা পুরাতন সাম্রাজ্য নীতি চালাতে শুরু করেছে এমন সময়ে যখন পূর্ব আরবভূমিতে নব-যুগের বন্যা। আজকের আরবরা জানে যে, লক্ষ লক্ষ মার্কিন মুদ্রার বিনিময়ে তারা স্বদেশের এক ইঞ্চি ভূমিও ছাড়বে না, বস্তা বস্তা উদ্বৃত্ত মার্কিন খাদ্যের বিনিময়ে হস্তান্তর করবে না তাদের সার্বভৌম অধিকার।"*

মার্কিন বিরোধী জনমত গঠন করতে মিশরী পত্রিকাগুলি স্বভাবতই ভাবপ্রবণতার আশ্রয় নেয় বেশি। স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যাপারটাই ভাবপ্রবণ; ভারতবাসী তা বেশ ভালো জানে। জর্ডনে মার্কিন প্রতাপের সোজাসুজি চেহারা, লেবাননে আরো সূক্ষ্ম পথে মার্কিন প্রবেশ, বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের করাচী বৈঠকে সিরিয়ার বর্তমান গবর্নমেণ্টকে সরাবার ব্যবস্থা এবং এই পরিকল্পনা আগস্ট মাসে কাজে লাগাবার ব্যর্থ প্রয়াস, এসব ঘটনাই মিশরের জন-মতকে ক্ষিপ্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। কাইরোর সংবাদপত্র ও বেতারে ভাবপ্রবণ আক্রমণ তাই বেশি। এই আক্রমণের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার আমেরিকার ইজরেইল সমর্থক নীতি। এই একটি ক্ষেত্রে সমস্ত আরব সমান-ভাবে মার্কিন বিরোধী।

নাসের জানেন শীতল যুদ্ধের কঠিন বাস্তবে এই ভাবপ্রবণতার দৌড় নিতান্ত সীমাবদ্ধ। আরব দেশগুলির, বিশেষ করে মিশর ও সিরিয়ার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দুইটি:

* The Egyptian Gazette, Cairo, June 24, 1957.

* The New Statesman, London, July 6, 1957.

পুনরায় সামরিক সংঘাত থেকে আরব ভূমিকে মুক্ত রাখা; নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। একমাত্র আত্মবলই প্রকৃত বল। নাসের তা বিলক্ষণ জানেন। সঙ্গে সঙ্গে এও জানেন যে, দশ কোটি আরবের অন্তরে যে মুক্তির আগুন জ্বলছে—আলজেরিয়া থেকে আডেন পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি, তার পুরোভাগে মিশরকে থাকতেই হবে। এই ভাবপ্রধান নেতৃত্বে বিপদ যে আছে, তাও তাঁর অজানা নেই। কিন্তু পিছিয়ে-পড়া দেশগুলির এক-নিষ্ঠ স্বাধীন গঠন আজকের দুনিয়ায় অনেকটা বাঘের পিঠে চেপে বসার মতো; চড়তেও বিপদ, নামতেও বিপদ।

(ক্রমশঃ)

তিনু চক্রবর্তীর কর্তব্য পালন

সন্ধ্যাবেলায় মাঝিরা বলল, কর্তা এখানেই নৌকা বাঁধি।

রাম বসু বললেন কেন রে?

সামনের পথটা ভালো নয়, একা রাত-বিরেতে যাওয়া কিছু নয়, বোম্বেটের ভয় আছে।

তবে এখানেই আজ রাতের মতো নৌকা বাঁধ।

গাঁয়ের নাম কি রে? শুধায় পার্বতী।

আজ্ঞে জোড়ামউ।

জোড়ামউ সবাই চমকে ওঠে।

রেশমীকে ডেকে রাম বসু সাবধান ক'রে দিল, ভিতরে চুপটি ক'রে ব'সে থাক, বাইরে বের হ'স না। চণ্ডী বক্সীর এলাকায় এসে পড়েছে জেনে রেশমী নৌকার মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করল। কিন্তু তবু তার মনের মধ্যে কৌতূহল ও করুণা একযোগে আলোড়ন শুরু ক'রে দিল। এই তার গাঁ। আহা, একবার দিদিমার সঙ্গে দেখা করা যায় না! না, তা অসম্ভব। আহা কোন রকমে যদি তিনুদাদার সঙ্গে একবার দেখা হ'য়ে যেতো, গাঁয়ের খবরাখবর পারনি। না তা-ও সম্ভব নয়। তাই সে একা শুয়ে শুয়ে গাঁয়ের কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝিরা চাল ডাল পান তামাক কিনবার জন্যে বাজারের দিকে গেল।

তাদের সাবধান ক'রে দিতে, নৌকার আরোহীদের পরিচয় জ্ঞাপন না করতে সবাই ভুলে গেল। আর না ভুললেও সতর্ক করা সহজ নয়, হয়তো তাতেই গোল বাধবার আশঙ্কা ছিল বেশি।

মাঝিরা বাজারে গিয়ে কথাবার্তার সূত্রে কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে, নৌকার যাত্রীদের [illegible] প্রকাশ করল। তারাতো [illegible] না [illegible] কিছু আছে। সেখানে চণ্ডী বক্সীর এক [illegible] ছিল উপস্থিত, [illegible] চণ্ডীকে পৌঁছে দেবার জন্যে সে [illegible] গেল।

চণ্ডী সব শুনে বলল, জয় মা কালী, তোমার ইচ্ছায় বলি একেবারে ঘাটে এসে উপস্থিত। তার পরে দলের আর পাঁচ জনের দিকে তাকিয়ে বলল, হবে না! শাস্ত্র তো মিথ্যা হবার নয়।

তখন দলবল জুটিয়ে নিয়ে সে পরামর্শ করল। স্থির হ'ল অনেক রাতে সকলে মিলে গিয়ে পড়বে নৌকা খানার উপরে আর তার পরে রেশমীকে টেনে তুলে রাতেই কাজটা শেষ ক'রে ফেলতে হবে। শাস্ত্রজ্ঞ চণ্ডী বক্সী জানিয়ে দিল যে চিতাপলায়িতাকে চিতায় দর্শন করাই শাস্ত্রের বিধান।

একজন বলল দেখো দাদা শেষে বিপদে না পড়ি!

আরে বিপদ বাধাবে কে? সাহেব তো নেই।

নৌকায় সাহেব নাই মাঝিরা বলেছিল।

অন্ধকারে আবার নৌকা ভুল ক'রে ব'সোনা। বললে আর একজন।

পাগল নাকি! চণ্ডী বক্সীর চোখ পেঁচার চোখ, অন্ধকারেই খোলে ভালো। ঘাটে আর ক'খানা নৌকা। সাহেবের নৌকা যখন অবশ্যই বজরা হবে। চিনতে ভুল হবে না।

চণ্ডী বক্সীর অভিপ্রায়ের সংবাদ গড়াতে গড়াতে তিনু চক্রবর্তীর কানে গিয়ে পৌঁছল। জেলেদের উপরে তিনুর অপ্রতিহত প্রভাব, সে রসিক জেলেকে ডেকে বলল তোরা জন কতক ঠিক থাকিস, সময় মতো আমি খবর দেবো।

গভীর রাতে কোলাহল ও বন্দুকের আওয়াজে রাম বসুদের নৌকায় নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। সকলে ব্যস্তভাবে জেগে বাইরে এসে ঘটনা কি জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন কি হ'ল? ওরা কারা? কাকে আক্রমণ করল। নিদ্রার ঘোর কাটলে সকলে দেখতে পেলো অদূরে অবস্থিত একখানা বজরায় অনেক লোক চড়বার চেষ্টা করছে, সেই অন্ধকারেও চোখে পড়ল বজরার ছাদে জন দশেক লোক দণ্ডায়মান, খুব সম্ভব তারাই বন্দুক আওয়াজ ক'রে আক্রমণকারীদের তাড়াবার চেষ্টা করছে।

রাম বসু পরামর্শ দিল যে আর এখানে থাকা নয়, আস্তে সুস্থে নৌকা খুলে দিয়ে এগোনো যাক। এখন ওরা বজরাখানা লুঠ করছে, এর পরে হয়তো আমাদের পালা আসবে।

সেই পরামর্শ সকলের মনঃপূত হ'ল, মাঝিরা সন্তর্পণে নৌকা খুলে দিয়ে মাঝ গাঙে গিয়ে নৌকা স্রোতের মুখে ছেড়ে দিল। মাঝিরা নিজেদের মধ্যে বলা-কওয়া করছিল ও ভাই বোম্বেটের ভয়ে গাঁয়ে আশ্রয় নিলাম, এখন দেখছি গাঁয়েই ছিল বোম্বেটের দল। মাঝিদের কথাবার্তায় আকৃষ্ট হ'য়ে পার্বতী ও রাম বসু তাদের কাছে গেল। অনেকক্ষণ তাদের জেরা ক'রে বুঝল যে বাজারে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে নৌকার আরোহীদের পরিচয়, কোথা থেকে আসছে কোথায় যাবে প্রভৃতি মাঝিরা প্রকাশ ক'রে দিয়েছে।

তখন রাম বসু পার্বতীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, দেখো ভাই এবারে ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারছি। এ সেই চণ্ডী বক্সীর কাজ। মাঝিদের কথায় চণ্ডী বক্সী আমাদের পরিচয় পেয়ে আমাদের আক্রমণ করবে ভেবেছিল, ভুলক্রমে বজরাখানা আক্রমণ করেছে।

পার্বতী শুধাল, কিন্তু বজরায় ছিল কারা?

রাম বসু বলল, যারাই থাক, তারা ডাকাত নয়, বন্দুক চালিয়েছে তারাই মনে হচ্ছে।

নৌকা গ্রাম ছেড়ে অনেক দূরে এসেছে, ইতিমধ্যে রাতও ফরসা হ'য়ে এসেছে, তারা দেখতে পেলো একখানা বজরা পিছু পিছু আসছে।

পার্বতী বলে উঠল পিছু নিল না কি?

রাম বসু ভালো ক'রে দেখে নিয়ে বলল, না, এ সেই বজরা। তবু সাবধানের মার নেই। ও মাঝি পাল তুলে দেওয়া যায় না?

মাঝিরাও বজরাখানা দেখেছিল, পাল খাটাবার কথা ভেবেছিল। এখন রাম বসুর কথা শুনে বলল, না কর্তা পাল চলবে না, হাওয়া উত্তুরে।

বেশ ফরসা হ'য়ে এসেছে, বজরাখানাও কাছে এসে পড়েছে, বজরার ছাদের লোক চিনতে পারা যায়, জন তিনেক লোক বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে।

রাম বসু তাদের ঠাহর ক'রে দেখে বলল, পার্বতী ভায়া চেনা লোক যেন।

সাহেব যে!

জন স্মিথ ব'লে মনে হচ্ছে—আর ও দুজনকেও তাদের বাড়িতে দেখেছি মনে হয়।

তারা বুঝলো যে বজরা থেকে ভয়ের কারণ নেই, তখন নৌকার গতি ধীর ক'রে দেওয়া হ'ল।

রাম বসু বলল, একবার ওদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জেনে নেওয়া যাক কাল কি ঘটেছিল।

রাম বসু হে'কে ইংরাজিতে বলল—মিঃ স্মিথ নাকি?

জন তাকে চিনতে পেরে বলল—কি আশ্চর্য, মুন্সী যে, তোমরা কোথা থেকে? মদনাবাটি থেকে আসছি?

মিঃ কেরী কোথায়?

তিনি আসেন নি, আমরাই কয়েকজন আসছি।

তবে নৌকা ভেড়াও, অনেক কথা আছে।

তখন নৌকা দুখানা এক জায়গায় বাঁধা হ'লে পার্বতী ও রাম বসু বজরায় গিয়ে উঠল।

রাম বসু বলল, মিঃ স্মিথ আমার এই বন্ধুকে নিশ্চয় মনে আছে—পার্বতী ব্রাহ্মণ।

অবশ্য মনে আছে। এবারে আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই, মিঃ রিংলার ও মিঃ মেরিডিথ, আমাদের বাড়িতে দেখেছ নিশ্চয়।

খুব দেখেছি, বেশ মনে আছে।

জন বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলল, ইনি রাম বসু, পণ্ডিত ব্যক্তি, মিঃ কেরীর মুন্সী, আর ইনি, রাম বসুর বন্ধু, ইনিও খুব শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি।

রাম বসু শুধালো কাল কি হ'য়েছিল বলো তো!

জন বলল কিছুই জানি নে। আমরা শিকার করবার উদ্দেশ্যে ক'দিন আগে বেরিয়ে কাল সন্ধ্যায় এই গাঁয়ে নৌকা ভিড়িয়েছিলাম। হঠাৎ রাতে বোম্বেটের দল আক্রমণ ক'রে বসল—আর কিছুই জানিনে।

রাম বসু বলল, আমি জানি ব'লে মনে হচ্ছে।

তুমি জানবে কি করে?

ওদের লক্ষ্য ছিল আমাদের নৌকা, ভুলক্রমে তোমাদের নৌকাখানা আক্রমণ ক'রে বসেছিল।

কিন্তু তোমাদেরই বা আক্রমণ করতে যাবে কেন?

সে অনেক কথা ব'লে রেশমী সংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত বলল, মদনাবাটীর দু বছরের জীবন বৃত্তান্ত দিল, কেবল হঠাৎ মদনাবাটী পরিত্যাগের প্রকৃত কাহিনীটি চেপে গিয়ে বলল, অনেক দিন হ'য়ে গেল একবার নিজেদের আত্মীয়-স্বজন স্ত্রীপুত্রদের দেখবার আশায় চলেছি কলকাতায়। যাক, তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে খুব আনন্দ পেলাম।

জন বলল, মেয়েটিকে তো সঙ্গে নিয়ে এলে কলকাতায় রাখবে কোথায়? শত্রু পক্ষ খুব দুঃসাহসী বলে মনে হচ্ছে, লুট ক'রে নিয়ে না যায়।

সেই তো পড়েছি দুশ্চিন্তায়।

জন বলল, মেয়েটির যদি আপত্তি না থাকে তবে খুব এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি। সেখান থেকে যম ছাড়া আর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

কি রকম পরিবার শুনি।

আমাদের পাড়ায় থাকে জন রাসেল, সুপ্রীম কোর্টের জজ। কিছুদিন আগে তার শ্যালীকন্যা এসে পৌঁচেছে। মেয়েটির অল্প বয়স, তার কাজে কর্মে সাহায্য করবার জন্য একটি দেশী মেয়ের আবশ্যক।

কি কাজ করতে হবে?

কাজ আর কি? তাদের কি কাজের লোকের অভাব আছে! ইংরাজিতে যাকে Maid of Honour বলে সেইভাবে থাকবে। চুলটা বেঁধে দেবে, আয়নাটা হাতের কাছে এগিয়ে দেবে, বেড়াবার সময়ে সঙ্গে যাবে, দুটো গল্পগুজব করবে—এই আর কি?

রাম বসু বলে, সে রকম কাজের জন্য এর চেয়ে ভালো মেয়ে সহসা পাবে না। এ বেশ ইংরাজি বলতে কইতে লিখতে পড়তে পারে, ইংরেজ সমাজের কায়দা কানুনও শিখেছে, সচ্চরিত্র ও মধুরভাষী। তা ছাড়া বয়সও অল্প।

জন উল্লসিত হ'য়ে বলে ওঠে, বেশ মিলবে রোজ এলমারের সঙ্গে। আমি অনেক জায়গায় সন্ধান করেছি পাইনি। তা হ'লে কথা পাকা কি বল মুন্সী।

নিশ্চয় পাকা।

অপ্রত্যাশিতভাবে রেশমীর নিরাপদ আশ্রয় জুটে যাওয়ায় রাম বসু ও পার্বতী স্বস্তি অনুভব করল।

এমন সময়ে রাম বসুদের নৌকা থেকে কান্নার শব্দ উঠল—রেশমী কাঁদছে!

ন্যাড়া রেশমী কাঁদে কেন রে?

ঐ দেখো না কেন কাঁদে, আমারও কান্না পাচ্ছে।

ন্যাড়ার নির্দেশে নদীর দিকে তাকিয়ে তারা দেখল অদূরে একটি সদ্যমৃত মনুষ্যদেহ—রাম বসু ও পার্বতীর চিনতে বিলম্ব হ'ল না—টিনু চক্রবর্তীর মৃতদেহ।

জন বলে উঠল—এটাও ডাকুদের কারো দেহ হবে, কাল গুলী চালিয়েছিলাম,
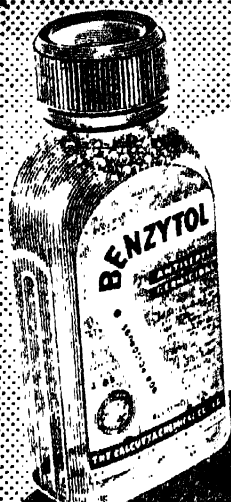
রাম বসু বলে উঠল, মিঃ স্মিথ এ লোক ডাকু নয়, এই গাঁয়ে আমাদের যে একমাত্র বন্ধু তারই মৃতদেহ।

তবে ও ডাকাতদের সঙ্গে এসেছিল কেন?

সঙ্গে এসেছিল কিন্তু এক উদ্দেশ্যে আসেনি, ও নিশ্চয় এসেছিল তার দলবল নিয়ে আমাদের সাহায্য করতে।

জন সত্যকার দুঃখিত হ'য়ে বলল, আর শেষে কি না মারা পড়তে সেই লোকটাই মারা পড়ল এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছুই হ'তে পারে না।

তখন পার্বতী, রাম বসু, ন্যাড়া মিলে মৃতদেহ জল থেকে তুলে কাঠ সংগ্রহ ক'রে মৃতদেহের সৎকার করল। যতক্ষণ মৃতদেহ পুড়ে নিঃশেষ না হ'য়ে গেল রেশমী তার মুখের দিকে তাকিয়ে ব'সে কাঁদল। ঐ মৃতদেহের সঙ্গে তার গ্রাম্যজীবনের শেষ চিহ্ন পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। তিনু চক্রবর্তী মৃত্যুর পরেও তার কর্তব্য ভোলেনি, রেশমীর পিছু পিছু ভেসে এসে অভয়পূর্ণ আশীর্বাদ জানিয়ে গেল।

আর একটি অবান্তর অধ্যায়

রাম বসু প্রভৃতির প্রস্থানের পরে কেরীর সমস্যা ও সংকট ঘনীভূত হ'য়ে এল—একটার পরে একটা। প্রথমেই বাংলা পাঠশালাটি ভেঙে গেলো, ছাত্ররা আগেই পালিয়েছিল, এবারে গুরুমশায় স'রে পড়ল। তারপরে জ্যাবেজের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই পিটার হঠাৎ মারা গেল। কেরী যখন শোকে আচ্ছন্ন ছিলেন মা কতক তৈজসপত্র নিয়ে স'রে পড়ল। বিপদের এখানেই শেষ নয়। কুঠির কাজে ক্রমাগত ক্ষতি হচ্ছে দেখে উডনী পত্রযোগে জানাল তার পক্ষে আর অধিক দিন ক্ষতি বহন করা সম্ভব নয়—শীঘ্রই কুঠির কাজ গুটিয়ে ফেলতে সে মনস্থ করেছে। ওদিকে ভবঘুরে টমাসের পালে আবার লেগেছে দমকা হাওয়া, সে নিরুদ্দেশ হ'য়ে চলে গেল' কোথায় কেউ নিশ্চয় ক'রে বলতে পারে না, কেউ বলে রাজমহলে কেউ বলে বীরভূমে।

এহেন অবস্থাতেও কেরীর আদর্শবাদ অটল, লক্ষ্য স্থির। যেন সমস্তই আগের মতো নিয়মিত চলছে এইভাবে সকাল বেলায় সে সংস্কৃত ব্যাকরণ খুলে কেবল বসেছে এমন সময়ে মিসেস কেরী ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে বললেন, কাউকে যে দেখছি নে! সব বাঘে নিয়েছে, তুমি এখনো একা ব'সে, পালাও, শীঘ্র, পালাও, এবার তোমার পালা।

এই বলে ছুটে মারল দৌড় বাইরের দিকে।

কেরী ছুটল পিছু-পিছু, দাঁড়াও ডরোথি, দাঁড়াও, কোন ভয় নেই।

এমন অন্তকাল প্রচলিত হচ্ছে। জ্যাবেজের ও পিটারের পর পর মৃত্যুতে ডরোথির মাথা সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গিয়েছে। উন্মাদ পত্নী ও কঠিন সংস্কৃত ব্যাকরণ এই দুয়ের চাপে

কেরীর দিবারাত্রি এখন বিভক্ত। একজন স্থানীয় লোকের সাহায্যে ফেলিক্স যথাসাধ্য গৃহকর্মাদি করে।

রাম বসু থাকতেই কেরী সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছিল। পাণ্ডিত্য ও কাণ্ডজ্ঞানের বলে সে বুঝেছিল রাম বসুর ফার্সিও নয়, ন্যাড়ার লোক মুখের ভাষাও নয়, সংস্কৃত ভাষার মধ্যে ভারতীয় যাবতীয় ভাষার প্রাণ-রহস্য নিহিত। রাম বসু ও পার্বতী ব্রাহ্মণ একবাক্যে কেরীকে সমর্থন করল—সংশয়ের আর কিছু রইল না। কেরী সবেগে নিজেকে নিক্ষেপ করল সংস্কৃত ভাষা সমুদ্রে। সংস্কৃত ভাষার প্রেরণায় সে বুঝতে পারল যে এই আদর্শে গড়ে তুলতে হবে বাংলা গদ্য রীতি। তখন সে সংস্কৃত ব্যাকরণের মডেলে বাংলা ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত অভিধানের মডেলে বাংলা অভিধান সংকলন শুরু করে দিল। অন্যদিকে চলল বাইবেল তর্জমার কাজ। বাইবেলের সেণ্ট ম্যাথিউ লিখিত সুসমাচারের অনুবাদ রাম বসুর সহযোগিতায় শেষে হ'য়েছিল, এবারে নবার্জিত সংস্কৃত জ্ঞানের সাহায্যে তার সংশোধন চলল।

কেরী ভাবল অনুবাদ তো চলছে, ক্রমে আরো জমে উঠবে কিন্তু ছাপাবার উপায় কি? এমন সময়ে সে খবর পেল কলকাতায় একটি ছাপাখানা নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। কেরী অবিলম্বে কলকাতা গিয়ে ছাপাখানাটি কিনে মদনাবাটীতে ফিরে এল। ফিরে এসে দেখল যে, উডনীর একখানা চিঠি অপেক্ষা ক'রছে। কুঠি উঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে উডনী। তখন কেরী নিকটবর্তী খিদিরপুর গ্রামে একটি নীলকুঠি ক্রয় ক'রে সপরিবারে সেখানে উঠে চলে গেল।

টমাস চলে গেলে কিছুদিন পরে ফাউণ্টেন নামে ধর্মোৎসাহী এক যুবক তার কাজে এসে যোগ দিয়েছিল—তারই সাহায্যে কোন রকমে কাজ চলল। কিন্তু মনের মধ্যে সে অনুক্ষণ অনুভব করত রাম বসুর অভাব। রাম বসুর উৎসাহ, বিচক্ষণতা, ভাষাজ্ঞান, ও সাহিত্য প্রীতির অভাব সে পদে পদে অনুভব করতে লাগল। এক একবার মনে হ'তো মুন্সীকে আনবার জন্যে ফাউণ্টেনকে পাঠিয়ে দি, আবার তখনই মনে হ'তো, না থাক, লোকটা ঘোরতর দুশ্চরিত্র। এই রকম দোটানার মধ্যে কোন রকমে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে লাগলো কেরীর কর্মজীবন।

(ক্রমশ)

দ্বিতীয় খণ্ড

('একটি অবান্তর অধ্যায়ের শেষে প্রথম খণ্ড ছাপা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু লেখকের অনবধানতাবশতঃ ছাপা হয় নাই বলিয়া লেখক নিতান্ত দুঃখিত।)
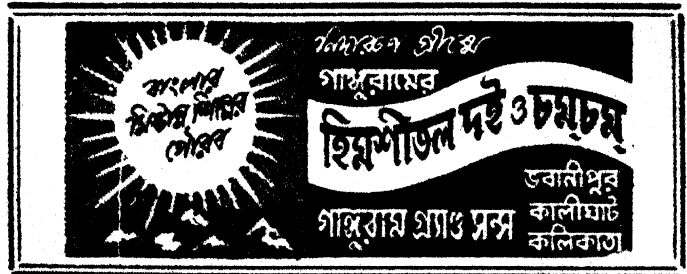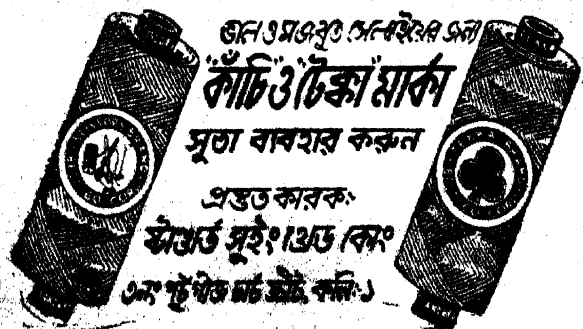
গত দুদিন ধরে সোভিয়েট রাশিয়ার তৈরী কৃত্রিম উপগ্রহ মহাবেগে দিনে পাঁচ ছ' বার করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ছুটছে এবং তার খবর কাগজে আর সব খবরকে কোণ-ঠাসা করে দিয়েছে, যদিও ঘটনাটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নয়। ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যেই মানুষের তৈরী উপগ্রহ আকাশে দেখা দেবে, এই সম্ভাবনা কিছুকাল ধরেই বৈজ্ঞানিক জগতের জানা ছিল। রাশিয়া এবং আমেরিকা উভয় দেশেই এই নিয়ে কাজ চলছিল। কার তৈরী উপগ্রহ আগে ছুটবে, এই ছিল প্রশ্ন। সে প্রতি-যোগিতায় রাশিয়া জয়ী হয়েছে। এই জয়ের পূর্বাভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল যখন রাশিয়ার আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (missile) প্রয়োগের কৌশল আবিষ্কারে সক্ষম হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারে আমেরিকা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে দেখা যাচ্ছে। শুনা যাচ্ছে, মার্কিন-মার্কা উপগ্রহের আকাশে বেরুতে আরো পাঁচ ছ' মাস দেরী হবে। তার মধ্যে রুশ-নির্মিত উপগ্রহ বোধহয় আরো গোটা কয়েক দেখা যাবে। রুশ-নির্মিত বর্তমান উপগ্রহটির ওজন নাকি ১৮০ পাউণ্ড অর্থাৎ দু' মণ আট সের; নিশ্চয়ই এর চেয়েও বড়ো বড়ো কৃত্রিম উপগ্রহ ভবিষ্যতে আসছে। আগে বার করতে না পারার দরুণ আমেরিকার যে-লজ্জা ও ক্ষোভ হয়েছে সেটা হয়ত সে মালের ওজন দিয়ে দূর করবে। চাঁদে যাওয়াটাও আর স্বপ্নের ব্যাপার থাকবে না, কারো কারো মতে আর পাঁচ দশ বছরের মধ্যেই মানুষ চাঁদে যেতে পারবে।

V—1, V—2'এর পরে অ্যাটম বোমার স্বাদ পৃথিবী পেয়েছে, হাইড্রোজেন বোমাও এখন পরীক্ষিত সত্য, আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র মানুষ লাভ করেছে, তারপর কৃত্রিম উপগ্রহ এল, এর পরে চাঁদেও মানুষ যাবে। অবশ্য কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে, চাঁদে যেতে পারলে, অর্থাৎ পৃথিবীর বাইরে কোথাও (জীবিত অবস্থায়) যেতে পারলে মন্দ হ'ত না। কারণ মানুষ পৃথিবীকে কোনো কোনো বিষয়ে মানুষের থাকার পক্ষে অযোগ্য করে তুলেছে। প্রফেসর হল্‌ডেনের কাছে ইংল্যাণ্ড অসহ্য বোধ হওয়াতে তিনি ভারতবর্ষে এসে পরীক্ষা করে দেখছেন, এখানে থাকা যায় কিনা। তিনি যদি একবার শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে রিফিউজীদের অবস্থা দেখেন তাহ'লে হয়ত তাঁর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—ভারতবর্ষও সকল মানুষের পক্ষে বাসযোগ্য স্থান কিনা। আমেরিকায় "সাদা" "কালো"র একসঙ্গে থাকার সমস্যা আজও মিটল না। পৃথিবীময় একটা না একটা এইরকমের অবস্থা রয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের "সহাবস্থান" কোথাও সংকটমুক্ত নয়।

আমাদের অল্পবয়সের কথা মনে পড়ে যখন আমরা প্রথম সোশ্যালিজম্-এর দ্বারা আকৃষ্ট হই। তখন এই কথাই শুনেছি যে, সায়েন্স এবং টেকনোলজির যে-রকম উন্নতি হয়েছে তাতে মানুষের আর দুঃখ দারিদ্র্য থাকার কোনো কারণ নেই, সমাজ ব্যবস্থা ঠিক মতো নিয়ন্ত্রিত হ'লে সকলেই সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, কারণ সায়েন্স ও টেকনোলজির উন্নতির ফলে মানুষের ভোগ্য-পণ্যের যাবতীয় চাহিদা এখন মেটানো সম্ভব। তারপর আমাদের জীবনেরই প্রায় দু' কুড়ি বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে সায়েন্স ও টেকনোলজির আরো যে কত উন্নতি হয়েছে, মানুষের হাতে যে আরো কত বেশি শক্তি এসেছে তার ঠিকানা নেই। কিন্তু এখনো কোটি কোটি মানুষের দুঃখ দুর্দশা প্রায় আগের মতোই আছে। সুতরাং শক্তি বাড়িয়ে হ'ল কী? শক্তি ও মঙ্গলের মধ্যে যে-ব্যবধান ছিল সেই ব্যবধান তো ঘুচছে না।

আজ চাঁদে যাবার জন্য আমরা উৎসাহী। কিন্তু হায়, যখন এক মাসের পথ এক ঘণ্টায় যাবার শক্তি মানুষের হয়েছে তখন এই পৃথিবীরই এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাওয়ার স্বাধীনতা পর্যন্ত সাধারণ মানুষ হারিয়েছে! আজ কর্তার হুকুম না হ'লে কারো দেশের বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই, বাইরে থেকেও কেউ ভিতরে আসতে পারে না। যখন দেখি যে, কর্তার হুকুম ছাড়া একই বাংলায় পূর্ব থেকে পশ্চিমে বা পশ্চিম থেকে পূর্বে যাওয়ার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত সাধারণ মানুষের নেই, আর সেই সঙ্গে শুনি যে, মানুষ মহাশূন্যে ভ্রমণের ক্ষমতা লাভ করেছে, তখন মানুষের জয়ধ্বনি করব না মানুষের জন্য বিলাপ করব বুঝতে পারি না।

শক্তি মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হচ্ছে না, একথা বললে অবশ্য পুরো সত্য বলা হবে না। কিন্তু বিজ্ঞানলব্ধ শক্তির চরম ব্যবহারের ক্ষমতা প্রবলের হাতেই থেকে যাচ্ছে এবং প্রবলের ক্ষমতার লিপ্সাকে সংযত করার কোনো উপায় বিজ্ঞানও আবিষ্কার করতে পারছে না। বৈজ্ঞানিকও রাষ্ট্রশক্তির দাসে পরিণত হয়েছে। কোনো কোনো সময়ে মানুষ ভেবেছে যে, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি এমন একটা বস্তু যেটা সহজে স্বাধীনতার সঙ্গে সংযুক্ত এবং গণতন্ত্রের সহায়ক। একথাও শুনা গেছে যে, রাষ্ট্রশক্তি যেখানে সর্বেসর্বা, যেখানে লোকস্বাধীনতা অবাধ নয় সেখানে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সম্ভব নয়। কিন্তু দেখা গেছে হিটলারের রাজত্বে V—1, V—2 তৈরী হয়েছে। যে-আবহাওয়ার মধ্যে অ্যাটম বোমা বা হাইড্রোজেন বোমা তৈরী হয়েছে সেটাকেও স্বাধীন চিন্তার খোলা হাওয়া বলা চলে না। সুতরাং সায়েন্স বা টেকনোলজির উন্নতির পক্ষে উক্ত নীতির আবহাওয়া আবশ্যক বা অপরিহার্য, একথার কোনো প্রমাণ নেই। বিজ্ঞানলব্ধ শক্তি কার হাতে পড়ে সেইটাই আসল প্রশ্ন। সেই শক্তি যতই বাড়ছে এই প্রশ্নও মানুষের পক্ষে ততো গুরুতর হয়ে উঠছে।

৭।১০।৫৭

আলোচনা

ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ও রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা

বিগত ৩১শে আগষ্ট, ১৯৫৭ ও ১৪ই ভাদ্র, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের ২৯ বর্ষের ৪৪ সংখ্যায় অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় মনস্বী রাখালদাস সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার ছাত্র ও বন্ধু রাখালদাস সম্বন্ধে নানা তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, যাহা বর্তমান যুগের অনেকেরই অজ্ঞাত রহিয়াছে। রাখালবাবু আমাদেরও ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমি, যতীন্দ্রমোহন রায় (ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা), পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, ব্যোমকেশ মুস্তোফি, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, রামকমল সিংহ প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার বাড়ি আসিতাম। কুমার শরৎকুমার রায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, যোগীন্দ্র সেন মহাশয়ও অনেকদিন সন্ধ্যার সময়ে আসিয়া মিলিত হইতেন। রাখাল ছিল সদালাপী, আমুদেপ্রিয় অতিথিবৎসল এবং প্রকৃত ঐতিহাসিক। তাঁহার "বাঙ্গলার ইতিহাস দুই খণ্ড", উড়িষ্যার ইতিহাস, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার বিশদ তথ্যই তাহার সাক্ষ্য। তাঁহার সম্বন্ধে আমার জানা অনেক তথ্য আছে সময়ে তাহা প্রকাশ করিব।

এই প্রসঙ্গে আমি ভাগলপুর সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষে দুই একটি কথা বলিতেছি। ভাগলপুরের এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথকে আনিবার জন্য তখনকার দিনের ভাগলপুরের তরুণ উকীল শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন গিয়াছিলেন বোলপুরে। যথাসময়ে পীড়িত অবস্থায় শারীরিক অপটুতা লইয়া রবীন্দ্রনাথ সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। খগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতার সঙ্গে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে, সে দিনের জনসংঘের অভিনন্দন, রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাকে যেমন করিয়া সম্বর্ধনা করিয়াছিল সেরূপ আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আমার যতদূর মনে আছে আমিই ঐ বক্তৃতার সারমর্ম লিখিয়া লইয়াছিলাম। ভাগলপুর সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতাটি প্রবাসী ৯ম ভাগ—চৈত্র, ১৩১৬। ১২শ সংখ্যায় ৬৬৯—৬৭২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল। খগেন্দ্রবাবু বক্তৃতাটির পুরোভাগে লিখিয়াছিলেন:

"শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্‌ এ ও বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সভাস্থলে রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতার যে নোট লইয়াছিলেন, তাহা হইতে স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া আমি বক্তৃতাটি সংকলন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সম্মিলনের পক্ষে আমার এ চেষ্টার যে মূল্য আছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা সেদিন সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, এবং রবীন্দ্রবাবুর ওজস্বিতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই ভাবজগতে অতুল, জীবন্তভাবে অনুপ্রাণিত বক্তৃতায় এই দীন সংস্করণে প্রীত হইবেন এ আশা আমার নাই। তাঁহারা মনে রাখিবেন যে, বক্তৃতায় অনেক এমন জিনিস থাকে যাহা অক্ষরে ধরিয়া রাখা যায় না। রবীন্দ্রবাবুকে যাহারা সম্যকরূপে জানেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, এ কথা তাঁহারও সম্বন্ধে সত্য বটে।"

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তৃতাটি আমি আমার নিজকৃত সাংকেতিক লিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। এতকাল পর্যন্ত সে খাতাখানি দেশের বাড়িতে যত্নে রাখিয়াছিলাম, আর তা কোনকালে ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাহা হইলে এখন হয়ত কাজে লাগিত। খগেন্দ্রবাবু এই বক্তৃতাটি লিপিবদ্ধ করিয়া সেই প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে এক মহদুপকার করিয়াছিলেন। 'বিশ্বভারতী' হইতে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর কোনও খণ্ডে নিশ্চয়ই ইহা স্থান পাইয়াছে, এইরূপ মনে করিতে পারি।

বন্ধুবর খগেন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'র উক্ত চৈত্র সংখ্যায় অপর একটি প্রবন্ধ ভাগলপুর সাহিত্য সম্মেলনেরও একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও অনুধাবনযোগ্য—প্রবাসী ৯ম ভাগ। ১২শ সংখ্যা। ১০৪১—১০৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সেদিনকার সেই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের পর যে কয়েকজন সাহিত্যরথী বক্তৃতা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করেন তাঁহাদের মধ্যে রাজসাহীর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মৈত্রেয় মহাশয় ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে প্রাচীন দেবমূর্তির শিল্পচাতুর্য, সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি পরিচয় ও তাহাদের বিশদ বর্ণনা করেন।

এই সম্মেলনে আমার মনে পড়িতেছে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, সম্মেলনের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বক্তৃতা, রাজসাহী সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের গত বৎসরের কার্যবিবরণী পাঠ সমাপ্ত হইলে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় অতি সুললিত উদ্দীপনাময়ী ভাষায় রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি রক্ষার্থ একটি মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তাঁহার এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন রাজসাহীর অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়। সভাতে স্থির হইয়াছিল স্মৃতিমন্দিরের নাম রাখা হইবে "রমেশচন্দ্র সারস্বত ভবন।" ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে বাছাই করিয়া যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে এবং বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়কে উক্ত মন্তব্য জ্ঞাপন করাইয়া এই ব্যাপারে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইবে।

আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংক্রান্ত রমেশ ভবন প্রতিষ্ঠার ইহাই আদি ইতিহাস।

মনে পড়ে সম্মেলনের অধিবেশনের পূর্ব রাত্রির কথা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রাখাল দাস, ব্যোমকেশ মুস্তোফি, বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রভৃতি আমরা ছিলাম একটি বাড়িতে—সেদিন দেখিয়াছিলাম, রাত্রিতে ত্রিবেদী মহাশয় গণেশের ন্যায় নিবিষ্টমনে রমেশচন্দ্র সারস্বত ভবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভাষণ লিখিতেছেন, অন্য কোনদিকে লক্ষ্য নাই, লেখনী চলিতেছে। রাত্রি দুইটার সময় তাঁহার ভাষণ লেখা শেষ হইয়াছিল। পরদিন তাঁহার সেই অনবদ্য ভাষণ ও মৈত্রেয় মহাশয়ের বক্তৃতা সকলকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

রাখাল আমাদের সকলকে হাস্যকৌতুকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ যখন বোলপুর হইতে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছিলেন যে তিনি অসুস্থতার জন্য আসিতে পারিবেন না, তখন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বোলপুরে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে আনিবার জন্য ভাগলপুরের দুই-একজন উৎসাহী যুবককে পাঠাইলেন—, বর্তমান ভাগলপুরের অন্যতম প্রধান উকীল শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন যে গিয়াছিলেন তাহা বেশ মনে আছে। আর সম্ভবত গিয়াছিলেন প্রেমসুন্দর বসু।

সম্মিলনের ভাগলপুরের অধিবেশনে যাঁহাদের দেখিয়াছিলাম তাঁহাদের সকলের নাম মনে নাই তবে সভাস্থলে সারদাচরণ মিত্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, পাকুড়ের কুমারেরা এবং প্রায় দেড়শত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মহিলারাও অনেকে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পর্দার অন্তরালে থাকিয়া সভার কার্য দর্শন করিয়াছিলেন।

আজ আমরা অনেকে সেকালের খ্যাতিমান্ সাহিত্যিকদের নাম ভুলিয়া গিয়াছি। সেদিনকার সম্মিলনে বিবিধ কঠোর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, জাতিতত্ত্ব, বাঙ্গালী আর্য কি দ্রাবিড় এই সব নীরস গবেষণার মধ্যে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় "বর্ণমালার অভিযোগ" উপস্থিত করিয়া এক নূতন রসের অবতারণা করিয়া গম্ভীর প্রকৃতির সাহিত্যিকদিগকেও হাসাইয়াছিলেন। সেটি যেমন হইয়াছিল শ্রুতিমধুর তেমনি শ্লেষপূর্ণ সরস ও সুন্দর।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে সম্মিলনের শেষ দিনে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার বিশেষত্ব এই ছিল যে, বিশুদ্ধ কাব্য সাহিত্য বাদ দিয়াও যে সম্মিলনের ক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে, সেই কথা তিনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সম্মিলন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাকয়টি এ সময়েও প্রণিধান যোগ্য। এখানে সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার কিয়দংশ প্রকাশ করিলাম।

"বাঙ্গলার ব্যক্তিগত চেষ্টায় অনেক অনুষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে—এমন বহুতর চেষ্টা দেখেছি, কিন্তু সে সব সম্পূর্ণ ও সফল হয়ে উঠেনি। কিন্তু সাহিত্য পরিষৎ যে বেড়ে উঠেছে, তার কারণ এটাও একটা সৃষ্টিকার্য; কেননা, এমন সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ইহা সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে যে, ব্যক্তিগত চেষ্টা বা সংকল্প থেকে ইহার জন্ম হলে কখনও তেমনটি হতে পারত না। আমাদের দেশের প্রকৃতি ইহাকে সৃষ্টি করেছেন, তাই আজ সাহিত্য পরিষৎ অলক্ষিতভাবে মূর্তি পরিগ্রহ করে আমাদের সকল চেষ্টা ও কামনার সফলতা স্বরূপে সকলের সমক্ষে উপস্থিত হয়েছে। এইজন্য আশা হয় যে যেহেতু এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, কোনও একজনের বা কোনো একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকৃত অনুষ্ঠান নয়, সেহেতু ইহা অনুকরণের কালে আবির্ভূত হয় নাই আনন্দের দ্বারা আপনি আপনাকে সৃষ্টি করেছে, ইহা স্থায়ী হবে এবং ক্রমেই উৎকর্ষ ও প্রসার লাভ করছে। যেটা স্বরচিত, সেটা দিন দিন ভাঙেগড়ে, কিন্তু এখানে সে সম্ভাবনা নাই।

"আনন্দের বিষয় এই যে, যে সাহিত্য এতদিন অবজ্ঞাত ছিল, তাহাই আজ এত সমাদর লাভ করতে পেরেছে। এতদিন আমাদের সাহিত্য বাহিরের কোনো সহায়তা পায় নাই, রাজার সাহায্য হতে বঞ্চিত থেকে অনেকদিন পর্যন্ত শিক্ষাভিমানীদিগের নিকট অনাদৃত থেকেও সকলের দৃষ্টির অন্তরালে সাহিত্য যে এমন একটি অতুল সম্পদ সঞ্চিত করে রেখেছে, ইহা বড়ই বিস্ময় ও আনন্দের বিষয়। বাহিরের এই অনাদর, উপেক্ষা সত্ত্বেও বৎসর বৎসর সাহিত্য আমাদের নিকট উজ্জ্বল মূর্তি নিয়ে আসছে—ক্রমশ ইহার উজ্জ্বলতা আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। ইহা অবজ্ঞার বিষয় নহে, ইহা যথার্থ স্বদেশের জিনিস, ইহাকে ভুলিয়া থাকা সম্ভব নহে। আমরা বৎসর বৎসর এর আত্মবিকাশের পরিচয় পাচ্ছি—বহরমপুরে যখন এই সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়, তখন যে পরিমাণ উৎসাহ ও উদ্যম দেখেছি, রাজসাহীতে তাহা আরও পরিস্ফুট হয়েছিল। কিন্তু ভাগলপুরের এই সম্মিলনটি সার্থকতা ও উৎসাহে অপর সম্মিলন দুইটিকে বহু পশ্চাতে ফেলেছে। এখানে যেরূপ বিচিত্র আয়োজন দেখলাম, যে সকল সারগর্ভ উপাদেয় প্রবন্ধ শ্রবণ করলাম—আর একটা বিশেষ গৌরবের জিনিস এর সঙ্গে যে একটা Museum স্থাপিত হয়েছে—যাহা ভাগলপুরের 'সাহিত্য-সম্মিলনের' একটা বিশেষ অংশ বলে মনে করি তাহা সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষে নূতন। সকলের মধ্যে এমন উৎসাহ, এমন আনন্দ আর কখনও দেখিনি। এত আশার সঙ্গে সকলে এই সম্মিলনে যোগদান করেছেন যে, মনে ভরসা হয় এই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করবে, সেইজন্য বৎসর বৎসর ইহার মূর্তি উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। যেন সে আপনার মধ্যে এমন একটা শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে যে, সে কাহারও অপেক্ষা করছে না। বরং আমাদিগকে আকর্ষণ করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আপনার নিয়ম আপনি বাহির করছে—সৃষ্টি করছে, ভিতর থেকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। বড় ভরসার বিষয়, এটা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হয়ে সম্পূর্ণ হয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করবে। আজ যে সব জিনিস আমরা বড় বলে মনে করছি—হয়ত সে সব জিনিসের গৌরব খর্ব হয়ে যাবে, কিন্তু এই অনুষ্ঠান অক্ষয় হয়ে থাকবে।"

সম্মিলনের কয়েকদিন ভাগলপুরবাসীরা অভিনয়ের আয়োজন, বিখ্যাত গল্প লেখক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাটীতে সঙ্গীতের মজলিস করিয়াছিলেন। সেখানেও উপস্থিত ছিলাম—এবং অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম।

ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনারায়ণ সিংহ, মাননীয় দীপনারায়ণ সিংহ এবং বহু বাঙ্গালী ও বেহারী ভদ্রমহোদয়গণের সৌজন্য ও আতিথেয়তার কথা স্মরণ করিয়া আজিও হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়।

এই সম্মেলনেই আবার দ্বিতীয়বার রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভ এবং ঘনিষ্ঠভাবে আলাপের সুযোগ হইয়াছিল।

আচার্য যদুনাথের নেতৃত্বে আমরা কর্ণগড়, কাসান ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখিয়াছিলাম, আর আমি রাত্রিতে সুলতানগঞ্জ গেবীনাথ দর্শনে গিয়াছিলাম।

সে সময় অনেকে নিজেদের জেলায় সম্মিলনীকে নিমন্ত্রণ করিতে ইতস্তত করিতেন। কিন্তু সেকালে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতি এমনি বিভিন্ন জেলাবাসীর আগ্রহ ছিল যে এই মিলন ব্যাপারে কেহ ব্যয়বাহুল্যের ভয়ে পশ্চাৎপদ হইতেন না। আমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও ময়মনসিংহ সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধিরূপে সভায় উপস্থিত ছিলাম। আমার প্রতি ময়মনসিংহের পক্ষ হইতে সম্মিলনীকে আগামী বর্ষের জন্য আহ্বান করিবার ভার পড়িয়াছিল। এ প্রসঙ্গে আমি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দ্বারা সম্মিলনীকে ময়মনসিংহে নিমন্ত্রণ করি, [illegible] এ পূজা দানের আয়োজন হইবে বলিয়াছিলাম। আমার ভাষণের পর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিয়াছিলেন আমরা আপনার এই নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিলাম।

বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় ১৩১৬ সালের ৫ই সংখ্যা 'সুপ্রভাতে' বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"এবার শ্রীযুক্ত [illegible] আগামী বৎসরে ময়মনসিংহে [illegible] করিবেন [illegible] সম্মিলনী [illegible] আগামী বৎসরে [illegible] গ্রহণ করিবে।"

সে আনন্দ ও উৎসাহ [illegible] আর নাই। সে প্রীতি ও ঐক্য [illegible] বিলুপ্তপ্রায়। কবি ভাগলপুরে সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য পরিষৎ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে—আজ সাহিত্য পরিষৎ গৌরবোজ্জ্বল মুকুট ভারতবর্ষের ইতিহাসে উজ্জ্বল।

সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র মহাশয় রাখালদাসের কথা বলিয়া আমাদের মনকে অতীতের দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। রাখাল ছিলেন ঐতিহাসিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্প লেখক, নাট্য সমালোচক, অভিনেতা এবং ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্ররূপে রূপ-সজ্জায় রঙ্গালয়ের পরামর্শদাতা। সে সব অতীতস্মৃতি বড় মধুর এবং মর্মস্পর্শী। [illegible] অনেক দেখিয়াছেন অনেক শিখিয়াছেন, তিনি যদি তাঁর স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেন তবে তাহা হইবে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। ইতি—নিবেদক

শ্রী[illegible]
[illegible] পোঃ জিঃ ২৪ পরগনা।

বাঙালীর জাতিপরিচয়

॥ ধরণী সেন ॥

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হ'তে
সমুদ্রে হ'লো হারা।

হেথায় আর্য হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন
শক-হূন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'লো লীন।"
(রবীন্দ্রনাথ)

প্রাচীন মানুষ প্রাগৈতিহাসিক হিমযুগ হইতেই ভারতের দিকদিগন্তে তাহার পদচিহ্ন রাখিয়া ভারতবর্ষকে এক মহা-মানবতীর্থে পরিণত করিয়াছে। যুগে যুগে বহু কৃষ্টি, বহু ধর্ম, বহু মানবধারা ভারত-ভূমিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিদেশী বণিক, নাবিক, সৈনিক, ধর্মযাজক, অভি-যাত্রিক দল যেন কোন অমৃতের সন্ধানে এই পুণ্যভূমি স্পর্শ করিয়াছে। প্রাগৈতি-হাসিক প্রস্তরযুগ, তাম্র-ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগ এবং ঐতিহাসিক কাল ধরিয়া আধুনিক যুগাবধি বিভিন্ন মানবজাতির এত ব্যাপক সংমিশ্রণ এখানে ঘটিয়াছে এবং আজও ঘটিতেছে যে, তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া আজ দুষ্কর।

ভারতবর্ষে কোন্ আদি মানবজাতির প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল আমরা জানি না; কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগের সংস্কৃতির নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এখানে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন্ মানবজাতি সেই সংস্কৃতির নির্মাতা আমাদের জানা নাই, কারণ তাহাদের জীবাশ্ম বা ফসিল আজও পাওয়া যায় নাই। অবশ্য পরবর্তী ব্রোঞ্জযুগে হারাপ্পা-মোহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার নির্মাতা-দের জাতি পরিচয় তাহাদের অস্থিঅবশেষ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। একথা সত্য ও সত্যপ্রমাণিত যে ভারতবর্ষের (তথা পাকি-স্থানের) উত্তর ও পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পথে সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানের পশ্চিম ও পূর্ব উপত্যকা দিয়া বহু মানবধারা বহু জাতি ভারতে আসিয়া মিলিত ও সংমিশ্রিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ হইতেও বহু জাতি [illegible] সংস্কৃতি দেশবিদেশে বিসর্পিত হইয়াছে। ভারতীয় মানবজাতির সবকিছু উপাদান যে বহির্দেশ হইতে ভারতে আমদানী হইয়াছে এই ধারণা ভ্রান্ত। ভারতবর্ষ কোন-কালেই (প্রাক-মানব টারশিয়ারি যুগ* ও তৎপূর্ববর্তী ভূতাত্ত্বিক যুগগুলি অবশ্য বাদ দিয়া) মনুষ্যশূন্য মহাদেশ ছিল না। এখানেও অতীতে যে মানবগোষ্ঠীর বিবর্তন ঘটিয়াছে এবং বর্তমানেও ঘটিতেছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের মত এদেশে যথেষ্ট রকম বৈজ্ঞানিকভাবে নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও গবেষণা করা হয় নাই, তাই আজও ভারতবর্ষে ও তথা বাংলাদেশের মানগোষ্ঠীর সমগ্র পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত। ভারতবর্ষের (এবং পাকি-স্তানের) সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক পটভূমিকায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত একদিকে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য-এশিয়ার দেশগুলি এবং অপর দিকে বর্মা-মালয় প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ও দ্বীপগুলি। প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতেই মানবজাতি এই সকল দেশবিদেশে এত বর্ধিত, বিসর্পিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, যে তাহার নিখুঁত মানচিত্র পরিনির্মাণ করা অসম্ভব। বাংলাদেশের কিঞ্চিৎ নৃতাত্ত্বিক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিশ্লেষণে বহু জটিলতা ও মতভেদ আছে। জাতি বিশ্লেষণে আরো অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী নৃতাত্ত্বিক মাপজোক ও তথ্যের প্রয়োজন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগে বাঙ্গালীর নৃতাত্ত্বিক উপাদান লইয়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা শুরু করা হইয়াছে। যাহা হউক, কয়েকটি প্রধান দৈহিক মাপজোক ও লক্ষণের উপর ভিত্তি করিয়া যে তথ্যগুলি প্রকাশিত ও বৈজ্ঞানিক মহলে আলোচিত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া সাধারণভাবে একটা আলোচনা আজকের এই প্রবন্ধে সম্ভব।

ভারতবর্ষে তথা বাংলা দেশেও এক প্রাচীন মানবজাতির নৃতাত্ত্বিক উপাদানের প্রভূত প্রমাণ আছে এবং তাহার বিস্তৃতিও লক্ষণীয়; পুরাণে ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এই প্রাচীন মানবজাতিকে নিষাদ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সঙ্গে ইহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া নৃতত্ত্ববিদগণ এই আদিবাসীদের অস্ট্রালীয় (Australoid) নামান্তরে দ্রাবিড় জাতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রাচীন অস্ট্রালীয় জাতিই ভারতের প্রকৃত আদিবাসী; প্রাগৈতিহাসিক ভারতে প্রাক্‌আর্য যুগে ইহাদেরই আধিপত্য ছিল বিস্তৃত। এই অস্ট্রালীয় জাতির আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য—অতি লম্বা মাথা, চওড়া নাক কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্র বা মধ্যমকায়। আজ ভারতীয় প্রায় সকল মানবজাতির মধ্যে এই অস্ট্রালীয় উপাদান অল্পাধিকতর সংমিশ্রিত, তবে ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যে—যেমন সাঁওতাল, ওরাঁও, মুণ্ডা প্রভৃতির মধ্যেই প্রধানত এই উপাদান দৃষ্ট হয়। বাংলায় নমঃশূদ্র, পোদ, বাউড়ী, বাগদী, চণ্ডাল প্রভৃতির মধ্যেও উল্লিখিত উপাদানগুলি দেখা যায়—তবে ইহাদের মধ্যে অন্যান্য কয়েকটি জাতিরও যেমন আর্য, শক, মঙ্গোল প্রভৃতি জাতির সামান্য মিশ্রণ আছে। ফলে এই তথা-কথিত নিম্নবর্ণ জাতিদের মধ্যে বেশ মিশ্র উপাদান দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালী উচ্চবর্ণে যেমন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের মধ্যে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত অস্ট্রালীয় জাতির উপাদানও দেখা যায়—যদিও সামান্য পরিমাণে।

এই অস্ট্রালীয় বা তথাকথিত নিষাদীয় উপাদান ব্যতীত বাংলা দেশে মঙ্গোলীয় বা মঙ্গোলরূপ জাতির—বিশেষ দক্ষিণী মঙ্গোলীয় প্যারোইয়ান জাতি শাখার উপাদানও বিশেষ লক্ষণীয়। মঙ্গোলীয় আকৃতির জাতিগত একটি বৈশিষ্ট্য—চোখের বিচিত্র গঠন, বাদামের মত বঙ্কিম চক্ষু ও চক্ষুকোণ-আবৃত ভাঁজ বা নেত্রবলী। অবশ্য চোখের এই বিচিত্র গঠন সকল মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যে সমান মাত্রায় দেখা যায় না। প্যারোইয়ান জাতির প্রধান আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য: গোল বা মধ্যম মাথা, বাঁকা চোখ, ক্ষুদ্রকায় ও ময়লা গাত্রবর্ণ। বাংলা দেশের উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে নিম্নবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে এবং মুসলমানদের মধ্যে এই প্যারোইয়ান উপাদান প্রধানত দৃষ্ট হয়। বাংলার কচ্ ও রাজবংশী এই প্যারোইয়ান জাতিভুক্ত। মালয় জাতিগত বা মালয়ী উপাদান (ইন্দোনেশিয়া) পূর্ববঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামে যেমন চাকমা, মগ প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে দেখা যায়—ইহাদের অত্যধিক গোলাকার মাথা, ক্ষুদ্রকায় ও গাত্রবর্ণ বাদামী। বাংলা দেশে ও অন্যত্র পূর্ব বর্ণিত অস্ট্রালীয় উপাদানের সঙ্গে বিভিন্ন পরিমাণে বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ

---

* টার্শিয়ারি যুগে (Tertiary) শিবালিক পর্বত অঞ্চলে নরবানরের (Anthropoid Apes) অস্থি অবশিষ্ট (দাঁত ও চোয়াল) পাওয়া গিয়াছে।

পূর্বাঞ্চলে এই মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। নানা সংমিশ্রণের ফলে প্যারোইয়ান মানবজাতির রূপ এত পরিবর্তিত হইয়াছে যে, তাহার সঠিক সনাক্তিকরণ নিতান্ত সহজ নয়।

ভারতীয় ইতিহাসে ও নৃতত্ত্বে আর্যদের ভারত-অভিযান একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আর্য-অভিযান হইয়াছিল সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ১২০০—১৫০০ বৎসর কালে। আর্যদের এই অভিযানের অন্যতম একটি কারণ—মধ্য এশিয়া মরুভূমিপ্রায় হওয়া এবং নূতন তৃণভূমি ও উর্বরা উপত্যকার অনুসন্ধান করা। দক্ষিণ-পূর্ব পারস্য দেশ দিয়া ইহারা সদলবলে ভারত-সীমান্ত অতিক্রম করিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে। পরে উত্তর ভারত হইতে এই ইন্দো-আর্য বা ভারতীয় বৈদিক আর্যরা ক্রমশ দক্ষিণ ভারতে ও পূর্ব ভারতে ছড়াইয়া পড়ে নানা জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়। বাংলা দেশেও বৈদিক আর্যদের উপাদানের প্রমাণ আছে। এই ভারতীয় আর্যদের আকৃতিগত প্রধান বৈশিষ্ট্য: বলিষ্ঠ দেহ-গঠন, দীর্ঘকায়, দীর্ঘশির, লম্বা সরু নাক, পিঙ্গল চক্ষু ও গৌরবর্ণ। বাঙালীদের মধ্যেও অনেকটা এইরূপ আর্যজাতীয় উপাদান উচ্চবর্ণ হিন্দু, যেমন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের মধ্যে অল্পবিস্তর দৃষ্ট হয়। রাঢ়ি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, দক্ষিণ রাঢ়ি ও বঙ্গজ কায়স্থদের ও গোয়ালাদের শতকরা আট-দশজনের মধ্যে দীর্ঘকায়, দীর্ঘশির বলিষ্ঠদেহ এই রূপটি দেখা যায়। বাংলার তথাকথিত নিম্নবর্ণ হিন্দুদের মধ্যেও সামান্য পরিমাণে এই উপাদান দৃষ্ট হয়। তবে মঙ্গোলীয় ও অস্ট্রালীয় মিশ্র উপাদানের সঙ্গে এই আর্যরূপ এত অল্পমাত্রায় মিশিয়াছে যে, তাহা সহজে ধরা পড়ে না। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে যে দীর্ঘশির, গৌরবর্ণ ও ঈষৎ পিঙ্গল চক্ষুসম্পন্ন মানুষ মাঝে মাঝে দেখা যায়, তাহা আর্যজাতীয় উপাদান।

আর্যদের পরেই সম্ভবত পারস্য তুর্কীস্থান এলাকা হইতে ভারত অভিযান করিয়াছিল শক জাতি বা সিথিয়ানরা। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে, বিশেষ দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে ইহারা ছড়াইয়া পড়ে ও ক্রমে অন্যান্য জাতির সহিত সংমিশ্রিত হয়। এই জাতির আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হইল—মধ্যমকায়, চওড়া গোল মাথা, মাথার পিছনে চ্যাপ্টা-খাড়াই, লম্বা নাক ও ঈষৎ পীতাভ রং। বাঙালীদের মধ্যে প্রধানত উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ আকৃতিগত উপাদান অল্পবিস্তর দেখা যায়। তথাকথিত নিম্নবর্ণ হিন্দু-দের মধ্যে এই উপাদান বিরল। অনেকে বলেন, উচ্চবর্ণ বাঙালীদের মধ্যে যে গোল মাথা দেখা যায়—তাহার হেতু নাকি এই শক বা সিথিয়ান উপাদান। অবশ্য এই বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদগণ এখনও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান নি। নৃতাত্ত্বিক মতে চওড়া বা গোল মাথার আনুপাতিক মাপ ৮২ ও তদোর্ধ্ব, মধ্যম মাথার আনুপাতিক মাপ ৭৬—৮০·৯ এবং লম্বা মাথার আনুপাতিক মাপ ৭৫·৯ ও তন্নিম্ন। বেশীরভাগ বাঙালীর মধ্যে মধ্যম মাথার প্রাধান্য দেখা যায়। বাঙালীদের মধ্যে যেমন রাঢ়ি ব্রাহ্মণ, দক্ষিণরাঢ়ি ও বঙ্গজ কায়স্থ এবং বৈদ্যদের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক গোল মাথা দৃষ্ট হয়, তাহার আনুপাতিক মাপ নিম্ন, অর্থাৎ মাথা অল্প গোলাকার অনেকের মতে, বাঙালীদের মধ্যে, বিশেষ রাঢ়ি ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ রাঢ়ি, কায়স্থ এবং অল্প পরিমাণে বৈদ্য, বঙ্গজ কায়স্থ, গোয়ালা ও পোদদের মধ্যে অস্ট্রালীয় ও মঙ্গোলীয় সংমিশ্রিত উপাদান, অর্থাৎ গোল মাথা, সরু নাক ও মধ্যমকায় এই উপাদান দেখা যায়। অবশ্য উপরোক্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও গোয়ালাদের মধ্যে ঐ উপাদানের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে বৈদিক আর্যদের অন্যতম আকৃতিগত উপাদান, যেমন দীর্ঘশির, দীর্ঘ-নাসা ও উজ্জ্বলবর্ণ। বাঙালীদের মধ্যে আরও একটি আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য প্রায় দেখা যায়—গোল মাথা, ভারী, চওড়া ও খাড়াই দেহগঠন—অনেকটা 'জন বুল টাইপ' (আল্পাইন) গোছের চেহারা। সত্য কথা বলিতে, গোল মাথার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের সত্যই বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন।

ভারতীয় এই জাতি বৈচিত্র্য ও বিবর্তনের সম্যক কারণ এখনও আমাদের অজ্ঞাত। মানবজাতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে হিমযুগে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক পুরা প্রস্তর যুগে। সেই আদি মানব যুগের এবং তৎপরবর্তী-কাল মধ্য প্রস্তর ও নব প্রস্তর যুগের কৃষি পশুপালন প্রবর্তনের যুগ, সংস্কৃতির নিদর্শন প্রচুর পাওয়া গেলেও কোন ফসিল মানবের অস্থি আজও পাওয়া যায় নাই। বলা বাহুল্য, ভারতীয় জাতিতত্ত্বের মূল সূত্র প্রাগৈতি-হাসিক ফসিল মানবের দেহ গঠনে নিহিত রহিয়াছে। ফসিল মানবের সঙ্গে আজকের আদিবাসীদের যেমন অস্ট্রালীয় আদিবাসীদের কোন যোগসূত্র স্থাপনে অতীতের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। ফসিল মানবকে তাহার গোপন আস্তানা হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। প্রাগৈতিহাসিক কবর স্থানগুলি, দাক্ষিণাত্য ও মধ্যপ্রদেশের গুহাগহ্বরগুলি, প্রাচীন নর্মদা উপত্যকা ও শিবালিক পর্বতমালার নিম্নদেশে পাঞ্জাবের নদী উপত্যকাগুলি প্রাচীন মানবের জীবাশ্ম আবিষ্কারে বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ। ভারত-বর্ষের তথা বাংলার এই জাতি উপজাতি বৈচিত্র্য—সম্ভবত ভারতের মাটিতেই বিবর্তনের ফলে প্রধানত ঘটিয়াছে—নানা স্তরের মাধ্যমে এক আদি জাতি হইতে ক্রমশ আর এক জাতি ও শাখা জাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং পরে বিদেশী রক্তের সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছে।

আপাতত নৃতাত্ত্বিক তথ্য অনুযায়ী মনে হয় —অস্ট্রালীয় উপাদানই সম্ভবত ভারতের তথা বাংলার মূল ও প্রধান উপাদান এবং সেই উপাদানের সঙ্গে ক্রমে মিশ্রিত হইয়াছে যেমন একদিকে (পশ্চিমে) শক পামিরীয় ও আর্য জাতীয় উপাদান, তেমনি আর একদিকে (পূর্বে) মঙ্গোলীয় জাতির শাখা জাতির উপাদান—প্যারোইয়ান ও মালয়ী ইন্দো-নেশিয় উপাদান প্রভৃতি। বিভিন্ন কালে ও পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন পরিমাণে এই বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই সকল সংমিশ্রণের আপেক্ষিক পরিমাণ কিরূপ, তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। তবে এই বিচিত্র সংমিশ্রণের ফলে বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কয়েকটি নৃতাত্ত্বিক মাপযোগ ও তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণ-ভাবে দেখা যায় যে, বাঙালীদের চেহারা কতকটা মধ্যম আকারের বা মাঝারি গোছের অর্থাৎ মাথার আকার মধ্যম রকম, নাকের আকার মধ্যম রকম,—লম্বাও নয়, চ্যাপ্টাও নয় এবং দেহের আকারও মধ্যম, অর্থাৎ দীর্ঘও নয়, খর্বও নয়। বাঙালীর আকৃতিগত এই রূপটিই সংখ্যাধিক দেখা যায় এবং এই রূপটিকে 'বাঙালী টাইপ' বলা যাইতে পারে।
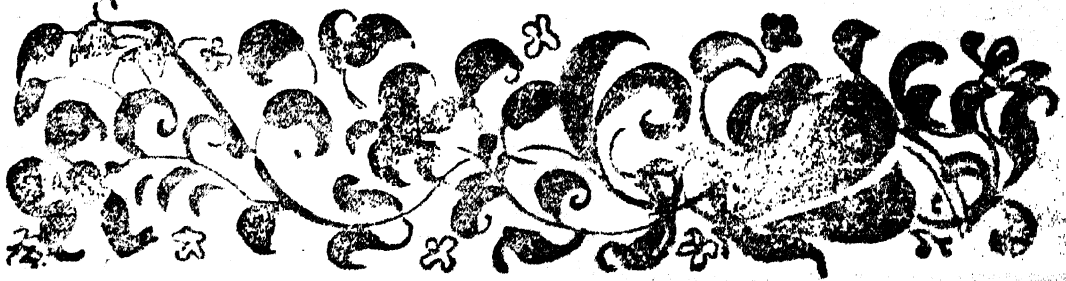
কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের কথ

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

॥ ১ ॥

উনিশ শতকের সংবাদপত্র জগতে 'সংবাদ প্রভাকর' এবং তাহার সম্পাদক গুপ্ত কবির দাপট বড় কম ছিল না। 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা দেশে প্রকাশিত সর্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। সংবাদ প্রভাকর তথা ঈশ্বর গুপ্তকে কেন্দ্র করিয়া সেকালের সাহিত্য জগতের বহুতর ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য সাধনা অপেক্ষা সাহিত্যিক সৃজনের প্রয়াস বাংলা দেশে অশেষ শুভকর হইয়াছিল। পরবর্তীকালের কৃতী সাহিত্যপথিক মাত্রেই ঈশ্বর গুপ্তের স্নেহস্পর্শে সৌভাগ্যবান্। সংবাদ প্রভাকরের একটি বিশেষ বিভাগ ছিল, যে বিভাগে 'ছাত্র হইতে প্রাপ্ত' রচনাসমূহ প্রকাশিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ অধিকারী, গোপালচন্দ্র সেন, বিশ্বম্ভর দাস বসু, রাধামাধব মিত্র প্রভৃতির রচনা এই বিভাগে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। প্রকাশিত রচনার শেষে সম্পাদকের মতামত অনেক ক্ষেত্রেই থাকিত। এই মতামতগুলি প্রত্যক্ষভাবেই এই তরুণ কবি-সমাজকে উৎসাহ যোগাইত।

বাংলা সাহিত্যে ১২৫৯।৬০ সাল চিরস্মরণীয়। এই সময় সংবাদ প্রভাকরের 'ছাত্র হইতে প্রাপ্ত' রচনা-বিভাগ সাহিত্যক্ষেত্রে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে সম্পাদক কবিতা প্রতিযোগিতার আহ্বান করিতেন। এইরূপ একটি প্রতিযোগিতায় যোগ দেন কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী, হুগলী কালেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং হিন্দু কালেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র। প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা থাকিত যে কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করিবার। রচনাসমূহ প্রকাশিত হইবার পর সম্পাদকের মতামত প্রকাশিত হইত কিংবা পাঠকসাধারণের মতামত আহ্বান করিয়া সেইগুলি প্রকাশ করা হইত। কোন কোন বার প্রতিযোগিগণকে পুরস্কৃত করাও হইত। ১২৫৯ সালের চৈত্র মাসের আহূত প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করেন দীনবন্ধু মিত্র। ২রা এবং ৩রা চৈত্রের সংবাদ প্রভাকরে দীনবন্ধুর রূপক কবিতা 'দম্পতি প্রণয়' প্রকাশিত হইল। ৪ঠা এবং ৫ই চৈত্র প্রকাশিত হয় দ্বারকানাথ অধিকারী রচিত রূপক কবিতা 'সত্যবতীর সহিত পাপিনীর দ্বন্দ্ব' এবং ৬ই চৈত্রের সংবাদ প্রভাকরে বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'কামিনীর প্রতি উক্তি' [illegible]।

কবিতা-ত্রয়ের শীর্ষনাম হইতেই কাব্য-বৈচিত্র্যের স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। কিশোর কবি দীনবন্ধু মিত্রের 'দম্পতি প্রণয় ॥ বিজয় কামিনী' কবিতাটি ভারতচন্দ্রের ধারার সম্পূর্ণ অনুগামী। আদি-রস ইহার প্রাণ-রস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিজয় নামধেয় রাজকুমারের বিবাহ বাসনা জন্মিল। [illegible]গণকে এজন্য চিন্তান্বিত দেখা গেল। পরদিন প্রাতর্ভ্রমণের কালে রাজকুমার অপরিচিত এক পুষ্পোদ্যানে পুষ্পশোভায় মোহিত হইয়া প্রবেশ করিলেন।

এমন সময়ে তথা মরাল গমনে।
আইল কুমারী এক কুসুম চয়নে॥
যৌবনে আগতপ্রায়, বিন্দু পাই ডলি।
ফুটিবার আগে যেন, কমলের কলি॥
কামিনী কন্যার নাম, ধর্মপরায়ণা।
দিবানিশি এক মনে, ঈশ্বর কামনা॥
বিজয়—লোচন পথে পড়িল কামিনী।
বিমোহিত হয় রায় হেরে সৌদামিনী॥

প্রথম দর্শনেই উভয়ের মনে প্রেম-সঞ্চার হইল। অতঃপর দুইজনে কুসুম চয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিজয়। ফুলে প্রয়োজন মম নাহি হে কামিনী।
ইচ্ছা নাহি করে আর লইতে নলিনী॥
হাতে নিতে নিতে যায় হইয়ে মলিন
ক্ষণেক বিলম্বে হয় সব শোভাহীন॥
এমন কুসুমে আর নাহি প্রয়োজন।
চিরস্থায়ী সুকুসুমে আছে মম মন॥
কামিনী। ক্ষণিক অবনীধামে সকলি নশ্বর
ভাবিয়া কিছুই আমি না দেখি অমর॥
আশার সংসার তব করিব কেমনে।
সৃষ্টি ছাড়া আশ তব রাখ মনে মনে॥
বি। কামিনী, বাঞ্ছিত ফুল আছে হে তোমার।
কা। দেখাও তোমায় দিব করি অঙ্গীকার॥
বি। মনে মনে দেখ দেখি ভাবিয়ে কামিনী।
কামিনী কুসুমে কি হে, কুসুম কামিনী॥

অবশেষে কামিনীর অঙ্গীকৃত হৃদয়-কুসুম অনার্পিত হয় নাই। বিজয়-কামিনী বা কামিনী-বিজয়ের ইহাই সারকথা।

দ্বারকনাথ অধিকারী রচিত 'সত্যবতীর সহিত পাপিনীর দ্বন্দ্ব' আদিরস বর্জিত ধর্মাশ্রয়ী এবং আদর্শপ্রচারমূলক কবিতা। সত্যের সহিত অসত্যের বা পাপের সঙ্গে পুণ্যের বিবাদমূলক বাদানুবাদ কল্পনা করিয়া সত্যের জয় ঘোষণা কবির মনোগত অভিপ্রায়।

সত্যবতীর উক্তি।

শুনি সত্যবতী সতী, কাতর হইয়া অতি
ধীরে ধীরে কন পাপিনীরে।
[illegible] প্রকার দুখ, [illegible] করিল দুখ,
আমারে [illegible] দুখ নীরে॥
[illegible] যদি আর রবে, [illegible] হবে,
[illegible] অনুগামী হবে।
করেতে করিয়া শূল, নাশিয়া পাপের কুল,
পুর্ব্ববৎ সগৌরবে রবে॥
হাঁ লো পাতকিনী বামী, আপন গুণের বাণী,
কি আর বলিব তোর কাছে।
অধম ভেকের দল, কেমনে জানিবে বল,
শতদলে কত গুণ আছে॥
ছাড়িয়া পাপের মত, যে আমাকে অবিরত,
ভক্তি ভরে মনে মনে ডাকে
তাহার না রহে দুখ, সতত স্বমনে সুখ,
শমনের ভয় নাহি থাকে॥

দ্বারকানাথের পর বঙ্কিমচন্দ্রের 'কামিনীর প্রতি উক্তি' প্রকাশিত হয়। রমণী দেহে কবি ষড়ঋতুর বিচিত্র লীলা-বিলাস প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই লীলা-বিলাস-কথনই কবির প্রতিপাদ্য বিষয় এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি স্বভাবতই আদিরসের স্রোতে পাঠক-মন ভাসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আদিরসের উপর নির্ভর করিয়া কাব্য বা সাহিত্য রচনা করার দৃষ্টান্ত কোন যুগেই বিরল নয় কিন্তু তাহাকে সার্থক সাহিত্যের পর্যায়ে লইয়া যাওয়া সব যুগেই দুর্লভ। আদিরসের আবেদন সমাজের সর্বস্তরে। ভারতচন্দ্র পরিণতকালে যে রসের মাধ্যমে আপনার প্রতিভার বিকাশ ঘটাইয়াছেন, তাহা যদি কিশোর-কবি দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রকে মোহমুগ্ধ করে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। দ্বারকানাথ ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেও মানুষের সত্যাসত্যের দুর্বলতা-বোধকে আপন কক্ষাবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মত দেবী সত্যবতীও সত্যপথিকদের পুরস্কারের লোভ দেখাইয়াছেন।

দীনবন্ধু-দ্বারকানাথ-বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উপর্যুক্ত কবিতাত্রয়ের গুরুত্ব বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমধিক। ইহা তাঁহাদের কিশোর বয়সের রচনা। সর্বোপরি, ইঁহাদের পশ্চাৎপট হিসাবে রহিয়াছে তৎকালীন সাহিত্যের ভাবাকাশ। মঙ্গল-নাট-গীত-পাঁচালী গানের যুগ তখনো আসর গুটাইয়া যায় নাই, অন্য দিকে চলিতেছে য়ুরোপীয় আদর্শের আবেগস্নাত নব্যবঙ্গের নব-জীবনের সূচনাকালীন সমারোহ। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে আনন্দ-বেদনার আবেগ-স্ফুরিত যুগজীবনে বাঙালী-চিত্ত কখনো বা পুরাতনের অনুকারী আবার কখনো বা নূতনের আহ্বায়ক। সেই যুগে, এই দ্বৈত-সত্তার আবেগচঞ্চল প্রতিরূপটি যাহার মধ্যে সহজেই ধরা পড়ে, তিনিই গুপ্তকবি। গুপ্তকবি পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন, তাহার অনুকারী হইয়াছেন, অন্য দিকে নূতন যুগের পদধ্বনিকে স্বাগত জানাইয়াছেন। উনিশ শতকের চারণকবি ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্ত ও তৎকালীন কাব্যপাঠকমণ্ডলের সাহিত্য-চেতনার ক্ষেত্রে এবং রচনার ক্ষেত্রে, এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের রূপটি যে একেবারে নাই এমন কথা

বলা চলে না। দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধির সহায়ক। 'সুধীরঞ্জন'-খ্যাত দ্বারকানাথের কবিখ্যাতিও উনিশ শতকে বড় অল্প নয়। কিন্তু পুরাতনের অনুকারিতা ইঁহাদের সাহিত্য-জীবনে যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভারতচন্দ্রকে পুরোভাগে রাখিয়া পাঁচালীকার-কবিওয়ালা এবং আখ্যায়িকা কাব্যের রচকগণের যে মিছিল বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অব্যাহতগতিতে চলিয়াছিল, তাহারই সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছেন দীনবন্ধু দ্বারকানাথ বঙ্কিমচন্দ্র। মাঝখানে রহিয়াছে গুপ্তকবির হৃদয় দেশ এবং তাঁহার জাগ্রত চৈতন্য। সেইজন্য, বাংলা সাহিত্যে গুপ্তকবিকে কেন্দ্র করিয়া যে কবি-সমাজের উপস্থিতি ঘটিয়াছিল, তাঁহারা 'কামিনীকুমার', 'চন্দ্রকান্ত' কিংবা 'জীবন-তারা' কাব্যের রচক হইয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা হইয়াছিলেন নবজীবনের তথা নবযুগের সার্থক পথিকৃৎ।

এই দিক দিয়া দ্বারকানাথের চাতুর্য বিশেষ লক্ষ্যণীয়। ধর্মের প্রতি সত্যের প্রতি সকলেই শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধার চাপে কাব্যত্ব হারাইয়া গেলেও কেহ দৃকপাত মাত্র করিবে না। ঐতিহাসিক 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের' সূচনা ইহার জন্যই। দীনবন্ধু-দ্বারকানাথ-বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশ হইলে পর ৬ই চৈত্রের সংবাদপ্রভাকরে সম্পাদক নিম্নোক্ত নিবেদনটি প্রকাশ করেন।

'হিন্দু ও কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্রের রচনা পূর্বে প্রকাশ হইয়াছে, অদ্য হুগলী কালেজের ছাত্রের লেখা সর্বসাধারণের দৃষ্টি পথে অর্পণ করিলাম, আমারদিগের সহযোগিগণ এবং পাঠক মহাশয়েরা যথাযোগ্য মনোযোগপূর্বক পাঠকরত আপনাপন স্বরুপাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কবিভ্রাতাদিগের কবিত্ব ও রচনা ঘটিত পরিশ্রম এবং গুণের পারিতোষিক প্রদান করুন। আমরা এ বিষয়ে অগ্রে কোন কথা উল্লেখ করিব না, তাহা পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এবং এইক্ষণেও করিতেছি; বিদ্যানুরাগি দেশহিতার্থি বিজ্ঞজনেরা যদ্রূপ অভিমত ব্যক্ত করিবেন আমরা তদনুসারে আনন্দপ্রকাশ করিব।'

এই নিবেদন প্রকাশিত হইবার পর ২৫শে চৈত্র ১২৫৯ সালের সংবাদপ্রভাকর পত্রিকায় 'প্রবাসী প্রভাকর পাঠকের' একটি পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার পর ৩০শে চৈত্রের পত্রিকায় প্রভাকরের অন্যতম কবি বিশ্বম্ভর দাস বসু মহাশয়ের অপর একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বসু মহাশয়ের পত্রের শেষভাগ হইতে এই তিনজন কবির খ্যাতির সীমারেখা সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা চলে।

'কৃষ্ণনগর কালেজস্থ ছাত্র শ্রীদ্বারকানাথ অধিকারী বিরচিত পদ্য পদ্য পারিপুরিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হর্ষসাগরে মগ্ন হইলাম। তিনি আপনার অসাধারণ কবিতাশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ও অতি সরল ভাষায় আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহা একবার মনোযোগপূর্বক পাঠ করিয়াছেন, তিনি মরণকাল পর্যন্তও তাহা বিস্মরণ হইতে পারিবেন না; অধিকারী মহাশয়ের কবিতা তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে মুদ্রাক্ষরের ন্যায় চিরকাল মুদ্রাঙ্কিত থাকিবেক তাহার সন্দেহ নাই, আর অধিকারী মহাশয় যে সম্পূর্ণরূপে কবিতাশক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাহা তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া ক্ষণকাল বিবেচনা করিলে অবধারিত হইতে পারে, কারণ তিনি অতি সুন্দর কৌশলে ও সহজ ভাষায় স্বদেশের দুরবস্থা স্বজাতিদিগের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে সর্বমতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।'

এই মতামত প্রকাশের পর এই প্রসঙ্গে সম্পাদকের পৃথক কোন মতামত প্রকাশিত হইতে দেখি নাই। স্বদেশ এবং স্বজাতির দুরবস্থার প্রতি এবং পরিত্রাণের পথ-নির্দেশ করিয়াছেন দ্বারকানাথ। এই নির্দেশনার ভিত্তিতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইল। যথার্থভাবে দেখিলে কবিতা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা উচ্চমানের হইয়াছিল। যাহা হউক, এই প্রতিযোগিতায় একই কবির শিষ্যত্রয়ের মধ্যে বাদানুবাদের স্পৃহা দেখা গেল। ইহাই হইল 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের' সূচনা-পর্ব।

॥ ২ ॥

প্রকৃতপক্ষে কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের আরম্ভ ঘটিল সংবাদ প্রভাকরের ২৬শে বৈশাখ ১২৬০ সালের সংখ্যায় প্রকাশিত দ্বারকানাথ রচিত 'অদ্ভুত স্বপ্ন' কবিতা হইতে। কবিতার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—'আমি এক দিবস কোন বিখ্যাত নব্য কবিদ্বয়ের বিরচিত কাব্যের অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষতা নির্বাচন করিতে অভিলাষী হইয়া তাঁহারদিগের প্রণীত দুইটি প্রবন্ধ সাদরে লইয়া পাঠ করিতেছিলাম, কিন্তু কে কোন্ বিষয়ে উত্তম কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবিলম্বেই নিদ্রাদেবীর আশ্রয় লইলাম। কিয়ৎকাল পরে স্বপ্ননাম্নী এক সুরূপসী নারী আমাকে মোহিত করিয়া তাহার সঙ্গে লইয়া চলিল। আমি বহুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হওত একটা সরোবরের সমীপস্থ কতকগুলীন বেণাবনের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া নানারূপে চিন্তা করিতেছিলাম, ইত্যবসরে এক অদ্ভুত ব্যাপার আমার নয়নগোচর হইল।' এই 'অদ্ভুত ব্যাপারটি' যে সেকালের সাহিত্যের দরবারে নিতান্তই 'অদ্ভুত' এবং আকস্মিক হইয়াছিল, তাহা পরবর্তীকালে দ্বারকানাথ নিজেও স্বীকার করিয়াছিলেন। যে দুই কবির কবিতা তিনি পাঠ করিতেছিলেন সেই কবিদ্বয় যে দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কবিতার আখ্যানভাগে তাহা বড় প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। ছদ্মবেশী সরস্বতীদেবীর সহিত এক সরসীকূলে মিত্রকবি ও বঙ্কিমকবির সাক্ষাৎকার ঘটিল। কবিদ্বয়ের বচনে-ব্যবহারে আদিরসের মাত্রাধিক্য ঘটিল। দেবী যখন শেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কহ কহ কবিগণ, কিসের কারণ।
কখন শীতল কভু, উষ্ণ সমীরণ॥
প্রথম কবির উত্তর।
শশিমুখি তব বুকে, কুচ হিমালয়।
পরশিলে পবন, শীতল অতি হয়॥
যখন তোমার বুকে, নাহি পায় স্থান।
প্রকোপে পবন হয়, অনল সমান॥

এইরূপ উত্তরে দেবীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়—

ছল বুঝে উভয়ের মানসিক গতি।
নিজরূপ ধরিলেন, দেবী সরস্বতী॥
দেখিয়া মায়ের মূর্তি, লজ্জিত উভয়ে।
দেবীর চরণ পদ্ম, ধরিলেন ভয়ে॥
তাদের বিনয়ে দেবী, হরিষ অন্তরে।
উপদেশ করি শেষে, দেন এই বর॥
আদি কবি আদি রসে, অদ্বিতীয় হবে।
সত্যে তোমার জ্ঞান, বঙ্কিমেতে হবে॥
দ্বিতীয় সরল জ্ঞান, করি ব্যবহার।
নিজগুণে হইবেন, মিত্র সবাকার॥
এত বলি বাগ্দেবী, গেলেন ভবনে।
অভিমান পরবশে, কাঁদিলাম মনে॥
বর পেয়ে উভয়ের, পূর্ণ হলো আশ।
আমার কপালে মাত্র, বেণাবনে বাস॥

দ্বারকানাথ যে বিবাদের সূত্রপাত করিলেন তাহাতে সংবাদ প্রভাকরকে কেন্দ্র করিয়া সেকালের সাহিত্য-সমাজে প্রবল আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সঞ্চার হইল। দীনবন্ধুও এই 'অদ্ভুত স্বপ্নে'র উত্তর দিলেন ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২৬০ সালের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত 'সত্যের মহিমায় পাপের পরাজয় এবং 'কবিত্ব পরিমাণের দোষ' কবিতায়। এই কবিতার প্রথমাংশে সত্যের জয় ঘোষণা করিয়াছেন।—

'কোথায় লুকেছ তুমি, সত্য পরাজয়।
পাপে কি কখন হয়, মনো সুখোদয়॥
ধরায় পাপেতে হয়, সম্পদ নির্বাণ।
'যথাধর্ম তথা জয়' বিধির বিধান॥'

কবির মনোগত অভিপ্রায় যথার্থভাবে এই কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। কাহারো প্রতি তিনি দোষারোপ করেন নাই, কাহারো রচনার প্রতি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কটূক্তি করেন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া দ্বারকানাথের আক্রমণ নীরবে সহ্য করেন নাই। যাহার রচনা সত্য-সুন্দরের স্পর্শলাভ করিবে, তাহার স্থায়িত্ব অমোঘ এবং অবশ্যম্ভাবী।

তাই বলি ওরে বাপু, নব কবিবর।
পাপের ক্ষমতা নাই, সত্যের উপর॥

* * *

স্বপনের বিবরণ, শুনিয়াছি সার।
দিও না দেবের দুষ্ট, নয়নেতে আর॥
নিজ আভা নিজগুণে, নাহোলে প্রবল।
পর আভা ঢাকা দিলে, কি হইবে বল॥

* * *

ব্যানা বনে বাস তব, বুনো কবি নাম।
বিলাতী তালের গাছ, ভাব দেখে থাম॥
আঁখি মুদে ভাব গিয়ে, আপনার স্থানে।
কেন চেয়ে কানা হও, বিভাকর পানে॥

সংযত ভাষায় দীনবন্ধুর বিশ্লেষণাত্মক এই প্রত্যুত্তর নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। দীনবন্ধুর মৃদু ভর্ৎসনায় বিশেষ ফল দর্শাইল না। ১১ই শ্রাবণ ১২৬০ সালের সংবাদ প্রভাকরে দ্বারকানাথ রচিত 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের' দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত হইল। সরস্বতী পুনর্বার পূর্বোক্ত সরসী-কূলে আসিয়াছেন, তাঁহার প্রিয় পুত্রের সহিত দর্শন কামনায়। কল্পনাদেবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল। দেবী তাঁহার প্রিয় পুত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিলেন,

সুভাব তাহার বেশ, মনে পরিপূর্ণ দ্বেষ,
শহরের মিত্র কবি নাম।
শুনিয়া কল্পনা সতী, চলিলেন শীঘ্র গতি,
দেবী পদে করিয়া প্রণাম॥

* * *

প্রখর রবির করে শ্রান্তা হোয়ে অতি।
এক সরসীর কূলে বসিলেন সতী॥
সেইকালে বুনো কবি, দিল দরশন।
ক্ষণকাল দুইজনে, হয় আলাপন॥
সুধান্, না পেয়ে দেবী, সরস উত্তর।
জান জান কোথা আছে মিত্র কবিবর॥
বুনো কবি বলে তাহা জানিব কেমনে।
থাকেন সহরে তিনি, আমি থাকি বনে॥
তবে একমাত্র জানি, বলি তব কাছে।
কমলিনী কামিনীর, ঘরে বুঝি আছে॥
শুনি শুনো যাবে গিয়ে, কামিনী আগার।
দেবীর কথিত কথা, কন বার বার॥
তথা ছিল কবিবর, তাহে ক্রোধী হোয়ে।
কল্পনা দেবীরে কন, নানা কটু কোয়ে॥
তুই বেটী কম কভু নোস্।
দাঁড়া তো দাঁড়া তো মাগী, যে কথায় আমি রাগি
সেই কথা মোর কাছে বার বার কোস্॥
এখনি পাইবি তুই টের।
কার জোরে কর জোর, নাসিকা কাটিব তোর
দেখিতেছি কপালে ঘটিল, ঘোর ফের!
ফের ফের ফের॥

এইরূপ আচরণে কল্পনাদেবী আপনার পরিচয় দিয়া মিত্র কবিকে দেবী সরস্বতীর নিকট লইয়া গেলেন। দেবীর নিকট আসিয়া মিত্রকবি আপনার মনের বিচিত্র ব্যথার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। অভিমান এবং বেদনায় প্রাণের কথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। দ্বারকানাথের কবিখ্যাতি শতাব্দী অতিক্রম করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু শক্তিমত্তার কিছু স্পর্শ তাঁহার বিভিন্ন কবিতায় উজ্জ্বল হইয়া আছে। বর্তমান প্রবন্ধে দ্বারকানাথের রচিত উদ্ধৃতিগুলির উদ্দেশ্য পৃথক, শুধু তাই নয় সামগ্রিকভাবেও এগুলির রচনাকালীন উদ্দেশ্য সন্দেহাতীত-ভাবে পৃথক। [illegible] আমাদের বিদ্রূপ করে, কিন্তু তাই বলিয়া পৃথক [illegible] আমাদের নিকট কম নয়। [illegible] অপরাধপর [illegible] [illegible] নিষ্কলঙ্ক হয় নাই তাহা নহে, এমন কি সেক্ষেত্রে শালীনতার গণ্ডিও হয় ত অতি-ক্রম করা হইয়াছে, তথাপি সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র বিষয়টি বিচার করিলে তাঁহার সাহিত্যবোধের উপর আস্থা হারাই-বার কোন প্রশ্নই উঠে না। পূর্বোক্ত কাহিনীর উপস্থাপনায় দ্বারকানাথের ব্যঙ্গচিত্র যথার্থই উপভোগ্য।

কবিমিত্র বলে আর, কহিয়া কি করি।
ইচ্ছা হয় জননী গো বিষ খেয়ে মরি॥
বুনোকবি নাম ধরে, বেনা বনে বাস।
আমার কবিতারয়ে, করে উপহাস॥
ভাষাকে সরল বলে, না জানি কি ভাবে।
একবার না ভাবিল, সুকোমল ভাবে॥
রাগ উপস্থিত মম, তাহার বচনে।
রেখেছে দিয়েছি দোষ, তাহার স্বপনে॥
পণ করিয়াছি মাগো, মনে করি ক্রোধ।
অবশ্য তাহারে আমি, দিব প্রতিশোধ॥
যতদিন পালিতে না, পারি অঙ্গীকার।
মানব সমাজে মুখ, দেখাব না আর॥
বিষম বেদনা মম, যাহা ছিল মনে।
নিবেদন করিলাম, তোমার চরণে॥
ইহার বিহিত যদি, না কর জননী।
জীবন জীবন মধ্যে, ত্যজিব এখনি॥

* * *

ওগো মাতা কি বলিব, মাথা গেছে কাটা।
এখন বুথায় আর আটা দিয়ে আটা॥
ভাব না ভাবিয়ে দেখে, বলে অহঙ্কারে।
নির্বোধ, মিত্র হবে, ভাষা ব্যবহারে॥

প্রিয় পুত্রের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া দেবী সরস্বতী পুত্রকে অশেষ প্রকারে প্রবোধ দিলেন। বুনো কবিকে ভয়ের কিছুই নাই। 'বারণ করিয়া তারে, দিব হে কুমার। বেণা-বনে মুক্তা সেই ছড়াবে না আর॥' ইহাই একমাত্র আশ্বাসবাক্য নয়, দেবী তাঁহাকে অপরাজিত হইবার বর প্রদান করিয়া গেলেন।

গ্রাম্য কবিগণে আর, নাহি তব ভয়।
আমার বরেতে সবে, হবে পরাজয়॥
লেখনী তোমার অতি, লিখিবে জলদ।
কবির মাঝারে তুমি, হইবে বলদ॥*
শহরের কবিবর, পাইয়া দেবীর বর,
হোলেন গ্রামের পঞ্চানন।
না বুঝিয়া অনুরাগে, আছেন বিষম রাগে,
পাগল হোয়েছে তার মন॥

ইহার পর কবি দ্বারকানাথ বিদায়কালীন বিনীত নিবেদন উপস্থাপিত করিয়াছেন।

বেলা নাই, আর ভাই, নিজ বাসে যাব।
মিলন উপায় গিয়া, আমি করি ভাব॥
মিত্র মিত্র পরিহরি, আপনার রোষ।
অনুগুণে ক্ষমহ এই পাগলের দোষ॥
ভেব না ভেব না কিছু, মুখে যাহা কোই।
প্রণয়ের পাশে যেন, মনে বাঁধা রোই॥
শিবিরে নমস্কার, লইয়া বিদায়।
চলিলাম গৃহে আজ, then Goodby,

দ্বারকানাথ সাময়িকভাবে বিদায় লইয়া চলিলেন বটে ;কিন্তু দীনবন্ধুরে 'প্রণয় পাশ' অধিকদূর বিস্তৃত হয় নাই। ২৬শে শ্রাবণের সংবাদপ্রভাকরে (১২৬০ সাল) দীনবন্ধুর 'চোকে আঙ্গুলে দিয়া বুঝাইয়ে দিই' রচনাটি প্রকাশিত হইল। রচনার ভাববস্তু খুবই পরিষ্কার। হিংসারূপ বিমাতার কবলে থাকার জন্যই দ্বারকানাথের মনে এই বৈরী ভাব জাগিয়াছে। বুনোকবি নিজেই নিজের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন।

[দ্বেষের প্রতি]

কেমন কেমন লাগে, এ কথা আমায়।
করিনি সুধেড়ি আমি, তোমার কথায়॥
তিন পত্র তিন জনে, লিখিনু যতনে।
প্রভাকর পাঠাইল, তাহা সাধারণে॥
সাধারণ অভিপ্রায়, শুনিতে সকলে।
কাণ বাড়াইয়ে আছে, পাঠকের দলে॥
কবিতা সবিতা রবি, তিনিও নীরবে।
কোন্ ভাবে কোন্ কবি, সাধারণে লবে॥
মাঝে পোড়ে আমি কেন, তুলিলাম মাতা।
মাতা হোয়ে মোর মাথা, খেলে ওগো মাতা॥

অবশেষে হিংসার সহিত বুনোকবির মনান্তর ঘটিল। পরিহাস নামক বয়স্যের সহিত বুনোকবির কথোপকথন বড়ই উপভোগ্য।

বুনো কবি
পরিহাস, পরিহাস, কেন কর ভাই।
কি বলিতে, কি বলেছি, ভাবিয়ে না পাই॥

পরিহাস
বেশ বেশ ও কথায়, কাজ নাই আর।
কি ভাবে বলদ তুমি, কর ব্যবহার॥
বলদেতে সেই অর্থ, সকলে লয়েছে।
যাতে লোক অধিকারী, বাচুর হয়েছে॥
এ অর্থে বলদ তুমি যদি লিখে থাক।
বৃথা কেন শাক দিয়ে, আর মাচ ঢাক॥
তব ষেষ স্পষ্ট হবে, হইবে প্রকাশ।
যা কিছু তোমার আছে, গোপন আভাষ॥

বুনো কবি
No, No, ভাই, আমি নই, এমন অসার।
এ অর্থে, বলদ, আমি, করিব ব্যাভার॥
যার বলে হয় লোক, গোরু অধিকারী।
আমি কি সে অর্থে কভু, লক্ষে দিতে পারি॥
বলদ অর্থেতে হয়, যেই দেয় বল।
জলদে যেমন অর্থ, যেই দেয় জল॥
পাছে লোক ভাবে, আমি বলদ বলেছি।
নোট কোরে সার অর্থ, নীচেতে লিখেছি॥

পরিহাসের মাঝ দিয়া আবহাওয়া লঘু হইয়া উঠিয়াছে। আলোচনা-চক্রে চট্টোকবিও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সরলতায় সকলের মন পূর্ণ। মিত্রকবিও তাই মিলনের কথা কবিতার শেষাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

বিবাদ বাড়বানলে, ঢালিয়ে সলিল।
সরলে সরলে হলো, সুখের সুমিল॥
সম্ভাষণ আলাপন, করে তিন জন।
সুখের সাগরে ভাসে, সকলের মন॥

অতঃপর ভাবিয়া লওয়া চলে যে, কবিতাযুদ্ধের এইখানেই বোধকরি বিরতি ঘটিল। কিন্তু ইহা যে সাময়িক বিরতি তাহা প্রমাণিত হইল মাসাধিককাল পরে ১২ই আশ্বিন ১২৬০ সালের সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিচিত্র

* [illegible]

নাটক' কবিতায়। এই কবিতাযুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র একবারই অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিতা রচনার কৈফিয়ৎ হিসাবে পাঠকসাধারণের নিকট তিনি একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন।

শুনিতে পাই প্রভাকরে নাকি দুটো বীর আসিয়া বড় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে? একটা নাকি আবার আশে পাশে কামড় মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, বেশ আমিও একবার এই সময় সাহেবদের সেলাম ঠুকিয়া যাই, কিন্তু নিজে বীর নহি, যুদ্ধ করিব না, চড়চাপড়টা মারামারিই ভাল।"

বঙ্কিমচন্দ্র, কবিতাযুদ্ধের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রধান যোদ্ধা বলিয়া নির্দেশ না করিলেও তাঁহার রচনার গুণে তাঁহাকে একমাত্র যোদ্ধা বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। সে প্রবল বিক্রমে বিপক্ষের প্রতি অজস্রধারায় অশালীন শর নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে সমভাবে বিস্মিত এবং বাধিত না হইয়া উপায় নাই। দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথকে ছাপাইয়া তাঁহার কবিতার বিচিত্রগামিতায় (যাহা শুধু অশালীনতার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ) আমরা বিমূঢ় হইয়া পড়ি। বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের এবং বাঙালী জাতির অনেক উপকার করিয়াছেন তাই শ্রদ্ধার সিংহাসনে তাঁহার স্থান অটুট কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সংযত হাস্যরসের প্রবর্তক হিসাবে তাঁহাকে সম্মানিত না করিলেই বোধকরি অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে। বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ সংযত হাস্যরসের প্রবর্তক বঙ্কিম নহেন, তাঁহার পূর্ববর্তী এবং বাংলাদেশের মানবতার চিরকালীন প্রতিনিধি—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সে যাহাই হউক, 'বিচিত্র নাটকে'র কবি বঙ্কিমের কাব্য পরিচয় অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ।

কবিদের মজলিশ বসিয়াছে। বিদ্যা এবং অবিদ্যার নৃত্য হইবে। বিদ্যার নৃত্যভঙ্গিমার বর্ণনায় কবি মুখর হইয়া পড়িয়াছেন।

নাচে শশিমুখী, গজেন্দ্র গতি।
কল্পনা কবিত্ব, লাবণ্যবতী॥
কোমল কুসুম, কলিকা প্রায়।
অলঙ্কারভূষণ, অলঙ্কারে॥
নিবিড় নিতম্ব, যৌবনভার।
হাবভাব লেখা, নব প্রকার॥ ইত্যাদি

অবিদ্যার বর্ণনায় তাঁহার বিতৃষ্ণা এবং ঘৃণা এবং রূপ লাভ করিয়াছে।

আইল অবিদ্যা তবে, দুলায়ে বাঁপে বুক।
ঠেঙ্গা মাগী পেটে মোটা, হাঁড়িপানা মুখ॥
বরণে হাঁড়ীর তলা কলঙ্কেতে যায়।
দীর্ঘকুচ দীর্ঘ দাঁত, দাঁতে পান খায়॥
বসন মলিন অতি, পচা গন্ধ গায়।
তিনি ফের নাচিবেন, নমস্কার পায়॥
ধুপ্ ধপ্ কোরে নাচে, মেঝে করে চুর।
পাইকের লাফান যেন, ব্যাঙ বাহাদুর॥

কবিগণ হেসে মরে, বলে একি পাপ।
পলাতে পারিলে বাঁচি, বাপ্ বাপ্ বাপ্॥

কবিদের মজলিশে নৃত্যের পর সঙ্গীতের আয়োজন করা হইয়াছে। কুবিদ্যার প্রতি কবিগণ অনুরোধ করিলেন তাহার পুত্রকে গান করাইবার জন্য।

কবিগণ।

যা হোক ডাক তারে, শুনিব গো গান।
ছেলের মুখের গতি, অমৃত সমান॥

কুবিদ্যার ছেলে ডাকা।

আয় যাদু, আয় যাদু, আয় ঝপ কোরে।
মহাগুণী কবি যত, ডাকিতেছে তোরে॥
শুনি তে ডাকিছে তোরে পাবিরে খাবার।
আয় আয় আয় বাবা, যাদুরে আমার॥
পাইবে সন্তোষ মনে, খাবে যাহা দিবে।
এতেক বিমল মুখে মিষ্টান্ন খাইবে॥*
আয় আয় ধনমণি, মুখ রাখ্ মার।
আমার হোস্ গো তুই, সর্বধন সার॥

ছেলে আসিতে আসিতে বলিতেছে,

মাকো তোর চরণেতে, ঢাক্ দিলি কান।
খাতে নারলাম মাগো, হাঁ——
মিহ কবি
——————Walkup man

কবীশ্বর।

বও রে কি নাম তোর, বাস্ কি নগর।

ছেলে।

নাম বলো অধিকারী, জেলাবলে ঘর॥

মিত্রকবি।

মাপ করে রাখ বাপু, দুটো চিনি দেরে।
বলু দেখি কিসে আছে, উপকার তোর॥

বড়ো।

চাহিলেতে ওরা বটে, ছোঁয়াতে বা কেড়ে।
কাটের গোড়াগুলো, ছেকাইয়া দেড়ে॥

চট্টু।

বল দেখি সদা কেন খাবার কেড়ে।
মহাবাধি হোয়েছে কি, ফোলা পেটে ভাত॥

বড়ো।

বাঁচি বা এভাবে, পাবে কোনো চিকাইতে।
কি কাওয়াবে দিবাং, কাবে লাগাইতে॥*

মিত্র।

চট্টু এর ছানা এ যে, দেখো ফোলা পায়।
অনুরাগ কোরে বল, তবে দেখা যায়॥†

কুবিদ্যা।

ডোবা হোলে কেন বাছা, কথা কও বড়।
মিছে কেন খাটো হও, জোরে হও দড়॥
দাঁড়ায়ে কি কর, গাঁজা, দেও যথোচিত।
না হয় গানেতে বর, সবারে মোহিত॥

আর সঙ্গীতের বিবরণে প্রয়োজন নাই। দীর্ঘ কবিতাখানি দ্বারকানাথের প্রতি যে ভাবে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, তাহার তুলনা গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'রসরাজ'কে বাদ দিলে আর কোথাও পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশের পর দ্বারকানাথ মিলন প্রত্যাশী হইয়া দীর্ঘ এক কবিতা রচনা করেন। ইহার উত্তরে দীনবন্ধু বিস্তর ভৎর্সনা করিয়া অবশেষে জানাইলেন—"তাঁহার সদুপদেশ অবলম্বন করিলাম, কারণ তাঁহার মন্দ কথায় রাগান্ধ হইয়া যদ্যপি না শুনি, তবে Shakespeare আমাকে বলিবেন—
"You are one of those, that will not serve God, if the devil bid you."

কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের যথার্থ পরিসমাপ্তি ঘটিল সংবাদ প্রভাকরের ১২৬০ সালের ১৯শে মাঘ সংখ্যায় 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের সন্ধিপত্র' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে। দ্বারকানাথ অধিকারী এই সন্ধিপত্রের রচক। "আমি রাগান্ধ হইয়া প্রথমতঃ পবিত্র মিত্রদ্বয়ের সহিত বাক্‌বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি, এই দুর্গিত বিবাদের সূত্রপাত আমা হইতেই হয়, এজন্য আমি ইহাতে সম্পূর্ণ দোষী হইয়া স্বীকার করিয়া উক্ত কবি ভ্রাতৃদ্বয়ের বিশেষতঃ মিত্রদ্বয়ের নিকট মার্জনা প্রার্থনা করিতেছি।... আমাদিগের হুগলী কালেজীয় সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অপরাধী নহি, তিনি স্বীয় কল্পিত দোষে আপনাকে কলঙ্কিত বোধ করিয়া মধ্যে একবার হানা দিয়া নানারূপ কটু কহিয়া গিয়াছেন। প্রথমে বোধ ছিল বঙ্কিমবাবু যুদ্ধবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী নন, কিন্তু সে দিবসের বিক্রম দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশারদ বলিয়াছেন। এদেশে অনেকেই কহিয়া থাকেন, "যে গরুটা দুধ দেয়, সে চাট মারিলেও সহ্য হয়"। বঙ্কিমবাবু সুকবি, বিশেষ সুবোধ, তাঁহার কথায় রাগ করিবার বিষয় কি?... আমরা কবিতাবিষয়ে তিনজনে একজনের শিষ্য, ইহাতে পরস্পরের কলহ করা কোনক্রমেই উচিত নহে, বরং অন্য কাহারো সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনজনেই ঐক্য হইয়া নিরাকরণ করা কর্তব্য। যাহা হউক, আমি আপনাদিগের মিত্রতা লাভের নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইয়া এই সন্ধিপত্র প্রেরণ করিতেছি, মহাশয়েরা কৃপা বিতরণপূর্বক এ দীন অপরাধীর দোষ সকল মার্জনা করত প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইয়া পরমবাধিত করিবেন, সুকবি মহোদয়েরা দুর্গন্ধ পঙ্ক পরিহারপূর্বক তজ্জনিত পঙ্কজ লইয়াই আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকেন, আপনারা উভয়েই সুকবি, অতএব মল্লিখিত পঙ্কস্বরূপ দুর্গন্ধ দোষ সকল পরিহারপূর্বক অবশ্যই সদুপদেশরূপ সরোরুহ গ্রহণ করিবেন।" এইখানেই কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

---

* এতেক বিমল মুখে মিষ্ট দেখাইবে॥
* অর্থাৎ দুর্জনেরা এটাকে পাড়িয়া ধরিয়া চিনি কয়াইছে, কিম্বা কাকুকে দই ভাত খাওয়াইয়া হাগাইছে।
(সংবাদ প্রভাকর হইতে)
† তাই কবি (সং প্রঃ হইতে)

—সৌমিক—

সুরের আসরে অসুর

কথায় বলে সংগীতের যে রসিক নয়, তার পক্ষে ধনী হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সংগীত সম্মেলন সংগীতের আসরকে এমন ধাপে নামিয়ে দিয়েছে যে, এখনকার সংগীতের পৃষ্ঠপোষক কথা বলতেই পিস্তল উঁচিয়ে ধরেন! এবারের সদারঙ্গ সম্মেলনের অধিবেশনকালেই এমনি একটা ঘটনা দেখা গেল। বসবার আসন নিয়ে বিতর্ক হতেই সম্মেলনের কার্যনির্বাহকমণ্ডলীর একজন সভ্য একেবারে টোটাভরা পিস্তল উঁচিয়ে শাসিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত পুলিসে যায়, তবে তারপর আর কি হয়েছে জানা যায়নি। আজকালকার সম্মেলনগুলির বিবরণ-পুস্তিকায় পৃষ্ঠপোষক ও কার্যনির্বাহকমণ্ডলীর সভ্যদের তালিকায় অজস্র নাম দেখা যায়; অধিকাংশই বড়ো বড়ো ব্যবসাদারদের নাম। এদের মধ্যে অনেকেই থাকেন যাঁদের ঝোঁক সংগীতের চেয়ে সম্মেলনের ওপরেই বেশী। সত্যিই ভাল গান-বাজনা হোক, ভাল গানবাজনার প্রসার হোক এবং প্রচার হোক সেই উদ্দেশ্যেই টাকা দিয়ে পৃষ্ঠপোষক বা কার্যনির্বাহকমণ্ডলীর সভ্য হওয়া, তালিকাভুক্ত নামগুলির মধ্যে তেমন লোক কমই পাওয়া যায়। অনেক নাম দেখা যায় যারা সম্মেলন বা সংগীত কোন বিষয়েই আগ্রহশীল নয়, তবে সম্মেলনের পরিচালক ধনী ব্যবসায়ীর নাম দেখে নিজেরও নামটা ওদের সঙ্গে রাখবার জন্য চাঁদা দেন। এদের অনেকে আসেনও না কোন অধিবেশনে, আর এলেও সামান্য কিছুক্ষণের জন্য হাজিরা দিয়েই চলে যান। কটি সংগীত সম্মেলন তো পুরো-পুরিভাবেই ব্যবসাদারদের হাতে চলে গিয়েছে। অপর সম্মেলনকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে বাজার দখল করার দিকেই এদের বেশী উৎসাহ। সংগীত পরিবেশনের চেয়ে টাকার খেলা দেখিয়ে অন্যসব সম্মেলনকে ম্লান করে দিতেই যত তোড়জোড় এদের। কতোটা হলে গানবাজনা, মেজাজ ও মর্যাদা রেখে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করে যেতে পারে, তার চেয়ে গাইয়ে-বাজিয়েদের কতো নাম দিয়ে অনুষ্ঠান ছেয়ে ফেলে অরসিকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, সে ব্যাপারেই সারা উদ্যোগ নিবদ্ধ রাখা হয়। সম্মেলন তাই এখন অনেক টাকার মামলায় দাঁড়িয়েছে, আর তাই সংগীত সম্মেলন বড়বাজারের গদীর নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। এমন অসাংস্কৃতিক ব্যাপার হতে থাকলে যা হয়, শিল্পীরাও তাই [illegible] যাচ্ছে। মেজাজ তাঁদের অনেকেরই এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, কোন সমালোচনাই তাঁরা বরদাস্ত করতে চান না। একজন [illegible] সমালোচককে [illegible] কাছে অপমানিত [illegible]। ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সংগীত সম্মেলন বলতে যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ক্রমশই, আর শিল্পীদেরও যা মেজাজ দেখা দিতে আরম্ভ করেছে! দু' একটি ছাড়া, যেমন কলিকাতা (এন্টালি) সংগীত সম্মেলন প্রমুখ কয়েকটি ছাড়া, প্রকৃত সাংস্কৃতিক পরিবেশই থাকে না কোনটিতে; অনেকে ঠিকমতো অনুষ্ঠান-সূচীও সাজাতে পারে না। সংগীতে যেটুকু ন্যূনতম রুচি (জ্ঞানের কথা তো আলাদা) থাকলে একটা সুষ্ঠু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারে, সেই রুচিটুকুরও অভাব দেখা দিচ্ছে। অবস্থা এমনি হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, সংগীতের প্রকৃত রসিকজন সংগীত সম্মেলনগুলির সার্থকতা বিষয়ে ভাবতে আরম্ভ করেছেন। সম্মেলনগুলি যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা ভাবিয়ে তোলারই কথা।
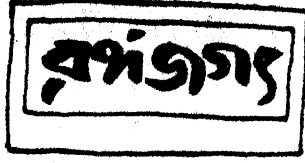
কলকাতায় চীনা চলচ্চিত্র উৎসব

চীনের অষ্টম বার্ষিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত চীনা ছবির একটি পক্ষকাল-ব্যাপী উৎসব কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। চীনা ছবির এমন ব্যাপক প্রদর্শনী কলকাতায় আর হয়নি। সেদিক থেকেও বটে, তাছাড়া, চীনের চলচ্চিত্রশিল্পের প্রগতি লক্ষ্য করার এমন একটি সুযোগ লাভ করার দিক থেকেও এদেশের চলচ্চিত্রামোদীর কাছে উৎসবটির একটা গুরুত্ব ছিল। ২৯শে সেপ্টেম্বর সকালে চিত্রায় উৎসবটির উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ আইন পরিষদের স্পীকার শংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎসবের উদ্যোক্তা ভারত-চীন মৈত্রী সংঘের পক্ষ থেকে সম্পাদক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংঘের সভাপতি শৈল-কুমার মুখোপাধ্যায় এবং কলকাতায় অবস্থিত চীনা কনসাল জেনারেল লু ছশী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। শহরের বারটি চিত্রগৃহে ছবিগুলি প্রদর্শিত হয়। ছবির মধ্যে ইদানীংকার তোলা ডকুমেন্টারি, অপেরা, রূপকথা, সামাজিক, ছোটদের ছবি ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর মিলিয়ে মোট সতেরখানি ছবি প্রদর্শিত হয়। ছবিগুলি দেখানো হয় বিনা প্রবেশমূল্যে। উদ্যোক্তারা একটা ত্রুটি করে ফেলেছেন উৎসবটি সম্পর্কে চিত্র-সমালোচকদের সময়মতো অবহিত না করিয়ে। ফলে, এমন একটা উৎসব, যা হয়নি এপর্যন্ত, তাতে প্রদর্শিত ছবিগুলি দেখা সম্ভব হতে পারেনি। ছবিগুলি নিয়ে তাই বিশদ আলোচনাও হতে পারলো না, অথচ সেটার দরকার ছিল খুবই। চীন আমাদের দেশের ছবির শুধু অনুরাগীই নয়, এখন একজন ক্রেতাও, সুতরাং বিনিময়ে আমাদের দেশেও চীনা ছবির প্রচলন সম্ভব হতে পারে কিনা সেটাও বিচার করা দরকার ছিল।

চীনা চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত অন্যতম ছবি "ফেদার্ড লেটার"-এর একটি দৃশ্য

এল বি ফিল্মস ইণ্টারন্যাশনাল চিত্রিত সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মীয়মাণ "অযান্ত্রিক"এর একটি দৃশ্যে গঙ্গাপদ বসু ও এক নবাগত শিল্পী

চিত্রালোচনা

পুনশ্চ

দীর্ঘদিন বিরতির পর সুখ্যাত কথা-সাহিত্যিক এবং একদা চিত্র প্রযোজক-পরিচালক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পুনশ্চ চেনে আবার তাঁর কথার-কগড়া পাকানো টেক-নিকে দৃশ্য গেঁথে ছবি তৈরীর নিদর্শন নিয়ে আসরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ডানলাইট প্রযোজিত ভেনাস পিকচার্সের "আমি বড়ো হবো" চেহারায় ও প্রকৃতিতে, চরিত্রে ও ঘটনায়, কথায় ও ভাবে শৈলজানন্দের আগেকারই সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এক সময়ে যে বৈশিষ্ট্য "শহর থেকে দূরে" ও "মানে না মানা" বাঙলা ছবির বাজার মাতিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল—সেই আধা-পাগলাটে গোছের অপ্রকৃতিস্থ ধাঁচের চরিত্র-দের দিয়ে কথার তোড়ে ঘটনা বকে বকে যাওয়া, সেই তাদের ওপরটা এক রকম, কিন্তু অন্তরে আরেকরকমের আচরণ—এক সময়ে তা উপভোগ করা গিয়েছে, কিন্তু অনেক ছবিতেই দেখে দেখে আজ তারা বড়ো সেকেল হয়ে পড়েছে। একটা বিষয় অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, সেটা হচ্ছে কাহিনীর মানবিক আবেদনের দিকটা। অনেক আগেকার হোক, কিন্তু চরিত্রগুলির মধ্যে অকৃত্রিম মানুষকে পাওয়া যায়; ভালোয়-মন্দয় মেশানো সহজ সাধারণ সামাজিক মানুষ, নিজেদেরই কাছাকাছির কেউ বলে যাদের ধরে নিতে সংকোচ জাগে না।

* * *

"আমি বড়ো হবো" নামেতে যে বিষয়-বস্তুর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ঘটনার বিন্যাসে সেটা শেষ পর্যন্ত গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে প্রাধান্য পেয়েছে একটি ছেলেকে মানুষ করে তোলা নিয়ে তার দুই অভিভাবকের দ্বন্দ্ব। দারিদ্র্য ও বয়সে জর্জরিত দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যা ও ছলনার সাহায্যে উপার্জনের পথ ধরে চলে। কোথাও গিয়ে বলে কন্যাদায়, কোথাও বলে পুত্রের উপনয়ন, এইভাবে জায়গায় জায়গায় গিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ানো তার পেশা। ওর ঐ অবস্থা দেখে নিঃসন্তান বিধবা শ্যালিকা চিন্ময়ী বড়ো ছেলে দেবুকে নিজের কাছে রেখে পড়াশুনো করায়। পড়ার খরচ জোগাবার জন্য চিন্ময়ী তার সর্বস্ব বেচতে থাকে। বড়ো ভাই বিশু তার স্ত্রীর গঞ্জনায় চিন্ময়ীর আচরণে সচেতন হয়ে ওঠে। ছোট ভাই নিশু নির্বিকার। দেবু তখন ম্যাট্রিকের পরীক্ষার্থী, দয়াময় এক ঘটকের পাল্লায় পড়ে নগদ প্রাপ্তির লোভে দেবুর বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেলে। সে বাবদ আগাম টাকাও নিলে পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে। চিন্ময়ী তা হতে দেবে না, এই নিয়েই সৃষ্টি হ'লো দয়াময়ের সঙ্গে তার বিরোধ। দয়াময় তার পুত্রের ওপর অধিকার খাটাবার চেষ্টা করলে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় চিন্ময়ী দেবুকে নিয়ে হাজির হলো শহরে এবং বস্ত্রব্যবসায়ী চাটুজ্যে মশাইয়ের বাড়িতে পরীক্ষার ক'দিনের জন্য আশ্রয় জুটে গেল। চাটুজ্যের মতলব ছিল অন্য। পরীক্ষা শেষ হতেই সে দেবুকে নিয়ে গিয়ে দোকানের কাজে বসিয়ে দিলে। তার ইচ্ছে দেবুর হাতে একদিন দোকান এবং সেই সঙ্গে একমাত্র সন্তান কন্যা অমলাকে তুলে দেবে। কিন্তু দেবুর অভিপ্রায় পড়াশুনো করার। সেইদিনই সে চাটুজ্যে বাড়ি ছেড়ে বড়মা চিন্ময়ীকে নিয়ে উঠলো তাদের পরিচিত জামাইদার বাড়িতে। জামাইদা কিন্তু একরকম জবরদস্তী করেই দেবুকে একটা চাকরিতে বসিয়ে দিলে। ভাল মাইনে বলে দেবু চাকরিটা নিলে। দয়াময় একদিন ঘুরতে ঘুরতে হাজির জামাইদার বাসায়: কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করার জন্য ভিক্ষে। দেবুও ছিল সেখানে, দয়াময় পাছে চিনতে পারে তাই আগেই সে উঠে চলে গেল। পরে দয়াময় জামাইদার কাছ থেকে ভিক্ষে নিয়ে চলে আসার সময় দেবু তার বাবাকে ধরে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। দয়াময় জিভ কাটলো লজ্জায়। পরদিন দেবু তার বাবার হাতে টাকা দিলে তার মাকে দেবার জন্যে। বাড়ি ফিরে দয়াময় তার স্ত্রী মৃন্ময়ীকে বোঝালে তার ছেলের অতো রোজগার, অথচ সেটা ভোগ করবে চিন্ময়ী! তা হবে না, চিন্ময়ীর কাছ থেকে ছেলেকে কেড়ে আনতে হবে। মৃন্ময়ী রাজী নয়, শেষে ছেলের মরামুখের দিব্যি দিয়ে দয়াময় মৃন্ময়ীকে বাধ্য করলে ছেলেকে চিন্ময়ীর কাছ থেকে নিয়ে আসার জন্যে যেতে। রাগে ও অভিমানে চিন্ময়ী দেবুকে ছেড়ে চলে গেল, সে বাড়িতে স্ত্রী ও ছেলেদের নিয়ে সংসার পাতলে দয়াময়। যে চাকরি করে বলে তার বড়মাকে হারাতে হলো, দেবু সে-চাকরি দিলে ছেড়ে। অপরদিকে পণের টাকা আগাম নিয়ে রাখায় দেবুর বিয়ের জন্য পাত্রীপক্ষের তাগাদা। পাত্রীপক্ষ বাড়িতে রয়েছে, পাকা কথা না নিয়ে উঠবে না। দেবু রাজী নয় কিছুতেই। এই সময়ে খবর এলো দেবুর পাশ হওয়ার; একেবারে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে সে। পাত্রীপক্ষ ধৈর্য হারিয়ে দয়াময়কে যাচ্ছেতাই অপমান করে বেরিয়ে যাবার মুখেই সামনে উপস্থিত হলো চাটুজ্যে মশাই অমলাকে নিয়ে। দেবুর সাফল্যে ওরা অভিনন্দন জানাতে এসেছিল। চাটুজ্যে পাত্রীপক্ষকে টাকা ফিরিয়ে দেবার আশ্বাস দিলে। অপরদিক থেকে বিশু ও নিশু দু' ভাই হাজির; তাদের অমন ভাগ্নেকে পড়াবার সব খরচ তারা দেবে। চাটুজ্যে কিন্তু আগেই সব ঠিক করে এসেছিল। অমলাকে তুলে দিলে চিন্ময়ীর হাতে। এই আনন্দের সোরগোলের মাঝে দয়াময় নিজের কোন অংশ পেলে না। তারই ছেলে, অথচ তার যেন কিছু নয়। আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লো সে এতোদিনের তার মিথ্যা ও ছল-

ভরা জীবনের অবসান ঘটাতে। দেবুই গিয়ে তাকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করলে।

* * * *

ঝগড়া আর ঝগড়া, একটানা একঘেয়ে। কোন দুটি চরিত্র সামনাসামনি পড়লেই কথার ঝগড়া ছাড়া কিছু নেই। বিশু ঝগড়া করে নিশুর সঙ্গে, বিশুর সঙ্গে ঝগড়া করে তার স্ত্রী, চিন্ময়ী ঝগড়া করে তার দাদার সঙ্গে; ভগিনীপতির সঙ্গে; দয়াময় ঝগড়া করে মৃন্ময়ীর সঙ্গে; চাটুজ্যের সঙ্গে ঝগড়া করে তার স্ত্রী; ঘটক ঝগড়া করে দয়াময়ের সঙ্গে; ভিক্ষে চাইতে মারমুখো লোকের হাতে পড়া; জল খাটার জন্য বিশুকে তাগাদা তাই নিয়ে ঝগড়া, দেবু ও অমলারও দেখা হলেই কথার কোঁদল, এমন কি দেবুর ছোট দুটো ভাই তাদেরও ঝগড়া। মঞ্চের মতো দুটো চরিত্রকে কোথাও কোনসূত্রে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ঝগড়া আর তর্কাতর্কি বাঁধিয়ে দেওয়া; আর ঝগড়াটা অভিনয়ের জোরে জমাতে দেখে দর্শক রেখে দেওয়া। এ যেন ছবি তোলার সময়েই অভিনয়ের জোরে ঝগড়া জমাতে দেখে একজোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া। ঘটনা দেখানো নয়, ঘটনা এখানে শোনানোই শুধু। বিসদৃশ লাগবে জামাইদাদার মতো একজন পরিচিত ব্যক্তি শহরে থাকলেও তার বাড়িতে না উঠে পরীক্ষার কদিন দেবুকে নিয়ে চিন্ময়ীর অপরিচিত চাটুজ্যের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় করিয়ে নিচ্ছে। এমনি বিন্যাস যে, অমলা বাগান থেকে 'মনের রঙ্ক ঝিলে খুশীর ঢেউ' লাগার গান গাইতে গাইতে, সিঁড়ি বেয়ে ঘরে গিয়ে গেয়ে চলেছে কিন্তু তার সে গান শুনতে হাজির দেবু নয়, শোনবার জন্যে হাজির অমলার বাবার ইনসার্ট। দেবুর ঝোঁক পড়াশোনার, কাজেই তাকে চাকরিতে বসাতে গেলে মোটা মাইনের সম্পর্ক রাখতে হয়; কিন্তু তাই বলে নন-ম্যাট্রিক (তখনও পরীক্ষার ফল জানা নেই), কাজে অনভিজ্ঞ অল্পবয়সের একটি ছেলের জন্য দুশো টাকা মাইনের কাঠগোলার ম্যানেজারী ঠিক করিয়ে দেওয়া বড়ো অসংগত ব্যাপার। অমলা স্কুলে যায় আসে বাড়ির মোটরে, অথচ দেবু যেদিন ওদের বাড়ি ছাড়লো তখন ও ফিরছিলো পায়ে হেঁটে! ঠিক মঞ্চের মতো করে দৃশ্য সাজানো, কথার তোড়ে ঘটনা সৃষ্টি করে যাওয়া। তাই চাটুজ্যে দেবুকে দেখামাত্রই দোকানের কাজে তৎক্ষণাৎ বসিয়ে দেয়; এক কথায় বিশু নিশুর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে, আবার হঠাৎ নিশুর গান শুনে বিনা বাক্যব্যয়েই গলায় গলায় হয়ে ওঠে। মঞ্চের পরিকল্পনায় সাজানো বলেই দেখা যায় পরীক্ষার খবর দেবু আর মৃন্ময়ীকে শোনাবার সুযোগ [illegible] পাত্রীপক্ষ [illegible] থাকার সময় চাটুজ্যের [illegible] জামাইদাকে নিয়ে অমলার [illegible] বিশু ও নিশুর

গণচিত্রমের "প্রবেশ নিষেধ" চিত্রে মিত্রা চট্টোপাধ্যায় ও নবাগত কুশল চৌধুরী

হাজির হওয়া, অতো সোরগোল সবই ঘটলো খোলা রাস্তার ওপরেই।

* * *

ছবিখানিতে মস্ত গুণের পরিচয় রয়েছে অভিনয়ের মধ্যে, যার বারো আনা কৃতিত্বের অধিকারী দয়াময়ের চরিত্রে একা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও মঞ্চঘেঁষা অভিনয় এবং 'আরোগ্য নিকেতন'এর শশি কম্পাউন্ডারকেই যেন আরো অনেকখানি করে উপস্থিত করা, কিন্তু তবুও একটি অনন্যসাধারণ চরিত্র-সৃষ্টি। আর মনে গেঁথে রাখার মতোও চরিত্র। মাঝে মাঝে একটু বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়, যেমন মৃন্ময়ীকে চিঠি লিখতে বলে এই লেখো সেই লেখো বলে শেষে দয় ছুম্বই দয় ছুম্বই দিদি বলে যাওয়া; ওতে হাসি আসে, কিন্তু চরিত্রটির মধ্যে একটু যেন ছ্যাবলামির ছাপ পড়ে। এ ধরনের বাড়াবাড়ি পরিচালক ছেঁটে ফেলতে পারতেন; তবে হয়তো ছবি তোলার সময় অভিনয়ে অভিভূত হয়ে পড়ার দরুণই এই বাড়াবাড়ি করে যেতে দিয়েছেন। সত্যিই অভিভূত হবার মতোই অভিনয়। কন্যাদায় জানিয়ে করুণভাবে ভিক্ষাতে যেমন, আবার পুত্রকে ফিরিয়ে নেবার জন্য রাগারাগিতেও তেমন, চিন্ময়ীর নামে দেবুকে আটক করে রাখার জন্য মামলা ঠুকে সমন নিয়ে বিশুদের কাছে উপস্থিত হয়ে উল্লাস প্রকাশে যেমন, তেমনি জামাইদার কাছে ভিক্ষে করতে গিয়ে দেবুর হাতে ধরা পড়ার লজ্জা প্রকাশের অভিব্যক্তিতে নিপুণ শিল্পচাতুর্যের পরিচয় ফুটে ওঠে। আর শেষ দৃশ্যে সকলের উল্লাসের মাঝে নিজেকে নিঃস্ব বোধ করে একটা দারুণ অভিমান নিয়ে সরে চলে যাওয়ার অভিব্যক্তি ও অঙ্গভঙ্গি ভোলবার নয়। বলতে গেলে ছবিখানির মধ্যে নতুন ধরনের চরিত্রে অবতারণা এই একটিই।

থাকি সবই, কথায় তারা ঝগড়াতে রুক্ষ প্রকৃতির, কিন্তু মনের দিক থেকে সোনার মানুষ, শৈলজানন্দের আগেকার ছবিতে যেমন সেইরকমই। চিন্ময়ীর চরিত্রে শোভা সেন নিঃসন্তানা নারীর অপরের সন্তানকে নিজের করে নিয়ে তাকে মানুষের মতো মানুষ করে তোলার জন্য আকুল চেষ্টা ফুটিয়ে তুলতে, সেই ছেলেকে হারানোর তার আশঙ্কা, তাকে রাখতে না পেরে রাগ, অভিমান ও দুঃখ নিয়ে চলে যাওয়া ইত্যাদি

চরিত্রগুলি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রাণে রেখাপাত করার মতো এও একটি চরিত্র। মঞ্চের মতো বড়ো করে অভিব্যক্তি প্রকাশ আর চেঁচিয়ে বলা প্রায় সবারই অভিনয়ে। ছবির যে ধরনের বিন্যাস তাতে মনে হ'লো ঐ ধারার অভিনয়ই এখানে মানিয়েছেও, অ'র নামানোও হয়েছে সব চরিত্রেই মঞ্চেরই শিল্পীদের, যাতে চরিত্রগুলি প্রাণ লাভ করে ঐভাবেই। তাই বিশুর চরিত্রে জহর গাংগুলী যেমন, তেমনি চাটুজ্যের চরিত্রে গংগাপদ বসুকে সমান পদে উপভোগ্য। চাটুজ্যে গৃহিণীর চরিত্রে, সদাই স্বামীর প্রতি মারমুখো অথচ, স্বামীর কোন অমংগলের আশঙ্কায় হাহুতাশে ভরে ওঠা আবেগ ফুটিয়ে তোলায় সরযূবালার অভিনয়ও উপভোগ করা যায়, আবার বিশুকে গঞ্জনা দিতে তার স্ত্রীর চরিত্রে শেফালিকার (অনেক বছর পর আবির্ভূতা) অথবা মৃন্ময়ীর চরিত্রে অপর্ণার অভিনয়ও মনে করা যায়। কান্না আসে না, কাঁদবো না বলে আনন্দে অথচ কেঁদে ফেলে, এমন দিলখোলা জামাইদার

বাদল পিকচার্সের 'জীবন তৃষ্ণা'র একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন

রিত্রটিতে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তেমনি দাদা বিশুর রাগারাগিতে সম্পূর্ণ নির্বিকার নিশুর চরিত্রটিতেও গঙ্গুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কেও না লক্ষ্য করে পারা যায় না। ওদেরই মধ্যে একটু ফিকে হয়ে পড়েছে দেবু ও অমলার চরিত্রে যথাক্রমে শিতু ভাওয়াল ও হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটক চরিত্রে গৌর শী, আর তার এক মক্কেলের চরিত্রে পঞ্চানন ভট্টাচার্য, এ'রা দুজনেও জমিয়ে তোলেন। অভিনয়ে আর আছেন জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানি, বাবুয়া, শ্যামল প্রভৃতি এবং ছোট ছোট চরিত্রে হলেও দৃষ্টিতে পড়ে অভিনয়-গুণে। কলাকৌশলের কাজ মাঝামাঝি শ্রেণীর, বিভিন্ন কাজে আছেন, আলোকচিত্র গ্রহণে বিজয় ঘোষ, শব্দগ্রহণে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, সুরযোজনায় রাজেন সরকার, শিল্পনির্দেশে সুধীর খান এবং সম্পাদনায় সন্তোষ গাঙ্গুলী।

ভিন্ন আসরের উপকরণ

খোলা আসরের জন্য যে উপস্থাপন কৌশলের উদ্ভব, পর্দায় সেইটেই অবলম্বন করে গেলে আর যাই হোক; তাকে চলচ্চিত্রের সংজ্ঞায় ফেলে বিচার করা চলে না। যাত্রা, থিয়েটার, পালাগান ইত্যাদির প্রত্যেকটিরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশভঙ্গী। এদের যার যা প্রকাশভঙ্গী তা যথাযথ রেখে ক্যামেরা বসিয়ে ছবি তুললেও যাত্রাটা যাত্রাই থাকে, থিয়েটার থিয়েটারই থাকে বা পালাগান পালাগানই থাকে, পর্দায় দেখানো হলেও তাদের ছবির আধারে ফেলা যায় না। তবে সুবিধে এই যে, যেমন যাত্রা বা থিয়েটার বা পালাগান [illegible] যায় একটি স্থানে পরিবেশিত হতে পারে, অথচ তা ক্যামেরার সাহায্যে ফিল্মে তুলে নিলে একই সময়ে বহু স্থানেই দেখানো সম্ভব। আরো একটা সুবিধে হচ্ছে, যাত্রা ইত্যাদি এক স্থানে যেমন অভিনীত হয়, অপর স্থলে ঠিক তেমনটিই হয়তো নাও হতে পারে, তার চেয়ে ভালোও হতে পারে আবার মন্দও। কিন্তু ফিল্মে তুলে রাখলে ঠিক একই জিনিস সর্বত্র একই দেখানো যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই যদি চন্দ্রিকা চিত্রকলা মন্দিরের "মাথুর"এর সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে তার একটা সার্থকতা আরোপ করা যায়, তা নয়তো যুক্তি খাটিয়ে মানাতে গেলে একে ঠিকমতো ছবির মর্যাদা দেওয়া যায় না। অবশ্য এর যা উপকরণ তা আলাদা-ভাবে অমর্যাদা পাবার নয়। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ও বৃন্দাবনের লীলা অবলম্বনে যে পালাগান জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে অনেককাল থেকেই, এই "মাথুর"ও তাই, এবং এখানে পূর্ণমাত্রায় পালাগানের চেহারা ও ভঙ্গীটাই রেখে দেওয়া হয়েছে। বিলিতী অপেরা যেমন পর্দায় পরিবেশিত হয় এও ঠিক তাই।

* * *

পালাকীর্তন বলে অভিহিত হলেও, কেবলমাত্র কীর্তনেই পালাটি ভর্তি নয়। বাক্যের বদলে অধিকাংশই গানের পদ ব্যবহার করা হয়েছে যার মধ্যে কীর্তনও আছে, ভজনাদিও আছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জয়দেব, মীরাবাঈ প্রভৃতির রচনা ছাড়া ইন্দিরা দেবী, সত্যেন দত্ত ও দিলীপকুমার রায় প্রভৃতির জনপ্রিয় গানের সমাবেশে পালাটি সমৃদ্ধ। গান সংখ্যায় মোট পঁয়ত্রিশ, অর্থাৎ ছবির যা দৈর্ঘ্য তাতে প্রতি চার মিনিটে একখানি গান, অর্থাৎ মোট দৈর্ঘ্যের প্রায় বার আনা অংশই গান, বাকি সিকি অংশের মধ্যে সংলাপ-ও আলা ভাগেও পড়ে না, এবং পালাগানে তাই যথেষ্ট। দৃশ্যের সংগঠন ও সুবিন্যাসের কৃতিত্বের চেয়ে পরিচালক সুধীরবন্ধু পর পর গানগুলি পরিবেশন, এবং সে পরিবেশনে বৈচিত্র্য রক্ষার চেষ্টা করেছেন গাইবার জন্য বহু গায়ক গায়িকার সমাবেশ ঘটিয়ে। একসঙ্গে এতো গানও যেমন পর্দায় বড়ো একটা পাওয়া যায়নি, তেমনি একক গানে একসঙ্গে আঠারজন গায়ক গায়িকার কণ্ঠও কচিৎ কাজে লাগাতে দেখা গিয়েছে। এদের মধ্যে আছেন দিলীপকুমার রায়, হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসু, কৃষ্ণ সেন, অসিতকুমার, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, পান্নালাল ভট্টাচার্য, উৎপলা সেন, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবানী বন্দ্যো-পাধ্যায়, গীতা ভট্টাচার্য, রেণুকা দাশগুপ্তা (সেনগুপ্তা), মাধুরী মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সব কখানি গানই মাতিয়ে তোলার মতো নয়, মাতিয়ে দেবার মতো গান, সঙ্গীত পরিচালনায় দিলীপকুমার রায় থাকতেও, কমই পরিবেশিত হতে পেরেছে। কতকজনের গাওয়াতে দিলীপকুমারের গায়ন-ভঙ্গীর অনুকরণও রয়েছে, তবে সমগ্রভাবে গানের প্রবাহে স্নাত থাকতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, বাঙলা ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা দিলীপকুমার রায়ের এই প্রথম। তবে তাঁর নামের আকর্ষণটাই বেশী কাজে এসেছে; কারণ, গান যা সব রয়েছে সেগুলির সুর আগে থেকেই প্রচলিত, আর আবহ-সঙ্গীত তাও সংযোজিত করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়চৌধুরী। কাজেই নাম এবং হয়তো, গান-গুলির সন্নিবেশে কিঞ্চিৎ পরামর্শ ছাড়া, দিলীপকুমারের আর কিছু করবার ছিল বলে মনে হয় না, তার পরিচয়ও তেমন পাওয়া যায় না।

• • •

আখ্যানবস্তুর পরিকল্পনা ও চিত্রনাট্য রচনায়ও পরিচালক সুধীরবন্ধু। ঘটনার উপস্থাপন ঠিক পালাগানের রীতিতেই, সেইমতোই দৃশ্যাবলীর গঠন ও সংস্থাপন। আরম্ভেই দেখা যায় স্বর্গ থেকে নারদকে মর্ত্যে এসে শ্রীকৃষ্ণকে কংস-নিধনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে। ওদিকে কংস শ্রীকৃষ্ণ জীবিত শুনে বিচলিত ও ত্রস্ত। রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম কেউ উচ্চারণ করতে পারবে না। রানী অস্তিই কেবল চেষ্টা করতে থাকে রাজাকে শান্ত করার, আবার ছোট রানী প্রাপ্তির কৃষ্ণভক্তি রাজাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। কংস একটা ছল করে কৃষ্ণকে মথুরায় এনে হত্যার উদ্যোগ করলে। কংস ঘোষণা করলে রাজ্য-সম্পদ ত্যাগ করবে সে এবং রাজ্যের ভার তুলে দিতে চায় কৃষ্ণের ওপর। একটা ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন হলো এবং অক্রূর গিয়ে বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণকে নিয়ে

এলেন। কংসের কৌশল খাটলো না, কৃষ্ণের হাতে তার নিধন হলো। মথুরার সিংহাসনে বসলেন কৃষ্ণ, পাশে মহিষীর আসনে অধিষ্ঠিতা হলেন শাপমুক্তা কুব্জা। এদিকে কৃষ্ণের বিরহে রাধিকা কাতরা। তার বিরহ-জ্বালা সখীদের অসহ্য হলো। পরামর্শ করে তারা বৃন্দাকে পাঠালে কৃষ্ণর কাছে রাধার বার্তা পৌঁছে দিতে। কিন্তু কৃষ্ণ যেন বৃন্দাকে চিনেও চিনলেন না। ব্যর্থ হয়ে বৃন্দা ফিরে এলো। তবে ভাবাবেশে রাধিকা তার প্রাণপ্রিয়কে লাভ করলে।

* * *

অভিনয় মাঝামাঝি এক ধরনের। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, ইন্দ্রনাথ, ওংকারনাথ, নবকুমার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ সেন, অনিতকুমার, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, দেবযানী, শিখা বাগ, আশা দেবী, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। মঞ্চের ধারা অনুসরণে পরিবেশ রচনার চেষ্টা হয়েছে, কলা-কৌশলের কাজে কৃতিত্ব প্রকাশের সুযোগ তাই এখানে সীমাবদ্ধ; পালাগানকে ফিল্মে তোলার পক্ষে যা যথেষ্ট তাই। বিভিন্ন কাজে আছেন, আলোকচিত্রগ্রহণে শচীন দাশগুপ্ত, শব্দধারণে পরিতোষ বসু, দৃশ্য-পরিকল্পনায় হীরেন লাহিড়ী, সম্পাদনায় সুকুমার মুখোপাধ্যায়।

অভিনবত্ব আনার একটি প্রচেষ্টা

সাফল্যের দিক থেকে যেমনই হোক, নতুনভাবে নতুন কিছু পরিবেশন করবার চেষ্টায় প্রযোজক-পরিচালকদের মধ্যে ভি শান্তারাম বিশিষ্ট আসনে অধিষ্ঠিত। নিজের স্টুডিও পত্তনের পর থেকে তাঁকে প্রায়ই বক্স-অফিসের মোহে পড়তে দেখা গেলেও, বেশ একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু পরিবেশন করার চেষ্টা থেকে তিনি অতি কদাচিৎই বিরত হয়েছেন। শান্তারামের ছবি মানে সব সময়েই আর পাঁচজনের চেয়ে আলাদা রকমের কিছু, যার মধ্যে নতুন দিক থেকে চিন্তার, নতুন কোণ থেকে দৃষ্টিপাতের পরিচয় থাকেই। কোন কোন ছবির ক্ষেত্রে দুঃসাহসিকতারও পরিচয় তিনি দেন নতুনভাবে কিছু সামনে তুলে ধরার অভিপ্রায়ে। যেমন দেখা যায় তার নবতম চিত্রসৃষ্টি "দো আঁখে বারহ হাত" ছবিখানিতে। জনপ্রিয় হবার সহজ ও সোজা উপকরণ ও পথকে সম্পূর্ণ পরিহার করে চলতে চেয়েছেন তিনি। মৌলিক সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ একটা জোরালো মনকে তিনি নিয়োজিত করেছেন ছবিখানি তৈরি করতে। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, শান্তারাম হৃদয়কে ছাপিয়ে বুদ্ধির জোরটাই যেন বেশি করে প্রয়োগ করেছেন। দেখা-যায় তাই, সর্বতোভাবে অভিনব প্রচেষ্টা "দো আঁখে বারহ হাত" অন্তরকে অভিভূত করে তোলার চেয়ে বুদ্ধির আঙিনাতেই বেশি তার বিচরণ। ভেবেচিন্তে এবং বেশ খেটেখুটে তৈরি প্রতিটি দৃশ্য ও দৃশ্যাংশ, নানাদিকের কৃতিত্ব চমক লাগিয়েও দেয়, বাহবা দিতে হয় অনেকবারই এবং নানা কাজেরই, কিন্তু তবুও শিল্প-কমনীয়তাটা আসতে পারেনি, সবই এমন যান্ত্রিক।

* * *

বিষয়বস্তু যেমন বেছেছেন, তেমনি বিন্যাস-সূত্রেও সব সময়েই একটা নাটকীয় গাম্ভীর্য পরিস্ফুট। গল্প এক আদর্শবাদী যুবক জেলারকে নিয়ে। তার বিশ্বাস খুনীর মধ্যেও মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনা যায় স্নেহ-পরিচর্যার দ্বারা অশৃঙ্খলিত পরিবেশের মধ্যে। সরকার রাজী হলো এই নিয়ে তাকে পরীক্ষা করতে দিতে। খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন কয়েদী ছজন দুর্ধর্ষ আসামীকে নিয়ে যুবক হাজির হলো লোকালয় থেকে দূরে একস্থানে। তারা যে মুক্ত এবং শৃঙ্খল বিনাই চলাফেরা করতে পারে, এটা প্রথমেই কয়েদী ছজনের বুঝতে অসুবিধে হলো। বুঝতে পারার পরও তারা নিজেদের মন থেকে অপরাধীর মনোবৃত্তি দূর করতে পারলে না। জেলার তাদের ক্ষেতের কাজে নিয়োগ করলে। মাঝে মাঝে তাদের ক্ষেপা প্রবৃত্তি চাড়া দিয়ে ওঠে, কিন্তু সস্নেহ আচরণে তারা নিরস্ত হয়। গোলমাল বাঁধলো ওদেরই একজনের দুটি শিশু পুত্রকে ওখানে আশ্রয় দেওয়ায়। একজনকে যদি তার পরিবারের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়, তাহলে সবাইকেই বা তা দেওয়া হবে না কেন? বিদ্রোহ দেখা দিল, যাতে জেলারের প্রাণ-সংশয়ে পড়লো। সে গোলমাল মিটলো এক সরলা খেলনাওয়ালীর চেষ্টায়; শিশু দুটিকে দেখতে আসতো রোজই সে। জেলারের চেষ্টায় কয়েদী কজন কাজের হয়ে উঠলো, ক্ষেতে সব্জী ফলালো তারা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার মতো। গাড়ীতে ভর্তি করে সেগুলো বাজারে বিক্রী করে আসার জন্য জেলার নিজেই যেতে চাইলে, কিন্তু কয়েদী কজনে আশ্বাস দিলে তারা পারবে সেকাজ করে নিয়ে আসতে। বাজারে গিয়ে তারা সব্জী বেচতে বসলো নামমাত্র লাভ রেখে। কালোবাজারী মহাজন এলো চোখ রাঙিয়ে, কিন্তু ছজন খুনেকে দেখে নরম পথের আশ্রয় নিলে সে। বাজার থেকে অনেক রাত করে ছজন সেদিনে ফিরলো মাতাল হয়ে। জেলারের বুক ভেঙে গেল। তার ওপর মত্তাবস্থায় ক্ষেপে উঠলো ওরা জেলারের ওপর, খুন চেপে উঠলো ওদের ধমনীতে, মারাত্মক অবস্থা। রিভলবার উঁচিয়ে ধরতে তবে ব্যাপারটা আয়ত্তে আনা গেল। কিন্তু তারপরই নিজেদের আচরণের জন্য কয়েদী ছজনের অনুশোচনার অন্ত রইলো না; অনুতপ্ত হয়ে ওরা ক্ষমা চাইলে। আবার স্বাভাবিক হলো ওরা। এবারও সব্জী বেচতে ওরাই বাজারে গেল, কিন্তু শপথ করে গেল যে, ব্যাপারিদের প্রলোভনে তারা ভুলবে না, তারা শান্ত থাকবে, শত প্ররোচনাতেও, এমনকি, মারধর হলেও তারা পড়ে পড়ে মার খাবে, তবু হাত ওঠাবে না। বাজারের মহাজনের গুন্ডাদের হাতে মার খেয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় ওরা ফিরলো সেদিন রাতে। সেই রাতেই মহাজন আরও এক কান্ড ঘটালো। গুন্ডার দল এসে ওদের ক্ষেতে আগুন লাগিয়ে শত শত ক্ষিপ্ত গবাদি পশু ছেড়ে দিয়ে সারা ক্ষেত তছনছ করে মাঠ করে ফেললে। একটা ক্ষেপা ষাঁড় এসে আক্রমণ করলে জেলারকে। তার কোপ থেকে আহত কয়েদী কজনকে বাঁচাবার চেষ্টা করলে জেলার, কিন্তু হিংস্র পশুর সঙ্গে সংগ্রামে তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো। কয়েদী কজন বুঝলে তাদের স্নেহ-মমতার আশ্রয় আর রইলো না, কিন্তু তারা মানুষ হয়ে চলার যে শিক্ষালাভ করেছে, সে আদর্শকে রক্ষা করে যাওয়ার শপথ নিলে উর্ধাকাশের দিকে চেয়ে। তারা জানলে যে, মমতার দৃষ্টিতে তাদের ওপর লক্ষ্য রাখার জন্য দুটি চোখ সব সময়েই মেঘের ফাঁকে সজাগ থাকবে। ছটি পাষন্ড, যারা একদিন তাদের বারোটি হাতে মানুষ খুন করেছে, দুটি স্নেহময় চোখের আওতায় তারা মনুষ্যত্বের পথে ফিরে যেতে পারলো আবার।

* * *

বিষয়বস্তুটির মধ্যে অভিনবত্ব আছে, এখনকার একটা সমস্যা নিহিত রয়েছে এর মধ্যে। পৃথিবীর নানা দেশে নানাভাবে দুষ্ট মানুষের প্রকৃতি সংশোধনের নানা রকমের পরীক্ষা চলেছে। এর একটা সর্বজনীন আবেদন আছে। তবে এখানে জেলারকে প্রাণ বিসর্জন দিইয়ে খুনি কজনের মানুষ হয়ে ওঠা যেভাবে দেখানো হয়েছে, ওটা যেন অনেকটা কেঁদে জেতার মতো ব্যাপার হলো। কারুর জন্যে কেউ প্রাণ বিসর্জন দিলে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুকম্পা অতিবড়ো পাষন্ডের মনেও জাগে, নিজেকে সংশোধন করার জন্য তার প্রাণে আকুলতা দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু সমস্যার ওটা যুক্তিপূর্ণ সমাধান বলে গণ্য করা যায় না। তাই শান্তারাম যে পথটা দেখিয়েছেন, কয়েদীদের মানুষ করে তোলার, শেষ পর্যন্ত তিনি তার আর হদিশ করতে যে পারেননি, সেইটেই দেখা গেল। আরো একটা কথা আছে। এখানে কয়েদীদের মিলিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে সমাজ ও লোকালয় থেকে

ফরাসী ভাষায় মলিয়রের নাট্যাভিনয়ে ভারতীয় শিল্পিবৃন্দ—উপবিষ্ট (বাম থেকে) মঞ্জু দত্ত, কলকাতায় অবস্থিত ফরাসী কনসাল জেনারেলের পত্নী, কনসাল জেনারেল, রেখা দে ও রূবি ঘোষ। দণ্ডায়মান—(বাম থেকে) দিলীপ রায়, অরুণ ভট্টাচার্য, ডাঃ শিবনাথ হাজরা, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অলোক দে

একেবারে দূরে, নির্জন স্থানে—প্রশ্ন ওঠে যে, যদি মানুষই করে তুলতে হয়, তাহলে ওদের সমাজের উপযোগী করে তোলা হবে না কেন? —সমাজ থেকে দূরেই যদি সরিয়ে রাখা হলো একান্তে, তাহলে সেতো অনেকটা আগেকার সেই আন্দামানে নির্বাসনের মতোই হয়ে দাঁড়ায়। ঘটনা সৃষ্টিতে কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে অবাধে; শেষে ষাঁড়ের গুঁতোয় জেলারের প্রাণ হারানো ব্যাপারটাই তো তাই। জনবিবর্জিত লোকালয় থেকে বহু দূরের একটা স্থান, অথচ সেখানে এক যুবতী খেলনাওয়ালীর একা আবির্ভাব ঘটে কি করে? সবই যেন একটু মাত্রাধিক্য। যান্ত্রিক কৃত্রিমতার ছাপ সর্বত্র। অভিনবত্বের পরিচয় টাইটেল থেকেই—(টাইটেল তৈরিতে শান্তারাম সব সময়েই বৈশিষ্ট্য রাখেন) দেয়ালের গায়ে দেখা দেয় এক-একটা হাতের পাঞ্জা, হাত যায় সরে আর সেই হাতের ছাপে ফুটে ওঠে ছবির পরিচয়-লিপি। তবে একইভাবে অনেকগুলি হাতের ছাপে পরিচয়লিপি সম্পূর্ণ করায় একঘেয়ে হয়ে পড়ে, অভিনবত্বের চমক কিছুটা কাটিয়ে দেয়। তারপর জেলের লোহার গেটের ছিদ্র দিয়ে জেলের দুর্গের অবতারণা, সঙ্গে সঙ্গেই মন নিবদ্ধ হয়ে পড়ে [illegible]। একে একে নানা [illegible] করে দৃশ্য থেকে [illegible] ছবি-খানি। তবে [illegible]—দৃশ্যও যেমন, [illegible]।

এ ব্যাপারে শান্তারাম বম্বাই ধারা থেকে সরে আসতে পারেননি। ছবিখানি দেখে বিমোহিত হওয়ার বাধা এসেছে ঐদিক থেকেই, তা নয়তো ক্যামেরা ও সাউণ্ডট্রাকের নিয়োগে ছবিখানিতে যে কাজ দেখা যায়, তা ভারতীয় চলচ্চিত্রমনীষার অতি উচ্চ পর্যায়ের কৃতিত্বের পরিচায়ক। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার ও শোনবার অনেক কিছুই পাওয়া যায়, যা ছবি-খানিকে অনন্যাধারণত্বের ধাপে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে। আলোকচিত্র, শব্দগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিচালনার কাজ করেছেন যথাক্রমে বালকৃষ্ণ, এ কে পারমার ও বসন্ত দেশাই। পরিচালক শান্তারামের কল্পনার রূপকে সমৃদ্ধ করে তোলায় এঁদের কাজ প্রভূত সহায়ক হয়েছে। পরিচালনা ছাড়া শান্তারাম এতে প্রধান চরিত্রে জেলারের ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন, তবে চিত্তে গাঁথবার মতো অভিনয় নয়। কয়েদীদের চরিত্রে অভিনয় হয়নি, হয়েছে দাপ্পা। চরিত্রগুলিতে অবতরণ করেছেন উল্লাস, বি এম ব্যাস, গজেন্দ্র, শর্মা, এস কে সিং ও জি ইণ্ডাভালে। জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের চরিত্রে বাবুরাও পেণ্ডারকরের অভিনয় নাটমুহূর্ত গড়ে তোলে। ছবিখানির মধ্যে একমাত্র ললিতস্বচ্ছন্দ হচ্ছে খেলনা-ওয়ালীর চরিত্রটি। বেশ কষ্টকল্পিত চরিত্র, তবু কাঁধের খেলনার ঝাঁকি, হাতে একতারা আর একতারার সংগে বাঁধা চাকার কাঠি-লাগানো ঝোলক, বেশ একটা অভিনব চরিত্র—হঠাৎ এসে এই কয়েদীদের দলে তার ঠাঁই করে নেওয়া, মানায় না, কিন্তু ভাল না লেগেও পারে না, কারণ সারা ছবির মধ্যে মিষ্টি ঝলক ঐ এক-ফালিই, আর সবই কেবল গুমোট।

বিবিধ সংবাদ

ফরাসী ভাষায় ভারতীয়দের অভিনয়

সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের দ্বারা ফরাসী ভাষায় নাট্যাভিনয় বোধহয় প্রথম হলো গত ২১শে সেপ্টেম্বর হিন্দী হাইস্কুলের মঞ্চে। কলকাতার আলিয়ঁস ফ্রাঁসেজের ছাত্রছাত্রীগণ অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। নাটকখানি ছিল মলিয়রের "Le Medicin Malgri Lui." কলকাতায় অবস্থিত ফরাসী কন্সাল জেনারেল, লেডী রানু মুখার্জি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অভিনয় দেখতে উপস্থিত ছিলেন। এ ধরনের অভিনয়ের একটা সার্থকতা হচ্ছে, বিদেশী নাট্য-চিন্তাধারার সংগে সরাসরি একটা সম্পর্ক স্থাপন করা, যা এদেশের নাট্য আন্দোলনের কাজে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

• • •

মিনার্ভা থিয়েটার আবার বন্ধ হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। এবার শোনা যাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহটি সংস্কৃত করে এবং ঘূর্ণায়মান মঞ্চ সহযোগে আধুনিক হয়ে উদ্বোধিত হবে।

একলব্য

অলিম্পিক অনুষ্ঠান থেকে দলগত প্রতিযোগিতা অর্থাৎ টীমস গেম বাদ দেওয়ার যে প্রস্তাব উঠেছিল সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভায় সে প্রস্তাব পাশ হয়নি। তবে ভবিষ্যৎ অলিম্পিক খেলাধুলো থেকে ইকোয়েস্ট্রিয়ান, জিমন্যাস্টিকস, আধুনিক পেণ্টাথলন ও সাইক্লিংয়ের দলগত প্রতিযোগিতা বাদ দেবার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিক থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে। তবে জিমন্যাস্টিকসের দলগত প্রতিযোগিতা রোম অলিম্পিক থেকেই উঠে যাবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। জিমন্যাস্টিকস সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাব পরে পরিবর্তন করা হয়। রোম অলিম্পিকের পর কুস্তি বা মল্লযুদ্ধের ১৬টি বিষয়ের জায়গায় অলিম্পিক কমিটি ৮টি বিষয় ধার্য করবার সিদ্ধান্ত করেছেন। আর যে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সেটা হচ্ছে অলিম্পিক খেলাধুলোর মধ্যে ভলিবল এবং ধনুর্বিদ্যার অন্তর্ভুক্তি আর ব্রেস্ট স্ট্রোক এবং বাটারফ্লাই স্ট্রোকের মধ্যে একটি সাঁতারের বিলোপ সাধন। আন্তর্জাতিক কমিটি উইন্টার অলিম্পিক থেকেও দুই একটি বিষয় বাদ দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য একুশ রকমের খেলাধুলো অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত করলেও ১৫টি কি ১৬টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ রাখবার নির্দেশ দিয়েছেন। এই ২১টি বিষয় হচ্ছে:—
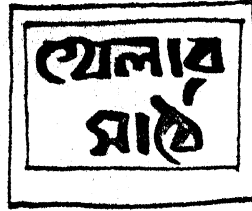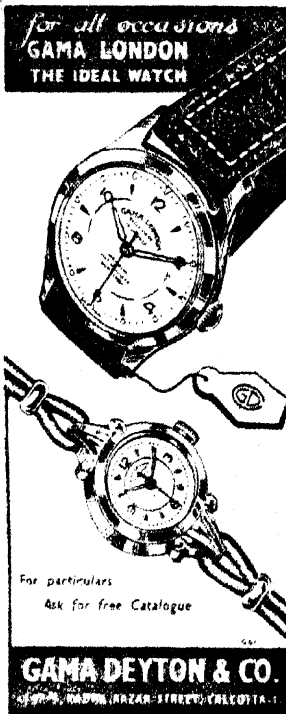
(১) এ্যাথলেটিক স্পোর্টস—ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেণ্ট, (২) রোয়িং, (৩) ফেন্সিং, (৪) জিমন্যাস্টিকস, (৫) মল্লযুদ্ধ, (৬) সাঁতার ও ডাইভিং, (৭) ইকোয়েস্ট্রিয়ান বা অশ্বারোহণ কৌশল, (৮) মুষ্টিযুদ্ধ, (৯) ক্যানোয়িং, (১০) ভারোত্তোলন, (১১) হ্যাণ্ডবল, (১২) হকি খেলা, (১৩) আধুনিক পেণ্টাথলন, (১৪) সুটিং, (১৫) ধনুর্বিদ্যা, (১৬) ভলিবল খেলা, (১৭) ফুটবল খেলা, (১৮) সাইকেল চালনা, (১৯) ওয়াটারপোলো, (২০) ইয়াটিং ও (২১) বাস্কেটবল খেলা।

সোফিয়া অধিবেশনে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সিদ্ধান্ত দেখে মনে হয় যে সব বিষয়ে পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশের আগ্রহ নেই সে সব বিষয় অলিম্পিক থেকে তুলে দেওয়াই কমিটির অভিপ্রেত আর কমিটি অলিম্পিক অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীর সংখ্যা হ্রাস করবার পক্ষপাতী। এ বিষয়ে আমাদের বলবার কিছুই নেই। কিন্তু ব্রেস্ট স্ট্রোক এবং বাটারফ্লাই স্ট্রোকের মধ্যে একটি সাঁতার তুলে দেবার সিদ্ধান্ত কেন গৃহীত হয়েছে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। দুটি সাঁতারই পৃথক ধরনের, ব্রেস্ট স্ট্রোক এবং বাটারফ্লাই স্ট্রোকের টেকনিকও সম্পূর্ণ আলাদা। তা ছাড়া এই দুই সাঁতারই পৃথিবীর সর্বত্র জনপ্রিয়। তবুও এর মধ্য থেকে একটি কেন বাদ দেবার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে ভেবে পাই না।

অলিম্পিকে ভলিবল এবং ধনুর্বিদ্যার অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য। ভলিবল সারা বিশ্বেই জনপ্রিয় আর ধনুর্বিদ্যা সূক্ষ্ম নৈপুণ্য প্রকাশের দিক দিয়ে একটি চমৎকার স্পোর্টস। এই দুটি বিষয় অলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভারতেরও নৈপুণ্য দেখানোর এক সুযোগ ঘটেছে। ভলিবল খেলায় ভারত খুবই শক্তিশালী। বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতার বিগত অনুষ্ঠানে ভারত আটটি গ্রুপের মধ্যে একটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছিল। গ্রুপ চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে অবশ্য আর খেলা হয়নি এবং বিশ্বের ভলিবল ক্ষেত্রে ভারতের চূড়ান্ত স্থানেরও নির্ণয় হয়নি। তবে ইতিপূর্বে ভলিবলের বিশ্বজয়ী সোভিয়েট রাশিয়াকেও ভারত পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছে। ভলিবল খেলায় বিশ্বপ্রাধান্য লাভের জন্য এখন থেকে চেষ্টা হলে ভারতের পক্ষে [illegible] অসম্ভব নয়। আর অলিম্পিকে ধনুর্বিদ্যার অন্তর্ভুক্তিতে ভারত তার অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের এক সুযোগ পাবে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ভারতীয় মহাকাব্যে ধনুর্বিদ্যার যে সব অলৌকিক কীর্তিকাহিনী বর্ণিত আছে, তাকে অনেকে কবিকল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু ভারতের নাগা, কুকি, কোল, ভীল, সাঁওতালদের মধ্যে এখনো ধনুর্বিদ্যায় যে কুশলতা দেখা যায় উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের অলিম্পিকে পাঠানো যেতে পারে। আশা করি ভারতের অলিম্পিক কমিটি বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

• • • •

আকাশবাণীর বাণী বৈদ্যুতিক আলোকমালার মধ্যে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার ও ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতায় তিনদিনব্যাপী উৎসব মহা ধুমধামের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। ওয়াটারপোলো খেলায় এবং সাঁতারে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁতারুরা দুই বিষয়েই চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। ১৯৪১ সালে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার ও জলক্রীড়া প্রবর্তনের প্রথম বছরে কলকাতার ছাত্রেরা সাঁতার এবং ওয়াটারপোলো দুই বিষয়েই বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছিল। তার পর দুবার সাঁতার এবং একবার ওয়াটারপোলো খেলায় বিজয়ী হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁতারুরা কোনবার "ডবল" অর্থাৎ সাঁতার এবং ওয়াটারপোলো দুই বিষয়ে বিজয়ী হতে পারেনি। দীর্ঘ পনর বছর পরে কলকাতার ছাত্রেরা
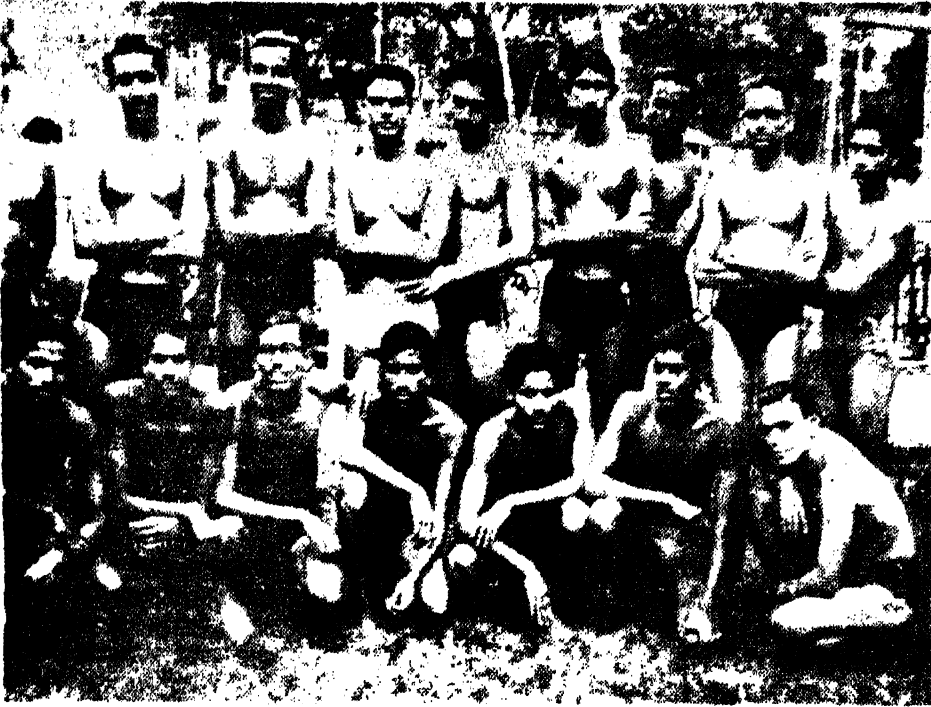
আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার ও ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁতারু দল

সাঁতারুরা আবার "ডাবলসের" অধিকারী হয়েছে, আর শুধু সাঁতারের চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে ছয় বছর পরে। এতদিন সাঁতারে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক-চেটিয়া প্রাধান্য ছিল। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সাঁতার এবং ওয়াটার-পোলো খেলায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় জলক্রীড়ায় তাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যেরও পরিচায়ক।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে এবার অবশ্য বেশ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। প্রথমত তাদের কীর্তিমান সাঁতারু এস বাক্কাক বর্তমানে ইংলণ্ডে অধ্যয়নরত। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি-যোগিতায় তার যোগদানের অধিকারও নেই। দ্বিতীয়ত, বাটারফ্লাই স্ট্রোকে ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী বোম্বাইর কলেজ ছাত্র সুভাষ লাঠি এবার বোম্বাই দলের সঙ্গে আসেননি। তবুও বোম্বাইর সাঁতারুরা কল-কাতার সাঁতারুদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজয় স্বীকার করেছে। দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাভ করেছে ৫০ পয়েন্ট আর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় লাভ করেছে ৪৭ পয়েন্ট।

সমাপ্তি দিনের অনুষ্ঠানে [illegible] বিশ্ব-বিদ্যালয়ের [illegible] প্রশ্নের তীব্র [illegible] হয়। পাঁচটি বিষয়ের [illegible] হলে দেখা যায় কলকাতা এবং বোম্বাই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ই ৩৬ পয়েন্ট করে লাভ করেছে। এরপর ১০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকে জয়লাভ করবার ফলে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ৪১—৪০ পয়েন্ট এগিয়ে থাকে। বাকী থাকে শুধু ৪×১০০ মিটার মেডলে রিলের শেষ প্রতিযোগিতা। কে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করবে? বোম্বাই না কলকাতা? এই প্রশ্ন নিয়ে ছাত্র সমর্থক-দের মধ্যে আরম্ভ হয় বিরাট গবেষণা। ৪×১০০ মিটার মেডলে রিলে। অর্থাৎ প্রতি দলের চারিজন সাঁতারুকে চারিটি বিভিন্ন বিষয়ে রিলে প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। প্রথমে ব্যাক স্ট্রোক বা পিঠ সাঁতার, পরে ব্রেস্ট স্ট্রোক বা বুক সাঁতার, তৃতীয় দফায় বাটারফ্লাই স্ট্রোক আর চতুর্থ দফায় ফ্রি স্টাইল, সাঁতার আরম্ভ হল। ব্যাক স্ট্রোকে বোম্বাই এগিয়ে গেল; কিন্তু বুক সাঁতারে কলকাতার কমল সাহা চমৎকার-ভাবে সাঁতার কেটে বোম্বাইর অগ্রগমণই ব্যাহত করলেন না, নিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে দিলেন বেশ খানিকটা এগিয়ে। এর পর বাটারফ্লাই স্ট্রোকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বোম্বাইর কাছে আবার মার খেতে হল। বোম্বাইর উদীয়মান সাঁতারু সুরেশ হরিয়ানী অনেকখানি এগিয়ে গেলেন—কলকাতার সমর্থকদের মধ্যে দেখা গেল নৈরাশ্যের ছায়া। কিন্তু কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক শান্ত কর্মকার ফ্রি স্টাইলের সাঁতার আরম্ভ করে বিদ্যুদ্বেগে জল কেটে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন, আধপুকুরের মধ্যেই বোম্বাইর সাঁতারু হলেন পরাজিত, শেষ পর্যন্ত প্রায় ৫ গজ পেছনে বোম্বাইর সাঁতারুকে পরাজিত করে শান্ত কর্মকার নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভকে সহজ করে তুললেন।

ওয়াটারপোলো খেলার ফাইনালেও বোম্বাই ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরস্পরের সম্মুখীন হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুই দলই পাঁচটি করে গোল করে। অতিরিক্ত সময়ে কলকাতা দল আরও তিনটি গোল করে ৮—৫ গোলে খেলায় বিজয়ী হয়। সেমি ফাইনালে কলকাতা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে ১১—০ গোলে এবং বোম্বাই বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৪—৩ গোলে পরাজিত করে। ওয়াটারপোলোতে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশ গ্রহণ করেছিল। সন্তরণে অংশ গ্রহণ করেছিল ১০টি বিশ্ব-বিদ্যালয়। এদের নাম—কলকাতা, এলাহাবাদ, আগ্রা, বিক্রম, পুণা, যাদবপুর, ওসমানিয়া,

পাঞ্জাব, বেনারস ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় অংশ গ্রহণের অভিপ্রায় জানিয়েও শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করেনি। এখানে বলা প্রয়োজন আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় জলক্রীড়ায় এবার সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় অংশ গ্রহণ করেছে। এর আগে কোনবার এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় অংশ গ্রহণ করেনি।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতারে এবারকার অনুষ্ঠানে সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বোম্বাইর উদীয়মান সাঁতারু সুরেশ হরিয়ানী। ১০০ ও ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক এবং ১০০ ও ২০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকের মোট চারিটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করা ছাড়াও এবার যে একটি মাত্র বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারও প্রতিষ্ঠা করেছেন হরিয়ানী। ২০০ মিটার বুক সাঁতারে বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন বোম্বাইর পি প্রভু। এই বিষয়ে তার সময় ছিল ৩ মিনিট ৫·৬ সেকেণ্ড। সুরেশ হরিয়ানী ৩ মিনিট ০·২ সেকেণ্ড সময়ে এবার নতুন রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তিনদিনব্যাপী সাঁতার প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিন সাঁতার আরম্ভের আগে ফ্লাড-লাইটের তিনটি সারির একটি সারির তার ছিঁড়ে যাওয়ায় দশটি ফ্লাডলাইট জলে পড়ে যায় এবং এজন্য অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটে। এই বিঘ্ন ছাড়া দর্শক ও কলেজ-ছাত্রদের উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে বেশ সচারুভাবেই অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। কিন্তু একটি বিষয়

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতারে ৪টি বিষয়ের বিজয়ী বোম্বাইর অধিনায়ক সুরেশ হরিয়ানী

অনেকের কাছেই বিষদৃশ ঠেকেছে। বিভিন্ন জায়গার দশটি বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার আয়োজনকারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের কোন সদস্যের দেখা পাওয়া যায়নি। না কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ছাত্রদের কোন আপ্যায়নেরও ব্যবস্থা হয়নি। অবশ্য স্পোর্টস বোর্ডের সভাপতি সিণ্ডিকেট সদস্য শ্রী এস কে ঘোষ সভাপতি হিসাবেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আর উপস্থিত ছিলেন খেলাধুলার পরম অনুরাগী কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রী এস এন ব্যানার্জি। কিন্তু আমরা মনে করি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, যিনি পদাধিকারবলে স্পোর্টস বোর্ডের সম্পাদক, এই অনুষ্ঠানে তার উপস্থিত থাকা খুবই উচিত ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজ সাঁতার এবং ওয়াটার-পোলো খেলায় চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করলেও বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের এতে কৃতিত্ব বেশী নেই। বিভিন্ন ক্লাবের সাঁতারুদের নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব। কলেজ-ছাত্রদের মধ্যে সাঁতার শেখানোর ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়েরও কিছু করা উচিত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক মনোনয়নেও এবার এক অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ১০০ মিটার বুক সাঁতারে বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ডের অধিকারী কমল সাহাই অধিনায়ক নির্বাচিত হবার যোগ্য পাত্র ছিলেন। তিনি শান্ত কর্মকারের চেয়ে বয়সেও বড়, সাঁতারু হিসাবেও সিনিয়র। কিন্তু কমল সাহাকে অধিনায়ক না করে শান্ত কর্মকারকে অধিনায়ক নির্বাচিত করায় কমল সাহা মনে আঘাত পান। তার ফলে শেষ দিনের অনুষ্ঠানে এক মেডলে রিলে ছাড়া তিনি আর কোন বিষয়েই অংশ গ্রহণ করেন না। কমল সাহা শেষ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ানশিপ

আন্ত জেলা স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ী বর্ধমান জেলা স্কুল টীম

লাভের অধিকারী হত কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শেষ সময়ে বিপদ দেখে তিনি যে মেডলে রিলেতে অংশ গ্রহণ করেছেন, এজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু অভিমানের কারণ থাকা সত্ত্বেও তার অন্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করাকে সমর্থন করতে পারছি না।

• • •

খেলাধূলার কোন বিষয়ে যিনি বিশ্বজয়ী ক্রীড়াক্ষেত্রে তার কলানৈপুণ্য দেখার সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের কথা। কয়েক দিন আগে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত পশ্চিম ভারত ও ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় বোম্বাইর অধিবাসীরা মালয়ের বিশ্বজয়ী ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় "এডি" চুং-এর চমকপ্রদ ব্যাডমিণ্টন খেলা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। এই সঙ্গে তারা আরও দেখেছেন, ডেনমার্কের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় চ্যাম্পিয়ানশিপের বিজয়ী কিন কোবেরোর উন্নত কলাকৌশল। কোবেরের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর দেশেরই খ্যাতনামা খেলোয়াড় হ্যামারগার্ড হ্যানসন আর এডি চু-এর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর সুনিপুণ খেলোয়াড় ডেভিড চুং। এ ছাড়া ভারতের সব নাম করা খেলোয়াড় তো ছিলেনই। এক কথায় পশ্চিম ভারত ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলা উপলক্ষে বোম্বাইয়ে বিশ্বের বহু কীর্তিমান ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়ের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। সুনিপুণ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়দের এমন সমাবেশ ভারতে আর হয়েছে কি না সন্দেহ। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান এডি চুং বা ডেনমার্ক প্রধান কিন কোবেরো এর আগে ভারতের মাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি।

বলা বাহুল্য বিশ্বজয়ী খেলোয়াড় এডি চুং, যিনি চারবার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়ানশিপে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন, তার পক্ষে ফাইন্যালে ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড় নন্দু নাটেকারকে পরাজিত করে পশ্চিম ভারতের চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করা মোটেই কষ্টসাধ্য হয়নি। এডি চুং স্ট্রেট গেমেই নন্দু নাটেকারকে পরাজিত করেন। কোয়ার্টার ফাইন্যালে তিনি পরাজিত করেন পি এস চাওলাকে আর সেমি ফাইন্যালে ভারত শ্রেষ্ঠ ত্রিলোকনাথ শেঠকে।

এই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ভারতের অমৃত দেওয়ানের কাছে যুক্তরাষ্ট্রীয় চ্যাম্পিয়ন কিন কোবেরোর পরাজয়। ডেনমার্কের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কিন কোবেরো যিনি এর আগে বিশ্বের বিভিন্ন খেলায় একবার এডি চুংকে এবং দুইবার নন্দু নাটেকারকে পরাজিত করেছেন অমৃত দেওয়ানের কাছে তার পরাজয় বিস্ময়ের বিষয়। কোয়ার্টার ফাইন্যালেই কোবেরোকে প্রতিযোগিতার থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য ডেনমার্কের দুই খেলোয়াড় কোবেরো ও হ্যানসন চুং ভ্রাতৃদ্বয় এডি ও ডেভিডকে ফাইন্যালে হারিয়ে ডাবলসের খেলায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন।

পশ্চিম ভারত এবং ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা পৃথক-ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু মালয় ও ডেনমার্কের খেলোয়াড়রা বেশী দিন ভারতে অবস্থান করতে না পারায় একসঙ্গেই দুই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই কারণে ভারতের অন্য কোন রাজ্যের অধিবাসীর পক্ষেও বিশ্বজয়ী খেলোয়াড়ের খেলা দেখার সুযোগ ঘটেনি।

নীচে ফাইন্যাল খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল:—

মেনস সিঙ্গলস

এডি চুং ১৫—১০ ও ১৫—৭ পয়েণ্টে নন্দু নাটেকারকে পরাজিত করেন।

মেনস ডাবলস

কিন কোবেরো ও হ্যামারগার্ড হ্যানসেন ১১—১৫, ১৫—৫ ও ১৮—১৭ পয়েণ্টে এডি চুং ও ডেভিড চুংকে পরাজিত করেন।

উইমেনস সিঙ্গলস

মিসেস মমতাজ লোটাওয়ালা ১১—৭ ও ১১—৩ পয়েণ্টে মিসেস প্রেম পরাশরকে পরাজিত করেন।

উইমেনস ডাবলস

মিসেস প্রেম পরাশর ও মিসেস সুশীলা কাপাদিয়া ১৭—১৬ ও ১৫—৬ পয়েণ্টে মিসেস মমতাজ লোটাওয়ালা ও মিস শশী ভাটকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস

কিন কোবেরো ও মিসেস প্রেম পরাশর ১৭—১৮, ১৫—১২ ও ১৫—৪ পয়েণ্টে নন্দু নাটেকার ও মিস শশী ভাটকে পরাজিত করেন।

সূচীপত্র
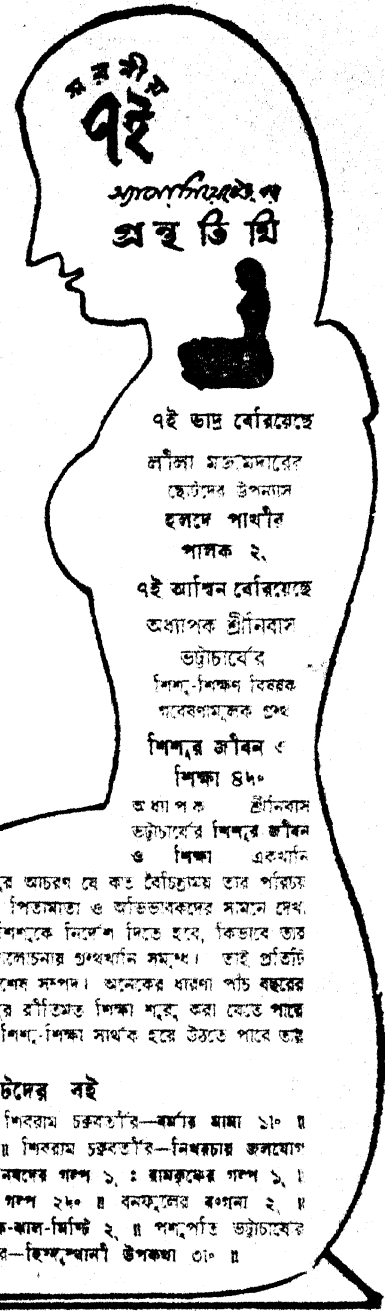
বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রসঙ্গ—	-	৭৫৩
শর্তাকিয়া—	শ্রীসুবোধ ঘোষ	৭৫৫
আন্তর্মহাদেশীয় বক্রগতি রকেট—	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৭৬১
কেন? (কবিতা)—	শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু	৭৭০
দীঘার সমুদ্র তীরে (কবিতা)—	শ্রীকিরণশংকর সেনগুপ্ত	৭৭০
নিমজ্জন (কবিতা)—	শ্রীসাধনা চট্টোপাধ্যায়	৭৭০

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

ভালো এক কাপ চা করতে হ'লে
তাজা জল ব্যবহার করুন

TEA BOARD
INDIA

সূচীপত্র

DESH : 40 Naye Paise
Saturday 19th October, 1957

২৪ বর্ষ ॥ ৫০ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ২রা কার্তিক ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

কৃত্রিম উপগ্রহ ও অকৃত্রিম দুশ্চিন্তা

সোবিয়েৎ রাশিয়া কর্তৃক কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সঙ্গে বিস্ময়েরও বটে। কেননা, কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টিকে মর্ত্যবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ বলা যাইতে পারে। আমরা "চরম উৎকর্ষ" বলিতে যাইতেছিলাম, তখনি সোভিয়েৎ বিজ্ঞানীদের উক্তি মনে পড়িল। তাঁহারা বলিয়াছেন, "কৃত্রিম উপগ্রহ" বিস্ময়ের কেবল প্রথম ধাপ মাত্র—অর্থাৎ চন্দ্রলোক যাত্রার পথে ইহা প্রথম ঘাঁটি, এইরূপে আর কয়েকটি ঘাঁটি বসাইতে পারিলেই চন্দ্রলোকে পৌঁছানো সম্ভব হইবে। তারপর অন্য একজন সোভিয়েৎ বিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই গ্রহ-উপগ্রহে ভ্রমণ সম্ভব হইবে। কাজেই বুঝিতে পারিলাম যে, "কৃত্রিম উপগ্রহ" সার্কাসের "বাঘের খেলা" নয়—নিতান্তই প্রাথমিক ব্যাপার। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে ইহা সামান্য ব্যাপার হইলেও সাধারণের কাছে ইহার অসামান্যতা অসাধারণ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বাহিরে ইহাই মানুষের প্রথম পদক্ষেপ এবং সেই সূত্রে বিচার করিলে ইহা অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার কেন্দ্র। ব্যাপারটি লইয়া বিশ্বব্যাপী যে আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে কিন্তু বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের চেয়ে লাভক্ষতির হিসাবটাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। একদল বৈজ্ঞানিক বিশেষ উল্লসিত; অপর দল তেমনি বিমর্ষ ও ভীত। কেন এরূপ হয়? সত্য কথা বলিতে কি, কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টিকে কেহই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিতেছে না। লাভ-ক্ষতি ও সামরিক জয়-পরাজয়ের আশা-আশঙ্কাই সকলের মনে প্রবল। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে—বর্তমান যুগে সাক্ষাৎভাবে রাজনীতিই [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। রাজনীতির [illegible] দ্বারা রাঙাইয়া জীবনকে দেখাই এ-যুগের অভ্যাস। দুঃখের বিষয় সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানও রাজনীতির দ্বারা রঞ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান ঘটনা তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, মানুষ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সীমা অতিক্রম করিল, ইহাই যথেষ্ট নয়; কিম্বা প্রধান রাষ্ট্র-গুলির ইহাই বিবেচ্য নয়। একটি প্রবল রাষ্ট্র উহা করিতে সমর্থ হইয়াছে ভাবিয়া অপর রাষ্ট্রগুলির শিরঃপীড়ার কারণ ঘটিল। কেন? না, ইহাতে তাহার সামরিক শক্তি অজেয় হইয়া উঠিল এবং সেই পরিমাণে অন্যান্য রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিতে দুর্বলতা দেখা গেল। ইহা যে আমাদের অনুমান মাত্র নয়—তাহার প্রমাণ স্বয়ং শ্রী খ্রুশ্চেভ জোগাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি-নীতির আবিষ্কারে বোমারু বিমানের যুগ শেষ হইয়া গেল। তিনি একথা বলেন নাই যে, যুদ্ধের যুগ, অশান্তির যুগ শেষ হইয়া গেল। তাঁহার উক্তি যদি বুঝিয়া থাকি, তবে তাহার অর্থ এই যে, অধিকতর মারাত্মক অস্ত্রের যুগ আরম্ভ হইল। যদি এমন সম্ভব হয় যে, আর কোন রাষ্ট্র কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারিবে না, তবে ভয়ে হোক, বাধ্য হইয়া হোক, যুদ্ধ স্থগিত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ সম্ভাবনার লেশমাত্র নাই। কারণ আগামীকাল হোক—কিছু পরে হোক মার্কিন মুলুকও উহা সৃষ্টি করিবে। তখন আবার বাধ্য হইয়া রাশিয়াকেও অধিকতর ধ্বংস-ক্ষম অস্ত্র আবিষ্কার করিতে হইবে। এইভাবে যতই অধিক-তর, নিপুণতর অস্ত্র উদ্ভাবিত হইতে থাকিবে, সর্বাত্মক যুদ্ধ ততই নিকটতর ও সর্বকাম্য শান্তি ততই দূরতর হইতে থাকিবে। ইহাই Weapon Diplomacy বা অস্ত্রের কূটনীতির পরিণাম। ইহার মতো পরম ব্যর্থ আর কি আছে জানি না। এই প্রসঙ্গে কথিত নেহরুর উক্তিকেই যথার্থ মনে হয়—কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও মানবসভ্যতার পশ্চাদ্‌গতি। বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতার গতির হেরফের যদি শীঘ্র দূর না হয় তবে যে সর্বাত্মক শোচনীয়তা মানবজাতির জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা আমাদের নাই।
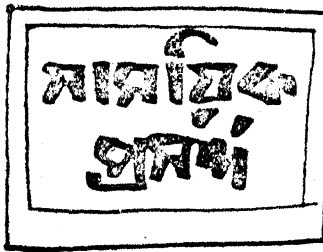
আধুনিক জগৎ ও আধ্যাত্মিকতা

টোকিও-র জনসভায় নেহরু বলিয়াছেন যে, বর্তমান চিন্তাসঙ্কটের যুগে নূতন চিন্তানীতির প্রয়োজন হইয়াছে। রাজ-নৈতিক 'ইজম' বা বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্র যে মানবসমাজকে রক্ষা করিতে পারিবে না তাহা তিনি স্পষ্টভাষায় জানাইয়াছেন। তাঁহার মতে চিন্তাধারায় আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন। এখন আধ্যাত্মিকতা শব্দটির প্রচলিত অর্থের প্রতি তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন না নূতন কোন অর্থে তিনি শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন জানা গেল না। কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি বান্দুং সম্মেলনে স্বীকৃত "পাঁচটি নীতি"র প্রতি আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়া-ছেন যে, এই পাঁচটি নীতি রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বীকৃত না হইলে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য। অনুমান করিয়া লওয়া অন্যায় হইবে না যে বান্দুং সম্মেলনে স্বীকৃত 'পাঁচটি নীতি' বা পঞ্চশীলকেই তিনি আধ্যাত্মিক উপাদান মনে করিয়া-ছেন। এখন আমাদের অনুমান যদি সত্য হয় তবে বলিব যে, আমরা যে অর্থে আধ্যাত্মিক শব্দটি বুঝি [illegible]

"পঞ্চশীলের" সহিত তাহার সম্বন্ধ সামান্যই। "পঞ্চশীল" মুখোশ মাত্র, মুখোশের মূল্য আর মুখের মূল্য এক নয়। রাম-রাবণের যুদ্ধে কথিত আছে যে হঠাৎ একটা রাক্ষস রামের ছদ্মবেশে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া সত্যই সে রাম হইয়া যায় নাই; যে-রাক্ষস সেই রাক্ষসই ছিল, বর্তমান যুযুধান যন্তুর রাষ্ট্রগুলি 'পঞ্চশীলের' মুখোশ পরিয়া সভাস্থ হইলেই কি সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া যাইবে? যে সব রাষ্ট্র রাতারাতি 'পঞ্চশীল' নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পরবর্তী আচরণে কি কিছুমাত্র প্রভেদ ঘটিয়াছে? তাহারা প্রকারান্তরে কখনো স্বনামে কখনো বেনামে 'পঞ্চশীলের' প্রত্যেকটি নীতি কি লঙ্ঘন করে নাই? দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই, অনুসন্ধান করিলে নেহরুজীর দপ্তরে দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। কাজেই 'পঞ্চশীল' যদি নেহরুর 'আধ্যাত্মিকতা' হয় তবে তাহাতে অবস্থার যে বিশেষ উন্নতি হইবে তাহা মনে হয় না। নেহরুজীর আন্তরিকতায় আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে—কিন্তু অন্যান্য যে-সব রাষ্ট্র ঘন ঘন 'পঞ্চশীলের' দোহাই দিয়া থাকে তাহাদের অনেকেরই মনোভাব সন্দেহজনক। আমাদের বিশ্বাস তাহাদের কাছে 'পঞ্চশীল' হইতেছে হিটলারের 'New-order', তোজোর 'Co-prosperity' এবং সোবিয়েৎ রাশিয়ার 'Co-existence'এর মতো একটি মনোরম মুখোশ মাত্র। মুখোশের মায়ায় লোক ভুলিতে পারে কিন্তু 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং—' ধর্ম লঙ্ঘনকারীর নিষ্কৃতি এত সহজ নয়। বর্তমান অস্ত্র সংকটের যুগে পণ্ডিত নেহরুর আন্তরিকতা একটি প্রধান ভরসার স্থল নিঃসন্দেহে, কিন্তু যুযুৎসুগণের যেরূপ মতিগতি দেখিতেছি তাহাতে বিশেষ আশার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি মনে হয় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত চিকিৎসালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও কর্মিগণের জন্য কলিকাতায় যে চিকিৎসাগারের ব্যবস্থা করিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহা বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। বস্তুত ছাত্রদের স্বাস্থ্যের যে অবস্থা বিভিন্ন সময়ে অনুসন্ধানের ফলে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে বহু পূর্বেই এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সমীচীন হইত। দেখা গিয়াছে, তরুণ বয়সেও সম্পূর্ণ নীরোগ ছাত্রের সংখ্যা স্বল্প, বহুল অংশই কোনো-না-কোনো পীড়ায় আক্রান্ত। তিন লক্ষ টাকা ব্যয়সাপেক্ষ বর্তমান প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও কর্মীদের পক্ষে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা সহজ হইবে, সাধারণ ব্যাধির ঔষধপত্রও বিনামূল্যে তাঁহারা পাইবেন।

এই ব্যবস্থাকে বৃহত্তর ছাত্র স্বাস্থ্য মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সূচনা বলিয়া ধরাই সঙ্গত; বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে পূর্ণাঙ্গ একটি বা একাধিক হাসপাতাল স্থাপনা করিবারই প্রয়োজন আছে, যেখানে ভর্তি হইয়া ছাত্র ও কর্মীরা চিকিৎসার সুযোগ লাভ করিতে পারেন; বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে সচেতন ও চেষ্টিত আছেন। আমাদের ভরসা আছে, শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ এজন্য অর্থের অভাব ঘটিতে দিবেন না; কথাটা বহুবার উক্ত হইলেও সত্য যে, অনাগত এই ছাত্রসমাজের হস্তেই ভবিষ্যৎ অগ্রগতির রথ-রশ্মি বিধৃত!

রাষ্ট্রভাষা ও রাজাজী

রাজাজী এক সময়ে, ১৯৩৭ সালে যখন তিনি মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, হিন্দী ভাষার সমর্থক ছিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশে হিন্দী ভাষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রচেষ্টা তৎকালে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সে-হেন রাজাজী যখন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার পদবীদানের বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন, তখন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য হইয়া ওঠে। তিনি কিছুদিনের মধ্যে একাধিকবার এই প্রসঙ্গে মত প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি ৩০শে সেপ্টেম্বর আর একবার হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দীকে দেশের সরকারী ভাষা হিসাবে গণ্য করিবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতের যেকোন রাজ্যেরই 'ভেটো' দিবার ক্ষমতা থাকা উচিত। আমরা এ বিষয়ে আগেও আলোচনা করিয়াছি, পরেও আবার করিব, তাই আজ শুধু রাজাজীর অভিমতের উল্লেখ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

কংগ্রেসী কর্মসূচী ও কম্যুনিস্ট

বাঙ্গালোরের এক জনসভায় কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট কর্মসূচীর মধ্যে পার্থক্য কি, এই প্রশ্নের উত্তরে কেরলের অর্থমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুত মেনন বলেন যে, কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট কর্মসূচী প্রায় একরূপ হইলেও শাসন-পার্থক্য আন্তরিকতায়। অর্থাৎ কেরলের অর্থমন্ত্রী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কেরলের কম্যুনিস্ট সরকার কংগ্রেসী কর্মসূচীটাই অনুসরণ করিতেছেন, তবে কি না তাঁহাদের আন্তরিকতা কংগ্রেসীদের চেয়ে অনেক বেশী। আমাদের মতো স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন সাংবাদিকের পক্ষে কর্মসূচীর আলোচনাই সম্ভবপর—অন্তরের আলোচনা আমাদের সাধ্যের বাহিরে, বিশেষ সে অন্তর যখন কম্যুনিস্টগণের। কর্মসূচীর অভেদ স্বীকার করিয়াও কেবল অন্তরের জোরে জনগণের উন্নতি সাধনের নাম 'মনসা মথুরাং ব্রজেৎ'। কম্যুনিস্টগণের মথুরা কোথায় কে জানে। অথবা কে না জানে!

ভারতীয় লেখক-সম্মেলন

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নানা ব্যাপারে নানা সম্মেলন মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন ভাষার লেখকবৃন্দ বড় একটা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগ পান না। সেই সুযোগ দানের জন্যই আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষে কলিকাতা শহরে ভারতীয় লেখকবৃন্দের এক সম্মেলন আহ্বানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সংবাদটি আনন্দদায়ক। যে সাধু উদ্দেশ্য লইয়া এই সম্মেলন আহ্বান করা হইতেছে, তাহাতে আমরা সুখী হইয়াছি। আরও সুখী হইয়াছি এই কারণে যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে পবিত্র কলিকাতা নগরীতেই সর্বপ্রথম এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইল।

ভারতবর্ষ এক বিপুল দেশ; স্মরণাতীত কাল হইতে নানা ভাষা, নানা সাহিত্য এবং নানা শিল্পশৈলীকে এ-দেশ সযত্নে লালন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সাধনা যেহেতু ঐক্যেরই সাধনা, সাংস্কৃতিক জীবনের সেই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যেও সুদৃঢ় এক ঐক্য-সূত্র রক্ষা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হয় নাই। বৈচিত্র্য এ-দেশে ঐক্যের পরিপন্থী নহে, ঐক্যের অনুকূল। বস্তুত অতিশয় রুক্ষরুচি বৈদেশিক সমালোচকবৃন্দও ভারতীয় ভাবজীবনের অন্তঃস্থ যে প্রসন্ন ঐক্যের প্রতি সবিস্ময় শ্রদ্ধা অনুভব না করিয়া পারেন নাই, সেই ঐক্যের মৌল রহস্য হয়ত সাংস্কৃতিক এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিহিত হইয়া রহিয়াছে। অনতিকালের মধ্যেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষার লেখকবৃন্দ প্রস্তাবিত সম্মেলনে আসিয়া সমবেত হইবেন,—পরস্পরের ভাবধারার, চিন্তাধারার পরিচয় গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের এই ভাব-বিনিময়ের ফলে ভারততীর্থের ঐক্য-ভাবনা যে আরও দৃঢ়, আরও সংহত হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

[উনিশ]

জাফরানের যে জীর্ণ কপাট বাঘা নেকড়ের থাবার আঘাত সহ্য করতে গিয়ে নড়বড় করে, সে কপাট ভেঙ্গে দু টুকরো করে ফেলতে কতটুকুই বা জোরের দরকার?

কিন্তু আর কোন জোরের দরকার হয় না। ঘরের ভিতরে রেড়ির তেলের মেটে বাতির আলো জ্বলে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় কপাট। দরজার চৌকাঠের কাছে বাতিটাকে রেখে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় মুরলী।

মুরলীর আদুড় শরীরের উপর শুধু দেড় হাত বহরের একটা মোটা খেরো শাড়ির আবরণ, এক পাক দিয়ে জড়ানো একটা বিচিত্র শিথিলতা। রেড়ির তেলের মেটে বাতির শিখাটা নেচে নেচে জ্বলে, সেই সঙ্গে মুরলীর মুখের উপর এক অদ্ভুত হাসির শিখাও যেন জ্বলে জ্বলে নাচে। দেড় বোতল সরাবের নেশায় টলমল চৌধুরীজীর নতুন পিপাসার সব আক্রোশের উপর যেন একটা বিস্ময়ের কুহক ছড়িয়ে দিয়েছে মুরলীর এই মূর্তি; চৌধুরীজীর চোখে পলক পড়ে না। রামাই দিগোয়ারও কথা বলতে ভুলে যায়।

কথা বলে মুরলী। আস্তে ঘাড় দুলিয়ে সড়কের অন্ধকারের দিকে একবার তাকায়, তারপর মুখ ফিরিয়ে আর ভুরু বাঁকা করে বাতিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরেই ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দূরে আকাশের তারার মত একটা মিটিমিটি হাসি মুখের উপর ফুটিয়ে তুলে চৌধুরীজীর মুখের দিকে তাকায় —কি যে শুনলাম, কি যেন দেখবে বলে তুমি এখনি কসম খেলে চৌধুরীজী?

চৌধুরীজী—আঁ? কিসের কসম?

—কি দেখতে ইচ্ছা হয়েছে? আমার গতর ভাল, না গতর ভাল?

গলা কাশে চৌধুরীজী, রামাই দিগোয়ার ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। আর সদ্য কোমরের উপর যেন একটা মস্ত মুদ্রের ঢং হঠাৎ মোচড় দিয়ে দুলিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে মুরলী—আমার গতর ভাল, গতরের ভাল কিন্তুক......।

চৌধুরীজী বিড়বিড় করে—তুমি রাগ করো না সরদারিন।

মুরলী—কেনে রাগ করবো না বল? যে লোক মেইয়ামানুষের সাথে কথা বলতে জানে না, মেইয়ামানুষের মন বুঝে না, সে লোক এখানকে আসে কেনে?

চৌধুরীজীর গলার স্বর আরও মৃদু হয়ে যেন অনুনয় করে —উসব কথা ভুলে যাও সরদারিন। তুমি এখন খুশি হয়ে দুটো কথা বল।

হেসে ছটফট করে দু' পা পিছনে সরে গিয়ে ভাঙ্গা খোঁপাটাকে শক্ত করে জড়িয়ে বাঁধতে চেষ্টা করে মুরলী। —খুশি কর, তবে তো খুশি হব।

চৌধুরীজী—কি চাও বল?

মুরলী—সরাব কই? শাড়ি কই?

চৌধুরীজী কুণ্ঠিতভাবে হাসে—সব দিব। সব দিব।

মুরলী—কিরিয়া কর।

চৌধুরীজী—কিরিয়া করছি।

আবার ভুরু বাঁকিয়ে আড়চোখে তাকিয়ে হেসে ওঠে মুরলী—তুমার চৌধুরাণীর জোয়ানির কিরিয়া?

চৌধুরীজী এইবার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, আর চোখের চাহনিটা টলমল করে। —আরে হাঁ, তাই বটে। তু বড় বেশি নখড়া জানিস সরদারিন।

মুরলী—আমিও কিরিয়া করলাম।

চৌধুরীজী—কিসের কিরিয়া?

আঁচল তুলে মুখে চাপা দিয়ে কেঁপে ওঠে মুরলী। —সব দিব।

ব্যস্তভাবে ডাকে চৌধুরীজী—রামাই।

রামাই—হুজুর।

চৌধুরীজী—তু এখন তবে...।

রামাই—আমি ভাণ্ডারে চললাম হুজুর। আপনি এখানকে থাকেন।

আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে মুরলী—আজ নয় চৌধুরীজী।

চমকে ওঠে চৌধুরীজী—আঁ, কি বটে? কি বললে সরদারিন?

মুরলী—আজ নয়; এখানকেও নয়। আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

চৌধুরীজী বিড় বিড় করে—নিয়ে যেতে হবে?

চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—হ্যাঁ, যেখানকে নিয়ে যাবে সেখানকে যাব। আমাকে ঘর দিবে, শাড়ি দিবে, সরাব দিবে, সুখে রাখবে। মেইয়া মানুষের মন বুঝতে পার না, কথা বল কেনে?

চৌধুরীজী ডাক দেয়—রামাই!

রামাই—বলেন হুজুর।

চৌধুরীজী—সরদারিন ভাল কথা বলেছে রামাই।

রামাই—খুব ভাল কথা বটে। এমন গতর, এমন সুরত, আর এমন মিঠা বলন, ই মানুষ বিরসের ঘরে থাকবে কেনে? কোন্ সুখে? দশটা মাস যায় ইয়ার কোন্ ইজ্জৎটা হয়?

চৌধুরীজী—তবে কোলিয়ারির বাজারে একটা ঘর দিয়ে দিতে হয়।

রামাই—তাই হয় হুজুর।

মুরলীর দিকে দু'পা এগিয়ে আসে চৌধুরীজী—বল, কবে যাবি সরদারিন?

দু' পা পিছিয়ে সরে যায় মুরলী—অমন হুকুম করলে যাব নাই। ভয় দেখালে যাব নাই।

চৌধুরীজী বিচলিত হয়—না না, হুকুম করছি নাই, ভয় দেখাচ্ছি নাই। আমি তুকে সাধছি সরদারিন।

যেন রূপের গরবে আর অভিমানে ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী—আমাকে পায়ে ধরে সেধে নিয়ে যাবে, তবে যাব। তা না হলে যাব না, মেরে ফেললেও না।

কাঁপতে কাঁপতে আরও এক পা এগিয়ে যেয়ে মাটির উপর উবু হয়ে বসে পড়ে চৌধুরীজী; আর ব্যাকুলভাবে হাত দুটোকে ছড়িয়ে দিয়ে মুরলীর দু' পায়ের পাতা ছুঁয়ে ফেলে। —আমি সাধছি সরদারিন।

আবার খিলখিল করে হেসে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সরে যায় মুরলী। —ঢের হয়েছে। এবার ঘরকে যাও, আর......।

চৌধুরী—বল সরদারিন।

মুরলী—আর কি, একটা খবর দিয়ে কালাদা থেকে আমার বাপকে নিয়ে এস।

চৌধুরীজী—শুনলে তো রামাই।

মুরলী—আমার বাপ, মহেশ রাখাল।

এইবার সত্যিই ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে,

মুরলী—বুড়া বাপের সাথে একবার দেখা না করে আমি যেতে পারবো না।

রামাই—চুপ কর সরদারিন। আমি বলছি, কালই তুমার বাপকে ঝালদা থেকে আনা করাই......।

চৌধুরীজী—সে তো হলো, তারপর?

মুরলীর চোখমুখ আবার প্রসন্ন হয়ে ওঠে, আর ঠোঁটের ফাঁকের সূক্ষ্ম হাসিটাও দূরের তারার আলোর মত আবার মিটমিট করে কাঁপে। —তারপর আর কি? তুমরা খবর দিও, কবে যেতে হবে।

রামাই বলে—বাস, এইবার চলেন হুজোর।

চৌধুরীজী মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে ডাকে—সরদারিন। ভাল গমর দেখলাম, কিন্তুক......।

মুরলী—কি?

চৌধুরীজী—কানে কানে একটা কথা বলতে চাই। শুনবি?

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে মুরলী—আর কোন কথা বললে আমি আবার কোঁদে ফেলবো গো বাবু। আজ আর কিছু শুনবো নাই।

ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর ঢোকেই দরজা বন্ধ করে দেয় মুরলী। রেড়ির তেলের মেটে বাতিটাও এক ফুৎকারে নিভে যায়।

খুট খুট, ঠক ঠক, টুং টুং, মোড়ার খুরের শব্দ সড়কের বুকের উপর টোকা দিতে দিতে চলে যাচ্ছে। সে শব্দ শুনতে শুনতে খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর যেন আছাড় খেয়ে পড়ে মুরলী, আর মেজের মাটির উপর কপালটাকে ঘষে ঘষে ছটফট করতে থাকে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীরটা যেন একটা যন্ত্রণার জ্বালায় জ্বলছে।

পুরনো জামকাঠের এই নড়বড়ে কপাট, আর এই মাটির ঘর; দাশু ঘরামি নামে একটা দাগীর ঘর। বাইরের অন্ধকার থেকে যে-কোন সাপ আর বাঘ এই ঘরের ভিতরে ঢুকে দাগীর ঘরণীর মাংস গিলে খাবার জন্য হাঁ করবে। অসহ্য। এই মুহূর্তে এই ঘরের মাটির উপর থুতু ফেলে দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছা করে।

না, এখনই চলে যাওয়া যায় না। খবর পেয়ে ঝালদা থেকে চলে আসবে বুড়া মহেশ বাঘাল। তার পর আর এক মুহূর্ত দেরি করবে না মুরলী। বাঁচতে হবে, পেটের ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে; কয়লা খাদের মালকাটা দশ্য পরে ঘরে ফিরে এসে দেখুক, ভাত নাই, মান নাই আর কোন সুখের আশা নাই যে ঘরে, সে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে মুরলী।

স্তব্ধ রাতের বাতাসে অনেক দূর থেকে কাদের বাঁশির ক্ষীণস্বরের কাঁপনি যেন ভেসে আসছে। কয়লাখাদের কাজের ধাওড়া আজ এই রাতে [illegible] কাঁদিয়ে কাঁদছে [illegible] [illegible] যায় না। খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর শুয়ে চোখ [illegible] দিয়ে তেমনি উপুর

যেন একটা আতঙ্কের ছবি দেখে আবার ছটফট করে মুরলী। কি ভয়ানক ছবি। কালো লেংটি পরা, সারা গায়ে কয়লার ধুলো, চোখের চারদিকে ঘামে ভেজা কয়লা-গুঁড়ো কাদা হয়ে রয়েছে, আর কাঁধে একটা গাঁইতা, একটা ভয়ানক জীব এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিচ্ছে—কপাট খোল মুরলী।

মুরলীর বুকের পাঁজরগুলি যেন একটা প্রচণ্ড শাস্তির রূপ দেখে শব্দ করে চমকে ওঠে। কানের কাছে একটা ঠাট্টার হাসিও যেন বাজছে। হাসিটা পলুস হাজদারের হাসি। —কি মুরলী, আমাকে চোর বলে গালি দিয়ে ভাগিয়ে দিলে, তবে এখন কাঁদ কেনে? এখন হাস না কেনে? সুখ কর না কেনে?

খেজুর পাতার চাটাই ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় মুরলী। বাতি জ্বালে। খাটিয়ার তলা থেকে টিনের তোরঙ্গটাকে টেনে আনে। দেড় শত বছরের মোটা খেরো শাড়িটাকে এক টানে নামিয়ে ফেলে। নীল রং-এর শাড়ি, কি মোলায়েম আর মিহি জমিন! গোলাপী রং-এর ব্লাউজ। লেসের ঝালর লাগানো সায়া। যেন জীবনের সব চেয়ে বড় সাধের ইচ্ছার অভিসারে এখনি ছুটে চলে যেতে চায় মুরলী। মিস্টার দিদি যেমনটি সাজ করতে শিখিয়ে দিয়েছেন, নিজের হাতে মুরলীকে যে সাজে কতবার সাজিয়েছেন, সেই সাজে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে আয়নাটাকেও মুখের কাছে তুলে ধরে মুরলী। চিরুনি চালায়, বড় করে খোঁপা বাঁধে। লেস্টানো বিছানাটাকে

ঘরের এক কোণ থেকে তুলে নিয়ে এসে খাটিয়ার উপর পাতে। নরম তুলোর তোষক, আর বালিস, আর চাদর। পুঁটলী করে বাঁধা সেলাই-কলটাকে এই কদিনের তুচ্ছতার বেদনা থেকে মুক্তি দেবার জন্য, আবার হাতের কাছে টেনে নেয়। গাটরি করে বাঁধা লেস-গুলিকেও হাতের কাছে রাখে।

ঘর্‌ ঘর্‌, ঘর্‌ ঘর্‌—কল চালিয়ে কাপড়ের টুকরোর উপর সুতোর নক্সা আঁকে মুরলী। ঘর্‌ ঘর্‌, ঘর্‌ ঘর্‌, গোরো মধুকুপির যত দীনতা আর হীনতার বিরুদ্ধে গরগর করে যেন নতুন আক্রোশের গান গেয়ে ওঠে মুরলীর প্রাণের ফিরে-পাওয়া স্বপ্নটা।

পিলার কাটাই! এক্সরা ব্রাদার্সের কয়লা-খাদের ভিতরে ও বাইরে একটা ব্যস্ততার মহোৎসব।

বিকাল থেকে পিলার কাটাই শুরু হয়েছে। সন্ধ্যা পার হয়ে রাতেরও প্রায় আধ প্রহর পার হয়ে গিয়েছে। হাঁফিয়ে করে করে হয়রান হয়ে যাচ্ছে টিকোয়ান। অফুরাণ ক্ষুধার আবেগে খাদের গভীরে নেমে যাচ্ছে খালাসদের টব-গাড়ি, আর এক একটি বিরাট হাঙরের উদর ভর্তি করে চাপ চাপ কয়লার টুকরোতে পরিপূর্ণ হয়ে উপরে উঠে আসছে। ম্যানেজার নিজে খাদের ভিতরে গিয়ে পিলার কাটাই-এর ব্যবস্থা তদারক করে গিয়েছেন। আজ সব ব্যাপারেই অতিরিক্ততা। অতিরিক্ত সংখ্যায় মালকাটা লাগানো হয়েছে। অতিরিক্ত টবগাড়ি ছাড়া হয়েছে। টবের হিসাব করবার জন্য দুজন অতিরিক্ত মুন্সী খাদের নীচে নেমে গিয়েছে। একজনের জায়গায় তিন জন ওভারম্যান কাজে নেমেছে। ফার্স্ট এড্‌ সরঞ্জাম নিয়ে ডাক্তারও খাদের ভিতরে নেমেছেন।

নীথলা সাতের আগতে আর মাস নেই; পাথরের ফাড় দেখা দিয়েছে। সেইখানে আজ পিলার কাটাই-এর মহোৎসব। ছাড় কয়লার যে-সব পিলার পাথুরে ওভারবার্ডেন মাথায় নিয়ে চুপ করে সারি সারি দাঁড়িয়ে ছিল, তারই উপর আছাড় খেয়ে পড়ছে শত শত গাঁইতার কোপ। কয়লা-গুঁড়োর ঝটকা উড়ছে, হাজার শাপের রোষা নিয়ে ঠেকানো পাথুরে ছাদের একটা অন্ধ আক্রোশের ভার পট্‌ পট্‌ করে শব্দ করে ফাটছে। মাঝে মাঝে বিদীর্ণ পাষাণের শব্দ রাক্ষুসে হুঙ্কারের মত ফেটে পড়ে। মাল-কাটার বুকের পাঁজর কেঁপে উঠলেও মাল-কাটার হাতের গাঁইতার দুঃসাহস একটুও বিচলিত হয় না। পিলারের উপর কোপ দিয়ে কয়লার এক-একটা প্রকাণ্ড চাঙড় টেনে এনে টব বোঝাই করে ফেলে। যে টব বোঝাই করতে অন্যদিন চার ঘণ্টা লাগে, সে টব আজ এক ঘণ্টায় ভরে ফেলছে

এক-একজন মালকাটা। আজকের রোজগারের আশাও যেন একটা ভয়ানক নেশা; লুঠেরা ডাকাতের মত যেন হিংস্র হয়ে আর মরিয়া হয়ে একটা ভাণ্ডার লুঠ করছে মালকাটার দল। তারই মধ্যে দেখা যায়, সব চেয়ে বেশি উগ্র উৎসাহ আর দুরন্ত দুঃসাহসের নেশায় মরিয়া হয়ে গাঁইতা চালিয়ে যাচ্ছে মধুকুপির কিষাণ দাশু ঘরামি।

সরদার হাঁক দেয়—খবরদার। দাশু ঘরামি খবরদার। আর আগে যাবে না, খবরদার।

কিন্তু দাশু বোধহয় শুনতে পায় না। মজুরী লুট করবার এই প্রচণ্ড মহোৎসবে যেন মন-প্রাণ লুটিয়ে দিয়ে গাঁইতা চালিয়ে যাচ্ছে দাশু। এরই মধ্যে পাঁচ টব বোঝাই করে ফেলেছে দাশু; কিন্তু তবু শান্তি নেই। জিরোতে চায় না দাশু।

ছাদ ফাটে, কালো ধুলোর ঝটকা ছোটে। শালের খোঁটা ছিটকে পড়ে, আর মাথার উপরে অন্ধ পাথরের ভার গুমরে গুমরে আরও কাছে নেমে ঝুলতে থাকে। সরদার হাঁক দেয়—খবরদার।

এর বার হুঁশিয়ারী দাগ এক লাফে ডিঙিয়ে গিয়ে ছাদের পিলারের চাপড়া চাঁচছে দাশু। চিৎকার করে ধমক হাঁকে সরদার—মরবি নাকি রে দেহাতী গাধা। দাশুর গাঁইতার উপর লাঠি মেরে দাশুকে ধাক্কা মেরে পিছনে সরিয়ে দেয় সরদার। চুপ করে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে দাশু।

সেই মুহূর্তে আতঙ্কিত হয়ে হাঁক ছাড়ে সরদার—গাঁইতা রোকো, মালকাটা। পিছু হটো, মালকাটা। চিবরি নিভাও মালকাটা। দূরে ছাড়ো বাইরে ভাগো মালকাটা!

বেজে উঠেছে গ্যাসবাবুর হুইসিল। গ্যাস দেখা দিয়েছে। আতঙ্কের হুইসিলটা বাজতে বাজতে সুঁদের মুখের দিকে চলে যায়। চিবরি নিভিয়ে দিয়ে ওভারম্যানের সেফটি ল্যাম্পের সংকেতের দোলানি লক্ষ্য করে মালকাটার দল ছুটতে থাকে।

কিন্তু একটা মিনিট পার না হতেই দখিনা সুঁদের অন্ধকারময় বিরাট রন্ধ্রটা যেন গুমরে ওঠে; আর, একটা প্রচণ্ড হাওয়ার ঝাপ্টা ছুটে চলে যায়। মুখ থুবড়ে পড়ে যায় কয়েকজন মালকাটা। গ্যাসের হাওয়া ফেটেছে।

তারপরেই খাদের মুখের কাছে সাইরেনের করুণ আর্তনাদ শিউরে শিউরে বাজতে থাকে। খোলা ডাঙা পার হয়ে দূরের মধুকুপির বড়কালুর আর ছোটকালুর মাথার উপর দিয়েও এই আতঙ্কের ক্ষীণ স্বর ভেসে চলে যায়। মাথা গুণতির পর দেখা গেল, চারজন মালকাটা নেই। দাশু ঘরামি নামে একজন, আর জামুনগড়ার তিনজন দেহাতী মালকাটা।

দুশ্চিন্তিত ম্যানেজার বিচলিত স্বরে হাঁকডাক করেন—রেস্কু! রেস্কু!

টর্চ দড়ি স্ট্রেচার আর জল নিয়ে খাদের ভিতরে নামবার জন্য যে রেস্কু পার্টি তৈরী হয়, তাদেরই একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে ম্যানেজার বলেন—এক শো টাকা বকশিস দেব পলুস।

পলুস বলে—বহুৎ আচ্ছা সার।

কে না জানে, কলঘরের বড় মিস্ত্রির এই পলুস হালদার এর আগে তিনবার এই খাদেরই তিনটে দুর্ঘটনায় রেস্কুর কাজ করেছে। তিনবার বকশিস পেয়েছে কলঘরের বড় মিস্ত্রির পলুস হালদার।

(ক্রমশঃ)

তাঁকে। ব... প্যাঁটরা গুছিয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন বরানগরে।

ফিরে এলেন তিনি প্রায় তিন মাস পরে। তাও ...নি নয়, বিমলের ছেলে হওয়ার খবর পেয়ে। বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে তিনি অবাক। তাঁর সাধের ঝিঙে আর লাউডগার বাগানের চারপাশ দিয়ে কচি বাঁশের সুন্দর বেড়া। গেলেন সুতপার ঘরে। ফুটফুটে নাতীকে নিলেন কোলে তুলে। বিমল এসে ঢুকলো গরদের থান নিয়ে। আনন্দে সুনয়নী

দেবীর চোখের দুই কোণে জল চিকচিক করে উঠল। সুতপা বিছানা থেকে ক্ষীণস্বরে বলল—"মা তোমায় আর কখনও বাড়ী ছেড়ে যেতে দেব না।" সুনয়নী দেবী তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "কি ভয় নিয়েই ফিরেছিলাম মা, হয়তো দেখব বাড়ীঘর সব ছারখার হয়ে গেছে—কিন্তু কি লক্ষ্মীশ্রী সারা বাড়ী জুড়ে, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—না মা কোথায় যাব এমন বৌ-নাতী ফেলে?"

এক দিন শুধু তিনি সুতপাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কি করে এত গুছিয়ে চালালে তুমি মা?" সুতপা বলল—"মা খরচ কত দিকে বাঁচাই দেখুন! উনি আগে আপিসে পয়সা খরচ করে আজে বাজে খাবার খেতেন, এখন বাড়ী থেকে টিফিন বাক্সে আমি ওঁর খাবার দিই। এতে খরচ অনেক বাঁচে, আর খাওয়াটাও ভাল হয়। ঠিকে চাকরটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি— কাপড় কাচা, বাসন মাজা এসব কাজ আমি আর ঝি ভাগাভাগি করে করে নিই। আর সব চেয়ে বেশি সাশ্রয় করেছি খাবারে। আগে আপনি ঘি কিনতেন অত দামে—আর সে ঘি'ও সব সময় ভাল হোত না। আমি ঘিয়ের বদলে কিনি ডালডা মার্কা বনস্পতি। ডালডায় ঘিয়ের সমান ভিটামিন 'এ' থাকে। ভিটামিন 'এ' চোখ আর ত্বক সুস্থ রাখে। আর থাকে ভিটামিন 'ডি' যা হাড়কে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ডালডায় রাঁধা সব খাবারই অত্যন্ত মুখরোচক হয়। এই সব কারণেই এবং স্বাস্থ্যদায়ক বলেই ডালডা আজ আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে। ডালডা "শীল" করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে সব সময় খাঁটি ও তাজা পাওয়া যায়। তাছাড়া ডালডায় ভেজালের কোন ভয় নেই কারণ খাঁটি ডালডা সব সময় পাওয়া যায় খেজুর গাছ মার্কা টিনে।"

সুনয়নী দেবী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁর কলেজে পড়া বৌয়ের দিকে।

কেন?

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

তোমার দু চোখ থেকে দূর করো আলোর ইশারা
উন্মত্ত কপোল থেকে মুছে ফেল বসন্তের ঠাট,
পত্রলেখা তুলে নাও, বন্ধ করো মনের কপাট—
ব্যাকুল প্রেমের ভূত ঘুচুক না ব্যর্থ দিশাহারা।
আকাঙ্ক্ষাত তূণ থেকে সুনিশ্চিত নিপুণ বিশিখ
হেনো না হেনো না এই রোদে পোড়া ক্ষুধার কংকালে।
যে বনে বসন্ত নেই সেখানে কি মিথ্যা রংজালে?
ফুল ছুঁড়ে ভুল কেন? অন্ধকারে নিভেছে প্রেমিক।

প্রেম? সে ত' পলাতক, বহুদিন ফেরারী আসামী।
বসন্তের ধ্বজা হাতে বন থেকে বনান্তরে বসিয়েছে হাট।
কি এক প্রসন্ন চিঠি সম্বোধনে কি যেন কি পাট
মৃতপত্র তরুতলে রেখে গেছে সোনালী বাদামী
থোকো থোকো ঝরা ফুলে, কবেকার সোহাগ-মদির
হৃদয়-ঐশ্বর্য দিয়ে মরা মনে কেন এই তীর?

দীঘার সমুদ্র তীরে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

উজ্জ্বল আলোর ঢেউ ভেঙে পড়ে বিস্তৃত সৈকতে
অসহ উচ্ছ্বাসে বেগে। যেন কোনো আদিম প্রেমিক
দুই হাতে আলিঙ্গনে মৃত্তিকাকে ধরে' রাখে স্রোতে
সংবর্তের ঝড়ো দিনে। দূর নীলে উড্ডীন নির্ভীক

সমুদ্র-পাখীরা ব্যস্ত মাছের সন্ধানে। জলে-জলে
সাদা ফেনা মুখময় সূর্যের রশ্মিরা দৃপ্ত হাসে;
নিপুণ শিকারী জেলে মাছ তোলে নৌকায় কৌশলে,
তীরে দীর্ঘ ঝাউবন ডানা মেলে ধূসর আকাশে।

বৃদ্ধ শিশু মহিলারা দৃপ্তবুক যুবকেরা কিছু
দীঘার সমুদ্রতীরে খোঁজে সাহসের সচ্ছলতা
উদ্দাম জলের স্নানে। এমন কি জিপ গাড়ী ক'রে
সৈকতেও ঘোরে কেউ,—সমস্ত নীলিমা আজ নীচু

সমুদ্র-শরীর ঘিরে,—মুঠি ক'রে এই উচ্ছলতা
স্তিমিত হৃদয়ে মেখে ফিরে যাই শান্ত নভেম্বরে॥

নিমজ্জন

সাধনা চট্টোপাধ্যায়

আমি ডুববো সবুজ পাতার রহস্যে,
ফুলের বুকের লোহিত ও পীত সুষমায়
আমি ডুববো দুপুর রোদের আলস্যে,
বিকেল বেলার ব্যাকুল সুরের মূর্ছনায়।

আমি ডুববো তারার হীরা-অরণ্যে,
বিষাদ মাখা ছায়া নিবিড় সন্ধ্যাতে
আমি ডুববো পূর্ণ চাঁদের লাবণ্যে,
উদীয়মান ভোরের আলোর বন্যাতে।

আমি ডুববো শ্রাবণ মেঘের উৎসবে,
শিরীষ ফুলের আকুল-করা সুগন্ধে,
আমি ডুববো নীল আকাশের অর্ণবে,
মৌন বনের বিশাল ঘন আনন্দে।

আমি ডুববো, বিলীন হব, আমার হারিয়ে যাবে ভাষা,
হয়তো তবু শান্ত হবে প্রেমের এ জিজ্ঞাসা।

সদ্যতো সকাল। ভোর খানিকক্ষণ আগে পেরিয়ে গেছে। কাজকর্মের হৈ-চৈ শুরুর এখনো কিছুটা দেরি। যেন সারারাত ঘুমিয়ে সকাল বেলাতেও অবসাদ থেকে দেহ সম্পূর্ণ মুক্ত হয়নি—কদমতলার রাস্তার চেহারা অনেকটা ঐ-রকম। সব দোকানের ঝাঁপ খোলে নি। গোপীনাথ স্টোর্সের দরজা এই একটুক্ষণ হলো খুলেছে। বড়ভাই তখনো রেডিওর ওপরে রাখা গণেশ মূর্তিটির পায়ে গাঁদা ফুল ছুঁইয়ে কী বিড়-বিড় করছে আর ছোটভাই সকালের খরিদ্দারদের দুয়েকটা জিনিস দিচ্ছে। রিক্‌শাঅলারা রিক্‌শা ঝাড়‌্পোঁছ করছে। রামবিরিজ এতক্ষণ ওর উনুনটা.. হাওয়া দিচ্ছিল। এইমাত্র তার ওপর পেতলের কলসীটা বসিয়ে দিয়েছে। সামনে হাসমৎ আলির বার-বাড়ির কুয়োর পাড়ে বসে দু-তিনজন বসে দাঁতন ঘষছে। একটু দূরে সিনেমা হলের পাশে হলচল কেবিনের বারান্দায় দু-চারজনের ভিড়। একটু পরে সিনেমার হাণ্ডবিল বেরুবে, তার ব্যান্ড বাজনাদাররা বসে বসে চা খাচ্ছে। স্ট্রীট পুলিসটাও স্থানে দাঁড়াবার আগে এককাপ চা, পান, সিগারেট ইত্যাদি খেয়ে নিচ্ছে।

সবকিছু মিলে যেন একটা মুখবন্ধকেই সূচিত করছে। অত্যন্ত ব্যস্ত, রৌদ্রদগ্ধ, ঘর্মক্লান্ত, আশা ও ব্যর্থতায় করুণ একটি দিনের মুখবন্ধ। পৃথিবী আরেকবার নিজের মেরুদণ্ডের চারপাশে ঘুরবে—তারই সূচনা। মানুষ আরেকবার ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমুতে যাবে—তারই ভূমিকা। বিয়েবাড়ির সামিয়ানা খাটানো হয়েছে—সামিয়ানাতলার ছায়ায় কিছু একটা শুরু হবার প্রতীক্ষা।

কিন্তু তখনই গোপীনাথ স্টোর্সে দাঁড়িয়ে যারা হাত পেতে জর্দা নিচ্ছিল বা জ্বলানো ডিমলাইট থেকে সিগারেট প্যাকেট-কাটা-টুকরো কাগজ দিয়ে আগুন নিচ্ছিল—তাদের হাতের জর্দাটা পড়ে গেল, কাগজের টুকরোটা ঠোঁটের সিগারেটের কাছে আনতে-না আনতেই ছিটকে গেল মাটিতে।

রিক্‌শাঅলাদের মধ্যে যারা আগে ঝাড়-পোঁছ করছিল, তারা সিটের ওপর উল্টোমুখে বসে পড়লো, আর যারা রামবিরিজের উনুনের সামনে বসে চা খাচ্ছিল, তারা লাফিয়ে ঘুরে গেল পেছন পানে। রামবিরিজ কেবল বললো—'সিয়া রাম সিয়া রাম।' যেন মাঝরাতের ভূতের ভয় তাড়াচ্ছে।

গোপীনাথ-স্টোর্স থেকে হলচল কেবিন পর্যন্ত ইতস্তত যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা সবাই মুহূর্তের মধ্যে রাস্তার দিকে পেছন ফিরে ঘুরে গেল।

নিমেষে শূন্য হয়ে গেল সমস্ত রাস্তাটা, যে-রাস্তাটা এতক্ষণ ধরে সারাদিনের জন্য তৈরি হচ্ছিল, যে-রাস্তাটা এতক্ষণ মুখর ছিল ছোট ছোট শব্দে, আলাপে, শূন্য রাস্তাটা পড়ে আছে—যেন কোন অতিথির আপ্যায়নের জন্য।

স্ট্রীট পুলিসটাও তার ছাতার ডাঁটের পাশ দিয়ে তাকিয়ে রইল সামনের কদমগাছের নি-পাতা আগডালের দিকে।

আর ঠিক তারই পর মুখভর্তি খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি নিয়ে এক ভদ্রলোক, মুগারঙের চাদরে গা-মাথা ঢেকে, মাথা-ছেঁড়া রঙ-চেনা-দায় কেডসের দিকে তাকাতে তাকাতে রাস্তাটা পেরিয়ে গেল, গুটিগুটি পায়ে, অত্যন্ত একা-একা, নির্বিকার, নিঃসঙ্গতার সঙ্গে—যে নিঃসঙ্গ নির্বিকারত্ব নিয়ে বিরাট মাঠে আর বাজারের গলিতেও

গোরু হাঁটে। এত নিঃশব্দে ভদ্রলোক রাস্তাটা পেরিয়ে গেল—পেছন-ফেরা অতগুলো লোক কেউ-ই টের পেল না। তবুও কেমো দেখে চোখ বুজে থাকা লোকের মতোই সবাই অনুভব করলো—লোকটা কখন বাঁদিকে মোড় নিয়েছে।

আবার প্রাণ এলো গোপীনাথ স্টোর্স থেকে হলচল কেবিন পর্যন্ত রাস্তার টুকরোয়, রামবিরিজের চায়ের আসরে, হাসমৎ আলির কুয়োতলায় আর রিক্শায় রিক্শায়।

গোপীনাথ স্টোর্সের সামনে দাঁড়িয়ে মুখে জর্দা ফেলতে ফেলতে এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক বললেন—'সক্কাল বেলাতেই শ্রীমুখ দেখলাম, না-জানি কী হয়।'

রিক্শার সিট থেকে নেমে, রামবিরিজের উনুনের কাছাকাছি গিয়ে একটা ইটের ওপরে ধপাস করে বসে পড়ে বাবুলাল একটা চরম হতাশার ভঙ্গি করে বললো—'দে ভাই বিরিজ, চাই-ই দে। শালা, আজ বত্রিশ-আঙুলিয়া দেখে সোকাল হোলো, দিনের বদনমে শালা মারো তিন জুতি।'

গোপীনাথ স্টোর্সের রেডিওতে সানাই দিনের ঘুম ভাঙাচ্ছে, রেডিওর ওপরে রোগা গণেশ মূর্তির সামনে ধূপদানির ধোঁয়ার শিখা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হচ্ছে।

দিনের আলো সকালের অস্পষ্টতা ঘোচাচ্ছে। রাস্তায় লোক-চলাচল বাড়ছে। আর সেই লোকটা পথ পেরোচ্ছে—কাঁচা-পাকা দাড়ি মুখে, মুগারঙের চাদর গায়ে, মাথা-ছেঁড়া কেড্স পায়ে। গোরু মাঠে যে-গতিতে চরে, পথে সেই গতিতেই হাঁটে। সেই লোকটা তেমনি একা-একা হাঁটে আর পথ পেরোয়। পথ, না মাঠ? কী পেরুচ্ছে, তা সে বোঝে না বোধ হয়। পথটাই তার কাছে মাঠের মতো মনে হয়। দুপুরের মাঠ। পায়ে হাঁটা পথ। সে একা যাত্রী। পথের শেষে দশকর্ম ভাণ্ডার। সে সেখান থেকে সোলার মুকুট কিনবে, পিদিম কিনবে, আরো অনেক বিয়ের টুকিটাকি। নমির বিয়ে। তার বড় মেয়ের। নাহলে শ্রীশ গাঙ্গুলী সকালে বেরোত না। সে বেরোয় না। মুগা-রঙের চাদরে গা-মাথা ঢেকে, মাথা নত করে যেতে যেতেও শ্রীশ গাঙ্গুলী বোঝে পথের দুপাশের চেহারাটা কীরকম হয়ে যায়। নিজের দুই হাতের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে অতিরিক্ত গজানো দুটো আঙুলকে সে যতোই ঢেকে রাখুক না কেন, পথ দিয়ে যেতে যেতে দু-চারবার অন্তত আদর-করে-ডাকা 'বত্রিশ আঙুলে' সম্বোধন তার কানে এসে পৌঁছুবেই। তাতে অবশ্য শ্রীশের কিছু যায়-আসে না। তাকে শ্রীশ গাঙ্গুলী বলে না ডেকে বত্রিশ আঙুলে বলে ডাকলেও সে জবাব দেয়, অবিশ্যি জবাবের যদি কোনো প্রয়োজন থাকে, হেসেই দেয়, খুব স্বাভাবিক হাসি। তবে শুধু শুধু লোকজনকে আর ক্ষেপিয়ে লাভ কি। তাই শ্রীশ বেরয় না, সকালে বেরয় না। সকাল নটা পর্যন্ত ছেঁড়া কাঁথার তোষক আর বউয়ের ছেঁড়া শাড়ির চাদরের ওপর একটা তেলচিটচিটে বালিশের মধ্যে বাঁ গাল আর আর বাঁ চোখের সবটুকু ডুবিয়ে দিয়ে, ছোট মেয়ে বিণ্টির তুলো-বেরোনো ছোট্ট বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে চুপচাপ পড়ে থাকে। চুপচাপ নিঃসাড় চেতনার ওপর দিয়ে তখন অনেক অনেক চিন্তার স্রোত বয়ে যায়। স্রোতের চেহারা দেখা যায় না। তন্দ্রার কুহেলিতে, সন্ধ্যার নদীর মতো, আবছা। নিজেকে নিয়ে শ্রীশ চিন্তা করে না। বউকে নিয়ে না। নমিকে নিয়ে না। বিণ্টিকে নিয়ে না। সংসার নিয়ে না। জগৎ নিয়ে না। কেবল সকালের নানারকম শব্দে বালিশ আঁকড়ে পড়ে থাকে, রাতের নানারকম শব্দ থেকে বাঁচবার জন্য যেমন শিশু বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। শিশু যেমন—একটা বিরাট পাহাড়ের ওপর থেকে হঠাৎ পড়ে গেল—এমন স্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যে শিউরে ওঠে, শ্রীশ তেমনি মাঝে মাঝে চমকে ওঠে, সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে যেন একটা না-দেখতে পাওয়া ভূতের দুপাশে আর সামনে পেছনে সির সির ভয় ছড়াতে ছড়াতে তার পেছনে ধাওয়া করেছে।

কোনো কোনো দিন অতক্ষণ শুয়ে থাকতে না পেরে, উঠে গিয়ে জানলার সামনে বসে। ঠাণ্ডা, ছায়ামধুর পথ, দুয়েকটা পথের কুকুর গাছের ছায়ায়, রিক্শার টুং-টাং, গোরুর ঘাড়ের ওপর বসে কাক ঘা ঠোকরায়, একজন ফেরিঅলা চেঁচাতে চেঁচাতে যায়। শ্রীশ ছোট ছেলের মতো, পথে-বেরুতে-মানা ছোট ছেলের আগ্রহ দুই চোখে নিয়ে দেখে। বহু ছোট বয়সে যেমন তাদের দেশের বাড়ির পুবদিকের তেঁতুল গাছটাকে দেখতো। প্রতি-দিন সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই দেখা যেত গাছটাকে। শীতে দেখতো গাছটার একেবারে গরম-কালের পুকুরের মতো চেহারা। জল-না-থাকা শুকনো পুকুরের হাঁ-করা ফাটা মাটির মতো মেঘ-না-থাকা আকাশের দিকে গাছটার নি-পাতা ডালগুলো ঝুলে রয়েছে। তেমনি বিস্ময় নিয়ে সকাল বেলায় পথ দেখে শ্রীশ।

আবার কোনোদিন জানলায় কাছে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতে ছিটকে চলে আসতে হয়। পথের ওপর দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে সিগারেট খাচ্ছে। একটি ছেলে জানলার দিকে মুখ করে, অপর-জন পেছন করে দাঁড়িয়ে আছে। এক মিনিট দেরি না করে জানলা থেকে সরে আসতো শ্রীশ। ও নিশ্চিত জানে, ছেলে দুটি পরীক্ষা করতে এসেছে। বাজি ধরেছে। একজন বলেছে বত্রিশ-আঙুলে অপয়া নয়। অপরজন বলেছে—নিশ্চয়ই। তারপর দাঁড়িয়ে আছে সাতসকালে শ্রীশের জানলায়। দেখা যাক, কী হয়।

আর সব পারে। এই পরীক্ষার সামনা-সামনি কিছুতেই শ্রীশ দাঁড়াতে পারে না। আগে পারতো। আগে দাঁড়াতো। ইচ্ছে করে দাঁড়াতো। নিজের বারোটা আঙুল দিয়ে শক্ত মুঠোতে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতো। 'দেখো, দেখো, দেখো।' তারপর, সারাদিন

নিজের মনে বলতো—এবারের পরীক্ষায় সে নিশ্চয়ই জিতে গেছে।

কিন্তু দাঁড়ায় না সেই ঘটনার পর থেকে। সামনের বাড়ির বিশ, সেবার আই-এ পরীক্ষা দিয়েছে। আর রেজাল্ট আউটের দিন সকাল বেলাতেই, শ্রীশের সংগে তার মুখোমুখি দেখা। শ্রীশ জানলায়। বিশ, ওদের বাড়ির কালভার্টে।

'কী বিশ, খবর পেলে?'

'না—দেখি কী হয়'—কোনোমতে জবাব দিয়ে বিশ, দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। আর শ্রীশ গাংগুলী সারাদিন ধরে কার কাছে যেন প্রার্থনা করতে লাগলো—বিশ, পাশ করুক, বিশ, পাশ করুক। বিশ, পাশ করলে যেন সে-ও পাশ করবে। সে-ও বাঁচবে।

সন্ধ্যাবেলা শুনলো—বিশ, ফেল করেছে। মা-খেয়েই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে শ্রীশ। একবার উঠে তার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আঙুল থেকে খুলেছে রূপার আংটিটা—মস্ত বড় কালো পাথর বসানো। কবে কোন্ কালে এক জ্যোতিষ ঠাকুর দিয়েছিল। আংটিটা নিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে ছুড়ে দিয়েছে। এতদিন আংটিটা তাকে ধোঁকা দিয়েছে। আর সে ধোঁকায় ভুলবে না। তারপর জানলা ছেড়ে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবেছে—আংটিটা দিয়েছিল কলকাতার এক জ্যোতিষ ঠাকুর—বিশ কি পঁচিশ বছর আগে। সে-ই বেঁধে দিয়েছিল। আর কিছু মনে নেই। কেবল এটুকু—আংটি নেবার আগের রাতে কী একটা ঘটেছিল, সে ব্লেড হাতে ছাদে উঠেছিল—আঙুল দুটোকে কেটে ফেলবে বলে। আজও তাই করবে নাকি? বউ এসে ঠেলা দিয়ে বলেছে—সরে শোও, বিল্টির বিছানার ওপর এসে পড়েছ যে!

তারপর থেকে আর শ্রীশ গাংগুলী জানলায় দাঁড়ায় না, সকালে বেরোয় না।

আর নমির বিয়ের জন্য সাতসকালে দশকর্ম ভাণ্ডারে যাবার দরকার হলেও, মুগা রঙের চাদরে গা-মাথা ঢেকে হাঁটে, মাথা-ছেঁড়া কেডসের দিকে তাকিয়ে। নির্বিকার। যেন বিরাট এক মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটছে সে। পাশাপাশি কেউ নেই। মাঠ। সে একা। ওপারে দশকর্ম ভাণ্ডার।

বিদ্রোহ যে শ্রীশ করে না, এমন নয়। হঠাৎ হঠাৎ মাঝে মাঝে নির্বিরোধী তন্দ্রায় সারাটা সকাল কাটিয়ে দিতে অভ্যস্ত শ্রীশ ক্ষেপে ওঠে, কার ওপর জানে না, কেন জানে না। সেদিন ঘুম ভাঙার পরই শ্রীশ বুঝতে পারে, তার মনের কোন জায়গায়-থাকা সেই লোকটা আজ তার বুকে মাথা ঝাঁকড়ে অস্থির হয়ে উঠবে। যেমনি একথা মনে হয় শ্রীশের, অমনি সে চাদরের ভেতরে গা-মাথা আরো ঢেকে ফেলতে চায়, অন্যান্য সকালের মতোই, এ-সকালটাকেও চেষ্টাকৃত তন্দ্রায় ডুব সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যেতে চায়। কিন্তু পারে না। কিছুতেই ছেলেবেলার কথা স্মরণে আনতে পারে না, যৌবনবেলার কথাও মনে আসে না। কেবল হাঁফ ধরে, প্রচণ্ড হাঁফ। আর এই হাঁফ ধরার সংগে সংগেই বত্রিশ-আঙুলে শ্রীশ গাংগুলী বুঝতে পারে যে, প্রতিদিনের শ্রীশ গাংগুলী হেরে যাচ্ছে, হেরে যাচ্ছে, অবধারিত পরাজয়। আর ধীরে ধীরে অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধে অগ্রসর হবার মতো পদক্ষেপে আসছে সেই ঝাঁকড়া-চুলো অবাধ্য লোকটা—যার কথা শ্রীশের একবারো মনে পড়ে না এমন এমন মুহূর্ত ছাড়া। পুরনো শ্রীশ ছেঁড়া চাদরের নীচে আশ্রয় খোঁজে—কুকুর যেমন গরম খোঁজে ছাইয়ের গাদায়। নতুন শ্রীশ হাঁফিয়ে ওঠে—যেন কেউ তাকে জোর করে কোনো গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, যেন বাড়ির অনেক-গুলো হাঁজি-পাঁজি কুকুরের বাচ্চার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য একটা বস্তায় পুরে তাদের দূরান্তরে পাঠানো হচ্ছে, আর সেই অন্ধকার বস্তার মধ্যে হাত-পা ছুঁড়ছে হাঁফসানো কুকুরছানাগুলি। শান্ত হবার জন্য গৃহস্থ শ্রীশ মুখের দাড়িতে হাত বুলোয়। আর কোথাকার সেই জোয়ান-মদ্দ হদ্দ-পাগলা শ্রীশের আঙুলগুলো হিংস্র আগ্রহে দাড়িগুলোকে ছুবলোয়। শ্রীশের কান লাল হয়ে ওঠে, নাকের আগা জ্বলতে থাকে, পায়ের পাতার নিচে যেন খচমচ করে ওঠে শুকনো পাতা, আর ডুবন্ত লোকের বাতাস-খিমচোনোর মতো আঙুলগুলো বেঁকে যায়। পুরনো শ্রীশ হেরে যায়।

ঠোঁটের যে বিশকন্ত হাসিটি দেখতে-পাওয়া হলদে দাঁতের সংগে সব সময় লেগে থাকে, ঐ মুহূর্তে সেই বেদনাকর হাসিটাও বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। মাড়িটা বিষাক্ত রক্তপ্রবাহে সির সির করে ওঠে। হঠাৎ কোনো ঘরোয়া-ধনুঃশরের সামনে-পড়া গৃহস্থ বধূর মতো, কিংকর্তব্যবিমূঢ় অসহায়তা এসে কণ্ঠ-নালীর বাতাস আটকে দেয়। মুখের ভেতরটা একেবারে শুকিয়ে যায় আর একটা লালাহীন বাতাস কণ্ঠনালীর শুকনো পথে আঁকু-পাঁকু করে। মৃত-হাসি-হাসা ঠোঁটটা কথার জন্য নড়ে ওঠে।

শ্রীশের মনে হয়—তাকে সবাই জোর করে এই সকালে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে! বাইরে দৈনন্দিন জীবনের শব্দ ভাসে—রিক্‌শার টুংটাং, ফেরিঅলার চিৎকার, বাচ্চা ছেলের গান, সিনেমার বাজনা। আর শ্রীশ ভাবে—তাকে জোর করে, ঐ বাইরের রাস্তা থেকে একটা অন্ধঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

না। শ্রীশ কিছুতেই ঘরে বন্দী থাকবে না। সে সবার মতো সকালে বেরুবে, দুপুরে ফিরবে, যখন ইচ্ছা বেরুবে। সবাইয়ের মতো সেও সবাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবে। সবাই তার মুখের দিকে চেয়ে সুখ-দুঃখের হাসি-কান্নার গল্প করবে। সে মানুষ। সে-ও দশজনের একজন।—আর এই শপথ পালনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শ্রীশ একটা ব্লেড আর একটা সেফটি-রেজর নিয়ে পারা-ওঠা আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। শুধুমাত্র জল দিয়েই কতো দিনের না-কামানো দাড়ি চাঁছতে শুরু করে।

দাড়ি কাটা যখন আধাখ্যাঁচড়া হয়ে শেষ হয়, শ্রীশ তখন দেখে, সেই ঝাঁকড়া-চুলো ক্ষ্যাপা শ্রীশ নেই, তার গোপন গুহায় সে আবার লুকিয়েছে—যেখান থেকে সে বেরিয়ে আসে মাঝে মাঝে।

তাই মুগার চাদরে গা-মাথা ঢেকে, মাথা-ছেঁড়া কেডসের দিকে তাকাতে তাকাতে সেই পুরাতন শ্রীশ গাংগুলীই পথে নামে। বিল্টির জন্য পেন্সিল কিনতে কিংবা নমির জন্য টোপর কিনতে—পথ হাঁটে। নির্বিকার। যেন বিরাট এক মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে সে। পাশাপাশি কেউ নেই। মাঠ। সে একা। ওপারে স্টেশনারি দোকান কিংবা দশকর্ম ভাণ্ডার।

নেই, নেই করেও, কম নয়। বিয়ের দিন শ্রীশ গাংগুলীর নিজেরই সন্দেহ হলো, এটা তারই বাড়ি কি না। বাতিতে ঝলমল। কলাগাছ আর লাল সালুর গেট। নমির বন্ধুরা, পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, সবাই এসেছে। শাড়ি ঝলমল, হাসি, কেজো ছেলেদের ছোটাছুটি, মাঝে মাঝে বাজনা, উলু-উলু, শাঁখের আওয়াজ, গরদপরা নমির মা, দীনভংগীতে দাঁড়িয়ে শ্রীশ। সবাইকে আদর আপ্যায়ন করতে করতে শ্রীশের মনে হলো—নমির বিয়ে-কে উপলক্ষ্য করে সবাই তার বাড়িতে এসে, তাকে যেন সমাজের একজন বলেই স্বীকৃতি দিলেন। তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আছে,

তারা এসেছে। পাড়া-প্রতিবেশীরা এসেছে। সবাই মিলে যেন শ্রীশকে বলছে—তুমি আমাদেরই। যেন বাড়ির কোনো ছেলে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ছ-সাত বৎসর পর হঠাৎই একদিন এসে উপস্থিত। পাড়ার সবাই মিষ্টি হেসে তাকে সম্বর্ধনা করছে। যেন বলছে—'কী হে, আমাদের ছেড়ে কোথায় ছিলে এতদিন?' শ্রীশ গাঙ্গুলী মনে মনে, সবার অজ্ঞাতে এমন কি নিজেরও, সবাই-কে ক্ষমা করলো। পাড়ার সব চেয়ে প্রবীণ লোক হরলালবাবু এলেন। শ্রীশ এগিয়ে গেল—'আসুন আসুন

'লগ্ন কটার সময় হে?'

'সাড়ে নটা।'

'বরযাত্রীরা এসেছে সব?'

'হ্যাঁ।'

'চারদিকে নজর রেখো।'

'আপনি একটু বসবেন না?'

'না, আমার আবার কদিন ধরে অম্বলের ব্যথাটা বড় বেড়েছে।'

'আচ্ছা, যদি পারেন—একবার আসবেন।'

'আচ্ছা—সে দেখা যাবে।'

এই করতে করতেই রাত নটা এগিয়ে এলো। আর—

'এই দিলু, বড় ঘর থেকে পরাতটা নিয়ে আয় তো।'

'কোথায় গেলি তপু, বুবু শাঁখে ফুঁ দে।'

'মীনা-রীনা—বাসরের জিনিস পত্তর গুছিয়ে রাখ—'

'ভদ্রলোকদের চা-টা দিয়েছিস তো রে মুকুল। এই জগদীশ, অবিনাশবাবুকে চা দিয়ে যা—'

'এই মায়া, দেখ্ না, ঠাকুর মশায় কী চাচ্ছেন!'

'সাবধানে পিঁড়ি ঘুরিয়ো হে নিমু—পুষ্পেন'—এই করতে করতে বিয়েটা হয়ে গেল।

বাসি বিয়ের সকাল এলো। নেবানো বাল্‌বগুলো ঝুলছে। গেটের কলাগাছের পাতা নুয়ে পড়েছে। সাজনো-গোছানো চেয়ার পত্তর বিশৃংখল। গত রাতের উজ্জ্বল সামিয়ানাকে উৎসবের আচ্ছাদনের মতো দেখাচ্ছে না। বহুলোকের আসা-যাওয়ায় উঠোনটা বিধ্বস্ত। নমির পরনে গত রাতের বিয়ের শাড়ি। জামাইয়ের পরনে গতরাতের বিয়ের গরদ। সবই গত রাতের। সবই বাসি। এমন কি, গত রাতের অনুভূতি-গুলিও।......

......বাসি বিয়ের সন্ধ্যে। সনাইয়ে বাজলো সুর। নতুন, সতেজ সুর নয়। বাসি সুর। গত রাত থেকে বাজতে বাজতে যেন সুরটা বাসি হয়ে গেছে। বাড়ির পেছন দিকের ঝাঁকড়া-মাথা আমগাছটা একগাদা ফুল-গজানো পরগাছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গত রাতে ওকে দেখা যায় না। আজ ওর মাথা অনেক উঁচু। বাড়ির সামনের মাঠটুকুতে দুয়েকটা কুকুর শুয়ে আছে। অলস ভঙ্গিতে। কোনো দিন যেন জাগবে না।

শ্রীশের মনের সব অনুভূতিগুলিকে বাসি মনে হলো। আবার সেই পুরনো সব মন ঢেকে গেল। ছেলেবেলার তেঁতুলগাছটাকে মনে পড়লো। সানাই সুর মিলিয়েছে ছোটবেলার ঝিরঝিরানি তেঁতুলগাছ আর বাড়ির পেছনের আমগাছটার সুরের সঙ্গে। সুর মিলিয়েছে শুয়ে থাকা কুকুরগুলোর সঙ্গে। সুর মিলিয়েছে রান্নাঘরের চালে বসা একটা অলস কাকের ডাকের সঙ্গে, নির্জন রাস্তার ওপর দিয়ে চলা একটা গোরুর গাড়ির একক আর্তনাদের সঙ্গে। পথের পাশে উচ্ছিষ্ট পাতা-গেলাসের মধ্যে কুকুরগুলোর খ্যাঁক-খেঁকি। যত পাতা, তত লোক। তারা আজ কই? শ্রীশ চারপাশে খুঁজলো। সানাইয়ের সুর তাকে ঠাট্টা করলো। কেউ নেই। কে একা দাঁড়িয়ে, এঁটো-পাতা-গেলাসের মতো।

বর-কনে এখুনি যাত্রা করবে। একটা ভাড়া করা ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে—স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাবে। দুয়েকটা রিক্শা দাঁড়িয়ে আছে। টিপি টিপি বৃষ্টি। সানাই বাজছে—গুমগুমোনো সুরে। সবাই স্থির। মাঠে চরে বেড়ানো গোরু, ঘর-ফিরতি কাক, পথ-ঘর কুকুর। সবাই যেন কাউকে বিদায় দিচ্ছে। নমি ঘর ছেড়ে যাচ্ছে। পেছনের ঘরে স্ত্রী-আচার-টাচার কী সব হচ্ছে। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় ট্রেন। ছটা বেজে গেছে। শ্রীশ, বাইরের বারান্দা থেকে হাঁকলো—'তাড়াতাড়ি করো সব!'

বাক্স, হোল্ড-অল, সুটকেস—সবই তোলা হলো। নমি চলে যাচ্ছে।

আর গতকাল এমনি সময় বাড়িতে লোক-জন আঁটে না। নমির বিয়ে। দুটো রাতের মধ্যে কতো তফাত। আজ মনে হচ্ছে কালকের রাতটা ভুয়ো। গতকালের সব কিছুই।

সবাই চলে গেছে। বাড়ি ফাঁকা। নমি চলে যাচ্ছে। বাড়ি আরো ফাঁকা হবে। একা-একা। একা একা আর একা-একা। সে সত্যি করেই একা। গতকাল রাতে যারা তার বাড়িতে এসেছিল, তারা শ্রীশগাঙ্গুলীর প্রতিবেশী; বত্রিশ-আঙুলের মন তারা দেখবে কেমন করে। সেই সব ভদ্র-প্রতিবেশীর দল বত্রিশ-আঙুলেকে কুরে কুরে খাবে। আর মাঝে মাঝে এমন সব উৎসবে, মুখে মিষ্টি হাসি নিয়ে আসবে। চলে যাবে। বত্রিশ আঙুলে একা। একা-একা। শ্রীশের মনে হলো—তার ভেতরকার সেই খ্যাপা শ্রীশ বেরুচ্ছে। নিজের দুহাতের বারোটা আঙুল দিয়ে চোখ-মুখ ঢাকলো শ্রীশ। তবু সেই পাগলা শ্রীশ বেরিয়ে আসছে। বেরিয়ে আসছেই। তাকে ঠেকানো গেল না। সে বাধা মানলো না।

শ্রীশ চুলের মধ্যে হাত চালালো—ছটা আঙুল দিয়ে ঐচুল আঁকড়ে ধরলো। একবার পদচারণা করলো। তবু সেই খ্যাপা শ্রীশ বেরিয়ে আসছে। নির্ভুল তার পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছে কপালের পাশে দুটো দপদপে শিরায়। সে লড়তে আসছে সেই সব সামাজিক কৃমিদের সঙ্গে, যারা লোলুপ লোভে বত্রিশ আঙুলেকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সবাই, সবাই, সে-দলে। বত্রিশ-আঙুলে একা।

ঠিক পেছনের ঘরে মেয়েদের পায়ের শব্দ। কান্নার শব্দ। কাঁদছে। নমির মা, নমি, বিন্টি, আর—আর সকলে। নমি নিজের ঘর করতে চলে যাচ্ছে। নিজের সংসার। সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ। এক্ষুণি শ্রীশের ডাক পড়বে আশীর্বাদ করার জন্য।

পাগলা শ্রীশ বেরিয়ে পড়েছে। এই শেষ বারের মতো সে লড়বে। জিতবে। চোখমুখ লাল হয়ে গেলো শ্রীশের। নমি সুখী হোক্। অপয়া বত্রিশ-আঙুলে শ্রীশ গাঙ্গুলী। যাত্রার সময় তার মুখ দেখা নিষিদ্ধ।...... দৌড়ে বারান্দা থেকে নেমে গেল শ্রীশ।

পেছনে বৌ ডাকলো—ওগো—

নমি ডাকলো—বাবা . . .

দূর থেকে দেখা গেল একটা রিক্শার তিনটে টায়ার বৃষ্টি ভেজা পিচের রাস্তায় লিকলিকে লাউডগা সাপের খোলসের দাগ আঁকতে আঁকতে সিরসিরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রিক্শার পেছন-পর্দা ঠেলে একটা মুগা-রঙের চাদরের কোণা, মহাবিজয়ীর ধ্বজার মতো দেখা যাচ্ছে।

ভেজা-রাস্তায় ছায়া ফেলে—ছোটো রিক্শার লাল-টকটকে টেইল-লাইটটা একটা ছোট্ট বিন্দু হয়ে যাচ্ছে।

তারপর বিন্দুটাও নিভিয়ে গেল।

শাঙ্গদেব

সংস্কৃত সাহিত্যের একটা বিচিত্র প্রভাব পড়েছিল গত শতাব্দীর সঙ্গীত রচয়িতাদের ওপর। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথও রয়েছেন এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনাও হয়েছে, কিন্তু অপরাপর গীতিকারেরা কিভাবে সংস্কৃত থেকে বস্তু সংগ্রহ করেছেন সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রায় হয়নি বললেই হয়। বাংলার সঙ্গীতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবের প্রথম দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেকালকার টপ্পা গান। ছোট ছোট চার লাইনের টপ্পা গানের সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোকের সাদৃশ্য আছে। এ গানগুলিও সংস্কৃত শ্লোকের মত অল্পকথার মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু অর্থের ব্যাপকতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। বাংলার গীতি রচয়িতাগণ প্রধান প্রধান সংস্কৃত কাব্য বা নাটকের চেয়ে প্রচলিত উদ্ভট শ্লোকগুলির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এর কারণ ছিল। অনেক সংস্কৃত শ্লোক তখন লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল এবং এগুলি ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ। একটি শ্লোকে মনের অনেক কথা প্রকাশ করা সম্ভব হত। এমন কি বিয়ের বাসরে মেয়েরাও তো নানা শ্লোকের অর্থ করতে দিয়ে জামাইদের নাকাল করতেন। রবীন্দ্রনাথ চিরকুমার সভায় কয়েকটি চমৎকার সংস্কৃত শ্লোকের পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত সেকালে অনেকেরই বহু উদ্ভট শ্লোকের পুঁজি ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকৃষ্ট বর্ণনার প্রভাব আমাদের বৈষ্ণব কবিদের ওপর বিশেষভাবে পড়েছিল। সেকালকার বেশ-ভূষা সাজসজ্জার সুনিপুণ বর্ণনা বৈষ্ণব কবিগণ সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করে তাঁদের রচনায় মিশিয়ে দিয়েছেন। অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকারগণ কিন্তু বর্ণনার দিকটা গ্রহণ করেননি, তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল ছোট ছোট উপমা এবং মনোধর্মিতার দিক। হৃদয়বত্তাই তাঁদের সংগীতের শ্রেষ্ঠ গুণ। সংস্কৃত সাহিত্যের এই দিকটাই তাঁরা বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন। পুরোনো বাংলার টপ্পায় ইমো-শনের প্রাবল্য আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের এই আবেগপ্রধান দিকটা এই কারণে তাঁদের এতটা আকর্ষণ করেছিল। টপ্পা রচয়িতা-দের ঠিক পূর্বযুগেই বাংলা গানের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল জয়দেবের গীত-গোবিন্দ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গীতগোবিন্দের ছন্দ বাংলার গীতি-রচয়িতাদের প্রাণে আলোড়ন তুলেছিল; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এই ট্রাডিসন স্তিমিত হয়ে এলো, গীতি-কারগণ আরও গভীর বস্তু খুঁজতে লাগলেন। এই বস্তু তাঁরা খুঁজে পেয়ে-ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে এবং তাঁদের সংগীতকেও তাঁরা সেইভাবেই নতুন করে গড়ে তুললেন। সে যুগের প্রধান প্রধান গীতিরচয়িতা, যেমন রাধামোহন সেন, রাম-নিধি গুপ্ত, কালী মির্জা, শ্রীধর কথক—এঁরা সকলেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং এঁদের রচনায় এই বৈদগ্ধ্যের পরিচয় সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

রাধামোহন সেনের এইরকম একটি বিদগ্ধ রচনা উদ্ধৃত করছি

কেন ভুরু ধনু টান হানিবে কি প্রাণ
কুরঙ্গ বাঁধিতে বুঝি করিছ সন্ধান।
শুনহে তোমারে কহি, আমি তো কুরঙ্গ নহি
কেবল আমার বদনে কুরঙ্গ নয়ান॥

এই যে উজ্জ্বল বুদ্ধিপ্রদীপ্ত রচনা এর পরিচয় আগের যুগের বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। এই সব গানের কাঠামোই সংস্কৃত শ্লোক-ঘেঁষা। শুধু সংস্কৃত নয়, পারস্য ভাষার প্রভাবও পুরাতন বাংলা গানে কিছুটা পড়েছে। "প্রীতিগীতি" নামক সংগীত সংকলনের ভূমিকায় উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষ জানিয়েছেন যে, নিধুবাবুর নিম্নোদ্ধৃত পদটি হাফেজের একটি প্রসিদ্ধ পদের অবিকল অনুবাদ—

ওষ্ঠাগত প্রাণ নাথ না দেখে তোমারে
স্বস্থানে যাইবে কি বাহির হইবে বলনা আমারে।

অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয়ই বোধ হয় প্রথম এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রসঙ্গে অমরু-শতক থেকে তিনি উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। অধ্যাপক সুশীলকুমার দে মহাশয়ও তাঁর "রামনিধি গুপ্ত" নামক তথ্যপূর্ণ নিবন্ধে বিষয়টির সমর্থন করেছেন।

অবিনাশচন্দ্রের একটি উদ্ধৃত শ্লোক হচ্ছে—

ন জানে সম্মুখায়াতে প্রিয়াণি বদতি প্রিয়ে।
সর্বাণ্যঙ্গানি মে যান্তি শ্রোত্রতাং কিমু নেত্রতাং॥

এর সরল অনুবাদ তিনি দিয়েছেন—

আসিয়া সম্মুখে প্রিয় সুধামুখে
সম্ভাষে যখন
সজনি না জানি হয় তনুখানি
শ্রুতি কি নয়ন।

এর সঙ্গে নিধুবাবুর এই পদটি তুলনীয়—

সে আদরাদর যা আদর অধর কম্পে কহিতে
দরশনে পরশনে অমিয় বচনে
শরীর শ্রবণমুখী আঁখি সহিতে।

প্রীতিগীতিতে আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে—

স্তনেও রচিতেঽপি সুচিরাধিকঃ
লোককণ্ঠম্ দ্বাঁকতে
দৃষ্টোঽপি বাচি সম্মিতোঽপি দর্শনেন জায়তে।
কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনু
রোমাঞ্চমালম্বতে
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন
জনে।

রোজ এলমার (Rose Aylmer) বা গুলবদনী

বাগানে দেশী বিদেশী নানা জাতীয় ফুল; গোলাপের বাহারই কিছু বেশি; সাদা লাল; কোথাও কুঁড়ি, কোথাও ফোটা-ফোটা, কোথাও পূর্ণ প্রস্ফুটিত। রেশমী বেছে বেছে সদ্যোন্মুখ লাল কুঁড়ি খুঁজছিল; একবার একটা তুলবার জন্য হাত বাড়ায়, ভালো ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে হাত গুটিয়ে নেয়—কিছুতেই পছন্দ হয় না। অবশেষে অনেকক্ষণ ঘুরে অনেকগুলো কুঁড়ি তুললো, তুলে ঘরে ফিরে এলো; ঘরে এসে একটি জরির সুতো নিয়ে বেশ ভালো ক'রে একটি তোড়া বাঁধলো।

তারপরে তোড়াটি নিয়ে একটি তরুণীর কাছে গিয়ে বললে—এই নাও মিসিবাবা।

তোড়াটি নিয়ে তরুণী করুণ সুন্দর হাসি হেসে বলল—ঐ বিশ্রী নাম ধরে আমাকে ডেকো না—ওর অর্থ হচ্ছে 'মিস ফাদার'।

রেশমী বললে, ঐ নামেই তো সকলে ডাকে তোমাকে।

সকলে যা খুশী বলুক, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা। দেখো না আমি তোমাকে কেমন Silken Lady ব'লে ডাকি।

তরুণী রেশমী শব্দের অর্থ জেনে নিয়ে অনুবাদ ক'রে নিয়েছিল 'Silken Lady'।

কি ব'লে ডাকলে তুমি খুশী হও?

কেন, তুমি যে মাঝে মাঝে 'গুলবদনী' বলতে তাই বলো না কেন, নইলে auntie যেমন Rosy বলে—তাই বলো।

রেশমী বললে, তার চেয়ে দেশী নামটাই ভালো, তোমাকে না হয় গুলবদনী বলেই ডাকবো।

মনে থাকবে তো?

দেখো এবার আর ভুল হবে না।

তখন রোজ এলমার তোড়াটি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, টেবিলের উপরে একজন তরুণের ছবি দাঁড় করানো ছিল, তার কাছে গিয়ে রেখে দিল।

রেশমী বললে, তোমাকে এত যত্নে তোড়া বেঁধে দিই, তুমি রোজ রোজ সেটা ঐ ছবির কাছে নিয়ে রেখে দাও কেন। ও কার ছবি?

রোজ এলমার হাসলো, বললে, ও একজন কবির ছবি।

কবিওয়ালার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?

সে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে রোজ এলমার বললে, জানো, ছবিখানা আমি এঁকেছি।

তুমি ছবি আঁকতে জানো নাকি? কই দেখি না তো।

দেশে থাকতে আঁকতাম—এদেশে এসে ঐ একখানা ছবিই এঁকেছি।

কই মানুষটাকে তো কখনো দেখিনি।

মানুষটা দেশে আছে।

বেশ কথা, মানুষ রইলো দূরে, ছবি আঁকলে কি ক'রে?

তরুণী হেসে বললে, দূরে থাকলেই কি সব সময়ে দূরে থাকে?

সে আবার কি রকম?

মনের মধ্যেও তো থাকতে পারে!

কথাটা রেশমী ঠিক বুঝলো কিনা জানি না, সে ব'লে উঠল—ঐ যে মিঃ স্মিথ আসছে, আমি যাই।

না, না, তুমি থাকো।

রেশমী সে কথায় কর্ণপাত করলো না,
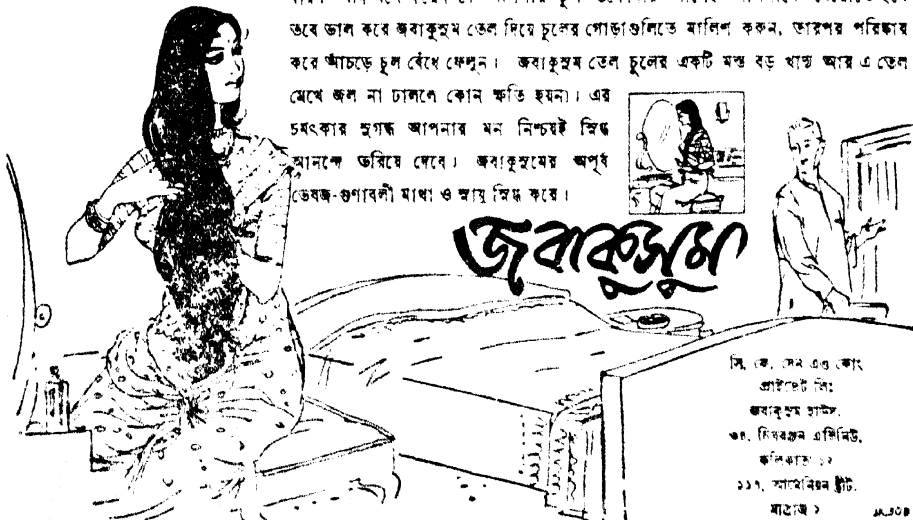
এক দরজায় সে বেরিয়ে গেল, অন্য দরজায় প্রবেশ করল জন স্মিথ।

শুভ সন্ধ্যা মিস্ এলমার।

শুভ সন্ধ্যা মিঃ স্মিথ, বসো।

জন অপাঙ্গে ছবিটির কাছে নিয়মিত স্থানে নিয়মিত ফুলের তোড়াটি দেখে অপ্রসন্ন মুখে উপবেশন করলো। আশা করি, আজকার দিনটা আনন্দে কেটেছে।

কালকার দিন যেমন কেটেছিল তার চেয়ে বেশিও নয়, কমও নয়।

মিস্ এলমার, আমার ইচ্ছা তোমাকে নিয়ে একদিন নৌ-বিহারে যাই। আমরা একখানা নূতন হাউসবোট কিনেছি।

মিস এলমারকে নীরব দেখে জন বলে উঠ্‌ল, সঙ্গে মিস্ স্মিথও যাবে।

সে জন্য নয়, নদীর মাঝিদের কোলাহল আমার ভালো লাগে না—তার চেয়ে এই বাগানের নীরবতা বড় মধুর।

কিন্তু কর্নেল রিকেট তো তোমাকে মাঝে মাঝে এখানে ওখানে নিয়ে যায়।

সে যে নাছোড়বান্দা।

আমি নিরীহ সেটাই কি তবে দোষ

'কখনো কখনো' হেসে উত্তর দেয় এলমার।

বেশ, তবে এবার থেকে জবরদস্তি করব।

যার যা স্বভাব নয় তেমন আচরণ করতে গেলে আরো বিসদৃশ দেখাবে।

দেখো মিস এলমার, আমি ঐ গোঁয়ারটাকে একদম পছন্দ করিনে। তুমি কি ক'রে ওটাকে সহ্য করো তাই ভাবি।

ও যে জংগী সেপাই, গোঁয়ার্তুমি করাই ওর ব্যবসা।

লোকটা বড়ই অভদ্র।

ভদ্রতা করলে লড়াই করা চলে না।

কিন্তু তোমার বাড়ি কি লড়াইয়ের মাঠ?

ও হয়তো এ-বাড়িটাকে অপরের বাড়ি মনে করে না।

ঠিক বলেছ, লোকটা এমনভাবে তোমার ঘরে প্রবেশ করে যেন এটা ওর পৈত্রিক আলয়।

এটাই তো যুদ্ধ জয়ের রহস্য।

কিন্তু এ বাড়িতে যুদ্ধ জয়ের আশা ওর নেই।

বুঝলে কি ক'রে?

এ তো সহজ ব্যাপার। আত্মম্ভরী লোকটা তোমাকে নিজের যে ছবিখানা উপহার দিয়েছিল—ঐ যে তার উপরে জমেছে ধুলো—আর প্রতিদিন যত্নের তোড়া পড়ে—আচ্ছা মিস্ এল্মার, ছবিটি নাকি একজন কবির—কই নাম তো শুনিনি।

একদিন শুনবে।

আচ্ছা, ও কি গ্রে বার্নস-এর মতো লিখতে পারে?

এই দেখো, একজন কবি কি অপর কবির মতো কবিতা লেখে? গোলাপ কি ডালিয়ার মতো? তারপর বলে—জানো মিঃ স্মিথ, ঐ কবির সংগে আমার একটা চুক্তি হয়েছে।

শংকিত জন শুধোয়, কি চুক্তি?

আমি মরলে এমন সুন্দর একটা কবিতা লিখবে যাতে আমার নাম অমর হ'য়ে থাকবে।

আহা, তুমি মরতে যাবে কেন?

আমি কি অমর হ'য়ে জন্মেছি?

অন্তত একজনের মনে।

তবে বোধ করি সে অমর। কিন্তু ঠাট্টা ছাড়ো, আমার মনে হয় কি জানো, এখানকার প্রতিকূল আবহাওয়ায় আমি বুঝি বেশিদিন বাঁচতে পারবো না।

তারপরে নিজ মনে ব'লে চলে, কি জীবন! নাচ গান, হৈ হল্লা, পান ভোজন, জুয়ো আড্ডা, ডুয়েল মারামারি। অসহ্য। এর মধ্যে লোকে বাঁচে কি ক'রে?

জন বলে, বাঁচে আর কই, ক'টা লোক পঞ্চাশ পেরোয় কলকাতায়?

তবু তো পঞ্চাশ অবধি টেঁকে—আমি তো কুড়িও পার হ'তে পারবো না।

Three score and ten! তার আগে তোমাকে মারে কে? সদম্ভে সদর্পে ঘরে প্রবেশ ক'রে সগর্জনে ব'লে ওঠে জংগী সেপাই কর্নেল রিকেট।

তারপরে টুপিটা টেবিলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে প্রকাণ্ড একখানা চেয়ারের সর্বাংগে আর্তনাদ উঠিয়ে ব'সে পড়ে, বলে, শুভ সন্ধ্যা রোজি।

শুভ সন্ধ্যা কর্নেল; এই যে এখানে মিঃ স্মিথ আছে।

মিস্ এলমারের কথায় ফলোদয় হয় না, রিকেট লক্ষ্য করে না জনকে। তার বদলে উঠে দাঁড়িয়ে তরুণ কবির পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত তোড়াটি হস্তগত ক'রে বলে ওঠে—এটা তো আমার প্রাপ্য, অস্থানে কেন?

নীরবে ঈর্ষ্যায় জ্বলতে থাকে জন।

তখন রিকেট উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বোতাম থেকে লাল গোলাপের কুঁড়িটি খসিয়ে নিয়ে মিস্ এলমারের দিকে এগিয়ে দেয়—সংগে সংগে ফরাসী কায়দায় 'বাউ' করে—বলে Rose to Rose! তারপরে একবার কটাক্ষে জনকে লক্ষ্য ক'রে বলে ফরাসী ধরনে 'বাউ' করবার কায়দাটি শিখেছি মঃ দুবোয়ার কাছে। লোকটা গুণী বটে। লজ্জায় ঘৃণায় মাটিতে মিশিয়ে যায় জন।

মিস্ এলমারেরও সংকোচের অবধি থাকে না।

মিস্ এলমার, কাল আমরা মস্ত একটা দল নৌকায় ক'রে সুখচরে যাচ্ছি। খুব হৈ হল্লা, স্ফূর্তি হবে।

কথার মোড় ঘুরলো এই আশায় মিস্ এলমার বলল, তাই নাকি, খুব আনন্দের বিষয়। তা কে কে যাচ্ছে?

অনেকেই যাচ্ছে, সংগে তুমিও যাচ্ছ।

রোজ কুণ্ঠিতভাবে বললে—আমার তো ভালো লাগে না।

সংগে আমি থাকলে অবশ্যই ভালো লাগবে।

রোজ আবার মৃদু আপত্তি করলো। রিকেট সে সব ঠেলে দিয়ে বললে, ওসব ঠিক হ'য়ে গিয়েছে। কাল ব্রেকফাস্টের পরে তোমাকে তুলে নিতে আসবো।

ম্লান ছায়ার মতো সন্তর্পণে প্রস্থান করলো জন, তার পক্ষে আর ব'সে থাকা অসম্ভব হ'য়ে পড়েছিল। প্রেমে ও সংকটে যারা ইতস্তত করে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

নিঃসপত্ন যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ীর অকুণ্ঠিত প্রত্যয়ে কর্নেল ব'লে উঠলেন, তুমি অবশ্যই যাচ্ছ—তোমার জন্যেই এত আয়োজন, এত দূর দেশ থেকে সদ্য আনীত তিন কাস্কেট বিয়াট্রিস ব্র্যান্ডি।

নাও, অমন মন-মরা হয়ে থেকো না রোজি! চলো, একটু হাওয়া খেয়ে আসা যাক—তোমার গাড়ির নতুন জন্তুটা দেখবে কেমন ছোটে! চলো রেসকোর্সে এক পাক ঘুরে এলেই মনটাও হাল্কা হবে—আর খিদেটাও বেশ জমবে।

জংগী কর্নেলের উৎসাহে বাধাদান রোজ এল্মারের সাধ্য নয়—কাজেই সে ফাঁসির আসামীর মুখ নিয়ে চেপে বসলো গিয়ে নতুন জন্তুতে টানা গাড়িতে আদিম জন্তুটির পাশে।
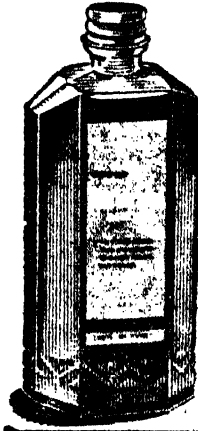
গাড়ি ছুটলো টগবগিয়ে। চরম বিজয়ের আশায় উল্লসিত সুখাসীন কর্নেল রিকেট তখন জীবনের ফিলজফি ব্যাখ্যায় লেগে গিয়েছে। সে ফিলজফি তার যেমন তেমনি সেকালের কল্‌কাতা সমাজের অধিকাংশ [illegible] বটে।

রেসকোর্স আর জীবনটার অর্ধেক যুদ্ধক্ষেত্র, অর্ধেক জুয়োর আড্ডা, দুই জায়গাতেই লড়াই আর তার জন্যে চাই টাকা। কাজেই যেন-তেন-প্রকারেণ চাই টাকা রোজগার করা। যে কটা দিন বাঁচা যায় স্ফূর্তি ক'রে নিতে হবে, কারণ কবে যে কল্‌কাতার Ditch [illegible] ক'রে বসবে তার স্থিরতা [illegible]।

[illegible] বিচিত্র ফিলজফি শুনে রোজ [illegible] হল, বললে, তবে যে এত খরচ ক'রে সেণ্ট জনস্‌ চার্চ তৈরি হচ্ছে তার সার্থকতা কোথায়?

ওসব হচ্ছে বাতিকগ্রস্ত লোকের কাণ্ড!

বলো কি! জীবনে তবে ধর্মের স্থান নেই!

একেবারে নেই তা নয়, লড়াই ফতে করবার জন্যে একটা ভগবানের দরকার।

শুধু এই জন্যেই?

তাছাড়া আর কি, আমার বুদ্ধিতে তো আসে না। আসল কথা কি জানো ডিয়ারি, লড়াই হোক আর জুয়োর টেবিল হোক, চাই সাহস, ভীরুর স্থান নেই জীবনে।

রিকেট নিজের বাগ্মিতায় এমন মুগ্ধ হ'ল যে, গলা খুলে গান ধরলো—

None but the Brave, None but the Brave, None but the Brave deserves the Fair.

সঙ্গে সঙ্গে চিল নিল বকলস—গাড়ি ছুটলো দ্রুত।

জন স্মিথ হেঁটে যাচ্ছিল, তার চোখে পড়লো গাড়ির উল্কাপাত, মনে পড়লো তার আর একদিনের কথা, রোজ এলমারের জন্য সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

আর একদিনের কথা

জন ফিরছিল ময়দানের দিক থেকে, এমন সময়ে দেখতে পেলো ছোট একখানা হাল্কা গাড়ি ছুটেছে বেগে, ঘোড়া রাশ মানছে না তরুণী আরোহীর হাতে। জন বুঝলো আর একটু পরেই গাড়িশুদ্ধ তরুণী উল্টে পড়বে খানার মধ্যে। গাড়িখানা যেমনি তার কাছে এসে পৌঁছলো, অমনি সে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে লাফিয়ে উঠল গাড়ির পাদানির উপরে আর লাগাম সবলে আকর্ষণ করলো। দশ বিশ গজ গিয়েই গাড়ি থামলো প্রকাণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে। তরুণী হুমড়ি খেয়ে পড়লো জনের গায়ে, জন বাঁহাতে তাকে জড়িয়ে ধরলো, নইলে সে প'ড়ে যেতো নীচে।

খুব কি লেগেছে তোমার?

দু-চার মুহূর্তে দম নিয়ে তরুণী বল্‌লে, আর দু'দণ্ড তুমি না এলে আমার আজ দুর্দশার অন্ত থাকতো না।

জন বল্‌লে সব ভালো যার শেষ ভালো। এমন একা বের হওয়া উচিত হয়নি।

প্রত্যেকদিন তো একাকীই বের হই, তবে আজ ঘোড়াটা নতুন। অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়িতে চলো। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ শুনলে মেসো আর মাসীমা খুব খুশি হবে।

এবারে জন তরুণীকে লক্ষ্য করলো, এতক্ষণ আসন্ন বিপদের কথা ভাবছিল।

জন দেখলো তরুণী আশ্চর্য সুন্দরী। শরতের উষাকে পেটিকোট আর বডিস পরিয়ে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরিশ্রমে ও উদ্বেগে সে সৌন্দর্য আমূলে প্রকট হয়ে উঠেছে, ঝড়ের আভাস-লাগা শরতের উষা।

তরুণী রোজ এলমার। সুপ্রীম কোর্টের জজ স্যার হেনরি রাসেলের শ্যালী-কন্যা।

স্যার হেনরি ও লেডী রাসেল সব শুনে জনকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিল। বলল, জন তোমার বাড়ি তো কাছেই, যখন খুশী এসো। তারা বলল, রোজ দেশ থেকে সবে এসে পৌঁছেছে, এখনো কারো সঙ্গে পরিচিত হয়নি, বড় নিঃসঙ্গ অনুভব করছে, তুমি এলে ও খুশী হবে। অবশ্য আমরাও কম খুশি হব না।

ঘটনাচক্রে জনের রাসেলদের বাড়িতে যাতায়াতের পথ সুগম হয়ে গেল। নতুবা এমন আশা ছিল না, কেননা সামাজিক বিচারে রাসেলরা স্মিথদের উপরের থাকের লোক।

রোজ এলমারের সঙ্গে জনের বন্ধুত্বে লিজা মনে মনে খুশী হ'ল, ভাবলো এতদিনে কেটির অভাব ও ভুলতে পারবে।

লিজা মাঝে মাঝে রোজ এলমারকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে নিয়ে আসে। লেডী রাসেলের নিমন্ত্রণে সে-ও যায় ওদের বাড়িতে। জন ও রোজের পরিচয় যে প্রণয়ে পরিণত হয়েছে, স্ত্রীসুলভ বুদ্ধিতে বুঝে নিল লিজা।

একদিন সে জনকে বল্‌লে—রোজকে বিয়ে করো না জন।

আগের দিনের জন হলে কথাটা অসম্ভব মনে হতো না তার কাছে। কিন্তু কেটির ব্যাপারে এমন আঘাত পেয়েছিল যে, তার মনে একটা দীনতার ভাব স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছিল, তাই সে বলল—কোনদিন বলবে জন চাঁদকে বিয়ে করো।

তা তো আর বলছিনে।

প্রায় তাই বলছ। জানো রোজ এলমার লাটঘরানা।

তার চেয়েও বেশি জানি। রোজের বাপ আবার বিয়ে করেছে—সেই দুঃখেই তো এদেশে চলে এসেছে ও।

তারপরে একটু থেমে বলল, এদেশে তোমার চেয়ে ভালো বর পাবে কোথায়?

জন বলল, হয়তো তা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু মাঝখানে এক কবি এসে জুটেছে।

সে আবার কে—বিস্ময়ে শুধায় লিজা।

ওয়াল্টার ল্যাণ্ডর তার নাম, বয়সে রোজের প্রায় সমান, লোকটা নাকি কবি।

কোথায় থাকে সে?

দেশে।

নিশ্চিন্ত হয়ে লিজা বলল, তাই বলো। সে যদি দেশে থাকে, তবে তোমার বাধা কোথায়?

ছবিতে লিজা ছবিতে। আমি প্রতিদিন যত ফুল নিয়ে গিয়ে দিই, সব পড়ে গিয়ে ছবির পদতলে।

ছবিকে ভয় করো না জন, ও ছায়ামাত্র।

কিন্তু কায়াটি আছে মনের মধ্যে, নইলে ছায়া আসে কিভাবে?

তুমি এবারে মনের মধ্যেকার কায়াটিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সেখানে [illegible] আসন দাও। অনুপস্থিত কবির চেয়ে বেশী দাবী উপস্থিত [illegible]। জন আমার কথা শোনো, মেয়েরা [illegible] যে পুরুষটি কাছে পায়, তাকেই আঁকড়ে ধরে।

জন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, মনের মানুষের চেয়ে কাছে আর কে?

তারপরে একটুখানি নীরব থেকে বলে, তা হবার নয় লিজা, [illegible] একটু অন্য প্রকৃতির লোক।

হেসে ওঠে লিজা, বলে সব মেয়েরাই এক প্রকৃতির, তাদের কাছে [illegible] মানুষের মূল্য বেশি হয়ে দাঁড়ায় মনের মানুষের চেয়ে।

তবে তোমার বেলায় [illegible] দেখছি কেন, তোমার কাছে তো [illegible] দুটি [illegible] বর্তমান।

সেই তো হয়েছে [illegible] বেছে উঠিব বিচার করতে করতেই [illegible] বয়স গেল পেরিয়ে।

তারপরে গম্ভীরভাবে বলে, না জন, আমি ওল্ড মেড, আইবুড়ো হয়ে থাকবো।

এ কেমন শখ!

শখের কি কোনো কারণ থাকে!

তারপরে আন্তরিকতার সঙ্গে বলে লিজা, না, জন শীঘ্র বিয়ে করো। বাবা গত হবার পর থেকে বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। তাছাড়া একবার মিস এলমারের কথাটাও ভেবে দেখা উচিত, সে খুব নিঃসঙ্গ।

আপাতত একটি সঙ্গিনী জুটিয়ে দিয়েছি।

দেখেছি মেয়েটিকে, এদেশী মেয়েদের মধ্যে অমনটি সচরাচর দেখা যায় না। প্রথম দিন দেখে হঠাৎ ইউরেশিয়ান মেয়ে বলে মনে হয়েছিল।

হাঁ, ইংরাজি বলতে, কইতে, লিখতে বেশ মজবুত।

এই ব'লে রেশমীর পূর্ব ইতিহাস শোনায় জন লিজাকে।

(ক্রমশ)

(পঁচিশ)

"আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার সফলতার জন্য আমরা তাকিয়ে আছি রাষ্ট্রপতি উইলসন ও উদারচিত্ত আমেরিকার দিকে; দুর্বল, ছোট ছোট দেশগুলির প্রতি আমেরিকার সহানুভূতি সুবিদিত"—১৯১৯ সালের সিরিয়ান কংগ্রেসের প্রস্তাব থেকে উদ্ধৃত।

"পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হয়ে প্রথমেই আমি দেখতে গিয়েছিলাম মধ্যপ্রাচ্য"—জন ফস্টার ডালেস।

"মধ্যপ্রাচ্যকে ধরে রাখতেই হবে"—ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট।

গত সাঁইত্রিশ বছরে আরব জাতি দুবার আমেরিকার মুখপানে তাকিয়েছে একটা নব-বিধান নেতৃত্বের আহ্বান নিয়ে। দুবারই আমেরিকা এ আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে। য়ুরোপীয় স্বার্থের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যকে বেঁধে রেখে আমেরিকা চেয়েছে আরব জাতীয়তাবাদকে ঠাণ্ডা রাখতে। যেখানে ইঙ্গ-ফরাসী স্বার্থের সঙ্গে এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের সংঘর্ষ হয়েছে, মার্কিন নীতি হয় সমর্থন করেছে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে, নয়তো সরে দাঁড়িয়েছে নিরপেক্ষতার নিশ্চিন্ত ছায়াতলে। ফলে, য়ুরোপীয় স্বার্থকেও সে কায়েম রাখতে পারেনি, আরব জাগরণকেও জয় করতে পারেনি বন্ধুত্বের দাবীতে। রাজনৈতিক ইতস্ততঃ ভাব, দীর্ঘসূত্রিতা ও নেতৃত্বের অভাবের আড়ালে আমেরিকার বিরাট শক্তি ধনতন্ত্র ধীরে ধীরে প্রতাপ বিস্তার করেছে আরব ভূমির উত্তপ্ত বালুগর্ভে লুকোনো অফুরন্ত তেল সম্পদের উপর।

অথচ এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে আরবমানসে আমেরিকার জন্যে যতোখানি প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল, অন্য কোন বিদেশী শক্তির প্রতি তেমন আরবের মনে কোনদিন জেগেছিল কিনা সন্দেহ।

যুদ্ধকালীন প্রতিশ্রুতি ভেঙে আরব বিদ্রোহকে ইংরেজ ও ফ্রান্স কিভাবে ক্ষুব্ধ ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল তা আমাদের অজানা নেই। এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে [illegible] অটোমান সাম্রাজ্যের [illegible] প্রতিনিধিরা এসে [illegible] দামাস্কাস শহরে ১৯১৯ সালের [illegible]। এর [illegible] আরব [illegible] যে [illegible] আরো [illegible] অটোমান [illegible] য়ুরোপীয় শক্তির [illegible] নিয়ে [illegible] সিরিয়া"—এই সিরিয়া হচ্ছে [illegible] ভৌগোলিক [illegible] প্যালেস্টাইন, জর্ডন ও [illegible] এই সিরিয়া হবে একটি সার্বভৌম [illegible] গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিগুলো [illegible]।" সিরিয়ান কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা জানালেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্সের নিকট এই আবেদন অরণ্যে রোদন মাত্র। তাই তাঁরা তাঁদের আবেদন জানালেন পৃথিবীর তখনকার সবচেয়ে চমকপ্রদ শক্তি আমেরিকার কাছে, তার বিশ্ববন্দিত রাষ্ট্রপতি উইলসনের কাছে।

"আমরা নির্ভর করে আছি রাষ্ট্রপতি উইলসনের মহান ঘোষণার উপর, যাতে তিনি প্রচার করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ষড়যন্ত্রকে খর্ব করতেই আমেরিকা মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। আমরা চাই আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদীর উপনিবেশনীতির প্রয়োগ না হোক। আমরা বিশ্বাস করি, আমেরিকার কোন সাম্রাজ্য বাসনা নেই। তাই আমরা আমাদের দেশ গঠনে বিশ বছরের জন্যে আমেরিকার কাছ থেকেই নানা রকমের সাহায্য নিতে চাই।"

প্রস্তাবের উপসংহারের দিকে আবার বলা হয়, "রাষ্ট্রপতি উইলসন যে মহান নীতিগুলি প্রচার করেছেন, তাতে আমরা ভরসা পাচ্ছি যে, আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ীই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। এই

আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে আমরা তাকিয়ে আছি আমেরিকা ও তার নেতা উইলসনের দিকে।"

সিরিয়ান কংগ্রেস পরোক্ষভাবে ঘোষণা করলেন যে, যদি আরব রাষ্ট্রের উপর কোন বহিঃশক্তির ম্যানডেট আসেই, তবে তা যেন হয় আমেরিকান ম্যানডেট, বৃটিশ কিংবা ফরাসী নয়। অর্থাৎ নবজাত আরব রাষ্ট্র বরং মার্কিন অভিভাবকত্ব মেনে নেবে, কিন্তু ইংরেজ বা ফরাসী খবরদারি মানবে না। ইরাকের লোকেরা আরো একধাপ এগিয়ে গেল। আলেপ্পো শহরে এক সম্মেলনীতে তারা সোজাসুজি চাইল একমাত্র মার্কিন ম্যানডেট।*

প্যারিসে শান্তি বৈঠকে আরব প্রতিনিধি ছিলেন আমির ফয়জল। তিনি প্রস্তাব করলেন একটি কমিশন সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ভ্রমণ করে জনগণের প্রকৃত দাবী জেনে আসুন। উইলসন এ প্রস্তাব মেনে নিলেন, লয়েড জর্জ নিমরাজী, কিন্তু ক্লিমেন্স ভয়ানক বিরোধী হয়ে উঠলেন।

তথাপি অনেক আলাপ আলোচনার পর চারটি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হল—আমেরিকা, ইতালি, বৃটেন ও ফ্রান্স। উইলসন নিজেই কমিশনের কার্যধারা তৈরী করলেন। মার্কিন প্রতিনিধি মনোনীত হলেন ওবেরলিন কলেজের অধ্যক্ষ, ডাঃ হেনরী কিং এবং আর একজন যাঁর নাম চার্লস ক্রেন। বৃটেন ও তার প্রতিনিধি মনোনীত করল, কিন্তু ফ্রান্স রইল চুপ করে। ফলে এই চতুঃশক্তি কমিশন আর তৈরীই হল না। কিছুদিন পর বৃটেন গেল পেছিয়ে; ইতালি রইল উদাসীন। শুধু উইলসন পিছু হটলেন না। হেনরী কিং ও চার্লস ক্রেন উইলসনের নির্দেশমত সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ভ্রমণ করে যে রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন, তার প্রচলিত নাম কিং-ক্রেন রিপোর্ট। কিন্তু উইলসন বোধহয় একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া এই রিপোর্ট পড়তেই পারেননি। যখন রিপোর্ট পেশ করা হয়, তিনি নির্বাচন সংগ্রামে ব্যস্ত; তাতেই তিনি গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়েন। তবু এই রিপোর্ট যখন ১৯২২ সালে প্রকাশিত হল তখন যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল।

আজকার দৃষ্টিতে কিং-ক্রেন রিপোর্টের দুইটি গুরুত্ব ধরা পড়ে। এই প্রথম এবং এখনো পর্যন্ত শেষ বার একটি বেসরকারী নিরপেক্ষ আমেরিকান কমিশন আরব-মানসকে প্রত্যক্ষভাবে বোঝবার চেষ্টা করেছিল। আজকার দৃষ্টিতে বিচার করলে শুধু এ-কথাই মনে হয় যে, ঐ ঐতিহাসিক

---

* এই সম্মেলনীতে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার নাম 'ইংরাজী প্রোগ্রাম'। ডামাস্কাসে গৃহীত প্রস্তাবের নাম 'ডামাস্কাস প্রোগ্রাম'।

যুগসন্ধিতে আমেরিকার কত কাছে আরব-নেতৃত্ব এসে দিগদর্শনের জন্যে দাঁড়িয়েছিল। আর পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে আমেরিকা কত সহজে এই বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ নেতৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

একজন বিখ্যাত আমেরিকান লেখকের মন্তব্য মনে পড়ে। "বিংশ শতাব্দী হতে পারতো আমেরিকান শতাব্দী। হয়নি। আমেরিকাই পারেনি আমাদের শতাব্দীকে তার নিজের শতাব্দীতে পরিণত করতে।"

কিং-ক্রেন রিপোর্টের সার মর্ম হলঃ মধ্যপ্রাচ্যে দুটি স্বতন্ত্র আরব রাজ্য গঠিত হোক, একটি ইরাক, অন্যটি সিরিয়া। দুই রাজ্যেই সংবিধানশাসিত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। আমেরিকা সিরিয়ার ম্যানডেট গ্রহণ করুন, আর বৃটেন ইরাকের, যদিও ইরাকের লোকেদের মার্কিন ম্যানডেটই বেশি পছন্দ। যদি আমেরিকা সিরিয়ার ম্যানডেট নিতে রাজী না হয়, তবে তা যাবে বৃটেনের কাছে —কোনমতেই ফ্রান্সের হাতে নয়। ম্যানডেট হবে একটি সুনির্দিষ্ট স্বল্পকালের জন্যে। সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য হতে একেবারে মুক্ত। তার একমাত্র লক্ষ্য হবে জনকল্যাণ।

প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব কমিশন অগ্রাহ্য করল। অনুমোদন করল নির্দিষ্ট হারে ইহুদি প্রবেশ। উইলসন-সমর্থিত বালফুর ঘোষণা যে কতখানি পরস্পরবিরোধী তা প্রমাণ করে কিং-ক্রেন রিপোর্ট বলল, "ইহুদিদের 'ন্যাশনাল হোম' তৈরী করার মানে এই নয় যে প্যালেস্টাইনকে একটি ইহুদি রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে। আর বর্তমান প্যালেস্টাইনে ইহুদি-নয় এমন জনসংখ্যার নাগরিক অধিকার ভয়ানকভাবে খর্ব না করে ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করাও সম্ভব নয়। একথা মনে রাখতে হবে যে, ইহুদিরা প্যালেস্টাইনের জনসংখ্যার মাত্র দশভাগের এক-ভাগ। বাকী নয়ভাগই জিয়নিস্ট কর্মধারার ঘোর বিরোধী।"

মহাযুদ্ধের পর আমেরিকা পুনরায় 'নিরপেক্ষতা নীতির' আড়ালে সরে পড়ল। আরব-দাবীর ন্যায্য অংশগুলি মিটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে জনসন্তোষের উপর ভিত্তি করে নতুন এক মানবপ্রগতির বহুগতি প্রাণধারাকে সে উন্মুক্ত করতে পারত। তা না করে পদদলিত অথোসান সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ ইংরেজ ও ফরাসীদের হাতে সে ছেড়ে দিল লুঠ করে নেবার জন্যে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব অপসৃত হবার পর যে মার্কিন প্রতাপ আরবভূমিতে ছায়া ফেলতে লাগল তা হচ্ছে তেল-স্বার্থ। ১৯২৮ সালে ইরাক পেট্রোলিয়ম কোম্পানীর এক-চতুর্থাংশ কিনে নিল মার্কিন তেলশিল্পপতিরা; তিন দশকের মাঝামাঝি সৌদী আরব ও অন্যত্রও মার্কিন তেল-স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে আদর্শবাদী মার্কিন সাহিত্যিকেরা এই "তেল-সাম্রাজ্যবাদ"কে আক্রমণ করতে থাকলেন—আপটন্ সিনক্লেয়ারের নাম সহজেই মনে পড়ে। কিন্তু তেল-স্বার্থ সরকারী সাহায্য থেকে কোনকালেই বঞ্চিত হল না।

তৃতীয় দশকের প্রথম হতে য়ুরোপে শুরু হল নতুন করে নাৎসীপন্থী ইহুদি-অত্যাচার। প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমেরিকাও প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে উঠল। কিং-ক্রেন রিপোর্ট তখন বিস্মৃত-প্রায়, শুধু ঐতিহাসিকের কাছেই তার যা কিছু গুরুত্ব।

মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে আমেরিকাকে পুনরায় সচেতন করে তোলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মধ্যপ্রাচ্য মিত্রশক্তির হস্তচ্যুত হওয়ার মতো সামরিক বিপর্যয় রুজভেল্ট কল্পনা করতে পারলেন না। ১৯৪১ সালের জুন মাসে একজন মার্কিন সামরিক পর্যবেক্ষক মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট রচনা করেন; এই রিপোর্ট রুজভেল্টের নিকট পেশ করেন
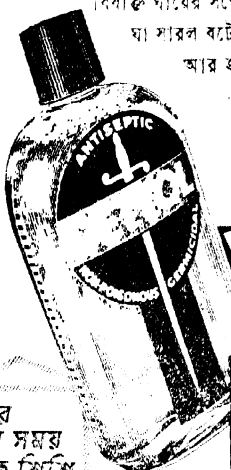
লণ্ডনস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ উইনান্ট। রিপোর্টে বলা হয়: "মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যশক্তির, অর্থাৎ বৃটেনের, অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে চলেছে।" পরের বছর গ্রীষ্মকালে মিশরে মিত্রশক্তির প্রাধান্য বিশেষ বিপন্ন হয়ে ওঠে। রুজভেল্ট তাঁর শয়নকক্ষ হতে জেনারেল জর্জ মার্শালকে 'তার' করেনঃ "মধ্যপ্রাচ্যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টির জন্যে আমাদের কি কিছুই করার নেই?" এই বিখ্যাত 'তারেই' রুজভেল্ট নির্দেশ দেন যে, প্রয়োজন হলে সুয়েজ খালকে অবরুদ্ধ করে ফেলতে হবে। কিছুদিন পরে চিয়াং কাইশেককে রুজভেল্ট জানান, "মধ্যপ্রাচ্যে অক্ষশক্তির দ্রুত অগ্রগতি মিত্রশক্তিদের পক্ষে এক বিশেষ সংকটের সৃষ্টি করেছে। যদি এই অগ্রগতি ব্যাহত না করা যায়, তবে ভারত ও চীনের সংগে আমাদের বিমানপথ বিপন্ন হবে, এবং ভারতের সংগে সমুদ্রপথ একেবারে বন্ধ না হলেও খুবেই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। মধ্যপ্রাচ্যকে ধরে রাখতেই হবে। তাই অক্ষশক্তির অগ্রগতি আটকাবার জন্যে সবরকমের সাহায্য পাঠান হচ্ছে।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর আমেরিকা হয়ে দাঁড়াল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সামরিক ও শিল্পশক্তি। দুনিয়ার এক বিস্তীর্ণ অংশে—এশিয়া ও আফ্রিকায়—অনেক নতুন আশা জেগে ওঠে মার্কিন নেতৃত্বে স্বাধীনতা ও গণস্বার্থ প্রতিষ্ঠার। রুজভেল্টের চাপেই বৃটেন চীনকে একটি বৃহৎ শক্তি বলে মানতে বাধ্য হয়েছিল, চীন থেকে ঔপনিবেশিক অধিকার প্রত্যাহার করেছিল; ভারতে রাজনৈতিক সন্তোষ আনয়নের একটা লোক-দেখান কপট চেষ্টাও বৃটেন করেছিল; অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে দাঁড়িয়ে সকল মানুষের চার-দফা স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারও মেনে নিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধবিরতির আগেই রুজভেল্ট গেলেন মারা, আর এমন সব শক্তি মার্কিন শাসনের উপর প্রভাব বিস্তার করে বসল যাদের বিশ্বদৃষ্টিতে রুজভেল্টের উদারতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

যুদ্ধোত্তর যুগে মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক গুরুত্বই আমেরিকাকে নাড়া দিল সবচেয়ে বেশি। আরব-সমস্যাকে বাস্তববুদ্ধিতে বিচার বিবেচনা করবার সময়ই সে পেল না। লেগে গেল রুশিয়ার সংগে শীতল যুদ্ধ। এলো ট্রুম্যান ডকট্রিন। একমাত্র নীতি হলঃ "মধ্যপ্রাচ্যকে ধরে রাখতেই হবে।"

রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের কোন 'আরব দৃষ্টি' ছিল না। তিনিই প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র গঠনে সবচেয়ে উৎসাহী হয়েছিলেন। অন্যত্র তিনি মোটামুটি বৃটিশ নীতিকেই সমর্থন করে গেছেন। ১৯৫১ সালে বৃটেনের নতুন মধ্যপ্রাচ্য কমাণ্ডের প্রস্তাবও ট্রুম্যান সমর্থন করেছিলেন। অর্থাৎ বর্তমান কালে আরবভূমিতে মার্কিন নীতির গোড়াপত্তন করলেন যে হ্যারী ট্রুম্যান আরব-মানস সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা আশ্চর্যকর। তাঁর আত্মচরিত পড়লেই এই অজ্ঞতা পরিষ্কার বোঝা যায়। শুধু সাম্যবাদ আটকানো ছাড়া আর বিশেষ কিছুই তিনি যেন জানতেন না, অবশ্য তেলস্বার্থ রক্ষা বাদে। শুধু দুবার ট্রুম্যান সরকার বৃটেনের মতে সায় দিতে অস্বীকার করেঃ প্রথম, ১৯৫১ সালে, ইংরাজের সংগে একজোট হয়ে সুয়েজে মার্কিন সৈন্য পাঠাবার জন্যে চার্চিলের প্রস্তাব, আর দ্বিতীয়, ১৯৫২ সালে ফারুককে নাসের-নাগিব বিপ্লব প্রতিরোধ করতে সাহায্য দানে বৃটেনের প্রস্তাব। উভয় ক্ষেত্রেই পররাষ্ট্র সচিব ডীন এচিসনের উদ্যোগেই মার্কিন নীতি গঠিত হয়।

আইসেন হাওয়ার রাষ্ট্রপতি হবার সংগে সংগেই ঘোষণা করেন যে, আরব দেশগুলি সম্বন্ধে নতুন একটা দৃষ্টিভংগীর তিনি সন্ধান করবেন, যার ভিত্তি হবে আরব-মার্কিন মৈত্রী। পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হবার চার মাসের মধ্যেই, ১৯৫৩ সালের মে মাসে, জন ফস্টার ডালেস আড়াই সপ্তাহ
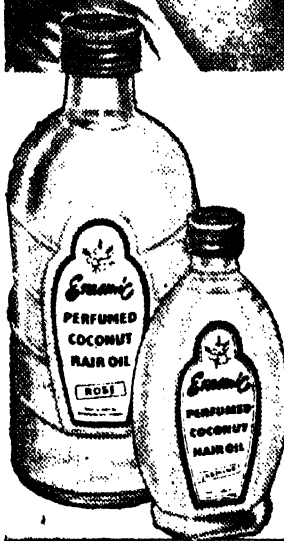
মধ্যপ্রাচ্যে ও দক্ষিণ এশিয়ায় কাটিয়ে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর গোড়াপত্তন করলেন। ১লা জুন ডালেস এক বেতার-টেলিভিশন বক্তৃতায় তাঁর প্রত্যক্ষদৃষ্টির ফলাফল মার্কিন জাতির নিকট নিবেদন করেন। প্রথমেই তিনি গিয়েছিলেন মিশরে। তখন বিপ্লবী মিশর সবে তার নতুন যাত্রা শুরু করেছে। ডালেস বললেন, "মিশর আজ এক মহান ভবিষ্যতের দ্বারে দাঁড়িয়ে। যদি সুয়েজ সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান হয়ে যায়, তবে আমি ঠিক বলতে পারি, মিশর তার ভূমির উন্নতি করে তার গৌরবময় অতীতের সঙ্গে একটি অধ্যায় যোগ করতে পারবে।" ইজরেইলে ডালেস দেখতে পেলেন, "নির্মাণব্যস্ত একটি নতুন জাতি", যে "এক মহান বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় বিরাট কিছু একটা সৃষ্টি করছে"; জর্ডনের রাজধানী আম্মানে রাজা হুসেনের সঙ্গে খানা খেতে খেতে বুঝতে পারলেন—"এদের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা প্যালেস্টাইনের বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন ও ইজরেইলের সঙ্গে সম্পর্ক"; সিরিয়ায় দেখতে পেলেন প্রাকৃতিক সম্পদ শিল্পায়নে জনগণের জীবন-মান বাড়াবার "ঐকান্তিক ইচ্ছা"; লেবাননে "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ব মিলনভূমি"; ইরাকে সম্ভাবনাময় নির্মাণ-কার্য; সৌদী আরবে আমেরিকার প্রতি রাজকীয় বাৎসল্য।

ডালেস তাঁর সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করতে প্রথমেই নাম করলেন "সাম্রাজ্যবাদের"। "নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সবাই স্বরাজের জন্যে উৎকণ্ঠিত। তারা উপনিবেশ-শক্তিগুলিকে দেখে সন্দেহের চোখে। তারা আমেরিকাকেও সন্দেহের চোখে দেখে, কারণ তারা মনে করে যে আমেরিকার মৈত্রী ও সমর্থন বৃটেন ও ফ্রান্সকে তাদের উপনিবেশগুলিকে ধরে রাখতে সাহায্য করছে... পশ্চিমী ঐক্যের কাঠামো সম্পূর্ণ বজায় রেখেও, আমেরিকা তার ঐতিহ্যানিহিত স্বাধীনতাশ্রয়ী নীতি অনুসরণ করতে পারে। বস্তুতপক্ষে, সুস্থির পথে স্বরাজ বিকাশ পশ্চিমী শক্তিগুলির ক্ষতি তো দূরের কথা, সাহায্যই করবে।.... ইজরেইল নির্মাণে সাহায্য ক'রে আমেরিকা যে আরব-অপ্রীতি-ভাজন হয়েছে, এবার তা দূর করতে হবে।......আরবদের ভয় যে আমেরিকা ইহুদী প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করবে; তারা সাম্যবাদের চেয়েও ইহুদি-প্রসারকে বেশি ভয় পায়...মধ্যপ্রাচ্যে নতুন কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বর্তমানে কোন সম্ভাবনা নেই......যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটা আবছা আগ্রহ রয়েছে; কিন্তু বাইরে থেকে একে চাপানো যাবে না, সমবেত উদ্দেশ্য ও সমবেত প্রয়োজনের তাগিদে মধ্যপ্রাচ্যেই কোন দিন এর জন্ম হবে......তবে উত্তর আরব অঞ্চলে সোবিয়েৎ ভীতি সত্যই বর্তমান রয়েছে......পরিশেষে আমি আবার বলছি যে আমাদের মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল বন্ধুত্ব দেখানো, সমঝোতা বাড়ানো।... আমেরিকারই কল্যাণ হবে যদি আমরা এ-সব দেশের লোকেদের সম্মান করতে পারি, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাধারা বুঝতে পারি।"

ডালেসের এই ভাষণ আরবভূমিতে অনেকখানি আশার সঞ্চার করেছিল। ডালেস তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কিছুটা কাজও শুরু করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে ডালেসের চাপেই বৃটিশ গভর্নমেণ্ট নাসেরের সঙ্গে সুয়েজ থেকে সৈন্য অপসারণের চুক্তি স্বাক্ষর

করতে বাধ্য হয়। ইরাক, তুর্কী ও ইরান ধীরে ধীরে পশ্চিমী আওতায় চলে আসা সত্ত্বেও ১৯৫৪ পর্যন্ত ডালেস নতুন একটা প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠনে আপত্তি করেন। তিনি মিশরকে প্রতিশ্রুতি দেন আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে অর্থ সাহায্যের এবং আদায় করে দেন বিশ্বব্যাংক ও বৃটেনের থেকেও অনুরূপ সাহায্যের প্রতিজ্ঞা। জর্ডন নদীতে বাঁধ দিয়ে জর্ডন উপত্যকাকে প্রাচুর্য-কেন্দ্রে রূপায়িত করবার জন্যে অর্থ সাহায্য করতেও তিনি এগিয়ে আসেন। মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে রাজদূত এরিক জনস্টন এজন্যে মিশর, সিরিয়া, ইরাক, জর্ডন ও ইজরেইলের সংগে আলাপ আলোচনার পর একটি সম্ভাবনাপূর্ণ পরিকল্পনা তৈরী করেন। ইজরেইল ও আরব দেশগুলির সহযোগিতায় ও বাইরেকার শক্তিসমূহের সাহায্যে বাস্তুহারা আরবদের পুনর্বাসন এই পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ডালেস জানতেন যে, ইজরেইল-আরব সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোনো নির্মাণ-আয়োজনই কার্যকরী হবে না। তাই ১৯৫৫ সালের ২৬শে আগস্ট মার্কিন কংগ্রেসের একটি কমিটির নিকট রিপোর্ট দিতে গিয়ে ডালেস ঘোষণা করলেন, "রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার আমাকে আপনাদের জানাবার অনুমতি দিয়েছেন যে, যদি আনুসংগিক অন্যান্য সমস্যার সমাধান হয়, তাহলে আমেরিকা প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী আছে যে, আরব-ইজরেইল সীমান্ত যুদ্ধ-দ্বারা পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক একটা চুক্তি স্বাক্ষরে সে প্রস্তুত।"

পূর্বতন ইতিহাসের সংগে তুলনা করে দেখলে সহজেই বোঝা যায় ডালেস মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতিকে অনেকখানি সোজা-পথে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনটি কারণে এই নীতি পরবর্তী পনের মাসের মধ্যেই একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। প্রথমত, ইজরেইল। আমেরিকার প্রবল ইহুদি স্বার্থ গভর্নমেন্টকে বাধ্য করল ইজরেইলকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য করে যেতে; মিশরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করতে অস্ত্র কিনতে গিয়ে নাসের দেখলেন মার্কিন বাজার একেবারে বন্ধ, আর ইংরেজ বাজার অতিশয় কৃপণ। তাই তিনি হাত পাতলেন রুশিয়ার কাছে, অস্ত্র পেলেন চেকোস্লোভাকিয়ায় ডালেসের উপরিউক্ত বক্তৃতার ঠিক পনের দিনের মধ্যেই। সংগে সংগে মধ্যপ্রাচ্য প্রাঙ্গণে আবির্ভাব হল রুশ মহাশক্তির। ডালেস-নীতির ব্যর্থতার দ্বিতীয় কারণ আরব জাতীয়তাবাদকে সাম্রাজ্যবাদের সংগে সংগ্রামে সাহায্য করার অক্ষমতা। বরং, ইরাককে সামরিক সাহায্য দিয়ে মিশরকে ডালেস ক্রুদ্ধ ও আতঙ্কিত করে তুললেন। ১৯৫৫ সালের প্রথমেই স্থাপিত হল বাগদাদ চুক্তির; সংগে সংগে আরব দেশগুলি দুটো পরস্পরবিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। তৃতীয় কারণ, মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক ও তৈলজাত গুরুত্বকে তার মানুষগুলির সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের চেয়ে বড় করে দেখে ডালেস এক দিকে যেমন আরব মানসকে পশ্চিম-বিরোধী করে তুললেন, অন্য দিকে রুশিয়াকে যেন প্রত্যক্ষ ভাবেই আহ্বান করলেন শীতলযুদ্ধের নবতম মল্লভূমিতে। ১৯৫৬ সালের হেমন্তে মিশর যখন আক্রান্ত হল আমেরিকা আক্রমণকারীদের বিরোধিতা করে আরব-জাতির হৃদয় জয় করল। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রস্থান ও রাশিয়ার আবির্ভাব যে নতুন মহাসমস্যার সৃষ্টি করল, সামরিক পথ ছাড়া তা সমাধানের অন্য কোন পথ ডালেস খুঁজে পেলেন না।

যে ট্রুম্যান নীতির অদূরদর্শী জটিলতা থেকে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন কূটনীতির মুক্তি জন ফস্টার ডালেসের কাম্য ছিল, বস্তুতপক্ষে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন সেই ট্রুম্যান ডকট্রিনেরই স্বাভাবিক পরিণতি। ব্যবধান মাত্র সময়ের, আর কালের কুটিলা গতির সংগে সংগে পৃথিবীর বদলাতি অবস্থার। ১৯৪৭ সালে শীতলযুদ্ধ সবেমাত্র ঘোরাল হতে শুরু করেছে; তার কেন্দ্র য়ুরোপ, সেখানেই সে সীমাবদ্ধ। গ্রীস ও তুর্কীকে সাম্যবাদের কবল থেকে বাঁচানোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য পশ্চিম য়ুরোপকে রক্ষা করা। তখনো রুশিয়ার হাতে অ্যাটম বোমা আসেনি। আমেরিকা পৃথিবীর বৃহত্তম সামরিক শক্তি। মধ্যপ্রাচ্যের ক্রোড়ভূমি আরব মহাদেশে বৃটিশ প্রভাব মোটামুটি অক্ষুন্ন। রুশিয়া যুদ্ধান্তে একবার কিছুদিনের জন্যে ইরান ও তুর্কীর উপর দৃষ্টি হেনে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে একপ্রকার বিদায় নিয়েছে; আরব অঞ্চলে তার কোন প্রভাবই নেই। আরব লীগ বিশেষভাবে রুশ-বিরোধী; নাহাস পাশা প্রমুখ আরব নেতারা রুশিয়ার কাছে ঘৃণা ও অবহেলার পাত্র। ভূমধ্যসাগর ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক বাতাবরণে যেটুকু অনিশ্চয় দুশ্চিন্তার আবির্ভাব, হস্তক্ষেপের হুমকি দিয়েই আমেরিকা তার গতিরোধে সক্ষম হবে, ট্রুম্যান ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ তাই বিশ্বাস করতেন।

১৯৫৬এর শেষে এ-অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। য়ুরোপে শীতলযুদ্ধ এমনই একটা স্থায়ী সীমান্তের সৃষ্টি করেছে যে হাংগারীর বিপ্লব, পোলাণ্ডের গোলমাল এমনকি রুশিয়ার রাজনৈতিক বিবর্তনও তাকে সামান্য নড়াতে পারেনি। এ সীমান্ত লংঘন করে নতুন যুদ্ধ ডেকে আনবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক যেমন আমেরিকা তেমনি রাশিয়া; আবার উভয়েই একই রকম দৃঢ়তার সংগে এই সীমান্ত রক্ষার জন্যে তৈরী। সুতরাং টয়েনবী যাকে "নড়ে চড়ে বসবার স্থান" বলে বর্ণনা করেছেন শীতলযুদ্ধের মল্লবীরদের তেমন কোন সুযোগ নেই য়ুরোপে। পূর্ব এশিয়ায়ও চীন মোটামুটি স্থির বাস্তবে পরিণত; সেখানে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, নতুন কোন গোলমালের সম্ভাবনা স্তিমিত। আফ্রিকায় চলেছে উপনিবেশ নীতির সংগে জাতীয়তাবাদের তুমুল সংগ্রাম; রুশ প্রভাব যেটুকু আছে, তা কেবল মানুষের চিন্তাধারায়।

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে পরিবর্তন পূর্ণবৃত্ত। ইংরেজ ও ফরাসী শক্তি অপসৃত। রুশ প্রভাব ক্রমবর্ধমান। আরব জাতীয়তাবাদ ঐতিহাসিক প্রেরণায় পশ্চিমবিরোধী। নেপথ্য থেকে প্রতাপ চালাবার দিন আর নেই। তাই রুশিয়াকে আটকে রাখবার প্রচণ্ড তাগিদে আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের সিঁড়ি বেয়ে আমেরিকা সোজাসুজি এসে নেমেছে আরব-রণ-প্রাঙ্গণে। (ক্রমশ)

আপনি ও তুই

শওকত ওস্‌মান

১

ভূমিকা

হালফিল যান্ত্রিক বাহনের মধ্যে মোটর-বাস্ সবচেয়ে গণতান্ত্রিক। স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে দেখুন, ওর পেট থেকে কি কি বেরোয়? বাচ্চা ত বেরোয়ই, তাছাড়া জোয়ান-বুড়ো, নর-মাদী, অফিসার-কেরানী, চাষী-মজুর, রোগা-মোটা অগয়রহ তাবত জান্তব মাল—অধিকন্তু চোগা-চাপকান, লুংগী-ধুতি, প্যান্ট, ঝাঁকা, গাঁঠরী, প্রভৃতি জড় পণ্য পর্যন্ত বাদ যাচ্ছে না। এহেন ইজ্জত-নির্বিকার যানবাহন আর কোথায়? ট্রেনে শ্রেণী ভাগ আছে। এরোপ্লেনে প্লেন লোক চড়ে না। ট্যাক্সির মাশুল সকলের জন্য সদয় নয়। বাস সত্যিই গণতন্ত্রের প্রতীক। আপিস-টাইমে গাদা-গাদি দাঁড়ানো বা বসা অফিসারের পাশে পিয়ন, ধনী ব্যবসাদার, গরীব পয়েণ্টসম্যানের ঔপবেশনিক ঘেঁষাঘেঁষি ও হৃদ্যতা দেখার মতো। সিল্কের হাওয়াই শার্টের সংগে হয়ত কোলাকুলি করছে তেলচিটে দাগ-ধরা গেঞ্জি। এখানে লেবাস সচেতন, ধোপ-দুরস্ত বাতিকওয়ালা পর্যন্ত কত উদার। কারণ, না হয়ে উপায় নেই। অপরের প্রতি সহনশীলতা, প্রতিবেশীর কোলে খানিকটা সরুয়া বা ঝোল মাখিয়ে দেওয়ার মেজাজের নামই ত গণতন্ত্র। বাস তার মক্কা।
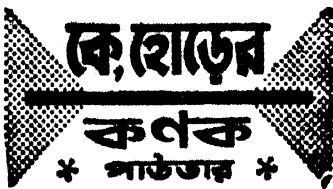
ড্রাইভার সকলের আগে গদি-ওয়ালা সীটে বসে। যে চালাতে জানে, তারই এমন আসন প্রাপ্য। যার চালানোর ক্ষমতা নেই, সে পিছনে বসবে। কোন না-লায়েক গদি-ওয়ালা সীটে বসে যদি রোয়াব ঝেড়ে বসে "বাস খারাপ, প্যাসেঞ্জার মহোদয়গণ, আপনারা নেমে ওটা ঠেলে ঠেলে পেছনে নিয়ে চলেন। এগিয়ে যাওয়া ত কথা, আমরা পিছন দিকে এগোচ্ছি ক্ষতি কি। কেউ বদনাম করতে পারবে না," তাহলে তার কান ধরে নামিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত একমাত্র এই বাসেই আছে। এমন বাহন গণতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি না ত কী? আগামী-কালে বাসের খানদানী ইজ্জত প্লেন, ট্রেনের চেয়ে ঢের বেড়ে যাবে, হলফ করে বলা যায়।

আপাতত বিশ মাইল মফঃস্বলের অভ্যন্তর জুড়ে ছুটোছুটি রত কোন বাস ধরা যাক। স্টেশনের পাশেই স্ট্যাণ্ড। ঈদের ভিড়ে বাসের পেট প্যাসেঞ্জারে আণ্ডিল। সকলে গাদাগাদি উপবিষ্ট। পনরজন দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার পর রাস্তা খারাপ। ড্রাইভার আর ঠাসার পক্ষপাতী নয়।

একটু পরে আমাদের মজকুর বাস গণ-তন্ত্রের মহিমা বিস্তারে জেলাবোর্ডের সড়কে কাঁকিয়ে কাঁকিয়ে চলতে লাগল। হেনরি ফোর্ডের অন্নপ্রাশনের সময় এই বাসের মডেল বেরোয়। সুতরাং বয়সে প্রবীণ। রাস্তা চলতে হাঁপায় ক্লান্তিবশত, তা না বলাই ভাল।

গুহাগত প্রাণের বেদনা যাত্রীরা ঠোঁট নেড়ে উপশম করতে লাগলেন। উজগুজ, মৃদু আলাপ, স্মিত-অট্ট-মুচকি—নানাবিধ হাসির ফোড়ন সংযোগে পাঁচ-সাত, দশ-বিশ মাইলের খন্দকী-ঝাঁকুনি সহার জন্য সকলে প্রস্তুত। কথা শেষে হৈরিগোল বনে যায়। কারণ বাইরে, লজ্ঝড় ইঞ্জিনের গণতন্ত্রী আর্তনাদ এত জোর যে, ভেতরে তার ধাক্কা সামাল দিতে, বাগ-যন্ত্র উঁচুগ্রামে তোলা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। বদহজমি হলে পেটে যেমন নানা ঐকতান শোনা যায়, বাসের পাকস্থলীর সেই হাল। সম্মুখে ইঞ্জিনের বুক-ধড়ফড়ানি, মধ্যে যাত্রী বোঝাই পেটের ট্রাবল, পেছনে কি? তার-ও সঠিক রিপোর্ট পনর মিনিট পরে পাওয়া গেল।

হঠাৎ পশ্চাতে বোমা-ফাটার শব্দ, তারপর শ্—শ্—শ্—রব। বোঝা গেল, গণতান্ত্রিক বায়ু নিঃসারিত হচ্ছে। বাসের টায়ার ফেঁসেছে।

ড্রাইভার বললে—"বদহজমি অইছিল, অহন ঢেকুর ছাড়তাছে। ডরান না সাব, বেশি দেরি অইত না।"

বায়বীয় দুর্ঘটনা না ঘটলে আর গল্প-লেখার কোন সুযোগ থাকত না। আপনাদের নিকট এই হাদিসেরও টীকা দিতে হয়।

বাস হরেক রকমের যাত্রী বোঝাই। কিন্তু একজন ঠিক সোজাসুজি পিছনে, এক কোণে বসেছিলেন। তাঁর কিসিম স্বতন্ত্র। লেবাস ত বটেই। তিনি পরেছেন ধূসর পাৎলুন, শার্ট উপরে কোট। পায়ে সম্ভ্রান্ত গোছের জুতো। তাঁর পদ তথা ইব চ। গোবদা ভারিক্কি-ভারিক্কি চওড়া মুখে তা জাহির।

বাসের পাকস্থলীর ঢেউয়ে এই জনাবের কোন বুদবুদ অবদান ছিল না। যেহেতু এতক্ষণ তিনি নির্বাক বসেছিলেন। বেবাক লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে শুধু ভেবেছেন, "এত কথা বলার উৎসাহ এরা কোথা থেকে পায়? রোজগারের নমুনা ত চেহারাতেই মালুম।" ভদ্রলোকের ঘড়ির বেল্ট পর্যন্ত হিরন্ময়। নিস্তব্ধতার মহিমা সেই সূত্রে, তিনি বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল হবেন, তা এমন কি বিচিত্র! কিন্তু ফাটা টায়ার সব ভণ্ডুল করে দিলে। অবশ্য ড্রাইভারের কারিগরী ইল্মে থেকে থেকে 'ওহি' (ঐশী-বাণী) ছাড়ছিল, "আধা ঘণ্টা যাইব, হুজুর। আপনেরা বাইরে বাতাস খান না ক্যান?"

কিন্তু বায়ু সেবনের কারো আগ্রহ ছিল না, সীট খোওয়ানের ভয়ে। পনেরজন ঠায় দাঁড়িয়ে আছে বাস ছাড়া অব্দি। সুতরাং তানরাই বরং হাওয়া খেতে গেলেন।

ড্রাইভারের পশ্চাদ্বর্তী সাহেব বেজায় অসোয়াস্তি অনুভব করেন। এতক্ষণ বাস চলছিল, সময় এক রকম করে কেটে যেত।

রাস্তার পাশে নানা দৃশ্য ত আছে। কিন্তু এখন কাঁহাতক আর চুপচাপ নিঝুমে ফকির সেজে বসে থাকা যায়? এখনও পনর মাইল পথ বাকী। তিনি উসখুস্ শুরু করলেন। আর কাঁহাতক চুপচাপ। কিন্তু কথা বলতে চাইলেই কি বলা যায়? তার জন্য হলকুমের ট্রেনিং দরকার। বাক্যালাপের আবার পর্যায় আছে। উঁচু ঢিবির নীচু ডহর জমিনের সংগে কথা—তার নাম উপদেশ, নসিহৎ, হুকুম, মেহেরবানী ইত্যাদি। নীচু জমিন থেকে আবার যে-কথা উপরের ঢিবির দিকে হাঁটে, তার আল্লার মত একশ' এক নাম (বোধ হয় আরো বেশি) :—অনুরোধ, আবেদন, আদেশ-পালন, যাচঞা, ভিক্ষা, অগয়রহ।

এই ক্ষেত্রে তাই সমস্যার আবির্ভাব। জনাবের পাশে যে-ব্যক্তি উপবিষ্ট ও যার সংগে কথা বলতে বাগ্‌যন্ত্র যথাসম্ভব খাদে রাখা যায়—সে একদম সাদা জমিনের বাসিন্দা। সুতরাং উঁচু ঢিবির বিস্তর অসুবিধা। পাশের লোকটির বয়স চল্লিশ-পঞ্চাশের মাঝামাঝি। একহারা চেহারা, ঘন দাড়িবিশিষ্ট মুখখানা বড় শান্ত ও স্নিগ্ধ। মাথার টুপি তার মুখের ইজ্জত আস্ত রেখেছে। লোকটির পরনে প্রবীণ স্যান্ডেল, গায়ের শার্টটি পাজামার চেয়ে আরো ময়লা।

কিন্তু গণতন্ত্র যে ওদিক ফেঁসে বসে আছে। ড্রাইভার টুকটাক, খুটখাট, কি কি যেন করছে। আধ ঘণ্টা গেল—কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না গণতন্ত্র চালু হওয়ার। এদিকে কতক্ষণ চুপ করে থাকা চলে। মজকুর সাহেব আসলে মজলিসী লোক। এখন গণতান্ত্রিক ফেরে পড়ে-ই না চুপ।

হলকুমের ওদিকে বড় দাপাদাপি, সুড়সুড়ি শুরু হয়েছে। কথা বলা একান্ত দরকার। অথচ—সমস্যা।

শেষে বাকপ্রয়াসী সাহেব মরিয়া হয়ে সিগারেট কেস বের করলেন। এটিও হিরন্ময়। কিন্তু স্তব্ধতার কদর আর তিনি দিতে রাজী নন। তাই সিগারেট কেস খুলে পার্শ্ববর্তী সহযাত্রীর দিকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু সে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ ধূমপানের এস্তেমাল নেই। যাক বাকসেতুর একটা লাইন পাতা হল। সাহেব ধোঁয়া টেনে গলা-চুলকানি থামানোর চেষ্টা পেলেন। কিন্তু সংযম আর হালে পানি পায় না। ওদিকে ড্রাইভার তুলে আছাড় দিচ্ছে, "থোড়া দেরি, আধা-ঘণ্টা লাইগত ন।" নিতান্ত গরজে মজকুর জনাব মুখ খুললেন।

সহজে মানুষ চেনার জন্যে এবার শর্টহ্যান্ড বা সংক্ষেপ-লিপির আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

আপনি=সেই জনাব।

তুই=সেই সাদা জমিনের বাসিন্দা।

তুমি=বাসের যে কোন যাত্রী।

আর ধরে নেওয়া যাক, ড্রাইভারের আধ ঘণ্টা আর ঘড়ির আধ ঘণ্টায় ইতিমধ্যে কোন এক সময় আর গরমিল হয়নি।

২

গল্প শুরু

বাস চলছে। গণতন্ত্রী মহিমা কীর্তনে আকাশের ফাট-ফাট অবস্থা।

(আপনি ও তুইয়ের অনেকক্ষণ মৃদু আলাপের পর।)

আপনি॥ বড় দেরি হচ্ছে।

তুই॥ এমন লক্কড়ে বাস। প্রায়-ই ঝামেলা লেগেই আছে।

আপনি॥ আপনি প্রায় যান নাকি?

তুই॥ হ্যাঁ, জনাব, কত দেরি হল, হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি নামলে?

আপনি॥ না, না,—এমন বদ—নিয়ত (অভিলাষ) করবেন না।

তুই॥ না করে উপায় কি। যত না-লায়েক বাস সব এই লাইনে।

আপনি॥ তবু মফঃস্বলের সংগে যোগাযোগ রেখেছে ত।

তুই॥ এমন থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

আপনি॥ ভাই সাহেব, এই দুঃখেই বাড়ি আসি না। ঠিক পুরো পাঁচ বছর পরে—

তুই॥ পাঁচ বছর পরে বাড়ি ফিরছেন?

আপনি॥ জী। বেগম সাহেবা আগে গেছেন। তার-ই ঝোঁকে এবার—

তুই॥ মেয়েদের মন বড় কাঁচা। শ্বশুর-বাড়ি না গিয়ে ওরা থাকতে পারে না।

আপনি॥ কিন্তু যা যাতায়াতে মজা। গাঁয়ে গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে হয় না। আর শহরে গেলে মনে হয় না যে, গাঁয়ে কোনদিন ফিরব।

তুই॥ তবু জন্মভূমি।

আপনি॥ আমার এপাট তুলে দিতে হবে।

তুই॥ না, না, তা করবেন না।

আপনি॥ সময়ের মূল্য আছে। এমনভাবে—

তুই॥ জেলাবোর্ড একটু নজর দিলেই সব হয়।

আপনি॥ নজর দেয় না?

তুই॥ মোটেই না। মাঝে মাঝে রাস্তায় মাটি দেয়, তাতেই নাকি দশ-পনের হাজার

খরচ। লোকে বলে, মেম্বরদের পকেট আর পেট মেরামত হয়।

আপনি॥ রাস্তা ভাল হলে কি হবে, ভাল গাড়িও দরকার।

তুই॥ রাস্তা ভাল হোক, দেখবেন ভাল গাড়ি আসছে।

আপনি॥ তা আপনার কথা ঠিক। এলাকার লোক লেখালেখি করে না কেন?

তুই॥ লেখক হয়ে যাওয়ার ভয়ে।

আপনি॥ (হাস্য) তবু লেখালেখি করলে—

তুই॥ আমি নিজে ছদ্মনামে খবরের কাগজে অন্তত দশখানা চিঠি দিয়েছি। কিন্তু গেরাহ্য করে কে?

আপনি॥ করে না?

তুই॥ করবে কে? সবাই নিজের চরকা নিয়ে ব্যস্ত।

আপনি॥ বড় খারাপ কথা।

তুই॥ যত বড় সাহেব, তত বড় চোর। আর চোরেরা নিজের ও পরের বুচকি নিয়ে ব্যস্ত।

আপনি॥ বড় খারাপ কথা। পাঁচ বছর পরে বাড়ি ফিরছি। দু-দশ দিন গাঁয়ে থাকব, কিন্তু রাস্তার এই অবস্থা!

তুই॥ আপনারা ত শহরে থাকতে পারেন। কিন্তু আমরা?

আপনি॥ সমস্যা—

তুই॥ সমস্যা বলে সমস্যা। এই রাস্তার জন্যে আমি নিজে কত কষ্ট করেছি। কত সায়েবদের তোষামুদি। কিন্তু সব শালা—

আপনি॥ আপনি একা চেষ্টা করলে কি হবে?

তুই॥ অনেক-কে ধরে দরখাস্ত লেখাই, সই করাই। তবে কি জানেন—

আপনি॥ কি বলুন।

তুই॥ আমার চেষ্টা করার মৌকা আছে।

আপনি॥ কি রকম?

তুই॥ নিজের জেলার রাস্তা। তাই সাহেবদের ধরে বসি। কিন্তু এই বুড়ো বয়সে—মুখে খিস্তি ছাড়া আর কিছু আসে না। আমি নিজে এল এম জি-তে (স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ) কাজ করি কিনা।

আপনি॥ কী বলছেন?

তুই॥ আমি নিজে এলোমজি 'ডিপার্টের' লোক কিনা।

আপনি॥ ওখানে কাজ করেন?

তুই॥ জী।

আপনি॥ কি করেন?

তুই॥ আমি?

আপনি॥ হ্যাঁ। আপনি ওখানে কেরানী?

তুই॥ না।

আপনি॥ তবে?

তুই॥ পিওন।

আপনি॥ ও—ও......কোন্ সেক্‌শন?

তুই॥ 'গ' সেকশন।

আপনি॥ তুই 'গ' সেকশনের পিয়ন।

তুই॥ (আহত) কি বলছেন?

আপনি॥ আমি 'গ' সেকশনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

তুই॥ (ঢোক গিলিয়া সংকুচিত) আদাব, স্যার।

আপনি॥ আদাব। তোকে দেখিনি যে।

তুই॥ আমার প্রায় আউট-ডোর ডিউটি থাকে। আর কিছুদিন ছুটিতে ছিলাম।

আপনি॥ তুই তাহলে আমার ডিপার্টমেণ্টের লোক?

তুই॥ হ্যাঁ, স্যার।

আপনি॥ আগে বলতে হয়। এতক্ষণ বোবার মত বসে আছি।

তুই॥ কি করে জানব, স্যার?

আপনি॥ বেশ ভালই হল। যাবি কোথা?

তুই॥ বাড়ি।

আপনি॥ তোর বাড়ি কোথায়?

তুই॥ সুধাগঞ্জ, মুন্সীপাড়া।

আপনি॥ সুধাগঞ্জ?

তুই॥ হ্যাঁ, স্যার।

আপনি॥ আমার খাঁ-পাড়া। এক মাইলের মধ্যে। তুই ত আমার পাড়াইল্যা ভাই দেখছি।

তুমি॥ (জনান্তিকে) কৌমী ভাই-ও বটেন!

আপনি॥ (প্রতিবাদের সুরে) নিশ্চয়। কুরানে আছে, সব মুসলমান ভাই-ভাই। আরবী ভাষায়ঃ কুল্লো কুল্লো (আটকাইয়া) কুল্লো......সব ভাই-ভাই।

তুমি॥ (জনান্তিকে) তাহলে ত মাকে ভাবী (বৌদি) ডাকতে হয়।

তুমি॥ (সকলে তুমুল হাস্য)

আপনি॥ (কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর) বেশ ভালই হল। আজ দেখছি, অনেক রাত হয়ে যাবে। বাসের ছাদে আমার বেশ কিছু মাল আছে। কুলী পাওয়া যাবে ত?

তুই॥ ভয় কী স্যার?

আপনি॥ রাত্রে কুলী না পাওয়া গেলে—

তুই॥ স্যার কোন ভয় নেই। আমার এই পাতলা ঘাড়ে এখনও সওয়া মণ নিতে পারি। আগে দু-মণ নিতাম।

আপনি॥ সাবাস। আমার ঘুম পাচ্ছে। কোণে বসেছি, হেলান দিয়ে একটু খোঁয়ারি নিতে হবে।

তুই॥ নিন না স্যার।

আপনি॥ বাসের ছাদে আমার দুটো বড় ট্রাঙ্ক আছে। প্যাসেঞ্জার যখন ওঠে-নামে, খেয়াল রাখিস্।

তুই॥ তা রাখব স্যার। আপনি স্যার আরাম করুন, স্যার।

৩

স্টেশনে নেমেও পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথযাত্রা। কোথাও ঝোপ-জঙ্গল, কোথাও অনুর্বর প্রান্তর, তারই মাঝে মাঝে ছোট ছোট চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এসে শাল আর গজারিবন বেষ্টিত এই অনুচ্চ মালভূমির সীমানা। এ সীমানার আশেপাশে আজ যারা বাস করে, তারা শান্ত নিরীহ জাত। এই নিরীহ লোকগুলোর নিস্তেজ মুখের দিকে তাকিয়ে এ-কথা আজ কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে, একদা এদেরই পূর্বপুরুষ দুর্ধর্ষ বীরবংশীরা এ-দিকের সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে এক বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এদের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ ও নিষ্ঠুর মূঢ়তা পাঁচ ক্রোশ দূরে রোহিতপুর থানার সরকারী লোকদের পর্যন্ত সন্ত্রস্ত করে তুলত।

ভাওয়াল পরগনার যে অংশটা গেরুয়া মাটির মালভূমির উপর ভাওয়ালগড় নামে পরিচিত, তারই এক প্রান্তে সুতানাটি গ্রামে এই বীরবংশীদের বাস। অতি দুর্ধর্ষ জাত; হত্যা, রাহাজানি, লুণ্ঠন—এই অঞ্চলে এমন কোন গর্হিত ঘটনা নেই, যার সঙ্গে কোন না কোন সূত্রে এরা জড়িত নয়। কালো আবলুসের মত গায়ের রং, গজারি-বীথির মতই সুদৃঢ় গড়ন, যেন এক-একটা সাক্ষাৎ যমদূত।

যমদূতই বটে। যেমনি স্বভাবে, তেমনি চেহারায়। দৈবাৎ যদি কথনো বুধন বংশীর মুখোমুখী পড়ে যান, তবে আর রক্ষা নেই। আপনি ঘাড় ফেরাবারও সময় পাবেন না, তার আগেই সব শেষ। এই 'গড়ের' মধ্যেই তো দেখলাম এমন কত 'কেস'।

অঘোর দারোগা আরো ঘন হয়ে বসেন। দু চোখে তাঁর অদ্ভুত বিস্ময়! রোহিতপুর থানার কাছারি ঘরে ফরেস্টার মুকুন্দ চৌধুরীর মুখোমুখী বসে এই বিচিত্র মানুষগুলোর কাহিনী শুনে অবাক হয়ে যান। সবেমাত্র বদলী হয়ে এসেছেন, আসবার পূর্বে এদের সম্বন্ধে কিছু কিছু গুজব শুনেছিলেন বটে, কিন্তু সেই লোকগুলো যে এমন মারাত্মক, তিনি তা কল্পনাও করেননি।

মুকুন্দবাবু মৃদু হাসলেন। বললেন, নতুন এসেছেন, কিছুদিন থেকে গেলে আরো কত কী জানবেন। কিন্তু সাবধান, ঐ লোকগুলোকে বেশি ঘাঁটাবেন না। সর্দার বুধন বংশীটা আসল শয়তান। সাক্ষাৎ দুশমন!

অঘোর দারোগা এবার মনে মনে হাসলেন। পুলিস লাইনে দুশমনের ভয়? দুশমন নিয়েই তো তাদের কারবার। হেসে বললেন, একবার দেখে আসি আপনাদের দুশমনের বাহাদুরিটা কেমন।

এই দুশমন খুঁজতেই অঘোর দারোগা সুতানাটি অঞ্চলে অনেকবার গিয়েছেন। জেনেছেনও অনেক কিছু। ভাওয়ালগড়ের এক প্রান্তে অনুর্বর লাল মাটির চড়াই, উতরাই। আশেপাশে সুতানাটি গ্রাম। কয়েক ঘর কুঁড়ে বস্তি আর ঝোপ-জঙ্গল নিয়ে ছোট এক লোকালয়। তারই এক প্রান্তে সর্দার বুধন বংশীর বাস। লম্বা মজবুত চেহারা, পোড়া তামাটে গায়ের রং, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, দেহের খুঁটিতে এখনো হাতির বল।

বুধন বলে, মিছা কতা কমু ক্যান, দারগাবাবু, ঐডাই মোদের বেবসা।

অঘোর দারোগা অবাক হন। বলিস কি, চুরি-ডাকাতি একটা ব্যবসা? এমন সব জোয়ান মরদ, খেটে খেতে পারিস না?

খেটে খাওয়া মানে চাষ-আবাদ করে খাওয়া। আশেপাশের মুসলমান আর নমঃশূদ্রেরা তাই করে খায়। কিন্তু বীরবংশীদের সমাজে চাষ-আবাদ নীচু কাজ। সমাজের বদনাম। পেটের দায়ে জাইত দিমু?

তা' বটে! অঘোর দারোগা মনে মনে হাসেন। পেটের দায়ে নয়, পুলিসের গুঁতোয় জাতের দেমাক ভাঙাতে হবে।

মুকুন্দবাবু মুখ টিপে হেসে বললেন, আপনি তো আপনি, কেমন কেমন কত কাদেরেল দারোগা এল আর গেল, কত জেল-আদালত হল, তবু এ-জাতের 'গোঁ' ছাড়াতে পারে, এমন সাধ্য কারো হল না।

অঘোর দারোগা বললেন, কি জানি মশাই, এ জাতের 'ফিলজফি' বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই। চুরি-জুচ্চুরির মধ্যে জাতের কোন্ কৌলিন্যটা থাকতে পারে, তা' আমি বুঝি না।

মুকুন্দবাবু হেসে বললেন, বুঝবেন-বুঝবেন। কিছুদিন থেকে গেলে আরো অনেক কিছু বুঝতে পারবেন।

ক্রমে সত্যি অনেক কিছু জানলেন অঘোর দারোগা। কবে—কোন্ সুদূর অতীতে এই গজারিবেষ্টিত মালভূমির বুকে একদিন সত্যি-সত্যিই 'গড়' স্থাপিত হয়েছিল, কত লোকজন, সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রের ঝনৎকার,—

সে সব কাহিনীর কিছুটা ইতিহাসাশ্রয়ী, আর কিছুটা প্রবচন। এ-গড়ের বুকে সত্যি কোনদিন দিল্লীশ্বরের সেনাবাহিনী পরিচালিত হয়েছিল কি না, শূরবীর মানসিংহের সঙ্গে বাংলার বারো ভূঁইয়ার শক্তি-পরীক্ষার লড়াই হয়েছিল কি না, সে সব ঘটনার চিহ্নমাত্র আজ কোথাও নেই। কিন্তু তার কাহিনী আছে, আছে এই বীরবংশীদের উপকথায়—।

হু, দারোগাবাবু, নিশ্চয় ছিল। ঐ যেথায় এখন গড়ের বড় টিলাটা আছে, হেথায় আছিল রাজার কেল্লা। কত লোকজন, সিপাই-সান্ত্রী, আর আছিল রাজপুত্তে পল্টন। মোরা তেনাদেরই বংশধর কিনা—।

অঘোর দারোগা বিস্মিত হন। বলিস কি?

—বলবু আর কি, ঠিক কথাই কইছি। তেনাদের বংশধর হয়ে মিছা কথা কবু?

মুকুন্দলালও বললেন সেই কথা। এই ভাওয়ালগড়ের বুকে ঈশা খাঁ আর মানসিংহের যুদ্ধকাহিনী ইতিহাসস্বীকৃত ঘটনা। সে যুদ্ধে কার কত সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল, তার হিসেব নজীর কোথাও লিখিত নেই। কিন্তু রাজা মানসিংহের সঙ্গে যে একদল রাজপুত পল্টন এসেছিল, তার উত্তরাধিকার পরিচয় আজও ভাওয়াল-গড়ের আশেপাশে রয়ে গেছে। এই রাজপুত কাহিনীরই একটা অংশ কেমন করে যেন এই গড়ের সীমানায় আটক থেকে যায়। কাল-ক্রমে এই গড় ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেল, আশ-পাশে জেগে ওঠে শাল আর গজারির নিবিড় অরণ্য। এই অরণ্যের আশে-পাশে জঙ্গলে ওঠে শাল আর গজারির নিবিড় করে একদা দুর্ধর্ষ পল্টন বাহিনীর বংশধর এই বীরবংশীরা আজও টিকে আছে।

অঘোর দারোগা অবাক হয়ে বললেন, বিচিত্র তো?

বৈচিত্র্য আরো ছিল। এই বিচিত্র জাতির জীবনযাত্রার বিচিত্রতর কাহিনী জানবার পূর্বেই অঘোর দারোগা বদলী হয়ে গেলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন ফটিক রায় এবং এসেই আরেক বিচিত্র ঘটনায় জড়িয়ে পড়লেন।

সন্তানাটি অঞ্চলে দু-চারটা খুন-জখম তো নৈমিত্তিক ব্যাপার। সন্ধ্যার পর শাল আর গজারির ছায়াতল যখন আঁধারে জমাট বাঁধে, নির্জন টিলা আর অনুর্বর প্রান্তর রাতের স্তব্ধতায় ছমছম্ করে, তখন সন্তানাটির বীরবংশীরা বের হয় অভিসারে। রক্তের শিরায় জাগে আদিম হিংস্রতা, চোখের তারায় শ্বাপদের ক্রূর উল্লাস, এমন মত্ততার মধ্যে কোন দুর্ভাগা পথিক দৈবাৎ মুখোমুখী পড়ে গেলে, তার আর অব্যাহতি নেই।

কিন্তু এ-ঘটনা তা' নয়। সেদিন উদ্ধব বংশীর বউটার ভাবগতি দেখে সকলের মনে এক সন্দেহ জাগল। আলুথালু চুল, ফোলা-

ফোলা চোখ মুখ, বিহ্বল দৃষ্টিতে চারপাশ তাকিয়ে বউটা এক-একবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে। তারপর হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়ে উন্মাদের মত বলতে থাকে,—না-না, আমি ডাইন না। আমারে তোমরা মাইরো না, আমি মরুম না—!

সন্দেহ আরো প্রকট হয়ে উঠে। সমস্ত লক্ষণই স্পষ্ট মিলে যায়। সুতানাটির পূর্ব-পুরুষদের নিয়মে বিয়ের পর যে মেয়ের ছেলেপিলে হল না, সে হল ডাইন! সেই ডাইনের চোখে বিষ, মনে বিষ, রক্তের শিরায় শিরায় বিষের দাহন! সে দাহনে ঘরের পুরুষ মরে, ডাইনের দৃষ্টিতে বিষ ঝরে, রোজা-বাদ্যির সাধ্য কি সে বিষ ছাড়ায়!

সুতানাটির উদ্ধব বংশী দুদিনের জ্বরে বেহুঁশ হয়ে মারা যায়। সর্দার বুধন বংশী বলে, জ্বর-টর কিছু না, আসলে ডাইনের ছোবলে মারা গেছে। উদ্ধবের বৌটা ডাইন অইয়া গেছে।

—আমি ডাইন? উদ্ধবের বৌ পাগলের মত আর্তনাদ করে বলে, আমার সোয়ামীরে আমি মাইরা ফেলছি? অ্যাঁ?—

চারদিকে লোকজন তখন ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। সবার চোখে মুখে এক বিচিত্র উল্লাস! ডাইনের চোখে বিষ মনে বিষ, রক্তের শিরায় শিরায় বিষের দাহন—সেই ডাইন ধরা পড়েছে, বাঁধন নিয়ে ছটফট করছে, স্বামীর চিতার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরবে—।

—না-না, আমি মরুম না। ছাইড়া দেও.—ছাইড়া দেও আমারে—। উদ্ধবের বৌ মরিয়া হয়ে উঠে। একপাশে উদ্ধবের মৃত দেহটা রাখা হয়েছে, রাশি রাশি শুকনো ডাল জড় করে একটি চিতাও তৈরী করা হয়েছে. মুহূর্ত পরেই এই নাটকের যে দৃশ্যটি উদ্ঘাটিত হবে, সে দৃশ্য বড় মর্মান্তিক! ভাওয়াল গড়ের বুকে দাউ-দাউ আগুন জ্বলে উঠবে, অগ্নিশিখা লেলিহান হয়ে উঠবে, তারই মধ্যে এই শবদেহের সঙ্গে এক বন্ধ্যা নারীকেও জোর করে চিতায় তুলে দেওয়া হবে। এ'টাই সমাজের বিধি, পূর্ব-পুরুষদের আচরিত নিয়ম।

—না-না, আমি মরুম না, আমারে তোমরা ছাইড়া দেও,— ছাইড়া দেও আমারে। মৃত্যু-যাতনায় যেন ছটফট করতে থাকে উদ্ধবের বৌ। বুধন সর্দারের পায়ে আছড়ে পড়ে,—কও—তুমি কও সর্দার, আমি ডাইন? সোয়ামীরে মাইরা ফেলাছি আমি? অ্যাঁ?—

বুধন রূঢ় হাসে। এমন ছল-চাতুরী অনেক দেখেছে সে। রক্তের বিষে ডাইন এমন ছট্‌ফট্ করে। ডাইনের চক্ষে বিষ, মনে বিষ, রক্তের শিরায় শিরায় বিষের জ্বালা! 'ডাইনীর বিষে পুরুষ নীল অইয়া মরে, বিষের জ্বালায় ডাইন জ্বইল্যা পুইড়া মরে।' পূর্ব-পুরুষদের এইটাই দৃষ্টান্তঃ তেনাদের এই বিধি-বেবস্থা, সোয়ামীর চিতায় ডাইন জ্বইল্যা পুইড়া মরে। ইয়ার আর অন্য বেবস্থা নাই, বিধি নাই। কিন্তুক—

পা-টা সরাতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য যেন বুধন বিমনা হয়ে যায়। উদ্ধবের বৌয়ের ছটফটানিতে বহুদিনের আরেকটা ছবি ভেসে উঠে। তার বড় মেয়ে কুন্তলাও এমনিভাবে আলুথালু বেশে বুধনের দু'পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলে ছিল, আমি ডাইন? ছাওয়াল পাওয়াল অইল না, হেই দোষ আমার? অ্যাঁ?—

বুধনের কপাল মন্দ, তার পুত্র সন্তান নেই। দু'টি মাত্র মেয়ে রেখে স্ত্রী মারা যায়। কুন্তলা আর পিংগলা। যেন দুই নয়নের মণি। বুকের পাঁজরের দুই টুকরো অস্থি। তারই একটি আজ ভেংগে গেছে. বুকের দু'পাশে হৃৎপিণ্ডের একটির স্পন্দন থেমে গেছে। বুধন আজ চোখের এক মণিহারা!

অথচ সবদিক দেখে শুনেই তো বিয়ে দিয়ে ছিল কুন্তলার। শ্রীদাম বংশীর ছেলেকে নিজে পছন্দ করে জামাই করে এনেছিল। কিন্তু শেষে এই ছেলেই কাল হল, ডাইনীর বিষ নজরে দু'বছর না ঘুরতেই শেষ হয়ে গেল। নিজের মাইয়াই অইল ডাইন! যে মাইয়ার ছাওয়াল পাওয়াল অইল না, সোয়ামী বাঁচল না, হেই মাইয়া ডাইন ছাড়া আর কী? মৃত্যুর পূর্বে কুন্তলা এমনিভাবে বুধনের পায়ে আছড়ে পড়ে মাথা খুঁড়ে বলেছিল, আমি ডাইন? সোয়ামী মইরা গেল, হেই দোষ আমার? অ্যাঁ?—

এর কি জবাব দেবে বুধন? বুধন নির্বাক। বুকের স্পন্দন বুঝি তার থেমে গেছে, সমস্ত দেহটা থরথর কাঁপছে, তবু বুধন নির্বাক! সমাজের বিধান, পূর্ব-পুরুষদের বিধি বেবস্থা সর্দার অইয়া' সে অমান্য করব কেমন? নিয়ম ভাংগবে কেমন করে?

শেষ পর্যন্ত নিয়ম লংঘন করেনি বুধন। সেদিন ভাওয়াল গড়ের বুকে তার অসহায় চোখের সামনে যে এক বিয়োগান্ত নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে, বুধন নিজে দাঁড়িয়ে নিজেরই বুকের এক টুকরো অস্থি স্বহস্তে যেন সেই চিতাগ্নি শিখায় বিসর্জন দিয়ে আসে।

তারপর একমাত্র মেয়ে এই পিংগলা। বুধনের অপর হৃৎপিণ্ড যেন। এতদিন বুকের আড়াল করেই রেখে আসছিল বুধন, সেই পিংগলা আজ তেরো চৌদ্দ বছরের হয়ে উঠেছে। পাড়ার লোকজন এখন বলাবলি করে, মাইয়ারে এইবার বিয়া-সাদি দেও, সর্দার। সুযুগ্যি দেইখ্যা এউগ্যা ছেইলা ঘরে আন। নাতি-পুতি লইয়া সাধ-আহ্লাদ কর—।

শুনে বুধন মনে মনে হাসে। নাতি-পুতি দেখে যাবার তারও কি অসাধ? কিন্তুক—, পরের কথাটা মনে পড়তেই বুধনের বুকটা যেন আচমকা কেঁপে উঠে। মনে মনে একটা কল্পিত অমংগল আশংকা যেন জোর করে চেপে রাখতে চেষ্টা করে। অদূরে

অসহায় বন্ধ্যা বউটার দিকে চোখ পড়তে হঠাৎ আরেকটা শঙ্কা যেন তাকে আড়ষ্ট করে তোলে। না-না-না—এমন একটা দুর্ভাগ্য কখনো আসতে পারে না—কখনো না।

নিজেকে আবার শক্ত করে তোলে বুধন। চারপাশে তখন ঢোল আর মাদলের তালে তালে ডাইনী নিধনের উৎসব মেতে উঠেছে, সুতানাটির জোয়ান পুরুষগুলো হিংস্র উল্লাসে মাতাল হয়ে উঠেছে। বুধনের দৃষ্টিও নির্মম। সর্দারের কঠোর কর্তব্য-জ্ঞানে বুধন ক্রুর হিংস্র, নির্মম হয়ে ওঠে।

তারপর সেই চিরাচরিত বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা। ভাওয়ালগড়ের বুকে চিতাগ্নির লেলিহান শিখায় এক নিষ্ঠুর নাটকের যবনিকা ঘটে। একটা ক্ষীণ আর্তনাদ,—চারপাশে বহু কণ্ঠের মাতাল উল্লাস—ভাওয়ালগড়ের বুকে চিতাগ্নি শিখায় একটা মৃতদেহের সঙ্গে এক অসহায়া নারীকেও জোর করে আহুতি দিয়ে সুতানাটির এক-দল মত্ত পুরুষ বহ্ন্যুৎসবের উল্লাসে মেতে উঠে।

খবর পেয়ে রোহিতপুর থানার ফটিক দারোগা দলবল সহ ছুটে যান। কিন্তু যাবার পূর্বেই সব শেষ হয়ে গেছে। লোক-জন পালিয়ে গেছে। ফটিক দারোগা সমস্ত গ্রামটা তোলপাড় করে বুধন বংশীকে থানায় টেনে নিয়ে আসেন।

—বল, বউটা গেল কোথা?

বুধন মুখ টিপে হাসে। চোখের কোণে রহস্যের ছায়া নামিয়ে বলে, বউটা কি আর মানুষ আছিল বাবু? ডাইন অইয়া গেছিল না? ডাইনীর চক্ষে বিষ, মনে বিষ, অক্তের শিরায় শিরায় বিষের জ্বালা! হেই জ্বালায় মানুষে পাগল অইয়া যায় না? জ্বইল্যা-পুইড়া মরে না?

ফটিক দারোগা ভ্রুকুটি করেন। কিন্তু বুধনের মুখে ঐ এক কথা। মানুষে কি আর তখন মানুষ থাকে? বিষের জ্বালায় পাগল অইয়া যায় না? আগুনে সেইধ্যা পুইড়া মরে না?

ফরেস্টার মুকুন্দ চৌধুরী বললেন, ডাইন-ফাইন কিছু নয়, মশাই। আসল ব্যাপার হল ওদের মারাত্মক প্রথা।

—মানে?

—মানে সহমরণ আর কি। স্বামীর মৃত-দেহের সঙ্গে স্ত্রীকেও পুড়িয়ে মারে এরা।

ফটিক দারোগা চমকিত হন। বলেন কি? এ-সব প্রথা এখনো আছে নাকি?

মুকুন্দবাবু বিজ্ঞের মত হেসে বললেন, আছে বই-কি। জংলী জাত, এদের নিয়ম-কানুনেই আলাদা।

সত্যি আলাদা নিয়ম। বহুকাল আগে এই দেশেরই সমাজ-জীবনে সতীত্বের গরিমায় যে মারাত্মক প্রথা প্রচলিত ছিল, সে প্রথাই যেন কিভাবে এই শাল আর গজারিবেষ্টিত ভাওয়ালগড়ের প্রান্তে এই জংলী লোক-গুলোর মধ্যে আজও টিকে আছে। এরা বলে, ডাইন। যে মেয়েমানুষের ছেলেপিলে হল না, সামাজিক প্রথায় সে হল ডাইন। সেই ডাইনের চোখে বিষ, মনে বিষ, রক্তের শিরায় শিরায় বিষের দাহন। সেই দাহনে ডাইন জ্বলে পুড়ে মরে, চিতার অনল দেখে পতঙ্গের মত লাফিয়ে পড়ে। সুতানাটি অঞ্চলে গভীর রাত্রিতে এক-একদিন এমনই মৃত্যুর বীভৎসতা জেগে উঠে!

খবর পেয়ে দারোগা পুলিস ছুটে আসে। সমস্ত গ্রাম যেন জাল দিয়ে ঘিরে তোলপাড় করে তোলে। লোকজন তাড়া খেয়ে ছুটে পালায়। ভাওয়ালগড়ের বুকে দাঁড়িয়ে সর্দার বুধন বংশী গর্জে উঠে,—আমিও দেইখ্যা নিমু, আমার নাম বুধন বংশী! পুলিসের ডরে জাইত প্রথা থোয়ামু? সর্দারের নিয়ম ভঙ্গ করমু? জোড়া জোড়া খুন করমু না? গর্দান মটকাইয়া দিমু না?

এ ঘটনাও অনেক দিন পূর্বের। তারপর এই রোহিতপুরে থানায়ই কত দারোগা এল, আর বদলী হয়ে গেল, সেই চল্লিশ বছরের বুধন সর্দার ঘাটের সীমানায় এসে পোঁছল। পক্ক কেশ, শিথিল দেহ, দুটি পাণ্ডুর চোখ তুলে ধরে বলে, এউগ্যা মাত্র মাইয়া আমার, তারেও বিয়া দিয়া পার কইরা দিছি। দুই-এউগ্যা ছাওয়াল-পাওয়াল হোক, তাই দেইখ্যা যাইতে পারলে আমার সুখ। এই সব হাঙ্গামায় যাওনের কি আর বয়স কাছে কত্তা?

সতীশ দারোগা ভ্রূকুটি করেন। দিন কয়েক পূর্বে আরেকটা বহ্ন্যুৎসব হয়ে গেছে। খবর পেয়ে দারোগা-পুলিস ঘেরাও করে বুধন বংশীকে ধরে এনেছে। টেবিলের উপর চাপড় মেরে সতীশ দারোগা ধমকের স্বরে বলেন, হারান বংশী মারা গেল, তার বউটা গেল কই?

বুধন নির্বোধের মত হাসে। বলে, কই গেল, আমি ইয়ার কি জানি বাবু? অক্তের বিষে মানুষে পাগল অইয়া যায় না? অনল দেইখ্যা জ্বইল্যা পুইড়া মরে না?

সতীশ দারোগা হুংকার দিয়ে ওঠেন। কিন্তু এমন অনেক হুংকার ও কশাঘাতে জর্জরিত করেও এই নির্বিকার বলিষ্ঠ লোকটির মুখ দিয়ে কেউ কোনদিন এর বিপরীত উক্তি আদায় করতে পারেনি। সর্দারের কর্তব্য, সমাজের নিয়মবিধি অতি কঠিন। হারানের বউ আছড়ে পড়ে মাথা খুঁড়ে বলেছিল,—আমি ডাইন? ছাওয়াল-পাওয়াল অইল না, হেই দোষ আমার? তুমি সর্দার, তুমি ইয়ার বিচার কর—।

বুধন অটল। মরবার আগে এমনিভাবে ছলা-কলা করে ভুলোতে চায় এরা। তারপর নিজের বিষে নিজেই জর্জরিত হয়ে ওঠে। দু' হাতে চুল উপড়ায়, মাটির বুকে মাথা খোঁড়ে, রক্তের বিষে ছটফট করতে থাকে। তারপর চিতার অনল দেখে পতঙ্গের মত সেই বহ্নিশিখায় লাফিয়ে পড়ে। ইহাই বিধান, চিরাচরিত নিয়ম। দারোগা-পুলিস লাফালাফি করেই বা করবে কি, আর আইন-আদালত করেই বা এর বিহিত হবে কি।

কিন্তু পরের এক ঘটনায় বুধন নিজেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। আইন-আদালত নয়, দারোগা-পুলিসের জোর-জুলুমও নয়, সুতানাটির সামাজিক বিধানে নারীমেধেরই এক চিরাচরিত ঘটনা।

সুতানাটির কাঙ্গালী বংশী ডাইনীর বিষ-নজরে বেহুঁশ হয়ে মারা যায়। খবর পেয়ে লোকজন ছুটে আসে, কাঙ্গালীর মৃতদেহটার সঙ্গে তার বৌকেও টেনে নিয়ে যায় ভাওয়াল গড়ের বুকে। তারপরেই শুরু হয় সেই নিষ্ঠুর নাটকের মর্মান্তিক উন্মেষ! চার-পাশে মস্ত জনতা, অগ্নিশিখা প্রদক্ষিণ করে একদল পুরুষের [illegible] উল্লাস, আরই মধ্যে এক অসহায় নারী [illegible] ছুড়ছে, মাথা খুঁড়ে [illegible]—না-না, আমি ডাইন না। আমি মরুম না, ছাইড়্যা দেও,— ছাইড়্যা দেও আমারে—।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। ভাওয়াল-গড়ের বুকে তখন রাত গভীর হয়ে উঠেছে, আশেপাশে শাল আর গজারীর ছায়ায় আঁধার ছমছম করছে, তারই মধ্যে সেই নিস্তব্ধ অরণ্যের মাঝখানে এক অগ্নি-কুণ্ডের চারপাশে একদল মত্তপুরুষ এক নিষ্ঠুর প্রথা উদ্‌যাপনে উন্মত্ত! কোন এক অভিশপ্ত নারীর ব্যর্থ আর্তনাদ রেখাপাত করার মত তখন তাদের মনের অবস্থা নয়।

মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুধন সর্দার। স্থাণু, নির্বাক, বিমূঢ় ও স্তম্ভিত! যেন অকস্মাৎ 'ভূত' দেখতে পেয়েছে সে। অদূরে এই অভিশপ্ত নাটকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে যে মেয়ে মৃত্যু যাতনায় ছটফট করছে, সে মেয়ে যে তারই একমাত্র সন্তান, এটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

সামনের দৃশ্যটা যেন ঝাপসা হয়ে উঠেছে, হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠেছে, —পিঙ্গলা না, যেন বুধনেরই অন্তরাত্মা বিকৃত কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠেছে—না-না, আমি মরমু না। আমারে ছাইড়া দেও,—ছাইড়া দেও আমারে।

হঠাৎ পিঙ্গলা ছুটে এসে বাপের পায়ে আছড়ে পড়ে বলতে থাকে,—কও, তুমি কও, আমি ডাইন? পোড়াইয়া মারবা আমারে? অ্যা?—

বুধন নির্বাক। নিস্পন্দ! যেন বোবা হয়ে গেছে সে। তার জীবনের শেষ ভরসা, একটা মাত্র মেয়েকে আশ্রয় করে এতটুকু স্বপ্নসাধ, তাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার এই মেয়েটাও শেষে ডাইন হয়ে গেল?

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে একবার চারপাশ তাকায় বুধন। একপাশে চিতাগ্নিশিখা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী চারদিক ছড়িয়ে পড়ে ঝাপসা হয়ে উঠেছে, তারই মধ্যে একদল মত্ত পুরুষ অশরীরী ছায়ার মত অগ্নিশিখা প্রদক্ষিণ করে হিংস্র উল্লাসে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলছে—।

সহসা এক অদ্ভুত সংকল্পে স্থির হয়ে দাঁড়ায় বুধন সর্দার। চারপাশের দৃষ্টিটা তার কুটিল হয়ে ওঠে। বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়। তারপর হঠাৎ হাতের দীর্ঘ লাঠিটা সজোরে মুঠোয় চেপে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় সামনের সেই বৃত্তের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে!

আচমকা যেন একটা ছন্দচ্ছেদ হয়। এক বিমূঢ় ত্রাসে আশেপাশের লোকজন ছিটকে সরে যায়। দূর থেকে দাঁড়িয়ে বুধনের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করে। যেন ক্ষেপে গেছে বুধন, লাঠির আস্ফালনে চারপাশে যেন সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। বন্-বন্ লাঠি ঘুরছে, পলকে পলকে বুধন ধেই ধেই নাচছে, চিতাগ্নির আলো-আঁধারির মধ্যে বুধনের সেই হিংস্র আস্ফালনের সামনে এসে দাঁড়াবে, এমন সাধ্য কার! ক্ষেপেই গেছে বুঝি লোকটা, মাইয়ার শোকে বুধন হঠাৎ পাগল হইয়া গেছে।

তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। সেদিন গভীর রাতে চিতাগ্নির কাঁপা কাঁপা শিখায় এক ক্ষিপ্ত পুরুষের মত্ততার আড়ালে চিরাচরিত বহ্ন্যোৎসবের কোথায় যে একটা ব্যতিক্রম ঘটে গেল, সন্তানাটির লোকজন কোন দিন তা জানতেও পারেনি। পরদিন তদন্তে এসে সতীশ দারোগাও সেই ভুলই করলেন। রাতের বহ্ন্যোৎসব শেষ হয়ে গেছে, ভাওয়াল-গড়ের বুকে কাঙ্গালীর মৃতদেহের সঙ্গে তার বউটাকেও হয়ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। কিন্তু বুধন কই? বুধনের কোন সন্ধান নেই। সেও ফেরার!

• • •

এই কাহিনীকে কেহ উপাখ্যান বলতে পারেন, অথবা নিছক গল্পও বলতে পারেন। রোহিতপুর থানার পুরান ডাইরীর পাতায় এ-অঞ্চলের যে দুর্ধর্ষ জাতির কথা উল্লেখ আছে, তাদের চিহ্নমাত্র আজ কোথাও নেই। গেরুয়া মৃত্তিকার এই অনুর্বর অঞ্চলে আজ যারা বাস করে, তারা শান্ত, নিরীহ, পরিশ্রমী জাত। পূর্বপুরুষদের সেই দুর্ধর্ষ স্বভাব আর এদের মধ্যে নেই, সেই মারাত্মক সহমরণ প্রথাও কবে উঠে গেছে, শুধু একটা বিচিত্র ব্যাপার ধর্মীয় প্রথারূপে আজও এদের মধ্যে টিকে আছে। ভাওয়ালগড়ের প্রান্তে প্রতি বছর চৈত্রের শেষ দিনে এ-অঞ্চলের যে একটা মেলা বসে, সে মেলাটা যদি কখনো দেখতে আসেন, তবে এই বিচিত্র ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। এরা এই মেলাকে বলে সতীদাহের মেলা। দশগ্রামের লোক ভিড় করে এই মেলা দেখতে আসে। নানা ক্রিয়াকৌতুক, তামাশা ও হুল্লোড়ের মধ্যে মেলা জমে ওঠে। লাঠি খেলা, কুস্তি আর বিচিত্র ক্রিয়াকৌতুক দেখতে দেখতে যদি মেলার কেন্দ্র স্থলে বাঁধান উচ্চ ঢিবিটার সামনে এসে দাঁড়ান, তবে এই বিচিত্র ব্যাপারটা লক্ষ্য করে অবাক হয়ে যাবেন। প্রথমে ঢিবিটার উপর যথারীতি পূজো দেওয়া হয়, পরে সেই পাদপীঠে রাশি রাশি কাঠ জড় করে আগুন লাগিয়ে দেয়। অগ্নিশিখা দাউ দাউ জ্বলে উঠলে, এ-অঞ্চলের সমস্ত পুরুষ একত্র সারিবদ্ধ হয়ে বিচিত্র ছড়া কেটে কেটে সেই শিখাগ্নি প্রদক্ষিণ করতে থাকে। আর গ্রামের সমস্ত বিধবা মেয়েরা কলসী কাঁখে জলভরে এনে একে একে ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে সেই তপ্ত ভিটেটা শীতল করে দেয়। যদি এই অদ্ভুত ব্যাপারটার কারণ জিজ্ঞেস করেন, তবে গ্রামের বৃদ্ধলোকটি হাত জোড় করে ঊর্ধ্বে প্রণাম করে বলবে, —প্রায়শ্চিত্ত করছে ইয়ারা, পিঙ্গলা মায়ের প্রায়শ্চিত্ত করছে।

—মানে?

—সর্দার আছিল মনিষ্যিবেশে দেবতা। তাই নিয়ম ভঙ্গ করবেন কেমনে? তাই না ছলনা কইরা নিজের মাইয়ারে লুকাইয়া রাইখ্যা নিজে চিতার আগুনে পরাণ উৎসর্গ করলেন—।

তারপরই গড় গড় করে এ-কাহিনীর ইতিবৃত্ত বলে যাবে লোকটা গোড়া থেকে।

সালাজারের জেলে উনিশ মাস

ত্রিদিব চৌধুরী

(১৬)

মাপ্‌সা হাজতে

চা খাওয়ার পর আমাদের বেশিক্ষণ ওয়ালপই থাকিতে হয় নাই। বেচারা নিতাই গুপ্ত চা খান না; কট্টর ব্রহ্মচারী লোক। সুতরাং চা দেখিয়া খুব খুশি হইতে পারিলেন না। কিন্তু আমি জাত চা-খোর মানুষ; যে কোনো অবস্থাতেই চা পাইলে বেশ কিছুটা খুশি না হইয়া পারি না। আর তাছাড়া দুদিন ধরিয়া শরীরের উপরে যে ধকল গিয়াছে, তাহাতে চা পাইলে কে না খুশি হইবে? ভগৎ তুলসীরামজীও আমার সমধর্মী। আমরা দুজনে ইতস্তত না করিয়া চায়ের গ্লাসে চুমুক দিলাম। স্টেনগান হাতে শান্ত্রী সম্মুখে খাড়া; কথা বলিবার উপায় নাই। তবু ইশারায় নিতাইকে জানাইলাম, হাত ভাঙার ব্যথায় চা খাইলে উপকার হইবে। আমার উপরোধে নিতাই গুপ্ত একবার চায়ের গ্লাসে মুখ লাগাইলেন বটে; কিন্তু এক চুমুক চা খাওয়ার পর বেচারী আর খাইতে চাহিলেন না। নাসিকের ছেলেটি বুদ্ধিমান; সে চা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢক্ ঢক্ করিয়া সবটুকু চা খাইয়া ফেলিল। বোধহয় বেচারীর সাংঘাতিক ক্ষুধাও পাইয়া থাকিবে. পরে সে আমায় বলিয়াছিল, সেও চা খাইতে তত অভ্যস্ত ছিল না। কিন্তু সেদিন ক্ষুধার চোটে—চা তো চা-ই সই—মনে করিয়া চা খাইতে দ্বিধা করে নাই।

আমাদের চা খাওয়া শেষ হইতে না হইতে আবার মন্তেইরোর ঘরে আমাদের এক-এক করিয়া ডাক পড়িল। উদ্দেশ্য নিছক গালাগালি ও শাসানি। আমি আবার তাঁহার ঘরে পা দিতেই বিকট চীৎকার করিয়া সে বলিতে লাগিল—"তোমাদের পণ্ডিত জওহরলাল নিজেকে খুব চালাক লোক মনে করেন না? তাঁহাকে বলিও, এভাবে গোয়া নেওয়া যাইবে না। গোয়া নিতে হইলে লড়িতে হইবে। তাঁহাকে বলিও, লড়িতে হইবে! লড়িতে হইবে!" আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া "Tell Nehru, Tell Nehru" বলিতে বলিতে আবার রোমাঞ্চ আমার কিছু কৌতুকবোধ জাগিয়া থাকিবে, যদিও আমার নিজের মানসিক অবস্থা বা ওয়ালপই থানার পরিবেশ খুব কৌতুকজনক ছিল না। আমি প্রশ্নের ভঙ্গীতে ভালো মানুষের মত জবাব দিলাম—How can I tell him now? He is not here. ("এখন তোমার এসব কথা আমি কি করিয়া পণ্ডিত নেহরুকে জানাইব? তিনি তো এখানে নাই"।) আর যায় কোথায়? বারুদের স্তূপে যেন জ্বলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি পড়িল। দ্বিগুণ জোরে হুঙ্কার করিয়া ক্ষিপ্তভাবে ইংরেজি, হিন্দী, পর্তুগীজ মিশাইয়া গালাগালি করিতে করিতে সে যাহা বলিল, সকল কথা আমার মনে নাই। সার মর্মটা এই রকম—"ওরে ভণ্ড তপস্বী, শা... ইত্যাদি, ইত্যাদি...তুই বুঝি মনে করিয়াছিস এসব হাসি-তামাশার জিনিস, আমি তোর সঙ্গে হাসি-তামাশা করিতেছি? তোর এখনই হইয়াছে কি? নেহরুর কাছে রিপোর্ট দিবার জন্য তোকে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। গোয়া নিতে আসিয়াছিলি, এখন তোকে আমরা গোয়ার জেলে পচাইয়া পচাইয়া মারিব। দেখি কোন্ তোর নেহরু বাপ আছে, তোকে বাঁচায়। ...ইত্যাদি। এইভাবে মিনিট কয়েক ধরিয়া একতোড়ে গালাগালি করার পর যখন দম ধরিল, ইশারা করিয়া আমার প্রহরীকে বলিল—একে নিয়া গিয়া গাড়িতে বসাও। তখন আবার সেই ওয়েপন কেরিয়ার গাড়িতে আমাদের নিয়া গিয়া বসানো হইল। বুঝিলাম, এবার কোনো জেল বা হাজতে আমাদের পাঠানো হইবে। কোথায় তাহা অবশ্য তখন বুঝি নাই।

গাড়ির ভিতরে আসিয়া দেখি নিতাই গুপ্ত গাড়িতে নাই। একটু চিন্তা হইল; কিন্তু নাসিকের ছেলেটি খুব আস্তে আস্তে ফিস ফিস করিয়া জানাইল—"গুপ্তা ট্রাক্‌লা গেলা"; অর্থাৎ গুপ্ত ট্রাকে গিয়াছে। বুঝিলাম নিতাই গুপ্তকে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সেই রাত্রেই বর্ডার পার করিয়া

তাড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং এযাত্রা ওয়েপন কেরিয়ারে করিয়া আমরা তিনজনই চলিলাম। আগের মতই প্রত্যেকের দু' পাশে একজন করিয়া স্টেনগানধারী গোরা পর্তুগীজ সৈন্য। সামনে ড্রাইভার ছাড়া কয়েকজন পর্তুগীজ অফিসার বসা বলিয়া মনে হইল। পরে অবশ্য বুঝিয়াছিলাম, তাহারা অফিসার নয়, গোরা পর্তুগীজ কনস্টেবল। সৈন্যদের সঙ্গে তুলনায়, বেশ-ভূষার জাঁকজমক দেখিয়া পর্তুগীজ পুলিস কনস্টেবলদের যে প্রায় অফিসার বলিয়া মনে হয়, সেকথা আগেই বলিয়াছি। আমরা রওনা হওয়ার আগে আমাদের ভলাণ্টিয়ার বোঝাই ট্রাকটা অন্য পথে রওনা হইয়া গেল। আমাদের ওয়েপন কেরিয়ার ঘুরিয়া বিপরীত দিকে মোড় নিল। নিতাই গুপ্তকে পর্তুগীজরা ছাড়িয়া দিলে অন্তত সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বাংলা দেশের বন্ধুবান্ধব সকলে তাঁহার নিকট হইতে আমার শেষ খবর জানিতে পারিবেন, একথা মনে করিয়া কিছুটা আশ্বস্তও বোধ করিলাম। যদিও আমাকে যে খুব বেশিদিন গোয়াতে থাকিতে হইবে, সে আশংকা সে সময় করি নাই। তবু কয়েকদিন আটকাইয়া না রাখিয়া পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ যে আমায় অব্যাহতি দিবেন না, তাহা পূর্ব হইতেই প্রত্যাশিত ছিল। সেটা এক সপ্তাহও হইতে পারে, আবার পনেরো দিনও হইতে পারে। সুতরাং বাংলা দেশ হইতে যাঁহারা আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্তত নিতাই গুপ্তের মতো অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী, একজন কিছুটা আগে ফিরিলে, বন্ধুবান্ধবেরা ও দেশবাসী, আমি অন্তত প্রাণে বাঁচিয়া আছি এবং বিশেষ কোনো শারীরিক নির্যাতন আমার উপর হয় নাই, এটুকু খবর পাইয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। তারপর তো আমি নিজেই গিয়া সশরীরে হাজির হইব। অন্তর্যামী অদৃষ্ট দেবতা তখন বোধহয় নীরবে হাসিতেছিলেন—গোয়াতে আমার ভবিষ্যৎ যে আমার আন্দাজ মাফিক চলিবে না, তাহা তখনো বুঝি নাই। অবশ্য তাহা যে চলে নাই, তাহাতে আজ আমার মনে কোনো ক্ষোভ নাই। উনিশ মাসকাল ধরিয়া পর্তুগীজ-ভারত সম্পর্কের বাস্তব দিকটার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়ের সুযোগ মিলিয়াছে। আর তাহার চেয়েও আমার কাছে যাহা মূল্যবান, গোয়ার ভিতরে গোয়ার মুক্তি-যোদ্ধাদের দুঃসাহস, স্বার্থত্যাগ ও কঠোর সংগ্রামশীলতার কিছুটা পরিচয় নিয়া ফিরিতে পারিয়াছি। এ-লাভ আমার পক্ষে কম নয়।

ওয়ালপই হইতে রওনা হওয়ার বোধহয় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমরা মাপুসা আসিয়া পৌঁছাই। সন্ধ্যা তখন অনুমান আটটার মতো। আমার হাতের ঘড়িটা তখনো হাতেই আছে বটে। কিন্তু সে বেচারী অনমনু

সীমান্তের পাহাড়ী নদীতে নাকানি-চোবানি খাইয়া এবং পরে দুদিন ধরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া বহু জল গিলিয়াছে, তাহায় তখন আর কাঁটা ঘুরাইয়া সময়ের গতি নির্দেশ করার ক্ষমতা নাই। গাড়ি এখন মাপ্সা শহরের ভিতরে ঢোকে, সন্ধ্যার ইলেকট্রিক আলোতে রাস্তার এদিক ওদিক গাড়ির ভিতর হইতে যতটা দেখা যায়, দেখিয়া বুঝিলাম, কোনো একটা বড় জায়গায় আসিয়াছি। অবশ্য বড় জায়গা মানে গোয়ার অবস্থা অনুপাতে বড় জায়গা। থানার কাছে ফুটপাথওয়ালা পীচের রাস্তা, দুপাশে ম্যাঙ্গালোর টালীর (আমাদের রাণীগঞ্জের টালীর মতো) ছাদ দেওয়া একতলা, দোতলা ঘরবাড়ি, দোকানপাট ইত্যাদি। চায়ের দোকানে তারস্বরে রেডিওর গানের চীৎকার চলিতেছে। এক জায়গায় কানে গেল গানের কলি—"দিল্ মে ছুপাকে ছুপাকে"; জনপ্রিয় সস্তা সিনেমার গান। হঠাৎ সাঁ করিয়া একটি আলো সাজানো সিনেমা হল চলিয়া গেল; গাড়ি অনবরত ইলেকট্রিক হর্ন বাজাইতে বাজাইতে মোড় নিতেছে। রাস্তায় লোকজন যা দেখিতেছি, মারাঠী-কোঙ্কনী ধরনের পাগড়ি টুপীর সঙ্গে ধুতি পরা; মেয়েদের কচ্ছি দেওয়া শাড়ি পরা বা সাধারণভাবে আঁচলা দেওয়া শাড়ি পরা। যোয়ান বয়েসী ছেলেদের পরনে লং প্যাণ্ট, ট্রাউজার, হাওয়াই শার্ট ইত্যাদি। অর্থাৎ ভারতের পশ্চিমী উপকূলে যে কোনো কোঙ্কনী-মারাঠী শহরে বা কানাড়ী শহরে যে ধরনের পাঁচমিশেলী বেশভূষা দেখা যায়, তেমনি সব লোক রাস্তায় চলাফেরা করিতেছে। ভারতের যে কোনো অঞ্চলের ছোটো বা মাঝারি আকারের নিম্নবিত্ত মফঃস্বল শহরের নিম্নবিত্ত দীন চেহারার সঙ্গে যেভাবে আধুনিক সাজায় টেকনিক-কমিক চেষ্টার প্রতীক চোখে পড়ে, তাহার কোনটির অপ্রতুল এ শহরে আছে বলিয়া বোধ হইল না। যেখানেই ইহারা আমাকে আনিয়া থাকুক, ভারতীয় পরিবেশেই আছি; য়ুরোপীয়, পর্তুগীজ বা লাতিন ক্যাথলিক সভ্যতার বিশেষ কোনো চিহ্ন চোখে পড়িতেছে না। অবশ্য সেদিনকার সন্ধ্যারাতের আবছা ইলেকট্রিক আলোয় পুলিস পাহারায় গাড়িতে বসিয়া কতটুকুই বা দেখিব বা দেখা সম্ভব ছিল? কিন্তু পরের যতটুকু দেখার সুযোগ আমার হইয়াছে, তাহাতে ক্যাথলিক গীর্জা ধর্মমন্দিরের সংখ্যাও কানাড়া-মালাবার উপকূলের ম্যাঙ্গালোর, ক্যানানোর, কালিকট, কোচিন-এর্নাকুলম প্রভৃতি শহরের চেয়ে বা কেরলের কুইলন-ত্রিবেন্দ্রামের চেয়ে কম ছাড়া বেশী মনে হয় নাই। গোয়াতে হিন্দু ধর্ম-মন্দির বা মঠ ও তীর্থস্থানের সংখ্যাও কম নয়। মোটের উপর সেই সন্ধ্যায় আবছা দেখাতেও কোন বিদেশী রাজ্যে আসিয়াছি, এরকম অনুভব করার মতো কোন কারণ দেখি নাই।

এইভাবে কিছুটা কৌতূহলের সঙ্গে যতটা পারি দেখিতে দেখিতে অল্প কিছু-ক্ষণের মধ্যেই শেষ একটা বাঁকে মোড় নিয়া গাড়ি মাপ্সা থানার দেউড়ীর গেটের ভিতর দিয়া থানার ভিতরে ঢুকিয়া গেল। গাড়ি থামিলে আমাদের গাড়ি হইতে নামাইয়া একটি ঘরের মধ্যে নিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হইল; ঘরের চেহারা দেখিয়া মনে হইল সেটি থানার অফিস ঘর। আমরা ঘরে ঢোকার সংগে সংগে ফিরিঙ্গী চেহারার একজন সুব্ শেফ্ বা দারোগা গোছের লোক—তাহার হাতে মস্ত বড় একগোছা চাবি—আমাদের প্রহরীদের বলিল আসামী-দের নিয়া আমার পিছনে পিছনে এস। থানার বারান্দা দিয়া চলিতে চলিতে সুব্ শেফ্ ভদ্রলোক একটু আগাইয়া গিয়া একটি হাজতের সেলের দরজা খুলিয়া দিলেন; সেখানে কয়েকজন বন্দী ছিল, তাহাদের সেল হইতে বাহির করিয়া আনিয়া আমাদের সেই খালি সেলে ঢুকাইয়া দেওয়া হইল। বিরাট আওয়াজ করিয়া লোহার দরজা বন্ধ হইয়া গেল। ডাঃ সাল্দাজারের জেলের সংগে সেই আমার প্রথম পরিচয়। অবশ্য মাপ্সার সেই পুলিস হাজতে আমাকে ঐদিন এক রাত্রির বেশী আর থাকিতে হয় নাই। কিন্তু তখনো বুঝি নাই যে, এখানে আমাদের ঐদিন রাত্রিবাসের পর আর থাকিতে হইবে না। জায়গাটা যে মাপ্সা, তাহাও তখনো টের পাই নাই। আমাদের ধারণা ছিল যে, আমাদের পঞ্জিম আনা হইয়াছে এবং আমাদের যে কয়দিন থাকিতে হয় এখানেই থাকিতে হইবে। সুতরাং সমস্ত ঘরটার উপরে নীচে চারিদিকে তাকাইয়া ডাঃ সাল্দাজারের অতিথি সংকারের ব্যবস্থাটা কি রকম তাহা বোঝার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

মাপ্সা, মাড়গাঁও এবং পঞ্জিমের পরেই গোয়ার সবচেয়ে বড় শহর বা তৃতীয় শহর। পর্তুগীজ ভাষায় নাম ম্যাপ্কা বলিয়া লেখা হয়; মাপ্সা বা মাহ্প্সা বলিয়া সকলে জানে। লোকসংখ্যা আট হাজারের মত। মাড়গাঁও এবং পঞ্জিমের মত এখানেও পুলিসের একটা বড় ঘাঁটি আছে; পর্তুগীজ ভাষায় তাহাদের সরকারী আখ্যা—'Quartel Geral da Policia' (কুয়ার্তেল জেরাল দা পোলিসিয়া); চলতি কোঙ্কনীতে 'থানা' বা 'কার্তেল'। পঞ্জিমের কুয়ার্তেল জেরাল সবচেয়ে বড় বা জাঁকজমক-সম্পন্ন; কিন্তু মোটের উপর মাড়গাঁও এবং মাপ্সার পুলিসের কুয়ার্তেলও বেশ বড়। মাড়গাঁও শহর হিসাবে পঞ্জিম এবং মাপ্সার চেয়ে বড় হইলেও সেখানকার কুয়ার্তেল পঞ্জিমের চেয়ে তো বটেই, মাপ্সার চেয়ে আকারে ছোট। কিন্তু এই তিন জায়গার কুয়ার্তেলের হাজত বা লক্ আপ জেল

(পর্তুগীজ Pisao; প্রিজাঁও, প্রিজন) এক কায়দায় তৈরী। সমস্ত ঘরে চারিদিকে একটি ছাড়া দরজা-জানালা বা স্কাইলাইট বলিতে কিছু নাই। সম্মুখের দরজায় মজবুত লোহার গরাদের উপর মোটা লোহার চাদর দিয়া সবটা ঢাকা। খালি দরজার দুই পাল্লার একটিতে ১০×১২ ইঞ্চি পরিমাণ একটি ফুটা, তাহাতে আড়াআড়ি লোহার পাত দিয়া জাফ্‌রির মত করা। বহির্জগতের সংগে যোগাযোগের পথ, আলো হাওয়া যাতায়াতের পথ সব ঐ একটি। ছাদের উপরে, টালির ছাদ বলিয়া দু'-একটি ঘরে একটি করিয়া টালীর বদলে মোটা কাঁচ বসানো। সেখান দিয়াও আবছা একটু আলো আসে; তবে সাধারণ এইসব কাঁচের স্কাইলাইটের উপর ধুলা-বালি এবং শেওলা জমিয়া এগুলিও প্রায় টালির মতই হইয়া গিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া একটুও আলো গলে না। ঘরগুলি সাধারণত খুব উঁচু ছাদ-ওয়ালা বলিয়া অন্ধকূপ-হত্যা এসব হাজতে হইতে পায় না। অন্ধকারের ভিতর দিয়া যতটুকু হোক ভ্যাপ্‌সা বদ্ধ হাওয়া একরকম চলিতে থাকে; কয়েদীদের একেবারে পুরাপুরি দম বন্ধ হইতে পায় না। কিন্তু 'অন্ধকূপ' ছাড়া এইসব হাজতকে প্রকৃতপক্ষে অন্য কিছু বলা যায় না। পনেরো দিন বা এক মাস থাকিতে থাকিতেই এইসব হাজতে দেখিয়াছি বন্দীদের মুখের চেহারা ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হইয়া পড়ে এবং শরীর ক্রমশ দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া আসে। এছাড়া আর এক রকমের হাজত আছে কোংকনী চলতি ভাষায় সেগুলিকে 'পিঁজরা' বা খাঁচা বলা হয়। দুদিকে দেয়াল ঘেরা জায়গার ভিতর দু-সার করিয়া লোহার গরাদ বসাইয়া খাঁচার মতো সব কুঠরী তৈরী করা আছে। মধ্যখান দিয়া পাহারাওলা আসিয়া যাহাতে তালা খুলিয়া কিম্বা বন্ধ করিয়া দিতে পারে, তাহার জন্য প্যাসেজের মতো পথ। দু'পাশের পিছনের দেওয়ালে প্রত্যেক কুঠরীর জন্য অনেক উঁচুতে একটি করিয়া গোল ঘুলঘুলি আছে। এই সব 'পিঁজরার' সারিতে ঢোকার পথ একটিই। সম্মুখের দিকে একটি বড় গেট আছে—পিঁজরাতে যা কিছু আলো হাওয়া যায়, সেই এক দিক দিয়া। তাহা না হইলে পিঁজরাগুলিও অন্ধকূপ হাজতের মতই অন্ধকার। দিনের বেলাতেও ইলেকট্রীকের আলো জ্বালিয়া রাখিতে হয়। তবে অন্ধকূপ হাজতের মত বদ্ধ ভাপ্‌সা হাওয়া এসব কুঠরীতে নাই, সে হিসাবে এগুলি কিছুটা ভালো।

মাপ্‌সার হাজতে আমাদের যখন ঢোকানো হয়, তখন রাত্রিবেলা এবং তাহার উপর ঘরের ভিতর ইলেকট্রীক আলো জ্বালানোই ছিল। তাই হাজত ঘরের অন্ধকার চেহারাটা পুরাপুরি প্রথমটা ঠাহর হয় নাই। কিন্তু বাহির হইতে আসিয়া হঠাৎ এই হাজতে বন্ধ হওয়ায় একটা ভাপ্‌সা গুমট ভাব যেন শ্বাস চাপিয়া ধরিতে চাহিল; কিন্তু সেটা সাময়িক। দু-এক মিনিটের ভিতর সেই অস্বস্তির ভাবটা কাটিয়া গেলে পর ঘরের এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখি তিনদিকে দেওয়ালের সংগে তিনটি কাঠের বেঞ্চি আছে এবং এক পাশে একটি ভাঙ্গা কমোড। কমোডটি ময়লা ভর্তি থাকিয়া ঘরের ভাপসা গুমট ভাব একটু বাড়িয়া গিয়াছে; তবু তাহার উপর ঢাকনা ফেলা আছে বলিয়া রক্ষা। বর্ষাকাল বলিয়াও বটে, আর পুরানো নীচু ভিতের দালান বলিয়াও ঘরের মেজে স্যাঁৎসেঁতে। আমাদের তিনজনের জন্য তিনটি বেঞ্চি অন্ততপক্ষে শোওয়ার জন্য পাওয়া যাইবে ভাবিয়া অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলাম। বেশী ভাবনা চিন্তা করার মতো শরীরের বা মনের অবস্থা তখন আমাদের ছিল না। তদুপরি কুমারস্বামীর শরীরে তখন জ্বর আসিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দু'দিন সমানে বৃষ্টিতে ভিজিয়াছেন, তার উপর বিনাদোষে গ্রেফতার হওয়ায় পুলিসের হাতে মারধোর খাইয়াছেনও যথেষ্ট। আমি দু'দিন পাহাড়ে জংগলে হাঁটার ফলে সমস্ত গায়ে এবং বিশেষ করিয়া পায়ের গোড়ায় [illegible] ব্যথার ভাব অনুভব করিতেছি। সুতরাং আর দেরি না করিয়া তাড়াতাড়ি [illegible] আমরা শুইয়া পড়ার উপক্রম করিতে লাগিলাম। [illegible] আমাদের এই হাজতে ঢোকাইয়া দিয়াছে, তখন আর মনে হয় আমাদের নিয়া আর কেউ নাড়া-চাড়া করিবে না। এই ভাবিয়া আমরা যখন নিজের নিজের বেঞ্চে শুইয়া পড়িতে যাইব, এমন সময় হঠাৎ আমাদের হাজতের দরজা খুলিয়া গেল।

দেখি একজন গোয়ানীজ পুলিস কনস্টেবল সংগে করিয়া সেই [illegible] সুবেশ ভদ্রলোক ও তাঁহার পিছু পিছু দুজন য়ুরোপীয় পর্তুগীজ অফিসার। তাঁদের একজনের পরনে একটি স্লিপিং সুট, পায়ে রবারের স্লিপার আর অন্যজন, বিকালে ফাঁড়িতে যে অফিসার আমাদের জেরা করিতে গিয়াছিল এবং যাহার সংগে আমার চড়া চড়া রকমের কথা কাটাকাটি হইয়াছিল সেই ব্যক্তি; তার পরনে বিকালের মতই ইউনিফর্ম এবং হাতে একটি রবার ট্রাঞ্চিয়ন। মনে মনে এবার ঠিকই প্রমাদ গণিলাম...'এতক্ষণ হাজতে ভরিয়া মারিয়াছিল...আবারও বা ছাড়িবে কেন?' 'বেটারা আমাদের রাতে একটু শান্তিতে ঘুমাইতেও দিবে না'! এই ভাবিতে ভাবিতে বেঞ্চি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই কিছুটা আশ্চর্য হইয়া শুনিলাম, স্লিপিং সুটপরা ভদ্রলোক বলিতেছেন—"ব' তার্দ, ব' তার্দ সিনর শাউদুরি, গুড ইভনিং, গুড ইভনিং মিস্টার শাউদুরি ("শাউদুরি" চৌধুরী শব্দের পর্তুগীজ উচ্চারণ, Chaudhuri-র Cha=শা; h অক্ষরের কোন উচ্চারণ নাই বলিলেও চলে, ব্যঞ্জন বর্ণের পর আসিলে য-ফলার মত উচ্চারণ; Bon Tarde কথার অর্থ—'গুড্ আফটারনুন' বা গুড্ ইভ্‌নিং)। (ক্রমশ)

চক্রদত্ত

বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। মানুষ পেটের পীড়ায় খুব বেশী ভোগে। পেটের বিভিন্ন ধরনের অসুখের কারণ নির্ণয় করবার অনেক পদ্ধতি আমাদের জানা আছে। বর্তমানে পেটের ভেতর থেকে বেতারের সাহায্যে খবর সংগ্রহ করবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। একটা ১½ ইঞ্চি ক্যাপসুলের মত জিনিস ডাক্তাররা রোগীকে গিলে ফেলতে দেন। এই ছোট ক্যাপসুলটি একটি সম্পূর্ণ রেডিও। এটি
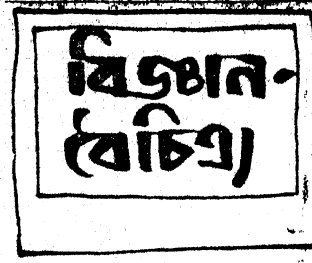
বাঁদিকে আঙুলের মধ্যে ১½ ইঞ্চি রেডিও ক্যাপসুল। ডান দিকের অংশে একজন রোগীর পেটের উপর যন্ত্রটির শুঁড় লাগিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে

মানুষের পেটের মধ্যে পৌঁছানোর পর এর ওপর পেটের ভেতরের বিভিন্ন অংশের খাদ্যবস্তুর চাপ পড়তে থাকে। আর এই বিভিন্ন চাপ পেটের বাইরে শরীরে উপর ঠেকান একটি শুঁড়ের মত বস্তুর সাহায্যে ধরা হয়। ডাক্তার যন্ত্রের সামনে বসে এই চাপের তারতম্য লক্ষ্য করতে থাকেন। আর এর থেকে তিনি ধরতে পারেন যে কোন জাতীয় পেটের পীড়া। রকফেলার ইনস্টিটিউটে এই নতুন ধরনের যন্ত্রটি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। যন্ত্রটি তৈরী করেছেন 'আর মিথ।'

*

ল্যাম্পপ্রে একরকম সামুদ্রিক জন্তু। এগুলো দেখতে অনেকটা মাছের মত হলেও, শ্রেণী বিভাগে এরা মাছের চেয়ে নিম্নস্তরের জীব। সম্প্রতি মিচিগানএর একটি মেডিক্যাল স্কুলে ল্যাম্পপ্রেকে মানুষের শ্রবণশক্তির অসুখ সম্বন্ধে গবেষণার কাজে লাগান হচ্ছে। প্রাণীতত্ত্ববিদরা বলেন যে, ল্যাম্পপ্রের কানের ভেতরের অংশগুলি খুবই প্রাচীন ধরনের। [illegible] এই কান মানুষের কানের [illegible] বিভিন্ন। [illegible]

ল্যাম্পপ্রের কানের ভেতরের অংশে পৌঁছান যায় বলেই গবেষণার কাজে এদের কান ব্যবহার করা হয়েছে। ল্যাম্পপ্রে ছাড়া প্রায় আর সব জন্তুদের কানের ভেতরের অংশ মাথার হাড়ের অংশ বিশেষের সাহায্যে ঢাকা থাকে। ফলে এই সব জন্তুদের কানের অংশে খুব সহজে পৌঁছান যায় না।

*

আণবিক শক্তির সাহায্যে তৈরী তেজস্ক্রিয় ফসফরাস এখন মানুষের উপকারে ব্যবহার করা হচ্ছে। মানুষের শরীর পুড়ে গেলে সেই পোড়া কত গভীর তা ডাক্তাররা ওপর থেকে সঠিকভাবে বলতে পারতেন না। এখন এই সব পোড়া মাপবার জন্য এই তেজস্ক্রিয় ফসফরাস ব্যবহার করা হচ্ছে। পুড়ে যাওয়ার পরই রোগীকে যদি এই ফসফরাস ইঞ্জেকশন করা হয় তাহলে সেটি সমস্ত শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এর পর একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে এই পোড়া অংশের কাছের তেজস্ক্রিয় ফসফরাসের বিকিরণ মাপা হয়। আর এই মাপ থেকে বিশেষজ্ঞরা বলে দিতে পারবেন যে, পোড়া কত গভীর। এটা জানার ফলে ডাক্তাররা নির্ভয়ে পোড়া অংশ থেকে চামড়া সরিয়ে নতুন চামড়া বসাবার বন্দোবস্ত করতে পারেন।

*

মাদ্রাজের ক্যানসার ইনস্টিটিউটে বর্তমানে আণবিক শক্তির সাহায্যে রোগীদের ক্যানসার চিকিৎসা করার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ডাঃ কৃষ্ণমূর্তি এই হাসপাতালটি দেখা শোনা করেন। কোবাল্ট বোমার সাহায্যে এই চিকিৎসা করার বন্দোবস্ত হয়েছে। ক্যানাডার 'অ্যাটমিক এনার্জি' এই নতুন কোবাল্ট ব্লক তৈরী করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া যে ঘরে কোবাল্ট বোমা দিয়ে চিকিৎসা করা হবে সেই ঘরের বিশেষ ধরনের দেওয়াল একটি ভারতবর্ষের ইঞ্জিনীয়ারীং প্রতিষ্ঠান নিজেদের পয়সায় তৈরী করে দিয়েছেন। এই কোবাল্ট বোমার সাহায্যে চিকিৎসা করার বন্দোবস্ত ভারতবর্ষে ক্যানসার চিকিৎসার এক নবযুগের সৃষ্টি করলো।

এই কয়দিন রাশ্যার "শিশুচন্দ্র" ছাড়া অন্য কোন খবর বড় একটা শুনি নাই। সত্যি কথা বলিতে গেলে আমরা অর্থাৎ ট্রামে-বাসের সাধারণ যাত্রীরা ব্যাপারটা বুঝি নাই সুতরাং বিস্মিতও হই নাই। কিন্তু জনমতে বিশ্বাস করি বলিয়াই সবার সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছি—অপূর্ব, অদ্ভুত, এমনটি আর হয় না,

মাইরি! তবে হ্যাঁ, না বুঝিলেও এই কথাটা বুঝিয়াছি যে "চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা" বলিয়া শিশু চন্দ্রকে ডাকা চলিবে না। যাঁরা শিশু চন্দ্রকে বুঝিয়াছেন তাঁরা ইতিমধ্যেই চন্দ্রাহত হইয়া শিবনেত্র হইয়া পড়িয়াছেন, সাদামাটা বাংলায় বোধ হয় ইহাকেই বলে টেরা হইয়া গিয়াছেন। অতঃপর শিশুসূর্য ছাড়িতে না পারিলে আর মনের জ্বালা যাইবে না।

* * *

বৈজ্ঞানিকরা ঘোষণা করিয়াছেন যে খালি চোখে এই কৃত্রিম উপগ্রহ দর্শন কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু তবু শুনিলাম অনেকেই উপগ্রহটি দেখিয়াছেন

বলিয়া হলফ করিতেছেন। কলিকাতার মাঠে ময়দানে, পথে-ঘাটে, ছাতে-পাঁচিলে উপগ্রহ দেখার হিড়িক। শ্যামলাল বলিল—"তাঁরা যা দেখছেন বা দেখেছেন সেটা উপগ্রহ নয়, গেরো"।

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ উপগ্রহটি অদ্ভুত আচরণ করিতেছে—তার পিপ্-পিপ্ শব্দ নাকি [illegible] সানাইধ্বনির মতো শুনাইয়াছে। কিন্তু খুড়ো বলিলেন—"কালক্রমে বাঁশির আওয়াজ সানাইয়ে পরিণত হবে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, অনেকে নাকি এখন থেকেই সানাই শুনছেন"!!

* * *

পাক প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জা সাহেব বলিয়াছেন ভারত যদি আক্রমণ করে তবে তা আক্রমণের সাহায্যেই প্রতিহত করিব।—"আর যদি আক্রমণ না করে তবে অনাক্রমণ প্রতিহত করবেন কী দিয়ে, সুড়সুড়ি দিয়ে"—জিজ্ঞাসাটি জনৈক সহযাত্রীর।

* * *

আকাশের দিকে তাকাইয়া এবং আকাশের কথা শুনিয়া শুনিয়া নরলোকের কথা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। অকস্মাৎ শুনিলাম যশোহরের গ্রামে গ্রামে নাকি পাক-প্রচারপত্র বিলি করা

হইতেছে;—আরজ করা হইয়াছে, প্রত্যেক মুসলমান দশজন দুশমনকে মারিয়া মোজাহেদরূপে হিন্দুস্থান দখল করুন। কোথায় আকাশ? এক চিতে মর্তে পতন। শ্যামলাল বলিল—"অর্থাৎ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে নাচিছে রামছাগল"!!

* * *

কাশ্মীরে পাক আক্রমণ বজায় রাখা আন্তর্জাতিক গুণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়—মন্তব্য করিয়াছেন শ্রীযুক্ত জহরলাল। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"প্রকাশ থাকে, এ গুণ্ডারা উঠতি গুণ্ডা নয়, আদি ও নির্ভেজাল গুণ্ডা"!

* * *

একটি আণবিক অস্ত্রের সাম্প্রতিক নামকরণ হইয়াছে—"ভদ্রলোক"। অর্থাৎ অস্ত্রটি শত্রুঘাটি লণ্ডভণ্ড করিয়া দিলেও উহার তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশির প্রতিক্রিয়া অন্যত্র বড়-একটা দেখা যাইবে না।—"অর্থাৎ যেমন সহজে দেখা যায় না ভদ্রলোকের কেতাদুরস্ত মার। যিনি নামকরণ করেছেন তাঁর রসজ্ঞানের তারিফ করতে হয় বৈকি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ বলিয়াছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে তাঁরা আগুন লইয়া খেলা করিতেছেন, জানেন না যে আগুন জ্বালিলে তা নিভানো শক্ত।—"বিশেষ করে সে আগুনে যদি তেলে লেগে যায়"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম রেল-রাস্তা ও পুলের নিরাপত্তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা হইতেছে।—"সংবাদটি নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ। কিন্তু এই সঙ্গে পুকুর চুরি দমনের চেষ্টা হলে রেল-সংস্থা ও জনসাধারণ উভয়েই উপকৃত হতেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ভারতের কুটিরশিল্পে জাপানী প্রথা প্রবর্তন করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জহরলালজী নাকি জাপানের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিবেন।—"নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করলে যে-কোনো প্রথাকেই কার্যকরী করা যায়। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো জল-মাটি আবহাওয়ার। ভারতের মাটিতে এসে না কুটিরশিল্প শেষ পর্যন্ত প্রাসাদ-শিল্প হয়ে ওঠে"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

রাষ্ট্রপুঞ্জে শ্রীযুক্ত মেননের বক্তৃতার প্রতিবাদে পর্তুগালের প্রতিনিধি নাকি বলিয়াছেন যে, এই ধরনের বক্তৃতা ভারতের "সাম্রাজ্যবাদ নীতির" ধাপ্পা ছাড়া যে কিছু নয় তা যে-কোন fair minded ব্যক্তিই জানেন। শ্যামলাল বলিল—"মনের চেয়ে গায়ের রঙ যাদের "সাদা" তাঁরাই হয়ত শুধু প্রতিনিধির সঙ্গে একমত হবেন"!

* * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইঁদুর ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। প্রতিটি জীবন্ত বা মৃত ইঁদুরের জন্য এক আনা করিয়া দেওয়া হইবে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আমরা যদ্দুর জানি কলকাতায় ইঁদুরের চেয়ে ছুঁচোর উৎপাতই বেশি। ছুঁচো ধরার চেষ্টা হলেই কলকাতা নিরাপদ হতো"!!

* * *

পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ সহযাত্রীর হাতের কাগজখানার উপর নজর পড়িল—বড় বড় হরফে লেখা জনাব সুরাবর্দি পদত্যাগ করিয়াছেন। খুড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"খাস করাচীর সংবাদ হলো—পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সংবাদদাতা "বাধ্য" কথাটা উড়িয়ে দিয়ে ইতিগজ করলেন মাত্র"!!

অনুবাদ-সাহিত্য

ডেইজি মিলার—হেনরী জেমস। অনুবাদক—গোপাল ভৌমিক। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। মূল্য—দুই টাকা।

বাংলায় বিদগ্ধ ইংরেজী সাহিত্য পাঠক সমাজে হেনরী জেমস সুপরিচিত হলেও, বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি অবজ্ঞাত লেখক। আলোচ্য গ্রন্থখানিই খুব সম্ভবত বাংলা ভাষায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত জেমসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। জেমসের জীবিতকালে "ডেইজি মিলার"-ই ছিল তাঁর সবচাইতে বেশী জনপ্রিয় রচনা। সেই দিক থেকে বইখানির অনুবাদ করে অনুবাদক বাঙ্গালী পাঠক সমাজের সঙ্গে জেমসের পরিচয় ঘটানোর সুযোগ করে দিয়েছেন বলে ধন্যবাদার্হ।

জেমসের রচনাশৈলী তাঁর সাহিত্যকর্মের অপরিহার্য প্রয়োজনেই কিঞ্চিৎ দুরূহ। তার বাক্য রচনারীতি কিছুটা জটিল; দীর্ঘ ও "প্যাংকচুয়েশান"-কণ্টকিত। নিষ্ঠাবান পাঠক ছাড়া অন্যের পক্ষে তাই তার মর্মোদ্ধার করা কঠিন। কিন্তু অনুবাদক গ্রন্থের যে সাবলীল অনুবাদ করেছেন, তাতে বইখানির সমস্ত রস অক্ষুন্ন থেকেও সাধারণ পাঠকের জেমসকে বোঝার উপরোক্ত অসুবিধা দূর হয়েছে।

৬২৯।৫৬

ফসলের গান—এইলিন চ্যাঙ। অনুবাদক—তীর্থনাথ সরকার। পরিচয় পাবলিশার্স, কলিকাতা-১৫। মূল্য—আড়াই টাকা।

আধুনিক চীনের একজন খ্যাতিমান লেখক এইলিন চ্যাঙ। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "The Rice-Sprout Song"-এর অনুবাদ আলোচ্য গ্রন্থখানি।

বইখানিতে লেখক কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখার টানে চীনের কৃষক জীবনের একটা গোটা ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের চোখের সামনে। তাদের স্নেহমমতা, ভালোবাসা-ঘৃণা, লজ্জা-ভয়, আনন্দ-বেদনা সবকিছু মিলিয়ে গ্রন্থের চরিত্রগুলি যেন জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। উপন্যাসখানি পড়তে পড়তে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই ভৌগলিক সীমার দূরত্ব পেরিয়ে বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তার নিজের দেশের চাষীর কথা, তাদের জীবনের আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশার কথা মনে পড়ে যায়। লেখকের তীব্র ও গভীর আবেদনে মন সাড়া না দিয়ে পারে না। এই-খানেই বইটির সার্থকতা।

৩৬।৫৭

দি আরমড ফ্রাঙ্ক—এ সেরাফিমোভিচ্। অনুবাদক—মন্মথ চৌধুরী। কে গাঙ্গুলী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা-১। মূল্য—সাড়ে চার টাকা।

কিউবা অঞ্চলে বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার পর বলশেভিক বাহিনী কশাক সৈন্যদল, স্বেচ্ছাসেবক, পদস্থ কর্মচারীদের দল, সমরশিক্ষার্থীদের কাছে শুধু পিছু হটেছে, তাদের প্রচণ্ড আক্রমণ রোধ করতে পারেনি। বিপ্লবের প্রথম দিকে বলশেভিক বাহিনীর একটা অংশ বিদ্রোহীদের বজ্র বেষ্টনীর মধ্য থেকে এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়ে হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী আর অসংখ্য গাড়ি অনেক পিছিয়ে যায়। কিন্তু পরে তারাই আবার [illegible] (জেনা)। কোজভিকের নেতৃত্বে কী করে [illegible] প্রতিষ্ঠা করলো তারই কাহিনী নিয়ে রচিত উপন্যাস "দি আরমড ফ্রাঙ্ক"।

বইখানি প্রচারধর্মী হওয়ার সুযোগ ছিল যথেষ্ট, কিন্তু তা হয়নি—এইখানেই লেখকের কৃতিত্ব। সেই বিরাট সঞ্চরণশীল জনতার প্রত্যেকের নিখুঁত ছবি লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—তাদের দোষগুণ কিছুই বাদ দেননি। কিন্তু সর্বোপরি তারা যে অনাহারে, নগ্ন অবস্থায়, খালি পায়ে থেকে কোন রকম মালমশলা, টাকাকড়ি বা সাহায্য ছাড়াই একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যে ব্যবস্থায় তারা সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে—তাদের এই অব্যক্ত অনুভূতিই তাদের মনে যেমন জাগিয়েছে অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি, তেমনি তা পাঠকের মনেও তাদের বিশ্বাসের প্রতি জাগায় প্রীতি ও শ্রদ্ধা।

৩০৯।৫৭

দখিনা পবন—এলমার গ্রীন। অনুবাদক—হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা-১২। মূল্য—দেড় টাকা।

১৯৪৬ সালের স্ট্যালিন-পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস Wind from the south-এর অনুবাদ আলোচ্য গ্রন্থখানি। সময় বয়ে যায়।

পৃথিবীর বুকে আসে পরিবর্তন। পুঁজিবাদীরা স্ফীত হ'য়ে ওঠে, কিন্তু শ্রমিকের অবস্থা থাকে অপরিবর্তিত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অন্যের ধনভাণ্ডার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পূর্ণ করে যেতে হয়। সেই শ্রমিক জীবনের দৈন্য, অভাব, সারল্য ও অজ্ঞতার চিত্র কখনও বা ব্যঙ্গ, কখনও বা রূপক আবার কখনও বা ভাবগম্ভীর উক্তির সাহায্যে লেখক যেমন একদিকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি অন্যদিকে সুনিপুণ তুলির টানে এঁকেছেন পুঁজিবাদীদের অর্থগৃধ্নুতা, ঔদাসীন্য, স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ চিন্তার ছবি।

ফিনল্যাণ্ডের এক শিলাময় পাহাড়ের কোলে ছোট একটি ঘরে বাস করে শ্রমিক ইনারি। মনিবের জমিতে বেগার খেটে দিতে হবে ঘরটির দাম হিসেবে। দিনের পর দিন সে কাজ করে যায়—আশা, ঘরটি একদিন তার হবে। অনাগত দিনের মধুর স্বপ্নে সে বিভোর হ'য়ে থাকে।

তারপর একদিন যুদ্ধ বাধে। তাকেও সৈন্যদলে যোগ দিতে হয়। কত তরুণ প্রাণ অকালে শেষ হ'য়ে যায়। কত সমৃদ্ধ নগরী শ্মশানে পরিণত হয়। পুঁজিবাদীরা আরো স্ফীত হ'য়ে ওঠে। যুদ্ধ থামে, কিন্তু ইনারির জীবনে আসে না কোন পরিবর্তন। শুধু তার মনের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। যৌবনের সীমা ছাড়িয়ে এসেছে সে, জীবনের একটিমাত্র সাধ আজো রয়েছে অপূর্ণ। মনিব তাকে জমি দিতে চান—শর্ত, নগদ টাকা অথবা বেগার খেটে দেওয়া। কিন্তু আজ কোন শর্ত মানতে সে রাজী নয়। সামনে রৌদ্রোজ্জ্বল তুষারাচ্ছন্ন পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। সেখানে সে বাঁধবে ঘর। দখিনা পবনে সবুজ সতেজ হ'য়ে উঠেছে বনভূমি, প্রকৃতি হাসছে হরিৎ আনন্দে। এই ভূমিহীন হতভাগ্য শ্রমিকও কী সেই আনন্দের অংশভাগী হ'তে পারবে না? ঐখানে নতুন করে ঘর বেঁধে সে কী পাবে না মুক্তির আনন্দ? প্রগতিবাদী লেখকের এই প্রশ্ন সর্বদেশের ও সর্বকালের। ৪৬৬।৫৬

শারদীয় পত্রিকা

তরুণের স্বপ্ন। মাজবিকা দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত। ১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। দাম ২.৫০ নয়া পয়সা।

তরুণের স্বপ্ন শারদীয় সংখ্যাটি যে উত্তম শারদীয়গুলির অন্যতম তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিচ্ছন্নতায়, রচনা নির্বাচনে, চিত্রসম্ভারে—আলোচ্য পত্রিকাটি যে কোনো পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া মনে করি। আলোচ্য সংখ্যার বিশেষ রচনাগুলির মধ্যে 'পত্র সাহিত্য' ও 'পিতা রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধটি ছাড়াও অন্যান্যগুলি মন্দ নয়। শিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ কাহিনী 'পশ্চিমী' ভাল হইয়াছে। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ছাড়াও এই সংখ্যায় গল্প লিখিয়াছেন সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সুধীরঞ্জন, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রভৃতি। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমল সিংহ, সাবিত্রীপ্রসন্ন, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ কবিদের রচনাও ইহার গৌরব। নন্দলালের ও হীরাচাঁদের ত্রিবর্ণ চিত্রগুলি চমৎকার। অন্যান্য স্কেচগুলিও প্রশংসার্হ।

শ্রীচরণেষু—সম্পাদক শ্রীননীগোপাল দত্ত। ৫বি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা। মূল্য—চার আনা।

ছোটদের পত্রিকা শ্রীচরণেষু আত্মপ্রকাশ করল এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে। এ পত্রিকার লভ্যাংশ সমস্ত অর্থই দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য ব্যয় করা হবে। বর্তমান সংখ্যায় কয়েকজন খ্যাত-অখ্যাত সাহিত্যিকদের প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নাটক সমৃদ্ধ। এছাড়া কয়েকটি নিয়মিত বিভাগও আছে।

প্রগতি—সম্পাদক সুকুমার ঘোষ, প্রগতি পরিষদ, নবদ্বীপ। মূল্য—ছ' আনা।

স্বল্প কলেবর এই পত্রিকাটি কয়েকটি সু-নির্বাচিত গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লইয়া শারদীয় রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

দেশের ডাক—সম্পাদক, গৌরমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, লোকশিক্ষা পুস্তকালয়, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলী। মূল্য—পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

মফঃস্বলের এই পত্রিকাটি কয়েকজন নবীন লেখকের রচনায় সজ্জিত। রচনাগুলি সুপাঠ্য।

সৃজনী—সম্পাদক, অমূল্যকুমার চক্রবর্তী। নয়া সচিবালয়, কলিকাতা—১। মূল্য—আট আনা।

সৃজনীর বৈশিষ্ট্য কয়েকটি শিল্প সম্পর্কে তথ্যবহুল প্রবন্ধ পরিবেশনে। তাছাড়া আরো কয়েকটি সুনির্বাচিত গল্প, কবিতা ও নক্সা উপভোগ্য।

ফাল্গুনী — সম্পাদক, শ্রীসুশান্তকুমার মজুমদার। ১এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, সলিল ঘোষ, অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সবিতাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের রচনায় সমৃদ্ধ। তাছাড়া খেলাধূলা ও চিত্র সমালোচনার জ্ঞাতব্য বিষয়ও উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষক—সম্পাদক, মহীতোষ রায় চৌধুরী। ৬১, বালীগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

উল্লেখযোগ্য রচনায় শিক্ষকের শারদীয় সংখ্যাটি রুচিরও দাবী রাখে। কালিদাস রায়, শ্রীগোপাল ভৌমিক, শ্রীপ্রবোধেন্দু অধিকারী, ডাঃ গণপতি ভট্টাচার্য, শ্রীবীরেশ্বর বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনার সহিত পশ্চিম বাংলার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বর্তমান শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধও আছে।

মিতালী—সম্পাদক, [illegible] বসু। ১৩ ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—এক টাকা।

বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের ছোটদের উপযোগী রচনায় মিতালীর শারদীয় সংখ্যাটি শুধু ছোটদের সঙ্গে কেন বয়স্কদের সঙ্গেও মিতালী পাতিয়ে নিতে পারবে।

ঊষা—প্রাণ সেন সম্পাদিত। ৩৩বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য—আট আনা।

খ্যাত ও অখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনায় সমৃদ্ধ ঊষা সত্যই সুখপাঠ্য।

প্রতিভা—সম্পাদক, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ১০২।৩।এ, বঙ্কিমচন্দ্র মল্লিক লেন, হাওড়া। মূল্য—তিন আনা।

স্বল্প কলেবর এই সংখ্যাটি কয়েকটি মৌলিক রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

প্রভাতী—শ্রীসত্যেশ্বর জানা। বামনবড়ে, মেদিনীপুর। মূল্য—৩৮ নয়া পয়সা।

মফঃস্বলের সাতজন নবীন লেখকের গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ—ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য। দক্ষিণী, বারুইপুর, ২৪ পরগণা। মূল্য—আট আনা।

সম্পূর্ণ নবীন লেখকের সুনির্বাচিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি রচনায় এই সংখ্যাখানি সমৃদ্ধ।

হাওড়া বার্তা—ডাঃ শম্ভুচরণ পাল। ৩৭৪, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, সালিখা, হাওড়া। মূল্য—ছ' আনা।

নবীন লেখক-লেখিকাদের মননশীল গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশই এই সংখ্যাটির বৈশিষ্ট্য।

কল্যাণী—রাণু ভৌমিক। ৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা—১। মূল্য—১.২৫ নয়া পয়সা।

মননশীল লেখক-লেখিকাদের রচনায় 'কল্যাণী' এই সংখ্যাটি [illegible] হইয়াছে। [illegible]

—সৌতিক—

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব পর্যটন

এবার ইউরোপের প্রধান চলচ্চিত্র উৎসবের সব কটিতে ভারতীয় ছবির অভূতপূর্ব সম্মান লাভ প্রত্যক্ষ করে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন প্রযোজক-পরিচালক অসিত চৌধুরী। "কাবুলিওয়ালা"র সঙ্গে যুক্ত থাকায় পশ্চিম বার্লিনের চলচ্চিত্র

অসিত চৌধুরী—এবার ইউরোপের প্রায় সবকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদান করে এসেছেন

উৎসবে যোগদানের জন্য ভারতীয় প্রতিনিধি-রূপে গত ১১ই জুন তিনি যাত্রা করেন। সেই সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলি দেখার অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। পশ্চিম বার্লিন থেকে কার্লোভি, ভারি, ওয়ারশ, পুলা, মস্কো, এডিনবরা, ভেনিশ থেকে লণ্ডন, প্যারিস ও কায়রো ঘুরে তিনি দেশে ফেরেন। চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানই শুধু নয়, সেই সঙ্গে ইউরোপে ভারতীয় ছবির ব্যবসায়িক সম্ভাবনা যাচাই করাও তাঁর একটা উদ্দেশ্য ছিল। বার্লিনের প্রদর্শনীতে "কাবুলিওয়ালা"র প্রদর্শন ও পুরস্কার লাভ পরিচালক তপন সিংহের বিবরণীতে আগেই প্রকাশিত হয়েছে। শ্রী চৌধুরী বলেন, বার্লিনের উৎসবের প্রধান লক্ষ্য ব্যবসায়িক। ইউরোপ ও আমেরিকার চিত্রপরিবেশকরা এখানে সমবেত হন; খুব জাঁকজমক হয় এবং পরস্পর দেশের ছবির লেনদেনের কথাই হয় বেশি করে। পশ্চিম জার্মানীর ছবি বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করার জন্য 'স্পিয়া' (SPIA) নামে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে, অনেকটা রাশিয়ার সোভেক্সপোর্ট ফিল্মের মতো। স্পিয়া পশ্চিম জার্মানীর ছবি বিভিন্ন দেশের বাজারে চালাবার প্রচেষ্টায় উৎসবে আগত প্রতিনিধি-দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত-নির্মাণ ব্যবস্থা দ্বারা আমেরিকায় জার্মান ছবির ব্যাপকভাবে প্রচলন কিছুকাল ধরে সম্ভব করা গিয়েছে। পশ্চিম বার্লিনের চলচ্চিত্র উৎসবটি হয় সম্পূর্ণ সরকারি উদ্যোগে এবং সরকারি খরচে। কেবল এডিনবরার উদ্যোক্তা যুক্তভাবে বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও ফিল্ম গিল্ড অফ স্কটল্যান্ড। বিভিন্ন দেশের চিত্র-প্রদর্শন ছাড়া উৎসবে পশ্চিম জার্মানীতে প্রস্তুত চলচ্চিত্র সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামেরও একটি প্রদর্শনী রাখা হয়। পরিবেশন প্রতিষ্ঠান প্রায় সবই মিউনিকে অবস্থিত এবং মিউনিকই ওখানকার চলচ্চিত্রের ব্যবসা-কেন্দ্র। পশ্চিম জার্মানীতে চিত্রগৃহ সংখ্যায় হু-হু করে বেড়ে চলেছে, শুধু গত বছরেই ৬৭৫টি নতুন চিত্রগৃহ নির্মিত হয়। বর্তমান সংখ্যা ৬৭৮০। গ্রেট বৃটেনে টেলিভিসনের চাপে সেখানে চিত্রগৃহ একটির পর একটি বন্ধ হতে আরম্ভ করেছে, সেস্থলে পশ্চিম জার্মানীর চিত্রগৃহ বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। জার্মানীতে বিভিন্ন দেশের চিত্র-পরিবেশকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, তাঁরা দু-তিনখানি ভারতীয় ছবি নিতে পারেন, তবে পরিবর্তে তাঁরা চান, ভারতও তাঁদের দেশের সমসংখ্যক না হোক, অন্তত একখানি ছবিও যেন গ্রহণ করে।

* *

শ্রী চৌধুরী বলেন, ভারতীয় ছবির প্রতি ইউরোপে আস্তে আস্তে আগ্রহ জাগতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু ভারত এ ব্যাপারে প্রায় উদাসীন। প্রসঙ্গত শ্রী চৌধুরী লণ্ডনে "পথের পাঁচালী"র প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, লণ্ডনের কার্জন থিয়েটার এক হাজার পাউণ্ড ন্যূনতম গ্যারাণ্টি শর্তে ছবিখানি দেখাবার চুক্তি করে। এ পর্যন্ত এশিয়ার কোন ছবিরই সঙ্গে এতো টাকার চুক্তি হয়নি। কিন্তু সময়-মতো প্রিণ্ট না পাঠানোতে সেই গ্যারাণ্টি এখন বাতিল হয়ে গিয়েছে। ফ্রান্স ও স্ক্যাণ্ডানেভীয় দেশগুলির জন্যে "পথের পাঁচালী"র পরিবেশন স্বত্বের দাম পাঁচ হাজার পাউণ্ড দিতে প্রস্তুত হয় ওখানকার পরিবেশক, কিন্তু ছ মাসের মধ্যেও একখানি প্রিণ্ট পাঠানো সম্ভব হলো না এখান থেকে। শ্রী চৌধুরী আক্ষেপ করে বলেন, ইউরোপের ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের দৃষ্টি ভারতীয় ছবির প্রতি আকর্ষণ করার একটা মস্ত সুযোগ ছিল ওটা। "পথের পাঁচালী" চললে "কাবুলিওয়ালা"ও চলতো এবং

তারপর অন্যান্য ভারতীয় ছবির পথও সুগম হয়ে উঠতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, ছবিখানির স্বত্বাধিকারী পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের এই গুরুত্ব উপলব্ধিতে উদাসীনতা ইউরোপে ভারতীয় ছবির প্রচলনের সম্ভাবনাকে খর্ব করেও দিল, আর ঐভাবে বহু প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা কিছু কিছুও আসার একটা সুযোগও নষ্ট করা হলো। পশ্চিম বার্লিনে পুরস্কৃত হবার পর দু-তিনটি দেশের প্রতিনিধি ছবিখানি তাঁদের দেশের জন্য নেবার কথা বলেন। বার্লিন থেকে শ্রী চৌধুরী উপস্থিত হন কার্লোভিভারিতে। বার্লিনের মতো এখানকার উৎসবেও ব্যবসার ভাবই বেশি, তবে বেশ ঘরোয়া ভাব। সোস্যালিস্ট দেশগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে পরস্পর দেশের ছবি কেনাবেচা নিয়েই যতো আলাপ-আলোচনা। তিনজন ভারতীয় সাংবাদিককেও উৎসবের উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে এখানে উপস্থিত দেখা গেল। তিনজনই বম্বের সাংবাদিক। শ্রী চৌধুরী বলেন, ওখানকার লোকের ধারণা এবং ওখানকারই শুধু নয়, ইউরোপের সর্বত্রই সাধারণভাবে ধারণা যে, ভারতীয় চলচ্চিত্র তোলা হয় কেবলমাত্র বম্বেতেই। বস্তুত কলকাতাতেও যে ছবি তোলা হয়, "পথের পাঁচালী"র আগে তেমন কারুরই ধারণা স্পষ্ট ছিল না। কার্লোভিভারিতে উৎসব আরম্ভের আগে থেকেই শ্রী চৌধুরী বলেন, ওখানকার হাওয়ায় হাওয়ায় "জাগতে রহো" সম্পর্কে একটা উচ্চ আশা অনুভব করা গিয়েছিল। রাজকাপুরের নাম ওখানে খুবই পরিচিত এবং জনসাধারণের তিনি অতি প্রিয় তারকা। ওর "আওয়ারা"র গান ভোলেনি ওরা। সোস্যালিস্ট দেশসমূহে রাজকাপুরের জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে শ্রী চৌধুরী বলেন, মস্কোতে তিনি এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের মণিব্যাগে রাজ আর নার্গিসের ছবি দেখেছেন, তাঁর মুখে "আওয়ারা"র গান শুনেছেন। সোস্যালিস্ট দেশসমূহে রাজের জনপ্রিয়তা ইউরোপের বহু সেরা শিল্পীর চেয়েও বেশি। কার্লোভিভারির উৎসবে "জাগতে রহো" এবং হাঙ্গেরীর "প্রফেসর হেনিবল" প্রত্যেকে চৌদ্দটি করে ভোট পায়, শেষ বিচারে ভারতীয় ছবিই বিজয়ী হয়। এখানে সমবেত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা ভারতীয় ছবি কিনতে যথেষ্ট উৎসুকে দেখা গেল। ভারতীয় ছবি এদের কাছে বিক্রী করা সহজ। এখানে দুটি দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে "কাবুলিওয়ালা" সম্পর্কে কথা হয়, ভারতে ফিরে এসে এবারে তাঁদের সঙ্গে পাকা চুক্তি হবে। পশ্চিম বার্লিনের ভারতীয় দূতাবাসের কাছ থেকে যেমন বিদেশী প্রতিনিধিদের আপ্যায়ন বিষয়ে কোন সাহায্যই পাওয়া যায়নি, কেবলই তাঁরা জানিয়েছেন যে, ভারত গভর্নমেণ্টের অনুমতি নেই, তেমনি কার্লোভিভারিতে চেকোশ্লোভাকিয়ায়

অবস্থিত ভারতীয় দূত ডাঃ খোসলা ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের আপ্যায়িত করার জন্য দশ হাজার টাকা খরচ করে তিনি এক বিরাট প্রীতি-সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন, যা রাশিয়া কর্তৃক অনুষ্ঠিত পার্টির চেয়ে কমতি ছিল না। ডাঃ খোসলা জানান, এসব ক্ষেত্রে যা দরকার, তিনি তাই করেছেন এবং ভারত গভর্নমেণ্ট যদি ও-টাকা মঞ্জুর না করেন, তাহলে সেটা তিনি নিজের ঘাড়ে নেবেন। এই প্রসঙ্গে শ্রী চৌধুরী বলেন যে, তিনি বিভিন্ন যেসব স্থানে গিয়েছেন, সর্বত্রই ভারতীয় দূত তাঁদের যা-কিছু সহায়তা দিয়েছেন নিতান্ত ব্যক্তিগত সূত্রে।

* *

কার্লোভিভ্যারি থেকে ওয়ারশ। এখানে আটশ পাউণ্ডে "কাবুলিওয়ালা"র একটি কপি বিক্রীত হয়। "আওয়ারা"র একটি কপি বিক্রী হয়েছিল দু হাজার পাউণ্ডে। পোল্যান্ড থেকে হাঙ্গেরী; এখানে সাড়ে বারশ পাউণ্ডে একটি কপি বিক্রী হয়। এই সময়ে ভারতের বেতার ও তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে টেলিগ্রামে নির্দেশ যায় যুগোশ্লাভিয়ায় ব্রিওনি দ্বীপের কাছে পুলায় অনুষ্ঠিত জাতীয় উৎসবে যোগদান করার জন্য। এই উৎসবে কেবল ভারত ও ফ্রান্সকে নিমন্ত্রণ করা হয়। শ্রী চৌধুরী জানান যে, কলকাতায় অবস্থিত যুগোশ্লাভিয়ার দূত "কাবুলিওয়ালা" দেখে ছবিখানি তাঁর দেশের জন্য কেনাবেন বলে জানিয়েছিলেন, সম্ভবত তারই অনুমোদনানুসারে এই নিমন্ত্রণ। ওখানে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়, যাতে প্রায় সত্তরজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমালোচক উপস্থিত হন। সকলেই দেখা গেল, "পথের পাঁচালী"র পর সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবির জন্য আগ্রহান্বিত। হাঙ্গেরীতে শ্রী চৌধুরী ওখানকার কয়েকটি স্টুডিও পরিদর্শন করেন। খুব কিছু নয়। বছরে পঁচিশ-তিরিশখানি ছবি তোলা হয়, বেশি নির্ভর আমদানী ছবির ওপর, তবে সব ছবিকেই ওদের ভাষায় ডাব করে নেওয়া হয়, তাই ডাব করার বেশ ভাল অনেকগুলি লেবরেটরি আছে। মস্কোয় স্টুডিও আর দেখা হয়ে ওঠেনি। শ্রী চৌধুরী মস্কো যান পুলা থেকে, কিন্তু তখন যুব উৎসবে সারা দেশ এমন মেতে ছিল, স্টুডিওগুলি প্রায় খোলাই থাকতো না। সোভেক্সপোর্ট ফিল্মের অধিকর্তা আলেকজান্ডার ডেভিডফের সঙ্গে ওখানে "কাবুলিওয়ালা"র প্রদর্শন ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা হয়। প্রথমে তো রাজীই ছিলেন না, পরে রবীন্দ্রনাথের নামের ওপর জোর দিয়ে রাজী করানো হয়। মস্কোর সবচেয়ে বড়ো চিত্রগৃহ কার্নিকে (৩৫০০ আসন) ছবিখানির প্রদর্শন ব্যবস্থা করেন যুব উৎসবের পক্ষ থেকে। একবার নয়, পর পর আটটি প্রদর্শনী দিতে হয় এবং প্রতি প্রদর্শনীই এতো ভর্তি হয় যে, শ্রী চৌধুরী বলেন, তিনি নিজের জন্য সিট চেয়ে পাননি। ছবিখানি দেখতে দেখতে ছোট-বড়ো সবাইকে চোখ মুছতে দেখে তাঁর ভারতীয় দর্শকের কথা মনে হয়েছে। তফাৎ হচ্ছে, এখানে রুমাল কি আঁচলে চোখ মোছে, ওখানে রুমাল কিম্বা স্কার্টের হাতায়। এর মাত্র দু মাস আগে ওদেশের ভাষায় "কাবুলিওয়ালা" অনূদিত হয়েছে বলে জানা গেল। "পথের পাঁচালী"র কিন্তু এখনও কোন প্রদর্শনী হয়নি মস্কোতে, ওর একটা প্রিন্ট দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় দূতাবাসে পড়ে রয়েছে। রাশিয়ায় রাজ কাপুরের জনপ্রিয়তার আর তুলনা হয় না। সবাই ওর ছবি দেখতে চায়। রাশিয়ায় বিদেশী ছবিকে ওদের বার-তেরটি মুখ্য ভাষায় ডাব করে নেওয়া হয় এবং ব্যাপকভাবে সারা দেশে দেখানো হয়। ভারতীয় ছবির খুবই কদর দেখা গেল।

* *

মস্কো থেকে শ্রী চৌধুরী যোগদান করেন এডিনবরা চলচ্চিত্র উৎসবে। এটাকে ঠিক চলচ্চিত্র উৎসব বলা যায় না; কারণ এই সঙ্গে সঙ্গীত, নাটকাদিরও উৎসব রাখা হয়। এডিনবরার উৎসব প্রতিযোগিতামূলক নয়, এখানকার উৎসবে ছবি প্রদর্শনযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়াই যথেষ্ট সম্মান লাভ। প্রদর্শন অন্তে এখানে নির্মাতার অনন্যসাধারণ প্রতিভার একটি স্বীকৃতিপত্র দেওয়া হয় কেবল। প্রতিযোগিতাটি পরিচালিত হয়

অনেকটা ভেনিশ উৎসবের আদর্শে। এখানটা চিত্র-ব্যবসায়ীদের ভিড়ে সরগরম থাকে না, এখানে ভিড় হয় পরিচালক, কলাকুশলী এবং শিল্পীদের। রাষ্ট্রের সেরা ব্যক্তিদের উপস্থিতি হয়; গত বছর স্বয়ং ইংলণ্ডের রানী উপস্থিত ছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের নাম খুব এখানে, সকলেই তাঁর ছবির খবর জানতে চায়। গত বছর "পথের পাঁচালী" এখানে প্রতিভার স্বীকৃতিপত্র লাভ করে গিয়েছে, এবারে ছবিখানি মানবিকতার প্রসারে একটি অনন্যসাধারণ চিত্রসৃষ্টি হিসেবে সেলজনিক গোল্ডেন লরেল মেডেল দ্বারা ভূষিত হয়। পুরস্কারটি প্রতি বছর প্রদান করেন আমেরিকার প্রযোজক ডেভিড ও সেলজনিক, তবে ওটি প্রদান করা হয় এডিনবরার উৎসবে। "কাবুলিওয়ালা" এবারের উৎসবে ভারতের পক্ষ থেকে নির্বাচিত হয়। কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত বিভাগের এমনি তৎপরতা যে, ছবি পাঠাবার যেখানে শেষ তারিখ ৩০শে জুন, সে জায়গায় প্রযোজকের কাছে ছবিখানি পাঠাবার জন্য চিঠিই এসে পেঁছয় ২রা জুলাই! তবুও নির্দেশ মতো ছবিখানি পাঠানো হয় এবং ছবি গিয়ে পেঁছয় ২০শে জুলাই; তখন জানা যায় যে, প্রবেশের তারিখ দিনকয়েক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানকার নিয়মানুযায়ী ছবিতে সাব-টাইটেল যোগ করার তখন চেষ্টা হয়, কিন্তু বিলেতের স্টুডিওসমূহ তখন এতো ব্যস্ত যে, সর্বত্র খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, দু মাসের আগে সাব-টাইটেলের কাজ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়, এমনকি, দ্বিগুণ চার্জ দিলেও নয়। ফলে "কাবুলিওয়ালা"কে এডিনবরা উৎসবে যোগদান থেকে বঞ্চিত হতে হলো। শ্রী চৌধুরী মন্তব্য করেন যে, ইউরোপে যে কটি চলচ্চিত্র উৎসব হয়, তার প্রত্যেকটিরই তারিখ বাঁধা এবং প্রতি বছর সেই একই তারিখ রক্ষিত হয়, আর ভারত গভর্নমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত বিভাগেরও তা অজানা নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্বাচিত ছবির প্রযোজকদের অবহিত করা কেন যে সময় মতো হতে পারে না, সেটা বড়ো আশ্চর্যের কথা। এডিনবরার পর লণ্ডনে দিন দুই বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটে যাতায়াত করে বোঝা গেল, ওদের কাছে ভারতীয় ছবি মানে শুধু সত্যজিৎ রায়ের ছবি। ব্যবসায়িক জনপ্রিয়তা নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই, ছবির শিল্পোৎকর্ষতেই শুধু ওরা গ্রাহ্য করে। লণ্ডনে "কাবুলিওয়ালা"র একটি প্রদর্শনী রাখা হয় এবং সেখানেও দর্শকদের যেরকম অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাতে এই ধারণাই হয় যে, দর্শক সব দেশেরই সমান। ছবিতে সাব-টাইটেল যোগ করা যায়নি, কিন্তু তাতে যে কারুর কোন অসুবিধে হয়েছে, তা বোঝা গেল না। অবশ্য কাহিনীর সারাংশ ছবি আরম্ভের আগে মুদ্রিত পুস্তিকার সাহায্যে জানিয়ে দেওয়া হয়। দর্শকদের মধ্যে আবেগের প্রতিক্রিয়া সোস্যালিস্ট দেশসমূহেও যেমন দেখা গিয়েছে, তেমনি অন্যত্রও। কার্লোভি-ভ্যারিতে প্রদর্শনীর পর ছ-সাতটি দেশে "কাবুলিওয়ালা" বিক্রী হয়, লণ্ডনে স্বত্ব বিক্রী হয় তিন হাজার পাউণ্ডে। এইভাবে, শ্রী চৌধুরী মোটামুটি হিসেব করে বলেন, তার সফরকালেই "কাবুলিওয়ালা"র প্রদর্শন স্বত্ব বিভিন্ন দেশে যা বিক্রী হয়েছে, তদ্দরুণ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা এদেশে আসবে, পরে আরো আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। শিল্পমানে উন্নততর ছবির অর্থাজর্ন সম্ভাবনা আরো বেশি। লণ্ডনে থাকাকালে শ্রী চৌধুরী ওখানকার বিশিষ্ট চিত্র-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ করেন এবং তাঁদের এই বিষয়ে অবহিত করেন যে, এখন কেবল ভারতে ছবি পাঠালেই হবে না, ভারতের ছবিও তাঁদের নিতে হবে।

• • •

লণ্ডনে থাকতে ইণ্ডিয়া অফিসের ফিল্ম অফিসার প্যামেলা কালেনের সঙ্গে শ্রীচৌধুরীর বাক্তি হয়, ভেনিশে "অপরাজিত"র সাফল্য সম্পর্কে। সাফল্যের সংবাদটা তিনি পান লণ্ডন থেকে প্যারিস যাবার পথে। প্যারিসেও "কাবুলিওয়ালা" দেখানো নিয়ে চিত্র-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা হয়। শ্রী চৌধুরী বলেন যে, একটা বিষয় তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, ইউরোপের সর্বত্র জনসাধারণের কাছে ভারতীয় ছবির উৎকর্ষের কথা গিয়ে পেঁাচেছে, ভারতীয় ছবির জন্যে তাদের মনে আগ্রহ উৎপন্ন হয়েছে, এখন কেবল এই অবস্থার সুযোগ নেওয়া। এ ব্যাপারে ভারত গভর্নমেণ্টের বিশেষ তৎপর হওয়া দরকার। ইউরোপীয় দেশগুলি চলচ্চিত্র শিল্পকে কিভাবে রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রদান করে, তার অনেক দৃষ্টান্ত শ্রী চৌধুরী আহরণ করেছেন। ফ্রান্স টিকিট বিক্রয়লব্ধ মোট টাকার শতকরা সাত ভাগ চিত্র-প্রযোজককে ফিরিয়ে দেয়। ইতালি দেয় শতকরা যোল, এছাড়াও ইতালির গভর্নমেণ্ট আরো নানাভাবেই চলচ্চিত্র শিল্পকে সাহায্য করে। ইতালিতে প্রতি বছরের শ্রেষ্ঠ পাঁচখানি ছবির জন্য আড়াই কোটি লিরা পুরস্কার বাবদ প্রদত্ত হয়। এ থেকে দু কোটি লিরা যায় চিত্রনির্মাতার বা প্রযোজকের হাতে এবং পরিচালক, চিত্র-নাট্যরচয়িতা, সংগীত পরিচালক, আলোকচিত্রশিল্পী ও শব্দযন্ত্রীর প্রত্যেককে দেওয়া হয় দশ লক্ষ লিরা করে। প্রত্যেককে আট লক্ষ লিরা করে মোট আশি-খানি ছোট ছবিকে পুরস্কৃত করা হয় ছোট ছবি তৈরিতে উৎসাহ দেবার জন্যে। গত বছর ছোট ছবি তোলা হয় মোট দেড়শ, তার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি সরকারি পুরস্কার লাভ করে। ছোটদের উপযোগী পাঁচখানি ছবির জন্য দু কোটি লিরা পুরস্কার দানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গতবার ছোটদের ছবি তোলা হয় মোট তিনখানি। ইতালিতে প্রমোদ-কর বাবদ যতো টাকা গভর্নমেণ্ট তোলে, তা থেকে শতকরা এক লিরা নিয়ে তাই দিয়ে ভেনিসের উৎসবের খরচ, চলচ্চিত্রবিষয়ক শিক্ষায়তন চালানোর খরচ প্রভৃতি নির্বাহ করা হয়। মিশরে পর্যন্ত চিত্র নির্মাণে উৎসাহিত করার জন্য বছরের শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত ছবিকে পনের হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হয়, যার অর্ধেক পান প্রযোজক এবং বাকি অর্ধেক কলাকুশলীবৃন্দ।

চীনের চলচ্চিত্র শিল্প

সম্প্রতি কলকাতায় ব্যাপকভাবে চীনা ছবির প্রদর্শন দ্বারা এক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সেই প্রসঙ্গে চীনের চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা গিয়েছে। ১৯৪৯ সালে মুক্তি অর্জন থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত চীনের চলচ্চিত্র শিল্পের প্রভূত অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এই আট বছরে ওখানে পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি তোলা হয়েছে ২৬৬ খানি এবং ছোট ছবি ১১৮৩, এছাড়া ১১৪৮ খানি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ও ছোট বিদেশী ছবি চীনা ভাষায় ডাব করা হয়েছে। সংবাদ-চিত্র, শিক্ষামূলক ও বিজ্ঞানবিষয়ক ছবিও প্রচুর তোলা হয়, যা প্রাক-মুক্তি আমলে হাতেই দেওয়া হয়নি। গত আট বছরের মধ্যে প্রাক-

মুক্তি আমলের ৬৪৬-এর স্থলে চিত্রপ্রদর্শন ইউনিট ৯০০০-এ পরিণত হয়, এর মধ্যে রয়েছে ৬০০ চিত্রগৃহ, ৭০০০ ভ্রাম্যমাণ চিত্রপ্রদর্শন ইউনিট এবং চিত্রপ্রদর্শন সরঞ্জাম-সমন্বিত সহস্রাধিক সংঘ। ভ্রাম্যমাণ দলগুলি প্রায় সারা দেশ জুড়ে ছবি দেখিয়ে বেড়ায়। হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৫৬-তে চিত্রদর্শনকারীর সংখ্যা ১৪০ কোটিতে দাঁড়ায়, যা ১৯৪৯-এ ছিল মাত্র ৪ কোটি ৭০ লক্ষ। চলচ্চিত্র শিল্পে এই সময়ের মধ্যে বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলা হয়েছে অনেক দিক থেকে। এখন নানা রকমের ক্যামেরা ওখানে তৈরী হচ্ছে; ছোট সাইজের ক্যামেরা, ছবির প্রসাধন ও শব্দগ্রহণ যন্ত্র প্রস্তুতের চেষ্টা হচ্ছে। বড়ো ল্যাবরেটরি ও ফিল্ম তৈরীর কারখানা বর্তমানে নির্মিত হচ্ছে। আগে রঙীন ছবি তোলার কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু এক গত বছরেই ছোট ও বড়ো মিলিয়ে ৩০খানি রঙীন ছবি তোলা হয়েছে। এখন ছবি তোলা থেকে প্রিণ্ট তৈরী পর্যন্ত যাবতীয় কাজ চীনা কলাকুশলী দ্বারাই সম্পন্ন হয়। পিকিংয়ে প্রথম সেট সিনেমাস্কোপ চিত্রগৃহের প্রবর্তন হয়েছে এবং প্রথম সিনেমাস্কোপে তোলা ডকুমেণ্টারি 'এ ফেস্টিভ্যাল ডে ইন মে' বর্তমানে প্রদর্শিত হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ৩৬০০০ অপারেটর এখন চীনাতে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মধ্যেই চীন কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ কলাকুশলী ব্যাপারে বাইরে থেকে আমদানীর ওপর নির্ভর না করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে চলচ্চিত্রশিল্পের প্রসার দ্রুততর করার চেষ্টা করছে। পিকিং, ক্যাণ্টন ও সিয়াংয়ে নতুন নতুন স্টুডিও স্থাপন করা হচ্ছে। শিল্পোন্নত ছবির নির্মাণ সংখ্যা বছরে একশখানি করে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দেশের প্রয়োজন মেটাতে বহুসংখ্যক নির্বাচিত বিদেশী ছবি ডাব করারও প্রয়োজন হবে। ছবির আঙ্গিক পরিকল্পনায় নিজেদের দেশীয় রূপ ও প্রকৃতির ওপরই বেশী নজর রাখার চেষ্টা হবে।

চিত্রালোচনা

পুজোর পর দেওয়ালীর প্রস্তুতির জন্যে একটু জিরিয়ে নিতেই বোধ হয় নতুন ছবির মুক্তি এখন কম। বাঙলাতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে 'হারানো সুর', 'অজয়ের বিয়ে', 'ওগো শুনছো', 'মাথুর' ও 'আমি বড়ো হবো' দর্শক আকর্ষণ করে চলেছে এবং এমাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত এইভাবেই চলবে মনে হয়। হিন্দীতেও "হম পন্‌ছি এক ডাল্‌কে", "কিৎনা বদল গায়া ইনসান", "দো আঁখে বারহ হাত", "আশা" ও "নয়া দৌর" বাজার জেঁকে রয়েছে, এ ছাড়া এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করেছে "ফ্রন্টিয়ার মেল"।

সৌন্দর্যের ব্যতিক্রম

যাকে আর্টের পর্যায়ে গণ্য করা যায় না, তা থেকে প্রচুর আমোদ পাওয়া গেলেও তার ভাগ্যে সুন্দর আখ্যা লাভ ঘটে না। হয়তো "আশা" ছবিখানির প্রযোজক-পরিচালক এম ভি রমন চেয়েছেনই স্রেফ আমোদ পরিবেশন করাতেই, কিন্তু শিল্পরুচি ও সৌকুমার্যকে সম্পূর্ণ পরিহার করে কেবলমাত্র মোটা বোধশক্তির তোষণের ব্যবস্থাই ছবির নীতি হলে সেটা প্রশ্রয় পাবার মতো নয়। "আশা"তে উপকরণ সমাবেশে বাকি কিছু নেই—বড়ো বড়ো সেট আছে; জনপ্রিয় শিল্পী সমাবেশ আছে; নায়ক ও নায়িকার একাধিক ছদ্মবেশ ও বিচিত্র সাজে বহুরূপী সাজা আছে; নাচ ও গানের ছড়াছড়ি আছে; "রক ফ্লাওয়ার্স" ও "রক চিটার্স" নাম নিয়েই দুদলের পাল্টাপাল্টি রক-এণ্ড-রোলের হুল্লোড় আছে উদ্ভট ও অশালীন বেশে; গুণ্ডা চালনা আছে, খুনও আছে; নারীহরণ আছে; পতিতাকে বাহন বলে মর্যাদা দিয়ে তাকে শোধরানো আছে; নায়কের পাগলামি আছে; বানরের সঙ্গে তার গাছের ডালে ঝোলাঝুলি আছে; নিজে বড়লোক হলেও দরিদ্রের প্রতি বুকভরা দরদ তার আছে; ছদ্মবেশে পুলিশকে ধোঁকা দেওয়া আছে; প্রকৃত আততায়ীকে জব্দ করা আছে; কানফাটা চীৎকার আর চড়া ঝেজোরের সংগীত আছে; বুদ্ধুর মতো কথাবার্তা ও আচরণ আছে; জমকালো বিচিত্র দৃশ্য পরিকল্পনা আছে; কলাকৌশলের কাজে যথেষ্ট খাটুনির পরিচয় আছে; বৈজয়ন্তীমালা ও কিশোরকুমার আছেন এবং অন্যান্য বম্বের ছবির ওপরে তুরুপ মারবার জন্যে আরো আছে রঙের সমাবেশে মাঝে মাঝে বিচিত্র নাচের দৃশ্য, টেকনিকলার ও গেভাকলার দু রকম পদ্ধতিতেই যা মোটছবির প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে লেপটে রেখে দেয়। বহু বহুরকমারি উপকরণে দীর্ঘ ছবিখানি (১৫৯৪৮ ফিট) জবরজঙ ভাবে ঠাসা, খুবই হাঁকডাক তুলে তরতর গতিতে এগিয়েও চলে ছবি, শ্রান্ত ও নির্জীবও নয় কোথাও, কিন্তু অনেক কিছু দৃষ্টি ও শ্রুতিকে ভরিয়ে রেখে গেলেও মোহিত হওয়াটা তো বাকি থেকে যায়ই, অধিকন্তু মাঝে মাঝে মাত্রাধিক্যতা এবং অশোভন বেশবাস ও আচরণ কিছুটা বিরক্তিরও উদ্রেক করে।

• • •

এতো কাণ্ড করা হয়েছে এক নির্দোষকে খুনের দায় থেকে মুক্ত করে তার প্রেমিকের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দেওয়ার জন্যে। বেলাপুরের জায়গীরদারের ছেলে কিশোরের বুদ্ধুমি দেখে পিসি দুর্গাবতী তাকে তার ছেলে রাজের কাছে বম্বেতে পাঠালে কেতাদুরস্ত হয়ে আসার জন্যে। রাজ পুলিশ সার্জেন্ট। দরিদ্রের মেয়ে কামিনীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে, অথচ শেঠ চিমনলালের ভ্রাতুষ্পুত্রী উচ্চশিক্ষিতা, নাচে নৃত্যগীতপটীয়সী নির্মলাকে বিয়ে করতে চায়। কথাবার্তা প্রায় পাকা, এই সময়েই কিশোরের বম্বাই আগমন। মেয়ে-হস্টেলের পাঁচিল টপকে কিশোর ওখানকার নাচের জলসায় হাজির হয়ে ধরা পড়ে যায়, তবে ছাড়া পেয়ে যায় এই জন্যে যে, তার বাবা ঐ হস্টেলে লক্ষ টাকা দান করেছেন বলে। কিন্তু ঐ ঘটনাসূত্রে কিশোর নির্মলাকে দেখেই তার প্রেমে পড়ে যায়। রাজের বাকদত্তার পরিচয় না জেনে কিশোর গিয়ে দেখলে নির্মলাই সেই পাত্রী। রাজের মা এলো পাত্রী দেখতে, কিন্তু চিমনলাল একদা বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ করেছে, আর নির্মলা স্কুটার চড়ে, এইজন্যে বিয়ে প্রায় ভাঙে ভাঙে, তার ওপর চিমনলালের ব্যাংক ফেল হবার খবরটা তখনি জানতে পারায় সম্বন্ধ একেবারে ভেঙে যেতে আটকালো না। কিশোর কিন্তু নির্মলাকে গরীব হয়ে পড়েছে জেনেও বিয়ে করতে রাজী ছিল কিন্তু পিসির এক দাবড়ানিতেই চুপ হয়ে গেল। রাজ বরাবরই কামিনীকে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে আসছে, কিন্তু নিজেকে সে কামিনীর কাছে বরাবরই বেলাপুরের জায়গীরদারপুত্র কিশোর বলে পরিচয় দিয়ে এসেছে। একদিন বেলাপুরে রাজ ও কিশোর পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও কালেক্টরকে নিয়ে জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছে, এমন সময় কামিনীর বাবা রাজকে একা পেয়ে কামিনী সম্পর্কে রাজের শেষকথা জানার জন্য পিস্তল

হাতে হাজির। কামিনীর বাবার কাছেও রাজের পরিচয় ছিল জায়গীরদারপুত্র কিশোর বলে। রাজের সঙ্গে কথা কাটাকাটি ও ঝগড়ার ফলে রাজের গুলিতে কামিনীর বাবা নিহত হলো। কিশোর এলোমেলো গুলী ছোঁড়ে বলে রাজ খুনের দায়টা কিশোরের ওপরে চাপিয়ে কিশোরকে ফেরার হবার পরামর্শ দিলে। কিশোর পালাবার পর পুলিস আসতে কামিনীর বাবা আততায়ীর নাম কিশোর বলেই মারা গেল। চললো কিশোরের সন্ধান। পালাতে পালাতে কিশোর বম্বেতে এসে উঠলো একটি মেয়ের ঘরে, নাম মিনু। এই পতিতা মিনুকেই একদিন কিশোর অপমান ও অসহায়তা থেকে রক্ষা করে তাকে বোন বলে সম্বোধন করে সৎপথে চলার উপদেশ দেয়। মিনু কিশোরকে আশ্রয় দিলে। ওদিকে গরীব হবার পর চিমনলাল হলো নিরুদ্দেশ। নির্মলার সঙ্গে থানাতে দেখা হলো কামিনীর, দুজনেই তাদের অভিভাবকদের সন্ধানে গিয়েছিল। কামিনীর বাবা নিহত, নির্মলার কাকা নিরুদ্দিষ্ট, অসহায়া দুজনে একত্রে বাস করা ঠিক করলে। নির্মলা তার নাচগানের বিদ্যের জোরে থিয়েটারে কাজ নিলে: জমে উঠলো থিয়েটার। কিন্তু একদিন হঠাৎ আগুন লেগে থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। কিশোর আরবদেশাগত আবদুল রহমান সেজে এক নতুন থিয়েটার খুললে। নির্মলা এসে সেখানে যোগদান করলে তবে নির্মলার কাছে কিশোর ছদ্মবেশী আবদুল রহমান হয়েই রইলো। এই সময়ে রাজ নির্মলার আশ্রয় থেকে কামিনীকে গুম করে ফেললে। রাজের সন্দেহ হলো আবদুল রহমানের থিয়েটার ছাড়াও অন্য কোন গোপন ব্যবসা আছে। কিশোর একদিন রাতে নির্মলার সঙ্গে স্ববেশে দেখা করে এলো। ঘটনাক্রমে নির্মলা জানলে রাজই কামিনীকে গুম করে রেখেছে। আবদুল রহমান রাজের বাড়ীতে গিয়ে বন্দিনী কামিনীকে দেখতে পেলে। রাজের সঙ্গে ব্যবসা করার আগে সর্ত হলো উভয়ে উভয়ের খুনের কুকীর্তি কাগজে লিখে বদলাবদলি করে পরস্পরের কাছে রেখে দেবে। আবদুল রহমান লিখলে তার বারটি খুনের কথা, রাজ তার স্বীকারোক্তিতে লিখলে কামিনীর পিতাকে হত্যার কথা। স্বীকারোক্তি লেখা কাগজ বদল হলো। ব্যবসা হবে চোরাই সোনার। সেই সূত্রে বেলাপুর ঠিক হলো উপযুক্ত স্থান। রাজ তার মামা জায়গীরদারকে দিয়ে আবদুল রহমানের থিয়েটারের দলকে বেলাপুরে আমন্ত্রণ পাঠিয়ে দিলে। নির্মলা ইতিপূর্বে আবদুল রহমান যে কিশোর তা জেনে ফেলেছিল। দশহরা উপলক্ষ্যে বেলাপুরে আবদুল রহমানের দল নাটক অভিনয়ে নামলো। শেষের দিকে হলো একটা খুনের গল্প, রাজ কামিনীর বাবাকে যেভাবে খুন করেছিল ঠিক সেই ব্যাপারই সাজানো। এইভাবে থিয়েটারের মধ্যে দিয়েই রাজকে খুনী বলে অভিযুক্ত করা হলো। নির্মলা আবদুল রহমানের ছদ্মবেশ খুলে কিশোরকে এবং সেই সঙ্গে রাজের খুনের স্বীকারোক্তিও হাজির করে দিল। রাজ পিস্তল বের করে সামনে নির্মলাকে ধরে রেখে বাঁচবার চেষ্টা করলে। সশস্ত্র পুলিস হাজির। দুর্গাবাঈ কুপুত্রকে নিজের হাতে হত্যা করতে চাইলে। রাজের সহচর ছুঁড়লো গুলি, কামিনী দিলো বুক পেতে। তার মাকে বাঁচাতে গিয়ে কামিনী প্রাণ দেওয়ায় রাজ অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করলে। এর পর, বলা বাহুল্য, কিশোর ও নির্মলার বিয়ে, আর আবদুল রহমান সম্প্রদায়ের রক-এন্ড-রোল আর এক দফা নাচ, আর তাই দেখে কিশোরের বুড়ো বাবাও আর না নেচে থাকতে পারলে না।

* * *

শিল্পরস সমন্বিত সুস্থ ছবির ধার দিয়ে যাবার কোন চেষ্টাও হয়নি আর সেদিক ভেবে ছবিখানি পরিকল্পিতও হয়নি। সঙ্গতি ও যৌক্তিকতা নিয়েও কোন বিচার নেই, আমোদ দেওয়া হবে এবং তার জন্যে পাগলামী বাঁদরামী বেহায়াপনা উদ্ভটপনা চেঁচামেচি করে যেভাবেই হোক আমোদের সৃষ্টি করাই লক্ষ্য। আর সে কাজে শিল্পী হিসেবে কিশোরের চরিত্রে কিশোরকুমার ও নির্মলার চরিত্রে বৈজয়ন্তীমালা ছবির পরিকল্পনাতে পূর্ণমাত্রায় খাপ খাইয়ে চলেছেন খুব হৈরৈ তুলে। বাস্তবের চেহারা যদি এতে না থাকতো, যদি একে রূপকথারূপে পরিকল্পনা করা হতো এবং চেহারাটাও রাখা হতো সেইমতো, তাহলে অবশ্য ছবির অনেক বাড়াবাড়ি ব্যাপার মানাতে পারতো। অন্যান্য চরিত্রে ওমপ্রকাশ, প্রাণ, রাজ মেহরা, ললিতা পাওয়ার প্রভৃতি আমোদলোভী দর্শকদের আকর্ষণ করার মতো অনেকেই আছেন। ফলি মিস্ত্রি আলোকচিত্র গ্রহণের কাজে, বিশেষ করে রঙীন দৃশ্যাদি তোলায় কৃতিত্ব ও কায়দা দেখিয়েছেন, তার কাজ বিদেশী কলাকুশলীদের সঙ্গে তুলনীয়। ঈশান ঘোষের শব্দ গ্রহণের কাজও ভাল, তবে সবই খুবই চড়া পর্দার, হয়তো ছবির প্রকৃতি ও রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যেই ঐভাবে তোলা। সি রামচন্দ্রকে দিশী ধাঁচের সঙ্গীতের চেয়ে ক্যাবারে বা রক-এন্ড-রোল জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনে বেশী দক্ষ দেখা গেল।

বিবিধ-সংবাদ

বি এম পি-এর প্রতিবাদ

গত ৫ই অক্টোবরের সংখ্যায় 'রঙ্গজগতে'এ 'বিশ্ব সম্মানিতের সম্বর্ধনা' প্রসঙ্গে এই মর্মে উল্লেখ করা হয় যে, বি এম পি-এর কার্যনির্বাহকমণ্ডলীর কোন সদস্যের আপত্তিতে এখানকার চলচ্চিত্র-শিল্পের পক্ষ থেকে সত্যজিৎ রায়কে সম্বর্ধনা জানানোর প্রস্তাব বাতিল হয়। বি এম পি এ এর প্রতিবাদ জানিয়ে এক পত্রে বলছেন যে, তাদের কোন সদস্যের প্রতি লক্ষ্য করে যা বলা হয়েছে, তা ঠিক নয়। বি এম পি এ-র মতে কেবলমাত্র চলচ্চিত্রশিল্পের দ্বারা সম্বর্ধিত হওয়ার চেয়ে যে জনসম্বর্ধনা সত্যজিৎ রায়কে জানানো হয়, তা অনেক বেশী গৌরবের হয়েছিল এবং সেই জনসম্বর্ধনায় বি এম পি এ-র সভ্যবৃন্দ আন্তরিকতার সঙ্গে যোগদান করেছিলেন।

• • •

গত সপ্তাহে ফরাসী নাট্যাভিনয় সংশ্লিষ্ট ছবিখানির নীচে ভুলক্রমে উপবিষ্টদের মধ্যে স্মারক মিস কান্সকেও ও নাট্যপরিচালক মিঃ প্যাগনল'র নামের বদলে যথাক্রমে কন্সাল জেনারেলের পত্নী ও কন্সাল জেনারেল বলে ছাপা হয়েছে এবং দণ্ডায়মান শিল্পীদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি বীরেশ্বর ভট্টাচার্যের নামটি বাদ পড়েছে।

সমারোহপূর্ণ এক প্রীতি সম্মেলন

গত ১৪ই অক্টোবর ধর্মতলায় অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের অফিসে এক সমারোহপূর্ণ প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চলচ্চিত্রশিল্পের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষ করে বহু চিত্র-প্রদর্শক ও সাংবাদিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই উপলক্ষ্যে অরোরা ফিল্ম পরিবেশিত "অপরাজিত" ও "পথের পাঁচালী" কর্তৃক অর্জিত আন্তর্জাতিক পুরস্কার, যথাক্রমে গোল্ডেন লায়ন অফ সেণ্ট মার্ক, ভেনিসের আন্তর্জাতিক সমালোচকদের মেডেল এবং সেলজ্নিক গোল্ডেন লরেল মেডেল, কানসে প্রাপ্ত

অসিত সেন পরিচালিত বাদল পিকচার্সের "জীবন তৃষ্ণা"তে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন

বিশেষ পুরস্কার, এডিনবরার সম্মানপত্র, রাষ্ট্রপতি পদক এবং অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত সম্মানপত্রসমূহের একটি প্রদর্শনী করা হয়। দেখা গেল যুগান্তকারী ছবির পরিবেশনে ভারতে অরোরার স্থান অদ্বিতীয়। এখনকার "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত"ই নয়, নিউ থিয়েটার্সের ছবি গোড়া থেকেই তারা পরিবেশন করে এসেছেন যার মধ্যে তালিকায় পড়ে "চণ্ডীদাস", "দেবদাস", "ভাগ্যচক্র", "সাপুড়ে", "বিদ্যাপতি", "উদয়ের পথে", "রাইকমল", "মহাপ্রস্থানের পথে" প্রভৃতি যাদের আবির্ভাব ভারতীয় ছবির রূপকেই প্রভাবিত করে তোলে। এমন গৌরব আর কোন পরিবেশক দাবী করতে পারেন কি না জানা নেই। সকলে বেশ আগ্রহের সঙ্গে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কারগুলি প্রত্যক্ষ করেন। (প্রত্যক্ষকারীদের মধ্যে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ও ছিলেন। গত বছর "পথের পাঁচালী" রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ও আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে রৌপ্য-পদক এবং এবার সেলজ্‌নিক গোল্ডেন লরেল মেডেল যা লাভ করেছে সেগুলি, সত্যজিৎ রায় জানান, তিনি এই প্রথম প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলেন অরোরার এই অনুষ্ঠানে। "পথের পাঁচালী"র পুরস্কারগুলি পশ্চিমবঙ্গ গবর্নমেণ্টের প্রচার দপ্তরের হাতে যাওয়ায় তিনি এ পর্যন্ত দেখতে পাননি। এবার এডিনবরার উৎসবে প্রদত্ত সেলজ্‌নিক মেডেলটি পশ্চিমবঙ্গ গবর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে ইণ্ডিয়া অফিসের ডাঃ মণি মৌলিক গ্রহণ করেন। নির্দেশ ছিল যে, মেডেলটি সত্যজিৎ রায় লণ্ডনে গেলে তাঁর হাতে দিয়ে পাঠানো হবে, কিন্তু পরে আর একটি নির্দেশে মেডেলটি পার্শেল করে পাঠাতে বলা হয়। ফলে ওটিও সত্যজিৎ রায় আজো দিন দেখবার সুযোগ পাননি। মেডেলটি বিতরিত হয়েছে ৮ই সেপ্টেম্বর, অথচ পশ্চিমবঙ্গ প্রচার দপ্তর প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কথাবার্তা'র ১৪ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় একটি খবরে দেখা গেল, 'প্রযোজক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে এই পুরস্কার নেবার জন্য শ্রীসত্যজিৎ রায় এডিনবরা গিয়েছেন।' দুর্বোধ্য ব্যাপার!) অরোরার স্বত্বাধিকারী বসু ভ্রাতৃগণ অভ্যাগতদের আপ্যায়নে যত্নবান ছিলেন।

নতুন ছবির খবর

অরোরার পরিবেশন তালিকায় নতুন ছবির মধ্যে রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের "জলসা-ঘর" ও "পরশ পাথর" এবং ঋত্বিক ঘটকের "অযান্ত্রিক"। শেষের দুখানির প্রযোজক এল বি ফিল্মস ইণ্টারন্যাশনাল। এ ছাড়া মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে নীতীন বসু পরিচালিত "মাধবীর জন্য"।

* * *

প্রেস পিকচার্সের প্রথম ছবি "শশিবাবুর সংসার"-এর প্রাথমিক কাজ এগিয়ে চলেছে। ছবিখানি পরিচালনা করবেন সুধীর মুখোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত পরিচালনা করবেন হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রেস পিকচার্স তাদের দ্বিতীয় ছবিতে অভিনয় করার জন্য সুচিত্রা সেনের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। এ ছবিখানি পরিচালনা করবেন অগ্রদূত এবং সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সলিল চৌধুরী।

* * *

নীতীন বসু পরিচালিত আর একখানি মুক্তিপ্রতীক্ষ ছবি হচ্ছে বিদম প্রডাকসন্স প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ"। বিনয় চট্টোপাধ্যায় এ ছবিখানির চিত্রনাট্য রচয়িতা এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন হরিপ্রসন্ন দাস ও গোপাল দাশগুপ্ত: রবীন্দ্র-গীতি গ্রহণ করা হয়েছে শান্তিদেব ঘোষের তত্ত্বাবধানে এবং বিভিন্ন চরিত্রে আছেন অসিতবরণ, বসন্ত চৌধুরী, উৎপল দত্ত, জহর গাঙ্গুলী, ভারতী দেবী, মঞ্জু দে ও নবাগতা রিতা রায়। রূপচন্দ্র পিকচার্স ছবিখানির পরিবেশক।

* * *

অমরবাণী পিকচার্স গজেন্দ্রকুমার মিত্রের রচনা অবলম্বনে "কলঙ্কের ভাগ" তোলার উদ্যোগী হয়েছেন। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন ফণী গাঙ্গুলী।

দাশরথি রায়ের তিরোধান অনুষ্ঠান

আগামী ২১শে অক্টোবর পাঁচালীকার কবি দাশরথি রায়ের শততম তিরোধান দিবসটি পালন করার এক আয়োজন করেছেন "পাঁচালী ভারতী"। এই উপলক্ষ্যে শশিভূষণ দে স্ট্রীটের শান্তি ইনস্টিটিউট ভবনে একটি তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান হবে। ২১শে হবে কবিশেখর কালিদাস রায়ের সভাপতিত্বে 'দাশরথি সাহিত্য' সভা। ২২শে বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে "দাশরথি সঙ্গীত" পরিবেশন এবং ২৩শে 'পাঁচালী ভারতী' কর্তৃক জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাসের পরিচালনায় দাশরথি রায় বিরচিত "শিব বিবাহ" পালাগান।

একলব্য

আই এফ এ শীল্ডের উপর এবার শনির দৃষ্টি পড়েছে কিনা কে জানে? কোনভাবেই শীল্ডের স্থগিত সেমি ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ও খাদ্যের মূল্য-বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের ঝামেলা কাটলো তো আরম্ভ হল পূজার হৈচৈ আর ময়দানের অশৌচ। অক্টোবরের পয়লা তারিখ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত ময়দানে খেলাধূলা বন্ধ থাকে। ময়দানের অশৌচ কাটবার পর সাধারণ ধর্মঘটের হুমকি। ১৮ই অক্টোবর মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেংগলের সেমি ফাইন্যাল খেলা এবং ২১শে অক্টোবর এই খেলার বিজয়ীর সংগে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের ফাইন্যাল খেলার কথা উঠেছিল, কিন্তু ১৮ই অক্টোবরই সাধারণ ধর্মঘটের কথা ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় পুলিস কমিশনারের পক্ষে খেলার অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। ঝামেলা কি একটা। এর পরই রোভার্স কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করছে কলিকাতার প্রধান চারটি টীম। এর মধ্যে ইস্টবেংগল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের প্রথম খেলার তারিখ পড়েছে যথাক্রমে ২৯শে ও ৩০শে অক্টোবর। রোভার্স শেষ হলেই আরম্ভ হবে দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতি-যোগিতা। এখানে ইস্টবেংগল ক্লাব অন্যতম প্রতিযোগী। সুতরাং ফুরসত কোথায়? অবশ্য এইসব খেলাধূলো এবং সুবিধা-অসুবিধার মধ্যবর্তী সময়ে শীল্ডের বাকি দুটি খেলার ব্যবস্থা করা যেত না একথা বিশ্বাস করা কঠিন। যে কারণেই হোক, তা সম্ভব হয় নাই। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ খেলা দুটি অনুষ্ঠানের এখনো আশা রাখেন। রোভার্স কাপের ফাইন্যাল খেলার পর নবেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে খেলা দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। এই উদ্দেশ্যে দিল্লী ক্লথ মিলের খেলা এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেবার জন্যও নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সম্পাদককে অনুরোধ করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব মাঠও খেলার উপযোগী হয়ে উঠবে। মাঠটিকে ইতিমধ্যেই খুঁড়ে ফেলে নতুন মাটি দেওয়া হয়েছে। ক্রিকেট খেলার উপযোগী করবার জন্য মোহনবাগান-ইস্ট-বেংগল এবং মহমেডান-এরিয়ান মাঠেও খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ হয়েছে। এ দুই মাঠে অবশ্য এ বছর আর ফুটবল খেলার প্রশ্ন ওঠে না। শীল্ডের বাকি দুটি খেলার ব্যবস্থা হলে সে খেলা ক্যালকাটা মাঠেই অনুষ্ঠিত হবে। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ অবশ্য খেলার সব ব্যবস্থাই একরকম পাকা করে রেখেছেন। সেমি ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলার "তারিখবিহীন" টিকিট ছাপারও ব্যবস্থা হয়েছে। এর পরও যদি খেলা অনুষ্ঠিত না হয়, তবে বুঝতে হবে কোন অদৃশ্য হস্ত খেলা বানচাল করবার জন্য বিশেষভাবেই সক্রিয়।
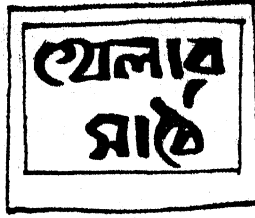
* * *

রেলওয়ে স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড এশিয়ান রেলওয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উৎসব নাকচ করে দিয়েছেন। ভারতীয় রেলওয়ে ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে এশিয়ার রেলকর্মীদের খেলাধূলার এই মহাউৎসব অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। কিন্তু সিংহল এবং ব্রহ্মদেশের রেলওয়ে ছাড়া এপর্যন্ত আর কোন রেলই এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এই প্রতি-যোগিতার জন্য এশিয়ার ২৪টি রেল সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এর মধ্যে পাকিস্থান, নেপাল, আফগানিস্থান, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, বোর্ণিও, হংকং, কম্বোডিয়া, জর্ডন, লেবানন ও ফিলিপাইনের রেল কর্তৃপক্ষ এশিয়ান রেলওয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোন প্রতি-নিধি প্রেরণ করতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। চীন ও জাপানের ভারতস্থ রাষ্ট্রদূত তাদের দেশের যোগদান সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তার আভাষ না দিলেও চীন ও জাপান এশিয়ান ক্রীড়া উৎসবে যোগদান করবেই এমন কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছেন না। খেলাধূলা সম্পর্কে পরম উৎসাহী চীন এবং জাপান যদি শেষ পর্যন্ত যোগদান না করে, তবে প্রতি-যোগিতার আকর্ষণ বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হবে। এদিকে সময়ও বেশী হাতে নেই। এই বিরাট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট সময়, উদ্যম এবং শ্রমের প্রয়োজন। কিন্তু

সম্প্রতি আজাদ হিন্দ বাগে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চল সেনা বাহিনীর সাঁতার প্রতি-যোগিতায় ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলের প্রথম তিনজন—
রাম সিং, হরিরাম ও গোবিন্দ প্রসাদ

এশিয়ার বিভিন্ন রেল সংস্থার যদি যোগ-দানের আগ্রহই না থাকে, তবে ভারতীয় রেলওয়ে স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ডের সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে। এই জন্য গভীর দুঃখের সংগে কন্ট্রোল বোর্ড প্রস্তাবিত এশিয়ান রেলওয়ে ক্রীড়া উৎসব বাতিল করে দিয়েছেন।

* * *

বোম্বাই রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে খেলাধূলার ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সাহায্যের জন্য এক স্পোর্টস কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। খেলাধূলার বিভিন্ন দিকে যাদের প্রতিভা আছে যারা খেলাধূলায় নৈপুণ্য দেখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চান তাদের মাসিক বৃত্তি দিয়ে সাহায্য করাই স্পোর্টস কাউন্সিলের উদ্দেশ্য। প্রধানত স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের জন্য এই স্পোর্টস কাউন্সিল গঠিত হলেও যারা ছাত্র নয় এবং খেলা-ধূলায় উৎসাহী তারাও বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন না। ৫০, টাকা থেকে ১৫০, টাকা পর্যন্ত মাসিক বৃত্তি দেওয়া হবে। এই টাকা দিয়ে খেলাধূলায় উৎসাহী ছাত্র ও যুবক প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব পূরণ করতে পারবেন। স্কুলের ছাত্রদের প্রধান শিক্ষকের মারফং এবং কলেজ-ছাত্রদের অধ্যক্ষের মারফং এই বৃত্তি গ্রহণের জন্য স্পোর্টস কাউন্সিলের কাছে আবেদন করতে বলা হয়েছে। স্কুল ও কলেজ বহির্ভূত খেলা-ধূলার উৎসাহী সভ্যকে কোন প্রতিষ্ঠান মারফং আবেদন করতে হবে। বর্তমান আর্থিক বছরে এই পরিকল্পনা খাতে বোম্বাইয়ের শিক্ষা দপ্তর ৮০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন।

বোম্বাই সরকারের এই পরিকল্পনা গ্রহণ খুবই সময়োপযোগী হয়েছে সন্দেহ নেই। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য খেলাধূলার সাজসরঞ্জামের মূল্যও যথেষ্ট বেড়ে গেছে। তারপর সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলেদের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করাও এক-রকম অসম্ভব। এ অবস্থায় সরকারের আর্থিক সাহায্য খেলাধূলায় উৎসাহী ছাত্র ও যুবকের প্রতিভা স্ফুরণের পথকে অনেকখানি সহজ করে তুলবে এবং এ দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রের ভবিষ্যতের পথও সুগম হয়ে উঠতে পারে। বোম্বাইয়ের অনু-করণে অন্যান্য রাজ্য এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করলে খেলাধূলার উন্নতির ক্ষেত্রে ভারত অনেকখানি এগিয়ে যাবে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও আমরা পরি-কল্পনার কথাটা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। আই এফ এ-র কর্তৃপক্ষও অতি সহজে এমন একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। কলকাতার ফুটবল খেলার চ্যারিটি ম্যাচ থেকে বছরে যে দুই আড়াই লাখ টাকা সংগৃহীত হয় সে টাকাটা এই প্রয়োজনে ব্যয় করা হলে একটা কাজের মত কাজ করা হয়। আই এফ এ-র কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন কি?

* * *

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতি-যোগিতার গতবারের বিজয়ী কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এবারও আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায়

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে।

*   *   *

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক খেলাগুলি এবার অনুষ্ঠিত হয় বেরিলীতে। ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় তিরুপাথিতে। আঞ্চলিক খেলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে ১১—০ গোলে দ্বিতীয় রাউণ্ডে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে ৭—০ গোলে, সেমি ফাইন্যালে জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ২—১ গোলে এবং ফাইন্যালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে ২—১ গোলে পরাজিত করে উত্তর অঞ্চলের বিজয়ী হয়। ফাইন্যালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণাঞ্চলের বিজয়ী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে ১—০ গোলে। বোম্বাই ও কলকাতার খেলায় আগাগোড়াই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভূত হয়। বিশ্রামের ১০ মিনিট পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক চুনী গোস্বামী বিজয়সূচক গোলটি করেন। এখানে বলা যেতে পারে, প্রতি খেলাতেই চুনী গোস্বামী উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তার কৃতিত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবারও আশুতোষ ট্রফি লাভে সমর্থ হয়েছে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে চুনী গোস্বামী পর পর ছয়টি গোল করে ডাবল হ্যাটট্রিক লাভেরও অধিকারী হন। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতিত্বপূর্ণ জয়লাভের জন্য অধিনায়ক চুনী গোস্বামীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

*   *   *

আই এফ এ-র বাছাই করা একটি ফুটবল দল বর্মায় তিনটি ম্যাচ খেলে ফিরে এসেছে। বর্মায় আই এফ এ দলের তিনটি প্রদর্শনী খেলার মধ্যে প্রথম খেলায় আই এফ এ বার্মিজ সার্ভিসেস একাদশকে পরাজিত করে ৩—২ গোলে। দ্বিতীয় খেলায় বর্মা অলিম্পিক ফুটবল ফেডারেশন দলের বিরুদ্ধে আই এফ এ দল ২—১ গোলে বিজয়ী হয়; কিন্তু তৃতীয় খেলায় আই এফ এ-র বাছাই দলকে বর্মা এমেচার ফুটবল ফেডারেশনের বাছাই দলের কাছে শোচনীয়ভাবে ৪—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য প্রথম খেলায় আই এফ এ দলের তিনটি গোল এবং দ্বিতীয় খেলায় দুইটি গোলই করেছেন সেণ্টার ফরোয়ার্ড কে পাল। প্রথম খেলায় তিনি হ্যাটট্রিক লাভেরও অধিকারী হন।

ইস্টবেঙ্গল ও রাজস্থান ক্লাবের খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ না করায় বর্মা সফরকারী আই এফ এ দলটি তেমন শক্তিশালী ছিল না। রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের নিখিল নন্দী আই এফ এ দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছিলেন; আর নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত হয়েছিল ব্রহ্মদেশ সফরকারী আই এফ এ দল।

গোল—পি বর্মণ (উয়াড়ী) ও আমেদ আখতার (মহঃ স্পোর্টিং); ব্যাক—সালাম (মহঃ স্পোর্টিং), সুশীল গুহ (মোহনবাগান) ও মুস্তাক আমেদ (মহঃ স্পোর্টিং); হাফব্যাক—নিখিল নন্দী (রেলওয়ে স্পোর্টস) —অধিনায়ক, পি বসু (রেলওয়ে স্পোর্টস), কেম্পিয়া (মোহনবাগান), টি সোম (রেলওয়ে স্পোর্টস) ও আমেদ হোসেন (মহঃ স্পোর্টিং); ফরোয়ার্ড—পি কে ব্যানার্জী (রেলওয়ে স্পোর্টস), রহমৎুল্লা (মহঃ স্পোর্টিং), কে পাল (মোহনবাগান), ইয়ামানি (মহঃ স্পোর্টিং), এস দত্ত (মোহনবাগান) ও সালাউদ্দিন (মহঃ স্পোর্টিং)।

মোহনবাগান ক্লাবের খ্যাতনামা লেফ্‌ট ইন চুনী গোস্বামীও আই এফ এ দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলার জন্য চুনী গোস্বামী আই এফ এ-র সঙ্গে ব্রহ্মদেশ সফর করতে পারেন নি। বর্মা সফরকারী আই এফ এ দল তেমন শক্তিশালী না হলেও প্রথম দুইটি খেলায় জয়লাভের পর তৃতীয় খেলায় তাদের এমন শোচনীয় পরাজয়ের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আই এফ এ-র খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেরই দূরপ্রাচ্য এবং বর্মার মাঠ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল। ব্রহ্মদেশের খেলার ধারাও কারো অজানা নয়। তা সত্ত্বেও এমন শোচনীয় পরাজয়ের কারণ কি? এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

*   *   *

ভারতের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বা রণজি ট্রফির খেলা এতদিন নক আউট প্রথায় পরিচালিত হয়ে এসেছে। কিন্তু ভারতের ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড এ বছর থেকে রণজি প্রতিযোগিতার খেলা প্রথমে লীগ প্রথায় এবং পরে নক আউট প্রথায় পরিচালনা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। খেলার নিয়মকানুন এবং অঞ্চল বিভাগও পাকাপাকি হয়ে গেছে।

আগের ব্যবস্থা মত এ ক্ষেত্রেও ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে লীগ প্রথার খেলায়। অর্থাৎ যে কয়টি রাজ্য দল নিয়ে এক একটি অঞ্চল গড়া হয়েছে সে কয়টি রাজ্য দলই লীগ প্রথায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। আঞ্চলিক বিজয়ী রাজ্য দলকে পরে নক আউট প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে অপর অঞ্চলের বিজয়ী রাজ্য দলের সঙ্গে। যে সব রাজ্য নিয়ে এক একটি অঞ্চল গড়া হয়েছে নীচে তার বিবরণ দিচ্ছি।

উত্তরাঞ্চল পাতিয়ালা, পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী ও সার্ভিসেস স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ড।

মধ্যাঞ্চল—মধ্য প্রদেশ, বিদর্ভ, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থান ক্রিকেট এসোসিয়েশন।

পশ্চিমাঞ্চল—বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, বরোদা, গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট-এসোসিয়েশন।

পূর্বাঞ্চল—বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম ক্রিকেট এসোসিয়েশন।

দক্ষিণাঞ্চল—মাদ্রাজ, কেরালা, মহীশূর, হায়দরাবাদ ও অন্ধ্র ক্রিকেট এসোসিয়েশন।

এখানে বলা প্রয়োজন ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডে বোম্বাইয়ের ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়া কলকাতার ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব এবং আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের পৃথক অনুমোদন থাকলেও রণজি প্রতিযোগিতার খেলায় এদের অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। অবশ্য ভারতের জাতীয় ক্রিকেট হিসাবেই যে প্রতি-

যোগিতার মর্যাদা সে প্রতিযোগিতায় একটি রাজ্যের দুইটি দলের অংশ গ্রহণের সুযোগ না পাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে সার্ভিসেস স্পোর্টস্ কণ্ট্রোল বোর্ড যদি একটি রাজ্য দলের মর্যাদা পায় তবে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডই বা সে মর্যাদা পাবে না কেন তার কারণ অজ্ঞাত। যাই হক্ মোট ২২টি দলকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করে খেলার তালিকা রচনা করা হয়েছে।

আঞ্চলিক লীগ খেলার স্থায়িত্বকাল নির্দিষ্ট হয়েছে তিনদিন। প্রতিদিন সাড়ে পাঁচঘণ্টা করে খেলতে হবে। দুই ইনিংস খেলার পর বিজয়ী দল পাবে ৮ পয়েণ্ট। দুই ইনিংস শেষ না হলে প্রথম ইনিংসের অগ্রগামী দল ৫ পয়েণ্ট এবং প্রতিপক্ষ দল পাবে ৩ পয়েণ্ট। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রথম ইনিংস বা দুই ইনিংস শেষ হবার পরও যদি খেলার ফলাফল সমান সমান থাকে তবে দুই দলই ৪ পয়েণ্ট করে পাবে। আর শুধু প্রথম ইনিংসের ফলাফল খেলা অমীমাংসিত থাকলে প্রতি দল পাবে ২ পয়েণ্ট করে আর দ্রুত রাণ তোলার ক্ষেত্রে যে দল কৃতিত্ব দেখাবে সে দল বোনাস হিসাবে অতিরিক্ত একটি পয়েণ্ট পাবে। তবে এই রাণের পরিমাণ ঘণ্টায় ৫০ রাণের কম হলে চলবে না।

আঞ্চলিক লীগ খেলা শেষ হবার পর যদি দুইটি বা দুইটির বেশী দল সমান পয়েণ্ট অর্জন করে তবে উইকেট পিছু রাণের হিসাবের শ্রেষ্ঠত্বে লীগ কোঠায় দলের স্থান নির্ণয় করা হবে। লীগ খেলার পর আঞ্চলিক লীগ বিজয়ী দলের মধ্যে কোয়ার্টার ফাইন্যাল ও সেমিফাইন্যাল খেলার স্থায়িত্বকাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে ৪ দিন আর ফাইন্যাল খেলা চলবে ৫ দিন ধরে। কোন দলে দুইয়ের বেশী পেশাদার খেলোয়াড় থাকতে পারবে না বলেও বোর্ড নির্দেশ দিয়েছেন। আঞ্চলিক লীগের খেলা ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে, কোয়ার্টার ফাইন্যাল ও সেমি ফাইন্যাল খেলা ২৬শে জানুয়ারীর মধ্যে এবং রণজি প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে অবশ্যই শেষ করতে হবে।

আঞ্চলিক প্রথায় লীগের খেলা পরিচালিত হলেও এই বিরাট দেশ ভারতবর্ষে একটি রাজ্য থেকে আর একটি রাজ্যের ব্যবধান কম নয়। পূর্বাঞ্চলের কথাই ধরা যাক। পূর্বাঞ্চলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রতি রাজ্যকেই অপর তিনটি রাজ্যের সঙ্গে খেলতে হবে। মোট খেলার সংখ্যা দাঁড়াবে ছয়টি। এক একটি রাজ্যের সুবিধা অসুবিধা অনুযায়ী খেলার স্থান এবং দিন তারিখ ঠিক করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খেলা শেষ করা সোজা কথা নয়। তবে এখানে ভারতে কোন বিদেশী দলের সফরের ব্যবস্থা হয়নি। সিংহল দলের ভারত সফরের কথা উঠেছে এবং রণজি প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক লীগ খেলা শেষ হবার পর এই সফরের আয়োজন করতে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড সম্মত হয়েছেন। তাই মনে হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লীগের খেলাগুলি শেষ হলেও হতে পারে। লীগ খেলায় প্রতিযোগিতার আকর্ষণ অনেকখানি বাড়িয়ে দেবে বলেই মনে হয়। তবে এ ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ প্রথম বছরের প্রতিযোগিতার পর তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাবে। তার আগে লীগ ও নক আউট প্রথায় প্রতিযোগিতা পরিচালনার পরিকল্পনাকে স্বাগত জানানই ভাল।
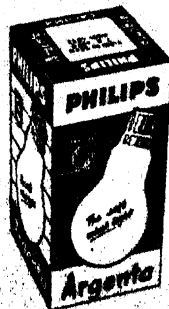
দেশী সংবাদ

৮ই অক্টোবর—আগামী ১৪ই অক্টোবর দিল্লীতে বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী সম্মেলন আরম্ভ হইবে। ট্রাইব্যুনাল এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের রোয়েদাদ কিভাবে কার্যে পরিণত করা যায় তাহা আলোচিত হইবে।

৯ই অক্টোবর—অদ্য সকালবেলা কলিকাতায় বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন লইয়া গঠিত মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটির এক সভায় পশ্চিমবঙ্গে ব্যাংক কর্মীদের ধর্মঘট সমর্থনে ১৮ই অক্টোবর সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হইবে বলিয়া মোটামুটি স্থির হয়।

বোম্বাইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, গতকল্য রাত্রিতে গোয়ার অনুমান ৫ মাইল অভ্যন্তরে গোয়ার জাতীয়তাবাদী ও পর্তুগীজ সৈন্যদলের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়।

১০ই অক্টোবর—আগামী ১৪ই নবেম্বর হাওড়া হইতে শেওড়াফুলি পর্যন্ত প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু করা হইবে বলিয়া পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে স্থির করিয়াছেন।

অদ্য কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চালনা মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর দিল্লী-কলিকাতা-রেঙ্গুন পথে আই এ সি'র ভাইকাউণ্ট বিমান সার্ভিসের উদ্বোধন করেন।

১১ই অক্টোবর—অদ্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মহল হইতে জানান হয় যে, ধর্মঘটে যোগদানকারী ব্যাংক কর্মচারীদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কর্মচারী কার্যে যোগদান করায় এইদিন আংশিক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা শুরু করা সম্ভব হইয়াছে। এইদিন ব্যাংক কর্মচারী ধর্মঘটের চতুর্বিংশ দিবস অতিক্রান্ত হয়।

অদ্য অপরাহ্নে রাষ্ট্রপতি ভবনে এক বিশেষ পুরস্কার দান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কতিপয় বীরকে বা তাঁহাদের নিকটতম আত্মীয়কে ১৭টি অসামরিক ও সামরিক পদক দান করেন।

১২ই অক্টোবর—অদ্য সকালবেলা কলেজ স্ট্রীট রুটে এসপ্ল্যানেডগামী এক ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে হিন্দুস্থানী এক স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করিয়া বসে। এই সময় অফিসযাত্রীদের ভিড়াধিক্যে এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি করে।

পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যা সমাধানের উপায় নিরূপণের জন্য আগামী ৩০শে, ৩১শে অক্টোবর শিলংএ আটটি রাজ্যের পুনর্বাসন মন্ত্রিগণ একটি সম্মেলনে মিলিত হইবেন।

১৩ই অক্টোবর—কেন্দ্রীয় সহকারী শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবিদ আলী পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঘটী ব্যাংক কর্মিগণকে কাজে ফিরিয়া যাইতে এবং সরকারের উপর আস্থা রাখিতে পরামর্শ দিয়াছেন।
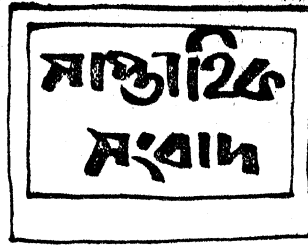
ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ, ১৯৫৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে ভারতের ৩ কোটি ২০ লক্ষ ডলারের এক "বিরাট ঘাটতি" হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার উদ্বৃত্ত হইয়াছিল।

১৪ই অক্টোবর—কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী আজ সকাল হইতে মহানগরীর রাজপথে একখানি 'লেডিজ স্পেশাল' চালু করিয়াছেন। এই ট্রামে কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর একখানি কামরাই আছে। প্রথমদিন অনুমান ৫০জন মহিলা যাত্রী উহাতে ভ্রমণ করেন।

ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি কারমারকার আজ নয়াদিল্লীতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্থা সম্মেলনে সমবেত নয়টি রাজ্যের প্রতিনিধিগণকে বলেন যে, পরিবার নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে এই অঞ্চলের জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা বানচাল হইতে বাধ্য।

বিদেশী সংবাদ

৮ই অক্টোবর—মস্কো বেতারের সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট বিজ্ঞানী অধ্যাপক পকরোভস্কী অদ্য ইজভেস্তিয়ায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলেন, কয়েক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহলোকে যাতায়াত মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হইবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে আজ আশি লক্ষ লোকের বাসভূমি সুরম্য নগরী টোকিওর সম্মানিত নাগরিকের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়।

৯ই অক্টোবর—হিরোসিমা "তীর্থযাত্রায়" আসিয়া প্রধানমন্ত্রী নেহরু আজ এই সংকল্প ব্যক্ত করেন যে, সর্বপ্রকার পারমাণবিক অস্ত্রের চূড়ান্ত বিলুপ্তির জন্য তিনি কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিবেন।

১০ই অক্টোবর—সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভ মার্কিন রাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীজন ফস্টার ডালেসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, শ্রীডালেস সিরিয়াকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ বাধাইবার জন্য তুরস্ককে উত্তেজিত করিতেছেন। আজ নিউইয়র্ক টাইমসে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, অদ্য সকাল পর্যন্ত সোভিয়েট উপগ্রহটি ২১৮৭০০০ মাইল পরিক্রমণ করিয়াছে। পৃথিবীকে উহা ৭৮বার প্রদক্ষিণ করিয়াছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের মতে, ইহা অনির্দিষ্ট কাল ধরিয়া প্রতিদিন পৃথিবীকে ১৬বার প্রদক্ষিণ করিবে।

১১ই অক্টোবর—৬৪ বৎসর বয়স্ক শ্রীহোসেন শহীদ সুরাবর্দীর নেতৃত্বে গঠিত পাকিস্থান গবর্নমেণ্টের অদ্য পতন ঘটিয়াছে। শ্রী সুরাবর্দী প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

'প্রাভদা'য় আজ শ্রীভিক্টর আম্বার্ট সুমিয়ান নামক একজন সোভিয়েট জ্যোতির্বিদ লিখিয়াছেন যে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই কৃত্রিম উপগ্রহসমূহে মহাশূন্যে সহস্র সহস্র মাইল ঊর্ধ্বে উঠিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে পারে।

১২ই অক্টোবর—করাচীর সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্থানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীরূপে কৃষক-শ্রমিক প্রজা পার্টির নেতা শ্রীহামিদুল হক চৌধুরীর নাম করা হইতেছে। প্রেসিডেণ্ট মীর্জার জরুরী আহ্বান পাইয়া তিনি গতকাল করাচীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীআইচিরো ফুজিয়ামা অদ্য রাত্রিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাপান ও ভারতের মধ্যে যে সমস্ত প্রশ্ন অমীমাংসিত ছিল, তৎসমুদয় সম্বন্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও জাপান সরকারের নেতাদের মধ্যে মতৈক্য ঘটিয়াছে।

রাশিয়া মহাশূন্যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের পর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রয়-বিক্রয় সংস্থা জাপানী ক্যামেরা ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের চাহিদা খুব জোরে চলিতেছে।

১৩ই অক্টোবর—অদ্য কায়রোতে ঘোষণা করা হয় যে, মিশর-সিরিয়া পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি অনুসারে মিশরীয় সশস্ত্র সৈন্যদলকে সিরিয়ায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

আজ মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে, তুরস্ক সিরিয়া সীমান্তে তাহার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে এবং ইস্রাইল ও তাহার সামরিক প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করিতেছে।

১৪ই অক্টোবর—কায়রোর রাজনৈতিক মহল আজ বলেন যে, সিরিয়ায় মিশরীয় সৈন্য প্রেরণ হইতেই বুঝা যায় যে, সিরিয়ার পরিস্থিতি কত গুরুতর।

নরওয়ের পার্লামেণ্টের নোবেল কমিটি আজ ঘোষণা করেন যে, কানাডার ভূতপূর্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলিস্টার বি পিয়ার্সনকে শান্তির জন্য ১৯৫৭ সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর জন্য যে অনুসন্ধান চালাইতেছেন, তাহা এখন দুইজন লোকের মধ্যে আসিয়া সীমাবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের একজন হইলেন রিপাবলিকান দলের নেতা ডাঃ খাঁ সাহেব এবং অপরজন হইলেন কৃষক-শ্রমিক দলের নেতা শ্রীহামিদুল হক চৌধুরী।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা
কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষান্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।
মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা, ষান্মাসিক ১১ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড]
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

Amul
PASTEURISED
BUTTER
৩½ আউন্স, ৭ আউন্স ও
১ পাউণ্ড মোড়কে আমূল
মাখন পাওয়া যায়
PSKMP-5/57

যকৃতকে
শক্তিশালী করিতে
নিয়মিত
বাই-কোলেটস্
ব্যবহার করুন।
BI COLATES
STEARNS
নূতন ট্যাম্পার-প্রুফ সীল করা অবস্থায় পাইবেন
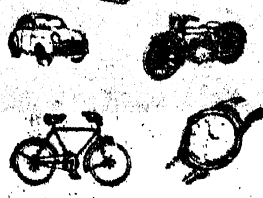
সূচীপত্র

সহজ কিস্তীতে এখন আপনি এগুলি কিনতে পারেন।
যে জিনিষগুলি আপনি কিনতে চান, তার জন্য যথোপযুক্ত অর্থ সঞ্চয় না করা পর্যন্ত আপনার আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই। আমাদের মারফৎ ওগুলি আপনি সহজ কিস্তিতে কিনতে পারবেন।
ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং

সূচীপত্র

প্রতিটি বিন্দুই খাঁটি
রাধাবিনোদ
মার্কা
সরিষার তৈল
সর্ব্বমঙ্গলা অয়েল মিল

পূজা বার্ষিকী
নব পত্রিকা
মূল্য ৪.
দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা-৯

DESH : 40 Naye Paise
Saturday 26th October, 1957

২৪ বর্ষ ॥ ৫১ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ৯ই কার্তিক ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

আল্‌বেয়ার কাম্যু

সুইডিশ বিদ্বজ্জন সভার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে, পূর্বেও কখনো কখনো উঠিয়াছে। বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী হিসাবে নোবেল পুরস্কার পাইবার যোগ্যতম অধিকারী কোন্ বৎসরে কে হইতে পারেন তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। বিচারকমণ্ডলী অথবা সারা পৃথিবীতে অসংখ্য রসজ্ঞ পাঠক কাহারও পক্ষেই ইহা সহজ নয়, সর্বসম্মতি লাভের কথা ত কল্পনাই করা যায় না, বিশেষ করিয়া সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে। তাই ফরাসী কথাশিল্পী আল্‌বেয়ার কাম্যু বর্তমান বৎসরে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় অভাবনীয় কিছু ঘটিয়াছে, অথবা নির্বাচন অসঙ্গত কিম্বা পক্ষপাতদুষ্ট হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

কিপলিং-এর মতো কাম্যুও অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক মর্যাদা পাইয়াছেন; অন্যান্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও ফ্রান্সেই কাম্যু অপেক্ষা খ্যাতিমান এবং ক্ষমতাশালী সাহিত্যিক আছেন; আঁদ্রে মাল্‌রো জাঁ পল সার্ত্‌র্ এবং গাব্রিয়েল মার্সেলের সত্য-সন্ধানী শিল্প-প্রতিভা শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি পাইবার অযোগ্য নয়। তবে নোবেল পুরস্কার একজন পাইবার পরে আর কেহ ঐ সম্মান পাইবার সুযোগ্য অধিকারী ছিলেন ইহা লইয়া জল্পনা করা খুব শোভন নয়; ইহার সার্থকতাও যৎসামান্য।

আল্‌বেয়ার কাম্যু নিঃসংশয়ে শক্তিমান লেখক। ফরাসী সাহিত্যে নাকি অশিক্ষিতপটুত্বের স্থান নাই, অথবা স্থান থাকিলেও তাহার সাহিত্যিক স্বীকৃতি নাই। আল্‌বেয়ার কাম্যুর কীর্তি এইজন্য যে তিনি তরুণ বয়সেই তাঁহার দার্শনিক চিন্তাধারা ও স্বচ্ছ রচনাকৌশল দ্বারা ফরাসী বুদ্ধিজীবী মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে সঙ্কটের চেতনায় বিক্ষুব্ধ-জর্জরিত বুদ্ধিজীবী-মণ্ডলের একপ্রান্তে যদি এল্‌য়ার-আরাগঁকে ধরা যায়, তবে অপর প্রান্তে আছেন বা ছিলেন সার্ত্‌র্ এবং কাম্যু। ভাবসমুদ্রের নিরন্তর মন্থন হইতে ফরাসী মনস্বীরা অমৃত না গরল কি আহরণ করিয়াছেন তাহা আমরা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারিব না। হয়ত অমৃত এবং গরল দুই-ই। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সার্ত্‌র্ অথবা কাম্যু কেহই আমরা যাহাকে "বিশুদ্ধ সাহিত্যিক" মনে করি তাহা নন। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং হাঙ্গেরী সম্বন্ধে সার্ত্‌রের নৈতিক সঙ্কট মর্মান্তিক; তেমনই আল্‌বেয়র কাম্যুও ভারত প্রভৃতি "নিরপেক্ষ" দেশগুলির মনোভাবের প্রখর সমালোচনায় অগ্রণী। "আইডিয়া" এবং বিবেকের চুল-চেরা বিশ্লেষণে ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের উৎসাহ অসীম। আলবেয়ার কাম্যু এই দিক দিয়া কেবলমাত্র উৎসাহী নন, তিনি একটি বিশিষ্ট দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্রষ্টাও বটে।

সৃজনশীল সাহিত্য তত্ত্বাশ্রয়ী হইলে তাহার রসাস্বাদন দুরূহ হয়। আল্‌বেয়ার কাম্যু যে "অর্থহীনতার দর্শন" প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার উপন্যাসগুলিতে ও প্রবন্ধাবলীতে তাহা সম্ভবত বর্তমান সভ্যতার সঙ্কটেরই একটি খণ্ডিত প্রতিরূপ। সমালোচকেরা বলেন, কাম্যুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "দি স্ট্রেঞ্জার" তাঁহাকে এই বিংশ শতাব্দীর আদর্শ সঙ্কটের শ্রেষ্ঠ শিল্পী-দার্শনিকের স্বীকৃতি দিয়াছে। বৈদান্তিক যে অর্থে সংসারকে মায়াপ্রপঞ্চ বলিয়া অভিহিত করেন কাম্যুর কাহিনীর নায়ক সেই অর্থে জীবনকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করে না। তাহার কাছে জীবন অর্থহীন। কারণ, কোনো মানবিক আবেগ, অনুভব, আদর্শ ও কল্পনাই তাহার কাছে কোনোই মূল্য বহন করে না। সংসারে থাকিয়াও, ভোগসুখ, অনুরাগ-বিরাগের স্রোতে ভাসিয়াও সে সংসারের বাহিরে, সকল দায় ও দায়িত্বহীন, "দি আউটসাইডার"। মৃত্যুই পরম ও চরম সত্য; জীবনের এই সর্বব্যাপী অর্থহীনতা, মূল্যহীনতার সমাপ্তি মৃত্যুতে।

মনে হইতে পারে যে, আল্‌বেয়ার কাম্যু ভয়ঙ্করভাবে নিরাশাবাদী, নেতিবাদী দার্শনিক কথাশিল্পী। কিন্তু জীবনের অর্থহীনতার বিরুদ্ধে এই দার্শনিক-বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে তিনি জীবনরসিকও। সব ফরাসী সাহিত্য-শিল্পীর মতোই তিনি জন্ম, মৃত্যু, প্রেম ও প্রণয়লীলার নিপুণ রূপকার এবং শেষ পর্যন্ত অর্থহীনতার দার্শনিক-তত্ত্বের সঙ্গে নৈতিক দায়িত্বের সমন্বয় করিতেও তিনি আগ্রহশীল। মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে নিরাশাবাদী, কিন্তু কাম্যু মানুষের আচরণ সম্বন্ধে, জীবনকে ঊর্ধ্বতর ক্ষেত্রে লইয়া যাইবার মানবিক কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি গভীর বিশ্বাস পোষণ করেন।

("I am pessimistic in everything that concerns the nature of man, but obstinately optimistic in all that concerns human action.")

তাঁহার "মহামারী" (দি প্লেগ) নামে

উপন্যাসখানি এই মানবিক দায়িত্ববোধের সার্থক ও মনোগ্রাহী শিল্পসৃষ্টি। কামুর সৃজনী-প্রতিভার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে অভিমত প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস "দি ফল্" কোনো কোনো সমালোচকের মতে তাঁর সৃজনীশক্তির নূতন ধারা সূচনা করিয়াছে। নৈতিক স্খলন ও অনুশোচনার আত্মগত স্বীকারোক্তির দীর্ঘ বর্ণনায় এই উপন্যাসখানি কিন্তু ক্লান্তিকর মনে হয়। সাম্প্রতিক কালের অনেক উল্লেখযোগ্য ফরাসী উপন্যাসই এই ধরনের তত্ত্ব ও তর্কাশ্রয়ী মনোবিকলনে ভারাক্রান্ত, শিথিল গঠন। হয়ত জীবনের জটিল পরস্পরবিরোধী ঘাত-প্রতিঘাতের পীড়নে শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পও বর্তমানে তার সুদৃঢ় গঠনসৌষ্ঠব হারাইয়াছে আলবেয়ার কামুর কাছে তাই যাহা আশা করা যাইতে পারে তাহা হয়ত কথাশিল্পের সামগ্রী মাত্র নয়; তাহা সম্ভবত জীবনসত্যের এক অভিনব অনুশীলন ও রূপায়ণ।

শান্তি পুরস্কার

কিছুকাল পূর্বে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, মহাত্মা গান্ধীকে নোবেল শান্তি পুরস্কার না দেওয়া যে ভুল হইয়াছে, তাহা পুরস্কার প্রদাতা কর্তৃপক্ষ এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। "এমন মানুষ যে ধরণীর মাটিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এরূপ কথাই হয়ত ভবিষ্যতকালের মানুষ বিশ্বাস করিতে চাহিবে না।"—বর্তমান যুগের অন্যতম মনীষীশ্রেষ্ঠ কর্তৃক রচিত এই সংহত বন্দনা-বাণীতে গান্ধীজীর আবির্ভাবে এ-যুগের সকল শ্রেষ্ঠ মানুষের বিস্ময় ভাষা পাইয়াছে — গান্ধীজী নোবেল পুরস্কার পাইলে তাঁহার দেশ ইহা অপেক্ষা গর্বের বড় উপলক্ষ্য পাইত না, আগামী কালে নোবেল পুরস্কার সমিতিই সম্মানিত বোধ করিবার সুযোগ পাইত এই পর্যন্ত।

বস্তুত চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে নোবেল পুরস্কার ভারতবাসী যে-দৃষ্টিতে দেখিত, আজ আর তাহা দেখে না—বিশেষত সাহিত্যভাগে। সেদিন দেশ এই পুরস্কার প্রাপ্তিকে নবজাগ্রত এশিয়ার স্বীকৃতিরূপে জানিয়া পুরস্কৃত বোধ করিয়াছিল; আজ স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি কবির স্মরণোৎসবে তাঁহার নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তি অনেকটা অবান্তর বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (বস্তুত উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ ভাবজগতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের জন্য একরূপ একক চেষ্টায় যে উদ্যোগ করিয়াছিলেন ও বিশ্ব-পরিক্রমা করিয়াছিলেন, যদি তাহার সম্পূর্ণ মূল্যনিরূপণ হইত, তবে তিনি শান্তির নোবেল পুরস্কার পাইতেও অধিকারী হইতেন, তাঁহার দেশের বহুসংখ্যক লোক এই কথা মনে করে।)

সম্প্রতি ১৯৫৭ সালে নোবেল শান্তি-পুরস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ঘোষিত হইয়াছে। এই দিনই ঐ সংবাদের পাশাপাশি সংবাদপত্রে হংকঙে ভারতীয়দের সভায় শ্রীজওহরলাল নেহরুর যে-বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বর্তমান জগতে কোন্ দেশের পররাষ্ট্র সচিব শ্রেষ্ঠতর শান্তির দূত এই কথাটা মনে না পড়িয়া পারে না। এককালে রবীন্দ্রনাথ যেমন বিশ্বমৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া এদেশে একশ্রেণীর লোকের নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন, জওহরলালও দেশে ও বিদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ধৈর্য ও উদ্যোগ প্রকাশ করিয়া তেমনি কাহারও কাহারও বিরাগভাজন হইয়াছেন —অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার উদ্যোগ হয়ত সমালোচনার ঊর্ধ্বে নহে—কিন্তু নানা দুঃখদৈন্য এবং ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ যে তাহার প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ঘরে ও বাহিরে শান্তিকামনাতেই তাহার চেষ্টাকে নিরলস জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছেন একথা নোবেল সমিতি স্বীকার করিলে অবশ্যই সুখের বিষয় হইত, তবে তাহা না করিলেও ক্ষতি নাই, কারণ একথা আজ দেশে দেশে বহুস্বীকৃত সত্য।

উদ্বাস্তু-প্রসঙ্গ

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থী-সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্তিতে এদেশের কর্তৃপক্ষ কতকটা স্বস্তিবোধ করিতেছেন এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রয়োগ-কালেই উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে এইরূপ আশাও প্রকাশ করিতেছেন। সমস্যা সমাধানকল্পে গভর্নমেণ্ট যে-সকল আয়োজন করিতেছেন, তাহার কার্যকারিতা আপাতত আমাদের আলোচ্য নহে। যত লোক আসিতে চাহেন, এককালে তাঁহাদের পুনর্বাসন-ব্যবস্থাও যে সহজ নহে এবং সেজন্য আগমন-নিয়ন্ত্রণের যে আবশ্যকতা আছে, তাহাও আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু একথাও বলিতে হইবে যে, এই সংখ্যা-হ্রাসে আত্মসন্তোষের কোন কারণ নাই এবং কঠিন হস্তে আগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিলে পূর্বস্বীকৃত দায়িত্ব অস্বীকারের একটি চরম দৃষ্টান্ত স্থাপনা করা হইবে—আমরা ভরসা করি সেরূপ অভিযোগের কোন কারণ ভারত সরকার ঘটিতে দিবেন না। উদ্বাস্তু আগমন স্বাভাবিক কারণে হ্রাস পাইয়াছে, না, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের কড়াকড়ির ফলে; এ বিষয়ে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, আমরাও এ বিষয়ে লিখিয়াছিলাম। সম্প্রতি কলিকাতার একখানি দৈনিকপত্র সংবাদ দিয়াছেন যে, ঢাকায় ডেপুটি কমিশনারের নিকট অনুমতি-পত্রের জন্য দুই লক্ষ আবেদন পড়িয়াছে। এই সংবাদের কোন প্রতিবাদ দেখি নাই; ইহা যদি বহুরঞ্জিত না হয়, তবে ইহার দ্বারা সমস্যার আকার প্রকার সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে।

কি নীতি ও নিয়ম প্রয়োগ দ্বারা দেশত্যাগার্থীর অগ্রাধিকার ঢাকায় নির্ণীত হইতেছে এই প্রশ্নটা অনেকের মনেই জাগরূক হইয়া আছে—কিন্তু আভাসেও ইহার কোন উত্তর-চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি নাই।

যে-কথাটা অনেকবার বলা হইয়াছে, সে-কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া যদি ভারত সরকার পরিকল্পনা করেন তাহা দ্বিতীয় পরিকল্পনা হউক বা তৃতীয় পরিকল্পনা—তবেই হয়ত প্রকৃত দূর-দৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হইবে। আগমনের পথ বন্ধ করিয়া দিলে এক সমস্যা হয়ত মিটিবে, কিন্তু ফলে অন্য সমস্যার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে পূর্ববঙ্গবাসীর সংখ্যা কম নয়—তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের চিত্ত সজাগ, তাঁহাদের মন পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের প্রতি সমবেদনায় অনবরত আন্দোলিত হইতে থাকিবে। আর শরণার্থীদের একান্তই ভারস্বরূপ বলিয়া গণ্য করিবার হেতু নাই—তাঁহাদের মনস্তত্ত্ব ও অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিলে তাঁহাদের মধ্যে অসন্তোষ কারণে বা অকারণে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে বলিয়া কোন কোন রাষ্ট্রকর্মী হয়ত তাঁহাদের সম্বন্ধে শঙ্কিত — তাঁহাদের অন্তরকে ঠিকমত স্পর্শ করিতে পারিলে,—ইঁহারা স্বভাব-বিদ্রোহী নহেন—অধিকাংশই নানা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিশেষ বলস্বরূপ হইয়া উঠিবেন বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

[কুড়ি]

দুখিনা সুঁদের মুখের কাছে এক জায়গায় জড়সড় হয়ে বসে আছে যারা, তারা হলো জামুনগড়ার তিনজন দেহাতী মালকাটা। হাওয়ার ঝটকার চোট বুকে পিঠে লেগেছিল, হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। মুখের এখানে-ওখানে চাম ছড়ে গিয়েছে। জখমগুলি সাংঘাতিক কিছু নয়। জখমের চেয়ে ওদের হতভম্ব চোখ আর মুখগুলি বেশি করুণ। এক হাতে ঢিবরি এবং আর এক হাতে গাইতা ধরে যেন একটা আতঙ্কের ভারে অনড় হয়ে বসে আছে।

পেঁৗছে যায় রেস্ক্যু দল, কলঘরের বড় মিস্তিরি পলুস হালদার, তিনজন মেশিন খালাসী, তিনজন সর্দার আর কম্পাউন্ডার। রেস্ক্যু দলের হাঁকডাকে চমকে ওঠে তিন মালকাটা। উঠে দাঁড়ায়, জল খায়, তারপরেই হাঁপ ছেড়ে হাসতে থাকে। একজন সরদারের হেপাজতে তিন মালকাটাকে খাদের বাইরে রওনা করিয়ে দিয়ে সুঁদের ভিতরে টর্চের আলো ছোঁড়ে পলুস।

বিপদ যত ভয়ানক বলে মনে হয়েছিল, তত ভয়ানক নয়। গ্যাসে আগুন লেগেছে বলে মনে হয় না। বোধ হয় সুঁদের ছাদের শেষ দিকটা ধসেছে; তাই প্রচণ্ড হাওয়ার ঝটকা ছুটে গিয়েছে।

কিন্তু, আর একটা মালকাটা কোথায়? গ্যাসে জখম হয়ে সুঁদের ভিতরে কোথাও পড়ে আছে কি?

উপর থেকে তিনটে টবগাড়ি জলে ভরা বড় বড় ড্রাম নিয়ে নেমে আসে। তিন মেশিন খালাসী একসঙ্গে হাত লাগিয়ে পাম্প চালায়; হোস পাইপ হাতে তুলে নিয়ে সুঁদের ভিতরে জলের ফোয়ারা ছড়াতে থাকে পলুস হালদার।

—গ্যাস মরে এসেছে বোধ হয়। বিড়বিড় করে কম্পাউন্ডার।

—না মরলেও, এ গ্যাসের তেজ নাই [illegible] হবে। ফিসফিস করে একজন সরদার।

—তোমরা এখানেই থাক। আমি এবার একটিকে [illegible] করে দেখি। ভেজা গামছা নাকের [illegible] বেঁধে, আর টর্চ হাতে নিয়ে [illegible] ভিতরে এগিয়ে যায়। একাকী

টাকা বকসিসের সবটুকু পেতে হলে যে সাহস আর বুদ্ধি দরকার, তার সবটুকুই কলঘরের বড় মিস্তিরি এই পলুস হালদারের আছে।

টর্চের আলো ছড়িয়ে দেখতে থাকে পলুস। না, কোন জখমী মালকাটার শরীর সুঁদের ভিতরে কোথাও পড়ে নেই। মাঝে মাঝে ভিতরের দিক থেকে গুমগুম শব্দ, আর ছোট ছোট হাওয়ার ঝটকা ছুটে আসছে। তবে কি ছাদের ধসে চাপা পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল মানুষটা?

গ্যাসের তেজ নাই ঠিকই; আরও ভিতরে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় পলুস। কি আশ্চর্য, পলুসের পায়ের কাছেই যে পড়ে আছে একটা ঢিবরি। দেখে খুশি হয় পলুস। না, ধস চাপা পড়েনি বোকা মালকাটা; এতদূরে যখন পালিয়ে আসতে পেরেছে, তখন এদিকেই কোথাও না কোথাও পড়ে আছে। সুঁদের গায়ের ডাইনে বাঁয়ে টর্চের আলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেখতে থাকে পলুস; তারপরেই একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে যেয়ে একটা মানুষের হাত চেপে ধরে।

যেন কালো পাথরের হাত-পা দিয়ে

তৈরি একটা মজবুত চেহারা কয়লার গুঁড়ো মেখে সুঁদের গায়ে হেলান দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে, চোখ বন্ধ করে আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাঁইতাটাকে তবু শক্ত করে এক হাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছে লোকটা। লোকটার নাক দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

লোকটার মুখের উপর টর্চের আলো সুস্থির করে রেখে ভেজা গামছা দিয়ে লোকটার চোখ নাক মুখ মুছে দিতে থাকে পলুস। —ডর নাই, কথা বল মালকাটা। লোকটার কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ডাক দিতে থাকে পলুস এবং তারপরেই চমকে ওঠে, দু পা পিছিয়ে সরে যায়।

লোকটার নাক মুখ চোখ থেকে কয়লা-গুঁড়োর আবরণ ভেজা গামছার জলে ধুয়ে যেতেই ফুটে উঠেছে একটা চেনা মুখ। এইতো সেদিন এক জঙ্গলের নিভৃতে ঘোর কালো রাতের অন্ধকারে একটা গাছের কাছে পলুসের হাতের এই টর্চেরই আলোর ঝাঁজ সহ্য করতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল এই মুখটা, এরই নাম দাশু ঘরামি, পলুসের দয়ায় আর ক্ষমায় যে মানুষটার প্রাণ বারবার দুবার অনেক শাস্তির মার থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছে। এই লোকটা আজও মুরলীর মত নারীর জীবনের মরদ হয়ে আছে। মুরলীর দুর্ভাগ্য; আর পলুস হালদারের বুকের সেই স্বপ্নময় দুর্বার পিয়াসের দুর্ভাগ্য।

দাশুর কাছে এগিয়ে এসে দাশুর দু কাঁধের উপর হাত রেখে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে আর চেঁচিয়ে হেসে ওঠে পলুস—দাশু সরদার।

চোখ মেলে মিটমিট করে তাকায় দাশু। জোরে জোরে দুবার নিঃশ্বাস টানে; তারপরেই চোখ বড় করে একটা নিথর ও অপলক দৃষ্টি তুলে পলুস হালদারের ছায়াময় অস্পষ্ট মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরেই থরথর করে কেঁপে ওঠে।

পলুস হাসে—মুরলীর মরদ, মধুকুপির কিষাণ এখানকে কেনে?

এখানেও পলুস হালদার! দাশুর জীবনের সেই অভিশাপের মূর্তি! কি অদ্ভুত পলুসের এই হাসির শব্দ! কিষাণের ঘরের শান্তি আর স্বপ্নের শত্রু হাসছে। পৃথিবীর যত দোআঁশ মাটির গন্ধ আর সবুজ ক্ষেতের শত্রুটা কথা বলছে। কপাল বাবার গৌরব আর মধুকুপির মাদল-ঝুমুরের শত্রু সেই পলুস হালদার দাশুর ভাগ্যটাকে ঠাট্টা করছে। পরম জয়ের উল্লাসে হিংস্র হয়ে হি-হি করে হাসছে কালো নরকের দানব। দাশুর বুকের ভিতর থেকে যেন এক ঝলক তপ্ত রক্ত উথলে উঠে দাশুর চোখের উপরে ছড়িয়ে পড়ে। চোখদুটো হঠাৎ লাল হয়ে রক্তপিপাসু নেশার জ্বালায় ছটফট করতে থাকে।

গাঁইতার হাতল দু হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে আর একবার কেঁপে ওঠে দাশু। তারপরেই একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে পলুসের মাথা লক্ষ্য করে গাঁইতা তোলে।

—একি? তুমি কি পাগল হয়ে গেলে সরদার? পলুসের উল্লাসের হাসিটা করুণ আর্তনাদ হয়ে কেঁপে ওঠে। পলুসের হাতের টর্চও থরথর করে কাঁপে, সেই সঙ্গে দাশুর গাঁইতার মুখটাও চিকচিক করে যেন একটা শাণিত হাসি কাঁপাতে থাকে।

কিন্তু দাশুর হাতের বধির গাঁইতা পলুস হালদারের এই আর্তস্বরের আবেদন যেন শুনতেই পায়নি। পলুসের মাথার উপর লাফিয়ে পড়ে একটা কোপ দিয়ে কাঁচা রক্তের ফোয়ারা পান করবার জন্য দুরন্ত পিপাসার আক্রোশ নিয়ে আবার দুলে ওঠে গাঁইতা। চেঁচিয়ে ওঠে পলুস—তুমি আমাকে মারবে কেনে সরদার? ভুলে যাও কেনে, আমি তুমাকে কত দয়া করেছি, তুমাকে কত সাজার ভয় থেকে বাঁচিয়েছি। আমি যে এখনই তুমার জখম নাকের রক্ত নিজের হাতে মুছে দিয়েছি।

দয়া! পলুস হালদারের এই দয়াই যে দাশু ঘরামির অদৃষ্টের সবচেয়ে কঠোর সাজা। আর সহ্য হবে না এই দয়া। দাশুর নিঃশ্বাসের শব্দ আরও রুক্ষ হয়ে ঘড়ঘড় করতে থাকে। গাঁইতাটাকে একবার নামিয়ে নিয়েই আবার পলুসের মাথার উপর কোপ দেবার জন্য তুলে ধরে আর লাফিয়ে ওঠে দাশু।

—দয়া কর সরদার। পলুসের বুকের ভিতর থেকে আরও করুণ ও আরও ভীরু স্বরের একটা আবেদন যেন চিৎকার বের হয়ে কাতরাতে থাকে।

দয়া চাইছে পলুস হালদার। দাশু ঘরামির জীবনকে বার বার দয়া করে নিষ্ঠুর অহঙ্কারে বিষে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে পলুস হালদারের জীবনে যে অহংকার, সেই অহঙ্কার এইবার দাশুর মুখের দিকে ভিক্ষুকের মত তাকিয়েছে। পলুসের ভীরু প্রাণের প্রার্থনার শব্দ শুনে দাশু ঘরামির অন্তরাত্মার সব আক্রোশ যেন হেসে ওঠে আর সেই মুহূর্তে শান্ত হয়ে যায়। গাঁইতাটাকে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু।

একটা লাফ দিয়ে সরে যায় পলুস; গাঁইতাটাকে হাতে তুলে নিয়েই কয়লার ধুলোর উপর শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। দাঁতে দাঁত ঘষে চেঁচিয়ে ওঠে—কিষাণের বাচ্চা কিষাণ!

দুহাত দিয়ে নিজেরই চুলের ঝুঁটি খিমচে ধরে কাঁপতে থাকে দাশু।

—দাগী ডাকু, চোট্টা দেহাতী ভিক্ষুক! পলুসের মুখের এক একটা গালির গর্জন যেন দাশুর বুকের উপর গাঁইতার কোপ মারতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দাশুর লাল চোখ দুটোও যন্ত্রণায় কুঁচকে যেতে থাকে।

—তুকে আমি এখানে মেরে এখানেই কবর দিয়ে দিতে পারি। একটা লাথি মেরে এক রাশ কয়লার ধুলো দাশুর গায়ের উপর ছুঁড়ে দিয়ে চীৎকার করে পলুস।

—তাই দাও না কেনে। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—না।

—কেনে?

—মুরলীকে বুঝাতে চাই, তু কত ছোট আর আমি কত বড়।

—তাতে তুমার লাভ কি?

—তাতে মুরলী আমার হবেক।

—কি?

—হ্যাঁ। তুর ঘরে থুক ফেলে দিয়ে মুরলী আমার কাছে ছুটে আসে কিনা দেখছি।

—তুমি কি চাও যে, মুরলী তুমার কাছে চলে আসুক?

—চাই।

—মুরলীকে সেকথা বল না কেনে?

—বলেছি।

—কি বলে মুরলী?

—একবার বলে যাব, একবার বলে যাব নাই। কাছে ডেকে নিয়ে কোমর ছুঁতে দেয়, আবার চোর বলে গালিও দেয়। তুমার মুরলীকে আমি চিনে নিয়েছি সরদার।

বলতে বলতে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে পলুস। সেই ভয়ানক হাসির প্রতিধ্বনি সুঁদের পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি খেয়ে আর গুমরে গুমরে গড়াতে থাকে। আর, দাশুর লাল চোখের দৃষ্টি সেই মুহূর্তে যেন মড়ার চোখের দৃষ্টির মত ঘোলা হয়ে যায়। যেন একটা অন্তহীন শূন্যতার দিকে তাকিয়ে দাশুর চোখদুটো গলে গলে ঝরে যাচ্ছে। মুরলী নেই, মুরলী নেই। পলুস হালদারের হাতের ছোঁয়া কোমরের উপর বরণ করে কবেই মরে গিয়েছে মুরলী।

না না না, অসম্ভব। মহেশ রাখালের বেটির প্রাণ এত কপট হতে পারে না। দাশুর বুকের কাছে শুয়ে দাশুর ছেইলার প্রাণ বরণ করে নিয়েছে যে মুরলী, তার কোমর পরের লোভের ছোঁয়া যেচে নিতে পারে না। যতই হিসেব করে হাসুক কাঁদুক মুরলী, হিসেব করে দাশুর ভালবাসার চোখে এমন ভয়ানক ধুলো দিতে পারে না মুরলী।

—তুমি মিথ্যুক বট হালদার। হুংকার দিতে চেষ্টা করে দাশু। কিন্তু পারে না। গলার স্বর জড়িয়ে যায়, আর বুকটা হাঁস-ফাঁস করে।

—তুমি একটা গাঁওয়ার বট দাশু। পলুসের হিংস্র ঠাট্টা হুংকার দিয়ে বেজে ওঠে।

কেঁপে কেঁপে হাঁপ ছাড়ে দাশু; পাথরের পাটার মত চওড়া বুকটা যেন সব নিঃশ্বাস হারিয়ে চুপসে যায়। না, পল্টুসের এই বাট্টার হুংকার মিথ্যা হুংকার নয়। জাত-পঞ্চও যে ঠিক এই রকম হুংকার দিয়ে মুরলীর কোমরের দুর্নাম ঘোষণা করেছিল। দাশুর চোখ দুটোও যে স্পষ্ট করে দেখেছে, পল্টুসের নাম শুনলেই মুরলীর চোখের তারা দুটো ছটফট করতে থাকে। তবে আর এই মিথ্যা লড়াই লড়ে হয়রাণ হওয়া কেন? মুরলীকে শেষবারের মত শুধিয়ে নিয়ে এই-বার কিষাণের দুর্ভাগাকে একেবারে একলা করে দেওয়াই ভাল।

বিড় বিড় করে দাশু—তুমি যা খুশি বল হালদার। মুরলী না বললে আমি বিশ্বাস করবো নাই। দুনিয়া বললেও বিশ্বাস করবো নাই। আমি মুরলীকে শুধাবো।

—আর কবে শুধাবে? লাইটটাকে কাঁধে তুলে আর দাশুর চোখের উপর টর্চের আলো দুলিয়ে আবার হেসে ফেলে দাশু।

—আমি আজই এই কয়লা খাদের নরক ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ে চলে যাব।

—যেতে দিলে তো যাবে?

—কি বললে?

—তুমাকে যে আজই গোবিন্দপুর থানাতে যাওয়া করাবো সরদার। তুমি গুণী লোহারের সাকরেদ বট; তুমি আমাকে খুন করতে গাইতা উঠাইছিলে। এত শক্ত পাপীকে আর মাপ করা চলে না। তুমার ফাঁসি যদি না হয়, তবু তো দশ বছরের শক্ত কয়েদ হবে।

—যা ইচ্ছা হয় করো হালদার, কিন্তুক আমাকে একবার গাঁয়ে যেতে দাও।

—কেনে?

—মুরলীকে একবার শুধাতে চাই।

—মুরলীকে শুধায়ে কি হবে?

—জেনে লিব, কার ঘরে যেতে চায় মুরলী।

—যদি বলে পল্টুসের ঘরে যেতে চাই?

—তবে পল্টুসের ঘরে যাবেক মুরলী।

—তুমি যেতে দিবে?

—খুশি হয়ে যেতে দিব।

—তুমার কপালবাবার নামে কিরিয়া কর।

—কপালবাবার নামে কিরিয়া করছি হালদার। চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—তবে এইসো। আমিও কসম করছি, তুমার নামে থানাতে এজাহার দিব না।

টর্চের আলো ফেলে আগে আগে চলতে থাকে কলঘরের বড় মিস্তিরি পল্টুস হালদার। আর, পল্টুসের ছায়ার পিছু-পিছু মধুকুপির মাটিহারা কিষাণ। আশার পিছু পিছু একটা হতাশা। জয়ের পিছু পিছু পরাজয়। বাস্তবতার পিছু পিছু একটা ক্লান্ততা।

—চল বাপ। আর ই গাঁয়ে থাকবো নাই। এখানকে থাকলে তুমার বিটির জান মান আর সুখ কুকুরে ছিঁড়ে খাবে।

বলতে বলতে কেঁদে ফেলে মুরলী; আর মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে বুড়ো মহেশ রাখাল—চল, চল, এখনই চল।

ভুবনপুর ফাঁড়ির চৌকিদার কালদাতে গিয়ে যখন খবর দিয়েছিল, তখন ঠিক বুঝতে পারে নি মহেশ রাখাল, এই খবরের অর্থ কি? যে মেয়ে এই পাঁচ বছরের মধ্যে একবারও বাপের বাড়ি আসবার কথা মনেও করেনি, সে মেয়ে আজ বাপকে ডাকে কেন? বাপের বাড়িতে ফিরে আসতে চাইছে, তাই বা কি করে হয়? এই মুরলীই যে বার বার তিনবার মহেশ বুড়োকে মধুকুপির এই ঘরের দরজা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে, না আমি এখানথে যাব নাই। যতদিন না সরদার ঘরকে ফিরে আসে, ততদিন এখানকে

থাকবো। মেয়ের সেই দেমাকের কথাগুলি আজও মনে পড়ে মহেশ রাখালের।

কিন্তু আজ আর এক মুহূর্তও মধুকুপির আলোছায়ার ছোঁয়া সহ্য করতে পারছে না মুরলী। যার জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষায় ছিল মুরলী, সেই দাশু কিষাণের ছায়াকেও ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার জন্য ছটফট করছে মুরলীর প্রাণ। কেন? জানতে পেরেছে মহেশ রাখাল। দাশু কিষাণ মানুষ নয়; দাশু একটা দাগী। মুরলীর কপালের সুখ মরাতে চায়। মুরলীর পেটের ছেইলাকে বাঁচিয়ে রাখবারও মুরোদ নাই। আর, দাগীর ঘরণীর গতর লুঠ করবার জন্য সয়তানের লোভ রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি এসে ঘরের দরজা ভাঙ্গতে চায়।—চল চল, এখনই চল? আবার চিৎকার করে মহেশ রাখাল।

ভুবনপুর থেকে যে গো-গাড়িতে চড়ে মধুকুপি এসেছে মহেশ রাখাল, সেই গো-গাড়ি সড়কের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বড় কালুর গায়ে বিকালের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। আর দেরি করবার সময় নেই। দেরি করা উচিতও নয়। রামাই দিগোয়ার নামে সেই সয়তানের চর যদি হঠাৎ এসে যায়, তবে মুরলীর এত কষ্টের চালাকিটা আবার বিপদে পড়বে।

সেলাই-এর কল, টিনের তোরঙ্গ, সুতোর নক্সা আর লেসের গাঁটরি, আয়নাটা এবং চিরুণীটাও, এবং গোটানো জড়ানো বিছানাটা; মুরলীর নিজের রোজগারের যত গৌরব আর আশাময় ভাগ্যের যত উপহার এক এক করে তুলে নিয়ে গো-গাড়ির ভিতরে রাখে মহেশ রাখাল। জামকাঠের জীর্ণ কপাট ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায় মুরলী। মুরলীর নীল রং-এর রেশমী শাড়ির চুমকি বিকালের রোদের আলোতে ঝিকমিক করে হাসে।

কিন্তু চমকে ওঠে মুরলী। এ কি! সড়কের উপর এত মানুষের ভিড় কেন? কি ভেবেছে ওরা? যেন মুরলীর মুক্তির পথ আটক করে গেঁয়ো মধুকুপির একটা মতলব শক্ত হয়ে সড়কের উপর দাঁড়িয়েছে। তাই কি? ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকে মুরলী।

সব চেয়ে আগে চেঁচিয়ে ওঠে সনাতন লাইয়া।—দাশু দাদা ঘরে নাই, আর সরদারিন ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে; ইটা কেমন কাণ্ড বটে?

গরুচরানি মেয়েগুলি ফিকফিক করে হাসে। ফুলকি মাসী, পল্টনী দিদি আর তেতরির ঘাসিনের চোখ ধিকধিক করে জ্বলতে থাকে।—ছিয়া ছিয়া ছিয়া। ভিড়ের মুখে মুখে ফিসফিস করে একটা চাপা ধিক্কারের রব।

মহেশ রাখাল হুমকি দেয়—আমার বিটিকে আমি লিয়ে যাচ্ছি; তাথে তুমাদিগের কি? তুমরা এখানকে ভিড় কর কেনে?

মহেশ রাখালের চোখের সামনে এগিয়ে এসে রোগা চেহারাটাকে যেন ক্ষেপিয়ে নিয়ে একটা গর্জন করে জাত-পঞ্চের বড় বুড়া রতন।—ই গাঁ মধুকুপি বটে, মহেশ রাখাল, আলদা লয়। এখানে তুমার বিটি তুমার কেউ লয়; আমার গাঁয়ের বউ বটে। দাশুর ঘরণীকে তুমি লিয়ে যেতে পারবে না।

—লিয়ে যাব। মহেশ রাখাল চিৎকার করে।

—যেতে দিব না। বড় বুড়া রতনের গর্জনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভিড়ের গলাও চেঁচিয়ে ওঠে। সড়কের পাশের বাঁশঝাড়ও কটকট শব্দ করে দুলতে থাকে।

মুরলীর মুক্তির পথে বাধা। সেই বাধা নিরেট হয়ে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। বিকাল ফুরিয়ে আসে। বড় কালুর মাথার

পিছনে সূর্য ডুবে যায়। সন্ধ্যার আবছা আঁধারের সঙ্গে ডাঙ্গার বুকের বাতাসও ঠান্ডা হয়ে ফুরফুর করে। ভিড় নড়ে না।

হঠাৎ সব হল্লার রব শান্ত হয়ে যায়। ভিড়ের মুখগুলি নীরব হয়ে আর চোখগুলি অপলক হয়ে দেখতে থাকে, সড়কের একটার পর একটা নিমের কালো ছায়া পার হয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে আসছে দাশু।

থমকে দাঁড়ায় দাশু। সড়কের গো-গাড়ির দিকে একবার, আর মহেশ রাখালের মুখের দিকে একবার তাকায়। দাশুর চোখে কোন ভ্রূকুটি নেই; শুকনো শ্রান্ত উদাস মুখের উপর কোন আক্ষেপ আর আক্রোশ নেই।

মুরলীর দিকে তাকায়; আর এগিয়ে যেয়ে একেবারে মুরলীর চোখের সামনে দাঁড়ায় দাশু। মুরলীর সরু কোমরে রেশমী শাড়ির ঘের রঙীন পালকের মত কাঁপছে তার দুলছে। দাশুর চোখে-মুখে একটা [illegible] শান্ত হাসির শিহর খেলাচ্ছে [illegible]

—আমি তুকে শুধাতে এলেম [illegible]। মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে [illegible] ফুরফুরে বাতাসের চেয়েও মৃদুস্বরে কথা বলে দাশু।

—কি?

—ই ঘরে থাকবি নাই?

—না।

—কার ঘরে যেতে চাস? পলুসের ঘরে?

—হ্যাঁ।

—পলুসকে কোমর ছুঁতে দিয়েছিলি?

—হ্যাঁ।

—এতদিন কেনে বলিস নাই মুরলী?

—বলবার দরকার হয় নাই।

—ভাল কথা।

—আর কি শুধাতে চাও?

—কিছু না। আমার ছেইলা তুর কাছে আছে, মনে রাখিস। আমাকে ছাড়লি, কিন্তুক উয়াকে ছাড়িস না।

—কেনে ছাড়বো? ছেইলা কি আমার ছেইলা লয়?

—নিশ্চয়। ভইসাল ভাই বড় ঠিক কথাটি বলেছিল।......আচ্ছা।

দৌড়ে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢোকে দাশু। এবং সেই মুহূর্তে ফিরে আসে। দাশুর হাতে জাম কাঠের একটা কালো কুচকুচে লাঠি। লাঠি দুলিয়ে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দাশুও যেন প্রচণ্ড এক মুক্তির উল্লাসে মরিয়া হয়ে হাঁক ছাড়ে।— জাতপঞ্চ শুনে যাও

হুড়মুড় করে দৌড়ে এসে সড়কের ভিড়টা ঘরের দরজার কাছে জড়ো হয়। ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে যেন দাশুর এই বিকট উল্লাসের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে মুরলী। মহেশ রাখালের বুক দুরদুর করে কাঁপতে থাকে।

—মহেশ রাখালের বিটি আমার ঘর করবেক নাই পঞ্চ। উয়াকে চলে যেতে দাও। পঞ্চের কাছে আবেদন করে দাশু।

সনাতন লাইয়া চেঁচিয়ে ওঠে—তবে এখনি সিঁদুর মাটি করুক মহেশ রাখালের বিটি।

বড় বুড়া রতন হাঁক দেয়—তবে এখনি পাতপানি চিরে ফেল দাশু।

গরুচরানি মেয়েগুলি চেঁচায়—উয়ার বালা ভেঙ্গে দাও দাশু দাদা।

লাল গালার বালা আছে যে হাতে, সেই হাতটা দাশুর চোখের সামনে এগিয়ে দিয়ে তেমনি ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকে মুরলী। জাম কাঠের কালো কুচকুচে লাঠির একটি বাড়ি দিয়ে মুরলীর হাতের বালা ভেঙ্গে দু' টুকরো করে দেয় দাশু। হাতটা নামিয়ে চিমটি দিয়ে মাটির ধুলো তুলে নিয়ে সিঁথির সিঁদুরের উপর ঘষে দেয় মুরলী। আর, বড় বুড়া রতন একটা পাকুড় পাতার উপর এক ঘটি জল ঢেলে দিয়ে পাতাটাকে দাশুর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়।

জটা রাখাল এগিয়ে এসে বড় বুড়া রতনের কানের কাছে চেঁচিয়ে ওঠে।—নাম বলতে হবেক, নাম বলুক দাশু। তা না হলে পাতপানি চিরা হয় না।

রতন—কার নাম?

জটা রাখাল—যার সাথে লষ্ট হইছে সরদারিন।

—খিরিস্তান পলুস হালদার। চিৎকার করেই ভেজা পাকুড় পাতা ছিঁড়ে দু টুকরো করে দেয় দাশু।

মহেশ রাখালের পিছু পিছু হেঁটে, এগিয়ে যেয়ে গো-গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসে পড়ে মুরলী।

ভিড় ভাঙ্গে, ভিড়ের হল্লাও মিলিয়ে যায়; তার আগে মিলিয়ে যায় গো-গাড়ির চাকার শব্দ। সন্ধ্যার অন্ধকারে মধুকুপির ডাঙ্গা কাঁপিয়ে ঝিঁঝি'র ডাকের যে শব্দ উথলে ওঠে, জাম কাঠের দরজার কাছে বসে সেই শব্দ শুনতে শুনতে যেন নিঝুম হয়ে যায় দাশু ঘরামির শূন্য মন, ক্লান্ত প্রাণ, আর পাথুরে ছাঁদে গড়া অলস শরীরটাও।

এই শূন্যতা ক্লান্তি আর আলসাও যে অদ্ভুত এক নেশার জ্বালার মত জ্বলছে। কত সহজে, মধুকুপির সব মায়া, আর সব আক্রোশ তুচ্ছ করে চলে গেল মহেশ রাখালের বিটি।

অনেক তারা ফুটেছে আকাশে। ঘরের ভিতরে ঢুকে রেড়ির তেলের মেটে বাতিটা জ্বালতেই দেখতে পায় দাশু, ঘরের এক কোণে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে টাঙ্গিটা। না; এই টাঙ্গিরও সাধ্য হলো না; মুরলীর পথ আটক করবার মত কোন জোর এই মাটিমাখা মধুকুপির প্রাণের মধ্যেই নেই। খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর গড়িয়ে পড়ে, আর দু হাত দিয়ে দুই চোখ [illegible] ধরে ছটফট করতে থাকে দাশু।

হঠাৎ গুমরে [illegible] মধুকুপির রাতের [illegible]। বড় [illegible] সব [illegible] একটা [illegible] প্রতিধ্বনি সহ্য করতে গিয়ে গুম্ গুম্ করে বাজতে থাকে। হাঁক ছেড়েছে বাঘিন কানারানী।

বেশি দূরে নয়, জঙ্গলের ভিতরেও নয়। বাঘিন কানারানীর গর্জন যেন হিংস্র আক্রোশের উল্লাস হয়ে ভুবনপুরে যাবার সেই সড়কের উপর ছুটোছুটি করছে, যে সড়কের কাঁকর মাড়িয়ে আজই কয়লাখাদের মালকাটা জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে মধুকুপিতে ফিরে এসেছে দাশু। মহেশ রাখালের বিটি এখন যে গো-গাড়িতে চড়ে, নীল রং-এর রেশমী শাড়িতে সাজানো গতর নিয়ে ঐ সড়ক ধরেই আন-মরদের পিয়াস আর পিয়ার নেবার জন্য এক ভয়ানক আশার অভিসারে এগিয়ে চলেছে।

কানারানীর হাঁক, যেন প্রচণ্ড ক্ষিপ্ততা আর হিংস্রতার উল্লাস। কানারানীর হাঁকে এমন ভয়ানক রাগের ধমক কোন দিনও শুনতে পায়নি দাশু।

মহেশ রাখালের বিটির অভিসারের পথ আটক করেছে কি কানারানী? আতঙ্কিত গো-গাড়িটা কি মরণভয়ে ভীরু হয়ে এক ছুট দিয়ে আবার এই পথে ফিরে এসে এই ঘরের সামনে ঐ সড়কের উপর দাঁড়াবে? গো-গাড়ির ভিতর থেকে একটা লাফ দিয়ে বের হয়ে এসে জাম কাঠের এই জীর্ণ কপাটের উপর মাথা ঠুকে আছড়ে পড়ে করুণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠবে কি মুরলী?— কানারানী আমাকে যেতে দিলেক নাই।

(ক্রমশ)

পূর্ববঙ্গের প্রাচীন লোকসংগীত ও পল্লীকবি পাগলা কানাই

অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েন রচিত উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য সবিনয়ে জানাচ্ছি।

প্রথমত তথ্যের দিক থেকে প্রবন্ধটি বেশ কিছু পরিমাণে অসম্পূর্ণ মনে হয় যখন প্রবন্ধটি বিশেষভাবে পাগলা কানাই প্রসঙ্গে। পাগলা কানাই-এর পিতা কুড়ন শেখ এবং শিক্ষাগুরু যশোরে কেশবপুরের নিকটবর্তী রসুলপুরের নয়ান ফকির সম্বন্ধে কোন আলোচনা দূরের কথা তাঁদের নামের উল্লেখটুকুও নেই। অথচ স্বভাবিক নিয়মেই এই দুই ব্যক্তির প্রভাবে তাঁর আধ্যাত্মিক ও কবিত্ব শক্তি পরিণতি লাভের পথে যথেষ্ট সহায়ক ছিল।—তা বলাই বাহুল্য।

জারী গানের প্রধান প্রবর্তক হিসেবেও পাগলা কানাই বিশেষ গৌরব ও কৃতিত্বের অধিকারী। এই কানাই এর সঙ্গে আর এক জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য —তিনি ইদু বিশ্বাস। এই দুজনকেই যশোর-খুলনার ইতিহাস প্রণেতা প্রতিথযশা অধ্যাপক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মিত্র মশায় যশোরে জারী-গানের শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অথচ এ সমস্ত বিষয়ে কোনো রকম উল্লেখ এই প্রবন্ধে নেই। প্রবন্ধ লেখক এ বিষয়ে খবর রাখেন না তাই জানেন না—বিশ্বাস করা যায় না। খুব সম্ভব পূর্বসূরীদের প্রতি কৃতজ্ঞতার দায়িত্ব কৌশলে এড়িয়ে গেছেন।

প্রসঙ্গত জানাচ্ছি আমি যশোর-খুলনার কয়েকটি অঞ্চল থেকে বেশ কিছু পরিমাণে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছি। কিন্তু আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত পাগলা কানাই ও ইদু বিশ্বাসের রচিত গান আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট সংগ্রহ করতে পারিনি। এবং দেখেছি প্রায় একই গান বিভিন্ন সংগ্রাহক কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ২য় খণ্ডে একটি, আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম সম্পাদিত কাব্য মালঞ্চে একটি পাগলা কানাই-এর গান সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (সন ১৩১২ সাল) পাগলা কানাই সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। এ সমস্ত তথ্য আমি গান সংগ্রহ করবার আগেই সংগ্রহ করি। অথচ অধ্যাপক সাকলায়েন এ সম্বন্ধে একেবারেই নীরব।

সবশেষে আর দু'চার কথা বলে আমার বক্তব্য মোটামুটি শেষ করছি। আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না এবং আশা করি সাহেব ভুল বুঝবেন না। বর্তমানে পূর্ববঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকদের মধ্যেই বিশেষ করে—এমন একটা মনোবৃত্তি দেখা যাচ্ছে যা অন্তত অধ্যাপকোচিত নয় বলেই মনে করি। বাংলা সাহিত্যের লোক-সাহিত্য বিষয়ক সংগ্রহ যা পূর্বসূরীগণ কর্তৃক অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে সংগৃহীত হয়েছে এবং যাঁরা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের নাম নিশ্চয়ই প্রাতঃস্মরণীয়। এই সংগ্রহ পরবর্তীতে মুসলমান ও মুসলমান সম্পাদিত রচনা পাকিস্তানের সম্পত্তি এই ধারণা নিয়েই পূর্ববঙ্গের অধ্যাপকরা এই সমস্ত রচনা পূর্ববঙ্গের লোককবি, পাকিস্তানের লোক-সঙ্গীত এই নাম এবং অন্তহাত দিয়ে নির্বিবাদে দীনেশচন্দ্র সেনের বই থেকে ভাগ করে নিচ্ছেন। পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত এই ধরনের বইগুলি দেখলে যে কেউ আমার কথার প্রমাণ পাবেন। আজ পর্যন্ত নতুন কোনো উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ প্রকাশিত হয়নি। প্রায় সমস্ত আলোচনা এবং প্রকাশিত পুস্তক পুনরালোচিত ও পুনঃপ্রকাশিত। এবং এই ধরনের আলোচনায় এবং প্রকাশনায় ডাঃ শহীদুল্লা সাহেবের মতো অধ্যাপকও বাদ যান না। খুব দুঃখের বিষয় এই আলোচনায় এবং প্রকাশনায় লেখক প্রকাশকগণ পূর্বসূরীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দূরের কথা নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। যেখানে অনুপায় বশত করেছেন সেখানে এমন অবজ্ঞার সাথে করেছেন তার চেয়ে বুঝি না করাই ভাল ছিল। তাঁরা এই আলোচনা এমনভাবে করেন যেন তাঁরাই এ বিষয় প্রথম আবিষ্কারক, প্রকাশক, পথিকৃৎ। কিন্তু আলোচিত বিষয়ের মধ্যে এমন কোন দিক নেই যা পূর্বসূরী কর্তৃক বিশেষভাবে দীনেশবাবু কর্তৃক আলোচিত হয় নি। অথচ তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের [illegible] কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করে গেছেন এবং [illegible] যথোচিত সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছেন।
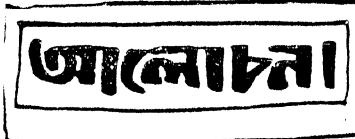
অধ্যাপক গোলাম সাকলায়েনের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন তিনি যেন আরও ব্যাপকভাবে সংগ্রহ ও গবেষণা করে পাগলা কানাই ও ইদু বিশ্বাসকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেন। কারণ তাঁদের রচিত গানের নির্বাচিত ইংরাজী অনুবাদে যে পাশ্চাত্য মহলে গভীর আগ্রহের সঞ্চার করবে এমন কথা অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র মশায় বলে গেছেন। তাঁর নিজের ইচ্ছা অপূর্ণই রয়ে গেছে। কিন্তু যথেষ্ট তথ্য তিনি দিয়েছেন তাঁর ইতিহাসে, যা নজর দিলে অধ্যাপক সাহেব উপকৃত হবেন। তা ছাড়া পূর্ববঙ্গ থেকে তাঁদের পক্ষে যা করা (সংগ্রহ) সম্ভব পশ্চিমবঙ্গের বা ভারতের কোন লোকের পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। তাঁদের এখন অবাধ সুযোগ। অতএব নতুন কিছু করুন এই অনুরোধ।

অমলেন্দু ঘোষ। কলকাতা ৬

হিন্দী-ইংরেজী ও মাতৃভাষা

সবিনয় নিবেদন,

ভাষা কমিশনের সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে 'দেশ' পত্রিকায় (২৪ বর্ষ, সংখ্যা ৪৯) শ্রীযুক্ত আবু সয়ীদ আইয়ুব দত্ত 'হিন্দী-ইংরেজী ও মাতৃভাষা' শীর্ষক যে আলোচনা করেছেন, তা অত্যন্ত সময়োচিত এবং যুক্তি-সঙ্গত। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর লিখিত মতে Hindu Imperialism বলেছেন, শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই সে প্রসঙ্গে পূর্বেই সজাগ হওয়া উচিত ছিল। সম্প্রতি মাদ্রাজে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালআচারিয়া ঠিক এই কথাই বলেছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের দুটি বিশেষ বক্তব্য আছে।

কমিশনের রিপোর্টে বাংলা ইত্যাদি ভাষাকে Regional Language বলা হয়েছে। কিন্তু একই অর্থে হিন্দীও কি Regional Language নয়? হিন্দীকে কি করে এঁরা National Language বললেন সেটা ভাববার বিষয়। বিহারের গ্রামাঞ্চলের হিন্দী, লক্ষ্ণৌর উর্দু এবং দিল্লীর গুরুমুখী ছোঁয়া হিন্দী—এগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই আকাশপাতাল তফাত রয়েছে ঠিক যতটা তফাত রয়েছে (একই বর্ণলিপির বৈষম্যের জন্য) বাংলা ও ওড়িয়ার মধ্যে, কিংবা কথনভঙ্গীর দূরত্ব না থাকলেও বর্ণলিপির বৈষম্যের জন্যে, বাংলা ও উড়িয়ার মধ্যে। দেবনাগরী হরফের সমস্ত ভাষাকেই হিন্দী বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুধু অযৌক্তিক নয়, গণতন্ত্রবিরোধীও বটে। মৈথিলীর সঙ্গে বাংলা ভাষার যে সম্পর্ক, হিন্দী ভাষার সঙ্গে তার চেয়া বেশী কিছু নয়। অধিকন্তু কথা হিন্দীর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন ভারত-সরকার অথবা অল ইন্ডিয়া-রেডিও কর্তৃক প্রচারিত হিন্দীর সঙ্গে এ ভাষার কত তফাৎ। যে হিন্দী বললে সবাই বুঝতে পারে বলে দাবী করা হয়, সেটা আসলে কোন ভাষাই নয়, কয়েকটা শব্দ ও ক্রিয়াপদের বিকৃতি। শুধু হিন্দী লিখন ও পঠন যে কোন ভারতীয় ভাষার চাইতে [illegible], একথা [illegible] মাত্রেই [illegible]।

দ্বিতীয়ত, ইংরেজী ভাষাকে [illegible] এই [illegible] হিন্দীকে [illegible] দেওয়ার জন্যেই নয়। [illegible] কি একটি ভারতীয় ভাষা নয়? [illegible], পার্শী এবং আরো বহু ভারতীয় [illegible] যাঁদের মাতৃভাষা ইংরেজী। [illegible] দুশো বছরের ইতিহাসকে [illegible] অস্বীকার করি কি করে? আমাদের দুই শতাব্দীর ঐতিহ্য শিক্ষিত ভারতবাসীর চেতনায় ইংরেজী ভাষার মর্যাদা ও স্থান আমরা সবাই জানি। আজ যদি আমরা আবিষ্কার করি যে অস্ট্রেলিয়ার একটি আদিবাসী জাতি বাংলা ভাষায় কথা বলে, তবে কি বাংলাকে আমরা বিদেশী ভাষা বলবো? ইংরাজ নামক একটি জাতির অধীনে ভারতবর্ষ ছিল এবং সেই দেশের ভাষা ইংরেজী এই জন্যেই ইংরেজী বিদেশী ভাষা? তাহলে তো বাংলাও একটি বিদেশী ভাষা, কারণ বাংলা দেশ মুসলমানদের অধীন ছিল, এবং বাংলা একটি মুসলমান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা এবং মাতৃ-ভাষা। প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষা ছাড়া আর যে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই মজ্জায় এবং রক্তে গ্রহণ করেছেন সেটা ইংরেজী ভাষা। ইংরেজী ভাষাকে অস্বীকার করে হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করার মধ্যে কোন ভারতীয়ত্ব বা সাজাত্য-বোধ নেই।

হিন্দীরক্ষা আন্দোলনের অন্ধতা ও গোঁড়ামী সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ুক এটা নিশ্চয় কারের কাম্য নয়? ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে ভারতের জাতীয় ভাষা চৌদ্দটি—একটি নয়। এই সমস্ত কারণে, কতকগুলি যুক্তিহীন এবং কাল্পনিক সুবিধার জন্য হিন্দীকে ইংরেজী ভাষার স্থলাভিষিক্ত এবং হিন্দী অপেক্ষা অনেকাংশে সমৃদ্ধ অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষাকে অবদমন করার এই চেষ্টা থেকে যে কোন গণতান্ত্রিক সরকারের বিরত হওয়া উচিত। বিনীত—ভাষা আন্দোলন সমিতির পক্ষে, তারাপদ রায়, কলিকাতা-১৯।

ঘন-ব্যুমেটের সাদা জানলায় আটকানো। দুটো মাছির মত ছটফট করে খুকীর চোখদুটো। রাস্তা দিয়ে মানুষ হাঁটে, রিক্‌শা, ঠেলাগাড়ি যায়, ইলেকট্রিক ইন্সপেক্টরের মোটর সাইকেলও আসে। দু-একবার আসে, তারপর এপার থেকে খুকী তাকিয়ে থাকে, মানুষজন, গাড়ি জানলার সামনে দিয়ে চলে যায়। কোথায় যায়? অনেক দূরে। কতদূরে? কেন যায়? ওদের কাজ আছে। খুকীর কোন কাজ নেই। খুকী উসখুস করে। ঘড়ির দিকে তাকায়। পাঁচ মিনিট। আর ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই বাবা অফিস বেরিয়ে যাবে। তারপরই একছুটে চলে যাবে ও হালদার বাড়ি।

নাকের উপর ধুলোর তেলক কেটে দিয়েছে জানলা। জোরে চাপড় দেয় খুকী। ধুলো ওড়ে। এত ধুলো আসে কোথা থেকে। এইটুকু তো ঘর। লাফিয়ে হাত বাড়ালে কড়িকাঠটাকে বোধহয় ছোঁয়া যায়। জংসন স্টেশনের মত কড়িকাঠের কাটা-কুটি। উই পোকায় ঝাঁঝরা করে দিয়েছে বরগা। দরজার চৌকাঠটাও ক্ষয়ে ক্ষয়ে মিশিয়ে এসেছে মেজের সঙ্গে। ঘরে রোদ্দুর আসে না। লেপ তোশকে ভ্যাপসা গন্ধ। একতলা বাড়ি। ছাদের সিঁড়ি নেই, বিছানা রোদে দেওয়া যায় না। খুকী তাই হাঁফিয়ে ওঠে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সিমেন্ট-চটা উঠোন। পাশে শ্যাওলা। এখন আর পা হড়কায় না। একপাশে রান্নাঘর আর বাড়িওয়ালী বুড়ী থাকে। দরজার ঝাঁটা দে ঘর মেজে যায় হয়না। আর বিনা দরকারে বাইরে ঘর ঢুকতে দিতেও সে রাজী নয়। তাই গুটি গুটি সদর দরজায় এসে দাঁড়াতে হয় খুকীকে। হয়ত তখন বার নম্বরের বাড়ির জোছনা জানলায় দাঁড়িয়ে। বাবা বাড়ি নেই, মা রান্নাঘরে। একছুটে খুকী জোছনার ঘরে চলে আসে। জোছনা যে রোজই জানলায় থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু জোছনা ছাড়াও তো আরো অনেকেই আছে যারা খুকীর সঙ্গে কথা বলে খুশী হয়। পনেরো বছরের খুকীর সঙ্গে।

খুকী ঘড়ি দেখে। পাঁচটা মিনিট না তো যেন এক জেই লাউ ডাঁটার চচ্চড়ি চিবুনো। শেষ আর হয় না। কেন পাঁচটা মিনিট হালদার বাড়ির বৌয়েদের চা খাওয়ার মত শেষ হয় না। ছোট ছোট চুমুক, পাঁচ মিনিট পর পর। খুকী ঘড়ি দেখে আবার, আর হঠাৎ মনে পড়ে এতক্ষণে, যেন এই প্রথম মনে পড়ল, হালদার বাড়িতে একটাও কড়িকাঠ নেই। ঢালাই কংক্রিটের ছাদ। এ পাড়ায় ওই একটি বাড়িতেই ওপর দিকে তাকালে ধবধবে দেয়াল দেখা যায়। কি নিশ্চিন্ত ওরা। নতুন কলির গন্ধ এখনো ফুরোয় নি। আর তো হাওয়া! আর দরজার পালিশ! হাত দিলে পিছলে পড়ে হাত। অথচ ওরা যখন হাত রাখে দরজায়, একটু কাঁপে না পর্যন্ত [illegible]। অভ্যেস হয়ে গেছে। খুকী ভাবে, এখনো তার হাত কাঁপে কেন! কতদিন তো হল সে ও-বাড়ি যাচ্ছে। কি ভয়টাই না করত প্রথমে। কেউ ভাবেনি, নিজে থেকে আলাপ করা খুব সোজা কথা নয়। তবু, অনেকটা সোজা হত যদি তার সমবয়সী কোন মেয়ে থাকত, কিন্তু হালদার বাড়িতে মেয়ে কেউ নেই, ছোট বৌ কম করেও তার থেকে দশ বছরের বড়। হালদার গিন্নী চালচলনে রাশভারী, আর বড় বৌ যেন মোমে গড়া পুতুল। অথচ কি খুশীই না হয়েছিল ওরা তাকে দেখে। পনেরো বছরের খুকীকে দেখে। সেই প্রথম দিনেই মুগ্ধ হয়েছিল খুকী। খুকীর সঙ্গেই ওদের প্রথম আলাপ, তারপর একে একে পাড়ার সকলের সঙ্গেই আলাপ হল। খুকীই তাদের এনে-ছিল। ওরা আসে, কথা বলে, চা খায়, হাসে তারপর চলে যায়। আর আসে না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। বড্ড বড়লোক এই হালদাররা। অন্তত তেমনি ধরন। খুকীর কিন্তু ভালই লাগে। ইচ্ছে করে এ-বাড়ির মেয়ে হয়ে থেকে যায়। গল্প করে সে এটা ওটার। সাত নম্বরের না পিসির গল্প বলে। হালদার বাড়ির সুন্দর ফুর-ফুরে বৌ দুজন, আকাশ-ভাঙা অবাক চোখে শোনে, আর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলে, ওমা, তাই নাকি!

ওদের বিস্ময়ে খুকী খুশী হয়। খুব খুশী। সে ত চাইছিল ওরাও তাকাক তার দিকে, শুনুক তার কথা। না পিসিকে ওরা জানে স্বামী পরিত্যক্তা দুঃখিনী। তাই রসিয়ে রসিয়ে খুকী গল্প করে। অল্প-বয়সী কোন সম্পর্কের কার সঙ্গে যেন না পিসি বেরিয়ে গিয়েছিল, তারপর কেমন

করে জানি বাপের বাড়িতে ঠাঁই পেয়েছে। বড় বৌ, ছোট বৌ, দুজনেই খুকীর গা ঘেঁষে আসে। মৃদু তাপ পাওয়া মোমের মত নরম নরম হাত বড় বৌয়ের, খুকীর হাত ছুঁয়ে যায়। ছোট বৌয়ের ডাগর চোখ, খুকীর চোখে পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকে। সময় কাটে গল্পে, গল্পে। তারপর খুকী বাড়ি ফেরে। মা ঝাঁঝিয়ে ওঠে:

—ছিলি কোন চুলোয় এতক্ষণ?

—হালদার বাড়িতে।

স্নান করা বেড়ালের মত চুপসে যায় মা।

—কি রোজ রোজ যাস ওদের বাড়ি। গেলেই তো এটা ওটা খেতে দেবে। ওতে কখনো মান থাকে!

খুকী চুপ করে থাকে, শুধু আর একটা কথা শোনার জন্য। প্রতিদিনের শোনা কথাটা।

—হ্যাঁরে, আজ কি খেতে দিল রে?

তারপরই কথায় কথায় ঢেউ ছড়ায় খুকী, মার প্রশ্নের ঘাটলায়।

প্রায় লাফিয়ে উঠল খুকী। পাঁচটা মিনিট কেটে গেছে অনেকক্ষণ। মা একবার চিৎকার করে ওঠে। 'তাড়াতাড়ি ফিরিস। কাপড় সেদ্ধ করতে দিচ্ছি। এসে কেচে দিবি।'

কথাটা শুনতে পেল কি পেল না, খুকী ততক্ষণে হালদার বাড়ির বড় বৌয়ের ঘরের পর্দা সরিয়ে ইতস্তত করতে শুরু করে দিয়েছে। নতুন বালা গড়িয়ে এসেছে। আয়নার সামনে বালা-পরা হাতটাই নয় শরীরটাকেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে বড় বৌ। খুকী মুগ্ধ চোখে আয়নাটারই তারিফ করে। কি বড় আয়নাটা! আরশুলা রঙের ড্রেসিং টেবল, গা-ডোবানো সোফা, বসলেই আরাম জড়িয়ে ধরে গলা পর্যন্ত। ঝকঝকে রেডিও সেট, রঙীন শেডের ল্যাম্প, ডাবল সীটের স্প্রীং খাট। প্রত্যেক দিন খুকী এ সব দেখে, আজকেও দেখল বড় বৌকে দেখার সাথে সাথে। তারপর পায়ে পায়ে ঘরের মাঝে এসে দাঁড়াল।

ফুরফুরে হাওয়া আসছে। পাখাটা বন্ধ। তবু হাওয়া আসে। তিন তলার ঘর। সারা দেওয়ালটাই তো জানলা দিয়ে তৈরী। আলো, আলো, আর হাওয়া। ঘুম পেয়ে যায় খুকীর। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শুধু ঘুমিয়ে থাকতে পারে সে, এমন একটা ঘর পেলে। একটুখানির জন্য চোখটা বুজেও আসে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ণ করে নেয় দৃষ্টিটা। বড় বৌয়ের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠেছে। খুকীর মন দুরু-দুরু। না বলে ঘরে ঢুকেছে, তাই কি? এ বাড়ির রীতি, জিজ্ঞাসা করে ঘরে ঢোকা। কিন্তু সে তো শুধু ঝি-চাকরদের জন্য নিয়মটা। না ঝি-চাকরদের সঙ্গে তার তফাত নিশ্চয় আছে। কথাটা ভেবে মনে মনেই লজ্জা পেল খুকী। কি আক্কেলে সে নিজেকে ঝি-চাকরদের সঙ্গে তুলনা করার কথা ভাবতে পারল।

খুকী আবার তাকায়। বিরক্তি চিহ্নটা নেই। তবু যথেষ্ট ভরসা পায় না।

'মার যেমন পছন্দ। উনি আসুন, তখন এটাকে ভেঙে আবার গড়াব।' বড় বৌ বলে হঠাৎ।

বড় বৌয়ের স্বামী বিলেত গেছে সম্প্রতি। কারখানাটা বড় করার জন্য সাহেবদের সঙ্গে পরামর্শ করা খুবই দরকার। মুখের বিরক্তিটা হাতে টেনে, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বড় বৌ খুলে ফেলল বালাটা। খুকী চুপ করে রইল।

—আজকাল কি আর এ ফ্যাশান চলে।

নড়েচড়ে বসল খুকী। এবার বড়বৌ কথা চাইছে তার কাছ থেকে।

—তারকদার বৌয়ের কিন্তু ঠিক ওমনি একটা বালা আছে।

নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল খুকী। তারকদার বৌয়ের গল্প এ-বাড়ির সবাই জানে। বি এ পাশ করে বিয়ে হয়েছে। কি একটা অফিসে চাকরি করে। মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতে রাত হয়। এই নিয়ে তারকদার সঙ্গে বৌয়ের তুমুল ঝগড়া হয় মাঝে মাঝে। [illegible] শির ফুলিয়ে নয়, দাঁতে দাঁত চেপে কথা কাটাকাটি হয়। [illegible] লোক শিক্ষিত [illegible] সুতরাং। নিজেদের কথা আর পাঁচজনকে শুনতে দিতে চায় না।

—তুমি শুনেছ ওদের ঝগড়া?

স্প্রীংয়ের ধাক্কায় দুলতে দুলতে বড় বৌ খাটের কিনারে এগিয়ে এল। খুকী কখনো শোনেনি, তবু ইচ্ছে হল বলে হ্যাঁ শুনেছি। তাহলে হয়ত বড় বৌ ওকে টেনে নিয়ে খাটের ওপর বসিয়ে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে শুনতে চাইবে গল্পটা। স্প্রীংয়ের খাটে কোনদিন শোয়নি খুকী। লোভী চোখে তাকায় সে বড় বৌয়ের প্রায়-অর্ধেক-ডোবা শরীরটার দিকে।

—কি? শুনেছ, কি বলে ওরা ঝগড়ার সময়?

মুখ টিপে হেসে খুকী একবার খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'সে বড় অসভ্য কথা।'

হাত বাড়িয়ে খুকীকে খাটের ওপর টেনে আনল বড় বৌ। যা ভেবেছিল তাই। খুকী বিছানায় সাবধানে হাত বসিয়ে, হাসল। কি রকম গা এলিয়ে শুয়ে রয়েছে বড় বৌ। এমন বিছানায় শোয়া যে ওর অনেক দিনের অভ্যাস। খুকী তার নিজের বসবার ভঙ্গিটাও অনেকখানি শ্লথ করে দিল।

এতক্ষণে বড় বৌয়ের মনে হল, গরম চায়ের সঙ্গে খুকীর গল্পটা ভাল জমবে।

—খুকী, ভাই একটা কাজ করবে! নীচে গিয়ে ঠাকুরকে বলবে দু কাপ চা পাঠিয়ে দিতে।

খুকী উঠে দাঁড়াল।

—কিছু মনে করলে না তো। ঝিটা যে থেকে থেকে কোথায় ডুব মারে। আর ওই বিস্কুটের টিনটাও নামিয়ে দিয়ে যাও।

ঝড়ের মত নীচে নেমে আসে খুকী। এ বাড়ির বাজার আসে দশটায়। স্কুল বা অফিসের ভাত খাওয়ার কোন লোক নেই। ব্যবসাদারের বাড়ি। তবু দশটা বেজে গেছে, তাই দম ফেলার ফুরসত নেই এখন ঠাকুরের।

—ঠাকুর শিগগিরী দু' কাপ চা করে দাও।

—চা-ফা এখন হবে না। এতক্ষণ উনুনে কামাই যাচ্ছিল, তখন আসনি কেন।

ভাঁড়ারঘর আর রান্নাঘরের মধ্যে কয়েক-বার ছোটাছুটি করে ঠাকুর। তবু দাঁড়িয়ে থাকে খুকী। চা নিয়ে যেতেই হবে। তিন তলার ঘরে, ফুরফুরে হাওয়া। সাদা দেওয়ালে মাজা মাজা সূর্যের আলো। নরম সোফা, আর বড় বৌ, এদের সান্নিধ্যের মধ্যে বসে চা খাওয়া! তার জন্য কিছুক্ষণ কেন, সারা বেলাটাই তো সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

[illegible] উনুনে। [illegible] পা [illegible] বসে ঠাকুর তাকাল খুকীর দিকে। সরু সরু পা। [illegible] নীচে [illegible] [illegible] বুকের [illegible] দাঁড়িয়ে থাকে খুকী। [illegible] করে।

পানের [illegible] কাল ঠোঁট দুটোকে [illegible] খুকীর দিকেই যেন এগিয়ে [illegible] ঠাকুরের। চৌকাঠের ধারে সরে আসে খুকী। ঠাকুর এ বাড়িতে অনেক দিনের লোক।

—চলে যাচ্ছ নাকি!

ডালের কড়া নামিয়ে, কেটলি বসাল ঠাকুর। 'তুমি নিজেই কাপ নিয়ে যাও।'

ঘরের মধ্যে গুটি গুটি আবার এসে দাঁড়াল খুকী। ঠাকুর পা চুলকোতে শুরু করল। খুকী [illegible] হয়ে তাকিয়ে থাকে কেটলির দিকে। গনগনে আঁচ, দু কাপ জল সঙ্গে সঙ্গেই ফুটে উঠল। চা ছেঁকে দুধ, চিনি দেবার সময় হাঁ হাঁ করে উঠল ঠাকুর।

—করছ কি, অতখানি চিনি দেয়! মা যদি জানতে পারে, তাহলে কুরুক্ষেত্তর বাধাবে।

[illegible] নিজের কাপে চিনি দেয় না খুকী। পেয়ালা হাতে উঠে দাঁড়ায় সে। কানা ছাপিয়ে পড়ছে চা। সাবধানে পায়ে-পায়ে এগোতে শুরু করে। প্রায় ধমকে তাকে থামায় ঠাকুর। 'চিনি না দিয়ে চা খাবে কি!'

দু' চামচ চিনি কাপে ঢেলে, চামচ নাড়তে থাকে ঠাকুর। বাঁ হাতটা খুকীর কাঁধে এসে পড়ে যেন আচমকা। সরে যেতে গেল খুকী, আঙুলগুলো কাঁকড়ার মত খুবলে ধরল ঘাড়টা। ভয়ে কেঁপে ওঠে খুকীর হাত। খানিকটা চা ছলকে পড়ল পায়ে। কেউ যদি

এসে পড়ে, কেউ যদি দেখে ফেলে। তার চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলে কেমন হয়। কিংবা একটা চড় যদি ওর গালে মারা যায়, কিন্তু তাই বা কেমন করে হয়। হাতে যে কাপ রয়েছে। সুন্দর সোনালী নক্‌শা করা, পাতলা ফিনফিনে কাপ। কাপটা ভেঙে গেলে, এখন চা খাবে কি করে বড় বৌ। স্প্রীংয়ের খাটে আধ-ডোবা শরীর নিয়ে বসে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে খুকী সোনালী নক্‌শা করা কাপের মধ্যে কেমন হয়ে যেন। আর এত কথা যখন ভাবছিল সে, তৎক্ষণে হঠাৎ চাপ চাপ, বিড়ি আর দোক্তার গন্ধ তার নাকে গেল ধক্‌ করে।

রান্নাঘর থেকে প্রায় ছিটকেই খুকী চলে এল। গরম চা আঙুলে পড়ল। আঁকড়ে ধরল সে কাপ দুটোকে আরো জোরে। ফ্যালফ্যাল করে সে তাকাল ঠাকুরের দিকে। বুকে, পিঠে গামছা চেপে চেপে ঘাম শুষতে তখন ঠাকুর ব্যস্ত।

উঠোনে দাঁড়িয়ে থরথরিয়ে একবার কেঁপে উঠল খুকী। চারতলা হালদার বাড়িটা চায়ের কাপে দুলে উঠে, ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল। সিঁড়িতে ওঠার আগে কাপ দুটো সে নামিয়ে রাখল। আঙুলে ফোস্কা পড়ে গেছে। ফুঁ দিল আঙুলে। কেমন একটা পুরোনো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। ঠিক নিজেরই গা গুলিয়ে উঠল খুকীর। যদি কেউ দেখে ফেলত তাহলে কি হতো। ভয়ে শিরশির করে ওঠে হাত দুটো। নিশ্চয় তাকেই সকলে খারাপ ভাবত, আর এ-বাড়িতে আসাও বন্ধ হয়ে যেত।

থুথু ফেলে কাপ দুটো তুলে নিল খুকী। হালদার বাড়ির সিঁড়ির রেলিং গুলো নির্ভুল ছায়া ফেলে কাপের মধ্যে এখন পাশাপাশি সাজান রয়েছে।

ঘরে ঢুকতেই কপট ঝঙ্কার দিয়ে উঠল বড় বৌ।

—ওমা, তুমি আবার নিজে হাতে করে আনলে কেন, ঠাকুরকে বললেই তো হতো।

—আপনাদের ঠাকুরের যা মেজাজ। কত খোসামোদ করে তবে চা তৈরী করে আনলুম।

হেসে তাকাল খুকী বিস্কুটের টিনটার দিকে।

হালদার বাড়ি থেকে বার হতেই বার নম্বরের জেঠিমা ডাকল খুকীকে বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল, তবু হেসে জানলার ধারে এগিয়ে এল খুকী।

সত্যি বলছি, আর একদম সময় পাইনা। নইলে বলুন আপনার কাছে তো রোজই আসতুম।

আহা-হা, কি এমন কাজের লোক হয়েছিস শুনি। হালদার বাড়ি রোজ যাবার সময় তো ঠিকই পাস।

জেঠিমার সুরে অভিযোগ নয় অভিমান-টাই তীব্র। খুকী জানলার রডে হাত বুলোয়। জেঠিমার বদলে সে লোহাটাকেই সান্ত্বনা দিতে থাকে। কোন কথা বলে না সে। যেন জেঠিমার কথাটাই সে মেনে নিয়েছে এমন ভঙ্গিতে ঘাড় নীচু করে থাকে।

কেমন লোকরে ওরা? শুনেছি খুব কাঁচা পয়সা আছে।

দুখানা বাড়িওতো আছে। দুটোই ভাড়া। এরাও আগে ভাড়াবাড়িতে থাকত। বাপ মারা যেতেই না—বাপটা খুব কেপ্পন ছিল, গিন্নীটাও সেই রকমের।

হ্যাঁরে ছোট বৌয়ের বাপের বাড়ি আহিরীটোলায় না? সেদিন ভাগ্নীর বড় ননদ এসেছিল। সে-ই বলল, হালদার বাড়ির ছোট বৌ ওদের শ্বশুর বাড়ির পাড়ার মেয়ে। বাপটার বুঝি মনোহারী দোকান আছে। এঁদোপড়া ভাড়াবাড়িতে চিরটাকাল কাটিয়েছে। দেখতে সুন্দর, কটা গায়ের রঙ বলেই না উতরে গেল।

খুকীর কথা যেমন করে থামিয়েছিল জেঠিমা, তেমনি করেই খুকী বলে উঠল, আচ্ছা জেঠিমা এখন চলি, মা রাগ করবে।'

আহা, এই তো মোটে সাড়ে এগারটা ভেতরে আয়না। ভুলু কি কেলেংকারী করছে শুনেছিস তো।

মনে মনে ক্লান্ত হয়েছিল খুকী। এক কাপ চা, খান দুই বিস্কুট, খিদেটাকে যেন আরো চাগিয়ে দিয়েছে। ইচ্ছে হলো ভেতরে গিয়ে বসে। তারিয়ে তারিয়ে শোনে ভুলুর কথা। কথা আর কি। সবই জানা। শুধু নতুন কিছু হয়তো ঘটেছে এবার। অনেক দিনই তো সে পাড়ার কোন বাড়িতে আর যায় না। যেতে ভালোও লাগে না। জেঠিমার পাশ দিয়ে সে ঘরের মধ্যটা দেখতে পায়। ছোট্ট ঘর, সারা ঘর জুড়ে প্রায় সেকেলে ভারী পালংক। খাটে স্তূপীকৃত বালিশ আর তোশক। খাটের নীচে বড় কয়েকটা ট্রাংক। দেয়াল-তাক ভর্তি টিনের কৌটো আর শিশি বোতল। আলমারী, আলনা আর ঠাকুর দেবতার ছবি। দম আটকে আসে শুধু তাকিয়ে থাকলেই। সঙ্গে সঙ্গে হালদার বাড়ির ঘরগুলোও মনে পড়ে খুকীর। জেঠিমার ছ'খানা ঘর নিয়ে ও বাড়ির বৌয়েদের ঘর। জানলা দরজায় ফুলতোলা পর্দা। দেয়ালে বন-পাহাড় আর সাহেব মেমের ছবি। কার্পেট অবশ্য শুধু বৈঠকখানা ঘরেই পাতা আছে। ও ঘরটায় ভয়ে ঢোকেনি খুকী। তবে ঘরের মানুষেরা যখন কথা বলে, গম গম করে ওঠে ঘরটা, চাপা রাগে যেমন কুকুর গজরায়।

পাড়ার অন্য বাড়িতে আর না যাবার কারণটা এই মাত্র যেন খুঁজে পেল খুকী। ভাল লাগে না। এই সব চাপা ঘর, ময়লা জামা কাপড়, নোংরা চালচলন। ঠিক এই জন্য তার নিজের বাড়িটাও ভাল লাগে না। এরা চুপ করে থাকতে জানে না। অবাক হতে জানে না। এদের মাঝে খুকী অতি সাধারণ হয়ে যায়। কত তফাৎ এদের সঙ্গে হালদার বাড়ির। সেখানকার বড়বৌ, ছোট বৌ, নভেল হাতে বিছানায় গড়ায়, রেডিওর কাঁটা ঘোরায়, সাজগোজ করে সিনেমায় যায়। স্বামীদের গলা জড়িয়ে রাগ করে আবার হেসে ঢলে পড়ে। অজস্র সময় আর উপকরণ ফেলে ছড়িয়েও শেষ করতে না পেরে, হাঁপিয়ে পড়ে। খুকী ঈর্ষা করে না। তাতেও তার ভয়। যদি ওরা জেনে ফেলে। কাছে আসতে যদি না দেয়।

—না জেঠিমা আজ বসব না। আর একদিন এসে শুনব।

চলে যাচ্ছিল খুকী। জেঠিমা ডেকে জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁরে ওদের দ্দু বোয়েরই ছেলেপন্নলে হয়নি কেন রে?

ঃ জানি না।

ক্লান্ত স্বরে খুকী জবাব দিল। আবার প্রশ্ন আসে জেঠিমার। ছোট বোয়ের ভায়ের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে শুনলুম?

ঘাড় নেড়ে খুকী এগিয়ে যায়।

—ভাগ্নীর ছোট ননদ এবার আই এ পাশ দিয়েছে, একবার বলিস না কথাটা।

খুকী তখন অনেক দূরে।

দুপুরের অর্ধেক সময় পর্যন্ত কাপড় কেচে ক্লান্ত হয়ে পড়ে খুকী। মাদুরে শোয়ার সংগে সংগেই ঘুমিয়ে পড়ে, আর কাঠওয়ালির চীৎকারে কাঁচা ঘুমটা ভেঙে যায়। একদিন বুঝি ওর কাছ থেকে কাঠ কিনেছিল, তাই রোজ জানলার কাছে চীৎকার করে যাবে। খোলা কল থেকে জল পড়ছে। বিরক্ত হয়েই খুকী কলটা বন্ধ করে দেয় আর গজগজ করে। এই এক আপদ জুটেছে। রোজ এসে স্নান করবে। বিরক্ত হয়েই খুকী কল বন্ধ করে দেয়।

কিন্তু খুকী যখন হালদার বাড়ির ছাদের পাঁচিলে কনুই রেখে দাঁড়ায়, বিরক্তির রেশমাত্র আর তখন থাকে না। বিকেলে বৌয়েরা ব্যস্ত থাকে। ঘুম থেকে উঠতে উঠতেই কলের জল সরু হয়ে আসে। তারপর চা খাওয়া, চুল বাঁধা, গা ধোয়া। সন্ধ্যে তখন প্রায় গড়িয়ে আসে। এই সময়টুকু ছাদে একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে খুকী। পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ছাদ। নীচের বাড়িগুলোকে কেমন বেঁটে, চ্যাপটা দেখায়। নীহারের ঠাকুমার আচারের শিশিগুলো সারি দিয়ে সাজানো ছাদের পাঁচিলে। ওপর থেকে মানুষগুলোকেও অমনি দেখায়। লিলির বাঁপিসি গামছা পরে বাসন মাজছে। মাথাটা দুলছে, ঘাড়ের কাছে শির দাঁড়াটা ফুলে ফুলে উঠছে। ভাবতে বিশ্রী লাগে খুকীর, বাঁপিসির ঘামাচি মেরে দিয়েছে সে নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে। সাত নম্বরের বৌদি, জানলা দিয়ে কাগজের টুকরো বাঁ হাতে করে ছুঁড়ে ফেলল রাস্তায়। বৌদির ছোট ছেলেটার বয়স আট মাস। আর কমাস পরেই বৌদি হাসপাতালে যাবে। গা ঘুলিয়ে ওঠে খুকীর, যখনই মনে পড়ল বৌদির সংগে লুকিয়ে কয়েদবেলের আচার তৈরী করে খেয়েছে সে কতদিন।

গোটা পাড়াটাকেই এখান থেকে দেখা যায়। অবাক লাগত প্রথম প্রথম। নতুন মনে হত বাড়িগুলোকে এত ওপর থেকে দেখলে, অবাক হবার সুযোগটুকু দেবার জন্য হালদার বাড়ির কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল খুকী মনে মনে। নীচু নোংরা বাড়ি আর মানুষগুলোর হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্যও রক্ষা করেছে হালদার বাড়ি তাকে। আপাতত মনে সে-কথা এমন অভিভূত করে খুকীকে যে, ডলির সংগে অন্য ছাদ থেকে ভুলুদার ইশারায় কথাবার্তাটাও এখন আর যথেষ্ট কৌতূহল আকর্ষণের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। ইশারাগুলো তারও জানা আছে। এক পলক দেখেই খুকী ইশারাটা পড়ে ফেলল। ডলির পাউডার ফুরিয়েছে আর বোধ হয় সাবান কিংবা ব্লাউসের ছিট দরকার। [illegible] বিয়ের সম্বন্ধ আসে আর ভেঙে যায়। হয় মেয়ের রূপ, গুণ কিংবা দেনা পাওনার জন্য। সাত নম্বরের বৌদিকে ডলি বলেছিল, ভুলুদার সংগে বিয়ে না হলে, সে বাড়ি থেকে পালাবে। ভুলুদার সংগে ডলির এখনো বিয়ে হয়নি। এখনো বাড়ি থেকে সে পালায়নি।

এক ঝাঁক পায়রা এতক্ষণ পাক দিয়ে দিয়ে উড়ছিল। এইবার তারা আকাশ [illegible] নম্বর বাড়ির ছাদের ওপর নেমে [illegible] শুরু করল। সাদা ধবধবে প্রায় কটা পায়রা। [illegible] নরম পালক, [illegible] আলোটা ফিকে হয়ে [illegible] না। দেখতে বেশ লাগে, অ্যালকী [illegible] সোনালী [illegible] আলোয় [illegible]।

হালদার বাড়ির [illegible] একটা কাপড় [illegible] উড়ে এল। হাত [illegible] আবার উড়িয়ে দিল খুকী।

এতদিন যাওয়া আসা করছে খুকী, হালদার বাড়ির [illegible] সে ছিল [illegible] দৃষ্টি দিয়ে। সময় কাটাবার অজস্র উপকরণের মধ্যে খুকী আর তার গল্পও একটা উপকরণ। মিথ্যে, বানানো নয়; সত্যি গল্প। মানুষের একান্ত করে বলা জীবনের কাহিনী, যা শুনলে অন্দরের কৌতূহল [illegible] ফিরিয়ে ওঠে রংবাজ মশালের মত। [illegible] সংসারে দুটি ক্ষিপ্ত চঞ্চল [illegible]। খুকী বুঝে নিয়েছে হালদার বাড়ির বৌয়েরা কেন তাদের মোম নরম হাত চেপে ধরে আর উজ্জ্বল চোখ পেশতো-চেরা ক'রে রেখে। [illegible] উজাড় করে গল্প দিয়েছে খুকী। তার পনের বছরের দেখা-শোনা সত্যি গল্প। এ-গলির বাড়িতে বাড়িতে যত গল্প তৈরী হয়েছে, তার একটাও সে [illegible] দেয় না।

তাই খটকা লাগল খুকীর। আজ কতদিন ধরেই সে লক্ষ্য করছে, তাকে দেখে আর হালদার বাড়ি তেমন খুশী হতে পারছে না। সারা বাড়িটা যেন থমথমে মুখ নিয়ে তার দিকে ভ্রূকুটি করে আছে। মশালের রং মরে গেছে। চপলতা যেন পূর্ণ-গভীর মন্থরতা এসেছে। খুকী ভয় পায় এ সব দেখে। হালদার বাড়িতে সে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ছে। বুক ঠেলে ভয়ের মত কান্নাও তোলপাড় করে। তন্ন তন্ন করে সে সাহস খুঁজে ফেরে, এ বাড়ির প্রতিটি কথা আর ভাবভংগী বিশ্লেষণ করে। ভয়টা তার বেড়ে যায়, সেদিন চিল-কোঠার ঠাকুর ঘরে হালদার গিন্নীর কথাটা মনে পড়তে।

ঠাকুর ঘর পরিষ্কার করছিল হালদার গিন্নী। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল খুকী। তাকে দেখে অন্যদিনের মত প্রথম কথা শুরু করলেন না হালদার গিন্নী, শুধু একবার তাকিয়ে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে খুকীই প্রথম কথা শুরু করল।

—ঠাকুরঘরের শ্রীধরের কাজগুলো সব [illegible] খুকীই করে। বাসন মাজা ঘর ধোয়া, [illegible] ঠাকুরের জামা কাপড় পরানো [illegible]"

হালদার গিন্নী শুনেও শোনেন না। খুকী [illegible] করে না। আপন মনেই সে বলে যায়, শুধু চোখ দুটোকে তীক্ষ্ণ [illegible]।

[illegible] উঠেছিল, আর [illegible] বিধবা [illegible] মন্দিরে [illegible] পুরুত [illegible] ভদ্রলোক একেবারে কি [illegible] জানেন?

—[illegible]।

[illegible] খুকী, হালদার গিন্নীর [illegible] সে [illegible] হালদার গিন্নীর [illegible] সে [illegible] গেছল, একদিন [illegible] একই ধরনের [illegible]।

উল বুনছিল বড় বৌ। বিলেতে নাকি ভয়ানক শীত। দুটো সোয়েটারেও শীত কাটে না। আর দু মাস বাদে ছেলের তার ফেরার কথা। দুই [illegible] হাত চলছে। হঠাৎ সোয়েটার পেয়ে অবাক হয়ে যাবে নিশ্চয়। খুকী চুপ করে দেখছিল, হঠাৎ সে বলে ওঠে।

—[illegible] সোয়েটারটা দেখেছেন তো, [illegible] সম্মনে তো কে করেছে।

বড় বৌ কথা বলে না, আরো দ্রুত হাত চলে। উত্তর না পেয়ে অপ্রস্তুত হয় না খুকী। জবাবটা সে নিজেই দেয়।

—নীলিমাদি। আগে ওদের বাড়িতে ভাড়া ছিল। তারকদার বিয়ের আগেই উঠে গেছে। এখনো তারকদা ওদের বাড়ি যায়। প্রত্যেক রোববার। নীলিমাদির এখনো বিয়ে হয়নি, খুব ভাব ছিল ওদের দুজনের। এই নিয়ে বৌয়ের সংগে ঝগড়া হয়েছিল, তাতে বৌদি কি বলেছিল জানেন?

—জানি, গলায় দড়ি দেবে বলেছিল।

সুস্পষ্ট বিরক্তি শুনে খুকী আর একটা কথাও বলতে পারেনি। শুধু সারাক্ষণ ভেবেছিল, কেন বিরক্ত হল বড় বৌ।

আজ ছোট বৌয়ের ঘরে পা দিয়েই মনে পড়ল আবার, এ বাড়িতে ক্রমশঃ সে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ছে, যেমন করেই হোক তাকে আবার আগের প্রতিষ্ঠা ফিরিয়ে আনতে হবে। হালদার বাড়ির কৌতূহলী শিরায় পাঁক পড়ছে। সেখানে, তপ্ত, বেপরোয়া বান ডাকাতে হবে।

খাটে শুয়ে সিনেমা পত্রিকার ছবি দেখছিল ছোট বৌ। শুধু একবার মুখ ফিরিয়ে দেখল খুকীকে।

—পড়ছেন বুঝি। কি পড়ছেন?

জবাব পেল না খুকী। তাতে কি হয়েছে, এ বাড়িতে তার কথাই তো সকলে শুনতে চায়।

—আপনার মত বিনুদিরও বই পড়ার বাতিক আছে। ওর ভায়ের মাস্টার রোজ বই এনে দেয়। একদিন বই না পেলে সেকি ছটফটানি বিনুদির। শুধু বই তো আর নয়, ওর মধ্যে আরো একটা জিনিস থাকে।

খুকী থামল। ছোট বৌ এতক্ষণে একবারও তাকায়নি মুখ তুলে। শুধু পত্রিকার পাতা উল্টে গেছে। খুকী ছোট বৌয়ের পিঠের ধারে এসে বসল। কথার সুরে রহস্যের সুতো যেন পাক দিয়ে উঠল।

—কি থাকে বলুন তো?

সুতোটাকে ছেড়ে দিল খুকী। ছোট বৌয়ের শুধু পেন্সিল-টানা চোখে তাকানো, তারপরই রহস্যের সুতোটা উল্টোদিকে পাক খেয়ে খুলে যেতে থাকবে অনর্গল।

—জানি, চিঠি থাকে তো।

জানি জানি আর জানি। আর কিছু জানতে বাকি নেই এদের। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় চোখ মোছে খুকী। কেউ আর তার কথা শুনতে চায় না। এ বাড়ির কৌতূহল যেন ফুরিয়ে গেছে। সব সম্পর্ক ফুরিয়ে আসছে তার হালদার বাড়ির সঙ্গে। কাঠের রেলিংয়ে হাত রাখে খুকী। কি পালিশ! পর্দাগুলো হাওয়ায় দুলছে। পর্দায় ময়ূরের নকশা মনে হয় যেন নাচছে। চোখ ফেরান যায় না। চা খাবার জন্য কেউ তাকে ডাকল না। এক কাপ চা কিছুই না। কিন্তু তাতে ঘনিষ্ঠতার স্বীকৃতি ছিল। সেটুকুও শেষ হয়ে এল।

বাড়ি ফিরে খুকী ঠিক করল, আর সে হালদার বাড়ি যাবে না। অন্তত যতক্ষণ না তাকে ডেকে পাঠাচ্ছে। সারাদিন বাড়ি থেকে বার হল না। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে তার বিশ্রী লাগে। ঘরের মধ্য থেকে রাস্তাটাকে ভাল লাগে। তাতে মন খারাপ হয় আরো। সদর দরজায় কয়েকবার এসে দাঁড়াল সে। গলির দিকে বারবার [illegible]

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে এল। সন্ধ্যে কেটে রাত। হালদার বাড়ির ঝিয়ের মত কাঠউলীর গলার স্বর। তাই পরদিন দুপুরে, বিরক্ত হয়েই সে কাঠউলীর সঙ্গে খানিকটা ঝগড়া করে ফেলল। সদর দরজায় এসে দাঁড়াল। তবু কেউ ডাকতে এল না। পরপর কত গুলো বিকেল গড়িয়ে গেল, রাত পুইয়ে এলো। আর হঠাৎ মনে হলো খুকীর, নিশ্চয়, কিছু একটা ঘটেছে হালদার বাড়িতে, কোন আপদ বিপদ। নয়তো খুকীর মতই কেউ এসে তাদের গল্প শোনাচ্ছে। নরম স্প্রীংয়ের খাটে গা ঢেলে, মোমনরম শরীরটাকে গদিতে ডুবিয়ে, কিংবা সেই আকাশ ভাঙা, অবাক করা চোখে, অপলক তাকিয়ে বৌয়েরা শুনছে। সোনালী নকশাকরা ফিন ফিনে কাপের চা। আর তিনতলাঘরের হাওয়ায় গল্প বলতে বলতে ঘুম পাচ্ছে কারো।

সদর দরজা থেকে পায়ে পায়ে খুকী হালদার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসে। জানলাখোলার শব্দে উপরে তাকাল সে। চোখাচোখি হল ছোট বৌয়ের সাথে। বাড়িটার পাশেই দাঁড়িয়ে পড়ল খুকী। কেমন যেন লজ্জা করছে। প্রতিজ্ঞা করেছিল না ডাকলে আসবে না সে। হোক না প্রতিজ্ঞাটা মনে মনে।

আস্তে আস্তে দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে যায় খুকী উলুদের সদর দরজা লক্ষ্য করে। হালদার বাড়ির সীমানা দিয়েই সে ছুটে একদম উলুদের রান্নাঘরে এসে উঠল।

বেশ করেছি। আমার সর্বোনাশ আমি করেছি তাতে তোমাদের কি?

ঘর থেকে চাপা চীৎকারে বাতাস তোলপাড় করল উলু। রান্নাঘর থেকে একই সুরে জবাব দিল উলুর মা।

তুই কি আমার একটা মেয়ে? অন্য গুলোর ভবিষ্যত দেখতে হবে না? এই কেলেংকারীর পর ওদের আর বিয়ে হবে?

উলুর মা খুকীর উপস্থিতি স্মরণ রেখেই কথাগুলো বলল। উলু জানেনা যে খুকী এসেছে। হয়ত জানলেও এই কথাগুলো বলতে পারত সহজেই।

বিয়ে না হয়, তাহলে আমি যা করেছি তাই করবে। সংসারে যখন এনেছিলে মনে ছিল না, খাইয়ে পরিয়ে বিয়ে দিতে হবে?

শুনলি, শুনলি খুকী মেয়ের কথা। মার সঙ্গে কেমন ধারা কথা বলছে।

গলার কান্নার ভাঁজ খুলতে খুলতে উলুর মা কড়াটা উনুন থেকে নামাল।

বলি তোর বিয়ে কি আমরা ইচ্ছে করে দিচ্ছি না? বাপের রোজগারপাতি, সংসারের মানুষজন, সব মিলিয়েই না বিবেচনা করতে হয়।

[illegible]

বেরিয়ে আসছিল উলু, খুকীকে দেখে চুপ করে ফিরে গেল। ব্যাপারটা কেমন হেঁয়ালি লাগছে খুকীর কাছে। হালদার বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে, সে আর অন্য বাড়িতে যেত না। ইতিমধ্যে কত কি ঘটে গেছে। কত নতুন নতুন গল্প তৈরী হয়েছে। সে কিছুই জানে না। এতদিন, একই গল্প, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বহু ব্যবহারে বিকল হয়ে গেছে। সে-গল্প শোনায় আর উৎসাহ থাকবে না, এতো স্বাভাবিক।

জ্বলজ্বলে চোখে খুকী তাকায় উলুর ঘরটার দিকে। হালদার বাড়িতে প্রবেশের ছাড়পত্র যেন উলুর কাছে। এবার সে এমন করে তার গল্পের ঝুলি ভরাবে, যাতে আর কোনদিন না হালদার বাড়ি বলতে পারে—জানি।

শ্বেত পাথরের সিঁড়ি মাড়িয়ে, চকচকে পালিশের রেলিং ধরে ধরে, ময়ূর আঁকা পর্দার সামনে, নিঃসংকোচে দাঁড়াল খুকী। ঘর থেকে বেরিয়ে এল বড়বৌ, বোধহয় পাশের ঘরে যাচ্ছিল। খুকীকে দেখেও থামল না। পায়ে পায়ে সে এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। ফুর ফুরে হাওয়ায় পর্দার ময়ূরটা নাচছে। খুকী পর্দা সরিয়ে ঢুকল। ছোটবৌ চা-খাচ্ছে সোফায় গা ডুবিয়ে। পাতা জোড়া ছুঁই ছুঁই করছে সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে। ফিসফিস করে খুকী বলল—জানেন কি হয়েছে উলুর।

—জানি।

জী ব না ন ন্দ

সানাউল হক

১

হৃদয়ে বেদনা খুঁড়ে খুঁড়ে
মেঘের দুপুরে
সোনালী ডানার চিল আজও দেখি ওড়ে।
হলুদ পাতার ওই ভিড়ে
নিরালা পালক ঘষে শীতের শিশিরে
এখনো জাগিছে পেঁচা অঘ্রাণের রাতে
মেঠো চাঁদ ঢলে পড়ে নক্ষত্রের সাথে।

রাতভর শুধু পথ চাওয়াঃ
যাবে নাকি পাওয়া
যে জিনিস আজও থরে থরে
লুকানো রয়েছে কোনো হৃদয়-গহ্বরে।
রাতে রাতে কোজাগরী নক্ষত্রের সনে
নির্জন পেঁচার মতো লক্ষ্য এক মনে
হাজার বছর ধরে খোঁজাঃ
লঘুভার হবে না কি হৃদয়ের বোঝা?

মাঝে মাঝে অরুণিমা সান্যালের মুখ
সুপ্তোত্থিত একফালি সুখ।
কখনো বা হেসে ওঠে শেফালিকা বোস
নির্মল নির্দোষ।

কখন বসন্ত-ঝড়ে ঝরে যায় শিশির সময়
ক্যাম্পের বিছানায় রাত শুনি অন্য কথা কয়ঃ
বনে বনে জোছ্না আর বসন্তের ডাক
কাছাকাছি রয়েছে কি বিস্ময় নির্বাক
হৃদয়-ভাণ্ডারী মেয়ে, ভেজানো দুয়ার—
পুরুষ হরিণ তাই হতেছে শিকার।
পৃথিবীর রাঙাকন্যা রূপ নিয়ে গেছে কোথা দূরে
হরিণেরা তারে খুঁজে জোছ্নার মাঠে মাঠে ঘুরে।

সারা রাত ঘুরে ঘুরে জোছ্না আর বসন্তের সনে
নাই দেখা নাই তার সনে—
হীরাকন্যা উধাও কোথায় কোন ধূসর জগতে
ক্লান্ত চাঁদ ঢলে পড়ে, খড়কুটো গায়ে লাগে পথে।

হাজার হাজার ধরে পথ হেঁটে ক্লান্তি আরো নামে
সফেন সমুদ্র দোলে ডাইনে ও বামে—
হঠাৎ কখন যেন দেহ-মনে আবেশ বুলায়
চোখ তুলে কুশল শুধায়ঃ
'এতদিন কোথায় ছিলেন?
নাটোরের বনলতা সেন।'

ক্লান্ত প্রাণে নতুন অন্তর
দোর্দণ্ড শান্তির সঞ্চর।

টুকরো-টুকরো শান্তি-স্বাদ—
ভরে না, ভরে না তাতে জীবন অগাধ।
ক্লান্ত মনে শান্ত এক শান্তির প্রত্যাশা
ঘনীভূত আত্মীয়তা-নেশাঃ
বনহংস-মন তাই সরের ভিতর মুখ ঢেক

কোনো এক বনহংসী পাখায় পালক রেখে
রক্তের স্পন্দন শুনে
মৃত্যুর অবসর—শান্তিক্ষণ গুণে!

২

কোথা সেই অপরূপ হেমন্তের কবি
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ভাসে যার কাব্যছবি
প্রতিদিন জলসিঁড়ি নদীতীরে
অঘ্রাণের রাতে কিংবা পৌষের জোছনার ভিড়ে?
চড়ুয়ের ভাঙা বাসা কোথায় শিশিরে ওঠে ভিজে,
মেঠো পথে নষ্টশশী খড়কুটো পড়ে আছে কি যে,
সারারাত এক ঠাঁয় বসে কোন পাখী
কোথায় যে ভীরু কোন শালিকের ইচ্ছাটি বাকী—
সব কথা, সব ব্যথা
মানুষের হরিণের সাধের ব্যর্থতা
হাজার হাজার ধরে যাহা শুধু মেঠো চাঁদ জানে
সব তারা ভিড় করে কার সেই কাব্যের মননে ও ধ্যানে।

সমুদ্র পাহাড় ছেড়ে একা-একা পথ চিনে
ওইখানে পাড়াগাঁর ধানকাটা দিনে
সুনিবিড় শান্তিসাধ, কথা কোন যায় বাকী রয়ে
কে আর বলিবে বলো মানুষ ফড়িং কীট সকলের হয়ে?

অনুভূতিতীক্ষ্ণ প্রাণ, কোথা কবি সুকোমল নিভৃত আশার
(হৃদয় কি আমাদের হবে লঘুভার?)
কে দেবে জবাব?
তাই তো অভাব।

৩

আমাদের কী-ই যে অভাব, কি যে খুঁজি
প্রকৃতির নারীর হৃদয়ে, রাত্রিদিন যুঝি,
কানাগলি পথ বেয়ে হাঁটি ঃ
যদি কেউ শুধায় কুশল পরিপাটি
হাসি টেনে মুখে,
যদি কেউ কথা কয় চোখ পেতে চোখে।
যদি হাঁসের পালক লেগে
কেঁপে ওঠে কলমীর লতা, ভোরে জেগে
শেফালিকা হাসে,
কুয়াশার ভেজা ঘাসে
ইঁদুরের ঝরা লোম থেকে
রোমহর্ষ রয় কিছু লেগে, এঁকেবেঁকে
নদী যদি ছলছল হেসে
জোছ্নার রূপসীরে ডাকে ভালবেসে।

কী যে চাই তবু! হেঁটে হেঁটে কি যে খুঁজি—
(আমরা কি বুঝি!)
হয়তো জানি না এই বাংলার
নদী, মেয়ে, ধানী মাঠ, অথবা জোছনার
চোখে, কিংবা খাঁজে খাঁজে ঘুঘুর পালকে
লুকিয়ে যা থাকে
রোমহর্ষ কত তার! সেই দোলা, রক্তের স্পন্দন
পেয়েছিল ভাগ্যবান আমাদের কোনো একজন।

আড্ডার বিবর্তন ও 'মান্‌ডে ক্লাব'

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কলারসিকরা আজকাল প্রায় সবাই-ই কোনও না কোনও আড্ডার আড্ডাধারী। নেশা ও পেশায় যাঁদের মেলে, এমন লোকদের আড্ডাও আজকাল অজস্র। অবশ্য ফরাস-পাতা তাকিয়া-আস্তীর্ণ বৈঠকখানা ছেড়ে আড্ডাদেবী আজকাল চা-খানা কাফি-খানায় আস্তানা গেড়েছেন। দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার অনেক অঞ্চলেই এমনি আড্ডা খুঁজলে মিলবে আজকাল।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বিলীন হয়ে ডেমোক্র্যাটিক ব্যবস্থাকে যেমন ঠাঁই করে দিয়েছে, আড্ডার ক্ষেত্রে তারও পরিচয় পাওয়া যায়। সাবেকী 'বাবু'দের বৈঠকখানায় আড্ডা হোতো। তার রূপে ছিলো মূলত কেন্দ্রমণি 'বাবু'-কেন্দ্রিক। এর সঙ্গে আজকালকার কাফি-খানার আড্ডার ডেমোক্র্যাসির যে আকাশ-পাতাল ফারাক তা বলে বোঝাতে হয় না।

বাঙলাদেশে 'বাবু'-কেন্দ্রিক আড্ডার ডেমোক্র্যাটিক আড্ডায় যে বিবর্তন, তার মধ্যপথে 'মান্‌ডে ক্লাব' (Monday Club) এই বিবর্তনের গতিপথ সূচনা করে। তাই আড্ডার রূপান্তরের প্রসঙ্গ উঠলে 'মানডে ক্লাবের' কথা না উঠেই পারে না।

'মান্‌ডে ক্লাব'কে কেউ কেউ 'মণ্ডা ক্লাব' বলে অভিহিত করেছেন। জানা যায় মণ্ডা নামটিও ক্লাবের একটি ওরফে। প্রতি সপ্তাহে এই ক্লাবের অধিবেশন বসতো। প্রতিবারেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্য রসিকদের রুচি তৃপ্ত হোতো সুরসিক আলোচনাদিতে এবং রসনা তৃপ্তিকর খাদ্যে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কলারস ও পাচকরস উভয়কে পরিতৃপ্তি দানের যে ব্যাপারটা আজকাল কাফি ও পকোড়াতে এসে দাঁড়িয়েছে, তার পত্তন হয় 'মান্‌ডে ক্লাব'-এ। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের সস্তাগণ্ডার দিনে হতো যে ভুরিভোজ, এখনকার ঝুরিভাজায় তারই প্রতিচ্ছায়া।

ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অতুলপ্রসাদ সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, অমল হোম, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীশ শর্মা, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, জীবনময় রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (জংলিবাবু), হিরণকুমার সান্যাল (হাবুলবাবু), বড়কু ও ছোটকু নামে দুই ভাই, দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, সুকুমার রায় ও তাঁর ছোট ভাই সুবিনয় রায়, শিশিরকুমার দত্ত (খোদনবাবু) প্রমুখ।

ক্লাবের পত্তন হয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে। ১৯১৯-এ এর শেষ।

ক্লাবের অধিবেশনগুলিতে নিমন্ত্রণ করা হতো ছাপা নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে। মাঝে মাঝে বিশেষ ঘোষণাদি সার্কুলার জাতীয় পত্রেও সদস্যদের জানানো হতো। এই চিঠিপত্রগুলি থেকে ক্লাবের স্ফূর্তি আর মেজাজের কিছু কিছু পরিচয় মেলে। নীচে সেগুলির কিছু দেওয়া গেলো।

(১)

"কেউ বলেছে খাবো খাবো,
কেউ বলেছে খাই,
সবাই মিলে গোল তুলেছে—
আমি ত আর নাই।
ছোটকু বলে 'রইনু চুপে
ক'মাস ধরে কাহিলরূপে'
জংলি বলে, 'রামছাগলের
মাংসে খেতে চাই।'
যতই বলি 'সবুর কর'—কেউ শোনে না কালা
জীবন বলে কোমর বেঁধে, কোথায় লুচির থালা?
খোদন বলে রেগে মেগে
ভীষণ রোষে বিষম লেগে—
'বিষ্যুতে কাল গড়পারেতে
হাজির যেন পাই।'
'Insure your Life with
Gresham at once.'

(২)

আঃ! আবার খাওয়া!!

এইত সেদিন সবাইকে বুঝিয়ে বললুম যে আর 'খাই খাই' ক'রো না—এর মধ্যে সুনীতিবাবু খাওয়াতে চাচ্ছেন। আমার হাতে কতগুলো টাকা গুঁজিয়ে দিয়ে এখন বলছেন, না খাওয়ালে জংলিবাবুকে দিয়ে মোকদ্দমা করাবেন। আমি হাতে পায়ে ধরে নিষেধ করলুম; তা তিনি কিছুতেই শুনলেন না, উলটে আমায় তেড়ে মারতে আসলেন। দেখুন দেখি কি অন্যায়! তা আপনারা যখন উপদেশ মত চলবেন না, কাজেই অগত্যা সুকুমারবাবুকে বলে ক'য়ে এই ব্যবস্থা করে এসেছি যে তাঁর বাড়িতে আগামী মঙ্গলবার (৩০শে জুলাই) সন্ধ্যা ৭টার সময় আপনি সুস্থদেহে হাজির হবেন। সুনীতিবাবুর ভোজের পাত সেখানেই পড়বে। এখন খুশী হলেন ত?

তারবিবরু
শ্রীসম্পাদক

(৩)

"সরবং সম্মিলন"

শনিবার ১৭ই
সাড়ে পাঁচ বেলা,

জার্মানীর ফ্রাঙ্কফর্টে অনুষ্ঠিত এক বৈজ্ঞানিক সভায় একটি নূতন ব্যাধির সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইয়াছে। ব্যাধিটির নাম 'ম্যানেজার্স ডিসিজ'। সংবাদে প্রকাশ এই ব্যাধির কবলে পড়িতেছেন রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী। বৈজ্ঞানিকগণ এই পরামর্শ দিয়াছেন যে মিতাহার, বিশ্রাম এবং সভাপতিত্ব (রাজনীতিবিদের পক্ষে) ইত্যাদির কাজ কমাইতে পারিলে এই ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। নিজের পাতে ঝোল টানিয়া অমিতাচারের জন্য ব্যবসায়ীরা চিরকালই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবেন। রাজনীতিবিদের ভাগ্যে শিকা সম্প্রতি ছিঁড়িয়াছে, সুতরাং তাঁদের উপরও অমিতাহারের ফল বর্তাইয়াছে। শখ করিয়া দুই একদিন নিশিপালন কিংবা হরতাল দেওয়ার জন্য প্রায়োপবেশনও মাঝে মাঝে চলিতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া সভাপতিত্ব না পৌরোহিত্য ইত্যাদির কাজ না করিলে যে বুকের ব্যাধি মাথায় চড়িবে। তা ছাড়া দীর্ঘকাল অনভিজ্ঞতাবশে পেটফাঁপা বা রসনায় দদ্রু প্রভৃতি উপসর্গের লক্ষণ প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং কাঙালের অশ্বব্যাধির ন্যায় রাজনীতিবিদের এই 'রাজ-ব্যাধি' শিবের অসাধ্য হইয়াই থাকিবে!

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ মঙ্গলগ্রহে জমি কিনিবার নাকি হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। জনৈক ভারতবাসীও জমি ক্রয় করিবার জন্য জাপানের একটি জ্যোতিষী
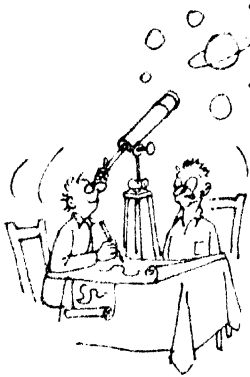
সংস্থার নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমরা যাঁরা শনি-গ্রহের প্রভাবে পরের নির্মিত বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে কাল কাটাই, তাঁদের কাছে মঙ্গলগ্রহের জমির খবরটা এমন কিছুই নয়। তাছাড়া জমি কিনলেই তো বাড়ি হয় না: মঙ্গলগ্রহে সিমেন্ট পাওয়া যায় কিনা সে খবর না পেয়ে উড়নচুকী করতে আমরা রাজী নই"।

* * *
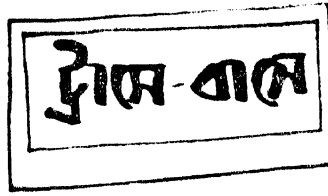
ট্রামে-বাসে দুই একটি জন্মের সংবাদ আমরা পাইয়াছি। মৃত্যুর সংবাদও যেন পাইয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়িতেছে। —"শুধু উঠতে-নাবতে ঠ্যাং ভাঙার সংবাদ পাইনি; সীট নিয়ে কামড়াকামড়ির সংবাদ পাইনি আর পান থেকে চুন খসা নিয়ে সভ্যজনগণের দাঁতখিঁচুনির খবর পাইনি। ট্রাম-বাস শুধু প্রসূতি আগার নয়, চিড়িয়াখানাও বটে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

মহিলাদের জন্য স্পেশাল বাস আগেই প্রবর্তন করা হইয়াছিল। সম্প্রতি একটি স্পেশাল ট্রামও নাকি চালু করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বহুবছর আগে শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ পার্লামেন্টে রেলওয়ে বাজেট বিতর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন—প্রথম শ্রেণীর রেল কামরাকে বলা হয় লেডিস্ কম্পার্টমেন্ট, মধ্যম শ্রেণীটা ভদ্রলোকদের জন্য এবং তৃতীয় শ্রেণীটা বরাদ্দ করা হইয়াছে জেনানাদের জন্য! মহিলাদের স্পেশাল থাকা হয়ত ভালো কিন্তু সেটা লেডিস্ এবং জেনানা সবার জন্য হইলেই বোধহয় ভালো। এবং তার জন্য পাণ্ডব-বর্জিত রুটগুলির কথা চিন্তা না করিলে যে লোকে কুকথা বলিতে পারে তা বোধহয় ট্রাম কোম্পানী চিন্তা করেন নাই।

* * *

১৮ই অক্টোবর প্রস্তাবিত ধর্মঘট স্থগিত রাখা হইয়াছে।—"ভালোই হয়েছে। কথায় কথায় ধর্মঘটের নামে আমরা ধর্ম ভীরুরা সত্যিই কাবু হয়ে পড়েছি। ধর্ম ও অধর্ম সব জেনে আমরা এখন হৃদয়া হৃষীকেশ নিয়েই আছি। কিন্তু দশ-পঁচিশের ঘুঁটি হয়ে ঘোড়ার সাধনা আমাদের পক্ষে সত্যিই দুস্কর হয়ে পড়েছে।"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

জনৈক পত্রপ্রেরক সম্পাদকের মারফতে জানাইয়াছেন যে পূজা মণ্ডপে প্যাণ্ট বা পাজামা পরিয়া অঞ্জলি দেওয়াটা সত্যিই অশোভন। শ্যামলাল বলিল—"আমরা তার সঙ্গে একমত। কিন্তু ভাবছি স্বয়ং মাকে যেখানে সিনেমা স্টার সাজিয়ে মঞ্চে নামাচ্ছি সেখানে নিজেরা একটু সঙ্ সাজলে কী—আর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে!!"

* * *

মহিলা চোর ধৃত—একটি সংবাদ শিরোনামা।—"কিন্তু শরীরে শ্রোতা ধীরে। তিনি একদিন মন চুরি করিয়া কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে এবং সুতরাং আপনার মাথায় চির অধিষ্ঠাত্রী হয়েছিলেন, ইনি তিনি নন, ইনি রীতিমতো সিঁদ কাটা চোর—মনের কুঠরী থেকে ঘরের কুঠরীতে পদার্পণ করেছেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

বাঁকুড়ার এক সংবাদে শুনিলাম কোন এক বাঁকুর সতী বিয়োগের পর তিনি সেই যে গাছে চড়িয়াছেন আর নামিতেছেন না। তাঁর মা তাঁকে গাছের

ডালেই খাবারদাবার দিতেছেন। লোকটির নাম শুনিলাম "হরি"—হরি এর নাম মাহাত্ম্য বজায় রেখেছেন বটে। কিন্তু অনেক দাদাদেরও দেখেছি উস্কানি ও মইয়ের সাহায্যে গাছে চড়ে আর নামতে পারে না। "গাছে তুলে প্রাণ নিলে কেড়ে" বলে চেঁচিয়েও না"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

ভারত বিদেশে ধানের তুষ রপ্তানী করিবে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু যে ধান গাছে শুধু কাঁকর ফলে এবং আমরা বর্তমানে যত কাঁকর গিলি তার তুষ কোথায় যাবে তাই ভাবছি"!!

* * *

মুসলিম লীগ-সভাপতি সর্দার আব্দুর রব নিস্তার নাকি রহস্যচ্ছলে বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান ১৯৫৭ সালের মডেলের মন্ত্রী বাহির করিবার জন্য বেশ ভালভাবেই আগাইয়া চলিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এই মডেলের পার্টস্ বিদেশ থেকে সহরেই আমদানী করা সম্ভব হবে, সেই খবরও হয়ত তাঁরা পেয়েছেন"।

রবি ঠাকুরের 'কেষ্টা' ছিল পাজি হতভাগা গাধা, কিন্তু আমার যে ভৃত্য শ্রীকৃষ্ট তাকে এক হারামজাদা ছাড়া আর কিছুতে ডাকলে ঠিক মানায় না। যদিও সে তস্কর, মিথ্যাবাদী, ধূর্ত কোনটাই নয়, উপরন্তু প্রধান গুণ হল অটল প্রভুভক্ত, কিন্তু তাতেই একটা লোককে সে অনায়াসেই পাগল করে দিতে পারে।

অন্তত আমাকে পারে।

কারণ আমি একা থাকি, পুত্র কলত্র এ-সবের ঝামেলায় পাগল হয়ে যাবার ভয়ে বিয়ে পর্যন্ত করিনি। ব্যাচেলর বটি, কিন্তু বাউণ্ডুলে নই। ঘরে আমার মেঝেতে এককণা ধুলো চড়ুই পাখী পর্যন্ত এনে পালাতে পারবে না, টেবিলে আমার বইএর সারিতে কেউ ডাইনে বাঁয়ে হেলে নেই, ছোট বড় সবাই ব্যাটেলিয়ান মার্চের হল্টের মত পিঠ সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে, আমার যে শয্যা তা দুগ্ধফেননিভ, তার চাদরের একটা কোণ পর্যন্ত এদিক ওদিক হয় না এবং আমার অন্নগ্রহণ থেকে চা পান পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটার হিসেব করে বাঁধা।

পুরুষের স্ত্রী নির্বাচনের মত ব্যাচেলরের চাকর রাখা অতি দুরূহ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ঘন ঘন চাকর বদলানো এসব অতি কঠিন ব্যাপার, এক স্ত্রীলোক আর পুরুষ-সিংহ ছাড়া এসব কম্ম সকলে পারে না। আমিও পারি না, তাই চাকর নেবার বেলায় আমি একেবারে কনে দেখার মত হাঁটিয়ে বাজিয়ে নেই। তার অসুস্থতা, অপরিচ্ছন্নতা, কথার জড়তা এসব দেখলে 'পরে জানাব' বলে বিদায় করি। অনেক পরিশ্রম করে বাছাই করে একটি গুণবানকে রাখি আর দীর্ঘ দিন সে রয়ে যায়।

কিন্তু শ্রীকিষ্ট বেলায় এসব অগ্নিপরীক্ষা কিছুই হয়নি, কারণ আমার আগের চাকরটা তিন দিন বাদে আসবে বলে শ্রীকিষ্টকে রেখে চলে গিয়েছিল, আর ফেরেনি। সুতরাং শ্রীকিষ্ট রয়ে গেল।

কথাবার্তায় শ্রীকিষ্ট অতি অমায়িক, অতি মাত্রায় অমায়িকই বলা যায়, সব সময় সহাস্য মুখ, জাতে উড়িষ্যাবাসী কিন্তু বাংলা ভাষায় তার কোনো কথা আটকায় না। মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যবান মেয়েলী চেহারার যে ওড়িয়া ভৃত্য দেখা যায় শ্রীকিষ্টও সেই জাতের, বয়স হয়ত বছর ছাব্বিশ হবে, কিন্তু বিনয় আর বশংবদতায় মাখামাখি ভাব।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আগে কোথাও কাজ করেছিস?'

শ্রীকিষ্ট সহাস্যবদনে বলল, 'হ্যাঁ করেছি, বকুলবাগানে অমৃতবাবুর বাসাতে। খুব বড় লোক অমৃতবাবু। দুইটা মোটরগাড়ী, সব সময় ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকে বাবু। আমাকে খুব ভালবাসত, খুব আপনার লোক। আপনি চিনেন বাবু অমৃতবাবুকে? বকুলবাগানে খুব নাম বাবুর।'

ব্যবসার সঙ্গে আমার কোনো কালে কোন সম্বন্ধ নেই, তা ছাড়া দূরের ভিতর রোডে বসে বকুলবাগানের অমৃতের সন্ধান আমার রাখার কথা নয়। বললাম, 'না জানি না।'

'বকুলবাগানের কিন্তু সবাই চিনে, বাজারের পিছনে যে লালবাড়ী, চারতলা সেইটাই অমৃতবাবুর, পঞ্চাশ জন লোক দুবেলা খায়। খরচা আছে বাবুর ডাইনে বাঁয়ে। কিন্তু ব্যবসা বাবু জিনিসটা বড় ভাল, এত যে খরচা তাকে কিছু এসে যায় অমৃতবাবুর। বাবু বলত খরচ করব নাত কি টাকা জমিয়ে রাখিব। হাত মুঠো করে আসিছি, হাতের মুঠো খালি চলি যাব।'

গল্পের জন্যে প্লট হাতড়াচ্ছিলাম, একটাকে ধরেও ধরতে পারলাম না, ফস্কে গেল অমৃতবাবুর ব্যাখ্যার ঠেলায়। বললাম, 'চা করে নিয়ে আয় তো। ঐ রান্নাঘরে সব পাবি, চিনি কম দিবি চায়ে।' সহাস্যমুখে শ্রীকিষ্ট ঘাড় নেড়ে প্রস্থান করল।

আর আমি বসে বসে একটা ছোট গল্পের প্লট আকাশ পাতাল খুঁজতে লাগলাম। এক এক সময় সাহিত্যিকের এমন দুর্দিন আসে যে নাকের জলে চোখের জলে হতে হয়। শারদীয়ার সময় এসেছে, এই এমন একটা সময় যখন গল্প লিখলেই সঙ্গে সঙ্গে তা ক্যাশ করা যায়, অথচ কাদাকে যদি গরু খোঁজা করতে হয় ত সে অবস্থা কষ্টের একশেষ।

এমন সময় শ্রীকিষ্ট ঠক্ করে চা রাখল টিপয়ের উপর, চুমুক দিলাম, নিখুঁত চা বানিয়েছে, বেশ তাজা তাতালো চা।

'বেশ হয়েছে!'

'অমৃতবাবুও খুব চা খেত বাবু। রোজ সকালে দু কাপো চা তার চাইই। আমাকে বলিত, দ্যাখ যে ভাল চা বনাতে পারে, সে পৃথিবীতে সব কামো করিতে পারে। অমৃতবাবু ত বউএর হাতে চা খেত না, সব চা আমি বানাতাম।'

'বউএর হাতে চা খেত না অমৃতবাবু, চা বানাতে জানত না বউ?'

সলজ্জিত হাসি হেসে বিনয়ে ঘাড় নোয়াল শ্রীকিষ্ট, 'সে বাবু অনেক কথা, সব কথা ত বলা যায় না বাহিরে। অমৃতবাবু বৌদিমণির মুখ দেখিত না, বড় ঘরের বড় কথা সে অনেক বাবু—।'

অমৃতবাবুর বড় ঘরের কথা সেদিন শ্রীকিষ্ট বলল না বটে, কিন্তু তিনদিনের মধ্যেই আমি জানলাম অমৃতবাবুর কি রুচি, কি খেতে ভাল লাগে, তার স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না হবার কারণ কি, অমৃতবাবুর একটি রক্ষিতা থাকে চৌরঙ্গী অঞ্চলে সে খবর পর্যন্ত আমি পেলাম। ক্রমশ অমৃতবাবু সেখানে সপ্তাহে কি কি বার যান, কটায় যান, কখন ফেরেন, কি অবস্থায় ফেরেন সে সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল হয়ে উঠলাম। চাকর বাকরের সঙ্গে এইসব প্রাইভেট কথাবার্তা আমার রুচিতে বাধে। কিন্তু শ্রীকিষ্টর কথাবার্তার নিয়ম হল তাকে প্রশ্নের অপেক্ষা করতে হয় না, নদীর মত আপনিই গান গেয়ে যায়। আমার কৌতূহলী পাপ মন ধমক দিয়ে যে থামিয়ে দেব তাও করি না। আর শ্রীকিষ্টর সবচেয়ে মহৎ গুণ মনিব সম্বন্ধে সে কুবাক্য কখনো উচ্চারণ করে না, তাই শুনতেও ভাল লাগে। অমৃতবাবুর যে অর্থস্ফীতি তাও সে গর্ব-ভরে করে, তার যে অবৈধপ্রীতি তাও সে নিন্দাভরে করে না। মনিবের উপর এমন গভীর প্রেম এবং মনিব সম্বন্ধে এমন নিখুঁত খোঁজ-খবর রাখা চাকরের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। ক্রমে আমি কৌতূহলী, আগ্রহান্বিত পরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।

মাছের ঝোল রেঁধেছিল শ্রীকিষ্ট, ঝোল বললে সে বস্তুকে ছোট করা হয় কারণ তাতে অনায়াসে অবগাহন করা চলে। গ্রাস দুই তিন ভাত খাবার পরে মুখে আর রুচল না। শ্রীকিষ্টকে বললাম, 'একি রেঁধেছিস মাথামুণ্ডু, একি মুখে দেওয়া যায় এই বাটা মাছের বাচ্চা!'

শ্রীকিষ্ট কিন্তু অপ্রতিভ হল না, বলল, 'বাটা মাছটা কিন্তু খাইতে খুব ভাল। অমৃতবাবু ত রোজ খেত। আমাকে বলিত,

রোজ বাটা মাছের বাচ্চা আনিবি বাজার থেকে।'

এর পরে কোন লোকই স্থির থাকতে পারে না। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'তোর অম্বুজবাবুর যদি টাই খায় তবে আমাকেও কি তাই খেতে হবে নাকি। এর পরে ফের যদি দেখি এমনি পচাকে মাছ বাজার থেকে এনেছিস তবে তা টান মেরে ফেলে দেব বাড়ি থেকে। আর রুটিরের রুটি হত শুকনো শুকনো বানাস কেন রে? একটু নরম করতে পার না গরে খাটিয়ে? অম্বুজবাবুও কি ওমনি শুকনো শুকনো রুটি খেতেন নাকি?'

শ্রীকণ্ঠ লজ্জিত হয়ে পড়েছিল, তথাপি সলজ্জ হাসিতে মৃদুস্বরে জানাল যে অম্বুজবাবু ঐ রকমই রুটি পছন্দ করেন।

'তবে অম্বুজবাবু, যা পছন্দ করে আমি তার একটাও করব না', হুংকার দিয়ে আমি শ্রীকণ্ঠকে শাসালাম, 'আমি যা পছন্দ করি এখন থেকে তাই করবি। আর না করবি ত পথ দেখবি।'

'আর একটা কথা', শ্রীকিষ্টর দিকে চোখ পাকিয়ে আমি বললাম, 'অমৃতবাবুর কথা যদি আর একবার আমার সামনে উচ্চারণ করবি ত—!' আমি এমনভাবে তাকালাম যে শ্রীকিষ্ট অতি সহজেই বুঝল যে উচ্চারণ করলে আমি তাকে খুন করে ফেলব।

এবারও শ্রীকিষ্ট সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

কিছুদিন পরে আমার একটা নতুন উপন্যাস বাজারে বের হল এবং অপ্রত্যাশিতভাবে সঙ্গে সঙ্গেই টালিগঞ্জের লক্ষ্মীদেবী যেন কি কারণে নেত্রপাত করলেন। বাঙলাদেশের লেখক মাত্রেরই এতে লাফিয়ে উঠবার কথা, আমার ত কথাই নেই। প্রকাশকের দোকান থেকে প্রচুর কাঞ্চন কুড়িয়ে একদিন গোটা কয়েক বই নিয়ে ফিরতে ফিরতে সহসা নিজের মন চনমন করে উঠল। বাজার থেকে অসময়ে রাত্তিরবেলা একটা ইলিশ ঝুলিয়ে হাওয়ায় উড়তে উড়তে আমি বাসায় ফিরলাম। মেজাজ সেদিন আমার হাতি কেনার মত।

শ্রীকিষ্ট রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল, ইলিশ ও আমাকে দেখে সে চমৎকৃত হয়ে হর্ষে উল্লাসে হাঁ করে রইল।

বললাম, 'গঙ্গার ইলিশ রে, সর্ষে ইলিশ করতে পারবি?'

আহ্লাদে শ্রীকিষ্টর দাঁত বেরিয়ে পড়ল, বলল, 'কেন পারব না বাবু, অমৃতবাবুর বাড়িতে কতদিন সরিষা-ইলিশ রান্না করিছি। অমৃতবাবু বলত, মাছের মধ্যে ইলিশ, গাছের মধ্যে—'

হুঁশ হতেই শ্রীকিষ্ট তাড়াতাড়ি থামল। আনন্দের ঠেলায় আগের প্রতিশ্রুতি সে বেবাক ভুল মেরে বসে আছে। কিন্তু আমি তাকে চটলাম না, সেদিন চটবার মত আমার মনের অবস্থাই ছিল না। ঐ রাত্রির অমৃতবাবু সম্বন্ধে ও যদি সারাক্ষণও গল্প করে তাতেও আমি চটব না ঠিক করেছিলাম।

সর্ষে দিয়ে গঙ্গার টাটকা ইলিশ যে কি উচ্চাঙ্গের জিনিস তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। সুতরাং পেট পুরে খাওয়া-দাওয়ার পর চকচকে আনকোরা বই দেখিয়ে বললাম, 'এটা কি জানিস?'

ও ঘাড় নাড়ল।

'আমি লিখেছি বুঝলি, এ আমার লেখা।'

'পড়বার বই?'

বললাম, গল্পের বই, আমরা যা গল্প করি তারই বই। উচ্ছ্বাসের মাথায় শ্রীকিষ্টকে গল্পের বই কাকে বলে সেই সম্বন্ধে একটা ছোটখাট লেকচার দিলাম। কেমন করে লেখে তাও বললাম। স্বামী লেখক হলে যেমন নতুন স্ত্রীকে লেখা সম্বন্ধে 'বোধগম্য' ঘটায় সেই রকম আর কি। ও অনেকক্ষণ হাঁ করে বিস্মিত ও বোকা বোকা মুখ করল, তারপর বলল, 'আমাদের অমৃতবাবুও খুব বই পড়িতো। অনেক বই, এতে বড় বড়।'

এবারও আমি চটলাম না, কারণ আজ চটবই না ঠিক করেছিলাম, বললাম, 'অমৃতবাবু গল্পের বই পড়ে আর আমি সেই বই লিখি, কে বড় বলত?'

কে বড় জিজ্ঞাসা করাতে সে একটু আমার দিকে তাকিয়ে হিসাব করে নিল।

অমৃতবাবুর কথা আর একবার আমার সামনে উচ্চারণ করবি তো...

তাকে বুঝিয়ে বললাম, কার গুণ বেশী, কে বেশী গুণবান? ঠিক করে বল।

ও অনেকক্ষণ ভেবে বলল, 'আপনি বেশী।'

শুনে হৃষ্ট হলাম, কিন্তু ও তৎক্ষণাৎ আরও বুঝিয়ে বলল, 'আপুনি বেশী গুণবান, কিন্তু অমৃতবাবু বেশী বড়লোক।'

চেঁচিয়ে বললাম, 'আরে আমিও বড়লোক হয়ে যাবরে। এই বই বিক্রি হয়ে গেছে বায়োস্কোপের বাবুদের কাছে। তিন হাজার টাকা পাব বুঝলি?'

ও বুঝল, কারণ হাসি মুখে ওর দাঁতের সারি দেখা গেল।

শ্রীকিষ্টর কাছে আমার প্রতাপ জাহির করে আমি খুশী হলাম, হলই বা চাকর সে, পাঠকের চেয়ে এমন কি অধম! অমৃতবাবুকে আজ যে চিট করতে পেরেছি এইটাই আমাকে সমস্তক্ষণ তৃপ্তি দিতে লাগল।

বিস্ফারিত নয়নে অনেকক্ষণ বাদে শ্রীকিষ্ট বলল, 'বাবু কত বই লিখছ আপনি?'

আমার বইএর র‍্যাকে সাজানো আমার গোটা আষ্টেক বই, যা এত ভংগ বংগদেশেও অখাদ্য বলে বিবেচিত হয়েছে তা দেখিয়ে দিলাম। তার সঙ্গে হয়ত আরও এর ওর দু' একখানা বই ছিল মনে নেই, কিন্তু বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল শ্রীকিষ্ট। আর মুগ্ধ শিশুর মত আমার মনের অকৃতার্থ আত্মা আনন্দে হাততালি দিতে লাগল।

এর পরে কিন্তু শ্রীকিষ্ট বেশীদিন রইল না, কারণ অকস্মাৎ আমার সেই পুরাতন ভৃত্য এসে হাজির হল কয়েক মাস পরে। অতএব শ্রীকিষ্টও একদিন আমার বাড়ির চাকরি ছাড়ল।

চাকরের স্মৃতি কে আবার কবে মনে করে রাখে? প্রথম ক'দিন শ্রীকিষ্ট আর তার অমৃতবাবুর কথা না শুনে শুনে কেমন লাগত, তারপর ক্রমে ক্রমে তাকে একদিন সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম।

এর পরে অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীকিষ্টর সঙ্গে আমার একদিন দেখা হয়ে গেল।

কাজ সেরে ফিরছি, বিকালের রোদ পড়ে এসেছে, লেক প্লেস ছাড়িয়ে ফুটপাতের পাশ ঘেঁষে আমি চলছি। সারা দুপুরে কাজের ব্যাপারে খুবই ভোগান্তি গেছে তাই মন মেজাজ খুবই খারাপ। সেই জন্যেই বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলাম, হঠাৎ তীব্র চিৎকার শুনলাম—বাবু-বাবু।

তাকিয়ে দেখি একটা ছোট বাগানওয়ালা বাড়ির দোতলায় শ্রীকণ্ঠ দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই সে অদৃশ্য হল এবং পরমুহূর্তেই দেখলাম সে গেটের কাছে হাজির।

চলে যেতেও বাধে, আবার দাঁড়িয়ে থাকাটাও অশোভন। কিন্তু শ্রীকণ্ঠকে আমি এড়াতে পারলাম না। কিছু একটা বলতে হয় বললাম, 'ভাল আছ শ্রীকণ্ঠ?'

শ্রীকণ্ঠ বিনয়াবনত হয়ে হাসল, 'এই বাড়িতে কাজ করছি বাবু। হঠাৎ দেখি আপনি বাবু যাচ্ছেন তাই ছুটে নীচে চলে এলাম।' তারপর সে একটানা কাজের ফিরিস্তি এবং সে পরম সুখে আছে এবং আমি কেমন আছি ইত্যাদি প্রশ্নের একটা ছোটখাট পাঁচ মিনিটের ঝড় বইয়ে দিল। তারপর সহসা কি যেন আরব্ধ কাজের কথা মনে পড়ে যেতে সচকিত হল, আমাকে বলল, 'এক মিনিট বাবু, আমি এখনি আসছি।' বলেই হঠাৎ দৌড় মারল ভিতরে।

আর গেটের কাছে আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম চরম বেকুবের মত। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে যখন কেটে পড়বার উদ্যোগ করছি এমন সময় দেখি এক সুবেশী চারুহাসিনী স্লিপার পায়ে ছোট বাগান পেরিয়ে আমার দিকে আসছেন। এখন আর ফেরার পথ নেই, মনে মনে আমি শ্রীকণ্ঠের সহস্র অভিসম্পাত দিলাম। কাছে এসে তিনি বললেন, 'আপনি কাউকে খুঁজছেন—?'

আমি বললাম, 'কাউকেই খুঁজছি না, আপনার বাসায় যে চাকরটি কাজ করে দুর্ভাগ্যবশত আমি তার আগের মনিব ছিলাম। আচমকা আমাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে থামিয়েছে কিন্তু তারপর তার আর কোন পাত্তা নেই।'

এইবার যেন তরুণীটির মুখে দন্তপঙক্তি দেখা গেল। বললেন, 'আপনি শ্রীকণ্ঠের কথা বলছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ওরই কথা বলছি।'

উনি হাসলেন। 'দাঁড়িয়ে কেন, ভিতরে এসে বসুন না।'

এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তাঁর সঙ্গে ভিতরে চললাম।

সামনে ছোট বাগান, তার পাশেই বাড়ির বারান্দা, বেতের চেয়ারে বসলাম। উনি পর্দার ভিতর দিয়ে মাথা গলিয়ে মিষ্টি গলায় চেঁচিয়ে বললেন, 'শ্রীকণ্ঠ দু পেয়ালা চা দিয়ে যেও।'

তারপর সামনের চেয়ারে এসে উনি বসলেন, হাসিমুখে বললেন, 'আপনি নিশ্চই সমরজিৎবাবু।'

ঢোক গিলে, কিছু বিস্মিত হয়ে একটু ঘাড় নাড়লাম, কারণ বিশ্ববিখ্যাত হওয়া দূরে থাকুক আমি এমন কুঁড়ে যে পাড়া-প্রতিবেশী পর্যন্ত আমার নামটা জানে না। কিন্তু শ্রীকণ্ঠ যে আমার অজান্তে তার একান্ত মনিবপ্রীতিতে আমাকে সম্রাট করে তুলেছে তাকি আমি জানতাম।

উনি হাসিমুখে বললেন, 'আমি আপনার অনেক লেখা পড়েছি—।' দু'খানা বইএর নাম করলেন, সে দু'খানা ভাগ্যক্রমে সত্যিই আমার লেখা বই। 'এখনো আপনি লিখতে লিখতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করেন নাকি?

চক্রদত্ত

আমাদের দেশে হেলিকপ্টার-এর চল প্রায় নেই বলা চলে। কিন্তু আমেরিকায় হেলিকপ্টার শুধু যে দৈনন্দিন কাজের জন্য ব্যবহার হয় তা নয়, এখন হেলিকপ্টারের ব্যবহার আরও সাধারণের জন্য সহজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। একটি মানুষের উপযোগী খুব সস্তাদরের হেলিকপ্টারের প্রচলন করার চেষ্টা চলছে। এইরকম কয়েকটি নতুন ধরনের হেলিকপ্টার পরীক্ষার জন্য আমেরিকায় তৈরী করা হচ্ছে। এই নতুন ধরনের হেলিকপ্টার যদি জনসাধারণ সচরাচর ব্যবহারের জন্য কিনতে পারেন তাহলে বলা যেতে পারে যে, মানুষের মনে যে পাখীর মত আকাশে উড়ে বেড়াবার বাসনা আছে তা সফল হবে। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি কোম্পানী "পিনহুইল" নামে একটি ছোট হেলিকপ্টার তৈরী করেছেন। এটি অ্যালুমিনিয়ম ফ্রেম দিয়ে তৈরী আর এতে মাত্র একটি চাকা আছে। চাকাটি মাথার ওপরে লাগান থাকে আর সমগ্র "পিনহুইলটি"র ওজন ১৫০ পাউণ্ড। একটিমাত্র আরোহীর বসার উপযোগী বাইসাইকেলের মত একটি বসবার জায়গা থাকে এবং বসার পর ছোট যন্ত্রটির সঙ্গে নিজেকে একটি স্ট্র্যাপ দিয়ে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নেওয়া হয়। আজকের দিনে "পিনহুইলই" সবচেয়ে ছোট, হাল্কা এবং সহজে চালাবার উপযোগী হেলিকপ্টার। পিনহুইলটি চালাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দফায় এক লাফে মাটি থেকে ১৫০ ফিট উঁচুতে যায় তারপর এদিক সেদিক, সামনে পিছনে নড়াচড়া করে এয়ারোড্রোমের ওপরে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে, তারপর গন্তব্য পথে চলতে থাকে। পিনহুইল সর্বসমেত ৫০০ পাউণ্ড ওজন নিয়ে এক মিনিটে ১০০০ ফিট ওপরে উঠে যেতে পারে। প্রয়োজনে ১২০০০ ফিট পর্যন্ত উঁচুতে উঠে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ মাইল পর্যন্ত গতিতে চলতে পারে। সমস্ত যন্ত্রটি এতই ছোট যে, দরকার হলে একটি টেলিফোন বুথের মধ্যে রেখে দেওয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা, চলন্ত হেলিকপ্টারে কোনও রকম শব্দ থাকে না। বাগানে তোড়ে জল দেবার সময় যেরকম একটা হিস্ হিস্ শব্দ শোনা যায়, চলন্ত হেলিকপ্টারে সেইরকম অল্প আওয়াজ পাওয়া যায়। এই হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন বলে কোনও জটিল পদার্থ নেই। সেই কারণে, ইঞ্জিনের পিস্টন অথবা তেল দেবার ব্যবস্থা কিংবা ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা ইত্যাদি কিছুই ভাবতে হয় না। ইঞ্জিনটি হেলিকপ্টারের মাথার ওপরের চাকার শেষ প্রান্তে থাকে। সমস্ত ইঞ্জিনটির ওজন মাত্র এক পাউণ্ড। হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের সাহায্যে ইঞ্জিনটি চলে। এই কোম্পানী আশা করেন যে, "পিনহুইলের" চেয়েও হাল্কা ধরনের হেলিকপ্টার তৈরী করতে পারবেন আর সেই হেলিকপ্টারের সাহায্যে মানুষ মোটর গাড়িতে যাতায়াত করার মত অতি অল্প খরচের মধ্যে যাতায়াত করতে পারবে। এরা আরও আশা করেন যে, ঐ ভবিষ্যৎ হেলিকপ্টারের দাম এক হাজার ডলারের চেয়ে কম হবে। আমেরিকার অন্যান্য কোম্পানীও এইরকম ছোট ধরনের হেলিকপ্টার তৈরীর চেষ্টা করছেন। এর মধ্যে একটি কোম্পানী "রোটর সাইকেল" নামে একটি হেলিকপ্টার তৈরী করেছেন। এটি ভাঁজ করা হেলিকপ্টার, তবে দশ মিনিটের মধ্যে এটির ভাঁজ খুলে সমস্ত হেলিকপ্টার তৈরী করা যায়। এতেও বাইসাইকেলের সিট লাগান থাকে এবং চালকের পিছন দিকে ইঞ্জিন থাকে; তবে মাথার ওপরে পাখাটা লাগান থাকে। সমস্ত যন্ত্রটির ওজন ২৫০ পাউণ্ড এবং ইঞ্জিনটি তেলের সাহায্যে চলে। অন্য আর একটি কোম্পানী "স্টেব্ল মেব্ল" নামে আর একরকম ছোট নতুন হেলিকপ্টার তৈরী করেছেন। ওজনে এটি "রোটর সাইকেলের" মতই আর "পিন হুইলের" মত এটি একটি ছোট রকেটের সাহায্যে চালান হয় এবং রকেটটি চলে হাইড্রোজেন প্যারক্সাইডে। এর গতি ঘণ্টায় ৬০ মাইল এবং এক দফায় ১৬ মাইল পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে। এই যন্ত্রে আর একটি সুবিধা যে, এমন ধরনের একটি যন্ত্র লাগান আছে যে, "স্টেব্ল মেব্ল" যখন চলতে আরম্ভ করে তখন ঐ যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত হেলিকপ্টারটি সোজা হয়ে চলতে পারে। আর একটি কোম্পানী "জাইরোপ্টার" নামক একটি হেলিকপ্টার তৈরী করছেন এবং এর ওজন ৯৫ পাউন্ড থেকে ১৩০ পাউন্ড হবে।
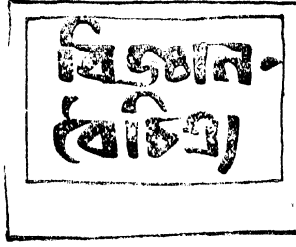
*

সম্প্রতি ভারত সরকার সামুদ্রিক মৎস্য সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি ছোট জাহাজ নিয়োগ করেছেন। এই জাহাজটির নাম 'ক্রিস্টেন মেন'। এই জাহাজটি 'ইন্ডো নরওয়েজিয়ান প্রজেক্টের' জাহাজ। এই জাহাজের সাহায্যে ভারতের সমুদ্রোপকূলের সামুদ্রিক মৎস্য ধরা হয়। বর্তমানে এই জাহাজটির কিছু পরিবর্তন করে এটিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযোগী করা হচ্ছে। এই জাহাজে ভারতীয় এবং নরওয়েজিয়ান নাবিক থাকবে এবং নরওয়েজিয়ান ক্যাপ্টেনের অধীনে থাকবে। এছাড়া জাহাজে একজন [illegible] অভিজ্ঞ মৎস্য [illegible] থাকবেন। এইটির [illegible] মৎস্য এবং সামুদ্রিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা। বিশেষজ্ঞরা আশা করেন যে, এই সব নতুন তথ্য সংগ্রহের সাহায্যে ভারতের উপকূলভাগের অনেক নতুন নতুন মৎস্য শিকারের সন্ধান খুঁজে বার করতে পারবেন।

*

আজকাল প্রায় সমস্ত এয়ার লাইনস-এ ভাইকাউন্ট এয়ারোপ্লেনের চাহিদা বেশী। সম্প্রতি ভারতবর্ষেও ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পোরেশন এই ভাইকাউন্ট এয়ারোপ্লেনের প্রবর্তন করেছেন। পরিসংখ্যান বিভাগের হিসাবানুসারে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সর্বত্রই ভাইকাউন্টের আয়তনের কোনও এয়ারোপ্লেন কিনতে ইচ্ছুক হলেই সবাই ভাইকাউন্ট চায়। লণ্ডনের ভাইকাউন্ট তৈরীর কোম্পানী বর্তমানে মাসে দশটি করে ভাইকাউন্ট তৈরী করছেন। এই কোম্পানী ৩১টি দেশ থেকে ৩৭৪টি ভাইকাউন্ট তৈরীর অর্ডার পেয়েছেন, এর মধ্যে ২৩৫টি তৈরী করে উঠতে পেরেছেন। এদের ধারণা যে, সামনের বছরে অন্ততঃ ৪০০টি ভাইকাউন্ট তৈরীর অর্ডার পাবেন এবং তার জন্য তৈরী করার কাজ আরও দ্রুত চালাতে হবে।
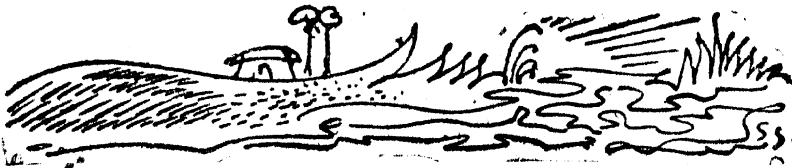
॥ ট্র্যাজিডি ও বাংলা নাটক ॥

বিভাস রায় চৌধুরী

॥ ১ ॥

বাংলায় বিয়োগান্তক নাটক বা কাহিনীকে বলে ট্র্যাজিডি। কিন্তু ট্র্যাজিডির এ অর্থ নয়। ট্র্যাজিডি বিয়োগান্তক হ'তেও পারে, আবার নাও হ'তে পারে। শেকস্‌পীয়র তাঁর ট্র্যাজিডিকে বিয়োগান্তক করার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু আজকাল এ রীতি আর সকলে মেনে চলেন না। গ্রহের ফেরেই হোক্, আর নিজের দোষেই হোক্, আজকাল ঘটনাচক্রে যে-কোন জীবনের ব্যর্থতার কাহিনীকে বলে ট্র্যাজিডি। তাই ট্র্যাজিডির যদি বাংলা করতেই হয়, তবে তাকে বিয়োগান্তক না ব'লে বিষাদাত্মক বলাই ভাল।

অনার্যজাতির কয়েকটি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান নিয়েই প্রাচীনকালে ট্র্যাজিডির সূত্রপাত হয়েছিল। এ-সব অনুষ্ঠানের প্রধান অংগ ছিল নৃত্য ও গীত। পৌরাণিক অথবা ঐতিহাসিক দু'জন বীরের বিরোধিতার কাহিনী নিয়ে নাচ শুরু হ'ত। নাচের শেষদিকে একজন বীরের মৃত্যু ও তার পুনর্জীবন ঘটতো। প্রকৃতিতে যেমন পাতা ঝরে যাওয়া ও পাতা গজানোর নিয়ম আছে, এও যেন ঠিক তাই। জীবনের পর মৃত্যু, আবার জীবন।

ইউরোপে গ্রীসদেশেই সর্বপ্রথম ট্র্যাজিডি বিকাশ লাভ করে। অতি প্রাচীনকালে প্রকৃতির দেবতা দিওনিস্যুসের মন্দিরে জীবনের কোন বিরোধমূলক ঘটনা নিয়ে নৃত্য-গীতের আয়োজন করা হ'ত। পরে এর সংগে যোগ দেওয়া হয়েছিল কোন কোমপতির সমাধির সমারোহ অথবা কোন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান। আসলে ট্র্যাজিডির মানে হ'চ্ছে 'ছাগলের গান' (trag oidia)। ট্র্যাজিডি শব্দটি গ্রীকভাষা থেকে ইংরেজি ভাষায় এসেছে। সেকালে দিওনিস্যুসের মন্দিরে ছাগবলি দিয়ে এ ধরনের নৃত্যোৎসব হ'ত। তখনকার দিনে নাটক লেখার যে প্রতিযোগিতা হ'ত, তাতেও ছাগল উপহার দেওয়ার নিয়ম ছিল। আরিস্তোতল ব'লেছেন, আদিযুগের ট্র্যাজিডিতে যারা অভিনয় করতো, তাদের রূপসজ্জা হ'ত অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ছাগল।

একই ধারা চিরকাল থাকে না, তাই এ-ধারার পরিবর্তন হলো। নৃত্যোৎসব থেকে শুরু হলো নাট্যাভিনয়ের। অভিনয়-ক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন শিক্ষিত সুজনেরা। ইস্‌কাইলাস, সোফোক্লেস, ইউরিপিডেস—এঁদের কল্যাণে সৃষ্টি হ'ল নতুন নাটক, নতুন অভিনয় রীতি। ইস্‌কাইলাস trilogy বা ত্রয়ী নাটকের সৃষ্টি করলেন। একই কাহিনী তিনটি নাটকে এক সংগে গেঁথে দিলেন। 'কোরাস্' বা সমবেত সংগীত যোগ করা হলো। আর যোগ করা হলো দেবদেবীর কাহিনী ও দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যা। সব ছাড়িয়ে নাট্যকারেরা যা প্রচার করলেন, তা হচ্ছে, ট্র্যাজিডির বিষয়বস্তু হবে মহৎ ও মংগলপ্রদ। ট্র্যাজিডিতে আজও এ-রীতি মেনে চলা হয়।

॥ ২ ॥

ইউরিপিডেসের মৃত্যুর সত্তর বছর পরে (অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩৩৬ সালে) আরিস্তোতল তাঁর Poetics গ্রন্থ লিখলেন, তাতে তিনি ট্র্যাজিডির সংজ্ঞা দিলেন এইভাবে—

"Tragedy is a representation of an action, which is serious, complete in itself, and of certain limited length; it is expressed in speech made beautiful in different ways in different parts of the play; it is acted, not merely recited; and by exciting pity and fear it gives a healthy outlet to such emotions."

ট্র্যাজিডির এই সংজ্ঞার মধ্যে আরিস্তোতল ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে অনেক কথাই ব'লেছেন; কিন্তু ট্র্যাজিডি যে বিষাদাত্মক হবে, এমন কথা তিনি বলেন নি। তবে অন্যত্র তিনি বলেছেন, ট্র্যাজিডির পরিণতি দুঃখময় হয় তো হোক, না হ'লেও ক্ষতি নেই।

আরিস্তোতলের মতে, ট্র্যাজিডির action হবে গম্ভীর, সম্পূর্ণ, একটি বিশেষ আকার-সম্পন্ন এবং কাব্যময়। শুধু আবৃত্তি নয়, ট্র্যাজিডির অভিনয়ও করতে হবে। ট্র্যাজিডির দুঃখপূর্ণ অভিনয় দেখে দর্শকের মনে প্রথমে জাগবে ভয়, শেষে দেখা দেবে করুণা বা সহানুভূতি। এই ভয় ও করুণাই নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখ ও প্রেমজনিত নৈরাশ্যের ভাবাতিশয্যকে দর্শকের মন থেকে দূরীভূত ক'রে দেবে। আরিস্তোতলের ভাষায় একে বলে catharsis বা purgation of the emotions। Catharsis কথাটি চিকিৎসা-শাস্ত্রের কথা। দেহে রক্তাধিক্য হ'লে চিকিৎসকগণ যেমন রক্ত বার ক'রে রোগীর দেহকে নিরাময় করেন, ট্র্যাজিডি থেকে উদ্ভূত ভয় ও করুণা তেমনি দর্শকের মনের কৃত্রিম বাসনা-কামনার প্রবণতাকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসে। এই রুদ্ধ ভাবের সহজ নিষ্ক্রমণ না হ'লে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। একটি শোকার্তা নারী সম্বন্ধে টেনিসনও ঠিক এমনি মন্তব্য ক'রেছিলেন।—

"All her maiden watching said,
She must weep or she will die."
(Home they brought her warrior dead).

মানুষ নিজের গভীর দুঃখের কথা অপরকে না জানিয়ে কিছুতেই স্বস্তি পায় না। সেজন্যই বোধহয় মাইকেলের মেঘনাদ-বধের সীতা সরমাকে ব'লেছেন,—
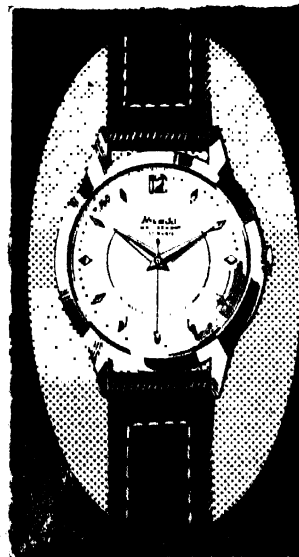
"বরিষার কালে সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারিরাশি দুই পাশে; তেমতি যে মন
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুনলো সরমে।"

আরিস্তোতলের কাল থেকে আজ আমরা অনেক দূর সরে এসেছি। এই দীর্ঘদিন অতিক্রমের মধ্যে নানা লোকের নানা চিন্তার সংঘাতে, আরিস্তোতলের সংজ্ঞাটির মৌল প্রকৃতি ঠিক থাকলেও, কোন কোন স্থানে মতভেদ ঘটেছে। action কথাটির অর্থ ব'লেছেন conflict বা নাটকীয় দ্বন্দ্ব, কেউ ব'লেছেন crisis বা নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর জীবনের চরম অবস্থা। এই action-কে অস্বীকার ক'রে, মেটারলিংক লিখেছেন, Static drama বা স্থিতিশীল নাটক; আর বারনার্ড শ' লিখেছেন, Discussion Play বা তর্কমূলক নাটক। ডক্টর টমসন রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে লিখেছেন,—
"His dramatic work is the vehicle of ideas, rather than expression of action."

আবার প্রসিদ্ধ নাট্যকার পিরানডেল্লো নাটকের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এই ব'লে—
"Drama is action, sir, action, not confounded philosophy."

এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে, নাটক যদি চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়, তবে তাতে গতি না থাকলে কি চলে? নাটকে গতি থাকবেই হবে, সে প্রত্যক্ষই হোক, আর অপ্রত্যক্ষই হোক। প্রত্যক্ষ গতিকে আমরা সাধারণত action বলে থাকি, কারণ তা বাইরে দেখা যায়। কিন্তু পরোক্ষ গতি হৃদয়ের অনুভূতি-সাপেক্ষ; তাই তাকে সাধারণ লোকে বুঝতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও গতি আছে, কিন্তু সে গতি অপ্রত্যক্ষ ও অন্তর্মুখী। আর তাঁর নাটকও সাধারণ নাটকের পর্যায়ে পড়ে না, তা রসাত্মক ও কাব্যপ্রধান। আধুনিককালে ইউরোপেও প্রাকৃতধর্মী নাটকের পাশে এই শ্রেণীর নাটক কিছু কিছু লেখা হয়েছে ও হচ্ছে। তার উদাহরণ হ'চ্ছে, Yeats, Synge, Masefield, Galsworthy, Drinkwater প্রভৃতির লেখা কয়েকখানা নাটক।

আরিস্তোতলের মতে, ট্র্যাজিডি গম্ভীর ভাবাত্মক হবে; কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজিডিতেও সর্বত্র গম্ভীর ভাব রক্ষা করা হয়নি। ইউরিপিডেস দিওনিসুসের সামনে পিথিউস ও প্রেমিককে নিয়ে এসেছিলেন বলে আরিস্তোফেনেস প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শেকস্পীয়রের নাটকেও গম্ভীর ভাবের সঙ্গে লঘু ভাবের অবতারণা করা হয়েছে। নাটকের ভাষা যে কাব্যময় হবে, তাও অনেক মানেন না। নাটক যদি দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী হয়, তাহলে তা কাব্যময় না হ'লেই ভাল হয়। আবার অনেকে নাটককে কাব্য ব'লে মেনে নিয়েছেন।

নাটকের মধ্যে বীভৎস দৃশ্যের অভিনয় প্রদর্শন গ্রীক নাটকে করা হ'ত না। নাটকের কোন্ কোন্ অংশ অভিনীত হবে, কোন্ অংশ আবৃত্তি করা হবে, তার নির্দেশ নাটকের মধ্যেই থাকতো। যে ঘটনা তিনদিন আগে শেষ হয়েছে অথবা বিশ ক্রোশ দূরে ঘটেছে, তাকে নাট্যাভিনয়ের স্থান দেওয়া হ'ত না। এইভাবে নাটকের ঐক্যনীতি মেনে চলার নিয়ম ছিল। কিন্তু সেক্সপীয়রের সময় এ নীতি ভাঙা হয়েছিল।

গম্ভীর ভাবের জন্য সবক্ষেত্রেই যে ট্র্যাজিডি হয় না, তা মনে রাখতে হবে। অনেক ট্র্যাজিডি বলতে বোঝায় চারিদিক উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে ভাবের সমুন্নতি ও উদ্দীপন। অনেক নাটকই অভিনয়কালে দর্শকের মন আকর্ষণ করতে পারে না। এর কারণ তাতে চরিত্রের প্রকাশ থাকে না, দ্বন্দ্বও থাকে না। কতকগুলি ঘটনা একত্র সাজিয়ে দিলে অভিনয় করলে দেখতে ও শুনতে ভাল লাগতে পারে, কিন্তু তাতে মন তৃপ্তি পায় না। তাই নাটকে ঘটনা অপেক্ষা চরিত্রের সাহায্য অধিক প্রয়োজন হয়। চরিত্রগুলি নানা বিরোধের

ভেতর দিয়ে ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে শেষ পরিণতিতে পৌঁছে দেয়। চরিত্র যেমন ঘটনাকে প্রকাশ করে, ঘটনাও তেমনি চরিত্রকে প্রকাশ করে। মহাকাব্যের ন্যায় ট্র্যাজেডির মূল কাহিনীকে আদি, মধ্য ও অন্ত্য—এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এই তিন ভাগের সমন্বয়ে নাটকীয় বিষয় ক্রমোন্নতি লাভ করে সার্থক হয়ে ওঠে। এই তিনটি স্তরের মাঝ দিয়ে চলতে গিয়ে নায়ক-নায়িকার জীবন বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যায়। নায়কের জীবনে ঔদার্য ও মহত্ত্ব থাকায় তার সর্বনাশ তখন সকলের বলে মনে হয়। এই সর্বজনীন বেদনাবোধের কাহিনীকে বলে ট্র্যাজেডি।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"মহৎ ট্র্যাজেডি তাকেই বলে, যা যুগপৎ পাঠক বা দর্শকের চিত্ত শুদ্ধ করে; অথচ এমন কোন ঘটনা সে প্রত্যক্ষ করে, যা তার সংস্কারকে আমূল নাড়া দিয়ে বিহ্বল করে তোলে। গভীর দুঃখেও সে তীব্র আনন্দ বোধ করে। চিত্ত শুদ্ধ হয় বলেই ট্র্যাজেডির আকর্ষণ বেশী, তার প্রেরণা মানুষকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।"

॥ ৩ ॥

গ্রীক ট্র্যাজেডির সঙ্গে পরের যুগের ট্র্যাজেডির তুলনা করলে কতকগুলি প্রভেদ চোখে পড়ে। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে নিয়তি কারণাত্মক কার্যক্রমের বিষয় হলেও এলিজাবেথীয় যুগে তা ছিল না। এলিজাবেথীয় যুগে ব্যক্তির ইচ্ছাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই ব্যক্তির ইচ্ছাই নাটকীয় সংঘর্ষ সৃষ্টির মূলে ছিল। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে ধর্মবোধের প্রাবল্য ছিল প্রধান। গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল, মানুষ দেবাধিপতি জিয়সের ন্যায়দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। পাপ করলেই তাকে শাস্তি একদিন না একদিন পেতেই হবে। গ্রীকদের এই প্রবল নীতিবোধ ইউরোপীয়ানরা কোনদিনই মেনে নেন নি। শেকস্‌পীয়রের নাটকে অদৃষ্টশক্তির লীলা কিছু কিছু দেখা গেলেও শেকস্‌পীয়র সম্পূর্ণভাবে তা স্বীকার করেন নি। শেকস্‌পীয়রের নাটকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব চরিত্রের অপূর্ণতা প্রদর্শন। পৃথিবীতে মানুষ যে প্রতিনিয়তই লড়াই করে চলেছে, সে দৈবশক্তির সঙ্গে নয়, সে তার নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে। প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির, ধর্মের সঙ্গে অধর্মের, বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির, বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের—এরকম কত লড়াই সে করে চলেছে। এই লড়াই-এর ফলে মানবীয় দুর্বলতার ও অজ্ঞতার কত সকরুণ ট্র্যাজেডি ফুটে উঠছে। শেকস্‌পীয়রের নাটকে মানবিক হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা অধিক মাত্রায় থাকায় শেকস্‌পীয়রের নাটক মানবচেতনার অনন্তবোধের ফল নয়। ইবসেনের ব্র্যান্ড, গেটের ফাউস্ট, ব্রাউনিং-এর প্যারাসেলসাস মানবজীবনের যে ট্র্যাজেডি আমাদের সামনে তুলে ধরে, শেকস্‌পীয়রের নাটকে তা পাওয়া যায় না। শ্রীনলিনী গুপ্তের মতে "শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডিতে কামলোক অর্থাৎ মৃত্যুর জগতের চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর চরিত্রগুলি তামসরাজ্য থেকে আহরিত হয়েছে। রাজা লিয়র, ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেট—এ যেন আধুনিক সভ্যজগতের কথা নয়। এরা সবাই যেন তামস যুগের আদিম সমাজের মানুষ। এই তমোরাশির অভ্যন্তরে যে আলোর রেখা তারই প্রতীক যেন করুণ মধুর কার্ডেলিয়া, ডেস্‌ডিমনা, ওফেলিয়া।"

গ্রীকদের সঙ্গে ইংরাজজাতির প্রকৃতিগত প্রভেদ আছে। সুদৃঢ় চিন্তাশক্তি, দৃঢ় সংযম ও প্রসাদগুণে গ্রীকজাতির চিত্তকে শীলবান করে তুলেছিল। গ্রীকদের সাহিত্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজ জাতি প্রাণশক্তির অফুরন্ত নির্ঝর। এলিজাবেথীয় যুগে ইংরাজজাতিকে বিপুল কর্মৈষণা ও ভোগৈষণা সঞ্জীবিত করেছিল। তারই ফলে বহু লোক ছুটেছিল দেশদেশান্তরে, সমুদ্রপারে নতুন সৃষ্টির প্রেরণায়। বিচিত্র রোমান্স সৃষ্টির আবেগ তাদের জীবন ও দৃষ্টিকে করেছিল স্বচ্ছ ও বেগবান। এই প্রাণশক্তির প্রবাহ উৎসারিত হয়েছে শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডিতে। কিন্তু গ্রীকদের সাহিত্যে মিশে গিয়েছে প্রাণের সঙ্গে মনের আবেগ। তাই সে সাহিত্যে কামনার সঙ্গে কামনার সংঘর্ষ নেই। কামনা শুধু মৃত্যুতেই পর্যবসিত হয়। গ্রীকদের সাহিত্যে কামনা রূপান্তরিত হয়ে অতিক্রম করেছে মৃত্যুকে।

শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডিতে মহৎ ব্যক্তির পতন ও মৃত্যুই ট্র্যাজেডির শেষ পরিণতি বলে স্বীকৃত হয়েছে। আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত ব্যক্তিজীবনের করুণ কাহিনী সেখানে ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছে। উচ্চপদস্থ ও মহৎ ব্যক্তির জীবনের ভ্রান্তি ও দুর্বলতা এনেছে বিপর্যয়। কিন্তু এই বিপর্যয় কোনক্ষেত্রেই জীবনের পরাজয় ঘোষণা করেনি, সর্বদা জীবনকে করেছে আত্মনিষ্ঠ ও আনন্দময়। শেকস্‌পীয়রের সাহিত্যে দৈব ও নিয়তির প্রভাব প্রবল না হলেও দুর্বল। নায়কের জীবনের—অন্তর ও বাহিরের সকল প্রকার দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে মৃত্যুতে। মৃত্যুর বাইরের জগতের সংবাদ শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজিডিতে নেই।

আধুনিক প্রকৃতধর্মী ট্র্যাজেডিতে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বই প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয়। এ দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায় ইবসেনের A Doll's House, হাউটম্যানের The Weavers, সাডারম্যানের Magda এবং শ'র Saint Joan প্রভৃতি নাটকে। সামাজিক দুর্নীতি, উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত দূষিত রোগ, মদ্যপান, অতিরিক্ত কাম-বাসনা প্রভৃতি বিষয় জীবনে ট্র্যাজেডির কারণ বলে নির্দেশিত হয়েছে। হাউটম্যানের Before

Sunrise, Rose Bernd, ইবসেনের Ghosts প্রভৃতি নাটকে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। বর্তমানে নিয়তি বলতে মানুষের দুর্দমনীয় পশু-প্রবৃত্তি ও বংশ-পরম্পরাগতভাবে প্রাপ্ত গুণাগুণকে বুঝিয়ে থাকে। এই নিয়তির বশেই মানুষ প্রতি-নিয়ত পতনের দিকে এগিয়ে চ'লেছে। প্রাচীন নিয়তিবাদ এখন নতুন অর্থে গৃহীত হয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান আবার প্রবৃত্তিকে বড় ক'রে মনের সজ্ঞান ও নিজ্ঞান দ্বন্দ্বকে ট্রাজিডির কারণ ব'লে নির্দেশ করেছে। মনের চেতন-অচেতন শক্তির দ্বন্দ্ব দেখান হয়েছে ও' নীলের The Great God Brown, Days Without End নাটকে। মেটারলিংকের নাটকে আত্মার নিগূঢ় রসের সন্ধান মেলে। মেটারলিংকের রহস্যময় রসসৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় রসতত্ত্বের কিছুটা নৈকট্য দেখা যায়। বর্তমানের কোন কোন নাটকে শ্রেণীসংঘর্ষও প্রাধান্য পাচ্ছে। শ্রমিক ও ধনিকের সংঘর্ষ সোবিয়েৎ রাশিয়ার অনেকগুলি নাটকে স্থান পেয়েছে। আন্টন চেকভের মতে, বর্তমান-কালের ট্রাজিডির লক্ষণ হচ্ছে, বিফলতা ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জীবনের পরাজয় (the essentials of tragedy are defeat by frustration and attrition)। সাংকেতিক ও নয়া-রোমান্টিক নাটকে অদৃষ্টবাদ বা নিয়তির লীলা আবার প্রধান হয়ে উঠছে। মেটারলিংক ও আঁদ্রে-ইয়েভের লেখায় তা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। মেটারলিংক বলেছেন,—"জীবনের প্রকৃত ট্রাজিডির স্বরূপ তখনই প্রকাশ পায়, যখন তথাকথিত কর্মস্রোত অবসিত হয় এবং প্রতিকূলতামূলক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। এইভাবে কালে কালে ট্রাজিডির ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হয়েছে ও হচ্ছে।

॥ ৪ ॥

ট্রাজিডির রসবোধের মূলে থাকে তিনটি উপাদান—দুঃখবোধ (suffering), সংঘর্ষ (struggle) এবং কার্যকারণত্ব (causality)। Pathos বা কেবল দুঃখবোধ থাকলে তাতে শোকের উৎপত্তি হয়। কেবলমাত্র সংঘর্ষে বীরত্ব প্রকাশ পায়। আবার কেবলমাত্র কার্য-কারণত্বে যুক্তিসিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু ট্রাজিডি সৃষ্টি হয় এই তিনের সমন্বয়ে। মোটামুটিভাবে ট্রাজিডি বলতে বোঝায়—

"The tragedy is the kind of effect provided by the sight of a losing struggle carried on between a strong but imperfect individuality and the overpowering forces of life."—(Woodbridge).

ট্রাজিডিতে দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে চরিত্র সৃষ্টি করা হয়। প্রথম দিককার পাশ্চাত্য নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা বহির্দ্বন্দ্ব প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে বেশী। এখন তা বদলে যাচ্ছে। এ সম্বন্ধে লুকাস লিখেছেন—

"We come to realise how surely and steadily during the centuries between Marlows and Tehekove the 'action' of tragedy has passed from outside the characters to within them, from the board to the theatre of the soul, so that at best the whole difference between action and passion tends to fade away." (Tragedy)

গতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে গেলে কাহিনী ও তার বিন্যাস কৌশলের প্রয়োজন হয়। এই কাহিনী বিন্যাসের চাতুর্যে নাট্যকারের শক্তি প্রকাশ পায়। নাট্যকার যে চরিত্র সৃষ্টি করেন তা নাটকীয় গতি সৃষ্টির জন্য। তা যদি না হয়, তবে পাত্র-পাত্রীর মুখে চোখা চোখা কথা দিলেও, নাটকের ট্রাজিক রস সৃষ্টি হয় না। ট্রাজিডির মধ্যে খণ্ড খণ্ড ঘটনাগুলি সুসংবদ্ধ হলেই নাটক সার্থকতা লাভ করে। এরিস্টোতল ব'লেছেন,—

"Fable being an invitation of an action should be an imitation of an action that is one and entire, the parts of it being so connected that if any one of them be either transposed or taken away the whole will be destroyed or changed; for whatever may be either retained or omitted, without making any sensible difference, is not properly a part."—(Poetics).

ট্রাজিডির নায়ক সম্বন্ধে আরিস্তোতল ব'লেছেন,—

"He (a tragic hero) falls from a position of lofty eminence; and the disaster that wrecks his life may be traced not to deliberate wickedness but to some great error of frailty." (Poetics).

সুতরাং ট্রাজিডি সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে—

"In tragedy which is the noblest form of drama the poet imitates the action of the great."—(Poetics).

ট্রাজিডির নায়ক স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় যখন নিজের বুদ্ধির দোষে, কর্মের শিথিলতায়, চিত্তের অনিশ্চয়তায় অথবা দৃঢ়তার অভাবে নিজের বিনাশকে নিজেই

ডেকে আনেন, তখনই ট্রাজিডি পাঠকের মনকে স্পর্শ করে। লুকাস বলেছেন,—

"For it is the perpetual tragic irony of the Tragedy of Life that again and again men do thus labouriously contrive their own annihilation."—(Tragedy).

ট্রাজিডিতে মহৎ ব্যক্তির জীবনের করুণ কাহিনী বিবৃত হবে ব'লে সেকালের আলংকারিকরা যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এ-কালে তা কিছু কিছু বদলে গিয়েছে। আঠার শতক থেকে ইংরেজী সাহিত্যে গার্হস্থ্যধর্মী (Domestic) ট্রাজিডির সূত্রপাত হয়। সেই থেকে ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণীর মানুষের ব্যথাবিধুর জীবন-মাধুরী সাহিত্যে প্রকাশ করার রীতি প্রচলিত হয়। ১৭৬৮ সালে Beaumarchais লিখেছেন—

"The genuine heart-interest, the true relationship, is always between man and man, and not between man and king. And thus, instead of exalted rank of the tragic characters adding to my interest on the contrary it diminished it."

এ উক্তি কেবল ট্রাজিডি সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, কমেডি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। আজ আর সেই "প্রখ্যাতবংশ্যঃ রাজর্ষি-ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্" ব্যক্তির জীবনের তীব্র মধুর পরিণতি নিয়েই নাটক লেখা হয় না। যে-কোন লোকের স্বপ্নময় ও প্রদীপ্ত জীবন-কাহিনী নিয়ে ট্রাজিডি বা কমেডি লেখা হয়। ট্রাজেডি ও কমেডির কোন আদর্শগত প্রভেদ নেই। শুধু জীবনের লঘু ও সহজ দিকটা ফুটে ওঠে কমেডিতে; আর ট্রাজেডিতে প্রকাশ পায় জীবনের গভীরতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি,—

"কমেডি এবং ট্রাজিডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদ। কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয়, তাহাতেও আমাদের হাসি পায় এবং ট্রাজিডিতে যতদূর পর্যন্ত যায়, তাহাতেও আমাদের চোখের জল আসে। ...অসংগতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।" —(পঞ্চভূত)

সুতরাং জীবনধর্মের মধ্যে অসংগতিবোধ ট্রাজিডি ও কমেডি—উভয়েরই উপজীব্য বিষয়।

॥ ৫ ॥

ট্রাজিডির মূলগত অনুভব হ'চ্ছে জীবন-স্বপ্নের পরাজয়ের একটা অনতিক্রম্য দুঃখ। জীবনে যিনি দুঃখ ভোগ করেন, তাঁর কাছে দুঃখ কাম্য নয়। তিনি দুঃখের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা, তাঁর কাছে দুঃখ আনন্দদায়ক। দুঃখের কাব্যে আনন্দের উপলব্ধি আছে বলে, দুঃখের কাব্য আমাদের অতি প্রিয়। মানবজীবনে দুঃখ একটি সত্যবস্তু, তাই দুঃখচেতনা মানুষের মনকে গভীর করে তোলে। শিল্পী, দার্শনিক, সাহিত্যিক চিরকাল মানুষের এই দুঃখের দিকটি তাঁদের শিল্পসৃষ্টির বিষয়-বস্তু ক'রেছেন। কমেডির ভাবের মধ্যে যে লঘুতা থাকে, তা গাঢ় হলেই ট্রাজিডিতে পরিণত হয়। অপূর্ণতার দুঃখবোধ মানুষকে সত্যের সন্ধানী করে তোলে। ট্রাজিক শিল্পী দুঃখের সেই সত্যরূপটি তাঁর সৃষ্টিতে ফুটিয়ে তোলেন।

ট্রাজিডিকে বলা হয় বেদনার শিল্পরূপ। তার মানে হচ্ছে, বেদনার সঙ্গে মিলিয়ে আছে আনন্দ। আনন্দ না থাকলে শিল্প হয় না। ট্রাজিডি বেদনা ও আনন্দের মিলিত রূপ। সব সৃষ্টির শেষে আনন্দ থাকতেই হবে; কারণ ঐক্যের জগতে বেদনা নেই। থিয়েটারে আমরা দুঃখময় নাটক দেখে শুধু কাঁদি না, যথেষ্ট আনন্দও পেয়ে থাকি। তা না হ'লে সে নাটক দেখতে যেতাম না। মোট কথা, সাহিত্য, চিত্র, সংগীত—যাকেই আমরা শিল্প বলি, তারই মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে আনন্দ। সে সুখের কথাতে হোক্, আর দুঃখের কথাতেই হোক্।

ট্রাজিডির রসোপলব্ধির মূল কথা লৌকিকও নয়, অলৌকিকও নয়—এই দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থা শিল্পবস্তুর আনন্দ সাধারণ সুখ-দুঃখ থেকে ভিন্ন। একেই সংস্কৃত আলংকারিকরা বলেছেন 'করুণরস'। সংস্কৃত আলংকারিকরা দুঃখময় নাটক লেখার বিধান দেননি, কিন্তু করুণরসাত্মক রচনা যে মানবচিত্তের আনন্দ-বিধান করে, সে-কথা বলেছেন। 'সাহিত্য-দর্পণে' আছে—

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎপরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥"

অর্থাৎ করুণ প্রভৃতি রসে মনে যে অপূর্ব সুখ উৎপন্ন হয়ে থাকে, তার একমাত্র প্রমাণ হৃদয়বান্ লোকের নিজের চিত্তের অনুভূতি। সংস্কৃত সাহিত্যে করুণরসপ্রধান কাব্যও যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে, তার উদাহরণ হচ্ছে 'উত্তররাম চরিত' ও 'রঘুবংশ'। করুণরসের ব্যাখ্যায় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন,—

"কবি যখন তাঁর প্রতিভার মায়াজালে এই লৌকিক শোক ও তার লৌকিক কারণের এক অলৌকিক চিত্র কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন, তখনি পাঠকের মনে রসের উদয় হয়, যার নাম 'করুণরস'। এই করুণরস শোকের 'ইমোশন' নয়। শোক হচ্ছে দুঃখদায়ক, কিন্তু কবির কাব্যে মনে যে করুণরসের সঞ্চার হয়, চোখে জল আনলেও, মনকে অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ করে। এ কথা কাব্যের আস্বাদ যার আছে, সেই জানে। যদিও একে প্রমাণ ক'রে দেখান কঠিন।"—(কাব্য-জিজ্ঞাসা)

সংস্কৃত আলংকারিকরা অশ্রুভোলা নাটক লেখার বিধান না দিলেও, সংস্কৃত ভাষার

সুপণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় অশুভান্ত নাটক লেখার পক্ষে মত দিয়েছেন। মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—

"সকল সংস্কৃত নাটকেরই উপসংহার শুভান্ত হয়—অশুভান্ত বর্ণন সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে নিষিদ্ধ। কিন্তু ইংরাজি-কাব্যে অশুভান্ত ঘটনা অনেক দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেগুলিই আবার তজ্জাতীয় কাব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট। ওরূপ বর্ণনা পাঠ পূর্বে আমাদের ভাল লাগিত না। কিন্তু বোধহয় কালভেদে বা অবস্থাভেদে রুচিভেদ হইয়া থাকে—সুতরাং আমাদেরও রুচি কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে—এজন্য এখন আমরা বুঝিতে পারি যে, করুণরসের উদ্দীপন করাই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে অশুভান্ত ঘটনার বর্ণনা দ্বারা সে রস যেরূপ উদ্দীপ্ত হয়—অন্য কোনরূপে সেরূপ হইতে পারে না। আরও আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদিগের আদিকাব্য রামায়ণ, সীতার পাতাল প্রবেশরূপ অশুভান্ত ঘটনাতেই পর্যবসিত। অথচ তাহা কোন আলংকারিকই অযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অশুভান্ত বলিয়া আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি বোধ হইল না।" (বাংলাভাষা বিষয়ক প্রস্তাব)

উপরের উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা গেল যে, অশুভান্ত উপসংহার করুণরস সৃষ্টির পক্ষে বাধাস্বরূপ নয়, বরং সহায়ক। এ বিষয়ে ইউরোপীয় মনীষীরাও ঐ একইরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তার প্রমাণ হচ্ছে শেলীর বিখ্যাত লাইন 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought'

উপনিষদে আছে, মানুষ হচ্ছে ভূমার উপাসক। অল্পে তার সুখ নেই। কিন্তু ভূমার সাধনা দুঃখের সাধনা, কঠিন সাধনা। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক, কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজিডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখং। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়। আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে, লীলা যদি না থাকে তবে বুক যেত ফেটে।—(সাহিত্যের পথে)

॥ ৬ ॥

সেকালের মানুষের কাছে একটা প্রধান সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছিল, তা হচ্ছে মৃত্যু। একালেও মৃত্যু আছে, তবে সে মৃত্যু দৈহিক মৃত্যু না হ'লেও পারে। জীবনের পরাজয়ও এক প্রকার মৃত্যু। মৃত্যু এসে যখন মানুষের আশাতরুর মূলগুলি কেটে দিয়ে যায়, তখন সে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ব'লে মনে করে। মৃত্যুর রহস্যময় রূপটি সে বুঝবার চেষ্টা করে, কিন্তু

বিহ্বলে মানুষ তা বুঝে উঠতে পারে না। আদিকালে অপরিণত মন নিয়ে এই মৃত্যুকেই মানুষ অদৃষ্টশক্তি বা fate বলে ধরে নিয়েছিল। সেদিন তার উপলব্ধি হয়েছিল, অদৃষ্ট দেবতার কার্যকলাপে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। ভয়ের মধ্যে দিয়ে মানুষ প্রথমে তাকে জেনেছিল। পরে অদৃষ্ট-শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত নৈতিক আদর্শ থেকে একটা কল্যাণবুদ্ধি জেগেছিল। বিশ্বপরিধির সবই যে কল্যাণমুখী এ জ্ঞান তার হয়েছিল। মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ জাগরিত হওয়ায়, ভয় ও দীনতা ক্রমে দূরে সরে গেল। গ্রীক ট্রাজিডিতে পরম কারুণ্য ও কল্যাণবোধ এইজন্যই স্থান পেয়েছিল। রামায়ণ মহাভারতে দুঃখের কথা থাকলেও, তাতে মানবাত্মার জয় ঘোষিত হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় লিখেছেন,—

"মৃত্যুর্যস্য ছায়ামৃতম্—উপনিষদের দেবতার মত ট্রাজিডিও তাহার আনন্দকে জমাইয়া তুলিয়াছে মৃত্যুর অভিনিবেশে। মৃত্যুর রসেই ট্রাজিডির পাক। ... প্রতিষ্ঠা যেখানে বিসর্জনের হাত ধরিয়া চলিয়াছে, সেইখানেই ট্রাজিডির মাধুর্য দেখা দিয়াছে। ট্রাজিডির মাধুর্য এক মধুর [illegible] এক তীর, এক [illegible], এক তীর, [illegible] কারণ অমৃতকে [illegible] মৃত্যুর [illegible] ফাটাইয়া দেওয়া [illegible]। [illegible] ফলের [illegible] মাধুর্য কোথায়? আশু, পূর্ণ বিকাশের সার্থকতা আবর্তনের পরেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ার নির্বাণের মধ্যে হারাইয়া যাইতেছে। অমরতাও এই হারাইয়া ফেলিবার [illegible] বর্তমান [illegible] জড়াইয়া রহিয়াছে [illegible] করিয়া তুলিয়াছে। অমৃত আছে কিন্তু তাহা দেখা দিতেছে মৃত্যুর ফাঁকে ফাঁকে। তাই অমৃতে এত মাদকতা, তাই সে মৃত্যুও অমৃতেরই তুল্য।"—(রূপ ও রস)

এ জগৎ, যেখানে মৃত্যুই অমৃতের ভিয়ান দিচ্ছে, তা হচ্ছে প্রাণময় জগৎ, তার নাম কামলোক। এই কামলোকের ধর্ম—ভোগ, বাসনা, বেদনার মধ্যে তৃপ্তি, অতৃপ্তির মধ্যে আনন্দ। এমন প্রাণী আছে যে সন্তানের জন্ম দিয়েই মৃত্যুকে বরণ ক'রে নেয়, তাতেই তার আনন্দ। এই অমোঘ আকর্ষণের নামই বেদন বা বেদনা। বেদনা আনন্দের একটা বিশেষ রূপ তৈরী ক'রে দিচ্ছে। কামনা এবং বাসনার শেষ পরিণতি হ'চ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুই পদেপদে জীবনের গতিতে টেনে দিচ্ছে যতি। বিচ্ছেদের মধ্যে আনছে শান্তি। যুগে যুগে তাই কবিশিল্পী রচনা করেছেন ট্রাজিডি। ট্রাজিডির মধ্যে মানুষ শুনতে পায় আপনার মর্মবাণী।

॥ ৭ ॥

এই ট্রাজিডির রস ভারতবর্ষের অন্তরাত্মায়ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে ভারতীয় চিন্তা ইউরোপীয় চিন্তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষ প্রাণ ও মনকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের মানসিক সাধনার স্বাভাবিক পরিণতি ঘটেছিল সমৃদ্ধ লোকে। ভারতীয় ঋষিরা সে বৃহৎ সত্যকে জেনেছিলেন। তাঁরা মৃত্যুর ভেতর দিয়ে অমৃতলোকের দুয়ারে গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

ভারতীয় সাহিত্যে এই রসসাধনার তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হয়েছে। ভারতবর্ষ বাসনা, কামনা, বুভুক্ষার কথা ভাবেনি। ভারতবর্ষ তন্ময় হয়েছিল সব ছাড়িয়ে বিস্ময়লোকের আনন্দে। তাই আমরা দেখতে পাই, নিছক ট্রাজিডি ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেনি।

ইউরোপীয় সাহিত্য মৃত্যুকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। আরিস্টোটল বলেছেন, ট্রাজিডির শক্তিতে রসলোকে কামনার আনন্দ বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। একটা বিপুল দুঃখের কাহিনী দর্শকের মনে জাগিয়ে তোলে করুণা ও সহানুভূতি। কিন্তু এতেও ট্রাজিডির মধ্যে একটা বেদনার রেশ রয়ে যায়। অন্তরাত্মা মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান দিলেও, মৃত্যুকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না।

কিন্তু ভারতবর্ষের আত্মা আধ্যাত্মিক পূর্ণতার আনন্দে বিলসিত। তাই ভারতবর্ষ ইউরোপীয় ট্রাজিডির আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। ইউরোপীয়েরা ট্রাজিডিকে যে-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, ভারতবর্ষ সে-ব্যাখ্যা গ্রহণ করেনি। ভারতবর্ষ ট্রাজিডির বিচ্ছেদ-[illegible] অন্তর্নিহিত মাধুর্যটুকু গ্রহণ [illegible] তাই ভারতের কাব্যে করুণরস [illegible] ওঠেনি। ভারত জীবনের যে [illegible] পৌঁছেছিল, সেখানে 'কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ' ছিল না। ভারতবর্ষের কবিদের অনুভব ছিল বিশুদ্ধ আনন্দ।

ভারতীয় চিন্তায় ভাঙার কথা নেই, শুধু গড়ার কথা। খণ্ড সত্য অপেক্ষা পূর্ণ সত্যের কথা ভারতবর্ষ শুনতে চেয়েছিল। তাই ভারতীয় সাহিত্যের মূলতত্ত্ব হ'ল মিলন ও শান্তি। এই হিসাবে ভারতীয় সাহিত্যে ট্রাজিডি ছিল না বলেই মনে হয়। রামায়ণ-মহাভারতকে যদি ট্রাজিডি ব'লে মেনে নিতে হয়, তাহ'লে তা হ'চ্ছে দৈবী ট্রাজিডি। মহাকবি দান্তের চিন্তাধারা ভারতীয় আদর্শের অনুকূল। তাঁর Divine Comedy মিলনান্তক হ'লেও ট্রাজিডির রসে ভরপুর। সে গ্রন্থের নামও দৈবী ট্রাজিডি দিলে অন্যায় হ'ত না।

ভারতীয় সাহিত্যের মূলকথা হ'চ্ছে প্রবৃত্তির মধ্যে নিবৃত্তির আনন্দ। কামনা, বাসনা বা দুঃখবোধের কথা যে সেখানে নেই, তা নয়। তবে ভারতের আত্মা হ'চ্ছে মিলন-মুখী, সত্ত্বগুণাত্মক। পরিণামে ভারত চায় সৃষ্টির আনন্দ। তাই ভারতীয় সাহিত্য বিচার ক'রতে গিয়ে বলা চলে না, শকুন্তলা কেন মিরান্দা হ'ল না বা দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান কিং লিয়রের থেকে ভিন্ন হ'ল কেন? এর উত্তর হচ্ছে, বিচ্ছেদের রসে ইউরোপীয় কবিদের সৃষ্টি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, মিলনের আনন্দে ভারতের সাহিত্য সার্থক হয়ে ওঠে। এই দুই দেশের প্রকৃতির এই ভিন্নতা না বুঝলে এই দুই দেশের সাহিত্য-বিচারেও ভুল হ'তে পারে।

মানুষের জীবনে তিনটি পর্ব লক্ষ্য করা যায়—আদি পর্ব, যুদ্ধ পর্ব ও শান্তি পর্ব। একটির সঙ্গে আর একটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে। এই ক্রম সাহিত্যসৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায়। মহাকাব্য বলুন, ট্রাজিডি বলুন, আর যে-কোন শিল্পসৃষ্টিই বলুন, এই ক্রমবন্ধনে সকলই বাঁধা পড়েছে। এই বিভাগ ভারতবর্ষ যেমন বুঝেছিল, ইউরোপ তেমন বোঝেনি। ইউরোপে দ্বন্দ্ব থেকে জীবনের উদ্ভব, দ্বন্দ্বের মধ্যেই তার পরিসমাপ্তি। ভারতীয় সাহিত্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও পরিণতিতে কেবল শান্তি। কিন্তু তাই ব'লে তুলনামূলক বিচারে এই দুই দেশের সাহিত্যের মধ্যে একটিকে ভাল, আর একটিকে মন্দ বলা যায় না। দুই দেশের সাহিত্যে পরিপুষ্টি লাভ করেছে, আপন আপন ধ্যান ও ধারণা অনুসারে। ভালমন্দের প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

॥ ৮ ॥

এবার বাংলা নাটকের কথা কিছু আলোচনা করা যাক। ইংরিজি নাটকের অভিনয় দেখে একদিন বাঙালী ছাত্রদের মনে অভিনয়ের স্পৃহা জেগেছিল। সেদিন তারা ইংরিজি নাটক, এমন কি সংস্কৃত নাটকের ইংরিজি ক'রে অভিনয় শুরু ক'রেছিল। নাট্যাভিনয়ের যে খাঁটি দেশী আদর্শ তখন এদেশে প্রচলিত ছিল, তা তারা বর্জন করেছিল। সুতরাং একথা অনায়াসেই বলা চলে যে, বাঙালীর নাট্যপ্রীতি আদৌ তার নিজস্ব নাট্যরস-প্রেরণা থেকে আসেনি। ধনীর বদান্যতায় কিছুটা আমোদ-প্রমোদ করার উদ্দেশ্যেই তখনকার দিনে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হ'ত। আর যে সব নাটকের অভিনয় হ'ত, তাও এত চটুলভাবে পূর্ণ থাকতো যে, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশকে নাটক বলা যায় কিনা সন্দেহ। মধুসূদন তাদের 'অলীক কুনাট্য' বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেগুলির বিরূপ সমালোচনা ক'রেছেন।

সামাজিক প্রহসন ও পৌরাণিক কাহিনী ঘটিত নাটক বাঙালীর জাতিগত রসপিপাসার অনুকূল। বিলিতি নাট্যকারদের অনুকরণে রোমাণ্টিক ট্রাজিডি ও ঐতিহাসিক নাটক লেখা সত্ত্বেও, কোন উচ্চশ্রেণীর নাটক বাংলায় সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে সমালোচক মোহিতলালের মত হচ্ছে এই:—"আসল কথা, বাঙালী নাটক বুঝে না, চায়ও না। বিলাতী নাটকের দেখাদেখি action ও চরিত্র-রচনা করিতে চায় বটে, কিন্তু আমাদের মজ্জাগত ভাব-দুর্বলতা—সেই ভগবানে আত্মসমর্পণ—নাটক অপেক্ষা গীতি-নাট্যেরই অধিক উপযোগী।......আমরা এই জগৎ ও জীবনের, তথা মনুষ্য-ভাগ্যের দুর্জ্ঞেয় রহস্য চাক্ষুষ করিয়া যে একটি অপূর্ব অনুভূতি-রসে আপ্লুত হই, তাহাই শ্রেষ্ঠ নাটকীয় কবি-কল্পনা। ইউরোপীয় সাহিত্যের কবিদৃষ্টি এই কবি-কল্পনাকে গভীর হইতে গভীরতর রহস্যের সন্ধান দিয়াছে; তাই ট্রাজিডি-জাতীয় নাটকেই তাঁদের কবিশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখা যায়।

বাংলা নাটক ইংরিজি নাটকের আংশিক অনুসরণ ক'রে গ'ড়ে উঠলেও অতি-ভাব-প্রধান ব'লে তা সার্থক হ'য়ে উঠতে পারেনি। ভক্তিভাবের প্রাবল্য, ঘটনা, চরিত্র ও সংস্কৃতির শিথিলতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা নাটককে দুর্বল ক'রে তুলেছে। বাংলা ট্রাজিডি বাঙালীর কাছে জনপ্রিয় হ'লেও, আগা-গোড়াই তা করুণরস-প্রধান। রসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে, লৌকিক অবস্থাকে ছাড়িয়ে যাওয়া, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে পাড়ি দেওয়া। ইউরোপীয় আদর্শ অনুসরণ ক'রে অনেকেই একে দোষই ব'লেছেন। বাংলা নাটক সম্বন্ধে মধুসূদন একবার বন্ধু রাজ-নারায়ণকে লিখেছিলেন,—

"In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairylands."

ইংরিজী ট্রাজিডির আদর্শে বাংলা ট্রাজিডি বিচার করলে, তা অতিশয় অসার্থক ব'লেই মনে হবে। ইংরিজী নাটকে সংগঠনের মধ্যে যে দৃঢ়তা, কাহিনী, চরিত্র এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে যে পারম্পর্য ও কার্যকারণত্ব লক্ষ্য করা যায়, বাংলা নাটকে তা প্রায়ই দেখা যায় না। বাংলা নাটকে অতিভাবের আতিশয্যে অনেক সময় তা কান্না হ'য়ে ওঠে। ইংরিজিতে যাকে বলে মেলোড্রামা, বাংলার অধিকাংশ ট্রাজিডিই এই মেলোড্রামার অন্তর্ভুক্ত।

মধুসূদনের পূর্বে বাংলা ভাষায় লেখা দু'খানি বিয়োগান্তক নাটকের নাম পাওয়া যায়। প্রথমখানি যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস-নাটক', দ্বিতীয়খানি উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ-নাটক'। এ দু'খানির রচনাকাল যথাক্রমে ১৮৫২ ও ১৮৫৬ সাল। এ দু'খানি নাটক রচনার দিক দিয়ে অকিঞ্চিৎকর। চরিত্র-বিশ্লেষণ, কাহিনী রচনা ও নাট্যরস সৃষ্টির কোন চেষ্টাই এ দু'খানি নাটকে নেই।

মধুসূদনের পরে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণ' নাটক সর্বজনপরিচিত। কিন্তু এখানিকে একটি সার্থক নাটক বলা যায় না। এ একখানি প্রচারধর্মী নাটক, আগাগোড়াই রোমাঞ্চকর ঘটনায় পূর্ণ। কাহিনী শিথিল, চরিত্রসৃষ্টি দুর্বল। কে যে এর প্রধান চরিত্র, তা বোঝা যায় না। রসসৃষ্টির বদলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়াস এতে অধিক। নাটক হিসাবে এ-বই সার্থক নয়।

ট্রাজিক নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' বহুখ্যাত নাটক হ'লেও, করুণরসের আতিপ্রাধান্য থাকায়, ট্রাজিডির ক্রিয়া তাতে শিথিল হয়ে পড়েছে। চরিত্র-গুলির মধ্যে অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নেই, বিরূপ অবস্থাকে মেনে নেওয়ার চেষ্টাই প্রধান। নাট্যকার সর্বত্রই হৃদয়াবেগের আতিশয্যে একটানা দুঃখের কাহিনী শুনিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহানে' পাশ্চাত্য ট্রাজিডির সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। কিন্তু সাজাহানের সম্রাট রূপ মুছে গিয়ে, পিতার রূপটি প্রধানভাবে ফুটে ওঠায়, তা কান্না হয়ে উঠেছে। পিতৃস্নেহের প্রাবল্যে সমগ্র নাটক-খানি করুণ হয়ে উঠেছে। তাঁর অপরিচিত স্নেহ রাজা লিয়রের স্নেহের মতই আত্মঘাতী হয়েছে। কিন্তু রাজা লিয়র বিপরীত শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে, যে মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন, সাজাহানে তা নেই। তাই 'রাজা লিয়র' ট্রাজিডি হয়ে উঠেছে, কিন্তু 'সাজাহান' তা হয়নি। গ্রন্থের শেষে নাট্যকার ঔরংজেবের সঙ্গে সাজাহানের মিলন ঘটিয়ে দিয়েছেন। তিনি ব'লেছেন, 'ইতিহাসে এ কথা নেই। এর অর্থ কানয়োদীমারেই বুঝবেন।'

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকেও তাই হয়েছে। গ্রন্থের শেষে কান্না প্রাধান্য-লাভ করেছে অর্থাৎ রাজসিংহ ও ঔরংজেব আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছেন। ইতিহাসে তা ঘটেনি। এ নাটকখানি বাংলা-সাহিত্যে একখানি উৎকৃষ্ট নাটক হ'তে পারতো, যদি এ থেকে কয়েকটি অবান্তর ও অসম্ভব ঘটনা বাদ দেওয়া হ'ত। ঔরংজেব ও উদিপুরীর অন্তরের দ্বন্দ্ব এ নাটকে খুবই রসোচ্ছল হয়ে উঠেছে। নাট্যকার একটু সাবধান হ'লেই, একে সহজেই শিল্পমূর্তি দিতে পারতেন। কিন্তু হৃদয়াবেগের আতিশয্যে তা ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর 'নরনারায়ণ' নাটকখানি ট্রাজিডি হ'লেও, সমাপ্তিতে দৈবীভাব প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বিরোধীপক্ষের লোক হ'লেও, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মৃত্যুকালে কর্ণের মুখ দিয়ে নাট্যকার বলিয়েছেন,—

"বাসুদেব—বাসুদেব
একবার সম্মুখে দাঁড়াও নর!
সম্মুখে দাঁড়াও নারায়ণ!"

দৈবের জয় ও পুরুষকারের পরাজয়ে এখানে ইউরোপীয় ট্রাজিডির আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অশান্তি থেকে নাটক পৌঁছেছে প্রশান্তিতে, অবশ্য এ নিয়ম সকল পৌরাণিক নাটকেই মানা হয়।

রবীন্দ্রনাথের নাটকও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। 'রাজা ও রাণী'তে সুমিত্রার মৃত্যুর পর রাজা গভীর শোকে অভিভূত হয়ে বললেন,—

"দেবি, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই ব'লে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির অপরাধী ক'রে?"

হৃদয়াবেগের আতিশয্যে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হ'ল নাটকের সমাপ্তি। আবার বিসর্জনের সমাপ্তি দেখুন। রঘুপতি বলছে—

"পাষাণ ভাঙিয়া গেল, জননী আমার
এবার দিয়াছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা।
জননী অমৃতময়ী।"

পাষাণ প্রতিমার বিসর্জনে অমৃতময়ী জননীর প্রতিষ্ঠা হ'ল—এ ভাবটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ ধারণা। রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে, এ রকম সমাপ্তি নাটকের পক্ষে সমীচীন নয়। তবু, তিনি তা দিয়েছেন এবং এ নাটক সম্বন্ধে ব'লেছেন—

"কেহ বলে, ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক
লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি।"

॥ ৯ ॥

উপরের নাটকগুলি আলোচনা ক'রে বোঝা গেল যে, ইংরিজি নাটকের মত বাংলা নাটক সার্থক হয়ে না উঠলেও, বাংলা নাটকের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং তা হ'চ্ছে তার গীতিপ্রবণতা ও করুণরসের প্রাধান্য। এই গীতিপ্রবণতার জন্য বাংলা নাটক ট্রাজিডি না হয়ে সর্বত্রই হয়ে উঠেছে দৈবীভাবে পূর্ণ গীতিকাব্য। এখানে বাঙালী নাট্যকারেরা ভারতীয় আদর্শকে কিছুটা অনুসরণ ক'রেছেন, যদিও আংশিক রচনায় তাঁদের আদর্শ হ'চ্ছে ইংরিজী নাটক। যে মধুসূদন এ-দেশের নাটককে ব'লেছেন all softness, all romance, সেই মধুসূদনও তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' পাশ্চাত্ত্য আদর্শকে সম্পূর্ণ সফল ক'রে তুলতে পারেন নি। পাশ্চাত্ত্য নাট্যশাস্ত্রের রীতির কথা তাঁর জানা থাকলেও মনে হয়, পাঁচজন বাঙালীর মত মধুসূদনের ভাবপ্রবণ মন কৃষ্ণকুমারীর দুঃখে বিগলিত হয়েছিল। তাই এই বিভ্রান্তি। দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি সব বাঙালী নাট্যকারই অতিশয় ভাবপ্রবণ। তার মধ্যে গিরিশচন্দ্রই বিলাতী নাটক ও যাত্রা-নাটক—এই দুয়ের কিছুটা সমন্বয় ক'রে বাঙলা নাটককে বাঙালীর হৃদয়ের সামগ্রী ক'রে তুলেছিলেন। সেজন্য গিরিশচন্দ্রকে অনেকে জাতীয় নাট্যকার ব'লে থাকেন।

বাঙলা ট্রাজিডিতে অনন্যসাধারণ স্বতন্ত্রতা এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি ইংরিজী আদর্শ একেবারে পরিত্যাগ ক'রে প্রাচীন ভারতের আদর্শকে তাঁর নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যদিও মোহিতলাল ব'লেছেন, "এত বড় গীতিকবির নাট্যকার হওয়া আর পরম ভাগবত বৈষ্ণবের তান্ত্রিক হওয়া একই কথা", তথাপি নাটকের আকারে রবীন্দ্রনাথ যে কাব্য রচনা করেছেন তার মূল্য নিরূপণ করা সহজ নয়। নাটকের পোশাকে কাব্যকে তিনি নূতনতর শক্তি দান করেছেন।

বাঙলা নাটক ইংরিজী নাটকের মত সার্থক হয়নি কেন, এ নিয়ে দুঃখ ক'রে লাভ নেই। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব চিন্তা, নিজস্ব সাধনাকে অবলম্বন ক'রে নাটক গ'ড়ে ওঠে। তা ছাড়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবও প্রত্যেক দেশের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। বাঙালীর মনোধর্ম ঠিক ইউরোপীয় জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুরূপ নয়। তাই তার সাহিত্য-সৃষ্টি ইউরোপীয় সাহিত্যের আদর্শ থেকে ভিন্ন। একজন সমালোচক লিখেছেন, "রুক্ষ পর্বতসংকুল গ্রীসদেশের এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের আবহাওয়ায় যে ট্রাজিডির জন্ম ও প্রসার, বাংলা দেশের নরম মাটিতে তার সম্পূর্ণ করুণরসে রূপান্তর খুবই স্বাভাবিক।" বাঙালী 'পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখীর ডাকে জাগে'। তার চারদিকের প্রকৃতি কাব্যময়। তাই তার সাহিত্য যেমন করুণ, তেমনি মধুর, তেমনি কবিত্বে ভরা। বিরোধ বা বিচ্ছেদ তার চিন্তায় স্থান পায় না। বিরোধ থাকলেও, সেই বিরোধের মধ্যেই সে পায় শান্তির সন্ধান।

নাটক নিয়ে আমাদের যে বিভ্রাট হ'য়েছে, তা ঐ বিদেশী আদর্শকে অনুকরণ করার জন্য। বিদেশী নাটকের অনুকরণ আমাদের ছাড়তেই হবে। আগামীকালের বাঙালীর যে নাটক হবে, তাতে থাকবে তার ভাব-জীবনের প্রতিচ্ছবি। তার গঠন, সংলাপ ও চরিত্র-সৃষ্টি হবে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ সেদিকে অনেকটা কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর অধিকাংশ নাটকেই ইংরিজী নাটকের মত অংক ও দৃশ্য-বিভাগ নেই। সংলাপ, চরিত্র-সৃষ্টি ও কাহিনী রচনায় তিনি নতুনত্ব এনেছেন। তবে তাঁর চরিত্রগুলির আত্ম-প্রকাশের পথে বাধা না থাকায়, সেগুলি অনেক সময় একঘেয়ে হয়ে পড়ে, আর কাহিনীও দুর্বল ব'লে মনে হয়। অতি-কথনও তাঁর নাটকের একটা প্রধান দোষ। অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথের সুউচ্চ ধারণা সর্বসাধারণের বোধগম্য নয়। তাঁর রূপক ও সাংকেতিক নাটকগুলি কেবলমাত্র শিক্ষিত লোকদেরই উপভোগ্য। একজন বিশিষ্ট সমালোচক তো স্পষ্ট ক'রেই ব'লেছেন, তাঁর নাটকগুলি আমাদের দুর্গাপ্রতিমার মত: সুন্দর রং, বিচিত্র গঠন, রাংতার চাকচিক্য সবই আছে, নাই কেবল প্রাণ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রচনা ভাবপ্রধান ও মাধুর্যগুণে গরিষ্ঠ হওয়ায়, তা গঠনে ও সামঞ্জস্য সাধনে বলিষ্ঠ নয়। তা হোক, তবু রবীন্দ্রনাথকেই আমাদের অনুসরণ করতেই হবে। তাঁর পথে চ'লে, তাঁর নাটক থেকে প্রেরণা নিয়ে, আমাদের নতুন নাটকের পরিকল্পনা করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ বহুবার ব'লেছেন, আমাদের নাটককে যাত্রার আসরে নামিয়ে আনতে হবে এবং যাত্রাকেও মার্জিত ক'রে ওপরে তুলতে হবে। আগামীকালের যে নাটক হবে, তা ঠিক যাত্রাও নয়, আবার বিলাতী আদর্শের নাটকও নয়। তা হবে দুয়ের মাঝামাঝি বাঙালী-হৃদয়ের রসবোধ ও রুচির প্রকাশক। নাটকের গঠনেও একটা সুসংগত দৃঢ়তা আনতে হবে।

এই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, শুধু নতুন ধরনের নাটক রচনা করলেই চলবে না, সেই সঙ্গে নতুন ধারায় অভিনয় ও রঙ্গপীঠও তৈরী করতে হবে। শহর ছেড়ে যেতে হবে পল্লীতে এবং তার সঙ্গে সহ-যোগিতা থাকবে রাষ্ট্র-নিয়ন্তাদের। তা না হ'লে নাটক ও নাট্যশালার কোনদিনই উন্নতি হবে না।

কথা। এবং যে হেতু এ জন্যে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সহায়তা একান্ত আবশ্যক, তাই উদারনীতির চেয়ে যুদ্ধ-প্রস্তুতি নীতিই তিনি বেছে নিয়েছেন। অসাম্যবাদী পৃথিবীর নায়ক আমেরিকা, তার অর্থ ও অস্ত্র ছাড়া এ পৃথিবীর অধিকাংশই বিপন্ন।

বিশাল পৃথিবীকে সাম্যবাদী ও সাম্যবাদবিরোধী দুইটি সীমা-নির্দিষ্ট শিবিরে পরিণত করা ডালেস পররাষ্ট্রনীতির ছিল অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। যারা কোন শিবিরেই ভিড়তে অনিচ্ছুক সে সব তথাকথিত নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব অপ্রসন্ন। পশ্চিম য়ুরোপকে যুক্তরাষ্ট্র সত্যই রক্ষা করেছে সাম্যবাদ থেকে; আজকের য়ুরোপ বলতে যা কিছু বোঝায় তার অনেকখানিই মার্কিন দাক্ষিণ্য ও নেতৃত্বের সাফল্য। গত পাঁচ বছরে সাম্যবাদ যে শুধু উত্তর ভিয়েৎনাম ব্যতীত অন্য কোন নতুন দেশে স্বীয় পতাকা ওড়াতে পারে নি ডালেস সাহেবের এটাই শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। প্রায় পঞ্চাশটি দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আজ প্রতিষ্ঠিত; এই ঘাঁটিগুলি তিনদিক থেকে রাশিয়াকে ঘিরে রেখেছে সংগ্রামপ্রস্তুত সেনা ও রসদ নিয়ে। ঊনষাটটি দেশ মার্কিন অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যে উপকৃত, অনুগৃহীত। এশিয়া ও আফ্রিকায় কম পক্ষে বারোটি দেশ এই অর্থ-অস্ত্র সাহায্যের বিনিময়ে তাদের পররাষ্ট্রনীতির স্বাধীনতাকে কমবেশি খর্ব করেছে। আদর্শগত ও এক-স্বার্থজাত যে ঐক্য ১৯৫৫ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বান্দুং মহাসম্মেলনে এক অভিনব আশার আলো বিকীর্ণ করেছিল সে সম্পদ থেকে এশিয়া-আফ্রিকা আজ অনেকখানি বঞ্চিত। এখানেও মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাফল্য।

মধ্যপ্রাচ্যে আজ পৃথিবীর দুইটি মহাশক্তিরই ছায়া পড়েছে। আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়েই শীতল যুদ্ধের এই আধুনিকতম রণক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অবতীর্ণ। এখন যে লড়াই শুরু হয়েছে শতাব্দী-পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ-জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম থেকে তা সম্পূর্ণ আলাদা। এ সংগ্রাম পরিপূর্ণ আগ্রাসী; উভয় শিবির থেকেই সমান সরবে দোহাই দেওয়া হচ্ছে আরব স্বাধীনতার। শুধু তফাত হল এই যে, আমেরিকা তার প্রভাব বিস্তারের জন্যে সহায়তা নিচ্ছে একদিকে যতদূর সম্ভব বৃটেনের, অন্যদিকে আরব নৃপতিদের বা জনসমর্থনহীন এক নেতৃকুলের। যে বিস্তীর্ণ ও বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদকে আমেরিকা বিরোধী করে তুলেছে তাকেই সন্তুষ্ট করতে তৎপর হয়ে উঠেছে রাশিয়া। তাই আরব সমাজে বর্তমান দিনে রুশ প্রভাব ক্রমবর্ধমান।

আমরা দেখেছি ডালেস চেয়েছিলেন আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মার্কিন

মিতালির গোড়াপত্তন করতে পারেন নি। প্রথমত, ইংরাজের বিরোধিতায়, দ্বিতীয়ত ধৈর্যের অভাবে। বাগদাদ চুক্তির চরম প্রয়োজন মিশরকে বিরোধীপক্ষ করে তুললো; যে নাসেরকে ফারুক-নির্বাসন পর্বের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে আমেরিকাই সাহায্য করেছিল, সেই নাসেরই হয়ে দাঁড়ালেন ডালেসের প্রধানতম আরব প্রতিপক্ষ; সেই নাসেরই মধ্যপ্রাচ্যে পথ করে দিলেন রুশ প্রভাবের। যে মিশরকে ডালেস কোনদিন জানবার, চেনবার, বোঝবার চেষ্টা করেননি, তারই মাধ্যমে আরব ভূমিতে মার্কিন নীতির আজ কঠিনতম প্রতিরোধ।

ট্রুম্যান ডকট্রিন থেকে বাগদাদ চুক্তি পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের প্রথম পর্যন্ত মার্কিন মধ্যপ্রাচ্যনীতির মূল প্রেরণা ছিল সাম্যবাদবিরোধিতা, রাশিয়ার প্রভাব সম্প্রসারণের পথরোধ করা। মিশর নিয়েই ডালেস একটা প্রকৃত যুরোপ-নিরপেক্ষ রাজনীতির সূচনা করেন, মিশরেই সে নীতির প্রথম একটা আশাপ্রদ স্ফুরণের

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, মিশর নিয়েই আইসেনহাওয়ার ডক্ট্রিনের পথ ধরে সে নীতি বর্তমান পর্যায়ে উপনীত। মিশর-সিরিয়াকে আরব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার যে-প্রয়াস বর্তমান মার্কিন নীতির প্রধান কাম্য তারই মধ্যে নিহিত এ নীতির পরাজয়ের বীজ।

সুয়েজ সংকটের সূচনা করেন জন ফস্টার ডালেস। কাইরোতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত চার্লস্ বাইরড এবং পররাষ্ট্র দপ্তরে মধ্যপ্রাচ্য বিভাগের অধিকারী জর্জ এ্যালেন উভয়েই ছিলেন নাসের সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁরা খবর পেলেন বান্দুং-এর পরেই নাসেরের মিশর সম্পর্কে রুশ নীতির হঠাৎ পরিবর্তন হচ্ছে। শেপিলভের প্রভাবে ক্রেমলিনের পররাষ্ট্রদপ্তরে সূচনা হচ্ছে নতুন এক আরব নীতির। বাইরড ও এ্যালেন ডালেসকে পরামর্শ দিলেন আসোয়ান বাঁধ নির্মাণে মিশরকে সাহায্য করতে। ডালেস অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই রাজী হয়ে গেলেন। তিনি আশা করেছিলেন সাহায্যের বিনিময়ে নাসের অন্তত পরোক্ষভাবে বাগদাদ চুক্তিতে সমর্থন করবেন। ডালেসের অনুরোধে একদিকে বিশ্বব্যাংক অন্যদিকে [illegible] ও [illegible] সাহায্য দানে স্বীকৃত হয়।

কিন্তু এর মধ্যে কয়েকটা অভাবনীয় ঘটনা এসে গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে ডালেস [illegible] পেলেন মার্কিন কংগ্রেসের একজন প্রভাবশালী সদস্য মিশরকে নির্মাণ-সাহায্য দেবার ঘোর বিরোধী। [illegible] [illegible] থেকে [illegible] ডালেস জানতে পেলেন [illegible] [illegible] আরব-[illegible] [illegible] [illegible] কয়েকজন প্রধান রুশ নেতা এবং আসোয়ান বাঁধ নির্মাণে রুশ সাহায্যের যে সংবাদ পেয়ে তিনি প্রথমে [illegible] তা গুজব মাত্র। ডালেস ভাবলেন নাসের রুশ সাহায্যের ব্যাপারটা স্রেফ ধাপ্পা হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আসলে রুশ সরকার তখনো সাহায্যের ঠিক কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি, যে সহানুভূতিশীল বাক্যাবলী তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন নাসেরের পত্রের উত্তরে, তা থেকে মিশর সরকার একটা আশাপ্রদ অনুমান গ্রহণ করেছিলেন। নাসেরের ইচ্ছা ছিল আমেরিকা ও বৃটেনের সাহায্য নিয়েই আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ করা; তিনি রুশ সাহায্য নিতে চান নি তার রাজনৈতিক ফলাফল বিচার করে। বরঞ্চ তিনি বিশেষ করে চেয়েছিলেন পূর্ব ইউরোপ থেকে তাঁর সৈন্যবাহিনীর জন্যে অস্ত্র আমদানী করতে। এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পশ্চিম শক্তি-ত্রয়—বৃটেন ফ্রান্স এবং আমেরিকা—অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে একটা বিচিত্র নীতি অনুসরণ করে আসছিল ১৯৫০ সাল থেকে। ইসরাইল আর আরব পাবে সমান ভাগ। অর্থাৎ ইজরেইল যদি পায় পাঁচটি ট্যাংক, সমস্ত আরব দেশগুলি মিলে পাবে পাঁচটি। এর ফলে ইজরেইলের সামরিক শক্তি যেমন বাড়ছিল, মিশরের তেমনই কমে যাচ্ছিল। নাসের সেনাপতিদের সাহায্য নিয়ে সার্থক করে তুলেছিলেন তাঁর বিপ্লবকে। প্যালেস্টাইন যুদ্ধে মিশরের শোচনীয় সামরিক পরাজয়ের স্মৃতি সেনাপতিরা বিস্মৃত হন নি। তাঁরা চাপ দিচ্ছিলেন নতুন অস্ত্রের জন্যে, সৈন্যদলকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্যে। এ দাবী নাসের উপেক্ষা করতে প্যারেন নি, করলে তাঁর বিপ্লবী-শাসন বিপন্ন হতো। পশ্চিমী দেশ থেকে অস্ত্র পাওয়া অসম্ভব,—গোপন পথ ছাড়া। তাই নাসের বাধ্য হলেন রাশিয়ার কাছে অস্ত্র ক্রয়ের অনুরোধ জানাতে। কিছুদিন ইতস্তত করে রুশ সরকার রাজী হলেন। কিন্তু নিজে এ দায়িত্ব না নিয়ে, তুলে দিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার হাতে।

ডালেস এই অস্ত্র-সরবরাহ চুক্তির খবর পেয়ে একদিকে যেমন শঙ্কিত হলেন অন্যদিকে তেমনি নিশ্চিন্ত। শঙ্কিত হলেন এ জন্যে যে রুশ প্রভাব আরব ভূমিতে একবার সংস্থাপিত হলে তার [illegible] পরিচিত চেহারা একেবারেই বদলে যাবে। নিশ্চিন্ত হলেন কেননা আসোয়ান বাঁধ নির্মাণে যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসে কঠিন প্রতিরোধের সৃষ্টি করেছে এ সুযোগে তা প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হবে। অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে চেক সরকার মিশরের সঙ্গে যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন সব দিক দিয়েই তা বাইরের অনুকূল। প্রত্যেক বছর মিশর সরকারকে তুলো বেচতে বিশ্ব প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকা। তুলোর দাম ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মিশরী চাষী পরিবারের দরিদ্র জীবন-মান ওঠে, নামে। চেক সরকার অস্ত্রের মূল্য তুলো আমদানী করে শোধ নিয়ে মিশরকে অনুমতি দিলেন—শোধ কয়েক বছরের মধ্যে। তাতে তুলোর একটা বাজার কয়েক বছরের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে রইল। ডালেস ব্যাপারটাকে অন্য রং মাখালেন। তিনি বললেন [illegible] [illegible] বছরের জন্য তার শ্রেষ্ঠ পণ্য রাশিয়ার কাছে বন্ধক রেখেছে, আসোয়ান ঋণ শোধ করার ক্ষমতা তার নেই। ১৯৫৬ সালের ১৬ই জুলাই ডালেস ডেকে পাঠালেন মিশরী রাজদূতকে। পররাষ্ট্র দপ্তরে তাঁর প্রশস্ত কক্ষে নাসেরের দূত যখন এসে বসলেন, তাঁর মুখে পরিষ্কার আশার চিহ্ন। তিনি নিশ্চিন্ত যে একটু পরেই কাইরোতে এক শুভ সংবাদ পাঠাতে পারবেন। কিন্তু ডালেস মিশর-চেক অস্ত্র চুক্তির উল্লেখ করে, মিশরের আর্থিক অবস্থাকে দূষিত আখ্যায় ভূষিত করে যখন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করলেন, এই নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতায় মিশরদূতের মুখ অপমানে রক্তিম হয়ে গেল। ডালেসের সঙ্গে
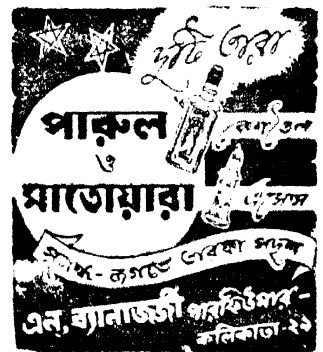
করমর্দন না করেই তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন এবং দূতাবাসে পৌঁছেই কাইরোতে জরুরী "তার" পাঠালেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বৃটেন ও বিশ্বব্যাংকও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করল।

ডালেসের মধ্যপ্রাচ্যনীতি নিয়ে "ওয়াশিংটন ইভনিং স্টার" পত্রিকায় ডরোথি টমসন ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে এক নিবন্ধে লিখেছেন, "আমেরিকার নীতি-নির্মাতারা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি বিরাট শক্তির কিভাবে চলা উচিত তার বিন্দুমাত্রও জানেন বলে মনে হয় না। পররাষ্ট্র বিভাগের উপর এমন সব প্রভাব রয়েছে যার কাম্য মধ্যপ্রাচ্যে এক্ষুনি একটা চরম শক্তিপরীক্ষা হয়ে যাক। সবাই জানে এ প্রভাব আসছে কোথা থেকে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার বা পররাষ্ট্রসচিব ডালেস দুজনেই এহেন শক্তি-পরীক্ষার বিরোধী। তাঁরা শুধু "যুদ্ধং দেহি" ভাব দেখাতে চান, তার উপর কিছু নয়। ডালেস বিংশ শতাব্দীর মধ্য-পথের চেহারার সঙ্গে পরিচিত নন। মার-মুখী কূটনীতির ব্যর্থতা তিনি স্বীকার করতে চান না। আসলে মারমুখী কূটনীতিও তিনি এড়িয়ে চলতে চান। তিনি শুধু হলিউড এবং টেলিভিশনে প্রচারমুখী কূটনীতির অধিকারী। আরব দেশগুলিকে যাঁরা একটুও জানেন তারাই বলবেন এই কূটনীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য। ডালেসকে সংযত ও স্থির থাকতে হবে, নয়তো আমেরিকার পরাজয় অনিবার্য। কূটনীতি কেবলমাত্র কতগুলি প্রচারধর্মী আস্ফালন নয়। বৃহৎ শক্তিদের প্রচার-এজেণ্টের প্রয়োজন হয় না। তাদের চাই আত্মসম্মান-বোধ, সংযম ও সহজ বুদ্ধি।"

ডরোথি টমসনের ভাষা কঠিন। কিন্তু সুয়েজ সংকটের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিননীতির মধ্যে আত্ম-সম্মানবোধ, সংযম ও সহজ বুদ্ধির অভাব প্রত্যেক পর্যায়ে অনুভূত হয়েছে।

আসোয়ান বাঁধ নির্মাণে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি অমন হাল্কা অজুহাতে প্রত্যাহার করে ডালেস আমেরিকার সম্মানকে গুরুতর আঘাত করেছিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম, সম্পন্নতম দেশ আমেরিকা; তার কথার দাম অত ছোট হলে বিশ্বের দরবারে তার নেতৃত্ব ক্ষুন্ন হয়। শুধু তাই নয়। ডালেস ভাবতেও পারেন নি প্রত্যুত্তরে নাসের সুয়েজ-খালকে মিশরের সার্বভৌম আওতায় নিয়ে আসবেন; ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "আমেরিকা, তুমি তোমার নিজের রোষাগ্নিতে নিজেই জ্বলে মরোঃ আজ থেকে সুয়েজ খাল চালাবে মিশর, মিশর মিশর।" ব্রিয়োনীতে নেহরু এবং টিটো নাসেরকে নিমন্ত্রণ করে বিশ্বের অদলীয় অংশের অন্যতম নেতৃত্বের আসনে স্থান দেওয়ায় ডালেস কুপিত হয়েছিলেন। ব্রিয়োনী থেকে ফিরে এসেই নাসের সুয়েজশাসন মিশরের হাতে তুলে নিয়ে ডালেসকে ভারত ও যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিও সন্দেহবান করে তুলেছিলেন। নেহরু যে এ বিষয়ে সত্যিই কিছু জানতেন না এ কথা বিশ্বাস করতে ডালেসের অনেক সময় লেগেছিল।

বহুদিন আগে মেকিয়াভেলি বলেছিলেন, দেবে একটু একটু করে, আঘাত হানবে একেবারে। সে পথ অনুসরণ করে বৃটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণের উদ্যোগ শুরু করলো সুয়েজ খাল জাতীয়করণের অব্যবহিত পরেই। এ যুদ্ধ প্রস্তুতি চললো অতি গোপনে, যদিও ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে বেশির ভাগ সংবাদপত্রই 'যুদ্ধ চাই' বলে চেঁচাতে লাগলো। সমরায়োজনের তথ্য ওয়াশিংটনে পৌঁছুতেই ডালেস প্রমাদ গণলেন। ১৯৫৬ সালের আগস্ট থেকে আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের হিড়িক লেগে গেল। মার্কিন জনসাধারণের কাছে আইসেন-হাওয়ারের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি শান্তিকামী। কোরিয়ার যুদ্ধ তিনি নিবিয়েছিলেন; বার বার পৃথিবীকে যুদ্ধের সীমানায় ডালেস ঠেলে নিলেও তিনিই যুদ্ধ ঘটতে দেন নি। এখন যদি মধ্যপ্রাচ্যে নতুন এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে আমেরিকা জড়িয়ে পড়ে, ডালেস ভাবলেন, তবে আইসেন-হাওয়ারের পরাজয় অনিবার্য। ডালেস মনস্থির করলেন তাঁর প্রধান প্রচেষ্টা হবে যুদ্ধ বন্ধ রাখা। যে সংকট প্রধানত তাঁরই সৃষ্টি, তার পরিণাম ডালেসকে অভিভূত করে দিল।

ডালেস জরুরী তার পাঠালেন লণ্ডন ও প্যারিসে সুয়েজ নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠকের অনুরোধ জানিয়ে। ইডেন ও মলেন এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন দুইটি উদ্দেশ্যেঃ প্রথমত, এই শান্তিমূলক উদ্যোগের অন্তরালে গোপন যুদ্ধ প্রস্তুতির সুযোগ মিলবে; দ্বিতীয়, মিশরের বিরুদ্ধে গঠন করা যাবে একটি ঘনিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধ আন্তর্জাতিক জনমত। আগস্টে যখন লণ্ডনে একুশটি দেশের বৈঠক বসলো, ডালেস নিজেই প্রস্তাব করলেন সুয়েজ খালকে স্থাপন করা হোক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার শাসনে। কনফারেন্সের বাইরে ইংরেজ ও ফরাসী মনোভাবকে নরম করতে তিনি চেষ্টা করলেন। কিছুটা পারলেনও। ভারতকে তখন ডালেস গভীর সন্দেহের চোখে দেখেন। তাই কৃষ্ণ মেননের প্রস্তাব, যা গ্রহণ করলে অনেক কলঙ্ক থেকে বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা রেহাই পেতো, ডালেস প্রত্যাখ্যান করলেন। বরং ডালেস দেখাতে পারলেন আন্তর্জাতিক সুয়েজ শাসন বোর্ড স্থাপনে জাপান, পাকিস্তান এবং ইরান নিরপেক্ষ। তাঁর প্রস্তাব অবশ্য অনুমোদিত হল ১৮টি দেশের সমর্থন পেয়ে। কিন্তু ডালেস বুঝতে পারলেন পশ্চিম য়ুরোপ ও এশিয়া-আফ্রিকায় মিশরকে আহত করার প্রস্তাব স্বাগত হবার সম্ভাবনা নেই।

এবার এই আঠারটি দেশের অনুমোদিত প্রস্তাব নাসেরের কাছে পৌঁছান চাই। ডালেস প্রস্তাব করলেন কনফারেন্সের একটি সাবকমিটি এ প্রস্তাব নিয়ে যাক কাইরোতে। তাঁর ইচ্ছা ছিল এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে নাসেরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলুক। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্স তখন আক্রমণের দিন গুনছে, এই ব্যর্থ কূটনৈতিক চালটা যতো শীঘ্র শেষ হয়, ততোই তাঁদের পক্ষে শ্রেয়। তারা ডালেসের প্রস্তাব মেনে নিলো, কিন্তু এই শর্তে যে সাবকমিটি কোন আলাপ-আলোচনা করতে পারবে না; শুধু নাসেরের সামনে প্রস্তাবটি রেখে বলবে, "বলো, হাঁ কিংবা না!" আমেরিকায় ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত জন ফস্টার ডালেস আর একটি মারাত্মক ভুল করলেন, এই শর্ত মেনে নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মেনজিসের নেতৃত্বে সাব-কমিটি কাইরোতে অর্থ-সংক্রান্ত কাটিয়ে এলো, মেনজিসের "চরম পত্র" নাসের অগ্রাহ্য করলেন।

ক্রমশ

এক নদীতে দ্বইবার স্নান সম্ভবে না

দার্শনিকেরা বলেন এক নদীতে দ্ব'বার স্নান করা সম্ভব নয়। মান্বষ সম্বন্ধে একথা আরও সত্য। নিয়ত সঞ্চরমাণ চৈতন্য প্রবাহ মান্বষকে অবলম্বন ক'রে চলেছে, এই ম্বহ্বর্তের মান্বষ পর ম্বহ্বর্তে থাকে না। এক মান্বষের সঙ্গে দ্ব'বার কথা বলা সম্ভব নয়। জলপ্রবাহ নিয়ত পরিবর্তনশীল, নদী মাত্র অপরিবর্তিত। চৈতন্যপ্রবাহ পরিবর্তনশীল, মন্বষ্যরূপী সংস্কার অপরিবর্তিত। কিন্তু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে নদী ও মান্বষ দ্বই-ই চঞ্চল। সব নদীতে স্রোতবেগ সমান নয়, সব মান্বষে চৈতন্যপ্রবাহ সমান গতিশীল নয়। মহানদীতে ও মহাপ্বর্বষে পরিবর্তন দ্রুততর।

যে-রামবাব্ব মালদ গিয়েছিল আর যে-রামবাব্ব মালদ থেকে ফিরলো কেবল তত্ত্বিচারে তারা ভিন্ন নয়—ব্যবহারিক বিচারেও তাদের ভেদ প্রকট হ'য়ে উঠল।

বিনা নোটিশে রাম বস্বকে ফিরতে দেখে পত্নী অন্নদা ঝংকার দিয়ে উঠল—কথা নেই বার্তা নেই অমনি এসে পড়লেই হল।

উত্তম বীণা যন্ত্র ও সাধ্বী পত্নীর বিনা কারণে ঝংকৃত হয়ে ওঠা স্বভাব।

আগে হ'লে রাম বস্ব উত্তর দিত, হয়তো বলতো নিজের বাড়িতে আসবো তার আবার এত্তালা কি, হয় তো বলতো যখন শালাদের বাড়িতে যাবো—তোমাকে দিয়ে আগে এত্তালা পাঠাবো। ঐ উপলক্ষ্যে স্বামী স্ত্রীতে এক পশলা ঝগড়া হ'য়ে যেতো। কিন্তু এখন তেমন উদ্যম করলো না, শ্বধ্ব একবার হেসে বলল, ভালো লাগলো না, চলে এলাম। তাছাড়া অনেকদিন তোমাদের দেখিনি।

মরি, মরি, কত সোহাগরে, ব'লে অন্নদা বলয় ঝংকৃত হাতখানা তার ম্বখের কাছে বার কতক নেড়ে দিল।

পত্বরোত্তম বা নেব্ব নাড়ুদাকে পেয়ে খ্বশী হ'ল তার সঙ্গে জ্বটে গেল।

অন্নদা লক্ষ্য করলো যে রাম বস্ব এবারে কেমন যেন নীরব, সর্বদা মন-মরা হ'য়ে থাকে, নইলে বাইরে বাইরে ঘ্বরে বেড়ায়।

রাম বস্ব বার হ'তে যাচ্ছে দেখে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ ভাগাড়ে যাচ্ছ?

একটা চাকুরি ছেড়ে এলাম আর একটা খ্বঁজে বার করতে হবে তো। চলবে কি ক'রে?

কেন ধিঙ্গিপনা ক'রে, যাও খ্বরিস্তানগ্বলোর সঙ্গে গিয়ে ঘোরো গে। দিলে তো কাঁটা মেরে বিদায় ক'রে।

নিরুত্তর রাম বস্ব চাদরখানা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে যায়।

ঝগড়ার ম্বখে নিরুত্তর স্বামী স্ত্রীর পক্ষে অসহ্য। উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বইজনে ভাগ করে নেবে এই হ'ল গিয়ে কলহের গার্হস্থ্য বিধি। কিন্তু দ্বর্ভাগাক্রমে স্ত্রীকে একা প্বর্ব পক্ষ ও উত্তর পক্ষ করতে হলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার আঁচ পাড়া প্রতিবেশীর গায়ে গিয়ে লাগে। স্বামীর ভৎর্সনাকে স্ত্রী প্রেমের বিকার ব'লে গ্রহণ করে, কিন্তু স্বামীর নীরবতার অর্থ অবহেলা। কোন্ সাধ্বী স্ত্রী তা সহ্য করবে? রাম বস্বর নিরুত্তর অবহেলায় কালবৈশাখীর অতর্কিত কর্কশ মেঘ-গর্জনের মতো চীৎকার ক'রে উঠল অন্নদা—এমন পাষাণের হাতেও পড়েছিলাম। এবং ম্বহ্বর্তেই কালবৈশাখীর বিপ্বল বর্ষণে সংসার ক্ষেত্র পরিপ্লাবিত করে দিল—হাড় জ্বললে গেল, হাড় জ্বললে গেল, এখন মরণ হলেই বাঁচি।

অভীষ্ট ফলোদয়ে বিলম্ব হল না, পাশের বাড়ির বর্ষীয়সী বাম্বন গিন্নি এসে উপস্থিত হ'ল।

কি আবার হল কায়েৎ বউ, এতদিন পরে সোয়ামী ঘরে এলো, অমন ক'রে কি কাঁদতে আছে!

সোয়ামী ঘরে এলো তো আমার চোদ্দ প্বর্বষ স্বর্গে গেল। এখন মরণ হলেই বাঁচি বাম্বন দিদি।

তবে সত্যি কথা বলি কায়েৎ বউ—ব'লে ধীরে স্বস্থে আসন গ্রহণ ক'রে মধ্বর উপদেশের সঙ্গে তীব্র বিষ মিশিয়ে দিয়ে, তেমন ক'রে মধ্বতে বিষে মেশাতে কেবল মেয়েরাই পারে, বলল, সত্যি কথা বলি বাছা, প্বর্বষ মান্বষ একটু গায়ে গতি আশা করে, কেবল নাকে কাঁদলে কি প্বর্বষের মন পাওয়া যায়। তুমি তো বাছা কাঠের প্বতুল—আমার কথা যদি শোনো—

কথা শোনাবার স্বযোগ বাম্বন গিন্নির ঘটলো না, ছিন্ন-জ্যা ধন্বর্যষ্ঠির মতো উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো অন্নদা,—তোমাকে তো সাতটা বাঘে খেয়ে ফ্বরোতে পারবে না, তবে বাম্বন দাদা সারা রাত বাইরে বাইরে কাটায় কেন? বলি আমাকে আর ঘাঁটিয়ো না।

এত বড় অপবাদেও বাম্বন গিন্নি বিচলিত

হ'ল না, আত্মস্থভাবে ধীরে সুস্থে বলল, তোমরা তো আসল কথা জানো না—তাই ঐ রকম ভাবো, বামুন শ্মশানে গিয়ে শব সাধনা করে—তান্ত্রিক কি না!

তবু যদি সব না জানতাম। শ্মশান হচ্ছে গিয়ে সোনাগাছি আর শবটি হ'ল কান্তমণি।

ভরি পরিমাণ দোক্তা মুখের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বামুন গিন্নি বলল, এত কথাও জানো, তোমার কর্তাটির সংগে দেখা হয়ে ছিল বুঝি, না, তোমার নিজেরই যাওয়া আসা আছে ঐ দিকে।

তবে রে শতেক খোয়ারী মাগী—

তখন অবিচলিত বামুন গিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পদে অগ্রসর হতে হতে শেষ বিষটুকু ঝেড়ে বিদায় হল—

এখন থেকে রাতের বেলায় বরটাকে আর অত দূরে যেতে দেবো না বলবো পাশের বাড়িতেই শবের জোগাড় হয়েছে, চণ্ডালের শবের অনুসন্ধান করছেন কি না নেকড়া!

এ কথার যোগ্য উত্তর মানবভাষায় সম্ভব নয় বুঝে অন্যতম সম্মার্জনীর সন্ধান করছিল। সশস্ত্র প্রত্যাবর্তন ক'রে দেখল শত্রু প্রস্থিতা। তখন সে মনের আক্রোশ [illegible] শত্রু অধিকৃত স্থানটির উপরে সম্মার্জনী বর্ষণ করতে শুরু করলো, মধু মধু তুই শুকিয়ে পাটকাঠি হবে শাঁখচুন্নি মরবি।

টুশকি বলে কাত্যেন্দা এবারে তোমার রকমসকম কিন্তু ভিন্ন রকম দেখছি।

কি রকম দেখছিস বল্‌ না।

কথাবার্তা আর আগের মতো নয়।

রাম বসু বলে, সবে আর বহুকাল চুপ করে থাকতে নেই—এবারে ভিতরের দিকে নিবত চলিয়ে দিচ্ছি।

সেখানে রস জোগাচ্ছে কে, গৌতমী নাকি? শুধায় টুশকি।

রাম বসু হেসে বলে কে ঐ ছোট্ট মেয়েটা? তার সাধ্যি কি?

রেশমী বলেছিল, কাত্যেন্দা আমার নামটা আর গাঁয়ের নামটা প্রকাশ করো না। মুখ পুড়িয়েছি, কে কোথায় চিনে ফেলবে!

রাম বসু বলে, তা ছাড়া চণ্ডী বক্সির ভয়টাও আছে।

রেশমীকে গৌতমী বলে উল্লেখ করে ন্যাড়া আর রাম বসু।

টুশকি শুধায় মেয়েটাকে একদিন নিয়ে এসো না। খুব দেখতে ইচ্ছা করে।

ওকে আনা সহজ নয় রে, সে এখন সাহেব বাড়ির দাসী, মেম সাহেবরা খুব ভালোবাসে।

তবে একদিন আমাকেই কেন নিয়ে চলো না সেখানে।

কি বলে পরিচয় দেবো?

বলবে ওর দিদি।

আচ্ছা দেখি, আজকাল গৌতমী দেখা করবার সুযোগ পাই কম।

টুশকি বললে, কাত্যেন্দা অনেক দিন পরে এলে, আজ রাতটা এখানে থাকো না।

রাম বসু একটু ভেবে বললে না, অন্যদিন থাক।

কেন কাব্যের সৌতিন ভয়ে নাকি। কেমন আছে বৌদি।

সে তোর ঐ চরকাটার মতো, যত ঘোরে তার চেয়ে বেশি শব্দ করে, ঘ্যানর ঘ্যানর করে তার চেয়ে বেশি।

টুশকি বলে, আহা কি সুখের তোমার জীবন।

রাম বসু কিছু বলে না, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

টুশকির কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাম বসু, চলতে থাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে এপথ সেপথ ধরে।

সন্ধ্যাকাশের উত্তাপ শক্তিতে ছিল অভাব-বিলাসী মানুষ ইন্দ্রনাথ সে জানতো একদিন এ ঐশ্বর্য সময়ে বিদ্যুদ্দীপ্তশিখা, জ্যোৎস্নাদীপ্ত দাবানলে সার্থক হবে তার নিষ্প্রভ জীবন। সহসা নামলো বহু-প্রতীক্ষিত শিখা; ইন্ধনরাশি ঊর্ধ্বোত্থিত করযুগলে ব'লে উঠল, ধন্য হল আমার প্রতীক্ষা, সার্থক হল আমার জীবন, যত দাহ সার্থকতা তত অধিক।

রাম বসুর মন পর্বতচূড়াস্থ ইন্ধনস্তূপ, রেশমী বিদ্যুৎবহ্নিশিখা।

মধ্যযুগের জীবনমানদণ্ড ছিল পাপ আর পুণ্য। নবযুগ বদলে ফেললো পুরাতন মানদণ্ড, তার বদলে গ্রহণ করলো নূতন মানদণ্ড সুন্দর আর কুৎসিত। নবযুগের চোখে যা সুন্দর তাই পুণ্য, যা কুৎসিত তাই পাপ। নবযুগে শিল্পী, মধ্যযুগে সাধক। নবযুগের প্রথম মানুষ রাম বসুর চোখে সৌন্দর্যের অরুণোদয় উদ্ঘাটিত হল রেশমীর দিব্য সৌন্দর্য। রাম বসু প্রচ্ছন্ন কবি।

রামরামের যখন সম্বিৎ হল সে দেখলো কেরি সাহেবের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছেছে—তখনও একবার দেখা করেই যাই না কেন। সদরের দিকে দরজায় এসে সে ডাক দিল রেশমী, রেশমী।

বকলমে প্রেম

রাম বসু শুধালো, হাঁরে রেশমী তারপরে কেমন আছিস বল।

রেশমী বললো, অনেক ভালো। বেশ সুখে হবে [illegible] ছেড়ে দিদি খুব ভালো বাসে।

[illegible] দিদি?

[illegible] সংগে [illegible] দেখা হয় না। আর [illegible] দূর থেকে [illegible] তাদের অনেক [illegible]

[illegible]

[illegible] জন সাহেব।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] কাদের [illegible] আর [illegible]

[illegible]

[illegible] সরকার!

[illegible] একেবারে [illegible]

[illegible]

[illegible] মধ্যে যখন কথা বলে তখন কাঁড় বড্ড কাঁপে।

তুই কাঁপিস না?

আমি কাঁপি কিনা জানিনে তবে জন সাহেব কাঁপে।

কেন?

কেন কি, রাগে হিংসেয় একাকার বসে কাঁপতে কাঁপতে অবশেষে উঠে বেরিয়ে যায়।

কেন রে?

কেন রে, তুমি এত বোকা আর এইটে বুঝতে পারছ না। দুজনেই ভালবাসে রোজ দিদিকে। কিন্তু মহাজনের সংগে পারবে কেন জন।

তোর রোজ দিদি কাকে আমল দেয়?

মহাজন কি সেই পাত্র যে তাকে আমল দিতে হবে। পুরানো জামাইয়ের মতো নিশ্চিতভাবে ঘরে প্রবেশ করে সে।

আর জন সাহেব?

মুখটি শুকিয়ে বেরিয়ে চলে যায়।

আহা বেচারার তবে বড় কষ্ট।

কষ্ট তো আসে কেন? ওরকম মেয়েলি—পুরুষকে পছন্দ করে কোন মেয়ে।

কথাগুলো কাজের সংগে বলে রেশমী।

ব্যস্ত হয়ে মিস এলমার বললে কেন, কেন?

রেশমী মনে মনে বললে, অত উদ্বিগ্ন হয়ো না রেজি, চব্বিশ ঘণ্টা না যেতেই বান্দা আবার ফিরে আসবে।

সুন্দরবনে যাবো।

রেশমী মনে মনে বললে, একবার গিয়ে শখ মেটেনি? সেবার তো হারিয়েছিলে কোটকে, এবার বুঝি পৈত্রিক প্রাণটা হারাবার শখ!

কোট প্রসংগ শুনেছে সে রাম বসুর কাছে।

জন জানতো যে পশু বধ পছন্দ করে না মিস এলমার তাই বললে মধুর সন্ধানে।

রেশমী মনে মনে বলে এখানকার মধুর আশা তবে ছাড়লে?

আমাকে কিছু দিয়ো।

উল্লসিত জন বলে তুমি নেবে? ইনডিড্। কি করবে? খাবে?

না মধু আমার ভালো লাগে না। রেশমী বলেছিল ভালো মধু পেলে ইণ্ডিয়ান স্টাইলে অফারিঙ (offering) দেবে ছবির কাছে।

কালো হয়ে যায় জনের মুখ, বলে আচ্ছা পেলে দেবো, কিন্তু আজকাল ভালো মধু সুন্দরবনে পাওয়া যায় না।

কেন, সব বুঝি মঃ দুবোয়া খেয়ে ফেলেছে—মানস উক্তি রেশমীর।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে রেশমীর। জন আসতেই উল্লাসে মিস এলমার তাকে বলে, জন আজ একটা surprise আছে তোমার ভাগ্যে।

আশা করি সুখদায়ক?

নিশ্চয়।

এই দেখো যুঁই কিনা জ্যাকমিন ফুলের মালা।

চমৎকার।

কি দিয়ে গাঁথা অনুমান করো তো।

কেমন করে বলবো?

আমার চুল দিয়ে!

ওয়াণ্ডারফুল, হেভেনলি, দাও, রেজি, আমাকে দাও।

তা কি করে সম্ভব, ছবিটির জন্যে স্বহস্তে কত যত্নে তৈরি করেছে রেশমী।

জন হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় চোখে পড়লো পর্দার ফাঁকে রেশমীর অশ্রুসজল চোখ দুটি—মুখ ফিরিয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো জন।

জনের হাড় জ্বলে যায় যখন দেখে যে কর্নেল রিকেট ঘরে ঢুকবামাত্র রেশমী আভূমি নত হয়ে সেলাম করে আর চেয়ারখানা সরিয়ে দেয় মিস এলমারের কাছে। জনকে সেলাম দূরে থাকুক যেন মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না। আবার চেয়ারখানা যদি মিস এলমারের কাছে থাকে সুবিন্যস্ত করবার অজুহাতে বেশ খানিকটা দূরে সরিয়ে দেয়। আরো তার মনে পড়ে কর্নেল রিকেট আসন গ্রহণ করলে সসম্ভ্রমে ও যায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে কিন্তু জন বসলে চায় না ঘর ছেড়ে নড়তে—আর যদিই বা বাইরে যায় পর্দার চঞ্চলতা প্রমাণ করে যে পাশেই আছে দাঁড়িয়ে। অব্যক্ত ক্রোধে জ্বলতে থাকে জন আবার ঠিক সেই পরিমাণে কৌতুক অনুভব করতে থাকে রেশমী।

সেদিনকার ঘটনা মনে পড়ে রেশমীর। সেদিন মনে মনে খুব হেসেছিল, আজও হাসি পেলো। ছোট ছেলে চুরি করা সন্দেশের স্বাদ যেমন গোপনে নেয় আবার ধরা পড়বার ভয়ে লুকিয়ে ফেলে তেমনিভাবে স্বাদ অনুভব করতে থাকে অভিজ্ঞতাটির।

জন ঘরে ঢুকে দেখে মিস এলমার নেই, শুধোলো মিস এলমার কোথায়?

রেশমী বললে বেরিয়েছেন।

কোথায়?

জানিনে।

কার সংগে?

রেশমীর বলা উচিত ছিল একাকী, কারণ একাকী বেরিয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু তা না বলে 'অশ্বত্থামা হতো ইতি গজঃ' করলো, বললে, মিসি বাবা তো সাধারণত কর্নেল সাহেব ছাড়া আর কারো সংগে বের হয় না।

খুঁটিয়ে জেরা করবার প্রবৃত্তি হল না জনের, গম্ভীরভাবে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইলো।

রেশমী চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে, বসো।

না এখানে বেশ আছি, বাতাস লাগছে।

রেশমী উদাসীনভাবে বললে, যদি মাথা গরম হয়ে থাকে টানা পাখার হুকুম করছি।

জন মনে মনে বললে অসহ্য! কড়া কিছু বলবে ভেবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। এতদিন ভালো করে দেখেনি তাকে, আজ মনে হল মেয়েটি তো সামান্য সুন্দরী নয়। মিস এলমারকে মনে হয়েছিল পেটিকোট পরা শরতের ঊষা—আর এখন রেশমীকে মনে হল শাড়ী সেমিজ পরা বসন্তের সন্ধ্যা। হাঁ উন্মাদনী শক্তি এই ওরিয়েণ্টাল মেয়েদের যেমন আছে তেমন কোথায় ঠাণ্ডা দেশের মেয়েদের সৌন্দর্যে?

অবাক হয়ে নীরবে তাকিয়ে থাকা অভদ্রতা, কিছু বলতে হয়—জন বললে রেশমী বিবি তুমি খুব সুন্দরী।

কথাটা শুনে আমি অবশ্যই খুব খুশী হলাম কিন্তু মিসি বাবার কানে গেলে কি সে রকম খুশী হবে?

কেন ক্ষতি কি?

লাভ ক্ষতি সে বুঝবে।

যাই হোক তার কান তো এখানে নেই।

আমিই না হয় কানে কথাটা তুলবো।

খানিকটা আন্তরিকভাবে, খানিকটা খুশী করার অভিপ্রায়ে বললে—তুমি খুব বুদ্ধিমতী।

এসব গুণ আজ হঠাৎ আবিষ্কার হল নাকি?

সে কথার উত্তর না দিয়ে জন বললে, এরকম ইংরেজি উচ্চারণ দেশী মেয়েদের মুখে শুনিনি।

দেশী মেয়েদের সংগে খুব মেলামেশা আছে বুঝি?

রেশমী বিবি তোমার বাক্‌পটুতা অসাধারণ।

এমন সময় মিস এলমার ঘরে প্রবেশ করলো।

জনের ভয় হল পাছে মেয়েটা সব প্রকাশ করে দেয়।

মিস এলমার শুধোলো কখন এলে?

জন উত্তর দেবার আগেই রেশমী বললে এইমাত্র।

সে বুঝলো রেশমী কিছু প্রকাশ করবে না। তবে প্রশংসার মনোভাবের সংগে কৃতজ্ঞতা যুক্ত হল।

এইসব স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো রেশমী। স্বপ্ন দেখলো আকাশে তিনটি তারা জ্বল জ্বল করছে, ভালো করে তাকিয়ে দেখলো তিনটি তারার তিনটি মুখ, মিস এলমার, কর্নেল রিকেট আর জন স্মিথ—তিন জনের। এমন সময় দেখলো জন স্মিথের তারাটি খসে পড়লো। ওকি তারা জানলার দিকেই ছুটে আসছে যে! জানলার বাইরে এসে জন থামলো।

ওখানে থেমে রইলে কেন? ভিতরে এসো।

না, না, মিস এলমার আছে।

তবে এসেছিলে কেন?

তুমি খুব সুন্দরী এই কথাটি বলতে।

রেশমীর ঘুম ভেঙে যায়। তার কানে সংগীতের মতো বাজতে থাকে, রেশমী তুমি খুব সুন্দরী। রেশমী তুমি খুব সুন্দরী।

যে মেয়ে ঐ কথাটি কখনো কোন পুরুষের মুখে শোনেনি তার নারীদেহ ধারণ বৃথা। কিন্তু তেমন মেয়ে কি সত্যই আছে?

রেশমী শয্যা ত্যাগ করে উঠে আয়নার সম্মুখে দাঁড়ালো—স্বপ্নের শিশির পড়ে মুখখানি অলৌকিক হয়ে উঠেছে। সে একবার চুলটা আঁচড়ে নিয়ে, বালিশে দীর্ঘশ্বাস চেপে শুয়ে পড়লো।

তখনো ভোর হতে অনেক বিলম্ব।

(ক্রমশ)

ত্রিদিব চৌধুরী

মাপসায় রাত্রিবাস

নিজের কানকেও বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছিল। ভদ্রলোক আর একটু কাছে আসিতে দেখি বেশ মার্জিত, প্রিয় দর্শন চেহারা। নিজেই পরিচয় দিলেন—"আমি এই পুলিস কুয়ার্টেলের কমান্ডাণ্ট, সন্ধ্যাবেলায় অনেকক্ষণ আপনার আসার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া আমি শুইতে চলিয়া গিয়াছিলাম।" এই বলিয়া নিজের সংগীর দিকে দেখাইয়া বলিলেন—"ইনি আমার ডেপুটী; ইঁহার সংগে তো আপনার আগেই পরিচয় হইয়াছে।" তারপর নিজে হাজত ঘরের একটি বেঞ্চির উপর বসিয়া আমাদেরও বসিতে বলিলেন। কমান্ডান্টের সামনে ডেপুটী তখন অবশ্য কিছুটা নরম ও ভদ্র-গোছের হইয়া আসিয়াছেন। তবে তিনি আর বসিলেন না; কাছে দাঁড়াইয়া মিলিটারী অফিসারদের কায়দায় ট্রাঞ্চিয়নটা দু' হাতে আড়াআড়িভাবে ধরিয়া আমাদের কথা শুনিতে লাগিলেন।

বুঝিলাম মারটা বোধ হয় আর খাইতে হইবে না। আমরা মাপসা এলাকায় বড় আসামী ধরা পড়িয়াছি, তার উপরে আমি ভারত পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য। সেই জন্য ভদ্রলোক কতকটা কৌতূহল প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের দেখিতে আসিয়াছেন। বেঞ্চিতে উবু হইয়া বসিয়া (বেঞ্চিটা এত অপরিস্কার ছিল যে, ভদ্রলোক তাহার পরে চাপিয়া বসিয়া নিজের স্লিপিং স্যুটটিকে বোধ হয় ময়লা করিতে চাহেন নাই) তিনি প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা খুব শ্রান্ত বোধ করিতেছেন না? আমি শুনিয়াছি আপনারা দু' দিন জংগলে জংগলে খুব ঘুরিয়াছেন। আমাদের লোকেরাও আপনাদের জন্য খুব হয়রান হইয়াছে। এই আপনারা এদিক দিয়া আসিতেছেন বলিয়া খবর পাওয়া গেল, আবার শোনা গেল যে, না আপনারা অন্যদিক দিয়া আসিতেছেন। আমাদের লোকেদের আপনাদের ধরিবার জন্য খুবই ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে, প্রায় লুকোচুরি খেলার মত।"

আমি বলিলাম, "তাহার কারণ আমরা অনমুড় হইতে রওনা হওয়ার সময় ওয়ালপই আসার সোজা পথ ঠিক খুঁজিয়া পাই নাই। আমরা আপনাদের সংগে ঠিক লুকোচুরি খেলিতে চাই নাই। কিন্তু আমরা পাহাড় ও জংগলের ভিতর পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। আজ ঠিকই আমরা কিছুটা শ্রান্ত। এখন শুইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে।"

—"আপনাদের তো নিশ্চয়ই খাওয়া হয় নাই?"

—"না, জংগলে আর খাবার কোথায় মিলিবে?"

—"তাহা হইলে তো প্রথমে আপনাদের কিছু খাওয়ানো দরকার।"

এই বলিয়া ভদ্রলোক "কে আছে?" বলিয়া বাহিরের দিকে হাঁক দিতেই একজন গোয়ানীজ কনস্টেবল হাজত ঘরের ভিতর আসিল। তাহার সংগে পর্তুগীজ ও কোংকনীতে মিশাইয়া ভদ্রলোক দু' একটি কথা বলিলেন, তাহার পরে আমাদের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কি খান, ভাত না রুটি, রুটি খাইতে হইলে 'পাঁও' (অর্থাৎ পাউরুটি) খাইতে হইবে।" আমরা জানাইলাম, আমরা ভাত খাইতে অভ্যস্ত; ভাতেই আমাদের চলিবে। ভগৎ তুলসী রামজী আমাকে তাঁহার হইয়া কমান্ডাণ্ট সাহেবকে জানাইতে বলিলেন, তিনি জ্বর জ্বর বোধ করিতেছেন, রাতে কিছু খাইবেন না। মনে হইল, কমান্ডাণ্ট সেই হিসাবে থানার কাছের কোনো হোটেল হইতে দুই জনের জন্য খাবার আনার কথা কনস্টেবলটিকে আদেশ দিলেন। তারপর আবার আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"এখুনি আপনাদের খাবার আসিবে। আপনারা খাইয়া দাইয়া সারা রাত নিশ্চিন্তে ঘুম দিন, কেহ আপনাদের বিরক্ত করিবে না। তবে আপনাদের খাবার না আসা পর্যন্ত আপনাদের সংগে দু একটি কথা বলিতে চাই। বুঝিতেছি আপনারা খুবই শ্রান্ত, তবে আমি বেশী সময় নিব না।

আমরা কেহই মনে মনে ঠিক এতখানি ভদ্রতার জন্য তৈয়ারী ছিলাম না, এতটা প্রত্যাশাও করি নাই। বিরোণ্ডের সেই গোয়ানীজ যুবকটির কথা মনে পড়িল, বোধ হয় আমি পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য হিসাবে আমার সংগে একটু লোক দেখানোভাবে ভদ্রতা করা হইতেছে। অথচ এই ভদ্রলোকের কথাবার্তায় সবটুকু লোক দেখানো বলিয়া মনেও হইতেছে না। মনের ভিতর একটু দ্বিধা ও সংশয় নিয়াই আমি বলিলাম—"নিশ্চয়ই, আমি আপনাদের হাতে বন্দী। আপনি যাহা কিছু আমাদের সম্পর্কে জানিতে চান আমার সাধ্যমত তাহার উত্তর দিব এবং সত্যাগ্রহী হিসাবে আমাদের কাহারও কাছে গোপন করার কিছু নাই।"

বলা বাহুলো, আমাদের কথাবার্তা ইংরাজীতেই চলিতেছিল। কমান্ডাণ্ট ভদ্রলোকের ইংরাজী ভাষার উপর তত দখল ছিল না; একটু থামিয়া থামিয়া ধীরে ধীরে কথা বলিতেছিলেন। ইংরাজী কোথাও আটকাইয়া গেলে দু একটি পর্তুগীজ শব্দ ব্যবহার করিয়া ফেলিতেছিলেন, ব্যাকরণ শুদ্ধ রাখার জন্য তাঁহাকে বেশ কিছুটা বেগ পাইতে হইতেছিল। কিন্তু তাহাতে আমাদের কথা-বার্তা চালাইতে মোটের উপর খুব বেশী কোনো অসুবিধা হয় নাই। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল দেশে থাকিতে ভদ্রলোক হয়ত কোনো সময় ইংরাজী ভাষার চর্চা করিয়া থাকিবেন (পর্তুগালে ইংরাজী ভাষা ও গ্রেট বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এসবের খুব খাতির; গোয়াতেও ইংরাজীর খাতির মন্দ নয়)। কিন্তু গোয়াতে আসিয়া পুলিসের চাকুরিতে সে চর্চা চালাইয়া যাওয়ার আর কোনো প্রয়োজন হয় নাই; অনভ্যাসে তাঁহার ইংরাজী বাচন-কুশলতাও বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। যাহা হোক, একটু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হইলেও আলাপ চলিতে থাকিল।

তাঁহার প্রথম প্রশ্ন—"মিঃ চৌধুরী আমরা এতদিন তো বেশ শান্তিতে আপনাদের পাশাপাশি চলিয়া আসিয়াছি; পর্তুগীজ গোয়ার সংগে ভারতের কোনো রকম গণ্ড-গোল হয় নাই বা আমরা গোয়া হইতে আপনাদের কোনোরূপ অনিষ্ট করার চেষ্টা করি নাই। আপনারা বাহির হইতে আসিয়া আমাদের এখানে লোকজনের ভিতর গণ্ড-গোল বাধানোর চেষ্টা করিতেছেন কেন?"

আমি উত্তর দিলাম—"আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, পর্তুগালের সংগে বা পর্তুগীজ জনসাধারণের সংগে আমাদের কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি নাই বা কোনো গণ্ডগোল বাধে নাই। আমাদের আসল ঝগড়া ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে। ভারতবাসী হিসাবে আমরা চাই না, আমাদের দেশের কোনো অংশে কোনো বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসনের ছিটাফোঁটাও থাকে। আপনাদের দেশ

পর্তুগাল; আপনারা ভারতবর্ষে থাকিবেন কেন?"

—"আমরা কি পাঁচশ বছর ধরিয়া এখানে নাই? ভারতবর্ষ, ভারত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু বহু পূর্বে হইতে কি গোয়ায় পর্তুগীজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই?"

—"হইয়াছে সে কথা সত্য, আমরা সে কথা অস্বীকার করিতেছি না, বা অস্বীকার করি না। কিন্তু ইহা কি আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, পাঁচশ বছর আগে ইউরোপীয়দের সংগে এশিয়ার ও ভারতবর্ষের যে ধরনের সম্পর্কের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছিল, আজ সে ইতিহাস বদলাইয়া যাইতেছে? ভারতবর্ষে ইংরেজদের যে বিরাট সাম্রাজ্য ছিল, আজ তাহা তাহারা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। ফরাসীরা পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, কারিকল, মাহে হইতে চলিয়া গেল। খালি ভারতেই নয়, এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে ইউরোপ পাততাড়ি গুটাইতেছে। আপনারা কি ইহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না?"

—"আমরা ইংরেজ কিম্বা ফরাসীদের বহু আগে এখানে আসিয়াছি। আপনারা পাকিস্থানে যান না কেন, পাকিস্থান তো মাত্র আট বছর আগে ভারতের ভিতর ছিল? আপনারা পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেন না কেন? আপনাদের সংগে লড়িয়া তাহারা তো কাশ্মীর নিতে চায়? কই পর্তুগাল তো ভারতের কোনো অংশ জোর করিয়া দখল করিতে চায় নাই? কিন্তু আপনারা সেখানে যাইতে সাহস করেন না। আপনাদের ধারণা যে, পর্তুগাল ছোট দেশ, গোয়া হইতে ৪০০০ মাইল দূরে। সুতরাং আপনারা গোয়ায় আসিয়া একটু হৈ চৈ করিলেই আমরা ভয় পাইয়া গোয়া ছাড়িয়া দিব?"

—"আমরা তাহা আদৌ মনে করি না। পর্তুগাল ছোট দেশ, কি বড় দেশ ইহার সংগে আমাদের সত্যাগ্রহের কোনো সম্পর্ক নাই। গ্রেট বৃটেন এবং ফ্রান্স পর্তুগাল কেন, পাকিস্থানের চেয়েও বড় সাম্রাজ্য এবং অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্র। তাহা সত্ত্বেও তাহাদের বিরুদ্ধে লড়িতে আমরা পিছপাও হই নাই। পাকিস্থানের বিরুদ্ধে আমাদের সত্যাগ্রহ করার কোনো কথা ওঠে না, কেননা পাকিস্তানী মুসলমানেরা ইউরোপের লোক নয়; তাহারা এ দেশেরই লোক। তাহাদের সংগে কাশ্মীর নিয়া আমাদের ঝগড়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা একই পরিবারে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ার মতো। পাকিস্থানের কোনো অংশ ইউরোপীয় কেহ আসিয়া বা অন্য দেশের কেহ আসিয়া দখল করিতে চাহিলে আমরা পাকিস্থানীদের সংগে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে এইভাবেই লড়িব। যেমন আমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলাম, ফরাসীদের বিরুদ্ধে আমরা যেমন লড়িয়াছি এবং আজ আপনাদের বিরুদ্ধে যেমন লড়িতেছি।"

আমার এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোক একটু চুপ করিয়া গেলেন; হয়তো আমার কথার উত্তরে চলনসই ধরনের কিছু বলা যায় কিনা মনে মনে তাহার চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় পূর্বোক্ত গোয়ানীজ সিপাহীটির পিছন পিছন একজন হোটেলের চাকর গোছের লোক দুই থালা ভাত, তরকারি, জল ইত্যাদি নিয়া হাজতঘরে আসিয়া ঢুকিল। তাহাদের আসিতে দেখিয়া ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। আপনারা খাইয়া-দাইয়া ঘুমাইয়া পড়ুন।" এবং তাহার পর হঠাৎ তুলসী রামজীর কাছে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিয়া তাঁহার জ্বর কতটা হইয়াছে, আন্দাজ করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আধ মিনিট কাল সেইভাবে তুলসী রামজীর জ্বর দেখিয়া ভদ্রলোক বাহির হইয়া গেলেন এবং মিনিট [illegible] বাদে একটি ট্যাবলেটের শিশি হাতে করিয়া আবার হাজতে ফিরিয়া আসিলেন। শিশি হইতে দুইটি ট্যাবলেট বাহির করিয়া তুলসী রামজীকে তাহা দিয়া ইশারায় তাহা জল দিয়া খাওয়ার কথা জানাইয়া "Bon Noite" (বোঁ নোইত বা গুড নাইট) বলিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার ডেপুটীও এবার তাঁহার সংগে সংগে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন—সে ভদ্রলোক যাওয়ার সময় আমার দিকে অংগুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া গেলেন "জানো, আমি তোমার উপর খুব রাগিয়া গিয়াছি?" ("I am very angry with you"), "তুমি আমার রবিবারের ছুটিটা মাটি করিয়া দিয়াছ। তোমার গতকাল, কিম্বা আগামী কাল সোমবারে আসা উচিত ছিল।" এ ভদ্রলোক বিকালে বিবোলেঙ্ট চৌকিতে আমাকে জেরা করার সময় দোভাষীর সাহায্য নিয়াছিলেন। কাজে কাজেই তাঁহাকে হঠাৎ ইংরাজী বলিতে শুনিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া "আই য়্যাম সরি" বলিতে না বলিতেই কমাণ্ডাণ্টের পিছন পিছন ডেপুটীও গট গট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মাপসার এই কমাণ্ডাণ্টের কথা আমার আজো এই জন্য বেশী করিয়া মনে আছে যে, গোয়াতে আমার উনিশ মাস বন্দী জীবনের মধ্যে এত ভদ্র ও শালীনতাসম্পন্ন পর্তুগীজ পুলিস কর্মচারী আর চোখে পড়ে নাই। এই বছর গোয়া হইতে ছাড়া পাওয়ার সময় আমাদের পুলিস পাহারায় মাপসার পথে কারওয়ার সীমান্তে আনা হয়। সেই সময় আর একবার তাঁহার সংগে সাক্ষাৎ হয়। তখনও তাঁহার নিকট হইতে একই রকমের ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার পাইয়াছিলাম। অবশ্য ছাড়া পাওয়ার সময় কেহই আর কেহ সংগে অভদ্র ব্যবহার করে নাই। সে সময় খাস পর্তুগাল হইতে তারাও [illegible] সত্যাগ্রহীদের মুক্তির আদেশ আসায় পুলিস ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে একটা ধারণা হয় যে শীঘ্রই [illegible] গোয়ার [illegible] আপোষ-[illegible] সময় [illegible] অতিরিক্ত [illegible] ছিল। [illegible] কোনো [illegible] পর্তুগীজ [illegible] পুলিস [illegible] যে [illegible] একটা [illegible] এই [illegible] রাজনৈতিক [illegible] হয় নাই। [illegible] পুলিস [illegible] সম্পন্ন ও ভদ্র পর্তুগীজ [illegible] কেহই [illegible] সেরূপ কেহই [illegible] ভুল হইবে। [illegible] শাসকদের ফ্যাসিস্ট এবং [illegible] সম্পর্কে আমাদের [illegible] দরুণ এবং কয়েকটা [illegible] গোয়াতে রাজনৈতিক [illegible] পরিচালনায় যে ধরনের নৃশংস অত্যাচার চলিয়াছে তাহার কথা দেশের মনে খুব বেশী করিয়া থাকার দরুণ, পর্তুগীজ জাতি সম্পর্কে আমাদের অনেকের মনে একটা ভুল ধারণা আছে যে পর্তুগীজরা অত্যন্ত নৃশংস প্রতিহিংসাপরায়ণ জাতি। বলা বাহুল্য যে একটা দেশের শাসক শ্রেণী বা শাসক গোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে দিয়া দেশের অধিবাসীদের সম্পর্কে কিম্বা সেখানকার জনসাধারণ সম্পর্কে সমগ্রভাবে কোনো ধারণা করা চলে না। হিটলার বা গোয়েরিংকে দিয়া যেমন সমগ্র জার্মান জাতি সম্পর্কে, কিম্বা মুসোলিনীকে দিয়া সমগ্র ইতালিয়ান জাতি সম্পর্কে বিচার করিতে চাহিলে যেমন ভুল ও অবিচার করা হইবে; রুম্বা, মন্তেইরো, বা "পিদে"-র অফি-

ভেইরাকে দিয়া পর্তুগীজ জাতির বিচার করিতে চাহিলে তেমনিই ভুল এবং অবিচার করা হইবে। উনিশ মাস কাল ধরিয়া আমার পুলিসের লোক ছাড়াও বহু পর্তুগীজ সাধারণ শ্রেণীর লোক এবং ভদ্র ও উচ্চ-শিক্ষিত লোকের সংস্পর্শে আসার অল্প বিস্তর সুযোগ হইয়াছে। মোটের উপর আমার ধারণা, "পিডে" (Policia International) ও সিকিউরিটি পুলিস (Policia Segurança) ছাড়া, এবং গোয়া পুলিসের গোয়েন্দা বাহিনী ছাড়া, সাধারণ পর্তুগীজরা অত্যন্ত সৌজন্য ও শালীনতা-বোধসম্পন্ন জাতি। লাতিন-জাতি-সুলভ একটা দিলখোলা "hail-fellow-well-met" গোছের হৃদ্যতাপূর্ণ সহৃদয়তা তাহাদের মজ্জাগত। বৃটিশ, ডাচ বা উত্তর ইউরোপীয় দেশের লোকেদের মত এদের কোনো বর্ণবিদ্বেষ, জাতিগত উন্নাসিকতা বা অহমিকার ভাব নাই, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। পাদ্রী কার্ডিনো নিজে পর্তুগীজ ও স্প্যানিশ; তিনি অনেকদিন নিজের দেশ স্পেনের লোকেদের সাথে পর্তুগীজদের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, পর্তুগীজরা জাতি হিসাবে খুবই ভদ্র ও বন্ধুভাবাপন্ন জাতি। গোয়াতে আমার উনিশ মাসের পর্তুগীজ কারাবাসের অভিজ্ঞতা হইতে আমিও সেই একই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি। গোয়ার অত্যাচারী পুলিসের নৃশংসতার কথাও যেমন সত্য; পর্তুগীজ সাধারণ মানুষের সহজ হৃদ্যতা ও সৌজন্যবোধের কথাও তেমনি সত্য। পর্তুগীজদের দুর্ভাগ্য, নানান কারণে তাহাদের দেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ঐতিহ্য তত প্রবলভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এবং তাহা পারে নাই বলিয়াই আজো সালাজারের ফ্যাসিস্ট শাসনের কবলমুক্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সালাজার গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক বিরোধের দরুণ, বা সালাজারের গোয়েন্দা পুলিসের গুণ্ডামী ও নৃশংসতার দরুণ গোটা পর্তুগীজ জাতিকে আমরা যদি ভুল বুঝি তাহা হইলে অন্যায় করা হইবে।

আমাদের খাইতে বসাইয়া দিয়া কমাণ্ডাণ্ট সাহেব ও তাঁহার ডেপুটি সে রাতের মতো হাজত ঘর হইতে চলিয়া যাওয়ার পর আর কেহ আমাদের সেদিন বিরক্ত করে নাই—এক হাজত বন্ধ করিয়া যাওয়ার সময় সেই ফিরিঙ্গি "সুচ্ শেফ্"-টি ছাড়া যে লোকটা প্রথম আমাদের হাজতে আনিয়া ঢুকায়। কমাণ্ডাণ্ট চলিয়া যাওয়ার পর বড় সাহেবের দেখাদেখি সেও ভাবিল "আমিও কিছুটা ইহাদের বক্তৃতা শুনাইতে ছাড়ি কেন"। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে সেও খানিকক্ষণ আমাদের বুঝাইতে চাহিল গোয়ার লোকেরা ইণ্ডিয়াকে চায় না। ইণ্ডিয়ার কোনো "কালচার" নাই, বোম্বাইয়ের পথে পথে খালি ভিখারী এবং পকেটমারে খুব ভর্তি, "ইণ্ডিয়া"-র রেলগুলিতে ভীষণ ভীড়—ইত্যাদি। তাহার শেষ কথা—"Nehru bad Salazar very good. Our Salazar beat Nehru" (ভাষা ও ভাবের অনুবাদঃ নেহরুটা বড় পাজি, আমাদের সালাজারের তুলনা নাই। আমাদের সালাজার তোমাদের নেহরুকে পিটাইয়া ঢিট করিয়া দিবেন)। তখন তাহার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করার কিম্বা তাহার কথার প্রতিবাদ করার মত শরীরের ও মনের অবস্থা আমাদের ছিল না। ভগৎ তুলসীরাম কমাণ্ডাণ্টের দেওয়া ট্যাবলেট খাইয়া আগেই একটি বেঞ্চিতে শুইয়া পড়িয়াছিলেন। আমাদেরও তখন ঘুমে ও শ্রান্তিতে চোখ জড়াইয়া আসিতেছে। কমাণ্ডাণ্ট সাহেবের কৃপায় ভাত খাইতে পাইয়া একটু সুস্থও বোধ করিতেছি; কিন্তু শ্রান্ত শরীর ভাতের নেশায় বেশ ভারী হইয়া উঠিয়াছে। আমি বেঞ্চিতে বসিয়া [illegible] শেফ্ সাহেবের বক্তৃতা [illegible] মরিয়া হইয়া বেঞ্চি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম—India very bad, Salazar very good; good night Mister, good night. সে কেরাণী এখন আর কি করে, তাহার উৎসাহের মুখে ছাই পড়িল। সেও আর কথা না বাড়াইয়া হাজতের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল; আমরা সে রাতের মতো অব্যাহতি পাইলাম।

সে রাত্রে যে যার বেঞ্চিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানিতে পারি নাই। পরের দিন সকালে বোধহয় আমাদের ঘুম ভাঙ্গিত না যদি না পাহারাওলা আসিয়া আমাদের ডাকাডাকি করিয়া না জাগাইত। ঘুম ভাঙ্গিয়া বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে সমস্ত গায়ে টনটনে ব্যথা অনুভব করিলাম। বুঝিলাম দুদিন পাহাড়ে জঙ্গলে একটানা হাঁটার ফল। যাহা হোক, প্রহরী আমাদের জানাইল, এখনি তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া আমাদের তৈরী হইয়া নিতে হইবে, আমাদের অন্যত্র যাইতে হইবে। এবার আর আমরা স্বাধীন মানুষ নই; গত রাত্রি হইতে আমরা জেলের কয়েদী বা আসামী। শুধু আসামীই নই বড় আসামী; কাজেই হাজতের সামনে ২০-৩০ গজ উঠান বা মাঠ পার হইয়া জেলের অফিসে যাওয়ার সময় আমাদের পিছনে পিছনে স্টেন গান লইয়া দুইজন শান্ত্রী চলিল। হাজত বা জেলের ভিতর হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্টেন্ গানধারী শান্ত্রী ছাড়া আমাদের কোথাও এক পা যাইতে দেওয়া হইত না—উনিশ মাসকাল এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখি নাই। তবে স্টেনগানধারী শান্ত্রী পাহারার বন্দোবস্তের ভিতরে যে ফস্কা গেরো থাকিতে পারে সালাজার তাহার সন্ধান

জানেন না। ডাঃ সালাজারের জীবনে অবশ্য কোনো রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামে বা গণ-সংগ্রামে যোগ দিয়া জেলে যাওয়ার বা রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে জেলে থাকার কোনো অভিজ্ঞতা হয় নাই। সৌভাগ্যক্রমে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুগ্রহে বৃটিশ ভারতের জেলে আমাদের শিক্ষানবিশী খুব পাকাপোক্ত রকমেই হইয়া গিয়াছিল। আর তাহা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া গোয়াতে পর্তুগীজ জেলের ভিতরেও কোথায় সে সব ফস্কা গেরো আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতেও আমাদের বেশী দেরি হয় নাই। আমার মনে আজো কিছুটা ক্ষোভ থাকিয়া গিয়াছে যে "সত্যাগ্রহী" হিসাবে গোয়াতে গিয়াছিলাম বলিয়া আমরা সেই "ফস্কা গেরো"র সুযোগ সব সময় নিতে পারি নাই বা নেওয়াটা সংগতও বোধ করি নাই। অবশ্য একেবারে নিই নাই বলিলেও ভুল হইবে; ক্রমে ক্রমে সে কাহিনীতে আসব। কিন্তু সেদিন এইভাবে বন্দুক ও পুলিস পাহারায় বাথরুমে যাইতে যাইতে অনেকদিন পর, জেলজীবনের পুরোনো সব কথা মনে করিয়া বেশ কিছুটা কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম।

ইহার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই, প্রাতঃকৃত্য সারা হইয়া গেলে পর আমরা চা ও 'পাঁও' খাইয়া নিয়া মাপুসা হইতে বিদায় নিলাম। মাপুসা নিজেরই আমাদের একরাত্রির হাজত স্টেশন ছাড়া আর কিছু ছিল না। তবে আমার গোয়া প্রবেশ মাপুসার পথে, আবার গোয়া হইতে ছাড়া পাওয়ার সময়েও আমি ঘটনাচক্রে মাপুসা দিয়া ভারতে ফিরিয়া আসি। তাই মাপুসার কথাটা বেশ ভালো করিয়া মনে আছে। মুক্তি পাওয়ার দিন প্রায় গোটা মাপুসা শহর দিয়া আমাদের গাড়ি ঘুরিয়া আসে। কাজে কাজেই মাপুসার চেহারাটা আজো খুব স্পষ্ট মনে আছে। তাছাড়া গোয়া মুক্তি আন্দোলনে মাপুসার স্থান বা অবদান কম নয়। ছোট মাপুসা শহর দুইজন বড় গোয়ানিজ মুক্তিযোদ্ধার জন্মস্থান—বীরাঙ্গনা শ্রীমতী সুধাতাই জোশীর পিতৃগৃহ মাপুসায়; আর মাপুসা মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ও গোয়ার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ [illegible] বাড়ি। সুধাতাই আজ পর্তুগালে জেলে এবং ডাঃ [illegible] [illegible] বছর [illegible] মাথায় নিয়া জেলে আছেন। মাপুসার কথা সেজন্যও ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব।

পঞ্জিমের পথে

মাপুসা হইতে একটি ল্যাণ্ড রোভারে চড়াইয়া আমাদের বেতিম-এর পথে পঞ্জিম আনা হয়। এখানেই জুলাই, সেদিন মেঘলা থাকিলেও বৃষ্টি মোটেই ছিল না। কখনো দুপাশে ধানের ক্ষেত, কখনো এক আধটা গ্রাম, কখনো দুএকটা উঁচু কাথিড্রাল বা চার্চ দেখিতে দেখিতে আধঘণ্টার ভিতর বেতিমের ফেরিঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। বেতিম খুব ছোট একটি গ্রাম বলিলেও চলে। সামনেই মাণ্ডভী নদী, তাহার ওপারেই নোভা গোয়া বা পঞ্জিম—এক ফেরিঘাট বলিয়া বেতিমের যা কিছু গুরুত্ব। গোয়ার উত্তর বা পূব দিক হইতে পঞ্জিম আসিতে হইলে বেতিমে পেট্রোল লঞ্চে করিয়া মাণ্ডভী নদী পার হইতে হয়। সমুখেই ডান হাতে দুমাইলের মধ্যে পঞ্জিমের পশ্চিম দিক হইতে জোয়ারী নদী আসিয়া মাণ্ডভী ও সাগর সংগমে মিশিয়াছে। দুই নদীর মধ্যে একটা সংকীর্ণ অন্তরীপ; তাহার সমুখের কোণায় পঞ্জিম বা নতুন গোয়া শহর। বেতিম্ব ফেরিঘাট হইতে সাগর-সংগম দেখা যায়। যদিও গোয়ার সমুখে সমুদ্রের গভীরতা বেশী বলিয়া সমুদ্র সেখানে খুবই প্রশান্ত, তবু বর্ষার দিনে কতকটা নদীর জলের তোড় খুব বেশী বলিয়া এবং কতকটা বর্ষার একটানা মৌসুমী হওয়ায় সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া ওঠায় মাণ্ডভী ও জোয়ারী যেখানে এক হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে সেখানটায় উদ্বেল সমুদ্রের তরঙ্গ গর্জন খুবই বেশী হয়, ঢেউ ও খুব উঁচু হইয়া ওঠে। আমাদের ল্যাণ্ডরোভার সমেত লঞ্চের উপর আনিয়া ওঠানোতে একটু উঁচু হইতে সাগর-সংগমের দিকে চাহিয়া সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখার আমাদের সুবিধা হইয়া গেল। ভুলিয়া গেলাম সামনে পুলিস ও মিলিটারী পাহারায় বন্দী হিসাবে পঞ্জিম কুয়ার্টেলের দিকে যাত্রা চলিয়াছি। ভুলিয়া গেলাম ১৫।১৬ জন রাইফেল ও স্টেনগানধারী সৈন্য আমাদের ঘিরিয়া আছে। ভুলিয়া গেলাম ফেরিঘাটে সমবেত অনেক শ' লোক কিছুটা ভয়, কিছুটা কৌতূহলে দূরে হইতে আমাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। আমার সমুখে নদীর ওপারের হোটেল মাণ্ডভীর [illegible] পঞ্জিমের [illegible] আছে, তাহার কথা ভুলিয়া গেলাম। মাণ্ডভী জোয়ারীর বর্ষার ঘন লাল জল ফুলিয়া ফাঁপিয়া পাক খাইয়া যেখানে আরব সমুদ্রের নীল সবুজের সঙ্গে আসিয়া মিশিতেছে, আরব সাগরের উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গের সঙ্গে লড়াই করিয়া সমুদ্রে লীন হইয়া যাওয়ার আগে তরঙ্গ গর্জন করিয়া লাফ দিয়া উঠিতেছে, ফুলিয়া ফাঁপিয়া হুংকার করিয়া উঠিতেছে, সেই [illegible] স্বর্ণ-সম্ভার-সমাপ্ত দৃশ্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তখন আমাদের আশ মিটিতেছে না। মাণ্ডভীর এক পাশে পঞ্জিম শহরের সাদা বাড়ি, ঘন সবুজ গাছপালার ভিতর দিয়া অপূর্ব সমারোহ সৃষ্টি করিয়াছে। অন্যদিকে আগুয়াদার পাহাড় নীচু হইয়া সমুদ্রের কোলের কাছে নামিয়া আসিয়াছে; নারিকেল-শাল-শিশুর জংগল সেদিকেও ঘন সবুজ পাড়ের মত মাণ্ডভীর পার্বতী রেখার ধার ঘেঁষিয়া একটানা চলিয়া আসিয়াছে। নদী সমুদ্র অরণ্যানী বর্ষার মেঘ সব কিছু মিলিয়া যত ঐশ্বর্যের সৃষ্টি করিতে পারে তার কোনো কিছুর অপ্রতুলতা সেখানে নাই। সেদিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কখন যে আমাদের ফেরি লঞ্চ পঞ্জিমের ছোটো ডকে আসিয়া ঠেকিয়াছে তাহা বুঝি নাই। চট্‌কা ভাঙিল নৌকা ঘাটে লাগার ধাক্কায় এবং আমাদের ল্যাণ্ডরোভারের সেল্‌ফ স্টার্টার সংগে সংগে সক্রিয় হইয়া ওঠার ঘরর ঘরর শব্দে। এবার পঞ্জিম: পর্তুগীজদের ভারত সাম্রাজ্য—Estado da India-র রাজধানী। (ক্রমশ)

চীনা ছবির প্রিণ্ট

অহিভূষণ মল্লিক

ছাপা না হাতে আঁকা বোঝাই মুশকিল। যে ছবিটির কথা বলছি সেটি একটি স্কুল। ছবিটির বিষয়—কয়েকটি চিংড়ি মাছ জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। চিত্রকরের নাম—চি পাই শীর্। একেবারে কাছে গিয়ে পরশ করে দেখলাম, তবুও সন্দেহ ঘুচলো না। পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল রাইস পেপারে ওয়াশ দিয়ে আঁকা ছবি। চি পাই শীর্-এর নাম শুনেছি আগে। চীনের শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে ইনি একজন। রা-বাবু এ ছবি পেলেন কোত্থেকে ভাবতে লাগলাম। একের পর এক করে তিনি প্রায় ৬০।৭০ খান ঐ রকম ছবি দেখালেন। প্রত্যেকটিই প্রখ্যাত চীনা শিল্পীদের রচনা। কয়েকটি বেশ পুরোনো প্রায় চার পাঁচ শ বছরেরও বেশী মনে হয়। যত দেখি ততই ঘাবড়ে যাই। রা-বাবু বললেন আরও আছে। ভাবলাম কত টাকাই না লেগেছে তাঁর এই শিল্প সম্ভার সংগ্রহ করতে। কিছুক্ষণ পর তিনি হেসে বললেন এগুলি আসল নয়, ছাপা। এসব স্কুলগুলির দাম ৩০।৪০ টাকার মধ্যেই। শুনে আমি তো অবাক। রা-বাবু বোঝালেন এ ছাপাকে ক্সোজাইলোগ্রাফিক প্রিণ্ট বলা হয়ে থাকে। চীনাদের মধ্যে এ ছাপার রেওয়াজ বহুদিন থেকে চলে আসছে, প্রায় ১০০০ বছর আগে থেকে। প্রথমে শুধু কালো কালি দিয়েই ছাপার প্রথা ছিল। পরে বহুবর্ণে ছাপার রেওয়াজ চালু হয়েছে। ঠিক ছাপা একে বলা চলে না, অরিজিনাল ছবির কপি বলাই সমীচীন। অরিজিনাল ছবিতে যে রঙ এবং যে কাগজ ব্যবহৃত হয় জাইলোগ্রাফিক প্রিণ্ট-এও ঠিক সেই রঙ এবং সেই কাগজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কেবল তুলি দিয়ে না এঁকে কাঠের ওপর খোদাই করে ব্লক করে নিয়ে সেই ব্লক দিয়ে ছাপ দেওয়া হয়। কিন্তু কাঠ-খোদাই ব্লক-এ অমন চমৎকার ওয়াশ-এর কাজ কি করে সম্ভব হয় সেইটে হল প্রশ্ন। আমাদের দেশে বা পাশ্চাত্যে যেভাবে কাঠ-খোদাই ছাপা হয়ে থাকে তাতে ওয়াশ-এর কাজ ছাপা সম্ভব নয়। চীনারা ঠিক এভাবে ছাপেন না। এঁদের পদ্ধতি একটু আলাদা। প্রথমে এঁরা নিখুঁতভাবে ছবির বিভিন্ন রঙীন স্থানগুলি ট্রেস করে নেন পাতলা কাগজের ওপর, তার পর সেগুলি পিয়ার বা পাইন কাঠের ওপর জুড়ে চার-পাশ থেকে বেশ গভীর করে সাধারণ কাঠ-খোদাইয়ের যন্ত্রের সাহায্যেই গভীর করে খুদে বার করে দেন। বিভিন্ন বর্ণের জন্যে বিভিন্ন ব্লক তৈরী হয় এত নিখুঁতভাবে ব্লক করা হয় যে মূল ছবির তুলির টানের সঙ্গে খোদাই করা সীমা-রেখার কোনও তফাৎ থাকে না। ব্লক প্রস্তুত হয়ে গেলে যে রঙে শিল্পী ছবি এঁকেছেন সেই সব রঙে কিছু কিছু করে গালা অথবা শিরিশ মিশিয়ে নিয়ে মুদ্রক কাঠের ব্লক-এ রঙ লাগান তারপর রাইস পেপারে অথবা যে কাগজে মূল ছবিটি আঁকা হয়েছে সেই কাগজে খুব সন্তর্পণে ছাপ তোলেন এবং তৎক্ষণাৎ কয়ের-এর তুলি দিয়ে রঙটি সমান-ভাবে ছড়িয়ে দেন। পরিমাপ মত জল মিশিয়ে হালকা বা গাঢ় রঙ করে নিতে হয় এবং ছাপ তোলার সময় কাগজটির ওপর একটি কাপড়ের প্যাড রেখে তার ওপর প্রয়োজন মত কখনও সমানভাবে কখনওবা কম বেশী চাপ প্রয়োগ করতে হয়। কখনও রঙ ভিজে থাকতেই তার ওপর আরেকটি রঙের ছাপ দিতে হয়, কখনও বা প্রথম রঙটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবার পর দ্বিতীয় রঙ চড়াতে হয়। যেখানে যেখানে ওয়াশ-এর কাজ আছে কাঠের ব্লকের ওপর সেই সব স্থানে ওয়াশ-এ রঙ লাগিয়ে নেন। অনেক সময় কমবেশী করে রঙ লাগিয়ে একই ব্লক বারে বারে একই স্থানে ছেপেও ওয়াশের কাজ দেখানো হয়। এখানে যেভাবে প্রণালীটির বিবরণ দেওয়া হল তাতে মনে হয় ব্যাপারটি খুবই সহজ, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তা নয়। মুদ্রকের অসাধারণ দক্ষতার প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে ধৈর্যও।

যাই হোক, চিং রাজত্বের সময় অর্থাৎ গত শতকের শেষার্ধে পিকিং-এ প্রায় ১৩টি প্রতিষ্ঠান ছিল যাঁরা এই ক্সোজাইলোগ্রাফিক প্রথায় বড় বড় শিল্পীদের ছবি ছাপতেন। তখনকার দিনে বিখ্যাত কবিদের কবিতাও নানান রকম নক্সা করে ছাপা হত এবং ঐ কবিতাপত্রগুলি খুব লোভনীয় উপহার হিসেবে গণ্য হত। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দু শ বছরের পুরোনো 'সুং চু চাই'-এর নাম। রাজ-নৈতিক গোলযোগে ১৯০০ সালে প্রতি-ষ্ঠানটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পরে এটি আবার খোলা হয় কিন্তু আগের নামে নয়, 'জুং পাও চাই' নামে। ১৯৫২ সালে চীন সরকার এ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এখন এখানে কেবল প্রাচীন ছবিই ছাপা হয় না, আধুনিক চীনা শিল্পীদের ছবিও ছাপা হয়ে থাকে। এঁরা গত বিশ বছরের মধ্যে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এবং প্রখ্যাত লেখক লু সুন এবং সাহিত্য সমালোচক

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু জু পেয়ঁ-র 'ধাবমান অশ্ব' চিত্রটি দেখছেন

প্রবন্ধ-সাহিত্য

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি—[illegible] সাগর গ্রন্থমালা। গ্রন্থজগৎ, ৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। অবশ্য 'বিজ্ঞান যুগ' বলিতে যাঁহারা উড়ো জাহাজের বিস্ময় অথবা অপর কোনো বিস্ময়কর যান্ত্রিক ধারণার বিষয় ভাবেন তাঁহাদের কথা নয়, যাঁহারা বর্তমান বিশ্বজগতের বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের অসীম কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা এবং যুক্তিশীল অর্থে আবিষ্কারের ধারণাকে বিজ্ঞানজনোচিত বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইবে। প্রিয়দারঞ্জন এই ক্ষুদ্র কলেবর গ্রন্থটিতে বিজ্ঞানের সীমানা, বিজ্ঞানের খাঁটি, বিজ্ঞান ও সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য, বিজ্ঞানের বিভীষিকা, বিজ্ঞান ও বিশ্বশান্তি, বিজ্ঞান সমাজ ও ধর্ম—মোট এই সাতটি প্রবন্ধ যোজনা করিয়াছেন। বর্তমান সংস্কৃতির ধারণা, ইতি-পূর্বে এরূপ [illegible] সুগ্রন্থ অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে—বিশেষত এরূপ বিষয়ে। 'বিজ্ঞান ও সত্য' নামক প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, আমাদের নানাপ্রকার প্রশ্নের একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবি ইহাতে দেখা যায়। বিজ্ঞানের খাঁটি সুলিখিত ও তথ্যপূর্ণ। 'বিজ্ঞানের সীমানা' নানাকারণে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। লেখকের ভাষা সুন্দর। ছাপা বাঁধাইও ভাল। ৪৪২।৫৭

অনুবাদ-সাহিত্য

সুরা ও সাকী—বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। জয়দীপ নিকেতন, ১০, সতেন দত্ত রোড, কলিকাতা—২৯। মূল্য চার টাকা।

'সুরা ও সাকী' অমর কবি ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ-গুলির অনুবাদ। বলা বাহুল্য ইতি-পূর্বে ওমরের রুবাইয়াৎ-এর অনুবাদ বাংলায় একাধিক যশস্বী কবিরা যথোচিত সামর্থ্য অনু-যায়ী অনুবাদ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। বর্তমান গ্রন্থটির অনুবাদক স্বভাবতই এই কিঞ্চিৎ সংকোচের সহিত তাঁহার অনুবাদে হাত দিয়াছেন। ফিটজেরাল্ড সাহেবের ইংরাজী অনু-বাদে আমাদের অন্তত অতৃপ্তি ছিল না। কান্তি-চন্দ্রের বাংলা অনুবাদেও। একটি রুবাইয়াৎ মনে পড়িতেছে—Here with a loaf of bread beneath the bough, A flask of wine and thou......ইত্যাদি। আলোচ্য গ্রন্থের অনুবাদক তাহার অনুবাদ করিয়াছেন—

রচবো হেথায় রম্য কুলায়
　　রইবে কাছে অল্প রুটি;
পাত্র ভরা উগ্র সুরায়,
　　কাব্য-কেতাব একটি-দুটি।
গাইবে তুমি মোহন সুরে,
লাগবে দোলা স্বপনপুরে;
মোর নয়নে — বিজন বনে
　　বেহেস্ত, সাকী, উঠবে ফুটি।

ইংরাজী অনুবাদের কতখানি গাম্ভীর্য ও মাধুর্য যে উল্লিখিত অংশে আছে পাঠকই তাহার বিচার করিবেন। তথাপি বলিতে বাধা নেই, ছন্দের ও শব্দ প্রয়োগের উচ্চ পর্দায় হাত লাগাইতে না পারিলেও বীরেন্দ্রকুমার সরল সাবলীল অনুবাদ মন্দ করেন নাই। ৩৯২।৫৭

অংকুর—এমিল জোলা। অনুবাদিকা—গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য জগৎ, ২০৩।৪, কর্ন-ওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা চার আনা।

এমিল জোলার বিখ্যাত উপন্যাস 'জার্মিনাল'-এর অনুবাদ অংকুর। কয়লাখনির শ্রমিকদের

দ্বিতীয় কণ্ঠ

রঞ্জন

সেদিন রেংগুনে, বিমানঘাঁটিতে নেমে প্রথম যে বাঙালীর কথা মনে হোলো তিনি যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তা আমার বইয়ের মধ্য দিয়ে দেশ ও মানুষকে দেখার পুরোনো অভ্যাসের অবশ্যম্ভাবী ফল। পরবর্তী চারদিনের অবস্থানে বিভিন্ন প্রবাসী বাঙালীর সংগে সাক্ষাৎ হয়েছে। দীর্ঘ ও অন্তরিত আলাপে আনন্দ পেয়েছি, বিদেশে দেশের স্বাদ পেয়েছি (যা বিদেশে তত বিস্বাদ লাগে না), কিন্তু তাঁদের মধ্যে যদি কেউ ভবিষ্যৎ শরৎচন্দ্র থেকে থাকেন তবে আমি অন্তত তাঁকে আবিষ্কার করতে পারিনি। এটা অবশ্য কারোই দোষ না হতে পারে। শরৎচন্দ্র যখন সত্যিই বর্মায় ছিলেন, সাধারণ কর্মিরূপে, তখন তাঁর খেলার সাথীদের মধ্যে কে তিনি তা কে জানতো?

বার্মা তখনও বাঙালীর কাছে বিদেশই ছিল, যদিও শাসন আলাদ হয়েছে এই সেদিন, বছর বাইশ আগে। শরৎচন্দ্রেরই নানা উপন্যাসে ও গল্পে বার্মা যাত্রার দুর্ভোগের অনেক বর্ণনা আছে, যা আজ অতিকৃত বলে মনে হয়। (অংশত বোধহয় আমি জাহাজে না গিয়ে বিমানে গেছি বলে।) তবু ভাবতে ভালো লাগছিল—এই বার্মায় একদিন নানা বাঙালী এসেছিল (অন্তত তিনজন তো নন্দই ছিল তাদের মধ্যে), তারা এখানে এসে ঘর বেঁধেছিল, হেসেছিল, কেঁদেছিল, কাঁদিয়েছিল। দ্বিতীয় শরৎচন্দ্র থাকুন বা না থাকুন, তাঁর নানা-উপন্যাসের চরিত্রেরা বা তাদের উত্তরসূরীরা কি আজো আছে বার্মায়? বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের স্থির উত্তর মাত্র চারদিনে আমার পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব ছিল না।

আমার প্রিয় বার্মা সেই ছোটভাইয়ের বার্মা, বাবুসাহেবের বার্মা। সেই যিনি "মিনিট দশেকের মধ্যেই দ্বিচক্রযানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে ইংরাজি পোশাক, হাতে দু-তিনটা আঙটি, ঘড়ি চেন—কাজকর্ম কিছুই করিতে হয় না—অথচ অবস্থাও দেখিলাম বেশ সচ্ছল।...লোকটার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। বোধহয় চাম্‌-টাম্‌ এমন কি একটা যেন হইবে। যাক্‌ গে, আমরা না হয় তাঁকে শুধু বাবু বলিয়াই ডাকিব।"

তারপর কাহিনীর সমাপ্তিটা মনে আছে?

"চট্টগ্রামের জাহাজ রবিবারে ছাড়ে।...এইবার ছোটবাবু তাঁহার দ্রব্যসম্ভারের হেফাজত করিয়া, জায়গা ঠিক করিয়া তাঁহার বর্মা-স্ত্রীর কাছে বিদায়ের ছলে সংসারের নিষ্ঠুরতম এক অঙ্কের অভিনয় করিতে জাহাজ হইতে বাহির আসিলেন।...লোকটা এক হাতে [illegible] লইয়া নিজের দু' চক্ষু আবৃত করিয়া অপর হাতে তাঁহার বর্মা-স্ত্রীর [illegible] করিয়া কান্নার সুরে কি যে বলিতেছে; এবং মেয়েটি আঁচলে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছে। আশেপাশে অনেকগুলি বাঙালী ছিল। তাহারা কেহ মুখ ফিরাইয়া হাসিতেছে। কেহ বা মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে।...লোকটা রোদনের কণ্ঠে বর্মা ভাষায় এবং বাঙলা ইতর ভাষায় মিশাইয়া বিলাপ করিতেছে। বাঙলাটা কথঞ্চিৎ মার্জিত করিয়া লিখিলে এইরূপ শুনায়—এক মাস পরে রংপুর হইতে তামাক কিনিয়া যা আনিব তা আমিই জানি! ওরে আমার রতনমণি! তোকে কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম রে, কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম!"

শরৎচন্দ্রের মন্তব্যঃ "আমি অনেক সময়ে ভাবি, ইহার কি প্রয়োজন ছিল? কেন মানুষ গায়ে পড়িয়া আপনার মানব-আত্মাকে এমন করিয়া অপমানিত করে? সে মন্ত্র-পড়া স্ত্রী নাই বা হইল, কিন্তু সে ত নারী। সে ত কন্যা-ভগিনী-জননীর জাতি! তাহারই আশ্রয়ে সে ত এই সুদীর্ঘকাল স্বামীর সমস্ত অধিকার লইয়া বাস করিয়াছে! তাহার বিশ্বস্ত হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত অমৃত সে ত সমস্ত কায়মনে তাহাকেই নিবেদন করিয়া দিয়াছিল!"

*

ছোটবাবুর বিরুদ্ধে তাঁর অবিবাহিতা বর্মা স্ত্রীর যে অভিযোগ ছিল পরে তা সমগ্র ভারতীয় সমাজের বিরুদ্ধে সমগ্র বার্মার অভিযোগে পরিণত হয়েছে, এমন একটা কথা অনেকের মুখে শোনা গেল। বার্মার স্বামী অবশ্য আমরা কখনোই ছিলাম না। ছিলাম স্বামীর তল্পীবাহক। (প্রসংগত বলি, বার্মা, মালয় ইত্যাদি দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কল্যাণে আমরাও যে অংশত উপকৃত হয়েছিলাম তার স্বীকৃতি আজ পর্যন্ত কোনো ভারতীয়ের মুখে শুনেছি বলে স্মরণ করতে পারিনে।) তবু আমাদের জিজ্ঞাসা না করে উপায় নেই, বার্মার কাছে আমাদের যতটুকু ঋণ বা নৈতিক দায় ছিল তার সবখানি আমরা পরিশোধ করেছি কিনা।

অতি সহৃদয় এক বাঙালী ভদ্রলোকের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম এক সন্ধ্যায়। তিনি বললেন, আমরা করিনি। সফল ব্যবসায়ী তিনি। সাফল্যের ব্যাখ্যায় বললেন, আমি স্থির করেছি, স্বাধীন বার্মা বর্মীদের জন্যে। তাদেরই সংগে ব্যবসা করি, ওরা আমাকে আপন বলে জানে। আবার সুদর্শন ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। পোশাকে পুরো বর্মী। মুখের কাঠামোতেও যে আমি দুয়েকটা বর্মী বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করলাম সে নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টিভ্রম, কেননা ভদ্রলোক বার্মা গেছেন মাত্র বছর কয়েক আগে। বাঙালী ক্লাবের তিনি বড় পৃষ্ঠ-পোষক, দুর্গাপুজা কমিটির পাণ্ডা। বৃহত্তর-বাঙলার এই সমন্বয়ে বৃহত্তর বাঙালীত্বকে ছাড়িয়ে গেছে কিনা আজো ঠিক করে বলতে পারব না।

এ এক সমস্যা। বাঙালী জাতিকে বাঁচতে হলে তার বাইরে যেতে হবে, কেননা পশ্চিমবংগে স্থানাভাব। বাইরে কি সে বাঙালী বিদেশী থাকবে চিরকাল? না কি স্থানীয় হবে, পুরোপুরি মিশে যাবে পারিপার্শ্বিকের সংগে? এ দ্বন্দ্বের সমাধান যাঁর জানা তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন।

মহা একটি প্রহসন

শনিবার, ১২ই অক্টোবর। স্থান: বল্লভভাই স্টেডিয়াম, বম্বাই। অনুষ্ঠান: রাজ কাপুরে (কার্লোভি ভারিতে গ্রাণ্ড প্রিক্স প্রাপ্ত) এবং সত্যজিৎ রায় (গোল্ডেন লায়ন অফ সেণ্ট মার্ক প্রাপ্ত) ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্তদের সম্বর্ধনা-ভোজে আপ্যায়ন। উদ্যোক্তা: ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া। সময়: সন্ধ্যা আটটা। রঙীন আলো দিয়ে সাজানো মণ্ডপ; মঞ্চের প্রথম ধাপে রয়েছে বিলিতী অর্কেস্ট্রা দলের রক-এণ্ড-রোল বাজনা। গুটি কয়েক পাশ্চাত্য পুরুষ-মহিলার বল-ড্যান্স চললো। নিমন্ত্রণ গিয়েছিল দেড় হাজার জনের কাছে, রাত দশটা পর্যন্ত উপস্থিতের সংখ্যা দেড়শোও পুরলো না। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বেশ কিন্তুভাব ফুটে ওঠা স্বাভাবিকই; দেখাও গেল তাই। ঐভাবেই সম্পন্ন হলো অনুষ্ঠান। পৃথিবীর মধ্যে যা একটি অনবদ্য অনুষ্ঠান হবার কথা সেটি রূপান্তরিত হলো মহা এক প্রহসনে। এটা হলো ভুল লোককে সম্বর্ধনা জানাবার গোঁ দেখাতে গিয়ে, আর সম্ভবতঃ অনুষ্ঠানটা বিলিতী কায়দায় করতে গিয়ে। ভুল হয়েছে 'জাগতে রহো'র জন্যে ছবিখানির প্রকৃত স্রষ্টাদের বদলে রাজ কাপুরকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে, ফলে তিনখানি ছবিতে ('পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' ও 'কাবুলিওয়ালা') আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন করে আনলেও কলকাতার কেউ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি। অনুষ্ঠানে প্রবেশমূল্য ধার্য হয়েছিল একা হলে কুড়ি টাকা এবং জোড়ে হলে তিরিশ টাকা, অবশ্য

—শৌভিক—
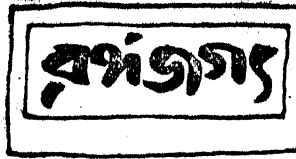
ওটা ধার্য হয়েছিল বল-ড্যান্স বাবদ। বম্বের চিত্রশিল্পের চলচ্চিত্র বিষয়ক কোন অনুষ্ঠান হলে লোকে ভেঙে পড়ে। সেদিন তাদের অনুপস্থিতি, এমন কি রাজ কাপুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপকুমারেরও অনুপস্থিতি সত্যিই অবাক হবার মতো ব্যাপার। উপস্থিত শ দেড়েকও নয়, তার মধ্যে শিল্পী কয়েক-জন মাত্র, বাকি সব চিত্রব্যবসায়ী। কুড়ি কি তিরিশ টাকার জন্যে, অর্থাৎ টিকিট কিনে নেমন্তন্ন রাখার পাশ্চাত্যে রীতিতে সায় নেই বলে হয়তো কেউ কেউ আসেননি, হয়তো বল-ড্যান্স দেখে অনেকে পিছিয়ে গেছেন, কিন্তু বম্বের লোকের ব্যাপকভাবে অনুপস্থিতির ঠিক কারণ বোঝা গেল না। কলকাতার কেউ উপস্থিত হয়নি কেন, সে বিষয়ে ফিল্ম ফেডারেশনের সভাপতি এম বি বিলিমোরিয়া স্পষ্টভাবে কিছু জানাননি। তবে ওখানকার লোকে শুধু এইটুকু বুঝতে সক্ষম হলো যে, একটা মতবিরোধ ঘটার ফলেই কলকাতা থেকে কেউ যায়নি। এটা বম্বাই বনাম কলকাতার বিরোধ নয়, ছবির পুরস্কার কার প্রাপ্য—প্রযোজকের না পরিচালকের, এই নিয়েই ফিল্ম ফেডারেশনের সঙ্গে মতদ্বৈধতা। ফেডারেশনের মতে পুরস্কারের অধিকারী প্রযোজক, কলকাতার মতে অধিকারী ছবির যিনি প্রকৃত স্রষ্টা তিনি, অর্থাৎ পরিচালক। এ বিষয়ে কলকাতার সঙ্গে ফিল্ম ফেডারেশনের যে পত্র বিনিময় হয় তা উদ্ধৃত করলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়। কলকাতা থেকে কেউ যাননি কেন অভিনন্দন গ্রহণ করতে তার কারণটাও প্রকাশিত হওয়া দরকার, যেহেতু ছবির পুরস্কার কার প্রাপ্য সেটা চূড়ান্ত-ভাবে নির্দিষ্ট হওয়া দরকার।

• • •

ফিল্ম ফেডারেশনের সভাপতি এম বি বিলিমোরিয়া ৩০শে সেপ্টেম্বর সত্যজিৎ রায়কে একখানি পত্র দ্বারা জানান রাজ কাপুরের সঙ্গে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর কথা। তাঁকে সম্মানিত করার উদ্যোগের জন্য ফিল্ম ফেডারেশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সত্যজিৎ রায় ৬ই অক্টোবর এম বি বিলিমোরিয়াকে লেখেন যে, দুটি কারণে তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অক্ষম। তার প্রথম কারণ হচ্ছে, অনেকদিন বিদেশে কাটানোর জন্যে তার কাজ অত্যন্ত ব্যাহত হয়ে পিছিয়ে পড়েছে এবং বর্তমান অবস্থায় কাজ রেখে গেলে উৎকর্ষ রক্ষার আশা ছাড়তে হয় যা তার পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কারণ—

'relates to the nature of the reception. It would seem that it is being accorded to the producers of the film in question i.e. to the business heads as opposed to the creative heads. I must humbly submit that in the former capacity my contribution to 'Aparajita' is negligible and in no way to be compared with the experienced contribution of Shri Raj Kapoor to 'Jagte Raho'. I merely happen to own a share in the producing Company of which I am the youngest and least experienced partner.'

('দেখা যাচ্ছে যে, সম্মানটা সৃজন সূত্রে যিনি প্রধান তাঁকে পুরস্কার না দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়িক সূত্রে যিনি প্রধান তাঁকে। বিনীতভাবে আমাকে জানাতে হচ্ছে যে, শেষোক্তভাবে 'অপরাজিত'তে আমার কৃতিত্ব নগণ্য এবং কোনক্রমেই তা 'জাগতে রহো'তে রাজ কাপুরের অভিজ্ঞ কৃতিত্বের সঙ্গে তুলনীয় নয়। প্রযোজক প্রতিষ্ঠানে আমার একটা অংশ আছে মাত্র এবং ওদের মধ্যে আমি কনিষ্ঠতম ও ন্যূনতম অভিজ্ঞ অংশীদার।') শ্রী বিলিমোরিয়া ঐ চিঠির উত্তরে এক টেলিগ্রামে জানান যে, সারা ভারত থেকে লোক আসবে সম্বর্ধনা জানাতে, সত্যজিৎ রায় যেন তাঁদের হতাশ না করেন; ১২ই অক্টোবর অন্তত অপরাহ্ন থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ব্যক্তিগত ও ব্যবসাগত অসুবিধা সত্ত্বেও যেন তিনি আসেন; নিমন্ত্রণপত্র উনি

মেহবুবের টেকনিকলার ছবি 'মাদার ইণ্ডিয়া'তে রাজকুমার ও নার্গিস

শিশু রঙমহল কর্তৃক সত্যজিৎ রায়কে সম্বর্ধনা। বক্তৃতায় শিশু রঙমহলের সভাপতি এন এন ভোস এবং উপবিষ্ট (বাম থেকে) এ এন কর, ইউ এন সুর, মেরি সুর, সমর চট্টোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, তারা সরকার, অঞ্জলি সেনগুপ্তা ও শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটোঃ মনো মিত্র

হয়ে গেয়েছে এখন আর বন্ধ করা যায় না। ৮ই অক্টোবর শ্রী বিলিমোরিয়া একখানি চিঠিতে জানানঃ

"Your message perplexes me with fine distinctions between Producer, Administrator and Creator. It is our desire to honour you for your achievement in 'Aparajito' which won the Golden Lion of St. Mark at the Venice Festival this year. We wish to felicitate you on your fine work in the film in creative capacity.

"I have asked the BMPA, the Aurora Films Corporation and my office in Calcutta to repeat my request that you and your colleagues should come to Bombay on Saturday, 12th inst. and accept the Industry's felicitations. I very well realise it means serious inconvenience to you at this stage but I am making this appeal to you again because I am confident you would respond to our call and not disappoint your earnest fellow-workers in the Industry, the reputation of which you have so signally advanced."

(অর্থাৎ "প্রযোজক, প্রশাসক ও স্রষ্টার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে আপনার বার্তা পেয়ে হতবুদ্ধি হলেম। আমাদের অভিপ্রায় হচ্ছে 'অপরাজিত'তে আপনার কৃতিত্বকে সম্মানিত করা যা এবছর ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন লায়ন অফ সেণ্ট মার্ক লাভ করেছে। স্রষ্টার পদে আপনার চমৎকার কাজের জন্যই আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করতে চাই। বি এম পি এ, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন এবং আমার কলকাতার অফিসকে [illegible] আপনার সহকর্মীদের নিয়ে চলচ্চিত্র [illegible] অভিনন্দন গ্রহণ করার [illegible] বম্বাই আসার জন্য [illegible] আবার আপনাকে জানাতে। আমি বুঝতে পারছি আপনার সাংঘাতিক অসুবিধে হবে, কিন্তু আমি আপনার কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি কারণ, আমার বিশ্বাস আছে, আপনি আমাদের আহ্বানে সাড়া দেবেন এবং চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যগ্র সহকর্মীদের হতাশ করবেন না, যে শিল্পের খ্যাতি আপনি বিশেষভাবে বাড়িয়েছেন।") ঐ তারিখেই ফিল্ম ফেডারেশনের সেক্রেটারী অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন, বি এম পি এ এবং বিলিমোরিয়া এণ্ড লালজীতে একটি টেলিগ্রামে তাদের বলেন, সত্যজিৎ রায়কে ফেডারেশন সভাপতির অনুরোধটা জানিয়ে বলতে যে তাঁকে স্রষ্টার কাজেই অভিনন্দন জানানো হবে, তিনি যেন অবশ্যই বম্বাই আসেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, সত্যজিৎ রায়ের বম্বাই যাবার আপত্তির যেটা কারণ, সেটা ফেডারেশন একরকম উপেক্ষাই করে চলেছেন। এথেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে, যেমনই হোক রাজ কাপুরকে অভিনন্দন জানানোটাই হচ্ছে অবশ্য; প্রযোজক ও ছবির স্রষ্টা পরিচালকের মধ্যে পার্থক্য তারা বুঝতে রাজী নন। তাই শ্রীবিলিমোরিয়ার ৮ই তারিখের পত্রের উত্তরে সত্যজিৎ রায় ব্যাপারটি স্পষ্ট করে লেখেনঃ

"The difference between a Producer and a Director in relation to JAGTE RAHO is that which exists between Sri Raj Kapoor—who financed and provided the facilities for making the film—and Sri Sambhu Mitra and Sri Amit Maitra, who jointly wrote and directed it. It is not a 'fine' distinction, as you say, but a broad, fundamental and self-evident one. I am amazed that you should fail to comprehend it. It leads me to conclude that this incomprehension is widespread and helps to explain the omission of the names of the creators of JAGTE RAHO from nearly all published reports of the victory at Karlovy Vary. But to me this is a matter of the utmost importance, and if only out of sympathy with the two artists

দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার রোটারি ক্লাবের মহিলা নাট্য শাখা কর্তৃক অভিনীত 'মৃচ্ছকটিক'-এর ইংরাজী অনুবাদ 'টয় কার্ট'-এর একটি দৃশ্য

ফটো: মনো মিত্র
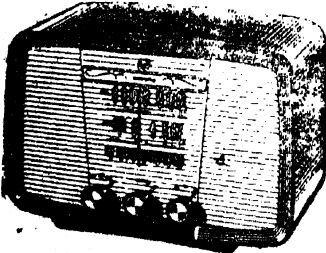
concerned, I must decline to attend a function that proposes to celebrate the victory but ignore its architects.

"However, I remain deeply thankful to you for the honour that you had intended to bestow on me. I regret the intervention, and hope that the error may be redressed."

(অর্থাৎ 'প্রযোজক ও পরিচালকের মধ্যে তফাৎটা হচ্ছে 'জাগতে রহো'র তৈরীতে অর্থ ও সুযোগ দেওয়ার জন্যে রাজ কাপুরের সংগে, যুক্তভাবে কাহিনী রচনা ও পরিচালনার জন্যে শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের যে তফাৎ, সেই তফাৎ। আপনি যা বলেছেন 'সুক্ষ্ম' বিভেদ, তা নয় বরং এটা স্থূল, মৌলিক এবং স্বতঃ প্রমাণিত পার্থক্য। আপনি এটা অনুধাবন করতে পারছেন না দেখে বিস্মিত হচ্ছি। এ থেকে এই ধারণাতে পৌঁছতে হয় যে, এই অননুধাবনতা ব্যাপক এবং কার্লোভি ভারিতে বিজয়লাভ সম্পর্কে প্রকাশিত প্রায় সকল বিবরণী থেকে 'জাগতে রহো'র স্রষ্টাদের নাম কেন বাদ পড়ে চলেছে তার কারণ বুঝতে পারা যায়। আমার কাছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং ঐ দুই শিল্পীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশার্থেই যে অনুষ্ঠানে বিজয় নিয়ে উৎসব, অথচ স্রষ্টাদের উপেক্ষা, সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া প্রত্যাখ্যান করতেই হয়। যাই হোক, আমাকে যে সম্মান জানাতে চেয়েছিলেন তার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এই মধ্যস্থতার জন্য দুঃখিত, এবং আশা করি এই ভুলের প্রতিকার হবে।")

* * *

সত্যজিৎ রায়ের প্রথম চিঠি পাবার পরই, মনে হয়, ফেডারেশন শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রকেও একটা নেমন্তন্ন পাঠানো দরকার বুঝে একটা টেলিগ্রাম পাঠান শম্ভু মিত্রের নামে এই বলে যে, শনিবার বাম্বাই বন্দের বল্লভভাই স্টেডিয়ামে অভিনন্দন-ভোজে আপনার এবং অমিতা মৈত্রের(?) উপস্থিতির জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।" কাকে অভিনন্দন, কিসের অভিনন্দন তার কোন ইংগিতও নেই টেলিগ্রামে। তাই শম্ভু মিত্র এক টেলিগ্রামে ফেডারেশনের কাছ থেকে সেটা জানতে চাইলেন। ইতিমধ্যে ৭ই অক্টোবর তারিখে শম্ভু মিত্রের কাছে দুখানি নিমন্ত্রণ-পত্র সমেত একখানি চিঠি এলো যাতে লেখা, একখানি আপনার এবং একখানি অমিতা মৈত্রের নামে শনিবার ১২ই ১৯৫৭ সালের আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্তদের অভিনন্দন জানানোর জন্যে ভোজে যোগদানের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হলো। এই পত্রে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করার আছে। সত্যজিৎ রায়ের চিঠিতে জানানো হয় যে, তাকে এবং রাজ কাপুরকে অভিনন্দন জানানো হবে, কিন্তু শম্ভু মিত্রকে জানানো হলো যে, আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত সকলকেই অভিনন্দন জানানো হবে। নিমন্ত্রণ-পত্র যা এলো সেটা আবার আর একরকম। তাতে দুটি মাত্র নাম, সত্যজিৎ রায় এবং রাজ কাপুরের আলাদাভাবে দেওয়া, তার পরে রয়েছে 'এবং ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত অপরদের' অভিনন্দন জানানো হবে। এর পর ৮ই অক্টোবর শম্ভু মিত্র আর একখানি চিঠি পান। তাতে ছিল:

"The Federation has been planning a function to honour the Award Winners and it was decided to have the Dinner on 12th October, as it was explained that friends from Bengal would be able to leave Calcutta only after Laxmi Puja on 9th. We had requested the Bengal Motion Picture Association to give us a list of all persons connected with the Award Winning Pictures, so that invitations could be sent to them.

"Meanwhile our President received a report that there was a feeling that your name and the name of Sri Ashit Sen who were the Directors of "Jagte Raho" had been left out of the invitees. The Federation wishes to honour every one connected with the Award Winning Pictures, and there can be no room for any misunderstanding in the matter. So, I was asked to send you a telegraphic invitation along with the printed one. The name of Sri Amita Moitra was given to me by a press representative as that of one of your colleagues and I included it."

("ফেডারেশন পুরস্কারপ্রাপ্তদের সম্মানিত করার জন্য একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছে এবং স্থির হয় ভোজটি হবে ১২ই অকটোবর, যেহেতু জানা গেল বাঙলার

বন্ধুরা ৯ই তারিখে লক্ষ্মীপূজোর পর না হলে আসতে পারবেন না। আমরা বেঙ্গল মোশন পিকচার এসোসিয়েশনের কাছে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের নামের তালিকা চেয়েছি যাতে তাদের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো যায়। ইতি-মধ্যে আমাদের সভাপতি শুনতে পান যে, 'জাগতে রহো'র পরিচালক আপনারা যাঁরা ছিলেন, আপনার নাম এবং অমিত সেনের নাম নিমন্ত্রিতদের তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। ফেডারেশন পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি-গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকেই অভিনন্দন জানাতে চায় এবং এ বিষয়ে কোন ভুল বোঝার অবকাশ নেই। এই কারণেই আপনার কাছে টেলিগ্রামের সঙ্গে ছাপানো নিমন্ত্রপত্র পাঠাবার নির্দেশ ছিল। আপনার সহকর্মী বলে অমিতা মৈত্রের নাম আমাকে এক সাংবাদিক দিয়েছিলেন তাই আমি ঐ নামটা ধরে ছিলাম।") এ চিঠি থেকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে 'জাগতে রহো'র পরিচালকদের কতোটা অবজ্ঞা করার চেষ্টা হয়েছে। যে ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায়, ফেডারেশন সে ছবির পরিচালকের নামও জানে না! তাছাড়া, রাজ কাপুর বা আর কে ফিল্মস বম্বেতেই অবস্থিত—একটা টেলিফোন করলেই পরি-চালকের নাম জানা যেতো, কিন্তু যারা উপেক্ষিত হবে বলে ঠিকই করে রাখা হয়ে-ছিল, তাদের নাম ঠিক হলো কি নাহলো, সেটা দেখবার চেষ্টা ফেডারেশন সেক্রেটারীর না হওয়াই স্বাভাবিক। অসিত সেনের নাম যে কিভাবে এলো বোঝা দুষ্কর। শম্ভু মিত্র ঐ চিঠির জবাবে জানান:

"The invitations clarified the position,—at least, clarified the ambiguity of the position very sharply.

"It is a dinner given to felicitate the winners of International Awards, 1957. In the case of Sri Satyajit Roy it is the director (and NOT the Producer) who is being felicitated, and in the case of Sri Raj Kapoor it is the producer (and NOT the Director).

"In science they say that there must be a cause or a number of causes for every effect. So it must have been in this case also.

"If the names are chosen according to some private causal chain, we can only thank you for remembering to invite us. But we are at a loss to understand that how we can come in the picture.

"We worked in the very humble and creative capacity of the Story-writer, the Scenarist, and the Director. This invitation to us, people would say, is almost like adding insult to injury."

I write this letter with the fullest consent of my friend Sri Amit Maitra also.

("নিমন্ত্রণপত্রে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো—অন্ততঃ দ্ব্যর্থবোধকতা ঘুচলো। এটা হচ্ছে ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক পুরস্কার-প্রাপ্তদের জন্য ভোজ। সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে পরিচালক—প্রযোজককে নয়—অভি-নন্দন জানানো হচ্ছে, এবং রাজ কাপুরের ক্ষেত্রে প্রযোজককে (পরিচালককে নয়)। বিজ্ঞান বলে সব কিছুরই এক বা একাধিক কারণ থাকে। এক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই তাই। নাম-গুলি যদি হঠাৎ কোন প্রাইভেট সূত্র থেকে বেছে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আমাদের যে মনে করে নিমন্ত্রণ করেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু বুঝতে পারছি না এর মধ্যে আমরা কি করে পড়ি। আমরা কাহিনী-রচয়িতা, চিত্রনাট্য রচয়িতা ও পরিচালকরূপে সৃজনসূত্রে কাজ করেছি মাত্র। এই নিমন্ত্রণ, লোকে বলবে, আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া। এ চিঠি লিখলাম আমার বন্ধু অমিত মৈত্রের সম্পূর্ণ সম্মতি নিয়ে।"

দিলীপকুমার রায়কে সম্বর্ধনা—গত রবিবার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ষাট বৎসর বয়োঃপূর্তি উপলক্ষ্যে জন-সম্বর্ধনা জানানো হয়। অধ্যক্ষ সত্যেন বসু দিলীপকুমার রায়ের হাতে একটি স্মারক গ্রন্থ উপহার দেন

• • •

অভিনন্দন অনুষ্ঠানে বাঙলার শিল্পীদের যোগদান কেন সম্ভব হয়নি সে বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা থাকে না চিঠিগুলি পড়বার পর। যোগদান করা উচিতও হতো না। কারণ, অভিনন্দনটা ছিল রাজ কাপুরেরই জন্যে, নেহাৎ সত্যজিৎ রায় গোল্ডেন-লায়ন পাওয়ায় তাকেও না জানিয়ে উপায় ছিল না। তাই দেখা যায়, ফেডারেশন যে কোন্ মতে চলবেন সেটা তারা ঠিক করতে পারেননি। ছবির প্রযোজককে অভিনন্দন জানানোই যদি তাদের উদ্দেশ্য তাহলে, 'জলদীপ' ছবি-খানির জন্যে (ভেনিসে ছোটদের ছবির মধ্যে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত) চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটিকে অভিনন্দিত না করে পরিচালক কেদার শর্মাকে অভিনন্দন কেন? —কিংবা, "পথের পাঁচালী"র জন্যে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ন-মেণ্টকেই বা নিমন্ত্রণ পাঠানো হলো না কেন? কোন যুক্তি না পেয়ে ফেডারেশন নাকি শেষে বলে ফেলেন যে, প্রযোজক পরিচালক তারা বোঝেন না, হাতে করে যে ব্যক্তি পুরস্কার গ্রহণ করেছে অভিনন্দন তারই প্রাপ্য। এই ছেলেমানুষী যুক্তিই যদি মানতে হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ন-মেণ্টের পক্ষে এডিনবরায় সেলজ্‌নিক মেডেল গ্রহীতা মণি মৌলিককেও তো ডাকা উচিত ছিল অভিনন্দন দেবার জন্যে। অভিনন্দন কার প্রাপ্য সে বিষয়ে দ্বিমত থাকবার কোন কথাই উঠতে পারে না। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের ক্ষেত্রে পুরস্কার প্রযোজককে দেওয়া হয় বলে অনেক কথা উঠেছিল, যার ফলে ঠিক হয় যে, এবার থেকে পরিচালককেও পুরস্কৃত করা হবে। কিন্তু পুরস্কার পরিচালক পাবে না, পাবে প্রযোজক, সেটা আমাদের দেশের

'জন্মতিথি'তে অনুপকুমার ও সবিতা চট্টোপাধ্যায়

ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবার নয়। কারণ, আমাদের দেশে, সত্যজিৎ রায়ের কথায়, প্রযোজক হচ্ছেন যিনি টাকা দেন এবং ছবি তোলার সুবিধা দেন। কার্লোভি ভারির পুরস্কারে অমন আত্মহারা হয়ে না উঠলে রাজ কাপুর নিজেও তা স্বীকার করতেন। কিন্তু সেদিন বম্বের অনুষ্ঠানটি হলো ডেনমার্কের রাজা ছাড়াই হ্যামলেটের অভিনয়ের মতো। ব্যাপারটা যে কি রকম প্রহসনে দাঁড়াবে বম্বের লোকে তা আঁচ করেই বোধহয় অনুপস্থিত হয়। অনুষ্ঠানের খবরটাকে সংবাদপত্রের বিবরণীতে চাপা দেবারও আবার চেষ্টা হয়েছে। সংবাদপত্রের বিবরণীতে গোড়াতেই বড় হরফে যে সারাংশ ছাপা হয়েছে, সেটা পড়লে মনে হবে সত্যজিৎ রায়ও যেন উপস্থিতই ছিলেন। বাইরের কাগজের জন্য এজেন্সী মারফৎ যে বিবরণ পাঠানো হয় তাও পড়লে মনে হবে সত্যজিৎ রায়ও ছিলেন অভিনন্দন নিতে। রাজ কাপুর কোনমতেই দ্বিতীয় হতে রাজী নন। সেদিনের অনুষ্ঠানে বিচিত্র ভাষণে শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের কৃতিত্বের স্বীকৃতি লাভ করে রাজ কাপুর তাঁর ভাষণেও ওদের দুজনের নাম করলেন, কিন্তু একটার পর একটা আলোকচিত্রশিল্পী, শব্দযন্ত্রী, সঙ্গীত পরিচালক, সম্পাদক, শিল্প নির্দেশক প্রভৃতি সকলের নাম করে এইটেই বোঝাতে চাইলেন যে, শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র অন্যান্য সব কর্মীদের চেয়ে বেশী কোন কৃতিত্বের অধিকারী নন। সভাপতি শ্রী [illegible] তাঁর অভিনন্দন ভাষণে ওদের দুজন এবং অন্যান্যদের মধ্যে তপন সিংহ, রবিশঙ্কর প্রভৃতির নামও উল্লেখ করেন, কিন্তু বম্বাইয়ের কাগজে তা পাওয়া যাবে না; ওখানকার পত্র-পত্রিকাও রাজ কাপুরের দাবীটাই ন্যায্য মনে করে।

চিত্রালোচনা

ক' সপ্তাহ ধরে নতুন ছবির আবির্ভাব খুবই কম। বাংলা এবং হিন্দী দুই-ই। অবশ্য ছবির কোন অভাব নেই, অভাব চিত্রগৃহের, আর এ অভাবটা বরাবরের। প্রথম চিত্রগৃহটি যেদিন নির্মিত হয় তার ঠিক পরের দিন থেকেই চিত্রগৃহের অভাব, এবং আজ কলকাতায় আটাত্তরটি চিত্রগৃহ গড়ে উঠলেও সেই অভাবই রয়ে গিয়েছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে ছবির সংখ্যা বৃদ্ধি। আর দ্বিতীয়ত জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। গত তিন সপ্তাহ ধরে কোন নতুন বাংলা ছবি মুক্তি পায়নি, তার কারণ পাঁচখানি ছবি যা আগে মুক্তি পেয়েছে সেগুলি ভাল চলছে বলে হটে যাবার প্রশ্ন আসেনি। চিত্রগৃহ সংখ্যায় আরো বাড়লেও এ অসুবিধে দূর হবার নয়। দূর হতে পারে, যদি ছবি কমে যায় বা লোকে চিত্রগৃহে যাওয়া কমিয়ে ফেলে, যেমন ঘটছে বিলেতে, আমেরিকায় এবং অন্যান্য যেসব দেশে টেলিভিশনের ব্যাপক প্রচলন। কাজেই নতুন ছবি মুক্তিলাভ করছে না বলে আক্ষেপ করার কিছু নেই, বরং ছবি ভাল চলছে, ব্যবসা ভাল হচ্ছে বলে উল্লসিত হওয়াই উচিত। এ সপ্তাহে নতুন ছবি মাত্র একখানি হিন্দী, মেহবুবের 'মাদার ইণ্ডিয়া' এবং একখানি বাংলা, [illegible]। বছর পনের আগে তোলা [illegible] ছবিখানিই নতুন-ভাবে মুক্তি [illegible]। [illegible] স্ট্যাণ্ডার্ডে [illegible] এসোসিয়েশন [illegible] সম্মানিত হয়েছিল। এ সপ্তাহের আলোচ্য হচ্ছে একখানি ছবি, 'হিল স্টেশন'।

ছকে ফেলা ক্রাইম-ড্রামা

আরম্ভটা যার জুয়া খেলার দৃশ্য নিয়ে, সে ছবির শেষ যে খুনোখুনিতে তা বুঝতে পারা যায় দেখতে বসেই। তাতে নাম 'হিল স্টেশন' এই কারণেই যে ঘটনার সূত্রপাত এক পাহাড়ে [illegible]। একেবারে ছকে ফেলা [illegible]; জুয়া খেলাতে খেলাতে নায়কের [illegible] হোটেল মালিক স্বয়ং, তার [illegible] পড়া; নায়কের হোটেলের নর্তকীর [illegible]। প্রেমে পড়ে তাকে মালিকের গ্রাস থেকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে যাওয়া; তাই নিয়ে মায়ের রাগ কারণ নায়কের জন্যে অন্য পাত্রী ঠিক হয়ে রয়েছে আগে থেকেই; শেষে [illegible] পছন্দকেই [illegible] হোটেল মালিকের আবির্ভাব এবং নায়কের মনোনীত পাত্রী যে নর্তকী সে কথা ফাঁস করে দেওয়া; তাই শুনে মেয়েটির অন্তর্ধান আর তাই নিয়ে মায়ে ছেলেতে এমন বিরোধ যার ফলে বুকের যন্ত্রণায় মা মরণাপন্ন; মায়ের জীবন বাঁচাতে নায়কের রাজী হয়ে মায়ের মনোনীত মেয়েকেই বিয়ে করা; বিয়ের পর সে-স্ত্রীর মনে শান্তি নেই কারণ নায়কের মন তার আগেকার প্রেমিকার ওপর; তাই নিয়ে অশান্তি এবং স্ত্রীর উন্মাদ হওয়া; হাসপাতালে তাকে সেবা করে ভাল করে তুললো নায়কের প্রেমিকা; আবার হোটেল মালিকের আবির্ভাব; নায়ককে এবং তার প্রেমিকাকে জব্দ করার জন্য নায়কের স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা; আদালতে একটা সত্র ধরে পাহাড়ের বিশ্রামাগারে গিয়ে হোটেল মালিককে [illegible] পাওয়া; হোটেল মালিকের পলায়ন; পুলিশের তাড়া; মোটরের ভয়াবহ

বরুণ পিকচার্সের 'জন্মান্তর' চিত্রে নির্মলকুমার ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

কৃতিত্বের প্রশংসা না করে পারা যায় না। এর পরে আর এক জায়গাতেও প্রশংসা করতে হয়—ছোটটি চিঠি নিয়ে পালাবার সময় পাহাড় ডিঙিয়ে নদী পার হয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় চিঠিখানি ওর অজ্ঞাতে পড়ে যায়। অনেকখানি পথ পার হয়ে সেই চিঠি খুঁজতে পকেটে হাত দিয়েই ওর সেই দারুণ হতাশা, যে বিপদ থেকে পালিয়ে এসেছে, চিঠির খোঁজে পা পা করে সেই বিপদের দিকে আবার ফিরে যাওয়া এবং শেষে চিঠিখানি খুঁজে পাওয়া, এ পরিস্থিতিটিও পরিচালনা গুণে হৃদয়স্পর্শী। টেকনিক্যাল কাজ আমাদের দেশের স্ট্যাণ্ডার্ডে নিন্দনীয় নয়। চীনা চলচ্চিত্র নির্মাতারা এক বিষয়ে ভারতের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে; সেটা হচ্ছে পাপেট-ফিল্ম তোলায়। সেদিন "প্রিন্স অফ হুশাও নদী" নামে একখানি প্রায় চার হাজার ফিটের পাপেট-ফিল্ম দেখা গেল যা বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় দেয় এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের যে পাপেট-ফিল্ম দেখা গিয়েছে সে তুলনায়ও যথেষ্ট পরিণত কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এই কখানি ছবি দেখেই অবশ্য সমগ্র চীনা চলচ্চিত্র শিল্পের কৃতিত্বের বিচার হয় না। তবে বছর কতক আগে যে খানকয়েক চীনা ছবি দেখা গিয়েছিল তার চেয়ে এখন যে অনেক উন্নত হয়েছে সেটা বেশ অনুভব করা যায়। চীনা ছবির প্রতি আমাদের অনেক দৃষ্টি দেওয়া দরকার এইজন্যে যে, ওরা আমাদের ছবি কিনছে এবং চীনের নিজস্ব বাজারে ভারতীয় ছবি চালানো সেটা যেমন আমাদের নানা দিক থেকেই, তার বদলে ভারতের বাজারেও চীনা ছবির প্রচলন উভয় দেশেরই চলচ্চিত্র ব্যবসাকে লাভবান করে তুলবে।

ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ

গত রবিবার ভারতীয় সঙ্গীত সমাজের উপাধি বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ বিশ্ব বিখ্যাত প্রতিষ্ঠিত এলাহাবাদের প্রয়াগ সঙ্গীত সমাজের সঙ্গে যুক্ত। এদের শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নাম করা যায় মীরা চট্টোপাধ্যায় (বন্দ্যোপাধ্যায়), যিনি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এবং মনোজ মুখোপাধ্যায়, যিনি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন। সেদিনের দীক্ষান্ত উপাধি বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ বিমল রায়, প্রধান অতিথি ছিলেন ডি এ পি ভাণ্ডার এবং দীক্ষান্ত-ভাষণ প্রদান করেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিশু রঙমহলের অনুষ্ঠান

গত ১৩ই অক্টোবর শিশু রঙমহলের বিজয়া সম্মেলন মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক সমর চট্টোপাধ্যায় অভ্যাগতদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে শিশু রঙমহলকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান করে নেবার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। এই সূত্রে তিনি জানান যে, শিশু রঙমহলের বার্ষিক সম্মেলন এবার ডিসেম্বর মাসের শেষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। এবার সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে শিশুরা সম্মেলনে যোগদান করতে আসবে। সেদিনের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অনিমেষ বসু ও ডি পি নাহা।

* * *

গত ২১শে অক্টোবর পূর্ণ থিয়েটারে এক অনুষ্ঠানে শিশু রঙমহলের পক্ষ থেকে পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে অভিনন্দন জানানো হয়। 'পথের পাঁচালী'র অপু ও দুর্গা বাঙলার চিরন্তন শিশু। তারই চিত্র নির্মাণে সত্যজিৎ রায় অপূর্ব নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তাই গুণমুগ্ধ শিশু রঙমহলের পক্ষ থেকে তাঁকে এই অভিনন্দন জানানো হয়। অভিনন্দন অন্তে "পথের পাঁচালী" প্রদর্শিত হয়।

মহিলাদের 'মৃচ্ছকটিক' অভিনয়

দক্ষিণ-পশ্চিম কলকাতার রোটারি ক্লাবের মহিলা নাট্য শাখা গত ১৬ই অক্টোবর নিউ এম্পায়ারে শূদ্রকের সংস্কৃত নাটক 'মৃচ্ছকটিক'এর ইংরাজী অনুবাদ 'টয় কার্ট' মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল সোসাইটি ফর দি প্রটেকশন অফ চিলড্রেন ইন ইণ্ডিয়ার সাহায্যার্থে। ভারতীয় মহিলাদের ইংরাজীতে নাট্যাভিনয় বিশেষ কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। অভিনয়ে যে পারদর্শিতারও পরিচয় এঁরা দেখিয়েছেন তার প্রমাণ এঁদের মধ্যে তিনজনের স্বর্ণপদক উপহার লাভ। এই তিনজন ছিলেন বিচারক, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সম্বাহকের চরিত্রে যথাক্রমে এন বেসিল, অপু দেব ও কমলা মুখোপাধ্যায়। চারুদত্ত, মৈত্রেয় ও বসন্তসেনার চরিত্রে অভিনয় করেন যথাক্রমে লীলা সরকার, শকুন্তলা বসু ও শান্তা সুব্রামানিয়ন।

* * *

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে রাজকুমারী চিত্র মন্দিরের "যমালয়ে জীবন্ত মানুষ"এর মহরৎ গত বুধবার সকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়। ছবিখানি পরিচালনা করছেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী। এর কাহিনীটি দীনবন্ধু মিত্রের এই নামের পুরনো রচনা থেকে নেওয়া নয়, এটি নতুন রচনা করেছেন গৌর শী। এর সঙ্গীত পরিচালনা করবেন শ্যামল মিত্র। সেদিন পরিচালক সুশীল মজুমদার ক্ল্যাপস্টিক দেবার সঙ্গে মহরৎ শর্টটি গ্রহণ করা হয়। দৃশ্যে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন নবাগতা বাসবী।

* * * *

বাঙলা ছবির একজন "leading" প্রযোজক-পরিচালক ছবি তুলতে পঁচাত্তর হাজার টাকা ধারের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। ভাল এবং নামকরা চিত্রনির্মাতাকে টাকা দিয়ে ছবি করাবার জন্যে পরিবেশকরাই তৈরি সর্বদা, এই তো বলে সকলে। কিন্তু কে এমন "leading" অর্থাৎ সামনের সারির প্রযোজক-পরিচালক, যার খবর পরিবেশকরা রাখেন না, সেটা জানবার মতো খবর।

একলব্য

মেলবোর্নে বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতি-যোগিতা আরম্ভ হবার আগেই ১৯৫৮ সালের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যে মূল প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবারও অধিকার অর্জন করেছে।

বিশ্ব ফুটবল বা জুলেস রিমেট কাপ প্রতিযোগিতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতি-যোগিতা। অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার পার্থক্য—অলিম্পিক শুধু শৌখীন খেলোয়াড়দের জন্যই সীমাবদ্ধ। পেশাদার খেলোয়াড়, অর্থাৎ খেলাকেই যারা জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন, অলিম্পিকে তাদের যোগদানের অধিকার নেই। আর বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা জাতিধর্ম পেশা নির্বিশেষে বিশ্বের সর্বশ্রেণীর ফুটবল খেলোয়াড়দের জন্যই উন্মুক্ত। এতে শৌখীন খেলোয়াড়দেরও যেমন যোগদানের অধিকার আছে, পেশাদার খেলোয়াড়দেরও তেমন আছে যোগদানের অধিকার। তাই এ প্রতি-যোগিতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা হিসাবেই স্বীকৃত। সারা জগতের ফুটবল প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব যাচাইয়ের জন্যই ১৯২৮ সালে ফেডারেশন অব ইণ্টারন্যাশন্যাল ফুটবল এসোসিয়েশনের লুক্সেমবার্গ অধি-বেশনে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা পরি-চালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ফেডারেশন অব ইণ্টারন্যাশন্যাল ফুটবল এসোসিয়েশনের পরম ক্রীড়ানুরাগী প্রাক্তন সভাপতি মিঃ জুলেস রিমেটের নামানুসারে বিজয়ীর পুরস্কারের নামকরণ করা হয় জুলেস রিমেট কাপ। ১৯৩০ সাল থেকে প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়। ঠিক হয় অলিম্পিকের মধ্যবর্তী সময়ে অলিম্পিকেরই মত প্রতি ৪ বছর অন্তর এক একটি দেশে বিশ্ব ফুটবল কাপের খেলা পরিচালনা করা হবে।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হবার আগে উপর্যুপরি দুইটি অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ফুটবল বিজয়ী উরুগুয়ের উপর প্রথম বারের জুলেস রিমেট কাপের খেলা পরিচালনার সম্মান অর্পণ করা হয়। সুতরাং ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ আমেরিকার মণ্টিভিডো শহরে। ১৯৩৪ সালে ইটালীতে এবং ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সে যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হবার পর বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। ফলে ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালের অনুষ্ঠান বন্ধ থাকে। যুদ্ধ অবসানের পর যুদ্ধ-ক্লান্ত [illegible] আয়োজনের জন্য মানুষ আবার যখন উদগ্রীব হয়ে উঠলো তখন ১৯৫০ সালে ব্রেজিলে আবার আরম্ভ হল বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার চতুর্থ অনুষ্ঠান। ১৯৫৪ সালে সুইজার-ল্যাণ্ডে শেষবার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫৮ সালে ষষ্ঠ প্রতিযোগিতার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে সুইডেন। অবশ্য সারা বিশ্বেই এখন চলছে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা। ১৬টি দেশকে নিয়ে মূল প্রতি-যোগিতার খেলা অনুষ্ঠিত হবে সুইডেনে আগামী জুন মাসে।
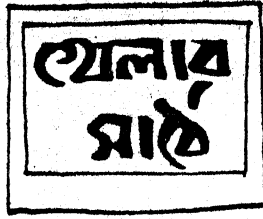
জুলেস রিমেট কাপের খেলা প্রতিবার একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হয় না। যোগদান-কারী দেশের সংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতার নিয়মকানুনেরও কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। তবে যতগুলি দেশই যোগদান করুক না কেন ১৬টির বেশী দেশ মূল প্রতিযোগিতায় প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করবার অধিকার পায় না। এর মধ্যে মূল প্রতিযোগিতার পরিচালনাকারী দেশ এবং আগের বারের জুলেস রিমেট কাপ বিজয়ী দেশ অন্যতম। বাকী ১৪টি দেশের নির্বাচনের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে সারা বিশ্বেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত তিনটি দেশকে এক একটি গ্রুপে রেখে লীগ প্রথায় পরিচালনা করা হয় প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা। প্রতি দেশকেই নিজ গ্রুপের অপর দুটি দেশের সঙ্গে দুটি করে খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। একটি খেলা অনুষ্ঠিত হয় নিজের দেশে পাল্টা খেলাটি খেলতে হয় প্রতিপক্ষের দেশে গিয়ে। লীগের নিয়মানুযায়ী জয়-লাভের জন্য ২ পয়েণ্ট এবং অমীমাংসিত খেলার জন্য এক পয়েণ্ট প্রাপ্য। একটি গ্রুপে দুই দেশ সমান পয়েণ্ট সংগ্রহ করলে কোন তৃতীয় দেশে গিয়ে তাদের আবার প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে হয় মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার সুযোগ লাভের জন্য। সমস্ত ব্যবস্থাই হয় 'ফিফা' অর্থাৎ ফেডারেশন অব ইণ্টারন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রতিযোগিতা কমিটির নির্দেশে। যোগ-দানকারী দেশগুলিকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগও করেন 'ফিফা'র প্রতিযোগিতা কমিটি।

প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর বিজয়ী ১৪টি দেশ আর আগের বারের জুলেস রিমেট কাপ বিজয়ী ও মূল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপক দেশকে নিয়ে মোট ১৬টি দেশের মূল খেলাও অনুষ্ঠিত হয় লীগ প্রথায় ৪টি গ্রুপে। এই চারটি গ্রুপের বিজয়ী ও রানার্স কোয়ার্টার ফাইন্যালে খেলার সুযোগ পায় এবং কোয়ার্টার ফাইন্যাল, সেমি-ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় নক আউট প্রথায়। ১৯৫০ সালে অবশ্য মূল প্রতিযোগিতার চারটি গ্রুপ বিজয়ীর মধ্যে আবার লীগ প্রথায় খেলা পরিচালিত হয়েছে এবং লীগ বিজয়ী দল লাভ করেছে জুলেস রিমেট কাপ। তার আগে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর মূল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে নক আউট প্রথায়। তাই বলছিলাম প্রতিবার একই নিয়মে খেলা অনুষ্ঠিত হয় না, আঞ্চলিক দেশ ভাগও হয় না এক নিয়মে।

যাই হক, বিশ্ব ফুটবলের মূল প্রতি-যোগিতার অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভকারী দেশ ১১টি রৌপ্য পদকের অধিকারী হয়। বিজয়ী দেশ জুলেস রিমেট কাপ ছাড়া লাভ করে ১১টি স্বর্ণপদক। প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণকারী খেলোয়াড়কে অবশ্যই তার দেশের নাগরিক হতে হবে। কোন খেলোয়াড় অপর কোন দেশের ফুটবল এসোসিয়েশনের অনুমোদিত খেলোয়াড় হিসাবে যদি পরি-গণিত থাকেন তবে সেই দেশের ফুটবল

এসোসিয়েশনের অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি নিজ দেশের পক্ষে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

আগেই বলা হয়েছে, প্রতি ৪ বছরের ব্যবধানে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং বিশ্বের সমস্ত ফুটবলপ্রিয় দেশই বিশ্বপ্রাধান্য প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য নিজেদের উপযুক্ত এবং প্রস্তুত করবার যথেষ্ট সময় পায়। একটি প্রতিযোগিতার পরই পরবর্তী প্রতিযোগিতার জন্য দেশে দেশে সাজ সাজ রব পড়ে যায়।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় এবার পৃথিবীর প্রায় অর্ধশত দেশ অংশ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ইংলণ্ড, ব্রেজিল এবং প্যারাগুয়ে ইতিমধ্যেই মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকার অর্জন করেছে। আর গতবারের বিজয়ী পশ্চিম জার্মানী এবং অনুষ্ঠানের আয়োজনকারী দেশ সুইডেন তো আছেই। এবারের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আগামী সপ্তাহে আলোচনার ইচ্ছে রইলো। তার আগে পূর্বের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

প্রথম প্রতিযোগিতা—১৯৩০ সাল

আগেই বলেছি, বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভের আগে উরুগুয়ে উপর্যুপরি দু'বার অলিম্পিক ফুটবল খেলায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছিল। সুতরাং ফেডারেশন অব ইণ্টারন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশন উরুগুয়ের উপরই প্রথমবারের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার পরিচালনার সম্মান অর্পণ করে। দক্ষিণ আমেরিকার মণ্টিভিডো শহরে ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে জুলেস রিমেট কাপের খেলা আরম্ভ হয়। প্রথমবারের অনুষ্ঠানে যোগদান করে বিশ্বের ১৩টি দেশ। এদের নাম—ফ্রান্স, মেক্সিকো, আর্জেণ্টিনা, চিলি, যুগোশ্লাভিয়া, ব্রেজিল, বলিভিয়া, রুমেনিয়া, উরুগুয়ে, পেরু, ইউ এস এ, বেলজিয়াম ও প্যারাগুয়ে। এই ১৩টি দেশকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে প্রথমে লীগ প্রথায় প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা হয়। চারটি গ্রুপের বিজয়ী সেমি-ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নক আউট প্রথায়। সেমি-ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলার ফলাফল:—

সেমি-ফাইন্যাল

আর্জেণ্টিনা (৬)	ইউ এস এ (১)
উরুগুয়ে (৬)	যুগোশ্লাভিয়া (১)

ফাইন্যাল

উরুগুয়ে (৪)	আর্জেণ্টিনা (২)

দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা—১৯৩৪ সাল

১৯৩৪ সালের মে ও জুন মাসে দ্বিতীয় বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ইটালীতে। এবছর ২৯টি দেশ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রাথমিক প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় গ্রহণ করে হাইতি, কিউবা, মেক্সিকো, প্যালেস্টাইন, লিথুয়ানিয়া, পর্তুগাল, গ্রীস, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, আয়ারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও লুক্সেমবার্গ। বাকি ১৬টি দেশের মধ্যে নক আউট প্রথায় খেলায় ইটালী বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ের খেলায় ইটালী ২—১ গোলে পরাজিত করে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সেমি ফাইনালে পরাজিত দুইটি দেশের খেলায় জার্মাণী পরাজিত করে অস্ট্রিয়াকে। নীচে মূল প্রতিযোগিতার খেলার ফলাফল দেওয়া হল—

প্রথম রাউণ্ড

ইটালী (৭)	ইউ এস এ (১)
স্পেন (৩)	ব্রেজিল (১)
অস্ট্রিয়া (৩)	ফ্রান্স (২)
হাঙ্গেরী (৪)	মিশর (২)
চেকোশ্লোভাকিয়া (২)	রুমেনিয়া (১)
সুইজারল্যাণ্ড (৩)	নেদারল্যাণ্ড (২)
জার্মাণী (৫)	বেলজিয়াম (২)
সুইডেন (৩)	আর্জেণ্টিনা (২)

দ্বিতীয় রাউণ্ড

ইটালী (১) (১)	স্পেন (১) (০)
অস্ট্রিয়া (২)	হাঙ্গেরী (১)
সুইজারল্যাণ্ড (২)	চেকোশ্লোভাকিয়া (৩)
জার্মাণী (২)	সুইডেন (১)

সেমি ফাইন্যাল

ইটালী (১)	অস্ট্রিয়া (০)
চেকোশ্লোভাকিয়া (৩)	জার্মাণী (১)

ফাইন্যাল

ইটালী (২)	চেকোশ্লোভাকিয়া (১)

তৃতীয় প্রতিযোগিতা—১৯৩৮ সাল

১৯৩৮ সালের জুন মাসে তৃতীয় বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ফ্রান্সে। মোট ৩৬টি দেশ এবারের প্রতিযোগিতায় যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত ২৫টি দেশকে নিয়ে প্রাথমিক প্রতিযোগিতার খেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজনকারী দেশ এবং আগেরবারের জুলেস রিমেট কাপ বিজয়ী দেশকে এইবার থেকেই সরাসরি মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকার দেওয়া হয়। নীচে মূল প্রতিযোগিতার খেলার ফলাফল দেওয়া হল—

প্রথম রাউণ্ড

সুইজারল্যাণ্ড (১) (৪)	জার্মাণী (১) (২)
হাঙ্গেরী (৬)	ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ (০)
সুইডেন—(ওয়াক ওভার)	
কিউবা (৩) (২)	রুমেনিয়া (৩) (১)
ফ্রান্স (৩)	বেলজিয়াম (১)
ইটালী (২)	নরওয়ে (১)
ব্রেজিল (৬)	পোল্যাণ্ড (৫)
চেকোশ্লোভাকিয়া (৩)	নেদারল্যাণ্ডস (০)

দ্বিতীয় রাউণ্ড

হাঙ্গেরী (২)	সুইজারল্যাণ্ড (০)
সুইডেন (৮)	কিউবা (০)
ইটালী (৩)	ফ্রান্স (১)
ব্রেজিল (১) (২)	চেকোশ্লোভাকিয়া (১) (১)

সেমি ফাইন্যাল

হাঙ্গেরী (৫)	সুইডেন (১)
ইটালী (২)	ব্রেজিল (১)

ফাইন্যাল

ইটালী (৪)	হাঙ্গেরী (২)

চতুর্থ প্রতিযোগিতা—১৯৫০ সাল

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালের প্রতিযোগিতা স্থগিত থাকবার পর ১৯৫০ সালের জুন-জুলাই মাসে ব্রেজিলে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা। ১৯৩৮ সালের বিজয়ী ইটালী এবং প্রতিযোগিতার আয়োজনকারী দেশ ব্রেজিল ছাড়া ৩০টি দেশ এবারের প্রতিযোগিতায় যোগদানের অভিপ্রায় জানায়, কিন্তু প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর ১৩টি দেশকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করে লীগ প্রথায় মূল প্রতিযোগিতার খেলার আয়োজন করা হয়। এই চারটি গ্রুপের বিজয়ীর মধ্যে পরে আবার লীগ খেলার ব্যবস্থা করা হয় শ্রেষ্ঠত্ব যাচাইয়ের জন্য। এই বছর ভারত সর্বপ্রথম বিশ্ব প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অভিপ্রায়
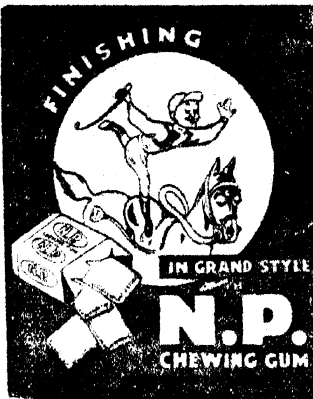
জানায়। কিন্তু আর আর কয়েকটি দেশের মত শেষ পর্যন্ত ভারতের পক্ষেও যোগদান করা সম্ভব হয় না। নীচে ১৯৫০ সালের প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ের লীগ খেলার তালিকা দেওয়া হল।

'এ' গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
ব্রেজিল	৩	২	১	০	৮	৩	৫
যুগোশ্লাভিয়া	৩	২	০	১	৭	২	৪
সুইজারল্যাণ্ড	৩	১	১	১	৪	৬	৩
মেক্সিকো	৩	০	০	৩	২	১০	০

'বি' গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
স্পেন	৩	৩	০	০	৬	১	৬
চিলি	৩	১	০	২	৫	৪	২
ইংল্যাণ্ড	১	১	০	২	২	২	২
ইউ এস এ	৩	১	০	২	২	৮	২

'সি' গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
সুইডেন	২	১	১	০	৫	৪	৩
ইটালী	২	১	০	১	৪	৩	২
প্যারাগুয়ে	২	০	১	১	২	৪	১

'ডি' গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
উরুগুয়ে	১	১	০	০	৮	০	২
বলিভিয়া	১	০	০	১	০	৮	০

ফাইন্যাল টেবল

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
উরুগুয়ে	৩	২	১	০	৭	৫	৫
ব্রেজিল	৩	২	০	১	১৪	৪	৪
সুইডেন	৩	১	০	২	৬	১১	২
স্পেন	৩	০	১	২	৪	১১	১

(উরুগুয়ে অপরাজিত থেকে জুলেস রিমেট কাপ লাভ করে)

পঞ্চম প্রতিযোগিতা—১৯৫৪ সাল

১৯৫৪ সালের জুন মাসে সুইজারল্যাণ্ডে পঞ্চম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এবছর মোট ৩৮টি দেশ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অভিপ্রায় জানায়, কিন্তু পোল্যাণ্ড ও চীন শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ না করায় ৩৬টি দেশকে লইয়া প্রাথমিক প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা হয়। ১৯৫০ সালের বিজয়ী উরুগুয়ে এবং অনুষ্ঠানের আয়োজনকারী দেশ সুইজারল্যাণ্ড সমেত ১৬টি দেশ মূল প্রতিযোগিতায় চারটি গ্রুপে কিছুটা লীগ এবং কিছুটা নক আউট প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই চারটি গ্রুপের বিজয়ী ও রানার্স আপ দেশ কোয়ার্টার ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নক আউট প্রথায়। নক আউট প্রথায়ই সেমি ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। মূল প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরী অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন
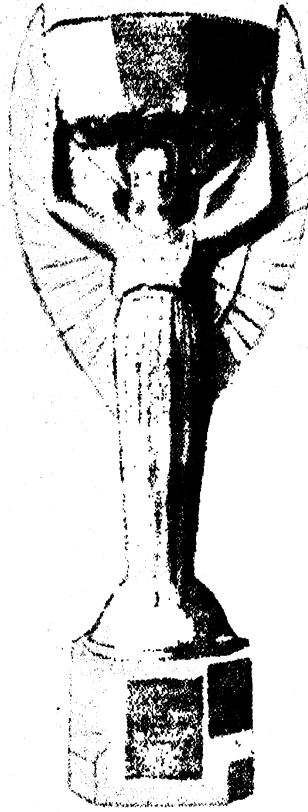
বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ী দেশের পুরস্কার—জুলেস রিমেট কাপ

শক্তিশালী হাঙ্গেরীর কাছে যে পশ্চিম জার্মাণী দলকে ৮—৩ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল, সেই পশ্চিম জার্মাণী দলই ফাইন্যালে হাঙ্গেরীকে ৩—২ গোলে হারিয়ে জুলেস রিমেট কাপ লাভ করে। নীচে মূল প্রতিযোগিতার খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল—

প্রথম গ্রুপ

যুগোশ্লাভিয়া (১)	ফ্রান্স (০)
ব্রেজিল (৫)	মেক্সিকো (০)
ব্রেজিল (১)	যুগোশ্লাভিয়া (১)
ফ্রান্স (৩)	মেক্সিকো (২)

দ্বিতীয় গ্রুপ

হাঙ্গেরী (৯)	দক্ষিণ কোরিয়া (০)
পঃ জার্মাণী (৪)	তুরস্ক (১)
হাঙ্গেরী (৮)	পঃ জার্মাণী (৩)
তুরস্ক (৭)	দঃ কোরিয়া (০)
* পঃ জার্মাণী (৭)	তুরস্ক (২)

তৃতীয় গ্রুপ

অস্ট্রিয়া (১)	স্কটল্যাণ্ড (০)
উরুগুয়ে (২)	চেকোশ্লোভাকিয়া (০)
উরুগুয়ে (৭)	স্কটল্যাণ্ড (০)
অস্ট্রিয়া (৫)	চেকোশ্লোভাকিয়া (০)

চতুর্থ গ্রুপ

ইংল্যাণ্ড (৪)	বেলজিয়াম (৪)
সুইজারল্যাণ্ড (২)	ইটালী (১)
ইংল্যাণ্ড (২)	সুইজারল্যাণ্ড (০)
ইটালী (৪)	বেলজিয়াম (১)
* সুইজারল্যাণ্ড (৪)	ইটালী (১)

(তারকা চিহ্নিত খেলাগুলি রানার্স আপ নিষ্পত্তির জন্য গ্রুপের অতিরিক্ত খেলা)

কোয়ার্টার ফাইন্যাল

উরুগুয়ে (৪)	ইংল্যাণ্ড (২)
হাঙ্গেরী (৪)	ব্রেজিল (২)
অস্ট্রিয়া (৭)	সুইজারল্যাণ্ড (৫)
পঃ জার্মাণী (২)	যুগোশ্লাভিয়া (০)

সেমি ফাইন্যাল

পঃ জার্মাণী (৬)	অস্ট্রিয়া (১)
হাঙ্গেরী (৪)	উরুগুয়ে (২)

ফাইন্যাল

পঃ জার্মাণী (৩)	হাঙ্গেরী (২)

দেশী সংবাদ

১৫ই অক্টোবর—বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে 'আদর্শ-গ্রাম' গঠনের বহু-বিঘোষিত সরকারী পরিকল্পনা 'আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতার' ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

সোমবার শেষরাত্রে ১নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের বিরাট একটি ভবনের পিছনের দিককার ত্রিতলের একটি অংশ ধসিয়া পড়ায় তিনজন নারী সমেত ১১জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আরও ছয়জনের জীবনও বিপন্ন হইয়াছিল।

আজ নয়াদিল্লীতে রাজ্য শ্রমমন্ত্রিগণের চতুর্দশ সম্মেলন এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত রোয়েদাদ কার্যকর না করা হইলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।

১৬ই অক্টোবর—রাজ্যের শ্রমমন্ত্রিগণ আজ এই মর্মে সুপারিশ করেন যে, বিভিন্ন শিল্প গঠিত বেতন বোর্ডের সিদ্ধান্তের পিছনে আইনানুগ ক্ষমতা থাকা উচিত এবং রাজ্য সরকারসমূহকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

টালিগঞ্জের ইন্দ্রলোক স্টুডিও এবং কাশীপুরের কয়েকটি গুদামে যে পাঁচ হাজার পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু অবস্থান করিতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তাহাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

১৭ই অক্টোবর—ব্যাঙ্ক কর্মচারী ধর্মঘটের মীমাংসার্থে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির মধ্যে আপোষ আলোচনা চলিতে থাকায় বামপন্থী নেতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে আগামীকল্য ১৮ই অক্টোবর সাধারণ ধর্মঘটের যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল সেই সাধারণ ধর্মঘট স্থগিত রাখা হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু জাপান থেকে ও রেঙ্গুনে ১৪ দিনব্যাপী সদিচ্ছামূলক সফরান্তে অদ্য নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহাকে সাদরে স্বাগত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

১৮ই অক্টোবর—অদ্য কলিকাতায় কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার বাসভবনে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী এম পিদের এক সম্মেলনে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুরা তিন বৎসর বা ততোধিককাল পর্যন্ত যে সকল উদ্বাস্তু-শিবিরে বাস করিতেছেন, সেইগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ার সুপারিশ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৯শে অক্টোবর—পশ্চিম বাঙলার ব্যাঙ্ক কর্মিগণের একত্রিশ দিনব্যাপী ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হওয়ায় অদ্য সকাল দশটায় ব্যাঙ্ক কর্মিগণ স্ব স্ব কাজে যোগদান করেন।

স্ট্যাণ্ডিং লেবার কমিটি অদ্য নয়াদিল্লীতে দুই দিবসব্যাপী অধিবেশনের সমাপ্তির পূর্বে শিল্প শৃঙ্খলাবিধির অনুমোদন করেন এবং এই বিধি অমান্য করার ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রাসঙ্গিক সার্কুলার না পৌছাইলেও এপ্রিল মাসে (সম্ভবত মাসের মাঝামাঝি) বিদ্যালয়ের সেশন শুরু হইবে, ইহা
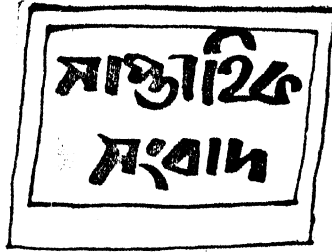
স্থির হইয়া গিয়াছে।

২০শে অক্টোবর—অদ্য হাওড়া গার্লস কলেজ ভবনে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভায় উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে দীর্ঘকাল আলোচনার পর সদস্যগণ এই বিষয়ে একমত হন যে, একটি নির্দিষ্ট দিন ধার্য করিয়া উহার পর পূর্ববঙ্গ হইতে নবাগতদের উদ্বাস্তু বলিয়া গণ্য না করিবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

যে সকল উদ্বাস্তু সরকারের পুনর্বাসনের প্রস্তাব মানিয়া লইতে অস্বীকার করিবে তাহাদের আর উদ্বাস্তু শিবিরে থাকিতে দেওয়া হইবে না এবং তাহাদের নগদ অর্থ সাহায্যও দেওয়া হইবে না বলিয়া জানা গিয়াছে।

২১শে অক্টোবর—অদ্য নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু দেশের সঙ্কটজনক খাদ্য সমস্যা সমাধানে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য দলনির্বিশেষে প্রত্যেকের নিকট আবেদন জানান।

স্কুল ফাইন্যাল ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে গবর্নমেণ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক এই বৎসর ৫৫০টি বৃত্তি দেওয়া হইবে। আগামী বৎসর এই সংখ্যা বাড়াইয়া ১,১০০ করা হইবে।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই অক্টোবর—আজ বৈকালে করাচীর রাস্তায় রাস্তায় "কর্মখালি: প্রধানমন্ত্রী চাই" বলিয়া হাজার হাজার বিজ্ঞাপন বিলি করা হয়। বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য বিষয় সহ পদপ্রার্থীদের নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা চাই—(১) স্বদেশপ্রেমের অভাব, (২) ভাল তাঁবেদার হইবার যোগ্যতা, (৩) সাধারণ নির্বাচন চাহিতে পারিবেন না, (৪) পাকিস্থানকে খণ্ডিত করিতে রাজি থাকিবেন, (৫) গণতন্ত্রী হওয়া চলিবে না, (৬) কাশ্মীরের কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে, (৭) পাকিস্থানকে অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্বান্ধব দেশে পরিণত করিতে হইবে।

১৬ই অক্টোবর—মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জন ফস্টার ডালেস অদ্য বলেন যে, তিনি মনে করেন, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ বাধিবার কোন আশঙ্কা নাই; কারণ সেখানে যে সমস্ত ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহার উপর জগতের দৃষ্টি যথেষ্ট পরিমাণে নিবদ্ধ আছে।

মস্কো বেতারের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীরা যে দুঃসাহসিক পরিকল্পনা রূপায়ণে ও বিপজ্জনক আগুন লইয়া খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে নূতন বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী আজ রাত্রে লণ্ডনে এক সাংবাদিক বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানান যে, ভারত কম্যুনিস্ট দেশসমূহ হইতে "নিশ্চয়ই" বিনাসর্তে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিবে।

১৭ই অক্টোবর—পশ্চিম এশিয়া সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রচারিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সিরিয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষ গতকল্য রাত্রিতে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করিয়া সমস্ত সামরিক কর্মচারী ও সৈনাদের ছুটি বাতিল করিয়া দিয়াছেন।

পাকিস্থান জাতীয় পরিষদে মুসলিম লীগ দলের নেতা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট শ্রী ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রীগড় আজ শ্রী এইচ এস সুরাবর্দির স্থলে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮ই অক্টোবর—আজ শ্রী আই আই চুন্দ্রীগড় পাকিস্থানের ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রিরূপে শপথ গ্রহণ করেন। নূতন মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা তের।

সোভিয়েট রুশিয়া আজ সিরিয়াকে আক্রমণ করার নিমিত্ত তুরস্কের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রচিত একটি পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছে।

১৯শে অক্টোবর—ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন অদ্য নিউ ইয়র্কে ঘোষণা করেন যে, আক্রমণকারিগণ দেশ (ভারতবর্ষ) ত্যাগ না করা পর্যন্ত কাশ্মীর বিরোধ সম্পর্কে পাকিস্থানের সহিত কোনরূপ আপোস হইতে পারে না।

২০শে অক্টোবর—খাকসার নেতা আল্লামা মাশরিকির সোমবার দশ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক সহ কাশ্মীর দখলের জন্য ভারতে অভিযানে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু লাহোরের জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট অদ্য তাঁহাকে জেলে হাজতে প্রেরণ করিয়াছেন।

সৌদি আরবের রাজা সৌদ এবং লেবাননের প্রেসিডেণ্ট কামিল চামুনের মধ্যে আলোচনা শেষ হইলে গত রাত্রে প্রচারিত এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয়, সিরিয়া অথবা যে কোন শক্তির আক্রমণ লেবানন ও সৌদি আরব নিজেদের উপর আক্রমণ বলিয়াই মনে করিবে।

অধ্যাপক ডি উবেনরাউভ অদ্য মস্কোতে বলেন, সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা চন্দ্র যাইবার 'পথ' খুঁজিয়া পাইয়াছেন এবং চন্দ্রে যাইতে প্রায় পাঁচ দিন সময় লাগিবে।

২১শে অক্টোবর—লাহোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লাহোর জেলায় খাকসারদের সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া, কুচকাওয়াজ, ছাউনী স্থাপন নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারি করিয়াছেন। এই আদেশ দুই মাসকাল বলবৎ থাকিবে।

'এভিয়েশন উইক' নামক সাপ্তাহিক পত্রে গতকল্য বলা হইয়াছে যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কে স্থাপিত দূরপাল্লার রাডার ও অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে দুই বৎসরের অধিককাল যাবৎ গোপনে রুশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষার সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৫০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১১, ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

২৪ বর্ষ

(৪০শ সংখ্যা হইতে ৫১ সংখ্যা পর্যন্ত)

—ফ—

—ব—

—ম—

—র—

—ল—

—শ—

—স—

—হ—

সূচীপত্র
GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar
৭ই
প্রস্তুতি

সূচীপত্র
ERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

ভালো এক কাপ চা করতে হ'লে
জল বেশিক্ষণ ফোটাবেন না
জল অনেকক্ষণ ধরে ফোটালে (কিংবা কম ফোটালেও)
চায়ের স্বাদ জ'লো হয়ে যায়
চা তৈরির নির্দিষ্ট পাঁচটি নিয়ম মেনে চলুন :
১। চা সব সময় নাম-করা দোকান থেকে কিনবেন।
২। টাট্‌কা জল নিন। জল টগবগ ক'রে না ওঠা পর্যন্ত ফোটাবেন এবং পরে কেট্‌লি নাবিয়ে নিয়ে সেই ফোটানো জলে চায়ের পট ধুয়ে নিন।
৩। মাথা-পিছু এক চামচ এবং পটের জন্য আর এক চামচ বেশি চা পটে দিন।
৪। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ফোটানো জল পটে ঢালুন এবং তিন থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত চা ভিজতে দিন।
৫। ভিজনো হয়ে গেলে, চা কাপে ঢালুন এবং রুচিমতো দুধ চিনি মিশিয়ে নিন। খাবার আগে চা-টা নেড়ে নেবেন।
আমার নাম চা—আমি মৈত্রীর প্রতীক
TEA BOARD
INDIA

PST 187

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : জে এন আডালজা (মাদ্রাজ)

DESH · 40 Naye Paise
Saturday 2nd November, 1957

২৫ বর্ষ ॥ ১ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ১৬ কার্তিক ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

আমাদের নববর্ষ

ভগবানের কৃপায় দেশ পত্রিকা চব্বিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া পঁচিশ বৎসরে পদার্পণ করিল। চব্বিশ বৎসর এক শতাব্দীর প্রায় এক পাদকাল। এই সময়ের মধ্যে নানা বাধাবিঘ্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা অতিক্রম করিতে হইয়াছে আমাদের। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যে দেশ পত্রিকা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার মূলে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বর্তমান বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

১৯৩৩ সাল আর ১৯৫৭ সালে কেবল যে চব্বিশ বৎসরের ব্যবধান তাহা নয়—সত্যই যুগান্তরের ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে, দশ বৎসর পূর্বে দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ঘটনাটি একটি বাক্যে বিবৃত হইলেও তাহার ইতিহাস যেমন ব্যাপক তেমনি দুস্তর। বহু আত্মদান ও দুঃস্মরণের ইতিহাস ইহার মধ্যে পুঞ্জীভূত। দেশ পত্রিকাও যথাসাধ্য এই ইতিহাস রচনায় সাহায্য করিয়াছে বলিয়া আমাদের ধারণা।

এ যেমন গৌরবের দিকে, ক্ষতির দিকের পরিমাণও সামান্য নয়। এই সময়ের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ ও সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে আমরা হারাইয়াছি। ইঁহাদের সাহায্য ও সাধনা যেভাবে ও যতখানি দেশ পত্রিকার পুষ্টি সাধন করিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইবার কথা নয়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন দীর্ঘকাল দেশ পত্রিকার সম্পাদনা করিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিপুণ চালনাই দেশ পত্রিকার বর্তমান উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ। তাঁহার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অবধি নাই। ভগবানের কাছে তাঁহার শান্তিময় দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতেছি।

সাহিত্যে ও জীবনে সুস্থ ও বলিষ্ঠ একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার ব্রত দেশ পত্রিকা গ্রহণ করিয়াছিল এবং যথাসাধ্য সেই পথ ধরিয়াই চলিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিয়ৎ পরিমাণেও সেই আদর্শ যদি দেশ পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রকাশ সার্থক হইয়াছে বলিব।

আজ নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা দেশ পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, লেখক ও বান্ধবগণকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া আমরা সকলের প্রীতি ও সহযোগিতা যাচনা করিতেছি।

মজ্জাগত বিষ

মাদ্রাজের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম্ তথাকার সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্বন্ধে বিধানসভায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে জানা গেল যে, রামনাথপুরমে থেবর-হরিজন সংঘর্ষের মূল কারণ সাম্প্রদায়িক। তারপরে রাজনৈতিক দলগুলি জুটিয়া গিয়া সাম্প্রদায়িক বিষকে উগ্রতর করিয়া তোলে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলিয়াছেন, গত সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশব্যাপী যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়—অভিসন্ধিপরায়ণ রাজনীতিকগণ তাহাকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দাবানলে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। অবশেষে একটি উপনির্বাচনকে উপলক্ষ্য করিয়া আগুন লাগিয়া যায়।

ইহাই এই পীড়াদায়ক ঘটনার বাহুল্য-বর্জিত রূপ। আর ইহা শুধু পীড়াদায়ক নয়, শিক্ষাদায়কও হওয়া উচিত। ভারতবর্ষীয় সমাজে জাতি-ভেদের বিষ গুপ্তভাবে বিদ্যমান। স্বাভাবিক অবস্থায় তাহা তেমন প্রকট নয়। কিন্তু কখনো কোন সংকট উপস্থিত হইলেই এই বিষ প্রাণঘাতী-মূর্তিতে প্রকাশ হইয়া পড়ে। আর যুগে যুগে অভিসন্ধি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ এই বিষময় সমস্যার সুযোগ লইয়া এদেশে যথেচ্ছাচার করিয়াছে। ইহারই ভীষণতম মূর্তি হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ ও পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ভারত খণ্ডিত হইলেও এই বিষ প্রশমিত হয় নাই। স্বাধীন ভারতেও নানা বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছে। কোন উপলক্ষাই অবহেলার যোগ্য নয় সাম্প্রদায়িক-ছিদ্রান্বেষীদের কাছে। ইহারাই সাধারণ নির্বাচনের সাময়িক উত্তেজনাকেও নিজ উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে ব্যবহার করিয়াছে—রামনাথ-পুরমের অশান্তি তাহারই অন্যতম লজ্জাজনক নিদর্শন। সরকার ও জন-সাধারণের একযোগে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। অগ্নির ও বিষের শেষ দেখিতে নাই—শাস্ত্রের উপদেশ।

একটি উদাহরণ

পাঞ্জাবের ভাষা আন্দোলনে যোগদানের জন্য বাংলাদেশের তৃতীয় সত্যাগ্রহী দল যাত্রা করিয়াছেন—খবর দেখিলাম। পাঞ্জাবের 'হিন্দী বাঁচাও' আন্দোলন একটি বিচিত্র ব্যাপার। ভারতের সুবৃহৎ

অংশ যখন "হিন্দীর হাত হইতে বাঁচাও" বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে, ঠিক সেই সময়ে পাঞ্জাবের হিন্দী ভাষার এই কাতর আর্তনাদ উপভোগ্য সন্দেহ নাই। ভীমসেনের হঠাৎ এই শিখণ্ডীবৎ আচরণের উদ্দেশ্য কি? কিম্বা "ইহা মহতের লীলা", কিম্বা ইহাও সাম্প্রদায়িক বিষের একটা অভিনব মূর্তি? বুঝি তাহাই হইবে। নেহরু প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ বারংবার বলিয়াছেন যে, এই আন্দোলনের সঙ্গে ভাষা বা সাহিত্য বা সংস্কৃতির কোন সম্বন্ধ নাই। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ভাষাকে অবলম্বন করিয়া এখানে যেমন প্রকট, অন্যান্যপ্রদেশে প্রকট একটি উপনিবেশিকের উপসর্গ। কতদিন আর আত্মঘাতী খেলা চলিবে।

ভারত দান

লখনৌ-এ যুব কংগ্রেসের সম্মেলনে নেহরু সমবেত তরুণ-তরুণীকে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষকে তোমরা গ্রহণ করো এবং তোমাদের আদর্শ মত ইহাকে গড়িয়া তোল—দানের যোগ্য এমন বস্তু আর নাই। লক্ষাধিক নরনারীর উপস্থিতি, তাঁহাদের বেড়াভাঙা উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রমাণ করে যে, এই দান গ্রহণে ইচ্ছার অভাব নাই। আমাদের দেশের নেতাগণ অনেক সময়ে নির্বিশেষভাবে কথা বলেন, সেই জন্য তাঁহাদের ভাষণের ফল ফলে না, শ্রোতার মর্ম স্পর্শ করে না, সব কেমন যেন গোলমেলে অস্পষ্ট হইয়া যায়। মর্ম স্পর্শ করিয়া কথা বলিবার শক্তি নেহরুর আছে। তাঁহার বক্তৃতার লক্ষ্য কেবল নৈর্ব্যক্তিক জনসাধারণ নয়। তিনি এমনভাবে কথা বলেন, যাহাতে প্রত্যেক শ্রোতা মনে করে ইহা তাহারই উদ্দেশ্যে কথিত—তাঁহার ব্যক্তিত্ব তাঁহার বক্তৃতায় ফুটিয়া বাহির হইয়া আসে। যুব কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ সেইজন্য এমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারত দান এমন সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

ভারত-মার্কিণ মৈত্রী

সম্প্রতি ভারত-মার্কিন মৈত্রী সম্বন্ধে শ্রীরাজাগোপালাচারীর একখানি পত্র বিখ্যাত নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রখানিতে রাজাজী স্বভাব-সিদ্ধ বাক্-কুশলতায় ভারত-মার্কিন মৈত্রী, মার্কিন কর্তৃক পাকিস্থানকে সাহায্য প্রদান ও ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আর্থিক ঘাটতির বিশ্লেষণ করিয়া এই তিনের আপেক্ষিক সম্বন্ধ বিচার করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, মার্কিন কর্তৃক পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্যদানের সঙ্গে ভারতের পরিকল্পনার আর্থিক ঘাটতি অতিশয় ঘনিষ্ঠ। তিনি বলিয়াছেন যে, রুশ-ভীতির জন্য পাকিস্থান সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করে। মার্কিন পাকিস্থানের প্রার্থনার উত্তরে প্রভূত সামরিক সাহায্যদান করে—পাকিস্থান রুশ-বিরোধী একটি ঘাঁটিতে পরিণত হয়। রাজাজীর মতে রুশ-ভীতি অমূলক, কিন্তু পাকিস্থানের নবলব্ধ সামরিকশক্তি অমূলক নয়। তাহার একটা প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য। মার্কিনের অনভিপ্রেত হইলেও পাকিস্থানের পক্ষে ভারত আক্রমণ অসম্ভব নয়, আর একবার আক্রমণ শুরু হইয়া গেলে তাহা কতদূর গড়াইবে কেহ বলিতে পারে না। এই সব কথা চিন্তা করিয়া ভারতকে তাহার ইচ্ছা ও স্বাভাবিক প্রবণতার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। ভারতীয় লোকসভায় ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে নেহরুর বক্তৃতায় এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই পর্যন্ত বলিয়া রাজাজী দ্বিতীয় পরিকল্পনার আর্থিক ঘাটতি প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এখানেই অর্থাৎ পাকিস্থানের সামরিক প্রস্তুতির উত্তরে ভারতের সামরিক প্রস্তুতির মধ্যেই ঘাটতির আসল কারণ নিহিত। তাঁহার মতে মার্কিন কর্তৃক পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্যদানের ফলে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে ছোটখাটো (বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির তুলনায়) একটা অস্ত্রসজ্জার রেষারেষি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যে অর্থ দেশ গঠনের জন্য বরাদ্দ ছিল, সেই অর্থ বাধ্য হইয়া ভারত অস্ত্র সজ্জায় ব্যয় করিয়াছে। তাহার দ্বিতীয় পরিকল্পনার বরাদ্দের একটা বিপুল অংশ অস্ত্রসজ্জার খাতে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কাজেই রাজাজীর মতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ঘাটতির দায়িত্ব মূলত মার্কিনের। তিনি বলিতেছেন যে, এ হেন অবস্থায় ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনার ঘাটতি পূরণের নৈতিক দায়িত্ব মার্কিনের। তিনি আরও একটা বিষয় মার্কিনকে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। পাকিস্থানকে রুশ-বিরোধী সংগ্রামের মিত্ররূপে লাভ করার যে সার্থকতা আছে, তাহার সঙ্গে তৌল করিয়া দেখিতে হইবে ভারতের মৈত্রী হারাইবার আশঙ্কা। তিনি আশা করিয়াছেন, মার্কিনের মনীষা বিষয় দুইটি ধীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিবে।

রাজাজীর দক্ষ বিশ্লেষণ ও বিচারের পরে মন্তব্য করিবার বিশেষ স্থান নাই। তিনি ভারতের পক্ষে ওকালতি করেন নাই, ভারত ও মার্কিন, দুই রাষ্ট্রেরই যাহাতে মঙ্গল হওয়া সম্ভব তাহাই বলিয়াছেন। মার্কিনের ভ্রান্ত নীতির ফলে ভারত-মার্কিন মৈত্রী বন্ধন যদি শিথিল হয়, তবে তাহাতে কেবল ভারতেরই অনিষ্ট হইবে না। বিশ্বের বৈজ্ঞানিক উন্নতি বর্তমান মুহূর্তে যে পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে তাহাতে মার্কিন ভারতের মৈত্রী হারাইবার দুঃসাহস করিতে পারে না। মার্কিনকে মনে রাখিতে বলি যে নৈতিক শক্তি সামরিক শক্তির চেয়ে প্রবলতর—ভারত সেই শক্তিতে সর্বাধিক বলীয়ান।

অপরিবর্তনীয় ?

উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব ১৭ই অক্টোবর ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দী প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়। গত দশ বৎসর আমরা এতবার এত পরিবর্তনীয় সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়াছি (এবং বহুবার তাহা পরিবর্তিত হইতে দেখিয়াছি) যে এরূপ কথায় আস্থা রক্ষা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কংগ্রেস সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলিয়াই তাঁহাদের অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন কোন সিদ্ধান্তকে আর অপরিবর্তনীয় বলিয়া ঘোষণা না করেন (বিশেষত যে ক্ষেত্রে তাঁহারা লোকপ্রতিনিধি বলিয়া দাবী করেন), কারণ সর্বসাধারণ তাঁহাদের এই সকল দৃঢ় ঘোষণা লঘুভাবে দেখে—ইহা আমাদের পক্ষে দুঃখকর।

ঐ তারিখেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহ বলিয়াছেন যে, অবশ্যই হিন্দী "অফিশিয়াল" ভাষা হওয়া উচিত, কিন্তু (১) ভারতবর্ষের বিভিন্ন "আঞ্চলিক" প্রধান ভাষাগুলিও "জাতীয়" ভাষা বলিয়া বিবেচিত হওয়া কর্তব্য; এবং (২) ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব এবং বিশ্বভাষারূপে ইহার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় ইহাও ভারতবর্ষের "সাধারণ" ভাষা ('Common language')রূপে রক্ষিত হওয়া উচিত।

এখন জিজ্ঞাস্য এই—এই দুটি শর্ত ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিবার উপায় কি? ভাষা-কমিশন যে-সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে স্বীকৃতি হইলে সরকারী ভাষা ('Official language') শিক্ষা কর্ম প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যেভাবে দীর্ঘ বাহু বিস্তার করিবে, তাহাতে ইংরেজি ভাষা দূরে থাক্, বিভিন্ন রাষ্ট্রে মাতৃভাষার ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিবে বলিয়া আমরা মনে করি।

(একুশ)

কে জানে কত রাত হয়েছে! এল কি মুরলী? সত্যিই ফিরে আসবে কি মুরলী? জানে না দাশু, খোলা দরজার দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো কখন ক্লান্ত হয়ে মুদে গিয়েছে।

বাঘিন কানারানীর হিংস্র ধমকের হাঁক আর শোনা যায় না। মানাঝিপাড়ার আতঙ্কের হল্লাও অনেকক্ষণ হলো ক্লান্ত হয়ে শেষে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ঝিঁঝিঁ ডাকা রাতটাও যেন নিজের ক্লান্তিতে এখন একেবারে নীরব হয়ে ঝিমোতে শুরু করেছে।

কয়লা খাদের ধাওড়া থেকে বিদায় নেবার সময় সুরেন মানাঝির কাছে দেনার হিসাব মিটিয়ে দেবার পর বার বার দু'বার স্নান ক'রেও মনে হয়েছিল দাশুর, এই ক'দিনের মালকাটা জীবনের কালো ধুলো জলে ধুয়ে গেলেও বুকের ভিতরে যেন ভয়ানক এক অভিশাপের ময়লার মত এখনো লেগে আছে। মধুকুপি ফিরে যাবার পথে ভুবনপুর সড়কেরই ধারে গালা বাজারের কাছে আবগারী ভাটিখানার বোতলা সরাব বিক্রী হয় যে লাইসেন্সী দোকানে, সেই দোকানের দাওয়ার উপর কিছুক্ষণ জিরোতে হয়েছিল। বুকের ভিতর আর গলার ভিতর বড় পিয়াস। মাথার ভিতর বড় জ্বালা!

সুরেনের দেনা চুকিয়ে দেবার পরও মালকাটা জীবনের সেই উন্মত্ত রোজগারের বারটা টাকা দাশুর কোমরের গোঁজের ভিতরেই ছিল। বুকের ভিতরের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। এক টাকা খরচ করে এক বোতল সরাব গিলে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল দাশু। মাথার জ্বালাকেও সেই নেশা দিয়ে শান্ত করে, আর অবশ করে নিয়েছিল দাশু। সেই নেশার রেশ অনেকক্ষণ হলো ক্লান্ত হয়ে দাশুর চোখে একটা স্বপ্নের ঘোর ধরিয়ে দিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে দাশু।

স্বপ্নটাও যেন একটা ভাদুরে বিকালের বৃষ্টি। ঝিমঝিম করে বাজে, আর ঝির ঝির করে ঝরে পড়ে। তারপর বড়কালুর মাথার উপরে আকাশের এপার-ওপার জুড়ে রঙীন রামধনু ফুটে ওঠে। দাশুর কাঁধের উপর ছেঁইমাটা, বুকের কাছে মাদলটা, পাশে পাশে মুরলী। ধানের খেতের [illegible] উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আখড়ার দিকে যেতে যেতে দাশুর মাদলের বোল ভেজা বাতাসে মিষ্টি শব্দের শিহর তুলে বাজতে থাকে, দিপির দিপাং ধিতাং ধিতাং!

দাশুর স্বপ্নের মাদল যেন আর্তনাদ করে ছিঁড়ে যায়। চমকে ওঠে, ঘুম ভেঙে যায় দাশুর। মনে হয়, রাতের বাতাস একটা বন্দুকের গুলীর শব্দে আহত হয়ে গুমরে উঠেছে।

ঠিকই, আবার বন্দুকের গুলীর শব্দ।

ভুবনপুর সড়কের দিক থেকে সেই শব্দের গোমরানি বাতাসে গড়িয়ে এসে আস্তে আস্তে এই মধুকুপির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

খেজুর পাতার চাটাই থেকে এক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় দাশু। আর একটা লাফ দিয়ে একেবারে দরজা পার হয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, সড়কে এখনও বেশ অন্ধকার আছে, আকাশে তারা আছে। রাত ভোর হতে বাকি আছে।

ফিরে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে দুহাতে বুক চেপে ধরে কাঁপতে থাকে দাশু। কার বন্দুক? কে গুলী ছাড়লো? কাকে মারলো? কাণারাণী আর হাঁক দেয় না কেন?

খেজুর পাতার চাটাইএর উপর আবার গড়িয়ে পড়ে ছটফট করে দাশু। একটা ভয়ানক সন্দেহের বেদনার সংগে যেন প্রাণপণে লড়াই করতে থাকে। না না না, মিছা সন্দেহ। কাণারাণী আছে, নিশ্চয় আছে। এখনি আবার হাঁক দিবে কাণারাণী। উ যে বনমাতা বটে। উ যে মধুকুপির কিষাণ দাশুকে উয়ার মানুষ ছেইলা বলে মনে করে। মুরলীও যে ভয় পেয়ে উয়াকে শাশুড়ি বলে মেনে ফেলেছিল। কিন্তু কই, সেই কাণারাণী আর হাঁক দেয় না কেনে?

কখন ভোর হবে? ভোরের আলোর অপেক্ষায় ছটফট করতে করতে আবার কখন যে ঘুমে অসাড় হয়ে গিয়েছিল ছেঁড়া স্বপ্নের বেদনা, তা'ও বুঝতে পারেনি দাশু। ঘুম ভাঙে যখন, তখন বাঁশঝাড়ের মাথার উপর সকালের রোদ লুটিয়ে পড়েছে। ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই আর একবার চমকে ওঠে দাশু।

মানঝিপাড়ার একদল লোক সামনের সড়ক দিয়ে যেন একটা উল্লাসের ঝড়ের মত ছুটে চলে গেল। কিন্তু একি ভয়ানক কথা চেঁচাতে চেঁচাতে চলে গেল ওরা!—কাণারাণী মরেছে! কাণারাণী মরেছে!

সকালবেলার আলো আর বাতাস যেন একসংগে হিংস্র হয়ে দাশুর বুকের পাঁজরগুলি কামড়ে ধরবার জন্য দাঁত কড়মড় করছে। ঘরের দরজার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দাশু।

কলকল করে হেসে আর চেঁচিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেল একদল গরুচরানী মেয়ে।

—ডর কেনে ডরানি এল গুড়ুম ভাই, চল শিয়ালিন বিহা করবি, কাণারাণী নাই।

মরা কাণারাণীর মুখ দেখবার জন্য ছুটে যাচ্ছে ওরা? তাইতো। দাশুরও পা দুটো টলমল করে ওঠে। তার পরেই যেন একটা বদ্ধ আর্তনাদের জ্বালায় পাগল হয়ে ঘরের দাওয়া এক লাফে পার হয়ে সড়কের উপর এসে দাঁড়ায়। ছুটতে থাকে দাশু।

খুব বেশিদূর ছুটে যেতে হয় না। ভুবনপুর সড়কের পাশে সেই জোড়া ডুমুরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় দাশু। সড়কের পাশেই ঘেসো মাঠের উপর কাৎ হয়ে পড়ে আছে একটা গরুর গাড়ি। গাড়ির একটা গরু গোবরমাখা ধড় নিয়ে গাড়ির কাছেই পড়ে আছে, এখনও যেন মরণ আতঙ্কে গরুটা ধুঁকছে। আর ডুমুরের ছায়ায় চুপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে একজন। চিনতে পারে দাশু, এবং ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে, এই তো সেই গাড়িয়াল লোকটা। আর ঐ তো সেই গাড়ি, মুরলীকে মধুকুপির কিষাণের ঘর থেকে তুলে নিয়ে অন-মরদের বুকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য কাল সন্ধ্যাতে যে-গাড়িটা যাত্রা শুরু করেছিল।

সড়কের পাশে যে মাঠ, সে মাঠের শেষদিকে একটা খাদ, আর খাদের চারদিকে কেঁদ ও বাবলার ভিড়। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে দাশু, অনেক মানুষ জমা হয়েছে সেই খাদের কাছে।

—কি ব্যাপার বটে গাড়িয়াল?

হাঁপ-ধরা বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ সামলে নিয়ে ফিস ফিস স্বরে প্রশ্ন করে দাশু।

উত্তর দেবার জন্য মুখ তুলেই দাশুকে চিনতে পারে আর চমকে ওঠে গাড়িয়াল লোকটা। আস্তে আস্তে বলে—বাঘিনটা মরেছে সরদার।

—কে মারলেক?

উত্তর দিতে গিয়ে আবার যেন একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে গাড়িয়াল।—কয়লা খাদের বড় মিস্তিরী।

—সে এখানে কেমন ক'রে এল?

—আমি ডেকে নিয়ে এসেছিলাম।

—কেনে?

—বাঘিনটার ডরে।

—কি করেছিল বাঘিন?

—সে আর শুধাও কেনে? কি বরে নাই বল? একটা গরুর জান লিয়েছে। এক

—তার পর

—শেষ রাতে বাঘিনটা আবার এল।

—তার পর?

—পর পর দুটো গুলী মেরেছিল মিস্তিরি। একটা গুলী বাঘিনের গলা ফুটো করে দিলেক, আর একটা গুলীতে বাঘিনটার পা ভেঙে গেল।

—তার পর?

—আর শুধাও কেনে সরদার? মরা বাঘিনকে দেখতে সাধ থাকে তবে দেখে লাও। মিস্তিরি চলে গিয়েছে, এখনি থানের লোক এসে বাঘিনের দেহ বাঁশ-দড়ি করে বেঁধে নিয়ে গোবিন্দপুরে থানায় নিয়ে যাবে। হোই যে, উয়ারা দেখছে দেখ।

হাঁ, দেখতে সাধ আছে বৈকি। আস্তে আস্তে হেঁটে মাঠ পার হয়ে কেঁদ আর বাবলার ছায়াময় ভিড়ের কাছে এসে মানুষের ভিড়ের মাথার উপর দিয়ে উঁকি দেয় দাশু। ভাল করে দেখবার জন্য আরও এগিয়ে যেয়ে একেবারে খাতের কাছে দাঁড়ায়। সেই মুহূর্তে, মাটির উপর উবু হয়ে বসে পড়ে বুকের ভিতরের একটা যন্ত্রণা চাপতে চেষ্টা করে দাশু।

খাতের ভিতরে একটা কালো পাথরের উপর মাথা রেখে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে কাণা-রাণী। কাদামাখা গোঁফ নেতিয়ে পড়েছে। লেজ দিয়ে ভাঙা পা জড়িয়ে ধরে রেখেছে কাণা চোখের উপর পিচুটি জমে রয়েছে। একটা বোলতা কাণারাণীর শিথিল চোয়ালের উপর সুড় সুড় করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মরবার আগে বোধ হয় কাঁকরের উপর খুব জোরে মুখ ঘষেছিল কাণারাণী, তাই মুখটা পানখাওয়া মুখের মত রুলচে হয়ে রয়েছে। গলার ফুটো থেকে ঝরে পড়া রক্ত লাল কাদার মত পাথরের উপর পড়ে আছে।

কাঁধের গামছা হাতে তুলে নিয়ে বার বার চোখ মোছে দাশু। একটা বুড়ি সাধনীর শান্ত ও উদাস মুখের মত দেখতে কাণা-রাণীর এই মুখটা। ভীরু সংসারের যত হিংসুটে সোরগোল আর ঝামেলা থেকে পালিয়ে এসে কেঁদ-বাবলার ঘন ছায়ার এই ঠাণ্ডা শান্তির মধ্যে লুটিয়ে পড়েছে।

না, আর কিছু দেখবার নেই। লোকের ভিড় আর বাবলা ও কেঁদের ছায়ার ভিড়ের কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে যায় দাশু।

স্বপ্ন নয়, কিন্তু স্বপ্নেরই মত একটা আশার ছবি। এবং সেই আশার ছবির মধ্যে মুরলীরই মুখ দেখতে পায় দাশু।

রেড়ির তেলের মেটে বাতিটা মিটি মিটি জ্বলে। উনানের আগুনে চড়চড় করে। একলা ঘরের ভিতরে শুধু নিজের ছায়াটাকে সঙ্গে নিয়ে মকাই-এর ঘাটা রাঁধে দাশু। তার আগে ছোট হাঁড়ি মুখের কাছে তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে হাঁড়িয়া মদ গিলে নেয়।

নেশা দিয়ে একটা আশাকে যেন জীইয়ে রাখতে চায় দাশু। আসবে, একদিন নিশ্চয় ফিরে এসে এই ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুরলী। দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলবে মুরলী।

আশার ছবিটা মাঝে মাঝে যেন কথা বলে ফেলে।—এই দেখ, তুমার ছেইলাকে তুমার কাছে লিয়ে এসেছি।

দাশুর আশার চোখ দুটো মুরলীর কোলের দিকে তাকাতে গিয়ে চমক দিয়ে হেসে ওঠে। আর সত্যিই বিড়বিড় করে ওঠে দাশু।—আমার ছেইলা! আমার ছেইলা!

রেড়ির তেলের মেটে বাতি নিভিয়ে দিয়ে নেশাতুর চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়তে গিয়ে আর একটা আশার ছবি দেখতে থাকে দাশু। উরানির ধারে পাঁচ বিঘা ভাল দো-আঁশের কানালি কিংবা গরাতি। ধান ফলেছে। সবজী ধরেছে। সবজী ক্ষেতের পলেস্তের বেড়ার উপর বসে কালো কোকিল ডেকেই চলেছে। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে মুরলী। কবে এমন ভাল ক্ষেত কোত্ কবলে আর সবজী ফলালে ছেইলার বাপ?

—কপাল বাবা দয়া করেছে মুরলী।

—তাই তো চলে এলাম। জমি নাই, কিষাণের ঘরে এত সুখ আছে।

নেশাতুর আশার ছবিটাকে দেখতে দেখতে ঘরের অন্ধকারের মধ্যে দাশু কিষাণের চোখ দুটো যেন একটা বাসনার প্রতিজ্ঞার জ্বালায় জ্বলজ্বল করতে থাকে। হাঁ, জমি করতে হবে। জমি নাই, তাই মুরলী নাই। ঈশান মোক্তারের কাছ থেকে পাঁচ বিঘা দো-আঁশ নিতেই হবে। জাতপঞ্চের সভা ডেকে বলতে হবে, ঈশান মোক্তার কেনে আমাদিগকে শুধু মুনিষ খাটাবে পঞ্চ? বিনা সেলামীতে ভাগজোতের জমি দিবে না কেনে? জমি লিব, জমি লিব।

ঘুমিয়ে পড়বার আগে জমিহারা জীবনের এই নতুন প্রতিজ্ঞার জ্বালাটাই নেশার আবেশে নরম হয়ে হেসে ওঠে। কিষাণের ঘরের সুখের খবর পেয়ে আবার ফিরে এসে এই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছে মুরলী। —আমাকে কি আর ঘরে লিবে না সরদার? আমি যে তুমার মুরলী

দিদিম দিপাং, ধিতাং ধিতাং! সত্যিই যে মাদল বাজছে, আর মধুকূপির সকাল-বেলার বাতাস মিষ্টি হয়ে গিয়েছে।

ঘুম ভাঙতেই ধড়ফড় করে উঠে বসে দুই চোখ ঘষে দাশু।

—আজও ঘরে থাকবে আর ঘুমাবে নাকি দাশু? কে যেন ডাকছে।

দরজা খুলে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পায় দাশু, সনাতন মাইঝি এসেছে।

সনাতন বলে—খবর মানবে তো দাশু?

দাশুর ঘুমভাঙা চোখ যেন ঝিলিক দিয়ে হেসে ওঠে।—কেনে মানবো নাই সনাতন? তুমি আমাকে এমন কথা বল কেনে?

ভাদ্রের সকালবেলার রোদ মধুকূপির [illegible] এসেছে। [illegible] গাছ ঘিরে [illegible] মগ্ন হয়ে উঠেছে। [illegible] মধুকূপির [illegible]

[illegible] দাশু [illegible] দিয়ে সনাতন?

সনাতন [illegible]

দাশু—কি?

সনাতন—[illegible] ডেকেছে। তুমি যাবে কি?

—কেনে?

—রাগ করেছে দুখন বাবু। গাঁয়ের বউ ঝিটি বাঁহন ধরলে যদি লাচে, তবে জাত ত্যাগ করবে দুখন বাবু।

—কি করবেন দুখন বাবু? ভ্রূকুটি করে দাশু।

—আর একটা পণ করবেক দুখন বাবু। যাদিগের বউ ঝিটি বাঁহন লাচবে, তাদিগের জাত-ভাইয়ালিতে আসবেক নাই দুখন বাবু।

দাশুর ভ্রূকুটিও আস্তে আস্তে কেঁপে কেঁপে যেন হিংস্র হয়ে উঠতে থাকে। মধু-কূপির প্রাণের এত রকমের শত্রুও ছিল?

—চল। দাঁতে দাঁত চেপে, যেন একটা আক্রোশ চাপতে চাপতে সনাতনের সঙ্গে চলতে থাকে দাশু।

(ক্রমশ)

দু সপ্তাহ "বৈদেশিকী" লেখা বাদ গেছে। এর মধ্যে তথাকথিত বড়ো বড়ো ব্যাপার দুচারটে পৃথিবীতে ঘটে গেছে যে-গুলোর উল্লেখ এখন করলে পাঠকের কাছে কিঞ্চিৎ বাসি ব'লে মনে হবে। খবর নিয়ে যাদের কারবার তাদের পক্ষে এই মুশকিল। সত্যের কারবারীদের এই মুশকিল নেই; কারণ খবর বাসি হয়, সত্য বাসি হয় না। কিন্তু আজকালকার মানুষের কাছে এই প্রভেদ অস্পষ্ট করে দেওয়ার আয়োজন প্রচুর। কোনো কিছু ঘটা মাত্রই সেটার উপর "আলোক সম্পাতে"র এরকম হিড়িক পড়ে যায় যে, বোধহয় যেন কারো কিছু আর বুঝতে বাকী রইল না। নানা পণ্ডিতের নানা ব্যাখ্যার ঠেলায় সাধারণ মানুষের পক্ষে মন দূরের কথা পা স্থির রাখাই কঠিন হয়। এরকম অবস্থায় মানুষ স্বস্তি খোঁজে, নিজে বুঝবার চেষ্টা ত্যাগ করে দলের আশ্রয় নেয়, দলের কর্তা বা দলের কাগজ যেটাকে যেমন ক'রে বুঝায় তেমনি করে বুঝে নিয়ে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করে। ফলে, আজ-কালকার দিনে এতোদিক থেকে ঘটনাকে জানবার এবং তার সম্বন্ধে দ্রুত সংবাদ প্রেরণের নানারকম ব্যবস্থা থাকলেও সাধারণ মানুষের মনে তার তাৎপর্য আংশিক বা বিকৃতভাবে ছাড়া বড়ো একটা পৌঁছায় না। প্রোপাগাণ্ডাকারীরাও যেন নিজেরা নিজেদের তাড়িয়ে নিয়ে চলে: যা কিছু ঘটুক সদ্য সদ্য তার সম্বন্ধে কিছু বলা চাই, পাছে অন্য দলে আগে অন্যরকম কিছু বলে ফেলে "বিভ্রান্তি" সৃষ্টি করে। ঘটনার খবরকে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার সত্য হিসাবে প্রচারের এই প্রতিযোগিতার ধাক্কায় দুয়ের মধ্যে প্রভেদ সাধারণ মানুষের কাছে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তার চেয়ে আরো বিপদ এই যে, ঘটনাকে সম্পূর্ণ হতে দেবার আগেই তার মর্মার্থ মানুষকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা হয়। অথচ মানুষ যদি একটু পিছন দিকে তাকিয়ে দেখে তাহ'লে সে দেখতে পাবে যে, বহমান্ ঘটনার স্রোত এবং পণ্ডিতের বা প্রোপা-গাণ্ডাকারীর ব্যাখ্যার মধ্যে কী পরিমাণ গরমিল চলে আসছে, কত ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন মানুষকে তাড়া ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, এক দণ্ড দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে তাকাতে দিচ্ছে কোথায়? যদি দিত তবে তারা দেখত যে, আট কলমের শিরো-নামায় যে ঘটনার বিবরণ কাগজে পড়ে একদিন মনে হয়েছিল যে একটা যুগান্তকারী [illegible] ঘটছে সেটা তেমন কিছু ব্যাপার নয়। আবার যে-ঘটনাকে একদিন অকিঞ্চিৎকর [illegible] মনে হয়েছে, পৃথিবীর এক কোণের [illegible] ঘটনা সেটা ঘটেছে ব'লে বড়ো একটা কেউ টেরও পায়নি, তার প্রভাব যুগ থেকে যুগান্তরে বয়ে চলেছে। কোনটা ছোটো, কোনটা বড়ো, কালের ছাকুনিতে কোন্‌টা থাকবে আর কোন্‌টা গলে পড়ে যাবে তা পলিটিশিয়ান বা খবরের কাগজের সম্পাদকের জানা আছে, এটা মনে করা ভুল। স্বাস্থ্যের জন্য যেমন মাঝে মাঝে উপবাস করা ভালো তেমনি মাঝে মাঝে সংবাদের গাড়ি থেকে নেমে, রাস্তার ধারে একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকা মন্দ নয়।
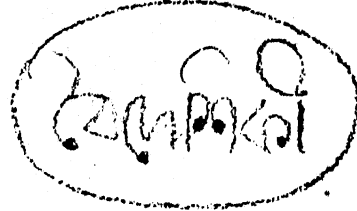
মানুষ খবর শুনতে চায়। সেটা যে সত্য বা তথ্য জানবার জন্য তা নয়। খবর জানার জন্য যে-আগ্রহ সেটা গল্প শোনার আগ্রহের সঙ্গে তুলনীয়। সেজন্য খবর নূতন হওয়া চাই, যেমন গল্প নূতন না হ'লে তাতে রস পাওয়া যায় না। সেইজন্য গল্পরস জোগানের দিক থেকে খবরের কাগজ বাসি হ'লে চলে না। কিন্তু সত্য বা তথ্য আহরণের দিক থেকে খবরের কাগজ একটু পুরোনো ক'রে পড়াই বোধহয় ভালো, কারণ তাহ'লে কোন্ খবরের কী দাম সেটা বুঝার পক্ষে একটু সুবিধা হয়। কোন্ কথা কত বড়ো বা কত ছোটো সেটার পরিমাণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। (আর যদি খুব পুরোনো হয় তবে আবার তাতে গল্পের রস পাওয়া যায় যেমন একশ বছর আগেকার খবরের কাগজ পড়লে নভেল পড়ার আনন্দ পাওয়া যায়।)

পাঠকগণ (এবং সম্পাদক মহাশয়) বোধহয় মনে ভাবছেন যে, আমি ফাঁকি দিচ্ছি, অর্থাৎ দু সপ্তাহ "বৈদেশিকী" লিখি নি, এ সপ্তাহেও এইসব বাজে কথা ব'লে আসল কাজটি বাদ দেবার মতলবে আছি। কিন্তু তাতে ই বা কার কী এমন ক্ষতি হবে? সুরাবর্দী সাহেবের গলাধাক্কা খাওয়া, আইজেনহাওয়ার-ম্যাকমিলন মিলন, ইউনোতে কাশ্মীর প্রসঙ্গ, সিরিয়া-তুর্ক সংবাদ, মার্শাল জুকভের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা যা আজ করতে পারতাম তা মুলতুবি রেখে লেখকের অন্তত কোনো লাভ নেই; বরঞ্চ এর দ্বারা তিনি সংযমেরই পরিচয় দিচ্ছেন। ধরুন, সুরাবর্দী সাহেবের ব্যাপার। আজ যদি এ বিষয়ে কিছু লিখতাম তাহ'লে তাতে অনায়াসেই এই কথা বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারতাম যে, "বৈদেশিকী"তে পাকি-স্তানী রাজনীতির আলোচনা যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে সুরাবর্দী সাহেবের গদিচ্যুতি এবং সেটা যে-ভাবে ঘটেছে কোনটাই আকস্মিক ব'লে মনে হওয়া উচিত নয়।

২৯।১০।৫৭

রঞ্জন

সহকর্মী শৌভিকের সাম্প্রতিক রচনায় এমন একটা আভাস যেন ছিল যে, বহির্বিশ্বে প্রশংসিত হবার পূর্বে সত্যজিৎ রায়ের "অপরাজিত" ছবিটি যে বাঙলা দেশে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়নি, তার কারণ বাঙালী জাতির গুণ-গ্রাহিতার শোচনীয় অভাব। কোন কোন অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগের প্রতিধ্বনিও শোনা গেছেঃ নোবেল পুরস্কার পাবার আগে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব যেমন আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি বা পারলেও মাৎসর্যবশত যথোচিত গুণগান করিনি এবারও তেমনি হয়েছে। আমার পরিতাপ কিন্তু পরিমিত, যেমন সত্যজিৎ রায়ের সাফল্যে আমার আনন্দ অপরিমিত।

গুণগ্রহণের ক্ষমতা আমাদের যে সামান্য নয়, তার প্রমাণ "পথের পাঁচালীর" স্মরণীয়, অভাবনীয় সাফল্য। সেদিন অখ্যাত অপরিচিত এক নবীন পরিচালকের প্রথম চিত্রপ্রয়াসকে আমরা অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। শুধু জনকয় শিক্ষিত দর্শক বা চিত্রসমালোচক সে ছবির প্রশংসা করেনি, সর্বশ্রেণীর বাঙালী সে ছবি পয়সা দিয়ে দেখেছে এবং নিজেদের পুরস্কৃত মনে করেছে। দ্বিতীয় ছবির অভিজ্ঞতা অনুরূপ না হবার একাধিক কারণ নিশ্চয় ছিল—যার সবগুলি বোধ হয় সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণেও আবিষ্কৃত হবার নয়—কিন্তু ভেনিসের রায় সত্ত্বেও একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় না যে, "অপরাজিতের" স্থানীয় পরাজয়ে, অর্থাৎ অসাফল্যে, বাঙালীর রুচির বা বুদ্ধির বা উদারতার অভাব ঘটেছে।

*

পরিমিতিবোধ বাঙালী চরিত্রের স্পষ্টতম বৈশিষ্ট্য নয়। কখনোই ছিল না। "অপরাজিত" ছবিকে ঘিরে বাঙালীর যে ব্যাপক আত্মধিক্কারের আয়োজন হয়েছে, তার মধ্যেও মাত্রাবোধের আতিশয্য না থাকা সম্ভব। দুটো ছবি নিয়ে সমান বুদ্ধিমান ও রুচিবান ব্যক্তিদের মধ্যে মতভেদ নিশ্চয়ই অজ্ঞাত নয়। সত্য বলতে কি, "পথের পাঁচালী" আমাকে যেমন অভিভূত করেছিল, "অপরাজিত" তেমন করেনি। এ মতের জন্য লজ্জিত হবারও কারণ খুঁজে পাইনে। বিশ্বে সম্মানিত হওয়া সত্ত্বেও "গীতাঞ্জলি"কে যদি আমি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনে না করি তাহলে অমনি আমার রসজ্ঞানশূন্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল? না কি "গীতাঞ্জলি" সম্বন্ধে আমি এমন মত পোষণ করি বলে কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমার আনন্দ প্রকাশের অধিকার নেই? বর্তমান বিতর্ক প্রশ্রয় পেয়েছে এইজন্য যে, পুরস্কার ও উৎকর্ষ আমরা সমার্থক বলে ভুল করেছি।
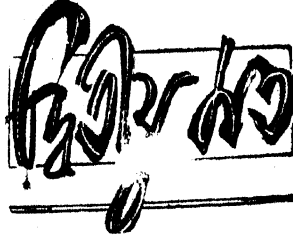
দুয়ের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী কোন পরস্পর-বিরোধিতা নেই, কিন্তু দুয়ের সহাবস্থিতিও অবশ্যম্ভাবী নয়।

আমি তো বলব, ভেনিসের দেখাদেখি আমরা "অপরাজিত"কে অপূর্ব বলে মনে করলেই আমরা আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাবের লজ্জাকর পরিচয় দিতাম। আমার মতে প্রথম ভারতীয় ছবি "পথের পাঁচালী", দ্বিতীয় "অপরাজিত" এবং তৃতীয় কিছু নেই। ভেনিসের নির্দেশে আমার এই তালিকার অদলবদল করব কোন্ দুঃখে? দ্বিতীয় কথা, এ মত সত্ত্বেও সত্যজিৎ রায়ের সেণ্ট মার্কের স্বর্ণ-সিংহাসন প্রাপ্তিতে আমাদের অভিনন্দনে কণামাত্র আন্তরিকতা নেই। আমাদের এ আনন্দ তিনি বাইরে সম্মানিত হয়েছেন বলে, তাঁর প্রতিভা বিশ্বের স্বীকৃতি পেয়েছে বলে এবং এ আনন্দ উপভোগ ও প্রদর্শন করবার জন্য স্বীয় সমালোচনাশক্তির বিসর্জন আদৌ অপরিহার্য নয়।

*

ছবির জন্যে পুরস্কার ও সাহিত্যকীর্তির জন্য সম্মান দেবার পদ্ধতির মধ্যেই মূলগত একটা প্রভেদ আছে। ছবির স্রষ্টা সাধারণত পুরস্কৃত হন বিশেষ একটি ছবির জন্য, লেখক নোবেল পুরস্কার পান তাঁর সারা জীবনের সাহিত্যকীর্তির জন্য—যদিও ক্ষেত্রবিশেষে একটি বইয়ের নাম করে দেবার রীতি আছে কোথাও কোথাও। সত্যকার শিল্পী বোধ হয় দ্বিতীয় পদ্ধতিটাই শ্রেয় মনে করবেন। "পথের পাঁচালী" ছবিতে ত্রুটি কম ছিল না; কিন্তু ছবিটি এদেশের চিত্রজগতে এনে দিয়েছিল নতুন একটা দৃষ্টি, শুধু নতুন একটা ভঙ্গি নয়। এটাই কি পুরস্কারের যোগ্য নয়? এই নূতন দৃষ্টি ও নূতন অনুভূতি সর্বথা স্বীকৃত হয়েছে।

অন্যান্য পুরস্কারেই বা সত্যজিৎ রায় বঞ্চিত হয়েছেন কোথায়? ইতিমধ্যেই কোন কোন সমালোচক খৃষ্টপূর্ব ও খৃষ্টাব্দের মতো সত্যপূর্ব ও সত্য যুগের কথা বলতে শুরু করেছেন। এটা সামান্য সম্মান নয়। দ্বিতীয়ত, "অপরাজিত" ছবির ব্যবসায়িক অসাফল্য সত্ত্বেও তিনি দুটো ছবি করছেন এবং তৃতীয় ছবির কথাও ঘোষিত হয়েছে। শুনতে পাই, আরো অনেক লোভনীয় আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছেন।

*

এবার সত্যজিৎ রায়ের কথা ছেড়ে বাঙালীর স্বাভাবিক গুণগ্রাহিতা বা তার অভাবের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। আমরা গুণীর আদর করতে জানিনে—অন্তত বাইরে তাঁর সম্মান না মিললে—বাঙালীর বিরুদ্ধে এ অপবাদটা অংশত অতিকৃত বলে সন্দেহ করি। বরং বলব, বহির্বিশ্বের উচ্চতর মান বিস্মৃত হয়ে আমরা প্রায়শই বহু মুড়িকে মুড়কির সমান আদর দিই। সাধারণত আমাদের সমালোচনার ভাষা এত বহুলাদোষদুষ্ট, এত বিশেষণধর্মী, যে তফাৎটা আর মাণিক আর ভালোর মধ্যে ব্যবধান বোঝা শক্ত। অতিরঞ্জিত ভাষার এই প্রাত্যহিক অপব্যবহারে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, যখন সত্যকার অনন্যসাধারণ সৃষ্টির আবির্ভাব হয়, তখন সমালোচকের শব্দভাণ্ডারে নতুন বিশেষণ অবশিষ্ট থাকে না।

সত্যজিৎ রায়ের প্রশংসায় আমাদের ত্রুটি হয়নি। ত্রুটি হয়েছে এই যে, তাঁর আগেকার পরিচালকদের সামান্যতার আমরা নিন্দা করিনি। তাই অসামান্য যখন এলো, তখন আমাদের সমালোচনার ভাষার দৈন্য প্রকট হোলো। আর শৌভিক সেটাকে ভুল করলেন ভাবের দৈন্য বলে। পুরোপুরি অন্যায় করেননি, কেননা সাধারণত এ দুই দৈন্য অভিন্ন।

সাধারণভাবে পুরস্কার সম্বন্ধেও এ কথা সত্য হতে পারে। ডাক-পাওয়া মার্কিন ডিগ্রি এককালে হাস্যকর ছিল কেননা তাতে মূল্যবিচার সামান্যই ছিল। মান কিছু ছিল না বললেই হয়। ডিগ্রির সহজপ্রাপ্যতা ও দেদার তাই ডিগ্রিধারীদের মানবর্ধনে সহায়ক হয়নি। হতে পারে বাইরে—এবং ঘরের —পুরস্কার সম্বন্ধেও অনুরূপ সতর্কতার প্রয়োজন আছে। আজ এদের সংখ্যার শেষ নেই। বিচারেও উৎকর্ষসম্বন্ধবিরহিত নানা বিবেচনার আবির্ভাব হয়েছে। (না হলে ভারতীয় গল্পসংকলনে রাশিয়ায় খাজা আহম্মদ আব্বাস সবচেয়ে বেশি পৃষ্ঠা অধিকার করেন কোন্ গুণে?) তাই আন্তর্জাতিক পুরস্কার সম্বন্ধে নির্বিচার মোহও কিছুটা পরিত্যাগ করতে হবে। এই বিভ্রাটই ঘটেছিল সম্প্রতি বম্বেতে। নানা শ্রেণীর আন্তর্জাতিক পুরস্কার-প্রাপককে সেখানে বসাবার চেষ্টা হয়েছিল একই আসনে। কার্লোভি ভারি ও গোল্ডেন লায়ন অব সেণ্ট মার্ক, এই দুই পুরস্কারকে একই সংগে অভ্যর্থনা জানানোর মধ্যে সাম্য-প্রীতির পরিচয় আছে, বিচারশক্তির বাষ্পমাত্র নেই।

আলবেয়ার কামু

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যের পুরস্কার সাধারণত তাঁদেরই দেওয়া হয় যাঁদের রচনা স্থিতি ও পরিণতি লাভ করেছে। যে-সব লেখকের আঙ্গিক ও বক্তব্য একটি নির্দিষ্ট প্রকৃতি লাভ করেছে এবং যাঁদের রচনাধারায় নতুন বাঁক সৃষ্টির আর আশা নেই, পুরস্কার দিয়ে তাঁদের সম্মানিত করি এবং বিদায় দিই। আলবেয়ার কামু এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তিনি যে অল্প বয়সে নোবেল পুরস্কার পেলেন সেটাই বড় কথা নয়; তাঁর রচনা এখনো পরিণত রূপ লাভ না করা সত্ত্বেও যে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হল সেটাই আশার কথা। কামুর সাহিত্য সাধনার ধারা গত বিশ বছর ধরে যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, তাঁর মন ও লেখনী দুই-ই সৃষ্টিশীল সর্বদা নতুন পথে চলবার জন্য উৎসুক। এ পর্যন্ত কামুর সাহিত্য-কৃতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে, সুপরিণতির শিখরে স্থিতি-লাভ করতে এখনো তাঁর বিলম্ব আছে। ফরাসী সাহিত্যেও এজন্য তাঁর কোনো তর্কাতীত স্থান নির্দিষ্ট হয়নি। পুরস্কারের সংবাদ পেয়ে কামু নিজেই বিস্মিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার ধারণা ছিল যাঁরা জীবনের সাধনা সম্পূর্ণ করেছেন অথবা যাঁরা বয়সে প্রবীণ এ পুরস্কার শুধু তাঁদেরই প্রাপ্য।' তাঁর মতে এ পুরস্কার পাবার যোগ্যতম ফরাসী লেখক হলেন আঁদ্রে ম্যালরো।

অবশ্য অপূর্ণতা সৃষ্টিশীলতার একটি প্রধান লক্ষণ। সকল শিল্পীর পক্ষেই এটা সত্য। কিন্তু কামুর পক্ষে এর সত্যতা আরো বেশী। কারণ তিনি নিছক গল্পকার নন; তাঁর উপন্যাসে কাহিনী অপ্রধান। তিনি দর্শনভিত্তিক উপন্যাস লেখেননি; জীবন সম্বন্ধে একটি বিশেষ চিন্তাধারাকে কাহিনীর রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। কামু তাঁর জীবনদর্শন অভিজ্ঞতার মূল্যে দিয়ে অর্জন করেছেন। সুতরাং জীবনের পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নতুন রূপ লাভ করেছে এবং এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। যাঁরা মূলত গল্পকার তাঁদের চিন্তাধারার পরিবর্তনটা গল্পরসের প্রাচুর্যে চাপা পড়ে যায়। কামুর রচনায় গল্পের তেমন কোনো আড়াল নেই। তাই তাঁর চিন্তা ও রচনার ক্রমবিবর্তন পাঠকের নিকট সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। প্রথম জীবনের দারিদ্র্য এবং মারাত্মক রোগের আক্রমণ কামুকে গভীর নিরাশবাদী করেছিল। পৃথিবীকে তখন তাঁর মনে

হয়েছিল নির্দয় সংগ্রামশালা। নিরস্ত্র মানুষ এই সংগ্রামশালায় চারদিক থেকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রান্ত হয়। আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়াই জীবন; এ ছাড়া জীবনের অন্য কোনো অর্থ নেই। ব্যক্তিগত জীবনে যখন তিনি একটু স্বস্তি লাভ করলেন তখন তাঁর চোখে সংসারের অকারণ নির্দয়তার কঠোরতা অনেকটা কোমল হয়েছে দেখতে পাই। নোবেল পুরস্কার যে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রতিষ্ঠা দেবে তার ফলে কামুর জীবনদর্শন প্রভাবান্বিত হবে বলে নিশ্চয়ই আশা করা যায়। দারিদ্র্য, মৃত্যুর আশঙ্কা এবং যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যে চিন্তাধারার [illegible] ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে তার পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক।

১৯১৩ সালের ৭ই নভেম্বর অ্যালজিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে আলবেয়ার কামুর জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন কৃষিক্ষেত্রের কর্মী। মা ছিলেন স্পেনের মেয়ে। অন্যের খামারে কাজ করে উপার্জন হ'ত সামান্য। সুতরাং দারিদ্র্যের মধ্যে কামুর জীবন শুরু হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে বাবার মৃত্যু হওয়ায় সমগ্র পরিবার একান্তরূপে অসহায় হয়ে পড়ে। এরূপ প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও কামু নিজের চেষ্টায় ১৯৩৬ সালে অ্যালজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দর্শন ছিল তাঁর বিশেষ পাঠ্য বিষয়। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক জাঁ গ্রেনিয়ার-এর নিকট থেকে কামু যে প্রেরণা লাভ করেছেন এখনো কৃতজ্ঞতার সহিত তিনি সে কথা স্মরণ করেন। কামু তাঁর জীবনে দু জনের প্রভাব বিশেষরূপে স্বীকার করেনঃ একজন এই অধ্যাপক, আর একজন আঁদ্রে ম্যালরো।

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কামু অ্যালজিয়ার্স শহরের সাংস্কৃতিক জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ওখানে নবনাট্য আন্দোলনের সংগঠনে। তিনি একটি থিয়েটারের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং ম্যালরো, জিদ, সিঞ্জ, দস্তয়েভস্কি, বেন জনসন প্রভৃতির নাটকে তিনি অভিনয়ও করেছেন। অভিনয় করবার জন্য তাঁকে অনেক নাটক অনুবাদ করতে হয়েছে। এসব অনুবাদের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ঈস্কাইলাসের 'প্রমিথিউসের' যুগোপযোগী ফরাসী সংস্করণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু পূর্বে কামু সর্বপ্রথম উত্তর আফ্রিকা থেকে য়ুরোপ ভ্রমণ করতে আসেন। মধ্য য়ুরোপ, ইতালী ও ফ্রান্স ভ্রমণ করে অ্যালজিরিয়ায় ফিরে এসে তিনি যোগ দেন Alger Republicain কাগজের দপ্তরে। ১৯৪০ সালে কামু Paris-Soirএর সম্পাদকীয় দপ্তরে চাকরি পেয়ে ফ্রান্সে চলে আসেন। কিন্তু সে বছর জুন মাসে জার্মানীর নিকট ফ্রান্সের পরাজয় হওয়ায় তাঁকে অ্যালজিরিয়ায় ফিরে আসতে হয়। এবার তিনি ছোট একটা স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করলেন। স্কুলের শান্ত নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশে কামু সাহিত্য চর্চার সুযোগ পেলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রথম দুটি বই এ সময় রচিত হয়েছিল।

ফ্রান্সের বিপদের দিনে দূরে থেকে কামু শান্তি পাচ্ছিলেন না। ১৯৪২ সালে তিনি প্যারিস এসে প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন। এই প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁর দান উল্লেখযোগ্য। প্রতিরোধ আন্দোলনের বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে তিনি Combat নামে একটি কাগজ বের করলেন। ভিচি সরকার ও জার্মান সেন্সরের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে কাগজ বের করতে

হত। কামুর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ মুক্তিকামী ফরাসীদের উদ্দীপ্ত করে তুলত। তিনি যে শুধু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন, তাই নয়; কাগজ প্রকাশের সকল দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। জীবন বিপন্ন করে পথে পথে কাগজ ফেরি করতেও তাঁকে দেখা গেছে। প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকবার ফলে কয়েক বছর কামুর জীবন কেটেছে রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে। বছরখানেক তিনি কম্যুনিস্টদের সমর্থক ছিলেন। ক্রমশ তাঁর মত বদলে যায়। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত উৎপীড়নের সমালোচনা করায় অনেক সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটেছিল। কামু সকল প্রকার একনায়কত্বের ঘোর বিরোধী।

কামু সাংবাদিকতা একেবারে ত্যাগ করেননি। একটি বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত আছেন। কামু নাটক রচনা করেছেন চারখানি। ফ্রান্সের বাইরে তাঁর নাটক সামান্যই পরিচিতি লাভ করেছে। তথাপি কামু বলেন, থিয়েটারেই তিনি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পান; ভবিষ্যতে আবার নাটক পরিচালনা আরম্ভ করবেন বলে ভাবছেন। বর্তমানে কামু একটি বড় উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত একটি মানুষের জীবন কিভাবে কেটেছে এই কাহিনীতে তা বর্ণনা করা হবে। কাহিনীর পটভূমিকা অ্যালজিরিয়া। বলা বাহুল্য, এটি হবে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

• কামুর প্রথম বই কতকগুলি ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংকলন। এর পরে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয় Noces বা বিবাহ: একজন নবযুগের রোমান্টিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা অ্যালজিরিয়ার জীবনের রেখাচিত্র। লেখকের সৌন্দর্যপিপাসু আনন্দোজ্জ্বল মনের স্বাক্ষর এ বইয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট। এক জায়গায় তিনি বলছেন:
"Except the sun, kisses and wild perfumes all seems futile to us."
নারীর স্পর্শে যে আশ্চর্য সুখানুভূতি জাগ্রত হয় তাকেও তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। কারণ তরুণ লেখক সেদিন বিশ্বাস করতেন যে, যে আনন্দ প্রকৃত, তা কোন্ পথ দিয়ে এসেছে সে কথা ভেবে সঙ্কুচিত হবার কারণ নেই।

একজন তরুণ ফরাসী লেখকের কাছ থেকে এরূপ রোমান্টিক ও নিবিড় জীবনানন্দময় রচনা আশা করাই স্বাভাবিক। কামু এই প্রত্যাশিত পথেই সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু মাত্র তিন বছর পরে লেখক হিসাবে কামুর যে নতুন পরিচয় পাওয়া গেল তা বিস্ময়কর। সেই রোমান্টিক ভাববিলাস, নারীর প্রতি আকর্ষণ এবং সৌন্দর্যের প্রতি মোহ তাঁর রচনা থেকে যেন অকস্মাৎ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেল। উর্বর ভূমির স্নিগ্ধতা থেকে পাঠক অতর্কিতে এসে পড়ে নিষ্ঠুর মরুভূমির বুকে। এই পার্থক্য শুধু লেখকের মানসিক বিবর্তন বলে চিহ্নিত করা যায় না। তিন বৎসর পরে একেবারে নবজন্ম লাভ করেছেন লেখক। এই নবজন্মের সূচনা দেখতে পাই ১৯৪২ সালে প্রকাশিত তাঁর দুটি বই থেকে। একটি উপন্যাস, আর একটি দার্শনিক প্রবন্ধের বই। দুটি একই সময়ের রচনা।

L Etranger (বৃটিশ অনুবাদ: দি আউট সাইডার; আমেরিকান অনুবাদ: দি স্ট্রেঞ্জার) যুদ্ধোত্তর ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট উপন্যাস বলে অনেকে মনে করেন। যুদ্ধের সংঘাতে বুদ্ধিজীবী নাগরিকের মনের চিন্তাধারা কোন পথে চলেছিল এই উপন্যাসে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। 'দি স্ট্রেঞ্জার' পড়ে য়ুরোপ-আমেরিকার সমালোচকদের দৃষ্টি কামুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই ছোট উপন্যাসটিতে কাফকা ও হেমিংওয়ের প্রভাব পড়েছে। তথাপি লেখকের বৈশিষ্ট্য পাঠককে স্বীকার করতেই হবে। লেখকের জীবন দর্শন এবং তাঁর বাহুল্য বর্জিত সাবলীল ও ইঙ্গিত সমৃদ্ধ ভাষা এই কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ।

উপন্যাসের নায়ক মারসো অ্যালজিয়ার্সের এক সওদাগরী আপিসের সামান্য কেরাণী। তার একঘেয়ে নিরানন্দ দিনগুলি এক রকম কেটে যায়। বৈচিত্র্যহীন জীবনের প্রধান ঘটনা মা'র মৃত্যু। কিন্তু মারসোর কাছে এটা একান্তই বাইরের ঘটনা। মা'র মৃত্যু তার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি। তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ল না, কিংবা কথা ও ব্যবহারে শোকের চিহ্ন প্রকাশ পেল না। মৃত্যুর বছর তিনেক পূর্বে মাকে সে একটা আশ্রমে এনে রেখেছিল। কারণ, মাতা-পুত্রের মধ্যে সব কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল; নতুন কিছু বলবার নেই, তবু এক বাড়িতে থাকবার বিড়ম্বনা ভোগ করতে সে চায়নি। মাকে কবর দেবার পরদিন তার পরিচয় হল মারি নামে একটি তরুণীর সঙ্গে; সারাটা দিন ও রাত্রি কাটল তারই সাহচর্যে। পরের সপ্তাহে মারি জিজ্ঞাসা করল সে তাকে ভালোবাসে কি না; মারসো মনে মনে হেসে উঠল, ভালোবাসা আবার কী? কিন্তু সে মারিকে বিয়ে করতে সম্মত হল। এই সম্মতির মধ্যে ছিল তাচ্ছিল্যবোধ। যেন বিয়ে করা আর না-করায় কিছুই এসে যায় না।

সেদিন মাথার উপরে প্রচণ্ড সূর্য, পায়ের নীচে উত্তপ্ত বালি। কয়েকজন আরবের সঙ্গে কলহ বাধল। হঠাৎ মারসো একজন আরবকে হত্যা করল পিস্তলের গুলী দিয়ে। কেন এমন কাজ করল সে সম্বন্ধে মারসো নিজেই সচেতন নয়। হয়ত উত্তপ্ত আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া কিংবা আরবের হাতে দেখেছিল ছোরার ঝলকানি, অথবা নিজের কাজের পরিণাম সম্বন্ধে ছিল চরম ঔদাসীন্য। গ্রেপ্তার করবার পর পুলিস তার অতীত জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করল। দেখা গেল মারসোর সামাজিক জীবন বলে কিছু ছিল না। বন্ধুত্ব, প্রেম, আতিথেয়তা, আবেগ ইত্যাদির প্রমাণ নেই তার জীবনে। মা'র মৃত্যুতেও যে সে শোক প্রকাশ করেনি এটাই তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল। তাকে যখন প্রশ্ন করা হল সে মাকে ভালোবাসত কি না, তখন সে উত্তর দিল, হাঁ অন্য সকলের মতোই ভালোবাসতাম। কর্ডেলিয়ার উত্তরে যেমন লিয়র সন্তুষ্ট হয়নি, তেমনি বিচারকও মারসোর উত্তরকে যথার্থ বলে স্বীকার করতে পারলেন না। পূর্ব পরিকল্পিত নরহত্যার অপরাধে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। পাদ্রি যখন জেলে তাকে শান্তির বাণী শোনাতে এল তখন মারসোকে সর্বপ্রথম উত্তেজিত হতে দেখি। ক্রুদ্ধ হয়ে সে পাদ্রিকে জানিয়ে দিল ধর্মের পথে প্রচলিত উপায়ে শান্তি পাওয়া যায় এ বিশ্বাস তার নেই। তার কাছে বর্তমান জীবনটাই একমাত্র সত্য, ঈশ্বর ও জন্মান্তর নিয়ে সে একটুও ভাবে না।

উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেই লেখকের বক্তব্যের ইঙ্গিতটা উপলব্ধি করা যায়। পৃথিবীতে মানুষ অনাকাঙ্ক্ষিত অপরিচিত আগন্তুকের মতো কয়েকদিনের জন্য বাস করতে আসে। তার নিজের জীবনের সঙ্গে সংসারের রীতি-নীতির কোনো মিল নেই। তাই মারসোর কাছে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক, হৃদয়াবেগের প্রকাশ ইত্যাদি অর্থ-হীন বলে মনে হয়। কামুর নায়ক আদর্শ চরিত্রের লোক নয়; কিন্তু তিনি কাহিনীর বিন্যাস এমন কৌশলের সঙ্গে করেছেন যে পাঠকের সকল সহানুভূতি মারসোর উপরে পড়বে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরূপতাকে প্রাধান্য দিয়ে কামু ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেছেন। এই ট্র্যাজেডির জন্য মানুষের চারিত্রিক ত্রুটি অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দায়িত্ব বেশী।

কামুর নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ সব এক চিন্তাসূত্রে গাঁথা। সুতরাং তাঁর উপন্যাসের বক্তব্য উপলব্ধি করতে হলে দার্শনিক প্রবন্ধও বিচার করতে হয়। 'দি স্ট্রেঞ্জারের' সমকালীন The Myth of Sisyphus থেকে কামুর জীবন দর্শন উপলব্ধি করা যাবে। গ্রীক পুরাণে সিসিফাসের কাহিনী আছে। করিন্থের রাজা সিসিফাস দেবতার অভিশাপে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড পাহাড়ের চূড়ার দিকে ঠেলে তোলে; চূড়ায়

কাছে গিয়ে প্রস্তর খণ্ড আবার গড়িয়ে নামতে শুরু করে, আর সিসিফাস তাকে ধরে রাখবার জন্য পিছনে পিছনে ছোটে। দিবা-রাত্রি অবিশ্রাম প্রস্তর খণ্ড ঠেলে উপরে তোলা এবং আবার পিছনে ছুটে নামা হল সিসিফাসের একমাত্র কাজ।

সিসিফাসের মতো মানুষের ভাগ্যেও আছে অসম্ভবকে সম্ভব করবার জন্য প্রাণান্তকর প্রয়াস। ঠুলিবাঁধা বলদের মতো একই বৃত্তে ঘুরে মরাই আমাদের ললাটলিপি। 'দি স্ট্রেঞ্জার' এবং 'দি মিথ অব সিসিফাস' মানুষের এই নির্দয় ভাগ্যের উপর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এরূপ গভীর নিরাশাবাদ কামু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়েছে; প্রথম জীবন কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। এই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মূলত জীবনপ্রেমিক। Noces তার প্রমাণ। কিন্তু অবচেতন মনে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হবার পর ডাক্তারের একটি কথায় তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সকল স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। অকস্মাৎ জানতে পারলেন, তিনি যক্ষ্মারোগী, মৃত্যু হতে পারে যে কোন মুহূর্তে। অল্পদিন পরে আরম্ভ হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ব্যক্তিগত জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে যা কিছু সত্য ও মহৎ বলে বিশ্বাস করেছিলেন, তা মিথ্যা হয়ে গেল। তিনি উপলব্ধি করলেন, যাকে আমরা সত্য ও যুক্তিসংগত বলে বিশ্বাস করি বাস্তব জীবনে তার কোন মূল্য নেই। এক অন্ধশক্তি আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, আদর্শ জীবনযাপন করেও তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে বা নালিশ জানালে অনন্ত নীরবতার প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে তা ফিরে আসে। মানুষ চার দিকের অসম্ভবের প্রাচীরের মধ্যে বন্দী। আমাদের জীবন যেসব বাধার সম্মুখীন হয়, তাদের যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না বলে তারা অসম্ভব এবং অদ্ভুত। বাধাগুলি অযৌক্তিক, সুতরাং যুক্তিবান মানুষ আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে কোন ফলের আশা করতে পারে না। একমাত্র বেঁচে থাকবার অনুভূতিটাই মানুষের জীবন। তাই অস্তিত্ববাদীরা বলেন:

"We and things in general exist, and that is all there is to this absurd business called life."

এই উক্তির যে নিষ্ক্রিয়তা আছে, কামু তা সমর্থন করেন না। 'অ্যাবসার্ডের' সংগে সংগ্রাম করে কোন ফল নেই, একথা নিশ্চিত জেনেও আমরা নিরন্তর লড়াই করে যাব। নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ তাঁর মন। জয়ের আশা নেই, তবু 'অ্যাবসার্ডের' বিরুদ্ধে অবিশ্রাম সংগ্রাম করবার মধ্যেই মনুষ্যত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই সংগ্রামই মানুষের একমাত্র আশ্রয়।

শুভ প্রচেষ্টার সকল পথ রুদ্ধ দেখে আত্মহত্যার প্রতি মন ঝুঁকতে পারে। কামুর সিসিফাস প্রবন্ধ এই আত্মহত্যার সমস্যা নিয়ে আরম্ভ হয়েছে। আত্মহত্যার প্রশ্ন তিনি বাতিল করে দিয়েছেন এই জন্য যে, মানুষ যদি জীবনবিদ্বেষী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে অ্যাবসার্ডের বাধা আরো শক্তিলাভ করবে। সুতরাং আত্মহত্যা নয়, বিদ্রোহ ঘোষণা হল 'অ্যাবসার্ডের' যোগ্য প্রত্যুত্তর। কামুর মতে শিল্পী ও দার্শনিকের বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। কারণ তাঁরা সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে যতটা নিস্পৃহ, এমন আর কেউ নয়। ক্ষুদ্র স্বার্থে তাঁরা বিদ্রোহের দোহাই দিয়ে অকল্যাণ ডেকে আনবেন না। ফলের আশা না করে শুধুই কাজ করে যাবার আদর্শ কামু তাঁর নিজের জীবনেও অনুসরণ করেছেন। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েও তিনি কর্তব্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন নি। সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে যা কল্যাণকর বলে ভেবেছেন, প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তার জন্য অক্লান্ত-ভাবে পরিশ্রম করেছেন।

কামুর পরবর্তী উপন্যাস 'দি প্লেগ' প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। এই উপন্যাসে তাঁর স্বকীয়তা অনেক বেশী উজ্জ্বল এবং শিল্পকলাও প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় সাহিত্যে 'দি প্লেগ' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রকাশিত হবার কয়েক মাসের মধ্যেই ফ্রান্সে এই বইয়ের প্রায় সওয়া লক্ষ কপি বিক্রি হয়। কামুর অন্য কোন রচনা এরূপ জনপ্রিয় হয়নি।

আলজিরিয়ার বন্দর ওরাঁ: এই শহরের অন্যতম চিকিৎসক ডাঃ বেরনার রিয়ো হঠাৎ লক্ষ্য করলেন ইঁদুরের মধ্যে মড়ক শুরু হয়েছে। তাঁর বাড়ির সিঁড়িতেও মরা ইঁদুর দেখতে পেলেন। প্রথম কিছুই সন্দেহ হয়নি। কিন্তু বাড়ির দারোয়ানের মৃত্যুর পর অন্যান্য ডাক্তারদের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে বুঝতে পারলেন শহরে প্লেগ আরম্ভ হয়েছে। শহরের কর্তৃপক্ষ প্রথম প্লেগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। প্যারিস থেকে নির্দেশ আসায় শহর থেকে কারো বাইরে যাওয়া বা ভিতরে আসা নিষিদ্ধ হল। ডাঃ রিয়োর নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়ে আরম্ভ হল শহর পরিষ্কার ও মৃতদেহ সংকারের কাজ। ডাঃ রিয়ো হাসপাতালে প্লেগ রোগীদের চিকিৎসা করেন। প্যারিস থেকে যে সিরাম এসেছে, তা মোটেই ফলপ্রদ নয়। কোন ফল হবে না জেনেও ডাক্তার নিষ্ঠার সংগে তাঁর কর্তব্য করে যান। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এই ডাক্তার। তাঁর সংগে আমরা পাই তারো, র‍্যাঁবার, পাদ্রি প্যানেলো প্রভৃতি কতকগুলি উজ্জ্বল পার্শ্ব-চরিত্র। র‍্যাঁবার প্যারিসের সাংবাদিক; এই শহরে এসেছিল রিপোর্ট সংগ্রহ করতে। কোয়েরাণ্টাইন জারী হবার পর পালিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। কিন্তু প্লেগ প্রতিরোধে নাগরিকদের উদ্যোগ দেখে সে মুগ্ধ হল। যোগ দিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে। প্লেগ আরম্ভ হবার পর পাদ্রি প্যানেলো নাগরিকদের বলেছিলেন যে, তাদের পাপের শাস্তি হিসাবে ভগবান প্লেগ পাঠিয়েছেন। কিন্তু একটি সম্পূর্ণ নিরপরাধ বালককে প্লেগে মরতে দেখে ভগবানের বিচারের উপর তাঁর আস্থা রইল না। অথচ এতদিনের বিশ্বাসকে অস্বীকার করবার মতো মনের বলও নেই। প্যানেলো শোচনীয় মানসিক অবস্থায় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। আর একটি অদ্ভুত চরিত্র পাঠকের মনে দাগ রেখে যায়। সে সামান্য কেরানী গ্রাঁ। অনেক বছর ধরে কাজ করছে, তবু তার পদোন্নতি হয়নি। স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে গেছে। আপিস থেকে ফিরে সে তার কল্পিত উপন্যাসের পাণ্ডু-লিপি নিয়ে বসে। শুধু প্রথম বাক্যটি লেখা হয়েছে। বছরের পর বছর প্রত্যহ সেই একটি বাক্যই সে নতুন করে লেখে, তার বেশী অগ্রসর হতে পারে না।

আট মাস পরে প্লেগ থেমে গেল। ডাঃ রিয়োর অনেক সহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এতদিন ভোগ করতে হয়েছে অনেক দুঃখ ও গ্লানি। এখন রোগমুক্ত শহরের রাজপথে স্বাভাবিক জনপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে তিনি তৃপ্তি অনুভব করলেন। কোন ফলের কথা না ভেবে একান্ত নিরাসক্ত চিত্তে তিনি সংগ্রাম করেছেন মহামারীর বিরুদ্ধে। এক উদ্দেশ্যের অনেক সাধকের সংগে যে যোগাযোগ ঘটেছিল, সেটাই তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বলে মনে হল। বিপদে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার উপযোগিতা উপলব্ধি করলেন তিনি। ডাঃ রিয়ো ধর্ম ও পুঁথিগত আদর্শবাদ ত্যাগ করে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর নিস্পৃহ মানবপ্রীতিকে "পেসিমিস্টিক হিউম্যানিজম" বলা যেতে পারে।

মারসো একাকী, সে 'আউটসাইডার'; সিসিফাসেরও সংগী নেই। ডাঃ রিয়ো একা নন; তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার মূলে আছে সহযোগিতা ও সমাজবোধ। কাজ শেষ হবার পর ডাক্তার তৃপ্তিলাভ করেছেন, তাও কাহিনীর মধ্যে দেখতে পাই। মারসো বা সিসিফাসের মতো তাঁর জীবন ব্যর্থ নয়। তাঁর সহকর্মী তারো পাঠকদের আশার বাণী শুনিয়েছে। সংকটের দিনে কি হারিয়েছে, কি হতে পারত তার জন্য আক্ষেপ করে লাভ নেই; যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকেই নতুন করে জীবন শুরু হোক। "বিগিনিং এগেন ফ্রম জিরো"—এই হল তারোর স্লোগান। 'দি স্ট্রেঞ্জার' ও 'দি মিথ অব সিসিফাস'-এ আমরা নিঃসংগ নিরস্ত্র মানুষকে পৃথিবীর সংগ্রামশালার সম্মুখীন

হতে দেখি। 'দি প্লেগ'ও সংগ্রামের কাহিনী; কিন্তু নিঃসঙ্গ আশাহীন সংগ্রামের কাহিনী নয়। কাম্যু তাঁর সক্রিয় নিরাশাবাদ থেকে অনেকটা সরে এসেছেন। প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগের অভিজ্ঞতা থেকেই এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

এই উপন্যাসে কাম্যু প্লেগের যেরূপ সূক্ষ্ম বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, তার একমাত্র তুলনা পাওয়া যায় ডিফোর Journal of the Plague Year-এ। এই বাস্তব বর্ণনার পশ্চাতে আছে একটি রূপক। প্লেগে আক্রান্ত ওরাঁ হল হিটলারের মতো কোনো স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রপতির দ্বারা উৎপীড়িত একটি দেশের প্রতীক। শুভবুদ্ধি প্রণোদিত সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্যে সেই উৎপীড়ন প্রতিরোধ করা যেতে পারে, এই আশার মধ্যে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। যুদ্ধের কিছুকাল পরে এরূপ একটি প্রতীকী উপন্যাস য়ুরোপে সহজেই আশাতিরিক্ত সমাদর লাভ করতে পেরেছিল।

'দি মিথ অব সিসিফাস'-এ কাম্যু আত্মহত্যার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর পরবর্তী দার্শনিক গ্রন্থ 'দি রিবেল' (১৯৫১)-এ আত্মহত্যার প্রশ্ন নেই, আছে বেঁচে থাকবার জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা উন্নত করবার উপায় নির্ধারণের আলোচনা। প্রধান উপায় প্রচলিত অরাজকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। গত দুশ বছর ধরে য়ুরোপে যে সব রাজনৈতিক ও চিন্তা বিপ্লব ঘটেছে কাম্যু তাদের বিশ্লেষণ করেছেন। কাম্যু বলেন, "We are living in the era of premeditation and perfect crimes." তিনি দেখিয়েছেন, ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে স্টালিনের আমল পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতারা অপরাধ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে দার্শনিকদের চিন্তাসম্পদের অপব্যবহার করেছেন। একজন ক্ষমতাশালী নেতার ব্যক্তিগত লোভ ও অপরাধপ্রবৃত্তি যে বিদ্রোহের মূলে থাকে, সে বিদ্রোহ সমাজের মঙ্গল করতে পারে না। বিদ্রোহ কেন করব সে সম্বন্ধে কাম্যুর অভিমত এই: "We all carry within us our places of exile, our crimes and ravages. But our task is not to unlash them on the world: it is to fight in ourselves and in others."

কাম্যুর সর্বশেষ উপন্যাস 'দি ফল' প্রকাশিত হয়েছে গত বছরে। এই বই তাঁর সাহিত্য সাধনায় সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা করেছে। প্রচলিত অর্থে একে উপন্যাস বলা যায় না। ঘটনা নেই, প্রেম নেই, সংঘাত নেই; শুধু এক অনুতপ্ত হৃদয়ের যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট সুদীর্ঘ 'মনোলগ'। প্যারিসের খ্যাতিমান আইন ব্যবসায়ী জাঁ-ব্যাপ্টিস্ট ক্ল্যামেন্স সমাজে নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিল। লোকে তাকে উদারহৃদয়, রুচিবান নাগরিক বলে যে সম্মান করে তা সে জানে, এবং জেনে গর্ব অনুভব করে। কিন্তু দুটি ঘটনায় তার আত্মপ্রসাদ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। একদিন রাস্তায় সামান্য কারণে কে একজন তাকে 'গাধা' বলে গালি দিল। সেই মুহূর্তে ক্ল্যামেন্স উপলব্ধি করল তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার গৌরব একান্তই মিথ্যা। আর একদিন একটি তরুণী পুলের উপর থেকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবার উদ্যোগ করছে জেনেও সে তাকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে গেল না, দ্রুত বাড়ির পথ ধরল। কিন্তু এর পর থেকে শুরু হল তার বিবেকের দংশন। তরুণীর জীবন সে রক্ষা করতে পারত, কিন্তু করেনি। সুতরাং সে প্রায় হত্যার অপরাধে অপরাধী। নিজের মন বিশ্লেষণ করে সে দেখল তার পরোপকারবৃত্তির গৌরব এতদিন নিছক ফাঁকির উপর দাঁড়িয়েছিল। আত্মপ্রেমের বশবর্তী হয়েই সে এতদিন সকল কাজ করেছে—সেবা, পরোপকার সব মিথ্যা। এই উপলব্ধি তাকে জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ করল। সে লোভনীয় আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বিবেকের যন্ত্রণার কাহিনী সে শ্রোতা পেলেই শোনায়। লেখকের আশ্চর্য রচনা কৌশলের গুণে তার বিবেক-দংশনের জ্বালা পাঠকের মনে সংক্রামিত হয়। আমরা প্রত্যেকেই যে বিবেকের নির্দেশ অমান্য করবার অপরাধে অপরাধী। সুতরাং ক্ল্যামেন্সের বিবেক-জ্বালার যন্ত্রণা আমাদেরও এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

'দি ফল'-এর পূর্ববর্তী কাম্যুর রচনাবলীতে মানুষ অপ্রধান; জীবনবিদ্বেষী শক্তিগুলির প্রাধান্য দেখতে পাই। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কারণ সে নিজে তত নয়, যত বাইরের পরিবেশ ও ভাগ্যের অন্ধ বিরূপ শক্তি। এই উপন্যাসে কাম্যু সর্বপ্রথম মানুষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেছেন। ক্ল্যামেন্সের যে বেদনা তার জন্য অন্য কেউ বা অন্য কিছু দায়ী নয়; দায়ী সে নিজে। ক্ল্যামেন্সের চরিত্র কাম্যু যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তা পর্যালোচনা করলে মালরোর এই উক্তিটি স্বভাবতই মনে পড়ে যায়: "A man is the sum of his acts, of what he has done and of what he can do—nothing else."

মানুষকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে কাম্যুর সাহিত্য নতুন পথে যাত্রা আরম্ভ করেছে। তাঁর সাহিত্যের পরিণত রূপ লাভ করবার এখনো অনেক বিলম্ব। সুইডিশ সাহিত্য আকাদামী 'দি ফল' এবং তাঁর গল্প সংগ্রহ 'The Exile and the Kingdom' (এখনো ইংরেজী অনুবাদ হয়নি)-এর মধ্যে মহৎ সাহিত্যের পরিচয় পেয়েছেন। 'দি ফল' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে কাম্যুর রচনাধারায় নতুন বাঁক সৃষ্টি হয়েছে তা স্বীকার করে তাঁরা বলেছেন: "Camus has left nihilism far behind him and his existentialism can reasonably be called a form of humanism."

কিন্তু এই উপন্যাস প্রকাশের পূর্বেও তো কাম্যুর লেখক হিসাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। তার কারণ কি?

প্রধান কারণ তাঁর জীবনদর্শনের আকর্ষণ। বিশেষ করে যুদ্ধোত্তর এই জীবনদর্শনের আবেদন গভীর হওয়া স্বাভাবিক। আদর্শবাদী তরুণ বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হয়ে যখন ক্ষুব্ধ হয় তখন কাম্যুর চিন্তাধারার মধ্যে সে নিজের মনের প্রতিফলন দেখতে পায়। অবশ্য জীবন যে নিরর্থক সংগ্রামের দুঃখময় ইতিহাস, এটা একেবারে মৌলিক চিন্তা নয়। অনেক লেখকই একথা বলেছিলেন। কিন্তু ক্লাসিক্যাল [illegible] কৌশল অবলম্বন করে কাম্যু যেমন সুস্পষ্টভাবে তাদের [illegible] দেখাতে পেরেছেন, এমন আর কেউ পারেননি। কাম্যুর চরিত্রগুলি রক্তমাংসের মানুষ নয়, তাদের এক একটি প্রবৃত্তির প্রতীক হিসাবে আঁকা হয়েছে। কোনো চরিত্রেরই সামগ্রিক পরিচয় পাই না, যতটুকু প্রয়োজন, শুধু ততটুকু [illegible]। [illegible] প্রয়োগে, [illegible] কাম্যুর [illegible] নেই, [illegible] কাহিনী [illegible] ও [illegible] অভিভূত করে।

একমাত্র তত্ত্ব দিয়ে মানুষের জীবনকে বিচার করতে গিয়ে কাম্যু ভুলও করেছেন। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক, স্নেহ-প্রীতি ইত্যাদি কাম্যুর রচনায় মর্যাদা লাভ করেনি। অথচ এসব নিয়েই তো আমাদের জীবন।

আর একটি কারণে কাম্যু জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। য়ুরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিক্ষোভের বিশ্লেষণ এবং সমাধানের ইঙ্গিত তাঁর রচনায় ওতপ্রোতভাবে জড়ানো আছে। সুতরাং ভুক্তভোগীদের নিকট কাম্যুর বই সমাদৃত হয়েছে। 'দি ফল'-এর পূর্ববর্তী রচনার মধ্যে সুইডিশ আকাদামী কাম্যুকে দেখেছেন, "as the world's foremost literary antagonist to totalitarianism."

'দি ফল'-এর নায়কের যে বিবেক-দংশন তার মধ্যে যেন আমরা একালের মানুষের বিবেক জ্বালার সামগ্রিক ছবি দেখতে পাই। তাঁকে পুরস্কার দেবার কারণস্বরূপ কমিটি তাই বলেছেন যে, পুরস্কার দেওয়া হয়েছে "for his important literary production, which with clearsighted earnestness illuminated the problems of the human conscience in our times."

মেনন সাহেবকে মনে পড়লে প্রথমেই মনে পড়ে যায় তাঁর হাসিটা। সদা-হাস্য মুখ। যার দিকেই তিনি চান না কেন, মনে হবে তাকে হাসি দিয়েই অভ্যর্থনা করছেন যেন! সে হাসির মধ্যে কোথাও আড়ষ্টতা নেই, অভিনয় নেই, অতিশয়োক্তি নেই। সে এক নির্বিচার নিরপেক্ষ হাসি। সে হাসি প্রসন্নতা সৃষ্টি করে, পরিতৃপ্তি দেয়, পরিশুদ্ধ করে।

কিন্তু সেই মেনন সাহেবকেই আবার একদিন কাঁদতে দেখলাম। একেবারে হাউ হাউ করে কান্না। সেই জামনগরের চীফ ইন্‌জিনিয়র মেনন সাহেবকে কাঁদতে দেখে আমি সেদিন সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আর তার পর-দিনই জামনগর ছেড়ে চলে আসি। তারপর আর কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।

প্রথম যেদিন আলাপ হলো, বললেন—আই হ্যাড বীন টু ক্যালকাটা, আমি কলকাতায় গিয়েছি, একবার—খুব বড় বড় হোটেল আছে—না?

জামনগরে অফিসার্স ক্লাবে তাঁর আর আমার একই টেবিলে জায়গা হয়েছিল।

বললাম—এবার আর একবার চলুন, আপনাকে বড় বড় বস্তিও দেখিয়ে দেব—

হো হো করে হেসে উঠলেন মেনন সাহেব। হাসতে হাসতে একবার এর সঙ্গে গল্প করছেন, একবার ওর সঙ্গে। সকলেই তাঁর প্রিয়, তিনিও সকলের প্রিয়। পনের দিন মাত্র ছিলাম ওখানে। স্টেটের অতিথি আমি, গেস্ট হাউসের কায়দা-কানুন আদব-কায়দা সবই মেনে চলতে হতো! অনেক বড় বড় কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গেও আলাপ হলো। সকলের মুখেই ওই এক কথা—মেনন সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার?

যাহোক, সেই মেনন সাহেবের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একদিন আলাপও হলো, বন্ধুত্বও হলো, ঘনিষ্ঠতাও হলো; কিন্তু ঠিক চলে আসবার আগের দিন মেনন সাহেবের এক অদ্ভুত পরিচয় পেয়ে গেলাম হঠাৎ। মেনন সাহেব আমার সামনে হাউ হাউ করে দুই হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললেন।

সেই ঘটনাটি বলি।

জামনগরের দ্রষ্টব্য জিনিস যা কিছু সব তখন দেখা হয়ে গেছে। ছোট্ট শহর, বিকেল বেলা লেক-এর ধারে গিয়ে চক্কর দিয়ে আসি, তারপরেই শহরের রাস্তায় সুভাষ মার্কেটের দিকে টাংগা, ট্যাক্সি, রেডিও, লাউডস্পীকার, আরো, লোকজন—সব মিলে সে এক হট্টগোলের ব্যাপার। তখন ক্লাবে গিয়ে বসি। চা, কিম্বা ঠাণ্ডা সরবৎ কিম্বা কফি চুমুক দিতে দিতে পরস্পরের সঙ্গে গল্প করা, কিম্বা টেনিস খেলা। এমনি করেই কেটেছে পনের দিন।

শেষের দিন ত্রিবেদীজী এসে বললেন—আপনাকে একটা উপকার করতে হবে আমার—

বললাম—কীসের উপকার?

ত্রিবেদীজীর সঙ্গে একটি ছেলে ছিল। তাকে দেখিয়ে ত্রিবেদীজী বললেন—এই ছেলেটি মেনন সাহেবের অফিসে চাকরি করে, এর মায়ের ভারি অসুখ, টেলিগ্রাফ এসেছে—এ ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছিল; কিন্তু মেনন সাহেব কিছুতেই রাজি নয় ছুটি দিতে—

বললাম—কেন?

ত্রিবেদীজী বললেন—মেনন সাহেব বলেছেন এখন বাজেট তৈরির সময়, এখন কেউ ছুটি পাবে না—

ছেলেটির দিকে চেয়ে দেখলাম। ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়েস। ভারি ম্রিয়মান হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ত্রিবেদীজী বললেন—আপনার সঙ্গে

মেনন সাহেবের বন্ধুত্ব আছে, আপনি বললে আর না বলতে পারবেন না—

জানলাম ছেলেটি মেনন সাহেবের অফিসে ড্র্যাফট্সম্যানের চাকরি করে। সামান্য মাইনে পায়। মা দেশে থাকে। সেখানে তাদের জমি-জমা আছে সামান্য। শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে মা ছেলের কাছে আসতে রাজি নয়। বয়েস হয়েছে মায়ের। তাঁকে দেখা শোনা করবার কেউ নেই। এ-সময়ে যদি মার কাছে না যেতে পারে তো আপশোষের সীমা থাকবে না তার।

ত্রিবেদীজী চলে গেলেন। বললাম—আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

জানতাম মেনন সাহেব নিয়ম করে ঠিক আটটার সময়ে ক্লাবে আসেন। আর কাঁটায় কাঁটায় রাত নটার সময় চলে যান। ক্লাবে এসেই হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কথা বলেন। এর সঙ্গে খানিকক্ষণ, ওর সঙ্গে খানিকক্ষণ। জামনগর স্টেটের চীফ ইঞ্জিনীয়ার। বয়েস হয়েছে, তবু ছাড়তে চায় না স্টেট। মেনন সাহেব কাজের সূত্রে সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। অথচ একদিন নাকি খুব গরীব ছিলেন। নিজের উপার্জনে বুড়ো বাপ, তিন ভাই, তিন বোনের ভরণ-পোষণ করেছেন। ছোটবেলা থেকেই বৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়েছিল। বোনেদের বিয়ে দিয়েছেন, ভাগ্নীপাগ্নেদের প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। ভাইদের সব বড় বড় চাকরি করে দিয়েছেন। বড় আমুদে লোক। শুধু আমুদে লোকই নয়, পরোপকারী লোকও বটে। চল্লিশ পঞ্চাশ জন গরীব ছাত্র বাড়িতে থেকে লেখা-পড়া করে, তাদের ভবিষ্যতের ভার তিনি নিয়েছেন। দান ধ্যানও প্রচুর। জামনগরের সব লোক তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ত্রিবেদীজী বলেছিলেন—সেদিন দেখলাম আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প করছেন—আপনার কথা এড়াতে পারবেন না মেনন সাহেব—

সত্যিই মেনন সাহেব আমার সঙ্গেই বেশি মেলামেশা করতেন। যে ক-দিন দেখা হয়েছিল, সে ক'দিনই আমার সঙ্গে গল্প করে কাটাতেন। কফি আসতো দুজনের জন্যে, ক্লাবের বাগানের এক কোণে বসে তিনি নানা রকম গল্প করে যেতেন আর মাঝে মাঝে কফির কাপে চুমুক দিতেন আর চুরুট টানতেন।

ত্রিবেদীজী বলতেন—মেননজী কলকাতায় বম্বেতে বড় বড় চাকরি পেয়েছেন, কোথাও যাননি—এই জামনগরেই পড়ে আছেন—

বললাম—কেন?

ত্রিবেদীজী বললেন—এখন তো বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু যখন ওর বয়েস কম ছিল তখনও কোথাও যাননি এই জামনগরেই কনট্রাক্টরি কাজ নিয়েছেন, এখানেই ওর জীবন কাটিয়ে দিলেন, শেষে অনেক ধরা-ধরির পর এই চাকরি নিয়েছেন—

একদিন বলেছিলাম—মেননজী, আপনি কলকাতায় চলুন না আমার—

মেননজী যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বললেন—না, কলকাতায় আর যাবো না!

—কেন?

মেননজী বললেন—কলকাতায় যেতে ভালো লাগে না, কোথাও যেতেই আর ভালো লাগে না, নিজের দেশ ছেড়ে সেই যে এখানে এসেছি, এখানেই রয়ে গেছি—

জিজ্ঞেস করলাম—কখনও বাইরে যেতে ইচ্ছে করেনি?

বললেন—বাইরে?

—এই ধরুন বম্বে কি আহমেদাবাদ, কি দিল্লী, কিম্বা আপনার নিজের দেশ মাদ্রাজ?

মেনন সাহেব বললেন—না—

বললাম—বিয়ে থাও করলেন না, সারা-জীবন এত টাকা উপায় করলেন—কার জন্যে করলেন, কে এসব দেখবে; হয়তো আপনার হাতে গড়া সব জিনিস নষ্ট হয়ে যাবে একদিন! অন্য লোকে কি এর মূল্য বুঝবে, এর মর্যাদা রাখবে তেমন করে?

মেনন সাহেব বললেন—কী জানি কেন সম্পত্তি করতে গেলাম, কেন এত সম্পত্তি করাতে গেলাম! সত্যিই সম্পত্তি করবো বলে করিনি, এত বড় বাড়ি করবার ইচ্ছেও ছিল না। কনট্রাক্টরি করতাম, একটার পর একটা কাজ আসতো আর নিতাম কাজ, কখন টাকার পাহাড় জমে গেছে ঠিক টের পাইনি। সত্যি বিশ্বাস করুন, টাকা যখন উপায় করেছি হিসেব করিনি কত টাকা জমলো বা কত টাকা খরচ হলো। ভাই-বোনেরা মানুষ হয়েছে, তাদের কোনও অভাব রাখিনি, হঠাৎ যখন বড় হলো একদিন পাশ বইটা খুলে দেখে অবাক হয়ে গেলাম—এত টাকা, এত টাকা জমে গেছে! আমার বিশ্বাসই হলো না!

বললাম—কিন্তু বিয়ে করলেন না কী জন্যে?

মেনন সাহেব হেসে ফেললেন। বললেন—বিয়ে করার সময় পেলাম কই?

বললাম—বিয়ে করতে আবার সময় লাগে নাকি?

মেনন সাহেব হেসে বললেন—গল্প লিখবেন বুঝি আমাকে নিয়ে?

বললাম—লিখলে আপনার কি আপত্তি আছে?

মেনন সাহেব বললেন—আপত্তি নেই, তবে পুরো মানুষটাকে না জেনে লিখবেন কী করে? আমাকে কি পুরো জেনেছেন? আমাকে কি পুরোপুরি দেখেছেন?

বললাম—পুরোপুরি জানালেই জানতে পারি।

মেনন সাহেব বললেন—আমার অত্যন্ত সাধারণ জীবন, যেমন আর সকলের—এতে নতুনত্ব কিছু নেই, একদিন বুড়ো বাবা মারা গেল, আমি ভাইবোনদের নিয়ে ভাসতে ভাসতে এসে পড়লাম এই জামনগরে—তারপরে ভাগ্যচক্রে পড়ে বড়লোক হয়ে গেলাম! এই পর্যন্ত!

—কিন্তু বিয়ে করলেন না কেন?

মেনন সাহেব বললেন—ওই যে বললাম, বিয়ে করবার সময় হয়নি—বিয়ে করতেও তো সময় লাগে, বিয়ে করতেও তো অবসর দরকার হয়!

—কিন্তু সেই সামান্য অবসরটুকুও পাননি আপনি বলতে চান?

মেনন সাহেব বললেন—না, সত্যিই পাইনি আমি, বিশ্বাস করুন এর মধ্যে আর রোম্যান্স খুঁজবেন না, এর মধ্যে আর গল্পের খোরাক খুঁজবেন না আপনি, ও-দিক থেকে আমার জীবন একেবারে নীরস—একেবারে রস-কষহীন—

মেনন সাহেবের জীবনের কিছু কিছু ত্রিবেদীজীর কাছে শুনেছিলাম।

ত্রিবেদীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আচ্ছা ত্রিবেদীজী, এত বড় কনট্রাক্টর, উনি বিয়ে করেন নি কেন বলুন তো?

ত্রিবেদীজী বললেন—কী জানি, তা তো জানি না, শুনিনি তো কিছু—

—কোনও ব্যর্থ ভালবাসা কিম্বা প্রণয় কিছু ঘটেছিল কি ওঁর জীবনে?

ত্রিবেদীজী বললেন—কই, এত বছর আছি এখানে, শুনিনি তো তেমন কিছু—বিয়ে দিয়েছেন ভাইদের বোনেদের, তাদের বিয়ের পর যে-যার কাছে চলে গেছে, উনি তো একলাই পড়ে আছেন এখানে—বাড়িতে তো একগাদা পুষ্যি, চাকর-বাকর, দরোয়ান সরকার—তাদের হাতেই সংসার—

বললাম—মেনন সাহেবের ঘরে কখনও গেছেন? ওঁর বাড়িতে?

বাড়ি? তা বাড়িতেও গেছেন দু'একবার। বিরাট বাড়িটা। থাকতে মাত্র ওই একটি লোক। সেই যে সকাল বেলা খেয়ে দেয়ে অফিসে আসেন, আর যান সেই অফিস ছুটি হবার পর। তারপর ওই ক্লাব, আর ক্লাব থেকে বাড়ি! শুনেছি বাড়িতে চারতলায় একটা ঘরে নিজে থাকেন, সেখানে চাকর-বাকর কাউকে ঢুকতে দেন না। সে ঘরে কারো প্রবেশ নিষেধ। নিজে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন, আবার বেরিয়ে তালা বন্ধ করে দিয়ে অফিসে আসেন। চাকর-বাকর কাউকেই ঢুকতে দেন না সেখানে শুনেছি।

এসব জানা ছিল আমার। যে-কদিন ছিলাম জামনগরে মেনন সাহেবের সম্বন্ধে জানবার চেষ্টা করেছি—তারপর একদিন চলে যাবার সময় এলো। আর কিছু জানা

যাননি। কিন্তু ঠিক যাবার আগের দিন সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

মেনন সাহেব সেদিন নিজের ঘরেই বসে ছিলেন। এক-একদিন যেমন হঠাৎ নীল আকাশে মেঘ করে আসে, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ পশ্চিম দিক কালো করে সারা পৃথিবীতে ঘনঘটা ছড়িয়ে পড়ে, সেদিনও বোধহয় তেমনি হয়েছিল। কেউ কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি। সমস্ত বাড়িতে আজ অন্য রকম চেহারা। মেনন সাহেব ক্লাবে চলে গেলেই সকলের একটু গড়িয়ে নেবার অবসর। অফিসে চলে যাবার পর তখন লোকজনের কথাবার্তার চীৎকারের আওয়াজ শোনা যাবে। তখন দরোয়ান রঘুবীরের সঙ্গে সরকার মুন্সীর বচসা বাধে। চাকর পূরণচাঁদের সঙ্গে ঝি যমুনার সঙ্গে ঝগড়া হয়। কিন্তু সেদিন মেনন সাহেব অফিসে যাননি। সারা বাড়িতে থম্‌থমে ভাব। সাহেব যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া করেছেন। কিন্তু ড্রাইভার নারায়ণ সিং গাড়ি তৈরি করে হঠাৎ শুনলো—সাহেব বেরোবে না। নারায়ণ সিং আবার গাড়ি তুলে রেখেছে। রঘুবীর দরোয়ান গেটের সামনেই পাগড়ি পরে হাজির রইল। কখন সাহেবের কী হুকুম হবে বলা যায় না। পূরণচাঁদ সাহেবের কামরার আশে পাশে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল। আজ আর তার ছুটি নেই। যমুনাবাঈ আজ নিজের মনের ঝাল নিজেই হজম করে নিয়ে সংসারের কাজে মেতে আছে। ওদিকটা বাবুলোকদের থাকবার জায়গা। রঘুবীর গিয়ে একবার শুনিয়ে দিয়ে এল—বাবুজী আজ গোলমাল মাত করিয়ে—সাহেব কোঠিতে মোতায়েন আছে—

হঠাৎ সন্ধ্যেবেলা সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করতেই পূরণচাঁদ সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মেনন সাহেব বললেন—কুছ কহেগা?

পূরণচাঁদ বললে—হুজুর, এক আদমী আপনার সঙ্গে মোলাকাত করতে চায়।

—বল্‌ এখন দেখা হবে না।

এ-রকম অনেক লোককে ফিরিয়ে দিয়েছেন সেদিন। মেনন সাহেব আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। পূরণচাঁদ অনেকক্ষণ নিচে দাঁড়িয়ে সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে সে-ও টিপি টিপি পায় সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে সেই দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলে। দেখলে—ফাঁকা ছাদের উপর সাহব একলা এদিক থেকে ওদিকে দ্রুতপায়ে পায়চারি করছেন।

যারা মতুন তারা বুঝতে পারে না। সকলের সামনে এলে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেন—কেমন আছেন ভাইসাহেব?

গাড়িতে উঠে জিজ্ঞেস করেন—নারায়ণ সিং, তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায়? ছেলে কেমন আছে তোমার? লেড়কী কেমন আছে?

পূরণচাঁদকে দেখলেও বলেন—যাও বেটা, আবি শো যাও—

ভারি মোলায়েম ব্যবহার, ভারি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সকলের সঙ্গে। রঘুবীর সেলাম করবার আগেই নিজে থেকে সেলাম করে বসেন। বাড়িতে যে-সব ছাত্ররা পড়া-শোনা করে, তাদের মধ্যেও গিয়ে দাঁড়ান মাঝে মাঝে। ভাল মন্দের খবর নেন। কারো কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না খবর নেন। লেখাপড়া কেমন হচ্ছে জিজ্ঞেস করেন। কার বাড়ি থেকে চিঠি আসেনি, কার বাড়ির জন্যে মন-কেমন করছে, সকলের সঙ্গে কথা বলেন। যেন আপনার জন। কেউ পর নয় তাঁর। বাইরে যাবার পথে হঠাৎ ঢুকে পড়েন তাদের ঘরে। চৌকীতে বসেন তাদের সঙ্গে সমান হয়ে। এক সবাই—সব একাকার।

কিন্তু সামনে থেকে চলে গেলেই সকলের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। হঠাৎ সামনে পড়ে গেলে ভয়ে বুক দুরদুর করে ওঠে সকলের।

আগ্রা থেকে ছোটভাই গণেশ চিঠি লেখে। নাগপুর থেকে মেজভাই বিশ্বনাথন্ চিঠি লেখে। সব ভাই বোন মেনন সাহেবকে চিঠি লেখে। মেনন সাহেবের খবর নেয়। কেমন আছেন মেনন সাহেব জানতে চায়। মেনন সাহেব সবাইকে লেখেন তিনি ভালো আছেন। কোনও ভাবনা নেই তাঁর জন্যে। তোমরা সকলে ভালো থাকো, তোমাদের সকলের কল্যাণ হোক, তোমরা সকলে সুখী হও, তা হলেই আমার আনন্দ, তা হলেই আমার সুখ! আর কিছু চাই না।

এখন, এই পরিস্থিতিতে আমি কিছুই জানতাম না। ত্রিবেদীজী বলেছিলেন—আপনি বললেই ছেলেটির ছুটি হয়ে যাবে।

আমি শুধু ছেলেটার উপকারের জন্যে একটা দরখাস্ত নিয়ে সোজা ক্লাবে গেলাম। একেবারে ক্লাবে গিয়ে তাঁকে গিয়ে ছুটিটা মঞ্জুর করে নিয়ে আসবো, এই ছিল মতলব। কিন্তু অনেকক্ষণ বসে বসেও মেনন সাহেব এলেন না। অথচ পরের দিন সকালেই আমাকে জামনগর ছেড়ে চলে যেতে হবে।

শেষে ঠিক করলাম মেনন সাহেবের বাড়িতে যাবো।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে সুভাষ মার্কেটের সামনে দিয়ে ঘুরে পাশের রাস্তার ওপরেই তাঁর বাড়ি জানতাম। ঠিক চেনা ছিল না জায়গাটা। তবু চিনে চিনে গেলাম তাঁর বাড়িতে। বিরাট বাড়ি। সামনে গিয়ে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম।

দরোয়ান চাকর কর্মচারী সবাই জড়ো হয়েছে, আর সকলের সামনে একটি মহিলা। সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা বলেই মনে হলো। তিনি ভেতরে ঢুকতে চাইছেন।

দরোয়ান হাতে লাঠি নিয়ে মুখের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল।

বললে—নেহি বাঈ, সাহেব মানা করে দিয়েছে—যানা মাত্—

এক কর্মচারী, সরকার বলে মনে হলো—বললে—এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না—তিনি দেখা করবেন না আপনার সঙ্গে—

মহিলাটি বললেন—আমার বিশেষ দরকার, সাহেবকে বলো আমি বোম্বাই থেকে আসছি—না দেখা করলে আমার চলবে না—

মহিলাটির চোখ ছলছল করে উঠলো যেন। চেয়ে দেখলাম একটু বয়েস হয়েছে। কিন্তু চেহারার জলুস আছে, ঘষা মাজা রূপ। পোষাক-পরিচ্ছদের বাহুল্য না থাকলেও মার্জিত রূপ।

হঠাৎ চেহারাটা দেখতে দেখতে মনে হলো এ-মুখ যেন কোথায় দেখেছি। ভারি চেনা-চেনা। অথচ ঠিক মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেছি। শুধু একবার নয়, অনেকবার দেখেছি, অনেকবার, অনেক জায়গায়। অনেক রকম ভাবে!

মহিলাটি তখন রীতিমত কাঁদতে শুরু করেছেন।

বললেন—আমি অনেকদূর থেকে এসেছি, তোমরা একবার গিয়ে সাহেবকে বলো বাবা। দরোয়ান না-ছোড়। বললে—নেহি বাঈ, নেহি—যানা মাত্—

বলে মোটা লাঠিটা একবার জোরে ঠুকলে মাটিতে।

মহিলাটি সকলের মুখের দিকে অসহায়ের মত তাকাতে লাগলেন। কারোর মুখ থেকেই কোনও আশ্বাসের ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। ভদ্রমহিলা যেন বেশ মুষড়ে পড়লেন। দু'হাতে মুখ ঢেকে বোধহয় নিজের লজ্জা আর অপমান ঢাকতে চাইলেন। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বাইরে চলে গেলেন হঠাৎ। রাস্তার

একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল তাতেই গিয়ে উঠলেন। তারপর ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলে।

আমি এতক্ষণ বিমূঢ়ের মত এসব দেখছিলাম। কেমন যেন সংকোচ হতে লাগলো। এমন অবস্থায় কি দেখা করা উচিত হবে! কিন্তু দেখা না-করলেই নয়। পরের দিন সকালবেলাই আমার যাওয়া!

একজন কর্মচারীকে আমার উদ্দেশ্য বলতেই আমাকে পাশের একটা ঘরে বসিয়ে দিলে। তারপর খবর দিতে গেল সাহেবকে। আমার নাম জেনে নিয়ে গেল।

কিন্তু আশ্চর্য, খবর দেবার একটু পরেই মেনন সাহেব নিজে এসে পড়লেন। ড্রেসিং গাউনপরা। হাসিমুখে। হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন—কী খবর? আপনি?

বললাম—কাল সকালে চলে যাচ্ছি—

বললেন—জামনগর কেমন লাগলো বলুন?

বললাম—তার আগে একটা আর্জি আছে আপনার কাছে—

মেনন সাহেব বললেন—কী আর্জি বলুন?

বললাম—আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি এতক্ষণ ক্লাবে অপেক্ষা করছিলাম, আপনাকে দেখতে না পেয়ে সোজা আপনার বাড়ি চলে এলুম—

মেনন সাহেব—খুব ভালো করেছেন, খুব খুশী হলাম—বলুন আপনার কী আর্জি, বলুন আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি?

পকেট থেকে দরখাস্তটা বার করে দিলাম সামনে। বললাম—আপনার অফিসের ড্রাফটস-ম্যান্ এই ছেলেটি, এর মার খুব অসুখ, মৃত্যুশয্যায়—একে আপনাকে ছুটি দিতে হবে—

দরখাস্তটা নিয়ে মেনন সাহেব হাসতে লাগলেন।

বললেন—আপনাকে ধরেছে বুঝি এরা?

বললাম—আপনার কাছে অনেক পীড়াপীড়ি করে যখন কোনও ফল হয়নি, তখন আমার কাছে এসেছে, আপনি না বলবেন না—

মেনন সাহেবের দিকে চেয়ে দেখলাম। তিনি যেন কী ভাবছেন।

বললাম—এর মা সত্যিই মৃত্যুশয্যায়, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি ছেলেটিকে নিজে দেখেছি, সে-ছেলে কখনও মিথ্যে বলতে পারে না—

মেনন সাহেব তখনও দরখাস্ত হাতে নিয়ে কী যেন ভাবছিলেন। মুখে কিন্তু তখনও সেই হাসিটি লেগে আছে, মৃদু মৃদু হাসছিলেন দরখাস্তটার দিকে চেয়ে।

সাহস পেয়ে বললাম—আর তা ছাড়া পৃথিবীতে মায়ের মত আর কী আছে বলুন! ছেলের কাছে মায়ের মত আপন আর কে হতে পারে!

মেনন সাহেব হঠাৎ মাথা তুললেন আমার দিকে।

বললেন—কী বললেন?

বললাম—এ ছেলেটি যদি মায়ের শেষ

সময়ে কাছে যেতে পারে, তবু একটু সান্ত্বনা পাবে মনে. মায়ের মৃত্যুশয্যায় বসেও একটু শান্তি পাবে—সত্যিই বলুন মায়ের ভালবাসার কি তুলনা আছে?

মেনন সাহেব মাথাটা নাড়া দিলেন। বললেন—মিথ্যে কথা!

কেমন যেন অবাক হলাম মেনন সাহেবের কথা শুনে। চাইলাম তাঁর দিকে। দেখি তখনও হাসি লেগে আছে সে-মুখে।

বললাম—মিথ্যে কথা? বলছেন কী? মায়ের ভালবাসার সঙ্গে তুলনা?

মেনন সাহেব বললেন—হ্যাঁ, মিথ্যে কথা। ছুটি আমি দিয়ে দিচ্ছি ছেলেটিকে, বিশেষ করে আপনি যখন ধরেছেন—সে-কথা নয়,—কিন্তু ওটা আপনি কী বললেন?

বললাম—কোন্ কথাটা?

মেনন সাহেব হাসতে হাসতেই বললেন—মায়ের শত্রুতারও কি তুলনা আছে পৃথিবীতে?

মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম মেনন সাহেবের। কী বলছেন মেনন সাহেব!

মেনন সাহেব আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। বললেন—বিশ্বাস হচ্ছে না?

আমার মুখে তখন আর কোনও কথা নেই। তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আসুন—আমার সঙ্গে আসুন—

কী জানি হঠাৎ কী হলো। তখন রাত সাড়ে আটটাও বাজেনি। তিনি আমার হাত ধরে বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। আমলা, কর্মচারী, চাকর, দরোয়ান সবাই সরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকেই বাঁ দিকে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন মেনন সাহেব। পেছনে পেছনে আমিও চলতে লাগলাম। মেনন সাহেব পেছন ফিরে বললেন—আসুন আমার সঙ্গে—

বললাম—কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?

মেনন সাহেব বললেন—আপনি না বললেন মায়ের ভালবাসার তুলনা নেই—তাই আপনাকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি—

বুঝতে পারলাম না কী দেখাবেন তিনি আমাকে।

চলতে চলতে মেনন সাহেব বললেন—কাউকেই আমি ওপরে নিয়ে আসি না, শুধু আপনাকেই নিয়ে যাচ্ছি...আপনি বিশ্বাস করেন মায়ের ভালবাসার তুলনা নেই?

এর উত্তরে কী বলবো বুঝতে পারলাম না। মেনন সাহেব কোথা দিয়ে ঢুকে, কোথায় যাচ্ছেন, কোন্ তলা দিয়ে কোন্ তলায়, তাও টের পাচ্ছি না। অনেক ঘুরে অনেক এঁকে বেঁকে এক জায়গায়, একটা ঘরের সামনে এসে থামলেন তিনি। একজন চাকর দৌড়ে আসছিল, তিনি হাত তুলে তাকে বারণ করলেন। চাকরটা থেমে গেল। তিনি চাবি দিয়ে ঘরের তালা খুলতে খুলতে বললেন—আপনি জানেন বোধহয় আমাদের ছোটবেলায় অবস্থা খুব খারাপ ছিল—

বললাম—জানি—

মেনন সাহেব বললেন—জামনগরের লোকের মুখ থেকে কিছু কিছু শুনেছেন বোধহয়; কিন্তু কতটুকু আর জানে তারা, তারা কতটুকু আর দেখেছে আমায়—আমি একলা বুড়ো বাবাকে সাহায্য করেছি, ছোটবেলা থেকে তিন ভাই তিন বোনের ভরণপোষণ করেছি, আমাদের চাকর রাখার ক্ষমতা ছিল না, আমি নিজের হাতে বাসন মেজেছি, রান্না করেছি, পরের বাড়িতে ছেলে পড়িয়েছি—তারপর সকলে ঘুমোলে নিজের লেখাপড়া করেছি—

ততক্ষণে দরজা খুলে গেছে।

বললাম—কিন্তু আপনার মা ছিল না?

মেনন সাহেব ভেতরে ঢুকে দরজাটা আবার ভালো করে বন্ধ করে দিলেন। বললেন—একটু আগে আপনি বলছিলেন না মা'র চেয়ে আপন কেউ নেই পৃথিবীতে? আপনি জেনে রাখুন—আমার জীবনে আমার মা'র চেয়ে অত বড় শত্রু আর কেউ নেই—আর অত কষ্টও আমাকে কেউ দেয়নি—

বললাম—মা ছিল?

মেনন সাহেব বললেন—ছিল, কিন্তু সে না-থাকারই মত। আমার মা ছিল ভয়ানক রাগী, আমার বাবার সঙ্গে দিনরাত ঝগড়া লেগে থাকতো, একদিন সামান্য একটা দেশলাই নিয়ে এমন ঝগড়া বাধলো যে আমার মা রেগে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়—আর সেই যে গেল আর এল না—

বললাম—কোথায় গেলেন?

মেনন সাহেব বললেন—আমরা তখন খুব ছোট তা আমরা জানতে পারিনি—

—কিন্তু পরে? পরে আর আসেন নি?

মেনন সাহেব একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

বললেন—আজ এসেছিল! আপনি দেখেন নি?

মনে পড়লো ঘটনাটা! অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু তখনও অবাক হওয়া বুঝি আমার শেষ হয়নি।

মেনন সাহেব হাসতে লাগলেন। বললেন—আজ এতদিন পরে এসেছিল, আমি দরোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে অমন মায়ের মুখদর্শন করবো না—

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—ওই দেখুন—চেয়ে দেখুন—ওইটে দেখাতেই আপনাকে এই ঘরে এনেছি, এ-ঘরে আমি কাউকে ঢুকতে দিই না, ওই দেখুন—

এতক্ষণ নজরে পড়েনি। অবাক হয়ে দেখলাম—দেয়ালে একটা ফ্রেমে বাঁধানো ফোটো। ছ'সাতটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। মাঝখানে একজন বয়স্ক পুরুষ আর একটি মহিলা। সকলের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—মাথা থেকে পা পর্যন্ত। কিন্তু মহিলাটির মুখের ওপর কে যেন এক টুকরো গোল কাগজ আঠা দিয়ে এঁটে দিয়েছে। সে-মুখ কোনও দিক থেকেই দেখবার উপায় নেই। সম্পূর্ণ ঢাকা।

বললাম—ইনি কে?

মেনন সাহেব তখন মৃদু মৃদু হাসছেন। বললেন—প্রতিজ্ঞা করেছি মা'র মুখদর্শন করবো না জীবনে—

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম ফোটোটার দিকে। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

মেনন সাহেব বলতে লাগলেন—অথচ দেখুন মুখদর্শন করবো না বলে প্রতিজ্ঞা করলে কী হবে, দিনের পর দিন সব সময় মায়ের মুখ দেখতে হয়েছে আমাকে—খবরের কাগজে, রাস্তার দেয়ালে-দেয়ালে, পোস্টারে পোস্টারে মায়ের মুখ যে কতবার দেখেছি...

হঠাৎ মনে পড়লো আমার, কেন মহিলাটিকে অত চেনা-চেনা মনে হয়েছিল তখন। মনে পড়লো কেন মেনন সাহেব বোম্বাই যান না, কলকাতায় যান না। মনে পড়লো এই কিছুদিন আগেও ছবিতে যেন দেখেছি মেনন সাহেবের মাকে।

কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখি মেনন সাহেব, জামনগরের সেই চীফ ইঞ্জিনীয়র দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদছেন। সে-কান্না আর কিছুতেই থামে না।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেব কি, সে-দৃশ্য দেখে আমারই বাকরোধ হয়ে গেল।
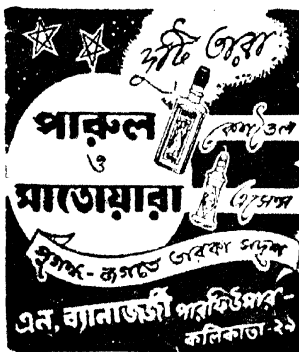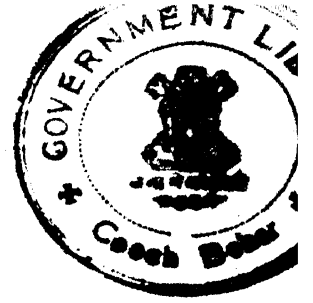
এখানে নক্ষত্রে ভ'রে—

জীবনানন্দ দাশ

এখানে নক্ষত্রে ভ'রে রয়েছে আকাশ,
সারাদিন সূর্য আর প্রান্তরের ঘাস;
ডালপালা ফাঁক ক'রে উঁচু উঁচু গাছে
নীলিমা কি চায় যেন আমাদের পৃথিবীর কাছে।

চারিদিকে আলোড়িত রোদের ভিতরে
অনেক জলের শব্দে দিন
হৃদয়ের গ্লানি ক্ষয় কালিমা মুছিয়ে
শুশ্রূষার মতো অন্তহীন।

স্বগত

জগন্নাথ চক্রবর্তী

যে ছিল অনেক কাছে,
এসেছিল নক্ষত্রের মতো
জীবনের মাঝে,
আজ সে এখানে নেই—
মনে নেই—
কোনোখানে নেই।

যে ছিল, যে কাছে নেই,
যে গিয়েছে বহুদূরে স'রে
সে যেন সুখেই থাকে
সে যেন শান্তিতে থাকে
সে যেন না মোছে চোখ
অন্ধকার ভোরে।

ভিক্ষুক-মনকে বলি—
কাজ নেই নিষ্ফল ভিক্ষায়;
বারোটি দুঃখের গান বেঁধে রাখ—
তাই গেয়ে গেয়ে
বৎসর ফুরায়।

ত্রিদিব চৌধুরী

(১৪)

পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের পথে

পূর্বদিক হইতে ফেরীতে মাণ্ডভী নদী পার হইলেই পাঞ্জিম বা পনজী শহর; পর্তুগীজদের নোভা গোয়া। এদিক হইতে শহরে ঢোকার মুখে প্রথমেই চোখে পড়ে হোটেল মাণ্ডভীর ছতলা বাড়ি। হোটেল মাণ্ডভী ঠিক ফেরী ঘাটের সামনে বড় রাস্তার উপর। এই হোটেলের একটি আধুনিক ছতলা উঁচু এই বাড়িটিকে পাঞ্জিমের একমাত্র স্কাই স্ক্রেপার বলা চলে। ইহার আশে পাশে সাধারণ একতলা দোতলা বাড়ি ছাড়া সেরকম কোন উঁচু বাড়ি বা দালান নাই। নদীর ধারে একেবারে প্রায় ফাঁকা একটা জায়গায় মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া থাকার দরুণ ফেরী ঘাটের ওপার হইতে অথবা পাঞ্জিমের বাহিরে উত্তর বা দক্ষিণ কোনদিক হইতে পাঞ্জিমের দিকে তাকাইলেই সবার আগে হোটেল মাণ্ডভীর দিকে নজর যায়। বাড়িটির এমন কোনো স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য নাই। তবে গোয়ার ভিতরে সবচেয়ে উঁচু ইমারত বলিয়া হোটেল মাণ্ডভীর বাড়ি সকলের কাছে পরিচিত। বোম্বাই, কলিকাতা বা পুনাতে হইলে এই রকম একটি বাড়ির কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখার কোনো দরকার করিত না। কিন্তু আমাদের পাঞ্জিমে ঢোকার সময় চোখের সম্মুখে এই খাপছাড়া রকম উঁচু বাড়িটি খাড়া হইয়া থাকায় ইহার কথা আজও বেশ মনে আছে। গোয়াতে এই হোটেল মাণ্ডভী ই ইউরোপীয় কায়দায় সবচেয়ে বড় হোটেল, যদিও ইহার মালিক জনৈক সরকার-ঘেঁষা ধনী সারস্বত ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ী। বড় বড় সরকারী পর্তুগীজ কর্মচারী কিংবা বিদেশাগত ইউরোপীয় বা অন্য দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেদের পাঞ্জিমে ওঠার জায়গা এইটি। ফেরী লঞ্চ হইতে নামিয়া আমাদের ল্যাণ্ডরোভার হোটেল মাণ্ডভীর পাশ দিয়া পাঞ্জিমের কুয়ার্তেলের দিকে চলিল। ডাঃ সালাজার যে হোটেল মাণ্ডভীতে আমাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন নাই তাহা না বলিলেও চলিবে।

ছোট বড় প্রত্যেক শহরেরই একটা সাধারণ রূপ বা চেহারা থাকে। পাঞ্জিম শহরও তাহার ব্যতিক্রম নয়। বড় রাস্তার উপরে, সরকারী দপ্তর বা অভিজাত অঞ্চলে সেই চেহারাটার মধ্যে যে একটা ফিরিঙ্গি ছোপ চোখে পড়ে না তাহা নয়। ফেরী লঞ্চে খেয়াঘাট পার হওয়ার সময় ইউরোপীয় ফ্রক পরিহিত দেশীয় গোয়ানীজ মহিলা বেশ কয়েকজন চোখে পড়িয়াছিল। হাওয়াই শার্ট, বা পুরোপুরি কোট-প্যান্টের স্যুট পরিহিত অনেক পুরুষ লোকও সে সময় ঘাটে ছিল, আবার মারাঠী ধরনে ধুতি, পাঞ্জাবি, টুপী বা পাগড়ী পরা লোকের অভাবও সেখানে ছিল না। কিন্তু মেয়েদের ফ্রক পরাটা একটু চোখে ঠেকিল। মারাঠী ধরনে কাছা দিয়া শাড়ি পরা মহিলাও যে সেখানে কয়েকজন ছিলেন না, তা নয়। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। বোম্বাইয়ে বা কলিকাতায় গরীব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ক্রিশ্চিয়ান পাড়ায় যেরকম দেখা যায়, অনেকটা সেই-রকম। কিন্তু খুব বড় শহর বলিয়া সে সব জায়গায় লোকের বেশভূষার ফিরিঙ্গিয়ানাটা তত চোখে পড়ে না কিন্তু গোয়াতে, বিশেষ করিয়া পাঞ্জিমের মত ছোট শহরে ইহা চোখে না পড়িয়া পারে না। মাড়গাঁও বা মাপ্‌সার পথে এটা আমার চোখে অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া মনে হইয়াছে। বিদেশী পর্যটক বা সংবাদিকেরা অনেকে গোয়াতে আসিয়া পাঞ্জিমে ফ্রক পরা মহিলা বা কোট প্যান্ট পরা লোকের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া এই কারণেই কৃষ্টিগতভাবে গোয়াকে ইউরোপের কাছাকাছি বলিয়া ধরিয়া নেন। বলা বাহুল্য, পাঞ্জিমের বাহিরে বা গ্রামাঞ্চলে গিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর করা সকল সময় বিদেশী সংবাদিকের হইয়া ওঠে না এবং সেই জন্য পাঞ্জিমটাই সাধারণতঃ হইয়া অনেক সময় গোয়া সম্পর্কে পর্তুগীজ প্রচারের রসদ যোগায়। কিন্তু এও ঠিক যে, পাঞ্জিম বা মাড়গাঁও বাহিরের অন্যান্য ভারতীয় শহরে ইউরোপীয় স্যুট পরিহিত পুরুষ মানুষ বরং দেখা গেলেও ফ্রক পরা বয়স্থা দেশীয় মহিলা বেশী কেন, একজনও হয়ত দেখা যাইবে না। গোয়ায় সেটা দেখা যায়। আজকাল অবশ্য গোয়ানীজ ক্রিশ্চিয়ান মহিলাদের মধ্যে শাড়ির চলনই বেশী হইয়াছে, কিন্তু ফ্রক পরাটাও যথেষ্ট চলতি আছে। দরিদ্র ক্রিশ্চিয়ানদের ঘরেও মেয়েদের মধ্যে ফ্রক পরার চল আছে—খালি পায়ে শ্যামবর্ণা গরীব ক্রিশ্চিয়ান মেয়েরা ফ্রক পরিয়া মাথায় ঝাঁকা লইয়া তরি-তরকারি কলা ইত্যাদি নিয়া যাইতেছে এরকম দৃশ্য গোয়াতে পথে ঘাটে প্রায়ই দেখা যাইবে যাহা ভারতবর্ষের অন্যত্র দেখা যায় না।

বাড়িঘরের দিক দিয়া অবশ্য চার্চ ক্যাথিড্রাল প্রভৃতির কথা বাদ দিলে খুব ইউরোপীয় ছাঁদের বাড়িঘর যে গোয়াতে আছে তা নয়। গোয়ার রাজধানী হইলেও পাঞ্জিমে ইউরোপীয় ধরনে তৈরী উঁচু বড় বাড়ির সংখ্যা খুব বেশী নয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য মফঃস্বল শহরের মতো পাকা বাড়ি-ঘরের মধ্যে সাধারণত একতলা দো-তলা বাড়িই বেশী। দু' একটি ইমারত তিনতলা পর্যন্ত আছে। কিন্ত পাঞ্জিম শহরে তাহার সংখ্যা ১৫টির বেশী হইবে না। পাঞ্জিমে হোক, আর মাড়গাঁও মাপ্‌সাতে হোক, ম্যাঙ্গালোর টালির ছাদ দেওয়া একতলা বাড়ির সংখ্যাই

বেশী। দোতলা বাড়িতেও ছাদটা সাধারণত টালিরই থাকে। তাহার একটা কারণ কোঙ্কনভূমি গোয়াতে বর্ষার সময় বৃষ্টির প্রাবল্য একটু বেশী বলিয়া ঢালু ধরনের টালির ছাদে সুবিধা; জল আপনি ঝরিয়া গড়াইয়া যায়। তাছাড়া, টালির ছাদ খরচের দিক দিয়া সস্তাও বটে। বোম্বাইয়ের নীচে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সর্বত্রই ঘরবাড়ির ছাদ তৈরীতে টালির চলন একটু বেশী। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকেরা টালির ছাদ দেওয়া ভিলা প্যাটার্নের বাগান ঘেরা বাড়ি তৈরী করেন। গোয়াতেও মোটামুটি সেইটাই নিয়ম। সুতরাং পাঞ্জিমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পশ্চিম উপকূলের অন্যান্য শহরের তুলনায় এমন কোনো বিশেষত্ব চোখে পড়ে না। গোয়ার পাঞ্জিম, মাড়গাঁও মাপসা সবই ছোটো বা মাঝারি আকারের শহর ছাড়া কিছু নয়। শহরতলী এবং আশপাশের সমস্ত বস্তি ধরিয়া পাঞ্জিমের মোট জনসংখ্যা ঊর্দ্ধপক্ষে পনেরো হাজারের বেশী হইবে না; মাপসার [illegible]। গোয়ার সবচেয়ে বড় শহর [illegible] জনসংখ্যা ষাট হাজারের মতো। [illegible] পাঞ্জিম বা গোয়ার অন্য কোনো শহরকে কলিকাতা বা বোম্বাইয়ের সঙ্গে তুলনা করিতে সম্পূর্ণ ভুল হইবে।

[illegible] না বলা গোয়া, গোয়ার রাজধানী [illegible] হিসাবে পীচের রাস্তা, ফুটপাথ, ইলেকট্রিক আলো, স্যানিটারী ড্রেন-পায়খানা, জলের জন্য সব কিছুরই বন্দোবস্ত পাঞ্জিমেও আছে; তবে সেটা শহরের সর্বত্র নয়। আমাদের অন্যান্য শহরেও যেমন, পাঞ্জিমেও তেমনি এসব আধুনিক শহর-জীবনের সরঞ্জাম বিশেষ অঞ্চলের—অর্থাৎ সরকারী এবং অভিজাত অঞ্চলের জন্য সীমাবদ্ধ। এইসব অঞ্চলের বাহিরে গেলে আধুনিকতার এইসব নিদর্শন আর দেখা যায় না। ১৯২৭-২৮ সালে গোয়াতে একজন পর্তুগীজ গভর্নর আসিয়াছিলেন যাঁর আধুনিকতার দিকে ঝোঁকটা একটু বেশী ছিল এবং প্রধানত তাঁহার উদ্যোগেই খুব তোড়জোড় করিয়া গোয়াকে মডার্ন বানানোর চেষ্টা শুরু হয়। পীচের রাস্তা ইত্যাদির সেই সময় পত্তন হয়। তবে গোয়া মোটের উপর এমন কিছু বড় জায়গা নয় বা পাঞ্জিম, মাড়গাঁও এসব শহরের মিউনিসিপ্যালিটির আয়ও বেশী নয়। তবুও সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত কিছুটা মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের উপর নির্ভর করিয়া, কিছুটা সরকারী খরচে মধ্যে মধ্যে পাঞ্জিমের উপর আধুনিকতার প্রলেপ চড়াইবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু হঠাৎ ঝোঁকে পড়িয়া আধুনিকতার এইসব সাজ-সরঞ্জাম চালু করিলেও, তাঁহাকে চলতি রাখা সহজসাধ্য [illegible]। [illegible] শহরে [illegible] আমাদের দেশে দেখা যাইবে, হয়ত একটা পার্কের বন্দোবস্ত হইল; কিন্তু দু' এক বছরের মধ্যে সেখানে জঙ্গল আগাছা গজাইয়া গিয়াছে, ফুলের বাগান ন্যাড়া হইয়া গিয়াছে, পার্ক আর পরিষ্কার পর্যন্ত হয় না—এক কথায় পার্কের 'পার্কত্ব' মধ্যবিত্ত গরীবিয়ানায় সম্পূর্ণ ঢাকিয়া গিয়াছে। পাঞ্জিমেও তাহার নিদর্শন প্রতি পদে চোখে পড়িবে। তবু রাজধানী জায়গা; সেজন্য সরকারী সমারোহ বজায় রাখার জন্য শহরকে কিছুটা পরিচ্ছন্ন, কিছুটা জাঁকজমকসম্পন্ন রাখার চেষ্টা সব সময় চলিতেই থাকে। সরকারী এবং অভিজাত অঞ্চলগুলিতে তাই মোটের উপর গরীব মধ্যবিত্ত সুলভ হতশ্রী ভাবটা একটু কম।

পাঞ্জিমে ঢুকিয়া পুলিস পাহারায় ল্যান্ড রোভার গাড়িতে বসিয়া যতটা দেখা যায় দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। আমাদের গন্তব্য-স্থান পাঞ্জিমের পুলিস হেড কোয়ার্টার বা কুয়ার্তেল জেরাল। পাঞ্জিমের কুয়ার্তেল জেরাল সারা পর্তুগীজ ভারতের পুলিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কেন্দ্র—Quartal Geral da Policia da Estado da India। পর্তুগীজ শাসন কর্তৃপক্ষের তখন ব্যবস্থা ছিল (আজও সেই ব্যবস্থা বহাল আছে) গোয়ার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে এক জায়গায় পাঞ্জিমে আনিয়া জমায়েত করা এবং [illegible] ও [illegible] তদন্তকে তাহাদের হাজতে আটক রাখা। আমিও সেখানেই চলিয়াছি। ফেরী ঘাট হইতে পুলিস হেড কোয়ার্টার বোধহয় আধ মাইল পথও নয়। 'হোটেল মাণ্ডভী' ছাড়াইয়া নদীর ধারের রাস্তায় কিছুদূর গেলেই মোড় ঘুরিয়া পুলিসের কুয়ার্তেল। কিন্তু পুলিস কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য আমাকে সরল সোজা রাস্তা দিয়া সেখানে না নিয়া খানিকটা বেশী ঘোরাপথ দিয়া গাড়ি ঘুরাইয়া নিয়া যাওয়া হইল। অবশ্য তাহাতে আমার বরং সুবিধাই হইয়া গেল; হাজতে বন্ধ হওয়ার আগে শহরটি এক ঝলক দেখিয়া যাওয়ার সুযোগ পাইয়া গেলাম। এ ছাড়া, পাঞ্জিমের বিভিন্ন রাস্তায় ও একাধিক অঞ্চল দিয়া পুলিস পাহারায় আরো কয়েকবার ঘোরাফেরা করার সুযোগ আমার হইয়াছে। ভারতীয় কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে দু'বার দেখা করিতে যাওয়ার সময়, মিলিটারী ট্রাইব্যুনালে বিচারের জায়গায় আসা-যাওয়ার সময়, এবং ১৯৫৬ সালে একবার আগুয়াদা দুর্গ হইতে পাঞ্জিমে চোখের ডাক্তারের কাছে চোখ দেখাইতে আসার সময় পাঞ্জিম শহরের ভিতর চারিপাশে মোটামুটি ঘুরিয়া যতটা দেখা সম্ভব তাহা দেখিয়াছি। গোরে, শিরভাউ লেমায়ে এবং দেশপাণ্ডেকে পুলিস কর্তৃপক্ষ পাঞ্জিম, ওল্ড গোয়া এবং মাড়গাঁও পর্যন্ত জীপে করিয়া ঘুরাইয়া দেখান। গোরে এবং লিমায়ের বেলায় কারণ ছিল তাঁহাদেরকে গোয়ায় ঘুরাইয়া এটা তাঁদের কাছে প্রমাণ করা যে, গোয়াতে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন নাই। দেশপাণ্ডের বেলায় উদ্দেশ্য ছিল, গরু মারিয়া জুতা দানের মতো—হাজতে পুরিয়া তাঁহাকে উত্তম-মধ্যম পেটার পর ছাড়িয়া দিবার আগে একটু ভদ্রতার প্রলেপ দেওয়া। তাঁহারা তিনজনেই এইভাবে গোয়াতে সবচেয়ে যাহা দর্শনীয়—সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের সমাধি ও রক্ষিত দেহ দেখার সুযোগ পান। আমার দুর্ভাগ্য বশত গোয়ায় উনিশ মাস থাকা হইলেও এই জগৎপ্রসিদ্ধ সমাধি স্থল দেখার সুযোগ আমার হয় নাই। যাহা হউক, খাস গোয়ার ভিতরে আমার এই প্রথমদিনে পাঞ্জিমের রাস্তায় কিছুটা কৌতূহলের সঙ্গে যতটা পারি এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছি। মধ্যে মধ্যে চোখে পড়িল দেওয়ালে দেওয়ালে স্লোগান লেখা—"Portugal esta aqui"। তখন ইহার অর্থ বুঝি নাই; কিন্তু এটুকু বুঝিয়াছিলাম যে, হয়ত ইহার কোনো রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। হাজতে ঢোকার পর ক্রমে ক্রমে গোয়ানীজ রাজনৈতিক বন্দীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার অর্থ জানিয়াছিলাম—"Portugal is here" ('পর্তুগাল এইখানেই')। বলা বাহুল্য, এই স্লোগান দেওয়ালে দেওয়ালে লেখার উদ্যোক্তা ছিল

গোয়ার 'ইউনিয়ন নাসিওনাল'; ডাঃ সালাজারের দলের গোয়া শাখা। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ জানিতেন যে, গোয়াতে জাতীয় আন্দোলন এবার শুরু হইয়াছে গোয়াকে পর্তুগালের অন্তর্ভুক্ত খাস মহল প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা করার বিরুদ্ধে। সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে স্লোগান হিসাবে ইউনিয়ন নাসিওনালের তরফ হইতে আওয়াজ ওঠানো হয়—পর্তুগাল গোয়া হইতে দূরে নয়, গোয়াতেই পর্তুগাল। "পর্তুগাল এইখানেই" স্লোগানের আসল তাৎপর্য বা ইতিহাস ইহাই। আরও দু'একটি স্লোগানও যে এই সঙ্গে দেওয়ালে দেখিলাম না তাহা নয়; "Viva Portugal!" (পর্তুগাল জিন্দাবাদ!) "Viva Salazar!" (সালাজার জিন্দাবাদ!) ইত্যাদি। এইসব দেখিতে দেখিতে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফেরী ঘাট হইতে আমাদের কুয়ার্টেলে আসিতে মিনিট দশেকের বেশী লাগে নাই। আমাদের ল্যাণ্ড রোভার আসিয়া বিরাট দেউড়ীর ভিতর দিয়া গট্ করিয়া কুয়ার্টেলের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। গাড়ি হইতে নামাইয়া আমাদের প্রথম যে ঘরে আনা হইল তাহা কুয়ার্টেলের দেউড়ীর পাশের একটি ছোট অফিস। বোধ করি নূতন হইল কয়েদী ভর্তি বা খালাস করার খাতাপত্র এখানে থাকে। আমাদেরই করিয়া কাহাকেও হাজতে আনিয়া ঢুকাইতে হইলে প্রথমে এখানে আনিয়া তাহার নাম ধাম বিবরণ লিখিয়া নিয়া তারপর হাজতের ভিতরে পাঠানো হয়। কুয়ার্টেলের এই হাজত বিভাগ সাধারণত একজন শেফ-এর জিম্মায় এবং কয়েদীদের তত্ত্বাবধানে একজন সুব শেফের জিম্মায় থাকে। অর্থাৎ শেফ হাজতের খাতাপত্র, কাগজপত্র এ সব ঠিক রাখেন আর সুব শেফ হাজতের চাবী এবং কয়েদী গণতি ঠিক রাখেন। প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় হাজতের, সুব শেফের ডিউটি বদল হয়। হাজতের চাবীর গোছা তাঁহার কাছে থাকে সুব শেফ সঙ্গে না গেলে কয়েদীদের কোনো ক্রমেই হাজত হইতে কেহ বাহির করিতে পারে না। কোর্টে বা অন্য কোথাও কোনো কয়েদীকে হাজির করার সময় সেদিন যে সুব শেফের ডিউটি, সাধারণ পাহারাওলা ও কনেস্টবল রাইফেল নিয়া সঙ্গে থাকিলেও, তাঁহাকেও একটি স্টেন গান কাঁধে ঝোলাইয়া সঙ্গে যাইতে হয়। হাজত হইতে কয়েদীদের স্নান বা প্রাতঃকৃত্য সমাপনের উদ্দেশ্যে বাহিরে আনিতে হইলেও সুব শেফকে সামনে থাকিতে হয়। আমরা অফিস ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শেফ ভদ্রলোক যথারীতি আমাদের নামধাম বিবরণ এ সব লিখিয়া নিয়া সেদিনের সুব শেফকে ডাকিয়া আমাদেরকে তাঁহার সঙ্গে হাজতে পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য তাহার আগে আমাদের সমস্ত শরীর তল্লাসী করিয়া পকেটে যা কিছু টাকা পয়সা ছিল তাহা রাখিয়া দেওয়া হইল। অবশ্য তাই বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, হাজতে কয়েদীদের সঙ্গে টাকা পয়সা রাখিতে দেওয়া হয় না। পর্তুগীজ জেলে সে সম্পর্কে খুব কড়াকড়ি নাই। কিন্তু কোনো কয়েদীকে হাজতে প্রথম ঢোকানোর সময় যদি তাহার সঙ্গে কোনো টাকা-পয়সা থাকে তাহা হইলে সেই টাকা তাহার খাই খরচা বাবদ কাটিয়া নেওয়া হয়। আমার সঙ্গে তখন বোধ হয় ২,।৩, টাকার মতো নোট ছিল। আমার নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া নেওয়াতে প্রথমটা আমার মনে হইয়াছিল জেলখানার ভিতরে কাহারও সঙ্গে টাকাকড়ি রাখিতে দেওয়া হয় না বলিয়াই বোধ হয় আমার টাকা উহারা নিয়া নিল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার আসল কারণটা কি, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যা হোক এ সব কাজ চুকাইয়া শেফ সাহেব ডিউটি সুব শেফ আসিলে পর আমরা তাঁর পিছনে পিছনে হাজতের দিকে পা বাড়াইলাম। শেফ সুব শেফকে বলিয়া দিলেন, "numero uno" অর্থাৎ এক নম্বর ঘরে নিয়া যাও। শেফ ভদ্রলোক বোধ হয় মিশির বা পর্তুগীজ হইতে পারেন; তিনি সুব শেফ বা কনেস্টবলদের যথাসম্ভব পর্তুগীজ বা তিনিকানি কোঙ্কনীতে কথা বলিলেও আমাদের নামধাম জিজ্ঞাসাবাদে ভাঙা ভাঙা ইংরজী ভাষাই ব্যবহার করিলেন। ডিউটি সুব শেফ উত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন "mas dois (দুই নম্বরে নয়?)। শেফ জবাব দিলেন "nao, nao! um, um!" তাঁহাদের মধ্যে পর্তুগীজ ভাষাতেও কিছু কথাবার্তা হইল। তখন তাহার অর্থ বুঝি নাই। পরে অবশ্য বুঝিয়াছিলাম এক নম্বর হাজত ঘরে গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দী অনেকে আছেন বলিয়া সুব শেফ আমাকে সেখানে রাখার যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিলেন। ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণত গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে রাখা হইত না। দুই নম্বর ঘরে সে সময় ভারতীয় জনসংঘের নেতা জগন্নাথ রাও জোশী এবং তাঁহার সঙ্গে আগত কয়েকজন ভারতীয় সত্যাগ্রহীকে রাখা হইয়াছিল। আমাকে সেই ঘরে রাখা উচিত কি না সেইটাই সুব শেফের জিজ্ঞাসা ছিল। কিন্তু আমাকে যে এক নম্বর ঘরে গোয়াবাসী বন্দীদের সঙ্গে রাখা হইবে মন্তেইরোর নির্দেশে তাহা আগেই স্থির করিয়া রাখা হইয়াছিল। কাজে কাজেই সুব শেফের ক্ষীণ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আমাকে সেই এক নম্বর হাজতেই নিয়া গিয়া ঢোকানো হইল। ভগৎ তুলসী রাম ও নাসিকের ছেলেটিকেও আমার সঙ্গে সেখানে রাখা হইল।

(ক্রমশ)

গান আর

শার্ঙ্গদেব

একটি পত্রিকার (শারদীয় সংখ্যায়) অভিযোগ যে, আধুনিক বাংলা গান সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে আলোচনা হয়েছে তাতে অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং অনাধুনিক গান সম্পর্কেই অধিকতর শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে।

সমালোচনা এক জিনিস আর অসহিষ্ণুতা অন্য জিনিস। সমালোচনার মধ্যে চিন্তাশীলতা এবং শ্রদ্ধা বর্তমান, কিন্তু অসহিষ্ণুতার মধ্যে বিদ্বেষের অস্তিত্ব রয়েছে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি তখনই অসহিষ্ণু হন, যখন তাঁকে ঈর্ষ্যা বা বিদ্বেষ পীড়িত করে। এই অভিযোগটি এক্ষেত্রে আদৌ খাটে কিনা সন্দেহ; কেননা, আধুনিক গান যাঁরা প্রচার করেন বা প্রয়োগ করেন তাঁদের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই; রেডিও, সিনেমা, থিয়েটার, গ্রামোফোন—কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও কোনরকম যোগসূত্র নেই। অতএব আধুনিক সঙ্গীতে যে কেউ কৃতিত্ব লাভ করলে তাতে এপক্ষ থেকে নিরুৎসুক্য হবার কোন কারণ নেই। এটা কে না ইচ্ছা করবে যে, আধুনিক সঙ্গীতের উন্নতি হোক এবং আমাদের শিল্পীরা গৌরবান্বিত হোন। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে মূল্যায়ন নিয়ে। ইতিহাসের পটভূমিকায় যখন বর্তমান সঙ্গীতের মূল্য নির্ধারণ করতে হয় তখনই আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টাকে যাচাই করে দেখতে হয়;—আর তখনই প্রিয় এবং অপ্রিয় সত্য—এই দুটিই উচ্চারণ করতে হয়। এর মধ্যে অসহিষ্ণুতার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আমাদের সংগীতে প্রেমের গান কিছু অধিক পরিমাণেই পরিবেশিত হয়। শুধু আমাদেরই নয় সব দেশেই প্রেম-সংগীতের সংখ্যা অধিক, কেননা প্রেমের বিচিত্র বেদনা-মধুর অনুভূতি চিরকালই শিল্পী এবং শ্রোতার হৃদয়ে আবেগ সঞ্চার করেছে! কিন্তু তার মধ্যে সংযম এবং সুস্থতা থাকা একান্ত প্রয়োজন, নতুবা প্রেম আর ন্যাকামি এক জিনিস হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে এই বিকৃতিটা কিছু বেড়ে গেছে। এর জন্য দোষ দেব কাকে? শিল্পীকে, সংগীত-প্রচারক প্রতিষ্ঠানকে না আমাদের জাতিকে। সবাই-কারই দুর্বলতা কিছু কিছু আছে, কিন্তু আসলে আমাদের মানসিক বলিষ্ঠতার অভাব হয়েছে। এই কারণেই এই ধরনের চাহিদা বেড়েছে। সত্যিকারের সাংস্কৃতিক ভিত্তির জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, তার পরিকল্পনা আজও হয়নি। উন্নতির পথ রুদ্ধ হবার প্রধান কারণ এইটাই।

সেণ্টিমেণ্টের আধিক্যের জন্য অজয় ভট্টাচার্য এবং হিমাংশু দত্তকে দায়ী করা হয়েছে, কেননা আধুনিক শিল্পীরা তাঁদের পথ অনুসরণ করেছেন। একথা হয়তো অনেকখানি সত্য; কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হয় যে, হিমাংশু দত্তের সুরে গভীরতা, সৌন্দর্য এবং কারুকলাও যথেষ্ট ছিল। হিমাংশুকুমারের মধ্যে যেটা স্বাভাবিক ছিল, তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে সেটা নেই। অর্থাৎ সংস্কৃতির যে স্তরে থেকে হিমাংশু দত্ত সুর রচনা করেছেন, তাঁর অনুকরণ যাঁরা করেন, তাঁরা তাঁর অনেক নিচের স্তরে রয়েছেন এবং তাঁদের উৎসাহী সমর্থকরাও কোন স্তরে রয়েছেন, সেটাও সহজেই বোঝা যায়। অতএব কয়েকটি দুর্বলতা সত্ত্বেও হিমাংশু দত্ত উৎকৃষ্ট স্তরের শিল্পী ছিলেন—তাঁর সুর রচনা নেহাৎই 'রুগ্ন রোমাণ্টিক মনোবিলাস' নয়।
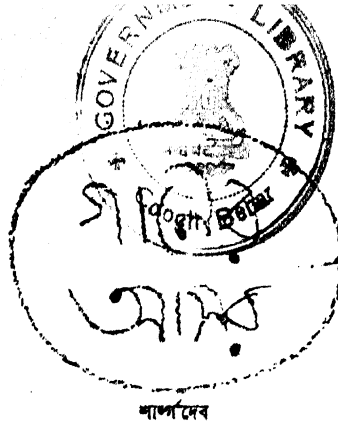
প্রেমের এই আতিশয্যের বিপরীত ক্রিয়া হিসাবেই দেখা দিল বাস্তবধর্মী বর্ণনাত্মক সংগীত। এই সৃষ্টিতেও দেখা গেল বহু ক্ষেত্রে একটা রুগ্ন বাস্তববিলাস দেখা দিয়েছে। এটি উক্ত রুগ্ন মনোবিলাসের উল্টো পিঠ। এই দৃষ্টিভঙ্গিও খুব সুস্থ নয়, কেননা এটাও আর একটি সেণ্টিমেণ্টকে নাড়া দিয়ে নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এক্ষেত্রেও স্বতই একটি রস-চেতনা জাগ্রত হচ্ছে না, যা উচ্চতর সৃষ্টির নিদর্শন! আর্টের দিক থেকে এই সৃষ্টির জন্যও খুব মহৎ স্থান নির্দিষ্ট করা যায় না, কেননা এখানে সুর এবং কথায় যে মিল হচ্ছে, তার আবেদন নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে মহৎ নয়। এই সুরের মধ্যে সুগভীর জ্ঞাপকতার পরিচয়ও নেই। প্রসঙ্গত বলি, সত্যজিৎ রায় মহাশয় পথের পাঁচালী বা অপরাজিততে যে রূপ দিয়েছেন, তাও বাস্তবেরই রূপ, কিন্তু তাঁর পরিচালনা মহৎ হয়েছে এই কারণে যে, তার মধ্যে সুগভীর জ্ঞাপকতার পরিচয় আছে। উপন্যাসের উপাদান বা সাহিত্য ছাড়াও চিত্রের মধ্যে এমন একটি জিনিস আছে, যা হয়তো পরিচালক চিত্রের মধ্যে না দেখিয়ে দিলে অন্তর্লোকে আলোড়ন সৃষ্টি করত না। পরিচালনার এই যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এইটিই মহৎ শিল্পসত্তার পরিচায়ক। কিন্তু আধুনিক বাস্তবধর্মী গান গাওয়া হল, শোনা হল, ফুরিয়ে গেল। এসব সৃষ্টি মনে আর কোন ছাপ রেখে যায় না, কেননা বর্ণনার জন্যই এক্ষেত্রে সুরের প্রয়োজনীয়তা এবং বর্ণনার মধ্যেই তার পরিসমাপ্তি। এই বর্ণনার মধ্যে অবর্ণনীয় এমন কিছু নেই, যা সুরের প্রয়োগে অন্তরকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। এ একটা বৈচিত্র্য-তার বেশি কিছু নয়। আমরা অনেকেই নিছক কল্পনাবিলাসী নই—জীবনের গানকেই আমরা বরণ করে নিতে চাই; কিন্তু জীবন তো শুধু বেঁচে থাকাটুকুই নয়, সারা প্রকৃতির শাশ্বত সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে জীবনধারা বয়ে চলেছে—তার পরিচয়টুকু না মিললে অনেকখানি বাকি থেকে যায়।

আধুনিকের চেয়ে অনাধুনিক গান সম্পর্কে অধিকতর শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে—এই অভিযোগের উত্তরে প্রথমেই এই প্রসঙ্গ তুলতে চাই যে, আধুনিক এবং অনাধুনিকের সংজ্ঞা কি? যা রসোত্তীর্ণ তাই আর্ট, তাই মহৎ শিল্প। আজ থেকে শতাধিক বৎসর পূর্বে যাঁরা সংগীত রচনা করেছেন, তাঁরাও সে যুগে আধুনিক ছিলেন এবং সে যুগে যদি তাঁদের সৃষ্টির মূল্যায়ন না হয়ে থাকে, তবে এযুগে সেটা করতে হবে। অনাধুনিক বা প্রাগাধুনিক যুগ সম্বন্ধে দৃষ্টি যদি শ্রদ্ধিত হয়, তাহলে আধুনিক সৃষ্টি সম্বন্ধে সে দৃষ্টি অশ্রদ্ধিত হবে—এমন কোন কারণ নেই। আধুনিক যুগের ওপর অনাধুনিক যুগেরও একটা দাবী আছে। আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে কজন সেই দাবীকে স্বীকার করেছেন? কজন খোঁজ রাখেন তাঁদের আগে বাঙলা গানে কত আন্দোলন ঘটে গেছে? চলতি গানের ওপরে যে মনোযোগ আধুনিক শিল্পীরা দাবী করেন, তাঁর কিছু কি তাঁদের পূর্ববর্তীরা তাঁদের ওপর দাবী করতে পারেন না? যদি বর্তমানের দাবীকে স্বীকার করতে হয়, তবে প্রাক্তনকেও

অস্বীকার করা সংগত নয়। যে ব্যক্তি এই বাঙলাদেশে প্রথম গেয়েছিলেন—"নানান দেশে নানান ভাষা, বিনা স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা"—আজ স্বদেশী ভাষার গৌরবের দিনে সেই গীতিকারকে কজন স্মরণ করেন? চিরপ্রচলিত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গানকে পাশ কাটিয়ে, মিথ্যা ভক্তির অজুহাত থেকে বাঙলা গানকে উদ্ধার করে যাঁরা মানুষের প্রেমের প্রাধান্য দিলেন এবং বাঙলার কাব্যসংগীত গঠন করে গেলেন, সেই গীতিকারদের পরিচয় আজ কজন আধুনিক গাইয়ের জানা আছে? আজকের গান সম্বন্ধে যত নিন্দাই বর্ষিত হোক, তবু তা গৃহীত হচ্ছে; কিন্তু এমন একটা সময় গেছে, যখন সমাজের উচ্চস্তর এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁদের কালের এইসব সংগীত-স্রষ্টাদের রীতিমত শ্লান করে চেপে দিয়েছেন, যার ফলে মাত্র এক শতাব্দী পূর্বেকার সংগীত সম্বন্ধে আজ আমরা অতি অল্পই জানতে পারছি। অবশ্য সে যুগের সংগীতে যা যাবার, তা আপনা থেকেই চলে গেছে। কবির লড়াই-এর ভাঁড়ামোর্খিটি, হাফ-আখড়াই, পাঁচালীর অশ্লীলতা এবং অনাবশ্যক অংশ—এসবই কালের গতিতে অবজ্ঞার মত চলে গেছে। কিন্তু যেসব গান আজও রয়ে গেছে, তারা রয়ে গেল কোন ধর্মে? সে কি রাগ-সংগীত বলে না রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বলে? না, তা নয়, তারা বেঁচে রইল মানবিক আবেদনের জোরে। সে যুগে রেকর্ড, রেডিও ছিল না, প্রচারের এতরকম মাধ্যমও ছিল না, তথাপি তার একটা বিরাট প্রাণশক্তি ছিল, যার বলে বহু বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে সে সব গান আজও চলে এসেছে। আজকে এই যান্ত্রিক যুগে যেসব শিল্পী বহু আধুনিক গান রেকর্ড করেছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করে দেখবেন হয়তো ছমাস আগেকার গাওয়া গানের প্রথম চটচটে আঠা তাঁদের মন থেকে শুকিয়ে গেছে। গাইবার সময় তাঁরা গেয়েছেন, শোনবার সময় লোকে শুনেছে, তারপরে তা সবাইকারই মন থেকে মুছে গেছে। কিন্তু মন থেকে মুছে যায় না, এমন গানও তো রচিত হয়েছে এবং মানুষের মনই তাদের বাঁচিয়ে রেখে এসেছে। এইভাবেই পুরাতন গানের কিছু চলে এসেছে এবং আধুনিক সংগীতে যেসব রমণীয় সৃষ্টি হচ্ছে, সেগুলিও চলতে থাকবে। ইতিহাস আপনা থেকেই এইভাবে রচিত হয়ে যায়।

সংস্কৃতির ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। রাজনীতিতে এক দল আর এক দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা ঘটে না—এক যুগ আর এক যুগের ওপর প্রভাব রেখে যায় এবং আরও কিছু রেখে যায়, যা পরবর্তী যুগ যখন পূর্ববর্তী যুগের মূল্যায়ন করে তখন বুঝতে পারে এবং হয়তো গ্রহণও করে। এইটিই হচ্ছে সংস্কৃতির আশীর্বাদ। সেই আশীর্বাদ কি আমরা গ্রহণ করেছি? আধুনিক সংগীত-সমাজে মূল্যায়নের এই প্রয়োজনীয়তাকে আজও উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি, কেননা বাঙলাদেশের সাংগীতিক ইতিবৃত্ত তাঁদের অনায়ত্ত। তথাপি স্বাভাবিক নিয়মে যাঁদের ওপর এই প্রভাব পড়েছে, তাঁরা এই মূল্য-নির্ধারণ করবেন এবং প্রকৃত সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এইভাবেই রক্ষিত হবে।

আজ এই আধুনিক যুগে সাংগীতিক প্রেরণার জন্য আমরা পশ্চিমের দিকে তাকিয়েছি; কিন্তু সেখান থেকে কতটুকু নিলুম? নিলুম গীটারের হালকা ঝাম্প আর হাল্কা গানের চাপল্য। সাহিত্য-সাধনায় আমরা পশ্চিম থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছি, কেননা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য বহু দশকব্যাপী অধ্যয়নের ফলে আমরা মহৎ জিনিসের সন্ধান পেয়েছি। সংগীতের ক্ষেত্রে এতখানি সাধনার কল্পনা কেউ করেন না, অতএব যা স্থূল এবং চটুল, সেইটুকু সংগ্রহ করতে পারলেই আমাদের মনে হয় অনেকখানি কার্যসিদ্ধি হল। পাশ্চাত্ত্য সংগীতের হার্মনির উৎকর্ষ এখনো আমরা গ্রহণ করতে পারি নি। মনে পড়ছে পাশ্চাত্ত্য সংগীতে অভিজ্ঞ একজন এই প্রসংগ তুলেছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য সংগীতে গান এবং বাজনা—এই দুটো একমুখো চলে না, অথচ গান এবং বাজনার মধ্যে চমৎকার একটি সংগতি সেখানে রক্ষিত হয়। আমাদের সংগীতে এইভাবে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায় কি না সে সম্বন্ধে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু আজও সে চেষ্টা হয়নি, কেননা হার্মনি সম্বন্ধে স্বল্পজ্ঞান দিয়ে একাজ করা সম্ভব নয়। তথাপি আমার মনে হয় আমাদের সংগীতে সম্বাদী সুরের সাহায্যে এ বৈচিত্র্য সৃষ্টি যে করা যায় না তা নয়; কিন্তু সেসব দিকে আমরা চিন্তা করি নি। যেখানেই কোন একাডেমিক কাজের প্রয়োজন হয়, সেখানেই আমরা পাশ কাটিয়ে যাই। কাজে কাজেই কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। পাশ্চাত্ত্য সংগীতের শ্রেষ্ঠ কারুকলায় যদি আমাদের উৎসাহ থাকত, তবে পিয়ানোর মত উৎকৃষ্ট যন্ত্রের দিকে আমাদের নজর পড়ত, কণ্ঠচর্চা আরও উন্নত হ'ত এবং চাপা গলায় নাকি সুরে গান গাওয়া বন্ধ হ'ত।

আধুনিক যুগের সুরকারগণ কবিতায় সুর সংযোগ করছেন। উত্তম কাজ। কিন্তু এই সুর সংযোগ কাব্যকে অতিক্রম করে তাকে সুরলোকে উত্তীর্ণ করছে কি? না বাস্তবের ঘূর্ণাবর্তেই তাকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে? সুর-সংযোগের পরেও কবিতা যদি নিছক কবিতাই থেকে গেল, তাহলে তার সার্থকতা কি? সার্থকতা যে কিছু নেই তা নয়—সার্থকতা হচ্ছে এই যে, এইসব গানে একটি নাট্য-পরিবেশ সৃষ্ট হয় এবং নাটের দিক থেকে এর একটা বিশিষ্ট আবেদন আছে। জনসাধারণের ওপর এই নাট্যপ্রভাবটাই বিশেষভাবে পড়ে থাকে—এই কারণেই এসব গান জনপ্রিয়। কিন্তু বিশুদ্ধ সাংগীতিক দিক থেকে বিচার করলে একে বড় আর্ট বলে স্বীকার করা সম্ভব নয়। অতএব এর নানা মূল্য বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে এবং সেটি তাকে সকলেই দেবে। এর বেশি চাইলে চাওয়াটা বেশি হয়।

আসলে আধুনিকতা জিনিসটা অনুকরণ নয় অথবা চমক লাগিয়ে দেবার ব্যাপার নয়। সৃষ্টির উদ্দীপনা আসে সংগীতবোধ থেকে এবং এই বোধ জাগে হয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের জ্ঞান থেকে। এই সাংস্কৃতিক জ্ঞান আসে শুধু একটা পথে নয়—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান এইসব থেকে অধিকার করেই সংস্কৃতি। [illegible] বর্তমান সংগীতস্রষ্টাদের এই সুগভীর সংস্কৃতি-বোধের পরিচয় অল্পই মেলে। অতএব আধুনিক সংগীত-সমাজে আজ সেই শিক্ষার সমস্যাই প্রধান। সাংস্কৃতিক শিক্ষা আমাদের এখনো নিতান্ত অসম্পূর্ণ, প্রকৃত শিক্ষা যখন জনসাধারণ এবং শিল্পীর রুচিকে উন্নত এবং পরিমার্জিত করবে, তখনই সংগীতকারের আধুনিক সৃষ্টি সম্ভব হবে, নতুবা একদিকে রাজনৈতিক, অপরদিকে ব্যবসায়ীদের প্ররোচনায় যে রুচি তৈরি হচ্ছে এবং যে সংগীত সৃষ্ট হচ্ছে, তার আধুনিকত্ব যথার্থ শিক্ষিতের আধুনিকত্ব নয়।

প্রাগাধুনিক যুগের শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা সংস্কৃত জানতেন, তাঁরা সংগীত রচনায় সংস্কৃত সাহিত্য থেকে মালমশলা গ্রহণ করেছেন; ভারতীয় সংগীত যেটুকু তাঁরা জানতেন, সেটুকু বাঙলার বৈশিষ্ট্যের সংগে মিলিয়ে পরিবেশন করেছেন। এতে করে তাঁরা যে নূতনত্ব এনেছিলেন, তার একটা স্বাভাবিক স্বীকৃতি তাঁদের পাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু গত যুগের আধুনিকগণ আজকের আধুনিকের মতই তাঁদের সম্পর্কে শ্রদ্ধিত ছিলেন না। তাঁদের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়নি। সুতরাং সে যুগের প্রাপ্য থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন। আজকের যুগে সেই ত্রুটি সংশোধনের ভার যাঁদের ওপর পড়েছে, তাঁদেরও কপাল মন্দ, কেননা এই কারণেই আধুনিক যুগ থেকে তাঁদের অপাংক্তেয় করে রাখা হচ্ছে।

প্রবাসের জার্নাল : অক্সফোর্ড

শিবনারায়ণ রায়

ইউনিভার্সিটিজ অ্যাণ্ড লেফট রিভিয়ু:

ব্রকওয়ে বলেছিলেন, লেবার পার্টির তরুণদের সঙ্গে আলাপ করতে। তার সুযোগ ঘটল অক্সফোর্ডে গিয়ে।

ইতিহাসের হিসেবে দশম শতকে অ্যাংলো-স্যাক্সন এবং ডেনদের যুদ্ধবিরোধের কালে অক্সফোর্ডে প্রথম ব্যাপকভাবে বসতি শুরু হয়। বিখ্যাত ডুমস্‌ডে বুক-এ অক্সফোর্ডের উল্লেখ আছে। পরে বারো শতকের শেষভাগে চার্চের ছায়ায় এখানে ছোটখাটো অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। সেযুগে লেখাপড়ার চর্চা সম্পূর্ণভাবেই চার্চের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ক্রমে চার্চের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি শুরু হয়। কিন্তু তখন চার্চের ক্ষমতা অগাধ। ১২১৪ সালে পোপের প্রতিনিধি এক ফতোয়া জারী করেন। এই ফতোয়া অনুসারে চার্চের তরফ থেকে অক্সফোর্ডে একজন চ্যান্সেলার নিযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয় এবং স্থানীয় লোকেরা চার্চের ক্লার্কদের কাছ থেকে কি হারে ঘরভাড়া নিতে পারবে, তা বেঁধে দেওয়া হয়। এই ফতোয়া থেকেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন।

তের শতকে ডোমিনিকান এবং ফ্রান্সিসকান ফ্রায়াররা দলে দলে অক্সফোর্ডে এসে বাসা বাঁধতে শুরু করে। তারাই প্রথম অক্সফোর্ডে একটার পর একটা কলেজ গড়ে তোলে। অক্সফোর্ডের যেটা ইউনিভার্সিটি কলেজ, তার জন্মতারিখ ১২৪৯। বয়েসের দিক থেকে তার পরই হল বেলিয়ল (১২৬৩) এবং মের্টন (১২৬৪)। চৌদ্দ শতকের শেষাশেষি অক্সফোর্ড ইংল্যাণ্ডের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এদিক থেকে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কেম্ব্রিজ।

অক্সফোর্ডে আসার এবং থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন বৃটিশ কাউন্সিল। আমি যেখানে এসে উঠেছি, তার নাম কিংস আর্মস হোটেল। হোটেলটা যে শুধু প্রাচীন তাই নয়, এর অবস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ার ঠিক কেন্দ্রে। আমার ঘরের ঠিক মুখোমুখি ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট; ইংলণ্ডে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ইতিহাস চর্চার এটাই প্রধান কেন্দ্র; এর পরিচালক অধ্যাপক বারো মস্ত পণ্ডিত; সম্প্রতি মার্কিন দেশ থেকে আগন্তুক অধ্যাপক মারী প্রমেনুর সঙ্গে একত্রে মধ্যভারতের আদিম ভাষা গোষ্ঠী বিষয়ে একটি বিরাট অভিধান রচনায় ব্যাপৃত। এঁদের সঙ্গে আলোচনা করে যত না উপকৃত হয়েছি, তার চাইতেও বেশি মুগ্ধ হয়েছি এঁদের সৌজন্যে এবং সহৃদয়তায়।

হোটেল থেকে বেরিয়েই একপাশে পড়ে নতুন বোড্‌লেইয়ান লাইব্রেরী, অন্য ধারে কোণাকুণি দাঁড়িয়ে শেলডোনিয়ান থিয়েটার। বোড্‌লেইয়ান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগার—ইয়োরোপের প্রাচীনতম সাধারণ পাঠাগারসমূহের অন্যতম। এখানে প্রায় বিশ লক্ষ বই আছে; বিলেতে যত বই ছাপা হয়, তার এক কপি এখানে আসে। শেলডোনিয়ান-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্তন-সভা হয়। যত বিখ্যাত লোকের উপাধি বিতরণ হয় এখানে।

হোটেলের সামনেই যে রাস্তা, তার নাম ব্রড স্ট্রীট। এরই একধারে এক্সটার কলেজ। অন্য ধারে ট্রিনিটি এবং বেলিয়ল। হোটেলের গা ঘেঁষে যে সড়ক চলে গেছে, তার ওপারে যে কলেজ, তার নাম ওয়াড্‌হ্যাম; সেই সড়কের উল্টোদিকে কেট্‌ স্ট্রীট। সেখানে প্রথমে হার্টফোর্ড কলেজ এবং তারপর বিখ্যাত অলসোলস্‌। অলসোলস্‌ ছাড়ালেই হাই স্ট্রীট—সেখানে ইউনিভার্সিটি কলেজ, ওরিএল এবং কুইন্স কলেজ।

বেলা এগারোটা নাগাদ অক্সফোর্ডে পৌঁছেছি। বারোটার সময় বৃটিশ কাউন্সিল মারফত খবর পেয়ে এখানকার 'ইউনি-ভার্সিটিজ অ্যাণ্ড লেফ্‌ট রিভিয়ু' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী আমার হোটেলে উপস্থিত। "চলুন, একসঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া যাবে এবং আলাপ করা যাবে।"

হাঁটতে হাঁটতে হাই স্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয় ঢোকা গেল। এবার পরিচয়-পর্ব।

"লেফ্‌ট রিভিয়ু" লেবার পার্টির তরুণ চিন্তাশীলদের মুখপত্র। কিছুদিন আগে প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে এবং তা যে বেশ খানিকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, লণ্ডনে থাকতেই সে খবর পেয়েছিলাম। চারজন সম্পাদক। পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে বয়েস হবে। প্রধান সম্পাদক স্টুয়ার্ট হল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে এসেছেন—রোডস স্কলার—মের্টন কলেজ থেকে পাশ করে সম্প্রতি হেনরী জেমস-এর উপন্যাস সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। গেব্রিয়েল পিয়ারসন বেলিওল থেকে পাশ করে ডিকেন্সের ওপরে গবেষণায় ব্যাপৃত। র‍্যাফল স্যামুয়েল ইতিহাসের কৃতী ছাত্র; এখন লণ্ডনে স্কুল অব ইকনমিকস-এ গবেষণা করছেন লণ্ডন, ব্রিস্টল এবং লিভারপুলে ডক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে। এঁরা দুজন ইংরেজ। চতুর্থজন, চার্লস টেলর

ক্যানেডিয়ান। গত বছর দর্শনে "জনসক্ প্রাইজ" পাওয়ার পর অলসোলস-এর নির্বাচিত ফেলো হয়েছেন (অক্সফোর্ডে এর চাইতে সম্মান নেই)। সম্প্রতি বই লিখছেন হেগেল থেকে একজিসটেনশিয়ালিস্ট দর্শনে "এলিয়েনেশান" মতবাদের বিবর্তন সম্বন্ধে।

আমার নিজের পরিচয় দেবার পর আমি এ'দের জিজ্ঞাসা করলাম, "লেফট রিভিয়ু" যে আন্দোলনের মুখপত্র, তার উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতি কি? আলোচনা থেকে মোটা-মুটি যা বোঝা গেল, তার একটা বিবরণ দিচ্ছি। এ থেকে এদেশের তরুণ শিক্ষিত সমাজের একটা অংশ কি ভাবছে, তার কিছুটা আভাস মিলবে।

—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপের এবং বিশেষ করে বৃটেনের ভাবজগতে ব্যাপকভাবে অবসাদ এবং শূন্যতা দেখা দেয়। ইতিপূর্বে প্রায় পনের-কুড়ি বছর ধরে পশ্চিমের প্রগতিশীল চিন্তা মূলত মার্ক্স-বাদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। আমাদের আগের দশকের তরুণদের মধ্যে যারা চিন্তাশীল এবং বিবেকবান, তাদের বেশির ভাগই ছিল কমবেশি মার্ক্সবাদী। কিন্তু যুদ্ধের পর ক্রমেই রাশিয়া এবং পূর্ব-ইয়োরোপের কম্যুনিস্ট সমাজ-ব্যবস্থার চেহারা যত প্রকট হয়ে উঠতে লাগল, পশ্চিমের এবং বিশেষ করে বৃটেনের তরুণ

ইনটেলেকচুয়ালরা ততই বুঝতে লাগল যে, মার্ক্সবাদকে আশ্রয় করে কোনো প্রগতিশীল আন্দোলন আর সম্ভব নয়।

প্রথমে মনে হয়েছিল বৃটেনের লেবার পার্টি বুঝি এ-সংকটে নতুন নেতৃত্ব দিতে পারবে। কিন্তু লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসার পর দেখা গেল, সমাজতন্ত্রের আদর্শবাদী প্রেরণা অনেকদিন লোপ পেয়েছে। ওয়েল ফেয়ার স্টেট খাড়া হল বটে, কিন্তু তারি সংগে সমস্ত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে আমলাতন্ত্রের রাজত্বও প্রতিষ্ঠিত হল। বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ হল সরকারী চাকুরে। যুদ্ধোত্তর বৃটেনের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রাণের, প্রশ্নশীলতার, উদ্ভাবনার চিহ্ন ক্রমে ক্রমে লোপ পেল। আজ আমরা এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে রাষ্ট্র কোনো রকম জোর-জুলুম না করা সত্ত্বেও আমাদের ব্যক্তিসত্তা একেবারে নির্জীব হয়ে এসেছে।

এই আত্মঘাতী অবস্থা যারা মেনে নিতে গররাজী, তাদের মনে আজ প্রশ্ন উঠেছে, এ অবস্থা কেন হল, এ থেকে উদ্ধারের উপায় কি, একই সংগে সৃষ্টিশীল চিন্তা এবং সামাজিক বিবেক দুয়েরি পুনরুজ্জীবন কি করে ঘটানো যায়? কম্যুনিজম্ অথবা ওয়েল ফেয়ার স্টেটের পথে এ-পুনরুজ্জীবন ঘটার সম্ভাবনা নেই, রাশিয়া এবং বৃটেনের সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে এটা আমরা বুঝতে পেরেছি। আমরা নতুন পথ খুঁজছি এবং সেই অনুসন্ধানের মুখপত্র হল "লেফট রিভিয়ু"।

—এ প্রশ্ন কি শুধু ছাত্র এবং তরুণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? যাঁরা বয়স্ক এবং প্রধান, তাঁদের সংগে কি তোমাদের কোনো যোগাযোগ নেই?

—তা আছে বইকি। আমাদের প্রথম সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন কোল, জোন রবিনসন, ডয়েটশার, ডিকিনসন, বেসিল ডেভিডসন। লণ্ডনে আমরা যে "লেফট রিভিয়ু ক্লাব" গড়ে তুলেছি, তার আলোচনায় এ'রা একটা বড় অংশ নিচ্ছেন। তাহলেও এ-আন্দোলন মুখ্যত তরুণদের আন্দোলন, এ-সমস্যা মুখ্যত যুদ্ধোত্তর যুগের ছেলেমেয়েদের সমস্যা।

—তোমরা যে পথ খুঁজছ, তার পেছনে তো নিশ্চয়ই কতগুলো প্রত্যয় প্রেরণা যোগাচ্ছে। তার কিছুটা আভাস পেলে খুশি হতাম।

—সেকথা আলোচনা করার আগে বোধহয় জানিয়ে রাখা দরকার, আমাদের আন্দোলন কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ বা দর্শনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ নয়। আমরা প্রায় সকলেই লেবার পার্টির সংগে সংশ্লিষ্ট এবং মোটামুটি নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলি বটে, কিন্তু কি লেবার পার্টি, কি সমাজতন্ত্র, এ দুয়ের কোন কাজ বা কোন সূত্রকেই আমরা বিচারোর্ধ্ব বলে মানতে রাজী নই। আমরা চাইছি বর্তমান সংকটের পটভূমিতে সমস্ত সমাজ-দর্শন নতুন করে বিচার-বিশ্লেষণ করা হোক। তবে এই চাওয়ার পেছনে কতগুলো প্রত্যয় যে বর্তমান সেকথাও ঠিক। প্রথমত, স্বাধীন চিন্তা এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ঘাত-প্রতিঘাত যে যে-কোনো সমাজের পক্ষে কল্যাণকর, এতে আমরা বিশ্বাসী। দ্বিতীয়ত, সমাজের যারা সাধারণ মানুষ; বিশেষ করে আমাদের মত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সমাজের বিরাট অংশ যে শ্রমিকশ্রেণী, তাদের সুখ-দুঃখ, ভাবনা-চিন্তা, বিক্ষোভ-আন্দোলন থেকে বিযুক্ত থেকে কোন সার্থক সমাজ-দর্শন যে গড়ে উঠতে পারে, তা আমরা মনে করি না। অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একধারে শ্রমিক আন্দোলনে আমলাতন্ত্র প্রবল হয়ে ওঠায়, অন্যধারে ফুল এমপ্লয়মেণ্ট এবং বিভিন্ন রকমের ওয়েল ফেয়ার সার্ভিসের ব্যবস্থা হওয়ায় বুদ্ধিজীবী সমাজে ক্রমেই এই মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছে যে, শ্রমিক আন্দোলনে তাঁদের কিছু করবার নেই। এই মনোভাবের সাম্প্রতিক ভালো উদাহরণটি কিংসলি অ্যামিস-এর Socialism and the intellectuals। আমাদের ধারণা মনের দিক থেকে এ ব্যবধান সমাজ এবং সংস্কৃতি দুয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর।

—এ ব্যবধান কিভাবে কমানো যায়, সে বিষয়ে কি তোমাদের মনে কোনো ধারণা গড়ে উঠেছে।

—না, আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছইনি, আমরা আপাতত চেষ্টা করছি এই ব্যবধানের স্বরূপটা বুঝতে এবং এ ব্যবধান দূর করা যে প্রয়োজন, শিক্ষিত সমাজের মনে সে বোধ জাগাতে। হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন, যুদ্ধোত্তর ইংরেজি সাহিত্য কিভাবে সমাজবোধকে সযত্নে পরিহার করে চলেছে। কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোয় খোঁজ নিলে দেখবেন, অধিকাংশ ছেলে রাজনীতি কিম্বা সামাজিক সমস্যা নিয়ে আর মাথা ঘামায় না। তাদের ধারণা, এসব ক্ষেত্রে তাদের আর কিছু করার নেই। কিন্তু সত্যিই তো আর ব্যাপারটা তা নয়। করবার বিস্তর রয়েছে—আমাদের সমাজ আজ যেসব গভীর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, এর আগে তেমন সমস্যার মুখোমুখি কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এসব সমস্যার গভীর রূপ মর্মস্পর্শী তীক্ষ্ণতায় উদ্ঘাটিত করার দায়িত্ব যাদের ওপরে, তারা আজ পলায়নধর্মী কিম্বা নিষ্ক্রিয়। আমাদের তাই প্রথম কাজ এমন একটা আন্দোলন গড়ে তোলা, যার ফলে এই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা বিশ্লেষণ শুরু হতে পারে। বুদ্ধিজীবী তরুণেরা তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে।

—তোমাদের এ-আন্দোলনে এতাবৎ কিরকম সাড়া পাওয়া গেছে?

—অবিলম্বে খুব যে একটা ব্যাপক সাড়া

পাওয়া যাবে, এমন আশা করি না। তবে মোটের ওপর যেটুকু সাড়া পাওয়া গেছে, তাও নেহাত নৈরাশ্যজনক নয়। আমাদের প্রথম সংখ্যা বার হবার আগে আড়াই হাজার গ্রাহক হয়েছিল, প্রথম সংখ্যা বেরোবার পর প্রায় সাত-আট হাজারের মত নিয়মিত পাঠকের আশা পাওয়া গেছে। আপাতত আমাদের এ-আন্দোলন এদেশের দু-তিনটে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু ক্রমেই অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং তরুণ অধ্যাপকদের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আপনি তো লণ্ডনে থাকেন। ওখানে আমরা একটা ক্লাব গড়ে তুলেছি, মাসে তার দুটো করে অধিবেশন হয়। আসুন না, আগামী অধিবেশনে।

অক্সফোর্ড থেকে ফিরে লণ্ডনে এদের একটা আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছিলাম। তাতে প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যাপক রেমণ্ড উইলিয়মস। "শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতি" বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করলেন। তাঁর মতে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ শ্রমিকের ব্যক্তিগত দান অথবা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত গাথা, কাহিনী বা গান—এসব শ্রমিক-সংস্কৃতির খুব অপ্রধান অংশ। অন্য ধারে সাম্প্রতিককালে খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনে যেসব বিকার দেখা দিয়েছে, তার জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে দায়ী করা অর্থহীন। আধুনিক সংস্কৃতির এসব মাধ্যম সম্পূর্ণভাবেই বুর্জোয়াদের করায়ত্ত; শ্রমিকরা এর ফল ভোগ করলেও এদের পরিচালনায় তাদের কোনো হাত নেই। তবে শ্রমিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কি? সংস্কৃতি আসলে একটা সমগ্র জীবনযাত্রার প্রকাশ। শ্রমিক জীবনের বিশিষ্ট ধর্ম হল ব্যক্তির বিকাশকে সমষ্টির বিকাশের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করা। বুর্জোয়া সংস্কৃতি ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাতে শিখিয়েছে। শ্রমিক সংস্কৃতির প্রধান লক্ষণ সামষ্টিক সংস্কৃতির ওপরে ঝোঁক। সাম্য, সহযোগিতা এবং ব্যক্তি ও পরিবারের সঙ্গে সমাজের স্বার্থ একত্রিতভাবে অনুভব করা—এসবই হল শ্রমিক শ্রেণীর চরিত্রগত গুণ। এই সব মূল্যকে আশ্রয় করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠবে, তাই প্রকৃত শ্রমিক সংস্কৃতি। তবে সে সংস্কৃতি পূর্বতন সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বর্জন করে গড়ে উঠবে না। যেভাবে ধনতন্ত্রের বিভিন্ন টেকনিক সমাজতন্ত্র গ্রহণ করবে, তেমনি বুর্জোয়া সভ্যতার সাংস্কৃতিক সম্পদেরও শ্রমিক সংস্কৃতির মধ্যে স্থান হবে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের যে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী তার মারফত প্রাক্তন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নতুনভাবে মূল্যায়ন এবং পরিশোধন ঘটবে।

অধ্যাপক মশায়ের বক্তৃতার পরে তাঁর বক্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হল। সভা বসেছিল লণ্ডনের বিদগ্ধ পাড়া রাসেল স্কোয়ারের ধারে রয়াল হোটেলের একটা বড় হলঘরে। প্রায় শ' পাঁচেক তরুণ তরুণী হাজির দেখলাম। এরা প্রায় সকলেই "লেফট রিভিয়ু ক্লাবের" সদস্য—অধিকাংশই নানা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। তাদের আলাপ-আলোচনা থেকে দুটো কথা বোঝা গেল। প্রথমত, তারা সকলেই প্রায় নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে এবং সকলেই আদর্শবাদী। দ্বিতীয়ত, তাদের বেশির ভাগই রাশিয়া এবং কম্যুনিস্ট পার্টির সমালোচক হলেও তাদের ওপর মার্ক্সীয় চিন্তার প্রভাব খুবে গভীর। অবশ্য কয়েকজন প্রশ্ন তুলেছিল, শ্রেণীর দ্বারা কোনো সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করা যায় কি না। এবং সত্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা শ্রেণী-আনুগত্যের চাইতে বেশি মূল্যবান কিনা। মোটামুটি দেখা গেল বেশির ভাগ বক্তারই বিশ্বাস, শ্রমিক শ্রেণীই বর্তমান ইতিহাসের নায়ক, ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিকদের যত দোষত্রুটি থাক, তাদের শ্রেণীগত নেতৃত্ব দ্বারা সভ্যতার বর্তমান সংকট অতিক্রম করা অসম্ভব এবং সেই হেতু ইনটেলেকচুয়াল এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান দূর করা বিশেষ প্রয়োজন। সে ব্যবধান যে কিভাবে দূর হতে পারে, সে সম্বন্ধে কারো মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা আছে, তা মনে হয় না। তবে একটা ক্ষেত্রে এরা এদের পূর্বসূরী প্রগতিবাদীদের অভিজ্ঞতা থেকে কিছুটা শিখেছে। এরা বুঝেছে যে, পার্টির চাপে ইনটেলেকচুয়ালেরা যদি তাদের ইন্টেগ্রিটি হারায়, তাতে শ্রমিক শ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবী উভয়েরই সমান ক্ষতি। অর্থাৎ লেখক, শিল্পী, জ্ঞানী-গুণীরা শ্রমিকদের সঙ্গে আত্মিক যোগ সাধনে ব্রতী হবে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিবেক, যুক্তি বা কল্পনাকে দলীয়, এমনকি মতবাদগত নির্দেশের কাছে ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না।

সব মিলিয়ে "লেফট রিভিয়ু ক্লাবের" এই আন্দোলন আমার কাছে সময়োপযোগী বলে ঠেকল। মহাযুদ্ধের পর গভীর অবসাদ পশ্চিমী সভ্যতাকে গ্রাস করতে বসেছে। একধারে চোখে পড়ছে চটক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা; অন্য ধারে শিক্ষিত-সাধারণের মধ্যে দায়িত্বগত শূন্যবাদিতার বিষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে। লেবার পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে আমলাতন্ত্র এবং রক্ষণশীলতা আগেও যথেষ্ট ছিল, সম্প্রতি যা দেখছি শুনছি, আরো বোধহয় বেড়েছে। এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে কিছু শিক্ষিত বুদ্ধিমান তরুণ যে তাদের সভ্যতার সংকট নিয়ে ভাবছে, সেই সংকটকে চোখ না ঠেরে, তা থেকে উদ্ধারের উপায় খুঁজছে, ডগমার আশ্রয় না নিয়ে আদর্শবাদ এবং আত্মপ্রত্যয় টিঁকিয়ে রেখেছে—এটা আশার কথা। এরা সকলেই জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে পরীক্ষা করার বিরোধী; এরা সমাজ-ব্যবস্থার অসাম্য দূর করতে চায়, কিন্তু ওয়েল ফেয়ারের নামে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করতে গররাজী; মার্ক্সবাদের প্রভাব এড়াতে না পারলেও ব্যক্তিগত বিবেক এবং সৃজনী-শক্তির মূল্য সম্বন্ধে এরা অচেতন নয়। আমার ধারণা ইংলণ্ডের যদি মানসিক-সামাজিক-পুনরুজ্জীবন ঘটে, তবে তাতে এই তরুণদের আন্দোলন একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করবে।
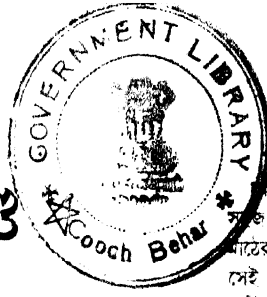
✡ সভ্যতার মানদণ্ড ✡

ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

প্রাচীন যুগে মানবসমাজে স্ত্রীলোকের সন্তানধারণ এবং প্রসব সাধারণ একটা প্রাকৃতিক ঘটনা বলেই গণ্য হ'ত। তাই স্ত্রীলোকের ব্যাপারে পুরুষেরা সাধারণত কোন মাথা ঘামাত না। আত্মরক্ষা এবং দলরক্ষার জন্যেই তারা সর্বদা ব্যস্ত থাকত। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে একবার যদি এই ব্যাপারে বাধ্য হয়ে মাথা ঘামাতে হত, তাহলে সাংঘাতিক একটা গড়বড় না করে পুরুষেরা ছাড়ত না। ফলে প্রসূতির কষ্ট লাঘব তো দূরের কথা, উল্টে তার প্রাণ নিয়েই টানাটানি পড়ে যেত।

তাই দেখতে পাই তখনকার প্রসূতি একা, কিংবা এক সখী, কি কোন এক বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে প্রসবকালে দল ছেড়ে জঙ্গলে চলে যাচ্ছে। নদীর ধারে নিরিবিলি কোন এক জায়গা খুঁজে নিচ্ছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে স্নান করে আবার দলে ফিরে আসছে।

তখনকার ঐ আদিম সমাজে প্রসূতিদের আজকালকার সভ্যসমাজের মত এত রকমারি বিভ্রাট ঘটত না। স্ত্রীজাতিকে তখন শারীরিক কঠিন পরিশ্রম করতে হত। প্রসবের আগে পর্যন্ত। এই পরিশ্রমে পেটের সন্তান নড়েচড়ে বাইরে বেরুবার সহজ এবং সাধারণ পথটিতে ঢুকে পড়ত। মাতার কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের ফলে তখন সন্তানের দেহ আয়তনে অনেক ছোট হত। ওজনেও অনেক কম থাকত। সভ্যতার নানাবিধ বিধি-নিষেধ না থাকায় মাতৃদেহে প্রচুর পরিমাণে সূর্যের আলো লাগত। সভ্য খাদ্য না খাওয়ায় রিকেটস্ হয়ে পেলভিসের (বস্তির হাড়) হাড় বেঁকে যেত না। কাজেই প্রসবের সময় মাথা নিম্নগামী করে সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে অনায়াসে ভূমিষ্ঠ হত। সাধারণত কোন বিঘ্ন ঘটত না।

তখন লোকে বিশ্বাস করত, মাতৃগর্ভ থেকে শিশু বাইরের পৃথিবীতে আসে নিজের ইচ্ছায়। কাজেই প্রসবে বিলম্ব হলে সবাই ভাবত, শিশুর ভূমিষ্ঠ হবার ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে শুধু মাকে ভোগানো। খামোখা কষ্ট দেওয়া। তাই সাহায্যকারিণীরা গর্ভস্থ শিশুকে নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করত। বলত, তাড়াতাড়ি বেরুলে খেতে পাবি। দুধ পাবি। দেরি হলে উপোস করে মরবি।

ক্ষুধায় কাতর হয়ে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে তাড়াতাড়ি বেরুবে এই আশায় মাতাকে প্রসবের আগে থেকে উপোস করিয়ে রাখা হত। তাতেও যখন সময় মত প্রসব হত না, প্রসবকাল বিলম্বিত হত তখন নিঃসংশয়ে বোঝা যেত, গর্ভে মানুষ নেই। যে আছে সে রাক্ষস। অথবা শয়তান। কাজেই এই রাক্ষস কি শয়তানকে গর্ভেই বিনষ্ট করা হত। এজন্যে পরে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া পর্যন্ত প্রচলিত হল। এত অনুনয় বিনয় প্রলোভন এবং ভয় দেখানো সত্ত্বেও যে দুষ্ট সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে বার হয় না সে যেমন

আঁব্রোজ পারী

রাক্ষস অথবা শয়তান, তেমনি যে মাতার গর্ভে এই সন্তান থাকে সেও নিশ্চয় রাক্ষসী কিংবা শয়তানী। অতএব উভয়েরই শাস্তির যোগ্য। মৃত্যুর যোগ্য।

প্রসবকাল অনাবশ্যক বিলম্বিত হলে পুরুষদের অবশেষে ডাকা হত। তারা এসে যে সাহায্য দিত, তা তখন সরাসরি সোজা। ভেতরে কোন ঘোরপ্যাঁচ থাকত না।

সন্তান এখনও ভূমিষ্ঠ হয় নি? দেখা যাক, কি করে এবার গর্ভে থাকে। প্রসূতিকে দু' পা ধরে শূন্যে তুলে মাথা নিচু করে খুব কষে ঝাঁকানো হল।

তবুও প্রসব হল না? তাহলে প্রসূতিকে মাটিতে ফেল। কম্বলে জড়িয়ে বেশ করে গড়িয়ে দাও। পেটে চাপ পড়লে আপনি ব্যাটা বেরিয়ে আসবে।

তাতেও হল না? এবার তাহলে পেটের ওপর চাপ দাও। পা দিয়ে মাড়াও। না হলে দুই বগলে দড়ি দিয়ে প্রসূতিকে গাছের গুঁড়িতে ঝুলিয়ে দাও। পেটের ওপর কাপড় বেঁধে দুদিক থেকে টান। কিংবা খাটের সঙ্গে বেঁধে খাটের দু' পা শূন্যে তুলে মাটিতে রাখা ভাঙা ডালপালার ওপর আছড়ে ফেল।

কোথাও আবার ভয় দেখিয়ে প্রসব করানো সহজ হবে ভেবে, প্রসূতিকে একলা নির্জন মাঠের মাঝে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হত। সেই সময় এক অশ্বারোহী বীর ঘোড়া ছুটিয়ে প্রসূতির দিকে তেড়ে আসত। প্রসূতি ভাবত, তার দেহের ওপর দিয়েই বুঝি ঐ ছুটন্ত ঘোড়া মাড়িয়ে চলে যাবে। এমনি করে ছুটে এসে সর্বশেষ মুহূর্তে প্রসূতির গায়ে না পড়ে পাশ কাটিয়ে অশ্বারোহী চলে যেত। আমেরিকার রেড-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এইরকম ভয় দেখানোর প্রথা খুব চালু ছিল।

তখনকার দিনে পুরুষদের সাহায্য এই-রকমই হত। এমনকি ষোল শতকের ইউ-রোপে পর্যন্ত ঐ ধরনের সাহায্য অনেক জায়গায় দেখা যেত।

প্রসবকালে প্রসূতিকে সাহায্য করার রীতি মানব সমাজে অতি সুপ্রাচীন। যুদ্ধকালে আহত সৈনিকদের যেমন পুরনো যোদ্ধারা ক্ষতের চিকিৎসায় সাহায্য করত, তেমনি যে প্রতিবেশী রমণীর নিজের অনেক সন্তান সন্ততি হয়েছে সে এই প্রসূতিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত। ক্রমে কোন কোন স্ত্রীলোক শুধু এই কাজেই বেশ দক্ষ এবং অভিজ্ঞ হয়ে উঠল। প্রসবকালে এদেরই তখন ডাক পড়তে শুরু হল। এরাই পরে ধাত্রী অথবা পেশাদার দাই হয়ে গেল।

দাইএর ওপর নির্ভর করে প্রথমে কিছু সুবিধে হলেও, এই দাইরাই পরে ধাত্রী-বিদ্যার উন্নতির প্রধান বাধা হয়ে উঠল।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা পুরোহিত, চিকিৎসক নাপিত অথবা সার্জনদের হাতে চলে গেল। উন্নতি শুরু হল ধীরে ধীরে। কিন্তু

রেডইণ্ডিয়ানদের প্রসূতিকে সাহায্য

প্রসবের বেলায় কিছুই তা হল না। দাইরা নিজেদের অধিকার ছাড়ল না। প্রসবকালে স্ত্রীলোক ছাড়া পুরুষের কোন সাহায্য দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব করে তুলল। সমাজের অতি নিম্নশ্রেণী থেকে এই দাইরা আসত। এই বিদ্যা তাদেরই একচেটিয়া হয়ে রইল। কাজেই এর উন্নতিও শীঘ্র আর হল না।

প্রসবকালে দাইদের সকল রকম প্রচেষ্টা যখন বিফল হত তখনি শুধু সংকটকালে পুরোহিত, ওঝা এবং শেষে চিকিৎসককে ডাকার নিয়ম হল। প্রাচীন সভ্যতার শীর্ষস্থানে যে সব দেশ, কেবল তারাই দেখি চিকিৎসকের হাতে প্রসূতিকে ছেড়ে দিত। তাঁর নির্দেশ মেনে চলত।

প্রাচীন ইহুদী সভ্যতায় তাই প্রসূতির প্রতি যত্নের ব্যবস্থা ছিল। ধাত্রীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার বিধান ছিল। খৃষ্ট জন্মের তিন হাজার বছর আগে মিশরে এবং দেড় হাজার বৎসর আগে ভারতবর্ষে ধাত্রীর আহ্বানে চিকিৎসক প্রসূতির ঘরে যেতেন। ব্যবস্থা দিতেন।

প্রাচীনকালের প্রসূতির সবচেয়ে ভয় ছিল, প্রসবকালে পেটের মধ্যে সন্তান যদি স্বাভাবিকভাবে মাথা নিম্নমুখী করে না থাকে। যদি পেটে আড়াআড়িভাবে থাকে। তাহলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে বিঘ্ন হত। প্রসূতির মৃত্যু হত।

এ অবস্থা হলে প্রাচীন ভারতের চিকিৎসক প্রসূতির পেটে হাত রেখে শিশুর পা ধরে ঘুরিয়ে মাথা নিম্নমুখী করে দিতেন। খৃষ্ট জন্মের দেড় হাজার বছর আগে। দু হাজার বছর পরে খৃষ্টীয় ষোল শতকে ইউরোপে আবার নতুন করে এ প্রথা প্রবর্তন করতে [illegible] ফরাসী দেশে। শ্রেষ্ঠ সার্জন অ্যামব্রোজ প্যারীর হাতে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে নিয়ম ছিল, প্রসূতিকে চারজন বৃদ্ধা ধাত্রী প্রসব করাবে। এদের প্রত্যেকের হাতের নখ খুব ছোট করে আগে কাটতে হবে। না হলে প্রসব করানো চলবে না।

শাস্ত্রের নির্দেশ ছিল, প্রসবের জন্য সব উপায় যখন ব্যর্থ হবে তখনি শুধু চিকিৎসক অগত্যা অস্ত্রোপচার করবেন। কিন্তু এমনভাবে ছুরি চালাবেন যাতে শিশুর দেহে কোন ক্ষত না হয়। কারণ তাহলে শিশু এবং মাতা দুজনেরই মৃত্যু হবে।

এই অস্ত্রোপচারের নাম এখন সিজারিয়ান অপারেশন অথবা সেকশন। অনেকের ধারণা জুলিয়াস সিজার এই অপারেশনের সাহায্যে ভূমিষ্ঠ হন। তাই তাঁরই নামে এই অপারেশন।

কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। জুলিয়াস সিজারের যখন জন্ম হয়, তখনকার যুগে জীবিত কোন গর্ভবতীর ওপর এ অপারেশন হয়েছে বলে জানা নেই। তখন নিয়ম ছিল, মৃত্যুকালে গর্ভে সন্তান থাকলে কবর দেবার আগে মায়ের পেট কেটে সন্তান বার করে নিতে হবে। মাতা এবং সন্তানকে আলাদা কবর দিতে হবে। রোমক আইন সংশোধন করে রাজা নুমাপম্পিলিয়াস এই নতুন আইন প্রবর্তন করেন। খৃষ্ট জন্মের ৭১৫ বছর আগে। রাজার আইন মানেই তখন সিজারের আইন। রাজার আইনে এই অপারেশন, কাজেই এটা সিজারের অপারেশন। অথবা সিজারিয়ান সেকশন।

প্রাচীনকালে প্রসূতিকে সাহায্যের রকমফের

জুলিয়াস সিজার তাঁর মা জুলিয়াকে যেসব চিঠিপত্র লিখে গেছেন তা থেকেই প্রমাণ হয় সিজারের জন্মের বহুকাল পর পর্যন্ত তিনি বেঁচেছিলেন। অথচ ঐ সময়ে এ অপারেশন হলে সিজার এবং তাঁর মা দুজনেরই নিশ্চিত মৃত্যু হত। তখন না ছিল [illegible] না ছিল অপারেশনে [illegible]।

[illegible] প্রাচীন গ্রীক [illegible] গ্রীক দেশ [illegible] এবং [illegible]। [illegible] চিকিৎসককে [illegible] প্রসূতির [illegible] এই [illegible] প্রসব করানো [illegible]।

তখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ধাত্রীরা নবজাত শিশুটিকে কোলে নিয়ে বাইরে এসে আত্মীয়স্বজনের সামনে সন্তানের পিতাকে দেখাতো। কিন্তু এই ছেলে দেখানোর উদ্দেশ্য একটু ভিন্ন ছিল। সন্তানের চেহারা দেখে পিতা ঠিক করতেন এ শিশু গ্রহণযোগ্য কি না। ধাত্রীর কোল থেকে শিশুকে পিতা যদি নিজের কোলে নিতেন তাহলেই বোঝা যেত পিতা সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করলেন। শিশুকে গ্রহণ করলেন।

গ্রহণ না করলে পিতা শিশুকে ছুঁতেন না। মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেন। তখন ধাত্রীরা ঐ শিশুকে হয় পাহাড়ের ওপর, নয় কোন মন্দিরের সিঁড়িতে ফেলে দিয়ে আসত। খেতে না পেয়ে শিশু মারা যেত। কিংবা কোন পথচারীর দয়া হলে তাকে তুলে নিয়ে আসত। নিজের বলে মানুষ করত।

তখনকার ধাত্রীদের কাজ তাই শুধু প্রসব করানোতেই শেষ হত না। ধাত্রীরা স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করত। বিবাহের পূর্বে পরীক্ষা করে কন্যার বিবাহ উচিত কি না তার পরামর্শ দিত। গর্ভবতীর ইচ্ছা থাকলে

গর্ভনষ্ট পর্যন্ত করাত। এ কাজ তখন বে-আইনী ছিল না।

গ্রীকদের কাছ থেকে ধাত্রীবিদ্যা রোমানরা শিখল। কিন্তু রোমক সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকদের এই জ্ঞান বিজ্ঞান ক্রমশ চাপা পড়ে গেল।

খৃষ্ট ধর্ম সারা ইউরোপে পুরোহিত এবং মোহান্তদের হাতের মুঠোয় চলে গেল। মোহান্তরা গ্রীকদের লেখা চিকিৎসাবিদ্যার পাণ্ডুলিপি মঠে নিয়ে ফেলে রাখল। কেউ খুলে দেখল না। পড়ল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হল, তবু কেউ জানল না।

মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি এবং যুক্তির চেয়ে অলৌকিক শক্তির প্রসার বাড়ল। মানুষের পাপে আর বিধাতার অভিশাপে রোগ হয় এই বিশ্বাস মোহান্তরা লোকের মনে ঢুকিয়ে দিল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং অলৌকিক বিধানে রোগ সারে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল। ইয়োরোপে মাতৃজাতির নিদারুণ দুর্দিন শুরু হল।

ইয়োরোপের মধ্যযুগে মাতৃজাতির লাঞ্ছনার চরম যুগ। তখন না ছিল আদিম জাতির সন্তান প্রসবের সেই সহজ সরল রীতি, না ছিল পূর্ববর্তী সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান। অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং ধর্মের নামে মাতৃজাতির ওপর চাপল। ধর্মের নামে অমানুষিক অত্যাচার শুরু হল। নিজের রক্ত দিয়ে অপরিসীম যন্ত্রণা সহ্য করে, নারীর বাধ্য হয়ে অপরের নিজের প্রাণ বলি দিয়ে সমস্ত মাতৃজাতির আর সেই প্রথম পাপ, ঐ প্রথম পুরুষ অ্যাডামকে প্রলুব্ধ করার ঋণ শোধ করল।

আদিম মাতৃজাতি সন্তান ধারণ এবং প্রসবে কোন বিঘ্ন হতে পারে ভেবে অনায়াসে নিজের ইচ্ছায় অনেকেই গর্ভনষ্ট করাতে পারত। গ্রীক সভ্যতার পর্ব বিকাশ পর্যন্ত এ প্রথা চালু ছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় সভ্যতার ধর্মযাজক এবং মোহান্তদের অনন্ত নরক ভোগের শাস্তি দিয়ে ভয় দেখিয়ে এ প্রথা বন্ধ করে দিল। গর্ভনষ্ট করায় যে সাহায্য করবে তার পর্যন্ত প্রাণদণ্ডের বিধান হল। অথচ প্রসবে বিঘ্ন ঘটলে অন্য কোন ব্যবস্থা করা হল না। প্রসবের সময় ধাত্রী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ চিকিৎসকের উপস্থিতি সাংঘাতিক পাপ বলে বর্জিত হল। প্রসূতিকে একান্তভাবে ঐ মূর্খ অশিক্ষিত কুসংস্কারগ্রস্ত দাইদের হাতে ফেলে রাখার নিয়ম হল। কাজেই তখন অতি সাধারণ প্রসবেও জ্বর কিংবা অন্য কোন উপসর্গ হয়ে প্রসূতির যন্ত্রণা বাড়ল। অনেকের মৃত্যু হল।

খৃষ্ট জন্মের পর পনের শ' বছরের মধ্যে তাই ধাত্রীবিদ্যার একখানিমাত্র উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৫১৩ সালে। জার্মানীর ওআরম্‌স্‌এর ইউকেরিআস্ রস্‌লিন এই বইখানি লেখেন। জার্মান

খৃষ্টজন্মের পনের শ' বৎসরের মধ্যে ধাত্রীবিদ্যার প্রথম পুস্তক ডাচেস অব ব্রান্‌স্‌উইককে উপহার

ভরসা। অসাবধানী মূর্খা স্ত্রীলোক এবং দাইদের জন্যে।

বইখানির নাম 'গার্ডেন অফ রোজেস্ ফর প্রেগন্যান্ট উইমেন অ্যান্ড ফর মিডওয়াইভস্।' লেখা হয় ডাচেস অফ ব্রান্‌স্‌উইক, ক্যাথারিনের নির্দেশে।

বইখানা যদিও প্রসবকালে ধাত্রীদের অবশ্য করণীয় সব বিষয় নিয়ে লেখা, তবু মজা এই, যে লেখক জীবনে কখনও নিজে সন্তান প্রসব দেখেন নি। কোন পুরুষের সাধ্য ছিল না তখন এই ঘটনা দেখে। হামবুর্গের এক ডাক্তার স্ত্রীলোকের পোশাক পরে একদিন সন্তান প্রসব দেখতে এক আঁতুড়ঘরে ঢোকেন। শেষে ধরা পড়ায় তাঁর শাস্তি হয় প্রাণদণ্ড। হাজার হাজার লোকের সামনে তাঁকে আগুনে দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়। তখন ১৫২২ সাল।

তবু এই বইএ অনেক কাজ হল। ইয়োরোপের সব ভাষায় এই বই অনূদিত হল। ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজীতে। প্রসূতি এবং
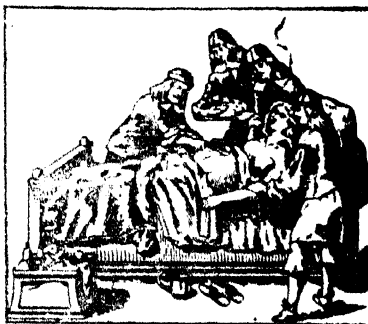
সতের শতাব্দীতে সিজারিয়ান অপারেশন

সন্তান উভয়েরই যে সমান যত্নের প্রয়োজন এই জ্ঞানের প্রথম আলোড়ন শুরু হল। খৃষ্টের পর ষোল শতকে।

সেই সময় প্যারিসে আঁব্রোজ্ পারী মস্ত বড় সার্জন। সাধারণ নাপিত থেকে নিজের বুদ্ধি এবং অধ্যবসায়ের গুণে সবচেয়ে বড় সার্জন বলে নাম করেছেন। যুদ্ধে গিয়ে বন্দুকের গুলী জনিত ক্ষতের নতুন চিকিৎসা আবিষ্কার করেছেন। তখনকার চিকিৎসা ছিল ক্ষতে তেল ফুটিয়ে ঢালা। যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের ক্ষতে ঐ উত্তপ্ত তেল ঢালতে গিয়ে একদিন পারী দেখলেন, তাঁর কাছে সঞ্চিত সব তেল নিঃশেষ হয়েছে। অথচ সেদিন আহতদের সংখ্যা অনেক। কি করবেন ভেবে না পেয়ে পারী শুধু তুলো আর কাপড় দিয়ে ঐ ক্ষত বেঁধে দিলেন। রাত্রে তাঁর ঘুম হল না। ভাবলেন, অতগুলি আহত সৈনিক তাঁরই ভুলে বুঝি মারা যাবে।

পরদিন গিয়ে দেখেন যাদের ক্ষতে তপ্ত তেল ঢালা হয়েছিল তারাই শুধু যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। যাদের ক্ষত তিনি শুধু তুলো এবং কাপড় চাপা দিয়ে রেখেছিলেন তারা বেশ ভাল আছে। হাসছে।

পারী বুঝলেন, ক্ষতে তপ্ত তেল ঢাললে অপকারই বেশী হয়। সেই থেকে ক্ষতের নতুন চিকিৎসা শুরু হল।

এই আঁব্রোজ্ পারী প্রসূতির সন্তান যদি পেটে আড়াআড়ি থাকে তাহলে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে মাথা নিম্নগামী করে স্বাভাবিকভাবে প্রসবের রীতি আবার নতুন করে প্রবর্তন করলেন। তাঁর আগে খৃষ্টান ধর্মযাজকরা এইসব ক্ষেত্রে সিজারিয়ান অপারেশন করবার হুকুম দিতেন। তাতে মাতা এবং শিশু দুজনেরই মৃত্যু হত। পারী এই 'ভারসন' চালু করে মাতা এবং শিশু উভয়েরই প্রাণ রক্ষা করলেন। খৃষ্টের পর ষোল শতকে।

এই ষোল শতকে মাতৃজাতির কল্যাণের কথা ইউরোপ ভাবতে শিখল। ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার স্কুল খোলা হল। ফরাসী দেশে। ধাত্রীরা এখন আর অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর দাই মাত্র রইল না। রীতিমত লেখাপড়া শিখে গ্রাজুয়েট হতে লাগল।

এর পরে পুরুষরাও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ পেল। ঐ ফরাসী দেশে। রাজা চতুর্দশ লুই-এর রক্ষিতা লা ভালিয়ের প্রসবকালে সর্বপ্রথম পুরুষ ধাত্রী ডাকা হল। রাজা নিজে পর্দার আড়াল থেকে এই পুরুষ ধাত্রীর হাতের কাজ দেখে খুব খুশী হলেন। মুগ্ধ হলেন। সেই থেকে প্রসবের সময় পুরুষ ধাত্রী ডাকা অভিজাত মহলে এক ফ্যাসানে দাঁড়িয়ে গেল। সতেরো শতকে।

ঐ সময়ে ইংলণ্ডে রানী এলিজাবেথের রাজত্ব। ফরাসী দেশ থেকে পালিয়ে এক ডাক্তার ইংলণ্ডে এসে বসবাস শুরু করলেন। তাঁর দুই ছেলে ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ হয়ে

উঠল। এ'দের দুজনের নামই পিটার চেম্বারলিন। বড় পিটার এবং ছোট পিটার। ধাত্রীবিদ্যায় এই চেম্বারলিনদের এত বেশী নাম হয়ে গেল যে, রাজ-অন্তঃপুরে পর্যন্ত এ'দের ডাক পড়ল। রানী হেনরিয়েটা মেরিয়া এই পুরুষ ধাত্রীর সাহায্য নিলেন ১৬২৮ সালে।

আদিম মাতৃজাতির প্রসবকালে সবচেয়ে বেশী যে ভয় ছিল তা ঐ গর্ভস্থিত সন্তানের আড়াআড়িভাবে থাকা। আঁরোজ পারী সে ভয় দূর করেছেন, সন্তানকে পা ধরে ঘুরিয়ে, পোডালিক ভারসান করে। তখন সন্তানের আয়তন ছোট থাকত, মাথাও তাই ছোট হত। তাই মাথা নিম্নমুখী থাকলে মাতার প্রসবে কোন বিঘ্ন হত না।

কিন্তু সভ্যতার কল্যাণে এবং ধর্মের অনুশাসনে মাতৃজাতির নতুন এক বিপত্তি শুরু হল। শারীরিক পরিশ্রম কমে গিয়ে এবং সভ্য খাদ্য প্রচুর খেয়ে সন্তানের আয়তন বৃদ্ধি হল, মাথা বড় হতে লাগল। কাজেই গর্ভে সন্তান নিম্নমুখী থাকা সত্ত্বেও প্রসব দ্বারে এসে শিশুর ঐ বড় মাথা সহজে আর বেরুতে না। প্রসবে দারুণ বিঘ্ন দেখা দিত। এমন কি অস্ত্র দিয়ে ঐ শিশু খণ্ড খণ্ড করে কেটে শেষে বার করতে হত।

এই দেখে পিটার চেম্বারলিন এক বুদ্ধি বার করলেন। ভাবলেন, প্রসব দ্বারে শিশুর মাথা যখন আটকে থাকে তখন তাকে সাড়াশী দিয়ে টেনে বার করলে কেমন হয়? এই ভেবে তিনি এক নতুন যন্ত্র তৈরী করলেন। এরই নাম ফরসেপ্‌স্‌।

পুরুষ ধাত্রীর সতের শতকে প্রসূতিকে সাহায্য

কিন্তু এই যন্ত্রের কথা তাঁরা গোপন রাখলেন। প্রায় দু'শ বছর ধরে গোপনে প্রসব তা সে যতই কঠিন হোক এরা অনায়াসে করিয়ে দিতে সক্ষম।

আশ্চর্য এই যে, নতুন এই যন্ত্র আবিষ্কারের কথা কেউ কিন্তু জানল না। এই ফরসেপ্‌স্‌ চেম্বারলিনরা তিন পুরুষ ধরে পারিবারিক গুপ্তধনের মত লুকিয়ে রাখলেন। প্রায় দু'শ বছর ধরে গোপনে রেখে দরকারের সময় ব্যবহার করা শুধু তখনকার দিনেই সম্ভব ছিল। কারণ প্রসবে পুরুষ ধাত্রী ডাকার রেওয়াজ হলেও প্রসূতিরা পুরুষ দেখে লজ্জা পেতেন। তাই পুরুষ ধাত্রীরা চাদরের এক প্রান্ত নিজের গলায় এবং অন্য প্রান্ত প্রসূতির গলায় বেঁধে চাদরের নিচে হাত দিয়ে প্রসব করাতেন। কাজেই নিজের ব্যাগ থেকে ডাক্তার কি যন্ত্র বার করে কাজ করেন কেউ তা জানত না। দেখতে পেত না।

এমনি করে এই গুপ্তধন অর্থাৎ ঐ ফরসেপ্‌স্‌ ছোট পিটারের ছেলের হাতে এল। তাঁর নামও পিটার। তিনি আবার এই ধন তাঁর ছেলের হাতে তুলে দিলেন। এর নাম হিউ চেম্বারলিন (১৬৩০-১৭০৬)। এই হিউ চেম্বারলিন রানী অ্যানীর জন্মের সময় রাজমাতাকে প্রসব করান ১৬৯২ সালে।

হিউ চেম্বারলিন সগর্বে ঘোষণা করলেন, [illegible] আর্কাইভ এবং পূর্বপুরুষদের চেষ্টায় সমগ্র ইংল্যাণ্ডে শুধু তাঁদের বংশেই সন্তান প্রসবের এক সহজ উপায় আবিষ্কার হয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে এই আবিষ্কার একমাত্র তাঁর সম্পত্তি।

কিন্তু এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে প্রসবের সময় পুরুষ ধাত্রী ডাকা নিয়ে তুমুল মতান্তর শুরু হল। হিউ নিজেও খুব জনপ্রিয় ছিলেন না। তার ওপর রাজনীতিতে যোগ দিয়ে আরও তিনি অপ্রিয় হয়ে উঠলেন, কাজেই একদিন ইংল্যাণ্ড ছেড়ে অবশেষে প্যারিসে চলে গেলেন।

প্যারিসে তখন রাজা চতুর্দশ লুইএর রাজত্ব। এইখানে এসে হিউ নিজের ঐ গুপ্তধন বিক্রি করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, দশ হাজার টাকায় এই আবিষ্কার তিনি বিক্রয় করতে প্রস্তুত।

প্যারিসে তখন ফ্রাঁসো মরিশো সবচেয়ে বড় ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ। তাঁর আগে প্রসূতিকে প্রসব-চেয়ারে বসিয়ে প্রসব করানো হত। এই রীতি ইয়োরোপে অতি সুপ্রাচীন। বিয়ের সময় এই চেয়ার কনের বাড়ি থেকে যৌতুক দেওয়া হত। মরিশো এই প্রথা বাতিল করে বিছানায় শুইয়ে প্রসব করার রীতি প্রবর্তন করলেন।

এই মরিশোর কাছে এসে হিউ চেম্বারলিন বড়াই করে বললেন, যে কোন প্রসব, তা সে যতই কঠিন অথবা অসম্ভব হোক অনায়াসে তিনি করাতে পারেন। মাত্র কয়েক মিনিটের চেষ্টায় তাঁর ঐ গুপ্ত আবিষ্কারের সাহায্যে।

মরিশো তৎক্ষণাৎ তাঁকে এক গর্ভবতী বামনের কাছে নিয়ে গেলেন। রিকেট হয়ে প্রসূতির পেলভিসের হাড় বাঁকা। হিউ

চেম্বারলেন সগর্বে এগিয়ে গেলেন। খুশিতে আত্মবিশ্বাসে তাঁর চোখ মুখ জ্বল জ্বলে হয়ে উঠল।

তিন ঘণ্টা পর যখন তিনি প্রসব ঘর থেকে বেরুলেন বোঝা গেল তাঁর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। প্রসব করানো যায়নি। শুধু তাই নয়। এতক্ষণ এই চেষ্টার ফলে প্রসূতির দেহে যে আঘাত লেগেছে তাই থেকে তার মৃত্যু হল।

হিউ চেম্বারলিন অপদস্থ হয়ে আবার ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। ইংলণ্ডে তখন হাতুড়ে চিকিৎসার স্বর্ণময় যুগ। কিন্তু তবু হিউ কোন সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। আবার তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেন। তার ফলে একদিন তাঁকে ইংলণ্ড ছেড়ে পালাতে হল। ১৬৯৯ সালে।

এবার তিনি হল্যাণ্ডে এলেন। এইখানে এসে তাঁর গুপ্তধন বিক্রি হয়ে গেল। আমস্টারডামের মেডিকো ফারমাসিউটিক্যাল কলেজ এই আবিষ্কার কিনে নিল।

এই কলেজ থেকে লাইসেন্স না নিলে তখন হল্যাণ্ডে কেউ চিকিৎসা করতে পারত না। কাজেই লাইসেন্সের সঙ্গে মোটা টাকা ফি নিয়ে কলেজ ডাক্তারদের কাছে এই গুপ্ত বিদ্যা বিক্রি করতে শুরু করল।

প্রসূতির কল্যাণকর এমনি এক আবিষ্কার নিয়ে এমন জঘন্য ব্যবসা দেখে কয়েকজন উদার প্রকৃতির লোক এটা বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। চাঁদা তুলে টাকা দিয়ে এই গুপ্ত বিদ্যা কলেজ থেকে কিনে নিয়ে খবরের কাগজে প্রকাশ করে দিলেন। তখন দেখা গেল, এই গুপ্ত বিদ্যার সবটাই ফাঁকি। প্রচুর টাকা নিয়ে হয় হিউ চেম্বারলিন নয় ঐ কলেজ সাংঘাতিক প্রতারণা করেছেন।

ফরসেপ্‌স্ আসলে একটি বড় সাঁড়াশী। শিশুর মাথা ধরা চাই এত বড় তার মুখ। কিন্তু দেখা গেল সমগ্র সাঁড়াশী না দিয়ে কলেজ মাত্র তার অর্ধেক অর্থাৎ একখানা ডাণ্ডা খুলে বিক্রি করেছে। এই দিয়ে শিশুর, প্রসূতির কিংবা তার পিতার মাথায় ডাণ্ডা মারা যেতে পারে কিন্তু প্রসবকালে শিশুর মাথা ধরে টান দিয়ে প্রসব কখনও করানো যায় না।

পরে হিউ চেম্বারলিনের ছেলে হিউ জুনিয়র যখন ডাক্তার হলেন তখন এই দু'শ বছরের গুপ্ত আবিষ্কার প্রকাশ করে দিলেন। ইংলণ্ডে। সেই থেকে এই ফরসেপ্‌স্ সর্বসাধারণের ব্যবহারে লেগে গেল।

কিন্তু দু'শ বছর ধরে এই আবিষ্কার গোপন রাখার জন্য এর কৃতিত্ব চিকিৎসক সমাজ চেম্বারলিনদের দিলেন না। বেলজিয়ামের এক ডাক্তার, জীন প্যালফিন, এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব পেলেন। তিনিই সর্বপ্রথম এই ফরসেপ্‌স্ প্যারিস আকাডেমিকে দান করেন। ১৭২১ সালে।

এত দীর্ঘকাল পরে ইয়োরোপে মাতৃজাতির দুঃখ এবং কষ্ট নিবারণের সত্যকার চেষ্টা শুরু হল। ষোল শতকে ফরাসী দেশে আঁব্রোজ পারী ভারসান অর্থাৎ পেটে সন্তান আড়াআড়িভাবে থাকলে তা ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু করেন। সতের এবং আঠারো শতকে ফরসেপ্‌স্ ব্যবহার শুরু হল। তারপর উনিশ শতকে অজ্ঞান করার পদ্ধতি এবং জীবাণু শূন্য করার রীতি আবিষ্কার হওয়ায় সিজারিয়ান অপারেশন করা সম্ভব হল।

বর্তমান বিংশ শতাব্দীর যুগে মাতৃজাতির সবচেয়ে মঙ্গলময় এবং গৌরবময় যুগ। এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের সাহায্যে মাতৃজাতি এখন সন্তান ধারণ এবং প্রসবের সব বাধা অনায়াসে কাটাতে পারেন। সভ্যতার মানদণ্ড এই।

পৃথিবীতে কোন দেশ সবচেয়ে বেশী সভ্য?

মাতৃজাতির প্রতি যে দেশ যত বেশী যত্ন নেয়, যত বেশী সম্মান করে সেই দেশ তত বেশী সভ্য।

এই সম্মান এই যত্ন কি দেখে বোঝা যায়?

সন্তান ধারণ, প্রসব কালে, এবং প্রসবের পর যে দেশ মাতা এবং শিশুর প্রতি যতখানি যত্ন নেয় তাই দেখে।

এই মানদণ্ডে আমাদের দেশ কি?

প্রসবকালে মাতা এবং সন্তানের মৃত্যু এখনও ভারতবর্ষে অন্য সব সভ্য দেশের চেয়ে অনেক অনেক বেশী।

কলেজে পড়া বৌ

সুনয়নী দেবীর দুঃখের অন্ত নেই। কি ভুলই না তিনি করেছিলেন ছেলেকে কোলকাতায় লেখা-পড়া শিখতে পাঠিয়ে। ছেলে কিনা বিয়ে করে বসল এক কলেজে পড়া মেয়েকে! ছেলের জন্যে তিনি পাত্রী ঠিক করেছিলেন কেষ্টনগরের বনেদী চাটুজ্যে পরিবারে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি—বয়স একটু কম কিন্তু তাতে কিইবা এসে যায়? টাকার কথাটাও ফ্যালনা নয়। নগদ দশ হাজারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চাটুজ্যেরা। কথাটা এখনও ভাবলে খচ্ করে লাগে সুনয়নী দেবীর বুকে।

সুতপা ঘরে এলো দুগাছি শাঁখা আর দুগাছি চুড়ী সম্বল করে। প্রথম দিন প্রণাম করতে যাওয়ার সময় সুনয়নী দেবী পেছিয়ে গিয়েছিলেন দু'পা, "থাক থাক মা,"—তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া কলেজে পড়া মেয়ে সুতপার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেই প্রথম দিনটি আজ প্রায় দেড় বছর পেছনে কিন্তু আজও শাশুড়ী কলেজে পড়া বৌকে আপন করে নিতে পারেন নি। রান্নাঘরের কোন কাজে সুতপা সাহায্য করতে এলেই তিনি বলেন—"থাক থাক বৌমা—এসব তো তোমাদের অভ্যাস নেই, আবার মাথা ধরবে।"

বিমল কোলকাতার এক সদাগরী আফিসে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে চাকরী করে। থাকে সহর-তলীতে। রোজগার সামান্যই। বিয়ের আগে অস্বাচ্ছন্দ্য বিশেষ বুঝতে পারেনি। কিন্তু বিয়ের দেড় বছর পরে আজ বুঝতে পারে যে খরচ সংকুলান করা দরকার। দায়ীত্ব অনেক বেড়ে গেছে, কিছু সঞ্চয়ও থাকা দরকার। মায়ের হাতেই সংসার খরচের টাকা সে তুলে দেয়। ইদানিং মাকে আকারে ইঙ্গিতে দু একবার বলেছে যে খরচ কিছু কমানো দরকার। কিন্তু সুনয়নী দেবী গেছেন চটে। "তোর কলেজে পড়া বৌ বুঝি তোকে এই সব বুদ্ধি দিচ্ছে? এত দিন তো তোর এসব মনে হয়নি?" ভয়ে বিমল আর কিছু বলতে পারেনি।

সুতপা কিন্তু ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। "তুমি বুঝিয়ে বল মাকে। আর তিন মাস পরে আমাদের প্রথম সন্তান আসবে। এখন চারিদিক সামলে সুমলে না চললে চলবে কেন? তাছাড়াও ধর অসুখ বিসুখ আছে, সবাইয়ের সাধ আহ্লাদ আছে, কিছু তো বাঁচাতেই হবে। মায়েরই তো কতদিনকার সখ একটা গরদের থানের আর কত দিন তোমায় বলেছেন তরকারীর বাগানটা বেশ সুন্দর বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিতে।"

মরীয়া হয়ে বিমল গেল মায়ের কাছে। খুলে বলল তাঁকে মনের কথা। কিন্তু হিতে বিপরীত হোল। সুনয়নী দেবী গেলেন ক্ষেপে। "যখনই তুই ওই কলেজে পড়া মেয়েকে বিয়ে করেছিস তখনই জানতাম পরিবারে অশান্তি আসবে। থাক তুই তোর বৌ আর সংসার নিয়ে—আমি চললাম দাদার বাড়ী।" কিছুতেই আটকানো গেল না
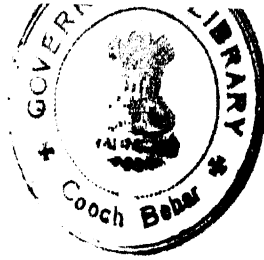
তাঁকে। বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন বরানগরে।

ফিরে এলেন তিনি প্রায় তিন মাস পরে। তাও এমনি নয়, বিমলের ছেলে হওয়ার খবর পেয়ে। বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে তিনি অবাক। তাঁর সাধের ঝিঙে আর লাউডগার বাগানের চারপাশ দিয়ে কচি বাঁশের সুন্দর বেড়া। গেলেন সুতপার ঘরে। ফুটফুটে নাতীকে নিলেন কোলে তুলে। বিমল এসে ঢুকলো গরদের থান নিয়ে। আনন্দে সুনয়নী

দেবীর চোখের দুই কোণে জল চিকচিক করে উঠল। সুতপা বিছানা থেকে ক্ষীণস্বরে বলল—"মা তোমায় আর কখনও বাড়ী ছেড়ে যেতে দেব না।" সুনয়নী দেবী তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "কি ভয় নিয়েই ফিরেছিলাম মা, হয়তো দেখব বাড়ীঘর সব ছারখার হয়ে গেছে—কিন্তু কি লক্ষ্মীশ্রী সারা বাড়ী জুড়ে, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল—না মা কোথায় যাব এমন বৌ-নাতী ফেলে?"

এক দিন শুধু তিনি সুতপাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কি করে এত গুছিয়ে চালালে তুমি মা?" সুতপা বলল—"মা খরচ কত দিকে বাঁচাই দেখুন! উনি আগে আপিসে পয়সা খরচ করে আজে বাজে খাবার খেতেন, এখন বাড়ী থেকে টিফিন বাক্সে আমি ওঁর খাবার দিই। এতে খরচ অনেক বাঁচে, আর খাওয়াটাও ভাল হয়। ঠিকে চাকরটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি—কাপড় কাচা, বাসন মাজা এসব কাজ আমি আর ঝি ভাগাভাগি করে করে নিই। আর সব চেয়ে বেশি সাশ্রয় করেছি খাবারে। আগে আপনি ঘি কিনতেন অত দামে—আর সে ঘি'ও সব সময় ভাল হোত না। আমি ঘিয়ের বদলে কিনি ডালডা মার্কা বনস্পতি। ডালডায় ঘিয়ের সমান ভিটামিন 'এ' থাকে। ভিটামিন 'এ' চোখ আর ত্বক সুস্থ রাখে। আর থাকে ভিটামিন 'ডি' যা হাড়কে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ডালডায় রাঁধা সব খাবারই অত্যন্ত মুখরোচক হয়। এই সব কারণেই এবং স্বাস্থ্যদায়ক বলেই ডালডা আজ আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে। ডালডা "শীল" করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে সব সময় খাঁটি ও তাজা পাওয়া যায়। তাছাড়া ডালডায় ভেজালের কোন ভয় নেই কারণ খাঁটি ডালডা সব সময় পাওয়া যায় খেজুর গাছ মার্কা টিনে।"

সুনয়নী দেবী মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন তাঁর কলেজে পড়া বৌয়ের দিকে।

(সারাংশ)

"তোমার বিরাট আয়তন, তোমার বিপুল সম্পদ আমার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে নি। আয়তন মাহাত্ম্য আনে না। ভূমিই একটি জাতি তৈরী করে না। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন তার মধ্যে রয়েছে সত্যের মহানতা আর আসন্ন ভাগ্যের আতঙ্ক—সেই আসল প্রশ্ন হচ্ছে: তুমি তোমার এত কিছু নিয়ে কি করছ, যাচ্ছ কোন পথে?"

—টমাস হাক্সলি (১৮৭৬ সালে জন হপ্‌কিন্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা)।

—

মেঞ্জিস মিশন মুখ কালি করে লণ্ডনে ফিরে এলো। ইতিমধ্যে বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়েছে। আগস্টের প্রথমার্ধেই ইংলণ্ডে পঁচিশ হাজার রিজার্ভ সৈন্যকে কাজে ডাকা হয়েছে; নৌ ও স্থলে যুদ্ধের নানা বড় বড় মালমশলা গুদাম থেকে বার করা হয়েছে—যেমন সৈন্য তীরে নামাবার জাহাজ, ট্যাংক বহন করবার জাহাজ, ডেস্ট্রয়ার, মাইন সুইপার ইত্যাদি। ক্যাটেরিক ও মনসুবুরী নামক দুইটি ঘাটিতে ট্যাংক, লরী ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং যানবাহনকে মরুভূমির ধূসর-হরিৎ রংএ রাঙিন করা হয়েছে। বৃটেনের দক্ষিণ উপকূলে বন্দর-গুলিতে ভিড় করেছে মিশরযাত্রী সৈন্যদল। ফরাসী সরকারও আলজেরিয়া থেকে তিন ডিভিশন সৈন্য সরিয়ে এনেছেন সুয়েজে পাঠাবার জন্যে। মাল্টাতে জমায়েত হয়েছে আরো অনেক সৈন্য। এ সব তোড়জোড় মেঞ্জিস কাইরো যাবার আগেই। মেঞ্জিস তাঁর 'শান্তি-পূর্ণ' মিশনে তখনো রওনা হন নি; এমন সময় লণ্ডনে ও প্যারিসে একযোগে ঘোষণা করা হল যে, এই সমরায়োজন শুধু 'প্রয়োজন হলে' নাসেরের অত্যাচার থেকে ইংরেজ ও ফরাসী নাগরিকদের বাঁচাবার জন্যে। আর, পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ইঙ্গ-ফরাসী স্বার্থ রক্ষা করবার উদ্দেশে। কাইরো থেকে নাসেরের উত্তর এলো: মিশর প্রাণপণে আক্রমণ প্রতিরোধ করবে। নাসের সামরিক যুদ্ধ প্রস্তুতির আদেশ দিলেন।

এ সময়ে ইংলণ্ডের প্রায় প্রত্যেক জাতীয় সংবাদপত্রই আক্রমণাত্মক নীতির পক্ষে। শুধু দু চারখানা বামপন্থী পত্রিকা শান্তি-পূর্ণ সমাধানের ধ্বনি তুলে অরণ্যে রোদন করছেন। ইডেন এবং মলে যে আক্রমণ-পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন তা মোটা-মুটি এই:

পুরাতন সুয়েজ কোম্পানী থেকে সব ইংরেজ ও ফরাসী পাইলট ও টেকনিসিয়ান-দের তুলে নেওয়া হবে। তাতে সুয়েজ জল-পথ হয়ে পড়বে পঙ্গু; জাহাজ যাতায়াত বন্ধ আসবে দ্রুতগতিতে; তখন বৃটেন ও ফ্রান্স নালিশ নিয়ে হাজির হবে স্বস্তি পরিষদে। সেখানে তো জানা কথাই যে, রাশিয়া তার 'ভেটো' প্রয়োগ করে মিশর-বিরোধী কোন প্রস্তাব 'পাশ' হতে দেবে না। তখন ১৮৮৮ সালের কনভেনশনের অজুহাতে সৈন্য পাঠিয়ে দখল করা হবে সুয়েজ খাল, বাধা পেলে, সমগ্র মিশর। নাসেরকে নির্বাসন দিয়ে একজন মিত্র-স্থানীয় কাউকে মিশরের শাসন দেওয়া হবে, প্রয়োজন হলে ফিরিয়ে আনা হবে ফারুককে।

১১ই সেপ্টেম্বর, বুধবার এই চক্রান্তের পরিকল্পনা ইডেন পার্লামেন্টে পেশ করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। ততক্ষণে সব তিনটি ছক সম্পূর্ণ তৈরী। এমনকি জেনারেল সার চার্লস কেইটলিকে যুদ্ধ সেনাবাহিনীর অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। ইডেনের সংকল্প সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিই অভিযান শুরু করা। শুধু আক্রমণ আরো মাস কয়েক পেছিয়ে গেল?

এর জন্যেই দায়ী জন ফস্টার ডালেস।

বুধবার পার্লামেন্টের অধিবেশন। ইডেন তাঁর বক্তৃতার খসড়া তৈরী করে ফেলেছেন। তিনি তখন নিজেকে ভাবছেন যে বিজয়ী বীর। এমন সময়, মঙ্গলবার, অর্থাৎ ১০ই সেপ্টেম্বর, ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের টেলিফোন বাজিতে বেজে উঠলো। কথা কইছেন ওয়াশিংটন থেকে জন ফস্টার ডালেস। ডালেস এ পারের রণদামামার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। আইসেন-হাওয়ার বার বার ইংরেজদের প্রধানমন্ত্রীকে সাবধান করেছেন হিংসাত্মক কিছু যেন না ঘটে। ডালেস ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে মিশর আক্রমণ থেকে নিরস্ত করতে নতুন উদ্যমের প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাই দূরধ্বনি-বহ যোগে যোগাযোগ করলেন ইডেনের সংগে।

এই দূরপথের টেলিফোনে সত্যিকারের কি কথাবার্তা হয়েছিল কোনদিন তা জানা যাবে না। ডালেস সাহেবের পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল করে কোন কিছু বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা কম। তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। তাঁর কথাবার্তাতেও কেমন যেন একটা আইনের ঘোর প্যাঁচ থাকে। তিনি যাই বলে থাকুন, ইডেন শুনলেন একরকম। ইডেন যাই শুনে থাকুন, ডালেস বললেন অন্যরকম। টেলিফোন-কূটনীতি যে কতোটা

বিপজ্জনক হতে পারে তার উদাহরণ এই ১০ই সেপ্টেম্বরের কথোপকথন।

ইডেন যা বুঝলেন তা হচ্ছে এই ডালেস বর্তমানে মিশরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে। কিছুদিন সবুর করলে আরো বড়ো মেওয়া ফলবে। তিনি, অর্থাৎ ডালেস, ইতিমধ্যে একটা চমকপদ প্ল্যান তৈরী করেছেন। সতেরোটি দেশ নিয়ে তৈরী হবে সুয়েজ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান—সুয়েজ ইয়ুজার্স অ্যাসোসিয়েশন। তাঁরা নিজেরা একত্রিত হ'য়ে পাইলট নিযুক্ত করবেন, নিজেদের তহবিলেই মাশুল জমা দেবেন, এবং সুয়েজ জলপথে জাহাজ চালাবেন। যদি বাধা দেয় তবে সুয়েজ কানালই ত্যাগ করবেন; জহাজ নিয়ে যাবেন উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে। খরচ?—যতো টাকা লাগে দেবে গৌরী সেন। ইডেন যেন শুনতে পেলেন ডালেস বলছেন 'আমাদের জাহাজ যদি বাধা পায়, তবে আমরা গুলি করতে করতে এগিয়ে যাবো।'

বিদায়। আনন্দে গৌরবে ইডেনের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। এই তো তিনি চেয়েছিলেন! 'যুদ্ধং দেহি' নীতির সঙ্গে আমেরিকাকে জড়াতে পারলে তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়! তক্ষুনি তিনি প্যারিসে মলে-কে খবর দিলেন। বুধবারের জন্যে যে ভাষণ তৈরী করেছিলেন তা ছিঁড়ে ফেলে নতুন একটি ভাষণ লিখলেন। লণ্ডনে ও প্যারিসে পররাষ্ট্র দপ্তরের বড়ো সাহেবরা ডালেস-প্রস্তাবিত অ্যাসোসিয়েশনের প্ল্যান তৈরী করতে লেগে গেলেন। বুধবার অপরাহ্নে যখন পার্লামেণ্ট বসলো, গৌরবোজ্জ্বল অ্যাণ্টনী ইডেন যে বক্তৃতা দিলেন তার সার মর্ম হল এই যে সুয়েজ ব্যবহারকারীদের অ্যাসোসিয়েশন তৈরী হবে মার্কিন সহযোগিতা নিয়ে, সে নিজের জাহাজ নিজের পাইলট দিয়ে চালাবে সুয়েজ জলপথে। ইডেন বললেন, "মিশর সরকারকে অনুরোধ করা হবে সুয়েজ খালে সর্বাধিক জাহাজ চলবার ব্যবস্থা চালু রাখতে। আমি সাফ্ বলে দিচ্ছি, যদি আমাদের কাজে মিশর কোনপ্রকারের বাধা দেয়—"

হ্যারল্ড ডেভিসঃ "আপনি ইচ্ছে ক'রে মিশরকে উত্তেজিত করছেন।"

ইডেন—"—যদি মিশর আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের কাজে বাধা দেয়, বা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না করে তবে সে পুনরায় ১৮৮৮ সালের কনভেনশন ভঙ্গ করবে। (কয়েকজন সদস্য চেঁচিয়ে উঠলেন "পদত্যাগ করুন, পদত্যাগ করুন") আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমি যা বলছি (একজন সদস্য—'আহা রে, কি শান্তিকামী'!) তা একাধিক গভর্নমেণ্টের যৌথ সিদ্ধান্ত। যদি মিশর তাই ক'রে, তাহলে বৃটেন ও তার মিত্ররা এমন পন্থা অবলম্বন করবে—"

হ্যারল্ড ডেভিসঃ "আপনি কি বলতে চান?"

ইডেন—"এমন পন্থা অবলম্বন করবে যা অবস্থার দাবীতে প্রয়োজনীয়—"

ডেভিস—ঃ "আপনি তো যুদ্ধের কথা বলছেন!"

ইডেন—ঃ "আর এ ব্যবস্থা নেওয়া হবে হয় জাতিপুঞ্জের মারফৎ, নয়তো অন্য উপায়ে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে।"

বৃটেনের রক্ষণশীল দলের সর্বত্র মহা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। যুদ্ধনীতিতে মার্কিন সমর্থন! এবার আর নাসের-দমনের বিলম্ব কি?

কিন্তু ইডেনের বক্তৃতার রিপোর্ট টেলিপ্রিণ্টারে ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র দপ্তরে পৌঁছতেই এক মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হল। ডালেস আবার কি করে বসেছেন? রিপাবলিকান দলের নেতারা বার বার

আইসেনহাওয়ারকে টেলিফোন করতে লাগলেন। সত্যই কি ডালেস আশ্বাস দিয়েছেন' আমেরিকা কামান দেগে দেগে সুয়েজ দিয়ে তার জাহাজ নিয়ে যাবে? এতো খোলাখুলি আক্রমণেরই নামান্তর! ডালেস প্রমাদ গণলেন। তিনি তো কই এমন কথা টেলিফোনে ইডেনকে বলেন নি? লণ্ডনে জরুরী বার্তা পাঠান হল। ডালেস তাড়াতাড়ি একটি সাংবাদিক বৈঠকে ডেকে বললেন, "শুটিং থ্রু দি সুয়েজ কানাল" তাঁর স্বপ্নেরও বাইরে; তিনি শুধু ভেবেছিলেন উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম ক'রে জাহাজ পাঠানোর কথা, যদি সুয়েজ খাল একান্তই বয়কট করতে হয়!

এদিকে ইডেনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়! বৃহস্পতিবার যখন কমন্স্-এর অধিবেশন শুরু হল, তখন ডালেসের সাংবাদিক বৈঠকে বিবৃতির বিবরণ সকলের জানা হ'য়ে গেছে। বিরোধী-দলের চাপে পড়ে ক্রুদ্ধ, আশাহত ইডেন "শুটিং থ্রু" পথ ত্যাগ করতে বাধ্য হ'লেন।

এর পরে সুয়েজ ব্যবহারকারীদের অ্যাসোসিয়েশন গঠন করবার জন্যে দ্বিতীয় বার যখন সতেরোটি দেশের বৈঠকে বসলো লণ্ডনে, ডালেস প্রথমে যোগই দিতে চাইলেন না। পরে, ইডেনের একান্ত অনুরোধে তিনি যখন হাজির হলেন, তখন দেখা গেল "উত্তমাশা অন্তরীপ" প্রদক্ষিণ প্ল্যানও কার্যকরী করতে তিনি ইতস্ততঃ করছেন। কংগ্রেসে যে এ নিয়ে বিরোধিতা হ'তে পারে এবং কংগ্রেসের অনুমতি না নিয়ে অর্থ সাহায্য করায় যে খুবই অসুবিধা, পূর্বে তিনি তা ভেবে দেখেন নি। এদিকে গ্রীক, যুগোশ্লাভ ও রুশ পাইলটদের সাহায্য মিশরী পাইলটরা সুয়েজ জলপথে জাহাজ চলাচল চালু রাখছে দিনের পর দিন। পশ্চিম য়ুরোপের কয়েকটি দেশ—জার্মেনী ও নরওয়ে পর্যন্ত—জানিয়ে দিল যতোদিন সুয়েজ খোলা থাকবে, তারা উত্তমাশা ঘুরে এশিয়ায় যাবে না। শুধু এ সব মতানৈক্য কোন মতে ধামাচাপা দিয়ে পঙ্গু, অকেজো এক সুয়েজ ব্যবহারকারী সংস্থা গঠিত হল। শক্তির বিজয় পতাকা বহন ক'রে ডালেস ফিরে গেলেন স্বদেশে। যাবার আগে দেখা গেল বৃটেন ও আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিবদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ!

২৬শে সেপ্টেম্বর যখন বৃটেন, ডালেসের আপত্তি সত্ত্বেও সুয়েজ সমস্যা নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে হাজির হল, আমেরিকা তাদের সঙ্গে একমত হ'য়ে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ খুঁজতে শুরু করলো। তৈরী হল ছয়টি মূলনীতি যার উপর ভিত্তি করে মিশর, বৃটেন ও ফ্রান্স সুয়েজ সমস্যার সমাধান করবে। রক্ষ যেমন প্রথম এই মূলনীতির অন্যতম কথা হল মিশরের সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে অক্ষুণ্ণ, ... আন্তর্জাতিক ... কোন একটি বিশিষ্ট দেশের রাজনীতি সুয়েজ শাসনকে প্রভাবিত করবে না।

স্যর অ্যান্টনী ইডেন এবং মলে দুজনেই এই মূলনীতি মেনে নিলেন। তথাপি চললো তাদের সহযোগে ফ্রান্সের মাধ্যমে ইজরেইল এসে যোগ দিল মিশর আক্রমণের গভীর ষড়যন্ত্রে। তেল-আভিভ হ'য়ে উঠলো এই ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র। ওখানকার মার্কিণ রাষ্ট্রদূত হঠাৎ এর গন্ধ পেলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন ইংরেজ ও ফরাসী দূতাবাসে সন্দেহজনক গোপনীয় তৎপরতা। মার্কিণ সামরিক প্রতিনিধি দেখতে পেলেন তাঁর ইঙ্গ-ফরাসী সহকর্মীরা তাঁকে হঠাৎ এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। ঝাঁক ঝাঁক ফরাসী জঙ্গী বিমান ইজরেইলে এসে পৌঁছতে লাগলো। সীমান্তবর্তী সামরিক ঘাঁটিগুলিতে হঠাৎ রণ প্রস্তুতির সাড়া পড়ে গেল। তেল-আভিভ থেকে খবর পেয়ে আইসেনহাওয়ার ইজরেইলের প্রধান মন্ত্রী বেন গুরিয়নকে পুনরায় রণপথ পরিহার ক'রে চলবার ঐকান্তিক অনুরোধ জানালেন। লণ্ডনে ও প্যারিসে মার্কিণ রাষ্ট্রদূতেরা হঠাৎ দেখতে পেলেন ওদেশের সরকারী মহল থেকে তাঁরা কেমন যেন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছেন। অনুরোধ করলেও প্রধান বা পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সাক্ষাত মেলে না। যে সব সরকারী মুখপাত্রদের সাক্ষাত মেলে তাঁরা কোন প্রশ্নেরই সদুত্তর দিতে পারেন

না; শুধু বলেন 'শান্তির পথই আমাদের একমাত্র পথ।'

এই "শান্তির পথেই ২৯শে অক্টোবর সোমবার ভোর সাড়ে চারটার সময় ইজরেইল মিশর আক্রমণ করলো। শুরু হ'য়ে গেল এ যুগের সব চেয়ে কলঙ্কময় সাম্রাজ্যবাদী হামলা একটি স্বাধীনতা-গর্বিত নির্মাণ-উৎসুক প্রাচ্য রাষ্ট্রের উপর!

(আঠাশ)

"তারপর রইল ঐতিহাসিক প্রলোভন। প্রেরণা হিসাবে যথেষ্ট।" —টি লরেন্স

ডালেস যুদ্ধকে সাত সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়েছিলেন। আইসেনহাওয়ার এক সপ্তাহ এগিয়ে দিলেন। লণ্ডন, প্যারিস ও তেল-আভিভের মধ্যে ঠিক ছিল ইজরেইলী আক্রমণ শুরু হবে ৭ই নভেম্বর। কিন্তু ডেভিড বেন গুরিয়ন আইসেনহাওয়ারের কঠিন সতর্ক বাণী পেয়ে আক্রমণের তারিখে এক সপ্তাহ এগিয়ে দিলেন। লণ্ডন ও প্যারিসে খবর দেওয়া হল। ইডেন পড়লেন মহাবিপদে। এক সপ্তাহ সময়ের ফাঁক হঠাৎ পূর্ণ করা সহজসাধ্য নয়। সোমবার ইজরেইলী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল মিশরের উপর। মঙ্গলবার ভোরে মলে ও পিনু এলেন লণ্ডনে ইংগ-ফরাসী চরমপত্রের খসড়া তৈরী করতে। এতদিন এই চরম-পত্রের কথা ইডেন ও লয়েড ছাড়া ইংলণ্ডে কেউ জানতো না। এবার ইডেন তাঁর মন্ত্রি-মণ্ডলীর সভা ডাকলেন। চরমপত্রের কথা তুলতেই দেখা দেখা গেল বেশ কয়েকজন মন্ত্রী বিরোধী। তীব্র বাদানুবাদ, এমনকি ব্যক্তিগত আক্রমণ সভার আবহাওয়াকে অপ্রীতিকর করে তুললো। কিন্তু ইডেন তখন নিজেকে কবুল করে ফেলেছেন। ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটেরই অন্য এক কক্ষে বসে আছেন ফ্রান্সের প্রধান ও পররাষ্ট্র-মন্ত্রী। মতবিরোধ সত্ত্বেও ক্যাবিনেট চরম-পত্র অনুমোদন করল।

দুপুরের আগেই পার্লামেণ্টে গুজব রটে গেল যে, সেদিন রাত্রে বৃটেন ও ফ্রান্স মিশর আক্রমণ করছে। পার্লামেণ্ট বসবার মাত্র পনের মিনিট আগে ইডেন বিরোধী দলের নেতা গেটস্কেলকে ডেকে চরম পত্রের কিছু পরিচয় দিলেন। প্রায় সেই সময়েই পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন বড়ো সাহেবের ঘরে ডাক পড়লো মার্কিন রাষ্ট্রদূতের। এই সর্বপ্রথম আমেরিকাকে বলা হ'ল ইংগ-ফরাসী কর্মধারার কথা। চরমপত্র ও তার-পরে বৃটেনের মতলবের কথা শুনে একটি কথা না বলে রাষ্ট্রদূত গম্ভীর মুখে দূতাবাসে ফিরে গিয়েই আইসেনহাওয়ারকে টেলিফোন করলেন। তখন পররাষ্ট্র দপ্তরের সেই বড়ো সাহেব ডেকে পাঠালেন ইজরেইল ও মিশরের রাষ্ট্রদূতদের একই খবর দেবার জন্যে। ইজরেইল দূত আগেই সব জানতেন; তাঁকে ডাকাটা শুধু লোক-দেখানো চাল। মিশরের রাষ্ট্রদূত প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেন, পরে নিদারুণ ক্রোধে প্রতিবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বড়ো সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে একজন লোক এই কূটনৈতিক নাটকের অভিনয় উপভোগ কর-ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের সোস্যালিস্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ক্রিশ্চিয়ান পিনু।

চরম পত্রের সংবাদ পেয়ে আইসেন-হাওয়ার এমন রেগে গেলেন যে, অসতর্ক মুহূর্তে বৃটেনকে লক্ষ্য করে তাঁর মুখ থেকে অরাষ্ট্রপতিসুলভ গালাগাল বেরিয়ে

গেল। অত রাগতে ম্যাক তাঁকে কেউ কখনো দেখেননি। তাঁকে একেবারে কিছুই ঘুণাক্ষরে না জানিয়ে বৃটেন ও ফ্রান্স এত-বড় একটা আক্রমণের সূচনা করবে তিনি বা ডালেস তা কল্পনাও করতে পারেননি। পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র সাংবাদিকদের সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন, "বৃটিশ সরকার এখন যাই বলুন না কেন, মার্কিন গবর্নমেণ্টকে এবিষয়ে কোন রকমেই খবর দেওয়া হয়নি।" ইডেন ও মলের চরম পত্রকে তিনি বর্ণনা করলেন, "বর্তমান যুগের ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম চরম পত্র।"

শুধু নিষ্ঠুরতমই নয়, এ এক অতি অভিনব চরম পত্র। বারো ঘণ্টার মধ্যে ইজরেইল ও মিশর বাহিনীদের সুয়েজ কানাল হতে দশ মাইল দূরে হটে যেতে হবে। বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য দখল করবে সুয়েজ, পোর্ট সৈদ এবং ইসমাইলিয়া। কেন? দুই যুদ্ধমান বাহিনীকে পরস্পর থেকে আলাদা করতে, সুয়েজ খালকে নিরাপদ করতে। যদি ইজরেইলী ও মিশরী সৈন্য অপসারণ না করে, বিপুল সংখ্যায় ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। যদি অপসারণ করে? তথাপি ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্য অবতরণ করবে! কেননা, জলপথকে নিরাপদ রাখা চাইই। মিশর ও ইজরেইলকে রাখা চাই ব্যবধানে।

ইডেন-মলের এই নিতান্ত ব্যক্তিগত সমরাভিযান—অবশ্য ফরাসী দেশের বেশির ভাগ মানুষই মলের সপক্ষে ছিল—কঠিন প্রতিরোধ পেল চারদিক থেকে। বৃটেনের শ্রমিক দল দুর্দম্য প্রতাপে এই মারণ্যক রাজনীতির বিরোধিতা করে সমস্ত মনুষ্য সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিল, বৃটেনের নামকে কলঙ্ক থেকে বাঁচিয়েওছিল অনেক-খানি। লেবার পার্টির নেতৃত্বে সে গণবিক্ষোভ বৃটেনে সংগঠিত প্রতিরোধে পরিণত হয়ে ইডেনের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল, ও দেশের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। ইংরাজ তার চারশ' বছরের ঔপনিবেশিক জীবনে অনেক অন্যায় সমরে অবতীর্ণ হয়েছে: বুওর যুদ্ধ নিয়েও একদা ইংলণ্ডে বেশ আলোড়ন হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সালের মিশর আক্রমণের বিরুদ্ধে বৃটেনের জনমত যেভাবে ক্ষেপে উঠেছিল, তার নজীর ইংরাজের ইতিহাসে নেই। যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইডেন ও মলে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেন তা হচ্ছে জাতিপুঞ্জ। এখানে প্রতিরোধের পুরোভাগে আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত। ক্রুদ্ধ আইসেনহাওয়ার জাতিপুঞ্জে মার্কিণ প্রতিনিধি হেনরী ক্যাবট লজকে নির্দেশ দিলেন, যে কোন উপায়ে সমরাভিযান বন্ধ করার।

স্বস্তি পরিষদের প্রথম বৈঠকে লজ নিজেই একটি প্রস্তাব পেশ করলেন ইজরেইলকে মিশর থেকে অপসারণ করতে আহ্বান জানিয়ে আর সব দেশকেই ইজরেইলকে সাহায্য করতে বারণ করে। সাতটি দেশ এ প্রস্তাব সমর্থন করে—মাত্র দুটি বৃটেন ও ফ্রান্স বিপক্ষে ভোট দেয়। বেলজিয়ম, এমনকি অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত সেদিন ইংলণ্ডকে সমর্থন করতে পারেনি। বৃটেন এই সর্বপ্রথম তার 'ভেটো' ব্যবহার করে এ প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। তৎক্ষণাৎ রাশিয়া উপস্থিত করে নতুন প্রস্তাব; ইজরেইল এক্ষুনি ১৯৪৮ সালের যুদ্ধ-বিরতি সীমান্তে পিছু হটে যাক। এ প্রস্তাবও সাতটি ভোট পায়, অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। বৃটেন ও ফ্রান্স পুনরায় 'ভেটো' প্রয়োগ করে। স্বস্তি পরিষদের আলোচনা-বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার পিয়ারসন ডিক্সন ফরাসী প্রতিনিধির সঙ্গে আড়ালে কথাবার্তা বলতে চাইলে লজ তাঁর অনুরোধ অবহেলার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। পরিষদের বৈঠক শেষ হতেই ফরাসী প্রতিনিধি কর্নেট জেন্টিল অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

জাতিপুঞ্জে সমগ্র পৃথিবীর বিরোধিতা ইডেনকে ভয়ার্ত, ক্রুদ্ধ, পঙ্গু এবং ব্যর্থ করে দেয়। সাতবার বৃটেন ও ফ্রান্স জাতিপুঞ্জে তিরস্কৃত হয়েছে কমনওয়েলথের তিনটির বেশি দেশ বৃটেন ও ফ্রান্সকে সমর্থন করেনি। তারও মধ্যে একটি ইজরেইল। অন্য দুইটি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড।

ইডেন ও মলে তৃতীয় বাধা পান আরব দেশগুলি থেকে, চতুর্থ কমনওয়েলথ অন্তর্বর্তী কানাডা, ভারত ও সিংহল থেকে। পাকিস্থানও বাধা দেয়, কিন্তু তা বাগদাদ গোষ্ঠীর গোঁজামিল বাধার সঙ্গে একজোট। কানাডা প্রথম থেকেই বৃটেনের কর্মপদ্ধতির নিন্দা করে এবং জাতিপুঞ্জের যে আন্তর্জাতিক শান্তি সৈন্য বাহিনী তৈরি হয়, তাও কানাডারই উদ্যোগে। ভারত প্রতিবাদ করেই নিরস্ত থাকেনি। একদিকে কৃষ্ণমেনন যেমন জাতিপুঞ্জে মিশরের স্বরাজ ও জাতিগত অধিকারের শ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষীর ভূমিকা গ্রহণ করেন, তেমনি অন্যদিকে নয়া-দিল্লীতে মিলিত হয়ে ভারত, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও বর্মা সমস্ত এশিয়ার পক্ষ থেকে মিশর আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

এই চারদিকের বাধার মধ্যে ইডেনকে সবচেয়ে পঙ্গু করে দেয় আমেরিকা, সবচেয়ে আতঙ্কিত করে রাশিয়া। (ক্রমশ)

বাংলা ভাষার ওটা সবচেয়ে আদরের শব্দ!

ইনডীড্। কি ওটার বাংলা?

শালা।

জন উচ্চারণ করে শালা। চমৎকার fine sounding world! Sala! Sala! তারপর নিজ মনেই বলে উঠল!

সুরা-সাম্য

রাম বসু বাড়ি ফিরে চলেছে এমন সময় শুনতে পেলো কে যেন পিছন থেকে ডাকছে মিঃ মুন্সী, মিঃ মুন্সী।

কে ডাকে? পিছন ফিরে দেখে মিঃ স্মিথ দ্রুতপায়ে তার দিকে আসছে।

মিঃ স্মিথ বে, গুড ইভনিং। তারপরে খবর কি? গুড ইভনিং। এদিকে কোথায় এসেছিলে?

অনেকদিন রেশমীকে দেখিনি তাই একবার দেখে এলাম! তোমার সঙ্গেও অনেকদিন পরে দেখা, আশাকরি সব কুশল।

এক রকম কুশল বই কৈ। মিঃ মুন্সী তোমার কি খুব তাড়া আছে?

আমার কখনো তাড়া থাকেনা। যে-কাজটা সম্মুখে এসে পড়ে তখনকার মতো সেটাই আমার একমাত্র কাজ।

এখন কি কাজ তোমার সম্মুখে?

বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই কাজ।

[illegible] আমি যদি একটু গল্পগুজব করতে অনুরোধ করি।

তখন সেটাই হবে একমাত্র কাজ!

তুমি incomparable মিঃ মুন্সী।

আমারও তাই বিশ্বাস।

দুইজনে এক সঙ্গে হেসে উঠল।

জন বললে চলোনা কাছেই আমাদের বাড়ি, একটু গল্পগাছা করা যাক্, রাত তো এমন হয়নি।

রাম বসু বুঝলো গরজ কিছু বেশি, নইলে কোন শ্বেতাঙ্গ এমন ক'রে কৃষ্ণাঙ্গকে বাড়িতে আহ্বান করে না।

চলো ক্ষতি কি?

বাড়ি এসে পৌঁছে লিজাকে বললে, মিঃ মুন্সীকে নিয়ে ড্রয়িং রুমে আমি একটু স্কলারলি ডিস্কাশন করছি, এখন যেন কেউ না আসে দেখো।

লিজা হেসে বললে কেউ যাবে না। তবে ব্রাণ্ডি সোডা পাঠিয়ে দেবো কি? শুনেছি স্কলারলি ডিস্কাশনে ও দুটো বস্তু অপরিহার্য।

জন হেসে বললে মিথ্যা শোননি, দাও পাঠিয়ে।

সোডার সঙ্গে উপযুক্ত মাত্রায় মিশ্রিত ব্রাণ্ডির মহৎ গুণ এই যে ওতে বয়স বিদ্যা লিঙ্গ জাতি বর্ণ ভাষা প্রভৃতি লৌকিক গুণ অতি সত্বর লোপ পায়। এখানেও তার অন্যথা ঘটলো না। অল্পক্ষণের মধ্যেই জনের শাদা চামড়া কটা ও মুন্সীর কালো চামড়া ফিকে হ'তে হ'তে মৈত্রীর সীমান্তে এসে ঠেকলো—তখন মুখোমুখি হ'য়ে দুটিমাত্র মানুষ; বয়স, বর্ণ, বিদ্যা ইত্যাদি তুচ্ছ পার্থক্য বেঙাচির লেজের মতো গেল খ'সে।

মুন্সী ইউ আর এ জলি গুড ফেলো

সো ইউ আর জন।

দেখো মুন্সী তোমাদের হিন্দু রিলিজন অতি আশ্চর্য বস্তু।

সেই রকম ধারণাই ছিল কিন্তু পাদ্রী ব্রাদার-ইন-ল'দের সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে অবধি হতমান হ'য়ে আছি।

আচ্ছা মুন্সী তুমি পাদ্রীদের ব্রাদার-ইন ল বললে কেন?

How I wish Miss Oylmer's brothers were my Sala !

হবে জন, হবে। দুঃখ করো না।

আবেগ কম্পিত কণ্ঠে জন জিজ্ঞাসা করে—কেমন ক'রে জানলে মুন্সী?

ঐ যে হিন্দু রিলিজনের কথা বললে না—তারই কৃপায়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে নেই এমন জিনিস নেই।

ইনডীড!

এখন তোমার একজন রাইভেল জুটেছে।

কি করে জানলে মুন্সী?

প্রসঙ্গের উত্তর না দিয়ে মুন্সী বলে লোকটা খুব মোটা।

আশ্চর্য।

লোকটা জঙ্গী সেপাই।

ঠিক কথা।

আপাতত মিস এলমার তার প্রতি অনুরক্ত।

জিজ্ঞাসা ও কান্নার মাঝামাঝি সুরে জন ফুকরে ওঠে, আমার কি হবে মুন্সী?

ঋষি বাক্যের গাম্ভীর্যে রাম বসু বলে মিস্ এলমার তোমারই হবে।

ঋষিবাক্যের আশ্বাসে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে জন বলে তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো মুন্সী, সেই ব্যবস্থাই করে দাও।

বেশ তাই হবে, বলে বসুজা।

শুনেছি তোমাদের Stastras-এ yogic rites দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।

শাস্ত্রগৌরবে স্ফীতবক্ষ রাম বসু সংক্ষেপে বলল যায়ই তো। কিন্তু সে যে ব্যয়সাপেক্ষ।

ব্যয়ে আমি কুণ্ঠিত নই। তুমি একটু চেষ্টা করে ঐ জঙ্গী সেপাই বেটাকে কাত করে দাও। লোকটা পাওয়ারফুল কিন্তু শুনেছি তোমাদের Colegot-এর (কালী-ঘাট) Coli (কালী) একেবারে অলমাইটি!

নিশ্চয়, বলে কালীর প্রাপ্য সম্মান আত্ম-সাৎ করে নেয় রাম বসু।

তুমি শীঘ্র ব্যবস্থা করো।

তুমি চিন্তা করো না জন, আমি কালকেই yogic rites-এর সবচেয়ে বড় এক্স-পার্টের সঙ্গে দেখা করবো—' তার ক্রিয়ায় মানে ফাংকশানে হাতে হাতে ফল মানে হ্যাণ্ড টু হ্যাণ্ড ফ্রুট পাওয়া যায়।

তবে তাই করো মুন্সী, আপাতত এই নাও বলে মুন্সীর হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিল জন।

দেখো না জন তোমার রাইভেল ব্রাদার-ইন-ল-কে কেমন জব্দ করি?

ও কি মুন্সী, তুমি গোড়াতেই বিশ্বাস ঘাতকতা শুরু করলে?

কেন? সত্যই বিস্মিত হয় মুন্সী।

ওই মোস্ট এনার্ডিয়ারিং টার্মটা ব্যবহার করলে ঐ গোঁয়ারটা সম্বন্ধে।

রাম বসু বুঝলো তার ব্যাখ্যাতেই ভুলের মূল, বলল, আই অ্যাম সরি! ভুল হয়ে গিয়েছে।

নেভার মাইণ্ড ম্যান! এখন মিস এল-মারের ভাই শীঘ্র যাতে আমার ব্রাদার-ইন-ল হতে পারে তার ব্যবস্থা করে দাও! ওটার বাংলা কি যেন বললে ?

শালা।

Sala ! fine ! It tastes as sweet as Miss Aylmer ! Sala !

আসন্ন জয়ের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় সে এমনি উল্লসিত হয়েছিল স-সোডা ব্রাণ্ডিতে দুটি গেলাশ পূর্ণ করে একটি বসুজার হাতে তুলে দিয়ে বলল—মুন্সী বিদায় নেবার আগে let us drink to the honour of Eternal, Universal, Ever present, All powerful.

রাম বসু বললো, ব্রাদার ইন ল।

জন বললো, নো, নো, বাংলা শব্দটা অনেক বেশি মিষ্টি, শালা।

তখন দুজনে সমকণ্ঠে উচ্চারণ করলো শা-লা।

অগ্নিময় পানীয় যথাস্থানে পৌঁছল।

বিদায় নেবার মুখে রাম বসু বলল উদ্বিগ্ন হয়ো না জন, আমি কালই এক্স-পার্ট ওপিনিয়ন নেবো—হ্যাণ্ড টু হ্যাণ্ড ফ্রুট।

জন বলল নাঃ এই ব্যবসায়ে কিছু নেই। কাল থেকেই আমি যথারীতি শুরু করবো 'হিন্দু স্টুয়ার্টের' কাছে।

রূপচাঁদ পক্ষী

পরদিন সকালে পটলডাঙ্গায় রূপচাঁদ পক্ষীর আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল রাম বসু।

রূপচাঁদ পক্ষীর পিতৃদত্ত নাম সনাতন চক্রবর্তী বা ঐরকম একটা কিছু। মহা-পুরুষগণের জীবনে প্রায়ই দেখা যায় যে, স্বোপার্জিত পরিচয়ের তলে কৌলিক পরিচয় চাপা পড়ে যায়—এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্বোপার্জিত রূপচাঁদ পক্ষী পৈতৃক সনাতন চক্রবর্তীকে চাপা দিয়ে লুপ্ত ক'রে দিয়েছে।

সেকালে যে-সব মহাপুরুষ একাসনে বসে একশ' আট ছিলিম গাঁজা খেতে পারতো তারা একখানি ক'রে ইঁট পেতো। এইভাবে উপার্জিত ইঁটে বাসভবন নির্মাণ করতে পারলে পক্ষী পদবী পাওয়া যেতো। তখনকার কলকাতায় দেড়জন পক্ষী ছিল। পটলডাঙ্গায় রূপচাঁদ পক্ষী আর বাগবাজারে নিতাই হাফ পক্ষী। হাফ পক্ষীর অর্থ এই যে, বাড়ির চার দেয়াল গড়বার পরে হঠাৎ সাধনোচিত ধামে প্রয়ান ক'রে নিতাই। তাই লোকে তাকে হাফ পক্ষী বলতো। বস্তুত রূপচাঁদই একমাত্র পক্ষী। নিতাইয়ের কথা উঠলে রূপচাঁদ দুঃখ ক'রে বলতো, ছোকরার এলেম ছিল, অকালে না মরলে একটা আস্ত পক্ষী হ'তে পারত। তারপরে ভবিষ্যতের জন্য খেদ ক'রে বলত, এসব প্রাচীন প্রথা ত একরকম উঠেই গেল, আমার মতো দুই চারজন মরলেই সব

ফরশা। এখনকার ছেলেরা সব গোঁফ না উঠতেই 'এলে' 'বেলে' পড়ে, ফিরিঙ্গির বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দি হ'তে যায়—কৌলিক প্রথা রক্ষায় আর কারো আগ্রহ নেই। দিনে দিনে কি হ'তে চলল হ্যাঁ! বলে সে ছিলিমের সন্ধান করে।

যাই হোক, রূপচাঁদের ভরসা ছিল যে, তার জীবনকালে এ প্রথা লুপ্ত হ'তে সে দেবে না—বলা বাহুল্য, সে প্রতিজ্ঞা সে রক্ষা ক'রেছিল।

শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ঘরের উঠতি বয়সের ছোকরা রূপচাঁদ পক্ষীর আড্ডায় নিয়মিত যাতায়াত করত—আর সেখানে যে শাস্ত্র চর্চা করত না তা বলা নিষ্প্রয়োজন। পাদ্রীদের সঙ্গে জুটবার আগে এক সময়ে রাম বসুও যাতায়াত করত তার আড্ডায়, সেই সূত্রে পরিচয়। রাম বসু জানত যে, মুখ্য গুণের আনুষঙ্গিক আরও অনেক গুণের অধিকারী রূপচাঁদ পক্ষী। তুকতাক্, মন্ত্রতন্ত্র, তাবিজ কবচ, ঝাড়ফুঁক এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। বস্তুত তার ভরসাতেই রাম বসু জনের অনুরোধ স্বীকার করেছিল।

রাম বসু রূপচাঁদ পক্ষীর দরজায় ধাক্কা দিতে ভিতর থেকে ভাঙা গলায় কর্কশ স্বরে ধ্বনি হ'ল—ক্যা, ক্যা, বলি এত সকালে ক্যাহে।

দরজা খুলুন পক্ষী মশায়, চেনা লোক।

দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল একটি মূর্তি। দীর্ঘ কঙ্কাল, হাঁটু পর্যন্ত মলিন ধুতি, পায়ে খড়ম, খালি গা, জীর্ণ উপবীত, অত্যুজ্জ্বল কোটরগত চক্ষু, মুখমণ্ডলের বাকি অংশ গাল, কপাল, চিবুক প্রভৃতি অজস্র বলি চিহ্নিত, চুল শাদা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফও শাদা; বয়স পঁয়ত্রিশও হতে পারে আবার পঁচাত্তর হতেও ঠেক নাই।

প্রণাম পক্ষীমশায়।

ঠাহর করে দেখে নিয়ে গলায় ভাঙা কাঁসর বাজিয়ে বলল পক্ষী, ক্যা বসুজা যে। অনেক দিন পরে, হঠাৎ চিনতে পারিনি, তারপরে ভালো তো, বসো বসো।

জীর্ণ তক্তপোশের উপরে দুইজনে পাশাপাশি বসলো।

কেমন আছেন পক্ষী মশাই?

আর থাকাথাকি, এখন গেলেই হয়।

সেকি কথা, এরই মধ্যে গেলে চলবে কেন?

আর থেকেই বা কি করছি? এখনকার বড়লোকের ছেলেরা আর এদিকে ঘেঁষতে চায় না, ফিরিঙ্গি বেটাদের দেখাদেখি সব মদ ধরছে। মদে কি আছে হ্যা—বলে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালো বসুজার দিকে।

কিছু বলা কর্তব্য মনে ক'রে বসুজা বলল—যুগের ধর্ম কি করবেন বলুন।

এই কি একটা উত্তর হল! তুমি যে খিরিস্তান হলে হ্যা।

কিছুক্ষণ এইভাবে সময়োচিত কথাবার্তার পরে পক্ষী শুধালো—তারপরে কি মনে করে?

রাম বসু তখন আগমনের উদ্দেশ্য বিবৃত করলো। সমস্ত বিবরণ ধীরভাবে শুনে গম্ভীরভাবে পক্ষী বলল—তা হবে। কিন্তু এ যে খরচপত্রের ব্যাপার।

সে জন্য ভাববেন না, আপাতত কিছু রাখুন বলে জন প্রদত্ত অর্থের কিয়দংশ পক্ষীর হস্তে সমর্পণ করলো রাম বসু।

মুদ্রা স্পর্শে তড়িদ্‌স্পর্শের লক্ষণ ঘটলো পক্ষীদেহে, সে বেশ এঁটেসেঁটে জেঁকে বসলো, বললো, আর কিছু নয় প্রথমে একটা বগলা পুজো করে একটা বশীকরণ কবচ করতে হবে, কিন্তু সব প্রথমে চাই কালীঘাটে ষোড়শোপচারের একটা পুজো দেওয়া।

সে সবে বাধবে না, কিন্তু মেম সাহেব কি কবচ তাবিজ পরতে চাইবে—তাকে লুকিয়ে সব করা হচ্ছে কিনা।

সে একটা কথা বটে। তারপরে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, দেখো শাস্ত্রে সব রকম বিধানই আছে। কবচটা গোপনে একবার মেম সাহেবের মাথায় ঠেকিয়ে তার শয়ন গৃহে রেখে দিতে পারবে তো।

রাম বসু বলল তা পারা যাবে

তবেই হবে, বলল পক্ষী।

আচ্ছা পক্ষীমশায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কলিকালে কবচ তাবিজে ফল ফলে?

দেখো বাপু, মানলে কেউটে, না মানলে ঢোঁড়া—এই হচ্ছে গিয়ে তন্ত্রমন্ত্রের রহস্য।

তা তো বটেই, তবে কথা হচ্ছে কিনা ম্লেচ্ছগুলোর উপরে এসব ফলদায়ক হ'য়ে থাকে?

কেন হবে না? এই যে স্টুয়ার্ট সাহেব, হিন্দু স্টুয়ার্ট ব'লে যার নাম পড়েছে, শালগ্রাম পুজো না ক'রে যে জলগ্রহণ করে না, গঙ্গাজলে স্বপাক ক'রে হবিষ্যি খায়—এসব কেমন ক'রে হ'ল খোঁজ রাখো?

রাম বসুকে স্বীকার করতেই হ'ল যে, সে খোঁজ রাখে না।

উদ্‌গত পঞ্জর বুকের উপরে বারকতক চড় মেরে বল্‌ল—এই বান্দার কাজ। সব কথা বলবো, আর একদিন।

তারপরে বল্‌ল, সব ভালোয় ভালোয় হ'য়ে যাবে, সাহেবকে চিন্তা করতে নিষেধ ক'রে দিয়ো। মেমসাহেবের কপালে কবচটা স্পর্শ করাবার সাতদিনের মধ্যে বেটি এসে সাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়বে না? এমন কত গণ্ডা দেখলাম—হ্যাঃ।

রাম বসু বল্‌ল—তাহ'লে আজ উঠি। তাড়াতাড়ি গিয়ে সাহেবকে সুসংবাদ শুনিয়ে দি।

কবে আবার আসছ?

কালকেই—না হয় পরশু।

পরশু আবার কেন—কালই এসো। এমনি গোটা পঞ্চাশেক টাকা হাতে ক'রে এসো।

টাকা আনতে ভুলবে না ব'লে রাম বসু রওনা হ'য়ে গেল।

এমন সময়ে পিছন থেকে ভাঙা গলায় সজোরে বেজে উঠ্‌ল—সিক্কা টাকা, ভায়া, সিক্কা টাকা।

রাম বসু ইঙ্গিতে জানালো, তাই হবে।

(ক্রমশ)

ধরমশালা

প্রভাত দেবসরকার

'হোলি' গেটের সামনে বেলা নটা থেকেই টাংগাওয়ালারা চেঁচাতে শুরু করে। ঘোড়া সুদ্ধ টাংগাগুলোকে রাস্তার ওপরে টেনে এনে পথ জোড়া ক'রে রাখে যতক্ষণ না যাত্রী পায়।

ঘোড়ার নাদে আর টাংগাওয়ালার চিৎকারে এ সময়টা এ জায়গায় কান পাতবার বা পা রাখবার উপায় থাকে না। যাত্রী ধরার জন্য অদ্ভুত ব্যূহ রচনা করে রাখে মথুরার টাংগাওয়ালারা।

"বড়ি লাইন কো? জংশন কো!"

"ছটি লাইন কো? কাছারী কো!"

দশ পনের মিনিট ধরে সে এক অদ্ভুত শব্দতাধর্ষিত "হোলি" গেটের সামনে।

বেলা নটা বিয়াল্লিশে আসবে পাঞ্জাব মেল বড় লাইন মথুরা জংশন স্টেশনে আর বেলা নটা বাহান্নয় আসবে কাঠগুদাম থেকে ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার ছোট লাইন মথুরা ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশনে। দু' মাইল আর সওয়া মাইল। কিন্তু চিৎকার শোনা যায় বিশ মাইল দূর থেকে।

তেলচিটে গামছাটা ধব্‌ধবে কামিজের ওপর চাপিয়ে নীলাম্বর ছেলেকে বললে, তিথুয়া, তুই এই টাংগায় ওঠ, পাঞ্জাব মেল দেখিস্।

তীর্থনাথ বললে, তুমি? ওইনা ঐটাতে ছোট লাইনে যাবো!

নীলাম্বর রাজী হলো না। সওয়া মাইল তার কতদূর, গাড়ি আসবার আগেই হেঁটে যাবে স্টেশনে। শুধু শুধু পয়সা খরচ করবে কেন।

বড় লাইনের টাংগায় উঠে তীর্থনাথ বললে, ছ' পয়সা তো! ওই না ঐটায়—

একটা দোয়ানি ছেলের হাতে দিয়ে নীলাম্বর চোখ কুঁচকে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বললে, ছে পয়সা ভি পয়সা আছে। তুমি যাও, আমি হাঁটতে পারবে!

চার সওয়ারী পুরো হ'তে বিশ্বনাথের টাংগা ছেড়ে গেল। ঘোড়াটা ধড়মড় ক'রে উঠলো।

তীর্থনাথ চেয়ে দেখলে, গামছাটা মাথায় চাপিয়ে নীলাম্বর খালি পায়ে হেঁটে চলেছে ছোট লাইনের দিকে। কেমন থপ্ থপে হ'য়ে গেছে তার বাবা!

একেবারে যে গাড়ি-ঘোড়ায় ওঠে না, তা নয়—পারতপক্ষে না। বড় কঞ্জুস প্রকৃতির নীলাম্বর চৌবে! সাত-পুরুষ পাণ্ডা মথুরার।

টাংগাওয়ালা চেনা, কম ক'রে তারও তিন পুরুষ টাংগা চালাচ্ছে মথুরায়—বড় লাইন, ছোট লাইন থেকে যাত্রী কুড়িয়ে আনছে। ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে দিয়ে বললে, চৌবে লোক বড় পয়সা চিনেন, পয়দল যে দেহেলী যানে সকতা!

স্পষ্টই বিদ্রূপ চৌবে চরিত্রে। ছোট জাত টাংগাওয়ালা! ছোট মুখে বড় কথা! গুম হ'য়ে রইলো তীর্থনাথ। বাপের জন্য তারই নিজের লজ্জার শেষ নেই। রোজই পিতা-পুত্রে বিরোধ বাধে।

বড় ডাকখানা পেরিয়ে কাসটিলা ছাড়িয়ে বড় লাইনের পথটা বেঁকে যায়, ছোট লাইনের সড়ক সোজা 'হোলি গেটের' নাকের সিধে!

বাপকে আর দেখতে পায় না তীর্থনাথ। তেমনি থপ্ থপ্ ক'রে চলেছে হয়তো, কাঠগুদাম ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার আসতে আর দেরি নেই। ইচ্ছে করলে কি আর একটা সাইকেল রিক্সায় উঠে বসতে পারতো না। না উঠলো না, হেঁটে যাব, পয়সা বাঁচাব! 'স' মিল কি দূর নয়?

বাপ-বেটায় বিরোধটা খরচপত্তর নিয়ে। এক পয়সা এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। কোন পয়সা নিজে হাতে নেবার জো নেই তীর্থনাথের। বাপকে হিসেব বুঝিয়ে দিতে হবে পাই-পয়সার যাত্রীদের কাছ থেকে পাওনার। রোজ!

কাল একচোট হ'য়ে গেছে। এক শাঁসাল মক্কেল পাকড়েছিল নীলাম্বর কিন্তু মক্কেলটি তীর্থনাথকেই অবলম্বন করেছিল। কচি মুখে, কিশলয় কান্তি আকৃষ্ট করেছিল। নীলাম্বর সরে গিয়েছিল, বৃথা বাগাড়ম্বর!

সেই যাত্রীকে অল্পে রেহাই দিয়েছে তীর্থনাথ। সারা মথুরার পথ-ঘাট ঘুরিয়ে দুপুর রুদ্দুরে টো-টো ক'রে মাত্র দু টাকা বাপের হাতে তুলে দিয়েছে দিন-শেষে।

নীলাম্বর অবিশ্বাস করেছে। নিশ্চয়ই মোটা অংশ সরিয়ে রেখেছে তিথ্য়া। যাত্রীর মুখ দেখে ট্যাঁকের দৌড় বুঝতে পারে নীলাম্বর, সাত পুরুষে তাদের পাণ্ডাগিরি করছে! শয়তানি করছে আপন সন্তান!

টাকা দুটো ছুঁড়ে ফেলে গর্জন ক'রে উঠেছিল নীলাম্বর, দো রুপয়া! আউর?

প্রথমটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল তীর্থনাথ। গম্ভীর মুখে বললে, আর না! নেই—

ভেঙচে উঠেছিল নীলাম্বর, আর না! চালাকি!

বাপের মুখে উত্তর করেনি তীর্থনাথ। সত্যি, দু টাকার এক পয়সাও সে সরিয়ে রাখেনি। পয়সায় তার দরকার নেই।

নীলাম্বর দস্তুরমত ক্ষেপে গিয়েছিল। সারা দেহে তরঙ্গ তুলে মুখে অকথ্য ভাষা উচ্চারণ ক'রে বললে, নিকাল পয়সা! বড় পয়সা চিনেছো এই বয়সে!

কানে আঙুল দিয়েছিল তীর্থনাথ। তার উনিশ বছর জীবনে নিজে হাতে কোনদিন উনিশটি পয়সা খরচা করেছে কিনা সন্দেহ! পয়সা চিনলে আর এভাবে উঞ্ছবৃত্তি করতে হয় না, এমনি তাড়ন অকারণে!

চোখ ছল ছল ক'রে তীর্থনাথ বলেছিল, শুধু শুধু গালি দিচ্ছো কেন?

তেমনি উত্তেজিত নীলাম্বর বলেছিল, না, পোদ্দার করবো তোমাকে! গণেশের পুত্র তুমি যে!

চুপ করেছিল তীর্থনাথ। অকারণে চীৎকার করছে নীলাম্বর, দিন-দিন মানুষটো যেন কেমন হ'য়ে যাচ্ছে। পয়সা পয়সা ক'রে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। স্ত্রীপুত্র কাউকে বিশ্বাস করে না।

কি চায়?

সত্যি কোন গুণের অধিকারী নয় তীর্থনাথ। এতখানি বয়েস পর্যন্ত বাপ-পিতামহের ব্যবসা ছাড়া আর কিছু জানলো না। সেই পাণ্ডাগিরি। তাও লজ্জায় মাথা কাটা যায় তীর্থনাথের। যাত্রীর পিছনে পিছনে ঘোরা—বাঁধা বুলি আউড়ে যাওয়া—একবার যখন মথুরায় এসেছেন দ্বিতীয়বার আর জন্ম নিতে হবে না। বহুৎ পুণ্য আছে, দ্বারকাধিশ, বাঁকে বিহারীজীর কাছে যা কিছু চাইবেন সব আপনার সফল হবে। ধামে এসেছেন, আর আপনার কিছু ভাবনা নেই—কেবল দান, ধ্যান করুন মশাই! এক গুণ দিলে—

শুনে কোন কোন যাত্রী আবার মুখের দিকে এমন ক'রে চেয়ে থাকে তীর্থনাথের যে অপ্রস্তুতের একশেষ—মথুরার কথা বলতে বলতে অযোধ্যা, কাশী, কাঞ্চির কথা বলে ফেলে, মুখস্থ!

অনেকে আবার উপভোগ করেন। দুধের মুখে পাকা বুলি শুনতে ভালই লাগে।

কথায় যদি চিঁড়ে ভিজতে দেরী হয়, নীলাম্বর শিখিয়ে দেয়, এটা-ওটা ক'রে চেয়ে নিবি পয়সা যাত্রীর পারলৌকিক সুখ বিধানের জন্যে! যত মূর্তি আছে, যত 'থান' আছে সব জায়গায় 'মানৎ' করতে বলবি—পয়সা আসবার ভাবনা থাকবে না।

আর তাতেও যদি দেখিস আশা নেই তা হ'লে—নীলাম্বর ছেলের কাঁচুমাচু মুখের দিকে খানিক চেয়ে কি ভেবে নেয়, আরে পরদেশী সব ধর্মই করতে আসে না, বেড়াতে আসে, মজা করতে চায়, ফূর্তি-রঙদারি!

লোক তথা যাত্রী চরিত্রের একটা সন্ধান তীর্থনাথ রাখে না, বা কুশলী হ'য়ে উঠতে পারেনি!

নীলাম্বর তালিম দিয়ে বলে, জিনিস-পত্তর কিনাবে, গাড়ি-ঘোড়ায় উঠাবে, এখানে-ওখানে যাবে, সবার কাছ থেকে দস্তুরি নিবি। কেনাকাটা যত করাবি ততই লাভ। সাড়িয়া, চুড়িয়া, বর্তন, পেড়ে! পয়সা আপসে এসে যাবে!

তবু আশানুরূপ নয়, অনিশ্চিত এই রোজগার। প্রায় রোজই লেগে যায় পিতা-পুত্রে বিরোধ!

মনে মনে বিদ্রোহ করে তীর্থনাথ। না, এ নয়, এমন করে নয়। জীবিকার জন্যে আর কিছু করা উচিত।

তীর্থনাথও বলেছিল চড়া সুরে, আমি পারবো না আর এসব করতে!

লাঠির ঘায়ে অবাধ্য ছেলের মুখ তুড়ে দিতে গিয়ে নীলাম্বর বাধা পেলে, তীর্থনাথের মা এসে মাঝখানে দাঁড়িয়েছে পিতাপুত্রের।

হাতের লাঠি ফেলে দিয়ে নীলাম্বর গর্জন করতে লাগল। ঐ একটি জায়গায় নীলাম্বর জোঁকের-মুখে-নুনের মত। স্ত্রীকে বড় সমীহ করে নীলাম্বর।
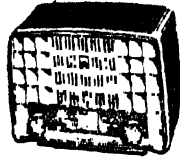
শুধু রূপ নয়, আরো কি যেন আছে সরস্বতী বাঈ-এর। তীর্থনাথকে কোলের কাছে টেনে, কটাক্ষে স্বামীকে ভর্ৎসনা করলে। মুরোদ যাদের নেই তারাই এমনি ক'রে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে 'লড়াই' করে।

মায়ের আশ্রয় চায়নি তীর্থনাথ, বোঝা-পড়া ক'রতে বাপের মুখোমুখি দাঁড়াতে চেয়েছিল। মায়ের হাত ছাড়িয়ে নীলাম্বরের সামনে এসে উদ্ধত মুখে বলেছিল, মার! মার ভালো যেতনা খুশ!

লাঠি ফেলে তখন নীলাম্বর নিশ্চেষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। দৈত্য-কুলে প্রহ্লাদ জন্মেছে! হারামী!

অঢেল সময়ের দেশ কৃষ্ণ-জনম-ভূমি মথুরা ক্রমেই যেন মাপে ছোট হ'য়ে আসছে। সে প্রাচুর্য আর নেই কোনখানে। লেবু-কচলে-তেতো করার মত যাত্রীরা তিক্তবিরক্ত, সহজে হাত খোলে না কারো। পাণ্ডা ছাড়া আরো অনেকে জুটেছে যাত্রীদের 'মদৎ' করতে, যাত্রী-নিবাস মাছি-ভন-ভন ক'রছে। অনেকে হোটেল খুলেছে যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে। ঐসব দুর্গন্ধ গলির মধ্যে কানা মাছি হ'য়ে কেন থাকবে যাত্রীরা!

ধরমশালা নয় যেন গো-শালা! পাণ্ডাগুলো কি মনে করে যাত্রীদের! চলেছিল আর চলবে না, তীর্থ করতে এসে কষ্ট-করার কোন অর্থ নেই। আত্মাকে কষ্ট দিয়ে ভগবানের দর্শন মেলে না। চৌবেদের কথা আর কে শুনেছে!

এখন খুশী মত হোটেলে থাক, খাও-দাও, ব্রজভূমি পরিক্রমা কর, কোন কষ্ট নেই। হোটেলওয়ালারা সব সাহায্য ক'রতে রাজী আছে, কেবল মুখের কথাটা খসালেই হ'লো।

সময়ে কেমন যেন দ' পড়েছে। কেবল নীলাম্বর বলে না, সব পাণ্ডার মুখে ঐ এক বুলি, শালা যাত্রীরা বড় চালাক হয়ে গেছে! শিখে প'ড়ে মথুরায় আসছে, সব জানছে! হোটেলওয়ালারা সব মাটি ক'রে দিলে!

এখানেও পিছু নেয়। যাত্রী এগিয়ে নিতে হোটেল মালিকরা লোক পাঠায়। ঠিক টাইমে হাজির হয় স্টেশনে। ছোট বড় কোনটাই বাদ দেয় না।

স্টেশন-কম্পাউণ্ডে কাঁটা-তারের বেড়া নড়া দাঁতের মত ঢিলে হ'য়ে গেছে। ঘোড়া-গাড়ি, মনুষ্য-মাল কেউ-ই আর তাকে গ্রাহ্য করে না। যথাক্রমে—

নিশ্চিন্তে তারের বেড়ার একটা 'পিলারে' ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে নীলাম্বর। গাড়ি এসে চলে গেছে, যাত্রীও সব গড়িয়ে গেছে জলধারার মত এদিক-ওদিক, এখনো পাগড়ী, ওড়না, ঘাগরার চিহ্ন খুঁজলে পাওয়া যায়।

কিন্তু কেউ ভেড়েনি নীলাম্বরের কথায়। হু না বুঝেকে নাক না সিঁটকে সবাই পাশ কাটিয়েছে দামোদর চতুর্বেদীর ধরমশালার নাম শুনে। এমন কি, দেহাতী রাজস্থানী-গুলোও কান পাতেনি। বেশ বুঝেছে, নীলাম্বর, চিঁড়ে ভেজার দিন ফুরিয়ে গেছে। ধরমশালার নামে আর ধর্মার্থীর মন টানে না! দুখানা খাঁচার মত কালি-ছাপ ঘরে দম বন্ধ ক'রে কেষ্টনাম ভজতে কেউ রাজী নয় আর! মথুরায় এখন অনেক ভাল বন্দোবস্ত হ'য়েছে রাত্রি-বাসের!

কম ক'রে তিন চারটে হোটেল থেকে লোক এসেছিল, ফার্স্ট প্যাসেঞ্জারের যাত্রী নিতে। পেয়েওছে তারা যাত্রী, টাঙ্গা, রিক্সা ভর্তি ক'রে মাল ও মানুষ নিয়ে গেল নীলাম্বরের চোখের ওপর দিয়ে। হাত ধরে না টানলেও মুখে অনুনয়-বিনয়ের অন্ত রাখেনি নীলাম্বর, হোটেল মালিকের লোকের সাথে এক হাত হ'তে হ'তে বেঁচে গেছে। যাত্রীরাই যখন চায় না, তখন নীলাম্বরকেই হার মানতে হ'য়েছে, সরে দাঁড়িয়েছে—অনন্যোপায় আর যাত্রীর সামনে আর্জি পেশ করেছে—মথুরায় যত ধরমশালা আছে, যত যাত্রী-নিবাস আছে, যত কিছু আছে সব থেকে 'বাড়িয়া' দামোদর ধরম-শালা। আপনা ঘরের মত!

কিন্তু বৃথা। আজকাল যেমনি কানা তেমনি কালাও হ'য়েছে যাত্রীগুলো! পুরোন জিনিসের নামে চটা!

বড় লাইনে পাঞ্জাব-মেল এল, সিটি শোনা যাচ্ছে। কে যানে 'বিশুয়াটা' কি করছে! সেখানেও হোটেলওয়ালার লোক আছে। তবে ছেলেমানুষ দেখে কেউ যদি আসে, কারো মন ভেজে।

ছেলেটা বড় মুখ-চোরা। কথা বলতে পারে না। কতদিন নীলাম্বর তালিম দিয়েছে—বলবি, এ বড় পুণ্য স্থান আছেন, এখানে স্বয়ং ভগবান জন্মেছিলেন, সেই ভগবানের কৃপা পেয়েছিল দামোদর চৌবের পূর্বপুরুষ, যে ঘরে আপনি থাকবেন সেখানে একদিন শ্রীকৃষ্ণজীর পায়ের ধুলো পড়েছিল, এখনো পায়ের চিহ্ন আঁকা আছে মশাই!

কিচ্ছু বলতে পারে না ছোকরা। চড় মেরে গাল বেঁকিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কোনই সুসার হ'লো না, হাতের দোসর হ'লো না অত বড় ছেলে! আবার তর্ক আছে! মায়ের আদুরে ছেলেটা খারাপ হ'য়ে গেল। সুন্দরে বিশ্রী! কি হবে ও-ছেলেয়?

ঐ বয়সে নীলাম্বর বাপকে কত সাহায্য করেছে। গাদা গাদা যাত্রী জুটিয়ে এনে দামোদর চতুর্বেদীর ধর্মশালায় পুরে দিয়েছে। দুখানা ঘরে তিল ধারণের জায়গা থাকতো না বারো মাসে একদিনও!

নিশ্চিন্ত থেকে বাঁচ দামোদর বলতো, নীলাম্বর থাকে কাজের ছেলে! আমি মরে গেলে ভাবনা নেই।

মাথা-কামান, লেঙ্গুটি-পরা, বুক-ডন-করা নীলাম্বর শুনে বুকের ছাতি ফুলিয়ে রাখতো। আরে বাপ কা বেটা যদি না হলি তো জন্মালি কেন, কি লাভ!

তাও চেহারাটা যদি মনের মত ক'রে ভুলতে পারতিস বুঝতুম। চোখ-বড়-বড়, নাক-উঁচু ঐ কার্তি মত ছেলের চেহারাটা দেখলে নীলাম্বরের রাগ হয়। ও ছেলেই নয়! গলা টিপে একদিন শেষ ক'রে দেবে। দেখা যাবে সরস্বতীয়া কি করে!

রোদ চড়া হ'য়ে উঠেছে। ধুলো উড়ছে, খাবারের ঠেলা গাড়িতে মাছি ভন্-ভন্ করছে, মুটিয়া ছায়া খুঁজছে।

স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে নীলাম্বর। কাঁটা-তারের ভোঁতা-মুখ কাঁটা একটা বেশ জোরে চাপ দিচ্ছে, ফুটে যাবে বুঝি!

নীলাম্বর বেড়া ছেড়ে গেটের সামনে এগিয়ে গেল। যদি ঝড়তি-পড়তি কাউকে পাওয়া যায়। আজকাল যাত্রীরা আবার গড্ডালিকা নয়, দেখে-শুনে চেয়ে-চেয়ে তবে স্টেশনের বাইরে পা বাড়ায়! আগে-ভাগে দরদস্তুর করে।

আরো এই যেন অবসর। সাথীরা কেউ নেই ধারে-কাছে। যা পাবে সব তার।

নীলাম্বরের চোখটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। গেটের সামনে টি স্টলে দু'জন বাবু বসে তখনো চা খাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে

হাসাহাসি করছে, এদিক-ওদিক চাইছে কৌতুক করে, একটা চামড়ার স্যুটকেশও আছে। একজনের কাঁধে ঝুলোনো ক্যামেরা চামড়ার খাপে মোড়া।

পায়ে-পায়ে নীলাম্বর এসে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াল। আড়চোখে বাবু দুটিকে দেখে নিলে। না, শাঁসাল! এখন—স্টলওলা কি বলতে যেতে নীলাম্বর চোখ টিপে ইশারা করলে। নীলাম্বর বেঞ্চির একধারে চেপে বসলে।

বাবু দুটির একজন লক্ষ্য ক'রে সংগীকে বললে, ঠেকাও এবার!

তারপর দুজনেই নিজেদের মধ্যে রহস্য ক'রে হেসে উঠলো।

অপ্রস্তুতের একশেষ, লজ্জায় নীলাম্বর কাঠ হ'য়ে আছে। বাবুরা হয়তো জানে না, দামোদর চতুর্বেদীর পুত্র নীলাম্বর চতুর্বেদী ভালই বাংলা জানে। চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় বাংলা ভাব-ভাষার সংগে ব্রজবাসীর পরিচয় অনেক কালের।

নীলাম্বরকে কিছু জিজ্ঞেস ক'রতে হ'লো না। বাবু দুটিই আলাপ ক'রলে যেচে পড়েঃ

কি ঠাকুর, মথুরার খবর কি? কেমন চল্‌চে দিনকাল?

নীলাম্বর মাথা নেড়ে হাসলে। এ হাসির অর্থ অনেক।

মথুরায় গোপিনী মেলে ঠাকুর? একেবারে কানের কাছে এসে একজন জিজ্ঞেস করলে।

তেমনি মাথাটা একদিক থেকে আর একদিকে গড়ালে নীলাম্বর।

ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে আর একটি বাবু বললে, ভাল তো? খাপসুরৎ!

নীলাম্বর উত্তর দিলে না, বাবু দুটির মুখের দিকে চেয়ে রইল। কেমন যেন থমকান ভাব।

টাংগায় উঠে বাবু দুটি বাজিয়ে নিলে, আসল গোপিনী চাই কিন্তু, বাজে মাল হ'লে এক পয়সাও পাবে না!

তথাস্তু। সারাপথ নীরব নীলাম্বর। কে জানে, বাবুরা কি ভাবছে। ব্রজের কথা কি শুনেছে। কি ধারণা এদের।

রাস্তায় বাবু দুটি নিজেদের মধ্যে আলাপ করলে, তারকটা একেবারে গুল মেরেছে, এতখানি পথ এলুম, কই বাবা একটিও নজরে পড়ল না! বললে, রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে! আবার হিসেব ক'রে বুঝিয়ে দিলে, শ্রীকৃষ্ণের সহস্র গোপিনী যদি ছ' হাজার বছর ধ'রে ছ'টি করেও খোলস ছেড়ে যায়, তা হ'লে মথুরায় গোপিনীর সংখ্যা কত দাঁড়ায়?

নীলাম্বর কাঠ হ'য়ে বসে আছে সামনের দিকে চেয়ে। শ্রীকৃষ্ণ নন্দিত গোপিনী সে কোথায় পাবে বাবু দুটির জন্যে!

সে অনেকদিনের কথা। আর সেদিন নেই। মানুষের সম্বন্ধের অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে।

পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে একটি বাবু বললে, কি ঠাকুর, পারবে তো! যা নমুনা দেখ্‌চি—

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে নীলাম্বর। পারাপারির কিছুই যেন তার খেয়াল ছিল না।

সুপ্তোত্থিতের মত বললে, চলিয়ে তো!

বাবু দুটির আর তর সয় না।

স্বামীর মূর্তি দেখে সরস্বতী বাঈ অবাক। এই কয়েক ঘণ্টায় মানুষটা যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে, ভারি ব্যস্ত, ভারি বিচলিত! মুখটাও এতটুকু যেন।

কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই স্ত্রীকে কাছে ডেকে নীলাম্বর বললে, উধার বালা কামরা খোল দেও!

কারণ জিজ্ঞেস করতে দিলে না নীলাম্বর, তেমনি ব্যস্তভাবেই বললে, জলদি! পরদেশী আয়া—

উধার-বালা কামরা মানে অন্তঃপুরের শয়ন-শালা।

বিস্মিত কণ্ঠে সরস্বতী বললে, বাহার মে তো কামরা খালি পড়া হ্যায়! পরদেশী—

কথা শেষ করতে দিলে না, নীলাম্বর চেঁচিয়ে উঠলো, নেহি, ওহি দেনে হোগা পরদেশীকো!

কি স্বামীর মনোগত ভাব বুঝলে না সরস্বতী, একান্ত অনিচ্ছায় ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে অন্তঃপুরের নিজস্ব শয়ন-শালা খুলে দিলে। একটা গুমোট হাওয়া নিঃশ্বাসে গাঢ় হ'য়ে উঠলো।

পিছন ফিরে চলে আসবার আগেই যাত্রী দুটির সংগে চোখাচোখি হ'লো সরস্বতীর,
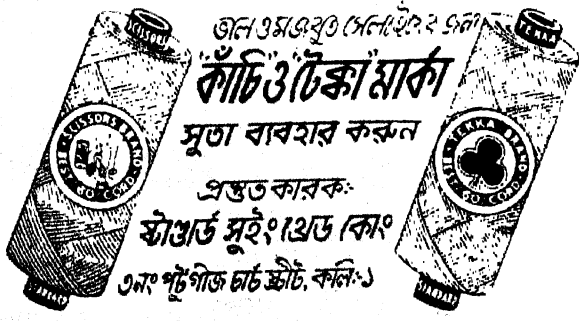
কখন সদর দরজা পেরিয়ে অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছে। লজ্জায় রাগে, দুঃখে বিরক্তিতে গায়ে-মাথার কাপড় জড় ক'রে সরে গেল সরস্বতী! কে জানে কি মাননীয় অতিথি জুটিয়ে এনেছে নীলাম্বর। বুড়ো বয়েসে ভীমরতি না হ'লে এমন করে কেউ? পরদেশীকে ঘরের মধ্যে ঢোকায়! ছি, ছি!

কিন্তু নীলাম্বর কিছু খেয়াল করছে না, পরম উৎসাহে যাত্রী দুটির কানে দামোদর ধরমশালার সম্ভাব্য সুখের উল্লেখ ক'রছে। বলছে, কোন ভাবনা করবেন না, আমি সব আনিয়ে দেবে। অতিথি নারায়ণ! সেবা করা তো আমাদের কর্তব্য আছে।

পাশের ঘরে কাঠ হ'য়ে শুনেছে সরস্বতী! কি আবোল-তাবোল বকছে নীলাম্বর আজ!

কে জানে কি বললো বাবু দুটি! নীলাম্বর চেঁচিয়ে বললে, বিশ্বাস রাখিয়ে, ঠিক সময়ে পেয়ে যাবেন! কুছ্ ভাবনা নেই—

তারপর খানিক চুপ-চাপ। পাশের ঘর থেকে সরস্বতী বাঈ শুনতে পায় জিনিস-পত্রের গড়াগড়ির শব্দ, নীলাম্বরের অস্ফুট বাক্যালাপ, আপ্যায়ন।

মথুরার যাত্রী আসে না, আর কালে-ভদ্রে এলেও হোটেলওয়ালারা নানাবিধ প্রলোভনে ভুলিয়ে নেয়, 'হোলি গেটের' মধ্যে ঢুকে কেউ আর ধরমশালার খোঁজ করে না বা চোবেদের সঙ্গ নেয় না। কোন আকর্ষণ নেই সূর্য-হীন সে-সব ঘরে। দিন চলা দায়!

রাত হল। কত কে জানে? যমুনার জলে চাঁদের চাহনি স্তিমিত হয়ে আসছে, এদিক-ওদিক একটা দুটো বাঁদরের বাসা-ছাড়া ডাক পাওয়া যাচ্ছে। 'হোলি গেটের' বাঁড়গুলো ঘাড় পাড়ে যায়। বিশ্রাম ঘাটের বিশ্রাম টুটে গেছে, ফুলওয়ালী হাঁকছে।

বাইরের দরজায় সাড়া পেয়ে সরস্বতী বাঈ ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এল। দরজা খুলেই যেন লজ্জায় মরে গেল। খেয়াল ছিল না তার নিজ বেশবাসের!

তীর্থনাথ নির্বাক, এ কে তার সামনে? এই মোহিনী বেশ কেন তার মার? অপরূপ, তবু, কত কুৎসিত মনে হ'চ্ছে তার মাকে।

সরস্বতী দরজার পাশে সরে দাঁড়িয়েছে মাথা নিচু করে। ছেলের সামনে এ লজ্জা তার রাখবার জায়গা নেই।

নিজের লজ্জার কথা তীর্থনাথ কিছু বললে না। সারাদিন অনেক চেষ্টা করেছে সে, একটি যাত্রীও জোটাতে পারেনি, ধরমশালার নামে এ'টো পাতাটা পর্যন্ত উড়ে চলে গেছে। বৃথা চেষ্টা আর ওকাজে। মনের দুঃখে, বাপের তাড়নায় ভয়ে সারাদিন, সারারাত পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে তীর্থনাথ। রোজগারের কোন পথই ঠিক করতে পারেনি। শেষে পথশ্রমের, মনস্তাপের শান্তি পেতে আবার ঘরে ফিরে এসেছে অনেক বোঝাপড়া ক'রে।

কিন্তু একি? তাকে বাদ দিয়েই গৃহে উৎসব আয়োজন হয়েছে সাজ-সজ্জায় রূপ চর্চা চলেছে? তা হ'লে—

তীর্থনাথ ফিরে যাচ্ছিল।

সরস্বতী ছেলের হাত ধরলে, মিনতি করলে। অস্ফুটে বললে, যাসনি!

তীর্থনাথ হাত ছাড়িয়ে নিলে। অভিমানে, রাগে তার গা-হাত-পা কাঁপছে।

মুহূর্তকাল স্থির হ'য়ে কি ভাবলে সরস্বতী। তারপর নিমেষে অঙ্গের সব আভরণ খুলে দিয়ে বললে, এবার আয় বাছা! রাগ করিসনি!

না। তীর্থনাথ দেখেনি সন্দেহ, এ মা নয় মোহিনী, এ গৃহ নয় নাট্যশালা।

আবার সরস্বতী ছেলের হাত ধরলে, কাছে টানলে।

তীর্থনাথ আর বাধা দিলে না। তার দুচোখ জলে ভরে এল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। নিজের দুঃখে না, কার দুঃখে সেই জানে।

সাড়া পেয়ে কখন নীলাম্বর খাটিয়া ছেড়ে উঠে এসেছিল, মা-ছেলের কেউ লক্ষ্য করেনি। আদর ক'রে জড়িত কণ্ঠে নীলাম্বর ডাকলে, তিথুয়া!

তীর্থনাথ বাপের দিকে চেয়ে দেখলে, জবাফুলের মত লাল চোখ দুটো নীলাম্বরের।

সাড়া দেবার আগেই নীলাম্বর ভেউ-ভেউ ক'রে কেঁদে উঠলো ছেলের হাত ধ'রে।

সরস্বতী বাঈ ছুটে পালিয়ে গেল আর একদিক দিয়ে। এ দৃশ্য সে আর দেখতে পারে না।

পরাজিত, পিষ্ট পালোয়ানের নিঃশেষিত আক্রোশে নীলাম্বর সরস্বতী বাঈ-এর পরিত্যক্ত মলমলের ওড়নাটা তুলে নিয়ে দাঁতে কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, শালার পরদেশী, খাপসুরৎ গোপিনী চায়!

তীর্থনাথ নির্বাক বিস্ময়ে বাপের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কোন কিছুই স্পষ্ট ক'রে এখনো বুঝতে পারলে না সে। কি বিপর্যয় ঘটেছে তাদের ঘরে? লাঞ্ছিত, ক্ষুব্ধ, ব্যথিত তারা সবাই যে!

ছোট গল্প

প্রিয় অপ্রিয়—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম ২৷৷০।

ভাল-লেখা আর জনপ্রিয়তার মধ্যে সম্বন্ধটা অহি-নকুল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ছোট-গল্প গল্পকারদের অনেকেই খুব ভাল লেখেন যার তুলনা পূর্বে ছিল না, এখনো নেই। কিন্তু সেই সব লেখকের লেখার যথেষ্ট সমাদর নেই জনপ্রিয়তার কষ্টিপাথরে: তারা যেন সাহিত্য-পরিবেশক সম্পাদকদের খাতিরেই বেঁচে আছেন। সাধারণ পাঠকদের কাছে তাঁদের খাতির নেই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'প্রিয় অপ্রিয়'র গল্প-গুলি বিচক্ষণ পাঠক-মনে সে প্রশ্ন তুলবে কি না জানি না, তবে এ গল্পগুলি নিঃসন্দেহে ছোট গল্পাকার হিসাবে তাঁর খ্যাতিকে দৃঢ় করবে। যাঁরা মাত্র শ্লীলতা-অশ্লীলতার চুলচেরা হিসাবে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে দারিদ্র, অসারত্ব প্রভৃতি ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং সেই দোহাই-এ সমাজ-ভিত্তির সমুৎপাটন কল্পনা করে মাথায় হাত দিয়ে পড়েন, তাঁরা যেন 'প্রিয়-অপ্রিয়'র গল্পগুলি পাঠ করেন। তাঁরা মত বদলাবেন। দুর্ভাগ্য আমাদের শিল্পক্ষেত্রে আমাদের যা ভাল তা সব সময় অপরকে দেখিয়ে দিতে হয়, নয়তো আমরা দেখতে পাই না। পেলেও স্বীকার করি না।

প্রিয় অপ্রিয়'র গল্পগুলির প্রথম গল্প 'কৈশোর', গল্প হিসাবে যত না, ততোধিক তার ব্যঞ্জনা পাঠককে বিমুগ্ধ করে। মধ্যবিত্ত পরিবার জীবনের পারিপার্শ্বিকতায় কিশোর মনে কি পরিমাণ আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে, জ্যোতিরিন্দ্র-বাবু অতি দক্ষতায় তার চিত্র এঁকেছেন, প্রচলিত নীতির দিক দিয়ে বাবলুকে যে জায়গায় লেখক নিয়ে গেছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু সত্য-সুন্দরের খাতিরে এমন ঘটনার সংস্থাপন না হলে বুঝি গল্পের মূল সুরটা হারিয়ে যেত।

তারপরের গল্প 'গিরগিটি'। সত্যিকথা বলতে এমন গল্প ইতিপূর্বে পাঠ করিনি। যৌবনের চোখে যৌবনের রূপ কেমন খোলে—কতখানি সমাদর পায়? না, বৃদ্ধ না হলে যৌবনের প্রকৃত রূপের মাধুরী ধরা পড়ে না? এ প্রশ্নের এমন সার্থক উত্তর গল্পের ভিত্তিতে বুঝি কেবল জ্যোতিরিন্দ্রবাবুই দিতে পারেন। গল্পটি বাংলা ছোট গল্পের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প বলে পরিগণিত হবে।

আর দুটি গল্পের মধ্যে 'আটপৌরে' গল্পে পরিণত বয়সে হঠাৎ একদিন বাল্য প্রণয়ের আঁচটুকু উপলব্ধি করে মুখোমুখি হওয়ার মধ্যে যে মর্মান্তিক লুকোচুরি তার বেদনার শ্লেষটা অতিমাত্রায় উদ্ঘাটিত। প্রতিভা যেচে আসতে চাইলেও প্রণব কিছুতে নিজের ঠিকানা দিতে পারলে না শেষ পর্যন্ত।

আর 'বুটীক ছুটীক'? পা-কাটা কম্পোজিটারের দুই মেয়ে উদ্ভিন্ন যৌবনা, রুদ্ধ তরঙ্গের মত সে-যৌবন দেনো, শাসনে টিনের চাল, গুহা-গহ্বর, বস্তি-ঘরে অবরুদ্ধ, বেদনাভারাক্রান্ত। যৌবন জ্বালা নয়, একটা করুণ হাহাকার শোনা যায়, গল্প পড়া শেষ হলে, "ছিঃ কাঁদিসনে!" "আশা, আশা নিয়ে বেঁচে থাক ছুটীক, ওতে সুখ আছে, আমি তো—"

কথা অসমাপ্ত থাকে। (৩১২/৫৭)

প্রবন্ধ

অণুর উত্তরায়ণ—শিবতোষ মুখোপাধ্যায়। অভিজিৎ প্রকাশনী। ৭২-১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম পাঁচ টাকা।

ইংরিজী ভাষায় অনেকগুলিই আছে, বিশেষ করে বহু প্রচলিত, বহু কথিত দু-খানি গ্রন্থ ও সবায়েরই চেনা জানা—এইচ জি ওয়েলস সাহেবের আউটলাইন অফ ওআর্লড হিস্ট্রি; ভ্যান লুনের "স্টোরি অফ ম্যানকাইন্ড"। দুটি গ্রন্থই সাধারণ পাঠকের জন্যে লেখা—কিন্তু অসামান্য গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় এর জুড়ি খুঁজতে যাওয়া উচিত নয়। ইদানীং এ-ধরনের সর্বজনবোধ্য ভাল বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ যে লেখা হচ্ছে, তার জন্যই আমাদের খুশী থাকা উচিত। শিবতোষ মুখো-পাধ্যায় মহাশয়ের "অণুর উত্তরায়ণ" উপরিউক্ত দুটি অসামান্য ইংরিজী গ্রন্থের সঙ্গে খানিকটা তুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে শেষ পরিচ্ছেদ দুটি—"অ্যাটমের খেলা", "শেষ কথাটির শেষ নেই"—ছাড়া প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা কথিত দুটি গ্রন্থের মতনই প্রায়। কাজেই ইংরিজী-না-জানা পাঠকের পক্ষে প্রচুর সুবিধা লেখক করে দিয়েছেন। শেষ দুটি পরিচ্ছেদ মূলত আণবিক বিজ্ঞানের সহজ ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারিক জীবনের বিজ্ঞানের সরস পরিচয়। সমগ্র বইখানির মধ্যে লেখকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তাঁর ভাষায়, "......ক্রমবিকাশে-উৎসুক আমাদের মন-হংস, পশ্চাদপসরণ করে চলে গেছে কোন সে অতীতে; যেখানে সবের শুরু, কিন্তু যার আজও শেষ নেই, সেই সমস্ত কিছুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে ভেসে কালের সাগর পাড়ি দিয়ে চলে এসেছে বর্তমানে। নিষ্প্রাণ জড়রাজত্ব থেকে মানসিক পরিপূর্ণতার মাঝে"—এই বিশ্ব ও প্রাণ বিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য রেখে অ্যামিবা থেকে অ্যাটমিক এজের—একটি সরস সংক্ষিপ্ত নির্ভুল পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন লেখক। বলা বাহুল্য, অনধিকারী ব্যক্তি নয়—যোগ্যজনই (লেখক নিজেই প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক) এই দুরূহ কাজে হাত দিয়েছেন এবং সাফল্যলাভ করেছেন। তাঁর রচনার রীতি সম্পর্কে একটি আপত্তি এই হতে পারে যে, মাঝে মাঝে সরসতা যোগ করতে গিয়ে কিঞ্চিৎ আধিক্য ঘটে গেছে। ফলে খাস্তা খাজা, পটলের দোরমা—ইত্যাদি কানে ভাল লাগে না, গ্রন্থের গুরুত্বকেও হালকা করে। ছাপা বাঁধাই চমৎকার। চিত্রগুলি মন্দ নয়। অধ্যাপক সত্যেন্দ্র বসুর ভূমিকা এই গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। (৩৪৪/৫৭)

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার—প্রথম খণ্ড। শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য। দেবদত্ত অ্যান্ড কোং। ৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য আট টাকা।

প্রায় এক শ' বছরের ওপর হল আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির কোনো ইতিহাস লেখবার চেষ্টা তেমন হয় নি। লেখক ঠিকই বলেছেন, বাংলা ভাষায় 'লাইব্রেরিজ অব্ লণ্ডন' বা 'লাইব্রেরিজ অব্ দি ওয়ার্ল্ড'-এর মতন বই অতি অবশ্য থাকা উচিত।

প্রথম খণ্ডে লেখক বাংলা দেশের মধ্যে কেবল কলকাতা আর হাওড়ার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বিবরণ দিয়েছেন। প্রত্যেকটি লাইব্রেরির মোটামুটি পরিচয়, প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত সারস্বত কর্মীদের প্রাসঙ্গিক পরিচয় এবং গ্রন্থাগারগুলিতে রক্ষিত পুস্তক, পাণ্ডুলিপি ও মনীষীদের দুর্লভ সংগ্রহের বর্ণনা বইখানিতে পাওয়া যাবে। লাইব্রেরির ইতিহাস লিখতে গিয়ে গ্রন্থকার সামাজিক পরিবেশ এবং গ্রন্থবিলাসী পণ্ডিতদের একটি নতুন ও সুন্দর পরিচয় তুলে ধরেছেন। এ বইয়ের পরবর্তী খণ্ডের জন্য আমাদের বিশেষ আগ্রহ রইল। ইতিমধ্যে অনুসন্ধিৎসু সংস্কৃতির ছাত্র আর গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের এ বই সংগ্রহ করা উচিত। (২৭৬/৫৭)

নাটক

ধৃতরাষ্ট্র—ধনঞ্জয় বৈরাগী, আর্ট অ্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স। জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২। দাম সুলভ সংস্করণ ২৲ এবং শোভন সংস্করণ ২॥৽।

ধৃতরাষ্ট্র সামাজিক নাটক। আমাদের বর্তমান সাহিত্যে ভাল নাটকের একান্ত অভাব। তাই 'ধৃতরাষ্ট্র' পড়ে মনে হল, সামাজিক নাটক বলতে যা বোঝান উচিত, এখানি তা-ই। একটি আপাত-স্বচ্ছন্দ বাঙালী সংসারে কি ভাবে একটি মানুষের কুটিলতা অথবা বিকৃত মনুষ্যত্ব দুর্যোগ ঘনিয়ে আনল, তারই উন্মোচন হয়েছে এই নাটকে।

এই নাটকের বিশেষত্ব হচ্ছে এর বিন্যাস-কৌশল। এখানে যা ঘটছে, তার চেয়ে যা ঘটে গেছে, সেইটেই অতি নিপুণভাবে উদ্ঘাটিত হচ্ছে এবং আমাদের উদ্‌গ্রীব করে তুলছে। তথাকথিত কোনো প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ নাটকীয় ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় নি এ নাটকে। সমস্ত হিংসা, চক্রান্ত এবং তার প্রতিকার পাঠক-দর্শকের নেপথ্যে ঘটে গেছে এবং তারই অদৃশ্য প্রভাবে নাটকের চরিত্রগুলি অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে আশ্চর্যভাবে নাটকীয় কৌতূহলকে বজায় রেখেছে। কেবল স্থির হয়ে থাকছে একটি চরিত্র। সে হল সংসারের কর্তা ধৃতরাষ্ট্র বা ধীরাজ। ছোট্ট সংসারটি তাঁরই স্নেহবন্দী। কিন্তু সেই সংসারেই দুর্যোধন-বেশী স্বরূপ যখন তার স্বকৃত ও জঘন্য অন্যায়ের কঠিন শাস্তিকে ডেকে এনেছে, তখন সমস্ত সহ্য করেছেন ধীরাজ। উত্তেজিত হলেও উৎক্ষিপ্ত হন নি। বরং তাঁর স্নেহ আরও বেগান্ধ হয়ে সংসারটিকে করুণ বিস্ময়ে জড়িয়ে ধরেছে। বলা বাহুল্য 'ধৃতরাষ্ট্র' নাটকের ধারণা মূলানুগ, অর্থাৎ মহাকাব্য থেকেই নেওয়া। কিন্তু বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো হয়েছে অতি শোভন ও সঙ্গত উপায়ে। এটা রূপক নয়, জীবনেরই প্রতীক। নাট্যকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কারণ বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের আপাত-সরল, কিন্তু কঠিন সত্যকে পুরোপুরি মর্যাদা দিয়ে নাট্য-সাহিত্যে তিনি একখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন করলেন। (১৯০/৫৭)

পত্রিকা

সাহিত্য পত্র—শারদীয় সংখ্যা। শান্তি বসু ও আশীষ বর্মণ সম্পাদিত। বাক্। ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯। দাম ১৲ টাকা।

'সাহিত্যপত্রে'র শারদীয় সংখ্যার বৈশিষ্ট্য যথারীতি রক্ষিত হয়েছে। অরুণ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ "গণ-অভ্যুত্থান ১৮৫৭", সন্তোষ ঘোষের প্রবন্ধ "আধুনিক স্থাপত্যকলার বিচার", শান্তি বসুর "সমালোচনার আদর্শ"—এই সংখ্যার বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত রচনা "দেশীয় চলচ্চিত্রের প্রগতি" চমৎকার। বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ কবিতা ছাড়াও অন্যান্য খ্যাতনামা ও নবীন কবিদের রচনা এই সংখ্যায় পরিবেশন করা হয়েছে। দুটি গল্প, মন্দ নয়। আলোচনা এবং অন্যান্য রচনাও পাঠযোগ্য।

অনুক্ত—শারদীয় সংখ্যা। সুনীলকুমার নন্দী সম্পাদিত। ৫ মদন মিত্র লেন, কলকাতা ৬। দাম ১৲ টাকা।

অনুক্ত পত্রিকার নিজস্ব পরিচয়টি এই পত্রিকার রচনা নির্বাচন ও পরিবেশনের মধ্যে নিহিত। শিশিরকুমার ঘোষ, অমলেশ ত্রিপাঠি, সুনীলচন্দ্র সরকার, দেবীপদ ভট্টাচার্য-র প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগন্নাথ চক্রবর্তী, গোপাল ভৌমিক, অলোকরঞ্জন প্রভৃতির কবিতা ছাড়াও অন্যান্য কবিদের কবিতা এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অশোকানন্দ দাস, সরোজকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতির গল্পে আলোচ্য সংখ্যাটি আকর্ষণীয়।

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

ছবিতে পৃথিবী আদিম যুগ—শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ।

জনরব—হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাঙ্গা আঁখা—অনুরূপা দেবী।

শবরী—সুনীলকুমার লাহিড়ী।

ক লকাতায় কালীপূজো এখনো ধুমধামের সঙ্গে চলিতেছে। চলিতেছে বলিতে হইল এইজন্য যে, পূজোর নির্ঘণ্ট শেষ হইয়া গেলেও বাজির নির্ঘণ্ট এখনো শেষ হয় নাই। এখনও পূর্ণ উদ্যমে হাউই উড়িতেছে, তুবড়ী জ্বলিতেছে, বোমা ফাটিতেছে। পূজোর রাতের তো কথাই নাই, পঞ্চাশজন আহত হওয়াতেও আমাদের ভক্তি বিচলিত হয় নাই। উচ্ছৃংখল আচরণের জন্য শুনিলাম পুলিশ

নাকি ১৫৩ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উচ্ছৃংখলতাটা পূজোর অঙ্গ কিনা তা আমরা কী করিয়াই বা বলি। নিহিতং গুহায়াম্ তত্ত্বকথা আমরা কতটাই বা জানি।

* * *

কো ন একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জনৈকা ফরাসী গায়িকাকে নাকি একটি চন্দ্রলোকে যাওয়াআসার টিকিট দিয়াছেন।—"চন্দ্রলোকে গমনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও

আমাদের এখন নেই। রেলওয়ের মতো বিনাটিকিটে ভ্রমণের সুবিধে যে-দিন হবে তখন ভেবে চিন্তে যা হোক কিছু একটা করা যাবে"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

রা শিয়া নাকি রকেটে করিয়া আকাশমার্গে একটি কুকুর প্রেরণ করিয়াছে। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"অন্য কোন দেশ থেকে এবারে একটি বেড়াল ছাড়লেই আসর গরম হয়ে উঠবে"!!

* * *

চ ব্বিশ পরগণার কোন এক আশ্রমের জনৈক সেবক নাকি ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্তমান ইংরেজী সালের ২২শে অক্টোবর কলিযুগ শেষ হইয়া গিয়াছে।—"শুনে খুশী হলাম। কিন্তু আমরা ভাবছি কলি শেষ হয়ে সত্যযুগ ফিরে এলো, আর তা ঘুণাক্ষরেও টের পেলাম না! অথচ সত্যযুগের মহিমা সম্বন্ধে কত কথাই না শুনেছি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

কা শ্মীর দখলের জন্য খাকসার নেতা আল্লামা মাসরিকির নাকি দশ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক লইয়া ভারত অভিযানে অগ্রসর হইবার কথা ছিল। কিন্তু লাহোরের ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেল হাজতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শুনিলাম তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে এই মর্মে প্রচারপত্র বিলি করিয়াছেন যে,—জেহাদে যোগদানের পর হিন্দুস্থান তোমাদের হইবে। শ্যামলাল সংক্ষেপে বলিল—"লংকাভাগের ইতিকথা আমরা ইতোপূর্বে কালনেমির মুখেও শুনেছি"!!

* * *

এ কটি ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নাকি আধা ঘণ্টার মধ্যে তিনশত আবেদন পেশ করা হইয়াছে। সংবাদ এই কলিকাতা শহরেরই। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"অতঃপর মঙ্গল-গ্রহে জমি কেনা ছাড়া কোন উপায়ই আর নেই, অসামর্থ্যে অন্তত জবরদখল কলোনি হলেও মঙ্গলগ্রহের কথাই আমাদের ভাবতে হবে"।

* * *

না গপুরের এক সংবাদে শুনিলাম, বনাজীবন-সপ্তাহ উদ্যাপনের অঙ্গ হিসাবে সেখানকার কোনও এক স্থানে একটি সভার আয়োজন করিয়া উদ্যোক্তারা সাতজন বক্তাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেও কোন শ্রোতা সভায় উপস্থিত না হওয়ায় বক্তারা নিরাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন।—"দুর্ঘটনা বা নানারকম ক্ষয়-ক্ষতির কথা আমরা প্রায়ত শুনে থাকি। কিন্তু মর্মান্তিকতায় এটি বোধ হয় সব-কিছুকে ছাড়িয়ে গেল। সযত্নে লিখিত বা মুখস্থ করা বক্তৃতার জ্যান্ত কবরের মতো শোচনীয় ঘটনা বুঝি আর নেই। আমাদের একমাত্র সম্বল বক্তৃতারই যদি এই পরিণতি হয়, তবে বল মা তারা দাঁড়াই কোথা"—খুড়ো বুঝি সখেদে গান ধরিয়া ফেলিলেন।

* * *

পা কিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জে সিরিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে দেখিয়া নাকি অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্র বিস্মিত হইয়াছেন।—"কিন্তু

তাঁরা যদি নীলবর্ণ শৃগালের কাহিনী পাঠ করতেন তাহলে কিছুতেই বিস্মিত হতেন না"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

হ ল্যাণ্ডের আমস্টারদাম শহরের একটি খানায় নাকি বহুপদবিশিষ্ট ব্যাঙ জন্মাইতেছে। সংবাদে বলা হইয়াছে, আণবিক গবেষণাগারের জল ও পরিত্যক্ত অন্যান্য জিনিস খানায় ফেলাতেই নাকি ব্যাঙের বহু পা গজাইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"এবারে বুঝলাম কী ক'রে সাপের পাঁচ পা অনেকে দেখেছেন। আণবিক বোমার দৌলতেই ব্যাঙ বা সাপের পাঁচ পা গজায়"!!

* * *

জা হাজে করিয়া তেরটি দৌড়ের ঘোড়া সিঙাপুরে পাঠানো হইয়াছিল। সংবাদে শুনিলাম, জাহাজডুবিতে নাকি ঘোড়াগুলি ডুবিয়া গিয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমরা শুনে আসছি ঘোড়া-ই নাকি মানুষকে ডোবায়; ঘোড়া নিজে ডুবছে এ খবর হয়ত এই প্রথম"!

চক্রদত্ত

সাধারণত আমরা টেবিল পাখা কিনলেই সেটা রিভলভিং অর্থাৎ চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে চলে কিনা দেখে নি। কেনবার সময় অনেক পাখাই এই গুণবিশিষ্ট হয় কিন্তু কিছুদিন ব্যবহারের পরই এই বিশিষ্ট গুণটি নষ্ট হয়ে যায়। অথচ একটি ঘরে একখানি টেবিল পাখা যথেষ্ট না হওয়ায় খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হয়। সেই কারণে কোনও নতুন উপায় স্থির করা দরকার হয়ে পড়ে।

দ্বিধাবিভক্ত পাখার হাওয়া

য পাখা এদিক ওদিক ঘুরতে পারে না এমন একটি পাখার "গার্ড"এর ওপর একখানি কাঠের অথবা এলুমিনিয়মের পাত আড়াআড়িভাবে লাগিয়ে দিতে পারলে ঐ পাখার হাওয়া দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে। ফলে পাখাটি ঘরের মাঝে রাখলে দুদিকেই হাওয়া পাওয়া যাবে।

*

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বৎসরের কর্মতালিকার মধ্যে ভূপৃষ্ঠের ওপরের স্তরের আবহাওয়ার খবরাখবর সংগ্রহ করা অন্যতম কর্ম। বৈজ্ঞানিকরা জানেন যে, পৃথিবীর ওপরে সর্বসমেত চারটি আবহাওয়ার স্তর আছে। সর্বনিম্ন স্তরটি ট্রোপোস্ফিয়ার নামে খ্যাত। এটি ঘন বাতাসের স্তর। এর মধ্যেই আমরা বাস করি। বিষুবরেখার ওপরে এই স্তরের ঘনত্ব দশ মাইল এবং মেরুপ্রদেশে মাত্র পাঁচ মাইল হয়। ট্রোপোস্ফিয়ার ওপরের স্তরের নাম স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ঘনত্ব পঞ্চাশ মাইল। তৃতীয় স্তরটির নাম আয়োনোস্ফিয়ার। আয়োনোস্ফিয়ারে ঘনত্ব পঞ্চাশ মাইল থেকে আরম্ভ করে আড়াইশত মাইল পর্যন্ত। আয়োনোস্ফিয়ারের পর চতুর্থ স্তরটির নাম এক্সোস্ফিয়ার। এক্সোস্ফিয়ারের সীমারেখা ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় আঠার হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বৎসরের গবেষণাগুলির মধ্যে বৈজ্ঞানিকরা আশা করেন যে, ট্রোপোস্ফিয়ারের গবেষণা দ্বারা 'জেট-স্ট্রীম' সম্বন্ধে তাঁরা অনেক কিছু জানতে পারবেন। এই জেট প্রবাহকে আমরা একটি হাওয়ার নদীর মত বলেই কল্পনা করতে পারি। এটি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। উত্তর ভূ-গোলার্ধে জেট-স্ট্রীম সারা বৎসরে পনের হাজার থেকে চল্লিশ হাজার ফিট পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠের ঊর্ধ্বে পঞ্চাশ থেকে তিনশত মাইল গতিতে ঘুরে বেড়ায়। এই জেট-স্ট্রীম'এর খবরাখবর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকলে বাণিজ্যিক বিমান বহরের গতিবিধির যথেষ্ট সুবিধা হয়। কোনও উড়োজাহাজ পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে যাওয়ার সময় যদি এই জেট-স্ট্রীমের মধ্যে পড়তে পারে তাহ'লে ঐ বিমানের গতি খুব দ্রুত হয়ে যাবে এবং সময় সংক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় সংকোচনও ঘটে, কারণ গতি দ্রুততর হওয়ায় তেলের খরচ কম হবে। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারেও সেইরকম একটি ওজনের (Ozone) স্তর ভূপৃষ্ঠের বিশ থেকে চল্লিশ মাইল ঊর্ধ্বে পাওয়া যায়। ওজন অক্সিজেনের আর একরূপ। সূর্যের মধ্যে যে অল্ট্রাভাওলেট রশ্মি আছে ওজন সেটুকু নিজের মধ্যে মিশিয়ে নেয়। পৃথিবীর জীবজন্তুরা অল্ট্রাভাওলেট রশ্মির তেজ সোজাসুজিভাবে সহ্য করতে পারে না সুতরাং ওজনের সঙ্গে মিশে থাকায় পৃথিবীর জীবশ্রেণীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। আয়োনোস্ফিয়ারের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা বিশেষ খবর এ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারেন নি। এখন এই আয়োনোস্ফিয়ার সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করাই বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণে আয়োনোস্ফিয়ারে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা চলছে। আয়োনোস্ফিয়ার একটি বৈদ্যুতিকশক্তি বিশিষ্ট স্তর। বহুদূরে পর্যন্ত বেতারবার্তা প্রেরণের জন্য আয়োনোস্ফিয়ারের স্তরটির প্রয়োজন খুব বেশী। ভূপৃষ্ঠ থেকে বেতার তরঙ্গ পাঠানোর পর সেটি আয়োনোস্ফিয়ারের ধাক্কা খেয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে আবার ভূপৃষ্ঠ থেকে সেটি আয়োনোস্ফিয়ারে ধাক্কা খায়। এইভাবে বারে বারে ঊর্ধ্ব এবং অধঃগতি হ'তে হ'তে অবশেষে শব্দতরঙ্গটি গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছায়। শব্দতরঙ্গটি আয়োনোস্ফিয়ার এবং ভূপৃষ্ঠে এভাবে বারে বারে ধাক্কা খেতে খেতে যাতায়াত করে বলেই পৃথিবীর সমগ্র চক্রাকার পরিধি পরিক্রমার সুযোগ পায়। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, আয়োনোস্ফিয়ার সম্বন্ধে আরও খবর সংগ্রহ করা যদি সম্ভব হয় তাহলে ভবিষ্যতে আরও দূরবর্তী স্থানে বেতারবার্তা পাঠানো সম্ভব হবে। এক্সোস্ফিয়ার সম্বন্ধে আরও বৈজ্ঞানিকদের সঠিক কোনও ধারণা নেই। তবে জ্যোতির্বিদরা বলেন যে, এক্সোস্ফিয়ার [illegible] নিয়ন্ত্রণ এবং পাতলা। এই [illegible] এতই পাতলা যে, অক্সিজেন [illegible] একটি অপরটি থেকে বেশ দূরে থাকায় এদের পরস্পরে ধাক্কা লাগে না। এসব সম্বন্ধে খবরটিই বৈজ্ঞানিকদের জানতে হবে। এঁদের বর্তমানের আশা এই যে, এবারকার গবেষণার দ্বারা এরা আয়োনোস্ফিয়ারের ওপরের স্তর এবং এক্সোস্ফিয়ার সম্বন্ধে আরও সঠিক খবর সংগ্রহ করতে পারবেন।

*

ব্লাড প্রেসার রোগের চিকিৎসার জন্য ডাঃ পেজ রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে সম্প্রতি একটি নতুন ওষুধ বার করেছেন। ১৯৩৯ সালে তিনি প্রথম আনজিওটোনিন নামে একটি হর্মোন আবিষ্কার করেন। এখন তিনি বিশ্লেষণ ও সংমিশ্রণ দ্বারা প্রথম আনজিওটোনিনের অনুকরণে দুই নম্বরের আনজিওটোনিন বার করেছেন। দুই নম্বরের আনজিওটোনিন মানুষের দেহে ইনজেকশন করলে ব্লাড প্রেসার খুব তাড়াতাড়ি উঠে যায়। প্রথম আনজিওটোনিন তৈরী করতে তাঁকে খুব কষ্ট পেতে হয় কারণ প্রাণীদের দেহ থেকে অতি অল্প পরিমাণ আনজিওটোনিন পাওয়া যেতো। বর্তমানে ডাঃ পেজের তৈরী সংমিশ্রিত আনজিওটোনিন পাওয়ার জন্য আর কোনও রকম রিসার্চ করতে অসুবিধা হবে না।

—শৌভিক—

'অনুমোদিত' ছবির প্রদর্শন

'অনুমোদিত' ছবি মানে ডকুমেণ্টারি বা সংবাদচিত্র যা ভারতের প্রতি সিনেমায় প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। নিয়ম হচ্ছে, প্রদর্শনীর গোড়াতেই দু' হাজার ফিট করে দেখানো, তবে ফিল্ম ডিভিসন যা সরবরাহ করে তা অতি ক্বচিৎ দু' হাজার ফিটের সময় দখল করার মতো হয়। অবশ্য ফিল্ম ডিভিসনের ছোট ছবি, সংবাদচিত্র বা ডকুমেণ্টারি সাধারণত হাজার ফিটের মধ্যেই থাকে বলে একদিক থেকে রক্ষে এই যে, প্রদর্শকরা বাকি সময়টায় তবু কয়েকখানি বিজ্ঞাপন-চিত্র দেখিয়ে (আজকাল তো বিজ্ঞাপনচিত্র তিন-চারখানিও পর পর দেখানো হয় এবং দর্শকেরা, দেখা যায়, ঐসব চিত্র মারফৎ বিজ্ঞাপিত সামগ্রীর প্রতি কৌতূহলি হয়ে ওঠার চেয়ে অধিকাংশ সময়েই বিরক্ত হয়ে ওঠে।) ফিল্ম ডিভিসনকে প্রদত্ত ভাড়া বাবদ টাকার কিছুটা উসুল করে নেবার সুযোগ পায়। তবে আবার চিত্রগৃহের প্রদর্শনসূচীর মূল ছবিখানি খুব বেশী লম্বা হলে বিজ্ঞাপনচিত্র দেখাবার আর ফাঁকই পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র 'অনুমোদিত' ছবি দেখিয়েই সূচী পূরণ করতে হয়। দশ বছর ধরে 'অনুমোদিত' ছবি দেখানোর নিয়ম বহাল হয়ে রয়েছে এবং প্রথমে কয়েক বছর ছবিগুলির প্রতি তেমন কোন শ্রদ্ধা না দেখা দিলেও ক্রমেই ছবি উৎকর্ষে উন্নতি করতে থাকায় আজ এমন ধারা দাঁড়িয়েছে যে, 'অনুমোদিত' ছবি বাদ দিয়ে যে কোন চিত্রপ্রদর্শনী হতে পারে, তা আর ভাবাই যায় না। এমন কি, এদেশের দর্শকদের মধ্যে ছোট ছবি দেখার অভ্যাসটা এমন হয়ে পড়েছে যে, প্রাইভেট প্রদর্শনীতেও গোড়াতেই কিছুক্ষণ কোন ডকুমেণ্টারি বা সংবাদচিত্র না দেখতে পেলে, একেবারে আরম্ভতেই মূল বড়ো ছবি চালিয়ে দিলে কেমন যেন খাপছাড়া লাগে। ছোট ছবি এখন এদেশের যে কোন চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে, যে কোন চিত্রসূচীতে অপরিহার্য। ফিল্মস্ ডিভিসন এখন অবশ্য পৃথিবীর স্ট্যাণ্ডার্ডে দাঁড়াবার মতো গুণ-সম্পন্ন ছবি তোলায় আজ সক্ষম, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হচ্ছে এদেশের কোটি কোটি লোককে ছোট ছবি দেখায় অভ্যস্ত করে তোলা। আর সেটা অবশ্য সম্ভব হতে পারতো না যদিনা দেখানোটা আইনবলে বাধ্যতামূলক করা হতো। এখন সিনেমার লাইসেন্সেরই অন্যতম সর্ত হচ্ছে 'অনুমোদিত' ছবি দেখাতে রাজী হওয়া। এই সর্তটি আইনত সিদ্ধ হতে পারে কিনা এই নিয়ে অন্ধ্র হাইকোর্টে গত দু বছর ধরে একটা মামলা চলছে এবং একটি ইনজাংশন বলে অন্ধ্রের প্রদর্শকেরা 'অনুমোদিত' ছবি পর্দায়িত করা থেকে রেহাই পেয়ে রয়েছে। অন্যান্য রাজ্যের প্রদর্শকেরা দেখাচ্ছে তবে প্রতিবাদের সঙ্গে। এ নিয়ে ফিল্ম ফেডারেশন এবং বেতার ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে অনেক কাল ধরে আলোচনা চলে আসছে।
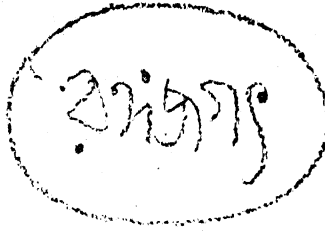
* * *

'অনুমোদিত' ছবি দেখানো বিষয়ে প্রদর্শকদের অনুযোগ কতকগুলি আছে। তাঁরা বলেন যে, 'অনুমোদিত' ছবির ভাড়া প্রমোদ-কর নিয়ে মোট বিক্রীর ওপর ১ থেকে ২ শতকরা হারে ধাপে ধাপে ধার্য করা হয়। মাঝের ধাপে ভাড়া নির্ধারণেই অসুবিধেতে পড়তে হয়। যেমন, সাপ্তাহিক বিক্রী যদি হয় ৫০০, তাহলে ভাড়া দাঁড়ায় ৫, কিন্তু বিক্রী ৫০১, হলেই ভাড়া ধরা হয় ১০, অর্থাৎ বছরের ৫২ সপ্তাহে মাত্র ৫২, বিক্রী বেশী হলেই ফিল্ম ডিভিসনকে ভাড়া বাড়তি দিতে হয় ২৬০,। এমন কি, সাপ্তাহিক বিক্রী যখন ২০০, হয়, অথবা ৩০০, তাহলে ন্যূনতম ভাড়া ৫, টাকাটা দিতেই হয়। ভারতের চিত্রগৃহগুলির মধ্যে শতকরা ২০টা পড়ে ৫০০, টাকা সাপ্তাহিক বিক্রীর নীচের ধাপে। গভর্নমেণ্টের বর্তমান ভাড়া ধার্য নীতিতে এই শ্রেণীর চিত্রগৃহকেই আর্থিক বিপাকে পড়তে হয়। (খ) সাধারণত পূর্ববর্তী জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত বারো মাসের বিক্রীর ভিত্তিতে ভাড়া নির্ধারিত করা হয়। কিন্তু মালিকানা বদলালেই ভাড়া নির্ধারিত হবার আগেই অন্তত ২৬ সপ্তাহের বিক্রীর টাকা [illegible] দিতে হয়। নতুন কোন চিত্রগৃহ আরম্ভ হলে, বা কোন চিত্রগৃহ দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর চলতে আরম্ভ করলে সেক্ষেত্রে হয়তো ও ব্যবস্থা চলতে পারে, কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের বিক্রী ধরেই ভাড়ার হার ধার্য করা যেতে পারে, কারণ হাত বদলালেই বিক্রীর টাকার তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা তেমন থাকে না। (গ) ভাড়া বা অন্য বাকি টাকা আদায়ের জন্য লাইসেন্স কর্তাদের কাছে গিয়ে পড়া হয়। এমন কি, বিরোধমূলক ক্ষেত্রেও ফিল্মস ডিভিজনই মত প্রয়োগ করে এবং বিরোধকে সালিশীতে দেওয়ার পরিবর্তে উক্ত চিত্রগৃহের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য লাইসেন্স কর্তৃপক্ষকে বলা হয়। (ঘ) কোন সময়ে ভাড়া বাকি বা অন্য কোন কারণ হেতু ফিল্মস

ডিভিসন কর্তৃক ছবি সরবরাহ বন্ধ যদি হয় তাহলেও যতোদিন ছবি সরবরাহ বন্ধ থাকে সেই সময়েরও গভর্নমেণ্টের ক্ষতিপূরণ করার জন্য প্রদর্শকদের বলা হয়। (ঙ) প্যাকিং ও প্রেরণ বাবদ খরচা, বিশেষ করে, দেউপ্পকা স্টেশনের ক্ষেত্রে বড়ো বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এই বাবদ ৫০ নয়া পয়সা ধরা হয়। তাছাড়া, প্রত্যেক প্রযোজককে পরিবাহন খরচও বহন করতে হয়। একটি ক্ষেত্রে ডাক খরচই দাঁড়ায় ৫.০৬ নয়া পয়সা অথচ ছবির ভাড়া ৫, টাকা। তবুও ডাক মাশুল কমার জন্য ফিল্মস ডিভিশন রেল বা রাস্তা পরিবহনের সাহায্যে ছবি পাঠাবে না। (চ) ভ্রাম্যমাণ সিনেমাগুলিকে জমার টাকা ছাড়া লাইসেন্সওয়ালের টাকাটাই অগ্রিম দিতে হয়, তবে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়, তা না হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে লাইসেন্স পাওয়া যায় না। (ছ) গত ১৯৫ নম্বর হতে কোন চুক্তিপত্র ফিল্মস ডিভিসন সই করে না অথচ সমিক্ষণ খরচ বাবদ প্রদর্শকদের কাছ থেকে অনুমোদিত ছবি সরবরাহের একটা চুক্তিপত্র সই করিয়েই দেড় টাকা করে নেওয়া হয় প্রতি বছরই। 'অনুমোদিত' তথা সংবাদচিত্র ও ডকুমেণ্টারি ভারতের চিত্রগৃহসমূহে থাকা যে প্রয়োজন সে বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। তবে কিভাবে সেগুলি দেখানো অব্যাহত রাখা যায় সে বিচার গভর্নমেণ্টের এবং প্রদর্শকদের। এ ব্যাপার নিয়ে গভর্নমেণ্ট ও প্রদর্শকদের মধ্যে মিটিয়ে একটা ন্যায্য বোঝাপড়া হওয়া দরকার।

একটা হিসেব করে দেখা গেল, বর্তমানে হিন্দী ছবি যা হচ্ছে, তার প্রতি পাঁচখানির মধ্যে একখানির নাম থাকে ইংরাজীতে। যেমন, মিঃ এণ্ড মিসেস ফেইশন, ট্যুরেজভ চেজ, ব্ল্যাক মেলার, ব্ল্যাক ক্যাট, ডক্টর জু ইত্যাদি। অনেক ইংরাজী কথা আছে যা আমাদের দেশের ভাষার মধ্যে এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে, সে কথাগুলি ইংরাজীতে বললেই মানায়ও এবং সাধারণ নিরক্ষর লোকের পক্ষেও বোঝা সহজ হয়। যেমন, রেস কোর্স, পুলিস ইত্যাদি। তা নাহলে, মিস্টার কার্টুন এম-এ নাম দিলে ওর রসিকতা শতকরা একজন ইংরাজী জানা লোকও কজনই বা বুঝবে! তাছাড়া, ইংরাজী নাম ব্যবহারের আদপেই প্রয়োজনই বা কি? —গল্প দিশী, চরিত্রও দিশী জায়গা নিয়ে, কথা বলে তারা দিশী ভাষাতেই, ছবি তৈরীও দিশী লোকেদের জন্যেই, শুধু ছবির নামটা ইংরাজীতে কেন? এথেকে ধরা যায়, হিন্দী ছবির নির্মাতাদের দেশকে অবজ্ঞা করার পরিচয়, আর নয়তো দেশ সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয়। দুঃখের বিষয়, আজকের হিন্দী চিত্রনির্মাতাদের অধিকাংশই এই দ্বিবিধ অপরাধেই অপরাধী।

বিকৃত জীবনীচিত্র

নভোমণ্ডলে 'শিশুচাঁদ' পাঠানো সম্ভব হওয়ার যুগে কোন অলৌকিক কাহিনীকে বিশ্বাসের ধাপে পৌঁছে দেবার চেষ্টা যতোটা ভেবেচিন্তে করা দরকার তা যে হয় না, এবং আমাদের চিত্রনির্মাতারা যুক্তি ও সঙ্গতির চেয়ে যে সরলমতি মানুষের অবোধ ভক্তিপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে আধ্যাত্মিক সিদ্ধপুরুষদের যে কি রকম কিম্ভুতকিমাকার চিত্র প্রকাশিত করে থাকেন, তার অজস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে সাম্প্রতিক হচ্ছে আর বি পিকচার্সের 'সর্বানন্দ'। পাহাড়ীর মানুষকে অলৌকিকত্বের মুখোসপরা এক পুরুষোত্তম পরিপূর্ণরূপে দেখিয়ে, সর্বদাই সংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত জনসাধারণের মনকে তাঁর প্রতি মোহগ্রস্ত করে তোলবার জন্য ভক্তজনদের রচনা আখ্যানকে পরিবেশন মহাপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাটা হয়ে আসছে। ফলে, সিদ্ধপুরুষদের জীবনের অন্তর্গত যেটুকু ঐতিহাসিক সত্য তাও চাপা পড়ে যাচ্ছে, শুধু থেকে যাচ্ছে বিস্ময় ও অবাক ভক্তজনের কল্পনা উদ্ভূত যতোসব অলৌকিক ঘটনাবলী, যা মাহাত্ম্য প্রচারে অলংকাররূপে জীবনীর গায়ে সাজিয়ে রাখা হয়। এই অলৌকিক ঘটনাবলীর অলংকারসমূহই হয় ছায়াছবির উপকরণ। ঐ ধরনের উপকরণ নিয়েই ছবি হয়ে আসছে এবং হচ্ছেও, আর তাই সিদ্ধপুরুষদের জীবনীচিত্রে বিকৃতি ও অসত্য ভূরি ভূরি থাকলেও সাধারণত কেউ সেটার উল্লেখও করে না, হয়তো ভয়, যদি তাতে পাপ হয়ে যায়! মেহারের দশমহাবিদ্যা সিদ্ধপুরুষ সর্বানন্দদেবের আবির্ভাব পৌরাণিক যুগে নয়, মাত্র পাঁচ-সাড়ে পাঁচশো বছর আগেকার কথা। তাঁর পুত্র শিবানন্দ কর্তৃক লিখিত জীবনীচরিত রয়েছে এবং এখন তা মুদ্রিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়; সে গ্রন্থে সর্বানন্দদেব সম্পর্কে বহু অলৌকিক ঘটনার বর্ণনাও আছে, কিন্তু তাহলেও মানুষ-সর্বানন্দকেই তার মধ্যে পাওয়া যায়। ছবিখানির জন্যে পরিচালক ধীরেশ্বর বসু যে আখ্যানবস্তু আহরণ করেছেন তা যতোটা ছবির ঠিক ততোটাই অসম্পূর্ণ। গুণাবলী বিচারেও এতোটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পরিচয় সর্বথা যে, আদপেই ছবিখানি আলোচনারই যোগ্য নয়, তবুও সিদ্ধপুরুষের জীবনকাহিনীর প্রকৃত বৃত্তান্তকে উপেক্ষা করার কতকগুলি নিদর্শন তুলে ধরতে হয়।

* * *

ছবিতে অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে যে কাহিনীটুকু পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়,

বাসুদেব ভট্টাচার্য নামক পূর্বস্থলীর এক বৈদিক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তার ভৃত্য পূর্ণানন্দকে নিয়ে মেহারে আসেন। বাসুদেব দেহত্যাগের পূর্বে পূর্ণানন্দকে জানিয়ে যান যে, দেবীদর্শনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে তিনি স্বীয় পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন। বাসুদেবের দুই পৌত্র, আগম ও সর্বানন্দ। আগম এপাড়া ওপাড়ায় পুরোহিতের কাজ করে, বাড়িতে তার কালী বিগ্রহ। রাজবাড়িতে তার সম্মান। সর্বানন্দ আকাট মূর্খ, বিবাহিত কিশোর। একদিন আগম রাজবাড়িতে যেতে না পারায় সর্বানন্দ সেখানে উপস্থিত হয়ে সেদিনের অমাবস্যা তিথিকে পূর্ণিমা বলে অভিহিত করে আসে। এমন মূর্খের জন্য পিতৃপুরুষের বদনাম। আগম সর্বানন্দকে তিরস্কার করলেন। সর্বানন্দর স্ত্রীও খাবার সময় গঞ্জনা শোনালে। সর্বানন্দ ভাতের থালা ফেলে চলে গেল বাড়ি থেকে। পূর্ণানন্দ বাড়িতে এসে সে ব্যাপার শুনে সর্বানন্দের খোঁজে বের হলো। সর্বানন্দ এদিক ওদিক ঘুরে একটা তালগাছে উঠলো, সংগে সংগে একটা সাপ এলো আক্রমণ করতে। সর্বানন্দ সাপের মুখটা মুঠোতে ধরে তালপাতার ডগায় ঘসে ঘসে মেরে ফেলে গাছ থেকে নেমে এলো। নামবার পরই দেখা হলো এক সাধুর সংগে। সাধু তাকে সিদ্ধিলাভের মন্ত্র দিয়ে শব-সাধনা করতে বলে একটা তালপাতার লেখা দিলে পূর্ণানন্দকে দেখাবার জন্যে। পূর্ণানন্দ সে লেখা পড়ে বুঝলে, সর্বানন্দই তার বিগত প্রভু বাসুদেব ভট্টাচার্য। রাতে গভীর জংগলে ওরা প্রবেশ করলে। পূর্ণানন্দ উপুড় হয়ে শুয়ে তার পিঠের ওপরে সর্বানন্দকে বসিয়ে সাধনা করতে বলে কাস্তে দিয়ে নিজের গলা কেটে ফেললে শব হবার জন্যে। মাতৃদর্শন ঘটলো, তারপর হলো দশবিদ্যার দর্শন। সর্বানন্দ সিদ্ধিলাভ করলেন। অমাবস্যার আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হলো। গ্রামবাসী বিস্মিত হলো। রাজা বিমুগ্ধ হয়ে সাধনাস্থলে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু সর্বানন্দকে পুরোহিত করায় আপত্তি উঠলো প্রবীণদের তরফ থেকে। বিরোধের মাঝে সর্বানন্দ ধ্যানগত হয়ে মাতৃরূপ দর্শন করিয়ে সকলের সংশয় দূর করলেন, কিন্তু মেহারে আর থাকতে চাইলেন না। সকলের অনুরোধ, উপরোধ, প্রার্থনা সত্ত্বেও তিনি মেহার ত্যাগ করলেন। এই হলো ছবির আখ্যানবস্তু।

• • • •

ছবিতে যে আখ্যানবস্তু পাওয়া যায় তা সর্বানন্দদেবের জীবনীর অতি সামান্য অংশ এবং তাও ভুলে ভরা। ছবির নাম 'বাকসিদ্ধ' হতে পারে না, কারণ সর্বানন্দ দশমহাবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করেন অর্থাৎ তিনি সর্ববিদ্যাসিদ্ধ হন। সর্বানন্দদেবের জীবনী প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় সিদ্ধিলাভের পর, এবং সিদ্ধপুরুষ [illegible] সেটা ঐ পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্যেই সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া, সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত অংশও ছবিতে যা পরিবেশন করা হয়েছে এবং যেভাবে বিন্যস্ত, কোনরূপ রেখাপাত করবার মতো তো নয়ই, অধিকন্তু ইতিহাসের বিকৃতি ও অসংগতি চোখের সামনে পীড়াদায়ক হয়েই ওঠে যা সর্বানন্দদেবের ভক্তজন এবং বিশেষ করে তাঁর বংশধরদের মনে হয়তো আঘাত লাগতে পারে। সিদ্ধিলাভের পরবর্তী অংশ যা ছবিতে নেই তা নিয়ে কোন কথা অবশ্য বলা যায় না, কিন্তু যা আছে সে সম্পর্কে সর্বানন্দদেবের বর্তমান বংশধর নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কতকগুলি মোটা রকমের ভুলত্রুটীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সর্বানন্দদেবের পুত্র শিবানন্দ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত "সর্বানন্দতরঙ্গিনী"ই হচ্ছে এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সর্বানন্দ যে সময়ে সিদ্ধিলাভ করেন তখন তাঁর প্রথম পুত্র শিবনাথ ছিলেন অন্তত কিশোর বয়সের। ছবিতে সর্বানন্দকেই দেখা যায় তরুণ বয়স্ক। ছবিতে বাসুদেব ভট্টাচার্যকে বলা হয়েছে পূর্বস্থলীর বৈদিক ব্রাহ্মণ, কিন্তু গ্রন্থে দেখা যায়, তাঁরা ছিলেন রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। মেহারে গিয়ে দাস রাজাদের কুলগুরুপদে এরা অধিষ্ঠিত থাকেন এবং রাজগুরুর পক্ষে যজমানদের বাড়িতে গিয়ে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করা অভাবনীয়, অথচ ছবিতে তাও দেখানো হয়েছে। সর্বানন্দের ভায়ের নাম দেওয়া হয়েছে আগম বলে, কিন্তু তাঁর নাম ছিল বাগেশ্বর এবং উপাধি ছিল আগমাচার্য। পূর্ণানন্দকে ভৃত্য দেখানো হয়েছে, কিন্তু পূর্ণানন্দ ছিলেন বাসুদেব ভট্টাচার্যের শিষ্য। শব সাধনার জন্য নিজেকে শবে পরিণত করতে কাস্তে দিয়ে নিজের গলা কাটার মতো বীভৎস ব্যাপার গ্রন্থে নেই; ওতে

আছে পূর্ণানন্দ ভাবাবেশে নিজের প্রাণবায়ু দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত করে দেন। অভিমান করে সর্বানন্দ না খেয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে করতে হঠাৎ কেন যে তালগাছে উঠলো, ছবি দেখে মনে হয় যেন একটা সাপের সঙ্গে লড়াইয়ের একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখাবার জন্যেই ঐ দৃশ্যের পরিকল্পনা—বিদ্যাশিক্ষার অভিপ্রায়ে তালপাতা কেটে আনতে গিয়েই যে এই ব্যাপারটা ঘটে যায় সেটা মনে হয় না। সে ঘটনা দেখে এক সন্ন্যাসীই সর্বানন্দকে গাছ থেকে নেমে আসতে বলে তার কানে মন্ত্র দেয় এবং গুরুকে তার নির্দেশ লিখে দেয় পূর্ণানন্দকে দেখাবার জন্য। ছবিতে রয়েছে সর্বানন্দ সাপ মেরে গাছ থেকে নেমে কিছুটা এগিয়ে যেতে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয় এবং সন্ন্যাসী একটা তালপাতায় কিছু লিখে সর্বানন্দর হাতে দেয়। সর্বানন্দের গৃহে কালীর বিগ্রহ দেখা যায়, কিন্তু নরেশচন্দ্র বলেন, তাঁদের গৃহে কোনদিন কালী প্রতিষ্ঠিত হননি।

• • •

এমন যদি দেখা যেতো যে, ছবিতে অলৌকিকত্ব পরিহার করে মানুষকে পার্থিব মহাপুরুষরূপে দেখাবার চেষ্টা করতে, ঘটনার সঙ্গে যুক্তি ও সঙ্গতি মানিয়ে দিতে প্রচলিত কাহিনীকে বদলে নেওয়া হয়েছে, তাহলে সে হতো অন্য কথা। কিন্তু ছবির কাহিনীকেও প্রধানত নির্ভর করে দেওয়া হয়েছে অলৌকিকত্বের ওপরেই। কাজেই, কিম্বদন্তী নয়, যাকে নিয়ে কথা তারই ছেলের লেখা জীবনী-অন্তর্ভুক্ত বিবরণ উপেক্ষা করে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া, 'সর্বানন্দতরঙ্গিণী' অবলম্বন করলে নাটকীয় উপকরণও তো বেশী পাওয়া যেতো। সর্বানন্দ বংশধর নরেশচন্দ্র বলেন যে ছবিখানি হচ্ছে শুনে তিনি নির্মাতাদের সঙ্গে আলাপ করে ফল পাননি। ছবিখানিতে অবলম্বিত ঘটনাবস্তুর ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি গত ২৬শে ডিসেম্বর আঞ্চলিক সেন্সার বোর্ডকে চিঠি দেন, কিন্তু ছবিখানি সেন্সার বোর্ডকে দেখাবার সময় তাঁকে ডাকা হবে, এইমাত্র জানানো ছাড়া সেন্সার অফিসার আর কিছুই করেন নি। হয়তো বিশেষভাবে নজর দেবার অনুপযোগী অপাঙক্তেয় ছবি মনে করেই সেন্সার বোর্ড এ নিয়ে আর এগোন নি। না ঘটনার বাঁধুনী, আর না কোন সমঞ্জস পরিস্থিতি, না অভিনয় আর না কলাকৌশলের কাজে, কোনদিক থেকেই ছবিখানিতে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী লাহিড়ী, মিহির ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অরুণাংশু, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, দেবযানী, মেনকা দেবী, রাজলক্ষ্মী, স্বাগতা, সন্ধ্যা প্রভৃতি শিল্পী, আর কলাকৌশলে, আলোকচিত্র গ্রহণে দীনেন দে, শব্দ যোজনায় পরিতোষ বসু, সুর যোজনায় বৈদ্যনাথ রায়, শিল্প-নির্দেশে সত্যেন রায়চৌধুরী প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন।

সময়ের অনুগমন

'আওয়ারা' যখন ইংরাজী নাম 'মাদার ইণ্ডিয়া'য় অভিষিক্ত, তখনই মনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, মৌলিক সৃজনীশক্তিসম্পন্ন আমাদের দেশের কতিপয় প্রতিভাধর পরিচালকদের অন্যতম মেহবুবও হিন্দী ছবির বর্তমান ধারাকেই অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অর্থাৎ, সঙ্গতি ও যুক্তিতে মানায় কি না সে প্রশ্ন নয়, আটকে সার্থকতাকে লোভাময় মনোহারিত্বকে বড়ো বলে দেখা নয়, সংযত সমৃদ্ধ রসচেতনায় হৃদয়বৃত্তিকে বিমুগ্ধ করে তোলা নয়। তার জায়গায় উৎকট অসংগতিপনার ধাপে ধাপে মোটা দাগের ও কর্কশ বস্তুকে কাঁপিয়ে ফেঁপিয়ে বাড়িয়ে সংকীর্ণ রসানুভূতিকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সাধারণকে উত্তেজিত করে তোলবার জন্য একগাদা উপকরণের সমাবেশ ঘটিয়ে মন ও মগজকে নিষ্ক্রিয় করে তোলার যে পথ বর্তমানে অবলম্বিত হয়ে চলেছে মেহবুবও সেই পথই ধরে নিয়েছেন। তবুও এই, সাধারণ পরিচালক নন বলে মেহবুব তাঁর কল্পনাকে অনেক বড়ো ক্যানভাসে ফেলে বিরাট চেহারায় উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন। 'আওয়ারা'র সেই বছর পনের আগের সুস্থ হৃদয়ানুভূতিসম্পন্ন মেহবুব আর 'মাদার ইণ্ডিয়া'র ব্যবসাবুদ্ধিপ্রদীপ্ত এই মেহবুব একই ব্যক্তি এবং একই কাহিনীর চিত্রকর, কিন্তু শিল্প-বিবেচনায় কতো তফাৎ! মেহবুব আগের ছবিখানির চেয়ে একটা সুযোগ করে নিয়েছেন রঙের প্রয়োগ এনে, কিন্তু দেখে মনে হলো, তিনি রঙে হাত না দিলেই ভাল করতেন, কারণ রঙ তাঁর হাতে মনীষার ভাবময়তার চেয়ে অসির হিংস্রপনাকেই বেশী প্রকট করে তুলেছে।

• • •

প্রায় তিন বছর সময় নিয়ে তোলা ছবিখানির বিস্তৃত পরিসর জুড়ে বিরাটভাবে দৃশ্যের পরিকল্পনায় মেহবুবের কৃতিত্ব অসাধারণ। প্রতি দৃশ্য ও দৃশ্যাংশ এমনভাবে সাজানো, এমনভাবে তোলা যাতে দর্শকমনে কেবলই চমক সৃষ্টি করে অভিভূত করে যায়। মাত্রা মেপে, সমতা রক্ষা করে দৃশ্যের গাঁথুনি নয়, চমকপ্রদ করে তোলার জন্যে আধিক্য ও অতিরঞ্জনতাকেও অকুণ্ঠভাবে প্রশ্রয় দিয়ে যাওয়া হয়েছে। রস সৃষ্টির কথা নয়, কেবল ছবির সর্বাঙ্গে চমক ছড়িয়ে হতভম্ব করে রেখে দেওয়া সর্বক্ষণ। আর সে বিষয়ে

মেহবুব প্রধান অবলম্বন করেছেন রঙকে—কোথায় কি রঙ মানায় তা নয়, কতোটা রঙ খাপ খায় তাও নয়, কেবল রঙ লেপে লেপে যাওয়া যাতে চোখ ধাঁধিয়ে রাখা যায়, রঙের ঘোরটাই দৃষ্টিকে মাতাল করে রেখে দিতে পারে। বাস্তবিকই এমন বিপুল রঙের সমাবেশ, এমন বড়ো-করে-ভাবা ছবি আমাদের দেশে বড়ো একটা হয়নি। বিরাটত্বের দিক থেকে 'ওয়ার অ্যান্ড পিস'-এর মতো ছবির সংগে তুলনীয়, অবশ্য তার সংগে আরো কয়েকখানি বিদেশী ছবির প্রভাবও এতে লক্ষ্য করা যায়। অনেক কিছুরই বিপুল সমাবেশ, কিন্তু সবের সংগে সবের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়টা ঠিক ঘটেছে বলা যায় না। আরম্ভতেই দেখা যায় এক বৃদ্ধাকে। একটা ড্যামের উদ্বোধন হবে। গ্রামের মাতব্বররা এসে ধরলে সেই বৃদ্ধাকে উদ্বোধন করে দেবার জন্য। বৃদ্ধার আপত্তি কেউ শুনলে না, তাকে জোর করে ধরে নিয়ে হাজির করে অনুষ্ঠানের অংগ হিসেবে গলায় একটা মালা পরিয়ে দিলে। সেই মালায় গাথা একটা ফুল শুঁকতে শুঁকতে বৃদ্ধার হলো ভাবান্তর। এইখানে হলো ফ্ল্যাশব্যাক। অত্যন্ত অসংগত স্থল: কাহিনী শেষ হতে ঐ দৃশ্যেই আবার ফিরে আসা হচ্ছে, অর্থাৎ অন্ততঃ বছর পঁচিশের কাহিনী ঐখানে বৃদ্ধার ফুল শোঁকার কয়েক পলকের মধ্যে বিবৃত করে দেওয়ার উদ্ভট কল্পনা। ফ্ল্যাশব্যাকে গল্প আরম্ভ হয় ঐ বৃদ্ধার বিবাহের দিন থেকে। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি আসা। বিয়ের কনে হয়ে আসার দিনই রাধা শুনতে পায় বিয়ের জন্য স্বামীর ভিটে-জমি সুখী লালার কাছে বাঁধা পড়ার দুঃসংবাদ। রাধা তার স্বামীর সংগে এক-যোগে ক্ষেতের কাজ করে ভাল ফসল ফলিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব লালার দেনা শোধ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। ফসল হলো, কিন্তু তা দখল করে নিলে লালা। ক্রমে লালা বলদ দুটিও টেনে নিয়ে গেল। অনন্যোপায় হয়ে ওরা স্বামী-স্ত্রী নিজেদেরই কাঁধে লাঙল জুড়ে টানতে লাগলো। ভাল জমি যা ছিল তাও লালা হস্তগত করলে, ফলে পাথরভরা জমি ওদের কর্ষণ করতে হলো। একদিন একটা ভারী পাথর সরাতে গিয়ে তার নীচে চাপা পড়ে রাধার স্বামীর দুটি হাতই পংগু হলো। ক্ষেতের কাজ দেখে রাধা। গহনা বেচে দুটো বলদ কেনা হয়েছিল, লালা তাও ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তার ওপর স্ত্রীর মেহনতের আয়ে খাওয়ার গঞ্জনা। রাতে রাধার স্বামী বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হলো। রাধার তখন তিনটি সন্তান, স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হবার পর আরো একটি সন্তান জন্মালো। লালা প্রায়ই আসে রাধাকে হাতে রাখবে বলে। প্রলুব্ধ করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে, রাধা ঘৃণার সংগে লালাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়, লালার আক্রোশ তাতে আরো বেড়ে যেতে থাকে। হঠাৎ এলো ভীষণ প্লাবন। সব ভেসে গেল। কোন রকমে একটা মাচায় আশ্রয় নিয়ে রাধা তার প্রথম দুটি সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হলো। ওদের খাওয়াবার জন্য নিজের সতীত্বকেও লালার ইন্ধনে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছিল রাধা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সতীত্ব বাঁচিয়ে সন্তানদের বাঁচাতে সমর্থ হলো। তারপর আবার আরম্ভ হলো চাষের কাজ। ছেলেরা বাড়তে লাগলো। রাধার চেষ্টায় আবার সমৃদ্ধি ফিরে এলো, কিন্তু লালার দেনা তবুও শোধ হয় না। ছোট ছেলে বিরজু ছেলেবয়েস থেকেই গুন্ডা প্রকৃতির, লালার অন্যায় দেনা সে মানতে রাজী হলো না। এই নিয়ে বাধলো লালার সংগে সংঘাত নতুন করে। লালার ব্যাপারে বিরজু মায়েরও কথা শুনতে রাজী নয়। কাণ্ডটা এমন পাকালো যার ফলে সবদিক রক্ষা করতে রাধাই বন্দুক তুলে দাঁড়ালো তার ছেলের বিরুদ্ধে।

* * *

ভারতীয় নারীর মাহাত্ম্য—তার ত্যাগ, পতিভক্তি, সন্তানের প্রতি মমতা, জীবন নির্বাহে ও সন্তানদের পালনে তার সংগ্রাম, নির্লোভ সহনশীল জীবন—তাকেই বড়ো করে দেখানোর জন্যে এই কাহিনী। ঘটনা-কাল এখনকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ধরে আরো অন্ততঃ পঁচিশ বছর পেছনে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে বিরাট বিরাট প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও দেশকে বিপর্যস্ত, দেশের আপামর জনসাধারণের অবস্থাকে বিধ্বস্ত করে তোলার ব্যাপারে রাজনীতিক বিবিধ আন্দোলনও ছিল, কিন্তু অত্যন্ত প্রশস্ত ক্ষেত্র নিয়ে গল্পটির পরিকল্পনা হলেও ও-সবের কোন আভাসমাত্রও না থাকাটা ঠিক হয়নি। 'আওরং'এ যে কাহিনী ছিল মূলত তা ঠিকই আছে, তবে বিশদে পরিবর্তন অনেক এবং বিন্যাসটাও অন্যভাবের। এখানে একটা অতিরিক্ত অস্ত্র হাতে নিয়েছেন মেহবুব, সেটা হচ্ছে রঙ। আর রঙের বাহার দেখাবার জন্যেই ঘটনাকে ছেড়ে দিয়ে ক্যামেরা দৃশ্যের টুকরো টুকরো অংশের ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে অনেক ক্ষেত্রে—মেহেদী লাগানো হাতের পাঞ্জা, পায়ের পাতা, মেজের রঙ্গবল্লী, দেওয়ালের চিত্রবিচিত্র, আকাশের বিবিধ বর্ণচ্ছটা, সাজপোশাকের অংশ ইত্যাদি এমন অজস্র অংশ রয়েছে যা গল্পের প্রয়োজনের চেয়ে রঙের বাহার দেখাবার জন্যই সন্নিবেশিত। রঙের সুবিধের জন্য বিবাহ, হোলি প্রভৃতি ভারতীয় রঙীন উৎসবের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অবতারণা, যা ভারতীয়ের চোখে অনুরাগের নব অঞ্জন

িয়ে দেবার মতো কিছু নয়। যারা রতকে নিবিড় করে দেখেনি তাদের অর্থাৎ দেশীদেরই কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ রবে। অবশ্য ছবির ধরনটাই যেন দেশীদের দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী—নাম কেই তা বোঝা যায়। রাধার দুর্দশা শনির াপগ্রস্ত শ্রীবৎসের নির্মম অবস্থাকেও

হার মানায়। শ্বশুরবাড়িতে পা দেওয়ামাত্রই দেনার কথা শোনা, স্বামীর সঙ্গে কাঁধে জোয়াল নিয়ে লাঙল টানা, স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হওয়া, লালার অত্যাচার, প্লাবনে সব ভেসে যাওয়া, একটা মাচাতে আশ্রয় তাও ভেঙে পড়া, সাপের আক্রমণ, দুটো শিশু-পুত্রকে হারানো, ক্ষিধেয় কাতর মরণাপন্ন ছেলের জন্য সামান্য কিছু রাঁধতে যেতেও হাঁড়ি ফেঁসে যাওয়া ইত্যাদি এমনভাবে দেখানো হয়েছে, যা সুস্থমনে সহ্য করা শক্ত। প্লাবনে সব ভেসে গিয়েছে, রাধারাও ভাসছে, সেই অবস্থায় লালাকে রাধার কাছে কুপ্রস্তাব করতে এনে হাজির করা; সর্বত্র কেবলই জল অথচ তারই মাঝে আগুন জ্বালিয়ে হাঁড়ি চাপানো ইত্যাদি কতকগুলি এমন অসঙ্গত ব্যাপার আছে যা মেহবুবের ছবিতে আশা করা যায় না। দেখবার মতো এবং দেখে তারিফ করার মতো দৃশ্যও আছে যথেষ্টই; এমন দৃশ্য যা অন্যের ছবিতে আশা করা যায় না এবং এমন কলাকৌশলের কৃতিত্বও আছে যা ভারতীয় চলচ্চিত্রের অতীব সৌকর্যের পরিচায়ক, কিন্তু সব মিলিয়ে ছবিখানির চেহারাটায় কৃত্রিমতার এমন একটা ছাপ পাওয়া যায়, যা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। নৌসদ আলি সঙ্গীতে রকমারিত্ব আনার চেষ্টা করেছেন, অনেক রকমের বাজনা ও অনেক জাতের সুরও ব্যবহার করেছেন ছবিখানিকে ভরিয়ে তুলতে, কিন্তু হৃদয়তন্ত্রীতে সাড়া যেন জাগায় না। ফরেদুন ইরানীর ক্যামেরার কাজ দৃষ্টিকে বিস্ফারিত করে রাখে, কতকগুলো দৃশ্য-রচনা চমকে দেয়, কিন্তু সমগ্রভাবে হৃদয়ের চেয়ে মস্তিষ্কের প্রয়োগটাই বেশী মনে হয়। অভিনয়ে রাধার চরিত্রে নার্গিসই সব। আগের 'আওরং'এ সর্দার আখতারের সঙ্গে তুলনা না করাই ভাল, তবে নার্গিস একটা জীবন্ত নারীত্বকে ফুটিয়েছেন চমৎকার। মন হরণ করে রাখার মতো অভিনয় পাওয়া যায় ছোট বিরজুর চরিত্রে সাজ্জিদকে। ওর দুষ্টুমিই ছবির সবচেয়ে সরস অংশ। বড়ো বিরজুর চরিত্রে সুনীল দত্ত একটা একরোখা জাহিল চরিত্র অনেকটা ফুটিয়েছেন, তবে পাঠশালায় পড়তে যাওয়া, মেয়েদের দলে ঝাঁপিয়ে পড়া, দাদার ভাবী পত্নীর সঙ্গে দুষ্টুমি এসব ব্যাপারের মধ্যে অভিব্যক্তিতে কিছুটা অসঙ্গতি এসেছে। রাধার স্বামীর চরিত্রে রাজকুমারকে ভাল লাগবে। কনাইয়া-লালের লালার চরিত্রও বাড়াবাড়ি; আগেরটিতেও তিনি এই চরিত্রেই ছিলেন।
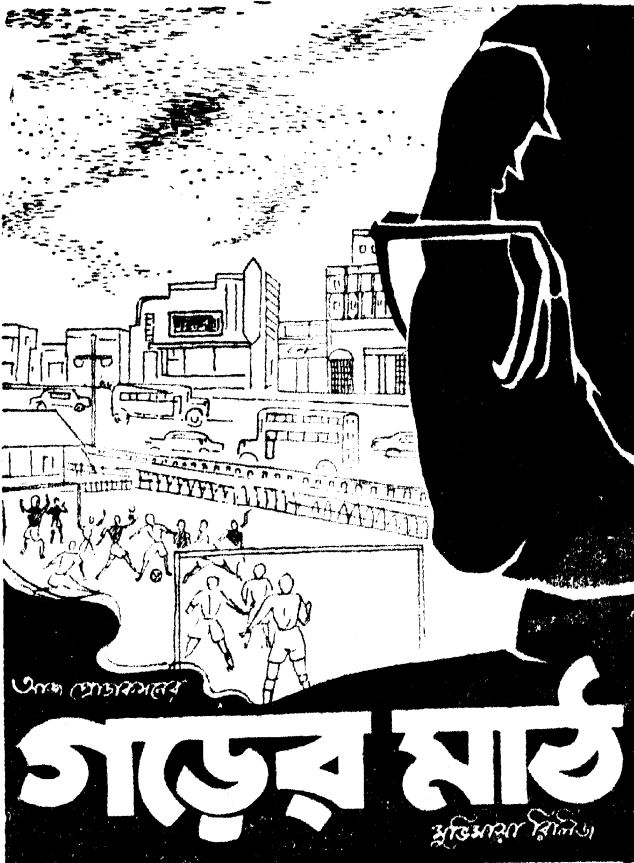
এণ্টালি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্যোগে দ্বিতীয় কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলন আগামী ১২ই ডিসেম্বর থেকে পাঁচদিন ধরে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম সম্মেলনটি হয় গত বছর এবং সেই প্রথমবারেই এই সম্মেলন কলকাতার সেরা সম্মেলনগুলির মধ্যে ঠাঁই করে নিতে সক্ষম হয়। গতবারের মতো শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পরিবেশন করার আয়োজন হচ্ছে।

• • •

গত দীপান্বিতা দিবসে শ্রীশ্রীঠাকুর বালক-ব্রহ্মচারীর ৩৮তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এক সঙ্গীতের আসর অনুষ্ঠিত হয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন ওস্তাদ আহমেদ আলি খাঁ, বাহাদুর হোসেন খাঁ। সরোজ সেন-গুপ্তের পরিচালনায় আধুনিক সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন সুধীর সেন, অমূল্য সান্যাল, অমূল্য মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

জুলেস রিমেট কাপ বা বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলার নিয়মকানুন এবং পূর্ব প্রতিযোগিতার কিছু কিছু বিবরণ আগের সপ্তাহে প্রকাশ করেছি। এসপ্তাহে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার এ বছরের আয়োজন এবং কিছু কিছু খেলার কথা আলোচনা করছি। এ বছরের খেলা অর্থে ১৯৫৮ সালের প্রতিযোগিতার কথাই বুঝতে হবে। মূল প্রতিযোগিতা ১৯৫৮ সালেরই জুন মাসে আরম্ভ হবে। কিন্তু বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাস থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে। কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবারও অধিকার অর্জন করেছে।

গত সপ্তাহেই বলেছি বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় এবার যত বেশী দেশ অংশ গ্রহণ করেছে, এত বেশী দেশ অন্য কোনবার জুলেস রিমেট কাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। গতবারের অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের প্রতিযোগিতায় ৩৬টি দেশ যোগ দিয়েছিল, আর এবার যোগ দিয়েছে বিশ্বের শক্তিশালী ৪৯টি দেশ। ইউরোপ অঞ্চল থেকে যোগ দিয়েছে ২৭টি দেশ। আফ্রো-এশিয়া অঞ্চল থেকে ৮টি আর উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা অঞ্চল থেকে ১৪টি দেশ যোগ দিয়েছে। এছাড়া গতবারের জুলেস রিমেট কাপ বিজয়ী পশ্চিম জার্মানী এবং এবারের মূল প্রতিযোগিতা আয়োজনকারী দেশ সুইডেনের তো সরাসরি মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকার আছে।

এখন প্রাথমিক পর্যায়ের খেলার আলোচনা করা যাক। মূল প্রতিযোগিতার ১৬টি দেশের মধ্যে কোন কোন দেশ ইতিমধ্যে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকার অর্জন করেছে, আর কোন কোন দেশের খেলবার সম্ভাবনা আছে এই আলোচনা থেকেই তা বোঝা সহজ হবে। এই সঙ্গে প্রতিযোগিতার গ্রুপ বিভাগ সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল হওয়া যাবে।

একলব্য

অবশ্য বিশ্বব্যাপী বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের খেলার সমস্ত বিবরণ এখনও আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। অনেকগুলি খেলার ফলাফলও পাওয়া যায়নি। তবুও এ আলোচনা থেকে প্রতিযোগিতার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি করা কষ্টসাধ্য হবে না আশা করি।

ইউরোপ অঞ্চল

ইউরোপ অঞ্চলের ২৭টি দেশকে ৯টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। ফলে প্রতি গ্রুপেই আছে তিনটি করে দেশ। প্রতি গ্রুপ বিজয়ীই মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার সুযোগ পাবে। সুতরাং বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার মূল খেলায় এবার ইউরোপ অঞ্চলের ৯টি শক্তিশালী দেশকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দেখা যাবে। লীগ প্রথায় প্রথম ও পাল্টা খেলার নিয়মে একটি গ্রুপের তিনটি দেশকেই ৪টি করে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে এবং এইভাবেই নির্ণীত হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলার ফলাফল।

প্রথম গ্রুপ

ইউরোপ অঞ্চলের প্রথম গ্রুপে স্থান পেয়েছিল ইংলণ্ড, ডেনমার্ক আর আয়ারল্যাণ্ড। এর মধ্যে ইংলণ্ড অপরাজিত থেকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকার অর্জন করেছে। এই গ্রুপে ইংলণ্ড পেয়েছে ৭ পয়েণ্ট আর আয়ারল্যাণ্ড পেয়েছে ৫ পয়েণ্ট। ডেনমার্ক একটি পয়েণ্টও লাভ করেনি। চারটি খেলাতেই ডেনমার্ককে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ইংলণ্ডের সপক্ষে গোল হয়েছে ১৫টি, বিপক্ষে গোল হয়েছে ৫টি। আয়ারল্যাণ্ড ৬টি গোল করেছে, কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডের বিপক্ষে হয়েছে ৭টি গোল। ডেনমার্ক ১৩টি গোল খেয়ে ৪টি গোল পরিশোধ করেছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় গ্রুপের শ্রেষ্ঠ দল হিসাবেই ইংলণ্ড বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। বিশ্বকাপে ইংলণ্ড চিরদিনই ভাল খেলে। গতবার কোয়ার্টার ফাইনালে ইংলণ্ড শক্তিশালী উরুগুয়ের কাছে ৪—২ গোলে পরাজয় স্বীকার করেছিল।

গতবারের পরাজয়ের পর থেকেই ইংলণ্ড বিশ্বকাপের জন্য আপ্রাণ তোড়-জোড় করছে। ৪০ মাসের প্রচেষ্টায় তারা অন্ততঃ ৬০জন কৃতিসম্পন্ন খেলোয়াড় তৈরি করেছে। বিশ্বকাপের মূল প্রতিযোগিতায় দল গঠনের জন্য ইংলণ্ড আপাততঃ ৪৬ জন খেলোয়াড়কে মনোনয়ন করেছে। এর মধ্যে ৫জন আছেন গত বিশ্বকাপের খেলোয়াড়। এরা হচ্ছেন ফুটবল যাদুকর স্ট্যানলি ম্যাথুজ, ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের লেফট ব্যাক বার্ণ, উলভার হ্যাম্পটন ওয়াণ্ডারার্সের সেণ্টার হাফ ব্যাক রাইট, প্রেস্টনের লেফট আউট খ্যাতনামা খেলোয়াড় টম ফিনে এবং ম্যানচেস্টারের সেণ্টার ফরোয়ার্ড টেলর। গত ২ বছরে ১৬টি আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার মধ্যে ইংলণ্ড এপর্যন্ত একটি খেলাতেও পরাজয় স্বীকার করেনি। ইংলণ্ডে অধিবাসীদের ধারণা ঠিকভাবে দল গঠিত হলে সুইডেন থেকে এবার জুলেস রিমেট কাপ নিয়ে আসা ইংলণ্ডের পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য নয়।

নীচে প্রথম গ্রুপের খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল—

আয়ারল্যান্ড (২)	ডেনমার্ক (১)
ইংলণ্ড (৫)	ডেনমার্ক (২)
ইংলণ্ড (৫)	আয়ারল্যান্ড (১)
ইংলণ্ড (১)	আয়ারল্যান্ড (১)
ইংলণ্ড (৪)	ডেনমার্ক (১)
আয়ারল্যান্ড (২)	ডেনমার্ক (০)

(ইংলণ্ড গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন)

দ্বিতীয় গ্রুপ

ইউরোপ অঞ্চলের দ্বিতীয় গ্রুপে ফ্রান্সই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ এবং ৪টি খেলায় ৭ পয়েন্ট পেয়ে ফ্রান্সই বিশ্ব কাপের মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকার অর্জন করেছে। এই গ্রুপের সমস্ত খেলা শেষ হয়ে গেলেও বেলজিয়াম ও আইসল্যাণ্ডের খেলার খবর এখনও আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। বেলজিয়াম ফ্রান্সের বিরুদ্ধে চিরদিনই ভাল খেলে। ফলে বেলজিয়ামকে নিয়েই ফ্রান্সের ভয় ছিল। কিন্তু প্যারিসে গ্রুপের প্রথম খেলাতেই ফ্রান্স ৬—৩ গোলে বেলজিয়ামকে পরাজিত করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নসিপ লাভের পথ সহজ করে তোলে। পরে আইসল্যাণ্ডকে ৮—০ ও ৫—১ গোলে পরাজিত করতে ফ্রান্সকে মোটেই বেগ পেতে হয় না। বেলজিয়ামের সংগে ফ্রান্সের পাল্টা খেলাটি অবশ্য গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রুপের খেলাগুলির ফলাফল নীচে দেওয়া হল—

ফ্রান্স (৬)	বেলজিয়াম (৩)
ফ্রান্স (৮)	আইসল্যাণ্ড (০)
বেলজিয়াম (৮)	আইসল্যাণ্ড (৩)
ফ্রান্স (৫)	আইসল্যাণ্ড (১)
ফ্রান্স (০)	বেলজিয়াম (০)

বেলজিয়াম : আইসল্যাণ্ড

(ফ্রান্স গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন)

তৃতীয় গ্রুপ

তৃতীয় গ্রুপে হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া এবং নরওয়ে তিনটিই পরম শক্তিশালী দল। এর মধ্যে হাঙ্গেরী বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় গতবারের রানার্স। অবশ্য দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হাঙ্গেরীর ফুটবল শক্তিকে অনেকখানি দুর্বল করে তুলেছে। রাজনৈতিক গোলযোগের সময় যেসব কীর্তিমান খেলোয়াড় দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাদের সকলে এখনও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেননি। তবুও ফুটবল খেলায় হাঙ্গেরী অপরিমিত শক্তির অধিকারী। নরওয়ের কাছে প্রথম খেলায় পরাজয় স্বীকার করতে হলেও তৃতীয় গ্রুপে হাঙ্গেরীই এখন পর্যন্ত শীর্ষস্থানে রয়েছে। হাঙ্গেরী তিনটি খেলায় ৪ পয়েন্ট, নরওয়ে দুটি খেলায় ২ পয়েন্ট এবং বুলগেরিয়া তিনটি খেলায় ২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।

সোফিয়ায় বুলগেরিয়ার সংগে হাঙ্গেরীর শেষ খেলাটিতে আগাগোড়াই সুতীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। যোগ্য দল হিসাবেই হাঙ্গেরী অবশ্য খেলাটিতে ২—১ গোলে জয়লাভ করে। বিজয়ী দলের পক্ষে দুইটি গোলই করেন হাঙ্গেরীর বিশ্বখ্যাত সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিদেকুটি। গ্রুপের বাকি দুটি খেলায় নরওয়েকে বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরীর সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে নরওয়ে জয়লাভ করলে হাঙ্গেরী ও নরওয়ের শেষ খেলাটি হবে চ্যাম্পিয়নসিপ নির্ণায়ক খেলা। সুতরাং বাকি দুটি খেলার ফলাফলের উপর তৃতীয় গ্রুপের চ্যাম্পিয়নসিপের প্রশ্ন নির্ভর করছে। নীচে খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল—

বুলগেরিয়া (২)	নরওয়ে (১)
নরওয়ে (২)	হাঙ্গেরী (১)
হাঙ্গেরী (৪)	বুলগেরিয়া (১)
হাঙ্গেরী (২)	বুলগেরিয়া (১)

বুলগেরিয়া : নরওয়ে (৩রা নবেম্বর)

হাঙ্গেরী : নরওয়ে (১০ই নবেম্বর)

চতুর্থ গ্রুপ

ইউরোপ অঞ্চলের চতুর্থ গ্রুপের প্রথম খেলায় ওয়েলস শক্তিশালী চেকোস্লোভেকিয়া দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে বেশ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল এবং চেকোস্লোভেকিয়া ও পূর্ব জার্মানীর মধ্যে গ্রুপের শেষ খেলাটি না হওয়া পর্যন্ত ওয়েলস এবং চেকোস্লোভেকিয়া উভয় দেশই ৪টি করে পয়েন্ট লাভ করেছিল। সম্প্রতি পূর্ব জার্মানীর লিপজিগে অনুষ্ঠিত গ্রুপের শেষ খেলায় চেকোস্লোভেকিয়া ৪—১ গোলে পূর্ব জার্মানীকে পরাজিত করে বিশ্বকাপের মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকার অর্জন করেছে। চেকোস্লোভেকিয়া পেয়েছে ৬ পয়েণ্ট, ওয়েলস পেয়েছে ৪ পয়েণ্ট আর পূর্ব জার্মানী পেয়েছে ২ পয়েণ্ট, খেলাগুলির ফলাফল—

ওয়েলস (১)	চেকোস্লোভেকিয়া (০)
পূর্ব জার্মানী (২)	ওয়েলস (১)
চেকোস্লোভেকিয়া (২)	ওয়েলস (০)
চেকোস্লোভেকিয়া (৩)	পূর্ব জার্মানী (১)
ওয়েলস (১)	পূর্ব জার্মানী (০)
চেকোস্লোভেকিয়া (৪)	পূর্ব জার্মানী (১)

(চেকোস্লোভেকিয়া গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন)

পঞ্চম গ্রুপ

পঞ্চম গ্রুপে অস্ট্রিয়া এবং নেদারল্যাণ্ড প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন, কিন্তু চারটি খেলায় ৭ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে অস্ট্রিয়া গ্রুপ চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছে। এই গ্রুপের সব খেলাই শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে নেদারল্যান্ডের এবং লুক্সেমবার্গের সঙ্গে নেদারল্যান্ডের খেলা দুটির ফলাফল এখনও পাওয়া যায়নি। অবশ্য অস্ট্রিয়া ও নেদারল্যান্ডের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে, এখবর পাওয়া গেছে, কিন্তু গোলসংখ্যা জানা যায়নি। অস্ট্রিয়ার চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ সম্পর্কেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। গ্রুপের চারটি খেলার ফলাফল—

অস্ট্রিয়া (৭) — লুক্সেমবার্গ (০)
নেদারল্যান্ড (৪) — লুক্সেমবার্গ (১)
অস্ট্রিয়া (৩) — নেদারল্যান্ড (২)
অস্ট্রিয়া (৩) — লুক্সেমবার্গ

(অস্ট্রিয়া গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন)

ষষ্ঠ গ্রুপ

ষষ্ঠ গ্রুপে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সোভিয়েট রাশিয়ারই জয়লাভের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। এই গ্রুপে পোল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডের মাত্র একটি খেলা বাকি আছে। এই পর্যন্ত রাশিয়া ৬ পয়েন্ট এবং পোল্যান্ড ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। বাকি খেলাটিতে পোল্যান্ড ফিনল্যান্ডকে পরাজিত করলে চ্যাম্পিয়নসিপ নির্ণয়ের জন্য পোল্যান্ড এবং রাশিয়াকে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রথম খেলায় পোল্যান্ডকে ৩—০ গোলে পরাজিত করেছিল। কিন্তু পাল্টা খেলায় পোল্যান্ড রাশিয়াকে পরাজিত করে ২—১ গোলে। পোল্যান্ডের সাম্প্রতিক ফুটবলমান বেশ উন্নত। তবুও সোভিয়েট রাশিয়া মূল প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পাবে না একথা ভাবা যায় না। খেলাগুলির ফলাফল—

ইউ এস এস আর (৩) — পোল্যান্ড (০)
ইউ এস এস আর (২) — ফিনল্যান্ড (১)
পোল্যান্ড (৩) — ফিনল্যান্ড (১)
ইউ এস এস আর (১১) — ফিনল্যান্ড (০)
পোল্যান্ড (২) — ইউ এস এস আর (১)
পোল্যান্ড : ফিনল্যান্ড (৩রা নবেম্বর)

সপ্তম গ্রুপ

গ্রীস এবং রুমেনিয়ার সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করায় অলিম্পিক রানার্স যুগোস্লাভিয়া সপ্তম গ্রুপ চ্যাম্পিয়নসিপ লাভের প্রশ্ন সন্দিহান হয়ে উঠেছে। এপর্যন্ত রুমেনিয়া দুটি খেলায় ৩ পয়েন্ট এবং যুগোশ্লাভিয়া দুটি খেলায় ২ পয়েন্ট লাভ করেছে; গ্রীস দুটি খেলায় লাভ করেছে ১ পয়েন্ট। সুতরাং বাকি তিনটি খেলার ফলাফলের উপরই সবকিছু নির্ভর করছে। এই গ্রুপে যুগোস্লাভিয়া সবচেয়ে শক্তিশালী সন্দেহ নেই। কিন্তু ফুটবল খেলার সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও যুগোস্লাভিয়ার ফরোয়ার্ডরা গোলকানা। তবুও মূল প্রতিযোগিতায় যুগোস্লাভিয়ারই খেলার সম্ভাবনা ষোলো আনা। খেলার ফলাফল—

গ্রীস (০) — যুগোস্লাভিয়া (০)
রুমেনিয়া (১) — যুগোস্লাভিয়া (১)
রুমেনিয়া (২) — গ্রীস (১)
রুমেনিয়া : গ্রীস
যুগোস্লাভিয়া : গ্রীস (৩রা নবেম্বর)
যুগোস্লাভিয়া : রুমেনিয়া (১৭ই নবেম্বর)

অষ্টম গ্রুপ

ইউরোপ অঞ্চলের অষ্টম গ্রুপে ইটালী, পর্তুগাল ও নর্থ আয়ারল্যান্ড—তিনটি দেশের মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রশ্নের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা। ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালের 'জুলেস রিমেট' কাপ বিজয়ী ইটালির ফুটবল শক্তি অনেকাংশে হ্রাস হয়েছে। এই গ্রুপে নর্থ আয়ারল্যান্ড দলই ছিল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। কিন্তু লিসবন ও রোমে নর্থ আয়ারল্যান্ডকে যথাক্রমে পর্তুগালের কাছে এক পয়েন্ট এবং ইটালির কাছে দুই পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়। এখন পর্তুগাল এবং নর্থ আয়ারল্যান্ড দুই দেশই তিনটি করে পয়েন্ট অর্জন করেছে, ইটালি অর্জন করেছে দুই পয়েন্ট। গ্রুপের বাকী দুটি খেলার ফলাফলের উপরই সব কিছু নির্ভর করছে। তিনটি দেশের শ্রেষ্ঠত্ব যাচাইয়ের জন্য এ গ্রুপে একটি অতিরিক্ত খেলার ব্যবস্থারও প্রয়োজন হতে পারে। নীচে খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল:—

পর্তুগাল (১) — নর্থ আয়ারল্যান্ড (১)
ইটালি (১) — নর্থ আয়ারল্যান্ড (০)
নর্থ আয়ারল্যান্ড (৩) — পর্তুগাল (০)
পর্তুগাল (৩) — ইটালি (০)
নর্থ আয়ারল্যান্ড : ইটালি (৩রা ডিসেম্বর)
ইটালি : পর্তুগাল (২২শে ডিসেম্বর)

নবম গ্রুপ

নবম গ্রুপে স্পেন, স্কটল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই গ্রুপে সুইজারল্যান্ডের চেয়ে স্পেন ও স্কটল্যান্ড অনেক শক্তিশালী। দুর্ভাগ্যবশতঃই স্পেন গতবার বিশ্ব প্রতিযোগিতার মূল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি। তুরস্কের সঙ্গে স্পেনের তিনটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলার পরও দুই দেশের পয়েন্ট সমান থাকে। শেষ পর্যন্ত লটারীর দ্বারা ফলাফল মীমাংসিত হয় এবং ভাগ্যের খেলায় স্পেন পরাজয় স্বীকার করে। এবারও স্পেনের প্রতি ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন বলে মনে হয় না। মাদ্রিদে সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্পেন অনেক ভাল খেলেও জয়লাভ করতে পারেনি। এ দিকে গ্লাসগোতে স্কটল্যান্ডের কাছে স্পেনকে ৪—২ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। এ পর্যন্ত স্কটল্যান্ড ৪ পয়েন্ট এবং স্পেন ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। দুই দেশেরই আর সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে একটি করে খেলা বাকী আছে। এখন স্কটল্যান্ডের মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার সম্ভাবনা বেশী। গ্রুপের ফলাফল:—

স্পেন (২) — সুইজারল্যান্ড (২)
স্কটল্যান্ড (৪) — স্পেন (২)
স্কটল্যান্ড (২) — সুইজারল্যান্ড (১)
স্কটল্যান্ড : সুইজারল্যান্ড (৬ই নভেম্বর)
সুইজারল্যান্ড : স্পেন (২৪শে নভেম্বর)

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল

ফুটবল খেলায় দক্ষিণ আমেরিকা অপরিমিত শক্তির অধিকারী। এই অঞ্চলের দলগুলির মধ্যে যেমন উরুগুয়ের শক্তি তেমন প্যারাগুয়ের নৈপুণ্য। আর্জেন্টিনা এবং ব্রেজিল বহু সুনিপুণ ফুটবল খেলোয়াড়ের জন্মভূমি। পেরু, চিলি এবং বলিভিয়াও কম যায় না। মোটের উপর ফুটবল খেলায় দক্ষিণ আমেরিকা খুবই সমৃদ্ধ।

দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম গ্রুপে ব্রেজিল পেরুর সঙ্গে প্রথম খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে। কিন্তু পাল্টা খেলায় পেরুকে পরাজিত করে ব্রেজিল মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকার অর্জন করেছে। বিশ্ব ফুটবলে ব্রেজিল ১৯৫০ সালের রানার্স। গতবার ব্রেজিল কোয়ার্টার ফাইন্যালে হাঙ্গেরীর কাছে ৪—২ গোলে পরাজয় স্বীকার করে। **ফলাফল—**

পেরু (১) — ব্রেজিল (১)
ব্রেজিল (১) — পেরু (০)

(ব্রেজিল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন)

দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের দ্বিতীয় গ্রুপের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে বিশ্ব প্রতিযোগিতার প্রথম বছরের রানার্স আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা এখন খুবই

শক্তিশালী ফুটবল দেশ। মূল প্রতিযোগিতায় এরা অনেককেই বেগ দেবে বলে মনে হয়। গ্রুপের খেলার ফলাফল—

চিলি (২)	বলিভিয়া (১)
আর্জেণ্টিনা (৪)	চিলি (০)
আর্জেণ্টিনা (৪)	বলিভিয়া (০)
বলিভিয়া (৩)	চিলি (০)
আর্জেণ্টিনা (২)	চিলি (০)

(আর্জেণ্টিনা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন)

১৯৩০ ও ১৯৫০ সালের 'জুলেস রিমেট' কাপ বিজয়ী পরম শক্তিশালী উরুগুয়ে দল দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের তৃতীয় গ্রুপের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করবে, ফুটবল বিশারদ অনেকের মনেই এই ধারনা বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু কলম্বিয়ার সংগে 'ড্র' করে এবং প্যারাগুয়ের কাছে প্রথম খেলায় শোচনীয়ভাবে ৫—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করে উরুগুয়েকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। প্যারাগুয়ে হয়েছে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন। খেলাগুলির ফলাফল—

উরুগুয়ে (১)	কলম্বিয়া (১)
প্যারাগুয়ে (৩)	কলম্বিয়া (২)
উরুগুয়ে (১)	কলম্বিয়া (০)
প্যারাগুয়ে (৫)	উরুগুয়ে (০)
উরুগুয়ে (২)	প্যারাগুয়ে (০)
প্যারাগুয়ে (৩)	কলম্বিয়া (২)

(প্যারাগুয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন)

উত্তর-মধ্য-আমেরিকা অঞ্চল

উত্তর ও মধ্য আমেরিকার ছয়টি দেশের মধ্যে থেকে একটি দেশকে মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ছয়টি দেশকে দুই গ্রুপে ভাগ করে এখানকার খেলা পরিচালনা করা হয়েছে। দুই গ্রুপের বিজয়ী মেক্সিকো ও কণ্টারিকার খেলায় মেক্সিকো ২—০ গোলে বিজয়ী হয়ে লাভ করেছে উত্তর-মধ্য আমেরিকার চ্যাম্পিয়নশিপ।

মেক্সিকো, ইউ এস এ ও ক্যানাডা ছিল একটি গ্রুপে। অপর গ্রুপে ছিল কণ্টারিকা, কিউরাকাও ও গুয়েতেমালা। দ্বিতীয় গ্রুপের সব খেলার ফলাফল পাওয়া যায়নি। যতগুলি পাওয়া গেছে, প্রকাশ করছি।

মেক্সিকো (৬)	ইউ এস এ (০)
মেক্সিকো (৩)	ক্যানাডা (০)
মেক্সিকো (২)	ক্যানাডা (০)
মেক্সিকো (৭)	ইউ এস এ (২)
ক্যানাডা (৩)	ইউ এস এ (২)
ক্যানাডা (৫)	ইউ এস এ (১)

দ্বিতীয় গ্রুপ

কণ্টারিকা (৪)	কিউরাকাও (০)
কণ্টারিকা (২)	কিউরাকাও (১)
কিউরাকাও (৩)	গুয়েতেমালা (১)

(মেক্সিকো চ্যাম্পিয়ন)

আফ্রো-এশিয়ান অঞ্চল

উত্তর-মধ্য আমেরিকা অঞ্চলের মত আফ্রো-এশিয়ান অঞ্চলেরও ছয়টি দেশের মধ্য থেকে একটি দেশকে মূল প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ দেওয়া হবে। এখানেও হয়েছে দুটি গ্রুপ। সুদান, সিরিয়া ও মিশর আছে একটি গ্রুপে আর প্রজাতন্ত্র চীন, ইন্দোনেশিয়া এবং ইস্রাইল আছে আর একটি গ্রুপে। ইন্দোনেশিয়া ও ইস্রাইলের খেলা নিয়ে এক রাজনৈতিক জটিলতাও দেখা দিয়েছে। বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রাথমিক খেলায় নিয়মানুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি দেশের মাটিতে পর্যায়ক্রমে দুটি ম্যাচ খেলতে হয়। কিন্তু গত বছর মিশরে ইস্রাইলী অভিযানের বিরুদ্ধে মিশরের সমর্থক ইন্দোনেশিয়া ইস্রাইলের মাটিতে খেলতে নারাজ। এদিকে ইস্রাইলও তার মাটিতে একটি ম্যাচ খেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ সমস্যার এখনও মীমাংসা হয়নি; খেলার মধ্যেও রাজনীতি এসে পড়েছে।

যাই হোক, দুই দেশের মাটিতে প্রজাতন্ত্র চীন ও ইন্দোনেশিয়ার দুটি খেলার মধ্যে একটি খেলায় ইন্দোনেশিয়া অপর খেলায় চীন জয়লাভ করে। ফলে তৃতীয় দেশ রেংগুনে এদের মধ্যে তৃতীয় খেলার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এ খেলায় জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি না হওয়ায় গোল 'এভারেজে' লাল চীনকে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মিশর এবং ইস্রাইল নিজ নিজ গ্রুপের কোন খেলায় এখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। দুই গ্রুপ বিজয়ীর খেলায় বিজয়ী দল মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার অধিকার অর্জন করবে। আফ্রো-এশিয়ান গ্রুপের খেলার ফলাফল :—

সুদান (১)	: সিরিয়া (০)
সুদান (১)	: সিরিয়া (১)

(মিশর এই গ্রুপের তৃতীয় দল)

ইন্দোনেশিয়া (২)	: লাল চীন (০)
লাল চীন (৪)	: ইন্দোনেশিয়া (৩)
* লাল চীন (০)	: ইন্দোনেশিয়া (০)

(এই গ্রুপের তৃতীয় দল ইস্রাইল)

মূল প্রতিযোগিতা

মূল প্রতিযোগিতায় ১৬টি দেশকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করে লীগ ও নক-আউট প্রথায় খেলা পরিচালনা করা হবে সুইডেনে. ১৬টি দেশের মধ্যে ৮টি দেশ ইতিমধ্যেই মূল প্রতিযোগিতায় খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এদের নাম হচ্ছে—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, চেকোস্লোভেকিয়া, অস্ট্রিয়া, ব্রেজিল, আর্জেণ্টিনা, প্যারাগুয়ে ও মেক্সিকো। এ ছাড়া গতবারের 'জুলেস রিমেট' কাপ বিজয়ী পশ্চিম জার্মানী আর মূল প্রতিযোগিতার আয়োজনকারী দেশ সুইডেন মূল প্রতিযোগিতায় অন্যতম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী।

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ৮ তারিখ ১৬টি দেশকে চারটি গ্রুপে ভাগ করার দিন স্থির হয়ে আছে। তারপর জুনের ৮ তারিখ থেকে সুইডেনের চারটি অঞ্চলে চারটি গ্রুপের লীগ খেলা আরম্ভ হবে। স্টকহোম, গোথেনবার্গ, মালমো ও নরকপিংয়ের মনোরম ক্রীড়াক্ষেত্র চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের সুপ্রশস্ত স্টেডিয়াম নির্বাচিত হয়ে আছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতার সর্বশেষ খেলার অনুষ্ঠানক্ষেত্র।

দেশী সংবাদ

২২শে অক্টোবর—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৩তম অধিবেশনের তিন মাস বাকী। গৌহাটীর নিকটস্থ জালুকাবাড়িতে এই অধিবেশন হইবে। ইহা লইয়া আসামে এই দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে।

২৩শে অক্টোবর—অদ্য শ্রীশ্রীকালী প্রতিমা নিরঞ্জন এবং দীপাবলী উৎসব পালনকালে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ২ জনের শোচনীয়ভাবে মৃত্যু ঘটে এবং প্রায় ৩০ জন অল্পাধিকতর আহত হয়। বিভিন্ন অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গতকল্য মাদ্রাজের এক অঞ্চলে পটকা বিস্ফোরণের ফলে নয়জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে।

২৪শে অক্টোবর—অদ্য কলিকাতায় সর্বভারতীয় মার্চেণ্ট ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি উহা হইতে নিজেদের প্রত্যাহার করিয়া লন। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত রোয়েদাদের অধীনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ক্ষতিপূরক ভাতাদানের দাবী যুক্তিযুক্ত কি না, তাহা বিবেচনার নিমিত্ত এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এ পি জৈন অদ্য এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের অংশ বিশেষে ঘাটতির জন্য বিদেশ হইতে আরও অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য আনার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য আমদানী নীতি সংশোধন করিতে হইবে।

২৫শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গের সরকার অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে [illegible] সকল শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক নির্বাচন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইবেন তাঁহাদের বেতনক্রম বাড়ানো হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পশ্চিম বাঙলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের দশম শ্রেণী ব্যতীত অবশিষ্ট সকল শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৫৮ সাল হইতে যে নববিধান প্রবর্তিত হইতে যাইতেছে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষা-সংস্থার নিকট এক বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিয়াছেন।

হরিপাল (হুগলী) থানার অন্তর্গত ইলামি-পুর গ্রামের শ্রীকুলদাচরণ [illegible] বাড়ীতে একটি নারিকেল হইতে নারিকেল চারার পরিবর্তে একটি আমের চারা বাহির হইয়াছে। অনেকেই এই আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ানুভব করিতেছেন।

২৬শে অক্টোবর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ও উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন [illegible] পি-ই-এন-এর (কবি, প্রবন্ধকার ও ঔপন্যাসিক) সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনে লেখক ও বৈজ্ঞানিকগণের প্রতি এই আবেদন জানান যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের লেখা ও বাক্যের ভিতর দিয়া আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও শান্তিস্থাপনের বাণী প্রচার করেন।

[illegible] ও কুকিদিগের পার্বত্য অঞ্চলের খণ্ড-[illegible] অধিবাসীদের এক সর্বদলীয় সম্মেলনে আসামের পাঁচটি জেলা লইয়া পার্বত্য জেলার [illegible] ব্যাপক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী জানাইয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ-বল্লভ পন্থের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

২৭শে অক্টোবর—বিশ্বভারতী কলা-ভবনের প্রবীণ অধ্যাপক এবং ভারত বিখ্যাত জনৈক শিল্পীকে বিশ্বভারতীরই ইংরেজী সাহিত্যের জনৈক বয়স্ক অধ্যাপক গতকল্য রাত্রে অকস্মাৎ প্রহার করিয়া বসায় শান্তিনিকেতনে এক অবাঞ্ছনীয় অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

২৮শে অক্টোবর—উড়িষ্যা সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ দক্ষিণ উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার মালকানগিরিতে উদ্বাস্তুদের উন্নয়নমূলক কার্য চালাইবার জন্য উদ্বাস্তু কর্মী সংগ্রহের ব্যাপারে অসুবিধায় পড়িয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উড়িষ্যার এই অংশের প্রায় ৫০ বর্গমাইল জমি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

আজ নয়াদিল্লীতে ১৯তম আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সম্মেলনের উদ্বোধনী সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু উভয়েই আন্তর্জাতিক সমস্যাবলীর সমাধানে সহনশীলতার পরিচয় দেওয়ার জন্য বিবদমান শক্তিবর্গের প্রতি আবেদন জানান।

বিদেশী সংবাদ

২২শে অক্টোবর—পাকিস্তানে কর্তৃপক্ষ নাকশার নেতা আল্লামা মাশরিকির অনুগামী-দের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য পাকিস্তানের সীমান্ত হইতে অভ্যন্তরে পাঁচ মাইলের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন।

পাকিস্তানের নূতন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মুজিবর রহমান খান নির্দেশ দিয়াছেন যে, অতঃপর পাকিস্তানের রাজধানী করাচীর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে উর্দু ও বাংলা এই উভয় রাষ্ট্র ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হইবে।

আজ মস্কোর সংবাদে জানা গেল, সোভিয়েট-আর্মেনিয়ায় শীঘ্রই বিশ্বের প্রথম সৌর-বিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্রের কাজ শুরু হইবে। এই কেন্দ্রটি একটি সুন্দর উপত্যকায় অবস্থিত।

২৩শে অক্টোবর—ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী আজ লণ্ডনে বলেন যে, ভারতের পাঁচসালা পরিকল্পনার পক্ষে আগামী ছয় মাস কাল সংকটজনক সময়। এই সময়ে বাহির হইতে যদি কোন আর্থিক সাহায্য না পাওয়া যায়, তবে পরিকল্পনাটির সংশোধন করিতে হইবে।

গতকল্য লাহোরের এক ম্যাজিস্ট্রেট খাকসার নেতা আল্লামা মাশরিকিকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

২৪শে অক্টোবর—সিরিয়ার প্রধান সেনাপতি জেনারেল আফিফ বিজরী আজ এই অভিযোগ করেন যে গত কয়েকদিন যাবত আমেরিকান বিমানসমূহ সিরিয়ার আকাশে অনধিকার প্রবেশ করিতেছে।

ভারত জার্মানী অর্থনৈতিক আলোচনা সমাপ্তির পর পশ্চিম জার্মান সরকার একটি ইস্তাহার প্রচার করিয়া বলিয়াছেন যে, ফেডারেল জার্মান রিপাবলিক তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ভারতের শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করিবে।

২৫শে অক্টোবর—প্যারিসের চেক ব্যাঙ্কের ভূগর্ভস্থ গুপ্তকক্ষে পঞ্জীভূত ধনরত্নের মধ্যে কপূরতলার মহারাজার হীরক, নীলকান্তমণি, মুক্তা, স্বর্ণালঙ্কার এবং প্রভূত পরিমাণ নোট ও মুদ্রায় পরিপূর্ণ সাতটি সুটকেস মৃত মহারাজের সম্পত্তির দাবীদারগণ কর্তৃক পরীক্ষিত হইতেছে।

আজ জর্ডান সরকার দেশের অসামরিক অধিবাসীদের যে কোন জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

২৬শে অক্টোবর—তাসের খবরে প্রকাশ, [illegible] সোভিয়েট ম্যাকিনেভস্কি রুশ প্রতিরক্ষা বিভাগের [illegible] জুকভের স্থলবর্তী হইয়াছেন, সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতিমণ্ডলী [illegible] সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

পাক প্রধানমন্ত্রী শ্রী আই আই চুন্দ্রীগড় গতকল্য রাত্রে ঘোষণা করেন যে, [illegible] পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের এক নির্বাচন [illegible] হইবে। উক্ত পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের জন্য আইন প্রণীত হইবে।

২৭শে অক্টোবর—বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী [illegible] ম্যাকমিলান আজ [illegible] বলেন যে, [illegible] অবস্থায় রাশিয়ার সহিত উচ্চতম স্তরের আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা নাই [illegible] অবস্থায় রাশিয়ার সহিত তিনি উচ্চতম স্তরে আলোচনা চালাইবার পক্ষপাতী নহেন।

আগা খাঁ কর্তৃক [illegible] পত্নীকে শ্রী [illegible] নামক জনৈক ক্যালিফোর্নিয়াবাসীকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী আমেরিকান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার সম্পত্তির পরিমাণ ৭০ কোটি হইতে ১০০ কোটি ডলার।

২৮শে অক্টোবর—গতকল্য লাহোরে শ্রী এইচ এস সুরাবর্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় শ্রী সুরাবর্দীকে প্রধানমন্ত্রী পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করায় সংশোধন অগ্রাহ্য করার অভিযোগে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে অভিযুক্ত করার দাবী করা হয়।

[illegible] রাষ্ট্রপুঞ্জের সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রকে লইয়া একটি স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণ কমিশন গঠনের প্রস্তাব করিয়াছে। সরকারী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী 'তাস' আজ এই সংবাদ প্রচার করেন।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১১ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

মায়েদের প্রতি!
গুরুতর অসুখ হওয়ার আগেই আপনার শিশুর সর্দি সারিয়ে তুলুন !
রাতের মধ্যে নাক, গলা ও বুকের যন্ত্রণা সারিয়ে তুলতে হ'লে এই উত্তম বিশেষ কার্যকরী ঔষধটি মালিশ করুন !
সর্দি লাগলে আপনার শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মোটেই অবহেলা করবেন না। শোবার সময় তা'র বুকে, পিঠে ও গলায় ভিকস ভেপোরাব মালিশ করুন। যেখানে সর্দি তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে সেখানেই সে আরাম বোধ করবে। আর ভিকস ভেপোরাব, আপনার শিশু যখন সারারাত শান্ত হ'য়ে ঘুমোবে ঠিক সেই সময়েই তার সর্দির সকল জ্বালা যন্ত্রণা দূর করতে থাকবে। আর সকালেই সে আবার আগের মতই সুস্থ বোধ করবে।
ইহা দু'ভাবে সর্দি উপশম করে !
১
ইহা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে কাজ করে—
ভিকস ভেপোরাব থেকে যে ঔষধের গন্ধ বেরোয় তা' আপনার শিশু যখন শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে তখন তার গলার ও নাকে সর্দির যন্ত্রণা দূর হয়।
২
ইহা ত্বকের ভিতর দিয়ে কাজ করে—
ভিকস ভেপোরাব মালিশ করা মাত্রই উহা ত্বকের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে, আপনার শিশুর বুকের সর্দির ব্যথা দূর করে।
বুকে, পিঠে ও গলায় মালিশ করুন !
VICKS VAPORUB
ভিকস্ ভেপোরাব
এখনই ভিকস ভেপোরাব ব্যবহার করুন, পরখ করে দেখার জন্য সঙ্গে রাখার উপযোগী নূতন আকারের টিনের মূল্য মাত্র ৪০ নঃ পঃ ও তদুপরি ট্যাক্স।
VICKS

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

র‍্যালে
পৃথিবীর সেরা বাইসাইকেল....
SEN RALEIGH
Products
....সকলেই পছন্দ করেন
রবিন হুড
SRC-45 BEN

সূচীপত্র

DESH 40 Naye Paisa
Saturday 9th November, 1957

২৫ বর্ষ ॥ ২ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ২৩ কার্তিক ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

বিপিনচন্দ্র পাল জন্মবার্ষিকী

গান্ধী যুগের নবভাবপ্রবাহে ভারতবর্ষের যে-সকল পুরুষপ্রধানের কীর্তি যবনিকান্তরালবর্তী হইয়াছে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহাদের অন্যতম; কিন্তু ইতিহাসের বিচারে, কংগ্রেসের একরূপ সূচনাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অসহযোগ-যুগের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের সুপ্ত স্বাধীনতা-কামনা যাঁহাদের দৃপ্ত কণ্ঠে ও বলিষ্ঠ লেখনীতে ভাষা পাইয়াছে, যাঁহাদের উদাত্ত আহ্বানে পরাধীন ভারতবাসীর ভয়-তন্দ্রা ক্রমশ দূর হইয়াছে বিপিনচন্দ্র সেই পুরোধাদের অন্যতম—সেই কথা স্মরণ করিয়াই "One of the mightiest prophets of Nationalism" বলিয়া শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন।

যৌবনকাল হইতেই বিপিনচন্দ্রের অলোকসামান্য মনীষা ও বাগ্মিতাশক্তির প্রকাশ হইয়াছিল। এই সময় বাংলা দেশে ধর্ম সমাজ রাষ্ট্রচেতনায় বাংলা দেশে নূতন আশা ও জিজ্ঞাসার যুগ—বিপিনচন্দ্র যৌবনের সম্পূর্ণ শক্তি ও উৎসাহ লইয়া এই জিজ্ঞাসুদের দলে যোগ দিয়াছিলেন পিতৃরোষ অর্থকষ্ট একন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিমাণেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তিনি পথচ্যুত হন নাই।

গত শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই তিনি রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগদান করেন এবং স্বল্পকাল মধ্যেই তাহার পুরোবর্তী হন; কংগ্রেসের আদিযুগের অন্যতম প্রধান নায়ক ফিরোজশাহ মেহতা যে "Loyal Patrioti m"-এর কথা প্রচার করিয়াছিলেন তাহার স্থলে যে "New Patriot'sm" দেশে ক্রমশ আসন লয়, তাহার দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া—"The Patriot loves his Fatherland, not simply because of the good that is in it......He is not blind to the ignorance, the errors, the weaknesses and the superstitions of his people. Who, indeed, is more concious of these th.. he? But he sees also the eternal possibilities of light and love and strength that are hidden in the soul of his nation. In his desire to remove the errors and weaknesses of his people, he first idntines himself with them. He takes upon himself the burden of these. His consciousness of these makes him suffer bearing the sins and wrongs, the shame and ignorance of his nation, he sacrifies himself for removing them." (Bipin Chandra Pal, 7th August 1906).
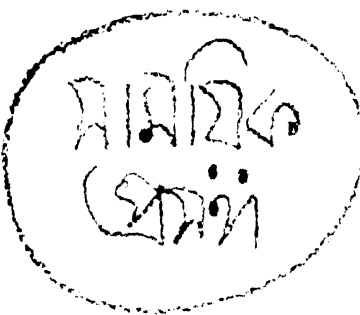
ইহার প্রচার বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভেই যে-সকল শক্তিমান পুরুষের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল বিপিনচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনে বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বের কথা একালেও অনেকের নিকট সুবিদিত, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাহারও পূর্ব হইতেই তিনি ব্রিটিশের নিকট ভিক্ষাবৃত্তির পথ ত্যাগ করিয়া, যে "agitation" বা আন্দোলন ভিক্ষারই নামান্তর তাহা বর্জন করিয়া, আত্মত্যাগ ও আত্মনির্ভর দ্বারা সুকঠিন দেশোদ্ধার ব্রতের কথা দেশকে শুনাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও মনীষার বলে স্বভাবতই তিনি নিখিল ভারতের অন্যতম প্রধান আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন—পঁচিশ বৎসরের উর্ধ্বকাল তাঁহার এই আসন অবিসংবাদিত ছিল।

১৯০৭ সালে তাঁহার মাদ্রাজ-বক্তৃতাবলী প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী (স্বয়ং সুবিখ্যাত বাগ্মী) লিখিয়াছেন—"Oratory had never dreamed of such triumphs in India; the power of the spoken word had never been demonstrated on such a scale."

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, এই সকল বক্তৃতা সহস্র সহস্র শ্রোতার অন্তরে প্রবেশ করিয়া অগ্নিসঞ্চার করিয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর পরে এই সকল বক্তৃতায় এবং তাহারও পূর্বে, বিপিনচন্দ্র পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ সম্পর্কবিহীন স্বায়ত্তশাসন—"autonomous absolutely free of British Control"—আমাদের লক্ষ্য।

বরিশালে প্রাদেশিক কনফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণ (১৯১২) এক অর্থে তাঁহার রাষ্ট্রীয় চিন্তার শেষ প্রধান দান বলা যাইতে পারে। ইহার কিছু পরেই নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়—সেই প্রস্তাবের বিচার ও ব্যাখ্যা করিয়া এই কনফারেন্সে বিপিনচন্দ্র যাহা বলেন দেশ তখন তাহা বিচার করিয়া দেখে নাই, কিন্তু অসামান্য রাষ্ট্রনৈতিক মনীষা ও দূরদৃষ্টির বলে তিনি সেদিন যে-সকল মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহার অনেকখানিই পরে কার্যতঃ স্বীকৃত হইয়াছিল। দেশনায়কগণ যে স্বরাজের জন্য দেশবাসীকে আত্মত্যাগের আহ্বান জানাইতেছেন, সেই স্বরাজের স্বরূপ যে গণতান্ত্রিক তাহা স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিবার কথা তিনি বলিয়া-

ছিলেন—গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া বিকেন্দ্রীকরণের পথে গ্রাম নগর জেলা প্রদেশকে বহুল পরিমাণে আত্ম-চালনাধিকার দিয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্র-সমবায় বা ফেডারেশনের পথেই ভারতবর্ষে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা তাঁহার বক্তব্য ছিল। কিন্তু দেশের অনেক প্রধান নায়কও সে-দিন ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্তিকেই লক্ষ্য বলিয়া জানিয়াছিলেন, স্বরাজের রূপ নির্ধারণ পরে হইবে—এইজন্য এ সকল দূর লক্ষ্যের আলোচনায় তাঁহারা কেহ মনযোগ দেন নাই; ফলে দেশ এই অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের সেবা হইতে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছিল, ইহা কম দুর্ভাগ্যের কথা নহে।

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রেও, বিশেষতঃ চরিতব্যাখ্যানে, এই মনস্বীর দান সামান্য নহে। বাণী যেমন তাঁহার কণ্ঠকে তেমনি লেখনীকেও আশ্রয় করিয়াছিলেন—তাঁহার ইংরাজি বাংলা সমস্ত রচনা একত্র করিলে কয়েক সহস্র পৃষ্ঠা হইবে। ইহার কিয়দংশ সম্প্রতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে—১৯৫৮ সালের ৭ নভেম্বর তাঁহার জন্মশতবার্ষিক উৎসবের পূর্বে তাঁহার প্রধান রচনাগুলি প্রকাশিত ও সুপ্রচারও হইবে আশা করিতে পারি। দুঃখের বিষয় তাঁহার "সত্তর বৎসর" ও ইংরাজি স্মৃতিকথা উভয় গ্রন্থই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ভারত-বর্ষের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার দানের কথা আলোচনা করিয়া বাংলা ও ইংরাজিতে তাঁহার জীবনী-গ্রন্থও এই উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। এই মনীষীর শেষজীবনের কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার পরলোক-গমনের পর কোনো প্রধান সংবাদপত্র Democracy's Ingratitute"-এর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—ভারতবর্ষে নূতন কালের গণতন্ত্র তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিবে, আমরা ইহাই আশা করি।

উদ্বোধিত যুবশক্তি

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের যুব উৎসবে পণ্ডিত নেহরু সমবেত ছাত্রছাত্রীগণকে সম্বোধন করিয়া 'তৃতীয় ভারত' গড়িয়া তুলিতে আহবান করিয়াছেন। কয়েক দিন আগে লক্ষ্ণৌ শহরে অনুষ্ঠিত যুব কংগ্রেসের অধিবেশনেও এই মর্মে আহবান করিয়া-ছিলেন। নেহরু বর্ণিত 'তৃতীয় ভারত' মানে ভারতেতিহাসের নূতন গৌরবময় পর্ব। তিনি বলিয়াছেন যে, সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিক, ভাষাগত, ধর্মগত, দলগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া দেশের নূতন ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। এ কাজটি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে যেমন সহজ বয়স্কদের পক্ষে তেমন নহে, কেন না জীবনের প্রারম্ভে অবস্থিত তরুণতরুণী-গণের মন বহুল পরিমাণে পূর্বসংস্কার বর্জিত। আমরা আশা করি, নেহরুর আহবান, তাহাদের মর্ম স্পর্শ করিবে। কিন্তু এই উপলক্ষে আমরা সরকারকে দু'একটি কথা বলিতে চাই। কোন দেশ স্বাধীন হইলে চাপা-পড়া প্রচণ্ড মানবীয় শক্তি সহসা আত্মপ্রকাশ করে। এই শক্তির সুপ্রয়োগ ও সুব্যবহারের উপরে দেশের ভাগ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আমাদের দেশেও প্রচণ্ড মানবীয় শক্তি মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং সার্থকতার পথ সন্ধান করিতেছে। এ পর্যন্ত এই শক্তির সুপ্রয়োগ হইয়াছে এমন বলা চলে না। অবশ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কাজটি সহজ নহে। বিভিন্ন দলের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ সেখানে অব্যাহতভাবে কাজ করে বলিয়া সরকার কর্তৃক উদ্বোধিত মানবীয় শক্তির একক ব্যবহার সম্ভব নয়। তুলনায় স্বৈরতন্ত্র রাষ্ট্রে কাজটি অনায়াসসাধ্য। প্রতি-দ্বন্দ্বী-রহিত সরকার যথেচ্ছভাবে এই শক্তিকে ব্যবহার করিতে পারে। কখনও কখনও যেমন ফরাসী বিপ্লবের পরে, কৌশলী শাসকগণ গণশক্তির হাতে যুদ্ধরূপী মারাত্মক খেলনা তুলিয়া দিয়া তাহাকে নিযুক্ত রাখে, শাসন কর্তৃপক্ষের উপরে তাহারা হামলা করিবার সময় পায় না। ভারতের মতো শান্তিকামী গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ নিন্দনীয় সুযোগ নাই। তবুও তাহার পক্ষে উদ্বোধিত গণশক্তিকে বেকার রাখা উচিত নয়। তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেশের সর্বজনীন কল্যাণে নিয়োগ করা আবশ্যক। অনিয়ন্ত্রিত নদী প্লাবিনী। আমরা এই দিকে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মাঝে মাঝে যুব উৎসব ও অন্যান্য উৎসব অত্যাবশ্যক ও আনন্দদায়ক। কিন্তু ইহা আদৌ যথেষ্ট নয়। উদ্বোধিত যুব শক্তির সার্থকতা লাভের আর কি পন্থা আছে, তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।

বাক্‌দান

বাঙ্গালোরে আচার্য বিনোভা ভাবে মন্তব্য করিয়াছেন যে, শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ "বাক্‌দান" দ্বারা তাঁহার দান পর্যায়ের কর্মনীতিতে সাহায্য করিতে পারেন। একজন সাংবাদিক আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তাঁহার কর্মে শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ কিভাবে সাহায্য করিতে পারে—সেই প্রসঙ্গে এই উত্তর। আচার্যজী বলিয়াছেন যে, শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ যদি বর্তমান জীবন প্রবাহের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তবেই তাহাদের রচনা স্থায়ী মূল্য লাভ করিবে। তাহাদের রচনা প্রেরণা পাইবে গণজীবনের উৎস হইতে রস আকর্ষণ করিবে গণজীবন হইতে প্রেরণা জোগাইবে নবসমাজ গঠনে। ইহাকেই আচার্যজী 'বাক্‌দান' বলিয়াছেন।

আচার্যজীর কথা সাধারণভাবে সত্য হইলেও ইহার মধ্যে গুরুতর বিভ্রান্তির বীজ নিহিত বলিয়া আমাদের আশঙ্কা। আচার্য ভাবে যাহাকে গণজীবনের উৎস ও প্রেরণা বলিয়াছেন, "প্রগতিপন্থী" লেখকগণ তাহাকেই "সমাজচেতনা" বলেন। সাহিত্যে "সমাজচেতনা" যে বিচিত্র সৃষ্টি করিতেছে, সাহিত্যের নামে "সমাজ-সচেতন" লেখকগণ যে রাশি রাশি "প্রোপাগাণ্ডা লিটারেচার" সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, তাহার ভূরি নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে মিলিবে। বোধকরি সব দেশের সাহিত্যই আজ ঐ শ্রেণীর অপসৃষ্টির ভারে পীড়িত। আচার্য ভাবের "বাক্‌দান" মতলববাজের হাতে পড়িলেও তাহা সহজে যে সাহিত্যিক "ইজমে" পরিণত হয়, তার কারণ ইহার একমাত্র সাধনে দলীয় রাজনীতি ওৎ পাতিয়া অপেক্ষমান। আচার্যজী অবশ্যই বিশুদ্ধ মনোভাব লইয়া বলিয়াছেন, কিন্তু ঐ কথাগুলিই কি দেশ-বিদেশের "প্রগতিবাদী" সাহিত্যিক-গণ ভাষান্তরে, রূপান্তরে বলে না?

গণজীবনের প্রেরণায় যে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব তাহার প্রমাণ রামায়ণ, মহাভারত ও রামচরিতমানস। কিন্তু সে প্রেরণা স্বাভাবিকভাবে আসা চাই, ভিতর হইতে আসা চাই, কোন ব্যক্তি বা দলের নির্দেশে আসিলে বা কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া আসিলে বিষফল না ফলিয়া পারে না। আমরা বলিব কোন সাহিত্যিক যদি সহজে স্বাভাবিকভাবে গণজীবনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন, তবে তিনি গণসাহিত্য সৃষ্টি করুন। আর যদি সেরূপ অনুভূতি তাঁহার ভাগ্যে না ঘটে, তবে তাহাতেও তাঁহার নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই। সাহিত্যিকের ও শিল্পীর চরম নির্দেশক তাঁহার সহজাত শিল্প-বুদ্ধি। সেই নির্দেশকের প্রেরণায় তিনি সৃষ্টি করিতে থাকুন, স্থায়ী সাহিত্য হইল কি না ভাবিবার আবশ্যক তাঁহার নাই। কেন না, সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে রচিত জগদ্দল ভূধর যখন অতলে তলাইয়া যায়, তখনো ভাসিয়া থাকে শিল্পলক্ষ্মীর প্রেরণায় সৃষ্ট অনবদ্য ক্ষুদ্র শতদলটি, তাঁহারই চরণাশ্রয়ের সুযোগ্য নিলয়।

[বাইশ]

পিপুলতলার ছায়ার কাছে মধুকুপির মুনিষদের সমাবেশ আজকের উৎসবের দিনেও বেশ একটু বিষন্ন হয়ে উঠেছে। মনে হয়, উৎসবের আনন্দটাই হঠাৎ আহত হয়েছে, যদিও মুনিষদের সাজের মধ্যে রঙীন উৎসবের ছিটেফোঁটা দেখা যায়। কারও কারও কোমর হলুদ ছোপানো গামছা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। মনে হয়, করমের নাচে যাবার জন্য ওরা মাদল হাতে নিয়ে মাত্র তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বাবু দুখন সিংহের আহ্বান শুনে হঠাৎ চলে আসতে হয়েছে। কারও কারও রুক্ষ চুলের উপর তেলের প্রলেপ পড়েছে। স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে কালো কোঁকড়া চুলের রাশ। দু চার চুমুক হাঁড়িয়ার পাতলা নেশার আবেশও কারও কারও চোখে এই সকালেই ফুটে উঠেছে। কিন্তু সকলেই জানে, রাগ করেছেন দুখনবাবু।

নিকটেই যে বনচণ্ডীর মন্দির, তারই কাছে ঝুমকো জবার গা ঘেঁষে একটি চৌকির উপর বসে আছেন যিনি, তিনি হলেন বনচণ্ডীর সেবাইত চক্রবর্তী। আজকের জাতপঞ্চের সভার দিকে তাকিয়ে চক্রবর্তীর চোখ দুটোও কি যেন আশা করে রয়েছে।

সভার একেবারে মাঝখানে একটি চারপায়ার উপর বসে আছে দুখনবাবু। আর জাতপঞ্চের বড় বুড়া রতন তার শীর্ণ শরীরটাকে কুঁকড়ে নিয়ে সভার এক কোণে অসহায়ের মত বসে আছে।

সভার কাছে এসে দাঁড়ায় সনাতন লাইয়া, তার পিছনে দাশু। দাশুর মুখের দিকে একবার আড়চোখের দৃষ্টি হেনে সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে যায় দুখনবাবু।

তার পরেই চমকে ওঠে দুখনবাবু: এবং দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে জ্বলতে থাকে দুখনবাবুর এক জোড়া কঠোর চক্ষু। কারণ অদ্ভুত একটা কথা বলে দুখনবাবুর পদস্থ জীবনের সম্মানের উপর যেন একটা বীভৎস গেঁয়ো টাঙ্গির কোপ মেরেছে দাশু নামে এই মুনিষটা, পাঁচ বছর জেল খেটে এই সেদিন দাগী হয়ে গাঁয়ে ফিরেছে যে।

চেঁচিয়ে উঠেছে দাশু—জাতপঞ্চের সভায় দুখনবাবু চারপায়ার উপর বসে, আর বড় বুড়া রতন ধুলার উপর বসে কেনে? তুমি চারপায়া থেকে নেমে যাও দুখনবাবু।

—কেনে নামবো? দাঁতে দাঁত ঘষে দাশুর মুখের দিকে তাকায় দুখনবাবু।

দাশু বলে—জাতপঞ্চের সভায় চারপায়ার উপর যদি কেউ বসে, তবে বড় বুড়া রতন বসবেক। তুমি না, আমিও না।

দুখনবাবু—ঈশান মোক্তারের কুঠিতে যখন কাজ মাগতে যাও, তখন তুমরা আর তুমাদের বড় বুড়া কোন্ চারপায়াতে বস হে?

দাশু—কুঠিতে তুমি বড় গমস্তা বট। সেথা তুমি চারপায়াতে বসবে, আর মুনিষেরা ভুঁই-এর উপর বসবেক। কিন্তুক, জাতপঞ্চের সভায় তুমি জাতের মানুষ বট দুখনবাবু। হেথা বড় বুড়ার মান তুমার মানের চেয়ে বড়। তুমি চারপায়া থেকে নেমে যাও দুখনবাবু, আর ভুঁই-এর উপর বস।

দাশুর মুখের দিকে আর একবার কটমট করে তাকিয়ে চারপায়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় দুখনবাবু। কিন্তু ভুঁই-এর উপর বসে না। চুপ করে এক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।

সংগে সংগে উঠে দাঁড়ায় জটা রাখাল ও আরও কয়েকজন। বাবু দুখন সিংহের এই অপমানের কান্ড সহ্য করতে গিয়ে ওরাও যেন ব্যথিত হয়েছে। দাশুর মুখের দিকে রুষ্টভাবে তাকিয়ে কি-যেন বলতে চেষ্টা করে জটা রাখাল। দাশু চেঁচিয়ে ওঠে—চুপ।

বড় বুড়া রতন তার শীর্ণ শরীরটাকে টান করে উঠে দাঁড়ায়, যেন নতুন মান পেয়ে বড় বুড়ার বিমর্ষ প্রাণটা হঠাৎ বলীয়ান হয়ে উঠেছে। বড় বুড়া বলে—কেনে জাতপঞ্চ ডেকেছ, সেই কথাটা বলে ফেল দুখনবাবু।

দুখনবাবু—সেদিন যে কথা বলেছিলাম, আজ আবার সে-কথাই বলছি। জাতের সুধার চাই।

দাশু—সেটো কি বটে?

দুখনবাবু—গাঁয়ের বউ বিটি বাহিন করবে লাচবে না।

দাশু— লাচবে।

দুখনবাবু—তবে জাতের সুধার হবেক কেমন করে বল? যদি বামহন না মান, যদি বনচণ্ডীর পূজা না কর, যদি বিটি বহিনের বিহা দিতে লাজের বয়স পার করে দাও, তবে জাতের ভাল হবেক নাই পঞ্চ।

দাশু—জাতের ভাল হবেক দুখনবাবু, যদি তুমি জাতের একটো কথা মান।

—কি কথা?

—জাতের মানুষকে জমি পাওয়াই দাও দুখনবাবু।

—জমি? চেঁচিয়ে ওঠে দুখন বাবু।

দাশু—হ্যাঁ, দুখনবাবু। তুমার জাতের মানুষ ঈশান মোক্তারের জমিতে শুধু মনিষ খাটে, ইয়াতে তুমার কি দুখ হয় না? যত ভাল ভাল দো-আঁশ আর দুই ফসলী মাটিতে আমাদিগে মনিষ খাটাবে ঈশান মোক্তার, আর ভাগজোত করতে দিবে যত টাঁড় জমি, ইটা কেমনতর বিচার বটে?

দুখনবাবু—কি চাও তুমরা?

দাশু—আমরা আর মনিষ খাটবো নাই। আমরা ভাল জমি ভাগজোত করবো। বীজ, লাঙল বুঠি দিবে।

দুখনবাবু—সেলামী?

দাশু হাসে—তুমার গরীব জাতটাই সেলামী দিতে পারে কি দুখনবাবু? তুমি কি সেকথা জান না?

দুখনবাবু হেসে ফেলে—গরীব হয়ে গরীবের মত কথা না বলে ডাকাইতের মত কথা বলছো কেনে?

দাশু—আমাদিগে তুমি ডাকাইত বলছো দুখনবাবু।

দুখনবাবু—হ্যাঁ। তুমরা ঈশান মোক্তারের জমি লুটে নিবার কথা বলছো।

দাশু—লুটে নিলে দোষ কি?

দুখনবাবু—কি বললে?

দাশু—যদি ঈশান মোক্তারের জমি ভাগজোত করতে না পাই, তবে মধুকুপির কোন কিষাণ উয়ার জমিতে মনিষও খাটবেক নাই।

দুখনবাবু হাসে—ভিন গাঁ হতে মনিষ আসবেক দাশু। ঈশান মোক্তারের চিন্তা নাই।

দাশু—তবে শুনে রাখ দুখনবাবু, ভিন গাঁ হতে মনিষ আসলে উয়ারা মরবেক।

দুখনবাবু—কে মারবে উয়াদিগে?

জাতপঞ্চের নীরব মুখগুলির দিকে তাকিয়ে আর হাত দুলিয়ে চিৎকার করে দাশু—জবাব দাও পঞ্চ।

বড় বুড়া রতন উঠে দাঁড়ায়। সংগে সংগে প্রায় পঞ্চাশজন মনিষের বুক ও কাঠার

হাত একসঙ্গে দুলে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে জাতপথের ভিড়। —আমরা মারবো। মধু-কুপির মনিষের টাঁগি এখনও মরে নাই দুখনবাবু।

কেঁপে ওঠে দুখনবাবুর চোখ দুটো। জটা রাখালের দলও ভীরুর মত আস্তে আস্তে সরে গিয়ে দুখনবাবুর পিছন দিকে দাঁড়ায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে থাকে দুখনবাবু। তারপর হঠাৎ লজ্জিত হয়ে আর মৃদু হাসিতে চোখমুখ স্নিগ্ধ করে নিয়ে হাতযোড় করে জাতপথের

বিজ্ঞপ্তি

এ সপ্তাহে 'ধীরে বহে নীল' প্রকাশ করা সম্ভব হল না। পাঠকদের মার্জনা চাই। আগামী সংখ্যা থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক, দেশ

উর্মিলার মনপ্রাণের দিকে চেয়ে। সেই মুহূর্তে শান্ত হয়ে যায় জাতপথের আশ্চর্য মুখরতা আর চেহারার রুক্ষতা।

—কি বলছো দুখনবাবু? বড় নরম স্বরে শান্ত স্বরে প্রশ্ন করে।

দুখনবাবু বলে—ঠিক ঠিক ঠিক; খুব ঠিক কথা বলেছে পণ্ডু; আগে জমি চাই। আমি ঈশান মোক্তারকে বলে তুমাদিগে ভাগজোতের জমি পাওয়াই দিব। এক পয়সা সেলামী দিতে হবেক নাই। লিখ্যর দিব।

দাশু একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে দুখনবাবুর একটা হাত জড়িয়ে ধরে। ছলছল করে দাশুর উৎফুল্ল দুটো চোখের আশা। —তুমি জাতের দুখ বুঝেছ, তুমাকে কপালবাবা অনেক সুখ দিবেন দুখনবাবু। অনেক দুখে তুমাকে অনেক শক্ত কথা বলেছি দুখনবাবু; তুমি রাগ করবে নাই।

শান্তভাবে হাসতে থাকে দুখনবাবু, সেই সঙ্গে দুখনবাবুর চোখ দুটোও অদ্ভুতভাবে যেন ধিকধিক করে হাসতে থাকে। —না হে দাশু, দুখন সিংহ রাগ করে নাই। দুখন সিংহ যদি বেঁচে থাকে, তবে তুমাদিগে জমির সুখ পাওয়াই দিবে। আমি আজই ঈশান মোক্তারের দরবারে চলে যাব।

দিপির দিপাং!

আঁটি আঁটি ধান কাটি কনাকির মাটি গো। কিষাণের খিয়াপুত্তো বড় সুখে খাটি গো! হে করম দয়া কর!

করম ডালে জল ঢেলেছে মেয়েরা। মাদার মেরেছে আর নেচে নেচে সারা হয়েছে। আর দাশু কিষাণও যেন জমিদারদের সব আঁকিয়ান মাঝে মুঠো মদল হাতে নিয়ে সারা দুপুর আর বিকেল মত্ত

হয়ে উৎসবের আসরে একটা জয়ের নাচ নেচেছে। হাঁড়িয়ার তরল নেশার রসে দাশু কিষাণের অমন পাথুরে পাটার মত বুকের ভিতরটাই যেন ভিজে কাদা হয়ে গিয়েছে। জমি হবে, বাবু দুখন সিংহ বলেছে, জাতের সব মানুষকে জমি পাওয়াই দিবে।

জমির স্বপ্নের মধ্যে বার বার যার সুন্দর মুখের ছবিটা ফুটে ওঠে, সে আজ মধু-কুপির এই মাদল-বাঁশির মত্ত উল্লাসের আসর থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। কিন্তু দাশুর জীবনের এই সঙ্গিবিহীন শূন্যতার বেদনাও যেন আজকের একটা আশাময় মত্ততার কলরবে ভরে গিয়েছে। মুরলী আজ নাই; কিন্তু আসবে। দেখি, কেমন করে না এসে থাকতে পারে মুরলী? দাশু কিষাণের জমিতে ধানের শিস যেদিন দুলে উঠবে, সেদিন [illegible] কলঘরের বড় মিস্তিরির ঘর মুরলীকে আটক করে রাখতে পারবে কি? কখনই না।

বিকেল হতেই মাদল রেখে দিয়ে আর সনাতন লাইয়ার হাত ধরে টলতে টলতে ঘরে ফিরে আসে দাশু। সনাতন বলে—আজ সাঁঝে আর আখড়াতে যেও নাই দাশু।

দাশু হাসে—তুমি আমার নাচ দেখে ডর পেলে নাকি সনাতন?

সনাতন—হ্যাঁ।

দাশু—কেনে?

সনাতন—তুমি সরদারিনকে ভুলতে পারছো নাই দাশু।

দাশু—তুমি কেমন করে বুঝলে?

সনাতন—নাচতে নাচতে দু'বার কাঁদলে কেনে?

জলে ভরে যায় দাশুর চোখ—হাঁ সনাতন। করমের দিনে মুরলী আমার কাছে নাই, ই কেমন কৃপা করলেন কপালবাবা?

সনাতন—উসব কথা আর মিছা কেনে মনে কর দাশু।

দাশু—কিন্তুক মুরলী একদিন আসবেক সনাতন।

সনাতন—কেনে?

দাশু—আমি উয়াকে আনা করবো।

সনাতন—কেমন করে?

দাশু—জমি নিব, ক্ষেতখোলা করবো, নতুন মাটি দিয়ে ঘর বানাবো। মুরলী তখন না এসে পারবেক কেনে? জমি নাই, তাই মুরলী নাই।

সনাতন হাসে—হলে বড় ভাল হয় দাশু, কিন্তুক ......।

দাশু—কি?

সনাতন—মধুকুপির কপাল ভাল নয় দাশু। আমার বড় ডর লাগছে।

দাশু—ছিয়া! গাঁয়ের লাইয়া হয়ে তুমিও এমন ডরের কথা বল সনাতন?

সনাতন বোধ হয় দাশুর এই অভিযোগের উত্তর দিত; কিন্তু সনাতন সত্যিই একটা নতুন ভয়ে ভীরু হয়ে সড়কের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সড়কের উপর দাঁড়িয়ে দাশু কিষাণের ঘরের এই জীর্ণ জামকাঠের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে একটা লোক। আধবুড়ো চেহারার একজন বাবু মানুষ। গায়ে কালো কাপড়ের জামা [illegible] দিয়ে পরা ধুতি। পায়ে [illegible] এক জোড়া জুতো, আর হাতে ছড়ি ও একটা থলি। বাবু মানুষটা অপলক চোখ তুলে দাশুর ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে। বাবু মানুষটার মুখটা [illegible] মনে হয়।

— ও কে বটে সনাতন? প্রশ্ন করে দাশু।

সনাতন—উটি হ'ল [illegible] মিস্টার দিদির [illegible] বাবু। তুমার সরদারিনের [illegible] এই লোকটা কিনে নিয়ে [illegible] ভরে [illegible] নাই।

দাশুর [illegible] চোখ দপদপ করে—মিস্টার

দিদির লোক আবার হেথা আসে কেনে?

সনাতন—কে জানে?

দাশুর রুষ্ট গলার স্বরের শব্দ বোধ হয় শুনতে পায় সিস্টার দিদির লোকটা। সেই মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে হনহন করে হেঁটে পাকুড়তলার দিকে চলে যায়।

আবার কারা যেন গল্প করতে করতে ভুবনপুরের দিক থেকে সড়ক ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে।

সনাতন বলে—বাস্, আর কি? কানারানী নাই। আবার শুরু হলো …শু।

দাশু—কি?

সনাতন—কয়লা খাদের ঠিকেদারের লোক আবার গাঁয়ে ঢুকছে।

দাশু—কেনে?

সনাতন—মালকাটা যোগাড় করতে।

হঠাৎ হতভম্ব হয়ে যায় দাশু। ঠিকেদারের লোকগুলি মধুকুপির কিষাণের ঘর ভাঙবার জন্য কি কুৎসিত আনন্দের হাসি হেসে কত সহজে মধুকুপির মাটি মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে দাশু—ইয়াদিগে একটুক ভোঁট দিলে কেমন হয় সনাতন?

সনাতন ভয় পেয়ে দাশুর হাত চেপে ধরে। —তুমি ঘরের ভিতরে যাও আর শুয়ে থাক দাশু।

হাত ধরে দাশুকে টেনে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে সনাতন চলে যায়।

নিঝুম হয়ে ঘরের ভিতরে খেজুরে পাতার চাটাই-এর উপর বসে থাকে, আর মাঝে মাঝে যেন একটা অস্বস্তির জ্বালায় ছটফট করে দাশু। আজকের জয়ের উৎসবটার সব সুখ যেন বিস্বাদ হয়ে গেল। কয়লা খাদের ঠিকেদারের লোক গাঁয়ের ঘরে ঘরে ঢুকে হাঁক দিয়ে মজুরীর লোভ দেখাবে। মধুকুপি যে শূন্য হয়ে যাবে। সিস্টার দিদির লোক, ঐ পাপটা আবার মধুকুপির কোন্ কিষাণের ঘরের আশা ছিঁড়ে নিয়ে যাবার জন্য চোর নেকড়ের মত গাঁয়ের পথে ঘুরঘুর করছে? তু কেনে মরলি কানারানী? পাপগুলা যে মধুকুপির ঘরে ঢুকতে আর ভয় করে না!

না, বড় জোর নেশা ধরেছে। ঠিক বলেছে সনাতন। এখন ঘুমিয়ে পড়লেই ভাল হয়। খেজুর পাতার চাটাই-এর উপর গড়িয়ে পড়ে দাশু। কিন্তু সেই মুহূর্তে করুণ চিৎকারের মত একটা বুকফাটা কান্নার শব্দ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসে। কে কাঁদে? এমন সুন্দর বরনের দিনে, মধুকুপির কার প্রাণের দুখ এমন করে কেঁদে উঠলো?

ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পায় দাশু, সড়কের উপর দাঁড়িয়ে আর অনেক দূরের দিকে তাকিয়ে ছটফট করছে, দু' হাত ছুঁড়ে বুক চাপড়ে আর চিৎকার … কাঁদছে পল্টনী দিদি।

পল্টনী দিদির—পরনে একটা ছেঁড়া ঘাগরা। ময়লা একটা কাঁথা গায়ে জড়ানো। মাথার চুলগুলি ক্ষেপী ভিখারিনীর চুলের মত এলোমেলো হয়ে মাথার চারদিকে ঝুলে রয়েছে।

দৌড় দিয়ে এগিয়ে আসে দাশু। —কি হলো পল্টনী দিদি?

—লিয়ে গেল, লিয়ে গেল। ডাইনে আমার ছেইলা দুটাকে ছিনে লিয়ে গেল দাশু দাদা। চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকে পল্টনী দিদি।

আশ্চর্য হয় দাশু। —কে ডাইন? তুমার ছেইলা ছিনে লিয়ে যায় কেনে ডাইন?

সড়কের অনেক দূরে, চলমান কয়েকটা ছায়ার দিকে তাকিয়ে বুক চাপড়ায় পল্টনী দিদি—হারাণগঞ্জের সিস্টার দিদির লোক আমার ছেইলা দুটাকে অনাথবাড়িতে লিয়ে যাচ্ছে দাশু দাদা। কটা রে, মোটা রে। আমাকে এত দুখ দিতে কেনে এসেছিলি রে!

সড়কের অনেক দূরের সেই চলমান ছায়ার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে দাশু, হ্যাঁ, সেই আধবুড়া বাবুটা ছাতা হাতে নিয়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে চলে যাচ্ছে। বাবুটার দুই পাশে দুটো ছোট ছোট কচি ছেলের মূর্তি শীর্ণ ছায়ার মত হেঁটে চলেছে।

—পল্টনী দিদি! চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

—কি দাশু দাদা?

—তু কাঁদিস না।

আরও জোরে চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে পল্টনী দিদি। দাশুও সেই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে সেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা টাঁগি হাতে তুলে নিয়ে এসে আবার পল্টনী দিদিকে সান্ত্বনা দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। —আমি এখনই তুমার কটা আর মোটাকে ফিরিয়ে লিয়ে আসছি পল্টনী দিদি।

কিন্তু কি আশ্চর্য, পল্টনী দিদিই হঠাৎ কান্না থামিয়ে, আর যেন একটা ঝাঁপ দিয়ে দাশুর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে দাশুর টাঁগিটাকে শক্ত করে দুহাতে দিয়ে চেপে ধরে। —তুমি থাম দাশু দাদা। তুমার পায়ে পড়ি দাশু দাদা।

—কি বলছিস পল্টনী? হতভম্ব হয়ে পল্টনী দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে দাশু।

পল্টনী বলে—মারতে হলে আমাকে মার দাশু দাদা। সিস্টার দিদির লোক কোন কসুর করে নাই।

—কেনে?

—আমি ছেড়ে দিয়েছি, তবে না আমার কটা আর মোটাকে লিয়ে গেল। আস্তে আস্তে ফোঁপাতে থাকে পল্টনী।

—কেনে ছেড়ে দিলি?

ময়লা কাঁথার কোণা তুলে চোখ মোছে পল্টনী। —তিন দিন হলো ছেইলা দুটা কিছু খায় নাই। খেতে দিতে পারি নাই দাশু দাদা।

দাশুর লাল চোখের জ্বালা হঠাৎ জল হয়ে ঝরে পড়ে। কথা বলতে গিয়ে দাশুর গলার স্বর ভেঙে যায়। —কেনে খেতে দিতে পারিস নাই পল্টনী?

—যে মাগির মরদ নাই, জমি নাই, সে মাগি তাল্পপাখা বেচে আর কতদিন ছেইলা পুষতে পারবেক দাশু দাদা? আমার কটা আর মোটা আমার বুকের উপর থেকেও মরবেক, তার চেয়ে সিস্টার দিদির অনাথবাড়িতে গিয়ে বেঁচে থাকুক। সেটা ভাল বটে কি না দাশু দাদা?

দাশুর শক্ত হাতের মুঠো হঠাৎ শিথিল হয়ে যায়। গেঁয়ো গর্বের টাঁগিটা অলস অক্ষম ও অসার বস্তুপিণ্ডের মত যেন একটা আবর্জনা হয়ে ধপ করে সড়কের ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়ে। (ক্রমশ)

রুশ উপগ্রহের পৃথিবী পরিক্রমার পূর্বেও রাশিয়ায় প্রকাশিত নানা গ্রন্থের প্রচার প্রায় বিশ্বপরিব্যাপ্ত ছিল। আমাদের দেশে এগুলির দেখা মিলত দোকানে, পথের ধারে। প্রধান আকর্ষণ ছিল এগুলির অবিশ্বাস্য সস্তা দাম। তবু ভাষা ইংরেজী বলে বেশির ভাগ বই বোধহয় অনেকের হাতে পৌঁছত না। এখন মেলায় বা পুজোর মণ্ডপে বইয়ের দোকান, সেখানে বাঙলা ভাষায় ছাপা নানা রঙের নানারকমের বই। কেউ কেউ যে নানা রঙের মধ্যেও একটি মাত্র রঙ—লাল—দেখতে পান, তাঁদের কথা আমার আলোচ্য নয়। বস্তুত, বর্তমান ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা ছাড়াও অন্যান্য দিক থেকে আলোচনার যোগ্য নিশ্চয়ই।

সবচেয়ে সুদৃশ্য ছেলেমেয়েদের বইগুলি। রঙিন বই এবং ভালো বই আমরাও কিছু কিছু বের করেছি। কিন্তু উৎপাদনের আইন অনুসারেই দাম ওদের বেশী, রুশ বইগুলি সস্তা এবং তার অনেকগুলি মজার। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র দেশী রস নেই এগুলিতে; গরমে ঘামতে ঘামতে এত তুষারের ছবি দেখে কী মনে হয় আমাদের শিশুদের তা ওরাই জানে; কজন ওদের মধ্যে কোনোদিন তুষার দেখেছে? কিন্তু রবিনসন ক্রুসোর গল্প পড়া যদি আমাদের শৈশবে দেশদ্রোহিতা না হয়ে থাকে তবে আজ দাদুর দস্তানার গল্প পড়লে ক্ষতির আশংকা দেখিনে।

*

কিন্তু এখন পর্যন্ত মস্কোর ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস যে-সব বই বাঙলায় প্রকাশ করে আমাদের পাঠিয়েছেন তা তাঁদের পরিকল্পিত প্রয়াসের অতি সামান্য অংশ মাত্র। মস্কোতে এখন সাত-আটজন বাঙালী অনুবাদক প্রতিদিন নানা গ্রন্থের অনুবাদে ব্যস্ত। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বাঙলা সাহিত্যে স্বনামে পরিচিত। অতএব আগামী মাস ও বছরগুলিতে মস্কো থেকে নিয়মিত অনেক রুশ বই বাঙলায় প্রকাশিত হয়ে আসবে এবং ক্রমে আমাদের বইয়ের তাকে শোভা পাবে। কী রকমের বই হবে সেগুলি?

তার আগে রুশ সরকারকে একটা বিষয়ে ধন্যবাদ দেবার আছে। ভারতের জাতীয় ভাষা কী হবে তা নিয়ে আমাদেরই মধ্যে তর্কের অন্ত নেই। (অত্যন্ত ভাল তর্ক।) এক্ষেত্রে বিদেশীরা মন স্থির না করতে পারলে দোষ দিতে পারিনে। এখন পর্যন্ত ভারত সরকারের অংশবিশেষের হিন্দী হুংকারে বিশেষ কেউই গুরুত্ব আরোপ করেননি—একমাত্র রাশিয়া ছাড়া। আর সবাই যখন ইংরেজীতেই কাজ চালাচ্ছে তখন রুশ দোভাষীদের সংস্কৃতসর্বস্ব হিন্দী শুনে বিস্মিত হয়েছি। তাসকেন্দে নেমে যখন রুশ
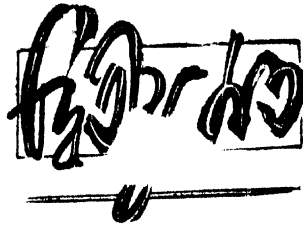
ভাল

তরুণের হিন্দী সম্বর্ধনা শুনলাম তখন ত স্পষ্টই বলতে হয়েছে—এবার আপনার দোভাষী হয়ে আপনার বক্তৃতা আমায় ইংরেজীতে বুঝিয়ে দেবে কে? তাই ভয় ছিল, হিন্দীকে বুঝি ওরা ভারতের একমাত্র ভাষা বলে মনে করে। বাঙলা বইয়ের প্রতি মনোযোগের বহর দেখে ভয় কাটল।

•

কিন্তু কী রকম বই পেলে আমরা খুশী হব? প্রথমত আছে রুচির প্রশ্ন। সম্প্রতি মস্কোপ্রবাসী এক বাঙালী কবি পত্রান্তরে জানিয়েছেন, ভারতীয় গল্পের যে সংকলন রাশিয়ায় কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে আমাদের প্রচলিত মানের সাদৃশ্য অতি সামান্য। খাজা আহমদ আব্বাস, মুল্ক রাজ আনন্দ ইত্যাদির পরে সত্যকার পরিচিত গল্পকারের জন্য আর ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট এ তরী' এর অবশ্য অনেক কারণ থাকতে পারে রুচি ছাড়াও। হয়তো হিন্দী ও ইংরেজী লেখকরা আত্মপ্রচারে বাঙালীদের চেয়ে বেশি উদ্যম দেখিয়েছেন। হয়ত বাঙলা গল্পের ইংরেজী অনুবাদ যথেষ্ট বা ভাল হয়নি। হয়ত এর মধ্যে রাজনীতিরও স্পর্শ আছে কোথাও।

আর এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, আমাদের রুচি অনুযায়ী পুস্তক পরিবেশন করাই রুশ উদ্দেশ্যের সবখানি নয়। কেনই না হবে? বাঙলায় রুশ বই অনুবাদ করে এ ভাষার অতি সংকীর্ণ বাজারে তা প্রকাশ করে বিপুল অর্থ উপার্জন করবার দুরাশা রুশ চিত্তে নিশ্চয়ই প্রধান হতে পারে না। সাংস্কৃতিক বিনিময় সাধু উদ্দেশ্য, সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা রুশ সংস্কৃতি হতে হবে তো। তার কতখানি আমরা গ্রহণ করতে সমর্থ?

•

কিছুদিন আগে দুদেন্তসিভ রচিত "নট বাই ব্রেড অ্যালোন" উপন্যাসখানা নিয়ে রাশিয়া ও রাশিয়ার বাইরে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। সে সম্বন্ধে "নিউ স্টেটসম্যান" পত্রিকায় একজন লিখেছেন:

A good deal of the plot of "Not By Bread Alone, and almost all the background, must be pretty incomprehensible to anyone who hasn't at least a nodding acquaintance with engineering practice.... Dudintsev's book has been a great popular success in Russia, and the critical distussions go on as if every literate person knew what the inside of a development laboratory was like.

ইংরেজী সমালোচক ও পাঠকদেরই মধ্যে যদি এই বৈষম্য থাকে সাধারণ রুশ পাঠকদের সঙ্গে, তবে আমাদের কী দশা হবে? আমাদের শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ত আরও বহুগুণে কাঁচা। লজ্জার কথা, আমি নিজে বিজ্ঞান বা কলকব্জার ক-ও জানিনে এবং এটা আরও অনেকের সম্বন্ধে সত্য হওয়া সম্ভব।

বাঙলার জন্য বই নির্বাচনে তাই রাশিয়ার সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বোধহয় আরও সতর্ক হতে হবে। নিজের চোখে দেখে এসেছি, পাইওনিয়ারস কমুনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আস্ত গাড়ি ভাঙছে আর গড়ছে। ট্রেনে সাধারণ মিস্ত্রীরা মস্ত মস্ত বই পড়ছে অবসরে—এঞ্জিনীয়ারদের বই। এসব বই আমাদের ভাষায় অনূদিত হয়ে এলে কে পড়বে ওগুলো? যাঁদের কৌতূহল আছে তাঁরা ত ইংরেজী পড়বেন।

কেবলমাত্র গল্প-উপন্যাস না পাঠালে দোষ দেব না। কিন্তু আমাদের শিক্ষার ভিত্তির সম্পূর্ণ বিভিন্নতা স্মরণে না রেখে যা রাশিয়ায় সহজবোধ্য শুধু তাই তর্জমা করে পাঠালে বহু অর্থ ও বহু শ্রম অপচয়িত হবে। অপচয় রাশিয়ার হলেও অপচয়।

ভূমিব্যবস্থা সংস্কার ও অর্থনৈতিক উন্নতি

ওয়াকিবহাল
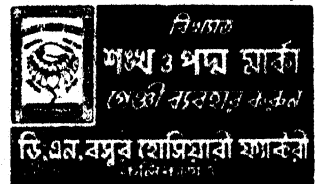
আমাদের মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমরা স্বাধীনতা পেলেও প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের অনেক বুলি এখনও ছাড়তে পারি নি। যেকথা তিরিশ বছর আগে বলে আসতাম, এখনও অনেক সময় সেইসব বুলিই কপচে যাচ্ছি। হয়তো তার কিছুটা প্রয়োজন এখনও আছে। আমরা যেসব কথা বলেছি তার অনেক কথা কাজে পরিণত এখনও হয়নি, সে অবস্থাও সব বদলায় নি, কাজেই সেকথা কাজে পরিণত করার দরকারও আছে। কিন্তু এই কথাটা মনে রাখতে হবে, স্বাধীন দেশের মানুষের, অর্থাৎ স্বাধীন মানুষের, প্রথম লক্ষণই হল বাঁধাবুলির সিধে সড়ক ছাড়াও নানা পথে মনের স্বাধীন বিচরণ এবং মোহমুক্ত দৃষ্টিতে বাস্তব অবস্থার বদলের বিচার। বাঁধাবুলি হল শাস্ত্রের বিধানের মত—একবার আঁকড়ে ধরলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, মনকে আর খাটাতে হয় না। কিন্তু মনের এই আলস্য ও পরনির্ভরতা স্বাধীনতার মহাশত্রু। কারণ মন যদি সর্বদা ক্রিয়াশীল ও বিচারপরায়ণ না হয়, তাহলে স্বাধীনতার ভোগ হতে পারে বটে, কিন্তু ক্ষেম হবে না। আর এই স্বার্থকুটিল জগতে কোনও ভগবান সেই ক্ষেম বহন করতেও আসবেন না।

আমাদের জাতীয় জীবনের নানাদিকে এইরকম চিন্তার আলস্য ও জোড়াতালির আভাস দেখা যাচ্ছে। যেমন, সত্য কথা বলতে, আমরা গান্ধী-কল্পিত গ্রামোদ্যোগ অর্থনীতি এবং বিকেন্দ্রিত সমাজের দিকে মোটেই যাইনি, তবু আমাদের বক্তৃতায় ও বাজেটে এ দুটি জিনিস অনেক সময় নৈবেদ্যের চুড়োর মণ্ডার মত বিরাজমান থাকে। আমরা সর্বত্র ভূমিসংস্কার আইন করে সরকারী ব্যবস্থার মারফৎ জমি বিলি করছি, অথচ ওদিকে বিনোবা আইনের আওতার বাইরে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে যে ভূমি-পুনর্বণ্টনের চেষ্টা করছেন, তার প্রতিও কম ভক্তি দেখাই নে। এ বিষয়ে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি দুই নৌকায় পা রাখবার বৃথা চেষ্টা না করে খুব পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, জমিবণ্টন হয় সরকার করবে, না হয় বিনোবাজী করবেন—এ দুয়ের মাঝামাঝি কিছু হতে পারে না। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে [illegible] [illegible] [illegible]

পররাষ্ট্রসচিবকে ধাপ্পাধুম্পি দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারলেই কাজ চলত, তখন পলিটিক্‌সের ছিল পলিটিক্সের রূপ। কিন্তু এখন হল কোটি কোটি জনসাধারণ নিয়ে করবার এবং সেখানে শ্রেষ্ঠ পলিটিক্স হল সকল কথা সবচেয়ে সহজ ভাষায় সব-চেয়ে স্পষ্টভাবে খুলে বলা। প্রাচীন অর্থে ডিপ্লোম্যাসি আজকের যুগে অচল। সেই-জন্য এখন বড় হতে ছোট পর্যন্ত সবাইকেই বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে খুব সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্নভাবে চিন্তা করতে হবে এবং মনকে সদাজাগ্রত ও সচল রাখতে হবে। এই হল আজকের যুগের স্বাধীনতার সব-চেয়ে বড় কথা।

(২)

এতখানি উপক্রমণিকা করবার কারণ হল, এই প্রবন্ধের যা বিষয়বস্তু—অর্থাৎ ভূমি-সংস্কার ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি—সে সম্বন্ধেও অনেক ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে কথা ও প্রাচীন বুলির পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। সেইসব ধোঁয়াটে কথা এবং চিন্তাহীনভাবে নিশ্চিন্ত নির্ভরে প্রাচীন বুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকার অভ্যাস যদি আমরা না ছাড়তে পারি, তাহলে ভূমিসংস্কার বাস্তবানুগামী হবে না এবং জমির ও কৃষকেরও চেহারা ফিরবে না।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারী-উচ্ছেদ আন্দোলনও প্রবল হয়ে উঠেছিল। তা যে প্রবল হয়ে উঠবে সে তো খুব স্বাভাবিক। শ্রমিক এবং নিপীড়িত জনসাধারণের চেতনা জাগরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে প্রশ্ন জাগবে তাদের পরিশ্রমে যে অর্থ ও সম্পদ উৎপন্ন হয় জমিদার বা মধ্যস্বত্ব-ভোগী কিছু না করেই তার মোটা অংশ নিয়ে যাবে কেন? এ প্রশ্ন অত্যন্ত সংগত প্রশ্ন: সেই অনুসারে আন্দোলনও চলে-ছিল। তার সঙ্গে আরও কথা উঠেছিল এই যে, যতদিন পর্যন্ত জমিদারী-উচ্ছেদ না হয় ততদিন পর্যন্ত অন্তত চাষীদের জমিতে অধিকার দিতে হবে, তাদের খেয়াল-খুশিমত জমি হতে উচ্ছেদ করা চলবে না, যখন তখন খাজনা বৃদ্ধির মত চলবে না। তখন এ দাবীও খুব স্বাভাবিক ছিল, কেননা একদিকে জমিদার-দের অধিকার এবং অন্যদিকে কৃষকের অধিকার, এই দুই অধিকারের মধ্যে যদি কোনও পক্ষে রায় দিতে হত তাহলে সে রায় স্বভাবতই কৃষকদের পক্ষেই যাবে। এর পিছনে সেণ্টিমেণ্ট তো আছেই, কিন্তু তা ছাড়া অর্থনৈতিক কারণও আছে। খুব গোড়ার গোড়ার যাই হোক, ইদানীং কৃষির ক্ষেত্রে জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীরা কোনও অর্থনৈতিক কাজই করছিলেন না, সব অর্থ-নৈতিক দায়িত্বই পড়েছিল কৃষকদের ঘাড়ে। অতএব সেখানে জমিদারদের স্বপক্ষে রায় না দিলে কোনই ক্ষতি ছিল না, কিন্তু কৃষক-দের পক্ষে রায় না দিলে সারা দেশের অর্থ-নীতিই উলটপালট হয়ে যেত।

প্রাক্‌-স্বাধীনতা ও প্রাক্‌-জমিদারী উচ্ছেদ কালের সমস্ত আইন ও বিধিব্যবস্থা আলোচনা করলে এই কথাই প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশ এই কাজ খুব বেশিদূর অগ্রসর হয়েছিল অন্যান্য প্রদেশে অনেক কম। উত্তর-প্রদেশ কৃষকদের জমি হস্তান্তর অধিকার প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রিসভা এসে ১৯৩৭ সালে দেন। কিন্তু বাংলায় ১৮৮৫ সালেই প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষকেরা যথেষ্ট অধিকার পেয়েছিল, যেটুকু বাধা ছিল সেটুকুও পরের কতকগুলি সংশোধনীতে দূর হয়ে যায়। বস্তুত বাংলায় এই পর্যায় শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিশ যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করলেন তখন তিনি জমিদারদের হাতেই জমির মালিকানা সমর্পণ করলেন এই আশায় যে তাঁরা নিজেদের স্বার্থের জন্যেই পতিত জমি হাসিল করবেন, জমির উন্নতি করবেন এবং চাষীদেরও দেখবেন। মোগল আমলে কৃষক-দের যে সব অধিকার ছিল কর্নওয়ালিশ এক কলমের খোঁচায় সে সবই উড়িয়ে দিলেন এবং জমিদারদের হাতে অধিকার দিয়ে আশা করলেন তাঁরা প্রজাদের পাট্টা দেবেন এবং অকারণ উচ্ছেদ করবেন না।

হায় সে আশা! কালক্রমে দেখা গেল জমিদারেরা এসব কোন কাজই করেন নি। জমি হাসিল হয়েছে, চাষের বিস্তার হয়েছে, এ সব সত্য কথা। কিন্তু তার জন্য জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধিই প্রধানত দায়ী, জমিদারদের উৎসাহ বা সাহায্য নয়। এই কথা স্পষ্ট হতে হতেই চাকা ঘুরল। জমিদারদের হাতে অধিকার দিয়ে কিছু ফল হল না, তাহলে এবার অধিকার দেওয়া যাক্ চাষীদের হাতে। বাংলার ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সেই অধিকারের সবচেয়ে বড় পরোয়ানা। এত বড় অধিকার ভারতবর্ষের অন্য কোন জায়গার কৃষকই পায়নি। হস্তান্তর, বিক্রয়, তলায় অন্য স্বত্ব সৃষ্টি, উচ্ছেদ বন্ধ, বিশেষ কারণ না থাকলে খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ,—এসবের সম্পূর্ণ অধিকার পেয়ে গেল বাংলার কৃষক। চাকা পুরো এক পাক ঘুরে এলো—অধিকার এলো জমিদারদের বদলে কৃষকদের হাতে।

ফল কি হল? ফল পূর্ববৎ। জমির চাহিদা যথেষ্ট থাকায় জমিদারেরা যেমন পত্তনীদার ইত্যাদি বহু মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, এখন কৃষকদের হাতে অধিকার আসায় তাঁরাও তারই পুনরাবৃত্তি করলেন। সর্বত্র নয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই। কৃষির সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব গ্রহণ করা নয়, কেবল এনক্যাশমেণ্ট অব লিগ্যাল রাইটস্। এবার অভ্যুদয় হল জোতদারের। নামে তাঁরা চাষী, কাজে নন। আসল চাষী হল তাঁদের তলায় স্বল্পতর স্বত্ববিশিষ্ট চাষীরা, বর্গাদারেরা, কৃষাণ প্রভৃতি দিনমজুরেরা। চাষের আসল দায়িত্ব রইল, বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়, সেই রামা কৈবর্ত ও হাশিম সেখের উপর। যারা সবচেয়ে সম্বলহীন, অতএব ভাল করে চাষ করবার পক্ষে বা চাষের উন্নতির জন্য সবচেয়ে অনুপযুক্ত। অথচ তাদের উপর ভর করেই কৃষি ও কৃষক সমাজ চলতে লাগল এবং আমাদের এগ্রিকালচারাল ইকনমি তাদের স্কন্ধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে লাগল। পরে পশ্চিমবাংলায় এই চেতনা হতেই বর্গাদার আইন হয় স্বাধীনতার পরে। যখন বর্গাদারেরাই চাষের কাজ বেশির ভাগ চালাচ্ছে তখন এবার তাদের কিছুটা অধিকার দিতেই হল। জমিদারদের অধিকার দিয়ে অভীষ্ট লাভ হল না, চাষীদের অধিকার দিয়েও হল না, অতএব চাকা আর এক পাক ঘুরুক, অধিকার নিয়ে যাওয়া যাক্ আর এক ধাপ তলায়. এবার বর্গাদারদের অধিকার দিয়ে দেখা যাক্ কি হয়। ইতিমধ্যে জমিদারী উচ্ছেদ হয়ে গেল তাই, তা না হলে আর কিছুদিনের মধ্যেই বর্গাদারেরা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের কৃষকের মতই পুরো স্বত্ব পেয়ে যেত এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশ যে পথে চলেছে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ সেই পথে পিছনে পিছনে চলবার চেষ্টা করে এসেছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ১৯৩৭ সালে উত্তর প্রদেশে কৃষকেরা জমি হস্তান্তর প্রভৃতির অধিকার পায়। তার পর হতে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভূমি-সংক্রান্ত আইন আলোচনা করলে দেখা যাবে তারা সবই সেই সুপরিচিত চক্রপথে সংক্রমণ শুরু করেছে। এক ধাপকে অধিকার দাও—তাদের দ্বারা না হলে তার তলার ধাপকে অবাধ অধিকার দাও—তাহলেই কৃষি ও কৃষকের উন্নতি হবে। এই কথাটিই হল প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ভূমিব্যবস্থার মূল কথা। অধিকার লাভের লোভ—হেডোনিস্টিক ক্যালকুলাস—এক স্তরে তা ফলবান না হলে তার তলার ধাপে এই সর্বরোগহর বটিকা প্রয়োগ করা—ব্যস্, এর পর আর কোনও কথা নেই। অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ!

॥ ৩ ॥

আমার বলার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, প্রাক্-স্বাধীনতা ও প্রাক্-জমিদারী-উচ্ছেদ যুগের এই যে বিশৃঙ্খলাকরণী, আমরা আজও তাকে আঁকড়ে ধরে থাকব কি না, থাকলেও কোনও ফল লাভ হবে কি না। এবিষয়ে আমার নিজের উত্তর হচ্ছে—না।

প্রথমে একটা অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ দিই। বাংলায় জমিদারী উচ্ছেদ বেশিদিন হয়নি। কিন্তু পূর্বেই বলেছি বাংলায় কৃষকদের খুব পাকা রকমের অধিকার বহুদিন আছে। তার কতকগুলি ফল পরীক্ষা করা যেতে পারে।

(১) বাংলাদেশে ক্ষয়িষ্ণুতার চেহারা যেরকম দেখা গিয়েছে তেমন আর অন্য কোথাও নেই। এখানে নিজের জমি নিজে চাষ করে এমন মালিক-কৃষকদের অনুপাত খুবই কম, কাজেই অপরের জমি চাষ করে, বর্গাদার বা দিনমজুরের সংখ্যা অনুপাতে খুব বেশী। এর হিসেব সেন্সাস রিপোর্ট হতে তুলে দিচ্ছি:—

মোট জনসংখ্যার কত অংশ নিজের জমি নিজে চাষ করে

পশ্চিমবাংলা	...	৩২·৩৪%
উত্তর প্রদেশ	...	৬২·২৭%
বিহার	...	৫৫·২৯%
বোম্বাই	...	৪০·৭৪%
মধ্যপ্রদেশ	...	৪৯·৫%
উড়িষ্যা	...	৫৯·৫৩%

তা হলে দেখা যাচ্ছে, এখানে ক্রমাগত স্বত্বের উপর স্বত্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, যা আর অন্য কোথাও হয়নি।

(২) অন্য জীবিকার দিকে প্রয়োজনানুরূপ প্রসার হয়নি। ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে (পশ্চিমবঙ্গ) একটি হিসেব দেওয়া আছে, যা হতে বোঝা যায় কৃষির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বহনক্ষম চাপ বেশিরভাগ জেলাতেই ১৯২১ সালে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, কোন কোন জেলাতে ১৯১১ সালেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনতা বেড়েই চলেছে।

(৩) ফলে কৃষির ক্ষেত্রে স্বয়ং-নির্ভর লোকের অনুপাত কমছে। দুটি হিসেব তুলে দিচ্ছি:—

	সমস্ত কৃষক শ্রেণীর মধ্যে স্বয়ং-নির্ভর লোকের অনুপাত	নিজের জমি নিজে চাষ করে এমন কৃষকদের মধ্যে স্বয়ংনির্ভর লোকের অনুপাত
১৯০১	২৯·৮	১৭·০
১৯১১	২৩·৪	১৬·৩
১৯২১	২৩·৪	১৩·২
১৯৩১	১৮·৫	৮·২
১৯৫১	১৪·১	৭·৫

স্বয়ংনির্ভরতা ভয়াবহ বেগে কমছে। তার অর্থই হল, জীবিকান্তর না পেয়ে বহু লোক একটি উপার্জনশীল লোকের স্কন্ধে ভর করতে বাধ্য হচ্ছে।

(৪) এর ফল অন্যদিকেও ফলছে। বরাবরই কিছু লোক থাকে যাদের প্রধান জীবিকা কৃষি-বহির্ভূত কোনও জীবিকা, কিন্তু কৃষিও তার সঙ্গে অপ্রধান জীবিকা হিসেবে কিছুটা থাকে। এইরকম ব্যক্তির সংখ্যা ১৯২১ সালে বর্ধমান বিভাগে ছিল দশ হাজার স্বয়ংনির্ভর লোকের মধ্যে মাত্র ৬০ জন, ১৯৫১ সালে তা হয়ে দাঁড়াল ৮৩১ জন। সেই ঘুরে ফিরে আবার কৃষির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে—এবং অবশ্যই তার ফলে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না।

(৫) আরও একটা প্রমাণ দাখিল করা যায়। সে হল জমির পরিমাণ, অর্থাৎ কে কত জমি রাখে। ফ্লাউড কমিশন যুদ্ধের ঠিক আগে এরকম একটা হিসেব নিয়েছিলেন, আর যুদ্ধের ঠিক পরেই তদন্ত করেছিলেন ঈশাক সাহেব। তাঁদের অনুসন্ধানের ফল পাশাপাশি সাজিয়ে দিলে ফল দাঁড়ায় এইরকম:—
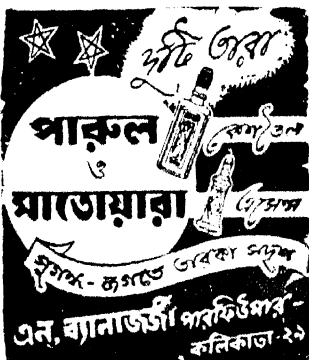
অবিভক্ত বাংলা

	ফ্লাউড কমিশন	ইশাক্ রিপোর্ট
(১) তিন একর পর্যন্ত জমি রাখে ...	৫৭·২	৭৬·১
(২) তিন একরের বেশি জমি রাখে ...	৪২·৮	২৩·৯

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ছোট জমির মালিকের সংখ্যা বেড়েছে। তারপর ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠান যে অনুসন্ধান করেছিলেন তা হতে জানা যায় ২ একর পর্যন্ত জমি রাখে এমন লোকই মোট লোকসংখ্যার ৬৪·৭%। দেখা যাচ্ছে অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে।

এরকম প্রমাণ আরও অজস্র দেওয়া যায়। এ প্রমাণ হতে একমাত্র সিদ্ধান্ত হল : চাষীর অবস্থার অবনতি ঘটেছে, উন্নতি হয়নি। তার ক্ষয়িষ্ণুতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কোনো উপায় নেই বলেই তারা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর জমি আঁকড়ে ধরে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর সম্বল নিয়ে ক্লিষ্ট হতে ক্লিষ্টতর জীবনযাপন করছে।

এবার আর একটা দিক্ দেখা যাক্। চাষীর যা হয় হোক্ গে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে কি? এবিষয়ে সহজেই দীর্ঘকালের প্রমাণপত্র দাখিল করা যায়, কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তা করব না। অল্প-স্বল্প দু একটি হিসেব দেব।

স্বাধীনতার পরের হিসেবটা দেখা যাক্ —যে সময়ে যথেষ্ট সেচ সার ও বীজের জন্য ঝোঁক পড়েছে।

আউস ধান ও আমন ধানের একর প্রতি ফলনের হারও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। সে হিসেবটিও তুলে দিচ্ছি:—

পশ্চিম বাঙলায় একর প্রতি ফলন (মণ)

	আউস	আমন
১৯৫৩-৫৪	৯·১৩	১৪·২৬
১৯৫৪-৫৫	৮·৬৯	১০·৬৪
১৯৫৫-৫৬	৮·৬০	১১·৫৮
১৯৫৬-৫৭	৮·০৬	১২·২৬

আউসের ফলনের হার তো স্পষ্টতই কমেছে। আমনের কিছুটা বাড়ছে বটে, কিন্তু সেটা কতটা চেষ্টার ফল এবং কতটা ভাগ্যের দান তা আরও কিছু বছর না কাটলে জোর করে বলা ঠিক নয়। ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতে এবং অন্যান্য প্রাচ্যদেশেও অত্যন্ত সুবৃষ্টির ফলে অত্যধিক ফসল ফলেছিল, আমরা তাই দেখে ভুল করেছিলাম এ বুঝি আমাদের চেষ্টার ফল এবং এইরকম ফলনই বুঝি স্থায়ী হয়ে দাঁড়াল। বলা বাহুল্য, এরকম হিসেব ঠিক নয়।

৪

ভূমিব্যবস্থা সংস্কারের আসল উদ্দেশ্যটা কি? এ বিষয়ে ধারণা খুব স্পষ্ট হওয়া দরকার।

(০০০ টনের হিসেব)

	১৯৫০/৫১	৫১/৫২	৫২/৫৩	৫৩/৫৪	৫৪/৫৫	৫৫/৫৬	৫৬/৫৭
১। চাল							
(ক) আমন	৩৫৫৯·১	৩১০৩·৩	৩৪৮৪·৭	৪৬৭৯·৮	৩৩৪১·৬	৩৭১৮·৮	৩৯৪১·৫
(খ) আউস	৩৩৫·৯	৩৫৯·৭	৪৪৭·১	৫২৬·৭	৩৯৮·১	৪০৯·৩	৩৭৫·৪
(গ) বোরো	১৫·৫	১৫·৫	১৮·৩	১৮·৪	১৫·৯	১৭·৬	১৯·৮
মোট	৩৯১০·৫	৩৪৭৮·৫	৩৯৫০·১	৫২২৪·৯	৩৭৫৫·৬	৪১৪৫·৭	৪৩৩৬·৭
২। অন্যান্য তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য (যথা—গম, যব, জোয়ার বাজরা ইত্যাদি)	৪০১৩·৩	৩৫৯৪·০	৪০৫৫·৯	৫৩৪৬·৪	[illegible]	[illegible]২৬৭·৩	৪৪৪০·৫
৩। ডাল জাতীয় (ছোলা, অড়হর মুগ ইত্যাদি)	৩৪০·৬	৩৮৫·২	৩৯০·৭	৪১৫·৫		৩৮০·৪	২৬৮·৯
৪। তৈলবীজ	৫৮·৩	৫২·৪	৫৯·৩	৪১·৩		৪৯·৮	৩৫·২
৫। তন্তুজ পদার্থ							
পাট	১৪৯৬·০	২০০০·৪	২৩৬৩·১	১৪৯৮·৪	১৪৯৬·৪	১৯৫৭·৮	১০৪৭·৭
মেস্তা (জাতীয় পাট)		৫৮·২	৪৯·৫	৩৫·৫	৪২৮·৩	৬১১·৫	৮০৩·৬
শণ	৪৪·০	২৬·৩	২৭·৫	২৪·৯	২১·৩	২৪·৫	১৯·৩
৬। অন্যান্য							
আখ	[illegible]	৮১১·৮	[illegible]	৬৫০·২	১১৯৩·১	১২৮৯·৫	১১০৮·৪
আলু	৩৬৪·১	৪৪৬·০	৪২৯·১	৪১০·৫	৩৭৪·১	৩৮৩·৬	৩০৪·৯

জমিদারেরা অনুপার্জিত আয় উপভোগ করতেন? তার জন্য খুব চড়াহারে ট্যাক্স বসিয়ে সেই ট্যাক্সের টাকা হতে প্রজাহিতকর কার্য করলেই খুব সহজে সে অভিযোগ দূর করা যেত।

জমিদারেরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করতেন? সেগুলো বেআইনী অত্যাচার সেগুলো তো অনায়াসে থানা-পুলিস দিয়ে ও রাজনৈতিক দলগুলির সংঘবদ্ধ চাপেই বন্ধ করা যায়। আর যেগুলো আইনী অত্যাচার—যেমন এ কাজ করতে হলে জমিদারের অনুমতি, অর্থাৎ নজরানা লাগবে—সেসব তো আইন বদলিয়েই বন্ধ করা যায়।

জমিদারেরা থাকার জন্য চাষীদের সাহায্য করতে সরকারের অসুবিধা হচ্ছে? মোটেই নয়, কারণ জমিদারেরা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রজাদের সরকার ইচ্ছামত তাগাবি ঋণ, পশু-ক্রয় ঋণ, শিল্প-ঋণ ইত্যাদি নানারকম ঋণ বহুকাল হতে দিয়ে আসছেন।

জমিদারী উচ্ছেদ হলে অবশ্য এসব কাজেরই অনেক সুবিধে হয় বটে। কিন্তু এগুলো সবই আনুষঙ্গিক এবং গৌণ। এইগুলোকেই যদি আমরা মুখ্য এবং প্রধানতম উদ্দেশ্য বলে ধরি, তাহলে ভুল করা হবে। যেমন এখনও অনেক সময় হচ্ছে।

মনে রাখতে হবে, মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদের মুখ্য উদ্দেশ্য এসব কিছুই নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য অন্য। মুখ্য উদ্দেশ্য হল এতকাল অর্থ-নীতির যে বিশৃংখল আইনের স্রোতে আমরা কৃষি ও কৃষক সমাজকে নিশ্চিন্তে ভাসিয়ে দিয়েছি এবং মধ্যে মধ্যে দাউ স্যাল্ট নট বলে দু-চারটে নিষেধাত্মক আইন করে কর্তব্য শেষ করে বসেছিলুম, সে জিনিস আর এক-দিনের জন্যও, এক মুহূর্তের জন্যও চলবে না, চলতে দেওয়া উচিত নয়। লাভের লোভে চাষের এবং নিজের উন্নতি করবে এই ধারণাই গত দেড়শ বছর ধরে ভূমিব্যবস্থার কঠিনতম বুনিয়াদ ছিল। একবার জমিদারদের লাভের লোভ পরীক্ষা করে দেখা গেল, ফল ভাল হল না। পরেরবার 'কৃষক'-দের অধিকার দিয়ে দেখা গেল, ফল পূর্ববং। অর্থাৎ যতদিন বাইরের অর্থনৈতিক নিয়মের প্রবল টান অব্যাহত থাকবে, জনসংখ্যার চাপ বাড়তে থাকবে, জীবিকান্তর থাকবে না, ততদিন নিরঙ্কুশ অধিকার দেওয়ার একমাত্র অর্থই হল ডিসচার্জ অব রেসপনসিবিলিটি বা দায়িত্বপালন নয়, কেবল এনক্যাশমেন্ট অব লিগ্যাল রাইটস্। তার ফলে দরিদ্র শেষ পর্যন্ত রামা কৈবর্ত ও হাশিম সেখের, তার ফলে কৃষির অবনতি, তার ফলে যে স্বচ্ছলতা থাকলে কৃষি হতে উদ্বৃত্ত অর্থ পরিকল্পনায় লগ্নী হতে পারত সে ব্যবস্থার বানচাল, অর্থাৎ এক কথায় দেশের সার্বিক অবনতি। সন্দেহ নেই এই স্রোত অবারিত চলতে থাকলে যদি আবার [illegible]দের ঐরকম

পুরো অধিকার দেওয়া হত, আর কিছুদিন বাদেই বর্গাদারেরা আবার উপ-বর্গাদার সৃষ্টি করত। বর্গাদারেরা আবার অন্য লোককে বর্গা দের এখনও কোথাও কোথাও এ ব্যবস্থা আছে বলে শোনা যায়।

জমিদারী উচ্ছেদের ফলে জমিদারী অত্যাচার গেল, ভাল কথা। অনেকখানি অনুপার্জিত আয় পরাশ্রয়ীদের হাত হতে রাষ্ট্রের হাতে এল, ভাল কথা। কিন্তু সেইটেই সব কথা নয়, শেষ কথাও নয়। প্রাচ্যদেশের কৃষির ব্যাপারে হেডোনিসটিক ক্যালকুলাস অচল এই কথাটা উপলব্ধি করার সময় এসেছে। এর জন্য চাই নিষেধাত্মক কতকগুলি বিধিমাত্র নয়, চাই পজিটিভ প্ল্যানিং। সজ্ঞানে সচেতনে দায়িত্বগ্রহণ—কি রাষ্ট্রের, কি কৃষকের। এই কাজ জমিদার থাকতে হওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা জমিদার এবং জমিদারের অধিকার থাকলেই আর একজনের পাল্টা অধিকার গড়ে দেওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না। যেহেতু এই ব্যবস্থা আর চলতে পারে না, সেই হেতু

জমিদারদের যেতে হতই, যদিও তাঁরা অত্যাচারী না হতেন এবং নিজেদের সব টাকা কৃষকের হিতার্থে নিঃশেষে বিলিয়েও দিতেন। জমিদারী-উচ্ছেদের পর কি রাষ্ট্র, কি কৃষক যদি এই বিরাট দারিদ্র্য সম্বন্ধে খুব তীক্ষ্ণভাবে সচেতন না হন, তাহলে ভবিষ্যৎ উন্নতি হবে না।

৫

কিন্তু সে সচেতনতার পরিচয় সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে না বলেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। সেদিন অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ভূমিব্যবস্থা সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, তার কয়েকদিন পরেই জাতীয় উন্নয়ন পর্ষৎ (ন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল) সেই বিষয়েই আলোচনা করলেন। দুয়েরই সিদ্ধান্ত মোটামুটি অনুরূপ। তাঁদের মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, জমি থেকে চাষী উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে; জমির মালিকানার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে; চাষীরা যাতে দীর্ঘ মেয়াদের কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে জমি কিনতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে; যেসব রাজ্যে আইনবলে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে, সেইসব রাজ্যে আইনের বিধান তিন বছরের মধ্যে চালু করতে হবে; কৃষি-সমবায় সমিতির প্রসার ঘটাতে হবে, ১৯৫৮-৫৯ সালের মধ্যে ৬০০ সমিতি গঠন করতে হবে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেকগুলি রাজ্যে এসব বিধান কার্যকর হতে পারে, কেননা সেখানে জমির সর্বোচ্চ সীমা হয়তো নির্দিষ্টই হয়নি, হলেও হয়তো কাজে পরিণত হয়নি, উচ্ছেদ বন্ধ হয়নি, কৃষি-সমবায় সমিতি নেই। সেসব রাজ্য এই নির্দেশ অনুসারে কাজ করুন। কিন্তু পশ্চিম বাঙলার কি হবে?

কারণ, দেখা যাচ্ছে, একটি ছাড়া অন্য কোনও বিধানই পশ্চিম বাঙলার বেলায় কার্যকর হবে না—সেসব কাজ পশ্চিম বাঙলায় আগে থেকেই হয়ে আছে। এখানে জমির সর্বোচ্চ সীমানা শুধু নির্দিষ্টই হয়নি, কাজেও পরিণত হয়েছে। এখানে কৃষি-সমবায় সমিতি সম্ভবত ৯৬টি আছে, আরও বাড়াবার চেষ্টা চলছে। এখানে সমস্ত রকম প্রজার উচ্ছেদ কড়া হাতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কেবল একটি দরজা খোলা আছে। সেটি হল বর্গাদার উচ্ছেদ। তাদের সরাসরি প্রজা বলে স্বীকার করে নেওয়াও হয়নি, অবশ্য খুব কামানাই দেওয়া আছে, উচ্ছেদের পথটা খোলা আছে। অথচ এরা [illegible] তো বটেই [illegible] [illegible] [illegible] নিজের জমি নিজে চাষ করে [illegible] [illegible] এখানে বেশি, কাজেই [illegible] জমি চাষ করে (অর্থাৎ বর্গাদার বা কৃষাণ) এমন লোকের সংখ্যা বেশি। এইখানে পশ্চিম বাঙলার আইনের ফাঁক আছে, সুতরাং সে হিসেবে কেবল এইটুকুতে দিল্লীর হুকুমনামা জারী হতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে তা প্রয়োজ্য নয়, কেননা দিল্লী যা বলছেন, সেসব কাজ পশ্চিম বাঙলায় হয়ে বসে আছে।

দিল্লীর বা পশ্চিম বাঙলার এই বিষয়ের আলোচনায় সাধারণত যা দেখি, তা হতে মনে হয় এতদিন পর্যন্ত আমরা যেসব বুলি বলে এসেছিলাম, সেইগুলির বাইরে আর দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারছি না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃষ্টি স্পষ্ট হচ্ছে না। জমিদারীর জঞ্জাল যেখানে যেখানে এখনও ছদ্মবেশে রয়ে গিয়েছে, সেসব পরিষ্কার করে ফেলা হোক, যেসব এই ধরনের কাজ এখনও অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে, তা বাজিকৈতার সঙ্গে শেষ করা হোক। কিন্তু তবুও কিমাশ্চর্য! চিন্তাধারা পরিষ্কার হতে অনেক সময় লাগে, কাজের অনেক আগিয়ে আগিয়ে তার চলা উচিত।

সুতরাং আমরা যদি এখনো কাজকেই একমাত্র ধ্যানধারণা করে বসে থাকি তাহলে ভবিষ্যৎকালে আমরা অপ্রস্তুত হয়ে যাব, সেইকালের জন্য প্রস্তুত থাকব না, ফলে জমিদারী উচ্ছেদ ও ভূমি-সংস্কারের আসল ফল হতে আমরা বঞ্চিত হব। কাজের ক্ষেত্রে না হোক, চিন্তার ক্ষেত্রে জমিদারী উচ্ছেদ এখন বাসি মাল, চিন্তার ক্ষেত্রে এখন সমাকারের ভাবনার কথা ভূমিসংস্কার এবং আসল ভূমিব্যবস্থা সংস্কার।

৬

ভবিষ্যৎকালের সেই ভূমিব্যবস্থা সংস্কারটি কি?

বলা বাহুল্য, তা সকল প্রদেশে এক ধরনের হবে না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতেই হবে। তবু ভারতবর্ষের কৃষিতে ও কৃষকজীবনে মোটামুটি একটা ঐক্য আছে, একই ধরনের অর্থনৈতিক তাগিদ সেখানে চলছে এবং পথটা মোটামুটি একই ধরনের হবে। এক হিসেবে পশ্চিম বাঙলা এ বিষয়ের ল্যাবরেটরী। অন্যত্র যেসব সংকট ক্রমে ক্রমে দেখা দিচ্ছে পশ্চিম বাঙলায় তা বহুকাল আগেই দেখা দিয়েছে এবং খুব তীব্র রূপ নিয়েছে। সে হিসেবে পশ্চিম বাঙলায় সমস্যার সমাধান করতে পারলেই সারা ভারতের সমস্যাও সেই পথে সমাধান করা যেতে পারবে এ ধারণা অমূলক নয়।

এই কথা বলবার আগেই ধরে নিচ্ছি জমিদারী উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে, এমন [illegible] ছদ্মবেশে টুকরো টুকরো জমিদারী [illegible] এখনও কোথাও কোথাও আত্মগোপন [illegible] আছে তা-ও নেই। (জমিদারী থাকলে [illegible] ব্যবস্থা, না থাকলে অন্য ব্যবস্থা। [illegible] বা জোতদারী নেই ধরে নিয়েই কথা [illegible]

এই কথাটার দুটো দিক আছে—[illegible] রাষ্ট্রের দিক, অন্যটা প্রজার দিক [illegible] রাষ্ট্রের কথা বলি।

রাষ্ট্র এ পর্যন্ত যেসব আইন [illegible] তার অধিকাংশই হল নিষেধ। [illegible] তুমি এ করতে পারবে না, ও করতে [illegible] না। হে প্রজা, তুমি এইসব কাজ [illegible] অনুমতি না নিয়ে কোরো না। এই [illegible] আইনেই ছিল। এখন দরকার একটা [illegible] সবের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সরকারপ্রতিশ্রুতি [illegible] যথা—যদি তুমি এই করো তাহলে [illegible] এই সুবিধা দেওয়া হবে। পশ্চিম বাঙলা ভূমিসংস্কার আইনের (ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যা[illegible] রিফর্মস অ্যাক্ট ১৯৫৫) কথাই বলি। [illegible] ৪৩ ধারা হতে ৫৮ ধারা খুব গুরুত্বপূ[illegible] কেননা ভবিষ্যৎ কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি নির্ভর করছে মূলত এই ধারার উপরে। তাতে আছে যদি সাতজন বা তার বেশিসংখ্যক প্রজা সমবায় সমিতি করে তাহলে তারা কতকগুলি সুবিধে পাবে, যথা সরকারী খাজনা কমিয়ে দেওয়া হবে, প্রথম তিন বছর বিনামূল্যে সার ও বীজ সরবরাহ করা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার মতে এ হল দারিদ্র্য এড়িয়ে যাওয়া—যা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অচল,

বিশেষত কৃষির ক্ষেত্রে অচল। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা কল্যাণময় রাষ্ট্র (আসল কল্যাণময় রাষ্ট্র সমাজতন্ত্র না হলে হতেই পারে না) কখনও অপরের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। তোমরা যদি কর তাহলে লাভ পাবে। আবার সেই লাভের লোভ দেখানো। সমাজতন্ত্রের গোড়ার কথাটাই হল লাভের লোভই যে চরম নিয়ন্তা সেই কথাটাকে অস্বীকার করা—লাভের লোভ তো ধনতান্ত্রিকতার খাসমহাল। আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র করছি অথচ তার মূল কথাটাকেই না মেনে অন্য যুগের জের টেনে যাচ্ছি। এ কেমন কথা? যদি চাষীরা সমবায় সমিতি না করে তাহলে কি হবে? ব্যক্তিক চাষই চলতে থাকবে? আমি নিশ্চয়ই সমবায় কৃষির উপকারিতায় বিশ্বাস করি,* তা নইলে আইনে তা দিলাম কেন? অথচ তার জন্য কোনও পজিটিভ প্ল্যান করলাম না, ছেড়ে দিলাম অন্তহীন কালের উপরে এবং অনির্দিষ্ট লাভের লোভের উপরে। কেন আমি বলতে পারলাম না (যদি সমবায়ী কৃষিতে আমি বিশ্বাসই করি) যে আমি জমি কাউকেই দেব না যদি না সে সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়? উত্তরপ্রদেশের গঙ্গাখাদিদর কলোনিতে যেখানে পশ্চিম পাকিস্থানের শরণার্থীদের বসানো হয়েছিল নতুন গ্রাম পত্তন করে এবং নতুন জমি হাসিল করে, সেখানে তো এরকম কড়াকড়ি আইন ছিল! প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এইরকম। এখনও কেউ ইচ্ছে করলে সমবায় সমিতি করে তার মারফৎ ঋণ নিতে পারে, কেউ বা ইচ্ছে করলে মহাজনের কাছেও যেতে পারে। ভবিষ্যৎকালে রাষ্ট্রকে বলতে হবে, কোনও কৃষক মহাজনের কাছে যেতে পাবে না, জমিবন্ধক দিতে পারবে না (প্রসঙ্গতঃ বঙ্গীয় ভূমিসংস্কার আইনে বন্ধক দিতে পারার ব্যবস্থা রেখে দেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ ঘুরিয়ে মহাজনদের জমিদারী রেখে দেওয়া হয়েছে।), তার বদলে যত টাকা লাগে তা দেবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করছে। এসব ব্যবস্থা না করতে পারলে এবং এসব কথা জোর করে না বলতে পারলে সত্যকারের জমিদারী উচ্ছেদ ও ভূমিব্যবস্থা-সংস্কারই বা হল কই, আর চাষ ও চাষীর উন্নতিরই বা কি গোড়াপত্তন হবে? শুধু গোটাকতক মধ্যস্বত্বাধিকারী উচ্ছেদ করে ক্ষতিপূরণের ঘোলা জলে হাবুডুবু খাবার নামই কি ভূমিব্যবস্থা সংস্কার? যদি দামোদর বা ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা সফল হয়ে থাকে, বিশেষজ্ঞদের হিসেবে যদি ভুল না থাকে (যা অবশ্য প্রায়ই থাকে), যদি সেচের জন্য জল ব্যবহার করলে দুটি ফসল বা তিনটি ফসল হয় এবং যদি তার economies ঠিক থাকে, তাহলে কেন কৃষকদের বাধ্য করা হবে না জল নিতে, দুটো বা তিনটে ফসল করতে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে? অবশ্য যেসব 'যদি'র কথা উল্লেখ করলাম, তবেই এইভাবে বাধ্য করা যেতে পারে, নাচেৎ কদাপি নয়। কিন্তু 'যদি'গুলি যদি ঠিক থাকে, তাহলে এমন অবস্থার কথা কল্পনাও করা যায় না যে, একজন মর্জি হলে একাধিক ফসল ফলাবে, আর একজন মর্জি হলে একটারও বেশি ফসল ফলাবে না। সোভিয়েট রুশিয়া যখন ভেবেচিন্তে ঠিক করল, যৌথ খামার হিতকর, তখন সে কি কাউকে ছেড়ে কথা কয়েছিল? চীন যে ক্রমে ক্রমে Collective farming-এর দিকে এগিয়ে আসছে, তখন কি যে কেউ খুশি বলতে পারে, আমি কিন্তু বাপু ওসবের মধ্যে নেই, আমি আমার খুশিমতই চাষ করতে থাকব? সমাজতন্ত্র স্থাপনা করতে চলেছি, তবু এত শংকা কেন, দ্বিধা কেন? এই দ্বিধার দুটি মাত্র অর্থ হতে পারে (১) সমাজতন্ত্র এখনও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং আমরা যা করছি, তা পুরোপুরি চাষীদের উন্নতির জন্য নয়; (২) এবং/অথবা আমরা যেসব হিসেব করেছি, সেসব হিসেব রিপোর্টেই ভাল, কাজে নয়। তা কলম দিয়ে কাগজে লেখা যায় নির্বিঘ্নে, কিন্তু খন্তা দিয়ে মাটির বুকে লেখা যায় না। বলা বাহুল্য, এই ধরনের দুর্বলতা থাকলে আমরা কোনদিনই দেশের চেহারা ফেরাতে পারব না, কৃষকেরও নয়। ফলে সেই hedonistic calculus-এর মায়াজাল কেটেও আমরা বেরোতে পারব না। কিন্তু তাহলে আর হল কী?

রাষ্ট্রের দিক হতে যেমন এই কথা চিন্তা করতে হবে, তেমনি কৃষকদের দিক থেকেও কয়েকটা কথা চিন্তা করা দরকার। এতদিন তাদের অধিকারের সীমানা নির্দিষ্ট ও বর্ধিত হবার প্রয়োজন ছিল, কেননা, তা না হলে জমিদার ও জোতদার প্রভৃতি মুনাফাভুকদের রাজত্ব প্রসারিত হত। কিন্তু যখন মুনাফাভুকেরা অপসারিত, তখন আর কৃষকদের অধিকার বাড়ানোর কোন অর্থ হয় না। কার বিরুদ্ধে অধিকার? জমিদার-জোতদারেরা তো নেই। তবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার বাড়ানো, অর্থাৎ নিজেদের বিরুদ্ধে অধিকার বাড়ানো? সত্যকারের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ কথার কোনও অর্থ হয় না। আমি একথা বলছি না যে, তারা দিনমজুর হয়ে এখানে-ওখানে ভেসে ভেসে বেড়াবে। তাদের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট অধিকার নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু আমরা এতকাল ধরে কৃষক শ্রেণীর মনে যে অধিকারবোধ খুব দৃঢ়ভাবে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম যে, security of tenure এবং right of ownership দিলেই চাষ ভাল হবে, চাষীও ভাল থাকবে—আজ সেই চিন্তা-ভাবনার যুগ অতীত হতে চলেছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি, এই ঔষধ কোনদিন সফল হয়নি। অধিকার যতই বাড়ানো হয়েছে, ততই স্বত্ব সৃষ্টি হয়েছে। তখন হয়তো উপায় ছিল না, কিন্তু এখন তো আর সেকথা চলে না।

৭

আসল কথা, চাষ ও চাষীকে এখন হতে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে হবে—তারই নাম প্রকৃত ভূমি-ব্যবস্থা সংস্কার। এতদিন পর্যন্ত চাষ ও চাষীকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একটিমাত্র। সেটা হল কিসে খাজনা আদায় হয়। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত বাংলাতেও সরকারের প্রধান আয় ছিল ভূমিরাজস্ব, এখনও অনেক অনগ্রসর প্রদেশে সেই অবস্থাই আছে। মুরগী মরে গেলে সোনার ডিম প্রসব করে না, তাই মুরগীটাকে যেটুকু ঘাসজল না দিলে নয়, সেইটুকুই দিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষক সমাজই ভারতে সংখ্যাধিক্য, কাজেই ভারতবর্ষের উন্নতি মানেই কৃষক-সমাজের উন্নতি। এমন কি শুধু যে কৃষকদের উন্নতি, তাই নয়। কৃষকসমাজের উন্নতি না হলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও বানচাল হয়ে যাবে, কেননা, কৃষি অংশের উদ্বৃত্তই পুনরায় লগ্নী হয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সফল করতে সহায়তা করবে। সুতরাং এখন এই ব্যাপারটা এই বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গী হতে দেখতে হবে। অনেক সময় এই সব আলোচনায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কথাটা খুব বড় হয়ে দেখা দেয়। সেটা খুব বড় কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটাও বোধহয় শেষ কথা নয়। প্রায় সমস্ত চাষীকে তাড়িয়ে দেশময় ট্র্যাক্টর ও কলের চাষ চালালেও হয়তো খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু আমরা তা চাই কি? আসল কথা, কৃষকের উন্নতি—সে উন্নতি হলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করানোও কঠিন হবে না, কৃষি অংশের উদ্বৃত্ত আয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুনরায় লগ্নী করিয়ে দেশের উন্নতিও কঠিন হবে না। কিন্তু এই উন্নতি প্রাচীন ধারায় অপ্রত্যক্ষ চেষ্টায় হবে না। তার জন্য চাই পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গী, সজ্ঞানে দায়িত্ব গ্রহণ ও দায়িত্ব পালন ও positive forceful planning।

* সমবায়ী কৃষির উপকারিতা নিয়ে অবশ্য অনেক তর্ক আছে। উত্তরপ্রদেশের রাজস্বমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং এবিষয়ে চমৎকার একটি বই লিখে এদেশে সমবায়ী কৃষির অসুবিধাগুলি দেখিয়েছেন। কিন্তু সে কথা আলাদা। পশ্চিমবাংলা সরকার নিশ্চয়ই তার উপকারিতায় বিশ্বাস করেন—নইলে আইনে দিয়েছেন কেন?

১ নম্বর চৌরঙ্গী টেরাস-এ দিলীপ রায়ের, ১৫ নম্বর পার্ক স্ট্রীট-এ তারাপ্রসাদ বিশ্বাসের এবং ১ নম্বর সদর স্ট্রীট-এ রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা প্রদর্শনী চলেছে এ সপ্তাহে।

দিলীপ রায় একাধারে কবি, গায়ক এবং চিত্রকর। অঙ্কন বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন ইনি নিজেই, কোনও স্কুল বা ব্যক্তির শিক্ষাধীনে না থেকে। সেই কারণেই বিশেষ কোনও প্রভাব এঁর ওপর পড়ে নি। এঁর ধারা সম্পূর্ণ স্বকীয় এবং প্রথা প্রকরণ নানাবিধ। রেখার বেষ্টনীতে আকৃতিকে ধরা যায় বটে কিন্তু ভাব প্রকাশ করতে হলে বর্ণই হল উপযুক্ত মাধ্যম, সেই কারণে ইনি বর্ণ ব্যবহারেই বেশী জোর দিয়েছেন প্রত্যেক ছবিতে। দু-একটি ছবি ছাড়া সব ছবিতেই লক্ষ্য করা যায় একটা কিছু বিশেষ প্রাকৃত রূপ। অর্থাৎ জড়জগৎকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুই ভাব প্রকাশের চেষ্টা ইনি করেন নি। ইনি মাধ্যম ব্যবহার করেছেন দেশী রঙ, পোস্টার কালার, জাপানী প্যাস্টেল, চুন এবং ক্রেয়ন। এঁর আগে আর কোনও শিল্পীকে রঙ হিসেবে দেশী চুন ব্যবহার করতে দেখিনি। তবে চুনের স্থায়ীত্ব কতখানি সেইটে হল প্রশ্ন। সবুজ কাগজের ওপর চুন দিয়ে শিল্পী যে হিমগিরির রচনা করেছেন তা সত্যই রসোত্তীর্ণ। কনকনে ঠাণ্ডা ভাব চমৎকার ভাবে ফুটে উঠছে। ছোট ছোট মাছ, মোরগ, বেড়াল ছানা, পাখি এসব বিষয়বস্তুর রচনাগুলিও চমৎকার। ড্রইঙ এবং অ্যানাটমীতে ইনি যে বেশ পারদর্শী তার প্রমাণ ঐ সব রচনাগুলি। পারস্পেকটিভ জ্ঞানও এঁর চমৎকার তার প্রমাণ মহিষের দল মাঠে বিশ্রাম করেছে ও পেছনে পাহাড়, গরুর পাল চরে বেড়াচ্ছে এবং দূরে দু একটি গাছ দেখা যাচ্ছে প্রভৃতি ছবি। গোলাপের থোকা, ঘোড় দৌড় প্রভৃতি ছবিগুলি এবং রেলগাড়ির ইঞ্জিন এসব ছবিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁর প্রদর্শনী আগামী সপ্তাহে শেষ হবে। এইসঙ্গে আট বছরের সুভঙ্কর সরকারেরও ছবি প্রদর্শিত হয়েছে।

•

শিল্পী তারাপ্রসাদ বিশ্বাস গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফট-এর প্রাক্তন ছাত্র। পরে ইনি শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কাছে কিছুদিন শিল্পশিক্ষা করেন। ইনি বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারু ও কারুকলা শিক্ষক।

ইনি [illegible] অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল প্রভৃতি পথিকৃত শিল্পীদের অনুসরণ করেছেন। [illegible] ৫৩টি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে এবং এঁর মাধ্যম [illegible], [illegible] কালি, লাইনো কাট, [illegible] এবং ওয়াশ। এঁর গুরুদেবের কাছ থেকে ইনি যতটা শিক্ষা করেছেন ততটাই প্রয়োগ করেছেন চিত্র রচনায়। বেশী কিছু করতে যান নি ফলে রচনাগুলি নন্দলাল বসু এবং অবনীন্দ্রনাথের শিল্প কলারই পুনরাবৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এঁর রচনা জ্ঞান এবং টানটোন বেশ পরিণত। বিশেষ করে রেখ প্রধান ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য। অঙ্গংকরণ, ওয়াশ, এসব প্রথাপ্রকরণেও তিনি বেশ সুদক্ষ। কিন্তু একটা কথা, পথিকৃত শিল্পীদের পথ ধরে কাজ করে শিল্প বিস্তারের আশা হয়ত করা যেতে পারে কিন্তু আধুনিক কালকে বাদ দিয়ে সে কাজ হবার জো নেই। গুরুর কাছ থেকে যা শেখা যায় সেইটকুরই প্রকাশ করার সার্থকতা নেই। পাকা শিল্পী হলেন তিনি, যিনি শিখলেন একরকম কিন্তু রচনা করলেন সম্পূর্ণ স্বকীয় আর্ট। যেমন শিল্পী রামকিংকর। ভারতীয় শিল্প মহান শিল্প, 'সেকালের স্তরের ওপর একালের শিল্পের প্রতিষ্ঠা হল স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা। সেকালটা সিন্দ-বাদের বুড়োর মতো একালের ঘাড়ে উঠে বসল এ বড় বিষম প্রতিষ্ঠা—দাড়ির ভিত উঠে এল ছাদের উপরে, খুব একালের বাস্তু শিল্পীর মতেও এটা ভয়ংকর ব্যাপার।' এ কথা অবনীন্দ্রনাথেরই।
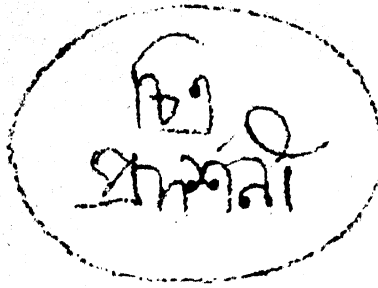
যাইহোক তারাপ্রসাদবাবুর 'ময়ুরাক্ষী', 'হরিদ্বারের গঙ্গা, 'সাঁওতালী নৃত্যোৎসব', 'গোপালপুরের সমুদ্রতীর,' 'বসন্ত' এবং 'নানান রঙের ঋতু' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীটি ১১ই নভেম্বর অবধি খোলা থাকবে। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় লেখার ইচ্ছে রইল।

—চিত্রগ্রীব

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার একটি দৃশ্য। —তারাপ্রসাদ বিশ্বাস

নায়ক-নায়িকা

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

চিনতে তাকে পারবে আবার মলিন পথে
ছিন্নবেশে বাসর যদি ভাঙা?
পথের পাশে স্রোতস্বিনী ভাঙলে স্রোতে
লজ্জা দিয়ে মুখ হবে না রাঙা?

সে বলেছে : ভয় করি না, লজ্জা নেই মনে,
আকাশ যদি ডাক দিয়েছে অমন সংগোপনে
হবোই হাওয়া, হাওয়ায় আমি মরবো মাথা কুটে,
মেঘের দেশে আলোর গানে উঠবো শুধু ফুটে;

ভুল হবে না চিনতে সেই আকাশভরা নীল
যখন তার রোদবৃষ্টি পড়বে এই ঘরে—
স্মৃতির পটে ভেসে উঠবে একই মুখ-মিছিল,
লিখলো নারী টুকরো টুকরো মলিন অক্ষরে;

দুজন তারা অবিচ্ছেদ আলোর সখাসখী
গাছের গায়ে জড়িয়ে আছে লতার ছায়াছবি
দুজন তারা দিগন্তের করুণ চখাচখি
জীবনমরণ এক করেছে পূরবী ভৈরবী।

অর্বাচীন নায়িকা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অঙ্গেতে চন্দনগন্ধ, কণ্ঠে শোভে নীল চন্দ্রহার,
মৃণাল বলয়ে যুগ্ম স্বর্ণবিছা, অঙ্গুরী হীরকে
বাঁধে সে সম্মানমূল্য, হংসীর গমনে দোলে তার
অঙ্গার আকুল কেশ, দৃষ্টি দূরে স্নিগ্ধ কুরুবকে।

প্রাচীন রূপসী চলে বিলাসিনী নদীর নিকটে-
চরণমঞ্জীরে বাজে চঞ্চল জলের মিষ্টস্বর,
কে যেন চতুর চোর অশ্ব বাঁধা পিতামহ বটে;
এ সকল নাট্যে কিম্বা পৌরাণিক যুগে আনতো দর।

এখন শিল্পের মাটি পরেছে অক্ষম নীলাশিরা
যুক্তির বা নায়িকার মুখ ভরে অঙ্কের মতন
চেক্ চেক্ ডোরা কাটা, ক্যাম্প, কুঞ্চিত করে বাসে চড়া—
মা নিয়ে নবাতি পোলা, ইলেকশন, সুস্থ শিরঃপীড়া
কেবল অন্নের জন্য। প্রেম আহা, উজ্জ্বল স্টেশন
দূরে নিয়ে চলে মনকে, কাঁধে জ্বলে সংস্কারের ঘড়া॥

লিলিকে

জিন্দা হায়দার

নিজেই তো ফুল তুমি।
তবু কেন ফুল হাতে এলে তুমি লিলি।
দুষ্টুমি হাসির ছায়া চোখে মেখে নিয়ে
বললে না কিছু, শুধু
আমার ঠোঁটের প্রান্তে
একটু জাফ্রানী সুধা ঢেলে

দেখালে যে সদ্যঃস্নাতা পঞ্চদশী চাঁদ।
হাসলেম। তারপর তোমার ও নিটোল কপালে
মৃদু নাড়া দিয়ে বললেম :
নিজেই যে চাঁদ তুমি লিলি॥

সেই রাতেই পুলিস এল।

হয় তো আসতো না। কে জানে ওরা মিটমাট করে নিত কিনা।

কিন্তু সবকিছুর একটা সীমা আছে। কত আর সহ্য করতে পারে মানুষ। সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই—সময় অসময় নেই, দিনরাত গোলমাল চিৎকার হৈ হৈ। পুলিসে টেলি-ফোন না করে দিনের পর দিন চোখ কান বুজে এই অশ্লীল কলহ উপভোগ করবার মতো ধৈর্য মিহিরের নেই।

রমা বারণ করেছিল। কি দরকার এসব ব্যাপারে মাথা গলাবার। ওদের চটিয়ে দেয়া ঠিক নয়। রাত করে মাঝে মাঝে বাড়ি ফেরে মিহির। রাগ পুষে রাখলে ওরা কখন কি করে বসে ঠিক নেই।

রমার বারণ মিহির শোনে নি। এটা মগের মুলুক নয় যে, যার যা খুশি তাই করবে। অত আমল দিয়েই তো মাথায় তোলা হয়েছে ওদের। তাই যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করে ওরা। পান থেকে চুন খসলে ধর্মঘট করে মিছিল বার করে। মিহিরের হাতে ক্ষমতা থাকলে একদিনে সে ওদের শায়েস্তা করে দিত।

কিন্তু তার হাতে যখন তেমন ক্ষমতা নেই তখন এদের হট্টগোলে সে শুধু স্ত্রীর কাছেই গজগজ করে। আস্ফালন করে। বাইরে গিয়ে চোখ রাঙিয়ে ওদের থামিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু বাধা দেয় রমা। স্বামীকে [illegible] বোঝায়, বিবাদ ছাড়া কি আছে ওদের জীবনে। কলহ করেই সুখ পায় ওরা। পাক। বাধা দিয়ে কেন বেচারিদের সুখ নষ্ট করবে মিহির।

আর আমাদের সুখ? বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে মিহির, যতক্ষণ বাড়িতে থাকব ওই খ্যানখ্যানে গলা শুনতে হবে—আর রাস্তায় বার হলেই কুৎসিত চেহারা দেখতে হবে। কলকাতা শহরের বাড়িওলাগুলোও হয়েছে তেমনি। এক একটা স্কাউণ্ড্রেল। ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াতে হয় ওদের, দাঁতে দাঁত চেপে বলে মিহির, নবাবী আমলে যেমন করা হত—

মিহির যেন দেখতে না পায় এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে রমা মুচকি হাসে। বস্তির লোকগুলোকে শায়েস্তা করতে চায় তার স্বামী। বাড়িওলাদের ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াতে চায়। কিন্তু কিছুই করবার ক্ষমতা নেই বলে আস্ফালনটা হাস্যকর মনে হয় রমার। অপরিণত বুদ্ধির এক অক্ষম, দাম্ভিক মানুষ বলে রমার হঠাৎ মনে হয় মিহিরকে। তাই বোধহয় হাসি পায় তার।

তুমি আর কতক্ষণ বাড়িতে থাক, বেশ আস্তে রমা বলে, অসুবিধা আমারই হওয়ার কথা। আমিই তো বাড়ি বসে থাকি সারা দিন।

কেমন করে থাক তুমিই জান।

বললাম তো, আমার কোন অসুবিধা হয় না। আর উপায় যখন নেই তখন—

বাধা দিয়ে মিহির বলে, উপায় নেই মানে? নিশ্চয়ই উপায় আছে। ইচ্ছে করলে—

না, না, তুমি কিছু কর না। বেশ আছি তো। অমন একটু আধটু অসুবিধা এখন কলকাতায় সব পাড়াতেই লেগে আছে। যেখানে যাবে সেখানে অশান্তি।

রমা আর দাঁড়ায় না সেখানে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে একটা গোটা বাড়ি পাওয়া গেছে। নিচে একটা ঘর আর ওপরে দুটো। অন্যান্য বাড়ির তুলনায় ভাড়া রীতিমতো কম। কারণ এই বাড়িটা একেবারে বস্তির গা ঘেঁষে।

ট্রাম থেকে নেমে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়। রাস্তার দু-পাশেই বস্তি। ঘরে ঘরে কেরোসিনের আলো জ্বলে। ধোঁয়া ওঠে। সুর করে ছেলে নামতা পড়ে। মেয়ে কাঁদে।

স্বামী শব্দ করে ঘন ঘন থুতু ফেলে। আর নিটোল স্বাস্থ্যের বউটা বোধহয় রাঁধতে রাঁধতে তরকারিতে একটু বেশি মাত্রার ফোড়ন দিয়ে নিজেই খক খক করে কাশে।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অল্প অল্প অন্ধকারে রমা তাকিয়ে দেখে ওদের সংসার। মিহির ফেরে না এত তাড়াতাড়ি। যখন ফেরে তখন প্রায়ই দৃশ্যের পরিবর্তন হয়। রমা আর ওদের করুর চেহারা দেখতে পায় না। কিন্তু গলা শুনে অবাক হয়ে ভাবে, এই বোকা স্বামীটা এত চেঁচাতেও পারে! বউটাও কিছু কম যায় না। হাতাহাতি হয় কিনা বলা

ক বুঝতে পারে না। কিন্তু হলেও বিচলিত
ার কোন কারণ নেই। বউটাও প্রয়োজন
লও দু ঘা বসিয়ে দিতে যে ইতস্তত
বে না, তার গলাবাজির চোটে রমা
-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়।

অবশ্য এত ফাটাফাটি করবার কোন মানেই
না। কারণ একেবারেই তুচ্ছ। কোলের
লেটা হামাগুড়ি দিতে গিয়ে ইঁটের
ক্কর খেয়ে গলা ফাটাচ্ছে। স্বামী দাঁত
ঁচিয়ে বলে, বউটার কি হুঁশ নেই।
চাটা সাবাড় হতে চলল যে—

ফোড়নের প্রতাপে নাকের জলে চোখের
ল বিব্রত হয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে বউটা
ন ওঠে, স্বামী কি পঙ্গু? হাত-পা কাটা
ছে নাকি কর্তা? লাটবেলাটের মত বসে
থেকে ছেলেটার দিকে একটু লক্ষ্য
খলেই তো ঝামেলা মিটে যায়।

ঘরের বউ না বাজারের মেয়েমানুষ?
মীর হাত-পা কাটা যাওয়ার কথা যে
ত্তা করতে পারে সে গিয়ে নাম লেখাক
ত-বেশ্যার খাতায়—

তারপর গলার স্বর সপ্তমে ওঠে। স্পষ্ট
নতে পায় রমা। কিন্তু সব কথার মানে
ঝতে পারে না। ভয় পায়। বিবর্ণ হয়ে
র মুখ। খুন-খারাবি হবে মনে করে
ম্পিত বোধ করে। আর ঠিক সেই সময়
: গজ করতে করতে দুম দুম করে পা
লে মিহির ওপরে উঠে আসে।

ওগো, মিহিরের দুটো হাত শক্ত করে
র প্রবল উত্তেজনায় রমা বলে, একটা কিছু
য় যাবে। তুমি তাড়াতাড়ি যাও। থামিয়ে
ও ওদের—

নুইসেন্স! ঝোঁকের মাথায় সজোরে
াকেই ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দেয় মিহির,
লি করে শেষ করে দিতে ইচ্ছে করে সব
াকে। তা ছাড়া ছোটলোকগুলোকে
মাবার আর কোন উপায় নেই—রাস্কেলস্!
একটু জোরেই রমাকে ধাক্কা দিয়েছিল
হির। দেয়ালের গায়ে ছিটকে পড়ে মাথাটা
টন করছে তার।

আত লক্ষ্য না করে মিহির বলে, কাল
কে আবার বাড়ি খুঁজতে হবে। ছোট-
াকের মধ্যে থাকবার চেয়ে ক্যানসারে ভুগে
া ভাল—

রমার মাথাটা টনটন করছে তখনও।
হিরের সব কথা কানে যায় না তার।
ধকার ঘন হয়ে আসে। শীতের আমেজ
াছে হাওয়ায়। সিরসির করে শরীর।
ঃশব্দে প্রথম হেমন্তের কুয়াশা নামে।
ক সুরে রাস্তার একটা কুকুর ডেকে চলে।
। জানে কখন থামবে। মেজাজ আরও
রাপ হয়ে যায় মিহিরের। বস্তির কুকুর
লই বোধহয় এমন বেয়াড়া। পরের সুবিধা
সুবিধা চিন্তা করবার মতো বুদ্ধি নেই
দের কারুর। না মানুষের, না জানোয়ারের।

কিন্তু বোধহয় তুমুল কলহের ফলাফলটা
নবার জন্যেই পরদিন ভোর বেলা রমা
এসে আবার বারান্দায় দাঁড়ায়। ভয় মেশানো
কৌতূহলে দুরু দুরু করে ওর বুক। কে
জখম হয়েছে কে জানে।

ভিজে ভিজে সকাল। সূর্যের তেজ
জোরালো নয় ততো। কিন্তু দূরের মাঠে
ধোপারা কাপড় মেলে দিয়েছে এর মধ্যে।
মোষগুলো জমা হয়েছে পুকুরের ধারে।
পাতলা কুয়াশা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে রমার
কৌতূহল। আজ ভোরের হাওয়া আশ্চর্য-
রকম ভারী আর ঠাণ্ডা। শীতটা বেশ আগেই
এসে যাবে বোধহয়।

কিন্তু কোথায় কি। কে বলবে যে আগের
দিন অমন একটা প্রলয় হয়ে গেছে ওদের
মধ্যে। কারুর মুখে বিরক্তির কোন রেখাই
নেই। শব্দ করে বালতিতে জল ভরছে বউ।
গামছা জড়িয়ে ঘরে ঢুকলো স্বামী। বাচ্চাটা
ট্যাঁ ট্যাঁ করছে। কিন্তু কেউ মাথা ঘামাচ্ছে
না ওটাকে নিয়ে। রান্নার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ
আসে। ক্ষিপ্রগতি এখন বউটার চলাফেরার।
একটা খাঁকি শার্ট পরে টেরি কাটে স্বামী।
বাচ্চাটাকে কোলে তুলে একটু আদর করে।
চিৎকার করে বউকে শাসায়, আর দেরি
হলে খাওয়া হবে না— দিন দিন যেন কুড়েমি
বাড়ছে বউএর—

লজ্জা পেয়ে বউ উত্তর দেয়, যাই গো
যাই। বস না তুমি। ঠাঁই তো করে দিয়েছি
কখন—

ছুটোছুটি করে বউ। বালতির উনুনটা
দূরে সরিয়ে রাখে। বসে বসে মিষ্টি হেসে
যত্ন করে খাওয়ায় স্বামীকে। হাসি উপভোগ
করবার সময় নেই স্বামীর। আয়েস করে
খেতেও পারে না। কোনরকমে গলাধঃকরণ
করে শুধু। বউএর কাকুতি মিনতি শোনে
না। অনেক বেলা হয়ে গেছে আজ। নাকে
মুখে ভাত গুঁজে সেই ভোরবেলা ছুটে
বেরিয়ে যায়। বউটা লক্ষ করে কিনা বুঝতে
পারে না রমা, কিন্তু সে দেখে ছুটে বেরিয়ে
গেলেও, একটু দূরে গিয়ে বারবার পিছু
ফিরে তাকায় স্বামী। কিন্তু বউটা বোকা।
বাইরে দু এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবার
মতো বুদ্ধি তার নেই। তবু হাসি মুখেই
বারান্দা থেকে সরে যায় রমা।

তারপর থেকে আর রমা বিচলিত হয় না।
ভয় পায় না। উত্তেজিত হয়ে ওঠে না
মিহিরের মতো। বরং ঝগড়া উপভোগ করে
ওই বস্তির মানুষগুলোর। জোরালো উত্তাপ
আছে যেন ওদের উলঙ্গ জীবনযাত্রায়—
ঝগড়ায়ও। কিছু লুকোয় না। গোপন করে
না মনের ভাব। সব কিছু ভুলে পাড়া মাতিয়ে
যেমন বিষ ঢালে আবার ঠিক তেমনি করে
সুধার ভাণ্ডও উপচে দেয়। একটু একটু
করে চতুর কৃপণের মতো রেখে ঢেকে নয়,
আদিম মানুষের মতো উজাড় করে দুই
হাতে। মাত্র কয়েক গজ তফাত থেকে ওদের
জীবনের রূপটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে
রমার কাছে। তাই সে প্রতিবাদ করে
মিহিরের কথার। বাধা দেয় ওদের কোন
ক্ষতি করতে চাইলে। ইচ্ছে করে ওরা তো
আর বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না কারুর।
রমা যেন ওদের স্বভাবের পরিচয় পেয়ে গেছে
এর মধ্যে।

ঘরের তফাতটা মাত্র কয়েক গজ হলেও
স্বভাবের তফাত বোধহয় আকাশ-পাতাল।
সাজ পোশাক একেবারে অন্যরকম মিহিরের।
রমারও তো বটেই। হবেই। কথা বলার
ধরনটাও একেবারে আলাদা। সেটাও
স্বাভাবিক। চেঁচিয়ে কখনও কথা বলে না
মিহির। ঝগড়ার সময়ও নয়। খুব রেগে
গেলে দাঁতে দাঁত চেপে আস্তে আস্তে
রমাকে খোঁটা মারে। কথায় বিষ মিশিয়ে
দেয়। এমন বিষ যে রমার হৃৎপিণ্ডটা
আগুনের আঁচে যেন ধক ধক করে। তবু
চুপ করে থাকে না রমা। বউটার মতো
চিৎকার করে পাল্টা জবাবও দেয় না
স্বামীকে। বেশ আস্তে আস্তেই ভেবে ভেবে
উত্তর দেয়। অন্তত এতদিন দিত।

কিন্তু সব ঘটনাটাই ঘটে গোপনে।
সকলের অলক্ষ্যে। একটি লোকও টের
পায় না। তাই নিজেদের কলহের মধ্যে কোন
রস আবিষ্কার করতে পারে না রমা। উত্তাপও
অনুভব করতে পারে না। হয়তো সেই
কারণেই একেবারে জুড়িয়েও যায় না কিছু।
ভিজে ধোঁয়ার মতো ঠাণ্ডা কলহের কুণ্ডলী
মনের কোণায় পাকিয়ে পাকিয়ে জমা হয়ে
থাকে। আত্মতৃপ্তির দমকা হাওয়ায় শরীর
মন হাল্কা করে দিয়ে ধোঁয়াটা বেরিয়ে
গিয়ে হাওয়ায় মিশে যায় না।

একটু সকাল সকাল সেদিন ফিরে আসে
মিহির। থমথমে মুখ। কেমন যেন বিরক্ত-
বিরক্ত ভাব। আজ তো কোন চিৎকার নেই
বস্তিতে। মানুষগুলো একেবারে নীরব।
তাহলে? শরীর খারাপ হল নাকি?

মিহিরের কপালে হাত দিয়ে শরীরের
তাপ পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হয় রমা।
জিজ্ঞেস করে, কি হল?

কোন উত্তর আসে না। উত্তেজিত পদ-
ক্ষেপে মিহির বেশ কিছুক্ষণ পায়চারি
করে যায়। তারপর এক সময় নায়কের
ভূমিকায় ছায়াচিত্রের বোকা অভিনেতার মতো
রমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে
অনেকক্ষণ। তার দৃষ্টিটা একটু অস্বাভাবিক
মনে হয় রমার।

একটু পরে আপনমনেই যেন গজগজ
করে ওঠে মিহির, স্রেফ সুন্দরী স্মার্ট বউ
দেখিয়ে আই-এ পাশ দাশগুপ্তটা ডবল
ইনক্রিমেণ্ট পেয়ে গেল আর আমি শালা
অনার্স গ্র্যাজুয়েট হয়ে কলার ছিবড়ে মুখে
ঘষলাম।

মিহিরের কথা শুনে কান দুটো কটকট
করে ওঠে রমার। এমন অভিযোগ এই প্রথম
নয়। একেবারে স্পষ্ট করে না বললেও রমা
এ ছটফটানির আসল অর্থ বুঝতে না পারার
মতো বোকা মেয়ে নয়। অর্থাৎ যেহেতু সে

সুন্দরী নয়, বা তেমন বলিয়ে কইয়ে চতুর মেয়ে নয় সেইহেতু অনেক অসুবিধা সহ্য করতে হয় মিহিরকে এবং আপিসে উন্নতির পথটাও প্রশস্ত হয় না। এর পরই এসব কথা এসে পড়বে। দোষটা জোর করে রমার ঘাড়েই চাপিয়ে দেবে মিহির। রুদ্ধ অভিযোগ প্রকট করে তুলবে।

আগে এসব কথা শুনলে রমা চুপ করেই থাকতো। মুখ বুজে দোষটা নিত নিজেরই ঘাড়ে। লজ্জায় এতটুকু হয়ে থাকতো। চেষ্টা করতো স্মার্ট হতে—বলতে কইতে। রূপটা অবশ্য একেবারে পাল্টে ফেলতে না পারলেও ঘষে মেজে জৌলুস বাড়াবার চেষ্টা করত বৈকি। যদিও কোন ফল হয়নি তাহলেও এতদিন তো তাই করে এসেছে রমা। চেষ্টার ত্রুটি হয় নি তার দিক থেকে। মিহির তার এই একক প্রচেষ্টা প্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ্য না করলেও।

আজ কিন্তু রমার অত অধ্যবসায় নেই। বরং কলহের বাসনাটা তীব্রতর হয়ে উঠছে। আর ভাল লাগে না কেবলই অক্ষমতা গোপন করবার স্থূলে প্রচেষ্টা।

আস্তে আস্তে চেপে চেপে বলে রমা, তেমন একটা মেয়ে দেখে শুনে বিয়ে করলেই তো পারতে—এতই যখন অসুবিধা হয় তোমার আমাকে নিয়ে—

দাঁতে দাঁত চেপে সেই পুরোনো ভঙ্গিতে মিহির বলে, কি হলে কি হতে পারত সেসব যুক্তি তো ঠোঁটের আগায়। আমি কি তোমার মতো গুণবতী মেয়েকে ঘরে আনবার জন্যে তোমার বাবার পায়ে ধরেছিলাম?

না। তিনিই শুধু তোমার পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিলেন। সেসব কথা তো বহুবার বলেছ। পুরনো হয়ে গেছে। এবার নতুন কিছু শোনাও—

মিহির জবাব দেয় না। টাইটা টেনে খাটের ওপর ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু চেঁচায় না। মারতেও ওঠে না রমাকে। মনে মনে বোধহয় তাকে শোনাবার জন্যে কথা শানায়।

মিহিরের ভঙ্গি অনুকরণ করে রমাই কথা বলে আবার, তেমন গুণাবলীই যদি থাকতো আমার তাহলে তোমার মতো ছেলেকে বিয়ে করে এই বস্তির মাঝে এসে যে কিছুতেই উঠতাম না সেকথা বুঝতে পার না কেন?

গলার স্বর অল্প একটু তোলে মিহির, কি করতে? ফিল্মে নেমে রূপগুণের পাবলিসিটি দিতে বুঝি?

কোন গুণ যখন নেই তখন চট করে বলতে পারব না ফিল্মে নামতাম কি স্টুডিওকারে উঠতাম; একটু থেমে রমা বলে, তবে [illegible] কোম্পানীর বউ হয়ে দেখতে পেয়ে যে জীবন কাটাতাম না সেকথা জোর করেই বলতে পারি—

[illegible] চেঁচায় মিহির, [illegible] বাইরে

যেতে পারে না। একটি লোকেরও শান্তির ব্যাঘাত হয় না ওদের কথা কাটাকাটিতে।

মিহির বলে, দাশগুপ্তের বউ কাকে বিয়ে করেছে? গাড়ি-বাড়ির মালিককে? দাশগুপ্ত আমার চেয়ে সব দিক থেকে তিন কাঠি নিচে। দেখে এস একবার গিয়ে তার বউকে। মাথা ঘুরে যাবে। সকলেই তোমার মতো লোভী মেয়ে নয় যে, শুধু গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারলেই জীবন ধন্য মনে করবে। বড় ঘরের মেয়ে হলে মনটাও বড় হয়—ওসব কথা তুমি কোনদিন বুঝতে পারবে না।

তাহলে ওসব কথা শোনাও কেন আমাকে? দাশগুপ্তের বউ-এর মতো মেয়ে বিয়ে করবার কম চেষ্টা করেছিলে নাকি তুমি? ওসব কথা আমার জানতে বাকি নেই। যতই নিজের বাহাদুরীর কথা জাহির কর না কেন, আসল কথা বুঝতে দেরি হয় না আমার। দাশগুপ্তের বউএর মতো মেয়েদের কাছে পাত্তা পাওনি বলেই বাবাকে দয়া দেখিয়ে আমাকে উদ্ধার করেছিলে। অন্য কোথাও সুবিধা হলে তোমার মতো লোক বাবাকে লাথি মেরে বিদায় করে দিতে দ্বিধা করতো না সেকথা আমি জানি।

ছাই জান! দাশগুপ্ত পাত্তা পেতে পারে আর আমি পারি না?

না না না, বোধহয় মাথার ঠিক নেই রমার, নিজেই তো বলেছ দাশগুপ্তের বাবা জজ। ওদের গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, বিরাট সাজানো সংসার আছে। আর তোমার কি আছে বলতে পার? কে আছে? মুখে জল দেবারও কেউ নেই। কি দেখে ভুলবে রূপসী বড় ঘরের মেয়ে? তোমার বিশ্রী মেজাজ দেখে—

মিহির হিংস্র মুখে এগিয়ে আসে রমার দিকে। না, গলা টিপে ধরে না। দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে কড়কড় করে একটা শব্দ করে শুধু বলে, তবুও জেনে রাখ তোমার চেয়ে লাখো গুণে ভালো মেয়ে আমি বিয়ে করতে পারতাম। ভুলে যেও না আমি ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির অনার্স গ্র্যাজুয়েট। অনেক বুদ্ধিমতী মেয়ের সঙ্গে আমার মেশবার সুযোগ হয়েছিল আর, তীক্ষ্ণ শাণিত হাসি হেসে মিহির শোনায়, তাদের কেউ কেউ যে আমার কদরও না বুঝেছিল তা নয়। ইচ্ছে করলে খোঁজ নিয়ে দেখতে পার। এখনও প্রমাণ মিলবে—

রমা কিছু বলবার আগেই গটগট করে আবার বেরিয়ে যায় মিহির। কোথায় কে জানে। জানতে চায়ও না রমা। যেখানে খুশি যাক। কিছুক্ষণ একা বসে শুধু চোখের জল ফেলতে চায় রমা। মিহির তাড়াতাড়ি ফিরে না এলে সে বেঁচে যায়। চোখের জল দেখিয়ে কারুর কাছ থেকে কৃপা ভিক্ষা করতে চায় না সে। তার স্বামীর মতো মানুষের কাছ থেকে তো নয়ই।

বেডেলার বারান্দায় এসে দাঁড়ায় না সেদিন রমা। তোশকে মুখ গুঁজে ঘরের মধ্যেই ফুলে ফুলে কাঁদে। তার ঠিক মনে পড়ে না কবে মিহিরের কাছে স্পষ্ট প্রকাশ করেছে সে। কবে গাড়ি চড়বার জন্যে বায়না

...ছে আর বাড়ির জন্যে কাঙালপনা ...য়েছে।

কতক্ষণ ঠিক খেয়াল নেই, কেঁদে কেঁদে তন্দ্রা এসে গিয়েছিল রমার। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল ও। মিহির ফিরে এসেছে। জড়িয়ে ধরেছে রমাকে। আদর করছে ঘন ঘন।

আঃ ছেড়ে দাও—সজোরে ঠেলা মেরে মিহিরকে সরিয়ে দেয় রমা। চোখের জল শুকিয়ে গেছে তার।

ছেড়ে দোব? নিজের বউকে ছেড়ে কাকে ধরব মাইরি? আর বলবে আমাকে কেরানী? কাণাকে কাণা বল না। খোঁড়াকে খোঁড়া বল না। কেরানী মাসের শেষে ছ' পেগ হুইস্কি খাবার ক্ষমতা রাখে? মুখ থেকে কথা খসিয়েছি কি সঙ্গে সঙ্গে টাকা হাজির। তোমার কথাও ভুলিনি মাইরি, পকেট থেকে একটা এসেন্সের শিশি বের করে রমার দিকে এগিয়ে দিয়ে মিহির বলে, কোন্ শালা বলে আমি স্বার্থপর? এই দেখ এটা তোমার। কাছে এস ডার্লিং—বাঁধিয়ে দিই, জড়ানো স্বরে কীর্তনের সুরে মিহির গুনগুনিয়ে ওঠে, তোমার অপেক্ষা-গন্ধ টোল পাড়িলে চিতে আমার থই যে ফোটে—মরি মরি!

থামো, মিহিরের হাত থেকে এসেন্সের শিশিটা নিয়ে মাটিতে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলে রমা বলে, কচি খুকি আমি? ভুলাতে এসেছ খেলনা কিনে নিয়ে ভোলাতে এসেছ? ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির অনার্স গ্র্যাজুয়েট, তা এত কম বুদ্ধি থাকার কথা নয়—

ভাঙলে তো? দামি এসেন্সের শিশিটা? স্কুল মাস্টারের মেয়ে কি না। কদর বুঝবে কেমন করে! আমারই আট টাকা গচ্চা গেল। ...য়া ভুল হয়েছিল মাইরি—টিম টিম হয়ে ...টে শুয়ে পাশ ফেরে মিহির, কাছে এস, ...ছে এস। কচি খুকি কাছে এস। তোমাকে ...শ কিনে দেব, কত কি কিনে দেব। চুমু ...ব। ভালবাসব। মাইরি। সারা রাত। পট করে সুইচ টিপে আলো নিবিয়ে ...য় রমা। না হলে বকেই যাবে লোকটা। ...দ খেয়ে এলে এমনি আবোলতাবোল বকে ...রা রাত।

কিছুতেই খাটে শুতে পারবে না রমা। ...য় চেয়ারে বসেই কাটিয়ে দেবে। মিহির ...ইরে থেকে খেয়ে এসেছে নিশ্চয়ই। রমার ...ওয়া দিয়ে আজ কিন্তু কিছুই নামবে না। ...বার এতটুকু ইচ্ছে নেই ওর।

বস্তিতে কিন্তু চিৎকার ওঠে সেই রাতেও। সেই বউটার গলা চিনতে রমার দেরি হয় না। কে একটা মরা ইঁদুর ফেলে গেছে তার ঘরের কাছে। ওটা সকালে অন্নদার ঘরের সামনে পড়ে থাকতে দেখেছিল। দুর্গন্ধে ঘুম হচ্ছে না বলে অন্নদার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে বউটা। অন্নদাও কথা হজম করছে না মুখ বুজে। চিল-চিৎকারে উত্তর দিচ্ছে। চোখের মাথাখাওয়া মাগিগুলো কেন রাত-বিরাতে অন্নদাকে জ্বালায়। অন্নদা শত্তুর নাকি ওদের। মাগির যে তার ঘরের সামনে মরা ইঁদুর ফেলতে যাবে। সে যে ওটা রাস্তায় নর্দমার পাশে দুপুরবেলা ফেলে এসেছিল, তা দেখেছে যারা চোখের মাথা খায়নি তারা। নিশুতি রাতে গলাবাজি না করে যমের বাড়ি গেলেই তো পারে মাগি। হাড়ে হাড়ে জ্বালায় এখানকার সবকটা মানুষগুলোর। বউটা কিন্তু এসব শুনেও থেমে যায় না। আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে।

ওদের ঝগড়ার প্রত্যেকটি কথা রাতের নিস্তব্ধতায় স্পষ্ট শুনতে পায় রমা। আর তারপর হঠাৎ একবার চমকিয়ে দেখে, নিজের [illegible] কোন শব্দ নেই। [illegible] কী আশ্চর্য নীরব! একটা পিন পড়লে বোধ হয় শুনতে পাওয়া যায়। মরা ইঁদুরের দুর্গন্ধও নেই। [illegible] ঘুম আসে না রমার।

শেষ রাতের দিকে মিহিরই বাধ্য হয়ে পুলিসে খবর দিল। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে [illegible] চুপ করে বসে দেখা যায় না।

[illegible] মিহিরের [illegible] এসেছিল [illegible] কিল-চড়-লাথি। মারই [illegible] হয় যাবে মেয়েটা।

বাড়ি থেকে জামাটা বদলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল মিহির। রমা দাঁড়িয়ে বলল, কি দরকার তার এসব ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। পুলিস নিজের খেয়ালেই তো আসবে সাংঘাতিক রকম কিছু ঘটলে। তার কথা কানে না তুলে মিহির বেরিয়ে পড়ল ট্রাম-রাস্তার ধারে একটা ওষুধের দোকান থেকে পুলিসে টেলিফোন করতে। যথাসময় পুলিস এল। উত্তেজনা। হৈ হৈ। তারপর সব চুপচাপ। শেষ অবধি দেখা গেল সেই বউটার স্বামীকেই ধরে নিয়ে গেল পুলিস। যাকে প্রহার করা হচ্ছিল, সে অবশ্য মরেনি। তবে প্রায় মর মর অবস্থা। তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করল পুলিস।

স্বামীকে পুলিসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করে উঠল না বউটা। বরং পাঁচজনকে শুনিয়ে দম্ভভরে বলল, বিনাদোষে শুধু শুধু ধরে নিয়ে গেলেই হল। দেখা যাক কদিন আটকে রাখে। জামিন দাঁড়িয়ে খালাস করে আনবার মানুষ নেই নাকি এখানে? সরকারের ভাগ্য ভাল যে, একেবারে অক্কা পায়নি। রোগা-পটকা হলে হবে কি, গায়ে জোর আছে টেঁপির মায়ের। কম্মে খাটে না সে।

টেঁপির বাপ মানে বউটার স্বামী। যা হোক আসল ব্যাপারটা একটু পরে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। রমাও সব কাহিনী শুনল ঝিয়ের মুখে।

বস্তির মালিকের আধবুড়ো সরকার ভাড়া আদায় করতে আসে মাসের মধ্যে অনেকবার। সকলের কাছ থেকে ভাড়া ঠিক সময় পায় না বলেই তাকে বারবার আসতে হয়। বউটার সঙ্গে সেই সূত্রে কথাও বলে হাসে। আলাপ জমায়। ভাড়া অনেক কমিয়ে দেবার আশ্বাসও নাকি দেয়। আকারে-ইঙ্গিতে প্রশংসা করে বউটার—রূপ-বর্ণনাও করে। তাকে বস্তির এ ঘরে মানায় না, এমন কথাও বলে।

এমনি করেই কিছুদিন ধরে চলছিল। ভালোমন্দ ভাব না জানলেও কথা শুনে গেছে বউটা। মানে না বুঝে। আধবুড়ো সরকার। বাপের বয়সী। রসিকতা বলেই ধরে নিয়েছে তার কথাবার্তা।

স্বামী ফেরেনি তখনও। সন্ধ্যে হয় হয়। ভাড়া আদায়ের কাজে এল সরকার। বউটার সঙ্গে কথা বলল, যেমন বলে তেমন। ভাড়া অনেক কমিয়ে দেবার আশ্বাসও দিল। তারপর আধো অন্ধকারে হঠাৎ সব ভুলে একটা ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বউটার ওপর। সে একাই রুখে করে নিতে পারত নিজেকে, কিন্তু ঠিক সেই সময় তার স্বামী এসে ঘরে ঢোকে।

মোটামুটি ঘটনাটা হল এই। আর ঠিক এমনি করেই থেমে থেমে পুলিসকে একে একে সব কথা পৌঁছিয়ে বলে বউটা। কিন্তু শুধু তার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেল পুলিস।

সরকার নয় বাড়িওলা মণিবাবু স্বয়ং আবার এল মিহিরের কাছে। মাসের দশ তারিখ চলে গেল। এখনও ভাড়া দিতে পারেনি মিহির। এ মাসে কবে দিতে পারবে ঠিক নেই। প্রায় দেড়শ টাকা ধার শোধ করতে হয়েছে তার। কিন্তু প্রথম মাস থেকেই এমন করলে লজ্জার কথা বৈকি। মণিবাবুর কাছে মান থাকে না মিহিরের। ভাড়া তো এই গোটা বাড়িটার মোটে একশ কুড়ি টাকা।

প্রথম সপ্তাহেই মিহির চিঠি পেয়েছিল মণিবাবুর। মৃদু তাগাদা দিয়ে লিখেছিলেন। এই বাড়ি ভাড়ার ওপর নির্ভর করেই তাঁর নাকি সংসার চলে। কাজেই প্রথম সপ্তাহের

মধ্যে ভাড়াটা দয়া করে মিহির চুকিয়ে দিলে অনেক সুবিধা হয় তার।

সে-চিঠির কোন উত্তর না পেয়ে মণিবাবু নিজেই এসেছিল মিহিরের কাছে আর একবার। মিহির লজ্জিত হয়ে তাঁকে বিনীতভাবে জানায় যে, ব্যাঙ্কের গোলমালের জন্যেই তার এই বিলম্ব। একটা মোটা চেক আটকে আছে বলে তার নিজেরও অসুবিধা হচ্ছে খুব। যা হোক, দশ তারিখে সে নিশ্চয়ই ভাড়া চুকিয়ে দেবে।

তাই দশ তারিখ সকালেই আবার এসে উপস্থিত হল মণিবাবু। আর মিহির বিরক্ত হল মনে মনে। ভাবতে লাগল কি বলে লোকটাকে আজও বিদায় করা যায়। কিন্তু মণিবাবুর মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে না মিহিরের।

মিহিরের অবস্থাটা ভাল করেই বুঝতে পারে রমা। তবু কোন কথা বলে না। সে জানে কিছু বলতে গেলেই মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠবে মিহির। সব দোষ যেন রমার।

খুব আস্তে অসহায় শিশুর মতো বলে ওঠে মিহির, তুমি একবার নিচে যাবে নাকি রমা?

আমি গিয়ে কি করব?

লোকটাকে বিদায় কর। ব্যাঙ্ক-স্ট্রাইক দেখিয়ে বল, আর কষ্ট করে আসতে হবে না। হাঙ্গামা মিটলেই আমরা ভাড়াটা পাঠিয়ে দেব—

যেন লাখ টাকা তোমার ব্যাঙ্কে পচছে, রমা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, কথাটা তুমি নিজে গিয়েই তো বলতে পার মণিবাবুকে?

হঠাৎ বিরক্ত হয় মিহির, তা পারলে আর তোমাকে বলতে বলব কেন? ওসব গাইয়া লোক মেয়েদের কথার একটু বেশি মূল্য দেয়। আমার উন্নতির জন্যে কিছুই তো করবার ক্ষমতা নেই তোমার। একটা গবেট বাড়িওলাকেও যদি মাসখানেক ঠেকিয়ে রাখতে না পার—

যাচ্ছি যাচ্ছি, মিহিরের মনের ভাব বুঝতে পারে রমা, কিন্তু আসছে মাসে দু'মাসের ভাড়া এক সঙ্গে দেবে কোথা থেকে?

সেকথা ভেবে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না—একি, ওই নোংরা শাড়িটা পরেই যাবে নাকি নিচে? কী আশ্চর্য, মুখে পাফটা একবার বুলিয়ে যাও। এক মাস বাড়িভাড়া বাকি রাখা সোজা ব্যাপার নাকি তুমি ভাব আজকাল কলকাতা শহরে?

দোতলার সেই বারান্দায় এসে দাঁড়ায় রমা। রাস্তার কলে বস্তির একপাল ছেলেমেয়ের ভিড়। শুধু একটা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে কচি রোদ্দুরে বউটা তেল মাখাচ্ছে একমনে বাচ্চাটাকে। ফিক ফিক করে হাসছে বাচ্চাটা। লজ্জায় চোখ বন্ধ করছে। সুড়সুড়ি লাগছে বোধ হয়।

আত্মতৃপ্তির সংজ্ঞার্থ জানে না রমা। তবে মনটা আজ তার প্রসন্ন হয়ে আছে [illegible]।

এতদিন পর স্বামীর কাজে লাগতে পেরেছে ও। আপিসে বেরুবার আগে রমার পিঠ চাপড়ে তাকে বাহাবা দিয়ে গেছে মিহির।

কৌশলে বুদ্ধিমতী মেয়ের মতোই কাজ গুছিয়ে নিতে পেরেছে রমা। শাড়ি বদলেছিল। পাউডারের পাফও বুলিয়েছিল মুখে মিহিরের কথামতো। মণিবাবু আর ভাড়া চাইবে না এ মাসে।

তবে আসবে বৈকি মণিবাবু এ বাড়িতে মাঝে মাঝে। রমা যখন এমন আশ্চর্য আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পারল। আরও কত ভাড়াটে ছিল এর আগে এ বাড়িতে। কিন্তু তারা কেউ রমার মতো এমন ভদ্র ব্যবহার করেনি বাড়িওলার সঙ্গে। দেনা-পাওনার সম্পর্ক ছাড়াও মানুষে মানুষে অন্য একটা ব্যাপক সম্পর্ক আছে তো। অন্য ভাড়াটেদের সেকথা বোঝবার মতো বুদ্ধি ছিল না। মণিবাবু অনেকক্ষণ ধরে সেসব কথাই শোনাল রমাকে।

ব্যাঙ্কের গোলমালের কথা রমাকে শেষ করতে দিল না মণিবাবু। হবেই তো মানুষের অসুবিধা—বিশেষ করে রমাদের মতো ভদ্রপরিবারের মানুষদের। মণিবাবু তো আর চামার নয় যে, সেসব কথা বুঝবে না।

কিন্তু খালি অসুবিধার কথা শুনিয়ে শুধু মুখে মণিবাবুকে বিদায় করেনি রমা। যত্ন করে চা-মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছে তাকে। রমার আন্তরিকতার নিখুঁত অভিনয়ে বাড়িওলা গদ গদ হয়েছে খুশিতে। তাদের মতো ভদ্রলোকের কাছে ভাড়ার তাগাদা দিতে এসেছে বলে বারবার লজ্জা প্রকাশ করেছে।

কিন্তু বারান্দায় দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবতে ভাবতে আত্মতৃপ্তির সুখটা হঠাৎ বিকট হয়ে ওঠে রমার মনের মধ্যে। ঘন ঘন কাঁটা ফোটায়। হেমন্তের তাজা রোদ্দুরের আঁচটা অস্বাভাবিক রকম কড়া মনে হয়। আর চোখে একটু জলও চিক চিক করে ওঠে বোধ হয়।

ওদিকে বস্তিতে হঠাৎ কোলাহল জাগে। বউটা ছুটে এসে বাইরে দাঁড়ায়। জামিনে খালাস পেয়ে সদলবলে হৈ হৈ করতে করতে ফিরে আসে তার স্বামী।

রমা ঠিক বুঝতে পারে না বস্তির মালিকের সেই আধবুড়ো সরকারটা এখনও বেঁচে আছে কিনা।

শ্রীযুক্ত বিড়লা সাংবাদিকদের নিকট এই মর্মে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কোনরূপ আতঙ্কের কারণ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।—"অর্থ সম্বন্ধে বিড়লাজীর আতঙ্ক হতে পারে এমন কথা আমরাও মনে করিনে"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

লাহোরের এক জনসভায় জনাব সুরাবর্দি সংবিধান অগ্রাহ্য করায় প্রেসিডেন্ট ইস্কিন্দার মির্জাকে অভিযুক্ত করিবার দাবী জানাইয়াছেন।—"রাতারাতি মেক্-আপ্ পরিবর্তনে মির্জা সাহেব হয়ত

চোখ কপালে তুলেছেন। কিন্তু এতে তাজ্জব বনবার কিছু নেই। উনি আসর বুঝে কখনো ছোহরাবর্দি, কখনো ছোরাওয়ার্দি, কখনো হাসান সুরাবর্দিরূপে লোক হাসান"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

রয়টার সম্প্রতি মার্কিন ধনকুবেরদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।—"এ সংবাদে আমাদের কোন কৌতূহল নেই। কেননা মাসের শেষদিকে দু চার টাকা ধারকর্জের জন্য আমরা এই তালিকা না খুঁজে বরং কাবুলি কুবেরদের খোঁজেই বেরিয়ে পড়ি; রয়টার এদিক থেকে কোন সংবাদ দিতে পারলে বুঝব বাহাদুরী"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় শ্রীনেহরু ছাত্রদিগকে মনের দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা, পুব দুয়ারী তাহার প্রজা—ছড়াটিও ছাত্রদের জানিয়ে দিলে ভালো করতেন, মনের দরজা সবদিক থেকে খোলা রাখায় বিপদ আছে"!

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার নাকি অচিরেই অন্ততঃ পঞ্চাশটি কেন্দ্রে পারিবারিক বাজেটের একটা হিসাব নিকাশ লইবেন।—"বাজেট ঘাটতির ব্যাপারে তাঁরা কী করবেন সে সংবাদটি অবশ্য বলা হয়নি"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় শহরের বিপজ্জনক গৃহ সম্পর্কে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নাকি দাবী পেশ করা হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"প্রকাশ থাকে, বিপজ্জনক বললে পুরনো জীর্ণ বাড়ি-ঘরই বোঝায়। যে-অবস্থায় নূতন মজবুত বাড়িও বিপজ্জনক হয়ে পড়ে তার সংস্কার বুঝি স্বয়ং বিশ্বকর্মারও অসাধ্য"!!

* * *

ময়ূরাক্ষী সেচ পরিকল্পনা হইতে যে জল সরবরাহ করা হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার মূল্য হ্রাস করিয়াছেন বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। বিশু খুড়ো বলিলেন—"এতে নিঃসন্দেহে চাষীরা উপকৃত হবে। কিন্তু নাগরিকদের উপকারের জন্যও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তব্য আছে।—কলকাতার খাটালের বেসরকারী সেচ পরিকল্পনায় "বে-জল" সরবরাহ করা হয় তার গুণ ও মূল্য ক্রমেই মারাত্মক হয়ে উঠছে"!!

* * *

কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের আবিষ্কার কাহিনী আবার নূতন করিয়া শুনিলাম। শ্যামলাল বলিল—"অগ্রহায়ণ মাস প্রায় এলো বলে। এ সময়ের বৃষ্টির কথায় খনা বলেন—যদি বর্ষে আগনে, রাজা বেরোন মাগনে। সুতরাং আপাততঃ এটা তোলা থাক। দরকারের সময় দেখছি বরাবর আবিষ্কারের চেয়ে ছড়ার ওপরই নির্ভর করতে হয়—আয় বৃষ্টি ছেনে, ছাগল দেবো সেনে"।

* * *

সংবাদে প্রকাশ কলিকাতা টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে নাকি অনেক ভুল নম্বর ছাপা হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"এতদিন "এন্‌গেজ্‌ড্‌" থেকেও শেষ পর্যন্ত ছাদনতলা যেতে বেলতলা হলো"!!

কানপুর হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল সেখানে বানর বাহিনীর সঙ্গে কুকুর বাহিনীর একটি যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধে বানর বাহিনী পরাজিত হইয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"রাম রাজ্যের পটভূমিকায় এবম্বিধ সংবাদ সেন্সার করা উচিত ছিল"!!

* * *

কলিকাতায় গড়ের মাঠে আই এফ এ শীল্ড খেলার উপলক্ষ্যেও আমরা অন্য একটি খণ্ডযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"খণ্ডযুদ্ধ বলে এটাকে ছোট করা ভুল,—এটি হলো পানিপথের চতুর্থ যুদ্ধ!!

* * *

হরিপালের এক সংবাদে শুনিলাম জলাশয় হইতে নাকি মানুষের মাথা বাহির হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"হবেই

হবে। সেই দিনের সংবাদেই শুনেছি কলি-যুগ শেষ হয়ে, সত্য যুগ ফিরে এসেছে। সুতরাং নিমগাছে সীম এবং কাকের বাসায় ঘোড়ার ডিম হবেই"।

* *
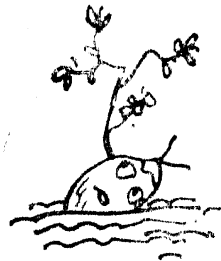
চণ্ডীগড় বিধান সভায় জনৈক সদস্য উচ্চহাস্যের উপর কর ধার্যের পরামর্শ দিয়াছেন। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—
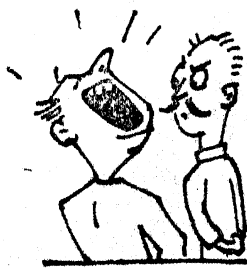
"তা থেকে অর্থকরী হবে বলে মনে হয় না; বরং মুচকি হাসির ওপর করের কথা ভেবে দেখুন। মুচকি হাসিটা সর্বলোকে ও সর্বকালেই অমূল্য ও অপরিহার্য"!!

সালাজারের জেলে উনিশ মাস

ত্রিদিব চৌধুরী

পশ্চিম কুয়ার্তেলের হাজতে

সেদিনকার ডিউটিতে যে সব শেফ্ ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহার পিছনে পিছনে আসিয়া কুয়ার্তেল হাজতের এক নম্বর ঘরে ঢুকিয়া দেখি সেটা আমার পূর্ব-বর্ণিত লোহার কবাট দেওয়া 'অন্ধকূপ' হাজতও নয়, কিম্বা মোটা মোটা লোহার গরাদ দেওয়া 'পিঁজরা' জাতীয় হাজতও নয়। আসলে সেটা ছিল একটা মোটর সাইকেলের গ্যারাজ। দৈর্ঘ্যে প্রায় আঠারো ফুট বা হাত বারোর মতো, প্রস্থে তের চৌদ্দ ফুট। ঘরের মেঝের মধ্যখান হইতে ছয় ফুটের মত জায়গাকে ক্রমশ নীচু ও ঢালু করিয়া দরজা বরাবর নামাইয়া আনা হইয়াছে। দরজার জায়গায় খালি একটি লোহার কোলাপসিবল গেট, সাধারণত গ্যারাজে যে রকম থাকে। পশ্চিম পুলিসের মোটর সাইকেলগুলিকে এই গ্যারাজে রাখা হইত; স্টার্ট দিয়া তাহার কোনটিকে নামাইয়া বাহিরে আনার দরকার হইলে মধ্যের এই ঢালু জায়গাটা দিয়া একটুখানি পায়ের ধাক্কার সাহায্যে গড়াইয়া নীচে আনিতে আনিতে আপনা-আপনি সাইকেলের মোটরে স্টার্ট হইয়া যাইত। গোয়াতে রাজনৈতিক সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর হইতে আজকাল কুয়ার্তেলের প্রত্যেকটি হাজতে কয়েদীর ভিড় খুব বেশী বলিয়া এই গ্যারাজটিকেও খালি করিয়া একটি অতিরিক্ত হাজত-ঘর বানানো হইয়াছে বলিয়া অন্য হাজত হইতে তাহার আকার-প্রকার কিছুটা ভিন্ন রকমের। এই গ্যারাজ হাজতটিই এখন কুয়ার্তেলের 'Cela numero um' বা এক নম্বর সেল। ইহার পাশাপাশি এক সারিতে অন্য যে সমস্ত সেল আছে—৪।৫টির মতো—সেগুলি সবই অন্ধকূপ সেল। তাহার পরে কতটা ভিতরের দিকে 'পিঁজরা'। তাহার পরে দু'তিনটি খোলামেলা জানালাওয়ালা একটু উচ্চগোছের সেল। সেগুলিতে পর্তুগীজ গোরা সৈনাদের শাস্তি দিবার দরকার হইলে রাখা হয়। এ সবের পিছন দিকে একটি 'ব্যাক্ ইয়ার্ডে'র মতো আছে। সেখানে কিছুদিন হইল ভাঙচুর করিয়া টালির ছাদ দেওয়া নূতন কয়েকটি ছোট ছোট সেল তৈরী করিয়া নেওয়া হইয়াছে। এই ব্যাক্ ইয়ার্ডেই কুয়ার্তেলের পায়খানার সারি ও একটি বাথরুম। পর্তুগীজ গোরা পুলিসদের ক্যান্টিন বা মেসের রান্নাঘর এখানেই। তাহার পাশেই সাধারণ রাজনৈতিক কয়েদীদের স্নানের কুয়া ও কাপড় কাচার জায়গা। আমরা পশ্চিমের পুলিস কুয়ার্তেল হইতে মানিকোরের পাগলা গারদে চালান হইয়া যাওয়ার পর এই ব্যাক্-ইয়ার্ডটিতে আজকাল নূতন ধরনের 'বক্স সেল', দেখিতে বাক্সের মতো হাজত নূতন তৈরী হইয়াছে। সেগুলি খুব আধুনিক বৈজ্ঞানিক কায়দায় তৈরী করা—তাহার ভিতরে কাহাকেও ঢুকাইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলে মনে হয় যেন একটা বাক্সে বন্ধ করিয়া তাহার উপর হইতে কেহ ডালা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বাহিরের দিকে কোন জানালা দূরের কথা, কোন 'ভেন্টিলেটর' বা 'স্কাই লাইট' জাতীয় কিছু নাই। অথচ গোটা দালানটা এমনভাবে তৈরী, দু'পাশের সারি সারি সেলের 'করিডরের ভিতর দিয়া খানিকটা আলো হাওয়া চলাচল করার পথ আছে, যাহাতে বাহিরের দিকে তাকানোর কোন পথ খোলা না থাকিলেও দম বন্ধ হয় না—কিন্তু দৃষ্টিপথ বন্ধ হয়। আমি প্রথমে, অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে পশ্চিম কুয়ার্তেলের হাজতে থাকার সময় এগুলি তৈরী হয় নাই। পরের বছর একদিন যখন আমাকে আগুয়াদা দুর্গের জেল হইতে পশ্চিমে চোখ দেখানোর জন্য চক্ষু-পরীক্ষকের কাছে আনা হয়, তখন আরো কয়েকজনের সঙ্গে আসিয়া ঘণ্টা পাঁচ ছয়েকের জন্য আমি এই বাক্স-সেলের থাকিয়া গিয়াছি।

সম্মুখে কোলাপসিবল গেট দেওয়া বলিয়া এক নম্বর সেলের সামনের দিকটা অন্য হাজতের তুলনায় অনেকটা খোলামেলা; অর্থাৎ দরজার গোটা জায়গাটি কোলাপসিবল লোহার বেড়া দিয়া আটকানো। তাহার ফাঁক দিয়া কিছু আলো-হাওয়া ঘরে ঢোকে বটে। কিন্তু ঘরটি পুলিস কুয়ার্তেলের এক কোণায় বলিয়া এবং সামনে টিনের চালু ছাদ দেওয়া নীচু বারান্দা থাকার জন্য ঘরের ভিতরটা ঘুপচি অন্ধকার ধরনের। তার উপরে সে সময়টা ছিল ঘনঘোর বর্ষাকাল। কাজে কাজেই সকালবেলা হইতেই ঘরের ভিতর একটি ইলেকট্রীক বাল্ব জ্বালাইয়া রাখা দরকার হইত। তাহা না হইলে বাহির হইতে ঘরের আবছা আলো অন্ধকারের ভিতর কয়েদীরা ঘরের ভিতর আছে কি না আছে, কি করিতেছে, পাহারাওয়ালা সান্ত্রীদের পক্ষে তাহা ঠাহর করা সম্ভব হইত না।

সেদিন যখন আমাদের এই গ্যারাজ ঘরের হাজতে ধাক্কা মারিয়া ঢুকাইয়া দেওয়া হয়, তখনই সে ঘরের মধ্যে প্রায় আঠাশ উনত্রিশ জনের মতো লোক আগে হইতে আটক ছিল। এখন আমাদের তিনজনকে নিয়া আমরা একত্রিশ-বত্রিশ জনের মতো হইলাম; অর্থাৎ ঘরের মেঝের ২৫২ স্কোয়ার ফুটের ভিতরে আমাদের প্রত্যেকের মাথা পিছু হিসাবে আট স্কোয়ার ফুট জায়গা ভাগে পড়িল। ইহার মধ্যেই আবার ঘরের এক কোণায় প্রস্রাবের জন্য ২০।২২টি টিনের ছোট-বড় কৌটা বা বোতল রাখা আছে। তাহার জন্যও আট-দশ স্কোয়ার ফুটের মতো জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। একেবারে সেইসব প্রস্রাবের টিন বা বোতলের ধার ঘেঁষিয়া কেহ দুর্গন্ধে শুইতে পারে না। সেজন্য আরো খানিকটা জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। তাছাড়া, ঘরের মেঝের মধ্যখানটা গ্যারেজের কায়দায় যেখানে ঢালু হইয়া নীচে দরজার দিকে নামিয়া গিয়াছে, সেখানেও লোকজনের শোয়ার খুবই অসুবিধা। এতটুকু ঘরের ভিতর এই রকম গাদাগাদি ভিড়ে শোওয়া দূরে থাকুক সকলের একসঙ্গে ভালো করিয়া বসাও কষ্টকর ছিল। রাত্রে সকলের এক সঙ্গে শোওয়া সম্ভব হইত না—কোনমতে পিঠে পিঠ ঠেকাইয়া ঠাসাঠাসি করিয়া কিছু লোক শুইত, কিছু লোক বসিয়া ঝিমাইত।

তবে এই ঘরটিতে একটি সুবিধা ছিল।

ঘরের সামনের দিকে কোলাপ্‌সিবল গেট থাকায় তাহার ফাঁক দিয়া হাজতে বসিয়া বসিয়া সমস্ত পুলিস কুয়ার্তেলের খবরা-খবর নেওয়া যাইত; কুয়ার্তেলে কে আসিতেছে না আসিতেছে, কাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, নূতন রাজনৈতিক আসামীর দল, কাহারা আসিল না আসিল—সব কিছু এই হাজতে বসিয়া দেখা যাইত। অন্যান্য হাজতঘরের সম্মুখের দরজায় লোহার মোটা চাদর বা প্লেট দেওয়া কবাট বলিয়া বাহিরের দিকে তাকানোর বা কোন কিছু দেখার সুযোগ আদৌ ছিল না। সেসব হাজতঘরের দরজার কবাটে একটা করিয়া জাফ্‌রি দেওয়া জানালা বা ফোকর থাকিত বটে। কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া বাহিরে কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে সেটা দেখা খুবই কষ্টকর এবং অসুবিধাজনক ছিল। আমাকে মাসখানেক এই কোলাপ্‌সিবল গেট সমন্বিত এক নম্বর হাজতে রাখা হয়। হাজতে ঢোকার দিন হইতে আমি গেটের কাছাকাছি একটি কোণায় আমার আস্তানা গাড়িয়া নিয়াছিলাম এবং প্রত্যেকদিন দিনের বেলায় সারাদিন বসিয়া বসিয়া সেখান হইতে সারা কুয়ার্তেলটার বাহিরের চেহারাটা দেখার চেষ্টা করিতাম। সকাল ৯টা—১০টা হইতে অফিসার, বাহিরের লোকজন এসবের আনাগোনা শুরু হইত এবং সেই সময় হইতে ১টা—২টা পর্যন্ত প্রবল কর্মব্যস্ততা দেখা যাইত। সাঁ সাঁ করিয়া জীপ, ল্যাণ্ডরোভার, ট্রাক বা অন্য ধরনের মোটর ট্রান্সপোর্ট আসিয়া দেউড়ীর ভিতর দিয়া কুয়ার্তেলে ঢুকিতেছে, বাহির হইয়া যাইতেছে, ভারী ভারী মোটর সাইকেলে চড়িয়া পর্তুগীজ গোরা পুলিস কনেস্টবলরা তাহাদের সেইসব মোটরের কিংবা সেগুলির হর্নের বিকট আওয়াজে সকলকে সচকিত করিয়া দিয়া দেউড়ীর বাহির হইতে ঢালু বারান্দা বরাবর উপরে আসিয়া উঠিতেছে কিম্বা সেইভাবেই ভিতর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। নানা রকম বিচিত্র ইউনিফর্ম ও উর্দীপরা মিলিটারী ও পুলিস র‍্যাঙ্কের লোক বারান্দা দিয়া আসা-যাওয়া করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা আমাদের দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কৌতূহলভরে আমাদের দেখিয়া যাইতেছে। মিস্তী (দো-আঁসলা ফিরিঙ্গী) যুবকেরা, যারা কাসিমির মন্তেইরোর কৃপায় সম্প্রতি গোয়েন্দা পুলিসের কাজে, কিংবা পুলিস কুয়ার্তেলের নানারকম বাড়তি কাজে চাকুরীতে ভর্তি হইয়াছে, তাহারা গম্ভীরভাবে যতটা চটপটে ভাব দেখাইয়া পারে গট্ গট্ করিয়া বারান্দা দিয়া এদিক-ওদিক যাইতেছে। আমাদের হাজতঘরটা এমনই একটা জায়গায় ছিল যে, আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া কাহারও কুয়ার্তেলের ভিতরে ঢোকার বা ঢুকিলে বাহির হইয়া যাওয়ার উপায় ছিল না। কোন সময় রাজনৈতিক কয়েদীর দলকে বাহির হইতে আনিয়া কুয়ার্তেলের হাজতে ভর্তি করিতে হইলে আমরা তাহাদের দেখিবই। কাহাকেও ছাড়িয়া দিতে হইলে কিংবা কোর্টে নিয়া যাইতে হইলে আমাদের হাজতঘরের সম্মুখের বারান্দা দিয়া তবে দেউড়ীর দিকে যাওয়া চলিবে। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই। কাজে কাজেই এই একমাস ধরিয়া পর্তুগীজ পুলিসের রীতিনীতি, ধরনধারন এসব দেখার বোঝার বা জানার একটা ভালো সুযোগই আমি পাইয়াছিলাম তাহা বলা যায়।

আমার কাছে তখন সবই নূতন। তাহার উপর না জানি কোঙ্কনী ভাষা, না জানি পর্তুগীজ। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী-মরাঠী দিয়া কোনমতে ঘরের সহবন্দীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইতেছি। আমাদের ঘরের একটি ছেলে ইংরেজী জানে। একজন পোস্টাল ক্লার্ক ভদ্রলোক এবং তাঁর দুই ভাই পুলিসের বন্দুক চুরি মামলায় ধরা পড়িয়া আসিয়াছেন। তিনিও মোটামুটি ইংরাজী ও হিন্দী বলিতে পারেন। এইসব নূতন বন্ধুদের সাহায্যে আমার পর্তুগীজ জেল জীবনের শিক্ষানবীশির কাজে হাতে-খড়ি হইল; তাঁহাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পর্তুগীজ পুলিসের রীতিনীতি, কোনটা কি, কাকে কি বলে এসব জিনিস জানিয়া নিতে আরম্ভ করিলাম।

প্রত্যেকটি হাজতঘরের সামনে একটি কেরাসিন কাঠের বাক্সে একজন করিয়া গোয়ান পুলিস কনেস্টবল, কোমরবন্ধে রিভলবার ঝুলাইয়া আমাদের পাহারা দেয়। অবশ্য শুধু ৪ ঘণ্টার শান্ত্রী ডিউটি ছাড়া তাহাদের অন্য কাজ নাই। ইহার কিছুদিন বাদে গোয়ান পুলিস কনেস্টবলদের এই শান্ত্রী ডিউটি হইতে হঠাইয়া দেওয়া হয়। কারণ পঞ্জিম পুলিস হেডকোয়ার্টারেই জন-কয়েক গোয়ান কনেস্টবল সত্যাগ্রহী রাজনৈতিক বন্দীদের বে-আইনীভাবে সাহায্য করার অভিযোগ ধরা পড়ে; তাহাদের দু-একজন বন্দীদের নিকট হইতে গোপনে চিঠি নিয়া বাহিরে যোগাযোগ করিতে গিয়া হাতেনাতে ধরা পড়িয়া যায়। কাজেকাজেই পুলিস হেডকোয়ার্টারে হাজত পাহারা দিবার কাজেও গোরা এবং নিগ্রো মিলিটারী সৈন্যদের লাগানো হয়। পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ লিসবন হইতে এই সময় বহু সংখ্যায় গোরা পর্তুগীজ কনেস্টবল আমদানী করিতে থাকেন। তাহাদের প্রধান কাজ ছিল গোয়ান পুলিসের উপর নজর রাখা, খবরদারী করা এবং গোয়ান পুলিস বাহিনীকে একটু শক্ত বানানো; সুতরাং সাধারণ শান্ত্রী পাহারার ডিউটি তাহাদের উপর পড়িত না, পড়িত গোরা কিম্বা নিগ্রো সৈনিকদের উপর। কিন্তু ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে আমরা যখন পঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজতে ঢুকি তখনও গোয়ান কনেস্টবলদের হাজত পাহারার শান্ত্রীর কাজ হইতে হঠানো হয় নাই; সেটা হয় আরো কয়েক মাস বাদে।

কুয়ার্তেলের হাজতে আমাদের দিন আরম্ভ হইত ভোর সাড়ে চারটা পাঁচটায়। সুব্ শেফ্ নিজে আসিয়া হাজতের ঘর খুলিয়া দিবেন, তারপর কমপক্ষে দুজন রাইফেলধারী কনেস্টবলকে আমাদের সম্মুখে পিছনে রাখিয়া সারি বাঁধিয়া আমাদেরকে ব্যাক্ ইয়ার্ডের পায়খানা ও কুয়াতলায় নিয়া যাইবেন। সে সময় প্রত্যেকে নিজের নিজের প্রস্রাবের টিন ও বোতল এক হাতে নিয়া, অন্য হাতে খাবার জলের বোতল, গামছা জামাকাপড় যাহার যা কিছু আছে নিয়া আমরা সেই ৩১।৩২ জন লোক আধ ঘণ্টার জন্য বাহিরে যাইব—সব রকমের প্রাতঃকৃত্য সমাপন, মুখ-হাত ধোওয়া, পায়খানা, স্নান, কাপড়-জামা পরিষ্কার করা, এসব ঐ আধ ঘণ্টার মধ্যে সারিতে হইবে। অন্যান্য ঘরে যেসব বন্দী আছে, তাহারা এক নম্বর হাজত, দু'নম্বর হাজত এই হিসাবে পর পর এইভাবে বাহিরে যাইবে। তখন বোধ হয় সব মিলিয়া কুয়ার্তেলের হাজতের দশ বারোটি ঘরে প্রায় ৮০—৯০ জনের মত রাজনৈতিক বন্দী ছিল; সাধারণ কয়েদী বা বন্দী এক আধজন ছিল কিনা বলিতেও হয়। এক একটি ঘর খুলিয়া সকলের প্রাতঃকৃত্য, স্নান, কাপড় কাচা, এসব সারিতে সারিতে প্রায় তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগিয়া যাইত।

এসব সারিয়া আবার নিজের নিজের হাজতঘরে ফিরিয়া আসিলে পর প্রত্যেকের জন্য দুটি এক আনা দামের গোল পাঁউরুটি এবং ছোট এক গ্লাস চা বা কফি বরাদ্দ ছিল। বাহিরের একজন হোটেলওয়ালা ঠিকাদারের উপর কুয়ার্তেল হাজতের বন্দীদের জন্য বরাদ্দ খাবার দিবার ভার ছিল; একজন চাওয়ালা রেস্তোরাঁ মালিকের উপর ভার ছিল চা, কফি ও পাঁও যোগানোর। সকালে স্নান সারিয়া হাজতে ফিরিতে ফিরিতেই পুলিসের একজন শান্ত্রী সঙ্গে করিয়া চাওয়ালা আসিত; কোন কোনদিন গণ্ডগোল হইলে যে পর্তুগীজ গোরা কনস্টেবলটির উপর কয়েদীদের খাবার ব্যবস্থা তদ্বির-তদারকের ভার সেও আসিত। প্রত্যেক ঘরের সামনে চা-ওয়ালা আসিয়া রোজ জিজ্ঞাসা করিবে—"চাহা কিত্তী" রে, কাফি কিত্তী? পাঁও"? দুই টুকরা পাঁওয়ের বদলে একটি অতিরিক্ত আরেলে ভাজা চাপাটী বা পরোটাজাতীয় জিনিস পওয়া যায়, আপনার ইচ্ছা হইলে পাঁউরুটি না নিয়া তাহাও নিতে পারেন। এইভাবে সকালবেলার জলখাবার বা 'refaecaon' (রেফাএসাঁও) শেষ হইলে বন্দীরা সেদিনকার পিটুনীর পালার জন্য কিংবা ট্রাইব্যুনালের জন্য কিংবা জেরা জবানবন্দীর জন্য তৈরী হয়—যার অদৃষ্টে যেদিন যেমন জোটে। (ক্রমশ)

নিখিল মৈত্র

অন্ধ্র

অন্ধ্র কৃষকের দেশ। একথা বিজয়ওয়াড়া, গুণ্টুর, বিশাখাপত্তন—ওয়াল্টেয়ারএ গেলেও মনে হয়। কৃষ্ণার অববাহিকায় অন্ধ্র সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র মাঝারিগোছের বড় শহর বিজয়ওয়াড়া। এখানে বহু লোক একসঙ্গে বাস করে, ছোটখাটো কলকারখানাও গড়ে উঠছে শহরের আশেপাশে, শহরের সঙ্গেই বড় জংশন স্টেশন। বিশাখাপত্তন ভারতের পূর্ব উপকূলে সব থেকে ভাল প্রাকৃতিক বন্দর। জাহাজ নির্মাণ কারখানা বেড়েই চলেছে। পার্শ্বে ওয়ালটেয়ার শহরে রেল জংশন ও রেলের কারখানা এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দপ্তর এ অঞ্চলকে বিজয়ওয়াড়া থেকে বেশি নাগরিক সভ্যতার রূপ দিয়েছে। তবুও এইসব শহরের সঙ্গে যে গ্রামের নিবিড় যোগ আছে, তা দেখলেই বোঝা যায়। তেলেগু কৃষককে এইসব শহরেও হাসিমুখে নিজের ক্ষেতের ভার্জিনিয়া তামাকপাতার চুট্টা (চুরুট) টানতে দেখেছি, শহরে এসেছে বলে অস্বস্তির কোনও ভাব নেই। দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, কোয়েম্বাটুর বা তিরুচিরাপল্লীতে যন্ত্র সভ্যতার যে সুস্পষ্ট ছাপ দেখেছি, তার কোনও নিদর্শনই অন্ধ্রের বড় শহরে পাইনি। গত দশ বছরে বিজয়ওয়াড়া, গুণ্টুর এবং বিশাখাপত্তন-ওয়াল্টেয়ারের জনসংখ্যা প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ বেড়েছে। কিন্তু শিল্প প্রসার সে পরিমাণে না হওয়ায় জনসংখ্যা স্ফীতি নাগরিক জীবনের দৃঢ় ভিত্তি রচনা করতে পারেনি।

অন্ধ্র রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজধানী হায়দ্রাবাদ-সেকেন্দ্রাবাদের অবস্থা একটু স্বতন্ত্র। নিজামী শাসনে এখানকার শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজ উর্দুভাষী এবং বিরিয়ানী ভোক্তা হয়েছে। সেই সঙ্গে তেলেগু সমাজের বলিষ্ঠ জীবনীশক্তিও অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে। এখানে এলে লক্ষ্ণৌ-এর কথা বারবার মনে হয়। আচারে, বিচারে সৌজন্যের মাত্রা যেন একটু বেশি। অন্ধ্র কৃষকের প্রাণখোলা হাসির মত তা অত স্বচ্ছ, সাবলীল নয়। কৃত্রিমতার ভাব বেশ স্পষ্ট।

দক্ষিণ ভারতের তেলেগু, তামিল, কন্নড় ও মালয়ালম ভাষাভাষীদের মধ্যে তেলেগু-ভাষী লোকের সংখ্যা সর্বাধিক। তা সত্ত্বেও, সংযুক্ত মাদ্রাজ রাজ্যে অন্ধ্রেরা নিজেদের স্বাধিকার পায়নি বলে অভিযোগ করতো। '৫৩ সালে পয়লা অক্টোবর মাদ্রাজ রাজ্যের এগারোটি জেলা ও বেলারি জেলার ৩টি তালুক নিয়ে ৬৩ হাজার ৬ শো বর্গমাইল আয়তনের দু' কোটি আট লক্ষ লোকের বাসভূমি অন্ধ্র রাজ্যের সৃষ্টি হয়। গত বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের সীমানা পুনর্নির্ধারিত হবার পর হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলও অন্ধ্র রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। বর্তমান অন্ধ্রের আয়তন প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা তিন কোটি কুড়ি লক্ষেরও বেশি।

ভৌগোলিক স্থিতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস অন্ধ্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছে। সরকার অঞ্চল, রায়লসীমা এবং তেলেঙ্গানা। শ্রীকাকুলম, বিশাখাপত্তন, পশ্চিম এবং পূর্ব গোদাবরী, কৃষ্ণা, গুণ্টুর এবং নেল্লোর জেলা নিয়ে সিরকার অংশ সংগঠিত। বঙ্গোপসাগরের সংলগ্ন সমভূমি অঞ্চল উর্বর, বৃষ্টিপাতও এখানে বেশি। বছরে গড়ে ৪০-৫০ ইঞ্চি। গোদাবরী ও কৃষ্ণার অববাহিকা অন্ধ্রের সব থেকে শস্যশ্যামল, ধনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। পূর্বঘাট পর্বতমালা তটসংলগ্ন সমভূমি ও দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন এবং তৃষ্ণার্ত মালভূমিকে বিভক্ত করেছে। পাহাড়ের উচ্চতা খুব বেশি নয়। পূর্বঘাট পর্বতমালার মহেন্দ্রগিরি অন্ধ্রের সর্বোচ্চ গিরিশিখর। এর উচ্চতা পাঁচ হাজার ফিটেরও কম। পর্বতশ্রেণীকে ভেদ করে

অন্ধ্রের কৃষক রমণী

অন্ধ্র মৎস্যজীবী

বহু পূর্ব-পশ্চিমগামী পথ আছে। অনুচ্চ পূর্বঘাটের বাধার প্রাচীর কিন্তু বরুণদেবের কৃপাদৃষ্টি থেকে রায়ালসীমা অঞ্চলকে বঞ্চিত করেছে। প্রতি পাঁচ বছরে এখনও সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গ্রীষ্মের দিনে গ্রামের পথে সেখানকার মেয়েদের বহুদূরে যেতে দেখেছি এক পাত্র জলের জন্য। চারদিকে গাছপালা সূর্যের তাপে ঝলসে গিয়েছে। মাঝে মাঝে বহু পরিশ্রমে কুয়ো খুঁড়েছে। সেখানে জল আনতে যাওয়া যেন পাতাল পুরীতে প্রবেশ করার মতো। এঁকে, বেঁকে সিঁড়ি গিয়ে নেমেছে বহুদূরে, তারপর আরও নিচে লম্বা দড়ি দিয়ে জল টেনে তুলতে হয়। আবহাওয়াবিদদের কেতাবে লেখা আছে যে, গড়ে ২০-২৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত এখানে বছরে হয়। প্রায়ই কিন্তু নির্দিষ্ট বর্ষণকালের সীমা লঙ্ঘন করে বরুণদেব একান্ত অনিচ্ছায় আত্ম-প্রকাশ করেন। কুর্নুল-কুড্ডাপ্পা খালের জলই তখন চাষবাসের একমাত্র ভরসা। তুঙ্গভদ্রার জলধারাকে বাঁধ বেঁধে ক্ষেত নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা চলছে। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে গুন্টুর ও নেলোর জেলার সঙ্গে তেলেঙ্গানা অঞ্চলের অনেক মিল আছে। গুন্টুর ভারতবর্ষের গ্রীষ্মপ্রধান শহরের মধ্যে অন্যতম। থার্মোমিটারে প্রায় বছরই এখানে তাপমাত্রা ১১৮° ডিগ্রীর কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়। এই এলাকার বৃষ্টি-পাত অবশ্য রায়ালসীমা ও সমুদ্র সংলগ্ন অঞ্চলের মাঝামাঝি।

অন্ধ্রের অতীত ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, পুরাণ এবং মহারাজ অশোকের শিলালিপিতে অন্ধ্রের উল্লেখ আছে। মৌর্য সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির পর অন্ধ্রের শতবাহন রাজ্য সেই সময়ে ভারতের সব থেকে পরাক্রমশালী রাজ্য। অমরাবতী স্তূপ ও অন্যান্য ভগ্নাবশেষ সে যুগের সাক্ষ্য বহন করে আছে। সম্প্রতি অমরাবতী ধ্বংসস্তূপ থেকে বহু রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। শতবাহন নৃপতি যজ্ঞশ্রী পুলু-মায়ির সময়কার মুদ্রায় সমুদ্রগামী তরণীর প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। এ ছাড়াও, অবশ্য আরও বহু প্রমাণই আছে যে, ভারতের পূর্ব উপকূল থেকে অন্ধ্র পণ্যবাহী জাহাজ বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃত জলরাশির বাধা অতিক্রম করে সুদূর [illegible], যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে যাতায়াত করতো। পরবর্তী যুগে ভেঙ্গি রাজধানীকে কেন্দ্র করে শালংকায়ন এবং পূর্ব চালুক্য সাম্রাজ্য গড়ে উঠে। ভেঙ্গি রাজ্যের প্রভাব সমুদ্র পারে ব্রহ্ম, মালয় এবং ইন্দোচীনে সুস্পষ্ট। [illegible] দক্ষিণ অঞ্চলে [illegible]-দের শিলালেখে বারবার [illegible] ভেঙ্গি [illegible] অনুরূপ। পশ্চিম গোদাবরী জেলার প্রধান শহর এলুরোর কাছে বর্তমান পেড্ড ভেঙ্গি গ্রামকে অতীতের সমৃদ্ধ [illegible] ভেঙ্গির অবস্থিতি স্থান বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। বিজয়নগর রাজ কৃষ্ণদেব রায়ের সময়ে অন্ধ্র সংস্কৃতি ও তেলেগু সাহিত্য চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

অন্ধ্রের বর্তমান ভাষা অতীতের তেলেগু, সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং [illegible] প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত। [illegible] সংস্কৃত [illegible] থেকে [illegible] সমৃদ্ধ হয়েছে। [illegible] প্রথম সংকলন করেন। [illegible] বছর পরে [illegible] তেলেগু ভাষায় [illegible] রচনা করেন। [illegible] অন্ধ্রের [illegible] তেলেগু, তার বর্তমান রূপ [illegible] একদিকে যেমন অতীতের বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারা থেকে, তেমনি সাম্প্রতিক কালে সমাজ-সংস্কারক ও সাহিত্যিক [illegible] সমৃদ্ধ করেছেন [illegible] দিয়ে।

গোদাবরী, কৃষ্ণা, পেন্নার এবং তুঙ্গভদ্রা অন্ধ্রের প্রধান নদী। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন নদীর মধ্যে পবিত্রতায় গোদাবরীর স্থান সকলের উপরে। গোদাবরী ও কৃষ্ণার উৎসমুখ আরব সাগরের কাছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায়। এই দুই নদীই পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অনুচ্চ শৈলশ্রেণীর বাধা অতিক্রম করে, দাক্ষিণাত্যের তপ্ত মালভূমির মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে অন্ধ্রের পশ্চিম দ্বারে এসে পূর্বঘাটের প্রাচীর লঙ্ঘন করেছে। গোদাবরীর এই যাত্রাপথ অত্যন্ত মনোরম। পূর্বঘাটের প্রবেশদ্বারে গোদাবরীর ধারা সংকুচিত হয়েছে। কোথাও দুই তীর কয়েক শো ফিটের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। পাহাড় চূড়ায় গাছ, লতাগুল্ম যেন নদীর খরস্রোতা ধারার উপর সেতু রচনা করেছে। কিছুদূর গিয়েই আবার নদী প্রশস্ত, শান্ত রূপ নিয়েছে। পাহাড়ের বেষ্টনী দূরে চলে গিয়েছে। জলধারাকে দেখলে মনে

হয় যেন নীল হ্রদ। বিদেশী দর্শক গোদাবরীর এ অংশকে রাইন নদীর যাত্রাপথের সংগে তুলনা করেছেন। শীতের সময় নদীবক্ষে ছোট ছোট পলেজ দ্বীপ গোদাবরীর বক্ষ থেকে উঠতে দেখেছি। বাধিক্কু তেলেংগু কৃষক এইরকম ছোট এক লংকা (দ্বীপে) দেখাতে গিয়েছিল তার ভার্জিনিয়া তামাকের চাষ। সারা ভারতে ভাল তামাকের যে চাষ হয় তার অধিকাংশই আসে অন্ধ্র থেকে আর অন্ধ্রের সেরা তামাকের চাষ হয় এইসব ছোট ছোট চরে। বন্যা সমাগমে চর নদীগর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং জল শুকিয়ে গেলে উর্বর ভূমি আবার জেগে উঠে। প্রতিবছর যে সব লংকা একই জায়গায় আত্মপ্রকাশ করবে—এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই, গংগা বা পদ্মার ধারে চরের জমি নিয়ে যেমন লাঠালাঠি হয়, অন্ধ্রেতেও তেমনি বিবাদ বিসম্বাদ লংকার মালিকানা স্বত্ব নিয়ে হয়। আমাদের সংগে তেলেংগু কৃষকটি বললেন যে, তাঁর এই ক্ষেত বেশ কিছুদিন ধরেই একই জায়গাতে রয়েছে। তখন অবশ্য চরের জমি বেদখল হবার আর একটা বড় কারণও ছিল। এপারে মাদ্রাজ, ওপারে নিজামী শাসনে হায়দ্রাবাদ রাজ্য—মাঝখানে গোদাবরীর জলধারা। পূর্বঘাটের মধ্যে দিয়ে গোদাবরীর এ যাত্রাপথ শেষ হয়েছে অন্ধ্রের সুপরিচিত রেলকেন্দ্র রাজমহেন্দ্রীর কাছে। এইখানেই দক্ষিণ রেলপথ গোদাবরীকে অতিক্রম করেছে বিরাট সাঁকোর উপর দিয়ে। কৃষ্ণা নদী [illegible] পবিত্রতায় গোদাবরী এবং কাবেরীর অনেক নিচে। পূর্বঘাট শৈলশ্রেণী ভেদ করে কৃষ্ণা অন্ধ্রের সমভূমিতে এসে মিশেছে বিজয়ওয়াড়ার কাছে। এইখানে সিংহাচলম্ শিখরের উপরে ভগবান বরাহ-নরসিংহস্বামীদেবের মন্দির। চান্দ্রায়ণ ব্রত উদ্‌যাপন করার জন্যে এখানে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। তেমনি, শিবরাত্রির সময়ে শ্রীশৈলম মন্দির বহু পুণ্যলোভাতুর নরনারীর কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠে।

অন্ধ্রের তীর্থস্থানের আর একটা বৈশিষ্ট্য যে, নদী আর পাহাড় মিলে মন্দিরের অপূর্ব পটভূমি রচনা করেছে। পূর্বঘাটের সর্বোচ্চ শিখর মহেন্দ্রগিরিতে প্রাচীন শিব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। তেমনি গোদাবরী তীরে পর্ণশালা, ভদ্রাচলম্ এবং শ্রীরামগিরি পুণ্য তীর্থস্থান। শ্রীকাকুলম জেলায় মোখলিংগম্ প্রাচীন হিন্দুমন্দির এবং তারই কিছু দূরে শালিহুন্দনে বৌদ্ধযুগের স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে আছে।

অন্ধ্রের মধ্যবিত্ত সমাজ গ্রামের সংগে সংযোগ হারায়নি। তামিলনাদ বা বাঙলার গোত্রজদের মতো তাদের মধ্যে শহুরে ভাব অনেক কম। এর ফলে হয়তো কর্মব্যস্ততা ও অনেক কম, কিন্তু সজীবতা অনেক বেশি। কৃষক বা মধ্যবিত্ত সমাজের

বড়ো কথা গায়ক দল : অন্ধ্র

অন্ধ্র কৃষক

অন্ধ্ররমণী অবরোধ প্রথার অভিশাপ থেকে মুক্ত। ক্ষেতের কাজে, উৎসবের আঙিনায় মেলার মাঠে—অন্ধ্র রমণী পুরুষের সঙ্গে একই সারিতে এসে দাঁড়ায়। তেলেগু মহিলার উজ্জ্বল শাড়ির বর্ণবৈচিত্র্য আদিম জাতির পরিধানের কথা মনে করিয়ে দেয়। কয়েক বছর আগে একবার বিজয়ওয়াড়ার কাছে ছোট এক পাহাড়ের উপর থেকে মেলার দৃশ্য দেখতে উঠেছিলাম। দূর দূর গ্রাম থেকে গরুর গাড়ি করে পরিবার পরিজন নিয়ে অন্ধ্র কৃষক মেলায় বেচাকেনা করতে এসেছে। গরুকে খুলে দিয়ে, এদিকে ওদিকে গাড়ি সার করে রেখেছে। ছাড়া ছাড়া দোকান, নাগরদোলা, যাদুকরের তাঁবু অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। অস্তগামী সূর্যের আলোকে কিন্তু সব থেকে বেশি করে চোখে পড়েছিল বর্ণের বন্যা। লাল, নীল, সবুজ আর হলুদে রং অন্ধ্র রমণীকে ঘিরে রংয়ের তুফান তুলেছে এবং তা সমস্ত পথপ্রান্তরকে প্লাবিত ক'রে দিয়েছে।

অন্ধ্র কৃষক ও তার ষণ্ড

অন্ধ্র কৃষককে দেখলে মানুষের বলিষ্ঠ কর্মশক্তি ও সততার মূর্ত প্রতীক বলে মনে হয়। ভারতের গ্রামাঞ্চলে যে দারিদ্র্য, অভাব-অনটন আছে তা থেকে অন্ধ্র মুক্ত নয়। রায়ালসীমা অঞ্চলে অভাব প্রায়ই আকালের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। বর্ষণের অভাবে ক্ষেত উজাড় পড়ে থাকে, সামান্য পানীয় জলও সংগ্রহ করতে হয় বহু শ্রমে। তবুও, অন্ধ্র গ্রামে শান্ত লক্ষ্মীশ্রী সমস্ত মানুষকে নতুন এক মর্যাদা দিয়েছে। পাঞ্জাব বা উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের কৃষক আরও বলিষ্ঠ। প্রকৃতির দানে ও মানুষের শ্রমে সেখানে সমৃদ্ধি আরও বেশি। তবুও, অন্ধ্র গ্রামের শান্ত প্রফুল্লতা সেখানে নেই।

অন্ধ্রের প্রধান খাদ্যশস্য চাল, বাজরা, ভুট্টা প্রভৃতি। তামাক, তুলা, আখ, চীনাবাদাম, তিল প্রভৃতি প্রধান পণ্যশস্য। অন্ধ্রে মরিচ চাষ এবং তার উপযোগও হয় ব্যাপকভাবে। বিভিন্ন ব্যঞ্জনে যে পরিমাণ ঝাল দেওয়া হয় তা সহ্য করা আমাদের পক্ষেও মুশকিল। একবার অন্ধ্রের গ্রামাঞ্চলে এক সম্মেলনে যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু প্রতিনিধি এসেছিলেন সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য। খাবার থাকার আয়োজনও হয়েছিল বিরাট রকমের। প্রথম দিন অন্ধ্র ব্যঞ্জনের স্বাদ গ্রহণ করার পর অধিকাংশ প্রতিনিধিই অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলেন। কারণ, মরিচের আধিক্য। তারপর কড়া নির্দেশ জারি হলো যে, মরিচ যেন রন্ধনশালার ত্রিসীমানায় ঢুকতে না পারে। পাঞ্জাবের কৃষক পরিবার দুধ থেকে প্রস্তুত খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খায়, তারপরেই বোধহয় অন্ধ্র কৃষকের স্থান। সরকার অঞ্চলে ধান বেশি হয় এবং সেখানে প্রায় সবাই ভাত খায়। সমুদ্রতট ছেড়ে মালভূমি অঞ্চলের দিকে গেলে বৃষ্টিও কমে যায় এবং সেখানকার লোকজন জোয়ার, বাজরাই বেশি ব্যবহার করে।

অন্ধ্রের ভূমিহীন কৃষক বহুদিন ধরে জীবিকার সন্ধানে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বর্মায় যাতায়াত করছে। অল্প কিছু লোক মালয়েও গিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অবশ্য বর্মায় চাকরি ও বসবাস করার উপর নানা বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে মালয়ের দ্বারও রুদ্ধ হয়েছে। বিদেশের উপার্জন এদেশে পাঠাবার উপরও নানারকম আইন-কানুন জারি করা হয়েছে। তবুও, এখনও বর্মায় বহু ব্যবসায়ীর কাছে 'তেলেঙ্গি' শ্রমিকরা কাজ করে। তারা সবাই পরিশ্রমী এবং সৎ শ্রমিক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।*

* প্রবন্ধে ব্যবহৃত ফটোগ্রাফগুলি সুনীল জানা কর্তৃক গৃহীত।

খুশী হয়ে পাঁচু বললো হবে না মাঠান, সকাল বিকাল কুস্তি করি, মুগুর ভাঁজি, একশটা বৈঠক মারি।

অন্নদা বুঝলো তার পক্ষে এসব সম্ভব নয়, তাই কিঞ্চিৎ হতাশ হল, তবু আশা ছাড়লো না, চললো জেরা।

আর কি করিস?

পাড়ার ছেলেদের জুটিয়ে নিয়ে কপাটি খেলি।

তাতো খেলিস দেখতেই পাই, আর কি করিস, বলি খাস কি?

খাবো আর কি ডাল ভাত মাছ।

সে তো আগেও খেতিস, বলি, স্বাস্থ্য ফিরলো কিসে?

তাই বলো মাঠান, সকাল বিকাল ছোলা ভিজা খাই।

ছোলা ভিজা! বিস্ময়প্রকাশ করে অন্নদা।

হাঁ মাঠান ছোলা ভিজা, রাতে ভিজিয়ে রাখি, সকালবেলা খানিকটা খাই, বাকিটা বিকালে, আবার ভিজিয়ে রাখি।

ওতেই তোর স্বাস্থ্য ফিরলো!

ফিরবে না! গফুর মিঞা বলেছে, গফুর মিঞা আমাদের ওস্তাদ কিনা, ছোলা ভিজায় যে তাগদ আছে এমন মাছ মাংস ছানা সন্দেশে নাই।

অন্ধকারে আলোর রেখা দেখে অন্নদা, শুধায় কতখানি করে খাস।

দু-বেলা দু-মুঠো।

যদি দু-বেলায় চার-মুঠো খাস তবে?

তবে আর কি, শীগগীরই থাবো, আরো তাগদ হবে, বুকের পাটা ইয়া চওড়া হবে।

বলিস কিরে ছোলা ভিজার এত গুণ!

বিশ্বাস না হয় খেয়েই দেখো মাঠান।

দূর বোকা ছেলে, ছোলা ভিজায় কি আর আমার মতো বুড়ীর স্বাস্থ্য ফেরে।

দ্বিগুণ জোর দিয়ে বলে সে বিশ্বাস না হয় খেয়েই দেখো মাঠান।

তারপরে বলে তোমার আর কি বয়স, গফুর মিঞার বয়স পঞ্চাশ, যেমন বুকের ছাতি, তেমনি হাত পায়ের গোছা।

সব কি ঐ ছোলা ভিজার গুণে?

চাল ভাজা শেষ হয়ে [illegible] দীর্ঘশ্বাসটা কণ্ঠনালীতে [illegible] উঠছিল সেটাকে উত্তরের মধ্যে [illegible] করে দিয়ে পাঁচুগোপাল বললো স—ব।

গফুর বুঝি দু-বেলা দু-মুঠো করে খায়?

পাগল হয়েছ মাঠান। অতবড় জোয়ানের দু-মুঠোয় কি হবে? দু-বেলায় সের খানেক খায়।

তারপর বলে, যখন ছোলা জুটে ওঠে না, তখন ঘোড়ার বরাদ্দ থেকে চুরি করে খায়। ও কেরামতুল্লার [illegible] সাহেব কিনা। [illegible] বরাদ্দ ছোলা না পেয়ে ঘোড়া শুকিয়ে যাচ্ছে আর চুরি করা ছোলায় গফুর ফুলে [illegible] তাই মজার মাঠান। [illegible]

পাঁচুর [illegible] একদিন [illegible] মিঞা [illegible] ছোলা চুরি [illegible] নেই। [illegible] চুরি [illegible]

[illegible] পাঁচুর [illegible] ছিল না, [illegible] কাজেই পাঁচুকে [illegible] এবং [illegible]

[illegible] পাঁচুর [illegible] একদিন একটা [illegible] এনেছিল।

অন্নদা তর্জন করে শুধালো বাক্স ওটা কি?

রামবাবু হেসে বললে খুলেই দেখো।

অন্নদা কাগজের মোড়ক খুলে দেখল আলখাল্লার মতো একটা বস্তু।

আমাকে বুঝি সঙ সাজাবার জন্যে এনেছ? সেমিজ কখনো চোখে দেখেনি সে।

না গো না এসব মেম সাহেবরা পরে, খাস সাহেব দোকান থেকে খরিদ।

তখনি সেটা ফেলে দিয়ে সে গর্জন করে উঠল, ও ডাকরা মিন্সে, নিজে খিরিস্তান হয়ে সাধ মেটেনি এখন আমাকে খিরিস্তান করবার মতলব। থুঃ থুঃ! তখনি সে গংগাজল স্পর্শ করে পবিত্র হল।

অপ্রস্তুত হয়ে রাম বসু প্রস্থান করলে তার দুশ্চরিত্রতা সম্বন্ধে নূতন প্রমাণ পেলো অন্নদা। মেম সাহেবদের অন্তর্বাসের সংগের এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আর কি অর্থ সম্ভব।

এতদিনে সেই বস্তুটার কথা মনে পড়লো অন্নদার। সেটা নষ্ট হয়নি বস্তুত তুলে রেখেছিল। এখন সেটাকে আবিষ্কার করে গোপনে বসে পর্যবেক্ষণ করলো সে, বহু, মিহি, কারু-করা পাড় সবশুদ্ধ মিলে মন্দ লাগলো না তার চোখে। গায়ে দিয়ে দেখল বড় ঢিলে, ভাবলো গায়ে আর একটু গতি লাগলেই পরবে। সেই শুভদিনের আশায় একখানা ফরাসডাঙার শাড়ী আর সেমিজটা, অন্নদা উদ্ধার করে সযত্নে, যত্ন করে তুলে রেখে দিল। পাড়ার ঠাকুরঝির উপদেশ মনে পড়ল পুরুষ মানুষ একটু সাজগোজ পছন্দ করে বই, সাজগোজ পছন্দ করে।

সাধ্বী স্ত্রীর একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, স্বামীর নিঃসপত্ন অধিকার সে চায়। সতীনের সংগে ভাগ করে নেওয়ার চাইতে পতির নিঃসপত্ন মৃতদেহও তার কাছে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অন্নদার সমস্যা কিঞ্চিৎ ভিন্ন রকম। তার সতীন নাই, তবু কেন স্বামীর পুরো অধিকার পায় না বুঝতে পারে না সে। মানুষের ভয়ের চেয়ে ভূতের ভয় অনেক বেশি ভীষণ, কারণ তার কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। এই রহস্যময় সমস্যা সমুদ্রে যত বেশি সে হাঁসফাঁস করে, যত বেশি সে হাত পা ছোঁড়ে তত আরো তলায়—কূলের দিকে অগ্রসর হয় না। স্বামীর মন পাওয়ার আশায় যত অধিক তরংগ তোলে সে মনটি তত অধিক দূরে গিয়ে পড়ে। শিল্পীর মন ঘুড়ির মতো তার সাঁতার জন্যে আকাশের ফাঁকের আবশ্যক, গেরস্থালির হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যে তার যথার্থ স্থান নয়। রাম বসু জাতশিল্পী। একথা তাঁর স্ত্রী বুঝবে কি করে, তখনকার দিনে কেউ বোঝেনি। অনাত্মীর সমাজ, আকাশে সেই অবকাশ, শিল্পীর মন যথেচ্ছ বিহারক্ষেত্র পায় সেখানে; আত্মীয় সমাজের হাঁড়িকুড়ি, ডালাধামার মধ্যে স্বভাবতই সে সংকুচিত। শিল্পীর কাছে অনাত্মীয় আপন, আত্মীয় পর। কেন যে রাম বসু বাইরে বাইরে ঘোরে অন্নদা তা বুঝবে কি করে? শিল্পী পত্নীর দুরূহ সৌভাগ্য।

পল্লবে চাঁদের ছায়া

সেদিন জন আসবামাত্র রোজ এলমার সাগ্রহে, সানন্দে ব'লে উঠল, এসো, এসো জন, তোমাকে দু'দিন দেখিনি কেন?

প্রত্যাশাতীত স্বাগতে অভিভূত হয়ে জন বললো, একটু ব্যস্ত ছিলাম, তা ছাড়া, আমার ধারণা কি জানো?

কি তোমার ধারণা, শুনি।

আমার ঘন ঘন আসাটা তুমি তেমন পছন্দ কর না।

আমার প্রতি অবিচার করছ, জন। আমি সারাদিন অপেক্ষা ক'রে থাকি কখন তুমি আসবে।

ঐ যদি সত্যই তোমার মনের কথা হয়, বেশ তাহলে আর কখনো আসা বাদ পড়বে না।

রোজ এলমার হেসে বললে, নিশ্চয় তো?

হাসিতে হাসিতে প্রত্যুত্তর দিয়ে জন বললে, দেখো নিশ্চয় কিনা!

রোজ এলমার বললে, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি একখানা শাল নিয়ে আসি, তোমার সংগে বেড়াতে বের হ'ব।

জনের বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না। বলে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে থাকব।

না, না, ততখানি ধৈর্যের প্রয়োজন হবে না, দশ মিনিটের মধ্যেই আসব, ব'লে হেসে সঘূচ্ছন্দে গৃহান্তরে যায় মিস এলমার।

অভিভূত জন ভাবে, হঠাৎ এ পরিবর্তন কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল? তারপরে ভাবে, এই তো স্বাভাবিক, না হ'লেই তো বিস্ময়কর হ'ত, সাধে কি আড়াই শো টাকা খরচ ক'রে ইণ্ডিয়ান Yogic ট্যালিসম্যান জোগাড় করেছি! মনে পড়ে তার রাম বসুর কথা, রাম বসু কবচখানা তাকে দেবার সময়ে বলেছিল, মিঃ স্মিথ, ফল না ফ'লে যায় না, মাদার কালী হচ্ছে একার ওয়েকফুল গডেস! এখন জন রাম বসুর ভাষায় হাতে হাতে ফল, hand to hand fruit পেয়ে মনে মনে ব'লে উঠল, "জয় মা কালী"। রাম বসু শিখিয়ে দিয়েছিল, মাঝে মাঝে বলতে হবে "জয় মা কালী।"

আগের দিন মন্ত্রঃপূত তামার কবচখানা নিয়ে রাম বসু জনের সংগে দেখা করে বলে যে, মিঃ স্মিথ, এ ট্যালিসম্যান অব্যর্থ, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবেই।

জন শুধায়, এবারে কি করতে হবে?

এবারে নিয়ে গিয়ে এটা মিস্ এলমারের হাতে বেঁধে দাও।

বিভ্রান্ত জন বললে, তা কি ক'রে সম্ভব? এ যে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মতো। না, না, মুন্সী, তা কখনো সম্ভব নয়, ওরকম

অদ্ভুত প্রস্তাব আমি মিস্ এলমারের কাছে করতে পারব না।

গম্ভীর হয়ে রাম বসু বল্‌ল, তবেই তো মুশকিল।

জন বল্‌ল, আর কি কোন উপায় নেই?

উপায় নেই সে কি হয়? আমাদের হিন্দু শাস্ত্র খুব উদার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায়ের নির্দেশ দিয়েছে।

তবে তারই একটা বল।

কিন্তু সে যে আবার খরচের ব্যাপার।

Damn it! কত চাই বলো, ব'লে এক মুঠো টাকা বের করল জন।

বেশি নয়, আপাতত গোটা কুড়ি হলেই চলবে।

এই নাও...... কিন্তু Talisman কখন দেবে?

টালিসম্যান এখনই নাও, পরে আমি পুজো দিয়ে দেবো—একরকম Posthumous পুজোর রীতি আমাদের দেশে আছে।

তবে নাও ব'লে কবচখানা প্রায় ছিনিয়ে নিল রাম বসুর হাত থেকে. বলো এবারে কি করতে হবে।

আর কিছু নয়, কোনরকমে মিস্ এলমারের বিছানার নীচে কবচখানা রেখে দিতে হবে।

আবার বিভ্রান্ত হয়ে জন বল্‌ল, তা কি ক'রে সম্ভব? মিস্ এল্‌মারের শয়নগৃহে আমি ঢুকবো কি ক'রে?

রাম বসু মনে মনে বল্‌ল, হাঁদারাম, তা কি আমি জানিনে, তার শয়নগৃহে যদি ঢুকতেই পারবে তবে কি আর আমার ফাঁদে পা দিতে এসো। মনে মনে আরো বল্‌লে, তুমি ওর শয়নগৃহের বাইরে চিরদিন ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াবে। ঢুকবে ঐ বেটা জংলী সেপাই! হয়তো এতদিন ঢুকেছে, নইলে বেটী তোমাকে আমল দিতে চায় না কেন?

মুন্সীকে নীরব দেখে জন বললে, দেখো, মুন্সী আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে। রেশমী বিবি মিস্ এল্‌মারের শয্যা প্রস্তুত করে। সে ইচ্ছা করলে অবশ্যই গোপনে বিছানার তলায় রেখে দিতে পারে। সে তো তোমার হাতের লোক, তাকে দাও না কেন!

চমৎকার বলেছ মিঃ স্মিথ। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে যে, প্রেমে পড়লে মানুষের বুদ্ধি খুলে যায়।

তখন স্থির হ'ল যে, রেশমীকে দিয়ে কাজটা করাতে হবে।

রাম বসু রেশমীর সঙ্গে দেখা ক'রে প্রস্তাবটা করলো। সব শুনে রেশমী রেগে উঠে বলল, কায়েৎদা তুমি এত লেখাপড়া শিখে এইসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করো!

রাম বসু বলল, ওরে রেশমী, রাম বসু কিছুতেই বিশ্বাস করে না, আবার কিছুতেই অবিশ্বাস করে না. তবে লাগে তাক না লাগে তুক! যা বলছি কর।

রেশমী বলে—এ যে বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে?

কেমন?

মিস্ এল্‌মারকে না বলে তার বিছানার তলায় রাখলে।

দূর বোকা মেয়ে। বিশ্বাসভঙ্গ তো দূরের কথা, সামান্য নিদ্রাভঙ্গও হবে না—যা বলছি কর।

শেষে সত্যি যদি মিস্ এল্‌মার জনকে বিয়ে করতে চায়?

বিয়ে করবে! তাতে তোরই বা কি আর আমারই বা কি?

আমার অবশ্য কিছু নয়। কিন্তু ধরো, এর পরে কর্নেল সাহেব যদি আবার তোমাকে ধরে একটা কবচ ক'রে দিতে!

ক'রে দেবো!

তখন যদি আবার মিস্ এল্‌মার, তখন অবশ্য মিসেস স্মিথ কর্নেলকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে ওঠে।

করবে কর্নেলকে বিয়ে। ক্ষতিটা কি। ওদের কাছে বার বার ক'রে ডাইভোর্স আর বিয়ে হয় জানিস নাকি?

কিন্তু তখন মিঃ স্মিথের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখছ?

রেশমীর কথা শুনে রাম বসু হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল, কাশিখোয় ঝড় হ'ল, কাক মরলো, ময়নাকাঁদিতে, সেইরকম কথা বলছিস্ যে! আচ্ছা, জনের অবস্থা যদি তখন খুব খারাপ হয় তখন তুই না হয় কণ্ঠী বদল ক'রে ওকে বিয়ে করিস! এই বলে আবার হেসে উঠ্‌ল রাম বসু!

কি যে বলছ কায়েৎদা, থামো!

আচ্ছা থামছি, এখন বল্‌, কবচটা নিবি কিনা!

কিছুক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল, দাও।

যেমন বলেছি ঠিক-ঠিক করিস, শিয়রের বিছানার তলায়।

আচ্ছা, তাই হবে।

রাম বসু চ'লে গেলে রেশমী স্থির করলো যে, কখনো সে বিশ্বাসভঙ্গ করবে না, কখনো সে মিস্ এল্‌মারের বিছানার তলায় কবচ রাখবে না।

তারপরে মনে মনে বল্‌ল, আর ঐ বোকা, হাঁদা মানুষটা বিয়ে করবে কিনা মিস্ এল্‌মারকে! নিজের পৌরুষে যখন কুলোল না তখন আনু তাবিজ, আন কবচ! যত সব বুজরুকি! না কখনোই এমন হাঁদা লোকের সঙ্গে আমি নেই।

এইভাবে সংকল্প স্থির ক'রে নিজ শয়নগৃহে প্রবেশ করলো আর কবচটা নিজের বালিশের তলায় চাপা দিয়ে রেখে বললে, আপাততঃ থাকুক এখানে। আর যাই হোক, মিস্ এল্‌মারকে আমি নিন্দা করাতে পারবো না। তাবিজ কবচের দ্বারা অনেক সময়ে মানুষ মারা যায়।

এমন তিন চারটি ঘটনা ঠিক সময় বুঝে মনে পড়ে গেল তার হঠাৎ।

রেশমী বেশ নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু জনের অপ্রত্যাশিত সাদর অভ্যর্থনায় তার আপাদমস্তক বিঁধিয়ে উঠল, বিস্ময়ে ও বিতৃষ্ণায় তার মন গেল ভ'রে। জন ও মিস এল্‌মারের প্রীতিপূর্ণ আলাপের অন্তরালিত পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বারংবার সে মনে মনে বলতে লাগল ওঃ সবাই এমন, ওঃ সবাই এমন!

সবাই বলিতে কে কে আর এমন বলাতে কি কি বিচার করবার মতো মনের অবস্থা তখন তার ছিল না। নিজের ভদ্রাসন নীলাম নগরে উঠে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে দেখলে পরিস্থিতিকে বিচার করতে পারে কয়জন!

জন ও রোজ এল্‌মার বেড়াতে বেরিয়ে গেলে যতক্ষণ তাদের দেখা যায় দেখল চেয়ে রেশমী, সাপে-কাটা মানুষ কেমন একদৃষ্টে চেয়ে দেখে ভয়াল সাপটার দিকে। তারপরে এক ছুটে সরে গিয়ে বের ক'রে নিল কবচটা, হাতের চাপে দিল সেটাকে চেপ্টিয়ে, তারপরে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বাড়ির প্রান্তের পুকুরটার ধারে—সবলে ছুঁড়ে দিল সেই দীর্ণ কবচ গভীর জলের দিকে—যাঃ

(জাদুঘরের উত্তরে সেই পদ্মপুকুরটা এখনো বর্তমান)।

রেশমী ফিরে এসে দেখে অপেক্ষা করছে কর্নেল রিকেট।

সে আভূমি নত হ'য়ে সেলাম করল।

মিস্ এলমার কোথায়?

বেড়াতে বেরিয়েছে।

একাকী?

না।

সংগে কে গিয়েছে?

মিঃ স্মিথ। তার সংগেই তো যায় মিস্ এলমার।

সে কি কথা! গতকাল পর্যন্ত আমি তো গিয়েছি তার সংগে।

তবে আজ থেকেই শুরু হ'ল।

এ কেমন হ'ল? জানিয়েছিলুম যে, আমি আসবো।

হয়ত সেইজন্যেই আগে বেরিয়েছে।

কি জন্যে?

তোমাকে এড়াবার জন্যে!

অসম্ভব!

সম্ভব তো হ'ল।

মধুর সংগে বিন্দু বিন্দু বিষ মিশিয়ে দিতে মেয়েরা কেমন পারে! মধুরে অধরে কঠিন কথা কোমল অংগুলিতে হীরের অংগুরীয়ের মতো কেমন শোভা পায়!

কর্নেলের আত্মম্ভরিতার আঘাত পড়ায় তার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল, নতুবা বুঝতে পারতো, সামান্য একজন পরিচারিকাকে এমন ক'রে জেরা করা ভদ্রতাসম্মত নয়।

কার বেশি আগ্রহ দেখ্‌লে?

রেশমী একটু ভেবে বল্‌ল, দু'জনেরই সমান মনে হ'ল।

কখন ফিরবে জানো?

বোধহয় রাত হবে।

কেমন ক'রে জানলে?

গায়ের শাল নিয়ে গিয়েছে।

টগবগ ক'রে ফুটছিল কর্নেল—পায়চারি করছিল ঘরের মধ্যে।

আমার সম্বন্ধে কিছু বল্‌ল?

না। অনেক সময়ে উদাসীনতাটাই খারাপ!

রাইট! ময়দানের দিকে গিয়েছে?

না বনের দিকে।

তারপরে প্রায় স্বগতভাবে—একটু নিরিবিলি চায় বোধ করি।

হেঁটে গিয়েছে?

হাঁ।

গাড়ি ছিল না?

ছিল।

তবে গেল না কেন!

নিতান্ত নির্বিকারভাবে রেশমী বল্‌ল, কোন কোন সময়ে ফুটোর পাল্কের উপস্থিতি বিড়ম্বনাজনক।

রাইট! আজ তাঁদেরানের ফুল দেখছি না

আজ ফুল অন্যত্র শোভা পাচ্ছে?

কোথায় শীঘ্র বলো।

মিঃ স্মিথের বুকে!

কে দিল?

দিতে একজন মাত্র পারে!

আমি স্কাউণ্ড্রেলটাকে দেখে নেবো—ব'লে সগর্জনে ছুটে বেরিয়ে গেল কর্নেল রিকেট।

রেশমী জানলা দিয়ে দেখতে পেলো কর্নেলের বগি গাড়ি নক্ষত্রবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড ধ'রে পূর্বদিকে।

রোজ এলমার ফিরে এসে শুধালেন কর্নেল এসেছিল নাকি?

রেশমী বল্‌ল, এসেছিল।

আমার জন্যে কি অপেক্ষা করেছিল?

না।

অপেক্ষা করতে বলেছিলে কি?

আর অপেক্ষা করতে ব'লে কি হবে?

রেশমীর কথার ভংগীতে কিছু বিস্মিত হ'য়ে এলমার শুধাল, কেন?

কেন আর কি! মনে হ'ল, তুমিও জাও না, আর খুব সম্ভব মিঃ স্মিথও বিরক্ত হবে।

কি আশ্চর্য, আমিই বা চাই না কেন, আর মিঃ স্মিথই বা বিরক্ত হবে কেন?

কোনদিন তো কর্নেলকে উপেক্ষা ক'রে তোমরা বেরিয়ে যাও না তাই মনে হ'ল!

হঠাৎ চমক ভাঙল এলমারের, সে ব'লে উঠল, ওঃ বুঝেছি। তুমি ভেবেছ আমি মিঃ স্মিথকে ভালোবাসি।

আমার ভাবায় কি আসে যায়, কর্নেল তাই মনে করেছে।

কর্নেল একটি গোঁয়ার আর তুমি একটি নির্বোধ।

সে তো বরাবরই আছে, নূতন ক'রে মনে পড়াবার কারণ কি?

মনে পড়াবার কারণ এই যে, আজ সকালে দেশ থেকে কবির একখানা চিঠি পেয়েছি।

নিরানন্দমুখে রেশমী বল্‌ল, বড় আনন্দের কথা।

আগে সবটা শোনই, তারপরে উত্তর দিয়ো। জন আর কর্নেলের কথা ভেবে খুব লিখেছিলাম। উত্তরে কবি লিখেছে যে, কর্নেলের মত লোকের জন্যে চিন্তা করিনে, ওদের হাতে সব সময়েই একাধিক তীর থাকে, ওরা জন্ম তীরন্দাজ লোক। তোমার কাছে প্রত্যাখ্যাত হ'লে ভগ্নহৃদয় হয়ে ও মরবে না, সমান উৎসাহে অন্য লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করবে। চিন্তা করি অপর লোকটির জন্যে যার নাম লিখেছ জন স্মিথ। সংসারে মুষ্টিমেয় একদল লোক আছে যারা জন্মপ্রেমিক—স্মিথ সেই দলের। ভালবাসার প্রত্যাখ্যান ওদের কাছে মৃত্যুতুল্য। ভালবাসতে ওকে যখন পারবেই না অন্তত একটু আদর যত্ন আত্মীয়তা করো। কবি লিখেছে, ওটা ভালবাসার বিকল্প নয় জানি —তবু ওর বেশি তোমার হাতে তো নেই।

তখন তার কাছাকাছিটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া উপায় কি!

এই পর্যন্ত ধীরে ধীরে ব'লে রোজ এলমার কিছুক্ষণ নীরব হ'য়ে থাকল। তারপরে আবার শুরু করল—কবির কথায় থামার চৈতন্য হ'ল। তাই আজ জনকে নিয়ে একটু বেড়াতে বের হলাম। এর মধ্যে ভালবাসা টাসা নেই। তোমার তো একদিনে বোঝা উচিত, সংসারে আমার একমাত্র যে ভালবাসার লোক ঐ তার ছবি। যদি আমি কখনো কাউকে বিয়ে করি তবে ওকে করব।

রোজ এলমারের কথার আন্তরিকতায় রেশমীর বুকের ভার নেমে গেল। সে স্বাভাবিকভাবে বল্‌ল, মিস্ এলমার আমাকে ক্ষমা করো।

এর মধ্যে ক্ষমা করবার কি আছে? তুমি ত কোন অন্যায় করনি, বড়জোর ভুল বুঝেছ।

রেশমী বিদায় হচ্ছিল এমন সময়ে এলমার বল্‌লে, Silken Lady, আমি লক্ষ্য করেছি যে, তুমি জনকে সহ্য করতে পার না। আর কিছু না হোক, সে আমার বন্ধু বলেও অন্ততঃ তাকে সহ্য করা তোমার কর্তব্য।

রেশমীও বলতে পারত, মিস্ এলমার, তুমিও আমাকে ভুল বুঝেছ।

সে রাত্রে বিছানায় শুয়ে সুখতন্দ্রালীন জন যখন Coligot (Kalighat)-এর Coli (Kali)-র উদ্দেশ্যে শত শত Salutation জানাচ্ছিল, মনে মনে যখন বলছিল যে, হিন্দু শাস্ত্রের Yogic rites সব অব্যর্থ, নতুবা এমন hand to hand fruit কি রকমে ফল্‌লে—আগের দিন রোজ ছিল উদাসীন, আজ সে প্রায় তার কণ্ঠলগ্ন, ঠিক সেই সময়েই রেশমী বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে মনে কালীঘাটের মা কালীর উদ্দেশ্যে শত শত প্রণাম ক'রে বলছিল—মা তোমার লীলার অন্ত নাই, এই কবচের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়াও তোমার এক লীলা মা। হঠাৎ ভুল বুঝে তোমার উপর অবিশ্বাস করেছিলাম ব'লে অবোধ সন্তানের অপরাধ নিয়ো না মা, নিয়ো না। এইরকম কত কথা মনে মনে বলতে বলতে সুখনিদ্রায় কখন সে অভিভূত হয়ে পড়ল।

রেশমীর এই বিচিত্র মনোভাবের কারণ কি? সে কি মনে মনে জনকে ভালবেসে ফেলেছে? জন ও তার মধ্যে দুস্তর অবস্থা ভেদে তা কি সত্যই সম্ভব? যদি সত্যই সম্ভব না হয় তবে কেন চাঁদের ছায়া পড়ে পল্বলে! (ক্রমশ)
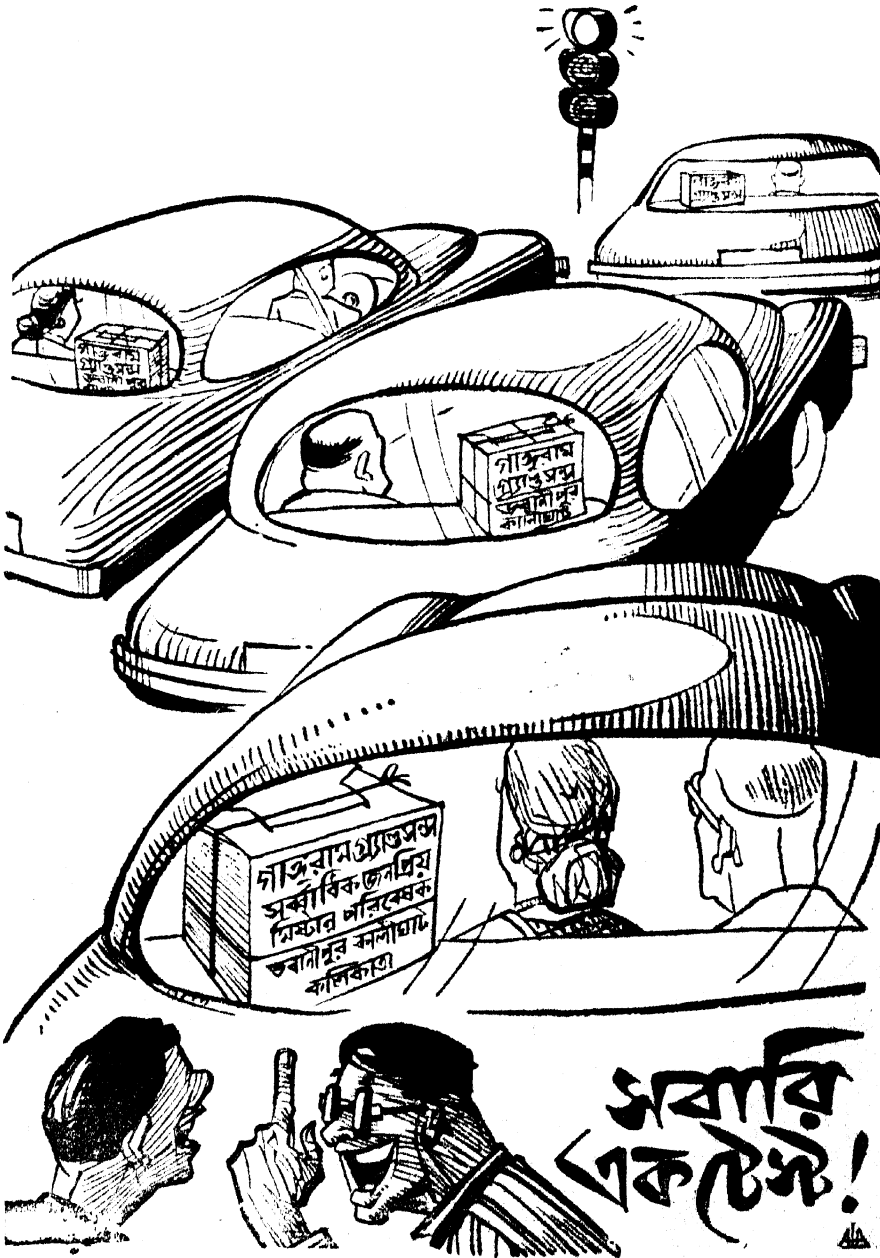
প্রভাতকুমার দত্ত

মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ শহর থেকে প্রায় দু' মাইল দূরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বড়নগর অবস্থিত। বড়নগর রানী ভবানীর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত স্থান। এখানেই সর্বজনবন্দিত দানশীলা রানী ভবানী তাঁর শেষ বৈধব্যজীবন ধর্মকর্মের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছিলেন। ধর্মপ্রাণা এই নারী অজস্র অর্থব্যয়ে বড়নগরকে মন্দির শোভিত করে তুলে একে বাঙলার বারানসী তীর্থে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু রানী ভবানীর এই প্রিয় স্থানটিকে শুধু তীর্থক্ষেত্র বললেই সবটুকু বলা হয় না; বড়নগর কেবল পুণ্যার্থীদের নয়, শিল্প ও শিল্পরসিকদেরও তীর্থক্ষেত্র। এখানকার মন্দিরের অপূর্ব গড়ন ও মন্দিরগাত্রের অনবদ্য কারুকার্য দর্শককে বিস্মিত ও বিমোহিত করে। এই ধরনের উচ্চস্তরের শিল্পকাজ বাঙলার অন্য স্থানে বিরল বললেই হয়। রানী ভবানী বড়নগরের গোড়াপত্তন করেন নি। তিনি শুধু একে নবরূপে মণ্ডিত করেছিলেন। বড়নগর বাঙলার একটি প্রাচীন ব্যবসাকেন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই স্থানেই ছিল বাঙলা দেশের অন্যতম প্রধান আড়ং। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দালাল-গোমস্তা ও স্থানীয় বিক্রেতাদের ভিড়ে ভাগীরথী তীরের এই ব্যবসাকেন্দ্র থাকত দিবারাত্র জমজমাট। পিতল-কাঁসার জিনিস উৎপাদনে বড়নগরের যে বিশেষ গুরুত্ব ছিল তা আমরা বুঝতে পারি ১৭৮০ সালের রেবেল-কৃত কাশীমবাজার দ্বীপের মানচিত্র থেকে। এই মানচিত্রে বড়নগরকে বড় অক্ষরে দেখানো হয়েছে।

বড়নগরকে বাঙলার বারানসী বলা হয়ে থাকে। এই উক্তিটি যে কত সত্য তা এই স্থান পরিদর্শন না করলে বোঝা যায় না। আজ অবশ্য রানী ভবানীর এই প্রিয় সাধনক্ষেত্র বারানসীর মত তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে ও কাঁসর-ঘণ্টার রবে মুখরিত নয়। কিন্তু এই পুণ্যময়ীর জীবিতকালে তাই ছিল এবং তিনি বড়নগরকে বারানসীতুল্য করে তোলায় কোন কার্পণ্য করেন নি। হাওড়া থেকে আজিমগঞ্জ শাখায় বড়নগর যাওয়া যায়। কিন্তু আমি গিয়েছিলাম শেয়ালদা থেকে লালগোলা লাইনে জিয়াগঞ্জে নেমে সেখান থেকে নৌকায়। জিয়াগঞ্জ থেকে বড়নগর যেতে উজানে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। ভাগীরথীর এই অংশের প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও আনন্দদায়ক। চারিদিকের শান্ত পরিবেশ, দুই তীরের ঘনবৃক্ষশ্রেণী, নদীর আঁকাবাঁকা স্রোত ও মাঝে মাঝে তীরের দিককার শুকনো চর ঐ সমস্ত মিলে স্থানটি অদ্ভুত সৌন্দর্যময়ী। শত কোলাহলের বাইরে মানুষের নিজের মনের সঙ্গে কথা কওয়ার এ যেন এক দুর্লভ ক্ষেত্র। রানী ভবানী তাঁর ইষ্টদেবতা ভবানীশ্বরের সান্নিধ্যের জন্য তাই বড়নগরকে নির্বাচন করেছিলেন। নৌকা ক'রে এলে প্রথমে গাছপালার আড়ালে রানী ভবানীর বিখ্যাত চারিবাংলা মন্দিরের আনত চালা চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিগোচর হয় ভবানীশ্বর মন্দিরের উচ্চ চূড়া। এছাড়া, নৌকা থেকে বড়নগরের রানী ভবানীর বিপুল কীর্তির আর কিছুই দৃষ্টিতে আসে না। নৌকা থেকে নেমে উঁচু পাড় ভেঙে উপরে উঠে একটু চারপাশে দৃষ্টি ফেরালে তবেই আমরা বড়নগরের রানী ভবানীর কীর্তির বিরাটত্ব খানিকটা উপলব্ধি করতে পারি। বাহান্ন বিঘে জমি নিয়ে রানী ভবানীর বসতবাটী, কাছারী, বিভিন্ন মন্দির, গুরুবংশীয়দের মঠবাড়ি ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। রানী ভবানীর মূল বসতবাটী এখন আর দাঁড়িয়ে নেই; কতকটা জায়গা জুড়ে ছড়ানো রাবিশই কেবলমাত্র তার স্মৃতি বহন করছে। অন্যান্য সৌধের মধ্যে কয়েকটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যেমন রানী ভবানীর একমাত্র কন্যা তারার প্রতিষ্ঠিত গোপাল মন্দিরের সামনেকার নাটমণ্ডপের ছাদ বহুলাংশে পড়ে গেছে। আশঙ্কা হয়, কিছুদিনের মধ্যেই মন্দিরের বেশীর ভাগ ধূলিসাৎ হবে। সুতরাং
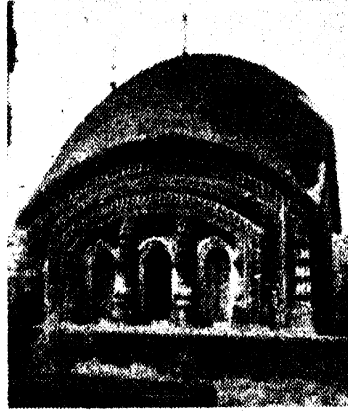
চারিবাংলা মন্দির

ভাগীরথী হইতে চারিবাংলার দৃশ্য

বর্তমানে বড়নগরে গেলে রানী ভবানীর সময়কার বড়নগরের সবকিছুকে আমরা পাই না। খানিকটা প্রত্যেক দর্শককেই কল্পনার চক্ষে দেখে নিতে হয়।

বড়নগর গোড়াতে রাজশাহী জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজশাহীর প্রখ্যাত রাজা উদয়নারায়ণ সৎ ও প্রজাপরায়ণ জমিদার ছিলেন। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় মুর্শিদকুলি খাঁ আশঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং কূট চক্রান্তের দ্বারা এক অন্যায় যুদ্ধে উদয়নারায়ণকে পরাজিত করেন। পরাজয়ের পর রাজা উদয়নারায়ণ কিছুদিন বেঁচেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজসাহী জমিদারী নাটোর রাজদের হাতে আসে। নাটোর রাজদের আদিপুরুষ হচ্ছেন রঘুনন্দন। তিনি পুঁটিয়ায় সামান্য বেতনের কর্মচারী ছিলেন এবং পরে উকীল পদে উন্নীত হন। উকীল থাকাকালীন তিনি রাজা দর্পনারায়ণের সঙ্গে ঢাকায় নবাব দরবারে যান। মুর্শিদকুলী খাঁ নবাব নিজামতের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির বাইরে মুর্শিদাবাদে থাকার সিদ্ধান্ত করলে তাঁর সঙ্গে রঘুনন্দন চলে আসেন। মুর্শিদাবাদে তিনি স্বীয় কর্মদক্ষতার দ্বারা নায়েব কানুনগোর পদে উন্নীত হন। নায়েব কানুনগো থাকা অবস্থায় তিনি জমিদারী লাভ করেন। এই জমিদারী অবশ্য রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের নামে থাকে। রামজীবনের পুত্র কালিকাপ্রসাদ। কালিকাপ্রসাদের কোন সন্তান না হওয়ায় তিনি রামকান্তকে দত্তক গ্রহণ করেন। এই রামকান্তের পত্নীই হচ্ছেন স্বনামধন্যা রানী ভবানী। রানী ভবানীর জন্ম রাজশাহী জেলার ছাতিম গ্রামে এবং তাঁর পিতামাতার নাম আত্মারাম চৌধুরী ও জয়দুর্গা। রানী ভবানী মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে বিধবা হন এবং নাটোরের বিপুল সম্পত্তির পরিচালনাভার তাঁর উপর এসে পড়ে। সে যুগে নাটোরের জমিদারীই ছিল বাঙলাদেশে সবচেয়ে বৃহত্তম। এর বাৎসরিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল দেড় কোটি টাকা যার মধ্যে সত্তর লক্ষ টাকা সরকারকে রাজস্ব হিসাবে দেওয়া হ'ত। বিধবা হওয়ার পর থেকে রানী ভবানী ব্রহ্মচারিণীর জীবন আরম্ভ করেন। তাঁর একমাত্র কন্যা তারাও অল্প বয়সে বিধবা হন। সুতরাং জমিদারী রক্ষার জন্য দত্তক পুত্র গ্রহণ করতে হয়। যাঁকে গ্রহণ করা হয় তিনি সাধক রামকৃষ্ণ। এই রামকৃষ্ণের হাতেই পরে বিষয়ভার দিয়ে রানী ভবানী তাঁর মৃত্যুকাল ৭৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত বড়নগরে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত ধর্মপ্রাণা এই নারী বড়নগরকে যে মন্দিরভূষিত ক'রে দেবস্থানে পরিণত ক'রে তুলবেন তা খুবে স্বাভাবিক। নিজে অত্যন্ত সহজ ও সাদাসিধে জীবন যাপন ক'রে সমস্ত অর্থ ইনি মন্দির নির্মাণ ও তার ব্যয় হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন। এই কারণে যিনি নাটোরের বিপুল সম্পত্তির

ভবানীশ্বর মন্দির

মালিক ছিলেন তাঁকেই শেষ জীবনে সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রথমে এই সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাসিক ৮০০০৲ টাকা এবং পরে তা ক'মে দাঁড়ায় মাসিক ১০০০৲ টাকা। রানী ভবানীর চারিত্রিক মহত্ত্বের এও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রানী ভবানীর বংশগত পরিচয় শেষ করতে গেলে আরো দু' একটি কথা বলা দরকার। নাটোর মহিষীর বড়নগর অবস্থানকালে সাধক রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে এখানে এসে শবসাধনা করতেন এবং কিরীটেশ্বরী নামক স্থানে পূজা করতে যেতেন। রামকৃষ্ণ বড়নগর থেকে কিরীটেশ্বরী পর্যন্ত একটি খাল খনন করান। এই খালের উপস্থিতি আজ নেই তবে তার কিছু কিছু চিহ্ন আছে। রামকৃষ্ণ রানী ভবানীর জীবদ্দশাতেই পরলোকগমন করেন। তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ বংশগত ইষ্টদেবকে ত্যাগ ক'রে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। ফলে তাঁর মহিষী রানী জয়মণি বড়নগরে চলে এসে রানী ভবানীর সঙ্গে বাস করেন। এই রানী জয়মণিকেই

মঠবাড়ির জোড়বাংলা মন্দির

রানী ভবানী যাবতীয় দেবোত্তর সম্পত্তি লিখে দিয়ে যান।

এরপর বড়নগরে রানী ভবানীর কীর্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রানী ভবানীর অতিপ্রিয় ভবানীশ্বর শিবমন্দিরের কথা। এইটেই বড়নগরে সর্বোচ্চ মন্দির এবং এর চূড়া বহুদূর থেকে দেখা যায়। রানী ভবানী বারানসীতেও ভবানীশ্বর শিবের একটি মন্দির স্থাপন করেছিলেন। কাশীর মন্দিরটির গায়ে যে শিলালেখ আছে তার থেকে জানা যায়, দেবালয়টি ১৬৭৫ শকাব্দে নির্মিত হয়েছিল। সাধারণত বলা হয়ে থাকে, বড়নগর ও বারানসীর মন্দির একই সময়ে নির্মিত হয়েছিল। তাহ'লে বড়নগরের মন্দিরের নির্মাণকালও ১৬৭৫ শক বৎসর। অবশ্য ভবানীশ্বর মন্দিরের গায়ে নির্মাণকাল সংক্রান্ত কোন শিলালেখ পাওয়া যায় না। আলোচ্য মন্দিরটি অষ্টভুজাকার এবং প্রবেশপথও আটটি। চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দা আছে। ওপরের চূড়া বা গম্বুজটি হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য রীতির মিশ্রণে নির্মিত। তবে চূড়াকে আশোকস্তম্ভের মত পদ্মের পাপড়ি আছে। প্রবেশপথের আটটি খিলানের উপর [illegible] কাজ আছে। প্রত্যেকটি খিলানেই লেড ফ্রট আকারের পাশাপাশি স্থাপিত বিভিন্ন ভঙ্গিমার তিনটি ক'রে মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু মূর্তির অংশ দেয়াল থেকে খসে পড়ে গেছে। নীচের দিককার দেয়ালে ছোট ছোট প্যানেলে বিভক্ত অপূর্ব ভাস্কর্য কাজ রয়েছে তবে এর সংখ্যা খুবে বেশী নয়। মন্দিরটি বর্তমানে সরকারী সংরক্ষিত পুরাকীর্তিরূপে পরিগণিত। এখানে দেবতার নির্যমিত পূজা হয়ে থাকে। রানী ভবানী প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী বড়নগরের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মূর্তি। দেবীর এই নাম থেকেই রানী ভবানীর নাম হয়েছিল রাজরাজেশ্বরী। রাজরাজেশ্বরী ভবনের তিনদিক একেবারে ভেঙে গেছে, কেবল উত্তর দিকে দেবীর মন্দিরের অংশ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এই অংশের অবস্থাও তেমন ভাল নয়, চারিদিকেই জরাজীর্ণ ভাব। উচ্চ একটি বেদীর উপর দশভূজা সিংহবাহিনী দুর্গার মূর্তি স্থাপিত। মূর্তিটি উচ্চতায় মোটামুটি তিন ফুট হবে। এটি পিতলের তৈরী এবং এর নির্মাণভঙ্গী অতি মনোরম ও বলিষ্ঠ। রাজরাজেশ্বরীর বামে জয়দুর্গা ও করুণাময়ীর মূর্তি আছে। জয়দুর্গা মূর্তির স্থাপয়িতা রামজীবন এবং করুণাময়ী রানী ভবানীর পিত্রালয় থেকে আনীত। রাজরাজেশ্বরী মূর্তি যে গৃহে স্থাপিত তারই সামনের চত্বরের এক পাশে একটি ছোট ঘরে রাজশাহীর জমিদার রাজা উদয়নারায়ণের বিগ্রহ মদনগোপালের মানুষপ্রমাণ দারুমূর্তি রক্ষিত। মদনগোপালের আসল মন্দির ভেঙে যাওয়ায় বিগ্রহটি

ভবানীশ্বর মন্দিরের খিলানের কাজ

এখানে স্থানান্তরিত হয়েছে। একই ঘরে দারুনির্মিত মহালক্ষ্মী ও পাথরের তৈরী হয়গ্রীব মূর্তি আছে।

রানী ভবানীর একমাত্র কন্যা তারা বৈধব্যের পর বড়নগরে একটি মন্দির স্থাপন করেন যা গোপাল মন্দির নামে পরিচিত। কালো পাথরের তৈরী গোপালের চমৎকার মূর্তিটি বাৎসল্যরসের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মন্দিরের শিলালিপিটি এইরূপঃ "খশূন্যে-মিশেকে শ্রীভবানী তনুসম্ভবা নির্মমে শ্রীমতী তারা শ্রীমদ্গোপাল মন্দিরম্"। খশূন্যেমিত্র কথার অর্থ ১৭০০। খশূন্যেমিত্রশকে অর্থাৎ ১৭০০ শক বৎসরে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। শ্রীভবানী তনয়া তারা অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন। সিরাজদ্দৌল্লা নাকি একবার ভাগীরথীতে নৌকাবিহারের সময় তীরের সৌধচূড়ায় তারার সৌন্দর্য পলকে দেখে বিশেষ মুগ্ধ হন। খামখেয়ালী নবাব তারাকে পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত এক সাধুর বুদ্ধিতে তারা রক্ষা পান। ঘটনাটির সত্যাসত্য যাই হোক, রূপবতী তারার বৈধব্য জীবনে এই গোপাল মূর্তিই ছিল একমাত্র সান্ত্বনার বস্তু।

এরপর আসে রানী ভবানীর বিখ্যাত 'চারবাংলা' মন্দিরের কথা। বাংলার নিজস্ব আটচালা স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত এই মন্দিরের জুড়ি বাংলার আর কোথাও নেই। রানী ভবানীর 'চার বাংলা' বাংলার স্থাপত্য রীতির সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। 'চার বাংলা' সবসুদ্ধ চারটি মন্দিরের সমষ্টি। একটি প্রশস্ত চত্বরকে ঘিরে চারিধারে চারটি মন্দির। প্রত্যেকটিতেই তিনটি প্রবেশদ্বার তবে বাংলার অন্যান্য স্থানের আটচালা মন্দিরের মত এখানে গর্ভগৃহের সামনে কোন দালান নেই; দরজা দিয়ে একেবারেই গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে হয়। প্রত্যেকটি মন্দিরেই তিনটি করে শিবলিঙ্গ আছে এবং লিঙ্গগুলির আকারও খুব বড়। চার-বাংলার নির্মাণকাল ইং ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ পলাশীর দু' বছর আগে। Walsh-কৃত History of Murshidabad গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে চারবাংলা মন্দির মোট ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল। চার-বাংলার অনেকটা উটের পৃষ্ঠদেশের মত অতি আনতভঙ্গী যেমন মনোরম, তেমনি এই ধরনের সৌধ গড়ে তোলাও সুকঠিন কাজ। চারবাংলা মন্দিরের গঠনসৌষ্ঠব যেমন সুন্দর তেমনি এর গায়ে যে পোড়া-মাটির ভাস্কর্য কাজ আছে তাও অতুলনীয়। চারটি মন্দিরের পূর্বেরটিতেই পোড়ামাটির সবচেয়ে প্রকৃষ্ট কাজ লক্ষ্য করা যায়। আশ্চর্য, এই একই চত্বরে চারটি মন্দিরের মধ্যে একটিকেই এতটা ভাস্কর্য কাজ দ্বারা শোভিত করা হয়েছে। মন্দিরের মধ্যেকার খিলানের উপর রাম-রাবণের বিখ্যাত যুদ্ধ-চিত্রটি খোদিত আছে। রাম ও রাবণের যুদ্ধরত মূর্তির মধ্যে যে গতিময়তা ও বলিষ্ঠতা ধরা পড়েছে তা বাঙালী কারু-শিল্পের দুর্লভ প্রতিভার পরিচয় বহন করছে। এ ছাড়া চার কোণে ছাদের ঠিক তলায় মকর আসীন দেবী ইত্যাদির যে ত্রিকোণাকার বড় ভাস্কর্য কাজগুলি আছে সেগুলিও বিশেষ স্মরণীয় সৃষ্টি। এ ছাড়া ছোট বড় প্যানেলে অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়ের উপর কাজ আছে তা হচ্ছে দশাবতার, দশমহাবিদ্যা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ, রাধাকৃষ্ণ, শিব ও অন্যান্য দেবমূর্তি। মন্দিরের নীচের দিকে মানুষ ও হাতি-ঘোড়ার একত্রে যে চিত্রগুলি আছে তার নিখুঁত ও প্রাণস্পর্শী সজীবতা মনকে দোলা না দিয়ে পারে না। অল্প-পরিসরে শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে শিল্পীর মাত্রা ও পারম্পর্যজ্ঞান দেখে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। যে মন্দিরটি সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ বললাম তারই পাশে আর একটি চারবাংলা মন্দিরের দেওয়ালে সাদা প্লাস্টারে পৌরাণিক ও রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত নানা চিত্রাবলী খোদিত দেখা যায়। সাদা প্লাস্টারের এই কাজগুলিতে পোড়ামাটির

ভবানীশ্বর মন্দিরের পোড়া মাটির ভাস্কর্য

বড়নগরের পোড়া মাটির ভাস্কর্য

ভাস্কর্যের গোলাকার (Rounded) সম্পূর্ণ ভাব উপস্থিত নেই, আছে রেখার ছন্দ, যা কম চিত্তাকর্ষক নয়। মোট কথা, বড়নগরের রাণী ভবানীর চারিবাংলা না দেখলে বাংলার মন্দির সম্পর্কে কারুর ধারণাই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

ভবানীশ্বর মন্দির থেকে অল্প দূরে অবস্থিত মঠবাটী বড়নগরের আর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। মঠবাটী হচ্ছে রানী ভবানীর গুরুবংশ ঠাকুরের বাসস্থান। এই মঠবাটীর ভেতরে ছোট আকারের চমৎকার একটি জোড়বাংলা মন্দির আছে। এটি শিবের মন্দির। এখানে তিনটি শিবলিঙ্গ আছে। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত জোড়বাংলা মন্দিরের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। বড়নগরের জোড়বাংলা বিষ্ণু-পুরের জোড়বাংলার মত অত বড় নয়, তবে এর সম্মুখভাগের পোড়ামাটির ভাস্কর্য-গুলি অনবদ্য। মন্দিরটি ছোট, তাই সম্মুখভাগের ভাস্কর্য প্যানেলগুলিও ছোট। কিন্তু তারই মধ্যে যে সমস্ত তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্যের সমাবেশ করা হয়েছে তা আমাদের অবাক করে। এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের শিল্পীদের ছোট বড় যে কোন পরিসরে অপার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা ছিল। এই জোড়বাংলা মন্দিরটি সরকারী সংরক্ষিত কীর্তির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অবিলম্বে সৌধটিকে সরকারী সংরক্ষিত কীর্তিরূপে ঘোষণা করা উচিত।

মঠবাটীর উত্তরে দয়াময়ীবাটী অবস্থিত। সাধক রামকৃষ্ণের বন্ধু ব্রহ্মানন্দ দয়াময়ী-বাটীর পাষাণময়ী কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। বড়নগরে সাধক রামকৃষ্ণের 'পঞ্চমুণ্ডি' আসনক্ষেত্র আর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। এ ছাড়া রাজবাড়ির উত্তর দিকে অষ্টভুজ গণেশের মন্দির অবস্থিত। অষ্টভুজ গণেশ আসলে বড়নগরের গ্রামদেবতা। বড়নগরের মন্দিরগুলিতে পূজা-অর্চনা বা তার দেখা-শোনা ঠিকমত হয় না।

অভিসারিকা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মুখের ওপর রোদ এসে পড়তেই পান্না সুরেখার ঘুম ভেঙে গেল। আলস্য-ভরা চোখ মেলে এদিক-ওদিক দেখল। প্রথমে দেয়াল ঘড়ির দিকে, তারপর পাশের খাটের ওপর।

বিছানা খালি। অবশ্য বেলা সাড়ে সাতটার সময় মানুষটার থাকবার কথাও নয়। এতক্ষণ পাক দিচ্ছে মেমোরিয়াল-ময়দানে কিংবা হয়তো গাড়িতে বসে দাঁতন করছে।

পান্নাকেও অনেক সাধাসাধি করেছে। কি আর অসুবিধা। ঢাকা গাড়িতে চেপে সোজা ময়দান, তারপর নেমে পড়ে শিশির-ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটা।

উপকারও অনেক। পেটে গ্যাস হবে না, বদহজম নয়, ডায়াবেটিসের সুঁই নিতে হবে না রোজ, তা ছাড়া আঁখ ভাল হবে।

পান্না হেসেছে। তার শরীরে কোন গোলমাল নেই। না বদহজম না বদহাওয়া। আর আঁখ?

দেয়ালে টাঙানো বিরাট আয়নার সামনে গিয়ে পান্না দাঁড়িয়েছে। বিলোল কটাক্ষ হেনে বৈজনাথের দিকে ফিরে বলেছে, কেন আমার আঁখ কি খারাপ? কোন দোষ দেখতে পাচ্ছ? আঁখ ঠিক করতে ও রকম ভেজা ময়দানে [illegible] করতে হবে কিসের জন্য?

[illegible] বৈজনাথ সুরেখা অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারেনি। চাঁদির তেজী-মন্দী বোঝে, পাটের ওঠানামা, কিন্তু টানা কাজল চোখের মায়া তার আওতার বাইরে। বোঝে না, বোঝবার চেষ্টাও করে না।

হেসে বলেছে, এখন উমর কম, সবই ঠিক আছে। কিন্তু এর পর?

ভ্রূ কুঁচকে পান্না বলেছে, কি এরপর? আমার উমর বাড়বে না, আমি কোনদিনই বুড়ো হব না। চিরটা কাল ঠিক এই রকমই থাকব।

বৈজনাথ আর কথা বাড়ায়নি। পান্নাকে কিছু বলেও লাভ নেই। বললেও হেসে উড়িয়ে দেবে।

হলদে পাগড়ির প্যাঁচগুলো মাথায় শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে বৈজনাথ বেরিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু লঘু সুরে কথাগুলো বললেও পান্না রীতিমত ভয়ই পেয়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই অমনি অবস্থা হবে। বৈজনাথের আগের চেহারা পান্নার বেশ মনে আছে। উটের পিঠে চেপে বিয়ে করতে এসেছিল ছিপছিপে ফর্সা রঙের ছোকরা। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। পান্না ওর দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার। বয়সের তফাত দুজনের বেশ। বিয়ের সময় পান্নার বয়স বছর পনেরো।

তারপর এই ক বছরেই বৈজনাথ বদলে গেল। বাড়ি হ'ল, গাড়ি হ'ল, চাঁদির চাকতি বাড়ল, পান্নারও গয়না হ'ল, সেই সঙ্গে মেদ বৃদ্ধি হ'ল বৈজনাথের। গালের মাংস ফুলে ফেঁপে চোখ আর নাক প্রায় ঢেকে দিল। উদরের পরিধি জালাসদৃশ। এমনি বিরল কেশ ছিলই, এবার মোহরের মাপের টাক ফুটে উঠল। চলতে ফিরতে হাঁপানী, একটু পরিশ্রমেই স্বেদের ফোয়ারা। মাংসের চাপে হার্টের হাল সঙ্গীন।

আগে এক খাটে পাশাপাশি শুতে দুজনে। পান্না আর বৈজনাথ। কিন্তু ইদানীং তা আর হবার উপায় নেই। সারা খাট জুড়ে বৈজনাথের দেহ। পাশে এক চিলতে যে জায়গাটুকু বাকি থাকে, তাতে পান্না কোনরকমে ভয়ে ভয়ে শুত। মাঝ-রাতে আচমকা যদি পাশ ফেরে বৈজনাথ, তাহলে পান্নাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে চিঁড়ে চ্যাপটা।

অনেক ভেবে-চিন্তে আলাদা বন্দোবস্ত হয়েছে। বৈজনাথও হাত-পা ছড়িয়ে শুতে পারবে, পান্নাও নির্ভাবনা। প্রাণ হাতে করে রাত কাটাতে হবে না।

এ চেহারা বৈজনাথের নিজের তৈরি। কাউকে দোষ দিতে পারবে না। বেলা এগারোটায় শেয়ার মার্কেটে গিয়ে বসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে। ওঠা-হাঁটার নাম নেই। একটু মেহনত নেই। কেবল মাঝে মাঝে গলার [illegible]। [illegible] সাদা কাগজের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে।

দুনিয়ার কোন বাজারে কি ডিগবাজি খেল, কোথায় ধাপে ধাপে ইজিপ্সিয়ান সুতোর দর চড়ল, কিংবা কাত হচ্ছে দস্তার দাম রাত বারোটা পর্যন্ত তার খবরদারি। তাতেও নিষ্কৃতি নেই। মাঝে মাঝে আচমকা ঘুম ভেঙে পান্না হাতড়ে হাতড়ে খুঁজেছে। না, মানুষটা বিছানায় নেই। উঠে বসতেই নজরে পড়েছে। টেলিফোন সামনে নিয়ে চেয়ারে বসে বসে ঢুলছে।

—কি, সারা রাত ওভাবে বসে থাকবে নাকি?

—না, না, সারা রাত কেন, বৈজনাথ বিব্রত গলায় আমতা আমতা করেছে। চেয়ার ঘুরিয়ে পান্নার দিকে ফিরে বলেছে, এই আর ঘণ্টা দুয়েক, তার মধ্যেই পেয়ে যাব।

কথার ভঙ্গীতে মনে হল আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বৈজনাথ বাঁধা মোক্ষই পেয়ে যাবে।

—কি পাবে কি? পান্না খিঁচিয়ে উঠেছে।

—ব্রজকিশোর মানুভাইয়ের টেলিফোন কলটা। কানাডার বাজারের মোক্ষম খবর। আজ রাতে খবরটা পেলে কাল সকালেই একটা ওলোট-পালোট শুরু হবে, এখানকার বাজারে।

অন্ধকারে বৈজনাথের মুখটা আবছা দেখা গেল। জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে রাস্তার আলোর কিছুটা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। সব অস্পষ্ট। ছায়া-ছায়া।

পান্না আর কথা বাড়াল না। ঠোঁট কুঁচকে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আশ্চর্য মানুষ। আজ বলে নয়, চিরকাল। আগে তবু মন বলে একটা পদার্থ ছিল, মাঝে মাঝে পান্নার সঙ্গে হালকা কথাবার্তা দু-একটা বলত, কিন্তু আজকাল একেবারে বদলে গেছে। সোনা-চাঁদির দর আর শেয়ার স্ক্রিপের চাপে সে মন থেঁতলে গেছে। সে মানুষও নিশ্চিহ্ন।

চোখ বন্ধ করে পান্না শুয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু ঘুম আসেনি। আবোল-তাবোল চিন্তা, এলোমেলো ভাবনার জট, হারিয়ে-যাওয়া কথার টুকরো। প্রায় সারাটা রাত পান্না বিছানায় ছটফট করেছিল।

মনে পড়ল পান্নার। পূর্ণিমার রাত। চাঁদের আলোয় ভেসে গেছে ঘর আর বারান্দা। পানমল কোঠারির বাড়ির ছাদের ওপর নিটোল, রুপো-রঙা চাঁদ। চেয়ারটা বাইরে টেনে নিয়ে পান্না বসেছিল, দিনের কাজ শেষ করে বৈজনাথ পিছনে এসে দাঁড়াল।

—ইস, খুব জোর আলো তো!

কি ভাগ্যি চাঁদের। বৈজনাথ হাতের কাগজ টেবিলে আছড়ে রেখে চাঁদের দিকে চোখ ফেরাল।

—হবে না, আজ যে পূর্ণিমা। এক কলা ক'রে বেড়ে বেড়ে আজ চাঁদ ষোলকলায় পূর্ণ। কাল থেকে আবার কমতে আরম্ভ করবে।

পান্না খুব আস্তে আস্তে কথাগুলো বলল। ওর মন নুরমল লোহিয়া লেন পার হয়ে লোয়ার চিৎপুর রোডের এলাকা ছেড়ে বিষাণগড়ের এক পল্লীর প্রান্তে পৌঁছে গেছে। চারদিকে মরুপ্রান্তর। বালির স্তূপ। ওপরে মেঘহীন আকাশ আর আকাশে আজকের রাতের মতন এমনি পরিপূর্ণ চাঁদ।

চমক ভাঙল বৈজনাথের উচ্চহাস্যে।

—ঠিক বলেছ, একেবারে বিলকুল ঠিক। শুধু চাঁদ কেন, সারা দুনিয়া জুড়ে এই তেজী-মন্দীর খেলা। আজ বাড়ছে, কাল কমছে। দু আনা কমল তো কিনে রাখ হাজার খানেক, তেজীর বাজারে ছেড়ে দাও। চাঁদের চেয়েও দামী চাঁদি পকেটে চলে আসবে।

পান্না চেয়ার ছেড়ে উঠে ভিতরে চলে এল। এরপর আর সে চাঁদের দিকে চাইতে পারবে না। চাইলেও চাঁদের কি রূপ চোখে পড়বে কে জানে। হয়তো বৈজনাথ চেঁচিয়েই উঠবে। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই, কাল থেকে যদি কমেই যায় চাঁদি, তো এই বেলা বিক্রি করে ফেলাই সমীচীন। ভাল দাম পাওয়া যাবে।

কিন্তু একদিন সব গোলমাল হয়ে গেল। অফিসের কাজ শেষ করে মোটরে ওঠবার মুখেই মাথাটা ঘুরে উঠল। ড্রাইভার ধরে না ফেললে হয়তো বৈজনাথ পড়েই যেত মুখ থুবড়ে। গদিতে হেলান দিয়ে বৈজনাথ ক্লান্ত গলায় বলল, বিবেকানন্দ রোড।

এইটুকুতে ড্রাইভার ঠিক বুঝে নিল। বিবেকানন্দ রোড মানে ডাক্তার সেনের ফার্মেসী। নর্দার্ন ক্লিনিক।

ডাক্তার সেন আধ ঘণ্টা ধরে দেখলেন। বুকে পিঠে কল বসিয়ে। হাতে কাল কাপড় জড়িয়ে যন্ত্র টিপে টিপে। জিভ, চোখের কোণ। শিরা ফুঁড়ে রক্তও নিলেন খানিকটা, ইউরিন নিলেন, তারপর গম্ভীর গলায় বৈজনাথের দিকে ফিরে বললেন, আপনাকে বিশ্রাম নিতে হবে। কিছুদিন একেবারে পুরো আরাম, তারপর থেকে খাটুনির মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে।

বৈজনাথ কোন কথা বলল না। কেবল জলে-ডোবা মানুষের মতন অসহায় দুটি

চোখ তুলে ডাক্তার সেনের দিকে চেয়ে রইল।

—নিজের কারবার, ছুটি নেওয়ার তো হাঙ্গামা নেই। কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসুন, বুঝলেন?

বৈজনাথ কিছু বুঝল না। কথাগুলো আদৌ কানে গেল কি না কে জানে!

বৈজনাথের মনে পড়ল কপার কেনা আছে পাঁচ হাজার, স্টিল হাজার দুয়েক, তার ওপর বিশপ কোম্পানি দেড় হাজারের মতন। এ ছাড়া ছোটখাটো শেয়ার অগুনতি। এ সপ্তাহের মধ্যেই একটা ওলোট-পালোট হওয়ার সম্ভাবনা। বোম্বাইয়ের জবর খবর আছে। এখন কখনো অফিস কামাই করা চলে! পরের অফিস হলে কথা ছিল, কিন্তু নিজের অফিসে না গেলেই ক্ষতি। মোটা টাকা লোকসান হয়ে যাবে। কারবারে নিজের লোক বলতে এক ভাতিজা সম্বল। কিন্তু তার মতিগতি মোটেই সুবিধার নয়। একটু ফাঁক পেলেই সরে পড়ে। হয় হোটেলে, নয় ঘোড়দৌড়ের মাঠে। তা ছাড়া সাজ-পোশাকের বাহারই বা কি। যে কারবারীর ধুতির ঝুল হাঁটু ছাড়ায়, তার কারবার লাটে উঠতে মোটেই দেরি হয় না। গন্ধ তেল মেখে চুল উল্টানো মানেই গণেশ উল্টানো।

বৈজনাথ অনেক বুঝিয়েছে। তার ছেলে নেই—পুলে নেই। চোখ বুজলে সবই ভাতিজার। সমঝে চললে দু পুরুষ বসে খেতে পারবে। পুরুষোত্তম সুরেখা ঘাড় হেঁট করে কথামৃত পান করেছে। ভাবভঙ্গী দেখে বৈজনাথ ভেবেছে রত্নাকরের বাল্মীকি হবার আর দেরি নেই। কিন্তু রাত ভোর হতে যে কে সেই। ইয়ারবক্সী নিয়ে ফুর্তি-ফাজলামী। খেয়াল শুনে রাত কাটানোর বদখেয়াল।

কিন্তু এত কথা তো আর ডাক্তার সেনকে বলা যায় না, তাই বৈজনাথ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, বেমারীটা কি?

—বেমারী? ডাক্তার সেন গলা থেকে স্টেথস্কোপের মালাটা খুলে হাতে জড়ালেন, মানে রক্তের চাপ একটু বেড়েছে মনে হচ্ছে। কাল রক্তের রিপোর্টটা পেলে ঠিক ঠিক সব জানতে পারব। আজ রাতে আর কিছু খাবেন না।

—বিলকুল উপোস? বৈজনাথ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

—খুব খিদে পেলে ছানা কিংবা হালকা কিছু খাবেন।

হাতে-হাতে টাকা দেবার দরকার নেই। মাসকাবারী বন্দোবস্ত আছে। হিসেব করে চেক পাঠালেই চলবে।

গাড়ির গদিতে হেলান দিয়েই বৈজনাথ মুখ খুলল। ডাক্তার সেনের বাপান্ত। আজকালকার ডাক্তাররা কিছু জানে না। কেবল ভড়ং। ঝকঝকে তকতকে কামরা, ধোপদুরস্ত পোশাক আর দাঁত ভাঙা কতকগুলো রোগের নাম, বাস পয়সার জন্মে ওঠে। হুজুগে মানুষের তো আর অভাব নেই।

বড়বাজারে ঘি-জবজবে বুট, ভাজি, প্যাঁড়া আর রাবড়ী এই ছেড়ে শুধু ছানা—আবার মাথা ঘুরে পড়ার বন্দোবস্ত!

কিন্তু পরের দিন বিকেলে ব্যাপারটা ঘুরে গেল। সন্ধ্যার পরে ডাক্তার সেন নিজে এলেন রক্তের রিপোর্ট নিয়ে। রক্তের রিপোর্ট সামনে নিয়ে গম্ভীর গলায় যা বললেন, তাতে বৈজনাথের রক্ত জল।

ব্লাডসুগার পাঁচশোর ওপর। ইউরিনেও এ্যাসিটোন রয়েছে, এইবেলা সাবধান না হলে সমূহ বিপদ।

পর্দার ওপারে পান্না দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তারের কথাগুলো মন দিয়ে শুনল, তারপর সিঁড়িতে ডাক্তারের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই বৈজনাথের মুখোমুখি দাঁড়াল।

—ডাক্তারসাব যা বলে গেলেন, সব আমি শুনেছি। তোমায় খাওয়া কমাতে হবে।

—খাওয়া কমাতে হবে? ডাক্তারের কথাবার্তায় বৈজনাথ একটু বে-কায়দায় পড়েছিল, পান্নার কথায় একেবারে চুপসে গেল।

—হ্যাঁ, এ বেমারী আমার পিতাজীর ছিল। আমি জানি। শক্কর একেবারে বন্ধ! রোজ সকালে সুঁই নিতে হবে। তার জন্য ডাক্তার ডাকবার দরকার নেই। আমি বাবাকে দিতাম, সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। লোক দিয়ে কাউকে দিয়ে ওষুধ আর সিরিঞ্জ আনিয়ে নিতে হবে।

এত কথা বৈজনাথের কানে গেল না। শক্কর বন্ধ! রোজ এক সের রাবড়ী আর গোটা ছয়েক গুলাবী প্যাঁড়া না মুখে দিলে বৈজনাথের তবিয়তই ঠিক থাকে না। দিল খিঁচড়ে যায়।

—ডাক্তারের সব কথায় কান দিলে কখনো চলে? বৈজনাথ পান্নাকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু পান্না মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, না, ডাক্তারের কথায় কান দেব কেন, কান দেব তোমার বোম্বাইয়ের বুজরাকিদাস মানুভাইয়ের কথায়। আজ থেকে মিষ্টি জিনিস তোমার একেবারে বন্ধ। মিষ্টি কিছুর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।

ওরই মধ্যে পান্না গলার আওয়াজ একটু মোলায়েম করল। মুচকি হেসে বলল, অবশ্য কেবল আমার মিষ্টি কথা শোনা ছাড়া।

সেই থেকে খাওয়া দাওয়ায় কড়াকড়ি। প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধা হত বৈজনাথের। কারবারে মন বসত না। যেতে আসতে মোড়ের গলির মিষ্টির দোকানের সামনে চুপচাপ বসে থাকত। কাচের কেসের মধ্যে থাকে থাকে সাজানো মেঠাইগুলো দুচোখ দিয়ে লেহন করত। মাঝে মাঝে অফিস থেকে বেরিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ত। এদিক ওদিক চেয়ে একেবারে পর্দাঢাকা কামরার মধ্যে। খাওয়া-দাওয়া সেরে গোঁফ মুছে বেরিয়ে আসত ভালমানুষের মতন।

কিন্তু এও আর বেশীদিন চলল না। বাদ সাধল ওই ভাতিজা। অদৃষ্ট। দলবল নিয়ে সে যে ঐ দোকানেই ঢুকবে তা কি বৈজনাথ ঘুণাক্ষরে টের পেয়েছিল।

বৈজনাথের পাগড়ির খানিকটা পর্দার পাশ থেকে দেখা যাচ্ছিল। গোঁফ দেখে বেড়াল চেনার মতন, পাগড়ি দেখে চাচাজীকে পুরুষোত্তম ঠিক চিনে ফেলল।

সবে বৈজনাথ হালুয়াসান শেষ করে ক্ষীরের লাড্ডু ভাঙতে যাচ্ছিল, এমন সময় পুরুষোত্তম উঁকি দিল।

—চাচাজী।

সেই মুহূর্তে পুরুষোত্তম যদি কারবার নিজের নামে লিখিয়ে নেবার চেষ্টা করত, বৈজনাথ বোধ হয় বাধা দিত না। কিন্তু পুরুষোত্তম সেদিক দিয়ে গেল না। কেবল বলল, তোমার না এসব খাওয়া বারণ?

তর্ক করল না বৈজনাথ। বলল না, জোয়ান ছোকরার রাতভর বাঈজীর গান শোনাও তো বারণ, ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে পা বাড়ানোও তো অনুচিত। তবে?

বৈজনাথ এক হাত দিয়ে ক্ষীরের লাড্ডুটা সরিয়ে রেখে আর এক হাতে পকেট থেকে

করকরে একশ টাকার একটা নোট ভাতিজার দিকে প্রসারিত করে দিল।

হাত বাড়িয়ে নোটটা নিয়ে পুরুষোত্তম সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দোকান ছাড়ল।

বৈজনাথ নিশ্চিন্ত। কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই তার দুটো চোখ কপালের মাঝ-বরাবর।

পুরুষোত্তম নোটও নিয়েছে আবার চাচীকে ফোন করে সব বলেছে। নেমক-হারাম পুরুষোত্তম। রাজপুত জাতের কলঙ্ক!

এসব অবশ্য অনেক আগের কথা। এখন বৈজনাথ অনেকটা ধাতস্থ। খাওয়া-দাওয়া গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। রোজ ভোরে ময়দানে পায়চারী, তারপর গঙ্গায়ীতে নেমে অবগাহন স্নান।

ছুটিছাটার দিকে বৈজনাথ যায়নি। একটি দিনের জন্য কামাই নয়। বাড়িতে ফিরে এসেও নিস্তার নেই। পান্নার সঙ্গে সংসারের দু-একটা কথা বলেই কাগজের স্তূপ নিয়ে বসেছে। ছানার জিরে মুখে দিতে দিতে একমনে শেয়ার মার্কেটের হালচাল পড়েছে। মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক টেলিফোন করে আরো পাকা খবর সংগ্রহ করেছে।

পান্নার অবস্থা মারাত্মক! সারাটা দিন আর কাটে না। দুজন চাকর, গোটা তিনেক পরিচারিকা। কাজেই নিজেকে কুটো ভেঙে দুখানা করতে হয় না। নিজের ঘরে চুপ-চাপ বসে থাকে। কাকাতুয়াকে খাওয়ায় কিংবা পোষা বেড়ালকে আদর করে একটু। কিন্তু দিনের পর দিন কি আর এসব ভাল লাগে কারুর।

দামী শাড়ি আর জড়োয়া গহনা পরে বারান্দায় বসে থেকেছে। ভাল লাগেনি বেশীক্ষণ। কুড়ি ফিট চওড়া সড়ক। সার-সার মোষের গাড়ি, ঠেলাগাড়ি, মাঝে মাঝে অনবরত হর্নবাজানো কয়েকটা মোটর। লাল, নীল, হলদে রংয়ের পাগড়ি মাথায় পুরুষের দল, বুক অবধি ঘোমটা-টানা মেয়ের পাল। দেখে দেখে পান্নার অরুচি।

মাঝে মাঝে মরিয়া হয়ে বৈজনাথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঝি-চাকরের নজর বাঁচিয়ে বৈজনাথের কাঁধে হাত রেখে মোলায়েম সুরে বলেছে, গণেশ টকির খবর রাখ?

বৈজনাথ কাগজ থেকে মুখ তুলে পলকের জন্য পান্নার দিকে চেয়ে মুচকি হেসেছে, তা আর খবর রাখি না। এই কাজই তো করছি ত্রিশ বছর?

—কি খবর রাখো?

—কালকের বিকেলের খবর সতেরো টাকা চার আনা। তবে আর বিশেষ বাড়বে বলে মনে হয় না। এ বছর ডিভিডেণ্ড দেবে, [illegible] ম্যানেজিং এজেন্সিও হাত পাল্টাচ্ছে। কিছু কিনে থাক তো বেচে দাও এই বেলা। এরপর ধরে রাখলে লোকসান খাবে।

কথা শেষ করে বৈজনাথ বিজ্ঞজনোচিত হাসি ফোটাল মুখে।

পান্না অবাক।

—কি বকছ তুমি মাথামুণ্ডু।

—মানে?

—মানে, কিসের খবর চাইছি?

—কেন, গণেশ ইঞ্জিনীয়ারিং তো! খুব জানি।

—আমার পোড়া কপাল। কপালে হাত চাপড়ে পান্না সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। আঁচল দিয়ে গলার ঘাম মুছতে মুছতে বলল, বলছিলাম গণেশ টকির কথা। সতী অনসূয়া হচ্ছে। খুব ভাল বই। চল না দেখে আসি।

—আমি? সাপের গায়ে যেন হাত ঠেকেছে এমনিভাবে বৈজনাথ আঁতকে উঠল, আমার তো যাওয়া মুশকিল। আটটা থেকে দশটার মধ্যে একটা টেলিফোন আসবে। আমার বাড়ি ছাড়া চলবে না।

পান্না চুপ করে রইল।

আড় চোখে বৈজনাথ একবার চেয়ে দেখল, তারপর মিহি গলায় বলল, একটা কাজ কর না। মোহনকে নিয়ে তুমি চলে যাও না। এই তো কাছেই। লছমীকেও না হয় সঙ্গে নাও।

মোহন ড্রাইভার। লছমী ঝি। পান্না একটি কথাও না বলে ভিতরে চলে গেল। নিজের বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ।

হায়রে এই তার জীবন। দামী শাড়ি আর জড়োয়া গহনা, হুকুম করার জন্য একগাদা দাসদাসী, না চাইতে খাবারের থালা এসে হাজির। একটা মানুষের বাঁচার পক্ষে তো যথেষ্ট। কিন্তু কতটুকু দাম এমন বাঁচার। মনকে উপোসী রেখে এ প্রাচুর্যের নিক্তিতে নিজেকে ওজন করে লাভ কতটুকু।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে পান্না এক সময়ে উঠে পড়ল। চাঁদমল বাঁটিয়ার বাড়ির পোষা কোকিলটা অনবরত ডেকে চলেছে। আশ্চর্য, নুরমল লোহিয়া লেনে কোকিল থাকে আবার এমন করে ডাকেও।

দেরাজ খুলে পান্না রুপোর চুমকী দেওয়া গোলাপী শাড়ি বের করল, সেই রংয়ের ব্লাউজও। সাজপোশাক শেষ করে বৈজনাথের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—তা হলে আমি ঘুরে আসি গণেশ টকিতে।

প্রথমে কথাটা বৈজনাথের কানে গেল না। একমনে কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি দেখছে। বোধ হয় নারানগঞ্জে নতুন খোলা পাটের এজেন্সির হিসেব।

পান্না আরো কয়েক পা এগিয়ে এল। আবার বলল কথাটা।

মুখ না তুলেই বৈজনাথ ঘাড় নাড়ল।

পান্না একলাই গেল। লছমীকে সঙ্গে নিল না। মোহনকে নির্দেশ দিয়ে গাড়ির পিছনের সিটে হেলান দিয়ে বসল।

লোয়ার চিৎপুর রোড পার হতেই পান্না মত বদলাল। ভিড় অনেক ভদ্র। বয়েল-গাড়ি আর ঠেলার ঝামেলা নেই। রঙীন নিওন আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। ফুরফুরে বাতাস। বসন্তের আবাহনী।

—সোজা চল ময়দান। সামনে ঝুঁকে পড়ে পান্না মোহনকে নতুন নির্দেশ দিল।

ময়দান অবধি অবশ্য তাকে আর পৌঁছোতে হল না। ধর্মতলার মোড়েই দেখা হয়ে গেল।

পান্না মুখ বাড়িয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল, হঠাৎ আলোর নিচে চোখ পড়তেই থেমে গেল। পরিচিত নয়, তবু মনে হল যেন যুগযুগান্তের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। দুর্নিবার আকর্ষণে পান্নাকে টানতে লাগল।

সঙ্গিনীদের কাছে কিছু কিছু পান্না শুনেছে। কোথায় দেখা পাওয়া সম্ভব সে কথাও তারা বলেছে। পান্না একলা কোনদিন এমনভাবে বের হয়নি। সাহস হয়নি। কিন্তু আজ চাঁদমল বাঁটিয়ার কোকিলটা সব ভয়, সব সংকোচ, সব জড়তা ঘুচিয়ে দিয়েছে।

এদিক-ওদিক পান্না চেয়ে চেয়ে দেখল। ধারে কাছে চেনা লোক নেই তো কেউ। মোটর থামিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলে হয় না! কি ক্ষতি। এমনভাবে পরিমিত জীবনযাত্রার সরু সড়ক ধরে কতদিন চলতে পারে মানুষ! সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাপা কথাবার্তা, মাপা খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা তাও নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে।

ঘরের মানুষটার কথা মনে পড়ল। তার ইজ্জত ধুলোয় মিশবে, খসে পড়বে আভি-জাত্যের মিনার!

—তাই যদি কি হয়, কি করতে পারে পান্না! বার বার সেই কেবল সকলের কথা ভাববে এটাই বা কেন হবে! পান্নার দিকে কতটুকু দেখে বৈজনাথ? পান্নার দেহের দিকে নয়, তার মনের দিকে!

শাড়ি গহনা পরল, দুবেলা খেল, ভাল-মন্দ, ব্যস, এই পরিধির বাইরে আর কি দেখার আছে! পান্না তো সুখী। রাজ-স্থানের পল্লীপ্রান্ত থেকে আহরণ করে এনে তাকে শহরের সম্রাজ্ঞী করেছে, এই কি যথেষ্ট নয়।

কিন্তু পান্নার সাহস হল না। একদৃষ্টে চেয়ে থেকে থেকে আবার ফিসফিস করে মোহনকে বলল, গাড়ি ঘোরাও, বাড়ি যাব।

[illegible] দিকে পান্না মন ঠিক করে ফেলল।

[illegible] সে বাঁচবে। তাতে কার কতটুকু [illegible] দেখবার দরকার নেই। [illegible] নয়। বৈজনাথ সুরেখা যদি [illegible] আর পাটের কেনাবেচা নিয়ে [illegible] চায়, টুলি পরা ঘোড়ার মতন [illegible] রাস্তা ছাড়া আর কোন দিকে [illegible] না করে, তবে পান্না [illegible]। যেখানে ইচ্ছে [illegible]।

কিন্তু [illegible] মুখেই পান্না [illegible]।

সকালে [illegible] ঠিক করেছিল, সন্ধ্যার [illegible]। বৈজনাথ বাড়ি [illegible]। গাড়ি একটু দূরে দাঁড় [illegible] হেঁটেই যাবে। একেবারে [illegible]।

[illegible] কোন [illegible] নেই। [illegible] পান্নাকে পিছু হটে [illegible] হবে দাঁড়াবে। [illegible] মোহন [illegible]।

কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি। নাচতে নেমে [illegible] মানে হয়।

[illegible] দিয়ে যেতেই পিছু [illegible]।

—[illegible] কোথায়?

—ভাল লাগছে না বাড়িতে। একটু ঘুরে আসি।

—কিন্তু আমি যে বেরোব এখুনি। [illegible] ওখানে জরুরী একটা মিটিং আছে। আর বাড়ির বৌ তুমি, রোজ হুট হুট করে কোথায়ই বা যাবে। মোহন বলল, কাল তো সিনেমাতেও যাও নি। পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছ।

আচমকা একটা ধাক্কা খেল পান্না। গোয়েন্দাগিরিও শুরু করেছে বৈজনাথ। চুপি চুপি ওর গতিবিধির খবর নিচ্ছে। ঠিক আছে। ও বেরোবে না। এতদিন যখন না বেরিয়ে চলেছে, আজও চলবে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে পান্না সজোরে দরজা দুটো বন্ধ করে দিল। দামী শাড়ি জামা ছেড়ে নিজের আটপৌরে পোশাক [illegible] জড়াল, তারপর উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পরই কথাটা পান্নার মনে এল।

সব সময় বৈজনাথ তো আর চোখে চোখে রাখতে পারবে না। তার কারবার আছে, মিটিং আছে, এদিক ওদিক ছোটাছুটি আছে। সেই ফাঁকে পান্না বেরিয়ে পড়বে। মোটর না জোটে ট্যাক্সিতে যাবে। লছমীকেও সংগে নেবে।

কিন্তু এত সব ব্যাপারের পরে যার জন্য যাওয়া সেই যদি না থাকে। চণ্ডলমতি পুরুষের কথা বলা যায়! ঠাঁইবদল করলেই হ'ল। পান্নার না হয় ওকে ছাড়া গতি নেই, কিন্তু কত পান্না ঘোরাফেরা করবে ওকে ঘিরে। নিজের চোখেই তো পান্না দেখেছে।

মতলব ঠিক করে পান্না উঠে পড়ল।

পাশ ফিরে হঠাৎ শুতে যাবার মুখেই পান্নার খেয়াল হ'ল। আজ বুধবার। পাঁচটার পর বৈজনাথ সোজা যাবে চন্দনমলের গদিতে। দুজনে মিলে নতুন কারবারের পত্তন করছে, বুধবার বুধবার তারই শলা পরামর্শ। গাড়ি ফেরত পাঠায় বাড়িতে। চন্দনমল নিজের মোটর পাঠায় বৈজনাথ সুরেখাকে আনতে। কাজেই কোন অসুবিধা নেই। বাড়ির মোটরেই পান্না বেরোতে পারবে। প্রতি সপ্তাহে তাই বেরোচ্ছে। মোহনের মুখ বন্ধ। করকরে দুটো চাঁদির রুপেয়া হাতের মুঠোয় দিতেই সেলাম ঠুকেছে। একটি কথা বাবুর কানে যাবে না। মহাবীরের নামে শপথ নিয়েছে।

কথার খেলাপ করে নি মোহন। বৈজনাথ একটি কথাও জানতে পারেনি।

হয়তো সন্দেহ একটু করেছে। চালচলন একটু বদলে গেছে পান্নার। আগের মনমরা ভাব আর নেই। কথায় কথায় হাসি, কারণে অকারণে গানের কলি। বৈজনাথ একদৃষ্টে দেখেছে। এত ফুর্তির উৎসটা কোথায়? বয়স বাড়ার সংগে সংগে প্রথম যৌবনের উন্দামতা ফিরে এল কি করে।

ভয় ভয় করেছে পান্নার। বৈজনাথ কাছে এগিয়ে আসতেই ছলছুতো করে সে সরে গেছে। দ্রুতস্পন্দন বুকের মধ্যে। সন্ধানী চোখের দৃষ্টিতে বুঝি ধরা পড়ে যাবে পান্না। তা হ'লে লজ্জা লুকোতে গংগা-মায়ীর বুকেই মুখ লুকোতে হবে।

বেলা পড়তেই পান্না সাজগোজ শুরু করল। ফিকে আসমানি শাড়ি, জরির বুটি দেওয়া, ঘাস-সবুজ ব্লাউজ। দু চোখের কোণে সুর্মা। আতর দান থেকে আতর বের করে কপালে, চোখের পাতায় মিঠেতোল। ঘোমটাটা আলতো হাতে টেনে দিল কপাল বরাবর।

সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে পান্না নামল। বৈজনাথ বাড়ি নেই, কাজেই কৈফিয়ত চাইবার লোকও নেই কেউ। তবু লজ্জা করে পান্নার। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেই মুশকিলে পড়তে হবে। জানাজানি হ'লে মুশকিলে পড়তে হবে। জানাজানি হ'লে বৈজনাথের দিকে সারা জীবন বোধ হয় আর মুখ তুলে চাইতে পারবে না।

পান্না ওঠার সংগে সংগেই মোটর চলতে শুরু করল। পান্না একেবারে কোণের দিকে গুটিসুটি হয়ে বসল। কি জানি, বলা যায় না, চেনা লোকের সংগে যদি পথে ঘাটে চোখাচোখিই হয়ে যায়।

ভিড়ের যেন কামাই নেই। লোকগুলোও তেমনি ভালকানা। একজন তো মোটরের তলায় পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। দোষ তার, কিন্তু তম্বী করতে ছাড়ল না। হাতের ছাতা উঁচিয়ে বীরবিক্রমে গালাগালি শুরু করল। মোটরের মালিকের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার। চিড়িয়াখানার প্রায় সব কটা জন্তুর নামে মোহনের নতুন নামকরণ হ'ল। কিন্তু আশ্চর্য কান্ড। পান্না জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতেই লোকটা সংগে সংগে থেমে গেল। রাস্তা পার হ'তে হ'তে বার তিনেক ফিরে ফিরে দেখল পান্নার দিকে। আর একটা মোটরের তলায় পড়তে পড়তে কোনরকমে বেঁচে গেল।

মোহন ঠিক জায়গায় মোটর থামাল।

নেমে কয়েক পা এগিয়েই পান্না থমকে দাঁড়াল। যার জন্য এত লুকোচুরি, এত বিপদ কাটিয়ে আসা, সেই-ই নেই। এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে পান্না দেখল। ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মোটরে ফিরে যাবার মুখেই পান্নার নজরে পড়ে গেল।

ওই যে আসছে গুটি গুটি করে। যেখানে অপেক্ষা করার কথা সেখানেই এসে দাঁড়িয়েছে।

দ্রুত পায়ে পান্না এগিয়ে গেল। তার মুখোমুখি দাঁড়াল।

ধরা গলায় বলল, আমি অনেকক্ষণ এসে খুঁজছি তোমায়। ভাবলাম আজ বুঝি এলেই না।

লোকটি মৃদু হাসল, পুলিসের হাংগামার জন্য অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছিলাম। আমার না এলে কখন চলে।

কথা শেষ করেই শালপাতার ঠোঙাটা এগিয়ে দিল পান্নার দিকে। বলল, নিন, আপনাকে দিয়েই আজ বউনি। খুব গরম আছে। দেখবেন, সাবধান।

সাগ্রহে অঞ্জলি পেতে পান্না শালপাতার ঠোঙাটা টেনে নিল। ফুচকাওয়ালার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলল, সত্যি বেশ গরম আছে। তেঁতুলের ঝোল আর একটু দাও তো। দেখ, যেন কাপড়ে না লাগে।

দরজার সামনে মোটর তৈরী। খুব কাপড়)

হিন্দী, ইংরাজী ও মাতৃভাষা

সবিনয় নিবেদন,—শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব-দত্তের "হিন্দী ইংরাজী ও মাতৃভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধটি আগ্রহে পাঠ করলাম। কারণ ভাষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর জাতীয় ভাষা সম্পর্কিত সমস্যাটি বর্তমানে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, ভারতের অহিন্দী-ভাষী অধিবাসীদের (ভারতের ৩৬ কোটি নর-নারীর মধ্যে যাঁদের সংখ্যা ২২ কোটিরও বেশী) অনতিবিলম্বেই এবিষয়ে একটি সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়োজন ঘটেছে। শ্রীআইয়ুব দত্তের রচনাটি এদিক থেকে খুবই সাহায্যকারী হবে বলে মনে করি।

প্রবন্ধকারের সঙ্গে এবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত যে বহুধর্মী ভারতের বিশেষ কোন ধর্মকে রাষ্ট্রস্বীকৃতি না দিয়ে ভারতের সংবিধান-কারেরা যে নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, ভাষার ক্ষেত্রে সেই নিরপেক্ষতা তাঁরা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেননি। আর এই পক্ষপাতিত্ব ভারতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অহিন্দীভাষী নর-নারীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলবে বলে যে আশঙ্কা তিনি প্রকাশ করেছেন তাও সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করি। কারণ ভাষার প্রতি আকর্ষণ মানুষের ধর্মের তুলনায় এতটুকুও কম নয়। বরঞ্চ এইটাই দেখা যায় যে মানুষ যতই শিক্ষিত ও কৃষ্টিসম্পন্ন হয়, ততই ধর্ম তার কাছে গৌণ হয়ে যায়, আর ভাষা হয়ে ওঠে প্রাণের সম্পদ। এই কারণেই পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি বহু-ভাষাভাষী সভ্য রাষ্ট্র আজ তার নাগরিকদের কথিত প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা-রূপে স্বীকৃতি জানিয়েছে। যেমন বহু ভাষা-ভাষী সুইজারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রভাষা হল জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয়, যদিও তার ২২টি ক্যাণ্টনের মধ্যে ইতালীয়ভাষী ক্যাণ্টন (প্রদেশ) হল মাত্র একটি। ক্যানাডার রাষ্ট্রভাষা তার অধিবাসীদের ভাষা অনুসারে ইংরেজী ও ফরাসী; পাকিস্তানেরও রাষ্ট্রভাষা উর্দু আর বাঙলা। আর সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রভাষা হল তার ষোলটি অঙ্গরাজ্যের ষোলটি ভাষাই। এইভাবে একাধিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়ে বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রগুলি কিভাবে তাদের ভাষা সমস্যার সমাধান করেছে এবং তার ফলে কতখানি তারা উপকৃত হয়েছে তা উপরিউক্ত রাষ্ট্রগুলির যে কোন একটির ইতিহাস পাঠ করলেই জানতে পারা যাবে। এখানে আমি শুধু সোভিয়েট রাশিয়ার উন্নতির কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করছি, কারণ সোভিয়েট অনুসৃত পদ্ধতির মধ্যেই আমাদের বর্তমান সমস্যার প্রকৃত সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে বলেই আমার ধারণা।

সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রভাষা ষোলটি। এই কারণে তাদের কেন্দ্র শাসিত যাবতীয় বিষয়ের কাগজপত্র অনূদিত হয় ষোলটি ভাষায়। এর ফলে গোড়ার দিকে সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থায় অনেক রকম অসুবিধা দেখা দিত। কিন্তু কিছুকাল অভ্যাসের ফলেই তাদের সে অসুবিধা দূর হয়ে গেল এবং এই ব্যবস্থার ফলে প্রত্যক্ষ এবং অমূল্য লাভ যা হল, তা হল ষোলটি ভাষারই সমান সমৃদ্ধি এবং ষোলটি অঙ্গরাজ্যেরই কল্পনাতীত উন্নতি। বিপ্লবের আগে এই সব ভাষার অনেকগুলিরই কোন লিখিতরূপ ছিল না এবং কাজেই বলতে গেলে সে সব ভাষায় তারাও ছিল নিরক্ষর অসভ্য ও বর্বর। কিন্তু মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যেই এই ভাষাগুলি পৃথিবীর যে কোন ভাষার মতই সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এবং এই সকল ভাষাভাষী লোকেদের কৃষ্টি ও শিক্ষাগত উন্নতি হ'ল কল্পনাতীত। আজ কাজাক, তাজিক বা উজবেকিস্তানের লোকেরা নিজেদের মাতৃভাষায় পাঠ করছেন বিশ্বের সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, অভিনয় করছেন শ্রেষ্ঠ নাটক; শুধু তাই নয়, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, আইন, ইতিহাসও তাঁরা অধ্যয়ন করছেন নিজেদের ভাষায়, নিজ নিজ রাজ্যের শাসনকার্যও তাঁরা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করছেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে! অথচ রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বজয়ী প্রতিভার উত্তরাধিকারী হয়েও আমাদের পক্ষে আজ পর্যন্ত ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি বা অর্থ-নীতির ওপর একখানাও ভাল প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হল না, যন্ত্র বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা ত অনেক পরের কথা। এ বিষয়ে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার অনগ্রসরতার কথা ত ভাবলেও ভয় হয়। কাজাকি, উজবেকি বা তাজিকি ভাষার তুলনায় আমাদের ভাষাগুলির এই অবিশ্বাস্য অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধান করলেই আমরা বুঝতে পারব যে রাষ্ট্রীয় পোষণ ছাড়া কখনও কোন ভাষার সমৃদ্ধি সম্ভব হতে পারে না। আর জাতির অগ্রগতিও অসম্ভব হবে যদি না তার প্রত্যেকটি নাগরিক মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্ববিষয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।
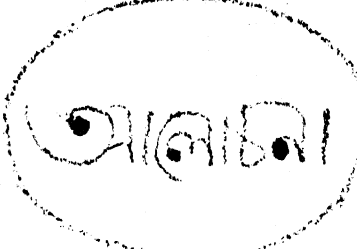
আশ্চর্যের বিষয় যে, এমন একটি অনুসরণীয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চোখের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও আমাদের শাসকগোষ্ঠী এমন এক নীতি গ্রহণে অগ্রণী হয়েছেন যার সমর্থনে একটি সংযুক্তিও তাঁরা দেখাতে পারেন না। ভারতের ৩৬ কোটি নরনারীর ওপর এক রকম জোর করেই তাঁরা চাপিয়ে দিতে চাইছেন মাত্র ১৫ কোটি নরনারী কথিত একটি অতি অনগ্রসর ভাষা। (আর হিন্দী ভাষীর সংখ্যা যে ১৫ কোটি বলা হয় সেটাও অনেকটা গায়ের জোরের কথা। কারণ এই ১৫ কোটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মৈথিলী, মগধি, উর্দু, মারোয়াড়ী, পাঞ্জাবের গুরুমুখী প্রভৃতি ভাষাভাষী লোকেদেরও।)

জাপান কোনদিনই ইংরাজকবলিত ছিল না। কিন্তু তবুও সে একদিন ইংরাজী ভাষাকে তার শিক্ষার্থীদের অবশ্যপাঠ্য করেছিল। আর আমাদের জাত্যাভিমান হঠাৎ এমনই প্রবল হয়ে উঠল যে, যে ইংরাজী ভাষার কল্যাণে আমাদের এত উন্নতি, সেই ভাষার অতি নিকট সংস্পর্শে থেকেও আমরা তাকে আগামী আট বছরের মধ্যেই সর্বতোভাবে বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এতই যদি আমাদের স্বজাত্যবোধ ত আমরা কমনওয়েলথে এখনও থাকি কোন যুক্তিতে? তাছাড়া ইংরাজীকেই বা আমরা এখনও বিদেশী ভাষা বলি কেন? যদি সম্পূর্ণরূপে 'মৃত' সংস্কৃত ভাষা বা মাত্র ৫০ হাজার নরনারী কথিত কাশ্মীরী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে, তাহলে এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার ভারতবাসী কথিত ইংরাজী ভাষাই বা জাতীয় ভাষার মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হবে কেন? এ ছাড়াও রয়েছেন ভারতের কয়েক লক্ষ উপজাতি, যাদের ভাষার লিপি হল রোমান লিপি এবং ইংরাজ মিশনারীদের কাছে তাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন বলে তাঁরা মাতৃভাষার চেয়ে অনেক ভাল জানেন ইংরাজী ভাষা। আর এ সবের চেয়েও বড় কথা হল যে, এই ভাষার সাহায্যেই গড়ে উঠেছে সর্বভারতীয় ঐক্য এবং এই ভাষাতেই শিক্ষালাভ করেছেন আমাদের রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি সাধারণ শিক্ষিত মানুষ এবং আজই যদি আইন করে এই ভাষাটিকে এদেশে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়, তাহলে এই মুহূর্তেই উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে দেশের সব কটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সুতরাং, এ ভাষাকে 'বিদেশী' বলে বর্জন করার চিন্তা করি আমরা কোন সর্বনাশা সাহসে? এই কারণে আমার মনে হয়, অনতিবিলম্বেই আমাদের উচিত হবে সংবিধানের দুটি সংশোধন করে ইংরাজী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশীলের অন্তর্ভুক্ত করা।

তবে শ্রীআইয়ুব দত্ত ইংরাজী ভাষাকে এক-মাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং কেন্দ্রে প্রয়োজন মনে করলে হিন্দীকে আর একটি রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি জানাবার জন্যে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা আমি সমর্থন করতে পারলাম না। কেন, তা আমি আগেই বলেছি। যদি এইভাবে আমরা একটি বা দুটি ভাষায় ওপর নই আমাদের যাবতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বা শাসনকার্য পরিচালনার এক-চেটিয়া অধিকার ছেড়ে দিই, তাহলে আমরা ভারতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নরনারীকে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের এবং পূর্ণতা অর্জনের সুযোগ থেকে চিরকালের জন্যে বঞ্চিত করব, যা করার কোন অধিকার আমাদের কারও আছে বলে মনে করি না। শ্রীআইয়ুব দত্ত হয়ত বলতে পারেন যে ইংরাজী ও হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হলেও দেশবাসী শিক্ষা অর্জন করবে মাতৃভাষার মাধ্যমে। কিন্তু তা যে সম্ভব নয় তা আমি ইতিপূর্বে বলেছি। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ যে ভাষার সমৃদ্ধির পেছনে নেই, সে ভাষা কখনও সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না এবং এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের মত রত্নখনির উত্তরাধিকারী হয়েও বাংলাভাষার এত দৈন্য।

তাই আমার এ সম্বন্ধে বক্তব্য হল এই যে, ইংরাজী ভাষাকে ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করে তারপর সর্বসমেত ১২টি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করা হোক এবং সরকারী প্রচেষ্টায় প্রত্যেকটি ভাষাকেই দেশের বিদ্বজ্জনের সাহায্যে সুসমৃদ্ধ করে তোলা হোক, যাতে আগামী সাত বছরের মধ্যেই অসমীয়া, বাঙালী, ওড়িয়া, তামিল, হিন্দী প্রভৃতি সকল ভাষাভাষী ভারতীয়ই মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং থেকে শুরু করে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই সর্বোচ্চ বিদ্যা অর্জনে সমর্থ হতে পারেন। আমার ধারণা, ভারত সরকার যদি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে পাঁচ বছরে দশ কোটি টাকা ব্যয় করেন এই ভাষাগুলির সমৃদ্ধির জন্যে, তাহলেই এই উদ্দেশ্য সফল হতে পারবে। শুধুমাত্র ভারতের এক রাজ্যের অধিবাসীর সঙ্গে আর এক রাজ্যের অধিবাসীর যোগাযোগ ও ভাব বিনিময় অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে এবং আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালন করার জন্যে

আমরা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিখব ইংরাজী এবং সে ইংরাজীও হবে সহজ, সরল, 'ইণ্ডিয়ানাইজড্' ইংরাজী। যেমন, রাশিয়ার বিভিন্ন ভাষাভাষী নরনারীর দ্বিতীয় ভাষা হল রাশিয়ান। ইতি—

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়,
কলিকাতা—১৬

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

আবু সয়ীদ আইয়ুব দত্তর "হিন্দী ইংরেজি ও মাতৃভাষা" ৪৯ সংখ্যা দেশ পত্রিকার পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। এমন সারগর্ভ ও সময়োপযোগী প্রবন্ধের জন্যে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। কোন্ পথ ধরলে কি পরিণতি তা তিনি দুই-আর দুই-এ চার-এর মত সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রতিটি প্রসঙ্গ সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। মোট কথা, ভারত রাজনৈতিক ভিত্তিতে একক। কিন্তু আচার-ব্যবহারে, বেশ-ভুষায়, আহার-বিহারে এবং ভাষায় বিভিন্নের সমন্বয় তার প্রকৃষ্ট রূপ। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারলে সার্থক হবে নবভারতের রূপ। আর ঐক্যের ধুয়া ধরে যদি বাষ্টির ভাবধারা সমষ্টির ওপর চাপান হয়, সাম্য হবে না, সাম্যের সমাধি হবে। ভাষা প্রসঙ্গে এর পরিণতি আরও নিষ্ঠুর হবে। সুতরাং ভাষা সমস্যার সহজ সমাধান প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাকে সমান মর্যাদা দেওয়া এবং তার উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা। যার ফলে ধীরে ধীরে সে মাধ্যমিক কেন উচ্চশিক্ষার দায়িত্বও বহন করতে পারে। প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ইংরাজির উপকারিতা প্রচুর। শুধু আন্তঃপ্রাদেশিক নয়, আন্তর্জাতিক যোগসূত্র সে বজায় রাখতে পারে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শিল্পে তার সহযোগিতা অপরিহার্য; সুতরাং সেটাকে রাখলে ক্ষতি কি?

হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষা করার সমর্থকরা জোর গলায় যা বলেন, তার প্রথম কথা—শতকরা পাঁচজন ইংরাজি শিক্ষিত লোকের স্বার্থে সমগ্র দেশের স্বার্থ বলি দেওয়া অন্যায়। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হলে ভারতের গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব হবে। ইংরাজি দ্বারা তা কোন মতে সম্ভব নয়। আশ্চর্য লাগে সহজ সরল কথাটা তাঁরা বোঝেন না যে, সামগ্রিকভাবে শিক্ষা বিস্তার একমাত্র মাতৃভাষা দ্বারা সম্ভব। আর যদি তাঁরা আশা করে থাকেন হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে সকল ভারতবাসীকে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার অভাবে গ্র্যাজুয়েট করে দেবেন, তাহলে আকাশ-কুসুম বলেও পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় কি না সন্দেহ। পৃথিবীর কোন দেশ যা পারেনি, হিন্দীর যাদুমন্ত্রে আমরা তা পারব এমন স্বপ্নও আমি দেখতে পাই না। তাই ইংরাজির আসনে হিন্দী বসিয়ে দেশের অশিক্ষা দূর করার কথা শুনলে আমার মনে হয়, দাঁতের ব্যথা উপশম করতে পায়ে বাতরাক্ষস তেল মালিশ করার বিধান দেওয়া।

দ্বিতীয় কথা ভাষার ব্যবধান ভারতবাসীকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে—গণসংযোগের সুযোগ আজ নেই। এক প্রদেশের মানুষ আর এক প্রদেশের মানুষ সম্বন্ধে জানতে পারে না, তাদের সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করতে পারে না। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হলে তবেই ভারতবাসী পরস্পরকে জানতে পারবে। আমি হিন্দী জানি না। তার কারণ হিন্দী বিদ্বেষ বা ইংরাজীর প্রতি অযথা অনুরাগ নয় ঘটনাচক্রে শেখা হয় নি, যেমন আমার বয়সী অনেক লোকের হয়ে ওঠেনি। হিন্দী শেখার রেওয়াজ যখন হয়েছে তার আগে লেখাপড়ার পাট চুকিয়েছি। তবু সরল হিন্দী শিক্ষা কিনেছিলাম রাষ্ট্রভাষার ক্লাস একেবারে মাড়াইনি বলে কেউ অপবাদ দিতে পারবেন না, রেডিয়ো খুলে মনোযোগ দিয়ে হিন্দী শিক্ষার পাঠ নিয়েছিলাম। কিন্তু প্রথম দু-চার অধ্যায়ের বেশী এগোন হয়ে ওঠেনি। বাংলা জানি কারণ মাতৃভাষা, ইংরাজির চলনসই জ্ঞান আছে দাবী করতে পারি। আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছি। ব্যবসা বাণিজ্যের সুপারিশে বা রাজনৈতিক প্রচার পর্বে নয়, নিতান্ত দেশ দেখার জন্যে। বড় বড় হোটেলের ওপর বিরূপ নই। তবে সে সামর্থ বা সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ। সে সময় বহু ধর্মশালায় থেকেছি পল্লীগ্রামে কৃষকের বাড়ী রাত কাটিয়েছি, খটমল ভরা চারপাই বিছিয়ে অন্য প্রদেশের লোকের সঙ্গে গল্প জুড়েছি। তীর্থযাত্রীর সঙ্গে মিশে গেছি। হিন্দী জানি না বলে কোন অসুবিধা ভোগ করি নি। বরং বহুক্ষেত্রে অনেক কিছু জানতে পেরেছি ইংরাজী জানা ছিল বলে. দুর্ধর্ষ আফ্রিদির দেশ খাইবার গিরিপথে গিয়েছি। 'শিনওয়ারী' উপজাতির সঙ্গে বসে খানা খেয়েছি, 'মুসোরী'র সঙ্গে মস্করা করেছি, 'খাখাখেল' কুকিখেলদের আশ্রয়ে রাত কাটিয়েছি। আশ্চর্য সেই মরের মুলুকেও ইংরাজি জানা লোকের অভাব বোধ করিনি।

যাঁরা দেশের বাইরে গিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয় উপলব্ধি করেছেন ইংরাজি কত কাজে আসে। ইংরাজি ছাড়া এমন কোন ভাষা নেই যার বলে পৃথিবী বিজয় করে আসা যায়। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের কথা ছেড়েই দিলাম, রাশিয়াতেও ইংরাজি জানা লোক পথেঘাটে খুঁজে পাওয়া যায়।

অনেকের মতে সংস্কৃতজ বলে ভারতীয় ভাষার মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য অনেক। সুতরাং ভারতবাসীর পক্ষে হিন্দী শেখা ইংরাজি শেখার চেয়ে অনেক সহজ। শেখা হয়ত একটু সহজ। তবে দখল হওয়া সমান কষ্টসাধ্য। এই প্রসঙ্গে একটা তুলনা দিতে পারি। হিন্দী ও অন্যান্য উত্তর ভারতীয় ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য (দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার কথা ছেড়েই দিলাম) ইংরাজির সঙ্গে ফরাসী বা জার্মানীর তার চেয়ে বেশি বিভেদ নেই। বহু বছর ধরে চর্চা করেও একজন ইংরেজ সার্থক ফরাসী সাহিত্য রচনা করতে পারে না বা একজন জার্মান পারে না ইংরাজি সাহিত্য সৃষ্টি করতে।

হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষার সনদ দেবার আগে আরও একটা কথা ভেবে দেখতে বলি। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা শেখা, পড়া বা লেখা যত কঠিন, তার চেয়ে অনেক গুণ কঠিন শুদ্ধ ভাষা বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গলভাবে বলা। প্রকাশভঙ্গিমা ও ভাষা দ্বারা মানুষ সাধারণত নিজের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা ফুটিয়ে তুলতে পারে। হিন্দী যদি ভারতের রাষ্ট্রভাষা হয় হিন্দী ভাষাভাষীর পাশে অহিন্দী ভাষাভাষীরা নিতান্ত অযোগ্য বলে প্রমাণিত হবে, এমন কি হিন্দী সাহিত্যে বেশী জ্ঞান থাকলেও।

একটা উদাহরণ দেই। ইংরেজরা যখন ইংরাজি বলে শুনতে কত মধুর লাগে। একজন সাধারণ ইংরেজের শব্দ সংকলন, ব্যবহার বিধি, উচ্চারণ কত নিখুঁত। তার একটা স্বকীয়তা আছে। তেমনটি বিদেশীর কাছে পাওয়া যায় না। কিছুদিন আগেও কত ভারতীয় ইংরাজিকে মাতৃভাষার ওপর স্থান দিয়েছে। ছেলেকে ইংরাজি স্কুলে পড়িয়েছে, মেমসাহেব মাস্টার রেখেছে, বাড়িতে ইংরাজিতে কথা বলেছে, তাদের ইংরাজিও কানের পর্দায় ঘা দেয়। নেহরুও সেই আবহাওয়ার মানুষ। কিন্তু ইংরেজের উচ্চারণ

যা বলার ভঙ্গি তিনিও আয়ত্ত করতে পারেননি। যে সমস্ত ডাচ, জার্মান বা পোলিশ বহু বছর ধরে বিলেতে বাস করেছে, তারাও পারে না।

এবার ইংরাজির প্রয়োজনীয়তার কথা ধরা যাক। তার সঙ্গে হিন্দীর তুলনাই চলে না। ইংরাজি জানার অর্থ বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন হওয়া। সমগ্র পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ লোক ইংরাজি জানে। আরও আশ্চর্য লাগে, পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশ যখন ইংরাজি শেখবার জন্যে উঠে পড়ে লাগছে, আমরা তখন আইনের বাঁধন দিয়ে ইংরাজি তোলার অভিযান চালাচ্ছি। সুইডেন জীবনযাত্রার মানে ইয়োরোপের মাথায়। ইংরেজ ও সুইডিশ পরস্পর খুব মন কষাকষি। ইংরেজের ধারণা, গত মহাযুদ্ধে নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে সুইডেন জার্মানীকে সাহায্য করেছে। সে দেশে গিয়ে দেখেছি, তারা কয়েক বছর আগে স্কুলে ইংরাজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। সম্প্রতি রাশিয়ায় গিয়ে তাজ্জব বনে গেছি। তাদেরও যে এত ইংরাজি ভাষা-প্রীতি তা কল্পনাও করতে পারিনি। সাহিত্য ও কলাবিদ্যার ছাত্রদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। টেকনিক্যাল স্কুলে প্রতিটি ছাত্রকে একটি বিদেশী ভাষা শিখতে হবে। দু' চারজন জার্মানী বা ফরাসী শেখে, তবে শতকরা নব্বই-জনের ওপর শেখে ইংরাজি।

ইংরেজ শব্দটাও আমাদের উত্তেজিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। ধরে নিলাম ইংরাজ এখনও আমাদের শত্রু। তাই বলে তার দেওয়া ভাল জিনিসটা বিসর্জন দেব কেন? চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে মানা চলে না। ইংরেজের দেওয়া গণতন্ত্রের কাঠামো আমরা রেখেছি, তাদের শেখান বিচারব্যবস্থা পুরোপুরি বজায় আছে। তাদের গড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভেঙে ফেলিনি; সুতরাং ইংরাজি ভাষাটা রাখলে যদি আমাদের উপকার হয়, রাখব না কেন?

আমাদের সংবিধানের ভাষাপরিচ্ছেদের গায়ে হিন্দীর নামাবলি। শুরু থেকে শেষ কেবল হিন্দী আর হিন্দী। তারই জয়গান গাওয়া—তাকে মানুষ করে তোলার সঙ্কল্প। আর প্রাদেশিক ভাষা বেওয়ারিশ মাল। হিন্দী যেন ভারত সরকারের সুয়োরানী, অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা দুয়োরানী। জানি না, এই নীতির মধ্যে সাম্যের নিদর্শন কি?—ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সূচনাই বা কোথায়?

তাই আবু সৈয়দ আইয়ুব-দত্তর সঙ্গে একমত হয়ে বলতে চাই ভারত সরকারের উচিত হবে কাজ চালানোর জন্যে ইংরেজি বজায় রাখা, মান বাঁচানোর জন্যে হিন্দীকে যুক্তভাবে রাখা যেতে পারে। তবে শিক্ষাদীক্ষায় বা প্রাদেশিক অফিসে ইংরাজি স্থানান্তরিত করা হবে মাতৃভাষা দিয়ে এবং ভারত সরকার সমানভাবে চেষ্টা করবে সকল প্রাদেশিক ভাষার উন্নতির জন্যে।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য,
৩১, কলিংহাম প্লেস,
লণ্ডন।

লেখকের বক্তব্য

সবিনয় নিবেদন,

১২ই অক্টোবরে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ সম্পর্কে শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত মন্তব্য পড়ে খুশি হলাম। তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ যৎসামান্যই এবং যতটা আছে বলে তিনি মনে করেন, তার চেয়েও অনেক কম।

তিনি মনে করেন যে, আমি "ইংরেজি ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং নেহাত প্রয়োজন হলে হিন্দীকে আর একটি রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি জানাবার পক্ষে অভিমত" প্রকাশ করেছি। কিন্তু আমি তা করিনি। 'রাষ্ট্রভাষা' আখ্যা দিয়ে আমাদের কোনো একটি জাতীয় ভাষার প্রতি অসম রাজানুকূল্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে মতই আমি প্রকাশ করেছি। ইংরেজি ভাষাকে আমাদের 'রাষ্ট্রভাষা' জ্ঞান করার প্রস্তাব আমার কাছে আরও অগ্রাহ্য।

প্রশ্নটা রাষ্ট্রভাষা বা State language-এর নয়, সরকারী ভাষা বা Official language-এর। আমাদের শাসনপদ্ধতি ফেডারাল, সুতরাং এখানে সরকারী ভাষার প্রশ্ন দুটি প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে যায়—কেন্দ্রীয় সরকারের এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ভাষার প্রশ্নে। এ দুটি শাখা প্রশ্নের আমি দু রকম উত্তর দিয়েছি। রাজ্য সরকারের সরকারী ভাষা অর্থাৎ প্রত্যেক রাজ্যের সমস্ত দপ্তর আদালত ও বিধানসভার একমাত্র ভাষা সেই রাজ্যের ভাষাই হওয়া উচিত—প্রবন্ধে এই মত ব্যক্ত হয়েছে। আমার বিশ্বাস এ মত এখন প্রায় সবাই মেনে নিয়েছেন। মতভেদ দেখা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা আর সেই সঙ্গে 'আন্তর ভাষা' বা যোগাযোগের ভাষার প্রশ্নে। 'আন্তর ভাষা'রূপে যোগনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ইংরেজিকেই রাখতে চান অর্থাৎ এ বিষয়েও আমরা একমত। তাঁর সঙ্গে আমার মতানৈক্য কেবল দিল্লী সেক্রেটারিয়েটের ও কেন্দ্রাধীন অন্য সব দপ্তরের ভাষা নিয়ে। যোগনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লিখিত আমাদের ১৪টি ভাষার (সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজিকে তালিকাভুক্ত করলে ১৪টাই হয়; তাঁর ১২ সংখ্যার উল্লেখ নিশ্চয়ই অনবধানতাবশত) যুগপৎ ব্যবহারের পক্ষপাতী। আমার প্রবন্ধেও এ প্রস্তাবের উল্লেখ আছে এবং তাকে "গণতান্ত্রিক অধিকারের দিক থেকে সবচেয়ে সঙ্গত" বলা হয়েছে (৬৯২ পৃঃ)। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সরকারী লিখিত কাগজ-পত্রের এবং মৌখিক আলোচনার তৎক্ষণাৎ ১৪টি ভাষায় অনুবাদ অত্যন্ত অসুবিধাজনক ও ব্যাঘাতকারী হবে অনুমান করে আমি বিকল্প প্রস্তাবের বিবেচনায় অগ্রসর হয়েছিলাম। অন্য কারণও আছে, তার কথা পরে বলছি।

শ্রী মুখোপাধ্যায় সোভিয়েৎ রাশিয়ার নজির পেড়েছেন। সে দেশের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা আমাদের কারুরই সঠিক জানা নেই। তবে একাধিক ব্যাপারে লক্ষ্য করা গেছে যে, ওখানকার শাসন-কর্তারা আইনের পাতায় যে সব অধিকার উদারভাবে জনগণের হাতে অর্পণ করেন, কার্যত এবং প্রয়োজনমত তার নির্মম প্রত্যাহারে বিন্দু-মাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। তাদের ভাষাগত নীতি কাগজ-কলমে যা হাতে-কলমেও কি ঠিক তাই? এমন একটি দৃষ্টান্ত ধরা যাক, যে বিষয়ে আমাদের সকলের সাক্ষাৎ জ্ঞান আছে। খ্রুশ্চেভ বুলগানিন এদেশে পরিভ্রমণকালে তাঁদের সমস্ত বক্তৃতা রুশ ভাষায় দিয়েছিলেন (যদিও খ্রুশ্চেভের নিজের ভাষা উক্রাইনিয়ান)। তাদের ষোলটি ভাষাই রাষ্ট্রভাষারূপে শুধু পরিগণিত নয় ব্যবহৃত হলে কি এটা সম্ভব হত বা সঙ্গত হত? আমার ধারণা রুশ ভাষা সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে কেবল যোগাযোগের ভাষা নয়, শ্রী মুখোপাধ্যায় 'রাষ্ট্রভাষা' বলতে যা বোঝেন কার্যত তাই। কেন্দ্রীয় অধিকাংশ কাজকর্ম এই ভাষাতেই পরিচালিত হয়, কেবল কোনো কাগজপত্র অন্তর্ভুক্ত কোনো রাজ্যে পাঠাবার প্রয়োজন হলে সেই রাজ্যের ভাষায় অনূদিত হয়। এই ভাষার স্থান সেখানে বিশিষ্ট এবং অনন্য।

সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য অনেক বিষয়ে এত মৌলিক এবং বিশেষত ভাষাগত পরিস্থিতি এত বিভিন্ন (রুশ ভাষা ওখানে অন্য সব ভাষার চেয়ে অনেক গুণে বেশি অগ্রসর ও পরিব্যাপ্ত, আমাদের দেশে তেমন কোনো ভাষা নেই) যে ভাষা বিষয়ে কোনো নীতি তাদের দেশে ফলপ্রদ হলে সেটা আমাদের দেশে সরাসরি টেনে আনা যাবে এটা অবধারিত সত্য নয়। তা ছাড়া তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হলে হিন্দীকেই একাধারে আমাদের কেন্দ্রীয় ভাষা এবং যোগাযোগের ভাষা করতে হয়। সরকারী ভাষা কমিশনের মেজরিটি রিপোর্টে সোভিয়েটের নজির তুলে ঠিক এই প্রস্তাবই করা হয়েছে। স্বভাবত কমিউনিস্টরাও একই প্রস্তাব করেছেন এবং এই একই দৃষ্টান্ত চোখের সামনে রেখে।

যোগনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজিকে কেন্দ্রচ্যুত করতে চান। কিন্তু যোগাযোগের ভাষারূপে রাখতে চান। কাজের বেলা সেটা টিকবে কি? ইংরেজিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষারূপে বলবৎ রাখার পক্ষে অন্য সব যুক্তির মধ্যে একটা যুক্তি এই যে, তাহলেই ইংরেজি শেখার প্রতি আমাদের ছাত্রদের মধ্যে তবু একটু উৎসাহ দেখা যাবে। অবশ্য উপরের ক্লাসেই ইংরেজি শেখার প্রশ্ন ওঠে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষার প্রবেশ স্পষ্টতই অবাঞ্ছনীয়। বিদ্যোৎসাহী বা সাহিত্য অনুরাগী যারা, তারা হয়ত শিখবে; কিন্তু তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়ই। কোনোরূপ ব্যবহারিক সুবিধার প্রত্যাশা না থাকলে সাধারণ ছাত্ররা ইংরেজি ভাষাকে একেবারে অবহেলা করবে। অন্য গরজে এবং সাধারণের পক্ষে সবচেয়ে বড় গরজ হচ্ছে জীবিকার গরজ — যদি অনেকে ইংরেজি শেখে তবে তার ফলে যোগাযোগের একটা অবলম্বন তৈরী হয়। নইলে কেবলমাত্র যোগরক্ষার উদ্দেশে ইংরেজি শেখানো যেমন ব্যর্থ হবে যেমন অধিকাংশ ছাত্রের বেলা সংস্কৃত বা পার্শী শিক্ষা ব্যর্থ হচ্ছে এবং সে অবস্থায় ভারতীয় ঐক্য শীঘ্র বিপন্ন হবে না কি?

—আবু সয়ীদ আইয়ুব দত্ত

সূর্য সংস্করণ

অমিতাভ দাশগুপ্ত

চাঁদ ধরার স্বপ্নটা চিরকালের। সেই ছোটবেলা থেকে মানুষের লুব্ধ চোখদুটো ঘুরেছে চাঁদের আকাশে। কারণ, সূর্যের আকাশ বড় বেশী ঝলমল করে। দৃষ্টি ঠিকরে ফিরে আসে, অগ্নিগর্ভ সূর্যগোলকের দিকে চোখ পড়লে। তাই হয়ত সূর্যকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার কল্পনা কখনও কেউ করেনি।

কিন্তু আজ সেই স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে। অন্তত কল্পনার সুদূর দিগন্তে তার আভাস দেখা দিয়েছে।

হয়ত কথাটা ঠিকমত বলা হল না। হয়ত একটু ফাঁক থেকে গেছে। কারণ যে-সূর্যের স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে মানুষের মনে, বৈজ্ঞানিকের চোখে, তা শূন্যলোকের অগ্নি-গর্ভ মার্তণ্ড নয়। মানুষ নতুন সূর্যের স্বপ্ন দেখছে, যে সূর্য অগ্নিগর্ভ হয়েও মহাশূন্যে অবস্থান করবে না, যে সূর্য সৃষ্টি করবে মর্তলোকের মানুষ, অণুদেহের অমিত শক্তি দিয়ে।

শক্তি যোগাবে মানুষকে।

চকমকি ঠুকে স্ফুলিঙ্গ দেখছে যেদিন, সেদিন থেকেই বলা যেতে পারে মানুষের শক্তিসন্ধান শুরু। স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবদাহ সৃষ্টি করা সম্ভব, একথাটা যেদিন সরল সহজ ও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেদিন থেকেই নব নব শক্তির উৎস সন্ধান করেছে, আজও করে আসছে মানুষ।

তাই একদিন কয়লা হল কালো মাণিক, কেৎলিতে ফোটান জলের বাষ্প নিয়ে এল যন্ত্রযুগ, বিদ্যুৎ মানুষের ঘরে পৌঁছে দিল আধুনিক যুগের রোশনাই। আরও এগিয়ে এসে শঙ্কা নিয়ে এল অণুগর্ভ শক্তি।

কিন্তু একদিন দেখা গেল শক্তি-উৎস অফুরন্ত নয়। অনুমানে বোঝা গেল একদিন শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে ধরিত্রী। অনুমানে জানা গেল, হয়ত একশ বছর পরে ধরিত্রী অকৃপণ দানে রিক্ত হয়ে যাবে। সেদিন হয়ত পাওয়া যাবে না কালো মানিক, হয়ত নিঃশেষ হয়ে যাবে এই শক্তি-উৎস। যে উৎসধারায় উৎসারিত আধুনিক সভ্যতা।

বিজ্ঞানের সন্ধান সর্বক্ষেত্রে সর্বব্যাপী। এই অনুসন্ধান থেকে কতকগুলো জিনিস কিছুটা স্পষ্ট হয়ে যায়। দেখা যায়, অফুরন্ত তেজ ও শক্তির ভাণ্ডার এই সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত বিচ্ছুরণের স্রোত বইছে বিশ্ব-লোকে। পৃথিবীতেও প্রতিনিয়ত বইছে সেই [illegible]। কিন্তু যে তরঙ্গকে ধরে রাখবে কে? কে আহরণ করবে সূর্য উৎসারিত এই বিপুল শক্তিধারাকে?

আলবার্ট আইনস্টাইন যখন বিজ্ঞানের অনেকগুলো মামুলি ধারনাকে বিপর্যস্ত করে দিলেন, তখন থেকেই দেখা গেল সূর্য আর পরমাণু সম্বন্ধে মানুষ অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠল। শক্তির সন্ধান আরম্ভ হল সূর্য ও পরমাণুকে কেন্দ্র করে।

সূর্য উৎসারিত শক্তিস্রোত এক নয়, বিবিধ। কিছু তার সঠিক জানা গেছে, কিছুটা অনুমানও আছে। তবু সূর্যবলয় থেকে কিম্বা সূর্য গোলকের অগ্নিতেজ থেকে যে বিপুল শক্তিসম্ভারের সন্ধান মেলে, সে-সম্বন্ধে অনুমানের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সে শক্তিসম্ভারের মূল উৎস যদি ধরে নেওয়া যায় সূর্যতেজ বা তাপ, তাহলে একটা কথা খুব স্পষ্ট হয় যে, প্রচণ্ড শক্তি, সূর্য বিচ্ছুরিত শক্তির মত, বিকীরণের জন্য একটা প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

এই উত্তাপ সৃষ্টির কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে অনু-বিজ্ঞানের প্রসারে। অর্থাৎ আণবিক এবং তারও পরে উদ্‌যান বোমা বিস্ফোরণের পরে।

অণু সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা অস্পষ্ট থাকলেও বৈজ্ঞানিকদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে, অণু পরমাণুতে প্রচণ্ড শক্তি লুকিয়ে আছে। কিন্তু সে-শক্তির সঠিক রূপটা তখনকার দিনে অর্থাৎ আইন-স্টাইনের আগে জানা ছিল না।

নিউটনের যুগ পার হয়ে বর্তমান আইন-স্টাইনের যুগে এলে দেখা যাবে, আণবিক শক্তিটা চেনা অনেক সহজ হয়ে আসে। এই শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয় যখন জানা গেল, তখনই বোঝা গেল সূর্যগোলকের ভিতরে যে উত্তাপ সঞ্চিত আছে, তা এই বালুকণার মত এই পৃথিবীতেও সৃষ্টি করা সম্ভব।

এটা বিশেষ করে জানা যায় উদযান বোমা বিস্ফোরণের পর। উদযান বোমার মূল কথা হল উদযান পরমাণু সংমিশ্রণে (বিচূর্ণন নয়) 'ভারি' উদযান সৃষ্টি করা। সংমিশ্রণকে সফল করতে হলে প্রয়োজন প্রচণ্ড উত্তাপ ও বিপুল শক্তি। এই উত্তাপ সূর্যতাপের চাইতেও বেশী এবং তা পাওয়া সম্ভব বন্দুক ছোঁড়ার মত আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে।

অর্থাৎ, উদযান বোমার প্রক্রিয়া শুরু হয় আণবিক বোমার মত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। আণবিক বন্দুক ছোঁড়ার ফলেই সূর্যতাপের চাইতেও বেশী উত্তাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

কাজেই প্রশ্ন উঠতে পারে, সূর্যতাপ যদি এই ক্ষুদ্র পৃথিবীকে নিমেষে বাষ্পের মত ধোঁয়া করে দিতে পারে, তাহলে উদযান বোমার বিস্ফোরণ শুরু হয় যে উত্তাপে,

সেই তাপ পৃথিবীকে এখনও ধ্বংস করেনি কেন? এটা খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন এবং বৈজ্ঞানিকরাও এসম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। তাই উদযান বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে যে উত্তাপ সৃষ্টি করা হয়, তাকে এত ক্ষণস্থায়ী করা হয়েছে যে, এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগেরও কম সময়ের মধ্যেই এই তাপের মৃত্যু ঘটে। অবশ্য উদযান সংমিশ্রণের ফলে নতুন এক তাপের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সংমিশ্রণের তাপ প্রচণ্ডতা সংমিশ্রণ ঘটাবার তাপের মত নয়।

এই সংমিশ্রণ ঘটাবার তাপের কথাটাই বর্তমান বিজ্ঞান মহলে উঠেছে। এ-থেকেই কথা উঠেছে, সূর্যকে যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, তাহলে কাঙালীর মত কালো মানিকের মুখের দিকে পৃথিবীকে তাকিয়ে থাকতে হবে না শক্তি সঞ্চয়ের জন্য।

কথা যখন উঠেছে, কল্পনা যখন মনে জেগেছে, তখন তাকে বাস্তব রূপ দেবার প্রচেষ্টা যে হবে তা খুবই স্বাভাবিক। কারণ ধরাসূর্য যদি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, তাহলে শান্তির কাজে আণবিক শক্তিকে ইচ্ছামত প্রয়োগ করা যাবে।

তাই মার্কিন বৈজ্ঞানিক মহলে ধরা-সূর্যের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা চলেছে। এই কল্পিত ধরাসূর্যের নাম দেওয়া হয়েছে "স্টেলারেটর"। এই স্টেলারেটর থেকেই শক্তি আহরণ করা হবে অফুরন্ত-ভাবে। শিশু সূর্য সোর সূর্যের মুখ চেয়ে থাকবে না।

কিন্তু স্টেলারেটরের প্রধান সমস্যা এই প্রচণ্ড উত্তাপকে পৃথিবীর স্পর্শ থেকে আড়াল করা কারণ এই তাপকে আড়াল করে না দিলে পৃথিবীর ধ্বংসকেই ডেকে আনা হবে। শিশু সূর্যের তেজে গোটা পৃথিবীটাই ধোঁয়ার মত উড়ে যাবে।

অথচ কোন পার্থিব পদার্থ দিয়ে এই প্রচণ্ড উত্তাপের আধার সৃষ্টি করা অসম্ভব। কারণ সমস্যা ঐ একই। উত্তাপের আঁচ আধারের পদার্থ আর পদার্থ থাকবে না। অথচ উদযানের সংমিশ্রণে যে তাপ সৃষ্টি করা হয়, তা মানুষের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন। যদি নতুন কোন শক্তি-উৎসের প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে এই উত্তাপকে এমন কোন আধারে রাখতে হবে, যার গায়ে তাপের আঁচ লাগবে না।

এমন একটা অসম্ভব কথাও বৈজ্ঞানিকরা চিন্তা করছেন। তাঁরা মনে করেন, চুম্বকের অদৃশ্য বাহু দিয়ে যদি কোন নিশ্ছিদ্র আধার প্রস্তুত করা সম্ভব হয়, তাহলে সমস্যার সমাধান হতে পারে। দু চারটে এইরকম চুম্বক বাহুর আধার পরীক্ষাও করা হয়েছে, কিন্তু জানা গেছে তা এখনও নিশ্ছিদ্র করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা আশা করছেন, শীঘ্রই তা সম্ভব হবে, যার ফলে 'স্টেলারেটর' বা শিশু সূর্য হয়ত বাস্তব রূপ নিতে পারবে।

বৃটেনেও সম্প্রতি উদযান দিয়ে এইরকম শক্তি উৎপাদনের জন্য অগ্নিগোলক সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চলেছে। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন 'জেটা'।

অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে সূর্যের আধুনিক ও পার্থিব সংস্করণ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চলেছে বিজ্ঞানী মহলে। আকাশ রইলো কল্পলৌকিক, ধরাতলে ধরাসূর্য।

অনুযুগে অসম্ভব কিছুই নয়।
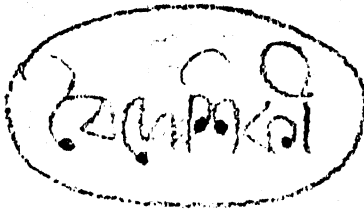
অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করে জগৎবাসীকে বিস্মিত করেছিলেন। তারপর একমাস গত হবার পূর্বেই তাঁরা মহাকাশে দ্বিতীয় উপগ্রহ ছেড়েছেন। এটির সংবাদ আরো বিস্ময়কর। প্রথমটির ওজন ছিল প্রায় সোয়া দু'মণ। এটির ওজন তার সাড়ে ছ'গুণেরও বেশি। দ্বিতীয়টির কক্ষপথের দূরত্ব পৃথিবী থেকে ৯৩০ মাইল, অর্থাৎ প্রথমটি যত দূর দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে, দ্বিতীয়টি তার প্রায় দ্বিগুণ দূর দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। উভয়ের গতিবেগ একই—ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল। সুতরাং একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে দ্বিতীয়টির প্রথমটির চেয়ে বেশি সময় লাগছে। আধ টন ওজনের দ্বিতীয় উপগ্রহটিকে যে রকেটের সাহায্যে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তার ওজন পাঁচশত টনের কম হবে না বলে অনুমিত হয়। সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কথা হচ্ছে এই যে, এই দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহের ভিতর একটি জীবন্ত কুকুর পাঠান হয়েছে এবং সেই কুকুরটিকে জীবন্ত অবস্থায় আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই আশা যদি ফলবতী হয়, তবে মহাশূন্য দিয়ে মানুষের ভ্রমণও সম্ভব হবে বলে ধরা যায়। এই দ্বিতীয় উপগ্রহ রাশিয়ায় বিজ্ঞানের উন্নতির যে প্রমাণ দিয়েছে, তা থেকে অনেকে মনে করছেন যে, সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে রকেট দিয়ে চাঁদ স্পর্শ করা এখন একটা সম্ভবপর ব্যাপারের সীমানার মধ্যে এসে গেছে।

মানুষের মস্তিষ্কের শক্তির এই সমস্ত আশ্চর্যকর প্রমাণে মানুষ উৎফুল্ল হবে, এইটাই স্বাভাবিক। সুস্থ দেহের সামঞ্জস্যপূর্ণ শক্তির প্রকাশ দেখে মনে যে আনন্দবোধ হয়, সেটা কলারস উপভোগের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু বিকারের রোগীর বলবৃদ্ধি আতঙ্ক সৃষ্টি করে। আজ নিখিল মানবসমাজ সুস্থ অবস্থায় নেই। তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষের স্রোত বইছে। এক অংশে সঞ্চারিত শক্তি অন্য অংশে বিভীষিকা সৃষ্টি করে। সুস্থ দেহের অঙ্গসমূহের মধ্যে দান-প্রতিদানের ব্যবস্থা অসুস্থ দেহে ঘাত-প্রতিঘাতে পরিণত হয়। এক দেশের উল্লাসের ধ্বনি অন্য দেশে হাহাকারের প্রতিধ্বনি জাগায়। নব আবিষ্কার—যে আবিষ্কারের মধ্যে মানুষের অপরকে আঘাত করার শক্তিলাভের সুযোগ নিহিত আছে—তাতে কখনো সম্পূর্ণ স্বস্তিবোধ করা যায় না। কারণ শক্তি কতটা মঙ্গল এবং কতটা অমঙ্গলের কাজে নিয়োজিত হবে, তা কেউ জানে না।

এই অস্বস্তিবোধের পরিমাণ অবস্থা অনুসারে কম-বেশি হয়। মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় যে, যে কোন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হোক সেটাকে যুদ্ধশক্তি বৃদ্ধির কাজে লাগানো যায় কিনা, তার চেষ্টা শাসক সম্প্রদায় সর্বদেশে এবং সর্বকালে করেছে। এই কারণে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চিরকাল রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এসেছে। যুদ্ধের সময়ে এটা বেশি প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। অন্য সময়ে এটা তত চোখে পড়ে না। তখন বিজ্ঞানের আবিষ্কার যে দেশেই হোক, তাকে মানবের কীর্তি হিসাবে সানন্দে অভিবাদন জানাতে মানুষের বাধে না। কিন্তু যখন যুদ্ধ চলছে অথবা যুদ্ধের আশঙ্কা প্রবল তখন মানুষের মনের অবস্থা অন্যরকম হয়। তখন অন্যপক্ষের বৈজ্ঞানিকদের সাফল্য ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। তখন বিপক্ষের বৈজ্ঞানিক সাফল্যকে মানববুদ্ধির জয় বলে মনে হয় না, শয়তানের কর্ম বলে মনে হয়। গত মহাযুদ্ধের সময়ে ভি—১, ভি—২-এর আবির্ভাবে বিপন্ন পক্ষ জার্মান বৈজ্ঞানিকদের মানববুদ্ধির জয়যাত্রায় অগ্রণী বলে সাধুবাদ জানায় নি, তাদের দানবের দোসর বলে মনে করেছে। অন্যদিকে অ্যাটম বোমার মার যারা খেয়েছে, তাদের কাছে তার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্তাদের নিশ্চয়ই দেবদূত বলে মনে হয় নি। বড়োদের মধ্যে "গরম যুদ্ধ" এখন

নেই, কিন্তু "ঠাণ্ডা লড়াই" চলছে এবং তারই তাড়নায় ভি—১, ভি—২, অ্যাটম বোমাকে বহু পশ্চাতে ফেলে বৈজ্ঞানিকগণ এতদূরে এগিয়ে এসেছেন যে, এখন মহাযুদ্ধ ঘটলে মানবজাতিরই নির্মূল ধ্বংস হবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাতেও যুদ্ধের প্রস্তুতির বিরাম নেই। কৃত্রিম উপগ্রহের দ্বারা সোভিয়েট সামরিক শক্তির যে পরিমাণ সূচিত হচ্ছে, তার সমান শক্তিলাভের চেষ্টা মার্কিন-পক্ষ অপরিহার্য বলে মনে করছে। অথচ সেই শক্তির প্রয়োগ উভয়পক্ষসমেত সমস্ত মানুষের ধ্বংসের দায়িত্ব না নিয়ে করার উপায় নেই।
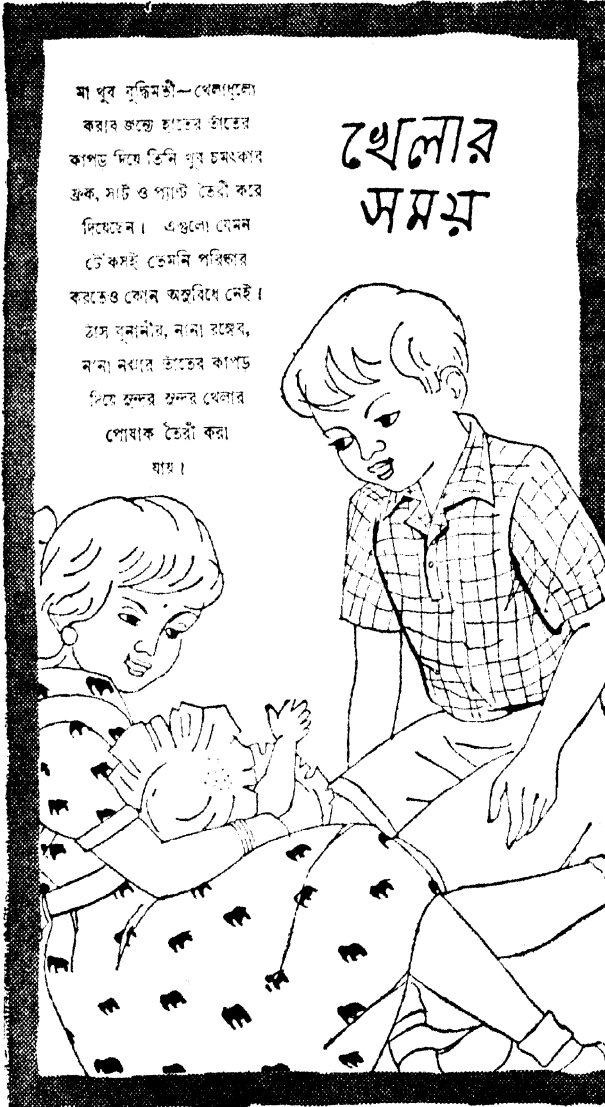
বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত শক্তি মঙ্গল কার্যে নিয়োজিত করা যায় এবং মানুষ যখন দেখছে যে, এই শক্তির সামরিক ব্যবস্থার মানবজাতির অপমৃত্যু ডেকে আনবে, তখন তার চৈতন্য উদয় হবে—এই আশাই এখন ভরসা, কিন্তু এই আশার জোরে কতখানি নিশ্চিন্ততবোধ করা যায় জানি না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা শক্তিলাভ মানব-ইতিহাসে নূতন নয়। বহু পূর্বেই মানুষ যে পরিমাণ শক্তিলাভ করেছে, তা যদি কেবল মঙ্গলকার্যে নিয়োজিত হোত, তবে পৃথিবীতে কোথাও হয়ত আজ দারিদ্র্য-দুঃখ থাকত না। অ্যাটম-যুগের পূর্বেই মানুষ এত ভৌতিক শক্তির সন্ধান পেয়েছিল যে, মানবের বাহ্য সচ্ছন্দতা লাভের পক্ষে তাই যথেষ্ট হোত। কিন্তু মানুষ বিজ্ঞানলব্ধ শক্তিকে কেবলমাত্র রচনাত্মক কার্যে নিয়োজিত করে নি, তার বহুলাংশ যুদ্ধে, অপরের উপর প্রভুত্ব-সৃষ্টির জন্য ব্যয় করেছে। তাছাড়া আর একটা বড়ো কথা আছে। মানুষ থামতে পারে নি, শক্তির সন্ধানে ক্রমাগত চলেছে, একটা আবিষ্কার ডাকে আর একটা আবিষ্কারে টেনে নিয়ে চলেছে। আর দরকার নেই বলে সে কোথাও থামবে যেন সে উপায় নেই।

বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে স্ববশে আনছে, মানুষ প্রকৃতির উপর জয়ী হচ্ছে—'বিজ্ঞানের যুগে' এই রকম শুনতে এবং বলতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু এটা কি সত্য? মানুষ কি প্রকৃতির অন্তর্গত নয়? প্রবাল কীটের দেহের দ্বারা প্রবাল দ্বীপ তৈরী হয়, সেটা প্রবাল কীটের ইচ্ছায় নয়। মানুষের "বিজ্ঞানের" উদ্ভবও যে প্রকৃতির কোন কাজে লাগার জন্য হয়নি, তা কে বলতে পারে? হয়ত এমনও হতে পারে যে, পৃথিবীকে কয়েক টুকরো করে দেবার জন্য মানুষের মস্তিষ্ককে প্রকৃতি কাজে লাগাবার আয়োজন করছে।

তা না হলে মানুষের মধ্যে এমন অসামঞ্জস্য দেখি কেন? যে দেশে মানুষের মস্তিষ্ক এমন অত্যাশ্চর্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে, সেই দেশের সেই মানুষই কর্তার হুকুমে আজ যাকে উত্তম বলে গলায় মাল্য দিচ্ছে, কাল তাকে অধম বলে গায়ে ধুলো দিচ্ছে। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এবং দ্বেষের ভাব একই মস্তিষ্ক থেকে কেমন করে উদ্ভূত হয়? জুকভ-সংবাদ ও উপগ্রহ-সংবাদের মধ্যে মিল কোথায়? বোধ হয় প্রকৃতির উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে মিলের কোন প্রয়োজন নেই।

৫।১১।৫৭

প্রবন্ধ-সাহিত্য

স্বদেশ ও সংস্কৃতি—বুদ্ধদেব বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা-১২, আড়াই টাকা।

বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত, গত দশকে রচিত মোট এগারোটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে এই বইখানিতে। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর মসৃণ ভাষা এবং কোনোকোনো অংশে তাঁর অভ্যস্ত ব্যক্তিগত ধারণার একটু বেশি জোর সত্ত্বেও তাঁর সেই বিশেষ রীতিরই বিশেষ আকর্ষণ মুগ্ধ করে। এই সংকলনের প্রত্যেকটি প্রবন্ধে সেই অনন্যতার স্বাক্ষর আছে। ১৯৫৬ সালের প্রজাতন্ত্র-দিবস উপলক্ষে নয়াদিল্লীর বেতার কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কবি সম্মেলনে ভারতীয় কবিতা পাঠের প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধটির মধ্যে তিনি বাঙালী মনের সংবেদনশীলতার কথা তুলেছেন এবং সেখান থেকে এগিয়ে গেছেন ভারতের ভাষাগত ও জীবনধারাগত বিচিত্রতার প্রসঙ্গে। 'ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক অসাম্য রয়েছে তার নিরসন প্রত্যেক প্রদেশবাসীর আপন দায়িত্ব বলে মনে করা চাই। কোনো ভাষার সবচেয়ে বড়ো বিজ্ঞাপন তার সাহিত্য, তার পৃষ্ঠপোষক রাজশক্তি নয়।' তাঁর এ মন্তব্যের সারবত্তা সন্দেহাতীত। শুধু ভাষা সমস্যা সম্বন্ধেই নয়,—তাঁর গ্রন্থনাম-চিহ্নিত এই প্রথম প্রবন্ধটির মধ্যেই আমাদের সংস্কৃতির আধুনিকতম নানা দিকের কথা আছে এবং সেই সব কথার স্বাদ কেবল মিষ্টিও নয়, অবিমিশ্র ঝালও নয়। তাতে প্রবীণ মনের চিন্তাও আছে, আবার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার তীব্রতাও আছে। 'বাঙালি লেখক আজ সব দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ; তাঁর কোনো সমাজ নেই, সংসর্গ নেই, আবহাওয়া নেই; তাঁর রচনা যাচাই করার, গ্রহণ করার প্রত্যাখ্যান করার জন্য কোনো প্রাণবন্ত পরিমন্ডল নেই।' —তাঁর এ মন্তব্য পাঁচজনে মানবেন কি না জানি না, তবে একথা তাঁর মতন অকৃত্রিম সাহিত্য শিল্পীর কলম থেকে নিঃসৃত হতে দেখে আমরা যার-পর-নাই খুশি হয়েছি। 'একটি নতুন ভালো কবিতা লেখা হলে আরো কয়েকটি নতুন ভালো কবিতা রচিত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যথার্থ অনুমোদন ও যথার্থ বিরুদ্ধতা, দুটোই উপকারী, প্রথমটা অপরিহার্য। বাংলাদেশে কোনোটাই নেই;—তাঁর এই সব মন্তব্য অকুন্ঠ এবং সময়োচিত। 'বাংলাদেশের সং লেখককে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হয়ে টিঁকে থাকতে হয়—অবস্থাটা যেন নিজেকে নিজে আহার করে বেঁচে থাকার মতো'—এ উক্তি মর্মান্তিকভাবে সত্য!

'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' এবং 'ভাষা ও রাষ্ট্র'—এ-বইয়ের পর-পর দুটি প্রবন্ধেরই রচনাকাল ১৯৫৬। ভাষার সঙ্গে জাতীয়তার সম্পর্কের কথা তুলে অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডের ওপর জার্মান ভাষার আধিপত্যের পাশাপাশি বেলজিয়ামের ওপর ফরাসী ভাষার দাবীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তিনি জার্মান ও ফরাসী ভাষার দ্বারা প্রশাসিত দেশগুলির যথোচিত স্বাতন্ত্র্যের অভাব সম্বন্ধে ইশারা করেছেন; 'রাষ্ট্র ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে, কিন্তু ভাষা ছাড়া পারে না'—তাও বলেছেন এবং সেই সঙ্গে লেখকের বা সাহিত্যিক-মনের সত্যিকার দেশপ্রেম যে পেশাদার রাজনীতি ব্যবসায়ীর কিংবা প্রচলিত-অর্থে 'দেশপ্রেমিক'দের অভ্যস্ত দেশপ্রেম নয়, সে বিষয়ে আত্মচিন্তা স্পষ্ট করে তিনি লিখেছেন যে 'লেখকের মতো এমন অনিচ্ছুক ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক আর নাই।' পৃথিবীর দূর দূর দেশের মধ্যে ভাষাগত আত্মীয়তার উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি উত্তর-আমেরিকা ও ইংলন্ড, দক্ষিণ-আমেরিকা ও স্পেন ইত্যাদির কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ইংরেজ আমলে ব্যবহৃত 'ভার্নাকুলার' ও বর্তমানে ব্যবহৃত 'আঞ্চলিক' বিশেষণে বিশেষিত বাংলা, মারাঠি, তামিল প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির অবাঞ্ছিত মর্যাদাহানিতে তিনি খুবই সঙ্গতভাবে দুঃখিত হয়েছেন এবং আমরা তাঁর সঙ্গে একবাক্যে একথা মেনে নিতে পেরে সুখী বোধ করব যে 'আজ ভারতের প্রত্যেক ভাষা পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, চায় আত্মবিকাশের চরম অধিকার, নিজেকে ফলিয়ে তুলতে চায় বহুতম কর্মজীবনে।......বিভিন্ন পক্ষের বৈশিষ্ট্য লোপ করে দিয়ে মিতালি গড়ে ওঠে না; চারিদিকে ঐশ্বর্য বিকশিত হলেই সত্যিকার মিলন সম্ভব হয়।'

এ-বইয়ের বাকি ন'টি প্রবন্ধই আরো ঘনিষ্ঠ-ভাবে সাহিত্য-সম্পর্কিত। নামের ইশারায় 'চার্লস চ্যাপলিন' যদিও এর ব্যতিক্রম বলে মনে হয়,

প্রবন্ধটি পড়ে দেখলেই সন্দেহ মিটে যায়। 'নাটক আর উপন্যাসের মধ্যবর্তী স্থান নিয়েছে সিনেমা—এই মন্তব্য বিশদ হয়ে উঠেছে চ্যাপলিন প্রতিভার আলোচনাসূত্রে। 'ইংরেজি সাহিত্য ও আমরা' প্রবন্ধটিও ভাবনা জাগিয়ে তোলে। 'টমাস মান' এবং 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' লেখা দুটিও তাঁর বিশ্বসাহিত্য-রসিক বড়ো দৃষ্টিরই পরিচয়বাহী। এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে-উপন্যাসে একদিকে 'অলৌকিকের উদ্ভাস' অন্যদিকে সামাজিক বস্তুসত্যের আলোক সম্বন্ধে এই অতি-সংক্ষিপ্ত রচনাটি হয়তো পরে কোনো সময়ে আরো বিস্তারিত রূপ নেবে, বই শেষ হবার পরেও এমনি একটি আশা জেগে থাকে। ৩৭৯।৫৭

ভ্রমণ-সাহিত্য

পথ চলি—মনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

গল্প উপন্যাসের অভ্যস্ত পথ ছেড়ে মনোজ বাবু সম্প্রতি নাটিকা ও ভ্রমণ-বৃত্তান্তের দিকে ঝুঁকেছেন। গত কয়েক বছরে তিনি যেসব দেশ ভ্রমণ করেছেন, তারই সরস চিত্র আজকাল পরিবেশন করছেন। এই ধরনের রচনার জন্য তিনি একটি মনোমত ভঙ্গী ব্যবহার করেছেন যার মধ্যে নিছক মজলিশী চঙ, নিছক কথকতার সুর আছে। প্রকাশক এ বইখানিকে "পরমাশ্চর্য সৃষ্টি" বলে বর্ণনা করেছেন ও বলেছেন "নগণ্য গ্রামজীবন থেকে শুরু করে অশেষ পৃথিবী পারের উত্তাস।" বিজ্ঞাপনে অত্যুক্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। পরমাশ্চর্য সৃষ্টি বলতে যে কোনো সৃষ্টির পাঠকই বিভ্রান্ত হবেন। তবে বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে অভিজ্ঞতার বর্ণনায় দেশের গ্রামজীবনের যে খণ্ডচিত্রগুলি গ্রন্থকার এঁকেছেন, সেগুলি আরও উজ্জ্বল ও মধুর মনে হয়। তবে এখানে মনোজ বসুর দৃষ্টিভঙ্গী ও বক্তব্য নিতান্ত মামুলি অথবা আত্মকেন্দ্রিক নয়। ৩৭৬।৫৮

অনুবাদ-সাহিত্য

হারানো স্কুলে—আলফাঁস দোদে। অনুবাদক জ্যোতিশঙ্কর সেন। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২। দাম ১·২৫ নয়া পয়সা।

আজকাল অনেক বই বাংলায় অনুবাদ করা হয়, তার মধ্যে অনেকগুলি অক্ষম এবং মূল-গ্রন্থকে ঠিকমত অনুসরণ করেন না। সেদিক থেকে জ্যোতিশংকরবাবু মৌলিক আখ্যানের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রক্ষা করেছেন। দোদের অনুরাগী পাঠকের কাছে 'শেষ নিভারনে' গল্পটি সুপরিচিত। অনুবাদক এখানে তার ইংরেজী রূপ থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত করেছেন এবং সে কাজে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শিশু-পাঠ্য বাংলা বইয়ের জগতে এই নতুন ধরনের গল্পটি এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বইখানি পড়ে ছোটরা তো বটেই, বড়রাও তৃপ্ত হবেন। ৩৭০।৫৭

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

কয়েকটি রং—সুরেশ ঘোষ।

অভিনয়-নাটক-মঞ্চ—শম্ভু মিত্র।

যোগান্ত—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।

পরিণতি—রবীন্দ্র কর।

কেরালার গল্পগুচ্ছ—বি হিরণ্ময়ম্।

রাঙা প্রভাত—আবদুল হাকিম।

শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্জাবিধি—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন;

এক রাত্রির কাব্য—অশোক গুহ।

দর্শন প্রসঙ্গ—ইন্দুভূষণ মজুমদার।

হিং টিং ছট্—(১ম খণ্ড) কামাখ্যারঞ্জন সেন।

আজব পাখী—মুরি, সোটাক অনুবাদক রেখা বিশ্বাস ও অমলাকান্ত দত্ত রায়।

আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান—শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়।

দেবাঃ ন জানন্তি—শ্রীতারাপদ রাহা।

ছোটদের পঞ্চতন্ত্র—শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক।

Centenary Souvenir of the Indian War of Independence—Sarkar Sen Gupta.

The Order—Paramhansa Paribrajak-acharyya.

জীব ও জঠর—সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বুদ্ধ বোধিকা—রামকান্ত ভট্টাচার্য।

ময়ূরাক্ষী—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী।

অথ ভারত কথকতা—১ম পর্ব—শ্রীকথক ঠাকুর।

গল্প আর গল্প—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

অলি ভুলির দেশে—সুখলতা রাও।

বিদেশিনী—শেখর সেন।

ছন্দের পাণি—সত্য গুপ্ত।

মরু ভাস্কর—কাজি নজরুল ইসলাম।

শিশুর জীবন ও শিক্ষা—শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য।

হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীব্রজনন্দন সিংহ।

সাত পাক—দীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

এলো আহ্বান—সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়।

পদাবলী—শিবেন্দু মোদক।

নবজীবন—কণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

—শৌভিক—

বাস্তবের পটে ছবি তোলা

বর্তমানে নির্মীয়মান বাঙলা ছবির তালিকায় অন্তত কুড়িখানির নাম করা যায় যেগুলির পুরো বা অনেকটা অংশ খোলা জায়গায় প্রাকৃতিক পটে তোলার জন্য নির্দিষ্ট। বলা বাহুল্য এটা "পথের পাঁচালী"র প্রভাব। এখনকার চিত্রনির্মাতারা বুঝে নিয়েছেন যে, বাস্তবকে নিয়ে ছবি তুলতে গেলে স্টুডিওতে তৈরী সেটে চলবে না, বাস্তব যেখানে অকৃত্রিম রূপ নিয়ে পড়ে রয়েছে সেখানে চরিত্রকে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলতে হবে। খাঁটি বাস্তবকে ছবিতে প্রকাশ করবার এই হলো রীতি সন্দেহ নেই, কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে, প্রাকৃতিক পটকে ছবির প্রয়োজনানুসারে ঠিকভাবে গেঁথে গেঁথে গল্পের বক্তব্যকে ভাষান্তরিত করে নেওয়া বড়ো সোজাও কাজ নয়। দৃষ্টি ও বাছাই শক্তি রীতিমতো প্রখর ও শিল্পবিচারসম্পন্ন না হলে গল্পকে মানিয়ে যথাযথ দৃশ্যরচনা সম্ভব নয়। কাজেই বাইরে খোলা জায়গায় ছবি তোলা হলেই যে সেটা বাস্তবচিত্র হয়ে উঠবেই, সেটা মোটেই সত্যি নয়। প্রাকৃতিক পটকে ছবিতে অবলম্বন করতে যারা চাইছেন তাদের অনেকেই এগিয়ে এসেছেন হুজুগে মেতে। তাদের কাছে প্রাকৃতিক পটে ছবি তোলাটাই হচ্ছে "পথের পাঁচালী" বা "অপরাজিত"র সমান হয়ে ওটা। কাজেই গল্পও তারা বেছে নিচ্ছেন ঐ মনে করেই। পাড়াগাঁ গাছপালা, মেঠো পথ, মেটেবাড়ি, আদল গা, পানাপুকুর, পদ্মবন, বাঁশের সাঁকো, ক্ষেত খামার কাশবন ইত্যাদি দেখাবার সুযোগ থাকলে সে-গল্পেরও পার নেই, আর তাছাড়া যেন বাস্তবচিত্রও হবার নয়। দলে দলে ছুটছেন চিত্রনির্মাতারা গ্রামাঞ্চলে ছবি তোলার জন্য। ভাবটা এই, বাস্তবচিত্র তোলার কায়দাটা তাঁরা সবাই রাতারাতি আয়ত্ত করে ফেলেছেন। এর একটা ভাল দিক হচ্ছে যে এখনকার চিত্রনির্মাতাদের মধ্যে একটা নতুন চেতনা এসে পড়েছে, বাস্তবধর্মীতার চেতনা। কিন্তু ভাববার বিষয় হচ্ছে, বাস্তবকে সাজিয়ে আর্টের সৃষ্টিতে পরিণত করে তোলার ক্ষমতা তাদের কজনের মধ্যে আছে? বাস্তব মানে পাড়াগাঁ, মাঠঘাট বুঝে তোলে এখনকার যে দৌড় আরম্ভ হয়েছে তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া আসতেও দেরী হবে না। এটা অবশ্য ঠিক যে, আমাদের দেশের পনের আনা অংশই গ্রাম নিয়ে কাজেই আমাদের দেশের প্রকৃত রূপ চিত্রায়নে গ্রামজীবনটাই বেশী করে এসে পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবকে বোঝাতে ও অনুভব করতে সবায়েরই দৃষ্টি-ভঙ্গী যদি একই থেকে যায়, চিন্তা একই কোণ বেয়ে চলতে থাকে, তাহলে একঘেয়েমী এসে পড়তে দেরী লাগবে না। আসলে, দেখে দেখে অনুসরণ বা অনুকরণ করে যাওয়াটাই
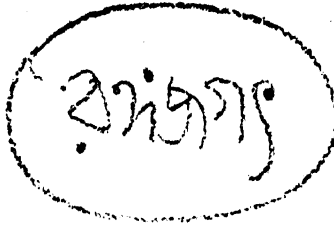
আদর্শ চিত্রের অনুগামী হওয়া নয়, বাস্তবকে মনেপ্রাণে নিবিড়ভাবে অনুভব করার প্রেরণা ছাড়া বাস্তবচিত্র তুলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। আরো একটা সমস্যা আমাদের আছে। প্রাকৃতিক পটে ছবি তোলার সুবিধাজনক সরঞ্জামের বড়ো অভাব আমাদের। স্টুডিওর সংকীর্ণ পরিসরে ছবি তুলতে যা সব সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়, সেই একই সরঞ্জামের সাহায্যেই প্রাকৃতিক পটের বিস্তৃত ক্ষেত্রেও ছবি তোলার ব্যবস্থা। ক্যামেরাকে সর্বক্ষণ প্রাকৃতিক আলোর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। সে আলো ক্যামেরাম্যানের হুকুম মেনে চলবার নয়, প্রাকৃতিক নিয়মে তার তেজের তারতম্য ঘটে। ফলে ছবি তোলার কাজ হয় রুখে রুখে, আর দৃশ্যকেও সংক্ষিপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে রচনা করতে হয়। অনেক সময়ে ধৈর্য ও চেষ্টা সত্ত্বেও দৃশ্যাতে আলোর সমতা মানিয়ে যাওয়াও অসুবিধে ঘটে। শব্দগ্রহণের দিকেও অসুবিধা আছে; বহির্দৃশ্যে তোলা অংশের সংলাপ সমানভাবে স্পষ্টতা রেখে গিয়েছে এমন ছবি তো মনেই পড়ে না। এসব অসুবিধে দূর করবে কে?

পুজোর পর কটা সপ্তাহ ছবির বাজার, বিশেষ করে বাঙলা ছবির বাজার একটু যেন নিষ্প্রভ গেল। হিন্দী ছবি 'আশা', 'নয়া দৌর' এবং গতপূর্ব সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মাদার ইণ্ডিয়া' তবু বাজার জাঁকিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। বাঙলা ছবির বাজার পুজোর কদিন অপ্রত্যাশিত রকমের ভাল গেলেও তারপর থেকেই যেন ঝিমিয়ে পড়েছে; এক 'অন্তরীক্ষ' ছাড়া উল্লেখযোগ্য বাঙলা নতুন ছবি মুক্তিও লাভ করেনি গত কসপ্তাহে। এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে দুখানি বাঙলা ছবি —'কড়ি ও কোমল' এবং 'মাধবীর জন্য' আর হিন্দীতে হয়েছে 'অব দিল্লী দূর নেহি' ও 'কাঠ পুতলী'। 'অব দিল্লী দূর নেহি'র নির্মিয়মান অবস্থায় পরিচালক অমিয় চক্রবর্তীর আকস্মিক পরলোকগমন হয়, ছবিখানি তোলা সমাপ্ত হয় নীতিন বসুর পরিচালনায়। "মাধবীর জন্য" ছবিখানিরও পরিচালক নীতিন বসু।

বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে গল্প বোনা

"পথের পাঁচালী" দ্বারা সরাসরিভাবে প্রভাবান্বিত একটি উল্লেখযোগ্য চিত্রসৃষ্টি সিনে আর্ট প্রডাকসন্সের প্রথম ছবি, রাজেন তরফদার পরিচালিত "অন্তরীক্ষ"। বাস্তব-ধারায় ছবি তোলার একটা অসুবিধে যে "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত" দর্শকমনে এমন একটা নিরিখ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে, ঐ ধারায় কোন ছবি দেখতে বসলেই তুলনা-মূলক বিচার এসে পড়বেই, আর সে নিরিখে কোন ছবির কৃতিত্ব কিছু বিচ্যুত হলে আর রক্ষে নেই। "অন্তরীক্ষ" এসে উপস্থিত হয়েছে এই হেণ্ডিক্যাপের মধ্যে। একেবারে নতুন লোকের তোলা প্রায় তারকা-বিহীন এমন ছবি সম্পর্কে দর্শক-সাধারণের মনে বিশেষ রকমের ঔৎসুক্য জাগবার কথা নয়, কিন্তু এ ছবিখানি তার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। কেমন যেন আগে থেকেই রটে যায় যে এ ছবি আসছে 'পথের পাঁচালী'র সঙ্গে পাল্লা দিতে, হয়তো 'পথের পাঁচালী'র পরিচালকের মতো এ

ছবিরও পরিচালক একটি বড়ো প্রচার প্রতিষ্ঠানের আর্ট-ডিরেক্টর বলে, যে কারণেই হোক, ছবিখানি চিত্ররসিক জনসাধারণকে দু বছর ধরে খুব একটা উঁচু আশা ধরে রেখে দিতে সক্ষম হয়। সে আশা পূরণ হওয়া খুবেই অপ্রত্যাশিতই ছিল এবং তা হয়ওনি, কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র সংগে তুলনা থেকে হঠিয়ে নিয়ে বিচার করলে 'অন্তরীক্ষ'কে আমাদের দেশের নিরিখে স্বাগতম জানাবার মতো একটি অসাধারণ সৃষ্টির লক্ষণসম্পৃক্ত ছবি বলে অভিহিত করা যায়। বহুগুণে আছে ছবিখানির যা পরিচালক রাজেন তরফদারের প্রভূত সম্ভাবনাযুক্ত প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে ধরা যায়। ছবিতে শিল্পব্যক্তিত্বেরও কিছু ছাপ পাওয়া যায় যা আর আর পাঁচটা ছবির ভীড়ের মাঝেও 'অন্তরীক্ষ'র বৈশিষ্ট্য চোখে ধরিয়ে দেয়। প্রভূত পরিশ্রমই শুধু নয়, শিল্পীক চিন্তা প্রয়োগে প্রতিটি দৃশ্যের বিশিষ্ট রূপ প্রণয়নেও শিল্পকৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ছবিখানিতে। কিন্তু ত্রুটি হয়েছে গল্পকে সাসপেন্স গড়ে তোলায় পদে পদে কেবলই বিভ্রান্তি সৃষ্টির পথ অবলম্বন করে ফেলে, আর গল্পের প্রয়োজনের চেয়ে পরিবেশটা বেশী বেশী করে গেঁথে যাওয়ার জন্যে। ছবিখানি শেষ পর্যন্ত তাই মনকে তেমনভাবে আঁকড়ে নিতে পারে না।

• • •

ছবির আখ্যানবস্তু গাঁথা হয়েছে তুলসী লাহিড়ী পরিকল্পিত একটি কাহিনীর সূত্রে ধরে। স্বল্প ঘটনার সামান্য গল্পটি হচ্ছে স্বামী পরিত্যক্তা এক বাল্যবিবাহিতা কন্যার পুনর্বিবাহ নিয়ে। জমিদারের পোষ্যপুত্র-রূপে মানুষ জয়ন্ত, আর গ্রামের পুরোহিতের কন্যা বাণী পরস্পরকে ভালবাসে ছেলে বয়েস থেকেই। জমিদার গৃহিণী জয়ন্তর জন্য পাত্রী হিসেবে বাণীকেই নির্বাচিত করলেন। একদিন বিয়েও হয়ে গেল ওদের। পরে এলো জমিদারপুত্র নরেন্দ্রের বিবাহ। বেশ বড়ো গোছের উৎসব হবে, সাহেবসুবো আসবে তাই জমিদার ব্যবস্থা করলেন বাইজী নাচের। বেনারস থেকে ভালো বাইজী বায়না করে আসার ভার পড়লো জয়ন্তর ওপর। বেনারসে বাইজীর বাড়িতে যেতে পথে জয়ন্তর পকেটমারা হয়ে মনিব্যাগটা চলে গেল। জয়ন্ত গ্রামে ফেরবার পর এক-দিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হলো এক পাষণ্ড। নাম বললে গগন গাঙ্গুলী এবং জয়ন্তর স্ত্রী সম্পর্কে অনেক গোপন কথা সে নাকি জানে। একসময়ে জয়ন্তকে ডেকে গোপন কথাটা গগন জানিয়েও দিলে। একটা আশঙ্কায় জয়ন্ত অভিভূত হলো। গগন বলে পঁচিশ হাজার টাকা পেলেই সে প্রমাণপত্র জয়ন্তর হাতে সমর্পণ করে দেবে। অতো টাকা জয়ন্ত পাবে কোথায়! কাজ নিয়ে আর হিসেব সামলাতে নায়েব ব্যস্তার। টাকার ভার পড়লো জয়ন্তর ওপর; জয়ন্ত হাতে টাকা পেয়ে গগনের কথা ভাবে। স্কুলের মঞ্জুরীর টাকাটা দিয়ে আসার ভার পড়লো জয়ন্তর ওপরে। জয়ন্ত সন্তানসম্ভবা বাণীকে নিয়ে রওনা হলো। জয়ন্ত পালিয়ে যাচ্ছে ভেবে গগন পিছু নিলে। মাঝপথে দুজনে হাতাহাতি। পুলিস এসে রাজ-বাড়িতে খবর দিলে গগনকে খুনে করার জন্য জয়ন্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সন্দেহ করা হলো যে গগনের সংগে ষড়যন্ত্র করে জয়ন্ত টাকা নিয়ে সরে পড়তে যাচ্ছিল এবং পথে ভাগীদার গগনকে হত্যা করে একাই সব মেরে নিতে চেয়েছিল। জমিদার মহেন্দ্র-প্রতাপ তহবীল তছরূপের চেষ্টা বলেই ধরে নিলেন। জমিদার গৃহিণী গেলেন বাণীকে নিয়ে আসতে। জয়ন্ত হাজতে কোন কথারই জবাব দেয় না। ইতিমধ্যে নরেন্দ্র আর পুরোহিত গগনের জিনিসপত্র খুঁজে স্যুট-কেশ থেকে একখানি চিঠি উদ্ধার করলে। জমিদার গৃহিণী বাণীকে আনলেন তার পিতৃগৃহে; ডাক্তারের ব্যবস্থা হলো। পুরো-হিত চিঠিখানি নিয়ে হাজির হলো জমি-দারকে দেখাবার জন্যে, কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপ কিছুতেই দেখা করতে চান না। শেষে পুরো-হিতের অটল প্রতিজ্ঞা দেখে দেখা করলেন। গগনের স্যুটকেশ থেকে পাওয়া চিঠি পড়তে ব্যাপার পরিষ্কার হলো। চিঠিখানি ছিল বাণীর দিদিমা সৌদামিনী দেবীর লেখা। তাতে তিনি জানিয়েছেন যে গগন গাঙ্গুলী নামক এক ব্যক্তির সংগে সাত বৎসর বয়স্কা বাণীর বিয়ে দেন, কিন্তু গগনের কোন পাত্তা না থাকায় সে বিয়ে তিনি নাকচ করতে চান এবং পুরোহিতের কাছে অনুরোধ, তিনি যেন বাণীর আবার বিবাহ দেন। সেইমতো

পুরোহিত বাণীকে কাশী থেকে নিয়ে এই গ্রামে চলে এসে তাকে মানুষ করতে থাকেন নিজের কন্যা পরিচয় দিয়ে। গগন নামে যে ব্যক্তিটি গ্রামে এসে জয়ন্তকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে এসে খুন হলো, আসলে তার নাম গণেশ, গগন সেজে এসেছিল। চিঠিখানি মহেন্দ্রপ্রতাপকে অস্থির করে তুললে। পাছে আরো কিছু ঘটে এই আশঙ্কায় তিনি পুরোহিতকে বিদায় করে দিয়ে চিঠিখানি পুড়িয়ে ফেললেন। ঠিক সেই সময়েই জমিদার গৃহিণী বাড়ি ফিরলেন কোলে বাণীর সদ্যোজাত পুত্রকে নিয়ে। প্রকাশ হল বাণীর মৃত্যু হয়েছে। এতক্ষণে যেন মহেন্দ্রপ্রতাপ তার কর্তব্য বুঝতে পারলেন।

* * *

আরম্ভতেই টুকরো টুকরো শোভাময় দৃশ্যের সহায়তায় গ্রামখানিকে এমন চমৎকারভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সামনে তুলে ধরা হয়েছে যা দেখতে দেখতে মন বেশ ভরে ওঠে। বেশ একটা কাব্যের ধাঁচ রয়েছে, তারিফ না করে পারা যায় না দৃশ্যের রচনাধারাকে। একটা পুরো গ্রামজীবনধারা। পথ ঘাট বিবিধ কর্মরত মানুষ, মন্দিরে পূজো, দোল দুর্গোৎসব, জমিদার বাড়ির অলস বুড়োদের দাবা খেলা নিয়ে ছেলেমানুষী ঝগড়া, ছেলেদের ছুটোছুটি, জমিদারের প্রাতঃভ্রমণ, বেড়াতে বেড়াতে কে কিভাবে যাচ্ছে লক্ষ্য করা, ইত্যাদির সাহায্যে একটা কৌতূহল জাগিয়ে ছবি এগোতে থাকে। কিন্তু গল্পতে এসে উপস্থিত হতে দেরী হয় যথেষ্ট এবং আখ্যানবস্তু এগিয়ে চলতে, তখন মনে হয় গোড়ার ঐ গ্রাম-পরিবেশ সৃষ্টির দৃশ্যাবলী চমৎকারভাবে গৃহীত হলেও অনেকখানিই যেন ফালতু। তখন মনে হয় দৃশ্যগুলি রাখা হয়েছে ভাল দেখায় বলেই, গল্পের প্রয়োজন মেটানোর কথা ভেবে ততটা নয়। ঘটনার বিন্যাসে গোড়া থেকেই লক্ষ্য করা যায় দর্শকমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে যাওয়ার চেষ্টা। ঘটনার মধ্যে জয়ন্ত যে কোথায় যেন কিছুদিনের জন্য যাবার আগে বাণীর কাছ থেকে জয়ন্তর বিদায় নিয়ে আসার দৃশ্যতে। তখন মনে হয় জয়ন্ত জমিদারের প্রিয়পাত্র একজন, সেরেস্তায় কাজ করে এবং কিছুদিনের জন্য চলেছে তার নিজের বাড়ির কাছে। কিন্তু পরে ছবির কোথাও কোন সূত্রেই দেখা গেল না জয়ন্তর কোন কেউ কোথাও আছে; বরং জমিদারই তাকে পুত্রবৎ মানুষ করেছেন। বাণীকে বিবাহের অভিপ্রায় জেনে পুরোহিত জয়ন্তকে ডেকে আড়ালে কি যেন জানিয়ে দিলে। ঘরের পর্দার থেকে তা শোনা গেল অস্পষ্টভাবে, এই হলো সাসপেন্স। তারপর গগনবেশী গণেশের উপস্থিতির পর জয়ন্তর সঙ্গে তার রহস্যজনক কথাবার্তা কৌতূহলের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে থাকে। এমন কি গোপন রহস্য, যে গণেশের কাছ থেকে তা জেনে নেবার জন্য জয়ন্ত জমিদার বাড়িতে উৎসব ছেড়ে সেখানে না গিয়ে, বাণীকে একা অপেক্ষায় রেখে দারুণ ঝড়জলের রাতে গণেশের পাল্লায় পড়ে থাকে। এমন কি রহস্য যে, ভোর না হতেই বাণীকে না বলে জয়ন্ত দরজা হাট রেখে বেরিয়ে গিয়ে সারাদিন ধরে গণেশের সামনে বসে থাকে। আরো রহস্য পাকিয়ে তোলা হয় বাণী জানতে চাইলেও পুরোহিতের নির্দেশে জয়ন্তর প্রকৃত ব্যাপার চেপে যাওয়া দেখিয়ে। বাণী সম্পর্কে যে একটা নিদারুণ গোপনীয় কিছু, সে রহস্যকে আরো ভারি করে তোলা হয় গণেশকে দিয়ে পঁচিশ হাজার টাকার দাবী জানিয়ে। সে দাবী জয়ন্ত মেটাবে কি মেটাবে না সেটাতেও একটা রহস্য আরোপ করার জন্য দেখানো হয়েছে নায়েবের হিসেব থেকে [illegible] নিয়ে পঁচিশ হাজার টাকা জয়ন্তর হেফাজতে জমা দেওয়া দেখিয়ে। সব ব্যাপারই রহস্যের মধ্যে উহ্য রেখে গল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। খুনে করতে ছুরি হাতে গণেশ বাগিয়ে কাবু করল জয়ন্তকে, কিন্তু খুন যে গণেশই হয়েছে সেটা জানতে পারা গেল দারোগা এসে জমিদারকে জানাতে তবে। বেনারসে জয়ন্তর পকেট থেকে যে মনিব্যাগটা মারা যায়, সেটা নায়েবের ছেলে বলে দেখানোই বা কেন, আর সেই মনিব্যাগের সূত্র ধরে গণেশের গগন সেজে জয়ন্তর খোঁজ করে টাকা আদায় করার [illegible] রহস্যজনক। মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নে জয়ন্তর বাণী যে মারা গেছে, সেটা বোঝা যায় মহেন্দ্রপ্রতাপ সৌদামিনীর চিঠিখানি পুড়িয়ে ফেলার সময় শিশুটিকে কোলে নিয়ে জমিদারগৃহিণী উপস্থিত হন যখন। জয়ন্ত জমিদারের পালিত পুত্র, [illegible] তাকে দেখানো হয়েছে অথচ দারোগা জয়ন্ত সম্পর্কে [illegible] জমিদারের সেই [illegible] আর তা থেকে [illegible] এমন অসঙ্গতিও রহস্যজনক। [illegible] নিজেই বিদায় নিলেন। [illegible] বাণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে [illegible] সময়ের [illegible] পাঁচিলের একটা ছিদ্রপথ [illegible] করে, বাণীর [illegible] জয়ন্তর [illegible]; গণেশের [illegible] পাঁচিল বেয়ে [illegible] চেপে চলে যাওয়া; বাণীকে একা [illegible] ভীষণ ঝড়জলের দুর্যোগের [illegible] হঠাৎ চলে যাওয়া এবং অন্যপক্ষে [illegible] সারাদিন অভুক্ত রেখে রহস্যের [illegible]; বাণীর মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন [illegible] দৃশ্যের সঙ্গে খুন [illegible] মহেন্দ্রপ্রতাপের মনোভাবকে রহস্যাচ্ছাদিত করা, ইত্যাদি রহস্যের পর রহস্যের আবির্ভাব গল্পকে জট পাকিয়ে দর্শকের বোধশক্তিকে উত্যক্ত করে এমন করে তোলে যে, কোনোবিধ গল্পের [illegible] করার আর মন থাকে না। শেষে গল্পই দর্শককে বোকা বানাবার জন্যে আখ্যানবস্তুকে জটিল থেকে জটিলতর করে কৌতূহল জাগিয়ে যাওয়া, এমন কি ছবি শেষ হয়েও মহেন্দ্রপ্রতাপ কিসের দেরী হয়ে গিয়েছে বলে যে বেরিয়ে পড়লেন, সে কৌতূহল থেকেই যায়।

* * *

শিল্পকল্পনা প্রবণ মনের পরিচয় পাওয়া যায় আলাদা আলাদাভাবে এক একটা দৃশ্য ধরলে। দৃশ্যগুলির গ্রন্থনে অসাধারণত্বের বৈশিষ্ট্য বেশ উপলব্ধি করা যায়। ছৈবিক ভাষায় রচনার একটা স্টাইলও পরিচালক আয়ত্ত করেছেন। কথার ব্যবহার খুবই কম, দৃশ্যের সাহায্যেই কাহিনীর বিবৃতি। কিন্তু গল্পাংশকে সহজভাবে [illegible] জটিল পথের আশ্রয়েই একটি অতি -

চিত্রসৃষ্টি থেকে 'অন্তরীক্ষ'কে বঞ্চিত করেছে। ক্যামেরায় দীনেন গুপ্ত দৃষ্টি ফেলে দেখে তারিফ করার মতো কাজ দেখিয়েছেন। শব্দগ্রহণেও ঘটনার পরিবেশ ও মেজাজ মতো স্বর ও শব্দের প্রয়োগে অবনী চট্টোপাধ্যায় ও দেবেশ ঘোষ বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সংগীতাংশ গ্রহণেও সত্যেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর খ্যাতি মতো কাজ করেছেন। সংগীত পরিচালনায় আলি আকবর 'আঁধিয়ার পর উজ্জীবিত কাজের পরিচয় এই ছবিতেই দিয়েছেন। রকমারি যন্ত্র ও রকমারি সুরের সহায়তায় গ্রামীন পরিবেশের বর্ণকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন; ঘটনার মেজাজও রক্ষা করেছেন। তবে সমগ্রভাবে ছবিতে সংগীতকে একটু বেশী করে যেন ব্যবহার করা হয়েছে। বাইজীদের গান ও নাচ পরিবেশনে অভিনবত্ব দেখা যায়। ছবির এটা অন্যতম উপভোগ্য অংশ। শিল্প পরিকল্পনার দিক থেকে বংশী চন্দ্রগুপ্ত অনিন্দ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পরিবেশনাগে দৃশ্য সাজানোর বেশ একটা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। অভিনয়ের দিকটাও স্মরণ করে রাখবার মতো। বিশেষভাবে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় কপীর চরিত্রে নবাগতা কাজল চট্টোপাধ্যায়ের কাজে। অবশ্য অভিনয় তথা চরিত্রগুলির একটা বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হওয়া পরিচালকের দৃশ্য উপস্থাপন ধারার ওপর নির্ভর করে এবং সেকাজে পরিচালক রাজেন তরফদার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নবাগতা কাজল চট্টোপাধ্যায়কে প্রথম দৃষ্টিপাতেই গ্রহণ করে নেবার মতো করে হাজির করে দিয়েছেন। মুখে কথা নেই বললেই হয় বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না গোছের সরল সহজ গ্রাম্য মেয়ের চরিত্রটি চমৎকারভাবে ফুটেছে। শেষের দিকে অতি নিদারুণ মুহূর্তেও ওর মুখে কথার অভাব দর্শক মনে বিরক্তির উৎপাদন করতে পারে, চারিদিকে অঘটনের মাঝেও ওর একেবারে বোবা বনা সহ্য না হওয়াই স্বাভাবিক। একজন বড়ো দরের চরিত্রাভিনেতারূপে এঁকে আবির্ভূত পাওয়া যায় পাষণ্ড গণেশের চরিত্রে কালীপদ চক্রবর্তীকে। পাকা মঞ্চাভিনেতা, ছবিতেও ছোটখাটো চরিত্রে অবতরণ করেছেন, কিন্তু এ ছবিতে অভিনয় তাঁকে নতুন করে দেখতে বাধ্য করবে। পরিচালক তাঁকে দৃশ্যে হাজির করেছেন চমকে দেবার মতো করেই। যেচে গলায় পড়ে জয়ন্তর বাড়িতে অতিথি হতে চাওয়া, জয়ন্তর সঙ্গে দরকষাকষিতে কথার ভঙ্গী, নরম মাখামাখা কথা ও অভিব্যক্তি দ্বারা একটা রহস্যজনক ব্যাপারে আশঙ্কিত করে তোলা ইত্যাদি বিষয়ে কালীপদ চক্রবর্তী অসাধারণ অভিনয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছবিখানির আর একটা বড়ো আকর্ষণ এই চরিত্রটি। ছবি বিশ্বাসকে দেখা যায় মহেন্দ্রপ্রতাপের চরিত্রে, নিজস্ব ভঙ্গিতে সমুজ্জ্বল অভিনয়। এই প্রথম প্রবীরকুমারকে ভাল অভিনয় করতে দেখা গেল জয়ন্তর চরিত্রে, পরিচালক তার ক্ষমতাকে ভালভাবে কাজে লাগিয়েছেন। নায়েবের চরিত্রে হরিমোহন বসুর অভিনয়ও দৃষ্টিতে পড়বে। গোড়ার একটু অংশ ছাড়া পুরোহিতের চরিত্রে মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়, বিশেষ করে জয়ন্তর নিরপরাধিতা প্রমাণের জন্য মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে তার বিতর্ক চমৎকার একটা নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে দেয়। জমিদারগৃহিণীর চরিত্রে পদ্মা দেবীর অভিনয় ভাল লাগবে। এছাড়া অভিনয়ে আছেন প্রেমাংশু বসু, দিলীপ রায়, পারিজাত বসু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, অমৃত দাশগুপ্ত, রেবা বসু, হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলা অধিকারী প্রভৃতি।

মাঠের কথা পর্দার গায়

কলকাতার গড়ের মাঠ এ-যুগে বাঙালীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর গড়ের মাঠ বললেই সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে ফুটবল খেলা, আজ যা বাঙালীর জাতীয় ক্রীড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য সবরকম খেলাই হয় গড়ের মাঠে কিন্তু ফুটবলের চেয়ে বেশী নয় কোনটিই, আর ফুটবলের মতো বাঙালীর কাছে আদরের খেলা নেইও। কলকাতার সমাজজীবনের একটা বিশেষ আলোড়ন ফুটবল। বাল্য থেকে যৌবন পর্যন্ত জীবনের একটা মস্ত প্রভাব। ফুটবল তথা গড়ের মাঠকে কেন্দ্র করে কতো শত ঘটনাই না সংঘটিত হয়ে চলেছে, যার সঙ্গে শত সহস্র ব্যক্তি ও পরিবারের জীবন জড়িত হয়ে থাকে। কতো নাটকীয় উপাদানই না পাওয়া যায় এইসব জীবন থেকে। এ নিয়ে ছবি হওয়া উচিত ছিল অনেক আগেই, তাই 'আজ প্রভাবসন্দেশ'র প্রচেষ্টা 'গড়ের মাঠ' একটা বিশেষ আকর্ষণরূপে পরিগণিত হবার কথা। কিন্তু যে ধরণের উপকরণ নিয়ে ছবির গল্পটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করেছেন এবং ঘটনারও এতো কাঁচা পরিকল্পনা যে, শেষ পর্যন্ত ফুটবল নিয়ে একখানি ছবি তোলাও যদিবা হলো তো তাতে সন্তুষ্ট হবার কিছু পাওয়া গেল না। এমন একপেশে এবং অপ্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে গড়ের মাঠকে দেখা যে, মাঠের একটা তাঁবুর পরিবেশও ঠিকমতো পাওয়া যায় না, পুরো গড়ের মাঠের পরিবেশ তো দূরের কথা। তার পরিবেশটি যদি না রইলো তাহলে কাহিনীর প্রেক্ষাপট গড়ের মাঠ না অন্য কোন মাঠ, সে বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায় না।

আসলে গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা নিয়ে সস্তা একটা প্রেমের গল্প। তার মধ্যে একটি প্রধান অংশ হচ্ছে ফুটবলে বাঙলার প্রেরণা দুখীরামবাবুর মতো একটি চরিত্র। টমসন স্কুলের কাছে প্রতিবারই হেরে যাওয়ার অপমানের শোধ নিতে বদ্ধপরিকর হলো বালক বিমান। স্কুলের সেরা ছাত্র হলো সেরা খেলোয়াড়। পড়াশুনার ক্ষতি হবে ভেবে তার বাবা ও হেডমাস্টার বিমানকে খেলা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বিমান যেদিন সাঁতাই প্রায় একার কৃতিত্বে টমসন স্কুলকে হারিয়ে দিলে সেদিন তার বাবা আর বাধা দিলেন না। যুবক বিমান বড়ো খেলোয়াড়। বাবার মৃত্যু হয়েছে, তার দাদা তাকে ভুগিয়ে সব সম্পত্তি নিয়ে যেতে চায়। বিমানের আদর্শ অভিরামবাবু, তাঁরই প্রেরণা ও শিক্ষায় বিমানের কৃতিত্ব। দুষ্ট গ্রহের মতো উদয় হলো ভবতোষ। তারই পিতা প্রতিষ্ঠা করেছে ওয়েস্ট ক্লাব। সে বুঝলে শীল্ড পেতে গেলে বিমানকে দলে চাই; টাকার লোভে বিমানকে কাবু করা গেল না। বিমান অভিরামবাবুর দল ইণ্ডিয়ানা ক্লাবেই রয়ে গেল। ওদিকে বিমানের বোন অরুণার সঙ্গে বিয়ে হলো ভবতোষের, আর এদিকে বিমান ভালবাসে ভবতোষের বোন লিলিকে। ভবতোষ বিমানকে তাদের দলে আসতে রাজী করার জন্য চাপ দিলে অরুণার ওপর এবং লিলিরও ওপর। কিন্তু কাজ হলো না। ভবতোষ একদিন অরুণাকে প্রহার করে বাপের বাড়ি তাড়িয়ে দিলে। বিমান এইবারে টললো, বোনকে সুখী করার জন্য ওয়েস্ট ক্লাবে যোগ দিতে বাধ্য হলো। অভিরামবাবু ভেঙে পড়লেন। ইণ্ডিয়ানার সঙ্গে ওয়েস্ট ক্লাবের ফাইনাল খেলার দিন। বিমানের দারুণ জ্বর। তবুও সে পালিয়ে মাঠে এসে উপস্থিত হলো। খেলায় যোগদান করলেও বিজয়সূচক গোলটা দিয়েই জ্ঞানহারা হয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়লো। অবশ্য শেষে হাসপাতালে ভাল হয়ে উঠলো। বাঙলার খেলোয়াড়দের প্রতি অভিরামবাবুর উপদেশে ছবি শেষ হয়।

* * *

গড়ের মাঠের পরিবেশ তো নেই-ই, তাছাড়া ভুল ভ্রান্তি ও অসংগতিতে ভরা। একটা উদাহরণই যথেষ্ট—বাঙলার সেরা খেলোয়াড় বিমান ফাইনাল খেলার আগে তিনদিন থেকে জ্বরে শয্যাশায়ী, অথচ সে খবর খেলার দিন মাঠে তার ক্লাবের লোকের কাছেও অজ্ঞাত, এমন কি খেলা আরম্ভ হতে চলেছে সে সময়ও কেউ তার বাড়ি থেকে খবর নেবার প্রয়োজন মনে করেনি। যা তো ভাবে তোলা ছবিখানি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য ও তত্ত্বাবধানে ছবিখানি পরিচালনা করেছেন ... ... নতুন ... ... অধিক সঙ্গীতে ...

নষ্ট হওয়ার চমৎকার দৃষ্টান্ত)। কলাকুশলীদের মধ্যে আছেন আলোকচিত্রগ্রহণে সুহৃদ ঘোষ, শব্দগ্রহণে শিশির চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালনায় রাজেন সরকার, শিল্পনির্দেশে বটু সেন ও সম্পাদনায় রবীন দাস। অভিনয়ে আছেন প্রশান্তকুমার, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বসু, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বোস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস, বলিন সোম, মনি শ্রীমানি, বাণীকণ্ঠ, আদিত্য ঘোষ, পারিজাত বসু, প্রকাশ রায়, দিলীপ রায়, সুমিতা দেবী, দীপ্তি রায়, রেণুকা রায়, মায়া ভট্টাচার্য, জ্ঞানদা কাকতি, অনুশীলা, রেবা বোস, সন্ধ্যা দেবী, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি।

'কবি'র শততম অভিনয় উৎসব

পেশাদার মঞ্চে এখন কোন নাটকের একাদিক্রমে শত রজনী অভিনয় উদ্‌যাপন তেমন কিছু বড়ো ঘটনা নয়, তবুও এই উপলক্ষ্যে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তার প্রয়োজনটা আবার অস্বীকার করা যায় না। কারণ এই হচ্ছে উপলক্ষ্য, যে সূত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও কুশলীবৃন্দ জনসমক্ষে সম্বর্ধিত হন, আর তাদের কাজের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পারিতোষিক লাভ করেন। এই হচ্ছে উপলক্ষ্য যা থেকে জনসাধারণের নাট্যপ্রিয়তার কথা প্রকাশ্যভাবে বুঝতে পারা যায়। বুঝতে পারা যায় যে, নাটক দেখবার লোক আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে, এতো যথেষ্ট যে উৎকর্ষ নির্বিশেষে কোন নাটককে শত রজনী ধরে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে তারা অনায়াসে। কিন্তু শত কিংবা একাদিক্রমে কয়েকশত রজনী ধরে একই নাটকের চলা অভিনয়শিল্পীদের প্রতিভাকে খর্ব করে রাখে কিনা সে প্রশ্ন তোলেন ছবি বিশ্বাস গত শনিবার রঙমহলে 'কবি'র শততম রজনী উপলক্ষে সংশ্লিষ্টদের পারিতোষিক বিতরণকালে। ছবি বিশ্বাস বলেন, আগেকার দিনে শিল্পীদের প্রতিভাকে স্ফুরিত করার জন্য একই সপ্তাহে ভিন্ন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকতো। তিনি নাট্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে বলেন যে, মুখ্য আকর্ষণটি শনি-রবিবার রেখে সপ্তাহের মাঝের কদিন অন্য নাটক অভিনয় করার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। অনুষ্ঠানের সভাপতি নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আমাদের দেশের নাটকে নাচগানের ব্যবহার বিদেশীদের কাছে কেমন প্রশংসিত হয় তার উল্লেখ করেন। 'কবি'র নাট্যকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রঙমহলের শিল্পীবৃন্দ যেভাবে নাটকখানি অভিনয় করেছেন তার চেয়ে ভাল হতে পারতো বলে তিনি মনে করেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি চীনের অপেরার কথা উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথি বিমলচন্দ্র সিংহ 'কবি' নাটকখানির বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা করেন।

• • • •

গত ৩রা নবেম্বর স্টার থিয়েটারে 'শ্রীকান্ত' নাটকখানি দ্বিশততম অভিনয় অতিক্রম করেছে। এই উপলক্ষে আগামী ১৪ই নবেম্বর স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

'মাদার ইণ্ডিয়া' তোলা বিদেশের দিকে লক্ষ্য রেখে

কলকাতার সাংবাদিকদের সঙ্গে গত রবিবার আলাপ প্রসঙ্গে পরিচালক মেহবুব বলেন, 'মাদার ইণ্ডিয়া' তিনি তুলেছেন প্রধানত বিদেশে দেখানোর কথা মনে রেখে। গত শনিবার মেহবুব দিল্লী থেকে কলকাতায় আসেন, তাঁর সঙ্গে আসেন আলোকচিত্রশিল্পী ফেরাদুন ইরানী, নার্গিস, কুমকুম ও আজরা। দিশী ছবির নামটা কেন বিদেশী হলো এই প্রশ্নের উত্তরে মেহবুব বলেন যে, কুখ্যাত গ্রন্থ 'মাদার ইণ্ডিয়া'তে ভারতের নারীকে যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তারই প্রতিবাদে তিনি এই ছবিখানি তুলেছেন এবং বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই নাম রেখেছেন 'মাদার ইণ্ডিয়া'। ছবির প্রধান চরিত্র রাধার জীবনে নিষ্ঠুর ঘটনার আধিক্য কেন ঘটানো হয়েছে সে প্রশ্নের উত্তরে মেহবুব বলেন, বাস্তব জীবনে অমন নিষ্ঠুরতার অভাব নেই এবং তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় তা পেয়েছেন। রঙ মাত্রাধিক্য পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে বলে যে কেউ কেউ মনে করেন তার উত্তরে মেহবুব বলেন, প্রকৃতিতে যে রঙ ছড়িয়ে রয়েছে তাই তিনি তুলেছেন, যদি বেশী হয়ে থাকে তো সেটা ভগবানের হাত। প্রচারবিদ বাগীশ্বর ঝা পরিচালক মেহবুব ও তাঁর দলের সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দেন। দলটি রবি ও সোমবার কলকাতায় 'মাদার ইণ্ডিয়া' প্রদর্শনকারী চিত্রগৃহগুলি পরিদর্শন করেন।

খেলার মাঠ

একলব্য

অভিশপ্ত ফুটবল

'জুলেস রিমেট' কাপ বা বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার নিয়মকানুন এবং ১৯৫৮ সালের প্রতিযোগিতার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য গত দু সপ্তাহে 'দেশের' পাতায় অন্য কোন খেলাধুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে পারিনি। গত পনেরো কুড়ি দিনের খেলাধুলোর অনেক খবরই জমে আছে।

এ সপ্তাহের খেলাধুলোর সমস্ত জমকালো খবরাখবরকে ছাপিয়ে একটা খবরই সবার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সে খবর হচ্ছে মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মধ্যে আই এফ এ শীল্ডের দ্বিতীয় দিনের সেমি ফাইন্যাল খেলার কলঙ্ক-মলিন ঘটনা এবং তারই পরিণতিস্বরূপ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে আই এফ এর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন।

ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সেমি ফাইন্যাল খেলার সমস্ত ঘটনা আলোচনা করা সময়সাপেক্ষ। অনেকখানি যায়গারও প্রয়োজন। দৈনিক কাগজে সমস্ত খবরই প্রকাশিত হয়েছে। তবু সংক্ষেপে বলি।

গত ২৮শে অক্টোবর সোমবার এরিয়ান মাঠে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রথম দিনের সেমি ফাইন্যাল খেলা অতিরিক্ত সময় খেলান সত্ত্বেও ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর একই মাঠে ৩০শে অক্টোবর আবার খেলার দিন ধার্য করা হয়। প্রথমদিন যোগ্যতার সঙ্গে খেলাটি পরিচালনা করেন রেফারী পি চক্রবর্তী। দ্বিতীয় দিনের খেলায় তরুণ রেফারী জ্যোতি দত্তর উপর খেলার পরিচালনাভার পড়ে। দ্বিতীয় দিন উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয় এবং রেফারীর কয়েকটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মধ্য থেকে প্রবল আপত্তির ধ্বনি ওঠে। দ্বিতীয়ার্ধের ৫ মিনিটের সময় মহমেডান দল একটি গোল করলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তৃপক্ষ মহলের কয়েকজনের মধ্যে ধৈর্যচ্যুতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের দুই খেলোয়াড় মুস্তাক আমেদ ও নারায়ণকে পারস্পরিক বাকযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে দেখে রেফারী দুইজন খেলোয়াড়কেই 'মার্চিং অর্ডার' দিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেন। রেফারীর এই কাজ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষের মনঃপুত হয় না। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রী জে সি গুহ একেবারেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় মাঠের মধ্যে প্রবেশ করতে উদ্যত হন। পুলিসের কাছ থেকে বাধা আসে। লালবাজার সদর পুলিস অফিসের ডেপুটি কমিশনার শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত নিজে শ্রীগুহকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীগুহকে শান্ত করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে ওঠে। রেফারী কর্তৃক বহিষ্কৃত ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় নারায়ণকে শ্রীগুহ জোর করেই মাঠের মধ্যে ঠেলে দেন এবং ক্লাবকে খেলা পরিহারের নির্দেশ দেবার জন্য ক্লাবের ফুটবল সম্পাদক শ্রী বি বসুর প্রতি ইঙ্গিত করেন। মাঠের পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে বি বসু নিজে উত্তেজিত হলেও তাকে প্রথমে একটু ইতস্তত করতে দেখা যায়। এদিকে কোনমতে খেলা চলতে থাকে এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়রা খেলা চালিয়ে যাবার জন্য আগ্রহী বলে মনে হয়। এদিকে মাঠের বাইরে যাবার আদেশপ্রাপ্ত খেলোয়াড় নারায়ণ আবার খেলায় যোগ দিয়েছেন, এই ঘটনা মহমেডান দলের একজন খেলোয়াড় রেফারীর দৃষ্টিগোচর করলে রেফারী নারায়ণকে আবার মাঠ থেকে বের করে দেন। এর পর শ্রী জে সি গুহ এবং শ্রী বি বসুর আহবানে ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা খেলা ছেড়ে দিয়ে মাঠের একপাশে এসে জটলা করে বসে থাকেন। রেফারীকে বাঁশী বাজিয়ে খেলোয়াড়দের মনোযোগ আকর্ষণ করতে দেখা যায়। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা খেলায় যোগ দেন না। মহমেডান দল কিছুক্ষণ মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে রেফারীর সম্মতিক্রমে মাঠ ছেড়ে ক্লাব তাঁবুতে চলে যায়। খেলা সমাপ্তির নির্দিষ্ট সময় অতীত হলে মাঠের মধ্যে উপবিষ্ট ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়রাও মাঠ ত্যাগ করে। মহমেডান দল গোল করবার পর গোলমালের মধ্যে পাঁচ সাত মিনিট কোনভাবে খেলা চলেছিল। দ্বিতীয়ার্ধের ১৬ মিনিটের পর আর খেলা হয়নি। খেলা সম্পর্কে এই হচ্ছে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এরপর আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ১৬ নম্বর আইন এবং আই এফ এ গঠনতন্ত্রের ৫৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফ থেকে আই এফ এ সম্পাদক উদ্দেশ্যমূলকভাবে অমীমাংসিত খেলার রেফারী পরিবর্তন করে খেলার ফলাফলকে প্রভাবিত করেছেন এই অভিযোগ করে এক 'প্রতিবাদ' পেশ করা হয়। ঘটনা সম্পর্কে রেফারী জ্যোতি দত্তও যথাসময়ে তার বিবরণী পেশ করেন।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিবাদ এবং রেফারীর বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে আই এফ এ প্রতিযোগিতা কমিটির তিনটি সভা হয়। আইনঘটিত কারণে প্রথম দিনের সভায় কোন আলোচনা হয় না। দ্বিতীয় দিন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিবাদ নিয়ে দীর্ঘ দুই ঘণ্টা আলোচনা চলে। অভিযোগের সমর্থনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফ থেকে রেফারী এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত এবং আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য শ্রী পি মিশ্র একখানি করে পত্র পেশ করা হয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিবাদের আলোচনার পর রেফারীর বিবরণী আলোচনার সময় দেখা যায় রেফারী সভায় উপস্থিত নেই। অনিবার্য কারণবশত তিনি বাড়ি চলে গেছেন। ফলে দ্বিতীয় দিনের সভায় কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না।

প্রতিযোগিতা কমিটির তৃতীয় দিনের সভার প্রারম্ভে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিনিধি
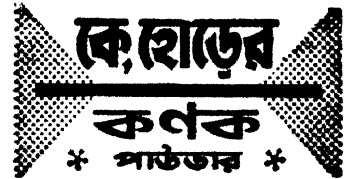
শ্রী জে সি গহুহ সভাপতির কয়েকটি রুলিংয়ের প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা আলোচনার পর প্রতি-যোগিতা কমিটি খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে বিজয়ী ঘোষণা করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ১৯৫৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 'সাসপেণ্ড' করেন। রেফারী কর্তৃক মাঠ থেকে বহিষ্কৃত মহমেডান দলের খেলোয়াড় মুস্তাক আমেদ ক্ষমা প্রার্থনা করায় প্রতিযোগিতা কমিটি তাকে লঘু দণ্ড দিয়ে দুই সপ্তাহের জন্য সাসপেণ্ড করেন, কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় নারায়ণ দোষ অস্বীকার করায় তার প্রতি গুরু দণ্ড দেওয়া হয়। নারায়ণ এক বছরের জন্য সাসপেণ্ড হয়েছেন। নিজ ক্লাবের খেলোয়াড়দের খেলা পরিত্যাগ করবার জন্য প্ররোচিত করার ফলে প্রতিযোগিতা কমিটি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রী জে সি গুহ এবং ফুটবল সম্পাদক শ্রী বি বসুর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না, তার সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শনের জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রতিযোগিতা কমিটির সদস্য হচ্ছেন— শ্রী ডি বি সেন (প্রতিনিধি মোহনবাগান
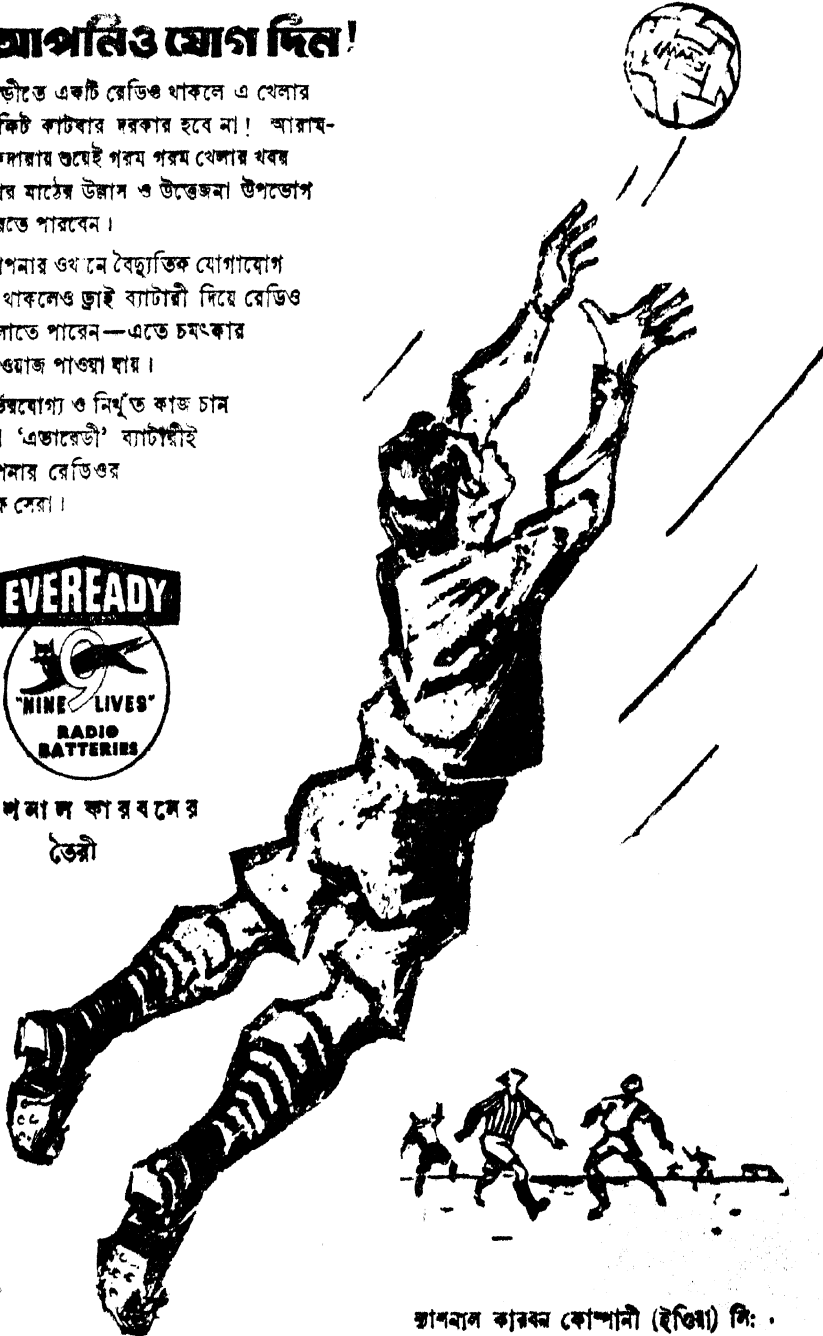
ক্লাব), শ্রী এম এন মিত্র (প্রতিনিধি ভবানী-পুর ক্লাব), শ্রী সি বি চ্যাটার্জি (প্রতিনিধি রেফারীজ এসোসিয়েশন), শ্রী এস গাঙ্গুলী (প্রতিনিধি অফিস স্পোর্টস ফেডারেশন) ও শ্রী এন কে ঘোষ (প্রতিনিধি ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ড)। আই এফ এর সহ-সভাপতি ডাঃ পরিমল রায় প্রতিযোগিতা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন। আই এফ এর সভাপতি শ্রীনীরেন দে বর্তমানে লণ্ডনে আছেন।

* * *

এখন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিবাদ, ঘটনা সম্পর্কে রেফারীর বিবরণ ও প্রতিযোগিতা কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে হলে তিন পক্ষেরই বক্তব্য জানা প্রয়োজন। তাই একে একে তিন পক্ষেরই বক্তব্য পেশ করছি।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিবাদপত্রের খসড়া

৩০শে অক্টোবর, '৫৭

আই এফ এর সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু।

প্রিয় মহাশয়!

অদ্য মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সহিত আমাদের খেলা সম্পর্কে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ১৬ নম্বর আইন এবং আই এফ এ'র ৫৫ নম্বর আইন অনুযায়ী আমি এই প্রতিবাদ পেশ করিতেছি।

পি চক্রবর্তী অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন এই অজুহাতে আই এফ এ সম্পাদক উদ্দেশ্যমূলকভাবে খেলার রেফারী পরিবর্তন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবে জে দত্তকে রেফারী নির্বাচিত করিয়া খেলার ফলাফলকেও প্রভাবিত করিয়াছেন। এই অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্য আমার হাতে সাক্ষ্যপ্রমাণও রহিয়াছে। যেহেতু এই প্রকার রেফারীর দ্বারা খেলা পরিচালনার ফলে খেলার ফলাফল প্রভাবিত হইয়াছে, সেহেতু আমি দাবী করিতেছি যে, পূর্বে নির্বাচিত রেফারীর দ্বারা খেলাটি পুনরানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হউক। এই প্রতিবাদ-পত্রের সহিত ২০০, টাকা প্রতিবাদ ফিও জমা দেওয়া হইল।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ) জে সি গুহ,
অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক,
ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

ঘটনা সম্পর্কে রেফারীর বিবরণ

৩০শে অক্টোবর, ১৯৫৭

আই এফ এ-র সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু!

প্রিয় মহাশয়!

বিষয়—৩০শে অক্টোবর মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব মাঠে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দ্বিতীয় দিনের সেমি ফাইন্যাল খেলা সম্পর্কে।

আমার সম্পাদকের নির্দেশ অনুসারে আমি এরিয়ান-মহমেডান মাঠে বেলা ৩ ঘটিকার সময় উপরোক্ত খেলা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি। যেহেতু খেলাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেইহেতু খেলাটির মধ্যে উত্তেজনাও ছিল যথেষ্ট। যদিও খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির মধ্যে প্রথমার্ধ শেষ হয়, তবুও খেলায় সাময়িক উত্তেজনার অভাব ছিল না। কিন্তু আমি আনন্দের সংগেই উল্লেখ করিতেছি যে, প্রথমার্ধে দুঃখিত হইবার মত কোন ঘটনা ঘটে নাই এবং গোলশূন্য অবস্থায় প্রথমার্ধ শেষ হয়।

দ্বিতীয়ার্ধের ৬ মিনিটের সময় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব চাতুর্যের সহিত একটি গোল করিয়া খেলায় অগ্রগামী হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ইহার ফলে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অখেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা যখন তখন ফাউল করিবার চেষ্টা করে এবং ইস্টবেঙ্গলের রেফারী অভিজ্ঞ মুনতাকে কাউন্টারের জন্য আমি সতর্ক করিয়া দিতে বাধ্য হই। কিছু সময় পরে ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবের নারায়ণ এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মুসতাক আমার পরস্পর মারামারি করিতে আরম্ভ করায় আমি উভয় খেলোয়াড়কেই মাঠ হইতে বাহির করিয়া দিই।

সম্ভবত আমার এই কার্যের জন্য ইস্ট-বেঙ্গল দল অসন্তুষ্ট হয় এবং তাহাদের খেলায় আন্তরিকতার অভাব দেখা যায়। ইহার পর মাঠের পশ্চিমদিকের বেষ্টনীর পার্শ্বে উপবিষ্ট কিছু সংখ্যক সদস্য শ্রী জে সি গুহ ও শ্রীব্যোমকেশ বসুর নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের খেলার মাঠ ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে আহ্বান করে। অবশ্য আমার অনুরোধে খেলোয়াড়গণ খেলিতে থাকেন। কিন্তু আমি ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাই যে, যে নারায়ণকে আমি কিছু সময় পূর্বে মাঠ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলাম, সেই নারায়ণ মাঠে নামিয়া খেলিতেছে। ইহা আমার দৃষ্টিগোচর করা হইলে আমি খেলা বন্ধ করিয়া নারায়ণকে পুনরায় মাঠ পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করি। কারণ মাঠ হইতে বহিষ্কৃত হওয়ায় নারায়ণের আর খেলার অধিকার ছিল না। অবশ্য নারায়ণ আমার আদেশের সংগে সংগেই মাঠ পরিত্যাগ করেন। অল্প সময় পরে মুসা মহমেডান স্পোর্টিংয়ের রাইট ব্যাকের বিরুদ্ধে পুনরায় অন্যায় ফাউল করিলে আমি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে ফ্রি-কিকের নির্দেশ দিই।

সংগে সংগে আমি অপরদিকে দেখিতে পাই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়গণ মাঠ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং কেহ কেহ প্রান্তরেখা অতিক্রম করিয়াও গিয়াছে। এই অবস্থায় আমি প্রায় পাঁচ মিনিটকাল মাঠের মধ্যে অপেক্ষা করি। এই সময় একমাত্র মহমেডান দলের খেলোয়াড়গণই শুধু মাঠের মধ্যে ছিল। ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়দের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এবং তাহাদের খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য আমি মাঝে মাঝে বাঁশী বাজাইতে থাকি। কিন্তু আমার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়গণ আর খেলিতে আসেন না। আমি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই খেলাটি শেষ করিয়া দিতে বাধ্য হই। এই সময় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১—০ গোলে অগ্রগামী ছিল।

আপনার অবগতি ও যথাবিহিত ব্যবস্থার জন্য ইহা জানাইতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ) জ্যোতির্ময় দত্ত।

প্রতিযোগিতা কমিটির বক্তব্য

প্রতিযোগিতা কমিটির বক্তব্য আই এফ এ সংবিধানের ৫৫ নম্বর ধারার অভিযোগ প্রতিযোগিতা কমিটির বিচার বহির্ভূত ঘটনা। এ অভিযোগ আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর বিচার বিবেচনার এক্তিয়ার-ভুক্ত। সুতরাং অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা হলেও এসম্পর্কে তাঁরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। তাই রেফারীর বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা মূল খেলার ঘটনা সম্পর্কে যথাকর্তব্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

* * *

ইস্টবেঙ্গলের অভিযোগ এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষের আচরণ নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক। ৫৫ নম্বর আইন অনুযায়ী ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাবের অভিযোগ খুবই গুরুতর

সন্দেহ নেই। আই এফ এ গঠনতন্ত্রের ৫৫ নম্বর ধারায় আছে—

"It is misconduct for any of the persons or parties mentioned in the next preceding rule to do or attempt to do any act there in mention with a view to influence the result of a match or competition or to give away a match willingly or improperly. The appropriate standing sub-committee may annul the match; the result there of is so influenced or which is given away to take such disciplinary action against the offending persons and parties as it think fit.

Rule 55—I F.A.)

অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত আইনে যাদের কথা বলা আছে, তাদের কেউ বা কোন সঙ্ঘ যদি খেলার ফলাফলকে প্রভাবিত করেন বা প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেন, তবে সংশিলষ্ট স্ট্যাণ্ডিং সাব কমিটি খেলাটি নাকচ করতে পারেন। এছাড়া অপরাধী ব্যক্তি বা সঙ্ঘের বিরুদ্ধে কমিটির যথা-বিহিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনেরও অধিকার আছে।

কিন্তু পূর্ববর্ণিত আইনে আই এফ এ সম্পাদকের কথা উল্লেখ নেই। হয় ভুলক্রমে তার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, না হয় ইচ্ছে করেই তাকে রাখা হয়েছে এই গুরুত্বের অভিযোগের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আর এই অভিযোগ প্রতিযোগিতা কমিটির বিচার্য বিষয় নয়, আইন পড়লে তা মনে হয় না। তবে ৫৫ নম্বর আইন অনুযায়ী সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগই যদি না টেকে, তবে বিচারেরই বা কি আছে? আইনের ত্রুটিই হক, আর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আইন উল্লেখে ভুলই হক সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ খুবই গুরুতর। অভিযোগের স্বপক্ষে দুইজন প্রভাবশালী ব্যক্তির পত্রও রয়েছে। শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত শুধু ক্যালকাটা রেফারীজ এসোসিয়েশনের সভাপতিই নন, ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনেরও সভাপতি। মিঃ পি মিত্রও পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছাড়া রেফারীজ এসোসিয়েশনেরও সভ্য। স্বনামধন্য রেফারীও বটে। তাছাড়া আইনে বাধা না থাকলেও রেফারী পরিবর্তন করা হয়েছে, এটা ঠিক। আগের দিনের রেফারী পি চক্রবর্তী, যিনি দ্বিতীয় দিনও মাঠে উপস্থিত ছিলেন, তিনি সত্য সত্যই অসুস্থ ছিলেন কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। উপরন্তু এ বছর মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতি আই এফ এ সম্পাদকের কিছু কিছু অনুরাগেরও পরিচয় পাওয়া গেছে। সুতরাং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অভিযোগ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত হওয়া উচিত।

কিন্তু কথা হচ্ছে, আই এফ এ সম্পাদকের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অভিযোগ প্রমাণিত হলেও নিজেদের আচরণ সম্পর্কে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কি বলবার আছে? খেলার মাঠে তারা যে ব্যবহার করেছেন, তার তুলনা বিরল। মাঠ থেকে রেফারী কর্তৃক বহিষ্কৃত খেলোয়াড়কে আবার মাঠের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার অর্থ খেলার আইনকানুন, নিয়ম-নীতি অস্বীকার করে খেলাকে প্রহসনে পরিণত করা। খেলা যদি প্রহসনই হয়, তবে সে খেলার জন্য এত উন্মত্ততা কেন? রেফারী জ্যোতি দত্তর বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোন লিখিত অভিযোগ নেই। তাদের অভিযোগ আই এফ এ সম্পাদকের বিরুদ্ধে। সুতরাং খেলার পরও তারা অভিযোগ করতে পারতেন। [illegible]

কয়েকঘণ্টার মধ্যে তারা যে কাণ্ড করেছেন, আজ অবসর সময়ে সুস্থ চিত্তে যদি তা ভেবে দেখেন, তবে নিজেরাই লজ্জা পাবেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একটা ইতিহাস আছে; ইতিহাসের পেছনে আছে বহুজনের বহুদিনের শ্রম ও সাধনা। দেশব্যাপী আছে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। সেই ক্লাবের যারা নেতৃস্থানীয়, তাদের যথেষ্ট ধৈর্য ও সংযমের প্রয়োজন। খেলোয়াড়রা যেখানে খেলতে প্রস্তুত, সাধারণ সভ্যরা যেখানে গোলমাল করতে নারাজ সেখানে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বোঝা উচিত ছিল তাদের কাজের পেছনে কারো সমর্থন নেই। সবশেষে বলবো, শ্রী জে সি গুহর বোঝা উচিত ছিল ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। বিধি বাম না হলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অনায়াসেই খেলায় জিততে পারত। কারণ দুই দিনই তারা অনেক ভাল খেলেছে, দুই দিনে অন্তত চারটি অবধারিত গোলের সুযোগও ক্রসবারে বল লেগে ব্যর্থ হয়েছে। আর ভাগ্য সহায়ক থাকায় ঘটনা সংঘাতে ভাঙ্গা ছেঁড়া দল নিয়েও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব পেয়েছে ফাইন্যালে খেলার অধিকার।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে আই এফ এর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনও কোন নতুন ঘটনা নয়। এর আগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে আরও দু'বার 'সাসপেণ্ড' করা হয়েছে। অন্তত এ কথাটি মনে রেখেও ক্লাব কর্তৃপক্ষ যদি তাদের আচরণে সংযমের পরিচয় দিতেন তবে ক্লাবের বিরুদ্ধে আজ আই এফ এ 'সাসপেনসনের' হ্যাট্রিক করাতে পারতেন না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আই এফ এ সম্পাদকের অপরাধ প্রমাণিত হলেও ইস্টবেঙ্গলের অপরাধ নাকচ হয় না।

রেফারী জ্যোতি দত্তর খেলা পরিচালনা সম্পর্কে সমালোচনার যথেষ্টই অবকাশ আছে। ভুল ত্রুটির ফলেই হক, আর অন্য যে কোন কারণেই হক, তার কয়েকটি সিদ্ধান্ত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে গিয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খুঁটিনাটি ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া তাঁর ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার ফলে প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব একটি পেনাল্টি কিকের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে জ্যোতি দত্ত যে বিবৃতি দিয়েছেন তাও প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। প্রথমত জ্যোতি দত্ত বলেছেন উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও প্রথমার্ধে দুঃখজনক কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু খেলার সময় 'খেলা ছেড়ে' অহেতুক ঘুষি মারা যদি দুঃখজনক ঘটনা না হয় তবে দুঃখজনক ঘটনা কাকে বলে জানি না। খেলার মধ্যে খেলোয়াড়কে চার্জ করবার সময় ফাউল করা এক কথা, আর

কথা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অপরাধ খুবই গুরুতর। এখানে দোষী খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্য বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। সবাই লক্ষ্য করেছেন খেলা আরম্ভের কিছু পরেই বলটি 'ডেড' থাকা সময়ে মহমেডান দলের ব্যাক মুস্তাক আমেদ পেনাল্টি সীমানার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড় নারায়ণকে ঘুষি মেরেছিলেন। এ ক্ষেত্রে মুস্তাক আমেদকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়াই রেফারীর কর্তব্য ছিল। আর মুস্তাককে বের করে দিলে হয়তো খেলায় আর কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতো না। কিন্তু রেফারী মুস্তাক আমেদের প্রতি অহেতুক অনুকম্পা প্রদর্শন করে শুধু সতর্ক করেই ছেড়ে দেন। এ সতর্ক করার কথাও তিনি বিবরণীতে উল্লেখ করেননি। পরে অবশ্য নারায়ণ ও মুস্তাক আমেদের মধ্যে বাকযুদ্ধ আরম্ভ হবার ফলে রেফারী দুজনকেই মাঠ থেকে বের করে দেন। কিন্তু রেফারী তার বিবরণীতে বলেছেন, মুস্তাক আমেদ ও নারায়ণের মধ্যে মারামারি আরম্ভ হবার ফলেই তিনি উভয়কে মার্চিং অর্ডার দিয়েছিলেন। আসলে কিন্তু এক্ষেত্রে মুস্তাকের সঙ্গে নারায়ণের মারামারি হয়নি; মারামারি হয়েছিল মুস্তাকের সঙ্গে মুসার এবং মুসারই ছিল অপরাধ বেশী। কিন্তু চতুর মুসা মেরেই সরে পড়েছিলেন। ঘটনাচক্রে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয়েছিল নারায়ণের সঙ্গে মুস্তাকের। রেফারী মুস্তাক ও নারায়ণ দুজনকেই বের করে দিলেন। অবশ্য কথা কাটাকাটির জন্য রেফারীর খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করবার নিশ্চয়ই অধিকার আছে। কিন্তু অবস্থাবিপাকে বেশী অপরাধী খালাস পেয়েছে, দণ্ড পেয়েছে সে, যার অপরাধ অনেক কম। ব্যাপার দাঁড়িয়েছে রামের পাপে শ্যামের দণ্ড পাবার মত।

রেফারীর বিবরণীর অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ একমত। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তৃপক্ষ খেলোয়াড়দের খেলা ত্যাগের জন্য প্ররোচিত করা এবং 'মার্চিং অর্ডার' প্রাপ্ত খেলোয়াড় নারায়ণকে আবার মাঠে ঠেলে দেওয়া ছাড়াও ফুটবল সম্পাদক শ্রী বি বসু একবার মাঠের মধ্যেও ঢুকে পড়েছিলেন। তবে সে ঘটনা রেফারীর দৃষ্টিগোচর নাও হতে পারে।

* * *

আই এফ এ প্রতিযোগিতা কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমি বলতে চাই, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের তারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, অপরাধের গুরুত্বে অনুযায়ী কোনমতেই তা কম হয়নি। বরং এর চেয়েও গুরু দণ্ড দেওয়া যেতে পারতো। কিন্তু আই এফ এর কাছ থেকে সেটা আশা করা যায় না। কারণ তাদের নিজেদের প্রয়োজনের জন্যই কলকাতার ফুটবল মরসুমে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রয়োজন। আই এফ এর এবারকার অর্ধশূন্য কোষাগার ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এই 'অভিশপ্ত' সেমি ফাইন্যাল খেলার দৌলতে প্রায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। দুইদিনের খেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে আধ লাখেরও বেশী টাকা। নিজেদের খেয়ালখুশিমত এ টাকা খরচ করার নবাবীয়ানা বড় কম কথা নয়।

• • •

সবশেষে আমার বক্তব্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হক, আর আই এফ এ সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগই প্রমাণিত হক, কলকাতার ফুটবল খেলার পুঞ্জীভূত ক্লেদ অপসারণ করতে হলে কলকাতা স্পোর্টস বিভাগকে কার্যকরী করা এবং আই এফ একে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজা একান্ত প্রয়োজন। কারণ ফুটবল খেলার বর্তমান পরিস্থিতি সাধারণ নাগরিকের সুস্থ চিন্তার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। তাছাড়া কলকাতার কৃষ্টি, কলকাতার নাগরিক মর্যাদা, কলকাতার শান্তিশৃঙ্খলা ময়দানের খেলাধুলোর সুস্থ পরিবেশ ও শান্তিশৃঙ্খলার সঙ্গে অনেকখানি জড়িত।

দেশী সংবাদ

২৯শে অক্টোবর—ময়ূরাক্ষী এলাকায় রবিশস্য উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ অঞ্চলে আসন্ন রবিশস্য ঋতুর মরসুমে সেচের জন্য জলকর একর-প্রতি ১৫, টাকার স্থলে উহা হ্রাস করিয়া সাড়ে সাত টাকা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আজ দার্জিলিং-এ পুনর্বাসন সচিব সম্মেলনের দুইদিনব্যাপী অধিবেশনের সমাপ্তি দিবসে বিভিন্ন রাজ্যে কয়েকটি নূতন পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের এবং শেষ পর্যন্ত সেই সব কেন্দ্রেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতিদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মেডিকেল আণ্ডার গ্রাজুয়েট এবং গ্রাজুয়েটগণের দীর্ঘদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত করিয়া আগামী নবেম্বর মাস হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল কোর্সের শিক্ষা প্রবর্তিত হইতেছে।

৩০শে অক্টোবর—বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু সোমবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়াই শান্তিনিকেতনের সাম্প্রতিক ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করেন। কর্মসচিব শ্রীশৈলেশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁহাকে সমস্ত বিষয় জানান।

৩১শে অক্টোবর—অদ্য শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীগণ খিদিরপুরে ডকে নোঙ্গর করা ইটালী জাহাজ নামক জাহাজে তল্লাসী চালাইয়া কৌশলে রক্ষিত আনুমানিক ৭ মণ ওজনের প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ১০০৮টি সোনার বাট উদ্ধার করেন।

পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে ঢাকায় অবস্থিত ভারত সরকারের প্রধান মাইগ্রেশন অফিসারকে 'খুব উদারনীতি' অবলম্বন করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

১লা নবেম্বর—অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় শ্যামবাজারের মোড়ে ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের পরিবেষ্টনীর ভিতর একটি ছোট বাড়ি নির্মাণ করিয়া তথায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একটি প্রতিমূর্তি স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে দেশবন্ধু পার্কেও একটি ছোট বাড়ি নির্মাণ করিয়া তথায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়।

গতকল্য কেঙ্গানোরে দুইখানি মোটর লঞ্চ হইতে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৮ হাজার তোলার বে-আইনীভাবে আমদানীকৃত স্বর্ণ আটক করা হয়। এই মোটর লঞ্চ দুইখানি গোয়া উপকূল হইতে আসিয়া দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত ম্যাঙ্গালোর ও কেঙ্গানোর বন্দরে নোঙ্গর করিয়া অবস্থান করিতেছিল।

২রা নবেম্বর—জানা গিয়াছে যে, খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি সরকারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করিবেন তাহাতে এমন একটি সঠিক মূল্য নীতির প্রস্তাব করিবেন যাহাতে চাষী ও ক্রেতা উভয় পক্ষের প্রতিই ন্যায় বিচার করা হয় এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের পক্ষেও সাহায্য করা হয়।

বারাসত-বসিরহাট রেল স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গেল। এখনই রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হইতেছে।

৩রা নবেম্বর—সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে জনৈক অধ্যাপক অপর একজন অধ্যাপক কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়ায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, শান্তিনিকেতনের দায়িত্বশীল আশ্রমিকগণের মধ্যেও তাহা গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বভারতীর দুইজন ভূতপূর্ব উপাচার্য শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন এবং শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু প্রমুখ প্রবীণ ব্যক্তিগণ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

৪ঠা নবেম্বর—গত ৩০শে অক্টোবর ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাবের আই এফ এ শীল্ডের দ্বিতীয় দিনের সেমি ফাইনাল খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব [illegible] মাঠে [illegible] খেলার মধ্যপথে প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ করায় আই এফ এ এর পরিচালক কমিটি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ক্লাবকে ১৯৫৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সাসপেণ্ড করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

২৮শে অক্টোবর—সিরিয়াকে সকল প্রকার ঋণ দান, অর্থনৈতিক ও উপদেষ্টা দিবার উদ্দেশ্যে আজ দামাস্কাসে সিরিয়া-সোভিয়েট ইউনিয়নের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

পাকিস্থান সরকার আজ রাত্রে যুক্ত ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে নির্বাচনী সংশোধন করিয়া এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। তদনুসারে এখন হইতে ভোটার-তালিকা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রস্তুত হইবে।

২৯শে অক্টোবর—ফরাসী জাতীয় পরিষদ গতকাল শেষ রাত্রিতে ২৮৯—২৭৮ ভোটে প্রধানমন্ত্রীর পদে সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রী মোলের নিয়োগ না-মঞ্জুর করিয়াছেন।

নিরাপত্তা পরিষদের আরও পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্র—অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, কিউবা, ফ্রান্স ও সুইডেন কর্তৃক ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব সমর্থিত হইয়াছে।

৩০শে অক্টোবর—প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত মার্শাল জুকভ কমুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে।

৩১শে অক্টোবর—বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার আলেকজাণ্ডার টডকে রসায়নে এবং বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কার্যরত দুইজন চীনা বিজ্ঞানী সুং দাও লী এবং চেন নিং ইয়াংকে যুক্তভাবে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

রাশিয়া অদ্য রাত্রে ঘোষণা করেন যে, আন্তঃমহাদেশ আক্রমণকারী রকেট নির্মিত হইয়াছে। উহা দ্বারা পৃথিবীর যে কোন অংশের ক্ষতি করা চলে। এজন্য নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় বর্তমান কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন।

১লা নবেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জে সিরিয়ার প্রতিনিধি দলের সহকারী নেতা ডাঃ ফরিদ জিয়ানুদ্দিন গত রাত্রিতে জানান যে, সিরিয়া ও তুরস্কের মধ্যে বিরোধ সম্পর্কে উভয় দেশের মধ্যে এক আপোষ রফা হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী অদ্য সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে উভয় দেশের প্রতিনিধি জানাইয়া দিবেন যে, সিরিয়ার নিরাপত্তা সম্পর্কে তুরস্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ লইয়া আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।

নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গে এপর্যন্ত যে সমস্ত বিতর্ক হইয়াছে তাহার উত্তরদানের জন্য ভারতবর্ষ শীঘ্রই নিরাপত্তা পরিষদের একটি অধিবেশন আহ্বানের জন্য অনুরোধ করিয়াছে বলিয়া এইমাত্র নিউইয়র্কে জানিতে পারা গিয়াছে।

২রা নবেম্বর—অদ্য ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এক সপ্তাহ পূর্বে সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত মার্শাল জুকভকে কমুনিস্ট পার্টিতে তাঁহার পদ হইতেও অপসারিত করা হইয়াছে।

পাকিস্থান জাতীয় আওয়ামী পার্টির প্রেসিডেন্ট মৌলানা ভাসানী অদ্য কায়রোতে বলেন, পাকিস্থানের ন্যায় অনুন্নত দেশের পক্ষে সিয়াটো এবং বাগদাদ চুক্তিতে যোগ দেওয়া আত্মহত্যার সমান। কারণ এই সামরিক মৈত্রীর ফলে পাকিস্থান আন্তর্জাতিক বিরোধে লিপ্ত হইয়া পড়িবে।

৩রা নবেম্বর—অদ্য মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, একটি কুকুরসহ মহাশূন্যে উপগ্রহ প্রেরণের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। রাশিয়ার এই দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজন প্রায় অর্ধ টন। উহা পৃথিবীর ৯৩০ মাইল ঊর্ধ্বে থাকিয়া ১০২ মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে।

৪ঠা নবেম্বর—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইয়াছেন, সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিজ্ঞানী গাব্রিয়েল টিখোভ অদ্য বলেন, শীঘ্রই এমন একটি উপগ্রহ নির্মাণ করা হইবে, যাহা চন্দ্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিবে এবং চন্দ্রের যে অংশ পৃথিবী হইতে দেখা যায় না, তাহার ফটো তুলিয়া আনিবে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার   সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা
কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।
মফঃস্বলে সডাক বার্ষিক ২২ টাকা ষাণ্মাসিক ১১ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও [illegible]।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

আমার নাম চা...
বীজ থেকেই
আমার যত্ন শুরু হয়
বাছাই করা সরেস বীজ থেকে যে চারা জন্মায় তারই ক'টি পাতা থেকে চা তৈরি করা হয়। আসাম, কাছাড়, ডুয়ার্স, দার্জিলিঙ, দেরাদুন, কাংড়া, কেরালা ও নীলগিরি প্রভৃতি অঞ্চলে চা উৎপন্ন হয়।
মাটি, জল, আবহাওয়া, এমন কি সূর্যের তাপের প্রকার ভেদেও এক এক অঞ্চলের চা এক এক ধরণের হয়। কোন কোন চায়ের বিশেষ চাহিদা তার স্বাদের জন্য, কোন কোন চায়ের গন্ধের জন্য, কোন চায়ের বা রঙের জন্য। আবার কোন কোন চা কড়া জাতের হয় বলেও তার চাহিদা আছে। চায়ের অনেক বিশেষত্বের মধ্যে এই ক'টি উল্লেখ করা হলো।
চা পায়ীদের বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী নানান রকমের পাতার সংমিশ্রনে তাদের পছন্দসই চা তৈরি করা হয়। ভালো চা পেতে হ'লে সব সময়েই নামকরা দোকান থেকে কিনবেন। কেননা তৃপ্তিকর পানীয় হিসেবে চায়ের বিশ্বজোড়া সুনাম যা'তে অক্ষুন্ন থাকে সেদিকে বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরাই সব সময় নজর রাখেন।
TEA BOARD INDIA
আমার নাম চা — আমি মৈত্রীর প্রতীক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

Mobilgas

DESH 40 Naye Paisa
Saturday 16th November, 1957.

২৫ বর্ষ ॥ ৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৩০ কার্তিক, ১৩৬৪

নেহরু জন্মদিন

চোদ্দই নভেম্বর পণ্ডিত নেহরু উনসত্তর বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই শুভদিনে সমস্ত দেশবাসীর সহিত একত্রে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি আর তাঁহার কর্মগৌরবময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি।

একথা বোধ করি প্রাতিশয্যদোষে দূষিত না হইয়া অনায়াসে বলা চলে যে, বর্তমান মুহূর্তে জীবিত ভারতীয়গণের মধ্যে নেহরুজী শ্রেষ্ঠ পুরুষ। প্রত্যক্ষত তিনি কংগ্রেসের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী হইলেও বস্তুত উহাই তাঁহার চরম পরিচয় নয়; তিনি দলনির্বিশেষে ভারতের নেতা। বর্তমান ভারত তাহার যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধ্যান-ধারণা, কর্ম ও কর্মের স্বপ্নকে একটি মানুষের মধ্যে যেন সংহত করিয়া তুলিয়াছে; নেহরু ভারত-পুরুষ। প্রত্যহের ধূলিজালে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সব সময়ে এ সত্যটি ধরা পড়ে না; কিন্তু কোন একটা বিশেষ উপলক্ষ্যে ক্ষণকালের জন্য ঐ পরম রূপটি উম্ঘাটিত হইয়া যায়, দেখিতে পাই যে, সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসনে সমাসীন নেহরুর মস্তক দলাদলির ঊর্ধ্বে চির-বিরাজিত আদর্শের নির্মল নিরঞ্জন আকাশকে স্পর্শ করিয়াছে।

বহুকাল আগে (১৯৩৬ সালে) রবীন্দ্রনাথ নেহরু সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"জওহরলাল নেহরু আজ সমস্ত ভারতের তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী; অপরিসীম তাঁর ধৈর্য, বীর্য তাঁর বিরাট, কিন্তু সকলের চেয়ে বড়ো তাঁর সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা। পলিটিকস্-এর সাধনায় আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে নিজেকে কখনো হারিয়ে ফেলেন নি। সত্য যেখানে বিপজ্জনক সেখানে সত্যকে তিনি ভয় করেননি, মিথ্যা যেখানে সুবিধাজনক
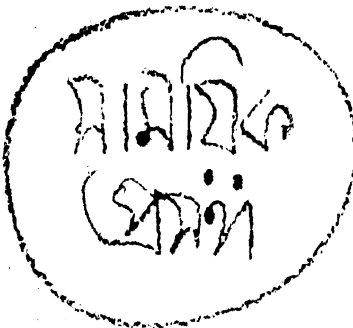
সেখানে তিনি সহায় করেন নি মিথ্যাকে। মিথ্যার উপচার আজও প্রয়োজনবোধে দেশপূজার যে অর্ঘে অসংকোচে স্বীকৃত হয়ে থাকে, সেখানে তিনি সত্যের নির্মলতম আদর্শকে রক্ষা করেছেন। তাঁর অসামান্য বুদ্ধি কূটকৌশলের পথে ফললাভের চেষ্টাকে চিরদিন ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করেছে। দেশের মুক্তি সাধনায় তাঁর এই চরিত্রের দান সকলের চেয়ে বড় দান।"

ঋষির দৃষ্টি সত্যদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু সেদিন সত্যের অনেকখানিই ছিল অপ্রকট, কবিগুরু যেন ভবিষ্যৎ নেহরুকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। আজ, সেই ভবিষ্যদ্বাণীর অনেক পরে কবির ধ্যানের নেহরু ভারত পাদপীঠে বাস্তব মূর্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, কবিদৃষ্টির সমস্ত সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। নেহরুর চারিত্রিক ব্যক্তিত্ব এখনো ক্রমস্ফীতির মুখে। দশ বৎসর আগে যেদিন তিনি স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হইলেন, তখন কয়জন দশ বৎসর পরেকার অদ্যকার নেহরুকে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি আমাদেরই মনে সংশয়বিদ্ধ সঙ্কোচ ছিল। ভাবিয়াছিলাম জন্মকে এখন হইতে

স্বদেশের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে পদার্পণ করিতে হইবে, চলিতে হইবে বিশ্ব-রাজনীতির পথে। সে পথটা যে কী পৃথিবীর ইতিহাস পাতায় পাতায় তাহার নিদারুণ সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ঝানু রাজনৈতিক দাবাখেলোয়াড়ের দল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে থানা গাড়িয়া অবস্থিত; সত্যের মুখে তুড়ি-মারা অর্ধসত্য ব্যবসায়ীগণ সে পথের শ্রেষ্ঠ সার্থবাহী; যে-রক্তপুরুষগণ ঐ পথে পাহারা দেয় তাহাদের রাজদণ্ডের একদিকে লেখনী অন্যদিকে অসি; রজত ও রক্তের সমবায়ে বেশ পাকাপোক্ত করিয়া ঐ ক্ষুরদুর্গম পথের বনিয়াদ গঠিত; সেই পথে আজ চলিতে হইবে নবজাত এই রাষ্ট্রের কর্ণধারকে, মনে শঙ্কা না হইয়া যায় কিরূপে। এখন, নেহরু বিশ্বরাজনীতির ঐ রক্তপিচ্ছল পথে চলিলে ভারতের দুর্দশার অন্ত থাকিত না। কিন্তু "তাঁর অসামান্য বুদ্ধি কূট-কৌশলের পথে ফল লাভের চেষ্টাকে ঘৃণাভরে অবজ্ঞা" করিয়াছে। ভারতের ঐতিহ্য, তাঁহার গুরুর আশীর্বাদ ও তাঁহার চারিত্রিক সাধুতা তাঁহাকে চির দুর্গম সত্যের পথে চলিতে উৎসাহিত করিয়াছে। মিথ্যার পথ আশু ফললাভ ঘটায়, প্রাকৃতজনের কাছে বাহবা মিলায়, বিদেশের নজির তাহার পক্ষে—এসব জানিয়া শুনিয়াও "মিথ্যা যেখানে সুবিধাজনক সেখানে তিনি সহায় করেননি মিথ্যাকে"—স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রীরূপে তিনি যখন বিশ্বরাজনীতিকগণের কুটিল পদ-চিহ্নে পীড়িত প্রশস্ত রাজপথটার পাশে পাশে অন্য একটি অনভ্যস্ত অচিহ্নিত পথে চলিতে আরম্ভ করেন, তখন সকলের মুখে প্রথমে কৃপার হাসি দেখা দিয়াছিল, পরে কৃপা বিস্ময়ে পরিণত হইয়াছে, এখন, ক্রমে প্রায় সব দেশেই বিস্ময় অনন্যভূতপূর্ব শ্রদ্ধায় পরিণত

তবে কি রাজনীতির আরও একটা পথ সম্ভব—এই কথাই ঝানুর দল পরস্পরকে কানাকানিতে শুধাইতেছে।

সত্যের স্থান যে রাজনীতির বাহিরে নয়, সত্যকে অবলম্বন করিয়াই যে রাজনীতির কারবার করা সম্ভব আর তাহা দেশের কল্যাণের পরিপন্থীও নয়—"পূর্ব-পশ্চিম" দুই শিবিরের মল্লগণ ইহা বুঝিয়া কিঞ্চিৎ হকচকাইয়া গিয়াছেন। নেহরুকে আক্ষরিক অর্থে "গান্ধীবাদী" বলা চলে না সত্য, কিন্তু আন্তরিক অর্থে তিনি শ্রেষ্ঠ গান্ধীবাদী। গান্ধীজী সত্যকে জীবনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। নেহরু সত্যকে বিশ্বরাজনীতির কৌরব সভায় সগৌরবে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই নেহরুজীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। রবীন্দ্রনাথ ঘটনার বহুকাল পূর্বে যেন এটি প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সত্য-সন্ধ রাজনীতির সূত্র অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁহার কৃতিত্ব সহজেই আবিষ্কৃত হইবে। এখানেও দেখি তাঁহার গুরুর প্রভাব। অনেকে বলিবেন আজ বিশ্বশান্তির কথা কে না বলে! ছোট বড় প্রবল দুর্বল কোন্ রাষ্ট্র না 'শান্তি, শান্তি' উচ্চারণ করে। তবে নেহরুর বৈশিষ্ট্য কি? নেহরুর বৈশিষ্ট্য খুব প্রত্যক্ষ। সকলেই শান্তির কথা বলে কিন্তু কেহই অহিংসার কথা বলে না। সকলেই শান্তির কথা বলে কিন্তু সেই সঙ্গে শান্তির বিকল্প যে যুদ্ধ সেই ভীতি প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হয় না। তাহাদের উচ্চারিত শান্তির অর্থ নিজ নিজ দলের বা রাষ্ট্রের চিহ্নিত শান্তি; সে শান্তির গৈরিক আলখাল্লার উল্টা দিকটা সামরিক কোর্তা। নেহরুর শান্তি-নীতির প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁহার শান্তিনীতির ভিত্তি অহিংসা—অহিংসার ভিত্তি "পঞ্চশীল"; নেহরু জানেন অহিংসা নীতি যথার্থভাবে অনুসরণ করিয়া চলিলে, নিশাবসানে সুপ্রভাতের ন্যায়, শান্তি আপনি আসিবে—তজ্জন্য মিছিল করিয়া ফুকরাইয়া মরিতে হইবে না। আর অহিংসার পাঁচটি নীতি "পঞ্চশীল"। এমন দুধের পুকুর জলে ভরাইতে যাহারা অভ্যস্ত তাহারা যদি মনের সঙ্গে চোখ ঠারিয়া, তাহাদের বিশ্বাস সত্যের সঙ্গেও চালাকি চলে, কপটাচারে "পঞ্চশীল" গ্রহণ করিয়া থাকে—তবে তাহাতে নেহরুর ব্যর্থতা বোঝায় না, বোঝায় যে, সত্যের পথ দুর্গম আর মিথ্যায় অভ্যস্তগণের পক্ষে সে পথ আরো দুর্গম। নেহরু যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করিতে সমর্থ না হন, তবে বিশ্বব্যাপী সামগ্রিক প্রতিকূলতার মধ্যে তাহাই তাঁহার অগৌরব নয়, কিন্তু যদি কেহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করিতে পারেন, তবে একমাত্র তিনিই পারিবেন। অন্ততঃ এখন পর্যন্ত যে তাঁহার চেষ্টাতেই পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে, কোন একপক্ষে টলিয়া পড়িয়া যে চরম শোচনীয় কাণ্ড ঘটায় নাই—ঐতিহাসিক সত্যের এতটুকু বিলোপ না করিয়াও নিশ্চয় এ গৌরব আমরা করিতে পারি। রাজনীতিতে নেহরুর মানদণ্ড সত্য, সেই মানদণ্ডের বীরোচিত নৈপুণ্যে তিনি বিশ্বশান্তি রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। এই সত্যটা এখন ক্রমে ক্রমে সকলেই প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে, মনে মনে স্বীকার খুব সম্ভব অনেককাল আগেই করিয়া লইয়াছে। ধনবলে ও ক্ষাত্রবলে দীন ভারতের পক্ষে যে ইহা সম্ভব হইয়াছে তাহার কারণ জীবন ক্ষেত্রে আরও একটা শক্তি আছে—সত্য। এযুগে সত্যকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ গান্ধীজীর অবদান তিনি সারা জীবন সত্যের পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সত্যকে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে প্রয়োগ নেহরুর অবদান, সেই পরীক্ষা তিনি করিতেছেন। ইহার সাফল্যে কেবল ভারতের লাভ নয়—বিশ্বযুদ্ধের গ্রাসমুক্ত সমগ্র পৃথিবীর লাভ। তাই নেহরুর জন্মদিনটি ভারতের পক্ষে আনন্দের দিন নয়, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন হওয়া উচিত।

ভারতভাগ্যবিধাতা নেহরুকে গৌরবময় ইতিহাসের অভীষ্ট পথে চালনা করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সাহিত্যিকের সম্মান

লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী কবি ও কথা-সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁহার "সাগর থেকে ফেরা" কাব্যগ্রন্থখানির জন্য এবার সাহিত্য-আকাদমির পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা আমাদের সানুরাগ অভিনন্দন জানাই।

আধুনিক বাংলা কবিতার উপরে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রর প্রভাব যে কতখানি, তাহা কাহারও না জানিবার কথা নয়। বস্তুত, মুষ্টিমেয় যে-কয়জন কবির সনিষ্ঠ সাধনায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য এখন একটি সংহত চারিত্র অর্জন করিয়াছে, তিনি তাঁহাদেরই অন্যতম। মানব-জীবনের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা প্রায় অন্তহীন, এবং তাঁহার সাহিত্য সেই শ্রদ্ধারই পরিচয় বহন করিতেছে। বর্তমান কালের যন্ত্রণাকে তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু সেই যন্ত্রণার অশ্রুবিন্দু তাঁহার দৃষ্টিকে কোথাও আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। আধুনিক জীবনের সমস্ত গ্লানি ও সংশয়ের মধ্যেও তিনি তাঁহার বিশ্বাসের আলোকশিখাটিকে জ্বালাইয়া রাখিতে পারিয়াছেন; অপরাজিত, অপরাজেয় সেই মহাজীবনের প্রতিই তিনি বারংবার তাঁহার আস্থা ঘোষণা করিয়াছেন, যে-জীবন খণ্ডকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, খণ্ডকালের যন্ত্রণা ও সংশয় যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

মানবজীবনকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রর এই রাষ্ট্রীয় সম্মাননায় তাঁহারা সকলেই যে গৌরব বোধ করিবেন, তাহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই।

ডাক ও তার বিভাগের নূতন কর্মব্যবস্থা

গত কয়েক বৎসরে সরকারী কর্ম-ব্যবস্থা সর্বসাধারণের নানা প্রয়োজন পূর্ণ করিবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন—তৎসত্ত্বেও ডাক ও তার বিভাগ ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে সকলের দৈনন্দিন সুখদুঃখ ও প্রয়োজনকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ত যতখানি স্পর্শ করে বোধ করি এখনও এমন আর কোনো বিভাগ নয়। সরকারী সকল বিভাগের মধ্যে এই বিভাগটিই সর্বাপেক্ষা সুপরিচালিত একসময় ইহার এই খ্যাতি ছিল—গত কয়েক বৎসরে এই খ্যাতি অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, সংবাদপত্রে চিঠিপত্র বিভাগে ডাক ও তার বিভাগের অব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিযোগ অনেকখানি অংশ জুড়িয়া থাকে, প্রতিকারনিরাশ অকথিত অভিযোগের পরিমাণও কম হইবে না।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে এই সকল অভিযোগ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বর্জন করিয়া, ইহার মূলে যে সত্য আছে, সম্প্রতি ডাক ও তার বিভাগের আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ সম্মিলনে সে কথা প্রকাশ্যেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাহাতে ভরসা হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে এই বিভাগে নূতন কর্মব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া অধিকতর তৎপরতার সূচনা হইবে—কারণ, কোনও মন্ত্রী কর্তৃক এরূপ স্পষ্ট ভাষায় নিজ বিভাগের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা স্বীকার করিয়া লওয়াটাই নূতন দৃষ্টির সূচনা করে।

নূতন কর্মব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা উঠিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডাকবিভাগে ব্যবস্থা-বিভ্রাটের সংবাদ বিভ্রান্তিজনক হইয়াছে—আমরা আশা করিব এ সকল অব্যবস্থা সাময়িক।

(তেইশ)

আরও কিছুক্ষণ গুনগুন করে কাঁদে পল্টনী দিদি। তারপর সেই মৃদু-স্বরের কান্নাটাই যেন ধিক্কার দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—গাঁয়ে আর থাকবো নাই দাশুদাদা।

—কেনে? আস্তে আস্তে টাঙিটাকে আবার অলসভাবে হাতে তুলে নিয়ে উদাস-স্বরে প্রশ্ন করে দাশু।

—গাঁয়ের ঘরে মান নাই, ভাত নাই, কিছু নাই দাশুদাদা।

—কিন্তুক যাবি কুথাকে?

—কয়লাখাদে যাব।

—কি বললি? ভ্রূকুটি করে দাশু।

—হ্যাঁ দাশুদাদা। ময়লা কামিন হয়ে খাদে খাটবো। ঠিকেদার বললেক, দশ ঘণ্টা খাটলে এক টাকা সওয়া টাকা মজুরী দিবেক।

—কিন্তুক তু কি শুনিস নাই, দুখনবাবু যে গাঁয়ের সব মানুষকে জমি পাওয়াই দিবে। জমি কর পল্টনী, মনের সুখে ক্ষেতি কর। গাঁয়ের বার হবি কেনে?

হেসে ফেলে পল্টনী—দুখনবাবুর নাম নিও না দাশুদাদা। গাঁয়ের দুখ দেখে সাপেও কাঁদবেক, কিন্তুক দুখনবাবু কাঁদবেক নাই।

দাশু—দুখনবাবুকে এত গালি দিস নাই পল্টনী। খাদের ঠিকেদার বেটা কোন্ দয়ার দেওতা বটে? সে বেটা কি গাঁয়ের দুখে কাঁদে বলে গাঁয়ে ঢুকেছে?

পল্টনী—জানি না দাশুদাদা। কিন্তুক গাঁয়ে আর থাকবো না।

—ঠিকেদার বেটা কোন্‌দিকে গেল? হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে, আর লাল চোখ দুটোকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে প্রশ্ন করে দাশু।

—দাশুদাদা! পল্টনীর গলার স্বরেও একটা আতঙ্ক কেঁপে ওঠে।

—কি?

—তুমি মিছা মাথা গরম করে খাদের ঠিকাদারের সাথে মারামারি করে......।

পল্টনীর আতঙ্কের আবেদন তুচ্ছ করে, আর পল্টনীর আতঙ্কিত মুখটার দিকে একটা ভ্রূক্ষেপও না করে হনহন করে হেঁটে সড়ক ধরে এগিয়ে যায় দাশু।

কিছু দূরে এগিয়ে তেমনই থমকে দাঁড়ায়। সড়কের পাশেই যে অড়হরের ক্ষেত, তারই পিছন দিকে একটা মেটে ঘরের কাছে চিৎকারের হানাহানি চলেছে। যেন একটা

কঠোর হুংকারের সঙ্গে একটা করুণ অট্টহাসির ঝগড়া চলেছে। ওটাই যে তেতরি ঘাসিনের ঘর। কয়লা খাদের ঠিকেদার বেটা কি ভয় দেখিয়ে তেতরিকে ময়লাকামিন করে নিয়ে যাবার জন্য গর্জন করছে?

তেতরির ঘরের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াতেই যেন একটা নির্মম লজ্জার ধাক্কা খেয়ে চমকে ওঠে, আর চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে দাশু। বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে আছে একটা সাইকেল। বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখতে পায় দাশু, ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বাবুরবাজার ডাকবাংলার খানসামা। খানসামার পা ঘেঁসে একটা রোগা কুকুর হাঁ করে আর জিভ ঝুলিয়ে দিয়ে চুপ করে, যেন একটা ঘটনার জন্য লোলুপ হয়ে ওৎ পেতে বসে আছে।

চিৎকার করে খানসামা—যাবি কিনা বল মাগি?

—না, যাব না। বলতে বলতে একটা লাল রং-এর ছেঁড়া সায়া হাতে তুলে নিয়ে পটপট করে ছিঁড়ে মাটির উপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় তেতরি। রোগা কুকুরটা একটা লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ছেঁড়া সায়ার টুকরো কামড়ে ধরে আর ছুটে পালিয়ে যায়।

খানসামা—মনে ক'রে দেখ তেতরি, ভুখা মরে যেতিস কিনা, যদি আমি তুকে দশটা টাকা দাদন না করতাম।

তেতরি—সব মনে আছে; কিন্তুক তুমি এখন যাও।

খানসামা বলে—তাহলে আমার টাকা ফেরত দে।

তেতরি—টাকা নাই।

খানসামা—তাহলে বল, কবে ফেরত দিবি?

তেতরি—সে বলবো নাই। যেদিন পারবো ফেরত দিব।

খানসামা—সে হবেক নাই। হয় আমার টাকা ফেরত দে, নয় আমার সাথে চল। কলকাতা থেকে থেকে ভাল বাবুসাহেব এসেছে। উয়াদিগে খুশী ক'রে দিয়ে চলে আয়। তুর দুটো টাকা হবে, আমারও কিছু হবেক।

তেতরি—না যাব নাই।

খানসামা—তবে তোর ঘরের মাল বের করে দে।

তেতরি—তাই নিয়ে যা।

ঘরের ভিতরে ঢোকে তেতরি। পিতলের একটা থালা আর একটা ঘটি নিয়ে এসে খানসামার দিকে ছুঁড়ে দেয়। —নিয়ে যা।

খানসামা—ইয়াতে কি দশ টাকা উশুল হয়?

আবার ঘরের ভিতরে ঢুকে একটা রুপোর হাঁসুলির আধখানা টুকরো হাতে করে নিয়ে এসে খানসামার দিকে ছুঁড়ে দেয়।

খানসামা চেঁচিয়ে ওঠে—হলো না। আর কি আছে বের করে দে।

একটুও বিচলিত না হয়ে, একটাও কটু কথা না বলে যেন একটা নতুন অহংকারের আনন্দে হেসে ওঠে তেতরি; আর খানসামার দস্যুতাকেও তুচ্ছ করে।

—আর কিছু নাই। তুমি এবার চলে যাও।

—না যাব না। ইয়াতে উসুল হয় নাই। আবার চিৎকার করে খানসামা।

—তাহলে আমার মাথায় লাঠি মার, আর আমার লোহু পিয়ে নিয়ে চলে যাও। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাসতে থাকে তেতরি।

—তু মাগির মত দুষমনের লোহু পিয়েও আমার রাগ যাবেক নাই। তেতরির মুখের দিকে তাকিয়ে হুংকার ছাড়ে খানসামা।

ঘরের বেড়া মড়মড় শব্দ করে কাতরে ওঠে। ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে ওঠে দাশু। —খানসামাটা যায় না কেনে তেতরি? ভেবেছে কি?

দাশুর লাল চোখ আর হাতের চকচকে টাঙিগর দিকে চোখ পড়তেই তেতরি ঘাসিনের মুখ শুকিয়ে যায়। —যাচ্ছে দাশুদাদা, এখনি চলে যাবেক। তুমি উয়াকে কোন কথা বলো না।

দাশু বলে—ইয়াকে ঝাড়ু মার না কেনে তেতরি!

আর এক মুহূর্তও দেরি করে না খানসামা। থালা ঘটি আর হাঁসুলির টুকরো হাতে তুলে নিয়েই সরে যায়। দৌড়ে গিয়ে সাইকেলটাকে ধরে, আর অড়হরের ক্ষেতের কিনারা ধরে উড়ন্ত ছায়ার মত পালিয়ে যায়।

হাঁপ ছাড়ে দাশু—তু উয়াকে ঘরের চিজ ছেড়ে দিলি কেনে তেতরি?

তেতরি হাসে—পাপের ধার শুধে দিলাম। ভাল হলো দাশুদাদা।

দাশু আশ্চর্য হয়ে তাকায়। —তু যেন কি মনে করেছিস মনে লিচ্ছে।

তেতরি—আর গাঁয়ে থাকবো নাই দাশুদাদা।

দাশু—কুথাকে যাবি?

তেতরি—কয়লা খাদে যাব, কামিন খাটবো।

দাশু—খাদের মালকাটার ঠিকেদার এসেছিল?

তেতরি—হাঁ।

দাশু—কোনদিকে গেল?

তেতরি—মানঝিপাড়ার দিকে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবে দাশু। তারপর অসহায়ের মত চোখ তুলে অড়হরের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে—সত্যিই কয়লাখাদে যাবি?

তেতরি—হাঁ দাশুদাদা। এমন গাঁয়ের এমন ঘরে থাকলে গতর পচে যাবে। —মরে যাব গো দাশুদাদা। মানও নাই ভাতও নাই, এমন গাঁয়ে কেনে থাকবো?

দাশু—জমি যদি পাস, তবে?

তেতরি—কে দিবে জমি?

দাশু—ঈশান মোক্তার দিবে। দুখনবাবু বলেছে, জমি পাওয়াই দিবে।

তেতরি হেসে ওঠে—দিবে না। উয়ারা আমাদিগে কখনো জমি দিবে না দাশুদাদা।

দাশু বিরক্ত হয়। —কেনে দিবে না?

তেতরি—আমাদিগে দুখ না দিয়ে উয়ারা খুশি হবে না দাশুদাদা। উয়ারাই যদি জমি দিবে, তবে আমাদিগে দুখ দিবে কে?

চলে যায় দাশু। অলস হাতের মুঠোর মধ্যে টাঙিগর হাতল শিথিলভাবে চেপে ধরে, আস্তে আস্তে হাঁটে, অড়হরের ক্ষেত পার হয়ে আবার সড়কের উপর এসে দাঁড়ায়।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে। ছোটকাসরের মাথার পিছনটা লাল হয়ে উঠেছে। তরানির বুকের উপর দিয়ে বকের সারি উড়ে চলেছে। কিন্তু ওরা কারা?

চমকে ওঠে দাশু। একটা আশার চমক। পল্টনী জার তেতরির অবিশ্বাসের হাসি-গল্প নিতান্তই অবিশ্বাস। সত্যিই যে জমি পাইয়ে দেবে দুখনবাবু। সত্যিই যে ঈশান মোক্তারের দরবারে গিয়েছিল দুখনবাবু।

বেশ কিছু দূরে হলেও এখান থেকেই ওদের চিনতে পারা যায়। সড়ক থেকে নেমে কুঠির পথে সবার আগে এগিয়ে চলেছেন যিনি, তিনি হলেন ঈশান মোক্তারের বড় ছেলে লালবাবু। পাঁচ বছর আগে দেখা লালবাবুর সেই চেহারা অনেক বদলে গিয়েছে। সেই রকমই ধবধবে ফরসা সুন্দর চেহারা, আর বড় বড় কোঁকড়া চুল বটে। কিন্তু সেই কাঁচা মুখটি আর নেই। এক জোড়া কালো গোঁপ নিয়ে লালবাবুর মুখটা বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। বড় হ'ইছে, বেশ ডাগর হ'ইছে লালবাবুটা!

আগে আগে লালবাবু। তাঁর পিছনে দুখনবাবু। তার পিছনে দুটো পালোয়ান চাকর। একটা চাকরের হাতে বন্দুক, আর একটা চাকরের হাতে ব্যাগ। আরও পিছনে একটা মোটরগাড়ি। অনেক লোক হল্লা করে গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। তার মধ্যে জটা রাখালের মুখটা বেশ স্পষ্ট করে চিনতে পারা যায়। গলার স্বর সবচেয়ে বেশি জোরে বাজিয়ে আর চেঁচিয়ে হাঁক দিচ্ছে জটা রাখাল। —রাজাবাবু এইলো, কত দয়া করালেন, হেঁইও!

—হেঁইও! একসঙ্গে দম ছেড়ে গাড়ি-ঠেলা ভিড়টা।

—রাজাবাবু খুশি হে, কত আশা পুষি হে, হেঁইও।

—হেঁইও!

বিকালের লাল আলোতে রঙীন হয়ে উঠেছে মধুকুপির ক্ষেত আর ডাংগা। আখড়াতে করমের মাদলও বাজতে শুরু করেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে দাশু। গাড়ি-ঠেলা ভিড়টাও যে সাঁতাই বিশ্বাসের গান গাইছে। মধুকুপির বুকের উপর আশা আর আশ্বাসের উৎসব মেতে উঠেছে।

ঐ তো লালবাবু: মনে পড়ে দাশুর, জেলে যাবার ঠিক আগের বছরে শীতের সময় যে-বার বড় ভাল গম ফলেছিল ডরানির কানা নালার দু'পাশে, সে-বার ডরানির দহের নতুন হাঁস শিকার করতে এসেছিলেন লাল বাবু। শীতের সকালে দহের জলে নতুন হাঁস ভাসতে দেখে ছেলেমানুষের চোখে সে কি খুশি, মুখে সে কি হাসি। ছেলেমানুষ হয়েও কি সুন্দর বন্দুক চালাতে পারতো লালবাবু। সে-বার দাশুই যে লাল-বাবুকে কাঁধে চড়িয়ে ডরানির কনকনে ঠাণ্ডা জল পার হয়ে শিকার খেলাতে ওপারে নিয়ে গিয়েছিল।

মধুকুপির কিষাণের দুখ বুঝতে পেরেছেন কি লালবাবু? তাই তো মনে হয়। হে কপালবাবা, তাই যেন হয়! পল্টনী আর ক্রেতারির সন্দেহ যেন মিথ্যা হয়!

কপালবাবার জঙ্গলের দিকে তাকায় দাশু। কপালবাবা ছাড়া মধুকুপির কিষাণের অন্য কেউ সহায় নাই। এখনই কি কপাল-বাবার আসনের কাছে গিয়ে একবার মাথা ঠেকিয়ে চলে আসতে পারা যায় না? সন্ধ্যা হয়ে এল, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? এক দৌড়ে যাওয়া, আর এক দৌড়ে ফিরে আসা, রাত হলেও কতই বা রাত হবে?

না, ফিরে আসতে এমন কিছু রাত হয়নি। কপালবাবার আসনের কাছে মাথা ঠেকিয়ে যখন উঠে দাঁড়িয়েছিল দাশু, তখনও আকাশের সব তারা ফুটে ওঠেনি। ডরানির পুল পার হয়ে মধুকুপির মাটির উপর এসে দাঁড়াতেই থমথমে অন্ধ-কারের মধ্যে শিয়ালের দল আগ-রাতের প্রথম হাঁক হেঁকে ডাংগার উপর দিয়ে ছুটে চলে গেল।

কিন্তু কই, মাদলের শব্দ শোনা যায় না কেন? করম পরবের উল্লাস এক তাড়াতাড়ি আগ-রাতের পহরেই ক্লান্ত হয়ে আর নীরব হয়ে যাবে, এ কেমন পরব? বড় বুড়া রতনের কলিজায় না হয় জোর নাই; কিন্তু সনাতন সাইয়ার কি হলো? মাদল পিটতে আর হাঁড়িয়া টানতে সনাতনেরও কি সাধ নাই আর কলিজায় জোর নাই? একজনারও কি হুঁস নাই, দম নাই? হাঁপিয়ে পড়েছে মেয়ে-গুলিও: গরুচরানী জগমোতি বুধি শুকুরি আর কালিমণি? ওরাও কি বমি করে করে ঝুমুর গান থামিয়ে দিল, আর নাচ ছেড়ে দিয়ে ভুঁই-এর উপর লুটিয়ে পড়লো?

না, আখড়াতেই যেতে হবে। সড়ক থেকে নেমে একটা চষা ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকে দাশু। চিনতে পারে দাশু, এই ক্ষেত হলো ঈশান মোক্তারের সেই ক্ষেত, জেলে যাবার আগে রোজ এক সের চালের সিধা আর চার আনা নগদ পেয়ে যে ক্ষেতে বরবটি বুনেছিল দাশু। কেমন ফলন হয়েছিল, নিজের চোখে দেখে যেতে পারেনি দাশু।

কিন্তু এ কি? আবার কাঁদে কে? যেন দুহাতে মুখ ঢাকা দিয়ে আর লুকিয়ে লুকিয়ে ভয়ানক তীক্ষ্ণ স্বরের একটা কাঁদুনির গান গাইছে কেউ। ঐ যে একটা ঘর, টিম টিম করে একটা বাতি জ্বলছে ঘরের সামনের ছোট আঙিনায়। ওটা যে ফুলকি মাসীর ঘর।

হলুদ ছোপানো শাড়ি পরে, নারকেল তেলে চুল ভিজিয়ে খোঁপা বাঁধে, লাল গালার রং দিয়ে নখ রাঙায়, সে ফুলকি মাসী আজ কাঁদে কেন? ঈশান মোক্তারের সেবা করবার জন্য জীবনটাকে বাঁধা দিয়েছে যে ফুলকি, কুঠি থেকে বছরের সিধা যার জন্য বরাদ্দ করা আছে, সে ফুলকির প্রাণ আবার কিসের ব্যথায় কাঁদে?

এগিয়ে যেয়ে ফুলকি মাসীর আঙিনার উপর দাঁড়ায় দাশু। ফুলকি মাসীর চাপা কান্নায় তীক্ষ্ণস্বের ভাঙাভাঙা চিলের আর্তস্বরের মত আরও করুণ তীক্ষ্ণতায় কেঁপে কেঁপে বেজে ওঠে। —আর ই গাঁয়ে থাকবো নাই দাশু।

আবার সেই অভিশাপের শব্দ! কি আশ্চর্য, ফুলকি মাসীও যে পল্টনী আর তেতরির মত সেই একই ধিক্কারের ভাষা দিয়ে মধুকুপির মাটিকে গালি দিয়ে অপমান করছে।

—তুমার আবার কাঁদতে সাধ হলো কেনে মাসী? ফুলকির মুখের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে প্রশ্ন করে দাশু।

আবার মুখের উপর আঁচলচাপা দিয়ে কাঁদতে থাকে ফুলকি। ঘরের দাওয়ার এক কোণ থেকে মরা জীবের মত একটা অনড় চেহারা হঠাৎ নড়ে ওঠে। ফুলকির স্বামী খোঁড়া তিনকড়ির গলার স্বরটাও যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত কথা বলে। —লালবাবু ফুলকির কমরে জুতাপায়ে লাথি মেরেছে দাশু।

—কেনে? গর্জন করে দাশু।

তিনকড়ি বলে—ফুলকি জানে। আমাকে শুধাও কেনে?

—কি মাসী? তুমার ঈশান মোক্তারের ছেইলা হয়ে লালবাবু তুমাকেই জুতার ঠক্কর মারে কেনে? ফুলকির কাছে এগিয়ে এসে আবার প্রশ্ন করতে গিয়ে দাশুর দাঁত কড়মড় করে বেজে ওঠে।

হঠাৎ মুখের উপর থেকে চাপা আঁচল সরিয়ে খোঁড়া তিনকড়ির দিকে হিংস্রভাবে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ফুলকি। —তু আমার জ্বালা বুঝবি কি রে খোঁড়া গরু। তুর লেগেই যে আমাকে মরতে হয়েছে রে মড়া! তুকে পুষবার জন্য সিধা মাগতে গিয়ে যে আমার ধরম করম সব গেল রে কপালপোড়া। তু মানুষ হলে ভিখ মেগে খেতিস, জরুর ভাত খেতিস নাই।

খোঁড়া তিনকড়ির চেহারাটা আবার একটা মড়া জানোয়ারের মত গুটিয়ে পাকিয়ে অনড় হয়ে যায়। ফুলকি বলে—ঈশান মোক্তারের বেটা আমার সিধা বন্ধ করে দিলেক দাশু।

—কেনে বন্ধ করে দিলেক?

—আমি উয়ার সেবা করতে রাজি হই নাই।

দুহাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে থাকে ফুলকি। —আমি ভাবি নাই দাশু, বুড়া মোক্তারের বেটাও আমাকে এমন কথা বলবেক। যাকে ছেইলা বলে মানি, সে আমাকে মাগি বলে মনে করে আর গতর ছুঁতে চায়; কি কপাল করেছিলি রে ফুলকি!

দাশুর লাল চোখের কোণে জলের ফোঁটা কাঁচা রক্তের ফোঁটার মত টলমল করে। ফুলকি মাসীকে সান্ত্বনা দেবার মত কোন ভাষা আর খুঁজে পায় না দাশুর মন। দাশুর পাঁজরের হাড়গুলি যেন পুড়ছে। সারাদিনের একটা ভুয়া আশার নেশা এইবার একেবারে ছাই হয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে। লালবাবু একটা অভিশাপ, দুঃখনাথ একটা হিংসা। মধুকুপির কিষাণের প্রাণের সব সুখ শান্তি নিয়ে রক্তমাখা ছিন্ড দুলিয়ে নাচবার জন্য দুই পিশাচের মতলব আরও কঠোর হয়ে উঠেছে।

টাঙিটা কাঁধের উপর তুলে, আর নিজের মুখের চেহারাটাকেও একটা আক্রোশের পিশাচের মত বীভৎস করে তখনি একটা দৌড় দিত দাশু, কিন্তু ফুলকি মাসিই আগে দৌড় দিয়ে এগিয়ে এসে দাশুর হাতের টাঙি চেপে ধরে। —তুমি উদিক পানে আর যেওনা দাশু।

দাশু—কি বলছিস মাসি?

ফুলকি—তুমি কুঠিতে যেও না।

দাশু—কেনে?

ফুলকি—যেয়ে লাভ নাই। কুঠির দয়া আর চাই না দাশু। আমি ই গাঁয়ে আর থাকবো নাই।

দাশু—কুথাকে যাবে?

ফুলকি—কয়লা খাদে যাব।

আস্তে একবার চমকে ওঠে দাশু। মাথার ভিতরের সব আক্রোশের উত্তাপও যেন হঠাৎ শিউরে ওঠে আর ঠান্ডা হয়ে যায়। মাথা হেঁট করে একটা হাঁপ ছাড়ে দাশু। —ছেড়ে দে মাসি, ঘরকে যেতে দে।

ঘরের দিকেই এগিয়ে যেতে থাকে দাশু। চষা ক্ষেতের মাটির ঢেলা মাড়িয়ে, টলতে টলতে সড়কের উপর এসে উঠে একবার পিপুলতলার দিকে চোখ পড়ে দাশুর। অনেক আলো জ্বলছে পিপুলতলায়, আর বেশ নতুন রকমের একটা হল্লার শব্দও

বাজছে। কে জানে, বাবু দুখন সিং কোন নতুন অভিশাপের উৎসব মাতিয়ে তুলেছে। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবার পথেই এগিয়ে যেতে থাকে দাশু।

ঘরের কাছে এসে পৌঁছতেই দেখতে পায় দাশু, দাওয়ার উপর একটা ছায়া বসে আছে। —কে বটে? ডাক দেয় দাশু।

—আমি সনাতন।

—কি বটে সনাতন?

—দুখনবাবু নতুন জাতপঞ্চ চালু করলেক। যারা ঈশান মোক্তারের জমিতে মনিষ খাটতে রাজি আছে, শুধু তাদিগে নিয়ে নতুন জাতপঞ্চ হলো। জটা রাখালের দল আছে। সাধু, ভনু আর পচুও আছে। শুনে নাই পিপুলতলার হল্লা?

—শুনেছি। কিন্তুক......।

দাশুর হাত ধরে টান দেয় সনাতন। —না দাশু। আজ আর উ দিগে কিছু বলতে যেও না। তুমি ঘরে থাক।

দাশু চেঁচিয়ে ওঠে। —কিন্তুক কাল আমাদিগের জাতপঞ্চ ডাকতে হবে সনাতন। ডর করলে চলবেক নাই।

—বেশ, বেশ। তাই হবে দাশু। দাশুকে ঘরের ভিতরে ঠেলে দিয়ে আর দরজার কপাট ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায় সনাতন।

পিপুলতলায় চারটে খুঁটির গায়ে চারটে লণ্ঠনের আলোর কাছে বনচণ্ডীর নামে শপথ করে যে নতুন জাতপঞ্চ হেসে আর চেঁচিয়ে উঠলো, সেই জাতপঞ্চের সভার মাঝখানে দুখনবাবুর পাশে আর একটি চৌকির উপর বসে আছেন বনচণ্ডীর সেবাইত চক্রবর্তী।

দুখনবাবুর প্রাণের আশা উৎসাহ আর প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি এই জাতপঞ্চ জাতের সংস্কার মেনে নিয়েছে। না, ঘরের বউ বিটি বহিন আর নাচবে না। স্যাঙ্গের বয়স হবার আগেই বিটি বহিনের বিহা দিতে হবে। বিহার কাজে বামহুনে মন্তর পড়বেক। কেউ আর কুঁকড়া খাবে নাই।

তা ছাড়া, জমি চাই না। কুঠির জমিতে সাতপুরুষ যেমনটি মনিষ খেটে এসেছে, সবাই তেমনটি মনিষ খাটবে।

আর, আর একটা প্রস্তাব করলেন দুখন বাবু, এবং চক্রবর্তীও বুঝিয়ে দিলেন। জাতের তিনটা ভাগ হলো। জাতিয়া, খাদিয়া, আর কুঁকড়াশী। যারা বামহুন মানবে তারা জাতিয়া; যারা কয়লাখাদে কাজ নিয়ে মালকাটা আর ময়লাকামিন হবে, তারা খাদিয়া। যারা কুঁকড়া খাওয়া ছাড়বেনা, তারা কুঁকড়াশী। জাত-ভাইয়ারীতে জাতিয়ারা সবার আগের সারিতে বসবে; পরের সারিতে খাদিয়ারা, শেষ সারিতে কুঁকড়াশী। যদি খাদিয়া আর কুঁকড়াশীরা এই নিয়ম না মানে তবে জাতিয়ারা তাদের সাথে কোন জাত-ভাইয়ারীতে বসবেই না।

জটা রাখাল বলে। —বড় ভাল নিয়ম হলো দুখনবাবু।

বনচণ্ডীর প্রসাদ বিতরণ করবার পর জাতপঞ্চের সভা যখন ভাঙে, তখন পিপুলতলারই ছায়ার আর একদিকের একটা চৌকির উপর নড়ে চড়ে বসে একটি প্রসন্ন মূর্তি, এবং টেঁকুর তুলে নিয়ে সরাবের বোতলটাকে আর একটা উবু হয়ে বসে থাকা বিনীত মূর্তির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—সে রামাই। একটুক তাড়াতাড়ি কর।

পুলিস মুন্সী চৌধুরীজী আর রামাই দিগোয়ার। আজই দুপুরে গোবিন্দপুরে থানাতে গিয়ে এজাহার দিয়েছিল দুখনবাবু, মধুকুপির একদল দুর্দান্ত কিষাণ কুঠির ভাণ্ডার লুঠ করতে চায়।

শালুর রুমালে বাঁধা দশটা টাকার নগদ উপহার চৌধুরীজীর খাকি কোটের পকেটের ভিতরে অনেকক্ষণ হলো ঠাঁই পেয়েছে। চৌধুরীজীর আশ্বাসে প্রসন্ন আর নির্ভয় হয়ে নতুন জাতপণ্ড চালু ক'রে ফেলেছে দুখনবাবু। কুঠিতে লালবাবু আছেন, বন্দুক আছে আর দুটো পালোয়ান চাকরও আছে। আর এখানে আছে পুলিস মুন্সী চৌধুরীজী ও রামাই দিগোয়ার। চৌধুরীজীর কাঁধেও বন্দুক আর কিসের পরোয়া? কার ডর? বড়বুড়ো রতনের শীর্ণ কণ্ঠের হুঙ্কার, দাশু দাগী আর সনাতন লাইয়ার চিৎকারকে বার ঘণ্টার মধ্যেই জব্দ করে দিয়েছে দুখনবাবু।

—আর কি চাই, আজ্ঞা করেন চৌধুরীজী। চৌধুরীজীর কাছে এগিয়ে এসে বিনীতভাবে প্রশ্ন করে দুখনবাবু।

—একটা গো-গাড়ি চাই দুখনবাবু; বাস্।

গো-গাড়ি আসতেও দেরি হয় না। তার পরেই পিপুলেতলার সড়কের উপর দিয়ে দুটি ছায়ামূর্তি যেন দুলে দুলে হাঁটতে শুরু করে। চৌধুরীজীর পায়ের ভারী বুটের শব্দ খট্ খট্ করে বাজে। রামাই দিগোয়ারের খালি পা পথের গা ঘষে ঘষে চলে; পিছনে গো-গাড়ির চাকার আর্তনাদের শিহর। মধুকুপির রাতের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা লোলুপ আগ্রহের অভিযান এগিয়ে যেতে থাকে। চৌধুরীজী ডাকে—রামাই!

—বলেন হুজুর।

—সরদারিনের হাসিটি বড় মিঠা, লয় কি রামাই?

রামাই—হ্যাঁ হুজুর......বাস্......এই তো উয়ার ঘর। আপনি এখানে গাড়ির কাছে একটুক দাঁড়ান; আমি সরদারিনকে ডেকে লিয়ে আসছি।

জীর্ণ জামকাঠের দরজার উপর আস্তে আস্তে দুটো টোকা দিয়ে অতি নরম শব্দ বাজিয়ে ডাক দেয় রামাই—সরদারিন; আমরা এসেছি গো। গো-গাড়িও এনেছি।

দরজা খুলে যায়। ঘরের ভিতর বড় অন্ধকার। এবং সেই অন্ধকারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছটফট করছে যে ছায়াটা, তারই দিকে তাকিয়ে রামাই দিগোয়ার বলে—তুমি যেমনটি বলেছিলে, তেমনটি বন্দোবস্ত হ'ইছে সরদারিন। গোবিন্দপুরে বাজারে তুমার লেগে ঘর লিয়েছেন চৌধুরীজী।

ঘরের ভিতরের ছায়াটা আরও অস্থির হয়ে ওঠে। রামাই হাসে—আরও ভাল খবর আছে সরদারিন। দাশুর নামে থানাতে অনেক এজাহার পড়েছে। জঙ্গলের শিশাল চুরি, বাঁশ চুরি, আর কাঠকয়লা চুরি। গত মাসে থানাতে হাজিরাও দেয় নাই দাগীটা। কাল উয়ার গেরেপ্তারী হবে। আবার পাঁচ বছর ধরে জেলের ভাত খাবে দাগীটা। তুমার কোন ভাবনা নাই সরদারিন। এইসো, চইলে এইসো। চৌধুরীজী দাঁড়াই আছেন। আর দেরি কর কেনে সরদারিন?

ঘরের ভিতরের ছায়াটা আর একবার ছটফট করে ওঠে। তার পরেই শান্ত হয়ে দরজার চৌকাঠ পার হয়ে ঘরের বাইরে দাওয়ার উপর এসে দাঁড়ায়।

—তু কে বটিস? চিৎকার ক'রে দু' পা পিছিয়ে যায় রামাই দিগোয়ার। তার পরেই একটা প্রচণ্ড আতঙ্কের ডাক ছাড়ে।—জলদি আসেন হাজুর। দাগীটা ঘরে আছে।

একটা ঝোলার ভিতর থেকে হাতকড়া আর দড়ি বের ক'রে নিয়ে, আর পিতল-বাঁধানো লাঠি দুলিয়ে ছুটে আসে চৌধুরীজী।—শালাকে বেঁধে ফেল রামাই।

কোন আপত্তি করে না, নড়েও না দাশু। রামাই দিগোয়ার দাশুর দুটো হাত শক্ত করে চেপে ধরে, হাতকড়া পরিয়ে দেয় চৌধুরীজী। দাশুর কোমরটাকেও দড়ি দিয়ে দু' পাক বেঁধে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে চৌধুরীজী—সরদারিন গেল কুথাকে?

দাশু—ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে।

চৌধুরী—যাবেই তো; তুর মত দাগীর ঘরে থাকবেক কেনে মুরলীর মত মাগি? কিন্তু ভাল ঠগিন বটে মাগিটা!

রামাই বলে—মাগিটা ই দাগীটার চেয়েও চালাক আর বদমাশ বটে হুজুর।

দাশুর কোমরের দড়ি ধরে টান দেয় চৌধুরীজী।—চল্।

(ক্রমশ)

ত্রিদিব চৌধুরী

পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজত জীবন

হাজত জীবনের নিয়মিত রুটিনের মধ্যে মার খাওয়ার কথা শুনিয়া কেহ যেন এরূপ না মনে করেন যে, রোজই সকাল বেলার চা-রুটীর পর হাজতে বাসিয়া সকলকে একবার করিয়া মার খাইতে হইত। ব্যাপারটা অবশ্য কোনো সময় অতদূরে গড়ায় নাই। কিন্তু রোজই কিছু কিছু লোকের নিয়মিতভাবে মার খাওয়ার পালা আসিত, যেমন রোজই প্রত্যেক হাজতের জনকয়েকের মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে বিচারের জন্য কিংবা জবানবন্দীর জন্য হাজির হওয়ার হুকুম আসিত। চা-রুটী খাওয়া শেষ হইতে না হইতেই যাহাদের আদালতে যাওয়ার কথা, তাহাদের জন্য নাপিত আসিবে। জজের সামনে বা ট্রাইব্যুনালের হাজির করার সময় কয়েদীদের চুল-দাড়ি ভদ্রভাবে কামাইয়া সাফ্-সুতুরো করিয়া নিয়া যাওয়ার নিয়ম। যদি নাপিত না আসে, তাহা হইলে কুয়ার্তেলের চুল-দাড়ি কাটার সেলুনে আপনাকে নিয়া যাওয়া হইবে। এই সেলুনটি কুয়ার্তেলের পুলিস ফোর্সের হেয়ার কাটিং সেলুন। সেখানকার 'শেফ্ দোস্ বার্বেইরস্' (Chefe dos Barbeiros বা head barbar) একজন গোয়ান পুলিস কনস্টেবল। তাহার অধীনে তাহার কয়েকজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, যেমন সব সেলুনেই থাকে। কুয়ার্তেলের উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারিবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া, পর্তুগীজ ও গোয়ান কনস্টেবল পর্যন্ত, সকলেই এই সেলুনে বিনামূল্যে চুল-দাড়ি কামানোর সুবিধা পায়। রাজনৈতিক কয়েদীদের জন্য অবশ্য আলাদা নাপিত আছে; সে সেলুনের বড়ো হেড্ নাপিতের ছেলে। কুয়ার্তেলের এবং মানিকোমের পাগলা গারদে আটক প্রায় ২০০-২৫০ জন রাজনৈতিক বন্দীর ক্ষৌরী কর্মের ঠিকা ছিল এই লোকটির উপর। তাহার রোজগারও সেইজন্য তাহার বাপের চেয়ে বেশি ছাড়া কম ছিল না। তবে বাপের কনস্টেবলের র‍্যাঙ্ক ছিল এবং অভিজ্ঞ ক্ষৌরকার হিসাবে মান-মর্যাদা বেশি ছিল। ছেলে ঠিকায় রাজনৈতিক কয়েদীদের ক্ষৌরকার্য করিত বলিয়া তাড়াতাড়িতে বেশি লোক সারিতে পারিলে তাহার সুবিধা ও আয় বেশি হইত। তাই তাহার হাত এবং ক্ষুর কেমন ছিল, সে-প্রশ্ন না করাই ভালো; তবে পুলিস মহলে তাহার বাবার ওস্তাদ ক্ষৌরশিল্পী হিসাবে নাম ছিল। তাহার হাতের একটা ভালো 'শেভ্' সত্যই আরামের ব্যাপার ছিল; দু'একবার সে আরাম উপভোগ করার সৌভাগ্য আমারও হইয়াছে। যাই হোক, বাপ বা বেটা দু'জনের যার হাতে আপনার ভাগ্য হয়, আপনার কামানো শেষ হইয়া গেলে আপনাকে তাড়াতাড়ি করিয়া কাপড়-চোপড় পরিয়া নিয়া প্রিজন ভ্যানে গিয়া বসিতে হইবে। এইভাবে আদালতের লোক আদালতে চলিয়া যাইবে। ঠিক এই রকমই প্রত্যহই কিছু লোকের ডাক আসিবে 'পের্গুন্তাস'-এর জন্য। 'পের্গুন্তাস' (perguntas) কথার অর্থ জেরা বা questioning, interrogation —অবশ্য ইহার আসল অর্থ কুয়ার্তেলের মারের ঘরে নিয়া গিয়া আপনাকে একচোট উত্তম-মধ্যম প্রহার করা হইবে। পুলিসী জেরা বা 'পের্গুন্তাস'-এর অজুহাতে রাজনৈতিক কয়েদীদের নিয়মিতভাবে প্রহার করা সালাজারের পুলিসী ব্যবস্থার একটা সাধারণ নীতি। যতদিন পর্যন্ত মিলিটারী আদালতে আপনার সাজা না হইয়া যাইতেছে, যতদিন পর্যন্ত আপনি পুলিস হাজতে পুলিসের হেফাজতে আটক থাকিতেছেন, ততদিন পর্যন্ত আপনাকে মাসে দুই-তিনবার করিয়া কুয়ার্তেলের এই মার দেওয়ার ঘরে আনিয়া পুলিসী জেরার নামে আপনাকে প্রহার করা হইবে। হাজতের প্রত্যেক ঘর হইতে রোজই এই রকম ৪।৫ জন করিয়া বা আরও কিছু বেশি লোকের জেরার জন্য ডাক পড়ে এবং সেটা আরম্ভ হয় সাধারণ দৈনিক চা-রুটীর পালার পরই।

ট্রাইব্যুনাল বা 'পের্গুন্তাস'-এর জন্য যাহাদের যাইতে হইল না, তাহাদের সেদিনকার মতো আর বিশেষ কোনো চিন্তার কারণ নাই, কোনো কাজকর্মও নাই, খালি চব্বিশ ঘণ্টা আটক থাকা ছাড়া। বেলা গোটা বারোর সময় হাজতের কয়েদীদের জন্য দুপুরের খাবার আসে। আমরা যখন ছিলাম, তখন একজন স্থানীয় হিন্দু হোটেলওয়ালা কণ্ট্রাক্টর তাহার হোটেল হইতে পুলিস পাহারায় নিজের লোকজন দিয়া হাজতের ঘরে ঘরে খাবার দিয়া যাইত। অবশ্য পুলিসের রিপোর্ট অনুযায়ী মধ্যে মধ্যে কখনো কাহারো কাহারো খাবার যে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত না, তাহা নয়। তবে সেটা সাধারণ

নিয়ম ছিল না, শাস্তি বা নির্যাতনের রকমফের হিসাবে সেটা ঘটিত। কয়েদীদের যে খাইতে দিতে হইবে, সে দায়িত্ব সাধারণত পর্তুগীজ পুলিসকে অস্বীকার করিতে দেখি নাই। সত্যের খাতিরে বরং একথাই বলিতে হইবে যে খাওয়ার ব্যবস্থা কিংবা খাদ্য যেরকমই হোক, সারাদিনে কয়েদীদের সকালে চা-রুটী ছাড়াও দুপুরে একবার ও রাত্রে একবার যে পেট ভরিয়া খাইতে দিতে হইবে, সেটা প্রত্যেক পর্তুগীজ হাজতেই মোটামুটি ঠিক ছিল। তবে মস্তেইরোর হুকুমে নির্যাতনের অঙ্গ হিসাবে, কাহাকেও খানিকটা [illegible] করার জন্য হয়ত তাহাকে কোনো ঘরে একলা আটক রাখিয়া তাহার খাওয়া দু-তিন বেলার জন্য কিংবা কখনো-সখনো দু-তিন দিনের জন্যও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত—সেকথা আলাদা। সেরকম মাঝে মাঝে অনেকের অদৃষ্টেই ঘটিত, কিন্তু সেটা সাধারণ নিয়ম ছিল না। [illegible] নির্ধারিত দু'বেলা খাইতে দেওয়ার [illegible] নড়চড় হইতে দেখি নাই।

দুপুরে বেলার ও রাতের খাবার [illegible] হইতে আনিয়া হাজতের ঘরে ঘরে কয়েদীদের দেওয়ার ও তাদের খাওয়া দাওয়ার তদারক করার ভার ছিল, আমাদের সময়ে, একজন পর্তুগীজ কনস্টেবলের উপর। একটু মোটাসোটা, বেঁটেখাটো, নাদুস-নুদুস চেহারার এই লোকটী গোয়ার কোলভেলী রাজনৈতিক বন্দীদের কাছে 'অন্ন মন্ত্রী' বা 'ফুড মিনিস্টার' নামে পরিচিত ছিল। বয়স তাহার বেশী ছিল না, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মতো হইবে; পুলিসের চাকুরিতেও সে বেশী দিন ঢোকে নাই, র‍্যাঙ্কে সে এক বিরক্ষার কনস্টেবল। কিন্তু নিজের পদ-মর্যাদার গুরুত্ব এবং কাজের দায়িত্ব সম্পর্কে সে একটু বেশী মাত্রায় সচেতন ছিল। কিছুটা হিউমার-জ্ঞান বর্জিত গোমড়া-মুখো লোক, সহজেই চটিয়া ওঠে। তাহাকে নিয়া মজা করিতে আমোদ ছিল। অবশ্য পালিশ কয়ার্টেলের বিভীষিকাময় আব-হাওয়ায় রাজনৈতিক বন্দীদের সে সুযোগ বেশী না ঘটিলেও বন্দীদের মধ্যে অল্প-বয়েসী যারা, তাহারা একথা সেকথা বলিয়া তাহাকে রাগাইয়া দিয়া মজা দেখিতে একেবারে ছাড়িত না। অবশ্য তাহাকে নিয়া সবচেয়ে বেশী মজা করিত তাহার সঙ্গী পর্তুগীজ কনস্টেবলেরা এবং সেপিট্ট ডিউটিতে নিযুক্ত পর্তুগীজ সৈনারা। দু একজন গোয়ান নূরে সেফ বা 'মিস্কী' (ফিরিঙ্গী গোয়ান) কনস্টেবলকেও তাহার সঙ্গে রসিকতা করিতে দেখিয়াছি তবে খুব বেশী নয়। দেশী গোয়ান কনস্টেবলদের মুখে শুনিয়াছি লিসবন গবর্নমেণ্ট যখন গোয়াতে জাতীয় আন্দোলনকে দমাইয়া দিবার জন্য গোয়ান পুলিসদের উপর বেশী আস্থা না রাখিতে পারিয়া পুলিস কনস্টেবল পর্যন্ত খাস পর্তুগাল হইতে আমদানী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেই সময় তাহাদের গোয়াতে পাঠানোর জন্য তাড়াহুড়ো নূতন রিক্রুট করেন, আমাদের 'অন্নমন্ত্রী' তাহাদের মধ্যে একজন ছিল। ইহাদের চাকুরি নাকি পাকা বা 'পার্মানেণ্ট' চাকুরি ছিল না। গোয়াতে আন্দোলন না থাকিলে বা গোয়ার কাজ ফুরাইলে তাহাদের চাকুরি আর থাকিবে না এইরকম একটা কথা পুলিশ মহলে প্রচলিত ছিল। পর্তুগীজ কনস্টেবলদের অনেকে সেই কথা তুলিয়া তাহাকে রাগাইয়া দিয়া মজা দেখিত। এবিষয়ে ওস্তাদ ছিল আমাদের সালিকোম জেলের ইনচার্জ কনস্টেবল কেরুস। কেরুস অবশ্য দুই বিরক্ষার পাকা সিনিয়র কনস্টেবল, তাহার সার্জেণ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে। খুব ধীর স্থির শান্ত বেশ রসিকতা জ্ঞানসম্পন্ন। অন্নমন্ত্রী হয়ত কোনোদিন সবেমাত্র তার হোটেলওয়ালা [illegible] সঙ্গে বন্দীদের খাবার নিয়া তাহাদের ঘরে ঘরে খাবার দিবার ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছে, কেরুস সেই সময় হয়ত দুই [illegible] মিলিটারী সেপিট্ট ডিউটির লোক সঙ্গে জুটাইয়া নিয়া তাহাকে ইশারা করিয়া [illegible] সেটা শোনা। [illegible] কাছে যাইতে খুব গম্ভীর মুখ করিয়া কেরুস বলিত—ভাই, বড় একটা খারাপ খবর শোনা গেল। এরা সব (মিলিটারী লোকদের দেখাইয়া) মিলিটারী [illegible] শুনিয়া আসিয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সকলে মিলিয়া [illegible] সম্মুখে যে গল্প ফাঁদিত, তাহার মর্ম এই রকম হয়, মিলিটারীর লোকেরা [illegible] [illegible] অফিসারদের বলাবলি করিতে শুনিয়া আসিয়াছে যে, ডাঃ সালাজার ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন, গোয়াকে আর ধরিয়া রাখা হইবে না, গোয়া ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে; আর গোয়াতে কাজ করার জন্য লিসবন হইতে [illegible] আসা হইয়াছে, পুলিসের লোক মিলিটারীর লোক, সকলকেই দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। কেহ হয়ত তখন মুখ আরও লম্বা এবং গম্ভীর করিয়া বলিবে—'আমাদের আর কি, ভালই হইবে দেশে ফিরিয়া যাইব এই হতচ্ছাড়া দেশে কে থাকিতে চায়?' কেহ বলিবে—'কিন্তু অনেকের তো চাকরি যাইবে'। 'কাদের?' 'এই ধর আমাদের সেনর পেট-মোটার? ওর চাকরিতো এখনও পাকা হয় নাই? গোয়া স্বাধীন হইলে ও বেচারার কি হইবে?' এই পর্যন্ত গল্প অগ্রসর হইতে না হইতেই 'অন্নমন্ত্রী' খোঁত খোঁত করিয়া উঠিবে—'বাজে কথা! এরকম হইতেই পারে না, গোয়া পর্তুগালের অধীনে চিরকাল আছে, চিরকাল ধরিয়া থাকিবে। ডাঃ সালাজার কিছুতেই গোয়া ছাড়িবেন না!' 'আহা-হা জানো না ডাঃ সালাজার যে আমাদের পেট-মোটার বোনাই?'—এইভাবে ক্রমে হৈ চৈ শুরু হইয়া যাইবে; অন্নমন্ত্রী ক্রমে ক্রমে হাত পা ছুঁড়িয়া প্রায় নাচিতে

আরম্ভ করিয়া দিবে। বাকিটা পাঠক আন্দাজ করিয়া নিতে পারেন।

রোজ দুপুরে এবং সন্ধ্যায় হোটেল বাহিনীসহ আমাদের একবার 'অন্নমন্ত্রী'র দেখা মিলিত। সকলে ঠিকমত খাবার পাইতেছে কিনা, খাইয়া দাইয়া থালাবাটি ঠিক ঠিক বাহির করিয়া দিতেছে কিনা, এই সব তদ্বির তদারক করার ভার ছিল 'অন্নমন্ত্রী'র উপর। কাহারো শরীর অসুস্থ থাকিলে যদি খাওয়া অদল-বদল করার দরকার হয়, কিম্বা কেহ ভাত না খাইয়া রুটি খাইতে চায় বা কোনদিন ধর্মকর্মের অঙ্গ হিসাবে ফলমূল খাইতে বা উপবাস করিতে চায়—অন্নমন্ত্রীকে বলিতে হইবে। লোকটি নিজের পদমর্যাদা সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিল বলিয়া কিছু খাতির-তোষামোদের বশ ছিল। কোনো কোনোদিন নিজের ক্ষমতা জাহির করার জন্য আজগুবি আজগুবি ধরনের হুকুম জারি করিত। কোনোদিন হয়ত সে হুকুম জারি করিবে, এখন হইতে হাজত ঘরের সম্মুখে হোটেলের লোকেরা থালায় থালায় খাবার দিয়া গেলে, সেই ঘরের কয়েদীদের প্রত্যেককে বাহিরে আসিয়া নিজের নিজের আলাদা থালা ভিতরে নিয়া যাইতে হইবে; খাওয়া হইয়া গেলে নিজের নিজের থালা বাহিরে রাখিয়া যাইতে হইবে, কেহ অন্য কাহারো থালা বা খাবার ছুঁইতে পারিবে না। কোনোদিন আবার হয়ত তার হুকুম জারি হইল, একজন ছাড়া কেউ খাবার থালা ভিতরে আনার জন্য বা খাওয়া শেষ হইয়া গেলে সেগুলিকে বাহিরে রাখিয়া দেওয়ার জন্য ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে পারিবে না। এইসব হুকুম জারি করার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক তর্জন গর্জন বা চোটপাটও সে কম করিত না। কিন্তু অল্পবুদ্ধির লোক হইলেও এবং পুলিসের লোক হইলেও মোটের উপর লোকটি খারাপ ছিল না। কাহারো অসুখবিসুখ হইলে হোটেলের লোকেদের আবার হোটেলে পাঠাইয়া তাহার জন্য কাঞ্জি ভাত কিম্বা একটু দুধের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে সে কোনো সময়ে দ্বিধা করিত না। তাহার চোটপাট যে কেবল রাজনৈতিক বন্দীদের উপর চলিত তা নয়, হোটেলের চাকরবাকর বা কর্মচারীরাও কয়েদীদের পাওনা খাবার দিতেছে না বা কোনো ফাঁকি দিতেছে, ইহা জানিতে পারিলেও সে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিকার করার চেষ্টা করিত। তাহার চোটপাট বা ধমক-চমকের মধ্যে 'স্যাডিজম' বা পর নির্যাতন প্রবণতার কোনো নিদর্শন ছিল না। গোয়ার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দরুণই তাহার চাকরি জুটিয়াছে বলিয়া হয়ত সত্যাগ্রহীদের জন্যে মনের কোণায় প্রচ্ছন্ন একটু সহানুভূতি থাকিয়াও থাকিবে। কিন্তু সে যাই হোক, পর্তুগীজ সাধারণ মানুষদের মধ্যে যে একটা সহজ মানবিকতা বোধ লক্ষ্য করিয়াছি (অবশ্য মন্তেইরো-অলিভেইরার গোয়েন্দা পুলিস বাদে) এই লোকটির ভিতরেও তাহার অভাব আছে বলিয়া আমার মনে হয় নাই; যদিও সময় সময় আমার উপরেও সে হম্বি-তম্বি করিতে ছাড়ে নাই। অনেকদিন পর্যন্ত তাহার ধারণা ছিল আমি গোয়ান সত্যাগ্রহী, সেইজন্য বোধ হয় হম্বিতম্বির মাত্রাটা একটু বেশী হইয়া থাকিবে। 'বুরো' (Burro=গাধা), কাঁও (Cao=কুকুর), 'পুলেগুয়েদু' (Pulguedo=Vermin; মশা, মাছি, পোকা-মাকড়) এবং আরো দু' একটি অনুদ্রিতব্য সম্বোধন প্রায়ই তাহার মুখে শুনিয়াছি।

মাড়গাঁও সত্যাগ্রহের তরুণ জনপ্রিয় নেতা ফাবিয়ান দা কস্তা-র সঙ্গে আমার প্রায় মাসখানেক এক সেলে থাকার সুযোগ হইয়াছিল। অন্নমন্ত্রী আমাদের উদ্দেশ্যে যেসব সম্বোধন প্রয়োগ করিতেন, তাহার অর্থ ফাবিয়ানের নিকট হইতেই জানি। ফাবিয়ানের উপর আমাদের অন্নমন্ত্রীমশায় একটু বেশীরকম চটা ছিলেন; কারণ ফাবিয়ান প্রথম পাঞ্জিম কুয়ার্তেলে আসিয়া মন্তেইরো-র কাছে প্রহৃত হওয়ার প্রতিবাদে কয়েকদিন হাঙ্গার স্ট্রাইক করিয়াছিলেন। অন্নমন্ত্রীর ধারণা ছিল, তাহাকেই বিশেষ করিয়া অপদস্থ করা ফাবিয়ানের উদ্দেশ্য

ছিল। কিন্তু সেই ফাবিয়ানেরও শরীর কোনোদিন অসুস্থ থাকিলে অন্নমন্ত্রী তাঁহার জন্য যতটা পারা যায় ফল বা দুধের ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করে নাই। মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের বিচারে আমার সাজা হইয়া যাওয়ার অনেক পরে সে জানিতে পারে যে আমি একজন ভারতীয় সত্যাগ্রহী 'শেফ' বা লীডার; এবং শুধু তাই নয় আমি একজন 'পোলিতিকো' (Politico—পলিটিসিয়ান বা রাজনীতির লোক, যারা রাজনীতি করে) এবং 'পার্লামেন্তারিও দা নোভো দেলহী' (নয়াদিল্লীর পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার)। তাহার পর হইতে আর সে আমায় ধমক চমক্ করিতে না। হোটেলের চাকরদের ধমকাইয়া চমকাইয়া যতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সম্ভব আমার খাবার দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল। হঠাৎ তাহার কি খেয়াল হয়, একদিন আসিয়া আমার অটোগ্রাফ ও নাম ঠিকানাও লিখাইয়া নিয়া গিয়াছিল। তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"সিনর, ইহা তোমার কি কাজে লাগিবে"। সিনর সেদিন প্রথম হাসিয়া রসিকতা করিয়া জবাব দিয়াছিলেন—"কি জানি, তোমরা তোমাদের দেশের নাম করা লোক, পোলিতিকো, শেফ্; কে জানে হয়ত কোনো দিন তোমার সাহায্যেই আমার একটা হিল্লা হইয়া যাইবে"। পরে আমরা সকলে যখন আগুয়াদা দুর্গে বদলী হইয়া যাই তখন গোরে, শিরুভাউ, মধু লিমায়ে, ঈশ্বরভাই সকলের কাছেই—ইহার সম্পর্কে আমার ধারণার অনুরূপে ধারণা দেখিয়াছি—মোটের উপর, বেচারী নূতন পুলিসের চাকরী নিয়া পর্তুগাল হইতে আসিয়াছে বটে এবং আমাদের উপর কর্তৃত্ব জাহির করার জন্য সময় সময় হম্বিতম্বির সঙ্গে আমাদের ধমক-চমক করিতেও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু মনেপ্রাণে পাজী বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক বলিয়া ইহাকে আমাদের কোনো সময়ই মনে হয় নাই।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পালা চুকিয়া যাওয়ার পর আবার একটানা একভাবে চুপচাপ বসিয়া থাকা। হাজতে ঘরে যাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়সী তাহারা মাঝে মাঝে মেঝের কোথাও একটু জায়গা করিয়া নিয়া বাঘবন্দী কি ঐ জাতীয় খেলা বা পঁচিশ বা কড়ি খেলা জাতীয় খেলা খেলিয়া সময় কাটাইত। [illegible] বন্দীদের মধ্যে অল্প-স্বল্প গল্প-গুজব যে চলিত না তা নয়, কিন্তু সে দিক দিয়া [illegible] ছিল বেশী। কারণ হাজতের দরজা একবার বন্ধ হইয়া গেলে ভিতর কে কি করিতেছে তাহা কেহ দেখিতে আসিত না, এক আধবার সান্ত্রী পাহারাওলা হয়তো দরজার ফাঁকের কাছে আসিয়া উঁকি মারিয়া কে কি করিতেছে দেখিয়া গেল। তা না হইলে ঘরে বসিয়া নিজেরা খেলাধূলা করিয়া বা গল্প করিয়া সময় কাটানোর পথে কোনো বাধা ছিল না হইত না। কিন্তু আমাদের ঘরটার কিছুটা অসুবিধার ব্যাপার ছিল; ঘরের দরজার নিকটেই একটি [illegible] গেটের [illegible] ছাড়া আর কিছু ছিল না, বাহির হইতে সব কিছু দেখা যাইত। খেলার সময় বা গল্প-গুজবের ফলে সামান্য একটু গোলমালের আওয়াজ বা হৈ-চৈ-এর উপক্রম হইলেই পাহারার সান্ত্রী ধমক দিতে চাহিত। সম্মুখে বা কাছে পিঠে কোনো পর্তুগীজ অফিসার থাকিলে ধমকের মাত্রা বা আওয়াজটা বেশী হইত; দু এক সময় সাথে সেক্ বা কোনো পর্তুগীজ 'কাবো দা গার্দা' (Cabo da guard—হাবিলদার বা কর্পোরাল) ছুটিয়া আসিয়া ধমকাইয়া খেলা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিত। কিন্তু তার ভিতরেই একটু আড়াল-আবডাল দিয়া খেলাধূলা গল্পগুজব চলিত, যতটা পারা যায়।

এইভাবে বিকাল-সন্ধ্যা কাটিয়া গেলে সন্ধ্যায় বন্দীদের ঘরে ঘরে সান্ধ্য উপাসনা আরম্ভ হইয়া যাইত। এটা বন্দীদের নিজস্ব অনুষ্ঠান। পর্তুগীজরা ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান বলিয়া আমাদের মন্দির, ধূপধুনো, মালা জপ বা পূজা অনুষ্ঠানের সঙ্গে তাহাদের খুব বেশী তফাৎ নাই। সন্ধ্যা বেলায় হাত জোড় করিয়া সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করা বা গান করার মধ্যে তাহারা খুব আপত্তি করার কিছু দেখে না। 'ওরাসাঁও' বা 'রেজা' (oracao বা reza) জিনিসটা মোটের উপর তাহারা এইরকমই কিছু একটা মনে করিত। সেজন্য সন্ধ্যা বেলায় অর্থাৎ prayer বেলায় বন্দীরা একসঙ্গে বসিয়া গান করিয়া ঈশ্বর প্রার্থনা বা উপাসনা করিতে চাহিলে বাধা দিত না। সন্ধ্যাবেলায় তাই এই আধ ঘণ্টা সময়ে বন্দীদের আনন্দের ও বৈচিত্র্যের সুযোগ ছিল Community singing এবং prayer-এর ভিতর দিয়া। অন্যদিকে সারা দিনের ভিতর হাজতে বসিয়া এই একটি সময়ে কিছুটা প্রকাশ্যভাবে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্যের সাথে একটা যোগাযোগ রাখার চেষ্টাকে রূপ দেওয়া চলিত, প্রার্থনার ভিতর দিয়া পর্তুগীজদের অজানিতে দু একটি জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া। সাধারণ ঈশ্বর উপাসনা মনে করিয়া পর্তুগীজ পুলিস কর্তৃপক্ষ এইসব সঙ্গীত সম্পর্কে বিশেষ কোনো খেয়াল করিতেন না। তাছাড়া যতটা [illegible] পর্তুগীজ পুলিস এক 'জন-গণ-মন অধিনায়ক' ছাড়া আমাদের অন্য রাজনৈতিক সঙ্গীত বা জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। তা ছাড়া সাধারণতঃ সন্ধ্যাবেলায় পুলিস কর্তাদের আশেপাশে কোনো অফিসার বড় কেহ একটা থাকিত না। দুপুরের লাঞ্চের পর 'সিয়েস্তা' বা দিবা নিদ্রা দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কাজ করার রীতি গোয়ানিজ পর্তুগীজ অফিসারদের বড় একটা নাই। কাজে কাজেই ঐ 'জন-গণ-মন' ছাড়া প্রার্থনার সময় অন্য যে কোনো রাজনৈতিক সঙ্গীত গাওয়াতে কোনোই বাধা হইত না। তবে ইহার মধ্যে আমরা সকলেই প্রথমে যে গানটি গাহিতাম, তাহা ছিল—'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম'। আমাকে যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে চেনেন এবং আমার রাজনৈতিক মতবাদ ও কাজের কথা যাঁহারা অল্প-বিস্তর খোঁজ খবর রাখেন, সেইসব বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাদের কল্পনার চোখে, আমাকে কোনো নিষ্ঠাবান গান্ধীপন্থী অহিংস আশ্রমিকের মতো, ১০জনের সঙ্গে বসিয়া হাত জোড় করিয়া 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' গান গাওয়ার ভূমিকায় দেখিয়া নিশ্চয়ই খুব কৌতুক বোধ করিবেন। কিন্তু পঞ্জিম হাজতে আমি আমার মনের দিক দিয়া কোনো মতেই এই প্রার্থনার সঙ্গে যোগদান না করিয়া থাকিতে পারি নাই। গোয়ার জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে একটা জিনিস

সবসময় মনে রাখিতে হইবে, এই আন্দোলন আদর্শবাদের দিক দিয়া জাতীয়তাবাদের যে প্রথম রোমাণ্টিক স্তর তাহার সীমা অতিক্রম করে নাই। সালাজারের ফ্যাসিস্ট ঔপনিবেশিক শাসনের বিভীষিকার বিরুদ্ধে লড়িয়া ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সংগে নিজেদের মানসিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাও সেখানে রাজদ্রোহ। গোয়ার রাজনৈতিক পরিবেশে পঞ্জিম হাজতে প্রতিদিনকার সেই "রঘুপতি রাঘব" উপাসনা তাই ভারত সংস্কৃতির ঐক্যসূত্রের এক মহান অংগীকার হিসাবে আমার মনে প্রতিভাত হইয়াছিল। অসহায় গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীরা ভারতের সংগে ঐক্য ও সংযুক্তির দাবী তুলিয়া যে অত্যাচার নির্যাতনের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিদিন মনে মনে এই গানের ভিতর দিয়া ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাহাদের আনুগত্য জানাইয়াছে; আজও জানায়। আমাদের পরিচিত "রঘুপতি রাঘব" উপাসনার কয়েক লাইনের সংগে গোয়ার কোনো অখ্যাত অজ্ঞাত সংগীতকার একটি অতিরিক্ত কলি জুড়িয়া দিয়াছিল,

"ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম"—ইহার পরেই

"মন্দির মসজিদ তেরে ধাম" এই কলির সংগে ফিরিয়া আর একবার

"মন্দির ইগ্রেজ তেরে ধাম" দোহার।

'ইগ্রেজ' বা 'ইগ্রেজা' কথার অর্থ গির্জা চার্চ। বাংলা ভাষার 'গীর্জা' কথা পর্তুগীজ 'ইগ্রেজ' শব্দের অপভ্রংশ হিসাবে ষোড়শ সপ্তদশ শতক হইতে চলিয়া আসিয়াছে; মারাঠী-কোংকনীতে মূল 'ইগ্রেজ' বা 'ইগ্রেজ' শব্দই ব্যবহার হয়। গোয়ার ক্রিশ্চিয়ানদের কথা মনে রাখিয়া দোহারটুকুতে মসজিদ মন্দিরের সংগে 'ইগ্রেজ' কথাটুকু কে যেন জুড়িয়া দিয়াছে।

পঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজত ঘরের ছোটো ইলেকট্রিক বালবের ক্ষীণ আলোয় আমরা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন বন্দী ভারত-ভাগ্য-বিধাতা প্রজানুরঞ্জক ভগবান রামচন্দ্রের নাম স্মরণ করিয়া আমরা সকলে যে এক ও অভিন্ন, সেই কথা নিজেদের মনে গাঁথিয়া নিবার চেষ্টা করিতেছি। খালি আমাদের ঘরেই নয়, হাজতের অন্য যে ঘরে একাধিক গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দী আছে, সেখানেই এই গান দিয়া সান্ধ্য উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখি একপাশে তরুণ ক্রিশ্চিয়ান ফের্নান্দিস, জোয়াঁও আলমেইদা অন্যদিকে বিচোলী বাজারের মহম্মদ ওস্তাগর, মাঝে ভগৎ তুলসীরাম নাসিকের সেই ছোট ছেলেটি, আমি নিজে; আশেপাশে বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন শ্রেণীর গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দী, তাহাদের কেহ-বা সারস্বত ব্রাহ্মণ, কেহ ভাণ্ডারী, কেহ কুনিয় দেশাই। সকলে গলা মিলাইয়া এক সুরে গাহিয়া চলিয়াছি।

ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম
মন্দির মসজিদ তেরে ধাম
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
মন্দির ইগ্রেজ তেরে ধাম
পতিত পাবন রাজা রাম.........

আমার জীবনে ভারত-আত্মার এত কাছাকাছি নিজেকে কখনো অনুভব করি নাই। প্রতি সন্ধ্যায় কমপক্ষে অন্তত পাঁচ সাতখানি গান গাওয়া হইবে; দু চারটি মারাঠা প্রার্থনার মাঝে মাঝে একটি দুটি রাজনৈতিক সংগীত। এই সান্ধ্য উপাসনার ভিতর দিয়াই গোয়ার লোককবি গজানন রায়কতের "আজলা ত্রিবার মংগলবার, স্বাতন্ত্র্যাচী সিংহগর্জনা আঁতা ইয়ে উঠনার" বা "পুঢ়ে চলা পুঢ়ে চলা পুঢ়ে! রউন চলা পনজী-বরী বিজয়ী ঝাণ্ডে" গোয়া মুক্তি আন্দোলনের এইসব জনপ্রিয় জাতীয় সংগীতের সংগে আমার পরিচয় হয়।

উপাসনা শেষ হইয়া যাইতে না যাইতেই সন্ধ্যাবেলার খাবার আসিয়া যাইবে। তখন আবার কিছুটা হৈচৈ, কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে তাও শেষ হইয়া যায়। খাওয়া-দাওয়ার শেষে আবার কিছুটা একঘেয়ে রকম জাগিয়া থাকা, যতক্ষণ ঘুম না আসে। অবশ্য আমাদের হাজতে সকলে একসংগে শুইয়া ঘুমানো এক মহা হাংগামার ব্যাপার ছিল। তবু উহারই মধ্যে সকলে যত্ন করিয়া আমার জন্য কিছুটা জায়গা করিয়া দিতই। গোয়াবাসী সহবন্দীরা তাহাদের সাধ্যমত আমার কোনো অসুবিধা হইতে দিত না। আমার শোয়ার জায়গা করিয়া দেওয়ার জন্য তাহাদের দু' তিনজন হয়ত ভালো করিয়া শুইতে বা বসিতেও পারিত না। কিন্তু আমার ওজর-আপত্তিতে কান না দিয়া আমার জন্য একটু জায়গা তাহারা না করিয়া নিজেরা শুইতে যাইত না। এইভাবে শেষ পর্যন্ত হাজতে আধো-জাগ্রত, আধো-তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়, কখনো একটু ঘুমাইয়া কখনো পাহারাওয়ালার হাঁকে ডাকে জাগিয়া উঠিয়া খানিকটা জাগিয়া জাগিয়া থাকিয়া আমাদের রাত কাটিয়া যাইত।

এই ছিল আমাদের পঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজত জীবনের সাধারণ রুটিন।

(ক্রমশ)

তী র্থ ন দী র

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

খাঁ খাঁ রোদ্দুরে তপ্ত পথের ধুলো
হাঁ-করা এ মাঠ শত জিহ্বায় জ্বলে
তামাটে কালোয় ছড়ানো এই খোয়াই
লোহা হয়ে আছে এ-মাটির পিঠ পুড়ে।

বিরল-তরুর এ-মাঠে তালের সারি
যেন জাগ্রত কঠিন লোহার থাম
মাথায় সবুজ আগুনের শিখা জ্বলে
কঙ্কালীতলা ঐ দেখা যায় দূরে।

ওখানে কোপাই ছায়া-ঢাকা তার তীর
চলেছে ব্যাকুল তীর্থযাত্রী দল
জানে পথ দূর, তবুও পথের শেষে
আছে মন্দির ক্লান্তির শেষ হবে।

তৃষ্ণায় তুমি কে দাও প্রাণবর
পান্থ-পাদপ মরু-পথিকের তরে!

হা ও য়া

অমলকান্তি ঘোষ

উত্তাপ জ্বালা শেষ হল
কালো মেঘ তবুও বিরল
ক্ষুব্ধ যুবক এই হাওয়া
অভিমানে উচ্ছৃঙ্খল

আজীবন ছিল নিশ্চুপ
প্রগল্ভ হাসি নেই তাঁর
আজ দেখি নিশ্চুপতর
শুধু বুঝি মন দুর্বার

ঝড় এই দুর্বার মন
পথের গাছের মাথা নড়ে
হঠাৎ অনেক ধূলি দেখি
ধূলিহীন আপাত শহরে।

প্রি য় ত মা সু

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্

মিষ্টি মুখের একটু হাসি থাক্ না লেগে ঠোঁটে
অনুরাগের ছোঁয়ায় যদি ফুল হয়ে তা-ই ফোটে;
প্রাচীনকালে অশোক নাকি ফুটতো পদাঘাতে—
এখন না-হয় ফুটবে কুসুম মনের কিনারাতে!
তা-ই দিয়ে যে গাঁথলো আমি বিনা-সুতোর মালা
প্রেমের দেশে এলো যে আজ দিন-বদলের পালা!

রাজ্য তো নেই, তোমায় বলো কি-ই-বা দিতে পারি!—
ছোট্ট মুখের কিলটি পেলে, নেহাৎ বাড়াবাড়ি!
হতেই পারে তোমার মতো আধুনিকার কাছে
রিক্ত হাতে বিলিয়ে দেবার আর কি বলো আছে?
বেশ তো, নেবে? তোমায় দেবো কাব্য-কথার হার
আমার আছে পুঁজিবিহীন একটু অধিকার!

ভাবছো বুঝি ঘোলে কি আর দুধেরও সাধ মিটে
তুমি কি চাও তোমায় দেবো সাতপুরুষের ভিটে!

শার্ঙ্গদেব

সম্প্রতি শ্রীদিলীপকুমার রায় মহাশয় কলকাতায় কয়েকটি আসরে গান গেয়েছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির আয়োজনে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল সেটিতে তাঁর গান এবং আলোচনা শোনা গেল। বিষয়বস্তু ছিল ভজন। রায় মহাশয় ভজনের সাংগীতিক দিক নিয়ে আলোচনা করেন নি, ভক্তিতত্ত্ব তথা দার্শনিক বিষয় নিয়েই তিনি প্রধানত আলোচনা করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে কয়েকটি গান গেয়ে শোনালেন। তাঁর পিতৃদেবের বিখ্যাত গান "ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়"—এটিও শুনলুম প্রভূত আখর সমেত। ভাল লাগলেও বলব, আখরের প্রয়োগে কিঞ্চিৎ আতিশয্য বর্তমান। উচ্ছ্বাস এবং আবেগের প্রকাশ সংগীতে নিশ্চয়ই ঘটে কিন্তু আধিক্য ঘটলে বোধহয় উভয়েরই আবেদনের মূল্য কিছুটা হ্রাস পায়। তথাপি একটি মহৎ এবং পরিণত শিল্পীর সম্মুখে বসে গান শুনে মন ভরে গিয়েছিল—একথা বলতে দ্বিধা নেই।

ভজন ভক্তিমূলক সংগীত বলেই সর্ববিদিত। কিন্তু সংগীতশাস্ত্রে "ভজন" একটি পারিভাষিক শব্দ। শাস্ত্র বলছেন—রাগস্যাতিশয়াধানং প্রযত্নাৎ ভজনং মতম্। অর্থাৎ রাগের বা রঞ্জকত্বের অতিশয্যাধানই ভজন। এখানে রাগের অর্থ রঞ্জকত্ব—ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী নয়। এক কথায়, খুব মিষ্টি করে যে গান গাওয়া হয় তারই নাম ভজন। ভক্তিমূলক গান সাধারণতই মিষ্টি করে গাওয়া হয়ে থাকে। এসব গান স্বতই শ্রুতিমধুর, অতএব ভজন এই আখ্যাটি এইসব গানে সার্থক হয়েছে।

আজকাল দিলীপকুমার ভজন ছাড়া অপর কোন গান করেন না, কিন্তু এককালে করতেন। এক সময় সংগীতের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে তাঁর যে উৎসাহ ছিল আজ আর সেদিকে সে উৎসাহ নেই, কিন্তু তাঁর সেই সুচিন্তিত রচনাগুলি যখন পড়ি আর সেগুলিতে তত্ত্ব এবং প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে আলোচনার সারবত্তা উপলব্ধি করি, তখন তাঁর প্রতিভা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যে ব্যক্তি পরিচয় করিয়ে দেন তিনি বৃহৎ। আজকের যুগে যখন সামান্য প্রতিভাকে বিজ্ঞাপন এবং প্রোপাগান্ডা ঢক্কানিনাদে অসামান্যতার পর্যায়ে তোলবার প্রচেষ্টা হল তখন সামান্য এবং অসামান্যের তফাৎটা আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।

দিলীপকুমারের সঙ্গে একালের শিল্পী সমাজের পরিচয় না থাকবারই কথা। তিনি আমাদের যুগেরও পূর্ববর্তী। আমরা যখন কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছি বলতে গেলে, তখনই তিনি নিজেকে তৎকালীন পরিচিত সংগীত সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু তখনও তিনি আজকের মত এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হন নি:—তখনও সংগীত সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন, চিঠিপত্রও কম লেখেন নি, এমনকি গানও শিখিয়েছেন অনেককে। সে যুগের সেই সব প্রবন্ধের বিষয়বস্তু, তর্কাতর্কি আমাদের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল, আমাদের সাংস্কৃতিক আসরেও সে সব বিতর্ক নিয়ে আলোচনা হত কম নয়। এই সময় বহুদিন বাদে আবার তাঁর অনেকগুলি রেকর্ডও পর পর বাজারে বেরুলো। এই সব রেকর্ড নিয়েও তর্ক কম হয়নি। কেউ বললেন—এসব পাগলামি, কারুর মতে—এসব নানা জিনিসের একটা খিচুড়ি ছাড়া আর কিছু নয়,—কেউ মন্তব্য করলেন—অসম্ভব রকমের আর্টিফিশিয়েল। আবার কেউ হয়তো তদ্গতচিত্তে গদগদ হয়ে সে সব গান শুনতেন। সে যাই হোক, তাঁর মহৎ শিল্পসত্তাকে শতসমালোচনাতেও কেউ উড়িয়ে দিতে পারেন নি। তাঁর প্রতিভাকে সকলেই স্বীকার করেছেন।

এরও আগের যুগে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সঙ্গে বাংলার পরিচয় সাধন করেছেন দিলীপকুমার। ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা যখন বেরুতো তখন সংগীতরসিক ব্যক্তিগণ সেগুলি সাগ্রহে পড়তেন। আজকের কন্‌ফারেন্সে কলকাতায় বসে ভারতের শিল্পীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটছে। এক সময় দিলীপকুমার সারা ভারত ঘুরে বিশিষ্ট শিল্পীদের গানবাজনা শুনে তাঁদের সম্বন্ধে মনোরম সমালোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। আজকে যে সংগীত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে দিলীপকুমারের প্রচেষ্টা কম নয়। তাঁর আগে সংগীত সম্বন্ধীয় রচনা এমন সুখপাঠ্য হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া, ওস্তাদী শাসনের তীব্র নিন্দা করবার সাহস তাঁর ছিল। সত্যিকারের ওস্তাদীকে তিনি যেমন প্রাণ খুলে প্রশংসা

করেছেন তথাকথিত ওস্তাদিয়ানাকে বিদ্রূপও তিনি করেছেন তেমনি চোখা ভাষায়। ওস্তাদদের কবল থেকে যাঁরা কাব্যসংগীতকে মুক্তি দিয়েছেন তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন দিলীপকুমার। এজন্য তাঁকে নিন্দাও কম সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু নিন্দুকেরা জয়ী হন নি, বর্তমান কাব্যসংগীতের গতি ওস্তাদপন্থীদের পরাজয়ই সূচনা করেছে।

দিলীপকুমার আর একটি মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, সেটি হচ্ছে বিভিন্ন গানের স্বরলিপি। রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া এত অধিক সংখ্যক স্বরলিপি আর কারুর নেই। তাঁর পিতৃদেবের গান যা তিনি জানতেন তার স্বরলিপি করেছেন। শুনেছি, সেই স্বরলিপির বই আর পাওয়া যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের বহু গান বিলুপ্ত হয়েছে, মুখে মুখে বিকৃত হয়েছে। একমাত্র আদর্শ ছিল দিলীপকুমারের স্বরলিপিগুলি। সেও যদি লুপ্ত হয় তবে বাস্তবিকই দুঃখের কথা। তারস্বরে চিৎকার করে "ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সংগীত ভেসে আসে" গেয়ে থিয়েটারে ক্ল্যাপ পেয়ে যাঁরা দ্বিজেন্দ্রলালের গানের বিশেষজ্ঞ বনে গেছেন তাঁদের ট্র্যাডিশনটাই যদি পাকা হয়ে যায় তবে সত্যিই আমাদের দুর্ভাগ্য। অতুলপ্রসাদের গান বাংলায় প্রচার করবার দায়িত্বও এক সময় দিলীপকুমার গ্রহণ করেছিলেন। আজকাল রেডিওতে অতুলপ্রসাদের গান অনেকেই গাইছেন এবং তার জন্য প্রধানত নির্ভর করতে হচ্ছে দিলীপকুমারের এবং সাহানা দেবীর স্বরলিপির ওপর। এছাড়া, যখন যেখানে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন সেটির স্বরলিপি করে সবাইকার সামনে মেলে ধরেছেন। অনেকেই অনেক কিছু জেনেও হাত গুটিয়ে বসেছিলেন এবং আজও রয়েছেন কিন্তু দিলীপকুমার সেটি করেন নি।

বহু সুরশিল্পীকে দিলীপকুমার সর্ব-সমক্ষে তুলে ধরেছেন। প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় অকুণ্ঠ সমর্থন সহযোগে তাঁদের নাম প্রচার করেছেন যা তাঁদের পক্ষে সহজলভ্য ছিল না। অনেকে হয়তো এযুগে সেটা স্বীকার করেন না। কিন্তু সেটা তাঁদের স্বভাব। আমাদের দেশের সুরশিল্পীদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা জিনিসটা দুর্লভ, কিন্তু তাই বলে রায় মহাশয়ের ঔদার্যের অভাব ঘটেনি।

সংগীতের আদর্শ সম্বন্ধে দিলীপকুমারের সঙ্গে অনেকেরই মতানৈক্য ঘটেছে। অনেকেই সেই মতানৈক্যটাকে বড় করে দেখেছেন—ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। সংগীতের সঙ্গে পরিচয় নেই অথচ সামাজিক প্রতিষ্ঠার জোরে নানারকম মন্তব্য করতেও অনেককে দেখেছি। উঁচু ভুরুদের মধ্যে এ নিয়ে দলাদলিও হয়েছে। সব দেশেই এইরকম দলাদলি গুণগ্রহণ এবং রসগ্রহণে বাধা জন্মায়। আমাদের দিক দিয়ে বলতে পারি, আমরা অধ্যাত্মবাদী নই, ভক্তিতত্ত্ব বা সাধন ভজন সম্বন্ধে আমরা নিরাসক্ত। দিলীপকুমারের আজকের যা আদর্শ তা হয়তো আমাদের অনেকেরই আদর্শ নয়, তথাপি যখন তাঁর কণ্ঠে "বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম" শুনি তখন সেই মধুর ছবিটি সেই সৌন্দর্য এবং সেই আবেগ আমাদেরও উদ্দীপিত করে, আকৃষ্ট করে এবং উদ্বেল করে। সেখানে আমাদের মধ্যে যে শিল্পসত্তা রয়েছে তার সঙ্গে দিলীপকুমারের শিল্প-সত্তার কোন বিরোধ নেই, থাকতেও পারে না, কেননা সেখানে আমরা সব মিথ্যা কৃত্রিমতাকে ছাড়িয়ে শিল্পীর সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত।

পাবলিশার বললেন, 'দপ্তরী মাত্র একশ কপি বই দিয়ে গেছে। আজ পাঁচ কপি নিয়ে যান। দরকার হয় পরে আরো দেব।'

কল্যাণী বলল, 'মোটে পাঁচ কপি? আমার যে অনেককে দিতে হবে। এই আমার প্রথম বই। আত্মীয়স্বজনরা আছেন, অফিসের বন্ধুরা রয়েছে—।'

প্রৌঢ় পাবলিশার তরুণী তন্বী লেখিকার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, 'থাকবেই তো, বন্ধুবান্ধব তো থাকবেই। ধীরে ধীরে এক একজনকে দেবেন। এক দিনেই তো সব দেওয়া শেষ হয়ে যাবে না। গল্পের বই আস্তে আস্তে কাটবে। বন্ধুবান্ধবকে দেওয়ার সময় পরে ঢের পাবেন।'

বঙ্কুবাবুর কর্মচারী পঞ্চানন বইয়ের একটি প্যাকেট কল্যাণীর দিকে এগিয়ে দিল।

ছোট দোকানের সামনে লোকজনের ভিড় বেড়ে চলেছে। কল্যাণী আর দেরি করল না। বঙ্কুবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বইয়ের প্যাকেটটি নিয়ে কলেজ স্ট্রীটের সরু গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। দু চারজন লেখক পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, কেউ বা ঢুকলেন গলির মধ্যে। কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে তাকালেনও। কিন্তু কল্যাণী বেশ বুঝতে পারল, তাঁরা একটি মেয়ের দিকে তাকালেন; কোন লেখিকার দিকে নয়। সে অনেককে চেনে, তাকে এঁরা কেউ চেনেন না! কিন্তু সে কি চিরকালই এমন অচেনা থাকবে?

ভারি ভালো লাগছে ভাবতে। তার বইও বেরোল। এর চেয়ে অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর ঘটনা আর কি আছে। পাবলিশার কার্পণ্য করলেও কল্যাণীর বইয়ের গেটআপটি পরিচ্ছন্ন হয়েছে। জমকালো রঙে মোটা তুলিতে আঁকা নারীমূর্তি যে মলাট জুড়ে দাঁড়িয়ে নেই এতেই সে খুশী। ছিঃ, সে বড় ছেলেমানুষি হত। কী-যে রুচি হয়েছে এখনকার। বড়দের বই ছেলেদের মলাট দিয়ে মোড়া। এখনকার ক্রেতাদের এই নাকি পছন্দ। কিন্তু কল্যাণী তাঁদের চোখের কথা ভাবেনি। তার লেখক বন্ধু দিব্যেন্দু রায়ের পরামর্শ মতই বইয়ের অঙ্গসজ্জা করেছে। এই নিয়ে দিব্যেন্দুবাবু তাঁর পাবলিশারের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, আর্টিস্টের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছেন, তবে এমন বই বেরোতে পেরেছে। শুধু কি মলাট? বইয়ের নামটিও দিব্যেন্দুবাবুরই দেওয়া। 'আমরা এলাম।' চমৎকার নাম। কারো নামের সঙ্গে এ নামের মিল হবে না। যেমন আজকাল হচ্ছে, এক নামে পাঁচজনের বই বেরোচ্ছে। কিন্তু কল্যাণীর বই অনন্য। তার বই স্বনামধন্য। এ নাম যদিও পরের দেওয়া তবু কল্যাণীর মনঃপূত হয়ে তা তার একান্ত আপন হয়ে উঠেছে। আচ্ছা অভিধানে এত শব্দ থাকতে ওই দুটি কথাকে কেন জুড়ে দিলেন দিব্যেন্দুবাবু? কোথায় খুঁজে পেলেন ওই দুটি শব্দ? এই নিয়ে অফিসের বান্ধবীরা হাসাহাসি করেছে। 'তোমরা কারা?'

কল্যাণী বলেছে, 'কারা আবার? যারা আমার গল্পের নায়ক নায়িকা তারা।'

বান্ধবীরা হেসে বলেছে, 'উঁহু, শব্দের ঝোঁকটা বহুবচনের নয়, দ্বিবচনের।'

দিব্যেন্দুবাবু এখনো বিয়ে করেননি। বইয়ের সংখ্যা খান দশেক হলেও বয়স ত্রিরিশের নিচে। তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করবে বইকি সখিরা। কিন্তু কল্যাণী জানে ব্যাপারটা শুধু ঠাট্টাই। দিব্যেন্দু তার বন্ধু এবং উপদেষ্টা ছাড়া আর কিছু না। কল্যাণী আর কিছু হতে দিতে পারে না। বাপ মা ভাই বোনের ভরণ-পোষণের ভার তার ওপর। সে সকলের আশ্রয়। সবাইকে

অনাথ করে তার সরে দাঁড়াবার জো নেই, সরে দাঁড়াবার প্রবৃত্তিও নেই।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণে নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ল কল্যাণীর। মনে পড়ল বাবার কথা। আজকের দিনে সবচেয়ে আগে তাঁকেই স্মরণ করা উচিত ছিল। বাবার জন্যেই তো সব। বাবাই তো তাকে লিখিয়েছেন। সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন। অথচ তাঁর কথা মনে না ক'রে সে এতক্ষণ একজন অনাত্মীয় পুরুষের কথা ভাবছিল। সে কথা ভেবে কল্যাণীর লজ্জা হ'ল এবার। ছি ছি ছি, প্রথম কপিটি দিব্যেন্দুবাবুকে দিয়ে আসবার কথা সে ভাবল কী করে। বাবাকে উৎসর্গ করা বই। প্রথম কপি তাঁরই প্রাপ্য। কতদিন ধ'রে তিনি রোজ জিজ্ঞাসা করছেন, 'কিরে কলি, তোর বই বেরোল?' তার বই সম্বন্ধে এত ঔৎসুক্য আর কার আছে? না দিব্যেন্দুবাবুরও নেই। তা হলে কি এমন দিনে তিনি এদিকে একবার আসতে পারতেন না? কত কল্পনা, কত পরিকল্পনাই তো এতদিন ধ'রে হয়েছিল, কল্যাণী দেবী, আপনার বই যেদিন বেরোবে কী ক'রে সেলিব্রেট করবেন বলুন তো?'

কল্যাণী লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'তার আমি কি জানি। হয় না বই, তার আবার সেলিব্রেশন।'

দিব্যেন্দুবাবু বলেছিলেন, 'তাই কি হয়? নবজাতকের সম্বর্ধনা চাই বই কি। কী করবেন। কফি খাওয়া যাবে এক সংগে।'

কল্যাণী বলেছিল, 'সে তো আপনি মাঝে মাঝে খেয়েই থাকেন।'

দিব্যেন্দুবাবু বলেছিলেন, 'তাইতো, তাহলে তো আরো নতুন কিছু করা দরকার। ছোটখাটো একটা সভাই ডাকা যাবে তাহলে। আরো পাঁচজন লেখক লেখিকা থাকবেন। তাঁদের সংগে নবাগতার পরিচয় হবে।'

কল্যাণী বলেছিল, 'আপনি ঠাট্টা করছেন।'

কিন্তু তার কথাটা যে দিব্যেন্দুবাবু এমন সত্য ক'রে ভুলবেন কল্যাণী তা আশংকা করেনি। এর আগে অবশ্য তিনি অনেকদিন এসেছেন। এক সংগে পাবলিশারের দোকানে গিয়ে বইটার জন্যে তাগিদ দিয়েছেন। নানারকম জল্পনা কল্পনা করেছেন। কিন্তু একদিনের না আসা হাজার দিনকে যে ব্যর্থ ক'রে দেয় তা কি তিনি ভাবতে পারেননি? হতে পারে অন্য কোথাও গল্প জমিয়েছেন দিব্যেন্দুবাবু। তাঁর বন্ধুর অভাব নেই, বান্ধবীর অভাব নেই, কিন্তু অভাবের সংসারে কল্যাণী তার বাবার একমাত্র অবলম্বন।

দুটো বাস ছেড়ে দিয়ে ছত্রিশ-এ নম্বরের তৃতীয় বাসটিতে উঠে পড়ল কল্যাণী। কষ্ট করেই উঠল। ভিড় পাতলা হবার আশায় থাকলে রাত আটটা বাজবে।

ছোট লেডীজ সীটটি জুড়ে দুই অপ্রসন্নভাবে উঠে দাঁড়ালেন। কল্যাণী জানলার ধারে ঘেঁষে বসে তাঁদের একজনকে জায়গা করে দিল। সবদিন এই সৌজন্যবোধ, কি মনের প্রসন্নতা থাকে না কল্যাণীর। কিন্তু আজ তার জীবনের এক বিশেষ দিন। আজ তার প্রথম বই বেরিয়েছে। আজ সে গ্রন্থকর্ত্রী। লেখিকার চেয়ে অনেক ধ্বনি-গম্ভীর কথাটি। কিন্তু আজকাল এ ধরনের শব্দ কেউ ব্যবহার করে না। মুখে না, লেখাতেও নয়। বাবা ঠিকই বলেন, 'এখনকার তোমরা সব হালকা আর পলকার ভক্ত। যেমন তোমাদের ভাব তেমনি তোমাদের ভাষা। যেমন তোমাদের মন তেমনি তোমাদের মুখ। কোনটাই পুরু না, সব পাতলা। গাম্ভীর্য নেই, গভীরতা নেই, যতসব কাগজের নৌকা।'

বাবার অভিযোগগুলি কান পেতে শোনে, মন দিয়ে শোনে কল্যাণী। শুনতে মন্দ লাগে না। কিন্তু কলম ধরে এ যুগের ভঙ্গিতে, কাগজ ভরে এ কালের ভাষায়। বাবা মনে মনে অসন্তুষ্ট হন। মাও তাঁর দেখা দেখি রাগ করেন।

'এ কি ছাইভস্ম লিখছিস?'

কল্যাণী মুখ টিপে হাসে। ওঁদের ক্ষুণ্ণ না করে তার উপায় নেই। সে মাতৃভাষায় কথা বলে কিন্তু লেখে নিজের ভাষায়।

তবু সবার কাছেই তার হাতেখড়ি। হাতেখড়ি বলা যায় কিনা বাবার সংগে তার এক অদ্ভুত সম্পর্ক। বাবা তাকে লিখতে শেখাননি, নিজে লিখে কল্যাণীর নাম ধার নিয়েছেন। সে কথা ভেবে এত অবাক লাগে তাই, এত লজ্জা হয় যে তা কাউকে বলা যায় না।

বাবার লেখার ঝোঁক অনেকদিন ধরেই ছিল। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা সবই লিখতেন। লিখে লিখে মাকে শোনাতেন, তাকে শোনাতেন। শুনতে শুনতে মা হাই ছেড়ে বলতেন, 'বেশ হয়েছে।'

কল্যাণীও উৎসাহ দিয়ে বলত, 'বেশ হয়েছে বাবা।'

কিন্তু তাদের রুচির সংগে কোন মাসিক সাপ্তাহিকের সম্পাদকের রুচির মিল হত না। তাঁরা পত্রপাঠ বাবার সব লেখা ফেরত পাঠাতেন। এমন কি না পাঠ করেই অপাঠ্য বলে অবহেলা করতেন। বাবার মুখের দিকে আর তাকানো যেত না। এক একটা লেখা ফেরত আসত আর তিনি শয্যাশায়ী হতেন। সম্পাদক যেন বাবার পাঁজরের হাড় ভেঙে দিয়েছেন। বাবার মুখের দিকে তাকানো যেত না। তবু মা মুখ করতে ছাড়তেন না। বলতেন, 'মিছিমিছি কতগুলি পয়সা নষ্ট। কাগজ নষ্ট, কালি নষ্ট, তারপর আবার ডাকটিকিটের খরচা। ওই পয়সাগুলি বাজারের মধ্যে দিলে দুটো আনাজ তরকারি বেশি আসে। ছেলেমেয়েগুলি খেয়ে বাঁচে।'

ধমক খেয়ে বাবা কিছুকাল লেখা টেখা সব ছেড়ে দেন। শুধু অফিসে বেরোন, আর বাসায় এসে চুপচাপ বসে থাকেন। কলেজের অফিসে কনিষ্ঠ কেরানী। প্রফেসররা তো ভালো, সর্দার বেয়ারাদের চেয়েও সেখানে কম সম্মান কল্যাণীর বাবার। বাড়িতেও নামে মাত্র কর্তা। করবার যা মা নিজেই করেন। কি বাবাকে দিয়ে করান। বাবা এসে চুপ করে রোয়াকে বসে থাকেন। তাস পাশার নেশা নেই, মানুষজনের সংগে মেলা-মেশার শক্তি নেই। শুধু চেয়ে থাকা, শুধু চেয়ে দেখা। গলি দিয়ে লোকজন আসে যায়। কেউ যদি বাবাকে দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করে জবাব দেন। না করে তো দেন না। যেচে কারো সংগে কথা বলতে যান না কল্যাণীর বাবা। হয়তো ভয় পান পাছে কেউ জবাব না দিয়েই চলে যায়।

সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাবা যে অমন নিঃসঙ্গভাবে একা একা বসে থাকেন তাতেও মার রাগ। তাও মার সহ্য হয় না। তিনি বলেন, 'আচ্ছা, দুনিয়াদারিতে তোমার কি কেউ নেই? দিনরাত পথের মধ্যে বসে থাকবে কেন, কি হয়েছে তোমার? ঘর কি তোমার কাছে বিষ? ঘরে যদি তোমার মনই না টেঁকে এ ঘরে আগুন জ্বেলে দাও। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে একদিনে সব শেষ হয়ে যাক। ধিকি ধিকি করে পুড়তে পুড়তে আমি যে খাক হয়ে গেলুম।'

মার চোখে জল দেখতে পায় কল্যাণী। রান্নাঘরে গিয়ে তিনি কাঁদেন না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। এবার কল্যাণী মনে মনে মার পক্ষ নেয়। উঠে গিয়ে পিঠের কাছে গা ঘেঁষে বসে। তখনো সে বুঝতে পারে। বয়স আর কত। এগারো বারোর বেশি নয়। কিন্তু সেই বয়সেই সে বুঝতে পেরেছিল বাবার তূণে এমন এক ব্রহ্মাস্ত্র আছে যার সংগে মা কিছুতেই পেরে ওঠেন না। এমনিতে বাবা মার মধ্যে বনিবনাও নেই, সংসারের খুঁটিনাটি অভাব অনটন নিয়ে ঝগড়া লেগেই আছে। কিন্তু কল্যাণী লক্ষ্য করে, দু'দিন যদি বাবা মার সংগে ভালো করে কথা না বলেন মার যেন দম বন্ধ হয়ে যায়। বাবা অনায়াসে মার অনাদর অবহেলা সহ্য করতে পারেন কিন্তু মা বাবার এক ফোঁটা অমনোযোগ সহ্য করতে পারেন না। কল্যাণীর মার জন্যেও কষ্ট হয়, বাবার জন্যেও কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্টের মাত্রাটা বাবার জন্যেই যেন বেশি।

কল্যাণী বলে, 'বাবা, তুমি আর লিখছ না কেন?'

তার বাবা বলেন, 'কী হবে লিখে? কেউ তো আর ছাপবে না।'

কল্যাণী বলে, 'নিশ্চয়ই ছাপবে। তুমি আবার পাঠিয়ে দেখ। দেখবে এবার নিশ্চয়ই ছাপা হবে।'

বাবা ভরসা পেয়ে বলেন, 'তুই বলছিস হবে?'

কল্যাণী বলে, 'কেন হবে না বাবা। তুমি ছেড়ে দিয়ো না, লেখা ছাড়া তো তোমার আর কিছু নেই।'

গোপনে গোপনে বাবা আর মেয়েতে কথা হয়। যেন দুজনে এক গভীর ষড়যন্ত্রের অংশীদার। কল্যাণীর বাবা ফের লিখতে শুরু করেন, কাগজে কাগজে আবার লেখা পাঠান, কিন্তু সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। কোন কোন লেখা ফেরত আসে, বেশির ভাগ লেখাই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ফিরতি ডাকটিকিট পাঠাবার মত অত পয়সা কই কল্যাণীর বাবার। সব লেখা যে তিনি ডাকে পাঠান তা নয়, নিজে গোপনে গোপনে পকেটে করে নিয়ে যান কাগজের অফিসে। সে লেখা গোপনই থেকে যায়, প্রকাশিত আর হয় না।

তারপর হঠাৎ একদিন কল্যাণীর বাবা তার বাংলা রচনার খাতাটা টেনে নিয়ে বললেন, 'কলি, দেখি দেখি, তোর হাতের লেখাটা তো মন্দ হয়নি।'

কল্যাণীর মা সগর্বে বলেন, 'তোমার চেয়ে ঢের ভালো হয়েছে।'

কল্যাণী লজ্জিত হয়। তখন সে পাড়ার হাই স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়ে। সেক্রেটারীকে ধরাধরি করে হাফ ফ্রীশিপ পেয়েছে। ছাত্রী হিসেবে মন্দ নয়। বাৎসরিক পরীক্ষায় তিন চারজনের মধ্যেই থাকে।

মার কথার প্রতিবাদ করে কল্যাণী বলল, 'কী যে বল তুমি। বাবার লেখার সঙ্গে আমার লেখার তুলনা। ও'র লেখা কত পাকা।'

বাবা বলেন, 'তা হোক। কাঁচা হলেও তোর লেখার ছাঁদ বেশ ভালো।'

দুদিন বাদে বাবা তাঁর সদ্য লেখা একটা কবিতা নিয়ে আসেন, 'এটা একটু কপি করে দে তো মা।'

কল্যাণী বাবার কথা মত আর একখানা কাগজে সুন্দর করে কবিতাটি লিখে দেয়। তারপর নিচে যেই লেখকের নামটি লিখবে বাবা বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, 'উঁহু, আমার নাম নয়। ওখানে লেখ শ্রীমতী কল্যাণী বসু রায়।'

কল্যাণী অবাক হয়ে বলে, 'সে কি বাবা। আমার নাম কেন লিখব।'

বাবা বলেন, 'আমি যখন বলছি, তুই লেখ না। কোন দোষ হবে না তুই লেখ।'

কল্যাণী আর প্রতিবাদ না করে বাবার কবিতা 'হৃদয় ব্যথায়' নিজের নাম সই করে দেয়।

মাস তিনেক বাদে অঞ্জলি পত্রিকায় ছাপা হয় সে কবিতা। কাগজটি ডাকে আসে কল্যাণীরই নামে। মোড়ক খুলে কম্পিত হাতে বাপ আর মেয়ে দুজনেই কাগজের পাতা উলটায়। একটি পুরুগম্ভীর প্রবন্ধের নিচে ওদের হৃদয় ব্যথা স্থান পেয়েছে। বড় বড় হরফে কয়েকটি মুক্তার অক্ষর। লেগুলি এক সঙ্গে গাঁথলে একটি মেয়ের নাম উচ্চারিত হয়। কী অপূর্ব তার ধ্বনি, কী অনির্বচনীয় তার ব্যঞ্জনা। কোথায় ব্যথা বাপ আর মেয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। যেন উৎসব লেগেছে বাড়িতে।

মা এক সময় বলেন, 'কিন্তু ওই সব কথা তুমি মেয়েটার নামে ছাপালে?'

বাবা বলেন, 'তাতে কী হয়েছে?'

মা বলেন, 'না হয় নি কিছু। তবে ওই সব হৃদয় টিদয় আছে তো? ওগুলি কি ভালো?'

বাবা হেসে বলেন, 'হৃদয় টিদয় থাকাই বুঝি খুব খারাপ? আচ্ছা, এরপর থেকে ও আপদ বাদ দিয়েই লিখব।'

কবিতার পরে গল্প। অঞ্জলির পরে পঞ্চ শঙ্খ, মহিলাদের মুখপত্র বঙ্গনারী কাগজেও কল্যাণীর নামে তার বাবার লেখা ছাপা হতে থাকে। কী আশ্চর্য, একটা কাগজ থেকে পাঁচ টাকা দক্ষিণা পর্যন্ত আসে। তিন টাকা মার হাতে দিয়ে দু টাকার মিষ্টি কিনে আনেন বাবা। বিশু, শম্ভু, সন্তুদের মধ্যে মহোৎসব পড়ে যায়।

মা খুশী হয়ে বলেন, 'ওগো, কলির জন্যে কিছু একটা কিনে দিলেই পারতে।'

কল্যাণী বলে, 'বাবা, তুমি একটা নতুন কলম কিনে নাও না। লিখতে লিখতে তোমার কলমের একদিকটা ক্ষয় হয়ে গেছে। আর একটা কলম কেন।'

বাবা বলেন, 'কিনব কিনব। আস্তে আস্তে কত কি হবে দেখবি।'

কিন্তু অত তাড়াতাড়ি সব হয় না। কল্যাণী বসু রায়ের নামাঙ্কিত লেখাও বড় আর মাঝারি কাগজে অমনোনীত হয়। সেগুলিও সসম্মানে ফেরত আসে। বাবা দমে যান। কিন্তু লেখা ছাড়েন না। গল্প টল্প ছ মাসে ন মাসে যা দু একটা ছাপা হয় যত্ন করে নিজের বাক্সে রেখে দেন। ভাবেন, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করল কল্যাণী। কিন্তু কলেজে ঢুকতে না ঢুকতে বাবাকে অফিস থেকে বিদায় নিতে হল। স্বাস্থ্য কোনদিনই ভালো ছিল না। বাস থেকে পড়ে গিয়ে হাসপাতালে গেলেন। ফিরে আসবার পর বাঁ দিকটা পড়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে রোয়াক পর্যন্তও আর যেতে পারেন না বাবা। ঘরেই বসে থাকেন। ডান হাতটা এখনো চালু আছে। হাতে কলম এখনো চলে। কিন্তু তাতে সংসার চলে না।

কল্যাণী ভেবেছিল না খেয়ে সব দুঃখ

তারা মরে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য প্রাণের জোর। মরল না। মরতে মরতেও বেঁচে গেল। গয়নাগাটি বিক্রি করে কিছু টাকা আগাম দিয়ে বাকিটা কিস্তিবন্দী করে সেলাইর কল কিনে মা হলেন দর্জি। আর অনেক ধরাপড়ার পর কল্যাণী ঢুকল মার্চেণ্ট অফিসে রুটিন গ্রেড ক্লার্ক হয়ে। ছুটির পর কমার্শিয়াল কলেজে গিয়ে টাইপ আর সর্টহ্যাণ্ড শিখে নিল বছরখানেকের মধ্যে। তাতে পদোন্নতি আর বেতন বৃদ্ধি দুই-ই হল। বাবা সংসারের ধার ধারেন না। শুধু লিখে যান। তিনি যা চেয়েছিলেন তাই যেন হয়েছেন।

অফিসের খাটুনির পর রাত্রে ফিরে এসে বাবার ওইসব লেখা নকল করে দিতে কল্যাণীর মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে। কিন্তু এর চেয়ে তাঁকে তেল মালিশ করে দেওয়া অনেক সহজ। তবু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কল্যাণী না করতে পারে না। তাব হয়ে মাই বরং খোঁটা দেন, 'আচ্ছা, তুমি কিরকম ধারার মানুষ। মেয়েটা সারাদিন খেটে খুটে আসে, ফের তুমি ওকে ওইসব কাজে লাগাও। তোমার প্রাণে কি দয়া মায়া বলতে কিছু নেই?'

কল্যাণী বলে, 'থাক্ থাক্, তোমাদের আর রাত দুপুরে এ নিয়ে ঝগড়া করতে হবে না। যা লিখতে হবে দাও আমি লিখে দিচ্ছি।'

কিন্তু লেখার আপদও কম নয়। একদিন অফিসে গিয়ে কল্যাণী দেখল, তার দুই কলিগ রেখা আর সুনেত্রা খুব হাসাহাসি করছে।

কল্যাণী কিছু বুঝতে না পেরে বলল, 'কি ব্যাপার, এত ফুর্তি কিসের তোদের। বড়বাবুর নেকনজরে পড়লি নাকি?'

সুনেত্রা বলল, 'নারে না। আমরা একটা গল্প পড়লুম। বাব্বা কি লেখাই একখানা লিখেছিস।'

কল্যাণী বিস্ময়ের ভাণ করে বলল, 'আমি আবার লিখলাম কোথায়।'

রেখা বলল, 'আমরা সব জানি।'

তারপর দেরাজ খুলে অঞ্জলি পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যাখানা বের করে দিল।

কল্যাণী দেখল, বাবার সেই 'মরুতৃষ্ণা' গল্পটি এতদিনে ছাপা হয়েছে।

রেখা হেসে বলল, 'তোর এই গল্প পড়ে দিব্যেন্দুদা কি বলেছে জানিস? এ গল্প কল্যাণী বসু রায় না লিখে দাক্ষায়ণী দাসী লিখলেও পারতেন। যেমন ভাষা, তেমনি ভঙ্গী, তেমনি ভাব। তুই একেবারে প্রাক্‌-বঙ্কিম যুগে চলে গেছিস ভাই। দিব্যেন্দুদা বললেন, মাইকেল বিদ্যাসাগরের সমবয়সী।'

কোন্ এক দুর্বল মুহূর্তে কল্যাণী ওদের কাছে স্বীকার করেছিল সে লেখে। কল্যাণী বসু রায়ের নামে যে সব গল্প বেরোয় সেগুলি তারই রচনা। আজ সেই জালিয়াতির শাস্তি ভোগ করতে হল। জেল জরিমানার চেয়েও বড় বন্ধুদের উপহাস। বাবার অপরাধের জন্যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল কল্যাণীকে। নিজের নামের যে অক্ষরগুলি এতদিন তার চোখে মুক্তোর মিনারের মত মনে হয়েছিল, আজ তা বিষের কৌটোর মত লাগল।

বিকেলে সেই বিষ হজম করে কল্যাণী ফিরে এল বাড়িতে। বাবাকে এসে বলল, 'তুমি আমার নামে ওসব গল্প আর পাবলিশ করো না।'

বাবা মুখ তুলে বললেন, 'কেনরে কলি, কি হয়েছে?'

কল্যাণী বিরস শুকনো গলায় বলল, 'আমাকে সবাই ঠাট্টা করে। তুমি ওসব আমার নামে আর চালিয়ো না বাবা।'

কল্যাণীর বাবা লেখা থেকে মুখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন, 'কিন্তু তুই ছাড়া যে আমার আর গতি নেই মা। তুই ছাড়া সংসার অচল, তোর নাম ছাড়া আমি অচল।'

কল্যাণী বলল, 'অচল যদি হও, চুপ করে বসে থাকো। ওসব চালাকি করতে যেয়ো না।'

বাপকে এমন কঠিন কথা কোনদিন আর বলেনি কল্যাণী। আঘাতের দুঃখ নিজের বুকেই শতগুণ হয়ে লাগল। রাত্রে নিজে যত্ন করে বাবাকে খাওয়াল। তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিল অনেকক্ষণ ধরে।

বাবা বললেন, 'যা এবার শুতে যা।'

কিন্তু ঘরে এসে শুয়ে পড়ল না কল্যাণী। মার শাসন, ভাইবোনদের বিরক্তি ভ্রূক্ষেপ না করে রাত জেগে ডায়েরি লিখতে লাগল কল্যাণী। প্রথমে ডায়েরি, তারপরে গল্প। একটু এদিক ওদিক করে বাড়িয়ে কমিয়ে কাটছাঁট করে রূপান্তর সাধন। কল্যাণী নিজের কথা লিখল, বাবার কথা লিখল, ভাইবোনকে নিয়ে লিখল, অফিসের বন্ধু আর সহকর্মীদের নিয়ে লিখল। এ লেখা মেয়ের জবানীতে পুরুষের রচনা নয়, মেয়ের চোখে দেখা, মেয়ের মর্ম দিয়ে বোঝা পুরুষপ্রধান সমাজের রূপ, দরিদ্রের অন্তর দিয়ে অনুভব করা ধনিকপ্রধান সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই একই হৃদয় আর একই ব্যথার কাহিনী। যুগে যুগে গোঙানির ধরনটা শুধু আলাদা।

তারপর থেকে নিজের নামেই নিজের লেখা বেরোতে লাগল কল্যাণীর। বাবার কলম ঠিক স্তব্ধ হল না। থেমে থেমে চলতে লাগল। কখনো স্বনামে, কখনো বেনামে।

যে দিব্যেন্দু রায় একদিন বিদ্রূপ করেছিলেন তিনি নিজে এসে ধরা দিলেন, যেচে আলাপ করলেন কল্যাণীর সঙ্গে। তার লেখার সুখ্যাতি করলেন, সাহায্য করলেন। গল্প সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থাও তিনিই করে দিয়েছেন শেষ পর্যন্ত। এ বই বাবাকেই উৎসর্গ করেছে কল্যাণী। দিব্যেন্দুর নামটা যে কয়েকবার মনে না পড়েছে তা নয়। কিন্তু মনের কথাকে কলমের মুখে কিছুতেই টেনে আনেনি।

নবকৃষ্ণ্ডোঙা ছাড়িয়ে বাদপাড়া। সেই পাড়ায় কল্যাণীদের হল আসলের বাসা। বাস থেকে নেমে বেশী দূর হাঁটতে হয় না। গলির মুখেই বাড়ি। দোর পর্যন্ত যাওয়ার আগেই শুভা আর সন্তু ছুটে এল। সন্তু বলল, 'দিদি তোর হাতে কী ওটা। প্যাকেটে কী?'

কল্যাণী হেসে বলল, 'কিছু না। একটা ডিকসনারি।'

ছোট বোন শুভা ছোঁ দিয়ে সন্দেশের বাক্সের মত কেড়ে নিল দিদির হাতের বইয়ের প্যাকেট। প্রথমে হাত দিয়ে খুলতে চেষ্টা করল, পারল না। তারপর দাঁত দিয়ে কেটে ফেলল রঙীন সুতোর বাঁধন। ব্রাউন রঙের মোড়কটা খোলসের মত পড়ে রইল পথে। বই ক'খানি নিয়ে ওরা কলস্বরে বাড়ির ভিতরে ঢুকল, 'মা, 'আমরা এলাম', 'আমরা এলাম।'

কল্যাণী হাসিমুখে ভাইবোনের পায়ে পায়ে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

সন্তুর আর সবুর সয়নি। সে আগেই গিয়ে বাবাকে বইগুলি দেখিয়েছে। উৎসাহে তিনি সত্যিই বিছানার ওপরে উঠে বসেছেন। সামনে একটি স্যুটকেশ বাবার সেই চিরন্তন লেখার টেবিল। তার ওপর তাঁর লেখা কাগজের রাশ।

বাবা হেসে কল্যাণীর দিকে তাকালেন। 'এতদিনে তাহলে তোর বই বেরোল কলি?'

'হ্যাঁ বাবা।'

তিনি বললেন, 'বেশ হয়েছে। তা নবাগত কি আগন্তুক নাম দিলেই পারতি।'

কল্যাণী বলল, 'ও নামে আরো বই আছে বাবা।'

এবার তিনি উৎসর্গের পাতাটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকালেন। তারপর হেসে বললেন, 'ঈস্, শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ বসু রায় শ্রীচরণেষু। কিন্তু শিবপ্রসাদ তোর কে তা লোকে কী করে বুঝবে। বাপও হতে পারে, মেসোও হতে পারে।'

মা কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন, প্রতিবাদ করে বললেন, 'শুনেছি কথা? ছেলেমেয়েদের সামনে কী যে যা তা বল তুমি।'

কল্যাণীর বাবা এ কথার কোন জবাব না দিয়ে স্মিতমুখে বইয়ের পাতা উল্টে যেতে লাগলেন। 'যাক্, বেশ হয়েছে। ভূমিকা নেই, সূচীপত্র নেই, কী যে এক স্টাইল হয়েছে তোদের। লোকে গল্প খুঁজে বের করবে কী করে।'

বইখানা আগাগোড়া উল্টে পাল্টে দেখে নিঃশব্দে বইখানি নামিয়ে রাখলেন মাদুরের ওপর। তারপর অস্ফুট আর্তনাদের সুরে বললেন, 'আমার সেই গল্পগুলোর একটাও বুঝি দিসনি?'

বাবার চোখের দিকে তাকাতে পারল না কল্যাণী। মুখ নামিয়ে নিয়ে আরও অস্ফুট স্বরে বলল, 'না বাবা।'

তিনি ধরা গলায় ছল ছল চোখে বললেন, 'সম্পাদকের মত তুইও শেষ পর্যন্ত অমনোনীত করলি।'

কল্যাণীর মা এবার স্বামীর পক্ষ নিলেন। তাঁর গলায় দুঃখ আর রাগ দুই-ই ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'ছি ছি ছি, ও'র লেখা একটা গল্পও তুই তোর বইতে দিতে পারলিনে? তোর নামেই তো বেরিয়েছিল, তোর নামেই তো থাকত! কী দোষ ছিল তাতে? বুড়ো মানুষ, রোগা মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে এইটুকু দয়ামায়াও তোর হল না? চুলোয় যাক তোর লেখা। মায়া মমতাই যদি না থাকে, বই লিখে কী হবে?'

একটু থেমে শ্লেষের সুরে বললেন, 'দিব্যেন্দু বুঝি সব বাদ দিয়েছে?'

কল্যাণী আরক্ত মুখে বলল, 'তাঁর কেন দোষ দিচ্ছ মা? তিনি কিছুই করেননি। আমি আমার বিচারবুদ্ধি মত যা করবার করেছি।'

মা আবার বললেন, 'চুলোয় যাক্ তোর বিচারবুদ্ধি।'

কল্যাণী নিজের ঘরে ফিরে এসে বসে রইল চুপ করে। অফিসের কাপড় ছাড়ল না, হাত মুখ ধুতে গেল না। টিনের চেয়ারখানার ওপর কাঠ হয়ে বসে রইল। উৎসবের ঘরে মুহূর্তের মধ্যে যেন শোকের স্তব্ধতা নেমেছে।

আজ নয়, মাসের পর মাস, যতদিন ধরে বইখানা ছাপা হচ্ছে তার প্রত্যেকটি দিন এই একই দ্বন্দ্বে কল্যাণী মাসের পর মাস ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। বাবার সেই গল্পগুলি রাখবে কি রাখবে না। তার শিল্পবুদ্ধির সঙ্গে মমতার দ্বন্দ্ব, হৃদয়বোধের দ্বন্দ্ব। সে তো বাবার সম্পাদক নয়, সে তার বাবার মেয়ে। আর তার বাবা অসহায় পঙ্গু, সবদিক থেকে দুর্বল আর বঞ্চিত। যাঁর কোন আশা, কোন সাধ আকাঙ্ক্ষা জীবনে পূর্ণ হয়নি। যিনি বাঁচতে গিয়ে বাঁচতে পারেননি, লিখতে গিয়ে সে লেখা কাউকে শোনাতে পারেননি। তাঁর একটি কি দুটি লেখা নিজের বইতে নিলে দোষ কি। তাঁর রক্ত কল্যাণীর শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে আর তাঁর একটি রচনা কি কল্যাণী আত্মসাৎ করতে পারে না? পঁচিশ কি পঞ্চাশ বছর পরে তার লেখাও থাকবে না, তার বাবার লেখাও থাকবে না। কাল সব একাকার করে দেবে, সব নিঃশেষে ধুয়ে মুছে ফেলবে। তাহলে ক্ষতি কি পরমাত্মীয়ের একটি রচনাকে আত্মসাৎ করায়? কিন্তু কিছুতেই পারেনি কল্যাণী। সে বাবাকে নিয়ে লিখেছে, বাবাকে বই উৎসর্গ করেছে, তবু বাবার লেখা নিতে পারেনি। সে বাবারই মেয়ে। বাবারই ভাষা, বাবারই ভাব, বাবারই সাধ, স্বপ্ন আর সাধনার ধন। তবু সে আলাদা তবু সে সম্পূর্ণ আর একজন। আর সেই স্বাতন্ত্র্যেই তার স্বকীয়তা।

অনেকক্ষণ বাদে কল্যাণী উঠে দাঁড়াল। বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার পন্থা সে খুঁজে পেয়েছে। ছদ্মনাম থেকে মুক্ত করে বাবার সেই লেখাগুলি তাঁর নিজের নামেই বই করে প্রকাশ করবে কল্যাণী। পাবলিশার যদি নাই জোটে টাকা ধার করে ছাপবে। মাস-খানেকের মধ্যে বার করবে সে বাবার বই।

কল্যাণী উঠে এসে বাবার ছোট ঘরখানার মধ্যে ঢুকল। তিনি অন্ধকারে চুপ করে বসে আছেন। সুইচ টিপে আলো জ্বালল কল্যাণী। এ বাসায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু বাবার কাণ্ড দেখে কল্যাণী অবাক হয়ে গেল। তাঁর সামনে এক রাশ ছেঁড়া কাগজের স্তূপ। শুধু হাতে লেখা পাণ্ডু-লিপিই নয়, পুরোন সেই ছাপা গল্পগুলির ফাইল কপিও টুকরো টুকরো হয়ে রয়েছে।

কল্যাণী মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'এ কি বাবা, এ কি করলে তুমি।'

বাবা ছল ছল চোখে বললেন, 'ওগুলি কিছু হয়নি। তাই নষ্ট করে ফেললাম।'

কল্যাণী বলল, 'সে কি বাবা, তুমি কি আর লিখবে না?'

তিনি একটু হেসে বললেন, 'না লিখে থাকব কি ক'রে, লিখতেই হবে। কিন্তু যশের লোভে তোকে আর জ্বালাব না।'

কল্যাণী ধরা গলায় ডাকল, 'বাবা।'

বাবা বললেন, 'আয় তোকে আশীর্বাদ করি। আজ বড় আনন্দের দিন।'

কল্যাণী মাথা নিচু করে বাবার কাছে এসে বসল।

মাইকেলের তারা ও রবীন্দ্রনাথের দেবযানী

মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে একটি দুকুলপ্লাবী বিপ্লব এনেছিলেন মধুসূদন। জীবনের জয়গানমুখর ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্য একটি বিশিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই কাব্যেই আধুনিক রোমান্টিক প্রেম প্রথম দেখা দিল বাঙলা কাব্য-জগতে। তার পিছনে যে মানবিকতা ও ব্যক্তিত্ববাদের পাশ্চাত্য ভাবনা-ধারণার প্রেরণা ছিল, একথা সর্বজনবিদিত। তেমনি সুবিদিত—মানুষের স্বাভাবিক বাসনা-কামনার অকৃত্রিম স্বীকৃতি বাঙলা কবিতা প্রথম পেল মধুসূদনের লেখনী মুখে। কোনো তত্ত্বের আবরণে, কোনো অলৌকিকতার আচ্ছাদনে তা ঢাকা ছিল না।

মধুসূদনের জীবনের গতি ছিল যেমন দুর্দম, সাহিত্য-আদর্শও তেমনি ছিল তাঁর দুঃসাহসিক। তাঁর উদ্দাম অশান্ত জীবনস্রোতে দৈন্য ছিল না—ছিল না সংস্কারের অলঙ্ঘ্য বন্ধন-বাধা। মধুসূদনের প্রাণের আবেগ-বাসনা-কল্পনা তাঁর কাব্যস্রোতে বয়ে নিয়ে এল বাঙালীর অভ্যস্ত চিন্তাধারায় চাঞ্চল্য ও বিপ্লব। মানুষের সহজাত অথচ দুর্বার আকাঙ্ক্ষাকে মধুসূদন দেখলেন মানবিক দৃষ্টিতে। তিনি তাই প্রকাশ করলেন, পারলেন করতে অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রাচীন ভারতগাথার সর্বজনপরিচিত চরিত্রগুলির স্খলন-পতন কলঙ্ক স্খালন করে তাদের চিরকালীন মানবমূর্তিতে। আমাদের চিরাচরিত সংস্কারকে সজোরে নাড়া দিয়ে এনে দিল তা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সেই দৃষ্টিতেই তার পরবর্তী যুগে সৃষ্ট হয়েছে রবীন্দ্র-কাব্যে—চিত্রাঙ্গদা, কচ, দেবযানী; রূপান্তরিত হয়ে তারা আজকের জীবন-স্পন্দনে স্পন্দিত।

এ প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে পড়ে যায়, রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপের' দেবযানীর পাশে মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' তারাকে। মনে হয় এরা সগোত্র। কিন্তু তবুও মধুসূদনের তারা ও রবীন্দ্রনাথের দেবযানীর মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। কাহিনী-নির্বাচনে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মধুসূদন এক হিসাবে নির্ভীক এবং দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন প্রেমিক নির্বাচনেও। দেবযানী গুরুকন্যা, আর তারা গুরুপত্নী। দুটি কবিতাতেই কিন্তু অতীতের প্রেম-কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত হয়েছে নতুন মনোজগৎ। তারা ও দেবযানী—কুণ্ঠাহীন তাদের আত্মপ্রকাশ। তারা প্রণয়ভিক্ষু, প্রেমাস্পদের কাছে আত্মনিবেদনব্যগ্র। দেবযানী তার কুমারী হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করেছে কচের উদ্দেশে। তারা সোমদেবকে বলেছে—

এ প্রেম বঁধু আছিল হৃদয়ে
অন্তরিত; কিন্তু ধিক্ বৃথা চিন্তা তোরে।
কে পারে লুকাতে কবে জ্বলন্ত পাবকে?
এস তবে প্রাণসখে। তারানাথ তুমি
জুড়াও প্রাণের জ্বালা!

তার হৃদয় আবেগের প্রকাশে কোথাও আবরণ রাখেনি সে। স্বচ্ছন্দে সে বলতে পেরেছে—

এস তুমি; এস শীঘ্র। যাব কুঞ্জবনে
তুমি হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে!
দেহ পদাশ্রয় আসি,—প্রেম-উদাসিনী
আমি! যথা যাও যাব; করিব যা কর;—
বিকাইব কায়মনঃ তব রাঙা পায়!

দেবযানীও পরিণতবয়স্ক, ব্যক্তিত্বশালিনী, মনোভাব গোপন করবার দুর্বলতা তার নেই, প্রকাশ করতেও সংকোচ-শঙ্কা নেই। তবু কুমারীসুলভ শোভনতা ও আবরণ আছে। তারার উদগ্র কামনার প্রকাশ নেই তার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাকে অর্পণ করেছেন শ্রী ও সহজাত সংযম। প্রথমেই স্পষ্ট করে কিছু বলতে দেবযানীর বেধেছে, অথচ নিজের কথা জেনে নিতে কতই না তার আগ্রহ!

দেবযানী—হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আর কোনো সহচরী ছিল তব পাশে
পরগৃহবাসদুঃখ ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রিদিন ধরে?.....
কচ—চিরজীবনের সনে
তার মন গাঁথা হয়ে গেছে।

এই আশ্বাসবাণী পেয়েই তবে দেবযানী নিজেকে ধরা দিয়েছে, যদিও আগাগোড়াই ধরা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল সে। কচকে সে যে ভালবেসেছে প্রথম দিন থেকেই। দেবযানীর এই দ্বিধাটুকুই আমাদের মুগ্ধ করে।

দেবযানী ও তারা দুজনেই আত্ম-সচেতন। কিন্তু দেবযানীর মন নির্দ্বন্দ্ব, তারার পক্ষে অন্তর্দ্বন্দ্বই স্বাভাবিক। তারা নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের যে আভাস দিয়েছে, তাতে তার প্রেমের মহিমা খর্ব হয়ে গেল—

জনম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি?......
কর্মনাশা পাপ প্রবাহিনী।
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে?

এই গ্লানিকে সে কাটিয়ে উঠেছে অবশ্য, তবু জগতের সমক্ষে তার প্রেমকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, কারণ নিজেই তার মহত্ত্ব সম্পর্কে নিঃশঙ্ক নয় তারা। মর্ত্যবাসীর পক্ষে দেহতৃষ্ণার হাহাকারকে অস্বীকার করবার উপায় নেই সত্য, কিন্তু যদি বাস্তব প্রাপ্তির সৌভাগ্য না হয়, মিলনের উপায় যদি না থাকে, তবুও সেই অপ্রাপ্ত প্রেমে পরম সান্ত্বনা থাকতে পারে—মধুসূদনের রোমান্টিক প্রেমের ধারণায় এই মহৎ উপলব্ধির দেখা আছে। হাতে-হাতে চাওয়া-পাওয়ার হিসাব না মিটিয়ে নিলে তারার তৃষ্ণার শান্তি নেই; একান্তেই সে প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হবার কামনা করে—

যদি দয়া থাকে এস শীঘ্র করি।
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়......।

জীবন মরণ মম আজি তব হাতে।

যৌবনের জ্বালা তারাকে পাগলপারা করে তুলেছে। মধুসূদনের আবেদন, কামনা, সংসার সব কিছুকে প্লাবিত করে উদ্দামবেগে ছুটে যায় একটি হৃদয় থেকে আর একটি হৃদয়ে স্ফুলিঙ্গের বহ্ন্যুৎসব বাধিয়ে দেয়। দেহতৃষ্ণার প্রবল আসক্তি সর্বনাশা উন্মাদনায় সব কিছুকে তছনছ করে দিতে চায়।

তারার এই আবেদন এবং দেবযানীর প্রণয় নিবেদনের মধ্যে মস্ত বড় একটা প্রভেদ আছে—যদিও তারার মতই দেবযানীও হাতে-হাতে পাওনাটুকু মিটিয়ে নিতে চায়, কল্পনার স্বর্গলোকের আশ্বাসে তার লোভ নেই, মনও ভরে না, এই বেণুমতী তীরেই কচের সহচারে অভিনব স্বর্গ সৃজনেরই তার বাসনা।

মহাভারতের দেবযানী চরিত্রের প্রবল আদিমতা তাকে এক হৃদয়ের ঘাট থেকে আরেক ঘাটে নিয়ে এসেছে। সেই দুর্দম প্রণয়পিপাসু নারী আমাদের বিচলিত করে। সে নিশ্চয়ই সতী-সাবিত্রীর আদর্শে গঠিত রমণী নয়, কিন্তু তবু তার স্পর্ধিত আত্ম-গরিমা, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব আমাদের অভিভূত করে। কবিচিত্তও তাতেই আকৃষ্ট হয়েছে মনে হয়। কবি ভারত মহাকাব্যের এই চরিত্রটির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটান নি তাঁর রূপায়ণে: দেবযানীর আহত অবলুণ্ঠিত প্রণয়মহিমা, তার শূন্য হৃদয়ের হাহাকার শেষ পর্যন্ত অভিশাপের তীক্ষ্ণতম শায়কে কচকে বিদ্ধ করেছে।

কিন্তু এই চির অতৃপ্তির অপরিসীম বেদনাতেই প্রেম অনির্বচনীয় মাধুর্য-মণ্ডিত হয়ে উঠল কচের মধ্য দিয়ে। কচের শেষ ক্ষমার বাণীতে একটি মহৎ সান্ত্বনার ঐশ্বর্য উদ্ভাসিত। এই ঊর্ধ্ব ভাবভূমির আদর্শের আলোকে উজ্জ্বল প্রেমই রবীন্দ্রনাথের নিকষিত হেম। দেবযানীর প্রেমের অগ্নিগর্ভ আবেগের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে কচের প্রশান্তিযুক্ত হয়ে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রেমের পৌরুষদীপ্ততার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই কাব্যটি।

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস গত সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন ১ নম্বর সদর স্ট্রীট-এ। সবশুদ্ধ ৪০টি ছবি প্রদর্শন করা হয়েছিল। এই ছবিগুলি উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেফাজতে আছে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে নানা কথা শোনা যায়। অনেকে বলেন এ কেবল তাঁর অবসর সময় চিত্তবিনোদনের জন্য হিজিবিজি আঁকিবুঁকি কাটা। আবার অনেকে বলেন ইউরোপে অর্ধ শতাব্দী ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করেও শিল্পীরা যে স্তরে উঠতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ রঙ এবং তুলি স্পর্শ করেই সেই স্তরে উঠেছিলেন। অনেকে বলেন তিনি সুররিয়ালিস্ট। পাশ্চাত্যের আধুনিক ছবিই তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস সেকথা ঠিক কিন্তু তিনি যে বিশেষ কোনও 'ইজম'-এর পথ ধরে চলেছিলেন সে কথা মানা যায় না। তাঁর আর্ট সম্পূর্ণ তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। মাঝে মাঝে সুররিয়ালিস্টিক ছবির সঙ্গে তাঁর ছবির সাদৃশ্য পাওয়া যায় বটে কিন্তু সুররিয়ালিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর যে কিছু মিল ছিল বলে মনে হয় না। আঁদ্রে ব্রেতঁ-র সংজ্ঞায় সুররিয়ালিজম হল—

"It is sheer psychological automatism, by means of which it is intended to express verbally, in writing, or in some other way, the actual function of thinking. Dictation of thinking, without any control exercised by reason, outside any aesthetic or moral prejudice." তাই সুররিয়ালিস্টিক ছবিতে দেখা যায় স্বপ্ন দেখার মত সব এলোমেলো ব্যাপার। যা সম্ভব নয় সেই রকম সব ঘটনা। জাগা অবস্থায় মানুষ যা দেখে তার স্থান নেই এখানে, কারণ সুররিয়ালিস্টরা মনে করেন মানুষের মন যখন অবচেতন অবস্থায় থাকে তখনই সে তার ভেতরের মনের কথা জানাতে পারে এবং আর্ট হিসেবে যদি কিছু দেবার থাকে তাহলে এই অবস্থায় যা দেখা যায় সেইটেই প্রকাশ করা উচিত। মনস্তাত্ত্বিক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডকে এঁরা অত্যন্ত ভক্তি করেন এবং মেনে চলেন। জাগা মনে যা আজগুবি মনে হয় সেই সব বিষয়বস্তু থাকলেও সুররিয়ালিস্ট ছবিতে যে সব আকার থাকে তা খাঁটি বস্তুরূপধর্মী। প্রতিটি আকারকেই চেনা যায় এবং প্রতিটি আকারেরই নাম করা যায়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার বিশেষ শ্রেণীর ভাগ সময়েই বস্তুরূপধর্মী নয়। মাঝে মাঝে তিনি সোজা লাইন-এ মনুষ্যাকৃতি এঁকেছেন (৯নং ছবি। মাঝে মাঝে খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে কতগুলি বক্ররেখায় ফিগার এঁকেছেন (৩৫নং ছবি)। মানুষের প্রাকৃত আকারের সঙ্গে কোনও মিল না থাকলেও প্রকার বেশ স্পষ্ট। পাখির ছবিগুলি যে পাখিরই তা বোঝা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তারা এ জগতের পাখি নয়। তাঁর মনে যখন যা ভাব জেগেছিল তিনি তা নিঃসংকোচে ব্যক্ত করে গেছেন। এর জন্যে কোনও নিয়ম বা ব্যাকরণ বা যুক্তির ধার ধারেননি। কোনও বিশেষ পথ ধরে এগোবারও চেষ্টা করেননি। পিকাসোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটু মিল আছে; পিকাসো বলেন যে, তিনি ছবি আঁকেন কেবল তাঁর অনুভূতি এবং কল্পনার ভার মুক্ত হবার জন্য। রবীন্দ্রনাথও তাঁর অনুভূতি এবং কল্পনার ভার মুক্ত হবার জন্যেই ছবি এঁকে গেছেন, দর্শককে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। পিকাসোকেও এক সময় সুররিয়ালিস্ট বলা হয়েছিল যা তিনি আদৌ ছিলেন না। তবে পিকাসোর ক্রাফটসম্যানশিপ এবং বণিকতা অনেক মার্জিত, কারণ তিনি ড্রইং এবং পেইন্টিং নিখুঁতভাবে শিক্ষা করে তার পর আধুনিক আর্টে মন দিয়েছিলেন।

যাই হোক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সংগ্রহটি প্রদর্শন করে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের কাছে অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ভবিষ্যতে মৃত এবং জীবিত সব প্রথিতযশা শিল্পীদেরই চিত্রকলার এইভাবে প্রদর্শনীর আয়োজন যদি তাঁরা করতে পারেন কলারসিক সমাজের কৃতজ্ঞতা তাঁরা সব সময়েই লাভ করবেন। এর পর গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলার একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

—চিত্রগ্রীব
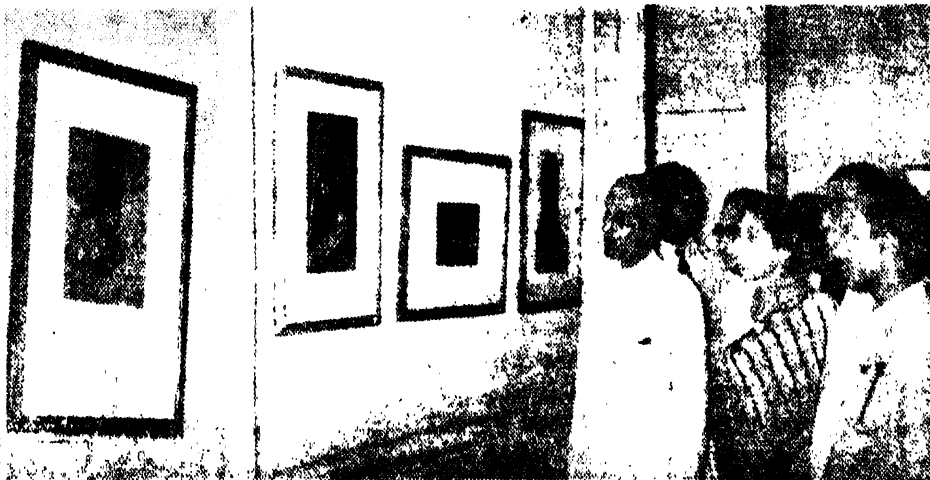
সংবাদে প্রকাশ এবারে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থীদের ভীড় অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছিল।—"চন্দ্রদেহে গ্রহণের সময় বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনার কথা শুনে মুক্তিস্নানের জন্যে হয়ত কেউ আর লালায়িত হননি। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে চাঁদ অবশ্য অনাহতই আছেন, বরং চন্দ্রাহত হয়েছেন শত্রুরাই"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

চাঁদ সম্পর্কে অন্য এক সংবাদে প্রকাশ রাশ্যা নাকি চাঁদের অ-দৃষ্ট অংশের ফটো তোলার পরিকল্পনা করিতেছেন। শ্যামলাল বলিল—"কুছ্ পরোয়া নেই। আমেরিকা চাঁদের ছবি তোলার চেষ্টা না করে "চাঁদ-মুখের" ছবি তুলে বাজারে ছাড়ুন, দেখবেন রাশ্যা এক ঢিলে কুপোকাৎ"!!

* * *

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নাকি রহস্যচ্ছলে বলিয়াছেন যে, এখানে কমিউনিস্টদের ক্রিয়াকলাপ বাড়িলে তিনি কিছু দিনের জন্য মঙ্গলগ্রহে গিয়া থাকিবেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন,—"মঙ্গলগ্রহে গিয়ে ক'টা দিন থাকার ইচ্ছে যদি এই কারণেই হয়ে থাকে তাহলে সবিনয়ে নিবেদন

করব, সেখানে লোক সমাগম না হলেও চোঙা, ঝাণ্ডা, মাইক্ নাকি ইতোমধ্যেই পৌঁছে গেছে, বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন"।

* * *

পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল শিক্ষা কোর্সের উদ্বোধন সভায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় চিকিৎসাক্ষেত্রে নূতন ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"ভিজিট এবং ভেজালের যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আভাস আমরা পাচ্ছি তাতে মনে হয় ছাত্ররা যদি সেই পুরোনো ধারার দিকে ফিরে যান তাহলে আমরা বেঁচে যাই।

মুখ্যমন্ত্রী মশাই পুরোনো দিনের চিকিৎসক, আশা করি তিনি আমাদের সঙ্গে একমত হবেন"।

* * *

বাঁকুড়া জেলার গোপালনগর নামক গ্রামের এক সংবাদে শুনিলাম সেখানে নাকি একটি অদ্ভুত বাবুই পাখীর বাসা পাওয়া গিয়াছে। বাসাটি সাধারণ বাসার মতো হইলেও ইহার নাকি দুইটি প্রকোষ্ঠ আছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ডানহাত-বাঁহাতের কারসাজিতে অনেক বাবু-ই এমন কোঠাবাড়ি তৈরি করছেন।"

* * *

"সঙ্ঘবদ্ধভাবে রেল সম্পত্তি অপহরণ" একটি সংবাদ শিরোনামা। শ্যামলাল সংক্ষেপে মন্তব্য করিল—"দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ,—একবারে পূর্ণাবয়ব সমাজতন্ত্র"!!

* * *

শান্তিনিকেতনে সম্প্রতি যে একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়া গেল তা লইয়া সংবাদপত্রে অনেক লেখালেখি হইয়া গিয়াছে। অনেকে অবাক বিস্ময়ে এ সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্নও আমাদিগকে করিতেছেন। শুনিলাম একটি গ্রীক নাটকের পরিচালনা লইয়াই নাকি গোলযোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের কাছে এতই "গ্রীক্" যে এর মাথামুণ্ডু কোন কিছুই মুণ্ডে ঢুকিতেছে না।

* * *

তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ বি ভি কেশকার নাকি বলিয়াছেন যে সিনেমা সঙ্গীত বহু সুরের জগাখিচুড়ী ছাড়া কিছুই নয়।—"কিন্তু যারা খিচুড়ি খাবো বলে বায়না ধরে, তাদের তথ্য মন্ত্রী মশাই কোন্ তত্ত্বকথা শোনাবেন"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

একটি বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম জনৈক ৭৬ বৎসরের বৃদ্ধ তাঁর ৪৪ বৎসর বয়স্কা পত্নীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়াছেন। কিন্তু পরে তিনি ঐ পত্নীকেই দত্তক কন্যারূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আবেদন জানাইয়াছেন। শ্যামলাল বলিল "কন্যারূপে না পেয়ে দত্তক মাসীরূপে পাবার আবেদন জানালে হয়ত প্রার্থনাটা জুৎসই হতো"!!

* * *

দ্রাবিড় কাজাগাম সম্মেলনে নেতা নায়কর নাকি বলিয়াছেন যে, যে ছয়জন আইনজীবী ভারতীয় সংবিধান রচনা করেন তাঁদের মধ্যে ৬ জন ব্রাহ্মণ অথচ ব্রাহ্মণ হইলেন জনসংখ্যার ৩ জন মাত্র। সুতরাং ভারতীয় সংবিধান ভস্ম করিয়া ফেলিতে হইবে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"হয়ত নায়কর মশাই ন্যায্য কথাই বলেছেন। আমরা জানি সংবিধান রচনায় যিনি বেশি শ্রম ও দায়িত্ব স্বীকার করেছেন তাঁর নাম শ্রীআম্বেদকার ভট্টাচার্য, নিবাস ভট্টপল্লী"!!!

* * *

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট টীম নাকি পাকিস্থানে তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলিতে রাজী হইয়াছেন।—"লাহোরের মাঠে

সুরাবর্দি সাহেব এই জন্যেই "গুগ্লি" বোলিং প্রাকটিস করেছেন কিনা তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—মন্তব্য করিলেন ক্রিকেট-রসিক বিশু খুড়ো।

প্রবাসের জার্নাল : অক্সফোর্ড

শিবনারায়ণ রায়

আইসায়া বার্লিন

ঐতিহ্যাশ্রয়ী অক্সফোর্ডে আধুনিক চিন্তা ছাত্রদের মধ্যেই আবদ্ধ নেই। এসব চিন্তার যাঁরা খোরাক যোগাচ্ছেন তাঁদের অনেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক। এঁদের কয়েকজনের সংগে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একজন হলেন আইসায়া বার্লিন, অন্যজন ডি ডি এইচ কোল।

বাংলা দেশে বার্লিনের নাম হয়ত এখনো অনেকে জানেন না, কিন্তু বিলেতে সম্প্রতি-কালে যে দুএকজন মনীষী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, ইনি তাঁদের মধ্যে প্রধান। ইনি একই সংগে দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক। বয়স পঞ্চাশের কোঠা ছুঁই ছুঁই করছে। ইনি অলসোলস্‌-এর ফেলো। সেখানেই এক অপরাহ্নে শেরী-পানের নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

অলসোলস্ কলেজ নামে কলেজ, কিন্তু এখানে কোন একটা অধ্যাপনা হয় না। এখানে থাকেন শুধু ফেলোরা। তাঁদের প্রত্যেকের আলাদা বসবাসের জায়গা আছে, আর আছে অপর্যাপ্ত বই এবং আপন আপন বিষয় নিয়ে অনুশীলন করবার অফুরন্ত অবসর। এঁদের অনেকেই অধ্যাপক, অন্য অন্য কলেজে মাঝে মাঝে পড়াতে যান, কখনো কখনো অলসোলস-এও তাঁদের বক্তৃতা হয়। কিন্তু এঁদের প্রধান কাজ নিজের নিজের বিষয় নিয়ে পড়াশুনো, গবেষণা। অলসোলসকে তাই অক্সফোর্ডের মনীষীদের প্রায় কেন্দ্র বলা চলে। এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ হেনরী চিচেলি এবং তখনকার দিনের রাজা ষষ্ঠ হেনরী। এটা পরিকল্পিত হয়েছিল মৃখ্যাত গ্রাজুয়েটদের একটা যৌথ সমিতি এবং বাস-স্থান হিসেবে। পরের কয়েক শতাব্দী ধরে সেই হিসেবেই এটা গড়ে উঠেছে। প্রাসাদের মত বিরাট বাড়ির মাঝখানে দুটো কোয়াড্রাংগল, তাদের ঘিরে চারপাশে সারি সারি ঘর। অট্টালিকার উত্তর দিকের সমস্তটা জুড়ে বিরাট কোড্রিংটন গ্রন্থাগার—মৃখ্যাত ফেলোদের গবেষণার জন্যে তৈরী।

আইসায়া বার্লিনকে প্রথম নজরে দেখে, স্বীকার না করে উপায় নেই, আমার সুবিধে ঠেকেনি। হৃষ্টপুষ্ট মাঝবয়েসী মানুষ, মস্ত গোলগালের মুখে, তাতে বেশ খানিকটা স্থূল আত্মতৃপ্তির চেকনাই—বিদগ্ধ ব্যক্তি-দের চেহারা সম্বন্ধে আমাদের যা সাধারণ ধারণা, তার সংগে মোটেই মেলে না। কিন্তু এঁর বিভিন্ন বই এবং প্রবন্ধ পড়ে আগেই আকৃষ্ট হয়েছি, সুতরাং চোখ নাই বলুক মন আশা ছাড়তে রাজী হল না।

শেরী পান করতে করতে আলোচনা শুরু হোল। টুকরো-টাকরা কথার পরে প্রশ্ন উঠল, ঐতিহাসিকের পক্ষে অবজেকটিভ হওয়া সম্ভব কিনা, হলে কতটা সম্ভব? কিন্তু অবজেকটিভিটি কথাটার মানে কি? যা ঘটেছে, তার বর্ণনা এবং ব্যাখ্যায় নিজের ভাললাগা মন্দলাগার দ্বারা পরিচালিত না হওয়া। কিন্তু ব্যাপারটা কি এতই সরল? প্রথমত, যত ঘটনা ঘটে তার সবকিছুই ইতিহাসে স্থান পায় না, ঐতিহাসিককে বাছতে হয়, সাজাতে হয়, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র এবং ধারাবাহিকতা আবিষ্কার করতে হয়। যতই না কেন তিনি নিরপেক্ষ থাকতে চান, প্রসব কাজের মধ্যে তাঁর মূল্যা-মানের প্রভাব না পড়ে পারে না। ফলে দুজন বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীসম্পন্ন ঐতিহাসিক একই যুগ, একই দেশ নিয়ে লিখতে গিয়ে দুই বিভিন্ন ছবি আঁকেন।

দৃষ্টিভংগির ছাপ অস্পষ্ট এমন ইতিহাসও নিশ্চয়ই লেখা যায়। বার্লিন হেসে বললেন, অধিকাংশ ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস সেই জাতের। কিন্তু তাতে শুধু ঘটনার কংকাল আছে, প্রাণ নেই। ইতিহাস লেখা তখনি সার্থক যখন তা পড়ে যে যুগের, সমাজের এবং মানুষদের নিয়ে সে ইতিহাস, তাদের আমরা জীবন্ত বলে অনুভব করি। শুধু ঘটনা সমাবেশ করে ইতিহাস হয় না, ইতিহাসও একধরনের শিল্পকর্ম। সেইজন্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসে অতীত দিনের মানুষ, সমাজ, সভ্যতা যত প্রত্যক্ষ, অধিকাংশ তথা-কথিত ইতিহাসে তা হয় না।

—কিন্তু শুধু কল্পনার সামর্থ্যে তো ইতিহাস লেখা যায় না। বস্তুর মত ঘটনারও কি স্বকীয় অস্তিত্ব নেই? বস্তুর মত ঘটনার ধারণাও জ্ঞাতার ওপরে নির্ভর করে, কিন্তু বস্তুর মত ঘটনারও জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। সেই অস্তিত্বের স্বীকৃতি ছাড়া বিজ্ঞান যেমন অসম্ভব, ইতিহাসও কি তেমনি অসম্ভব নয়?

—প্রথমত, জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব বোধহয় ঈশ্বরের মতই অপ্রমাণ্য। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের মধ্যে একটা মৌল পার্থক্য কি আপনি স্বীকার করেন না? অর্থাৎ ইতিহাস বললেও আমরা এখানে মানুষের ইতিহাসের কথাই বলছি। বিজ্ঞানে আমরা বস্তুকে বাইরে থেকে দেখি, ইতিহাসে আমরা ঘটনাকে ভেতর থেকে অনুভব করি। অর্থাৎ বিজ্ঞানে যা জ্ঞেয়, তা জ্ঞাতার কাছে পরোক্ষ। কিন্তু অপরোক্ষতা ছাড়া ঐতিহাসিক ইতিহাস

লিখতে পারেন না। এবং প্রতি ঐতিহাসিকের অপরোক্ষানুভূতি যেহেতু তার স্বকীয়, সে কারণে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের কল্পনায় একই যুগের ইতিহাস বিভিন্নরূপে দেখা দেয়।

—কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহকে যতই কেন ভেতর থেকে বোঝার চেষ্টা করুন না, সে ঘটনাপ্রবাহ যে তাঁর কল্পনাপ্রসূত নয়, এটা তো সত্যি। এবং ঘটনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন না হলে, একধারে যেমন প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবকে স্বকপোলকল্পনার আড়ালে ঢাকা দেবার আশংকা আছে, অন্যধারে তেমনি ইতিহাস-চর্চা বিভিন্ন আত্মকেন্দ্রিক কল্পনাবৃত্তে পর্যবসিত হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যতই বাড়বে, ততই তাদের জটিল বহুমুখী যোগসূত্র সম্বন্ধে আমরা সচেতন হব এবং ততই ব্যক্তিগত সংস্কার মার্জিত হয়ে ঐতিহাসিকের কল্পনায় অবজেকটিভিটি গুণ বাড়বে। অন্তত, আমার তো তাই মনে হয়েছে।

—কিন্তু ইতিহাস বিজ্ঞান হতে চাইলে অন্যদিকে যে আশংকাগুলো আছে তা কি আপনার নজরে পড়ছে না। প্রথম আশংকার কথা আগেই বলেছি—এর ফলে ইতিহাসের কতকগুলো কংকাল খাড়া হতে পারে, তাতে প্রাণ সঞ্চার ঘটবে না। দ্বিতীয় আশংকা আরো গুরুতর। বিজ্ঞানের অনুকরণে ঐতিহাসিক চাইবেন ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ নিয়ম বার করতে এবং তারপরে সেইসব তথাকথিত সাধারণ নিয়ম প্রয়োগ করে তিনি চেষ্টা করবেন সব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে। উদাহরণ, হেগেল, স্পেংলার, মার্কস, টয়েনবী। এই মনোভাবের ফল যে কত মারাত্মক হতে পারে তার সবচাইতে প্রামাণিক উদাহরণ মার্কসবাদ। মার্কস কয়েকটা প্রাচীন এবং সমকালীন ঘটনা আলোচনা করে দাবী করলেন তিনি ইতিহাসের মূল সূত্র আবিষ্কার করেছেন এবং তারপরে সেই সূত্র অনুসরণ করে ভবিষ্যতে ইতিহাস কোন ধারায় চলবে তার গণনাও শুরু করে দিলেন। পরে যখন দেখা গেল ঘটনাপ্রবাহ সে সূত্র অনুসরণ করছে না, তখন তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যেরা মূল দাবীর পুনর্বিচার না করে নানারকম পেঁচালো ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন ঘটনাপ্রবাহ মূল সূত্র অনুসারেই চলছে, শুধু আমরা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অভাবে সেটা বুঝতে পারছি না। ফলে ইতিহাস বিজ্ঞান তো হলই না, যা হতে পারত, তাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

—কিন্তু সেজন্যে কি ইতিহাস চর্চায় বিজ্ঞানবুদ্ধির আমদানী দায়ী, নাকি তার কারণ ঐতিহাসিক জগতে বিজ্ঞানবুদ্ধির অভাব? বিজ্ঞান যখনি কোনো নিয়ম খাড়া করে, তখনি নতুন তথ্য এবং বিশ্লেষণের আলোয় সে নিয়ম যে বদলাতে হতে পারে তাও স্বীকার করে নেয়। তাছাড়া যথেষ্ট তথ্যানুসন্ধান এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ না করে বিজ্ঞান কখনো কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয় না।

—প্রশ্ন হচ্ছে ইতিহাসের ক্ষেত্রে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো একেবারেই সম্ভব কিনা? আমার ধারণা তা সম্ভব নয়, কারণ ইতিহাসের ক্ষেত্রে না সম্ভব গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ, না ল্যাবরেটারীর।

—কিন্তু বিজ্ঞান কি শুধু গণিত আর ল্যাবোরেটরীর মধ্যেই আবদ্ধ? তার প্রয়োগ কি অনেক বেশী ব্যাপক নয়? প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং সংস্কৃতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যেসব অনুসন্ধান চলছে, সেগুলো কি বিজ্ঞানসম্মত নয়? অথচ এসব ক্ষেত্রে গণিত ও ল্যাবোরেটরী পদ্ধতির

প্রয়োগ সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের জ্ঞান যে আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে এবং নির্ভরযোগ্য হয়েছে, তা বোধহয় অস্বীকার করা যায় না। এবং এসব অনুসন্ধানের ফলে আমাদের জ্ঞান যতই বাড়বে, ততই আমরা মানব-বিজ্ঞানের উপযোগী নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করব এবং সে ক্ষেত্রে আশা করা যায় ততই আমাদের ইতিহাস চর্চায় বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগ ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে।

—হয়ত বিজ্ঞান কথাটিকে আমরা আলাদা অর্থে ব্যবহার করছি বলে আমাদের চিন্তা সমান্তরালভাবে চলেছে। আমার কথাটা হচ্ছে যেসব পদ্ধতি এবং প্রত্যয় অনুসরণ করে আমরা প্রকৃতিবিজ্ঞান গড়ে তুলেছি, মানুষের মন এবং যেসব ঘটনার মধ্যে সেই-মনের স্বাক্ষর আছে তাকে বোঝার পক্ষে তারা উপযোগী নয়। তার পন্থা অন্য এবং সেই কারণে ইতিহাসচর্চা প্রকৃতিবিজ্ঞানের অনুসরণ করে সার্থক হতে পারে না। কিন্তু সে পন্থা যে কি তা নিয়ে ভাব দরকার—অন্তত আমার কাছে তা এখনো খুব স্পষ্ট নয়। তবে পন্থাটা যে অন্য এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

—পন্থা অন্য তা আমিও মানি, কেননা প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব পন্থা আছে। জীববিজ্ঞান আর পদার্থবিজ্ঞান ঠিক এক-পদ্ধতি অনুসরণ করে না। তবু তারা পরস্পর বিরোধীও নয়, বরং উভয় ক্ষেত্রের বৈজ্ঞানিকই পরস্পরের পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কারে অগ্রহশীল। ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তেমনি স্বতন্ত্র পন্থার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি অন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে তার যোগসূত্রও অগ্রাহ্য করা চলে না। মানুষের মনের ক্রিয়া যত জটিলই হোক, মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অন্তত, আমি এধরনের দ্বৈতবাদী দর্শনে নির্ভর করে চিন্তায় অসমর্থ।

আলোচনায় কিছুক্ষণের জন্য ছেদ পড়ল। তারপর আমি বললাম, আমি কিন্তু আপনার কাছে অন্য প্রশ্ন নিয়ে এসেছিলাম।

—আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব কি, আমার নিজের মনেই কত প্রশ্ন রয়েছে যার কোনো সমাধান খুঁজে পাই না। উত্তর আশা করবেন না, তবে আলোচনা নিশ্চয়ই করা যেতে পারে।

—প্রশ্নটা কিছু জটিল নয়, তাছাড়া আমি যা শুনতে চাইছি তা হলো আপনার ব্যক্তিগত মতামত। এই যুদ্ধের পর এদেশের বারা তরুণ এবং বুদ্ধিমান তাদের ভাবনা-চিন্তাটা কোন খাতে বইছে?

—দেখুন গোড়াতেই সাবধান করেছি, আমার কাছে বৈজ্ঞানিক অবজেকটিভিটি আশা করবেন না। প্রথমত, এবিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুব সীমাবদ্ধ এবং দ্বিতীয়ত, আমার বিচার আমার দৃষ্টিভঙ্গীকে অতিক্রম করার সামান্যতম দাবীও রাখে না। তা সত্ত্বেও আপনার কাছে আমার ধারণার যদি কোনো মূল্য থাকে, তাহলে সংক্ষেপে সেটা আপনাকে বলতে পারি। আমার মনে হয়েছে পশ্চিমে যুক্তিবাদের যে ঐতিহ্য আঠারো শতক থেকে গড়ে উঠেছিল, এখন তা ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসছে। লক্ষ্য করবেন ইয়োরোপে এখন আর যুক্তিবাদী আন্দোলনের কোন নেতা নেই। রাসেলই বোধহয় এ আন্দোলনের শেষ ইয়োরোপীয় নেতা। যুক্তিবাদের জায়গায় কোন ধারা যে প্রবল হয়ে উঠছে, তা বলা শক্ত। কিছুকাল আগেও হয়ত বলা যেত কম্যুনিজমই এখনকার প্রধান ধারা—কিন্তু সম্প্রতি রাশিয়া এবং পূর্ব ইয়োরোপের নানা ব্যাপারে কম্যুনিজমের ধারাও দুর্বল এবং দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তার ফলে কিন্তু যুক্তিবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটেনি। বরং আমার মনে হচ্ছে একধারে সিনিক্যাল ঔদাসীন্য ক্রমেই ব্যাপক হয়ে উঠছে, অন্যধারে ধর্মের আবেদন প্রবলতর হচ্ছে। ছাত্র এবং তরুণ অধ্যাপক-চিন্তাশীলদের মধ্যে লক্ষ্য করছি নানাযুক্তি দিয়ে ক্রিশ্চিয়ানিটির ডগমাগুলোকে খাড়া করার চেষ্টা ক্রমেই ফ্যাশনেবল হয়ে উঠছে। তবে আমার কথার ওপরে নির্ভর করে আপনি যে কোনো সিদ্ধান্ত করবেন না তা জানি। আপনার অন্য পাঁচটা অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিশ্চয়ই বিচার করবেন, আমার এই নিতান্ত ব্যক্তিগত ধারণায় কতটা "অবজেকটিভিটি" আছে।

[illegible]
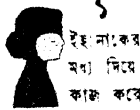
"যুদ্ধের সঙ্গে বাঁধা ইতিহাসের ঘটনা-মালা: বার বার ভুল, বিদ্রোহ নির্বাসিত করেছে সত্য ও যুক্তিকে। চতুর-সৌভাগ্যবানরা মূর্খ-অভাগাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে; কিন্তু কালের বিবর্তনে তারাই হয়ে পড়েছে ভাগ্যের হাতের পুতুল, একদা-শাসিত দেশগুলির মতো।" —ভলতেয়ার

আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের ব্যর্থতা মার্কিন মধ্যপ্রাচ্যনীতিকে বিষম বিপাকে ফেলেছে। এ নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মিশরকে আরবভূমিতে একঘরে করে রাখা। কিন্তু জর্ডন নিয়ে ক্ষণিক সাফল্যের পর হঠাৎ যে মার্কিন সূর্যোদয়ে আরব আকাশ জ্বলে উঠেছিল, পূর্বাহ্ন গগনেই সে সূর্যের অস্ত যাবার উপক্রম। হঠাৎ আরবভূমিতে নতুন এক ঐক্যের বাতাস বইতে শুরু করেছে; এমন যে বশংবদ মিত্র ইরাক ও লেবানন, সেখানেও আবহাওয়া হঠাৎ যেন বদলে উঠেছে। সাধারণ পাঠক নিশ্চয় অবাক হয়ে ভাবছেন এ সবের কারণ কি, কেন হঠাৎ সৌদী আরবের রাজা সিরিয়ার মিত্র হয়ে উঠলেন, কেন সেপ্টেম্বরে হঠাৎ অনুষ্ঠিত হল ইরাক-সিরিয়া-সৌদী আরব-মিশরের মিলিত বৈঠক, কেন এ বৈঠক থেকে ধ্বনি উঠল আরব ঐক্যের, কেন হঠাৎ ইরাক সিরিয়ার সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তি করতে রাজী হয়ে গেল, কেন লেবানন সিরিয়ার সীমান্ত-অবরোধ তুলে দিয়ে বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করল, কেনই বা এক মিশরী বাহিনী অতি সংগোপনে উপস্থিত হল সিরিয়াতে, আর, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল আরবভূমিতে নাসেরের নেতৃত্ব।

এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে একটা বিশেষ অসুবিধা আছে। বর্তমান আরব বাতাবরণ এতোই অস্থির যে যে-কোন সময়ে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, দেখা দিতে পারে নতুন মিতালি আর নতুন দুশমনী, নতুন চক্রান্ত, নতুন মতলব। পৃথিবীর এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে কতগুলি জন-সমর্থনহীন স্বৈরাচারী বিদেশীপ্রসাদপুষ্ট শাসনব্যবস্থা চালু থাকার জন্যই এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা। এর সমাধান হবে না যতদিন না প্রত্যেক আরব দেশের শাসন ক্ষমতা এসেছে জনসাধারণের হাতে, দেশের মাটিতে সুদৃঢ় শিকড় প্রসার করেছে, আর আরব সত্যিকারের বলতে পেরেছে কোনটা তার স্বার্থে, কোনটা তার পথ, কি তার পাথেয়।

আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের একমাত্র বিঘোষিত উদ্দেশ্য মধ্যপ্রাচ্যের বারোটি দেশকে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ, অর্থাৎ রুশ প্রভাব থেকে বাঁচানো—অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে, প্রয়োজন হলে স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে। ডালেস যে প্রভাবকে [illegible] সাম্যবাদী নয়, জাতীয়তাবাদী, তার [illegible] এসেছিল মস্কো থেকে নয়, মিশর থেকে।

হুসেনকে দলে টেনে যে [illegible] শিবির আমেরিকা তৈরী করতে চাইল, তার উদ্দেশ্য নাসেরকে একঘরে করা, আরবভূমিতে তাঁর প্রতিপত্তিকে খর্ব করা এবং মার্কিন আওতায় আরব অঞ্চলে এমন একটি প্রাচীর গড়ে তোলা যা ভেদ করে রুশ প্রভাব কোনমতেই প্রবেশ করতে পারবে না।

কিন্তু, হায়, তিন রাজাই তো আর তিনটি দেশ নয়! দেখা গেল, সৌদী আরবেই গোলমাল! রাজার ভাই প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রসচিব যুবরাজ ফয়জল নিজেই নাসের সমর্থক, রাজা আবদুল আজিজের মার্কিন-তোষণ নীতির পরিপন্থী। ফয়জলকে নিয়ে একটু ইতিহাস আছে। আবদুল আজিজ নিরক্ষর না হলেও, শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর বেশি নেই। ফয়জল শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, অনেক বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। পিতা শেরিফ হুসেনই তাঁকে একটু হিংসার চোখে দেখতেন, তাই রাজসিংহাসন তাঁর ভাগ্যে না জুটে জুটল আবদুল আজিজের। ফয়জল প্রধান মন্ত্রী হিসাবে রাজকার্যে সহায়তা করতে লাগলেন। কিন্তু সৌদ মার্কিন পন্থা অনুসরণ করবার সঙ্গে সঙ্গে ফয়জলের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়; ফয়জল 'চিকিৎসার জন্যে' চলে যান আমেরিকা, এবং সেখানে আইসেনহাওয়ার ও ডালেসকে বলেন যে সিরিয়া নিয়ে সামরিক সংঘর্ষ হলে সমগ্র আরবভূমিতে এমন আগুন জ্বলে উঠবে যার পরিণাম আজ কেউ কল্পনা করতে পারবে না। মিশর সিরিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের

ফলে সিরিয়া, মিশর ও লেবাননের বামপন্থী কাগজে সৌদী আরব সম্পর্কে এমন সব কাহিনী প্রচার হতে শুরু করল যা পূর্বে আরবদের জানা ছিল না। এ সব কাহিনী জনগণের দারিদ্র্যের ও অসহায়তার কাহিনী, রাজকীয় বিলাস ব্যসনের কাহিনী, গণস্বার্থ সমর্থকদের উপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী। সৌদ পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের কাছে একটা ধর্মীয় আনুগত্যের দাবী রাখেন। তাঁর শাসন বিষয়ে এ সব 'অপ-প্রচারে' তিনি শঙ্কিত ও বিরত হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে ওমান নিয়ে বাঁধালো ইংরাজের সঙ্গে সংঘর্ষ।

পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী মস্কাট ও ওমান নামে স্বাধীন হলেও ইংরাজের অধীন। এই রাজ্যের ওমান অঞ্চলে সম্প্রতি তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। সুলতান তেল-সন্ধানের সনদ দিয়েছেন ইরাক পেট্রোলিয়ম কোম্পানীকে, যার তিন ভাগ অংশ ইংরাজের এক ভাগ আমেরিকার। সৌদের বহুদিনকার দৃষ্টি এই ওমান অঞ্চলে; নির্বাসিত ইমামকে তিনি বহু অর্থ সাহায্য ক'রে এসেছেন। তাঁর ভরসা ছিল ইমামের সঙ্গে সুলতানের লড়াই বাঁধলে, আমেরিকা, তাঁর মুখ চেয়ে, ইমামের পক্ষ নেবে এবং অন্ততঃ স্বস্তি পরিষদে এমন একটা জটিল পরিস্থিতির সূচনা হবে যার ফলে সুলতানের রাজত্বের ভিত্তি নাড়ে উঠবে।

কিন্তু তা হল না। ইংরেজ অস্ত্রবলে ইমামের সৈন্যদের পরাস্ত করল। আমেরিকা টু শব্দ করল না। বুরেইমী মরূদ্যান কয়েক বছর আগেই সৌদ ইংরেজের কাছে হারিয়েছিলেন, এখন গেল ওমান। সৌদ দেখলেন তাঁর পররাষ্ট্রনীতি উত্তরোত্তর ব্যর্থ হ'তে চলেছে। আরব-মণ্ডভূমিতে তিনি সবাইকে একত্রিত ক'রে এসেছেন, তাঁর ভূমিকা ছিল একজন সর্বমান্য সালিশের। মিশর-সিরিয়ার সঙ্গে একত্রিত হ'য়ে নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি প্রচার ক'রে তিনি যে আরব-মানসে নেতৃত্বের স্থান অধিকার করতে পেরেছিলেন, মার্কিন নীতির পথে চলে তা তিনি হারাতে বসেছেন, অপর পক্ষে নতুন কিছুই তাঁর লাভ হচ্ছে না। সাম্যবাদ তাঁর বিরাট মরুধূসর দেশে অনুপস্থিত; রাশিয়া কোন মতেই আজ পর্যন্ত তাঁকে বিব্রত করে নি, বরঞ্চ, দুই দশকের প্রথম দিকে তাঁর পিতা যখন তলোয়ারের জোরে একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, রাশিয়াই সর্বাগ্রে তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল!

লেবাননকে কেন্দ্র ক'রে সিরিয়ার বর্তমান সরকারকে উৎখাত করার যে পরিকল্পনার কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি তার ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে রাজা সৌদের চিত্ত চাঞ্চল্য দেখা দিল। ভাই ফয়জল ওয়াশিংটনে ব'সে ডালেসকে নতুন পরামর্শ দিলেন, যার মূল কথা; আমেরিকা, এখন পুরাতন নীতি বর্জন ক'রে সিরিয়া ও মিশরের সঙ্গে মিতালি করুক। সৌদ হঠাৎ পশ্চিম য়ুরোপীয় সফর সংক্ষিপ্ত ক'রে ডামাস্কাসে এসে হাজির হ'লেন; তাঁর আহ্বানে এলেন ইরাকের প্রধান মন্ত্রী ও লেবাননের এক প্রতিনিধি। মিশরের রাজদূতকেও ডাকা হল। দু'দিনব্যাপী আলাপ-আলোচনায় ঠিক হ'ল সিরিয়ার বিরুদ্ধে সব আন্দোলন বন্ধ হবে, ইরাক ও লেবানন বাণিজ্য পথের অবরোধ তুলে নেবে, ইরাক করবে নতুন বাণিজ্য-চুক্তি। আর সৌদ? সৌদ এক গুরুগম্ভীর বিবৃতিতে বললেন, "দু দিন ধ'রে সিরিয়ার রাজধানীতে বসে এখানকার সব ব্যাপার আমি চাক্ষুষ করেছি। নানা মতের নেতাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। সিরিয়া অন্য কোন আরব দেশকে কোনমতেই বিপন্ন করে নি। কোন আরব দেশ যে অন্য একটি আরব দেশকে বিপন্ন করতে পারে, আঘাত করতে পারে, তা আমার বিশ্বাসের বাইরে। সব আরব দেশই এক

জোট হ'য়ে প্রতিরোধ করবে তাদের সবাকার শত্রুকে। একটি আরব দেশের উপর আক্রমণের মানে সব আরব দেশের উপর আক্রমণ।"

সিরিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের সবচেয়ে বড়ো নালিশ ছিল যে নতুন বামপন্থী গভর্নমেণ্ট, রুশ অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে, প্রতিবেশী আরব দেশগুলিকে বিপন্ন ক'রে তুলেছে। তার ফলে যে কোন মুহূর্তে জর্ডন বা লেবানন আক্রান্ত হ'তে পারে। সৌদের ঘোষণা এ নালিশের শাঁস তুলে নিল। দু চারদিনের মধ্যেই লেবাননের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করলেন সিরিয়া থেকে তিনি কোন বিপদের আশঙ্কা করেন না; ইরাকের প্রধান মন্ত্রীও সুরে সুর মেলালেন। বাকী রইল শুধু জর্ডন। হুসেন প্রথম বুঝতে পারলেন না নতুন ব্যাপারটা কি হল; বুদ্ধিমানের মতো তিনি চুপ ক'রে রইলেন। পরে ইরাক-নৃপতি কয়জনের সঙ্গে জর্ডন সীমান্তে মিলিত হ'য়ে তিনি বুঝতে পারলেন নতুন এক বিপদ দেখা দিয়েছে আরব আকাশ কৃষ্ণায়িত ক'রে এবং এই বিপদের মুখে আরব দেশগুলির প্রধান কর্তব্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আর এ কথা নিশ্চিত, যে যদি হুসেন তাঁর স্বদেশী আন্দোলনকারীদের চেপে রাখতে পারেন তাহ'লে অন্তত কিছু দিনের জন্যে তিনি নির্ভয়।

নতুন বিপদ হ'ল তুর্কী।

সিরিয়া আরবভূমির মধ্যমণি। প্রায় চতুর্দিকে তাকে ঘিরে তুর্কী, ইরাক, লেবানন, জর্ডন, ইজরেইল। শুধু পশ্চিম সীমান্তের অর্ধেক ঘিরে ভূমধ্য মহাসাগরের সুনীল জলরাশি। সিরিয়াকে বাহুবলে নমিয়ে দিতে পারে একমাত্র তুর্কী। তুর্কীর সুশিক্ষিত সৈন্য মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত, মার্কিন রণনীতিতে দীক্ষিত। তুর্কীর মতো মিত্র আমেরিকার খুব কমই আছে। নর্থ আটলাণ্টিক সামরিক চুক্তির প্রায় গোড়া থেকেই তুর্কী তার সভ্য। যুদ্ধযোগ্য প্রশিক্ষিত ন্যাটো বাহিনীর এক চতুর্থাংশ সেনা দিয়েছে তুর্কী। তুর্কীর রুশ-ভীতি সুগভীর ও পুরাতন। রাশিয়াকে সমুদ্র পথের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে তুর্কী এবং এজন্যে পশ্চিমী শক্তিগুলির কাছে তার সামরিক গুরুত্ব অতুলনীয়। তুর্কীর রাজনৈতিক অবস্থা যতোই অনিশ্চিত হোক না কেন, আর্থিক অবস্থা যতোই শোচনীয় হোক, মার্কিন সামরিক সাহায্যে এখনো সেখানে রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা অটুট আছে। তুর্কী সরকারের দেশী ও বৈদেশিক নীতি পশ্চিমী স্বার্থের অনুকূল।

সিরিয়ায় নতুন বামপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই রুশ সরকার তাকে প্রচুর অর্থনৈতিক সাহায্যের

প্রতিশ্রুতি দেন এবং রুশ বিমান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সিরিয়ায় পৌঁছতে শুরু করে। প্রত্যুত্তরে আমেরিকা যুদ্ধোপকরণ পাঠাতে থাকে জর্ডনে, ইরাক, লেবাননে। ভূমধ্য সাগরে অবস্থিত বিরাট মার্কিন নৌবাহিনী সিরিয়ার উপকূল থেকে কিছু দূরে বিচরণ শুরু করে। এদিকে শুভেচ্ছা-মূলক পরিভ্রমণরত দুখানি রুশ যুদ্ধজাহাজও এসে নোঙর করে সিরিয়ার বন্দরে। সিরিয়া নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের শীতল যুদ্ধ বেশ গরম হ'য়ে উঠবার লক্ষণ দেখা দেয়।

এর মধ্যে তুর্কী তার সৈন্যবাহিনী একত্রিত করতে শুরু করল সিরিয়ার সীমান্তে। বলা বাহুল্য, মার্কিন অনুমতি না নিয়ে এ কাজ সে করতে পারতো না। তুর্কীর সৈন্যবাহিনীর পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার। এর বেশির ভাগই তুর্কী-রুশ সীমান্তে প্রহরী। এ সব সৈন্যদেরও সিরিয়ার সীমান্তে এনে জড়ো করা হল। সঙ্গে সঙ্গে জমায়েত হল নতুন অস্ত্রশস্ত্র, আমেরিকা থেকে পাওয়া। অর্থাৎ লেবানন থেকে যে হুমকি কাজে লাগেনি, আইসেনহাওয়ার ডকট্রীন সে হুমকি নতুন করে দেখাতে শুরু করল তুর্কী থেকে!

কিন্তু এখানেই মার্কিন কূটনৈতিক চাল মস্ত বড় ভুল হ'য়ে গেল। এ ভুলটা অশিক্ষার, অনিপুণতার, আরব মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতার। সমস্ত আরব ভূমিতে তুর্কী এখনো এক মহা আতঙ্কের উৎস। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত আরবভূমি ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের পদানত এবং এই কঠোর অত্যাচারী, বন্ধ্যা দীর্ঘ ইতিহাসের স্মৃতি আরব মনকে এখনো অধিকার ক'রে আছে। আমরা আগেই দেখেছি ইরাক যে তুর্কীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাগদাদ চুক্তিতে যোগ দিয়েছে, ইরাকী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে আরব জনসাধারণের তা একটা ভয়ংকর অভিযোগ। আরব দেশগুলি ইজরেইলের মতোই তুর্কীকে সমবেত প্রতিরোধের চোখে দেখে আসছে এবং তুর্কী হ'তে বিপন্ন সিরিয়া স্বভাবতই সমগ্র আরব জাতির সক্রিয় সহানুভূতি ও সাহায্যের অধিকারী।

বামপন্থী সিরিয়া কি ক'রে তুর্কীর নিকট মহাবিপদ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে সহজে তা বোঝা যায় না। তুর্কীর সামরিক শক্তির কাছে মিশর-সিরিয়ার মিলিত শক্তিও নিতান্ত তুচ্ছ। আসলে তুর্কীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা মোটেই সুস্থির নয়। কামাল আতাতুর্ক যে আদর্শে তুর্কীতে নতুন রাষ্ট্রের স্থাপনা করেছিলেন বর্তমান তুর্কী তার থেকে বহু দূরে চলে গেছে। আতাতুর্ক চেয়েছিলেন তুর্কীকে পশ্চিমী শক্তিগুলির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করতে। গণতন্ত্র সত্যিকার চেহারা নিয়ে কোনদিনই তুর্কীতে দেখা যায় নি। রাজশক্তি একটি ছোট্ট গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ। বিপক্ষ দলগুলি নির্যাতিত, অবদমিত। অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমাগতই খারাপ হ'তে চলেছে। বাজেটের বেশির ভাগ অর্থ সামরিক খাতে ব্যয়িত হয়ে থাকে। একটা সামরিক ডিক্‌টেটারশিপ রাজশক্তি কবলিত ক'রে কেবলমাত্র শীতল যুদ্ধের চতুর সুবিধা নিয়ে শাসন চালিয়ে এসেছে গত দশ বছর। এ জাতীয় শাসকগোষ্ঠির অন্তরে সর্বদাই পরভূমির প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন লোভ থাকে। আরবরা বিশ্বাস করে না যে তুর্কী কোনদিনই আরবভূমিকে নির্লোভ দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছে। আতাতুর্ককেও একদিন আরবভূমি বাদ দিয়ে তুর্কী রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগে প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের সুযোগ নিয়ে বৃটেন ও ফ্রান্স যে তুর্কীদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো করে গিলে খেয়েছে, অনেক তুর্কী নেতা আজও তা বিস্মৃত হননি।

তুর্কীর আসল ভয় বামপন্থী সিরিয়াকে নয়, আরবভূমিতে রুশ প্রভাবের সম্ভাবনাকে। অনগ্রসর বিরাট আরবভূমি তুর্কীর বর্তমান শাসকগোষ্ঠির পক্ষে আশীর্বাদ। তুর্কীর উত্তর-পূর্ব ঘিরে সোভিয়েত রাশিয়া; সেখানকার সাম্যবাদী সমাজ তুর্কীর পক্ষে কোনক্রমেই গ্রহণীয় নয়। কৃষ্ণসাগরের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের যোগাযোগের পথ রোধ করেছে তুর্কী; রুশ প্রভাবকেও আটকেছে। বসফোরাস খাল না অতিক্রম ক'রে রুশ নৌবহর কৃষ্ণ সাগর অতিক্রম করে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছতে পারে না, আর এই খালের মুখেই তুর্কীর অন্যতম প্রধান শহর ইস্তানবুল। অর্থাৎ তুর্কী হচ্ছে রুশ নৌবহরের উপর পশ্চিমের সদাজাগ্রত প্রহরী। তুর্কীর পশ্চিমে গ্রীস ও বুলগারিয়া, পূর্বে ইরাণ, দক্ষিণে আরব অঞ্চল। গ্রীস বা মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ঢেউ তুর্কীর জনমনকে উদ্বেলিত করতে বাধা। এজন্যেই এ সব দেশে প্রগতিমূলক কোন পরিবর্তনকেই তুর্কীর বর্তমান শাসনগোষ্ঠি প্রীতির চোখে দেখতে পারে না। ইরাণে যখন ডাঃ মুসাদিকের আমলে নতুন গণজাগরণের সূচনা হয়েছিল তখনো তুর্কীর শাসকগণ সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। আরবভূমিকে পশ্চাৎগামী, দরিদ্র, পরমুখাপেক্ষী দেখতেই তুর্কী অভ্যস্ত এবং তাতেই সে প্রীত। একথা ভাবলে অবাক হ'তে হয় যে কয়েকশত বৎসরের তুর্কী-আরব সম্পর্ক সত্ত্বেও, বাগদাদ চুক্তির পূর্বে কোন স্বাধীন দেশের সঙ্গেই তুর্কীর বিশেষ কোন যোগাযোগ ছিল না।

এহেন তুর্কীকে সিরিয়ার বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া যদি আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'য়ে থাকে, তবে তা শুধু ব্যর্থই হবে না, আরবভূমিতে মার্কিন

আঙ্কল্‌ নিক

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমাণু শক্তির নাম শুনলে সাধারণ মানুষ এখনো আতঙ্কে ওঠে, কারণ তাদের চিন্তাজগতে বিরাজ করছে হিরোশিমার দুঃস্বপ্ন। বারো বছর আগে যে বোমাটা জাপানের বুকে ফেটে পরমাণু শক্তির প্রলয়ংকর ধ্বংসলীলার স্বরূপ দেখিয়েছিল তার আগুনের জ্বালার উপশম আজও ঘটে নি। গত কয়েক বছরে সে তো মানুষের কম উপকার করেনি, বরং হিসাব করতে গেলে দেখা যাবে পরমাণু শক্তি যতো লোকের প্রাণ নিয়েছিল—ক'বছরে তার অনেক বেশী লোকের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করেছে। এক্স-রে এবং রেডিয়ামের আবিষ্কারের পর থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি-সমূহ দুরারোগ্য রোগসমূহের আক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে যে কি পরিমাণে সাহায্য করেছে তা বলবার নয়। কৃষি, শিল্প, সর্বক্ষেত্রেই সে বর্তমানকালে মানুষকে সহায়তা করছে—তবু তার দুর্নাম গেল না। একবার কোন ভদ্রলোকের যদি নাম হাঁড়িফাটা হয়ে যায় তাহলে আর যাবার নয়। তিনি যতোই দানধ্যান করুন না কেন, দান গ্রহণ করবার সৎসাহস থাকা সত্ত্বেও দুপুরে বেলা খাবার আগে বোধ হয় ভরসা করে তাঁর নাম নিতে পারা যায় না।

পরমাণু শক্তি আমাদের আগামী যুগের বিজ্ঞান সভ্যতার সবচেয়ে বড় বন্ধু। তার যে বীভৎস রূপ আমরা দেখেছি, সেটা তার চেহারা নয়, আমাদের নিজেদের মনের প্রতিচ্ছবি। দৈত্যকে বশ করে প্রতিবেশীর ঘর ভাঙবার আদেশ দিয়েছিলাম—সে ভেঙেছে। তার শক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি,—পেয়েছি তার নির্মম মনের পরিচয়। এবার সাবধান না হলে কোনদিন খ্যাপা দানব মনিবকেও ছেড়ে কথা বলবে না।

রাষ্ট্র বলুন আর জাতি বলুন সকলেই আজ এই সহজ কথাটা বুঝেছে তাই সকলেই একযোগে চাইছে পরমাণু শক্তিকে শান্তির জন্য ব্যবহার করতে। কিন্তু চাইলেই তো হবে না—আর একটা কাজ করা দরকার। ভুলতে হবে যে পরমাণু শক্তিকে যুদ্ধের কাজে লাগান যায়। শক্তি বৃদ্ধির নামে, শক্তির ভারসাম্যের নামে সকলেই যদি যুদ্ধের প্রয়োজনে পরমাণু শক্তির ধ্বংস ক্ষমতার বৃদ্ধিকল্পেও আত্মনিয়োগ করেন তাহলে যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে ভুলের পুনরাবৃত্তি হওয়া অসম্ভব নয়।

হেনরী ফোর্ড আর এডসেল ফোর্ডের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। পুরস্কারের উদ্দেশ্য খুবই মহৎ, পরমাণু শক্তির শান্তিকামী ব্যবহারের জন্য যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ চেষ্টা করবেন তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ৭৫ হাজার ডলার, নোবেল পুরস্কারের তিন গুণ। ১৯৫৭ সালের পুরস্কার দেওয়া হলো ২৪শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার বেলা তিনটের সময়। স্থান ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়ান্সেস—এ বৎসরের পুরস্কার গ্রহণ করলেন ডেনমার্কের

নীলস বোর

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী অধ্যাপক নীলস বোর।

এই গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ আর্থার কম্পটন পরমাণু কেন্দ্রের শক্তির মনুষ্যজনোচিত ব্যবহারের প্রচেষ্টা ও সম্ভাবনার বিষয়ে যে ভাষণ দেন তার গুরুত্ব সর্বকালের। চমৎকার কথা বলেছেন তিনি,—প্রত্যেক জাতি যদি অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং সহযোগিতা-মূলক গবেষণার দ্বারা পৃথিবীর কল্যাণ কামনা করে, একমাত্র তবেই মানব সভ্যতা নিরাপদ হবে। একটা সাধারণ ক্ষেত্রে সকলকে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে, কম্পটনের মতে সেই ক্ষেত্র হলো পরমাণু বিষয়ক গবেষণা। কোন জাতি যদি তার নিজের স্বার্থকে এখানে অন্য কোন রাষ্ট্র বা জাতির চেয়ে বড় করে দেখে তাহলে এই প্রচেষ্টা কোনদিনই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবে না। মার্কিন বিজ্ঞানী কম্পটন বিশেষ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, এই প্রচেষ্টায় প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই জগতের সমস্ত নরনারীর প্রয়োজনের কথা চিন্তা করতে হবে।

এবার যিনি "শান্তির জন্য পরমাণু" পুরস্কার লাভ করলেন তাঁর চিন্তাধারার উদারতা বিশ্ববন্দিত। অন্তরঙ্গ বিজ্ঞানী মহলে সকলে তাঁকে ডাকে আংকল নিক বলে, মানব কল্যাণের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানী মহলে পিতৃবোর গুরুদায়িত্ব নিতে তিনি কোন-দিনই পরাঙ্মুখ হননি। লস আলামসের গবেষণাগারে প্রথম পরমাণু বোমা নির্মাণ-কল্পে যে বিজ্ঞানী দল আত্মনিয়োগ করে-ছিলেন তাঁদের অন্যতম নেতা ছিলেন আংকল নিক। বিজ্ঞানীরা জানতেন তাঁরা প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এক অস্ত্র নির্মাণ করছেন

কিন্তু এই অস্ত্রের শক্তির সঠিক পরিচয় তখনও তাঁদের উপলব্ধির বাইরে ছিল। সেই গবেষণাগারেও আংকল নিক পরমাণু শক্তির মানব কল্যাণে ব্যবহারের কথা চিন্তা করতেন। পরমাণু বোমা পরীক্ষিত হবার আগে তিনি বিজ্ঞানীদের বারে বারে প্রশ্ন করেছেন কি করে এই শক্তির ব্যবহারের দ্বারা জগতে অবিচ্ছিন্ন শান্তির আবির্ভাব ঘটানো সম্ভব।

কল্পনা করে দেখুন সেই দিনের কথা। হিটলারের আক্রমণে সমগ্র ইউরোপ সন্ত্রস্ত, নাৎসীরা ডেনমার্ক দখল করে নিয়ে চালাচ্ছে অকথ্য অত্যাচার। পরাধীনতার জ্বালা কি আমরা জানি—স্বাধীন ডেনিস জাতি সেদিন পরাধীন। হিটলারের অত্যাচারের প্রতিবাদে বিশ্ববিখ্যাত এই বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাগারে পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণা বন্ধ করে দিলেন। সহজ তো কম নয়!—১৯৪৩ সালে ইউরোপের বুকে বসে হিটলারের কার্যাবলীর প্রতিবাদ? ডেনমার্কে থাকা আর হলো না—অত্যাচারিত, অপমানিত এই বিজ্ঞানী ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লুকিয়ে একটি মাছধরা নৌকোতে করে সুইডেনে পালিয়ে গেলেন। সঙ্গে তাঁর পরমাণু গবেষণা সংক্রান্ত গোপনীয় মূল্যবান তথ্যাবলী। তারপর সুইডেন থেকে ইংল্যান্ড যাত্রা করলেন মিত্রশক্তির একটি বোমারু বিমানের বোমা রাখবার স্থানে বসে।

এই অত্যাচার, অবিচার এবং দুর্যোগময় দিনগুলির কথা আংকল নিক কোনদিনই ভুলতে পারেন নি। পরাধীন স্বদেশের মুক্তি কামনায় এবং হিটলারের অত্যাচারের প্রতিশোধকল্পে তিনি ব্রিটিশ আমেরিকান আটমিক বোম্ব প্রজেক্টে তো যোগদান করলেন। এর পরে লস আলামসে পরমাণু বোমা নির্মাণকল্পে সর্বাধ্যক্ষ বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারকে সর্বপ্রকারে সহায়তা করেছিলেন। যুদ্ধাবসানে আংকল নিক আবার স্বদেশে ফিরে এসে পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ১৯৫৭ সালে "শান্তির জন্য পরমাণু" পুরস্কার দিয়ে আংকল নিক অর্থাৎ অধ্যাপক নীলস হেনরিক ডেভিড বোরকে—বিশ্বের শান্তিকালীন পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার নেতৃত্ব করবার অভিনন্দন জানান হলো। বর্তমান যুগে পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণায় সর্বাগ্রে এই প্রবীণ বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ করা যায়, শান্তিকামী বিশ্বজগৎ তাঁর কাছে অনেক কিছু আশা করে।

গত ১৯৫৫ সালে জেনেভাতে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের গবেষণায় আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে, বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বিষয়ে উৎসাহ দেবেন বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সর্বপ্রথম ফোর্ড মোটর কোম্পানী এগিয়ে এলেন। ফোর্ড কোম্পানী হেনরী ফোর্ড এবং এডসেল ফোর্ড-এর স্মৃতিতে এই পুরস্কার ঘোষণা করে একটি ট্রাস্টী বোর্ড গঠন করেছেন। বোর্ডকে ১০ লক্ষ ডলার দেওয়া হবে এবং আগামী ২০ বছর প্রতি বৎসর ১ লক্ষ ডলার করে খরচ করতে তাঁরা পারবেন। এই টাকা থেকে প্রতি বৎসরই সমস্ত দেশের বিজ্ঞানী, যন্ত্রবিজ্ঞানী অথবা যে কোন লোক যিনি শান্তির জন্য পরমাণু শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান করবেন, তাকে একটি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হবে। এই পুরস্কার পাবার যোগ্যতা কেবল অবদানের উৎকর্ষতার মানদণ্ডে বিচার করা হবে—মতবাদ, জাতি বা ধর্মের সংকীর্ণতা এতে স্থান পাবে না। দেখা যাচ্ছে বর্তমানের হিসেব মতো এই পুরস্কারের মেয়াদ ১০ বৎসর,—পুরস্কারে ৭৫ হাজার ডলার অর্থের সঙ্গে একটি সোনার মেডেলও স্মারকচিহ্ন হিসাবে দেওয়া হবে।

বিজ্ঞানী নীলস্ বোর অর্থাৎ আংকল নিককে আধুনিক কালের পরমাণুবাদের স্রষ্টা বলা হয়। তাঁর সহায়তা না পেলে পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণা এতো তাড়াতাড়ি বর্তমান রূপ লাভ করতে সমর্থ হতো না। স্বয়ং বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন,—"বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বোর নিঃসন্দেহে বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক।"

১৯৩৮ সালের কথা। এনারিকো ফার্মি কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে বিজ্ঞানী অটো হান এবং ফ্রিটস্ স্ট্রাসম্যান ইউরেনিয়ামের পরমাণু ভাঙতে সমর্থ হলেন এবং এর থেকে প্রচুর পরিমাণ শক্তিরও হলো আবির্ভাব। ঠিক কি করতে সক্ষম হয়েছেন তখনও বিজ্ঞানীদ্বয় বুঝতে সমর্থ হননি, কিছুদিন পরে আর দুজন বিজ্ঞানী তাঁদের এই পরীক্ষার সাফল্যের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে

দেন। কিন্তু তখনও এক বিরাট সমস্যা রয়ে গেল। ভাঙলো কোন ইউরেনিয়াম?—ইউরেনিয়াম ২৩৮, যা পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, না দুষ্প্রাপ্য আইসোটোপ ইউরেনিয়াম ২৩৫। কেবল সেদিনের কথা নয়, ১৯১৩ সাল থেকে ২৫ বৎসর ধরে আঙকল নিক পরমাণু সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান ঘটিয়েছেন, তাই এই জটিল সমস্যার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করলেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সমাধান পাওয়া গেল ইউরেনিয়াম ২৩৫ বিদীর্ণ হয় এবং শুরু করে পর পর সারিবদ্ধ বিস্ফোরণ। এই মূল তথ্যই, পরমাণু শক্তির উৎসের সন্ধান দিয়েছে।

আঙকল নিককে ১৯২২ সালে পরমাণু কাঠামো এবং তা থেকে নিঃসৃত রশ্মির বিষয়ে গবেষণা করার জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পরমাণু কাঠামোর বিষয়ে তাঁর গবেষণা শুরু হয় ১৯১১ সালে। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি পেয়েই ঐ বছরই তিনি ইংল্যাণ্ডে এসে জে জে টমসনের কাছে গবেষণা শুরু করেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই কেমব্রিজ পরিত্যাগ করে চলে যান ম্যাঞ্চেস্টারে রাদারফোর্ডের কাছে গবেষণার করার সুযোগের জন্য। রাদারফোর্ডের কাছে গবেষণা করবার সময়ই, তাঁর পরমাণু বিষয়ক মতবাদ উদ্ভাবনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

রাদারফোর্ডের মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে পজিটিভ চার্জ সমন্বিত নিউক্লিয়াস এবং তার চারদিকে ঘুরে বেড়ায় নেগেটিভ চার্জ সমন্বিত ইলেকট্রন। একে সৌরজগতের একটি পকেট সংস্করণ বলা যেতে পারে, কেন্দ্রে সূর্য অর্থাৎ নিউক্লিয়াস এবং চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্রহরূপী ইলেকট্রন। রাদারফোর্ডের পরমাণু কাঠামোর উদ্ভাবিত রূপকে মেনে নিলে অনেক সমস্যার সমাধান ঘটে, কিন্তু সহকর্মীদের অনেকেই তাঁর মতবাদ পুরোপুরি মেনে নিতে পারলো না। তাঁরা বললেন, ইলেকট্রন কেন্দ্রবস্তুর চতুর্দিকে ঘোরার ফলে তার থেকে আলো নির্গত হবে, ইলেকট্রনের কক্ষপথ যাবে সংকুচিত হয়ে এবং অবশেষে নিউক্লিয়াসের বক্ষে ইলেকট্রনের হবে পতন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তো তা হয় না? কেন হয় না, এই সমস্যাই সকলকে বিচলিত করে তুললো।

১৯১৩ সালে বোর তাঁর মতবাদ নিয়ে এগিয়ে এলেন। রাদারফোর্ডের পরমাণু কাঠামোর চিত্র অক্ষুণ্ন রেখে তিনি বললেন নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে আলো বিকিরণ না করে ইলেকট্রনগুলি বিচরণ করে। এইসব কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলির অবস্থাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন স্টেশনারী স্টেটস, কারণ ঘূর্ণনের সময় আলো বিকিরণ না করার জন্য শক্তিরও কোন ক্ষয় হয় না এবং তারা একটি নির্দিষ্ট গতিতে আবর্তিত হয়। ধাক্কায় অথবা বাইরের তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা সৃষ্ট গোলযোগের ফলে ইলেকট্রনের কক্ষপথের পরিবর্তন ঘটতে পারে, তখন ইলেকট্রনগুলি শক্তি গ্রহণ করে বাইরের কোন কক্ষপথে চলে যায়। কিন্তু এই উত্তেজিত অবস্থায় থাকা সম্ভব না হওয়ার জন্য আবার লাফ মেরে চলে আসে নিজেদের আসল কক্ষপথে, বিকিরিত হয় কয়েক কোয়ান্টাস আলো।

৭২ বছর বয়স্ক এই বিজ্ঞানীর দীর্ঘ কর্মময় গবেষক জীবনের কার্যাবলীর দু' একটির সামান্য পরিচয় দিলাম। স্বল্পভাষী আঙকল নিকের হাতে বহুদিন পূর্বেই আপনা থেকেই বর্তমান কালের পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত গবেষণার নেতৃত্ব অর্পিত হয়েছে। প্রথম বছরের 'শান্তির জন্য পরমাণু পুরস্কার তাঁকে দেওয়া,—নতুন করে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো ছাড়া আর কিছুই নয়।

চক্রদত্ত

সৈন্যদের যুদ্ধের সময় খবর আদান প্রদান করবার জন্য রেডিও সেট রাখতে হয়। কর্তৃপক্ষরা সব সময় চেষ্টা করেন যাতে এই সেট খুব সহজে সৈন্যরা বহন করতে পারে। এতদিন এই সব রেডিও সেট ব্যাটারীর সাহায্যে চালান হোত। যাতে এই সেটকে আরও সহজ এবং হাল্কা করা যায় তার জন্য বর্তমানের নতুন সেটে ব্যাটারী ব্যবহার করা হবে না। এখন এমন এক ধরনের সেট তৈরী করা হয়েছে যেটা সূর্যের তাপের সাহায্যে কাজ করবে। সৈন্যর মাথায় যে শিরস্ত্রাণ থাকে তার ওপরদিকে এমন বন্দোবস্ত করা আছে যাতে ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো

সূর্যের তাপ চালিত রেডিও সেট
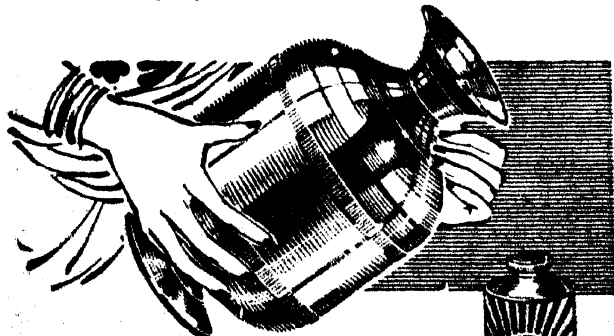
প্রবেশ করে এই রেডিও সেটটি চালাবার মত শক্তি সঞ্চয় করবে। দিনের বেলার এই সূর্যের শক্তি অন্য সময়, বিশেষ করে রাত্রি-বেলা, রেডিও চালাতেও সাহায্য করবে। এর জন্য এই শক্তিকে আলাদা ভাবে সঞ্চয় করে রাখার ব্যবস্থাও আছে।

*

আমরা জানি যে প্রত্যেক বছরে বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য ইত্যাদির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। সম্প্রতি, ১৯৫৭ সালের রসায়ন এবং পদার্থ বিজ্ঞানের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। রসায়নের জন্য বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার আলেকজাণ্ডার টডকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। স্যার আলেক-জাণ্ডার টড-এর বর্তমান বয়স ৪৯ বৎসর। তিনি প্রথমে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি লণ্ডনে একাডেমীর মেডেল, ডেভী মেডেল এবং রয়াল মেডেল পান। পদার্থ বিজ্ঞানের জন্য দুইজন চীনা বিজ্ঞানী সুং দাও লী এবং নিং ইয়াংকে যুক্তভাবে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তাহারা আণবিক বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে তারা আমেরিকায় গবেষণা করছেন। চীনা বিজ্ঞানী চেন নিং ইয়াংয়ের বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর। তিনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক বিজ্ঞানীদের অন্যতম। তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন গণিতজ্ঞ। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে তার অন্যতম সহকর্মী এবং চীনা মহিলা বিজ্ঞানী মিস্ উই চিয়েন সুংয়ের সহযোগিতায় তিনি আধুনিক বিজ্ঞানে একটি বিপ্লবকর আবিষ্কার করেন। বর্তমানে এই চীনা বিজ্ঞানী দুজন 'ল অব প্যারিটি' আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আশা করা যায় যে, ভারতবর্ষে আরও ৯২টি বিজ্ঞান মন্দির তৈরী করা হবে। বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে ১৫টি বিজ্ঞান মন্দির তৈরী হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে এই বিজ্ঞান মন্দিরগুলি গ্রামের লোকেদের মনে সাধারণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি করছে। কাশ্মীরে কোন বিজ্ঞান মন্দির না থাকায় প্রথমে এখানে একটি মন্দির তৈরী করা হবে। তারপর একটি পাঞ্জাবে এবং একটি বাঙলাদেশে হবে।

*

জিয়ালগোড়ার সেন্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউট একরকম ধোঁয়া বিহীন জ্বালানি কয়লা তৈরী করেছেন। খুব বেশী রকম নিম্নস্তরের প্রধান সাধারণ কাঁচা কয়লাকে কার্বোনাইজেশন করে নতুন কয়লাটি তৈরী করা হচ্ছে। প্রথমে সাধারণ কয়লাগুলি একটি ট্রে-র মত পাত্রে রেখে সেটি একটি চুল্লীর মধ্যে ভরে দিয়ে জ্বালান হয়। ট্রে-র সঙ্গে একটি বেশ লম্বা হাতল থাকে এবং কয়লাগুলি জ্বালানোর সময় ট্রেটিকে অনবরত নাড়ান হয়। জ্বালানোর পদ্ধতিরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণত বাতাসের সাহায্যেই আগুন জ্বলে। এই কয়লাগুলি জ্বালাবার সময় চুল্লীর মধ্যে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত উপায়ে হাওয়া ঢুকতে দেওয়া হয়। কয়লাগুলি যতখানি জ্বালাবার পর একেবারে ধূমবিহীন হতে পারে ঠিক সেই পরিমাণ জ্বালানের জন্য বাতাসের পরিমাণ সেই অনুপাতে নির্দিষ্ট রাখা হয়। জ্বালানোর সময় যে ধোঁয়া ও উত্তাপের সৃষ্টি হয় সেটুকু নষ্ট করা হয় না। সেই দিয়ে বাষ্প তৈরী করা হয় কিংবা চুন পোড়ানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ইটের পাঁজা পোড়ান বা সিমেন্ট তৈরীর জন্যও ব্যবহার করা যায়। আশা করা যাচ্ছে যে, এই কয়লা সাধারণ গৃহস্থের রান্না ঘরে ব্যবহারের জন্যও শীঘ্রই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে।

*

জেট ইঞ্জিন বা টার্বোজেটের জ্বালানি হিসাবে বাদামী রং-এর ভিক্টোরিয়ান কয়লা ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কয়লা ইঞ্জিনগুলির জ্বালানি তেলের বদলেই ব্যবহার করা যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার "এরোনটিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী" এই কয়লাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে নিয়ে জেট ইঞ্জিনের তেলের বদলে ব্যবহারের জন্য পরীক্ষা করে দেখেছেন। প্রথম পরীক্ষার ফলাফল তাদের আশানুরূপই হয়েছে।

শার্দুলগিরির অরুণোদয়

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

দার্জিলিংএ যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের কাছেই 'টাইগার হিল' হইতে অরুণোদয়ের দৃশ্যের কথা অনেকদিন হইতে বহুভাবে শুনিয়াছি। সুতরাং অতি স্বাভাবিকভাবেই দার্জিলিংএ গিয়া স্থানীয় লোকজনের কাছে 'টাইগার হিলে'র খোঁজ খবর করিতে লাগিলাম। 'টাইগার হিলে'র বাঙলা নাম কি করা যায় মনে মনে ভাবিতেছিলাম; নিজে যে ক'টির কথা ভাবিতেছিলাম তাহার একটিও লাগসই মনে হইতেছিল না, অনুসন্ধানে যখন জানিলাম ইহার বাঙলা নাম দেওয়া হইয়াছে 'শার্দুলগিরি' তখন মনটা খুব খুশী হইল। নামটা বেশ মুখভরা। দার্জিলিং-এর এই পাহাড়টির নাম 'শার্দুলগিরি' রাখিবার সার্থকতা অনেকই থাকিতে পারে; তবে শেষরাত্রে সূর্যোদয় দেখিবার জন্য তাহার চূড়ায় গিয়া উঠিয়া পূবাস্য হইয়া দাঁড়াইলে শীতটা যে বেশ 'বাঘা শীত' লাগে সে কথাটি বুঝিয়া আসিয়াছি। কম্ফর্টার দিয়া শুধু কান দুটি ঢাকিয়া আরাম লাগিতেছিল না—মনে হইতেছিল, নাকটিও কোনওরকমে ঢাকিয়া লইতে পারিলে ভাল হইত!

পরিচিত এবং অপরিচিত মহলে শার্দুলগিরির অরুণোদয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া কোথাও ঐকমত্য দেখিতে পাইলাম না। কেহ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—'দেখবেন, দেবতার লীলাভূমি; সকালবেলায় আকাশের প্রাঙ্গণে দেবতারা নানা রঙ নিয়ে যেন হোলি খেলছেন'! কেহ বলিলেন,—'দেখবেন মশাই ঠিক পরীর দেশ—মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ বদলে গিয়ে কেমন একটা স্বপ্নলোক তৈরী হবে!' কেহ কেহ আবার আধুনিক ভাষায় বলিলেন,—'ঠিক সিনেমা মশাই; মনে হবে পাহাড় এবং মেঘের পেছন থেকে কেবল অদ্ভুত অদ্ভুত লাইটের ফোকাস!' অপরে আবার ঠোঁটখানি উল্টাইয়া বলিলেন,—'সব ভাঁওতা মশাই; আমি একদিন নয়, দুদিন নয়—পাঁচ দিন গিয়ে দেখেছি; কিছু না—খালি কুয়াশা আর মেঘ—আর তার ফাঁকে যেটুকু লাল রঙ তার জন্যে আর পয়সা খরচ করে আপনাকে এই শীতের মধ্যে 'টাইগার হিলে' যেতে হবে না!'

পরে নিজেও দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করিলাম। আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা যে সত্যই এমন কিছু অপূর্ব তাহা নয়। উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘার রঙের কোনও প্রতিফলন দেখিলাম না, হয়ত কিছু মেঘের আবছায়া ছিল। অন্যত্র অবশ্য আমি তুষারাবৃত গিরিচূড়ায় প্রভাত গগনের লালবর্ণের আশ্চর্য প্রতিফলন দেখিয়াছি। সেদিন সমগ্র পর্বতভূমিতেও তেমন কোনও রঙের প্রতিফলন দেখিলাম না। পূর্ব দিগ্বলয়ে যেটুকু লালের খেলা দেখিলাম তাহা সমতলভূমিতে সুলভ না হইলেও একান্ত দুর্লভ নয়। সূর্য উঠার ভঙ্গিটি অবশ্য অভিনব; সমতলভূমিতে দিগ্বলয়ের অতখানি বিস্তার বা দূরত্ব পাওয়া সম্ভব নয়—সুতরাং এমন সপ্তঅশ্বের রথে বেগে ধাবমান সূর্যের সাক্ষাৎ পাওয়া দুষ্কর। যাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম তাহা হইতে মোটামুটি বুঝিতে পারিলাম, এখানকার রঙের যে আশ্চর্য খেলা তাহা খুব সহজ-লভ্য নয়; আবহাওয়ার বিশেষ বিশেষ কতগুলি অবস্থানের উপরেই সে খেলা নির্ভর করে। শুধু পূর্বাকাশ নির্মল হইলেই চলে না; পূর্বের উদয়াচল নির্মল হওয়া চাই, উত্তরের তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গগুলিও মেঘমুক্ত হওয়া চাই,—অথচ নিম্নের উপত্যকাটি মোটামুটি একটু একটু কুয়াশাবৃত হওয়া চাই—তবেই রঙের খেলাটি খোলে ভাল।

যাক্, শেষরাত্রে কিছু আলোয়ান ও কম্বল চাপাইয়া যখন শার্দুলগিরির শিখরে গিয়া পৌঁছিলাম তখনই দেখিলাম সেখানকার সূর্যোদয় দেখিবার নিমিত্ত নির্মিত গম্বুজটির উপরিভাগ ইতিমধ্যেই লোকে ভরিয়া গিয়াছে; দেখিতে দেখিতে নিম্নভাগও লোকে ভরিয়া গেল। স্থানীয় মোটর এবং জীপের ড্রাইভারগণ বলিল, আবহাওয়ার অনিশ্চয়তার জন্য সেদিন লোকের ভিড় অনেক কম হইয়াছে, তাহাতে দু'শ আড়াই শ' লোক জমা দেখিলাম—বালক-যুবক-প্রৌঢ়। অধিকাংশের হাতেই বিচিত্র আকার-প্রকারের ক্যামেরা। যখন সূর্য উঠিবার সময় হইল তখন দেখিলাম ক্যামেরা দিয়া ফটো তোলা হইতেছে—আর চারিদিকে কেবল চঞ্চল বিস্ময়সূচক অব্যয় ও বিশেষণের ধ্বনি 'ওঃ হাউ লাভ্লি', 'হাউ ব্যুটিফুল'—'ও মাই গড্'—ওয়ান্ডারফুল'—'হাউ ফাইন'—'ভেরি নাইস্'—!

প্রভাতের সূর্য এবং বিস্তৃত পার্বত্য দিগ্বলয় সম্বন্ধে এত উদ্ভট উদ্ভট সুরে ইংরেজী বিস্ময়ার্থক অব্যয় এবং বিশেষণের প্রয়োগ আমাকে রীতিমতন উত্যক্ত করিয়া তুলিল। আশপাশে তাকাইয়া দেখিলাম, যাঁহারা এই অদ্ভুত ধ্বনিগুলি করিতেছেন তাঁহারা অনেকেই বাঙালী—অন্তত ভারতীয়; ইংরেজ ভদ্রলোক এবং মহিলা যে কয়েকজন উপস্থিত আছেন তাঁহারা পরস্পরে অস্ফুট দু'একটি কথাবার্তা ব্যতীত মোটামুটি নীরবেই আছেন, বিকৃত ইংরেজী বুলিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছেন অপর দলটি। যাঁহারা উচ্ছ্বসিত হইয়া অনিবার্য-ভাবে মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহাদের ভিতরে একজন কাহাকেও সহজ উচ্চারণে বলিতে শুনিলাম না, যাহা দেখিলাম তাহা 'সুন্দর'।

কিছু বিরক্তি ও বিষণ্ণতা লইয়া বাসস্থানে ফিরিলাম। এই বিরক্তি ও বিষণ্ণতা শুধুমাত্র সেদিনকার গিরিশিখরের নবোদিত সূর্য এবং রক্তিম দিগ্বলয়ের প্রতি নিক্ষিপ্ত কয়েকটি মাত্র ইংরেজী বুলি অবলম্বন করিয়া নয়—ইহার পিছনে দার্জিলিংএ কয়েকদিন একস্থানের অভিজ্ঞতার একটি পৃষ্ঠভূমি রহিয়াছে, তাহাই একটু খুলিয়া বলিতে হইতেছে।

নূতন দার্জিলিংএ আসিয়া দু'চার দিন আনাড়ীর মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি এদিক সেদিক। প্রথম দু'চার দিন অবশ্য আবার

এমন মেঘ-কুয়াসা এবং ছিচকাঁদুনে বৃষ্টির পাল্লায় পড়িয়াছিলাম যে সকল উৎসাহ ভিজিয়া ঠাণ্ডা হইয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল। আকাশ একটু ফরসা হইয়া আসিলে ভাবিলাম, না—এমন আনাড়ীর মতন ঘুরিলে চলিবে না। কাছের লাইব্রেরীতে গিয়া দার্জিলিং সম্বন্ধে বই জোগাড় করিলাম কয়েকখানা। বলা বাহুল্য সবই ইংরেজ সাহেবদের লেখা। খবর অনেক আছে—দার্জিলিংএর শ্যামল সৌন্দর্যের কথা, নির্মল আবহাওয়ায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং সন্নিকটবর্তী চিরতুষারাবৃত গিরিশ্রেণীর কথা, কোন্‌খান হইতে তাহাদিগকে কিরূপ দেখা যায়—দু'চারিটি প্রসিদ্ধ ঝরনার কথা—আশপাশের শহরগুলির কথা—সেখানে যাইবার পথের কথা—যান-বাহনের কথা ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরে দেখিলাম বড় বড় হোটেলগুলির কথা—দার্জিলিংএর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের সহিত মজা লুটিবার বিবিধ ব্যবস্থার কথা—খেলা, ঘোড়দৌড়, ভোজ, নাচ-গান হৈ-হুল্লোড়—সব কিছু। বইগুলি বার বার উল্টাইতে পাল্টাইতে লাগিলাম ভাবিলাম, আর সব খবরই ত মোটামুটি জানিলাম—কিন্তু এই গিরিশ্রেণীকে ঘেরিয়া উঁচুতে নিচুতে দূরে দূরান্তরে যে লোকগুলির বাস তাহাদের কথা ত কিছুই জানিলাম না। দেখিলাম অনেক বইতে সংক্ষেপে তাহাদের খবর কিছু লিখিত আছে—তাহা হইল এই, এখানকার লোকগুলি মোটামুটি পরিশ্রমী এবং বিশ্বস্ত —পুরুষগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া বেশ চাকর বা অফিস কারখানার দারোয়ান করিয়া লওয়া যায়—আর এখানকার মেয়েরা চমৎকার 'আয়া' হয়—এখানকার মেয়েদের ভিতর হইতেই অনেক বড় বড় শহরে ভাল 'আয়া' রপ্তানি হয়। মনটা আস্তে আস্তে কেমন সমস্ত শহরটার বিরুদ্ধেই বিরূপ হইয়া উঠিতে লাগিল!

পরে ভাবিলাম, আজ আর এই অভিমান ও বিরূপতার কোনও অর্থ নাই। গত একশত বৎসর ধরিয়া যে বিদেশী 'সাহেবী সমাজ' একটু একটু করিয়া এই শহরকে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহারা বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করিবার জনাই এই শহরকে গড়িয়া তোলে নাই; তাহারা শোষকরূপে এদেশের প্রকৃতি, এ দেশের সকল সম্পদ—সকল লোককে তাহাদের ভোগের নানা উপকরণরূপে ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি লইয়াই এ-সকল গড়িয়া তুলিয়াছিল। এখন তাহা অতীতের কথা—সে অতীতকে মন হইতে জোর করিয়া মুছিয়া ফেলাই উচিত। কিন্তু মুছিয়া ফেলিব তাহার উপায় কি? দেখিলাম অতীতের সেই 'সাহেবী সমাজ' এখনও ছায়ামূর্তিতে দার্জিলিংএর চড়াই উতরাইতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

প্রথম যেদিন ঘুরিতে ঘুরিতে 'ম্যালে' গিয়া পৌঁছিলাম, সেদিন চৌরাস্তায় কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করিয়া নিজেই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। পার্বত্য স্রোতের ন্যায়ই জনস্রোত উঠিতেছে নামিতেছে—তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চলা-ফেরা, ভাব-ভঙ্গি, কথাবার্তা সবই যেন কেমন অপরিচিত ঠেকিতেছিল। পুরুষদের শক্ত আঁটা 'সুট', গলায় বাঁধা 'টাই'—মাথায় বিবিধ আকার প্রকারের টুপি—মহিলাদের শাড়ির বাহার, ওভারকোট, 'ফারে'র কোট, ক্লোক, [illegible] রুজ, লিপ্‌স্টিক এবং অন্যান্য প্রসাধন-বিন্যাস—সব মিলিয়া কেমন একটা সাজ-সজ্জার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতন লাগিতেছিল। ইহার ভিতরে ধুতি-পাঞ্জাবি-আলোয়ান এবং সস্তাদামের কেড্‌স ভূষিত নিজেকে কেমন একটা মূর্তিমান বেমানান বলিয়া লাগিতেছিল। শুধুই সাজ-সজ্জায় নয়—দেখিলাম পথে গাড়িতে স্টীমারে যাঁহারা আমাদেরই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকরূপে স্বাভাবিকভাবে গল্পগুজব কথা-বার্তা বলিয়া আসিয়াছেন যেসব ভদ্রমহিলাদের আমাদেরই সাধারণ ঘরের গিন্নি-বান্নি মা-বোনরূপে দেখিয়া আসিয়াছি তাঁহারাই এখানে আসিয়া সহসা বহু ও ঢঙ দুই-ই বদলাইয়া ফেলিয়া কেমন [illegible] 'হ্যালু-উ-উ হ্যালু-উ-উ' করিয়া পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করিতেছেন বিবিধ অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে 'মাই গড' বলিয়া সহসা চিৎকার করিয়া হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতেছিলেন, কেমন চাপা কণ্ঠে 'গুড্ বাই, গুড্ বাই' বলিয়া নাটকীয় ভঙ্গিতে বিদায় গ্রহণ করিতেছিলেন; একপ্রান্তে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, দার্জিলিং এর অক্টোবরের এইটুকু শীতের জন্য কি এতখানি পরিবর্তনেরই প্রয়োজন ছিল না ইহা বিশুদ্ধ স্থান-মাহাত্ম্য!

একটা চিত্তক্ষোভ লইয়া দার্জিলিংগামী সবজনের প্রতি কতগুলি অশ্রদ্ধেয় উক্তি বা ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্য আমার আদৌ নাই। শ্রদ্ধেয় ব্যতিক্রম অনেক আছেন, আমি পূর্বেই তাহাদিগকে আমার আলোচনার বহির্ভূত করিয়া লইতেছি। যাঁহারাই দার্জিলিং যান তাঁহারাই খানিকটা 'সাহেবিয়ানা' ফলাইবার জন্য যান এমনতর কথা বলিবার মত বেকুবি অভিসন্ধি আমার নয়। স্যুট পরা বা ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা সম্বন্ধেও আমার এমন কোনও চিত্তক্ষত নাই যে উভয়ের দর্শন বা শ্রবণমাত্রেই একটা অসহ্য অন্তর্দাহ অনুভব করিব। এ-কথাও সত্য যে গরমের স্থানের পোশাক এবং শীতের স্থানের পোশাকের ভিতরে অবশ্যই কিছু পার্থক্য থাকিবে। আমার সকল বক্তব্যের লক্ষ্য একটি বিশেষ শ্রেণী যাঁহাদের সম্বন্ধে আমার মনে হইয়াছে যে তাঁহাদের মনের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে একটা সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে, এই দার্জিলিং শহর যে 'সাহেবী সমাজে'র বিলাসভূমি ছিল —তাঁহারা সেই সাহেবী সমাজেরই স্থলাভিষিক্ত। এই 'সাহেবী মনোবৃত্তি'টিই হইল আসল অশ্রদ্ধেয় বস্তু।

আমি এখানে 'সাহেবী মনোবৃত্তি' কাহাকে বলিতেছি? ইংরেজগণের মধ্যে সকলেই কিছু অশ্রদ্ধেয় ছিলেন না; অশ্রদ্ধেয় 'সাহেবী সমাজ' ছিল কোনটা? যাহারা উচ্চপদস্থ কর্মচারী হইয়া বা ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি হইয়া প্রচুর 'তন্খা' লুটিতেন এবং সেই অর্থবলের দ্বারা এই দেশটাকে সর্বপ্রকারে ভোগ করিতেন—কিন্তু দেশের বৃহত্তর সত্তার সহিত কোনও যোগ রাখিতেন না। সেই বিদেশী 'সাহেবী সমাজে'র স্থলে দেখিতে দেখিতে আর একটি দেশী 'সাহেবী সমাজ' গড়িয়া উঠিয়াছে; ইঁহারাও উচ্চপদস্থ কর্মচারী, অথবা ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি—সুতরাং ইঁহাদের হাতেও প্রচুর নগদ 'তন্খা'; ইঁহাদের শিক্ষা সংস্কৃতির সহিত এই অর্থসম্পত্তি যুক্ত হইয়া ইঁহাদিগকে বৃহত্তর সমাজজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; ইঁহাদের মনের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, ইঁহাদের স্বোপার্জিত এই অর্থ সম্পত্তিই নিজের ভোগে ব্যয় করিবার ইঁহাদের সমাজজীবনে একটা বিশেষ অধিকার আছে। এই বিশেষ অধিকারের [illegible] মানুষকে [illegible] মধ্যে [illegible] এই আত্মকেন্দ্রিকতার [illegible] মনে হইয়াছে, [illegible] এমন কি [illegible] এই দার্জিলিং শহরের যেন কোনও [illegible] নাই—আত্মকেন্দ্রিকতার বিলাসভূমিরূপে সমগ্র দেশের সত্তা হইতে সে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে।

দেশের জনসাধারণের প্রতি একটা ঘৃণা বা অবজ্ঞাবোধ এবং সেই বোধের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়া যেমন জাতির পক্ষে অকল্যাণের তেমনি ব্যক্তির পক্ষেও। আত্মম্ভরিতা, অমিতব্যয়িতা, অসংবেদনশীলতা এই বিচ্ছেদের অনিবার্য ফলরূপেই দেখা দেয়। এ সত্যকে বার বার এই ক্ষুদ্র জীবনেই অনুভব করিয়াছি যে বহুর সঙ্গে নিজেকে এক করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি মানুষের কল্যাণবুদ্ধিকে সদা জাগ্রত রাখে, সেই কল্যাণবুদ্ধি জাতিকেও উন্নত করে—আত্মাকেও মহৎ করে।

ছেলেবেলায় গ্রামজীবনে মুষ্টিভিক্ষা করিতাম। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়া ঘরে ঘরে একটি একটি মাটির ঘট রাখিয়া দিতাম; কথা ছিল, মায়েরা যখন দু'বেলা খাবার চাল লইবেন তখন এক মুষ্টি করিয়া চাল প্রত্যেক বেলা এই মুষ্টিভিক্ষার ঘটে রাখিবেন; সপ্তাহান্তে রবিবার সকালে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে বাহির হইতাম এই চাল সংগ্রহে,—চাল সংগ্রহ করিয়া গ্রামের একান্ত

দুস্থ পরিবারগুলির ভিতরে বণ্টন করিয়া দিতাম। এই ভিক্ষার সহিত অনেক কষ্টপূর্ণ এবং অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার স্মৃতি জড়িত আছে। পূর্ববঙ্গের গ্রাম—বর্ষাকালে জলে কাদায় রাস্তাঘাট ডুবিয়া ভাঙিয়া গিয়া প্রত্যেকটি বাড়িকে একটি দ্বীপে পরিণত করিত। মনে আছে শ্রাবণে ভাদ্রে বেশি জলের সময় আমরা দু'তিনটি কিশোর গামছা লইয়া বাহির হইতাম, সেই গামছা পরিয়া এ-বাড়ি ও-বাড়ি গিয়া চাল সংগ্রহ করিতাম। তারপরে সকল মায়েরা বা গৃহকর্তারাই আমাদের প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন না; অনেকেই আমাদিগকে একটা সাপ্তাহিক উৎপাত বলিয়া মনে করিতেন— তাহাদের কটু কথা এবং লাঞ্ছনাকর ইঙ্গিতও অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু আজ পদে পদে অনুভব করি, কৈশোরের সেই কৃত্যগুলি বর্তমান জীবনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রাখিতেছে। সেই যে গ্রামের ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল পরিবারের সহিত যোগাযোগ—দুস্থতম পরিবারগুলির সহিত নিবিড়তম যোগ—তাহার স্মৃতি বর্তমান জীবনের আত্মম্ভরিতা-বৃত্তির পদে পদে রাশ টানিয়া বাঁচাইয়া দিতেছে। পৌষ-মাঘের শীতের দিনে যাঁহাদিগকে স্বল্পায়তন মোটা ধুতির খুঁট কোনরকমে গায়ে জড়াইয়া দুই হাতে বক্ষ-আবৃত করিয়া শীতে কাঁপিতে দেখিয়াছি তাঁহাদের সঙ্গে অনেক দিন শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়াছি বলিয়া আজও শীতের দোহাই দিয়া বহুমূল্য গরম পোশাক গায়ে চড়াইতে দ্বিধা বোধ করিতেছি; কি জানি হয়ত আর কিছুদিন সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত হইলে সে বালাই ঘুচিয়া যাইবে! অক্টোবর মাসে দার্জিলিংএ যেটুকু শীত পাইয়া আসিয়াছি তাহা ত খদ্দরের পাঞ্জাবীর উপরে একখানি আলোয়ান চাপাইয়া চটি পায়ে বা সস্তা দরের কেডস্ পায়েই কাটাইয়া দিয়া আসিয়াছি; তাহাতে নিউমোনিয়ায় ত আক্রান্ত হই নাই-ই সর্দি-কাশিতেও একদিন ভুগি নাই,—বরং কিছু স্বাস্থ্য লাভ করিয়াই আসিয়াছি। হয়ত কষ্ট একটু একটু পাইয়াছি; সেই কষ্ট-টুকুই ত ছিল উপরি লাভ; তাহার ভিতর দিয়া চারিদিকে তাকাইয়া তাকাইয়া যে ভুটিয়া ও লেপচা পল্লী দেখিয়াছি তাহাদের সঙ্গেও নিজের কিছু কিছু যোগ অনুভব করিয়াছি—সমতল ভূমির বাঙলা দেশের অসংখ্য অধিবাসীর মধ্যেও যে আমি একজন এই কথাটা অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

একটা কথা অপ্রিয় হইলেও সত্য বলিয়া মনে হয়; তাহা এই যে সরকারী বেসরকারী কার্য উপলক্ষে এবং শৈলাবাসযাত্রী হিসাবে দার্জিলিংএ এত বাঙালীর ভিড়, অথচ দার্জিলিংএর অধিবাসীদের সহিত সমগ্র বাঙালী জাতির এখন পর্যন্ত কোনও অন্তরঙ্গ যোগ গড়িয়া ওঠে নাই। দার্জিলিং-বাসী গুর্খা, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি জাতীয় সাধারণ লোকদের সম্বন্ধে বাঙালী বাবুগণের মুখে যাহাই থাকুক, মনে মনে আছে একটা অবজ্ঞা; অপর স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে যাহারা আবার একটু শিক্ষিত হইয়া উঠিতেছেন তাঁহাদের মনে আছে এই বাঙালী বাবুদের প্রতি অবিশ্বাস, ঈর্ষা এবং প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ। একটা রাজনৈতিক চেতনা লইয়া অবশ্য এখন আমরা একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছি এবং সে-জাতীয় সম্পর্ক স্থাপনের পথ খুঁজিতেছি। কিন্তু পূর্বতন যে সাহেবী সমাজ এখানকার চাকর-দারোয়ান-আয়ার সুলভতার সন্ধানই দিয়া গিয়াছেন বিধির কৃপায় কালচক্রের পরিবর্তনে সেই সাহেবী সমাজের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া যাহারা ভিতরে ভিতরে কিছু কিছু আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টায় আছি তাহাদের কাছে এই মিলনের পথ কোনও দিনই সহজ বা সত্য হইয়া উঠিবে না। এখানকার অধিবাসীরা সাধারণ জীবন-যাত্রায় শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতিতে সত্য সত্যই যদি আমাদের অপেক্ষা অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিয়া থাকে তবে তাহার জন্য আমাদের মনের মধ্যে অবজ্ঞা ব্যতীত সহানুভূতি নাই কেন? ইহারা সাতজন্মে স্নান করে না এ-কথা বহু লোককেই বলিতে শুনিয়াছি; আবার তাহাদিগকেই বলিতে শুনিয়াছি যে গরম জল ব্যতীত এখানে স্নান করা সম্ভব নয়, আর এখানে স্নানের উপযুক্ত যথেষ্ট গরম জল সংগ্রহ করা প্রচুর ব্যয়সাধ্য, স্নানের জন্য বেলা ঠিক এগারটার সময় বালতিতে বালতিতে গরম জল ইহাদিগকে কে জোগান দিবে ইহাদের সম্বন্ধে উন্নাসিকগণ সে কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ইহারা জন্মের পর যে জামা গায় দেয় মৃত্যুর পর তাহা গা হইতে খোলা হয় এমন কথা রসমধুর করিয়া বলিতে শুনিয়াছি; পর্যায়ে পর্যায়ে জামা বদলাইবার ব্যয়ভার বহন ইহাদের মধ্যে কি করিয়া সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে সে সম্বন্ধে কজনে মাথা ঘামাইয়াছেন? বৃহৎ মানবতার সহিত অন্তরের যোগ সত্য না হইয়া উঠিলে ইহাদিগকে রাজনৈতিক বুদ্ধি লইয়া আপন করিয়া লইতে গিয়া আরও পর করিয়া

তুলিব—সন্দেহ, ভুল ধারণা, বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বর্ধিতই হইবে। মিলনের পথ একমাত্র প্রেমে।

খাঁটি সাহেবদের সময়কার দার্জিলিং শহর দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই, কিন্তু ক্ষুদে সাহেবদের দার্জিলিং শহরটাকে আমার অত্যন্ত কৃত্রিম মনে হইয়াছে; কারণ শহরের উপরিতলায় হাঁটিতে চলিতে যাঁহাদিগকে চোখে পড়িয়াছে তাঁহাদের অনেককেই মনে হইয়াছে ইঁহারা ঠিক 'স্বভাবস্থ' নন,—অর্থাৎ ঐ সাহেবিয়ানাটা অনেকেরই যথার্থ স্বভাব নয়—একটা চেষ্টাকৃত আরোপিত গুণ মাত্র। এই আরোপের চেষ্টা আমার নিকটে একটা চিত্তদৈন্যের লক্ষণ বলিয়া মনে হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে শ্রুত একটি গল্প মনে পড়িয়া যাইতেছে। বিকালের দিকে একটি জাপানী কাপে করিয়া কবি চা খাইতেছিলেন। কাপটির গায়ে জাপানী রঙের চিত্রণ কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে, তিনি চা খাইতেছিলেন আর বার বার সেই অত্যন্ত অনাড়ম্বর অথচ আশ্চর্য রঙের দিকে তাকাইতেছিলেন। খানিক পরে তিনি তাঁহার আশপাশের লোকদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—'দেখ, আমার মনে অনেক সময় একটা খটকা জাগত; ভাবতুম, মানুষের বেলায় বিধাতার রঙ সম্বন্ধে এত কার্পণ্য কেন? পাখী ময়ূর—তার গায়ে বিধাতা বিচিত্র রঙ ঢেলে দিয়েছেন; তার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম,—বনের যে কোনও পাখীর দিকে তাকিয়ে দেখ—কত রঙ! এমন যে বনের হিংস্র পশু বাঘ—তারও গায়ে কেমন ডোরা ডোরা রঙ!—আর রঙ দিলেন না তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের গায়ে—তাকে তৈরী করবার বেলাতেই কেমন এক সাদা-মাটা! পরে ভেবে দেখলুম, না—তিনি ঠিকই করেছেন, পশু পাখীদের মনে তেমন রঙ নাই—তাই তাদের গায়ে রঙ ছড়িয়ে দিয়েছেন—আর মানুষের মন ভরে দিয়েছেন রঙে—তাই গায়ে আর রঙ দেন নি।'

কবিগুরুর কথা স্মরণ করিয়া মনে হইতেছে আমাদের শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যে পোশাকে পরিচ্ছদে প্রসাধনে এত গায়ে রঙ চড়াইবার চেষ্টা ইহা কি মনের রঙের ঘাটতির সূচনা? দার্জিলিং-এর ত আকাশে রঙ, মেঘে রঙ, পাহাড়ের গায়ে গায়ে অপূর্ব অজস্র রঙ—ইহার সহিত সামান্য একটু মনের রঙ মিশাইয়া দিতে পারিলেই ত যথেষ্ট। ইহার ভিতরে আবার গায়ে এত রঙ চড়াইবার বাসনা কেন?

আসল কথাটা সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একটা সাহেবিয়ানার মোহ এখনও আমাদের ভিতরকার একটি সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, ফলে কৃত্রিম অনুকরণের মধ্যে যে বিরাট দৈন্য রহিয়াছে, তাহা আমাদের চোখে পড়িতে চাহে না। এই মোহ স্থানে স্থানে কতখানি যে সর্বনাশা হইয়া উঠিতেছে তাহা একটি ছোট দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। দার্জিলিংএর যে সাধারণ-আবাসে আমরা বাস করিতেছিলাম সেখানে তিন চারি দিনের জন্য পাঁচ ছয়টি যুবকের একটি দল আসিয়া উপস্থিত হইল। মনে হইল কলেজে-পড়া বন্ধু-বান্ধব—তিন চারি দিনের শৈলযাত্রী। একসঙ্গে খাইতে বসিতাম, দেখিতাম খাওয়া লইয়া রোজই তাহারা গোলমাল করিত—প্রদত্ত খাওয়ায় তাহাদের পেট ভরিত না, আরও মাছ চাহিত, মাংস চাহিত। আহার্যদানকারিগণ স্পষ্ট বলিয়া দিলেন, আরও খাবার পাইতে হইলে তাহাদিগকে আরও বেশি টাকা দিয়া 'বিশেষ শ্রেণী'তে ভর্তি হইয়া লইতে হইবে। সেদিনকার মতন খাওয়া শেষ করিয়া দেখিলাম যুবক কয়টি প্রাঙ্গণে জড় হইয়া নিজেদের মধ্যে খাওয়ার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছে। একটি যুবক বলিল,—'নারে,—এ খাওয়ায় আর চলবে না, চল 'স্পেশালেই' ভর্তি হয়ে পড়ি।'

অপর একটিতে বলিল,—'না ভাই, আমি তা পারব না, আমার আর টাকা নেই, এখন ফিরে যাওয়াই আমার কষ্ট।'

'তার মানে,—তোর হাতের এতগুলো টাকা দিয়ে তুই কি করলি?'

'বারে, একটা 'সুট' করাতেই ত নগদ এক শ' টাকা বেরিয়ে গেল।'

'তোর খাবার টাকা নেই, ফিরে যাবার টাকা নেই,—তবে তুই তিন দিনের জন্য এক শ' টাকা দিয়ে একটা 'সুট' করতে গেলি কেন রে?'

'বারে, একটা ইডিয়ট—! দার্জিলিং আসব—একটা 'সুট' করব না—এর কোনো মানে হয়?'

দূর হইতে কথাটা আমার কানে আসিয়া আমাকে ভাবাইয়া তুলিল, এই যুবকটি যাহা বলিল তাহা কি এই যুবকটির একারই কথা—না আমরা ঋতুতে ঋতুতে দার্জিলিংএ আসিয়া যাহারা ভিড় করি তাহাদের আরও অনেকের কথা?

এই অন্ধ অনুকরণের মোহ যে শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে বা বিশেষ একটি সমাজের ক্ষেত্রে তাহা নয়—দার্জিলিংএ বসিয়া বুঝিতে পারিলাম এখন পর্যন্ত এই মোহাচ্ছন্নতা আমাদের আদর্শ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও। ছোট মুখে বড় কথা বলার একদিক হইতে একটা নিরাপত্তা এই যে, তাহা বেশি দূরে গিয়া পৌঁছায় না; সেই ভরসায় অনেক কথা বলিয়া ফেলিতেছি। এখনও বাঙলা দেশের রাজ্যপালের বৎসরে দুইবার করিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয়ে এবং প্রচুর সমারোহে দার্জিলিং বাস কেন? বিদেশী রাজ্যপালদের ক্ষেত্রে এ-ব্যবস্থার ভিতরে বিলাসের সঙ্গে প্রয়োজনও খানিকটা ছিল, আমাদের দেশী রাজ্যপালগণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অংশটা ত কিছুই চোখে পড়িতেছে না—বাকীটা তাহা হইলে ত শুধু বিলাস বা অন্ধ-অনুকরণের মোহাচ্ছন্নতাটাই থাকিয়া যায়। রাজনৈতিক প্রয়োজনের কথা হয়ত খানিকটা তোলা যায়; কিন্তু এই বন্ধনের দ্বারা যদি কেহ দার্জিলিংকে অবশিষ্ট বঙ্গের সহিত দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিতে চান, তবে তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে ভ্রান্ত আখ্যা দিতে চাহি।

শুনিলাম দার্জিলিংএ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ির জন্য স্থান খোঁজাখুঁজি চলিতেছে; স্থান সংগ্রহে এবং গৃহ নির্মাণে বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে। কেন এই বিরাট পরিধিযুক্ত প্রাসাদটি বা তাহার কোনও একটা অংশ কি এই কাজে ব্যবহার করা যায় না? ইহার সহিত দার্জিলিংএর যাদুঘর, স্থানীয় শিল্প-কলা প্রদর্শনী প্রভৃতিকে যুক্ত করিয়া ইহাকে ত দার্জিলিংএর প্রাণকেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। বেলভেডিয়ার প্রাসাদ যেমন 'জাতীয় পুস্তকাগার'রূপে রূপান্তরিত হইয়া সার্থক হইয়া উঠিয়াছে, দার্জিলিংএর রাজপ্রাসাদও সেইরূপ দার্জিলিংএর প্রাণকেন্দ্ররূপে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে।

না—অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। শার্দুলগিরির শিখরে অরুণোদয় দেখিতে গিয়াছিলাম—অনেক চড়াই উতরাইয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অন্যমনস্কভাবে অনেক দূরের বিপথে আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছি। শার্দুলগিরির কথা বলিতেছিলাম, সত্যই শার্দুলগিরি! দুর্জয় শার্দুলশক্তি নিহিত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঝুপড়িগুলির ভিতরে—এখানকার প্রত্যেকটি নরনারী বালবৃদ্ধের দেহে। কিন্তু সে শার্দুলগিরি আজও ঘুমন্ত—দিগ্বলয় অনভিপ্রেত মেঘে ঢাকা—সর্বদেহ তাহার আচ্ছন্ন ঘন কুয়াশায়। শক্তির ভিতরে এখনও ঘটে নাই চৈতন্যের আধান। সেই চৈতন্যের স্পন্দনে মহাজাগরণের অপেক্ষায় রহিলাম। ঘুমন্ত গিরির গায়ে অরুণোদয়ের অজস্র বর্ণবিচ্ছুরণ আজ মনে আঘাত হানিতেছে; আজ তাই ফিরিয়া গেলাম একটি নবপ্রভাতের অপেক্ষায়—যে প্রভাতে জাগ্রত শার্দুলগিরি অঙ্গে অঙ্গে অরুণোদয়ের অজস্র রশ্মিস্পন্দন প্রাণস্পন্দনের সহিত যুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

বাসা থেকে ট্রাম ডিপোর দূরত্ব কম নয়। আদি গঙ্গার পুল পেরিয়ে কয়েক মিনিট। কিছুটা কাঁচা রাস্তা। তারপর পীচের। এখানে এসে সত্যিকারের শহরের গন্ধ পাওয়া যায়। দু' পাশে পাকা বাড়ি। ছোট-বড়, একতলা-দোতলা, নানা রকমের। রংবেরঙের। মাঝে-মাঝে দু' একটা ডোবার পুকুর সাজার হীন অপচেষ্টা। চার পাশে জঙ্গল আর মশার গুন-গুনানির ফাঁকে টল-টলে আলকাতরার মত একটু জল। স্থির আর দুর্গন্ধময়। জলের কলও আছে। তবে হিসেব করে সময়মত আসা-যাওয়া তার। একটা বাজারের ছোট্ট সংস্করণও চোখে পড়ে। ঠিক বাজার নয়। বাজার-বাজার খেলা। অর্থাৎ রাজধানী যতই আদর করে বুকে টেনে আপন করে নিক, জায়গাটা আজও তার স্বভাবসুলভ গ্রাম্যতা ছেড়ে শহুরে বনে যায়নি। এখনো বাসরঘরের দোরে অপেক্ষমানা লাজুক মেয়েটির মত দাঁড়িয়ে। লোকে বলবে গ্রাম? গ্রাম্য? তা বলুক। জায়গাটার সঙ্গে নিজের জীবনের এক সূক্ষ্ম মিল অনুভব করে অনুপমা। চেষ্টা করেও শহুরে সাজ-বাজ আয়ত্ত করতে পারেনি সে।

পথটা অনুপমার চেনা। ভয়ংকরভাবে চেনা। চোখ বুজে চলে যেতে পারে। চিনে নিতে হয় না। কষ্ট হয় না কিছুতেই। পথই তাকে পায়ে ধরে ট্রাম ডিপোতে পৌঁছে দেয়। তারপর এক দৌড়ে চেনা-জানার বাইরে। প্রায়-শহর থেকে একটা আস্ত শহরে। শহর নয়। নগর। বহুলোকের কোলাহলে বিচিত্র মুখর। সেই মুখরতার মিছিলে ডুবে যায় একটি নরম মনের মেয়ে অনুপমা। একটি শরীর। কেউ দেখে না। কেউ বোঝে না। যে যার কাজে ব্যস্ত। অনুপমা এখানে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। বুকের ধুকপুকুনিটুকু থেমে যায় এইখানে এসে। অনেকটা মুক্ত মনে হয় নিজেকে। বেশ হাল্কা। যদি ডানা থাকতো দুটো, অনুপমা মাটিতে পা ফেলতো না। অপার শূন্যে, অথৈ নীলে ভেসে বেড়াত অবিরমাণ।

এসব কথা এখন আর মনে হয় না অনুপমার। পুরনো হয়ে গেছে এসব কল্পনা। বরং হাসি পায় ভাবলে। যতদিন এই নতুন জীবিকার সঙ্গে পুরনো জীবনের সংঘাত ছিল ততদিন এই যন্ত্রণা ছিল অসহ্য। প্রকাশ্য বেদনার ভারে ততদিনই বার বার নুয়ে পড়েছে মনটা। ব্যথায় টন-টন করে উঠেছে বুকের ভেতরে। কিন্তু সকল মানুষই অভ্যাসের দাস। আর এই অভ্যাস যখন তার অভাব মেটাল—

সোমনাথকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেদিন চাকরীর ইণ্টারভিউ-এ ফেল করে মুষড়ে পড়েছিল অনুপমা। তখন ভিজে গলায়, চাপা সুরে সোমনাথই বলেছিল, 'ভাবছেন কেন অত? এ ছাড়াও তো চাকরী থাকতে

পারে? আপনার মত মেয়েরা বেকার বসে থাকবে না কখনো।'

বিস্মিত হয়েছিল অনুপমা। সোমনাথের হৃদ্যতায় মুগ্ধ হয়েছিল সেদিন। চারিদিকের এই নির্মমতার দুর্ভেদ্য পরিবেশে একটা কোমল প্রাণের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়েছিল সে। মুহূর্তে আশার ঝিলিক খেলে গিয়েছিল মনে। সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিল সোমনাথের দিকে। কথা বলতে পারেনি। শক্তি ছিল না।

এগিয়ে এসেছিল সোমনাথ। মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, 'আপনি রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করুন আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি আমি।'

আধ ঘণ্টা নয়। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এসেছিল সোমনাথ। ট্যাক্সির দরজা খুলে তুলে নিয়েছিল অনুপমাকে। তারপর শহর ছেড়ে দূরে পাল্লার পথে ছুটে গিয়েছিল তারা। আপত্তি জানায়নি অনুপমা। সাহস ছিল না। কিন্তু বুক কাঁপছিল। মুখ পাংশু হয়ে আসছিল ভয়ে। বাইরে তাকাল অনুপমা। শহর ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছে তারা। এখনো চলছেই। দিগন্তে সূর্যাস্তের আয়োজন। দিনান্তের সমারোহ। সোনার সবুজে অপূর্ব সুন্দর বনশ্রী। মাটির গভীর থেকে উঠে আসছে অন্ধকার। অসংখ্য নাগিনীর মত সেই কুটিল অন্ধকার পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর সমারোহকে জড়িয়ে ফেলতে চায়। ঢেকে ফেলতে চায়। আত্মসাৎ করে নিতে চায় নিজের মধ্যে। রাত্রি নেমে আসছে ধীরে ধীরে। চোখের সামনে একটা কালো ক্যানভাসে ক্লান্তিহীন একটা অদৃশ্য হাতে কালো রঙের তুলি বুলিয়ে দিচ্ছে কেউ। চোখে তাই গাঢ় অন্ধকার। গাড়ির ভেতরেও আছড়ে পড়ছে সেই অন্ধকারের ঢেউ। শুধু একটানা যন্ত্রের গোঁ গোঁ গর্জন। যেন একটা আদিম হিংস্র জন্তু ক্ষেপে গেছে আজ। জ্বলজ্বল করছে সামনের মিটারের ডায়ালটা। মাঝে-মাঝে দূরের ঘরগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। হিংস্র সাপের চোখের মত জ্বলছে সোমনাথের ঠোঁট-চাপা সিগারেটটা। তা ছাড়া কেউ কাউকে দেখে না। দেখে চিনতে পারে না তারা। শংকায় অনুপমার বুক কাঁপে থর-থর। তবু অকম্পিত কণ্ঠেই জোরে প্রশ্ন করে সে, 'এ আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছেন আপনি?'

—'কোথাও না।' ধীর কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠ সোমনাথের।

—'তবে এ আমরা কোথায় চলেছি?'

—'দূরে, বহুদূরে।' পরিহাসের মত তরল কণ্ঠ সোমনাথের।

—'আমাকে নামিয়ে দিন। আমি যাব না।' কেঁদে ওঠে অনুপমা।

কথা শুনলো সোমনাথ। রাস্তার ধারে দিয়ে থেমে গেল গাড়িটা। কিন্তু নামল না অনুপমা। ভরসা পেল না। ভয়ে কুঁকড়ে রইল এক পাশে।

প্রশ্ন করে সোমনাথ, 'নামবে না?'

—'না।'

—'গাড়ি থামাতে বললে কেন তবে?' চাপা গর্জন সোমনাথের কণ্ঠে। চেষ্টা করেও মুখ দেখা গেল না অন্ধকারে। নইলে আঁতকে উঠত অনুপমা।

অনুপমা বললে, 'আমাকে যেখান থেকে এনেছিলেন সেখানেই পৌঁছে দিন আপনি।'

এবারেও কথা শুনল সোমনাথ। গাড়ির মুখ ঘুরে গেল। শহরে পৌঁছুতে রাত হল অনেক। সোমনাথ বললে, 'কোথায় যাবে তুমি?'

—'টালিগঞ্জ।'

টালিগঞ্জের দিকে গাড়ি ছোটাল সোমনাথ। অনুপমার আর ভয় নেই। নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করে এবার। 'কই আমার চাকরীর কথা কিছু বললেন না তো?'

পাতলা চাপা ঠোঁটে হাসির একটি সূক্ষ্ম রেখা ফোটাল সোমনাথ। 'চাকরী? এই তোমার চাকরী অনুপমা।' কথা শেষ না হতেই অনুপমার একটা হাত কোলের উপর টেনে এনেছিল সোমনাথ। অনুপমা কাঁপছিল। হাতটা টেনে নেবার শক্তি ছিল না। বোকার মতন কেঁদে উঠেছিল অনুপমা।

—'কিন্তু আমি যে আপনি কী, বলুন তো?' এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল অনুপমা। সোমনাথ নিশ্চল নীরব। সে হাসছে। নিঃশব্দ বিদ্রূপায়িত হাসি।

গাড়িটা থামল। অনুপমা নামল। পকেট থেকে পার্স বের করে অনুপমার হাতে কটা বড় নোট দিল সোমনাথ। বললে, 'তোমার কাজেই বেশ লাগে অনুপমা। কাল আবার আসবে আশা করি।'

আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না সোমনাথ। পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা। চোখের আড়ালে চলে গেল। মিলিয়ে গেল সোমনাথের সমস্ত ঠাটবাট। শুধু এক শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে কোন ছানি-পড়া বৃদ্ধের চোখের মত অস্পষ্ট গ্যাসের লাইট পোস্টের নিচে অনেকক্ষণ ভূতগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে রইল অনুপমা। নিশ্চল, নিষ্প্রাণ। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেল। অনুপমা টের পেল হাতের মুঠোয় ছাপা কাগজ কম নয়। খুলে দেখল যথেষ্ট টাকা। তারপর একটা ঘর-ফিরতি খালি রিক্সা ডেকে উঠে বসল।

সেদিন থেকেই শুরু। কিন্তু শেষ কবে জানে না অনুপমা। বড় দুর্বহ, বড় তিক্ত মনে হয় নিজেকে। ভয়ংকর ফাঁকা, শূন্য আর অর্থ মাধুর্যহীন মনে হয় জীবনকে। দুঃসহ! অর্থহীন বর্তমান আর অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে তবু বেঁচে আছে সে। এই তো জীবন!

তারপর কত নায়ক এল জীবনে। রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের নির্ভুল অভিনয়-ক্ষমতার প্রমাণ দিয়ে বিদায় নিয়েছে কেউ। তাদের সকলের কথা মনে নেই অনুপমার। প্রয়োজন নেই। মনের কারবার সে করে না। তাছাড়া ও বস্তুটি কোনদিন তার ছিল কি না সে কথা স্মরণ করতে পারে না অনুপমা। প্রেম তার আনন্দ নয়। প্রেম তার পেশা। সে কথা আজ ভাল করেই বোঝে অনুপমা।

তবু সোমনাথ আছে। আজো অবিচল। আর তেমনি গম্ভীর সে। আরো আপন হয়েছে। ঘনিষ্ঠ হয়েছে। নিকট হয়েছে সুধাময়ীর। সুধাময়ীর পরম বিশ্বাস আজ সোমনাথ। মনে মনে তাঁর গর্ব অপরিসীম। এমন ছেলে তাঁর হাতের মুঠোয়! এত বাধ্য! অনুপমার কত বড় সহায়! ভাবতে গেলে আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে সুধাময়ীর।

আর কি অমায়িক সোমনাথ! সুধাময়ীকে ডাকে মাসীমা। গর্বে বুক ফুলে ওঠে সুধাময়ীর। চা তৈরী করেন। নতুন নতুন খাবার খেতে দেন সোমনাথকে। ছেলে নেই তাঁর। একমাত্র মেয়ে অনুপমা। ছেলের সাধ মেটান সোমনাথকে দিয়ে। দুধের স্বাদ ঘোলে দিয়ে মেটানো নয়। বিলিতি দুধেল-আঁটা বকনাকে কৌটোর দুধ দিয়েই। বকনের হলেও দুটোরই উৎপত্তিস্থান এক। সেজন্য ক্ষোভ নেই সুধাময়ীর মনে। সোমনাথের তুল্য ছেলে নেই।

সুধাময়ী জিজ্ঞেস করেন মেয়েকে, 'হ্যাঁ রে বিয়ে করেছে সোমনাথ?'

—'করেছে।'

—'বউ কেমন? ছেলেমেয়ে নেই?'

—'জানি না। দেখিনি তাদের।'

সংক্ষিপ্ত আর কাটা কাটা উত্তর অনুপমার। বিরক্ত হন সুধাময়ী। মেয়ে যেন কী! শ্রী-ছাঁদ নেই কথার! কিন্তু কোন রাগ নেই সুধাময়ীর। সহজ ভাবেই বলেন তবে, 'তা হলে কেমন আলাপ তোদের? এ কেমন ধারা ভাব!'

ভাব! কথা শুনে চমকে ওঠে অনুপমা। তা হলে সব জেনে ফেলেছেন সুধাময়ী? শুনেছেন সব? কিছুই গোপন নেই তবে? অনুপমার ইচ্ছে হল একবার চীৎকার করে ভাবের নতুন অর্থটা বুঝিয়ে দেয় সুধাময়ীকে। একটা জটিল আর অন্ধকার জীবনের কদর্য ব্যাখ্যা শুনিয়ে স্তব্ধ করে দেয় চিরকালের মত। তার জীবনে ভাব-ভালবাসা-প্রেম কিছুরই ঠাঁই নেই আর। ওসব কথার কথা। শুনতে মধুর। রসাল একটি শব্দ ছাড়া কিছু না। ওসব মূল্যহীন, পচা আর বাসি হয়ে গেছে অনুপমার জীবনে। অথচ ঐ তার শিকারের একটি হাতিয়ার মাত্র। তার মন আজ মিথ্যে কথার সোনায় মোড়া একটি বিশুদ্ধ ছলনা। বাইরে থেকে বোঝা দুষ্কর কতখানি তলিয়েছে সে! কতখানি পাঁক মেখেছে গায়ে!

কিন্তু না। টের পাননি সুধাময়ী। পেলে

অমন করে কেউ হাসে? পরিতৃপ্তির হাসি? নির্বিকার প্রশংসার হাসি।

না তাও ভুল। বোঝার ভুল অনুপমার। দেখার ভুল। এমনি ভুলই করে সে আজকাল। সবখানে। সব কাজে। তবু ধরা পড়েনি। আশ্চর্য।

সুধাময়ী বলেন, 'হ্যাঁ রে অফিসেও কি সোমনাথ এমনি ব্যবহার করে সকলের সঙ্গে?'

—'সকলের সঙ্গে করবে কেন মা? করে আমার সঙ্গে।'

শুনে খুশি হন সুধাময়ী। বলেন, 'বড় ভাল ছেলে সোমনাথ। দ্যাখ অনু, যার কেউ নেই ভগবান আছেন তার।'

কথাটা ভাল লাগে না অনুপমার। ভগবান সম্পর্কে আজ আর কোন কৌতূহল নেই তার। সংস্কারবশে বিশ্বাস হয়তো একদিন ছিল। কিন্তু আজ সেই বিশ্বাসের বেড়া ডিঙিয়ে এসেছে সে। তিনি নিরাকার কিম্বা সাকার যাই হোন তাঁর প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই অনুপমার। যদি কোন অস্তিত্ব থেকে থাকে ভগবানের তা হলে তাঁর দেহ মনের সবটাই লাম্পট্য দিয়ে গড়া। মিথ্যা দিয়ে মোড়া। সোমনাথের দোষ নেই। এরা তাঁরই অংশ বিশেষ। অনুচরমাত্র।

তবু সোমনাথেরা চাকরী দেয়। ইন্টারভিউ-এ ফেল করলে আশ্বাস দেয়। এগিয়ে এসে বলে, 'ভয় কি! আপনার মত মেয়েরা চাকরীর অভাবে না খেয়ে মরে না।' ভগবান শুধু নিরাকার বস্তু নন, তিনি এখানে নির্বিকার শয়তান। সোমনাথদের প্রাসাদ-প্রাচুর্যের বিলাসে তিনি বন্দী। দোষ নেই তাঁর। সোমনাথরাও নিরপরাধ। অন্যায় শুধু অনুপমাদের অভাব আর ক্ষুধার। নিষ্ঠুর, বিষাক্ত ছোঁয়াচ-রোগের মত অষ্টপ্রহর শুধু নেই নেই, খাই-খাই-এর কান্না।

সুধাময়ী বলেন, 'তোমার তো কত জায়গায় যাওয়া-আসা। বন্ধু-বান্ধব কত। অনুর জন্যে একটি ভাল পাত্র দেখে দাও না সোমনাথ।'

'ঐ নামেই আছে তারা। আজকাল সব শেয়ালেরই এক সুর মাসীমা। বিয়ে করার মন নেই।' সুধাময়ীর কথাটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করে সোমনাথ।

সুধাময়ী তবু বলেন, 'সব ছেলেই ওরকম বলে। কিন্তু বিয়ে করে সকলেই। তুমি চেষ্টা করে দেখ না সোমনাথ। না হয় মাসীমার জন্যে একটু কষ্টই করলে।'

—'ছি ছি, কি যে বলেন আপনি মাসীমা!' সোমনাথ জিভ কাটে। লজ্জার ভান করে সে।

—'তারি অনুর কথা। আমি মরে গেলে ওকে দেখবার লোক নেই। তার আগে যদি একটা বিয়ে হয়ে যায় ওর, তবে নিশ্চিন্তে মরতে পারবো আমি।' আপন মনেই বিড়-বিড় করেন সুধাময়ী।

—'অনুর মত মেয়েরা কখনো দুঃখ পায়না মাসীমা। ওরা যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে।'

বিদ্রূপের মত কথাগুলি অনুপমাকে বেঁধে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অসহ্য লাগে তার। সে চলে যায়। সুধাময়ী মেয়ের কাণ্ড দেখে মনে-মনে হাসেন। ভাবেন, যতই লেখা-পড়া শিখুক আর চাকরী করুক, অনুপমা এখনো মেয়ে। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বসেনি একেবারে। দেখে তৃপ্তি পান। ভেবে আনন্দ।

পাশের বাড়ির বউটি এসেছে একবাটি নুন ধার করতে। ঘরের ভেতর উঁকি মেরে দেখে সোমনাথকে। সুধাময়ীকে জিজ্ঞেস করে, 'উনি আপনার আপন বোনের ছেলে নাকি মাসীমা?'

কথাটার জবাবদিহি অনেকবার, অনেককেই করতে হয়েছে। সুধাময়ী তাই বউটির কথায় না রেগে পারেন না। জ্বলে ওঠেন সুধাময়ী, 'বোন আবার আপন পর কি মা? বোন কি মানুষের পর হয়?'

কথা বলে ফাঁপরে পড়েছে বউটি। আর উচ্চবাচ্য করে না। এবার অন্য কথা বলে, 'আপনার বোনপো'র শুনেছি হাত আছে। একটু বলে দেখুন না, ও'র যদি একটা কাজ-কর্ম কিছু হয়?'

সুধাময়ী ভাবেন লোকগুলি কি সুবিধে-বাদী! মুখে স্বার্থ ছাড়া কথা নেই। সুযোগ পেলে জোঁকের মত এঁটে থাকে গায়ে। এবার নিয়ে না-হোক পঞ্চাশবার কথাটা বলেছে বউটি। সুধাময়ী উত্তর দেননি কোনবার। এবারও না। বউটি চলে গেল নিঃশব্দে।

একটা নিদারুণ ছলনা দিয়ে নিজেকে ঘিরে রেখেছে অনুপমা। একটা অকপট মিথ্যা দিয়ে। সে-ও চাকরী করে! অফিসে যায়! দশটা-পাঁচটার ডিউটি! সুধাময়ীকে ঠিক সময়ে ভাত রেঁধে দিতে হয়। নইলে গোলমাল বাঁধে। অসুবিধা হয় অনুপমার। অবশ্য অফিসের মাইনে কাটা যায় না তাতে। দু'দিন চুপ করে বাড়িতে বসে থাকলেও না। সোমনাথ সব ঠিক করে দেবে। অনুপমার পরম সহায় সে। অনুপমার দুর্ভাবনার কারণ নেই কোন। তবুও বিবেকে বাঁধে। কোম্পানীর নুন খেয়ে বেইমানি করতে পারে না অনুপমা।

পাঁচটায় ছুটি। কিন্তু অনুপমার ছুটি আরো কয়েক ঘণ্টা পরে। ওভার ডিউটি থাকে তার। একদিন-দুদিন নয়। রোজ। প্রোমোশানের আশায় করে সে। সুধাময়ী এসব বোঝেন না। নিরক্ষরা মেয়েমানুষ তিনি। দিন-দুনিয়ার হালফিল খবর তার জানা নেই। তাই চুপ করে থাকেন। অনেক রাতে ফিরলেও কিছুই বলেন না মেয়েকে।

অনেক রাত অবধি জেগে থাকতে হয় সুধাময়ীকে। রোজ। ফিরতে রাত হয় অনুপমার। গভীর রাত। পাড়াটা তখন নিঃসাড় হিম-শীতল। ধুমের কালো কাফনে ঢাকা। একটি পাখীও যখন ভুল করে ডাকে না। গান বন্ধ করে অঘোরে ঘুমোয় ঝিঁঝিঁপোকার দল। শুধু নিঃশব্দে জ্বলে আর নেভে বন-বাদাড়ের জোনাকী। বুক-চাপা দীর্ঘশ্বাসের মত নিস্পন্দ গাছের পাতা দুলিয়ে দিয়ে যায় সর্-সর্ সরীসৃপ বাতাস। অনুপমা তখন ফেরে। ক্লান্ত পা জোড়া টেনে টেনে বন্ধ দরজার সামনে থামে। কড়া নাড়ে। সুধাময়ী টের পান। জেগেই থাকেন তিনি। দরজাটা খুলে যায়। অনুপমা ঘরে ঢোকে। কথা নেই। বড় ক্লান্ত!

আজ কিন্তু অবাক হলেন সুধাময়ী। বেশ তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে অনুপমা। রাত্রি হতে এখনো অনেক বাকী। সূর্য ডোবেনি। আলো মুছে আকাশের মুখ অন্ধকার হয়নি এখনো। বাড়ন্ত বেলার হলুদ ছোপ লেগে রয়েছে চারদিকে গাছ-গাছালি, বাড়ি-ঘরের জটলায়। পাখীদের কিচির-মিচির শোনা যায় দূরে-কাছে সর্বত্র। দিনের কাজ সাঙ্গ হয়নি এখনো। সুধাময়ী বলেন, 'ওমা, তোর দেখছি মতি-গতি পালটে গেল অনু!'

—'আমার নয় মা, বলো অফিসের।' সংশোধন করে দেয় অনুপমা।

—'কেন, কী হল আবার অফিসে?' আশংকায় অন্ধকার হয়ে যায় সুধাময়ীর মুখখানা।

—'কিছুই হয়নি মা। শুধু সোমনাথবাবু বদলি হয়েছেন দিল্লীর হেড অফিসে।'

—'কবে?'

—'কাল।'

—'কই, আমাকে তো সে কথা বলোনি একবার।'

—'আমাকেও না। হঠাৎ হল। দেখাও হয়নি আমার সঙ্গে।'

সুধাময়ী মেয়ের মুখের দিকে তাকান। বোঝা যায় না কিছু কোন ভাষাই পড়া যায় না মুখে। শুধু কতগুলি ভয়াবহ সাংকেতিক চিহ্নের অস্পষ্টতা চোখে পড়ে। কিন্তু মর্মোদ্ধার করা যায় না। সুধাময়ীর বুকের মধ্যে কেমন এক দুর্বোধ্য যন্ত্রণা মোচড় খায়। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে জলে। কোথা থেকে এই জল আসে! আর কেন যে আসে তা বুঝতে পারেন না সুধাময়ী।

অনুপমা এখনো অফিস যায়। কিন্তু অনিয়মিত। সময়ের ঠিক নেই। তাড়া-হুড়ো নেই কোন। সুধাময়ী আশ্চর্য হন। আশঙ্কিত হন। বলেন, 'কী রে কী হল তোর? কাজে বেরুবার গা নেই কেন?'

—'না মা, ও কিছু না। এমনি। এই যাচ্ছি।' এমনি নিরাসক্ত কণ্ঠ অনুপমার। যেন বহু যোজন দূরে থেকে কথা বলছে ও।

—'না, আমাকে লুকোচ্ছিস তুই। বল, কী হয়েছে? শরীর কী ভাল নেই তোর?' এগিয়ে এসে মেয়ের কপালে হাত রাখেন সুধাময়ী। তারপর হাসেন। অস্পষ্ট বেদনার হাসি।

মায়ের হাতটা আস্তে সরিয়ে দেয় অনুপমা। বলে, 'শরীর ঠিক-ই আছে মা। শুধু পুরনো চাকরীটা নেই।'

সুধাময়ী অবাক হন না। সমস্ত উদ্বেগ-ভাবনার স্তর বহুদিন আগে পেরিয়ে এসেছেন তিনি। আক্ষেপ নেই। অভিযোগও করেন না তিনি। শুধু বলেন, 'তা আমি তোর মুখ দেখেই টের পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে এই লুকোচুরি কেন বলতে পারিস?'

না বলতে পারে না অনুপমা। সুধাময়ীর কাছেও না। বলা যায় না বলেই পারে না। সুধাময়ী জানতেন না, আরো কত গোপনতা আছে। চার দেয়ালের বাইরে আছে অনুপমার কর্মজীবনের অভিসার। অনুপমার পেশা। তার চাকরী। তা হলে অনুপমার অন্ন হয়তো মুখে তুলতেন না কখনো। আর কখনো মেয়ের মুখ দেখতেন না মেয়ের।

অনুপমা বলে, 'ভেবো না মা, আরেকটা চাকরী পাচ্ছি।'

সত্যি চাকরী পেল অনুপমা। সুন্দরলালের কাছেই। তার নতুন নায়ক সুন্দরলাল। বিত্তবান প্রৌঢ় পুরুষ। সব আছে। শুধু শান্তি নেই। সব মেটে। শুধু তৃষ্ণা মেটে না মনের। অনুপমা শান্তি দেয়। তৃষ্ণাও মেটায়।

আবার অফিসে যায় অনুপমা। ঠিক সময়ে। আগের মত। ট্রামে নয়। মোটরে। সুন্দরলালের মোটর এসে নিয়ে যায় তাকে। আবার রেখে যায়। পাড়াপ্রতিবেশীরা অবাক। পাশের বাড়ির নতুন পাশ করা মেয়েটি বলে, 'পড়া আর হল না অনুদি। দেখুন না, আপনাদের অফিসে কোন কাজ হয় কি না?'

—'কাজ?' আকাশ থেকে পড়ে অনুপমা। 'ও কথা বল না ভাই। সুযোগ পেলে আমিই এ কাজটা ছেড়ে দেব ভাবছি। বড্ড নোংরা, বড্ড বিশ্রী কাজ আমাদের। তুমি তাই পারবে না।' অনুপমা এইভাবে অনেকের আগ্রহের মুখে পাথর চাপা দেয়।

তারপর একদিন। অনুপমা বাড়ি ফেরেনি দুদিন। সুধাময়ী ভয়ংকর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। পাড়ার লোকে কী সব বলছে। চুপে-চুপে। ফিস-ফিস করে। সুধাময়ীর আড়ালে-আবডালে। তিনি কাছে গেলেই আবার সব চুপ। কিন্তু চোখ বন্ধ করে না কেউ। চোখ খুললেই কুৎসিত কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকায়। সুধাময়ীকে দেখে হাসে সবাই। আনন্দ, তৃপ্তি আর বিদ্রূপে মেশা হাসি। যেন মজা দেখছে সবাই।

আজ-ও সেই বউটি এল। বলল, 'কিছু শুনেছেন মাসীমা?'

—'কী আবার শুনবো?' অত্যন্ত আতঙ্কিত চোখে তাকান সুধাময়ী।

—'বলছিলাম, অনু ঠাকুরঝি কাল ফেরে নি?'

—'না। অফিসে কাজ আছে বোধ হয়।'

—'তাই বলছিলুম ও। খবরের কাগজে দেখে এলুম কিনা।'

—'কি দেখে এলে?' সুধাময়ী চমকে ওঠেন।

—'একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে অনু ঠাকুরঝিকে নাকি পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। [illegible] [illegible]... দেখাচ্ছে ওদের। খুব নাকি খারাপ!'

সুধাময়ীর চোখের সামনে একটি সুন্দর ছবি যেন নিমেষে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক স্বপ্ন ছিল তাঁর। আশা ছিল বহু। অনুপমাকে ঘিরে দেখেন তিনি। ঘর বাঁধবে অনুপমা। ভাঙা প্রাণে জোড়া লাগাবে সে। তা বুঝি আর হল না। হবার নয়। সুধাময়ী কাঁদেন। [illegible] [illegible] কাঁদেন।

সেদিন বিকেলেই ফিরে এল অনুপমা। রুক্ষ চুল। শুকনো মুখ। ক্লান্ত-ক্লান্ত নিষ্প্রভ চোখ। ক্লান্ত বিষণ্ণ শরীরে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায় ম্লান-বিষণ্ণ মূর্তি। অনুপমার চোখে জল। আত্ম-অনুশোচনা নয়। কোন অপরাধবোধ নয়। শুধু নিষ্কারণ দুঃখ। দুঃখ আর লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায় অনুপমা। আজ জেনে ফেলেছে সবাই। অনুপমার অফিসের ঠিকানায় খোঁজ পেয়েছে তারা। জেনে ফেলেছে তার চাকরীর খবর।

কিন্তু আশ্চর্য! কিছু বলেন না সুধাময়ী। শুধু শুকনো আঁচলে মেয়ের জলভরা চোখ দুটি মুছিয়ে দেন নিঃশব্দে। বললেন, 'আর তুই অফিসে না গেলি অনু। চাকরীটা তুই ছেড়ে দে।'

—'সত্যি বলছ মা? সত্যি!' অনুপমা মাকে জড়িয়ে ধরে দুহাতে। আশ্চর্য-অবাক হয়ে তাকায় মুখের দিকে। যেন কতকাল থেকে এই একটি কথার প্রতীক্ষা করে এসেছে অনুপমা। কিন্তু বলেনি কেউ। আজ সে-কথা শোনালেন সুধাময়ী।

কিন্তু সুধাময়ী আর কিছুই বললেন না। অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। কথাটা সত্যি কি না কে জানে। হয়তো মনের নয়। সুধাময়ী তাই চুপ।

ঠিক তখন। পাশের বাগানে মর-মর করে উঠল বাতাস। আকাশে জমাট বেঁধে এল আলতো মেঘেরা। ঝড় উঠল। আর এক-ফালি মেঘ এসে চাঁদের হাসি ঢেকে দিল। পৃথিবীতে নামল এক আদিমতম অন্ধকার।

পথ্যলা

রাম বসু শুধোয়, অন্নরে মা, তোমার শরীরটা যেন ভালো দেখছিনে।

ভাঙা কাঁসর অধিকতর কর্কশ স্বরে বেজে ওঠে, কেন, আমাকে কি রামসিং পালোয়ান হতে হবে নাকি?

কি সর্বনাশ, এতেই তোমার যা প্রতাপ, এর পরে পালোয়ান হলে কি আর বাড়িতে টিকতে পারব।

আহা, সারাদিন যেন বাড়িতেই বসে আছ। কোন্ আক্কেলে তালে সারাদিন ঘুরে বেড়াও?

শাওড়া গাছের ডালে নয়রে মা, শাওড়া গাছের ডালে।

তা জানি। বাক্তে ভাঙা কাঁসর, পেত্নী ভর করেছে তোমার কাঁধে।

তাহলে তো সারাদিন বাড়িতেই বসে থাকবার কথা।

কি বল সত্যি মুখ নয় তবে বড় কথা, আমি পেত্নী!

কি যে বলো ছাই, পেত্নীরও তো গায়ে একটু গত্তি আছে, একেবারে শাকচুন্নি।

গভীরতম মর্মে আঘাত লাগে অন্নদার, যে-গত্তি অর্জনের আশায় সে এত করছে, তারই অভাবের অপবাদ। আগেকার দিন হলে সম্মার্জনী সন্ধান করতো সে, এখন আর তা সম্ভব না হওয়ায় স্থানত্যাগ করে প্রস্থান করলো সে।

এরূপ সম্ভব না হওয়ার সত্যই কিছু কারণ আছে। পাঁচুগোপালের উপদেশে, গায়ে মাংস লাগাবার আশায় ভিজে ছোলা খেতে আরম্ভ করবার সংগে সংগে দেখা দিল অজীর্ণ ও পেটের পীড়া। একদিন পাঁচুকে ডেকে অন্নদা জিজ্ঞাসা করলো—হাঁরে পাঁচু, তোরা যে ছোলা ভিজে খাস, অসুখ-বিসুখ করে না।

করে না আবার মাঠাকরুণ! প্রথম যখন আমি ছোলা ভিজা খেতে শুরু করি হয় হায়, তারপর সর্দি-কাশি, তারপরে পায়ের ব্যথা। ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করি, কি করবো ওস্তাদ। ছেড়ো না বাবা ছেড়ো না—ওরকম একটু-আধটু প্রেথমে হয়েই থাকে। ওস্তাদ বলে আমি যখন প্রেথমে শুরু করি—

অন্নদা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, ওসব অসুখ নয়রে।

তবে আবার কি অসুখ?

ধর্ এই অজীর্ণ আর—

ওঃ এই কথা। ওতো একটু-আধটু হবেই, তাই বলে ছেড়োনি মাঠাকরুণ, খেতে যখন শুরু করেছ খেয়ে যাও ভবিষ্যতে—

আবার তাকে থামিয়ে দিয়ে অন্নদা বলে, আর আমি খেতে যাবো কোন্ দুঃখে—

তবে আবার ভাবনা কি। ও পাড়ার লোকের যদি অজীর্ণ হয়, তবে তোমার মাথাব্যথা কেন।

পাঁচুগোপালের কাছে অভয় পেয়ে দ্বিগুণ বেগে ছোলা ভিজা চালায় অন্নদা, অবশ্য পেটের পীড়াও দ্বিগুণ বাড়ে।

মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় তার মনে, বুঝি মুষ্টিযোগে ফল ফলছে না, বুঝি আরও একটু রোগা হয়ে গিয়েছে। কখনো কখনো গোপনে সুতো দিয়ে মেপে দেখে হাত-পায়ের গোছা, ফল উৎসাহজনক মনে হয় না। তখন মুখশ্রীর সাক্ষ্য লওয়ার আশায় বের হয় সাহেব বাড়ির আরসিখানায়, নাঃ মুখশ্রীতে একটু লাবণ্য যেন ফুটেছে। মনে আশা হয়, অচিরে একদিন সেই সেমিজ ও শান্তিপুরে শাড়িতে সুসজ্জিত হয়ে যৌবন লাবণ্য মুখশ্রীতে স্বামী সম্ভাষণ করতে সক্ষম হবে সে! স্বামীর এমন আদর পাবে যে পাড়ার মুখপুড়ীর দল হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরবে, সেদিন নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে ডেকে এনে দেখাতে হবে, ঐ তিনকালগত বামুনগিন্নিকে! তাঁর গায়ে গত্তির অহঙ্কার হয়েছে।

কিন্তু আর চলে না, অবশেষে শয্যা গ্রহণ করতে হয় অন্নদাকে।

রাম বসু বৈদ্য ডেকে আনে। বৈদ্য লক্ষণ দেখে বলে, এ যে দারুণ অজীর্ণ ও পেটের পীড়ার ফল দেখছি।

এখন উপায়? জিজ্ঞাসা করে রাম বসু।

চিকিৎসা, অর্থাৎ ঔষধ ও সুপথ্য। আহার বিষয়ে বিশেষ সাবধান হতে হবে। একটু মাগুর মাছের ঝোল ও সুজি ছাড়া আর কিছু চলবে না।

অন্নদা শুধোয়, ডাল?

কাঁচা মুগের ডালের জল একটু চলতে পারে।

কুণ্ঠিত কণ্ঠে শুধোয় অন্নদা, ছোলার—

কথা শেষ হওয়ার আগে সর্পচকিত হয়ে বৈদ্য চীৎকার করে ওঠে, ছোলার নাম করেছ কি মারাত্মক সংকট।

বৈদ্য চলে গেলে অন্নদা স্বামীকে বলে মুখপোড়াকে আর ডাকতে হবে না, তার চেয়ে সোনারপুর থেকে ঠাকুরঝিকে আনতে লোক পাঠাও।

ঠাকুরঝিকে আনবার প্রস্তাব শুনে রাম বসু শংকিত হয়ে ওঠে, বোঝে যে অবস্থা সত্যই সংকটাপন্ন।

রাম বসুর বিধবা বোন তার সংসারে থাকতো। তাকে মুখের ধোঁয়া দিয়ে তাড়িয়েছিল অন্নদা—এখন তাকে আনবার প্রস্তাব। এক রাজ্যে কখনো দুই রাজার বাস সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু এক সংসারে দুই স্ত্রীলোকের বাস শশ-বিষাণের চেয়েও অসম্ভব।

ঠাকুরঝি এলে শয্যাগতা, কঙ্কালসার অন্নদা সংসারের ভার তাকে বুঝিয়ে দিল, স্বামীর পায়ের ধুলো নিল, নরুর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল, তারপরে আগামী জন্মে পুরুষ হয়ে জন্মাবার আশা নিয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে নিভৃতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল ভগ্নহৃদয় নারী।

নরু চীৎকার করে কেঁদে উঠল, মা, কার কাছে রেখে গেলে?

ন্যাড়া তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, তোর ন্যাড়াদা তো রইল নরু ভয় কি!

সমস্ত ব্যাপারটা কাঠের পুতুলের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে দেখল রাম বসু, স্বভাব-মুখর লোকের মুখে না জোগাল একটা কথা, না এলো চোখে এক ফোঁটা জল।

ঠাকুরঝির কাছে একটু হেসে, একটু কুণ্ঠায়, একটু লজ্জায় অন্নদা ইচ্ছা জানিয়েছিল যে, তাকে যেন ঐ শাড়ি আর শেমিজে শেষবারের মতো সাজিয়ে দেওয়া হয়।

বিপত্নীক রাম বসু

পত্নীর অন্ত্যেষ্টি সমাধা করে আলুথালু-বেশে রাম বসু গিয়ে উপস্থিত হল টুশকির বাড়িতে। টুশকি শুধালো, একি বেশ কায়েৎদা?

টুশকিরে নরুর মা স্বর্গে গিয়েছে।

ওমা সেকি কথা! স্তম্ভিত হয়ে যায় টুশকি, শুধায় এমন সর্বনাশ কখন হল?

আজ সকালে রে, এইমাত্র সব সেরে আসছি।

টুশকি কি বলবে ভেবে পায় না, গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। কিছু বক্তার দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দিল রাম বসু, বলল, এতটা লাগবে ভাবিনি রে।

ঐ একটি মাত্র ক্ষুদ্র বাক্যে রাম বসুর আঘাতের গুরুত্ব বুঝতে পারলো টুশকি — আঘাত যে সামান্য নয় তা অনুমান করেছিল প্রথম প্রবেশের মুখে তার 'টুশকিরে' সম্বোধনে। টুশকি জানে যে অনেক কথা বলা রাম বসুর অভ্যাস কিন্তু সে সমস্ত মনের উপরতলার কথা, সেখানে আকাশ-কুসুম ফোটে, মনের নীচতলার কথা মুখে প্রকাশ করায় সে অভ্যস্ত নয়। তাই বলে সেখানকার সন্ধান তো টুশকির অনবগত নয়, ঐ ছোট্ট 'রে' ধ্বনিটির এতটুকু ফাঁক দিয়ে ভিতরকার দাবদাহ চোখে পড়ে টুশকির। গালে হাত দিয়ে সে মূঢ়ের মতো বসে থাকে, ঘরের মধ্যে ইতস্তত পায়চারি করতে করতে রাম বসু অনর্গল বকে যায়।

সবাই অবাক হয়ে গেল স্থির নিশ্চল নির্বাক ভাব দেখে।

তারা বলে একটু কাঁদো বসুজা, কাঁদো, হাল্কা হবে।

টুশকি চোখের জলের স্বভাব বড় বিচিত্র। যে বৃষ্টি ভাদ্র মাসে থামতে চায় না মাথা-কুটে মরলেও তার দেখা পাওয়া যায় না অঘ্রাণে, বড় অদ্ভুত এই চোখের জল। আপন জনের মাথা ধরতে দেখলে আমার চোখ ছলছল করে আসে অথচ মৃত্যুতে এক ফোঁটা জল আসে না চোখে।

এই পর্যন্ত বলে সে থামে, জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়, চুপ করে তাকিয়ে থাকে সূর্য ডোবার আলো যেখানে রাঙিয়ে তুলেছে চলমান নৌকার পালগুলোকে। কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু করে —

শোকে যারা কাঁদতে পারে তাদের তো সৌভাগ্য, চোখের জলে রোখ শোধ করে দিব্যি হাল্কা হয়ে গেল তারা। আর আমি, এই চেয়ে দেখ্ এখানে, বলে বুকটা দেখায়, শোকের পাষাণ ভার বয়ে বেড়াচ্ছি, কতকাল এমন বেড়াতে হবে জানিনে, তবে জানি যে তিলে তিলে পলে পলে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরাবে সারাজীবন ধরে। লোকে বলে আমি কাঁদি না কেন, ওরে কাঁদতে পারি কই!

টুশকি বুঝলো এই অনর্গল বাক্য প্রবাহই তার শোক প্রকাশের রীতি, চোখের জলের বিকল্প। সে বলল, কায়েৎদা তুমি বসো, একটু সরবৎ করে দিই।

সরবৎ খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হলে টুশকি শুধালো কি হয়েছিল বলো তো, কই কোন-দিন তো কিছু বলোনি।

বলবো কি, আমরাই কি ছাই কিছু জানতাম। মানুষটা চিরকালের রোগা। রোগা তো রোগা, এমন অনেকে থাকে। ইদানিং কিছুদিন থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল, বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারে না। বদ্দি আনলাম, দিলো তাড়িয়ে। শেষে যখন সোনারপুর থেকে আমার বোনকে আনিয়ে নিতে বলল তখন বুঝলাম আর আশা নাই। তারপরে আর দুটো দিনও সময় পাওয়া গেল না।

তাহলে বোঝাই গেল না কি হয়েছিল?

কেন যাবে না, অজীর্ণ, পেটের অসুখ।

এই সামান্য অসুখ চিকিৎসার অসাধ্য হয়ে উঠল।

সে যে নিজে করে তুলেছিল অসাধ্য, সারবে কেমন করে?

সে আবার কি রকম?

সব শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ভাঁড়ার থেকে বের হল এক হাঁড়ি ভেজানো ছোলা। ব্যাপার কি? শেষে পাড়ার একটা ছেলের কাছ থেকে রহস্য উদ্ধার হল। গায়ে মাংস লাগবে আশায় ঐগুলো খেতো। এদিকে পেটের অসুখ চলছে ওদিকে চলছে ছোলা ভিজা।

হঠাৎ এমন ইচ্ছা হতে গেল কেন কিছু শুনেছ?

শুনবো আর কোথায়, তবে অনুমান করছি একটু মোটাসোটা হলে স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া যাবে এই ভরসায় অখাদ্য খেয়ে প্রাণটা দিল। তারপরে পায়ে পায়ে টুশকির সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে দুই আঙুলে তার গাল টিপে ধরে বলল, তোরা এক অদ্ভুত জাত টুশকি, স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে সব করতে পারিস।

টুশকির চোখ ছলছল করে উঠল, টুশকির চোখে জল থেকে এতক্ষণে এই প্রথম জল এলো রাম বসুর চোখে!

রাম বসুর কথাই যথার্থ, বড় বিচিত্র স্বভাব চোখের জলের।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, বাড়ি জনশূন্য ঘরে, শাঁখ বাজলো, [illegible] মদন-মোহন তলায়। হঠাৎ রাম বসু বলে উঠল টুশকি আজ এখানে থাকবো।

বিস্ময় চোখে তাকায় টুশকি, কুণ্ঠিতভাবে বলল, তাতে [illegible] হয় না।

না, না, আজই [illegible], হ্যাঁরে, হোটেলটার কিছু আছে নাকি?

থাকবে কি করে? কদিন আসিনি।

আচ্ছা সে-ব্যবস্থা হবে এখন।

রাম বসুর মন ফেরাবার আশায় [illegible] সে বলল, তুমি না গেলে নরুর খুব ফাঁকা লাগবে।

তার পিসি আছে, ন্যাড়া আছে, অভাব সে অনুভব করবে না।

তারপরে একটু থেমে বলল আমার ফাঁক পূরণ করবার কে আছে বল।

এই বলে সবলে সে বুকের মধ্যে টেনে নিলো টুশকিকে।

মৃত্যুর পরে মানুষের চৈতন্য যদি নির্মল ও সর্বব্যাপী হয় তবে অবশ্যই অন্নদা খুশি হতো, এই মুহূর্তে তার স্বামীর আলিঙ্গনা-বদ্ধা নারী টুশকি নয়, দেহান্তরে সে নিজেই, তার পরজন্মের আশা ফেলে-আসা জন্মে সার্থক হয়ে উঠল, পৃথুলারূপে সন্নিবিষ্ট হল সে স্বামীর বক্ষে।

রাত্রে আহারের পর টুশকি বললো এবারে তোমার খুব অসুবিধা হবে কায়েৎদা, তাই না?

রাম বসু বলল এক কথায় এর কি উত্তর দেবো বল।

এক কথায় না হয় নাই দিলে, বুঝিয়ে বলো না।

তবে তাই বলি শোন। অসুবিধা হবে এবং হবে না।

টুশকি বলল কথা একটার বেশি হল বটে, কিন্তু বুঝতে পারলাম না কিছু।

পারাবিনে জানি, বুঝিয়ে দিচ্ছি। স্ত্রী স্বামীকে টেনে রাখে কিসের জোরে বলতো?

ভালবাসার জোরে।

ওটা বোকা মেয়ের মতো কথা হল। হ্যাঁ, ভালবাসা দিয়ে পুরুষের মনের দরজাটা খোলে বটে; কিন্তু ঐ পর্যন্ত।

টুশকি শুধোয় তারপরে?

তারপরে অশিক্ষিত পটুতায় ধীরে ধীরে তিলে তিলে দিনে দিনে স্বামীর ছোটখাটো দৈনন্দিন অভ্যাসগুলো জেনে নিয়ে, তার অজ্ঞাতসারে সেগুলো পূরণ করে তাকে অসহায় করে তোলে। সময় মতো গাড়ু-গামছা এগিয়ে দেওয়া, সময় মতো দাঁতনটি ভেঙে দেওয়া, স্নানের তেল, স্নানের পরে ধুতি, আহারের সময়ে বিশেষ পছন্দের ব্যঞ্জন হাতে তুলে দিয়ে দিয়ে নিজের উপর নির্ভরশীল করে তোলে স্বামীকে। সহস্র অভ্যাসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিনা সুতোয় বাঁধা পড়ে বনের বিহঙ্গ, তখন খাঁচার দরজা খোলা পেলেও আর বাইরে যেতে মন সরে না তার। যে-স্ত্রী স্বামীর অজ্ঞাতসারে এই কারসাজি করতে পারে সে সাধ্বী, যে স্বামী অনায়াসে এই ব্যবস্থায় আত্মসমর্পণ করে সে সুখী।

আর ভালোবাসা? শুধোয় টুশকি।

ওরে হাবলাবার ভালোবাসার প্রাণ বড় দুর্বল, তার পাখা আছে পা নেই, সংসারে তার মতো অসহায় আছে অল্পই।

তবে যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার কথা শুনি।

অশ্বথামার দুধ বলে পিটুলি খাওয়ার কথা কি শুনিস নি।

চুপ করে থাকে টুশকি।

চুপ করে রইলি যে বড়।

সবই ভুল ভুল।

কিছুই ভুল নয়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অভ্যাসের বন্ধনের ঐ সম্বন্ধটাই না তুচ্ছ কি?

কিন্তু আসল প্রশ্নের তো উত্তর পেলাম না, তোমার সুবিধা অসুবিধার কথা বলো।

আমি চিরকাল দূরে দূরে থেকেছি, অভ্যাসের দাস হয়ে পড়িনি, সেই জন্যেই তার রাগের অন্ত ছিল না আমার উপরে, কাজেই সেদিক থেকে আমার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

তবে?

তবে আর কি! এতদিন দেখছিস আমাকে বুঝতে পারিসনি। আমি নিজের দুঃখ এক-রকম করে সইতে পারি কিন্তু সেই দুঃখটা অপরের ঘাড়ে পড়তে দেখলে অসহ্য বোধ হয়। ছেলেটার কান্নাকাটি, বরদোরের খাঁ খাঁ ভাব—অসুবিধা ঐখানে।

কায়েৎদা তুমি বড় পাষাণহৃদয়।

সেকথা একেবারে মিথ্যা নয়। সংসারে আমার মন থাকলে এতদিনে দুঃখ দুর্দৈবের ভারে ভেঙে পড়তাম।

তবে তোমার মন কোথায়?

খান কতক বই পেলে সব ভুলে যাই। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে শোভাবাজারের রাজবাড়ীর গ্রন্থাগারে গিয়ে ঢুকি—এক মুহূর্তে সব ভুলে যাই।

প্রসঙ্গ বন্ধ করাবার আশায় টুশকি বলল, বেশ করো ভুলে যাও, এখন দয়া করে ঘুমোও দেখি।

রাত অনেক হল না!

হল বই কি।

শোন্, এখন কদিন তোর বাড়িতেই থাকবো। পাড়াপড়শীদের ঘ্যান ঘ্যান বড় অপছন্দ করি।

ভালোই তো থেকো।

পরদিন বিকালে ঘরে এসে রাম বসু বললে তোর এখানে থাকা হ'ল না টুশকি।

হঠাৎ আবার মত বদলালো কেন?

কেরী সাহেবের চিঠি পেয়েছি, অবিলম্বে দেখা করতে লিখেছে।

আবার মালদ যাবে?

মালদ কোথায়, সাহেবরা চলে এসেছে শ্রীরামপুরে।

কিন্তু এমন জোর তাগিদ কেন?

সেটা গিয়ে শুনবো।

আসবে কবে?

গিয়ে পৌঁছবার আগে তা বলি কেমন করে?

কবে রওনা হচ্ছ?

আগামীকাল, আর দেরী নয়।

টুশকি দুঃখ করে বললে নরু, তাহলে একেবারে একলা পড়লো।

একলা কেন, ন্যাড়া রইলো, দুটিতে বেশ মিলেছে।

তোমার সংবাদ পাবো কি করে?

পারিস তো ধরে রাখ, পাস তো ভালো। ন্যাড়াকে বলে দিয়েছি মাঝে মাঝে এখানে এসে দেখা করে যেতে।

আজ রাতটা তো এখানে থাকছো।

আর কোথায় থাকবো বল্।

কেরীর আকস্মিক আমন্ত্রণে সত্যই খুব আনন্দিত হয়েছিল রাম বসু, স্ত্রী বিয়োগের দুঃখদায়ক পরিস্থিতি থেকে দূরে যাওয়া সম্ভব এটা প্রধান কারণ হলেও আরও কারণ আছে। কেরীর জ্ঞান চর্চার আবহাওয়া তার জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় সেই অভাবটাই তাকে পীড়িত করছিল প্রতি মুহূর্তে। কেরীর চিঠিতে যতই আনন্দিত হোক সে বিস্মিত হয়নি একটুও সে জানতো অচিরে কেরীর আহ্বান এসে পৌঁছবেই, সে বুঝে নিয়েছিল কেরীর পক্ষেও সে সমান অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

শ্রীরামপুরে গেলে কতকাল আর রেশমীর সঙ্গে দেখা হবে না ভেবে সে তখনি রওনা হয়ে গেল রাসেল সাহেবের কুঠির দিকে—কোথায় যাচ্ছে জানালো না টুশকিকে। রাম-বসু জানতো রেশমীর স্মৃতি ছোট্ট একটি কাঁটার মতো বেঁধে টুশকির বুকে। রাম বসু ভাবে অকারণে দুঃখ দিয়ে কি লাভ?

(ক্রমশ)

ছোট গল্প

পিঙ্গলার প্রেম—বিমল কর। আভেনির, ২৩৮।বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯। দাম ২·৫০।

'পিঙ্গলার প্রেম' বিমল করের সর্বশেষ গল্পসমষ্টি। এ এমন একখানি বই, যার সমালোচনা ভালয়-মন্দয় দু-চার কথায় শেষ করা যায় না, অথচ স্থানাভাব। শুধু পুস্তক-পরিচয়ই দিতে হবে, বুদ্ধিমান পাঠক বইখানি খুঁটিয়ে পড়ে' সমালোচনার কাজটা নিজেই সেরে নেবেন। আমরা এখানে কেবল লেখকের মননশক্তি ও তার প্রকাশভঙ্গির নমুনাস্বরূপ পর পর গল্প কয়টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

প্রথম গল্প 'বকুল গন্ধ'। অঞ্জনা আর তার স্বামী সুধাংশুকে নিয়ে গল্প। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি শ্যামল অঞ্জনার জাগ্রত স্বপ্নকে ঘিরে আছে এবং সে স্বপ্ন ঝরা বকুলের স্মৃতি-সুরভিত পিছনে ফেলে-আসা জীবন এবং সে জীবনের সৌরভকে বহন করে আনছে বকুল। বকুল ফুল এখানে শুধু একটি প্রতীক ও চিত্রকল্প নয়,—শারীর উপস্থিতি, প্রচ্ছন্ন নায়ক বলাও চলে। একাধারে অমৃত এবং গরল। এর স্পর্শে ও গন্ধে যে উন্মাদনা—সেটুকু রোমান্স। যে অস্থির উত্তেজনা আমাদের আকুলিত, মনকে ভুলিয়ে নিতে চায় বিপথে—সেইটেই অপ্রকাশ্য এবং তিক্ত বাস্তব। এই দোটানার মধ্যে অঞ্জনার মানসিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠছে একটির পর একটি ঘটনায়। শ্যামল যতটুকু কাছে এসেছে, অঞ্জনা তাকে সরিয়ে দিচ্ছে আরও বেশি। কিন্তু বকুল ফুলের স্মৃতি-অনুষঙ্গ তাকে ছাড়বে না। অতীত যেখানে স্বেরাচারী, বর্তমান সেখানে ভীরু প্রজা। বিদ্রোহ আছে, কিন্তু স্তিমিত। সূক্ষ্ম শিল্পের কাজ রয়েছে এ গল্পে। গল্পের শেষে শুধু একটি কথা জুড়েছেন লেখক—'আশ্চর্য'! জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, কোনটি আশ্চর্য—অঞ্জনার শাদা মুখ না কি 'ফেটিশ'-এর আদিম ছায়াচ্ছন্ন তার মন? গল্পটি পড়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সেই গান—'বকুল গন্ধে বন্যা এলো'......। নিত্যকালের বিরহী খোঁজে আশার বাণী, কিন্তু তার আসনখানি একেবারেই একলা।

'পাতকের পা' পুরোপুরি 'সেক্স-স্টোরি'। এ ধরনের গল্প আপনিই জমে ওঠে, শুধু লাগাম টেনে রাখা দরকার। গল্পকারের সংযম-দক্ষতার পরিচয় আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু 'থীম' হিসাবে যৌন আকর্ষণ মামুলিই লাগে। তাছাড়া চরিত্র-চিত্রণে কোনো নতুনত্ব পাওয়া গেল না। মিস্টার মিত্র আর মৃণাল, তুষার এবং কমলা 'টাইপ' হিসেবে ব্যবহৃত। দুটি দলের সমস্যা

একই, আকর্ষণ আর বিকর্ষণের পাল্লায় তারা পরস্পরের 'কাউন্টার-ফয়েল'। তবে স্থূল পরিণতির কবল থেকে গল্পটিকে বাঁচিয়েছেন লেখক ঐ শেষ লাইনে—এখানে সে বা তারা ব্যর্থ নয়......।

'উদ্ভিজ'-এর বিষয় এবং রূপায়ণ, দুটিই নতুন এবং লেখকের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয়। সত্যচরণকে জড়িয়ে কাঁপার ওঠার চিত্রটি এ-গল্পের চাবিকাঠি। স্মৃতি অথবা অবচেতন কামনার সূক্ষ্ম প্রকাশ আর গল্পের পরিবেশ, এ দুয়ে মিলে কাহিনীটিকে প্রায় স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে গেছে অথচ বাস্তবকে হারায় নি। গল্পটি পড়লে বিদেশী মুন্সিয়ানার কথা মনে হয়, তারিফ করতে ইচ্ছা হয়।

'আত্মজা' গল্পটি নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ হতে পারে। আত্মজার প্রতি পিতার প্রীতি, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তার পিছনে যে অচেতন বা সুপ্ত বৃত্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে, তা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব। মনস্তত্ত্ব এবং মনো-বিকলন সাহিত্যের এলাকায় প্রবেশ করতে পারে না, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু কতখানি ও কিভাবে, তারই ওপর নির্ভর করে গল্পের ও শিল্পের অভিব্যক্তিকরণ। এ-গল্পের শিল্প-সম্মত প্রকাশ ও পরিণতির মধ্যে লেখকের শক্তিমত্তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বক্তব্য এমন কি জরুরী, যার জন্য একটি সম্ভাব্য 'ইনসেস্ট' নিষেধ পার হয়ে চিত্রিত করতে হয়। মনের গহন রাজ্যে বৈধ-অবৈধ কত শত ভাবনা-কামনার উদয়-বিলয়! কিন্তু তাই বলেই কি তাদের একটিকে টেনে বার করে এনে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে? জবাব দেওয়া যায়—আর্টের ক্ষেত্রে বিষয়-নির্বাচনে 'পিউরিটান' হওয়া সাজে না। অস্বাভাবিক পরিবেশনযোগ্য হতে পারে কলমের জোরে। কথাটা ঠিক এবং এ-গল্পের পরিণতিতে যে ট্র্যাজেডি, সেইখানেই লেখকের বলিষ্ঠতা এবং প্রকৃত জবাব। প্রশ্নটা শুধু রুচির নয়, মনুষ্যত্বের শক্তির ও দাবির। শেলির রচনা এবং বায়রনের দুষ্কৃতি, এ দুটোর নজির আছে বটে। কিন্তু তারা শিল্পের সমর্থক নয়। শেলির নাটকটি শোকাবহ ইঙ্গিত বহন করে মাত্র, জীবনের একটি অন্ধকার সাময়িক অংশকে তুলে ধরে মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। 'আত্মজা' গল্পটি যদি আরও সংক্ষিপ্ত এবং এতটা বিশ্লেষণমূলক না হয়ে ইঙ্গিতধর্মী হত, তাহলে বোধ হয় জীবনের ও মনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত না।

'পলাশ' গল্পটি সত্যিই পলাশ রঙে লাল। ছাপার কালিতে এমন নিটোল সুন্দর ছবি যে আঁকা যায়, না পড়লে বিশ্বাস হয় না। গল্পটি শুধু মিষ্টি নয়, এক বিশেষ ক্ষমতার প্রতিনিধি। এ রচনায় যে পরিবেশ, যে সাধারণ অভিজ্ঞতার দৈব ঐশ্বর্য, পুরুষ ও নারীর যে সুস্থ এবং স্বাভাবিক কামনা এবং কয়েকটি মুহূর্তের যে গভীর উপলব্ধি বর্ণনা করা হয়েছে, তা পড়ে কেন জানি না, চেখভ্-এর গল্প-বৈশিষ্ট্যের কথাই মনের মধ্যে জেগে ওঠে।

'পিঙ্গলার প্রেম' শুধু নাম-গল্প নয়, এ বইয়ের শ্রেষ্ঠ গল্প। এ-গল্পটি আধুনিক কথা-সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হবার দাবি রাখে। মফস্বলের এক ড্রামাটিক ক্লাব শহর থেকে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দল আনিয়েছে। তাদের মধ্যে ভুবন চৌধুরী আর বিরহলক্ষ্মী নামে নামকরা অভিনেত্রী; একদিকে এরা দুজন আর একদিকে স্থানীয় অ্যামেচার যুবকেরা। সে-ও গণেশ, প্রাণ দিয়ে অভিনয় করে। প্রথম তিন রাত তিনখানি বই অভিনীত হল। কেউ কাকে হারাতে পারে না, এমনি জবরদস্ত অভিনয়। চতুর্থ রাত্রির চতুর্থ বই [illegible] নাটকের তিনটি রূপ-বিলাস, জয়া, কমলা; কলকাতায় এসে ভুবন চৌধুরীই সেখা [illegible] অভিনয় করা হল। মৃণাল আর বিরহলক্ষ্মীর ক্রমিক আকর্ষণকে মোড় ঘুরিয়ে দিল ভুবন চৌধুরী। কেমন ভাবে, তার পরিচয় পেতে হলে গল্পটি মন দিয়ে পড়া দরকার। ছোট গল্পের মাধ্যমে নাটকের রস, তার 'ক্লাইম্যাক্স' এবং 'কোলাপ্স'-এর নিয়ামক উপস্থিতি একাগ্র হয়ে রূপ ও বিরূপের দ্বন্দ্বকে মূর্ত করেছে। ছোট গল্পের শিল্প-সম্ভাবনা কতদূর, তার 'এক্সিবিশান' কত বাড়াতে, এই গল্পই তার নির্ভুল প্রমাণ।
(৪০৪/৫৭)।

বিপ্রমুখ

উপন্যাস

অসিধারা—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২। সাড়ে তিন টাকা।

শান্তিভূষণের ছেলে কান্তিভূষণের যখন আঠারো বছর বয়স তখন সে জানতে পারে যে, পিতা শান্তিভূষণ ছিলেন খুনী আসামী। ছেলেবেলার খেলার সঙ্গিনী সুপ্রিয়া সব শুনে বলেছিল 'তোমার কেউ না থাক, আমি আছি।' সংগীতে কান্তির কৃতিত্ব ছিল, আর, সুপ্রিয়া তখন শিক্ষার্থিনী। ক্রমশ বি-এ পাশ করে কলকাতায় চাকরি নিয়ে ওস্তাদ দুর্গাশঙ্করের কাছে গান শিখতে গেছে সুপ্রিয়া। কলকাতায় অতীশ তার ভক্ত প্রণয়ী,—তারও আগে কোনো-এক সময়ে লখনউ-এর গীতশিল্পী দীপেন বোস তার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিল। এদিকে অতীশ গানের ব্যাপারে কিছু নয়, কিন্তু লেখাপড়ায় সেরা ছাত্র, মস্ত বড়োলোক মল্লিক সাহেবের বাড়িতে তার আসা-যাওয়া আছে; মল্লিক সাহেবের মেয়ে মন্দিরার সঙ্গে তার বিয়ের সম্ভাবনা সে নিজেই নাকচ করে দিলো। তারই

'রুমমেট' গ্রাম্য শ্যামলালের সঙ্গে মন্দিরার প্রণয় ঘটিয়ে দিয়ে। সুপ্রিয়ার বিশ্বাস যে, সে অনেককেই ভালোবাসতে পারে—'কাউকে রূপের জন্যে, কাউকে গানের জন্যে, কাউকে বিদ্যার জন্যে।' আবার, দীপেন বোসের অনুরাগিণী পাঞ্জাবী উদ্বাস্তু গীতা কাউর আর-এক অসাধারণ মেয়ে। অসাধারণ চরিত্রের দিকে লেখকের ঝোঁক অসাধারণ রকম! তিনি পদে-পদে চমক-অভিপ্রায়ী, ছত্রে-ছত্রে অবিশ্বাস্য কল্প-কথাময়! খুন, গান, ভাঁড়ামি ইত্যাদির সমবায়ে 'অসিধারা'-কে চলচ্চিত্রোপযোগী করে তোলবার চেষ্টাতেই লেখক বোধ হয় বেশি সজাগ ছিলেন।

ছাপ, বাঁধাই, প্রচ্ছদ ইত্যাদি ত্রুটিহীন।

৩৬৭।৫৭

গৃহ ও প্রাঙ্গণ—অতুল চক্রবর্তী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২, দাম তিন টাকা।

কথাসাহিত্যে লেখক নবাগত হলেও উপন্যাস-রচনায় তাঁর হাত আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক উপন্যাসে 'প্লেট' গল্পের চেয়ে মনের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন এবং কলা-কৌশলের প্রাধান্যই বেশি। কিন্তু লেখক উপন্যাসের প্রাথমিক দাবি অর্থাৎ গল্পের গতিকে ক্ষুণ্ণ করেন নি, একজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। তিনি সোজাসুজি গল্প বলেছেন, একটি মিষ্ট মিলনাত্মক কাহিনী। তার মধ্যে নায়ক-নায়িকা, প্রেমের স্বাভাবিক ত্রিকোণ, ভুল বোঝা, শঠতা প্রভৃতি মামুলি উপকরণগুলি আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু উপন্যাসের পরিবেশটি স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে। প্রবাসে বাঙালী সমাজ ও জীবন এ-উপন্যাসের পটভূমি, সেখানে ভদ্রতা ও অভদ্রতা, উদারতা, হিংসা ও দলাদলি সবই আছে। লেখক এই বাস্তবের ভিত্তিতেই রোমান্স তৈরি করেছেন। গুজরাট ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলের স্থানীয় দৃশ্য ও চরিত্র-চিত্রগুলি বোধহয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই সজীব হতে পেরেছে। মোটের ওপর, একখানি সরল সুপাঠ্য উপন্যাস। (৩৭৩/৫৭)

মাথুর—স্বরাজ বন্দোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে শশিনাথের সঙ্গে বিয়ে হলো গদাধর চাটুজ্যের মেয়ে সরমার। গান শেখার ঝোঁক ছিল শশিনাথের। ওস্তাদ আনন্দলাল এলো। শশিনাথের ছোট বোন রূপ-মঞ্জরীর জীবনে প্রথমে এই আনন্দলালের সঙ্গে ঈষৎ পরিচয়ের,—তারপর বৈষ্ণব সাধু নীল-কেশরের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির সুযোগ এলো। ঘটনাচক্রে আনন্দলালের সঙ্গেই রূপমঞ্জরীর বিয়ের সম্ভাবনা ঘনিয়ে এলো, কিন্তু বিয়ে হলোনা; আনন্দলাল ফিরে গেল তার পূর্ব-বিবাহিতা স্ত্রী উমার কাছে। নীলকেশরকে তাঁর নিজের সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হতে দিলো না রূপ-মঞ্জরী। শূন্য ঘরে রূপমঞ্জরীর মাথুর-বিরহেতেই এ-কাহিনীর উপসংহার ঘটেছে। গল্পবস্তু, চরিত্র রূপায়ণ এবং অন্যান্য উপাদানের দিক থেকে বইখানি অসাধারণ, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবাস্তব এবং উদ্ভট বলে মনে হয়।

প্রচ্ছদ ও ছাপা ইত্যাদি চমৎকার।

৩৭১।৫৭

সংগীত শাস্ত্র

সংগীতে রবীন্দ্রনাথ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। নবভারত পাবলিশার্স, [illegible] মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দু' টাকা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সংগীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বাংলার প্রচলিত সংগীত সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহ এবং অনুশীলনের পরিচয় বর্তমান গ্রন্থে পাওয়া গেল। গ্রন্থকার রবীন্দ্র সংগীতের বিশেষজ্ঞ নন; কিন্তু বাংলার সাংগীতিক পট-ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনাকে প্রস্ফুটিত করতে চেষ্টা করেছেন এবং বহুল পরিমাণে সফল হয়েছেন। গ্রন্থটিতে পাঁচটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে,—রবীন্দ্র সংগীতের পরিচিতি, রবীন্দ্র সংগীত ও তার ক্রমবিকাশ, ধ্রুপদ-ধামার গান ও রবীন্দ্রনাথ, কীর্তন ও বাউল সংগীতে রবীন্দ্র-নাথ এবং সংগীতে আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথ। স্বল্প পরিসরে রবীন্দ্র সংগীতের বৈশিষ্ট্য যতটা প্রকাশ করা সম্ভব এ কয়েকটি প্রবন্ধে সেই চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। আর একটি বিশেষ গুণের পরিচয় পাওয়া গেল যে, গ্রন্থকার রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর রচনা কোথাও সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েনি। ঔচিত্যবোধ, গাম্ভীর্য এবং বিশ্লেষণনৈপুণ্য এই গ্রন্থটিকে পাঠকদের কাছে আদরণীয় করে তুলতে সমর্থ হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

সংগীত প্রদর্শনী—শ্রীবিপ্রদাস নন্দী, এম-এ। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা।

গ্রন্থটির আয়তন ক্ষুদ্র। এই স্বল্প পরিসরে লেখক সংগীতের ঔপপত্তিক অংশ প্রশ্নোত্তর দ্বারা সহজে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। পুস্তকের শেষাংশে কবিপরিচিতি শীর্ষক যে সব বিশিষ্ট গায়কের জীবনী দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে যদু ভট্ট এবং অঘোরনাথ চক্রবর্তীর পরিচয় পাওয়া যায়। সাংগীতিক পরিভাষাগুলি সরল-ভাবে বোঝানো হয়েছে। সংগীতের প্রয়োগ-বিধি সম্বন্ধেও সহজ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। পুস্তকটি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হবে।

সংগীতাগম—আর্ট সেন্টার অব দি ওরিয়েণ্ট, ১নং অপূর্ব মিত্র রোড, কলিকাতা-২৪। এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

স্বল্পায়াসে যারা সংগীত ও নৃত্যকলা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানার্জনে আগ্রহী, বইখানি তাদের সাহায্য করবে। সবিস্তারে না হলেও মাত্র পঞ্চাশ পৃষ্ঠার পরিধির মধ্যে কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত এবং নৃত্যশিক্ষা সম্বন্ধে বহু তথ্য সন্নিবেশের চেষ্টা হয়েছে। দুঃখের বিষয়, এই ক্ষুদ্রাকৃতি বই-খানিতে মুদ্রণপ্রমাদ এত বেশী ও মারাত্মক যে দীর্ঘ ভ্রম সংশোধনের তালিকাটি চোখের সামনে না রেখে পড়লে অনেক ভ্রান্ত ধারনা মনে গাঁথা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। এই দিকটির প্রতি প্রকাশকের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

৩৬৯।৫৭

কিশোর সাহিত্য

সোনার বাঙলা (১ম+২য়+৩য় ভাগ)—গোপাল হালদার সম্পাদিত। বেঙ্গল পাবলিশার্স। প্রতি খণ্ড ২্ টাকা।

গোপাল হালদার সম্পাদিত 'সোনার বাঙলা' গ্রন্থটির উদ্দেশ্য মহৎ। বাঙলা দেশ সম্পর্কে কিশোর পাঠকদের মোটামুটি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করাই সম্পাদকের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রথমত পশ্চিম-বঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয়, বঙ্গদেশের সংস্কৃতি এবং অতীত ইতিহাসের প্রতি পাঠকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম খণ্ড "জলমাটি পাহাড়ের" প্রতি সম্পাদকের একটু বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া উচিত ছিল। কারণ, এই খণ্ডতে লোকসংখ্যা, আয়তন ইত্যাদি বিষয়ে সংখ্যার কোথাও কোথাও কৌতূহলজনক উল্লেখ আছে। জেলা পরিচয় অতি সংক্ষিপ্ত। মানচিত্রে

"কুটীরবিহার" লেখায় "কোটীবিহার" কেন? তথাপি, আশা করব ছোটখাটো ত্রুটি সংশোধন করে নতুন সংস্করণে গ্রন্থগুলিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে সম্পাদক ত্রুটি করবেন না।

(৩৬৫/৫৭, ৩৬৪/৫৭, ৩৬৩/৫৭)

অনুবাদ-সাহিত্য

আমেরিকার বিপ্লব—রিচার্ড বি মরিস। সুকুমার চট্টোপাধ্যায় অনূদিত। কমলা বুক ডিপো। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম ২, টাকা।

রিচার্ড মরিসের The American Revolution গ্রন্থের অনুবাদ আমেরিকার বিপ্লব। রিচার্ড সাহেবের গ্রন্থটি নানা কারণে আধুনিক বলে কথিত। আমেরিকা বিপ্লবের ব্যাখ্যায় এবং ঘটনা ও কার্য কারণ বিশ্লেষণে লেখকের ইতিহাস-বিজ্ঞানের স্বাভাবিক দৃষ্টি সহাসম্ভব স্বচ্ছ ছিল। রাজনৈতিক পটভূমিকার দৃষ্টি [illegible] তিনি কখনও হ্রাস করেন নি। ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে আমেরিকার বিপ্লব সম্পর্কে সহজ ধারণাটি গড়ে উঠতে এবং পরবর্তী আমেরিকার রাজনৈতিক নীতির আভাস কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করাও কষ্ট হয় না।

অনুবাদ ভাল হয়েছে। ছাপাও মন্দ নয়।

(৩২৫/৫৬)

পত্রিকা

বার্ষিক শিশুসাথী—১৩৬৪। আশুতোষ লাইব্রেরি। ৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য চার টাকা।

ছোটদের জন্য প্রতি বৎসরই শিশুসাথীর শারদীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। এ বৎসরও আয়োজনের ত্রুটি হয় নাই এবং বালক-বালিকাদের জন্য পূজার সময় এরূপ সুন্দর বই বাহির হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বার্ষিক শিশুসাথী নিশ্চয়ই বিশিষ্ট স্থান দাবি করিতে পারে। গল্প, বিজ্ঞানের কথা, ঐতিহাসিক রচনা, ছবি ও কবিতার বহু সুন্দর নমুনা ইহাতে আছে। প্রায় সকল খ্যাতনামা লেখক-লেখিকার রচনা-সম্ভারে বার্ষিক শিশুসাথী সমৃদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, ধীরেন্দ্রলাল ধর, কার্তিক দাশগুপ্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, তারাপদ রাহা এবং ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন মাইতি, সুকুমার দে সরকার, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও বিমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। প্রবীণদের মধ্যে কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি লেখকেরা আছেন। ছবিতে ও ছাপায় বইখানি সত্যই মনোরম হইয়াছে।

কৃত্তিবাস—(নবম সংকলন)। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। ২২ শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলকাতা-৪। মূল্য ৮০ আনা।

তরুণ কবিদের মুখপত্র হিসাবে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা কবিতা-রসিক পাঠকদের কাছে যথেষ্ট আদরণীয় হয়ে উঠেছে। [illegible] সংখ্যায় শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, [illegible] সেন, [illegible] মজুমদার, [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংখ্যাটি [illegible] মেয়ের প্রবন্ধ "তরুণ ইংরেজ কবি" ও কিছু পুস্তক সমালোচনা আছে। "কৃত্তিবাসের" অনুরাগী পাঠক ও কাব্যপ্রিয় পাঠক আলোচ্য সংখ্যাটি সংগ্রহ করবেন বলে আশা করি।

আবাহন—শ্রীসুধীরকুমার পালিত ১৮/১, দেওদার স্ট্রীট, কলিকাতা-১৯। মূল্য—১.৫০ নয়া পয়সা।

আবাহন একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য সংকলন। ইহার কার্তিক সংখ্যাটি বর্ধিত কলেবরে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণি বাগচি, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, বিমলচন্দ্র ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অশোক সরকার, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, আবদুস সত্তার প্রভৃতি বিশিষ্ট লেখক ছাড়া আরো বহু নতুন লেখক-লেখিকার রচনায় এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

বিবিধ

THE WHIRLWIND—N. S. Phadke. Jaico Publishing House. Price Rs. 2/-.

Jaico প্রকাশনী আজকাল অনেক ভারতীয় বই প্রকাশ করে ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় লেখকদের সাহিত্য-প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করছেন। তাঁরা ইতিমধ্যে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসের লেখক অধ্যাপক ফাড়কে ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখে মারাঠী সাহিত্যে সুনাম করেছেন। এ উপন্যাস প্রথমে মাতৃভাষায় পরে ইংরেজী সংস্করণে প্রকাশিত হল। বইখানিতে প্রেমোচ্ছ্বাসের কিছু আধিক্য আছে। তবে স্থানীয় রীতি ও রং থাকার জন্য, বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত বলে, অনেক পাঠকের কাছে এ উপন্যাস চিত্তাকর্ষক হবে।

১৩৬।৫৭

Socialist Upsurge in China's Countryside: Foreign Languages Press, Peking.

পরিবেশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা নয় আনা।

নতুন চীনের কৃষি-উন্নতি, কৃষক-সংগঠন, কো-অপারেটিভ ও কালেকটিভ ফার্মিং, উৎপাদন-পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতির কথা এ বইখানিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। চীনের গ্রামাঞ্চলের সমাজতন্ত্রী আন্দোলন ও কর্ম-পদ্ধতির পরিচয় ও নমুনা জানতে হলে এ বই পড়া দরকার।

৩২৭।৫৭

কুটির শিল্প ও পরিকল্পনা—আদিনাথ সিংহ, বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড কলিকাতা—১২. দু টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

সুন্দর কাগজ এবং সুন্দর ছাপার জন্যে তো বটেই, তদুপরি সহজ, সর্বজনবোধ্য ভাষার গুণে শ্রীযুক্ত সিংহের এই সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্য-বহুল বইখানি বর্তমান ভারতবর্ষের কুটীর শিল্প সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রেরই বিশেষ সমাদর দাবী করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেকার-সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কুটীর শিল্পের উন্নয়ন সম্বন্ধে ভারত সরকার বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। গ্রন্থকারের এই আলোচনা সেই কারণে খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। 'পশ্চিমবঙ্গে কুটীর শিল্প' নামে পৃথক একটি অধ্যায়ে তিনি বাংলার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন; অন্যান্য অধ্যায়ের মধ্যেও বাংলার শিল্প ও সমাজ-সংগঠন সম্বন্ধে জানবার বহু কথা আছে। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

৩৬৮।৫৭

করে দেখ (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২৯৪।২।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য—এক টাকা চার আনা।

বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বই। ইহার প্রথম খণ্ড ইতিপূর্বে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিশোর-কিশোরীরা যাতে সহজে বিজ্ঞানের নানারকম পরীক্ষা করতে পারে, তা এই বইটির মধ্যে পাওয়া যাবে।

২৩৯।৫৬

গল্প লেখা হ'ল না—চারুচন্দ্র চক্রবর্তী। সুপ্রকাশ পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। দাম—১.৫০ নয়া পয়সা।

দশটি গল্পের সমষ্টি এবং ছোটদের জন্য লেখা। খুব সহজ, স্বচ্ছ গল্প। তাদের মধ্যে কোনো বাহুল্য, নাটকীয় কিংবা মিথ্যা আড়ম্বরের ছোঁয়াচ নেই। কয়েকটি গল্প বেশ উপভোগ্য—বিশেষ করে নাম-গল্পটি 'গল্প লেখা হ'ল না' আর 'বড় কুটুম্ব', 'বহুরূপী' আর 'টুনটুনি'।

৩৬৯।৫৭

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

ARIEL—Andre Maurois.

LAUGH WITH LEACOCK—Stephen Leacock.

LAUGHTER AND APPLAUSE—Allan M. Laing.

JATAKA TALES—H. G. Francis and E. J. Thomas.

THE PRINCE—Niccolo Machiavelli.

THE SPELL OF APHRODITE AND OTHER STORIES—S. K. Chettur.

SOME INNER FURY—Kamala Markandaya.

THROUGH THE JUGLE OF BRAZIL—Tilok Serkelji.

TALES FROM KALIDASA—Suba K. Survegor.

YOU ARE YOUNGER THAN YOU THINK—Dr. Martin Gunapert.

YOUR MIND AND HOW TO USE IT—W. J. Ennever.

নিশিলগ্ন—সত্যেন্দ্রকুমার সেন।

কালপেঁচার বৈঠকে—বিনয় ঘোষ।

ভারতের সাধক ৩য় খণ্ড—শংকরনাথ রায়।

দূরকে করিল নিকট—জন জে ফ্লোহার্টি অনুবাদক—রবীন্দ্রনাথ সরকার।

মঞ্জরী—শ্রীমতী বাঁশরী কুণ্ডু।

দৈববাণী—ডক্টর শ্রীমনোমোহন বাগচী।

পঞ্চপ্রদীপ—মণীন্দ্রনারায়ণ রায়।

অগ্নিহোত্র—শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়।

এক যাত্রা—শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী।

দুর্গতোরণ—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

অনেক দিন—সমীর ঘোষ।

ফকিরের গান—নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালিদাসের মেঘদূত—বুদ্ধদেব বসু।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, মানুষের তৈরী ব্যোমচারী উপগ্রহের আবির্ভাবের পরে আমাদের আর ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে বাদবিসম্বাদ করা সাজে না অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা পূর্বে বড়ো ব্যাপার বলে মনে করতে অভ্যস্ত ছিলাম সেগুলো এখন তুচ্ছ হয়ে গেছে। পুরনো চোখ দিয়ে দেখা, পুরনো মন নিয়ে ভাব —এসব এখন চলবে না। সেইজন্যই বোধহয় গত কয়েক সপ্তাহ ধরে 'বৈদেশিকী'র লেখক ঊর্ধ্বদৃষ্টি হয়ে রয়েছে, শূন্য থেকে চোখ মাটির দিকে নামাতে পারছে না। কিন্তু এ অবস্থা কি কেবল তারই ছিল? কেবল কি 'বৈদেশিকী'র লেখককেই চার ডাইমেনশনের (four dimensions) চিন্তাধারায় পেয়ে বসল?

কই, যাঁরা নিজেরা 'স্পুৎনিক' আকাশে ছাড়লেন, তাঁদের চিন্তা এবং হাবভাবের মধ্যে তো চতুর্থ একটি ডাইমেনশনের কোনো আভাস দেখছি না। শ্রী খ্রুশ্চেভ যেমন করে শ্রী জুকভকে তাড়ালেন এবং তাড়িয়ে মার্শাল মহাশয়ের প্রতি যে-সব দোষারোপ করছেন তাতে তো কিছুমাত্র নূতনত্ব দেখছি না। পণ্ডিত নেহরু বলছেন যে স্পুৎনিকের পরে কম্যুনিজম কম্যুনিজম-এর আর কোনো অর্থ নেই, ওসব বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু যে-কম্যুনিস্ট রাশিয়া স্পুৎনিক বানালো তার নেতাদের মুখে তো মার্কসিজম লেনিনিজম ছাড়া বুলি নেই। তবে মনের চতুর্থ ডাইমেনশান কি কেবল যারা 'গরুর গাড়ির যুগে' আছে তাদের উপরই ভর করল? আর যাঁরা স্পুৎনিক ছেড়ে এই কাণ্ডটি ঘটালো তাঁরা দিব্য পুরাতন তিন-ডাইমেনশানী মন নিয়েই চলবে?

কিন্তু আমরাই কি সত্যি কোনো নূতন মনের পরিচয় দিচ্ছি? পাঞ্জাবে হিন্দী-ওয়ালারা স্পুৎনিকের আবির্ভাবের পরেও এইসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে গোলমাল করছে চার-ডাইমেনশনী চিন্তার কোনো পরিচয় দিচ্ছে না বলে পণ্ডিতজী ক্ষোভ অনুভব করছেন। কিন্তু পণ্ডিতজীর সরকারই ব কী নূতন মনের পরিচয় দিচ্ছেন? যদি স্পুৎনিকের পরে সবই আমাদের নূতন চোখে দেখা উচিত তাহলে কাশ্মীরের ব্যাপারটাও আমাদের চোখে বদলে যাচ্ছে না কেন? ইউনোতে শ্রীকৃষ্ণ মেনন সেই পুরাতন তর্কই করে যাচ্ছেন কেন? স্পুৎনিকের পরে 'সভরেইনটি'র (sovereignty) বা কী মানে আছে? মার্কিন সামরিক সাহায্যের দ্বারা পাকিস্তানের বলবৃদ্ধির কথা তোলার এখন কোনো মানে হয়? পাকিস্তানেরই হোক আর ভারতেরই হোক, কারোই এখন দেশরক্ষার জন্য অস্ত্রসজ্জার কোনো মূল্য আছে? প্রাক্‌স্পুৎনিক কালের তৈরী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টারই বা কী মানে আছে? এমন কি, আমাদের 'পঞ্চশীলের'ই বা কী দাম রইল? জগতের যে-অবস্থার জন্য 'পঞ্চশীলে'র দরকার ছিল সেই অবস্থাই কিনা স্পুৎনিক বদলে দিয়েছে। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ-বিরোধের জন্যই 'পঞ্চশীল' কিন্তু আলাদা আলাদা দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্পুৎনিক একসঙ্গে থাকার জিনিস নয়। আর বুদ্ধের দোহাই যদি এখনো চলে তবে তার সঙ্গে এটমিক বা নিউক্লিয়ার শক্তির আবিষ্কারের দরুণ নূতন মনের প্রয়োজনীয়তার কথা জুড়ে দেবার কোনো মানে হয় কি?
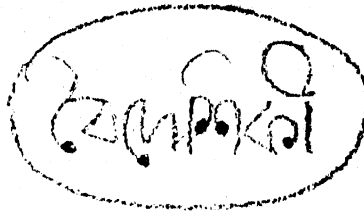
বুদ্ধ যখন মৈত্রীর বাণী প্রচার করছিলেন তখন সেটা গরুর গাড়ির যুগ ছিল। ভৌতিক বিজ্ঞানের কোনো নব-আবিষ্কারজনিত সংকটের প্রতিক্রিয়ারূপে বৌদ্ধ নীতি উদ্ভাবিত হয়নি। মানুষের প্রকৃতিগত যে-সব সমস্যার সমাধানের জন্য বৌদ্ধ অনুশাসন উদ্ভূত হয় সেগুলি গরুর গাড়ির যুগেও যেমন ছিল, নিউক্লিয়ার যুগেও তেমনি আছে। মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যকে জয় করার সমস্যা তখনও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। স্পুৎনিকের ভয়ে মানুষ এই রিপুগুলোকে জয় করে ফেলবে অথবা স্পুৎনিক মানুষের শুভবুদ্ধি উদয়ের প্রেরণা দেবে, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।

একদা মানুষের মনে নরকের ভয় কম ছিল না। মানুষ নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত কিন্তু সেই ভয়ে মনুষ্যসমাজ সাধু হয়ে যায় নি। আত্মজয়ের পথ ও প্রেরণা আলাদা। স্পুৎনিক মানুষকে আত্মজয়ের পথে নিয়ে যাবে, এটা দুরাশা। আত্মজয় থেকে উল্টো দিকে যাওয়ার দরুণই হয়ত স্পুৎনিকের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের কর্তারা একবার বলেন যে, গরুর গাড়ির যুগের বা গোবরের যুগের মন নিয়ে এটমিক যুগে বা নিউক্লিয়ার যুগে বাঁচা চলে না। আবার বলেন বুদ্ধের বাণী ছাড়া এ-যুগে গতি নেই কিন্তু বুদ্ধ তো বাষ্প যুগেরও দু'হাজার বছরের বেশি আগেকার মানুষ ছিলেন। আসল কথা মানুষ যখন সৎপথে যাবার তাগিদ অনুভব করে তখন সেটা নিজের ভিতরের রিপুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য করে। লোভ যখন ত্যাগ করে তখন লোভকে শত্রু বলে মনে করেই ত্যাগ করে, কোনো বাহ্য শত্রুর ভয়ে নয়। শত্রুর প্রতিহিংসার ভয়ে মানুষের হিংসাপ্রবৃত্তি দমিত হয় না, নিজের হিংসাকেই শত্রু বলে যখন অনুভব করে তখনই কেবল হিংসাজয়ের আরম্ভ হয়।

১২।১১।৫৭

রঞ্জন

কঠিনতম সমস্যাগুলিই মানুষের কঠিনতম পরীক্ষা না হতে পারে। আমি নিজের জীবনে অন্তত দেখেছি, দুরূহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাধারণত তত সময় লাগেনি যত লেগেছে সামান্য ও সাধারণ বিষয়ে মন স্থির করতে। শুধু তাই নয়, ছোটখাট ব্যাপারেই বোধহয় আমাদের ব্যক্তিত্বের স্বরূপের স্পষ্টতর পরিচয় মেলে। বড়ো বড়ো সমস্যাগুলির মধ্যে একটা চরিত্রগত সাদৃশ্য আছে এবং সেগুলির প্রতি বিভিন্ন ব্যক্তির সাড়ায়ও ব্যাপক সাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। এককালে আমরা সবাই একমত ছিলাম যে এদেশ থেকে ইংরেজদের যাওয়াই ভালো। সে মতে আমার ও তোমার ভারতীয়ত্বের পরিচয় ছিল, আমাদের ব্যক্তিত্বের নয়। আমরা নূতন আলাদা হলাম যখন আমি একটা বই কিনলাম আর অপরজন আরেকটা।

শুধু আমার বা তোমার কথা নয়। মহান বা বিখ্যাত ব্যক্তিদের বেলায়ও আমার পরীক্ষা পদ্ধতি প্রযোজ্য হতে পারে। ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলনে উপনেতৃত্ব করা বা কাশ্মীরে যুদ্ধ পরিচালনা করা, এর মধ্যে হিটলার আর নেহরুর ব্যক্তিত্বের মৌল বিভিন্নতা অস্পষ্ট হতে বাধ্য। অথচ এমন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারি—পরে করব—যা থেকে সন্দেহের সামান্যতম অবকাশ থাকবে না যে, একজন পুরোপুরি মানুষ নয় এবং অপরজন পুরোপুরি মানুষ। শুধু ব্যক্তি নয়, জাতির বেলায়ও নানা ছোটখাটো বৈষম্য থেকে বোঝা যায় এক জাতির নিহিত মহত্ত্ব আর অপর জাতির ঔদাসীন্য। একবার বলা যাক, আমি ভাবছি রাশিয়ার দ্বারা বহিরাকাশে প্রেরিত 'লাইকা' নামক কুকুরের কথা। ঠিক কুকুরের কথা নয়—এখানেই বোঝা গেল আমি ইংরেজ নই—লাইকাকে নিয়ে বৃটিশ জাতির উদ্বেগের আতিশয্যের কথা। অনেকের কাছে ঘটনাটা হাস্যকর। মানুষের দুর্দশা নিয়ে উৎকণ্ঠা নেই আর একটিমাত্র কুকুরের ভবিষ্যৎ নিয়ে এত হৈচৈ!

*

অনেকদিন আগে বি বি সি হ্যান্ড বুকের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এমনি চমকে উঠেছিলাম। একটা জায়গায় লেখা ছিল, অন্ধ হলে রেডিওর লাইসেন্সের ফী লাগবে না। ব্যক্তির প্রতি সমাজের সমবেদনা কী প্রখর হলে এমন ব্যবস্থার কথা মনে হতে পারে। আমরা ভারতীয়রা হৃদয়হীন নই। সব সময় স্বার্থপরও নই। কিন্তু কর্মবাদের জন্যই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, দুঃখের প্রতি আমাদের সামষ্টিক ঔদাসীন্য অবিশ্বাস্য। রাস্তার দু ধারে ভিখারী সাজানো, কেউ বা এক পয়সা দিই বা দিই না, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তির অবসানের কথা মনে হয় কজনের? অন্তত কলকাতায় আমরা ভিখারীদের প্রায় নাগরিক আসবাবের অংশ বলেই কি মনে করি না? এই সমস্যার প্রতি আমাদের মনোভাবে বিভিন্নতা সামান্য, সবাই একমত এর অবসান হওয়া প্রয়োজন, এবং এও সত্য যে, কোনো ব্যক্তির সাধ্য নয় এর অবসান ঘটানো।

কিন্তু আমাদের চরিত্রগত পার্থক্য প্রকট হবে বিশেষ ভিখারীর প্রতি আমাদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত আচরণে। একজন বলবে, 'মাফ করো', আর তারপর যে কথা বলছিল, সে কথা বলতে শুরু করবে। অন্যজন হয়তো নীরবে একটি পয়সা দেবে এবং তার মুখ দেখে বোঝা যাবে, আরো বেশি দিতে পারল না বলে সে দুঃখিত। তৃতীয় শ্রেণী আজ আরো পরিচিত, যে প্রাইভেট চ্যারিটিতে অবিশ্বাসী, কেননা এতে সামাজিক অন্যায়ের নগ্নতা নিয়ে দেখা দেয় না এবং তাইতে আরো প্রশ্রয় পায়। আমার ধারণা আমাদের বেশির ভাগ ভাইস পার্মানেন্ট আর বেশির ভাগ ভার্চু প্রাইভেট।

*

আমেরিকার ঐতিহাসিক গৃহযুদ্ধে এব্রাহাম লিংকনের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। তিনি জানতেন এমন যুদ্ধের বিভীষিকা, বহু মাতা হবেন পুত্রহীনা, বহু নারী বিধবা। তবু এই যুদ্ধটার ভয়াবহ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে লিংকনের লেখা সেই চিঠিটি, পুত্রশোকাতুরা কোনো মাকে লেখা। সেখানে প্রেসিডেন্ট উদ্দেশ্যে সুবিচালিত থেকেও একজন অজ্ঞাত অখ্যাত মহিলার নিতান্ত ব্যক্তিগত শোকের অংশীদার হয়ে আপন মহত্ত্বের বৃহত্তম প্রমাণ দিয়েছেন। সহস্র ব্যস্ততার মধ্যে ওই পত্র রচনার কথা কজনের মনে হত?

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আছে স্যার উইনস্টন চার্চিলের যুদ্ধস্মৃতিতে। ভদ্রলোক আর যাই হোন, সেন্টিমেন্টাল নন। আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কোনো মূল্যই তাঁর কাছে অতি বৃহৎ নয়। তবু যুদ্ধকালে এক সাংঘাতিক সংকটের সময় দেখতে পাই, তিনি একটা চিঠি লিখছেন অতি সামান্য একটা বিষয় নিয়ে। মনে থাকতে পারে, বৃটেনের ফ্যাসিস্ট নেতা অসওয়াল্ড মোসলি তখন সপরিবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তবু চার্চিল লিখছেন—শুনলাম, মোসলির অধুনোজাত সন্তানকে সব সময় মার কাছে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না। কেন? আর ওদের হপ্তায় দুবার স্নান করতে দিলে হিটলারের শক্তিই বা বাড়বে কোন উপায়ে?

শুধু মোসলিও নয়। ভারতবিরোধী বলে চার্চিলের বিরাট খ্যাতি আছে, যেটা পুরোপুরি অমূলক নয়। গান্ধী সম্বন্ধে তাঁর নানা মন্তব্য আজো উত্তেজনার সঞ্চার করে। নেহরু সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা অত্যুচ্চ হবার কথা নয়। তবু ওই যুদ্ধস্মৃতিরই পরিশিষ্টে কোথাও দেখা যাবে তিনি অধস্তন কর্মচারীদের নির্দেশ দিচ্ছেন—নেহরুর কারাবাস যেন যথাসম্ভব আরামদায়ক হয়। সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর মতো মানুষকে বৃহৎ কোনো দুর্গে বন্দী রাখা হোক।

*

নেহরুর সম্বন্ধে তাঁর একটি কাহিনী স্মরণ করতে ভালো লাগছিল। তখন তিনি সবে স্বাধীন ভারতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু কী কারণে যেন আজ আর মনে নেই, রামমনোহর লোহিয়া তখন জেলে। বলা বাহুল্য, তিনি নেহরু সরকারেরই কোনো আইন ভঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কাগজে দেখা গেল, প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারী বন্দী লোহিয়ার কাছে এক ঝুড়ি ল্যাংড়া আম পাঠিয়েছেন। রাজনৈতিক বিরোধের কথা তাঁর মনে হয়নি, বা তারও উপরে স্থান পেয়েছে ব্যক্তিগত সখ্য।

নেহরু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সফল করতে পারবেন কিনা জানিনে। মতবিরোধী পুরাতন বন্ধুর কাছে আম্রপ্রেরণের কীর্তি আমার কাছে তাঁর মহত্ত্বের পর্যাপ্ত প্রমাণ।

*

বিপন্নের মধ্যে সিন্ধু দেখবার রীতির কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সেজন্য যে দৃষ্টির প্রয়োজন তা আদৌ সুলভ নয়। নেহরু যে রামমনোহর লোহিয়াকে আম পাঠিয়েছিলেন তা মহাসমারোহে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। অতি সঙ্গত কথা। কিন্তু মহত্ত্বের অনুরূপ দৃষ্টান্ত হয়তো প্রতিদিন ঘটছে আমাদেরই মধ্যে। কে তার খবর রাখে? যে বন্ধু তার প্যাকেটের সর্বশেষ সিগারেট বিলিয়ে দিল, তার মহত্ত্ব কি লক্ষমুদ্রাদানকারী নিজামের উদারতার চেয়ে কম?

হয়তো এখানেই দেখা যাবে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা। একজন চাইছেন খবর। দ্বিতীয় জন? তাঁর হয়তো নিজেরই জানা নেই! সাহিত্যিককে সাধারণ মানুষ নিয়ে লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু সাংবাদিকের একমাত্র কৌতূহল অসাধারণকে নিয়ে। সে কুকুর-কামড়ানো মানুষ হলেও।

উন্নত চিত্র নির্মাণে উৎসাহ দান

উন্নত মানের ছবি তোলায় উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বম্বাই গভর্নমেণ্ট তাদের সচেষ্টতার পরিচয় সম্প্রতি দিয়েছেন দুখানি ছবির প্রমোদ-কর প্রযোজকদের কাছে প্রত্যর্পণ করে দেবার আদেশ দিয়ে। ছবি দুখানি হচ্ছে শান্তারামের 'দো আঁখে বারহ হাত' এবং মেহবুবের 'মাদার ইণ্ডিয়া'। বম্বাইয়ে আজকাল যে নাক্কারজনক ধরনের ছবি হয়েই চলেছে তা প্রতিহত করার জন্য চিত্রনির্মাতাদের সামনে এমনধারা কোন টোপ ফেলার হয়তো দরকার ছিল, কিন্তু ভাল ছবি তোলায় উন্মুখ করে তুলতে এ টোপ যে কজন চিত্রনির্মাতার ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে সেটা কিন্তু ভাববার বিষয়। কারণ, ছবি মুক্তিলাভ করলে তবে প্রমোদ-কর অর্জন হতে পারে, এবং ছবি জনপ্রিয় হলে তবেই প্রমোদ-করের টাকার পরিমাণটা ধর্তব্য অংকের পর্যায়ে উঠতে পারে। টিকিট বিক্রীর দরুণ মোট যে টাকাটা জড়ো হয়, মোটামুটি হিসেবে তার চার আনা অংশ প্রমোদ-কর। এই প্রমোদ-করের অংশ লোভনীয় হয় ছবি যদি বিশেষ জনপ্রিয় হয়। কিন্তু জনপ্রিয় হবেই, এমন কথা দপ্তরে সংগে বলতেই বা পারে কে? আর প্রভূত জনপ্রিয় যদি না হয়, তাহলে ভাল ছবি তোলার পুরস্কার-স্বরূপে প্রমোদ-করের টাকাটা ফেরৎ পাওয়া লোকসানের ধাক্কা সামলাতে যে বিশেষ সহায়ক হবে না, সেটা বিপুল অর্থব্যয়ী বম্বের চিত্রনির্মাতাদের বলে বোঝাতে হবে না। হাজার হোক ছবি তুলে ব্যবসা করার জন্যই ওরা রয়েছে, কাজেই ভাল ছবি তুলে লোকসান খাওয়ার চেয়ে, নিন্দের ছবি তুলে দুপয়সা করে নেওয়াতে ওদের লজ্জাতে বাধবে না। সুতরাং ছবি ভাল হলে প্রমোদ-কর ফেরৎ পাওয়ার টোপে বিশেষ কেউই ভোলবার নয়। অবশ্য গভর্নমেণ্ট ভাল ছবি তোলার জন্য উৎসাহ দিতে যে চাইছেন, সেটাই সবিশেষ প্রশংসনীয়, কিন্তু ঐ উপায়টিই যথেষ্ট নয়।

গত সপ্তাহে ছাপার ভুলে 'অব দিল্লী দূর নেহীঁ'র পরিচালক বলে পরলোকগত অমিয় চক্রবর্তীর নাম প্রকাশিত হয়েছিল। আসলে অমিয় চক্রবর্তী পরিচালিত শেষ ছবি হচ্ছে 'কঠপুতলী'। এ সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির মধ্যে রয়েছে বঙ্গসাহিত্যে 'চন্দ্রনাথ' বা ইন্দিরা-দর্পণ-প্রাচীর সঙ্গে মৈত্রী দিয়ে কাহে মুক্তি-[illegible]

—শৌভিক—
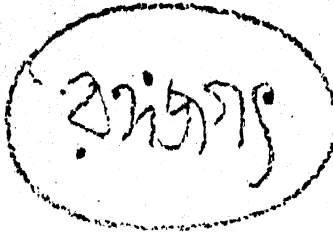
মুক্তিলাভ এই দ্বিতীয়বার, এর আগে প্রথম মুক্তি পায় 'চিত্রাঙ্গদা'। তবে মনে হয়, বিদেশী ছবির জন্য যে চিত্রগৃহগুলি রিজার্ভ রয়েছে তাদের এবার থেকে মাঝে মাঝে দিশী ছবি দেখাতেই হবে। কারণ, নবপ্রবর্তিত আমদানী নীতিতে বিদেশী ছবির আমদানী প্রায় অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে, বিদেশী ছবির প্রেক্ষাগৃহদের পক্ষে বছরের বাহান্ন সপ্তাহ নতুন ছবি জোগাড় করা সম্ভব হবে না। এখন অবশ্য কিছুকাল পুরনো ছবির পুনঃপ্রদর্শন দিয়ে চালিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু পুরনো ছবিও অচল একদিন হবেই। কাজেই, চিত্রগৃহ খোলা রাখতে গেলে দিশী ছবি দেখানো ছাড়া উপায় নেই। হলো অবশ্য ভালই—দিশী ছবির কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর চিত্রগৃহ এবং ভাল-দরের দর্শকসংখ্যা কিছু বাড়লো।

গোঁজামিলের মিছিল

মিষ্টি দুটি সুরমাখানো শব্দ, কড়ি ও কোমল। কিন্তু ওদের আড়ালে যে একটা খুনের ব্যাপারও পরিবেশন করা যায়, সেটা দীনবন্ধু প্রডাকসন্সের 'কড়ি ও কোমল' দেখবার আগে বুঝতে পারা যায়নি। ছবি-খানি দেখবার পর প্রথম প্রশ্ন জাগে, কেন তোলা হলো এ ছবি। যেমন অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন একটা কাঁচা গল্প নিতাই ভট্টাচার্য সরবরাহ করেছেন, তেমনি কল্পনা-হীন উদ্ভটতার [illegible] করেছেন যুগ্ম পরিচালক মণি ঘোষ ও অমল দত্ত। যেমন অত্যন্ত মামুলি যতো সব উপকরণের সমাবেশ, তাও নাড়াচাড়াতে তেমনি বেআক্কেলপনা। একটা খুন, এবং কারুরই সন্দেহ হবার নয় যার ওপর, গল্পের পরিসমাপ্তিতে এমনই একজনকে খুনী সাব্যস্ত করিয়ে একেবারে থ বানিয়ে দেবার জন্যে গোড়া থেকেই দর্শকদের বুদ্ধু ধরে নিয়ে যাতোজন বোকার মতো আচরণ ও কথা-বার্তায় সহায়তায় [illegible] নির্বোধ গোঁজামিলের একটা মিছিল যেন বেকাস করে দেওয়া হয়েছে পর্দার ওপরে।

• • • •

জনপ্রিয় গায়িকা সমিতা যখন ছাত্রছাত্রীদের গান শেখায়, ঠিক তারই লাগোয়া ফ্ল্যাটে সুস্মিতা একা বসে সেই গান নকল করে যায়। প্রশান্ত নামে এক ব্যক্তি এসে সলিলকে জানালে মামা মহেশবাবু তাকে ডেকেছে। প্রশান্ত গেল সুস্মিতার ঘরে এবং ওদের কথা থেকে বোঝা গেল সুস্মিতা সলিলের আকর্ষণেই এখানে এসে রয়েছে। ঘর থেকে একটি মেয়ের কণ্ঠে নিজের গান শুনে সলিল বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো পাশের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে (দরজা খোলা রাখা হয়েছে, তবু কিন্তু সলিলের কৌতূহল ভিতরে আর প্রবেশ করলো না) এবং বাড়িওয়ালার কাছ থেকে নতুন ভাড়াটে এসেছে শুনেই
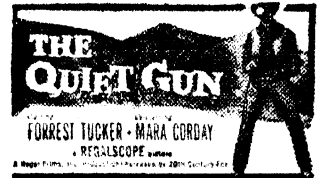
সলিলের কৌতূহল মিটে গেল। সলিলের বৈমাত্রেয় ছোটভাই সমীর। সমীর কৃষ্ণাকে সলিলের প্রতি বিরূপ করে তোলার চেষ্টা করতে থাকে। সলিল তা জানতে পারে। সমীরের সঙ্গে খাতির বেশী কৃষ্ণার দাদা মদনের। কৃষ্ণা সলিলের ফ্ল্যাটে এসে পাশের ফ্ল্যাটে তার সহপাঠিনীকে দেখে প্রবেশ করলে। সহপাঠিনী জানালে সে থাকে ঐ ফ্ল্যাটে এবং তার সঙ্গে থাকে সুমিতা। (গোড়াতে একা সুমিতা থাকে দেখিয়ে পরে বোধহয় ব্যাপারটার বিসদৃশতা কাটাবার জন্যেও বটে এবং প্রেম ব্যাপারে সলিল সম্পর্কে কৃষ্ণার মনে একটা খোঁচ ধরানোতেও ওকে সুমিতার সঙ্গে পরিচিত করার একটা সূত্র আনার জন্যই বোধহয় চট করে ঐ সহপাঠিনীর আমদানী) সুমিতার সঙ্গে কৃষ্ণার সেই প্রথম আলাপ, কিন্তু কথাবার্তা এমন ধরনের যা অতি অন্তরঙ্গ বান্ধবীদের পরস্পরের মধ্যেও হয় না। কথামতো মামা-বাবুর কাছে উপস্থিত হলো সলিল। তার আগে সুমিতাও ছিল সেখানে, কিন্তু তাকে আড়ালে সরিয়ে দেওয়া হলো। সুমিতা মহেশবাবুর শ্যালক কন্যা। মহেশবাবু উইল করে তার বাড়ির তিনটি অংশ সলিল, সমীর

সুকৃতিপ্রতীকিত 'মরণের আগে' চিত্রে নমিতা সিংহ ও কবিতা রায়

ও সুস্মিতাকে দিয়ে যেতে চান, সেই সঙ্গে প্রত্যেককে নগদ পঞ্চাশ হাজার করে টাকা। সলিলের ওপর সর্ত হলো যে, সে বাড়ি ও টাকা পাবে যদি সুস্মিতাকে বিয়ে করে। সলিল রাজী নয়, উলটে সে তার মামা-বাবুকে তাদেরই সম্পত্তি আত্মসাৎ করে তাদেরই দাতব্য করে যাওয়ার কথা তুলে দু কথা শুনিয়ে দিলে। সব ভেস্তে গেল। সে রাতে সলিল আবার এসেছিল মামার বাড়িতে। তার আগে কৃষ্ণার প্রসঙ্গ নিয়ে সমীরের সঙ্গে তার ঝগড়া হয় যার ফলে সমীরকে মেরে তার নাক ভেঙে দেয়। সমীর রক্তমোছা রুমালটা ফেলে রেখে চলে যায়। হঠাৎ পুলিস উপস্থিত। সলিলকে ধরে নিয়ে হাজির করলে মামার বাড়িতে। একটা লাস পড়ে রয়েছে। দেখেই সলিল জানালে ওটা সমীরের মৃত দেহ। পুলিস সলিলকে গ্রেপ্তার করলে সম্পত্তির লোভে ভাইকে খুন করার দায়ে। (ব্যাপারটা সাজাবার জন্যে হাই ব্লাডপ্রেসার রোগী মহেশবাবুকে স্ট্রোক ধরিয়ে নির্বাক করে নেওয়া হয়েছে, বাড়ির চাকরকে হঠাৎ কবিরাজ বানিয়ে তাকে গাওনার জন্যে রাতে বাড়ির বাইরে সরিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে) বিচার চললো, সাক্ষী-প্রমাণ দ্বারা সলিলই প্রায় খুনী সাব্যস্ত হয়, এমন সময় সুস্মিতা এলো সলিলকে রক্ষা করতে। সুস্মিতা জানালে ঘটনাকাল রাতে সে সলিলের সঙ্গে একঘরে ছিল। কুমারী শিক্ষিতা মেয়ের মুখে অকপটে এই স্বীকারোক্তি শুনে রায় বদলে গেল, সলিল ছাড়া পেল। মহেশবাবু তখন নার্সিংহোমে। সুস্মিতা তার সেবা করে ক্লান্ত হয়ে চলে গেল রাজমহলে। সলিল একদিন বুঝলে সুস্মিতার প্রতি সে অন্যায় করেছে, ক্ষমা চাওয়া দরকার। কেউ মামার খবর নিতে গিয়ে সুস্মিতার খোঁজ পেয়ে হাজির হলো রাজমহলে। যে পুলিস অফিসার সলিলকে গ্রেপ্তার করেছিল তার স্ত্রীর মনে সুস্মিতার জন্য চিন্তার অন্ত ছিল না। তারই কথা থেকে অফিসার বুঝলে একটা ভুল তাদের হয়েছে কৃষ্ণাদের খবর না নিয়ে। ইতিমধ্যে প্রকাশ পায় যে, খুনের দিন কৃষ্ণার দাদা মদন ইন্সিওর কোম্পানির সত্তর হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে। বাইরে চলে যাবে জানিয়ে মদন সমীরের কাছ থেকে একটা সুট ধার নেয়। মদন যে নোট নিয়ে গেছে পুলিস অফিসার তার নম্বর জানিয়ে চতুর্দিকে তদারকের ব্যবস্থা করলে। নম্বর মেলার খবর এলো রাজমহল থেকে। দেখা গেল কৃষ্ণা ব্যাঙ্কে এসে নম্বরী হাজার টাকার নোট ভাঙিয়ে যায়। পুলিস অফিসার হাজির হলো রাজমহলে। ইতিমধ্যে সুস্মিতা ও সলিলের বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণার মাথায় সিঁদুর দেখা গেল, তাকে অনুসরণ করতে দেখা গেল তার বাড়িতে রয়েছে সমীর। অর্থাৎ বোঝা গেল খুনে যে ব্যক্তি হয়েছে, সে সমীর নয়। জেরায় সমীরের জবানবন্দীতে (অর্থাৎ ফ্ল্যাশব্যাকে) বোঝা গেল ঘটনার দিন সমীর গিয়েছিল মামার বাড়িতে এবং সেখানে মদনের লাস পড়ে থাকতে দেখে, তার পাশে ছড়ানো ব্যাগের টাকা। টাকা নিয়ে সমীর পালিয়ে এসেছে কৃষ্ণার সঙ্গে। জানা গেল সলিল ভাইকে এতো ভালবাসে যে মৃতদেহটা দেখে ওর ধারনা হয় যে সমীরই মদনকে খুন করেছে, তাই তাকে বাঁচাবার জন্যই সলিল মৃতদেহটা সমীরের বলে উল্লেখ করে। হঠাৎ খবর এলো মহেশবাবুর মুখ খুলেছে এবং তিনি ওদের ডেকেছেন। সবাই উপস্থিত হলো কলকাতায়। মহেশবাবুর জবানবন্দী (তথা ফ্ল্যাশব্যাক) থেকে ঘটনা পরিষ্কার হলো। রাতে সলিল তার কাছে আসতে তিনি উইল আর টাকা সলিলের হাতে দেন। সকালে উইল নিয়ে কথাবার্তার সময় মদন উপস্থিত ছিল এবং টাকা আলমারীতে তুলে রাখতে দেখে যায় সে। রাতে সে ইন্সিওর কোম্পানির টাকা ব্যাগে নিয়ে মহেশবাবুর বাড়িতে হানা দেয় এবং মহেশবাবুই তাকে গুলী করেন। বলা বাহুল্য, স্বীকারোক্তির পরই মহেশবাবুর মৃত্যু হলো।

* * *

সলিল এসে বললে মৃতদেহ সমীরের অমনি সেটা মেনে নেওয়া হলো, এমন কি ভৃত্য জগন্নাথ থাকতেও; জগন্নাথকে ঘটনার সময় অনুপস্থিত রেখে দেবার জন্যে হঠাৎ ওকে কবিরাজ বানিয়ে তোলা; মামলায় কৃষ্ণারা জড়িত এবং তারা উধাও অথচ তাদের খোঁজ না করা; চুরি করা এক ব্যাগ টাকা বাড়িতে এনে কৃষ্ণার সামনে খুলে ধরলে, মদন আর কৃষ্ণার হঠাৎ নম্বর দেখে কখানা নোটের জন্য আবদার; সবাইকে টেনে রাজ-মহলে জড়ো করা; মহেশবাবুর স্ট্রোক; সমীরের রক্তমাখা রুমাল ফেলে আসা সলিলের ঘরে; মদনের হঠাৎ সমীরের কাছ থেকে সুট ধার করা; প্রভৃতি পদে পদে কেবলই গোঁজামিল দিয়ে ছবি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে বিরক্তির আর অন্ত থাকে না। রহস্যমূলক কাহিনীর বিন্যাসে একটা মস্ত ভুল পথ হচ্ছে আসল ঘটনাকে চেপে যাওয়া। তাতে কৌতূহলকেই দমিয়ে দেওয়া হয়। গল্প বোঝাবার জন্যে ছবির শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষাতে রেখে দেওয়া মানে ধৈর্যকে পীড়ন করা। সেটা দর্শকের পক্ষে সহ্য না করতে চাওয়াই স্বাভাবিক। ভূপেন হাজারিকার দেওয়া সুরের কখানি

রঙমহলে 'কবি'র শততম অভিনয় স্মারক উৎসব অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত প্রধান অতিথি বিমলচন্দ্র সিংহ। বামে উপবিষ্ট ছবি বিশ্বাস এবং মধ্যে সভাপতি নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ফিলিপাইন শুভেচ্ছা মিশনের সদস্যগণ কর্তৃক সাংস্কৃতিকীর অনুষ্ঠানের টুপি নৃত্য পরিদর্শনের দৃশ্য

গান ছাড়া ছবিখানিতে উপভোগ করার কিছু নেই। গানগুলির প্রয়োগ অবশ্য অতি মামুলী, তবু সুর ও গাওয়ার গুণে ওরা স্বতন্ত্র আকর্ষণ। গান লিখেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। আবহসংগীত কিন্তু এলো-মেলো। কলাকৌশলের কাজ মোটামুটি। বিভিন্ন বিভাগে আছেন, আলোকচিত্র গ্রহণে প্রবোধ দাস, শব্দগ্রহণে অতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিল্প নির্দেশনায় সত্যেন রায়চৌধুরী। অভিনয় ভাল জমতে পারেনি গল্পের দুর্বল উপকরণের সঙ্গে দুর্বল সংলাপের জন্যে। তবুও বিশেষভাবে নজরে পড়েন পুলিস অফিসাররূপে ছবি বিশ্বাস, মহেশবাবুর চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল (এমনি দুর্দৈব যে, এই ছবিতে ব্লাডপ্রেসার রোগীর যে স্ট্রোক তিনি অভিনয়ে দেখিয়েছেন, বাস্তবে ঠিক তেমনি স্ট্রোকেই তিনি পড়েন সম্প্রতি। তার আশু নিরাময় প্রার্থনা করি)। আদালতে আইনজীবীর ছোট চরিত্রে তরুণকুমার ও নীরেশ্বর সেন, সুমিতার চরিত্রে কমলা মুখোপাধ্যায়, পুলিস অফিসারের স্ত্রীর চরিত্রে ভারতী দেবী। এ ছাড়া রবীন মজুমদার, বিকাশ রায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপতি চৌধুরী, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানি, সবিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে আছেন।

বিন্যাস দোষে বিনষ্ট

ভালো প্রেমের গল্প আসে কম এবং যাওবা একটি এলো প্রতিভা বসু রচিত "মাধবীর জন্য", তাও চিত্রনাট্যে রূপান্তর ও পরিচালনার দোষে বাজে হয়ে উপস্থিত হলো। প্রডিউসার্স ইউনিয়ন ভাল গল্পই শুধু নির্বাচিত করেননি, ছবিও ভাল করার জন্যে তারা প্রযোজনার ভার দিয়েছেন পি এন রায়ের ওপর, পরিচালনার ভার দিয়েছেন নীতীন বসুর হাতে, চিত্রনাট্য লিখিয়েছেন মনোজ ভট্টাচার্যকে দিয়ে, শিল্পনির্দেশনার ভার দিয়েছেন সৌরেন সেনের ওপর, সঙ্গীতের জন্য অনুপম ঘটক, শব্দযোজনায় বাণী দত্ত—অর্থাৎ নিউ থিয়েটার্সেরই পরম গৌরবের দিনকার একটি পুরো ইউনিটই বলা যায়। কিন্তু সেও যেমন বিশ বছর আগেকার কথা, তেমনি দেখা গেল এরাও ঠিক সেই আমলেই পড়ে রয়েছেন চিন্তার ক্ষেত্রে। নিম্প্রভ কল্পশক্তির ছবিখানি বসে দেখা সবচেয়ে দুষ্কর করে তুলেছে নায়ক-নায়িকার চরিত্রাভিনয়ে শিল্পী নির্বাচনে। স্বরে, আচরণে ও চেহারায় কচিপনা মাখানো দেখেও অসিতকুমারকে নায়ক নির্বাচন করার (ও-বেচারার দুর্নাম ঘটিয়ে দেওয়া) কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। ঠিক এমনিই দৃষ্টির ও চিন্তার বিভ্রমে ভরা সারা ছবি-খানি।

• • •

আরম্ভ মফস্বলের একটি দৃশ্যে। বকুল তার ছোট বোন রাণুকে নিয়ে স্নেহশীল কাকা-কাকিমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় এলো। চরিত্রগুলির যথাযথ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই গল্পের চলা আরম্ভ হলো। কলকাতার সমাজসেবিকা ধনী মহিলা মিসেস ঘোষালের কৃপায় বকুল ও তার বোন রাণু মেয়ে হোস্টেলে আশ্রয় পেলো। হোস্টেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিসেস ব্যানার্জি কড়া মরালিটির লোক। মিসেস ঘোষালের মেয়ে মাধবী ভালবাসে তরুণ ইঞ্জিনিয়ার অশোককে। একদিন ওদের পিক-নিকে যাওয়ার শখ হলো; সঙ্গে মিসেস ঘোষালও যাবে ঠিক হয়, কিন্তু সেদিন তার যাওয়া হলো না। শেষে ঠিক হলো মাধবী বকুলকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, কিন্তু বকুলও যেতে পারলে না। অগত্যা ওরা দুজনেই গেল বটে, মাধবীর জিদে, তবে অশোক তাড়াতাড়ি ফিরলো পাছে কোন বদনাম রটে। এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হলো বলে অশোক বকুলকে দেরী করে তাকে টেলি-ফোন করলে হোস্টেলে। হোস্টেলের মেয়ে-দের পুরুষের টেলিফোন ধরা নিষেধ। মাধবীর টেলিফোন ভেবে রিসিভার তুলতে বকুল শুনলে অপরিচিত পুরুষকণ্ঠ, আর

তার বক্তব্যও বকুলকে বিস্মিত করলে। পরদিন একই সময়ে আবার সেই একই লোকের টেলিফোন। তার পরদিনও আবার। মিস ব্যানার্জির কাছে ব্যাপারটা ধরা পড়লো, নালিশ চলে গেল মিসেস ঘোষালের কাছে। বকুলকে বিতাড়ন করা ঠিক হয় প্রায়, এমন সময় মাধবী অশোককে বলে তার মার কাছ থেকে সেবারের মতো বকুলকে ক্ষমা করিয়ে নিলে। অশোক জানালে না যে, টেলিফোন করেছিল সে নিজেই বা বকুলও জানলো না, অশোকই টেলিফোন করেছিল তাকে। বকুলের ছিল একটা টিউশানী, একদিন ফেরবার পথে অশোক তাকে ধরলে। তারপর থেকে রোজই ওরা দুজনে বেড়াতে বের হয়। ওদিকে, অশোক না আসায় মাধবী উতলা হতে থাকে। একদিন এসে অশোকের সঙ্গে দেখা হতে মাধবী স্পষ্টই জানলো, অশোকের মন পড়েছে আর কারুর ওপরে। মাধবী গিয়ে বকুলকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলে, বকুল বুঝলও মাধবীর কথা এবং ব্যথা। কিন্তু অশোক বকুলকে ভুললো না। ওদের মেলা-মেশা অব্যাহতই চললো। ইতিমধ্যে মিসেস ঘোষাল একটা পাত্রের খোঁজে মাধবীকে নিয়ে পাটনা চলে গেলেন, মাধবীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও। এই সময়েই অশোক বকুলকে নিয়ে উপস্থিত করলে তার বাবার কাছে। মিস্টার চ্যাটার্জি বুঝলেন ছেলের মনের কথা। বকুলকে তিনি অনুনয় জানিয়ে রাজী করালেন অশোককে বিয়ে করতে। বিয়ের চিঠি পাটনাতে পৌঁছতেই মাধবী ক্ষেপে উঠলো। বিয়ের ঠিক আগের দিন কলকাতায় এসে বকুলের সঙ্গে দেখা করে মিথ্যে করে জানালে যে, অশোকের সঙ্গে গোপনে তার বিয়ে হয়েছে এবং সে সন্তানসম্ভবা। দরজা বন্ধ করে দিলে বকুল অশোকের মুখের ওপর। বাড়ি ফিরে অশোক বকুলের প্রত্যাখানবার্তা শোনাতেই হৃদরোগী মিস্টার চ্যাটার্জি মর্মান্তিক বেদনায় আক্রান্ত হলেন। অশোক খবর জানিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে মিস্টার চ্যাটার্জি তার পিছন পিছন উত্তেজিতভাবে আসতে আসতে স্ট্রোকে পড়লেন। অশোক তাদের ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় গিয়ে পৌঁছতেই এলো তার বাবার মৃত্যু সংবাদ। উত্তেজিত হয়ে গাড়ি চালিয়ে আসতেই পড়লো এক্সিডেন্টে। হাসপাতালে রোজই মাধবী যায়; বাইরে থেকে ফুল পাঠিয়ে দেয়। হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবার দিন এলো; মাধবী গিয়ে শুনলে সেদিন সকালেই অশোক চলে গিয়েছে। বকুলরা কোথায় যেন চলে গিয়েছে। বছর কতক পার হতে দেখা গেল, বকুল স্কুলে শিক্ষিকার কাজ করে। একদিন বইয়ের দোকান থেকে তার লেখা পাঠ্যপুস্তক বাবদ টাকা আনতে গিয়ে হঠাৎ দেখা হলো মাধবীর সঙ্গে। বকুলকে ডেকে মাধবী জানালে, অশোককে পাবার জন্যই সে মিথ্যে করে তাদের গোপন বিয়ের কথা এবং তার সন্তান সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে। মাধবীর কাছ থেকে ঠিকানা জেনে বকুল উপস্থিত হলো বিহারের এক শহরে। গিয়ে দেখলে, অশোক একটা স্কুল খুলে বসেছে ওখানে। ভুল বোঝার অন্ত হলেও অশোক জানালে, বকুলকে সে গ্রহণ করতে পারে না। বকুল ছাড়তে চায় না অশোককে, ছাড়লেও না যখন দেখলে যে, অশোকের এক পা কাটা, আর পঙ্গু বলেই বকুলের ওপর নিজের ভার দিতে অশোকের দ্বিধা হচ্ছিল।
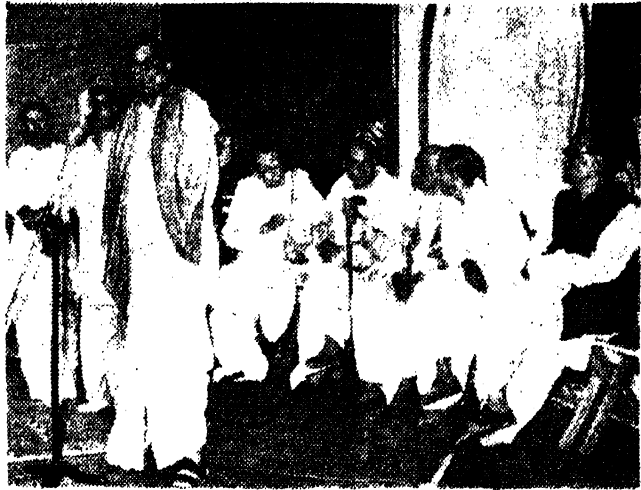
স্টার থিয়েটারে অভিনীত "শ্রীকান্ত" নাটকের শিবশততম অভিনয়ের স্মারক উৎসবের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বক্তৃতারত

• • •

প্রধানত বিন্যাসের দুর্বলতাতেই কাহিনীটি জমেনি। কৃত্রিম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বিয়ে ভেঙে যাওয়া থেকে শেষাংশ কিছু নাটকীয়। নয়তো মূল গল্পকে অনেকখানিই বদলে অন্য চেহারাই করে তোলা হয়েছে। গল্পের আসল রসটাও ধরতে পারেননি চিত্রনাট্যকার এবং মাধবীকে একটা ভিলেন করে ছেড়েছেন তিনি। চমৎকার অভিনয় পাওয়া যায় মিস্টার চ্যাটার্জির চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের। বকুলকে পুত্রবধূ হতে রাজী করানো, ঘরে লক্ষ্মী আসছে বলে আনন্দ এবং শেষে বকুলের প্রত্যাখ্যানে ভেঙে পড়ার যে অভিনয় তিনি করেছেন তা স্মরণ করে রাখার মতো। আর ভাল অভিনয় পাওয়া যায় শেষাংশে বকুলের চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। দু' একটি ক্ষেত্রে পরিচালনা কৃতিত্বের কিছু পরিচয় যা পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি হচ্ছে শেষ দৃশ্যটিতে দীর্ঘকাল পর বকুল আর অশোকের সাক্ষাৎ। কিন্তু অশোকের চরিত্রে অসিতকুমারের ফিকে অভিনয়ে অমন সুন্দর দৃশ্যও নিষ্প্রভ। মাধবীর চরিত্রে প্রণতি ঘোষ আগাগোড়াই বেমানান। হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের চরিত্রে মিসেস লাহিড়ী মরালিটির প্রতিমূর্তিটি সুন্দর ফুটিয়েছেন।

হিরণ্ময় সেন পরিচালিত 'বাঘা যতীন' চিত্রে নামভূমিকায় রবীন রায় চৌধুরী ও জ্যোৎস্না গুপ্তা

হোস্টেল বলেই ছাত্রীদের বেলেল্লা গান-বাজনার হৈ-হুল্লোড় মাত্রায় বেশী হয়ে পড়েছে, নয়তো আমোদ পাবার ঐ যা অংশ। জহর গাঙ্গুলী, চন্দ্রাবতী দেবী, পদ্মা দেবী, কালী সরকার, প্রীতি মজুমদার, তুলসী লাহিড়ী, তপতী ঘোষ প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আঙ্গিকে পারিপাট্য আছে, আবার কেমন একটা কৃত্রিমতার ছাপও। বকুলকে অশোকের গাড়িতে চড়তে বাধ্য করার জন্য পলকের মধ্যে মেঘ জানিয়ে বৃষ্টি নামিয়ে দেওয়ার মতো, বা অশোকের কাটা-পা প্রকাশ করিয়ে দেবার জন্য বকুলকে ফিরিয়ে এনে নমস্কার করাতে যাওয়ানো প্রভৃতি হাস্যকর ও বিসদৃশ ব্যাপারও যেখানে ঠাঁই পায় সে ছবির আর বিশদ পরিচয় প্রয়োজন করে না।

বিস্মৃত আবেদন

সহজ ভাবাবেগকে মুচড়ে মুচড়ে মানুষের আনন্দ-বেদনার অনুভূতি জাগানোর বিবিধ উপকরণ সম্ভার নিয়ে শরৎচন্দ্রের রচনা। 'চন্দ্রনাথ' কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনার অনেক গুণ থেকেই বঞ্চিত। তার ওপর ওর বিষয়-বস্তুর যে আবেদন তা নিয়ে এখনকার মনে গল্প জমানোও যায় না। পরিপুষ্ট নাটকীয় ঘটনা রহিত অতি বিলম্বিত লয়ের এ কাহিনী অবলম্বনে তৈরী চমৎকৃত হবার মতো ছবিও তাই আশা করা যায় না, আর তা হয়নিও। মূল গল্পের চালটা ছবিখানিতে ঠিক থাকলেও ব্যবসায়িক সাফল্য বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে সেই জাতের উপকরণ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত চিত্রনাট্যে পাওয়া যায় যা রুচি দিয়ে বিচার করলে সস্তা প্যাঁচ বলে অভিহিত করতে হয়। পরিচালনায় কার্তিক চট্টোপাধ্যায় শরৎকাহিনীর ধাঁচটা রক্ষা করে গিয়েছেন, ভাবাবেগ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন যথাযথ স্থলে, তা নয়তো থিয়েটারি ধাঁচের দৃশ্যোরচনার সমাবেশে চমৎকৃত হবার মতো কৃতিত্বের কোন উল্লেখযোগ্য পরিচয় নেই।

*　　*　　*

'চন্দ্রনাথ' অনেকদিন ধরে ছবি হওয়া থেকে পড়েছিল বলেই হয়তো এর নানা অংশ নানা ছবিতে টুকরো টুকরোভাবে এতো ব্যবহৃত হয়েছে যে, এ ছবিখানি দেখতে দেখতে ওর মধ্যে মৌলিক কিছু যেন আর পাওয়াই যায় না। কাকার সঙ্গে ভিন্ন হয়ে চন্দ্রনাথ কাশীতে উঠলো ওদের দয়াল পান্ডার বাড়িতে। ওখানে রাঁধুনীর কাজ যে করে তারই সুন্দরী মেয়ে সরযূকে দেখে চন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলো এবং তাকে বিয়ে করে দেশে ফিরলো। মামী চন্দ্রনাথের আশ্রিত হলেও, তার নির্বাচিতা পাত্রীকে বিয়ে না করে চন্দ্রনাথ নিজেই বলে পছন্দ করে এনেছে বলে সরযূর ওপর গোড়া থেকেই অসন্তুষ্ট। রাখাল ভট্টাচার্য বলে এক মাতাল প্রায়ই এসে সরযূর মাকে উত্যক্ত করতো। জমিদারের সঙ্গে সরযূর বিয়ে হয়েছে জেনে রাখাল দাঁও মারার জন্যে সরযূর মাকে শাসিয়ে ঠিকানা বের করবার চেষ্টা করলে। জানা গেল, সরযূ যখন তিন বছরের তখন তার মা এই রাখালের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে। কুলটার মেয়েকে বিয়ে করেছে এই জানিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে রাখাল মুখ বন্ধ করার জন্য টাকা আদায়ের ফন্দী করলে। দয়াল পান্ডাকে সে ভয় দেখালে যে, এতোদিন কুলটার হাতের রান্না খেয়ে ও খাইয়ে দয়াল যে অপকর্ম করেছে সেটা সে ফাঁস করে দেবে। ভয়ে দয়াল রাখালকে ঠিকানা দিলে এবং চন্দ্রনাথের কাকার কাছে সরযূর কথা জানিয়ে চিঠি দিলে। কাকা চিঠিখানি চেপে গিয়ে নিজের মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। চিঠিটা গোপন থাকলেও রাখাল একদিন এসে পড়ায় আড়াল থেকে তার কথা শুনলে চন্দ্রনাথের কাকিমা। এ-কান ও-কান হতে হতে কথাটা চন্দ্রনাথেরও কানে উঠলো। চন্দ্রনাথের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। সরযূকে প্রশ্ন করে জানলে যে, যা রটেছে তা সত্যি। সরযূকে ছাড়তে পারে না চন্দ্রনাথ, অথচ রাখলেও কুলমান যায়। পথ বের হলো আত্মহত্যার, কিন্তু পারলে না সরযূ, কারণ সে সন্তানসম্ভবা। তার চেয়ে সরযূ নিজেই গৃহত্যাগ করে কাশীতে উপস্থিত হলো। আসবার আগে চন্দ্রনাথকে শুধু জানিয়ে গেল তার সন্তানসম্ভাবনার কথা। কাশীতে দয়াল ঠাকুরের বাড়িতে উঠে তার মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনলে, দয়াল তাকে

অগ্রগামী প্রোডাকসন্সের নির্মীয়মান চিত্র 'ডাকহরকরা'র একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও শোভা সেন

গুরুদত্ত প্রোডাকসন্সের নির্মীয়মান চিত্র 'গৌরী'র নায়িকা গীতা দত্ত (রায়)

আশ্রয় দিতে চাইলে না। সরযূকে মায়ের সম্মানে বাড়িতে নিয়ে এলো বৃদ্ধ কৈলাস খুড়ো। যথাসময়ে সরযূর একটি পুত্রসন্তান লাভ হলো। কৈলাস ছোট শিশুকে নিয়েই মেতে থাকে, তার দাদা খেলার নিত্যসহচর। একদিন থাকতে না পেরে চন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলো কাশীতে এবং কৈলাস খুড়োর ঘর অন্ধকার করে তার ছেলে বৌকে নিয়ে ফিরে গেল।

* * *

উঁচুদরের ছবি হবার মতো যথেষ্ট উপাদান নেই কাহিনীতে। এ দুর্বলতাকে ঢাকতে গল্পের জোরালো উপকরণ চিন্তা করার চেয়ে সস্তা ব্যবসায়িক বুদ্ধির প্রয়োগই লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অবিবাহিতা সরযূকে আদল গায়ে দেখানো। কোন প্রয়োজনই ছিল না তার, অথচ ঐ ভাবের একটা খেলো রুচির পরিচয় দিয়ে ছবির পরিচ্ছন্নতাই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পরিচালনা গুণে কতকগুলি অংশ ফুটেছে ভালভাবে, তার মধ্যে উল্লেখ করা যায় কাশীতে প্রথম দিনে চন্দ্রনাথের ঘরে সরযূর আটক পড়ে যাওয়া এবং চন্দ্রনাথের অলক্ষ্যে থেকে সরযূর পালাবার চেষ্টা; সরযূর পরিচয় জানবার পর চন্দ্রনাথের তাকে আত্মহত্যার নির্দেশ থেকে সারারাত চন্দ্রনাথের দালানে বসে কাটানো; পুজোর দিনে চন্দ্রনাথের বিদেশ যাওয়ার জন্য যাত্রা; কাশীতে সরযূর কাছে খেতে বসা। এ দৃশ্যগুলি ভালভাবে জমে ওঠার সহায়কও হয়েছে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেনের অভিনয়গুণে। বিলম্বিত লয়ের গতি বারবারই ছবির ওপর থেকে কৌতূহল নিঝুম করে দেয়। জহর গাঙ্গুলীর কৈলাস খুড়ো, তুলসী চক্রবর্তীর দয়াল ও কমল মিত্রের চন্দ্রনাথের কাকার চরিত্রে অভিনয় মঞ্চানুগ আর ওদের উপস্থাপনও করা হয়েছে সেই-ভাবেই। ওদের চেয়ে ভাল লাগবে মাতাল রাখাল ভট্টাচার্যের চরিত্রে নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়। মনে রাখার মতো একটা ভাল টাইপ চরিত্র ফুটিয়েছেন তিনি। সরযূর মার চরিত্রে চন্দ্রাবতীর অভিনয়ও ভাল লাগবে। আরো আছেন ঝগড়াটে মামির চরিত্রে রেণুকা রায়, কাকিমার চরিত্রে পদ্মা দেবী, গাঁজাখোর মামার চরিত্রে হরিধন মুখোপাধ্যায়, মিশিরজির চরিত্রে তুলসী লাহিড়ী, ঠানদির চরিত্রে মলিনা দেবী প্রভৃতি। কলাকৌশলের কাজ বিশেষ প্রশংসার কিছু নয়। আরো চোখে ও কানে লাগে সিনেমাস্কোপ পর্দায়। বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন আলোকচিত্র গ্রহণে বিভূতি চক্রবর্তী, শব্দগ্রহণে শিশির চট্টোপাধ্যায়, বাণী দত্ত; শিল্প নির্দেশে সত্যেন রায়চৌধুরী। রবীন চট্টোপাধ্যায় গানগুলির সুরসংযোগে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু আবহসংগীতে বৈশিষ্ট্যও নেই, আর ব্যবহৃতও হয়েছে বেশী মাত্রায়।

কলিকাতা সংস্কৃতি সম্মেলন

আগামী ১২ই ডিসেম্বর থেকে পাঁচ দিনব্যাপী এণ্টালির সি আই টি পার্কে কলিকাতা সংস্কৃতি সম্মেলনের অধিবেশন বসবে। যোগদানকারী শিল্পীদের মধ্যে এপর্যন্ত যা নাম পাওয়া যাচ্ছে তাদের মধ্যে আছেন ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, বড়ে গোলাম আলি খান, আমীর খান, আলাউদ্দীন খান, রবিশঙ্কর, আলি আকবর খান, আবদুল হালিম জাফর। তাছাড়া, পরিবেশিত হবে সাজঘরের নাটক "মৌচোর", সাংস্কৃতিকীর নৃত্যনাট্য "ভানুসিংহের পদাবলী", পাঁচালী ভারতীর "শিব বিবাহ" পালা, শান্তিদেব ঘোষের রবীন্দ্রসংগীত ইত্যাদি। এই সঙ্গে সাহিত্য শিল্প সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ে আলোচনা সভারও আয়োজন হচ্ছে।

একলব্য

ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের 'অভিশপ্ত' সেমিফাইন্যাল খেলার গণ্ডগোলের ব্যাপার গড়ের মাঠ থেকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের দরবারে এবং হোটেলের দরবার থেকে হাইকোর্টের দরজায় গেছে। মামলা এখন বিচারাধীন, সুতরাং আর আলোচনা বিধিবহির্ভূত।

তবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে 'সাসপেন্ড' করার বিষয়ও নতুন নয় আর খেলার ব্যাপারকে হাইকোর্টে টেনে নিয়ে যাওয়াও প্রথম নয়। তাই মনে হয় ইতিপূর্বে যেভাবে খেলার মাঠের আর আর গণ্ডগোলের নিষ্পত্তি হয়েছে এবারও হয়তো সেইভাবেই গণ্ডগোলের নিষ্পত্তি হবে। কিংবা হাইকোর্টে শুনানী হতে হতেই যাবে 'সাসপেনসনের' সময় উত্তীর্ণ হয়ে। এর একটা আভাষও পাওয়া যাচ্ছে। আই এফ এর আবেদনে মামলার শুনানীর দিন নবেম্বর মাসের ২৫ তারিখ থেকে ১৮ তারিখে এগিয়ে আনা হয়েছিল। এখন শোনা যাচ্ছে—এই এফ এ-ই নাকি ২৫ তারিখে শুনানীর দিন ফেলার পক্ষপাতী এবং এ সম্পর্কে নাকি দুই পক্ষেরই মতৈক্য হয়েছে। খেলার মাঠের খেয়ালী কর্মকর্তাদের এই সব গণ্ডগোলের ভাব দেখে মনে হয় এ-ও এক ধরনের 'খেলা'।

* * *

পেশাদার টেনিসের বিশ্ববিশ্রুত প্রবর্তক এবং কীর্তিমান টেনিস খেলোয়াড় জ্যাক ক্র্যামার তাঁর দলবলসহ কলকাতায় আসছেন 'সাউথ ক্লাবে' প্রদর্শনী টেনিস খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য। নবেম্বরের ১৬ই ও ১৭ই তারিখে এই খেলার দিন ধার্য হয়েছে। ক্র্যামারের দলে আছেন গত দু বছরের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন লুই হোড, প্রাক্তন উইম্বলডন রানার্স কেন রোজওয়াল ও স্বনামধন্য পেশাদার খেলোয়াড় পাঞ্চো সেগুরা। এছাড়া জ্যাক ক্র্যামার তো আছেনই। টেনিস খেলায় এরা সকলেই এক একজন দিকপাল। পেশাদার টেনিসের সঙ্গে এমেচার টেনিসের পার্থক্যও আকাশ পাতাল। সমস্ত পেশাদার খেলোয়াড়ই টেনিসের উন্নত নৈপুণ্যের অধিকারী। এদের খেলার মধ্যে আছে বিজ্ঞানসম্মত ক্রীড়াকুশলতা, আর দর্শক-চোখের আনন্দদায়ক মাধুর্য সুষমা।

দীর্ঘ ১৯ বছর আগে ১৯৩৭ সালে বিগ বিল টিলডেন, হেনরী কোশে প্রমুখ বিশ্বের কীর্তিমান টেনিস খেলোয়াড়দের প্রদর্শনী খেলার পর সাউথ ক্লাবে আর পেশাদার খেলোয়াড়দের প্রদর্শনী খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। টিলডেন এবং কোশে যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন তাদের টেনিস প্রতিভাও স্তিমিত হয়ে এসেছিল; কিন্তু এবারকার খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রায় সবাই রয়েছেন গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে। তাই এ খেলার আকর্ষণও অভূতপূর্ব।

নীচে ৪ জন খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল:—

জ্যাক ক্র্যামার—পেশাদার টেনিসের প্রবর্তক জ্যাক ক্র্যামার টেনিস খেলার মধ্যে দৃপ্ত ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তোলারও অন্যতম প্রবর্তক। যে খেলার মধ্যে শক্তি ও নৈপুণ্যের নিদর্শন আছে, যাকে বলে 'পাওয়ার টেনিস' ক্র্যামার সেই খেলারই প্রতিভূ। টেনিসের এমেচার জীবনে ক্র্যামার ছিলেন আমেরিকার কীর্তি-মান খেলোয়াড়। সিংগলস ও ডাবলসের খেলায় এর প্রায় সমান দক্ষতা। ১৯৪৭ সালে আমেরিকার টেনিস ক্রমপর্যায়ে ক্র্যামার শীর্ষ-স্থান লাভ করেন। এই বছরই উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করবার পর ইনি হন পেশাদার খেলোয়াড়। ক্র্যামারের জন্মস্থান আমেরিকার 'লাস ভেগাসে'। বয়স ৩৬ বছর।

জ্যাক ক্র্যামার

কেন রোজওয়াল—১৯৩৪ সালের নবেম্বর মাস অস্ট্রেলিয়ার দুই কীর্তিমান টেনিস খেলোয়াড়ের জন্মমাস। এই মাসের দুই তারিখে 'সিডনীতে' ভূমিষ্ট হন সুনিপুণ টেনিস খেলোয়াড় কেন রোজওয়াল আর তেইশ তারিখে নিউসাউথওয়েলসের 'গ্লেবে' জন্মগ্রহণ করেন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন লুই হোড।

কেন রোজওয়াল ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৫৬ সালে ইনি আমেরিকার চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেন এবং উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইন্যালে লুই হোডের কাছে পরাজিত হন। অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ লাভের পর ১৯৫৬ সালেই রোজওয়াল প্রবেশ করেন পেশাদার টেনিসের বৃহত্তর ক্রীড়াক্ষেত্রে। বর্তমানে রোজওয়াল অনেক উন্নত খেলোয়াড়।

লুই হোড—১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন লুই হোড প্রভূত অর্থের বিনিময়ে মাত্র কয়েক মাস আগে পেশাদার টেনিস ক্ষেত্রে প্রবেশ করে উপলব্ধি করেছেন, এমেচার ও প্রোফেশনাল টেনিসের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। এমেচারের বিশ্ব-জয়ী টেনিস খেলোয়াড়কে পেশাদার টেনিসের বহু খেলায় নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে। কেন রোজওয়ালের মত হোডও ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ডেভিস কাপে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলেছেন এবং এই সময়ের মধ্যে বিশ্বের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রতিযোগিতায় অর্জন করেছেন বিজয়ীর সম্মান। ডাবলসে হোড ও রোজওয়ালের যোগাযোগপূর্ণ খেলা দেখবার মত। হোডের বয়স এখনও ২৩ পার হয়নি।

ফ্রান্সিস্কো সেগুরা—ফ্রান্সিস্কো সেগুরা টেনিস জগতে পাঞ্চো সেগুরা নামে পরিচিত। এমেচার টেনিস জীবনে সেগুরা কোন বড় সাফল্য অর্জন না করলেও নিপুণ পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে সেগুরা এখন সুনিপুণ খেলোয়াড়। ওয়েম্বলীতে পেশাদার টেনিস প্রতিযোগিতার সেমিফাইন্যালে সেগুরা পেশাদার টেনিসের বিশ্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় গঞ্জালিসকে পরাজিত করেন, কিন্তু ফাইন্যালে সেগুরাকে রোজওয়ালের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। সেগুরার জন্মস্থান ইকোয়েডারের 'গোয়াকিল'। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আমেরি-কার টেনিস ক্রমপর্যায় সেগুরার স্থান ছিল তৃতীয়। ১৯৪৭ সালে ইনি পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করেন। বয়স ৩৬ বছর। এর খেলা সত্যই দর্শক চোখের আনন্দদায়ক।

* * *

আজাদ হিন্দ বাগের পুকুরে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাঁতার প্রতিযোগিতা অর্থে বাঙলার সাঁতার পরিচালক প্রতিষ্ঠান বি এ এস এ পরিচালিত রাজ্য প্রাধান্য প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ বাঙলার সাঁতারে কে কোন বিষয়ে

শ্রেষ্ঠ তারই প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল কলকাতার আশেপাশের দ্বই তিনটি ক্লাব সমেত মোট ১৫টি সাঁতার ক্লাব। মেয়েদের প্থক বিভাগ ছাড়া সিনিয়র, ইণ্টারমিডিয়েট ও জুনিয়র এই তিনটি বিভাগে প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়। ওয়াটারপোলো খেলা এবং ডাইভিং ছাড়া প্রতিযোগিতার বিষয় থাকে ২৯টি। বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য এই ২৯টি বিষয়ের মধ্যে বাঙলার কিশোর কিশোরী সাঁতার্রা এবার ১৫টি বিষয়ে বাঙলার নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর মধ্যে দ্বটি বিষয়ের রেকর্ড ভারতের রেকর্ড সময়কেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু, যেহেতু ভারতীয় সাঁতারের পরিচালক সমিতির বিধান আছে—একমাত্র নিখিল ভারত সাঁতার প্রতিযোগিতার রেকর্ড ছাড়া কোন রেকর্ডই ভারতীয় সাঁতার সংস্থার অন্মোদন লাভ করবে না, সেহেতু বাঙলার উদীয়মান সাঁতার্ বেণী তাল্কদারের দ্বটি ভারতীয় রেকর্ডও অন্মোদন

লাভ করেনি। শুধু ভারতের সাঁতার ক্ষেত্রেই নয়,—রাজ্যের ক্ষেত্রেও রেকর্ড অনুমোদনের একই নিয়ম। অর্থাৎ রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ ছাড়া এখানেও কোন ক্লাব প্রতিযোগিতার সাঁতারের রেকর্ড রাজ্য রেকর্ড হয় না। কিন্তু বিশ্বের কোথাও এমন খাপছাড়া নিয়ম আছে বলে আমাদের জানা নেই। অনুমোদিত নিয়মমাফিক প্রতিযোগিতা উপযুক্ত এবং যোগ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত হলে সেই প্রতিযোগিতার রেকর্ড বিশ্বের সর্বত্রই গ্রাহ্য হয়ে থাকে। যাইহক, বেণী তালুকদারের এই রেকর্ড ভারতের সাঁতার ফেডারেশন গ্রাহ্য না করলেও যিনি বারবার ভারতীয় রেকর্ডকে ম্লান করে দিচ্ছেন তার পক্ষে একদিন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করা মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না। দুদিন আগে আর দুদিন পরে, এই যা পার্থক্য।

উদীয়মান সাঁতারু ১৬ বছরের স্কুলছাত্র বেণী তালুকদার ভারতীয় রেকর্ডকে ম্লান করেছেন ১০০ ও ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক বা বুক সাঁতারের প্রতিযোগিতায়। মাসখানেক আগে ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের সাঁতার প্রতিযোগিতায় বেণী এই পুকুরেই ২০০ মিটার বুক সাঁতারে সার্ভিস টীমের সাঁতারু সামসের খাঁর ভারতীয় রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছিলেন। ৭ সেকেন্ডে অর্থাৎ ২০০ মিটার বুক সাঁতারে সামসের খাঁর ভারতীয় রেকর্ড হচ্ছে ৩ মিনিট ০·৪ সেকেন্ড আর বুক সাঁতারে ২০০ মিটার অতিক্রম করতে বেণীর সময় লেগেছিল ২ মিনিট ৫৩·৪ সেকেন্ড। অ্যাথলেটিকস স্পোর্টস বা সাঁতারের রেকর্ড সময়ের এক আধ সেকেন্ড উন্নতি করতে যেখানে বহুদিনের সাধনার প্রয়োজন, সেখানে ৭ সেকেন্ড উন্নতি করা বেণীর পক্ষে বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। যাইহক বেণী এবার তার আগের সময়কে আরও কিছু উন্নত করেছেন। এবার ২০০ মিটার সাঁতার কাটাতে তার সময় লেগেছে ২ মিনিট ৫৩·১ সেকেন্ড। আর ১০০ মিটার উত্তীর্ণ হয়েছেন ১ মিনিট ১৯·৮ সেকেন্ডে। ১০০ মিটার বুক সাঁতারে ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী হচ্ছেন সার্ভিস টীমের রঘুপৎ সিং—তার রেকর্ড সময় ১ মিনিট ২১·৩ সেকেন্ড। এর আগে কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের সাঁতার প্রতিযোগিতায় বেণী আরও একবার এই রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, বেণী তালুকদার এই দুই বিষয়ে আপাতত ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী হতে না পারলেও রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে তার রেকর্ডের সঙ্গে ভুবনেশ্বর পাঁড়ে (২০০ মিটার বুক সাঁতারে) ও প্রফুল্ল মল্লিকের (১০০ মিটার বুক সাঁতারে) রাজ্য রেকর্ড বিলীন হয়ে গেছে। বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য, ১০০ মিটার বুক সাঁতারে

লুই হোড

১৯৪৩ সালে প্রফুল্ল মল্লিক যে (১ মিঃ ২২·৪ সেঃ) রেকর্ড করে রেখেছিলেন দীর্ঘ ১৪ বছর পরে বেণী তালুকদার সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন।

বেণী তালুকদারের দুটি রেকর্ড ছাড়া রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে আর যে ১৩টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বাংলার সাঁতার পটিয়সী কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র। ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলের তিনটি বিষয়েই কুমারী সন্ধ্যা নতুন রাজ্য রেকর্ড করেছেন। অবশ্য এই তিনটি বিষয়ে কুমারী সন্ধ্যাই ছিলেন রাজ্য রেকর্ডের অধিকারিণী। তার পুরানো রেকর্ডকে এবার আরও উন্নত করলেন মাত্র।

জুনিয়র সাঁতারুদের মধ্যে একটি ছেলের সাঁতার আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। ছেলেটি হচ্ছে ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের ১০।১১ বছরের সাঁতারু সত্যেন দাশ। জুনিয়রদের ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে সত্যেন নতুন রেকর্ড করে শান্ত কর্মকারের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। সত্যেনের সময় হয়েছে ১ মিনিট ৯·৩ সেকেন্ড আর ইন্টারমিডিয়েট বিভাগে এই বিষয়ে যে ছেলেটি রেকর্ড করেছে তার সময় হয়েছে ১ মিনিট ৯·২ সেকেন্ড। সত্যেনের সাঁতার কাটার স্টাইল দেখে মনে হয় উত্তর জীবনে ও খুবই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবে যদি উপযুক্ত শিক্ষা পায়।

কেন রোজওয়াল

রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে এবার মোট ১৫টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা হলেও আসলে কিন্তু রেকর্ড হয়েছে ২০টি। কারণ ৫টি বিষয়ে দ্বিতীয় স্থানাধিকারীও আগের রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছেন। কিন্তু এদের রেকর্ড তো আর রেকর্ড বলে পরিগণিত হবে না। সেই সময়টাই শুধু রেকর্ড বলে গ্রাহ্য হবে যার উপরে আর কেউ উঠতে পারেনি।

যাই হক, বাংলার সাঁতারে দিন দিন উন্নতি দেখা যাচ্ছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এবারকার প্রতিযোগিতায় ১৫টি বিষয়ে নতুন রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা এই উন্নতিরই পরিচায়ক। কিন্তু পরিচালনা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এখনও গলদ আছে। বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী জে এন দাশগুপ্ত সেদিন প্রতিযোগিতার সময় এ কথাটি ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যখন কোন সাঁতারুর মধ্যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তখন সেই সাঁতারু যে ক্লাবের সভ্য সেই ক্লাব বেশী পুরস্কার পাবার আশায় সাঁতারুকে দিয়ে নানা বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করান। ফলে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে সাঁতারুর প্রতিভা স্ফুরণের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

বুক সাঁতারে বেণী তালুকদার সত্যই প্রতিভার অধিকারী। উপযুক্ত 'কোচের' তত্ত্বাবধানে একে শুধু বুক সাঁতারের কলা-কৌশলে পটু করে তুললে এর পক্ষে বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মোটেই অসম্ভব নয়। সাঁতারের বিশ্ব-মান থেকে ভারত যে অনেক পিছিয়ে আছে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব তার এক প্রধান কারণ।

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত ওয়াটারপোলো লীগের খেলায় এবার অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশন। অনেকদিন আগেই লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন মীমাংসিত হয়ে গেছে। কিন্তু ওয়াটারপোলো নক আউট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজ্যের সাঁতার প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে। নক আউটে বিজয়ী হয়েছে গতবারের বিজয়ী সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব।

বেণী তালুকদার

ফাইনালে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব তাদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনকেই ৪—২ গোলে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। বলা বাহুল্য, সাঁতার ক্ষেত্রে এ দুটি ক্লাবের অবস্থা ফুটবল ক্ষেত্রে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের অবস্থার অনুরূপ। তবে দুটি ক্লাবই সাঁতারু তৈরীর প্রতিষ্ঠান।

রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ সাঁতারের সব ফলাফল দেওয়া সম্ভব নয়। যে কয়টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারই বিবরণ দিচ্ছি।

সিনিয়র বিভাগ

১০০ **মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক**—বেণীমাধব তালুকদার (ন্যাশনাল এস এ), **সময়** ১ মিঃ ১৯·৮ সেকেণ্ড (আগের ভারতীয় রেকর্ড ১ মিঃ ২১·৩ সেঃ; আগের রাজ্য রেকর্ড ১ মিঃ ২২·৪ সেঃ)

২০০ **মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক**—বেণীমাধব তালুকদার (ন্যাশন্যাল) **সময়** ২ মিঃ ৫৩·১ সেঃ (আগের ভারতীয় রেকর্ড ৩ মিঃ ০·৪ সেঃ; আগের রাজ্য রেকর্ড—৩ মিঃ ৫·৩ সেঃ)

১০০ **মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোক**—অরুণ সাহা (জগৎজননী ক্লাব), সময় ১ মিঃ ১৫ সেঃ (আগের রাজ্য রেকর্ড—১ মিঃ ১৭·২ সেঃ)

৪ × ১০০ **মিটার মেডলে রিলে**—স্টেট ট্রান্সপোর্ট এ সি—সময়—৫ মিঃ ৮·১ সেঃ (আগের রাজ্য রেকর্ড—৫ মিঃ ১৫·৪ সেঃ)

ইণ্টারমিডিয়েট বিভাগ

১০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল**—কানাই চ্যাটার্জি (বৌবাজার বি এস) সময় ১ মিঃ ১·২ সেঃ (আগের রাজ্য রেকর্ড—১ মিঃ ১·৪ সেঃ)

১০০ **মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক**—দুলাল কুণ্ডু (চাতরা—এস সি) সময় ১ মিঃ ২৭·৬ সেঃ (আগের রাজ্য রেকর্ড ১ মিঃ ৩০·২ সেঃ)

১০০ **মিটার ব্যাকস্ট্রোক**—বি মজুমদার (শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাব) সময় ১ মিঃ ২২·৪ সেঃ (আগের রাজ্য রেকর্ড—১ মিঃ ২৫ সেঃ)

১০০ **মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোক**—দুলাল কুণ্ডু (চাতরা এস সি) **সময়** ১ মিঃ ২৩ সেঃ (আগের রাজ্য রেকর্ড—১ মিঃ ২৭·৩ সেঃ)

জুনিয়র বিভাগ

১০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল**—সত্যেন দাশ (ন্যাশন্যাল এস এ) সময় ১ মিঃ ৯·৩ সেঃ (আগের রাজ্য রেকর্ড—১ মিঃ ৯·৬ সেঃ)

১০০ **মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোক**—তপন দত্ত (সেণ্ট্রাল এস সি), সময় ১ মিঃ ২৪·৯ সেঃ (আগের রাজ্য রেকর্ড ১ মিঃ ২৫ সেঃ)

কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র

১০০ **মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক**—অনিল চন্দ্র (সেণ্ট্রাল এস সি) সময় ১ মিঃ ২৮·৫ সেঃ (আগের রাজ্য রেকর্ড ১ মিঃ ২৮·৯ সেঃ)

৪ × ১০০ **মিটার মেডলে রিলে**—ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশন **সময়** ৫ মিঃ ৪৫·৮ সেঃ (আগের রাজ্য রেকর্ড—৫ মিঃ ৫৩·৩ সেঃ)

মহিলা বিভাগ

১০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল**—কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র (সেণ্ট্রাল এস সি), সময় ১ মিঃ ২৩·৫ সেঃ (আগের রাজ্য রেকর্ড ১ মিঃ ২৮·৪ সেঃ)

২০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল**—কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র (সেণ্ট্রাল এস সি), সময় ৩ মিঃ ১২·৭ সেঃ (আগের রাজ্য রেকর্ড—৩ মিঃ ১৭ সেঃ)

৪০০ **মিটার ফ্রি স্টাইল**—কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র (সেণ্ট্রাল এস সি), সময় ৬ মিঃ ৩৩·৩ সেঃ (আগের রাজ্য রেকর্ড ৭ মিঃ ৩·৭ সেঃ)

ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের রোভার্স ফাইন্যাল খেলায় ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়রা খেলা ছেড়ে মাঠের একপাশে এসে বসে আছেন

দেশী সংবাদ

৫ই নবেম্বর—রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৭১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এক আদেশ জারী করিয়া পাঞ্জাব আইন সভার দুইটি আঞ্চলিক কমিটি গঠন করিয়াছেন ইহার মধ্যে একটি পাঞ্জাবী অঞ্চলের জন্য এবং অপরটি হিন্দী অঞ্চলের জন্য।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী আজ রাজ্য বিধান সভায় বলেন যে, তিনি তৈল শোধনাগার আন্দোলন সম্বন্ধে ধৃত সকল বন্দীকেই মুক্তির আদেশ দিয়াছেন। এবং বিচারাধীন বন্দীদের বিরুদ্ধে যে সকল মামলা দায়ের করা হইয়াছিল সেগুলিও প্রত্যাহার করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৬ই নবেম্বর—উপাচার্য অধ্যাপক এস এন বসু একটি সার্কুলার জারি করিয়া বিশ্বভারতীর ছাত্রগণকে কোনরূপ সাধারণ সভা সমিতির অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কলাভবন ও সঙ্গীত ভবনের ছাত্রদের উপরে এই মর্মে এক নোটিশ জারী করা হইয়াছে যে, ছাত্রদের নিকট যে টাকা পয়সা পাওনা আছে, তাহা যদি তাঁহারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মিটাইয়া দিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে হোস্টেল ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

৭ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সম্মেলনের দশ দিনব্যাপী অধিবেশন অদ্য তাণ্ডবের মধ্যে শেষ হয়। ফরমোজার প্রতিনিধিদ্বয়কে চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব গৃহীত হইলে কয়েকজন প্রতিনিধি এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সম্মেলনকক্ষ ত্যাগ করেন। ভারতীয় রেড ক্রস প্রতিনিধিও ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন।

পরিকল্পনা কমিশন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত এক লিপিতে এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মাত্রাধিক উচ্চাভিলাষপূর্ণ হওয়ায় উহার রূপায়ণে বিঘ্ন দেখা দিয়াছে।

৮ই নবেম্বর—কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না আজ কটকে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের দ্রুত পুনর্বসতির জন্য ভারত সরকার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

বিশাখাপত্তনমে স্থাপিত হিন্দুস্থান জাহাজ নির্মাণ কারখানায় নির্মিত প্রথম যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ "এম ভি আন্দামান" আজ কলিকাতা বন্দরে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিকগণের সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করে।

৯ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীর খবরে প্রকাশ যে, সোভিয়েট রাশিয়া যে ৫০ কোটি রুবল ঋণ দিবে, তাহার সাহায্যে ভারতে কয়েকটি শিল্প সংস্থা গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে অদ্য সোভিয়েট সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

ভারতে তীর্থকার্যেনিরত একদল তিব্বতী লামা আজ কালিম্পং-এ প্রকাশ করিয়াছেন যে,
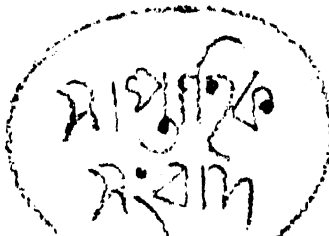
পশ্চিম তিব্বতের শাকা মঠে এক লক্ষ মূল্যবান পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি পুরাকালে ভারতে লিখিত।

১০ই নবেম্বর—অদ্য রাত্রি ৮-২৫ মিঃ বরাহনগর রোড স্টেশনে ডানলপ ব্রীজের নিকট শিয়ালদহমুখী কিউল প্যাসেঞ্জার ও ডানকুনি লোকালের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে একজন মহিলাসহ ৫ ব্যক্তি আহত হন।

জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর খামখেয়ালীর ফলে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডাকঘর কলিকাতা জি পি ওতে প্রায় লক্ষাধিক চিঠি এবং সমসংখ্যক মনিঅর্ডার আটক পড়িয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে বহুসংখ্যক জরুরী চিঠি (এমন কি এক্সপ্রেস ডেলিভারী চিঠিও), সংবাদপত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যক সামগ্রীও আছে।

১১ই নবেম্বর—আজ লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনের উদ্বোধন দিবসে বিরোধীপক্ষ রামনাথপুরমে সাম্প্রতিক দাঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর প্রদেশ ও বিহারের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে অনশনে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাঁহাদের সঞ্চিত বিক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ লাভ করেন।

আসামের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতিরাম বরা অদ্য আসাম বিধানসভায় ঘোষণা করেন যে, আসামে তৈল শোধনাগার স্থাপনের জন্য আসাম তৈল শোধনাগার সংগ্রাম কমিটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত।

নাগা পাহাড় অঞ্চল কেন্দ্রীয় শাসনাধিকারে আনিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিল বর্তমান মাসেই সংসদে উপস্থিত হইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ লোকসভায় সুস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

৫ই নবেম্বর—সরকারী সোভিয়েট সংবাদ পরিবেশন সংস্থা 'তাস' কর্তৃক অদ্য ঘোষিত হইয়াছে যে, রুশ বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারগণ এরূপ রকেট উদ্ভাবন করিতেছেন যাহা নিরাপদে অপ্রত্যাশিত গ্রহসমূহে অবতরণ করিতে সমর্থ হইবে।

৬ই নবেম্বর—কায়রো বেতারে প্রকাশ, গতকল্য আলেকজান্দ্রিয়ার একটি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটি অদ্ভুত জ্বলন্ত পদার্থ নামিয়া আসিয়াছে। উহা কোন চালকবিহীন ক্ষেপণাস্ত্রের অংশ বিশেষ বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট মাও সে তুং আজ মস্কোতে বলেন যে, পুঁজিবাদ ইতিমধ্যেই তাহার আধিপত্য হারাইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীগণ যদি তৃতীয় যুদ্ধ আরম্ভ করে তাহা হইলে পুঁজিবাদ ব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বারা ঐ সংগ্রামের উপসংহার হইবে।

৭ই নবেম্বর—আমেরিকার শ্রীওয়াল্টার বেরম্যানের বয়স বর্তমানে ছিয়াত্তর। তিনি তাঁহার পত্নী ৪৪ বছর বয়স্কা শ্রীমতী ভার্জিনিয়া বেরম্যানের সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রাক্তন পত্নীকেই আবার নিজ দত্তক কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী হিসাবে গ্রহণ করিতে তিনি উৎসুক। শ্রীমতী ভার্জিনিয়াও তাঁহার 'কন্যারূপে' অধিষ্ঠিত হইতে সমভাবে লালায়িত।

৮ই নবেম্বর—অদ্য রেঙ্গুনে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, চার দিন পূর্বে মধ্য ব্রহ্মের পাকোক্কু জিলার জনসন্নিবিষ্ট অরণ্যাঞ্চলে দুই ঘণ্টাব্যাপী সংগ্রামের পর বর্মী সৈন্যদল লাল পতাকাধারী কম্যুনিস্ট বিদ্রোহীদের হেড-কোয়ার্টার দখল করে।

৯ই নবেম্বর—পূর্ব পাকিস্থান নাবিক ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীআফতাবুদ্দীন হক আজ ঘোষণা করিয়াছেন যে, আজ সন্ধ্যা ৬টায় নারায়ণগঞ্জ হইতে স্টীমারের যাত্রা বাতিল করা হইয়াছে; কিন্তু সমগ্র স্টীমার কোম্পানীর দশ হাজার কর্মীর ধর্মঘট আজ মধ্যরাত্রি হইতে আরম্ভ হইবে।

মার্কিন স্থলবাহিনীর গবেষণা ও উন্নয়ন শাখার অধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল জেমস গ্যাভিন অদ্য বলিতে বলেন, শূন্যলোক হইতে মানুষকে এখন নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর। অধ্যক্ষ বলেন, শূন্যলোকে [illegible] ক্ষেপণাস্ত্রের চূড়াগ্র পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। কোন্ পদার্থের দ্বারা এই চূড়াগ্র নির্মিত হইয়াছে, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই।

১০ই নবেম্বর—বহুল প্রচারিত রবিবাসরীয় সংবাদপত্র "দি পিপল" এই মর্মে ঘোষণা করিয়াছে যে, যে ব্যক্তি প্রথম চন্দ্রলোকে গমন করিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে পারিবে তাহাকে ৫০ হাজার স্টার্লিং পুরস্কার দেওয়া হইবে।

সোভিয়েট রাশিয়ার সরকারী সংবাদ সরবরাহ সংস্থা "তাস" গতকল্য ঘোষণা করিয়াছে যে, গত ৪ঠা অক্টোবর রাশিয়া যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি আকাশে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা ক্রমশ পৃথিবীর দিকে নামিয়া আসিতেছে।

১১ই নবেম্বর—"ডেইলী এক্সপ্রেস"-এর মস্কোস্থিত সংবাদদাতা আজ জানাইয়াছেন—মহাশূন্যে সোভিয়েটের তৃতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ আসন্ন। এই উপগ্রহটির ওজন নাকি হইবে প্রায় এক টন।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা
কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা ষাণ্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।
মফঃস্বল / [illegible] বার্ষিক ২২ টাকা ষাণ্মাসিক ১১ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র
LIBRARY
Cooch Behar

সকলের সেরা..
SANKHA
শঙ্খ
যশোর কম্ব ইণ্ডাস্ট্রী কোং

বিখ্যাত
শঙ্খ ও পদ্ম মার্কা
গেঞ্জী ব্যবহার করুন
ডি.এন.বসুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী

সূচীপত্র

নতুনের চেয়ে
ধপ্‌ধপে আর উজ্জ্বল
করে কাচুন

গোদরেজ

কাপড়কাচা
গুঁড়োসাবান

মেশানো
অপ্‌টিক্যাল ব্রাইটনার
শতকরা ৯৭% বিশুদ্ধ সাবান
সোডা নেই
১০০% স্বদেশী
অনেক সস্তা • অনেক তাড়াতাড়ি
অনেক ভালো
এটি গোদরেজের একটি উৎকৃষ্ট অবদান
WASHING SOAP GRAINS
WASHING SOAP GRAINS

DESH 40 Naye Paisa
Saturday, 23rd November 1957

২৫ বর্ষ ॥ ৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪

ভাষা সমস্যা

মাতৃভাষা সংরক্ষণ সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শিক্ষাব্রতীগণের সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে—

(১) সংবিধানে উল্লিখিত চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষাকে জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি দিতে হইবে এবং হিন্দী ব্যতীত অপর বারোটি জীবিত ভাষার প্রতি প্রযুক্ত 'আঞ্চলিক' বিশেষণটির উচ্ছেদ করিয়া তাহার বদলে 'জাতীয়' শব্দ ব্যবহৃত হোক;

(২) সংবিধানে উল্লিখিত চৌদ্দটি ভাষার সহিত ইংরেজীকেও জাতীয় ভাষারূপে গণ্য করিতে হইবে।

(৩) আঞ্চলিক ভাষার দ্বারাই প্রত্যেক রাজ্যের শিক্ষাকার্য সর্বস্তরে নির্বাহিত করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব শীঘ্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(৪) সম্ভবমত সময় হইতে সকল ডিগ্রী পরীক্ষা ও গবেষণামূলক রচনার ক্ষেত্রে বাঙলা অথবা বিকল্প ভাষারূপে ইংরেজীকেই পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্বীকৃতি দিতে হইবে;

(৫) শিক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে ইংরেজী ও অন্য ভাষার স্থান কি হইবে, তাহা রাজ্য সরকার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বাধীনভাবে নির্ণয় করিবার অধিকার দিতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় অধিকার দিতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে কোন নির্দেশ বা পক্ষপাতিত্ব ব্যবস্থা থাকিবে না।

(৬) ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রচেষ্টা একটি বিশেষ ভাষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা চলিবে না।

(৭) নিখিল ভারতীয় চাকুরি সংক্রান্ত সকল পরীক্ষা একমাত্র ইংরেজীতেই পরিচালিত হইবে এবং

(৮) প্রাদেশিক চাকুরি সংক্রান্ত পরীক্ষা সেই প্রদেশের ভাষাতেই গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের বিবেচনায় প্রস্তাবগুলির মধ্যে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি-যাহাতে ইংরাজী ভাষাকেও অন্যতম 'জাতীয় ভাষা'রূপে স্বীকার করিবার দাবী করা হইয়াছে তাহাই সবচেয়ে গুরুতর। ইংরাজীর অন্যতম 'ভারতীয় ভাষা'রূপে গণ্য হইবার দাবী সম্বন্ধে আমরা আগে একাধিকবার লিখিয়াছি। আরও অনেকে লিখিয়াছেন। বস্তুত ইংরাজীর এই দাবী অগ্রাহ্য হইলে ভারতের নাগরিক ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের নাগরিকতার দাবী বাতিল হইয়া যায়। একটি সম্প্রদায়কে নাগরিক অধিকার দান করিব অথচ তাহাদের 'মাতৃভাষা'কে নাগরিক অধিকার দান করিব না এমন বিচিত্র পরিস্থিতি কল্পনার অতীত। আর একবার ইংরাজী ভারতীয় ভাষারূপে স্বীকৃত হইয়া গেলে আমাদের বিশ্বাস রাষ্ট্রভাষাঘটিত প্রধান সমস্যাটিরই সমাধান হইয়া যায়। আমরা জানি এবং অনেকেই অবগত আছেন যে, ইংরাজীকে রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহার করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহাদের মনটা খুঁত খুঁত করে একটা বিদেশী ভাষাকে ঐ পদ দানে। কিন্তু উহা যে বিদেশী নয়, অন্যতম ভারতীয় ভাষা তাহা, ব্যবহারে সিদ্ধ হইলেও এখন পর্যন্ত আইনে স্বীকৃত না হওয়াতেই এই গোলযোগ। ইহা অবিলম্বে স্বীকৃত হওয়া আবশ্যক।

প্রথম প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, হিন্দী ব্যতীত বারোটি ভাষার প্রতি বর্তমানে প্রযুক্ত 'আঞ্চলিক' শব্দের পরিবর্তে 'জাতীয়' শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে।

আঞ্চলিক শব্দের পরিবর্তন যদি করিতেই হয়, তবে তৎস্থলে 'ভারতীয়' শব্দ ব্যবহৃত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। যেহেতু 'জাতীয়' শব্দটি পরবর্তীকালে গুরুতর ভ্রমের সৃষ্টি করিতে পারে। ভারতের ঐক্যবিরোধীগণ (তাঁহারা সর্বত্র আছেন) ঐ পনেরোটি (বর্তমানে চোদ্দ ইংরাজী স্বীকৃত হইলে পনেরো) 'জাতীয় ভাষা'র সূত্র ধরিয়া প্রমাণ করিতে বসিবেন যে, ভারতীয়গণ একটি জাতি নয়, পনেরোটি জাতির সমষ্টি। ভারতীয় ঐক্যবিরোধিগণের হাতে এই মারাত্মক অস্ত্র তুলিয়া দেওয়া উচিত নয়। এক ভ্রমাত্মক 'দ্বি-জাতি তত্ত্বে'র অস্ত্রে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া পাকিস্থানের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতীয় সংহতি যাঁহারা চান না, উহার নাশেই যাঁহাদের স্বার্থ, পনেরোটি 'জাতীয় ভাষার' স্বার্থে ভারতকে বহুধা করিবার পক্ষে একটি যুক্তি তাঁহারা পাইবেন। আমাদের ধারণা 'মাতৃভাষা সংরক্ষণ সঙ্ঘ' বিষয়টি তেমন তলাইয়া বিবেচনা করেন নাই, নতুবা ভ্রান্তপথে চালিত হইয়াছেন। আমাদের অনুরোধ 'জাতীয়' এবং 'ভারতীয়' শব্দটির পরিণাম সম্বন্ধে তাঁহারা পুনর্বিবেচনা করিবেন।

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে পাকাপোক্তরূপে কায়েম করিবার সময় (১৯৬৫)

যতই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে হিন্দী বিরোধী মনোভাব ও উদ্বেগ ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও এই হিন্দী বিরোধী মনোভাব সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। পণ্ডিত নেহরু ও পণ্ডিত পন্থ এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ হইতেছে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা পদবীতে কায়েম করা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট সাল তারিখ মানিয়া চলা সম্ভব নহে। তাঁহাদের বক্তব্য যদি বুঝিয়া থাকি তবে বলিব যে, সমস্ত ব্যাপারটাকে তলাইয়া দেখিতে হইবে, সহিষ্ণুতা ও সহৃদয়তার সহিত দেখিতে হইবে এবং ঝোঁকের মাথায় ও আইনের আক্ষরিক অর্থের দাবীতে কিছু করা উচিত হইবে না—হঠকারিতা সর্বথা পরিত্যাজ্য।

এই সঙ্গে তাঁহারা হিন্দী অনুকূলে ও হিন্দী প্রতিকূলে উভয় পক্ষকেই গোঁড়ামি পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে তাঁহাদের লক্ষ্য পাঞ্জাবের 'হিন্দী বাঁচাও' আন্দোলন। ঐ আন্দোলন, পাঞ্জাব অকারণ জিদের সঙ্গে হিন্দী প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া ভারতের ব্যাপক অংশে হিন্দী বিরোধী মনোভাব জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। সম্প্রতি কয়েকজন লোকসভার সদস্যকে ভাষা কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে অনুরোধ করা হইয়াছে। তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ হইলে হাওয়ার গতি বুঝিতে পারা যাইবে। শেষ পর্যন্ত এই গুরুত্ব বিষয়টির সর্বজনগ্রাহ্য একটি সিদ্ধান্ত হইবে বলিয়া আমরা আশা পোষণ করি।

মণ্ডল কংগ্রেসের নির্বাচন

মণ্ডল কংগ্রেসের নির্বাচন উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক স্থানে হাঙ্গামা, সত্যাগ্রহ, ধর্মঘট প্রভৃতি ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। আমাদের ধারণায় এ রকম ব্যাপার যে-কোন দলের পক্ষে লজ্জাকর, কংগ্রেসের পক্ষে সর্বাধিক লজ্জাকর। এরূপ কেন হয়? অনেকে বলিবেন যে, নির্বাচনে আগ্রহাতিশয্যই ইহার কারণ, কাজেই উদাসীনতার চেয়ে ভাল। কিন্তু আগ্রহের আতিশয্য হাতাহাতিতে পৌঁছাইলেও কি ভাল বলিতে হইবে? ইহা রাজনীতির লুব্ধমূর্তি। এবং একথা বিশ্বাস করিবার হেতু আছে যে, ক্ষমতালুব্ধতা, পদলুব্ধতা অনেক কংগ্রেসকর্মীকে পাইয়া বসিয়াছে। আর ইহার ফলে কংগ্রেস সংগঠন মধ্যে দুর্বলতার ও কংগ্রেস সংগঠনের বাহিরে মর্যাদাহানির কারণ হইয়াছে। সেবার উপরে কংগ্রেসের ভিত্তি, ক্ষমতা গ্রাস বা Power Politics-এর উপরে নহে, একথা ভুলিয়া গেলে কংগ্রেসের ক্ষতি হইবে—এই অতি স্থূল কথাটি আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

অনধিকার চর্চা নয় কি?

"দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল নির্বাচন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখিত "বাঙলা অর্থনৈতিক ইতিহাস" বাঙলা পুস্তকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা বিবেচনা করিয়া শ্রী ভট্টাচার্যকে ১৯৫৫ সালের নরসিংহ দাস বাঙলা পুরস্কার দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।"

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে পুরস্কার-প্রাপ্তির জন্য আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। এই সংবাদটি উপলক্ষে একটি প্রয়োজনীয় কথা আমরা বলিতে চাই। সংবাদে লিখিত আছে, "বাঙলা পুস্তকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা বিবেচনা করিয়া শ্রী ভট্টাচার্যকে ১৯৫৫ সালের নরসিংহ দাস বাঙলা পুরস্কার দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।" ইহার অর্থ কি দাঁড়ায় না যে, ১৯৫৫ সালে যত পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমরা তো সাধারণ জ্ঞানে ঐরূপ বুঝি। এখন অর্থ যদি ঐরূপ দাঁড়ায়, তবে কি বিচারকগণ অনধিকার চর্চা করেন নাই? ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত যাবতীয় বাঙলা পুস্তক নিশ্চয়ই তাঁহারা পড়েন নাই। (অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পুরস্কারের জন্য প্রদত্ত পুস্তকগুলির সমস্ত সব বিচারক কর্তৃক পঠিত হয় না।) বিচারক-গণের বলা উচিত যে, "পুরস্কারের জন্য প্রদত্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে বা তাহার বাহিরে যে-সব গ্রন্থ আমরা পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে অমুক বইখানি আমাদের বিচারে শ্রেষ্ঠ।" যে-সব গ্রন্থকার বিচারকগণের সম্মুখে পুরস্কারপ্রার্থী হইয়া আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড়ান নাই, ইঙ্গিতে তাঁহাদের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ সৌজন্যসম্মত নয়। কোন একটা বিষয়ের বিচারক হইয়াছি বলিয়াই সোজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসিয়াছি, এরূপ মনে করা খুব সম্ভব ভুল। সংবাদের ভাষাকে ছাপার ভুল বলিতে পারি না; যেহেতু নরসিংহ দাস পুরস্কার ঘোষণার সংবাদে আগেও এইরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছি। অন্যান্য পুরস্কার ঘোষণার সংবাদেও ঠিক এই জাতীয় অনধিকার চর্চা হইয়া থাকে দেখিয়াছি। বাঙলা ভাষার বিচারকগণ নিজেদের বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে সতর্ক হইলে পুরস্কার দানের মর্যাদা বাড়িবে।

উপগ্রহের উপসর্গ

সোবিয়েৎ রাশিয়া কর্তৃক দুইটি উপগ্রহ নিক্ষিপ্ত হইবার ফলে মার্কিন রাষ্ট্রের আত্মতুষ্টির সুখস্বপ্ন ভাঙিয়াছে, হঠাৎ সে জাগিয়া উঠিয়া নিজেকে প্রশ্নবাণে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে—একি হইল? এবং সেই সঙ্গে স্বকীয় উপগ্রহ পরি-কল্পনা সে ত্বরান্বিত করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার বিশেষজ্ঞগণকে কষিয়া তাড়া লাগাইয়াছেন—শীঘ্র গোটা দুই যেমন তেমন উপগ্রহ নিক্ষেপ কর নতুবা মান থাকে না। এই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, (ফলে বৈদেশিক ঋণদান কমিবার আশঙ্কা)। যাহা হোক মার্কিন মুলুকে একসঙ্গে 'গেল, গেল' ও 'সাজ, সাজ' রব। অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি মার্কিন ও পশ্চিম জোটের এই পরাজয়কে 'পার্ল হারবার' ও 'ডানকার্কে'র পরাজয়ের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই শোচনীয় পরাজয়ের পরে ও পরাজয়ের ফলে যেমন ইংলণ্ড ও মার্কিনের শক্তি সমগ্রভাবে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল, এবারেও সেইরূপ ঘটিবে।

অন্যদিকে সোবিয়েৎ রুশও নিষ্ক্রিয় নাই, আরও উপগ্রহ প্রেরণের জন্য উদ্যত হইয়াছে এবং অচিরাৎ চন্দ্রলোকে পৌঁছিবার আশাও প্রকাশ করিয়াছে।

এ সব কথা যে বিস্তারিতভাবে বলিলাম তার কারণ প্রথম রুশ স্পুটনিক (অর্থ নাকি সহযাত্রী বা Fellow traveller) উৎক্ষিপ্ত হইবার কালে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের মনেও আশঙ্কা ছিল যে, ইহার ফলে যুদ্ধভীতি অপ্রত্যাশিতরূপে মারাত্মক হইয়া উঠিল, আরও বলিয়া-ছিলেন যে, মার্কিনও দীর্ঘকাল পিছাইয়া থাকিবে না, কাজেই এই নূতন Satellite Deplomacy-র পূর্বতন Atomic Deplomacy-র মতোই সমগ্র পৃথিবীকে শেষ পরিণামের দিকে আরো কয়েক পা অগ্রসর করিয়া দিবে। উপগ্রহ নিক্ষেপ ব্যাপারটাকে অনেকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা বলিয়া ফুকারিয়া উঠিয়া ছিলেন। কিন্তু যে জ্ঞান সামগ্রিক নরহত্যার জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে তাহা জ্ঞান কি অপজ্ঞান সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বস্তুত এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বাহনমাত্র—জিঘাংসা আরোহী। যুদ্ধের ঘোড়াকে উত্তম দানাপানি দিয়া তাজা করিয়া তুলিলে তাহাকে জীবে দয়ার দৃষ্টান্ত বলা চলে না। এ ক্ষেত্রেও আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ও উপগ্রহ প্রভৃতি উদ্ভাবনকেও বিজ্ঞানের উন্নতি বলা চলে না। কাজেই উপগ্রহ উৎক্ষেপে আমরা আনন্দের কারণ দেখিতে পাই নাই।

[চব্বিশ]

গোবিন্দপুর থানার হাজতঘরে সাতটা দিন আর রাত পার করে দেবার পর যেদিন জেল হাজতে চালান হয় দাশু, সেদিন দাশুর প্রাণ যেন একটা দুঃসহ জ্বরের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁপ ছাড়ে। গোবিন্দপুরের থানার পিশাচটা, চৌধুরীজী যার নাম, তার ছায়াও আর চোখে দেখতে হবে না। ঐ ঘড়ঘড়ে স্বরের হাঁকডাক আর শুনতে হবে না।

যখন তখন এসে মুরলী কিষাণীর নাম করে এক-একটা গালভরা লালসার গালি আর ঠাট্টার বুলি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে ও হেসে উঠতে বড় মজা পায় চৌধুরীজী। মুরলীর মত কিষাণীর আগুনপারা যৌবনটি, গতরের ঠাটটি, আর বুকটির ও কোমরটির বাহার কি এক ভাতারের বশ হতে পারে রে বোকা কিষাণ? মাগি ঘরেব বার হইছে, বেশ হইছে। চৌধুরীজীর কথা শুনে হাজত-ঘরের বন্দী যত কালো-কালো মুখগুলিও হো-হো করে হেসে ওঠে।

ভেজা ঠোঁটের সরস হাসিটাকে জিভ দিয়ে চেটে চেটে চৌধুরীজী যেন আক্ষেপ করে—কিন্তুক কিষাণটা বড় চালাক বটে হে সরদার। খিরিস্তান পলুস হালদারের সাথে চলেছে। মাগি শেষে মেমসাহেব হয়ে যাবেক নাকি হে?

হাজত-ঘরের ভিড় আবার হেসে ওঠে। চৌধুরীজীর চোখে হঠাৎ ছোট একটা ভ্রূকুটি শিউরে শিউরে কাতরাতে থাকে। —বড় শক্ত খুঁটো ধরেছে কিষাণীটা; তা না হলে উয়াকে টেনে এনে থানার ভাত খাওয়াই ছাড়তাম হে।

ছোটকালের বহেড়া জঙ্গলের একটা নেকড়ে একবার ডরানির বানভাসির যত মড়ার মাংস খেয়ে খেয়ে পাগল হয়ে গিয়েছিল। নেকড়েটার গলার স্বরও বদলে গিয়েছিল। মনে হয় দাশুর, গোবিন্দপুর থানার পিশাচ এই চৌধুরীজীর গলার স্বরের মধ্যে সেই পাগল নেকড়েটারই গলার স্বর ঘড়ঘড় করছে। একদিন ধান-ক্ষেতের আলের কাছে দেখতে পেয়ে নেকড়েটাকে মারবার জন্য টাঙ্গি হাতে নিয়ে তাড়া করেছিল দাশু। কিন্তু পালিয়ে গিয়েছিল নেকড়েটা।

সেই ব্যর্থতার আর অক্ষমতার আক্ষেপ বরং সহ্য করা যায়। কিন্তু চৌধুরীজী নামে এই পাগলা নেকড়েটাকে সেদিন রাতের অন্ধকারে ঘরের দরজার কাছে পেয়েও টাঙ্গির এক কোপে কেটে দু টুকরো করে দেবার ইচ্ছাও কেন হয়নি, সে কথা ভাবলে একটা জ্বালাময় আক্ষেপ যেন মনের ভিতরে ছটফট করে ওঠে। ভুল হয়েছিল, বড় খারাপ ভুল। সেই ভুলেরই শাস্তি; মুরলীর নামে যত নিদারুণ লালসার ঠোঁট-চাটা উল্লাস, ঠাট্টা, আক্ষেপ আর গর্জন নিজের কানে শুনতে হচ্ছে।

তাই জেল-হাজতে যাবার দিনে দাশুর প্রাণটা সাত দিনের অভিশাপের গ্রাস থেকে সরে যাবার সৌভাগ্যে খুশি হয়ে ওঠে। গোবিন্দপুরের ছোট জেলখানা; ফটকটা পুরুলিয়ার জেলখানার ফটকের মত দরাজ নয়। কিন্তু গোবিন্দপুরের ছোট জেল-

থানার ভিতরের সবজীবাগানটা দেখতে কী চমৎকার। মাটিটা লাল এঁটেল বটে; কিন্তু পচা হিঙের সবুজ সার দিয়ে মাটি মজানো হয়েছে নিশ্চয়; তা না হলে মাটির রং-এ এত কালো-কালো দানা কেন, আর গন্ধটাও সোঁদা কেন? বাগানের একদিকে পুঁই আর লাউ-এর লতা মাচান উপচে ঝুলে পড়েছে। আর একদিকে শুধু চষা হয়ে পড়ে আছে মাটি। ওখানে ফুলকপির চারা লাগানো হবে বলে মনে হয়, নয়তো মুলো আর পালং!

জেল-হাজতে প্রথম রাত্রেই আধা-ঘুমের ঘোরে হেসে ফেলে আর জেগে উঠে কম্বলের উপর কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর বুঝতে পারে দাশু, কেন হেসে উঠলো মনটা, আর মাথার ভিতরে একটা স্বস্তির আরামই বা বোধ হচ্ছে কেন?

মনে পড়েছে দাশুর, পাগলা নেকড়ের মাংসাশী আহ্লাদের চক্রান্তটাকে কী সুন্দর বুদ্ধির খেলায় বেকুব করে দিয়েছে বেচারী মুরলী। ওর প্রাণের ইজ্জৎ আর গতরের মান বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছে। তু সাচ্চা হিসাব জানিস, বড় ভাল হিসাব জানিস মুরলী।

ভালই হয়েছে; মুরলীই যদি রক্ষা পেয়ে গেল, তবে নেকড়েটাকে কাটবার আর দরকার হয় না। কোন ভুল হয়নি দাশুর; নিজের অক্ষমতার উপর আর রাগ করবারও দরকার হয় না। দাশুর আধা-ঘুমের স্বপ্নটা যেন মুরলীর সৌভাগ্য দেখে হেসে উঠেছে। না, আর আক্ষেপ করবার কিছু নেই। মুরলী যখন নিরাপদ, তখন পাঁচ বছরের কয়েদ নির্ভাবনায় সহ্য করতে পারা যাবে।

পাঁচ বছর? সত্যিই কি আবার পাঁচ বছরের শক্ত সাজা হবে? যদি হয়, তেই গো কপালবাবা, দাশু কিষাণের প্রাণটাকে বাঁচাই রাখবে তো? মুরলীর পেটে যে দাশু কিষাণের ছেইলা আছে। দেখতে কেমনটি হবে, দেখতে কত ভাল লাগে নিজের ছেইলার মুখটা, সে সুখ জীবনে না বুঝে যে মরে যেতে ইচ্ছা করে না।

না মরবো কেনে? দাশুর জীবনের আশা আর প্রতিজ্ঞা যেন আবার আশ্বস্ত হয়ে তন্দ্রাময় হাসি হাসে; কলঘরের বড় মিস্তিরি খিরিস্তান পল্টুসের ঘরের সুখের গৌরবকে হার মানতে বাধ্য করবে যে দাশু, সে দাশু মরবে না। জেল থেকে ফিরে এসে ক্ষেত-জোত করবে, নতুন মাটির ঘর তুলবে। আঙিনায় খড়ের মাচানের পাশে বসে সাঁঝের চাঁদের দিকে তাকিয়ে যখন মাদল বাজাবে দাশু, তখন আঙিনার দিকে মুরলীকে আস্তে আস্তে আর হেসে হেসে এগিয়ে আসতে দেখে একটুও আশ্চর্য হবে না দাশু। আমি তো জানতাম মুরলী, একদিন তোকে ফিরে আসতে হবে। কিন্তুক...তু বল এবার, আজ আমি তুকে কেমন করে ঘরে ঢুকতে বলি?

—কেনে সরদার? আমার লেগে কি তুমার মনে একটুকও মায়া নাই?

জেল-ফটকে বিউগল বাজে। হাজত-ঘরের দরজার বাইরে ভারি বুটের শব্দ শোনা যায়। দাশু কিষাণের ঘুমভাঙা চেতনার মধ্যে একটা অভিমান যেন নীরবে গুণগুণ করে, সত্যিই কি মধুকুপির গরীব কিষাণকে আবার পাঁচ বছরের কয়েদ খাটাবেন কপালবাবা?

তারপর আর বেশি দেরি হয় না। জেল-ফটকে সকাল নটার ঘণ্টা বাজতেই রুটি-গুড় আর জল খেয়ে যখন হাঁপ ছাড়ে দাশু, তখন হাজত-ঘরের দরজা খুলে যায়। আর দড়ি-বাঁধা কোমর নিয়ে দুই নতুন সিপাহীর পাহারায় গোবিন্দপুরের আদালতের পথে এগিয়ে যেতে হয়। তিনটে চুরির অপরাধ, থানায় হাজিরা না দেবার অপরাধ, আর ইশান লেঙ্কাসের ভাণ্ডার লুঠ করবার জন্য হাঙ্গামা মাতব্বর অপরাধ। পাঁচটি অপরাধের বিচার বরণ করতে হবে। দাশু জানে, চৌধুরীজীই জানিয়ে দিয়েছে, এই পাঁচ কসুরের জন্য তুকে চালান করা হয়েছে রে দাশু।

জেল-হাজত থেকে আদালত, দাশুর দিনগুলো আবার অভ্যস্ত হয়ে দুই সিপাহীর পাহারায় আনাগোনা করে। প্রায়ই রোজই আধ ক্রোশেরও বেশি পথের লাল ধুলো মাড়িয়ে আদালতে যেতে হয়। আসামীর কাঠগড়ায় একবার দাঁড়াতেও হয়। কে জানে কি বলেন আর কি লেখেন হাকিম। তারপর আবার কোমরের দড়িতে টান দেয় সিপাহী। কাঠগড়া থেকে নেমে আসতে হয়। আবার জেলের পথে ফিরে যেতে হয় এবং আবার জেল-হাজতের নিভৃতে কম্বলের উপর শুয়ে বসে শুধু ভাবনা এবং সেই ভাবনার মধ্যে একটা ক্ষেত আর গুলঞ্চের বেড়া, একটা নতুন মাটির ঘর; মুরলী আর মুরলীর ছেইলা, মাদল আর মহুয়ার মায়া তন্দ্রাময় হয়ে ওঠে। ভোরের বিউগল বাজলে তবে সেই তন্দ্রার ছবি ভাঙে।

কে জানে কবে বিচার শেষ হবে? আদালতের বাইরে একটা আমবাগান। তারই ছায়ায় বসে আসামী দাশুর কোমরের দড়ি ধরে ডাকের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে রোজই হাঁপিয়ে ওঠে সিপাহী দুজন।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে সিপাহী গোকুল সামন্ত। —এ অর্জুন সিং?

—কি হো? মাথা ঝেঁকে ক্লান্ত চোখের আলস্য ঝেড়ে ফেলে উত্তর দেয় অর্জুন সিং।

গোকুল সামন্ত বলে—জ্বালা পাগল হইছে আদালত। এক বেটা দেহাতী চাষার ছুটকা চুরির মামলা খতম করতে আর কতদিন লিবে? রোজ সাক্ষী রে: সাবুদ

রে; তারিখ রে। আর আমাদিগের দিনভর হয়রানি রে! ভালা, এতদিনে বে কোলের ছেইলার মোচ গজায়ে যার হে।

অর্জুন সিং মুখ কুঁচকে দাঁতের ব্যথা চাপতে চেষ্টা করে। —মত্ কহো ভইয়া! থোড়াসা শিশাল, দো-চারঠো বাঁশ আর ইতনাসা কোয়লা, সাড়ে চার রুপাইয়াকা মাল চোরিকে মামলা; ইসকে লিয়ে শও শও রুপেয়া খরচা! মামলা নেহি; এ তো তামাশা হ্যায় ভাইয়া!

দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে একটা রাগের হাঁক ছাড়ে সিপাহী গোকুল সামন্ত। —তুমার লাজ লাগে নাই সরদার? মাগের কানে কোন্ সোনার মাকড়ি পরাতে সাধ হ'ইছিল যে সাড়ে চার টাকার মাল চুরি করলে? সত্যি চুরি করেছিলে কি?

দাশু হাসে—হ্যাঁ, চুরি বল তো চুরি। ডাকাতি বল তো ডাকাতি। যাদিগের মাল তাদিগের হুকুম না লিয়ে ঐ সাড়ে চার টাকার মাল তুলে এনেছিলাম।

অর্জুন সিং—সে তো হলো, কিন্তু ঈশান মোক্তারকে ডাণ্ডার মুঠে করবার লেগে তুমি যে......।

গোকুল সামন্ত চেঁচিয়ে ওঠে—দূর দূর! লখন গোমস্তার মত শয়তানের এজাহারে তুমিও বিশ্বাস কর সিংজী?

অর্জুন সিং—কি সরদার? ঝুট বাৎ কি?

দাশু—হ্যাঁ।

গোকুল সামন্ত—নিশ্চয় তুমার উপর উয়ার রাগ আছে?

দাশু—হ্যাঁ।

গোকুল—থানার পুলিস মুন্সীটারও তুমার উপর রাগ আছে কি?

দাশু—হ্যাঁ।

গোকুল—তবে আর তুমার ছাড়া নাই সরদার। উয়ারা দুজন হলেন দুটো ভগবান; আর থানাটা উয়াদিগের বৈকুণ্ঠ। উয়াদের দয়া খণ্ডাবেক, কারও বাপের এমন জোর নাই।

অর্জুন সিং-এর চোখ আবার ঢুলুঢুলু হয়। ঘুমের আবেশে মাথা ঝুঁকিয়ে বিড়-বিড় করে অর্জুন সিং—সাড়ে চার রুপেয়ার মাল চোরি না করে ভিখ মাংনা যে ভাল আছে রে ভাই। কাজ না মিলে তো ভিখ মাংগো। বাজারে বাজারে রাম নাম হাঁকতে চলো, আউর ভিখ মাংগতে চলো। পুনভি হোবে, ভুখভি মিটবে।

দাশুর চোখ দুটো যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে। এ কি ভয়ানক অদৃষ্টের খবর শুনিয়ে দিয়ে ঘুমের আরামে মাথা ঝুঁকিয়ে ঢুলতে শুরু করেছে সিপাহীটা! উয়ার কপালে হলুদ রং-এর কত বড় তিলক! [illegible] কিষাণের জীবনটা কি সত্যিই ভিক্ষুক হয়ে যেতে চলেছে?

দাশু কিষাণের [illegible] বুকটাও ধড়ফড় করে ওঠে; সত্যিই একটা ভিক্ষুকের নাকি সুরের চিৎকার যেন আদালতের চার-দিকের সব সোরগোলের বুক ভেদ করে উথলে উঠছে। ভীরু কুকুরের আর্তনাদের মত একটা আবেদনের ভাষা যেন কেঁউ কেঁউ করে ভিড়ের ভিতর ঘুরছে।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে থাকে দাশু, নাকি সুরের গানের মত সুর করে

ছড়া কাটছে ভিক্ষুকটা—দাতা দেবতা, দেবতা দাতা। দাতার মাথায় সোনার ছাতা।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসছে ভিক্ষুকটা, আর পথের ভিড়ের মানুষগুলির চোখের সামনে একটা টিনের কৌটা দুলিয়ে বুড়ো কুকুরের মত ধুঁকে ধুঁকে নাকিসুরের বুলি ছাড়ছে—বাবা গো বাবা। একটা পায়সা যে তুমার পানের পিক গো বাবা। দুটা পয়সা যে তুমার চা-পানির থুক গো বাবা! খোঁড়া সাধুকে একটা-দুটা পয়সা দয়া কর গো বাবা!

সড়ক থেকে নেমে আমবাগানের ভিড়ের কাছে এগিয়ে আসে ভিক্ষুকটা এবং দাশুর চোখের কাছ দিয়ে যেতে যেতে হাঁক দেয়—বাবা গো বাবা!

দাশুর পাথুরে বুকের পাঁজরগুলি যেন এক সঙ্গে ছিঁড়ে গিয়ে একটা প্রচণ্ড শব্দ ছাড়ে। —মেসো গো, তিনকড়ি মেসো!

থমকে দাঁড়ায় ভিক্ষুকটা। হাঁ, মধুকুপির তিনকড়ি মেসোই বটে। বটের আঠা আর ধুলো মাথায় মেখে বড় বড় চুলের জটা করে, গিরিমাটি দিয়ে রাঙন করে নিয়ে এক টুকরো কাপড় কোমরে জড়িয়ে, আর বুকের উপর এক মুঠো ছাই ছড়িয়ে দিয়ে সাধু সেজেছে যে তিনকড়ি; সেই তিনকড়ি দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। তারপর আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে দাশুর আরও কাছে এগিয়ে আসে।

সিপাহী গোকুল সামন্ত বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। —না না না, আসামী হয়ে রাস্তার কারও সাথে কথা বলবে না সরদার।

অর্জুন সিং চোখ মেলে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। —হাঁ হাঁ হাঁ; রাস্তে নেহি আপনা, কারও সাথে বাতচিত করবে না আসামী।

দাশু—ই আমার গাঁয়ের মানুষ বটে।

সিপাহী গোকুল সামন্ত কি-যেন ভাবে। তারপর নরম স্বরে বলে—আচ্ছা, দুটা-একটা কথা বলে নাও।

—তুমি ই কেমন দশাটি বানালে মেসো? তিনকড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে দাশুর গলার স্বরে যেন একটা রাগের ঝাঁঝ তপ্ত হয়ে ওঠে।

তিনকড়ি বলে—ফুলকিকে আর দুখ দিতে চাই না দাশু, তাই......।

দাশু—তাই ভিখমাগা হয়ে গেলে?

তিনকড়ি—হাঁ রে বাপ!

দাশু—মাসি কি বলে?

তিনকড়ি—তুমার মাসী গাঁ ছেড়েছে, কয়লাখাদে চলে গিয়েছে। আমিও গাঁ ছেড়ে দিলাম দাশু।

দাশু—মাসীর সাথে তুমিও খাদে গেলে না কেনে?

তিনকড়ি হাসে—না দাশু, আর লয়। তুমার মাসী সুখে থাকুক; আমার ভাত আমি করে খাব।

তিনকড়ির ফ্যাকাশে চোখ দুটো হঠাৎ লাল হয়ে ওঠে আর জলে ভরে যায়। তারপরেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ব্যস্তভাবে চলতে থাকে তিনকড়ি।

বাবা গো বাবা! বুড়ো কুকুরের আর্তনাদের মত শব্দটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ধুঁকতে ধুঁকতে আর টিনের কৌটা দুলিয়ে দুলিয়ে আদালত এলাকার ভিড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে দাশু।

মরেছে, তিনকড়ি মেসো মরেই গিয়েছে। গাঁ ছাড়লো আর ভিখমাগা হলো যে, তার আর মরণের বাকি কি আছে? দাশুর বুকের ভিতরের আতংকটাও যেন করুণ কষ্টের মত সিরসির করে।

দুপুর পার হতে চললো। আমবাগানের ছায়াও গরম হয়ে উঠেছে। আজও কি মামলার রায় দিবে না হাকিম? ছটফট করে দাশু কিষাণের প্রাণ। দাশুর অন্তরাত্মা যেন ভিক্ষুক হয়ে যাবার ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই মুহূর্তে কয়েদ হয়ে যেতে চায়।

জানে না দাশু, কতক্ষণ ধরে এই ভয়ঙ্কর ভাবনার মধ্যে ছটফট করতে করতে ঝিমিয়ে পড়েছিল মন; চোখ বন্ধ করে দুই হাঁটুর উপর মাথা পেতে দিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর আবার চোখ দুটো যেন একটা ব্যাকুল পিপাসায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। এদিক-ওদিক তাকায় দাশু। না, জেলে যেতে ইচ্ছে করে না; এক কটকা দিয়ে অর্জুন সিং-এর হাত থেকে কোমরের দড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে এই মুহূর্তে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

রোদ পড়ে বড়কালুর গায়ের ঝরনা চিকচিক করছে, কাছে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে। পলাশবনের ছায়ায় তিতির ডাকছে, একবার শুনে আসতে ইচ্ছে করে। জাম কাঠের ভিরজিরের কপাটের গায়ে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। ডরানির জল বড় ঠাণ্ডা! ছোটকালুর জঙ্গলের কেঁদ আর পিয়াল বড় মিঠা! সনাতনের মাদলের আওয়াজ আরও মিঠা। না, জেল যেতে চাই না কপালবাবা। তুমার দাশু কিষাণকে ছাড়া পাওয়াই দাও। দাশুর যে ঘর আছে, গাঁ আছে; দাশুর মুরলী যে একদিন এসে পড়বে; মুরলীর কাছে দাশুর ছেইলা যে আছে।

টিহা টিহা টিহা! আমবাগানের ছায়া আর বাতাস মিঠা করে দিয়ে শিউরে ওঠে একটা পাখির ডাক। চমকে ওঠে দাশুর বুক। দাশুর স্বপ্নটাকে যেন ঠাট্টা করছে পাপিহাটা। কি সর্বনাশ; ওটা কি সেই পাপিহা?

এ কি? সত্যিই যে সেই পাপিহার ডাক। তা না হলে দাশু কিষাণের এত কাছে এসে দাঁড়িয়ে আর দাশুর মুখের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠবে কেন সকালী?

বেইদানি সকালীর কালো চোখ দুটোও হাসছে। সকালীর কাঁকালে একটা ঝুড়ি। ঝুড়িতে লাল টুকটুক একগাদা পাকা তেলাকুচা। সকালীর হাতে জ্যান্ত তিতিরের একটা মালা। মধুকুপির পলাশবনের একটা বিহ্বল স্মৃতি এই আমবাগানের ছায়ার ভিতরে ঢুকে দাশুর দড়িবাঁধা কোমরের দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসছে।

—ইটা তুমার কে বটে হে সরদার? সকালীর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বিরক্ত হয়, আর প্রশ্ন করে সিপাহী গোকুল সামন্ত।

দাশু বলে—আমার কেউ নয়। কিন্তুক......।

গোকুল—কি?

উত্তর দেয় না দাশু। যেন সকালীর হাসির স্মৃতের জ্বালা সহ্য করবার জন্য মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায়।

আরও কাছে এগিয়ে আসে সকালী। —আমি তো তুমার কেউ লই; কিন্তুক মুরলী তুমার কে বটে সরদার? একবার বল শুনি। মুরলীকে নিয়ে কেমন সুখের ঘর করছ, ধরবটি একবার বল।

টিহা টিহা টিহা! আমবাগানের পাপিহা অনেক উঁচুর আকাশে আত্মহারা হয়ে পাতার আড়ালে লুটোপুটি করে আর ডাকতে থাকে।

গোকুল সামন্ত একবার অর্জুন সিং-এর মুখের দিকে তাকায়। অর্জুন সিং মাথা নেড়ে বলে—হাঁ, দু-চারঠো বাতচিত হোবে, এই তো। হোনে দেও ভাই।

গোকুল বলে—তুমরা একটুক আস্তে কথা বল সরদার।

হাতের দড়ির তিনটে পাক আলগা করে দিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে বসে অর্জুন সিং। গোকুল সামন্ত আরও একটু দূরে। সরদারটার করুণ মুখের চেহারা দেখে দুজনের আপত্তি আর সাবধানতাও যেন একটু করুণ হতে চাইছে।

ফিসফিস করে চাপা গলার স্বরে যেন একটা আক্রোশের জ্বালা দাশুর কানের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে হাসতে থাকে সকালী—যে মুরলীর লেগে আমাকে ঠকালে, সে মুরলী এখন কুথাকে আছে সরদার?

উত্তর দেয় না দাশু।

সকালী নিজেই ছুটে এসে সকালীর বুকে ছুঁয়ে নিয়ে শেষে সকালীকেই ঠেলে দিয়ে পালিয়ে গেলে সরদার? ছিয়া ছিয়া; মরদে কি মেইয়ামানুষকে এমন দুখও দেয়?

দাশু—আমার দোষ হইছে সকালী। মাপ করবে কি?

হেসে ফেলে সকালী—তুমি মুরলীকে চিনেছ কি?

—চিনেছি।

—উয়াকে ঘিন্না করেছ কি?

চমকে ওঠে, আর বোবা বোবার মত শব্দে ঠোঁট নাড়ে দাশু। সকালীর মুখের দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকে।

সকালী হাসে—বল সরদার। আমার বেইদা হতে ইচ্ছা হয় কি?

দাশু কিষাণের মাথার রক্তে একটা নেশার স্মৃতি চন্‌চন্‌ করে ওঠে। বুকের উপর একটা নম্র কোমলতার স্মৃতি তপ্ত হয়ে ওঠে। চোখের উপর স্বচ্ছ জলের তরলতা দিয়ে গড়া একটা মধুরতার ছবি টলমল করে।

সকালী বলে—কিসের গাঁ, কিসের ঘর আর কিসের বিহা সরদার? সব ভুলে যাও। আমার সাথে থাক। আমার বেইদা হয়ে মন ভরে সুখ কর। আমি তুমাকে ভাত দিব, কাপড় দিব, হাঁড়িয়া দিব। যেদিন ইচ্ছা হবে চলে যেও, ইচ্ছা হয় তো সকালীকে টু'টি চিপে মেরে রেখে চলে যেও।

—সকালী! আস্তে বলতে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে দাশু।

কিন্তু সেই মুহূর্তে আদালতের বারান্দার উপর এসে হাঁক দিয়েছে পিয়াদা। দাশু আসামীর মামলার হাঁক।

একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সিপাহী গোকুল সামন্ত আর অর্জুন সিং। —বস্‌, আর বাতচিত হোবে না, খবরদার! দাশুর কোমরের দড়ি ধরে টান দেয় অর্জুন সিং।

ঝুড়ির তেলাকুচা সরিয়ে শালপাতায় মোড়া একটা বস্তু বের করে কাতরভাবে মিনতি করে সকালী—একটুক সবুর করেন সিপাহীজী।

—উটা কি বটে? চোখ বড় করে তাকায় গোকুল সামন্ত।

সকালী—মকাই-এর দুটো মোয়া বটে। সরকারকে মোয়া দুটো খেয়ে নিতে দাও সিপাহীজী।

—আরে না! খবরদার। ধমক দেয় অর্জুন সিং।

আমবাগানের ছায়ার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সকালী। ব্যস্তভাবে হে'টে দড়ি-বাঁধা কোমর নিয়ে আদালত ঘরের দিকে চলে যাচ্ছে সরদারের যে পাথুরে ছাঁদের চেহারাটা, সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাকালের ঝুড়ির দিকে তাকায় সকালী। লাল হয়ে ওঠে আর চিকচিক করে সকালীর কালো চোখ। বোধ হয় টুকটুকে লাল পাকা তেলাকুচার ছায়া পড়েছে সকালীর চোখে।

আদালত এলাকার ভিড় বেশ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। বিকালের আমবাগানের ছায়া বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু চলে যায় না, আর সঙ্গেও যায় না সকালী। এক ঠায় দাঁড়িয়ে আদালত ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

টং-টং করে চারটে ঘণ্টা বাজলো।

আদালত ঘর থেকে বের হয়ে আসছে দাশু। দড়িবাঁধা কোমর নিয়ে ব্যস্তভাবে হে'টে হে'টে এগিয়ে আসছে। দাশুর কোমরের দড়ি শক্ত করে ধরে আছে অর্জুন সিং। গোকুল সামন্ত প্রকাণ্ড লাঠি ঘাড়ে তুলে আর দাশুর প্রায় গা ঘে'ষে ঘে'ষে মচ্‌মচ্‌ করে হে'টে আসছে।

সকালীর হাতে মকাই-এর মোয়া দুটো কে'পে ওঠে। সকালীর চোখের কাছ দিয়েই যেতে যেতে হেসে ওঠে দাশু—তিন বছর কয়েদ হলো সকালী। ফিরে আসি, তারপর তুমার মোয়া যদি খাওয়াতে চাও...।

অর্জুন সিং হাঁকে—খবরদার, আর বাতচিত নেহি।

টিহা টিহা টিহা! আবার ডেকে ওঠে পাপিহাটা! (ক্রমশ)

স্বরবিতান

রবীন্দ্রনাথ-বিরচিত যাবতীয় স্বদেশী গানের স্বরলিপি
স্বরবিতান ৪৬ ও ৪৭ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

॥ সূচী ॥

॥ মূল্য যথাক্রমে তিন টাকা ও সাড়ে তিন টাকা ॥

¶ স্বরবিতান এযাবৎ ৫২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। চিঠি লিখলে সম্পূর্ণ তালিকা পাঠানো হয়।

¶ বসন্ত (৬), ফাল্গুনী (৭), প্রায়শ্চিত্ত (৯), তাসের দেশ (১২), নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৭), নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (১৮), নৃত্যনাট্য শ্যামা (১৯), কালমৃগয়া (২৯), অরূপরতন (৪২), মায়ার খেলা (৪৮), বাল্মীকি-প্রতিভা (৫১) প্রভৃতি নাটকের যাবতীয় গানের স্বরলিপি স্বরবিতানের এক-একটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে—কোন্ খণ্ডে কোন্ নাটকের গানের স্বরলিপি আছে তা বন্ধনীমধ্যে সংখ্যাদ্বারা নির্দিষ্ট।

¶ কাঙ্গালীচরণ সেনের 'ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি' গ্রন্থের ছয় ভাগে রবীন্দ্রনাথের যে-সকল গানের স্বরলিপি ছিল, বর্তমানে তার অধিকাংশ 'স্বরবিতান'-গ্রন্থমালায় পাওয়া যাবে। যথা—

স্বরবিতানের চতুর্থ খণ্ডে ৫০টি, দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ, চতুর্বিংশ, পঞ্চবিংশ ও ষড়্‌বিংশ খণ্ডের প্রত্যেকটিতে ২৫টি এবং সপ্তবিংশ খণ্ডে ১৯টি স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে।

তা ছাড়া সপ্তবিংশ খণ্ডে 'বৈতালিক'-গ্রন্থের ৫টি ব্রহ্মসংগীত ও 'আমি সংসারে মন দিয়েছিনু'-গানের স্বরলিপি ছাপা হয়েছে।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

১

আবির্ভাব কাল

মহেন-জো-দড়োতে মাটি খুঁড়ে যেসব জিনিস পাওয়া গিয়েছে তার থেকে জানা যায় যে, সে-যুগে ভারতবাসী কাচ তৈরি করতে জানত, কয়েকটি ধাতুকে পরিষ্কার করতে পারত। এ প্রায় তিন হাজার বছর আগের কথা।

পণ্ডিতবর ম্যাকডোনেল তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লিখছেন—

In science, too, the debt of Europe to India has been considerable. There is, in the first place, the great fact that Indians invented numerical figures used all over the world. The influence which the decimal system of reckoning dependant on these figures has had not only on mathematics but also on the progress of civilization in general, can hardly be overdestimated.

কিমিয়া-বিদ্যা (alchemy) হল রসায়নবিদ্যার পূর্বগামী। অথর্ববেদের সময় থেকে চরক সুশ্রুতের কাল অবধি এই কিমিয়া-বিদ্যা ভারতবর্ষে বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে আসছিল। এই বিদ্যায় নাগার্জুন ছিলেন সর্বপ্রধান ব্যক্তি। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে রসায়নবিদ্যা যতদূর এগিয়েছিল ইউরোপের কোনও দেশ তখন অবধি তার কাছে যেতে পারেনি। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দেখিয়েছেন যে সে-সময় বিজ্ঞান অনুশীলনের বহুক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। জগদ্‌বিখ্যাত গণিতবিৎ ভাস্করাচার্যের আবির্ভাব দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

কিন্তু ওই দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ভারতবর্ষে এক অন্ধকারময় যুগ দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বন্ধ হল, বিজ্ঞান অনুশীলনের ধারা ক্ষীণ হয়ে এল। এর মূলে কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। বিদেশী কর্তৃক ভারতবর্ষ বারবার আক্রান্ত হল, ফলে দেশে শান্তির অভাব [illegible]। অন্যদিকে নব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের [illegible] হল, [illegible] সেকালের বৌদ্ধ বিহার-বিদ্যায়তনগুলি [illegible] হয়ে এল। সেগুলি ছিল বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। কারণ যাই হোক, [illegible] সে-ভারত বিজ্ঞান আলোচনায় জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তার আর সে-স্থান রইল না।

যে যুগে এদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ভাঁটা এল পাশ্চাত্ত্য দেশে সেই সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বন্যা বয়ে যেতে থাকল। সে-সময় জন্মালেন গ্যালিলিও যাঁর আবিষ্কৃত দূর-বীক্ষণ ব্রহ্মাণ্ডের কত না রহস্য পৃথিবী-বাসীর কাছে উদ্ঘাটিত করতে থাকল। জন্মালেন ভল্টা যাঁর আবিষ্কৃত তাড়িৎস্রোত আজ পৃথিবীর রূপকে একেবারে বদলে দিয়েছে; রসায়নবিদ্যার জনক ল্যাভোয়াসিয়ে জন্মগ্রহণ করেন এই সময়ে; আর এই সময় আবির্ভূত হলেন নিউটন, সকল দেশের সকল কালের সকল বিজ্ঞানীর মধ্যে যাঁর আসন সর্বোচ্চে। ইউরোপের নানা জায়গায় কত মনীষী বিজ্ঞানের ভাণ্ডার পুষ্ট করতে থাকলেন। কয়েক শতাব্দী চলে গেল, তার-পর ইংরেজ এদেশে এল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেশের চিন্তার ধারা এদেশে আনল না।

১৭৮৪ সালে উইলিয়াম জোন্স এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করলেন। গবেষণামূলক সুচিন্তিত প্রবন্ধ ওই সোসাইটি প্রকাশ করতে থাকল। কিন্তু তার পরিসর সীমাবদ্ধ রইল।

রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় ১৮১৬ সালে কলকাতায় সবপ্রথম একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হল যেখানে

জন্ম—৩০ নভেম্বর, ১৮৫৮ শততম জন্মদিন—৩০ নভেম্বর, ১৯৫৭

এদেশের ছেলেরা ইংরেজি ও বাংলায় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে পারে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুরে একটি কলেজ স্থাপন করলেন। এদেশে এইভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের সূচনা হল। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের শিক্ষাদান আরম্ভ হল।

মৌলিক গবেষণা ব্যাপারে দীর্ঘকালব্যাপী অন্ধকারের পর এদেশে ঊষার নবারুণরেখা দেখা দিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। এসম্বন্ধে গৌরবময় অতীতের সঙ্গে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের যোগসূত্র যাঁরা স্থাপন করলেন জগদীশচন্দ্র বসু তাঁদের অগ্রণী।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের মৌলিক গবেষণা যখন প্রকাশিত হল তখন ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি কর্নু লিখেছিলেন—

"আপনার আবিষ্ক্রিয়া দিয়ে আপনি বিজ্ঞানকে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছেন। দু'হাজার বছর আগে আপনার পূর্বপুরুষ মানবসভ্যতার অগ্রণী ছিলেন, তাঁরা বিজ্ঞানে ও কলাবিদ্যায় জ্ঞানের তীব্র আলো জগতের সামনে প্রজ্বলিত করেছিলেন। আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের গৌরবকীর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করুন।"

জগদীশচন্দ্রের অপূর্ব আবিষ্ক্রিয়া যখন বৈজ্ঞানিক জগৎ স্বীকার করে নিল তখন অধ্যাপক র‍্যামজে জগদীশচন্দ্রকে বলেছিলেন, আপনি ব্যতিক্রম; একটি কোকিলের ধ্বনিতে বসন্তের আগমন সূচিত হয় না।

সেদিন স্পর্ধার সঙ্গে জগদীশচন্দ্র উত্তর দেন,—আমি নিশ্চয় বলছি,—অচিরে ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে শত শত কোকিল বসন্তের জয়গান করবে।

সেদিন এসেছে। আজ ভারত শুধু দ্রষ্টা হিসেবে দাঁড়িয়ে নেই, একটা বৈজ্ঞানিক জাতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

জগদীশচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন ৩০ নভেম্বর, ১৮৫৮ সাল। তাঁর শততম জন্মদিন আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি।

২

বাল্যকাল

জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু সে সময়কার একজন খ্যাতনামা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের শৈশব-কাল ফরিদপুরে কাটে, তখন ফরিদপুরে তাঁর পিতার কর্মস্থল ছিল।

তখনকার দিনে চোরডাকাতদের উৎপাত খুব প্রবল ছিল আর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রধান কাজ ছিল তাদের দমন করা। ফরিদ-পুরে ভগবানচন্দ্র অনেক ডাকাত-সর্দারকে গ্রেপ্তার করেন, আর সেজন্য তাঁকে অনেকবার নানারকমের বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

ভগবানচন্দ্র চোরডাকাতদের রীতিমতো শাস্তি দিতেন, কিন্তু তাঁর হৃদয়টা ছিল করুণায় ভরা। একদিন এক নামকরা ডাকাত-সর্দার জেল থেকে বেরিয়ে ভগবান-চন্দ্রের কাছে এসে বললেন,—এখন আমি কি করে খাব? কেউ তো আমাকে চাকরি দেবে না। ভগবানচন্দ্র বললেন,—আমার কাছে চাকরি কর, আমার ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দেবে আর বিকেলে বাড়ি আনবে। ভূতপূর্ব ডাকাতসর্দার কাজে বহাল হল। বালক জগদীশচন্দ্র তাঁর কাঁধে চড়ে প্রত্যহ স্কুলে যেতো ও বাড়ি ফিরত। ডাকাত তার বীরত্বের কাহিনী বলে যেত, কি করে তার দল মশাল জেলে নিদ্রিত গ্রামবাসীর উপর পড়ত, মাঝে মাঝে গ্রামবাসীরা বাধা দিত, তারপর দু'দলে লড়াই লেগে যেত। বালক জগদীশচন্দ্র একাগ্রচিত্তে এসব কাহিনী শুনত, বারবার শুনত, আর মুগ্ধনয়নে লক্ষ্য করত, ডাকাতের বুকে হাতে পায়ে তীর ও বর্শার চিহ্ন এখনও লোপ পায়নি।

একবার এক ছুটিতে ভগবানচন্দ্র সপরি-বারে তাঁর দেশের বাড়িতে যাচ্ছেন। নৌকার পথ, অনেক দূর যেতে হবে। যেতে যেতে লক্ষ্য করলেন, তীরবেগে একখানা নৌকা তাঁর নৌকার দিকে ছুটে আসছে, সে নৌকার মাঝিমাল্লা অনেক। এটা যে ডাকাতের নৌকা তা বুঝতে বাকি রইল না। এদের হাত থেকে আর উদ্ধারের উপায় নেই। কিন্তু ভগবানচন্দ্র দেখলেন তাঁর পোষা ডাকাতটি হঠাৎ লাফ দিয়ে নৌকার ছাতে উঠল আর সোজা দাঁড়িয়ে একরকম বিকট চীৎকার করতে লাগল। দেখতে দেখতে ওই নৌকাখানা মোড় ফিরে চলে গেল।

জগদীশচন্দ্রের বয়স যখন ছয় তখন তার জন্যে এক টাট্টু ঘোড়া কেনা হয়। অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে বালক ওই ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে লাগল। একদিন এক মজার ব্যাপার ঘটল। ফরিদপুর শহরে এক ঘোড়দৌড় হবে, অনেক ঘোড়সওয়ার উপস্থিত হয়েছে। বালক জগদীশচন্দ্র তার টাট্টু চড়ে ঘোড়দৌড় দেখতে এসেছে। দর্শকদের মধ্যে একজন রহস্য করে বলল খোকা, তুমিও দৌড়ও। খোকা গম্ভীরভাবে এ প্রস্তাব গ্রহণ করল, আর ঘোড়দৌড় যখন আরম্ভ হল খোকাও তার টাট্টুকে ছুটিয়ে লাগল। ছোটো পা-দুখানি দিয়ে জিন চেপে ধরেছে, দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে, দৃক্‌পাত নেই, খোকা আনন্দে মশগুল হয়ে দৌড়চ্ছে। শেষে বিরাট জনতার বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে খোকা ফিরে এল, অবশ্য সবার পিছনে, কিন্তু মনের ভাব যেন সে-ই বাজিমাৎ করে ফিরে এসেছে। দেহের ক্ষতের কথা কিছু বলল না, শেষে লোকে যখন দেখল রক্ত ঝরছে তখন তারা সঙ্গে করে নিয়ে খোকাকে বাড়ি পৌঁছে দিল।

ফরিদপুরে তখন দুটি স্কুল ছিল, একটি গভর্নমেণ্ট স্কুল, সেখানে ইংরেজি পড়ান হয়, আর একটি সেখানকার সাধারণ লোকের ছেলেদের শিক্ষার জন্য বাংলা স্কুল। এই বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ভগবানচন্দ্র বসু। ভগবানচন্দ্রের বন্ধুর ছেলেরা এমন কি তাঁর কাছারির আমলাবর্গের ছেলেরাও ইংরেজি স্কুলে পড়ত। কিন্তু ভগবানচন্দ্র তাঁর নিজের ছেলেকে বাংলা স্কুলে পাঠালেন। তিনি

বলতেন যে ইংরেজি শেখানর আগে প্রত্যেক ছেলেকে তার মাতৃভাষা আয়ত্ত করান উচিত। তাছাড়া একটা কথার উপর তিনি জোর দিতেন যে প্রত্যেক ছেলে দেশের উচ্চনীচ ধনী-দরিদ্র সব রকম ছেলের সংগে মিশবে। এই বাংলা স্কুলে জগদীশচন্দ্রের সহপাঠী ছিল জেলের ছেলে, চাষীর ছেলে। জগদীশ-চন্দ্র তাদের কাছ থেকে জলজন্তুর কথা, গাছ-পালার কথা শুনে যেতেন।

বাল্যকালে জগদীশচন্দ্র বিশেষ উৎসাহের সংগে রামায়ণ মহাভারত পড়তেন। ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি বলতেন,—রাম ও বিশেষভাবে লক্ষণের চরিত্র মহৎ, কিন্তু অতিমাত্রায় মহৎ; আমাকে অভিভূত করে কর্ণের চরিত্র। কর্ণের চরিত্রের কথা বলতে বলতে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন,—এই কর্ণ, বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ, পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ কর্ণ, তারই তো সম্রাট হবার কথা; কিন্তু সম্রাটের চেয়েও বড়ো এই কর্ণ! জগদীশচন্দ্র বলতেন—কর্ণের জীবনব্যাপী ব্যর্থতা ও পরাজয় শিশুকাল থেকে আমার মনকে আঘাত দিত। কর্ণের সেই কথা, 'আমি সূতই হই আর সূতপুত্রই হই, আমার জন্ম আমার দৈবাধীন কিন্তু আমার পৌরুষ আমার নিজের' চিরদিন আমার প্রাণে প্রেরণা জাগিয়েছে। তিনি বলতেন,—কর্ণের কথা ভাবলে আমার পিতৃদেবের কথা মনে পড়ে। দেশবাসীর উন্নতির জন্যে কত না আশা তিনি করেছেন, কিন্তু জীবনের শেষভাগে দেখলেন যে তাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থ! হয়ত একথা তাঁর জীবনে খাটতে পারে, কিন্তু সেই ব্যর্থতার ফলে বহু জীবন সার্থক হয়েছে। তাঁর জীবন থেকে শিখেছিলুম যে সার্থকতাই ছোটো, বিফলতাই বড়ো! ফল ও নিষ্ফলতার মধ্যে তফাত যখন ভুলতে শিখলুম তখন থেকেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হল।

৩

শিক্ষা ও শিক্ষকতা

সেণ্ট জেভিয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে জগদীশচন্দ্র ওই কলেজে প্রবেশ করলেন। চার বছর পরে সেখান থেকে বি-এ উপাধি নিয়ে বার হলেন। সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী ফাদার লাফোঁ তখন সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন জগদীশচন্দ্র ছিলেন তাঁর প্রিয়তম ছাত্র।

বি-এ পাস করবার পর জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা হল বিলাত যাওয়া ও সেখানে গিয়ে আই-সি-এস পরীক্ষা দেওয়া। তখনকার দিনে জজ ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সকলের কাম্য ছিল। কিন্তু তা ছাড়া একটা সাংসারিক ব্যাপারও ছিল।

১৮৮০ সালে বাংলাদেশে এক ভীষণ মন্বন্তর দেখা দেয়। চারদিকে লোক অনা-হারে মরছে; সরকার থেকে বিভিন্ন জায়গায় সাহায্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে। ভগবানচন্দ্রের উপর তদারকের ভার পড়ল। কিছু চিঁড়ে ও ছাতু নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ভগবানচন্দ্র উদয়াস্ত ঘুরছেন। নিজেও আধপেটা খান। প্রতিবেশীরা যখন অনাহারে তখন তিনি পেট ভরে খেতে ঘৃণাবোধ করতেন। অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ল। তিনি দু'বছরের ছুটি নিলেন। মাইনে কমে গেল। এদিকে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি চেষ্টায় তাঁর সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়েছে, তাছাড়া তিনি কিছু ঋণগ্রস্ত হয়েছেন।

ঠিক এই সময় জগদীশচন্দ্র বি-এ পাস করলেন ও তাঁর বিলেত যাবার কথা উঠল। পিতার এই অর্থকষ্টে তাঁকে কিছুদিন পরে সাহায্য করতে পারবেন এই মনে করে জগদীশচন্দ্র আই-সি-এস পড়তে ইচ্ছুক হলেন। ভগবানচন্দ্র বললেন,—না, তুমি বিদ্যাশিক্ষা করতে পাশ্চাত্ত্য দেশে যাও, কিন্তু আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে নয়। জগদীশচন্দ্র চিকিৎসাবিদ্যার কথা বললেন, পিতা সম্মত হলেন। কিন্তু খরচ তো অনেক! জগদীশচন্দ্র অনেক ভেবে এদেশে থেকে কিছু করবেন স্থির করলেন। একদিন রাত্রে জননী সন্তানের কাছে এসে বললেন, তুমি নিজেকে আরও বেশি শিক্ষিত করতে চাচ্ছ, তোমার সে-ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করাব; আমার নিজের কিছু টাকা আছে, গায়ের গহনাও সব রয়েছে, তুমি যাবার ব্যবস্থা কর। যাওয়া স্থির হল, গহনা বিক্রয় করতে হল না, ভগবানচন্দ্রের শরীর ভালো হয়ে গেল, তিনি চাকুরীতে যোগ দিলেন।

জগদীশচন্দ্র যাত্রা করলেন। তখন তাঁর মাঝে মাঝে জ্বর হত। একদিন জাহাজে অবসন্ন হয়ে পড়ে গেলেন। জাহাজে শুয়ে শুনতে পেলেন পাশের কামরায় লোকেরা বলাবলি করছে, এ ছেলে ইংলণ্ডে পৌঁছলে হয়।

যা হোক ভগ্নদেহ নিয়ে তিনি লণ্ডনে পৌঁছলেন। চিকিৎসাবিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। কিন্তু জ্বর মাঝে মাঝে চলতে লাগল। চিকিৎসকেরা বললেন যে মেডিক্যাল কলেজের পরিশ্রম অত্যন্ত বেশি, সে তাঁর সহ্য হবে না; অন্য কিছু পড়তে উপদেশ দিলেন। একটা বছর বৃথাই গেল। তিনি লণ্ডন ছেড়ে কেম্ব্রিজে পড়তে গেলেন। ওষুধপত্র ছেড়ে দিয়ে এখানে তিনি প্রত্যহ দাঁড় টানতে লাগলেন। স্বাস্থ্য ভালো হল, জ্বরটা আস্তে আস্তে চলে গেল।

কেম্ব্রিজে তিন বছর থেকে বিজ্ঞানে ট্রাই-পোস পাস করলেন আর অল্পদিন পরে লণ্ডনের বি-এস-সি উপাধিও পেলেন। এখন তিনি দেশে ফেরবার আয়োজন করতে লাগলেন।

সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু ছিলেন ভগবানচন্দ্রের বড়ো জামাই। অর্থ-নীতিবিশারদ ফসেট-এর সংগে আনন্দ-মোহনের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। ফসেট জগদীশচন্দ্রের হাতে লর্ড রিপনকে একখানি পরিচয়পত্র দিলেন। ভারতবর্ষে পৌঁছেই জগদীশচন্দ্র লর্ড রিপনের সংগে সাক্ষাৎ

করলেন। শিক্ষা বিভাগে একটি চাকরী দিবেন বলে লর্ড রিপন জগদীশচন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এখন জগদীশচন্দ্র শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের সংগে দেখা করলেন। এর আগেই ডিরেক্টর বাহাদুর জগদীশচন্দ্র বসুকে নিয়োগ করবার জন্য বাংলা সরকারের কাছ থেকে লর্ড রিপনের চিঠি পেয়েছেন। পেয়ে যে খুব খুশি হয়েছেন, বলা যায় না। জগদীশ-চন্দ্র দেখা করলে তিনি বললেন—এখন আই-ই-এস-এ কোন পদ খালি নেই, বি-ই-এস-এ একটি পদ নিন। জগদীশচন্দ্র বি-ই-এস-এ পদ নিতে অস্বীকার করে চলে এলেন। কিছুদিন গেল। লর্ড রিপন যখন জগদীশচন্দ্রের নিয়োগ গেজেটে দেখতে পেলেন না তখন তিনি বাংলা সরকারকে এই বিলম্বের কৈফিয়ত চাইলেন। এবার ডিরেক্টর বাহাদুর অস্থায়ীভাবে জগদীশচন্দ্রকে আই-ই-এস-এ নিয়োগ করলেন।

১৮৮৪ সালে জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হলেন। তখনকার দিনে আই-ই-এস-এ একজন ভারতবাসী একজন সাহেবের মাইনের দুই-তৃতীয়াংশ পেতেন। চাকরী নেবার পর জগদীশচন্দ্র আর একটা নিয়মের কথা শুনলেন; চাকরী পাকা না হলে এই কম মাইনেরও অর্ধেক দেওয়া হয়। তিনি প্রতিবাদ করে চিঠি লিখলেন, তাঁর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হল। তিনি অধ্যাপনা করতে লাগলেন কিন্তু কম হারে মাইনে নিলেন না।

এইরকম অবস্থায় পুরোপুরি তিনটে বছর কাটল। পিতা ঋণগ্রস্ত, নিজে চাকরী করেন অথচ বেতন পান না। তিন বছর পরে নিয়োগের প্রথম দিন থেকে তাঁকে চাকরীতে পাকা করা হল। একসংগে তিন বছরের বেতন পেলেন। পিতৃঋণ সব শোধ হল।

কিন্তু একই চাকরীতে ভারতীয় ও বিদেশীয়দের মধ্যে বেতনের তারতম্য, ভারতীয় হলে দুই-তৃতীয়াংশ পাবে, এই অমর্যাদাকর ব্যবস্থা তখনও রয়ে গেল। এ দূর করতে জগদীশচন্দ্রকে অনেক চেষ্টা করতে হয়েছিল। বহুদিন পরে তাঁরই চেষ্টার ফলে তাঁর দেশবাসীর এ অসম্মান দূরীভূত হল।

৪

আবিষ্কার—বৈদ্যুতিক তরঙ্গ

রেডিও নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাঁরা জানেন যে কলকাতা থেকে সাধারণ প্রোগ্রাম প্রচারিত হয় ৩১, ৪১, ৩০০ ও ৪৪৭ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলতে কি বুঝব?

একটু গোড়া থেকে ধরা যাক। আমাদের শব্দের যে অনুভূতি তা ঘটে বায়ুর কম্পনের জন্যে। সেকেণ্ড-প্রতি কম্পন-সংখ্যা যত বেশি হয়, সুর ততই চড়া হয়; কম্পন-সংখ্যা বেড়ে বেড়ে যখন সেকেণ্ডপ্রতি ত্রিশ চল্লিশ হাজার হয় তখন বায়ুর সেই কম্পন আর আমাদের মনে শব্দের অনুভূতি জাগায় না। নিচের দিকে ত্রিশ বত্রিশের কম হলেও আমরা তা শব্দ বলে অনুভব করি না। আমাদের আলোকের অনুভূতিও কম্পনজনিত, কিন্তু সে কম্পন বায়ুর নয়। বিজ্ঞানীর এক কল্পনা হল যে জগৎময় আকাশ ব্যাপ্ত হয়ে ঈথর বলে একটা কিছু আছে। সেই ঈথারে তরঙ্গ তোলা যায়। সেই ঈথর-তরঙ্গ আমাদের চোখে পড়ে আলোর অনুভূতি জাগায়। কিন্তু বায়ুর সকল রকমের কম্পন যেমন আমাদের শব্দের অনুভূতি দেয় না, তেমনি ঈথারের সকল রকমের ঢেউ আমাদের কাছে আলো বলে প্রতিভাত হয় না। সেকেণ্ডে চার শ লক্ষ কোটি কম্পন হলে আলো লাল মনে হয় এবং এর দ্বিগুণ সংখ্যার কম্পন বেগুনী আলোর রূপ নেয়, অন্যান্য আলোর কম্পন-সংখ্যা এই দুই সীমার মধ্যে। সেকেণ্ডে কিলো-সাইকেল্স হিসেবে যেটা প্রকাশ করা সেটা হল কম্পন সংখ্যা। কম্পন সংখ্যার পরিবর্তে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হিসেবেও প্রকাশ করা যায়। দৈর্ঘ্য হল দুটি পর পর তরঙ্গের মাথার মধ্যে দূরত্ব।

হার্ৎজ নামে জার্মানীর এক বিজ্ঞানী তড়িতের সাহায্যে ঈথর-তরঙ্গ উৎপন্ন করলেন। সে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কয়েক গজ। কিন্তু এ তরঙ্গ তো চোখে দেখা যাবে না; এই অদৃশ্য আলোকের অস্তিত্ব তবে কিভাবে জানা যাবে? হার্ৎজ ওই রকম ঈথর-তরঙ্গ ধরবারও এক ব্যবস্থা করলেন। বিজ্ঞানের এক নতুন দিক হার্ৎজ খুলে দিলেন। কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হবার আগে তিনি মারা গেলেন। পরের অধ্যায় যাঁরা আরম্ভ করলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হলেন জগদীশচন্দ্র।

হার্ৎজের যন্ত্র থেকে যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বেরুত তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ছিল খুব বেশি, আর বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরবার যে ব্যবস্থা হার্ৎজ করেছিলেন তা মোটেই সূক্ষ্ম রকমের ছিল না, একটু দূরে রাখলে তাতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরা যেত না।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করতে করতে জগদীশচন্দ্র হার্ৎজ-প্রবর্তিত যন্ত্রের উন্নতিসাধন করলেন। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে যন্ত্র নির্মাণের কারখানা বলে কিছু নেই। ঠিকে মিস্ত্রী লাগিয়ে নিজে খেটে ১৮৯৪ সালে তিনি এক যন্ত্র তৈরি করলেন যা দিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ণীত হতে থাকল। এই সকল তথ্য পাশ্চাত্ত্য দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় যখন প্রকাশিত হতে রইল তখন সেখানকার বিজ্ঞানমণ্ডলী

চমৎকৃত হলেন। জগদীশচন্দ্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস-সি পাস করেছিলেন, তাঁর ওইসব গবেষণার জন্য ওই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-এস-সি উপাধি দিলেন।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধরবার যে অংশ জগদীশচন্দ্র নির্মাণ করলেন, যাকে কৃত্রিম চোখ বলা যেতে পারে, তার উপর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পড়লে একটা তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়, যন্ত্রের একটা কাঁটা ঘুরে যায়। কিন্তু তড়িৎ-স্রোত কাঁটা না ঘুরিয়ে একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা তো বাজাতে পারে, বারুদের স্তূপে আগুনে ধরাতে পারে। দেখা গেল ইট-পাটকেলের মধ্যে দিয়েও এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চলে যায়; তা হলে মাঝের দেওয়াল ভেদ করে তো পাশের ঘরে যেতে পারে; আর জগদীশচন্দ্রের তৈরী কৃত্রিম চোখ তো খুবই কার্যকর, অত দূরে থাকলেও নিশ্চয় তা সাড়া দেবে। ১৮৯৪ সালে নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি এক পরীক্ষার আয়োজন করলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ঘর থেকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ছুটল, মাঝের দরজা বন্ধ, সে দরজা রক্ষা করছেন তাঁর পূর্বতন অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ; ঘর ভেদ করে ওই ঘরের পরের ঘর যেখানে পেডলার সাহেব বসতেন, সেই ঘরে পৌঁছল, পৌঁছে ওই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ একটা পিস্তল ছুঁড়ল।

পৃথিবীতে বিনা তারে বার্তা প্রেরণের এই হল সূচনা।

এ বিষয়ে তিনি যে মার্কনির পূর্বগামী তা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়েছে অধ্যাপক লাফোঁর এক চিঠিতে। তিনি লিখছেন—

My dear Jagadish,

I would like to give a public lecture at St. Xavier College Hall on "Telegraphy without wires", but as the instruments you so kindly gave me are not in working order and as I would like to take this opportunity to vindicate your rights to priority over Marconi, would you assist me in my lecture with your presence and work your own instruments. Let me know as soon as possible as I intend inviting the Lieutenant Governor . . .

Very sincerely yours
E. Lafont, SJ.,

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার-কাহিনী সমস্ত জগতে প্রচারিত হল। ১৮৯৫ সালে বাংলার লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জির উপস্থিতিতে জগদীশচন্দ্র যে পরীক্ষা দেখালেন তাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দুটি রুদ্ধ-ঘর ভেদ করে ৭৫ ফিট দূরে তৃতীয় ঘরে পৌঁছল, আর সেখানে একটা লোহার গোলা ফেলল, পিস্তল আওয়াজ করল, বারুদস্তূপ উড়িয়ে দিল। ওই সালে ইংলণ্ডের ইলেকট্রিসিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত হল,—বর্তমান সময়ে বিনা তারে বার্তা প্রেরণে যতগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত যন্ত্র তাদের সকলকে হটিয়ে দিল।

বাইরে জগদীশচন্দ্রের কাজ প্রশংসিত হওয়ায় বাংলার লাট সাহেবের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হল। তিনি জগদীশচন্দ্রের জন্যে এক নতুন পদের সৃষ্টি করতে সংকল্প করলেন। এ পদের মাইনে হবে বেশি, কাজ হবে গভর্নমেণ্টের অধীন কলেজগুলির বিজ্ঞানাগার ভালোভাবে গঠিত করা, আর প্রেসিডেন্সী কলেজে অল্পসংখ্যক ছাত্রকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্ররোচিত করা। সমস্ত ঠিকঠাক, জগদীশচন্দ্রকে মুখে কথাটা জানানো হল, বলা হল তিনি শীঘ্রই সরকারী চিঠি পাবেন।

কিন্তু এরপর একটা ঘটনা ঘটল যাতে অতদূর এগিয়ে যাবার পরও ব্যাপারটা একেবারে বাতিল হয়ে গেল। জগদীশচন্দ্র তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য, অবশ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় সরকারী কর্মচারীরা যেদিকে ভোট দিলেন জগদীশচন্দ্র তার বিরুদ্ধ দিকে ভোট দিলেন। কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক সভায় উপস্থিত থাকবার জন্যে আর উপস্থিত থেকে সরকারী পক্ষে ভোট দেবার জন্যে তাঁকে জানানো হল। জগদীশচন্দ্র সভায় উপস্থিত হলেন না। তাঁর কৈফিয়ত তলব করা হল। তিনি উত্তর দিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে তাঁর বিবেকের বিরুদ্ধে সরকারের আদেশ মতো যদি ভোট দিতে হয় তবে যত শীঘ্র সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ থেকে তাঁকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। ব্যাপারটা লাট সাহেবের গোচরে আনা হল। লাটসাহেব জগদীশচন্দ্রের যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করলেন। কিন্তু তিনি শিক্ষা-বিভাগের বাধার বিরুদ্ধে জগদীশচন্দ্রকে নতুন পদে নিযুক্ত করতে পারলেন না। লাট সাহেব ছ'মাসের জন্যে জগদীশচন্দ্রকে পাশ্চাত্ত্য দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিলেন। স্পেকটেটর, টাইমস্ প্রভৃতি পত্রিকা তাঁর কৃতিত্বের ঘোষণায় মুখরিত হল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে,
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত-সভায়।
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে।
সে ধ্বনি গভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হয়ে সিন্ধুপার।
আজি মাতা পাঠাইছে অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎসভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাতঃ।
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে।

(ক্রমশ)

অমৃতস্য পুত্রাঃ

শিবরাম চক্রবর্তী

ছোট্ট খোকন বাবার মতন খড়ম পরে হাঁটে—
বাবার খড়ম পায়।
গুড়ুক গুড়ুক গুড়ুক করে
বাবার হুঁকো খায়।
ভালো মোটেই লাগে না তার তেমন,
বাবার মত হুঁকো টানার তবু মজা এমন,
চিলিম আদৌ না থাকলেও মাথায়!

বাবার মতই বই পড়ে সে,
কথা বলে বাবার মত করে';
বাবার লাঠি হাতে নিয়ে ঘোরে
বাবার মতন সবাইকে শাসায়।

সারা রাত তার মায়ের কোলে কাটে;
সারাটা দিন বাবার ভূমিকায়।
আর কেবলি ভাবে,
কেমন করে বাবার খাটের নাগাল সে যে পাবে,
পায়াগুলো এমনি উঁচু হায়!
তাকিয়ে দ্যাখে বাবার তাকিয়ায়।
কবে সে যে ঠেস দেবে তার গায়,
কবে সে যে গা গড়াবে, উঠবে বাবার খাটে॥

জানালা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

॥ রোমান ॥

উঠোনের মতো ছোট ন্যাড়া মাঠে ছোট টালি-ঘর।
দেখি এককণা গেঁয়ো সেকেলে শহর।
বউটি কে আনলে এখানে—
উঠোনে উদোম গায়ে আসে বারেবারে,
এটা-ওটা করেঃ
শখানো কাপড় কাচে শানে,
শুকোয় চিকনো মোটা খুঁটি-বাঁধা তারে,
শুনিনে, হয়ত গুন্‌গুন্‌ গানও ধরে;
কখনো বা একঝাঁক বাসন ঝিকিয়ে তুলে' মাজে।
রাত্রির কি উজ্জ্বলতা ছড়ায় সে কাজে॥

॥ রোমান্টিক ॥

হেমন্ত বিকেলে
আকাশ কী শান্ত ছায়া ফেলে
তুলে ধরে চাঁদ,
আস্তে হাওয়া-চুল আঁচড়ায় তাই নারকেল পাতার চিরুনি
মিহি রোদে, আলস্যের পিঠে, দেখে বুনি
মনে ঘরে-ফেরা সরু স্বাদ॥

অবশেষের দেখা

হীরেন্দ্র চক্রবর্তী

তীক্ষ্ণ কঠিন তীব্র মদির তিক্ত মধুর চেয়ে
এই বুঝি ঐ মিথুন দুটির কৈশোরে অস্মিতা
মস্তো দুপুর একলাভাবার গহন রাতে বৃষ্টি
কী খোঁজে ঐ ছেলেটির চোখ বিপুল ব্যথায় পূর্ণ
কী-যে মেয়ের চাওয়া ছিলো ভক্তদেরই দৈন্য
অবশেষে দেখায় তারা পেলো মানসমিত্রে।

তীক্ষ্ণ কঠিন তীব্র মদির তিক্ত মধুর চেয়ে
কাছে আসার প্রবল টানে ভালোবাসার ইচ্ছে
স্বর্গে যাওয়ার আকাশ নিলো সময়-ভরা মূর্চ্ছা
হাওয়ায় হাওয়ায় অন্ধকারে জলের গানে কীর্ণ
কান্না-পাওয়ায় সুখে-থাকার গন্ধে ভরে শূন্য
অবশেষে দেখায় দুজন পেলো মানসমিত্রে॥

কেষ্টনগরের পুতুল // জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ওর সঙ্গে প্রথম দেখা লাটুদের পুকুর পারের জাম তলায়। সময়টা দুপুর। আকাশ মেঘে মেঘে কালো হয়ে আছে। থম থম করছে চারদিক। যেন এখনি ঝড় উঠবে। ঝড় এবং সঙ্গে বৃষ্টি হওয়া অসম্ভব না। সেটাই সম্ভব। তাই আশা করছিলাম। ওপরের দিকে মুখ করে সবুজ লাল এবং কালো জামের ছড়াগুলো দেখতে দেখতে নিজের মনে বললাম, 'জল হওয়া ভাল, যত বেশি জল হবে তত তাড়াতাড়ি জাম পাকবে।' কাঁচা আধকাঁচা লালচে জামগুলো রাতারাতি কালো হয়ে গিয়ে গাছটাও মেঘলা আকাশের মতন থম থম করবে কল্পনা করছিলাম। তা হলেও ওপরের ডালগুলোতে কালো ছড়ার কিছু অভাব ছিল না। কিন্তু গাছে উঠব কি করে! বস্তুত লাটুদের সেই গাছটার মত অত বড় জামগাছ সারা টালিগঞ্জে সেদিন ছিল কিনা আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু তা হলে হবে কি। গাছের আধেকটা কাণ্ড ঘিরে কাঁটালতার জঙ্গল। কার সাধ্য গাছে ওঠে। কাজেই গাছের সব জাম পাকলেও আমাদের কাছে সেগুলো 'আঙুর ফল টক' হয়ে থাকত। মুখের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া কিছু করার থাকত না। তবে এটা সত্য, পাখিগুলো ঠুকরে ঠুকরে কিছু কিছু জাম নীচে ফেলত। পাকা টুসটুসে ফলগুলো মাটিতে পড়ে থেঁতলে যেত ফেটে যেত। তাই কুড়িয়ে খাওয়ার আনন্দ কম ছিল কি।

হ্যাঁ, সেদিন দুপুরটা বড় বেশি থম থম করছিল। গাছের পাতাটা পর্যন্ত নড়ছে না। একটু আগে কোথায় যেন একটা ডাহুক খুব খানিকটা ডেকে চুপ করে গেছে। চারদিক চুপচাপ। অতবড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একলা আমার কেমন ভয় ভয় করছিল। সঙ্গীদের ইচ্ছা করে ডাকিনি। কেননা তা হলে কুড়ানো জামে ওরা ভাগ বসাবে। তাই চুপটি করে একলা গাছতলায় চলে গিয়েছি।

কিন্তু বরাত খারাপ ছিল আমার। ওপরে গাছের ডালে না ছিল একটা কাক না একটা বুলবুলি। যেন ঝড় উঠবে ভয় পেয়ে সব বাসায় উড়ে গিয়ে বাচ্চা আগলে বসে আছে। নীচে আঁতিপাঁতি করে খোঁজা হল। ঘাস উল্টেপাল্টে দেখা হল। একটা ফাটা কি থেঁতলানো জাম চোখে পড়ল না। বুঝলাম আগে এসে কেউ সব কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। আমার জন্য একটা আধ-পাকা কি আধ-খাওয়া জাম কেউ রেখে যায়নি। এখন ভরসা, ওপরের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, যদি ঝড়টড় ওঠে, হাওয়ার দাপাদাপিতে ডালপালা নড়েচড়ে উঠলে দু'-চারটা জাম টুপটাপ মাটিতে পড়বে। কিন্তু তার নিশ্চয়তা কি। ঝড়ের পর কতদিন গাছতলায় এসে দেখেছি, সবুজ লালচে সব জামের ছড়া নিয়ে কিছু ডালপালা ভেঙে মাটিতে পড়ে আছে। কালো জামগুলো আগের মত আকাশে ঝুলছে আর আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন মিটিমিটি হাসছে। যেন ঝড়ের ছিটেফোঁটা ওদের গায়ে লাগেনি বা লাগলেও ওদের খসাতে পারেনি, তাই সামান্য বাতাস রাগ করে কাঁচা কচি সবুজ সব ছড়াগুলোকে দুমড়ে মোচড়ে ভেঙে মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখে গেছে।

দাঁড়িয়ে ভাবছি, শেষ অস্ত্র ঢিল। কিন্তু অত উঁচুতে কালো ছড়াগুলো ঝুলছিল যে ঢিল ছুঁড়ে তাদের ঘায়েল করা শক্ত হবে, হয়েছে, ঢিল ছোঁড়ার বিদ্যায় আমি লাটু বা মন্তুদের মতন মোটেই দক্ষ ছিলাম না। কি করব, কি করা যায় ভাবতে ভাবতে মাথার ওপর এক জোড়া কালো ফড়িং-এর নাচানাচি দেখছিলাম। একসঙ্গে দুটো নাচছে। একটা আর একটার ঘাড় কামড়ে ধরে পিঠে চেপেছে, আর সেই অবস্থায় উড়ে উড়ে খেলছে। বেশ লাগছিল দেখতে। অত মিশমিশে কালো রঙের ফড়িং এর আগে আমার চোখে পড়েনি। আমাদের ওদিকটায় ছিল লাল আর হলদে ফড়িং-এর রাজত্ব। খয়েরি রঙের একটা দুটো দেখা যেত। কিন্তু এমন চমৎকার কুচকুচে কালো ফড়িং! হা করে তাকিয়ে ওদের সুখের নাচন দেখছিলাম আর ভাবছিলাম কোন্ দেশ থেকে দুটিতে উড়ে এল কে

জানে। আদর করে যে একটা আর একটার মাথা কামড়াচ্ছে এবং কামড় খেয়ে সুখ পাচ্ছে বুঝে ফেলে আমি ভারি আমোদ পাচ্ছিলাম। ভিতরে এক ধরনের উত্তেজনাও অনুভব করছিলাম। কপালটা ঘামছিল, কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে মনে হচ্ছিল। অবশ্য জায়গাটা অত নির্জন ছিল বলে আর দিনটা এমন মেঘে মেঘে থম থম করছিল বলে জোড়া ফড়িং দেখে আমার এই অবস্থা হয়েছিল। তার আগে খেলার মাঠে কি স্কুলে যাবার রাস্তায় কি লাট্টু মন্তিদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে এক শ জোড়া ফড়িং চোখে পড়লেও অত মনোযোগ দিয়ে কোনোটাকে দেখিনি। তারপর মনে হয়েছে কেবল নির্জন জায়গা বা মেঘলা বিষণ্ন দুপুর বলে না, কালো ফড়িং দুটোর গায়ের গড়নই আমাকে এমন উত্তেজিত মুগ্ধ করে তুলেছিল। লাল বা হলদে ফড়িং-এর মত পেটমোটা বেঁটে নয়; লম্বা বেশ লম্বা, মাথার তুলনায় শরীরটা ও ল্যাজের দিকটা কত সরু ছিমছাম, চামেলী ফুলের ডাঁটের মতন চিকণ সুন্দর। পুরুষ বা নারীর শরীরের গড়ন কেমন হলে দেখতে ভাল লাগে বুঝতে পারার বয়স আমার হয়েছিল। তা সেই শরীর পোকা মাকড়ের হোক কি পাখির হোক কি মানুষের। শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকা আর মনে মনে তার সমালোচনা করা। পনেরো বছরের ছেলের অতটা করা উচিত নয় যদিও, কিন্তু আমি করতাম, দেখতাম। তাই অত মনোযোগ দিয়ে সুন্দর শরীরের পতঙ্গ দুটোকে দেখছিলাম। এমন সময়, হঠাৎ খেয়াল হল, যেন আমার পিছনে এসে কে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে আমার মতন অবাক হয়ে কালো ফড়িং দুটোকে দেখছে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে আমি দ্বিতীয়বার অবাক হলাম। কেবল অবাক না অস্ফুট গলায় 'ও' করে উঠলাম। অবাক হয়ে তো বটেই, ভয় পেয়েও মানুষ তা করে আবার খুশি হলেও করে। হ্যাঁ., চৌদ্দ পনেরো বছর বয়স হবে। সাদা ধবধবে একটা সাটিনের ফ্রক গায়ে, খালি পা, মাথার পিছনে বেণীটা দু ভাগ করে এমনভাবে ঘুরিয়ে বাঁধা হয়েছে যে দেখে মনে হচ্ছিল ওর ফরশা ছোট্ট দু কানের পিছনে আরও দুটো কান আছে। কালো রঙের বেশ বড় গোটা দুটো কান। কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিলাম ওর চোখের পালক দেখে। অত লম্বা পালকের চোখের মেয়ে আমি আর দেখিনি।

'তুমি কোথায় থাক?' প্রশ্ন করলাম।

ও উত্তর দিলে না। চোখের পাতা নামিয়ে মাটির দিকে তাকাল। তারপর, লক্ষ্য করলাম, ও আমার হাঁটু অবধি ধুলো ভর্তি পা দুটো দেখছে, ময়লা হাফ প্যাণ্ট দেখছে, বোতাম খসা হাফ শার্টটার দিকেও একনজর তাকাতে ইতস্তত করল না। দেখলাম ফরশা নাকের ডগা কুঁচকে পরে মুখ ঘুরিয়ে ও অন্যদিকে তাকিয়েছে।

অপমান নয় কি? আমার কথারই উত্তর দিতে গ্রাহ্য নেই। তারপর আমার ময়লা বেশভূষা হাত পা দেখে নাক কুঁচকানো।

এটা আপনারা সবাই জানেন চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সের একটি ছেলের চেয়ে একটি মেয়ে অনেক বেশি ফিটফাট মাজাঘষা থাকে। আমার আঙুলের প্রত্যেকটি নখ বড় ও ময়লায় ভর্তি। ওর নখ বড় হবে কি, এমন পাতলা এমন পালিশ এমন ঝকঝকে হয়ে প্রত্যেকটা আঙুলের মাথায় বসে আছে যে মনে হচ্ছিল সেগুলোর আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। যদি থাকেও সেগুলো নখ না দামী কোনো পাথর। বাঁ হাতের একটা নখ রং করা শুধু।

হ্যাঁ, হাতের আঙুল, হাঁটু, পা, পায়ের পাতা, গোড়ালি সবই ওর পরিচ্ছন্ন। ভাবলাম দামী পাথর না হলেও সেগুলো দামী চামড়ায় মোড়া অনেক বেশি আদরের নরম মাংস। তেমনি ওর সাটিনের ফ্রক। যেন এই মাত্র বাক্স থেকে বার করে গায়ে চড়িয়ে এসেছে। অথচ, ভাবলাম, খোঁজ নিলে দেখা যাবে ফ্রকটা এক নাগাড়ে তিনদিন পরে ও ঘুরছে। আরও সাতদিন পরলে ওটা ময়লা হবে না। আর আমার, আমার মন্তির লাট্টুর একবেলার জামা প্যাণ্ট ওবেলায় যা চেহারা ধরে তাকানো যায় না। কি, ওর হাত পা জামা চুল যেমন সব সময় নতুন হয়ে আছে, বাড়িতে গিয়ে দেখুন পড়ার বই খাতা পেন্সিল (স্কুলে নিশ্চয় পড়ে অনুমান করলাম) রবার ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্সটা পর্যন্ত নতুন চেহারা নিয়ে সেই জানুয়ারী থেকে আজ জুলাই চলছে একরম আছে। না একটু ছেঁড়া, না এক ফোঁটা কালির দাগ, না একটু আঁচড়, না কিছু ভাগাচুরা ফাটাফুটি। মেয়েগুলো এমন সাংঘাতিক সাবধান এমন আশ্চর্যরকম হুঁশিয়ার হয়ে আছে সব সময়।

কিন্তু আমাকে দেখে ওর এভাবে নাক সিঁটকানো সহ্য হচ্ছিল না। কি, একটু দূরেই সরে গেল। সরে গিয়ে থুতনিটা আকাশের দিকে তুলে দিয়ে পাকা জামের ছড়াগুলো দেখছে। মনে মনে বললাম, 'সেগুড়ে বালি! আমি এমন ডানপিটে একটা পুরুষ ছেলে গাছে চড়তে পারছি না তো তুমি কোন্ ছার। অত নরম তুলতুলে হাত দিয়ে ঢিল ছোঁড়ারও আশা করো না। পাখি, পাখি এসে ঠুকরে নীচে ফেলবে আর তুমি কুড়াবে! দ্যাখোনা, থমথমে আকাশ দেখে সব পাখি পালিয়েছে।'

ফড়িং জোড়াটা তখন নাচতে নাচতে কোন্‌দিকে সরে গেছে। ডাহুকটা সেই যে চুপ করেছে আর ডাকবার নাম নেই। আকাশ আরও কালো হয়ে গেল। গাছের পাতাগুলো যেন আরো বেশি ভয় পেয়ে চুপ করে আছে। আমি সরে গিয়ে ঠিক ওর পিছনে দাঁড়ালাম। চুলের মিষ্টি গন্ধটা এবার নাকে ঢুকছিল।

'তুমি কোথায় থাক?' প্রশ্ন করলাম।

উত্তর নেই। এমন কি ঘাড়টা একটু ফেরাবে তা-ও না। থুতনি নামিয়ে পায়ের নীচের ঘাস দেখল। তারপর দামী চামড়ায় মোড়া আদুরে নরম মাংস জমানো পা দুটো দিয়ে আস্তে আস্তে ঘাস মাড়িয়ে আর একটু দূরে সরে গেল। এবং আমার দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কালো জাম দেখতে লাগল।

'বটে, তোমার এত অহংকার!' মনে মনে বললাম আর দাঁতে দাঁত ঘষলাম। ইচ্ছা করছিল কালো কানের মত বেণীর প্যাঁচ দুটো একটা হেঁচকা টান মেরে খুলে ফেলি।

কিন্তু কিছুই করা হল না। চিন্তা করছিলাম কোথা থেকে ও এলো, কাদের বাড়িতে এলো। সামারের ছুটিতে অবশ্য রাজ্যের মেয়ে টালিগঞ্জে মাসির বাড়ি পিসির বাড়ি জেঠু কি কাকুর বাড়ি বেড়াতে আসে। কেউ একবেলা এসে ওবেলা চলে গেছে, কেউ তিন চার পাঁচ হয়তো পনেরো দিনই কাটিয়ে যাচ্ছে। মন্তিদের বাড়িতে মন্তির তিন খুড়তোতো বোন এসেছে; মীনা বীণা ঝর্ণা। আমার শুধু দেখা না রীতিমত আলাপ করা হয়ে গেছে ওদের সঙ্গে। লাট্টুর এক মামাতো বোন এসেছে ঃ কাজল। কী মিশুকে কী মিষ্টি কথা বলে লোকের সঙ্গে। গুর্খাদের বাড়িতে সেদিন ওর রাঙা মাসি চমচম এসে চারদিন থেকে গেল। সকলের সঙ্গে কথা হাসিখুশি মেলামেশা। বরং চমচম ওর চেয়ে দেখতে ভাল, এই মেয়ে একটু বেশি লম্বা। চমচম কিছুটা খাটো, কিন্তু তা হলেও অহংকারের ছিঁটেফোঁটা তো ছিল না গুর্খার বার্নপুরের রাঙা মাসির। যাবার সময় ওর পড়া একটা ডিটেক্‌টিভ বই পর্যন্ত আমাকে দিয়ে গেল। একেবারে দান করে গেল। হোক পুরোনো বই। তবু তো একটা উপহার। আমি ওকে দিয়ে বইয়ের টাইটেল পেজে আমার নাম লিখিয়ে রেখেছি। আর কে, আর কোন্ মেয়ে এবার সামারের ছুটিতে আমাদের পাড়ায় বেড়াতে এল ভাবতে ভাবতে সন্তোষের মেজদি ডায়না, পিণ্টুর কাকীমার ছোট বোন রেখা, গোবিন্দর কাকার দু মেয়ে ঝুণ্টি ঝুণ্টির মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল।

কিন্তু এই মেয়ে কে, কোথাকার, কি নাম? যত ভাবছি তত রাগ বাড়ছে আমার আর মাথা গরম হচ্ছে। মেয়েটা বোবা নাকি। কিন্তু বোবা মেয়ের চোখ এমন করে চকচক করে না আর অত ঘৃণা করে না ঐ [illegible] -চোখ থেকে। বরং বোকা বোকা চোখ মেলে ওরা চেয়ে থাকে।

আমি আবার ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়াই। চুলের মিষ্টি গন্ধ নাকে লাগে। চোখ [illegible] গলার ফ্রকটার দিকে চেয়ে থাকি। [illegible]

ঝুক থেকেও একটা মিষ্টি গন্ধ উঠে আসছিল।

'তোমার নাম কি?'

উত্তর নেই। থুতনি নামিয়ে ও ঘাস দেখে।

আমার রাগের ডিগ্রী কতটা চড়ছিল কল্পনা করতে পারেন।

'এই মেয়ে!'

নিরুত্তর। কেন সরে যেতে আবার ও পা বাড়িয়েছে। ইচ্ছা করছিল এবার একটা ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিই। কেননা সরে যেতে যেতে আমরা প্রায় দীঘির ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। লম্বা ঘাস শেষ হয়ে কালো জল টলটল করছে। কিন্তু ধাক্কা দেবার আগেই সর্ সর্ একটা শব্দ হল। একটু সময়। গাছের পাতাগুলো নড়েচড়ে উঠল ঘাসের শিষগুলো দুলে উঠল। তারপর যে কে সে। বুঝলাম আর ঝড় উঠবে না। ঐ পর্যন্ত। হাওয়ায় কালো মেঘগুলোকে আকাশের এমথা থেকে ওমাথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলল। এবং অত ওপরের হাওয়ায় যে আর পাকা জাম গাছ থেকে খসে পড়ছে না আমার মত সে-ও তা বুঝতে পারল। বুঝে এবার আর জাম গাছ না জলের দিকে চেয়ে রইল। আর আমি হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিলাম ওর পা পিঠ ঘাড় গলা চুল। আশ্চর্য, ঝড় উঠল না, আর সেই সংগে যেন আমারও রাগটা পড়ে গেল। কেননা আশা ছিল ঝড়ের বাড়িতে যদি কিছু জাম-টাম মাটিতে পড়ে আমি একলা সব কুড়িয়ে নেব। নিশ্চয় তখন মেয়েটাও হাত বাড়াবে। আর তখন, মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম, হয় ওর হাত কামড়ে দেব নয়তো বেনী টেনে খুলে ফেলে গায়ের ঝাল মেটাব। কিন্তু সেসব কিছুই হল না। ঝড় এল না দেখে রাগটা যেমন পড়ে গেল তেমনি বুকের ভিতর কিরকম যেন একটা যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলাম। কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল। মনে হল পা দুটো অবশ হয়ে আসছে। হাতে জোর নেই।

'এই তুমি কি কথা বলবে না?' বললাম, কিন্তু গলার স্বরে তেমন জোর ছিল না। 'এই শোন।' ফের ডাকলাম।

এবারও ও কথা বলল না, বলার ইচ্ছা নেই এমন ভাব দেখিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে ঘাস মাড়িয়ে একেবারে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। লাটুদের দুটো রাজহাঁস ছিল। সারাদিন দীঘির জলে ভেসে বেড়াত। মাঝে মাঝে জল ছেড়ে তীরে উঠে চুপচাপ বসে দুটিতে বিশ্রাম করত। এখনও করছিল। একটা আর একটার পিঠ ঠোকরাচ্ছে, যেটার পিঠ ঠোকরাচ্ছে সেটা চোখ তুলে চুপ করে আরাম অনুভব করছে। কিন্তু মেয়েটা সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার সংগে সংগে হাঁস দুটো ভয় পেয়ে [illegible] জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই, এই মেয়েটা [illegible] চিৎকার করে উঠলাম। তারপর ছুটে জলের ধারে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়ালাম। এত জোরে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম যে চমকে উঠে ও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। আমি দু'চোখ পাকিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাতে ও যেন আর একটু ঘাবড়ে গেল। ধমক দেবার সমুচিত শিক্ষা দেবার একটা সুযোগ পেয়েছি ভেবে উল্লাসে উত্তেজনায় আমার বুকের ভিতর তখন নাচানাচি শুরু হয়েছে। এবং ও ভয় পেয়েছে দেখে আমার সাহস চতুর্গুণ বেড়ে গেল। দুর্বলের ওপর সবল চিরকাল অত্যাচার করেছে জানেন আপনারা। না, ও যদি তখন রুখিয়ে উঠত কি লম্বা পালকের চোখ দুটো দিয়ে মাটি না দেখে কটমট করে আমার চোখের দিকে তাকাত অমন খপ্ করে আমি ওর হাত ধরে ফেলতে পারতাম না। দামী চামড়ায় মোড়া আদুরে নরম মাংস যত জোরে চেপে ধরা যায় আমি ধরলাম। ভাবছি এবার ও থরথর করে কাঁপবে, কি ভয়ে কেঁদেই ফেলবে। কিন্তু তা করছে না দেখে আমি

চড়া গলায় বললাম, 'হাঁস দুটোকে তাড়ালে কেন, জান, লাট্টুদের হাঁস, আমার বন্ধু লাট্টু?'

অবাক হয়ে গেলাম ওর চেহারা দেখে। পাতলা ঠোঁট দুটো বেঁকিয়ে হাসছে নাকের ডগাটা কুঁচকোতে আরম্ভ করেছে। কি বলব, কি বলা যায় এ-মেয়েকে। এত সাহস! চিন্তা করছি এবং এর পর আমার কি করার আছে ভাবছি। আমার ভাবনা শেষ হতে না দিয়ে ও বলল, 'হাঁস তাড়িয়েছি বলে রাগারাগি করছ?'

'হ্যাঁ' মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'লাট্টুদের হাঁস।'

ও মাথা নাড়ল। কনের মতন বেণীর প্যাঁচ দুটো নড়ে উঠল। লম্বা পালক ঘেরা চোখ দুটো ঘুরিয়ে আর একবার জলের হাঁস দুটো দেখল তারপর আমার মুখের দিকে তাকাল।

'আমার সঙ্গে ভাব করতে পারনি বলে তুমি রাগ করছ।'

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার হাতের মুঠ শিথিল হয়ে গেছে টের পেয়ে ও ফস করে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিলে। মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলে উঠল। চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। কথাটা ও বলে শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তা তো তুমি বুঝতেই পারছ, এতক্ষণ বোঝনি বলেই তো রাগ হচ্ছিল।'

আবার ও ঘাড় ফেরাল নাক কুঁচকালো। তারপর আকাশের দিকে জামগাছের দিকে ধুতনিটা তুলে ধরে বলল, 'বিশ্বাস করি না। তা হলে কি এত দেরি করতে, আমাকে গাছতলায় এসে দাঁড়াতে দেখেই তুমি গিয়ে গাছে উঠতে।'

'কি করে এ-গাছে চড়ব?' গলার ঝাঁজ ফুটিয়ে বললাম, 'কাঁটালতার ভর্তি দেখছ না। এ গাছে কেউ উঠতে পারে না।'

'কাল ও কাঁটার ওপর দিয়েই গাছে উঠেছিল। বুকটা এতখানি চিরে গিয়েছিল। তা হলেও এই এতবড় একটা ছড়া আমার জন্যে পেড়ে এনেছিল।'

ফ্যাল ফ্যাল করে ওর মুখ দেখছিলাম। একটু পর ঢোক গিলে বললাম, 'কে, কে তোমাকে জাম পেড়ে দিয়েছিল?'

কথার উত্তর দিল না। চোখ দুটো নামিয়ে ঘাসের জঙ্গল পার হয়ে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল। দেখছিলাম, কিন্তু একপা নড়বার শক্তি রইল না আমার। ফরশা সুন্দর পা দুটো উঠছে পড়ছে বেণীটা কাঁপছে ফ্রকটা নড়ছে। বেশ একটু দূরে সরে গেছে ও। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। ছুটে গিয়ে আবার ওর হাত চেপে ধরলাম। ও ঘুরে দাঁড়াল। আমি বললাম, 'তুমি মিথ্যাবাদী, মিছাকথা বলে এখান থেকে কেটে পড়ছ।' এবার এত জোরে ওর হাত চেপে ধরলাম যে, মনে হচ্ছিল আমার আঙুলগুলো ওর নরম মাংসের মধ্যে ঢুকে পড়বে। যন্ত্রণায় ও এই প্রথম 'উঃ' করে উঠল। শব্দটা আমার কানে এমন ভাল লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা এত গরম হয়ে উঠল যে আমি আরো জোরে, শক্তি যতটা কুলোয়, প্রায় দম বন্ধ করে ওর বাঁ হাতের কনুইর কাছটা চেপে ধরলাম। কিন্তু তখন ও উঃ করল না, দেখা গেল এবার শক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেছে, হাতটা ছিনিয়ে নিতে চাইছে। 'কিছুতেই ছাড়ব না', বললাম, 'এই গাছে আজ পর্যন্ত কেউ উঠতে পারল না আর তুমি বলছ কিনা—বাজে চাল দিতে শিখেছ, কেমন?'

'বেশ', আমায় অবাক করে দিয়ে ও খুক্ করে হাসল, 'তুমি ওঠ, হ্যাঁ, আমি মিছাকথা বলেছিলাম, তুমি না হয় চেষ্টা করে দেখ আমায় কিছু কালো জাম পেড়ে দিতে পার কিনা।'

হাত ছেড়ে দিলাম। বেশ একটু ধস্তাধস্তি করা হয়েছে বলে ও হাঁফাচ্ছিল, আমি হাঁফাচ্ছিলাম।

'তুমি কোথায় থাক?'

'ওদিকে, ওই বাড়ি।' আঙুল দিয়ে মাঠের ওধারে একটা শাদা বাড়ি দেখাল ও। অন্য সব বাড়ি থেকে বাড়িটা একটু আলাদা; আশেপাশে কিছু পড়ো জমি নিয়ে কেমন যেন একলা দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া, বাড়িটা চিরকালই চুপচাপ। আমি মাথা নাড়লাম। 'ওবাড়িতে কোনো মেয়ে আছে বলে তো জানা নেই। আমরা তো রোজ দেখে আসছি।'

ও মাথা নাড়ল।

'আমি এখানে থাকি না। সামারের ছুটি তাই দিদির কাছে এসেছি।'

'ক'দিন থাকবে?'

'আজ সকালে এসেছি, বিকেলে সম্ভবত চলে যাব।'

ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললাম।

'একদিনের জন্যে বেড়াতে আসা।' ঠোঁট বেঁকিয়ে বললাম, 'আবার কোথায় ফিরে যাওয়া হচ্ছে?'

'কেষ্টনগরে।'

'ও! কেষ্টনগরের পুতুল।' ঠাট্টার সুরে বললাম বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, পুতুলের চোখের মণিদুটো কি এমন ঝকঝক করে, চোখের পালক হাওয়ায় কাঁপে? থুতনির নিচে গলার কাছে একটা ছোট্ট নীল শিরা ধুকধুক করছে। একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'নাম কি?'

ঘাড় নাড়ল ও। 'বলব না।'

'কেন?'

'এমনি।'

আবার আমার মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগল। কেননা, আবার আমার হাঁটুর ধুলো পরনের ময়লা হাফপ্যান্টের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ও নাক কুঁচকাতে আরম্ভ করেছে, ঠোঁট মোচড়াচ্ছে।

'তুমি কোন্ ক্লাশে পড়?' হাতটা আর একবার চেপে ধরব কিনা ভাবতে ভাবতে প্রশ্ন করলাম।

'ক্লাশ এইট।'

'আমি নাইনে পড়ি।' গম্ভীর হয়ে বললাম, 'তা নাম বলতে দোষটা কি?'

মাথা নাড়ল ও।

'আগে তুমি গাছে উঠতে পার কিনা দেখি, তারপর তো নাম, আগে আমায় জাম পেড়ে দাও, তবে তো বুঝব।'

বটে! কেষ্টনগরের মেয়ে এসেছে টাকিগঞ্জের ছেলের সঙ্গে চাল মারতে। খপ্ করে হাতটা ধরে ফেললাম। বোধ করি, সেও আগে থাকতে তৈরী হয়ে ছিল। ধরার সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ফস্ করে ছিনিয়ে নিয়ে ও ছুটতে আরম্ভ করল। ভুল করল সেখানেই। ডানদিকে গেলে মাঠে চলে যেতে পারত, ছুটল বাঁদিকে,—অর্থাৎ একটু যেতেই সামনে দীঘি। লাট্টুদের দীঘিটা যে চৌকোণ না চাঁদের মত, কাস্তের মত ওদিক থেকে বেঁকে এদিকে চলে এসেছে ওর বোধ হয় জানা ছিল না। মনে মনে খুশী হয়ে আমি ওর

পিছনে ছুটলাম। আর একটা ভুল করল ও। ঘনকাশের জঙ্গলে ঢাকা ঢালু পারটাকে শক্ত সমান জমি ভেবে চোখ বুজে ও পা বাড়াতে গিয়ে পড়বি তো পড় একেবারে দীঘির জলে। ঝপ্‌ করে শব্দ হ'ল। রাজহাঁস দুটো ভাসতে ভাসতে এখান অবধি চলে এসেছিল। জল নড়ে চড়ে উঠতে ভয় পেয়ে দুটো গাঁক গাঁক আওয়াজ তুলে আবার দূরে সরে গেল। আমার ভয় হচ্ছিল যদি এদিকটায় বড় গর্ত টর্ত থাকে তবে ও ডুবে যাবে। হয়তো সাঁতার জানে না। কাজেই--

দুশ্চিন্তা দূর হ'ল জলের মধ্যে ও দাঁড়াতে পারল দেখে। ছিটকে পড়ার দরুণ গলা বুক ভিজে গেছে। এখন কোমর সমান জলে ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। ছুটে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমার হাত ধরে ও পারে উঠল। পাতলা সাটিন জলে ভিজে একাকার। কি, জল ছেড়ে তীরে ওঠা মাত্র ওর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হ'ল ও বড়, এইমাত্র যেন বড় হয়ে গেল, যেন অন্ততঃ দশ বছর বয়স এগিয়ে গেছে। আর আমি ছোট। ছোট হয়ে গেছি ওর সামনে। যেন আমি আর ওর দিকে তাকাতে পারছি না, অথবা তাকাতে গিয়ে চোখ অন্যদিকে সরাতে পারছি না। কপালটা ঘেমে উঠল। 'কি বলছ, কিসের কথা বলছ?' যখন খেয়াল হ'ল ওর চোখের দিকে আমার বিহ্বল বিস্মিত চোখ জোড়া তুলে ধরলাম। 'কি হয়েছে?'

আর কিছু বলছে না। হাতের আঙুল দিয়ে আমায় কি দেখাতে চাইছে। ভীত আতঙ্কিত চাউনি। আঙুলটা কাঁপছে। অন্য কোথাও না, অন্য কিছু না, ওর শরীরের দিকে, ওর সুন্দর সমর্থ আঁটো সাটো ফরসা ঝকঝকে পায়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে আমায় কি দেখতে বলছে। ওর পায়ের দিকে চোখ পড়তে আমি চমকে উঠলাম, যেন আরো বেশি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। কাচ কানাস্তারা অথবা অন্য কিছু ধারালো জিনিসে লেগে পা-টা কেটেছে বুঝলাম। জলে ছিটকে পড়ার সময় এটা হয়েছে বোঝা গেল। না, পায়ের দিকে চোখ পড়া মাত্র আমি যে অতটা চমকে উঠলাম তা পায়ের ক্ষত দেখে নয়,— একটুখানি কেটেছে, আধ ইঞ্চিরও কম একটুখানি জায়গার চামড়া ছড়ে গেছে ব'লে মনে হ'ল। তা না, আমি স্তব্ধ আড়ষ্ট বিমূঢ় হয়ে গেলাম রক্ত দেখে, রক্ত না, রক্তের আশ্চর্য কোমল সুন্দর নিবিড় রং দেখে। দামী চামড়া দেখে ঈর্ষা হয়েছিল কিন্তু চামড়ার নীচের রক্ত দেখে মনটা অন্যরকম হয়ে গেল। মনে হল, এত সুন্দর রক্ত আমি কোথাও দেখিনি। মতিদের একদিন অন্তর বাড়িতে মুর্গি কাটা হয়। ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটতে দেখেছি। আমার ছোট বোন একদিন ব্লেড দিয়ে পেন্সিল কাটতে গিয়ে আঙুল কেটেছিল সেই রক্ত দেখেছি। বল ক্রিকেট খেলতে খেলতে এটা ওটায় হোঁচট খেয়ে বাড়ি খেয়ে আমাদের হামেশা নখ ওল্টাচ্ছে, কনুই হাঁটু ছড়ে যাচ্ছে, আঙুল কাটছে— কিন্তু কিন্তু; নিবিড় কোমল রক্তের রং আমাকে মুগ্ধ করল, আর, হ্যাঁ, ঐটুকুন সময়ের মধ্যে আমি চিন্তা করতে পারলাম, এই রক্তের স্বাদ অন্য রক্তের মতন নয়, নোনতা না, কেন জানি মনে হ'ল মিষ্টি হবে, দামী দুর্লভ কোনো ফলের রসের মতন মধুর।

আপনা থেকে গলাটা নরম হয়ে গেল, আদর ক'রে বললাম, 'এসো বেঁধে দিচ্ছি— না হ'লে—'

'কি দিয়ে বাঁধবে, ব্যাণ্ডেজ করার কিছু নেই তো।' ক্ষীণ গলায় ও বলল। 'আমার সঙ্গে রুমাল আছে।' প্যাণ্টের পকেট থেকে রুমাল বার করলাম, জাম বেঁধে নেব ব'লে মেজদার রুমাল চুরি ক'রে এনেছিলাম, তাই রুমালটা ফরসা ছিল। কথা বলল না ও, আমার কথা শুনে শুধু ঘাড়টা কাত করল। এইজন্য আরো ভাল লাগল। হাতে ধরে দীঘির ঢালু থেকে ওকে ওপরে তুলে আনলাম।

'এইখানে বোস।' আঙুল দিয়ে নরম ঘাস দেখিয়ে দিলাম। আমিও পা ছড়িয়ে বসলাম। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে সেটাকে দু' টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ তৈরী করতে লেগে গেলাম।

'কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে, শীত করছে।' বলল ও, আমি ওর গায়ের ভিজে জামার দিকে তাকালাম। 'খুলে ফেলবে ওটা?' বলেই হঠাৎ চুপ করে গেলাম। মাটির দিকে চোখ রেখে ও মাথা নাড়ল। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর কান দুটো এমন লাল হয়ে উঠল যে, আমি ভয়ঙ্কর বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। আবার শরীরের সুস্পষ্ট গোলকপী নিটোল রেখাগুলোর দিকে চোখ পড়তে আমি অসহায় বোধ করতে লাগলাম। নিজেকে ওর চেয়ে অনেক বেশি ছোট অকিঞ্চিৎকর মনে হ'তে লাগল। ভাগ্যিস ওর পা কেটে গিয়েছিল। সেটাই আমার মনের অবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করল। না হলে, ওকে আদর দেখাবার করুণা করার সাধ্য ছিল কি সেই মুহূর্তে। বললাম, 'দরকার নেই জামা খুলে, পা-টা দাও।'

ও পা বাড়িয়ে দিল।

'এমনি সুবিধা হবে না, এখানে আমার কোলের ওপর রাখ, কিছু ভয় নেই, তোমার কিছু হবে না।'

একটু পিছনের দিকে হেলে ঘাসের ওপর দু' হাতের ভর রেখে কাটা পা-টা ও আমার নোংরা উরুর ওপর তুলে দিল। সত্যি বলতে কি তখন আর ওকে নাক কুঁচকাতে দেখলাম না, বরং কেমন করুণ ক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল, মুখখানা তাই আরো সুন্দর লাগছিল। বেনী খুলে গেছে, জলের ঝাপটা লেগে অথবা কাশের জংগলে ঘষা খেয়ে চুলের এ অবস্থা হয়েছে বুঝতে কষ্ট হ'ল না।

ব্যাণ্ডেজ করা হয়ে গেল। কিন্তু রুমালের টুকরো দুটোর মাথা একত্র ক'রে বাঁধতে পারছি না, পায়ে জড়াতে গিয়ে সব শেষ হয়ে গেল। 'দাঁড়াও, এটা দিয়ে পারবে কিনা দেখ।' ব'লে ও টান মেরে ভিজে চুলের ফিতেটা খুলে ফেলল। এবার ও সোজা হয়ে বসল। আর পিছনে হেলে নেই। ওর নিশ্বাস আমার কপালে লাগছিল, চিবুকে লাগছিল। গরম মিষ্টি একটা গন্ধ। চুলের গন্ধ ফিতের গন্ধের চেয়েও ওর নিশ্বাসের গন্ধটা ভাল লাগছিল। 'কি করছ, এখনো বাঁধতে পারলে না?' বলল ও; আমি মুখ নীচু ক'রে ফিতেটা ব্যাণ্ডেজের ওপর জড়িয়ে বাঁধছি, খুলছি, আবার জড়াচ্ছি। যেন তখনই বাঁধা শেষ ক'রে দিতে আমার ইচ্ছা করছিল না। 'সুবিধে হচ্ছে না', বললাম, 'পা-টা আর একটি ছড়িয়ে দাও।' ও তাই করল। এভাবে দুজন কিছুক্ষণ ব'সে রইলাম। আর ও বাঁধা শেষ করতে তাড়া দিচ্ছে না। যেন এভাবে চুপচাপ ব'সে থাকতে ওরও ভাল লাগছিল। বাতাসটা তখন বেশ জোরে বইছে। টুপটাপ ক'রে পাকা জাম পড়ছে গাছতলায় শুনলাম। কিন্তু আশ্চর্য, দুজনের একজনেরও ইচ্ছা হচ্ছিল না উঠে গিয়ে জাম কুড়াই। একবার ঘাড় তুলে ও এদিক ওদিক তাকাল, আমিও তাকালাম। তারপর ঘাড় গুঁজে আবার ওর পায়ের ব্যাণ্ডেজের দিকে মনোযোগ দিই। একসময় দু হাতে জড়িয়ে পা-টা উরুর ওপর থেকে আমার বুকের কাছে তুলে ধরলাম। আর এমন সময় ও খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। ও হাসল ব'লে আমি ঘাবড়ে গেলাম। পা-টা আবার নীচে নামিয়ে রাখলাম। যদি না হাসত ও, যদি মুখখানা তেমনি করুণ বিষণ্ণ ক'রে রাখত, তবে বুঝি পা-টা আমি আমার ঠোঁটের কাছে তুলে নিতাম। যেন হেসে ভালই করেছে, তখন মনে হ'ল, আর সংগে সংগে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ ক'রে আমি পা-টা কোল থেকে নামিয়ে দিলাম। ও উঠে দাঁড়াল। আমিও। বললাম, 'এখন হেঁটে দেখ লাগছে কিনা।' একটু হাঁটল ও। 'না লাগছে না।'

'এখন কি বাড়ি চ'লে যাবে?'

ও ঘাড় নাড়ল।

'তবে তাই যাও।' বললাম, 'আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যাও।'

চ'লে যাচ্ছিল, হঠাৎ ও আবার দাঁড়াল।

'কি?'

'বিচ্ছিরি লাগছে, কিরকম খারাপ দেখাচ্ছে পটি বাঁধা পা!' এবার নিজের পায়ের দিকে চোখ রেখে ও নাক কুঁচকালো।

'তাতে কি', ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'ওটা খুলো না, খুললে রক্ত বেরুবে।'

'আর বেরোবে না।' মাথা নাড়ল ও। 'যা বেরোবার বেরিয়ে গেছে, বাকিটুকু তোমার রুমালে শুষে নিয়েছে, একটুখানি তো কেটেছে।'

বললাম, 'তবে খুলে ফেল, আমি খুলে দিই?'

'না আমি পারব।' ফিতের বাঁধন খুলে দিল ও, রুমালের ফালি দুটো খসে ঘাসের ওপর পড়ল, ফিতেটা ও হাতের মুঠোর মধ্যে রাখল। 'আর নেই, এক ফোঁটা রক্ত বেরোচ্ছে না।'

না নেই, নুয়ে আমিও দেখলাম, শুধু একটুখানি লাল আঁচড়। বললাম, 'ও কিছু হবে না, শুকিয়ে যাবে।'

'চলি'।

'যাও।'

ও আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেল। দীঘিপাড়ের উঁচু শক্ত জমি পার হয়ে মাঠে নেমে গেল। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। তারপর এক সময় আর ওকে দেখা গেল না। সেই চুপচাপ শাদা বাড়ির ভিতর অদৃশ্য হ'ল।

আমি কতক্ষণ জামতলায় চুপ ক'রে ব'সে ছিলাম খেয়াল নেই। যখন খেয়াল হ'ল, ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, আকাশে আর মেঘ নেই। যেমন মেঘ নেই তেমনি ওদিকে সূর্যও ডুবুডুবু, কেবল সেখানটায় একদলা মেঘ জমে আছে, নীচের দিকটা আবীরের মত লাল হয়ে গেছে। যেন তখনও সামান্য বেলা আছে টের পেয়ে এক ঝাঁক পাখি জাম গাছটায় এসে আবার কিচির মিচির শুরু করেছে। টুপটাপ জাম পড়ছে দেখতে পেলাম। কিন্তু উঠবার ইচ্ছা নেই। হঠাৎ পায়ের কাছে ঘাসের ওপর চোখ পড়ল। রুমালের টুকরো দুটো পড়ে আছে। রক্তের রং আর চেনা যায় না, শুকিয়ে কেমন কালচে হয়ে আছে। আর কোথা থেকে এতগুলো মাছি এসে জুটেছে ওটার ওপর। কেমন তিরতির ক'রে উঠল বুকের ভিতরটা, কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল। হাত বাড়িয়ে রুমালের টুকরো দুটো টেনে এনে চোখের সামনে তুলে ধরে নাড়াচাড়া করি, আর যেন অনেকটা ভয়ে ভয়ে, এদিক ওদিক তাকাই; আমার মাথার কাছে, নাকের কাছে মাছিগুলো বন্ বন্ ক'রে ক্রমাগত ঘুরছিল উড়ছিল। তখন কিন্তু, কেন জানি না, সেই কালো রঙের সুন্দর শরীরের জোট বাঁধা ফড়িং দুটোকে আমার হঠাৎ খুব মনে পড়ছিল। কিন্তু দুটোকে সেখানে আর দেখতে পাইনি।

শ্রীরামপুরে পুনর্মিলন

শ্রীরামপুরের ঘাটের কাছেই 'ডেনমার্ক টাভার্ন'। কেরী সেখানে খোঁজ করতে রামবসুকে লিখেছিল। 'ডেনমার্ক টাভার্নে' পৌঁছুতেই কেরী দৌড়ে এসে রামবসুকে ধরলো, ওয়েলকাম মুন্সী ওয়েলকাম, আমি জানতাম তুমি আসবেই।

কেরী উৎসাহে চীৎকার করে ডাকে, মিঃ মার্শম্যান, মিঃ ওয়ার্ড শীগ্গির এসো, আমাদের বন্ধু মিঃ বসু এসেছে।

কেরীর আহ্বানে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ওয়ার্ড আর মার্শম্যান।

তারপরে পরিচয়, করমর্দন ও সৌজন্যের পালা শুরু হয়। রামবসু দেখে ওয়ার্ড আর মার্শম্যান দুজনেরই বয়স অল্প, ত্রিশের দু'চার বছরের উপর, তার অধিক নয়।

কেরী বলে, মুন্সী আমি তোমার সবিশেষ পরিচয় এদের দিয়েছি, এদের পরিচয় দিই।

তারপরে একটু থেমে বলে, এদের পরিচয় মুখে আর দেবো কি—ক্রমে প্রকাশ পাবে, এদের আগমনে আমার শক্তি শতগুণ বেড়ে গিয়েছে, আমরা জোর কদমে ছাপাখানায় কাজ শুরু করে দিয়েছি।

রামবসু শুধোয়, কিন্তু তোমরা কলকাতা থাকতে শ্রীরামপুরে আস্তানা গাড়লে কেন? এসব কাজের জন্য কলকাতাই প্রশস্ত।

তাইতো ইচ্ছা ছিল এদের, কিন্তু মাঝখানে এক ভ্রান্তিবিলাস ঘটে যাওয়ায় এখানে বাস করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

এমন কি ভ্রান্তিবিলাস ঘটতে পারে যাতে এমন হওয়া সম্ভব।

তবে খুলে বলি বলে, কেরী।

এদের জাহাজ কলকাতায় পৌঁছবার আগে সেখানকার কাগজে ছাপা হ'ল যে, কয়েকজন প্যাপিস্ট পাদ্রী আসছে, লেখা উচিত ছিল ব্যাপটিস্ট কিন্তু লেখা হয়ে গেল, প্যাপিস্ট! কিনা পোপের চেলা, রোম্যান ক্যাথলিক। তুমি নিশ্চয় জানো যে, কলকাতার খৃষ্টীয় সমাজ প্রোটেস্টাণ্ট খৃষ্টান, রোম্যান ক্যাথলিক গুরু পোপের চেলাদের বড় ভয় তাদের। তখনি সরকারী হুকুম বের হ'ল যে, ওরা যেন কলকাতায় নামতে না পারে। অগত্যা তাদের নামতে হ'ল শ্রীরামপুরে, এ শহর ইংরেজ কোম্পানীর অধীন নয়, ডেনমার্কের রাজার রাজত্ব। এখানকার খৃষ্টীয় সমাজ সাদরে এদের বরণ করে নিল।

কিন্তু এই সামান্য ভুল কি সংশোধন করা যায় না? শুধোয় রামবসু।

মুন্সী, ভুল বড় মারাত্মক বস্তু, আর সবচেয়ে মারাত্মক ছাপার ভুল।

তারপরে একটু থেমে সকলের দিকে তাকিয়ে বলে, আমরাও ছাপাখানা খুলেছি, আর ছাপাখানার দৈত্যদানবদের, আমরাই ছাপখানার দৈত্যদানব, বলে দিয়েছি, দেখো সাবধান, তোমরা এক মারাত্মক ছাপার ভুলের শহিদ, তোমরা যেন আবার ভুল ছেপে বসো না।

সকলে হো হো করে হেসে ওঠে।

এমন সময়ে মার্শম্যান বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, ওই যে একটি ক্ষুদে দৈত্য আসছে।

এক গেঁজি ভিজে প্রুফ হাতে প্রবেশ করে ফেলিক্স কেরী।

এই প্রুফটা এখনি দেখে দিতে হবে। কেরী ছোঁ মেরে প্রুফটা কেড়ে নিয়ে তন্ময় হয়ে যায়।

মুন্সী এগিয়ে এসে ফেলিক্সের করমর্দন করে জিজ্ঞাসা করে, তারপর মাস্টার কেরী কেমন আছ?

খারাপ থাকবার উপায় কি? দিনরাত্রি আমি আর মিঃ ফাউণ্টেন কাজের মধ্যে ডুবে রয়েছি।

কি ছাপছ?

'মথীয়ের লিখিত সুসমাচার।'

ওটা কবে শেষ হ'ল?

তুমি চলে আসবার পরে বাবা একাই শেষ করেছে।

তোমার পিতার তুলনা হয় না মাস্টার কেরী।

প্রুফ নিয়ে ফেলিক্স ফিরে যেতে উদ্যত হলে রামবসু বলল, চলো তোমার সঙ্গে গিয়ে ছাপাখানার কাজ কেমন হচ্ছে দেখিগে, আর অমনি মদনাবাটি ত্যাগের পরেকার ইতিহাসটুকুও শুনে নেওয়া যাবে।

বেশ তো চলো বলে ফেলিক্স, কাছেই ঐ বাড়িটায় আমাদের ছাপাখানা।

ওদের যেতে দেখে কেরী বলে মুন্সী, এক মিনিট দাঁড়াও।

তারপরে বলে মুন্সী, তুমি আজ এই মুহূর্ত থেকে আমাদের মিশনের কাজে নিযুক্ত হ'লে বেতন ত্রিশ টাকা। কেমন, রাজি তো!

রামবসু বলে ডাঃ কেরী, তবে আমি তোমার কথার অন্যথাচারণ করেছি।

ওরা দুজনে বেরিয়ে যায়। কেরী মার্শম্যান আর ওয়ার্ডকে বলে মুন্সীর সঙ্গে পরিচয় হলে দেখবে, পাণ্ডিত্যে, বাগ্মিতায়, নিষ্ঠায় ওর দোসর নেই হিন্দুস্থানে।

তুমি তো চলে এলে মুন্সী, কেন চলে এলে আজও জানতে পারলাম না, তারপরেই শুরু হল বিপদ, একটার পরে একটা।

বিগত কাহিনী বলে যায় ফেলিক্স, প্রথমে বাঙলা পাঠশালাটি গেল ভেঙে, ছিরুর মা একদিন রাতে বাসনকোসন চুরি করে পালালো—সেই সঙ্গে পালালো কুঠির আমলা গোমস্তার দল তবিল ভেঙে।

এদিকে যত পাগলামী আরও বাড়লো, ওদিকে উড্নী সাহেব নোটিস দিল কুঠি দেবে উঠিয়ে।

আমি বাবাকে বললাম, চলো যাই কলকাতায় ফিরে। বাবা কি বলে জানো মুন্সী? সে বলল, জীবনযুদ্ধে এক পা হটলে আর কখনো এগোনো সম্ভব হয় না। বাবা বলল, এইটুকু অসুবিধেয় পড়ে যদি কলকাতায় ফিরি, তবে কলকাতায় অসুবিধা দেখলে শেষ পর্যন্ত বিলেত ফিরে যেতে ইচ্ছা হবে। না, ফেলিক্স তা হয় না।

মুন্সী তন্ময় হয়ে শোনে, বলে কথাটা মিথ্যা নয় ফেলিক্স, শেষ পর্যন্ত হটবার ইচ্ছা না থাকলে কেউ প্রথম ধাপ পিছোয় না।

এমন সময়ে মিঃ ফাউণ্টেন এলো, তার সহায়তায় বাবা কলকাতা থেকে কিনে আনলো চল্লিশ পাউণ্ড দিয়ে একটা মুদ্রাযন্ত্র। ঠিক সেই সময়ে গেল কুঠি উঠে, সবাই মিলে চলে এলাম খিদিরপুর নামে নিকটবর্তী এক গ্রামে। সেই ছাপাখানার যেদিন প্রথম শীট ছাপা হ'ল পাঁচ গাঁয়ের

লোক পড়লো ভেঙে, কলে বই ছাপা হয়। ওদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। উপলক্ষ্যটা নিয়ে গাঁয়ের লোকে একটা গান বেঁধেছিল, এখনো দু'একটা কলি মনে আছে।

এই পর্যন্ত বলে সুর করে আবৃত্তি করে ফেলিক্স—

ধন্য সাহেব কোম্পানী
বই লেখা হয় কলে
কলটি যখন চলে
গুরুমশার ব্যবসা মাটি, ঘুচলো দানাপানি
মরি ধন্য সাহেব কোম্পানী

বাঃ বেশ লিখেছে তো বলে রামবসু, তারপরে কি হ'ল বলো।

এমন সময়ে খবর পেঁছিলো যে, এরা পেঁছেছে শ্রীরামপুরে, বাবাকে সাদরে আহ্বান করলো, বাবাও দেখলো উদ্দেশ্য এক, তবে আর অতদূরে পড়ে থাকি কেন, সবাই মিলে চলে এলাম।

আর টমাসের কি হ'ল?

তোমার চলে আসবার কিছুদিন পরে সেই যে সে বেপাত্তা হ'ল আজও খোঁজ পাইনি তার, কেউ বলে গিয়েছে রাজমহলে, কেউ বলে বীরভূমে।

মদনাবাটীর পরবর্তী ইতিহাসের মোটামুটি একটা আভাস পায় রামবসু।

রাত্রিবেলা বিছানাতে শুয়েই সারাদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় মাকড়শার সুতোর মতো কোথায় ছিন্ন হয়ে গেল উড়ে, মনে পড়লো রেশমীর অশ্রুকাতর মুখখানি। নিস্পন্দ চোখের কোণ দিয়ে জল গড়াচ্ছে—সমস্ত মুখখানি নিপুণ ভাস্করের গড়া মূর্তির মতো স্থির। সামনে দাঁড়িয়ে রামবসু অথচ চোখে পড়ছে না, দৃষ্টি হারিয়ে গিয়েছে কোন অলক্ষ্য দিগন্তে।

কি হ'ল রে রেশমী, কাঁদছিস কেন?

কে উত্তর দেবে? উত্তর দেবার মালিক যে মন, সে আজ কোন্ অগম গহনে পথ ভুলেছে। বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে রামবসু—দুইজনে মুখোমুখী নির্বাক।

হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে রেশমী বলে ওঠে—কায়েৎদা যে, কখন এলে?

রামবসু ব্যাখ্যার মধ্যে যায় না, বলে—ব্যাপার কিরে, কাঁদছিস কেন?

ঐ প্রশ্নে চোখের জল আবার দ্বিগুণ বেগে নামে।

রামবসু বিরক্তির সুরে বলল, কেন কাঁদছিস যদি না বলিস, তবে থাক আমি চললাম।

ওঃ বলিনি বুঝি! কায়েৎদা আজ সকালে মিস এলমার মারা গেছে।

বলিস কিরে, চমকে ওঠে বসুজা, বলে হঠাৎ।

ঠিক হঠাৎ নয়, কিছুদিন থেকে শরীর খারাপ চলছিল, প্রায়ই আমাকে বলতো রেশমী বিবি আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না।

ওসব কথা বললে আমি আর তোমার কাছে ঘেঁষব না।

মিস এলমার বলতো, তাই বলে মনে করো না যে তোমার দুষ্টান্ত যম গ্রহণ করবে—প্রতিদিন সে একটু করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

বুঝলে কায়েৎদা প্রায়ই এমনি কথাবার্তা হতো আমাদের মধ্যে।

শেষে কি হয়েছিল বল।

এমন কিছুই নয়, দুইদিন আগে সামান্য জ্বর কালকে জ্বর বিকারে পরিণত হ'ল, আজ সকালে সব শেষ হয়ে গেল।

রামবসু বলল, মিঃ স্মিথ খুব দুঃখিত হয়েছে নিশ্চয়।

একেবারে ভেঙে পড়েছে, তার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

বলিস কিরে, ভালোবাসে, দুদিন বাদে বিয়ে হবে, এমন সময়ে এই কাণ্ড, ভেঙে পড়বে না তো কি?

ভালোবাসে না ছাই, মিস এলমার ওকে দুচক্ষে দেখতে পারতো না।

কিন্তু আমাকে যে স্মিথ বলেছিল কবচের ফল ফলেছিল।

এই তো ফল দেখলে। তাছাড়া যে পুরুষ কবচ তাবিজ করে তাদের এমনিটিই হয়ে থাকে, এমনিটিই হওয়া উচিত।

বেশ একটু চাপা ঝাঁজের সঙ্গে কথাগুলো বলে রেশমী। রামবসু বুঝতে পারে না তার ঝাঁজের কারণ।

এ যে আর এক সমস্যা হ'ল।

কেন?

এখন থাকবি কোথায়?

লেডি রাসেল এখানেই থাকতে বলেছে আমাকে; বলেছে তুমি আর কোথায় যাবে, যতদিন আমরা আছি এখানেই থাকো।

যাক নিশ্চিন্ত হ'লাম, নইলে কাল আমার যাওয়া হতো না।

কাল আবার কোথায় চললে?

শ্রীরামপুরে, কেরী সাহেব ডেকে পাঠিয়েছে।

ওরা কি সব শ্রীরামপুরে এসেছে?

নইলে আর আমাকে ডেকে পাঠাবে কেন?

তবে কি এখন ওখানেই স্থায়ীভাবে থাকবে?

আমার পক্ষে যতখানি স্থায়ী হওয়া সম্ভব।

কিন্তু নড়ুর কষ্ট হবে না?

ইতিমধ্যে নাড়ু এসে অন্নদার মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে গিয়েছে।

রামবসু বলে, মা মরলে কোন্ ছেলের কষ্ট না হয়?

তার উপরে তুমি আবার চললে?

মার অভাব কি বাপে দূর করতে পারে! দেখেই না কি করবো।

রামবসুর ঘুম আসতে চায় না, ঘুরে ফিরে রেশমীর মুখ, রেশমীর চোখের জল মনে পড়ে। এতদিন রেশমীর স্মৃতি যদি বা একটু ঝাপসা হয়ে এসেছিল, অশ্রুধৌত হয়ে তা আবার নতুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো হাল ছবির মতো। একটুখানি কলঙ্কিত না হলে চাঁদ বুঝি এত সুন্দর হতো না।

শেষ রাতে একটু ঘুম এসেছিল হঠাৎ একটা গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল রাম বসুর।

উঠোনের মধ্যে সকলে এক সঙ্গে তারস্বরে কথা চলছে, বিশেষ উচ্ছ্বাসের কারণ ঘটে থাকবে। কৌতূহলী রাম বসু বাইরে গিয়ে দেখলো পাদ্রীদের মধ্যে ডাঃ টমাস দাঁড়িয়ে। রামবসু দেখলো টমাসের পোশাক যেমন ছিল তেমনি আছে, চেহারাও তদ্বৎ, উপরির মধ্যে সঙ্গে একটা জরাজীর্ণ মধ্যবয়স্ক বাঙালী হিন্দু।

এই যে মুন্সী তুমিও এসেছ, আহা, প্রভুর মন্দির পূর্ণ হয়ে উঠল—বলে ছুটে এসে টমাস জড়িয়ে ধরে রাম বসুকে।

তারপরে ভালো ছিলে তো ডাঃ টমাস।

খুব ভালো, আনন্দে ছিলাম।

এতদিন ছিলে কোথায়?

বীরভূমে সুরুল নামে একটা গ্রাম আছে সেখানে।

সেখানে কি গীর্জা আছে নাকি?

কোম্পানীর প্রত্যেক কুঠিটাই যে একটা গীর্জা। ওখানকার কুঠিয়াল মিঃ চীপ বড় সদাশয় ব্যক্তি।

সঙ্গে ওটি তোমার চাকর নাকি?

আমার চাকর কোথায়? প্রভুর চাকর। ওর নাম ফকির। ও হচ্ছে "খ্রীষ্টের খোঁয়াড়ে প্রবেশেচ্ছু, একটি মেষ।"

বেশ, বেশ বড় আনন্দের কথা বলে মুন্সী।

ওকে খ্রীষ্ট মণ্ডলীভুক্ত করে প্রথম খ্রীষ্টান করবার গৌরব লাভ করবো আমি।

দেখা যাবে তুমি কত বড় বাহাদুর! মনে মনে বলে রাম বসু।

ইতিমধ্যে কেরী মার্শম্যান ওয়ার্ড ফাউণ্টেন প্রভৃতি সকলে একে একে স'রে পড়েছে, তার কারণ টমাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রত্যেকের একবার ক'রে শোনা হ'য়ে গিয়েছিল, পুনরায় শোনবার আগ্রহ আর কারো ছিল না।

টমাস দেখলো মুন্সীই একমাত্র শ্রোতা, পাছে সেও অন্য সকলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাই সবলে তার হাত ধরে বসিয়ে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের বিস্তারিত ভাষ্য কথনে নিযুক্ত হ'ল। রাম বসু টমাসের প্রকৃতি জানতো, বুঝলো সকালবেলাটা এই পর্বেই যাবে।

উদ্দেশ্য—তীর্থ দর্শন

চণ্ডী বক্সি রেশমীর দিদিমা মোক্ষদা বুড়ীকে হাত ক'রে নিয়ে রেশমীর নামীয় বিষয় আশয় জোত ব্রহ্মত্র বাড়িঘর দখল ক'রে বসেছে। লোকে কানাকানি করছে অনুমান ক'রে যত্রতত্র বলে বেড়াতো, আরে বাপু একটা দেখাশোনা না করলে পাঁচভূতে লুটে খাবে, বুড়ো মানুষ সামলাতে পারবে কেন?

তারপরে বলতো কি গেরো! যত দায় কি আমার ঘাড়ে এসে চাপবে।

লোকে মনে মনে বলতো কথাটা মিথ্যা নয়, গাঁয়ের এবং আশে পাশে পাঁচ গাঁয়ের এমন অনেকগুলো বিষয় আশয়ের ভার ঘাড়ে চেপেছে বটে তোমার।

চণ্ডী বক্সি বলতো এ যেন কাকের বাসায় কোকিলের ছানা পুষেছি, ডানায় জোর পেলেই উড়ে পালাবে, তখন কাকস্য পরিবেদনা! মানে বুঝলে তো মুৎসুদ্দি কাকের কেবল মনে ব্যথা। এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল যদি নিজের জোত জমির তদারক করতাম।

সে খেদের প্রয়োজন ছিল না চণ্ডীর, নিজস্ব বলতে এক ছটাক জমি ছিল না তার। চণ্ডীর মতো লোকের পক্ষে পরস্বই নিজস্ব।

কিন্তু লোকের কাছে যাই বলুক মনে শান্তি ছিল না চণ্ডীর। সে জানতো রেশমী এখনো জীবিত আর আছে সাহেবদের হেফাজতে। কোন্‌দিন যে হঠাৎ দেখা দেবে, তখন বিষয় আশয় যাবেই, না জানি কোন্ প্যাঁচে পড়বে ভেবে তার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। বিপদে মধুসূদন মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর কিছুকাল আগে দেহরক্ষা করেছেন, কাজেই কে তখন রক্ষা করবে চণ্ডীকে।

কিন্তু মেঘ যতই কালো হোক দু' একটা রজত রেখা না থেকে যায় না। চণ্ডীর অভিপ্রায়ের প্রধান অন্তরায় তিনু চক্রবর্তী নিহত হ'য়েছে। গাঁয়ের লোকে আজও বুঝতে পারেনি তিনুর হত্যাকাণ্ডের রহস্য। কেবল চণ্ডী ঠিক অনুমান করেছিল। অসৎ লোকের ধূর্ত না হ'লে চলে না, সাধু সজ্জনেরই নির্বোধ হওয়া সাজে।

চণ্ডী বুঝেছিল যে, তিনু চক্রবর্তী তার অভিপ্রায় জানতে পেরে রেশমীকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল বজরায়। অন্ধকারে শত্রুমিত্র একাকার। মরতে মরলো তিনু। এটাকেও সে বিধাতার অভিপ্রায় ব'লে ব্যাখ্যা করতো।

সে বলতো মিত্যুঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় তার দুষ্কর্মের প্রধান সংগী, বলো দেখি এটা কেমন ক'রে ঘটলো, আমি যদি অন্যায় কাজ করতেই গিয়ে থাকি মরা উচিত ছিল আমার, মরলো কেন তিনু?

লোকে বলে সাহেব অন্ধকারে গুলী চালিয়েছিল।

বাবা মিত্যুঞ্জয় অন্তর্যামীর চোখেও কি আলো অন্ধকার আছে? তিনি তো দেখেছিলেন কে মরছে, রক্ষা করলেন না কেন?

মৃত্যুঞ্জয় বলে আপনিই বুঝিয়ে দিন, আমরা যে লোকের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।

তাতে দুঃখিত হয়ো না, বাবা, শাস্ত্রের মর্ম বোঝা সহজ নয়।

তারপরে বেশ শাস্ত্রালোচনার উপযুক্ত শান্ত সংযতভাবে উপবেশন ক'রে বলে গীতায় শ্রীভগবান কি বলেন নি যে 'পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম সম্ভবামি যুগে যুগে।' আরে বাপু তিনু যখন মরলো তখন বুঝে নিতে হবে যে লোকটা দুষ্কৃতকারী, আমি যখন বেঁচে গেলাম বুঝে নিতে হবে যে আমি সাধু।

একটু থেমে পুনরায় বলে, পড়ো পড়ো গীতা পড়ো, ভালো, ভালো ক'রে গীতা পড়লে কোন কাজ করতে বাধবে না।

চণ্ডী খুব সম্ভব সাকারেদের মহিমা সম্পূর্ণ অবগত ছিল না নতুবা এমন উপদেশ কেন দিতে যাবে!

তখন মৃত্যুঞ্জয় বলল, এখন কি করবেন ভাবছেন?

একবার কলকাতা যেতে হবে?

কলকাতায় কেন?

আমার মনে হচ্ছে ছুঁড়িটা ওখানেই গিয়েছে, সেখানে সাহেবে সাহেবে মুখ শোঁকাশুঁকি, কতদূর কি গড়ালো একবার সারেজমিনে দেখে আসা ভালো—জানই তো ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে।

আর কাকে সঙ্গে নেবেন?

বেশি লোক নেওয়া কিছু নয়, জানাজানি হ'য়ে যাবে।

তবে একাই যাচ্ছেন?

একেবারে একাকীও কিছু নয়, তুমি যেতে পারবে না?

বাধা কি?

আর সঙ্গে নিতে হবে মোক্ষদা বুড়ীকে।

তাকে আবার কেন?

ছেলে-মানুষ কিছুই বোঝ না দেখছি। কলকাতা কোম্পানীর মুল্লুক, আইনের রাজত্ব। ছুঁড়িটার প্ররোচনায় সাহেবগুলো গোলমাল বাধাতে চেষ্টা করলে মোক্ষদাকে এগিয়ে দেবো, বলবো যে বুড়ী এসেছে নাতনিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বুঝলে না তা হ'লে আমাদের আর কোন দায় থাকবে না।

ভালো বলেছেন, কিন্তু বুড়ীকে তো এত বলা যায় না।

যা বলা যায় বলেছি, কালীঘাটে যাচ্ছি মা কালীকে দর্শন করতে। বুড়ী নেচে রাজি হ'য়েছে।

তবে তো চারদিক বেঁধেই অগ্রসর হ'য়েছেন।

অগ্রসর আর কোথায় হ'লাম, এখনো তো জোড়াসউ গাঁয়ে ব'সে আছি। যাও তুমি গিয়ে গোছগাছ ক'রে নাও, কাল সকালেই বেরিয়ে পড়বো।

পরদিন সকালে মোক্ষদাকে নিয়ে চণ্ডী মৃত্যুঞ্জয় কলকাতা রওনা হ'য়ে গেল।

লোকে বলাবলি করলো, চণ্ডী মুখে কটুকাটব্য করলেও মনটায় সাদা। বুড়ীকে নিয়ে তো গেল কালীঘাটে—একা যেতে তার কি বাধা ছিল? যাই বলো দোষে গুণে মানুষ।

তিনু চক্রবর্তীর অভাবে চণ্ডীর প্রকৃত উদ্দেশ্যের সন্ধান কেউ জানতে পারলো না।

(ক্রমশ)

চক্রদত্ত

যেসব লোক কোনওরকম দুর্ঘটনা-বশত সমুদ্রের মধ্যে পড়ে যায় এবং তাদের মধ্যে কেউ আহত হয়ে পড়লে নিজের শক্তির বলে উঠতে পারে না, তখন তাদের হেলিকপ্টার দিয়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। হেলিকপ্টারের সঙ্গে একটি হাল্কা জাল ভাঁজ করে রাখা থাকে। বিপদকালে জালটি ঐ বিপন্ন লোকটির ওপর ছড়িয়ে পড়ার পর আস্তে আস্তে স্বতঃই গুটিয়ে আসতে থাকে। ক্রমশ লোকটি জালসমেত গুটিয়ে এসে হেলিকপ্টারের গায়ে আটকে যায়। ঐ জালটির সঙ্গে একটি ছোট সাদা থলি-যুক্ত থাকে। সেইটি বায়ুর গতিনির্দেশক। বায়ুর গতি অনুসারে জালটি বিস্তৃত করা হয়।
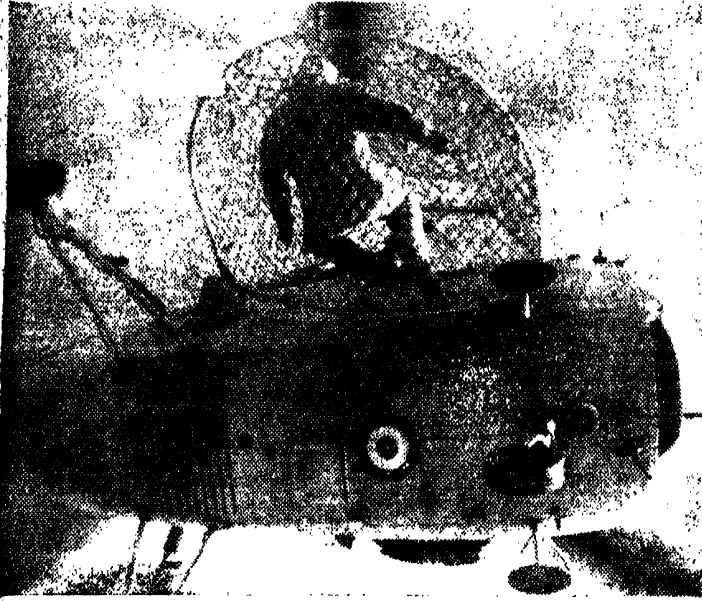
ফাঁদে ফেলা নয়, উম্ধারকারী জাল

★

প্রায় বিশ বছর আগে ভারতের প্রয়োজনীয় সমস্ত সাইকেলই ভারতের বাইরে থেকে তৈরী হয়ে আসতো। বেশীর-ভাগই যুক্তরাজ্য এবং জাপান থেকে তৈরী হতো। কিন্তু আজকের দিনে দেশীয় কারখানা থেকে যত সাইকেল তৈরী হয়, তাতে ভারতের চাহিদার প্রায় সবটাই মিটে যায়। আশা করি, অদূরভবিষ্যতে ভারতের বাইরে থেকে আর সাইকেল আমদানী করতে তো হবেই না, উপরন্তু রপ্তানি করতে পারবে। বর্তমানে দেখা যায় যে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্জাবেই সবচেয়ে বেশী সাইকেল তৈরীর কারখানা আছে। পাঞ্জাবে প্রায় ১৬টি, দিল্লীতে ১৩টি, বম্বেতে ১টি, উত্তরপ্রদেশে ৭টি, পশ্চিম-বঙ্গে ৬টি, মধ্যপ্রদেশে ৫টি, রাজস্থানে ৪টি, মাদ্রাজে ২টি এবং বিহারে মাত্র একটি সাইকেল তৈরীর কারখানা আছে। ভারতে মোট ৬৩টি সাইকেল তৈরীর কারখানা পাওয়া যায়। ১৯৫০-১৯৫১ সালে ভারতবর্ষে ১৭ হাজার সাইকেল তৈরী হয়েছিল। ১৯৫৫-৫৬ প্রায় ৫১৩০০০টি সাইকেল তৈরী হয়। ভারতে তৈরী সমস্ত সাইকেলের শতকরা ২৫ ভাগ পাঞ্জাবে তৈরী। কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সালেও এই পাঞ্জাবেই একখানি পুরো সাইকেলের কয়েকটি অংশ মাত্র তৈরী করা হতো। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম থেকেই পাঞ্জাবের সাইকেল তৈরীর কারখানার সুদিন দেখা গিয়েছিল। তখন বাইরে থেকে সাইকেল আসতো না, ফলে দেশীয় সাইকেলের চাহিদা বেড়ে যায়। ১৯৪১—৪২ সালে বোম্বের "হিন্দ সাইকেল" আর পাটনার "হিন্দুস্থান বাই-সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন" নামে দুটি সাইকেল তৈরীর কারখানা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইসব কারখানা থেকে তখন মোট ৫০,০০০টি সাইকেল ভারতবর্ষেই তৈরী হতো। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সঙ্গে পাঞ্জাবের সাইকেল শিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। সুদক্ষ মুসলমান কর্মচারিগণ পাকিস্থানে চলে যাওয়াতেই এমন ঘটে। এরপরে ধীরে ধীরে অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই সাইকেল শিল্পের যে উন্নতি হতে থাকে, তাই ক্রমশ বর্তমান অবস্থায় পরিণত হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে এই শিল্পকে বিশেষ উৎসাহিত করা হয়। দেখা যায় যে, তখন "অ্যাটলাস সাইকেল ইণ্ডাস্ট্রিস" ১৯৫২ সালে যখন প্রথম সাইকেল তৈরী করতে আরম্ভ করে, তখন মাসে ২০০খানি করে সাইকেল তৈরী করে। আজকের দিনে এই কারখানায় মাসে ৮,০০০খানি সাইকেল তৈরী হচ্ছে। এই কোম্পানীর সঙ্গে পাঞ্জাব এবং লুধিয়ানায় আরও কতকগুলি ছোটখাট সাইকেলের কারখানা সাইকেলের অংশ তৈরী কিংবা পুরোপুরি সাইকেল তৈরীর সাহায্য করে। বৃটিশ রাজত্বে ইংরাজ সরকার বিদেশ থেকে সাইকেল আমদানীর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন বলেই ভারতের সাইকেল শিল্পের কোনও-রকম উন্নতি হয়নি। ১৯৪৯ সাল থেকে ভারত সরকার দেশী সাইকেলের উন্নতিকল্পে বিদেশী সাইকেলের মূল্যের ওপর শতকরা ৬০ থেকে ৭২ মুদ্রা পর্যন্ত কর ধার্য করেন। যদি এই অনুপাতে সাইকেল শিল্পের ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে, তাহলে আশা করা যায় যে, ভারতের চাহিদা পূরণ করার পরও বিদেশে সাইকেল রপ্তানি করা যাবে এবং বছরে প্রায় ১৫ কোটি টাকার বিদেশী জিনিস আমদানী করা বন্ধ হবে।

(ত্রিশ)

“অনেক শতাব্দী ধরে আমাদের দেশবাসী এই অলীক সাম্রাজ্যবাদের জন্যে কাঁধ দিয়ে লড়ে এসেছে। তাতে ফল হয়েছে কি? যেখানেই তারা গেছে, লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে। আপনারা জানেন ইয়েমেনের জন্যেই মরুতে কতো তুর্কী প্রাণ দিয়েছে? কতো মানুষের মৃত্যু হয়েছে শুধু ধরে রাখতে সিরিয়া, ইরাক ও মিশর?” —কামাল আতাতুর্ক।

তেরো শ' বছর আগে যখন তুর্কীরা তাদের আদিম জন্মভূমি তিয়েন শান পর্বতমালা ও আরাল সমুদ্রের উপকূল ছেড়ে পশ্চিম-পথে যাত্রা করে তখন, কথিত আছে, তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল একটা ছাই রং-এর হিংস্র নেকড়ে বাঘ। এই দুর্ধর্ষ পরম দুঃসাহসী জাতি নানা ধর্ম প্রভাবের মধ্য দিয়ে ইসলামে উপনীত হয়েছিল; একাদশ শতাব্দীতেই সমগ্র মুসলমান দুনিয়ায় সাহসে, বীর্যে, নিষ্ঠুরতায় এদের সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। আরবী ভাষায় প্রচলিত একটা প্রবাদ আছে, ধর্মগুরু মহম্মদের মুখ থেকে নিঃসৃত “আল্লাহ্ বলছেন, আমার এক সৈন্যবাহিনী আছে, তার নাম দিয়েছি তুর্কী। যখনই আমি কোন জাতির উপরে ক্রুদ্ধ হই, তাদের শায়েস্তা করতে পাঠাই এই তুর্কী সৈন্যদের।” ১০৫৫ সালে তুর্কীরা অধিকার করে বাগদাদ; দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় এক বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ক'রে এগিয়ে যায় আরো পশ্চিমে। এরটুগ্রুল (Ertugrul) নামে এক তুর্কী বীর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্য-এশিয়া থেকে অবতীর্ণ হন উত্তর-পশ্চিম আনাটোলিয়ায়। ইনিই হচ্ছেন ওসমানের পিতা, যে ওসমান তুর্কীর প্রথম সুলতান। ওসমান শব্দটি এসেছে আরবী ‘উথমান’ থেকে। আর ‘উথমান’ থেকেই “অথোমান বংশ”, অথোমান সাম্রাজ্য, ছ' শ' বছর আয়ু নিয়ে পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে যা ছিল প্রতিষ্ঠিত। এ সাম্রাজ্য যে কতো বিরাট ছিল তার আন্দাজ পাওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীর “মহানুভব” সুলতান সুলেমানের আত্ম-প্রশস্তি থেকে:

> “আমি সুলতান সুলেমান খান, সুলতান সেলিম খানের পুত্র। আমি পূর্ব ও পশ্চিমের সকল সুলতানদের সুলতান। রোমক, পারস্য ও আরব সাম্রাজ্যের ভাগ্যবান মালিক। সমস্ত মনুষ্যজাতির বীর। ধরণী ও কালের কর্তা। ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর আমার পদানত। মক্কা ও মদিনার পবিত্র তীর্থস্থানের আমি রক্ষক, জেরুসালেমের অভিভাবক। মিশরের সিংহাসন আমার। এডেন, আডেন, সিনাই, বাগদাদ, বসরা, লাহসা, আলজিয়ার্স, আজারবাইজান আমার অধিকারে। তাতারদের দেশ, কিপচাক অঞ্চল, কুর্দিস্থান, লুরিস্থান ও সমগ্র রুমেলিয়া, আনাটোলিয়া ও কারামান, ওয়ালাচিয়া, মোলডাভিয়া ও হাংগারী আমার শাসনে।”

এই বিশাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় ১৬৮৩ সালে, যেদিন অথোমান সৈন্যেরা ভিয়েনা অবরোধ তুলে দিতে বাধ্য হয় সেদিন থেকে। তার পরও ২৩১ বছর এ সাম্রাজ্য টিঁকে ছিল ভাঙতে ভাঙতে, পড়তে পড়তে। উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর নানা স্থানে মুসলমান শাসকদের একে একে পতন হ'তে থাকে; ভারতে ও মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের হাত থেকে ক্ষমতা চ'লে যায় বিদেশী খৃশ্চানদের কাছে। তখন অথোমান সাম্রাজ্যকে বলা হত “য়ুরোপের রুগ্ন ব্যক্তি”। বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মেনী মিলে যে “প্রাচ্য প্রশ্নের” সৃষ্টি করেছিল, একজন তুর্কী ঐতিহাসিকের ভাষায় তা হ'ল “অথোমান সাম্রাজ্য ভাগ করে নেবার প্রশ্ন”। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বিদ্রোহ দেখা দেয় সার্বিয়া ও বুলগারিয়ায়; মিশরে সুলতান-প্রতিনিধি মহম্মদ আলী, সুলতানের সার্বভৌমত্ব অগ্রাহ্য ক'রে আক্রমণ করেন সিরিয়া; তাঁর পুত্র ইব্রাহিম বিজয়ী সেনাবাহিনী নিয়ে অথোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল্ পর্যন্ত উপস্থিত হন। তিনি যে এ নগরী আক্রমণ করেন নি তা কেবল একটি বিরাট রুশ বাহিনীর বসপোরাসের এশীয় উপকূলে উপস্থিতির জন্যে।

তুর্কী সাম্রাজ্যে যে কঠোর স্বেচ্ছাচার রাজত্ব জনস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে অত্যাচার ও উৎপীড়নের চাকায় চ'লে আসছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ জানিয়ে কয়েকজন সামরিক ছাত্র ১৮৮৯ সালে একটি সমিতি তৈরী করেন, যার নাম “অথোমান একতা ও প্রগতি সমিতি।” যে সব শহর থেকে এই সময়ে সুলতানের অত্যাচারের ভয়াবহ কাহিনী প্রচার ক'রে নানাবিধ পুস্তিকা তুর্কীতে পাঠান হত তার মধ্যে ছিল লণ্ডন ও কাইরো। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মেনির সঙ্গে যোগ দিয়েই তুর্কী সাম্রাজ্যের পূর্ণ পতনের আরম্ভ হয়। এ সাম্রাজ্যের বিরাট ভৌগোলিক দেহের কোন অংশের সঙ্গেই সুলতানের আত্মার যোগাযোগ ছিল না। বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়াকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা তো তাঁর ছিলই না, তার উপর বিস্তীর্ণ আরব অঞ্চলের সর্বত্রই সুলতানের প্রজারা বিদ্রোহ

করে ইংরেজের নেতৃত্বে একটি বলিষ্ঠ গেরিলা বাহিনীর সৃষ্টি করে তুলেছিল। ১৯১৮ সালের অক্টোবরে তুর্কী সাম্রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা করতে হিণ্ডেনবার্গ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখে গেছেন: "পূর্বাঞ্চলে, তুর্কী সাম্রাজ্যের শেষ প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে। মসুল ও আলেপ্পো প্রায় বিনা-যুদ্ধে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ইরাক ও সিরিয়ার সৈন্যদলের কোন অস্তিত্বই নেই।"

যে কামাল আতাতুর্ক তুর্কীকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে বিজয়-গৌরবে উন্নত-শির করেছিলেন, তাঁর বিপ্লবী কর্মজীবনের শুরু হয়েছিল সিরিয়ার রাজধানী ডামাস্কাসে, যেখানে তিনি "পিতৃভূমি" নামে একটি বিপ্লবী সংগঠনকে তেজী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। পরে, সিরিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে এলেনবীর অগ্রগতি প্রতিরোধ ও তাঁর সামরিক উচ্চাশা ব্যর্থ করে মুস্তাফা কামাল তুর্কীর সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক নেতার গৌরব অর্জন করতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ, একদিক থেকে দেখতে গেলে, সিরিয়াই মুস্তাফা কামালকে আধুনিক তুর্কীর নির্মাতা হতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

যুদ্ধোত্তর তুর্কীতে কামাল পাশা প্রথম ধ্বনি তুলেছিলেন যে, নতুন যে-তুর্কী তৈরী হবে তাকে বর্জন করতে হবে পুরাতন আরব সাম্রাজ্যের স্মৃতি ও স্বপ্ন। তার ভৌগোলিক বিস্তার সীমাবদ্ধ থাকবে শুধু তুর্কী ভাষাভাষী অঞ্চলে। যে সিভাস কংগ্রেসে (Sivas Congre[illegible]) নব্য তুর্কীর গোড়াপত্তন হয় সেখানে কামালের নেতৃত্বে অগ্রাহ্য হল কয়েকজন প্রতিনিধির দাবী: সমগ্র অটোমান সাম্রাজ্যের উপর লীগ অব নেশনস-এর ম্যানডেট দেওয়া হোক মার্কিন সরকারকে। মুস্তাফা কামাল বললেন, তুর্কীদের কোন অধিকার নেই আরব দেশগুলির পক্ষ থেকে ম্যানডেট দাবী করার। ১৯২০ সালের ২৮শে জানুয়ারী তুর্কীর জাতীয় সভা (পার্লামেন্ট) একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যার নাম "জাতীয় চুক্তি", ন্যাশনাল প্যাক্ট। তার প্রস্তাবেই বলা হয় অটোমান সাম্রাজ্যের আরব-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির ভবিষ্যৎ স্থির হবে গণভোটের নির্দেশে। কামাল আতাতুর্ক তুর্কীর প্রেসিডেন্ট হবার আগেই রাজধানী স্থানান্তরিত হয় আনকারায়; এটাও নব্য তুর্কীর আরব উপনিবেশ থেকে পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের প্রতীক। আনকারা ভৌগোলিক দিক থেকে তুর্কীরই রাজধানী হতে পারে, অটোমান সাম্রাজ্যের নয়। আতাতুর্ক খলিফাৎ সমাপ্ত করে, তুর্কীর জাতীয় মুসলমান [illegible], চালচলনের চরমপন্থী পরিবর্তন ঘটিয়ে, স্ত্রীজাতির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নব্য তুর্কীকে সম্পূর্ণ দিকে আরবভূমি থেকে আলাদা নির্মাণ করেন। তুর্কী ভাষাকে তিনি আরবী অক্ষর থেকে মুক্ত করেন; প্রবর্তন করেন তুর্কী হরফের। সৃষ্টি হয় নতুন তুর্কী সাহিত্য, নতুন ইতিহাস। আরবিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনযাত্রায় তুর্কী য়ুরোপেরই একটি অংশ বলে পরিচয় দিতে শুরু করে।

কামাল আতাতুর্কের মূল রাষ্ট্রনীতি ছিল "ঘরে শান্তি, বাইরে শান্তি"। তুর্কীকে সকল আন্তর্জাতিক অশান্তি থেকে তিনি বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন। [illegible] আমলে রাশিয়া [illegible] অটোমান সাম্রাজ্যের দিকে লোলুপ দৃষ্টি রেখেছে। তার [illegible] অটোমান সাম্রাজ্য [illegible] না করতে দেবার জন্যেই [illegible] ও ফ্রান্স ১৮৫৫ সালে ক্রাইমিয়া যুদ্ধে [illegible] হয়েছিল। তার [illegible] বছর পরে [illegible] হানা দিয়েছিল [illegible] রাজধানীর উপকণ্ঠে; সেদিনও যুদ্ধ [illegible] সংগে। [illegible] মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির মধ্যে [illegible] গোপন চুক্তি [illegible] রাশিয়াকে [illegible] দিয়েছিল [illegible] তুর্কী [illegible]; যদি রাশিয়ায় [illegible] বিপ্লব না হত, তাহলে [illegible] অটোমান সাম্রাজ্য থেকে [illegible] শহর, [illegible] ও [illegible] [illegible]

কিন্তু [illegible] পর লেনিন সোভিয়েত [illegible] [illegible] কামাল [illegible] নীতি ছিল সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করা। লেনিন যুদ্ধোত্তর যুগে বড় বড় দেশগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবার সুযোগ না পেয়ে মিত্রতা করতে চেয়েছিলেন পরাজিত দেশগুলির সঙ্গে, যেমন জার্মানী ও তুর্কী। যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক বৈঠকে সোভিয়েত সরকার বরাবরই সমর্থন দিয়েছিল পরাজিত রাষ্ট্রের জাতীয় দাবীকে। তাই পার্লামেন্টে মুস্তাফা কামাল ১৯২৪ সালের ১লা নভেম্বর ঘোষণা করেছিলেন, "আমাদের পুরাতন বন্ধু সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে তুর্কীর সম্প্রীতি রোজ বেড়ে চলেছে। রিপাবলিকান গভর্নমেন্ট মনে করেন যে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সর্বপ্রকারের ব্যাপক মৈত্রী তার পররাষ্ট্রনীতির মূল প্রেরণা ও উদ্দেশ্য।"

কামাল পাশার মৃত্যুর পর থেকেই রুশ-তুর্কী সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তুর্কীতে জার্মান প্রভাব ছিল যথেষ্ট, এবং তুর্কী নেতারা ভেবেছিলেন যে জার্মেনীর সামরিক শক্তির কাছে রাশিয়া কোনমতেই দাঁড়াতে পারবে

না। ১৯৪৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তুর্কী ছিল নিরপেক্ষ। শুধু তাই নয়, তুর্কী ছিল জার্মান গোয়েন্দাগিরির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র; ফ্রন ভন প্যাপেন তাঁর আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে অনেক আলোকপাত করেছেন। তুর্কীর নিরপেক্ষতা কৃষ্ণ সাগরে সোভিয়েটের শক্তিকে বহুই অসুবিধায় ফেলেছিল।

যুদ্ধের পর তুর্কী চলে এল মার্কিন আওতায় এবং রাশিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্রমাগতই খারাপ হয়ে চলল। রাশিয়ার সঙ্গে অসদ্ভাব ও আমেরিকার সঙ্গে সদ্ভাব, যুদ্ধোত্তর তুর্কীর পররাষ্ট্র নীতির এই হল প্রধান পরিচয়। মার্কিন সামরিক সাহায্যের শুরু, হল ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে, এবং ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ এই চার বছরে তুর্কী মার্কিন আর্থিক ও সামরিক সাহায্য পেল প্রায় দশ কোটি পাউণ্ড, অথবা একশো তিশ কোটি টাকা। কৃষ্ণ সাগর নিয়ে নতুন একটি সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হবার আশঙ্কায় [illegible] ১৯৫২ সালের [illegible] ফেব্রুয়ারী তুর্কী উত্তর আটলান্টিক সামরিক সংস্থার পূর্ণ সভ্যরূপে গৃহীত হয়। বর্তমানে এই সংস্থার সমগ্র [illegible] দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের [illegible]। এখন তুর্কীতে একাধিক মার্কিন সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত; এ সব ঘাঁটি থেকে সর্বাধুনিক বোমারু বিমান অনেক রুশ নগর আক্রমণে সক্ষম। তুর্কী সৈন্যেরা মার্কিন পোশাকে, মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত; মার্কিন রণনীতিতে দীক্ষিত। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে তুর্কীতে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি থেকে রাশিয়ার 'ব্যালিস্টিক মিসাইল' পরিকল্পনার উপর সজাগ নজর রাখা হচ্ছে গত দু'বছর ধরে। তুর্কীর বাজেটের পরিমাণ তিন হাজার মিলিয়ন লিরা; তার চল্লিশ ভাগ ব্যয় হয় প্রতিরক্ষায়। মার্কিন সামরিক সাহায্য নিয়ে সামরিক খাতে বাৎসরিক ব্যয় প্রতি বৎসর দু হাজার মিলিয়ন লিরা। মার্কিন বাণিজ্য তুর্কীতে ধীরে ধীরে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯৫০ থেকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতৃত্বে বেসরকারী আর্থিক স্বার্থের ক্রম-প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিয়ে অনেক মার্কিন মূলধন তুর্কী শিল্পে ও বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়েছে। দেশ হিসাবে দেখতে গেলে তুর্কী রপ্তানি বাণিজ্যের সর্বপ্রধান বাজার এখন আমেরিকা, আমদানী বাজার পশ্চিম জার্মানী।

অনেকে মনে করেন যে যদি আবার এক বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়, তুর্কী কোন এক অভাবনীয় কূটনৈতিক চাতুর্যে পুনরায় নিরপেক্ষতার আশ্রয় নেবে। অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক জি এল লুইস্ তাঁর 'তুর্কী' গ্রন্থে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে তুর্কীর ভাগ্য পশ্চিমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। আসলে, কঠিন বাস্তব তুর্কীকে সহজে নিরপেক্ষ হতে দেবে না। আমেরিকা এত অর্থ ও অস্ত্র ঢেলে এই বিনিময় সহজে গ্রহণ করবে না। তুর্কী সামরিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে পরিপূর্ণ মার্কিন-বন্ধু। শীতল যুদ্ধে সে আকণ্ঠ ডুবে রয়েছে। তার বর্তমান নীতির আমূল পরিবর্তন না হলে রুশ তুর্কী সম্পর্কের উন্নতি সম্ভব নয়।

আনকারাতে একটি চলতি রসিকতা আছে। গত মহাযুদ্ধের সময় এই শহরে ব্লাক-আউটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখন নাকি রুশ রাজদূত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। মন্ত্রী মহোদয়কে তিনি জিজ্ঞাসা করেন ব্লাক-আউটের কারণ কি? উত্তর হয়, আক্রমণের ভয়। তখন রুশ রাষ্ট্রদূত বলেন, "অযথা ব্লাক-আউট করবেন না। যদি আমরা কখনো আক্রমণ করি, প্রকাশ্য দিনের আলোতেই করব।" তুর্কীর পঁচিশ হাজার সৈন্য থাকা সত্ত্বেও এবং যদিও এ সৈন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দেশপ্রেমী, পশ্চিমী বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, এর যুদ্ধ-যোগ্যতা "১৯১৯ সালের পক্ষে খুবই ভাল।" অর্থাৎ বর্তমান সময়ে রুশ বাহিনীর কাছে দাঁড়াবার যোগ্যতা তার নেই। তাই, মহাসমরে, তুর্কীকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র আমেরিকা। এর উপর ক্রুশ্চেভ সম্প্রতি রকেট-অস্ত্রের ভয় দেখিয়েছেন তুর্কীর শাসকদের। "একবার রকেট উড়তে শুরু করলে, আর উপায় নেই।"

তুর্কী-রুশ সম্পর্ক কামাল আতাতুর্কের আমল থেকে, মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

আরব দেশগুলির সঙ্গে তুর্কীর কোনদিন মিত্রতা স্থাপিত হয় নি। কামাল আতাতুর্ক শুধু চেয়েছিলেন তুর্কী মানস থেকে আরবভূমির উপর বহুকালের পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বিদূরিত করতে। মিশরের সঙ্গে কোনদিন তুর্কীর সৌহার্দ্য ছিল না, আজও নেই। তুর্কীর চিরদিন আরবদের অবহেলার চোখে দেখে এসেছে।

কোন তুর্কীকে গ্রহণের অযোগ্য কোন প্রলোভন দেখালে সে চট করে বলে বসবে, "ডামাস্কাসের মিঠাই বা আরবের মুখচ্ছবি, কোনটাই চাই নে।" এর অন্যতম কারণ অনারব মুসলমানদের আরবদের প্রতি খানিকটা ঐতিহাসিক হিংসা। আরবদের মধ্যেই জন্মেছিলেন মহম্মদ, আরবরাই ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃত উত্তরাধিকারী। আরবদের বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি যেমন তাদের অহংকারী করে তুলেছিল, তেমনি অন্যান্য মুসলমানদের করেছিল ঈর্ষান্বিত। আরবরা একদিকে যেমন ভুলতে পারে নি তুর্কীর কঠোর সাম্রাজ্যবাদী দুঃশাসন, অপরদিকে তেমনি ঈর্ষার চোখে দেখে এসেছে নব্য তুর্কীর দ্রুত উন্নয়ন। আবার তেমনি আতংক ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছে আতা-তুর্কের নেতৃত্বে তুর্কীর জীবন থেকে ইসলামের প্রভাব কমে এসেছে, খিলাফৎ সমাপ্ত হয়েছে, তুর্কী মেয়েরা বোরখা ছেড়ে য়ুরোপীয় পোশাক পরে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার লাভ করেছে, ধর্মীয় বিবাহের বদলে প্রবর্তিত হয়েছে সিভিল বিবাহ; তুর্কী ভাষা ও সাহিত্য আরব প্রভাব থেকে ঘোষণা করেছে স্বরাজ।*

আরো কারণ আছে তুর্কী-আরব অমিত্রতার। ১৯৪৯ সালের ২৮শে মার্চ, সমস্ত আরব ভূমিকে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট করে তুর্কী শিশুরাষ্ট্র ইজরেইলকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছিল। তারপর থেকে সে ইহুদি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে এসেছে। ঐ বছরই আমেরিকা ও ফ্রান্সের সঙ্গে তুর্কীও মনোনীত হয়েছিল জাতিপুঞ্জের প্যালেস্টাইন আপোসী কমিশনের সভারূপে। কোন আরব দেশই এ মনোনয়নকে প্রীতির চোখে দেখে নি।

সিরিয়ার সঙ্গে অসদ্ভাব আরো গভীর এবং পুরাতন। সিরিয়া-তুর্কী সীমান্তের দৈর্ঘ্য চার শো নব্বুই মাইল; তুর্কী-ইরাক সীমান্ত তিন শো ছেচল্লিশ মাইল। ১৯৩৯ সালের ৩০শে জুন তুর্কী সিরিয়ার 'হাতে' (Hatay) শহর অধিকার করে, যার পুরাতন নাম আলেকজান্দ্রেটা, এবং যার উপর সিরিয়ার দাবী অনেককালের। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এ শহরটি সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তুর্কী ফ্রান্সের সঙ্গে ১৯২১ সালের আঙ্কারা চুক্তিতে এ হস্তান্তর মেনেও নিয়েছিল। ১৯৩৫ সালে, য়ুরোপে আসন্ন যুদ্ধে শঙ্কিত হয়ে, ফ্রান্স তুর্কীর সঙ্গে মৈত্রীর জন্যে আগ্রহ দেখাতে থাকে। তুর্কী আলেকজান্দ্রেটা শহরের উপর তার পুরাতন দাবী নতুন করে পেশ করে। এখানকার জনসংখ্যার চল্লিশ ভাগ তুর্কী। ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকালে তুর্কীর সঙ্গে ফ্রান্সের সামরিক সংঘর্ষ শুরু হয়; ফ্রান্স মেনে নেয় যৌথ ফরাসী-তুর্কী শাসন। ঐ বছরের আগস্ট মাসে স্থানীয় আইনসভার নির্বাচনে ৪০ জন সদস্যের মধ্যে বাইশ জন তুর্কী-সমর্থক জয়লাভ করেন। এই সংখ্যা-গরিষ্ঠতার সুযোগে তুর্কী ঘোষণা করে একটি "স্বাধীন হাতে প্রজাতন্ত্র"; ফ্রান্স মেনে নেয়। ১৯৩৯ সালের ২৯শে জুন এই হঠাৎ-জন্ম প্রজাতন্ত্র তুর্কীর অন্তর্ভুক্ত হবার প্রস্তাব গ্রহণ করে; পরের দিন অন্তর্ভুক্তি বাস্তবে রূপায়িত হয়। সিরিয়া আজ পর্যন্তও এই বাস্তব সত্য মেনে নেয় নি। সিরিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্র আলেপ্পো শহরের উপরও তুর্কীর লোভ হয়েছে; এ শহর 'হাতে' অঞ্চলের সন্নিকট।

আরব জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তুর্কীর সংঘাত ঘনীভূত হয়ে ওঠে ১৯৫১ সালে যখন তুর্কীর নেতৃত্বে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে একটি সামরিক সংস্থা গঠন করবার সূচনা করে। মিশর বা ইরাণ কেউ তখন এ সংস্থা স্থাপনে সম্মতি দেয় নি। ব্যর্থ হয়ে, উত্তর অঞ্চলের দেশগুলিকে নিয়ে আমেরিকা ও বৃটেন একটি সামরিক সংগঠন গড়ে তোলায় উদ্যোগী হয়। এই উদ্যোগের ফল তুর্কী-ইরাক চুক্তি, এবং ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাগদাদ চুক্তি। বাগদাদ চুক্তি তুর্কীকে উত্তর পশ্চিম এশিয়ার সামরিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তুর্কীর মারফত বাগদাদ চুক্তিকে সংযুক্ত করেছে উত্তর অতলান্তিক সামরিক সম্প্রদায়ের সাথে। ইরাক যদিও তুর্কীর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে, মিশর ও সিরিয়া মানে নি।

শ্রী [illegible] বলেছেন, বাগদাদ চুক্তি [illegible] বিচ্ছিন্ন করেছে, শান্তির [illegible] আরবভূমি, আর [illegible] সাম্রাজ্যের [illegible]। [illegible] এই বাগদাদ চুক্তি। [illegible] উপর প্রতিষ্ঠিত [illegible] রুশ-তুর্কী [illegible] এই দুই [illegible] রাশিয়া [illegible] ইরাকের প্রধানমন্ত্রী [illegible] বাগদাদ চুক্তিতে যোগ দেবার ঘোর পরিণতি সম্বন্ধে বারে বারে রাশিয়া তুর্কীকে [illegible] সাবধানবাণী পাঠিয়েছে। আজ, মধ্যপ্রাচ্যের সুযোগ নিয়ে, উচ্চকণ্ঠে রাশিয়া তুর্কীকে আরব জাতীয়তাবাদের, আরব স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান দুশমন প্রতিপন্ন করবার জন্যে তৎপর। প্রত্যেক [illegible] আরবের কাছে তুর্কী আজ ইজরাইলের মতোই পশ্চিমী এজেন্ট।

কাইরো ও আম্মান(?) থেকে যেভাবে চলেছে প্রতিদিন শব্দের লড়াই। নাসের যে আরব ভূমি গড়তে চান তার সঙ্গে কামাল আতা-তুর্কের নতুন-তুর্কী স্বপ্নের হয়তো খানিকটা মিল আছে। কিন্তু কামাল তুর্কীকে গণ-তন্ত্রে পরিণত করতে পারেন নি। তুর্কী এখনো আসলে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রেই রয়ে গেছে। নতুন মিশর গড়তে নাসেরকে তুর্কীর সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই থেকেই প্রকৃত নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত এশিয়ায় তুর্কী একদিন যে আশার প্রবাহ এনেছিল আজ মরুপথে তার ধারা হারিয়ে গেছে। তবু, হয়তো তার সবটাই হারা হয়ে যায় নি।

(ক্রমশ)

* Turky : by G. L. Lewis, London, Page 143.

ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী

অসুখ হলে ডাক্তাররা আজকাল কথায় কথায় রক্তপরীক্ষা করান। মলমূত্র থুতু ইত্যাদিতে জীবাণু খোঁজেন। জীবাণু তত্ত্ব না জানলে আজকাল আর ডাক্তারী করা যায় না। রোগ নির্ণয়ও হয় না। অথচ এই জীবাণু তত্ত্বের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, চিকিৎসায় এই তত্ত্বের যিনি প্রথম প্রয়োগকর্তা তিনি কিন্তু নিজে কখনও ডাক্তার ছিলেন না। চিকিৎসা বিদ্যা তিনি জানতেন না। এই অসাধারণ লোকটির নাম লুই পাস্তুর। (১৮২২—৯৫)

পাস্তুরের বাবা নেপোলিঅনের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে একসঙ্গে যুদ্ধ করেন। সৈনিক হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ক্রশ অফ দি লিজিয়ন অফ অনার-এর সম্মান তাঁকে দেওয়া হয়। যুদ্ধ শেষে এই সার্জেণ্ট মেজর দেশে ফিরে নিজের জাত ব্যবসা শুরু করলেন। এই ব্যবসা চামড়া শুকিয়ে ট্যান করা। চর্মকারের কাজে নেমে এক মালীর মেয়েকে বিবাহ করে সংসার পাতলেন। পাস্তুর তাঁদের তৃতীয় সন্তান। কিন্তু বড় ছেলে। ফরাসী দেশের দোলে (জুরা পাহাড়ে)। তাঁর জন্ম। ১৮২২ সালে।

তখনকার দিনে ফরাসী দেশে চাষাভুষারা ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া কখনও শেখাত না। কিন্তু পাস্তুরের বাবা ছেলেকে লেখাপড়া শেখালেন। স্কুলে ভরতি করলেন। ছেলেবেলায় পাস্তুর পড়াশুনোয় বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। শুধু ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে খুব ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর আর একটি নেশা ছিল ছবি আঁকা। মাত্র পনের বৎসর বয়সে তাঁর বাবা মার যে প্রতিকৃতি তিনি এঁকে গেছেন, তার আর তুলনা নেই। দেখে মনে হয়, এই ছবি আঁকার দিকে মন দিলে একদিন তিনি হয়ত নামকরা একজন আর্টিস্ট হতে পারতেন।

বিশ বছর বয়সে পাস্তুর প্যারিসে এলেন। একোলে-নরমালে (নরমাল স্কুলে) ভরতি হলেন। এ যেন অজ পাড়াগেঁয়ে এক ছেলে কলকাতায় এসে কলেজে ভরতি হল। তফাৎ শুধু এই, ঐ স্কুলে পড়তে বাপ মায়ের তখন কোন খরচা হত না। বিনা বেতনে শিক্ষাদান তখনকার ঐ দিনেও ফরাসী দেশেই সম্ভব ছিল। পাস্তুর এই স্কুল থেকে গ্রাজুয়েট হলেন, ১৮৪৭ সালে।

তখন পাস্তুরের শিক্ষক আঁদ্রে দুমা জৈব রসায়ন (অরগ্যানিক কেমিস্ট্রী) নিয়ে খুব মত্ত। পাস্তুরও এই রসায়নের দিকেই ঝুঁকে পড়লেন।

তিনি দেখলেন, মদের পিপের ওপর টারটারিক অ্যাসিডের যে কৃস্টাল জমে সেই কৃস্টাল দানাকাটা। এই দানা কোনটা ডান-

মুখী কোনটা বা বাঁমুখী। আলো ডানমুখী ঐ কৃস্টাল দিয়ে কাঁচের শিশিতে আলোর কাছে ধরলে আলোর রশ্মি ডাইনে বেঁকে যায়। আর বাঁমুখী কৃস্টালের বেলায় বাঁয়ে। এই দুরকম কৃস্টাল ছাড়া নতুন আর এক রকম কৃস্টাল পাস্তুর আবিষ্কার করলেন। সেই কৃস্টাল নিউট্রাল। আলোর রশ্মি এর ভেতর সোজা চলে যায়। ডাইনে বাঁয়ে কোন দিকেই বেঁকে যায় না। মৌলিক গবেষণার এই প্রবন্ধ 'মলিকুলার ডিস্‌সিমেট্রি' নামে প্রকাশিত হল। ১৮৪৮ সালে।

এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে পাস্তুরের নাম ছড়িয়ে পড়ল। খাতির বাড়ল। সেই সঙ্গে শত্রুও বাড়ল। পাস্তুর স্ট্রাসবুর্গ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। শুধু তাই নয়, ইউনিভার্সিটির রেকটরের যুবতী কন্যাটিরও হৃদয় জয় করে ফেললেন। সাতাশ বৎসর বয়সে পাস্তুর এই মেয়েটিকে বিবাহ করলেন। এই মেয়েটিকে সঙ্গিনী পেয়ে তাঁর কাজে উৎসাহ বেড়ে গেল। মাত্র ছ' বৎসরের মধ্যেই তিনি লিলের ফ্যাকালটি অফ সায়ান্সের ডীনের পদে উন্নীত হলেন।

এইখানে এসে পাস্তুরের মন রসায়ন থেকে জীবাণুর দিকে ঝুঁকল। পাস্তুরের দু শ' বছর আগে সতের শতকে সামান্য এক দারোয়ান, হল্যাণ্ডের লুয়েনহুক্ সর্ব-প্রথম নিজের চোখে জলে কীটাণু দেখতে পান, নিজের হাতে তৈরী মাইক্রোসকোপে। তারপর দু শ' বছর চলে গেছে, জীবাণুর অস্তিত্ব নিয়ে নানা রকম মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু কিছুই প্রমাণ হয়নি।

জীবদেহে প্রাণ কি করে আসে, প্রাণহীন দেহে অথবা উদ্ভিতে পচন কি করে ধরে, এই নিয়ে তখন তুমুল বাদানুবাদ চলত। জার্মানীর জাস্টাস্ ভন লিবিগ তখনকার দিনের নামকরা রসায়নবিদ। তিনি কীটাণু মানতেন না। জীবাণু মানতেন না। মাইক্রোস-কোপে দেখা এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থকে তিনি হিজিবিজি বলে উড়িয়ে দিতেন। বলতেন কীটাণুই যদি জীবের পচন ঘটায়, তাহলে ঐ কীটাণু নিজেই বা একদিন পচে কি করে?

তখন একদল বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন, জীবদেহে প্রাণ নিজে থেকেই স্ফুরিত হয়। (স্পনটেনিআস জেনারেশন) অপর দল বলতেন তা হয় না।

এই তথ্য প্রমাণের জন্য তখন একটা কাঁচের শিশিতে একটুকরো মাংস জলে ফুটিয়ে ছিপি এঁটে রাখা হত। আগুনে পোড়ালে অথবা জলে সেদ্ধ করলে সব প্রাণীরই যে মৃত্যু হয় সে বিষয়ে সবাই একমত। কাজেই এই মাংস যখন ফোটান হল, তখন সেই মাংসও প্রাণহীন হল। তারপর কয়েকদিন পরে ঐ ছিপি যখন খোলা হত কেউ দেখতেন, ঐ মাংস পচে গেছে। কীটাণুতে ভরে গেছে। আবার কেউ কেউ

দেখতেন সেদ্ধ মাংস তেমনি অবিকৃত আছে।

কাজেই একদল বলতেন, ছিপি আঁটা প্রাণহীন বস্তুর মধ্যেও যখন প্রাণসঞ্চার হয়েছে, তখন প্রাণ স্বতঃস্ফূর্ত। আর একদল বলতেন, ছিপি ভাল করে আঁটা হয়নি তাই বাইরে থেকে জীবাণু ঢুকেছে। পচন ঘটিয়েছে। এই নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক হত।

পাস্তুর এইদিকে মন দিলেন। ছোট্ট একটি ঘরে নিজের যন্ত্রপাতি সাজিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। পাস্তুর দেখলেন ঘরের যে বাতাস, তাতে পর্যন্ত ধুলো থাকে। একটা কাচের টিউবে পরিষ্কার সাদা একটু তুলো পুরে অপর দিকে মুখ লাগিয়ে হাওয়া টেনে পাস্তুর তা প্রমাণ করলেন। সাদা তুলো কালো হয়ে গেল।

পাস্তুর ভাবলেন, এই বাতাসে যদি এত ধুলো থাকে তাহলে তার মধ্যে জীবাণুই বা থাকবে না কেন? এবং সেই জীবাণু যদি ঐ ছিপির ফাঁক দিয়ে ঐ সেদ্ধ মাংসে ঢোকে তাতেই বা বাধা কি?

পাস্তুর নতুন রকমের কাচের ফ্লাস্ক তৈরী করালেন। তার গলাটা বকের মত লম্বা। বার বার ওপর নিচ করে আঁকাবাঁকা। এই সরু মুখ দিয়ে হাওয়া ফ্লাস্কে ঢুকবে। কিন্তু বাঁকের মুখে বার বার ধাক্কা খেয়ে ধুলোবালি সব আটকে যাবে। এই ফ্লাস্ক মাংসের সুপ রেখে পাস্তুর আগুনের ওপর বসালেন। ফুটিয়ে এই ফ্লাস্ক রেখে দিলেন। দেখা গেল এই সুপ পচল না। অবিকৃত রইল।

একই পরীক্ষা বার বার পাস্তুরের হাতে একই ফল দিল। ঐ সুপ পচল না। পাস্তুর ভাবলেন, ধুলোর সঙ্গেই যদি এই জীবাণু থাকে, তাহলে যে আকাশে ধুলো নেই সেখানে গিয়ে একবার পরীক্ষা করা দরকার। কুড়িটি ফ্লাস্ক নিয়ে পাহাড়ে উঠে তিনি ছিপি খুললেন। মাত্র পাঁচটি ফ্লাস্ক খারাপ বাকি পনেরটি পরিষ্কার রইল।

পাস্তুর ভাবলেন আরও ওপরে উঠে পরীক্ষা করবেন। এইবার তেত্রিশটি ফ্লাস্ক নিয়ে তিনি আল্পস্ পাহাড়ে উঠলেন। তেরটির ছিপি খুললেন পাহাড়ের ওপর। পাইনের ধারে। তেরটি সুপই পচে গেল। বাকি কুড়িটি নিয়ে তিনি আরও ওপরে উঠলেন। একেবারে মানুষের বসবাসের বহু ঊর্ধে। এইখানে এসে ছিপি খুললেন। এই কুড়িটির মধ্যে একটি মাত্র খারাপ হল।

পাস্তুরের নিজের মনে আর কোন সংশয় রইল না। জীবাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ তিনি পেয়েছেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি ঘরে ফিরলেন।

কিন্তু তাঁর এই পরীক্ষা অনেক বিজ্ঞানীই মানলেন না। জীবাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেন না। নানাভাবে তাঁর প্রতি শ্লেষমন্দ বিদ্রূপের গোলাগুলী ছুঁড়তে লাগলেন।

এমনি সময় তাঁর কলেজের একটি ছাত্র এসে খবর দিল, তার বাবার সুরাশিল্প নষ্ট হতে বসেছে। জালাতে আঙুরের রস টকে যাচ্ছে। কিন্তু সুরাতে পরিণত হচ্ছে না। পাস্তুর যদি একবার গিয়ে কোন প্রতিকার বাতলে দেন।

ফরাসী দেশ চিরকাল নানাবিধ মহামূল্য সুরার জন্য বিখ্যাত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ সোমরস তৈরী করেছে। খেয়েছে। স্ফূর্তি করেছে। নেশা করে মত্ত হয়েছে। আঙুর পিষে একটা জালাতে রাখা হয়েছে। গ্রাম্য মেয়েরা মাথায় ফুল গুঁজে বেণী দুলিয়ে হাত ধরাধরি করে তার চারধারে নৃত্য করেছে। গান গেয়েছে। আর দেবতার অনুগ্রহে ঐ রস জালাতে গেঁজে উঠেছে। সুরায় পরিণত হয়েছে।

গ্রাম্য লোকের সরল বিশ্বাস, সোমরসের

দেবতার দয়ায় আঙুরের রস সুরায় পরিণত হয়। কিন্তু পাস্তুরের রাসায়নিক মন এই ব্যাখ্যায় তুষ্ট হল না। তিনি ভাবলেন, বিয়ার ওয়াইন এসব সত্যি কি জিনিস? সামান্য কিছু কঠিন অতরল দ্রব্য, জল, কিছু গন্ধ-দ্রব্য এবং বাকিটা অ্যালকোহল। কিন্তু ঐ গাঁজান ব্যাপারটা কি? আঙুরের রস গেঁজে ওঠে কি করে?

ছাত্রটির বাবার ভাটিখানায় গিয়ে পাস্তুর কিছু নমুনা নিয়ে এলেন। যে ভাটিতে সুরা হয়েছে এবং যেখানে হয়নি এই দুরকম নমুনো নিয়ে এসে মাইক্রোসকোপে পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, যে রসে খামি (ঈস্ট) আছে সেই রসে সুরা হচ্ছে। কিন্তু যে রস টকে গেছে সে রসে খামি নেই। সুরাও নেই।

পাশাপাশি দুটি শিশি তিনি আলোর সামনে ধরলেন। চোখ কাছে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। শিশি ঝাঁকিয়ে পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, টকে যাওয়া শিশির গায়ে দানার মত কি যেন আটকে আছে। রসের ওপরেও কি যেন ভাসছে। লম্বা ছুঁচের ডগায় ঐ জিনিস তুলে তিনি মাইক্রোসকোপে চড়ালেন। দেখলেন, অতি ক্ষুদ্র সরু কাঠির মত সব জীবাণু দলা পাকিয়ে আছে। কতকগুলি আবার নড়ছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পাস্তুর বুঝলেন, এই জীবাণুরাই আঙুর রসের খামির নষ্ট করে। তাই আর সুরা তৈরী হয় না। ঠিক দুধের মত টকে যায়।

পাস্তুর বুদ্ধি দিলেন, এই রস গরম করা হোক। গরমে এই জীবাণু মরে যাবে। তারপর ঐ রসে খামি মেশালে সুরা তৈরী হবে।

এই বুদ্ধিতে কাজ হল। দেশের সুরা-শিল্প রক্ষা পেল। গরম করে জীবাণু শূন্য করবার পদ্ধতির নাম হল, পাস্তুরিজেশন। সারা পৃথিবীতে এই পদ্ধতিতে এখনও দুধ জীবাণুশূন্য করা হয়।

খামির জন্যই যে সুরা উৎপন্ন হয় তাও পাস্তুর প্রমাণ করে দেখালেন। আঙুর যখন পাকে তখন গায়ে সাদা একরকম ছাতা পড়ে। এই ছাতা একরকম উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদই খামি। আঙুরের সঙ্গে এই উদ্ভিদও পেষা হয়। ভাটিতে যায়। তারপর রস গেঁজে ওঠে। যখন যথেষ্ট পরিমাণে সুরা উৎপন্ন হয় তখন এই খামিও ধ্বংস হয়।

এই জিনিস প্রমাণ করবার জন্য পাস্তুর নিজের বাড়ির আঙুর লতায় পাকবার আগেই আঙুরের গায় কাপড় জড়িয়ে বেঁধে রাখলেন। আঙুর একদিন পাকল। খেতেও খুব সুমিষ্ট হল। কিন্তু দেখা গেল গায়ে সাদা ছাতা নেই। এই আঙুর পিষে যখন ভাটিতে দেওয়া হল, সেই রস আর গাঁজল না। এতদিনে সুরার রহস্য সমাধান হল। ফারমেনটেশন' সম্বন্ধে পাস্তুরের প্রবন্ধ বেরুল ১৮৫৭ সালে। পাঁচ বছর পর ১৮৬২ সালে 'স্পনটেনিয়াস জেনারেশন'। এবং এক বছর পরে ১৮৬৩-তে 'ডিজিজেস্ অব বিয়ার'।

তারপর হঠাৎ একদিন পাস্তুরকে তাঁর ল্যাবরেটরী ছেড়ে রেশম কীটের গবেষণায় দক্ষিণ ফ্রান্সে যেতে হল। তাঁর শিক্ষক দুমো এসে ধরলেন রেশম কীটের কি এক রোগ দেখা দিয়েছে। দেশের রেশম শিল্প ধ্বংস হতে বসেছে। পাস্তুর দেশের সুরা-শিল্প বাঁচিয়েছেন, এইবার রেশম-শিল্প না রক্ষা করলে চলবে না। পাস্তুর নিজে দেশপ্রেমিক। রাজী হয়ে গেলেন। অথচ রেশম কীট সম্বন্ধে তখন কিছুই তাঁর জানা নেই।

পাস্তুর ঐ রেশমকীট সম্বন্ধে বই সংগ্রহ করলেন। দক্ষিণ ফ্রান্সের শিল্প অঞ্চলে এক গ্রামে গিয়ে বসলেন। এইখানে এসেও তাঁর অভ্যাস মত ঐ কীট মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখতে শুরু করলেন। অসীম অধ্যবসায়ে একদিন ঐ কীটে কি রোগ হয় তা তিনি আবিষ্কার করলেন। প্রতিবিধান বার করলেন। পাস্তুরের জন্য দেশের রেশম-শিল্পও রক্ষা পেল। 'রেশমকীটের রোগ' নামে তাঁর প্রবন্ধ বেরুল ১৮৬৫ সালে।

পাস্তুর আবার প্যারিসে ফিরে এলেন। একদিন অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সে পাস্তুর এক প্রবন্ধ পাঠ করছেন, মনে হল তাঁর দেহের বাঁদিকটা কেমন যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। পাস্তুর তবু বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু ঐ রাত্রে সাংঘাতিক এক কাণ্ড হল। পাস্তুর সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হলেন। কথা বন্ধ হয়ে গেল। দেহের বাঁদিকে পক্ষাঘাত হল।

সবাই ভাবল, পাস্তুর আর বাঁচবেন না। তাঁর জন্য ফ্রান্সের সম্রাট নতুন এক ল্যাবরে-টরী তৈরীর আদেশ দিয়েছিলেন। তৈরীও শুরু হয়েছিল। কিন্তু শত্রুদের রটনায় এ কাজ বন্ধ হয়ে রইল। সবাই বলল, পাস্তুর নিজেই যদি না থাকেন তাহলে অতগুলি টাকা খরচ করে ঐ বাড়ি তৈরী করে কি হবে?

আড়াই মাস পরে পাস্তুরের বাকশক্তি ফিরে এল। পাস্তুর চেয়ে যেতে সমর্থ হলেন। সেই সময় আবার এক দুর্ঘটনা ঘটল। প্রুসিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করল। প্যারিস দখল করল। পাস্তুর তাঁর ফ্রান্সকে ভালবাসতেন। প্রুসিয়ার ওপর তিনি ক্ষেপে গেলেন। বন ইউনিভার্সিটি তাঁকে একদিন এম ডি উপাধি দিয়েছিল। ঘৃণায় অপমানে পাস্তুর সেই ডিগ্রি প্রত্যাখ্যান করেন। গালাগাল দিয়ে চিঠি লিখলেন।

যেদিন থেকে পাস্তুর জীবাণুতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন সেইদিন থেকেই চিকিৎসক সমাজ তাঁর শত্রু হয়েছে। যখন পাস্তুর তাঁর প্রামাণিক তথ্য উপস্থিত করেছেন, তখনও তাঁরা শ্লেষের সঙ্গে বলেছেন, আপনি কি ডাক্তার? আপনার ডিগ্রি দেখি?

কাজেই পাস্তুর অ্যাকাডেমি অফ মেডি-সিনের সভ্য হতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধের পর

যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল, পাস্তুর এই সুযোগ পেলেন। মাত্র এক ভোটে জিতে পাস্তুর এই অ্যাকাডেমিতে ঢুকলেন। পক্ষাঘাত নিয়ে। ১৮৭৯ সালে।

পাস্তুরের বিরোধীরা যখন জীবাণু নিয়ে পাস্তুরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং ব্যঙ্গ করে চলেছেন তখন এডিনবরায় জোসেফ লিস্টার সার্জারীতে পাস্তুরের এই প্রবন্ধ পড়ে হাসপাতালে জীবাণুশূন্য অপারেশনের রীতি প্রবর্তন করেছেন।

পাস্তুরের কাছে একদিন এক চিঠি এল। লিস্টার লিখেছেন, আপনার জীবাণু বিষয়ের গবেষণার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনার ঐ চমৎকার গবেষণার জন্যই আমি বুঝেছি, জীবাণুই দেহে পচন ঘটায়। তাই অপারেশনে জীবাণুশূন্য রীতি এত বেশী সফল হয়েছে। যদি কখনও আপনি এডিনবরায় আসেন, দেখবেন আপনার ঐ কাজের জন্য কত শত দুঃস্থ মানব উপকৃত হয়েছে।

এই চিঠি পেয়ে পাস্তুর ছোট ছেলের মত যেন লাফিয়ে উঠলেন। যাকে সামনে পেলেন, তাকেই ঐ চিঠি দেখালেন। কাগজে ছাপালেন। ১৮৭১ সালে তাঁর "বিয়ারে জীবাণু" বলে যে প্রবন্ধ বেরুল তারও মুখবন্ধে এই চিঠি ছাপিয়ে দিলেন।

সেই সময় ফ্রান্সের গরু ভেড়ার হঠাৎ মড়ক লেগে গেল। এক একটা গ্রামে শতকরা পঞ্চাশটি করে মৃত্যু শুরু হল। প্রাচীনকাল থেকে এই অ্যানথ্রাক্স রোগ গবাদি পশু বিনষ্ট করেছে। সাংঘাতিক এই রোগ। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জ্বরেই পালকে পাল গরু ভেড়ার মৃত্যু হয়েছে। যে রাখাল সুস্থ সবল গরু ভেড়া নিয়ে মাঠে চরাতে গিয়ে হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে, বাড়ি ফেরবার সময় ঘুম ভেঙে সেই হয়ত দেখেছে, পালে একটা গরুও বেঁচে নেই। একটা ভেড়াও জীবিত নেই। মাঠ জুড়ে শুধু মৃত পশু। যদি কোন রাখাল কাটা কিংবা ছড়ে যাওয়া হাতে ঐ মৃত পশু ছুঁয়েছে, তারও অমনি করে মৃত্যু হয়েছে। এমনি ভীষণ এই রোগ।

পাস্তুর এই কঠিন রোগের প্রতিকারে হাত দিলেন। জীবাণু বিদ্যায় তাঁর পরবর্তী জার্মানীর রবার্ট কক্‌ তখন এই অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেছেন। মৃত গরু ভেড়ার রক্তে। ১৮৭৬ সালে। কক্‌ আরও দেখিয়েছেন, এই জীবাণু ছোট মটরদানার মত স্পোরে আবদ্ধ থাকে। কক্‌ এই জীবাণু বিজড়িত ইঁদুর, খরগোস এবং ইঁদুরের গায় ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে এই রোগ সংক্রামিত করতে সমর্থ হন। তবু তাঁর মনে দ্বিধা, হয়ত ভেড়া গরুর অ্যানথ্রাক্স্‌ ভিন্ন।

পাস্তুর তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করে সব দ্বিধা, সব সন্দেহ দূর করে দিলেন।

যে স্যুপে এই জীবাণু ভাল গজায় সেই স্যুপের একশ সি সি তিনি দশটি ফ্লাস্কের প্রতিটি ফ্লাস্কে রাখলেন। এই ফ্লাস্কের প্রথমটিতে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু সংক্রামিত করলেন। এই ফ্লাস্ক তাই একশ সি সি অ্যানথ্রাক্সের জীবন্ত কালচার তৈরী হল। এই থেকে তিনি মাত্র এক সি সি তুলে দ্বিতীয় ফ্লাস্কে মেশালেন। তাহলে এই দ্বিতীয় ফ্লাস্কে প্রথমটার একশ গুণ কম অ্যানথ্রাক্স্‌ কালচার রইল। এইবার দ্বিতীয় ফ্লাস্কটি থেকে এক সি সি তুলে তিনি তৃতীয়টিতে মেশালেন। ফলে দশম ফ্লাস্কে দশ কোটি গুণ কম জীবাণু রইল। অথচ এই দশম ফ্লাস্কের এক ফোঁটা যখন ভেড়ার গায় ইন্‌জেকশন দেওয়া হল, ঐ অ্যানথ্রাক্স্‌ রোগে তার মৃত্যু হল।

পাস্তুর দেখলেন, কোন একটি বিশেষ জায়গায়, বিশেষ এক জমিতে কেন এই রোগের প্রকোপ বেশী। বিশেষ করে যে জমিতে ঐ মরা জন্তু কবর দেওয়া হয়, সেখানে। পাস্তুর ঐ মাটি খুঁড়ে কেঁচোর পেটে অ্যানথ্রাক্স্‌-এর স্পোর পেলেন। এইবার সব রহস্য সমাধান হয়ে গেল। ঐ স্পোর সহজে মরে না। ঐ মাটিতে যে ঘাস জন্মে তাতেও ঐ স্পোর থাকে। ঐ ঘাস খেয়ে পশুদের রোগ হয়। অতএব এই রোগ থেকে গবাদি পশুকে বাঁচাতে হলে, মাটিতে কবর দেওয়া চলবে না। পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

অ্যানথ্রাক্স্‌-এর জীবাণু নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে গিয়ে পাস্তুর দেখলেন, সামান্য একটু কারবলিকে এই জীবাণু হয় ম্রিয়মান হয়, নয় মরে যায়। সেই জীবাণু কোন জন্তুতে ইন্‌জেকশন দিলে তার এই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মে। ঠিক যে পদ্ধতিতে বসন্তের টিকা দিয়ে বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করা হয়। তাহলে এই উপায়ে গবাদি পশুকে এই রোগ থেকে বাঁচাতে বাধা কি?

পাস্তুর ঘোষণা করলেন, পঞ্চাশটা ভেড়াকে যদি জীবন্ত ঐ বীজাণু ইন্‌জেকশন দেওয়া হয় তাহলে পঞ্চাশটাই এ রোগে মারা যাবে। কিন্তু যদি এর মধ্যে পঁচিশটাকে ঐ কারবলিক দেওয়া অর্ধমৃত কি স্তিমিত জীবাণু ইন্‌জেকশন করা হয় তাহলে ঐ পঁচিশটা এই রোগ প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে।

যাঁরা পাস্তুরের ভক্ত তাঁরা ভাবলেন, পাস্তুরের কথা কখনও মিথ্যা হয় না।

নিশ্চয়ই তাই হবে। আবার একটা বিরাট প্রমাণ তিনি খাড়া করতে সমর্থ হবেন। তাই তাঁরা খুশী হলেন।

পাস্তুরের যাঁরা শত্রু তাঁরাও খুব খুশী হলেন। উল্লসিত হলেন। ভাবলেন, এই বুড়ো বয়সে মুখটার পতন এবার সুনিশ্চিত।

বন্ধুরা কিন্তু শঙ্কিত হলেন। ভাবলেন, এই বয়সে এরকম অনাবশ্যক ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হল না।

কিন্তু এই ঘোষণায় মিলুনের এগ্রি-কালচারাল সোসাইটি পঞ্চাশটি ভেড়ার ওপর এই পরীক্ষায় রাজী হলেন। ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়ে গেল। নানারকম গুজব শোনা গেল। কেউ বলল, পাস্তুর এবার ডুবল। একটা ভেড়া মরেছে। পাস্তুরের শিষ্যরা ছুটোছুটি শুরু করল। রাত্রিতে পাস্তুর খবর পেলেন, সত্যি একটা ভেড়া মর মর। সারারাত পাস্তুরের নিদ্রা নেই। শিষ্যরা এই প্রথম দেখল, পাস্তুর বিচলিত। গম্ভীর মুখ। উদ্বেগে সন্দেহে সংশয়াকুল। বিষাদে বিষণ্ণ চোখ। কুঞ্চিত ভ্রূ।

রাত্রি প্রভাত হল। দলে দলে লোক ঐ ফার্মে ছুটল। দেখা গেল, যে পঁচিশটা ভেড়া শুধু জীবন্ত অ্যানথ্রাক্‌স্‌ ইন্‌জেক্‌-শন পেয়েছিল তারা সব মৃত। আর যে পঁচিশটি ঐ ভ্যাক্‌সিন পেয়েছে তারা সব জীবিত। একটিরও মৃত্যু হয়নি। পাস্তুর যখন লাঠি ভর দিয়ে পক্ষাঘাতে পংগু বা পা টেনে টেনে ঐ ফার্মে এলেন, জনতা বিরাট এক জয়ধ্বনি তুলল। কিন্তু পাস্তুরের কানে এ জয়ধ্বনি পৌঁছল না। জীবন্ত ঐ পঁচিশটি ভেড়ার দিকে তাকিয়ে তিনি যেন দেখলেন, মানুষ সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে। রোগ জয় করেছে। কিন্তু যেই তাঁর হুঁশ হল, অমনি লাঠি তুলে উল্লসিত জনতার দিকে তেড়ে গিয়ে বললেন, তবে রে অবিশ্বাসীর দল—। তাতেও জনতা খুশী হল। আরও জোরে জয়ধ্বনি দিল।

দু' বৎসরের মধ্যেই আশি হাজার গবাদি পশুকে এই ভ্যাক্‌সিন দেওয়া হল। মৃত্যু-হার শতকরা একটিতে নেমে গেল। জীবাণু-তত্ত্ব জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

৫৮ বৎসর বয়সে পাস্তুর রোগ প্রতিরোধ সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধ 'প্রিভেন্‌টিভ ভ্যাক্‌সি-নেশন' প্রকাশ করলেন। ১৮৮০ সালে। কিন্তু এখনও তাঁর আসল কাজ বাকি।

সেই কাজ এইবার শুরু হল। পাগলা কুকুর কামড়ালে যে রোগ হয় তার নাম জলাতঙ্ক। পাগলা কুকুরের মুখ, যেন ভয়ে আতঙ্কে বীভৎস হিংস্র মুখ। চোখ দুটি লাল। দাঁত বার করা হাঁ করা মুখ। কষ বেয়ে লালা ঝরছে। এই কুকুর সামনে যাকে পায় তাকেই দংশন করে। বন্ধু শত্রু জ্ঞান থাকে না। যাকে কামড়ায় তারও এই রোগ হয়। তফাৎ এই, মানুষ মানুষকে কামড়ায় না। পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়। কিন্তু এক ফোঁটা জলও গিলতে পারে না। চোয়াল এবং গলার মাংসপেশী কুঞ্চিত হয়ে নিদারুণ ব্যথায় কষ্ট পায়। যন্ত্রণা ভোগ করে।

পাস্তুরের ছেলেবেলার এক ঘটনা মনে পড়ে। একটা পাগলা নেকড়ে বেরিয়েছে। যাকে কাছে পেয়েছে তাকেই কামড়েছে। তখন সেই দংশনের কি সাংঘাতিক চিকিৎসা। যাকে কামড়েছে তার ঐ ক্ষত তপ্ত লোহা দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মনে পড়লে এখনও পাস্তুরের দেহ শিউরে ওঠে।

পাস্তুর এই পাগলা কুকুরের লালায় এই রোগের জীবাণু খুঁজলেন। এই লালা সংগ্রহ করাও এক সাংঘাতিক ব্যাপার। একটা ক্ষিপ্ত হিংস্র জন্তুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে হাতে পুরু চামড়ার দস্তানা পরে তার মুখ হাঁ করে রাখতে হত। একটা সরু কাঁচের নল ঐ কুকুরের মুখে ঢুকিয়ে নিজের মুখে ঐ নলে লাগিয়ে পাস্তুর ঐ ক্ষিপ্ত কুকুরের লালা টেনে নিতেন। তারপর ঐ বিষাক্ত লালার পরীক্ষা নিরীক্ষা হত।

এই বিষাক্ত লালা পাস্তুর সুস্থ এক কুকুরের মাথায় ইন্‌জেকশন দিতেন। দু' সপ্তাহের মধ্যেই তার এই রোগ হত। তারপর যথাসময়ে তার মৃত্যু হলে মগজের যে অংশে এই জীবাণু বেশী ক্ষতি করেছে দেখা যেত, এই অংশ (মেডালা) বার করে গুলে এই রোগ প্রতিরোধের জন্য সুস্থ কুকুরকে ইন্‌জেকশন দেওয়া হত।

এইভাবে ইন্‌জেকশন দিয়ে পাস্তুর সুস্থ কুকুরকে ঐ রোগ প্রতিরোধ করাতে সমর্থ হলেন। কিন্তু মানুষকেও কি এই উপায়ে বাঁচানো যাবে?

মানুষের ওপর এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করবার কোন সুযোগ পাস্তুর পেলেন না। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোন অপরাধী যদি রাজী হয় তাহলে অবশ্য পাস্তুর পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কিন্তু ইউরোপের কোন রাজা পাস্তুরের এ প্রস্তাবে রাজী হল না। পাস্তুর ব্রেজিলের সম্রাটকে চিঠি লিখলেন। তাতেও কোন সুফল হল না।

অবশেষে একদিন একটি স্ত্রীলোক তার নয় বৎসর বয়সের একটি ছেলেকে নিয়ে কাছে এল। ছেলেটির নাম জোসেফ মাইস্টার। স্কুলে যাবার পথে পাগলা এক কুকুর তাকে মাটিতে ফেলে দেহের চৌদ্দ জায়গায় দংশন করেছে। ছেলেটা হয়ত মরেই যেত। কিন্তু কাছেই ইটের এক মিস্তিরি কোনওরকমে ঐ কুকুরটাকে মেরে তাড়িয়েছে।

পাস্তুর ছেলেটির ক্ষত পরীক্ষা করলেন। সহকারীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সবাই ইনজেকশন দেবার পক্ষপাতী। শুধু প্রধান সহকারী এমিল রাউ ছাড়া। ইনজেকশন দেওয়াই যখন স্থির হল রাউল ল্যাবরেটরী ছেড়ে চলে গেলেন।

ইনজেকশন শুরু হল। পাগলা কুকুরের মগজের অংশের (মেডালা) তেজ ক্রমশ যত বাড়ানো হল পাস্তুর ভয়ে কেঁপে উঠলেন। শেষে যখন এমন তেজস্কর ইনজেকশন দেওয়া হল যাতে সাতদিনের মধ্যে দেহে এই রোগ সংক্রামিত হয়, তখন পাস্তুর রাত্রে আর ঘুমুতে পারলেন না। চোখের সামনে ছেলেটির ঐ ভীত আতংকিত মুখখানি ভেসে উঠল। দেখলেন, ঢোক গেলবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ছেলেটির মাংশপেশীতে কি নিদারুণ কুঞ্চন হচ্ছে। যন্ত্রণায় কি সাংঘাতিক কষ্ট পাচ্ছে। পাস্তুর উঠে বসলেন। দেখলেন, ভোর হতে এখনও অনেক দেরী। মনে হল, এই রাত্রি কি আর শেষ হবে না?

অবশেষে ভোর হল। পাস্তুরের মনে হল, তিনি বৃদ্ধ। পঙ্গু। অসুস্থ। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ল্যাবরেটরী ছেড়ে গ্রামে পালিয়ে গেলেন। জোসেফ মাইস্টারকে তাঁর শিষ্য গ্রানচারের হাতে দিয়ে গেলেন। পাস্তুর প্রথমে গেলেন বারগান্ডি, তারপর আরবয়। কিন্তু কোথাও তিনি শান্তি পেলেন না। কেবলি মনে হল, এই বুঝি টেলিগ্রাম আসে, ছেলেটির মৃত্যু হয়েছে।

মাইস্টার এদিকে বেশ ফূর্তিতে দিন কাটাচ্ছে। গায়ের ক্ষত শুকিয়ে গেছে। ইনজেকশন নেওয়াও শেষ হয়েছে। ল্যাবরেটরীতে থাকে। আর পোষা জন্তু জানোয়ার নিয়ে খেলা করে। দেখতে দেখতে একটি মাস কেটে গেল। জোসেফের কোন রোগ হল না। বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে এসে জোসেফ আবার এই ল্যাবরেটরীতে বেয়ারার কাজ নিল। পাস্তুরের প্রথম পরীক্ষা সফল হল।

কয়েক মাস পরে পাস্তুরের নিজের দেশে জুরোপাহাড়ে ছ'টি বাচ্চা রাখাল ছেলে ভেড়া চরিয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ এক বিরাট পাগলা কুকুর তাদের তাড়া করল। ছেলেরা ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল। পালাতে চেষ্টা করল। এদের মধ্যে সবচেয়ে যে বড় তার নাম জাঁ ব্যাপটিসতে জুপিলএ। বয়েস চৌদ্দ বৎসর। সে কিন্তু পালাল না। চাবুক হাতে সে কুকুরটার দিকে এগালো। কুকুরটাকে তাড়াতে চাইল। শেষে না পেরে ধস্তাধস্তি করে চাবুক দিয়ে তার মুখ বাঁধল। কাঠের জুতো দিয়ে মাথায় মেরে কুকুরটাকে ঘায়েল করল। কিন্তু নিজে ঐ কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হল।

দুজন পশুচিকিৎসক মৃত কুকুরটাকে পরীক্ষা করে বললেন, ওটা পাগলা। ছেলেটিকে পাস্তুরের কাছে পাঠানো হল। কিন্তু পাস্তুর দেখলেন, কামড় খাবার ছ' দিন পরে এই ছেলেটা এসেছে। অথচ জোসেফ মাইস্টার এসেছিল তিনদিনের মধ্যে। এর বেলায় কাজ হবে কি? তবু ইনজেকশন দেওয়া হল। ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠল।

পাস্তুর অনেকদিন পর্যন্ত এই ছেলেটির সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন। একটা চিঠিতে দেখা যায়, পাস্তুর লিখছেন, তোমার হাতের লেখা অনেক ভাল হয়েছে। কিন্তু এত বানান ভুল কেন? তুমি কোন স্কুলে পড়? কে তোমাকে শেখায়? বাড়িতে যে পরিমাণ কাজ করা উচিত তা তুমি কর কি? তুমি নিশ্চয় জান জোসেফ মাইস্টার, যে প্রথম আমার কাছে এই টিকে নিয়েছিল সেও আমাকে চিঠি লেখে। আমার মনে হয়, সে তোমার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি উন্নতি দেখাচ্ছে। অথচ দেখ, সে তোমার চেয়ে কত ছোট। মাত্র দশ বছর তার বয়েস। কাজেই একটু কষ্ট সহ্য কর। অন্য ছেলেদের সঙ্গে বাজে গল্প করে সময় নষ্ট না করে তোমার শিক্ষকদের কথা শুনো। বাবা মার কথা শুনো।

তবু পাস্তুরের শত্রুদের মুখ চাপা পড়ল না। বরং আক্রোশ আরও বেড়ে গেল। অ্যাকাডেমি অফ মেডিসিন পাস্তুরের নিন্দে করল। বলল, কাজটা পাস্তুরের ঠিক হচ্ছে না। পাগলা কুকুরের বিষ খামোখা পাস্তুর সুস্থ লোকের গায়ে ঢোকাচ্ছেন। কাগজে কাগজে গালাগাল বেরুল।

কিন্তু দেশ বিদেশ থেকে পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রুগীরা পাস্তুরের দরজায় এসে জড়ো হল। উনিশ জন রাশিয়ান কৃষক পাগলা নেকড়ের কামড়ে মৃতপ্রায় হয়ে একদিন এসে পাস্তুরের কাছে উপস্থিত হল। এই ইনজেকশন নিয়ে হাসি মুখে ষোলজন দেশে ফিরে গেল। জার হীরকখচিত এক স্মারক উপহার দিলেন। পাস্তুর ইনস্টিটিউট-এ মোটা টাকা চাঁদা দিলেন। পাস্তুরের প্রবন্ধ 'হাইড্রোফোবিয়া' প্রকাশিত হল। ১৮৮৫ সালে।

সুদূর আমেরিকা থেকে চারজন ছেলে এসে এই ইনজেকশন নিয়ে গেল। ইংলন্ড থেকে এক কমিটি জোসেফ মিস্টারকে নিয়ে পাস্তুরের কাজ দেখে খুশী হয়ে ফিরে গেল। ১৮৮৮ সালে।

এতদিন পরে পাস্তুর তাঁর নিজের দেশে সম্মান পেলেন। খুব ঘটা করে তাঁর সপ্ততিতম জন্মোৎসব পালন করা হল। ছাত্ররা, দেশ বিদেশ থেকে তাঁর ভক্তরা, ফরাসী দেশের অভিজাতরা সবাই তাঁর স্তুতি গান করল। ইংলন্ড থেকে লর্ড লিস্টার এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। পাস্তুর অভিভূত হয়ে গেলেন।

তিন বৎসর পরে তাঁর মৃত্যু হল। তিয়াত্তর বৎসর বয়সে। ১৮৯৫ সালে। পাস্তুরের সন্যাস রোগে পক্ষাঘাত হয় পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে। তারপর আরও সাতাশ বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন। যে বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয় সেই বাড়িতে এখন ডিপথেরিয়া অ্যান্টিটক্সিন তৈরীর জন্য ঘোড়া রাখা হয়। পাগলা কুকুরের বিষ ইনকুবেশন করা কুকুর রাখা হয়।

প্যারিসে পাস্তুর ইনস্টিটিউটের ভিতর সুন্দর একটি গির্জায় পাস্তুরের সমাধি নির্মিত হয়েছিল। দেয়ালে মার্বেলের গায়ে কবে কি গবেষণা পাস্তুর করে গেছেন তা লিপিবদ্ধ ছিল।

পাস্তুরের মৃত্যুর পর পঁয়তাল্লিশ বৎসর পার হয়েছে। ১৯৪০ সাল। জার্মান সৈন্য প্যারিস দখল করেছে। সৈন্যরা এসে এই পাস্তুর ইনস্টিটিউটে ঢুকল। যে পাস্তুরের স্মৃতি দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ সম্মান করেছে তাই আজ হঠাৎ শত্রুর পায়ে অবমানিত হতে দেখে বৃদ্ধ দ্বারওয়ান বাধা দিল। ফলে বন্দুকের গুলিতে তার মৃত্যু হল। ঐ স্মৃতিসৌধের দরজায় তার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল। এই বৃদ্ধ দ্বারওয়ান, সেই জোসেফ মাইস্টার। নয় বৎসর বয়সে পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে পাস্তুরের হাতে যার জীবন রক্ষা হয়েছিল।

চমৎকার। চমৎকার। চমৎকার।

অপূর্ব একটা এগজিট দেখিয়ে গেল হিরোয়িন। মুখে একটা ডায়ালগ নেই, কেবল চোখের কাজ।

হিরোর কাছ থেকে চিরবিদায় নেবার সময় তার মুখের দিকে চেয়ে শরীরে একটা ঝাঁকি দিয়ে উইংসের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্তে, তারপর ফিরে তাকাল হিরোর দিকে। কী-যেন একটা কাজ দেখাল চোখে। চোখের পলকে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল উইংসের আড়ালে।

হাউস-সুদ্ধ সকলে একসঙ্গে চাপা গলায় তারিফ করে উঠল।

হাততালি দেবার মত মোটা কাজ এটা নয়। সকলের গলায় তাই বেজে উঠল চাপা গুঞ্জন।

দু-পাশের লোককে বিরক্ত করে চঞ্চল হয়ে উঠেছে কৃপানাথ।

স্টেজে হিরো একা। মূক অভিনয় করছে এখন সে। নায়িকাকে চিরবিদায় দেবার পর নায়কেরা সাধারণত যে-রকম দাপাদাপি করে থাকে অনেকটা সেইরকম অভিনয়ই করছে হিরো। কিন্তু হাউস-সুদ্ধ লোক একদৃষ্টে ওইদিকে তাকিয়ে পরিণাম কি দাঁড়াল দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।

কিন্তু কৃপানাথ ব্যাকুল অন্য কারণে। দু'পাশের লোককে বিরক্ত করতে করতে সে কেবলই জিজ্ঞাসা করছে, কি নাম বলুন তো ওর? ওর নামটা কী?

কোনো নামেই এখন কারো কৌতূহল নেই, এখন সকলেই পরিণামের জন্যে ব্যাকুল। কৃপানাথের কথায় কেউ তাই কর্ণপাত করছে না। একে উপেক্ষা মনে করল না কৃপানাথ। নিরুৎসাহও সে হল না। তাই সকলকে বিরক্ত করে সে এবার বুঝি একটু জোরেই জিজ্ঞাসা করে বসল, কি নাম বলতে পারেন ওর?

পিছন থেকে একসঙ্গে কয়েকজন বলে উঠলেন, চুপ, চুপ করুন।

পাশের ভদ্রলোকটির বুঝি একটু করুণা হয়েছে, এক ফাঁকে ফিসফিস করে বলে দিলেন, ওর নাম জানেন না? মুরলীধর হালদার।

—উঁহু, হিরোর না, হিরোয়িনের।

সমস্ত স্টেজটায় বার কয়েক জোর কদমে পুরো পায়চারি করে এইবার হিরো কাতরভাবে চীৎকার করে উঠল, অম্বা, অম্বা, অম্বালিকা—

চীৎকার করতে করতে স্টেজ ছেড়ে সে ছুটে পালাল।

নেমে এল ড্রপ। একটা অঙ্ক শেষ। আলো জ্বলে উঠল প্রেক্ষাগৃহে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন, শুনলেন তো নামটা?

চমৎকার। চমৎকার। চমৎকার।

নতুন সুরকির রাঙা রাস্তাটি এইখানে পাক খেয়ে প্রান্তরটিকে বেষ্টন করে আবার সোজা হয়ে চলে গিয়েছে অনেক দূরে। মনে হয়, প্রান্তরের সিঁথিতে বুঝি এঁকে দিয়ে গেছে সিঁদুরের দাগ।

রাস্তার দুই পাশে গাছের মিছিল। দু পাশের দু সারি গাছ নিজেদের মধ্যে পাল্লা দিয়ে সোজা ছুটে চলেছে ওই রাস্তা বরাবর বহুদূরে।

আকাশ এখানে অবাধ। সন্ধ্যায় ওই প্রান্তরে মাথার নীচে হাত দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে তারা-খচা আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হয়, ও যেন মিনে-করা বিরাট একটি পানপাত্র তার সমস্ত সুধা প্রান্তরটির উপর উজাড় করে দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সে-সুধা ধরে রাখার জন্যেই যেন রাঙা রাস্তাটি ধরেছে একে বেষ্টন করে, আর ঐ গাছেরা হয়েছে প্রহরী।

এইখানে কৃপানাথ প্রথম যখন এসেছিল তখন সে এই ধরনের নানা আজগুবি কথা ভেবেছে। আসলে, জায়গাটা তার বড়ই পছন্দ হয়েছিল।

শহর-কলকাতা থেকে বেশি দূরেও না, রূপনারায়ণ নদীটা পার হয়ে মাত্র কয়েকটা স্টেশন।

হাতের কাছেই এমন ভালো ভালো জায়গা

আছে এ কথা আগে জানাই ছিল না কৃপানাথের।

কৃপানাথ ছবি আঁকে। ছবি ভালোই আঁকে, ইমাজিনেশনও ভালো, হাতও ভালো। কিন্তু ছবি যতটা ভালো আঁকতে পারে, আর্টিস্ট সে তার চেয়ে বড়। তুলীতে-রঙে শিল্পীর চেয়ে মনে-প্রাণে সে শিল্পী বেশি। রুচি তাই অসাধারণ রঙীন, কল্পনা তাই অসাধারণ তেজী।

বলে, জীবনটা জুয়াখেলা নয়, জীবনটা যাদুবিদ্যাও নয়, জীবন হচ্ছে একটা ক্লাউডস্কেপ—অপর্যাপ্ত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের উপর আলোর ফুলঝুরি যখন ঝরে পড়ে তখন সে মেঘ হয়ে ওঠে রঙের রংমশাল। আমাদের জীবন সেই রঙ ও সেই মশালে, সেই বর্ণে ও সেই আলোতে—

কথা শেষ করতে না দিয়ে বটকৃষ্ণ বলে উঠল, চমৎকার, চমৎকার, চমৎকার।

কৃপানাথ পায়চারি করছিল তার স্টুডিওতে, হাতের মোটা ব্রাশ দুই হাতে পিছন দিকে ধরে সে হেঁটে হেঁটে বেড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল।

কয়েকটা মোড়া ছড়ানো। তাতে বসে বটকৃষ্ণ নিখিল আর হরেন্দ্রনাথ কৃপানাথের ছবি আঁকা দেখছিল আর তারিফ করছিল। হঠাৎ কৃপানাথ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, লাইফ হচ্ছে একটা ক্লাউডস্কেপ।

তারপর পায়চারি করতে করতে তার বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করল। মাঝ পথে বটকৃষ্ণ বাধা না দিলে কৃপানাথ আজ বুঝি অনেক কথা বলে যেত।

বটকৃষ্ণের কথা শুনে সে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ঠাট্টা নয়, তামাশা নয়।

—সেইই তো। বটকৃষ্ণ বলল, আমরা ঠাট্টা করতে এখানে আসি নি। তামাশা করা আমাদের কাজ নয়। আমরা এসেছি ছবি দেখতে।

—ইয়েস। নিখিল বলল, ইয়েস। ছবি দেখতে, বক্তৃতা শুনতে নয়।

হরেন্দ্রনাথ মুচকে মুচকে হাসছিল, বলল, বক্তৃতা শুনতে হলে তো সোজা চলে যেতাম ময়দানেই।

কৃপানাথ এদের কথায় ক্ষুণ্ণ হয় না। সে জানে এরা তিনজন ব্যঙ্গবিদ্রূপ হাসি-ঠাট্টা যা-ই করুক তার সঙ্গে, তার ছবির সমজদার এরাই। তাই সে বলল, তবে বক্তৃতা থাক্, ছবিটা শেষ করে ফেলি। তোমরা তাহলে বোসো। মনোহর চা নিয়ে আসছে, এই নাও সিগারেটের টিন, ঐ আশ-ট্রেটা টেনে নাও।

—তা নিচ্ছি, তা নিচ্ছি। সবাই বসছি। কিন্তু মনোহরকে দিয়ে আর কতদিন চালাবে? একটা মনোহারী নিয়ে এস।

নিখিলের কথায় যোগ দিল বটকৃষ্ণও, বলল, জীবন যদি রংমশাল, তবে একটু জ্বলে ওঠো, একটু দৌড়। চারদিকে তো শুধুই রং, একটা মশাল আনো।

হরেন্দ্রনাথ বেশি কথা বলতে চায় না, মুখ টিপে টিপে হাসে, সে বলল, হ্যাঁ। অমনি তেজী আগুন এক খণ্ড—তোমার প্রতিভার মত।

চমকে ফিরে তাকাল কৃপানাথ, জিজ্ঞাসা করল, প্রতিভা কে?

তিন বন্ধু হেসে উঠল একসঙ্গে, বলল, চমকালে কেন? কারো নাম করিনি। বলছি তোমার [illegible] কথা।

কথা শুনে খুশি হল কৃপানাথ, ওদের মুখের দিকে চেয়ে বুঝি তৃপ্তির হাসিই হাসল, তারপর ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে তুলি ঘষতে লাগল।

হাঁটুর নীচ অবধি ঝুলে গেরুয়া পাঞ্জাবি তার গায়ে, হাত উঁচু করে যখন তুলি টানছে তখন পাঞ্জাবির ঢোলা হাতটা গড়িয়ে নেমে আসছে কনুই পর্যন্ত, সুপুষ্ট একটা মসৃণ হাত দেখা যাচ্ছে তখন। পা দুটো দেখার উপায় নেই, ঢিলে পায়জামায় গোড়ালি অবধি ঢাকা। আর্টিস্টের মতই চেহারা, আর্টিস্টের মতই সাজ। কিন্তু মনে-প্রাণে সে আর্টিস্ট আরো বেশি। ভিতর থেকে চিন্তার বুদ্বুদ ঠিকই ওঠে, তার উপর কল্পনার রং লেগে রামধনুকের মত সাতরঙের বর্ণালিও ওঠে স্পষ্ট হয়ে কিন্তু সে বুদ্বুদ আচম্বিতেই বুঝি যায় কেটে।

কৃপানাথের আঁকা ছবি দেখে কৃপানাথের বিচার তাই সম্ভব না। আর্টিস্ট সে আরো বড়।

বন্ধুরা বলে, ঐ ছবি ভালো করে দেখতে হলে মশাল চাই।

কৃপানাথ হাসে, বলে, তার চেয়ে আগে চাই একটি ডেরা।

হরেন্দ্রনাথ হেসে ওঠে, বলে, ভালো-বাসার সঙ্গে ভালো বাসার সম্পর্ক নেই।

কৃপানাথ বলল, ভালো হোক মন্দ হোক, বাসা চাই আগে, নইলে বাস করব কোথায়?

—এখানে।

—এই স্টুডিওতে? এখানে মডেল নিয়ে থাকা যায় কিন্তু বউ নিয়ে নয়।

—তবে কর একটা বাসা।

—করব।

বন্ধুদের কথা শুনে কৃপানাথের মাথায় পোকা ঢোকে। সে নিঃসন্দেহ হয়ে গেল যে—একটা ঘর তৈরি করতে না পারলে তাকে দিয়ে সে সব কাজ সম্ভব না।

টাকা আছে তার, রুচিও আছে। কিন্তু সেই পৈতৃক টাকা ও বাবুগিরির রুচির প্রকাশ না হয় এ বিষয়ে সে হুঁশিয়ার। সে শিল্পী, নগরের জনতা ও জনতার কোলাহল শিল্পের পরম শত্রু। এই জন্য একটা নিরিবিলি নিভৃতি খুঁজে বেড়াল সে একা-একা অনেকদিন ধরে।

অবশেষে মিলে গেল জায়গা। রূপনারায়ণের ওপারে। এইখানে সে মনের মতন করে তৈরি করল দোতলা একটি বাড়ি। নীচের অংশ স্টুডিও, উপরটা থাকবার। বাড়িটা ঘিরে পুঁতে দেওয়া হল ঝাউগাছের চারা। গাছগুলো লম্বা হয়ে উঠলে অদ্ভুত শোভা হবে। দোতলায় দাঁড়ালে দেখা যায় অর্ধচন্দ্রের আকারে ঐ রাঙা রাস্তাটি বেষ্টন করে আছে তার এই বাড়িটা। রাস্তাটা দেখে মনে হয় যেন একটা রাঙা শাঁখা,—নববধূদের হাতের।

শরীর সিরসির করে ওঠে, মাথাও ঝিমঝিম করে। কিন্তু নববধূ বললেই তো নববধূ হয় না। তারও রুচি থাকা চাই, তারও শিল্পবোধ থাকা চাই। কেবল বধূ হলেই চলবে না, তাকে হতে হবে তার জীবনসঙ্গিনী। অতএব দরকার একটি কলাকুশলী কন্যা।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবে কৃপানাথ। ঠিক। পরামর্শ করে দেখতে হবে হরেন্দ্রনাথ, নিখিল আর বটকৃষ্ণের সঙ্গে।

কিন্তু পরামর্শ করার জন্যে তাকে নিজেকে উদ্যোগী হতে হয় না।

কৃপানাথের ডোভার লেনের ঘরটিতে তার এই তিন বন্ধু নিত্য এসে তাকে কেবলই পরামর্শ দিতে থাকে।

—এইবার তো তোমার বাড়ি হল কৃপানাথ, এবার চাই একটা নারী। শিল্পী মানুষ তুমি, এসব না হলে ইন্সপিরেশন পাবে কোথা থেকে। ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে জয়ী হওয়া এবং নারী-বিবর্জিত জীবনে শিল্পচর্চা করা একই বস্তু। অতএব তোমাকে এবার আমরা দেখতে চাই জোড়ে।

নিখিলের কথা মনোযোগ দিয়ে সে শোনে। এখন এসব কথা শোনায় তার বিশেষ আগ্রহ। সে নিজেও এখন বোধ করছে একজন সংগী না হলে চলবে না। তুলিটা এগিয়ে দেওয়া, রংটা গুলে দেওয়া—এসব কাজ তো মনোহরকে দিয়ে চলে না। বড়জোর সে দিতে পারে চায়ের বাটি কিংবা খাবারের প্লেট এগিয়ে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য, মেয়ে তো কতই আছে, মনের মত মেয়েরই যে অভাব।

বটকৃষ্ণ বলল, কি, চুপ করে রইলে কেন? কথা বল, কথা দাও।

এবার মনের কথা বলল কৃপানাথ, বলল, মনের মত মেয়ে পাব কোথায়। এখানে তোমরা আছ সময় কাটছে, কিন্তু ওখানে ঐ প্রান্তরের নির্জনতায় একজন সংগী অবশ্যই দরকার। কিন্তু যেমন-তেমন মেয়ে হলে তো চলবে না।

বটকৃষ্ণ এগিয়ে বসে বলল, কি রকম তোমার চাহিদা, বল। স্পেসিফিকেশন দাও, ড্রয়িং দাও—খোঁজ করে নিয়ে আসব আমরা।

ড্রয়িং-স্পেসিফিকেশনের কথা না। মেয়েকে হতে হবে আর্টিস্ট, রং-তুলির না হলেও চলবে, গানে শিল্পী না হলেও চলবে, কিন্তু প্রাণে শিল্পী হওয়া চাই।

বন্ধুরা পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এটা আবার কি ধরনের বস্তু তারা বুঝে পেল না। প্রাণে শিল্পী কে, তা খুঁজতে হলে মেয়েদের প্রাণ নিয়ে যে ছানাছানি করে বেড়াতে হবে।

হরেন্দ্রনাথ চুপ করে বসে ছিল, ধীরে ধীরে নস্যি টেনে মৃদু হেসে বলে উঠল, না প্রাণ, আমরা পারব না। হার মানলাম, নিজে খুঁজে নাও।

তাই। তবে তাই। সে নিজেই খুঁজে নেবে। তার বিত্ত আছে, চেহারা আছে, রুচি আছে, বাড়ি আছে—তাকে পাওয়ার জন্যে লালায়িত মেয়ের সংখ্যা কম হওয়ার কথা না। তার থেকে একটি মাত্র মেয়ে সে কি আর পারবে না বেছে নিতে?

পারবে। পারতে তাকে হবেই। বন্ধুরা যতই ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ করুক, সে ভ্রূক্ষেপ করে না। শুধু মনে হয় সেই নির্জন উপত্যকায় তার গৃহটির কথা। অমন সাজে আর অমন সজ্জায় সে-গৃহ সে পরিপাটি করে তুলেছে, সে-গৃহের যোগ্য একটি বধূ তার প্রয়োজন। ঐ নিস্তব্ধতিতে তার উপযুক্ত একজন সংগী না হলে চলবে কেমন করে?

এখন তাই তাকে উদ্যোগী হতে হয়েছে। এখন সর্বদা তার চোখ তার সংগী নির্বাচনের জন্যে ব্যস্ত। যখন যেখানেই থাক, কোনো পার্টিতে কিংবা কোনো ক্লাবে, কোনো জলসায় কিংবা এগজিবিশনে—সব সময়ই তার চোখ-দুটি খুঁজতে থাকে মাত্র একটি জিনিস।

অবশেষে পেয়ে গেছে কৃপানাথ। ঠিক যেমনটি সে চেয়েছিল অবিকল তেমনটিই।

সুন্দরী না, কিন্তু খুব সুশ্রী। কথায় যেমন মার্জিত, উচ্চারণ তেমনি স্পষ্ট, যেমন পরিপাটি তেমনি পরিচ্ছন্ন, যেমন রুচি তেমনি—

তিন বন্ধু এসে উপস্থিত হল এক সঙ্গে, তাদের পায়ের শব্দে চমকে উঠল কৃপানাথ।

—কী, ভাবা হচ্ছিল কার কথা?

কৃপানাথ বিনীত ভঙ্গিতে বলল, কার কথা আর ভাবব? ভাবছিলাম অদৃষ্টের কথা।

—কেন, অদৃষ্টের কি হল?

মুচকি হেসে কৃপানাথ বলল, আমার অদৃষ্ট বড় প্রসন্ন।

—হঠাৎ এ-কথা কেন?

কৃপানাথ বলল, যা চেয়েছি তা পেয়েছি।

শব্দ করে হেসে উঠল হরেন্দ্রনাথ, বলল, বাঃ, চমৎকার ড্রামা, ফার্স্ট ক্লাস নাটক।

নিখিল চাপা গলায় বলল, জিনিসটা বড় ছোঁয়াচে। এরই মধ্যে অন্যের কথা ধার করে কথা বলতে শিখে গেছে কেমন চমৎকার।

বটকৃষ্ণ একটু চিন্তা করল বুঝি, বলল, তা বেশ। কিন্তু তোমার অদৃষ্টটা কোথায়? তাঁকে একবার ডাকো, একটু আলাপ-পরিচয় করা যাক।

কৃপানাথ মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, ঘুমিয়ে আছে।

—তাহলে কাল সারারাত বুঝি খুব ড্রামা গেছে?

স্বীকার করল কৃপানাথ, বলল, হ্যাঁ। রাত প্রায় তিনটে হয়েছে ফিরতে।

একটু চমকই লাগল বুঝি তিন বন্ধুর। তারা এ ওর মুখের দিকে তাকাল, কোনো কথা বলল না।

সোফার মধ্যে ডুবে বসল নিখিল, জিজ্ঞাসা করল, এই ডোভার লেনের মায়া কাটিয়ে কবে গিয়ে গৃহপ্রবেশ করছ তোমার নতুন গৃহে?

—শিগগিরই হবে। কন্ট্রাক্টের কাজ কিনা। আর তিনটি লাইট আছে, বাধা হয়ে

মমতাকে তাই কন্ট্রাক্টের টার্ম ফুলফিল করতে হচ্ছে। তার পরেই ছুটি।

হরেন্দ্রনাথ ঘুরে ঘুরে দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলি দেখছিল, এদের দিকে পিছন দিয়েই বলল, তার পর দুইজনে ছুট দেবে উর্ধশ্বাসে।

হরেনের কথাই ঠিক। চতুর্থ দিনে তারা ডোভার রোডের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছে রূপনারায়ণের ওপারে।

শহরের সমস্ত বিলাস, সব কোলাহল, আর যাবতীয় বন্ধু-সমাবেশ পরিহার করে সকলের দৃষ্টির আড়ালে মধুযামিনী যাপন করেছে কৃপানাথ আর মমতা।

মমতার উপর কৃপানাথের কৃতজ্ঞতা অসাধারণ। কেমন অক্লেশে সে তার জীবনের আকর্ষণগুলি ত্যাগ করে এত দূরে চলে এসেছে কৃপানাথের সঙ্গে।

নীচের হলঘরটা নানাবিধ ছবিতে ভরা। দেয়াল চারটি বিচিত্র চিত্রের একটা পাতা-খোলা অ্যালবামের মত দেখায়।

বিস্মিত চোখে ঐ দিকে চেয়ে থাকে মমতা। সব ছবির মানে সে বোঝে না। অনেক ছবি তার কাছে মনে হয় উলটো করে টাঙানো হয়েছে ভুল করে।

কৃপানাথের মুখের দিকে তাকায় সে, বুঝিয়ে দেয় কৃপানাথ, বলে, ওটা হচ্ছে একটা সী-স্কেপ—সেবার ওয়ালটেয়ারে গিয়েছিলাম, উঃ, কী বিরাট সেই সমুদ্র, দেখলে মনে হয় যেন—

কান দিয়েই শুনছিল মমতা, হঠাৎ কৃপানাথের তুলিসুদ্ধ হাতটি চেপে ধরে বলল, চল না গো, যাই তোমার সেই ওয়াল-টেয়ারে। ছবিতে সমুদ্র দেখে পেট ভরে না। চল, দেখে আসি গিয়ে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কৃপানাথ বলে, যাব। যাব।

—আর গিয়েছ, আজ তিন মাস কেটে গেল, এইখানে আটক করে রাখলে আমাকে।

মমতার মুখের দিকে তাকাল সে, বড় মায়াই হল মেয়েটার জন্যে। সত্যিই তো, রং-তুলি নিয়ে নিজেকে সে ডুবিয়ে রেখেছে তার মনের আনন্দের মধ্যে, কিন্তু মমতার জন্যে করেছে সে কী! ঠিক তার চাহিদা অনুযায়ীই এই বধূ সে পেয়েছে, এ কথা জোরগলায় ঘোষণা করতে সে রাজি—যখন তার যা দরকার একেবারে মুখস্ত করে ফেলেছে মমতা। নীলের সঙ্গে কতটা হলুদে রং মেশালে ফিকে-সবুজ তৈরি হবে, সে আর্টও শিখে নিয়েছে সে। কখন কোন্ তুলিটা এগিয়ে দিতে হবে বলে দিতে হয় না, কৃপানাথ হাত বাড়ালেই তার প্রয়ো-জনীয় রং-মাখা তুলি তুলে দেয় তার হাতে মমতা।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে কৃপানাথ, হাতের তুলি রেখে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই হাতে মমতার দুই কাঁধ চেপে ধরে সে বলে ওঠে, মারভেলাস।

একেবারে কাদা হয়ে যায় মমতা, কৃপা-নাথের বুকের উপর গাল রেখে বলে, গাল দিলে, না, আদর করলে বুঝিয়ে দাও। কথাটা কি বললে, বল।

—মারভেলাস।

চমকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায় মমতা, বলে, সে কি গো, মারবে নাকি?

মমতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কৃপানাথ বলল, সে কি কথা।

—অত এংরেজি জানি না, বাংলায় বল।

কৃপানাথ চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, চমৎকার।

হল-ঘরের চতুর্দিকের জানালা খোলা। অপর্যাপ্ত আলো খেলে বেড়াচ্ছে ঘরময়, এবং তার চেয়েও বেশী বাতাস।

এমন অবারিত এবং এরকম উন্মুক্ত কক্ষে স্ত্রীকে নিয়ে এমন অন্তরঙ্গভাবে দাঁড়াবার অবকাশ কখনো মেলে না কোনো শহরে। কিন্তু তাদের এই ডেরা সেই অভিনব অবকাশের সুযোগ দিয়ে বুঝি ধন্য করে তুলেছে তাদের।

তুলিগুলো তাই ক্রমশ শুকিয়ে শক্ত হয়ে উঠছে।

দিন কেটে চলেছে একে-একে। এতে আফশোষও নেই, অনুশোচনাও নেই, উদ্বেগও নেই। যে-বিত্তের অধিকারী হয়েছে কৃপানাথ, তা দিয়ে পরম আনন্দে তার জীবন অক্লেশে কাটিয়ে দিতে পারবে। ছবি এঁকে, ছবি বেচে জীবিকার জন্যে ছুটোছুটি করার দায় থেকে সে মুক্ত।

উপরের ঘরের জানলায় দু-জন ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে রাঙা রাস্তাটির বক্র গতিটা লক্ষ্য করে, লক্ষ্য করে তার দু-পাশের গাছের মিছিল, আর উপরের দিকে চেয়ে দেখে নীল আকাশের গায়ে পেঁজা তুলোর মত হালকা মেঘের গুচ্ছ—ধীর মন্থর গতিতে ভেসে ভেসে চলেছে।

কৃপানাথ মমতার মুখের দিকে তাকাল, একটা হাত রাখল তার পিঠের উপর।

অনেকক্ষণ ঐ মুখের দিকে চেয়ে সে বুঝি দেখতে লাগল তার চোখের দৃষ্টি তার চোখের কালো দুটো তারার মধ্যে লুকিয়ে আছে কি না কোনো জ্যোতিষ্ক।

কিন্তু বলল অন্য কথা, বলল, তোমার নাকে এই একটা ফুটো কেন বল তো!

—নাকছাবি পরতাম গো আগে। একটা পুঁতির নাকছাবি কিনেছিলাম মগরার হাটে, কী সুন্দর দেখতে।

—গেল কোথায় সেটা?

—ফেলে দিয়েছি।

—কেন?

—সে অনেক কথা। আমরা সব পোষা পাখি। যার যেমন পছন্দ তার মতন থাকতে হয়।

কৃপানাথ এ-সব কথার কোনো মানেই বুঝি বুঝতে পারল না, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কি বললে?

মমতা ফিক করে হেসে বলল, বুঝেছি। পুরুষ মানুষগুলো বড় হিংসুটে। ও-সব কথা থাক। কি বলছিলে বল।

কিছু বলছিল না কৃপানাথ। সে দেখছিল বাইরের ঐ শোভা, ঐ শোভা দেখতে দেখতে ভিতরের এই শোভায় চোখ আটকে গিয়েছিল তার। সত্যি, মমতার মুখটা বড় মিষ্টি, হাসিটা আরো বেশি সুষ্টু।

বাইরে চেয়ে সে ধরা গলায় বলতে লাগল, বাতাসটা কী সুন্দর লাগছে, ওই গাছের সার দেখে মনে হচ্ছে ওদেরই মধ্যের একজন হয়ে যাই, এই আলো, এই হাওয়া, এই আকাশ—

খিলখিল করে হেসে উঠল মমতা, বলল, বুঝেছি, বুঝেছি, বুঝেছি। বুঝেছি তোমার মতলব।

—কিসের মতলব? সোজা হয়ে দাঁড়াল কৃপানাথ। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলল মমতা, তার পর সরে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে চেয়ে বলল, পুরুষমানুষদের চিনি না?

ছন্দটা কেটে গেল নাকি? বুকের কাছটা কেমন যেন টনটন করে উঠল তার। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল কৃপানাথ।

তার হাত ধরে টেনে, চোখে অদ্ভুত চাউনি হেনে, মমতা বলল, থাক আর আবৃত্তি করতে হবে না, ও-ঘরে চল।

অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কৃপানাথ। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল নীচের হল-ঘরটার কথা। ব্রাশগুলো শুকিয়ে সব শক্ত হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

বলল, মাথাটা ধরেছে মমতা, একা থাকতে দাও।

—ইশ। দু-জন মানুষের বাড়িতে একা থাকতে দিলেই হল। মাথা ধরেছে চল ওষুধ দিচ্ছি। ও-ঘরে চল, টিপে দিচ্ছি মাথা। অমন করতে নেই গো, অমন করতে নেই।

মমতা তার দুই হাতের সমস্তটুকু মমতা কৃপানাথের মুখে ও মাথায় বুলিয়ে দিতে লাগল। ঐ স্নেহের প্রলেপেই তার বুকের ভিতরের ব্যথাটা কমে এল অনেক।

হেসে ফেলল কৃপানাথ, বলল, তোমার সঙ্গে পারা মুশকিল। এমন চমৎকার করে কথা বলতে পার।

—তাই যদি না পারব, তবে তোমার মত মানুষকে কি পেতাম কখনো? আচ্ছা, খুব হয়েছে, এসো। তামেশা রাখ।

—কি রাখতে বললে?

—তামেশা।

ও-ঘরের দিকে যেতে যেতে কৃপানাথ বলল, এ-ধরনের কথা বল কেন? সব কথায় শুধু গো, আর ভাষাগুলো কেমন যেন—কই অমন কথা তো বলতে শুনিনি কখনো।

মমতা হেসে বলল, সেসব মুখস্ত-করা কথা। যা শিখিয়েছে তাই বলেছি। মুখস্ত

করা কথা দিয়ে তোমার সংগে আলাপ করতে কি বল তুমি? তোমার সংগে কি আমার অভিনয়ের সম্পর্ক?

তা বটে। যুক্তি আছে বটে এ-কথায়। কৃপানাথ তাই চুপ করে গেল। এবং মমতার সংগে সংগে গিয়ে প্রবেশ করল পাশের ঘরে।

যতই দিন যায় ততই কৃপানাথ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মমতার চোখের দিকে। কৃপানাথের সে-চাউনির মধ্যে মমতা আবার কি-যেন খোঁজে। জিজ্ঞাসা করে, অমন করে তাকাচ্ছ কেন?

—খুঁজছি।

—কি।

—সেই দৃষ্টিটা।

সমস্ত শরীর দুলিয়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে মমতা বলে, ঐ এক কথা। রোজ রোজ এক কথা। ও-দৃষ্টি কি যখন-তখন পাওয়া যায়?

হাসতেই থাকে মমতা, কেবলই হাসে।

কৃপানাথ ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করে, তবে কখন পাওয়া যায় ওটা?

—জান না? জান না? ভালো করে দেখনি নাটকটা? ও-দৃষ্টি চিরবিদায় নেবার দৃষ্টি। যার সংগে শুভদৃষ্টি হয়েছে তার দিকে কি অমন দৃষ্টিতে কখনো চাইতে আছে গো?

—তাহলে, ও-দৃষ্টিটা বুঝি শুধু মুরলীধর হালদারের জন্যে?

—তা কেন। মুরলীধর হোক, জটাধর হোক—যে যখন নায়ক সাজবে, তার দিকেই চাইব অমনি চোখ করে।

—কত ড্রামায় নায়িকা সেজেছ?

—সে কথা আজ কেন?

কৃপানাথ বলল, জানতে ইচ্ছে করছে।

শক্ত হয়ে বলল মমতা, চোখের দৃষ্টিও শক্ত হয়ে উঠল তার, বলল, সেদিন সাজঘরে গিয়ে যখন হানা দিয়েছিলে তখনই জেনে নেওয়া উচিত ছিল। তখন বুঝতে পারনি আমি কি আমি কে, কোনখান থেকে ছিটকে এসে অবশেষে উঠেছি ওই স্টেজে?

—ভুল হয়ে গেছে।

—আপসোস কর। কিন্তু আমি ভুল করিনি।

গদগদ গলায় কৃপানাথ জিজ্ঞাসা করল, ভুল করনি? তবে তুমি আমাকে ভালো বেসে এসেছ বল।

—অত জেরা কোরো না। সাজঘরে সাজ খুলছি, অমনি একজন হানা দিল সেখানে, অমনি ভালোবেসে ফেললাম তাকে, ভালোবাসাটা অত সস্তা জিনিস নয় গো, অত খেলো সামগ্রী নয়।

—তবে রাজি হয়ে গেলে যে?

বাড়ির চারদিকে তাকাল মমতা, ঘরের বিবিধ আসবাবপত্রে চোখ বুলোলো, বলল, সে কথা এখন নয়।

উঠে পড়ল কৃপানাথ, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ছুটে দিল নীচের দিকে, মনে হল, ও যেন অম্বা অম্বা অম্বালিকা ব'লে আর্তনাদ করতে করতে নেমে গেল।

একা বসে বসে হাসতে লাগল মমতা। তাকে এই বনবাসে নিয়ে এসে তার জীবনটা বরবাদ করে দেবার ইচ্ছে বুঝি ওই মানুষটার। কিন্তু জীবন বরবাদ কার হয়, দেখে নেবে মমতাসুন্দরী। সাঁতার দেওয়া সাইকেল-চড়া আর অভিনয় করা, কেউ কখনো ভুলে যায় না। তার অভিনয়ের জীবন শেষ হয়ে গেছে বলে কে?

অনেকক্ষণ বাদে নীচে নেমে এসে মমতা দেখল হল-ঘর ফাঁকা। বাইরে বেরিয়ে দেখল মাঠ খালি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল অকালে কালো মেঘের স্তূপ উঠে আসছে পশ্চিমদিগন্তের কিনার থেকে।

—মনোহর মনোহর মনোহর।

চীৎকার করে ডাকতে লাগল মমতা তাদের ভৃত্যকে।

রান্নাঘরে ছিল সে, ছুটে এল, বলল, কি, মা?

ধমক দিয়ে উঠল মমতা, মা কি রে। দিদিমণি। দেখ তো তোর দাদাবাবু গেল কোথায়?

মমতার মুখের দিকে চেয়ে রইল মনোহর। আবার ধমক দিল মমতা, বলল, এই রূপ দেখো এখন পরে। যা বললাম, আগে কর।

মনোহর বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। হল-ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল মমতা। তার মুখে এতটুকু উদ্বেগ নেই, এতটুকু অশান্তিও নেই বুঝি তার বুকের মধ্যে। তার দুই চোখে আছে বুঝি একটু করুণা—ঐ বেচারাটার জন্যে।

দুই কনুই জানলার উপর রেখে দু-হাতের পিঠে থুৎনির ভর রেখে সে দেখতে লাগল বাইরেটা। রোদ আড়াল করে নেমে আসছে মেঘের ছায়া, যেন গাছের মাথায় মাথায় পা রেখে রেখে এগিয়ে আসছে এই দিকে। হাওয়া উঠেছে জোরে। গাছের ডালপালা দুলে উঠেছে।

অদূরে ঐ রিঠে গাছের ডালে ধুঁধুলের ছোবার মত দুলছে কি যেন। হয়তো পাখির বাসা। ওর বাইরে ডালে বসে চঞ্চল চোখে পাখিরা তাকাচ্ছে চারদিকে।

মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এল। সারা প্রান্তরে নেমে এল বুঝি চিকের যবনিকা। গাছের ঐ ডালে পাখিদের ভিজতে দেখে মমতার মনে হল, আহা বেচারা।

জানলা বন্ধ করে সে সরে এল। মনোহররা এখনো ফিরল না দেখে একটু ব্যস্তই বুঝি হল সে। খোলা মাঠে ওরা ভিজে বুঝি কাঁথাই হয়ে গেছে এতক্ষণে।
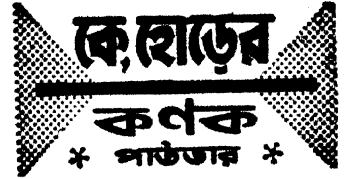
শ্রীযুক্ত নেহরুর জন্মদিনে তিনি যখন শিশু-উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, এমন সময় নাকি একটি শ্বেত পারাবত উড়িয়া আসিয়া তাঁহার কাঁধের উপর বসে। সংবাদদাতা বলিতেছেন—এইটি হইল শান্তির শ্বেত-পারাবত। —"আংতা, বাংতা, কাগজি, গাগনাদী, জলালী, সীমারিয়া, ঘোগিয়া, লক্কা, লোটন প্রভৃতি কত পায়রাই তো

দিনের পর দিন নেহরুজীর কাঁধে ভর করে তাঁকে অতিষ্ঠ করেন। আমরা শুনে খুশী হয়েছি, অন্ততঃ এই দিনে লক্কারা ভদ্রলোককে একটু রেহাই দিয়েছেন"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

১৩ই নবেম্বর বেলুড় ও কোন্নগরের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালানো হয়। উহাতে কোন যাত্রী লওয়া হয় নাই। তবে সংবাদে বলা হইয়াছে যে, কিছুসংখ্যক বিনাটিকিটের যাত্রী নাকি ট্রেনটিতে উঠা-নামা করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"তাঁরাও হয়ত বিনা-টিকিটে ভ্রমণের কাজটা প্রথমদিন শুধু পরীক্ষামূলকভাবেই চালিয়ে দেখে নিলেন মাত্র"।

* * *

জিপি-ও-তে শুনিলাম, লক্ষাধিক চিঠি ও সমসংখ্যক মনিঅর্ডার আটক পড়িয়া রহিয়াছে। —"তা থাক্; আমরা আশা করে থাকব যে, অন্ততঃ "সৌজন্য-সপ্তাহ"টা যথাদিনে যথাসময়ে সাড়ম্বরেই অনুষ্ঠিত হবে"—মন্তব্য করিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

মহীশূর রাজ্য বিধানসভায় নাকি একটি অভিনব যন্ত্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই যন্ত্রটির সুইচ্ টিপিয়া দিলে সদস্য বক্তৃতা দিতে থাকিলেও তাঁর বক্তব্য আর শোনা যাইবে না। —"যন্ত্রটি সর্বত্র চালু হলে আগামী নির্বাচনে অনেক

ঝামেলাই চুকে যাবে। প্রার্থীরা হয়ত বলবেন—মনের সুখে টেনে বক্তৃতাই যদি দিতে না পারি, তবে কিমহং তেন কুর্যাম"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকে এবং প্রাচীরগাত্রে নাকি একটি ঔষধের বটিকার বিজ্ঞাপন সাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে—ইহা সেবনে স্নায়ু স্নিগ্ধ হইবে, মন স্থির হইবে এবং রাত্রি জাগরণে ক্লেশ হইবে না। সুতরাং পরীক্ষা পাশ করিতে হইলে এই বটিকা অবশ্য সেব্য। শ্যামলাল বলিল—"বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এই সুবর্ণ সুযোগ। আর কিছু না হোক, অন্ততঃ সন্ন্যাসীদত্ত শেকড়-বাকড় বা স্বপ্নাদ্য মাদুলী রপ্তানিতে আমাদের জুড়ি কেউ হবে বলে তো মনে হয় না।"

* * *

প্রসংগত একটি সংবাদ মনে পড়িল—মার্কিন রাষ্ট্রদপ্তর হইতে নাকি ভারতকে প্রচুর ঋণ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এটা সত্যি আশা ও আনন্দের কথা। কিন্তু ভয় হয় ঋণং কৃত্বা শুধু ঘৃতং পিবেৎ নীতিই না অনুসরণ করা হয়"।

* * *

কোন একটি বিদেশী সংবাদপত্র ঘোষণা করিয়াছে যে, যে ব্যক্তি চন্দ্রলোকে গমন করিয়া আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন, তাঁহাকে ৫০ হাজার স্টার্লিং পুরস্কার দেওয়া হইবে। শ্যামলাল বলিল—"এটা তো আর গোলকধাম খেলা নয়, কড়ির চিৎ দিয়ে গমন, পুনরায় সংসারে পতন! চাঁদ ধরার বায়না যিনিই করুন, শেষ পর্যন্ত গাইতে হবে—চাঁদ হাসে মোর দশা হেরে ভাঙা মেঘের ফাঁকে"!

* * *

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায় কোন একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠানের সভায় জনচিত্তে মঞ্চাভিনয়ের গভীর প্রভাবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"প্রতিবাদ আমরা অবশ্য করব না। কিন্তু দেখে-শুনে মনে হয়, মঞ্চ নয় এবং জন-

চিত্তেও নয়, জনমস্তিষ্কে পর্দাভিনয়ের প্রভাবই চলছে বেশি"!!

* * *

একটি কুকুর নাকি একাদিক্রমে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত তার প্রভুর জন্য একটি বাসস্টপে রোজ আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিয়াছে। —"এবারে প্রভুরা কুকুরের জন্য কত বছর অপেক্ষা করবেন তা একমাত্র ভগবান, থুড়ি, প্রভুরাই জানেন"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী। শূন্যে বিচরণকারী "লাইকা" সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিলেন কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

* * *

লণ্ডনের এক পশুশালায় একটি ভারতীয় গণ্ডার শাবকের জন্ম হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, ইহা লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে এবং জনসাধারণের মধ্যে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। —"তা তো পড়বেই। ভারতীয় গণ্ডারের চামড়া মজবুত করে তুলতে লণ্ডনের দান নগণ্য নয়"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

বোম্বাইতে সম্প্রতি বিশ্ব-নিরামিষ সম্মেলন হইয়া গেল। সম্মেলনে নিরামিষ খাদ্য ও রন্ধন প্রণালীর একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। বিশু-খুড়ো বলিলেন—"উদ্যোক্তারা পশ্চিমবঙ্গের মাছের বাজারটা ঘুরে এলে বুঝতে পারতেন, দেশকে নিরামিষাশী করে তুলতে সম্মেলনের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া রন্ধন-প্রণালীর প্রদর্শনীও নিরর্থক। সুশনি, কলমী জাতীয় কিছু শাক কড়াতে চাপিয়ে শুধু জল আছড়া—এ প্রণালী গিন্নীদের খাতস্থ হয়ে গেছে"!!

ত্রিদিব চৌধুরী

॥ ২১ ॥

এক নম্বর হাজতের কাহিনী

পঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজতে ঢোকার পর হইতে আমার মনে যেসব প্রশ্ন জাগে, তাহার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল: প্রথম, ইহারা এখন আমাকে নিয়া কি করিবে? দ্বিতীয়, ইহারা আমাকে গোয়ার রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে এক সঙ্গে রাখিল কেন? এ দুই প্রশ্নের উত্তর আন্দাজ করিতে আমার খুব বেশীদিন লাগে নাই, তবে একেবারে প্রথমেই ব্যাপারটা ঠিক ঠাহর করিয়া উঠিতে পারি নাই। তাহার কারণ, পর্তুগীজ পুলিস পারতপক্ষে ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে গোয়ার রাজনৈতিক বন্দীদের একত্র এক হাজতে থাকিতে দিত না। হাজতে স্থানাভাবে তাহাদের সময় সময় এই পলিসির ব্যতিক্রম করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণত যে-সব ভারতীয় বন্দীকে একদিন বা দুইদিন হাজতে রাখিয়া ছাড়িয়া দিবে বলিয়া তাহারা ঠিক করিত মাত্র তাহাদেরকেই গোয়ার রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে রাখা হইত। অন্যান্য বাছাই করা বন্দীদের কোনো সময়েই তাহারা গোয়ার বন্দীদের সঙ্গে এক সঙ্গে থাকিতে বা গোয়াবাসী বন্দীদের সঙ্গে মেলামেশা করার সামান্যতম সুযোগ দিতে চাহিত না। ইহার অনেক পরে—আগুয়াদা দুর্গে বদলি হওয়ার পর—আগুয়োদার কমান্ডান্ট লেফটেনান্ট আর্কোসো কস্তা আমায় একবার বেফাঁস বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—'তোমাদের আলাদা রাখার কারণ, তোমরা আমাদের 'প্রজা'দের মাথায় আজে বাজে সব 'আইডিয়া' ঢুকাইয়া দিবে এটা আমরা চাই না।' কারণ যাহাই হোক, যে-সব ভারতীয় বন্দীকে তাহারা বেশীদিনের জন্য আটক রাখিবে তাহাদের গোয়াবাসী বন্দীদের সংস্পর্শে আসিতে না দেওয়াই ছিল পর্তুগীজ পুলিসের সাধারণ নিয়ম। কাজে কাজেই আমার বেলায় সে নিয়ম যখন আলগা করা হইল, তখন প্রথমটায় আমি নিজে এবং এক নম্বর হাজতে আমার সহবন্দীরা সকলেই ধরিয়া নিয়াছিলাম যে, আমাকে হয়ত উহারা বেশীদিন রাখিবে না; খুব বেশী হইলে সাত-আট দিন রাখিয়া ছাড়িয়া দিবে। আমার আগে পার্লিয়ামেন্টের মেম্বার অধ্যাপক বিষ্ণু ঘনশ্যাম দেশপাণ্ডেকে পর্তুগীজরা মাত্র কদিন রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়াতে আমাকেও তাহারা ছাড়িয়া দিবে, ভারত পার্লিয়ামেন্টের কোনো সদস্যকে তাহারা বেশীদিন আটক রাখিতে সাহস পাইবে না এই ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল হয়। দেশপাণ্ডে হাজতে পর্তুগীজ পুলিসের কাছে মার খাওয়ার ফলে আমি যে ধরা পড়ার সময় মার খাওয়ার হাত হইতে বাঁচিয়া যাই, তাহা কেন ও কিভাবে ঘটে সে কথা উপরে বলিয়াছি। কিন্তু প্রহারের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার ফলে আমি আটক পড়িয়া গেলাম। আর শুধু আটকই পড়িলাম না; পঞ্জিম হাজতে ঢোকার পরের দিন হইতে দুর্ভোগ ও বে-ইজ্জতির পালা রীতিমত শুরু হইয়া গেল। উপরের হুকুমে আমার গায়ে হাত না দিতে পারার ফলে ডাঃ সালাজারের 'ইণ্টারন্যাশনাল' পুলিস এবং মন্তেইরোর পিটুনী পুলিসদের মনে যে আক্ষেপ থাকিয়া গিয়াছিল কিভাবে সুদে-আসলে তাহা পূরণ করিয়া নেওয়া যায়, আমাকে পঞ্জিমে আনার পরের দিন হইতে সেইটা দাঁড়াইয়া গেল অলিভেইরো-মন্তেইরো কোম্পানীর প্রধান চিন্তা। আমাকে গোয়ার রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে এক হাজতে এক সাথে রাখার কারণও কতকটা তাই। ভারত হইতে যখন পর পর ভারতীয় সত্যাগ্রহীদল আসিতে আরম্ভ করিল, পর্তুগীজ ভারতের বড়লাট জেনারেল পাউলো বের্ণার্দ গেদীস পুলিসের সঙ্গে এবং লিসবন সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রথম হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের পারতপক্ষে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে রাখা হইবে না; তাহাদের বেশীর ভাগকেই মারধোর করিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহার কারণ প্রথমত, গোয়াতে অত লোককে আটক রাখার মত বড় জেল একটিও নাই; তাছাড়া, খরচপত্রের প্রশ্নও আছে। সত্যাগ্রহীদের ধরিয়া ধরিয়া অবশ্য আফ্রিকাতে, পর্তুগালে কিংবা সমুদ্রপারে কোনো দ্বীপে চালান করিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল; ইতিপূর্বে গোয়ার বহু রাজনৈতিক বন্দীকে এভাবে সমুদ্রপারে চালান দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয় বন্দীও যে ছিল না তা নয়। শ্রীদত্তাত্রেয় দেশপাণ্ডে আজও নির্বাসিত অবস্থায় পর্তুগালে আছেন। পুলিসের অমানুষিক অত্যাচারে মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া তিনি লিসবনের উন্মাদাগারে দিন কাটাইতেছেন। কিন্তু তাই বলিয়া এখন একেবারে ঢালাওভাবে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের আফ্রিকায় বা বিদেশে সমুদ্রপারে চালান দিতে চাহিলে ভারত গভর্নমেণ্ট চুপ করিয়া মুখ বুজিয়া তাহা সহ্য করিবেন, তাহা নাও হইতে পারে। বরং ইহা নিয়া ভারত গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে সারা দুনিয়ায় গোয়ার ব্যাপার নিয়া পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিরাট হৈ চৈ করার সুবিধা হইয়া যাইবে। ভারত নৌ-বাহিনীর কুজার আই-এন-এস "ইণ্ডিয়া" ইহার কিছু-দিন আগে যে একবার গোয়া হইতে রাজনৈতিক বন্দীদের সমুদ্রপারে জোর করিয়া চালান দেওয়া হইতেছে এই সন্দেহ করিয়া একটি পর্তুগীজ জাহাজকে মাঝ-সমুদ্রে থামাইয়া খানা-তল্লাসী পর্যন্ত করিতে চাহিয়াছিল, গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ সে-কথা তখনো ভোলেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদের মনে তখনও বেশ কিছুটা ভয় থাকিয়া গিয়াছিল। সুতরাং ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের যে সেভাবে বিদেশে নির্বাসনে চালান দেওয়া যাইবে না বা দিতে গেলে তাহার ফলাফল খুব ভাল হইবে না, ইহা বুঝিয়া পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের যতটা পারা যায় ঠেঙাইয়া তাড়ানোর নীতি গ্রহণ করে। এ বিষয়ে মন্তেইরোর পরামর্শ তাঁহাদের খুব কাজে লাগে। মন্তেইরো ইংরেজ আমলে যে কিছুদিন বোম্বাই পুলিসের সার্জেণ্টের কাজ করিয়া গিয়াছিল সে কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। সত্যাগ্রহীদের কিভাবে ঠেঙাইয়া সিধা করিতে হয় ভারত হইতে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় সে সে বিষয়ে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া ফিরিয়াছে। কাজে কাজেই পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের কাছে—এমন কি সালাজারের 'ইণ্টারন্যাশনাল' পুলিসের লিসবন হইতে আগত বড় সাহেব-দের কাছেও—মন্তেইরোর পরামর্শের যথেষ্ট দাম ছিল। মোটের উপর, সকল দিকের কথা ভাবিয়া-চিন্তিয়া এইটাই ঠিক হয়, সত্যাগ্রহীরা যখন ভারতের জাতীয় পতাকা ছাড়া আর কোনো অস্ত্র শস্ত্র নিয়া আসিতেছে না তখন তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া উত্তম-মধ্যম ঠেঙানি দিয়া বিদায় করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। তবে, ঠেঙানি দেওয়ার সময় এমনভাবে শিক্ষা দিয়া দিতে হইবে যে,

পর্তুগীজ পুলিসের লাঠির বাড়ি কিরকম, সহজে তাহার কথা যেন ভারতীয় সত্যাগ্রহী-দের মন হইতে মুছিয়া না যায় এবং ভুলিয়া দ্বিতীয়বার গোয়ায় ফিরিয়া আসার শখ কাহারো না হয়। জেনারেল বেনার্দ গেদীস্ ইহার উপরে বুদ্ধি খাটাইয়া স্থির করেন, বেশীর ভাগ সত্যাগ্রহীকে মারধোর করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হোক তাহাতে আপত্তির কিছু নাই; কারণ আটক রাখিলেই খাইতে দিতে হইবে, খরচ লাগিবে। কিন্তু তাহা হইলেও, সত্যাগ্রহীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হিসাবে যাহারা আসিবে তাহাদের কয়েকজনকে বাছাই করিয়া আদালতে বিচারের জন্য সোপর্দ না করিলে বা আইনত শাস্তি না দিতে পারিলে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট এবং পর্তুগীজ আইন-আদালতের মর্যাদা থাকিবে কি করিয়া? অবশ্য ইহার ভিতরে কূটনীতি বা 'হাই ডিপ্লোমাসি'-ও যে কিছুটা ছিল না তা নয়। পরে পর্তুগীজ পুলিস ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সংগে কথাবার্তায় আভাসে ইংগিতে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হইয়াছে, আমাদের কয়েকজনকেও আটক রাখাটা আদৌ ঠিক হইবে কিনা সেটা গোয়ার পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ প্রথমে স্থির করিতে পারেন নাই। পরে লিস্‌বনের সংগে কথাবার্তা বলিয়া স্থির হয়, সত্যাগ্রহীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে লম্বা শাস্তি দিয়া আটক রাখিলে, পরে তাহাদের মুক্তির প্রশ্নকে উপলক্ষ্য করিয়া ভারত গভর্নমেণ্টের সংগে প্রয়োজন মত রাজনৈতিক দরকষাকষি করার সুবিধা হইবে। জেনারেল বেনার্দ গেদীস এবং পর্তুগীজ ভারতের 'শেফ্ দে গাবিনেড্' (Chefe de Gabinet) বা শাসন পরিষদের চীফ্ সেক্রেটারীর ক্যাপ্টেন কার্লো ফেরেইরা, পর্তুগালের বৈদেশিক মন্ত্রী ডাঃ পাউলো কুনা এবং ঔপনিবেশিক মন্ত্রীর নির্দেশক্রমে শেষ পর্যন্ত আমাদের কয়েকজনকে বাছাই করিয়া আটক রাখার ও যথারীতি ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। মণ্টেইরো মানা সাহেব গোরের কাছে একদিন কথা প্রসংগে বলিয়াও ফেলিয়াছিল—"আমি তোমাদের ধরিয়া রাখিতে চাহি নাই; কিন্তু কি করিব, আমার উপর গভর্নর জেনারেল আছেন, তাঁহার উপরে লিস্‌বন গভর্নমেণ্ট আছে; আমাদের কথায় তো আর সব কাজ হয় না!

সে যাই হোক, অধ্যাপক বিষ্ণু ঘনশ্যাম দেশপাণ্ডেকে ছাড়িয়া দেওয়ার পরেও আবার আর একজন পার্লিয়ামেণ্ট সদস্য সত্যাগ্রহী দলের নেতা হিসাবে গোয়ায় আসিতেছে শুনিয়া এবার প্রথম হইতেই পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, এ ব্যক্তিকে আটক রাখিতে হইবে; ইহাকে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। সুতরাং আমাকে গ্রেপ্তার করার সময় যে প্রহার করা হইবে না বা আমার শরীরে হাত দেওয়া হইবে না, যতটা পারা যায় আমার উপর কোনোপ্রকার শারীরিক নির্যাতন না করিয়া পাঞ্জিম কুয়ার্টেলে নিয়া গিয়া আমাকে আটকাইয়া রাখা হইবে এবং যথাসময়ে বিচারের ও শাস্তি দেওয়ার জন্য মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে আমাকে হাজির করা হইবে—আমার সম্পর্কে এসব সিদ্ধান্ত আমি গোয়ার ভিতরে গিয়া পর্তুগীজ পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই মোটামুটিরকম স্থির করিয়া রাখা হইয়াছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া ডাঃ সালাজারের পেয়ারের 'ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস' তাহাদের এক্তিয়ার ছাড়িবে কেন? সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং রাজদ্রোহ দমানোর জন্য খাস্ লিস্‌বন হইতে তাহারা গোয়ায় আসিয়াছে। সুতরাং আমাকেও কিছুটা শিক্ষা না দিয়া তাহারা ছাড়িবে কি করিয়া? তাহারা তাই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল—বেশ, গোরে, লিমায়ে, দেশপাণ্ডে-র মত ইহাকে না হয় নাই মার-ধোর করা হইল? কিন্তু হাতে না মারিয়া অন্যভাবে শোধ তোলা যায় না?' আমাকে পাঞ্জিম কুয়ার্টেলে আনিয়া এক নম্বর হাজত-ঘরে রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য একটি ছিল ইহাই।

এই ঘরে যে আঠাশ-উনত্রিশজন লোককে রাজনৈতিক সন্দেহভাজন বলিয়া আটক রাখা হইয়াছিল তাহাদের কাহারো বিরুদ্ধে—দুইজন স্কুলের ছাত্র আল্‌ভারিস ও ফের্নান্দিস ছাড়া, স্কুলের ফুটবল খেলার মাঠে তাহারা ভারতীয় জাতীয় পতাকা টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল—কোনো আইন-অমান্যের বা নির্দিষ্ট অপরাধ করার অভি-যোগ ছিল না। তাহাদের কেহ প্রত্যক্ষভাবে গোয়ার ভিতরকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বা অন্য কোনোপ্রকার প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্য-কলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য গ্রেপ্তার হইয়া আসে নাই। ইহাদের মধ্যে দু' চারজন যে রাজনৈতিক কর্মী ছিল না তা নয়, কয়েকজন গোপনে গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের কিংবা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী আজাদ গোমন্তক দলের সংগে অপেক্ষাকৃত সম্পর্ক রাখিত। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে পর্তুগীজ পুলিসের নির্বিচার দমননীতি অনুযায়ী ঢালাও গ্রেপ্তারের বেড়াজালে আটকা পড়িয়া হাজতে আসিয়াছে। এই ধরনের লোকেদের উপর মারধোর করা সোজা; ইহাদের উপর মাত্রাহীন অত্যাচার করিয়া জনসাধারণের মনে আতংক সৃষ্টি করা যায় সহজে। চলতি পর্তুগীজ-কোংকনী পরিভাষায় এক নম্বর হাজত ঘরের বেশীর ভাগ লোক ছিল 'সুস্‌পেইত্' (suspeito' বা 'suspect' কথার অপভ্রংশ)। কোথাও হয়ত গোপনে পর্তুগীজ-বিরোধী রাজনৈতিক হ্যাণ্ডবিল বিলি হইয়াছে; কোনো গ্রামের বাজারে হয়ত গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের পোস্টার দেখা গিয়াছে কিংবা কোনো শহরে কেহ হয়ত কোনো সরকারী বাড়ির উপর ত্রিবর্ণরঞ্জিত ভারতীয় জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দিয়াছে—তাহা হইলেই হইল, গ্রামসুদ্ধ লোককে পুলিস প্রথমে কোমরে দড়ি দিয়া কাছাকাছি যে থানা বা কুয়ার্টেল থাকিবে সেখানে আনিয়া পিটাইবে। তারপর তাহাদের ভিতর হইতে বাছাই করা কিছু লোককে জেলা পুলিস কুয়ার্টেলে নিয়া গিয়া হাজতে দু' তিন মাস আটক রাখা হইবে এবং জেরা-জবানবন্দীর নামে মধ্যে মধ্যে আমের ঘরে নিয়া গিয়া পিটানো হইবে। ইহাদের ভিতর হইতে আরও কিছুটা বাছাই করিয়া বা যাহাদের

নামে গোয়েন্দাদের রিপোর্ট আসিবে (অনেক সময় গ্রেপ্তারের পরে গোয়েন্দাদের খোঁজ খবর করিয়া রিপোর্ট দিতে বলা হয়) তাহাদের 'সুস্‌পেইতো' হিসাবে আনা হইবে পশ্চিমের বড় কুয়ার্তেলে। এখানে তাহাদের এক মাসও থাকিতে হইতে পারে, আবার ছয় মাস, নয় মাস পর্যন্ত থাকিতে হইতে পারে —কতদিন থাকিতে হইবে সেটা নির্ভর করে 'ইণ্টারন্যাশনাল' পুলিসের মর্জির উপর, কারণ, এসব ব্যাপারে পশ্চিম কুয়ার্তেলে তাহারাই কর্তা। যাহার গায়ে রাজনীতির একটু ছোঁয়াচ আছে, যাহাকে একটু ঘন ঘন ভারতে কারওয়ার বা বেলগাঁও কি সাবন্ত-বাড়ীর দিকে আসা যাওয়া করিতে দেখা গিয়াছে, যে হয়ত বেলগাঁওয়ের কোনো কংগ্রেসী জনসভায় উপস্থিত ছিল বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে (গোয়েন্দাদের রিপোর্টে এই ধরনের যেমন তেমন একটা কিছু অভি-যোগ থাকিলেই হইল) তাহা হইলেই আর কথা নাই; এরকম কোনো লোককে আমি সাধারণত ছয় হইতে আট মাসের আগে হাজত হইতে অব্যাহতি পাইতে দেখি নাই। আর এই ছয় মাস বা আট মাসকাল ধরিয়া— যাহার ভাগ্যে যেরকম হয়—তাহাদের শুধু আটকাইয়া রাখাই হইবে না; প্রতি দশ পনেরো দিন অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে তাহাদেরকে কুয়ার্তেলের পিছনদিকে কয়েদী-দের মার দেওয়ার যে বিশেষ ঘর আছে সেখানে নিয়া গিয়া 'ইণ্টারন্যাশনাল' পুলিসের উদ্ভাবিত বিশেষ পদ্ধতিতে নৃশংসভাবে প্রহার করা হইবে। আগেই বলিয়াছি, এটা পশ্চিম কুয়ার্তেলের হাজত-জীবনের সাধারণ রুটিনের মধ্যে। সাধারণ লোকের মনে নিছক আতঙ্ক [illegible] এত ব্যাপক ও সুচিন্তিত পরি[illegible] আমি আমার অভিজ্ঞতায় কোথায় দেখি নাই। ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষেও রাজনৈতিক বন্দীদের উপর নির্যাতন বা শারীরিক অত্যাচার কম হয় নাই। বিপ্লবী সন্দেহে বৃটিশ পুলিসের জেলেও চৌদ্দ-পনেরো বছর থাকার সৌভাগ্য, আরো অনেক বন্ধু ও সহকর্মীর মতো আমারও হইয়াছে। কিন্তু নানান্‌ কারণে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুলিসী নির্যাতনের উপর কিছুটা বিধি-নিষেধের সীমানা টানা ছিল। আইনত প্রতিকার চাওয়ার ও প্রতিকার পাওয়ার একটা পথ খোলা ছিল। কিন্তু শুধু গোয়াতে কেন, খাস পর্তুগালেও সালাজার আমলে (এক খোদ সালাজার সাহেব এবং সালাজারের ইউনিয়ন নাসিওনালের খেয়াল-খুশী বা মর্জি ছাড়া) 'ইণ্টারন্যাশনাল' পুলিস বা 'পিদে'র দমননীতি বা নির্যাতনের উপর কোনো বিধি-নিষেধ দেওয়া নাই বা তাহার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিকার নাই। গোয়াতে 'ইণ্টারন্যাশনাল' পুলিসের এই ঢালাও দমননীতি বা নির্যাতন নীতির একটা দিক প্রবৃত্ত ছিল রাজনীতির সঙ্গে বেশী

সংশ্লিষ্ট নয়, হয়ত খুব দূরে থাকিয়া যে-সব লোক গোয়া মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ক্ষীণ সহানুভূতি দেখাইয়াছে বা দেখাইতে পারে এমন লোকেদের বিরুদ্ধে। প্রত্যক্ষভাবে ও সক্রিয়ভাবে যাহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত আছে বা সবকিছু জানিয়া শুনিয়া তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছে তাহাদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালাইয়া গায়ের ঝাল মিটানো যায় কিন্তু সেভাবে তাহাদের মনে বা জনসাধারণের মনে কোনো আতঙ্ক বা ভীতি সৃষ্টি করা যায় না। তাহা করিতে হইলে রাজনীতির সঙ্গে যাহাদের সম্পর্ক তত ঘনিষ্ঠ নয়, যাহাদের খুব এক চোট মারধোর করিয়া পরে ছাড়িয়া দিলেও চলে, শারীরিক অত্যাচার ও নির্যাতন বেশী করিয়া চালানো দরকার তাহাদের উপর। তাহা হইলে তাহাদের মুখে মুখে সেই অত্যাচারের কথা ছড়াইয়া পড়িয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে কোনো অংশ গ্রহণ করা বা তাহাকে সমর্থন করা সম্পর্কে সহজেই সাধারণ লোকের মনে ব্যাপকভাবে বিভীষিকা সৃষ্টি করা যায়। পুলিসের এবং গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা সম্পর্কে লোকের মনে একটা প্রবল ভয়ের ভাব বদ্ধমূল হইয়া থাকে। সুতরাং অবাধ বা ঢালাও গ্রেপ্তারের ফলে যে-সব 'সুস্পেইতো' হাজতে আসে, মারধোরটা একটু বেশী মাত্রায় তাহাদের উপর চলে। আমাদের এক নম্বর ঘরটা ছিল প্রধানত এইসব অপেক্ষাকৃত নিরীহ 'সুস্পেইতো'-দের ঘর। আমাকে এখানে রাখার কারণ, আমাকে খানিকটা নাকাল বা নাজেহাল করা। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কারণ আমাকে যতটা পারা যায় নাকালের চূড়ান্ত করিয়া গোয়ার সাধারণ রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে একটা 'পলিটিকাল এফেক্ট'র সৃষ্টি করা—যাহাতে গোয়াতে লোকে এটা বুঝিয়া যায় যে, ভারত পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য বলিয়া পর্তুগীজ সরকার আমাকে কোনোরকম রেয়াৎ করিতেছে না; পর্তুগীজ পুলিস সকলকেই ঠিট্ করিতে জানে।

আমাকে মারা হইবে না, বা আমার উপর কোনপ্রকার শারীরিক নির্যাতন করা হইবে না। আমার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের এই হুকুম পুলিসের উপর থাকিলেও, 'পিদে'-র লোকেরা ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করে, অত সহজে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়াটাও ঠিক হইবে না। নাও যদি আমাকে মারা হয়, আমাকে অন্যভাবে সমঝাইয়া দিতে হইবে পর্তুগীজ জেল কি জিনিস। তাছাড়া, আমাকে যখন হাতে পাওয়াই গিয়াছে তখন আমাকে সকল রকমে নাজেহাল করিয়া এবং অপমানের চূড়ান্ত করিয়া গোয়ার সাধারণ রাজনৈতিক বন্দীদের চোখের সামনে এটাও দেখাইয়া দিতে হইবে যে, তাহাদের কাছে ভারত পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার হোক, আর যেই হোক, কাহারো কোনো খাতির নাই। ভারত পার্লিয়ামেণ্টের একজন মেম্বারের এত দুর্গতি সত্ত্বেও ভারত সরকার বা নেহরু কিছু করিতে পারিতেছেন না, ইহা দেখিয়া গোয়ার রাজনৈতিক বন্দীরাও এটা বুঝিয়া যাইবে যে, ভারতের উপর বা নেহরুর উপর ভরসা রাখিয়া বেশী কিছু লাভ নাই। অর্থাৎ কতকটা ঝিকে মারিয়া বৌকে শেখানোর বিপরীত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া, বৌকে (পরের মেয়ে, বাহিরের লোক) মারিয়া ঝিকে (নিজের মেয়ে, গোয়ার লোক) শেখানোর কায়দায় গোয়ার বন্দীদের সঙ্গে আমাকে রাখিয়া আমার উপর কিছুটা জোর-জুলুম বা অত্যাচার চালানো হয়। এক নম্বর হাজত ঘরের বর্ণনা আগেই দিয়াছি। হাজতে বন্ধ হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, মোটামুটি নিজের অবস্থাটা একটু বুঝিয়া নিয়া আমি আমাদের হাজতের শান্ত্রী পাহারাকে ডাকিয়া বলিলাম,—"একজন অফিসারকে ডাকিয়া দাও, আমি কথা বলিতে চাই।" আধ ঘণ্টা বাদে সেদিনকার ডিউটীতে যে 'সুব্ শেফ্' ছিল সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি চাই?" আমি তাহাকে জানাইলাম—"আমি কিছু চাই না, তবে আমি একজন ইণ্ডিয়ান সিটিজেন, ইণ্ডিয়ান পার্লিয়ামেণ্টের একজন মেম্বার; তোমরা আমাকে এভাবে এইরকম অপরিচ্ছন্ন ঘরে বে-আইনীভাবে রাখিতে পারো না। আমি এখনি আমাদের দেশের কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে দেখা করিতে চাই। তোমার উপরওয়ালাদের জানাও, আমাকে আমাদের কন্সালের সঙ্গে দেখা করিতে দিতে তাঁরা আইনতঃ বাধ্য। সেটুকুর বন্দোবস্ত তাহারা করুন এবং যদি সম্ভব হয় আমাকে অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন ও কম লোক যেখানে আছে এমন হাজত ঘরে দেওয়ার বন্দোবস্ত করুন—আমি এ ঘরে থাকিব না।" এই 'সুব্ শেফ্'টি একজন গোয়ান খ্রিস্টান, ইংরেজী ভালো কিছু বলিতে পারে না। আমাদের ঘরে আসার্তিন নামে যে ছোকরাটি ছিল সে কিছুটা পর্তুগীজ জানে, ইংরেজীও জানে। 'সুব্ শেফ্' সাহেব তাহাকে ডাকাইয়া বলিল—"ইহাকে বলো, আমি ইহার কথা 'আজেণ্টে'র কাছে রিপোর্ট করিতেছি। কন্সালের সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত 'আজেণ্ট' করিবে। আমি সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারিব না।" আমি ভাবিলাম, ইহার পরে হয়ত 'আজেণ্ট' নামীয় জীবের সঙ্গে দেখা হইবে। তাহার কাছে আবার ঘর বদলের ও কন্সালের সঙ্গে দেখা করার দাবী জানাইব। কিন্তু মিনিট দশেক বাদে হাজত ঘরের সামনে যাহারা দেখা দিল তাহারা কেউ 'আজেণ্ট' নয়। তাহারা কয়জন পর্তুগীজ পুলিসের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী বিভাগের প্রতিনিধি; জমকালো পোশাকে জরীর জাব্বা-জোব্বা আঁটা লাগানো, বুকে নীল, লাল ও সোনালী রংয়ের কাজ করা এনামেলের চাকতি বাজ—"Policia Internacional de defesa do Estado"—সাম্রাজ্যের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র সংরক্ষণ বাহিনী বা সংক্ষেপে PIDE; অর্থাৎ পর্তুগালের সাম্রাজ্যবাদী গেস্টাপো বাহিনীর কয়েকজন অফিসার আমাদের হাজত ঘরের সম্মুখে আসিয়া উদিত হইলেন এবং তাহাদের একজন আংগুল ইশারায় আমাকে ডাকিলেন।

(ক্রমশ)

হিন্দী, ইংরেজী ও মাতৃভাষা
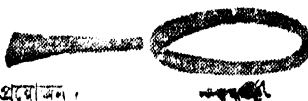
২৫শে আশ্বিনের সংখ্যায় আবু সৈয়দ আইয়ুব-দত্তের "হিন্দী, ইংরেজী ও মাতৃভাষা" শীর্ষক সুলিখিত প্রবন্ধটি পড়লুম। তিনি ইংরেজীর স্বপক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছেন, প্রথমে আমি সেই নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমত ইংরেজীর উপর রাগ করে আমরা ইংরেজী ভাষাকে ত্যাগ করছি, একথা ভুল। প্রত্যেক জাতিরেই মর্যাদাবোধ আছে। কাজে-অকাজে বিদেশের উপর নির্ভর করে থাকা স্বাধীন চিত্তের পরিচয় নয়। যে ভাষা আমাদের জাতীয় জীবনে মহৎ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকবে, সেখানে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকা আত্মবিসর্জনের সামিল। আবেগ-বর্জনের দোহাই দিয়ে আমরা কি জাতীয় মর্যাদার সবটুকু বিসর্জন দেব? বিশেষ করে ভারতের মতো নবীন যুক্তরাষ্ট্রে এই আত্মসচেতনতার মূল্য অনেকখানি। ইংরেজী সমৃদ্ধ ভাষা, বিদেশী ভাষা, এই যুক্তিতে ইংরেজী-না-জানা কোনো দেশ ইংরেজীকে এত প্রাধান্য দিয়েছে বলে জানি না। লেখক বলেছেন, আমাদের ইংরেজীকে গ্রহণ করতে হবে, কারণ "আমরা যে দায়ে ঠেকেছি। ......দায় এই যে, নিজের ভাষা একটি নয়, এক ডজন।" এর অর্থ এই যে, আমরা বিভিন্ন ভাষার মধ্যে মীমাংসা করতে গিয়ে একটি বিদেশী ভাষাকে প্রাধান্য দিচ্ছি। এমনই আমাদের ঈর্ষা ও অভিমান যে, আমরা নিকটতম ভাষাকে মেনে নেব না, কিন্তু সানন্দে গ্রহণ করব সেই ভাষাকে যার সঙ্গে কোনো ভারতীয় ভাষার এতটুকু সাদৃশ্য নেই এবং দুশো বছর প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করার পরেও যাকে জনসাধারণের এক-শতাংশও ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারল না। জানি না, এর পর হয়ত অবাঙালীরা দাবী করবেন যে, সমস্ত ভাষার মধ্যে অধিকার সাম্য রক্ষার জন্যে জাতীয় সংগীত বাংলায় না রেখে ইংরেজীতে করা হোক। সহযোগিতার ভিত্তিতে যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, সেখানে বিদেশী উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমতা বিধানের চেষ্টা কৃত্রিম হতে বাধ্য। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সামঞ্জস্যবিধানের মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্র স্থায়ী হতে পারে।

আজ চারিদিকে হৈ হৈ রব উঠেছে, ইংরেজী-বিহনে আমরা বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলব, আমাদের সাহিত্য নির্জীব হয়ে পড়বে ইত্যাদি। একথা সত্য যে আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু একদিন ইংরেজীর অনুগ্রহে আমরা দাঁড়াতে পেরেছিলাম বলে চিরকাল যে তার হাত-তোলা হয়ে থাকতে হবে, এ কথার অর্থ হয় না। আমরা পরস্পরের সহযোগিতায় ভারতের একটি রাষ্ট্রভাষা গড়ে তুলব, এ সংকল্প তো স্বাধীন জাতিরই যোগ্য! তেমনি অর্থহীন "মহত্তর প্রয়োজনের" তাগিদ দিয়ে দেশসুদ্ধ লোককে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজী শেখানো। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশনের যুগে কেবল ইংরেজী না জানার দরুণ আমরা মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতায় গিয়ে পৌঁছব, বিশ্বাস করা শক্ত। সভ্যতার অগ্রগতি কেবলমাত্র ইংরেজীভাষী দেশেই সীমাবদ্ধ নেই। তা ছাড়া ইংরেজীর পাট আমরা এখনই একেবারে উঠিয়ে দিচ্ছি, একথা কেউ বলেনি। এখানে ওখানে কয়েকজন অর্বাচীন লোক হয়ত বলে থাকবে। বলা বাহুল্য, দায়িত্বসম্পন্ন কোনো লোকই এর সমর্থন করেন না। ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকুক, ইংরেজী-শিক্ষিতেরা নিজেদের আদবকায়দা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আমাদের কাছে আনবেন, পাশ্চাত্য ভাবধারায় আমাদের সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করবেন। কিন্তু আজও যেমন এঁদের সংখ্যা কম, চিরকালই তাই থাকবে। আমি বলছি, দেশের অগণিত অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত জনসাধারণের কথা। এঁদের জীবন কাটবে ভারতবর্ষের মধ্যেই। এখন যাঁরা কেবল বাংলা দেশের মধ্যে বদ্ধ রয়েছেন, তাঁদের হয়ত দুদিন পরে উত্তরপ্রদেশ কিংবা মহারাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে, তাঁদের ইংরেজী শেখার প্রয়োজন কি? সরকারের উচ্চপদে ইংরেজী-জানা সুশিক্ষিত লোক থাকতে আপত্তি নেই, কিন্তু কেবল তাঁদের সুবিধার জন্যে কেরানীকুলকেও শৈশবকাল থেকে বিদেশী ভাষার চর্চা করতে হবে কেন?

এদিক দিয়ে দেখতে গেলে হিন্দী সরকারী ভাষা হওয়াতে সুবিধা দুটি। সরকারী ভাষা অবশ্য সবাইকেই শিখতে হবে, কিন্তু হিন্দীর সঙ্গে ভারতীয় ভাষাগুলির অপেক্ষাকৃত নৈকট্য থাকায় ইংরেজীর চেয়ে হিন্দী অল্পায়াসে আয়ত্ত করা যাবে এবং সরকারী ও পাঁচজনের কাজকর্মে অপর রাজ্যের জনসাধারণের সঙ্গে হিন্দী ব্যবহার করাই সুবিধাজনক। ইংরেজীপন্থীরা সময়ে অসময়ে প্রচার করেন যে, হিন্দী অত্যন্ত জটিল ভাষা এবং যেন এত দুরূহ যে, ইংরেজীও তার কাছে সোজা। দুঃখের সহিত লক্ষ্য করছি, শ্রীযুক্ত আইয়ুব-দত্তও একই সুরে বক্তব্য পেশ করেছেন। আমি হিন্দীকে সরল বলেই জানি, হিন্দী-জানা বহু অহিন্দীভাষীর মুখেও তাই শুনেছি। অবশ্য লিঙ্গ প্রকরণ প্রথম দিকে শক্ত লাগে; তবে তা দুঃসাধ্য নয়। উদাসিনতা ত্যাগ করে আন্তরিকভাবে শিখলেই কিছুদিনের মধ্যে শুদ্ধ হিন্দী লিখতে বা বলতে পারা যাবে। অফিসে বসে আমরা যে ইংরেজী লিখি, তার সঙ্গে ব্যাকরণের গরমিল যে একেবারেই থাকে না, তা নয়; আমাদের হিন্দীও না-হয় সেই রকম হবে। হিন্দীভাষীরাও পুরোপুরি শুদ্ধ হিন্দী বলেন না; লিঙ্গ সম্বন্ধে উদাসীন হতে তাঁদের দেখেছি। মোট কথা, হিন্দী ভাষায় আর যে অসুবিধাই থাক না কেন, বহু বৎসর ধরে ব্যাকরণ মুখস্থ করে অভিধানে হাবুডুবু খাবার ভাষা এ নয়। আর গোড়ায় গোড়ায় হিন্দীভাষীদের কাছে একটু-আধটু বিদ্রূপ যদি শুনতেই হয়, তবে আমাদের ইংরেজী শুনে খাঁটি ইংরেজদের রুমালের আড়ালে হাসির চেয়েও কি তা অসহ্য বোধ হবে?

ইংরেজীর মাধ্যমে যে গণসংযোগ সম্ভব নয়, লেখক তা স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রশ্ন: "হিন্দীকে রাজভাষা করলেই বা কোন্ সুবিধা হবে?" তাঁর মতে অবাঙালীরা মহারাষ্ট্রীয় জনগণের সঙ্গে কেউ যদি আত্মীয়তা স্থাপন করতে চান, তাহলে তাঁদের ঐ ঐ ভাষায় পারদর্শী হতে হবে। অথচ আমরা জানি, সে আত্মীয়তা স্থাপন হয়েছে। যে কোনো সর্বভারতীয় নেতা স্বীকার করবেন যে, হিন্দী না জানলে জনতার সঙ্গে সংযোগ রাখা সম্ভব নয়। বস্তুত ইংরেজী চলতে থাকলে রাজপুরুষদের সঙ্গে জনসাধারণের ব্যবধান দুস্তরই থেকে যাবে, কারণ এ কেবল শিক্ষার ব্যবধানই নয়, ইংরেজী-জানা না-জানার ব্যবধানও বটে।

ইংরেজী শিক্ষার ফল কি হয়েছে দেখতেই পাচ্ছি। দেবীপক্ষে ভক্তির কথা তুলছি না। ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে আমাদের যা কিছু সংযোগ, তা ইংরেজীর মাধ্যমে। তাদের সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এই সব ভারতীয় ভাষার চেয়েও ইংরেজী যেন বেশী আপন। বাংলাদেশে ছেলেরা বাংলা ও ইংরেজী মাত্র এই দুটি ভাষার সঙ্গে পরিচিত। বাংলাকে যদি সরকারী ভাষা করা গেল না, তবে স্বভাবতই ইংরেজীকে সরকারী ভাষা করার দাবী উঠবে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে আমাদের এমনিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা আছে, এ অভিযোগও তো অস্বীকার করা যায় না।

দুশো বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, ইংরেজী কখনও জনগণের ভাষা হয়ে উঠতে পারে না। কারণ, তার মূল ভারতীয় সংস্কৃতিতে নেই। শ্রীতারাপদ রায় ভারতীয় ভাষার যে সংজ্ঞার নির্দেশে ইংরেজীকে ভারতীয় ভাষা বলে অভিহিত করেছেন, তাতে জগতের বহু ভাষাকেই দেশীয় ভাষার পর্যায়ে ফেলা যায়। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের আমি অভারতীয় বলছি না, কিন্তু ইংরেজী একান্তভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতারই অংশ। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগ নেই। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করা আর তার অংশভাক হওয়া এক কথা নয়। একমাত্র সংস্কৃতিজাত বা শুদ্ধ ভাষাই জনসাধারণের ভাষা হতে পারে। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দীর একটি বড় সুবিধা যে, দেশের অধিকাংশ লোক হিন্দী বুঝতে পারে। সে হিন্দী অশুদ্ধ, ভেজালমিশ্রিত ইত্যাদি বলে তাকে যতই বিকৃত আখ্যা দেওয়া হোক না কেন, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বিনা ব্যাকরণ-অভিধানেই এটা সম্ভবপর হয়েছে। ইংরেজী তো নয়ই, ভারতের অন্য কোনো ভাষার এ সুবিধাটুকু নেই। ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যে অধিক সংখ্যক লোক স্বচ্ছন্দে যে ভাষা ব্যবহার করতে পারে, কেবল সেই ভাষাকে সরকারী ভাষা করব, একথাও আশা করা অন্যায়। তার চেয়ে যে ভাষা বেশী ব্যাপকভাবে প্রচলিত, তাকেই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। তা ছাড়া অধুনা প্রচলিত কথা হিন্দুস্থানী যে রাজভাষা হবে, যাতে আইনকানুন রচিত হবে তার রূপ কেমন, সে কথাই বা কে বলছে! শিক্ষিত লোকের কাছ থেকে আমরা শুদ্ধ হিন্দীই আশা করব; কথ্য ভাষার চেয়ে লেখ্য ভাষা উন্নত হয়ে থাকে, কথ্যভাষা জানা থাকলে লেখ্যভাষা আয়ত্ত করা কঠিন হয় না। হিন্দী অপরিণত ভাষা সন্দেহ নেই। কিন্তু একে সরকারী ভাষা করলে অন্যান্য সমৃদ্ধ ভাষার সংস্পর্শে এসে এর উন্নতি হবে। আগে উন্নতি হোক, তারপর বিবেচনা করে দেখা যাবে, বলে আষ্টেপৃষ্ঠে ইংরেজী চাপিয়ে রাখলে এর কোনোদিনই উন্নতি হবে না। এর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার।

হিন্দী-ইংরেজী আলোচনায় দুটি দিক আছে। একটি হল, ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দীর তুলনা, অপরটি হিন্দীর সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্ক। উত্তেজনার বশে অনেক সময়েই আমরা দুটোর মধ্যে গোলমাল করে ফেলি এবং বাংলা সরকারী

ভাষা হচ্ছে না দেখে তাড়াতাড়ি ইংরেজীকে সমর্থন করে বসি। বাংলা ভাষা এই সম্মান পেল না দেখে আমাদের অভিমান হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের এই অভিমান বিসর্জন দিতে হবে। মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাগুলির স্থান সংবিধানে নির্দিষ্ট করা আছে; তারা জাতীয় ভাষা, বিভিন্ন রাজ্যে সেই সেই অঞ্চলের ভাষাকে রাজ্যের সরকারী ভাষা করবার স্বাধীনতা আছে। অত্যুগ্র হিন্দী-উৎসাহীদের কথা বাদ দিই; দায়িত্বসম্পন্ন সরকারী মহলের এই বিধান পরিবর্তন করার কোনো অভিপ্রায় নেই। রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক ভাষা ও কেন্দ্রে হিন্দী ভাষা চালু থাকলে হিন্দীর ব্যবহার হবে সীমাবদ্ধ। সুতরাং অন্যান্য ভাষাকে দাবিয়ে রেখে কেবল হিন্দী চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এ ধারণা ভুল। অন্ততঃ প্রাদেশিক ভাষা ও কেন্দ্রের সরকারী ভাষা হিসাবে যদি হিন্দীকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তবে তার সঙ্গে মাতৃভাষার বিরোধ থাকতে পারে না। বলা বাহুল্য, বর্তমানে ইংরেজীর মতো হিন্দীর ব্যবহার এত ব্যাপক থাকবে না। তাতে বরং এখনকার চেয়ে মাতৃভাষার চর্চা আরো বহুল হওয়ায় তার নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীরও শক্তি বাড়বে বই কমবে না। মাতৃভাষার চর্চার তো পূর্ণ সুযোগ রইল। বাংলা ভাষা কি এতই নির্জীব যে, হিন্দীর সঙ্গে সংঘর্ষে সে অবলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ইংরেজীকে প্রহরী হিসাবে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে? এখানে কৌতুককর ব্যাপার হচ্ছে যে, যাঁরা বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য হিন্দীর বিরুদ্ধে এত জেহাদ চালাচ্ছেন, তাঁরা পশ্চিম বাংলায় সরকারী ভাষা কেন যে আজও ইংরেজী হয়ে রইল, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলেন না। অন্ততঃ এক এক করে সমস্ত রাজ্যগুলিতে যদি সেখানকার আঞ্চলিক ভাষাকে সরকারী ভাষা করা হয়, তাহলে হিন্দী আতংক খানিকটা কমে আসবে।

হিন্দীর সপক্ষে এত কথা বললুম বলে সরকারী ভাষা কমিশনের সমস্ত সিদ্ধান্তই যে আমি সমর্থন করছি তা নয়। বস্তুত আমাদের সংকট উভয় দিকে। একদিকে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ, অপরদিকে ইংরেজীপন্থী রক্ষণশীলতা। প্রথমটির লক্ষ্য, দেশের বিশেষ সুবিধাভোগী এক সম্প্রদায় সৃষ্টি, দ্বিতীয়টির মাতৃভাষা বিপন্ন রব তুলে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ। এই দুই দলের মধ্যেই অবশ্য কিছু লোক বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই বলেছেন। তবু কোনো দিকেই চরমপন্থা অবলম্বন করা আমাদের উচিত নয়। হিন্দীভাষীদের হিন্দী ছাড়া আর কোনো ভাষা শিখতে হবে না বা সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষার মাধ্যম হবে হিন্দী, এ সব আবদারও মেনে নেওয়া যায় না, তেমনি সরকারী ভাষার প্রশ্নে [illegible] কালের জন্য স্থগিত [illegible] নয়। অদূর ভবিষ্যতে হিন্দীকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্প্রতি অত্যুগ্র হিন্দী-উৎসাহীদের [illegible] হিন্দীর বিরুদ্ধে [illegible] উঠেছে। এই [illegible] নিরপেক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই মুহূর্তে একমাত্র সরকারী ভাষারূপে হিন্দী চালু করলে অহিন্দীভাষীদের বিপন্ন বোধ করবার যথেষ্ট কারণ আছে; [illegible] ভাষাগুলির সঙ্গে হিন্দীর ব্যবহার কিছু দেশীয় [illegible] হিন্দী ও ইংরেজী সরকারী ভাষা হিসাবে [illegible] চালু থাকবে। তবে এই সময়ের

সীমা যথাসম্ভব কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দেখা গেছে, অনেকেরই মনে ধারণা যে, শেষকাল পর্যন্ত ইংরেজীই থেকে যাবে। অহিন্দীভাষী অনেক রাজ্যে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের হিন্দীর প্রতি অবজ্ঞা থাকায় হিন্দী প্রচার খাতে বাজেটের টাকা খরচ হয় না। এই সব কারণেই কিছুটা বাধ্যবাধকতা থাকাও প্রয়োজন। আশা করি, লোকসভার ও রাজ্যসভার সদস্যগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

—শ্রীঅরুণকুমার হালদার, কলিকাতা-৩৮

লেখকের বক্তব্য

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীঅরুণকুমার হালদার ইংরেজীর বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি পেশ করতে গিয়ে এমন কয়েকটি কথা লিখেছেন, যার সঙ্গে হয় তথ্যের গরমিল, নয় অর্থের অসংগতি দেখা যায়।

তিনি লিখছেন, "যে ভাষা আমাদের জাতীয় জীবনে মহৎ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকবে, সেখানে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকা আত্মবিসর্জনের সামিল।" আমার প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় জীবনে ইংরেজীর দুটি ভূমিকা উল্লিখিত আছে—উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বচিন্তা ও বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগের বাহন হয়ে থাকা এবং কেন্দ্রীয় দপ্তরে সরকারী কাজকর্মের মাধ্যম হয়ে থাকা। প্রথম ভূমিকাটি নিঃসন্দেহে মহৎ, কিন্তু হালদার মহাশয় ঐ ভূমিকা থেকে ইংরেজীকে সরাবার কথা ভাবছেন না। দ্বিতীয় ভূমিকাটিকে কোনোক্রমেই "মহৎ" বলা যায় না, কিন্তু তাঁর আপত্তি ঐখানটাতেই।

হালদার মহাশয় লিখছেন, "ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তার (অর্থাৎ ইংরেজীর) যোগ নেই।" অন্য প্রদেশের লোকের পক্ষে এমন কথা যদি বা বলা সম্ভব হয়, একজন বাঙালীর মুখে এই উক্তিটি অপ্রত্যাশিত। বাংলার নবজাগরণ, সাহিত্যে দর্শনে বিজ্ঞানে রাজনীতিতে আমাদের জাতীয় জীবনের বিচিত্র বিকাশে ইংরেজীর কি কোনো মূল্যই নেই হালদার মহাশয়ের কাছে? অষ্টাদশ শতাব্দীর [illegible] শতাব্দীতেই আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে ইতি পড়েছে বলে তাঁর ধারণা? নিশ্চয়ই তাঁর মত সুধী ব্যক্তিকে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, অরবিন্দ, গান্ধীজী, রাধাকৃষ্ণণ, জওহরলাল, সত্যেন্দ্রনাথ বসু—এঁদের সকলের চিন্তায়, জীবনবোধে, নৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনায় ইংরেজী ভাষা অর্থাৎ ইংরেজী ভাষা-সাহিত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এঁরাও কি ভারতীয় সংস্কৃতির যোগ্য প্রতিনিধি এবং মহান ব্যক্তিত্ব নন?

হালদার মহাশয় লিখেছেন, "একদিন ইংরেজীর কল্যাণে আমরা দাঁড়াতে পেরেছিলাম" ইত্যাদি। ইংরেজী তো দেবতা নয়, মানুষ নয়, মানুষের ব্যবহারের যন্ত্রমাত্র। অনুগ্রহ-নিগ্রহ শব্দগুলি তার প্রতি প্রযোজ্য নয়, রূপকার্থে প্রয়োগও বিভ্রান্তিকর। প্রায় একশ বছর যাবৎ ইংরেজী ভাষা আমাদের উচ্চশিক্ষার অঙ্গ হয়ে আছে বলে আমরা নিরতিশয় লাভবান হয়েছি; সমগ্র শিক্ষার মাধ্যম হয়ে আছে বলে আমাদের চিত্তের উন্মেষ শোচনীয়ভাবে ব্যাহত হয়েছে। প্রথম ব্যবস্থাটা আরো বহুকাল, আক্ষরিক অর্থে অনির্দিষ্টকাল (অর্থাৎ যার সীমা নির্দেশ করা এখন সম্ভব নয়) চললে আমাদের সর্বৈব সুবিধে; দ্বিতীয় ব্যবস্থায় অবিলম্বে ছেদ টানা দরকার। সুখের কথা যে, এ দুটি প্রস্তাবেই হালদার মহাশয়ের সম্মতি আছে। তিনি আপত্তি তুলেছেন সরকারী ভাষা প্রসঙ্গে, কিন্তু কেন্দ্রের সরকারী ভাষা এবং রাজ্যের সরকারী ভাষার সমস্যা ও সমাধান যে ভিন্ন এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নন। রাজ্যের সরকারী ভাষা যে সেই রাজ্যের লোকের মাতৃভাষা হওয়া বিধেয়—আমার এ প্রস্তাবেও সম্ভবত তাঁর সায় আছে। কেন্দ্রের সরকারী ভাষা এবং 'আন্তর ভাষা'রূপে আমি ইংরেজী ও হিন্দীর যুগ্ম স্থান দাবী করেছিলাম—আমাদের স্বাজাত্যাভিমান যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য হিন্দী এবং অহিন্দীভাষীরা হিন্দীভাষীদের তুলনায় যাতে বিশেষ অসুবিধায় এবং অসম প্রতিযোগিতায় না পড়েন, সেজন্য ইংরেজী। কিন্তু ইংরেজীকে কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরের অন্যতম ভাষারূপে হালদার মহাশয় কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। তিনি আবেগভরে প্রশ্ন করেছেন: "আবেগ বর্জনের দোহাই দিয়ে আমরা কি জাতীয় মর্যাদার সবটুকুই বিসর্জন দেব?" আশ্চর্য প্রশ্ন! নিজের মাতৃভাষাই যেখানে কাজে চলে না অর্থাৎ ভারতবর্ষের অন্ততঃ [illegible] আনা লোককে যেক্ষেত্রে অন্য কোনো ভাষার আশ্রয় নিতেই হবে, সেখানে যে ভাষাটি সকলের পক্ষে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সব দিক দিয়ে সুবিধের এমন একটি ভাষাই আমরা ব্যবহার করব। এতে মর্যাদা বিসর্জন দেবার প্রশ্ন ওঠে কেমন করে? আমরা [illegible] কোনো কর্ম করাতে যাচ্ছি না; কারণ ভাষা [illegible] করছি না, [illegible] নিচ্ছি না, নিজেরাও [illegible]। ভাষা তো জাতিবিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, আর দেড়শ বছরের [illegible] আদান-প্রদানের ফলে ইংরেজী ভাষার উপর আমাদের একটা দাবি কিছু, অধিকার নিশ্চয়ই জন্মেছে। হালদার মহাশয় লিখেছেন "ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকুক" অর্থাৎ [illegible] বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে তার "মহৎ ভূমিকা" থাকুক। অথচ দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে তার প্রবেশমাত্রে আমাদের মানমর্যাদা সব মাটি হয়ে যাবে বলে তিনি আতঙ্কিত। আর নতুন করে তো ইংরেজীকে ডেকে আনার প্রশ্ন হচ্ছে না; স্বাধীনতা লাভের পরও আজ দশ বছর যাবৎ আমরা রাজ্য সরকারে এবং কেন্দ্রীয় সরকারে উভয়ত একমাত্র ইংরেজী ভাষাই ব্যবহার করে আসছি। তাতে করে আমাদের সুবিধা অসুবিধা কী এবং কতখানি হয়েছে এ নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে; কিন্তু জাতীয় মর্যাদা "সবটুকু বিসর্জন দেওয়া" হয়েছে বলে ভাববার কি কোনো কারণ আছে? বরঞ্চ সকলেই জানি, দেশে-বিদেশে আমাদের মর্যাদা বেড়েই চলেছে। রুশ চীন থেকে অবশ্য ইংরেজী ভাষার ব্যবহার নিয়ে মাঝে মাঝে খোঁটা শুনতে হয়। কিন্তু তারা আমাদের ভাষা সমস্যাটা ঠিকমত বোঝে না (সম্প্রতি একজন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট ঐতিহাসিক আমাকে বললেন যে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভাষা সমস্যার সঙ্গে আমাদের ভাষা সমস্যার কোনো তুলনা হয় না, রুশ ভাষার সেদেশে যে স্থান, হিন্দী ভাষার এদেশে সে স্থান নেই এবং হতে পারে না)। কিন্তু ইংরেজীভাষী দেশগুলি যে [illegible], একথাটা তারা অত্যন্ত বেশি রকম বোঝে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের হাওয়ায় আমাদের ভাষা প্রশ্নের বিচার না হওয়াই বিধেয় এবং মনে রাখা ভাল যে, শুচিবায়ুর মত মর্যাদা-বায়ুও জাতীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।

"অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের কথা" তুলে হালদার মহাশয় প্রশ্ন করেছেন—"তাঁদের ইংরেজী শেখার প্রয়োজন কী?" আমি বলি,

হিন্দী শেখারই বা প্রয়োজন কী? প্রয়োজনের কথা দূরে থাক, অহিন্দীভাষী প্রদেশের আপামর সাধারণকে হিন্দী শেখান কি সম্ভব? তাদের মাতৃভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করা হোক আগে, তারপর আর একটি ভাষায় তাদের শিক্ষিত করে তুলবার স্বপ্ন দেখা আমাদের সাজবে। "হিন্দী না জানলে জনতার সংগে সংযোগ রাখা সম্ভব নয়" কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কারণ জানলেও তো সম্ভব নয়। জওয়াহেরলাল যখন মাদ্রাজ, উড়িষ্যা বা আসামের কোনো ছোটো শহরে বা গ্রামে গিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তখন তাঁর দর্শন লাভ করে জনতার নয়ন সার্থক হয়, কণ্ঠধ্বনি শুনে হয়ত তাদের কর্ণে সুধাবর্ষণ হয়, কিন্তু তাঁর কথা তাদের মর্মে গিয়ে পৌঁছয় না—যদি না অনুবাদক সংগে থাকে। রাজপুরুষের ভাষা ইংরেজীই হোক আর হিন্দীই হোক, জনসাধারণের সংগে তাঁরা যদি ব্যবধান না রাখতে চান, তবে দয়া করে এবং কষ্ট করে তাঁরা জনসাধারণের ভাষাই শিখবেন, উল্টো ব্যবস্থাটা স্বাভাবিকও নয়, সম্ভবও নয়। —আবু সয়ীদ আইয়ুব-দত্ত

এ সপ্তাহে শ্রীমতী করুণা সাহার চিত্র-প্রদর্শনী চলছে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। ছবি আছে ৬০টি। জল রঙে এবং তেল রঙে আঁকা।

শ্রীমতী সাহার আঁকার প্রথা প্রকরণ দেশী নয়। ইনি সাদৃশ্য সত্যই প্রকাশ করেছেন, তবে স্টাইল কিছুটা আধুনিক। মোটা মোটা তুলির টানটোন। মডেলিঙ-এর জন্য 'লিকিং' করা হয়েছে বটে, তবে তা যেখানে একেবারে না হলে নয় কেবল সেইসব যায়গায়, যেমন গন্ডা, গাল, বক্ষস্থল,

কেশ প্রসাধন
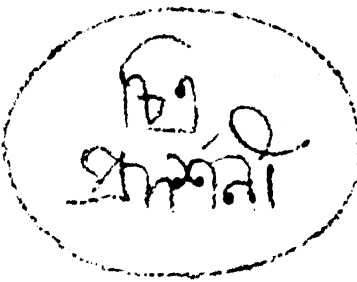
বাহু প্রভৃতি স্থানে। এ'র শরীর স্থান সম্বন্ধে জ্ঞান বেশ পাকা, কিন্তু ফর্মগুলি কোনও স্পষ্ট সীমারেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় নি। ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের মত ছোট ছোট টানটোনে ইনি বর্ণ প্রয়োগ করেছেন, তবে ইমপ্রেশনিস্টরা যেসব বর্ণ ব্যবহার করতেন, ঠিক সে ধরনের বর্ণ এ'র ছবিতে নেই। প্রতিকৃতি রচনায় ইনি বেশ পারদর্শী। 'মাই কাজিন' প্রতিকৃতিটিই এ প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে আমাদের বিশ্বাস। 'ফুল সাজা', 'এ স্টাডী', 'রেড অ্যান্ড গ্রীন' এসব প্রতিকৃতি চিত্রগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ক্লক টাওয়ার' 'উইণ্ডোজ', 'ব্যালকনি' প্রভৃতি স্টাডীগুলি লক্ষনীয়। 'লুকিং আউট', 'কোম্বিঙ' প্রভৃতি ছবিতে শিল্পীর শিল্পরসিকের চোখ দিয়ে দেখতে জানার পরিচয় পাওয়া যায়। জল রঙের ছবির মধ্যে 'ডালহাউসী স্কোয়ার', 'দি রাউন্ড ব্যালকনী', 'আপ হিল' প্রভৃতি ছবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জল মাধ্যমে এ'র বেশ দখল আছে, তবে আরও একটু জোরালো রঙ ব্যবহৃত হলে ছবিগুলি অপেক্ষাকৃত বেশী আকর্ষণীয় হ'ত বলে আমাদের বিশ্বাস। তেল চিত্রেও খুব জোরালো রঙের ব্যবহার ছিল না। এর ফলে অংকন, পরিপ্রেক্ষিত, শরীরস্থান, রচনা এসব নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও বেশীর-ভাগ ছবি ম্লান মনে হয়েছে। হাল্কা রঙ মাঝে মাঝে বেশ ভাল লাগে বটে, তবে একই ধরনের রঙের পুনরাবৃত্তি হলে ভাব কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয় নিশ্চয়। পাকা আর্টিস্ট-এর কাজ বিষয়বস্তু পরিবর্তনের সংগে বর্ণকারও পরিবর্তন করা। আরেকটা কথা শ্রীমতী সাহার টানটোনের প্রথা-প্রকরণ আগেই বলেছি ফরাসী ইমপ্রেশনিস্টদের অনুরূপ, কিন্তু ইমপ্রেশনিস্টরা বিরাট পরিবর্তন আনলেও তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন নি, অর্থাৎ প্রাকৃত রূপের সাদৃশ্য, ঐভাবে টানটোন প্রয়োগ করে হুবহু আনতে পারেন নি। সুতরাং সাদৃশ্য সত্য প্রকাশ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ টেকনিক খুব কার্যকরী বলে মনে হয় না। কাপড়ে সুতো দিয়ে বোনা সূচিশিল্পের মত মনে হয়। আমাদের দেশে এ ধরনের টানটোন আধুনিক হিসাবে চললেও এ টানটোন পাশ্চাত্ত্যে চালু হয়েছিল প্রায় একশ বছর আগে। এই টানটোনের স্রষ্টাদের সেখানে এখন 'ওল্ড মাস্টারস'দের দলে ফেলা হয়। মাস্টারস, যেহেতু এ'দের পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের ওপর ভিত্তি করে আজকের মডার্ন আর্ট গড়ে উঠেছে। মানুষের চেহারা এবং ল্যান্ডস্কেপ আঁকায় নতুন নতুন প্রকরণ দেখাচ্ছেন পাশ্চাত্ত্যের শিল্পীরা। এসব প্রথা প্রকরণ অর্জনে আপত্তি করার কোনও কারণ দেখিনে, তবে যেমন প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা সর্বান্তকরণে সমর্থন করতে পারিনে, তেমনি পুরানো বিদেশী প্রকরণের

বাতায়নে

পুনরাবৃত্তিরও সমর্থন করতে পারিনে। সব জিনিসই শেখা উচিত এবং যে কোনও আর্ট ভালভাবে শিক্ষা করে, তা দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। আঁকবার সময় শিল্পী প্রয়োগ করবেন সম্পূর্ণ স্বকীয় টেকনিক এবং চিন্তাধারা তবেই হবে সে ছবি যথার্থ রসোত্তীর্ণ।

যাই হোক, শ্রীমতী সাহার চিত্র-প্রদর্শনী চলবে আগামী ২৭শে নভেম্বর অবধি। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত খোলা। শিল্পরসিক দর্শকেরা এ প্রদর্শনী উপভোগ করবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। —চিত্রগ্রীব

রঞ্জন

কয়েকদিন আগে "আনন্দবাজার পত্রিকা" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছেন: "কলিকাতারই কোনো শ্মশানঘাটে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শোকার্ত আত্মীয়দের দ্বারা বাহিত বা পরিবৃত হইয়া শব আসিতেছে একের পর এক। অথচ যাহাদের কাজ কাঠ বিক্রয় করা বা শব দাহ করা তাহারা নির্বিকার। উহাদের বাজি ধরিতেও দেখিয়াছি, ইহার পরের শবটি ছেলের না মেয়ের। যেন ওগুলি দেহ নয়, যাহাতে কিছুক্ষণ আগেও প্রাণ ছিল—যেন উহারা তাস বা পাশার ঘুঁটি। এই দৃশ্য প্রথম দেখিয়া প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলাম। পরে বুঝিয়াছি, ইহাই মানবচরিত্র—এবং আমরা কেহই উহার ঊর্ধ্বে নই। দীর্ঘ ও ব্যাপক দুঃখ বা যন্ত্রণার নিয়মিত অভিজ্ঞতা আমাদের অনুভূতির ধারকে ভোঁতা করিয়া দেয়। নহিলে কলিকাতার রাস্তায় শত শত অভুক্ত ভিখারী দেখিয়া বাড়ি ফিরিয়া আমরা খাইতে বসি কী করিয়া? প্রতিদিন শত শত রোগী লইয়া কারবার করিতে হইলে আমরাই কি অপরিবর্তিত থাকিতাম? তরুণ কবিযশঃপ্রার্থীকে তার রচনা ফিরাইয়া দেওয়াটা তার পক্ষে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। অথচ এমন কাজ কি আমাদের রোজই করিতে হইতেছে না?

দুঃখ যে মনুষ্যজীবনের কেন্দ্রবিন্দু তা বহু প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকের স্থির বিশ্বাস। আর দুঃখের প্রতি আমাদের মনোভাবই আমাদের মনুষ্যত্বের পরিমাপ। আপন দুঃখ নয়, তার প্রতি সচেতনতা সহজাত। পরের দুঃখে বিচলিত হওয়া কিছুটা যুথবোধজাত আর অংশত সাধনা-সাপেক্ষ।

*

এই বিচলনের প্রকারভেদ অংশত বৃত্তিগত, বাকিটা ব্যক্তিগত। সকলের মন সমান অনুভূতিসজাগ নয়। কারো ক্ষমতা আছে নীরবে দুঃখ সহ্য করবার, কারো নেই। দুঃখে বিচলিত হয়েও কর্তব্য বিস্মৃত না হবার ক্ষমতা সর্বজনীন নয়। এমন মানুষও বিরল নয়, যার দুঃখ বোধ করবার শক্তিই অত্যন্ত পরিমিত। ঔদাসীন্য তার মজ্জাগত। আবার এমন কতগুলি কাজ আছে যা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে গেলে আবেগকে বল্গাহীন মুক্তি দেওয়া চলে না। ভালো কাগজ বের করতে গেলে অক্ষম কবিকে দুঃখ না দিয়ে উপায় নেই। রোগীর ব্যথা দেখে ডাক্তার বা সেবিকা কাঁদতে বসলে বিপদের কথা। তাঁদের কাজ ক্রন্দন স্থগিত রেখে ব্যথার উপশমে উদ্যোগী হওয়া। অর্থাৎ সাময়িকভাবে সামান্য হৃদয়হীনতা বরণ করা। নইলে সদুদ্দেশ্য কার্যে অনুদিত হবে কী করে?

প্রবন্ধারম্ভের উদ্ধৃতিতে দেখানো হয়েছে অভিজ্ঞতার আতিশয্যে অনুভূতির অবশ্যম্ভাবী ক্ষীণতাপ্রাপ্তি। আমার বর্তমান বক্তব্য দ্বিবিধ। এক, অনুভূতি নিয়ে যাদের কাজ—শিল্পী, সাহিত্যিক ইত্যাদি—তাদের জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যেমন অপরিহার্য তেমনি তার মাত্রাধিক্য ঘটলে তা সৃষ্টিকর্মের অন্তরায় হতে পারে। দুই, উপরে যে আংশিক হৃদয়হীনতার কথা বলেছি তা অভ্যাসজাত হবে অনেকের বেলায় কিন্তু কারো কারো পক্ষে সজ্ঞান চেষ্টা করে নির্লিপ্ত হবার প্রয়োজন আছে। আমার নিবেদন, আবেগপ্রবণতা আজ বড় বেশি আদৃত আর নির্লিপ্ততা অন্যায়ভাবে নিন্দিত। এই মনোবৃত্তির পরিণাম বাঙালীর সাহিত্যে ও জাতীয় চরিত্রে সমভাবে বর্তমান। বলা বাহুল্য, পরিণামটা কোনো ক্ষেত্রেই শুভ হয়নি।

*

ইতিমধ্যে "পলায়নী মনোবৃত্তি" বলে একটি অতিপ্রিয় তিরস্কার আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি যে কোনো লেখকের প্রতি নির্বিচারে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে যদি তিনি তাঁর পরিবেশের সমসাময়িক সমস্যাগুলির প্রতি সামান্যতম ঔদাসীন্যের অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকেন। রোম দগ্ধ হবার কালে বেহালা বাজানো অন্যায় নাকি নেই। এ মতের সত্যের অংশ অস্বীকার করিনে। লেখক বা শিল্পীর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অজ্ঞ বা অচেতন থাকা আজ সম্ভবই নয়, চেষ্টা করলেও না। তবু তার দ্বারা অভিভূত হবার বিরুদ্ধে যুক্তি আছে। লেখককে ধর্মাধিকারীর মতো প্রতি প্রশ্নে নিরপেক্ষ হতে হবে এমন কথা বলি না। বরং অমন বৈরাগ্য সৃষ্ট সাহিত্যের উষ্ণতা হরণ করে। কিন্তু জীবনের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িত হয়ে পড়লে, তার নানা সমস্যা নিয়ে মগ্নতা অত্যধিক হলে, দৃষ্টির স্বচ্ছতা ব্যাহত হওয়া সম্ভব।

আরো পরিষ্কার হতে চেষ্টা করি। ভালো ছবি যেমন দু' ভাবে দেখতে হয়—কাছে থেকে আর দূরে থেকে, নইলে তার সম্পূর্ণতার পরিচয় মেলে না—তেমনি জীবনকে সব সময় কাছে থেকে দেখার মধ্যে অসম্পূর্ণতা আছে। লেখক জীবনের অংশীদার বৈকি, কিন্তু যেহেতু সে জীবনের লিপিকারও তার উপায় নেই মাঝে মাঝে অন্তত জীবন আর নিজের মধ্যে কিছু দূরত্ব কিঞ্চিৎ ব্যবধান সৃষ্টি না করে, নইলে তার সৃষ্টি অসম্পূর্ণতাদোষে দুষ্ট হবে।

*

সৃষ্টির সর্ত সম্বন্ধে কোনো একটিমাত্র মতবাদকে একমাত্র সত্য বলে মনে করা মূর্খতা—সে মতবাদ আমার নিজের হলেও। তাই বিরুদ্ধ যুক্তি এখনই নিবেদন করব। জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিলে সার্থক সৃষ্টি সম্ভব নয়, একথা যে সত্য নয়, অন্তত একমাত্র সত্য নয়, তার প্রমাণে বিশ্বসাহিত্য আকীর্ণ। বোহেমিয়ানের মতো জীবনকে উপভোগ করেছেন অথচ সৃষ্টির সময় হিসাবে এক কানাকড়িও ভুল হয়নি, এমন দৃষ্টান্ত অনেক। একই সঙ্গে উদ্দাম জীবনের দাবী ও অপ্রতিরোধ্য সৃষ্টিপ্রতিভার চাহিদা মিটিয়েছেন, এমন শিল্পীর সংখ্যা আদৌ নগণ্য নয়। যদিও এমন প্রতিভারও উল্লেখ করতে পারি যা জীবনোপভোগের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়নি, পিষ্ট হয়েছে।

নিরাবেগ বুদ্ধির সাধনা দার্শনিকে সমীচীন, সাহিত্যিকে বা শিল্পীতে নয়। এদের পক্ষে আবেগ অপরিহার্য এবং তাতে কিঞ্চিৎ আতিশয্য আদৌ অস্বাভাবিক নয়। সাই বলা যাক, একথা তো সত্য যে, সাধারণের চেয়ে একটু বেশি স্পর্শসজাগ বলেই উনকে কবি আর আমি নই। কিন্তু আবেগসর্বস্ব লেখক বা শিল্পী যেহেতু কদাচ উচ্চতম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হন না, তাই আবেগ থেকে মাঝে মাঝে ছুটি নেবার নির্দেশ। তাই আসন্ন পরিবেশ থেকে মাঝে মাঝে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার বাঞ্ছনীয়তা।

*

জীবন বা দুঃখের প্রতি ঔদাসীন্য নয়, দুঃখের অনুভূতির সাহিত্যিক রূপান্তরীকরণের জন্যই কখনো কখনো দুঃখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়া আবশ্যক হতে পারে। পলায়ন নয়, ছুটি নেয়া। দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করা নয়, তার দ্বারা অভিভূত হওয়া থেকে বিরত হওয়া। এই মানসিক ডিসিপ্লিনের অবহেলা জাতীয় জীবনে আনে পরিমিতিবোধের অন্তর্ধান অর্থাৎ হুজুগ। আর সাহিত্যে আনে অপরিশ্রুত আবেগের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশন।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে যদিও উভয় পক্ষের নেতা, বক্তা, ব্যাখ্যাতা, সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রভৃতি যথারীতি আবেগের সঙ্গে স্ব স্ব পক্ষের গান গেয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু সকলেই জানেন যে মামলা যেখানে আছে আসলে সেখানেই থাকছে। ডক্টর গ্রাহামকে আবার একবার এদিকে পাঠানোর সুপারিশ করে যে ইংগ-মার্কিন প্রস্তাবটি সিকিউরিটি কাউন্সিলে আনা হয়েছে ভারতের পক্ষ থেকে শ্রীকৃষ্ণমেনন তাতে পুরোপুরি আপত্তি জানিয়েছেন। কারণ কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত সরকারের বর্তমান যুক্তির সঙ্গে গ্রাহাম-দৌত্যের প্রস্তাবের কোনো সামঞ্জস্য নেই।

কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসার জন্য প্লেবিসিট হবে, হওয়া উচিত এবং হওয়া সম্ভব—এরূপ মেনে নিলে তবে ডক্টর গ্রাহামকে আবার এ-ব্যাপারে পাঠানোর কিছু মানে হতে পারে। কিন্তু ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এখন পরিষ্কার বলা হয়েছে যে প্লেবিসিটের প্রশ্ন আর উঠতেই পারে না, সিকিউরিটি কাউন্সিলের সামনে এখন যদি কোনো বিচার্য বিষয় থাকে সেটা হচ্ছে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে পররাজ্য আক্রমণের অভিযোগ। কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্য বিধিসংগতভাবে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবার পরে পাকিস্তান অন্যায়ভাবে তা আক্রমণ করে এবং এখনও তার এক অংশ অন্যায়ভাবে জবরদখল করে আছে,—সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রথম কর্তব্য এই অন্যায়ের সংশোধন করতে পাকিস্থানকে বাধ্য করা। ভারতভুক্তি সম্বন্ধে জম্মু ও কাশ্মীরের জনমত যাচাইয়ের কোনো নৈতিক বাধ্য-বাধকতা যদি ভারতের পক্ষে থেকে থাকে তাও জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচিত গণ-পরিষদ ও পরবর্তী আইন পরিষদের নির্বাচনের দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে। এই যুক্তির সঙ্গে গ্রাহাম-দৌত্যের মিল খাওয়া-বার কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং যুক্তির দিক দিয়ে ভারত সরকার ইংগ-মার্কিন প্রস্তাবটির সম্পূর্ণ বিরোধী না হয়ে পারেন না। কিন্তু ভারতের আপত্তি সত্ত্বেও যদি প্রস্তাবটি সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভোটা-ধিক্যে পাশ হয়ে যায় এবং সোভিয়েট রাশিয়া সেটা 'ভেটো' বলে নাকচ করে না দেয় তাহলে কি ভারত সরকার বলবেন, 'ডক্টর গ্রাহাম যেন না আসেন; তিনি এলে তাঁর সঙ্গে আমরা কথা বলব না'? না,

তাও হবে না। সিকিউরিটি কাউন্সিল যদি কাশ্মীরে 'আন্তর্জাতিক সৈন্য' পাঠাবার কথা বলতেন, তবে সে আলাদা প্রশ্ন হোত। কিন্তু ডক্টর গ্রাহাম যদি আসতে চান, আসুন, ফিরে গিয়ে 'কিছু হোল না' এই রিপোর্ট লিখবার জন্যই যদি আসতে চান, তবে তাঁর আসতে কোনো বাধা নেই, তিনি নিশ্চয়ই ভারতে সরকারী আতিথ্য পাবেন।

এই অবস্থাটা কিন্তু মোটের উপর কারোরই নৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। অনেক সময়ে মোকদ্দমা শেষ করার কোনো পথ পাওয়া যায় না, ঝুলে থাকে, তারিখে তারিখে দুপক্ষের উকিলরা একটু-আধটু বাদানুবাদ করেন, আবার কিছুদিনের জন্য ধামাচাপা। আসলে কোনো পক্ষের উকিলই গরম হন না। কিন্তু এখানে মুশকিল—দুপক্ষের উকিলকেই হাউইবাজির খেলা দেখাতে হচ্ছে। এঁরা আবেগের ভান মাত্র করছেন, এরূপ নাও হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ মেননের ঐকান্তিক ভাবটা নিশ্চয়ই লোক-দেখানো নয়, বক্তৃতা দিয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিলকে বুঝাবার চেষ্টায় তিনি প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত বলে মনে হয়। মরতে মরাতেও দেশের জন্য যুদ্ধ করার বীরত্বের কাহিনী আমরা অনেক জানি, কিন্তু সিকিউরিটি কাউন্সিলে এই রকম 'প্রাণপণ' করে ওকালতির মহিমা বুঝা কঠিন। কী এমন সর্বনাশ হবে যদি বাকী কথাগুলো শ্রীমেননের মুখ দিয়ে না বেরিয়ে শ্রীলাল কিংবা অন্য কোনো ভারতীয় প্রতিনিধির মুখ দিয়ে বেরোয়? আর কথা তো সেই একই। যা বলার সে তো ঠিক করাই আছে, শিখিয়ে পড়িয়ে দিলে আর কেউ বলতে পারে না?

মুশকিল হচ্ছে, উকিলের এই রকম আবেগ দেখলে জজ, জুরী যাই ভাবুন না কেন মক্কেলের পক্ষে মন শান্ত রাখা মুশকিল হয়। উকিল যখন 'ন্যায় বিচার' চাই বলে আবেগের লক্ষণ প্রকাশ করেন, তখন মক্কেলও বিচলিত হয়, ভাবে তাহলে সত্যই বুঝি কিছু চাওয়া হচ্ছে। বর্তমান ক্ষেত্রে ভারত সরকার দাবি করছেন যে পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের যে-অংশ বে-আইনীভাবে দখল করে আছে, সেটা সে ছেড়ে দিক। কিন্তু এই দাবীর স্বীকৃতির জন্য ভারত সরকার এতো বছর ধরে কী করেছেন? পাকিস্তান সিকিউরিটি কাউন্সিলে প্লেবিসিটের জন্য তাগিদ দিতে না গেলে ভারত সরকার কি তাঁদের মূল মোকদ্দমার বিচারের কথা তুলতেন? অথবা অতঃপর তাঁরা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পাকিস্তান কর্তৃক অধিকৃত অংশ উদ্ধার করার জন্য কোনো সক্রিয় নীতি অবলম্বন করবেন? পাকিস্তান এর বে-আইনী দখল ছাড়বে এমন কি কোনো সম্ভাবনা আছে? তাছাড়া, সত্যি সত্যি ভারত সরকার নিজেও কি কাশ্মীরের পাক অধিকৃত অংশটা পাবার জন্য লালায়িত? যদি তাই হতো, তবে সিকিউরিটি কাউন্সিল মারফৎ বা অন্যভাবে সে চেষ্টা এতদিন করেননি কেন?

জোর দিয়ে সে-চেষ্টা করা উচিত ছিল, কার্যত পাকিস্তানের হাতে কাশ্মীরের এক অংশ ছেড়ে দেওয়ার নীতি অনুসরণ করা অন্যায় হয়েছে,—এরূপ সিদ্ধান্ত কাউকে করতে বলছি না। বর্তমানে ভারত সরকার যে-যুক্তির আশ্রয় নিচ্ছেন সেটা প্লেবিসিট প্রস্তাব খণ্ডন করার জন্য, কাশ্মীরের পাক-অধিকৃত অংশের উদ্ধারের আশায় নয়। এতে নৈতিক ক্ষতি আছে। প্লেবিসিট হতে পারে না, তার আবশ্যকতাও নেই, নূতন করে ঐ ধরনের কিছু করার চেষ্টা করলে সকল পক্ষেরই বিপদ হতে পারে। সুতরাং প্লেবিসিটের কথা এখন মানা যেতে পারে না। একথা স্পষ্ট বলা উচিত এবং তার পক্ষে যুক্তিগুলিও স্পষ্টভাবে বলা হওয়া উচিত কিন্তু সেটা আসল যুক্তি নয় কেবল সেটাকেই সামনে এনে বড়ো করে দেখানো ঠিক নয়। পাকিস্তান পররাজ্য আক্রমণের অপরাধে অপরাধী সন্দেহ নেই কিন্তু সেই অপরাধের মামলা ভারত সরকার জোরের সঙ্গে চালান নি বা চালানো ঠিক বলে মনে করেননি কাশ্মীর বিভাগ কার্যত তাঁরা মেনে নিয়েছেন। এই ব্যবস্থার এখন উলট পালট করা কেন ঠিক হবে না, সেই যুক্তিসমূহ এখন সুস্পষ্টভাবে দেওয়া উচিত। তা না করে, এটা উচিত নয় যে, প্লেবিসিটের কথা তুললেই আমরা গোড়ার কথা তুলে পাকিস্তানকে 'আজাদ' কাশ্মীর থেকে বেরিয়ে যেতে বলব —যদিও জানি যে, পাকিস্তান তা করবে না এবং শুধু তাই নয়, যদি কোনোভাবে 'আজাদ' কাশ্মীরের বোঝাও ভারত সরকারের কাঁধে এসে পড়ে তা হলে সেটা ভারত সরকার আদৌ একটা আহ্লাদের ব্যাপার বলে গণ্য করবেন কি না সন্দেহ। সুতরাং পাকিস্তানের মূল পাপের প্রায়শ্চিত্তের দাবি ওকালতির খাতিরে তোলা যেতে পারে, কিন্তু তাতে করে পাকিস্তান বা পাকিস্তানের সমর্থকগণও লজ্জিত হবে না, ভারতবাসীরাও ভাববে না। আপাতত কাশ্মীরের যে ব্যবস্থা আছে, সেই নিয়েই উভয় পক্ষের চলতে হবে, এই ধারণাই ভারত ও পাকিস্তানে দৃঢ় করা আবশ্যক। তার জন্য আইনের তর্কের চেয়ে সাধারণ বুদ্ধির কথায় যে কেবল বেশি কাজ হবে তা নয়, সরল স্পষ্ট কথায় নৈতিক হাওয়াটাও একটু পরিষ্কার হবে।

জীবনালেখ্য

অবনীন্দ্র-চরিতম্‌— শ্রীপ্রবোধেন্দু ঠাকুর। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭। দাম—৫,

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বস্তুত কিছুই আলোচনা হয়নি বাংলা সাহিত্যে। না তাঁর শিল্পকলা, না বা তাঁর সাহিত্য বিষয়ে। মধ্যে মধ্যে দু' একটি প্রবন্ধ শুধু এতদিন চোখে পড়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। অথচ দু' দিক থেকেই এই বিরাট প্রতিভার সামগ্রিক আলোচনার প্রয়োজন ছিলো। খুব সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, এ-বিষয়ে কেউ-কেউ মনোযোগ দিচ্ছেন। দেরি হয়েছে সন্দেহ কি, তবু যে তাঁর সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে উঠছি ধীরে-ধীরে তারও মূল্য কিছু কম নয়।

অবনীন্দ্র-চরিতম্‌ যদিও মুখ্যত শিল্পগুরুর সৃষ্টি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা-গ্রন্থ নয়, তথাপি এ-বইটি বাংলা দেশের কৌতূহলী সাধারণের কাছে এই কারণে আদর পাবে যে, এখানে শিল্পী ও সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপটি ছবির মতোই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এবং একজন মহৎ প্রতিভাধরের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসার আগে সেই ব্যক্তিমানুষটি সম্বন্ধেও কিছু জেনে নেওয়া দরকার। আমরা এতকাল অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখেছি, রচনা পড়েছি, কিন্তু তাঁর নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিনি। 'ঘরোয়া' আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে তাঁর সময়ের কথা আছে বটে, কিন্তু সেখানেও তিনি নিজে আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। 'আপন কথা' তো শৈশবস্মৃতি। সেখানেও শিল্পী-সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং অবনীন্দ্র-চরিতম্‌ চিত্রশিল্পী এবং সাহিত্যপাঠক উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বই।

প্রবোধেন্দুনাথ অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য, এবং নিজে বিদগ্ধ রচনাকার। তাঁর পূর্বতন রচনা থেকে তাঁর মনের যে সন্ধান পাওয়া যায়, তাতে এ-গ্রন্থের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক বাহক, প্রবোধেন্দুনাথ ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের প্রেমিক ছাত্র—সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য প্রবোধেন্দুনাথই উপযুক্ত ব্যক্তি, যিনি তাঁর সত্যিকার চরিত্রকে প্রকাশ করতে সক্ষম। বলাতে বাধা নেই, লেখক সে-বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করেন নি।

প্রসংগত এখানে বলা ভালো যে, শুধু চরিত্র-চিত্র নয়, প্রয়োজনমতো এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ করেছেন লেখক যা অবনীন্দ্রনাথের জন্যই নয়, ভারতবর্ষের মহৎ শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনার জন্যও সকলের জেনে রাখা দরকার। 'আলমগীর' ছবির জন্মবৃত্তান্ত তার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। বইটিতে অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছবির প্রতিলিপি দিয়ে গ্রন্থটিকে মূল্যবান করা হয়েছে। ৩৬২।৫৭

ভারতের সাধক—(তৃতীয় খণ্ড) শংকরনাথ রায় প্রণীত। রাইটার্স সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৮, টাকা।

গ্রন্থকার প্রথিতযশা। ভারতের সাধকের প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড বাংলার চিন্তাশীল সমাজে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আলোচ্য তৃতীয় খণ্ডে আচার্য শংকর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, ভক্ত তুকারাম, গোস্বামী তুলসীদাস, রামপ্রসাদ, কৃষ্ণানন্দ স্বামী, শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, মহর্ষি রমণ, শ্রীঅরবিন্দ এইসব মহাপুরুষের জীবনী আলোচিত হইয়াছে। ভারতের মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনায় গ্রন্থকার এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মনীষায় তিনি সাধকগণের অধ্যাত্মানুভূতিকে সাহিত্যের রসোত্তীর্ণ রূপ দিয়াছেন। প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, পরিনিষ্ঠিত মননশীলতা গ্রন্থকারকে তাঁহার রচনাশৈলীতে এই রসোন্মেষ সামর্থ্য সঞ্চার করিয়া তাঁহার লেখায় অভিনবত্ব উদ্রিক্ত করে। প্রত্যেকটি লেখায় তাজা প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়। এই স্পর্শ গ্রন্থকারের ভাষা এবং ভাবের পারিপাট্য সাধনের পথে মহাপুরুষ-গণের অধ্যাত্ম জীবনের মৌলিক মাধুর্য আমাদের চিত্ত উদ্দ্বুদ্ধ করে। মহৎ জীবনের এমন উজ্জীবনধর্মের প্রভাবে তাঁহার লেখা পড়িয়া আমরা মনের মূলে উদার একটি প্রশান্তি অনুভব করি এবং আমাদের জীবনের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করিয়া বৃহত্তের অনুভূতিতে অনাবিল রসোপচিতি আমাদের পক্ষে উপভোগ্য হয়। সর্বাংশে রসোত্তীর্ণ শংকরনাথের এমন অবদান বাংলার সাহিত্যকে স্থায়ীভাবে সমৃদ্ধ করিবে।

প্রেমের ঠাকুর—প্রথম খণ্ড। শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ সংকলিত। সুবর্ণাণ ললিত সাহিত্য ভবন, বিশ্বভাগবতী ও ভক্তিনিকেতন, ১০এ ডোভার রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা-১৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২, টাকা। বোর্ডে বাঁধাই ২৷৹ টাকা।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের লীলাকথা। প্রথম খণ্ডে প্রভুর গৃহত্যাগ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতকথা স্বভাবতই মধুর। লেখক সহজ, সরল ভাষায় এই লীলাকথা বিবৃত করিয়াছেন। সমগ্র অন্তর দিয়া তিনি লিখিয়াছেন, এজন্য রচনাশৈলী সর্বত্র সঙ্গত, সংযত সৌষ্ঠবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অবদান প্রত্যক্ষভাবে অন্তরকে স্পর্শ করে এবং বাংলার এই মনের মানুষটিকে সকলের আপনার করিয়া দেয়।

উপন্যাস

পাকা ধানের গান (দ্বিতীয় পর্ব)—সাবিত্রী রায়। প্রকাশক—মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—৪৲

উপন্যাস রচনার ব্যাপারে অন্যান্য লেখিকাদের সঙ্গে বিচার করলে সাবিত্রী রায়ের যে বৈশিষ্ট সব চেয়ে আগে ধরা পড়ে, সে হলো তাঁর পটভূমি-নির্বাচনে অভিনবত্ব বা কাহিনীতে একটি বিস্তৃতি আনার প্রয়াস। গ্রাম্য মধ্যবিত্ত, তুলসীতলা রান্নাঘর কিংবা তথাকথিত নাগরিক প্রেম আর প্রসাধন-লাঞ্ছিত চকচকে কাহিনীতে তিনি তৃপ্ত নন। তিনি ঘরের মেয়েকে যেমন মেয়েদের মতো করেই দেখেছেন, বাইরের পুরুষকেও তেমনি দেখতে ভুল করেননি। 'পাকাধানের গান' শুধুই একটি ঘরোয়া কাহিনী নয়, সেখানে রাজনীতির প্রশ্ন আছে, সমাজজিজ্ঞাসা আছে। সহজ গ্রাম্য মেয়ে [illegible] অথবা মেয়ে ভদ্রার পার্থক্য অনেক [illegible] ভদ্রা, [illegible] আর আরও [illegible] চরিত্রের সমাবেশে উপন্যাসটি বিস্তৃততর হয়েছে—তাদের চরিত্রও [illegible] বাঁচে।

তবু একটি কথা, [illegible] এমন বিস্তৃত [illegible] প্রকাশ করার প্রয়োজনে [illegible] অনুসরণ করা উচিত, সাবিত্রী রায় এখনও তাকে আয়ত্ত করতে পারেন নি। কিন্তু লেখিকার আত্মপ্রত্যয় এ-দিক থেকে তাঁকে বিশেষ বাধা দিতে যে সক্ষম হবে না, এ-গ্রন্থেই তার ইঙ্গিত আছে।

বৈষ্ণব সাহিত্য

VAISHNABA LYRICS—Dr. Motilal Das. Publishers—Bharat Sanskriti Parishat. Price—Rs. 3- only.

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান কোথায়, তার আর নতুন করে বলবার নয়। যুগে যুগে বাঙালী হৃদয় সে-রস পান করেও তাকে পুরনো করতে পারেনি। এ-একেবারেই বাঙলা দেশের জিনিস। তবু দেশের আত্মা যে-গানে নিহিত হয়ে আছে, চিরন্তনতার স্পর্শ পেয়ে যা উজ্জ্বল, তা সর্বজনীন, সুতরাং সর্বদেশেরও।

ডাঃ মতিলাল রায় বৈষ্ণব পদাবলী থেকে বেছে ১৫৭ খানি গান ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। গদ্য-অনুবাদ। কোনো বাঙালী পাঠকের কাছে বৈষ্ণব পদাবলীর কোনো অনুবাদই যথার্থ রসকে মেলাতে পারবে না। অনুবাদকের উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ই তা নয়। কিন্তু কয়েকটি অনুবাদ থেকে মনে হয়, অনুবাদক কবিতা-গুলোকে ইংরেজী ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন, কাব্যের আত্মা যেন তার নিজের রূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি।

তথাপি এ-প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করতে হবে। ভাবগভীরতায় পদাবলী-সাহিত্যের যে কী দান, তার সামান্যও অংশের সঙ্গেও যদি ভিন্ন দেশ-বাসীর পরিচয় হয়, তা হলে প্রাক্‌রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যও যে কতখানি মহৎ ছিল, তার হদিস তাঁরা পাবেন। এ-গ্রন্থটি সে দিক থেকে অনেক-খানি সাহায্য করবে। ৭০৮/৫৬

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

মরু প্রান্তরে—তরুণকুমার ভাদুড়ী।
চীনা গল্প—ফেং শুয়ে ফেং অনুবাদক শ্রীপ্রিয়দর্শন সেনশর্মা।
বেতার তথ্য—২য় খণ্ড—কালাচাঁদ শীল।
এক বিন্দু—নিখিল সুর।
চৌমাথা—রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
অন্তরঙ্গ—প্রফুল্ল রায়।
পাষাণ কল্যাণ—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।
কল্পলতা—বিমল কর।
পিয়ারী—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
রোশনাই—বিশু মুখোপাধ্যায়।
পথ—শ্রীভবেশচন্দ্র চক্রবর্তী।
একান্ত—স্বপন দাস।
ছায়াবিহীন—শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
তিন অঙ্ক—শান্তিময় ঘোষাল।
মিষ্টি মন—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক।
মায়া মৃগ—সুধীরঞ্জন চক্রবর্তী।
প্রেমের ঠাকুর ১ম খণ্ড—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ।
INDIA'S FIVE-YEAR PLANS 1951—1961—Prof. Dhiresh Bhattacharyya.
M. N. ROY—THE HUMANIST PHILOSOPHER—Ramgansu Sekhar Das.
DICTIONARY—M. Newmark.
ILLUSTRATED TECHNICAL DICTIONARY—M. Nswmark.
BEL-AMI—Guy De Maupassant.
মন্দিরময় ভারত—অপূর্বরতন ভাদুড়ী।

পাকিস্তানী ব্যাপার

ভারত ও পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের মধ্যে এক চুক্তিতে স্থির হয়েছে যে, এবার থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সতেরখানি ভারতীয় ছবি পাঠানো যেতে পারবে। (পূর্ব পাকিস্তানেও অনুরূপ সংখ্যক ছবি পাঠানোর একটা চুক্তি হয়েছে—যার মধ্যে দশখানি বাঙলা এবং সাতখানি হিন্দী ছবি) ভারতের কয়েক শত ছবির মধ্যে থেকে পাকিস্তানের দুটি অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ যখন মাত্র চৌত্রিশখানি ছবি, তখন এইটেই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, পাকিস্তান বেছে বেছে ভাল ছবিগুলিই গ্রহণ করবে। কিন্তু কার্যত ব্যাপার দাঁড়িয়েছে ঠিক তার উল্টো। অর্থাৎ, পাকিস্থানের নীতি হচ্ছে, ছবি বেছেই যদি নিতে হয়, তো নিকৃষ্ট ছবিগুলিই তাহলে নির্বাচন করা হবে। বস্তুত পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট থেকে আদেশ জারী করে জনপ্রিয় ভারতীয় ছবি গ্রহণে পাকিস্তানী পরিবেশকদের নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ভারতে জনপ্রিয়তা অর্জনকারী বহু ছবির নামের একটি তালিকাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব ভাল ছবির প্রায় পুরো একটি তালিকা। এমন একটি নীতি অনুসরণের কৈফিয়ৎ হচ্ছে পাকিস্তানী ছবিকে ভারতীয় ছবির প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করা। নিজের দেশের একটি সদ্যগঠিত শিল্পের উন্নতিকল্পে পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট তাদের যাতে সুবিধে হয় তেমনিই নীতি অনুসরণ করবেন তা নিয়ে বলবার কিছু নেই। কিন্তু এ ধরনের একটা নীতি দ্বারা এখানে দেখানো যে, ভারতীয় ছবি পাকিস্তানী ছবির চেয়ে নিকৃষ্ট হয়, এবং তাই দেখেই পাকিস্তানী চিত্রনির্মাতারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের ছবিকে উৎকৃষ্টতর করে তুলতে সক্ষম হবেন, এটা যেন কেমন কেমন একটা যুক্তি। দেশ বিভাগের পর সমগ্র পাকিস্তান পেয়েছিল তিনশটি চিত্রগৃহ, এখন তা সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে তিনশ পঁচাত্তর। এখন প্রদর্শন ব্যবসা চালাতে দরকার অন্তত আশিখানি দেশীয় এবং তিনশখানি বিদেশী ছবি। আশিখানি দেশীয় ছবির মধ্যে পাকিস্তান এখনো পঞ্চাশখানি ছবি বছরে তোলার মতো সামর্থ অর্জন করেনি। গত বছরে তোলা হয়েছে পঁয়তাল্লিশখানি এবং বর্তমানে যতোটা ব্যবস্থা রয়েছে তাতে পাকিস্তানের মোট পাঁচটি স্টুডিও দ্বারা আর বড় জোর সংখ্যায় পাঁচ-সাতখানি ছবি বাড়তে পারে। উৎকর্ষের দিক থেকে পাকিস্তানী ছবি ভারতীয় ছবির মানের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এ দেশে খানকয়েক পাকিস্তানী ছবি মুক্তিলাভ করেছে, তার মধ্যে প্রেসিডেণ্টের ছটি চলচ্চিত্র পুরস্কারের মধ্যে চারটি পুরস্কার-

—শৌভিক—

প্রাপ্ত "ইন্‌জোর"ও ছিল, কিন্তু এ ছবিখানি দেখেও পাকিস্তানের ছবি সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করা যায় না। বছরে মাত্র পাঁচ-ছখানি করে ভারতীয় ছবি বিদেশের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার অর্জন করে আনছে। ভারতীয় ছবি পাকিস্তানে প্রদর্শিত হলে ভারতীয় চিত্রব্যবসায়ের আর্থিক সুবিধে অবশ্য হয়, কিন্তু পাকিস্তান যদি বেছে বেছে নিকৃষ্ট ভারতীয় ছবিগুলি নিয়ে তাদের দেশের দর্শকদের কাছে ভারতীয় ছবিকে অপদস্থ করে অপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করে, তার চেয়ে ভারতীয় চিত্রশিল্পের উচিত হবে পাকিস্তানে এতোকাল ভারতীয় ছবির প্রদর্শন যেমন বন্ধ ছিল, সেই অবস্থাটাই কামনা করা।
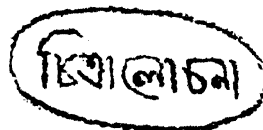
বাঙলা চিত্র প্রদর্শনের ইতিহাসে বোধ হয় "কাবুলিওয়ালা"ই প্রথম বম্বাই শহরে নিয়মিত প্রদর্শন সময়ে প্রতিদিন দেখাবার ব্যবস্থা হতে পারলো। এই শুক্রবার থেকে ছবিখানি বম্বাইয়ের স্বস্তিক সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে। এতোদিন বাঙলা ছবি কেবলমাত্র কোন কোন ছুটির দিন সকালে দেখানো হয়ে আসছিল; ইদানীং বাঙলা ছবি দেখবার প্রবল আগ্রহও দেখা দিয়েছে। বম্বাই প্রবাসী বাঙালী মহলেই কেবলমাত্র নয়, অবাঙালীদের মধ্যেও বাঙলা ছবির

প্রতি বিশেষ কৌতূহল দেখা যায়, তাদের মুখে সুনামও থবে। পরিবেশক ছায়াবাণী লিমিটেড যে এই সুযোগটি গ্রহণ করতে এগিয়ে গিয়েছেন, তার জন্যে তারা বম্বাইয়ের চিত্ররসিকদের কাছ থেকে ধন্যবাদ অর্জন করবেন। এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করলে বম্বাইয়ের চিত্ররসিকরা হয়তো নিয়মিতভাবে বাঙলা ছবি দেখার সুযোগ পাবেন, আর বাঙলার চিত্রশিল্পও বম্বাইয়ের বাজারে শ্রেষ্ঠ সামগ্রী পরিবেশনেরও একটা সুযোগ পাবেন। বাঙলা ছবির গৌরব বাঙলা গল্পের জন্য এবং এ সত্যটা বম্বাইয়ের চিত্রনির্মাতাদেরও উপলব্ধিতে এসেছে। বম্বাইয়ের নির্মীয়মাণ ছবির তালিকায় অনেকগুলি রয়েছে যার গল্প বাঙলা বই বা ছবি থেকে নেওয়া। কেউ কেউ এখানে বাঙলা ছবি তোলাতেও হাত দিয়েছেন। এও নতুন কিছু নয়,—"রাজনর্তকী", "নৌকাডুবি" থেকে হালে "একদিন রাত্রে" পর্যন্ত এমনও পাওয়া গিয়েছে যারা বাঙলা ছবির গর্বও বাড়িয়েছে। যাই হোক, একটা বিষয় এখন পরিষ্কার হয়েছে যে, উপরোপরি কটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ায় এবং বার বার রাষ্ট্রপতি পদক লাভ করায় বাঙলা ছবির প্রতি সর্বভারতের সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। চিত্র-ব্যবসায়ীরা তৎপর হলে ভারতের বিভিন্ন স্থানের সুধীজন নিয়মিত বাঙলা ছবি দেখার সুযোগ লাভ করতে পারেন।

ছোটদের উপযোগী উপকরণ নির্ণয়ে ভ্রান্তি

আর কে ফিল্মসের "অব দিল্লী দূর নহী" ছবিখানি ছোটদের জন্য বিশেষ করে তৈরী বলে বরাবর ধারণা জন্মিয়ে এসেছে এবং মুক্তিলাভের পরও ছাত্রদের জন্য বিশেষ কম প্রবেশমূল্যের ব্যবস্থা দ্বারা আরো স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ছবি-খানি প্রকৃতই ছোটদেরই জন্যে তৈরী। কিন্তু যে ছবি সর্পাঘাতে মাতৃবিয়োগের করুণ বিষাদময় পরিস্থিতি নিয়ে আরম্ভ হয়ে, ছেলে পাওনাদারের হাতে ঠেঙানি খায় আর বাপ বসে মদ খায় স্ত্রীর শোকে, নরহত্যা, পকেটমারি, লরী চাপা দিয়ে হত্যা করার বীভৎস চেষ্টা, বালককে অপহরণ, অপহৃত বালককে কুতবমিনার থেকে না পেরে শেষে যমুনায় নিক্ষেপ, একঘর ছোটদের আগুনে পুড়িয়ে মারতে যাওয়ার মতো নৃশংস কাণ্ড ইত্যাদি দ্বারা কাহিনী ভরিয়ে শেষে আদালতে যার পরিসমাপ্তি, তাও ছোটদের উপযোগী বলে বিশেষভাবে প্রচারিত হতে থাকে এবং সেটা যেন স্বীকৃতও হয়েছে! একজন পেশাদার পকেটমারকে এমন হৃদয়-বান দেখানো হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে ছবি-খানিতে তারই হচ্ছে হিরোর আসন; তার ভাইপোর সঙ্গে এমন ভঙ্গীর নাচগান যা আমাদের কালেও রুচিবিগর্হিত। এ-সবও যদি ছোটদের উপযোগী বলে পার পেয়ে যায়, তাহলে বড়োদের জন্যে আর রইল কি? "অব দিল্লী দূর নেহী"র অর্থ হচ্ছে স্বাধীন দেশে এখন ন্যায়বিচার হবেই এবং এই সূত্রে পণ্ডিত নেহরুকে ছোটদের মনে প্রায় ভগবানের আসনে অধিষ্ঠিত করে দেখান হয়েছে, যেটা পণ্ডিতজী নিজে বহুবারই নিষেধ করেছেন।

• • • •

সম্পদের লোভে পুড়ে মুকুন্দ গভীর রাতে মহাজন ভোলারামকে হত্যা করে, কিন্তু ধরা পড়ে হরিরাম। কারণ সেইদিনই হরিরাম তার ছেলে রতনকে ধরে মারার জন্যে ভোলারামকে খুন করবে বলে শাসিয়েছিল। সাক্ষীর অভাবে বিচারে হরিরামের ফাঁসির হুকুম হলো। হরিরামের বছর আটেকের ছেলে রতন সরল বিশ্বাসে পণ্ডিত নেহরুর কাছে চললো ফরিয়াদ জানাতে। রাস্তায় দেখা পকেটমার ঘাসিটার সঙ্গে—ঘাসিটার মনে পড়লো যে, হরিরাম খুনী হতে পারে না, কারণ ঘটনাকালে হরিরাম সারারাত তারই সামনে শ্মশানে পড়ে ছিল। ঘাসিটার দয়া হলো, সে-ই চললো রতনকে নিয়ে দিল্লীর পথে। ওদিকে আসল খুনী মুকুন্দ ব্যাপার সুবিধে নয় দেখে ঘাসিটাকে খুন করে রতনকে গুম করার চেষ্টা করলে। মাঝ পথে মুকুন্দ ঘাসিটাকে লরী দিয়ে চাপা দিয়ে জখম করলে তবে নিজেও জখম হলো। ঘাসিটা মৃত্যুর আশঙ্কা করে রতনকে একটা জবানবন্দী লিখে নিতে বলে নিজের রক্তে তাতে আঙুলের টিপ দিলে। রতন তাই নিয়ে উপস্থিত দিল্লীতে। পথে পথে ঘোরে আর পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন ফল হয় না। শেষে ওর করুণ কাহিনী শুনে ওকে সাহায্য করতে দলপরিকর হলো একদল ফিরিওয়ালা ছেলে। ফন্দী ফিকির করে ওরা পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা করার কয়েকবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। মুকুন্দ হাসপাতাল থেকে পালিয়ে দিল্লীতে রতনের খোঁজ করতে থাকে এবং একদিন তাকে পেয়ে ঘাসিটার জবানবন্দীটা হাত করার মতলবে রতনকে কুতবমিনারের ওপর থেকে ফেলে দেবার

চেষ্টা করে এবং সেটা সুবিধের নয় দেখে পুলের ওপর থেকে যমুনায় নিক্ষেপ করে। রতনের সঙ্গীরা রতনকে উদ্ধার করে। মুকুন্দ এবারে ঘুমন্ত রতনদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে, তা থেকেও রতনরা নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম হলো। ঘসিটাও রতনকে সহায়তা করার জন্যে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো। এরপর ওরা ঠিক করলে রামলীলা ময়দানে পণ্ডিতজী বক্তৃতা দিতে এলে তার সঙ্গে দেখা করার। ময়দানে মুকুন্দ রতনকে বাধা দেবার চেষ্টা করতে ধরা পড়ে গেল। রতন পণ্ডিতজীর কাছে তার ফরিয়াদ পৌঁছতে সক্ষম হলো। হরি-রামের বিচারের পুনরুদ্বোধন হলো এবং ঘসিটা ও অন্যান্যের সাক্ষ্য প্রমাণে সে ছাড়া পেয়ে রতনের সঙ্গে মিলিত হলো।

* * *

বড়োদের জন্যে এখনকার বম্বাই ছবির যা সব মুখ্য উপকরণ এতেও কাহিনী-রচয়িতা আখতার মির্জা সেই সবেরই সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তবে ছবিটা হচ্ছে ছোটদের লক্ষ্য রেখে। সাপ, খুন, নির্মম হাতাহাতি, মায় রক অ্যাণ্ড রোল, কিছুই বাকি নেই। বাস্তবের সঙ্গে নেহাৎ অসঙ্গত অবাস্তবকে সমান ভাগে সম্মিবেশিত করা হয়েছে। অবাস্তবের অংশগুলি হচ্ছে আমোদ পরিবেশনের জন্যে, ছোট বড়ো সবাই তাতে আমোদ পায়ও, কিন্তু বাস্তব যা আছে সেটা ছোটদের পক্ষে বড়ো কড়া অনুপানের যা তাদের ক্ষতিকর বলেই মনে হয়। পরিচালক অমরকুমার ছোটদের নিয়ে তুলেছেন বটে, কিন্তু বিন্যাসটা তার হয়েছে এমনভাবে যা ছোটদের সরল মনকে একেবারে ভরিয়ে দেবারই সম্ভাবনা। রতন একটা ছেলে, একটার পর একটা দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে কেবলই কেঁদেই চলেছে, সেটা বড়ো সুস্থ নয় ছোটদের পক্ষে। তবে পিতাকে রক্ষা করার জন্য পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা করার তার পণ এবং তার সেই পণকে সফল করে তোলার জন্যে ফেরিওয়ালা ছেলের দলের চেষ্টা, এইটেই সারা ছবিখানির মধ্যে ছোটদের মনে পৌঁছে দেবার মতো জিনিস। ছবি-খানির কলাকৌশলের কাজ বেশ ভাল। অভিনয়ের দিকটাও ভাল। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন মতিলাল, রোমি, আনওয়ার হোসেন, ইয়াকুব, পালসেকর, হরি শিবদশানি, সুলোচনা প্রভৃতি।

অমিয় চক্রবর্তীর শেষ ছবি

"কাঠ পুতলী"র সঙ্গে অনেককাল আগে নিউ থিয়েটার্সের তোলা "সাথী"র কাহিনী-গত মিল পরিলক্ষিত হয়, সেটা অমিয় চক্রবর্তীরই মূল পরকল্পনা ছিল, অথবা তিনি অসমাপ্ত রেখে মারা যাওয়াতে পরি-চালক নীতীন বসু ছবিখানি সম্পূর্ণ করতে এই মিল এসে গিয়েছে, সেটা বলা মুশকিল।

তবে দুজন কৃতীর কাজ নিয়ে যে ছবিখানি উপস্থিত হয়েছে, তা দোষেগুণে মাঝামাঝি শ্রেণীর ছবি। দোষের মধ্যে কষ্ট কল্পনার ভাবটাই বেশী। নৃত্যগীতবহুল ছবি এবং নাচ ও গানের ওপর থেকে কমনীয় মাধুর্য সরিয়ে অতি দ্রুত লয়ের সহযোগে উত্তেজক করে তোলার যে ধারা এখন চলছে, এখানে তার ব্যতিক্রম নেই। গল্প অনাথা মেয়ে পুষ্পাকে নিয়ে। পুতুলনাচের সঙ্গে এক-পাশে পুষ্পার গান ও নাচ নাট্য-প্রযোজক লোকনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। প্রথমে পুষ্পা রাজী হলো না থিয়েটারে যোগ দিতে, কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় শিবরাম পঙ্গু হয়ে পড়তে পুষ্পাকে রাজী হতে হলো। শিব-রামকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি সে রাখতে চায়। শিবরাম সুস্থ হয়ে উঠলেও পঙ্গু, পুতুল নাচানো আর চলে না তার দ্বারা। তবুও পুষ্পা তাকে বিয়ে করলে। লোক-নাথের নিজের বলতে ছিল একটিমাত্র ছেলে, বড়ো আদরের মা-মরা ছেলে। পুষ্পাও ছেলেটিকে স্নেহ না করে পারলে না। শিবরামের মনে সন্দেহ হলো, পুষ্পা তাকে বিয়ে করলেও আসলে ভালবাসে লোক-নাথকে। শিবরাম পুষ্পাকে থিয়েটার থেকে ছাড়িয়ে নিলে। ওদের একটি সন্তান জন্মালো। ইতিমধ্যে শিবরাম নিজে রোজগার করবে বলে একটা চাকরির খোঁজে গেল পাটনাতে। এদিকে লোকনাথের ছেলেটি

অসুখে মারা যাওয়াতে থিয়েটার উঠে যাবার উপক্রম হলো। লোকনাথের সহকারী পুষ্পার সাহায্য চাইলে লোকনাথের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে। নতুন এক নর্তকীর নাচ দেখিয়ে লোকনাথের মনে লোকের মনোরঞ্জনের নতুন পরিকল্পনা ধরিয়ে দিলে পুষ্পা। কিন্তু উদ্বোধন দিনে সে-নর্তকী টাকার পরিমাণ নিয়ে বেঁকে বসলো। পুষ্পার পক্ষে সে ঔদ্ধত্য সহ্য করা সম্ভব হল না, নিজেই সে অবতরণ করবে ঠিক করলে। এদিকে বাড়িতে শিবরাম এসে উপস্থিত এবং পুষ্পা আবার থিয়েটারে যোগ দিয়েছে শুনে শিশু-পুত্রকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হলো। পুলিসের সহায়তায় লোকনাথ তাদের সন্ধান পেলে এবং শিবরামের মন থেকে পুষ্পা সম্পর্কে মিথ্যা সন্দেহ দূর করতে সক্ষম হলো।

*　　*　　*

জনসাধারণকে যারা নিত্য আমোদ পরিবেশন করে তাদের মনের বিষাদ ও শ্রান্তি অপনোদন করে যায়, সেই সব প্রমোদ-প্রযোজক ও শিল্পীরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের শত দুঃখকষ্ট চাপা রেখেও যে কিভাবে কাজ করে যায়, তারই একটি অনুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টান্ত "কাঠপুতলী"। নতুন নয়, এ বক্তব্য অন্য ছবিতেও পাওয়া গিয়েছে, তবে এখানে পরিচালনগুণে বক্তব্যটি ফুটেছে আবেগময় হয়ে এবং লোকনাথের চরিত্রে বলরাজ সহানীর অভিনয়েও তা ফুটেছে মনকে স্পর্শ করার মতো হয়ে। তবে অসংগত হয়ে পড়েছে এই দিক থেকে যে, লোকনাথকে বলরাজ সহানী যে ধরনের একজন শিল্পসাধক দার্শনিক প্রকৃতির জনমনোরঞ্জনকারীর চরিত্রে রূপায়িত করেছেন, তার সংগে সেই লোকনাথেরই প্রযোজনায় উপস্থাপিত পুষ্পারূপী বৈজয়ন্তীমালা বা অপরা নর্তকীরূপে কমলা লক্ষ্মণের অতি দ্রুত লয়ের রতিবৈভবপূর্ণ ছন্দ ও ভংগীর নাচের যেন মিল থাকে না। গানও ঠিক তেমনিই অতি দ্রুত লয়ের, তবুও কয়েকখানি গান ভালই লাগবে। শংকর জয়কিষণের সংগত ওজনেও ভারি, মেজাজেও চড়া। অভিনয়ে শিবরাম চরিত্রে আছেন জওহর কৌল এবং হাসাবার জন্যে লোকনাথের সহকারীর চরিত্রে আগা। কয়েকস্থানে সেট বড়ো চোখে লাগে, রাস্তায় কাগজের স্ট্রীট-ল্যাম্পও ধরা পড়ে, বম্বাই ছবির ক্ষেত্রে এমনটা বড়ো দেখা যায় না। আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন এ বাবাসাহেব।

যদুভট্টের স্বহস্তলিখিত স্বরলিপি

মেদিনীপুর মিউজিক কলেজের অধ্যক্ষ ও যদুভট্ট সংগীত সম্মেলনের সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ সাহা যদুভট্টের হস্তলিখিত কয়েকটি গান ও স্বরলিপিসম্বলিত একখানি খাতা উদ্ধার করেছেন। মেদিনীপুরের জমিদার চৌধুরী যাদবেন্দ্রনাথ দাস মহাপাত্র তানসেনবংশীয় সংগীতজ্ঞ উজির আলি খাঁর (রামপুর) নিকট সংগীত শিক্ষা করেন। তৎকালীন ভারতের সকল বিশিষ্ট সংগীতশিল্পীই যাদবেন্দ্রনাথের পাঁচেটগড়ের প্রাসাদে পদার্পণ করতেন। যদুভট্টও তাঁর গৃহে প্রায়ই অতিথি হতেন। সর্বশেষ যেবার তিনি পদার্পণ করেন, সেই সময়েই এই স্বরলিপির খাতাখানি ফেলে যান। তদবধি খাতাখানি মেদিনীপুরের জমিদার-গৃহেই ছিল। সম্প্রতি শ্রীসাহা যাদবেন্দ্রনাথের পুত্র অনাদিনন্দনের কাছ থেকে পেয়েছেন। যদুভট্ট সেনী ঘরওয়ানার ধারক ছিলেন। শ্রীসাহা যদুভট্টের এই গানগুলির ব্যাখ্যা ও স্বরলিপি সমন্বিত একখানি পুস্তক প্রণয়নে সচেষ্ট হয়েছেন।

নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন

এলাহাবাদের প্রয়াগ সংগীত সম্মেলনের উদ্যোগে আগামী ৩রা থেকে ৫ই জানুয়ারী নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এর সংগে সংশিলষ্ট নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ২৯শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী। প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী ও আবেদনপত্র পাওয়া যাবে ১০৮ হিউয়েট রোড, এলাহাবাদে, প্রয়াগ সংগীত সমিতির অফিসে। পূর্বাঞ্চলের যোগদানকারীরা ১৫, যোগেশ মিত্র রোড, কলিকাতা-২৫,

শ্রীমতী পিকচার্সের "রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত"তে নামভূমিকায় সূচিত্রা সেন ও উত্তম কুমার

বাণী-বীথির সম্পাদক প্রণব রায়ের কাছ থেকে আবেদনপত্রাদি পেতে পারেন।

আলাউদ্দীন সংগীত সমাজ

গত ১৭ই নবেম্বর, ১৯৫৭ সন্ধ্যায় বালিকা শিক্ষাসদনে আলাউদ্দীন সংগীত সমাজের উদ্যোগে তৃতীয় বার্ষিক শিশু-প্রতিভা সম্মেলনের পুরস্কার বিতরণী সভায় বহু শিশু উচ্চাঙ্গ সংগীতের উৎকর্ষ প্রদর্শনে বিভিন্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়। এই উৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। প্রধান অতিথি সংগীতাচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসব উদ্বোধন করেন। জনাব আমিন আহেদ খান, সাধারণ সম্পাদক, ও সংগীতাচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণের পর সভাপতির ভাষণ হয়। সভাপতি বলেন, 'আজ যারা পুরস্কার পাচ্ছে না, তাদের বাইরের দিক দিয়ে মন খারাপ হতে পারে, কিন্তু তাদের ভেতরে যে প্রতিভা নেই, একথা ঠিক নয়। শিশুদের প্রতিভা জন্মগত, প্রতিভা নিয়েই তারা জন্মায়। প্রতিভা স্বভাবজাত, সুতরাং প্রতিভার বিকাশ সাধনা সাপেক্ষ, আবার প্রতিভার প্রকাশও বহুমুখী। সাংসারিক জীবনযাত্রার পথে সমস্ত কিছু কার্যের ভেতর দিয়েই প্রতিভার প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। বাহ্যিক ক্ষেত্রে শিশুদের প্রতিভাকে জাগাবার জন্য এবং নিঃসহায়দের সহায়তা করার জন্য অর্থ প্রয়োজন। প্রতিভা সম্মেলনের একটা ফাণ্ড থাকা দরকার এবং সকলের তরফ থেকে যে যা পারে, এতে জমা দেওয়া দরকার। তিনি নিজে এই ফাণ্ডে ৫১ টাকা দান করেন। সভাপতি আরও বলেন, 'বহু অনুর্বরা পতিত জমি পড়ে রয়েছে—চেষ্টার দ্বারা অনেক জায়গায় পাহাড়-পর্বত কেটেও উর্বরতা আনা হয়েছে। সেইরূপ প্রতিভা নিয়ে বহু শিশু অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে—তারা যদি সুযোগ-সুবিধা পায়, তাদের ভেতর হতেও প্রতিভার স্ফুরণ হবে। তিনি বলেন, সংগীত সর্বভাবেই আমাদের ভেতর আছে। হাসছে, খেলছে, বেড়াচ্ছে—সবটার মধ্যেই সংগীত—শুধু গানই সংগীত নয়। সুর সব সময়ই চলছে—আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে সব সময়ই জীবনভর আমাদের যে যা করছে সুরেই চলছে। শোক করে যে

কাঁদে, সেই কান্নার রোলেও সুর আছে—আবার হাসির রোলেও সুর আছে। সভাপতির ভাষণের পরে তিনি কৃতী শিল্পীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত সুধিবৃন্দকে তাদের শিল্পপ্রদর্শনে মুগ্ধ করে।

মার্কিন নিগ্রো সংগীতশিল্পী মেরিয়ান অ্যাণ্ডারসন

মার্কিন নিগ্রো সংগীতশিল্পী মেরিয়ান অ্যাণ্ডারসনের আজ জগৎজোড়া খ্যাতি। বিশ্বের প্রায় সকল দেশের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও অভিনন্দন লাভ করেছেন তিনি। প্রতিভা ও সাধনার মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে তাঁর জীবনে। কলকাতার অধিবাসীরাও তাঁর সংগীত উপভোগ করবার একটা সুযোগ পাচ্ছেন আগামী ২৪শে নভেম্বর। এশিয়া সফরে বেরিয়ে মেরিয়ান এবার এসেছেন ভারতে। মাদ্রাজ, বম্বাই ও নয়াদিল্লী পর্যটন শেষ করে তিনি আসছেন কলকাতায়। ইউ এস ইনফরমেশন সার্ভিসের উদ্যোগে রবিবার ২৪শে নভেম্বর সন্ধ্যা [illegible] মেরিয়ানের সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। [illegible] ও [illegible] সর্বসাধারণের [illegible] নির্দিষ্ট এক মণ্ডপে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেরিয়ানের জন্ম হয়েছিল ফিলাডেলফিয়ায় একটি দরিদ্র পরিবারে। যে যুগে তিনি জন্মলাভ করেছিলেন, নিগ্রো ধর্মসংগীত তখন সবে ইউরোপে যথেষ্ট প্রসার ও প্রচারলাভ করেছিল। নিগ্রো কণ্ঠশিল্পীরা যে নিগ্রো ধর্মসংগীতের বাইরে আর কিছু গাইতে পারেন, একথা তখন কেউ বিশ্বাসই করতে পারত না। বার্ট উইলিয়ামস ও জর্জ ওয়াকারের নিগ্রো সংগীতনৈশ নিগ্রো শিল্পীদের দৌলতে তখন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কোন নিগ্রো গায়ক তখন শুবার্ট, ব্রাহ্মস প্রমুখ সুরকারদের মহান সংগীতগোষ্ঠী নিয়ে সফলকাম হতে পারেন নি। এইরকম পরিবেশের মধ্যে আবির্ভাব হল মেরিয়ান অ্যাণ্ডারসনের। চিরাচরিত পথ ত্যাগ করে তিনি এগিয়ে এলেন নতুন পথে এবং অচিরেই প্রচুর যশ ও সম্মান লাভ করলেন। মেরিয়ানের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল অতি শৈশবেই। মাত্র ৮ বছর বয়সের শিশুর মুখে গান শুনে লোকে মুগ্ধ হয়েছে। ১৬ বছর বয়সে তিনি গির্জার প্রধান গায়কদলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাঁর পরম রমণীয় সুরেলা কণ্ঠস্বরের এমনই আকর্ষণশক্তি ছিল যে, তাঁর প্রথম শিক্ষিকা মিস পারিশ্রামিকেই তাঁর সংগীত-শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে নিউইয়র্ক ফিলহারমনিক প্রতিযোগিতায় তিনি ৩০০ প্রতিযোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৯৩০ সালে রোজেনওয়াল্ড বৃত্তি লাভ করে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হন। ইংলণ্ড, জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, জাপান—যেখানেই তিনি গিয়েছেন, সেখানেই তিনি সরকারী ও বেসরকারীভাবে সম্মানিত হয়েছেন। কোথাও পেয়েছেন সর্বোচ্চ সম্মান-পদক, কোথাও সম্মানসূচক ডিগ্রী, কোথাও বা নগদ অর্থ পুরস্কার। বিদেশের অকৃত্রিম প্রশংসা মাথায় নিয়ে নিজের দেশ আমেরিকায় ফিরে আসতে তাঁর খ্যাতিতে আমেরিকা-বাসীদের বুক গর্বে ভরে উঠল। হোয়াইট হাউসে সংগীত পরিবেশনের দুর্লভ সুযোগ তিনি লাভ করেছেন তিনবার। নিগ্রো শিল্পীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মেট্রোপলিটান অপেরায় অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। খ্যাতনামা সুরকার ও সংগীত পরিচালক আর্তুরো টসকানিনি ১৯৩৫ সালে সর্বপ্রথম মেরিয়ানের গান শুনে [illegible] ... [illegible] তিনি [illegible] একটি বৃত্তি গঠন করেছেন।

রবিশংকর ও আলি আকবরের দ্বৈত বাদ্য

আগামী ৩রা ও ৫ই ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ার মঞ্চে দীর্ঘকাল পর পণ্ডিত রবিশংকর ও ওস্তাদ আলি আকবরের দ্বৈত সেতার-সরোদ বাদ্যের আয়োজন হয়েছে। এঁদের একক বাজনা যথারীতি অবশ্য থাকবেই, তা ছাড়া অনুষ্ঠানে কণ্ঠ-সংগীতে অংশ গ্রহণ করছেন বম্বের লক্ষ্মীশংকর। তবলা সংগতে থাকবেন চতুর্লাল ও কানাই দত্ত।
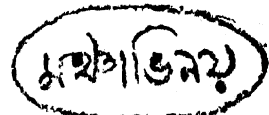
সৌখীন দলের কৃতিত্ব

একটা সময় ছিল যখন পেশাদার মঞ্চে অভিনীত নাটকের ওপরই সৌখীন দলের ঝোঁক নিবদ্ধ থাকতো। শুধু নাটক গ্রহণ করাই নয়, অভিনয়ও পেশাদার মঞ্চে যে চরিত্রের যেমনটি হতো সৌখীন দলের অভি-

অগ্রদূত পরিচালিত গেভাকলার চিত্র "পথে হল দেরী"তে সুচিত্রা সেন ও ছবি বিশ্বাস

নেতারা তারই অনুকরণ করতেন হুবহু। হয়তো শৌখীন দলের সংখ্যা এখন বহু সহস্র হওয়ায় এবং স্বভাবতই পরস্পর দলগুলি আলাদা আলাদা নাটক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় ইদানীং শৌখীন দলদের অনেককেই পেশাদার মঞ্চে অভিনীত হয়নি এমন নাটকও, এবং, সুতরাং সে সব নাটকের অভিনয়ে কিছু মৌলিকত্ব প্রদর্শনে ব্রতী হতে দেখা যাচ্ছে। এমনি একটি প্রচেষ্টা দেখা গেল গত ৮ই নভেম্বর বিশ্বরূপাতে জে এ সি এস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ দ্বারা। এদের মূল নাটক ছিল ডাঃ নীহার গুপ্ত রচিত "রাহুগ্রাস" যার নাট্যরূপ দান করেছেন শৈলেন ভট্টাচার্য। ক্রাইম-ড্রামা। আখ্যানবস্তু হচ্ছে দৈত-প্রকৃতির একটি চরিত্র নিয়ে। সামনে একরকম, কিন্তু আড়ালে এক পাষণ্ড। নাটকখানি রচনার দিক থেকে বিশেষ দুর্বল এবং উপস্থাপন ও আঙ্গিকের দিক থেকেও নানা ত্রুটিতে ভরা, কিন্তু কটি চরিত্রের অভিনয়গুণে নাটকখানি দেখবার কৌতূহল জাগে। মিঃ সিনহার দৈত-প্রকৃতির চরিত্রটিতে হিমাংশু দত্তের অভিনয় তাদের মধ্যে উল্লেখ করা যায়। তারই এক সহচর গোকুলের চরিত্রে পূর্ণেন্দু দত্তের অভিনয়েও কৃতিত্ব পাওয়া যায়। পরিচালক বিনয় মিত্রও তাঁর অভিনয়ে মিঃ সেনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে গীতা দের অভিনয়ই উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া, শৌখীন দলের অভিনয়ে সাজপোশাক ও রূপসজ্জাদি বিষয়ে সচরাচর যেমন ত্রুটি দেখা যায়, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। এদের অভিনীত দ্বিতীয় নাটকখানি ছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত "ভাড়াটে চাই"।

শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা সম্মান

মঞ্চমুকুরের উদ্যোগে শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা সম্মান প্রতিযোগিতায় প্রেরিত নাটকগুলির বিচার সমাপ্ত হয়েছে। বিচারের ফলাফল শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। মঞ্চমুকুর থেকে নাটকগুলি ফেরত নেবার জন্য রচয়িতাদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। ভবানীপুর, ৪২।১ হরিশ মুখার্জি রোডে মঞ্চমুকুরের কার্যালয় থেকে সকাল দশটার মধ্যে ফেরত পাওয়া যাবে।

শিশু রঙমহলের ষষ্ঠ বার্ষিক অনুষ্ঠান

শিশু রঙমহলের ষষ্ঠ বার্ষিক অনুষ্ঠান হবে আগামী ২০শে থেকে ২৯শে ডিসেম্বর। ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিশু-শিল্পীরা যোগদান করতে আসছেন। এবার সূচীতে থাকবে ছ'টি নৃত্যনাট্য, তিনটি পালা, পাঁচটি ছড়ার পালা, তাছাড়া অন্যান্য নৃত্য ও গীত। যেসব বিদ্যালয় যোগদান করতে চান, তাঁরা ৪, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৬ এই ঠিকানায় অনুষ্ঠান-সূচী সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন।

দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতি

গত বৎসরের মত এবারও দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতির তিনদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। আগামী ২০শে, ২১শে ও ২২শে ডিসেম্বর। প্রথমদিন 'বহুরূপী'র একটি নূতন নাট্য তাদের প্রখ্যাত শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত হবে, দ্বিতীয় দিন রবিশঙ্করের সেতার এবং তৃতীয় দিন কলকাতাও বম্বাইয়ের বিশিষ্ট শিল্পীদের রম্য-গীতির অনুষ্ঠান।

শিশু উৎসব

১৪ই নবেম্বর, সমবায় কৃষি ও শিল্প-মেলায় পার্কসার্কাস ময়দান) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মউৎসব উপলক্ষে 'ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির' কর্তৃক 'শিশু উৎসব' উদ্‌যাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের দ্বারা 'রামলীলা' ও 'নূতন প্রভাত' নৃত্য-নাট্য প্রদর্শিত হয়। পরিচালনা করেন—নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও সহকারী অরুণকুমার। প্রযোজনা করেন—স্বপ্না সেনগুপ্তা। কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন—সমর মিত্র, উমা মিত্র, স্বপ্না সেনগুপ্তা, অরবিন্দ মিত্র, নেপাল ঘোষ, 'সুর ও মালা'। 'নূতন প্রভাত' রচনা করেন প্রিয়তোষ মুখার্জী। সম্পাদনায়—অসিত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও উদ্বোধনের আসন অলংকৃত করেন; যথাক্রমে—জে সি গুপ্ত বার-এট্-ল, শংকরপ্রসাদ মিত্র বার-এট্-ল, সিদ্ধার্থশংকর রায় বার-এট্-ল, আইনসচিব, পশ্চিমবঙ্গ।

নতুন মহরৎ

আর্ট এণ্ড কালচার পিকচার্স, এবং শুধু আর্ট এণ্ড কালচার, বলা যায় না, এরা একই প্রতিষ্ঠান কি না, তবে এদের কার্যালয়ের ঠিকানা একই। গত ২৫শে অক্টোবর টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে এরা দুখানি ছবির মহরৎ করেন। প্রথম নামীয়রা মহরৎ করেন বেলা দুটায় "অগ্নিসম্ভবা" যার পরিচালক সুশীল মজুমদার এবং দ্বিতীয় নামীয় মহরৎ করেন বেলা ৫টায় "অনাগতা", যার পরিচালক উদয়ন। ১৭ই অক্টোবর কল্পতরু চিত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওতে মহরৎ করেন "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস"। রতন চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ছবিখানি পরিচালনা করবেন রাজকৃষ্ণ হাজরা ও সুখেন বসু। ৫ই নবেম্বর ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সোনালি প্রডাকসন্স "ছেলেধরা" নামে একখানি ছবির মহরৎ সম্পন্ন করেন। ছবিখানি পরিচালনা করবেন প্রভাত চক্রবর্তী। রূপজ্যোতির "ঠাকুর হরিদাস"-এর মহরৎ হয় গত ১৫ই নবেম্বর রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে। প্রযোজক গোবিন্দ রায় নিজেই ছবিখানি পরিচালনা করবেন।

পেশাদার খেলোয়াড়দের স্মরণীয় টেনিস খেলা

বিশ্ববিশ্রুত পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়রা কলকাতার সাউথ ক্লাবে দু'দিন প্রদর্শনী টেনিস খেলায় অংশ গ্রহণ করে দূরপ্রাচ্যের পথে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেছেন। পেশাদার খেলোয়াড়রা নানা জায়গায় খেলতে খেলতে এক রকম ঝড়ের বেগে কলকাতায় এসেছিলেন আবার ঝড়ের বেগেই কলকাতা ত্যাগ করেছেন। সোজা কথায়, খেলোয়াড়রা কলকাতায় এসে পৌঁছেছিলেন ১৬ই নভেম্বর তারিখের পূর্বাহ্নে। ঐ দিনই তারা খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। রাত্রিটুকু বিশ্রামের পর আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, পরের দিন দুপুর বেলা। এই দিনের খেলার পর আবার যাত্রা করেন দূরপ্রাচ্য অভিমুখে। তাই বলছিলাম খেলোয়াড়রা ঝড়ের বেগে কলকাতায় এসেছিলেন, ঝড়ের বেগেই কলকাতা ত্যাগ করেছেন। আবার খেলার মধ্যেও দেখিয়ে গেছেন, ঝড়ের গতি-বেগ আর উন্নত ক্রীড়াচাতুর্যের পরাকাষ্ঠা। সে ঝড়ের দোলা এবং ক্রীড়াচাতুর্যের অপূর্ব কলা এদেশের টেনিস-রসিক ক্রীড়ামোদিদের স্মৃতিপটে এখনও জেগে আছে, থাকবেও বহুদিন—বহুকাল।

সত্যই জ্যাক ক্রামার, কেন রোজওয়াল, লুই হোড এবং পাঞ্চো সেগুরা প্রদর্শনী খেলার মধ্যে যে সূক্ষ্ম-চাতুর্য এবং দ্রুত ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তুলেছেন—খেলার মধ্যে দেখিয়ে গেছেন যে, মাধুর্য-সুষমা কলকাতার টেনিস রসিকরা ইতিপূর্বে সে খেলা দেখার সুযোগ পেয়েছেন কি না সন্দেহ। অবশ্য দীর্ঘ ১৯ বছর আগে ১৯৩৭ সালে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে স্বীকৃত বিগ বিল টিলডেন ও ফ্রান্সের জগৎ বিখ্যাত খেলোয়াড় হেনরী কোশে টেনিসে পেশাদারবৃত্তি অবলম্বনের পর কলকাতায় খেলতে এসেছিলেন। তাদের সেই খেলার কথা টেনিস মহলে এখনও আলোচনার বিষয়বস্তু। কিন্তু টিলডেন ও কোশে যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তাদের টেনিস প্রতিভা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ফলে কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা এদের প্রতিভাদীপ্ত জীবনের খেলা দেখার সুযোগ পাননি। কিন্তু ক্রামার, হোড, রোজওয়াল এবং সেগুরা প্রত্যেকেই এখন গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে। এদের ক্রীড়াপ্রতিভার কথা নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন নেই। কেউ এমেচার জীবনে বিশ্ব-খ্যাতি অর্জন করে—কেউ-বা এমেচার জীবনে বিশ্বজয়ী হয়ে পেশাদারবৃত্তি অবলম্বন করেছেন। পেশাদার হয়ে খেলাকে করেছেন আরও উন্নত—আরও আকর্ষণীয়।
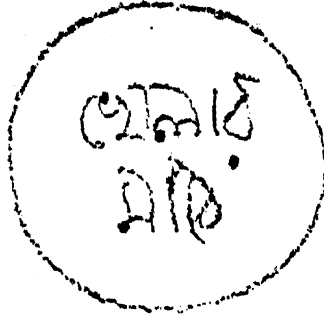
* * * *

এমেচার ও প্রোফেশনাল টেনিসে পার্থক্যও আকাশ পাতাল। কীর্তিমান এমেচার খেলোয়াড়দের বিজ্ঞানসম্মত খেলার মধ্যে যদি চারু-সুষমা ফুটে ওঠে, তবে প্রোফেশনাল খেলোয়াড়দের বিজ্ঞানসম্মত খেলার মধ্যে দেখা যায়, চারু-সুষমার চরম বিকাশ। সুচারু নৈপুণ্যে খেলা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। খেলার বিভিন্ন মারের মধ্যে হয়ে যায় বিজ্ঞানের দুরূহ নিয়মের নানা জটিল সমস্যার সহজ সমাধান। ক্রামার, হোড, রোজওয়াল, সেগুরা প্রত্যেকেই এই বিজ্ঞানসম্মত টেনিস খেলার নিপুণ শিল্পী। পেশাদার টেনিসের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় রিচার্ড গঞ্জালেস ছাড়া এদের দ্বিতীয় জুড়ি নেই। মাত্র কয়েক মাস আগে ওয়েম্বলীতে ইংল্যাণ্ডের পেশাদার টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের সেমি-ফাইনালে গঞ্জালেসকে আবার পরাজিত করেছেন সেগুরা। অপর সেমিফাইনালে ক্রামারকে হারিয়ে ফাইনালে সেগুরাকে হারিয়েছেন রোজওয়াল। সুতরাং পেশাদার

সাউথ ক্লাবের মনোরম সেণ্টার কোর্টে কীর্তিমান পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের ভাবময় খেলার দৃশ্য—ফটো দুলো মিত্র

পাঞ্চো সেগুরা ও জ্যাক ক্র্যামার
—ফটো দেশ

টেনিসের নিপুণ ও কীর্তিমান খেলোয়াড়দের মধ্যে এ'রা সুনিপুণ খেলোয়াড়। টেনিস বিশ্বে এ'দের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। চমকপ্রদ টেনিস খেলায় এ'রা সিদ্ধহস্ত এবং এ'দের খেলার উৎকর্ষতা সম্পর্কে কটাক্ষ করা ধৃষ্টতা একথা জেনেও বলছি, পেশাদার টেনিসের এই নিকষ্পদল অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও এমন খেলা দেখাতে পারেননি যার চেয়ে ভাল আর হয় না। পেশাদার খেলোয়াড়রা তাঁদের নয়নাভিরাম টেনিস চাতুর্যে দর্শকদের মন জয় করেছেন, মাঝে মাঝেও দেখিয়েছেন শিল্পীর দক্ষতা। তবুও চমকপ্রদ আরও কিছু দেখার প্রত্যাশী নিপুণ দর্শকের মনের কোণে একটুখানি অতৃপ্তি রয়ে গেছে।

পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের দলপতি হচ্ছেন জ্যাক ক্র্যামার। তাই পেশাদার টেনিসকে বলা হয় 'জ্যাক ক্র্যামারের টেনিস সার্কাস'। অর্থাৎ সার্কাস পার্টি যেমন চমকপ্রদ কলাকৌশল ও ভেল্কি দেখিয়ে দেশে দেশে ঘুরে অর্থ উপার্জন করে জ্যাক ক্র্যামারের পেশাদার দলও তেমন দেশে দেশে চমকপ্রদ টেনিস খেলা দেখিয়ে করেন প্রভূত অর্থ উপার্জন। টেনিসের সংগে সার্কাস কথাটি যুক্ত থাকায় খেলার মধ্যে ভেল্কির মত কিছু দেখার প্রত্যাশা করা অমূলক নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তেমন কিছু ভেল্কি দেখা গেছে কি? যা দেখা গেছে তা উন্নত ক্রীড়াচাতুর্যের নয়নাভিরাম ছলকলা আর শিল্পীর দক্ষতা। তবে একে যদি কেউ ভেল্কি বলে, আমার আপত্তি নেই।

কথা হচ্ছে ক্র্যামার, হোড, রোজওয়াল ও সেগুরার কাছ থেকে চমকপ্রদ আরও কিছু দেখবার সম্ভাবনা ছিল কি না? উত্তরে বলবো নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু না দেখার কারণও আছে। কারণ অবশ্য একটি নয়। একাধিক। প্রথমত, খেলোয়াড়রা মেশিন নয়—রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। দেহের ক্লান্তি আছে, খেলার উপর সংবেদনশীল মনের প্রভাব আছে, [illegible] আছে, আছে প্রতিনিয়ত খেলার ফলে দেহের অবসাদ। দ্বিতীয়ত, আবহাওয়া, পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা উন্নত ক্রীড়াচাতুর্য প্রকাশের সংগে অনেকখানি নির্ভরশীল। তৃতীয়ত, অচেনা দেশের অচেনা মাটির সংগে ক্রীড়াধারার সামঞ্জস্য করাও সময়ের প্রয়োজন। অবশ্য পেশাদার খেলোয়াড়রা বিশ্বের সব রকমের মাটির সংগেই পরিচিত। তবুও কলকাতায় আসার আগে এ'রা পাকিস্থানের 'সিমেন্ট'-কোর্টে দুদিন খেলে এসেছিলেন। সাউথ ক্লাবের বিশ্ববিখ্যাত সেণ্টার কোর্ট খুবই 'ফাস্ট'। কিছুটা অনুশীলন ছাড়া এই কোর্টে খেলতে গেলে মাঝের একটু তারতম্য সময়ের একটু হেরফের হওয়া খুবই স্বাভাবিক। হয়েছেও তাই। ফলে বিশ্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রা তাদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব সব সময় ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। তবুও যেটুকু ফুটিয়েছেন তার তুলনা নেই। ভারতের মাটিতে এ ধরনের খেলাও কোনদিন অনুষ্ঠিত হয়নি।

কোন একটি ভাল জিনিস দেখলেই আগের ভালর সংগে স্বাভাবিকভাবেই তার তুলনা এসে পড়ে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সময়ের সংগে সংগে অনেক কিছুই বদলে যায়। খেলার ধারা বদলায়, মানুষের রুচি বদলায়, খেলার মধ্যে দেখা দেয় বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল। টেনিস খেলারও ধারা বদলেছে, খেলার গতিবেগ বেড়েছে, খেলার মধ্যে হয়েছে বিদ্যুৎগতি সঞ্চারিত। এই গতিবেগের মধ্যে বলের পক্ষে বেশীবার এ কোর্ট ও কোর্ট করা সম্ভব নয়। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়ের র‍্যাকেটে বার কয়েক

কেন রোজওয়াল ও লুই হোড
—ফটো [illegible]

যা খেয়েই সে বল একটি পয়েন্ট [illegible] বাধা, সে পয়েন্ট যে খেলোয়াড়ের [illegible] অনুকূলে। তাই খেলার [illegible] অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। কলকাতার টেনিস ও [illegible] খেলা দেখার [illegible] সুযোগ হয়নি। [illegible] সে খেলাও দেখেছি এ খেলাও দেখলাম তাদের অভিমত—কেউ কম নয়। [illegible] দুটি একটি স্বাভাবিক [illegible], কেউ নতুন পুরোনো। তবে [illegible] অভিমত যে রোজওয়াল টেনিসের [illegible] শিল্পী।

• • •

পেশাদার খেলোয়াড়রা প্রতিদিন দুটি [illegible] সিংগলস এবং একটি করে ডাবলস খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিরতির সময়

'সাউথ ক্লাব কোর্ট ইজ দি ফাইনেস্ট কোর্ট অব দি ওয়ার্ল্ড'—জ্যাক ক্র্যামার
—ফটো মনো মিত্র

হয়, প্রথম দিন ১২৬ মিনিট খেলা হয়, দ্বিতীয় দিন খেলা হয় ১৫৯ মিনিট। প্রদর্শনী খেলার ফলাফল বড় কথা নয়। কে কেমন খেললেন সেইটাই বড় কথা। আগেই বলেছি চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ক্রীড়া-নৈপুণ্যে সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন অস্ট্রেলিয়ার অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি সাদাসিদে ধরনের চেহারাযুক্ত খেলোয়াড় কেন রোজ-ওয়াল। এর পরই প্রশংসা অর্জন করেছেন দলপতি জ্যাক ক্র্যামার। প্যাঞ্চো সেগুরার তেজোদৃপ্ত খেলাও দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। কিন্তু দর্শকদের কিছুটা নিরাশ করেছেন টপস্পীর দর্শ-নার এবং সদ্য উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন লুই হোড। অবশ্য টেনিস খেলার পাঠ্যপুস্তকে যত রকম মারের উল্লেখ আছে—যেমন ভলি, ড্রপ শট, পাসিং শট, গ্রাউণ্ড শট, স্লাইস, ড্রাইভ, ক্রসকোর্ট ড্রাইভ, অ্যাংগেলড ড্রাইভ, তা মারতে কেউই কসুর করেননি। তবু রোজ-ওয়ালের খেলা দর্শকদের তৃপ্তিদায়ক হয়েছে সবচেয়ে বেশী।

রোজওয়ালের 'ফোরহ্যাণ্ড মারে' যেমন সাবলীলতা, ব্যাকহ্যাণ্ডের তেমন রমণীয় ভঙ্গি। তেমনই চটুল পদক্ষেপ। ধীর স্থির অতি সাদাসিদে ধরনের চেহারা, কিন্তু এই ছোট্ট মানুষটির মধ্যে যে এত টেনিস প্রতিভা লুকিয়ে আছে খেলার আগে তা কারো জানবার উপায় নেই। কোন মারের কায়দাকানুন রোজওয়ালের অজ্ঞাত নয়, কোন মার প্রতিরোধ করাও এর পক্ষে অসাধ্য নয়। প্রয়োজনমত কোর্টের সর্বত্রই অবাধ গতাগতি। তবে ছুটোছুটির খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। মাথার বুদ্ধি আর খেলার নৈপুণ্যে রোজওয়ালের প্রতিপক্ষকেই ছুটোছুটি করতে হয় বেশী। রোজওয়াল দুদিনই চমৎকার খেলেছেন। প্রথম দিন স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেছেন হোডকে পরের দিন স্ট্রেট সেটে সেগুরাকে পরাজিত করে-ছেন। রোজওয়াল ও সেগুরার খেলা টেনিসের কলাচাতুর্যে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎকর্ষে দর্শকদের সবচেয়ে বেশী তৃপ্তি দিয়েছে। রোজওয়ালের খেলার মধ্যে সবাই প্রত্যক্ষ করেছে সুনিপুণ শিল্পীর দক্ষতা।

বিশ্বের টেনিস পণ্ডিতদের মতে ১৯৪৭ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন জ্যাক ক্র্যামার টেনিস সম্রাট টিলডেনের সমগোত্রীয় খেলোয়াড়। যুদ্ধোত্তর টেনিসে ক্র্যামারের মত প্রতিভাসম্পন্ন দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের সৃষ্টি হয়নি। ক্র্যামারের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি এসে পড়েছে, কিন্তু কালের রথচক্রে এর খেলা একটুকু নিষ্প্রভ হয়নি। বোধকরি এইজন্যই এক বিজ্ঞ ইংরেজ টেনিস সমা-লোচক 'রোলস রয়েস' গাড়ির সংগে ক্র্যামারের তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে কোন অবস্থার মধ্যে টপ্ গিয়ারে 'রোলস রয়েস' গাড়ি যেমন সাবলীলভাবে চলে যে কোন অবস্থায় ক্র্যামারের খেলাও তেমন সাবলীল। ক্র্যামারের হাতের ড্রাইভ চাবুকের মত। পাসিং শট দর্শক চোখের আনন্দদায়ক। সার্ভিস মাটি কাঁপান, কিন্তু সার্ভিস করার সময় ক্র্যামারের র‍্যাকেটের সাবলীল ভাব। কষ্ট বা শক্তিমত্তার চিহ্ন নেই। কোন কোন সার্ভিস মাটিতে পড়বার পর বল মাত্র ইঞ্চিখানেক উঁচু হয়ে সোঁ করে বেরিয়ে যায় প্রতিপক্ষের র‍্যাকেট চালাবার অনেক আগে। ক্র্যামারের মেদহীন লম্বা দেহ, কিন্তু সে দেহে ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যের ছাপ। চোখ কিছুটা কোটরাগত, কিন্তু সে চোখেও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। খেলার মধ্যেও বুদ্ধির ছাপ পরিস্ফুট।

সাউথ ক্লাবে ক্র্যামারের খেলার সময়ের একটি ছোট্ট ঘটনা: দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় সিঙ্গলসের খেলায় ক্র্যামারের সংগে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করছেন লুই হোড। অধীর আগ্রহে দর্শকরা খেলা দেখছেন। সহসা হোডের একটি সার্ভিস করা বল এসে লাগল কোর্টের পাশে পিতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট এক [illegible] শিশুর কপালে। শিশুর পিতা কোর্টের পাশে বসে খেলা দেখছিলেন। হয়তো সাউথ ক্লাবের কোন কেউকেটা হবেন। না হলে তিনি যেখানে বসেছিলেন সেটা সাধারণ দর্শকদের বসবার জায়গা নয়। যাই হোক, রোরুদ্যমান শিশুর অস্থিরতা দেখে ক্র্যামার খেলা ছেড়ে দৌড়ে এলেন শিশুর কাছে—একটা টেনিস বল তার হাতে দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন, শিশুর পিতাকে উপদেশ দিলেন, আহত স্থানে বরফ লাগাতে। তাই করা হল। শিশুর প্রতি এই মমত্ববোধের ফলে ক্র্যামারও দর্শকচিত্ত জয় করে নিলেন।

এবারের টেনিস জীবনে সেগুরা কোন বড় সাফল্য অর্জন না করলেও, ওয়েম্বলীর পেশাদার টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে সেগুরার কাছে পয়লা নম্বর পেশাদার খেলোয়াড় গঞ্জালিসের পরাজয় সেগুরার টেনিস জীবনের এক বড় কীর্তি। সেগুরা দক্ষিণ আমেরিকার ইকোয়েডরের অধিবাসী। দেখতে ঠিক ভারতীয় নাগরিকের মত। কালো চুল, শ্যামবর্ণ। পায়ের নিম্নভাগ ঈষৎ বক্র। একটু খুঁড়িয়ে চলেন। সেগুরার হাঁটাচলা বা খেলার মধ্যে টেনিসের সৌন্দর্য খুব বেশী নেই, কিন্তু সেগুরার মনের বল যেমন অদম্য খেলার মধ্যে শ্রমশীলতার শক্তি তেমন অপরিসীম। দুইদিনই সেগুরার খেলায় অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেছে। প্রথম দিন ক্র্যামারের সংগে দ্বিতীয় সেটের খেলায় সেগুরা এক সময় ১—৫ গেমে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত ৭—৫ গেমে সেট লাভ করেন। দ্বিতীয় দিন রোজ-

ওয়ালের সংগেও এর খেলায় পাওয়া যায় টেনিসের সূক্ষ্ম কলাকৌশল।
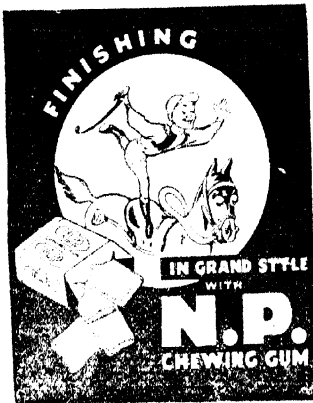
সেগুরো ফোরহ্যাণ্ডে বল মারবার সময় দুই হাতে র‍্যাকেটের হাতল ধরে সজোরে বল ড্রাইভ করেন। এর ফলে বলে তীব্র গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। অবশ্য দুই হাতে বল মারবার ফলে হাত খুব বেশী দূরে প্রসারিত হয় না। কিন্তু এতে সেগুরোর অসুবিধাও হয় না খুব বেশী। চটুল পদ-ক্ষেপে কোর্টের এক পাশ থেকে আর এক পাশে ছুটে ইনি সব বলেরই নাগাল পান। সেগুরোর বল প্লেসমেণ্ট খুবই ভাল। সব-চেয়ে ভাল এর টেনিস খেলার দৃপ্ত ভঙ্গিমা।

চারজন কীর্তিমান পেশাদার খেলোয়াড়ের মধ্যে দর্শকদের কিছুটা নিরাশ করেছেন উপর্যুপরি দু বছরে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান, এমেচার টেনিসের বিশ্বজয়ী খেলোয়াড় লুই হোড। দ্বিতীয়বার উইম্বলডন জয়ের পর যে বিপুল অর্থের বিনিময়ে হোড পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করেছেন আজ পর্যন্ত কোন পেশাদার খেলোয়াড়ই এককালীন সে অর্থ লাভ করতে পারেননি। ২৫ মাসের জন্য হোড পেয়েছেন ৫০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছ লাখ টাকা। এর উপর আবার লাভের অংশ আছে। কিন্তু আগেই বলেছি এমেচার ও প্রোফেশনাল টেনিসে বিরাট পার্থক্য। প্রোফেশনাল টেনিসে লুই হোডের মাত্র ৪ মাসের অভিজ্ঞতা। সব রকমের কোর্টে খেলাতে এখনও অভ্যস্ত হননি। তবে হোড যে অসামান্য টেনিস প্রতিভার অধিকারী নিপুণ হাতের কয়েকটি মারের মধ্যেই তিনি তার পরিচয় দিয়ে গেছেন। হোডের ব্যাকহ্যাণ্ড সত্যই দুর্বল, অবশ্য সতীর্থদের তুলনায়। কিন্তু ক্রসকোর্ট ফোর-হ্যাণ্ডের মার তুলনাহীন। সার্ভিসও মেদিনী কাঁপান, সার্ভিসের মধ্যে অসম্ভব 'স্পিন'। সত্যই 'পাওয়ার' টেনিস খেলেন লুই হোড।

মেদহীন কিন্তু পেশীবহুল সুঠাম চেহারা হোডের। চেহারার মধ্যে আভি-জাত্যের ছাপ। চুলের রং কটা ইংরেজীতে যাকে বলে 'গোল্ডেন হেয়ার'। সদা হাস্য-ময়। খেলার মধ্যে বেশ রসিকতাও আছে। প্রথম দিন ডাবলসের খেলার সময় সেগুরোর একটা সুতীব্র 'অ্যাংগেলড ড্রাইভ' হোড চেষ্টা করেও প্রতিরোধ করতে পারলেন না, বলটি কোর্টের মধ্যে পড়ে চাবুকের মত বেরিয়ে গেল, কিন্তু বল ফেরাতে অক্ষম হোড বল ফেরাবার প্রচেষ্টার মধ্যে হাতের একটি বল সেগুরোর দিকে আলতোভাবে ছুঁড়ে দিলেন, যেন তিনি র‍্যাকেট দিয়েই বল ফিরিয়ে দিয়েছেন; সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

প্রথম দিনের খেলার শেষে হোডের কাছে মাঠ এবং এখানকার আবহাওয়া সম্বন্ধে অভিমত জিজ্ঞাসা করেছিলাম। হোড হাসতে হাসতে উত্তর করেছিলেন, মাঠ চমৎকার— উইম্বলডন কোর্টের মত। আবহাওয়াও ভাল, খেলবার সময় শুধু একটু বেশী ঘামতে হয়। সাউথ ক্লাবের মনোরম সেণ্টার কোর্টকে অবশ্য দলপতি জ্যাক ক্রামার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস কোর্ট বলে অভিহিত করে গেছেন।

• • •

সাউথ ক্লাবের কোর্ট বিশ্বশ্রেষ্ঠ কিনা, সেটা বিশেষজ্ঞ খেলোয়াড়দেরই বিচার্য। তবে সাউথ ক্লাবের পরিবেশ এবং কোর্টের চেহারা যে মন-ভুলানো—সে বিষয়ে টেনিস অনভিজ্ঞের মধ্যেও সন্দেহের অবকাশ নেই। সত্যই সাউথ ক্লাবের কোর্ট তো নয় যেন একখানা সবুজ কার্পেট। তার উপর আলপনার রেখার মত টেনিসের মাপজোখ। বিচিত্র পোশাকআশাকে সজ্জিত তিনদিকের দর্শক গ্যালারীর মাঝখানে কোর্টটিকে মনে হচ্ছিল জলছবি ফ্রেমে আঁটা একখানি সুন্দর টেনিস কোর্টের ছবি।

পেশাদার খেলোয়াড়দের প্রদর্শনী খেলা এবং কোর্ট সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত বিষয়ই আলোচনা করা হয়েছে। এখন খেলার উদ্যোগ আয়োজন এবং দর্শক সম্পর্কে কিছু আলো-চনা না করলে লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পেশাদার খেলোয়াড়দের এই প্রদর্শনী খেলার প্রধান উদ্যোক্তা ভারতের ডেভিস কাপের খেলোয়াড় নরেশ কুমার। কয়েক মাস আগে ইউরোপ ও আমেরিকা সফরকালে নরেশ কুমার জ্যাক ক্রামারের সংগে এই খেলার ব্যবস্থা করেন। কোন এমেচার ক্লাব বা এমেচার সংঘের পক্ষে পেশাদার খেলোয়াড়-দের খেলার ব্যবস্থা করার অনেক বিধি-নিষেধ ও বাধাবিপত্তি আছে। তাই পৃথক-ভাবে এই খেলার ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য ব্যবস্থা তাঁরাই করেন, যাঁরা এমেচার টেনিসেরও হর্তাকর্তা।

কীর্তিমান পেশাদার খেলোয়াড়দের এই প্রদর্শনী খেলা দেখবার জন্য কলকাতা তথা সারা ভারতে অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছিল এবং টিকিট বিক্রীর জন্য কোন বিজ্ঞাপন না দেওয়া সত্ত্বেও ১০ টাকা, ১৫ টাকা এবং ২০ টাকার টিকিটের একটি দর্শক আসনও কোন দিন খালি ছিল না। টিকিটের অভাবে হতাশ হতেও হয়েছে বহুসংখ্যক দর্শককে। বোম্বাই, দিল্লী, এলাহাবাদ এবং কানপুর থেকেও মোটর গাড়ি করে অনেকে এসেছিলেন খেলা দেখতে। অবশ্য এ সব শহর সাউথ ক্লাবের অনেক ধনাঢ্য সভ্যের আবাসভূমি। সাউথ ক্লাবের সঙ্গে এঁদের নিয়তই একটা যোগাযোগ আছে। সোজা কথায় প্রদর্শনী টেনিস খেলায় উপলক্ষে সাউথ ক্লাবে পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা আর দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গের ধনাঢ্য টেনিস রসিকদের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল। তার সঙ্গে ছিল সাগর-পারের ভারত প্রবাসী টেনিস রসিকরা। আর ক্লাবের বাইরে ছিল নানা ধরনের মোটর গাড়ির সমারোহ। উডবার্ন পার্ক চত্বরে মোটর গাড়ির এক মেলা বসেছিল বললেও ভুল হয় না। অস্টিন, ভক্সহল, উস্‌লে, ফোর্ড, ফিয়েটের তো অভাব ছিল না; প্যাকার্ড, ক্যাডিলাক, মার্সিডেস, জাগুয়ারও ছিল অনেকগুলি; রোলসও দেখেছি কয়েকখানা।

প্রদর্শনী টেনিস খেলার ফলাফল যদিও গৌণ, তবুও ফলাফল উল্লেখ করছি।

প্রথম দিনের খেলা

প্রথম খেলায় কেন রোজওয়াল ৬—৩ ও ৬—৩ সেটে লুই হোডকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় খেলায় প্যাঞ্চো সেগুরা ৬—৪ ও ৭—৫ সেটে পরাজিত করেন জ্যাক ক্রামারকে।

ডাবলসের খেলায় ক্রামার ও সেগুরো ৬—৪ ও ৬—৪ সেটে কেন রোজওয়াল ও হোডকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলা

প্রথম খেলায় রোজওয়াল ৭—৫ ও ৭—৫ সেটে সেগুরোকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় সিংগলসে ক্রামার হোডকে পরাজিত করেন ৬—৩, ২—৬ ও ৬—৩ সেটে।

ডাবলসে হোড ও রোজওয়াল, ক্রামার ও সেগুরোকে ৬—২, ১—৬ ও ৬—৩ সেটে পরাজিত করেন।
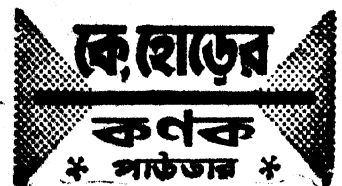
দেশী সংবাদ

১২ই নভেম্বর—অদ্য প্রাতঃকালে অনুমান ৬ ঘটিকার সময় বালিঘাট রেল স্টেশনের নিকট অপেক্ষমান একটি মালগাড়ির সহিত একটি যাত্রিবাহী ট্রেনের সংঘর্ষের ফলে একজন রেলগার্ড নিহত এবং তিনজন ফায়ারম্যান ও দুইজন যাত্রী আহত হন।

শিলচরের বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব মহেঞ্জোদড়োয় আবিষ্কৃত সীলমোহরসমূহের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার যুগের এই সীলমোহরসমূহের পাঠোদ্ধার এ যাবৎ সম্ভব হয় নাই।

১৩ই নভেম্বর—অদ্য লোকসভায় নীতি সম্পর্কিত এক সুস্পষ্ট বিবৃতিতে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন, পূর্ব পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কে ভারত সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন না।

বিদ্রোহী নাগাদের সহিত যোগসাজসের সন্দেহের অভিযোগে পুলিস আজ জোড়হাটের ইয়োরোপীয় চা-বাগানের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের কয়েকটি বাসভবনে তল্লাসী চালায়। পুলিস কিছু নথিপত্র হস্তগত করে বলিয়া প্রকাশ।

১৪ই নভেম্বর—অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী আজ লোকসভায় দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশসমূহ পেশ করিয়াছেন। তদনুসারে কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর আরও ৪৭ কোটি টাকা ভারতের ১৪টি রাজ্যকে দেওয়া হইবে। ইহার ফলে রাজ্যসমূহ কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে বার্ষিক প্রায় ১৪০ কোটি টাকা পাইবে। পক্ষান্তরে গত ৫ বৎসরে উহারা বার্ষিক ৯৩ কোটি টাকা পাইয়াছে।

অদ্য সকালে কলিকাতা হইতে প্রায় ৫৮ মাইল দূরে পূর্ব রেলওয়ের রানাঘাট বানপুর সেকশনের বগুলা স্টেশনে বানপুরে আপ লোকাল ট্রেনটি দুর্ঘটনায় পতিত হয় এবং তিনজন যাত্রী [illegible] আহত হন।

১৫ই নভেম্বর—অসামরিক বিমান পরিবহন [illegible] শ্রীমুহিউদ্দিন কবীর গতকল্য লোকসভায় [illegible] এয়ার লাইন্স কর্পোরেশনের চতুর্থ [illegible] রিপোর্ট পেশ করেন। উহা হইতে দেখা [illegible], ১৯৫৬-৫৭ সালে এয়ার ইণ্ডিয়া [illegible] ৩৮ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা [illegible] এবং ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স কর্পো[illegible] ১ কোটি ৮ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা [illegible] হইয়াছে।

[illegible] সরকার উদ্বাস্তু ছাত্রদের সাহায্যার্থ [illegible] রাজ্য সরকারকে মোট টাকা বরাদ্দের [illegible] করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্য সরকার [illegible] কোটির অধিক টাকা পাইবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাইবেন শতকরা ৮০ ভাগ।

১৬ই নভেম্বর—দেশের বৈষয়িক অবস্থা পর্যালোচনা ও কয়েকটি সাংগঠনিক বিষয়ের [illegible] শ্রী [illegible] নেহরুর বাসভবনে কংগ্রেস [illegible] কমিটির [illegible] বৈঠক আরম্ভ হয়। উহাতে যে [illegible] আলোচনা হয়, তাহাতে বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি ও বিশেষ করিয়া কয়েকটি অঞ্চলে নিদারুণ খাদ্যাভাবের বিষয় প্রাধান্য লাভ করে।

১৭ই নভেম্বর—দেশের খাদ্যাভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে একটি জরুরী কর্মসূচী গ্রহণান্তে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন অদ্য সমাপ্ত হয়।

প্রকাশ, কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ আজ স্থির করিয়াছেন যে, শ্রী ইউ এন ধেবর আরও দুই বৎসরের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের ঋণ দিবার জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের জন্য দেড় কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

১৮ই নভেম্বর—জানা গেল, অদ্য এখানে রাজ্য-অর্থমন্ত্রী সম্মেলনে বস্ত্র চিনি ও তামাকের উপর বিক্রয় করের পরিবর্তে এক অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক ধার্যের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহার ফলে আগামী বৎসর হইতে দেশের অনেক অঞ্চলের [illegible] উক্ত তিনটি [illegible] জন্য [illegible] কম অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

[illegible] ঘোষণা করার [illegible] বিভিন্ন অঞ্চল হইতে [illegible] পাঁচ সহস্রাধিক গ্রামবাসী [illegible] বিধান [illegible] সম্মুখে প্রায় [illegible] করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বিদেশী সংবাদ

১২ই নভেম্বর—গতকল্য [illegible] কাশ্মীর সম্পর্কে [illegible] হইতে শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন [illegible] দূরীভূত হইতে পারে, কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে যে [illegible] সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া [illegible]।

[illegible] রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণের নিকট হইতে জানা যায়, আওয়ামী লীগ নেতা শ্রীসুরাবর্দী [illegible] প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ করিয়া পাকিস্থান রিপাবলিকান পার্টি মুসলিম লীগের সহিত মিলিয়া কেন্দ্রে কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট গঠন করায় উক্ত রিপাবলিকান পার্টির সদস্যগণ [illegible] হইয়া পড়িয়াছেন।

১৩ই নভেম্বর—পাকিস্থান সরকার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত আবাসস্থল "শিলাইদহ কুঠিবাড়ি" এবং পূর্ব পাকিস্থানের কুষ্ঠিয়ায় তাঁহার সম্পত্তি রক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

১৪ই নভেম্বর—৩১০ বৎসর পরে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জামাইকা স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিয়াছে। এতকাল এই উপনিবেশটি ছিল বৃটিশ নিয়ন্ত্রণাধীনে।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন গতকল্য নিরাপত্তা পরিষদকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারত যে সমস্ত তথ্য পেশ করিয়াছে, তাহা বিবেচনা না করিয়াই নিরাপত্তা পরিষদ যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তবে 'আগুন লইয়া খেলা করা হইবে।'

১৫ই নভেম্বর—ফরাসী কর্তৃপক্ষ মহলে আজ জানা গেল যে, টিউনিসিয়াকে সমরাস্ত্র সরবরাহ করার বিরুদ্ধে ফ্রান্স আজ বৃটেনের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে। বৃটেন হইতে প্রেরিত এই চালানে ছোটখাট অস্ত্রের অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে এবং উহা "প্রতীক" হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

অদ্য রাষ্ট্র-দপ্তর হইতে বলা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট প্রস্তাব করিয়াছে যে, উভয় দেশের অভ্যন্তরে পরস্পরের পক্ষে যে সকল এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ আছে, উভয় পক্ষ কর্তৃক সেই ব্যবস্থা রহিত করা হউক।

১৬ই নভেম্বর—[illegible] নেতা ও পাকিস্থান জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা খাঁ আবদুল গফুর খাঁ পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত [illegible] পশ্চিম পাকিস্থানে এক ইউনিট বহাল রাখিতে [illegible], তিনি [illegible] বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিবেন।

[illegible] "[illegible]" জন্য [illegible] নির্বাচনী [illegible] লাভ করিবে [illegible] পাইবে।

১৭ই নভেম্বর—[illegible] এই মর্মে সংবাদ [illegible] যে, মার্কিন [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] বিশ্লেষণ [illegible] জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন [illegible] অপেক্ষাকৃত [illegible] জন্য একটি [illegible] পাড়িয়া তুলিয়াছে।

১৮ই নভেম্বর—ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে [illegible] বিরোধ রহিয়াছে, সে [illegible] প্রথম [illegible] একটি [illegible] বৈঠক হইবে বলিয়া [illegible] জানা গিয়াছে।

[illegible] সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটিতে মার্কিন প্রতিনিধি বলেন যে, উত্তর কোরিয়া [illegible] যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গ করিয়া [illegible] সামরিক শক্তি সন্নিবেশ করিয়াছে।

ভারত ও পাকিস্থানের বিভিন্ন নির্দিষ্ট [illegible] যে সকল ধর্মস্থান রহিয়াছে, সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারত সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, পাকিস্থান সরকার তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা যান্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা যান্মাসিক ১১ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত.

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

DESH 40 Naye Paisa
Saturday, 30th November, 1957.

শনিবার, ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ
২৫ বর্ষ ॥ ৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা

আচার্য জগদীশচন্দ্র

১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে, আজ হইতে ঠিক ৯৯ বৎসর আগে আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কেবল বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ নন, এদেশের প্রাচীন বিজ্ঞান সাধনার লুপ্তপ্রায় প্রবাহকে তিনি পুনরায় বহমান করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে জনৈক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপক বলিতেছেন—"দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ভারতবর্ষে এক অন্ধকারময় যুগ দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা বন্ধ হল, বিজ্ঞান অনুশীলনের ধারা ক্ষীণ হয়ে এল।......যে-ভারত একদিন বিজ্ঞান আলোচনায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিল, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তার আর সে স্থান রইলো না।......মৌলিক গবেষণা ব্যাপারে দীর্ঘকালব্যাপী অন্ধকারের পর এদেশে উষার নবারুণ রেখা দেখা দিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। এ সম্বন্ধে গৌরবময় অতীতের সঙ্গে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের যোগসূত্র যাঁরা স্থাপন করলেন জগদীশচন্দ্র বসু তাঁদের অগ্রণী।"

উক্ত লেখক বলিতেছেন যে, জগদীশচন্দ্রের বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হইলে ফরাসী বিজ্ঞান সভার সভাপতি তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন —"আপনার আবিষ্ক্রিয়া দিয়ে আপনি বিজ্ঞানকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছেন। দু হাজার বছর আগে আপনার পূর্বপুরুষ মানবসভ্যতার অগ্রণী ছিলেন, আর বিজ্ঞানে ও কলাবিদ্যায় জ্ঞানের তীব্র আলো জগতের সামনে প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের গৌরবকীর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করুন।"

পদার্থ বিদ্যায় ও জীবোদ্ভিদ বিদ্যায় জগদীশচন্দ্রের অবিস্মরণীয় দান রহিয়াছে। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় দান অন্যত্র। তিনি ভারতের প্রাচীন মৌলিক গবেষণা ধারার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, দেখাইয়াছেন যে বর্তমান ভারত সে যুগের ভারতের যোগ্য উত্তরাধিকারী, দেখাইয়াছেন যে পরাধীন ভারত বিজ্ঞান সাধনায় পুরোধা পাশ্চাত্যের পার্শ্বে গৌরবের আসন সংগ্রহ করিতে সক্ষম। নিজের দৃষ্টান্তে বিজ্ঞানসেবী ভারতবাসীর মনে তিনি আশা ভরসা ও উৎসাহ জাগাইয়া দিয়াছেন। এ দান ও দৃষ্টান্ত ভারতের বর্তমান ইতিহাস সগৌরবে বক্ষে ধারণ করিয়াছে। আর সেই বলে বলীয়ান হইয়া অনুগামী ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ সগর্বে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন যাঁহাদের কীর্তি স্মরণীয়, জগদীশচন্দ্রের ক্ষেত্রে তিনি নিজেই স্মরণীয়। ভারতবাসীর সেই শুভ স্মরণের দিন আজ। আমরা আশা করিতেছি, আগামী বছর যখন তাঁহার জন্মদিনের শতক পূর্ণ হইবে তখন আচার্যদেবের জন্মদিন সমগ্র ভারতবাসী যথাযোগ্যভাবে উদ্‌যাপন করিয়া গুণানুকীর্তনের দ্বারা তাঁহার ঋণ কতক পরিমাণে পরিশোধ করিবে।

শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ চালনার উদ্দেশ্যে একটি নূতন বিল বিধানসভায় উপস্থাপিত হইবে। পর্ষৎ পরিচালনার পুরাতন আইনের সঙ্গে বর্তমান বিলের একটি মূলগত প্রভেদ আছে এবং সেটি গুরুতর। বর্তমান বিলের উদ্দেশ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ চালনা বিষয়ে সরকারকে পরামর্শদান। অর্থাৎ নূতন বিল অনুসারে গঠিত পর্ষৎ সরকারের উপদেষ্টা মাত্র। নূতন বিল গৃহীত হইলে সরকার প্রত্যক্ষত ও স্পষ্টত মধ্যশিক্ষার নীতি-নির্ধারক ও চালক হইবেন, পর্ষদের সদস্যগণ পরামর্শদাতা সাজিয়া সদস্য-জীবন যাপনের ফাঁকা গৌরব লাভ করিবেন। বিলের এই মূল উদ্দেশ্য শিক্ষানীতির পক্ষে তথা মধ্যশিক্ষানীতির পক্ষে হানিকর বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কোন ক্ষেত্রেই শিক্ষার উপরে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মধ্যে আমরা নই। ঠিক এই কারণেই কেরল শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছিলাম। (পঃ বঙ্গে যাঁহারা কেরল শিক্ষা বিল সমর্থন করিয়াছিলেন, আশা করি এবারে তাঁহারা নূতন মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিলটির প্রতিবাদ করিবেন না) এবং সেই একই কারণে আমরা নূতন মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিলের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সুকুমার বিষয়ের উপরে স্থূল হস্তাবলেপ নিতান্ত ক্ষতিকর। 'টোটালিটেরিয়ান' রাষ্ট্রসমূহ এ নীতি মানিয়া চলে না, কারণ সেসব স্থানে সরকার একমাত্র 'পুরুষ' আর সমস্তই গোপীভাবাপন্ন। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেখানে বিভিন্ন স্বার্থকে সমন্বিত করিয়া চালনাই লক্ষ্য, সেখানে শিক্ষায় 'স্বার্থ' নাশ নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। ইহাতে সরকারের

আধিপত্য বাড়িতে পারে, কিন্তু শিক্ষার মানোন্নতি না কমিয়া পারে না।

পশ্চিমবঙ্গে যে কয়টি ভূশণ্ডির মাঠ আছে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ তন্মধ্যে প্রশস্ততম। আজ কয় বৎসর ধরিয়া এখানে যে ভৌতিক কাণ্ড চলিতেছে তাহার ফলভোগ করিতেছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-সমাজ। নূতন বিলে ভৌতিক নৃত্যের অবসান ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না—বরঞ্চ ইহাতে ভূশণ্ডি মাঠের বিস্তার আরও বাড়িবার আশঙ্কা। মধ্যশিক্ষা এ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ও জটিলতম সমস্যা অথচ এ বিষয়ে এমন উদাসীন ও যথেচ্ছাচার সত্যই উদ্বেগজনক। আমাদের প্রস্তাব, সরকার মধ্য শিক্ষা পর্ষৎকে স্বাধীন করিয়া দিন, তবে লক্ষ্য রাখুন যেন সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার না ঘটে। যেমন [illegible] সরকারের হস্তক্ষেপের পরেও [illegible] মনে করিবেন না। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমিষ ও নিরামিষ ভোজন

সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল নিরামিষাশী সম্মেলনের সভাপতি শ্রীশান্তিপ্রসাদ জৈন বলিয়াছেন যে, নিরামিষ আহারে মানুষের মনুষ্যত্ব এবং সর্বশেষে জাতিতে জাতিতে শান্তি ও মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করে।

শান্তি ও মৈত্রীর রহস্য এই সকল তত্ত্বকথা সঙ্গে বুঝি না। তিনি আরও বলেন যে, অহিংসাবাদের আদর্শ রক্ষার স্বার্থেই লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী নিরামিষ ভোজনে বিশ্বাসী। কিন্তু এ যুক্তি কি সত্য হয়? বহুযুগসম্পন্ন ভারতবাসী প্রায় হাজার বছর পরাধীন ছিল কেন? কেহ যদি বলে যে, তথাকথিত অহিংসাবাদীদের নিরামিষ ভোজনের ফলেই এমন ঘটিয়াছে! বস্তুত অনেকেই এ কথা বলিয়া থাকেন। আমাদের বিশ্বাস, নিরামিষ ভোজনের সহিত বিশ্বশান্তি, মৈত্রী ও অহিংসার প্রত্যক্ষ কোন যোগ নাই। শুনিয়াছি যে, হিটলার নিরামিষভোজী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অহিংস বলিয়া খ্যাতি আছে কি? আসল কথা, বিষয়টিকে আত্মিক দৃষ্টিতে না দেখিয়া বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্যের মাপকাঠিতে বিচার করিতে হইবে। যাহার বা যে জাতির যে শ্রেণীর খাদ্যে সন্তোষ ও পুষ্টিসাধন হয়, তাহাই তাহার বা সেই জাতির শ্রেষ্ঠ খাদ্য। ভারতবর্ষের আবহাওয়া, কৃষিপ্রধান, লোকাচার প্রভৃতি অনেকাংশে নিরামিষ ভোজনের পরিপোষক—এবং নিরামিষ ভোজনের পক্ষে ইহাই যথার্থ যুক্তি। নদীবহুল বাঙলা দেশে সহজে ও সুলভে প্রাপ্য মাছ স্বভাবতই বাঙালীর প্রিয় খাদ্য—মৎস্য ভোজনের পক্ষে ইহাই যথার্থ যুক্তি। ইহার মধ্যে বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমৈত্রী প্রভৃতি বৃহৎ ভাব টানিয়া আনিলে কুনীতির ও কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

নিরানন্দ গৃহ

সিনেমায় অভিনেত্রীরূপে গৃহীত হইবার আশায় কিশোর-কিশোরীদিগের ব্যাপক গৃহত্যাগ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এ সংবাদ নূতন নয়, মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু আলোচ্য রিপোর্টের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে গৃহত্যাগী কিশোর কিশোরীর বিস্তৃত সংখ্যার আভাস দেওয়া হইয়াছে। রিপোর্টটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, গৃহত্যাগীদের সমাজের কোন একটি স্তরে সীমাবদ্ধ নাই। ধনী মধ্যবিত্ত, অল্পশিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর ঘর হইতেই কিশোর-কিশোরীগণ সিনেমার স্বর্ণ মরীচিকার প্রলোভনে গৃহত্যাগ করে। অর্থের অভাব কিম্বা শিক্ষার প্রভাব বা শিক্ষার অভাব কারণ বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। আর প্রকৃত কারণ না জানিলে যখন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, তখন তাহারই সন্ধান প্রথমে কর্তব্য।

সত্য কথা বলিতে কি, বর্তমানকালে সিনেমার তারকাগণের যেরূপ খ্যাতি ও সম্মান, তাঁহাদের জন্য বিপুল অর্থের যে জনশ্রুতি, এরূপ বোধ করি আর কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের নয়। শত শত সিনেমা-পত্রে তাঁহাদের চাঞ্চল্যময় নট-জীবন প্রচারিত হইতেছে। সংবাদপত্রাদিতে তাঁহাদের চিত্র প্রকাশিত হইতেছে, দিল্লীর রাষ্ট্র-দরবারে এবং অন্যান্য প্রাদেশিক রাজধানীর রাষ্ট্র-দরবারে তাঁহারা যে প্রভূত সম্মানের অধিকারী হইতেছেন, সবসমেত মিলিয়া তারকাগণের নামের একটা glamour বা চাকচিক্য জড়িত যে, সেই মোহ হইতে অপরিণতবয়স্কগণের আত্মরক্ষা করাই কঠিন, কিশোর-কিশোরীগণের কাঁচা মাথা ও অনভিজ্ঞ বুদ্ধি বিচলিত হইবে, তাহা আর এমন বিস্ময়ের কি! কিন্তু এই চাকচিক্যের হাতছানিতেই যে সকলে গৃহত্যাগ করে এমন আমরা মনে করি না। বাহিরের এই আকর্ষণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি গৃহে থাকিলে দু'য়ে কাটাকাটি হইয়া যাইত, গৃহত্যাগ ঘটিত না। আমাদের বিশ্বাস, ব্যাপক গৃহত্যাগের অন্যতম প্রধান কারণ নিরানন্দ গৃহ। এই কারণের তাড়নায় সব সময়েই কিছু কিছু কিশোর-কিশোরী বা বালক বালিকা গৃহত্যাগ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র-অঙ্কিত বালক মুচিরাম নিরানন্দ গৃহের পরিস্থিতি এড়াইবার জন্যই যাত্রাদলে যোগ দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'পণরক্ষা' গল্পের বালক নায়ক সার্কাস দলে যোগ দিয়াছিল এই একই কারণে। তবে সে সময়ে যাত্রা ও সার্কাসের এরূপ জলুস না থাকায় গৃহত্যাগীর সংখ্যা নগণ্য ছিল। এখন সংখ্যা বিপুলতায় পৌঁছিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, বাঙলা দেশের (তথা সমস্ত দেশেরই) গৃহ ক্রমেই অধিকতর নিরানন্দময় হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহার ফলেই গৃহের আকর্ষণ দুর্বল হওয়ায় বাহিরের প্রলোভনের আকর্ষণের কাছে কিশোর-কিশোরীগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছে। এখন বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের অনেক পরিবারেই পিতা ও মাতা দুইজনেই কাজে বাহির হইয়া যান। (এই সংখ্যা ক্রমে আরও বাড়িবে) ছেলেমেয়েরা সারাদিন কি করে জানিতে পারেন না। [illegible] শয়ন-গৃহ শয়নের আশ্রয় হইয়া ওঠে। ধনী-গৃহের পিতা ব্যবসায়ে বা অন্য বিষয়কর্মে নিযুক্ত, ঘরের খবর লইবার সময় তাঁহার নাই; মাতা খুব সম্ভব [illegible] ও সভা-সমিতি লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারও সময় সংকীর্ণ। মধ্যবিত্ত ও ধনীগৃহের অবস্থা যদি এইরূপ হয়, তবে দরিদ্রদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এর পর বিদ্যালয়গুলি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অধিকাংশ বিদ্যালয় 'হরি ঘোষের গোয়াল' বিশেষ; সেখানে আদর-অনাদরের হিসাব শিথিল; এরূপ অবস্থায় কি আর আশা করা যাইতে পারে! একদিকে গৃহ আনন্দহীন, তত্ত্বাবধান করিবার চোখ সেখানে অর্ধনিমীলিত বা মুদিত, অন্যদিকে সিনেমা-জগতের চাকচিক্যময় আকর্ষণ! গৃহত্যাগীর সংখ্যা না বাড়িবে কেন! তার উপরে আবার এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে নব-গজায়িত একদল দালাল। সিনেমায় ঢুকাইয়া দিবার প্রলোভনে কিশোরী হরণের সংবাদ বিরল নয়। অবস্থা বেশ জটিল। জটিল সমস্যার সরল সমাধানে আমাদের বিশ্বাস নাই। কাজেই, আমাদের বর্ণিত মূল কারণ যদি সত্য হয় (আমাদের বিশ্বাস সত্য) তবে সেখানে প্রথমে প্রতিকারে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। গৃহ যদি অধিকতর আকর্ষণে পূর্ণ হয়, বিদ্যালয়গুলি যদি একাধারে বিদ্যার ও আনন্দের ক্ষেত্র হয়, তবে সিনেমা-জগতে প্রবেশের প্রতিষেধক শক্তি সৃষ্টি হইয়া সমাজকে এই আত্মবিপ্লব হইতে রক্ষা করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

[পঁচিশ]

সড়কে দাঁড়িয়ে তাকালে সবার আগে চোখে পড়বে গির্জাবাড়ির চূড়া, তারপরেই চোখে পড়বে তিন হাত উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা সমাধিভূমি। সারি সারি, আবার এদিকে ওদিকে ছড়ানো যত ঢিবি, ঢিবিগুলির উপর কাঠের ক্রস। কোনটা হেলে পড়েছে, কোনটা ক্ষয়ে গিয়েছে, আবার খাড়া দাঁড়িয়ে আছে কোনটা। সমাধিভূমির ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে গেলেই প্রথমে যে ছায়াময় প্রকাণ্ড একটা আমগাছ চোখে পড়ে, সেটাই বোধ হয় এই সমাধিভূমির সব গাছের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সের গাছ। এবং সে গাছের কাছে পাথর বাঁধানো যে সমাধি আজও শক্ত হয়ে বসে আছে, সেটাই হলো সবচেয়ে পুরনো সমাধি। সমাধির পাথরের বুকের উপর লেখা আছে সমাহিতের নাম, ফাদার হার্নে।

ফাদার হার্নের নাম নিয়ে পঞ্চাশ বছর আগে গড়ে উঠেছিল যে হার্নগঞ্জ, তারই আজকের নাম হারানগঞ্জ। ডাঙ্গার পর ডাঙ্গা পার হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে ফাদার হার্নের পঞ্চাশ বছর আগের স্বপ্নের উপনিবেশ। একটা কনভেন্ট আছে। দুটো স্কুল আছে। একটা অনাথবাড়ি আছে। আর আছে একটা কুষ্ঠী আশ্রম, লেপার আসাইলাম।

এক একটা ডাঙ্গার বুকের উপর এক একটা বসতির রূপও চোখে পড়ে। লাল খাপরার চালা আর চুনকাম করা দেয়াল, ছোট ছোট ঘরগুলি পরিষ্কার ছকের ছবির মত ফুটে রয়েছে। এইসব ঘরে যারা থাকে, তারা সবাই খিরিস্তান। প্রতি রবিবারের সকাল বেলায় গির্জাবাড়ির ঘণ্টা যখন ডিং ডাং করে বাজতে থাকে, তখন এইসব ঘরের ভিতর থেকেই ছোট ছোট ভিড় বের হয়ে আসে আর প্রেয়ার সাধবার জন্য গির্জাবাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

এরাও চারদিকের নানা গাঁয়ের নানা জাতের মানুষ। কিন্তু সেইসব গাঁয়ের আর জাতের স্মৃতি ওদের জীবন থেকে মুছে গিয়েছে। আজ ওরা শুধু হারানগঞ্জের মানুষ। একই বিশ্বাস, একই আশ্বাস আর একই প্রীতির শাসনে ঘষামাজা একটা নতুন জীবনের মানুষ। ওদের জীবন মাটি-কোপানো আর লাঙ্গল-ঠেলা জীবন নয়।

সকাল হতে কিংবা দুপুর হতেই ওরা সাইকেলের সওয়ার হয়ে চারদিকের দু ক্রোশ তিন ক্রোশ পথ পার হয়ে চলে যায় মতিডিহিতে রেলওয়ের মেরামতি কারখানায়, এজরা ব্রাদার্সের যত কয়লা খাদের কল-ঘরে, রামনগরের পটারিতে, আর কালিয়াবাগের ফ্যাক্টরীতে। সুবিধার কথা, এইসব কল খাদ আর কারখানার বিলাতী মালিকেরা আজও হারানগঞ্জের মানুষকে কাজ দিতে আর কাজের সুবিধা করে দিতে

ভুলে যান না। তাছাড়া, যে সিস্টার ম্যাকমিলেনের স্নেহে হারানগঞ্জের খিরিস্তান কলোনি আজও লালিত হয়ে চলেছে, তাঁর ইচ্ছার সুপারিশও কেউ তুচ্ছ করতে পারেন না। সিস্টার দিদির এক চিঠিতে একদিনেই চাকরি হয়ে যায়, এই কথা এই কলোনির বাইরের মানুষও জানে।

খিরিস্তান হোক বা অখিরিস্তান হোক, সিস্টার দিদিকে কে না শ্রদ্ধা করে? কে তুচ্ছ করতে পারে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব? এই হারানগঞ্জকে এবং এই হারানগঞ্জের চারদিকের অন্তত পঞ্চাশটি গাঁয়ের ঘরে ঘরে যেয়ে সুখদুঃখের খবর নিয়ে জীবনের তিরিশটা বছর এখানেই পার করে দিলেন তিনি, তাঁর মুখে সদা-সর্বদা একটা ক্লান্তি-হীন আনন্দের শান্ত হাসি লেগেই রয়েছে এবং সে হাসি দেখলে নিতান্ত অখিরিস্তান অভক্তের মনও ভক্তি দেখা না দিয়ে পারে না। সদরের সরকার থেকে শুরু করে থানার কনস্টেবল পর্যন্ত সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে এবং একটু ভয়ও করে বোধ হয়। ঝড় বাদলের দিনেও যখন সত্তর বছরের বৃদ্ধা সিস্টার ম্যাকমিলান তাঁর সেই হলদে রঙের ছোট সাইকেলে চড়ে তিন ক্রোশ পথ পার হয়ে জংলী টিবির এক নতুন খিরিস্তান চাষীকে [illegible] ওষুধ খাওয়াবার জন্য ছুটে যেতে থাকেন, তখন তাঁর মুখের সেই শান্ত হাসিটাই অদ্ভুত এক তেজের জ্বালায় যেন দপদপ করে জ্বলে। তখন তাঁকে দেখতে একটু অদ্ভুত রকমের লাগে বৈকি, এবং যারা দেখতে পায়, তারা আশ্চর্য হয়ে নিজে একটু ভয়ও পায়; সিস্টার দিদির দয়া যেন একটা একরোখা প্রতিজ্ঞার আক্রমণ।

বেশি দিন হয়নি, এইতো মাত্র দিন পনর আগে এইরকমই একটা একরোখা প্রতিজ্ঞার আবেগে হলদে রঙের সাইকেলে চড়ে এক সকালে হারানগঞ্জ থেকে ভুবনপুরের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন সিস্টার দিদি। মধু-কূপির সেই সুন্দর চেহারার কিষাণী মেয়েটি গাঁ থেকে তাড়িত হয়ে, বাঘের হামলা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে আর ছুটে এসে একেবারে হারানগঞ্জের কয়লাখাদের হাসপাতালে ঠাঁই নিয়েছে, খবর পেয়েই তার সঙ্গে দেখা করতে আর একটি দিনও দেরি করেননি।

কয়লাখাদের হাসপাতালের ঘরে ঢুকেই মুরলীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন সিস্টার দিদি—মুরলী, আমার প্রিয় কন্যা লাভলি মুরলী, চল, তোমাকে এখনই আমার কনভেন্টে নিয়ে যাব।

সিস্টার দিদির দয়া, আর সিস্টার দিদির হাসি; দেখতে পেয়ে মুরলীর প্রাণটাই যেন হেসে ওঠে। কল্পনা করতে পারেনি মুরলী, এত তাড়াতাড়ি এত বড় সৌভাগ্য এত কাছাকাছি এসে মুরলীর জীবনের আশাকে জড়িয়ে ধরবে।

পলুস হালদারের দিকে চোখ পড়তেই,

একটু আশ্চর্য হন সিস্টার দিদি। —তোমার কি খবর পলুস?

পলুস—খবর ভাল বটে দিদি, এখন শুধু আপনার দয়া চাই।

—বলো ভাই, কিরকম দয়া মাংতা হ্যায়। আচ্ছা নোকরি?

পলুস—না দিদি।

সিস্টার দিদি—তবে?

প্রশ্ন করতেই মুরলীর মুখের লাজুক চেহারাটা সিস্টার দিদির চোখে পড়ে যায়, সেই মুহূর্তে যেন বিপুল কৃতার্থতার আনন্দে হেসে ওঠে সিস্টার দিদিরও চোখ দুটো।—খুব ভাল কথা। মুরলীর সাথে তোমার বিবাহ হবে, অতি ভাল কথা বটে পলুস।

সিস্টার দিদির সংগে হারানগঞ্জে চলে যাবার আগে শুধু একবার ফটিকের মত গম্ভীর হয়ে মহেশ রাখালের কাছে দাঁড়ায় মুরলী—তুমি ভাল হয়ে ঘরে চলে যেও বাপ। আমি হারানগঞ্জে চললাম।

—খালদা যাবি নাই! চমকে ওঠে মহেশ রাখাল।

—না; হেসে ফেলে মুরলী। —আমার যেথাকে যাবার দিন সেথাকে যাচ্ছি বাপ; তুমি রাগ করো না।

মুখ ফিরিয়ে নেয় মহেশ রাখাল। মুরলীর মুখের দিকে আর তাকায় না।

শেষ পর্যন্ত হাসিমুখেই রওনা হয় মুরলী। পুরনো জীবনের একটা মমতার গিঁট ছিঁড়ে ফেলতেও একটুও ব্যথিত হয় না মন।

হারানগঞ্জের কনভেন্টের জীবনও এত ভাল লাগবে, কল্পনা করতে পারেনি মুরলী। সবই নতুন, তাই বোধ হয় সবই ভাল লাগে। মুরলীর কালো চোখের চাহনি সব সময় যেন হেসে হেসে ঝকঝক করে। ঘরটা কি সুন্দর। ঘরের দেয়ালে একটা জানালা, সে জানালার কাছে দাঁড়ালে গির্জাবাড়ির চূড়াটা দেখা যায়।

কনভেন্টের মেয়েরা খিলখিল করে হাসে। কী মিষ্টি কলরবের ঝুমুর। মেয়েগুলির খোঁপার ছাঁদও দেখতে কত ভাল লাগে। বার বার দেখতে ইচ্ছে করে। আর এক মিনিট ধরে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকবার পর মুরলীর মনের আশাও আবার হেসে ওঠে।

ডিং ডাং। ডিং ডাং, গির্জার ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে যায় মুরলী। আর বেশি দিন বাকি নেই, সিস্টার দিদি বলেছেন, একদিন গির্জাবাড়িতে গিয়ে ঈশাই মানবে মুরলী এবং তার কয়েক দিন পরেই......। মুরলীর চোখের চাহনি নিবিড় হয়ে ওঠে, আর ঠোঁট দুটোও নিবিড় হাসির আবেগে ফুলে ফুলে কাঁপে।

সিস্টার দিদি এসে একদিন বলে গেলেন, যদি ইচ্ছা কর, তবে বিবাহের পর এখানে এসে রোজ লেখাপড়া শিখে যেতে পার কন্যা। ঐ দেখো ঐ মেয়েটি, উহার নাম মেরিয়া, মেয়েটি ছয় মাসের মধ্যে বাইবেল পড়িতে শিখে ফেলেছে।

মুরলীর সারা মুখ জুড়ে আবার একটা স্বপ্নময় আশার হাসি ঝিলিক দিয়ে ফুটে ওঠে। হাঁ দিদি, দয়া করে আমাকে লিখাপড়া শিখাই দিও।

সিস্টার দিদি—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি যে সব সময় খ্রিস্তানের সেবার জন্য বকিলান হয়ে আছি।

তারপর আর দেরি হয়নি। গির্জাবাড়িতে গিয়ে ঈশাই মেনে নিয়ে সিস্টার দিদির প্রার্থনার গান শুনতে হলো; মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে সস্নেহ আশীর্বাদ করলেন সিস্টার দিদি—ধরম বুঝে করম করবে, ধরমের মান রাখবে, খিরিস্তান বেয়াদারী আর সিসটারীর সেবিকা হবে; সুখী হও জোছনা মুরলী।

বেদীর মোমবাতির আলোর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে মুরলী, এই জীবনটাকে কিষাণীর কষ্টের জীবন বলে আর ধিক্কার দেবার দরকার হবে না। গির্জাবাড়ির ঘর-ভরা ভিড়ের গলায় একটা আশীর্বাদের গান বেজে চলেছে; শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যায় মুরলীর অন্তরটাই। হাসতে হাসতে গির্জাবাড়ি থেকে কনভেন্টের ঘরে ফিরে এসে জানালার কাছে দাঁড়ায় মুরলী। দেখতে পায়, জানালার দিকেই তাকিয়ে আর চোখ-মুখ হাসিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যাচ্ছে পলুস হালদার। হাত তুলে, হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে মুরলীর মনের চঞ্চলতাকে সান্ত্বনা দেয় পলুস। আর মাত্র পাঁচটা দিন বাকি।

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণ বশত "কেরী সাহেবের মুন্সী" বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না। আগামী সংখ্যা হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইবে।

—সঃ দেশ

সেই পাঁচটা দিনও মুরলীর চোখ আর মুখ শুধু হেসে হেসে তৃপ্ত হয়েছে। কনভেণ্টের মেয়েরা এসে পলুসের নাম করে কি সুন্দর আর কত নতুন রকমের ঠাট্টা করেছে। সে ঠাট্টার ভাষাও নতুন রকমের।

—কে কাকে বেশি ভালবাসে জোহানা?

মেরিয়ার প্রশ্নের হাসি শুনে চমকে ওঠে মুরলী। —কি বলছো বহিন?

মেরিয়া—তুমি পলুসকে বেশি বেসেছে, না, পলুস তুমাকে বেশি বেসেছে?

খিলখিল করে হেসে ওঠে মুরলী—গড জানে!

মেরিয়া—গড তো জানে; কিন্তুক তুমি জান কি না?

মুরলী—আমি জানি না।

মেরিয়া—বিহার পরে জানতে চাও?

মুরলী—হ্যাঁ।

মেরিয়া—আগে জান নাই?

মুরলী—না।

মেরিয়া মুখ টিপে হাসে—একবারও না?

—না গো না; ছিঃ; বলতে বলতে মাথা হেঁট করে হাসতে থাকে মুরলী; আর, মুরলীর খোঁপায় একটা মৃদু চিমটির আদর বুলিয়ে দিয়ে চলে যায় মেরিয়া।

এবং, তার পাঁচ দিন পরে এই মেরিয়া নিজের হাতে মুরলীর খোঁপাটিকে নতুন ছাঁদে বেঁধে দিল। রঙীন ফুলের মালা দিয়ে খোঁপা জড়িয়ে দিয়ে গির্জাবাড়িতে নিয়ে আসার বেদীর মোমবাতির আলোকের দিকে যখন তাকায় মুরলী, তখন মুরলীর জীবনের আশা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মুরলীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে পলুস হাঁসদা।

[illegible] প্রার্থনার গান শেষে, [illegible] আশীর্বাণী [illegible] গির্জাবাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়ে [illegible] একটা গো-গাড়ি [illegible] ওঠে।

মেরিয়ার [illegible] হেসে [illegible] গো-গাড়ির ভিতরে ঠাঁই নেয় [illegible] এক নব-দম্পতি।

পলুস ডাকে—জোহানা।

মুরলী—তুমার ঘর কি এখান থেকে ঢের দূর বটে?

পলুস—না।

লাল খাপরার চালা, আর ইঁটের দেয়াল; একখানি ঘর। ছোট একটা দাওয়া; দাওয়ার উপর ছোট্ট একটা [illegible] আদুরে কুকুর। ঘরের দিকে চোখ পড়তেই হেসে ওঠে মুরলীর [illegible] চোখের চাহনি।

গো-গাড়ি থেকে নেমে ঘরের দিকে এগিয়ে যায় পলুস আর মুরলী। আদুরে কুকুরটা এক লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে মুরলীর কোলের উপর উঠতে চায়। কুকুরটাকে কোলে তুলে নেয় মুরলী। পলুস হাসে—কুকুরটা বড় চালাক বটে?

মুরলী—কেনে?

পলুস—তুমাকে চিনে নিয়েছে।

মুরলী হাসে—কি চিনলেক?

পলুস—তুমার কোল নরম বটে।

মুরলীর মুখের হাসি আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে। মুরলীর প্রাণ, মান আর শরীরটা দিনের পর দিন যেন শুধু আশীর্বাদে আর অভিনন্দনে প্রীত হবার মত এক নতুন সুখের জগতে এসে ঠাঁই নিয়েছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে আর একবার চমকে ওঠে মুরলী। এই চমকও একটা নতুন চমক। নিজের এই রূপের ছবি নিজেই কখনও দেখতে পায়নি মুরলী।

পলুসের ঘরের ভেতরে একটা কাঠের বাক্সের উপর প্রকাণ্ড একটা আয়না। মুরলী ঘরের ভিতরে ঢুকতেই সেই আয়নায় মুরলীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ঢলঢল করতে থাকে। মুরলীর চোখ দুটো কত কালো আর কেমন টানা-টানা, আজ এই প্রথম ভাল করে দেখতে পেল মুরলী। মুরলীর ঠোঁটের হাসিটা যে এমন ফুলে ফুলে কাঁপে, তাও কোন দিন দেখতে পারনি মুরলী। ফুলের মালা জড়ানো খোঁপা, আর রঙীন আঁচলের শাড়ি পরে পলুসের পাশে দাঁড়ালে কেমন দেখায় মুরলীকে, আয়নাতে তারই ছবির দিকে তাকিয়ে ধন্য হয়ে যায় মুরলীর দুই চোখের সাধ।

পলুসের পরনে সাদা রঙের পেণ্টালুন; আর নীল রঙের একটি কামিজ; গলায় রামধনুর মত পাঁচমিশালী রঙের একটা রুমাল জড়ানো। মুরলীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে হাসছে পলুস। মনে হয় মুরলীর, এই পলুস হালদার মুরলীকে একটা ভয়ানক বাঘ-ডাকা জঙ্গলের বীভৎস ভয়ের আর দুঃখের জগৎ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে মুরলীর স্বামী হয়েছে। পলুসের পাশে দাঁড়াতে পেরেছে, তাই না আজ নিজেকে এত ভাল করে দেখতে, চিনতে আর বুঝতে পারলো মুরলী।

পলুস বলে—আয়নাটা তুমারই লেগে কিনেছি জোহানা।

মুরলী হাসে—কবে কিনলে? যেদিন প্রথম আমার হাতের জল খেলে, সেদিন কি?

পলুস—না। কাল গোবিন্দপুর বাজার থেকে কিনে এনেছি।

মুরলী আবার চোখ টিপে হাসে। —এত দেরিতে কিনলে কেনে? বিশ্বাস কর নাই বুঝি?

পলুস—বিশ্বাস করেছিলাম জোহানা; তুমি আমার কাছে না এসে পারবেক না। সেটা কোন কথা লয়। কথা হলো, বাঘিনটাকে মেরে গোবিন্দপুর থানা থেকে একশো টাকা বকসিস পেলাম। ভাবলাম, বকসিসের টাকা দিয়ে সবার আগে যে জিনিসটা কিনবো, সেটা জোহানার জিনিস হবেক, তাই আয়নাটা কিনলাম।

পলুসের কাঁধের উপর মাথা লুটিয়ে দেয় মুরলী। মুরলীর শরীর যেন হঠাৎ একটা নেশার আবেশে অলস হয়ে গিয়েছে। মুরলীকে দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে ডাক দেয় পলুস—জোহানা!

উত্তর দেয় না মুরলী। পলুসের বুকে লুটিয়ে পড়ে থাকা নতুন জীবনের ছবিটাকেই আয়নার দিকে তাকিয়ে, দুই কালো চোখের সব পিপাসা তৃপ্ত করে নিয়ে দেখতে থাকে।

পলুস বলে—তুমার জ্বর হলো না তো জোহানা?

মুরলী—না।

পলুস—গতর এত গরম কেনে?

মুরলী হাসে—গতর জানে।

পলুস—কিন্তুক...আমার যে কি-রকমটা মনে নিচ্ছে জোহানা।

মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পলুস হালদার। মুরলীর চোখ দুটো যেন হঠাৎ বিদ্যুতের মত একবার হেসে উঠলো। তারপরেই ভিজে গেল।

—কাঁদছো কেনে জোহানা? প্রশ্ন করতে গিয়ে পলুস হালদারের গলার স্বরে একটা

বেদনার বিস্ময়ও কেঁপে ওঠে।

—তুমাকে একদিন বড় দুখ দিয়েছিলাম পলুস। ভেজা চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে মুরলী।

—কবে? আরও আশ্চর্য হয় পলুস।

—তুমি আমাকে ছুঁয়েছিলে বলে গালি দিয়েছিলাম।

হো হো করে হেসে ওঠে পলুস—সেকথা আজ আবার মনে কর কেনে জোহানা?

মুরলী—তুমার রাগ হয় নাই কি?

পলুস—হাঁ, হয়েছিল।

মুরলী—আজও রাগ আছে কি?

পলুস হাসে—আছে।

মুরলী—তবে?

—আঃ, তুমার প্রাণটাও বড় নরম বটে জোহানা। মুরলীর নরম গতরের অদ্ভুত বিহ্বল আর উষ্ণতাময় স্বাদ যেন প্রাণের ভিতরে বরণ করে নেবার জন্য মুরলীর সেই অভিমানভীরু অথচ ছলনাহীন সরু কোমরটাকে নিবিড় আগ্রহের বাঁধনের মত দুহাতে জড়িয়ে ধরে পলুস হালদারও জীবনের এক নতুন নিঃশ্বাসের নেশায় ফিসফিস করে। —আজ আমি যে তুমারই মরদ বটি জোহানা; আমাকে সাধতে হবে কেনে?

মুরলী বলে—চুপ কর।

চুপ করে পলুস হালদার।

লাল খাপরার চালা আর ইঁটের দেয়াল, ছোট ঘরটাও অনেকক্ষণের নীরবতা সহ্য করবার পর হঠাৎ যেন একটা আতঙ্কের রূঢ় চিৎকার ছেড়ে কেঁপে ওঠে।

চেঁচিয়ে উঠেছে পলুস—জোহানা!

আর মুরলীও যেন হঠাৎ [illegible] হয়ে নিরাবরণ শরীরটার [illegible] লুকিয়ে ফেলবার জন্য [illegible] উপর [illegible] পড়ে থাকা রঙীন শাড়ির আঁচলটাকে একটা হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু [illegible] জড়াতে পারে না। মুরলীর হাতটাকে শক্ত করে চেপে ধরে পলুস আবার ডাক দেয়—জোহানা!

মুরলী ভ্রুকুটি করে—কি বটে?

পলুস—ই কেমন কোমর বটে?

মুরলীর চোখ দুটো ছলছল করে হাসে—তুমি যা বুঝেছ, তাই বটে পলুস।

পলুস—আমাকে আগে বল নাই কেনে?

মুরলী—আগে না বলে কি কোন দোষ হলো পলুস?

পলুস—হাঁ, দোষ বটে।

মুরলী আশ্চর্য হয়—আগে বললে কি তুমি আমাকে ঘরে নিতে না?

পলুস—তুমাকে নিতাম, কিন্তু সরদারের ছেইলাকে নিতাম না।

ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী—সরদারের ছেইলা ভাবছো কেনে পলুস, উ যে আমার ছেইলা!

পলুসের চোখের হাসিটা যেন কটমট করতে থাকে। —তা হয় না জোহানা। কোন পাগলেও পরের ছেইলার বাপ হতে সাধ করে না।

কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী—কিন্তু উ যে আমারও ছেইলা বটে গো! আমাকে এত মায়া কর, আমার ছেইলার লেগে মায়া হয় না কেনে পলুস?

পলুস—তুমার এই ছেইলাকে উয়ার বাপের ঘরে রেখে এলে ভাল করতে জোহানা।

কেঁদে ফেলে মুরলী—তাহলে আমার ছেইলা যে মরে যেত পলুস।

—মরে যেত যদি, তবে মরে যেত। কিন্তু তুমি পরের সাধের বোঝা মাথায় নিবে কেনে?

মুরলীর [illegible] দিয়ে একটা করুণ আর্তনাদের [illegible] যেন ঠিকরে বের [illegible] করতে হয় না পলুস।

মুরলী [illegible] সরে যায় পলুস [illegible] এলোমেলো [illegible] উপর বসে [illegible] তুলে [illegible] মুরলী পড়ে গিয়েছে [illegible] ঠোঁট দুটো [illegible] কালো হয়ে গিয়েছে [illegible] থেকে খসে পড়ে [illegible] পড়েছে।

আস্তে আস্তে মুরলীর কাছে এগিয়ে এসে মুরলীর মাথায় [illegible] দিয়ে পলুস [illegible] হবার [illegible] কিন্তু তুমি এত ভাবছো কেনে জোহানা?

পলুসের কথাগুলি [illegible] এক সান্ত্বনার ভাষার মত মুরলীর কানের কাছে বাজতে থাকে। চমকে ওঠে মুরলী; শুকনো ঠোঁটের [illegible] হাসিটাই আরও গভীর হয়ে ওঠে।

—কি বলছো?

পলুস—[illegible] অনাথবাড়ি আছে; তুমি ভাবছো কেনে?

—এমন কথা বলো না পলুস? আবার আর্তনাদের মত শিউরে ওঠে মুরলীর গলার স্বর।

—কিসের ডর জোহানা?

—তুমি বুঝে দেখ পলুস। তুমার কুকুরটা আমার নরম কোলে বসবেক, কিন্তু আমার ছেইলাটা অনাথবাড়িতে যাবেক...... তুমার পায়ে পড়ি পলুস; একটুক বুঝে দেখ।

পলুস হাসে—আমি বুঝেছি জোহানা; কিন্তু তুমি বুঝছো নাই।

মুরলী—আমি সত্যিই বুঝতে নারছি পলুস।

পলুস—তবে সিস্টার দিদিকে একবার শুধোই দেখ; তবে বুঝবে আমি ঠিক কথা বলছি কি না।

(ক্রমশঃ)

এত রোদ পৃথিবীতে আছে, সত্যি, একথা যেন জানত না গৌরী। যেন আজ হঠাৎ জানল।

জানলার ধার ঘেঁষে বসে সেই যে চোখ দুটোকে বাইরে মেলে ধরেছে গৌরী, আর তাদের গুটিয়ে আনেনি। আনতে ইচ্ছেও করেনি তার।

এর মধ্যে কত মাইল যে দৌড়ে পার হল মেল ট্রেনখানা, কত স্টেশন ছিটকে ছিটকে পেরিয়ে গেল, কত গাছপালা, পাহাড় বন, গ্রামবসতি, নদী যে বেরিয়ে গেল আশপাশ দিয়ে, তার হিসেব আর রাখতে পারেনি সে। সে শুধু লক্ষ্য রেখেছিল রোদের দিকে। ভাবছিল, কখন এই ট্রেনখানা রোদের সীমানা পেরিয়ে ঝাঁপ দেবে অন্ধকারের কোলে।

একথাটা ভাবতে আদৌ ভাল লাগছিল না গৌরীর। তবুও ঘুরেফিরে সেই কথাই ভাবছিল। ভাবছিল আর কেমন যেন ভয় ভয় করছিল তার।

ভয়, আবার অন্ধকারে ফেরার ভয়।

গৌরী জানে, এই রোদ, এই আলো, এর আয়ু বেশী নয়। এই বেলাটুকু শুধু। বেলা ফুরোলেই সন্ধ্যে। ব্যস্, তারপর আর রাতকে ঠেকায় কে? অন্ধকারকে রোখে কে?

রাত ফুরোলে আবার যে দিনটা আসবে, তার রোদ এমন ঝিলিক ছড়াবার আগেই হয়তো ট্রেনখানা হাওড়ায় গিয়ে ভিড়বে। আর তারপর গৌরীদের কল্কেপাড়া বা লাগোয়া জেলেপাড়ার সেই রোদকানা বাইলেনে গিয়ে ঢুকতে। বড় জোর পনের মিনিট।

কাজেই, মনে মনে হিসেবটা কষে নিয়ে গৌরী স্থির করল, যতটা সময় পাওয়া যায় এই জানলার ধারেই বসে থাকি। অন্ধগহ্বরে ঢোকার আগে আশ মিটিয়ে নিই রোদ দেখে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কলকাতার মানুষ যে কি সুখে থাকে! ছিঃ!

অথচ, সেই কলকাতাতেই সাতাশ বছর কাটাল গৌরী। বাই লেনে বাই লেনে ঘুরেই বড় হল। না ছিল বাবার সংগতি, না আছে স্বামীর। তাই বাই লেন ছেড়ে দূরে বাসা বাঁধার আশা করেনি গৌরী। কখনও করত কিনা সন্দেহ, যদি না বড় জামাইবাবু এলাহাবাদ যাবার নেমন্তন্ন করতেন তাঁর বড় মেয়ের বিয়েতে।

শুধু পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ নয়, এলাহাবাদ যাবার প্রথম শ্রেণীর রেলভাড়া তার উপর পথে খাওয়াদাওয়া, পথ খরচের জন্য আরও একশ টাকা পাঠিয়ে বড় জামাইবাবু বিশেষ করে লিখেছেন যাতে কোনক্রমেই যেন অন্যথা না হয়।

দিদি দশ বছর বাদে [illegible]। পঞ্চাশোর্ধ্ব। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে সবাইকে একবার দেখতে চান। তাই এই ব্যবস্থা।

গৌরী কোনদিন কলকাতার বাইরে যায়নি। [illegible]

কাজেই বাইরেটা যে কি বস্তু, সে সম্পর্কে গৌরীর কোন ধারণাই ছিল না। তার [illegible] ছিল ভীতি। ওরা জন্ম থেকে [illegible] অন্ধকূপের বাসিন্দা।

ছেলেমেয়ে দুটিরও ভবিষ্যৎ নেই। বাই লেনের একতলার অন্ধ কুঠুরীতেই দুর্বিষহ জীবন কাটাবে ওরা। যেমন গৌরী কাটিয়ে এসেছে এতকাল। আবছায়া অন্ধকার আর ধোঁয়ার নিত্য সঙ্গী হয়ে দিনদিন ওরা এমন তাকাবে [illegible] আশ্চর্য পাবে না, যেমন পায়নি গৌরী। কোনদিন ওরা বিনা বাধায় এমন উদার আকাশ দেখতে পাবে না। যেমন গৌরী কখনও পায়নি।

ছাতে না গেলে কলকাতার আকাশ বড় একটা দেখা যায় না। আর ছাতটা তেতলার ভাড়াটেদের এক্তিয়ারে। একবার চন্দ্রগ্রহণ দেখার শখ চাপায় দোতালার গিন্নীর সঙ্গে ছাতে উঠেছিল। কিন্তু তেতলার গিন্নীর চোপার ঠ্যালায় নেমে এসেছিল তক্ষুণি আর কখনও ছাতে ওঠার ইচ্ছে গৌরীর হয়নি। ছাতে যাব, তার জন্যে [illegible] অনুমতি নিতে হবে! [illegible] মানুষের! ছি ছি!

আবার [illegible] সেখানেই। থাকবেও সেখানে। আচ্ছা, তুমি যদি তেতলার ভাড়াটে হতে, তুমি কি দিতে একতলার গিন্নীকে হাত ধরে ছাতে উঠতে? দিতে তুমি? গৌরী যেন নিজেকে [illegible] করে [illegible] নিজিতে তুলেছে। বাঁদিকের পাল্লাটা বন্ধে পড়ল একটু এই প্রশ্নে। আমি? গৌরী ডানদিকের পাল্লায় তোড়জোড় করে ওজন চাপাতে গেল। আমি? একটু থমকে গেল। না, আমিও হয়তো ঘাড় ধাক্কা করে উঠতাম ঐ তেতলার গিন্নীর মতই। গৌরী যেন আর্তনাদ করে উঠল। সবাই আমরা অন্ধকারের বাসিন্দা। রোজ পাইলে [illegible]। মনে আলো ঢুকবে কোথা দিয়ে।

মা, ওমা, ঐ দ্যাখ উট। উট।

কল্যাণ একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জানলার উপর। গৌরীর বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। টপ করে ধরে ফেলল ছেলেকে। যদি বাইরে পড়ে যেত এক্ষুনি! এখনও গৌরী থর থর করে কাঁপতে লেগেছে ভয়ে।

সামলে নিয়ে ধমক দিল গৌরী। বাঁদর ছেলে, এখুনি যে পড়ে মরতিস। জোরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব।

কেয়া ওদিক থেকে ফোড়ন কাটল, দাদা মরবে, না মা?

গৌরী কেয়াকে দেখতে পেল না। বলল, দাদা পড়া দুষ্টু ছেলে। কিন্তু তুমি কোথায়, কি করছ? দেখি, এস তো এদিকে।

খুকু আসতেই তাকে দেখে গৌরীর তো চোখ কপালে উঠল।

করেছিস কি রাক্ষুসী। আঁ, জামা [illegible] কি করে? ওগো, দেখছ, দ্যাখ তোমার মেয়ের কাণ্ড।

সতীন একটা বেঞ্চিতে আরাম করে বই পড়ছিল। মুখ থেকে বই না সরিয়েই হাঁক দিল, রাক্ষুসী!

খুকু বলল, রাক্ষুসী না, আমি ঝি। আমি ঘর ধুই।

সতীন আর গৌরী অবাক শুনে হেসে ফেলল।

সতীন বলল, তুমি ঝি? বাঃ বেশ। আবার হাসল।

গৌরী চটে গেল। ওর মনে হল, এরা সবাই যেন ষড়যন্ত্র করে ওকে রোদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এল। ইচ্ছে হল খুকুকে দুটো থাপ্পড় দিয়ে দেয়। ডাকল, এদিকে আয়।

খুকু বলল, না, ঝি ঘর ধুই।

আর ঘর ধুতে হবে না। আয় এদিকে।

কল্যাণ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মা, উটরা কি খায়?

জানিনে। [illegible] জিজ্ঞেস কর।

ট্রেনের গতি কমে আসছে।

সতীন জিজ্ঞাসা করল, কি গো, কিছু খাবে নাকি? চা-টা নিয়ে আসি, কি বল? ট্রেন কিরকম দেখছি [illegible] পায়।

গৌরী বলল, তাই নাকি। তাহলে এস, একটা মাত্র টিকিট কিনে ট্রেনেই থেকে যাই। বাড়িতে তো সকালে কিছু খাওয়াতে তোমার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

সতীন হাসল। স্টেশনের ঐ [illegible] গৌরী তখন নেমে গেছে। [illegible] এই কদিনে সে দেখে ফেলল। কত বিচিত্র পোশাক, কত বিচিত্র ধরনের কথাবার্তা। গৌরী মাঝে মাঝে যেন খেই হারিয়ে ফেলে।

এলাহাবাদ ওরা গিয়েছিল গাড়ি রিজার্ভ করে। একখানা গোটা কামরা, ছোট না ছোট, ওরা পেয়েছিল। বাইরে কার্ড লাগানো ছিল প্রোফেসার কে চৌধুরী এন্ড ফ্যামিলি। সারাপথ কেউ ওদের গাড়িতে ওঠেনি। সে জন্যেই বেঁচেছিল গৌরীর। ওদিকের কামরাগুলোর যা ভিড় অনবভাবে এলে সে বোধ হয় মরেই যেত। তখন ট্রেন চড়তেই ভয় পেয়েছিল। কি জানি ট্রেন উল্টো-টাল্টো যায় নাকি! ছেলেমেয়ে [illegible] না বসিস, পড়ে-টড়ে না যায়। এমন [illegible] ভয় যে ওর হাতে চেপেছিল, তার হিসেব নেই। প্রথম রাতটা তো ঠায় জেগে কাটিয়েছিল।

তারপর আস্তে আস্তে ভয় কেটেছে। মজা লেগেছে। ট্রেন-জার্নির মজা। স্টেশন আর লোক দেখতে দেখতেই এলাহাবাদে পৌঁছে গেছে।

কত কি যে দেখার বাকি ছিল, এখন টের পাচ্ছে গৌরী। এখন, এই ফিরতি পথে, আর যখন মোটে সময় নেই হাতে।

এ যেন এক নতুন জন্ম গৌরীর।

চুপচাপ বসে চলন্ত যান থেকে জগৎ দেখায় যে এত সুখ, স্বপ্নেও সে কখনও ভাবে নি।

এলাহাবাদে পৌঁছে, বিয়ে-বাড়ির হৈচৈ নিয়ে কদিন মেতে ছিল গৌরী। বড়লোকের বাড়ি দূর থেকেই তার দেখা। থাকেনি কখনও। দিদির বাড়ির ঐশ্বর্যে তাই সে হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথমটায়। প্রথম দু-চারদিন তার আড়ষ্ট মন লাগাম টেনে টেনে চলেছিল। কিন্তু দিদি জামাইবাবুর ব্যবহারে সহজ হতেও সময় লাগেনি তার। আর যে মুহূর্তে থেকে সে মনের রাশে ঢিল দিল, সেই তখন থেকেই গৌরী এক নতুন সুখের পাথারে ডুবে গেল। ডুবে রইল কদিন।

দিদি তার চেয়ে অনেক বড়। সে যখন নিতান্ত ছোট, তখন দিদির বিয়ে হয়েছে। জামাইবাবুর অবস্থা কেমন তা বোঝার বয়েস গৌরীর ছিল না। গৌরীর সে বয়েস যখন হল, তখন দিদি জামাইবাবু কলকাতায় আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। মাঝে মাঝে খবর পেয়েছে দিল্লী-সিমলা ছুটছেন তাঁরা। সেটা যুদ্ধের শেষ সময়। জামাইবাবু মন্ত্রণাদের ডিসপোজ্যালের মাল ধরে রাখছেন। সে সময় একবার কলকাতায়ও এসেছিলেন। বড় হোটেলে উঠেছিলেন দিদিকে নিয়ে। একদিন সময় করে খেতে এসেছিলেন তাঁরা, গৌরীর সে কথা মনে আছে। ওদের গাড়িতে [illegible] কলেজে বলে আমাদের কাছে [illegible] আফসোস। গৌরীকে দেখে জামাইবাবু কিন্তু খুব খুশি হয়েছিলেন। একদিন সিনেমা দেখিয়েছিলেন। শাড়ি-ব্লাউজ আর গয়নাও কিনে দিয়েছিলেন জামাইবাবু।

গৌরীর বিয়ের সময় জামাইবাবু বিলেতে গিয়েছিলেন দিদির চিকিৎসা করাতে। আগের বছরই দিদির পক্ষাঘাত হয়। বাঁ অঙ্গ একেবারে অবশ।

বাবা আর মা দু'বছরের ব্যবধানে যখন মরলেন, তখন তো দিদি শয্যাশায়ী। জামাইবাবু ব্যবসায় ব্যস্ত। আসতে পারেন নি ওঁরা তবে শ্রাদ্ধের খরচ দিন মতই পাঠিয়েছিলেন।

কল্যাণ কেয়া জন্মাবার পর, প্রত্যেকবার দিদি ওদের জামা, পুজোয় টাকা পাঠিয়েছে। অনেকবার যেতেও লিখেছিল। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি।

এইবার গৌরী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তার দিদির সংসার। কি বিরাট ব্যাপার! সিনেমাতে বড়লোকের বাড়ি যেমন দেখায়, তার চেয়েও সুন্দর। তার চেয়ে অনেক ভাল।

না, বাঁচার হলে এমনিভাবে বাঁচ। সেসব কথা কতবার যে গৌরীর মনে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। গরমে ঠাণ্ডায় ওম্ করা জলের মসৃণ টবে গলা ডুবিয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে সুগন্ধি সাবানে গা ঘষতে ঘষতে ওকথা কতবার মনে হয়েছে। বাথরুমের বড় আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে গৌরীর বারবার মনে হয়েছে। হ্যাঁ, এই তো বাঁচা।

এ কদিনেই গৌরী অনেক উদ্ভট শখ মিটিয়ে নিয়েছে। এরকম সুন্দর আর নির্জন বাথরুম পেলে মেয়েদের যেসব শখ মাথায় চাপে, তা মিটিয়ে নিয়েছে গৌরী। আদুড় গায়ে বাথটবে গলা ডুবিয়ে সাবান মেখেছে ঠাণ্ডা-গরম জলে। জলসিক্ত চেহারাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একদিন টুপ করে দেখেও নিয়েছে আয়নায়। আর বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেছে। এই কি গৌরী নাকি! এত সুন্দর সে!

গৌরীর চেহারা সত্যিই খুব সুন্দর। জামাইবাবু বলেন, দিদিরও নাকি ঐ রকম চেহারা ছিল। দিদি সাজতে ভালবাসত। সে শখ গৌরীকে পেয়ে মেটালো। নিজের সে আমলের শাড়ি-গয়না দিয়ে রোজ সাজাত। লজ্জা পেত গৌরী। যতীন ঠাট্টা করত, আরে বাপ, এ যে দেখছি রাজরানী। কিন্তু যতীনের চোখ দেখে গৌরী বুঝত, তার ভাল লেগেছে। নিজেও খুশি হত।

কল্যাণ কেয়াও যখন হাঁ করে চেয়ে থাকত তার দিকে, তখন গৌরী ছুটে দিত দিদির ঘরে।

কল্যাণ বলত, তোমার বিয়ে হবে, না মা?

হো হো করে হেসে উঠত সবাই। জামাইবাবু বলতেন, যতীন ভায়া, সামলে। আমার গিন্নীর পোশাকে ওকে দেখলে নকলে আসল বলে ভ্রম হচ্ছে। কিছু ঘটে যেতে পারে।

গৌরী চটে গিয়ে সব খুলে ফেলত। কিন্তু সাধ্যসাধনা করে আবার সবাই তাকে সাজাত।

মঞ্জুই একমাত্র মেয়ে দিদি জামাইবাবুর। কিন্তু দেখতে তত ভাল নয়। তাই সে মোটেই সাজগোজ করতে চায় না।

সবাই এখন গৌরীর উপর দিয়ে নিজের শখ মিটিয়ে নিচ্ছে।

সত্যি বলতে কি, প্রথম প্রথম গৌরী খুব বিরত বোধ করত। সাজপোশাক সে বড় একটা করত না। সংগতিও ছিল না তার।

তাই দিদির প্রস্তাব শুনে সে লাল হয়ে উঠেছিল লজ্জায়। রাজী হয়নি। কিন্তু অসুস্থ পঙ্গু লোকের ইচ্ছেটা পূরণ করবার জন্য সবাই যখন তাকে ধরে বসল, বিশেষ করে মঞ্জু, তখন সে আর না বলতে পারল না। রাতে যতীন যখন তার প্রশংসা করল, তখন খুব খুশি হয়েছিল গৌরী। তারপর তার যেন কেমন নেশা ধরে গিয়েছিল। কি এক সুখের আবেশে শরীর ভরে যেতে লাগল তার। কেমন মনে হতে লাগল, এ স্বপ্ন, এ স্বপ্ন। এ স্বপ্ন।

দিদি সব তাকে দিয়ে দিয়েছে। এক বাক্স গহনা। বহু শাড়ি। দামী দামী।

ক্লাসের টিকিট কিনতে বলি তোমার। কম টাকা বাঁচত!

যতীন বলল, ছি তাই কি হয় নাকি। টাকা দিলেন তাঁরা আরামে যেতে, আর আমরা ভিড়ের গ্‌তোর চেপ্টা হয়ে যাব, ওরা কি ভাবতেন?

তাইতো বলছি গো, গৌরী প্লেট সাজাতে সাজাতে বলল। সে তো তুমি ঠিকই করেছ, ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কেটেছ। আমি বলছি আমার মনের কথা। জীবনে রেলে চড়িনি কি মনে পড়ে না। যদি বা চড়লাম, একবারে ফার্স্ট ক্লাসে। তাও পরের পয়সায়। কোথায় খুশিতে ফেটে পড়ব, তা নয়; অপরাধ হচ্ছে ভেবে মনটা খচখচ করেই গেল।

গৌরীর কথা শুনে যতীন ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটু বোধ হয় অবাকই হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই হেসে ফেলল।

জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে তোমার বল তো। কে যে ভাবুক ভাবুকে লাগছে।

কিছু হয়নি যাও। গৌরী চটে গেল যেন। তোমার সব তাতেই ঠাট্টা।

খানের সাজিয়ে দিয়ে গৌরী কাঁটা চামচ নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বলল হ্যাঁ গো, কাঁটা চামচ দিয়ে খাবে?

যতীন এবার বেশ জোরেই হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, ওরে বাসরে, তোমার জামাইবাবু যে সে শিক্ষা সুনন্দন দিয়েছেন। তোমার শখ তাতেও মিটল না। এবার সাহেব বলতে হবে।

ওর কথার ধরনে গৌরীও হেসে ফেলল।

যতীন বলল, তাহলে তুমিও কাঁটা চামচ ধর। এক সঙ্গেই সাহেব মেম বনে যাই।

চমকে উঠল গৌরী। যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে।

ধ্যাৎ। আমি তাই বলেছি নাকি। সব তাতেই তোমার ঠাট্টা।

কাঁটা চামচ ঠিক ঠিক করে প্লেটের উপর গৌরী রেখে দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বুকের ধুকপুকানি গেল না। কি পাগলামিই না মাঝে মাঝে চাপছে তার মাথায়! কি ছেলেমানুষি!

কেয়া শুয়ে ছিল। চট করে উঠে বসল। বলল, বাবা তুমি মেম ছাহেব?

যতীন হেসে বলল, না মা, আমার কি মেম সাহেব হবার ভাগ্য। মেম সাহেব হচ্ছেন তোমার মা।

কল্যাণও তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়ল। আর আমি?

যতীন বলল, তুমি হলে মেম সাহেবের ছা।

গৌরীও হেসে ফেলল ছেলেমানুষের মত। এই কি হচ্ছে।

কেয়া থপ-থপ করে এগিয়ে এল যতীনের কাছে। কোল ঘেঁষে।

আর আমি? বাবা আমি?

তুমিও মা, মেম সাহেবের শ্বাশুড়ী।

কথাটা কেয়ার পছন্দ নয়। না, আমি মেম না। আমি ঝি।

যতীন বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি ঝি।

যতীন বলল, যাই বল, বেশ কাটল কিন্তু কদিন। তোমার জামাইবাবু লোকটি সত্যিই ভাল কিন্তু। ওখানে যাবার আগে, বড়লোক ভেবে আমার মনে কিন্তু দ্বিধা ছিল। বেশ লেগেছে আমার।

জামাইবাবুর প্রশংসা শুনে গৌরী খুশিই হল। যতীন এমনিতে চাপা। কিন্তু আত্মসম্মান জ্ঞানটি টনটনে।

যতীনের প্লেটে আরও কিছু মাংস চাপিয়ে গৌরী বলল, তা সত্যি। দেমাক-টেমাক তো নেইই বলতে গেলে। সেই করে দেখেছি। ভয় তাই আমারও ছিল।

একটু থেমে আবার বলল, তোমারও খুব প্রশংসা করছিলেন জামাইবাবু।

যতীন বলল, সেটা বোধ হয় ফিস হিসেবে।

গৌরী বুঝতে পারল না। যতীনের মুখের দিকে চেয়ে রইল তাই।

যতীন বলল, ব্যবসাদার লোক তো। শ্যালিকাটিকে যে আন্দাজ প্রশংসা করে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হয়ত মনে পড়ল, শ্যালিকার স্বামীটি হয়ত ঈর্ষান্বিত হতে পারে, তাই ফিস দিয়ে তার মুখটি বন্ধ করে দিলেন।

গৌরীর মুখ ঝপ করে লাল হয়ে উঠল। ও মা তুমি তাই ভেবেছ! আচ্ছা তুমি ...আমি বলি...সব কথা তালগোল পাকিয়ে গেল গৌরীর। তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে বিষম খেল। সামলে নিয়ে বলল, অসভ্য কোথাকার! মুখে কিছু আটকায় না।

বলতে বলতে হেসে ফেলল। যতীনের মুখে হঠাৎ সাধু ভাষায় ঈর্ষান্বিত কথাটা শুনে তখন চটেছিল, এখন আবার সেই কথাটাই তার মুখে হাসি ধরিয়ে দিল।

বলল, ঈর্ষান্বিত হবার আর লোক জুটল না। আবার বলে ঈর্ষান্বিত। হি হি হি।

পরের স্টেশনেই বাসনপত্র গুছিয়ে নামিয়ে নিলে বয়গুলো। বিলের পয়সা নিল। যতীন ওদের বকশিসও দিল। ওরা সেলাম জানিয়ে চলে যাবার আগে কোন স্টেশনে বিকেলের চা আর কোন স্টেশনে রাত্রের খাবার দেবে তাও বলে গেল।

গৌরী বেশ লক্ষ্য করে দেখল ওদের। কালো চেহারায় ধপধপে সাদা উর্দী পরেছে। মাথায় সাদা পাগড়ি। কোমরে সবুজ রঙের চওড়া বেল্ট। বেল্টের উপর আর পাগড়িতে ঝকঝকে তকমা।

গৌরীর এখন শুধু মনে হচ্ছে, সে যেন এমনি করেই এতটা জীবন কাটিয়ে এসেছে এমনি নিশ্চিন্ত আরামে। এমনি দিনে জাগানো প্রকাণ্ড রোদের নির্ভয় আশ্রয়ে।

এমনও তার মনে হতে লাগল, আবার যখন সে এসে বসল জানলার ধারে মাঠের দিকে চেয়ে, সে কখনও থাকেইনি জেলে-পাড়ার কানাগলির এক অন্ধকূপে। সকালে সন্ধ্যায় কয়লার ধোঁয়ায় কখনও আচ্ছন্ন হয়নি তার চোখ। কয়লা ভেঙে তার বাসন মেজে (মাঝে মাঝে ঠিকা ঝিও কামাই করলে) তার হাতে কোষ্কা পড়েনি কখনও। মাসের শেষে সংসার চলবে কি করে তা ভেবে রাতের ঘুম পাতলা হয়ে যায়নি। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মন কষাকষি হয়নি প্রতিবেশীর সঙ্গে।

সে যেন এইভাবে চলে এসেছে চিরকাল। বয় এসে খাবার দিয়ে গেছে সময়মত। প্রথম শ্রেণীর ট্রেনের কামরার গদী মোড়া বেঞ্চে বসে চলমান পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় করে বেড়িয়েছে শুধু। কোন ক্ষুদ্র অভাব তার চোখকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। কোন তুচ্ছ পাঁচিল তার মনকে আটকে রাখতে পারেনি।

গৌরীর হঠাৎ মনে পড়ল তাই তো, কারো সম্পর্কে সে তো মন্দ কিছু ভাবেনি, কারো অমঙ্গল চিন্তা করেনি এ কদিন। যেই সে কথা মনে পড়ল, অমনি গৌরীর গোটা অস্তিত্বকে কে যেন তুলে নিয়ে চলল উপরে উপরে অনেক উপরে। সুখানুভূতিময় অপূর্ব আনন্দের এক স্বর্গে। গৌরীর কেমন যেন কাঁদতে ইচ্ছে করল। হারিয়ে যাওয়া শিশু মার কোলে ফিরে এলে পাওয়ার আনন্দে যেমন কাঁদে, তেমনি কান্না তার পরিশুদ্ধ মনোলোকের গভীর থেকে পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে লাগল।

জানলার বাজুতে মাথা রেখে এক সময় সুখের ঘুমে ঘুমিয়ে গেল গৌরী।

ঠেলা খেয়ে জেগে দেখে যতীন ডাকছে। স্টেশনে গাড়ী থেমেছে। বয় এসে চায়ের ট্রে রাখছে। আর কল্যাণ কেয়া একটি বয়ের হাত ধরে ঝুলছে আর বলছে, তুমি কাবলিওয়ালা, তুমি কাবলিওয়ালা।

গৌরী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

বাথরুমে ঢুকে মুখে চোখে জল দিতে দিতে টের পেল সে, ট্রেন চলতে শুরু করল। আর অমনি তাদের কামরার ভিতর হুটোপাটি, চীৎকার, যতীনের ধমক, শুনে চমকে বেরিয়ে পড়ল।

দেখে কম বয়সি একটা দেহাতি ছেলে আর মেয়ে উঠে পড়েছে তাদের কামরায়। ছেলেটা দরজা ধরে অবোধ্য ভাষায় প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে চেঁচাচ্ছে। মেয়েটা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে। তার সারা মুখে হলুদ লেপা। পোশাক আশাক দেখে গৌরীর মনে হল নতুন বর কনে।

ওদের দেখে কল্যাণ কেয়ার ভারি ফুর্তি। যতীন হয়ত কিছুটা বিরক্ত। ছেলেটাকে লক্ষ্য করে সমানে বলে চলেছে, বন্ধ কর দরজা। এই ছোকরা। বন্ধ কর। পড়ে গেলে সব জাগা।

কিন্তু ছেলেটার কোনদিকে লক্ষ্য নেই। গাড়ীটা যতক্ষণ না প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেল, ততক্ষণ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে সমানে চেঁচিয়ে গেল। ভয়ে ভাবনায়, দেখে মনে হল, ছেলেটা দিশাহারা হয়ে পড়েছে। মেয়েটাকে দেখে গৌরীর মনে হল, ও যেন একটু মজাই পেয়েছে।

গাড়ীটা স্টেশন ছেড়ে গেলে ছেলেটি দরজা এঁটে দিয়ে মেয়েটির কাছে সরে এল। তারপর দুজনে ফিসফিস করে কি যেন বলল। একটু পরেই দেখা গেল দুজনে একটু ধাতস্থ হয়েছে। মেঝেয় জড়সড় হয়ে বসেও পড়ল ওরা।

যতীন ডাক দিল তাকে, এস গো, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। গৌরী রুটিতে মাখন মাখিয়ে কল্যাণ কেয়াকে খেতে দিল। দিল যতীনকেও।

কল্যাণ রুটি কামড়াতে কামড়াতে জিজ্ঞাসা করল, বাবা, ওদের বুঝি বিয়ে হয়েছে।

যতীনের বিরক্তির ভাবটা, গৌরী দেখল, কেটে যাচ্ছে।

বলল, তাই তো মনে হচ্ছে বাবা।

মঞ্জুদির মত বিয়ে?

হবে হয়ত।

নেমন্তন্ন খেয়েছে ওরা?

তা তো বলতে পারব না। সে বরং তুমি ওদের জিজ্ঞেস কর।

কল্যাণ সটান গিয়ে ওদের কাছে বসে পড়ল। তারপর মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করল, এই মেয়ে, তোমার বিয়ে হয়েছে, মঞ্জুদির মতন? নেমন্তন্ন খেয়েছ?

দেখাদেখি কেয়াও গেল। ছেলেটার পিঠে চড়ে বলল, আমি ঝি।

ছেলেটা আর মেয়েটা ওদের পেয়ে খুব খুশি। চারজনে জমে গেল খুব। কল্যাণ মঞ্জুদির বিয়ের বর্ণনা দিতে লাগল। কেমন বাজনা হল। মঞ্জুদির বরটা খুব পাজি। মঞ্জুদিকে নিয়ে পাতালে চলে গেছে। কল্যাণ একটু বড় হলে তীর ধনুক বানিয়ে পাতালে যাবে। তারপর এক বান মেরে মঞ্জুদির বরটাকে মেরে ফেলে মঞ্জুদিকে উদ্ধার করবে। ছেলেটাকেও সঙ্গে নেবে তখন। ওরা অবাক বিস্ময়ে কল্যাণের কথা শোনে, নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে আর খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

যতীন চা খেতে খেতে বলল, ছেলেটা একটু বোকা মনে হয়। মেয়েটা কিন্তু বেশ চতুর। শুনে গৌরীরও তাই মনে হল। সে হাসল।

পরের স্টেশনে গাড়ী থামতেই ওরা দুজনে হুড়মুড় করে নেমে গেল।

বেলাও পড়ে আসছে। গৌরীর কেমন খারাপ লাগতে শুরু করল।

কলকাতার বাংলা কাগজ পাওয়া গেল দেখে একখানা কিনল যতীন।

গৌরী কাগজখানা হাতে নিয়ে উল্টাতে লাগল।

"উদ্বাস্তুদের আর পশ্চিমবঙ্গে লওয়া হইবে না।" "আমেরিকা আগামী দশ বৎসরের মধ্যে চাঁদে রকেট পাঠাইবে।" "শিল্পনীতি সম্পর্কে রাশিয়ার প্রস্তাব।" "ভারত বিদেশী সাহায্য না পাইলেও পরিকল্পনার কার্য চালাইয়া যাইতে পারিবে।" এই সব বড় বড় খবর। গৌরীর কাছে কোন খবরই পড়ার মত বলে মনে হয় না।

হঠাৎ একটা খবর পড়ে তার গা ছমছম করে উঠল। "সোদপুরের নিকট চলন্ত ট্রেন হইতে মহিলা যাত্রীর অলংকার অপহরণ। দুর্বৃত্তের সহিত ধস্তাধস্তির সময় ছুরিকাঘাতে মহিলা আহত।"

মনে মনে ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল গৌরী। তার মনে পড়ল, তার সঙ্গে গহনা আছে অনেক টাকার। সে কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

কাগজটা নিয়ে যতীনের কাছে গেল গৌরী। জিজ্ঞাসা করল শংকিত গলায়, এই খবরটা দেখেছ?

যতীন তখন পুরো মন দিয়েছে পড়ায়। মুখ না তুলেই বলল, কোন খবরটা?

কাল নাকি সোদপুরের কাছে চলন্ত ট্রেনে এক হেডমিস্ট্রেসকে জখম করে তার গয়না কেড়ে নিয়েছে।

ও। বলে যতীন আবার পড়ায় মন দিল।

যতীন খবরটা গ্রাহ্যই করল না! যদি হেডমিস্ট্রেসকে খুন করে রেখে যেত?

আবার বলল গৌরী, ভাগ্যিস প্রাণে মারেনি।

যতীন নিরুত্তর।

মারতেও তো পারত?

এবার অবিশ্যি যতীন জবাব দিল। পারত বৈ কি। তবে এবারও সে মুখ তুলল না বই থেকে।

বল কি! শিউরে উঠল গৌরী। ট্রেনের মধ্যে মেরে ফেলবে মানুষকে?

তা কখনো সখনো ট্রেনের মধ্যেও মারে।

মারে! সর্বনাশ!

যে সংশয়, ভয় খোঁয়াড়ে ভরে রেখেছিল গৌরী সারাদিন, ঘেঁষতে দেয়নি মনের

ধারে কাছে, এবার তারা পিল পিল করে এগিয়ে আসতে লাগল। বাইরে তখন শেষ আলোটুকুও মিলিয়ে গেছে। ট্রেনের কামরায় বিজলী বাতি জ্বলে উঠেছে।

উৎসাহ উদ্দীপনা প্রাণের তেজ যা কিছু তার ছিল সব খুইয়ে বসেছে গৌরী।

রাত বেড়েছে। খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে দিয়েছে আগের স্টপে। দুদিকের জানলার ধারে দুটো বিছানা পেতেছে। একদিকে যতীন, আরেক দিকে গৌরী। ওদের মাঝখানে মাথার দিকে যে আড়াআড়ি বেঞ্চি তাতে শুইয়ে দিয়েছে কল্যাণ আর কেয়াকে। পায়ের দিকের বেঞ্চটা, দুটো দরজার মাঝে, খালি। জানলা কটা সব বন্ধ করেছে গৌরী। কল্যাণ কেয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। চাদর দিয়ে তাদের ঢেকে দিয়েছে বেশ করে। যতক্ষণ পেরেছে কাজ করেছে। থামলেই মুশকিল। শিরশিরে একটা ভয় কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে গৌরীকে।

একটু ভরসা আলোটা এখনও পর্যন্ত জ্বালা আছে। তবে যতীনের ঘুম পেলে সেটাও নিভে যাবে। আলো থাকলে ঘুমোতে পারে না যতীন।

গৌরীও পারে না। কিন্তু নাই বা ঘুমালো ওরা একটা রাত। কথা বলুক না যতীন। দুটো গল্প করুক না ওর সঙ্গে।

কি গল্প করবে? তাই তো, কি গল্প করবে। গৌরীর মনে পড়ল বিয়ের পর কি বকবকই না করতো দুজনে। রাতের পর রাত কেমন হুস্ করে পার হয়ে যেত। কোন খেই থাকত না, কিছু মানেও খুঁজে পাওয়া যেত না সে সব কথার। শুধু বলার আনন্দে বলত। তারপর ধীরে ধীরে সে স্রোতে ভাটা পড়ে এল কেমন করে। এলো কাজের কথা বলার যুগ। হ্যাঁ, যুগই বটে। ইতিহাসেরই শুধু যুগ পরিবর্তন হয় না, মানুষের জীবনেরও হয়। গৌরীর জীবনেও হয়েছে।

এমন এক যুগ গেছে যখন যতীন আর গৌরী শুধু কাজের কথা, দরকারী কথা ছাড়া আর কিছু বলারই পায়নি। তারপরের যুগ, অর্থাৎ এখন তো তাও কমেছে। সংসারে কি দরকার না দরকার তা জানা হয়ে গেছে দুজনেরই। এখন অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে আর প্রায় কথাই হয় না দুজনের।

বহুদিন পরে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল ওরা জামাইবাবুর চিঠি আর টাকা পেলে। যাওয়া হবে কি হবে না, জামাইবাবুর টাকায় যাওয়া হবে না তা ফেরৎ দেওয়া হবে, কদিনের ছুটি নেওয়া উচিত যতীনের, কোন ক্লাসে যাওয়া উচিত, জামা কাপড় কি কেনা হবে, বিছানাপত্র নেওয়া হবে কি না ইত্যাদি বহুতর আনকোরা নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং তার সমাধান নিয়ে বহু আলোচনা কয়েকদিন ধরে তাদের মধ্যে হয়েছিল।

বর্তে গিয়েছিল গৌরী। এখন আবার যে কে সেই।

যতীন আবার চুপ করে গেছে। সত্যি, কি এমন কথা আছে, যাকে অবলম্বন করে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায়?

তার চেয়ে যতীন বরং ঘুমিয়েই পড়ুক।

ভাবতে না ভাবতেই যতীন উঠে বসল। হাই তুলল দুবার। খুট করে আলো নিভালো। শুয়ে পড়ল বিছানায়।

জমাট এক শীট অন্ধকার তৎক্ষণাৎ গৌরীকে যেন ঠেসে ধরল বিছানায়। চোখ বুঝল গৌরী। সেখানেও অতল অন্ধকার। তার চেয়ে চোখ খুলে থাকাই ভাল। এত অন্ধকারে থাকতে পারল না। গৌরীর মনে হল অতল স্পর্শী এক অন্ধকূপের গভীরে সে পড়ে যাচ্ছে পা পিছলে। যেন দম আটকে মরে যাবে।

তাই এক ফাঁকে উঠে পায়ের দিকের একটা জানলা খুলে দিল। অন্ধকার একটু পাতলা হল সেখানে। এক ঝলক বাতাস ঢুকে তাকে একটু স্বস্তি দিল।

তারপর ভাবনা আর তন্দ্রা মিলিতভাবে তাকে এক আধো ঘুম আধো জাগরণের রাজ্যে নিয়ে ফেলল।

হঠাৎ কিসের একটা শব্দ হতেই গৌরী দেখল যতীনের দিকের দরজাটা খুলে গেল। হুড়মুড় করে অনেকটা ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল কামরায়। আর প্রায় তারই সঙ্গে একটা লোক। বিরাট চেহারা।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল গৌরী। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু কি আশ্চর্য, গলার স্বর বেরুল না। দৌড়ে গিয়ে যতীনকে উঠিয়ে দিতে চাইল। পারল না।

লোকটা দরজা ধরে বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল জমাট রাত্রির বুক চিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রেন ছুটেছে। তার গন্তব্য বুঝি গৌরীর সর্বনাশ।

গৌরীর সারা অঙ্গ অবশ হয়ে গেছে ভয়ে। ঠিক আছে চোখ দুটো। আর চেতনা।

লোকটির চেহারা এখন বেশ দেখতে পাচ্ছে গৌরী। বুঝতে পারছে না ওর মতলব। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কেন? ওখানে তো দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে এগিয়ে আসবে। তারপর এক এক করে শেষ করবে ওদের।

আগে যতীনকে। ওর শক্ত হাত দুটো দিয়ে যতীনের টুঁটি টিপে ধরবে। দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে। টুঁ শব্দটি করতে পারবে না। বেরিয়ে আসবে জিভটা, ঠেলে উঠবে চোখ। ওঃ! চোখ বুজে ফেলল গৌরী। ওর নাভিকুণ্ড থেকে ভয়াবহ এক শীতল স্রোত বেরিয়ে আসতে চাইছে গলার ভিতর দিয়ে। সমস্ত অন্তরাত্মা যেন জমে গেছে তার স্পর্শে।

যতীন গেছে। এবার কার পালা? গৌরীর মনে হল লোকটা এবার কল্যাণ কেয়ার দিকে চাইছে। ওগো না না না। ওদের ছেড়ে দাও, দয়া করো, ওদের ছেড়ে দাও। এই নাও, আমার যা আছে সব নাও।

লোকটা এতক্ষণ ওকে দেখতে পায়নি। ওর চিৎকারে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা মোটা আঙুলে গৌরীর ঠোঁট চেপে ধরে বলছে, চুপ। সে চুপ করে গেল। লোকটা ইশারা করল, যা আছে দাও। গৌরী যেন সম্মোহিত। সব বের করে দিল। দিদি যা দিয়েছিল, বাক্স থেকে বের করে দিল। নিজের গায়ে যা ছিল, খুলে দিল।

তাতেও হল না, খুশি হল না লোকটা, ইশারা করতে লাগল, আরও দাও। আর কি দেবে গৌরী? আর কানাকড়ি সম্পদও তো নেই তার।

আরো কি চায় লোকটা? কি, তাকে চায়! হা ঈশ্বর। না না, তোমার পায়ে পড়ি, আমার সর্বনাশ আর তুমি করো না।

লোকটা ইশারা করল, হয় তুমি না হয় ঐ বাচ্চা দুটো। না না, তার চেয়ে মেরে ফেল। আমাদের একসঙ্গে মেরে ফেল।

লোকটা গৌরীকে ভাবতে সময় দিয়ে বসল পায়ের দিকের বেঞ্চটায়। সিগারেট ধরাল একটা। অন্ধকারে বসে বসে সিগারেট টানতে লাগল।

রাক্ষস। পিশাচ। ধৈর্য ধরে বসে আছে, কতক্ষণে গৌরীর তেজ ভাঙে, কতক্ষণে সে স্বেচ্ছায় সম্মতি দেয়।

গৌরীর দেহটাকে টুকরো টুকরো করবে শকুনটা। সেই সুন্দর দেহটা। দিদির বাড়ির বাথরুমে নির্জন অবসরে জীবনে সে প্রথম তার নিরাবরণ রূপটা দেখেছিল। তা ফুটে উঠল তার চোখে। মুগ্ধ হবার মত রূপই তার। গৌরীকে যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। জামাইবাবুও মুগ্ধ হয়ে গেছেন এই বুড়ো বয়সেও। গৌরী তা জানে। যতীন ঈর্ষান্বিত হয়তো বোধ হয় একেবারে বানিয়ে বলেনি।

এখন এসেছে এই দস্যুটা। অমন সুষমা তচনচ করে দেবে। ঐ যে বসে বসে সিগারেট টানছে। অপেক্ষা করে আছে গৌরীর স্বেচ্ছা সম্মতির।

না, অপেক্ষা বোধ হয় আর করল না। নিজেই উঠে পড়েছে। হ্যাঁ, আসছে গৌরীর পায়ের দিকে। গৌরীর দেহের সমস্ত কটা স্নায়ু ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে গেল উত্তেজনায়।

দরজা খুলল লোকটা। পালাবার পথটা করে রাখল। ট্রেনের গতি কি কমে আসছে? চাকায় ব্রেক কি লেগে যাচ্ছে? এটা কি স্টেশন এল না কি? গাড়ী কেন থামল?

দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে নামতে গিয়েও লোকটি থমকে দাঁড়াল। তারপর জোর গলায় হাঁক দিল কন্‌ট্রাক্টর কন্‌ট্রাক্টর।

যতীন ধড়মড় করে উঠে পড়ল।

লোকটি বলে গেল, এইবার রাস্তা খারাপ। এখনও অনেক রাত বাকী আছে। বাবুজী কেন দরজা ভেতর থেকে লক করে দেন।

যতীন ঘুম চোখে উঠে এসে লোকটিকে বিড়বিড় করে ধন্যবাদ দিল। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ল।

গৌরী যেন মরে গেছে। অসাড়ে শিথিল হয়ে নিশ্চিতভাবে পড়ে রইল। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারল লোকটি নেমে গেছে। কেবল যতীন রয়েছেই আছে।

গৌরীর নিঃশ্বাসটা ভারী হয়ে পড়ল। যেন সব ভয়, সব আতঙ্ক শেষ করে দিয়ে বুকটাকে হালকা করে দিল।

মনে হল, একটু পরিষ্কার বাতাস টানতে পারলে বাঁচে। এই মনে হওয়া মাত্র উঠে মাথার কাছের জানালাটা খুলে দিল।

দেখল, আলোয় আলোয় স্টেশনটা ছেয়ে গেছে। আর তাদের কামরার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটা, যেন গাড়ী থেকে সে এই মাত্র নেমে গেল।

গৌরী দেখল লোকটার বেশ বয়স হয়েছে। সুন্দর সৌম্য চেহারা। লোকটির গলা জড়িয়ে ধরে পনের ষোল বছরের একটি মেয়ে ঝুলছে আর পিতাজী পিতাজী করে আনন্দে চেঁচাচ্ছে।

লোকটি আদর করে তার পিঠ থাবড়াচ্ছে। তার সারা মুখ দিয়ে স্নেহ ঝরে পড়ছে।

দৃশ্যটা যেন সপাং করে চাবুক মারল গৌরীকে।

শেষ রাত্রের সেই ভারী ভিজে অন্ধকার পরিবেশ, আলোকিত স্টেশন আর সব ছাপিয়ে বাপ বেটির সেই স্নেহক্ষরা পুনর্মিলন গৌরীর চেতনা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল।

লোকটা আদৌ দুর্বৃত্ত না বদমাস নয়। সে যতীনকে গলা টিপে হত্যা করেনি। ঐ তো যতীন ঘুম চোখে দরজা বন্ধ করে গেল, গিয়ে আবার ঘুমোচ্ছে। কল্যাণ কেয়ারও অমঙ্গল কিছু ঘটেনি। গৌরী যেন জমা খরচের খাতায় নিপুণ খাতাঞ্চির মত হিসেব তুলে রাখছে। না, কল্যাণ কেয়ার একগাছি চুলও নষ্ট হয়নি। ক্ষতি হয়নি গৌরীর। যদিও ট্রাঙ্কের দিকে সে চাইল না, তবু সে নিশ্চিতভাবে বুঝল, গহনার কেসটা তার মধ্যে অটুটই রয়েছে।

সব ঠিক আছে। তবে?

তবে ঐ লোকটিকে দেখে গৌরী অত ভয় পেল কেন? অত যন্ত্রণা বোধ করল কেন?

ট্রেনটা ছাড়ল। ধীরে ধীরে স্টেশনটা সরে যেতে লাগল গৌরী অবসন্ন চোখের উপর দিয়ে।

ঐ যে ওরা! গৌরীর চোখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গেটের সামনে ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে বাবা আর মেয়ে। মেয়ে বাবার হাত থেকে টিকিটটা কেড়ে নিয়ে কালেক্টরকে দিল তারপর হাসতে হাসতে দুজনেই বেরিয়ে গেল। আর দেখা গেল না ওদের। ট্রেনখানা ততক্ষণে গৌরীকে নিয়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছে।

কেন এত ভয় পেল গৌরী? লোকটার স্নেহময় মুখে সে তো তার বাবার ছবিই দেখতে পেল। দেখল যতীনের। কল্যাণ কেয়াকে যতীন যখন আদর করে তখন তার মুখেও তো ঐ একই অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে।

এই গাড়ীতে ও উঠেছিল কেন? কেন উঠবে না! গাড়ী তো তাদের রিজার্ভ করা ছিল না। আলো কেন জ্বালল না তবে? ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চায়নি, তাই।

এমনই খুঁটিয়ে বিচার করতে বসল গৌরী। লোকটি যে দুর্বৃত্ত নয়, সে সম্পর্কে একটার পর একটা যুক্তি খাড়া করতে লাগল। লোকটির প্রত্যেকটি আচরণ বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করল, লোকটি সত্যিই ভদ্রলোক ছিল। অনর্থক ভয় পেয়েছে গৌরী।

যে মুহূর্তে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাল, সেই মুহূর্তেই এক অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন কামড় মারল তার আত্মার মর্মমূলে। গৌরীর মনুষ্যত্ব তীব্র বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

সে হঠাৎ আবিষ্কার করল লোকটি যে ভাল, সে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে গৌরীকে অনেক প্রমাণের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে হয়েছে। কিন্তু লোকটাকে দেখে মুহূর্তের মধ্যেই তাকে দুর্বৃত্ত বলে ধরে নিয়েছিল। তখন তো কোন প্রমাণের জন্য সে ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা করেনি।

ছি ছি ছি। গৌরী কি, গৌরী কি? ট্রেনখানা যেন চাকায় চাকায় মৃদু ধিক্কার তুলতে লাগল।

গৌরীর মনে পড়ল, মানুষ এককালে গুহাবাসী ছিল। দেহে মনে অন্ধকার নিয়ে ঘুরে বেড়াত। শুধু ভয়, শুধু সংশয় আর আতঙ্ক, এই ছিল সে সব মানুষের প্রধানতম অনুভূতি। দৈবাৎ কাউকে দেখতে যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে হত্যা করত তাকে।

তারপর সে যুগকে অনেক পিছনে ফেলে গৌরীরা চলে এসেছে আজকের জগতে, অনেক আলোয় স্নান করে, অনেক সূর্যের প্রসাদ পেয়ে।

কিন্তু কই সে আদিম অন্ধকূপকে গৌরী তো আলোকিত করতে পারেনি। সে যে এখনও তার মধ্যে বাস করছে।

সেই লোকটি তাদের কামরায় ওঠার পর গৌরী আর তার মধ্যে যে বিশ্বাস জন্ম নিচ্ছিল কোথায় তাকে লালন করবে গৌরী, না তাকে খুন করে বসল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুন করেছি।

কল্পনায় যতীনের খুন যখন দেখছে গৌরী তখনই সে খুন করেছে নিষ্পাপ শিশুর মত নবজাত সেই বিশ্বাসকে। মেরেছি করে গলা টিপে টিপে।

পুবের আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। গৌরী হাত দুটো তুলে ধরল সেই আবছা আলোয়। কি বীভৎস দেখাতে লাগল সে দুটো।

এক অসহনীয় যন্ত্রণায় গৌরীর মর্মস্থল কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। নিজের মনের দিকে চাইলে গৌরী। কি গভীর খাদ, আর কত জমাট অন্ধকার। ভয় আর আর সংশয়, সন্দেহ আর আতঙ্ক, এই দিয়ে ঠাসা।

গৌরীর যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। আলো, আলো না হলে বাঁচবে না গৌরী।

পূর্ব দিগন্তের সীমানায় যে রক্তিম আলোর সংকেত দেখতে পেল গৌরী তারই উদ্দেশে হাত জোড় করে প্রার্থনা করতে লাগল :

হে জবাকুসুমকান্তি, আমার পাপ ক্ষমা করো। আমাকে শুচি করো। আর একবার আমার সুযোগ দাও, বিশ্বাসকে লালন করবার। অবিশ্বাসের অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করে আমাকে তোমার আলোর রাজ্যে নিয়ে যাও।

সেই লোকটির উদ্দেশেও বলল :

তুমি আবার এসো আমাদের সেই অন্ধকার কামরায়। তোমার উপস্থিতির সান্নিধ্যে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোবার আরেকটা সুযোগ আমাকে দাও।

—বিউটি এদিকে এসো।

উৎসুক চোখে তাকাতেই দেখলুম একটা সাদা ধবধবে কুকুর মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে আসছে।—কুকুরের নাম বিউটি রেখেছেন। পছন্দ আছে তো আপনার। আমি হেসে বললুম।

কুকুরটাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে ভদ্রমহিলা বললেন—সকলেই তাই বলে। আমি কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পাইনে—।

—না অস্বাভাবিক আর কি! বাড়ির মেয়ের নাম নেড়ী না রাখলেই হল—।

—ঠাট্টা করছেন?

—মোটেই না। আমি হাসলুম। ভারি সুন্দর দেখতে তো কুকুরটা; আপনি বুঝি ওকে খুব ভালোবাসেন? একটা কিছু বলতে হবে তাই বললুম।

—চুপ চুপ। কুকুর বলবেন না। শুনতে পেলে ও কি ভাববে! সতর্ক স্বরে ভদ্রমহিলা বললেন।

এ জাতীয় রসিকতায় হাসি পাবার কথা নয়। আমারো পায়নি। তবু জোর করে হাসলুম। ভদ্রমহিলা ভুরু কুঁচকে আমার হাসিটা লক্ষ্য করলেন। কুকুরটা ও'র কোলে বসে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো দুধের মত সাদা ওর নরম পিঠটায় একটু হাত বুলিয়ে দি। একটু আদর করি। বিউটির তুলতুলে গলাটা নিজের গালে চেপে ধরে ভদ্রমহিলা বললেন—আপনি তখন জিজ্ঞেস করছিলেন না ওকে আমি ভালবাসি কি না—।

—হ্যাঁ।

—ভীষণ ভালোবাসি। ওকে আমি নিজের হাতে নাওয়াই; নিজের হাতে খাওয়াই, ঘুম পাড়াই। আর দুষ্টুটাও এমন বুঝলেন; একদিন যদি আমি না পারি, বাস্, অমনি সব বন্ধ রইল মেয়ের—

—ও বুঝি মেয়ে?...

—মেয়েই তো। দু হাতে কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরলেন ভদ্রমহিলা।

—বয়স কত হল?

—কত আর, এই তো আসছে ফাল্গুনে চারে পড়বে। হলে কি হয়—। মুখ চেপে হাসতে লাগলেন ভদ্রমহিলা। হাসির শব্দ উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরটাও দুলতে লাগলো। আমি একটু অবাক। 'চৌধুরীদের কালো কুকুরটাকে দেখলেই মেয়েটা এমন চ্যাঁচামেচি শুরু করে যে'—খিল খিল করে আবার হাসতে লাগলেন ভদ্রমহিলা।

—পূর্বরাগ নয় তো—! হঠাৎ ফস্ করে বলে ফেললুম। বলেই দেখি ভদ্রমহিলার গাল দুটো ঈষৎ লাল হয়ে উঠেছে। চোখ ঘুরিয়ে নিলুম।

—কে জানে হতে পারে। কিছুক্ষণ পর নরম গলায় তিনি বললেন। তারপরই এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর কুকুরটার গালে চুমো দিতে দিতে আস্তে আস্তে ভেতরে চলে গেলেন। আমি দেখলুম তিনি কিছুটা অন্যমনস্ক।...

রাত্রে খেতে বসে বৌদিকে বললুম—তোমাদের এই জায়গাটা কিন্তু ভারি ভালো লাগছে বৌদি। বিশেষ করে এই বাড়িটা।

—তাহলে থেকে যাও কিছুদিন। খুশী গলায় বৌদি বললেন।

—ভাবছি।

—এখানে থাকলে কিন্তু লেখার অনেক মালমশলা পাবে। এটা ঠিক।

—কি রকম?

—সে তুমি নিজেই বুঝবে। সোনা ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ওকে খেতে ডেকে দিয়ে বৌদি বললেন—আচ্ছা, তোমার সঙ্গে বোসদির আলাপ হয়েছে!

—বেলাদিটা কে! খেতে খেতে মুখ তুলে তাকালুম।

—দি লেডী য়ুইথ হার হোয়াইট ডগ। বৌদি হেসে বললেন।

—ওহ্‌হো, ওই মহিলা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো আজই বিকেলে আলাপ হল।

—কেমন লাগলো!...

—ভারি সরল কিন্তু। বয়স তো প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হবেই অথচ—

—একেবারে বাচ্চা মেয়ের মত তো! বৌদি কথাটা কেড়ে নিলেন। আরে ঐটেই তো ও'র রোগ।

—রোগ? সেকি! কেন কি হয়েছে—

বৌদি কিছু বললেন না। বাঁ হাতটা মাথায় রেখে সোজাসুজি তাকালেন শুধু।

—তাই নাকি! ইস্‌ কতদিন হল এ রকম—আমি বললুম।

—অনেক দিন, প্রায় বারো বছর!

—কিন্তু দেখে তো বোঝা যায় না!

—না, মাঝে মাঝে বেশ ভালো থাকেন, স্বাভাবিক চলাফেরা। বোঝাও যায় না। তারপরেই আবার দুর্দান্ত হয়ে ওঠেন। তখন ঘরে আটকে রাখতে হয়।

—আমার সঙ্গে তো অনেক কথাবার্তা বললেন—

—ওই একটা ধরন। অপরিচিত লোক দেখলেই কেমন করে যেন সংযত হয়ে যান।

—ভীষণ কনসাস বলতে হবে—

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে মোটামুটি এইটুকুই জেনেছিলুম প্রথম দিন। পরদিন সকালে বেড়িয়ে ফিরছি। বাইরের লনে সেই ভদ্রমহিলা অর্থাৎ বেলাদির সঙ্গে দেখা। এড়িয়ে যাবো ভেবেছিলুম। উনিই ডাকলেন।—কতদূর যাওয়া হয়েছিলো!

—কাছেই; আমি বললুম—একটা চিঠি পোস্ট করতে গিয়েছিলুম পোস্টাপিসে।

—ও। তা এই জায়গাটা কেমন লাগছে শুনি!

—চমৎকার!

—হ্যাঁ, ভারি স্বাস্থ্যকর জায়গা। তলার কোমল ঘাসে ডান পা' ঘষতে ঘষতে বেলাদি বললেন। ও'র পরনে একটা হালকা সবুজ রঙের আটপৌরে শাড়ি। আর সাদা সুতোর কাজ করা একটা ব্লাউস। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, সবুজ পাতার ফাঁকে একটা সাদা ফুল। মাথার চুল এলোমেলো। ঘুমে ফোলা চোখ মুখ। গলায় একটা চিকন বিছাহার। রোদ লেগে লকেটটা চিকচিক করছে।

—কিছুদিন থাকার ইচ্ছে আছে তো! বেলাদিই কথা বললেন।

এই তৃতীয় পুরুষে কথা বলার অস্বস্তি থেকে আমিই ও'কে রক্ষা করলুম। বললুম—আপনি আমাকে 'তুমি' করেই বলুন না। বয়সে তো আপনি আমার চেয়ে ঢের বড়ই হবেন; কাজেই—

—বেশ বেশ তাই হবে। মনে হল উনি একটু খুশীই হলেন। আচ্ছা, আজকের ওয়েদারটা ভারি সুন্দর না! একটু পরে বেলাদি আবার বললেন।

—অদ্ভুত সুন্দর। আমি বললুম।

—এ রকম দিনে কি করতে ইচ্ছে করে বলো তো। আমার চোখে চোখ তুলে বেলাদি তাকালেন।

—বনের ধারে দল বেঁধে পিকনিক করতে। অবশ্য সেই বনের পাশে একটা ছোট্ট নদী থাকা চাই। আমি হেসে বললুম। আর আপনার?

—আমার? হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন বেলাদি। আমার কিন্তু ভাই গ্রেটিস্‌এর কবিতা পড়তেই ভালো লাগে। সেই যে সেক্সপীয়রের একটা কবিতা আছে না, আন্ডার দা গ্রীনউড ট্রী, হু লাভস টু লাই উইথ মি...। বলতে বলতে বেলাদি পিঠ টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। চোখ দুটো তীক্ষ্ণ করে এদিক ওদিক তাকালেন। যেন কি একটা খুঁজছেন অথচ পাচ্ছেন না।

সকালের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে নরম সবুজ ঘাস আর বেলাদির হালকা পাতলা শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে। সেই আলোয় বেলাদির এক মাথা কালো চুলের ফাঁকে দু চারটে সাদা চুল দেখা যাচ্ছিলো। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু দেহের বাঁধুনি একটুও নষ্ট হয়নি। মুখে বসন্তের দাগ। অনেক নয় কয়েকটা। তবু সুন্দর মুখশ্রী একেবারে বদলে গেছে। তবে বেলাদি যে এককালে অপরূপ সুন্দরী ছিলেন তা বোঝা যায়। টানা টানা দুটো চোখ। তার ওপর ঘন কালো পাতা। একটা শান্তি স্বপ্ন যেন সব সময়েই উঁকি দিয়ে আছে। সরু নাক। বাঁকানো ভুরু। হাসলে গালে টোল পড়ে। টোল পড়লে ভালো দেখায়। আগে হয়তো আরো ভালো দেখাত।

—আচ্ছা, তুমি একটা পাখী দেখেছো। সেই পাখী যে হারিয়ে গেছে অথচ পাচ্ছি না' অবস্থায় আচমকা বেলাদি বলে বসলেন।

—পাখী! কি রকম বলুন তো! অবাক হয়ে বললুম।

—কি রকম আবার—একটু উত্তেজিত গলায় বেলাদি বললেন—পাখী যেমন হয়ে থাকে। রঙটা কালো কুচকুচে, কিন্তু ডাকে বড় মিষ্টি। অথচ কোত্থেকে যে ডাকে খুঁজে পাইনে—কি বলবো আর। বিস্মিত চোখে বেলাদির দিকে তাকিয়ে রইলুম আমি। বেলাদির চোখ দুটো লাল হয়ে এসেছে। বুকটা জোরে জোরে ওঠানামা করছে। কপালের দু পাশের রগদুটো কাঁপছে। আমি আস্তে আস্তে সরে এলুম।

ঘরে ফিরে বৌদিকে পাখীর কথা বলতেই বৌদি হাসলেন।—ও এরি মধ্যে তোমাকে ওটা জানা হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ এই মাত্র উনি বলছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি বৌদি ঠিক বুঝতে পারছিনে তো—

—পাখীটা কি আজো খুঁজে পাচ্ছেন—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তা পারছি। কিন্তু—

—কিন্তু কি!

—এর কি কোন ট্রিটমেণ্ট নেই!

—অনেক আছে। তবে সেগুলো বেলাদির কোনো কাজে লাগেনি।

—আচ্ছা, কেন এমন হল জানেন! কারণটা কি?

—বলিনি তোমাকে!

—না তো!

—বেশ আজ দুপুরে মনে করিয়ে দিও, বলবো খন।

কিন্তু বৌদির কাছ থেকে সেদিন আর গল্পটা শোনা হল না। তারপরের দিন না। তারপরের দিনও না। এ কদিন জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখতেই কেটে গেল। চতুর্থ দিন আবার দেখা হল বেলাদির সঙ্গে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে সবে। চারদিক ছায়া ছায়া। পাখপাখালীর ডাকে উচ্চকিত। হেরিং সাহেবের কুঠির পেছনে সূর্যটা আড়াল হয়েছে এইমাত্র। বাইরের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বেলাদি বসেছিলেন। কোলের ওপর এক ঝাড় স্পাইডর লিলি আর কয়েকটা ব্ল্যাক প্রিন্স। বাতাসে তার মৃদু গন্ধ। বেলাদির পরনে হলুদ রঙের একটা মাদ্রাজী শাড়ি। আর হাঁসের বুকের মত নরম-সাদা একটা ভেলভেটের ব্লাউস। মাথার চুল হলুদে রিবন দিয়ে উঁচু করে বাঁধা। বসে বসে চকোলেট চিবুচ্ছিলেন বেলাদি।

—কেমন আছেন—আমিই এগিয়ে গিয়ে প্রথমে কথা বললুম।

—ভালো, বোসো। এভাবে কেউ ডেকে বড় একটা কথা বলে না ও'র সংগে। খুব খুশী হলেন তাই। পাশেই একটা মোড়া ছিল সেটা টেনে নিয়ে বসলুম। আমার দিকে চেয়ে বেলাদি অকারণে একটু হাসলেন। মনে হল তিনি যেন একটু গম্ভীর।

আচ্ছা, বেলাদি—ঈষৎ নড়েচড়ে একটা খাপছাড়া প্রশ্ন করে বসলুম—মানুষের কোন বয়সটা সবচেয়ে ভালো বলুন তো।

—তোমার কি মনে হয়?

—আমার তো শৈশবটাই ভালো লাগে। ইচ্ছে করেই বললুম। আমার উদ্দেশ্য বেলাদিকে একটু বাজিয়ে দেখা।

—আমার কিন্তু ভাই যৌবনটাই সবচেয়ে ভালো লাগে। কী মধুর ঐ সময়টা! ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বাঁ হাতের চুড়িগুলো নাড়তে নাড়তে বেলাদি বললেন। আমি দেখলুম বেলাদির চোখ দুটো বুজে আসছে আস্তে আস্তে। বুকটা দ্রুত উঠছে নামছে। ভেতরে ভেতরে একটা দুরন্ত আবেগের সংগে তাকে যেন লড়াই করতে হচ্ছে।

ভাবটা সরিয়ে দেবার জন্য আমি বললুম —ভালো কথা, আপনার আদরের বিউটি কোথায়?

—ঐ তো লনে খেলছে। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে বেলাদি বললেন।

সত্যিই লনে খেলছিলো ও। একা নয় অবিশ্যি। সঙ্গী হয়েছে সোমা আর পাশের বাড়ির ফুটফুটে পাঞ্জাবী মেয়ে রীতা। একটা সাদা টেনিস বল নিয়ে ছোটাছুটি করছে ওরা। মুখ ঘুরিয়ে ওদের খেলা দেখতে লাগলুম।

—তুমি বুঝি বাচ্চাদের খুব ভালোবাসো! বেলাদির কথায় আমি হাসলুম। —পাঞ্জাবীদের মেয়েটা কেমন সুন্দর দেখেছেন। কী সুন্দর ওর ফ্রকটা।

—ওকে তুমি সুন্দর বলছো। চাপা গলায় বেলাদি বললেন। কোনখান দিয়ে সুন্দর শুনি! কি আছে ওর? নাক? মুখ? রঙ?...

—না থাকুক তবু সুন্দর। বেশ একটা লাবণ্য আছে চেহারায়।

—ছাই আছে। তুমি ওকে চেন না তাই বলছো। ভারি বজ্জাত মেয়ে।—হঠাৎ বেলাদির গলার স্বরটা চড়ে গেল—আমায় দেখলেই ও ভেংচি কাটে। কি বলে জানো—বলতে গিয়েই ঝপ করে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন বেলাদি। আড়চোখে আমার মুখের দিকে তাকালেন; তারপর কোলের ওপর থেকে একটা ব্ল্যাক প্রিন্স তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকতে লাগলেন।

বেলাদি না বললেও বুঝেছিলুম রীতা কি বলে।—ছেলেমানুষ ওর কথা ধরেন কেন। আমি বললুম।

—ছেলেমানুষী বের করছি; একবার পেয়ে নি না হাতের কাছে—বেলাদির চোখ দুটো এক অদ্ভুত হিংস্রতায় জ্বলে উঠলো।

বেলাদির ক্রোধটা যে রীতার ওপর নয়, রীতা একটা উপলক্ষ্য মাত্র, বেশ বুঝেছিলুম। সেই জন্যই ঘুরিয়ে বললুম—ছেলেবেলার কথা আপনার মনে আছে বেলাদি!

—নেই আবার!

—তখন নাকি আপনি দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন—। আমি ঠিক জায়গাটি ছুঁতে চাইছিলুম।

—ছিলামই তো। তোমার ঐ বজ্জাত পাঞ্জাবী মেয়েটার চেয়ে অনেক বেশী—শিশুর মত খল্ খল্ করে উঠলেন বেলাদি।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। কেন তোমাকে আমার অ্যালবাম দেখাইনি বুঝি

—কই না।

—এহহে, ভাগ্যিস কথা উঠেছিলো। তুমি একটু বোসো ভাই, আমি এক্ষুনি ওটা নিয়ে আসছি। বেলাদি উঠে ঘরের ভেতরে গেলেন। একটু পরেই আবার ফিরে এলেন। হাতে একটা অ্যালবাম।—এই দেখো আমার ছবি। অ্যালবামটা আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে বেলাদি বললেন।

দেখলুম। পাতায় পাতায় বেলাদির ছবি। নানা বয়সের। নানা সাইজের, নানা ভংগীর। দেখে চোখ জুড়োয়। বুকে দোলা লাগে।

—অথচ আপনার চেহারার কত পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন দেখলে কে বলবে এগুলো আপনারি ছবি। আমি বললুম।

—মাঝে মাঝে আমিই চিনতে পারিনে।

বেলাদি শুকনো হাসলেন। হ্যাঁ ভাই, আমি কি একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছি—

—না না, তা হবেন কেন? আমি বাধা দিলুম। বেলাদির চোখে চোখ রেখে একটু হাসলুম। একটু কাশলুম। অকারণে বার কয়েক ঘাড় চুলকে বললুম—বেলাদি অ্যালবামের এক জায়গায় এক ভদ্রলোকের ছবি দেখলুম, তিনি কে—? সত্যি সত্যিই একটা ছবি ছিল। বছর আটাশ উনত্রিশের এক যুবকের। বেশ সুশ্রী বলিষ্ঠ চেহারা। দেখলে ভালো লাগে।

—অ, তুমি অমিয়র কথা বলছো বুঝি। ও হোল অমিয় সেন। বিলেত ফেরৎ মস্ত বড় ইঞ্জিনীয়র।

—মস্ত বড় ইঞ্জিনীয়র? চোখে মুখে কপট বিস্ময় ফোটালুম। এখন কোথায় আছেন ভদ্রলোক?

—তাতো জানিনে। অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ তো হয় না। বলতে বলতে হি হি করে হাসতে লাগলেন বেলাদি। গড়িয়ে গড়িয়ে। ছড়িয়ে ছড়িয়ে। তারপর হাসিটা থামিয়ে ভারি বেশ টেনে বললেন—বুঝলে, ও না আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো। বলে কি বেলা তোমাকে না পেলে আমার জীবনই বৃথা। অনেক অনুনয় বিনয় করলো—বেলাদি আবার হাসতে শুরু করলেন।

—তারপর কি হল। আমি মুখ তুলে তাকালুম।

—তারপর। আমগাছে একটা হাই তুললেন বেলাদি। হাইয়ের গলায় বললেন কিছু নয়।

—কেন?

—এমনি। বিয়ে করলেই তো সব শেষ। ফুরিয়ে গেলাম। যতদিন না করি ততদিনই ভাল। বুঝলে না—

—বুঝলাম। বেলাদির কথা শুনে ভারি আশ্চর্য লাগছিলো আমার। এতো সব সুস্থ মস্তিষ্কেরই কথা। কই সে লক্ষণ টক্ষণ গুলো তো একেবারে দেখা যাচ্ছে না। মনে মনে বৌদির ওপর রাগ হচ্ছিলো ভীষণ। দেখেছো, কেমন সুন্দর ভাঁওতা দিয়েছেন। নইলে এমন একজন ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে বৌদির কথাগুলো সম্পূর্ণ অর্থহীন ছাড়া কি! চোখ তুলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমি বেলাদির দিকে তাকালুম। দূরের ঝাউ গাছটার দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে আছেন বেলাদি। হাত দুটো কোলের ওপর জড়ো করা। চোখের পাতা ঘন ঘন কাঁপছে। সারা মুখটায় কী একটা অচেনা আবেশ।... হঠাৎ পট্ পট্ করে হাতের আঙুলগুলো ফুটিয়ে বেলাদি আমার দিকে চাইলেন। বাঁ পাটা মেঝেতে বারকয়েক ঠুকলেন, দাঁত দিয়ে শাড়ির আঁচলটা খুঁটতে খুঁটতে ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। পিঠটা টান টান করে পেছন দিকে একটু বাঁকিয়ে ঘাড়টা আমার দিকে ঈষৎ কাত করলেন। তারপর খুব চাপা গলায় ফিসফিস করে বললেন—আচ্ছা, তুমি একটা পাখী দেখেছো!

—পাখী?

—হুঁ

—না তো।

—চড় মুশকিল। কালো কুচকুচে পাখীটার গায়ের রঙ, কিন্তু ডাকে বড় মিষ্টি।...অথচ কোত্থেকে যে ডাকে খুঁজে পাইনে।—

• • •

সেই রাত্রেই একটা নতুন কিছু জানলুম। খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে একটা চিঠি লিখছিলুম কোলকাতায়। আমার বন্ধু অনিল দাসের কাছে। সাইকোলজি নিয়ে বিস্তর পড়াশুনো করেছে ও। বেলাদির কথাই লিখছিলুম। যদি কিছু বুঝতে পারে। আমি তো পারলুম না।

রাত তখন প্রায় এগারোটা হবে। চারিদিক নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে দু একটা কুকুর ডাকছিলো দূরে। বাইরে ঝাউয়ের ডালে পাতায় সির সির শব্দ। জানলার দুটো শিকের ফাঁকে একটা কালো বিড়াল। ভেতরে আসতে গিয়ে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই থমকে দাঁড়িয়েছে। তিথিটা মনে আছে। চারদিক ধবধবে চাঁদের আলোয় ভরে গিয়েছিলো। এক সঙ্গে এত সাদা ও এত থমথমে আলো জীবনে দেখিনি। চিঠি লেখা শেষ করে বিড়ালটার দিকে তাকিয়ে ছিলুম। হঠাৎ একটা বিকট চিৎকারে নিস্তব্ধটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

কে যেন কাকে চেঁচিয়ে বললো—বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি!...

প্রথম আওয়াজটা কেঁপে কেঁপে বাতাসে মিলিয়ে যেতে না যেতেই আবার শব্দ উঠলো। কান পেতে আমি শব্দটা শুনলুম। এ যে বেলাদির গলার আওয়াজ। কি হল আবার? কাকে বেরিয়ে যেতে বলছেন।

পাশের ঘর থেকে বৌদি বললেন—কি শুনছো তো।

—কালা তো নই। কিন্তু ব্যাপার কি! কাকে বেরিয়ে যেতে বলছেন।

—খুন করবো খুন। বেরিয়ে যা বলছি। ক্রুদ্ধ আওয়াজটা আবার জাগলো। কিছুক্ষণ ধরে হাওয়ায় ভাসলো। তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

—বেলাদির অ্যালবাম দেখেছো। বৌদির হালকা গলা শুনতে পেলুম।

—হ্যাঁ দেখেছি।

—ওতে অমিয় সেন নামে এক ভদ্রলোকের ছবি দেখেছো!...

—দেখেছি।

—শয়তান, বদমাইস এখনো গেলি না—ফের শব্দ উঠলো। হিংস্র গর্জনটা বাতাসে ছড়িয়ে গেল। কালো বিড়ালটাও যেন ভয় পেয়েছে। টেবিলের তলায় গুটিসুটি মেরে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকেই চেয়ে আছে।...

মাঝে মাঝে এমন সব সময় আসে যখন সঠিকভাবে ভয়ের কোন কারণ না থাকলেও ভয় করে। ঠিক বুঝিনে কাকে ভয় করছি, কেন ভয় করছি। তবু গা ছম্ ছম্ করে। সত্যি কথা বলতে কি, আমারো একটু ভয় ভয় করছিলো।

—সেই ভদ্রলোককেই উনি বেরিয়ে যেতে বলছেন। বৌদি বললেন।

—ও। তা ভদ্রলোকটি যে এত রাত্রে এসেছেন কেন? [illegible] এতদিন পর। একটা [illegible] হাই তুলে পাশ ফিরে শুতে শুতে আমি বললুম।

—ভদ্রলোকটি এসেছেন তোমায় কে বললে?

—বাঃ [illegible] না [illegible] বললে—

—না, ওকে এখন থেকে চলে যেতে বলো না, আমি সহ্য করতে পারছিনে—ধ্বনিটা এবার [illegible] বেলাদির [illegible] মিশে যেতে লাগলো। [illegible] আকাশে [illegible] কাঁপছে লাগলো। [illegible] ঝাউগাছের [illegible] ফাঁকে [illegible] উঠলো। [illegible] চিৎকার করে।...

—উঁহু, [illegible] অমিয়বাবুর [illegible] কাছে মন [illegible] না [illegible] বলছেন ঐ [illegible] নেই!...

—না না, তা আছেন। তবে এই মুহূর্তে বেলাদির সামনে নেই।

—ওহ্হো বুঝেছি বুঝেছি। আচ্ছা বৌদি ওর সব কিছুর মূলে তো [illegible] এইখানেই, তাই না।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার একটা শব্দ আসছে। জলের কলসির ভেতর হাত ডুবিয়ে ছপছপ করে হাত নাড়লে যে রকম শব্দ হয় অনেকটা সেই রকম একটা শব্দ। পাশ ফিরে দেখলুম কালো বিড়ালটার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। কোথায় যেন একটা অদৃশ্য পোকার একটানা সুর

—আমার পাখী খুঁজে দাও না গো। তোমার পায়ে পড়ছি মা, আমাকে পাখীটা এনে দাও।...

—বারো বছরের একটা পুরোনো স্মৃতি হিংস্র পশুর মত বেলাদির পেছনে পেছনে ঘুরছে। ধরা গলায় বৌদি বললেন।

—সত্যি ভারি ট্র্যাজিক ওর জীবনটা। কিন্তু বেলাদির স্মৃতিটা কি!

—আজ নয় ভাই, কালকে সব বলবো। ভীষণ ঘুম পেয়েছে এখন।

ঘুম আমারো পেয়েছিলো। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার আগে অনিল দাসের কাছে

বসু। বড় ব্যারিস্টার। অঢেল টাকা। এভাবে স্কুলের দরজায় নিয়মিত হাজিরা দেওয়াটা ওর পক্ষে একটু অশোভনই। কিন্তু এই ওর শখ। বাবা আর এন বসুর সঙ্গে এই নিয়ে নীলা তর্ক করে।

বাবা বলেন—তোর যে এ কী খেয়াল আমি কিছুই বুঝি না। এভাবে মাস্টারী করে করে শরীরটা নষ্ট করবি। ও দু-চারটে টাকা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলেই পারিস!

সত্যিই তুমি কিচ্ছু বোঝো না বাবা। গাল ফুলিয়ে নীলা হাসে। আমি বুঝি টাকার জন্য মাস্টারী করি। হাত পা চালানো চাই তো। রাতদিন শুয়ে বসে থাকলে মুটিয়ে যাবো যে; তখন কিন্তু আর—

—তখন কি হবে—বাবা হেসে বলেন।

—তোমার মেয়ের আর কিছুতেই বিয়ে দিতে পারবে না। নিটোল ঠোঁট দুটো একটু চেপে বাচ্চা মেয়ের মত আদুরে ভংগীতে বাবার দিকে চেয়ে থাকে নীলা।

হা, হা, হা। শব্দ তুলে হেসে ওঠেন আর এন বসু। আমার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য কত রাজা মহারাজা বসে আছে জানিস।

—রাজা মহারাজা! একটা সরল বিস্ময়ের ভান করে নীলা।

—নিশ্চয়ই। হাতের চুরুটটা মেঝেয় ঠুকে আর এন বসু বলেন। সুন্দর মেয়ে ওরা কোথায় পাবে শুনি।

"বাবার কথায় নীলা মুখ ঘুরিয়ে হাসে। হাসতে হাসতে নিজের ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখে। মাঝে মাঝে ভাবে, আমি যদি পুরুষ হতাম, আর আয়নার বুকে আমার ছায়াটা যদি মেয়ে হত!...ভাবতে গিয়ে লজ্জা পায়, তবু ভাবতে ভালো লাগে। বেশ একটা উত্তেজনা আছে এতে।...

"আর এন বসুর কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। নীলার মত সর্বাংগসুন্দরী মেয়ে যে আর হাটে বাজারে মেলে না। ইদানীং তাই একরাশ করে চিঠি আসছিলো আর এন বসুর কাছে। সব চিঠিতেই বিয়ের সম্বন্ধ। পাত্রপক্ষরাই উত্থাপন করেছেন। পাত্রেরা সব একেক জনের চেয়ে একেক জন গুণী। রাজা মহারাজা অবশ্য কেউই নয় তবু কেউকেটা নয় মোটেই। ওর ভেতর থেকে বাছাই করাও মুশকিল। তবে সে ভারটা নীলার বাবা মা নীলার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিয়েটা যখন ওরই। ঘর সংসার যখন ওকেই করতে হবে তখন পছন্দটাও ওই করুক।

—আমাদের কি বলো; মেয়ের পছন্দ হলেই হল। আর এন বসু বলেছেন।

—তাছাড়া কি। উত্তরে মা বলেন, তবে কথা কি জানো আজকালকার মেয়েদের রুচি-টুচির কোন বালাই নেই তো, জগতের হাল-চালও জানে না, কাজেই একেবারে ওর ওপরে ছেড়ে দেওয়াটাও—

—আরে না না, নীলির ওপর আমার বিশ্বাস আছে। আর তাছাড়া বি এ পাশ করা মেয়ে, তার কোন 'চয়েস' নেই বলতে চাও।

—[illegible] আমি কিছুই চাই না, তবে থাকলেই ভালো।

"কিন্তু ভারি অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে এই নীলা। পাত্র পক্ষ থেকে লেখা চিঠিগুলো বেশ মন দিয়েই পড়ে, পড়তে পড়তে হেসে কুটিকুটি হয়। কিন্তু মনোনয়নের বেলা সবগুলিই বাতিল। না, ঠিক বাতিল নয়, এড়িয়ে যাওয়া গোছের ভাব একটা। এ বিষয়ে নীলার একটা নীতি ছিল।

চিঠিগুলো মায়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে নীলা বলতো—এই নাও মা, তোমার সব গুণধর পাত্রের পরিচয়পত্রগুলো রেখে দাও।

ভুরু কুঁচকে মা বলেন—অ, এবারেও বুঝি কাউকে মনে ধরলো না। কপালে দুঃখু আছে, তা কে খণ্ডাবে। এমন সব জ্ঞানী গুণী ছেলেদের পর—

—ভারি তো, আমি কি বলছি এরা জ্ঞানী গুণী নয়, কিন্তু আমার পছন্দ হলো না। হাতে দুটো পেন্সিল নিয়ে নিজে লোফালুফি করতে করতে নীলা বলে—আমি হাজারবার বলেছি এদের সকলকেই আমার পছন্দ; অপছন্দ করার মত তো এরা কেউই নয়, তবু তুমি—

—তোমার হেঁয়ালী কথা আমি বুঝিনে বাপু, সোজা কথায় বল না যে বিয়ে করবে না!

—এ তোমার মনগড়া কথা মা, আমি কখখনো বলিনি বিয়ে করবো না।

—তবে কি বলছ শুনি?

মায়ের কথা বলার ধরণে নীলা হেসে ফেলে।

—বিয়ে ঠিকই করবো, তবে এখন নয়, আরো কিছুদিন পর।

—যা খুশি কর তুমি আমি কিছু জানি না। রাগ করে মা ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

"নীলা ঠোঁট টিপে টিপে হাসে। নীলা ভাবে, মাটা যেন কী! বিয়ে বিয়ে করে অস্থির হয়েছেন। হুঁ, এ কি আর পুতুল খেলা, খেলতে বসলেই খেললাম। এ হল বিয়ে। যা একবার করলেই ফুরিয়ে গেলাম। যতদিন না তা করেছি, ততদিন কত স্বাধীন; ততদিন কত রোমান্স কত উত্তেজনা। নিজের খুশিমত চলাফেরা। খেয়াল মত উড়ে উড়ে যাও। এক চাক পুরোনো হলে অন্য চাকে বোসো। জীবনটা হচ্ছে দুঃখময়। মধুর ভাগ কম। তারি মধ্যে যতটুকু পার সংগ্রহ করে নাও, অবশ্য বিপদ আছে এতে। তা আমিও তো আর কচি খুকীটি নই। নিজের দিকে চেয়ে নীলা হাসে। কেমন করে নিজে বাঁচিয়ে চলতে হয় আমি জানি। তবে বিয়ে একটা করতেই হবে, কিন্তু তা বলে এখনই নয়। এই রোমান্সটা যখন পানসে হয়ে যাবে তখন না হয় পেছনে একটা দোর জুড়ে নেওয়া যাবে। ছাছাড়া সকলকেই যে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘরসংসার করতে হবে এমন কথা নয়।

"এই ছিল নীলা বসুর নীতি। আর সেই অনুসারেই নীলা চলতো ফিরতো। সোসাইটি গার্ল বলতে যা বোঝায় তা না হলেও স্বাভাবিক কারণেই নীলা বসুরও অসংখ্য স্তাবক জুটেছিলো। তারা সব সময়ে তাকে ঘিরে গুঞ্জন করতো। নীলা বসুর হাসিতে তাদের হাসি; ঈষৎ নড়াচড়ায় ওদের বুকে উথাল পাতাল ঢেউ। নীলা বসুর সামান্য কৃপায় কৃতার্থ সেইসব রূপপায়ীদের সাম্রাজ্যে সে ছিল সম্রাজ্ঞীর মত। চতুর স্তাবকদের গড়া জগৎটাকে সে ভেবেছিলো আসল স্বর্গ। অথচ নীলা একথা ভালোভাবেই জানতো যে, বন্য চিতা যখন তার চোখের সামনে রূপসী হরিণীকে দেখে তখন একটিমাত্র বাসনাই তার চোখে জ্বলে। তবু কী আশ্চর্য মোহ ছিল ওদের কথায়, ওদের হাবভাবে। পোষা কুকুরের মত ওদের এই ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়ানোটাই বোধহয় ভালো লাগতো নীলার। হয়তো নীলার ভেতরে একটা সূক্ষ্ম অহংকার ছিল বলেই সে এর বাইরে আসতে পারছিলো না। কিংবা হয়তো ভেবেছিলো, খেলা আর খেলানোটাই জীবনের সবচেয়ে বড় রোমান্স।

"সব সময়েই একটা আত্মগরিমায় জ্বলতো নীলা বসু। কাঁকুলিয়া রোডের সেই দুরন্ত সুন্দরী মেয়েটি। নিজের রূপ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিল সে। এরই নেশায় কত-জনের প্রেম সে শুকনো পাতার মত উড়িয়ে দিয়েছে। এক ফুঁয়ে প্রদীপ নেভাবার মত, কত জনকে সে নিভিয়ে দিয়েছে হিসেব নেই।

"ছবি তোলা ছিল নীলার একটা হবি। পরের নয় অবশ্য নিজেরই। নানা ভঙ্গীতে, নানা ঢঙে, নানা বেশে আবেশে ছবি তুলে অ্যালবাম ভরে রাখতো। আর নিজের সেই সব ছবির দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীলা তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতো।

"আসল কথা কি, নীলা নিজেই নিজের প্রেমে পড়েছিল।

"কোন কোনদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাকে এমন একটা মধুর ভাব জাগতো যে নীলা ভুলেই যেত নীচের ঘরে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন এক বেচারী ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের নাম ধরা যাক অমল সেন। কিন্তু নয় তো ও'র কথা মনে থাকলেও নীলা নেবেছে, থাক না বসে। অপেক্ষা করুক তো! সময় কিছু ছড়িয়ে দিলেই হল।

"অথচ অমল অবহেলা করার মত মানুষ মোটেই নয়। নিজের চেহারা ও ডিগ্রীর জোরে সরকারী কাজ করে। দেখতেও ভালো। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। সুপুরুষই বলতে হয়। আচার ব্যবহারও মনে রাখার মত। কোনদিক দিয়েই অনুপযুক্ত নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা অমল সেন নীলাকে ভালবাসতো। পোষা বিড়ালের মত নীলার দেওয়া দুধ খেতে ছাটে আসতো না অবশ্য, তবে ভালোবাসতো ঠিকই।

"কিন্তু পুরুষের প্রেম বলতে নীলা বুঝতো শিকারী কুকুরের ভালবাসা। বড় জোর একটা অসুস্থ কমপ্লেক্স; সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার। প্রেমের গল্প 'এ টেল টোল্ড বাই অ্যান ইডিয়ট'। এই ছিল নীলা বসুর কথা। ওর মনটা এত হালকা ছিল যে, সেখানে গভীর কিছু দাগ কাটতেই পারতো না।

"অমল সেন সবই বুঝতো। তবু একদিন সে বললো—তুমি বিশ্বাস কর নীলা আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। তুমি আমাকে—সবটা বলতে পারলো না তার আগেই লজ্জা পেল। নিজের কথাগুলো নিজের কানে যেতেই যেন লজ্জাটা ওকে ছুঁয়ে গেল।

—হুঁ, বটে! প্রাণের চেয়েও ভালবাসো! ইস্, একটা কাজ কর তাহলে যদু লেটার রাইট এ ড্রামা অমল: অ্যান্ড ইউ উইল বি এ ফাইন ফার্স আই অ্যাস্যুওর য়ু। টেনে টেনে চিবিয়ে চিবিয়ে নীলা বসু বললো। তারপর আলগোছে একটা হাই তুলে আড়চোখে অমলের দিকে চেয়ে দেখলো ভালোবাসার কথা বলতে গেলে পুরুষকে কেমন বোকা বোকা দেখায়।

—না না, ইয়ারকী নয়, আমি সিরিয়সলি বলছি নীলা। আমাকে বিয়ে করলে সেটা কিছু—কথাটা অসমাপ্ত রেখে নীলার চোখে চোখ রাখলো অমল সেন।

সামনের দিকে একটু এগিয়ে এলো নীলা।

—তোমাকে আমি এই মুহূর্তে বিয়ে করতে পারি বলেই করবো না।

—কেন, আমি কোন দিক দিয়ে তোমার অনুপযুক্ত বলো—

—সব দিক দিয়েই উপযুক্ত। কিন্তু সে কথা নয়। তোমাকে স্বামী হিসেবে পেলে যে কোন মেয়েই নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করবে। কিন্তু বিয়ে ব্যাপারটার ওপরেই আমার আস্থা নেই—

—কারণটা কি।

—আচ্ছা, বিয়ে আমাকে কি দিতে বলতে পারো। গুটিকয় নাক দিয়ে জল ঝরা ছেলে-মেয়ে আর একরাশ অশান্তি ছাড়া কি দিতে পারে!

—সব কিছুই দিতে পারে, প্রেম ভালবাসা, স্থৈর্য, মাতৃত্ব এবং সব মিলে একটা শান্তি-পূর্ণ স্নিগ্ধ সংসার।

—ও-সব একটা সংস্কার ছাড়া কিছু নয়। সভ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা.....

—কি লেকচারবাজী করছো নীলা, দুদিন পরেই এসব বড় বড় কথা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

ভালবাসার দাম দিতে শেখ। উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল অমল সেন। সেটা এড়িয়ে গাঢ় গলায় বললো—বিশ্বাস কর নীলা, তোমাকে না পেলে আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

হাত দুটো কোমরে রেখে একটি একটি করে অমলের সবগুলো কথাই নীলা শুনলো। তারপর হঠাৎ খিলখিল করে হেসে বললো—আমার জন্য প্রাণ দিতে পারো তুমি।

•

—নিশ্চয়। একটু আশা পেয়ে অমল সেন এগিয়ে এলো।

—গুড। কাল থেকে তোমাকেই বেঁধে নিয়ে বেরুবে। কি বলো—!

এতক্ষণে আহত হল বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়র। বুকের ঠিক মাঝখানটিতে একটা তীর এসে যেন খচ্ করে বিঁধলো।

একবার মুখ তুলে নীলার দিকে তাকালো অমল। তারপর একটিও কথা না বলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"আসলে মাছ ধরার চেয়ে, মাছটাকে নিয়ে খেলা করতেই নীলা বসু বেশী ভালবাসতো। পৃথিবীসুদ্ধ লোক ওকে বিয়ে করার জন্য বসে আছে এমন একটা ভাব সব সময়েই ওকে ছেয়ে রাখতো। আমি ইচ্ছে করলেই একে করুণা করতে পারি, কিন্তু করবো না। এই ছিল নীলা বসুর খেলার ধরণ।

"তারপর থেকেই অমল সেনের যাতায়াত কমলো। মাঝে মাঝে আসতো। নীলার মা বাবার সঙ্গে গল্প করেই চলে যেত। যদি কখনো সখনো নীলার সঙ্গে দেখা হত তবে দু-চারটে দায়সারা কথা বলতো মাত্র এই পর্যন্তই। পারলে অমল নীলাকে এড়িয়েই যেতে চাইত।

"নিয়তি বলে কিছু আছে কি না জানি না। যদি সত্যিই থেকে থাকে তবে কি আশ্চর্য বিদ্রূপ তার, সেই নীলা বসুকেই ধরলো কাল রোগে। কিছু থেকে কিছু না। একদিন বিকেলের দিকে জ্বর জ্বর লাগছিলো। কিন্তু নীলা গ্রাহ্য করলো না। সেই নিয়েই সারাটা সন্ধ্যা গঙ্গার ওপর বোট ভাড়া করে দল বেঁধে বেড়ালো। যখন বাড়ি ফিরলো তখন গা বেশ গরম। সেই রাত্রেই কম্প দিয়ে জ্বর এলো। প্রথম কদিন হাই ফিবার। সবাই ভাবলো হঠাৎ ঠান্ডা লেগেছে, সাধারণ জ্বর। কিন্তু তিনদিনের দিন দেখা গেল সারা গায়ে গুটি বেরিয়েছে। সঙ্গে ভীষণ জ্বালা।

—হেই গো মা ঠাকরুণ মায়ের দয়া হয়েছে গো। শীতলার দিদিমণির নামে মানত করে এসো। মা, মা, রক্ষে কর মা। বাড়ির ঝিটাই প্রথম এটা আবিষ্কার করেছিলো।

"মানত করা হল। বড় বড় ডাক্তার এলো। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে। সারা শরীরে বিষাক্ত গোটা। যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে লাগলো নীলা। আর জ্বরের ঘোরে বকতে লাগলো, গেল গেল, আমার সব গেলো।..

"সেই সময় অতীতকে ভুলে গিয়ে আশ্চর্য সেবা করলো অমল সেন। হয়তো এইভাবেই ওর লাঞ্ছিত ভালবাসাটা নীলার ওপর ঢেলে দিলো। কাজকর্ম সব ফেলে রাতদিন বসে থাকতো নীলার শিয়রে।

"নীলা ভালো হলে একদিন ওর মা বললেন বাবা, অমল, মেয়েটা তোমাকে চিনলো না; তুমি যা করলে আমরা বাপ-মা হয়েও তো তা পারিনি।

—নিশ্চয় নিশ্চয়। সে কথা হাজার বার স্বীকার করবো আমি। আর এন বসু বললেন। শুনে অমল হেসেছিলো। আর সামনের খোলা জানলা দিয়ে দূরের গাছটার দিকে তাকিয়ে কী যেন আকাশ পাতাল ভেবেছিলো নীলা।

অমল হেসে বললো—তুমি যে আবার উঠে বসবে, নীলা, আমরা কিন্তু ভাবিইনি।

"ব্যস্, সব খেলার তো এইখানেই শেষ। মনে মনে নীলা ভাবলো। ইস্ এর চেয়ে মরে যাওয়াই বরং অনেক ভালো ছিলো। এখন কী নিয়ে বেঁচে থাকবে ও; রূপই যখন গেল! সারা মুখ জুড়ে বসন্তের দুষ্ট ক্ষত। আলো পড়লেই একরাশ হিংস্র মুখের মত জ্বল্ জ্বল্ করে ওঠে। তাকিয়ে থাকলে ভয় করে। বুক ফেটে একটা প্রচন্ড কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিলো। কেউ আর এখন ভুলেও ফিরে তাকাবে না। এতদিন যারা আঠার মত লেগেছিলো। তারাই এখন ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নেবে। মনে মনে বাচ্চা মেয়ের মত নীলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো।

"এইবার অসুখের সময় শুয়ে শুয়ে, ভাবতে ভাবতে এই নীলা প্রথম সমস্ত ধমনী দিয়ে অনুভব করেছে কী একটা শূন্যতা যেন তাকে ঘিরে রয়েছে।

"অসুখ থেকে ওঠার পর সেই শূন্যতার ভাবটা আরো যেন দৃঢ় হয়ে আসছে। অত চপল চঞ্চল মেয়েটা অসুখের পর কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

"মা ভাবলেন—যাক মেয়ের মতি ফিরেছে। বাবা ভাবলেন—এইবেলা ওর বিয়েটা সেরে ফেলা যাক। কবে আবার বেঁকে বসে ঠিক আছে! বাইরের বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে দেয়ালে টাঙানো নিজেরি একটা ছবির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নীলা ভাবলো—ঐ মেয়েটা আবার কে।

"তবে ঐ মেয়েটাকে যারা চিনতো এই মেয়েটাকে তারা যখন চিনতে পারলো না, তখন নীলা কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু ভাবলো না। কারণ ও বুঝেছে এটাই স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে আরো বুঝলো, 'কী যেন একটা হারিয়ে গেছে; কী যেন একটা নেই' এই ভাবটাই ওকে বড় বেশী অধিকার করে বসেছে। এটা যেমন দুঃসহ, তেমনি ক্লান্তিকর। মাঝে মাঝে নিজের দিকে চেয়ে চমকে উঠতো নীলা। মনে হত সত্যিই জীবনটা 'ফুল অফ সাউন্ড এ্যান্ড ফিউরি, সিগনিফাইং নাথিং'।

"এই ভাবটা কাটাবার জন্যই একদিন একটা কান্ড করে বসলো নীলা।

"সেদিন সন্ধ্যের সময় অমল এসেছিলো। বাবা মা বাড়ি ছিলেন না। বহুদিন পর অমলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বললো নীলা। নিজের হাতে স্টোভ ধরিয়ে চা করে দিলো। এমন কি ঝুপ করে অমলের পাশেও বসে পড়লো। অমল যে অবাক হয়নি তা নয়। তবে এটাকে ও সহজভাবেই নেবার চেষ্টা করলো। নীলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসলো। রসিকতা করলো।

হঠাৎ যেন নীলা আগের মত সেই চঞ্চল মেয়েটি হয়ে উঠেছে। ভালো লাগলো অমলের।

"ঘরের ভেতর একটা হাল্কা নীল আলো জ্বলছিলো। ফ্লোরেসেন্টের উজ্জ্বল আলোয় বাইরে বাগানের ঘাসগুলো অদ্ভুত সুন্দর লাগছে দেখতে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা টিপয়ের ওপর রজনীগন্ধার ঝাড়।..

আচমকা অমলের একটা হাত নীলা জড়িয়ে ধরলো। একটু চাপ দিয়ে হাল্কা গলায় ডাকলো—অমল।

—উঁ।

—তুমি তো তখন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে তাই না।

—হুঁ।

—আমি রাজী আছি অমল। ভেবে দেখলাম মিছিমিছি দেরী করার কোন অর্থ হয় না। থামলো নীলা। অল্প কেশে গাঢ় গলায় বললো, আমিও তোমাকে ভালবাসি অমল—

আড় চোখে নীলার মুখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলো অমল। একরাশ শয়তান সেখানে জ্বল জ্বল করছে।

—কিন্তু এখন তো আর তা হয় না নীলা।

—হয় না? কেন! একটা কান্না যেন ঝরতে গিয়ে আটকে গেল।

—কেন, সে তো তুমি বোঝই নীলা। খুব করুণ স্বরে বললো অমল।

কিন্তু নীলার মনে হল অমল সেন যেন ভেতরে ভেতরে হাসছে।"

যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাকতে হয় তুমি তার জন্য প্রস্তুত হোয়ো, সমস্ত ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য এই কাজ নষ্ট কোরো না। তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫/৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার কাছে লেশমাত্র সংকোচ কোরো না। সেখানে তোমাকে কত পরিমাণে দিলে তুমি বিনা ক্লেশে দীর্ঘ ছুটি নিতে পার আমাকে লিখো। যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার তা আমি [illegible] তার বন্দোবস্ত করে দিতে পারব। তুমি আমাকে খোলসা করে লিখো।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক জগদীশচন্দ্রকে লিখিত পত্রাংশ

রমেশচন্দ্র দত্ত রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন। রমেশচন্দ্র তখন বিলেতে।

54 Parliament Street,
London, S.W.
16th July 1901

My dear Robi,

I was glad to learn that some of our countrymen have been thinking of making arrangements to make Dr. Bose independent of the Government appointment which he holds, so that he may pursue his researches all his life to the credit and honour of our country. The idea is an excellent one, because the chance we have now will probably never return within a generation if we lose it now. Dr. Bose has read startling papers and disclosed startling discoveries at the Royal Institution and the Royal Society, he has awakened the interest of the civilised and scientific world, and he is on the eve of revealing farther truths which will give our countrymen a position and a name. But to pursue his work to a successful termination against all opposition is a work of years, and during these years we must support him and keep him in his work. The Indian Govt. can't do this and won't do this. They have refused his prayer for extension and you know as well as I, they will not be sorry to see him withdrawn from his brilliant labours into the drudgery and obscurity of Calcutta. If ever there was an occasion for us to fight for our fame and honour,—this is the occasion!...

I know, Robi, you feel as strongly as I do; you have immense influence in the country; and I appeal therefore to you to try privately to raise this money and invest in the manner proposed for the honour and the glory of our country.

Yours ever sincerely,
Romesh Dutt

১৯০০ সালে প্যারিসে এক বিরাট প্রদর্শনী হয়, আর সেই উপলক্ষে সেখানে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে এক আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু বিজ্ঞানী সমবেত হন। এখানে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা কিভাবে গৃহীত হয়েছিল তা স্বামী বিবেকানন্দের এই চিঠি থেকে বোঝা যাবে।—

এ বৎসর এ প্যারিস সভাজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জন সংগম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করবেন আজ এই প্যারিসে। সে নাদতরঙ্গ সঙ্গে তাঁহার স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর এ জার্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে গৌরবর্ণ প্রতিভা-মণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস। একা, যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক আজ বিদ্যুদ্বেগে পাশ্চাত্য-মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন, সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষ-স্থানীয় আজ জগদীশ বসু, ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, ধন্য বীর।

৬

আবিষ্কার—উদ্ভিদ-জীবন

ওই যে সামনের চারাটি [illegible] ... এই উদ্ভিদটির সম্বন্ধে [illegible] আছে।— [illegible] পরিবর্তন [illegible] ... কি পরি-[illegible] ... [illegible] প্রাণীর [illegible] কি কোনো [illegible] প্রাণীর হৃৎপিণ্ডে [illegible] উদ্ভিদে কি [illegible]?

জগদীশচন্দ্র এখন এইসব অনুসন্ধানে অগ্রসর হলেন, আর জীবনের শেষদিন অবধি নিজেকে ওইসব কাজে ব্যাপৃত রাখলেন। তিনি এমন সব যন্ত্র তৈরি করতে লাগলেন যাতে আঘাত দেওয়া, সাড়া নেওয়া প্রভৃতি কাজের সাহায্য ছাড়া যন্ত্রে আপনা-আপনি লিপিবদ্ধ হতে থাকে। এইসব যন্ত্র দিয়ে অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তিনি প্রাণী ও উদ্ভিদের সাড়ার একতা দেখালেন।

বাইরের উত্তেজনায়, ভিন্ন ভিন্ন আহার্যে গাছের বৃদ্ধির কিরকম পরিবর্তন ঘটে তা স্থির করার জন্যে জগদীশচন্দ্র ক্রেস্কোগ্রাফ নামে এক আশ্চর্য যন্ত্র তৈরি করলেন। উদ্ভিদের উপর আলো পড়ছে; অন্ধকার হল; খাদ্য দেওয়া হল; মদ, বিষ দেওয়া হল; ছোটো একটি চিমটি কাটা হল,—এসবের ক্রিয়া মুহূর্তমধ্যে ওই যন্ত্রে লিপি-বদ্ধ হয়ে চোখের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে।

সায়েন্টিফিক আমেরিকান নামে বিখ্যাত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পত্রিকা লিখল,—

ডক্টর বসুর ক্রেস্কোগ্রাফ নিয়ে বিজ্ঞান-চর্চার যে সম্ভাবনা রইল কোথায় তার কাছে আলাদিন ও তার প্রদীপের রূপকথা। পনের মিনিটের মধ্যে উদ্ভিদের উপর বিভিন্ন পদার্থ, সার, তাড়িৎপ্রবাহ ও উত্তেজকের ক্রিয়া নিরূপিত হয়ে যাবে।

১৯১৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে যেদিন তাঁর কার্যকাল শেষ হল সেদিন হতে, তখন যে বেতন পাচ্ছিলেন সেই পুরো বেতন, তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গভর্নমেন্ট তাঁকে প্রেসিডেন্সী কলেজে Emeritus Professor নিযুক্ত করলেন। ১৯১৬ সালে তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হল। কিন্তু তাঁর জীবনের চরম সার্থকতার দিন এল তার পর বছর ৩০ নভেম্বর, যেদিন বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ওই তারিখটি একটি স্মরণীয় দিন। ওই দিন ওই মন্দির যে প্রস্তরফলকটি বহন করল, চিরদিন তা প্রতিষ্ঠাতার হৃদয়ের বাসনা ঘোষিত করবে—

ভারতের গৌরব ও জগতের
কল্যাণ কামনায়
এই বিজ্ঞান-মন্দির
দেবচরণে নিবেদন করিলাম।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
১৪ই অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯৭৪।

সেদিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ রচিত এই সংগীত মন্দির-প্রাঙ্গণে ধ্বনিত হল,—

মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে,
বর-পুত্র-সঙ্ঘ বিরাজ হে।
শুভ-শঙ্খ বাজহ বাজ হে!

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে নতুন নতুন গবেষণা চলতে থাকল। এইসব গবেষণার ফলাফল দেখাবার জন্যে ১৯১৯ সালে গভর্নমেন্ট কর্তৃক তিনি পঞ্চমবার পাশ্চাত্যদেশে প্রেরিত হলেন। ১৯২০ সালে লন্ডনে তাঁর পরীক্ষাগারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীরা তাঁর নতুন আবিষ্ক্রিয়া দেখে গেলেন।

ওই বছর মে মাসে তিনি রয়াল সোসাইটির সভ্যপদে বৃত হলেন।

১৯২৮ সালে শেষবার তিনি ইউরোপে যান। বার্নার্ড শ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী জগদীশচন্দ্রকে উপহার দিয়ে লেখেন—'পৃথিবীর সর্বনিম্ন শরীরতত্ত্ববিদের কাছ থেকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শরীরতত্ত্ববিদের নিকটে।' রোমাঁ রোলাঁ তাঁর জিন ক্রিস্টফার উপন্যাস জগদীশচন্দ্রকে উপহার দিয়ে লিখলেন,—'একটি নতুন পৃথিবীর আবিষ্কর্তাকে'।

এবার ফিরে আসার পর ১৯২৮ সালে ১ ডিসেম্বর তাঁর দেশবাসী কর্তৃক তাঁর সপ্ততিতম জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হল। তাঁর আজীবনের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠান আয়োজনের অগ্রণী ছিলেন। তিনি যে কবিতাটি লিখে পাঠিয়েছিলেন তার কয়েকটি লাইন ছিল এই,—

তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে
দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের একূলে ওকূলে; আপন
দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান; উচ্ছ্বসি
উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্দ্র তোমার
আপন কর্ম-মাঝে।
জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেথা তব
আসন বিরাজে
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি
দীপালি উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে
মিলাইল, যবে
চেয়ে দেখো তার পানে এ দীপ
বন্ধুর হাতে জ্বালা।

১৯১৭ সালে ৩০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের উদ্বোধন হয়। ঠিক কুড়ি বছর পরে ১৯৩৭ সালে ৩০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় প্রতিষ্ঠাতার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শিষ্যবৃন্দ, রবীন্দ্রনাথ রচিত সেই সংগীতধ্বনির সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতার অস্থিভস্ম বহন করে এনে ওই মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রোথিত করলেন। এর ঠিক এক সপ্তাহ আগে গিরিডিতে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

তারপর আর কুড়ি বছর চলে গেল।

৫

সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী হলেও সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে তিনি কখনও পৃথক করে দেখেন নি। ১৯১১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির আসন থেকে তিনি বলেছিলেন,—

আমি যাঁহাকে সখা ও সহযোগী বলিয়া স্নেহ করি এবং স্বদেশীয় বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, সেই আমাদের দেশমান্য আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় একদিন এই সম্মেলন-সভার প্রধান আসন অলংকৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে সমাদর করিয়া সাহিত্য সম্মেলন যে গুণের পূজা করিয়াছেন তাহা নহে, সাহিত্যের একটি উদার মূর্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

অভিভাষণের উপসংহারে তিনি বলেন—

বহুদিন পূর্বে দাক্ষিণাত্যে একবার গুহা-মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এক গুহার অর্ধ-অন্ধকারে বিশ্বকর্মার মূর্তি অধিষ্ঠিত দেখিলাম। সেখানে বিবিধ কারুকর [illegible] আপন আপন কাজ

৫। ইন্‌কমট্যাক্স প্রায় [illegible] ৮০ পাউণ্ড
৬ষ্ঠ। মিউনিসিপ্যাল
ট্যাক্স ,, ১ টাকা

বায়ুর ২।১ ইঞ্চি চাপের উপর [illegible] উপর [illegible] হইবে। সুতরাং কলিকাতায় এই [illegible] স্থাপন করিলে বিশেষ যে উপকার হইবে এরূপ বোধ হয় না।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বন্ধু,

[illegible]

তোমার রবি

৮

দেশভক্ত জগদীশচন্দ্র

দেশের প্রতি জগদীশচন্দ্রের অনুরাগ, ভারতবর্ষকে তার পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা, জগদীশচন্দ্রের কথাবার্তায়, তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে।

সেটা ১৯০৩ সাল, এম-এ ক্লাসে আমরা তখন তাঁর ছাত্র। ক্লাসের সকল ছাত্রকে তিনি তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেছেন। খাবারের আয়োজন হচ্ছে। তখন ফনোগ্রাফ উঠেছে, স্বদেশী রেকর্ডও তৈরি হয়েছে। একটা গান দিলেন—

মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলেম না।

গানের এই লাইনটি হবার পর কল বন্ধ করে রাখলেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—তোমরা ভালো ক'রে এই গানটা শোন: একজন চাষা সমস্ত দিন মাঠে পরিশ্রম ক'রে বাড়ি ফেরবার সময় কি গাইতে গাইতে ফিরছে। গান আবার আরম্ভ হল। শেষ হলে দেখা গেল, তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বলে উঠলেন,—আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ, আমাদের যথার্থ গৌরব ভুলে গিয়ে মিথ্যে আড়ম্বর নিয়ে আমরা ভুলে আছি। অনেক দেশ তো ঘুরে এলুম, কোনো দেশের সভ্যতা এত নিম্নস্তরে [illegible] পৌঁছয়নি।

১৯০২ সালে এপ্রিল মাসে প্যারিস থেকে একখানা চিঠিতে লিখছেন,—

সারাদিন ঝঞ্ঝাট! সন্ধ্যার পর বাহিরের আঁধারের সহিত অন্তরের আলো জ্বলিয়া ওঠে। তখন আমি জন্মভূমির কোলে স্থান পাই।... [illegible] শুনিতে পাই হিন্দু স্বভাবতই সংসারবিমুখ, জীবনের সংগ্রাম

[একত্রিশ]

"সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জন্ম থেকে পৃথিবী দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, এক ভাগ নিয়ে [illegible] অন্যভাগে সমাজতন্ত্র"—১৯২৫ সালের সোভিয়েত সংবিধানে।

"[illegible] সবাই সহ-অবস্থানের সমর্থক। [illegible] শুধু [illegible] কোটি কোটি মানুষের [illegible]। আমেরিকার সঙ্গে আমরা একই [illegible] সমান [illegible]। শুধু বিজ্ঞান [illegible] সংহার করেছে। [illegible] প্রতিবেশীর [illegible]।"—ক্রুশ্চেভ।

"রাশিয়াকে সভ্যতার বাইরে [illegible], শুধু [illegible] না। মানব-রক্ত দিয়ে, তবে তাকে রুখতে হবে"—১৮৫০ সালের একখানা ফরাসী বই থেকে।

চল্লিশ বছরের পুরোনো একটি বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন পৃথিবীর বুকে বসে রয়েছে: তার নাম সোভিয়েত রাশিয়া। ক্রমাগত তার দেহ দীর্ঘতরো হতে হতে আজ ধরণীর এক-তৃতীয়াংশ এই প্রশ্ন-চিহ্নের কুক্ষিগত। যেদিন লেনিনের নেতৃত্বে এই প্রশ্নচিহ্নের সূচনা হয়েছিলো সেই থেকে সোভিয়েত রাশিয়া বার বার মানুষকে চমৎকৃত করেছে, হতাশ করেছে; প্রেরণা দিয়েছে, আশা জাগিয়েছে, খুলে ধরেছে নতুন আকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা, আবার আঘাত হেনেছে কঠিনভাবে মানুষের মনে ও দেহে, টুকরো টুকরো করেছে আশার স্বপ্ন। অনেকের দৃষ্টি খুলেছে, অনেকের দৃষ্টি নিয়েছে; অনেকের বাহুতে এনেছে নতুন বল, পায়ে নতুন অগ্রগতি, অনেকের দেহকে পঙ্গু, নির্বীর্য করেছে, অন্তরকে অন্ধকার। লক্ষ লক্ষ লোকের চমৎকৃত প্রশংসায়, অকুণ্ঠ স্তুতিতে সোভিয়েত রাশিয়া কোটি কোটি মানুষের কাছে দোষ-লেশহীন, চিরনিরপরাধ সতত-উজ্জ্বল দেবতার আসনে উন্নীত; আবার কোটি কোটি মানুষের ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা, ভয়, অপবাদ ও অভিশাপে সে কলঙ্কিত। কোন দেশ, কোন মতবাদ, কোন পথ এত নিন্দা ও এত স্তুতি পায়নি যেমন পেয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া ও তার প্রচারিত, অনুষ্ঠিত সাম্যবাদ; সোভিয়েত সাম্যবাদী বিপ্লবের কাছে, দীর্ঘ ও পল্লবিত প্রতি-ক্রিয়ায়, ফরাসী বিপ্লব নিতান্তই ম্লান, মার্কিন বিপ্লব নিতান্তই নিস্তেজ।

সাম্যবাদপ্রতিরোধী পৃথিবীর মানুষকে বার বার চকিত করে দেওয়া সোভিয়েত রাশিয়ার চল্লিশ বছরের অভ্যাস। প্রথম বছর গুলিতে সবাই আশা করেছিল যে, সামরিক হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক অসহযোগ ও রাজ-নৈতিক প্রত্যাখ্যানে শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্রকে কুঁড়িতেই বিনাশ করা যাবে; সোভিয়েত রাশিয়া শুধু বেঁচেই থাকেনি, ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেছে, [illegible] যুদ্ধ, সুদীর্ঘ দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক "সাফাই"এর অজুহাতে শত শত মানুষের প্রাণবলি সত্ত্বেও। লাল সেনাকে অসাম্যবাদী দুনিয়ার নেতারা কোন গুরুত্বই দেননি, এবং বৃটেন থেকে তুর্কী পর্যন্ত সবকার বিশ্বাস ছিল, জার্মান বাহিনীর আক্রমণের কাছে লাল সেনা সহজেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। সেই লাল সেনাই অর্ধেক য়ুরোপে সাম্যবাদের পতাকা উড়িয়েছে। গত মহা-যুদ্ধে সত্তর লক্ষ রুশ প্রাণ দিয়েছিল; লক্ষ লক্ষ গ্রাম ও জনপদ পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে, বিরাট, সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল শ্মশানে। বারো বছরের মধ্যে এই মহা-ধ্বংসের সহস্র ক্ষত নিরাময় করে রাশিয়া শিল্পে, উৎপাদনে আমেরিকার আজ প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। সোভিয়েত কূটনীতির বিচিত্র কুটিল গতির সঙ্গে পা চালাতে গিয়ে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনেতারা বার বার হোঁচট খেয়েছেন। সোভিয়েত বিজ্ঞানকে যাঁরা সে-দিন অবজ্ঞার চোখে দেখতে অভ্যস্ত তাঁদের চমকিত করে দুইটি সোভিয়েত উপগ্রহ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছে। আমেরিকাকে পেছনে ফেলে সোভিয়েত রাশিয়া এমন অস্ত্র নির্মাণ করেছে যা এক

মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে স্বতঃচালিত রকেটের বাহক আটম বা হাইড্রোজেন বোমা নিক্ষেপে সমর্থ।

শুধু তার শত্রুদেরই নয়, সোভিয়েত রাষ্ট্র তার মিত্রদেরও বার বার চকিত, বিহ্বল, ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করেছে। হিটলার-জার্মানীর সংগে হঠাৎ স্বল্পস্থায়ী মিতালি, ইরান আক্রমণ, ফিনল্যাণ্ডে যুদ্ধ, বার বার রাজনৈতিক "সাফাই" (Purge), বহুদিনের বহু হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত "দেবতা" স্টালিনের পতন, হাঙ্গারীর বিপ্লবকে দৃঢ় সামরিক হস্তে দমন, এর কোনটাই সোবিয়েত সমর্থকদের পক্ষে সহজে হজম করা সম্ভব হয়নি। বুদ্ধিজীবী একদা-মিত্র অনেকেই আজ যোগ দিয়েছেন বিপক্ষ শিবিরে।

দু বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যের আরব অঞ্চলে সোবিয়েত রাশিয়ার উপস্থিতি এমনি একটি অপ্রত্যাশিত, অবাক-করা ঘটনা। এর জন্যে না প্রস্তুত ছিল বৃটেন, না আমেরিকা—এমন কি আরব দেশগুলিও নয়। জার আমলের রাশিয়া যে "প্রাচ্য প্রশ্নের" সৃষ্টি করেছিল, তার সীমানা ছিল উত্তর-পশ্চিম এশিয়াঃ তুর্কী, ইরান ও আফগানিস্তান। নবজাত সোবিয়েত রাষ্ট্র, তুর্কী ও ইরানের উপর জার-সরকারের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দাবী পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও, দীর্ঘদিন তার দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল একই ভৌগোলিক রেখায়। তখনকার দিনে সোবিয়েত রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী তুর্কী ও ইরানের সংগে হার্দ্য বজায় রাখাই ছিল মস্কো সরকারের মধ্যপ্রাচ্য-নীতির মৌলিক প্রেরণা। আফগানিস্তানের স্বল্পায়ু প্রগতিবাদী নৃপতি আমানুল্লাকে বন্ধুত্বপূর্ণ সমর্থন দেখিয়ে রাশিয়া ও-দেশের সাবেকী জনচিত্তে এবং ভারতরক্ষা-সতর্ক বৃটিশ গভর্নমেণ্টের যথেষ্ট দুশ্চিন্তার উদ্রেক করেছিল; কিন্তু আমানুল্লার পতনের পরেও কাবুলের সংগে মিত্রতা স্থাপন করতে তার আগ্রহ বা ঔৎসুক্যের ঘাটতি দেখা যায়নি। দক্ষিণ রুশ সীমান্ত নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে রাশিয়া কখনও বা বন্ধুত্ব, কখনও প্রসারমুখী বৈরিতা করেছে ইরানের সংগে; কিন্তু তার আসল লক্ষ্য ছিল, প্রসারের চেয়েও, মিত্রতাপূর্ণ স্থিতিশীল সম্পর্ক।

আরব দেশগুলির সংগে সোবিয়েত রাশিয়ার প্রথম সংলাপে যে মিত্রতার সুর বেজেছিল অনুর্বর ধূসর মরুতে তার বীজ অংকুরেই গিয়েছিল শুকিয়ে। ইবনে সৌদ-প্রতিষ্ঠিত সৌদী আরবকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে সোবিয়েত রাশিয়াই সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিল, সেকথা আগেই বলেছি। প্রতিদান-স্বীকৃতি দিয়েছিল সৌদী আরব ১৯২৭ সালে, এমেন ১৯২৮এ। কিন্তু এটা শুধু স্বীকৃতিই, আত্মীয়তা নয়।

বস্তুতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে আরব-সোবিয়েত সম্পর্কের গোড়াপত্তন হয়নি। ১৯৪১ পর্যন্ত রাশিয়া আরবভূমিকে দেখে এসেছে একদল স্বেচ্ছাচারী সামন্তশাসিত শোষিতসর্বস্ব মানুষের দেশ, যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে দমিয়ে রাখাই বৃটেনের মুখ্য সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য। রাশিয়ার আরব-নীতির এ পর্যায়ের পরিচয় পেতে হলে শরণ নিতে হয় সোবিয়েত সরকারের নয়, যুদ্ধকালে তুলে-দেওয়া আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সংস্থার, যার নাম ছিল কমিণ্টার্ন। কমিণ্টার্ন থেকে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্যবাদীরা কোন পথে কি নীতি নিয়ে কাজ করবে তার নির্দেশ দেওয়া হত, সাম্যবাদী দৃষ্টিতে উপনিবেশ সমস্যার বিচার করা হত। বৃটেন মধ্যপ্রাচ্যকে দেখতো তার প্রাচ্য সাম্রাজ্যের চোখে; কমিণ্টার্নও মধ্যপ্রাচ্যকে গ্রহণ করেছিল এশিয়া-আফ্রিকা-ব্যাপী য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। সোবিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তকের রচয়িতা মাক্স বেলফ তিন দশকের রুশ মধ্যপ্রাচ্য নীতির আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "রুশ সাম্রাজ্য ও বৃটেনের মধ্যে এশিয়া নিয়ে পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার সমঝোতা যাকে কমিয়ে এনেছিল, আবার অন্য চেহারা নিয়ে দেখা দিল। ভারতের সীমান্তে, [illegible] মধ্যপ্রাচ্যে, এবং সবার উপরে চীনে, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সংস্থার প্রচার সর্বত্রই গোলমালের কারণ বলে (লেখকের) মনে হত, যদিও চীনের বাইরে তার প্রভাব বড় একটা দেখা যায়নি।"* সোবিয়েত রাশিয়া আরব নৃপতিবৃন্দকে যেমন মনে করতো শোষণ-পটু স্বার্থসেবী জনবিরোধী স্বেচ্ছাচারী, তেমনি বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষ্ট্র-সহায়ক নেতাদের মনে করতো সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার। কোন আরব দেশেই সাম্যবাদ শিকড় বিস্তার করেনি, তাই শাসক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনমতকে জাতীয়তাবাদের আগুনে তাতিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলাই ছিল কমিণ্টার্নের উদ্দেশ্য।

এর মধ্যে যে সামান্য একটু ব্যতিক্রম হয়েছিল তারও প্রেরণা ছিল বৃটিশ-বিরোধিতা আর মহাযুদ্ধের পূর্বাহ্নে স্বল্পস্থায়ী অনেক মানুষকে চমকে-দেওয়া রুশ-জার্মান মৈত্রী। ১৯৪১ সালে ইরাকে ইংরাজ-শত্রু, জার্মান-মিত্র রশিদ আলি যখন ক্ষমতা আয়ত্ত করেন, তখন মার্চ মাসে সোবিয়েত সরকার তাঁর সংগে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু রশিদ আলির বিপদের দিনে, সাহায্য করতে এক পা এগোয়নি, আর তার পতনের সংগে সংগেই এই ক্ষীণজীবী বন্ধুত্বের অবসান হয়েছিল।

হিটলারবিরোধী যুদ্ধের সময় ইংরাজের

* The Foreign Policy of Soviet Russia, by Max Beloff, Oxford University Press, vol. 1, p. 7.

হাত ধরেই রাশিয়া এসে দাঁড়ান আরব-প্রাঙ্গণে। বৃটেনের সমর্থনে রুশ দূতাবাস স্থাপিত হল কাইরোতে, বাগদাদে, বেরুটে ও ডামাস্কাসে। খাল কেটে কুমীর আনলেন স্বয়ং উইনস্টন চার্চিল। সে কুমীর যে কয়েক বছরের মধ্যেই মহা-আগ্রাসী হয়ে উঠবে, অঘটন-ঘটন-পটু বিধাতাই কি তা জানতেন?

প্রায় একশো বছর আগে কার্ল মার্কস য়ুরোপের আরবভূমি সম্পর্কে অজ্ঞতার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। বলেছিলেন, "আমাদের মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে সচরাচর যা ধারনা তার উৎস ঐতিহাসিক তথ্য নয়, আরব্য উপন্যাসের সহস্র রজনীর রোমান্টিক কাহিনী! য়ুরোপীয় দূতাবাসের কর্মচারীরা ওখানে বাস করে সত্যিকারের জ্ঞান দাবী করেন। কিন্তু এ জ্ঞানও অবান্তর। কেননা, এসব ভদ্রলোকদের কারবার জনসাধারণ নিয়ে নয়, তাদের সামাজিক অবস্থা নিয়ে নয়, প্রতিষ্ঠান নিয়ে নয়, শুধু রাজ-দরবার ও রাজপ্রাসাদ নিয়ে।" আজও পর্যন্ত মার্কসের এ কথার সত্যতা অম্লান। য়ুরোপ শুধু রাজদরবারের দৃষ্টিতে, আরব্য উপন্যাসের দৃষ্টিতে, ওমর খৈয়াম, ও ক্রুজেডের দৃষ্টিতে মধ্যপ্রাচ্যকে দেখে এসেছে। এমন কিছু কিছু ভারতীয়ও আছেন, যাঁরা এ দৃষ্টিরই অধিকারী। তাঁরা নতুন আরবভূমির বাণের উৎস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শ্রীমতী বাথারিন মেয়োর চোখ দিয়ে তাঁরা পশ্চিম এশিয়াকে দেখতে অভ্যস্ত।

কার্ল মার্কস ভাবতে পারেননি, তাঁর প্রচারিত সাম্যবাদের প্রথম বাস্তব প্রয়োজনা হবে রাশিয়ায়। রাশিয়াকে—জারশাসিত রাশিয়াকে—একশ' বছর আগে তিনি বৃটেন বা ফ্রান্সের চেয়ে অনেক বেশি প্রগতিপ্রতিপন্থী মনে করতেন। অথোমান সাম্রাজ্য যে রুশ সাম্রাজ্যের প্রাচ্য-প্রসার অবরোধ করে রেখেছিল মার্কস মনে করতেন এটা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর। ১৮৫৩ সালে নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন পত্রিকায় তিনি যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে বার বার "প্রাচ্য-প্রশ্নের" উল্লেখ রয়েছে, আর মার্কস বলেছেন, রুশ প্রভাব থেকে য়ুরোপ, এশিয়া ও য়ুরোপীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রক্ষা করতেই হবে।

অথচ বর্তমান শতাব্দীর পাদদেশ থেকে য়ুরোপই মধ্যপ্রাচ্যকে চেনবার ও জানবার শক্তি হারাতে লাগলো। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী ভুলের পুনরাবৃত্তি হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত রাশিয়াও নতুন দৃষ্টির, নতুন পরিচয়ের পরিচয় দিতে পারেনি। কিন্তু তার পরেই সোভিয়েত রাশিয়া নতুন চোখে আরব জগতকে দেখতে পেল। এবং তড়িৎ-গতিতে মিত্রতা পাতানো এমন সব নতুন মানুষ, নতুন প্রাণ-ধারার সঙ্গে যার সঙ্গে পশ্চিমের একান্ত অপরিচয়। এখানেই মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সোভিয়েত নীতির শ্রেষ্ঠ শক্তি, প্রধান শিকড়, মুখ্য সাফল্য।

[বত্রিশ]

"মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমান সংকটের একমাত্র জনক সোভিয়েত রাশিয়া"—স্যার অ্যান্টনী ইডেন।

"আরববন্ধু হিসাবে রাশিয়া যে আত্মপরিচয় দিতে চাইছে তা সম্পূর্ণ অলীক"—হেনরী কেবট লজ।

"সোভিয়েত রাশিয়াকে বাদ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের কোন সমস্যারই স্থায়ী সমাধান হতে পারে না"—এনিউরিন বেভন।

"আরব জনগণের হিত, প্রগতি ও শর্তহীন স্বাধীনতাই সোভিয়েত সরকারের একমাত্র কাম্য"—শেপিলভ।

"মধ্যপ্রাচ্যকে শীতল যুদ্ধের প্রাঙ্গণে পরিণত করা হয়েছে। বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ রহিত না হলে মধ্যপ্রাচ্যের প্রকৃত স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে না"—জওহরলাল নেহরু।

প্যালেস্টাইন সমস্যা সোভিয়েত রাশিয়াকে যুদ্ধোত্তর যুগে প্রথম সুযোগ দিয়েছিল আরবভূমিতে প্রভাব বিস্তারের। কিন্তু মস্কো তখনো আরব-মানস সম্বন্ধে অজ্ঞ-প্রায়, বড়ো কূটনৈতিক চালের জন্যে অপ্রস্তুত। যুদ্ধের পর থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত আরব-সমস্যা থেকে নিজেকে সে দূরে সরিয়ে রেখেছিল; পশ্চাৎ-দৃষ্টি দিয়ে দেখলে মনে হয়, তার ইচ্ছে ছিল বৃটিশ নীতি মধ্যপ্রাচ্যে দেউলিয়া হবার আগে সে অবতীর্ণ হবে না রঙ্গমঞ্চে কোন বিশিষ্ট ভূমিকায়। প্যালেস্টাইন সমস্যার সময়ে রাশিয়া আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ এবং ইজরেইলের প্রতিই সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল। আরব জাতীয়তাবাদ তখনো অস্পষ্ট, একদল স্বার্থান্বেষী লোকের হাতের পুতুল। অন্যদিকে জিয়নিস্ট আন্দোলনে য়ুরোপ-বিতাড়িত অনেক সাম্যবাদী বা "সহযাত্রীর" স্থান রয়েছে। রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে প্যালেস্টাইন ভাগের জন্যে জাতিপুঞ্জে ভোট দিয়েছিল; সর্বপ্রথম নতুন ইহুদী রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি জানিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল আরবভূমির সন্নিকটে এমন একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যে হবে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বন্ধু, সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন প্রভাবের পরিপন্থী। তার আচরণ সেদিন সমগ্র আরব সমাজকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। আরব লীগের তৎকালীন সম্পাদক, আজম পাশা, বলেছিলেন,

"আরবরা সমান দৃঢ়তার সঙ্গে একই সঙ্গে প্রতিরোধ করবে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও সোবিয়েত সাম্যবাদ।"

ইজরেইল সমর্থন নীতির ব্যর্থতা প্রমাণিত হতে দেরী লাগেনি। অচিরেই দেখা গেল ইজরেইল মার্কিন প্রভাবে চলে গেছে। শুধু তাই নয়, সাম্যবাদ জিয়নিজম্‌কে প্রভাবিত করার বদলে, জিয়নিজম্‌ই তার ইহুদীবাদ রাশিয়ায় প্রচার করতে শুরু করলো। সোবিয়েত কর্তারা প্রমাদ গণলেন। ইজরেইল সম্বন্ধে তাঁদের ভুল ভাঙলো। দেখতে পেলেন, ইজরেইল যুদ্ধোত্তর মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম মার্কিন প্রভাব-কেন্দ্র। এ সময়েই ইরানে ও তুর্কীতে সোবিয়েত নীতি পরাস্ত ও লাঞ্ছিত হল। রাশিয়া কিছুদিনের জন্যে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আবার লেজ গুটিয়ে নিল।

আজকালকার পশ্চিমী লেখকরা এই লেজ-গুটানোকে একটা সুবিবেচিত নীতির অংশ বলে মনে করেন। একজনের মতে, "১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে সোবিয়েত অনুপস্থিতি যে বিশেষ লাভজনক হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সোবিয়েত প্রচারকর্তারা দেখাতে পেয়েছিলেন, তাদের দেশের "হাত সরাও" নীতি ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির মধ্যপ্রাচ্যকে নতুন করে গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় তফাত কতোখানি! পশ্চিমী শক্তিরা চেষ্টা করছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে নানা চরিত্রের সামরিক সংস্থায় একত্রিত করতে। এর জন্যে আরবরা মোটেই প্রস্তুত ছিলো না; তাই তাদের অন্তর্নিহিত পশ্চিমবিরোধী স্বল্পতেজ আগুনে নতুন করে জ্বলে উঠল। "রুশ বিপদ" বলে যে একটা বাস্তব রয়েছে তা তারা বুঝতে পারলো না। ভাবলো এটা একটা পৌরাণিক কল্পনা, অথবা মার্কিন "সাম্রাজ্যবাদী"দের চতুর চাল, যার পেছনে রয়েছে তাদের মধ্যপ্রাচ্যে শিকড় বিস্তার করে বসার অভিপ্রায়। এর ফলে, সোবিয়েত সম্মান বাড়তে লাগলো।"

মানচিত্রের দিকে তাকালে সোবিয়েত রাশিয়ার মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে মাথাব্যথার কারণ বুঝতে পারা যায়। তুর্কী ও ইরান সোবিয়েত ভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের অনেকটা ঘিরে রয়েছে। সোবিয়েত নৌবহর কৃষ্ণসাগরে বন্দী। ইস্তাম্বুল শহরের নাকের ডগা সামনে রেখে বসফোরাস অতিক্রম করে সোবিয়েত জাহাজ আসবে মারমারা সাগরে, এ সাগরপাড়ি দিয়ে ঢুকবে দার্দানেলেস জলপথে। এখানেও তুর্কী সতর্ক প্রহরী। এবার সোবিয়েত জাহাজ উপনীত হয়েছে গ্রীস ও তুরস্কের মাঝখানে ইজিয়ান সাগরে। সেখান থেকে নেমে আসবে ক্রীট সাগরে; তার পর ভূমধ্যসাগর। তুর্কীতে অবস্থিত মার্কিন বিমান ঘাঁটি থেকে স্বয়ংক্রিয় দূরক্ষেপণ অস্ত্রে ঘায়েল করা যায় মস্কো, লেনিনগ্রাদ ও অন্যান্য অনেক বড়ো বড়ো শহর।

সুতরাং ১৯৫১ সালে বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও তুর্কী যখন একসঙ্গে একটি সংযুক্ত মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ড গঠনের প্রস্তাব পাঠাল কাইরোতে, রাশিয়া এ ঘটনাকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তুর্কী তখন অতলান্তিক চুক্তিতে যোগ দিতে চেয়েও কয়েকটি পশ্চিম য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের সম্মতি পায়নি। বিকল্পে, বৃটেন ও আমেরিকা তুর্কীর নেতৃত্বে গঠন করতে চাইলো মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ড। মিশরের কাছে যে প্রস্তাব পাঠান হল তার সারমর্ম এই: যদি এ কম্যান্ড গঠিত হয়, মিশর হবে তার অন্যতম সমপদ সভ্য, ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশর চুক্তির আর দরকার থাকবে না, ও মিশরে অবস্থিত বৃটিশ সামরিক ঘাঁটিগুলো নতুন যৌথ কম্যান্ডের অধিকারে চলে আসবে। অর্থাৎ, সুয়েজ অঞ্চলে যে ঘাঁটি গলিতনখদন্ত বৃটিশ সিংহ আজ শুধু নিজ প্রতাপে সংরক্ষণে অসমর্থ, তার উপর কর্তৃত্বে সমাসীন হবে বৃটেনের সঙ্গে, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং তুর্কী। মিশর যোগ দিলেই সঙ্গে সঙ্গে এসে জুটবে অন্যান্য আরব দেশ; সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমী পরাক্রম নতুন বেশে, নতুন চেহারায় পুনরায় কায়েম হয়ে বসবে।

১৯৫১ সালের ১৩ই অকটোবর যৌথ মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ডের প্রস্তাব ঘোষিত হয়। ১০ই নভেম্বর মিশর পায় নিমন্ত্রণপত্র। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নাহাস পাশা। মিশরে তখন প্রবল রাজনৈতিক ঝড়ের সংকেত। নাহাস নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন দুর্বল সিংহ বাইরে শিকার ধরতে না পেরে, শিকারকে ডাকছে নিজ-গুহার নিশ্চিন্ত সীমায়। তুর্কীর এই পশ্চিমী সামরিক সংস্থায় হাত-মেলানোতে জাতীয়তাবাদী আরব জনমত বিক্ষুব্ধ হল। তারা বুঝল তুর্কী আরব ও ইসলামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। একটি মিশরী সাপ্তাহিক একটা কার্টুন ছাপলো যাতে তুর্কীর প্রেসিডেন্ট সেলাল বেয়ার একটি কুকুরের বেশে তিনজন পশ্চিমী প্রতিনিধির অনুগমন করছে। কাইরোর তুর্কী রাজদূত জানালেন প্রবল প্রতিবাদ। পত্রিকাটি "মাফিনা" চেয়ে ছাপলো আর একটি কার্টুন। এখানে সেই কুকুরটা লেজ উঁচিয়ে চলছে আগে আগে, আর তার পেছনে বৃটিশ, মার্কিন ও ফরাসী প্রতিনিধি!

যৌথ মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ডের প্রস্তাব রাশিয়াকে সজাগ করে দিল নতুন বিপদের আশঙ্কায়। নভেম্বরেই সোবিয়েত সরকার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির কাছে যৌথ কম্যান্ডের আশঙ্কাজনক দিকটা ব্যাখ্যা করে একটি লিপি পাঠালেন। বললেন, "যৌথ মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ডের মানে হবে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে অতলান্তিক চুক্তির, বিশেষ করে বৃটেন ও আমেরিকার, সামরিক দখলে নিয়ে আসা।" এই প্রথম সোবিয়েত গভর্নমেণ্ট আরব জাতীয়তাবাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করলেন। "পশ্চিমী দেশগুলির মতো সোবিয়েত রাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যকে একটি উপনিবেশভূমি মনে করতে অভ্যস্ত নয়। মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের স্বরাজ-সংগ্রাম, জাতীয় দাবী প্রতিপূরণের প্রচেষ্টা সোবিয়েত সরকার চিরদিনই সহানুভূতি ও সমঝদার চোখে দেখে এসেছে।... আজ যদি কোন মধ্যপ্রাচ্য দেশ পশ্চিম-প্রণোদিত যৌথ কম্যান্ডে যোগ দেয়, তার সঙ্গে সোবিয়েত রাষ্ট্রের সম্পর্ক ভয়ানক আহত হবে।"

মস্কোর এই কঠিন সতর্কবাণী মিশরকে পশ্চিমী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে অনেকখানি উৎসাহ দিয়েছিল। সাবধান করে দিয়েছিল পশ্চিমী দেশগুলিকেও। আমরা দেখেছি, ১৯৫২ সালে আইসেনহাওয়ার-বিজয়ের পরে ডালেস একটি সামগ্রিক মধ্যপ্রাচ্য কম্যান্ডের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে উত্তর-পথের দেশগুলিকে নিয়ে বাগদাদ চুক্তির বিকল্প সীমাবদ্ধ সামরিক জোটের পরিকল্পনা করেন। তারও জন্ম হতে হতে চার বছর উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

(ক্রমশ)

ত্রিদিব চৌধুরী

(২২)

সালাজারের ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস

এতগুলি লোক আমায় ডাকাডাকি করিতেছে দেখিয়া আমি হাজতের দরজার দিকে আগাইয়া গেলাম। দরজার কোলাপসিবল গেটের কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে গণ্ডো-গোছের সর্দার চেহারা, কানের দু পাশে লম্বা ধরনের নার্টিন ফ্যাশানের রুডলফ ভ্যালেন্টিনো মার্কা কাইজারী-ছিকর ধরনের চুল ও গোঁফ, চোখে একটি আটকোণা ফিনফিনে অথচ সোনার হাতল-ওয়ালা চশমা, শার্টের হাতা কনুইয়ের কাছে যেখানে গুটানো সেখানে একটা সোনার তাবিজ দেখা যাইতেছে, ধমকের সুরে চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'সাত্যাগ্রহী' অর্থাৎ সত্যাগ্রহী? আমি মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম যে হাঁ, আমি তাহাই বটে। 'ইন্দিয়ানো' ভারতীয়? আবার মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। 'পার্লামেন্তারিও ইন্দিয়ানো'? বুঝিলাম আমি ভারতের পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য কি না, তাহা জানিতে চাহিতেছে। উত্তর দিলাম—'ইয়েস্'। দেখি উঁহাদের সঙ্গে একজন গোয়ান যুবক দাঁড়াইয়া আছে, আমি 'ইয়েস' বলিতেই সে তাহাদের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'সি' সি'। বুঝিলাম সে দোভাষীর কাজ করিতেছে; কিন্তু তখনও আমার পর্তুগীজ ভাষাজ্ঞান 'সি'-সি''-র অর্থ ভেদ করা পর্যন্ত অগ্রসর হয় নাই (পর্তুগীজ 'সি' বা 'Sim' কথার অর্থ 'হাঁ')। কিন্তু সেই 'সি'-সি' কথা জুল্ফি-ওয়ালার কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া এবং আরো জোরে জোরে চিৎকার করিয়া যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই—'ওহ! ইণ্ডিয়ান পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার! পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার! ও রকম অনেক পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার আমার দেখা আছে। তুই বেটা ভুলিস না এটা তোদের নয়াদিল্লী নয়, এটা পাঞ্জিম্। এখানে আমাদের রাজত্ব, তোদের নেহরুর রাজত্ব নয়, মামার বাড়ি নয়, যা খুশি চাহিলেই এখানে পাওয়া যাইবে না। ওঃ ইনি আবার এই ঘরে নাকি থাকিবেন না? ওঁর জন্য বুঝি একটা বাগানসমৃদ্ধ ভিলা চাই। যা না, তোর নেহরু....র কাছে চাহিয়া পাঠা......'। ইহার পরে তাহার কথা আর উদ্ধৃতব্য বা মুদ্রিতব্য নয়। আমার সুবিধা ছিল পর্তুগীজ ভাষা তখন কিছুই বুঝিতাম না, গালাগালিও বুঝিতাম না। অবশ্য লোকটির ভাবভঙ্গী দেখিয়া এবং চিৎকার শুনিয়া এটুকু বুঝিতেছিলাম যে, কিছু অশ্রাব্য গালাগালি আমার উপর বর্ষিত হইতেছে। গোয়ান দোভাষী বেচারী সংকোচেই হোক, আর অশ্লীল পর্তুগীজ গালাগালির সম্যক ইংরাজী পরি-ভাষাজ্ঞানের অভাবেই হোক (কে আর ইংরাজী শেখার সময় ইংরাজদের অশ্লীল পরিভাষা আয়ত্ত করে?), তৎক্ষণে একেবারে চুপ করিয়া গিয়াছে। এইভাবে খানিকক্ষণ গালাগালি ও ধমক-চমক করিয়া ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের এই দলটি চলিয়া গেল। আবার ঘণ্টা খানেক ঘণ্টা দেড়েক পরে আর একদল আসিয়া আবার এই ধরনের গালাগালি। সারাদিন ৩।৪ বার এই রকম। অবশ্য বেলা একটা-দুইটার পরে সাধারণত আর কেহ গালাগালি দিতে আসিত না; কারণ, ততক্ষণে সকলে দুপুরের সিয়েস্তা করিতে চলিয়া যাইত।

কয়েকদিন এইভাবে চলিল। বুঝিলাম, আমাকে প্রহার না করার শোধ তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। আমি মধ্যে মধ্যে একবার করিয়া দাবী জানাই—আমি এক নম্বর হাজত-ঘরে একভাবে থাকিতে রাজী নই, আমাকে আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করিতে দেওয়া হোক। ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের এক-একটি দলও তাহার উত্তরে রোজ তিন-চারবার করিয়া এইভাবে দল বাঁধিয়া আসিয়া আমাকে গালাগালি করিয়া যায়। ইহার মধ্যে উপরোক্ত জুল্ফি-ওয়ালাটি প্রায় প্রত্যেকটি দলের সঙ্গেই আসিত। কয়েকদিন বাদে এই লোকটির সামনেই আমাকে জবানবন্দীর জন্য হাজির করা হয়। ইহার পুরো নামটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি; তবে সকলে তাহাকে 'আলেক্সান্দর' (Alexandre) নামে ডাকিত। তবে এটি তাহার উপাধি নাম নয়, তাহার ডাক নাম বা ক্রিশ্চান নামের অনেকগুলি শব্দের মধ্যে একটি। কিন্তু নাম ধাম যাই হোক, নিছক 'স্যাডিজম' বা নৃশংস অত্যাচার প্রবণতায় ইহার জুড়ি আমি বড় বেশী দেখি নাই। ইহার অত্যাচারের একদিনকার কাহিনী এখানে বলিলেই যথেষ্ট হইবে। আমার তখন পাঞ্জিম পুলিস হেফাজতে কয়েক মাস থাকা হইয়া গিয়াছে। পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের গারদে তখন আমি নাই। নানা সাহেব, শিরুভাই, মধু লিমায়ে, জগন্নাথ রাও, রাজারাম পাটিল—আমরা সকলে

তখন মণিপুরের পাগলা গারদে বন্দি হইয়া গিয়াছি। হঠাৎ একদিন আমার পুলিস কুয়ার্টেলে যাওয়ার ডাক পড়িল; আমার জবানবন্দীর দু'একটি জায়গা ইণ্টারনাশনাল পুলিসের কাছে পরিষ্কার ঠেকিতেছে না। সেই জন্য আমাকে ফের নূতন করিয়া জেরা করা হইবে। এই সময় আমি যে জেলে থাকিতাম তাহার তিন চারিটি সেলে তফাতে একটি সেলে কামাথ নামে একজন লোককে আটক রাখা হইয়াছিল। সেদিন আমার সঙ্গে প্রিজন ভ্যানে করিয়া তাহাকেও কুয়ার্টেলে নিয়া যাওয়ার হুকুম আসে। সেদিন মাত্র আমাদের এই দুই জনেরই কুয়ার্টেলে যাওয়ার পালা আসে। কামাথ 'সুস্পেইতো' বা রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসাবে আটক থাকিলেও সকলেই জানিত যে, একজন ভিক্ষাজীবী এবং আধা-পাগল গোছের অতি নিরীহ ব্যক্তি। বিচোলী কিম্বা মাণ্ডুসার কাছে কোনো গ্রামের বাজারে সে থাকিত। তাহার কোনো নির্দিষ্ট ঘরবাড়ি ছিল না, আত্মীয়-স্বজন বলিতে কেহ ছিল না। বলা বাহুল্য, রাজনীতির সঙ্গে তাহার কোনোদিন কোনো সম্পর্ক ছিল না, থাকা সম্ভব ছিল না। Tramp বা ভবঘুরে জাতীয় লোক যেমন হয় যদি কেহ তাহাকে দয়া করিয়া খাইতে দিল তাহা হইলে খাইল; না হইলে না খাইয়াই সারাদিন কাটাইয়া দিল। ক্ষুধা পাইলে এর-ওর কাছে গিয়া খাবার বা পয়সা চাহিয়া নিত; এর ওর দাওয়ায় রাত্রিবেলা ঘুমাইয়া থাকিত। মাথা খারাপ ভিখারী ভবঘুরে হিসাবে সকলে কামাথকে জানিত, বাজারের সকলেই সেই হিসাবে তাহাকে কিছুটা দয়াও করিত. নিতান্ত নিরীহ লোক বলিয়া ভালও বাসিত। ইতোমধ্যে কামাথের দুরদৃষ্ট! একদিন সে যে বাজারে থাকিত সেখানে গোপনে গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের কিছু হ্যাণ্ড-বিল বিলি হয়। কে বিলি করিয়াছে, কখন বিলি হইয়াছে, স্থানীয় পুলিস কোনই সন্ধান পায় নাই। তখন থানায় পুলিসের গোয়েন্দা ইনফরমারদের ডাক পড়িল। পুলিসের মারমূর্তি দেখিয়া নিজেদের চাকুরী বাঁচানোর গরজে তাহাদের একজন কামাথের নাম করিয়া দেয় এবং বলে—"কামাথ পাগলের ভান করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আমি উহাকে অমুক দিন একজন বাহিরের অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলিতে দেখিয়াছিলাম এবং সেই অপরিচিত লোকটিকে উহার হাতে একটি কাগজের বাণ্ডিল দিতে নিজের চোখে দেখিয়াছি। আমার মনে হয়, ঐ বাণ্ডিলেই এই সব হ্যাণ্ড-বিল ছিল।" আর যায় কোথা? সঙ্গে সঙ্গে থানা পুলিস,

সিকিউরিটি পুলিস এবং মিলিটারী পাঠাইয়া কামাথকে গ্রেপ্তার করিয়া, হাতকড়া লাগাইয়া থানায় নিয়া আসা হইল। কিন্তু তিন-চার দিন ধরিয়া থানার হাজতে রাখিয়া মারধোর করার পরেও যখন তাঁহার মুখ হইতে কোনো স্বীকারোক্তি বাহির করানো গেল না, তখন সেখানকার পুলিস নিরুপায় হইয়া কামাথকে পুলিস কুয়ার্তেলে পাঠাইয়া দিল। সেখানে ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের বড় কর্তারা আছেন, তাঁহারা যাহা পারেন করুন। কামাথ বেচারী সেই সময় পুলিস হেফাজতে আটক হইয়া আছে। আমি যে দিনের কথা বলিতেছি, তখন কামাথের পুলিস কুয়ার্তেলে সাত-আট মাসের উপর আটক থাকা হইয়া গিয়াছে। এই সাত-আট মাসের মধ্যে সালাজারের ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের নিয়ম ও রুটিন মাফিক তাহার কমপক্ষে বারো-তেরো বার পিটুনী ঘরে গিয়া সেখানকার স্পেশাল পিটুনি খাওয়া হইয়া গিয়াছে। নিরীহ, আধা-পাগল এই লোকটি যে জীবনে কাহারও অনিষ্ট করে নাই, এইভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ চোরের মার খাইয়া আতঙ্কে, ভয়ে প্রায় সম্পূর্ণ পাগল হইয়া গিয়াছে। আর সে তখন সংলগ্নভাবে কথা বলিতে পারে না; কাহাকেও দেখিলে ভয়ে ঘরের কোণায় গিয়া আত্মগোপন করিয়া পালাইয়া থাকিতে চায়। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে চমকাইয়া আর্তনাদ করিয়া ওঠে। আমাদের ঘর হইতে মাত্র কয়েকটি সেল ওপাশে থাকে বলিয়া তাহার সেই আর্তনাদ অনেক সময় রাত্রে আমাদের কানেও আসিয়া পৌঁছায়। কুয়ার্তেলে যাওয়ার হুকুম আসিতে কামাথ সেদিন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আমার সঙ্গে প্রিজন-ভ্যানে করিয়া কুয়ার্তেলে চলিল। আমার মতই কামাথও পূর্ববর্ণিত আলেশান্দরে-র জিম্মায় ছিল। প্রহরীরা আমাদের আলেশান্দরে-র কামরায় হাজির করার সঙ্গে সঙ্গে আলেশান্দর অপর একজন অফিসারের দোভাষীর সাহায্যে আমায় জানাইল, আমাকে তাহার আরও জিজ্ঞাসাবাদ করার আছে—"Muito a perguntar"। তবে তাহার খাস দোভাষী আজও কাজে আসে নাই। সুতরাং আমাকে এখন অপেক্ষা করিতে হইবে (অর্থাৎ খাড়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে); ইতোমধ্যে সে অন্য কাজে যাইতেছে। এই বলিয়া সে প্রহরীদের ইশারায় কামাথকে তাহার পিছনে পিছনে আনার জন্য হুকুম করিয়া পাশের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। এই ঘরটি কুয়ার্তেলের স্পেশ্যাল পিটুনি ঘরগুলির মধ্যে অন্যতম। সেই ঘরের দরজায় যমদূতের মতো একজন নিগ্রো মিলিটারী শান্ত্রী পাহারা দিতেছে। অথচ দুই ঘরের মধ্যের দরজা অল্প-একটু ফাঁক করিয়াও রাখা হইয়াছে। আমার ধারণা, আমাকে অপর ঘরের ভিতর যে অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইবে তাহা দেখানোর জন্য ইচ্ছা করিয়াই দরজাটা একটুখানি খোলা রাখা হইয়াছিল, যেন আমি বুঝিয়া যাই আমার ভাগ্যেও প্রয়োজনমত এই পুরস্কার জুটিতে পারে। আলেশান্দর, কামাথ সেই ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগীজ ভাষায় চিৎকার করিয়া কি একটা প্রশ্ন করিয়াই মারের 'তক্তা' দিয়া তাহার মুখের একপাশে প্রচণ্ড একটি ঘা মারিল। কামাথ আচমকা ঘা খাওয়ার সেই ধাক্কা এবং টাল সামলাইয়া ফের সোজা হইয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই তক্তার বাড়ি তার গায়ে মাথায় পিঠে অবিরাম আসিয়া পড়িতে শুরু করিল।

এখানে সালাজারের ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের উদ্ভাবিত মারের বিশেষ পদ্ধতির কথাটা একটু বর্ণনা করা দরকার। এটা তাহাদের গোয়ার পেটেণ্ট। ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস কিল, চড়-চাপড়, ঘুষি এ-সব অপেক্ষাকৃত মৃদু দাওয়াই যে প্রয়োগ করিত না, তাহা নয়। কিন্তু তাহাদের প্রহারের আসল অস্ত্র রবার ট্রাঞ্চিয়ন্ এবং বিশেষ ধরনে তৈরি কেরোসিন কাঠের একটি তক্তা। রবার ট্রাঞ্চিয়ন্ দিয়া মারার সুবিধা এই, ইহাতে গায়ে কোনো মারের দাগ থাকে না; কোনো সময় এক-আধটু ফোলা দাগ কোথাও যদি থাকেও অল্পেই তাহা মিলাইয়া যায়। শুনিয়াছি হিটলার আমলে নাৎসীরা এবং মুসোলিনীর সময়কার ফ্যাসিস্ট-রা মারধোরের সময় এই রকম শক্ত রবারের ট্রাঞ্চিয়ন্ ব্যবহার করিত। আমাদের দেশে পুলিস যে রকম কাঠের ডাণ্ডা বেটন্ হিসাবে ব্যবহার করে, এও সেইরকম, খালি শক্ত রবারের তৈরী আর চামড়া দিয়া মোড়া। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি (আমার অন্যান্য সহবন্দীদেরও অভিজ্ঞতা আমারই মতন) কাঠের বেটনের চেয়ে রবারে ট্রাঞ্চিয়নের মারটা গায়ে লাগে বেশী। তবে কাঠের বেটনের ঘা হাড়ের উপর পড়িলে অনেক সময় চামড়া বা মাংস থেঁৎলাইয়া কাটিয়া যায়, রবার ট্রাঞ্চিয়নে কখনও কাটে না। সালাজার এখন য়ুরোপের সবচেয়ে বনেদী ফ্যাসিস্ট। পিলসুডস্কি মুসোলিনী, হিটলার, এঁরা য়ুরোপের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে বহুদিন হইল বিদায় নিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সম-সাময়িক সালাজার আজও টিঁকিয়া আছেন (সালাজার প্রথম ১৯২৬-২৭ সালে ক্ষমতা দখল করেন)। আর তাঁহার সঙ্গে সমস্ত পর্তুগীজ সাম্রাজ্য জুড়িয়া টিঁকিয়া আছে ফ্যাসিস্ট শাসনের প্রতীক চিহ্ন রবার ট্রাঞ্চিয়ন। কিন্তু সালাজারী ফ্যাসিজ্‌ম খালি রবার ট্রাঞ্চিয়নের প্রতীক চিহ্নটুকু নিয়া সন্তুষ্ট থাকে নাই—তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মাথা খাটাইয়া

বিভিন্ন রকমের মারের বা প্রহারের যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। জন গান্থার তাঁর 'ইনসাইড আফ্রিকা' বইয়ে উল্লেখ করিয়াছেন পর্তুগীজ পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকায় নিগ্রো সাধারণ লোকেদের পাশ নিয়া চলাফেরা করিতে হয়। যদি কোনো সময় কোনো নিগ্রো বিনা পাশে ধরা পড়ে তাহা হইলে থানায় নিয়া গিয়া তাহাকে হাজতে ভরিয়া পিং-পং বা টেবিল টেনিস ব্যাটের মত তৈরি কাঠের একটি গোল তক্তা দিয়া মারা হয়। সেই তক্তাটির মধ্যে মধ্যে আঙ্গুল-প্রমাণ ১৩টা ছিদ্র করা থাকে। চামড়ার উপর যেখানে সেই তক্তার বাড়ি পড়িবে সংগে সংগে ফোস্কা পড়িয়া যাইবে কিম্বা ফোস্কা পড়িয়া ফাটিয়া রক্ত পড়িবে। গান্থার লোরেঞ্জো মার্কুয়েসের পুলিসের বড়-কর্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনারা এভাবে মারধোর না করিয়া যাহাদের পাশ থাকে না তাহাদের আইনমত জেলে পাঠাইয়া সাজা দেন না কেন?" সে ভদ্রলোক হাসিয়া জবাব দিয়াছিলেন—"মিঃ গান্থার, এটা বুঝিতেছেন না কেন, এভাবে খরচা কত কম পড়ে? হাঙ্গামা কত কম? এক-এক বেটা নিগ্রোকে একবার এভাবে ধরিয়া ভালো করিয়া পিটাইয়া দিতে পারিলে আর সে ভুলেও বিনা পাশে বাহির হওয়ার সাহস করিবে? জেলে পাঠাইতে গেলেই খরচা! কোর্টে পাঠাইতে গেলেই খরচা! আমরা অত হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়া বিনা খরচে পিটাইয়া বেটাদের ঠিক করিয়া দেই।"*

জোহানেসবার্গেও ইন্টারন্যাশনাল পুলিসের লোকেরা হাজতে কয়েদীদের বা নির্যাতন করার জন্য কাঠের একটি ব্যবহার করে, তবে সেগুলি টেবিল টেনিসের ব্যাটের মতো গোল নয়; বরং কতকটা ক্রিকেট ব্যাটের মত যদিও অতো ভারি নয় এবং তাহার দুই দিকই চেপ্টা বা সমান। চব্বিশ হইতে ত্রিশ ইঞ্চি লম্বা একটি শক্ত কেরোসিন কাঠের তক্তা অর্ধ ইঞ্চি হইতে পৌনে এক ইঞ্চির মতো পুরু, তাহার এক দিকে ক্রিকেট ব্যাটের মতো একটা হাতল (ভালো করে ধরার জন্য তক্তার এক দিক খানিকটা সরু করিয়া কাটা)—এই তক্তা দিয়া সমস্ত শরীরে যাহাকে আগা-পাছ-তলা করিয়া পিটানো বলে, সেইভাবে পিটানো ইন্টারন্যাশনাল পুলিসের সাধারণ রীতি। তাহাদের হাতে যে কয়েদী আসিবে তাহার আর উপায় নাই। এই তক্তার মার খাইয়া সমস্ত শরীরে কালশিরা এবং চামড়া-ফাটা দগদগে ঘা নিয়া তাহাকে পিটুনি-ঘর হইতে ফিরিতে হইবে। এক-আধ দিন নয়; রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হিসাবে সে যতদিন হাজতে থাকিবে দশ দিন, পনেরো দিন অন্তর তাহাকে এইভাবে মার খাইতে হইবে; খুব উঁচু অভিজাত বংশের লোক না হইলে বা ধনী পরিবারের লোক না হইলে সাধারণত এই তক্তা-পিটুনী হইতে (যতদিন না সে আদালতে সোপর্দ হইতেছে) কাহারও সাধারণত অব্যাহতি নাই।

* কিন্তু পর্তুগীজ ইস্ট আফ্রিকা ও ওয়েস্ট আফ্রিকায় তাই বলিয়া নিগ্রো এবং সাদা চামড়ার লোকেদের মধ্যে আইনত কোনো বর্ণবৈষম্য নাই। নিগ্রোরা লেখাপড়া শিখিয়া ক্যাথলিক ধর্ম অবলম্বন করিলে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স দিতে পারিলে দরখাস্ত করিয়া আইনত যে কোনো সাদা চামড়ার লোকের মতো পর্তুগীজ নাগরিকের অধিকার অর্জন করিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ নিগ্রোই এত গরীব যে তাহাদের পক্ষে এত ট্যাক্স বা ফি দিয়া পর্তুগীজ সাহেব সাজা সম্ভব হয় না। ফলে আংগোলা এবং লোরেঞ্জো মার্কুয়েস সমেত প্রায় দেড় কোটির মতো নিগ্রো অধিবাসীদের মধ্যে হাজার পঞ্চাশ-ষাটের বেশী নাগরিক অধিকারসম্পন্ন লোক নাই।

কামাথের শরীরের উপর নির্বিচারে সেই ডাণ্ডার মার আসিয়া পড়িতেছে. আমি এ-ঘর হইতে দেখিতেছি, যদিও দরজা আধ-ভেজানো বলিয়া সবটা দেখিতে পাইতেছি না। দরজার সামনে রাইফেলধারী নিগ্রো শান্ত্রী; তাহাকে ঠেলিয়া কামাথকে বাঁচাইতে যাওয়ার উপায় নাই। বেচারী কামাথ অসহায়ভাবে মাটিতে পড়িয়া কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করিতেছে, গোঁ-গোঁ করিয়া গোঙাইতেছে! খানিকক্ষণ এই-ভাবে মার খাওয়ার পর অজ্ঞান হইয়া গেল। তখন কুয়ার্তেলের পুলিসের ডাক্তার তাঁর দৈনিক রাউণ্ডে আসিয়াছিলেন, তাঁহার ডাক পড়িল। ভদ্রলোকের নাম ডক্টর লোবো; কোনো কথার অর্থ নেকড়ে বাঘ হইলেও এ ব্যক্তি নিরীহ চাকরীজীবী লোক। ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের কাজে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি নাড়ী টিপিয়া বলিলেন ঠিক আছে, মরে নাই। আলেশান্দর তখন দেখিলাম একটি এনামেলের জগে করিয়া এক জগ জল আনিয়া কামাথের মুখের উপর ঢালিয়া দিল. ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়ায় তাহার জ্ঞান হইতেই আবার তাহার উপর অবিশ্রাম ডাণ্ডার বাড়ি পড়িতে লাগিল. আবার বেচারী অজ্ঞান হইয়া গেল। আবার তাহার মুখে জল ঢালিয়া তাহার জ্ঞান করানো হইল; তখন আবার প্রহার শুরু হইল। এইভাবে তিনবার তাহাকে মারিয়া তবে সেদিনকার মতো আলেশান্দর ক্ষান্ত হয়। তারপর তাহাকে দুজন শান্ত্রী দু দিক হইতে ধরিয়া কোনোমতে নিয়া গিয়া প্রিজন-ভ্যানে আনিয়া বসাইয়া দিল। তখন বেচারী থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে আর গোঙাইয়া গোঙাইয়া খালি ঈশ্বরকে ডাকিতেছে—'হে দেবা! হে দেবা!'

এ ঘটনা আমার নিজের চোখের দেখা! সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ইহার পরের দিন কামাথকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইণ্টার-ন্যাশনাল পুলিসও বুঝিয়াছিল যে, কামাথকে রাখিয়া কোনো লাভ নাই, সে কিছু জানে না। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক সন্দেহভাজন লোককে ছাড়িয়া দেওয়ার আগে তাহাকেও শেষবারের মতন মারিয়া তবে ছাড়া হয়, ইহাই পর্তুগীজ পুলিসের সাধারণ নিয়ম। বেচারী কামাথের দুর্ভাগ্য তাহার মুক্তির আদেশ হওয়ার পর তাহাকে শেষবারের মত মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার ভার পড়িয়াছিল আলেশান্দরের উপর। অন্য কেহ হইলে কামাথ হয়ত কিছুটা অল্পের উপর দিয়া বাঁচিতে পারিত; যদিও একেবারে মার না খাইয়া রেহাই পাইত না।

শুনিয়াছি, কুয়ার্তেলে অলিভেইরা-মন্তেইরোর অবাধ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে এবং বিশেষ করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন দমনের জন্য লিসবন হইতে ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের লোকেরা আসার আগে গোয়াতে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর এই ধরনের নৃশংসভাবে মারধোর করার প্রথা চালু হয় নাই। যতদিন আমি পুলিস হেফাজতে ছিলাম অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের ১১ই জুলাই হইতে ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত—প্রথম পঞ্জিম কুয়ার্তেলে তারপরে মানিকোমের পাগলা গারদে—এই ধরনের নৃশংস ও পাশবিক নির্যাতন দিনের পর দিন চলিতে দেখিয়াছি। উপরে যে ভক্ত-পিটুনীর বর্ণনা শারীরিক নির্যাতনের পদ্ধতির ইহাই একমাত্র নিদর্শন নয়। বুটের লাথি, বন্দীদের জোর করিয়া মাটিতে শোয়াইয়া তাহাদের উপরে বুট পড়িয়া পুলিসের নাচা, ঠাণ্ডা কলের জলের ধারার নীচে তিন ঘণ্টা চার ঘণ্টা করিয়া জোর করিয়া মাথা ঠেসিয়া রাখা, শরীরের গোপন স্থানে কোমলাঙ্গে প্রহার করা, ব্লেড দিয়া পায়ের তলাকার চামড়া কাটিয়া দেওয়া, হাত ধরিয়া ছাদ হইতে ঝোলাইয়া রাখা, ইলেকট্রিক শক লাগানো—অলিভেইরা একে-একে সব-কিছুরই প্রবর্তন করিয়া-ছিল। রাজনৈতিক বন্দীদের শাস্তি দেওয়ার একটা বিশেষ উপলক্ষ্য ঘটিত কোনো বিদেশী সাংবাদিক আসিলে। গোয়াতে কি ঘটিতেছে তাহা দেখার জন্য কৌতূহলভরে কখনো কখনো দিল্লী, বোম্বাই বা করাচী হইতে বিদেশী সাংবাদিকেরা পঞ্জিমে আসিতেন। অনেক সময় তাঁহাদেরকে রাজনৈতিক বন্দীদের কাছে নিয়া আসা হইত। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া কোনো বন্দী যদি কোনো সময়ে পুলিসের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে কোনো অভিযোগ তাঁহাদের কাছে করিত, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। সাংবাদিক ভদ্র-লোকেরা চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দী-দের শাস্তি হিসাবে অকথ্য রকমের নৃশংস অত্যাচারের সম্মুখীন হইতে হইত। টোনী ডি সুজার ছোট ভাই হেনরী ডি সুজা অপরাধের মধ্যে একবার একজন আমে-রিকান সাংবাদিকদের কাছে খালি বলিয়াছিল তাহাকে ও তাহাদের ঘরের অন্যান্য লোকেদের পাঁচ মাসের উপর বিনা বিচারে, বিনা অভিযোগে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। আর যায় কোথায়! স্বয়ং পুলিস কামাণ্ডাণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া মন্তেইরোর পিটুনী-বাহিনীর এবং ইণ্টার-ন্যাশনাল পুলিসের ছোট-বড় যে যেখানে আছে সকলে মিলিয়া হেনরীকে পিটাইতে শুরু করে। তারপর তাহারা তাহাকে কুয়ার্তেলের একটি বন্ধ সেলে আটকাইয়া তিন মাস ধরিয়া দিনের পর দিন তাহার উপর যে অত্যাচার চালায় তাহাতে চির-কালের মত হেনরীর শরীর ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ হেনরী সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়া আগুয়াদা দুর্গে তেরো বছরের মেয়াদ খাটিতেছে। তাহার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ অভিযোগ ছিল না। টোনী ডি সুজার ভাই বলিয়া নিছক সন্দেহের উপর সে গ্রেপ্তার হয়। প্রায় এক বছরের উপর বিনা বিচারে আটক রাখিয়া তাহাকে মিলিটারী ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করা হইলে পর জজের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে—"আমি সত্যাগ্রহ করি নাই; কিন্তু আমি সত্যাগ্রহ সমর্থন করি এবং বিশ্বাস করি যে, পর্তুগীজদের জোর করিয়া এখানে থাকার কোনো অধিকার নাই।" খালি এই অপরাধে এক কথায় তাহার তেরো বছরের সাজা হইয়া যায়।

এইভাবে খালি হেনরী একা নয়। হেনরীর মতো শত শত গোয়ানিজ স্বাধীনতাকামী যুবক সালাজারের ইণ্টার-ন্যাশনাল পুলিস বাহিনীর তদারকে এবং তাহাদের হাতে যে অত্যাচার সহ্য করিয়াছে ও আজও করিতেছে নিজের চোখে না দেখিলে আমার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পুলিসের হাতে আমাদের দেশের, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের রাজনৈতিক বন্দীরা যে নির্যাতন সহ্য করিয়াছে, পাশবিকতা ও নৃশংসতার মাপে হিসাবে সালাজারের ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের অত্যাচারের কাছাকাছি তাহা যাইতে পারে না। আমার নিজের উপর গোয়াতে কোনো শারীরিক অত্যাচার ও মারধোর হয় নাই—খালি একা আমার উপরেই হয় নাই কেন ও কি কারণে তাহা উপরে বলিয়াছি—তাহা সত্ত্বেও এ কথা বলিতেছি। আমাদের দেশের লোকের ফ্যাসিস্ট শাসনের বর্বরতার অভিজ্ঞতা নাই বলিয়া এই ধরনের অত্যাচারের কথা বিশ্বাস করা শক্ত। শুধু সালাজারের ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস কি জিনিস তাহার একটা আন্দাজ দিবার জন্য দু-একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিলাম, যাহাতে আমাদের দেশের লোকেরা ভালো করিয়া বোঝে গোয়ার মুক্তিযোদ্ধারা কি ধরনের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতেছে।

(ক্রমশ)

শাঙ্গদেব

বহুকাল পরে সংস্কৃত নাটক মৃচ্ছকটিক পড়ছিলুম। তৃতীয় অঙ্কের আরম্ভ। অর্ধেক রাত কেটে গেছে। চারদিক নিস্তব্ধ। বিলাস নগরী উজ্জয়িনীর পথ-ঘাট বিপদসঙ্কুল। আর্য চারুদত্ত গান শুনতে গেছেন, আজও ফেরেন নি। ভৃত্য কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলছে—"সেই কখন আর্য চারুদত্ত গান্ধর্ব শুনতে গেছেন, অর্ধেক রাত কাবার হয়ে গেল এখনও ফেরবার নামটি নেই। যাকগে, বাইরের ঘরে গিয়েই শোয়া যাক।" ঠিক এই সময় চারুদত্ত গান্ধর্বানুষ্ঠান থেকে ফিরছেন। পণ্ডিত রেভিলের গান, বীণার সংগত তখনও তাঁর কানে বাজছে। আপনার মনে তিনি বলছেন—"এই বীণা জিনিসটি একটি অসমুদ্রোত্থিত রত্নবিশেষ। এ যেন উৎকণ্ঠিত জনের মনোরমা বয়স্যা, প্রিয়জনাপেক্ষীর চিত্তবিনোদনের পরম সহায়, বিরহীজনের প্রিয়স্বরূপ এবং অনুরাগীজনের প্রমোদ পরিবর্ধক।" সখা মৈত্রেয় তাকে বাড়ি যাবার জন্য ত্বরান্বিত করছেন। চারুদত্ত কিন্তু অন্যমনস্ক, বলছেন—"বয়স্য, পণ্ডিত রেভিলের এমন সুষ্ঠু গীত শুনে তুমি কি পরিতুষ্ট নও? এমন রক্ত, মধুর, সম, স্ফুট ভাবান্বিত ললিত এবং মনোহর গীত—আচ্ছা, ছদ্মবেশী কোন বণিতার কণ্ঠস্বর শুনলাম না তো?"

আবার বলছেন—"গান তো থেমে গেছে, তবু সেই মূর্ছনা, বর্ণ, অন্তরগত সুরের সূক্ষ্ম কাজ, তারস্বরের বিস্তৃতি, অবরোহণে স্বরের মৃদুতা স্বভাবগত সংযম, অবিরুদ্ধ এবং ললিত গতি, অনুরাগবশত একটি শব্দের পুনরুচ্চারণ, সেই স্বরসংক্রমণ, মৃদুভাষা—আর তার সঙ্গে বীণার মধুর স্বর—এসব যেন আমার কানে বেজে চলেছে।" বলতে বলতে সখা মৈত্রেয়কে সঙ্গে নিয়ে আর্য চারুদত্ত বাড়ি পৌঁছোলেন। তখন চন্দ্র অস্তমিত—গাঢ় তমিস্রায় চারদিক পরিব্যাপ্ত হয়ে আসছে।

এর পরে যে দীর্ঘ ঘটনা ঘটেছে, তার বিবরণ উক্ত নাটকের দশটি অঙ্ক জুড়ে আছে। নাট্যামোদী পাঠক সমগ্র নাটকটি পড়ে দেখতে পারেন। সংগীতে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি কিন্তু এই অংশটুকু থেকেই একটি যুগের সংগীত সম্বন্ধে কিছু আলো পাবেন।

মৃচ্ছকটিক নাটক কোন যুগে লেখা, সে সম্বন্ধে সাহিত্য-ঐতিহাসিকদের মধ্যে হয়তো বিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু সংগীতের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা নিঃসংশয়ে অভিমত জানাবেন যে, এই নাটক যখন লেখা হয়েছে, তখন উত্তর ভারতে শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা এবং সাধারণী এই পাঁচটি গীতি প্রচলিত এবং তাতে গ্রামরাগ—তথা ভাষা রাগের প্রয়োগ হয়ে চলেছে। অর্থাৎ সাংগীতিক দিক থেকে এক কথায় এটি গ্রামরাগের যুগে রচিত।

ভৃত্যের মুখে আমরা প্রথমেই শুনছি গান্ধর্ব অনুষ্ঠানের কথা। উজ্জয়িনী তথা মালবের সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ এই গান্ধর্ব সংগীত। মগধের পাশেই মালব তারপরে সৌরাষ্ট্র আর একেবারে পূর্বে গৌড়। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে সেকালকার সংগীত সংস্কৃতির রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিবর্তিত হয়েছে। মাগধী-গীতিতে জাতির প্রয়োগ হত। মাগধী ভেঙে অর্ধ-মাগধী হল, তারপরে সম্ভাবিত, পৃথুলা। ক্রমে এইসব গানগুলি যখন পুরোনো হয়ে এলো, তখন ধীরে ধীরে পঞ্চগীতির উদ্ভব হল। এই সময়ে উজ্জয়িনী সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশ-বিদেশ থেকে সেখানে যেমন বড় বড় বাদকেরা আসতেন, তেমনি গাইয়ে, বাজিয়ে, নট, নর্তকীর সমাগমও কম হত না। উজ্জয়িনী উচ্চাঙ্গ সংগীতেরও একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল—গান্ধর্ব গীতির উল্লেখই তার প্রমাণ।

গান্ধর্ব গীতির পরিচয় কি? মাগধী প্রভৃতি গীতিতে প্রযুক্ত জাতি এবং পঞ্চগীতিতে প্রযুক্ত গ্রামরাগ—এগুলি গান্ধর্বের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দেশী সংগীত অর্থাৎ প্রচলিত প্রবন্ধাদি গান্ধর্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেকালকার উচ্চস্তরের গান ছিল গান্ধর্ব। এসব গানের অনেক বাঁধাবাঁধি। কোন্ স্বরে ধরতে হবে, কোথায় ছাড়তে হবে, কখন কোন্ মূর্ছনা লাগবে, কোনটা প্রধান স্বর এবং প্রাধান্য অনুসারে কোন্ কোন্ স্বর কিভাবে বসবে, গানের কাঠা আইন
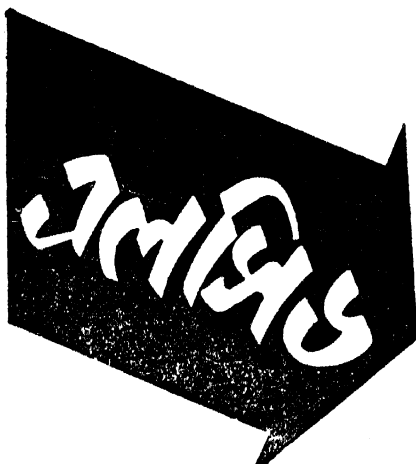
থাকবে—সব একেবারে ছক কাটা। তারপর তাল মানের বিবিধ কড়াকড়ি তো আছেই। এই সমস্ত বজায় রেখে তবে মাধুর্য বিস্তার করতে হবে, ওস্তাদি দেখাতে হবে। ব্যাপারটা কম কঠিন নয়।

তারপরে কণ্ঠস্বর। ওই যে বলা হয়েছে, রক্ত, মধুর, সম, স্ফুট, ললিত—এইসব শব্দগুলি এমনি সাধারণভাবে বলা হয়নি। সঙ্গীতশাস্ত্রে এগুলি পারিভাষিক শব্দ। এইসব আওয়াজ বিচার করে কণ্ঠের গুণ নিরূপণ করা হ'ত এবং সম্মেলক বা বৃন্দ-গায়নের উপযোগী করে কণ্ঠ বাছাই করা হ'ত।

রক্ত স্বর বলতে বোঝায় অনুরাগ-সঞ্চারী স্বর। এই স্বরে রক্তকাকুর আধিক্য অনুভূত হয়। মধুর স্বর বলতে বোঝায় এমন ধ্বনি, যা মন্দ্র মধ্য এবং তার এই তিন স্থানেই অবিকৃত থাকে। অর্থাৎ খাদ থেকে চড়া পর্যন্ত কোথাও আওয়াজের কোন বিকৃতি ঘটে না। স্ফুট বা স্ফুটিত শব্দটির অর্থ হচ্ছে একটু ফাটা ফাটা ভাব। আবেগের প্রাবল্য ঘটলে গলা একটু ধরে আসে। এখানে এই ভাবটিকেই স্ফুট বলা হয়েছে। নতুবা বেশি ফাটা হলে সেটি কণ্ঠের একটি দোষ হিসাবে ধরা হয়। ললিত হচ্ছে বিলাসবান কণ্ঠস্বর। কণ্ঠের সবিলাস ভঙ্গিটিই তাকে ললিত করে তোলে। সম শব্দের মানে হচ্ছে বেগ-বিলম্বরহিত অর্থাৎ মধ্যমানে গান করা। বর্তমানেও আমরা মধ্যমান তালে গান করে থাকি। এই মধ্যমান শব্দটি বহুকাল থেকে চলে আসছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সেকালে যাঁরা ওস্তাদ গাইয়ে ছিলেন, তাঁদের কণ্ঠস্বর সাধারণতই মিষ্ট হ'ত। আজকালকার গান্ধর্বগণ অবশ্য এদিকটায় মনোযোগ দেওয়া বাহুল্য বলেই মনে করেন। কণ্ঠস্বরটা যেমনই হোক তেড়ে তানকর্তব করতে পারলেই হ'ল।

এর পরে আসছে গানের ব্যাপার। গানের প্রধান অংগ হচ্ছে মূর্ছনা। এখন আমরা যেটাকে পকড় বলি, আগে মূর্ছনা তাকেই নির্দেশ করত অর্থাৎ জাতি বা গ্রামরাগের বিশেষত্ব মূর্ছনা দিয়ে প্রকাশ করা হ'ত। যদি বলা হত এই গানে রজনী মূর্ছনার প্রয়োগ হবে, তাহলে ধরে নেওয়া হ'ত যে, খাদের নি পর্যন্ত এর অবরোহণ এবং গানটি ষড়জ গ্রামে গাওয়া হবে। আবার যদি বলা হত সৌবীরী মূর্ছনার প্রয়োগ হবে, তাহলে বোঝা যেত গানটি মধ্যম-গ্রামের অন্তর্ভুক্ত এবং মধ্য-সপ্তকের মা থেকে চড়ায় একেবারে গান্ধার পর্যন্ত গানটির গতি। মূর্ছনা বলতে বোঝায় সপ্ত স্বরের ক্রমিক আরোহণ এবং অবরোহণ। কেন যে একে মূর্ছনা আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেটি স্পষ্টভাবে বোঝা শক্ত, কেননা "মূর্ছতে যেন রাগঃ" এই ধরনের ব্যাখ্যায় বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। তবে আমার মনে হয় মূর্ছনাগুলি যেভাবে করা নিয়ম ছিল, তাতে করে সব মিলিয়ে একটা সুরলহরীর সৃষ্টি হত, যাতে সুরগুলি যেন একটির ওপর আর একটি মূর্ছিত হয়ে পড়ছে, এইরকম প্রতীতি হত। এই মূর্ছনার আরোহণক্রম থেকে একটি বা দুটি স্বরের লোপ করলেই সেটি হত তান। সাতটি স্বরেও তান হত। সাধারণত মূর্ছনায় স্বরগুলি পর পর আসে, কিন্তু বিপরীতক্রমে অর্থাৎ উল্টোপাল্টাভাবে উচ্চারিত হলেই সেটি হয়ে দাঁড়ালো একটি কূটতান। বিস্তারিত হয় বলেই এর নাম হয়েছে তান। মূর্ছনা তো শুধু আরোহণ এবং অবরোহণ; কিন্তু স্বরের নানারকমের উচ্চারণে তানের সৃষ্টি। অতএব তানের ব্যাপ্তি অনেক বেশি। আবার এই তান থেকে বর্ণ শব্দটির তফাৎ আছে। যে কোন তানে একটা স্বর দুবার আসে না, কিন্তু বর্ণে এক স্বরের নানাবিধ প্রয়োগ হয়। এইজন্য এর নাম বর্ণালঙ্কার। এখানে চারুদত্ত বর্ণ বলতে সমগ্র গান ক্রিয়াকেই বোঝাচ্ছেন কেবল একটি পদের অলঙ্করণ নয়। সেকালে বর্ণ বলতে সাধারণভাবে সমগ্র গানটাকেই বোঝাতো। শকুন্তলায় রানী হংসপদিকার গান শুনে বিদূষক বলছেন—"দেবী হংসপদিকা বর্ণপরিচয় করছেন।" রসিকতা করে কথাটা বলা হলেও এটাই বোঝাচ্ছে যে, রানী একটি সম্পূর্ণ গান গাইছেন—স্বর-সাধনা নয়।

"অন্তরগত"—এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে পদের মাঝে মাঝে সুরের সূক্ষ্ম কারু-কার্য। জাতি গানের যুগে এইসব কাজকে বলা হত অন্তরমার্গ। বলা বাহুল্য, গ্রামরাগের যুগেও এইসব ক্রিয়াকলাপ জাতি-গায়ন পদ্ধতি অনুসারেই করা হত, কেননা আসলে গ্রামরাগে আলাপসহযোগে গাওয়াটাই হচ্ছে প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আলাপকরণ বাদ দিলে কেবলমাত্র গানের যে স্বরলিপি শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে জাতিগীতির প্রভেদ প্রায় নেই বললেই চলে।

তারপরে তার-মন্দ্র এই দুটি বিষয়ে সেকালকার শিল্পীরা বিশেষ সচেতন ছিলেন। স্বরের বিন্যাস কোনখানে তার এবং কোনখানে মন্দ্র হবে, তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছিল। এখনকার মত হঠাৎ একটা ছুট-এর কাজ করে দিলে হয়তো সেটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যাপার বলে নিন্দিত হ'ত।

"স্বরসংক্রমণ" জিনিসটি হচ্ছে এক কথায় খরজ পরিবর্তন। সম্ভবত মূর্ছনার বিশিষ্ট বিন্যাসে এই সংক্রমণ সাধিত হত, সংক্রমণ সম্বন্ধে আগ্রহসম্পন্ন ব্যক্তি "গীত-সূত্রসার" অথবা "রাগের গঠন শিক্ষা" পড়ে দেখতে পারেন। আলোচনাগুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

অতএব এই একটি শ্লোকের বর্ণনাকে যথাযথভাবে সংগীতশাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করলে একটি যুগের সংগীতপদ্ধতি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। এইসব গানের সঙ্গে বীণার সংগত হত। চারুদত্ত বলছেন বীণা একটি অসমুদ্রোত্থিত রত্ন। অর্থাৎ সমুদ্রমন্থনজাত বস্তু না হলেও বীণার মূল্য উক্ত মন্থনজাত দ্রব্যের চেয়ে কিছু কম নয়। বীণার সুরধারাও অমৃতবর্ষী।

কল্পনায় আমরা চিত্রটিকে আর একটু পরিস্ফুট করতে পারি। আমরা যেন দেখতে পাই মুখোগাত্তা বিন্দান রেভিল আসরের মধ্যভাগে বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে গান্ধর্ব এবং চিত্রাদি মার্গে কুশল এক ব্যক্তি কাংস্যতালবাদসহযোগে তাল রাখছেন, উঁহার পশ্চাতে বীণাবাদক বীণায় সংগত করছেন। আর রেভিল অঙ্গুলিসহযোগে গীত এবং তালের—গতি নির্দেশ করছেন। সংগীত-শাস্ত্রে এমনি ছবিরই বর্ণনা পাওয়া যায়।

গীতশিল্পী মেরিয়াম অ্যাণ্ডারসন

২৪শে নভেম্বর কলকাতায় শ্রীমতী মেরিয়াম অ্যাণ্ডারসনের গান শুনে আমরা প্রীতি লাভ করেছি। তাঁর গলায় খাদের কাজগুলি মনোরম। সাধারণত স্ত্রী কণ্ঠে এই রকম মন্দ্রে স্থিতি দেখা যায় না। তিনি হ্যাণ্ডেল, সুবার্ট-এর রচনা দিয়ে সংগীতানুষ্ঠান আরম্ভ করেন। অনুষ্ঠানের অপরার্ধে অ্যামেরিকান সংগীত ও নিগ্রো পারমার্থিক গীত শোনান। পরিশেষে শ্রোতাদের অনুরোধে "আভে মারিয়া" গানটি গেয়ে অনুষ্ঠান পরিসমাপ্ত করেন। ভক্তি-মূলক গানে তাঁর কণ্ঠের আবেগ শ্রোতাদের অভিভূত করেছে। এঁর সঙ্গে শ্রীফ্রানজ রূপ-এর পিয়ানো সহযোগিতা অতিশয় মনোজ্ঞ হয়েছিল।

সাংগীতিক পরিবেশটি চমৎকার হলেও এই সব গান আরও অনেক ভাল খুলত যদি প্রেক্ষাগৃহের অভ্যন্তরে শোনা যেত। এই রকম মুক্ত চন্দ্রাতপের নিচে সাধারণ শ্রোতৃবর্গকে শ্রীমতী অ্যাণ্ডারসনের গান শোনাতে সমর্থ হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর গায়নশৈলীর সম্যক পরিচয় আমরা বোধ করি পেলাম না। ভবিষ্যতে বিদেশী বিশিষ্ট গুণী গায়কদের অনুষ্ঠান প্রেক্ষাগৃহে হলেই সর্বাংশে সুফল হবে বলে মনে করি এবং এদেশের গুণী ব্যক্তিরাও তাঁদের প্রকৃত রস-গ্রহণে সমর্থ হবেন। আমাদের নিজেদের দেশের সংগীতানুষ্ঠানও ছাদের নিচে পরিবেশিত হয়ে রসগ্রহণে প্রভূত বাধা সৃষ্টি করছে। অনুষ্ঠানটির সুষ্ঠু আয়োজনের জন্য ইউ-এস-ইনফরমেশন সার্ভিস শ্রোতাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

রঞ্জন

অপরের দ্বারা সম্মানিত হবার প্রথম ও অপরিহার্য সর্ত নিজেকে বা নিজেদের সম্মান করা। এই মূলেই যদি ত্রুটি থেকে যায়, নিজের সম্বন্ধে এবং নিজের কাজ সম্বন্ধে যদি শ্রদ্ধায় ভাঁটা পড়ে, তাহলে দ্বারে দ্বারে সম্মান ভিক্ষা করে বেড়ালে সম্মানের ঝুলি শূন্য থাকবে—স্তূপীকৃত হবে শুধু অশ্রদ্ধাদত্ত অনুগ্রহের অসহ্য বোঝা। ক্রমে শুধু কয়েকজন অপরাধী ব্যক্তি ধিক্কৃত হবে না। সমগ্র বৃত্তিটাকে সমাজ দেখবে কৃপার চক্ষে, উপহাস করবে, অবহেলা করবে, উপেক্ষা করবে। যে প্রায়োপবাস এড়াবার জন্য বর্তমান বিচক্ষণতা, তাও একদিন ব্যর্থ হবে। বিবেক বাঁধা দেয়া থাকবে, পকেটও শূন্য রবে।

আমার উক্তির লক্ষ্য ভারতীয় সাহিত্যিকগণ, বিশেষ করে বাঙালী লেখক।

স্বাধীনতার আগমনে আনন্দে যেদিন দেশ ছেয়ে গিয়েছিল তখন কোনো কোনো লেখকের মনে হয়েছে, সাহিত্য আর ভিখারিনী মেয়ের ভূমিকায় থাকবে না। এ আশা অস্বাভাবিক ছিল না, পুরোপুরি অন্যায়ও ছিল না। যদিও এখানেই স্মরণীয়, পরশাসনে পুরো দেশই ভিখারী এবং লেখকদের ভাগ্য অন্যথা হবার উপায় ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, লেখকরা যে ইংরেজী আমলে কখনোই আদৃত হননি একথা সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড ত্যাগ করতে পেরেছিলেন কেননা তার আগে তিনি সে উপাধি পেয়েছিলেন। অন্যান্য দৃষ্টান্ত আছে।) সাহিত্যিকদের সরকারী সম্মানের আশা পূরণ করতে কয়েকজনের আগ্রহের আতিশয্য দেখে সেদিনই গভীর অস্বস্তির সংগে মনে মনে উচ্চারণ করেছিলাম অতি-পরিচিত ল্যাটিন প্রবাদ: Timeo Danaos et dona ferentes. গ্রীকরা উপহার নিয়ে এলে বড়োই ভয় পাই।

*

স্বাধীনতার দশ বছরে সাহিত্যিকদের সামষ্টিক মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে ঠিক সেই হারে, যে হারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকদের মধ্যে পর্যন্ত আজ যে পুরস্কারগৃধ্নুতা প্রত্যক্ষ তাতে মাঝে মাঝে মনে হয়, পূর্বতন ঔদাসীন্যও যেন শ্রেয় ছিল। সত্যকার শিল্প-প্রতিভার সংগে একই মানুষে চারিত্রিক দৌর্বল্যের সহ-অস্তিত্ব অজ্ঞাত নয়। বেঠোফেন বা ভাগনারের ব্যক্তিগত জীবন ছোট ছেলেদের সামনে আদর্শ বলে ধরবার মতো নয়। একজন তো নাকি তাঁর মুদীকে অতি ছোট অঙ্কের পাওনা মিটিয়ে দেননি মিছে কথা বলে। লেখকদের মধ্যে রাজানু-

গ্রহের জন্য তোষামোদের দৃষ্টান্তও অজ্ঞাত নয়। ডস্টয়েফস্কির মতো শক্তিধর প্রতিভা সম্বন্ধেও এমন অভিযোগ আছে।
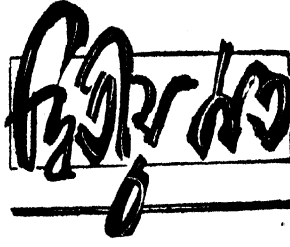
কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে অন্তত এই দুর্লক্ষণগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং ভয়াবহভাবে ব্যাপক। এখানে জমিদারের ছেলেকে দেখেছি দরিদ্র শিক্ষকের পায়ের ধুলো নিতে, সেই শিক্ষককে দেখেছি ইস্কুলের অতি প্রতিপত্তিশালী সেক্রেটারিকে স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিতে। উকিল-ডাক্তারদের দেখেছি এস-ডি-ওর বাড়ির সামনে, কোনো শিক্ষককে সে জায়গায় স্মরণ করতে পারিনে। সরকারী ইস্কুল না হলে হাকিম-পত্নীর জন্মগত অধিকার যে পুরস্কার বিতরণ তারও সুযোগ মিলত না। সাহিত্যিকরা থাকতেন ক্ষমতার আসন থেকে দূরে, বহু দূরে। তাকে ক্রয় করবার কথা কারো মনে হয়নি, সেও তখনো ভাবেনি আত্মবিক্রয়ের কথা।

আর আজ?

*

সাহিত্য সম্মেলনের বন্দনা আজ মন্ত্রী বিনা অন্ধকার। বরোদায় পি ই এন সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রীর পদধূলি চাই। ক্ষুদ্রতর সম্মেলনে ক্ষুদ্রতর মন্ত্রীদের আমন্ত্রণ। মন্ত্রী চাই! রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালরা আজ প্রতীক মাত্র, তাঁদের উপস্থিতি অংশত সংগততর হোতো, কিন্তু তাতে সুখ নেই কেননা সুবিধা নেই। ক্ষমতা যে মন্ত্রীদের হাতে! সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্যিকদের থাকাই যথেষ্ট নয়, কেননা তাঁরা নিজেরাই যে নিজেদের নগণ্য বলে জ্ঞান করেন। একমাত্র সম্মান আজ রাজসম্মান।

বলা হবে, এ রাজদ্রোহিতা আজকের দিনে অচল। স্বাধীন ভারতে সহযোগিতা চাই। গত দশ বছরে সরকার-সাহিত্যিক সহযোগিতার যে রূপ দেখেছি তারপর শুধু বলতে পারি, এতে আর কাজ নেই, এতে সরকারের কিছুমাত্র উপকার হচ্ছে না এবং সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সমূহ অপকার হচ্ছে। এই সর্বনেশে মিলনের চেয়ে পূর্বতন দূরত্ব ঢের ভালো ছিল। পুরস্কার-কাঙাল লেখকের এক চোখ পুরস্কারদাতাদের দিকে থাকে: সাহিত্য সৃষ্টি এক চোখের কাজ নয়। সাহিত্যে এই সরকারমুখিতার পরিণাম আর কিছুদিন পরে স্পষ্ট হবে, সাংবাদিকতায় এর অশুভ ফল আজই অতি প্রত্যক্ষ। সরকার বা রাজনৈতিক দল বা পৌরপ্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কর্তৃপক্ষের কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী হলে আমার তাঁদের সমালোচনা করবার না থাকে অভিপ্রায়, না অধিকার।

*

দুই মন্দের সমন্বয় ঘটে যখন স্বধর্মচ্যুত হয়ে এক অপরের ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষ পোষণ করেন—সাহিত্যিক রাজনীতিতে বা রাজনৈতিক সাহিত্যে। বলা বাহুল্য, এর ভয়াবহতা সত্য হয় তখনই, যখন সাধ সাধ্যের দ্বারা যুক্ত নয়। তখনই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য চাতুরীর বা অনুগ্রহ বিতরণের আশ্রয় নিতে হয়, তার দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় যুগপৎ দাতা ও গ্রহীতার মনে। সাহিত্যিক প্রসিদ্ধির জন্য মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তখন প্রকাশক, সম্পাদক আর সমালোচককে "তুষ্ট" করেন নানা উপায়ে, যার বিশদ বর্ণনা সাধারণ জানলে শিউরে উঠবেন ক্রোধে ও ঘৃণায়। অন্তরালের উপহারবিনিময়ের অগ্রভূমিতে হয় সাহিত্য সম্মেলন, জন্মদিনে অভ্যর্থনা, পুরস্কার দান (যা ক্ষেত্রবিশেষে টাকা বা পদক বা চালতেরোয়াল), অমুকে আকদমি বা কমিটির সদস্যপদে নিয়োগ আর দেশে বিদেশে নিখরচা নিমন্ত্রণ। সাহিত্যিকরা বিনিময়ে কী দেন? প্রকাশ্য প্রশংসা ও গোপন পদলেহন পূর্ণ উত্তর নয়। তাঁরা দেন নিজেদের।

কয়েকজন সাহিত্যিকের চরিত্রভ্রংশ আশংকার কথা নয়। আশংকার কথা বাঙলা সাহিত্যের চরিত্রেও প্রকৃতির পরিবর্তন। এ সাহিত্য ছিল প্রতিবাদের সাহিত্য। সে প্রতিবাদ কখনো ছিল নৈতিক, কখনো রাজনৈতিক, কখনো সামাজিক। সমালোচনা "গঠনমূলক" হতে হবে, এ মিথ্যা বুলি তখনো প্রচলিত হয়নি। আপন জনের সমালোচনা চলবে না, যা আজকের যুক্তি, তাও সেদিন সাহিত্যিকের কাছে চূড়ান্ত বলে মনে হয়নি। হলে "ঘরে বাইরে" লেখা হোতো না, "অচলায়তন" লেখা হোতো না, "পল্লীসমাজ" লেখা হোতো না।

প্রতিভার দৈন্য নিয়ে বিলাপ বৃথা, তার আবির্ভাব আকস্মিক। চরিত্রের দৈন্যের অভিশাপ আরো ভয়ংকর; তার বিদায়ের পরে পুনরাগমন অতি বিরল, অতি দুরূহ।

গল্প-গ্রন্থ

গল্প-সংগ্রহ—শ্রীসরলাবালা সরকার। প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯। মূল্য—৫ টাকা।

যে বৎসর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মন্দির' গল্পটি লিখে 'কুন্তলীন-পুরস্কার' প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, সেই বছরেই শ্রীযুক্ত সরলাবালা সরকার তাঁর 'স্মৃতিচিহ্ন' গল্পটির জন্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সে ১৩০৯ সালের কথা। তারপর দীর্ঘ উনষাট বছর ধরে তিনি একাদিক্রমে নানা পত্র-পত্রিকায় লিখে আসছেন। এই দীর্ঘকাল জাতির, দেশের ও ব্যক্তিসমূহের নানা পতন-অভ্যুদয় তিনি দেখেছেন এবং অনুভব করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা অর্জনের পক্ষে তাঁর নিজের দীর্ঘ-জীবনই যথেষ্ট, উপরন্তু তিনি সমসাময়িক স্বনামখ্যাতদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার সুযোগও লাভ করেছেন। সুতরাং তাঁর রচিত গল্প-সংগ্রহ যে-কোনও পাঠকের পক্ষেই লোভনীয় সন্দেহ নেই।

গল্প বলার রীতি-পদ্ধতি একাধিক। বাঙলা দেশে গল্পকারও অসংখ্য। রবীন্দ্রনাথের গল্প-রচনার আঙ্গিকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আঙ্গিকের কোনও সাদৃশ্য নেই। তবু আপন-আপন বৈশিষ্ট্যে দুজনেই সমুজ্জ্বল। আর শুধু আঙ্গিকই নয়, বিষয়বস্তু কিম্বা বক্তব্য—সমস্ত কিছুর সমন্বয়েই একজন লেখককে বিশিষ্ট বলে অন্য একজন লেখক থেকে পৃথক করে চিনতে পারি। লেখক-জীবনের প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা এই বৈশিষ্ট্য। শ্রীযুক্তা সরলাবালার গল্পগুলি পড়লে প্রথমেই এর বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। সারল্যই শ্রীযুক্তা সরলাবালার এই বৈশিষ্ট্য। কোথাও আঙ্গিকের অথবা মনস্তত্ত্বের প্যাঁচে পাঠককে বিভ্রান্ত করবার প্রয়াস নেই। কেবল মনে হয় একজোড়া স্নেহপ্রবণ চোখ ও একটি ক্ষমাশীল মন যেন সংসারের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি সরল সমাধানের সূত্র সন্ধান করতে ব্যস্ত। মানুষ নিজের জীবনকে নিজের অজ্ঞাতসারে যত জটিলই করে ফেলুক, শ্রীযুক্তা সরলাবালা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের মাধ্যমে সমস্ত জটিলতা অতিক্রম করে এক সরল পরিণতির আকাঙ্ক্ষা পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলেন।

মোট ছাব্বিশটি গল্পের সংগ্রহে গ্রন্থটি গ্রথিত। প্রথম যুগের লেখা গল্পগুলির সঙ্গে বর্তমান কালের লেখার অনেক তারতম্য নজরে পড়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনে যে-চিন্তা নিষ্ঠা ও কুশলতার স্বাভাবিক ক্রমাভিব্যক্তি ঘটেছে গল্পগুলিতে তার ছাপ সুস্পষ্ট। গল্পগুলি পড়তে পড়তে মানুষের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মনোভঙ্গির [illegible] বার বার এবং শ্রীযুক্তা

সরলাবালার ক্ষমতার মৌলিকতায় ও দৃষ্টির স্বচ্ছতায় মুগ্ধ বিস্মিত হতে হয়। ৪৬২।৫৭

রূপালী রেখা—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। আভেনির, কলিকাতা—১৯। মূল্য ৩৷০।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শেষ বইয়ের আলোচনা করবার আগেই তাঁর শেষতম বই বেরিয়ে যায়, এই হয়েছে মুশকিল। তিনি অনেক লেখেন। তাঁর গল্প আর উপন্যাসের সংখ্যা ঠিক কত, তা বোধ হয় অত্যন্ত অনুরক্ত পাঠকও চট করে বলতে পারবেন না। অবশ্য এদিক দিয়ে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকে তিনি হটাতে পারেননি। তবে প্রমথ বিশীর বিষয়বৈচিত্র্য আরও বেশি। নাটক, নভেল, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, সমালোচনা সর্ব ক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ কুশল গতি। নরেন্দ্র মিত্র কিন্তু কথাসাহিত্যেই আপনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। যদিও কাব্য তাঁর প্রথম সাধনা। সে যাই হোক, ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর যা খ্যাতি, তার চেয়ে গল্পকার হিসেবেই তাঁর কীর্তির বেশি এবং তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ এই যে, তিনি সাহিত্য রচনায় তাঁর নিজস্ব একটি মান খুঁজে পেয়েছেন, যার নীচে তাঁর লেখা নামে না। তাঁর সব গল্প সমান নয়, হওয়া বোধ করি সম্ভবও নয়। কিন্তু দুর্বল রচনা যে তাঁর কলম থেকে বেরয় না, তা নয়। কিন্তু সুখের বিষয়, তাঁর দৃষ্টি একেবারে আসগা হয় না কখনও। গল্পের তার যেখানে ঢিলে হয়ে যাচ্ছে, তারও শেষ পর্যন্ত তিনি নিপুণ হাতে টেনে নতুন যোগে তুলে ধরতে পারেন। এই জন্যেই তাঁর প্রতি সমালোচক পাঠক কুণ্ঠিত না হয়ে পারেন না। মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ অনেক গল্প-লেখকেরই পাচ্ছি। কিন্তু যে মৃদু কৌতুক, স্নেহ আর মমতা এবং প্রসন্ন প্রকাশভঙ্গী থাকলে সেই মধ্যবিত্ত জীবনের সাহিত্য অক্লান্ত আনন্দের হয়ে ওঠে, সে রচনা তিনি জানেন। বর্তমান গ্রন্থে বোধটি গল্প পড়ে এই কথাই মনে হয়। গল্পগুলিতে [illegible] ও সুচেতন মনের সার্থক প্রকাশ। সব গল্পই যে ভালো, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু আঙ্গিকের দিক দিয়ে উৎকর্ষ স্বীকার করতেই হয়। [illegible] কাছে [illegible] ছবি, [illegible] একটি [illegible] নায়িকাই [illegible] একটি [illegible] কিছু, [illegible] কিন্তু নায়িকা হতে চাইলেই যে নায়িকা হওয়া যায় না, [illegible] এই সহজ কথাটি [illegible] না বললেও চলত। [illegible] নয়। আপত্তিটা অতিকথনের বিরুদ্ধে।

৩৬৩।৫৮

উপন্যাস

কদম—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা—১২ আড়াই টাকা।

বাড়ির চাকর রামকানাই মনিবের কাছে ছুটি নিয়ে তার অসুস্থ স্ত্রীর কাছে গেল এবং যাবার আগে মালী রতীশ্বর এবং পাচক ঠাকুরের সাহায্যে রামকানাইয়ের হাতেও সংসার চললো। মনিবটি অকৃতদার, প্রবীণ এবং বিত্তবান। রামকানাই ফিরে এলো দিন চারেক পরে,—তার সঙ্গে এলো তারই স্ত্রী কদম। অতি সহজে কদম এই নতুন পরিবেশে তার নিজের বিশেষ জায়গা করে নিলো। মনিব ক্রমশ কদমের প্রতি স্নেহানুরক্ত হয়ে উঠেছেন। কন্যার স্থান নিয়েছে কদম। সুখে দুঃখে,—প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে কৌতুক-মাধুর্যে বহুমিশ্র এই গল্পটির প্রবাহ কিঞ্চিৎ অবাস্তব চমৎকারিত্বময় হয়ে উঠেছে এবং সে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে 'কদম'ই বইখানির নাম জুগিয়েছে। তবে গল্পটি কেমন যেন উদ্ভট ধরনের!

ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি প্রশংসনীয়।

৩৭২।৫৭

কবিতা

দূরান্তিক—সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দু টাকা।

মাঝখানে এমন একটা সময় গিয়েছে, কবিতা

সম্পর্কে পাঠক সমাজের আগ্রহ যখন প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকেছিল। সেই সঙ্কটকাল শেষ হয়েছে, কাব্য সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহ আবার ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। নতুন কবিদেরও রচনাবলী আজকাল আর শুধু সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই ছড়িয়ে থাকে না, গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়। প্রায়শই প্রকাশিত হয়। খুবই সুখের কথা।

আরও সুখের হত, যদি দেখা যেত যে, নবাগত এই কবিদের কণ্ঠে নতুন কোনও সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে। অথবা নতুন কোনও কথা। দুঃখের বিষয় এই যে, প্রায়ই আমাদের পুরনো সুরে পুরনো কথার পুনরাবৃত্তিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। 'দূরবীক্ষণ'-এর কবিকে আমাদের অভিনন্দন জানাই; তিনি নতুন সুরে কথা বলবার প্রয়াস পেয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, কথাগুলিও তাঁর নিজস্ব।

মোট ৩৪টি কবিতা নিয়ে তাঁর এই গ্রন্থ। হৃদয়ের বিভিন্ন অনুভূতি, আনন্দ আর যন্ত্রণা, যে স্পষ্ট শরীর নিয়ে এই কবিতাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে, তাতে মুগ্ধ হতে হয়। মাঝে মাঝে অবশ্য এমন দু-একটি শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, আজকাল যার ব্যবহার আর চোখে পড়ে না এবং সেগুলিকে বর্জন করতে পারলেই হয়ত ভাল হত। কিন্তু রসোপভোগের ব্যাপারে তা কিছু বাধার সৃষ্টি করেনি।

'দূরবীক্ষণ'-এর কবিতাগুলি পড়তে-পড়তে যে কথাটি আমাদের বারবার মনে হয়েছে, তা এই যে, কবির ভাবনা যদিও অত্যন্তই সংহত এবং দৃষ্টি যদিও অত্যন্তই মর্মভেদী, তাঁর চিত্তের সংবেদ্যতা এখনও নিঃশেষ হয়নি। পৃথিবীর রূপ-সম্ভারের সামনে এখনও তিনি মুগ্ধ, বিস্মিত হতে পারেন। তাঁর এই ক্ষমতা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, 'দূরবীক্ষণ'-এর কবি তাহলে পাঠকসমাজের হাতে স্থায়ী কিছু সাহিত্য-সম্ভার তুলে দিতে পারবেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ১২৪।৫৭

বিবিধ

পাঁচসালা পরিকল্পনা সমালোচনা—ভূপেশ গুপ্ত এম-পি। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা—১২। মূল্য পাঁচসিকা।

পাঁচসালা পরিকল্পনার একাধিক সমালোচনা হইয়াছে এবং হওয়া সম্ভব। বর্তমান পুস্তিকায় যে দৃষ্টিকোণ হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহা বামপন্থী বলা বাহুল্য। পরিকল্পনাকারীদের সামনে সমস্যাবলী, পরিকল্পনাটি যথেষ্ট বড় কি না, বৃটিশ শোষণ ও পরিকল্পনা, গ্রাম্য ভারত গঠনের পথ, দ্রুত শিল্পায়নের পথ কি, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিণাম, কর্মসংস্থানের সুযোগ যথার্থ কি না, জাতীয় আয় ও জীবনের মান-বিচার, সমাজ-কল্যাণ, শিক্ষা এবং পুনর্বাসন, অর্থনৈতিক অসাম্য ও পরিকল্পনা, অর্থ-সংগ্রহ সমস্যা এবং জনসাধারণের সহযোগিতা—এই কয়েকটি বিষয় নিয়ে জাতীয় পরিকল্পনার স্বরূপ ও চরিত্র আলোচনা করা হইয়াছে। বামপন্থী সমালোচনা হইলেও স্বাধীন চিন্তা ও মন্তব্যের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সে দিক হইতে বইখানির মূল্য নিশ্চয়ই আছে এবং কয়েকটি বিষয়ে বিচার-দৃষ্টির সূক্ষ্মতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩০৯।৫৭)

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর পাঠক—প্রথম খণ্ড। শ্রীনিকুঞ্জ-পদ গোস্বামী ভাগবতশাস্ত্রী প্রণীত। ভাগবত-ভবন, ১০২।৩ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত।

লেখক বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি। প্রধানত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাকে নাট্যরূপ দিয়াছেন। প্রথম খণ্ডে জন্ম-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া যজ্ঞপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা পর্যন্ত লীলা নাটকের আকারে কথোপকথনচ্ছলে বিন্যস্ত হইয়াছে। রসিক সমাজ এই নাটকে সুমধুর কৃষ্ণলীলার পরিবেশন পড়িয়া আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

পান্নার কৌটো—পাভেল পেত্রোভিচ বাজভ; অনুবাদক—শ্রীঅর্ধেন্দু গোস্বামী।

জনক—ওনোরে দ বালজাক; অনুবাদক—শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্তী।

বন্য শিকারী—হাওয়ার্ড ফাস্ট; অনুবাদক—প্রসূন বসু।

ইংলণ্ডের ডায়েরী—শিবনাথ শাস্ত্রী।

গঙ্গা—সমরেশ বসু।

বরযাত্রী—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

পূর্বপার্বতী—প্রফুল্ল রায়।

হিমাদ্রি—রানী চন্দ।

প্রাকৃত সাহিত্য—শ্রীমনোমোহন ঘোষ।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চা—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

রাশি বিজ্ঞান কথা—শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বসু।

সাহিত্য পাঠের ভূমিকা—শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

হে মহানগর—নগেন দত্ত।

মণিমধু—বিভূরঞ্জন গুহ ও সুনন্দা গুহ।

চলার পথে—জগদানন্দ বাজপেয়ী।

হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান—শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল।

সকালের সাত রং—রূপতী রায়।

আতপ্ত কাঞ্চন—শ্রীমতী ইন্দুমতী ভট্টাচার্য।

জাম কুড় কুড়—অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী ও জ্যোতিভূষণ চাকী।

সব সরেস—(অরুণা প্রকাশনী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত)।

বনভূমি—বিমল কর।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু সকলকে কম খাইতে এবং ঐ সংগে যোগাভ্যাস করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"এতে খাদ্য-সমস্যার খানিকটা
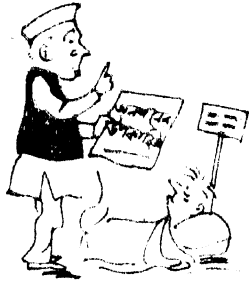
সমাধান নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু সব চেয়ে ভালো হয় নেহরুজী যদি বনমহোৎসবীদের পাকা হত্তুকী সংগ্রহের নির্দেশ দেন। এটি পেলে খাবার-দাবার ল্যাঠাই চুকে যায়।"

* * *

এই প্রসংগেই নেহরুজী বলিয়াছেন যে অতিরিক্ত আহার করিয়াই মানুষ ব্যাধিগ্রস্ত হয় এবং মরে। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় নাকি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট চিকিৎসার জন্য যাঁহারা আসেন তাঁহাদের দেখিয়াই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।—"ডাক্তার রায়ের নিকট যাঁরা চিকিৎসার জন্য আসেন তাঁরা যে সবাই অতিরিক্ত আহার করেন তা না বলে দিলেও আমরা বুঝি। কিন্তু না খেয়ে মরে এমন রোগীদেরও আমরা ডাক্তার না হয়েও দেখেছি"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * *

সম্প্রতি খাদ্য-কমিটি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এই রিপোর্ট ধোয়া জল কোন্ রাজ্যে কতখানি বণ্টন করা হবে তা না জানা পর্যন্ত আমাদের পেটে হাত বুলিয়েই দিন কাটাতে হবে!!"

* * *

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, খাদ্য সম্বন্ধে আতঙ্কিত হওয়ার কোনই কারণ নাই।—"আমরা মন্ত্রী মশাইর কথাটা বিশ্বাস করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব। কিন্তু যদ্দুর জানি, বিশ্বাসে কৃষ্ণ হয়ত মেলে, খাদ্য মেলে বলে আজ পর্যন্ত শুনিনি" বলিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

একাফের" সদস্যগণের সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় নাকি সদস্যগণ কলিকাতা শহরের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"আমার মনে হয় কোলকাতার চৌহদ্দিটা ওঁদের ভালো করে না দেখিয়ে শুধু রাজপথ দেখানো হয়েছে কোলকাতায় বাঘের চোখ মেলে।"

* * *

কলিকাতায় সম্প্রতি বিশ্ব নিরামিষাশী সম্মেলন হইয়া গেল।—"কয়েকটা দিন সবুর করে বড়দিনের মরসুমে হলেই

তামাসটা জমতো ভালো"—মন্তব্য করিল আমাদের শ্যামলাল।

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ হাইড্রেণ্টে জলের অভাবের জন্য কলিকাতার কোন এক কাঠের গোলার আগুন নিভাইতে নাকি অনেক বিলম্ব হয়।—"হাইড্রেণ্টের জল দুধ-পুকুর খননে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল কিনা তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

সিংগাপুরের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নাকি মঙ্গল গ্রহে গিয়া বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মনে পড়িতেছে কয়েকদিন আগে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ও মঙ্গল গ্রহে গিয়া কয়েকটা দিন কাটাইয়া আসিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছিলেন। —"একে একে করে মুখ্য এবং খুদে সব মন্ত্রী মশাইরাই যদি মঙ্গল গ্রহে গিয়ে জমি দখল করে বসেন, তা হলে আমাদের ভাগ্যে সেখানেও বস্তি এলাকা ছাড়া আর গতি নেই। একেই বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও তাকে ধান ভানতে হয়"—মন্তব্য করিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

রেংগুণ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ সেখানে কোন এক হাসপাতালে একটি রোগীকে ভর্তি করা হইয়াছে—সে নাকি একাধারে নর এবং নারী।—"দৈহিক অংগ প্রত্যংগের বিচারে না হলেও অনেক নরে আমরা নারীর লক্ষণ দেখতে পাই এবং নারীতেও দেখি উল্টোটাই নয়। মনে পড়ে কবি সত্যেনের কবিতা পড়েছেন, মনে পড়ে স্ত্রীর নরের উপর—অচ্ছি লড়াকেওয়ালী, হটো হটো"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

এই প্রসংগেই শ্যামলাল বেশ জোর দিয়েই উল্লেখ করেও যে নারী পুরুষ হিসাবেই থাকিতে চায়। অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"কোলকাতার ট্রামে-বাসে চড়তে হলে, মনে হয় ইচ্ছেটা দিশকাটাই হবে—দেখিয়া রেখেছি আমরা এখনো পুরুষের ভাগ্যে নেই!!!"

* * *

অস্ট্রেলিয়ায় কলম্বো পরিকল্পনা শিক্ষার্থীদের উত্তম দাঁতের অধিকারী বলিয়া সার্টিফিকেট দাখিল করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"পরীক্ষা পাসের পর কর্মক্ষেত্রে দাঁতের প্রয়োজন খুব বেশি, দেখো ই কি আর দাঁতবিচোনি দুইই অপরিহার্য কি না তাই।"

* * *

সোভিয়েৎ রাশ্যা ঘোষণা করিয়াছেন যে, চল্লিশ বৎসরের মধ্যে তাঁরা কৃত্রিম সূর্য সৃষ্টি করিবেন।—"প্রথম হলো চাঁদ,
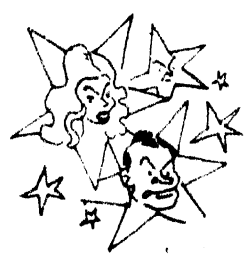
এবারে সূর্য। কিন্তু "তারকা" সৃষ্টি আমেরিকার সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত, এখানে আর মাথা গলাতে হবে না"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

—শৌণ্ডিক—

অন্যায় উপায়

সংগীত সম্মেলন নিয়ে পরস্পর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রেষারেষি বৃদ্ধি লাভ করার সঙ্গে শিল্পীদের নিয়ে টানাটানিও স্বভাবতই উৎকট প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। যতো শিল্পী হাতের কাছে পাওয়া সম্ভব, সম্মেলনের সংখ্যা তার চেয়ে বেশী। আবার একই সব শিল্পী সব সম্মেলনেই থাকলেই শ্রোতাসাধারণের কাছে সম্মেলনের প্রতি আকর্ষণ বিভক্ত হয়ে যায়। কাজেই বড়ো শিল্পীদের নিয়ে আগেভাগে সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে দিতে পারলেই লাভ। অনেকে আবার শিল্পীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন না করেই এবং তাদের বিনা অনুমতিতেই বিজ্ঞাপনে নাম ঘোষণা করে বসেন। সেই রকমই একটি অনুযোগ তুলেছিলেন সেদিন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। একটি সংস্কৃতি সম্মেলন ছাড়া কাছাকাছি সময়ের মধ্যে আর কোন সম্মেলনে যোগদান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আগামী কিছুকাল পর্যন্ত তার কার্যসূচী এমন ঠাসা যে, নতুন কোন প্রোগ্রাম গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভবই নয়, তবু আর একটি সম্মেলন তাদের অনুষ্ঠান বিজ্ঞপ্তিতে তার নাম দিয়েছেন যোগদানকারী হিসেবে এবং তাকে না জানিয়েই। এখন সেই উদ্যোক্তারা ডুবে যাবার আশঙ্কা প্রকাশ করে তার হাতেপায়ে ধরাধরি করছেন একদিন বাজাবার জন্যে, কিন্তু তার যা কার্যসূচী তার মধ্যে থেকে একদিন বের করে উক্ত সম্মেলনে বাজানো হয়তো হবে না। সেদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে কলিকাতা সংস্কৃতি সম্মেলনের সম্পাদক অমূল্য চট্টোপাধ্যায় একখানি টেলিগ্রাম দেখান, যা থেকে বুঝতে পারা গেল যে, কলিকাতা সংস্কৃতি সম্মেলনের আগে কলকাতায় আর কোন সম্মেলনে বড়ে গোলাম আলি যোগদান করছেন না। অথচ তারও নাম একটি সম্মেলনের বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছে, যে সম্মেলনের তারিখ রয়েছে কলিকাতা সংস্কৃতি সম্মেলনের আগেই। এতো মাত্র দুটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হলো। কিন্তু নাম ঘোষণা করে দিয়ে পরে হাতেপায়ে ধরে নিয়ে আসার চেষ্টা করার দাঁওয়ে থাকে কতকগুলি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা। বিজ্ঞাপনে প্রচারিত শিল্পীরা এসে উপস্থিত হতে না

পারলে কখনো কখনো দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয় সেই শিল্পীর ওপরেই এবং লোকের পক্ষে ভিতরের ব্যাপার জানার সুবিধে না থাকায় তারা উদ্যোক্তাদের কৈফিয়ৎই বিশ্বাস করে নেয়। বদনাম রটে শিল্পীদের। এই ভয়ে অনেক সময়ে শিল্পী আগাম না পেয়েও সম্মেলনে যোগদান করেন এবং অনেক সময় প্রতিশ্রুত টাকা পাওয়া থেকেও তাদের বঞ্চিত হতে হয়। রবিশংকর বলছিলেন তাঁর এমন অভিজ্ঞতার কথা। সেবার দক্ষিণ কলকাতার একটি সম্মেলন বিজ্ঞাপনে নাম দিয়ে তাকে হাতেপায়ে ধরে আসরে নামিয়ে দেন। বাজনা শেষ হবার পর গাড়ী ভাড়াটি পর্যন্তও না পেয়েই তাকে চলে আসতে হয়। অনেক শিল্পীকেই তাই টাকার ব্যাপারে খুবে কড়া দেখা যায়, তাতেও তাদের বদনাম। সংগীত সম্মেলনের যেরকম প্লাবন তাতে প্রতিদ্বন্দ্বী সম্মেলনকে ঘায়েল করার জন্য ফন্দিফিকিরের আশ্রয় কেউ কেউ গ্রহণ করে। তাতে কোথাও বদনামের ভাগী হতে হয় শিল্পীদের, কোন ক্ষেত্রে হয়তো, বেশী চালাকির ফলে উদ্যোক্তাদেরই ফাঁপরে পড়তে হয়। অসৎ লোক, যারা মাঝখান থেকে কিছু করে নেবার তাল খোঁজে, এবং হুজুগে লোক যারা খানিকটা হৈচৈ করতে পারলেই খুশী—সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, কেমনভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, সম্মেলন মারফৎ ভারতীয় সংগীতের প্রসার, প্রচার ও উন্নতি কিভাবে হতে পারে, সেসব নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করে না যারা, অধিকাংশই সেইধরো লোকেদেরই প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে সংগীত সম্মেলন উদ্যোগীদের মধ্যে। এটা বড়ো কুলক্ষণ। সংগীত সম্মেলনকে যারা ঠিক পথে চালাতে চান, সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা যাদের আছে, তাদের এটা ভাববার কথা।

• • •

নতুন কোন প্রযোজকের ছবি মুক্তিলাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক সময়ে সেই প্রযোজকেরই কয়েকখানি আগামী ছবির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেই ঘোষণা ঐ প্রথম বিজ্ঞাপন বা কাহিনী পুস্তিকার কভার পাতা পর্যন্তেই থেকে যায়। কারণ নতুন প্রযোজক-দের কজনেরই বা প্রথম ছবির পর দ্বিতীয় ছবি তৈরির সামর্থ্য থাকে। তেমনি আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নতুন একটা কোম্পানী কয়েকশ টাকা যোগাড় করে একটা মহরৎ অনুষ্ঠান করেই তাদের ছবির ভূমিকালিপিভুক্ত শিল্পী ও কলাকুশলীদের তালিকা পাঠিয়ে দেন কাগজে ছাপবার জন্য। অনেক কাগজে তা ছাপাও হয়। পরে হয়তো জানা যায় যে, যাদের নেওয়া হয়েছে বলে নাম দেওয়া হয়েছে, তাদের কেউ কোন খবরই জানেনা। শিল্পী বা কলাকুশলীরা চট করে প্রতিবাদ পাঠান না এই ভেবে যে, হয়তো প্রযোজক তাদের গ্রহণ করবেন বলে ঠিক করেছেন তাই নাম ছাপিয়েছেন। তারপর একদিন তাদের সেভুল ভেঙে যায়। এমনটা আখছারই হয়। আবার কেউ বিশেষভাবে নাম করলে তাকে নিয়ে নানা-রকম খবর বের হতে থাকে, এমনকি অনেক মিথ্যে খবর কাগজেও ছাপা হয়ে যায়। যেমন সম্প্রতি দেখা গেল, সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে। একটা খবর বেরিয়েছে ছাপা হয়ে যে, তিনি 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'র চিত্ররূপ দান করবেন। অথচ সত্যজিৎ রায় বলেন, খবরটা

মিথ্যে। ঘটনার চেয়ে রটনার ওপরেই চিত্র-রাজ্য বেশী নির্ভরশীল, তাই চিত্ররাজ্যের কোন বিষয়ে একটা কিছু রটলে সেইটেই সত্যি বলে ধরে নেয় সকলে।

সংগীত সম্মেলন সম্পর্কে

এখনকার সংগীত সম্মেলন সম্পর্কে সেদিন কথা হচ্ছিল পণ্ডিত রবিশঙ্করের সংগে। তার মতে এখন যেভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, তাতে না শিল্পী, না শ্রোতা, আর না সংগীতের, কোন পক্ষেরই কিছু হচ্ছে না। আগেকার দিনে হতো ঘরোয়া আসর। শ' দুয়েক মতো শ্রোতা নিবিষ্ট হয়ে একজন বা দুজন শিল্পীর সংগীত বেশ কাছাকাছি হয়ে শুনতে পারতো। এখন তা উঠে যাচ্ছে। রবি-শঙ্কর বল্লেন, এক ধরনের লোক আছে, যারা সর্বদা ব্যস্ত থাকে, কিন্তু সংগীতের প্রতিও অনুরাগী। অথচ সারা রাত ধরে গান-বাজনা শুনে পরদিন ঝিমনো অবস্থায় কাজে লাগা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, হয়তো উচিতও নয়। তারা পয়সা খরচ করতে পিছ-পাও নয়, কিন্তু বেশী সময় দিতেও সক্ষম নয়। এদের কথা বাদ দিয়ে রাখলে চলবে না। তিনি বল্লেন, এদের জন্য ইউরোপের কনসার্ট ধারায় সংগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা রাখা দরকার। যেটা তিনি নিজে এবার ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে এসে নিউ-এম্পায়ারে চালাবার চেষ্টা করেন। এ কনসার্ট সবদিক থেকেই বেশ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। রবিশঙ্কর বলেন, এখন একটা পারভার্সান এসেছে। তিনটে হয়তো কনফারেন্স, কিন্তু বড়ো আর্টিস্ট কজনকে শোনারই শুধু ঝোঁক। শ্রোতারা সংগীতের চেয়ে উত্তেজনা উপভোগেরই বেশী পক্ষ-পাতি। তিনি বল্লেন, এই ধরণের শ্রোতাদের দেখে বাজাতে দুঃখ হয়। এখন সংগীতের ওপর যেন প্রেম নেই। একটা কেমন যেন ভিসাস সার্কেল হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা ভাঙে সব শিল্পী একজোট হলে। কিন্তু, রবি-শঙ্কর দুঃখ করে বলেন যে, তা হবার নয়। কারণ শিল্পীদের মধ্যে ঈর্ষা, অনেকের ছোট মন। বর্তমান অবস্থার প্রতিকারের একটা উপায় হয়, তিনি বল্লেন, যদি বেশ বড়-গোছের গোটা দুই শীততাপনিয়ন্ত্রিত মিউজিক হল থাকে। এমন হল থাকলে সারা বছর ধরে সংগীত পরিবেশনে বাধা থাকে না,—গরমেও চলবে, শীত বর্ষা বসন্তেও চলতে পারে। সংগীত পরিবেশনের পাকা জায়গা থাকলে একজন বা দুজন শিল্পীকে নিয়ে এক একদিনের অধিবেশন হতে পারে এবং এক একজনের কনসার্ট ধারায় আসর হলে শিল্পীকেও বেশী করে টাকা দেওয়া যায়। এরূপ হল করা উচিত গভর্নমেণ্টের এবং প্রতি শহরেই তা থাকা উচিত, তাহলে সমস্যার নিরাকরণ হয় অনেকখানি। শিল্পী ভাল টাকা পেলে এবং শ্রোতা শীততাপনিয়ন্ত্রিত স্থানের ভাল আরাম পেলে সব ঠিক হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তিনি এপ্রস্তাব করেছেন বললেন। তিনি বল্লেন, এখন নিউজিক হল না থাকায় অনেক টাকা ভাড়া দিয়ে সিনেমা-হল নিতে হয়, আবার প্যাণ্ডেল হলে গাড়ি চলার আওয়াজ স্তব্ধ না হলে সংগীত জমে না। রবিশঙ্কর দক্ষিণ ভারতের সম্মেলন পরিচালন ধারার ভূয়সী প্রশংসা

সহায়ক হয়ে প্রলয় কাণ্ড বাঁধিয়ে ইন্দ্রের সিংহাসন টলাতে টলাতে চ্যবনের কাছে এনে হাজির করলে। ইন্দ্র তার ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইলে।

• • • •

উদ্ভট সব ব্যাপার। উপভোগ করার মধ্যে যদি বাছতে হয় তো নাচ আর গানই যা কিছু। অবশ্য জাতের জিনিস নয় এবং প্রায় সব গানেরই সুর অন্য ছবির গান থেকে নেওয়া, তবুও রফি আমেদ, মান্না দে, প্রদীপ, লতা মুঙ্গেশকর, গীতা দত্ত প্রভৃতির গাওয়া গান শুনতে ভাল লাগে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অবিনাশ ব্যাস। পরিচালক রমণ দেশাই পদে পদে কেবল তাক লাগিয়ে দেবার এতো ব্যবস্থা করেছেন যে, হাসিও পায়, হাঁফিয়েও উঠতে হয়। দীনু দেশাইয়ের ক্যামেরা কেবল ম্যাজিকই দেখিয়ে গিয়েছে অনেক রকমের। প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন ত্রিলোক কাপুর, মনোহর দেশাই, এস এন ত্রিপাঠী, পি কৈলাস, সুন্দর, নিরুপা রায় প্রভৃতি।
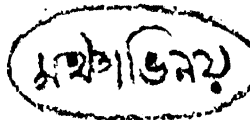
বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গুণীদের সমাদর

পেশাদার মঞ্চ যে নাট্য উন্নয়ন বিষয়ে উদাসীন নয়, তার একটি দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ একটি পরিকল্পনা করেছেন। গত ১৬ই নবেম্বর বাংলার মঞ্চ-সাংবাদিকদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য একটি ত্রিবিধ কর্মসূচী প্রণয়ন করেছেন। প্রথম হচ্ছে নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্রের নামে 'গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা।' পেশাদার মঞ্চে অনভিনীত মৌলিক বা অনূদিত নাটকের যে কোন এক কিংবা একাধিক আঙ্গিকে পারদর্শিতা ও নতুনত্ব দেখাতে পারলে তাদের গুণানুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রথম পুরস্কার 'গিরিশ চ্যালেঞ্জ শীল্ড' ও বিশ্বরূপার ব্যয়ে এক বছরের জন্য প্রখ্যাত বিদেশী মঞ্চ-পত্রিকা। দ্বিতীয় পুরস্কার 'অমৃতলাল চ্যালেঞ্জ কাপ' ও এক বছরের জন্য বিদেশী মঞ্চ-পত্রিকা। এছাড়া স্বতন্ত্রভাবে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, সহ অভিনেতা, অভিনেত্রী, সহ-অভিনেত্রী, সঙ্গীতকার ও নৃত্যশিল্পীদের বিভিন্ন পুরস্কার দান। আগামী জানুয়ারী মাস

থেকে বিশ্বরূপা মঞ্চে প্রতিযোগিতা, অনুষ্ঠিত হবে। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রায় পঞ্চাশজনকে নিয়ে একটি বিচারকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় কর্মসূচী হচ্ছে, আগামী জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বরূপা মঞ্চে যেসব সৌখীন সম্প্রদায় নাটক মঞ্চস্থ করাবেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্বরূপার নিজস্ব নির্বাচনে যে নাটক (নতুন হলে), পরিচালনা, সুরযোজনা, আলোকসম্পাত ও অভিনয় শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হবে বৎসরান্তে উক্ত বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে। তাছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সংস্থাকে পরের বছরে একদিন বিনা ভাড়ায় কোন নাটক মঞ্চস্থ করার সুযোগ দেওয়া হবে। তৃতীয় কর্মসূচী হচ্ছে, বিশ্বরূপাতে আগামী বৎসরে একটি পাঠাগার স্থাপন, যেখানে বাংলা ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে প্রকাশিত নাটক এবং মঞ্চ সম্পর্কিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা রাখা হবে। মঞ্চরসিক জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে প্রতিদিন বিকাল পাঁচটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত পাঠাগার খোলা থাকবে। নাট্য সংস্থাগুলি বার্ষিক দশ টাকা চাঁদায় এই পাঠাগারের স্থায়ী সভ্য হতে পারবেন। প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত বিস্তারিত নিয়মাবলী বিশ্বরূপাতে পাওয়া যাবে।

কলিকাতা সংস্কৃতি সম্মেলন

কলিকাতা সংস্কৃতি সম্মেলন বহুবিধ সাংস্কৃতিক সম্ভারে এমন ঠাসা অনুষ্ঠানসূচী প্রণয়ন করেছেন যে, অধিবেশন পাঁচদিনের জায়গায় আরো একদিন বাড়িয়ে দিতে হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন। অধিবেশন হবে ১২ই থেকে ১৭ই ডিসেম্বর। রসিকজনকে আকৃষ্ট করার বিবিধ অনুষ্ঠানে যোগদানকারীদের মধ্যে রয়েছেন কণ্ঠসংগীতেঃ বড়ে গোলাম আলি খান, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ভীমসেন যোশী, মোহন সিং, সরস্বতী রানে, লক্ষ্মীশঙ্কর, শান্তিদেব ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র প্রভৃতি। যন্ত্রসংগীতেঃ আলাউদ্দীন খান, রবিশঙ্কর, আলি আকবর খান, আবদুল হালিম জাফর খান, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, কণ্ঠে মহারাজ, শান্তাপ্রসাদ, চতুর্লাল, কেরামৎ আলি, কানাই দত্ত, সগীরুদ্দীন প্রভৃতি। নৃত্যেঃ রেখা বাত্তরকর (কলকাতায় প্রথম), মঞ্জুশ্রী ও রুম্পাদের এবং মণিপুরী নৃত্য সম্প্রদায়, যারা চার বছর আগে এই সম্মেলনে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাদের 'রাসলীলা', 'কৃষ্ণলীলা', নাগা নৃত্য প্রভৃতির সঙ্গে নৃত্যশিল্পী হাওবাম ও মৃদঙ্গবাদক লক্ষ্মণ সিংহের শিল্পকীর্তি আজও লোকে স্মরণ করে। বিশেষজ্ঞদের নানা উপদ্রুত অঞ্চল অতিক্রম করে চলে আসতে হচ্ছে তাদের এবার। বাংলার লোকনৃত্য বিভাগে রয়েছে জ্যোতিষ বিশ্বাস পরিচালিত পাঁচালী-ভারতীর নতুন পালা 'শিব-বিবাহ'; সাওতাল কর্তৃক নাটিকা 'মাচোর'; সাংস্কৃতিকী কর্তৃক অভিনীত নৃত্যনাট্য। ভারতীয়দের পরবর্তী ইত্যাদি। অন্যান্য বছরের মতো ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য দুটি বিশেষভাবে প্রস্তুত নৃত্যনাট্য রাখা হয়েছে। এ ছাড়া সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রতিযোগিতা ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনারও ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতি বছরের মতো প্রবেশ ও মণ্ডপ সজ্জার ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা হবে বলে জানা গেল। এবার মণ্ডপ, মঞ্চ ও তোরণ পরিকল্পনা করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী কালিকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার।

গুণীদের সমাদর

ভয় ভীতি, শোক অনুচিত্রে স্ত্রী সন্তানের জন্য প্রযোজকের হয়ে থেকে সংশ্লিষ্ট শিল্পী, কলাকুশলী ও কর্মীদের পারস্পরিক ক্ষেত্রে নিবন্ধন প্রায়ই পাওয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি ছবির প্রদর্শক হিসেবে প্রযোজক, পরিচালক ও শিল্পীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও পুরস্কার প্রদানের দৃষ্টান্ত প্রবীণ প্রদর্শক মনোরঞ্জন ঘোষই দেখিয়েছেন। 'সাগরিকা' ছবিখানির সাফল্যের জন্য তিনি প্রযোজক, পরিচালক প্রভৃতিদের পদক উপহার দেন। গত সোমবার ভারতী সিনেমায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি অনুরূপভাবে 'হারানো সুর' ছবিখানির সাফল্যের জন্য প্রযোজক ও শিল্পী উত্তমকুমার, পরিচালক অজয় কর, চিত্রনাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও নায়িকাচরিত্রাভিনেত্রী সুচিত্রা সেনকে (বর্তমানে ইউরোপে) রৌপ্যপদক দ্বারা সম্মানিত করেন। শ্রী ঘোষ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে ছবিখানির সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পী, কর্মী ও কলাকুশলীদের কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পুরস্কারগুলি প্রদান সূত্রে চিত্রসাংবাদিক নির্মলকুমার ঘোষ এইভাবে প্রদর্শক দ্বারা শিল্পী ও কুশলীদের সম্বর্ধনা জানানোর নজীর সৃষ্টির জন্য পুরস্কারদাতাকে ধন্যবাদ জানান। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ছবির সাফল্যের জন্য প্রত্যেকের সমবেত চেষ্টা ও উদ্যমের কথা উল্লেখ করেন।

একলব্য

ভারতের প্রধান তিনটি ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স কাপ ও ডুরাণ্ড কাপের খেলার মধ্যে মাত্র রোভার্স কাপের খেলা সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছে। আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা এখনও সিকেয় ঝুলছে, ডুরাণ্ড এখনও আরম্ভ হয়নি। ডিসেম্বর মাসের ১১ তারিখ থেকে ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভের কথা।

যদিও দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতা নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের কাছ থেকে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল প্রতিযোগিতার মর্যাদা পেয়েছে, তবুও দিল্লী ক্লথ মিল প্রতিযোগিতা আই এফ এ, রোভার্স বা ডুরাণ্ডের সমকক্ষ হতে পারেনি। যাই হোক, দিল্লী ক্লথ মিলের খেলাও প্রায় শেষ হবার মুখে।

এবার রোভার্স কাপ লাভ করেছে হায়দরাবাদ সিটি পুলিস দল। ফাইনালে হায়দরাবাদ পুলিস গতবারের রোভার্স বিজয়ী কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকেই ৩—০ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব শুধু গতবারের রোভার্স বিজয়ীই নয়, এবার কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং আই এফ এ শীল্ড ফাইনালিস্টও। সুতরাং পরম শক্তিশালী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩—০ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে রোভার্স কাপ লাভ করা হায়দরাবাদের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। হায়দরাবাদ পুলিসের পক্ষে এবারকার রোভার্স জয় আরও কৃতিত্বপূর্ণ এই কারণে যে, তাদের খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের মধ্যে সালাম ও ইয়ার্মান বহু আগেই দলের সংগে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছেন; নারায়ণ ও বলরাম এ বছরই এসেছেন ইস্টবেংগল ক্লাবে আর সেণ্টার হাফ আমেদ হোসেন ও রাইট ইন মহম্মদুল্লা এসেছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। একটি ক্লাব থেকে এতগুলি তৈরী খেলোয়াড় বেরিয়ে গেলে সে ক্লাবের পক্ষে ক্রীড়াধারার উচ্চ মান বজায় রাখা খুবই কষ্টসাধ্য। কিন্তু হায়দরাবাদ পুলিস দল তাদের ক্রীড়ামান পুরোপুরি বজায় রেখেছে; পুরানো খেলোয়াড়দের সংগে আরও কিছু নতুন খেলোয়াড় তৈরী করে দলটিকে করেছে পরম শক্তিশালী। অবশ্য যে কোন কারণেই হোক বোম্বাইয়ের কুপারেজ মাঠ হায়দরাবাদ খেলোয়াড়দের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রকাশের পক্ষে খুবই সহায়ক। হায়দরাবাদ পুলিস দল বোম্বাইতে যত ভাল খেলে অন্য কোন জায়গায় এত ভাল খেলতে পারে না। ইতিপূর্বে এরা উপর্যুপরি পাঁচ বছর রোভার্স কাপ লাভ করে ভারতের খেলাধুলার ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে রেখেছে। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে ভারতের কোন দলই হায়দরাবাদ পুলিসের কাছ থেকে রোভার্স কাপ ছিনিয়ে নিতে পারেনি। এবার নিয়ে হায়দরাবাদ পুলিস মোট ৬ বার রোভার্স কাপ লাভ করলো।

রোভার্স কাপ

হায়দরাবাদ পুলিস রোভার্স কাপ লাভ করায় এ বছর আর কোন টীমেরই 'ট্রিপল ক্রাউন' লাভের সম্ভাবনা রইলো না। কারণ হায়দরাবাদ পুলিস আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যালের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। পুলিস টীম হিসাবে আই এফ এ শীল্ডেও তারা অংশ গ্রহণ করেনি। আই এফ এ শীল্ডে হায়দরাবাদ যোগ দিয়েছিল হায়দরাবাদ এফ এ নামে। তৃতীয় রাউণ্ডে হাওড়া ইউনিয়নকে পরাজিত করবার পর কোয়ার্টার ফাইনালে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের কাছে পরাজয় স্বীকার করে হায়দরাবাদ দলকে আই এফ এ শীল্ডের খেলা থেকে বিদায় নিতে হয়। যাই হোক কলকাতার লীগ-চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এখনও আই এফ এ শীল্ড এবং ডুরাণ্ড কাপ লাভের সম্ভাবনা থাকলেও প্রকৃত 'ট্রিপল ক্রাউন লাভের' সম্ভাবনা নেই। কারণ ভারতের প্রধান তিনটি ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ীই প্রকৃত 'ট্রিপল ক্রাউনের' অধিকারী। লীগ সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা নয়—স্থানীয় প্রতিযোগিতা হিসাবেই বিবেচিত। এই কারণে ১৯৪০ সালে কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং রোভার্স এবং ডুরাণ্ড কাপ লাভ করেও প্রকৃত 'ট্রিপল ক্রাউনের' অধিকারী হয়নি। একই কারণে ১৯৩৯ সালে কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং আই এফ এ শীল্ড ও রোভার্স কাপ বিজয়ী ইস্টবেংগল ক্লাবের 'ট্রিপল ক্রাউন' খুঁত থেকে গেছে—আজ পর্যন্ত কেউই নিখুঁত 'ট্রিপল ক্রাউনের' অধিকারী হয়নি। 'ট্রিপল ক্রাউন' কথাটি অবশ্য শুধু কথার কথা। ভারতের ফুটবল সংবিধানে 'ট্রিপল ক্রাউনের' কোন উল্লেখ নেই। কথাটি ফুটবল আইনকানুনের অলিখিত সংবিধান এবং অনন্য সম্মান।

কলকাতার প্রধান চারটি ক্লাবই এবার রোভার্স কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে লীগ রানার্স ইস্টবেংগল ক্লাব তৃতীয় রাউণ্ডের প্রথম খেলাতেই বোম্বের কালটেক্স স্পোর্টস ক্লাবের কাছে ৩—১ গোলে পরাজয় স্বীকার করে। মোহনবাগান ক্লাব দ্বিতীয় রাউণ্ডে

পিকিং স্টেডিয়ামে চীনের মহিলা অ্যাথলীট চেং ফেং ইউংগ উঁচু লাফে বিশ্বের নতুন রেকর্ড করছেন। আমেরিকার মিলড্রেড ম্যাকডোনিয়েল মেলবোর্ন অলিম্পিকে ৫ ফুট ৯¼ ইঞ্চি লাফিয়ে মেয়েদের উঁচু লাফে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। সম্প্রতি চেং ফেং ইউংগ ৫ ফুট ৯¾ ইঞ্চি লাফিয়ে ম্যাকডোনিয়েলের বিশ্বরেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছেন

টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে ৩—১ গোলে পরাজিত করবার পর কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজয় স্বীকার করে হায়দরাবাদ পুলিসের কাছে ২—১ গোলে। দ্বিতীয় রাউণ্ডে এলাহাবাদ স্পোর্টিংকে ২—১ গোলে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে মাদ্রাজ রেজিমেণ্টাল সেণ্টারকে ১—০ গোলে পরাজিত করবার পর রাজস্থান ক্লাবকে সেমি-ফাইন্যালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে ২—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করে রোভার্স কাপ থেকে বিদায় নিতে হয়। আর মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বিশাখাপত্তমের স্পোর্টস ক্লাবকে ৪—০ গোলে, ই এম ই সেকেন্দ্রাবাদকে ৩—০ গোলে এবং রাজস্থান ক্লাবকে ২—০ গোলে পরাজিত করে ফাইন্যালে পরাজিত হয় হায়দরাবাদ পুলিসের কাছে ৩—০ গোলে।

হায়দরাবাদ পুলিসের রোভার্স কাপের ধারিয়াল

ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের রোভার্স কাপে যোগদান সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আই এফ এ শীল্ড সেমি-ফাইন্যালের গোলযোগপূর্ণ ঘটনার জন্য আই এফ এর প্রতিযোগিতা কমিটি ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে প্রায় ৪ মাসের জন্য 'সাসপেণ্ড' করলেও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব কলকাতা হাইকোর্টে প্রতিযোগিতা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইনজাংশনের প্রার্থনা করে এবং ইনজাংশন পেয়ে যাত্রা করে বোম্বাই অভিমুখে। কিন্তু ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাবের কাছে পরাজয় স্বীকার করে একরকম পত্রপাঠ বিদায় গ্রহণ করতে হয়।

রোভার্স কাপের খেলা শেষ হবার মুখে বোম্বের রেফারীদের ধর্মঘটের বিষয়ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রেফারীদের সঙ্গে রোভার্স কাপের পরিচালকদের মতবিরোধ ঘটে মোহনবাগান ও হায়দরাবাদ পুলিসের কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলা নিয়ে। বোম্বের রেফারীজ কমিটি এই খেলার জন্য সি এস গোডিনহোকে রেফারী মনোনীত করেন; কিন্তু পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রতিযোগিতা কমিটি গোডিনহোর উপর আস্থা না রাখতে পেরে খেলার ভার ন্যস্ত করেন অপর এক রেফারীর উপর। এতে বোম্বের রেফারীরা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হন এবং খেলা পরিচালনা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিলেতের পাশকরা এ পি সিংহ নামে এক রেফারীকে হাতের কাছে পাওয়া যায় এবং তিনিই মোহনবাগান ও হায়দরাবাদের কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলা পরিচালনা করেন। এর পর দিল্লী, বাঙলা এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের কাছে রেফারী পাঠাবার জন্য 'এস ও এস' পাঠানো হয়। বাঙলা থেকে রেফারী জ্যোতি দত্ত এবং দিল্লী থেকে রেফারী এস ভট্টাচার্য হাওয়াই পথে বোম্বে যাত্রা করেন। বিলেতের পাশ-করা রেফারী এ পি সিংহ এবং এঁদের দিয়ে রোভার্স কাপের শেষদিকের খেলাগুলি পরিচালনা করানো হয়। বোম্বের রেফারী-দের 'ধর্মঘট' বানচাল করে দেবার জন্যে এঁদের অনেকেই ভাল চোখে দেখতে পারেননি। আবার কিছুসংখ্যক উৎসাহী এদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিরস্কার এবং পুরস্কার যা কিছুই এঁদের প্রাপ্য হোক আমি বলবো পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশনের জন্য বাইরে 'এস ও এস' পাঠাবার আগে বোম্বের রেফারীদের সঙ্গে একটা মিটমাট করা উচিত ছিল। কারণ রেফারীদের বাদ দিয়ে খেলা চলতে পারে না। রেফারীরা ফুটবল খেলার এক প্রধান অংগ। আর সবাই যখন পাশকরা রেফারী, তখন কারো প্রতি অনাস্থা থাকাও উচিত নয়। অবশ্য অভিজ্ঞতার মূল্য আছে এবং কার্যক্ষেত্রে কেউ কেউ সুনামও অর্জন করেন বেশী। কিন্তু বোম্বের রেফারীজ এসোসিয়েশন মোহনবাগান ও হায়দরাবাদের খেলায় একজন অনভিজ্ঞ রেফারীর উপর পরিচালনাভার ন্যস্ত করেছিলেন, এও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। রেফারীদের প্রতি এসোসিয়েশন এবং পরিচালক সংস্থার সুনজর এবং কুনজর যে সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনার পক্ষে এক প্রধান অন্তরায় এও একরকম স্বতঃসিদ্ধ। এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় লটারী প্রথায় রেফারী নির্বাচন করা; কিন্তু তাতে কর্তাদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হবার আশংকা আছে, সুতরাং সেটি হবার নয়।

রোভার্স কাপের ফাইন্যাল খেলার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েই এবার রোভার্স কাপের আলোচনা শেষ করবো। ফাইন্যালে শক্তিশালী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব হায়দরাবাদ পুলিসের সঙ্গে মোটেই ভাল খেলতে পারেনি। অবশ্য তিনটি গোলের মধ্যে মহমেডান দলের বিরুদ্ধে দুইটি গোল

হয়েছে গোলরক্ষক আমেদ আখতারের আংশিক ত্রুটির জন্য। তবুও সামগ্রিকভাবে মহমেডান দলকে প্রায় সব সময়ই কোণঠাসা হয়ে থাকতে হয়েছে। মহমেডান দলের ওমর ও আবিদের যেমন একটি করে শট ক্রসবারে লেগে ব্যর্থ হয়েছে, তেমন হায়দরাবাদ সেণ্টার ফরোয়ার্ড সালেরও একটি শট ব্যর্থ হয়েছে গোলপোস্টে বল লেগে। বিশ্রাম সময়ের মধ্যেই হায়দরাবাদ ২—০ গোলে এগিয়ে থাকে। গোল করেন জুলফিকার ও ইউসুফ। খেলা শেষ হবার ১০ মিনিট আগে জুলফিকার আর একটি গোল করেন। খেলার শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন বোম্বের রাজ্যপাল শ্রীশ্রীপ্রকাশ।

নীচে হায়দরাবাদ পুলিসের ছয় বছরের রোভার্স জয়ের খতিয়ান দেওয়া হল। এ পর্যন্ত আর কোন টীমই উপর্যুপরি রোভার্স কাপ জয় করতে পারেনি। আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, পশ্চিম ভারতের সর্বপ্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতা রোভার্স কাপ এ পর্যন্ত জয় করতে পারেনি পশ্চিম ভারতের কোন ফুটবল টীম। বৃটিশ যুগে অবশ্য পশ্চিম ভারতে অবস্থিত বহু বৃটিশ সামরিক দলের পক্ষেই রোভার্স কাপ লাভের সুযোগ ঘটেছে।

হায়দরাবাদ পুলিসের রোভার্স জয়ের খতিয়ান

১৯৫০ সাল—কানপুরের রুপার্ট ক্লাবকে ৪—১ গোলে, দক্ষিণ সেনকে ২—২ ও ২—১ গোলে, লাহোর রেঞ্জার্সকে ১—১ ও ৫—০ গোলে ও ফাইন্যালে এরিয়ান ক্লাবকে ১—০ গোলে পরাজিত করে।

১৯৫১ সাল—আসোসিয়েটস সিমেণ্ট কোম্পানীকে ২—০ গোলে, রাজস্থান ক্লাবকে ৫—০ গোলে, ইণ্ডিয়া কালচার লীগকে ২—০ গোলে ও ফাইন্যালে উইমকো স্পোর্টস ক্লাবকে ২—০ গোলে পরাজিত করে।

১৯৫২ সাল—কানপুর জেলাকে ৩—০ গোলে, বোম্বে ডায়নামোকে ২—০ গোলে, সেণ্ট্রাল রেলওয়েকে ২—০ গোলে ও ফাইন্যালে বোম্বে এমেচার্সকে ০—০ ও ১—০ গোলে পরাজিত করে।

১৯৫৩ সাল—কানপুর জেলাকে ৫—০ গোলে, ইণ্ডিয়ান নেভীকে ৩—০ গোলে, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ০—০, ০—০, ০—০ ও ১—০ গোলে ও ফাইন্যালে ব্যাংগালোর মুসলিমকে ২—০ গোলে পরাজিত করে।

১৯৫৪ সাল—দিল্লী ইয়ংসকে ১—০ গোলে, ওয়েস্টার্ন রেলকে ৪—০ গোলে, মালাবার স্পোর্টসকে ৩—২ গোলে, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১—০ গোলে ও ফাইন্যালে করাচীর কেমারী ইউনিয়নকে ২—১ গোলে পরাজিত করে।

১৯৫৭ সাল—ইণ্ডিয়ান কালচার লীগকে ৪—০ গোলে, মোহনবাগান ক্লাবকে ২—১ গোলে, ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাবকে ০—০ ও ২—১ গোলে এবং ফাইন্যালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে।

* * *

বাঙলার টেবিল টেনিসে জুনিয়র খেলোয়াড় হিসাবে পরিচিত ১৫ বছরের ছেলে দীপক ঘোষ এবার বাঙলার জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করা ছাড়াও সিনিয়র বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপও লাভ করেছে। জুনিয়র বিভাগের ফাইন্যালে দীপক স্ট্রেট গেমে পরাজিত করেছে বাঙলা টেবিল টেনিসের অন্যতম বালকবীর হাবসী আংকে আর সিনিয়র বিভাগের ফাইন্যালে পরাজিত করেছে বাঙলার অন্যতম খেলোয়াড় জ্যোতির্ময় ব্যানার্জীকে। জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী বয়সে দীপকের চেয়ে অনেক বড়। তাছাড়া জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী শুধু বাঙলারই সুনিপুণ খেলোয়াড় নয়—আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিসেও জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সুতরাং এই রকমের একজন কুশলী ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে পরাজিত করে বাঙলার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করা শিশু খেলোয়াড় দীপক ঘোষের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। আজ পর্যন্ত কোন জুনিয়র খেলোয়াড়ের পক্ষেই সিনিয়র বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করা সম্ভব হয়নি। একই সঙ্গে জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে বাঙলার টেবিল টেনিসে দীপক এক নতুন কীর্তি স্থাপন করেছে।

কলকাতার ইনডোর স্টেডিয়ামে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বেংগল টেবিল চ্যাম্পিয়নশিপে যাঁরা দীপকের খেলা দেখেছেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন দীপকের জন্য আরও বড় সম্মান অপেক্ষা করছে। সত্যই দীপক অভিজ্ঞ ও কৃতী খেলোয়াড় জ্যোতির্ময় ব্যানার্জীকে শুধু খেলাতেই পরাজিত করেননি—বুদ্ধির খেলাতেও পরাজিত করেছেন। দীপক ঘোষের চেয়ে জ্যোতির্ময় ব্যানার্জীর খেলা অনেক ফাস্ট। জ্যোতির্ময়ের ফরাক্ষিপ্র হাতের মার চাবুকের মত টেবিলের উপর পড়ে বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে যায়। জ্যোতির্ময়ের কাছ থেকে দীপক প্রথম গেমটি লাভ করলেও জ্যোতির্ময় তীব্রগতিতে খেলে লাভ করেন পরের দুটি গেম। এ দুটি গেমে জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী টেবিল টেনিসের উন্নত কলাকৌশল দেখিয়ে দর্শকচিত্ত জয় করেন। জ্যোতির্ময়ের কয়েকটি ব্যাকহ্যাণ্ড স্ম্যাসিং খুবই দর্শনীয় হয়। গতিবেগে জ্যোতির্ময়ের সংগে এঁটে ওঠা অসম্ভব বুঝে দীপক খেলাকে আস্তে আস্তে মন্থর করে নিয়ে আসেন। ব্যাকহ্যাণ্ডের 'টপ স্পিন' ও ড্রাইভ মেরে তিনি প্রতিপক্ষের অসুবিধার সৃষ্টি করতে থাকেন। আর 'চপ' মারের সাহায্যে খেলাকে করে তোলেন অত্যন্ত মন্থর। ফলে জ্যোতির্ময়ের খেলায় ভুলচুক হতে থাকে। এর পর দীপক খেলায় আধিপত্য বিস্তার করে অতি সহজেই জ্যোতির্ময়কে পর পর দুটি গেমে পরাজিত করেন। জ্যোতির্ময় চতুর্থ গেমে মাত্র ৭ পয়েণ্ট এবং পঞ্চম গেমে ১০ পয়েণ্টের বেশী সংগ্রহ করতে পারেন না।

বেংগল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন কুমারী উষা আয়েংগার। ফাইন্যালে কুমারী উষা স্ট্রেট গেমে মিসেস চমন কাপুরকে পরাজিত করেছেন। এক্ষেত্রেও হয়েছে তারুণ্যের জয়। কারণ কুমারী উষার বয়স মিসেস কাপুরের বয়সের অর্ধেকেরও কম।

বাঙলার টেবিল টেনিসের টীম চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন। ফাইন্যালে ইস্টার্ন রেলওয়ে টীম বি টি এ সি টীমকে ৫—০ খেলায় পরাজিত করে। নীচে বেংগল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যাল খেলার ফলাফল দেওয়া হল:—

পুরুষদের সিংগলস ফাইন্যাল—দীপক ঘোষ ২১—১৪, ১৮—২১, ১৪—২১, ২১—৭ ও ২১—১০ পয়েণ্টে জ্যোতির্ময় ব্যানার্জীকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল—জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী ও সমীর চ্যাটার্জী ১৭—২১, ২১—১৪, ২১—১৩ ও ২১—১১ পয়েণ্টে দীপক ঘোষ ও পি মিত্রকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিংগলস ফাইন্যাল—দীপক ঘোষ ২১—৮, ২১—৯ ও ২৮—২৬ পয়েণ্টে হাবসী আংকে পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিংগলস ফাইন্যাল—কুমারী উষা আয়েংগার ২১—১০, ২১—১৬ ও ২২—২০ পয়েণ্টে মিসেস চমন কাপুরকে পরাজিত করেন।
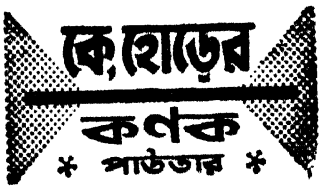
দেশী সংবাদ

১৯শে নবেম্বর—কলিকাতায় প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, গত সোমবার সন্ধ্যা হইতে নদীয়া জেলার চূর্ণী নদীতে হাজার হাজার মাছ মরিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে; শত শত মাছ নদীবক্ষে ভাসিয়া উঠিয়া খাবি খাইতেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মহলের বিশ্বাস এই যে, সীমান্তবর্তী পূর্ব পাকিস্থানের কোন স্থান হইতে বিষাক্ত কোন দ্রব্য চূর্ণী নদীর জলে ছাড়া হইয়াছে।

অশোক মেহতা খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এই দুয়ের কোনটিই চলিতে পারে না। পরিপূর্ণ অবাধ বাণিজ্য ও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ—এই দুয়ের মাঝামাঝি কোন স্থানে খাদ্য সমস্যার সমাধান সন্ধান করিতে হইবে।

২০শে নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ লোকসভায় বলেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল কাঠামো পরিত্যাগের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ভারত সরকারের নাই।

পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয়ের ১৯ বৎসর বয়স্কা কন্যা শ্রীমতী মীরা গত দেড় বৎসর যাবৎ কেবলমাত্র দিনে দুই বেলা দুই কাপ চা-পান করিয়া জীবন-যাপন করিতেছে। বীরেনবাবু বর্তমানে আলিপুর-দুয়ার নিউ টাউনে অবস্থান করিতেছেন।

২১শে নবেম্বর—ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীর 'সাবধানতাহীন উক্তি' সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ লোকসভায় যে সকল প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন, অধ্যক্ষ শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার অদ্য তাহা সমস্ত বাতিল করিয়া দেন।

দামোদর উপত্যকা করপোরেশনে নাকি আবার কর্মী ছাঁটাই হইতেছে। মাইথনে এই মাসেই ৩০০ কর্মীকে ছাঁটাই করা হইয়াছে এবং এই বছরের শেষে করপোরেশনের অনুমান ৩০০০ কর্মী ছাঁটাই করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব উঠিয়াছে।

২২শে নবেম্বর—বীর সাভারকর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দের ভাই) ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই) দেশসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁহাদের প্রত্যেককে মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতন দিবার জন্য বেসরকারী সদস্য রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আজ লোকসভায় এক বিল পেশ করিতে চাহিলে সরকার পক্ষ উহার বিরোধিতা করেন। ইহার প্রতিবাদে বিরোধী পক্ষের প্রায় সকল সদস্য সভা হইতে বাহির হইয়া যান।

কলিকাতায় ন্যায্য মূল্যের দোকানে ১৭৷৷০ মণ দরে চাউল পাওয়া যাইতেছে না, এই মর্মে এক অভিযোগ শুক্রবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সাপ্তাহিক অধিবেশনে বিভিন্ন ওয়ার্ডের কয়েকজন কাউন্সিলারের নিকট হইতে শোনা যায়। শুধু তাহাই নহে ন্যায্য মূল্যের দোকান বণ্টন এমন কি রেশন কার্ড বিলির ব্যাপারেও সরকার নিজ দলীয় সমর্থকদের প্রতি পক্ষপাত দেখাইতেছেন বলিয়াও কোন ইউ সি সি কাউন্সিলার অভিযোগ করেন।

২৩শে নবেম্বর—বোম্বাইয়ে প্রাপ্ত সরকারী

সংবাদে প্রকাশ, আজ রাত্রি ৭টা ১০ মিনিটের সময় বোম্বাই হইতে যে কলিকাতা মেল ছাড়িয়া গিয়াছিল সেই মেল ট্রেনখানি এই স্থান হইতে ৯৭ মাইল দূরে রেলপথের ইগাতপুরী এবং ভুশোয়াল শাখার পাদালী ও আশানলী স্টেশনের মধ্যে একটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়। পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ, এই দুর্ঘটনায় ৯ জন নিহত এবং ৫১ জন আহত হইয়াছে।

২৪শে নবেম্বর—পুনর্বাসন অর্থ সংস্থান কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য আরও ২ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইতিপূর্বে প্রাপ্ত ঋণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য মোট ২৮ হাজার টাকার তিন দফা পরিপূরক ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ভারত সরকার রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে স্থির করিয়াছেন যে, বিদেশে রপ্তানী মালের ব্যবহারের জন্য যে সব কাঁচামাল আমদানি করা হইবে রপ্তানিকারকদের সেইসব আমদানী করা মালের জন্য দেয় আমদানী শুল্ক হইতে সম্পূর্ণ রেহাই দেওয়া হইবে।

২৫শে নবেম্বর—আসামের অন্তর্গত বর্তমান নাগা পাহাড় জেলা এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর টুয়েনসাং ডিভিশন লইয়া একটি নূতন প্রশাসনিক অঞ্চল গঠনের জন্য আজ লোকসভায় তিন ঘণ্টা বিতর্কের পর নাগা পাহাড়-টুয়েনসাং এলাকা বিল গৃহীত হইয়াছে।

আজ লোকসভায় শ্রীবিভূতি মিশ্রের এক প্রশ্নের উত্তরে সরকারী রেলমন্ত্রী শ্রীশাহ নওয়াজ খাঁ জানান যে, হাওড়া-বর্ধমান সেকশনে চলতি মাসের শেষভাগে হাওড়া ও শেওড়াফুলির মধ্যে প্রথম বিদ্যুৎচালিত সুবারবন ট্রেন চলাচল করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিদেশী সংবাদ

১৯শে নবেম্বর—ক্যালিফোর্নিয়ার নামজাদা হাসপাতালে আজ এমন একজন ভর্তি হইয়াছেন—একাধারে যিনি নারী ও পুরুষ দুই-ই। উনিশ বৎসরের এই যুবক-যুবতীটির জন্ম কাটিন রাজ্যে। ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা যায়, নারী হিসাবে ইনি সন্তান ধারণেও সক্ষম। এক যুবতীর সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছে।

আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন ইঙ্গ-মার্কিন খসড়া প্রস্তাব ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণ গ্রহণের অযোগ্য এই অভিমত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বৃটেন কাশ্মীর সম্পর্কে পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছে।

২০শে নবেম্বর—বিশ্ব ব্যাংক এবং অপর নয়টি কানাডীয় ও মার্কিন কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক আজ ভারতের বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদনকারী কারখানা টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীকে যুক্তভাবে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ ডলার ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

আণবিক শক্তির অধিকারী রাষ্ট্রসমূহকে আণবিক পরীক্ষা বন্ধ রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করিবার আহ্বান জানাইয়া ভারতের তরফ হইতে উত্থাপিত একটি প্রস্তাব আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

২১শে নবেম্বর—ওয়াশিংটনে পশ্চিম জার্মান সরকার জানাইয়াছে যে, আমেরিকা হইতে ৭০ কোটি ডলার সরকারী বিনিয়োগ হারে এই অর্থের পরিমাণ ৬ কোটি ... আর্থিক সাহায্যদান করিতে সম্মত হইয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, রেঙ্গুন হইতে ১৪০ মাইল দূরবর্তী থাটোন জেলায় অনুমানিক ১০৫ জন কারেন বিদ্রোহী সরকারী ... ও ... সরকারী সৈন্যদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

২২শে নবেম্বর—... বিদেশ ... উপরাষ্ট্রপতি ... প্রস্তাব করিয়াছে ... পারমাণবিক ... বাতিল ...

আজ ... এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রাশিয়া মহাশূন্যে পরিভ্রমণের জন্য প্রায় ... ১৪০০০০ মাইল। ... পরিকল্পনা করিতেছে।

২৩শে নবেম্বর—আমেরিকার ... কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনের পর গত ... এক ... ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ... নীতির তীব্র নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে যে, পুঁজিবাদী দেশগুলি ... যুদ্ধের দিকে দিয়া চলিয়াছে। কিন্তু শান্তিকামীদের শক্তি এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, যুদ্ধ এড়াইবার প্রকৃত সম্ভাবনা এখন দৃষ্টিপথে পড়িতেছে।

২৪শে নবেম্বর—অধিকাংশ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের মতে প্রায় সংকটজনক যে পরিস্থিতি দ্বারা পাকিস্থানে এক মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া পড়ার আশঙ্কা ঘটিয়াছে তাহা অনুধাবনের জন্য প্রেসিডেণ্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা এক মাস বিদেশ ভ্রমণের পর আজ রাত্রিতে করাচীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

২৫শে নবেম্বর—সরকারী সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান "তাস"-এর এক খবরে আজ বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ার প্রথম উপগ্রহবাহী রকেটটি ডিসেম্বর মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে "পৃথিবীর আবহ মণ্ডলের ঘনস্তরে নিশ্চয়ই প্রবেশ করিবে এবং ধ্বংস হইয়া যাইবে।"

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা ষাণ্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল সডাক বার্ষিক ২২ টাকা ষাণ্মাসিক ১১ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট কালকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সিংহল
সমুদ্রমেখলা, বাংলার বিজয় সিংহের স্মৃতি-
বিজড়িত রত্নদ্বীপ। এ দেশের অতিবিখ্যাত ও প্রাচীন
কাণ্ডি নৃত্যের পোষাকও কম বিখ্যাত নয়। জমকালো
লুঙ্গির ওপর অনেকখানি ঘের দেওয়া জামা, গলায়
অনেক পুঁতির মালা, বুকে বিরাট গহনা।
নাচের চরিত্রের সঙ্গে পোষাকের ঢঙ
মিলেছে সোনায় সোহাগার মতো।
পৃথিবীতে কত বিচিত্র সাজপোষাক—
অন্ত নেই সেই বৈচিত্র্যের।
W.D.&H.O.WILLS
GOLD FLAKE
HONEY DEW

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

DESH 40 Naye Paisa
Saturday, 7th December, 1957.

শনিবার, ২১ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ
২৫ বর্ষ ॥ ৬ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা

রাষ্ট্রপতির বর্ষ বৃদ্ধি

গত মঙ্গলবারে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তিয়াত্তর বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার সুখ-শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি। তিনি নিরলস ভাবে দেশ-সেবা করিতে থাকুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সামান্য একজন কংগ্রেসসেবী হইতে সেবাগুণে কালক্রমে একাধিকবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন, পরে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হইবার গৌরব লাভ করিয়াছেন। ভারতের পরাধীন ও স্বাধীন দুই অবস্থাতেই তাঁহার সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ভারতের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই।

বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী

গত রবিবার হাওড়া-শেওড়াফুলির মধ্যে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী প্রথম যাতায়াত করিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল রেল পথের বৈদ্যুতিকরণ চলিতেছিল তজ্জন্য যাত্রীগণকে অনেক সময় অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছে। এখন বৈদ্যুত গাড়ীর প্রবর্তনে সেই অসুবিধা হ্রাস পাইবে আশা করা অন্যায় নয়। রেল বিভাগের কর্মীগণকে তাঁহাদের সার্থক প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। সেই সঙ্গে সরকারের কাছে আশা ও দাবী করিতেছি যে তাঁহারা যেন অচিরে বর্ধমান পর্যন্ত রেলপথে বৈদ্যুত গাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা করেন। আরও আশা করিতেছি যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা মধ্যে শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাট, বনগাঁ ও ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত যাবতীয় রেল পথ বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা করেন।
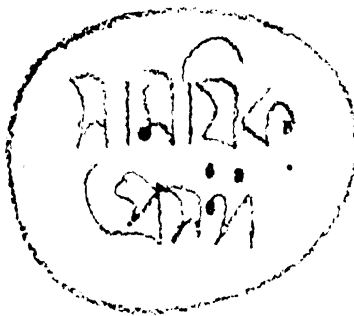
এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইলে কলিকাতায় যাতায়াতের বর্তমান দুঃসহ কষ্ট অনেকটা কমিবে ও সেই সঙ্গে কলিকাতা হইতে কিছু দূরে লোকে বাস করিতে সমর্থ হওয়ার ফলে শহরের উপরে লোক সংখ্যার দুর্নিবার চাপ অনেকটা কমিবে। রেল পথের বৈদ্যুতিকরণ প্রচেষ্টা কোন কারণে শিথিল করা চলিবে না—ইহা স্পষ্টতঃ আমরা সরকারকে জানাইয়া দিতে ইচ্ছা করি।

ছিদ্রান্বেষী রাজনীতি

ছিদ্রান্বেষী রাজনীতির পরিণাম এই যে কালক্রমে তাহার বিরুদ্ধেও ঐ অভিযোগ উত্থাপিত হয়। অপরের ছিদ্র অন্বেষণ করাই যাহার একমাত্র কাজ, নিশ্চয় ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে অপরেও তাহার ছিদ্রান্বেষণ ছাড়া আর কিছু করিবে না। ফলে, ছিদ্রান্বেষণ বৃত্তি একটি পাপচক্রে পরিণত হইয়া দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে কলুষিত করিতে থাকে। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি দেশের শ্রেষ্ঠ ছিদ্রান্বেষী রাজনৈতিক দল। ইহাদের কীর্তি অপকীর্তির হিসাব অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে জমার দিকে শূন্য খরচের দিকে অঙ্কপাতের অন্ত নাই। এই ভাবেই ইঁহারা আসর জমাইয়া আসিতেছেন, আর দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে যথেচ্ছ গালাগালি দিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু কেরল রাজ্যে তাঁহারা সরকার গঠন করিবামাত্র তাঁহাদের প্রতিকূলে চাকা ঘুরিয়াছে। আর এতদিন তাঁহারা যে-ভাবে অন্যান্য দল-গুলিকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সেই শিক্ষিত বিদ্যা একারে কম্যুনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কম্যুনিস্ট সরকার কেরল রাজ্যে যদি কিছু ভাল করিয়াও থাকেন (এ পর্যন্ত কিছু করিয়াছেন বলিয়া জানি না) কেহ তাহার উল্লেখ করিবে না, ছিদ্রগুলিরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিবে। আর ছিদ্রও একটি আধটি নয়—কম্যুনিস্ট শাসন একটি ঝাঁঝরা বিশেষ—পার্টি যে কিরূপে ইহাতে জল বহন করেন সত্যই তাহা বিস্ময়কর।

সম্প্রতি প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ভারত ব্যাপী "কেরল উৎপীড়ন বিরোধ দিবস" উদ্‌যাপন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক সভায় কেরল সরকারের বিরুদ্ধে স্বদল পোষণ, বিরোধী দল পীড়ন, ধনিক তোষণ, একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ভূমিকা সংরচন, বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন এবং মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়াইয়া তলে তলে সরকারী শক্তি ও অর্থে গণতন্ত্র ধ্বংসের চেষ্টা প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ আনীত হইয়াছে। আজ আর একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে অভিযোগগুলির মধ্যে অনেক-গুলিই সর্বজনবিদিত। কেরল রাজ্যের সরকারবিরোধী দলসমূহ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন কেবল কেরল রাজ্যের ভবিষ্যৎ স্মরণ করিয়া নয়—ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ স্মরণ করিয়া। অন্য রাজনৈতিক দল হইলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতাম কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন করিয়া লাভ নাই।

"ব্রণমিচ্ছন্তি মক্ষিকাঃ"। মক্ষিকা দূর করা সম্ভব নয়—বরঞ্চ ব্রণ দূর করিবার চেস্টা করাই কর্তব্য। ব্রণ না থাকিলে মক্ষিকা না থাকিবার সম্ভাবনা। মোটের উপরে কথা এই যে রাজনীতিক ছিদ্রান্বেষণ মনোবৃত্তির স্তর হইতে উর্ধ্বে তুলিতে হইবে।

কমনওয়েলথ বা সর্বস্বত্ব সংস্থা

দিল্লীতে কমনওয়েলথ্ সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়—ইহাই এশিয়াতে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশন। এই সভাতে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ও প্রধানমন্ত্রী নেহরু বক্তৃতা করিয়াছেন। কমনওয়েলথ্ স্টেট্স বা সমস্বত্ব রাষ্ট্রের এই সংস্থা সত্যই বিস্ময়কর এক বস্তু। রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন যে ইহার বন্ধন রেশমী বন্ধন অর্থাৎ ইহার মধ্যে বাধ্যবাধকতা নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে এযুগের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা হইতেছে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান অধিকার হইতে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রক্ষা। তাঁহার মতে রাষ্ট্র যদি সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিয়া ব্যক্তিকে গ্রাস করে তবে গণতন্ত্রের সমাপ্তি রচিত হইবে। অন্যপক্ষে অতি স্ফীত ব্যক্তিত্বও এযুগে অচল। এখন এ দুয়ের মধ্যে কিভাবে যুগোচিত সমন্বয় সাধন করা যায়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে সার্থক ভারসাম্য স্থাপন করা যায় গণতন্ত্রকে সেই উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে। কমনওয়েলথ্ বা সমস্বত্ব রাষ্ট্রগুলির এই সম্মেলন যদি সেই উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় তবে বর্তমান জগৎ বিশেষ উপকৃত হইবে। অথবা এই সমস্বত্ব সংস্থাটাই কি সেই আবিষ্কৃতির একটি প্রাথমিক লক্ষণ নয়?

শ্রীনাইকারের কর্মসূচী

দ্রাবিড় কাজাগাম নেতা শ্রীরামস্বামী নাইকার তিরুচির পল্লীতে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, সরকার যদি অচিরে তাঁহার দলীয় বন্দীদের মুক্তিদান না করেন এবং দুই তিন মাসের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা দূর না করিতে পারেন তবে তিনি প্রকাশ্যে গান্ধীজীর ছবি পোড়াইবেন এবং তাঁহার মূর্তি ভঙ্গ করিবেন। ২৬শে নবেম্বর হইতে ভারতীয় সংবিধান পুস্তক পোড়াইবার জন্যও তিনি অনুচরদের আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি আরো স্থির করিয়াছেন যে উত্তরখণ্ডের প্রভাব হইতে দাক্ষিণাত্যকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তামিলনাড়কে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবেন।

তাঁহার এই কর্মসূচী ভারতীয় জনগণ কি চক্ষে দেখিবেন শ্রীযুক্ত নাইকার নিশ্চয় তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে কেহই তাঁহার কর্মসূচীতে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবেন না—পরন্তু সকলেই নিতান্ত অনুকম্পা ও অবজ্ঞাবোধ করিবেন। আর এ বিষয়ে কাহারো সন্দেহমাত্র থাকিবে না যে তাঁহার কর্মসূচীর প্রেরণা সামাজিক নয়,—রাজনৈতিক। তাঁহার উদ্দেশ্য যখন রাজনৈতিক তখন রাজনীতির দরজা তো খোলাই আছে। সাধারণ নির্বাচনে সাফল্য লাভ করিতে তাঁহার বাধা কি? বাধা এই যে জনসাধারণের উপর তাঁহার বিশ্বাস নাই আর জনসাধারণও তাঁহাকে বিশ্বাস করে না। তাই যে কোন একটা ছুতা অবলম্বন করিয়া অশান্তি সৃষ্টি করিতে তিনি বদ্ধপরিকর। শ্রীযুক্ত নাইকার নির্বোধ নন, তিনি নিশ্চয় জানেন যে জাতিভেদ সরকার সৃষ্টি করে নাই—ইহার মূল রাজনৈতিক নয়,—সামাজিক। তাই ইহার বিলোপসাধন সর্বাংশে সরকারের উপরে নির্ভর করে না আর তাহা দু তিন মাসের মধ্যেও দূরীভূত হইবার নয়। যে ভারতীয় সংবিধান পোড়াইবার জন্য তিনি উদ্যত তাহা না পোড়াইয়া ফেলিলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে তাহাতে অস্পৃশ্যতার স্থান নাই। কিন্তু কাহাকে এ সব উপদেশ দিতেছি। জাগ্রতকে জাগানো যায় না। তিনি বেশ জানেন যে তামিলনাড়কে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তবু ঐ রকম কিছু না বলিলে বোধ করি সংবাদপত্রের শিরোনামায় স্থান পাওয়া যায় না—অতএব কাজটা যতই অসম্ভব হোক কথাটা বলিতেই হইবে। আর গান্ধীজীর ছবি পোড়ানো ও মূর্তি-ভাঙা! অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সার্থক চেষ্টা এ যুগে গান্ধীজীর চেয়ে অধিক কে করিয়াছেন। তাঁহার ঋণের এইভাবে পরিশোধ! শ্রীযুক্ত নাইকারের ভবিষ্যৎ ভারতে নাই। কিছু লোককে কিছুদিনের জন্য ধাপ্পা দেওয়ার সহজপন্থা যিনি গ্রহণ করেন তাঁহার সম্বন্ধেও মন্তব্য করিতে হয়—দুঃখ ইহাই।

পরলোকে ব্রজেন্দ্রকিশোর

ময়মনসিংহ গৌরীপুরের দানবীর ভূস্বামী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী পরিণত বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি নিজে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং শিক্ষাপ্রসারে বদান্য ছিলেন। বস্তুত শিক্ষাপ্রসারকল্পে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হস্তে তিনি প্রচুর অর্থদান করিয়াছিলেন। সে স্বদেশী আন্দোলন যুগের কথা। স্বদেশী আন্দোলনকে যাঁহারা নানাভাবে বিশেষ অর্থসাহায্যে পরিপুষ্ট করিয়াছেন শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ একজন সুসন্তান হারাইল। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সেবা ও সহযোগিতা

কানপুরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ভারত-সেবক সমাজের সর্বভারতীয় সম্মেলনে সেবা ও সহযোগিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, 'সেবা' শব্দটি এক্ষেত্রে অবাঞ্ছনীয়, 'সেবায়' উচ্চনীচ বোঝা যায়, উচ্চনীচ বোধ অনুচিত। তাঁহার মতে 'সহযোগিতা' সমানে সমানে হয়, তাই 'সেবার' বদলে 'সহযোগিতা' শব্দ ব্যবহার করা উচিত। আমরা নেহরুজীর ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। সহযোগিতা সমানে সমানে বোঝায় সত্য, কিন্তু সেবায় উচ্চনীচ বোঝায় না, অন্তত বোঝানো উচিত নয়। আমাদের দেশে যাঁহারা সেবা করেন, প্রকৃত মনোভাব লইয়া সেবা করেন, তাঁহারা সেব্য ব্যক্তিকে ঈশ্বরজ্ঞান করেন, নিজেকে বলেন সেবক। সেব্য ব্যক্তি উচ্চ, সেবক নীচ। অবশ্য ইহাতেও উচ্চনীচ আছে কিন্তু প্রভেদ মানবে ও ঈশ্বরে। তাহা দোষের নয়। আমাদের দেশের সেবাব্রতী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ইহাই মনোভাব। গান্ধীজিও এই অর্থে সেবাকে গ্রহণ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত সেবাব্রতিগণও এই অর্থে সেবা শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁহারা মনে করেন না যে, অমুকের সেবা করিয়া তাহার উপকার করিতেছেন, মনে করেন যে, তাঁহারাই উপকৃত হইতেছেন। কাজেই সেবা শব্দের ঐতিহ্যে উচ্চনীচ নাই—তবে যদি কেহ সেরূপ মনে করে তাহা শিক্ষার দোষে বা দৃষ্টির ত্রুটিতে। সেবা শব্দটি বহু ঐশ্বর্যমণ্ডিত, ভারত সেবক সমাজ উহা বর্জন করিলে দুঃখের বিষয় হইবে।

[ছাব্বিশ]

সিস্টার দিদি! কথায় কথায় হঠাৎ যার নাম করে ফেলেছে পলাস হালদার, তারই দয়া যে আলোকের মত পথ দেখিয়ে মুরলীর জীবনকে নতুন সুখের জগতে নিয়ে এসেছে। এই নামটা মনে পড়লেই নির্ভয় হয়ে যায় মুরলীর জীবনের আশা। সিস্টার দিদির নীল চোখের চাহনির সামনে দাঁড়ালেই মুরলীর কালো চোখে যেন ভরসার বিদ্যুৎ হেসে ওঠে। সাচ্চা দেবী বটে সিস্টার দিদি, ভুবনপুরের মাঙ্গথানের মাটির দেবীর মত মিথ্যা দেবী নয়। মধুকুপির দুঃখী কিষাণী মাঙ্গথানের দেবীর পায়ের কাছে ফুল আর গুড় রেখে দিয়ে কতবার ছেইলা চেয়েছিল, কিন্তু পেয়েছিল কি? পায় নাই। কাছে গিয়ে চাইলেও মাটির দেবী দয়া করতে জানে না। আর, সিস্টার দিদির কাছে চাও বা না চাও, সাচ্চা দেবীর মত নিজেই ছুটে এসে দয়া করে। যখন ইচ্ছা তখন সিস্টার দিদির হাতের ছোঁয়া কপালে বুলিয়ে নিতে পারা যায়। মুরলীর গালে টোকা দিয়ে, মুরলীর চিবুক টিপে আজই তো বার বার আদর করেছে সিস্টার দিদি— আমি তোমার দুখ মিটাতে সব সময় রেডি আছি বহিন জোহানা। যখনই দরকার হবে, আমাকে ডাকবে।

সিস্টার দিদির নাম শুনেই মুরলীর চোখ দুটো চমক দিয়ে হেসে ওঠে, আর বুকের ভিতরে মানতের মত একটা আবেদনের ভাষা নীরবে বিড়বিড় করতে থাকে — মাঙ্গথানের দেবীর কাছে কিষাণীরা ছেইলা চায়, কিন্তুক পায় না, আমি তুমার কাছে মানত করছি সিস্টার দিদি, আমার ছেইলা আমাকে পাওয়াই দাও। তুমি পাওয়াই দিতে পার, নিশ্চয় পার, তুমি যে সাচ্চা দেবী বট সিস্টার দিদি।

পলাস বলে—আমার কথাটা কানে গেল কি জোহানা?

হেসে ওঠে মুরলী—শুনেছি।...হাঁ... সিস্টার দিদি যা বলবেক, তা তুমি মেনে লিবে তো?

পলাস—নিশ্চয় মেনে লিব।...কিন্তুক ...।

মুরলী—কি?

পলাস—তুমি মেনে লিবে তো?

মুরলীর কালো চোখের হাসি আবার ঝিলিক দিয়ে ওঠে। —নিশ্চয়। সিস্টার দিদির বিচার না মেনে লিব তো কার বিচার মেনে লিব বল?

খুশি হয় পলাস। এবং পলাসের এত-...ের গম্ভীর ও করুণ এবং একটু বিষণ্ণ ...মুখের উপর একটা দুশ্চিন্তার ছায়া ...মেে ছিল, সেই মুখটাও হেসে ওঠে। —ঠিক বলেছো জোহানা; সিস্টার দিদির ...চার বড় ভাল বিচার বটে। হোই পাহাড়টা, ডরানি নদীটা আর হাতিয়া তারাটারও ভুল হয়, কিন্তুক আমাদিগের সিস্টার দিদির ভুল হয় না।

মুরলী খিলখিল করে হাসে—বড় ভাল কথা বলছো পলাস।

পল্সে—হ্যাঁ জোহানা; হোই পাহাড়ের পাথরও ফাটে আর ধুর হয়ে যায়, ডরানির জল ক্ষেতের ধান মারে, আর হাঁতিয়া ত্বায়াতেও কালা বাদল আনে না। কিন্তুক, সিস্টার দিদির দয়া দেখ; যার যেমনটি দুখ, তার লেগে তেমনটি দয়া। তুমাকে দাগী কিষাণের ঘরের দুখ থেকে বাঁচায়; আর আমাকে ক্ষেপী কিষাণীর জংলী সাধের মার থেকে বাঁচায়।

মুরলী—বেঁচে থাকুক সিস্টার দিদি; আমাদিগের মত পাপী-তাপীর দুখ মিটাতে আরও উমর নিয়ে, শ' বছরের বুড়া হয়ে বেঁচে থাকুক সিস্টার দিদি।

পল্সে—সে আর বলতে হবেক নাই জোহানা।...সিস্টার দিদির সাথে সাথে ঈশুল থাকে; কোন ডেভিলের সাধ্যি নাই সিস্টার দিদির গায়ে একটা ঢেলা ফেলতে পারে। শুনবে তো বলি...বাবুরবাজারে আমি নিজের চোখে দেখেছি...।

ধড়ফড় করে, একটা দুরন্ত কৌতূহলের আমোদে নড়ে-চড়ে বসে, আর দুই চোখ অপলক করে পাল্সের মুখের দিকে তাকায় মুরলী—বল পল্সে।

পল্সে—বাবুরবাজারে দেখেছিলাম, সিস্টার দিদি পথ হেঁটে চলেছে; আর, পথের পাশের কাঁটাঝাড়ের ভিতর হতে একটা গরলের শয়তান......।

মুরলী—কি?

পাল্সে—তিন হাত লম্বা একটা কালা কষাইত ফণা উঁচা করে সিস্টার দিদিকে কামড়াবার জন্য তেড়ে এল। তখনি দেখলাম জোহানা, একটা চিল এসে ছোঁ মেরে গরলের শয়তানটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

মুরলীর কালো চোখের বিস্ময় নিবিড় বিশ্বাসের আবেশে একেবারে সুস্থির হয়ে সুস্থির আলোর মত জ্বলতে থাকে।

পল্সে বলে—ভুবনপুরের মানঝিদের একটা ওঝা বাজারের ভিড়ের মধ্যে ছিপে থেকে সিস্টার দিদির পিঠের দিকে তাক করে তীর ছেড়েছিল। কিন্তুক...।

মুরলীর সুস্থির চোখের চাহনিতে যেন একটা তীর বিঁধেছে। কেঁপে ওঠে চোখ দুটো; আর্তনাদ করে মুরলী—সিস্টার দিদির গায়ে শয়তানের তীর লাগে নাই তো পল্সে?

পল্সে হাসে—না জোহানা; লাগবেক কেনে? শয়তানের মতলব কি সিস্টার দিদিকে ছুঁতে পারে?...তীরটা লেগেছিল এক বেটা মানঝির হাতে; সে বেটা মানঝি হলো ওঝারই ভাইটা।

মুরলী—মরে নাই পাপীটা?

পল্সে—কোন্ পাপীটা?

—ওঝাটা আর উয়ার ভাইটা?

পল্সে—না, মরে নাই। কিন্তুক দুটোরই কয়েদ হয়েছিল। ওঝাটার সাত বছর, আর ভাইটার তিন বছর।

মুরলীর চোখের চাহনিটা ধিকধিক করে। দাঁতে দাঁত চেপে আর নরম ঠোঁট দুটোকে শক্ত করে নিয়ে একটা ধিক্কার ছাড়ে মুরলী—মরলেই ভালো হতো।

পল্সে হাসে—হ্যাঁ, মরলে উয়াদিগের ভাল হতো। কয়েদ হবার সাজা যে কি কষ্টের সাজা, সেটা সে-ই বুঝে, যার কয়েদ হয়েছে। কয়েদের চেয়ে মরণ ভাল।

চমকে ওঠে মুরলী। হঠাৎ একটা যন্ত্রণার তীর যেন বুকের ভিতরে গিয়ে বিঁধেছে। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে, আর বার বার হাঁপ ছেড়ে যেন মনটাকে একটা মিথ্যা স্মৃতির মিথ্যা বেদনা থেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ উদাসভাবে তাকিয়েও থাকে, তারপরেই হেসে ওঠে। —তুমার কপাল

বড় ভাল, এমন সিস্টার দিদির দয়া তুমি পেয়েছো।

পল্‌সে—তুমি কি পাও নাই?

মুরলী হাসে—তুমি বেশি পেয়েছ।

পল্‌সে—কেনে? আমার তো মনে লেয়: তুমি বেশি পেয়েছ।

মুরলীর ঠোঁট দুটো হঠাৎ শিউরে ওঠে, যেন একটা লাজুক কৌতূহলের পিপাসা চাপতে চেষ্টা করছে।

পল্‌সে—কি বটে জোহানা?

মুরলী মুখ ফিরিয়ে বলে—আমার কাছে এসে বসো, তবে বলবো।

উঠে এসে, মুরলীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে, মুরলীর লজ্জামন্থর শরীরটাকে তুলে নিয়ে একটা চারপায়ার উপর বসিয়ে দেয় পল্‌সে; এবং নিজেও মুরলীর গা ঘেঁষে বসে।

মুরলী বলে—মেরিয়া একটা কথা বলেছিল।

—কি?

—তুমি আমাকে বেশি বাস না আমি তুমাকে বেশি বাসি?

—এ কথা কেনে শুধাও জোহানা?

—বুঝতে চাই, সিস্টার দিদি কাকে বেশি দয়া করলেন?

পল্‌সে—আমি বুঝেছি, আমি তুমাকে বেশি পিয়ার করি।

মুরলী—আমি বুঝেছি, আমি।

পল্‌সে কৃতার্থভাবে হাসে—ই তো ভাল ঝগড়া বটে।

পল্‌সের গলা জড়িয়ে ধরে মুরলী। বিচার হয়ে যাক না কেনে?

—জোহানা? ডাকতে গিয়ে পল্‌সের গলার স্বরে যেন মায়াভিভূত পিয়াস ছল-ছল করে।

—চুপ কর পল্‌সে। বলতে গিয়ে পল্‌সের গলার রামধনু রঙের রুমালের উপর মুরলীর খোঁপাটা ঘষা খায় আর ভেঙে পড়ে।

পল্‌সে বলে—তুমি এখনও কিছু খাও নাই জোহানা। আগে খেয়ে লাও।

মুরলী—না।

পল্‌সে—আমার কথা শুন জোহানা।...... হোই দেখ, কত খাবার জমা হয়ে রয়েছে।

ঘরের দেয়ালে কাঠের তাকের উপর নানারকমের খাবার, তার নানারকমের রূপ আর রং। নানারকমের বাসন; কাল পাথর, সাদা মাটি আর কাঁসা-পিতলের বাসন। মুরলীর চোখে সবই যে নতুন লাগে। মুরলীর জীবনের জন্য যে এক নতুন গেরস্থালির বিচিত্র স্বাদ, তার উপহার তাকের উপরে সাজানো রয়েছে। ক্ষণিকের মত চঞ্চল হয়ে ওঠে মুরলীর চোখের দৃষ্টি।

পল্‌সে বলে—হোই দেখ, উটা হলো কেক, যেটা সিস্টার দিদি দিয়েছেন। আর, চিনা-মুর্গীর লাল [illegible] কবুতরের তরকারি, আমি নিজের হাতে রেঁধেছি জোহানা। আর্থার বাবুর বউ থালা ভরে পেঁড়া দিয়ে গেল। আর, হোই দেখ, চারটা পাউরুটি এনে রেখেছি।

—আমি এতটা ভাবি নাই পল্‌সে! বলতে বলতে পল্‌সের বুকের কাছ থেকে একটু আলগা হয়ে আর ঘরের চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে থাকে মুরলী। কি সুন্দর ঘর! ওদিকে চৌকির উপর পাতা বিছানা। বিছানার উপর পাশাপাশি একজোড়া বালিশ। দেয়াল ঘেঁষে কাঠের একটা আলনা, তার উপরে পল্‌সের জামা-কাপড় সাজানো। এক কোণে একটা লোহার উনান, আর পাশে ঝুড়ির মধ্যে থাদের কয়লা। দেয়ালের গায়ে পল্‌সের বন্দুক আর টোটার মালা। ঝকঝক আর তকতক করছে মুরলীর নতুন জীবনের সুখের ঘর।

—ই ঘর আমার ঘর পল্‌সে। —চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—হাঁ, জোহানা। হাসতে থাকে পল্‌সে। পল্‌সের মাথায় হাত বুলিয়ে আস্তে

আস্তে ফিসফিস করে মুরলী। —ই পলুস আমার পলুস বটে।

পলুস—হাঁ।

মুরলী—এইসো।

পলুস—আগে খেয়ে নিবে না জোছানা?

মুরলী রাগ করে ফুঁপিয়ে ওঠে। —না। যাকে ছুঁতে গিয়ে দুই দুইবার দুখ পেলে, তার উপর তুমার এখনও রাগ হয় না কেন?

পলুস—জোছানা।

মুরলী—না, আগে এইসো। আগে আমাকে বুকে নিতে দাও [illegible] [illegible] মরদের ঘর বটে।

আবার কি একটা হোঁচট খেয়েছে মুরলীর জীবনের আশা? তা না হলে, এত রাত হয়ে যাবার পরেও বিছানা থেকে উঠে বসতে আর উৎসবের খাবারগুলি খেতে চায় না কেন মুরলী?

যেন ঐসব বাহারদার খাবারের কোন স্বাদ নেই। এই ঘরের বাতাসেও কোন স্বাদ নেই। এবং এই বিছানাটারও কোন স্বাদ নেই। বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে মুরলীর অতৃপ্ত শরীরটার রক্ত।

এই নতুন সুখের ঘরে এসে মুরলীর আশার প্রাণ যে বিহ্বলতা নিয়ে বুকের উপর পলুসের পিয়াস বরণ করেছে, সেই বিহ্বলতাই হঠাৎ হতাশ হয়ে গিয়েছে। পলুসের পিয়াস যেন একটা অসার দৌরাত্ম্য, মুরলীর উল্লাসের নিশ্বাসকে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছে। শুধু দম বন্ধ করে যেন একটা উপদ্রবের লোলুপতা ঢোঁক গিলে কোন মতে সহ্য করেছে মুরলী; তারপরেই, পলুসের ক্লান্ত ও তৃপ্ত শরীরের অলস স্পর্শটাকে একটু কঠোরভাবেই এক হাতের ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে মুরলী—ভাল সুখের ঘর বটে! ভাল মরদের ঘর বটে।

—কি হলো জোছানা?

—কিছু না।

বারবার অনুরোধ করে পলুস—এবার উঠে বসো জোছানা।

মুরলী—না।

পলুস—কেনে?

মুরলী—উ খাওয়া তুমি খেয়ে লাও; আমার সাধ নাই।

পলুস—ইটা কেমনতর রাগ বটে?

উত্তর দেয় না মুরলী। বিছানার এক পাশে, যেন পলুস হালদারেরই ছোঁয়া থেকে গতর বাঁচিয়ে চুপ করে গুটিয়ে পাকিয়ে একটা [illegible] প্রাণের [illegible] মত পড়ে থাকে।

আশ্চর্য হয়, ব্যথিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত মনে মনে একটু উত্তপ্তও হয়ে ওঠে পলুস। —তুমি যদি না খাও, তবে আমি একাই খেয়ে লিব জোছানা।

মুরলী—হাঁ, একা খাবে না কেনে? একা খেতেই জান। তুমি তো আর মধুকুপির কিষাণ।

পলুস ভ্রূকুটি করে—কি বললে জোছানা?

ঘরের অন্ধকারে পলুসের ভ্রূকুটি মুরলীর চোখে পড়ে না। উত্তর দেয় না মুরলী।

পলুস—আমার কথাটা কানে যায় নাই কি?

মুরলী—কি কথা?

পলুস—আমার কথা লয়, তুমি এখনই যে কথাটা বললে।

মুরলী—মধুকুপির কিষাণরা একা খেতে জানে না; উয়ারা গাঁওয়ার বটে।

আলো জ্বালে পলুস হারিকেনের। খাবারও খায়। সবই বুঝতে পারে মুরলী। কিন্তু মুরলীর সারা অন্তরাত্মা যেন একটা দুঃসহ বিস্বাদের ভারে ক্লিষ্ট হয়ে নতুন ঘরের বিছানার এক পাশে পড়ে থাকে।

আবার কখন ঘর আঁধার হয়ে গিয়েছে, জানে না মুরলী। ঘুম ভাঙ্গে যখন, তখন মুরলীর গায়ের উপরে ঘুমন্ত পলুসের অলস একটা হাতের ভার ঘুমন্ত আদরের মত পড়ে ছিল। কিন্তু চমকে ওঠে মুরলী—কে? কে? তুমি কে বটে গো?

মুরলীর ভাঙ্গা ঘুমের বিস্ময় হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে পলুসের হাতটাকে একটা ঠেলা দিয়ে নামিয়ে দেয়।

জেগে ওঠে পলুস—কি হলো জোহানা? কিসের ডর?

মুরলী—আঁ...না, ডর নাই, কিন্তুক তুমি এখানে কেনে?

পলুস হাসে—আমি যে তুমাকে এখানে নিয়ে এসেছি জোহানা।

মুরলী—তুমি আমাকে ছুঁয়ো না; দয়া কর পলুস।

পলুস—তুমার যে তুমাকে আদর ছুঁতে সাধ হয়েছে জোহানা; আমার ঘরণী জোহানা; আমার জোহানা।

পলুসের নিখুঁত সমাদরের ভাষা মুরলীর কানে যেন একটা দুর্বোধ লোভের উল্লাসের মত বেজে উঠেছে। আতঙ্কে শিউরে ওঠে মুরলী। মরদ বটে পলুস, কিন্তু কেমন মরদ নি? মহুলপিয়ার কিষাণের তুলনায় বাঘমারা শিকারী যে পোকা-মরদ বটে।

—তবে তুমি কি-এমন আর কেমনতর বড় মানুষ বটে পলুস? কলঘরের বড় মিস্ত্রিটির মনুষ্যত্বকেই সন্দেহ করে মুরলীর মনের ভিতরে একটা অভিযোগ নীরবে বিড় বিড় করে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে—না, না, না। তুমার মিছা আদরের জ্বালা ভাল লাগে না পলুস।

বলতে বলতে বিছানা থেকে নেমে যায় মুরলী। পলুস বিব্রতভাবে বলে—কি হলো?

মুরলী—আমি ভুঁই-এর উপর চাটাই পেতে শুয়ে থাকি।

পলুস—তুমার মাথার কি দোষ আছে জোহানা?

মুরলী—আছে বুঝি।

পলুসের এতক্ষণের নিরেট ধীরতা এই-বার একটা আক্রোশের ধমক হয়ে ফেটে পড়ে। —কিষাণীর মত ভুঁই-এর উপর শুতে সাধ হ'ইছে বুঝি।

মুরলী—হ'ইছে বুঝি।

পলুস—কিন্তু ইটা কিষাণের ঘর লয়।

মুরলী—লয় বুঝি।

পলুস—তুমি কি আমার সাথে হাসি করছো জোহানা?

মুরলী—না পলুস। হাসি করবো কেনে?

পলুস—তবে?

মুরলী—আমাকে শুইতে দাও।

ঘরের মেঝের উপর চাটাই পাতে মুরলী। হঠাৎ ব্যাকুলভাবে এগিয়ে এসে মুরলীর হাত ধরে পলুস—আমি বুঝেছি জোহানা।

—কি?

তুমার মনে দুখ হ'ইছে।

কিসের দুখ?

যে, তুমাকে আজ কিছু দিই নাই।

কি বললে?

মুরলীর শূন্য গলায় হাত বুলিয়ে পলুসে বলে—তুমার গলাটা খালি। একটা হাঁসুলিও নাই।

মুরলী হাসে—তাথে আমার গলার কোন দুখ নাই।

পলুসে—আমি কালিই গোবিন্দপুরে বাজারে গিয়ে তুমার লেগে একটা চিজ কিনে নিয়ে আসবো।

মুরলী—কোন দরকার নাই।

পলুসে—আমি নিয়ে আসবোই। চাঁদির সুতুলির মালা, তার সাথে তিনটা সোনার মটরদানা।

মুরলী হেসে ফেলে—ফাঁসি দিবে নাকি গো?

এবং হেসে হেসেই পলুসের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এইবার কর্কশ স্বরের একটা ধমক হানে।—সরে যাও।

পলুসে—বিছানাতে আসবে না?

মুরলী—না।

রাত আরও গভীর হয় যখন, তখন ভুঁই-এর উপর ঘুমের ঘোরে অচেতন মুরলীও জানতে পারে না যে, মুরলীকে আবার বার বার ডেকে শেষে একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছে পলুসে।

কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী—উঃ, কিসের আওয়াজ পলুসে। হায় বাপ, ই কেমন আওয়াজ।

বিছানার উপর ধড়মড় করে উঠে বসে পলুসে—ডর নাই জোহনা, ইটা নদীর সোতের আওয়াজ বটে।

মুরলী—কোন্ নদী?

পলুসে—ডরানি।

আরও ভীরু হয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলীর গলার স্বর।—এখানে ডরানি আসে কেনে পলুসে?

পলুসে—এই তো, হারাণগঞ্জের জঙ্গল পার হ'ইছ্‌ কি শালের জঙ্গলটা হবেছ, আর, তার পরেই ডরানির সোত। পেঁচা হাওয়া ছাড়লেই সোতের আওয়াজ ইদিক পানে ধেয়ে আসে।

মুরলীর বুকের পাঁজর একবার শিউরে উঠেই অলস হয়ে যায়। পেঁচা হাওয়া যেন দূরের ডরানির ঠাণ্ডা সোতের ঝুরু-ঝুরু ঝরানির শব্দ তুলে নিয়ে এসে মুরলীর বুকের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে।

এই তো, ঘরের এই অন্ধকারটা যে সেই ঘরেরই অন্ধকারের মত গাঁয়ের গায়ের গন্ধে ভরে যাচ্ছে। বাঁশঝাড়ের ধড়টা কটমট ক'রে দুলছে। জামকাঠের কপাটটা কাঁপে। আখড়ার ঝুমুর থেমে এল বুঝি। এত রাতে মাদল বাজায় কোন্ কিষাণ? আর, কি আশ্চর্য...মুরলীর গা ঘেঁষে সেই তো শুয়ে আছে সেই মরদ মানুষটি। শিলের পাটার মত সেই পাথুরে ছাঁদের বুকটা।

—কি গো সরদার, মুরলীকে ছুঁতে আর সাধ হয় নাকি?

—তুর সাধ হয় কিনা বল?

—কিসের সাধ?

—আমাকে ছুঁতে।

—কি বল সরদার? তুমার মত মরদের গতর যে সোনা বটে গো সরদার। তুমি না ছুঁলে যে মুরলীর হাড়মাস মিঠা হয়ে যায় না।

—তবে বল না কেনে মুরলী?

—বলছি তো, এইসো।

জোহনা! একটা একেবারে অচেনা ও অজানা ডাক রূঢ় আওয়াজের আঘাতের মত মুরলীর তন্দ্রাতুর শরীরের উতলা সাধের উপর যেন আছড়ে পড়েছে।

ঘুম ভেঙে, ভুঁই-এর চাটাই-এর উপর ধড়মড় ক'রে উঠে বসে মুরলী।

পলুসে হাসে—সকাল হয়ে এলো জোহনা।

মুরলী—হলো তো......কিন্তুক তুমি চিঁচালে কেনে?

পলুসে—আমি গোবিন্দপুরে চললাম।

মুরলী—কেনে?

পলুসে—মনে নাই?

মুরলী—না।

পলুসে—চাঁদির সুতুলির মালা, আর তিনটা সোনার মটরদানা।

মুরলী—এখন উসব চিজ কিনো না পলুসে।

পলুসে—[illegible] জোহনা। তুমাকে হাসাতে হবেক জোহনা। তুমাকে দুখ দিবার লেগে আমি তুমারে কিছু বলি নাই।

সাইকেলটাকে ঘরের ভিতর থেকে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে যায় পলুসে হালদার। (ক্রমশ)

ডাক্তার শাস্ত্রে নাকি অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে হিমাংশুর।
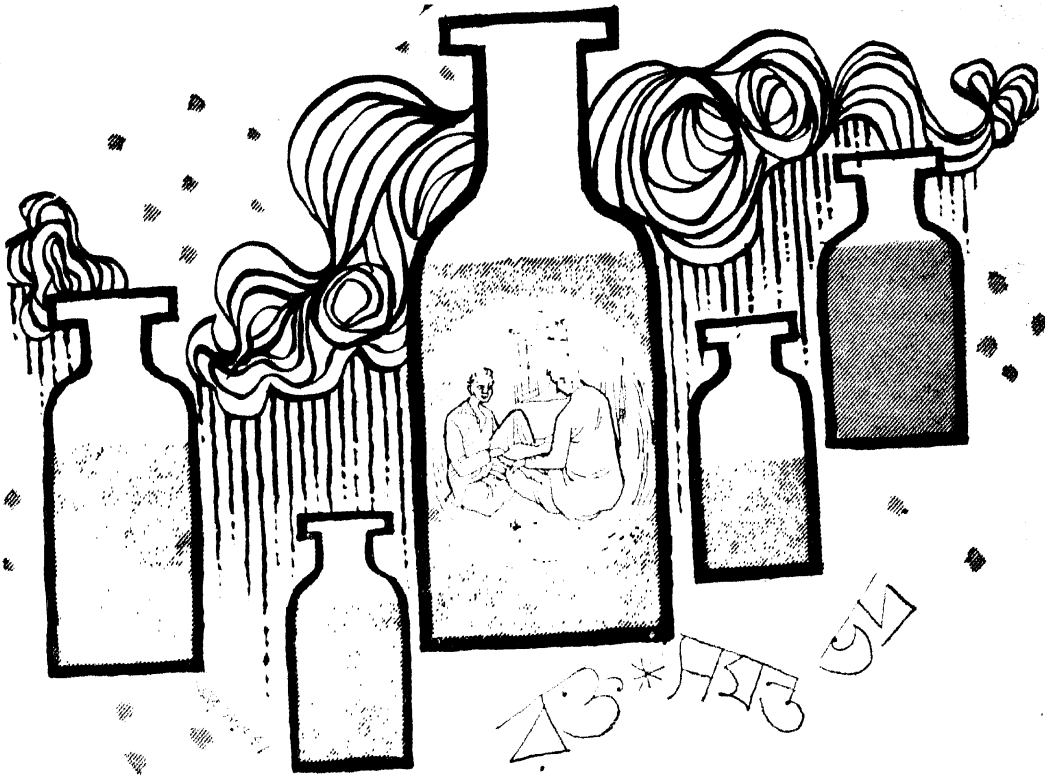
হিমাংশু ডাক্তার মানুষ। তাই কথাটা শুনে কৌতূহল হল। একটু কৌতুকও। নিজের মালকে যদি খারাপ বললে লোকে অবাক হবে বৈকি।

বললাম, 'বল কি হিমাংশু? এই তো সেদিন নিজস্ব চেম্বার করলে। আর প্যাডের কোণে 'এম-বি'-টার পাশে 'ডি-টি'-টম' জুড়েছ সেও তো বছর তিনেকের বেশি হয়নি। এর মধ্যে অরুচি ধরল কেন?'

'অরুচি নয়, বলতে পারো অভক্তি।' আমার কথাটা শুধরে দিয়ে হিমাংশু বললে, 'ডাক্তারির সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে ভেবে-ছিলাম খুব জেতা গেছে; এখন দেখছি সংসারে বেশিরভাগ জায়গায় এ-কড়ি অচল। অ্যানাটমির কাঠামোয় দুনিয়ার মানুষ আঁটে না, দুয়ে অনেক তফাৎ।'

মেসের ঘরে তক্তপোষের পাশে নড়বড়ে চেয়ারে পিঠ রেখে, কেমন নৈর্ব্যক্তিক গলায় হিমাংশু বলছিল কথাগুলো।

হিমাংশু প্রায়ই আসে আমার এখানে। সন্ধ্যার পর দিব্যি আড্ডা জমে। কোন কোন-দিন আড্ডা শেষ করে উঠতে রাত দশটাও বেজে যায়। মেসের চাকর মোড়ের দোকান থেকে মিল্ক পাউডার-মেশানো চা এনে দেয়, কোনদিন তার সঙ্গে গরম তেলেভাজা ফুলুরিও আসে। ডাক্তার হলে কি হবে, এসবে হিমাংশুর কোনদিন অরুচি দেখিনি।

আজ ওর আসতে দেরি দেখে ভাবছিলাম, বোধ হয় আসবে না হিমাংশু। সকাল থেকে আজ বাদলা চলেছে, থামবার নামটি নেই। হয়তো সেইজন্যেই। হিমাংশু আসবার আগে ভাবছিলাম, কি করি। একটা ছাতা টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়। গলি পেরিয়ে পাড়ার ক্লাব। নবকেষ্টবাবুকে ঘিরে এসময় ক্লাবের আসর জমে ওঠে। এতক্ষণে নবকেষ্টবাবু তাঁর যৌবনের প্রথম পদস্খলনের কাহিনীর থ্রিলিং জায়গাটায় পৌঁছে গিয়েছেন নিশ্চয়। কিংবা অত দূরে যাবার কি দরকার। বারান্দার ওদিকে রাস্তার ওপরের ঘরখানা অশ্বিনীবাবুর। এক্ষণি গিয়ে ডাক দেওয়া যায়, অশ্বিনীদা হবে নাকি দু'হাত? অশ্বিনীবাবুর দাবা খেলার নেশা খুব। খেলার লোক পেলে আর ছাড়তে চান না। কিংবা একেবারে কোথাও না গিয়ে, আমার তক্তপোষেই পড়ে থাকি না কেন চোখ বুজে। নিঃসঙ্গ নির্জনতাও তো উপভোগ করে মানুষ। গাঙ্গুলীবাড়ির তেতলার ঘরে অদ্ভুত শব্দ তুলে যতক্ষণ না রেডিওতে খবর বলা শুরু হবে, কেউ আসবে না আমার নির্জনতা ভাঙতে।

কি করি ভাবছি, এমন সময় হিমাংশু এল। ওর পায়ের সাড়ায় উঠে বসলাম, বললাম, 'ব্যাপার কি আজ এত দেরি যে!'

হিমাংশু এলে মনটা একটু খুশি না হয় এমন নয়। সময়টা কাটে। অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে হয় না। নবকেষ্টবাবুর গল্প বড় পুরনো হয়ে গেছে, আর অশ্বিনীবাবুর চাল সব আমার মুখস্ত।

সঙ্গের ভিজে বর্ষাতিটা দেওয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে রেখে হিমাংশু বললে, 'হাসপাতালে দেরি হয়ে গেল।' বলে চেয়ারটা টেনে নিল হিমাংশু। রুমাল বার করে চশমাটা মুছতে লাগল। আমার সিগারেটের বাক্স থেকে সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে নিল হিমাংশু। যত-ক্ষণ হাসিগল্প করে ততক্ষণ বেশ বোঝা যায় হিমাংশুকে। শুধু বোঝা যায় না এমনি এক-একদিন ও যখন ভারি ভারি তত্ত্বকথা টেনে আনে। দার্শনিকের ভারিক্কি ভাবুকতায় মুখখানা যখন গম্ভীর হয়ে ওঠে ওর। হিমাংশু তখন অন্য মানুষ।

ডাক্তারিশাস্ত্র নজর খাটো, আর একপেশে করে দেয়, এমন কথা শুনলে কে না তাজ্জব হয়!

হিমাংশুর সম্প্রতি ধারণা হয়েছে, ফিজিও-লজি নাকি দেহ দিয়ে মানুষকে আড়াল করে রাখে; আর আড়াল করে রাখাটাই তার ধর্ম।

আমি বললাম, 'কি রকম?'

হিমাংশু বলল, বাল্বের দিকে যদি খানিক-ক্ষণ তাকিয়ে থাক, একটু পরে আলোর চেতনা

আর তোমার থাকবে না। আমাদেরও হয়েছে তাই। থিয়েটারের ড্রেসার কোনদিন নাটক দেখে না, অভিনেতার সাজসজ্জায় তার চোখ আটকে থাকে। ডাক্তাররাও শরীরটাকেই শুধু দেখে, মানুষ বা তার জীবনের দিকে তাকাবার ক্ষমতা তারা বোধ হয় হারিয়ে ফেলে।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে সিগারেটের ধূম্রজাল সৃষ্টি করল হিমাংশু। তাকিয়ে রইল জানালার বাইরে মেঘলা আকাশটার দিকে। দূরে ক্যাথলিক গীর্জে'র চূড়োটা একটু দেখা যায়, বর্ষায় অস্পষ্ট অসংখ্য উঁচু বাড়িগুলোর মাথার মধ্যে বোধ হয় সেটাকে খোঁজবার চেষ্টা করল খানিকক্ষণ। তারপর মুখ ফিরিয়ে বললে, 'ম্যাথুর ব্যাপারটায় এ ধারণা আমার বদ্ধমূল হল। সন্দেহটা অবশ্য আগে থেকেই ছিল।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ম্যাথু কে?'

হিমাংশু জবাব দিলে, 'হাসপাতালের পেশেণ্ট। ডাক্তার থেকে জমাদার অবধি সবাই চোদ্দ নম্বরকে চেনে। হতভাগা জ্বালিয়েছেও তেমনি। অদ্ভুত লোক।' তারপর একটু থেমে হঠাৎ মনে পড়ার মত হিমাংশু বললে, 'কিন্তু তুমি তো তাকে একবার দেখেছ। মনে পড়ছে না?'

চিনবার কথা নয়। হিমাংশুর হাসপাতালের রোগীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। কোন কৌতূহলও নেই তাদের সম্বন্ধে। কিন্তু হঠাৎ মনে হল নামটা যেন শোনা-শোনা। না, শুধু নামটাই নয়, একটা চোয়াড়ে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের চেহারা সেইসঙ্গে মনসপটে ভেসে উঠল। বছরখানেক আগে দেখেছিলাম। দেখেছিলাম ব্লাড ব্যাঙ্কে। মাত্র কিছুক্ষণের জন্য। সেই লোকটিরই নাম—ম্যাথু ক্রেইগ।

ব্লাড ব্যাঙ্কে সেদিন খুব ভিড়। এ-সময় ভিড় অমন রোজই হয়। কাক-ডাকা সকাল থেকে লোক আসতে শুরু করে। হাঙ্গামা কি কম! প্রথমে নাম-ঠিকানা লেখাও। তারপর এ-টেবিল থেকে ও-টেবিলে। সেখান থেকে আর এক জায়গায়। সূচের ডগায় কেউ একটু রক্ত নেবে, কোথাও শরীরের ওজন। ক্লিনিকাল টেস্টে উৎরোলে তবে রক্ত নেওয়া। নতুন এলে ঘাবড়ে যেতে হয়। দশটাকা মোটে দক্ষিণা, তার জন্যে এত! হিমাংশুর অবসর ছিল না একটুও। ইন্সটিটিউট হসপিটালে আসার আগে হিমাংশু ছিল ব্লাড ব্যাঙ্কে।

খুব স্পষ্ট নয়, তবু মনে পড়ছে ম্যাথুকে। সারি দিয়ে দাঁড়ানো অন্য লোকগুলোর মাথা ছাড়িয়ে, হাতখানেক উঁচুতে ছিল তার মাথা। দেহের কাঠামোটা আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য নেই। যেন কোন অস্বাভাবিক কারণে শরীরটা দড়ির মতন পাকিয়ে গেছে। গলায় ও ঘাড়ে একরাশ রক্তমুখ ঘামাচি। আর তার মাঝখান দিয়ে একটা মোটা নীল শিরা দপদপ করছে।

হিমাংশু বুঝি তাকে বাতিল করে দিয়েছিল।

লোকটা বোকা-চোখে দাঁড়িয়ে রইল—যেন হাতের মুঠো ফসকে চিড়িয়া পালিয়েছে। দৃষ্টিটা ঘোলাটে। বিড় বিড় করে আপনমনে কি যেন বলল, তারপর অনুনয়ের সুরে কি যেন বলল হিমাংশুকে।

হিমাংশু মাথা নেড়ে ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। তা হয় না। 'ডোনারের' ইচ্ছে থাকলেই রক্ত নেওয়া হবে, তার কোন মানে নেই।

কিন্তু লোকটা সে-কথায় সন্তুষ্ট নয় দেখা গেল। জায়গা ছেড়ে কিছুতে নড়বে না ম্যাথু ক্রেইগ। সে বাসভাড়া খরচ করে এসেছে, দু'ঘণ্টা সারিতে দাঁড়িয়েছে। রক্ত না নিলে, সে যাবে না।

অন্য লোকেরা হৈচৈ শুরু করল। গণ্ডগোল বেশিদূর গড়াবার আগেই জমাদার রামধন এসে ওর উল্কি আঁকা হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে গেল। সে-ও কি সোজা ব্যাপার? যেন একরোখা বুনো মোষ টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি বললাম, 'লোকটা তো ভারি অদ্ভুত!'

'হ্যাঁ অদ্ভুত।' —হিমাংশু আমার দিকে না তাকিয়ে জবাব দিয়েছিল, 'কিন্তু ওকে চেননা তুমি। এক নম্বর বজ্জাত। রক্ত দেওয়া ওর পেশায় দাঁড়িয়েছে। এই মাসেই লোকটা আরো দুবার এসেছিল।'

আশ্চর্য হয়েছিলাম। বলে কি হিমাংশু!

হিমাংশু হেসেছিল। 'এদের শরীরে একটুও ভয় আছে ভেবেছ? রেজিস্টার খুলে তারিখগুলো আঙুল দিয়ে দেখাতে দেখাতে বলেছিল, আজ নাম ভাঁড়িয়ে এসেছে, ভেবেছিল চিনতে পারব না।

মনে পড়ছে লোকটাকে। অসুস্থ আত্মীয়ার অপারেশনের ব্যাপার নিয়ে বছরখানেক আগে ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে, দৈবক্রমে যে ঘটনাটুকু চোখে পড়েছিল, এতদিন বাদে তা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। হিমাংশু স্মরণ করিয়ে না দিলে সত্যিই আর মনে পড়ত না। পুরনো আমলের অকেজো পয়সার মত স্মৃতির সিন্দুকে তলায় পড়ে আছে।

হিমাংশু বলল, 'সেই ম্যাথু নানা ঘাটে ঘা খেয়ে শেষ অবধি আবার আমারই কপালে এসে জুটলো! এমন যোগাযোগ ঘটবে তা কোনদিন ভাবিনি। ইন্সটিটিউট হসপিটাল ছাড়া মরবার আর জায়গা পেলে না হতভাগা। ওর কথা সবই শুনেছিলাম লেসলির মুখ থেকে। সে অনেক ব্যাপার'—

আমি বললাম, কাহিনীটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে বোধ হচ্ছে। গোড়া থেকেই শুরু কর।

হিমাংশু গল্প শুরু করল। বৃষ্টিটা এতক্ষণ টিপ টিপ করে পড়ছিল, এবার বেশ জোরেই শুরু হল একটা পশলা। দক্ষিণের জানালাটা দিয়ে খানিক জলের ছাট ছুটে এসে মেঝেটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল। উঠতে আর ইচ্ছে করছিল না। জানালাটা খোলাই রইল। ঘরে অস্পষ্ট অন্ধকার। হাত বাড়িয়ে আর একটা সিগারেট তুলে নিল হিমাংশু।

লেসলি টার্নার বোধ হয় ওর ছেলেবেলাকার বন্ধু। অনেককালের তো বটেই। ম্যাথুর ঘরের খবর কিছুই লেসলির অজানা নেই। তেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ম্যাথু নিশ্চয়ই আর পায়নি। লেসলিও তাই। ও যখন চৌরঙ্গীর কাছে তার টেলারিং-এর দোকানটা খোলে, ম্যাথু পাশে থেকে বরাবর কিভাবে সাহায্য করেছিল, মাঝে মাঝে এখনও লেসলি মনে করে। অন্য কেউ হলে কি ম্যাথু অতটা করত? ধারের টাকা জোগাড়ের ব্যাপারটা ধরলেই বোঝা যায়। খাওয়া নেই, ঘুম নেই—ম্যাথু ছুটোছুটি করেছে। লেসলি তখন কটা লোককেই বা চিনত যে গিয়ে হাত পাতবে। মনে মনে একটু কৃতজ্ঞতা বোধ না করে পারে না লেসলি। ম্যাথু যা করেছে তা কোনদিন পরিশোধ করবার কথা ভাবে না লেসলি। সে নিজে যা করেছে, বন্ধু হিসেবে তা কর্তব্য বলেই করেছে।

ম্যাথুর তখন অবস্থা ভাল। বড় হোটেলে কাজ করে। মাইনে ছাড়া বেশ কিছু উপরিও ছিল নিশ্চয়। যে পাড়ায় সে থাকতো, একেবারে খড়খড়ি-পড়তি লোক পাত্তা পায় না সেখানে। ওয়েস্ট রেঞ্জে বাসাভাড়া বেশ উঁচু পর্দায় বাঁধা। একতলা বটে, কিন্তু দোরের মাথায় চীনে জেস্‌-এ কাগজী ফুলের বাহার লাগানো থাকতো। সে শৌখিনতা কটা লোকের আছে? কোন পরোয়া নেই, দিব্য দিন কাটাচ্ছিল ম্যাথু। ম্যাথু আর লিজা। ভবিষ্যতের কথা ওরা ভাবেনি। ম্যাথুর হাতে বরাবরই খরচে। তার স্বামীর রোজগার থেকে দু'পয়সা বাঁচিয়ে রাখবে বুদ্ধি লিজারও হয়নি। তাছাড়া ভবিষ্যৎ কত অনিশ্চিত, মানুষের ভাগ্য কত টলমলে! সংসার ছোট। আট বছর আগে এসেছিল রব—তাদের প্রথম সন্তান। আনির বয়েস মোটে পাঁচ কি ছয়। জেনেশুনে কোন অন্যায় করো না, ভালমানুষের ক্ষতি করবার জন্যে পাপে নামিও না নিজেকে। লেসলির ধারণা ভগবানের ওপর বিশ্বাসটুকু আঁকড়ে থাকতে পারলে, অসুখ-অশান্তি আসে না। নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারে মানুষ। কিন্তু ম্যাথু পারেনি। পাপ না করুক, বিশ্বাসে ঘাটতি ছিল বুঝি।

অতবড় হোটেল—দুম করে একদিন দরজা বন্ধ করে দিলে।

আগে থেকে একেবারে আঁচ করা যায়নি, এমন নয়। কোম্পানীর অবস্থা সুবিধের নয়, এ-কানাকানির রেশ ম্যাথুর কানেও পৌঁছেছিল। দোতলা আর তেতলায়—হোটেলের বড় বড় ঘরগুলো একটানা মাসের পর মাস তালা পড়ে থাকছে আজকাল। দুপুরেও টেবিলগুলো খালি। যারা আসে, তাদের দিকে তাকাতেও যেন মায়া হত—কি জুতো আর কি টাইয়ের ছিরি! বাজার খারাপ অনেকদিন ধরেই চলেছে, তা ঠিক। কিন্তু এমন হঠাৎ—একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে হোটেল বন্ধ হয়ে যাবে কে আশংকা করেছিল? হ্যাঁ বন্ধই হয়ে গেল সেণ্ট্রাল হোটেল। ঐ কুশন আর টেবিল আর পর্দা দূর করে দিয়ে, এখানে ইন্সিওরেন্সের আপিস বসবে, তার পাশে হালফ্যাশানের মিউজিক মার্ট।

আর ম্যাথুর মত যারা হোটেলের কর্মচারী?

অন্য সবার মত ম্যাথুও আপিসে ক্যাশিয়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কোম্পানীর বিবেচনা আছে, এক মাসের মাইনে দিচ্ছে ব্যবসা 'ওয়াইণ্ড' করবার আগে। ম্যাথু কিছু বুঝতে পারছে না তখন, সব গোলমেলে ঠেকছে ম্যাথুর। গুঁফো ক্যাশিয়ার বাঁধানো মোটা খাতা সামনে ঠেলে দিলে—'নাও সই কর'। ম্যাথুর মনে হচ্ছিল লোকটার হাতের মোটা কলমটা ছিনিয়ে নিয়ে দু'টুকরো করে দেয়, আর গুঁফো ক্যাশিয়ারের নাকের ওপর ভারি চশমাটার দিকে ছুঁড়ে মারে। কিন্তু সেসব কিছুই করল না ম্যাথু: যথারীতি সই করলে, নোট কটাও নিল গুণে গুণে। কিন্তু এবার? রাস্তায় নেমে এদিক ওদিক তাকাল ম্যাথু। অসহায় বোধ করতে লাগল—এবার যাবে কোন্ দিকে? অ্যাকর্ডিয়ন হাতে সেই ভিখিরিটার মত লিণ্ডসে

স্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে তাকেও কি হাত পেতে দাঁড়াতে হবে? রব আর অ্যানির বোঝার বয়স হয়নি। ক্ষিধে পেলে ছিঁড়ে খায়। গলা ফাটিয়ে ফেলতে চায়। আর লিজা? খবর শুনে লিজার বোবা চোখ দুটো কি রকম ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাবে, কল্পনা করতে পারে ম্যাথু। সামলে নেবে নিশ্চয়, গলা সান্ত্বনায় ভিজিয়ে বলবে, 'ভেবো না ম্যাক, দিন কখনো একরকম থাকে না।' —একগাছি চুল ছিঁড়ে যেন ডোবা-মানুষকে টেনে তোলার চেষ্টা! ...ভেল! পিছিয়ে এল ম্যাথু। পিঁপড়ের সারের মত গাড়িগুলো যেন চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে চায়।

সেদিন সন্ধ্যে হতেই বাড়িওয়ালী বুড়ি এসে হাজির। মোটা শরীর টেনে টেনে আসতে কষ্টও হয়েছে। মুখের ভাঁজগুলো আরো বেড়েছে। হাঁপের টানটাও। তবু নিজে না এসে পারেনি। ভাড়ার জন্য অবশ্য নেপালী-টাকেই পাঠালে চলে, কিন্তু এমন ক্ষেত্রে নিজে না এলে চলে না।

ম্যাথু ছিল না, লিজা প্রস্তুতই ছিল, জানত মিসেস রগাবি আসবেই। খবর নিশ্চয়ই তার কানে পৌঁছেছে।

দরজার কবাট ধরে একটু সামলে নিল বাড়িওয়ালী। অসময়ে এসে পড়ার জন্যে মাপ চাইলে। সে খবরেই দুঃখিত ওদের অসুবিধে ঘটাবার জন্যে—মিসেস রগাবি তার খসা গলাটা যথাসম্ভব মোলায়েম করবার চেষ্টা করে বললে, আগে তো কিছু জানা ছিল না, হঠাৎ করে লোকেরা ওয়াল্টেয়ার ছেড়ে আসছে কেন বুঝছি নে। আর জানালে তো একেবারে টেলিগ্রাম! দুদিন আগে জানাতে কি হয়েছিল?

বেশ ঠাণ্ডাভাবেই কথাটা হজম করলে লিজা। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললে, 'অহা তা বৈ কি। আপনজন থাকতে ও'রা আবার যাবেন কোথায়। কোথায় গিয়ে উঠবেন—'

রগাবি সংশয়ভাবে তার মুখের দিকে তাকাল। লিজা অভয় দিয়ে বললে, 'এই সপ্তায়ই আমরা চলে যাব ঘর ছেড়ে। দেরি করে লাভ কি?' এসব জায়গায় থাকা কি তাদের মত লোকের পোষায়! যাদের এক পয়সা আয়ের খবর নেই!

রগাবি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল। গা জ্বলে যায় লিজার। ওই হেঁপো রোগী যখ মিসেস রগাবির হাড়হদ্দ কিছু যেন তার অজানা আছে! কুমীর একটা। ওয়াল্টেয়ার না হাতি, বুড়ির আপনজন দেশে কোথাও নেই। থাকলেই বা কি, তাদের জন্যে মাথা ঘামাতে বুড়ির বয়ে গেছে। তেমন মানুষই নয় রগাবি।

লেসলি যেখানে থাকে, তার কাছেই একটা জায়গা খালি হয়েছিল সে মাসে। সেই নোংরা আর ঘিঞ্জি পাড়ার দম আটকানো পরিবেশে ওরা উঠে এল, ওয়েস্টরেঞ্জ ছেড়ে। আয়না টেবিল ডেস আরো কি কি বিক্রী করে দিল। ভাড়া কম; আর সুবিধে এটুকু যে আগাম কিছু দিতে হয়নি।

তবু এভাবে দিন চলা মুশকিল। হাতের কটা টাকা তো ফুরিয়ে এল। ঠিক সময় বুঝে ছেলেমেয়ে দুটোর ক্ষিধেও যেন শয়তানের মত হয়েছে। প্রতিটি পয়সা ওরকম হিসেব করে কি চলতে পারে মানুষ? অত শক্ত মানুষ লিজা, তবু তার মাথার ঠিক থাকে না সময় সময়।

ম্যাথুকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। সারা-দিন ঘোরাঘুরি করে রাতের বেলা শ্রান্তিতে ভেঙে বাসায় ফেরে। কদিনেই কিরকম কুঁজো হয়ে গিয়েছে ম্যাথু। আর চোখের কোলে কিরকম বাদামি ছাপ পড়েছে—হতাশার ছাপ।

লেসলির ঘর থেকে, প্যাসেজ দিয়ে গলিতে বেরিয়ে, দুটো দরজা পার হয়েই ম্যাথুদের দরজা। যাহোক করে টিঁকে আছে, কিন্তু লেসলির অবস্থাই বা কি এমন ভাল! টেলারিং-এর দোকানের মুনাফা অনেকগুলো ভাগ হয়ে যায়। বাজারে দেনাও এখনও শোধ হয়নি। যাহোক করে চলছে, এই যা। বসে বসে ম্যাথুর কথা সেদিন ভাবছিল লেসলি। নিজে নয় টিঁকে আছে, কিন্তু ম্যাথু কি করবে এবার। চেহারার দিকে তাকাতেও কষ্ট হয় তার। কিরকম যেন হয়ে গেছে ও—সেদিন দেখা হল, কথাই বলল না ম্যাথু। অভাব-দারিদ্র্য মানুষের মনুষ্যত্ব কেড়ে নেয়। মায়েকেও। বন্ধুত্ব কি আর পবিত্র জিনিস থাকে তখন? সত্যি কষ্ট হয় ম্যাথুকে দেখলে। অ্যানিটার অসুখ চলছে। রীতিমত পরীক্ষা করিয়ে, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে, ভাল স্টোরের শিশিভরা ওষুধ না খেলে জ্বর ছাড়ে না। জন্ম থেকে ট্রপিকসে মানুষ, এ আর জানে না কে?

দরজায় ঠুক ঠুক করে শব্দ। লেসলি দোর খুলে দেখল লিজা দাঁড়িয়ে। বোধ হয় সামান্য কিছু ধারের জন্যে এসেছে। রবকে বাজারে পাঠাবে। আগেও নিয়েছে দু-এক টাকা। ম্যাথু নয়, এসেছে লিজাই।

অবস্থা কোথায় নেমেছে, লিজার পরনের জামাটার দিকে নজর করলে বোঝা যায়। ডেজির পাপড়ির মত সুন্দর আর পরিষ্কার বেশেই ওকে মানায়। আর গয়না? এক মাসে গালের হাড় বিশ্রীভাবে ঠেলে উঠেছে লিজার, বুকের সৌষ্ঠব ভেঙে পড়েছে; শরীরের মধ্যেও যেন কি এক যাতনা সে বয়ে বেড়াচ্ছে। কটা মাস আগেও লেসলি দেখেছে—সে বোধ হয় অন্য কেউ। ম্যাথুর শক্ত বাহু জড়িয়ে ধরে যে তরুণী এসপ্ল্যানেড পার হয়ে ময়দানের দিকে বেড়াতে যেত সে যেন এ লিজা নয়। ম্যাথুর শখ ছিল বাঙালী মেয়েদের মত শাড়ি আর খোঁপার। ফেরার সময় মার্কেট হয়ে আসতো সে, হাতে একগোছা ফুল। লিজা জিজ্ঞেস করতো—'ও কি ফুল, বিল?' ম্যাথু বলত, 'জান না, ওর নাম কণকচাঁপা।' সন্ধ্যায় যখন দুটিতে বেরুত, দেখা যেত লিজার খোঁপার চারদিক ঘিরে ফুলের বাহার দুলছে।......ম্যাথু ছিল দিলখোলা খুব। পয়সার ওপর মমতা নেই একবিন্দু। টানতে টানতে লেসলিকে পার্ক স্ট্রীটে পানীয়ের দোকানে তুলেছে। ফুর্তি করেছে দু'জনে। ক্রিসমাসে রঙীন কেক পাঠিয়েছে ম্যাথু। আর তার ছেলের জন্যে নাইলনের মোজা। ছুটি পেলে ম্যাথু বাড়ি থাকত না। সোজা চলে আসত লেসলির এখানে আড্ডা দিতে। আজকাল কিন্তু ম্যাথু আর আসে না। অনেক দিন আসে না। সব কিছুই অবশ্যি বদলায়; কিন্তু এ যেন অন্য রকম।

'লেসলি—' লিজা ঘরে ঢুকে দেরাজের কোণ ধরে দাঁড়াল।

লেসলি বললে, 'অ্যানি কেমন আছে? আজ সকালে বেরোবার সময় দেখে যেতে পারিনি। জ্বর কি এখনো রয়েছে?'

'ওর জন্যে ভাবনা নেই, আস্তে আস্তে কমবে। ভয় আমার বিলকে নিয়েই।'

'ম্যাথু? কি হয়েছে তার?'

'কি হয়েছে তাইতো বুঝতে পারছি না। ভাবনা সেজন্যেই।' লিজার গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা। অসহায়। এক অনিশ্চিত আশংকায় থমথমে।

লিজা একে একে সব বলল।

ম্যাথুর শরীর ভেঙে পড়েছে খুবই—শরীরের দিকে আর তাকানো যায় না। অনেকদিনই ভেঙেছে। সারাদিন বাইরে বাইরে ঘোরা, শরীরের ওপর অত্যাচারের আর কিছু বাকি ছিল না। কিন্তু শরীর যতই খারাপ হোক, তাবলে আচমকা ওরকম মাথা ঘুরে পড়ে যাবে! আজকেই ঘটেছে ব্যাপারটা। সকালে উঠেই ম্যাথু বেরিয়ে গিয়েছিল। ফেরে দুপুরবেলা। ঘরে ঢুকেই হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়েছে। শরীরে কোন অসুখ নেই, কিছু নেই। আগেকার দিনে, যখন মদ চড়িয়ে ম্যাথু বাসায় ফিরত, তখনও তার পা একটু কাঁপতে দেখেনি লিজা। কোনদিন না। বাসায় না হয়ে রাস্তায়ও তো হতে পারত। ভাবলে প্রাণ শিউরে ওঠে।

একটু বাদেই অবশ্য উঠে বসেছিল ম্যাথু। মাথায় জল-হাওয়া করবার পর।

আঘাত লেগে কপালটা ফুলে উঠেছিল ঢেলার মত। কপালে হাত বুলোতে বুলোতে খানিক জিরিয়ে নেবার পর ম্যাথু ছেলে-মেয়ে দুটোকে খুঁজছে।

রব আর অ্যানীকে খুঁজতে দেখেই লিজা বুঝতে পেরেছে। হ্যাঁ, ঠিক সেই ব্যাপার। আগেও তিন চার দিন ঠিক এই কাণ্ডই করেছে ম্যাথু। বাড়িতে ঢুকে জুতো না খুলেই হাঁক দিয়েছে, 'ওরা কোথায় গেল? রব? অ্যান?' রবকে ধমক দিয়ে বলেছে, 'কোথায় ঘুরছিস? খিদে পেয়েছে না?'

অ্যানির অসুখ। চোখ মিট-মিট করে তাকাচ্ছিল। আগেকার দিনগুলোর মতই ম্যাথুর পকেট থেকে বেরুল আঙুরের গোছা, কেক আর সেদ্ধ করা ডিম। আঙুরগুলো চাপ লেগে ফেটে ফেটে গেছে। ভেতরের পকেট চটচট করছে রসে। আগেও ঠিক এমনি করেছে ম্যাথু। লিজা ভেবে পায়নি, ওরাও কেউ বুঝতে পারেনি, কোথা থেকে ও-সব এসেছে! আঙুর আর সেদ্ধ করা ডিম ওভাবে পকেটে ঢুকিয়ে আনারই বা মানে কি!

তবু—। তবু এই সময়টা বড় ভাল লাগে ম্যাথুকে। তার চোখের দৃষ্টি শান্ত আর বড় নরম হয়ে আসে। যেন অন্য মানুষ। বর্ষা-ভেজা মাটির কোমলতার মতই সহজ এক মায়ায় যেন তৈরি। বিছানায় উঠে বসেছে অ্যানি—আঙুর ছাড়িয়ে মুখে পুরছে। সেদিকে তাকিয়ে ম্যাথুর চোখ দুটো দিয়ে যেন স্নেহ ঝরে ঝরে পড়ছে। ম্যাথু সুস্থির, কিন্তু শুধু এই সময়টার জন্যেই। লিজা তা জানে।

প্রথম প্রথম কিছু মনে হয়নি; কিন্তু ক্রমেই যেন বিশ্রী একটা সন্দেহ লিজার মনে ঘুলিয়ে উঠেছে। শুধু খাবার গুলোই নয়। লিজা জানে আরেকটু পরে, একটা দশটাকার নোট বের করে তাকে কাছে ডাকবে ম্যাথু। নিঃশব্দে এগিয়ে দেবে নোটটা। লিজাও কোন কথা বলবে না। যা বাজার! পাঁজর ঠেলে মানুষের দম বেরুতে যা সময় নেয়, দশটা টাকা তার আগেই উড়ে যায়। দানবের হাঁ-য়ে পিঁপড়ের সঞ্চয়। ম্যাথু বোঝে সবই। তবু লিজা মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। খানিকক্ষণের জন্যেও ম্যাথু খুশি থাকুক—একটা ছোট প্রচ্ছন্ন তৃপ্তি নিয়ে নাড়াচাড়া করুক।

সময় বুঝে জিজ্ঞেস করে জানতে চেয়েছে লিজা।

'কাজ-টাজ কিছু পেয়েছ? টাকা কোথায় পেলে বললে নাতো!'

প্রথম দিন লিজা ভেবেছিল, ম্যাথ্যু নিজেই সব বলবে। তাকে ডেকেই বলবে আপনা থেকে। লিজার কাছে গোপনও তার কিছু নেই। কিন্তু...অবাক লাগে লিজার। সেই প্রথম সে অনুভব করল কি যেন গোলমাল হয়েছে। ম্যাথুর মন কি তাকেও বিশ্বাস করতে চাইছে না। জিভের তলায় কি যেন আটকে রেখেছে ম্যাথ্যু। কতকগুলো কথা—কতকগুলো গোপন শব্দ।

'ধার করেছ? না রোজগার? রোজগার যদি হয় তবে তো খুবই ভাল। এত ঘোরাঘুরি—এতদিনে তবে একটা সুরাহা হ'ল।'—

ম্যাথ্যু বিরক্ত হয়েছে। 'সব কথায় তোমার থাকবার কি দরকার? ধরে নাও রোজগার।'—পুরনো গীয়ারের শব্দের মত কট কট করে উঠেছে ম্যাথুর কথাগুলো।

লিজার লেগেছিল। সে শুনতে চায় না। না বলাই যদি ম্যাথুর মতলব, তো না-ই বা বলল। তাই বলে কতকগুলো কথার ধমক ছুঁড়ে মারবার কি দরকার?

একবার বসে, একবার উঠে দাঁড়ায়। আজকাল ঐ রকম অস্থির হয়েছে ম্যাথ্যু। হয়তো দুম দুম করে গেল দরজা পর্যন্ত। আবার ফিরল। তখনও গজ গজ করছে। মেয়েমানুষগুলোকে ঐজন্যে তার সহ্য হয় না। ম্যাথ্যু চুরি করুক, কি ঠকিয়ে আনুক, তাতে ওর মাথাব্যথা কিসের!

বুকের ভেতর হাওয়া যেন শুষে নিয়েছে কেউ—লিজার দম আটকে আসে। ওকে আজকাল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না লিজা। যেন অন্য কোন কর্কশ জগতের মানুষ হয়ে উঠেছে ম্যাথ্যু। এক রুক্ষ পর্দায় মেজাজ তার বাঁধা সর্বদা! গোড়া থেকেই লিজা লক্ষ্য করছে। বিলম্বিত বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলোর মত একে একে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ম্যাথুর বিকারগুলো। সিটি হোটেলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবার দুর্ঘটনা যেন ওই একটি লোকের ভাগ্যের ওপরই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে। অভাব বুঝি মানুষের হয় না! কত মানুষ পথে দুর্দশায় খাবি খাচ্ছে!

অ্যানির অসুখ জটিল হয়ে উঠেছে। ম্যাথুর প্যান্টের লাইনিংগুলো ছিঁড়ে গেছে। পুরনো তোবড়ানো টিনের মত ভেঙে গেছে লিজার গাল আর বুকের শ্রী। মাঝরাতে বব বিছানায় উঠে বসে; খিদেয় ঘুম হয় না তার—সব সত্যি। তবু সংসারে বাস করতে গেলে জ্বালা-যাতনা সইতে হয়। দু'এক সময় মানুষ অবুঝ হয়, তা বলে ম্যাথুর মত পাল্টে যায় না মানুষ। কি যে গোঁ মগজে বাসা বেঁধেছে, সামান্য একটু বিবেচনা নেই। ঠাণ্ডাভাবে লিজার প্রস্তাবটায় কান দিতেও চায় না। বাচ্চা দুটোর জন্মের স্বীকৃতি তো লিজা দিয়েছে; তাদের বাঁচাবার দায়টা খানিক যদি সে নিতে চায়, সে কি দোষের। অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছে লিজা।

'শুনেছ, ওয়াটকিনস্‌দের বাড়ি আয়ার কাজটা খালি আছে, নোব?'

যেন সাপের মাথার মণিতে হাত পড়েছে, ম্যাথ্যু হিসিয়ে উঠেছে তার কথা শুনে—'খবরদার লিজা ওয়াটকিনস কি রকম পাজী লোক তুমি জাননা।'

'ওমা পাজী হতে যাবে কেন', লিজা প্রতিবাদ করেছেঃ 'খুব ভাল লোক ওয়াটকিনসরা। বিশেষ করে গিন্নীর কথাবার্তা কত নরম!'

'হোক নরম'—চোখে চোখ রেখে ম্যাথ্যু বলেছে, 'শোন লিজা, তোমাকে ঐ নোংরা কাজের মধ্যে যেতে আমি কোনদিন মত দেব না।'

ভাল-মন্দ সব যেন ম্যাথ্যু একাই বুঝে রেখেছে। তার আর বোঝবার কিছু নেই। ভাববার কিছু নেই! নোংরা কাজ কিসের! বুড়ি জেনী তাকে আরো দু' একটা কাজের সন্ধান দিয়েছিল। আয় মন্দ না, খাটুনিও কম। জেনীকে ফিরিয়ে দিতে এত খারাপ লেগেছে লিজার।

সব কথা লেসলিকে খুলে বলল লিজা। সে যে কি করবে ভেবে পায়নি। ভয়ে আর আতঙ্কে দিশেহারা। হাত পা যেন জমে গেছে। লেসলি ছাড়া তো আর কেউ নেই এবিপদে যার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, পরামর্শ কি সাহায্য চাইতে পারে!

আড়ষ্ট হয়ে লেসলি লিজার কথাগুলো শুনেছিল। একটা ঢোক গিলে নিস্তেজ গলায় বললে, 'কিন্তু আমায় কি করতে বল? আমার কথা কি ম্যাথ্যু শুনবে?'

কয়েক মুহূর্ত লিজা জবাব দিতে পারল না। তারপর রুদ্ধস্বরে বললে, 'কিন্তু এরকম চললে ও যে পাগল হয়ে যাবে লেসলি!'

'না না একটা কিছু করতে হবে বৈকি।' লেসলি কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল, 'কি করা যায় ভেবে দেখি। কাজ জোগাড় করতে না পারি, কোন ভাল ডাক্তারের কাছে ম্যাথুকে টেনে নিয়ে যেতে পারব। চিকিৎসা ওর দরকার।'

কয়েকটা দিন বাদেই লেসলি জেনে ফেলল ভেতরকার ব্যাপার।

সকাল করেই সেদিন বেরিয়ে পড়েছিল ম্যাথ্যু। তার আর সকাল কি। আজকাল বাইরে যাবার কি ফেরার কিছু ঠিক নেই ম্যাথুর।

রাস্তা ফাঁকা; লোক চলাচল শুরু হয়নি তেমন। রাস্তায় জল দেওয়া আরম্ভ হয়েছে কেবল। পান-বিড়ির দোকানের কোনে ফুটপাথে ঝাঁকামুটেওয়ালা পাশ ফিরে ঘুমিয়ে আছে তখনো। পাশ দিয়ে দুধের গাড়ি গেল দু'খানা, আর সাইকেল চেপে খবরের কাগজওয়ালা।

ম্যাথুর পরনে সেই পুরনো ট্রাউজার। বোতাম আর একটাও আস্ত ছিল না বলে, গোটা দুই সেপটিপিন জুড়তে হয়েছে। জুতো জোড়াও যেন খারিজ হতে পেলে বেঁচে যায়। গতকালও খুব ভুগিয়েছে, আসবার সময় ভেতরকার কাঁটা দুটো ঠুকে নিতে হ'ল।

একটু বাদে ম্যাথুর খেয়াল হল, লেসলি তার সংগে সংগে আসছে। লেসলিও কি আজকাল এত সকালে বের হয়। দোকান তো খোলে আটটায়। কারিগররা এসে

পৌঁছুতে ন'টা। খদ্দের বলতে এবেলা বড় কেউ আসে না—সব সেই সন্ধ্যেয়।

সকালের তাজা হাওয়া গায়ে লেগে মন যদি-বা একটু খুশি ছিল, লেন্সলির সাড়া পেয়ে কটু লাগল তা।

দেখা পেয়েছে কি বকবক শুরু করবে লেসলি। মুখে তালা সেঁটে এক দণ্ড থাকতে পারে না। যা হোক বিষয় একটা পেলেই হল।

'আকাশে আজ একটুও মেঘ নেই, দেখেছ? খাসা সকালটা।'—লেসলি তারিফ করে।

ম্যাথু সাড়া দিল না। সে খেয়াল না করে লেসলি বলে চলল, 'ময়দানে ঘুরে বেড়াতে এই সময়টা চমৎকার লাগে। বড় লোকেরা গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে ঘাসের ওপর ছুটোছুটি করে বেড়ায়, দেখ নি? ইয়া তাগড়া আলসেশিয়ান সঙ্গে নিয়ে আসে ব্যাটারা। মেয়েছেলে তো আনেই।'

'হুঁ।'—ম্যাথু একটা অস্পষ্ট সায় দিল মাত্র।

গলায় আফশোসের সুর তুলে লেসলি বলে, 'আমাদের কি আর সে সময় আছে না শখ আছে তা বল।'

বড় রাস্তার কাছাকাছি এসে পড়েছিল, ম্যাথু জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যাবে কদ্দুর?'

'আমি? মার্কেটের ওদিকেই যাব।' লেসলি জানাল।

'এস তবে। আমাকে বাস ধরতে হবে।' রাস্তা পার হয়ে স্টপেজে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাথু। লেসলি তখনো তার সঙ্গ ছাড়েনি। বলল, 'তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে যাই। দেরি হবে না।'

বাস প্রায় ফাঁকা। ম্যাথু উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে লেসলিও। ম্যাথু অবাক। দিব্যি পা-টা ছড়িয়ে বসল সামনের সীটে। একটুও অপ্রস্তুত হয়নি, মুখের হাসিটাও তেমনি লেগে আছে। নিজে থেকেই কৈফিয়ৎ দিলে লেসলি। নর্থে নাকি তার বন্ধু আছে, বড়বাজারের খোঁজখবর সব পায়। 'ভাবলুম একটু ঘুরে আসি।'

ম্যাথুর গা জ্বলছিল। সারা রাস্তা আর কথাও বললে না।

হাসপাতালের স্টপেজেই ম্যাথু নামল। নেমে খানিকক্ষণ দাঁড়াল। না, লেসলি নামেনি। কিছু না বলেই, ম্যাথু যে চট করে নেমে পড়েছে, সেটুকু খেয়াল হতেই কিছুটা সময় নেবে। আশ্বস্ত হয়ে পা চালাল ম্যাথু। কোথায় গিয়ে সারি দিতে হবে, কার কাছে নাম-ঠিকানা বলতে হবে, কতক্ষণ অপেক্ষার পর ডাক আসবে, সব তার জানা। সরু একটা টিউবের মুখ, তার প্রাণের রস আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যখন একটা মোটা বোতলের পেটে গিয়ে ঢোকে, কেমন একটা আশ্চর্য সিরসিরে অনুভূতি, জিভের স্বাদ মদের আস্বাদের মত, চেতনায় ছড়িয়ে যায়। এ যেন হাসপাতাল নয়, হোটেলের স্মোকিং রুমও নয়, যেন নিজের বিছানায় ম্যাথু শুয়ে রয়েছে। আপন জায়গায়। চোখের ওপর ভাসছে কয়েকটা মুখ। রব আর অ্যানি আর লিজা। রক্ত নয়, তার শিরার ভেতর থেকে চুঁইয়ে নামছে যেন দরদের ধারা।

খানিকক্ষণ শুয়ে থাকতে হয়। কিছু দামী ফুড আসে। দুধটুকু খায়। বাকিগুলো পকেটে চালান করে দেয়। কারো চোখ সে সময় পাহারা দেয় না, যে লুকিয়ে ফেলতে কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। দুধটুকু তার যথেষ্ট। উষ্ণ সুগন্ধ দুধ। মনে হয় যেন ক্ষয়টুকু এর মধ্যে পুষিয়ে গিয়েছে।

হাসপাতালের গেট দিয়ে বেরুচ্ছিল, কে তার কাঁধে হাত রাখল। যেন ভাঙা সুইচের ছোবল লেগেছে, ম্যাথু চমকে উঠল লেসলিকে দেখে। পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে খ্যা খ্যা করে হেসে উঠল লেসলি, 'বেড়ে ভায়া, পয়সা উপায়ের খাসা রাস্তা বাৎলেছ। আঁ, একেবারে রক্তবেচা টাকা!'

ম্যাথু ততক্ষণে সামলে নিয়েছে বিস্ময়টা। কড়া গলায় বললে, 'বেশ, নর্থে যাওনি?'

'শুধু নর্থে! একদম সুমেরুতে পৌঁছে গিয়েছি বল। এতবড় একটা আবিষ্কার!' লেসলি হাসতেই থাকে, 'কি খেয়াল হল এক স্টপেজ পরেই নামলাম। খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখি এই ব্যাপার! তুমি যে এতবড় জিনিয়াস কে জানত!'

ম্যাথু শক্ত হাতে লেসলির কব্জি চেপে ধরেছে, লেসলি যাতনায় চেঁচিয়ে ওঠে। 'উঃ ছেড়ে দাও, একি হচ্ছে।'

ম্যাথু ধাতব গলায় বললে, 'লেসলি, তুমি আমার বন্ধু।'

'নিশ্চয়! তাতে কি হল?'

যেন শপথ উচ্চারণ করছে, ম্যাথু বললে, 'তুমি কি চাও জন্মের মত আমাদের ছাড়া-

ছাড়ি হোক, কোনদিন আর তোমার মুখ না দেখি?'

একটু থতমত খেয়ে গেল লেসলি। 'কি আবোল তাবোল বকছ, তা হতে যাবে কেন?' তাকে ধরে বিল রাস্তার দিকে এগোবার চেষ্টা করল।

ম্যাথু তাকে থামিয়ে বললে, 'তার আগে আমায় কথা দিতে হবে। লিজাকে এসব তুমি ঘুণাক্ষরে বলতে পারবে না। না, কোন কথা নয়। ওয়াটকিনসের বাড়ির আয়া কি সালেমদের চাকরানীর কাজ লিজাকে আমি করতে দিতে পারবো না কোনদিন।'

'তার মানে এইভাবে তুমি ওদের বাঁচিয়ে রাখবে ভেবেছ? ঐভাবে সংসার টানা যায়?'

'একটা কাজ যতদিন না পাচ্ছি, বুঝলে, শুধু সেই কটা দিন। একটু মুখ বুজে থেক, প্লিজ।' কি রকম কাতর হয়ে আসে ম্যাথুর গলার স্বরঃ 'তুমি তো আমার মনের কথা টের পাও, লেসলি।'

লেসলি তাকিয়ে দেখল সিঁদুর সাপের মত ওর চোখ দুটোয় কি যেন চিকচিক করছে।

ম্যাথুর একটা সুরাহা করবার জন্যে লেসলি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিল। বেশিদিন অবশ্য ভাবতে হয়নি তাকে। মাত্র কটা দিনই ছুটোছুটি করতে হয়েছে কাজ ফেলে। খোঁজাখুঁজির ব্যাপারে তার ক্ষমতাও খুব সামান্য। ম্যাথুর থেকে কমতো বটেই। ম্যাথুর বরং চেনা-জানা অনেক। তবে দিন দিন যে রেটে উত্তপ্ত আর অধৈর্য হয়ে উঠছে ম্যাথু, তাতে ঠাণ্ডা মাথায় কিছু চেষ্টা চালানোই অসম্ভব তার পক্ষে।

বন্ধুকে বিপদে রক্ষা করতে না পারুক, গতরে সাহায্যের জন্যে যতটুকু সম্ভব এগোতে হবে বৈকি। ঈশ্বরের কাছে অপরাধের বোঝা আর ভারি করায় লাভ নেই। কিন্তু সাহায্যই বা কতটুকু করতে পারল লেসলি?

সন্ধান অবশ্য কিছু কিছু পেয়েছিলও। ইলেকট্রিক পার্টসের ছোটখাট দালালি করতে গেলে পুঁজি কিছু চাই; পোর্ট লেবারের ঠিকেদারিতেও। পুলারদের যে অফিসটা আছে এসপ্ল্যানেডে, সেখানে একটা কাজের খোঁজ পেয়েছে। আগে থেকে একটু চেনাশোনা ছিল। একজন কর্তার নাকি নিজের লোক আছে। ভেতরকার খবর। তা সত্ত্বেও ক্ষীণ একটু আশা পেয়েছিল বলেই সেদিন ম্যাথুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল লেসলি।

কিন্তু বলা হল না। গিয়ে দেখে ম্যাথু বিছানায় ছটফট করছে। সামনে গম্ভীর মুখে একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বসে। মুখটা চেনা-চেনা।

তার সাড়া পেয়ে লিজা ছুটে আসে। চোখদুটো ছলছলে।

'লেসলি, আর কত দুর্গতি আমাদের কপালে আছে?'

ম্যাথু জ্বরের ঘোরে ঘোলাটে রক্তাভ দৃষ্টি তুলে একবার তাকাল। কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

ডাক্তার ঠিক দায়িত্ব নিতে চায় না। বলে—'বুকের ব্যথাটাই হল ভয়ের। তাছাড়া গোড়ার দিকে যখন ব্যারাম অল্প ছিল, তখন চিকিৎসা হলেও কথা ছিল। ওষুধ অবশ্য দিচ্ছি একটা—'

হাসপাতালে দেওয়াই ঠিক হল—আর কোন উপায় ছিল না তাছাড়া। যা কিছু করবার লেসলিই সব করলে। ছুটোছুটি, তদ্বির। কোলে চাপিয়ে তার বন্ধুকে টেনে এনে তুললো হাসপাতালে।......

হিমাংশু বলতে লাগলঃ এখানে আসার আগেও হাসপাতালে কাজ করিনি তা নয়। করেছি। কতরকম রোগী ঘাটাঘাটি করেছি। কতরকম রোগ। রোগের যেমন জটিলতা ও বৈচিত্র্য, রোগীরও তেমনি। না, তার চেয়ে বেশি। রোগটা চিনবার পদ্ধতি আছে; কত যন্ত্রপাতিও আছে, তার জন্যে—স্টেথো বল, মাইক্রোসকোপ বল, এক্স-রে বল। কিন্তু রোগীকে চিনবার?

সেই ম্যাথু। দেখেছিলাম ব্লাড ব্যাঙ্কে; তারপর এখানে। দেখে অবাক হইনি। ডাক্তারী জীবনে এসব কতই চোখে পড়ে। স্বাস্থ্যের জৌলুস রোগ আক্রমণের পর দু দিনে ঝরে যায়, বেরিয়ে থাকে শীতের বাবলার মত চামড়া-ঢাকা কঙ্কালটা। রক্ত দিতে গিয়ে, বাতিল হয়ে ম্যাথু ব্লাড ব্যাঙ্কের সামনে দাপাদাপি করেছিল। তার সঙ্গে ঘাড়ের কাছে বেগনী রঙের শিরাটা দপদপ করছিল। আজ যেন সেই ম্যাথু হেরে গেছে মনে হয়। ঘাড়ের কাছে সেই শিরাটা জলশূন্য নালীর মত নিস্তেজ হয়ে চামড়ার নিচে লুকিয়ে পড়েছে। সামনের দিকে চুল ঝরে গেছে। খুলিটা বেরিয়ে এসেছে। যেন এক অনিবার্য পরিণতির পূর্বাভাস। দৃষ্টিতে অসুস্থতার ছাপ হলদেটে হয়ে লেগে আছে।

অন্য কোথাও কি আর জায়গা খোঁজেনি? পেলে আর এতদূর আসত না। ডেস্টিটিউট হসপিটালে এসে যারা আশ্রয় নেয়, তারা সবাই ম্যাথুর মত বড় হাসপাতাল ঘুরে এসেছে। খুশি হইনি লোকটাকে দেখে। আবার এখানেও জ্বালাতে এল! আমার দৈনন্দিন বাঁধা রুটিনের মধ্যে একটা উৎপাত ঢুকলো। উৎপাত বৈকি। হাসপাতালে ঢোকার পর থেকে ক'টা মাস কেবল আমাদের উত্যক্ত করেছে।

তবু ভাল মিস মিত্রের মত সিস্টার ওয়ার্ডে আছে। খুব কড়া লোক। আমাকে কখনো হাঙ্গামায় ফেলেনি। অভিজ্ঞতা অনেক, দূরদৃষ্টিও খুব। তার সতর্ক

চোখের পর্যবেক্ষণে এত সুশৃঙ্খল আবহাওয়া ওয়ার্ডে। এত নিয়মনিষ্ঠা। চোদ্দ নম্বর পেশেণ্ট সম্বন্ধে সিস্টার মিত্রের মতটা প্রথমদিকে মোটামুটিরকম ছিল।—'লোক ভালই, মাথায় একটু ছিট আছে, এই যা।'

জ্বরের প্রথম ধাক্কাটা ম্যাথুর কেটে গেল। কিন্তু সোজা হতে এখনও অনেক দিন। অনেক দূর অবধি রোগের ঘুণ ঢুকে গেছে তার শরীরে। ভাল হয়ে ওঠার আভাস প্রথমদিকে খানিকটা দেখা গিয়েছিল অবশ্য, কিন্তু খারাপ লক্ষণগুলো আবার দেখা দিতে লাগল একে একে।

লেসলি এসে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে—'কি রকম বুঝছেন, ওকি আর বাঁচবে?'

প্রায় প্রতিদিন আসত সে। আমায় পেলেই দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা চাই। দেখতাম দুশ্চিন্তায় লেসলির মুখ ছোট হয়ে গেছে; চোখের কোণে কালি পড়েছে। কি যেন দায় বয়ে চলেছে লেসলি, দুদিন পরে ওর শিরদাঁড়াও বেঁকে যাবে।

হাতে সময় থাকলে দু'চার কথা জিজ্ঞেস করি। ভরসা দিই। বোঝাবার চেষ্টা করি যে ডাক্তারি শাস্ত্রটা মোটেই জ্যোতিষ নয়, যে হাত গুণে বলে দেওয়া চলবে জন্মমৃত্যুর খবর।

একদিনে নয়, পুরো ইতিহাসটা একটু একটু করে ওর মুখেই আমার শোনা। আর যত শুনেছি ততই আশ্চর্য হয়েছি, ভেতরের প্রচ্ছন্ন কৌতূহল আরো বেশি ছটফট করে উঠেছে।

আর একটা জিনিস গোড়া থেকেই লক্ষ্য করছি।

রোজ বিকেলে, ভিজিটিং আওয়ার শুরু হবার আগে হাসপাতালের গেটের কাছে এসে দাঁড়ায় একটা অ্যাংলো মেয়ে। কে ও? পামগাছের তলায় ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে কিসের অপেক্ষা করে মেয়েটি? হতশ্রী চেহারা। দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। অনেকক্ষণ বাদে উসখুস করে ওঠে মেয়েটি। দেখা যায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তার দিকে ব্যস্ত পায়ে হেঁটে আসছে লেসলি। মেয়েটিও এগিয়ে যায়। দুজনে কি বলাবলি করে। তার প্রশ্নের জবাব দেবার সময় লেসলির মুখ কেমন বিব্রত বলে বোধ হয়।

সেদিন ওয়ার্ডে ঢোকবার পথে সিঁড়ির কাছে লেসলিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম কথাটা।

'ও মেয়েটি কে, মিঃ টার্নার?'

লেসলি বললে, 'জানেন না বুঝি ওই হল ম্যাথুর স্ত্রী লিজা।'

'তাই নাকি?' বড় আশ্চর্য লাগল। পাম গাছটার নিচে একবার তাকালাম। মেয়েটি কি আমাদের দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে আছে?

প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু নিজে দেখতে আসে না কেন?'

লেসলি দুঃখের হাসি হাসল। 'বড় বিশ্রী

ব্যাপার সেটা। বলতে লজ্জা হয়। কিন্তু আজ থাক, আর একদিন বলব। দেরি হলে লিজা বড় অস্থির হয়।' তাড়াতাড়ি চলে গেল লেসলি।

দু'দিন বাদে ঘটনাটা জেনেছিলাম। হাসপাতালে ভর্তি হবার পর কিছুদিন লিজা নিয়মিতই এসেছিল। কিন্তু ম্যাথুর মন বড় সন্দেহপ্রবণ। ব্যাধির সঙ্গে মনে বিকার টেনে এনেছে। শিকারী কুকুরের ঘ্রাণের মত, তার কুটিল অনুভূতি কি যেন শুঁকে শুঁকে বেড়ায়। তাই লিজা সেদিন যখন তার শিয়রে বসে মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে নানা কথা জিজ্ঞেস করছিল, তখন তার একটাও জবাব করেনি ম্যাথু। অন্যদিন সে নীরব থাকে না। বলে—আগের থেকে ভাল বোধ করছে কিনা, রাতের দিকে ব্যথাটা বাড়ে কিনা আজকাল। হাসপাতালের রান্না অখাদ্য ব্রথ নিয়ে রসিকতাও করে ম্যাথু। কিন্তু সেদিন গোড়া থেকেই মুখে যেন আগল টেনে রেখেছে ম্যাথু। তার নজর যেন জ্বলছিল। শিয়রের কাছে সেফটার দিকে তার দৃষ্টি। ম্যাথুর জন্যে কিনে আনা ফলগুলো লিজা তার উপরেই রেখেছিল। ম্যাথু দেখছিল, টকটকে লাল আপেল, সাড়ে পাঁচ টাকা সেরের আঙুর, আর অসময়ের কমলা লেবুগুলো। মার্কেট ঘুরে নিশ্চয়ই বেছে বেছে কেনা।

পরদিন লেসলি এসেছে গোড়ায়, লিজা তখনো পৌঁছোয়নি। ম্যাথু ঠিক এই সুযোগটুকুর অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখতে পেয়ে ম্যাথু একবার উঠবার চেষ্টা করে—যেন অনেক দিন পরে লেসলির সাক্ষাৎ সে পেল।

লেসলি তাকে বাধা দিয়ে খাটের নিচে থেকে টুল টেনে বসেছে, বললে, 'ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল। বুঝলে—ওরা সব সময়ই অমনি গভীর গম্ভীর ভাব দেখায়। তোমার ব্যায়রামটা যে সাদাসিধে, এটা যেন আর আমি জানতাম না। কদিন ভোগান্তি আছে আর কি—তা কষ্টের মধ্যেই তো আমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করি—স্ক্রিপচারে আছে না?'

ম্যাথু ওসব কথার ধার দিয়েও গেল না। সরাসরি জিজ্ঞেস করলে, 'লিজা বুঝি সেই জুট মিলের ম্যানেজারটার বাড়িতে ঝি হয়েছে, জান? ওয়াটকিনসের বৌয়ের জামা-কাপড় নিয়ে লন্ড্রীতে পৌঁছে দেয়?'

প্রথমটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল লেসলি। চাপতে পারেনি। বড় ভুল করেছিল সেদিন ও। এখন অনুশোচনা হয়। একটু মিথ্যা বলতে সেদিন ক্ষতি কি ছিল। চালাকি নয়, শুধু কৌশলে কথাটা এড়িয়ে যাওয়া। ম্যাথুকে অন্যরকম বোঝানো কি অসম্ভব ছিল? লিজাও তো তাকে সাবধান করে দিয়েছিল।......এখন যে রোজ তাকে মিথ্যা বলতে হচ্ছে লিজার কাছে। ম্যাথু বাঁচিবে না জেনেও লিজার কাছে ভরসার কথা বলতে হয়। উপায় কি?

ম্যাথুর কি রাগ সেদিন! ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল কমলা লেবু, ছুঁড়ে ফেলেছিল টকটকে লাল রঙের আপেল। মার্কেট ঘুরে কেনা আঙুরের গোছার জন্যে মনের মধ্যে যত্নে পোষা একটা গর্বকে সে টেনে ফেলে দিতে পারেনি।

তখনো দাঁত ঘসছে, গলা কাঁপছে ম্যাথুর। 'হারামজাদিকে বলে দিও, আমার সুমুখে যেন আর না আসে।'

সমস্ত সম্পর্ক যেন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিল ম্যাথু। যেন ক্ষেপে গিয়েছিল সে। কতকগুলো আবেগের টুকরো দিয়ে মনের গহনে সে যে আশ্রয় তৈরি করে রেখেছিল, সেদিন যেন নিজের হাতে তা চুরমার করে দিয়েছে। লেসলি তাকে বোঝাতে পারেনি, শান্ত করতে পারেনি।

ম্যাথুকে দেখে আমার আগেও সন্দেহ হয়েছে। লোকটা ঠিক স্বাভাবিক নয়, সে-কথা সিস্টার মিত্র শুধু নয়, সবাই বলাবলি করে। শুধু বোঝা যায় না, কেন কিসের ক্ষত ওর মনে রক্ত ঝরাচ্ছে।

মাঝে মাঝে অসুখ বেড়ে ওঠে। বুকের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে ম্যাথু। আমাকে দেখতে পেয়ে বলেছে, 'ডক্টর আর কতো-দিন?' 'টিক্স টাইম অ্যাট শুড কিক দ' বাকেট। মরা কি এত কঠিন?'......

কিন্তু সত্যিই মরতে ম্যাথু চায়নি। কেউ তা চায় না। তার মুখেচোখে সেরে ওঠার আগ্রহ স্পষ্ট হত ওষুধ সিরিঞ্জে ভরে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে।

ফ্যাকাশে বাহুটা সামনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ম্যাথু বলেছে, 'কি দিচ্ছেন? ওতে হবে না—পারেন তো রক্ত দিন। একেবারে ফতুর হয়ে গিয়েছি।'

শরীর নিংড়ে রক্ত দিয়েছিল বলেই কি ম্যাথুর এ অসুখ? হয়তো ওর ধারণা মিথ্যে। কিন্তু সবটাই কি মিথ্যে?

ডাক্তারি গাম্ভীর্য মুখে নিয়ে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করে ওকে শান্ত করতে পারিনি। গলার স্বর ভেঙে গেছে, কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ম্যাথু।—'নিজের এ হাল করতে গেলাম কার জন্যে? আমার মত বোকারা আগে কিছু বুঝতে পারে না। আমিও টের পাইনি—হোয়াট আই হ্যাড ইন মাই স্লীভ—ওয়াজ এ স্নেক। এ স্নেক।'

একটু যখন ভাল থাকত, আমাকে দেখলে হাসবার চেষ্টা করত ম্যাথু। বলত, 'পা-জোড়া একটু তাড়াতাড়ি শক্ত করে দিতে হবে ডক্টর। জানেন, আমার দুটো বাচ্চা আছে। এবার সুবার্বের ফ্যাক্টরিতে গিয়ে ঢুকবো ঠিক করেছি।'

লেসলি বলছিল, লিজার কথা একদিনও জানতে চায়নি। কেমন আছে কোথায় আছে, কিছু না। অবস্থা বুঝে লিজাকেও এ

ব্যবস্থা মানতে হয়েছে। নইলে ম্যাথুর অসুখ বাড়বে।

বাচ্চা দুটো? তাদের খবর প্রায়ই জিজ্ঞেস করে ম্যাথু। 'ওরা কেমন আছে? একটু নজর রেখ, গুড ফ্রেণ্ড। জান রবটার মাথা খুব সাফ—ও একদিন রবার আর মোমবাতির টুকরো দিয়ে রবীলের ট্রাক্টর বানিয়েছিল। অদ্ভুত খেলনাটা। বড় হলে নিশ্চয় পুরোদস্তুর মেকানিক হবে। আর অ্যানি'—একবার শ্বাস টেনে ম্যাথু বলেছে, 'ও হবে, যাকে বলে থরোলি ওম্যানলি এ্যাট হার্ট।'

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। ম্যাথুর বিরুদ্ধে কিছু কিছু নালিশ শুনতে হচ্ছিল। ওয়ার্ডের সবাই ওর ওপর বিরূপ। এমন কি সিস্টার মিত্রও। বিশ্রী ভাষায় যাকে-তাকে গালাগাল করে। সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ বলে আর ধরা যায় না ওকে।

একদিন শুনতে পেলাম, নার্সের হাত থেকে থার্মোমিটার ছিনিয়ে নিয়েছে চোদ্দ নম্বর পেশেণ্ট।

ধমক দিয়েছি, ভয় দেখিয়েছি ম্যাথুকে। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে ম্যাথু। আর ওকে হাসপাতালে রাখা চলে না। পাঁচজন রোগীর স্বার্থ দেখতে হয় এখানে। কারো অদ্ভুত খামখেয়াল বা বেয়াড়াপনা প্রশ্রয় দিলে চলে না। আমারও ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে গেছে। শিগ্‌গির ওকে সরিয়ে দেবার জন্যে একটা রিপোর্ট দেব ঠিক করেছিলাম।

হিমাংশু ক্ষণেকের জন্যে থামল। বললাম, তারপর?

হিমাংশু বলতে লাগল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রিপোর্ট আর পাঠাবার দরকার হয়নি, আচমকা মারা গেল ম্যাথু। এইতো আজ বিকেলে তার ডেথ সার্টিফিকেট লিখে এলাম। আশংকা আগে থেকেই ছিল—এরকম হতে পারে। শেষ মুহূর্ত অবধি যা যা করা দরকার, সবই করা হয়েছিল। হাসপাতাল ছোট, তার সাধ্যই বা কতটুকু!......

আমার তখন ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। তখনো নিজের ঘরে বসেছিলাম। ভাবছিলাম বসে বসে। এতক্ষণ বোধ হয় সবাই পৌঁছেছে এসে। লেসলি আর লিজা। বাচ্চাদুটো ছাড়াও পরিচিত কেউ কেউ নিশ্চয় এসেছে। কি জানি, হয়তো স্যামুয়েল গিন্নীও এসেছেন, শেষ বেলায় সামাজিক কর্তব্যটুকু সেরে যাবার জন্যে। হাজার হোক রক্তে স্বজাতি—পপারই হোক আর পলটিই হোক। হয়তো কফিনের ফুলের দামটা স্বেচ্ছায় উনি দেবেন।

অনেকক্ষণ কাটল। কতক্ষণ একঠায় বসেছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখি রাত হয়ে গেছে। সার্সির বাইরে পাম গাছগুলোর ভৌতিক চেহারা বৃষ্টিতে ভিজছে। অকারণ একটা বিষাদ মনটাকে ভারি করে রেখেছে। তখনো।

বাইরে এলাম।

সিস্টার মিত্র বারান্দায় টেবলে বসে ফাইল নাড়াচাড়া করছে। সামনে শেড দেওয়া আলো। টেবলের ওপর একটা টাইমপীস টিক টিক শব্দ করে চলেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা চলে গেছে?'

'অনেকক্ষণ।' সিস্টার মিত্র মাথা হেলিয়ে জবাব দিলে। তারপর কি ভেবে ঠোঁটের

কোণে মৃদু একটু হাসল। আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছি তা খেয়াল না করে অন্যরকম সুরে বলল, 'মেয়েরা সেন্টিমেণ্টাল হয় শুনি,—কিন্তু পুরুষেরাও দেখছি কম যায় না!'

'মানে?'—মিস মিত্রকে এধরনের কথা বলতে কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ে না, তাই একটু অবাক হয়েছিলাম।

মিস মিত্র সামলে নিল; সংযত হল। নতুন কোন উপলব্ধি জেগেছে বুঝি! তার সংস্কার আর তার অভিজ্ঞতার কাছে যে আগন্তুক। কোন অপ্রত্যাশিত খবর মুঠোয় পৌঁছোলে বুঝি অমনি হয় মানুষের। গাম্ভীর্যের চিরাভ্যস্ত মুখোস খসে যায়।

ব্যাপারটা অবশ্য সামান্য।

ডেড বডি তুলে নেবার সময়, লোকটার ডান হাতের মুঠো থেকে কি যেন মাটিতে খসে পড়ে। এতক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদছিল সিন্ধা,—দেখেই হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠেছে সে। যেন দশ গুণ বেড়ে গিয়েছে তার কান্না। মিস মিত্র পাশেই দাঁড়িয়েছিল, কিছুই তার চোখ এড়ায়নি।

'জিনিসটা কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'একটা ছোট্ট চুলের কাঁটা।' জবাব দিল মিস মিত্র। কয়েক মুহূর্ত অন্য দিকে তাকিয়ে রইল সে। কেমন বিমনা ভাব। তারপরেই আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ফিরে গেল ফাইলের অরণ্যে।

আমার পা-দুটোও কয়েক মুহূর্তের জন্য আটকে গিয়েছিল। যেন নিজের মধ্যে কয়েকটা সাজানো চেনা তাস ম্যাজিকের মত রঙ পাল্টে ফেলল।

হিমাংশু চুপ করল। বাইরে বৃষ্টির সাড়া থেমে গেছে এতক্ষণে। গাঙ্গুলীদের তেতলার ঘর থেকে রেডিও আওয়াজ আসছে, শুরু হয়েছে খবর বলা। সুগন্ধি ধূপের গন্ধ আসছে বারান্দার ওদিকে অশ্বিনীবাবুর ঘর থেকে।

খানিক থেমে হিমাংশু বললে, তাই ভাবছিলাম। এতদিন ডাক্তারি শাস্ত্র ঘাঁটলাম, শিখলামও অনেক। চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ অবধি দেহের গলিঘুঁজি সব চিনতে হয়েছে। অস্ত্র হাতে নিয়ে মড়া কেটে তন্ন তন্ন করে দেখেছি সব, শরীরের নাট-বল্টু, কোনটার কি কাজ জানতে বাকি নেই। শিরায় শিরায় কিভাবে রক্তকণা ছুটেছে, কিভাবে হার্টের এক অলিন্দ থেকে আর এক অলিন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, দেহের প্রতি কোষে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে—তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ মুখস্থও করেছি। কিন্তু কি জান, কোথায় যেন ফাঁক থেকে গেছে। মনে হয় কিরকম একটা জোচ্চুরি, নিজেকে নিজেই ঠকিয়েছি। মানুষের শরীরের কথা, আর তার প্রবৃত্তির কথা জানলেই মানুষটাকে তো জানা হ'ল না।

ভাষা সমস্যা

সবিনয় নিবেদন,—

৭ই অগ্রহায়ণের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্যটি অনেক দিক দিয়ে সমীচীন হলেও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। একটি বড় প্রশ্নের—যাকে এই বিষয় সংক্রান্ত মূল প্রশ্ন বলা যেতে পারে—কোনো উত্তর পেলাম না ঐ নিবন্ধে। প্রশ্নটি হোল : আমাদের জাতীয় ভাষা কী?

এর তিনটি উত্তর সম্ভব বলে মনে হয়:

(১) কোনো একটি ভারতীয় ভাষাকে ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা বলে ঘোষণা করা।

(২) চৌদ্দটি ভারতীয় (ইংরেজীকে সে তালিকাভুক্ত করলে পনেরটি) ভাষাকেই ভারতের জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার করা।

(৩) সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেওয়া যে আমাদের জাতীয় ভাষা বলে কিছু নেই। অর্থাৎ 'জাতীয় ভাষা' শব্দটি অন্যত্র অর্থবহ হলেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে তেমনি অপ্রযোজ্য—যেমন শশক সম্পর্কে বিষাণ কিংবা বন্ধ্যা সম্পর্কে সুত।

প্রথম উত্তরটি আমাদের কয়েকটি প্রধান রাজনৈতিক দলের; কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবল পৃষ্ঠপোষকতাও এর পেছনে রয়েছে। বিশেষত, হিন্দীভাষী অঞ্চলে এই উত্তরটি অত্যন্ত সোচ্চার এবং বলদৃপ্ত আকার ধারণ করেছে। স্বভাবতই, কারণ কোনো একটি ভারতীয় ভাষা যদি ভারতের জাতীয় ভাষা বলে একক সম্মান পেতে পারে তবে সে ভাষা হিন্দী। অহিন্দীভাষী অঞ্চলে কিন্তু এর বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ ক্রমেই ব্যাপক হয়ে উঠছে। কেন হয়ে উঠছে তার বিশ্লেষণ আমরা একাধিকবার করেছি। সেসব কথার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। আরো নিষ্প্রয়োজন এইজন্য যে উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যেও এ উত্তরটি অগ্রাহ্য করা হয়েছে বলে ধারণা হয়।

দ্বিতীয় উত্তরটি মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘের। তাঁদের এ সিদ্ধান্ত কিন্তু খুব অভিনব নয়। কিছুকাল পূর্বে জবাহরলাল নেহরুও এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সংবিধানপত্রে উল্লিখিত চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষাকে ভারতবর্ষের 'জাতীয় ভাষা' আখ্যা দিয়েছিলেন। সম্পাদকীয় মতে একথা যাঁরা বলেন তাঁরা "বিষয়টি তেমন তলাইয়া বিবেচনা করেন নাই", কারণ এর ফলে ভারত বহুধা-বিভক্ত হয়ে যেতে পারে, এর সূত্র ধরে প্রমাণ করা সম্ভব হবে যে "ভারতীয়গণ একটি জাতি নন, পনেরটি জাতির সমষ্টি।" অর্থাৎ সম্পাদকীয় নিবন্ধকার এক জাতি ও এক ভাষার মধ্যে অন্বয়ব্যতিরেকী ব্যাপ্তি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, এবং এই ব্যাপ্তি সূত্রটিকে অবধারিত সত্য বলে জানেন। আমরা তাঁকে সূত্রটি পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। সাধারণভাবে এর সত্যতা স্বীকার্য, কিন্তু কয়েকটি ব্যতিক্রমও সুবিদিত। ইংরেজ ও মার্কিনের ভাষা এক কিন্তু

...রা দুই জাতি। আবার সুইস্ এবং যুগোশ্লাভেরা এক জাতি কিন্তু উভয়েরই জাতীয় ভাষা তিনটি। আমাদের এই বিশাল দেশের জাতীয় ভাষাও চৌদ্দ বা পনেরটা হওয়াতে কোনো তত্ত্বগত বা তথ্যগত বাধা নেই। পনেরটা জাতীয় ভাষার সূত্র ধরে যদি ভারতের সংহতি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে এর কোনো একটি ভাষাকে গায়ের জোরে এই বহুভাষী দেশের জাতীয় ভাষা (অর্থাৎ একমাত্র জাতীয় ভাষা, The National Language) বলে চালাতে গেলে সংহতি-নাশের সম্ভাবনা আরো অনেক বেশি। মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সভারূপে আমরা বলতে চাই যে বিষয়টি তলিয়ে দেখেই তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যে সমস্যার একেবারে নির্দোষ এবং সর্বগ্রাহ্য সমাধান হতে পারে না তার সবচেয়ে কম দুষ্ট এবং অধিক গ্রাহ্য সমাধানের প্রতিই দেশবাসীর দৃষ্টি তাঁরা আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

সম্পাদকীয় মন্তব্যে কিন্তু এ সমাধানের বিপক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে। তবে কি আমরা অনুমান করতে পারি যে জাতীয় ভাষা প্রশ্নের তৃতীয় উত্তরটাই 'দেশ'-এর সম্পাদকীয় উত্তর? এমন উত্তর ইতিপূর্বে কেউ দিয়েছেন বলে আমরা অবগত নই। যদি স্পষ্ট ভাষায় এর পক্ষে 'দেশ'-এর সম্পাদকীয় সমর্থন বিঘোষিত হয় তবে আমরা এই বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত বক্তব্য জানাব। আপাতত এইটুকু বলে রাখা শ্রেষ্ঠ যে, আমাদের জাতীয় ভাষা বলে কিছু নেই একথা ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের কাছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত ঠেকবে; তার চেয়ে অনেক সহজে তাঁরা মানতে পারবেন যে আমাদের পনেরটা প্রধান ভাষাই আমাদের দেশের জাতীয় ভাষা; এবং এই স্বীকৃতিকে জাতীয় সংহতির পরিপন্থী জ্ঞান করবেন না।

অথবা কোনো চতুর্থ উত্তরের কথা যদি সম্পাদকীয় নিবন্ধকার ভেবে থাকেন তাহলে সেটা উক্ত নিবন্ধে জানান হয়নি। জানিয়ে দিলে 'দেশ'-এর পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন।

২৯-১১-৫৭

আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রভৃতি
বুদ্ধদেব বসু

আধুনিক বাংলা গান

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৬ই কার্তিক, ১৩৬৪ এর "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনাটি পড়ে প্রীত হলাম। মনে হয়, এ বিষয়ে প্রয়োজনের তুলনায় আলোচনা কম হচ্ছে। শার্ঙ্গদেবের আলোচনাটিও আরও ব্যাপক এবং কঠোর হলে ভালো হত।

বাংলা কাব্য সঙ্গীতের নিজস্ব ধারা, এমন কি রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুলের সঙ্গীত ধারাও বর্তমানের "ছয় আনা" মূল্যের 'নিলামওয়ালা'র কল্যাণে অবরুদ্ধ হতে বসেছে। বাংলা গানের এমন দুর্দিন আর আসেনি। সিনেমার সস্তা গান অবাধে বাইরে প্রচার করছে কোনো কোনো গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানী। বাধা দেবে কে? দেশের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য বাবদে ওদের শিরঃপীড়া নেই—থাকবার কথাও নয়। আসল ব্যাপার যে, সরকারী বেতার প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত উদাসীন। এ বড় দুঃখের বিষয়।

শার্ঙ্গদেব প্রসঙ্গত 'হিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগরের কথা তুলেছেন। এটা খুবই সঙ্গত কাজ। কারণ বাংলা কাব্য সঙ্গীতে তাঁর দান আদরের সামগ্রী। গীতিকার "অজয়কুমার, সুরকার হিমাংশুকুমার এবং রূপকার শচীন্দ্র দেববর্মন এই ত্রয়ী একদা বাংলা গানে ইতিহাস রচনা করেছেন। "সেন্টিমেন্টের" কথাও উঠেছে। কথাটা সর্বৈব মিথ্যে নয়। আবার এটাও মিথ্যে নয় যে, গানে "ইমোশন" বা সেন্টিমেন্ট না থেকে পারে না আর গীত বা সুরাশ্রিত [illegible] নয়। হিমাংশুকুমারের সুরে যদি তার [illegible] প্রতিফলন হয়েও থাকে তাতে গানের [illegible] কিছু ঘটেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই [illegible]। তাঁর সুরের শুধু একদিকের যে ঐশ্বর্য আছে তার উল্লেখ দরকার। [illegible] সঙ্গীতের সঙ্গে বাংলা [illegible] সঙ্গীতের সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি [illegible] পরিচয় দিয়েছেন। সুরসাগর উপাধি তাকে দেওয়া হয়েছিল ঐ জন্যেই। আজও "সুরসাগরের গান" বলতে তাঁর গানকেই বোঝায়। [illegible] উদাহরণ [illegible]। তবু কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে। [illegible]

হিমাংশু দত্তের অনুবর্তীরা [illegible] অনুসরণ করেননি। [illegible] প্রতিভার [illegible] পারেন। তাই শার্ঙ্গদেব [illegible] এই নিলামওয়ালাদের [illegible] উল্লেখ করেছেন [illegible]। বাংলা গানকে তাঁরা [illegible] দিয়েছেন। [illegible] কিন্তু [illegible] সুরের জন্য [illegible] দেখতে হল। নিজের সম্পদ নিঃশেষ [illegible] পরের দ্বারস্থ হয়। সুরের ক্ষেত্রে বাংলা কি সত্যি নিঃস্ব হয়ে পড়েছে?

শার্ঙ্গদেব বিশ্বাস করেন কি না জানিনে তবে সব দেখে শুনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং দুঃখের সঙ্গেই আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে, এখনকার সুরকারেরা হয় হিমাংশুকুমারের নামও শোনেননি আর না হয়, শুনে থাকলেও তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত নন অথবা শক্তিহীন বলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন।

আধুনিক সুরকারদের নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। তাঁদের শক্তি সম্বন্ধে আমরা এখনও আস্থা হারাইনি—হারাতে প্রস্তুতও নই। তাঁদের সৃষ্ট ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দিকে তাঁরা একবার তাকিয়ে দেখুন।

শ্রীবিভূতি গুপ্ত
কলিকাতা—৩৩

সালাজারের জেলে

সবিনয় নিবেদন,—

শ্রীযুক্ত ত্রিদিব চৌধুরী মহাশয়ের "সালাজারের জেলে উনিশ মাস" প্রবন্ধটির একবিংশতিতম অধ্যায়ে (দেশ, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪) চৌধুরী মহাশয় আই-এন-এস "ইণ্ডিয়া" ভারত নৌবাহিনীর ক্রুজারের নামোল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঐ নামে ত ভারত নৌ-বাহিনীতে কোন ক্রুজার নেই। চৌধুরী মহাশয় বোধহয় আই-এন-এস "দিল্লীর" নামোল্লেখ করতে গিয়ে ঐ ভুল করেছেন।

ইতি—অমলেন্দু চক্রবর্তী, বোম্বাই।

সুজান

সুন্দরী চিত্রাভিনেত্রী যে পাশের বাড়ির সাধারণ মেয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বদাই বিজয়িনী হবেন, এমন নিশ্চয়তা নেই। তেমনি সমালোচকদেরও কবুল করা ভালো, তাঁদেরও চোখে একদল বড়ো লেখক থাকেন আর কয়েকজন প্রিয় লেখক। কয়েক বছর আগে এই পত্রিকায়ই তরুণী ফরাসী লেখিকার প্রথম বই নিয়ে আলোচনা করেছিলাম: "স্বাগত বিষাদ" নামে একটি প্রবন্ধে। তারপর তিনি A Certain Smile নামে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস প্রকাশ করেন, সেটিও নানা দেশে প্রভূত জনপ্রিয়তা ও রসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। আমারও ভালো লেগেছিল। ফ্রাঁসোয়াস্ সাগ' আমার প্রিয় লেখিকা।

এক কোকিল দেখে বসন্তের আবির্ভাব ঘোষণা করেছিলাম বলেই আজ মোহভঙ্গের কথা না জানিয়ে উপায় নেই। কুমারী সাগ'র তৃতীয় বই Those Without Shadows (John Murray, 9/6d) পূর্বোক্ত প্রতিশ্রুতির অযথেষ্ট সমর্থন। এর সম্পূর্ণ কারণ যদি শুধুমাত্র লেখিকার প্রতিভার দৈন্য হতো, তবে তা নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। Prodigy কথাটাই আমি কিঞ্চিৎ সন্দেহের চক্ষে দেখি এবং তার পরবর্তী অপরিণতিতে দুঃখিত হলেও বিস্মিত হই না। কুমারী সাগ'র সাম্প্রতিক ব্যর্থতার অন্যান্য দু'একটা কারণ থাকা সম্ভব বলে সন্দেহ করি।

*

লেখিকার বিষয়, চরিত্র, দৃশ্যপট ও বক্তব্য আগেকার বইগুলি থেকে বিভিন্ন নয়। সেই প্যারিসের বারান্দার, সেই আশাহীন আদর্শহীন নায়ক নায়িকা যারা কিসের লাগি প্রেম চায় নিজেই জানে না, ফলে প্রেম মেলে না, শুধু সুখ চলে যায়। এদের শয়নং যত্র তত্র—এটা প্যারিসের আবাসসমস্যার পরিণাম নয়—এবং এদের উচ্ছৃঙ্খলতা উদ্দামতারিক্ত। এরা bored, এরা blase, এরা জীবনের বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোনো সার্থকতা আছে কিনা সে সম্বন্ধেই সন্দেহী। অথচ এদের শক্তি নেই, বা ইচ্ছা নেই, অর্থহীন জীবনের উপর আপন অর্থ আরোপ করবার। ঈশ্বর না থাক, কোনো সামাজিক চিত্তও এদের নেই। বার্ট্রান্ড, জোসে, আঁলে, ফ্যানি, এডুয়ার্ড, নিকোল্, শাক, জোলিয়ে—এদের কারো ছায়া নেই কেননা এদের অস্তিত্বই অসার, যেন রক্তমাংসে গড়া নয়।

কথাটাকে অন্যভাবে বলতে পারি, শুধুই রক্তমাংসে গড়া। মানুষ শুধু ওই দুই বস্তু নয় নিশ্চয়ই। কুমারী সাগ' শুধু এই দুয়ের উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আপন সৃষ্টির পরিধিই সীমিত করে দিয়েছেন। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা অংশত অবাস্তব। অবাস্তব এই অর্থে নয় যে বর্তমান প্যারিসে এমন চরিত্র নেই; স্পষ্টতই অনেক আছে; কিন্তু এদের নিয়ে একাধিক উপন্যাস লিখলে একঘেয়েমি অনিবার্য।

"I know that music," whispered Josee, "it is very beautiful."

"It is the same thing he played last year. Do you remember, we were all here and and he played that same piece? I suppose he has had no new ideas; the same applies to us, by the way."

লেখিকার নিজের সম্বন্ধেও উক্তিটি অপ্রযোজ্য নয়।

*

একমাত্র যে চরিত্রটি সম্বন্ধে নানা ত্রুটি সত্ত্বেও পরিমিত শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় সে বেয়াট্রিস। তার জীবনেও সামান্যতা ও নিষ্ঠুরতার অন্ত নেই, কিন্তু সে উচ্চাভিলাষিণী, মঞ্চে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা না করে বিশ্রাম করবে না। সে উদ্দেশ্যের বিরোধী সবকিছুকে সে বিসর্জন দেবে অবিশ্বাস্য নির্মমতার সঙ্গে, বিনা দ্বিধায় বিদায় দেবে প্রিয়তমকে। অন্যান্যের লক্ষ্যহীনতা বেয়াট্রিসে নেই বলেই চরিত্রটি সংহতি পেয়েছে, সার্থক হয়েছে।

লক্ষ্যহীনতা শুধু জীবনের বিকাশে অন্তরায় নয়। সাহিত্যসৃষ্টিতেও, এবং কুমারী সাগ'র জীবনদর্শন স্থৈর্যশূন্য বলেই হয়তো তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির পরিবেশ ও উপজীব্যও অতি সংকীর্ণ। উপন্যাসের শেষে:

"Josee", he said, "what have we been doing all this time? What is the meaning of it all?"

"We must not begin to think in that way," she said tenderly, "it will make us mad."

এ কেমন সমাপ্তি এতগুলি জীবনের? কোনো উপন্যাসের?

*

লেখিকার বয়স মাত্র বাইশ বা তেইশ। মাত্র উনিশ বছর বয়সে কুমারী সাগ' যে পরিণত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তা স্বভাবতই প্রশংসিত হয়েছিল, যদিও সাহিত্যিকের বেলায় তারুণ্যে পরিণতমনস্কতা এবং বার্ধক্যে প্রাণপ্রাচুর্যের দৃষ্টান্ত অভূতপূর্ব নয়। তবু সন্দেহ হয়, এমন কতগুলি জিনিস আছে যা উপযুক্ত বয়সের আগে জানবারই নয়। Precosity আর Maturity এক বস্তু নয়; এক অপরের প্রাপ্তিতে বাধা হতে পারে। কুমারী সাগ'কে প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়তো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে; হয়তো কয়েক বছর। একথা বলার মধ্যে কুমারী সাগ'র প্রতিভার প্রতি কটাক্ষ নেই, আছে শুধু কালের শিক্ষকতার স্বীকৃতি। উপন্যাসের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীতে—এলিজাবেথের যুগের বাধাহীন কল্পনা পেরিয়ে, রেনেশাঁস অতিক্রম করে, যুক্তির যুগে।

*

আরেকটা কথা।

জোসে বলছে, জীবনের অর্থ খুঁজো না, খুঁজলে পাগল হয়ে যেতে হবে। আশা করি, এটা উপন্যাসের একটি চরিত্রেরই উক্তি মাত্র। সন্দেহ করি, কুমারী সাগ' অন্তত আপাতত অনুরূপ দর্শনে বিশ্বাসী। এটাও কাটিয়ে উঠতে হতে পারে, নইলে বহু বছর অপেক্ষা করলেও তাঁর সৃষ্টি পঙ্গু থাকবে।

জীবনের অর্থ আছে, এমন কথা বলব না। কিন্তু অর্থ খুঁজতেই হবে। জোসেকে নয়, উত্তর আফ্রিকা থেকে তার বাবা চেক পাঠান এবং তারপর তার সমস্যা শুধু বার্ট্রান্ডকে এড়ানো বা শাককে আঁচলে বেঁধে রাখা। কিন্তু শিল্পীর নিষ্কৃতি নেই এত সহজে। তাকে জীবনের অর্থ খুঁজতেই হয় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এবং এই অন্বেষণ নিয়েই তার সৃষ্টি।

পাগল হয়ে যাবার ঝুঁকি? শিল্পী হবার অবশ্যদেয় মূল্যের প্রথমই ওটা। না দিলে তুমি সাবধানী পথিক, বৈষয়িক জীবনোপভোগী বা আর সব কিছু হতে পারো, শিল্পী হবে না—যেমন আমি নই, অতি-সাবধানী বলে।

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন—অনাবৃষ্টির ফলে যে-শস্যহানি হইয়াছে তার পরিমাণ ৩০ হইতে ৪০ লক্ষ টন পর্যন্ত। বিশ্বখুড়ো বলিলেন—"কৃত্রিম বৃষ্টি সৃষ্টির চেষ্টায় যে-অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তার পরিমাণ কত তা অবশ্য এখনো কেউ জানান নি"।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরু বলিয়াছেন যে, ডাঃ গ্রেহামের সঙ্গে অতীত প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে তিনি রাজী নহেন। —"কিন্তু যাঁরা কেঁচে গণ্ডূষ করতেই ভালোবাসেন তাঁরা যে নেহরুজীর কথায় নারাজ হবেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

"টাকায় মিছরির শিল্পের সংকট"—একটি সংবাদ শিরোনাম। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"পাকিস্থান মধ্যষষ্ঠী ব্রতে বিশ্বাস করেন না। ষেটেরা থেকে পাকশিশুকে নিমতেতো দিয়ে বড় করে তোলা হয়েছে। সুতরাং মিছরি শিল্পে সংকট অনিবার্য"।

* * *

শ্রীযুক্ত কৃপালনী লোকসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ছোটবেলায় তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন না, তবু পরীক্ষা পাশ করিতে তাঁর কোন অসুবিধা
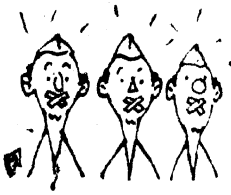
হয় নাই। ইহার কারণ বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, তিনি খুব কম লিখিতেন সেইজন্য ভুলও তাঁর কম হইত। কৃপালনিজী অতঃপর সদস্যদের পরামর্শ দিয়াছেন—তাঁরা যদি কম কথা বলেন তাহা হইলে ভুলের সংখ্যাও তাঁদের কম হইবে। বিশ্বখুড়ো ট্রামে বসিয়াই কৃপালনিজীর উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিলেন—"তিনি যদি প্রশ্ন খুব কম করেন তাহলে জবাবের জন্য সদস্যদের বেশি কথা বলতে হয় না"।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধী দলের নেতার জন্য বেতনের ব্যবস্থা করা হইতেছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। বলা হইয়াছে, এই ধরনের ব্যবস্থা নাকি ভারতে ইহাই প্রথম। শ্যামলাল বলিল—"খুবই ভালো কথা। কিন্তু ভাবছি, বেকার সমস্যা-জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গে অতঃপর বিরোধী দলের হয়ে

কাজ করার জন্য "কর্মপ্রার্থীর" বিজ্ঞাপনের সংখ্যা বেড়ে যাবে না তো"!!

* * *

দিল্লীতে সম্প্রতি মহিলাদের সঞ্চয় অভিযানের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। সংবাদে বলা হইয়াছে, সঞ্চয় অভিযানে মহিলারা নাকি চার কোটি চৌদ্দ লক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচশত সাতান্ন টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন।—"টাকার অংকটা সত্যিই বড়। কিন্তু আমরা অডিট রিপোর্ট পাইনি বলে বলতে পারছিনে এই অংকে পুরুষের সঞ্চয়ের ভাগ কতখানি"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

কলিকাতাতে সম্প্রতি যে বিশ্ব-নিরামিষাশী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গেল তাহাতে ঘোষণা করা হইয়াছে—নিরামিষ আহার শান্তি ও মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করে। বিশ্বখুড়ো বলিলেন—"যাঁদের ঘরে "গৃহমুচাতে" আছেন অর্থাৎ "ওগো" আছেন তাঁরাই এই ঘোষণার প্রতিবাদ করবেন। মীনাস্থি সংযুক্ত চচ্চড়ি না হলে বিশ্বশান্তির কী হয় জানিনে, গৃহশান্তিতে যে বিঘ্ন হয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঘরে ঘরেই আছে"!

* * *

পিকিং-এ নাকি এক শ্রেণীর মৎস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে,—এই মৎস্যটি গাছে চড়িতে পারে।—"গাছে-চড়া মাছের খোঁজ আমরা এখনো পাইনি। কিন্তু মাছের

দাম যে এখানে গাছে চড়ে আছে তা জানি এবং হাড়ে হাড়ে টের পাই। এদিক থেকে আমরা পিকিং-এর ওপর টেক্কা মেরেছি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* *

হাওড়ার উলুবেড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত পিছলদহ গ্রামের জনৈক ব্যক্তির এক কাঠা পরিমাণ জমিতে যে-ধান হইয়াছে তার প্রত্যেকটি ধানে নাকি দুইটি করিয়া চাউল বাহির হইয়াছে। বিশ্বখুড়ো বলিলেন—"গুনে গুনে হয়ত বলা যায় কত ধানে কত চাল। কিন্তু তবু বলব, এর চেয়ে জোর খবর আমরা এই ক'বছর আগেও পেয়েছি। চালের বদলে কত ধানে কত কাঁকর হয় তাই বসে বসে গুনতে গুনতে হিমসিম খেয়ে গেছি"!!

* * *

ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে শুনিলাম, সেখানে কোন একটি লোক নাকি একটি কুকুরকে কামড়াইয়া দিয়াছে। সংবাদে বলা হইয়াছে, লোকটি নাকি পাগল। শ্যামলাল একটি অসমর্থিত

সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিল—"লর্ড নর্থ-ক্লিফের মতে এটা সংবাদের মতো সংবাদ হলেও আমরা এর চেয়ে জোর খবর পেয়েছি। শুনলাম, কোন কোন বৈদেশিক শহরে "লাইকা" মনে করে কেউ কেউ নাকি পথে-ঘাটে যে-কোন কুকুরকেই কামড়ে বেড়াচ্ছে। তারা পাগল কিনা সে সংবাদ অবশ্য পাইনি"!!

* * *

আটজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক—আজ হতে শত বর্ষ পরের একটি বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—তখন দিনে এক ঘণ্টার বেশি কাহাকেও খাটিতে হইবে না। মানুষ পছন্দমত নিজের দেহ হ্রস্ব-দীর্ঘ, স্থূল-কৃশ করিতে পারিবে, স্বামী-স্ত্রীর মিলিত ইচ্ছামত পুত্র অথবা কন্যা লাভ করিতে পারিবে, রিপু-দমন বটিকা সেবন করিয়া রিপু দমন করিবে, প্রকৃতি খাদ্য জোগাইবে......আরো অনেক কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন। সেই সঙ্গে বলিয়াছেন—মনের কথা আর বলিতে হইবে না, চিন্তামাত্রই মনের বেতারে সেই নীরব চিন্তা সরব হইয়া উঠিবে। বিশ্বখুড়ো বলিলেন—"ভাগ্যিস মনের বেতার কেন্দ্র খুলবে শত বর্ষ পরে। নইলে আটজন বৈজ্ঞানিকের সম্বন্ধে আমাদের মনের কথাটা "সরব" হয়ে উঠলে কী কেলেঙ্কারীটাই না হতো"!

ভারতীয় ভাষা-সমস্যা

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ভাষা-কমিশনের সদ্যোপ্রকাশিত রিপোর্ট অহিন্দী অঞ্চলে যে সন্দেহ ও অসন্তোষ ধূমায়িত ছিল, তাকে আবার অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত করে তুলেছে। হিন্দীকে একমাত্র সরকারী ভাষার মর্যাদাদানে অন্যান্য ভাষা-ভাষীর অন্তরের সাড়া কখনই সায় দেয় নাই; একে একটা বাধ্যতামূলক সরকারী বিধানরূপে মেনে নিয়েছিল মাত্র ও সংশয়তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ঘটনার ভবিষ্যৎ পরিণতি লক্ষ্য করছিল। হয়ত তাদের মনে মনে আশা ছিল যে, এই ব্যবস্থা সত্যকার কার্যকরীরূপে নিতে অনেক সময় লাগবে। হিন্দী নিজ মর্যাদালাভে সন্তুষ্ট হয়ে অন্য ভাষার উপর আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি পরিহার করবে। হয়ত তারা ভেবেছিল যে সমস্ত ভারতে হিন্দী প্রবর্তনের বাস্তব অসুবিধা লক্ষ্য করে এর অত্যুৎসাহী সমর্থকদের উৎসাহ খানিকটা মন্দীভূত হবে। অন্তত নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা সময়ের মধ্যে এর প্রবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে তারা বিরত থাকবে। এ কয় বৎসরে হিন্দীর যে মন্থরগতিতে উন্নতি হয়েছে তাতে এই আশাকে নিতান্ত স্বপ্ন-বিলাসের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কিন্তু ভাষা কমিশনের রিপোর্ট তাদের এই আশার মূলোচ্ছেদ করেছে। এর বিপদ-সম্ভাবনা যে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পরিমাপহীন দূরত্বে পশ্চাদপসরণ করবে এই বিশ্বাস ভাষা কমিশনের জরুরী তাগিদ ও অশোভন ব্যস্ততার রূঢ় আঘাতে বিচলিত হয়েছে। যাকে দূরে ভেবেছিল তা যে অত্যন্ত কাছিয়ে এসেছে, যে মেঘ আমাদের চিন্তাকাশে লঘু, মন্থরপদে বিচরণ করছিল তা যে অকস্মাৎ ঘনীভূত বাষ্পরূপে বজ্র ও বিদ্যুতের সংযোগে মুষলধারা-বর্ষণে মাথার উপর ভেঙ্গে পড়তে প্রস্তুত হয়েছে, এই উপলব্ধি অন্তঃরুদ্ধ অসন্তোষকে বিস্ফোরক তীব্রতার সহিত বহিঃপ্রকাশে উত্তেজিত করেছে।

অবশ্য এই অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার মূল কারণ হলো কমিশন সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের এবং স্বয়ং সভাপতির মতভেদ—অসহিষ্ণু, একরোখা, উদ্ধত মনোভাব। এমন একটা গুরুতর বিষয়ে মতভেদ যে অনিবার্য এবং এই মতভেদ প্রকাশ যে অমার্জনীয় অপরাধ নয়, সভাপতি মহাশয় যেন সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন নন। তিনি শোভনতা ও ঔচিত্যবোধের সীমা লঙ্ঘন করে দুজন ভিন্নমতাবলম্বী সদস্যের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করেছেন ও দুইটি অভিমতের সমর্থনে যে যুক্তি-পরম্পরা তা নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপিত না করে আবার বিশেষভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ মতটি তীব্রভাষায় খণ্ডন করতে চেয়েছেন। এই ছাত্রের কান মলে দেওয়া গুরুমহাশয়ী মনোবৃত্তি, এই পুনশ্চ-যোজনা দ্বারা তিরস্কারের উগ্রতর ধমক দেওয়ার প্রবণতা যে গুরুতর রাজনৈতিক বিষয় আলোচনার পক্ষে অশোভন এ-খেয়াল হয়ত তাঁর ছিল না। তা ছাড়া, কমিশনের অধিকার-বহির্ভূত বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে ও জোরাল নির্দেশ দিয়ে কমিশন নিজ উগ্র পক্ষপাতিত্ব আরও বেশী মাত্রায় প্রকট করেছেন। সংবিধান অনুযায়ী হিন্দীর উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে সেই দায়িত্ব-পালনের সুষ্ঠু উপায় নির্দেশই কমিশনের কার্যক্ষেত্রের সীমা ছিল। সরকারী কার্য-পরিচালনা ও বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপারে হিন্দীকে কি করে উপযুক্ত করে তোলা যায় সেটাই তাঁদের একমাত্র বিচার্য বিষয়। এক্ষেত্রে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানে ও রাজ্য বিচারালয়গুলিতে ব্যবহারে হিন্দীকে একমাত্র বাহনরূপে নির্দেশ করে তাঁরা শুধু যে অশালীনতার পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, প্রত্যেক অহিন্দী রাজ্যে একটা আতঙ্কময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের এই সুপারিশ যে প্রকৃত-পক্ষে প্রত্যেক রাজ্য-প্রচলিত ভাষার সমাধি-রচনা করবে তাঁদের অত্যুৎসাহের জন্য তাঁরা এ সম্ভাবনার প্রতি স্পর্ধিত উপেক্ষাই দেখিয়েছেন। এঁরা যে নিজ ভাষার গৌরব-বৃদ্ধির কৃত্রিম সুবিধার জন্য অন্য সমস্ত ভাষাকে ভারতের মানচিত্র থেকে মুছে দিতেও পশ্চাৎপদ নন এই উৎকট একদেশদর্শিতা তাঁদের রিপোর্টের প্রতিছত্রে সঙ্গীণ উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

যাই হ'ক, এই রিপোর্ট-প্রকাশ সমস্ত প্রশ্নটিকে আবার নূতন করে বিবেচনা করার যে সুযোগ দিয়েছে তার জন্য আমরা রচয়িতাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাদের অনুদার মনোবৃত্তির অনুকরণ না করে আমাদের ধীরমস্তিষ্কে ও ভাল মন্দ সমস্ত সম্ভাবিত ফলের দিকে অপক্ষপাত দৃষ্টি রেখে এই ভাষা-সমস্যার মূল নীতি আলোচনা করা উচিত। প্রথম কথা হচ্ছে যে, একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার এই কৃত্রিম, একাধিপত্যমূলক মর্যাদাদানের প্রশ্ন উঠেছে কেন? এর পক্ষে দুটি যুক্তি উপস্থাপিত করা যেতে পারে—একটা প্রয়োজনগত সুবিধামূলক, আর একটা ভাবাবেগমূলক। ইংরেজী বিদেশী ভাষা, আমাদের পরাধীনতার স্মৃতিচিহ্ন ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রয়োগের অনুপযোগী—এই ত্রিবিধ যুক্তির ত্রিশূলাঘাতে একে ছিন্ন-ভিন্ন পর্যুদস্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ইংরেজী ভাষাকে আমরা যে-চক্ষে দেখি তাতে পরাধীনতার কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত নাই, আছে প্রীতি-শ্রদ্ধার উজ্জ্বল-করা মোহাঞ্জন-প্রলেপ। কোন একটি বিদেশী ভাষাকে যদি আমাদের দেশের মনীষীমণ্ডলী আপনার করে নিয়ে থাকতে পেরেছেন, এর প্রভাব যদি আমাদের মাতৃ-ভাষায় রচিত সাহিত্যের শিরায়-শিরায় রক্ত-প্রবাহ ও সৌন্দর্যসুষমা সঞ্চার করে থাকে, এখনও আদর্শ ও প্রগতিশীল চিন্তার বাহন-রূপে এ যদি আমাদের মননক্ষেত্রে একটা মর্যাদাপূর্ণ ও অতিপ্রয়োজনীয় স্থানের অধিকারী হয়, তবে অন্তত বিদেশী অপবাদ দিয়ে একে বরখাস্ত করাটা সঙ্গত হবে না। জনসাধারণের অনুপযোগী—এ-যুক্তির মধ্যে যে কিছুটা সারবত্তা আছে তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মনন-শীলতার যে উচ্চস্তরে পরিচালিত হয় তাতে সাধারণ লোকের অবাধ প্রবেশাধিকার ন

থাকলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। পণ্ডিত জওহরলাল যখন ভারতের বৈদেশিক রাষ্ট্র-নীতি ব্যাখ্যা করেন, বা মেনন যখন বিশ্ব-পরিষদে কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারতের দাবীর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁরা তথা-কথিত রাষ্ট্রভাষা প্রয়োগ না করে জাতিসংঘ স্বীকৃত, মর্যাদার উচ্চাসনে আসীন ইংরেজী ভাষাই ব্যবহার করেন এবং তাতে আমাদের জাতীয় আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। তার পরের দিনের সংবাদপত্রে সমস্ত ভারতীয় ভাষায় তাঁদের বক্তৃতা অনূদিত হয়ে ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ প্রতিটি নাগরিকের কৌতূহল নিবৃত্তি ও জ্ঞানভাণ্ডারের সমৃদ্ধিবিধান করে থাকে। লোকসভায় বিতর্ক আলোচনার ক্ষেত্রেও যদি আমাদের প্রতিনিধিবর্গ ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী না-হন, তবে এক হিন্দী ভাষার সর্বক্ষেত্রপ্রসারিত প্রয়োগ অহিন্দী-অঞ্চলের সদস্যেরা যে বিশেষ উৎসাহবোধ করবেন বা তাঁদের বক্তব্য চিত্তাকর্ষক ও জোরালো করে প্রকাশ করতে পারবেন তা মনে করার কোন হেতু নাই।

অন্তত দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের নিজের নিজের ভাষায় বক্তৃতা দিবার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে এবং হিন্দী ও ইংরেজীতে সেই সমস্ত বক্তৃতার দ্রুত ও সহজবোধ্য অনুবাদের ব্যবস্থা করে পারস্পরিক ভাববিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে যে অসুবিধা হতে পারে তার চেয়ে আরও গুরুতর অসুবিধার আমরা প্রতিদিনই সম্মুখীন হচ্ছি—সুতরাং, ভারতীয় ভাষাসমূহের বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের এই অসুবিধা নিবারণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। হয়ত এমন সময় স্বাভাবিকভাবে আসতে পারে, যখন হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্র হিন্দী ভাষা জনসাধারণের পক্ষে সুগম ও অনায়াস-বোধগম্য হবে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন অসীম ধৈর্য ও প্রতীক্ষাশীলতা। কোন এক কৃত্রিম বিধিনিষেধের চাপে ও মাতৃভাষাকে দাবিয়ে দিয়ে একটি ভাষার জোরপূর্ব প্রচলনা-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের দ্বারা সেদিন যে এগিয়ে আসবে না এ-সত্য প্রত্যেক হিন্দী প্রচারের অত্যুৎসাহী সমর্থককে মনে রাখতে হবে।

॥ ২ ॥

এবার ভাষাসমূহের পরিস্থিতির বিচার করা যাক। স্বাধীন দেশের একটি রাষ্ট্রভাষা থাকা, সন্দেহ নেই, উচিত এটা স্বীকার করা যায়, কিন্তু থাকতেই যে হবে এমন কথায় সায় দেওয়া যায় না। প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে কোন-একটিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার পূর্বে দেশের অতীত ইতিহাস, দেশবাসীর বর্তমান মনোভাব, ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এগুলি বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের ঐক্য কোন দিনই একভাষাভাষী পাশ্চাত্ত্য দেশের ঐক্যের সঙ্গে এক পর্যায়ের ছিল না। এর প্রাদেশিক ভাষাগুলি ঐতিহাসিক কারণে প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে উদ্ভূত হয়ে এক-একটি প্রদেশ-গোষ্ঠীর আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের উপায়রূপে পুষ্টি লাভ করেছে। বড় বড় ধর্মীয় আন্দোলন, গভীর আবেগ ও ভাবানুভূতি, জীবনসত্তার বিশিষ্ট ছন্দ ও প্রেরণা সমস্তই এই ভাষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সংযোগে যুক্ত হয়ে এদেরকে গোষ্ঠীর অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে, সত্তার অভিব্যক্তির অপরিহার্য অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলা ভাষা ছাড়া বাঙালী জাতির, তামিল ভাষা ছাড়া মাদ্রাজী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। এই সত্তার নিগূঢ় আকর্ষণের সঙ্গে তুলনায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য এদের কাছে অকিঞ্চিৎকর। কোন বাঙালী কৃত্তিবাস-কাশীদাস-রামপ্রসাদ-চণ্ডীদাস-রবীন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্রকে ভুলে গিয়ে, কোন হিন্দুস্থানী তুলসীদাস-মীরাবাঈ-এর সম্পর্ক ত্যাগ করে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার অবাস্তব স্বর্গে বাস করতে রাজী হবে না। স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য কেবল পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে নয়; আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ পাওয়া যাবে বলেই এর যথার্থ গৌরব। যদি কোন রাজনৈতিক নেতা মনে করেন যে, ভারতের সমস্ত ভাষাবিভেদ অবলুপ্ত হয়ে, সমস্ত বৈচিত্র্য মুছে গিয়ে হিন্দী ভাষার এক অবয়বচিহ্নহীন পিণ্ডাকার শিলামূর্তি সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র মহিমায় সিঁদুর তেলের রাজকর আদায় করবে এবং এই কূর্মাবতারের পূজা করেই ভারতের শক্তি ও ঐক্যবোধ বৃদ্ধি পাবে তবে তিনি যে আশা-মরীচিকায় বিভ্রান্ত হবেন তা নিঃসন্দেহ। মানুষের মননশক্তি ও আত্মাকে ক্ষুণ্ণ করে তাকে বড় করা যাবে না; সব প্রদেশের লোকই যদি তাদের প্রাদেশিক পরিচয় অস্বীকার করে নিজেদের তারস্বরে কেবলমাত্র ভারতীয় বলে ঘোষণা করে, তা হলেও তাদের ভারতীয়ত্বের পেছনে কোন সতেজ প্রাণ-চেতনা থাকবে না। গাছের পাতা যদি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম শিকড় ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শাখার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল বৃহৎ কাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চায়, তবে সে প্রাণরস আকর্ষণ করতে না পেরে শুষ্ক ও শীর্ণ হয়ে যাবে। তেমনি বাঙলী, অসমীয়া, তামিল, তেলেগু, মহারাষ্ট্রীয়—এরা নিজেদের প্রাদেশিক সত্তার ভেতর দিয়েই সর্বভারতীয় ঐক্যবন্ধনে সংযুক্ত থাকবে। কথামালার গল্পে মনুষ্যদেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদরের সঙ্গে অসহযোগ করে যে দুর্দশা ঘটিয়েছিল, প্রাদেশিকতা-বর্জিত ভারতীয়ও সেই-দুর্দশাকে আমন্ত্রণ করে আনবে।

অবশ্য হিন্দী একেশ্বরবাদীরা যে আঞ্চলিক ভাষাসমূহের উচ্ছেদ করতে চান একথা স্বীকার করবেন না। তাঁরা হয়ত মনে করেন যে, হিন্দীর রাজচ্ছত্রছায়াতলে

অন্যান্য ভাষাগুলি রাজার মোসাহেবের ন্যায় তৈলচিক্কণ, মেদস্ফীত দেহকান্তি নিয়ে চিরকালই বিরাজ করতে থাকবে। কিন্তু এইরূপ অনুমান ভাষাতত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞতাই প্রকাশ করে। তাঁরা সমস্ত মান-সম্মান, সমস্ত উচ্চশিক্ষা, সমস্ত উন্নত চিন্তা ও ভাবাবেগের উপর হিন্দী ভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে কি-যুক্তিতে আশা করবেন যে আঞ্চলিক ভাষাগুলি পূর্বের ন্যায় সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী থাকবে। এ কোন্ মূঢ় সন্তান যে মায়ের রসদ বন্ধ করে দিয়ে মাতৃস্তনে ক্ষীরধারার অব্যাহত প্রাচুর্য দেখতে আশা করেন? ভাগীরথীর সমস্ত জলপ্রবাহ কৃত্রিম খাতে সঞ্চারিত করে আবার তার বর্ষার দুকূলভরা সৌন্দর্য ও দুরন্ত গতিবেগ দেখতে কেমন করে আশা করতে পারি? সমস্ত মনীষা, উচ্চাভিলাষের সমস্ত প্রেরণা, সৃষ্টি—শক্তির সমস্ত উচ্ছ্বাস যদি রাষ্ট্রভাষাকে আশ্রয় করে, তবে অন্যান্য ভাষার ভাব-সম্বল ও আবেগ-সঞ্চয় আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে? এককালে ইংলণ্ডে ইংরেজী ও লাটিন ভাষার মধ্যে প্রায় এইরূপ সম্পর্ক গড়ে ওঠারই উপক্রম হয়েছিল; অথচ তখন লাটিনের কেবলমাত্র ধর্মাচরণে শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্তর্নিহিত উৎকর্ষের জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার বিশেষ সুযোগ পেয়েছিল, আইনের জোরে তাকে রাষ্ট্রভাষার সিংহাসনে বসাবার কোন জবরদস্তি ছিল না। সেই সুদূর অতীতে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ যে খানিকটা এই দুই প্রতিযোগী ভাষার আকর্ষণে দোলায়িতচিত্ত হয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহ। তবে শেষ পর্যন্ত ইংরেজের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও মাতৃভাষার প্রতি আস্থা তাকে এই অবস্থা-সংকট থেকে উদ্ধার করেছিল। সুতরাং এবিষয়ে কোন সংশয় থাকা উচিত নয় যে, দেশের ঐক্যের দোহাই দিয়ে হিন্দীর এইরূপ কৃত্রিম উন্নয়ন ভারতীয় অন্যান্য ভাষাগুলির অবসাদ ও অবসান ঘটাবে।

অতীত-ইতিহাস অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে যে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য কোন দিনই একভাষাভিত্তিক ছিল না; এর মূলে ছিল ধর্ম ও সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য ঐক্যবোধে। কিছুদিন হয়ত সংস্কৃত ভাষা সর্বভারতীয় ঐক্য-বিধানে সহায়তা করে থাকতে পারে, কিন্তু প্রাকৃত ও অপভ্রংশের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে এক দুর্বোধ্য আঞ্চলিক চেতনা-সঞ্চারের ফলে এদের মধ্যে প্রাদেশিক বিভিন্নতা দেখা দিল এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি এই সূক্ষ্ম বিভেদেরই ক্রমবর্ধমান, পরিণত রূপ। আজ ভাষানদীগুলি একই উৎস থেকে জন্মলাভ করে ক্রমশ বিসর্পিত-গতি ও দিকপরিবর্তনের ফলে মাত্র একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ মহানদীতে পরিণত হয়েছে; এখন এরা আর ফিরে গিয়ে একই সঙ্গম-স্থলে মিশতে পারে না। একই তূণ থেকে বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত শরগুলি আর সেই তূণে পুনঃপ্রবেশ করবে না। এখন এই স্বাতন্ত্র্যকে অপরিবর্তনীয় বলে স্বীকার করে নিয়ে এদের মধ্যে আবার নূতন আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত করতে হবে। একই পিতৃভিটার মায়া কাটিয়ে যারা দিকে-দিকে সুদূর অভিযানে বার হয়েছে, তাদের আর একান্নবর্তী পরিবারের গায়ে-গায়ে ঘনিষ্ঠতায় ফেরান যাবে না—যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে তার মর্যাদা রক্ষা করেই পারস্পরিক সংবাদের আদান-প্রদানে, ভাব-বিনিময়ে, উৎসবে নিমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে, সুখ-সৌভাগ্যের আনন্দ-বার্তা বহন করে এরা যে একবংশোদ্ভূত এই ধারণা দৃঢ়তর করতে হবে। বৃহৎ বনস্পতি যেমন সুদূর-বিক্ষিপ্ত শাখাপুঞ্জে পাখীর হর্ষ-কাকলী, আলোকের প্রাণোত্তাপময় স্পর্শ, বসন্তানিলের শিহরণ, অস্থিমজ্জাবাহী রসের নিগূঢ় সঞ্চার, আসন্ন নব-কিশলয়ের স্বপ্ন অনুভব করে আপনার ঐক্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারতীয় ভাষার বিভিন্ন শাখা-বিভক্ত বনস্পতিও সমস্ত শাখা ছেদ করে একমাত্র শাখায় এর প্রাণচেতনাকে কেন্দ্রীভূত করে নয়, অনুরূপ বিস্তার ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই আপনার ঐক্যসাধনায় অভিনিযুক্ত থাকবে।

॥ ৩ ॥

প্রশ্ন করা চলে যে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত হওয়ার জন্য ভারতীয় ঐক্যের কি বিশেষ কোন ক্ষতি হয়েছে? ঐক্যসাধনার উপায় ও ঐক্যের আদর্শ সবদেশে ঠিক একই ছাঁচে ঢালা নয়। আসলে ঐক্য নির্ভর করে জীবনসাধনার পন্থা ও চরম লক্ষ্যের অভিন্নতার উপর। ভারতে পৌরাণিক ধর্মের বিশ্বাস-সংস্কার, শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ ও ভক্তিবাদের চর্যা এক ভাষা-নিরপেক্ষ, অন্তর-গত ঐক্য রচনা করেছে। তীর্থভ্রমণে এই ঐক্যবোধের বাস্তব পরিচয় হিমালয়
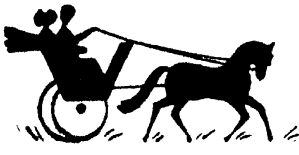
হতে কুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্রই মেলে। উত্তর ভারতের লোক দক্ষিণ ভারতের ভাষা হয়ত এক বর্ণও বুঝে না; তথাপি দক্ষিণ ভারতের অপরূপ শিল্পকলামণ্ডিত, ভক্তিরসের অক্ষয় আধার বিরাট মন্দিরগুলি ও মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত, রামায়ণ-মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনীর প্রস্তর-রূপায়ন দেখলে আমরা যে ভাষার অতীত এক গভীর ভাব-সংবেদনের স্তরে এক ও অবিভাজ্য এই প্রতীতি আমাদের মনে স্বতই জাগে। সমস্ত রীতি-নীতি ও বাঙময় প্রকাশের বিভেদ সত্ত্বেও আত্মার এই ঐক্য-বন্ধন, অধ্যাত্ম অনুভূতির এই সমপ্রাণতা কোনদিনই ছিন্ন হবার নয়। বরং গোষ্ঠীভেদে প্রকাশভঙ্গীর যে একটু অধটু বৈচিত্র্য, ভক্তিসাধনা ও উৎসব-অনুষ্ঠানের যে অল্পবিস্তর রীতি-পার্থক্য তাতে অন্তরশায়ী ঐক্য আরও গভীরভাবে প্রতিভাত হয়। নানাবর্ণের ফুলে সাজি ভরে, নানা ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করে, হৃদয়াবেগের সুর-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে যে বিরাট ঐকতান সংগীত ভারতমাতার পূজারীদের জন্য আকাশের দিকে উত্থিত হচ্ছে, তার ঐক্য-বিধায়ক শক্তি কি ভাষার একীকরণ অপেক্ষা কোন অংশে কম? যখন কোন পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে সমবেত বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতবাসী আপন আপন ভাষায় দেব-মহাত্ম্য কীর্তন করে, একই ভক্তির অর্ঘ্য বিভিন্ন বর্ণভঙ্গীর স্তবকে পাত্রে দেব-চরণে নিবেদন করে, ভাব-বিগলিত অশ্রুজলে, মুখের বিনম্র ভঙ্গিমায়, উৎসর্গিত চিত্তের আত্মনিবেদনে আপনাদের অভিন্ন মানস সংস্থিতির অখণ্ডনীয় প্রমাণ বহন করে, তখন ভারতের অসম্পূর্ণ ঐক্য যে এক ভাষার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করবে এ বিশ্বাসের কোন হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া, ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্রেই যে একভাষিকতা এক-জাতীয়ত্বের অপরিহার্য লক্ষণরূপে গৃহীত হয় তা নয়। রুশ, সুইট্জারল্যাণ্ড প্রভৃতি বহুভাষিক দেশে জাতীয়তা-বন্ধন যে শিথিল, ইতিহাস থেকে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং ভারতবর্ষের ঐক্য বজায় রাখবার জন্য এক ভাষার লৌহ বন্ধনে তার আত্মাকে জর্জরিত করার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই।

অবশ্য এ-কথা স্বীকার্য যে ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক থেকে সমস্ত ভারতে একই ভাষা প্রচলনের বিশেষ সুবিধা আছে। যদি এমন দিন আসে যখন ভারতীয় জনসাধারণ স্বেচ্ছায় এবং স্বাভাবিকভাবে হিন্দী ভাষাকে তাদের সাধারণ ভাষারূপে স্বীকার করে নেবে, তা হলে সেদিন নিশ্চয়ই অভিনন্দনীয়। এখনও অনেক প্রদেশ রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করবার জন্য স্বেচ্ছায় ও আগ্রহ সহকারে বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্লেশ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু আইনের বলে বাংলাকে তাদের উপর চাপাতে গেলে তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ প্রবল বিরাগে পরিণত হবে। হিন্দী যদি নিজ অন্তর্নিহিত উৎকর্ষের গুণে অন্যান্য ভাষাভাষীর চিত্ত জয় করতে পারে, তবে সে জয় তার চিরন্তন গৌরবরূপে থেকে যাবে। সেই আকাংখিত দিবস না-আসা-পর্যন্ত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে যে প্রয়োজন সাধিত হচ্ছে, যে ঐক্যানুভূতি জাগ্রত হয়েছে তাকে নষ্ট করা কি মূঢ়তার পরিচয় দেওয়া হবে না? ভারতের বড় বড় নদ-নদীগুলির উপর বিদেশী বাস্তুকারদের দ্বারা সেতু নির্মিত হয়েছে এই যুক্তিতে যদি সেতুগুলি ভেঙে দেওয়া হয়, তবে তাতে স্বদেশপ্রীতি অপেক্ষা আত্মঘাতী বর্বরতাই কি বেশী উৎকটভাবে ফুটে উঠবে না? দেশী মাল-মশলায় নূতন ঐক্যের স্তম্ভ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত বিদেশী উপাদানে গঠিত স্তম্ভই আমাদের ঐক্য-সৌধকে বহন করতে থাকুক। যদি

পরাধীনতার যুগে বিদেশী ভাষার সাহায্যে জাতীয়তাবোধ জেগে থাকে, তবে স্বাধীন ভারতে এই জাতীয়তাবোধকে প্রবলতর করবার আর কোন উপায়ই কি আবিষ্কৃত হবে না? বিদেশী ভাষা দেশবাসীর প্রবল বিরাগভাজন হওয়া সত্ত্বেও যে একতার ভিত্তি পত্তন করেছিল, দেশীয় জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ কি তাকে আরও উন্নত ও স্থায়ীরূপ দিতে পারবেন না? তার জন্যে কি ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে হিন্দী ভাষা প্রবর্তনের জন্য একটা কালসীমা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে? এই সীমার ঔচিত্য ও যৌক্তিকতা কোন্ মানদণ্ডে নির্ধারিত হবে? হিন্দীর সাবালকত্ব কি বয়সের হিসাবে না বয়স্কবৎ আচরণের দ্বারা ঠিক হবে? কথার জোরে নাবালককে সাবালক বলে চালিয়ে দিলে আমাদের জাতীয় উৎকর্ষের মান কি অবনমিত হবে না; আমাদের চিন্তা-কর্ম, বিচার-বিবেচনা সব কিছুর উপর অনভিজ্ঞতার স্থূল অঙ্গুলি-স্পর্শ কি অঙ্কিত হবে না? আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি যে আমাদের দেশীয় ভাষার মধ্যে যে কোন একটি ইংরেজীকে স্থানচ্যুত করার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করুক, কিন্তু অযোগ্য রাজপুত্রকে কেবল শারীরিক স্থূলতার বিচারে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীরূপে আগে থাকতেই ঘোষণা করলে যে অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ঘটবে তার জন্য কি আমাদেরই অবিমৃষ্যকারিতা ও অসংগত পক্ষপাত দায়ী হবে না? আয়োজনের তোড়জোড় চলতে থাকুক, কিন্তু অভিষেক-উৎসবটা যেন শক্তি-আহরণ পর্যন্ত স্থগিত থাকে, আমাদের এ-টুকুই বিনীত প্রার্থনা।

॥ ৪ ॥

তাহলে অন্তর্বর্তীকালে কি বাস্তব নীতি অনুসৃত হবে তা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা কর্তব্য। হিন্দীকে ইতিপূর্বেই সরকারী ভাষারূপে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এই সাময়িক সরকারীত্বের সুযোগে তার মর্যাদা-বৃদ্ধির আর যেন কোন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ চেষ্টা না হয়, সে দিকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে নিজের সেরেস্তায় হিন্দী ব্যবহার করতে পারেন, রাজ্যসমূহের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদানেও উক্ত ভাষার প্রয়োগ পরীক্ষামূলক-ভাবে প্রবর্তন করতে পারেন। কিন্তু এই অধিকার-সীমা যেন কোন ছলেই লঙ্ঘিত না হয়। যে চারিটি রাজ্যে হিন্দী-মাতৃভাষা, সেখানে ওর ভবিষ্যৎ পরিধি-বৃদ্ধির পরীক্ষা চলতে পারে। হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ওর প্রয়োগ, প্রাদেশিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ওর প্রবর্তন, সাহিত্যের সমৃদ্ধ কারুকার্য, ওর শক্তি বৃদ্ধি এ সবই চলতে পারে ও এর ফলাফল অন্যান্য রাজ্যের গোচরীভূত করা যেতে পারে। হিন্দীর সর্বময় কর্তৃত্ব এই সমস্ত রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার পর অন্যান্য রাজ্য এ সম্বন্ধে তাদের ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণের একটা সুস্পষ্ট নির্দেশ লাভ করবে।

অ-হিন্দী রাজ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হিন্দীকে অবশ্য-পাঠ্যরূপে প্রবর্তন করে ছেলে-মেয়েদের উপর চতুর্থ ভাষা শিক্ষার অনাবশ্যকীয় ও ক্লান্তিকর বোঝা চাপানো বর্জনীয়। তবে সপ্তাহে একঘণ্টা করে মৌখিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যে সমস্ত অভিভাবক ভবিষ্যৎ উন্নতির ভরসায় তাঁদের ছেলেদের হিন্দী শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী তাঁরা স্কুলের বাইরে যে কোন হিন্দী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে পারেন।

অহিন্দী রাজ্যের হাইকোর্ট ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে কোন অজুহাতে হিন্দী প্রবর্তনের চেষ্টা করলে তার প্রতিক্রিয়া যে ভয়াবহ হবে এটা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়াই ভাল। রাজ্যের শিক্ষা ও প্রগতির মনীষা এই দুই ক্ষেত্রকে অবলম্বন করেই আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজছে। এই দুটি পথ বন্ধ করে দেওয়া মানেই প্রাদেশিক ভাষার উপর [illegible] প্রচার। এর অবশ্যম্ভাবী [illegible] প্রাদেশিক সাহিত্য [illegible] অবনমিত হবে এবং [illegible] কাব্য কবি ও পণ্ডিতের [illegible]। এই সম্ভাবনাকে কেউ নির্বিবাদে [illegible] গ্রহণ করতে [illegible] সুপারিশ করার [illegible] মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সেটাই হিন্দীর উন্নতির পথে সবচেয়ে বেশী বাধা সৃষ্টি করবে। এই [illegible] জারি করার [illegible] হিন্দী [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] সমস্ত অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছে।

সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় হিন্দীর উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য আরোপ কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে সন্দেহ উদ্রেক করবে। এই সব পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় যুব সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষাকে আবিষ্কার করে তাদের দেশের শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া। হিন্দীতে কে কতটা ওস্তাদ তা ঠিক করা এর উদ্দেশ্য নয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্ম-বিতরণ নয়, প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন। হিন্দী শিক্ষার সঙ্গে মানস উৎকর্ষের এমন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই যাতে এ দুটোকে সমার্থবাচক বলে মনে করা যেতে পারে। তর্ক উঠতে পারে যে, ইংরেজী ভাষা সম্পর্কেও অনুরূপ আপত্তি প্রযোজ্য। কিন্তু একটা বিদেশী প্রগতিশীল ভাষাকে আয়ত্ত করে তার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশ করা ও পারদর্শিতার নিদর্শন দেওয়া উচ্চ মানসিক শক্তির পরিচয় দেয়। দ্বিতীয়, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালিত হলে সকলের উপর বোঝা সমান হবে ও কোন প্রদেশের উপর অযথা পক্ষপাত দেখান হবে না। প্রতি-

যোগ্যতা পরীক্ষায় অপক্ষপাত মূল্য-নির্ধারণ-পদ্ধতিই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ। যদি ইংরেজীর পরিবর্তে এমন কোন দেশীয় ভাষা পাওয়া যায় যাতে পারদর্শিতা সম্বন্ধে প্রদেশ-ভেদে কোন তারতম্য নাই, তবে সেই ভাষাই শেষ পর্যন্ত গ্রহণীয় হবে। কিন্তু বর্তমানে বা নিকট-ভবিষ্যতে সেরূপ কোন ভারতীয় ভাষা যে ইংরেজীর স্থান গ্রহণ করতে পারবে তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কোন প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালিত হলে সেই ভাষায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই পরীক্ষক নিযুক্ত হবেন। এবং তাতে পরীক্ষাগ্রহণে পক্ষপাতিত্বের সন্দেহ আরও তীব্রতর হবে। সুতরাং মিথ্যা দেশাত্মবোধের অজুহাতে বর্তমানের সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন মুষ্টিমেয় ভাষা-উন্মাদ ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে প্রশ্রয় দিলেও সর্বভারতীয় উচ্চতম নেতৃত্বের পক্ষে তা অশুভ ফলই প্রসব করবে। এ প্রসঙ্গে আরও লক্ষণীয় যে জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষা কোনদিনই ইংরেজীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না—সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ছেলেরা উচ্চস্তরে ইংরেজী শিখতেও পারে বা না পারে কিন্তু যারা উচ্চতম প্রশাসনিক স্থানে অধিষ্ঠিত হবে তাদের পক্ষে একটা আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠ ভাষায় অধিকার অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয়। যদি প্রতিযোগিতা শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে এরা যে কোনদিন ইংরেজী সম্বন্ধ-চ্যুত হবে তা অকল্পনীয়। সুতরাং বর্তমান ব্যবস্থাকে অনির্দিষ্টকাল স্থায়ী করলে কারও কোন অসুবিধা হবে না। যদি হিন্দী ভাষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তবে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের একটা হিন্দী রচনায় পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করলেই তারা হিন্দীভাষা-প্রয়োগে যোগ্যতা অর্জন করবে। কিন্তু হিন্দীকে পরীক্ষার বাহনরূপে নির্দিষ্ট করে অহিন্দী অঞ্চলের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ছাত্রদের গোড়া থেকে পথ রুদ্ধ করলে তার ফল সবদিক দিয়েই মারাত্মক হবে। কোন দায়িত্বশীল ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিসম্পন্ন সরকার যে এরূপ মারাত্মক ভুল করবেন তা কল্পনাতীত।

আজ স্বাধীনতা-লাভের দশম তিথি উত্তীর্ণ হলেও আমাদের অগ্রগতি আশানুরূপ হয় নাই। আমরা এখনও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চায়, বুদ্ধির মানের উন্নয়নে, শিল্প-বাণিজ্য প্রসারে, দারিদ্র্য-দুঃখ-মোচনে ও জনসমাজে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রবর্তনে অনেকখানি পিছিয়ে আছি। এখন দেশের মধ্যে গৌণ ব্যাপারে তীব্র মতবিরোধিতা সৃষ্টি না করে এই সমস্ত প্রাথমিক সমস্যা সমাধানে দেশের ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যখন ভাষাভিত্তিক প্রদেশ-গঠন উপলক্ষ্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণে দেশব্যাপী বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, যখন বোম্বাই ও আমেদাবাদের রাজপথে রক্তগঙ্গা বয়ে চলেছিল, যখন শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এইজাতীয় উপদেশামৃত বিতরণের দ্বারাই এই উত্তেজনার প্রশমন করতে চেয়েছিলেন। যদি তখন এই উপদেশের মধ্যে কোন সারবস্তু থেকে থাকে তা এই এক বৎসরের ব্যবধানে নিশ্চয়ই উবে যায় নি। আজ হিন্দীর বাধ্যতামূলক প্রবর্তনের বিভীষিকার মধ্যে তাঁরা কি নিজের উপদেশ-বাক্যের মর্যাদা রক্ষা করবেন, না—স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হয়ে তা লঙ্ঘন করবেন? আমরা অন্যান্য ভাষার ন্যায় হিন্দীর প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ও এর উজ্জ্বল ভবিষ্যতে আস্থাবান। কিন্তু কোন গণতান্ত্রিক জনপ্রিয় নেতা যদি যথেচ্ছাচারী-স্বৈরশাসকের আসন দখল করতে চান, তবে যেমন তাঁর জনপ্রিয়তা অচিরাৎ বিলুপ্ত হয়, তেমনি অন্যান্য ভাষার মধ্যে হিন্দীর স্বাভাবিক সমকক্ষতা যদি উদ্ধত শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে রূপান্তরিত হয়, তবে তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে বাধ্য। যে সাংস্কৃতিক ঐক্যের তথাকথিত প্রয়োজনে এই দাবী উত্থাপিত হয়েছে তা কার্যে পরিণত করতে গেলে সেই ঐক্যই বিধ্বস্ত হবে। ভারত-মাতার কণ্ঠে যে বিভিন্ন ভাষার বিচিত্র-রত্নগ্রথিত মণিহার প্রলম্বিত হয়ে তাঁর শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে, অতিরিক্ত টানের ফলে তা যেন শ্বাসরোধী উদ্বন্ধন-রজ্জুতে পরিণত না হয়, প্রত্যেক দেশভক্ত সন্তানের সে-দিকে বিশেষ অবহিত থাকাই আজ প্রধান-কর্তব্য।

চক্রদত্ত

...লকী গ্যাস লাইট' কোম্পানী তাদের বাড়ির চুড়োয় একটি ২১ ফিট লম্বা বাতি লাগিয়েছেন। এই বাতিটা দ্বারা তারা আবহাওয়া সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই লোকদের জানাতে পারবেন। ২৫ মাইল দূর থেকে এই বাতিটা দেখা যাবে। বাতির আলোটা যখন লাল হবে, তখন গরম বাড়ছে বলেই বুঝতে
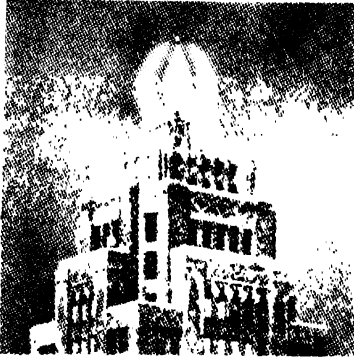
আবহাওয়া নির্দেশক বাতি

হবে। আলোর রং যখন সোনালী হয়ে আসবে, তখন আবহাওয়া ঠাণ্ডা হচ্ছে বলেই বোঝা যাবে। আবহাওয়ার অবস্থা যখন একভাবে থাকবে, তখন আলোর রং নীল হবে।

*

"ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কোকোনাট কমিটি" তাদের ১৯৫৫-৫৬ সালের গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা সংগৃহীত তথ্যাদি প্রকাশ করেছেন। এরা বলেন যে, গো-মূত্র এবং নারিকেলের জলের সঙ্গে বর্তমান মিকশ্চার ২·৪ ডি ছোট ছোট নারিকেল গাছের গোড়ায় দিলে নারিকেলের ছোট ছোট কুঁশি-গুলি কম ঝরে পড়ে। এই সংস্থা নারিকেল গাছের শিকড়ের রস পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, তার মধ্যে চার থেকে ৮·৫ পি এইচ আছে। বেশীর ভাগ সতেজ শিকড়ের রসই অম্লত্ব বিশিষ্ট। রোগদুষ্ট শিকড়গুলি হয় অত্যধিক ক্ষারযুক্ত না হয়তো একেবারে প্রশমিত। তাছাড়া রোগদুষ্ট শিকড়গুলির রসের পরিমাণও কম। কোন জমিতে বহু সংখ্যক গাছ জন্মাতে পারে, তা পরীক্ষা করার জন্য এরা দুই রকম দুই খণ্ড জমিতে গাছ লাগিয়েছেন। এক-খণ্ড জমিতে ৩২ বছর কোনও রকম চাষ আবাদ হয়নি এবং সারও দেওয়া হয়নি। অপর খণ্ড জমিতে রীতিমত চাষ করা হয়েছে এবং সারও পড়েছে। এই পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায় যে, প্রথম জমিতে প্রতি গাছে ২০টি করে ফল ধরে এবং দ্বিতীয় খণ্ড জমিতে প্রতি গাছে ৩৯টি করে ফল হয়। এরা আরও পরীক্ষা করে দেখেন যে, যদি গাছের গোড়ার মাটির স্তূপ করে দেওয়া যায়, তাহলে গাছ পিছু প্রায় ৬টি করে ফল বেশী ফলে। নারিকেল গাছের পাতাও অনেক কাজে লাগে, সেইজন্য এই গাছের পাতার সংখ্যা যত বেশী হয়, ততই ভাল। যদি তিন বিঘা জমিতে ৬০ পাউণ্ড করে ফসফরিক অ্যাসিড দেওয়া যায়, তাহলে পাতার সংখ্যা বেড়ে যায়। এছাড়া গাছে পোকা লাগলে তারও একটি প্রতিষেধক ব্যবস্থা আবিষ্কার করা হয়েছে। ইনসেকটিসাইড, পোকামাকড় মরার ওষুধের সঙ্গে বালি এবং কাঠ মিশিয়ে গাছের গোড়াতে দিলে নতুন গাছগুলিতে গুবরে পোকা জাতীয় পোকার আক্রমণ তিন ভাগ কমে যায় এবং পুরোন গাছে ১৫ ভাগ কমে যায়। পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আরও নানারকম ওষুধপত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই পরীক্ষানিরীক্ষা অন্ধ্র প্রদেশ, বোম্বে প্রদেশে করা হচ্ছে।

*

ক্যামেরার বেলোতে ফুটো হয়ে গেলে সেটুকু সারানর কায়দাকানুন আমাদের জানা না থাকায় ফোটোগ্রাফের দোকানে দৌড়াতে হয়। বর্তমানে জানা যাচ্ছে যে, এই ধরনের ফুটো জোড়ার জন্য রবার জোড়ার আঠার সঙ্গে বাতির ভুষো মিশিয়ে তাকে আবার বেঞ্জিন কিংবা সাদা পেট্রল দিয়ে গুলে যে সলিউসন তৈরি হবে, সেই সলিউসন একটি সরু ব্রাশ বা দাঁত খোঁটার কাঠির মাথায় করে তুলে নিয়ে ফুটো জায়গাটির বাইরের দিক দিয়ে একবার এবং ভেতর দিয়ে আর একবার প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ জায়গা দিয়ে আর আলো ঢুকতে পারবে না। এইভাবেই ফুটোটি সারান যাবে।

ক্যামেরার বেলো সারানর সলিউসন

*

"কর্নিং গ্লাস ওয়ার্কস কোম্পানী মৃন্ময় শিল্পের জন্য একরকম নতুন ধরনের বস্তু তৈরী করেছেন। এই বস্তুটি এলুমিনিয়ামের চেয়ে ওজনে হাল্কা, ইস্পাতের চেয়ে অনেক বেশী শক্ত। এই নতুন বস্তুটির নাম দেওয়া হয়েছে "পাইরো সেরাম"। "কর্নিং গ্লাস ওয়ার্কস" কোম্পানী আশা করেন যে, "পাইরো সেরাম" নানারকম শিল্পদ্রব্যের বিশেষত উড়ো-জাহাজ শিল্পের কাজে খুব বেশী ব্যবহার করা হবে। "পাইরো সেরাম" বস্তুটির খুব বেশী উত্তাপ সহ্য করার ক্ষমতা আছে, এমন কী ১৩০০ ডিগ্রী ফারেন-হাইট উত্তাপেও "পাইরো সেরামের" কোনও ক্ষতি হয় না। কাচ তৈরীর সাধারণ উপকরণগুলির সঙ্গে একটি বিশেষ ধরনের উপকরণ মিশিয়ে "পাইরো সেরাম" তৈরী হয়। খুব দ্রুতগামী রকেটের কোনও কোনও অংশ তৈরী, রাসায়নিক কাজ এবং তৈল শোধনের পাইপ তৈরী, গৃহস্থ পরিবারের রান্নাঘরের সাধারণ তৈজসপত্রাদি তৈরীতে পাইরো সেরামের প্রথম ব্যবহার হবে বলে উল্লেখ করা যায়। কোম্পানীর ডিরেক্টর আশা করেন যে, ওজনে হাল্কা অথচ শক্ত বস্তু হওয়ার দরুণ অত্যন্ত মজবুত বলে ঘরবাড়ি তৈরীর কাজেও একদিন পাইরো সেরামের ব্যবহার হতে পারে। পাইরো সেরামের মূল্য কাচের চেয়ে একটু বেশী হবে, কিন্তু যে কোনও-রকম স্টেনলেস স্টীলের চেয়ে অনেক কম হবে। সাধারণ কাচের বস্তু তৈরীর জন্য যেমন তরল কাচ আধারের মধ্যে ভরে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নানা ছাঁদ তৈরী হয়, "পাইরো সেরাম" দিয়ে ঠিক ঐভাবেই জিনিসপত্র তৈরী করা যাবে। এছাড়া প্রয়োজন হলে এই বস্তুটিকে ছাঁচে ফেলেও জিনিস তৈরী করা যায়। পাইরো সেরামে তৈরী জিনিসপত্র স্বচ্ছ কাচের তৈরী জিনিসের মতও দেখতে হয়, আবার কখনও কখনও দুধের মত সাদা দেখতে হয়। 'কর্নিং গ্লাস ওয়ার্কস" কোম্পানীর একজন রাসায়নিক পাইরো সেরাম বস্তুটির আবিষ্কার করেছেন। এই কোম্পানীই এর আগে 'ফাইবার গ্লাস' এবং 'সিলিকনস' আবিষ্কার করেছিলেন। বর্তমান শতাব্দীতে যেসব কাচ সংক্রান্ত গবেষণা হয়েছে, তার মধ্যে "পাইরো সেরাম" একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলা যেতে পারে। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিকের মতে "পাইরো সেরাম" আবিষ্কার প্রথম ইস্পাত আবিষ্কারের মতই উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর শততম জন্মদিন

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

১

নানা কথা

(ক)

তখন বড়লাট হলেন লর্ড হার্ডিন্‌জ আর ছোটলাট লর্ড কারমাইকেল। লর্ড হার্ডিন্‌জ যখন দিল্লী থেকে কলকাতায় এসে তিন সপ্তাহ বাস করবেন তখন তিনি একদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে এসে জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষাগুলি দেখবেন। এক মাস আগে দিন স্থির হয়ে গেল।

এমন সময় দিল্লীতে বড়লাটের উপর বোমা পড়ল, তিনি একটু আহতও হলেন। কলকাতায় তিনি এলেন, কিন্তু তাঁর কার্য-তালিকার অধিকাংশ বাতিল করা হ'ল। লর্ড হার্ডিন্‌জ কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজে আসাটা বাদ দিতে চান না; কলকাতার পুলিস কমিশনার রাজী হচ্ছেন না। শেষে এই ব্যবস্থা হ'ল যে, জগদীশচন্দ্র লাটভবনে গিয়ে বড়লাটকে তাঁর পরীক্ষাগুলি দেখিয়ে আসবেন। আমরা তিনজন সেইদিন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে বেলা বারটার মধ্যে লাটভবনে উপস্থিত হব, সেখানে একটা ঘরে কয়েকটা টেবিলের উপর পরীক্ষাগুলির ব্যবস্থা করব, আচার্যদেব সন্ধ্যার সময় আসবেন, আমরা পরীক্ষাগুলি দেখাব, দর্শক থাকবেন পাঁচজন,—লর্ড হার্ডিন্‌জ, তদীয় পত্নী, লর্ড কারমাইকেল, তদীয় পত্নী ও লর্ড কারমাইকেলের সেক্রেটারী গুরলে সাহেব।

আমরা প্রস্তুত হতে থাকলুম। আর পাঁচদিন বাকি, আচার্যদেব এসে বললেন,—কিছু করতে হবে না, সব বন্ধ করে দিয়ে এলুম।

কেন?

আচার্যের মুখ লাল হয়ে উঠল। বললেন, লাটপ্রাসাদে ঢোকবার আগে তোমাদের তিনজনকে সার্চ করবে, আর যন্ত্রপাতি একবার সব দেখবে। 'তা হতে পারে না' ব'লে আমি লিখে জানিয়ে দিয়েছি।

আপনাকে সার্চ করবে বলে নি, এই ঢের। এই ব'লে গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম জানালুম।

কিন্তু শেষ অবধি আমাদের যাওয়া হ'ল।

পরদিন গুরলে সাহেব এসে বললেন,—ও একটা ভুল হয়ে গেছে। পুলিস ধারেও আসবে না, আমি কর্মীদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।

তাই তিনি করেছিলেন; লাটভবনে আমাদের চা জলখাবার খুব খাইয়েছিলেন। পরীক্ষাগুলি ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল। লর্ড হার্ডিন্‌জের হাতে ব্যাণ্ডেজ তখনও দেখলুম।

(খ)

আচার্যদেব যথাসময় কলেজে এসেছেন; ঘণ্টাখানেক পরে কলেজ থেকেই ইসলিংটন কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে যাবেন। দেখলুম, তাঁর হাতে একখানা কাগজ, তাতে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা,—চটিও না। জিজ্ঞেস করলুম,—এ কি!

বললেন,—

কাল সন্ধ্যায় গোখলে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। বললেন,—ওরা তোমাকে যা তা প্রশ্ন ক'রে চটিয়ে দেবে, তারপর তোমার মুখ থেকে ওদের মনোমত উত্তর বলিয়ে নেবে। তাই এই কাগজখানায় 'চটিও না' লিখে রেখেছি, কাগজখানা টেবিলের উপর রাখব, মাঝে মাঝে দেখব।

(গ)

রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন,—

S. S. Arabia, Aden
19th July, 1900

সুহৃদ্বরেষু,—

কবির কল্পনা ও সত্যে কত প্রভেদ! আপনাদের রচিত সমুদ্র বর্ণনা পড়িয়া সাগ্রহে সমুদ্রযাত্রা প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। জাহাজে উঠিয়া কেবলমাত্র এক পেয়ালা চা পান করিয়াছিলাম, আর অমনি সমুদ্র-গর্জনে জাগিল, দাও দাও, দাও! অমনি সুদ সমেত প্রতিদান করিতে হইল। ইহাকেই বলে আতিথেয়তা। তারপর এই পাঁচদিন ক্রমাগত একই আদেশবাণী শুনিতেছি। যাহা ছিল সবই দিয়াছি, আর কিছুমাত্র দিবার শক্তি নাই। এ কয়দিন রবি কখনও উদয়, কখন অস্ত গিয়াছে। হয়ত উদয়ই হয় নাই। কিছুই জানি না। বায়ু, উল্কাপাত, বহ্নিশিখা কি হইয়াছে কিছুই অবগত নহি। দূরে বেদুইন-ভূমি দেখা যাইতেছে। এখন ভাবিতেছি, কবে সমুদ্রপার হইব।

(ঘ)

মে ১৯০১—রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,......

বেলার বিবাহ এই মাসেই স্থির হইয়াছে

আর তিন সপ্তাহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি এমনি হতভাগ্য, আমার কোন বন্ধুই বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন না। তুমি বিলাতে, লোকেন তথৈবচ, মহারাজ সে-সময় বোধ করি আগরতলায়, নাটোর নীল-গিরিতে। আমার গৃহে এই প্রথম বড় কাজ কিন্তু তোমাদের অভাবে আমার উৎসব নিরানন্দ হইবে।

লণ্ডন, ১১ জুলাই, ১৯০১।—জগদীশ-চন্দ্র লিখছেন,—

.........তোমার মিনির বিবাহ হইল। কাবুলিওয়ালা তাহাতে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছে।

(ঙ)

লণ্ডন, ৩০শে আগস্ট, ১৯০১। রবীন্দ্র-নাথকে জগদীশচন্দ্র লিখছেন,—

......আর তুমি জান, স্যার্ জন উডবার্ন আমাকে সর্বদা সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার অধস্তন কর্মচারীদের হস্তেই আমাদের জীবন সংশয়। তুমি শুনিয়াছ কি, যে, প্রফুল্ল রায়কে নাকি দূরে পাঠাইবার চেষ্টা হইয়াছিল?

(চ)

বেকার ল্যাবরেটরি তৈরি হয়ে গেছে। এবার খোলা হবে। ল্যাবরেটরি কিরকম কি হবে অধ্যক্ষ জেম্‌স্ কোনোদিন জগদীশ-চন্দ্রের সংগে পরামর্শ করেন নি। তাঁর পরামর্শদাতা ছিলেন পিক সাহেব যিনি অংকের অধ্যাপক হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে ঢোকেন, তারপর হয়ে পড়লেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক।

আচার্যদেব আমাদের কাছ থেকে প্রথম শুনলেন যে, অমুক দিন লর্ড কারমাইকেল ল্যাবরেটরি খুলবেন।

বললেন, দাঁড়াও, ওদের একটু শিক্ষা দিতে হচ্ছে।

তিনি লর্ড কারমাইকেলকে লিখলেন, আপনি যে আমার পরীক্ষাগার দেখতে আসবেন লিখেছিলেন, তা অমুক দিন কি আপনার সুবিধে হবে?—যে তারিখটা দিলেন, তা হ'ল ল্যাবরেটরি যবে খোলা হবে তার সাতদিন আগে।

কারমাইকেল সম্মতি জানালেন।

জেম্‌স্ সাহেব পুলিস কমিশনারের কাছ থেকে প্রথম শুনলেন যে, ওই তারিখে লাট সাহেব কলেজে আসছেন। রাগে গর্‌গর্ করতে করতে এসে আচার্যদেবকে বললেন,—আমাকে জিজ্ঞেস না করে এ ব্যবস্থা করা হচ্ছে কেন?—

আচার্যদেব উত্তর করলেন,—এটা প্রেসি-ডেন্সী কলেজের কিছু নয়, আমার নিজস্ব ব্যাপার, সুতরাং আপনাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করিনি।—সাহেব তখন নরম হয়ে বললেন,—দেখুন, এটা বড়ই অশোভন হচ্ছে; লাট সাহেব যবে এই ল্যাবরেটরি খুলছেন, তার আগেই তিনি সেই ল্যাবরে-টরিতে আপনার পরীক্ষা দেখতে আসছেন; আপনি অনুগ্রহ করে আপনার তারিখটা পেছিয়ে দিন।

জগদীশচন্দ্র বললেন,—আপনি তো আমাকে কোনোদিন বলেননি, কবে আপনি লাট সাহেবকে আনছেন; আমি এখন কিছু করতে পারিনে।

সেই অশোভন ব্যাপারই ঘটল। লাট সাহেব পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দেখে গেলেন; তার এক সপ্তাহ পরে সেই পরীক্ষাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন।

(ছ)

সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে ময়মনসিংহে যাবেন। সেখান থেকে তার এল—
Wire European or Indian style.

বললেন,—বাঙাল মানুষ বিকেলে কাঁচা লংকা দিয়ে মুড়ি খাই; European style-এর কথা ওরা ভাবল কি করে।

(জ)

বংগীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ওখানে তখন খুবই দলাদলি। দলাদলিটা প্রধানত প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে।

একদিন সকালে আচার্যদেব বিজ্ঞান-মন্দিরের মধ্যে বেড়াচ্ছেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এসে হেমচন্দ্র দাশগুপ্তকে লক্ষ্য করে বললেন,—ও যে লোক খারাপ তা নয়, তবে কি জানেন, বয়স কম আর বাঙাল, একটু উদ্ধত।—ব'লে ফেলে তাঁর হুঁস হ'ল কার কাছে 'বাঙাল' বললেন। তিনি জিব কেটে পিছু হঠতে লাগলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন আবার জগদীশ-চন্দ্রের প্রাক্তন ছাত্র। গুরুদেব তাঁকে ডেকে বললেন,—শোন, শোন, কি বললে, 'বাঙাল'। তোমাদের এখানকার লোকের চেয়ে 'বাঙাল'রা ঢের বেশি সাহসী, পরিশ্রমী; তবে, হ্যাঁ, একটা কথা মানি, বাঙালদের রহস্যবোধ একটু কম।

আমি উপস্থিত ছিলুম, বললুম,—আপনি কিন্তু ব্যতিক্রম।

একটু হেসে বলতে লাগলেন,—তোমাদের বীরত্বের কথা শোন; তখন আমি চন্দননগরে থাকি—কয়েকজন ছাত্রকে আমার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি; নৈহাটি থেকে গঙ্গা পেরিয়ে চন্দননগর যাব; নৌকা গঙ্গার মাঝামাঝি গিয়েছে, দেখি তোমাদের এখানকার একটি ছেলে চোখ বুজে মুখ শিঁটকে নৌকার ধারটা জোরে ধরে বসে আছে। জিজ্ঞেস করলুম,—তোমার কি হয়েছে?—বলল,—Sir, I have never been to sea before। Seaই বটে। আমাদের বাঙাল দেশের ছোট ছেলেরাও এরকম নদী সাঁতরে পার হচ্ছে।

(ঝ)

সভাসমিতিতে যেতেন না, লোকের সঙ্গে মেলামেশা খুব বেশি নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত, দিনরাত সেই চিন্তায় মগ্ন, কিন্তু তার মধ্যে থেকে সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্র কোনোদিন ছিন্ন হয়নি।

বিলেত থেকে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন,—

........তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ, যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্বভৌমিক।

১৯০২ সালে আর এক চিঠিতে লিখছেন,—

........তোমার 'চোখের বালি' বৈশাখ পর্যন্ত দেখিয়াছি। বেশ লাগিয়াছে। ভয় ছিল তুমি যেরূপ অবস্থায় ফেলিয়াছ, তাহাতে কি করিবে। কিন্তু সবই সুন্দর হইয়াছে।

ভবিষ্যৎ জীবনেও তিনি প্রবাসী ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত পড়তেন। ভারতবর্ষে ধারাবাহিক প্রকাশিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলি তিনি আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। একবার শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লেখেন। শরৎচন্দ্র তখন তাঁর নিকট একেবারে অপরিচিত।

(ঞ)

শিল্পীর যে সৌন্দর্যবোধ, যে রসানুভূতি থাকে, জগদীশচন্দ্রে তা পুরোমাত্রায় ছিল।

বাড়ির বসবার ঘরের তিনটি দেওয়ালে অজন্তার গুহাচিত্র, নন্দলাল বসুর আঁকা। চতুর্থ দেওয়ালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা মাতৃমূর্তি। ঘরে সোফা, কৌচ প্রভৃতি বিদেশী আসবাব নেই, গদ্দি-মুগা-চৌকি দিয়ে মোড়া বসবার আসন।

(ট)

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে তাঁর সপ্ততিতম বর্ষপূর্তিতে যে স্মারক গ্রন্থ দেওয়া হয়, তাতে জগদীশচন্দ্র লেখেন,—

In his long and distinguished career as a scientific investigator, which happily is not over yet, he has not only made important contributions in advancement of science, but has also evoked the true spirit of research among his disciples, many of whom now occupy very prominent positions in the scientific world. Such an achievement in the life time of one man is indeed remarkable but Sir P. C. Ray has done a great deal more.

He was one of the first to realise the importance of Indian industries for the economic advancement of the country. With this object in view he risked the very little he possessed; and the venture started in this modest way has now grown into perhaps the most successful chemical industry in the whole of India.....

He has wanted little and kept even less for himself, the rest being given away freely to poor students and charities. The association of plain living and high thinking is always very rare; in addition to these there is in Sir P. C. Ray the element of vigorous action which knows no rest. The combination of such qualities in a single individual is indeed rare in any country and there can be no higher example for the young generation to emulate than the life of this great teacher.

(ঠ)

আচার্যদেব আজীবন যা উপার্জন করেন, তার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ নিজেদের জন্যে ব্যয় করে বাকী সমস্তই সঞ্চয় করেন। সেই সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭ লক্ষ টাকায়। 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরে'র ট্রাস্টিদের হাতে ১৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি প্রদান করেন, বাকী ৪ লক্ষ টাকা তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দান করবার ইচ্ছা করেন। পেন্সিলে লেখা একটা ফর্দও তৈরি করেন, কিন্তু পাকাপাকি করবার আগে ইহলোক ত্যাগ করেন।

তাঁর মহীয়সী সহধর্মিণী স্বামীর পারলৌকিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত টাকাটা দান করলেন।

এর কুড়ি বছর আগে বিজ্ঞান-মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে আচার্যদেব বলেছিলেন,—

রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্তহস্তেই ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই কার্যে তাঁহার সর্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহায্য আমার দুঃখ ও পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে।

তা তিনি করলেন।

—শেষ—

জীবিত না মৃত?

বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোডের পূর্বদিকে সুন্দরবনের মধ্যে খানিকটা জায়গা গাছপালা কেটে পরিষ্কার করে নিয়ে নূতন সমাধিক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে। তারি একদিকে একটি সদ্যনির্মিত সমাধি পাথর দিয়ে গাঁথা, এখনো চুন-শুরেকি ভালো করে শুকোয়নি। একদিন বিকালবেলা জন কতকগুলো সাদা ফুল নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল। ধীরপদে বিষণ্ণ মুখে সমাধির কাছে এসে চমকে উঠল—একি, এ ফুলগুলো দিয়ে গেল কে? কাল অবশ্য সে এসেছিল, কিন্তু ফুল তো রেখে যায়নি। সাদা গোলাপের একটি তোড়া নিয়ে কাল এসেছিল সে, তোড়াটি রেখেছিল সমাধির শিয়রে। অনেকক্ষণ বসে থেকে উঠে যাওয়ার সময়ে তোড়াটি নিয়ে গিয়েছিল; সাদা গোলাপ রোজির খুব প্রিয় ছিল; ইদানীং কর্নেল তাকে হোয়াইট রোজ বলে ঠাট্টা করতো; মনে পড়ল রোজি বলেছিল যে কর্নেল ডাকে আমাকে রোজ রোজ বলে, এখন আবার তোমাদের মধ্যে ওয়ার অব্ রোজেজ না বেধে যায়। রোজের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপে সাদা গোলাপের তোড়াটি সঙ্গে করে সে বাড়ি ফিরেছিল। এখন আবার সেখানে শাদা ফুল দেখে তার বিস্ময়ের অন্ত রইল না, সেই সঙ্গে একটুখানি ঈর্ষাও কাঁটা ফুটিয়ে দিল। আমার প্রিয়জন আর কারো প্রিয় এ চিন্তা প্রেমিকের পক্ষে হৃদ্য নয়, এমন কি প্রিয়জনের মৃত্যুর পরেও এ চিন্তার ধারা অবসিত হয় না, হয়তো বা বাড়ে। মৃত্যু যখন পর্দা ঝুলিয়ে দেয়, তখন সমস্ত সম্বন্ধের অবসান হয়—থাকে একমাত্র প্রেমের সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ অপর কোন জীবিত মানুষ স্মরণ করে রেখেছে প্রেমিকের পক্ষে তা অসহ্য। তার মনে একবার বিদ্যুতের কশা আঘাত করে গেল কর্নেল নয়তো? তখনি আবার মনে পড়ল না! কর্নেল রোজির মৃত্যুর দিনেই আড়াই-মণি মিস স্পেংলারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, অবশ্য কর্নেলের পক্ষে যতখানি আত্মসমর্পণ সম্ভব। এ তার নিজের চোখে দেখা। যখন সবাই রোজ এলমারের মৃত-দেহের সঙ্গে সমাধিক্ষেত্রের দিকে যাচ্ছিল তখন কর্নেলকে দেখা গেল নবলব্ধ প্রিয়-তমাকে নিয়ে জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে। পাষণ্ডটা একটু থামল না, নামল না, এমন কি একবার টুপিটাও তুলল না। সবাই মনে মনে তাকে ধিক্কার দিল কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি জনের মনে কেন যেন আনন্দ হল! ওঃ এবার বেশ প্রমাণ হয়ে গেল তোমার প্রেম কতটা সত্য। মৃত্যুর কাছে চালাকি খাটে না।

সে ভাবল তবে এ ফুল কে দিয়ে গেল? কাল যখন এসেছিল, ছিল না এ ফুল। তবে সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি আরো পরে এসেছিল—অর্থাৎ প্রায় সন্ধ্যাবেলা। তারপরে ভাবল যে-ই দিক ক্ষতি কি? কর্নেল যে দেয়নি এই তো যথেষ্ট। ফুলগুলো সমাধির শিয়রে রেখে সে মূর্তের মতো বসে রইল। এমন সময়ে পিছনে পরিচিত পদশব্দ শুনে চমকে পিছনে চাইল—রেশমী, হাতে সাদা ফুল! এক মুহূর্তে ফুলের রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল তার মনে।

জন উঠে দাঁড়াল, রেশমী দিদি তুমি?

হাঁ মিঃ স্মিথ।

তুমি কাল এই ফুলগুলো দিয়ে গিয়েছিলে?

হাঁ মিঃ স্মিথ।

আমি ভাবছিলাম আবার কে এল?

এলেই বা ক্ষতি কি? মৃত্যুর কাছে তো রেষারেষি চলে না।

অবশ্যই চলে না, তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার রেষারেষিই বা হতে যাবে কেন? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ফুলগুলো দাও, বসো।

রেশমী ফুলগুলো সমাধির শিয়রে সাজিয়ে দিয়ে বসলো, সাদা ফুল। রেশমীর চুলে আর মনের ফুলে মেশামেশি হয়ে গেল।

মৃতকে কি লাল ফুল দেয় রেশমী বিবি?

মিস এলমার মরেছেন একথা আমার মন মানতে চায় না।

হায় যদি তা সত্য হতো।

সত্য হতে বাধা কি? সবই তো মনের ব্যাপার।

ফাল্গুনের হাওয়ার দমক বড় বড় বনস্পতিগুলোর মধ্যে চাপা দীর্ঘনিশ্বাসের মতো হু হু করে ওঠে; নানাফুলের মিশ্র গন্ধ ছড়িয়ে দেয় অব্যক্ত অস্পষ্ট আকুতি; হাজার পতঙ্গের চঞ্চল পাখা অদৃশ্যের উত্তরীয় প্রান্তের মতো হঠাৎ গায়ে এসে ঠেকে; আর অলক্ষ্য ঘুঘুটা একটানা বিলাপের রশি নামিয়েই চলেছে অতলের তল সন্ধান করে।

কথা ফুরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ দুজনের, দুজনে মৃতের মতো মনের রহস্যের দিকে তাকিয়ে নির্বাক বসে থাকে। মৃত্যুর কাছে মুখরতার স্থান নেই।

রেশমী কি ভাবছিল কেমন করে বলবো! তবে জনের আর্ত ভাব, ফুল নিয়ে আগমন বোধ করি তাকে খুশী করেনি। কাল যখন সে দেখলো যে সমাধিতে কারো ফুলের চিহ্ন নেই। সে নিশ্চয় জানতো জন ছাড়া ফুল দেওয়ার লোক আর কেউ নেই, তখন মনে মনে বেশ একটু খুশী হয়েছিল। নিজের মনকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে ভালোই হল, মৃত্যুর পরে নিঃসপত্ন অধিকার সে পেয়েছে মিস এলমারের। কিন্তু খুশী কি কেবল সেইজন্যেই? হয়তো মনের নীচের তলায় আরো একটা কারণ ছিল—জনের আর কোন টান নেই মিস এলমারের উপরে, নইলে মৃত্যুর দুদিন পরেই এমন করে ভুলে যেতো না, সমাধির শিয়রে দুটো ফুল নিতান্ত নিষ্পরেও দিয়ে থাকে। আজকে জনকে দেখে মনে লাগল তার খোঁচা, তবে দেখছি ভোলেনি; ভাবল ভালোই তো, এত শীগগির ভোলা কি শোভন, আবার ভাবল দুটো ফুল দেওয়া নিতান্ত সামাজিক প্রথা, ওর সঙ্গে ভোলা না ভোলার কোন সম্বন্ধ নেই।

মিঃ স্মিথ তুমি কি আজই প্রথম এলে?

না, রেশমী বিবি, গতকালও এসেছিলাম।

তবে ফুল দাওনি কেন?

এনেছিলাম সাদা গোলাপ, সমাধির শিয়রে ঠেকিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম, সাদা গোলাপ আমার প্রিয়ার বড় প্রিয় ছিল।

সমাধির ফুল কি ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

কেন?

মৃত্যুর দান ফিরিয়ে নিতে নেই।

এই তো তুমি এখনই বললে যে রোজিকে তুমি মৃত ভাবতে পার না।

তুমি তো পেরেছ দেখছি।

কেমন করে জানলে?

তোমরা পুরুষেরা প্রেয়সী মরলে নিতান্ত দুঃখিত হও না।

চমকে উঠে জন বলে, সে কি কথা?

তরুণতর প্রেয়সীর সন্ধানের সুযোগ পাও তোমরা।

রেশমী বিবি, তুমি যেমন কোমল তোমার কথাগুলো তেমনি কঠিন।

খুশী হল মনে মনে রেশমী, বলল, তোমাদের মনকে আঘাত করতে পারে এমন কঠিন কথা মেয়েদের অজ্ঞাত।

কি উত্তর দেবে জন ভেবে পায় না।

কোকিল দুটো সুরের টানাপোড়েনে আকাশটা প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলল।

জন বলল, রেশমী বিবি, চলো আর থাকা উচিত নয়, সন্ধ্যায় অনেক সময় শ্বাপদ বের হয় এদিকে।

রেশমী উঠল।

কাল আবার আসবে তো বিবি?

দেখি চেষ্টা করবো, সময় পাওয়া দুর্ঘট।

না, না, অবশ্য এসো, তোমার হাতের ফুল বড় ভালোবাসতো মিস এলমার।

তুমি নিশ্চয় আসছো মিঃ স্মিথ।

আমার আর অন্য কি কাজ আছে বলো? চলো তোমাকে একটু এগিয়ে দিই।

দুজনে অগ্রসর হয় পশ্চিমদিকে এবং লোকালয়ের কাছাকাছি এসে চলে যায় দুজন দুদিকে।

জন মনে মনে ভাবে রেশমী বিবি আসবে তো?

রেশমী মনে মনে ভাবে পৃথিবী রসাতলে গেলেও জনের না এসে উপায় নেই।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে মিস এলমারের সমাধির কাছে পৌঁছে জনের মন দমে গেল। কেউ নেই! কিন্তু যখন তার নজর পড়ল সমাধির শিয়রে টাটকা তাজা ফুলের রাশ, সে হতাশ হয়ে একেবারে বসে পড়ল। রেশমী এসেছিল এবং ফুল দিয়ে চলে গিয়েছে। জনের মনে হল এ অন্যায়, মনে হল রেশমী অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক, মনে হল সুখ সৌন্দর্য আশাপূর্ণ পৃথিবী একেবারে নিরর্থক। সে চুপ করে বসে হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে রইল।

অদূরে একটা সমাধির আড়ালে দাঁড়িয়ে জনের হেনস্থা দেখে রেশমীর চোখে কৌতুকের আভা ফুটল, ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা ফুটল, সমস্ত মুখে চোখে ফুটল সার্থকতার আলো, সে যা চাইছিল তাই ঘটল। বলা বাহুল্য সে আগেই এসেছিল আর ফুলগুলো রেখে একটু আড়াল হয়েছিল জনের মনোভাব যাচাই করবার উদ্দেশ্যে, সে পরীক্ষা করতে চায় জীবিত ও মৃতের মধ্যে কার টান বেশি! গতকাল পর্যন্ত তার ধারণা ছিল মৃত চাঁদের টানে যেমন জোয়ার ফেনিয়ে ওঠে সমুদ্রের বুকে তেমনি আজো মৃত এলমার ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছে জনের বুক। কিন্তু এইমাত্র জনের যে দশা স্বচক্ষে সে দেখল, বুঝল যে এক্ষেত্রে মৃতের উপরে জীবিতের স্থান। তার মনে কেমন একটু দয়াভাবের সঞ্চার হল এই হতভাগা যুবকটির উপরে, কেমন যেন একটু মাতৃভাব। প্রত্যেক প্রেমের সংগে মাতৃভাব মিশ্রিত, প্রত্যেক নারী সম্ভাবিত মাতা, এই অর্থে নিতান্ত বালিকাও অত্যন্ত বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের চেয়েও জ্যেষ্ঠতর।

ফাল্গুনের পত্র মর্মরে পায়ের শব্দ মিশিয়ে রেশমী কাছে গিয়ে ডাকল, মিঃ স্মিথ।

চকিতে মুখ তুলে চাইল জন, তার মুখে জ্বলে উঠল আলো, বলে উঠল, বিবি তুমি এসেছ?

এবং তারপরেই কি করছে ভালো করে ভেবে দেখবার আগেই হাত বাড়িয়ে রেশমীর হাতখানা ধরে, পাছে ছলনাময়ী পালিয়ে যায়, পাছে রহস্যময়ী স্বপ্নে পরিণত হয়, বসাল তাকে সমাধির উপরে।

তোমার ফুলগুলো দেখে আমার মন দমে গিয়েছিল, ধারণা হয়েছিল তুমি এসে চলে গিয়েছ।

চলে যাবো কেন, অন্য সমাধিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম।

কি আর দেখবার আছে ওগুলোতে?

বলো কি মিঃ স্মিথ মৃতের সমাধি বড় রহস্যময়।

না, বিবি, এ তোমার ভুল, রহস্যময় যদি কিছু থাকে তবে তা জীবন, যেমন রহস্যময় তেমনি সৌন্দর্যময়, তেমনি সার্থক।

কিন্তু মিঃ স্মিথ মৃত্যুও কি জীবনের অংগ নয়, মৃত্যুর রহস্যও যে জীবনের রহস্যের অন্তর্গত।

তোমার কথা ঠিক, বিবি, কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশের পথ যে জীবনের তোরণ দিয়ে, সমাধিতে প্রবেশ করতে হয় আঁতুড় ঘর দিয়ে।

সেই কথাই তো বলছিলাম, জীবনে প্রবেশের দুটি দরজা, আঁতুড় ঘর আর সমাধি।

বিবি, তোমাদের হিন্দুদের দর্শন শাস্ত্রে সহজাত অধিকার।

তারপর বলে উঠল, আহা তুমি যদি হিন্দু না হতে।

তবে কি নিগ্রো হলে খুশী হতে! বলে খিলখিল করে হেসে উঠল রেশমী, যেন প্রেমিকের শিয়রে বীজনরত বনাঙ্গনার হাতে বেজে উঠল রেশমী চুড়ির গোছা।

জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে এত কথা ওদের জানবার নয় যারা বলে তাদের মনে রাখা উচিত প্রেম মুখে অজ্ঞাত ভাষা জুগিয়ে দেয়, আবার প্রেমই হরণ করে মুখের ভাষা, যে-বসন্ত বনে বনে ফুল ফুটিয়ে তোলে সেই বসন্তই দমকা হাওয়া তুলে আবার তা ঝরিয়ে দেয়।

ওদের মুখের কথা গেল বন্ধ হয়ে, কিন্তু মানুষ তো শুধু মুখ দিয়েই ভাব প্রকাশ করে না। চৈত্র সন্ধ্যায় আকাশ কোণায় ছোট ছোট বিদ্যুৎ সঞ্চারের মতো ওদের চোখের কোণে কোণে ফুটল জিজ্ঞাসা, শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদের ফালির মতো ওদের ওষ্ঠাধরে ফুটল হাসির রেখা, পিপাসার অদৃশ্য মরীচিকা ওদের সর্ব অংগ ঘিরে আলোকরশ্মির চমক তুলতে লাগল।

অবশেষে ওদের মুখের কথা গেল একেবারে বন্ধ হয়ে। বসন্তের রাতে হাওয়ার মাতামাতি যখন ক্ষণতরে স্তব্ধ হয়ে যায় তখন আমের বোলের ঘন গন্ধ চেপে ধরে অরণ্যের বুক, সে চাপ একাধারে অসহ্য সুখের আর দুর্বহ দুঃখের, তা সহ্য করা সরিয়ে ফেলা দুই-ই সমান কঠিন।

কিছুক্ষণ পরে, কতক্ষণ পরে তা ওরা জানে না, প্রেমের জগৎ দেশকালের অতীত,
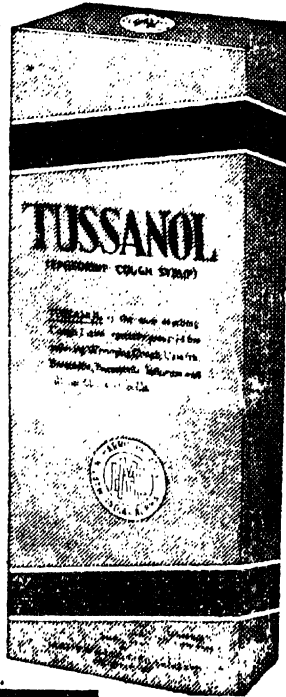
জন আচমকা বলে উঠল, রেশমী বিবি আমি তোমাকে ভালোবাসি।

নিজের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল জন, কে বলালো তার মুখ দিয়ে ঐ কথা, বোকার মত, কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে তাকিয়ে রইল, ভাবল না জানি এখনি কি রূঢ় উত্তর শুনতে হবে!

অত্যন্ত সহজভাবে রেশমী বলল, এবারে ওঠো মিঃ স্মিথ সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

উত্তরের সহজ প্রসন্নতায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল জন, ফাঁসির হুকুমের বদলে বেকসুর খালাসের রায়।

তখনি পরমুহূর্তে নৈরাশ্যের ধাক্কা অনুভব করল বুকে, এখনি ফিরতে হবে!

কিন্তু রেশমী উঠবার জন্যে কিছুমাত্র ব্যস্ততা প্রকাশ না করায় আনন্দিত হল কিন্তু তখনি আবার কেমন আশাভঙ্গের ভাব প্রবল হয়ে উঠল মনে. আসল কথাটার জবাব তো মিলল না। বেকসুর খালাস আসামী ফাঁসির দায় থেকে মুক্ত হয়ে দেখে মুক্তি মিলল বটে, কিন্তু আর কিছু তো মিলল না। বাড়িঘর আত্মীয়-স্বজন যায় রাহা খরচ কিছুই নেই সম্মুখে।

কোন্ কৌতুকপরায়ণ অদৃষ্ট প্রেমের নাগরদোলায় চাপিয়ে মানুষকে নিয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস করে, কি আনন্দ পায় সে-ই জানে।

ওঠো মিঃ স্মিথ, সন্ধ্যা হল যে।

সন্ধ্যা হল তো কি হল?

বাঃ তুমিই তো কাল বলেছিলে যে, সন্ধ্যা-বেলায় এদিকে বাঘ বের হয়।

হয় হোক, ক্ষতি কি?

ক্ষতি আর এমন কি, কেবল দুজনের ঘাড় ভেঙে রক্তপান করবে।

বীর্য প্রকাশ করে জন বলল, ডিয়ারি, আগে আমার ঘাড় ভাঙবে।

কিন্তু তাতেই বা কি লাভ হবে, দু-দণ্ড পরে যদি আমার ঘাড় ভাঙে!

দুশমনটার এমন দুঃসাহস কখনো হবে না।

না হওয়ার কি কারণ? সে তো আমার সঙ্গে প্রেমে পড়েনি।

ইনডীড! বলে হেসে ওঠে জন।

হাসির দমকায় ভাবালুতার কুয়াশা বায় কেটে। হাসি তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রথম সোপান।

দুজনে সমাধিক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর আসে। এমন সময় চমকে উঠে জন ইশারা করে দেখায়, ভীত বিস্ময়ে রেশমী দেখে অদূরে গাছপালার আড়ালে সঞ্চারমাণ শার্দূলরাজ। টুঁ শব্দটি করে না কেউ। ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে জনের কাছে রেশমী। জন বাহুবন্ধনে রেশমীকে টেনে নেয়। বাঘের ভয় বাহুবন্ধনের যে জোর দাবী করে তার চেয়ে বোধ করি কিছু অধিক ছিল জনের বাহুতে; বাঘের ভয় পুরুষের যে ঘনিষ্ঠতা দাবী করে তার চেয়ে বোধকরি কিছু অধিক ছিল রেশমীর নৈকট্যে, দুজনে প্রায় একাঙ্গ হয়ে স্থাণুর মতো, মূর্তের মতো, শিশুর মতো, জগতে সবচেয়ে সুখীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে, ভয়ে আনন্দে, বিচিত্র সৌভাগ্যে, আবার এখনি ছাড়াছাড়ি করতে হবে সেই দুর্ভাগ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপে; নির্বাক তাকিয়ে থাকে ওরা বাঘটার দিকে, শীঘ্র চলে যাক, ধীরে ধীরে যাক, আর কখনো যেন না আসে, আবার কাল যেন এইভাবে আসে—কত কি বিরুদ্ধ ভাবনার বলাকা উড়ে উড়ে যায় ওদের মনে। মুগ্ধ প্রণয়ী যুগলের লীলায় প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করে শার্দূলরাজ নির্দিষ্ট পথে চলে গেল। যে-অরণ্যে ওদের প্রণয়ের ভূমিকা সৃষ্টি হয়েছিল সেই অরণ্যের শার্দূলরাজ নির্মোচ্য গ্রন্থি এঁটে দিল ওদের বসনে। বহু যুগ আগে অরণ্যের এক সর্প যে-ভূমিকার সৃষ্টি করে দিয়েছিল আদিম দম্পতির জীবনে সেই অরণ্যেরই আর এক পশু তারই আর এক অধ্যায়ের সূচনা করে দিল বহুযুগ পরেকার আর এক দম্পতির জীবনে।

বাঘটা চলে গেলেও বাহুবন্ধন ওদের শিথিল হল না, দূরস্থ হ'ল না ঘনিষ্ঠতা, এখনো ভয়ের কারণ যায়নি, এই বিশ্বাস জাগিয়ে রেখে ওরা তেমনি রইলো দাঁড়িয়ে। এমন কতক্ষণ চলতো কে জানে! কিন্তু হঠাৎ সেই সময়ে কোকিলের কুহুতে বুঝি নূতন শর নিক্ষিপ্ত হল, আমের বোলের গন্ধ বুঝি আর একটু চেপে এলো, বাতাসের হুহুতে বুঝি নবীন ছন্দ ধ্বনিত হল আর শুক্লা তৃতীয়ার কৌতূহলী চন্দ্র বুঝি শাখা প্রশাখা ভেদ করে কৌতুকের পিচকারি আর একটু বেগে নিক্ষেপ করল—কি হচ্ছে ভালো করে বুঝবার আগেই জনের ওষ্ঠাধর স্পর্শ হল রেশমীর অধরোষ্ঠে। এমনি চকিতে জ্বালাময় সুখময়, বিষময় অমৃতময়, বেদনা আনন্দময়, সুখদুঃখের নির্যাসময়, বহ্নিজ্বল অগ্নিময় অভিজ্ঞতার সুতীব্র সুদীর্ঘ শূলে আমূল নিহিত হ'ল রেশমীর সত্তায়। সে এক ঝটকায় নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে বেগে ছুটে গেল বাড়ির দিকে, পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল না জনের অবস্থা। কিয়ৎক্ষণ অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অপরাধীর ন্যায় ধীরপদে জন চলতে শুরু করল।

এতক্ষণ কৌতুকপরায়ণ অদৃষ্ট দুটি অবোধ তরুণতরুণীর প্রেমের লীলা দেখে নিশ্চয় খুব হাসছিল—এবারে তার ছুটি হল।

তত্ত্বজ্ঞানীরা চিরকাল ধরে আলোচনা করে আসছেন মূলত মানুষ ভালো কি মন্দ। কিন্তু সত্য কথা এই যে, মানুষ মূলত ভালোও নয়, মন্দও নয়, মূলত মানুষ বিচিত্র, অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত তার প্রকৃতি।

তাই সমাধিতে বসে প্রেমসূত্র রচনায় তার সঙ্কোচ নাই; তাই অচিরগত প্রেয়সীর শ্মশান ভস্ম তার হাতে আবীরমুষ্টি হয়ে ওঠে, তাই সমাধির ফুলে প্রেমের মালা রচনা করে সে; এ কি ভালো মন্দের কাজ! এ কাজ অদ্ভুতের। বোধকারি এই হচ্ছে মানব প্রকৃতির সত্য। কিম্বা তার চেয়েও অধিক, এই বোধ-করি বিশ্বপ্রকৃতির সত্য। জীর্ণ পত্রপুষ্প রচনা করে নূতন জীবনের ভূমিকা, প্রেমের সমাধি গঠন করে নূতন প্রেমের রঙ্গমঞ্চ, শ্মশানের বুকে অংকুরিত হয় পঞ্চবটী আর একদিন অবশেষে সমাধিস্থ মৃতদেহ নবতর জীবনের পাত্র হাতে করে দেখা দেয় জ্যোতির্ময় রূপে। জীবনের অশ্ব সবেগে সোল্লাসে সার্থকতার মুখে টেনে নিয়ে যায় মৃত্যুর অনড় রথখানা। পরাজিত মৃত্যু আনন্দধ্বনি তোলে জয় জীবনের জয়।

(ক্রমশঃ)

ধীরে বহে নীল

॥ চঞ্চল সেন ॥

[তেত্রিশ]

"বাগদাদ প্যাক্ট হচ্ছে একটা বিরাট কারাগার, যার মধ্যে পশ্চিমী দেশগুলি টেনে আনতে চায় সমস্ত আরব দেশগুলিকে"—নয়াদিল্লীর মিশর দূতাবাস থেকে প্রচারিত পুস্তিকা।

মিশর চেয়েছিল আরব দেশগুলিকে নিয়ে একটা সমবেত প্রতিরক্ষা সংগঠন, পশ্চিমী প্রভাবের বাইরে। বহু শতাব্দী ধরে আরবভূমিতে বিদেশী প্রভুত্ব করেছে; তারা স্বরাজ আরবভূমি কল্পনাই করতে পারে না। মনে করে, আরব চিরদিন থেকে এসেছে একটা বিরাট বহিঃশক্তির ছত্রছায়ায়; তাতেই তার মঙ্গল। এ ছত্রছায়ার অভাব হ'লে আরবভূমি, তার অতুলনীয় সামরিক গুরুত্ব ও অফুরন্ত তেল-সম্পদ নিয়ে, শক্তি-শূন্য হ'য়ে পড়বে। আমরা হটে গেলে আসবে রাশিয়া, আর আরব, যে শাসনেই অভ্যস্ত, মেনে নেবে সেই সর্বনাশা পরিণতি। তখন আমরা যাবো কোথায়? সমস্ত ভূমধ্যসাগর, ভারত মহাসাগর এসে যাবে রুশ প্রতাপের গন্ডীতে। পশ্চিম য়ুরোপ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়বে তার আদি-সহচরী এশিয়া থেকে। আরব ভূমির তেল পৌঁছবে না য়ুরোপের বন্দরে বন্দরে। য়ুরোপীয় সভ্যতার চাকা দাঁড়িয়ে থাকবে অচল হ'য়ে। আরবদের শক্তি নেই স্বরাজ সত্তা রক্ষা করবার। তারা সংখ্যায় সামান্য; বিভেদে জর্জরিত। তা ছাড়া তাদের ঐক্য আমাদের সর্বনাশ। তারা যতদিন রাজায়-প্রজায়, রাজায়-রাজায় দেশে-দেশে লড়বে, ততদিনই আমাদের প্রাধান্য। আজ তারা দুর্বল, এই দৌর্বল্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ। দুর্বল বলেই তারা অভিভাবকহীন থাকতে পারে না। তারা বোঝে না আমাদের প্রয়োজন। তাই বলে আমরা এতো বড়ো সভ্য জাত, তাদের রেল গাড়ী দিয়েছি, তার-বেতার দিয়েছি, সভ্যতার চেহারা দেখিয়েছি; আজ আমরা সমস্ত 'স্বাধীন' দুনিয়াকে সাম্যবাদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছি, আরবদের অজ্ঞান, অবুঝ আব্দার কি মেনে নিতে পারি?

"পাওয়ার ভ্যাকুয়ম থিয়োরী"র মোটা-মুটি সরল ব্যাখ্যা হচ্ছে এই।

১৯৫৪ সালে মিশর যৌথ আরব প্রতিরক্ষা সংগঠন তৈরী করার জন্যে তৎপর হ'য়ে উঠেছিল। নাসের বুঝতে পেরেছিলেন ইরাককে যদি তিনি স্বমতে আনতে পারেন তাহলেই তাঁর স্বপ্ন সার্থক হবে। তাই ঐ বছর আগস্ট মাসে মন্ত্রী সালাহ্ সালেমকে ইরাকী নেতাদের সংগে কথাবার্তা কইবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। সারসাংক (Sarsank) শহরে পনেরই থেকে বাইশে আগস্ট পর্যন্ত যে বৈঠক হয় তাতে উপস্থিত ছিলেন ইরাকের রাজা ফয়জল তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ফদেল এল্-গামালি। মনে রাখতে হবে, মিশর তখন সবে মাত্র বৃটেনের সংগে নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ চুক্তি নিয়ে ইরাক একটু গোলযোগের সৃষ্টি করেছিল। চেয়েছিল, এমন একটি শর্ত থাকবে যার সূত্র ধ'রে, যদি ইরাক কোন দেশ দ্বারা আক্রান্ত হয়, বৃটেন সুয়েজ অঞ্চলে ফিরে আসতে পারবে। মিশর এ শর্ত মানতে রাজি হয়নি। কিন্তু প্রবল ইংগ-মার্কিন চাপে, মেনে নিয়েছিল আর একটি শর্ত, যার ভয়াবহ তাৎপর্য আজকাল সিরিয়া-তুর্কী বিরোধের দিনে সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। মেনে নিয়েছিল, তুর্কী যদি কোন দেশ দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহ'লে বৃটেন সুয়েজ ঘাঁটিতে ফিরে আসতে পারবে।

সারসাংক বৈঠকে সালাহ্ সালেম ইরাককে অনুরোধ করেন পশ্চিমী প্রতাপের বাইরে একটি সমবেত আরব প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠন করতে এগিয়ে আসার। আরবভূমি রক্ষা করবার পবিত্র দায়িত্ব একমাত্র আরবই

পালন করতে পারে; বাইরের কোন শক্তিকে এ ভার দেবার মানে তার অধীনতা স্বীকার করা। মিশর-প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন সমস্ত আরব দেশের সৈন্যদের একটি কম্যাণ্ডে নিয়ে আসা হোক; নয়তো কাগজে কলমে যে "যৌথ আরব প্রতিরক্ষা চুক্তি" বর্তমান, তার কোন প্রাণ থাকবে না। তা ছাড়া যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণেও আরব দেশগুলিকে এক সঙ্গে পারস্পরিক সহায়তায় অগ্রসর হ'তে হবে। সালাহ্ সালেম বলেন, "পশ্চিম আমাদের চায়। চায় আরবদের, আর চায় তেল। তাইতো প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে আমাদের এক্ষুনি পূর্ণ স্বরাজ পাবার! আমরা পশ্চিমের অনুচর হব না। আজ যদি আমরা কোন পশ্চিমী চুক্তিতে যোগ দি, আমাদের স্বরাজ যাবে, জাতীয়তা-বাদ যাবে।" ইরাকী নেতাদের তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, জাগ্রত আরব জনমত কোন পশ্চিমী চুক্তিতে যোগদানের ঘোরতর বিরোধী; ইরাকের প্রধান মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করেন কাইরোতে নাসেরের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনার জন্যে।

ইরাকী তরফ থেকে উত্তরে বলা হয় আরবদের যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তির সঙ্গে পশ্চিম প্রণোদিত অন্য কোন চুক্তির অমিল যে হ'তেই হবে এমন কোন মানে নেই। রাশিয়া থেকে আক্রমণ-ভয়টাও ভেবে দেখতে হবে। তা ছাড়া, সমস্ত আরবের মহাশত্রু ইজরেইল পশ্চিম-মিত্র। আজ বৃটেন ও আমেরিকাকে চটালে তারা ইজরেইলকে আরো শক্তিশালী ক'রে তুলবে। তাতে আরবদেরই সমূহ ক্ষতি। অপরপক্ষে বৃটেন-আমেরিকার মৈত্রী যদি আরব দেশগুলি অর্জন করতে পারে, এ ভয়াবহ সম্ভাবনা তিরোহিত হবে। ইরাকের রাষ্ট্রদূত ৫ই সেপ্টেম্বর নাসেরকে জানান পশ্চিমী বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পরে ইরাক প্রধান মন্ত্রী কাইরোতে আসবেন মিশর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথাবার্তার জন্যে।

এই সময় ইরাকের প্রধান মন্ত্রী হ'লেন নূরী এস-সৈয়দ। ১৯৫৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি উপস্থিত হ'লেন কাইরোতে; দুদিন ধ'রে কথাবার্তা চললো নূরী ও নাসেরের। বাগদাদ চুক্তি ও পরবর্তী ঘটনাবলীর পক্ষে এ আলাপ গুরুত্বপূর্ণ। নূরীর অনুরোধে নাসের বাগদাদ চুক্তির একটা সীমাবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু সে অনুরোধ চুক্তির শর্তাবলীতে রক্ষিত হয়নি।

নূরী নাসেরকে যা বুঝিয়েছিলেন মোটামুটি তা হচ্ছে এই: ইরাকের পরিস্থিতি মিশরের সঙ্গে সর্বাংশে তুলনীয় নয়। মিশরের প্রধান কর্তব্য সুয়েজ অঞ্চল থেকে বৃটিশ অপসরণ বাস্তবে পরিণত করা। ইরাকও চাইছে ১৯৩০ সালের ইঙ্গ-ইরাক চুক্তির সমাপ্তি। কিন্তু বৃটেন ইরাক ছেড়ে যেতে রাজী নয়। তাই ইরাককে এমন একটা ব্যবস্থার শরণাপন্ন হ'তে হচ্ছে যাতে বৃটিশ কর্তৃত্বের অবসান হবে, বৃটিশ যুদ্ধ-ঘাঁটিগুলি চলে আসবে ইরাকের হাতে। তা ছাড়া ইরাকের প্রয়োজন অস্ত্রের, যার জন্যে হাত পাততে হবে বৃটেনের কাছে। তুর্কী বহুদিন ইরাকের মসুল প্রদেশের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি হানছে। তুর্কীর সঙ্গেই ইরাককে মিত্রতা স্থাপন করতে হবে। এখন, বৃটেনের প্রভাবকে খর্ব করার জন্যেই বাগদাদ চুক্তিতে ইরাক আনতে চাইছে আরো তিনটি মুসলিম রাষ্ট্রকে; তুর্কী, ইরাণ, পাকিস্থান।

নূরী বোঝালেন, এ চুক্তি কোনমতেই যৌথ আরব প্রতিরক্ষা চুক্তিকে খর্ব বা প্রভাবিত করবে না। আরবদের প্রতিরক্ষা প্রধানত এই যৌথ চুক্তি অনুসারেই

সংরক্ষিত হবে। বাগদাদ চুক্তি হবে একটি আঞ্চলিক চুক্তি। অন্য কোন আরব দেশকেই এর মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা করা হবে না। অবশ্য বৃটেনের ইচ্ছা আরব প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আসন পাবার। কিন্তু মিশর যদি তা না চায় তাহ'লে ইরাকও চাইবে না। বাগদাদ চুক্তি চারটি মুসলমান দেশকে একত্রিত ক'রে ইজরেইলকে ভয় পাইয়ে দেবে। ইরাক, আরব স্বার্থকে বাগদাদ চুক্তির চোখে না দেখে আরব লীগের চোখেই দেখে চলবে। নাসের আরব দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী লোভ থেকে সমবেত চেষ্টায় মুক্ত করবার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করলে, ন্যুরী বললেন, ইরাকের সমস্যা একটু অন্যরকম; কিন্তু ইরাক বৃটেনের সঙ্গে কোনো রকমের সমঝোতায় উপনীত হ'লে, তার সঙ্গে মিশর বা অন্য কোন আরব দেশকে জড়াবার চেষ্টা করা হবে না।

ডিসেম্বর মাসে আরব লীগ পলিটিক্যাল কমিটির সভা বসলো সমস্ত আরব দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিয়ে। ন্যুরীর প্রতিনিধি নিবেদন করলেন মিশরের চিন্তাধারার যাথার্থ্য নিয়ে ইরাক সরকারের কোন সন্দেহ নেই। সুয়েজ থেকে বৃটিশ দাপট হটাবার জন্যে মিশর যেমন বৃটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, ইরাকও তেমনিতরো একটি চুক্তিতে নামসই করতে চায়। তার মুখ্য উদ্দেশ্য ইরাকে বৃটিশ সামরিক প্রতাপ হ্রাস করা। শুধু ইরাক এইটুকু মেনে নেবে যে যদি তুর্কী বা ইরাকের উপর পরদেশী আক্রমণ হয় তবে বৃটেন ইরাকে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। পলিটিক্যাল কমিটি এই প্রস্তাবনা গ্রহণ করে। সর্বসম্মতি নিয়ে ঠিক হয় যে, যৌথ আরব প্রতিরক্ষা চুক্তির বাইরে কোন আরব দেশই চুক্তি বা সমঝোতা স্বাক্ষর করবে না; পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে তখনই চুক্তি করা হবে যখন তারা আরবদের ন্যায্য দাবী মেনে নিয়েছে ও তাদের অস্ত্র সরবরাহ করতে রাজী; আর একটা যৌথ আরব কম্যান্ড সৃষ্টি ক'রে আরব প্রতিরক্ষা চুক্তিকে আরো বলীয়ান ক'রে তোলা হবে। ১৯৫৫ সালের ৬ই জানুয়ারী তুর্কী-ইরাক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, আর তাতে অন্য সব আরব দেশই যোগদানের আমন্ত্রণ পায়। এখানেই প্রথম ন্যুরী নাসেরকে প্রদত্ত আশ্বাস ভঙ্গ করেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল একটি আঞ্চলিক চুক্তি, যাতে ইরাক ছাড়া অন্য কোন আরব দেশকে টেনে আনা হবে না। তিনি গোড়াপত্তন করলেন একটি সামগ্রিক মধ্যপ্রাচ্য চুক্তির তুর্কী থেকে আডেন পর্যন্ত যার বিস্তার, বৃটেন ও আমেরিকার বাহুবলে যার শক্তি। নাসের প্রস্তাব করলেন সমস্ত আরব প্রধান মন্ত্রী মিলে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার মোকাবিলা করা হোক। ন্যুরী এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। ফেব্রুয়ারী মাসের ২৪ তারিখে বৃটেন এসে যোগ দিল তুর্কী-ইরাক-পাকিস্তান চুক্তিতে, এর নতুন নামাকরণ হল বাগদাদ চুক্তি। ৪ঠা এপ্রিল ইরাক নতুন এক চুক্তি করলো বৃটেনের সঙ্গে; তাতে দেখা গেল, ইরাক থেকে অপসরণ তো দূরের কথা, বৃটেনের সামরিক কর্তৃত্ব আরো পাকা হ'য়ে উঠলো।*

১৯৫৪ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তুর্কী-পাকিস্তান চুক্তিতে যে সামরিক সংস্থার গোড়াপত্তন হ'য়েছিল, এক বছর পরে তার কাঠামো সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হল।

বাগদাদ চুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য ৪ঠা এপ্রিল হাউস অব কমন্স্‌এ বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেন এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের সহকারী মন্ত্রী এণ্টনী নাটিং বিবৃত করলেন। ইডেন পরিষ্কার বললেন, "এ চুক্তির সাহায্যে আমরা মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের প্রভাব ও আমাদের প্রতিষ্ঠা শক্তিভিত করতে পেরেছি।" নাটিং যোগ দিলেন, "অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলোকেও এ চুক্তিতে আমরা টেনে আনবার চেষ্টা করছি।" ইডেন আরো ব্যাখ্যা ক'রে বললেন, "বাগদাদ চুক্তি আমরা কেন স্বাক্ষর

---

* এ সময়কার মূল নথিপত্রের জন্যে Documents on International Affairs, 1954 দেখুন।

Royal Institute of International Affairs থেকে এ বছরই প্রকাশিত হয়েছে। নয়াদিল্লীর মিশর দূতাবাস প্রচারিত Baghdad Pact and Its Real Facts পত্রিকা।

করেছি তা অতি সুস্পষ্ট। আমাদের প্রতিষ্ঠা এতে বেড়েছে, আমাদের কথার দাম চড়েছে। এখন আমরা মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনা প্রবাহে হস্তক্ষেপ করতে পারবো।...আমার ধারণা মানচিত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে বাগদাদ চুক্তির উদ্দেশ্য আরব ও ইহুদি দৃষ্টি পরস্পর থেকে অন্য দিকে ঘোরানো।"

এই 'অন্য দিক' মানে রাশিয়া। অথবা নাসের।

বাগদাদ চুক্তি শীতল যুদ্ধকে সমস্ত মধ্য-প্রাচ্যে ছড়িয়ে দিল, তার প্রবাহ এসে ঠেকল নিরপেক্ষ ভারতের দ্বারে। পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেবার সময় রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার ভারতকেও অনুরূপ সাহায্য গ্রহণে আমন্ত্রণ করেছিলেন। যেদিন পাকিস্তান-তুর্কী চুক্তি তৈরী হয় সেইদিনই তিনি শ্রী নেহরুকে এক পত্র লিখেছিলেন, "আমি জানি আপনার গভর্নমেণ্ট মনে করেন অর্থনৈতিক প্রগতিই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার প্রধান পথ।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে এসেছে এবং কংগ্রেসের কাছে আমি প্রস্তাব পাঠাচ্ছি যাতে এ সাহায্য না থেমে যায়। আমাদের আরও বিশ্বাস যে 'স্বাধীন' (অর্থাৎ অ-কম্যুনিস্ট) পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে ভারতের যথেষ্ট প্রতিরক্ষা শক্তি প্রয়োজন এবং আপনি যেভাবে আপনাদের সামরিক প্রতিষ্ঠান সুপরিচালিত করে এসেছেন, আমরা তার প্রশংসা করি। যদি আপনার গভর্নমেণ্ট মনে করেন মার্কিন সামরিক সাহায্য ভারতের প্রয়োজন, তাহলে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনার অনুরোধ আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করবে।"

আইসেনহাওয়ারের 'নাতিদীর্ঘ' পত্রের যে অতি সংক্ষিপ্ত জবাব নেহরু দিয়েছিলেন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরিমেয়। ১লা মার্চ তারিখে মার্কিন প্রেসিডেণ্টের পত্রের প্রাপ্তি ধন্যবাদের সঙ্গে স্বীকার করে নেহরু বললেন, "যে আশ্বাস আপনি দিয়েছেন তার মূল্য আমি স্বীকার করি। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের দেশের জনসাধারণ ও সরকারের অভিমতও আপনি ভালোই জানেন। যে নীতি ও যে পথ আমরা অনেক সতর্ক বিবেচনার পরে বেছে নিয়েছি তার প্রেরণা ও আদর্শ হচ্ছে বিশ্বের শান্তি ও সংরাক্ষ নির্ধারিত করার তীক্ষ্ণ অভিপ্রায়। আমরা এ নীতিই অনুসরণ করে চলবো।"

মিশর, রাশিয়া ও ভারত সমান তীব্রতার সঙ্গে বাগদাদ চুক্তির নিন্দা ও বিরোধিতা করে এসেছে। নাসের দেখেছেন ন্যাটোর আশঙ্কে-ভাঙন। বুঝতে পেরেছেন, এই চুক্তির সাহায্যে যেটুকু আরব ঐক্য বহুদিনের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে নির্মিত হয়েছিল তাকে ছত্রভঙ্গ করে আরবকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে আরবের পেছনে, এই পথেই পশ্চিমী দম্ভ প্রত্যাবর্তন করেছে মধ্যপ্রাচ্যে। ভারত প্রমাদ গুনেছে পাকিস্তানের সামরিক বল-বৃদ্ধিতে। তা ছাড়া ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের যোগাযোগ আরবভূমি বা মধ্য-প্রাচ্যের প্রাচীন ঐতিহাসিক পথে। এ পথ যতো শান্ত, নিরাপদ, সুস্থির ও পরিতৃপ্ত, ততোই মঙ্গল। ভারতের উপর যতো অত্যাচারী হামলা করেছে তারা সবাই এসেছে হয় ইরাণ-আফগানিস্থানের পথে, নয়তো ভূমধ্য ও আরব সাগর পাড়ি দিয়ে। সর্দার পানিকর যাকে "ভাস্কো দা গামার যুগ" বলেছেন সেই পাঁচশত বছরব্যাপী ভারতের দুর্দিনে ভারত ও প্রাচ্য সাম্রাজ্য দখলে আনবার ও রাখবার জন্যেই য়ুরোপীয় শক্তিগুলি বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যে স্বাধিকার বিস্তার করেছিল। আজ ভারত স্বাধীন; সে চায় এমন একটা আরবভূমি, যেখানে রাজনৈতিক সন্তোষ অর্থনৈতিক প্রগতির হাত ধরে পথ নির্মাণ করবে রাষ্ট্রীয় স্থিতি-শীলতার। বাগদাদ চুক্তি ভারতের এই সদিচ্ছার পরিপূর্ণ পরিপন্থী।

রাশিয়া চটেছে তার দক্ষিণ সীমান্তে পশ্চিমী শক্তি কায়েম হ'য়ে বসায়। চটেছে, আবার খুশিও হয়েছে। বাগদাদ চুক্তিই তার মধ্যপ্রাচ্য প্রবেশের পথ প্রশস্ত করেছে। এই সমরায়োজন, তা সে ভাবগতই হোক আর কূটনৈতিকই হোক, সে উপেক্ষা করে নি।

(ক্রমশ)

সালাজারের জেলে উনিশ মাস

ত্রিদিব চৌধুরী

(২৩)

রাম দেশাই ও গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের কথা

পশ্চিম কুয়ার্টেলের হাজতে আমি তেইশ-চব্বিশ দিন মাত্র ছিলাম। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তখন মাঝামাঝি সময়। গোয়ার ভিতরে এবং বাহিরে ভারতে তখন প্রবল উত্তেজনা চলিতেছে। কিন্তু গোয়ার ভিতরকার প্রকাশ্য আন্দোলন তখন প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে বলিলেও চলে। গোয়ার ভিতরে জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সত্যাগ্রহের শেষ প্রকাশ্য অনুষ্ঠান হয় ১৯৫৫ সালের ৬ই এপ্রিল—যে দিন মাপসাতে গোয়া কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিতে যাইয়া শ্রীযুক্তা সুধাবাই যোশী গ্রেপ্তার হন। সেদিন শুধু মাপসাতেই নয়, গোয়ার সবচেয়ে বড় শহর মাড়গাঁও-এও প্রকাশ্যভাবে সত্যাগ্রহের অনুষ্ঠান হয়। তাহার নেতা ছিলেন ফাবিয়ান দা কস্তা। ইহার পরে গোয়ার ভিতরকার জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন অবশ্যম্ভাবীরূপে সশস্ত্র সংগ্রাম ও ক্রমশ গুপ্ত সন্ত্রাসবাদের পথে চলিতে আরম্ভ করে। গোয়া কংগ্রেসের তখন যে সংগঠন ছিল এবং আন্দোলনের পিছনে তখন যে পরিমাণ গণ-সমর্থন ছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া যে আরো কিছুদিন গোয়ার ভিতরে গোয়াবাসীদের সত্যাগ্রহের প্রকাশ্য অনুষ্ঠান চালাইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইত না তাহা নয়। কিন্তু ভারত হইতে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের আসা আরম্ভ হইলে পর যে কোনো কারণেই হোক, গোয়া কংগ্রেসের যে সমস্ত কর্মী তখনও জেলের বাহিরে ছিলেন—অবশ্য তাহাদের সকলেই তখন আত্মগোপন করিয়া কোনোমতে গ্রেপ্তার এড়াইতেছিলেন। তাঁহাদের মনে ধারণা হয় যে, এখন গোয়ার ভিতরে আর সত্যাগ্রহ চালানোর দরকার নাই; আন্দোলন এখন প্রধানত ভারত হইতে পরিচালিত হইতে থাকিবে। জনসাধারণের মনেও একটা ধারণা জন্মে যে এখন ভারত হইতে সত্যাগ্রহী দল আসিতেছে এবং তাহাদের সঙ্গে বড় বড় নেতারাও যখন আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন (আমরাই তখন তাহাদের কাছে ভারত হইতে আগত 'বড়' নেতা!), তখন নিশ্চয়ই এবার ভারত সরকার পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যাইতেছেন। আমি যখন গোয়ার ভিতরে প্রবেশ করি পণ্ডিত নেহরু তখন সবে মাত্র রুশিয়া পরিভ্রমণ শেষ করিয়া, রোমের পথে গ্রেট বৃটেন হইতে ভারতে পৌঁছিয়াছেন। সেই সময়ে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের উপর পর্তুগীজদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী গোয়া হইতে বিতাড়িত সত্যাগ্রহীদের মারফত সারা ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়া প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা গোয়া সমস্যা নিয়া পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানাইয়া গরম গরম বিবৃতি দিতেছেন। হায়দরাবাদের মত, গোয়ার সম্পর্কেও পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে 'পুলিসী' ব্যবস্থা বা কোনোপ্রকার সামরিক ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রযুক্ত হোক এরকম একটা দাবী চারিদিক হইতে উঠিতে থাকে। পণ্ডিত নেহরু অবশ্য সকল সময়েই এ কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থায় ভারতের পক্ষে পর্তুগীজদের সম্পর্কে এরূপ কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হইবে না; সত্যাগ্রহ আন্দোলনকেও ভারত সরকার কোনো সময়েই প্রকাশ্য সমর্থন জানান নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সোভিয়েট রুশিয়া ও য়ুরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পণ্ডিত নেহরু নিজেও গোয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে যে সমস্ত বিবৃতি দেন তাহাতে গোয়ার ভিতরে জন সাধারণের মনে একটা নিশ্চিত ধারণা জন্মে যে যুদ্ধ বা 'পুলিসী' ব্যবস্থা না হইলেও ভারত সরকার গোয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়ই এবার এমন কোনো জোরালো কূট-নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যাইতেছেন যাহাতে অচিরেই গোয়া সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে এবং পর্তুগীজরা গোয়া দমন, দিউ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। পণ্ডিত নেহরু নিজে না হইলেও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গোয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দেওয়ার যুক্তি হিসাবে বলিতে থাকেন যে তাঁহারা, অর্থাৎ কংগ্রেস ও ভারত গবর্ণমেণ্ট, কূট-নৈতিক পথে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া পর্তুগীজদের উপর আন্তর্জাতিক 'চাপ' দিয়া অচিরেই গোয়া সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা করিতেছেন। কংগ্রেস সভাপতি বা কংগ্রেস নেতাদের এইসব কথা রেডিও মারফত শুনিয়া গোয়ার সাধারণ লোকে স্বভাবতই এটা ধরিয়া নেয় যে এবার ভারত সরকার সত্য সত্যই কিছু করিবেন।

অবশ্য গোয়ার বা ভারতের জনসাধারণের

মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার জন্য পণ্ডিত নেহরুকে নিশ্চয়ই দায়ী করা চলে না। পৃথিবীর আন্তর্জাতিক অবস্থার বাস্তব কার্যকারণ সম্পর্কে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে খুব স্পষ্ট ধারণা না থাকার জন্য এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের দেশের নেতাদের মর্যাদা ও শক্তির পরিমাণ ও সীমানা সম্পর্কে নিতান্ত অবাস্তব কল্পনাশ্রয়ী ধারণা থাকার দরুণ, 'পণ্ডিতজী সব ঠিক কর দেঙ্গে' জাতীয় একটা আশা বা আশ্বাস সহজেই লোকের মনে দানা বাঁধিয়া ওঠে। গোয়ার ভিতরে এই আশা শুধু সাধারণ লোকের মনেই নয়, শিক্ষিতদের মনেও খুব বেশী করিয়া জাগে। গোয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত, এবং ১৯৫৪ সালের প্রথম দিকে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন আবার নূতন করিয়া শুরু হওয়ার পর হইতে গোয়ার জনসাধারণ যে ধরনের অমানুষিক ও নির্বিচার পুলিসী দমননীতির সম্মুখীন হইয়াছে, সে সম্পর্কে যাঁহাদের কোনো ধারণা আছে, তাঁহাদের পক্ষে গোয়াবাসীদের ভিতর ভারত গবর্নমেণ্ট, ও বিশেষ করিয়া পণ্ডিত নেহরু সম্পর্কে, গোয়া সমস্যার সমাধান বিষয়ে এই প্রত্যাশার মনোভাবকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করা ও বোঝা কঠিন হইবে না। ১৯৫৫ সালের জুলাই আগস্ট মাস নাগাদ প্রায় চার-পাঁচ হাজারের মত গোয়াবাসী রাজনৈতিক সন্দেহভাজন হিসাবে গ্রেপ্তার হইয়া, ৭।৮ মাস করিয়া বা কমপক্ষে ৩।৪ মাস করিয়া আটক থাকিয়া, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ইন্‌স্পেক্টর অলিভেইরা-র উদ্ভাবিত পিটুনী তক্তার মার খাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। গোয়ার ভিতরে আন্দোলনের নেতা বা কর্মী হিসাবে যাঁহারা কাজ করিতে পারেন এমন লোক তখন প্রায় দুই শতের উপর গ্রেপ্তার হইয়া গিয়াছেন; প্রায় শতাধিক লোকের দশ হইতে একুশ-বাইশ বছর সাজা হইয়া গিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে গোয়ার ভিতরে জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক কোনো সংবাদপত্র নাই, থাকা সম্ভব নয়। ভারতে বৃটিশ দমননীতির কঠোরতম দিনগুলিতে—দু' একবার ছাড়া সমস্ত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র কোন সময় বন্ধ হইয়া যায় নাই। বন্ধ হইলেও তাহা জরুরী সরকারী প্রেস আইন ও দমননীতির প্রতিবাদে বন্ধ হইয়াছে; মোটা টাকার জামানত দাবী করিয়া, রাজদ্রোহের মামলা, কিম্বা প্রেস আইন অনুযায়ী মামলা চালাইয়া সময় সময় সংবাদপত্রের মুখবন্ধ করার চেষ্টা হইয়াছে বটে। কিন্তু কোনো সময়েই সংবাদপত্রের মারফত জনমতের দাবী যত ক্ষীণভাবেই হোক প্রকাশ করাটা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু গোয়াতে কোনো সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে চাহিলেই কাগজের মোট মূলধনের চেয়ে বেশী পরিমাণ টাকা জমা রাখিতে হয়। আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার বহু আগে হইতেই, পুলিসের দ্বারা সেন্সার না করাইয়া সংবাদপত্র কেন, বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র, রেস্তোরাঁ-হোটেলের ছাপানো বিল বা মেনু পর্যন্ত ছাপানো যাইত না। সরকারী ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা সরকারের সম্মতি ভিন্ন জনমত প্রকাশের বিন্দুমাত্র সুযোগ ছিল না। গণ-বিক্ষোভ প্রকাশের তো কোনো কথাই ওঠে না। রাজদ্রোহের মনোভাব আছে—পুলিসের কাহারো সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ হইলেই, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া কোনো না কোনো অজুহাতে সাজা দেওয়া হইবে। আমরা বৃটিশ আমলে ১৯২১ সালে 'অসহযোগ' আন্দোলনের সময়, ১৯৩০-৩২ সালের আইন অমান্যের কালে, পরে যুদ্ধের সময়, বা ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের সময়েও—বৃটিশ আইন-কানুনের বেড়াজালের মধ্যেও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারের যতটুকু সুযোগ সুবিধা নিতে পারিয়াছি, তাহার শত ভাগের এক ভাগও গোয়াতে বা খাস পর্তুগালেও পাওয়া সম্ভব নয়। সেখানকার আইন কানুনই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এই অবস্থার ভিতরে, সালাজারী শাসনের এই প্রচণ্ড দমননীতি ও স্বেচ্ছাশাসনের বিরুদ্ধে দুই বছর ধরিয়া অকুতোভয়ে সংগ্রাম করার পর, মুক্তিকামী গোয়াবাসীরা যদি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র কর্ণধারদের মুখের দিকে তাকাইয়া কার্যকরী সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়া থাকে তো তাহাদেরকে নিশ্চয়ই কোনো দোষারোপ করা চলে না।

গোয়াতে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিকদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন, তাহাদের সেই প্রত্যাশাকে আরো বেশী করিয়া জাগাইয়া তোলে। তাহার ফল হয় এই যে, গোয়ার ভিতরে গোয়াবাসীদের প্রকাশ্য আন্দোলন কিছুটা ঝিমাইয়া পড়ে, কিছুটা স্তিমিত হইয়া আসে। গোয়া কংগ্রেসের যা কিছু সংগঠন তখন ছিল তাহা এই সময় সম্পূর্ণ গুপ্ত সংগঠনের রূপ নেয়; প্রথম হইতেই গোয়াতে গোয়া কংগ্রেস, বা অন্য কোনো জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কোনোদিন প্রকাশ্যভাবে সংগঠিত হইতে পারে নাই। ভারতীয় সত্যাগ্রহীরা গোয়ায় আসিতে আরম্ভ করিলে পর, গোয়ার ভিতরে গোয়া কংগ্রেসের কর্মীদের প্রধান কাজ দাঁড়াইয়া যায়, তাহাদের পথ দেখাইয়া ভিতরে আনার বন্দোবস্ত করা, তাহাদের সত্যাগ্রহের জায়গা ঠিক করা ইত্যাদি। আমাদের গোয়ার ভিতরে আসায় গোয়ার ভিতরে সাধারণ লোকের মনে স্বভাবতই একটা প্রত্যাশা মিশ্রিত উত্তেজনার ভাব—ইংরাজীতে যাহাকে 'টেনশন' বলে—সেইরকম একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু, সেই আবহাওয়াকে আন্দোলন গড়িয়া তোলার কাজে লাগানোর মত সংগঠন তখন আদৌ ছিল না। অথচ তাই বলিয়া জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে পুলিসের

দমননীতির প্রকাশ একটুও কমে নাই। ভারত হইতে গোয়া সীমান্তের ভিতরে যেদিকেই বা যেখানেই ভারতীয় সত্যাগ্রহীরা আসুক না কেন, সেই জায়গার আশেপাশে যেখানে যত গ্রাম বা বসতি আছে সমস্ত জায়গায় ধর-পাকড় আরম্ভ হইয়া যাইবে। সত্যাগ্রহীরা বিশেষ করিয়া এই রাস্তায় কেন আসিল, এই সব গ্রাম ও বাজারের ভিতর দিয়া কেন আসিল, কে তাহাদের পথ দেখাইয়া আনিয়াছে, কেহ তাহাদের আশ্রয় দিয়াছে কিনা, সাহায্য করিয়াছে কিনা—এইসব জিনিস অনুসন্ধানের জন্য পুলিসের ও মিলিটারীর হামলা হইবে। ইহার হাত হইতে কোনো মতেই কাহারো অব্যাহতি নাই। একবার পুলিসের সন্দেহ হইলেই হইল। সময় সময় ইহার ফলে নিতান্ত নিরপরাধ লোকও পুলিসের বেড়াজালে পড়িয়া কুয়ার্তেল হাজত পর্যন্ত আসিয়াছে। আমার পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের হাজতে থাকার সময় তাহার দু'একটি কৌতুকাবহ নিদর্শন চোখে আসিয়াছে।

আমাদের একনম্বর হাজতে ঢুকিয়া আমি রাম দেশাই নামে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখি। তিনি সুপারির ব্যবসায়ী। আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর ভারত-গোয়া বর্ডারে পুলিসের কড়াক্কড়ি বাড়িয়া গিয়াছে; আইনী বে-আইনী কোনোভাবেই আর পুনা, বেলগাঁও, কারওয়ার বা সাবন্তবাড়ীর দিকে সুপারি চালান দেওয়া যাইতেছে না। রাম দেশাই অবশ্য গোয়ার বর্ডার এলাকার ছোট ছোট ব্যবসায়ীর মত বে-আইনীভাবেই তাঁহার সুপারি চালান দিতেন। তাঁহার অবশ্য নিজের কিছু সুপারির বাগানও আছে। স্মাগলিং গোয়া সীমান্তের সাধারণ লোকের জীবিকা অর্জনের একটা সহজ ও প্রায় সমাজ-সম্মত উপায়। গোয়াতে জিনিসপত্রের—বিশেষ করিয়া বিদেশ হইতে আমদানী জিনিসের দাম অত্যন্ত কম; হার নিতান্ত নামমাত্র। পড়তা বুঝিয়া, একটু পথ ঘাট দেখিয়া সেই সব জিনিস ভারতের এলাকায় লুকাইয়া চালান দেওয়া, আবার যে সব জিনিস গোয়ায় পাওয়া যায় না বা দর বেশী সেই সব জিনিস ভারত হইতে গোয়ায় আনিয়া বিক্রী করাতে বর্ডার এলাকার লোকেরা খুব বেশী দোষের কিছু দেখে না—বিশেষ করিয়া গোয়াতে; কারণ গোয়াতে গোয়ার ভিতরে থাকিয়া সাধারণ লোকের জীবিকা অর্জনের সুযোগ সুবিধা খুবই কম। 'স্মাগলিং' বা 'ব্ল্যাক' কথা দুইটি কোংকনী গোয়াতে জীবিকা অর্জনের অন্যান্য পাঁচটি পেশার মত একটি সাধারণ পেশা বলিয়া স্বীকৃত এবং ততটা নিন্দার্হ নয়; অন্যান্য আর পাঁচটা ব্যবসার মতই একটা ব্যবসা। সত্যাগ্রহী আন্দোলনের সঙ্গে বা মুক্তি আন্দোলনের সক্রিয় সাহায্যকারী এবং আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন অনেক লোককেও (যাহারা রাজনৈতিক কারণে পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে আসিয়াছে) তাহাদের 'জীবিকা'র কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছি—'ব্ল্যাকের কাজ করি'। এইসব লোকই আবার পুনা বা বেলগাঁও হইতে গোপনে গোয়া কংগ্রেসের বা আজাদ গোমন্তক দলের লিফ্লেট, হ্যাণ্ডবিল, পোস্টারের বাণ্ডিল নিয়া আসিয়াছে; গোয়ার ভিতরে যথাস্থানে সে সব পৌঁছাইয়া দিয়াছে, গ্রামে গ্রামে বিলি করার বন্দোবস্ত করিয়াছে। কাজে কাজেই পর্তুগীজ পুলিসের কিছুটা নজর এইসব লোকের উপরও কিছুটা আসিয়া পড়িয়াছিল। রাম দেশাই অবশ্য সেরকম কিছু করেন নাই। বরং সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার পর তাঁর সুপারির ব্যবসায়ে মন্দা আসিয়াছে, বাজার নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেজন্য তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উপরেই চটা। ধর্মভীরু, গেরস্থ লোক, হাজতেও নিয়মিত পূজা অর্চনা করেন; সুপারির বাগান আর সুপারির চোরাই চালানের ব্যবসায়ে অল্প দু' চার পয়সা জমাইয়া ছেনও। বেচারী গোয়াতে সুপারির ব্যবসায়ের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া ভারতে তাঁহার কোনো আত্মীয়কে চিঠি লিখিয়া এই সময় খবর দেন—"এদিককার বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ, বর্ডারের কড়াক্কড়ির ফলে এখান হইতে বেশী কিছু পাঠানো সম্ভব হইবে না। ওদিক হইতে কিছু পাঠানো যায় কিনা খবর দাও" ভদ্রলোক মারাঠী-কোংকনীতে জড়াইয়া মেসেজ লিখিয়া খামে করিয়া ডাকে চিঠি দিয়াছেন। পুলিস সেন্সরে যথারীতি সে চিঠি ধরা পড়িতে আর যায় কোথায়? নিশ্চয়ই বুড়ো দেশাই তলায় তলায় কিছু করিতেছে। তা' ছাড়া, দেশাই কিছুদিন আগে ভারতে কোথায় গিয়াছিল? দেশাই আসলে গিয়াছিলেন পুনা হইতে নাসিকে, বহুকালগত পিতামাতার সপিণ্ডকরণের জন্য। সপিণ্ডকরণ কি, তাহা পর্তুগীজরা বোঝে না। তাহার উপর দেশাইদের গ্রামের কাছ দিয়া ক'দিন হইল ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের একদল আসিয়াছে। সুতরাং দেশাইয়ের ডাক পড়িল পাঞ্জিম কুয়ার্তেলের এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে সেখানে এক নম্বর হাজতে তাঁহার জায়গা হইয়া গেল। আমি যতদিনে গোয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি ততদিন হাজতে ছেলেপিলের দল মিলিয়া দেশাইকে সত্যাগ্রহের এবং সত্যাগ্রহীদের কথা কিছু কিছু বুঝাইয়াছে। ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের হাতে চড়-চাপড় খাওয়ার পর দেশাই পর্তুগীজদের উপরও হাড়ে হাড়ে চটিয়াছেন। অবশ্য আমি যাওয়ার পর তাঁহাকে খুব বেশীদিন থাকিতে হয় নাই। তিনি যাওয়ার ক'দিন আগে সঙ্গোপনে আমাকে জানাইয়াছিলেন, তাঁহার ছেলেরা তাহাদের থানার শেফকে কিছু টাকা দিয়া ভালো রিপোর্ট লিখাইয়া নিয়াছে, তাঁহাকে বেশীদিন হয়ত আর থাকিতে হইবে না। তবে গোয়া ভারতে 'বিলীন' (ইংরাজী merged শব্দের মারাঠী প্রতিশব্দ) হইয়া যাওয়ার পর আমি যেন একবার তাঁহার বাড়িতে আসি। তাঁহার বাড়িতে দু' দিন না থাকিয়া আমার বাংলা দেশে ফিরিয়া যাওয়া চলিবে না। সত্য সত্যই একদিন বিকালবেলায় তাঁহার খালাসের ডাক আসিল। গোয়াতে কয়েদী খালাসের নিয়ম, আসামী যেখান হইতে ধরা পড়িয়াছে পুলিস প্রিজন ভ্যানে করিয়া তাহাকে সেখানে নিয়া গিয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিবে। রাম দেশাই তাড়াতাড়ি করিয়া তাঁহার জিনিসপত্র গুছাইয়া নিয়া হাত জোড় করিয়া আমার কাছে বিদায় নিতে আসিলেন। বেচারী হিন্দী-ইংরাজী জানেন না। মারাঠী-কোংকনীতে মিশাইয়া এক গাল হাসিয়া দেশাই জানাইলেন—"মি জাতো" (আমি যাইতেছি)। তাহার পর একটি হিন্দী জানা ছেলেকে কাছে ডাকিয়া আমাকে বলিতে বলিলেন,—"চৌধুরী সাহেবকে জানাও, গোয়া বিলীন হওয়ার পর আমার কথা যেন না ভোলেন। আমার বাড়িতে তাঁহার নিমন্ত্রণ রহিল।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সুপারির ব্যবসার কি হইবে"? দেশাই উত্তর দিলেন, "আমি আর বেশী ভাবিতেছি না, এত সব ছোট ছোট ছেলেরা দেশের স্বাধীনতার জন্য এত কষ্ট করিতেছে, আমার না হয় একটু আর্থিক ক্ষতি হইল"? তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন—"চৌধুরী সাহেব, আমি ব্যবসায়ী লোক, ভীরু লোক। রাজকরণের (পলিটিক্স) কথা কিছু জানি না। তবু তোমাদের দেখিয়া কিছু শিক্ষা নিয়া গেলাম। আমি হয়ত তোমাদের কাজে বেশী কিছু সাহায্য করিতে পারিব না; কিন্তু যাহারা গোমন্তকের মুক্তির জন্য লড়িতেছে আর কোনোদিন তাহাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিব না। ভগবান তোমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করুন।"

রাম দেশাইয়ের কথা আমার বেশী করিয়া মনে থাকার আর একটু বিশেষ কারণ আছে। রাম দেশাই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমার পরনে একটি ছাড়া ধুতি নাই; সেটিও ছেঁড়া ছিল। ধরা পড়ার আগে

দু' দিন বনে-জঙ্গলে চলিতে চলিতে কাঁটা গাছে লাগিয়া ধুতিটি একেবারে ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া গিয়াছিল। সংকোচে তিনি আমাকে হাতে করিয়া ধুতিটি দিতে সাহস পান নাই। ঘরের অন্য একটি ছেলের হাতে আমাকে দিবার জন্য দিয়া গিয়াছিলেন। ধুতিটি আজও আমার সংগে গোয়ার স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবে আছে। ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের নির্বিচার দমননীতির কল্যাণে রাম দেশাইয়ের মত আরো অনেকেই প্রথম হাজতে আসিয়া তারপর পর্তুগীজ-বিরোধী জাতীয় মনোভাবের সংস্পর্শে আসিয়াছেন ও জাতীয়তার দীক্ষা নিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। রাম দেশাইয়ের মত লোকের মন এভাবে পরিবর্তিত হইবে কে কল্পনা করিয়াছিল? রাম দেশাই নিজে ব্যক্তিগত-ভাবে নিশ্চয়ই কখনো নিজের সম্পর্কে এ কল্পনা করেন নাই। গোয়ার জাতীয় আন্দোলনে অলিভেইরা-মন্তেইরো-কোম্পানীর এই অবদানও কম নয়।

(ক্রমশ)

পাকিস্তানের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এত দ্রুত পট পরিবর্তন চলছে যে, সাতদিন বাদে সেখানে কি দৃশ্য দেখা যাবে বলা সহজ নয়। আর দৃশ্যও যা একটার পর একটা দেখা যাচ্ছে, সেও যে এক একটা পুরো ছবি তা নয়। যেন পাঁচটা ছবির এখান ওখান থেকে খানিকটা করে খাবলা দিয়ে এনে জুড়ে-দেওয়া এক কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার। যারা 'সীন' টানাটানি করছে, তারা মোটের উপর সব জানা খেলোয়াড়। কিন্তু কে যে কোন দড়িতে কখন টান দিচ্ছে, সোজা টানছে কি উল্টো টানছে, কার দড়ির সংগে কার দড়ির কখন প্যাঁচ লাগছে, সেটা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ রঙ্গমঞ্চে একটা মাত্র নাটক চলছে না, একাধিক নাটক এক-সংগে চলছে, তবে সবগুলোই দ্বন্দ্বমূলক—যথা, মির্জা বনাম সুরাবর্দী, গণতন্ত্রবাদ বনাম ডিক্টেটরশিপ, পশ্চিম পাকিস্তান বনাম পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বনাম প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার দাবি বনাম কেন্দ্রের আধিপত্য ইত্যাদি।

পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান গুলীর দ্বারা অপসারিত হন, তারপর যে কজনকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসানো হয়েছে এবং সে-পদ থেকে সরানো হয়েছে, তার মধ্যে সুরাবর্দী সাহেব ছাড়া অন্য সকলেই সেটাকে বিধাতার বিধান অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট গোলাম মহম্মদ অথবা প্রেসিডেণ্ট মির্জার বিধান বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সুরাবর্দী সাহেব তা করেননি, তিনি প্রেসিডেণ্ট মির্জাকে 'চ্যালেঞ্জ' দিয়েছেন এবং প্রকাশ্য সভায় প্রেসিডেণ্ট মির্জার বে-আইনী কাজের জন্য তাঁর বিচার দাবি করেছেন। সুতরাং এবার একটা বড়ো রকমের হেস্তনেস্ত হবার ভূমিকা তৈরি হয়েছে। এই দ্বন্দ্ব যদি কেবলমাত্র রাজনৈতিক অস্ত্র ব্যবহারের মধ্যে সীমিত থাকে, তবে মির্জা সাহেবের পক্ষে জয়ী হওয়া কঠিন হবে। সেই জন্যই এই আশংকা আছে যে, অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানে খোলাখুলিভাবে সামরিক বা অসামরিক ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হবে।
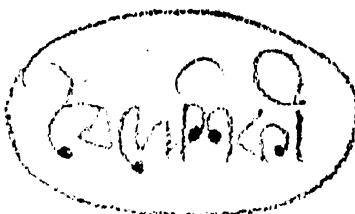
পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার পোশাকটায় আর তালি দেবারও জায়গা নেই, হাত দিলেই খসে পড়ছে। সুরাবর্দীর আওয়ামী দলকে সরিয়ে দিয়ে রিপাবলিকান পার্টি এবং মুসলিম লীগকে প্রধান শরিক করে যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গড়া হোল, সেটাকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হচ্ছে। রিপাবলিকান পার্টি যুক্ত নির্বাচন প্রথার সমর্থক ছিল। মুসলিম লীগের লোকেরা বলছে কোয়া-লিশন করার সময়ে নাকি এই সর্ত হয় যে, রিপাবলিকান পার্টি পৃথক নির্বাচন প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য বিল আনায় আপত্তি করবে না। চুন্দ্রিগড় সরকার সেইরকম একটি বিল আনার ব্যবস্থা করে পাকিস্তানী পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডেকেছেন এবং সে অধিবেশন আরম্ভও হয়ে গেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নির্বাচন প্রথার সম্পর্কে মুসলিম লীগ ও রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে আসলে কোনো টেকসই বুঝাপড়া আদৌ হয়নি। প্রেসিডেণ্ট মির্জা তাড়াহুড়া করে বিদেশ থেকে ফিরে এসে লীগ রিপাবলিকান কোয়ালিশনের ভাংগন ঠেকিয়েছেন ,কিন্তু সেটা একটা সাময়িক জোড়াতাড়া মাত্র। রিপাবলিকান দলের কয়েকজন প্রতিনিধি পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন প্রথা সম্বন্ধে জনমত পরখ করতে এসেছেন। যদি তাঁরা বোঝেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনমত সত্যই খুব বেশিরকম

যুক্ত নির্বাচন প্রথার পক্ষে, তাহলে পৃথক নির্বাচন প্রথার অনুকূলে বিল আনতে রিপাবলিকান পার্টি রাজি হবে না। অন্যথায় রাজি হবে। কেউ কেউ মনে করতে পারে, এটা একটা লোক দেখানো ব্যাপার, রিপাবলিকান পার্টির মুখ রক্ষার জন্য করা হচ্ছে। আসলে ঠিক হয়েই রয়েছে যে, রিপাবলিকান পার্টির প্রতিনিধিগণ পূর্ব-বঙ্গ থেকে ফিরে এসে সেখানকার জনমত সম্বন্ধে এমনভাবে চলবেন, যাতে পৃথক নির্বাচন প্রথার অনুকূলে বিল আনার পক্ষে কোনো বাধা না হয়।

কিন্তু কারো কারো মনে এরকম উদ্দেশ্য থাকলেও ব্যাপারটা এতো সহজে মিটবে না, করাচীতে মুসলিম লীগ সরকারী সহযোগিতায় গুণ্ডামি শুরু করে দিয়েছে। সুরাবর্দী সাহেবের নিজের গায়েও তার বিলক্ষণ আঁচ লেগেছে। তবে এবিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে সুরাবর্দী সাহেবের প্রতি সহানুভূতি বোধ হয়ত অনেকের মনে হবে না। বেশি আগেকার কথা ছেড়ে দিলেও ঢাকায় আওয়ামি ন্যাশনাল পার্টির উদ্বোধনী কনভেনশনে সুরাবর্দী সাহেবের অনুচরগণ যে গুণ্ডামি করেছিল, তার কথা এখনো কেউ ভোলেনি। কিন্তু এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি ব্যক্তিগতভাবে সুরাবর্দী সাহেবের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের কথায় করা হবে না। পূর্ববঙ্গের জনমত পরখ করবার জন্য রিপাবলিকান পার্টির প্রতিনিধিদের সফরে আসা প্রয়োজন ছিল না, যাই হোক তাঁরা যখন এসেছেন, তখন তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝে যাবেন যে, চুন্দ্রিগড় সরকারের পরিকল্পনা সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের জনমত কি। করাচীতেও লীগ গুণ্ডামিতে পার্টি-নির্বিশেষে অনেকেই বিরক্ত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া আরো প্রবল হবে।

গত নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজনৈতিক দল হিসাবে মুসলিম লীগ একরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রথম নির্বাচন প্রথাকে মুসলিম লীগের মার্কা বা লীগ মনোবৃত্তির প্রতীক বলা যেতে পারে। পৃথক নির্বাচন প্রথাকে আবার চালু করার পক্ষে যদি আইন পাশ হয়, তবে লীগের পক্ষে সেটা একটা বড়ো মনস্তাত্ত্বিক জয় হবে এবং লোকের ধারণা হবে যে, পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের আবার জেঁকে বসার সম্ভাবনা আছে। বলা বাহুল্য, অন্য পার্টিদের পক্ষে এটা মোটেই সুখকর নয়। সুতরাং নির্বাচন প্রথার গুণাগুণের কথা ছাড়াও এই ব্যাপারে অন্য দলগুলির নিজেদের স্বার্থেই একতাবদ্ধভাবে চুন্দ্রিগড় নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সম্ভব। ইতি-মধ্যেই কয়েকটি দল যুক্ত নির্বাচন প্রথার অনুকূলে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছে। আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টির নেতাগণ পূর্ব বিরোধ ভুলে গিয়ে এ ব্যাপারে এক হয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নমেণ্ট ও বিরোধী দল এবিষয়ে মোটামুটি একমত। চুন্দ্রিগড় নীতিকে কেবলমাত্র যুক্ত নির্বাচন প্রথার বিরোধী বলেই মনে করা হচ্ছে না, এটাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি একটা আঘাত বলে লোকে অনুভব করছে, এটাকে পূর্ব পাকিস্তানকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টার একটা অংশ বলে লোকে ধরে নিচ্ছে।

তাছাড়া পাকিস্তানের উভয় খণ্ডেই লোকের এই ধারণা হতে বাধ্য যে, নির্বাচন প্রথার প্রশ্ন যেটা একরকম মীমাংসিত হয়ে গেছে, সেটাকে আবার এইভাবে উঠাবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে নির্বাচন আরো পিছিয়ে দেওয়া। ইতিমধ্যেই [illegible] ভূমিকা [illegible] হয়েছে, তবে [illegible] আগামী বছর [illegible] পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেটা পালিত হবে না। সাধারণ নির্বাচন হলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক [illegible] দেখা যায় না। [illegible] রাজনীতিকদের মধ্যে অনেকেরই যে [illegible] পাওয়া যায় না, [illegible] সুরাবর্দী সাহেবের [illegible] [illegible] এর [illegible] সাহেবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জনমতের [illegible] হয়, [illegible] এবং [illegible] তাদের [illegible] আছে, [illegible] এরূপ [illegible] সাধারণ নির্বাচনের জন্য [illegible] কথা নয়। অথবা তাদের চেষ্টা হবে এমন ব্যবস্থা করে রাখার, যাতে সাধারণ নির্বাচন হলেও তাতে প্রকৃত জনমতের অভিব্যক্তির সুযোগ হবে না।

সুতরাং পাকিস্তানের সামনে দুটি আশঙ্কা দেখা দিয়েছে (১) অত্যধিক কাল বিলম্ব না করে অচিরেই খোলাখুলি ডিক্টেটরীর প্রবর্তন অথবা (২) পার্লামেণ্টারী শাসনের মুখোশ পরেই যাতে ডিক্টেটরী চালানো যায়, তার জন্য ভবিষ্যৎ সাধারণ নির্বাচনের ফল 'মনের মতো' যাতে হয়, তার ব্যবস্থা আগেভাগেই করে রাখা। পাকিস্তানের আরো দুর্ভাগ্য এই যে, এ ব্যাপারে পাকিস্তানের তথাকথিত বিদেশী বন্ধুদের প্রভাব কার্যত গণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কাজ করছে। কারণ তাদের বিশ্বাস হয়েছে এবং সে-বিশ্বাসের মূলে পাকিস্তানের কর্তারাই যথাসাধ্য শক্ত করে আনছেন—যে পাকিস্তানে ভদ্রভাবে সাধারণ নির্বাচন হলে যাদের হাতে ক্ষমতা আসবে, তাদের হাতে পাকিস্তানের বর্তমান বৈদেশিক নীতি অপরিবর্তিত থাকবে না।

৩।১২।৫৭

উপন্যাস

গৃহ সন্ধানে—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তি লাইব্রেরী, ১০বি, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য ৪·৫০।

'গৃহ সন্ধানে' প্রভাতবাবুর প্রথম উপন্যাস। অতএব সেই হিসেবেই বইখানি আলোচনার যোগ্য। লেখকের পরিচয় একাধিক। তিনি ছবি আঁকেন, কবিতা লেখেন—বিশেষ করে হাস্যরসের এবং ছোটদের জন্য কবিতা। সম্প্রতি 'তিন্তিড়ী' নামে বিশুদ্ধ 'ননসেন্স রাইমস' তিনি লিখেছেন এবং প্রমাণ করেছেন, এ লাইনে তাঁর সমকক্ষ বড় কেউ নেই বর্তমানে। আবার তিনি দেশকর্মী, বহুদিন ধরে পল্লী অঞ্চলের সেবা করে এসেছেন। কাজেই তাঁর ব্যক্তিত্ব বহুমুখী এবং সেই ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক এসে মিশেছে নতুন লেখা এই উপন্যাসখানিতে। আসলে এ বই হালকা রোমান্টিক উপন্যাস। কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে অনেক সিরিয়াস কথা আছে। গৃহ সন্ধান করতে গিয়ে নায়ক সুমন্ত্র সেনের যেসব অভিজ্ঞতা, সেগুলি হচ্ছে উপন্যাসের উপজীব্য। অভিজ্ঞতার সঙ্গে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, ফলে কাহিনীও মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়েছে। শেষ পর্যন্ত গৃহ সন্ধান গৃহপ্রতিষ্ঠায় পরিণত হয়েছে বেশ মধুরভাবেই। এ বইয়ের কাঠামো উপন্যাসের, কিন্তু লেখকের হাত হল রেখাচিত্রের ও নক্সার। কাজেই গড়নে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে। তা থাকুক, বইখানি কিন্তু সত্যিই মজার। অনাবিল হাসা, রঙ্গ এবং কথার শ্লেষে রীতিমত উপভোগ্য। চাঁপাতলা, বৌবাজার, পটলডাঙ্গা, মানিকতলা—এই হল উপন্যাসের ভৌগোলিক পরিধি। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে আমাদের মতন যাঁরা মধ্য কলকাতার এই অঞ্চলে মানুষ হয়েছেন, তাঁদের কাছে এ বই ও বইয়ের লেখককে পরিচিত আত্মীয়ের মতই মনে হবে। তার উপর ঐ যুগের রাজনীতি, সমাজের চেহারা, গঠনমূলক কর্মসূচী, ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক সম্পর্ক—সবকিছু মিলিয়ে একটা বিগত দিনের স্মৃতিচিত্র ফুটে উঠেছে এবং তার সাহিত্যিক রূপায়ন আকর্ষণেরই সামগ্রী। তাছাড়া চরিত্র-চিত্রণে লেখকের হাত যে ভালো, তার প্রমাণ শুধু নায়কনায়িকাই নয়, অনেকগুলি পার্শ্বচরিত্র সুন্দর ও জীবন্ত হয়েছে, যেমন উদাসী আর পটোল, ভদ্রেশ্বর এবং তার স্ত্রী। প্যারিস হোটেলের বর্ণনাও খুব জমেছে। মনে হয়, মিষ্ট হাসিতে ভরা এই প্রেমের কাহিনীর মধ্যে যেসব খণ্ড চিত্র, চরিত্র ও মজার দৃশ্য রয়েছে, সেগুলি ঠিকমত প্রযোজনা ও পরিচালনা করলে ছায়াচিত্র একখানি ভালো 'সোস্যাল কমেডি' তৈরি করা যায়, বর্তমানে যার একান্ত অভাব লক্ষ্য করি। বইখানার মধ্যে কোনো উদ্ভট আমদানী করা হয়নি, বড় বড় ইনটেলেকচুয়েল বিতর্কও নেই। সহজ সরস কাহিনী, পরিস্থিতি ও পরিবেশ বাস্তব এবং স্বাভাবিক। উপন্যাসের মধ্যে প্রভাতবাবুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং তাকে রূপদান করবার ক্ষমতা পরিস্ফুট। (৪৪৬।৫৭)

বৃষ্টি, বৃষ্টি—মনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা—১২। মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা।

মনোজ বসুর রচনায় একটি বিশেষ রসায়ন আছে। মনস্তত্ত্বধর্মী মানসিকতা তাঁর স্বভাব-বহির্ভূত। অথচ মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের বাইরেও একটি মনোজগৎ আছে যা বহির্জগতের সঙ্গে সহজ সংলগ্ন এবং বাংলাদেশের আধুনিক কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে এই ধারাটি বিশেষভাবে

বিভূতিভূষণ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনোজ বসুর লেখায় উপস্থিত। এঁদের রচনায় যে বৃহৎ জীবনের বেদনা ও অন্তর্জীবনের সংঘাত নেই, একথা বলছি না। কিন্তু এঁদের সবার মধ্যেই যে একটি অপীড়িত জীবন-রস আছে, সেটিই এক্ষেত্রে বক্তব্য। মনোজ বসুর যাবতীয় রচনায় সদোক্ত বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া 'বঙ্গ-পথিক' বললেও তাঁকে যেন চেনানো সহজ হয়। বাংলা দেশের পল্লীবাহিত অথচ শহরমুক্ত জীবনের যে এলাকা, মনোজ বসু সেই অংশটিকে অনায়াসে তাঁর সমস্ত রচনায় বহন করতে পারেন। এক যুগের সঙ্গে আরেক যুগের কোনো সংঘাত অপেক্ষা পরিবর্তিত অথচ চিরন্তন পটভূমির রূপ তাঁর লেখনীতে আশ্চর্য বর্ণালীতে ফোটে। 'বৃষ্টি, বৃষ্টিতে' তাঁর এই ধরনটির পরিণতি ও প্রাচুর্য। ইতিহাসের সঙ্গে গৃহ-কাহিনীকে যোগ করার দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বাংলা দেশের কথাশিল্পে সার্থকভাবে সূচিত। মনোজ বসু সেই ধারার একজন উজ্জ্বল উত্তরাধিকারী। 'বৃষ্টি বৃষ্টি'কে কোনো 'ফর্মের' পরিসরে নির্দিষ্ট করতে গেলে বলা যায় এ হলো ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্সেরই

একটি রূপচ্ছেদ এবং চিরন্তন জীবনের প্রাণবন্ত রূপেই এই অপূর্ব কথা-কাহিনীর বৈশিষ্ট্য।

নটী—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সাম্প্রতিক বাংলা কথা-সাহিত্যে মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য একটি উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছেন। আধুনিক কথাশিল্পীর দায়িত্ব একাধিক। কল্পনা-ক্ষমতা ও বৈদগ্ধ্যের একীকরণ না হওয়া পর্যন্ত 'আধুনিকতা' শব্দের সম্ভাবনা চরিতার্থ হয় না। অত্যন্ত সুখের বিষয়, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য এই দাবীর সদ্ব্যবহার করেছেন। তাঁর ইতিহাসবোধ এবং শিল্প-বিবেক এই ঐতিহাসিক রোমান্সটিকে আশ্চর্য মর্যাদা দিয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের কাললক্ষণ সম্পর্কে 'নটী'র লেখিকা শুধু অবহিতা নন, অধিকারিণী। সেই অধিকারকে শিল্পায়িত করার বাধা প্রচুর, অথচ তিনি অনায়াসে সেই বিঘ্ন পার হয়েছেন। তার অন্যতম কারণ তাঁর প্রসাদ-গুণান্বিত ভাষণভঙ্গি। তাঁর ভাষা ছন্দোময় এবং কল্পনাশক্তি অনাক্রান্ত। এই আখ্যানের শেষাংশে যে ঘটনাবাহুল্য দেখা যায় তা যদি অপেক্ষাকৃত সংযত হতো তবে এই গ্রন্থ সম্পর্কে সামান্যতম অনুযোগ উত্থাপন করার সুযোগ পেতাম না। ফার্সি ভাষায় তাঁর সঞ্চরণ সহজ এবং তার সূত্রে তিনি অতীতের একটি রোমাঞ্চরঞ্জিত পর্বে প্রবেশ করেছেন। তাছাড়া মোতি ও খুদাবক্স চরিত্র দুটি তাঁর জীবন-প্রবেশের অবিস্মরণীয় দুটি স্মারকরত্ন। এই শিল্পকর্মটিকে আমরা অভিনন্দন জানাই। এর লেখিকার কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক।

তাপসীর প্রেম—প্রভাত চট্টোপাধ্যায়। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সাহিত্য জগতে প্রথিতযশা না হইলেও বর্তমান গ্রন্থের লেখক উপন্যাস রচনায় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির পূর্বাভাস। প্রধান ভূমিকায় তাপসী, বাউল, বাঁশরী ও সুনীতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চরিত্র চিত্রণ এবং মনোবিশ্লেষণে লেখক বর্তমান গ্রন্থে যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। অনাবিল প্রেমের প্রতীক তাপসী—'তাপসীর প্রেম' নামের মধ্যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। অনাড়ম্বর ভাষার ভিতর দিয়া লেখক তাপসী এবং বাউলের যে ভাবগম্ভীর চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অনুধাবনযোগ্য।

মুদ্রণ পারিপাট্য এবং বহিরাবরণ প্রশংসার যোগ্য। ৪৭৩।৫৭

বসন্ত বাহার—অনিলবরণ ঘোষ। প্রকাশক—শ্রীরাখাল সেন, শংকর সাহিত্য সংসদ, ১৩, বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা—১৫। দাম—দু'টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সাহিত্য ক্ষেত্রে নিতান্ত অপরিচিত নহেন। যে বারোটি গল্পের সমবায়ে বর্তমান গ্রন্থখানা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তন্মধ্যে 'বসন্ত বাহার' ও 'ভালবাসা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গল্পসম্ভারের বিষয়বস্তু নির্বাচনে লেখক তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। গল্পের পটভূমিতে কোনরকম বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটাইতে না পারিলে শুধু ভাষার মাধ্যমে তাহাতে রসসৃষ্টি করিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। 'বসন্ত বাহার'-এ লেখক যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন একমাত্র সেই সুকৃতির ফলেই গ্রন্থখানার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। প্রচ্ছদপট নয়নাভিরাম। ৪৩৯।৫৭

ইতিহাস

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ—১৮৫৭। প্রমোদ সেনগুপ্ত। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য আট টাকা।

১৮৫৭ সালের ভারতীয় বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে এ বছর অনেকগুলি বই প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে ঐতিহাসিক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডাঃ শশিভূষণ চৌধুরীর বই এবং পি সি জোশী সম্পাদিত গ্রন্থ (ইংরেজীতে লেখা) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক পর্যায়ে পড়বার মতন বাংলা বই সম্প্রতি লেখা হয়নি। শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্তের 'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ' পড়ে মনে হল সে অভাব এখন পূর্ণ হয়েছে। বইখানির প্রকাশও সময়োচিত, কারণ একাধিক লেখকের একাধিক মতবাদের ঘূর্ণিতে পড়ে সাধারণ পাঠকের মন এ বিষয়ে আকৃষ্ট হলেও কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। গণ-আন্দোলন, না কি সামন্তধর্মী সামরিক বিদ্রোহ, এই দ্বৈত-বিচারের দোটানায় পড়ে পাঠক সাধারণের কৌতূহলও ইদানীং স্তিমিত হয়ে আসছিল। সেদিক থেকেও আলোচ্য গ্রন্থখানি মূল্যবান। অন্তত নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর ও দৃঢ় বক্তব্যের পরিচয়ে শিক্ষিত পাঠক খুশি হবেন এ কথা বলা যায়। অধ্যাপক হীরেন মুখার্জির সুলিখিত ভূমিকায় এই কথাই বলা হয়েছে যে ভারতীয় মহাবিদ্রোহ কেবল প্রতিক্রিয়াপরায়ণ সামন্তধর্মী বিক্ষোভ মাত্র নয়। এ বিপ্লবের সঙ্গে জনসাধারণের কিছু সংযোগ ছিল, এমন কি বাংলা দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ এ বিষয়ে পরাঙ্মুখ বা উদাসীন ছিলেন না, প্রমোদ সেনগুপ্তের গ্রন্থে সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। ভারতীয় মহাবিদ্রোহের গণ-চরিত্র সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করা কঠিন, তার জন্য আরও গবেষণা এবং তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন, একথা মেনে নিয়েও বলা চলে যে ১৮৫৭ সালের বিপ্লব জনগণের সংস্পর্শলেশহীন ছিল না। তথাকথিত 'সিপাহী-বিদ্রোহের' পূর্বে এবং পরেও অ-সামরিক কৃষি-বিক্ষোভ ছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের বিরোধী মনোভাব অনেক জায়গায় সক্রিয় আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল।

প্রমোদ সেনগুপ্ত শুধু ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য নয়, সাধারণ পাঠকদের কথা ভেবেই এ বই লিখেছেন। তিনি নিজে একজন বিপ্লবী কর্মী। বহুদিন দেশ ছাড়া হয়েও তিনি যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং জনগণের তরফে এ বিদ্রোহের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে চেষ্টা করেছেন, সেজন্য তিনি ধন্যবাদভাজন। বিভিন্ন শহরে ও অঞ্চলে একটির পর একটি বিদ্রোহের আগুন কেমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, মানচিত্রের সাহায্যে তিনি সে কাহিনী সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। পেশাদার ঐতিহাসিক না হয়ে এবং বাংলা ভাষার প্রথম চর্চায় তিনি একটি সফল এবং উল্লেখযোগ্য বই ঐতিহাসিক সাহিত্যে সংযোজন করতে পেরেছেন, এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। এ বিদ্রোহের ভিত্তি ও পরিধি যে সংকীর্ণ ছিল না, ইংরেজের শোষণ-নীতি যে অর্থনৈতিক অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল তাকে প্রতি-বিপ্লব দিয়ে বন্ধ করা যেত না, প্রমোদ সেনগুপ্তের বইখানি সে কথাগুলি বুঝতে সাহায্য করবে। সুদৃশ্য সুমুদ্রিত এবং চিত্রিত এই ইতিহাস-গ্রন্থ যথাযোগ্য সমাদর পাবে বলে ভরসা করা যায়। ৪৪৭।৫৭)

ভ্রমণ-কাহিনী

ভারত-পরিক্রমা (১ম খণ্ড, উত্তর ভারত ও মধ্য ভারত)—শশিপদ সেনগুপ্ত। প্রকাশক—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ১৪৯, দাওয়ানগাছি রোড, বালি, হাওড়া। মূল্য চার টাকা।

লেখকের মৃত্যুর পরে এই বহুতথ্যবাহী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। সৌরীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ 'কর্মজীবনে আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব গ্রন্থকার শশিপদ সেনশর্মা ছিলেন একজন রেল-কর্মচারী। প্রাচীন ভারতের গৌরোবজ্জ্বল সংস্কৃতিকে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলেন, সেই ভালবাসাই তাঁকে ভারতের পথে পথে ঘুরিয়েছে।' সুতরাং ভারত-প্রীতি ও ভূগোল-জ্ঞান মিলিত হয়ে এই গ্রন্থটিকে ভ্রমণার্থীর পক্ষে অপরিহার্য করে তুলেছে। উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতের স্মরণীয় স্থানগুলি তাঁর বর্ণনায় পরবর্তী পর্যটকের কাছে সহজ-নির্দেশ্য করে তুলেছে। 'ভারত পরিক্রমা'র দ্বিতীয় খণ্ডে দক্ষিণ ভারতের তীর্থ বিবরণী পাওয়া যাবে, এই গ্রন্থের ভূমিকা-রচয়িতা কালিদাস রায়ের কথায় সেই প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। আমরা সেইজন্য অপেক্ষা করে রইলাম। ৩৫০।৫৭

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

বিদ্যাসাগর—মণি বাগচি।
আপন প্রিয়—রমাপদ চৌধুরী।
তৃষ্ণা—সমরেশ বসু।
দ্বীপপুঞ্জ—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
পলাশের নেশা—সুবোধ ঘোষ।
বধূবরণ—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ—(ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা)।
এ মহাসাগর—কিষাণ চন্দর; অনুবাদক—শ্রীসুকুমার বসু।

—শৌভিক—

বাঙলার বাইরে বাঙলা ছবি

নির্বাক যুগে একটা সময় ছিল যখন সারা ভারতে বাঙলা দেশে তোলা ছবিই চলতো বেশী। ভারত ও ব্রহ্মদেশে (তখন ভারতের সঙ্গে যুক্ত) একা ম্যাডান কোম্পানীরই চিত্র-গৃহ ছিল শ' দেড়েক। কাজেই কলকাতায় ম্যাডানের স্টুডিওতে তোলা ছবির যে বিস্তৃত প্রদর্শনক্ষেত্র ছিল, তা অন্য কারুরই থাকা সম্ভব ছিল না। ছবি সবাক হতেই এলো ভাষার প্রশ্ন। বাঙলা দেশের বাইরে বাঙালী অধ্যুষিত স্থানগুলির মধ্যেই শুধু বাঙলা ছবি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো। নিউ থিয়েটার্সের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যতদিন ছিল ততদিন বাঙলার বাইরে বাঙালী অধ্যুষিত স্থানগুলিকে হিন্দী ছবি গ্রাস করতে পারেনি। পশ্চিমের বাঙালী অধ্যুষিত কয়েকটি শহরে নিউ থিয়েটার্সের নিজস্ব চিত্রগৃহও ছিল। সেই নিউ থিয়েটার্সের প্রভাবের অবলুপ্তি এবং হিন্দী ছবির আধিক্য বাঙলার বাইরে বাঙলা ছবির প্রচলন নগণ্য করে দেয়। তার ওপর ভাষা নিয়ে ঝগড়া এমন অবস্থা নিয়ে আসে যে, আশপাশের রাজ্য, আসাম, বিহার ও ওড়িষ্যাতে সম্পূর্ণ বাঙালী অধ্যুষিত স্থানে বাঙালীর চিত্র-গৃহেও বাঙলা ছবির প্রদর্শন অসম্ভব হয়ে ওঠে। ঝগড়ার তাপ একটু কমতে বাঙলার বাইরের কোন কোন শহরের বাঙালী চিত্রামোদীদের পৃষ্ঠপোষকতার মুখ চেয়ে কোন কোন চিত্রগৃহ বাঙলা ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করতে থাকেন, তবে দেখানোটা রবিবার অথবা ছুটির দিন সকালের প্রদর্শনীতে নিবদ্ধ রাখা হয়। যেমন নাম-করা ছবি হলে কোথাও কোথাও নিয়মিত তিনটি প্রদর্শনীর কোন একটিতে বাঙলা ছবি দেখানো হয়। ছবি খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করলে পর পর ক'টি রবিবার বা ছুটির দিনের সকালেও প্রদর্শনী রাখা হয়। খুব কম জায়গাই আছে যেখানে নিয়মিত প্রদর্শনীতে কখনো কখনো বাঙলা ছবি চলে। বাঙলার বাইরে বাঙালী অধ্যুষিত স্থানগুলিতে এইভাবে বাঙলা ছবি দেখানো হলেও সব বাঙলা ছবিই যায় না, এমন কি, ভালো ছবিগুলিরও সব ক'খানি যায় না। কিন্তু বাঙলা ছবির নাম আছে সারা ভারতে; আজ পর পর দু' বছর রাষ্ট্রপতি পদক বা শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে বলে নয়, তার আগে থেকেও বাঙলা ছবির সুনাম সর্বত্র। এমন কি, বম্বের চিত্র-নির্মাতারা নিজেরাই বলেন যে, তাঁরা ছবি তোলেন ব্যবসার মুখ চেয়ে, কিন্তু সত্যিকারের ভাল ছবি তোলা হয় কলকাতায়।

* * * *

নামকরা ছবি হলে ভাষার কথা ভেবে সে ছবি দেখা থেকে প্রকৃত চিত্ররসিকরা বিরত যে হন না তার প্রমাণ অনেকবারই পাওয়া গিয়েছে। কলকাতাতেই কতো ফরাসী, জর্মান, ইতালীয়, রুশ, চীন, চেক, আরবী ভাষার ছবি দেখানো হয়েছে। ডাব করা নয়, মূল ভাষাতেই এবং অনেক ক্ষেত্রে সাব-টাইটেলও ব্যবহৃত হয়নি। তবুও নামকরা ছবি দেখবার জন্য ভিড়ের অভাব হয়নি। কোন বাঙলা ছবি নাম করলে, বা নামকরা রচয়িতা (রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ইত্যাদি) বা নামকরা পরিচালক বা শিল্পী কোন ছবির সঙ্গে যুক্ত থাকলে এখানে সে ছবির দর্শকের মধ্যে অবাঙালীও দেখা যায়। কলকাতায় অবাঙলাভাষী অধিবাসীদের অনেকে আছেন যাঁরা নিয়মিত বাঙলা ছবি দেখেন। চিত্রব্যবসায়ীদের উদ্যম এদের সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে পারে। যেমন হয়েছে মেট্রোতে "চন্দ্রনাথ" মুক্তিদান করে। একটানা ভিড় যে চলেছেই তার মধ্যে অবাঙলাভাষী দর্শকও অনেক দেখা যায়, কিছু কিছু অভারতীয় দর্শকও। তার কারণ, সব জাতের লোক নিয়ে মেট্রোর বাঁধা পৃষ্ঠ-পোষক একটা আছে,- মেট্রোতে মুক্তিলাভ করেছে বলেই এবং ভাষা ভিন্ন হলেও অনেকেরই ছবিখানি দেখবার কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। লাইটহাউসে "পথে হলো দেরী" দেখতেও ওখানকার অবাঙলা-ভাষী পৃষ্ঠপোষকদের অনেককেই দর্শক-রূপে পাওয়া যাবেই। অবাঙলাভাষী দর্শকদের পাওয়া দরকারও, কারণ এখানে যারা রয়েছেন তাঁরা এখানকার ছবি দেখতে পাবেন না, সেটা শোভনীয় নয়। এই সূত্রে বম্বেতে "কাবুলিওয়ালা"র প্রদর্শনের কথাটা উল্লেখ করা যায়। এই প্রথম একখানা বাঙলা ছবি নিয়মিত প্রদর্শন সময়ে দেখাবার জন্য মুক্তিলাভ করলো। গত ২২শে নভেম্বর ছবিখানি স্বস্তিক সিনেমায় মুক্তিলাভ করে। পরিবেশক ছবিখানি এক সপ্তাহ চলাই যথেষ্ট বলে ধরে রেখেছিলেন, সে জায়গায় প্রতিদিন পাঁচটি করে প্রদর্শনী সত্ত্বেও দু' সপ্তাহ তো পার হলোই, এমন কি, এখন আশা হচ্ছে, হয়তো চার সপ্তাহও চলতে পারবে। আর ছবিখানি চলছে বাঙালী দর্শকদের জন্যেই শুধু নয়, বরং অবাঙালী দর্শকদের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভাল নামকরা ছবি হলে বাঙলার বাইরেও বাঙলা ছবি চালানো যায়। সাব-টাইটেল যোগ করে নিতে পারলে আরো

ভাল হয়, কিন্তু তাতে মুশকিল হচ্ছে যে, কেবলমাত্র হিন্দী লিপিতে হলে সব জায়গায় তা চলবে না—কোথাও প্রচলিত লিপি উর্দু, কোথাও তামিল, কোথাও মারাঠী, কোথাও ওড়িয়া, কি গুজরাতি, কি তেলেগু, কি মালয়ী, কি অসমীয়া। এক ছবিতে এতো সাব-টাইটেল ধরতেও পারে না, আর ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে এক একটি বিভিন্ন ভাষার সাব-টাইটেলযুক্ত আলাদা আলাদা কপি প্রস্তুত করাও আর্থিক দিক থেকে সম্ভব নয়। সুতরাং বাঙলার বাইরেও মূলে বাঙলা ভাষা রাখতেই হয়, তবুও ভালো ছবির যথেষ্ট দর্শক আশা করা যায়ই। আর, বাঙলা ছবি দেখতে চায় এমন যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির কাছ থেকে পৃষ্ঠপোষকতার আশ্বাস পেলে, যে কোন জায়গারই চিত্র-গৃহের কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত ভাল বাঙলা ছবি দেখাতে উৎসাহিত হবেনই। কারণ, ছবি দেখানোই তার ব্যবসা, যে ছবি দেখালে লাভ তার হবে বুঝতে পারবেন, সে ছবি না আনাবার হেতু নেই।

"পথে হলো দেরী" এ সপ্তাহে মুক্তি-লাভের সংগে বাঙলার চিত্রশিল্পে একটি নতুন পর্যায় যোগ হলো। বহু বর্ণের সমাবেশে রঙীন সবাক ছবি তোলা এই প্রথম। নির্বাক যুগে "মাধবী কঙ্কন" ছিল রঙীন ছবি। হিন্দী ছবি টেকনিকলারে বা গেভাকলারে রঙীন হতে আরম্ভ করেছে বছর কয়েক আগে থেকেই। তারো আগে, সাফল্যমণ্ডিত হিন্দী ছবিকে হাতে রঙ করে পরিবেশন করা হতো। বাঙলা ছবির পক্ষে তাও সম্ভব হয়নি। তার একমাত্র কারণ পয়সা। যে পদ্ধতিতেই রঙ করা হোক, তাতে সাদা-কালো ছবির চেয়ে খরচ অনেক বেশী পড়বেই। কিন্তু বাঙলা ছবির বাজার এতো সীমাবদ্ধ যে, এমনিতেই তো অধিকাংশই দেড়-দু লাখ খরচ করেও টাকা তুলতে পারে না, তার ওপর আরো খরচ বাড়িয়ে দেওয়া চলতেই পারে না। সেকথা ভাবলে বলতে হয়, অগ্রদূত বাঙলা ভাষায় প্রথম গেভাকলারে রঙীন ছবি তুলে বেশ দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে এমন দুঃসাহস না দেখালে আরো কতদিনে যে বাঙলা ছবির গায়ে রঙ চড়তো বলা যায় না। সে কারণে অগ্রদূতের এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করা যায়। ছবিখানির অন্যান্য গুণাগুণ সম্পর্কে কিছুই জানা নেই, তবে রঙীন হওয়ার যে নতুন বৈচিত্র্য সেটা আগে থেকেই দর্শকসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করেছে। তার প্রমাণ পাওয়া গেল লাইটহাউসে সেদিন অগ্রিম টিকিট বিক্রী আরম্ভ হওয়ার সময় ভিড় দেখে। অগ্রিম টিকিটের জন্য এতো ভিড় লাইটহাউসে আর দেখা গিয়েছে বলে মনে হয় না। হয়েছে বেশ চমৎকার—কলকাতার সেরা দুটো বিলিতি চিত্রগৃহে চলছে বাঙলা ছবি। এবারে যেন মনে হচ্ছে, বাঙলা ছবি কোণ থেকে বের হতে পেরেছে।

নিরেট বিন্যাস

সীতা দেবীর লেখা নিয়ে বসুমিত্রের তোলা 'তমসা'। সীতা দেবী চেয়েছিলেন একটি কালো মেয়ের দুঃখ জানাতে, কিন্তু তিনি যদি বুঝতে পারতেন তাঁর সেই কাহিনীটি একখানি বিরক্তিকর ছবিতে পরিণত হবে গৌরাংগ বসুর চিত্রনাট্য রচনার কায়দায় এবং বংশী আশের পরিচালনার জন্যে, তাহলে কাহিনীটি লিখতেন কি না সন্দেহ। আরম্ভ থেকেই চিত্রনাট্যকার একটা ভুয়ো সাসপেন্স সৃষ্টি করে গল্পকে এমন ভুল পথ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন যে, কোথাও একস্থলেও যথাযথ নাটকীয়তা সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা, বরং দেখতে দেখতে বোধশক্তিকে বারবারই উৎপীড়িত করে তুলতে হয়। কতক ক্ষেত্রে অজ্ঞতা এবং কতক ক্ষেত্রে দর্শকের বুদ্ধিকে উপেক্ষা করার উদাহরণ পরপর দেখে দেখে মন এমন হয়ে ওঠে যে, ছবিখানি শেষ হলে দুটো দাঁড়ি-আকার(।) খাড়া করে বসিয়ে দেবার ইচ্ছে করে—একটা ত-এর পাশে, আর একটা ম-এর পাশে।

* * * *

কালো মেয়ে মলিনা, কিন্তু সবিতা চট্টোপাধ্যায়কে এমনভাবে কালো সাজানো হয়েছে যে, একটু নজর করলেই কণ্ঠা ও বাহুর অংশে গৌরবর্ণ চোখে ফোটে। পেইণ্ট করা কালো মেয়ে বলেই দেখায় তাই ওকে স্বীকার করে নিতে বাধে, আর তাই চরিত্রটির দুঃখে সম-বেদনার ভাবটা জাগাতে দ্বিধাবোধ করে। উদ্বোধন দৃশ্য হচ্ছে পাত্রী দেখার। মলিনা পাত্রী, কিন্তু সে এসে উপস্থিত হবার আগেই বরপক্ষকে এমনভাবে দেখানো হয়েছে, দৃশ্যটির বিন্যাস করা হয়েছে এমনভাবে যে, চোখে পড়তেই বুঝতে পারা যায় ওরা পাত্রী অপছন্দ করবে বলেই যেন এসেছে। কালো মেয়ের দুঃখ ফুটিয়ে তোলার জন্য ওর প্রতি অপরের গঞ্জনা এবং ওর বিয়ের জন্য বাপ-মায়ের ভাবনা কষ্ট যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে তা বেমানান কৌতুক বলে মনে হয়। গ্রামের প্রৌঢ় 'খুড়ো'র ইচ্ছে মলিনাকে বিয়ে করার; মলিনার বাবা হরনাথকে দেখা যায় এবিষয়ে খুড়োর সংগে সম্মতিসূচক কথা বলতে উদ্যত হতে। বাস ঐখানেই ব্যাপারটা চেপে যাওয়া হলো। তারপরেই দেখা যায় হরনাথ এসে স্ত্রীকে মলিনার সম্বন্ধ পাকা হওয়ার কথা জানালে এবং কথাটা গোপন রাখতে বলায় স্ত্রী এমনভাব দেখালো যে, মনে হলো যেন ঐ খুড়োর সংগেই বিয়ে ঠিক। এর পরই এলো বিয়ে
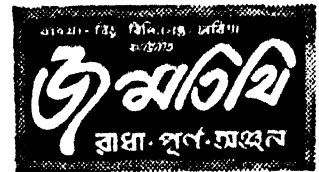
বাড়ি। এমন পরিবেশ যাতে বুঝতে পারা যায় মলিনাকে প্রৌঢ়ের হাতে বলি দেওয়াই হচ্ছে। কিন্তু বহু লোকজন তত্ত্ব নিয়ে উপস্থিত হতে বোঝা গেল বিয়ে এক জমিদারের ছেলের সংগে, যে কিছুদিন আগে মলিনাদেরই পাড়ার একটি মেয়েকে দেখতে এসেছিল। তত্ত্ববাহকরা তাদের রাণিমাকে দেখতে চাইলে, কিন্তু মলিনার অসুস্থতার কথা তুলে সেটা চেপে দেওয়া হলো। চিত্র-নাট্যকার ও পরিচালক হয়তো ভেবেছিলেন এইভাবে ব্যাপার চেপে চেপে গিয়ে দর্শকমনে খুব একটা রহস্য সৃষ্টি করতে পারবেন, কিন্তু সেসময়ে তারা দর্শকদের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে বুঝতে পারতেন যে, জমিদারের ছেলের সংগে সম্বন্ধ হলো কি করে তার কোনরূপ আভাসমাত্রও না থাকায় এতোখানি ব্যাপারটা

কেমন ফাঁকো লাগে। শুভদৃষ্টির সময়, মতোটা না পাত্রের চোখ দেখে, তার চেয়ে পাত্রের ভায়ের টেরা টেরা বাকিা থেকে বুঝতে পারা যায় পাত্র অন্ধ। পাত্র বৌ নিয়ে বাড়িতে গিয়ে বরণ-পীঁড়ির ধারে দাঁড়াতেই তার ভাই শ্লেষ আর ব্যঙ্গভরে হাঁকডাক তুলে মলিনাকে গৌরবর্ণা পরমাসুন্দরী মেয়ে বলে ব্যঙ্গ করে এমন সব কথা বলতে থাকে যে বোঝা যায়, পাত্র বরাবরই কেবল সুন্দর জিনিসই ভালবাসে, কিন্তু কি যেন একটা আক্রোশে তার ভাই তার সৌন্দর্যপ্রীতিকে কালো মেয়ের সংগে বিয়ে দিয়ে অপদস্থ করে দিলে। এতক্ষণে বোঝা গেল তত্ত্ববাহকরা তত্ত্ব নিয়ে গিয়ে কনে দেখতে চাইতে কেন তাদের বিমুখ করা হয়েছিল, কারণ তখন কনে দেখতে কালো বলে জানাজানি হয়ে যেত। আক্রোশ কিসের তা কয়েক ফিট পরেই বোঝা গেল। পাত্রের নাম ধরনী, তার ভাই মেদিনী, সৎমায়ের ছেলে। মেদিনী তার মা ও কুচক্রী মামার সহযোগিতায় সব দখল করে নিতে চায়। খটকা লাগে ভেবে যে মেদিনীর লোভ জমিদারীর ওপর, কিন্তু তার জন্যে দাদার সংগে কালো মেয়ের বিয়ে দেবার অর্থ কি? অদ্ভুত পরিকল্পনা। তাছাড়া দেখা গেল, ধরণী অন্ধ বলে সেরেস্তার নায়েব গোমস্তা কর্মচারি, বাড়ির দাসদাসী সবাই-ই হচ্ছে মামার লোক, ধরণীর চেয়ে মেদিনীর আর তার মায়ের দাপটেই তো সব চলে। তা সত্ত্বেও বিয়ে দিয়ে ধরণীর একজন পরম সহায়ক এনে দেওয়া কেন? মেদিনী, তার মা ও মামার ভাব দেখে তো মনে হয় ধরণীকে গুম করতে পারলেই নিশ্চিন্ত হয়। হয়তো সেটা পারছে না ধরণীর এক দিদির জন্য, যিনি তার বিয়ের কিছুদিন পর বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে এসে সেই যে মুখ বন্ধ করেছেন, আর একটিও কথা বলেন না। মেদিনী ও তার মা অন্যায় করছে কিন্তু তবুও তিনি মুখ বুজেই দেখে যান, কারণ তার মুখে কথা থাকলে বোধহয় গল্প ধসে যেতো—ঠিক সেইভাবেরই বিন্যাস।

* * *

ধরণী জানে মলিনা তার মনোমত সুন্দরী, স্পর্শ দিয়ে সে তার সৌন্দর্য অনুভব করে। মলিনা সত্যিটা ভেঙে দিতে চায়, কিন্তু ধরণী তা জানতে চায় না। মলিনা চায় নিজের হাতে স্বামীর যাবতীয় সেবা করতে, কিন্তু তাতেও মেদিনী ও তার মায়ের ঘোরতর আপত্তি। বাধা দেবার জন্য মলিনার সংগে ওদের দুর্ব্যবহার দেখানো হয়েছে বোধহয়, ওরা যে ধরণীর শত্রু সেইটে বেশী করে বোঝাবার জন্যেই, তা নয়তো ওদের আচরণ নিরর্থক। হঠাৎ একদিন মলিনা ঠাকুর ঘরে গিয়ে একখানা ভজন গেয়ে ফেললে। গান শুনে দিদি মলিনার গলায় পরিয়ে দিলেন নিজের গলার হার, বোঝা গেল এতোদিনে মলিনা তার কাছে স্বীকৃতি পেলো। ধরণীও গান শুনে মুগ্ধ, তাকে গান শেখাতে বাগানে দুজনে গান গেয়ে যায়। মলিনার বুদ্ধির বিকাশের জন্য লেখাপড়া শেখাতে ধরণী ওকে 'তিলোত্তমা' পড়িয়ে বোঝায়। লেখাপড়া শিখতে শিখতে সেরেস্তা থেকে জাবদা আনিয়ে ধরণী মলিনাকে দিয়ে হিসেব পড়িয়ে নেয়। মেদিনী দেখলে বিপদ, জাবদা থেকে হিসেবের পাতা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। মেদিনীর এ আচরণও বোঝা ভার—হিসেবপত্তর সবই তাদেরই লোকের হাতে, স্বয়ং মামা তার তদারক করে, অথচ ধরণীর কাছে হিসেবের ফাঁকি ধরা পড়ার ভয়! অদ্ভুত! এই ভয়েই মেদিনী মিথ্যে করে বাপের চিঠি এসেছে বলে মলিনাকে বাপের বাড়ি সরিয়ে রাখতে চাইলে। এই সময়েই ধরণীর ডাক্তার বন্ধু ভবেশ এসে জানালে যে কলকাতায় এক চিকিৎসক এসেছে যার হাতে ধরণী দৃষ্টি ফিরেও পেতে পারে। ধরণী কাউকে কিছু না বলে মলিনাকে নিয়ে কলকাতায় এলো। আরম্ভ হলো চোখে ওষুধ দেওয়া। মেদিনী ও মামা কলকাতায় ধরণীর চলে আসার রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য নায়েবকে পাঠালে। নায়েব জানালে চক্ষু চিকিৎসার কথা। শুনেই মেদিনী ছুটে এলো। মলিনাকে সে ধরণীর ঘরের দরজার বাইরে ধরে বোঝালে যে, চোখ ফিরে পেলে মলিনাকে দেখে তার দাদার চোখ কপালে উঠবে, কাজেই মলিনা যেন ওষুধের বদলে জল দেয়। মেদিনী চক্ষু চিকিৎসকের কাছে গেল, কি কথা হলো জানা গেল না, তবে মেদিনীর চেক কাটা দেখে এবং আগে দেওয়া মামার উপদেশের কথা মনে করে বোঝা গেল যে, মেদিনী ডাক্তারকে ঘুষ দিলে ধরণী যাতে দৃষ্টি ফিরে না পায় সেই ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তখনই বোঝা গেল ব্যাপার উলটোই হবে, কারণ তা না হলে অমন ঘুষের কাণ্ড সেন্সরই আপত্তি করতো। অপারেশন শেষ হবার পর ডাক্তার মেদিনীর কাছ থেকে ইতিপূর্বেই ফি পেয়ে গিয়েছে শুনে বোঝাও গেল যে, ডাক্তার ঘুষের সেই চেকটার কথাই উল্লেখ করছে। একটা রসিকতার সৃষ্টি করা হলো বটে, কিন্তু এটা বোঝা গেল না যে, ডাক্তার মেদিনীর মতো পাষণ্ডকে পেয়েও তাকে ধরিয়ে দেয়নি কেন? অপারেশনের পর মলিনার আশঙ্কা তাকে দেখে ধরণীর মনের অবস্থা কি হবে। মলিনাকে প্রথম দেখার সময় নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্যে, যা হয়না তাই করা হলো—ব্যাণ্ডেজ খোলা হলো আলো ঝলমল ঘরে আর সংগে সংগেই ধরণী চক্ষু বিস্ফারিত করে চাইলে মলিনার দিকে এবং ব্যাপারটা নাটকীয় করে তুলতে মলিনাকে দেখেই বিকট চীৎকার করে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে। মলিনা চলে গেল ঘর থেকে। ভবেশ ধরণীকে বোঝালে যে ঐ মলিনাই তার স্ত্রী যে তাকে এতো সেবাযত্ন করে এসেছে। ধরণীর মন
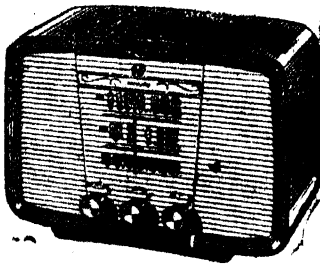
টললো, কিন্তু ভবেশ মলিনাকে ডাকতে গিয়ে দেখলে ঘরে সে নেই। চতুর্দিকে খোঁজ চললো মলিনার। মলিনা গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে। পরে দেখা গেল একজায়গায় তীরে ভেসে উঠেছে। এক পূজারি তাকে বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখান থেকে মলিনা গেল অন্ধের সেবা করতে এক আশ্রমে। অন্ধ ছেলেমেয়ে-দের সেবা যত্ন করে মলিনা আশ্রমের প্রিয় হয়ে উঠলো। একদিন দেখা গেল ভবেশ এসে হাজির। আশ্রম কর্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে জানলা দিয়ে ভবেশ মলিনাকে দেখতে পেয়ে চলে গেল। একদিন আশ্রমকর্ত্রী জানালেন এক ধনী ব্যক্তি আসছেন আশ্রম পরিদর্শনে, মলিনা যেন তাকে সব দেখায়। ধনী ব্যক্তি এলো ধরনী। মলিনা নিজেকে প্রথমে লুকিয়ে ফেললে। কিছু পরে এক ফাঁকে ধরনীর সামনে গিয়েই প ।লয়ে এলো। ধরনীও তাড়া করলে পিছু পিছু, শেষে ছুটোছুটি করে ধরনী মলিনাকে ধরে ফেললে। আরম্ভতে মলিনাকে পাত্রপক্ষের প্রত্যাখ্যান থেকে, আশ্রমে ধরনীর সঙ্গে পুনর্মিলন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তের হাজার ফিটের অসংলগ্নতা, অসঙ্গত আচরণ ও এলোপাথারি দৃশ্যের সংস্থাপন মনের অবস্থা এমন করে তোলে যে ছবিখানি শেষ হলে, আজো এমন সব কাঁচা লোকেও ছবি তোলায় রত রয়েছে দেখে দুঃখ হয়।

• • •

চিত্রনাট্যটাই এতো বাজে যে কোথাও কোন ঘটনারই জমে ওঠা সম্ভব হতে পারে না। তেমনি হয়েছে নিরেস পরিচালনা আর বাজে সংলাপের ঝুড়ি। ফলে কোন একটা চরিত্রেও অভিনয় খাপ খাওয়াবার মতোও হয়ে ওঠেনি। প্রদীপকুমার ধরনীর চরিত্রে গোড়া থেকেই অন্ধ, কাজেই ওর যেমন দেখবার কিছু নেই, তেমনি চেহারা ছাড়া দেখাবারও কিছু নেই। শেষ দিকে চোখ খুলতেই একেবারে বম্বাই অভিনয়। মেদিনীর চরিত্রে দীপক মুখোপাধ্যায়ের কেবলি চৌরিয়ে চাওয়া আর মুখ খিঁচিয়ে কথা বলা অত্যন্ত বিরক্তিকর। ভিলেন বলে বিরক্তি নয়, অসঙ্গত অভিব্যক্তি বলেই বেখাপ্পা। শকুনি মামার মতো ধীরাজ ভট্টাচার্য অভিনীত ভিলেন চরিত্রটিও তো রয়েছে, যাকে দেখলেই বিরক্ত হতে হয়, কিন্তু সে বিরক্তি অভিনয়ের ওপর নয়, সে বিরক্তি হচ্ছে চরিত্রটির বদমাইসির জন্যে। বস্তুতঃ এই একটি চরিত্রেই শুধু সঙ্গত অভিনয় দেখা যায়। মলিনাকে গঙ্গা থেকে উদ্ধারকারি পূজারির চরিত্রে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসে বসে হেলেদুলে গান গাওয়ার ভঙ্গিটাও দৃষ্টিকটু। মলিনার বাবার চরিত্রটি পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়ে যেরকম দেখায়, তাতে মনে হয় না ওরকম একজন লোক টাকার লোভে মেয়েকে অন্ধের হাতে তুলে দিতে পারে, কিন্তু জানা যায় যে, দেনার দায় থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেই সে মলিনার ঐ বিয়ে দেয়। তেমনি, শিশির মিত্র অভিনীত ডাক্তার চরিত্রটি ঘুষ নিয়ে অন্যায় করার লোক নয়, অথচ ঘুষ দিয়ে যে লোকটা একটা অমানুষিক কাজ করতে বললে, তাকে সে ধরিয়ে দিলে না। মলিনার চরিত্রে সবিতা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় জমবে কি, ওকে কালো দুঃখিনী মেয়ে বলে গ্রহণ করতেই বাধে। দিদির চরিত্রে ভারতী দেবী বোবা, কোন প্রয়োজনই বোঝা গেল না চরিত্রটির। মেদিনীর মার চরিত্রটিও অসঙ্গত, চন্দ্রাবতীর অভিনয়েও তার আচরণের যৌক্তিকতা ফোটেনি। অন্ধ-দের আশ্রমের অধিকর্ত্রীর চরিত্রে মলিনাকে দিয়ে এমনভাবে তত্ত্বকথা বলানো হয়েছে, যা বিরক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া জহর রায়কে হাজির করিয়ে তুলসী চক্রবর্তী অভিনীত খুড়োর বিয়ে মলিনার সঙ্গে দেবার জন্য প্রস্তাব করানো হরনাথের কাছে, ব্যাপারটা যেমন বেটপকা তেমনি চরিত্র-গুলিও। অভিনয়ে আর আছেন অরুণপ্রকাশ, প্রীতি মজুমদার, শ্যামলী চক্রবর্তী প্রভৃতি। হেমন্তকুমার, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখো-পাধ্যায় প্রভৃতির কখানি গান, শুনতে ভালো কিন্তু প্রয়োগদোষে জমে না। সন্তোষ মুখো-পাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় বিশেষ গুণের পরিচয় নেই। দিব্যেন্দু ঘোষের আলোকচিত্র গ্রহণ ও পরিতোষ বসুর শব্দ গ্রহণের কাজ সাধারণ।

অবিকল থিয়েটার

সম্পূর্ণ থিয়েটারের উপকরণ, মঞ্চের মতো দৃশ্য ভাগ করে সাজানো, সেইভাবের সংলাপ, ঠিক সেই জাতেরই অভিনয়, তবু তার জন্য পর্দাকে নিয়োজিত করার কি সার্থকতা ছিল থ্রি আর্টস প্রডাকসন্সের 'দাতাকর্ণ' দেখতে দেখতে বার বার সেই কথাটাই মনে হতে থাকে। মঞ্চে যেমন সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে দৃশ্যের সংস্থাপন, যেমনভাবে হয় চরিত্রের সমাবেশ এবং পরস্পর চরিত্রগুলির সংলাপের সহায়তায় ঘটনার বিবৃতি ও নাটকীয় সংঘাত পাকিয়ে তোলা; 'দাতাকর্ণ'তে কাহিনীকার মণি বর্মা ও পরিচালক ফণী বর্মা অবিকল সেই ধারার অনুসরণ করে গিয়েছেন। পুরনো আমলের চিন্তাধারার পরিচয় সর্বাঙ্গে, তবে কাহিনীটিতে জোর আছে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকে এখনকার দুই বিবদমান পক্ষের পর্যায়ে গণ্য করে নিতে পারলে একটা সাময়িক আবেদনও আছে, এবং পাকা থিয়েটারি অভিনয়ে কতকগুলি দৃশ্যে বেশ

নাট্যকৃতিত্ব থাকায় মনে আবেগ সঞ্চারেরও যোগ আছে।

* * *

আরম্ভ কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে কর্ণের পতন দৃশ্য থেকে। মঞ্চের মতো এক পাশে রথে কৃষ্ণ অর্জুন, অপর পাশে কর্ণ রথের চাকা টেনে তোলার চেষ্টা করছে। কৃষ্ণ কর্ণকে সেই অবস্থাতেই বধ করার জন্য অর্জুনকে প্ররোচিত করছে। অর্জুন নিরস্ত্রকে হত্যা করতে দ্বিধা করছে। কিন্তু কৃষ্ণের প্ররোচনায় অর্জুন কর্ণকে বাণবিদ্ধ করতে কর্ণ লুটিয়ে পড়তেই কোথা থেকে কুন্তী এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো কর্ণের বুকে। কৃষ্ণের চোখে জল দেখে অর্জুন আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলে, যাকে হত্যা করার জন্য এতো প্ররোচনা, তার পতনে কৃষ্ণের কেন শোক। এরই উত্তর দিতে কৃষ্ণ আরম্ভ করলে কর্ণের জীবন কাহিনী শোনাতে, অর্থাৎ ফ্ল্যাশব্যাকে পুরো কাহিনীটির অবতারণা। কর্ণের জন্ম থেকে অর্জুনের হাতে বাণবিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ কাহিনীটি প্রকাশ করার পর ফ্ল্যাশ-ব্যাক শেষ হলো আর তারপরই হলো কর্ণের মৃত্যু। প্রশ্ন ওঠে, কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র কর্ণ করুণভাবে মারা যাচ্ছে, কুন্তী বিলাপ করছে, আর সেই সময়ে অতক্ষণ ধরে কৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ণের দীর্ঘ জীবনকাহিনী শুনিয়ে যাচ্ছে, ফ্ল্যাশব্যাকের এটা হাস্যোদ্দীপক অসংগত অবতারণা কি-না। আর কুরুক্ষেত্র, যেটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধরূপে পরিকল্পিত, সেখানে ঐ চারটি প্রাণী ছাড়া আর কেউ নেই, তাও ছবির ক্ষেত্রে ভাবলে হাসি পায়। ভাসমান শিশু কর্ণকে জল থেকে তুলে মানুষ করতে লাগলো ধৃতরাষ্ট্রের সারথী অধিরথ। বালক কর্ণ অস্ত্রবিদ্যা অর্জন করতে চায়, কিন্তু সূতপুত্র বলে কেউ তাকে শিষ্য করতে চায় না। কর্ণ শেষে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে পরশুরামের শিষ্য হলো। সকল বিদ্যা অর্জন করে বিদায় নেবার কালে কর্ণের আসল পরিচয় পেতেই পরশুরাম তাকে অভিশাপ দিলে যে, সমকক্ষ যোদ্ধার সংগে যুদ্ধে কর্ণ গুরুদত্ত বিদ্যা বিস্মৃত হবে। ফেরবার পথে মৃগ-শিশু ভ্রমে শব্দভেদী বাণ প্রয়োগে ব্রাহ্মণের গোহত্যা করায় ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিলে সমকক্ষের সংগে যুদ্ধে কর্ণের রথের চাকা মেদিনী গ্রাস করবে। তবে দান করলে কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে। অর্জুন ও দুর্যোধনের সংগে অস্ত্র বিদ্যার প্রতিযোগিতায় কর্ণ এগিয়ে এসে জানালে যে, অর্জুনকে সে পরাস্ত করতে পারে। কিন্তু অর্জুন রাজী নয় কর্ণ সূতপুত্র ও রাজ্যহীন বলে। তৎক্ষণাৎ দুর্যোধন কর্ণকে অংগরাজ্য দান করে বন্ধু করে নিলে। কৃতজ্ঞতায় কর্ণ শপথ নিলে যে দুর্যোধনের সকল আজ্ঞা বিনা বিচারে পালন করবে। ধৃতরাষ্ট্র বিপদ বুঝে রাজ্য ভাগ করে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে রাজসূয় যজ্ঞ বসলো। কর্ণ ভাণ্ডারের ভার পেয়ে মুক্ত হস্তে দান করলে। দুর্যোধনের ঈর্ষা বাড়তে লাগলো। পাশা খেলায় সে আমন্ত্রণ জানালে পাণ্ডবদের। শকুনি মামার চালে পাণ্ডবদের রাজ্য সম্পদ এমন কি দ্রৌপদী পর্যন্ত হার হলো। দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য সভায় দুঃশাসন বিবস্ত্রা করতে উদ্যত হলো, কিন্তু কৃষ্ণ তাকে লজ্জা থেকে রক্ষা করলে। কর্ণকে পরীক্ষার জন্য কৃষ্ণ ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কর্ণের কাছে এসে কাঁচা নরমাংস ভক্ষণের অভিলাষ জানালে। অতিথির কাছে শপথবদ্ধ কর্ণ নিজের পুত্র বৃষকেতুকেই বলি দিতে উদ্যত হলো। স্বর্গ থেকে হলো পুষ্পবৃষ্টি, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দেহ পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ আশীর্বাদ জানালে। অজ্ঞাতবাসের পর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হলো। কর্ণ যুদ্ধের বিরোধী, কিন্তু দুর্যোধনকে অমান্য না করার বচন দিয়েছে সে। ভীষ্মের পতনের পর কর্ণ হলো সেনাপতি। ইন্দ্র একদিন বৃদ্ধ ভিখারীর বেশে এসে কবচকুণ্ডল নিয়ে গেল, যার বলে কর্ণ ছিল অমর। এরপর যুদ্ধ এবং কর্ণের পতন।

* * *

সব ঘটনাই প্রায় মুখে মুখে বলে যাওয়ার সামনে যে কটি ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে নাট্যকৌতুহল জাগিয়ে আবেগ সৃষ্টি করে তোলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কর্ণের সন্তান বলি, কবচকুণ্ডল দান এবং শেষে কর্ণ-কুন্তী মিলনের দৃশ্য। সর্বতোভাবে থিয়েটারের ঢঙে উপস্থাপিত হলেও দৃশ্য কটিতে নাট্যরস উপভোগ করা যায়। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের সময় গান, বৃষকেতুর বলি হবার আগে গান এবং মাঝে মাঝে নিয়তির গান গেয়ে আবির্ভাব মঞ্চের ধারারই

অনুসৃতি, কিন্তু পর্দায় দেখতে দেখতে মনে হয় *যেন গানের থাপ্পড়ে নাট্যসম্পূর্তিকে* দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্জুনের সঙ্গে প্রতিযোগিতার যোগ্য করে তুলতে দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ করলে, তারপর কিন্তু প্রতিযোগিতাটা আর দেখা গেল না। নাটকের মতো করে দৃশ্য সাজানো বলে ঘটনার মাঝে মাঝে ফাঁক দেখা যায়। অভিনয় সম্পূর্ণভাবে মঞ্চানুগ। নাম ভূমিকায় কমল মিত্র তার চেহারা ও কণ্ঠের সঙ্গে বেশ মানানসই চরিত্র পেয়ে জমিয়ে তুলেছেন। সুন্দর ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর ও অভিব্যক্তির জন্য কৃষ্ণ ও ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণের চরিত্রে অসীমকুমার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। বৃদ্ধের রূপসজ্জায় কর্ণকে বিপাকে ফেলার জন্য ছলনার তার অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নীতীশ মুখোপাধ্যায়কে দুর্যোধনের চরিত্রে মানিয়েছে, অভিনয়ও জমিয়েছেন। কীর্তিশিল্পীর একটুকরো ভাল অভিনয় পরিবেশন করেছেন কুচক্রী শকুনির চরিত্রে গঙ্গাপদ বসু। অরুণপ্রকাশ, মোহন ঘোষাল, রবি মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ, নরেন চক্রবর্তী, দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপ্তি রায়, মলিনা, তপতী, অপর্ণা প্রভৃতি সকলেরই অভিনয় মঞ্চধারার; বড়ো চরিত্রগুলির সঙ্গে তাল রেখে গিয়েছেন। দ্রৌপদীর চরিত্রে নবাগতা নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় তেমন ছাপ দিতে পারলেন না। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী বসু, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্রের গাওয়া গানগুলির প্রয়োগ মঞ্চনাটকের মতোই। সংগীত পরিচালনা করেছেন রাজেন সরকার, কাজ চালানোর মতো। স্বল্প পরিসর দৃশ্য, তবে শিল্পনির্দেশক সত্যেন রায়চৌধুরীর সেট কটির কাজ ভাল। আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ করেছেন যথাক্রমে ধীরেন দে ও সুশীল সরকার।

চরমের চরম

হিন্দী ছবিতে সব ব্যাপারেই অতিশয়তার যে ঢেউ এসেছে তার উৎপত্তি কিন্তু মাদ্রাজে। সেই 'চন্দ্রলেখা' যে হিন্দী বাজার মাতিয়ে তোলে তার পর থেকে সেই মাতনেরই জের চলে আসছে। আজ সেই অতিশয়তার মাতামাতি যে কতোটা চরমে উঠেছে তারই একটি দৃষ্টান্ত প্রসাদ প্রডাকসন্সের 'সারদা'। এ ছবিখানি মাদ্রাজে প্রভূত সাফল্যমণ্ডিত ছবিরই হিন্দী সংস্করণ এবং মাদ্রাজেই তোলা বম্বের শিল্পীদের নিয়ে। বাড়াবাড়িকে একেবারে চূড়ান্ত করার দৃষ্টান্ত সব বিষয়েই—নায়ক চরিত্রটি রাজ কাপুরের উপযোগী নয়, কিন্তু তাকে নেওয়া হয়েছে হিন্দীতে সেরা বড়ো শিল্পী বলে; সংগীত পরিচালনায় সি রামচন্দ্রকে নেওয়া হয়েছে বহুপ্রকারের বহু যন্ত্রের সমাবেশে সংগীতের বিরাট প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারেন বলে; এমন পরিবার যে বাড়ির মেয়ে রান্না থেকে ঘর নিকনো পর্যন্ত

অগ্রদূত পিকচার্সের প্রথম ছবি, গেভাকলারে রঙীন প্রথম বাঙলা ছবি "পথে হলো দেরী"তে সুচিত্রা সেন

কাজ করে কিন্তু তার বাড়িটা একটা প্রাসাদ; গলা ফাটিয়ে কথা বলার জন্যে সে বিষয়ে ওস্তাদ গোপ, আগা, ওমপ্রকাশ, মনোরমা প্রভৃতি শিল্পীকে তো নেওয়া হয়েছেই, তাছাড়া অন্যান্যদের গলাও যাতে সর্বদা সপ্তমে চড়ে থাকতে পারে, তার জন্যে শব্দগ্রহণে বেশী চ্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে; আবহসংগীত চড়া করে তোলা যাতে কাণের পর্দা ফেটে যায়। বিরাট বিরাট সেট, বিরাট শিল্পী, বিরাট সংগীত প্রবাহ, সংলাপ ও সংগীতের বিরাট আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে প্রায় পুরো তিন ঘণ্টার বিরাট দৈর্ঘ্য (১৫৮৯৫ ফিট)। মূল বিষয়বস্তুটি বেশ ভাল এবং হিন্দী ছবির তুলনায় সাহসিক পরিকল্পনা হলেও অতো সব বিরাটের দাপাদাপিতে খোঁড়া হয়ে ল্যাটিয়ে পড়ে থাকে। লালিত্য ও মাধুর্যকে, মানুষের কমনীয় রুচিবোধকে চেঁচিয়ে দাবিয়ে দেবার এই সব প্রচেষ্টার পরিণতি কি হবে বলা যায় না, কারণ দেখা যায়, এই ধরণের বিরাটের উৎকটতাই সাধারণ দর্শকদের বেশী আকৃষ্ট করে। এ সব ছবি দেখার ভীড়ও হয় বিরাট।

• • • •

শেখর তার এক মাতাল অসুস্থ বন্ধুকে চিকিৎসার জন্য পথে এক প্রাকৃতিক আরোগ্য আশ্রমে ভর্তি করে দেয়। সেই আশ্রমের প্রধানা সেবিকা সারদাকে দেখা মাত্রই শেখর আকৃষ্ট হয়। শেখর প্রায় জোর করেই সারদাকে বাধ্য করে তোলে তাকে ভালবাসতে এবং ঠিক হয় যে, শেখর সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসেবে চীন থেকে ফিরে আসার পর ওরা বিবাহ করবে। চীন যেতে পথে মাঝ আকাশেই বিমানে আগুন লাগে এবং যাত্রিসমেত বিমান ধ্বংস হয়। সব যাত্রীই মারা গিয়েছে এই খবর আসে, *আসলে কিন্তু শেখরকে আহত অবস্থায়* তুলে আনে একটা উপজাতির দল যাদের, দেখতে খানিকটা নাগা, খানিকটা তিব্বৎনামী, খানিকটা শ্যামদেশীয়—এমনি একটা জগাখিচুড়ি। শেখর মারা গিয়েছে জেনে ওর বাবা কাশীরাম ভেঙে পড়লো, ছোট ছেলেমেয়েদের দুর্দশার অন্ত রইলো না। কাশীরাম ও তার ছেলেমেয়েদের সেবা করার জন্য এলো সারদা। সারদা জানলো না কাশীরাম শেখরেরই পিতা। ওরা সব সুস্থ হয়ে উঠলো সারদার সেবাযত্নে। সারদাকে ওরা ছাড়তে চায় না, তবু সারদা আশ্রমে ফিরে এলো। তারপর ওকে বোঝানো হলো যে, তার অভাবে কাশীরামের সংসার উৎক্রান্ত হয়ে যাবে। সেবাব্রতে দীক্ষিতা ভারতীয়
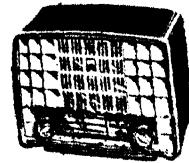
নারীর আদর্শ জেগে উঠলো মনে। তাছাড়া শেখর যখন মারা গিয়েছে তখন সারদার আপত্তি হলো না কাশীরামকে বিয়ে করতে। বিয়ের পর একদিন সারদা জানতে পারলে যে সে বিয়ে করেছে শেখরের বাবাকে। হঠাৎ একদিন শেখর আশ্রমে এসে হাজির। সারদা সেখানে গিয়েছিল পুজো দিতে, তাকে সীমন্তিনী দেখে শেখর তাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করলে বিশ্বাসঘাতিনী বলে। শেখরের আরো বুক ভাঙলো যখন দেখলে সারদা বিয়ে করেছে তারই বাবাকে। মায়ের আসনে সারদাকে সে অধিষ্ঠিত করবে কি করে? সারদা শেখরকে বোঝায়, প্রেম পিতামাতাপুত্র সকলের সঙ্গেই হতে পারে, শেখর একদিন তার সঙ্গে প্রেম করেছিল বলে আজ সে সন্তানরূপে প্রেম করতে পারে। শেখর বুঝতে চায় না। নিদারুণ মানসিক সংঘাত চাপা দিতে শেখর বাড়ি থেকে চলে গিয়ে মদ ধরলে। সারদা তাকে বাড়িতে আনালে, তাকে মদ খাবার অবাধ সুযোগ দিলে। এমন হলো যে, শেখরকে একদিন মদের জন্যে ফাটকে যেতে হলো। ওকে থানা থেকে সারদাই আনালে, তারপর সারদা তার স্বামী ও শেখরের ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হলো। শেখরের হাতে বাড়ির চাবি দিয়ে সারদা জানিয়ে দিলে বাড়ির মান ও সম্পদের সম্পূর্ণ মালিক শেখর, তার যা খুসী সে করতে পারে। শেখর অনুনয় জানালে তাকে ঐরকম অসহায়ভাবে ফেলে চলে না যেতে। কিন্তু সারদারা চললো, শেষে কোন কিছুতেই ওদের ফেরাতে না পেরে শেখর মা বলে আর্তনাদ করে ফিরে আসতে ডাকলে ওদের। মা ডাকটাই চাইছিল সারদা, ফিরে এলো ওরা।

* * *

. ন্যায্যভাবে গল্পের এইখানেই শেষ হওয়া উচিৎ, কিন্তু বাড়াবাড়ির যে আরো অনেক বাকি থেকে যায়। তাই এলো দ্বিতীয় পর্ব। এ পর্বের এক দিকে রয়েছে—শেখরের বিয়ে দিয়ে বৌ আনা; আরেক দিকে সেই বৌ চঞ্চলার বাপের বাড়িতে তার স্ত্রৈণ বাপ ও দজ্জাল মা এবং দাদা ও বৌদিকে নিয়ে। এই নিয়েই অর্ধেক ছবি। যাতে দেখানো হয়েছে শেখরের সৎমাপ্রীতিকে চঞ্চলা দেখে বিষচক্ষে, আর তাই নিয়ে শেখরের সঙ্গে ও সারদার সঙ্গে তার বিবাদ। আর ওদিকে চঞ্চলার দাদা গণেশের মা-বাবাকে শিক্ষা দেবার জন্যে বৌ ঠেঙানোর অভিনয় দেখিয়ে ঘর-শুধার পালা সৃষ্টি করে যাওয়া। চঞ্চলার সঙ্গে বিবাদের পরিণতি হলো শেখরের গৃহত্যাগে। সারদা স্বামীকে নিয়ে দীর্ঘদিন ঘুরে শেখরকে দারুণ অসুস্থ অবস্থায় খুঁজে নিয়ে এলো। সারদা চঞ্চলার কাছে শপথবদ্ধ যে শেখরের সামনে কোন-দিন যাবে না। সারদা এসে ঠাকুরঘরের সামনে পণ করে বসলো যে শেখর আরোগ্যলাভ না করলে সে জলস্পর্শ করবে না। শেখর বিছানায় শুয়ে কেবল মা মা বলে ডাকে। সারদা তার পণে অটল। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেল। স্বামী ছেলে মেয়ে সকলে এসে সারদাকে অনুরোধ জানালে শেখরকে এক-বার দেখতে যেতে। কিন্তু সারদা দাঁড়ালো ঠাকুরের সামনে, বললে শেখরের মৃত্যু হতে পারে না; ঠাকুরের কাছে নিবেদন করলে তার প্রাণের বিনিময়ে যেন শেখরের প্রাণ রক্ষা হয়। কাশীরাম সারদাকে শেখরের পাশে না আনতে পেরে শেখরের শেষ মুহূর্তে বুঝে তাকেই কাঁধে করে সারদার কাছে আনতে লাগলো। দারুণ ঝঞ্ঝা বজ্রপাত। বয়ে আনতে শেখর গেল পড়ে, সারদা ছুটে গিয়ে শেখরের মাথাটা কোলে নিয়ে বসলো। দারুণ ঝড় ভেদ করে আরম্ভ হলো বৃষ্টি। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ ফর্সা হলো। শেখর বেঁচে উঠলো—কে জানে সারদার প্রার্থনার জোরে না, সিনেমার কায়দায় হঠাৎ এনে ফেলা ঝড়, বজ্রপাত বৃষ্টির জন্যে, তা বলা যায় না। তবে শেখরকে বাঁচিয়ে সারদা প্রাণত্যাগ করলে। এতো তীব্র ও বাড়া-বাড়ির চরম যে, চোখ কাণের অবস্থা স্বাভাবিক হলে গুণাগুণ বিচার করে পেরে ওঠা যায় না। শুধু এইটেই বোঝা যায় যে, আগা আর অনিতা গুহ, এবং মনোরমা ও গোপকে দিয়ে বৌ-ঠেঙানোর পালাটা যেভাবে কচলাড়ে (কু-হস্তেমড়)। কাণ্ডতে ভরিয়ে ছবির এক-তৃতীয়াংশ জমিয়ে রাখা হয়েছে তাতে যে যাই বলুক, এ ছবির মার নেই।

বিবিধ সংবাদ

প্রেস পিকচার্স তাদের প্রথম ছবির নাম শশিবাবুর সংসার' বদলে রেখেছেন শুধু 'শশিবাবু'। সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরি-চালনায় ছবিখানি তোলা হচ্ছে।

* *

এম জি এস পিকচার্স গত ২৯শে নভেম্বর তাদের দ্বিতীয় ছবি 'বি পি ভট্টারী'র মহরৎ সম্পন্ন করেছেন। ছবি-খানি পরিচালনা করবেন এম জি এস পিকচার্স ইউনিট এবং সুরযোজনা, গীত রচনা ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে নচিকেতা ঘোষ, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

* * *

সংগীত পরিচালক ভূপেন হাজারিকা পূর্বভারতের শোভাময় প্রকৃতি ও সুরছন্দ অবলম্বনে কাব্য সংগীতমূলক একখানি ছবি পরিচালনায় উদ্যোগী হয়েছেন। ছবিখানির নাম 'মাহুত বন্ধু রে'। কাহিনী লিখেছেন স্বর্গত প্রমথেশ বড়ুয়ার পুত্র অমলেশ বড়ুয়া। এর গানগুলি গেয়েছেন আসামের সুখ্যাত গায়িকা প্রতিমা বড়ুয়া, ডবেন মাহুত, বয়ান মাহুত প্রভৃতি। কোচবিহার, গোয়ালপাড়া ও ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে ছবিখানি তোলা হবে।

* * *

হাওড়া সংগীত সম্মিলনীর দুই দিবস-ব্যাপী অনুষ্ঠান হবে ২২শে ও ২৩শে ডিসেম্বর হাওড়া ময়দানে। প্রথম দিন হবে অতীনলাল পরিচালিত নৃত্যনাট্য 'রামলীলা' এবং দ্বিতীয় দিন বম্বে ও কলকাতার বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীদের গানবাজনা।

* * *

আগামী ২১শে থেকে ২৩শে ডিসেম্বর পূর্ব কলকাতার নবমিলন সংঘের উদ্যোগে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। উচ্চাঙ্গ সংগীত বিষয়ে আলোচনা করবেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, রবীন্দ্রসংগীতে থাকবেন সুচিত্রা মিত্র, কীর্তনে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, পল্লীগীতিতে পূর্ণদাস বাউল, নৃত্যে পিনাকী ভাস্করেকর ও প্রহ্লাদ দাস সম্প্রদায়, সংগতে কানাই দত্ত, মহাপুরুষ মিশ্র, রামনাথ মিশ্র, ক্লাসিকাল সংগীতে বিনায়ক-রাও পটবর্ধন এবং 'মাইকেল' অভিনয়ে শিশির ভাদুড়ী ও সম্প্রদায়।

* * * *

এস আর প্রডাকসন্স তাদের নবতম প্রচেষ্টা 'নর্মবাণী'র মহরৎ সম্পন্ন করেন ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে গত সপ্তাহে। ছবি-খানি তোলা হচ্ছে সুশীল মজুমদারের পরি-চালনায় এবং অন্যান্য বিভাগে আছেন কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনায় মনোজ ভট্টাচার্য, সংলাপ রচনায় প্রশান্ত চৌধুরী, সংগীত পরিচালনায় জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, আলোকচিত্রগ্রহণে অনিল গুপ্ত, শব্দগ্রহণে বাণী দত্ত, সম্পাদনায় কালী রাহা, শিল্পনির্দেশে বিজয় বসু। ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, অনুপকুমার, অসীমকুমার, চন্দ্রাবতী, ছায়া দেবী, মঞ্জু দে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সীমা দত্ত প্রভৃতি।

* * * *

বিমল রায়ের পরবর্তী প্রচেষ্টা হচ্ছে পৌরাণিক আখ্যানবস্তু নিয়ে একখানি ছবি তোলা। ছবিখানি হবে ইস্টম্যানকলারে এবং অন্যতম বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকবে অমিত্রাক্ষর ছন্দে সংলাপ আগাগোড়া।

একলব্য

উড়িষ্যা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উপর এবার ভারতের জাতীয় খেলাধুলোর পরিচালনা-ভার ন্যস্ত হয়েছে। কটকের বড়বাটি স্টেডিয়ামে ফেব্রুয়ারী মাসের ৬ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত ৪ দিন ধরে জাতীয় খেলাধুলো অনুষ্ঠিত হবার কথা। সুতরাং এই মহাক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজনের জন্য উড়িষ্যার খেলাধুলোর কর্ণধারেরা এখন কর্মব্যস্ত।

ইতিপূর্বে উড়িষ্যায় কোনদিন জাতীয় খেলাধুলোর আসর বসেনি। তাছাড়া, এবারকার জাতীয় খেলাধুলোর একটা বিশেষ গুরুত্বও আছে। কারণ, জাতীয় খেলা-ধুলোর ফলাফলের ভিত্তিতেই এবার টোকিও এশিয়া গেমে ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হবে। সুতরাং নিজ নিজ দক্ষতা দেখাবার জন্য খেলোয়াড় এবং অ্যাথলীটরা যেমন চেষ্টা করবেন, তেমন খেলাধুলোয় পরম আগ্রহী উড়িষ্যার পরিচালকরাও চেষ্টা করবেন অনুষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত করতে।

অ্যাথলেটিকস্, ভলিবল, কবাডি, মুষ্টি-যুদ্ধ, জিমন্যাস্টিকস্ ও ভারোত্তোলন—এই পাঁচটি বিষয় কটক ক্রীড়ানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় দিল্লীতে সুইমিং এবং পাতিয়ালায় বাস্কেট-বল খেলার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।

জাতীয় খেলাধুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য উড়িষ্যা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন যে কমিটি গঠন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব হয়েছেন তার সভাপতি এবং রাজ্যপাল শ্রীসুখথনকর ও পৃষ্ঠপোষক। এরা ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর কাছ থেকে শুভেচ্ছাবাণীও আদায় করেছেন। বড়বাটি স্টেডিয়ামের বিপরীত দিকস্থ পুরান 'কল' ময়দানকে অলিম্পিক গ্রামে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। এখানে দেড় হাজার খেলোয়াড় ও অ্যাথলীটের থাকবার জন্য তাবু খাটানো হবে। অভ্যাগত প্রতিনিধি-দের অন্যান্য সুখ সুবিধার প্রতিও সর্বদা রাখা হবে সতর্ক দৃষ্টি। উড়িষ্যার খেলা-ধুলোর কর্ণধারেরা, যারা শুধু লটারীর সাহায্যে এক বিরাট স্টেডিয়াম গড়ে তুলেছেন তাঁদের কর্মদক্ষতার উপর আমাদের যথেষ্টই আস্থা আছে। সুতরাং আমরা আশা করি, ভারতের সপ্তদশ জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান উড়িষ্যাবাসীদের সুব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।

অল জাপান টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান-শিপের খেলায় টেবল টেনিসের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান তোশিয়াকী তানাকার সাম্প্রতিক পরাজয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টোকিওর চুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ খেলোয়াড় সেইজি নারিতা সেমি ফাইন্যালে তানাকাকে পরাজিত করবার পর ফাইন্যালে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর খেলোয়াড় সোইচি সাকাইকে পরাজিত করে জাপানের নতুন চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। নারিতার কাছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান তানাকার পরাজয় কোন অঘটন নয়। যোগ্য খেলোয়াড় হিসাবেই নারিতা বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন।

পুরুষ বিভাগের মত মহিলা বিভাগেও বিশ্বচ্যাম্পিয়ান মিস্ ফুজি এগুচিকে একুশ বছরের এক অখ্যাতনাম্নী খেলোয়াড় মিস্ যোশি নাকাজিমার কাছে কোয়ার্টার ফাইন্যালে হার স্বীকার করতে হয়েছে। জাপানের নতুন মহিলা চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মিস্ কাজু ইয়ামাইজুমি। মিস্ ইয়ামাইজুমি 'শেক্-হ্যাণ্ড গ্রিপে' খেলে ফাইন্যালে ১৯৫৬ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়ান মিস্ টমি ওকা-ওকাকে স্ট্রেট গেমে পরাজিত করেন। সুতরাং টেবল টেনিসের আগামী বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় জাপানের জাতীয় দলে সেইজি নারিতা ও মিস্ কাজু ইয়ামাই-জুমির অন্তর্ভুক্তি একরকম নিশ্চিত।

বিশ্ব টেবল টেনিসে জাপানের আবির্ভাব বেশী দিনের কথা নয়। মাত্র ১৯৫২ সাল থেকে জাপান বিশ্ব টেবল টেনিসে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু এর মধ্যে যতবার জাপান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ততবারই লাভ করেছে বিশ্বজয়ীর অনন্য সম্মান।
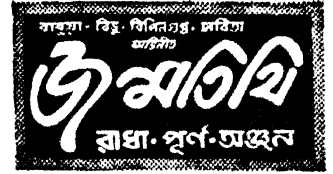
শুধু একজন বা দুইজন খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর করেই জাপান বার বার বিশ্বজয়ী হয়নি। প্রায় প্রতিবারই তৈরী করেছে নতুন নতুন খেলোয়াড়। ১৯৫২ সালে বিশ্ব টেব্‌ল টেনিসে জাপানের অভাবনীয় সুফলের পর পশ্চিমের খেলোয়াড়গোষ্ঠী জাপ-প্রতিভার উপর কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'এবারকার ফলাফল ব্যতিক্রম ছাড়া কিছু নয়'। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ১৯৫২ সালের ফলাফলই ব্যতিক্রম নয়—জাপানের সামগ্রিক প্রতিভাই বিশ্ব টেব্‌ল টেনিসের এক মহা ব্যতিক্রম। কে জানে, ১৯৫৮ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব জাপানের নতুন খেলোয়াড়ের জন্য অপেক্ষা করছে কি না!

• • • •

ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে পূর্বাঞ্চল টেব্‌ল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা শেষ হয়ে গেছে। পূর্বাঞ্চলের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন রেলওয়ের খেলোয়াড় কে নাগরাজ। নাগরাজ ফাইনালে রেলওয়েরই অপর খেলোয়াড় থিরুভেংগডমকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন বাঙলার টেব্‌ল টেনিস পটিয়সী কুমারী ঊষা আয়েংগার।

• • •

পূর্বাঞ্চল টেব্‌ল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্যোক্তারা এই খেলার জন্য ভারতের প্রায় সমস্ত কুশলী খেলোয়াড়কেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু নাগরাজ আর থিরুভেংগডম ছাড়া খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের মধ্যে আর কেউই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেননি। অথচ ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় নির্ধারণের জন্য পূর্বাঞ্চল প্রতিযোগিতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যাই হোক, কুশলী ও খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের অভাবে পূর্বাঞ্চল প্রতিযোগিতার খেলা মোটেই ভাল জমেনি। নাগরাজ ও থিরুভেংগডমের ফাইন্যাল খেলাকে নিঃসন্দেহে নৈরাশ্যজনক ফাইন্যাল খেলা বলে অভিহিত করা যায়। সাত দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার মধ্যে দর্শকদের কিছুটা আনন্দ দিয়েছে নাগরাজের সঙ্গে বাঙলার তরুণ খেলোয়াড় দীপক ঘোষের এবং থিরুভেংগডমের সঙ্গে বাঙলার কীর্তিমান খেলোয়াড় জ্যোতির্ময় ব্যানার্জির সেমি ফাইন্যাল খেলা।

পনেরো বছরের স্কুল ছাত্র দীপক ঘোষ, যিনি মাত্র কয়েক দিন আগে বাঙলার রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন, তিনি নাগরাজের সঙ্গে সেমি ফাইন্যালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। ভারতীয় টেব্‌ল টেনিস ক্রমপর্যায়ে নাগরাজের স্থান পঞ্চম আর জুনিয়র খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায়ে দীপকের স্থান চতুর্থ। কিন্তু জুনিয়র খেলোয়াড় দীপককে পরাজিত করতে সিনিয়র খেলোয়াড় নাগরাজের রীতিমতই বেগ পেতে হয়েছে। এক সময় মনে হয়েছিল দীপকই বুঝি নাগরাজকে হারিয়ে ফাইন্যালে উঠবে। দীপক ঘোষ 'টপস্পিনে' খেলতে খুবই অভ্যস্ত, হাতে মারও আছে চমৎকার। ফোর হ্যান্ডের ড্রাইভ প্রতিপক্ষের ভীতি সঞ্চারক। অভিজ্ঞ খেলোয়াড় নাগরাজের কাছ থেকে দীপক পাঁচটি গেমের মধ্যে দুইটি গেম লাভ করেছেন। এর মধ্যে একটি গেমে নাগরাজ দীপকের কাছ থেকে ৯ পয়েন্টের বেশী লাভ করতে পারেননি।

জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি ও থিরুভেংগডমের সেমি ফাইন্যাল খেলা দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে সবচেয়ে বেশী। বাঙলার খ্যাতনামা খেলোয়াড় জ্যোতির্ময় ব্যানার্জির ভারতীয় টেব্‌ল টেনিস ক্রমপর্যায়ে এখন আর কোন স্থান নেই। কিন্তু ইতিপূর্বে জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি টোকিওর এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে এবং ১৯৫৪ সালে ওয়েম্বলীর বিশ্ব টেব্‌ল টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। থিরুভেংগডমও প্রাক্তন ভারত চ্যাম্পিয়ন। জ্যোতির্ময় এবং থিরু দুইজনের খেলাতেই এইদিন পূর্ব নৈপুণ্যের আভাস ফুটে ওঠে। এবং পঞ্চম গেমের শেষ পয়েন্ট পর্যন্ত জয়-পরাজয়ের প্রশ্নে দর্শকদের মধ্যে থাকে অধীর আগ্রহ। খেলার সূচনা থেকেই একবার থিরুভেংগডম একবার জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি অগ্রগামী হতে থাকেন। জ্যোতির্ময় ব্যানার্জির ক্ষরক্ষিপ্র চাপ মারে থিরুভেংগডম নাজেহাল হন বটে, কিন্তু যে চাপ তোলা একরকম শিবের অসাধ্য, থিরু সে চাপ তুলে দর্শকদের অবাক করে দেন। দুই খেলোয়াড়ই দুটি করে গেম পাবার পর জয়-পরাজয় নির্ণায়ক পঞ্চম গেমটি হয় খুবই আকর্ষণীয়। শেষ মুখে জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি ১৬—২০ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েও অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে থাকেন। ফলে দুই খেলোয়াড়ের মধ্যে আর মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধান থাকে। জ্যোতির্ময়ের ১৯ আর থিরুর ২০। শেষ পর্যন্ত ২১—১৯ পয়েন্টে থিরু গেম লাভ করেন।

ফাইন্যালের প্রতিদ্বন্দ্বী নাগরাজ এবং থিরুভেংগডম—দুইজনই সাউথ ইস্টার্ন রেলের খেলোয়াড়। আগেই বলেছি ভারতীয় ক্রমপর্যায়ে নাগরাজের স্থান পঞ্চম। প্রাক্তন ভারত চ্যাম্পিয়ন থিরুভেংগডম বর্তমানে অষ্টম স্থানের অধিকারী। রক্ষণমূলক অর্থাৎ ডিফেন্সিভ খেলায় ভারতে থিরুভেংগডমের দ্বিতীয় জুড়ি নেই। থিরুর যেমন অনমনীয় দৃঢ়তা, তেমনই শক্ত ডিফেন্স। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নাগরাজ বলিষ্ঠ হাতে মেরে খেলতেই অভ্যস্ত। কিন্তু প্রয়োজন হলে নাগরাজও যে থিরুর চেয়ে ভাল ডিফেন্সিভ গেম খেলতে পারেন, পূর্বাঞ্চল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে তিনি তারই পরিচয় দিয়ে গেছেন। রক্ষণমূলক খেলার অবতারণা করে থিরুভেংগডম নাগরাজের কাছ থেকে প্রথম গেমটি লাভ করলেও পরের গেম থেকে নাগরাজ রক্ষণমূলক খেলার অবতারণা করেন। ফলে খেলা আকর্ষণহীন হয়ে ওঠে। থিরুভেংগডম মেরে খেলতে গিয়ে ভুলচুক করতে থাকেন। নাগরাজের জয়লাভও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

অনেকেই আশা করেছিলেন, ডাবলসের ফাইন্যাল খেলায় জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি ও সমীর মুখার্জি নাগরাজ ও থিরুভেংগডমকে যথেষ্ট বেগ দিবেন। কিন্তু নাগরাজ ও থিরুভেংগডম স্ট্রেট গেমেই বাঙলার ব্যানার্জি-মুখার্জি জুটিকে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি ও সমীর মুখার্জি ফাইন্যালে কিছুই খেলতে পারেননি।

নীচে পূর্বাঞ্চল টেব্‌ল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালের ফলাফল দেওয়া হল—

পুরুষদের সিংগলস—ফাইন্যাল

কে নাগরাজ ১১-২১, ২১-১৫, ২১-৯

২১-২ পয়েণ্টে টি থিরুভেংগড়মকে জিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস—ফাইন্যাল

টি থিরুভেংগড়ম ও কে নাগরাজ ২১-১০, ২১-১২ ও ২১-১২ পয়েণ্টে সমীর মুখার্জি ও জ্যোতির্ময় ব্যানার্জিকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস—ফাইন্যাল

সরোজ ঘোষ ও কুমারী উষা আয়েংগার ২০-২২, ২১-১৫, ২১-২৩, ২১-১৯ ও ২১-১৩ পয়েণ্টে দীপক ঘোষ ও মিসেস চমন কাপুরকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস—ফাইন্যাল

কুমারী উষা আয়েংগার ১৮-২১, ২১-১৮, ২১-১৩ ও ২১-১৩ পয়েণ্টে মিসেস চমন কাপুরকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিংগলস—ফাইন্যাল

দীপক ঘোষ ২১-১৯, ১৩-২১, ২১-১৩ ও ২১-১৫ পয়েণ্টে হাজারী অ-কে পরাজিত করেন।

• • •

পূর্বাঞ্চলিক টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা শেষ হবার সংগে সংগে ভারতের সমস্ত আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হয়ে গেছে। ডিসেম্বরের ২০ তারিখ থেকে কলম্বোতে আরম্ভ হচ্ছে ভারতের জাতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা এই বছর থেকেই প্রথম চালু হয়েছে। টেবল টেনিস ফেডারেশনের ব্যবস্থামত ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। বোম্বে, দিল্লী, নাগপুর, মাদ্রাজ ও কলিকাতাকে যথাক্রমে নির্বাচিত করা হয় পশ্চিম, উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের খেলার কেন্দ্র। এই পাঁচটি আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা ও জাতীয় প্রতিযোগিতার ফলাফলের নিরিখে খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় তালিকা রচনা করা হবে। এর আগে পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের ফাইন্যালে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন গৌতম দেওয়ান বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন সুধীর থ্যাকার্সে। পশ্চিম এবং মধ্য অঞ্চলের দুই ফাইন্যালে খেলাতেই গৌতম দেওয়ান পরাজিত করেছেন ডি সোমায়াকে আর সুধীর থ্যাকার্সে উত্তর অঞ্চলের ফাইন্যালে এস আর ইরানীকে এবং দক্ষিণ অঞ্চলের ফাইন্যালে এস বি জোগকে পরাজিত করেছেন।

মেয়েদের বিভাগে পশ্চিম অঞ্চলে কুমারী চিত্রা নাগোলকার, মধ্য অঞ্চলে কুমারী জয় ডি'সুজা এবং উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে কুমারী রাসেল জন বিজয়িনী হয়েছেন। জুনিয়র খেলোয়াড়দের বিভাগে পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর অঞ্চলের বিজয়ী হয়েছেন জয়ন্ত ভোরা, দক্ষিণ অঞ্চলের বিজয়ী হয়েছেন হায়দরাবাদের আজম। এখন জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের ফলাফলের উপর আঞ্চলিক বিজয়ী ও বিজিতদের ক্রমপর্যায় নির্ভর করছে। নীচে পুরুষ, মহিলা ও জুনিয়র খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় তালিকা দেওয়া হল—

ভারতীয় টেবল টেনিসের ক্রমপর্যায়

পুরুষদের

১ম—জি আর দেওয়ান (বোম্বে)
২য়—যতীন ব্যাস (বোম্বে)
৩য়—এস আর ইরানী (বোম্বে)
৪র্থ—সুধীর থ্যাকার্সে (বোম্বে)
৫ম—কে নাগরাজ (রেলওয়ে)
৬ষ্ঠ—দিলীপ সম্পৎ (বোম্বে)
৭ম—এম এস আজরেকর (মহারাষ্ট্র)
৮ম—টি থিরুভেংগড়ম (রেলওয়ে)
৯ম—কে রামকৃষ্ণ (হায়দরাবাদ)
১০ম—এস ভি রংগরাজ (বোম্বে)

মহিলাদের

১ম—কুমারী মীনা পরাণ্ডে (মহারাষ্ট্র)
২য়—কুমারী জয় ডি'সুজা (বোম্বে)
৩য়—কুমারী প্রিসকা নিউনস (বোম্বে)
৪র্থ—কুমারী রাসেল জন (মাদ্রাজ)
৫ম—কুমারী ইন্দিরা আয়েংগার (দিল্লী)
৬ষ্ঠ—কুমারী উর্মিলা থান্না (পাঞ্জাব)
৭ম—কুমারী উষা আয়েংগার (বাংলা)
৮ম—কুমারী উষা সুন্দররাজ (মহীশূর)

জুনিয়র খেলোয়াড়দের

১ম—জয়ন্ত ভোরা (বোম্বে)
২য়—এস কে শ্রীনাথ (দিল্লী)
৩য়—ইন্দ্রপ্রকাশ (দিল্লী)
৪র্থ—দীপক ঘোষ (বাংলা)
৫ম—এম আজম (হায়দরাবাদ)
৬ষ্ঠ—এ অশোক (মাদ্রাজ)

খেলাধূলোর খবরাখবর

তিনটি নতুন ভারতীয় রেকর্ড— লক্ষ্ণৌতে ইস্টার্ন কম্যান্ড সামরিক বাহিনীর অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে তিনটি বিষয়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২০০০০ মিটার ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় নতুন রেকর্ড করেছেন জোরু সিং। জোরু সিং ১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ৪৮·২ সেকেণ্ডে এই পথ অতিক্রম করেন। এই বিষয়ে হরনায়েক সিংয়ের রেকর্ড ছিল ১ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ১৮·৬ সেকেণ্ড।

হাতুড়ি ছোঁড়ায় দেবী দয়াল তার আগের রেকর্ড ১৬৩ ফুট ৮ ইঞ্চিকে ম্লান করে দিয়ে ১৬৬ ফুট ½ ইঞ্চি দূরে হাতুড়ি ছুঁড়ে নতুন রেকর্ড করেছেন।

৩০০০ মিটার স্টিপল চেজে ডাক্তার রায়ের রেকর্ড ছিল ৯ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড। ৩০০০ মিটার স্টিপল চেজে পাল সিংয়ের নতুন রেকর্ড হয়েছে ৯ মিনিট ৯ সেকেণ্ড।

তিনটি রেকর্ড অবশ্য এখনও অনুমোদন সাপেক্ষ।

সাউথ অস্ট্রেলিয়ান টেনিস—সাউথ অস্ট্রেলিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় মল এণ্ডারসন ৭-৫, ৬-৭, ৪-৬, ৬-২ ও ৬-৪ সেটে মার্ভিন রোজকে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। এই প্রতিযোগিতার সেমি ফাইন্যালে ডেভিস কাপের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে নির্বাচিত ৪জন খেলোয়াড়কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যায়। মল এণ্ডারসন উইম্বলডন রানার্স আপ অ্যাসলে কুপারকে ১০-৮, ১০-৮ ও ৬-৩ সেটে এবং মার্ভিন রোজ ৮-১০, ৮-৬, ৬-৪ ও ৬-৩ সেটে নীল ফ্রেজারকে হারিয়ে ফাইন্যালে উঠেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমেরিকার ডেভিস কাপ খেলোয়াড় এবং প্রাক্তন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন ভিক সেক্সাস, যিনি ডেভিস কাপের খেলার জন্য সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় এসেছেন। তিনি এই প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইন্যালে খেলোয়াড় মার্ভিন রোজের কাছে পরাজিত হন।

দেশী সংবাদ

২৬শে নভেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, ইগাতপুরীর নিকট বোম্বাই-কলিকাতা মেল দুর্ঘটনা সম্পর্কে একটি উচ্চ শ্রেণীর, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হইবে।

গতকল্য দ্বিপ্রহরে লিলুয়া স্টেশনের নিকট রেল লাইন পার হইবার সময় একই পরিবারের মা ও তাঁহার তিনটি শিশু সন্তান ট্রেন-কাটা পড়িলে তথায় এক শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

২৭শে নভেম্বর—বিদেশে তাঁহার উক্তির জন্য এবং নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার সংবাদদাতার সহিত সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে অদ্য লোকসভায় তুমুল বিতর্ককালে সমালোচনাকারিগণ অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারীর হস্তে দেশের অর্থনীতি ও সম্মান নিরাপদ নহে বলিয়া মন্তব্য করেন।

পর্তুগীজ কবলমুক্ত ছিটমহল দাদরা ও নগর-হাভেলীর বরিষ্ঠ পঞ্চায়েত এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে যে, বিশ্ব আদালতের কোন সিদ্ধান্ত যদি সংশ্লিষ্ট এলাকা দুইটির স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠিত তথ্যের পরিপন্থী হয় তাহা হইলে উহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে না।

২৮শে নভেম্বর—আজ নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, বাহিরের সাহায্য প্রাপ্তি সম্পর্কে কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকিলেও ভারত সরকার লভ্য সম্পদের সাহায্যে যে কোন উপায়ে পঞ্চ-সালা পরিকল্পনার লক্ষ্য সিদ্ধির ব্যাপারে কৃতনিশ্চয়।

এক সাংবাদিক বৈঠকে বিবৃতিদান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু কাশ্মীর প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট-ভাবে ঘোষণা করেন, "পাকিস্থানকে কাশ্মীর ছাড়িয়া আসিতে হইবে"—ইহাই ভারতের আসল দাবী।

২৯শে নভেম্বর—অদ্য কলিকাতায় প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, পাক পুলিস ও আনসার দল উত্তর বঙ্গের সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত চর বাসুদেবপুরে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। ঐ অঞ্চলে ভারতীয়রা যে ফসল উৎপাদন করিয়াছে, পাকিস্থানীরা তাহা সংগ্রহ করিতেছে।

অদ্য বেলা ১০-৫৫ মিনিটের সময় মহম্মদপুর গৌরীপুরের বিশিষ্ট জমিদার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁহার বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থ (কলিকাতা) বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল।

৩০শে নভেম্বর—অদ্য রাত্রি ১২টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে আসামের সহিত নাগা পাহাড় ও তুয়েনসাং এলাকার ঐতিহাসিক প্রশাসনিক সংযোগের অবসান ঘটিবে এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ হইতে আসামের রাজ্যপাল শ্রী ফজল আলী নবগঠিত নাগা পাহাড় তুয়েনসাং অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা অদ্য এক বিশেষ অধিবেশনে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, কলিকাতার বস্তি অপসারণ ও উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশে রাজ্য বিধানমণ্ডলীর বর্তমান অধিবেশনে একটি বিল উত্থাপনের ব্যবস্থা করা হইবে।

১লা ডিসেম্বর—পূর্ব রেলওয়ের যাত্রীবাহী বিদ্যুৎ-ইঞ্জিনচালিত প্রথম ট্রেনটি অদ্য সকাল ১১-৩৮ মিনিটে হাওড়া স্টেশন হইতে শেওড়া-ফুলীর উদ্দেশে যাত্রা করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের চাকরির সর্তাবলীর উন্নতির জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, চলতি আর্থিক বৎসর হইতে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে। আগামী চার বৎসরে এই পরিকল্পনার জন্য প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

২রা ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় বলেন যে, ইতালী সরকার ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমানকে ইতালীর বিমান বন্দরে অবতরণ করিতে দিতে প্রস্তুত আছেন।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ অদ্য হাজারীবাগে কেন্দ্রীয় জেলের মধ্যে একটি হাই-স্কুলের উদ্বোধন করেন। ভারতের মধ্যে এই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এই প্রথম।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে নভেম্বর—সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীক্রুশ্চেভ গতকল্য রাত্রিতে বলেন যে, সোভিয়েট সশস্ত্র বাহিনী নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে এবং আরও উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের এলাকার ভিতর দিয়া সৈন্য চলাচলের অধিকার দাবী করিয়া পর্তুগাল ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে যে মামলা দায়ের করিয়াছে, আন্তর্জাতিক আদালতের সেই মামলার বিচার করিবার এক্তিয়ার নাই বলিয়া ভারতবর্ষ ছয়টি প্রাথমিক আপত্তি দাখিল করিয়াছিল। অদ্য আন্তর্জাতিক আদালত ভারতবর্ষের সেই ছয়টি আপত্তির মধ্যে চারিটি আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

২৭শে নভেম্বর—নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমস্যা হইতে সৃষ্ট রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার শেষ চেষ্টা নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং বর্তমান রিপাবলিকান মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকারের অবস্থা ইহার পূর্বের কোয়ালিশন সরকারের অবস্থার ন্যায় হইবে বলিয়া মনে হয়।

২৮শে নভেম্বর—ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত হইতেছে এই যে, কাশ্মীর সংক্রান্ত পঞ্চশক্তির খসড়া প্রস্তাবের উপর সুইডেন গতকল্য যে সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছেন, তদ্বারা মূল প্রস্তাবটির আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়া উহাকে নির্দোষ করিয়া তোলা হইয়াছে।

২৯শে নভেম্বর—পৃথক নির্বাচনের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় আজ সন্ধ্যায় করাচীর জাতীয় পরিষদ ভবনের সম্মুখে পুলিসের সহিত বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী মুসলিম লীগ-পন্থীদের সংঘর্ষ হয়।

অদ্য মুসলিম লীগের সহিত সংশ্লিষ্ট মহল হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, রিপাবলিকান দলের নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্টের সম্মুখে লিখিতভাবে জানাইয়াছেন যে, পাকিস্থান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ উত্থাপিত হইলে তাঁহারা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা সমর্থন করিবেন।

৩০শে নভেম্বর—রাত্রিতে সাক্ষাৎকার করিবার পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে জাতিসংঘের আলোচনার সাফল্য কামনা করিয়া ইন্দোনেশিয়া ঘোষণা করে যে, ব্যর্থতার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেওয়া ছাড়া ইন্দোনেশিয়ার এখন গত্যন্তর রহিল না।

১লা ডিসেম্বর—গতকল্য রাত্রিতে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ সুকর্ণের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি হাতবোমা নিক্ষেপ করা হয়। বোমাটি তাঁহার মোটর গাড়ির নিকটে বিদীর্ণ হয়। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ এবং তাঁহার দুইটি সন্তান অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছেন।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এমন এক ধরনের বিমান নির্মাণে নিযুক্ত হইয়াছেন, যাহা রকেটের ন্যায় বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বস্তরে উড়িতে সক্ষম হইবে। এই সকল রকেট বিমান শূন্যলোকে আলোড়ন করিয়া সাধারণ বিমানেরই ন্যায় ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিতে সক্ষম হইবে।

২রা ডিসেম্বর—ইন্দোনেশীয় সরকার ডাচদের ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া আজ ঘোষণা করা হইয়াছে।

আজ অপরাহ্ণে ঢাকায় এক বিরাট জনসভায় দৃঢ়ভাবে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে পৃথক নির্বাচন প্রথা চাপাইয়া দিলে পূর্ব পাকিস্থান উহার প্রতিরোধ করিবে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা ষাণ্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল সডাক বার্ষিক ২২ টাকা ষাণ্মাসিক ১১ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

মঞ্চ-কথা

ডিসেম্বর সংখ্যায় সুরু হল
সুনীল ভঞ্জ রচিত ধারাবাহিক উপন্যাস
"অভিসারিণী"
দাম—৫০
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১২
(সি ৭১৯০/১)

কলমের লড়াই

বাংলা দেশের পত্রপত্রিকার আপোষহীন লোভনীয় সংগ্রামের বিরাট ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস জানতে হলে পড়ুন

বলাকা

প্রতি সংখ্যা—৷৷০
বার্ষিক—৬৲

৩৫/১, ম্যাকলিয়ড স্ট্রীট, কলকাতা-১৬
হুইলারের স্টলে পাওয়া যায়।

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত'র

কলাঙ্কনা কঙ্কাবতী

দাম ঃ ৫৲ টাকা

শ্রেষ্ঠ রহস্য গল্প

দাম ঃ ৪৲ টাকা

প্রকাশক—কথা সাহিত্য মন্দির
৮এ, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা—১২
প্রাপ্তিস্থান—ডি, সি, এম্পোরিয়াম
৬৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

নিজে পড়ুন, প্রিয়জনকে উপহার দিন
দীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের
যুগোপযোগী উপন্যাস

দাম—তিন টাকা মাত্র।

ছেলেমেয়েদের হাতে দিন

সর্বোৎকৃষ্ট কিশোর
মাসিক পত্রিকা
হিমাচল
বার্ষিক
সডাক ৪৲ টাকা
জানকী বুক ডিপো, কলি-১২

এই সুবিখ্যাত ঘড়ি
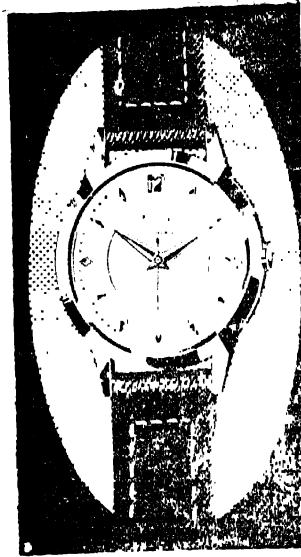
সঠিক সময়ের জন্য পৃথিবীর ৮৫টি দেশে সহস্র সহস্র লোক ব্যবহার করেন। আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য এই ঘড়িতে সময়ের ব্যতিক্রম ... অধিক বিভিন্ন ... নিভাদা ঘড়ি আপনার ...

Nivada
DISCUS
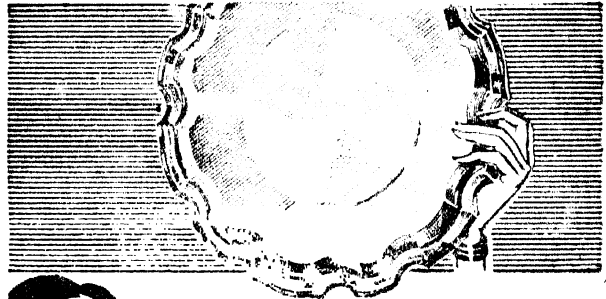
"শুধু ব্রাসোতেই
পিতল এত উজ্জ্বল হয়"

তিনি ঠিকই বলেছেন। কারণ তিনি জানেন যে পিতল ও তামার আসবাবপত্রের উপর ব্রাসোর ব্যবহার কি পরিবর্তনই না আনে। ব্রাসো শুধু উজ্জ্বলই করে না, সঙ্গে সঙ্গে ইহা শীঘ্র, সহজে এবং সুন্দররূপে আসবাবপত্রের ময়লা দূর করে।

BRASSO

ব্রাসো

মেটাল পালিশ
আপনার গৃহের উজ্জ্বলতা বাড়ায়

তরল ও পেষ্ট

এ্যাটলান্টিস্ (ইষ্ট) লিমিটেড
(ইংল্যাণ্ডে সংগঠিত)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীসুনীল সেন, বম্বাই

প্রয়োজনীয়
কারণে
লক্ষ লক্ষ
ব্যক্তির মত
আপনারও
উচিৎ
ফরহান্স টুথপেষ্ট
ব্যবহার করা
১ আপনার মাড়ি:
২ আপনার স্বাস্থ্য:
৩ আপনার শ্বাস প্রশ্বাস:
কারণ নেই। ফরহান্স টুথপেষ্ট দিয়ে মাজলে মুখ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যাবে—নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধের লেশ থাকবে না। মনে রাখবেন, নিঃশ্বাস যাতে বাস্তবিকই মধুর হয়, সেজন্য জিব ও তালুও পরিষ্কার করা উচিৎ। জিবের ওপর সামান্য একটু ফরহান্স রেখে টুথব্রাশ কিম্বা আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষে পরিষ্কার করবেন, সমস্ত খাদ্যকণা ও জীবাণু দ্রুত অপসারিত হবে।
৪ আপনার হাসি: ঝকঝকে সাদা একপাটি দাঁত সকলেরই এক বিরাট সম্পদ। ফরহান্স টুথপেষ্ট আপনার দাঁতকে অটুট ও সুস্থ রাখে কারণ এতে এমন একটি বিশেষ উপকরণ থাকে যাতে জীবাণু ধ্বংস হয় ও দাঁতের ক্ষয় রোধ হয়। ফরহান্স টুথপেষ্ট একটি মসৃণ সরের মত টুথপেষ্ট যা দিয়ে দাঁতের এনামেলের কোন ক্ষতি না করে, স্বাভাবিক রূপেই দাঁত ঝকঝকে করে তোলা যায়।
ফরহান্স
টুথপেষ্ট
দন্তচিকিৎসকের সৃষ্ট
টুথপেষ্ট
Forhan's
FOR THE G
GEOFFREY MANNERS & CO.
PRIVATE LTD.
H-112
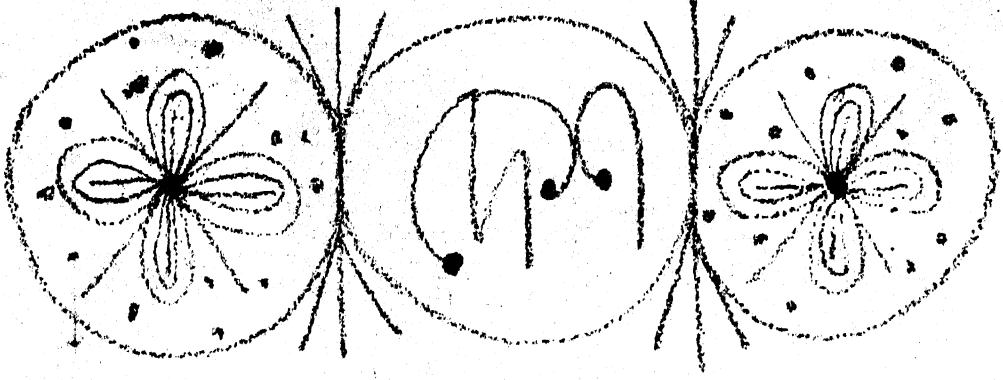
DESH 40 Naye Paisa
Saturday, 14th December, 1957.

২৫ বর্ষ ॥ ৭ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ভগীরথ আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের পুণ্য নাম কীর্তনের উদ্দেশ্যে ৮ই ডিসেম্বর মহাবোধি সোসাইটি হলে একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীনির্মল-কুমার সিদ্ধান্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। ডঃ কালিদাস নাগ, ডঃ নীহার-রঞ্জন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ দীনেশচন্দ্রের কীর্তির উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দীনেশচন্দ্র বক্তৃতামালা' প্রবর্তন করিবার জন্য একটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। আরো কিভাবে দীনেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য উপাচার্য মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি সংগঠিত হয় এই সভাতে। আমরা আশা করিতেছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় উক্ত কমিটি অচিরে দীনেশচন্দ্রের কীর্তির যোগ্য স্মৃতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা করিতে সক্ষম হইবেন। দীনেশচন্দ্রের কাছে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঋণ অপরিশোধ্য।

দীনেশচন্দ্রের নিজের জীবনটাই একটা মহৎ শিক্ষা। সুদূর মফঃস্বলের সামান্য শিক্ষকপদ হইতে প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিখিল বঙ্গ মনীষিগণের মধ্যে তিনি আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্যার আশুতোষের আনুকূল্য লাভ করিবার পূর্বে তিনি রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতির সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। পরে স্যার আশুতোষ-হস্তাবলম্বন: ঐন: তাঁহার আসন প্রশস্ত ও পথ সুগম করিয়াছেন।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইলেও মহত্তর দাবী তাঁহার আছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে তিনি অনুরাগ সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন, পরবর্তী মনীষিগণকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় প্রেরণাদান করিতে পারিয়াছেন, স্যার আশুতোষের সহায়তায় "বিমাতার গৃহে ভাষাজননীকে আনু-ষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা" দিতে পারিয়াছেন —ইহাই তাঁহার বহুকীর্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ হেন ব্যক্তির ঋণ সম্বন্ধে এতকাল আমরা উদাসীন ছিলাম। এখন সেই গুরুঋণ পরিশোধের চেষ্টা চলিতেছে। এই সদিচ্ছা ও উদ্যোগের প্রতি আমরা অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছি।

কবি সম্বর্ধনা

কবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের আকাদামি পুরস্কার লাভ উপলক্ষ্যে 'তরুণের স্বপ্নের' আহ্বানে রাজস্বমন্ত্রী শ্রীবিমল-চন্দ্র সিংহের গৃহে কবি সম্বর্ধনার আয়োজন হইয়াছিল। কবির গুণানু-রাগী ও বন্ধুগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বর্ধিত করেন। সংসারে পুরস্কার সব সময়ে যোগ্যপাত্রে অর্পিত হয় না, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, বর্তমানক্ষেত্রে পুরস্কার ও যোগ্যপাত্রের বাঞ্ছনীয় যোগাযোগ ঘটিয়াছে। জীবিত বাঙ্গালী কবিগণের মধ্যে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের যোগ্যতা সর্বজন স্বীকৃত এবং সংশয়ের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত। যোগ্যপাত্র নির্বাচনের জন্য আকাদামিকেও আমরা আন্তরিক অভিবাদন জানাইতেছি। এই উপলক্ষ্যে আমরা কবির যশ ও আয়ু-বৃদ্ধি কামনা করিয়া মনে মনে আশা পোষণ করিতেছি যে, কালক্রমে কলা-বিস্তার করিয়া তাঁহার প্রতিভা পরিণতির পূর্ণতায় উপনীত হইয়া দেশবাসীর অধিকতর আনন্দের ও গৌরবের কারণ হইবে।

ছাত্রকল্যাণ ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশন স্থির করিয়াছেন যে, বড় বড় যে-সব শহরে বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেখানে ছাত্রদের পড়াশোনা ও সামাজিক জীবনের পথ যাহাতে সুগম হয়, সেই উদ্দেশ্যে 'স্টুডেন্টস ডে-হোম' ক্লাব ও স্বাস্থ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্টুডেন্টস ডে-হোম বা ছাত্রমঙ্গল আবাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"একটি স্টুডেন্টস হোমে ছাত্রগণ সারাদিন অবস্থান করিয়া পড়াশুনা করিবার, খাওয়া দাওয়া করিবার, অবসর বিনোদনের, বস্ত্রাদি ধৌত করিবার এবং সম্ভব হইলে শিক্ষকগণের নিকট হইতে পাঠ গ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিবেন। কলিকাতায় যে দুইটি স্টুডেন্টস হোম স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতে দুই হাজার করিয়া ছাত্র থাকিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত সংস্থা-সমূহ এই সমস্ত স্টুডেন্টস হোমের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিবেন। এই সমস্ত সংস্থায় রামকৃষ্ণ মিশন এবং ওয়াই

এম সি এর ন্যায় সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ থাকিতে পারেন।"

ছাত্রদের ক্লাবগুলিও অনুরূপ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তবে তাহাদের আকার কিছু ছোট হওয়াই সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশনের উদ্যোগ সমর্থনযোগ্য। এই উপলক্ষ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কিছুকাল হইল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রবর্তনায় কলিকাতায় তিনটি 'ছাত্রমঙ্গল আবাস' বা 'স্টুডেণ্টস্ ডে-হোম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, একটি ছাত্রীদের জন্য, দুইটি ছাত্রদের জন্য। আমরা যতদূর খবর রাখি, এই প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে ছাত্রগণ প্রভূত সাহায্য লাভ করিতেছে। এ বিষয়ে আমাদের ধারণা এই যে, একটি প্রতিষ্ঠানে দুই হাজার ছাত্র গ্রহণ করিলে (কমিশন ঐ সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন) সমস্ত ব্যাপার আয়াসসাধ্য হইয়া পড়িবে এবং অবশেষে বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা দেখা দিবে। কোনক্রমেই ছাত্রসংখ্যা এক হাজারের ঊর্ধ্বে উঠিতে দেওয়া উচিত নয়—প্রয়োজন হইলে একটির স্থলে দুইটি, দুইটির স্থলে চারটি করা যাইতে পারে, কিন্তু একটিতে দুই হাজার ছাত্র গ্রহণ করিতে আমরা পরামর্শ দিতে পারি না। কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত তিনটি ছাত্রমঙ্গল আবাসের একটির সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, উহা সুপরিচালিত ও শৃঙ্খলাযুক্ত। কিন্তু উহার ছাত্রসংখ্যা এক হাজারের নীচে। দুই হাজার হইলে কি হইত জানি না। কাজেই ছাত্রসংখ্যা সম্বন্ধে কমিশনকে পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিয়া পরিকল্পনার জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

হিন্দী-ইংরাজী প্রসঙ্গে রাজাজী

মাদ্রাজের একটি সভায় ইংরাজীর স্থলে হিন্দী প্রতিষ্ঠিত হইলে কেন ও কিভাবে সমগ্র দেশ শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারে, তাহার উল্লেখ করিয়া রাজাজী সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। রাজাজী উচ্চমনীষাসম্পন্ন তীক্ষ্ণধী রাজনীতিক। দেশের ঐতিহ্য ও রাজনীতির গতি প্রকৃতি দুইটি বিষয়েই তাঁহার জ্ঞান অসাধারণ। কাজেই তাঁহার সতর্কবাণী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইতিপূর্বেও তিনি যখনই সুযোগ পাইয়াছেন, এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুত যাঁহারা হিন্দীর বদলে ইংরাজীকে সর্বভারতীয় সরকারী ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চান, রাজাজী তাঁহাদের অগ্রণী ও নায়ক। আশা করি, তাঁহার সতর্কবাণী সর্ব-ভারতীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের কর্ণে প্রবেশ করিয়া দেশকে একটা দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবে।

জাতীয় পতাকা ও সংবিধানের অবমাননা

দ্রাবিড় কাজাগাম নেতা শ্রী নাইকারের বাতুলোচিত উক্তির উল্লেখ করিয়া পর পর দুই দিন নেহরুজী মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রী নাইকার যদি উন্মাদ হন, তবে তাঁহাকে উন্মাদাগারে বন্ধ করিয়া রাখা উচিত। নেহরুজীর পরবর্তী উক্তি দেশের মর্মস্থল হইতে উদ্গত। তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জাতীয় পতাকা ও সংবিধানের অপমান করে, ভারতে তাহার স্থান নাই, অন্যত্র তাহার চলিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, অন্য কোন্ দেশেই বা তাহার স্থান হওয়া সম্ভব! সত্য কথা বলিতে কি, আর কোন দেশে এমন অমার্জনীয় উক্তি করিলে শ্রী নাইকারের মত লোকের কি দশাই না হইত! দুঃখ এই যে, এদেশের মানসিক আবহাওয়া ও রাজনৈতিক মতবাদের উদারতার মূল্য কাহারও কাহারও পক্ষে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। এই শ্রেণীর লোক উন্মাদও নয়, আদর্শবাদীও নয়, নিতান্তই মতলববাজ; অসম্ভব উক্তির মঞ্চে চড়িয়া নিজেকে দৃশ্যমান করিয়া তোলাই ইহাদের আসল উদ্দেশ্য।

'জাতীয়' না 'ভারতীয়'

ইতিপূর্বে মাতৃভাষা সংরক্ষণ সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়া দুটি শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি জানাইয়াছিলাম। মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘ যেখানে যে-অর্থে 'জাতীয়' শব্দ প্রয়োগ করিতে চান আমরা সেখানে সেই অর্থে 'ভারতীয়' শব্দটি অধিকতর প্রযোজ্য মনে করিয়াছিলাম। আমাদের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া উক্ত সংঘের দুইজন বিশিষ্ট সদস্য যে পত্র পাঠাইয়াছেন তাহা দেশ পত্রিকায় ৭ই ডিসেম্বর সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহাদের পত্র ও আমাদের পূর্বকৃত মন্তব্য পুনরায় পড়িয়াও বুঝিতে পারিলাম না সংঘের মূল উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সত্যকার প্রভেদ কোথায়? যাই হোক, যখন কাহারো কাহারো মনে দ্বিধার সৃষ্টি করিয়াছে, তখন আর একবার স্পষ্ট করিয়া বলি। মাতৃভাষা সংরক্ষণ সংঘের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে মূলত ও বস্তুত আমাদের কোন মতভেদ নাই। কেবল দুটি শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে, সঙ্ঘ ও আমরা ভিন্ন মত। তাঁহারা 'জাতীয়' শব্দটির ব্যবহার চান, আমরা সেখানে 'ভারতীয়' শব্দ ব্যবহার করিতে চাই। স্বাভাবিক অবস্থায় এমন বাছবিচার না করিলেও চলে—দুটিকেই একার্থে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। 'দুইজাতি' তত্ত্বের মতো অতি অসার যুক্তি প্রয়োগে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। এখন যদি আবার সংবিধানে পনেরোটি 'জাতীয় ভাষা' স্বীকৃত হয়, তবে ভাবীকালের ভারত সংহতির শত্রুগণের হাতে কি অস্ত্র জোগাইয়া দেওয়া হইবে কে বলিতে পারে। আমাদের আশঙ্কা হঠাৎ অমূলক মনে হইতে পারে, কিন্তু যে দেশে 'দুই জাতি' তত্ত্ব এককালে চলিয়াছে, সময় ও সুযোগ আসিলে সেখানে সব কিছুই চলিতে পারে। তা ছাড়া 'জাতীয়' শব্দের দ্বারা সঙ্ঘ যে কাজ পাইতে চান, 'ভারতীয়' শব্দের দ্বারা তাহা বেশ চলে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

পত্র লেখকদ্বয় তিনটি দুর্মোচ্য সূত্র নিক্ষেপ করিয়া সরাসরি উত্তরের বেড়াজালে আমাদের বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা বৃথা, কারণ সত্যকার প্রভেদ যেখানে নাই, সেখানে এত আয়োজন অহেতুক। প্রথমে তাঁহাদের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটা দিই।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর ॥ সর্বজন ব্যবহার্য ভাষাকে 'জাতীয় ভাষা' আখ্যা না দিয়া 'ভারতীয় ভাষা' আখ্যা দিলেই যে তাহার মাহাত্ম্য বা 'জাতীয়ত্ব' কিছুমাত্র কমে এমন বিশ্বাস আমরা করি না। সংস্কৃত ভাষা এদেশে দীর্ঘকাল ঐ ভাবে, ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু যতদূর জানি কেহ তাহাকে 'জাতীয়' ভাষা আখ্যা দেওয়ার কথা ভাবে নাই বা তাহার ফলে এদেশের ও বিদেশের চোখে সংস্কৃত ভাষার গৌরব ও ভারতবাসীর মর্যাদা কিছুমাত্র কমে নাই। বিশেষ যেখানে 'জাতীয়' শব্দটি মারাত্মক বীজের আধার বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি - সেখানে তাহা গায়ে পড়িয়া কেন ব্যবহার করিতে যাইব। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ॥ ইংরাজী লইয়া পনেরোটি ভাষা ভারতের প্রধান 'জাতীয়' ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হোক। প্রথম প্রশ্নের উত্তর ॥ অন্যতম প্রধান ভারতীয় ভাষারূপে ইংরাজী হিন্দীর বদলে ভারতীয় "সরকারী" ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হোক।

আশা করিতেছি যে, আমাদের মনোভাব যথেষ্ট সরল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং আরো আশা করিতেছি যে, মূলত ও বস্তুত আমাদের মতানৈক্য নাই তাহা পত্রলেখকদ্বয় বুঝিতে পারিয়াছেন।

[সাতাশ]

ঝরানির স্রোতের ঝরঝর, ঝরানির শব্দ আর শোনা যায় না। ভোরের আলো দেখে ভয় পেয়ে পেঁছা হাওয়া কি মরে গেল? তা না হলে মুরলীর চোখে আর ঘুমের আবেশ লাগে না কেন? মুরলীর নিঃশ্বাসের শব্দই বা কেন মাঝে মাঝে থমকে যায়? আর, বার বার চমকে উঠে, দু হাতে চোখ ঘষে, হাই তুলে ও গা-মোড়া দিয়ে শয়ান শরীরটাকে স্বপ্ন-পাওয়া একটা নেশার মিথ্যা আদর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসতে হয়?

ঘরের ভিতরে আবছা আঁধার, কিন্তু বাইরে পাখি ডাকে। কিন্তু খুব বুঝতে পারা যায় এবং এই আবছা আঁধারেই চিনতে পারা যায়, এই ঘর পলুসের ঘর বটে।

—তুমি চলে গেলে কিগো? ভেজানো দরজার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী এবং ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে কপাট খুলে পথের দিকে তাকায়।

ভোরের আলোর ঝলক মুরলীর চোখের উপর লুটিয়ে পড়ে, ধাঁধিয়ে যায় চোখ; এবং সঙ্গে সঙ্গে মুরলীর প্রাণটাও যেন ধাঁধিয়ে যায়। কি হলো? কোথায় গেল পলুস? যেন রাতের মুরলীকে ভয় পেয়ে ভোর হতে না হতেই পালিয়ে গেল বেচারা। রাতের আঁধারে যেন জংলা বিষের গন্ধ আছে এবং সেই গন্ধে মুরলীর বুকের বাতাসও জংলা হয়ে যায়। তা না হলে পলুসের মত মানুষকে একটা অবহেলার ঠেলা দিয়ে বুকের কাছ থেকে সরিয়ে দিল কেন মুরলী? ছিয়া ছিয়া, এ কেমন ভুল।

পথের উপরেও রোদ ঝলমল করে আর দেখতে পাওয়া যায়, অনেক দূরের সেই পিয়ালবনের গা ঘেঁষে ডাইনে বেঁকে গিয়েছে পথটা, তারপরেই বড় সড়ক। মনে পড়ে মুরলীর, গোবিন্দপুরে গিয়েছে পলুস, মুরলীরই মুখের সেই হাসির জন্য চাঁদির সুতলির মালা আর সোনার মটরদানা আনতে, যে হাসি দেখতে না পেয়ে বড় দুখ পেয়েছে বেচারা।

—কেনে হাসবো না পলুস? আমি যে তুমার ঘর করে, সুখের পর সুখ নিয়ে হেসে আর বেঁচে থাকবার লেগে তুমার কাছে এসেছি। আমি যে তুমারই জোহানা বটি গো।

মুরলীর প্রাণের একটা উতলা আক্ষেপ যেন কাতর অনুনয়ের মত মুরলীর মুখে বিড়বিড় করে।

—আমার ছেইলা যে তুমারই ঘরে থাকবেক গো। আমার লেগে তুমার কত মায়া গো।

মুরলীর বুক ঠেলে একটা ব্যাকুল কৃতজ্ঞতার উল্লাস উথলে ওঠে এবং রাগ হয় এই গতরটারই উপর। একটা বোকা ভীরু আর জংলী গতর। কে বললে,

পলুসের ছোঁয়া পেলে জোহানার এই শরীরের হাড়মাস মিঠা হয়ে যাবে না?

মিথ্যে নয়, পলুস হালদারের হাত ধরবার জন্য, পলুসের বুকের উপর লুটিয়ে পড়বার জন্য ভোরের আলোয় বিহ্বল মুরলীর এই শরীরের হাড়মাসের পিয়াস যেন এখনই সিক্ত হয়ে উঠেছে। কখন ফিরে আসবে পলুস?

ছোট্ট কালো কুকুরটা বড় বড় রোঁয়ায় ভরা শরীর; কোথা থেকে ছুটে এসে মুরলীর পায়ের উপর লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কুকুরটাকে দু হাতে সাপটে ধরে বুকের উপর তুলে নেয় মুরলী।

কুকুরটার মুখ এক হাতে টিপে, জোরে একটা আদরের ঝাঁকুনি দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে মুরলী—ভাল লোভী বটেক ইটা! ......হিংসা করবিক নাই তো রে কুটু? সেটাকে ভাই বলে বুঝতে পারবিক কি? চুমা নিতে চাস তো এখনই বলে দে।

ছোট্ট কালো রোঁয়াভরা নরম দেহ কুকুরটার মুখের উপর গাল ঠেকিয়ে দিয়ে সারা শরীরটাকে দোলাতে থাকে মুরলী।

টুং করে একটি মিষ্টি শব্দের শিহর যেন মুরলীর কানের কাছে চমকে উঠেছে। সাইকেলের ঘণ্টির আওয়াজ। মুরলীও চমকে ওঠে, মুখ ফিরিয়ে তাকায়। সঙ্গে

সঙ্গে মুরলীর বিহবল মুখের হাসিটাও যেন রঙীন ফোয়ারার মত উথলে ওঠে। সিস্টার দিদি এসেছে।

সাচ্চা দেবী বটে সিস্টার দিদি। যেন মুরলীর জীবনের একটা গোপন মানতের ভাষা, আর মুরলীর সুখ ও আশার একটা ভয়ের আর্তনাদ শুনতে পেয়ে নিজেই ছুটে এসেছে সিস্টার দিদি।

—জোহানা বহিন ভাল আছ? সিস্টার দিদির নীল চোখে স্নেহময় হাসির আভা ভোরের আলোর চেয়েও সুন্দর হয়ে ঝলমল করে।

—আমি তুমার ঠাঁই যাব ভেবেছিলাম সিস্টার দিদি। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—কেন বহিন? বলতে বলতে এগিয়ে এসে, এবং সাইকেলটাকে ঘরের দেয়ালের গায়ে হেলিয়ে দিয়ে বারান্দার উপর ওঠেন সিস্টার দিদি।

ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে ছোট একটা চারপায়া নিয়ে এসে সিস্টার দিদির সামনে রেখে দিয়ে হাঁপ ছাড়ে মুরলী—বইসো দিদি।

সিস্টার দিদি—হ্যাঁ, বল, আমার ঠাঁই কেন যাবে ভেবেছিলে?

কেঁপে ওঠে মুরলীর চোখ। মাথা হেঁট করে। ধপ করে মেজের উপর বসে পড়ে মুরলী এবং তারপর সারা শরীরটাকেই কাঁকড়ে নিয়ে সিস্টার দিদির কোলের উপর মাথা পেতে দেয়।

মুরলীর মাথায় হাত বুলিয়ে সিস্টার দিদি স্নিগ্ধ স্বরে হাসেন—বল জোহানা।

মুরলী—আমার পেটে ছেইলা আছে দিদি।

চমকে ওঠেন সিস্টার দিদি—লর্ড!

—দিদি! ফুঁপিয়ে ওঠে মুরলী।

—বুঝলাম, তুমি আমার উপদেশ মান নাই জোহানা। সিস্টার দিদির গম্ভীর গলার স্বর যেন একটা গম্ভীর ভৎর্সনা।

মুরলী—ভুল হইছে দিদি।

সিস্টার দিদি—হাঁ, খুব ভুল। আখিরস্তানের সন্তান নিয়ে খিরিস্তানের ঘরে এসেছ তুমি। তুমি আমার পলুসকে বিপদে ফেলেছো জোহানা।

—বিপদ কেনে হবেক দিদি?

—পলুস যদি বিপদ মনে করে, তবে বিপদ নিশ্চয়।

—তুমি পলুসকে বুঝাই দিলে কোন বিপদ হবে না দিদি।

—পলুস কি বলে?

—সে চায় না; আমার এই ছেইলাকে পরের ছেইলা মনে করে পলুস।

হেসে ফেলেন সিস্টার দিদি—পলুস ঠিক মনে করেছে জোহানা।

—তুমি বলে দিলে পলুস মেনে নিবে দিদি।

—কি বলবো?

—আমার ছেইলা আমার কাছে থাকবেক।

—আমি পলুসের উপর অবিচার করতে পারি না জোহানা। পলুসের ইচ্ছা যদি না থাকে, তবে পরের সন্তান উহার ঘরে তুমি রাখবে কেন? পলুসকে তুমি অকারণে শাস্তি দিবে কেন? এতটা অধিকার তোমার নাই জোহানা।

—কিন্তুক আমার উপর অবিচার করো কেনে দিদি?

—না, তোমার উপরেও অবিচার করতে চাই না। সেই কথাই বলছি, শুন।

—বল দিদি। সিস্টার দিদির হাঁটুর উপর চোখ ঘষে মুরলী।

—তিন-চারটি মাস পরে তুমি আমার অনাথবাড়িতে চলে আসবে।

—না দিদি। চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী, তীব্র করুণ ও ভীরু একটা আর্তনাদ; যেন জীবনের আশার পথে একটা রক্তলোলুপ বাঘের ছায়া দেখতে পেয়েছে মুরলী। মুরলীর পেটের ছেইলাকে খেতে চায় ঐ বাঘ।

—হ্যাঁ বহিন, ইউ মাস্ট! সিস্টার দিদির গলার স্বর একেবারে শান্ত ও অবিচল।

মুরলীর মাথাটা একবার কেঁপে উঠেই স্তব্ধ হয়ে যায় এবং একেবারে অলস হয়ে একটা নির্জীব পাথরের ঢেলার মত সিস্টার দিদির হাঁটুর উপর পড়ে থাকে।

—আমি তোমাকে উত্তম উপদেশ দিলাম, তোমারই জীবনের সুখ আর শান্তির জন্য। তুমি বুঝে দেখ জোহানা। সিস্টার দিদির গলার স্বরে যেন একটা সান্ত্বনার সাড়া ফুটে ওঠে।

মুখ তোলে মুরলী। সিস্টার দিদির মুখের দিকে একজোড়া অবুঝ চোখের কাতর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে ছটফট করতে থাকে।

সিস্টার দিদি আবার গম্ভীর হন।—তুমি আমার কথা বুঝতে পার নাই মনে হয়।

—বুঝি নাই দিদি।

—তবে, তুমি বল। আমি কি করতে পারি?

—তুমি যা বলবেক দিদি, তাই হবে।

—অনাথবাড়িতে যাবে?

—হ্যাঁ।

—অনাথবাড়িতে ছেইলা রেখে দিয়ে আবার স্বামীর ঘরে চলে আসবে?

—হ্যাঁ, দিদি। ...কিন্তুক...।

—কি?

—ছেইলাটার কি হবেক?

—অনাথবাড়িতেই থাকবে, বড় হবে।

—ভাল কথা দিদি, কিন্তুক আরও ভাল হয়, যদি তুমি ছেইলাটাকে...।

—কি?

—একটুক বড় করে দিয়ে উয়াকে উয়ার বাপের কাছে দিয়ে দাও।

—নো, নেভার। তুমি খুব অধম কথা বলছো জোহানা। আমার অনাথবাড়ি ধর্ম-বাড়ি আছে, হাসপাতাল নহে। ধমক দিয়ে উঠে দাঁড়ান সিস্টার দিদি।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মুরলী। সিস্টার দিদির কথাগুলিকে একটা ভয়ানক রাগী রহস্যের গর্জন বলে মনে হয়। বুঝতে পারা যায় না, সিস্টার দিদির মত এত শান্ত ও এত মায়ার মানুষ মুরলীর এই সামান্য আবেদনের উপর এত রাগ করে কেন।

—সিস্টার দিদি! আস্তে আস্তে ডাক দেয় মুরলী।

সিস্টার দিদি—না বহিন। খিরিস্তান হয়েও তোমার মনে ধরমের গরব নাই; এ বড় দুঃখের কথা বহিন। তুমি তোমার সেই ধরমছাড়া পুরাতন স্বামীর জন্য এখনও দরদ কর।

—না দিদি।

—নিশ্চয়। তা না হলে, তুমি কেন

আমাকে অর্থারিস্তানের ছেইলার ধাই হতে বলছো জোহানা?

—তবে কি উপায় হবে, বল দিদি।

—তোমার ছেইলা অনাথবাড়িতে থাকবে, খিরিস্তান হবে। তা না হলে মানুষ হবে কেমন করে?

বুকের ভিতরের সব নিঃশ্বাস ফুঁপিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে মুরলী—তাই ভাল দিদি।

হেসে ওঠে সিস্টার দিদির স্নেহাক্ত নীল চোখ। —সুখী হও জোহানা। তোমার কোন ভাবনা করবার দরকার হয় না।

মুরলীর কাছে এগিয়ে আসেন সিস্টার দিদি। মুরলীর মাথায় আবার হাত বোলাতে থাকেন। —তুমি ভুলে যাও কেন জোহানা, তুমি নতুন হয়ে গিয়েছ? পুরানা জীবনের সহিত তোমার যে আর কোন সম্পর্ক নাই। আছে কি?

—না দিদি।

—তবে আর পুরানা জীবনের ঘরের কথা মনে কর কেন? মায়া কর কেন?

—না দিদি, মায়া আর করবে কোন্ সাধে?

—ঠিক বলেছ জোহানা। তোমার যা কিছু পেতে সাধ হবে, সবই এই ঘরেই পাবে। এই ঘর সুখী খিরিস্তানের ঘর।

—হ্যাঁ দিদি।

—আচ্ছা, আমি এবার চলি বহিন...... হ্যাঁ, পলুস কোথায়?

—গোবিন্দপুরে গেল।

—কেন?

হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট করে মুরলী। সিস্টার দিদি—কি জোহানা? পলুস আজই গোবিন্দপুরে গেল কেন?

মুরলী—চিজ সওদা করতে।

সিস্টার দিদি—কি চিজ?

মুরলী—চাঁদির সুতুলির মালা আর সোনার মটরদানা।

ঝিক করে সুন্দর এক খুশির হাসি চমকে ওঠে সিস্টার দিদির মুখে। —তোমার সৌভাগ্য জোহানা; কত ভাল স্বামী তোমার। এই ঘরে না এলে কি এই সুখ পেতে বহিন?

মুরলী—একটা কথা কি তুমার মনে নাই দিদি?

—কি?

—তুমি আমাকে লিখা-পড়া শিখাবে বলেছিলে।

—মনে আছে বহিন। কিন্তু তুমি কি চাও?

—চাই দিদি।

—তবে আমার কনভেণ্টের স্কুলে ভর্তি হও।

—স্কুল যে বড় দূরে বটে দিদি।

—পলুসকে বল, তোমার জন্য গো-গাড়ি ঠিক করে দেবে। যেতে চার আনা, আসতে চার আনা, রোজ আট আনা গো-গাড়ির ভাড়া দিবে।

—কে দিবে?

—দিবে তোমার স্বামী পলুস। আবার কে? তোমার সাধ মিটাবে, তোমার সব সুখ এনে দিবে পলুস। তা না হলে তোমাকে ঘরণী করেছে কেন পলুস?

হো হো করে হেসে ওঠেন সিস্টার দিদি; আর মুরলীর গম্ভীর মুখটাকে যেন একটা প্রবল স্নেহাক্ত আশ্বাসের আবেগ দিয়ে আক্রমণ করবার জন্য মুরলীর থুতনি টিপে ধরেন। —এইবার হাস বহিন। হাস...... আমি বলছি হাস......এক দুই তিন......হাঁ।

হেসে ফেলে মুরলী; এই হাসি একেবারে নতুন হাসি। জীবনের যত পুরনো মায়ার বিভীষিকা থেকে মুক্তি পেয়ে হেসে উঠেছে মুরলীর প্রাণ। ঝকঝকে তকতকে শান্ত ঠাণ্ডা নিথর হাসি।

চলে যান সিস্টার দিদি।

৬

ঘরে ফিরতে আর কত দেরি করবে পলুস?

দুপুর হয়ে যাবার পর একবার ঘরের জানালা খুলে বাইরের মাঠের দিকে তাকিয়েই জানালা বন্ধ করে দেয় মুরলী। রোদের জ্বালায় মাঠটা পুড়ছে না হাসছে, বোঝা যায় না।

কিন্তু আর দেরি করে না মুরলী। বালতি হাতে নিয়ে নিকটের ইঁদারার কাছে এগিয়ে যায়। জল তোলে। স্নান করে। তার পর, নিজেরই ভেজা শরীরের স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ হয়ে আর ভেজা শাড়ির শব্দ শুনতে শুনতে ঘরে ফিরে আসে। রঙীন শাড়ি, জামা আর সায়াতে সুন্দর করে সেজে নিয়ে আয়নার দিকে তাকায় মুরলী। আর, খুশি হয়ে নিজেরই নরম ঠোঁটের নতুন হাসিটাকে দেখতে থাকে। ঝকঝকে তকতকে হাসি। মুরলীর নতুন জীবনের হাসি; যে হাসি পলুসের এই তকতকে ঝকঝকে ঘরের শোভার সঙ্গে বড় সুন্দর মানায়।

পলুসের ফিরে আসতে আরও দেরি হবে বলে মনে হয়। কিন্তু মুরলী আর দেরি করে না। এগিয়ে যেয়ে দেয়ালের তাকের উপর থেকে থালা গেলাস আর বাটি নামিয়ে নিয়ে মেজের উপর রাখে। এই ঘরে দুখ পেতে আসে নাই মুরলী। মিছা ক্ষুধা পুষে রেখে কষ্ট পাওয়া উচিত নয়।

কবুতরের তরকারি, পলুস বেচারা কত সাধ করে নিজের হাতে রেঁধেছে। চিনে-মাটির সাদা থালার উপর কবুতরের তরকারি ঢেলে নেয় মুরলী। পাঁউরুটি ছিঁড়তেও দেরি করে না।

খাওয়া শেষ হবার পর, নতুন জীবনের স্নিগ্ধ ও তৃপ্ত শরীরটাকে নরম বিছানার উপর এলিয়ে দিতেও দেরি করে না মুরলী।

কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তে দেরি করে মুরলী; সিস্টার দিদির হাসির ঝংকার এখনও যেন মুরলীর কানের ভিতরে বেজে চলেছে। মুরলীর চোখ দুটো অপলক হয়ে যেন এই নতুন জীবনের অনুভবগুলির জন্য অপলক শ্রদ্ধার মত জেগে থাকে। আর নরম ঠোঁটের উপর ছড়িয়ে থাকে সেই ঝকঝকে তকতকে ঠাণ্ডা হাসি।

ঘরের দরজার কাছে আগন্তুক পায়ের শব্দ শোনা যায়। শোনা যায়, একটা সাই-কেলের ধড় যেন হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ঝন-ঝন করে বেজে উঠেছে। আস্তে আস্তে দরজার দিকে মুখ ফেরায় মুরলী।

হাঁ, পলুস ফিরে এসেছে। এবং ঘরে ঢুকেই একটু আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে পলুস।

পলুসের উদ্বিগ্ন মুখটা হাসতে চেষ্টা করেও যেন হঠাৎ হাসি হারিয়ে ফেলে। —এ কি বটে জোহানা!

মুরলী—কি?

পলুস—তুমি হাসছো মনে লিচ্ছে।

মুরলী—হাঁ।......তুমিই যে বলেছ, আমাকে হাসতে হবেক।

পলুস—কিন্তু ই কেমন হাসি বটে? তুমার কি......।

মুরলী—না গো, আমার মাথা খারাপ হয় নাই।

পলুস—সে-কথা লয়; তুমার কি......।

মুরলী—না গো, আমায় অসুখ করে নাই।

পলুস—তবে কেনে......।

মুরলী চেঁচিয়ে হেসে ওঠে—কি পলুস?

পলুসও হেসে ফেলে—তুমার ই হাসিতে কোন মায়া নাই জোহানা।

আরও জোরে চেঁচিয়ে হেসে ওঠে, আর বিছানার উপর উঠে বসে মুরলী। —সিস্টার দিদি এসেছিল।

—কি বললেক সিস্টার দিদি?

—তুমি যা বলেছ, তাই বললেক।

—কি বলেছি আমি?

—আমার ছেইলাটা অনাথবাড়িতে থাকবেক।......বড় ভাল কথা বলেছিলে পলুস, আমি বুঝি নাই। আমার ছেইলা অনাথবাড়িতে থাকবেক, তুমার মত ভাল খিরিস্তান হবেক; আমার কিছু ভাবনা নাই পলুস। সিস্টার দিদির বড় দয়া!

মুরলীর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন শিউরে ওঠে পলুস হালদারের চোখ।

মুরলী বলে—কই, আমার লেগে কি চিজ লিয়ে এসেছ দেখি?

কাগজে মোড়া একটা জিনিস পকেটের ভিতর থেকে বের করে পলুস। খুশির আবেগে চঞ্চল হয়ে একটা ছোঁ মেরে পলুসের হাত থেকে কাগজের মোড়কটা তুলে নিয়েই আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মুরলী।

আস্তে আস্তে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলে পলুস—চিজটার দাম নিল আশি টাকা দশ আনা।

পলুসের কথা বোধ হয় শুনতেই পায় না মুরলী। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রুপোর সুতলির চকচকে হার গলায় পরতে থাকে। হারের সঙ্গে তিনটে সোনার মটরদানা দুলছে। আয়নার দিকে তাকিয়ে গলার এই নতুন গৌরবের রূপ দেখতে দেখতে যেন ছটফট করে মুরলীর কালো চোখের চাহনি। —আরও দুটো দানা হলে ভাল হতো পলুস।

পলুস—হাঁ, ভাল হতো।

মুরলী—দিবে কি?

পলুস—দিব।

আয়নার কাছ থেকে সরে এসে আবার বিছানার উপর বসে মুরলী। —আমি সিস্টার দিদির ইস্কুলকে যাব পলুস।

—কেনে?

—লিখা-পড়া শিখতে।

—কিন্তুক, ইস্কুল যে অনেক দূরে বটে জোহানা।

—গো-গাড়িতে যাব। রোজ আট আনা ভাড়া লাগবেক।

—মাসে যে পনর টাকা লাগবেক জোহানা।

—লাগুক না কেনে? হাঁ, আমার সিলাই কলটা মৌরিমার কাছে পড়ে আছে। আনাই দাও উটা।

—দিব।

জানালা খুলে দিয়ে বাইরের পথ, মাঠ আর আকাশের দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে মুরলী। নিকটে ও দূরে ছোট ছোট বসতির ঘরগুলির দিকেও তাকায়। গির্জার চূড়াটাকেও একটা সুন্দর দূরের ছবির মত দেখতে পাওয়া যায়।

—চল পলুস! যেন একটা দুর্বার উল্লাসের সুখে চেঁচিয়ে ওঠে মুরলী।

—কুথাকে যাবে?

—চল, তুমার হারানগঞ্জের খিরিস্তান-দিগের ঘর দেখে আসি। আথারিবাবুর ঘরণী দেখতে কেমনটি গো?

—বেশ তো, দেখে এইসো একদিন।

—এখনই চল।

—আমি যে এখনও খাই নাই জোহানা।

—খেয়ে লাও।

—তুমি খেয়ে নিয়েছ মনে লিচ্ছে।

—হাঁ।

বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে মুরলী। আর পলুস হালদার যেন একটা অনিচ্ছার ক্লান্ত মূর্তির মত আস্তে আস্তে হেঁটে ইঁদারার দিকে চলে যায়। হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে এসে ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে মুরলীর মুখের দিকে আবার কি-যেন আশা করে তাকিয়ে থাকে পলুস।

মুরলী—খেয়ে লাও পলুস। মিছা দেরি কর কেনে?

আর দেরি করে না পলুস। তাকের উপর রাখা পাঁউরুটি আর বাটির কবুতরের তরকারি একটা থালাতে ফেলে দিয়ে চুপ করে খেতে থাকে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন চুল আঁচড়ায় মুরলী, তখন ঢক-ঢক করে এক

ঘটি জল খেয়ে নিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে পলুস হালদার। —চল জোহানা।

ছোট ছোট ঘর, লাল খাপরার চালা। হারানগঞ্জের ডাঙ্গার বুকের উপর এদিকে-ওদিকে ছকের ছবির মত সাজানো এক একটা বসতির কাছে পলুস আর মুরলীকে এগিয়ে আসতে দেখেই ঘরের মানুষগুলি হেসে হেসে আর হল্লা করে পথের উপর ছুটে আসে। মেয়েরা চেঁচিয়ে ওঠে—হোই দেখ, পলুস আর পলুসের ঘরণী জোহানা আসছেক।

পলুসের পাশে দাঁড়িয়ে, আর মুখের সেই সুন্দর তকতকে ঝকঝকে হাসির শিহরটুকু ফুটিয়ে রেখে খিরিস্তান ভাই আর বহিন-দের উল্লাসময় মুখগুলিকে দেখতে থাকে মুরলী। বুকের ভিতরে যেন একটি নতুন অহঙ্কারের স্বাদ অনুভব করতে থাকে মুরলী।

—হেই মা, পলুসের ঘরণীর রূপ দেখ কেনে মা? চেঁচিয়ে ওঠে আর্থারবাবুর মেয়ে।

আর্থারবাবুর বউ হাসে—আমি দেখেছি; তু দেখে লে।

এগিয়ে যায় পলুস আর মুরলী। পলুসের একটা হাত শক্ত করে ধরে। ভাবতে গিয়ে ধন্য হয়ে যায় মুরলীর ভাবনাগুলি। পলুসের পাশে মুরলী, আর মুরলীর পাশে জোহানা, যেন সারা হারানগঞ্জের আত্মা খুশি হয়ে আর মুখর হয়ে এই মিলনের ছবিকে আশীর্বাদ করছে।

জনের মা, বুড়ি আনিয়া মুরলীর হাতে একগাদা ফুল তুলে দিল—গড বাবা দয়া করেন; সুখে থাক গো বহিন।

আরও এগিয়ে যায় পলুস আর মুরলী। বিকালের সূর্য বড় তাড়াতাড়ি লাল হয়ে গির্জার চূড়ার পিছনে নেমে পড়ছে। বড় সড়কের দু' পাশের আমগাছের মাথার উপর হুটোপুটি করে কাক আর কবুতর।

পলুস বলে—আর কত ঘুরবে জোহানা? এক ক্রোশ তো হাঁটা হলো।

—ইটা কার ঘর বটে পলুস? সড়কেরই এক পাশে একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে, এবং যেন একটা বিস্ময়ের চমক লেগে মুগ্ধ হয়ে যায় মুরলী।

—ইটা রিচার্ড সরকারের বাড়ি বটে।

—দাওয়ার উপর বসে আছে যে, সে কে বটে?

—রিচার্ডবাবু।

—বাবুটা এখানকে থাকে কেনে?

—রিচার্ডবাবু ডাক্তার বটে।

—খিরিস্তান বটে কি?

—হ্যাঁ।

—কিন্তুক..... খিরিস্তান যদি হবেক, তবে......।

—কি জোহানা?

—তবে তুমাকে আমাকে দেখেও আসে না কেনে? কথা বলে না কেনে?

হেসে ফেলে পলুস—ডাক্তার, রিচার্ডবাবু আমাদিগে দেখে ছুটে আসবে কেনে?

—কেনে পলুস?

—রিচার্ডবাবু আর্থারবাবুর মত ত্রিশ টাকার মাষ্টারবাবু লয় জোহানা, কল-ঘরের মিস্তিরিও লয়। রিচার্ডবাবুর কত নাম, কত মান, কত টাকা!

ধবধবে সাদা একটা ছোট বাংলো বাড়ি; কাছে দাঁড়িয়ে দেখলেও ছবি বলে ভুল হয়। লাল টালির চালার উপর সবুজ লতা ছড়িয়ে আছে। লতার ফুলগুলি নীল। বাড়ির দরজায় আর জানালায় রঙীন রেশমী কাপড়ের ঝালর উড়ছে। বাড়ির চারদিকে ইঁটের খাটো দেয়াল আর ফুলের কেয়ারি। ছোট একটা ফটক, ফটকের মাথার উপর লতার চাঁদোয়া। বাড়ির বারান্দার উপরে একটি চেয়ারের উপর বসে খবরের কাগজ পড়ছে ডাক্তার রিচার্ড সরকার।

দেখতে পায় মুরলী; রিচার্ডবাবু মানুষটাও জোয়ান বটে। চোখে চশমা আছে। পায়ে জুতোমোজাও আছে।

প্যেণ্টালুনের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে নিয়ে পথের দিকে রিচার্ড সরকারও একবার তাকায়। তারপরেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে খবরের কাগজ পড়তে থাকে।

পলুস বলে—চল জোহানা।

মুরলী চলতে চলতে বলে—বাবুটা কি গির্জায় যায় না?

পলুস—যায়।

মুরলী—আঁধার হয়ে এল পলুস।

পলুস—হ্যাঁ জোহানা।

হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুরলীর একটা হাত ধরতে গিয়ে চমকে ওঠে পলুস। পলুসের হাতটাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে মুরলী।

পলুস—কি বটে জোহানা?

মুরলী—কিছু না। আমি কাণা লই, হাত ধরতে হবেক নাই।

(ক্রমশ)

বাঙালী সাহিত্যিক ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা

সম্পাদক, 'দেশ' পত্রিকা সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন, গত ১৪ই অগ্রহায়ণ দেশ পত্রিকায় 'দ্বিতীয় মত' বিভাগে বাঙালী সাহিত্যিক ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রসঙ্গটি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে পড়লাম। সামান্য সাহিত্যিক হিসেবে আলোচ্য রচনাটির কোনো কোনো অংশের প্রতিবাদ করা, আমার বিবেচনায়, কর্তব্য। আশা করতে পারি, আমার প্রতিবাদ আপনারা পত্রস্থ করে বিষয়টিকে সাহিত্যিক সমাজের বিবেচনার সুযোগ দেবেন।

বলা বাহুল্য, বাঙালী সাহিত্যিক, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও তার ভয়াবহ পরিণাম—প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ, জটিল এবং সাহিত্যিক সমাজের সম্মান সম্ভ্রমের সঙ্গে জড়িত। বিবেকের সঙ্গে ত বটেই। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে নিবেদন করছি, আলোচ্য রচনায় লেখকের বিবেচনা ও মন্তব্য বিষয়টির গুরুত্ব এবং মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে, বিকৃতই বা না কেন। তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। খেয়াল-খুশি ঢালাও অভিমত, আপত্তিজনক, অসম্মানজনক কোথাও কোথাও।

লেখক বলেছেন, স্বাধীনতার দশ বছরের মধ্যে যে-হারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পেয়েছে সেই হারে সাহিত্যিকদের সামষ্টিক মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে। তাঁর এই মন্তব্যের পরিপূরক যুক্তি ও প্রমাণ দাবী করা আশা করি অন্যায় নয়। দশ বছর আগে সামষ্টিক মর্যাদা কি ছিল—এখন কতখানি তলিয়েছে তার স্পষ্ট ও সত্য উল্লেখ না থাকলে সন্দেহ হয় লেখক এ-বিষয়ে হয় অজ্ঞ না হয় অন্য কোনো গূঢ় কারণে তা এড়িয়ে যেতে চান। অবশ্য ব্যক্তিগত অভিমতের অথবা আত্মতুষ্ট মন্তব্যের সীমা অসীম।

দশ বছর আগে বাঙালী সাহিত্যিকদের মান-মর্যাদা কোন্ সুমেরু শিখরে ছিল তা আমি জানি না। তবে এটুকু জানি—বহুকাল ধরে রাজা, মহারাজা, জমিদার, ধনীজন, আই সি এস, ব্যারিস্টার দ্বারা সাহিত্যের সর্ববিভাগ পুষ্ট হত (তাঁদের বেশির ভাগেরই সাহিত্যিক যোগ্যতা কণামাত্র ছিল না—তথাচ নিগূঢ় কারণে প্রশ্রয় পেয়েছেন)। ইদানীং তার শতাংশের কতটুকু আছে? দশ বছর আগে মন্ত্রী বা ভাইস-চ্যান্সেলার সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছেন এর উল্লেখও করতে পারি। বুঝতে কষ্ট হয়, এত সত্ত্বেও দশ বছরের মধ্যে বাঙালী সাহিত্যিকদের মর্যাদায় ধস নামল কি করে! সরকারী সহযোগিতা ছাড়া অন্যান্য সহযোগিতায় বিবেক বাধা দেওয়া দোষ নয়। এমন যুক্তি অট্টহাস্যকর।

প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকদের মধ্যে পর্যন্ত যে পুরস্কারগৃধ্নুতা প্রত্যক্ষ......: লেখক বলেছেন। ধরে নিতে হচ্ছে অপ্রবীণ এবং অশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকদের (!) মধ্যে পুরস্কার-গৃধ্নুতা ত আছেই, প্রবীণ এবং শ্রদ্ধেয়দের মধ্যেও তা প্রত্যক্ষ। উত্তম কথা, কিন্তু প্রত্যক্ষ কার কাছে, কোথায়? লেখকের কাছে কি? তিনি কিভাবে প্রত্যক্ষ করলেন? অথবা কাণাঘুষো, জনরব—এবং কলরবই এ-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন (ঈশ্বরের অসীম কৃপায় মৃত্যু যদি না কাউকে এই হীন অসম্মানকর উক্তির অংশীদারী থেকে রক্ষা করে থাকে) এবং ভবিষ্যতে পাবেন—তাঁরা কে যে পুরস্কার গৃধ্নুতার আনুষঙ্গিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন—আর কে করেন নি তা স্থির করা ও বিশ্বাস করা দুরূহ। —সাধারণের ধারণায় কোন্ ভাবনা প্রশ্রয় পাওয়া স্বাভাবিক—সহজেই তা অনুমেয়। এই প্রসঙ্গে সাধারণ এক তুলনা মনে পড়ছে। ভর্তি বাস। ডালহৌসিগামী। কণ্ডাক্টর হাঁক দিল অতর্কিতে—সামলে বাবুরা—পকেটমার উঠেছে। অল্প একটু এই হাঁক-হুঁশিয়ারী নিয়ে কণ্ঠে কণ্ঠে লোফালুফি চলল। তারপর বাস-যাত্রী সবাই তটস্থ, শঙ্কিত। ধুতি জামা নেকটাইয়ের বাদবিচার নেই—সবাই কেমন পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসী। কে জানে কে পকেটমার? চেহারায় বেশভূষায় কিছুই বোঝা যায় না আজকাল। অবিশ্বাস বেড়ে বেড়ে অস্বস্তি। সকলেরই মনে হচ্ছে—কে জানে পাশের ভদ্রলোক যে-ভাবে পকেট মুঠো করে চেপে আছে—তাতে তাকেই পকেটমার ভাবছে কি না। এ-অস্বস্তি অমূলক হলেও স্বাভাবিক এবং সাংঘাতিক। শুধুমাত্র পকেটমারটিরই কোনো অবিশ্বাসের পীড়ন বা অস্বস্তি নেই। সে জানে, তার পকেট কেউ মারবে না। এবং স্বাভাবিক মর্যাদা—বলা বাহুল্য, তার থাকার কথা নয়।

সরকারী সহযোগিতা বা পুরস্কার লাভের সহযাত্রীদের মধ্যে 'পুরস্কারগৃধ্নু' উঠেছে শুনলে—বোধ হয়, সংশ্লিষ্ট সকলেই অস্বস্তি বোধ করবেন, অবিশ্বাসের ত কথাই নেই। কাজেই, এই দুর্নাম অসম্মান মোচন করার দায়িত্ব বেশি করে তাঁদেরই যাঁরা ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সে লেখক, প্রকাশক, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, আকাদামি সদস্য যিনিই হোন।

সরকারী সহযোগিতা, পুরস্কার ভাল না মন্দ সে প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে আলোচনা হতে পারে। এবং তাতে মতান্তর স্বাভাবিক। কাজেই সে-প্রসঙ্গে না গিয়ে লেখকের অপর মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত দশ বছরে সরকারী সহযোগিতা দেখে লেখক আতঙ্কিত হয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'এতে আর কাজ নেই, এতে সরকারের কিছুমাত্র উপকার হচ্ছে না এবং সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সমূহ অপকার হচ্ছে।' এ-যুক্তি যদি মেনে নিতেও হয়—তবে প্রশ্ন থাকে, সরকারের কিছুমাত্র উপকার না হলে সাহিত্যিকরা সরকারী সহযোগিতার ফলে কোন্ পদার্থ বিলোচ্ছেন। কোন্ শূন্য ভাণ্ডারে তা জমা হচ্ছে। 'তাঁরা দেন নিজেদের'—এই মন্তব্য কেমন করে আসে? এমন কোনো বাঙালী সাহিত্যিকের (গত দশ বছরের মধ্যে) বিষয় আমি জানি না—যিনি সরকারী সহযোগিতা অথবা পুরস্কার পেয়ে রাতারাতি (অথবা কয়েক বছরের মধ্যে) ভারত সরকারের পদবন্দনা করে কাব্য কি মহাকাব্য (এমন কি হায় একটি চটি উপন্যাসও) লিখে ফেলেছেন।

লেখক আরও বলেছেন, "কয়েকজন সাহিত্যিকের চরিত্রভ্রংশ আশঙ্কার কথা নয়। আশঙ্কার কথা বাঙলা সাহিত্যের চরিত্রেও প্রকৃতির পরিবর্তন।" কয়েকজন সাহিত্যিকের চরিত্রভ্রংশ (হওয়া অস্বাভাবিক নাও হতে পারে) যদি আশঙ্কার কথা না হয়—বুঝতে পারি না তবে এই চরিত্র পরিবর্তনের কথা কেন আসে? না কি তিনি মনে করেন এই সংক্রামক চ্যুতি সর্বত্র ঘটেছে। অবশ্যই তাই। কেননা 'অপেক্ষাকৃত আধুনিক' এবং 'ভয়াবহভাবে ব্যাপক' তাঁর মন্তব্য। যদি তাই হয়ে থাকে (জানি না সত্য কি না) শুধু সরকারী সহযোগিতার কল্যাণেই হয়েছে—এমন মনে করার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি কি তিনি দেখাতে পারেন।

প্রসঙ্গ আর দীর্ঘ করে লাভ নেই। সাহিত্যিক-সমাজকে শ্রদ্ধা শিক্ষার যে পাঠ লেখক দিয়েছেন তাঁর রচনার গোড়ার দিকে—রচনাটি সম্পূর্ণ পড়ার পর অন্তত সে-শিক্ষা কাজে লাগবে না। তবে নিঃসন্দেহে স্বীকার করব, ঈর্ষাকাতর যদি কেউ থাকেন তাঁর চিত্তে চমৎকার ইন্ধন জোগাবে।

প্রসঙ্গত বলা ভাল, সাহিত্যিক বিবেক অথবা মানুষী বিবেক রক্ষা করার দায়িত্ব নিজেদের। কাগজী দায়িত্বজ্ঞানহীন উপদেশে তাকে রক্ষা করা যায় না। সরকারী বেসরকারী উভয় সহযোগিতাতেই যে এই বস্তুটি মানুষ হারায় তার নজির অসংখ্য।

মন্ত্রীরা সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে পারবেন না—করলে হায়, হায় করতে হবে—এ যেন সেই হিন্দু বিধবার শুভকাজে মুখদর্শন পরিত্যাজ্য গোছের। শ্রী নেহরু বা শ্রী রাধাকৃষ্ণণের এ-অধিকার না থাকবে কেন বোঝা মুশকিল। প্রশ্নটা যোগ্যতার, পদবিচারের নয়।

—বিজন কর

নবজাতক

শিশির কুমার দাশ

॥ ১ ॥

নাগরিকেরা বিস্ময়ে প্রশ্ন করলোঃ কোথায় যাচ্ছ চিণ্ডা ?

শ্রাবস্তী থেকে নাগরিকেরা ফিরে আসছিল। সূর্য নিভে গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার বিস্তীর্ণ হয়ে গেছে দু'পাশের মাঠে। সুদীর্ঘ পথ চলে গেছে এ'কে বে'কে। পথের ধারের অশোক গাছ থেকে ফুল ছড়িয়ে পড়েছে ধুলোয়। আজ নাগরিকেরা গিয়েছিল জেতবনে শ্রাবস্তীতে। জেতবনে তথাগত বুদ্ধ এসেছেন। সেখানের আম্রবনে বুদ্ধদেব শিষ্যদের নিয়ে উপদেশ দান করেন। অবন্তী, কোশল, কাশী থেকে প্রতিদিন দলে দলে তীর্থযাত্রী আসে—তথাগতকে প্রণাম করে চলে যায়। নাগরিকেরা পথশ্রান্ত ক্লান্ত কিন্তু তবুও বুদ্ধের অম্লান হাসিটি বারবার মনে করে উৎসাহ পাচ্ছেন। মৌনী বুদ্ধদেব বসে আছেন অসীম করুণা নিয়ে চোখে। দুপাশে তাঁকে ঘিরে বসেছে শিষ্যেরা। মাঝে মাঝে তিনি একটি দুটি কথা বলেন, সমস্ত শোণিত প্রবাহের মধ্যে যেন সেই বাণী বিদ্যুৎস্পর্শ এনে দেয়। কথা বলা শেষ হবার পরেও মনে হয় তাঁর বলা শেষ হয়নি। সেই নীরবতা ভেঙে নাগরিকেরা একে একে উঠে এসেছে। গল্প করতে করতে তারা আসছিল। মৃদু বাতাসে পথের রক্তিম ধুলো উড়ে যাচ্ছিল। একসারি নীলকণ্ঠ পাখি পাশের ভুট্টা ক্ষেতের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। দূরেই বিতস্তা নদীর থেকে জলের স্পর্শ আসছিল বাতাসে। হঠাৎ নাগরিকদের গতি মন্থর হয়ে এল সুন্দরী চিণ্ডাকে দেখে।

চিণ্ডা দাঁড়িয়ে আছে অশোক গাছের তলায়। পরনে একটি সূক্ষ্ম বাসন্তী রং-এর অংশুক আর ঈষৎ ম্লান শ্যামল কঞ্চুলিকায় দুটি সুউচ্চ সুমেরুশিখর আবৃত। সুচিত্র দুকূলের অঞ্চলরেখা লুটিয়ে পড়েছে দক্ষিণ চরণের তলায়। সুবিন্যস্ত গহনকৃষ্ণ বেণী নেমে এসেছে পীবর স্তনচূড়ার ওপর। নাগরিকেরা বিস্ময়ে দেখছিল সুন্দরী চিণ্ডার মুখে লোধ্রপরাগ ও শ্বেতচন্দনের পত্রলেখা, চোখে বাঁকা কাজলের রেখা। অধরে লাক্ষা-রস। গলায় নবীন বসন্তের পুষ্পমালা। আর ডান হাতে একটি স্বর্ণদীপ। নাগরিকেরা একমুহূর্তে ভাবল, ঐ পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে কত স্বার্থবাহী, কত ধনীশ্রেষ্ঠী, কত সম্রাটের পুত্র। সাহস করে একজন নাগরিক প্রশ্ন করলঃ এই অন্ধকারে একা কোথায় যাচ্ছ, চিণ্ডা?

সেই অপরূপা স্বর্ণপ্রদীপ তুলে ধরল। স্থির দীপশিখায় নাগরিকেরা দেখল, দুলে উঠল কর্ণমূলে আশ্চর্য দুটি হীরকের কণ্ঠা-ভরণ, মুহূর্তের জন্য ঝলক দিল সোনার অবতংশ। আর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল কৌতুকের হাসি। নাগরিকদের কৌতূহল সচকিত করে অবলীলায় উত্তর দিল চিণ্ডাঃ আমি জেতবনে যাব। একাই আমি সেখানে প্রত্যহ যাই।

নাগরিকদের চোখে বিস্ময় আরো গাঢ় হল। 'জেতবনে, তথাগতের কাছে?'

শ্রাবস্তির নগরবিলাসিনী উত্তর দিলোঃ 'হ্যাঁ, আমি তথাগতের কাছে যাই।'

নাগরিকেরা ঠিক বুঝতে পারল না। যার পায়ে শত শত রাজপুত্র লুটিয়ে পড়েছে, সহস্র সুবর্ণমুদ্রা যার একরজনীর দক্ষিণা, সেই বহুবল্লভার জীবনে কি আজ নতুন লগ্ন এল! সে কী তার আযৌবনের উদ্ধত সম্ভার তথাগতের পায়ে নিবেদন করবে। তথাগতের অলৌকিক মহিমায় শ্রদ্ধাবান নাগরিকেরা সেই বিলাসবতীর দিকে তাকালো। বললোঃ তথাগতের জয় হোক, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হোক, জনপদবধূ!

ভ্রূ-বিলসিত করে নগরাঙ্গনা আবার সেই বিচিত্র হাসি হাসল, তারপর চঞ্চল পায়ে অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল যেন মনের গভীর গুহায় একটি বাসনা মিশে গেল। হঠাৎ সামনের পথচারীরা বললেঃ শিগগির চল, মেঘ দেখা যাচ্ছে।

ঈশান কোণে একটুকরো মেঘ জমেছে, বাতাসে যেন প্রবল ঝড়ের সম্ভাবনা ভেসে আসছে। অন্ধকারে পথ চলতে চলতে পিছিয়ে পড়া একটি পথচারী শুধু একবার বললেঃ 'এত রাতে বারবিলাসিনী জেতবনে যায়!'

যাদের কানে তখনও বুদ্ধদেবের কথা বাজছিল তারা চুপ করে রইল। ইতিমধ্যে আকাশ ঢেকে এল গহন মেঘে। পথ চলতে চলতে নামল বসন্তের অকালবৃষ্টি। বাতাসে ছিঁড়ে উড়ে গেল কোন একটি গাছের ডাল আর রাশি রাশি শুকনো আমের পাতা। দ্রুতপায়ে নাগরিকেরা চলল।

*

প্রতি ভোরেই সদ্যগাঁথা ফুলের মালা নিয়ে ভক্তেরা আসে তথাগতের কাছে। নদী-পারের সুদূর গ্রাম থেকে একদল গ্রামীণ চলেছে। এখন সেখানের আম্রবনে কোকিলেরা মধুস্বরে অনিবার ডাকছে। বিতথা নদীতে স্নান সেরে ব্রাহ্মণেরা চলেছেন নিজ কুটিরের দিকে। তাঁদের কণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রগাথায় প্রভাতী আকাশ ভরে উঠেছে। গত রাত্রির বৃষ্টির জল মাঠের কোথাও কোথাও জমেছে। শুকনো পাতা ছড়িয়ে আছে সমস্ত মাঠে। তেজপাতা গাছে ভরে গেছে দক্ষিণের মাঠ। তার মধ্য দিয়ে বাঁকা পথ মিশেছে জনপদে। দুটি একটি অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতবেগে ছুটে চলে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণেরা চলেছেন অনাবৃত দেহে। সবাই প্রণাম করছে তাঁদের। বিদেশী বণিক দুজন পথের ধারে দাঁড়িয়ে, সংগীকে হারিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে। সেসব ছাড়িয়ে দ্রুত ছুটে চলেছে গ্রামীণেরা।

হঠাৎ তাদের দুজন নাগররসিক থামিয়ে বললে: কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

গ্রামীণেরা সবিনয়ে বলল: জেতবনে, তথাগতের কাছে।

একটি রসিক বললে: তথাগত আবার কে হে? ভণ্ড সন্ন্যাসী, নাস্তিক। সে আবার তথাগত হল কবে?

গ্রামীণেরা বললে: আমরা সেসব জানি না। আমরা বহু দূরান্তের পথ হেঁটে চলেছি। আমাদের পথে পড়েছে দুটি নদী, আমাদের পেরোতে হয়েছে তিনটি দীর্ঘ প্রান্তর এবং ভয়াবহ জঙ্গল। আমাদের সঙ্গে আছেন এই বৃদ্ধা, তিনি সন্তান হারিয়েছেন, [illegible] মৃত সন্তান কোলে নিয়ে [illegible] ধরে ইনি ছুটে এসেছেন। আমরা [illegible] কাছে যাবো।

বৃদ্ধা মৃতপুত্র কোলে নিয়ে থরথর করে কাঁপছিল।

রসিক দুটি বিদ্রূপে হাসল। '—মৃতের প্রাণ দেবে ঐ ভণ্ড, চরিত্রহীন—' পাশ দিয়ে এক বৌদ্ধ শ্রমণ যাচ্ছিলেন। তাকে দেখে রসিকদের কথা বন্ধ হল। তারপর পাশে শুয়ে থাকা কুকুরটাকে শীৎকার করে ডেকে লেলিয়ে দিল বৌদ্ধভিক্ষুর দিকে। কুকুরটা বিশ্রীভাবে ডাকতে ডাকতে শ্রমণের পেছনে ছুটল। শেষপর্যন্ত পায়ে কামড়ে দিল। রসিক দুটি হেসে উঠল। হঠাৎ একটি গ্রাম্য যুবক তার উত্তরীয় খুলে সেই রসিক পুরুষকে প্রায় বেঁধে ফেলতে গেল। বৌদ্ধ ভিক্ষুর পা দিয়ে রক্ত পড়ছিল। মৃত-পুত্রের জননী সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে আর্তনাদ করে উঠল। আর্তস্বরে আকর্ষিত হয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু সেদিকেই এগিয়ে এলেন। সেই গ্রামীণ যুবকের হাত ধরে তাকে নিরস্ত করালেন। বললেন: বৎস, তোমরা আমাকে ভালোবেসে যা করছ তা ঠিক নয়। শত্রুতায় শত্রুকে জয় করা যায় না। ভালোবাসায় জয় করতে হয়। গ্রামীণেরা সবাই শ্রমণকে প্রণাম করালেন। গ্রামীণেরা বললে: আমরা বুদ্ধ দর্শনে যাচ্ছি।

শ্রমণ বললেন: কল্যাণ হোক। গ্রামীণেরা বললে: আপনি কে ভদন্ত! ভিক্ষাঝুলি হাতে [illegible] হাসিতে বললেন: আমি সামান্য [illegible] আমার নাম আনন্দ। তোমরা [illegible] তিনি এখন আম্রকাননে উপবিষ্ট। [illegible] তোমাদের শুভ হোক।

গ্রামবাসীরা নগর ছাড়ালো। সামনে আসছিল চারজন তীর্থিক। গ্রামবাসীরা তীর্থিকদের পছন্দ করতো না। তারা কেউ প্রণাম করলো না।

তীর্থিকরা ব্যঙ্গভরে বললে: নির্বোধ! তোমরা যার প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল সে কী তোমাদের শ্রদ্ধার উপযুক্ত! গ্রামবাসীরা ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যাচ্ছিল। তীর্থিকরা আবার বললে: তোমাদের গৌতম বলে বেদ মিথ্যা, বলে যজ্ঞ যাগ সব মিথ্যা, বলে ভগবান নেই।

গ্রামবাসীরা বললে: প্রভু, আমরা কেউ বেদ জানি না, আমরা মূর্খ জনসাধারণ, কেউ যজ্ঞে প্রবেশাধিকার পাইনি। আর আমরা ভগবান মানি, তথাগতই আমাদের ভগবান।

সুপ্রবুদ্ধ নামে এক তীর্থিক প্রচণ্ড গর্জন করে উঠলেন: মূঢ়, বুদ্ধ ভগবান! চরিত্রহীন—লম্পট—সন্ন্যাসভ্রষ্ট—নারী আসক্ত। গ্রামবাসীরাও উষ্ণ হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ তীর্থিকরা অন্যদিকে তাকালো। দৃষ্টি অনুসরণ করে গ্রামবাসীরাও দেখল নগরীর শ্রেষ্ঠা নটি চিঞ্চা বাসন্তী অংশুক ধুলোয় লুটিয়ে চলে যাচ্ছে। খসে পড়েছে তার আঁচল, তীব্র সুরার গন্ধ এখনও তার মুখে, কণ্ঠের স্বর্ণহার স্তনবৃন্তের ওপর অবসাদে শায়িত, চোখে রাত্রিজাগরণের চিহ্ন কম্প্র-কাজলে। তীর্থিকেরা সহাস্যে বললে: কী সংবাদ ভদ্রে, এত সকালে কোথা থেকে আসছ?

বিনীত অভিবাদন করে চারুনিতম্বিনী বললে: জেতবনে রাত্রিবাসের পর স্বভবনে ফিরে যাচ্ছি। গ্রামবাসীরা বিস্ময়ে বললে: ললিত-বনিতা নিয়ে জেতবনে কে রাত্রিবাস করে? বিলোলিত কটাক্ষে চিঞ্চা জানালে অম্লানমুখে: তথাগত, তিনি আমার দেহে আসক্ত।

তীর্থিকেরা হেসে উঠল বিদ্রূপে। লোভনা চিঞ্চা হেসে চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইল গ্রাম-বাসীরা। এক মুহূর্তে স্তব্ধতার পর সবাই সমস্বরে বললে: 'যাবো না, যাবো না। ফিরে চল।' শুধু মৃতপুত্র কোলে নিয়ে বৃদ্ধা স্থির হয়ে রইলো। তারপর শ্রাবস্তীর গ্রাম-পথ ধরে বৃদ্ধা একা-একা এগিয়ে চললো জেতবনের দিকে।

চিঞ্চা এসে ঢুকল তার প্রসাধন কক্ষে। বিশাল স্বর্ণখচিত দীর্ঘ মুকুরের সামনে দাঁড়ালো। চম্পকবর্ণা অঙ্গুলি সঞ্চালনে প্রথমে খুলে ফেলল সুবিনাস্ত দীর্ঘ কুন্তল। সুগৌর দুটি হাত দিয়ে টেনে দিল বাসন্তী অংশুক। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে সে দেখল অনাবৃত দেহকান্তি—দুটি ধনুকের মত বাঁকা ভ্রূর নীচে স্থির চোখ, সাদা করোনিকার

ওপরে কালো মণি যেন সমুদ্রের বুকে দিক-ভ্রান্ত অর্ণবযান; অধরোষ্ঠ অপূর্ণ বাসনার বিষে রক্তিম, যেন কবিতার দুটি চরণ। চিণ্ডা তাকিয়ে দেখছিল সেই ছায়ার বুকের ওপর থেকে সরে গেল সবুজ কঞ্চুলিকা—যেন সমুদ্রের আবরণ ভেদ করে ফুটে উঠল সুধা-ঘট। ছায়াটার পরিপূর্ণ রূপের দিকে তাকিয়ে রইল সে। দেহের প্রতিটি সুষমা, প্রতিটি রেখা সে দেখল। গালের ঈষৎ অরুণাভাস, বক্ষের মৃদু স্পন্দন, নাভির বলীরেখা, উৎসঙ্গের রহস্যময় বিচিত্র রেখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন হঠাৎ তার নিজের প্রতি ধিক্কার এল। এই দেহও গৌতমকে বিচলিত করল না। রজনী-শয়ন করেছে সে ধনীশ্রেষ্ঠ শর্বিলকের ভবনে। তাকে সে দেহ স্পর্শ করতে দেয়নি। প্রচুর মদ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।

কাল রাত্রে যখন প্রবল ঝড় বইছিল তখন সে তথাগতের ভবনের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সে তার স্বর্ণপ্রদীপের আলোয় গৌতমের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। শুদ্ধোধন শাক্যসিংহ গৌতম—এ নাকি মারজয়ী, কামজয়ী। হাসি পেল তার। কপিলাবস্তুতে কি নারী ছিল না? পুরুষকে ভোলাতে নারীর দেহ—শুধুমাত্র দেহই যথেষ্ট।

শ্বেতপাথরের ঘাট দিয়ে চিণ্ডা পুষ্করিণীতে নামল। ভাবছিল—বুদ্ধের সামনে গিয়ে সে দাঁড়ালো। বুদ্ধ স্থির চোখে তাকিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ বুকের বসন উড়ে গিয়েছিল হাওয়ায়—বুদ্ধ তখনও অম্লান মুখে তাকিয়েছিলেন। ঠিক সেসময় হাওয়ায় নিভে গিয়েছিল তার স্বর্ণদীপ। হঠাৎ তার কেমন ভয় করেছিল। ভেবেছিল সে অন্ধকারে এগিয়ে যাবে। কোমল দেহের তীব্র বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দেবে কামজিৎ মানুষটির রক্তে। কিন্তু হঠাৎ—।

সেই অন্ধকারের কথা মনে হতেই উঠে পড়ল চিণ্ডা। গতরাত্রির বিষণ্ণতা আর ক্লান্তিতে, দাসীদের বাজনে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল তখন দিন প্রায় শেষ। সান্ধ্যপ্রহর ঘোষণা করল দূরে। ঘরে ঘরে দাসী এসে জেলে দিলে আলো।

চিণ্ডা বিছানা ছেড়ে উঠল। তারপর নীচু হয়ে চন্দনকাঠের আধার থেকে একটি পুঁথি বার করে আনলে। পুঁথি খুলে বসল কোমল আসনে। সমস্ত কক্ষে আলো রহস্যময় দেখাচ্ছিল। মণিবসানো হারটা জ্বলজ্বল করে উঠল। পুঁথির পাতা আর উল্টানো হল না। মনে পড়ল প্রদীপ নিভে যাওয়ার ঠিক আগে সে গৌতমকে বলেছিল: আমি আমার দেহ উপহার দিতে এসেছি।

গৌতম হেসে বললেন: কেন শুচিস্মিতে, আমি ত' সামান্য দান গ্রহণ করি না। আমি চাই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

চিণ্ডা বলেছিল, দেহই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কত রাজরাজন্য, শ্রেষ্ঠী, বণিক-কবি-শিল্পী এরই জন্য লালায়িত।

গৌতম হাসলেন: তোমার দেহ কতদিন থাকবে, কত বছর, কত শতাব্দী! তোমার দেহ সব মানুষের মতই ক্ষতসংকুল, মরণশীল।

চিণ্ডা ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেছিল, আমি তাহলে আপনাকে জয় করে নেব, ভদন্ত। সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। সেই অন্ধকারে কী দেখেছিল সে—ভাবলেই মন শিউরে ওঠে। সেই আশ্চর্য অন্ধকার—সে যেন কোথায় চলে গেল—ঠিক বুঝতে পারে না। তবু সেই দুর্লক্ষ্য অন্ধকারে সে যেন কত কী দেখতে পেল। ভেবে ভেবে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। সখী পদ্মটিকা এসে খবর দেয় তীর্থিক ব্রাহ্মণেরা এসেছেন। ভবনশিখীগুলি তখনও নেচে নেচে বেড়াচ্ছিল। গৃহবলিভুক্ কপোতগুলি অলিন্দে ফিরে এসেছে। চিণ্ডা তাড়াতাড়ি বেশ বদল করে এল।

সাদা নরম চাদরের ওপর এসে বসল তীর্থিকরা। চিণ্ডা হেসে বললে: তারপর?

তীর্থিকরা বললে: তুমি অত্যন্ত বিরাট কাজ করেছ। গৌতমের প্রতি জনসাধারণের সন্দেহ হয়েছে।

চিণ্ডা বীণা তুলে নিল উৎসঙ্গে। সত্যি কি সন্দেহ হয়েছে।

তীর্থিকেরা বললে: হয়েছে। তবে এখনও কাজ বাকী। দেখবে একদিন ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম উঠে যাবে। তীর্থিকরা একসহস্র কার্ষাপণ রাখল চিণ্ডার সামনে। বীণার তারে সুর তুলতে তুলতে উদাসীন ভাবে তাকাল চিণ্ডা। তীর্থিকরা উঠে পড়ল—বলল, উদ্দালককে ওরা বৌদ্ধ করেছে—তার প্রতিশোধ নাও। বুদ্ধকে চরম পাপে ডোবাও। এতেই তোমার কীর্তি স্থাপিত হবে।

চিণ্ডার বীণার তার ছিঁড়ে গেল। বললে: প্রতিশোধ আমি নেবই।

চিণ্ডা চলে গেল পাশের ঘরে। প্রদীপ নিভিয়ে দিল। অন্ধকারটা বড় করুণ মনে হল। মনে হল সে কেঁদে উঠবে। মনে হল উদ্দালকের কথা। তাই চিণ্ডা আবার প্রদীপ জেলে নিল। প্রচণ্ড ব্যথায় অনুভব করে তার নিম্ন উদরে একটা কিসের টান। বিছানায় দেহ এলিয়ে দেয়। একটা মিষ্টি গন্ধ বাতাসে। মৃদু হয়ে আলো জ্বলে। শরীরটায় ব্যথা। আস্তে আস্তে ঘুম আসে চোখে। স্বপ্ন দেখে—সেই অন্ধকার—দীপ নিভে গেছে। নিশ্চয়ই বুদ্ধ যাদু জানে। বুদ্ধের প্রত্যাখ্যানে তার অপমানাহত দেহ কাঁপছিল।

প্রতিশোধ চাই—স্বপ্নের মধ্যে প্রতিজ্ঞা করল। আবার সেই একই ব্যথা অনুভব করল। আর দেখল কাপুরুষ উদ্দালক পালাচ্ছে। আবার ঘুম জড়িয়ে এল। আর দেখল উদ্দালক চিঞ্চার দুটি হাত ধরে প্রমোদ উদ্যানে বসে আছে—জামগাছের নীচে। ঘুম ভেঙে গেল তার। স্বপ্নে চিঞ্চা যা দেখল জাগরণে সেটা সবচেয়ে মিথ্যা। হীন উদ্দালক প্রবঞ্চক। তার প্রতিশোধও নিতে হবে।

সে বারবণিতা। গণিকা। বুদ্ধের কাছে ব্যর্থ, তাকে সে ঘৃণায় ফিরিয়ে দিয়েছে। আর উদ্দালক—তাকে পেয়েও হীনতার আশ্রয় নিয়েছে। কাপুরুষ। এই কাপুরুষকে সে অস্বীকার করতে চায়। সারারাত্রি ঘরে দীপ জ্বলে। শুয়ে শুয়ে বুঝতে পারে তার দেহের মধ্যে যেন আরো একটা প্রাণ গড়ে উঠছে। সমুদ্রের মধ্যে প্রবাল দ্বীপের মত। পরক্ষণেই মনে হল উদ্দালক তাকে ছেড়ে গেছে দু'মাস। উদ্দালকের সন্তানকে সে কিছুতেই স্বীকার করবে না। আর কেড়ে নিয়েছে ঐ বুদ্ধ। কামজয়ী বুদ্ধ। প্রতিশোধ চাই। সে জননী নয়। জায়া নয়। সে শুধু জনতোষিণী। উদ্দালকের কথা তবু মন থেকে সরছিল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগল চিঞ্চা। আলো নিভিয়ে দিল। তবুও অন্ধকার হল না। চাঁদের আলো এসে পড়ল।

সকালবেলা জেতবনে বুদ্ধদেব বসেছেন। পায়ের কাছে লুটিয়ে কাঁদছে সেই মৃতপুত্রের জননী বৃদ্ধা। তখন আমের ডালে ডালে হাওয়া লেগেছে বসন্তের। তথাগতের গৈরিক বসন ফুলে ফেঁপে উঠছে। বুদ্ধ স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন—মনে হয় যেন তিনি দিগন্ত পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু—এমনকি দিগন্তের ওপারেও তাঁর দৃষ্টি। তথাগতের পায়ের কাছে একটি শ্বেতপদ্ম। সামনে বসেছে অজস্র শিষ্য। বুদ্ধ তাঁদের বলছিলেন, মালাকার যেমন ফুল দিয়ে মালা গাঁথে, তেমনই জীবনের সমস্ত মঙ্গল কাজ দিয়ে একটি মাঙ্গলিক রচনা করাই মানুষের কর্তব্য। সেই শান্ত গম্ভীর পরিবেশে গিয়ে দাঁড়াল চিঞ্চা। হঠাৎ সে বলে উঠল : ভন্তে আমি আপনার আচরণে বিস্মিত হয়েছি। বুদ্ধ বললেন : চিরায়ুষ্মতী, তুমি কী বলতে চাও বল?

চিঞ্চা কৃত্রিম ক্রোধে বললে : মহাগুরো, আপনি অনেককে ধর্মশিক্ষা দেন। কিন্তু আপনার সহবাসে আমি সন্তানসম্ভবা হয়েছি। এখন আমার কর্তব্য কি!

সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। বুদ্ধশিষ্যেরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। হঠাৎ যেন হাওয়াটা থেমে গেল। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল তীর্থিকেরা, আর কয়েকটি ব্রাহ্মণ যুবক। তথাগত তাঁর আসন থেকেই রমণীর দিকে তাকালেন। তাঁর পবিত্র দেহ থেকে যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর এবং সুমিষ্ট। তিনি মধুবর্ষী কণ্ঠে বললেন : বৎসে, তুমি যা বলছ তা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক আমরা উভয়ে জানি। তুমি সন্তানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর। সন্তানকে সত্য পরিচয় দান কর। কল্যাণ হোক তোমার।

আলো নেচে উঠল বিলাসিনীর চোখে। তাকে দেখাচ্ছে উষার মত। মণিখচিত মেখলায় আলো পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে। এলায়িত কেশপাশ উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের প্রস্তরিত রূপের মত নেমে এসেছে। তবু চিঞ্চা অনুভব করল তার দিকে কেউ তাকিয়ে নেই। সবাই মাথা নীচু করে বসে আছে। সকলেই যেন বুদ্ধের কাছে অপরাধী। এই জনমণ্ডলী স্তব্ধ হয়ে গেছে—দর্পদংশনে মানুষ যেমন স্থির হয়ে যায়।

দূরে দাঁড়িয়ে তীর্থিকেরা লুব্ধ দৃষ্টিতে তার দেহের দিকে তাকিয়ে আছে। চিঞ্চার সংকোচ হল। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর কানে এল তথাগত আবার সেই অপূর্ব কলহংসনাদে উপদেশ দিচ্ছেন : নিন্দা এবং প্রশংসায় বিচলিত হয়ে কী লাভ! উভয়ই পরিণামে অর্থহীন। চিঞ্চা বেরিয়ে এল জেতবন থেকে। চতুর্দোলা নিয়ে বাহকরা ছুটে চলেছিল। সামনে ধুধু মাঠ। পাশে পাশে পর্ণকুটীর। মাঠে সাদা গাভী চরে বেড়াচ্ছে। বহুদূরে দাঁড়িয়ে আছে কৃষক-দম্পতী। চতুর্দোলার আবরণ খুলে দেখছিল চিঞ্চা। আর ভাবছিল এভাবেই সে প্রতিশোধ নিতে পারবে কি? উদ্দালক হয়ত আর ফিরবে না। তবু তার স্বপ্ন মন জুড়ে। তার স্মৃতি জ্বলন্ত। সে চেয়েছিল তার সম্পূর্ণ হতে। হতে চেয়েছিল তার প্রেয়সী—তার বংশের বধূ—তার সন্তানের জননী। নিতান্ত বাল্যকালে পাঞ্চালের কোন নির্জনপথ থেকে চিঞ্চা লুণ্ঠিত হয়েছিল—আজ সে পিতৃনাম মনে করতে পারে না। পণ্যের মত হস্তান্তরিত হয়েছে। আজ তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে রাজরাজড়া, ধনীশ্রেষ্ঠী, এমন কি কত সন্ন্যাসী। কিন্তু একজায়গায় সে পরাজিত। চেয়েছিল একজনের সন্তানের জননী হতে। সন্তানকে পিতৃপরিচয় দিতে। কিন্তু কাপুরুষ উদ্দালক। বাইরের মাঠ থেকে এক ঝলক বাতাসে চিঞ্চার শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। উদ্দালক পালিয়েছে—অথচ সে নামহীন গোত্রহীন ইতিহাসহীন এক মুহূর্তের সত্তাকে বুকের মধ্যে লালন করছে তা ভাবতে পারে না। তাকে যদি কলঙ্কিত হয়ে জন্ম নিতে হয় তবে এই মিথ্যা কলঙ্কের টীকা তার কপালে আঁকা থাক। এ তার সন্তান নয়। তার অজস্র বিলাসছলনার অভিনবতম ছলামাত্র। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। বাহকেরা অট্টালিকার মধ্যে চতুর্দোলা নিয়ে ঢুকল। চিঞ্চা ছুটে গেল তার শয়ন কক্ষে।

॥ ২ ॥

একটি একটি করে দিন কাটে। বুদ্ধের কথাটা এখনও মধ্যে মধ্যে কানে বাজে।

সত্য পরিচয় দেবে সন্তানের। উদ্দালকের পুত্র সে। কিন্তু সে পরিচয় সে দেবে না। সে চেয়েছিল জননী হতে। আজ চায় কলঙ্কময়ী হতে। সে তার পুত্র নয়। কলঙ্ক ছড়াবার উপকরণ। মারজিৎ বুদ্ধের মারণাস্ত্র।

দিনের পর দিন কাটে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। বিকেল বেলায় নিজের হাতে কপোতগুলিকে সে নীবারকণা খাওয়াচ্ছিল। একটি হরিণশিশুকে আদর করছিল। আদর করতে করতে মনে হল এমন একটা বোধ যেন

তাকে ঘিরে ফেলছে। হরিণ আদর পেয়ে নাচছিল। সোনার মত গায়ের রং। চিঞ্চা হাত বোলাতে কেমন স্থির হয়ে গেল। হাত থেকে খসে পড়ল তৃণমঞ্জরী। গোধূলির আলোকে সে ভয় করে। তাই তাড়াতাড়ি উঠে নিজের ঘরে গেল। ঘরের এককোণে আরণ্যকাঠের পালঙ্ক। ঘরের দেওয়ালে শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠ চিত্রীর আঁকা ছবি। দেবতাদের ছবি সে পছন্দ করে না। তাই দেওয়ালে আঁকা একটি ময়ূর। অন্য দেওয়ালে রথারোহী পুরুষ ও নারী। কোণে রজত পাত্রে একরাশ মল্লিকা। ইচ্ছে হল তার মালা গাঁথবে। সূচিকামুখে ফুলগুলি গাঁথতে গাঁথতে হঠাৎ দক্ষিণ অনামিকা থেকে রক্ত বেরিয়ে গেল অন্যমনস্কতায়। নীরবে দেখতে লাগল মালার গায়ে একটি একটি করে রক্তবিন্দু ঝরে পড়ছে।

দিনের পর দিন কাটে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। মাসের পর মাস।

তীর্থিকেরা ঘোষণা করে দিয়েছে বুদ্ধদেব চিঞ্চার সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়ে লিপ্ত। সমস্ত নগরে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বুদ্ধারা তাম্বুল মুখে এই কথা বলেন। শ্রমণদের ভিক্ষা দেয় না কেউ। ভিক্ষা চাইতে গেলে থু থু ছিটিয়ে দেয়। কেউবা গালাগালি দেয়। চিঞ্চা ভাবে, এইবার বুদ্ধদেব নিশ্চয়ই তার কাছে পরাজয় স্বীকার করবেন। এই কলঙ্কের হাত থেকে বুদ্ধদেবের কোন মুক্তি নেই। একমাত্র সে-ই মুক্তি দিতে পারে। সন্ধ্যাবেলা গন্ধতেলে অনুলিপ্ত হয়ে স্নান করলো চিঞ্চা। তারপর সুনীল বর্ণ শাড়ি পরে, হাতে শেফালির মালা নিয়ে অন্ধকারে তথাগতের কাছে দাঁড়ালো। তখন আম্রবনে সবাই নিদ্রিত।

তথাগত জেগেছিলেন। তিনি বললেন: কী সংবাদ সুভাগ্যবতী

চিঞ্চা বললে: আমি সন্তানবতী। লোকে জানে এ আপনার সন্তান। আমি আপনাকে এই কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারি যদি আপনি একদিন, এক মুহূর্তের জন্য আমার কাছে কলঙ্কমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন।

তথাগত হাসলেন। সুভদ্রে, যা সত্য তা পরিজ্ঞাত হোক। কলঙ্কের ভয় মিথ্যা ভয়। মানুষ নিষ্কলঙ্ক, জাতিহীন, কুলহীন। তুমি পৃথিবীর কাছে এবং সন্তানের কাছে সত্য পরিচয় দাও। কল্যাণ হোক তোমার।

একা একা ফিরে এল চিঞ্চা। দুটি ঠোঁট সে বারবার কামড়ে ধরছিল সারারাত্রি, এমন কি ঘুমের মধ্যেও।

সকালবেলা পরিচারিকা এসে খবর দিল, একজন সাধারণ নাগরিক দেখা করতে চান। তাম্রলিপ্ত থেকে এসেছেন। চমকে উঠল চিঞ্চা। তাম্রলিপ্ত। নিজের মনেই নামটা উচ্চারণ করল। তাম্রলিপ্ত—সুদূর বঙ্গদেশ—নীলসমুদ্রের বেলাভূমি—বহুদূরগামী অর্ণবপোত—প্রচুর অর্থ—আর শ্যামলী নারীর দেশ। আর মনের মধ্যে উঁকি দিল একটি মুখ। উদ্দালকের। সেও একদিন তাম্রলিপ্ত থেকে এসেছিল। চিঞ্চা পরিচারিকাকে সম্মতি জানালো।

নীচে নেমে এল চিঞ্চা। তাকে দেখে নাগরিকটি উঠে দাঁড়াল। অভিবাদনান্তে বললে: আমি উদ্দালকের বন্ধু, আসছি সুদূর বাংলা দেশ থেকে। সেখানের সমুদ্রবন্দর থেকে প্রতিদিন অর্ণবযান সুমাত্রা যবদ্বীপ ও সিংহল যাত্রা করে। সেখানের রাজা গুণী ও জ্ঞানী, বীর ও সুচেতা। নাগরিকেরা রসিক ও সত্যবাদী। নারীরা বিলাসবতী ও শোভনশ্রী। আমি সেই দেশ থেকে এসেছি।

চিঞ্চা বললে: আমি তাম্রলিপ্তের নাম শুনেছি, সে স্মৃতি এখনও জাগ্রত।

নাগরিক বললে: তাম্রলিপ্তের পরম-সৌভাগ্য। আমি একটি বিশেষ বার্তা নিয়ে এসেছি। আমি জানাতে এসেছি যে উদ্দালক আগামী তিনমাসের মধ্যে এখানে আসবেন।

চিঞ্চা বিস্ময়ে বলল: সেকি। তিনি এতদিন কোথায় ছিলেন? কবে আসবেন?

নাগরিক বলল: সমস্তই জানতে পারবেন। পরিচারিকা সুবাসিত ভৃঙ্গারে দ্রাক্ষারস নিয়ে এল। নাগরিক পান করতে করতে বললেন: এ-ত' গৌড়বণিতাদের চেয়েও মিষ্ট।

চিঞ্চা হাসল: আপনি এখন আমার অতিথিশালায় কিছুদিন থাকুন।

নাগরিক বলল: উদ্দালক তিনমাসের মধ্যেই আসবেন। আশাকরি আপনি সুস্থ আছেন। এখন আপনি সন্তান-জননী।

জননী কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করল চিঞ্চা।

উদ্দালক ফিরে আসছে। চিঞ্চা তার সন্তানকে ধারণ করে আছে। সে কি তার সন্তানকে ফিরিয়ে নিতে এসেছে! দিতে আসছে কি তাকে পিতৃপরিচয়। চিঞ্চা একবার ভাবল মিথ্যে, পুরুষের ছলনা। সুরার পাত্র পূর্ণ করল কানায় কানায়। ওষ্ঠাধরের কাছে এগিয়ে আনল। রাস্তা থেকে একটি শ্রমণের কণ্ঠ শোনা গেল: নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।' পেছনে একদল ছেলে হাততালি দিচ্ছে বোধ হয়। চিঞ্চার সামনে টলমল করছে সুরার পাত্র। হঠাৎ মনে হল নাগরিকের কথা, সন্তান-জননী। হাতে তুলল সুরাপাত্র। থরথর করে কাঁপছে। সেই ফেনবুদ্‌বুদ শোভন দ্রাক্ষারস ওষ্ঠাধর স্পর্শ করতে মনে হল: মানুষ জাতিহীন—তুমি পুত্রকে সত্য পরিচয় দাও।

তথাগতের হাসি মনে পড়ল। হাত থেকে পড়ে গেল সুরার পাত্র। সখী পঙ্কটিকা বললে: কী হল।

চিঞ্চা বললে: আমি আর সুরা পান করবো না।

সখী বললে: কেন।

চিঞ্চা বললেঃ আমি সন্তানবতী।

পরপর সাতটি মাস কেটে গেল। চিঞ্চা নবমমাসের গর্ভবতী। উদ্দালকের আসার সময় হল। নাগরিক এখনও তার অতিথিশালায় আছে। এমন সময় তীর্থিকেরা এসে বসল ঘরে। বাতায়নের ফাঁক দিয়ে একটি আলোর রেখা এসে পড়েছে।

তীর্থিকেরা বললেঃ এ কী শুনেছি?

চিঞ্চা বলল: কী শুনেছেন

তীর্থিকেরা বললেঃ তাম্রলিপ্ত থেকে এক বঙ্গীয় নাগরিক এসেছেন তোমার অতিথিশালায়?

চিঞ্চা বললেঃ আপনারা পরিশ্রান্ত হয়েছেন, সুমিষ্ট পানক পান করুন।

তীর্থিকেরা বললেঃ সে উদ্দালকের বন্ধু।

চিঞ্চা বললেঃ কয়েকটি অকালের আম সংগ্রহ করেছি—পানকের সঙ্গে তাও দি।

তীর্থিকেরা বললেঃ উপহাস নয়, সে নগরে রটনা করেছে তুমি উদ্দালক সন্তানজননী। বুদ্ধের সম্পর্কে যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল তা যে দূরীভূত হতে চলল। যদি তুমি উদ্দালকের সন্তানধারণ করো এই কথা সবাই জানে তাহলে বুদ্ধের নিকলঙ্ক চরিত্র যে প্রমাণিত হবে।

চিঞ্চা বললেঃ তাহলে কী করতে হবে।

সুপ্রবুদ্ধ নামে এক তীর্থিক বললেঃ হত্যা।

চিঞ্চা শিহরিত হল। সুপ্রবুদ্ধ তবু বললেঃ সন্তান হত্যা। তুমি বলবে যে, বুদ্ধদেব তোমাকে বাধ্য করিয়েছেন।

চিঞ্চা বললেঃ আমি তা পারব না। আমি সন্তানকে অবহেলায় অশুচি করতে পারব না। আজ যদি উদ্দালক ফিরে আসে তবে আমার সন্তানকে জানাতে পারব, সে একটি অখণ্ড সত্য—কালস্রোতের মত।

তীর্থিকেরা বললেঃ কিন্তু বুদ্ধকে পরাজিত করার সর্ত?

চিঞ্চা বললেঃ হ্যাঁ সর্ত ছিল। কিন্তু পারিনি। একদিন অন্ধকার প্রদীপহীন ঘরে বুদ্ধকে নগ্নদেহে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছি। পরিপূর্ণ নগ্নদেহে আলিঙ্গন করেছিলাম। মনে হল যেন আমি একা দাঁড়িয়ে আছি—কেউ কোথাও নেই। নিজের ঘর্মাক্ত সুন্দর দেহটাকে নিয়ে লজ্জা হল। দেখলাম তথাগত দাঁড়িয়ে আছেন।

তীর্থিকেরা বললেঃ হেঁয়ালি ছাড়ো। তোমাকে তাহলে আসল কথা বলি—উদ্দালক আসবে না—এটা বুদ্ধশিষ্যদের কারসাজী।

চিঞ্চা চমকিত হয়ে বলল: তার মানে।

তীর্থিকেরা বললো: উদ্দালক আজ থেকে তিন মাস আগে প্রাণত্যাগ করেছে—তুমি আহত হবে জেনে জানাইনি।

চিঞ্চা বললে, তার প্রমাণ?

সবচেয়ে বড় প্রমাণ আগামী শুক্লপক্ষের নিশান্তে সে আসবে না। ইতিমধ্যে শ্রাবস্তীতে তোমার কথা রটিত হয়ে প্রতিষ্ঠা পাবে। বুদ্ধ নিষ্কৃতি পাবে। তুমি ঐ ব্যর্থতার আবর্জনা বহন করবে। তাই বলছিলামঃ হত্যা।

মুখ লাল হয়ে উঠল চিঞ্চার। তারপর বলল: বেশ আমাকে সময় দিন শুক্লপক্ষ পর্যন্ত। যদি উদ্দালক না আসে তবে এই সন্তান হাতে নিয়ে আমি বুদ্ধের কাছে যাবো।

বেশ তাই হোক। তীর্থিকেরা উঠে গেল। পরিচারিকা জানালা বন্ধ করে দিল। যে এক ফালি আলো এসে পড়েছিল তা ফিরে গেল। একা বসে রইল চিঞ্চা।

শুক্লপক্ষ আরম্ভ হয়ে গেছে।

ছাদে দাঁড়িয়ে দেখে সে। দূরে বিশুষ্ক নদীর শুকনো বালুরেখা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে উদ্দালক আসবে না। মৃত। কিন্তু নাগরিক কালও বলেছে সব মিথ্যেকথা। চাঁদ ওপরে স্থির। হঠাৎ চিঞ্চার ভীষণ কষ্ট হয়। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল মনে নেই। স্বপ্নে সে কোন একটা রাজ্যে চলে গিয়েছে। সে একটা পথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে চলেছে। ছুটতে ছুটতে এলো একটা পদ্মদীঘির ধারে। সেখানে একটি সুন্দর ছেলে পদ্মফুল তুলছে। তার দিকে সে যতই ছুটে যায়—ততই ছেলেটি পুকুরে নেমে যায়। অবশেষে সে প্রায় যখন ধরে ফেললে তখনই দেখল পুকুরে কেউ নেই—একটি পদ্ম ফুটে আছে মাঝ পুকুরে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে রিক্তের মত চেঁচিয়ে উঠল। চেঁচিয়েই জ্ঞান ফিরে এল। দেখল, সখী পঙ্কঝটিকা পাশে ব্যজন করছে। চিঞ্চা বলল: বাতায়ন খুলে দাও। শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো পড়ল চিঞ্চার মুখে। তারপর হাত রাখল যেন কিসে। স্বপ্নে দেখা সেই পদ্মের মত।

চিঞ্চা ঘুরে তাকাল। চাঁদের আলোয় মুখ দেখল শিশুর। সে ঘুমুচ্ছে অন্তহীন কালের মত। নীল আকাশ। শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। কাল পঞ্চদশীর রাত্রি।

পঞ্চদশীর চাঁদ উঠল। রাত্রির প্রহর কাটল—এক দুই তিন। শুয়ে শুয়ে চিঞ্চা শুনলো বাইরে অশ্বারোহীদের আসাযাওয়ার শব্দ। মাতালের চিৎকার। কুকুরের ডাক।

জানলা দিয়ে আলো এসেছে। বাতাসে চাঁপার গন্ধ। শিশির ঝরছে—টুপ-টুপ। চারদিকে শুধু আলো। ম্লান শেজের আলো নিভিয়ে দিল পরিচারিকা। আরো একরাশ আলো ঢুকল। আলো-আলো-আলো। সমস্ত চৈতন্য মথিত করে চাঁদের জ্যোৎস্না তার ঘরে আসছে। ধীরে ধীরে নক্ষত্রগুলো নিভতে থাকে।

নক্ষত্রগুলো ঢলে পড়ে। প্রাচীর দিগন্তটি স্পষ্ট দেখা যায়। একটা ম্লান লাল—গাঢ় লাল—ঘন লাল—যুগান্তের সমস্ত রাজ্যের ছায়া পড়ে দিগন্তে। কালো চুল এলিয়ে দিয়ে উষা ছুটে পালায়—চিঞ্চা যেন স্পষ্ট দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে সখীকে ডাকল: যাও শিগ্গির ঐ নাগরিককে প্রশ্ন করো, উদ্দালক কেন আসেনি।

পঙ্কঝটিকা দাঁড়িয়ে রইল। চিঞ্চা বিরক্ত হয়ে বললেঃ যাও, যাও।

পঙ্কঝটিকা ভগ্নকণ্ঠে বললেঃ নাগরিক নেই।

আর্তস্বরে চিঞ্চা বললেঃ কেন, প্রহরী ত' ছিল।

পঙ্কঝটিকা বললেঃ রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর থেকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে শিশুপুত্রকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল চিঞ্চা। সঙ্গে দুটি পরিচারিকা ও চারজন বাহক। জেতবনে যখন চিঞ্চা পৌঁছল তখন শীতের হাওয়া লেগেছে ডালে। আমের ম্লান পাতা উড়ে যাচ্ছে। প্রথম রোদে তথাগত বসেছেন। পায়ের কাছে শ্রাবস্তীর বহু মানুষ।

চিঞ্চা গিয়ে বললেঃ তথাগত, এই আমার সন্তান। আপনি বলুন, কী এর সত্য পরিচয়।

বুদ্ধ বললেনঃ এর সত্য পরিচয় এ মানুষ। চিঞ্চা বললেঃ কী এর পিতৃ-পরিচয়।

বুদ্ধ বললেনঃ কল্যাণী, এর পিতৃ-পরিচয়? এ মানুষ, মানুষের পুত্র।

চিঞ্চা বললেঃ কী তার বংশপরিচয়?

বুদ্ধ বললেনঃ এ মানুষ, মানুষের বংশে তার জন্ম?

চিঞ্চা বললেঃ কিন্তু তথাগত, যে বিশেষ মানুষ এর পিতা আমি তাকে চাই।

তথাগত বললেনঃ যে মানুষ এর জন্য প্রতীক্ষা করেছে, পেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছে, সে-ই এর পিতা। নীরব জনমণ্ডল। তথাগত আবার বললেনঃ তেমনই করে এর পিতাকে ঘোষণা করতে দাও যে সে এর পিতা। পিতৃত্ব চাপিয়ে দিয়ো না। পিতৃত্ব ঘোষণা করতে দাও। বুদ্ধ বললেনঃ এ মানুষের পুত্র। মানুষ এর পিতা। সেই প্রচ্ছন্ন মানুষ আজ আবির্ভূত হও। যে পুত্রের পিতা ব'লে গর্বিত হবে।

জনমণ্ডল ঠেলে উঠল দুই তরুণ। একজনকে চিনল চিঞ্চা। সে নাগরিক। অন্যজন এগিয়ে এল—গৈরিকবেশে মুণ্ডিত কেশে সে দাঁড়ালো। চিঞ্চা আশ্চর্য হয়ে তাকালোঃ উদ্দালক।

উদ্দালক বললেঃ আমিই এই মানুষের পিতা, প্রভু।

চিঞ্চা প্রণত হল।

বুদ্ধ বললেনঃ জননী চিরজীবন লাভ করুন।

শীতের বাতাসে তথাগতের পায়ের কাছে দুটি শুকনো আম্রপল্লব উড়ে এল॥

সংশিলষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন—খাদ্যসমস্যার একমাত্র সমাধান হইল খাদ্য উৎপাদন। —"তাই বলুন; আমরা তো ক'দিন আগেকার ঘোষণা যৌগিক ব্যায়াম করতে গিয়ে বুকে-পিঠে ব্যথা করে ফেলেছি"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

এই প্রসঙ্গেই আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"সমস্যার সমাধান হবে কী করে মশাই। অনবরত খাদ্য নেই, খাদ্য নেই বললে লক্ষ্মী চঞ্চলা হয়ে ওঠেন। বলতে হয়ত "বাড়ন্ত"। বললেই দেখুন সমাধান আপনা থেকে হয়ে যাবে।"

* * *

কলিকাতার হাসপাতালে রোগীদের প্রতি হৃদয়হীন আচরণ"—একটি সংবাদ-শিরোনামা। —"অর্থাৎ হাসপাতালের হার্ট পরীক্ষার জন্য অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। বিলম্বে থ্রম্বসিস অনিবার্য"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

কলিকাতায় লাউডস্পীকার নিয়ন্ত্রণ আইনের আলোচনা প্রসঙ্গে শুনিলাম, বিধানসভার বিরোধীদল নাকি প্রস্তাবিত বিলটির সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা
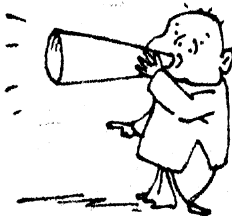
করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কেন করেছেন বুঝলাম না। "মানতে হবে", "চলবে না, চলবে না" ব্যাপারে মাইকাভাবাৎ চোঙাং-এর বিকল্প ব্যবস্থা তো আছেই। তাছাড়াও রয়েছে বলং বলং কণ্ঠ বলম্"!!

* * *

শ্রীযুক্ত নেহেরু সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত কানপুরের বণিকদের এক সভায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনিও একজন ব্যবসায়ী,—মৈত্রী শুভেচ্ছা ও শান্তিই হইল তাঁর সওদাগরীর পণ্য। —"বণিকরা নিশ্চয়ই মনে মনে ভেবেছেন,—এই ব্যবসাতে ঝঞ্ঝাট কিছু নেই, আয়কর ফাঁকির চেষ্টায় মাথায় ঘায়ে কুকুর পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় না।"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

কলিকাতার উগ্রকণ্ঠের এক সংবাদে শুনিলাম, বিবাহের দিনে লাঞ্ছিত বরযাত্রীরা নাকি কন্যাপক্ষের দেওয়া বৌভাতের মিষ্টি কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এই জন্যেই বুঝি বলে—মিষ্টান্নম্ "ইতরে" জনাঃ"।

* * *

ইতালির কোন এক শহরে নাকি "লাইকার" একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। আমাদের এ

সহযাত্রা একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"স্তম্ভটির গায়ে লেখা থাকবে......শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো"!

* * *

কলিকাতা কর্পোরেশন গরু ধরিবার অভিযানে বাহির হইয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"নেহাৎ গরু-ই ধরা পড়ে। ধরুন দেখি দুই একটি বাস্তুঘুঘু, তবে না বুঝব কেরামতি"!!

* * *

শিলচরের জনৈক ভদ্রলোক একটি অভিনব কৌটা আবিষ্কার করিয়াছেন। কৌটাটির সামনে গিয়া কোন হুকুম করিলে কৌটা নাকি নিজে হইতেই তা তামিল করে। কৌটার নাম দেওয়া হইয়াছে "কিঙ্কর কৌটা"। আমরা নামকরণে আপত্তি করব। কেননা, বর্তমান পরিবেশে কিঙ্কর বা কিঙ্করী একেবারেই অচল। যদিও প্রায় ঘরে ঘরেই এ প্রথা সচল আছে কিন্তু সেটা হয় নেহাত পর্দার আড়ালে!

* * *

ফ্রান্স নাকি আণবিক বোমা তৈয়ার করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"মারণাস্ত্র তৈরি না করে অঙ্গুররসের "সঞ্জীবনী" তৈরির কাজে লেগে থাকলেই তো ভালো হতো।"।

* * *

মার্কিনের একটি উপগ্রহকে শূন্যে প্রেরণ করিবার কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল। সর্বশেষ সংবাদে শুনিলাম, উপগ্রহটি নাকি যাত্রাস্থলেই বিদীর্ণ হইয়া
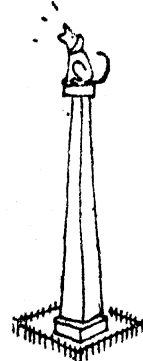
র। বিশুখুড়ো বলিলেন,—"ঠিক সেই দিনে এবং ঠিক সেই সময়েই নাকি রাশ্যাতে খ্রুশ্চেভ ভায়ের পেটটি বিদীর্ণ হয়ে যায়। অনুসন্ধানে জানা গেল, পেট ফেটেছে হাসির চোটে। সুতরাং দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই""
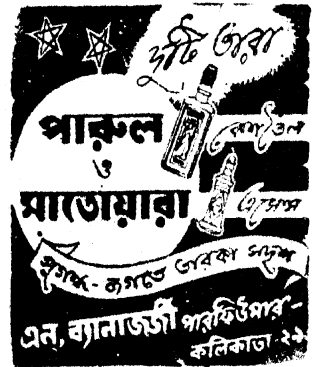
শঙ্খন

*

এবছর কলকাতার শীতের লিখা বড়োই নিরাশাজনক। ডিসেম্বর অর্ধমৃত, ১৯৫৭ সালের আয়ু তো মাত্র আর সাতের দিন। অথচ দিনের বেলায় এখনো মাথার উপর পাখা চাই! রাতে লেপ চাইনে। গরম জামা কিছু একটা পরতে হয়, কিছুটা রেওয়াজের খাতিরে, বাকিটা হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবার আশঙ্কায়। সন্ধ্যার কুয়াশায় আরোহণাক্ষম ধোঁয়ার পরিমাণই বেশি। প্রভাতে সূর্যোদয় অপরিচ্ছন্ন বিলম্বিত অফিসে আসতে একটু বেশি তাড়া। শীতের আর কী লক্ষণ আছে এখন কলকাতায়? বাজারে সবজীর আবির্ভাব হয়ে থাকবে, দোকানে বড়দিনের নৌকোর এখানে ওখানে কোথাও দেখা যাচ্ছে। তার? প্রকৃতির একটি ঋতুর আগমনের এই ঘোষণাকারী প্রমাণই কি যথেষ্ট? এ কেমন ঋতু-পরিবর্তন যার সংবাদ দেহের শিরায় শিরায় সহজেই পৌঁছে দিতে হয় না?

অবশ্য আমি কলকাতার যে অঞ্চলে থাকি সেখানে শীত না এলেও বড়দিন আসে। এই সেদিন গভীর রাতে শুনেছি খ্রিসমাস ক্যারল। পাশের কোনো ফ্ল্যাটে এই সেদিন শোনা গেছে সকাল খ্রিসমাস কোয়ারের অতি অপটু মহড়া। পাড়ার পশ্চিমে থাকে কয়েকজন ফিরিঙ্গী বা অর্ধ-শিখ, বছরের এই সময় ওরা অন্য পোশাক পরে আর ব্যাগপাইপ কাঁধে করে গান বাজিয়ে কখনো এমন সুর বাজায় যা হয়তো আধুনিক স্কটল্যান্ডবাসীরাও জানে না আর তার পরই এমন সুর যা শুধু আধুনিক বাঙালী ছেলেরাই জানে। সংস্কৃতির সংকরের এই হাস্যকর রূপ দুই পক্ষের কাছেই কিম্ভূতকিমাকার বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বড়দিনের স্মারক হিসাবে এই বাদ্যকরদের আবির্ভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আমার বাধে।

*

আমার প্রার্থনার প্রতি শীতের উত্তরের এই অকিঞ্চিৎকরত্ব যদি শুধুই বড়দিন বা নিজেদের ব্যাপার হোতো তাহলে তা নিয়ে বাদানুবাদের অবকাশের হোতো। আমি যেমন গ্রীষ্মে কাতর হই, তেমনি বাঙলা দেশে অনেকে আছেন শীতকাতুরে। কে বলবে, কার কাতরতা বেশি? কিন্তু একটা কথা, বাঙলা দেশের ভেজা গরমে কাউকে বলতে শুনিনি —আঃ, এমন আরাম আর নেই! যদিও সব বাঙালীর অতি মৃদু শীতেও সুখী না হতে পারেন। একথা বলা তাই অন্যায় না হতে পারে যে, প্রায় প্রতিজনের কাছেই কলকাতার শীত সর্বাপেক্ষা সুসহ ঋতু। অন্তত এইজন্য যে শাকসব্জীর বাজার এখন কম গরম।
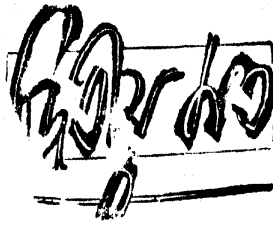
আরও পুরস্কার আছে। বছরের এই সময়টাতেই কলকাতাবাসীদের সুযোগ মেলে কিছু ছবি দেখবার কিছু গান শোনবার। চিত্র প্রদর্শনী এখন নানা জায়গায়, গানের আসর অসংখ্য। ক্রমে একদিন শীত ফুরোবে, অতিথিরা বিদায় নিয়ে জায়গা ছেড়ে দেবে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের জন্য, আর তখনকার সংগীত হবে শুধু বজ্রের, ছবি হবে শুধু কালোমেঘভরা আকাশের। অত্যন্ত উপভোগ্য, রুচি অনুযায়ী, কিন্তু ওরা তো মানুষের সৃষ্টি নয়।

*

মানবচরিত্রের ভৌগোলিক বৈভিন্ন অবিজ্ঞানীদের দ্বারাও নিত্যব্যবহৃত। পশ্চিমবঙ্গে এমন ব্যক্তির অভাব নেই যার কাছে কারো সম্বন্ধে "পূর্ববঙ্গীয়" কথাটির প্রয়োগই যথেষ্ট—সে যে মানবেতর। সন্দেহ করবার কারণ নেই, বহু পদ্মানদীর মাঝির কাছে গঙ্গাপারের লোকেদের পরিচয়ও অনুরূপ অজ্ঞতার ভিত্তির উপর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত। তবু, নানা ব্যতিক্রম সত্ত্বেও, একথা সত্য হতে পারে যে প্রতি দেশেরই উত্তরাপথের অধিবাসীদের মধ্যে অনেকগুলি চরিত্রগত সাদৃশ্য লক্ষণীয় এবং দক্ষিণাপথেও এ সাদৃশ্য অজ্ঞাত নয়। কোনো এক সমাজতাত্ত্বিক বহু গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, উত্তরের লোকেরা সাধারণত অনেক বেশি কর্মঠ, নিয়মানুবর্তী, উচ্চাভিলাষী, সাহসী এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দৃপ্তপদী আর দাক্ষিণাত্যের লোকেরা অপেক্ষাকৃত অলস, সংরক্ষণশীল, রোমান্টিক, নমনীয় ও পরিবর্তনপ্রীতিবিধায় অনির্ভরযোগ্য। সম্প্রতি এক দাক্ষিণী পণ্ডিতই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, অন্তত ভারতীয় সংগীতের বেলায় ধ্রুপদের আদর আর্যাবর্তের চেয়ে দাক্ষিণাত্যে বেশি এবং একমাত্র সেখানেই "সত্যকার ভারতীয় সংগীত" তার ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছে, কিন্তু এ ব্যতিক্রম সমাজতাত্ত্বিকের সকল বক্তব্য বাতিল করে দিয়েছে বলে মনে করবার কারণ নেই। প্রতি দেশেরই উত্তরাঞ্চলগুলির মধ্যে কতগুলি সাদৃশ্য লক্ষ্য না করে উপায় নেই এবং দক্ষিণেরও অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য বহুদেশে বর্তমান।

এবার সরাসরি বলি, শীতপ্রধান দেশগুলির সঙ্গে গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলির ব্যবধান শুধু থার্মোমিটারগত নয়। থার্মোমিটারে তফাত শুরু, কিন্তু তার ফলাফল বহুধা বিস্তৃত। কিপলিং থেকে কদর্থ্যতির সমর্থন এ উক্তির উদ্দেশ্য নয়—বিশেষ করে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের নানা কৌশল যখন আজ মানুষের করায়ত্ত। অপরিবর্তিত আবহে কিন্তু পৃথিবীর দুই ভাগের মানুষের আচরণে বিপুল প্রভেদ প্রায় অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করি।

প্রায় কোনো কিছুই না ভেবে রবীন্দ্রনাথের "গীতবিতান" খুলে দেখছি—দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রীষ্মের গান ষোলোটি, বর্ষার একশ' পনেরটি, শরতের ত্রিশটি, বসন্তের ছিয়ানব্বইটি, আর শীতের ঠিক বারোটি। এই সংখ্যাগুলি হয়তো নির্ণীত হয়েছে ঋতুগুলির আয়ুর আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যের দ্বারা, কিন্তু বাঙালী জীবনের আর সব কিছু অপ্রভাবিত থেকে গেছে এমন অনুমান অগ্রহণীয়। অন্তত বাঙালী চরিত্র যে বহুলাংশে তার ভৌগোলিক পরিবেশের সন্তান, এমন সন্দেহ বিপুল-পরিমাণ বিপরীত প্রমাণ না পেলে প্রত্যাখ্যান করব না।

*

একথা নিশ্চয়ই বহুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত যে শীতের সময় কর্মক্ষেত্রে ক্লান্তি সাধারণত বিলম্বিত। দৈনন্দিন স্নানকে আমাদের কেউ কেউ আজো হয়তো সমান স্নান করি, কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকার বাইরে যে যে দেশগুলি এ বিষয়ে অংশত সমকক্ষ হতে পেরেছে তাদের যেমন জাপানের—আবহাওয়া মোটামুটি শীত-প্রধান। ভারত সম্বন্ধেও সে কথা সত্য; উত্তরের ও পশ্চিমের তুলনায় দক্ষিণের কারখানার সংখ্যা নগণ্য। ইটালির অবস্থাও অনুরূপ। আরো দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই আছে।

অতএব?

আমার প্রার্থনা শীতের। একবার শীতের হাওয়ার লাগলো নাচন তা শুধু আমলকির ওই ডালে ডালে নিবদ্ধ থাকবে না, ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র বাঙালী জীবনে। বাঙালী আলস্য ত্যাগ করবে, কাজ বাড়াবে, কথা কমাবে।

রাত এখন এগারোটা। আমার জানলার ঠিক নীচে দুটি ছোট ফিরিঙ্গী ছেলে তারস্বরে কী যেন গান গাইছে। রাস্তার ওদিক থেকে পূর্বকথিত ব্যাগপাইপের আওয়াজ ভেসে আসছে; কোনো স্কচ নাচের সুর—প্রধানত লাফালাফি। ওদিকে পার্ক স্ট্রীটে কোনো অপ্রকৃতিস্থ নাবিক গাইছে বাহুলগ্না সামান্যা বান্ধবীর সঙ্গে লঘু সংগীত আর পাশের ফ্ল্যাটের রেডিওগ্রামে বাজছে জলদমন্দ্র কণ্ঠে একের পর এক নিগ্রো স্পিরিচুয়াল।

সব মিলিয়ে শীতই আমার থ্রাইস্ট।

শাংর্গদেব

কাব্যসংগীত ও রাগসংগীত

কাব্যসংগীত এবং রাগসংগীত—এই দুটিই আজকালকার আলোচনার প্রধান বস্তু। সরকারীভাবে রাগসংগীতের ওপর যতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, কাব্যসংগীতের ওপর ততটা নয় এবং কাব্যসংগীত সম্বন্ধে একটা হীনমন্যতার ভাবও এসেছে। কাব্যসংগীত সম্বন্ধে অনেকের ধারণা, এ একটা চলতি ব্যাপার—এর কোন স্থায়ী প্রভাব নেই—সুতরাং এ সম্বন্ধে কেউ বিশেষ চিন্তাও করেন না। অবশ্য আজকাল যেভাবে গান লেখা হচ্ছে বা গাওয়া হচ্ছে তাতে ব্যাপারটা এরকমই দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু কাব্যসংগীত যে এতটা লঘু নয় এবং এর মূল্য যে একদিক দিয়ে রাগসংগীতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ সেটা বোঝবার সময় এসেছে।

আসলে রাগসংগীত বস্তুটি কি সেটি ভাল করে বোঝা দরকার। ওস্তাদের ছেলে গোড়া থেকেই সা-রে-গা-মা শিখছে, তার পরেই সে শিখল কোন্ রাগে কি কি পর্দা লাগছে—কিভাবে তাকে গাওয়া হচ্ছে—এইসব। অতঃপর তার গানের সংগে পরিচয় হল। কিন্তু গানের ভাষা বা কাব্য এসবের সংগে তার পরিচয় হল না; সে শুধু এইটুকু বুঝল যে, কতকগুলি কথা আমার দরকার যার ওপর রাগের বিস্তৃতি চলে। অবশ্য বয়সের সংগে সংগে কিছুটা বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হওয়ায় গানের মানেটা সে কিছু কিছু বুঝল কিন্তু তার বেশি বোঝবার প্রয়োজনীয়তা সে দেখে না। তাহলে রাগটা তার কাছে এমন একটা বস্তু হয়ে দাঁড়ালো যার স্পষ্ট অর্থ সে নিজেই বোঝে না;—গাইতে ভাল লাগে, একটা আনন্দময় অনুভূতি হয় বা একটা সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় বলেই সে গেয়ে চলে। রাগ বলতে কি আমরা এই বুঝি? "রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ"—শাস্ত্র এই কথা বলে। অর্থাৎ, রঞ্জন করে বলেই তার নাম রাগ। অমনি প্রশ্ন জাগে—"কিভাবে রঞ্জন করে এবং কার ওপরেই বা এই রঞ্জকত্বের প্রয়োগ হচ্ছে?" এর একমাত্র স্পষ্ট উত্তর হচ্ছে, রাগ তার রঞ্জকত্ব গুণ দিয়ে কাব্যকে কাব্যলোক থেকে সংগীতলোকে উত্তীর্ণ করছে। এই রসোত্তরণই রাগের রঞ্জনধর্ম।
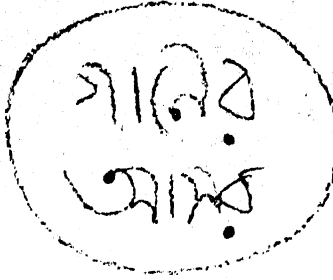
আমাদের সাংগীতিক ইতিহাসের শুরু হচ্ছে গীত থেকে। সুপ্রাচীন মগধের সভ্যতার সংগে সংগে যে গানের বিস্তৃতি হ'ল তার আখ্যা মাগধী গীতি। এই মাগধী থেকে ক্রমে অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা, পৃথুলা এইসব বিভিন্ন প্রকারের গীত সৃষ্ট হ'ল। এইসব গীতকে সুরে রূপ দেবার জন্য যে আর্টের প্রয়োগ হ'ত তার নাম ছিল জাতি। বর্তমানে একটি রাগ যেমন একটি গানকে সুরে রূপায়িত করে তেমনি পূর্বে একটি মাগধী গান একটি জাতি দ্বারা সুরে রূপায়িত হ'ত। পরবর্তীকালে যখন রাগের প্রচলন হ'ল তখনও আমরা দেখছি এই রাগসংগীত যেসব গানের ওপর প্রযুক্ত হ'ত তাদের নাম—শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, গৌড়ী, সাধারণী—এইসব। রাগসংগীতের এই যুগে রাগের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য অনুভব করেছেন শিল্পীরা। তাঁরা দেখলেন, ভাষা ছাড়াও কেবল স্বরলহরীতে একটি সৌন্দর্য বিকশিত হয়, তারও একটা রূপ আছে যেটি কাব্যের অপেক্ষা রাখে না। তাঁরা এই রূপটির নাম দিলেন আলাপ। আলাপে সুরের বিকাশ ঘটল, সৌন্দর্য সৃষ্ট হ'ল কিন্তু তাতেও মন ভরল না—গান চাই, ভাষা চাই, কাব্য চাই নইলে মন ভরে না, সংগীত সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয় না। অতএব আলাপের পরে সম্পূর্ণ একটি গানকে সংযোজিত করে সংগীতকে সম্পূর্ণতা প্রদান করা হ'ল।

রাগসংগীতের প্রথম যুগে শিল্পীরা সাতটি সুরের বিভিন্ন প্রয়োগে বহু নূতন রূপ পেলেন, তাঁদের বিভিন্ন নাম দিলেন। যুগের পর যুগ ধরে শত শত বৎসরব্যাপী এই রাগসংগীতের বিকাশ ঘটল। মগধের
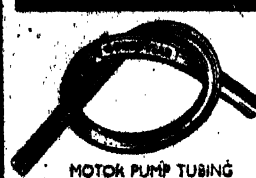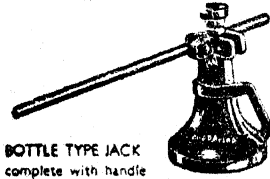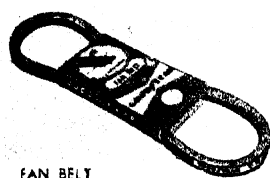
রাগ গেল মালবে, সেখান থেকে সে পে'ছিলো সৌরাষ্ট্রে—এদিকে পূর্বে তার বিস্তৃতি হ'ল গৌড়ে—এমনি করে রাগসংগীত ছড়িয়ে পড়ল সারা উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে। সংগে সংগে নানা পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সাধিত হ'ল। এই সমস্ত পরিবর্তনটা স্পষ্টরূপে বোঝা যায় ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা, রাগাংগ, ক্রিয়াংগ, উপাংগ প্রভৃতি রাগসংগীতের বিভিন্ন পরিচয়ে।

তারপরে একদিন রাগসংগীতের বিস্তৃতির আর অবকাশ রইল না। আর কত বাড়বে সে? সারা ভারতের নানাদিকে তার বিস্তৃতি ঘটেছে এবং পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সে সব চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে।

আমাদের সংগীত যখন এই পর্যায়ে এসে পে'ছেছে তখন দেশী সংগীত অর্থাৎ কাব্য-সংগীতের বিকাশ ঘটতে আরম্ভ করল। প্রকৃতির যে প্রভাব, তার যে বৈচিত্র্য সে অনন্ত। এই বিশাল প্রকৃতির প্রভাবে এবং স্বকীয় মননশক্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিরা গান রচনা করলেন, সুরকারেরা তাতে রূপ দিতে লাগলেন। তাঁরা রাগসংগীতের সহায়তা গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু কাব্য-সত্তাকে ক্ষুণ্ণ করলেন না। রাগ এবং কাব্যের যুগল মিলনে সৃষ্ট হ'ল কাব্যসংগীত। দেশের সভ্যতার যত উন্নতি ঘটেছে ততই তার সাহিত্য-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, আর ততই কাব্যসংগীত শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেছে। তার নূতনত্ব কোনদিন ম্লান হবার নয়, কেননা কাব্যকলা নিত্য নূতন হয়ে ফুটে উঠছে।

আজকে আমরা যে রাগসংগীত গাইছি বহু পূর্বেও সেই একই সুর গাইতেম। এর যে মাধুর্য আমাদের আকৃষ্ট করছে তাতে নূতনত্ব নেই, তার যে একটা চিরন্তন সৌন্দর্য আছে যেটি কয়েকটি স্বরের বিশেষ সংযোগে রূপায়িত হয়, সেইটিই আমাদের অনুভূতিকে দোলা দিচ্ছে। কিন্তু কাব্যসংগীত যে আমাদের আনন্দ প্রদান করছে সেটার মধ্যে প্রতিবারই নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আমি যা ভাবি অপরে তা ভাবে না। আমার ভাবনার রূপ, সে আমার নতুন অভিজ্ঞতালব্ধ সৃষ্টি। অতএব তার এই রূপটি পুনরুক্তি নয়। এই যে কাব্যসংগীত, এ-তো শুধু রাগসংগীতকে অপেক্ষা করেই নেই, নানাভাবেই তার অলংকরণ ঘটেছে। ওস্তাদের ভ্রূকুঞ্চনকে অগ্রাহ্য করেও নানা মিশ্রণ, নানা অঘটনই সেখানে ঘটছে।

*এই যে বৈচিত্র্যের বিকাশ এটিই বা কেন ঘটল? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, কাব্য-*সংগীত হচ্ছে জীবন সংগীত। কোটি কোটি জীবনের অসংখ্য অনুভূতি—সুতরাং সেখানে বৈচিত্র্য ঘটবে না তো, ঘটবে কোথায়? এই যে বিশাল জীবনসমুদ্র থেকে মথিত হয়ে কাব্যসংগীতের উদ্ভব হচ্ছে এর মূল্য অপরিসীম অথচ কতটুকু মর্যাদাই বা তার আমরা দিচ্ছি।

রাগসংগীত আজ স্থায়ীত্বে এসে পেঁছেছে তার আর বিকাশের পথ নেই, কিন্তু কাব্যসংগীত, যা আমাদের চলমান জীবনধারাকে অভিব্যক্ত করছে তার অগ্রগতিকে আমাদের সম্বর্ধিত করা উচিত। প্রাচীনপন্থী ভাবধারা যা কেবলমাত্র অতীতাশ্রয়ী, তার পরিবর্তন হওয়া দরকার।

আজকের যুগে আমরা আমাদের চলমান জীবনধারাকে সুন্দর এবং সার্থক করে তোলবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি না। মানব-সমাজে এইটিই আজ সবচেয়ে মহৎ চিন্তা। তাই যদি হয়, তবে যে সংগীতে এই জীবনের রূপটি প্রতিফলিত হচ্ছে তাকে উপেক্ষা করলে অদূরদর্শিতারই সামিল। যিনি জীবনকে সব সুন্দররূপে দেখেছেন তিনিই তো শ্রেষ্ঠ কাব্যসংগীতশিল্পী। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। এইভাবে আজও যাঁরা জীবনের জীবনশিল্পী তাঁরাও নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী। *সংগীতে যদি সার্থকতা না ঘটে থাকে তবে বুঝতে হবে আমাদের জীবনও সার্থক হয়ে ওঠেনি।* আমাদের জীবন যত সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে আমাদের কাব্যসংগীতও ততই সমৃদ্ধ হবে—সাহিত্য, শিল্প এবং সংগীত গৌরবান্বিত হতে থাকবে।

আজকের দিনে যাঁরা আমাদের কালচারের কর্ণধার, যাঁরা সেক্রেটারিয়েটে বসে কালচার সম্বন্ধে "ডাইরেকটিভ" দেন, তাঁরা জীবনের এই জয়যাত্রার পথে কোনদিন পা বাড়িয়েছেন কি? তাঁরা যদি আর্টের এই দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক দিকটা ভেবে দেখতেন তবে কেবল প্রাচীনকে নিয়ে মেতে থাকবার উপদেশ না দিয়ে, অথবা কাব্যসংগীতকে "লঘুসংগীত" প্রভৃতি সুযোগ্য আখ্যায় ভূষিত না করে, জীবনসংগীতের অনেক উচ্চতর মূল্য নির্ধারণ করতেন।

তাঁরা না করেন না করুন, আমি আবেদন করছি স্রষ্টা শিল্পীদের প্রতি। তাঁরা যখন কাব্যসংগীত রচনা করেন তখন যেন, রেডিও, গ্রামোফোন, সিনেমা, থিয়েটার তাঁদের সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে—তাঁরা যেন তাঁদের অনুভূতির বৈচিত্র্যকেই রূপায়িত করেন, তাঁরা যেন সব সময় এই কথা মনে রাখেন যে, আমরা এগিয়ে চলেছি জীবনের প্রসাদ লাভ করে। যে প্রকৃতির তাগিদে আমাদের জীবন চলেছে সেই প্রকৃতিরই প্রেরণায় মহান সংগীত রচিত হয়ে চলেছে, আর তারই আখ্যা কাব্যসংগীত। জীবন যত সার্থক হবে কাব্যসংগীতও ততই সার্থক শিল্পরূপে পরিগণিত হবে।
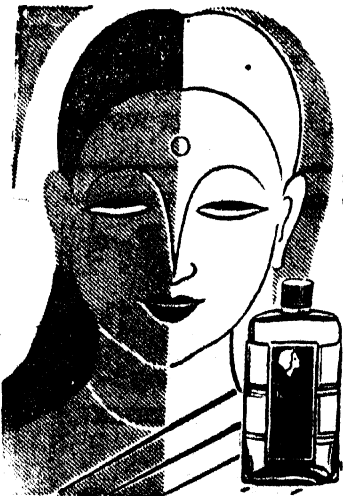
কর্তব্যপরায়ণ জন

বাণগ্রস্তা মৃগীর মতো ছুটে চ'লে এলো রেশমী, পথে লোকজন ছিল না, সে-অবস্থায় তাকে দেখলে অবাক হ'য়ে যেতো—একটা আস্ত মেয়ে এমনভাবে ছুটছে কেন। বাগানের খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়িতে, একেবারে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল, সে রাতে আহার করবার জন্যেও উঠল না।

সমস্ত অবস্থা ধীরভাবে বিবেচনা ক'রে দেখবার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না; যখন যে-ভাবটা প্রবল হ'য়ে উঠছিল সেটাকেই নিচ্ছিল চরম ব'লে; ফলে, পলে পলে, পলকে পলকে মনের মধ্যে তার ভাবান্তরের বন্যা প্রবল হয়ে উঠছিল। প্রথমে অপ্রতিরোধ্য দুর্জয় একটা রাগ হ'ল জনের উপরে, মনে হ'ল অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ঘোরতর অপমান করেছে সে রেশমীকে। কিন্তু একবারও তার মনে হ'ল না যে, অসহায় অবস্থা কেবল রেশমীর ঘটেনি, হাতে পেলে জনকে ছেড়ে কথা কইতো না বাঘটা। তারপরে জনকে কাপুরুষ ব'লে মনে হ'ল, নইলে একলা পেয়ে মেয়েদের সঙ্গে এমন ব্যবহার কোন পুরুষে করে না। কিন্তু তখনো ভেবে দেখল না যে, মনে মনে সে-ও আকৃষ্ট হয়েছিল জনের প্রতি। খুঁটিয়ে দেখলে তাকে স্বীকার করতেই হ'তো যে, তার মনটাও বেশ নুয়ে পড়েছিল জনের দিকে। দুইখানি মনের মেঘ যখন বেশ জলভারাবনত হ'য়ে কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন বাঘটা হঠাৎ এসে প'ড়ে তাদের মধ্যে বিদ্যুতের রাখী বেঁধে দিল! এতদিনের ধীর মন্থর মন্দাক্রান্তা এক মুহূর্তে শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে পরিভ্রমে গিয়ে পৌঁছল।

এই হ'ল গিয়ে তার মনের সাক্ষ্য। কিন্তু দেহ সাক্ষ্য দেয় ঠিক উল্টো। দেহ থেকে থেকে জনের স্পর্শপুলক স্মরণ ক'রে উল্লাসে কেঁপে কেঁপে ওঠে। সেই চুম্বিত মুহূর্তটাকে স্মৃতির উপরিতলে টেনে আনবার জন্যে চেষ্টার তার অবধি নেই, কিন্তু ঠিক মতো পেরে ওঠে না। স্বচ্ছ জলের নীচে দেখা যায় সেই স্খলিত চুনিটা, হাত বাড়িয়ে দেয়, আর একটু নীচে, আর একটু, তবু রয়ে যায় অপ্রাপ্য; চোখে মনে হয় এত কাছে তবু হাতটা পৌঁছয় না কেন, বুঝতে পারে না বিমূঢ় দেহ। একি রহস্য! একি রহস্যময় যন্ত্রণা। ইন্দ্রধনুর মধ্যে দুটি একটি রঙ আছে, মন বলে আছে বই কি, চোখ তবু ধরতে পারে না, মন যত নিবিষ্ট হয়, চোখ হয় তত উদভ্রান্ত, চোখে আর মনে কিছুতেই সাক্ষ্য মেলাতে পারে না। রেশমীর মন যতই বলছে জন কাপুরুষ, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, দেহ ততই আগ্রহে সেই চুম্বনে উজ্জ্বল মুহূর্তটিকে যথাযথ আকারে উদ্ধার করতে চায়। মন ও দেহের দ্বৈরথ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে রেশমী ভাবে একি আপদ! এমন সময়ে তার চোখে পড়ে জনের ছবিখানা। এখানা আবার কে আনলো ব'লে উত্তেজিত হয়ে ওঠে সে। এনেছিল সে নিজে। রোজ এলমারের মৃত্যুর পরে তার ঘর থেকে ছবিখানা সরিয়ে নিয়ে এসেছিল সে নিজের ঘরে। সরিয়ে ফেলবার উদ্দেশ্যে ছবিখানা হাতে নিয়ে হঠাৎ চমকে ওঠে, জনের মুখে এক সঙ্গে দেহ ও মনের বিপরীত সাক্ষ্যের চিহ্ন পড়ে তার চোখে। চোখ দুটো দেখে মন ব'লে ওঠে, এতো নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ; অধরোষ্ঠের গুণ-পরানো ছোট্ট ধনুকটার বিলাস বঙ্কিমা দেখে দেহ সর্বাঙ্গে কণ্টকিত হয়ে ওঠে, চুম্বনঘন সেই মুহূর্তটি অমৃতসিক্ত ক্ষুদ্র একটি শরের মতো নিক্ষিপ্ত হয় তার বুকে। কি করছে ভালো ক'রে বুঝবার আগেই দেহ সেখানে মুদ্রিত ক'রে দেয় একটি চুম্বন; পরমুহূর্তে মন ক'রে ওঠে প্রতিবাদ—ছবিখানা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। এইভাবে কতক্ষণ চলতো বলা যায় না, কিন্তু এক সময়ে এই অসম দ্বন্দ্বে ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ল কখন, কাপড় বদলাতেও গেল ভুলে।

ওদিকে জনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। পরদিন যথাসময়ে গেল সে রোজ এলমারের সমাধিতে, বসে রইলো সন্ধ্যা যতক্ষণ না গড়িয়ে যায় ঘনান্ধকার রাতে, এলো না কেউ। একবারও তার মনে পড়ল না যে, কাল এখানে বাঘ বেরিয়েছিল, আজও বের হ'তে পারে। মনের বাঘের মুখে যে ধরা পড়েছে বনের বাঘে তার কি করতে পারে, অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরে এলো। এমনি প্রতিদিন যায়, প্রতিদিন হতাশ হ'য়ে ফিরে আসে। লিজা তার বিষণ্ন উদভ্রান্ত ভাব দেখে ভাবে, আহা বেচারা জন, কত কষ্টই না পাচ্ছে। লিজা ভাবে, এত অল্প বয়সে এত বেশি দুঃখ পেলো জন। কেটির শোক ভুলতে না ভুলতে রোজির শোক। এক একবার ভাবে, জনকে সান্ত্বনা দেবে, কিন্তু ভাষা পায় না খুঁজে, ভাইয়ের

মনের মধ্যে গোপনে লালন ক'রে চুপ ক'রে থাকে, ভাবে বেচারা জন।

রেশমী মিস এলমারের সমাধিতে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছিল, জানতো যে, সেখানে গেলে জনের সংগে দেখা হওয়া অনিবার্য। সে মনে মনে ভাবল, থাক ওখানে আহাম্মুখটা ব'সে। বিকাল হ'লেই বুঝতে পারত, জন ওখানে ব'সে আছে। নির্বোধের নিরর্থক প্রতীক্ষা স্মরণ ক'রে মাঝে মাঝে সে কৌতুক অনুভব করত, আবার রাগও হ'ত, পড়ুক একদিন বাঘের মুখে, হোক উচিত শিক্ষা। লোকে বলে প্রেম অন্ধ। ওটা বাড়াবাড়ি। আসলে প্রেম কানা, নিজের দিকের চোখে মাত্র দেখতে পায়।

ক্রমে জনের মনেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সে ভাবল, সে কি অকৃতজ্ঞ, ঐ একটা নেটিভ মেয়ের জন্যে সে কিনা স্বর্গের দূতী রোজিকে অবহেলা করেছে! ছিঃ ছিঃ, এ কি কাপুরুষতা, ভাবল, এ দুঃখ তার ন্যায্য প্রাপ্য, এ তার শিক্ষা! তখনি সে মনঃস্থির ক'রে ফেলল, রোজি ছাড়া আর কোন মেয়ের কথা স্বপ্নেও চিন্তা করবে না সে! টেবিলের উপরে তাকিয়ে দেখল, এতদিনকার অযত্নে মিস্ এলমারের ছবিতে ধুলো জমেছে, অনেকদিনের ফুলগুলো শুকিয়ে মলিন অবস্থায় পড়ে আছে। তখনি সে তুলে আনল তাজা ফুল, শাদা গোলাপ, ধুলো ঝেড়ে ছবিখানাকে সাজাল আর অনেকদিন পরে তন্ময় হয়ে তাকাল রোজির মুখে। কি সুন্দর! চোখ দুটি আনন্দে কৌতুকে সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। আর সেই সংগে যে একটুখানি অবিশ্বাসের ভাব ছিল চোখদুটিতে—সেটুকু পড়ল না অবশ্য জনের চোখে।

জনের মনে পড়ল একদিনের বিশ্রম্ভালাপ। জন বলেছিল, রোজি তোমাকে চিরকাল আমি ভালবাসব।

রোজি উত্তর দিয়েছিল, তার মানে এ-বেলাটা!

ক্ষুব্ধ জন বলেছিল, রোজি তুমি আমাকে এমন চপল মনে কর?

তোমার দোষ কি জন, ভালবাসা বস্তুটাই চপল।

তাই ব'লে এ-বেলা ও-বেলা?

এক বেলার জন্যে পেলেই বা মন্দ কি?

দেখে নিয়ো রোজি, আমি সারাজীবন বাসব ভাল।

আমার মৃত্যুর পরেও। শুধিয়েছিল রোজি, চোখে জেগেছিল কৌতুকময় অবিশ্বাসের ভাব।

নিশ্চয়।

কিন্তু কেন জন, চপল বস্তুকে চিরস্থায়ী করবার এই ব্যর্থ চেষ্টা কেন?

তোমাকে ছাড়া আর কাউকে যে আমি জানিনে।

আমাকেই বা কতটুকু জান?

তোমাকে সবটুকু জানি।

জনের ছেলেমানুষী দেখে রোজ হেসেছিল।

জন নিতান্ত অবুঝ না হ'লে বুঝতে পারত যে, তার প্রতি রোজির মনোভাব আর যাই হোক, ভালবাসার নয়। যে ভালবাসে, ভালবাসাকে চপল জেনেও চিরন্তন মনে করে সে। তাত্ত্বিকের কাছে ভালবাসা চপল, প্রেমিকের কাছে চিরন্তন।

ছবিখানা দেখে আজ সেই সব কথা মনে পড়ল জনের। ছবিখানাকে টেনে নিয়ে সে চুম্বন করল, সংকল্প করল, আজ রোজির সমাধিতে গিয়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেবে। সংকল্প করবামাত্র দেহে মনে নূতন এক তেজ ও উৎসাহ বোধ করল সে, তখনি সবলে সদর্পে সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সদম্ভে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। তারপরে অনেকদিন পরে দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে প্রফুল্ল মনে একটা হাল্কা গানের সুর শিস দিতে দিতে দ্রুত পদবিক্ষেপে বেরিয়ে চলে গেল আফিসের দিকে। কর্তব্যপরায়ণ জন!

বিকালবেলা মিস্ এলমারের সমাধিক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হ'ল জন। সেখানে আর কাউকে না দেখতে পেয়ে সে যে হতাশ হয়নি এই কথাটাই মনকে বোঝাবার জন্যে শিস দিতে দিতে বারকয়েক প্রদক্ষিণ করে নিল সমাধিটা। তারপরে ফুল সংগ্রহের আশায় প্রবেশ করল বনের মধ্যে, আজ আফিস থেকে সোজা আসছিল, তাই ফুল আনতে পারেনি।

ওদিকে সমাধির কাছে এসে দাঁড়াল রেশমী। এতদিন পরে হঠাৎ আজ আসতে গেল কেন সে? রেশমী মনকে বোঝায়, একবার বোকা মানুষটার আহাম্মুকি দেখে আসি, বলে পুরুষের বোকামি দেখতে আমার বড় ভাল লাগে। এছাড়া, আর কিছু তার মনের অগোচরে থাকলে কেমন করে জানব? একথা অবশ্য সত্য যে, জনের প্রতি বিদ্বেষ সত্ত্বেও তাকে অনেকদিন না দেখে কেমন যেন দমে গিয়েছিল সে। মনকে বোঝাতে, একবার দেখা পেলে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিতাম, বুঝত যে, রেশমী রোজি নয়, রেশমী ন্যায্য কথা বলতে জানে। কিন্তু কড়া কথা বলবে কাকে? মানুষটার যে দেখা নেই। মন বলে যাওনা কেন সমাধিস্থলে, শুনিয়ে দিয়ে এস কড়া কথা। রেশমী বলে, পাগল নাকি! তাহ'লে ভাববে তার সংগে দেখা করবার জন্যেই এসেছি! তার চেয়ে আসুক না এ বাড়িতে। মন বলে, তুমিও পাগল হ'লে দেখছি। এ বাড়িতে আর কোন্ সুবাদে আসবে সে! রেশমী বলে, আচ্ছা বাড়িতে না হয় না-ই এলো, কিন্তু বাড়ির সামনের পথেও কি যাতায়াত করতে নেই? মন বলে, তুমি কি পথে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে ঝগড়া করবে নাকি? রেশমী বলে, দূর্, তা কেন, তবে একবার দেখতাম। মন বলে দেখবার এত আগ্রহ কেন? সন্দেহজনক নয় কি? রেশমী বলে, আগ্রহ আবার কিসের দেখলে? লোকটা কতখানি শুকিয়ে গিয়েছে তাই একবার দেখতাম। মন বলে, শুকোবে কোন্ দুঃখে? তোমার বিরহে নাকি? আর যদি দেখো যে, না শুকিয়ে বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠেছে। রেশমী বলে—যেরকম আহাম্মুক, হতেও পারে।

মনের সংগে এইরকম অবিশ্রাম ঝগড়া ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল রেশমী, ভাবল, একবার দেখেই আসি না ব্যাপার কি? তাছাড়া, গুলবদনীর প্রতিও তো একটা কর্তব্য আছে। কিন্তু সমাধিস্থল শূন্য দেখে মনটা কেমন দমে গেল, নিজের নৈরাশ্যকে অস্বীকার করবার উদ্দেশ্যে বারংবার মনকে বোঝাতে লাগল, আহা, কড়া কথা বলবার সুযোগ হ'ল না। সমাধিস্থলে গিয়ে ব'সে পড়ল বিষণ্ণমনে।

কিছুক্ষণ পরে পত্রমর্মরে সচকিত হয়ে পিছন ফিরে রেশমী দেখল, পাশেই জন কতকগুলো সাদা করবী ফুল হাতে দণ্ডায়মান। জনকে প্রত্যাশা করেনি সে, কাজেই বিস্মিত হ'ল। জনও কম বিস্মিত হয়নি রেশমীকে দেখে। সে-ও আগে দেখতে পায়নি রেশমীকে, একটা গাছের আড়াল পড়েছিল। অপ্রস্তুত হয়ে সে তাড়াতাড়ি ফেলে দিল হাতের ফুলগুলো।

রেশমী ব'লে উঠল, ফুল ফেলে দিলে কেন?

জন বলল, রেশমী তুমি তো সাদা ফুল পছন্দ কর না।

কিন্তু সাদা ফুল যে পছন্দ করে তার জন্যেই তো এনেছিলে?

কে বলল? তোমার জন্যে আনছিলাম।

আমাকে তো প্রত্যাশা করনি এখানে!

নিশ্চয় করেছি, বলে জন। বলে, প্রেমিকের প্রত্যাশা কি কখনো যায়?

রেশমী জনের কথা বিশ্বাস না করলেও তার অপ্রস্তুত ভাব দর্শনে খুশী হ'ল। চাঁদ কি খুশী হয় না সমুদ্রের উদ্বেল ভাব দর্শনে!

জন শুধালো, তুমি এতদিন এখানে আসনি কেন রেশমী?

কেমন ক'রে জানলে যে আসিনি।

আমি যে এসে এসে হতাশ হ'য়ে ফিরে গিয়েছি।

হতাশ হ'লে কেন? সমাধি তো ছুটে পালায়নি।

সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে জন ব'লে ফেলল, তুমি জান রেশমী, আমি এখানে কেন আসি।

নিতান্ত নিরীহের মত রেশমী বলল, কেমন ক'রে জানব?

অধীর আবেগে জন ব'লে উঠল, জান না? নিশ্চয় জান।

কি জানি?

আমি তোমাকে ভালবাসি, কায়মনোবাক্যে ভালবাসি, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসিনে।

জনের উক্তির পক্ষে অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না, তার কণ্ঠস্বরই যথেষ্ট প্রমাণ।

বলা বাহুল্য, রেশমী মনে মনে খুশী হ'ল—এহেন কণ্ঠস্বরে এহেন উক্তিতে কোন্ নারী না খুশী হয়!

কিন্তু একথার কি উত্তর দেবে রেশমী? যেখানে কথাটা অবিশ্বাস্য বা অগ্রাহ্য সেখানে উত্তর জোগায়, অন্যত্র মৌনই যে শ্রেষ্ঠ উত্তর। কিন্তু গোলমাল বাধায় এই মৌনভাবে, মৌন সম্মতির লক্ষণ হ'তে পারে আবার অসম্মতির লক্ষণ হ'তেও বাধা নেই।

রেশমীর নীরবতায় শঙ্কিত জন তার পাশে ব'সে প'ড়ে রেশমীর হাত দুটি হাতের মধ্যে টেনে নিল, রেশমী ছাড়িয়ে নিল না হাত। এতেই রেশমীর মনোভাব বোঝা উচিত ছিল জনের, কিন্তু কিছু বুঝতে না পেরে উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে রইল রেশমীর মুখের দিকে।

এসব ক্ষেত্রে পুরুষ নির্বোধ। মেয়েরা অনেক অনায়াসে পুরুষের মনের ভাব বুঝতে পারে। বুদ্ধিজীবী পুরুষ প্রমাণ চায়, সংস্কারজীবী নারী অনুমান ক'রে নেয়।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জন বলল, দাঁড়াও তোমার জন্যে লাল ফুল নিয়ে আসি, বনের মধ্যে দেখেছি একটা পলাশ গাছ।

এই বলে সে বনের ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে ছুটে চলে গেল। বনের মধ্যে সন্ধ্যাবেলায় বিপদ হ'তে পারে জেনেও বাধা দিল না রেশমী। দ্রৌপদীও তো বাধা দেয়নি পাণ্ডবদের নীলপদ্মের সন্ধানে যেতে।

রেশমী সুখস্বপ্নগ্রস্তের ন্যায় ব'সে রইল, কিছু চিন্তা করবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না, জনের স্পর্শে তখন তার দেহের উপশিরা উচ্চ নিখাদে আহত বীণাযন্ত্রের মত রী রী করছিল। কখন্ যে ফিরে এল জন কিংশুকের স্তবক নিয়ে, কখন্ যে তার খোঁপায় গুঁজে দিল কিংশুকের বহ্নিবলয়—ভাল করে জানতেও পারেনি রেশমী, তারপরে যখন জন তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুম্বনে চুম্বনে সহস্র ভ্রমর চিহ্নিত নিশ্চল পদ্মের মত উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিল তখন আর কিছু জানবার অবস্থা ছিল না তার, বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত হয়ে বিদ্যজ্ঞানের স্বর্ণতোরণ দিয়ে তখন চ'লে গিয়েছে সে কোন আদিম অবস্থার মধ্যে। তখন সেই অবস্থায় সে একরকম ক'রে অনুভব করল, আকাশের সবগুলো গ্রহনক্ষত্র সোনার ঘণ্টা হয়ে জ্যোতির্ময় সংগীত ধ্বনিত করছে, অরণ্যের সবগুলো তরুলতা অযুত বাহু আন্দোলন ক'রে মহানৃত্যে মত্ত হয়ে উঠেছে, আর পৃথিবীর সব ধূলিকণা মহোৎসবের ক্ষেত্রে যে ধূলোট রচনা করেছে আত্মবিস্মৃত স্বয়ং মহাকাল সেখানে লুটোচ্ছে, চরাচরের চৈতন্য চেতনার শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে আপনাকে ফেলেছে হারিয়ে, সিন্ধুতে বিন্দুবিলীন।

প্রথম সম্বিৎ পেল জন, দেখল রাত্রি প্রয়োত্তাণ প্রথম প্রহর, বুঝল নিরাপত্তার কাল অনেকক্ষণ গত।

সে বলল, রেশমী এবারে ওঠ।

রেশমী কোন কথা না ব'লে কেশবাস বিন্যস্ত ক'রে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

তখন দুইজনে বাহুবদ্ধ অবস্থায় বেরিয়ে এল সমাধিক্ষেত্র থেকে।

সমাধির উপরে বখন মুগ্ধ নরনারীর এই লীলা চলছিল তখন, খুব সম্ভব অসহায় জনের একটা হিল্লে হ'ল ভেবে সমাধির অভ্যন্তরে রোজ এলমার স্বস্তিতে পাশ ফিরে শুয়েছিল। আর তার আশেপাশে যে-সব মৃত নরনারী শায়িত ছিল খুব সম্ভব তারাও অনেকদিন পরে মর্ত্যজীবনের এই প্রহসন দেখে নিজ নিজ জীবনস্মৃতি স্মরণ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। জীবনে মরণে মানুষ সত্যই বিচিত্র!

জনহীন নিরালোক পথে চলতে চলতে জন বলল, রেশমী, কাল সন্ধ্যায় আসবে আমার ওখানে?

বিস্ময়ে ব'লে ওঠে রেশমী, তোমার বাড়িতে?

না, না, বাড়িতে কেন? কলাইটোলা আমার আফিসে ঘরগুলো সন্ধ্যাবেলায় খালি থাকে। তুমি বাড়িরকাছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকো, গাড়ি ক'রে তুলে নিয়ে যাব, আবার পৌঁছে দিয়ে যাব গাড়ি ক'রে। যাবে?

রেশমী বলল, যাব।

তারপরে বলল, অত রাতে ফেরা সুবিধা হবে না, ধর রাতটা যদি ওখানেই থাকি?

খুব ভালো হবে, আমিও থাকব। ব'লে টেনে নেয় আর একটু কাছে। কিন্তু কি বলবে লেডী রাসেল্‌কে?

সে কি আমার মত তুচ্ছ লোকের সন্ধান রাখে? যারা রাখে তাদের বলব, আজকার রাতটা কাটাব কায়েৎদার বাড়িতে।

তুমি লক্ষ্মী মেয়ে রেশমী। তাহ'লে কথা ঠিক।

নিশ্চয়।

চল তোমাকে বাড়ির কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিই—একাকী ছেড়ে দেওয়া কিছু নয়।

এই ব'লে রেশমীকে বাহুসংবদ্ধ ক'রে নিয়ে অগ্রসর হয় জন। কর্তব্যপরায়ণ জন।

রেশমীর 'না'

পরদিন অপরাহ্ণে জন রেশমীকে গাড়িতে তুলে নিল, পূর্বনির্দেশ মতো বেরিয়াল গ্রাউন্ড রোড ও চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল সে। সেকালে অনেক শ্বেতাঙ্গ দেশীয় রমণীদের নিয়ে প্রকাশ্যে যাতায়াত করত, ঘর করত, কাজেই কেউ বিশেষভাবে লক্ষ্য করল না রেশমীকে। গাড়ি সোজা উত্তরদিকে চলে কশাইটোলার মোড়ে এসে পৌঁছল, মোড়ের কাছেই জনের অফিস। তখন সন্ধ্যাবেলা অফিস খালি, দু'চারজন আরদালি দরোয়ান মাত্র ছিল। জন রেশমীকে নিয়ে সোজা তেতলায় চলে গেল, তেতলায় তার খাস কামরা।

ড্রয়িং রুমে ঢুকে জন রেশমীকে বলল, বস। রেশমী বসলে জন বলল, রেশমী, তুমি আসবে ভাবিনি।

কি আশ্চর্য, না আসব কেন, কাল ত কথা ঠিক হয়ে গেল।

ইউ আর সাচ্ এ গুড গার্ল!

আম আই! আর ইউ শিওর?

দু'জনে হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

আচ্ছা রেশমী, কি ব'লে বের হলে বাড়ি থেকে?

সে কথা কালকে ত বলেছি।

আমার কি ছাই কালকের সব কথা মনে আছে?

কেবল আমাকে তুলে নেবার কথাটা ভুলতে পারনি।

তাহলে ত নিজেকেই ভুলে যেতে হয়।

কিন্তু আমার ভয় হয়েছিল যে, তুমি ভুলে যাবে।

দেখলে ত যে ভুলিনি।

বাস্তবিক আশ্চর্য তোমার স্মরণশক্তি!

আবার দু'জনে হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

প্রাণপ্রাচুর্যের উচ্ছ্বসিত ফেনা ঐ হাসি, যৌবনে তা সুলভ। বার্ধক্যে প্রাণপ্রবাহ নিস্তেজ, হাসি স্তিমিত। বৃদ্ধ অকারণে হাসে, কারণ উপস্থিত হ'লেও বৃদ্ধের মুখে হাসি জোগায় না।

জন শুধাল, আচ্ছা রেশমী, আমার আরদালি যদি খাদ্য এনে দেয় তবে খাবে?

কেন খাব না?

আমার ধারণা ছিল, তোমাদের সমাজের সংস্কার অন্তরায়।

আমি আজ কতদিন সমাজছাড়া, দীর্ঘকাল কাটল খ্রীষ্টানদের সঙ্গে, খাওয়া ছোঁওয়া সম্বন্ধে বাছবিচার ছেড়ে দিয়েছি।

ভালোই করেছ।

না ক'রে উপায় ছিল না, রাতদিন এক সঙ্গে থাকলে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা খুব শক্ত। তাছাড়া, ডাঃ কেরীর মত লোকের, মিস্ এলমারের মত লোকের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতেই বা যাব কেন?

আর আমার মত লোকের ছোঁয়াচ?

তুমি আর সে বিষয়ে চিন্তা করবার সময় দিলে কই।

রেশমী আমার মনের কথা যদি জানতে—

তার চেয়ে তোমার আরদালিকে ডাক, খুব খিদে পেয়েছে। মনের কথা না হয় পেটের খিদে মিটিয়ে নিয়ে ধীরে সুস্থে শুনব।

জনের ইঙ্গিতে আরদালি দু'জনের মত খাদ্য নিয়ে এল। জন যত্নদ্বারে সম্ভব দেশীয় খানার ব্যবস্থা করেছিল, রেশমীর কোনরকম অসুবিধা হ'ল না। উচ্ছিষ্ট পাত্র সরিয়ে নিয়ে গেলে একটি সিগারেট ধরিয়ে জন ও রেশমী আবার মুখোমুখি বসল।

হেমন্তের তৃণবনে একটু হাওয়া লাগবা-মাত্র যেমন অজস্র পতঙ্গ চঞ্চল হয়ে ওঠে, তেমনি অজস্র তুচ্ছ কথা রঙীন পাখায় চপল ভঙ্গীতে চঞ্চল হয়ে উঠল ওদের মুখে। মাঝে মাঝে একটা ক'রে হাসির দমকা হাওয়া লাগে, তত আরো বেশি চঞ্চলতা প্রকাশ করে [illegible]দের পাখা। অবশেষে এক সময়ে কথার [illegible]গে ক্রমে নীরবতার ভাগ বাড়ল এবং ক্রমে [illegible]র কথা আত্মবিসর্জন করল অখণ্ড নীরবতায়। তখন দু'জনে মুখোমুখি নীরবে ব'সে রইল। দু'জন লোক নীরব ব'সে রইলে বুঝতে হবে যে, হয় তাদের সব কথা বলা হয়ে গিয়েছে, নতুবা এমন কিছু কথা আছে যা অনির্বচনীয়। যুবক-যুবতীর নিছক সান্নিধ্য একরকম জৈব বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে—মুখর শব্দের চেয়েও যা গভীরতর অর্থে পরিপূর্ণ। সেই বিদ্যুন্ময় নীরবতা দু'জনের মধ্যে তখন কথা চালাচালি শুরু করে। কথা রুদ্ধ, নীরবতা কক্ষ।

রেশমীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জন ভাবছিল, যার নয়নে অধরে, কপোলে গ্রীবায়, ভ্রূসন্ধি কুন্তলে, বসনে ভূষণে সর্বাঙ্গে এমন অজস্র অমৃতের সঞ্চয় তার কেন এত কৃপণতা; একজন দারুণ পিপাসায় সামনেই পুড়ে মরছে, আর একজন শীতল বারিধি নিয়ে নির্বিকার বসে আছে! জন ভাবছিল, কেন এমন সৌন্দর্য, এমন নিষ্ঠুরতা, এমন তৃষ্ণা, এমন পানীয় পাশাপাশি!

রেশমী জনের মনের কথা বুঝেছিল, ভারি একটা বেদনা বোধ করছিল মনে মনে, তবু শেষ সঙ্কোচটুকু কিছুতে যেতে চায় না। জন কেন একটুখানি জোর করে না! রেশমী যুদ্ধপ্রত্যাশী নয়, তবু একবার যুদ্ধের ভান না ক'রে আত্মসমর্পণ করে কিভাবে সে! পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তবে আত্মসম্মান রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য ঐ যুদ্ধের অভিনয়টুকু। রেশমী ভাবছিল, জন বোধকরি মনে করছে যে, এখনো স্তম্ভমূলে দৃঢ় নির্বোধ, এখন একটিমাত্র মৃদু ধাক্কার প্রয়োজন, সেটুকুও কি দিতে রাজি নয় জন! মনে একটুখানি রাগের মতও হ'ল। কিন্তু যখনি দৃষ্টি পড়ল জনের আর্ত-অসহায় তৃষিত চোখের দিকে। সে আর স্থির থাকতে পারল না, তার সঙ্কল্প বিচলিত হ'ল। সে মনে মনে বলল, জন তোমাকে কেবল আত্মসমর্পণ করলেম না, আত্মসম্মান রক্ষার যে সঙ্কোচটুকু নারীরা হাতে রেখে দেয় সেটুকু অবধি তোমাকে দিলাম! তুমি বড় অসহায় বলেই তোমার দাবী বড় প্রচণ্ড।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রেশমী বলল, জন, আর ঠায় ব'সে থাকতে পারছি না, আমি কাপড় বদলাতে চাই, শোবার ঘর কোথায় দেখিয়ে দাও।

জনের মত নির্বোধ লোকেও কথাটার ইঙ্গিত বুঝল, কৃতজ্ঞতায় আনন্দে তার দুই চোখ চকচক ক'রে উঠল, বলল, এটা তোমার শোবার ঘর রেশমী, পাশেই স্নানের ঘর, সেখানে ব্যবস্থা আছে। যাও ভিতরে যাও, আমি 'নক' করলে তুমি আসতে বলো।

কোন উত্তর না দিয়ে রেশমী শয়নগৃহে প্রবেশ করল।

রেশমী ক্লান্ত হয়েছিল, ভাবল, স্নান ক'রে নিই, তাহলে আরাম পাওয়া যাবে। স্নানের ঘরে ঢুকে শাড়ি শেমিজ খুলে ফেলে শীতলজলে খুব আরাম ক'রে সে স্নান ক'রে নিল, তারপরে মাথাটা মুছে শোবার ঘরের প্রকাণ্ড আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াবার জন্যে চিরুনি হাতে নিয়ে প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। বিধাতাপুরুষ সদ্যসৃষ্ট বিশ্বদৃশ্যের দিকে তাকিয়ে খুব সম্ভব এমনি বিস্ময় বোধ করেছিল; আদিম নারী ইভ পল্বলে প্রথমবার নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখে নিশ্চয় এমনি সম্মোহ বোধ করেছিল; সমুদ্রোত্থিত উর্বশী পুরুষের আঁখি তারায় নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখে নিশ্চয় এমনি তন্ময়তা বোধ করেছিল! বেশবিন্যাস, বেশবিন্যাস ভুলে গিয়ে রেশমী অপলক তাকিয়ে রইল নিজের জীবন্ত ছায়ার দিকে। স্ফুটনোন্মুখ সূচাগ্র ম্যাগনোলিয়ার কুঁড়ির মত চিবুক থেকে একটির পরে একটি জলবিন্দু ঝরে বুকের দুর্গম গিরিসঙ্কটে

অবিরল ধারার সৃষ্টি করেছে; মসৃণ, তপ্ত, উজ্জ্বল ত্বকের স্পর্শে জলবিন্দু মুক্তাবিন্দুর চেয়ে রমণীয় হয়ে উঠেছে; আর স্নানের আবেশে মৃদু স্পন্দিত বক্ষের আন্দোলনে তালে তালে কাঁপছে সেই মুক্তাহার। রেখা-মনোরম কণ্ঠ, জলে সিক্ত আঁখিপক্ষ; ভেজা অলকাগুচ্ছ বিচিত্র রেখায় ললাট প্রান্তে লিপ্ত; চোখের দৃষ্টি স্বপ্নভারাতুর মধুকরী তরীর মত নিরুদ্দেশের দিকে উধাও; আর চুম্বনের কুঁড়িভরা অধরোষ্ঠের দুই কোণে বিস্মিত পুলকের আভাস। রেশমীর আর পলক পড়ে না, তৃপ্তি হয় না, তার মনে হ'ল, সে যেন আর কাউকে দেখছে। রূপ দেহ-লগ্ন, সৌন্দর্য দেহবিবিক্ত: নিতান্ত সৌন্দর্য-চেতন নারীর কাছেও আপন সৌদর্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত নয়; রূপসী স্বাধীন, সৌন্দর্যময়ী আপন সৌন্দর্যের অধীন; সে নিতান্ত অসহায়। দেবসমাজে যার অসীম প্রতাপ সেই উর্বশীর মত অসহায়, দুর্বল, পরাধীন আর কে!

আয়নার কাছে ব'সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রহস্যময়ী ছায়ার দিকে রেশমী সে ভুলে গেল জনের কথা, ভুলে গেল বেশ-বিন্যাসের কথা, ভুলে গেল বাহ্যজ্ঞান। তার মনে প'ড়ে গেল মদনাবাটির পল্বলে ছায়া দর্শনের স্মৃতি; তার মনে হ'ল, সেদিন সৌন্দর্য ছিল পাতার আড়ালের কুঁড়ি, আর আজকার সৌন্দর্য পত্রাবরণমুক্ত নিরাবরণ, নিরাভরণ আবৃন্ত প্রস্ফুট পুষ্প।

হঠাৎ দরজায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজে তার আচ্ছন্নভাব কেটে গেল, মনে পড়ল বাইরে অপেক্ষমাণ জনের কথা। কেমন একটা বিস্বাদে বিতৃষ্ণায় তার মন ভ'রে গেল, কেবলি মনে হ'তে লাগল, এ অন্যায়, এ অন্যায়, জনের এ অন্যায় দাবী। তার মনে হ'ল জন সৌন্দর্যের দস্যু, তার দেহ মন্থন ক'রে হরণ ক'রে নিতে চায় সৌন্দর্যটুকু। এ অন্যায় দাবী জন, এ অন্যায় দাবী।

আবার দরজায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজ। রেশমী কাপড় প'রে নিল, আর টেবিলের উপর থেকে কলম তুলে নিয়ে এক টুকরো কাগজে কি যেন লিখল, তারপরে উৎকণ্ঠ ব্যাকুল ঠক্ ঠক্ আওয়াজ উপেক্ষা ক'রে স্নানের ঘর সংলগ্ন spiral সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে গিয়ে বেরিয়েল গ্রাউণ্ড রোডের বাড়ির দিকে দ্রুত চলতে শুরু করে দিল।

আরো কিছুক্ষণ পরে, বিলম্বশঙ্কিত জন ভিতরে আসীন রেশমী বলে ঘরে ঢুকে পড়ে দেখলো ঘর শূন্য, কেউ কোথাও নেই। তবে আশাকুলা যখন সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, চোখে পড়ল কাগজের টুকরো— খপ্ ক'রে তুলে নিয়ে পড়ে, যেন এক নজরে। তার মনে হল সে বুঝি ভাষা ভুলে গিয়েছে, বারম্বার পড়ে, মনে মনে প'ড়ে অবশেষে নিজেকে শোনাবার উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে পাঠ করল—"জন, পারলাম না, ক্ষমা করো। সৌন্দর্য অন্তরায়। আমার মন তুমি জান, ঠিক বুঝে নিতে পারবে আমার কথার অর্থ। রেশমী।"

ভগ্ন মহীরুহের মত্তো একেবারে ভেঙে গিয়ে ব'সে পড়ল জন, চিন্তা করবার শক্তি তার লোপ পেলো।

রেশমীর মনের কথা জন ঠিকই বুঝতে পারল কিনা জানিনে। কিন্তু কী তার যথার্থ অন্তরায়? সংস্কার না সৌন্দর্য? সে ভাবল সৌন্দর্য, লিখল সংস্কার, তার কলম আর মন চলল ভিন্ন পথে। অথবা সৌন্দর্যই প্রবল ক'রে তুলল তার সংস্কারকে? অথবা সুন্দরী নারীর মনের কথা স্পষ্ট বোধগম্য হলে মানুষ শিল্পসৃষ্টি করবার অসাধ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করত না কখনো।

(ক্রমশ)

চক্রদত্ত
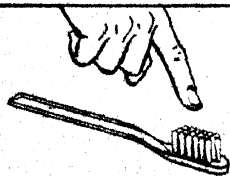
কোনও এয়ারোপ্লেনের দুর্ঘটনা ঘটলে ঐ বিমানের মধ্যস্থ চালক বা যাত্রীর বাঁচার কোনও উপায়ই প্রায় থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে চালকরা বিমান থেকে প্যারাসুট নিয়ে সময় মত লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচান। আজকাল এইভাবে প্রাণ বাঁচানর উপায়টি আরও সহজ করা হয়েছে। পাইলটের বসার জায়গাটির নীচে এমন একটি বিস্ফোরক রাখা হয় যে, দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে চালক যদি একটি বোতাম টিপে দেয় তাহলে ঐ বিস্ফোরকটি ফেটে গিয়ে চালকটিকে সিটসুদ্ধ বিমানের বাইরে ছিট্‌কে দিয়ে বহুদূরে শূন্যে নিক্ষেপ করবে। তারপর
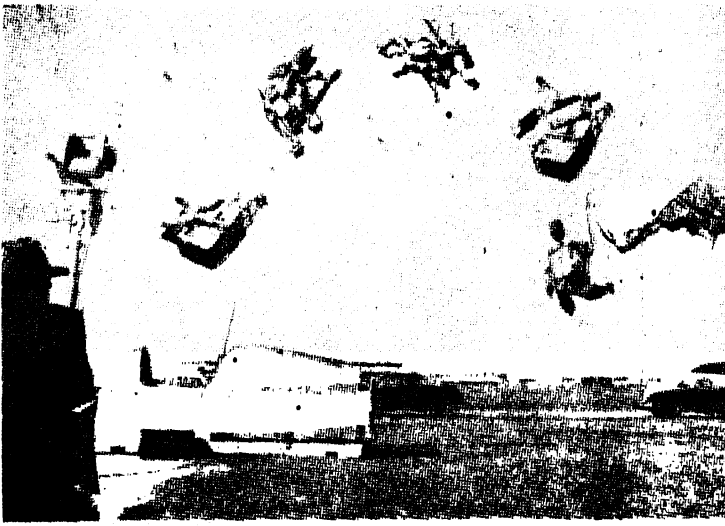
পাইলটদের বিপদত্রাণকারী ব্যবস্থা

বিমানচালক প্যারাসুটের সাহায্যে আস্তে আস্তে নীচে নেমে আসতে পারেন।

*

বাঙ্গালোরে "ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউশন অফ সায়েন্স" 'পাওয়ার এলকোহল'কে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের এক নতুন পদ্ধতি বার করেছেন। 'এলকোহল' ডিজেল ইঞ্জিনে তেলের বদলে ব্যবহার করার বন্দোবস্ত হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৮০ ভাগ ডিজেল তেল কম দরকার হবে। এছাড়া, তেল ব্যবহার করার দরুণ ইঞ্জিন যতটা শক্তি তৈরী করতে পারত এখন পাওয়ার এলকোহল সেখানে ব্যবহার করার দরুণ শতকরা ৫০ ভাগ বেশী শক্তি ইঞ্জিন উৎপন্ন করতে পারছে।

*

পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম নিওন আলো মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা এবং ১/২০ ইঞ্চি ব্যাস। এই আলো ক্ষেপণ অস্ত্রের ভেতরে সাহায্য করে। ছবিতে ক্ষুদে নিওন আলোটি মাঝখানে দেখা যাচ্ছে। ওপরে একটা পেন্সিলের সরু মুখ এবং নিচে একটা আলপিন দেখা যাচ্ছে।
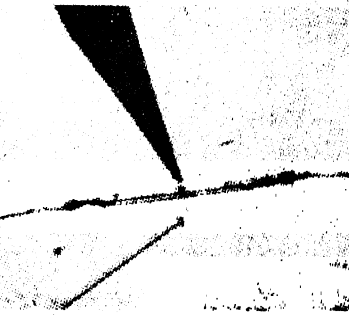
ক্ষুদে নিওন আলো

*

গত ১০ই নভেম্বর মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণগিরি বাঁধ উদ্বোধন করেছেন। মাদ্রাজ থেকে দু' মাইল পশ্চিমে পানিয়ার নদীর ওপর এই বাঁধটি অবস্থিত। সমস্ত বাঁধটি লম্বায় ৩২৫০ ফিট। এই বাঁধে ২,৪১০ লক্ষ ঘনফুট জল জমা করে রাখা চলবে। বাঁধটির বাঁদিকের খালটি ১০ মাইলের ওপর লম্বা এবং সবসুদ্ধ ৩,৪৪০ একর জমিতে সেচ করতে পারবে। ডানদিকের খালটি ৯ মাইল লম্বা এবং ৪,০৬০ একর জমির সেচের জন্য জল জোগাতে পারবে। বর্তমানে এই বাঁধের জল প্রায় ৭,৫০০ একর জমির সেচের জন্য ব্যবহার করলেও পরে এখানকার জল থেকে প্রায় ৯,০০০ একর জমিতে সেচ কার্য করা চলবে।

*

কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক একটি বিড়ালের সুষুম্না কান্ড (spinal cord) সম্পূর্ণভাবে কেটে ফেলে তার কাটা অংশটির ওপর নতুন করে নার্ভ উৎপন্ন করেছেন। এইরকম প্রচেষ্টা এর আগে কোনও বৈজ্ঞানিকই করেন নি। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, কোনও কারণে সুষুম্না কান্ড আঘাত পেলে সেই আঘাতের দরুণ অনেক সময় মানুষের পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে কাটা সুষুম্না কান্ডে নার্ভ জন্মান সম্ভব হলে পক্ষাঘাতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। অবশ্য এইসব বৈজ্ঞানিক এখনও সঠিকভাবে বলতে পারছেন না যে, এইভাবে উৎপন্ন নতুন নার্ভগুলি স্বাভাবিক নার্ভের মত কাজ করতে পারবে কী না।

*

রাশিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ যে, আলোর গতিবেগসম্পন্ন একটি রকেট মহাশূন্যে পাঠাবার পরিকল্পনা চলছে। সম্প্রতি রাশিয়া থেকে যে দু'টি উপগ্রহ ছাড়া হয়েছিল সেগুলি ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে আর এই উপগ্রহগুলির সাহায্যে শুধুমাত্র পৃথিবীর কাছেপিঠের গ্রহগুলিতে যাওয়া অথবা সেগুলির খবরাখবর সংগ্রহ করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আরও দূরবর্তী গ্রহগুলিতে যাওয়ার জন্য আরও অধিক গতি বিশিষ্ট উপগ্রহের প্রয়োজন। এই কারণেই রুশ বৈজ্ঞানিকগণ চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার উপযোগী রকেট তৈরীর পরিকল্পনা করছেন। এইসব বৈজ্ঞানিক আশা করেন যে, গতির তারতম্য অনুসারে এই রকেটগুলি এক থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে চন্দ্রে পৌঁছাতে পারবে। প্রয়োজনানুসারে কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে এক হাজার কিলোগ্রাম ওজনের করা যেতে পারে। শুধু তাই না, এইরকম কৃত্রিম উপগ্রহ এক সঙ্গে অনেকসংখ্যক শূন্যে পাঠান যাবে।

হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না

অন্নদাশঙ্কর রায়

বড়োদার নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে একটা হাসির কথা শুনে এলুম। তখন হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু ফিরে এসে যা দেখছি যা শুনেছি তা আমাকে হাসতে দিচ্ছে না। ভাবছি আমরা কোথায় ভেসে চলেছি। ভাসতে ভাসতে কোথায় গিয়ে ঠেকব। গৃহবিবাদের প্রথম দিকটা এমনি হাস্যকর হয়ে থাকে।

কথাটা এই। ভাষা কমিশনের রিপোর্টে অধিকাংশের সুরে সুর না মিলিয়ে সুব্বারায়ন ও সুনীতিকুমার উল্টো সুর গেয়েছেন। তাই গোসা করেছেন হিন্দীর এক স্বনামধন্য কবি তথা পার্লামেন্টের সদস্য। বলেছেন স্বভাষী কোন লেখককে, "দেওঘর থেকে বম্বে, অমৃতসর থেকে হায়দরাবাদ পর্যন্ত ভূখণ্ডে দেখি কেমন করে চাকরি পায় সুনীতিবাবুর ও সুব্বারায়নের ছেলেরা ও নাতিরা।"

গল্পটা সুনীতিবাবুর সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করার ইচ্ছা ছিল। যোগাযোগ ঘটেনি। জানিনে তিনি হাসতেন না ক্ষেপতেন। হয়তো নাচতেন। আমি কিন্তু ফাঁস করতে যাচ্ছিনে কবিবরের নাম। ভদ্রলোক যা বলেছেন একান্তে বলেছেন, প্রকাশ্যে বলেননি। তবে সত্যি বলেছেন। অপ্রিয় সত্য। ভণ্ডামি না করে অন্তরটা খুলে দেখিয়েছেন। হনুমানের অন্তরে "রাম" ভিন্ন আর কোনো নাম ছিল না। ভক্তদের অন্তরেও "হাম" ভিন্ন আর কোনো সর্বনাম নেই।

বেশ বোঝা যায় হাওয়া কোনদিকে বইছে। তার পাল্টা হাওয়া বইতে শুরু করেছে এবার পূর্বদিক থেকে। একমাত্র রাষ্ট্রভাষার বিরুদ্ধে পুরবীয়ারা দাঁড় করিয়েছেন চোদ্দটা কি পনেরোটা জাতীয় ভাষা। ইংরেজীও নাকি তাঁদের জাতীয় ভাষা। তাঁদের কথায় ন্যাশনাল ভাষা। নিন্দুকেরা বলবে এঁদের অন্তরেও "শ্যাম" ভিন্ন আর কোনো নাম নেই, যদিও এঁদের নামাবলীতে আরো চোদ্দটা নাম আছে। "না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

হিন্দী কবি বোধ হয় চিন্তা করেননি যে, দেওঘর থেকে বম্বে আর অমৃতসর থেকে হায়দরাবাদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড যদি তাঁর গোচারণভূমি হয়, তবে বাদবাকী ভূভাগ হবে অহিন্দী কবিদের মহিষচারণ-ভূমি।* পরে একদিন গোরু-মোষ গুঁতো-গুঁতি করে পাঁচিল তুলবে। যেমন করে হলো পাকিস্তান বা অ-হিন্দুস্থান তেমনি করে হবে অহিন্দীস্থান। এক বা একাধিক। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগে যুগে দেখা গেছে উত্তর ভারতের রাজচক্রবর্তীদের সঙ্গে বনিবনা হয়নি বলে বাঙলা ও দক্ষিণের রাজন্যরা স্বতন্ত্র হয়েছেন। ঐ করতে করতে ইংরেজকে ঢুকতে ছিদ্র দিয়েছেন। উত্তর ভারতের প্রভু মনোভাব থেকে এসেছে বাঙলা ও দক্ষিণের স্বতন্ত্র মনোভাব। ফলে দেশ বিপন্ন ও পরাধীন হয়েছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এ যুগেও ঘটতে পারে। আমাদের নেতারা সারা ভারতের ঐক্য কামনা করেন, তা সত্ত্বেও উত্তর ভারতের প্রভু-মনোভাবের যে হাওয়া তাঁরা বুনে যাচ্ছেন, তার থেকে যখন ঘূর্ণীহাওয়া জন্মাবে, তখন তাকে রোধ করবে কে?

উত্তর ভারতের হাতে এমনিতেই ভোট-সংখ্যা বেশী। গণতন্ত্রের খেলায় তুরুপের তাস তার হাতে। সারা ভারতের মসনদে সে যাকে বসাবে, সেই হবে বাদশা, সেই হবে উজীর। মসনদটাও দিল্লীতে। তার মানে উত্তর ভারতে। রাজধানী যেখানে সবরকম সুযোগ-সুবিধাও সেখানে বা তার চারপাশে। উত্তর ভারতের হাতে এ হলো দু'নম্বর তুরুপের তাস। এ ছাড়া আরো একটা তুরুপের তাস দেওয়া হয়েছে তার হাতে। ভারতের শাসনতন্ত্রে বা সংবিধানে লিখেছে হিন্দী হবে ইউনিয়নের সরকারী ভাষা। অর্থাৎ উত্তর ভারতের ভাষা পাবে সর্বাধিক মর্যাদা, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও পেট্রনেজ।

এতদিন আমাদের ধারণা ছিল ইংরেজকে হটানোর পর ইংরেজীকে হটানোর ন্যায়সংগত উদ্দেশ্য থেকে এই ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু এতদিনে কারো বুঝতে বাকী নেই যে, ইংরেজির সঙ্গে হিন্দীর লড়াইটা দৃশ্যত বিদেশীর সঙ্গে স্বদেশীর লড়াই হলেও কার্যত অহিন্দীর সঙ্গে হিন্দীর লড়াই। ইংরেজী শিক্ষায় কলকাতা, মাদ্রাজ, বম্বের লোক বহুকাল আগে স্টার্ট পেয়ে গেছে, কারণ এই তিনটি স্থানে ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হয়। প্রতিযোগিতায় এই তিনটি অঞ্চলের লোকের সঙ্গে এঁটে ওঠা শক্ত। এঁটে উঠতে হলে ইংরেজী শিক্ষাটাই তুলে দিতে হয়। তার জায়গায় সূত্রপাত করতে হয় হিন্দী শিক্ষার। তা হলে নতুন করে স্টার্ট পাবে উত্তর ভারতের ইংরেজী শিক্ষায় পেছিয়ে থাকা লোকজন। হিন্দী যেহেতু
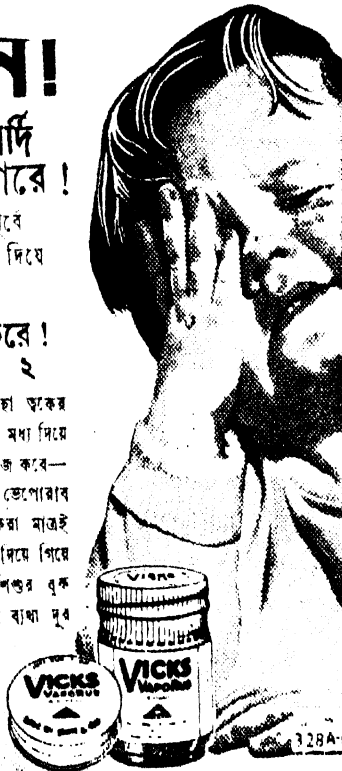
তাদের মাতৃভাষা সেহেতু কেউ কোনোকালে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠবে না। ইংরেজী শিক্ষার স্টার্ট ইতিমধ্যেই ক্ষয় হয়ে এসেছে। অন্যান্য অঞ্চল ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রগামী হয়েছে। কিন্তু হিন্দী শিক্ষার স্টার্ট কালক্রমে ক্ষয় হবে না, যদি না আমরা সবাই বাঙলা একেবারে ছেড়ে দিই, তামিল একেবারে ভুলে যাই, মারাঠীকে একেবারে হিন্দী করে তুলি।

আগেই বলেছি ভারতের মসনদে কে বসবে না বসবে, তা উত্তর ভারতের ইচ্ছা-নির্ভর। মসনদটা কোথায় হবে সেটাও তার মর্জি। এর পরে রাজপুরুষ কারা হবে, সেটাও স্থির হয়ে যাবে হিন্দী যাদের মাতৃভাষা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে তাদের জিততে দিয়ে। যদি জানতুম যে, হিন্দী যাদের মাতৃভাষা, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে আমরাও জিততে পারি তাহলে হিন্দীর জন্যে খাটতুম। কিন্তু সে ভরসা আমাদের নেই। সে আশঙ্কাও তাঁদের নেই। কিছুদিন শোনা গেল যে, হিন্দীকে সর্বসাধারণের জন্যে খুব সোজা করে দেওয়া যাবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোনো লক্ষণ নেই। যে ভাষায় রাজকার্য চলে, সে ভাষা কোনো দেশেই খুব সোজা নয়, হতে পারে না। সে ভাষায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলে প্রতিযোগীরাই তাকে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলবে। আর পরীক্ষকরাও কঠিনতাকে শিরোপা দেবেন। যেখানে হিন্দীর সঙ্গে অহিন্দীর প্রতিযোগিতা, সেখানে শুদ্ধতম হিন্দীর সূক্ষ্মতম প্রয়োগকেই মূল্য দেওয়া হবে সবচেয়ে বেশী। বিষয়টা ইতিহাস বা দর্শন যাই হোক না কেন।

নিছক ভাষাশিক্ষার বিরুদ্ধে একটিও যুক্তি নেই, কিন্তু ভাষা যেখানে ক্ষমতার বাহন, সেখানে ভাষাশিক্ষার ফলে যদি ক্ষমতালাভ না হয়, লোকে মানুষ তার বিপক্ষে একশটা যুক্তি হাজির করবেই। আর যদি ক্ষমতালাভ হয়, তবে তার স্বপক্ষেও একশটা যুক্তি পেশ করবে। ইংরেজ আমলে হিন্দী ছিল না ক্ষমতার বাহন। তাই কেউ তার বিপক্ষে দাঁড়ায়নি। যেদিন ইংরেজ চলে গেল, সেদিন ইংরেজীকে সরানোর কথাটাই বড় হয়েছিল, তাই চোখ বুজে ইংরেজীর জায়গায় হিন্দীকে বসাতে বাধেনি। ইংরেজী চাইনে এই নেতিবাচক মনোভাবের উপর হিন্দীকে স্থাপন করা হয়েছিল। এখন সেই নেতি-বাচক মনোভাব দুর্বল হয়ে এসেছে। ইংরেজীর উপর সে রকম বিরাগ আর নেই। সেইজন্যে হিন্দীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরতে শুরু করেছে। আমাদের হিন্দীভাষী ভাইদের এটা বোঝা উচিত যে, শুধু তাঁদের ক্ষমতালাভের জন্যে আমরা স্বাধীনতার সংগ্রামে নামিনি, আমাদের ক্ষমতালাভের কথাটাও আমাদের কল্পনায় ছিল। ইংরেজ এখন তাতে বাদ সাধছে না। সাধছেন তাঁরাই। এটা আর ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া নয়। এটা তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া।

তাঁদের বোঝা উচিত যে, দু-দুখানা তুরুপের তাস তাঁদের হাতে। গণতন্ত্রে অধিকসংখ্যক ভোট, যা দিয়ে বাদশা-উজীর বানানো যায়, পালটানো যায়। রাজধানী দিল্লী, যেখানকার সবরকম সুযোগ-সুবিধা তাঁদের মুঠোর মধ্যে। তার উপর এই ভাষার তাসটিকে তুরুপের তাস করে তাঁরা যে রাজকর্মের খেলায় ক্রমাগত জিতবেন, এটা সহ্য করা ঘোর জাতীয়তাবাদীর পক্ষেও অসম্ভব। অমন করে নেশন তৈরী হয় না।

নেশন বলতে বোঝায় জাতি, বর্ণ, ভাষা ও ধর্ম এই চারটি প্রধান প্রধান বিষয়ে মোটামুটি ঐক্য বা নিদেনপক্ষে বোঝাপড়া। আমাদের শাসনতন্ত্রে বোঝাপড়ার পরিচয় আর সব বিষয়ে পাচ্ছি। পাচ্ছিনে কেবল ভাষার বেলা এবং ভাষা যেহেতু ক্ষমতার বাহন, সেহেতু সন্দেহ হচ্ছে ক্ষমতাকে গোষ্ঠীগত করার এটা একপ্রকার ছল। এটা অহেতুক সন্দেহ কিনা নির্ভর করছে হিন্দীভাষীদের মতিগতির উপর।

মতিগতির নমুনা ভাষা কমিশনই দিয়েছেন। অহিন্দীভাষীরা কষ্ট করে হিন্দী শিখবেন, জাতীয় ঐক্যের খাতিরে। কিন্তু সেই জাতীয় ঐক্যের খাতিরে হিন্দীভাষীরা তামিল কিংবা তেলেগু কিংবা ওড়িয়া কিংবা বাঙলা শিখবেন না। কষ্ট যদি করতেই হয়, তবে তাঁরা বরং বিদেশী ভাষা শিখবেন। বিদেশী ভাষার প্রতি এই অনুরাগ ও স্বদেশী ভাষার প্রতি এই বিরাগ তাঁরাই আমাদের দেখালেন। এর পরে যদি আমরা ধুয়ো ধরি যে, কষ্ট যদি করতেই হয় তবে হিন্দী কেন, ইংরেজী শিখব, তা হলে সেটা মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছাড়া আর কী? জাতীয় ঐক্যের ছলনায় আর কেউ কি ভুলবে এর পর?

এখন থেকে অহিন্দীভাষীকে হিন্দী শেখানোর পূর্বে শর্ত হবে হিন্দীভাষীকে ভারতের অপর একটি ভাষা শেখানো এবং সে ভাষা হিন্দীর অনুরূপ কঠিন হওয়া চাই এবং প্রতিযোগিতায় তাতেও নম্বর তোলা চাই। আর প্রতিযোগিতার মাধ্যম যদি কোনো এক সার্ভিসে হিন্দী হয়, তবে অপর এক সার্ভিসে তামিল হবে, অন্যতর এক সার্ভিসে বাঙলা হবে। আমি জানি এতে কেউ রাজী হবে না। এসব প্রস্তাব নেহাৎ তর্কের খাতিরে। এ শুধু বুঝিয়ে দেবার জন্যে যে সমস্যার সমাধান এসব পথে নয়। সমাধানের একটি পথই প্রশস্ত। ভালো করে ইংরেজী শেখা ও বাঙালী, মাদ্রাজী, মারাঠার সঙ্গে টক্কর দেওয়া। এদের চাইতেও ভালো করে ইংরেজী শেখ, তাহলে এরা যে স্টার্ট পেয়েছে, সেটা কমে আসবে। ইতিমধ্যে এসেছেও অনেকটা। তাছাড়া দিল্লী তো তোমাদের ঘরের কাছে বা ঘরের ভিতরেই। একশ দেড়শ টাকার চাকরী-গুলোর জন্যে কে আর কলকাতা, মাদ্রাজ, বম্বে থেকে দিল্লী যাচ্ছে? সেরকম চাকরিও তো এন্তার সৃষ্টি হয়েছে। সেসব কারা পাচ্ছে?

আমার এই প্রবন্ধে আমি সংস্কৃতির প্রসংগ তুলব না। ঝগড়াটা সংস্কৃতি নিয়ে নয়। শাসনতন্ত্র সরকারী ভাষার উল্লেখ করেছে। সংস্কৃতির ভাষার উল্লেখ করেনি। শাসনতন্ত্রের রচয়িতারা হিন্দীকে সরকারী ভাষা করার নির্দেশ দিয়েছেন, সংস্কৃতির ভাষা করতে বলেননি। তাকে জাতীয় ভাষা বলেও আখ্যায়িত করেননি। এমন কি রাষ্ট্রভাষা বলেও ঘোষণা করেননি। সরকারী ভাষা হচ্ছে সরকারের কাজকর্মের ভাষা। ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা না-ও হতে পারে। সুতরাং হঠাৎ একদল লেখক চোদ্দটা ন্যাশনাল ভাষার রব উঠিয়েছেন কেন বোঝা গেল না। তার সঙ্গে ইংরেজীকেও ন্যাশনাল ভাষা বলে জুড়ে দিতে চাইছেন কেন? এতদিন তো জানা ছিল ইংরেজী হচ্ছে ইণ্টারন্যাশনাল ভাষা।

আমার এই বন্ধুদেরও কিছু বলতে চাই। অতগুলো ন্যাশনাল ভাষা নিয়ে কোথাও এক নেশন তৈরী হয়নি। সাধারণত দেখা যায় যতগুলো ন্যাশনাল ভাষা তত-গুলো নেশন। দুদিন পরে তাঁদের চেয়ে যাঁরা কম বিদ্বান, তাঁরা ভাববেনই বাঙলা যখন ন্যাশনাল ভাষা, তখন বাঙালীও নেশন। বাঙালীর মনের কোণে যে বাঙালী ন্যাশনালিজম কোনোদিন ছিল না তা নয়। এখনো যে মিলিয়ে গেছে তা নয়। আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে ন্যাশনালিজম বলতে বিশুদ্ধ ভারতীয় ন্যাশনালিজম কোনোকালে শিকড় গাড়তে পারে কি না ভাবনা হয়। কখনো দেখি, হিন্দু ন্যাশনালিজম ভারতীয় ন্যাশনালিজমের মুখোস এঁটে ঘুরছে। কখনো দেখি বাঙালী ন্যাশনালিজম ভারতীয় ন্যাশনালিজম সেজেছে। কিছুদিন আগেও মাল্টিন্যাশনাল স্টেটের প্রস্তাব শোনা যেত। যাঁরা সে প্রস্তাব এনেছিলেন, তাঁরা একনেশনবাদী নন। এখনো তাঁদের অন্তঃ-পরিবর্তন হয়েছে বলে শুনিনি। এই যেখানকার পটভূমিকা সেখানে এবার অংগনে নেমেছেন চোদ্দটা ন্যাশনাল ভাষার ধ্বজা হাতে একদল সৈনিক। এঁরা ইংরেজীকেও তার সংগে জুড়ে ন্যাশনাল বলে টীকা দিয়েছেন। এতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সবল হবে না। সুতরাং যাঁরা হিন্দীর প্রতি বিরূপ অথচ গোঁড়া জাতীয়তাবাদী তাঁরাও প্রতিবাদ করবেন।

শাসনতন্ত্রে রাজ্য বিধানসভাগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাঁরা ইচ্ছা করলে নিজ নিজ এলাকার বাংলা, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু ইত্যাদিকে সরকারী ভাষা করতে পারেন। কেন এতদিন করেননি কেউ

বলতে পারেন? হিন্দীর এখানে হাত নেই। হিন্দীর সঙ্গে একে জড়াতে যাওয়া ভুল। পশ্চিমবঙ্গে যদি বাঙলায় সরকারী কাজ চলে, হিন্দীওয়ালারা আপত্তি করবেন না। বরং আশীর্বাদ করবেন। কারণ তাঁরাও আমাদের দোহাই দিয়ে অন্যত্র হিন্দী প্রবর্তন করতে বল পাবেন। সেটা হয়তো আমাদেরই পছন্দ হবে না। বিহার প্রভৃতি রাজ্যে আমাদেরও কিছু প্রভাব আছে। সেটা এক কলমের খোঁচায় খোয়াতে আমরা রাজী নই। আমার মনে হয় মাতৃভাষার কথা ভেবে এঁরা নিশান কাঁধে নেননি। নিয়েছেন ইংরেজীর কথা ভেবে।

ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজীর প্রতি আমার মমতা আছে। রামমোহনের কাজ এখনো সারা হয়নি, সুতরাং রামমোহনের যে চিন্তা আমারও সেই চিন্তা। দেশকে আধুনিক করতে হবে, মধ্যযুগের অধিকার থেকে উদ্ধার করতে হবে, শুধু ইংরেজের দখল থেকে উদ্ধার করলেই হবে না। এ কাজ ইংরেজীর সাহায্যেই হতে পারে। সংস্কৃতের

সাহায্যে নয়। হিন্দীর সাহায্যে নয়। এমন কি বাঙলার সাহায্যেও নয়। ইংরেজীর স্থান নেবার মতো যোগ্যতা এখনো বাঙলারও হয়নি। বাঙলায় ডক্‌টরেট? এ কি ছেলেখেলা? এম-এ, এম এস্‌সি বাঙলায়? এম-বি, বি-ই বাঙলায়? ধীরে, বন্ধু, ধীরে। আন্তর্জাতিক শিক্ষামান অবনত করা অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। ইংরেজীকে এখনো অনেকদিন রাখতে হবে। সে ন্যাশনাল ভাষা বলে নয়। উচ্চশিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন বলে। উচ্চতর পরীক্ষার মান-নির্দেশক বলে। প্রতিযোগিতায় সুবিচারের একমাত্র ন্যায়দণ্ড বলে।

যা বলছিলুম। ব্যক্তিগতভাবে আমি ইংরেজীকে আরো অনেকদিন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তথা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাহন হিসাবে রাখতে চাই। প্রতিযোগিতা ও উচ্চশিক্ষা এক অপরের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু তা বলে আমি এমন কথা বলব না যে, ইংরেজী ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষা ও সে হিসাবে চিরস্থায়ী হওয়ার হকদার। ভারতের হিন্দী-অহিন্দী কোনো খণ্ডের জনমত এতদূর যেতে রাজী হবে না। আর জনমতকে ডিঙিয়ে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে কোনো একটি ভাষাকে জাতীয় ভাষা বলে আখ্যায়িত করা যায় না বা চিরকাল চালিত রাখা যায় না। তা ছাড়া আরো একটি কথা। আজ না হয় ইংরেজ আমাদের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন। কাল যদি বৈরীভাবাপন্ন হয়, তখন কি দেশের লোক ইংরেজীর মর্যাদা মানবে? ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে যদি কোনোদিন সংঘাত বাধে, তাহলে ইংরেজীই হবে তার প্রথম কাজুয়াল্টি। তখন শুধু হিন্দীওয়ালারা নয়, অহিন্দী-ওয়ালারাও ইংরেজীকে "কুইট ইন্ডিয়া" করাবে। রক্ত গরম হলে কেউ ঠাণ্ডা যুক্তি শোনে না। আমি যে কারো কান পাব সে আশা রাখিনে।

সুতরাং সবরকম অবস্থার কথা ভেবে ইংরেজীর পক্ষের উক্তিকে সংযত করতে হয়। কোনোদিনই সে বাঙলা হিন্দী ইত্যাদির সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। তার কেসটা নিতান্তই একটা স্পেশ্যাল কেস। সে যদি থাকে, তবে চিরকালের জন্যে নয়, কিংবা সব কাজের জন্যে নয়। সেইজন্যে বাঙলা হিন্দী ইত্যাদির সঙ্গে তাকে একসূত্রে গাঁথা ভুল। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি, তার থাকার মেয়াদ আর আট বছর মাত্র নয়। শাসনতন্ত্র সংশোধন করতেই হবে। কিন্তু সংশোধিত শাসনতন্ত্রে তাকে সনাতন করার কোনো সম্ভাবনা নেই। একটা স্বাধীন দেশ একটা বিদেশী ভাষাকে তার শাসনতন্ত্রে খুঁটি গাড়তে বা এনট্রেঞ্চড হতে দেবে এটা অভাবনীয়।

কেউ কেউ তর্ক করছেন এই বলে যে, উর্দুও তো একটা বিদেশী ভাষা। সেটা কুতর্ক। উর্দুতে বিদেশী শব্দ প্রচুর আছে, ওর লিপিটা পরদেশী, কিন্তু ওটা ভারত ও পাকিস্তান ভিন্ন আর কোথাও জন্মায়নি, বাড়েনি, চলে না, চলবে না। আবার এমন তর্কও উঠেছে যে, অ্যাংলোইণ্ডিয়ানরা যেহেতু ভারতীয় আর ইংরেজী যেহেতু তাদের ভাষা সেহেতু ইংরেজীও ভারতীয় ভাষা। ইংলণ্ডের জিপসিরা যেহেতু ইংরেজ আর রোমানি যেহেতু তাদের ভাষা সেহেতু রোমানিও ইংলণ্ডের অন্যতম দেশ-ভাষা! পোলাণ্ডের ইহুদীরা যেহেতু পোল আর য়িডিশ যেহেতু তাদের ভাষা, সেহেতু য়িডিশও পোলাণ্ডের অন্যতম দেশভাষা। মরি মরি! কী বুদ্ধি! ইংরেজীর উকীলরা তার কেসটাকে অতিবুদ্ধির দ্বারা মাটি করবেন।

ইংরেজীর ভাগ্যের সঙ্গে না জড়িয়ে বাঙলা, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার কথা যদি আলাদা করে ভাবি, তাহলে দেখতে পাব কেবল রাজ্য সরকারের উপর নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের উপরও তাদের দাবী আছে। এ কখনো হতে পারে না যে, ভারতের সন্তান আমি ভারতের পার্লামেণ্টে আমার মাতৃ-ভাষায় কথা বলতে পাব না। তুমি যদি বাঙলা বুঝতে না পার অনুবাদকের সাহায্য নাও। তবে একথাও ঠিক যে, আমিও আমার অধিকার সব সময় খাটাতে যাব না। তোমাকে শোনানোই যখন আমার উদ্দেশ্য, তখন মাঝখানে অনুবাদক রেখে আমি ভুল বোঝার অবকাশ রাখি কেন? আর দুজনেরই তো সময়ের দাম আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে বাঙলা ভাষায় দরখাস্ত পাঠানোর মৌলিক অধিকারও আমার রয়েছে। এটাও আমি দাবী করতে পারি যে, আমাকে যখন ট্যাক্সের জন্যে নোটিশ দেওয়া হবে, তখন সে নোটিশের একপ্রস্থ বাঙলা নকলও যেন দেওয়া হয়। এমনি একশ' রকম ব্যাপারে আমি বাঙলার জন্যে ঠাঁই করে নিতে পারি। আড়াই কোটি লোক একজোট হয়ে আন্দোলন করলে কেউ এসব দাবী ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আমি বাঙলার উদাহরণ দিলুম। বাঙলা, ওড়িয়া, তেলেগু, তামিল সব ভাষার বেলা এটা খাটে। কেন্দ্রীয় সরকারকে একদিন না একদিন এসব ভাষার সঙ্গে রফা করতে হবেই। তবে এসব দাবী যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। যে ডালে বসে আছে, সেই ডালকেই না কাটে। জাতিকে দুর্বল করে বিশৃঙ্খল করে আখেরে কোনো লাভ নেই। কাজেই যখন যা দাবী করব, তা না করলে নয় বলেই করব।
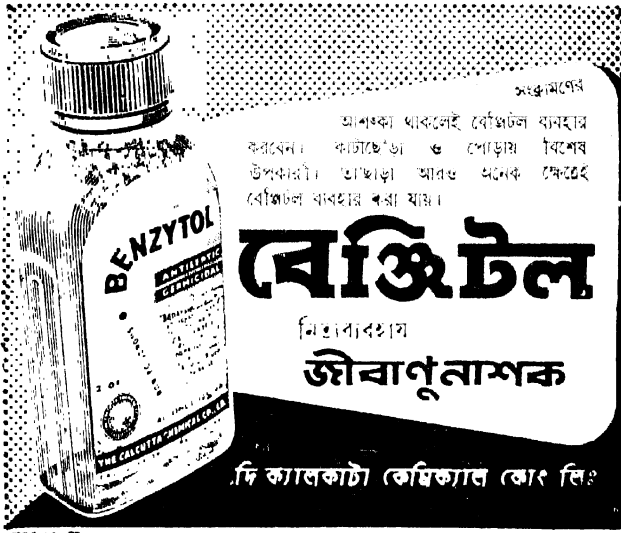
শাসনতন্ত্রের সংশোধন না করলেই নয়। সংশোধনের সময় 'আঞ্চলিক'কে কেটে 'ভারতীয়' করতে হবে। 'আঞ্চলিক' সত্যি আপত্তিকর। অপর পক্ষে 'জাতীয়' বা 'ন্যাশনাল' বিপত্তিকর। এক দেশে একাধিক নেশন থাকে না, থাকতে পারে না। তাই একাধিক 'ন্যাশনাল' ভাষা বিবেচনার অযোগ্য। 'ভারতীয়' বলতে তেমন কোনো বাধা নেই। তার পর হিন্দী প্রবর্তনের জন্যে যে পনেরো বছর মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়েছে সেটাকে পঁচিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর করা নিষ্ফল। অহিন্দী-ভাষীর উপর কোনো দিনই গায়ের জোরে হিন্দী চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। তা হলে গায়ের জোরের মেয়াদ বেঁধে দেওয়া কেন? অনুশাসনমাত্রেরই উদ্দেশ্য অনিচ্ছুককে বাধ্য করা। যেখানে বাধ্য করা ভালো সেখানে অনুশাসন ভালো। যেখানে বাধ্য করা খারাপ সেখানে অনুশাসন খারাপ। আমাদের শাসনতন্ত্রে খারাপ কিছু থাকবে কেন? কাজেই হিন্দী প্রবর্তনের জন্যে কোনো অনুশাসন রাখা উচিত নয়। শুধু এইটুকু বললে চলবে যে ভারতের শাসনকার্য ভারতীয় ভাষাগুলির সাহায্যে চলবে. যেসব ক্ষেত্রে হিন্দী নির্বিবাদে ব্যবহার করা যেতে পারে সেসব ক্ষেত্রে হিন্দী ব্যবহার করা হবে, যেসব ক্ষেত্রে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা নির্বিবাদে ব্যবহার করা যেতে পারে সেসব ক্ষেত্রে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করা হবে, যেখানে নির্বিবাদ ব্যবহার সম্ভব নয় সেখানে বর্তমান ব্যবস্থা চালু থাকবে। ইংরেজীর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে ইংরেজীও পড়ে, আদালত প্রভৃতিতে ব্যবহৃত অন্যান্য ভাষাও পড়ে।

আসল কথা বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে হবে। এ দায়িত্ব হিন্দী অহিন্দী সব ভাষাভাষীর। এখন পর্যন্ত এক সার্বভৌম ভাষার একমাত্র উত্তরাধিকারী রূপে অপর সার্বভৌম ভাষা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার কল্পনাই করা হয়েছে। স্বাধীন প্রজার উপরে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে যাওয়াটাই অন্যায়। আর হিন্দী ইংরেজীর সার্বভৌম উত্তরাধিকারী হবে এটার মধ্যেও একটা আইনের ফাঁকি আছে। বড় ছেলে বাপের সমস্ত সম্পত্তি পায় না। মেজ সেজ ছোটরা কেউ ভেসে আসেনি। কেনই বা তারা যে যার উত্তরাধিকার ছেড়ে দিয়ে বড় ছেলের অনুগ্রহনির্ভর হয়ে থাকবে? ইংরেজীর একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে কোনো একটি ভাষার সার্বভৌম দাবী খাটবে না। হিন্দী বড় জোর অগ্রাধিকার চাইতে পারে। ইংরেজীর স্থলে হিন্দী সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভবও নয়, সংগতও নয়। এ দেশে কেবল ন্যাশনালিজম বলে একটিমাত্র শক্তি কাজ করছে না। আমরা যাকে ন্যাশনালিজম বলতে ভয় পাচ্ছি অথচ যাকে আঞ্চলিকতা বললে খাটো করা হয় সেটাও একটা শক্তি। ইউরোপ হলে কেরল, তামিলনাড, অন্ধ্র প্রদেশ, উৎকল, পশ্চিমবঙ্গ এক একটি নেশন বলে গণ্য হতো। এখানে নেশন বলে কেউ দাবী করছে না যে এটা আমাদের সৌজন্য ও ত্যাগ। দোহাই তোমাদের, এর চেয়ে বড় ত্যাগ প্রত্যাশা কোরো না। শাসনতন্ত্রে এ রকম একটা অলিখিত প্রত্যাশা রয়েছে। অথচ হিন্দীর কাছে বা হিন্দী-ভাষীদের কাছে অনুরূপ কোনো প্রত্যাশা নেই! সব দেশের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে ত্যাগের সাম্য। এ দেশের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি যদি হয় ত্যাগের সাম্য তো হিন্দী বা হিন্দী-ভাষী প্রজাগণকে কেন সার্বভৌম উত্তরাধিকার দেওয়া হয়েছে? ওরাই যেন নেশন। আমরা যেন ন্যাশনাল মাইনরিটি।

শাসনতন্ত্রের ভাষাঘটিত পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণরূপে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। টুকরো টাকরা পরিবর্তন কোনো কাজে লাগবে না। আমাদের সংশোধিত শাসনতন্ত্র হবে দুটি সমান শক্তির স্বীকৃতি ও সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি তো ন্যাশনালিজম, অন্যটি ঠিক তা নয়, অথচ আঞ্চলিকতার চেয়ে বলবান ও বড়। ইতিহাস আমাদের নেতাদের চ্যালেঞ্জ করছে। দেখতে চায় তাঁরা কত বিজ্ঞ। তাঁরা কি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন না?

লাইকা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ঈশ্বরবিলাসী সেই জ্যোতিষীর উচ্চারণ আজ
মিলে গেলো এতদিন পরে?,
'দ্যাখো দ্যাখো মানুষেরা পাতালের ভিতরগহ্বরে
বাস করে,—গুহার একমুখ
ঈষৎ আলোর দিকে খোলা—আর তাদের স্বরাজ
আজন্মাধিকৃত, বুঝি তাদের হাত-পা
নিয়তির হাতে বাঁধা, তাদের আত্মা
খুব দূরে আছে বটে, কিন্তু তারা থাকে না যখন
তখনই তা দেখা যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে মিশুক
একটি আগুন দূরে দেখা যায়, সে-আগুন আর
মানুষের মাটির সংসারঃ
মাঝখানে দীর্ঘপথ, সেই পথে পর্দার মতন
একটি প্রাচীর তোলা, পর্দার উপরে বারবার
মানুষের ছায়া পড়ে পুতুল-নাচের আয়োজন
পুতুল করেছে দেখে বিধাতার কৌতুকী চিবুক।'

কিন্তু আমি যদি বলি ইউরেনাস-প্লুটোর দারুণ
ঠাণ্ডা নিথর হাতে আজ সেই অমর্ত্য আগুন
দূর থেকে বিদ্রূপের কান্তি হারিয়েছে;
ধীমান্ সূর্যের মুখ নির্বাণের বিপন্ন নিশীথে,
আকাশ নির্বাক কৃষ্ণ-পার্বতীর মিথুনমূর্তিতে;
লাইকা মরেছে, বেঁচে গেছে।

লাইকা মরেনি, চোখ বুজে
দেখছে পৃথিবী কবে শুধু তার নিজের পিলসুজে
আপন ঘরের কোণে জ্বালবে নিষ্কম্প দীপশিখাঃ
অসহায় ঈশ্বর লাইকা।।

বালি খুঁড়লে—

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পায়ের নীচে শুকনো বালি, একটু খুঁড়লে জল।
গভীরে যাও, গভীরে যাও, বুকের হলাহল
আলো চায় না, হাওয়া চায় না, স্তব্ধতার মুখ
দেখ জ্বলছে আকাশ ভরে—তবু ফেরাও মুখ।
গভীরে যাও, গভীরে যাও, দু হাতে ধরো আঁধার,
পায়ের নীচে বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।

মৌমাছির চাক ভেঙেছি, আমার চোখে মুখে
উড়ে বসলো কয়েক হাজার, সমস্ত বিষ বুকে
জমছে এসে, জ্বলে উঠলো অসীম মরুভূমি,
হা-হা-শব্দে বালি পুড়ছে, যদি পারতে তুমি
ছড়িয়ে দিতে বুকের বিষ আ-শির-পদ-নখে,
আমি যেতাম সমুদ্রতীর, ঝলসে উঠতো চোখে
তীব্র নীল বাঁচার স্বাদ—অন্ধকার জলে
আমি হয়তো ডুবে যেতাম আলোর কৌতূহলে।

এ কী অবাধ হাওয়া বইছে, বাসনা চঞ্চল,
আলো চাইনি, হাওয়া চাইনি, বুকের হলাহল
নীচে টানছে অন্ধকারে, চোখ ঢাকছে আঁধার
হয়তো শুকনো বালি খুঁড়লে অতল পারাবার!

(চৌত্রিশ)

"সাধু বা বিপ্লবী কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। পারবে শুধু এ দুয়ের সমন্বয়"। —আর্থার কোয়েসলার।

সোভিয়েত কূটনীতির সাফল্যের প্রধান প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে গতি। সে গজেন্দ্রগামিনী নয়। ক্ষিপ্র তৎপরতা, ঐতিহাসিক সুযোগের তড়িৎ সদ্ব্যবহার এবং একই সঙ্গে বহুপথ অভিযান চল্লিশ বছরের সোভিয়েত কূটনীতিকে অনেকখানি সহায়তা করেছে। এ কূটনীতিতে যেমন রয়েছে একটা আদর্শগত জোর, তেমনি রয়েছে একটা একান্ত সুবিধাবাদী তৎপরতা। যুদ্ধে ও আনন্দে নিয়ম নাস্তি। সোভিয়েত কূট-নীতিতে নিয়ম নেই, একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে; কিন্তু এ নিয়মের মধ্যেও এমন একটা অনিয়ম আছে, যা অবশিষ্ট জগৎকে বার বার চমকিত, বিকৃত ও অপদস্থ করেছে। যে দেশের জাতীয় ক্রীড়া দাবা, সে দেশ থেকে অন্য কিছু আশা করাই অন্যায়।

উনিশশো সতের সালে তার জন্ম থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত কূটনীতির অন্যতম প্রধান কাম্য ছিল নিরপেক্ষতা। প্রথম যুদ্ধে পরাজিত দেশগুলির সঙ্গে নিরপেক্ষতা ও অনাক্রমণ চুক্তি করেই সোভিয়েত কূট-নীতির শুরু। লীগ অব নেশনস্-এ লিটভিনভ একদিকে 'সমবেত স্বস্তি'র ধুনি তুলেছিলেন, অন্যদিকে সোভিয়েত সরকার নিরপেক্ষতা ও অনাক্রমণের রেশমী সুতোর রাখী বাঁধবার চেষ্টা করছিলেন যথাসম্ভব সংখ্যাধিক দেশের হাতে। ১৯৩৭ থেকে এ নীতির কিছুটা পরিবর্তন হয় য়ুরোপে হিটলারের আগ্রাসী লালসার পরিচয় প্রকট হবার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তখনো নিরপেক্ষতা ও অনাক্রমণ ছিল রুশ কূটনীতির বড়ো কাম্য। এমনকি হিটলারের হাতেও মলোটভ রাখী পরিয়েছিলেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রকে যুদ্ধ প্রস্তুতির সময় দেবার জন্যে। ফিন-ল্যাণ্ড, আক্রান্ত হয়েছিল, পোল্যাণ্ড ভাগাভাগি হয়েছিল; কিন্তু তুর্কী, সুইডেন ও সুইটজারল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা রাশিয়া সম্মান করে চলেছে।

অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত প্রমুখ রাষ্ট্রগুলির নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির মূল্য বুঝতে সোভিয়েত সরকারের অনেক বছর লেগে গেল। ১৯৪৭ থেকে শুরু করে ছয় সাত বছর সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি এ বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যেন বলতো, "তুমি যদি আমার দলে না হও, তুমি আমার বিপক্ষে।" দুই দলের মাঝামাঝি যে একটা তৃতীয় প্রান্তর থাকতে পারে সোভিয়েত সরকার তা ভাবতে পারতেন না। আমেরিকা মনে করত, এই যে এসব তথাকথিত নিরপেক্ষ দেশ, এরা আসলে সুবিধাবাদী, দু তরফেরই সাহায্য নিয়ে এগোতে চায়। এদের অন্তরে রয়েছে প্রচণ্ড রুশপ্রীতি। আর রাশিয়া ভাবতো "এরা আসলে সাম্রাজ্যবাদের দাস। এদের স্বাধীনতা একটা মুখোশ মাত্র। নিরপেক্ষতা একটা বিশুদ্ধ চাল। এদের অর্থনীতি সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত। এদের নেতারা প্রতিবিপ্লবী।"

তাই শ্রীনেহরু সে সময় বলতেন, "ভারত একাই জনহীন মাঠে তার কৃষিকাজ চালিয়ে যাবে।"

সোভিয়েত কূটনীতির এই অজ্ঞতা প্রথম রুশ নেতাদের কাছে ধরা পড়ে ১৯৫০ সালে। কোরিয়ার যুদ্ধই সর্বপ্রথম যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে দুটো যুধ্যমান শিবিরে ভাগ করে দেয়। বৃহত্তর সংখ্যক দেশগুলি মার্কিন শিবিরে যোগদান করে; কম্যুনিস্ট শাসিত দেশগুলি রুশ শিবিরে। কিন্তু দেখা গেল আরো অনেকগুলি দেশ রয়েছে যারা কোন শিবিরের জন্যেই লড়তে রাজী নয়। শুধু তাই নয়। এই জড়িয়ে-না-পড়া দেশগুলি কোরিয়ার যুদ্ধ থামাতে প্রথম হতেই তৎপর হয়ে ওঠে, এবং কোরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারত প্রমুখ রাষ্ট্রের অবদান সর্বত্র স্বীকৃত হয়।

নিরপেক্ষ দেশগুলির মূল্য প্রথম বুঝতে পারেন চীনের কম্যুনিস্ট নেতারা। তাঁরা তাঁদের রুশ মিত্রদের এ বিষয়ে অবহিত হতে পরামর্শ দেন। কিন্তু স্টালিন তখনো জীবিত। নতুন দৃষ্টি, নতুন কর্মধারার পথ ক্রেমলিনে তখনো অনাদৃত।

স্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত নেতারা নিরপেক্ষ দেশগুলির মূল্য ধীরে আস্তে স্বীকার করতে থাকেন। প্রাচ্য দেশগুলির ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি ও অর্থ-নীতি নিয়ে রাশিয়ায় নতুন ক'রে গবেষণা ও আলোচনা শুরু হয়। স্টালিনের আমলে

চাল্‌ করা হয়; মস্কো য়ুনিভারসিটিতে এশিয়া-আফ্রিকা গবেষণা বিভাগ খুলে তাকে কর্মতৎপর করে তোলা হয়। নতুন চোখে, নতুন মন নিয়ে রাশিয়া "নিরপেক্ষ দুনিয়ার" দিকে তাকাতে শুরু করে।

দেখতে পায় এ দুনিয়া তো কম বড়ো নয়! প্রায় ছয় কোটি বর্গ মাইল নিয়ে যে বিশাল পৃথিবী, তার চল্লিশ ভাগই নিরপেক্ষ। তেত্রিশ ভাগ পশ্চিমী শিবিরের আয়ত্তে, আর বাকী সাতাশ ভাগ কম্যুনিস্ট শিবিরের। সমস্ত মানুষের সাতাশ ভাগ নিরপেক্ষ দেশগুলির অধিবাসী, আটত্রিশ ভাগ পশ্চিমী শিবিরের, পঁয়ত্রিশ ভাগ কম্যুনিস্ট দুনিয়ার। এ হিসাবে উপনিবেশিক দেশগুলি বাদ গিয়েছে, যেখানকার জনসাধারণের মধ্যে পশ্চিম-প্রীতি স্বভাবতই অনুপস্থিত।*

এই নিরপেক্ষ পৃথিবীর আশা-আকাঙ্খা মূর্ত হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী নেহরুর কণ্ঠে। এদের সবার হয়ে কয়েক বছর আগেই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "কোন একটি শিবিরে যোগ দেবার অর্থ কি জানেন?" নিজেই উত্তর দিয়েছিলেন, "অর্থ একটাই। নিজের মত বিসর্জন দাও, অন্যের মত গ্রহণ করে তাকে খুশি করো, তার প্রসাদ লাভ করো।" সিংহলের ক্যাণ্ডি শহরে ১৯৫৪ সালের মে মাসে বক্তৃতা করতে গিয়ে নেহরু সমস্ত অদলীয় মানুষের হয়ে বলেছিলেন, "যদি অন্যদের ঝগড়া-বিবাদের জন্যে আমাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়, আমাদের কর্মধারা ব্যাহত হয়, তার চেয়ে দুঃখের কিছুই হ'তে পারে না। আমরা যারা নতুন স্বাধীনতা পেয়েছি, আমাদের বিশ্বশান্তি কামনা অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র ও প্রখর। কেন না, আমরা গড়তে চাই আমাদের দেশগুলিকে নতুন ক'রে। আমরা চাই না ইতিহাসের এই সংকটপূর্ণ দিনে যুদ্ধ এসে আমাদের বহু যুগের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ ক'রে দিক।"

১৯৫৪ সালে আর একটা আন্তর্জাতিক ঘটনায় নিরপেক্ষ দেশগুলির গুরুত্ব আরো পরিষ্কার হ'য়ে উঠল। "কলম্বো পঞ্চশক্তি"র উদ্যোগে এবং প্রধানত ভারতের প্রচেষ্টায় ইন্দোচীনে বহু-বছরের যুদ্ধের অবসান হল, এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার এক ক্ষত-বিক্ষত অঞ্চলে ফিরে এলো শান্তি। পিকিং ও মস্কোতে ব'সে সাম্যবাদী নেতারা দেখলেন অদলীয় দুনিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে মিত্রতার রেশমী সুতোর রাখী-বন্ধনের সময় উপস্থিত।

অদলীয় দুনিয়ার তিনটি প্রধান ঘাঁটি হচ্ছে ভারত, মিশর ও যুগোস্লাভিয়া।

---

* Don Passos নামে বর্তমান লেখকের রচিত প্রবন্ধ "The Peace Area Is Expanding", The Times of India, Aprial 15, 1956, দেখুন। তাতে 'নিরপেক্ষ দুনিয়ার' অনেক কথা রয়েছে।

১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নাসের নিরপেক্ষতা নীতির খোলাখুলি সমর্থন ঘোষণা করেন নি। তাঁর সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল সুয়েজ থেকে ইংরেজ সামরিক শক্তি হটিয়ে দেওয়া। তিনি এ কাজে মার্কিন সহায়তা পাচ্ছিলেন। এমন কিছু তাই করতে চান নি যা আমেরিকাকে নারাজ করবে, ইংরেজকে সুযোগ দেবে তার উপস্থিতি দীর্ঘায়িত করতে।

বলা বাহুল্য, ১৯৫২ সালে নাগিব-নাসের বিপ্লবকে প্রগতিমূলক ঘটনা বলে রাশিয়া স্বীকার করে নি। মনে রাখতে হবে যে দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী বছরগুলিতে রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যের আরবভূমির কোন পরিচয়ই রাখতো না। কমিন্টার্ন যে মনোভাব নিয়ে এ অঞ্চলের সমস্যার বিচার করতো তা ছিল বহুলাংশে বাস্তব-বিবর্জিত, বুদ্ধিসর্বস্ব, ইংরাজীতে যাকে বলে অ্যাকাডেমিক। তা ছাড়া, ভুঁই-ফোঁড় বিপ্লবীদের প্রতি সাম্যবাদী চিত্ত কোনদিনই সুপ্রসন্ন নয়। এ জাতীয় বিপ্লবের সঙ্গে সাম্যবাদী বিপ্লবের কোন সম্পর্কই নেই। নাগিব-নাসের বিপ্লবের প্রগতিমূলক সম্ভাবনা বুঝতে না পেরে দু' বছর মস্কো শুধু তাকে অস্পৃশ্য করেই রাখে নি, কঠোর ভাষায় নিন্দা-মন্দ করেছে। ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসেও রাশিয়ার একজন মিশর-বিজ্ঞ লেখক এল. এন. ভাটোলিনা যে বিশেষণে নাসের রাজত্বকে ভূষিত করেছিলেন তা হচ্ছেঃ "উন্মাদ, প্রগতিবিরোধী, অত্যাচারী, গণতন্ত্রবিরোধী, বাকসর্বস্ব।" এমন কি ১৯৫৫ সালের প্রথমে সোবিয়েত বিজ্ঞান আকাদমী থেকে প্রকাশিত একখানা পুস্তকে আগের বছরের ইঙ্গ-মিশর চুক্তিকে বলা হয় "মিশর ও অন্যান্য আরব দেশগুলির জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।"

কিন্তু ১৯৫৫ সালের এপ্রিলেই সোবিয়েত নীতির আমূল পরিবর্তন হ'য়ে গেল। তার প্রধান কারণ বান্দুং।

পনেরই এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার সুরম্য বান্দুং শহরে উনত্রিশটি এশিয়া-আফ্রিকা দেশের প্রতিনিধি নিয়ে যে মহাসম্মেলন বসলো এই দুই মহাদেশের, এমন কি সারা বিশ্বের ইতিহাসে, সে এক মহান ঘটনা। এর আগে এতোগুলো স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন এশিয়া-আফ্রিকা দেশ কখনো একত্রিত হয় নি। আমন্ত্রিত দেশগুলির মধ্যে সমস্ত রাজনীতি ও সমাজ-নীতির পথ-চলা দেশই ছিলঃ পশ্চিম অনুগামী, সাম্যবাদী, নিরপেক্ষ। ছিল চীন, উত্তর ভিয়েৎনাম, ছিল জাপান, ফিলিপাইন্‌স্‌, পাকিস্থান,* ছিল ভারত, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা। সাম্যবাদী চীন সমকক্ষের সম্মানে এই প্রথম আমন্ত্রিত হন সর্বদলীয় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। উনত্রিশটি দেশের প্রতিনিধি চু এন্ লাই-কে চিনতে পারলেন প্রাচীন ও নবীন চীনের প্রতিনিধির বেশে।

বান্দুং সোবিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টি খুলে দিল। আমেরিকা বান্দুং-এ যে ভুল করল রাশিয়া সতর্কভাবে সে পথ চলল এড়িয়ে। আমেরিকা তার অনুচরদের মাধ্যমে বান্দুং-এর প্রয়াসসাধ্য এশিয়া-আফ্রিকার ঐক্যবদ্ধ সংঘনির্মাণের উদ্যোগকে ব্যাহত, ব্যর্থ ক'রে দিতে চাইলে। শীতল যুদ্ধের মিত্রতানাশক প্রবাহ কয়েকটি ক্ষীণ ধারায় এসে ঢুকল বান্দুং-এর বন্ধুত্ব-প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টা দুর্বল করতে। সোবিয়েত রাশিয়া নিল উল্টো পথ। হঠাৎ সে অদলীয় দুনিয়ার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে উঠল। হ'য়ে উঠলো মিত্র। সবাইকে উদ্দেশ ক'রে বলল, "আমরা তোমাদের স্বাধীনতাকে সম্মান করি। তোমাদের দ'লে ভিড়াতে চাই নে। তোমাদের স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অর্থনীতিকে প্রসারিত করবার মহান প্রচেষ্টাকে আমরা সাহায্য করতে প্রস্তুত। বিনিময়ে কোন সর্ত আরোপ করতে চাই না। তোমরা তোমাদের পথে চলো। শুধু তোমরা আমাদের দুশমনদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের সঙ্গে দুশমনী কোরো না।"

নাসের এ সময়ে এক মহা সমস্যার সম্মুখীন। মিশরকে শক্তিশালী করতে অর্থ চাই, অস্ত্র চাই, কলকারখানা চাই, কুশলী কারিগর চাই। চিরাচরিত মহাজন বৃটেন যেমন দরিদ্র তেমনি কৃপণ। আমেরিকা দিতে চায়, কিন্তু চড়া দামে। অস্ত্র দিতে সে রাজী নয়, ইজরেইলকে চটাবার ভয়ে; অর্থ ও মেশিন দিতে রাজী, কিন্তু সর্ত তার কঠিন, মিশরের স্বাধীনতার গায়ে তাতে আঘাত লাগে। নাসের ভাবলেন এ অবস্থায় সাহায্য চাইতে হবে রাশিয়ার কাছে, হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে দর-কষাকষির জন্যেও রুশ মহাজনের "দিতে চাই, নিতে কেহ নাই" মনোভাবের প্রমাণ বহুলাংশে সহায়ক হবে। বান্দুং-এর পরে কাইরোতে ফিরে গিয়ে রুশ রাজদূতকে তিনি একদিন ডেকে পাঠালেন। বুঝিয়ে বললেন তাঁর সমস্যা। অস্ত্র চাই, ভিক্ষা নয়, খরিদ। হয়তো নগদ দাম দিতে পারবো না, কিন্তু আমাদের পৃথিবীর সেরা তুলো তোমরা নিতে পারো বিনিময়ে। আসোয়ান বাঁধের জন্য মেশিন চাই, কারিগর চাই, যন্ত্রপাতি চাই। শিল্প-গঠনে সাহায্য চাই। বিনিময়ে মিশরের স্বাধীনতা খর্ব হয় এমন কোন সর্ত মানা চলবে না। আমেরিকা সাহায্য দিতে প্রস্তুত। কিন্তু অস্ত্র দিতে বিমুখ। এখন বলো, তোমাদের কি কর্তব্য।

এই সময় সোবিয়েত সরকারের উপ-পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন, বর্তমানে লাঞ্ছিত নির্বাসিত শেপিলভ। আরব দেশগুলির বিষয়ে তাঁর জ্ঞান সুগভীর, সহানুভূতি সুস্পষ্ট। কাইরোতে [illegible] নির্দিষ্ট নাসেরের [illegible] ক্রেমলিন [illegible] হ'য়ে অভাবনীয় সাড়া পেলেন।

অদলীয় দুনিয়াকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছেন; স্থির করেছেন সত্যিকার বৃহৎ-শক্তি হ'তে গেলে আমেরিকাকে অর্থনৈতিক মল্লযুদ্ধে আহ্বান করতে হবে। এতদিন তাঁরা ভাবের জগতে আর সামরিক ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা ক'রে এসেছেন, এবার প্রতিযোগিতা করবেন আর্থিক জগতে।

কিন্তু শেপিলভের মিশরকে অস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটি সহজে গ্রহণ করতে রাজী হ'লেন না। তার কারণ ছিল প্রচুর। চতুঃশক্তির শিখর-সম্মেলন তখন সমাসন্ন। শীঘ্রই জেনিভাতে মিলিত হবেন বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়ার প্রধান নেতৃবৃন্দ। সেণ্ট্রাল কমিটি এমন কিছু করতে চাইলেন না যাতে এই সম্ভাবনাপূর্ণ সম্মেলনের সাফল্য ব্যাহত হয়। তা ছাড়া, মিশরকে অস্ত্র দেওয়া মানেই বহুদিনের চলতি মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতিকে একেবারে ঘুলিয়ে দেওয়া। তার জন্য রাশিয়া কতোখানি প্রস্তুত তা ভেবে দেখা উচিত। সে কি প্রস্তুত মধ্যপ্রাচ্য প্রাঙ্গণে আবির্ভূত হ'তে তার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে?

এ নিয়ে অনেক গভীর আলোচনা হল মস্কোতে, পূর্ব য়ুরোপের রাজধানীগুলোয় এবং পিকিং-এ। শেপিলভ একবার কাইরো ঘুরে এলেন। ইতিমধ্যে জেনিভাতে বসলো চার দেশের শিখর-বৈঠক। তাতে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে কোন আলোচনাই হ'ল না। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে পাশ্চিমী দেশগুলি রুশ কূটনীতির এই বিরাট আসন্ন পরিবর্তনের কোন আভাসই পেল না। না বৃটেন, না আমেরিকা বিশ্বাস করতো সাম্যবাদী দেশগুলির প্রয়োজন মিটিয়ে রাশিয়ার অন্য কোন দেশকে সাহায্য করার ক্ষমতা আছে। অথবা জানতে পেরেছিল, পূর্ব য়ুরোপের গোলযোগ সত্ত্বেও রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যের নিস্তেজ প্রাণধারায় আনতে পারবে বিপ্লবী বন্যা।

জেনিভা বৈঠকের দু মাস না যেতেই সোবিয়েত রাশিয়া মিশরকে অস্ত্র সরবরাহ করতে শুরু করল। এ কাজটা আরম্ভ হল কোন ঢাক ঢোল না বাজিয়ে। রাশিয়া নিজে মিশরের সঙ্গে চুক্তি করলো না, ভিড়িয়ে দিল চেকোশ্লোভাকিয়াকে। মস্কো থেকে দু চারটি যা বাক্য নিঃসৃত হল তার তাৎপর্য হচ্ছে, "এটা কিছুই নয়। সামান্য কিছু অস্ত্র ওদের দিচ্ছি আমরা। নিতান্তই একটা বাণিজ্যিক ব্যাপার। এর কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই।"

যখন দেবে, তখন আস্তে আস্তে দেবে: মেকিয়াভেলির এই প্রাচীন উপদেশ সোবিয়েত সরকার মানলেন না। আসোয়ান বাঁধ নিয়ে রুশ সাহায্য দানের অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ও তার পরিণামের কথা আগেই বলা হ'য়েছে। রাশিয়া অত বড় প্রচেষ্টার ঝুঁকি নিতে তখনো প্রস্তুত ছিল না; হয়তো তার সাধ্যও ছিল না। কিন্তু ১৯৫৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে বিনাসর্তে আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব সে পাঠাল সাতটি প্রাচ্য দেশকে: (২৭শে সেপ্টেম্বর), সিরিয়া (১৭ই নভেম্বর), আফগানিস্তান (১৮ই ডিসেম্বর), পাকিস্তান (৬ই ফেব্রুয়ারী) ভারত (১২ই ডিসেম্বর), বর্মা (৭ই ডিসেম্বর) ও তুর্কী (৭ই ফেব্রুয়ারী)। ১৯৫৬ সালের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই অস্ত্র সরবরাহের প্রস্তাব পেল আরব ও সুদান; আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব, সৌদী আরব, এমেন, লেবানন।*

১৯৫৭ সালের প্রথম মাসে স্যার এ্যাণ্টনী ইডেন ও রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার যখন বারমুডা বৈঠকে মিলিত হলেন তখন পৃথিবীর বৃহত্তম সমস্যা, তাঁদের কাছে, সোবিয়েত শক্তির মধ্যপ্রাচ্য প্রাঙ্গণে বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠা। ১লা ফেব্রুয়ারীতে একটি সংযুক্ত ঘোষণায় তাঁরা বললেন, "পশ্চিম ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে বিভেদ কমাবার জন্যে সব রকম চেষ্টা করতে হবে। এ অঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমান সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে আমরা উৎসুক। এ অঞ্চলের সমস্যার সমাধানে, কোন বিশেষ রাষ্ট্র বা গোষ্ঠিকে অস্ত্র সাহায্য করতে পারে, এ বিশ্বাস আমাদের নেই। সমাধান হতে পারে কেবলমাত্র প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে (অর্থাৎ আরব ও ইজরেইলের মধ্যে) শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনে। সোবিয়েত রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলিকে অস্ত্র দিয়ে শুধু ওখানকার গোলমাল বাড়িয়ে তুলেছে। আর যুদ্ধকে কাছে ডেকে এনেছে। আমরা এ বিপদ দূর করতে চাই।"

পরের দিন মার্কিন সেনেটে ইডেন ভাষণ দিলেন। তাতেও প্রধান বক্তব্য সোবিয়েতের আরবভূমিতে পদার্পণ। "য়ুরোপে আটকা পড়ে সোবিয়েত শক্তি দক্ষিণে হাত বাড়িয়েছে নতুন দেশ গ্রাস করতে", বললেন ইডেন। এতে অবশ্য নতুন কিছু নেই। রাশিয়ার

* মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলিকে আমেরিকা যুদ্ধোত্তর যুগে বিস্তর আর্থিক ও সামরিক সাহায্য ক'রে এসেছে। আজ পর্যন্ত তুর্কী পেয়েছে এক হাজার মিলিয়ন ডলার; অর্ধেকের বেশি সামরিক সাহায্যে। ইজরেইল একশো ত্রিশ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ মিশর, ইরাক, সৌদী আরব, লেবানন ও জর্ডানের মিলিত অঙ্কের চেয়েও বেশি। ইরাককে বাগদাদ চুক্তির সংবাদে অস্ত্র সাহায্য সবে মাত্র শুরু হয়েছে, ১৯৫৭ সালের প্রথম থেকে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক দিয়েছে অর্থ সাহায্য সেচকার্যের জন্যে। মিশর বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে সার-নির্মাণ কারখানার জন্যে পেয়েছে সাত মিলিয়ন ডলার, দুঃস্থ জনগণের জন্যে বেসরকারী সাহায্য উনিশ মিলিয়ন ডলার। সৌদী আরব পেয়েছে অস্ত্র, বিমান এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে যানবাহন উন্নত করতে পাঁচ মিলিয়ন ডলার। আইসেনহাওয়ার ডকট্রিনের ২০০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে আটটি দেশের জন্য ১২০ মিলিয়ন ডলার ইতিমধ্যেই বরাদ্দ হয়ে গেছে, তবে কে কতোটা পাবে তা ঘোষণা করা হয়নি। জর্ডানকে ১০ মিলিয়ন ডলারের বিশেষ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। একমাত্র সিরিয়াই কোন মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করে নি। লেবাননও আইসেনহাওয়ার ডকট্রিন গ্রহণের আগে সাহায্য বিশেষ পায়নি। যাঁরা অনগ্রসর দেশগুলিকে মার্কিন সাহায্যের বিস্তারিত তথ্য জানতে চান, নিউ ইয়র্ক টাইমস্ কর্তৃক প্রকাশিত উচ্চাঙ্গ মাসিক পত্রিকা Current Historyর আগস্ট, ১৯৫৭, সংখ্যা পড়লে তাঁরা উপকৃত হবেন।

সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসে আপনারা এই ধারাই দেখতে পাবেন। কিন্তু এখন বদলেছে মূল্য, পদ্ধতি, প্রতীক। এখন যে যুদ্ধ তা মানুষের মনের জন্যে। এক সময় মধ্যপ্রাচ্যে চলেছিল ধর্মের সংঘাত। এখন আদর্শের। ক্রেমলিন থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশে, এবং সমগ্র এশিয়ায়, পাঠান হয়েছে নতুন এক প্রবাহ। তার মধ্যে রয়েছে স্তুতি, হুমকি, অস্ত্র-দাও, অর্থ-দাও বুলি, আবার মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করার ষড়যন্ত্র। সবটাই পশ্চিম-বিরোধী পোশাকে সজ্জিত। এখন, এই সর্বনাশের মুখোমুখি, কি আমাদের কর্তব্য?"

কর্তব্য ঠিক করতে গিয়ে দেখা গেল, লণ্ডন ও ওয়াশিংটন দ্বিমত। ডালেস চাইলেন নাসেরকে তোষণ করতে। দিলেন আসোয়ান বাঁধ নির্মাণে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। পরে তা ভাঙলেন। এলো সুয়েজ সংকট। এলো বৃটেন, ফ্রান্স ও ইজরেইলের ষড়যন্ত্র। মিশর আক্রমণ।

রাশিয়ার হাতে তখন বিরাট সমস্যা হাঙ্গারীর গণ-বিক্ষোভ নিয়ে। এই "বিপ্লবে" কতখানি মার্কিন হাত, কতখানি সম্পূর্ণ রুশ দায়িত্ব তা নিয়ে বিতর্কের সম্ভাবনা এখনো রয়েছে। কিন্তু মিশর আক্রমণের দায়িত্ব যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ইংরেজ, ফরাসী ও ইজরেইলী দলপতির সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

সমস্ত জাতীয়তাবাদী আরবের দৃঢ় বিশ্বাস সোভিয়েত চরমপত্র না পেলে ইডেন ও ম্যালে মিশর অভিযান অত সহজে থামাতেন না। এই চরমপত্র সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির একটি বিশিষ্ট নথি। শুধু ইংরেজ, ফরাসী ও ইজরেইলকে যুদ্ধের হুমকি দেওয়াই এর প্রধান তাৎপর্য নয়; তারও চেয়ে বড় তাৎপর্য এই চরমপত্রে সর্বপ্রথম রুশ সরকার পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করেন যে, তাঁর আয়ত্তে এখন সব দূরক্ষেপণ রকেট আছে, যার সাহায্যে কোন সৈন্য নিযুক্ত না করেও রাশিয়া বৃটেন ও ফ্রান্সকে আক্রমণ করতে পারে।

সুয়েজ সংকটের ভয়ার্ত দিনগুলিতে সোভিয়েত কূটনৈতিক তৎপরতা সত্যই বিস্ময়কর। একদিকে জাতিপুঞ্জ, অপরদিকে আরবভূমিতে এবং আবার একই সঙ্গে অন্য দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত সরকার নানা প্রবাহে একটা প্রচণ্ড আন্দোলনের সৃষ্টি ক'রে তুললেন, যার উদ্দেশ্য একাধারে আরব জাতীয়তাবাদের স্থায়ী মিত্রতা অর্জন, আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বন্ধুত্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা, মধ্যপ্রাচ্যে ইংগ-ফরাসী প্রভুত্বের দ্রুত অবসান ও মার্কিন প্রসারের অবরোধ। ৩১শে অক্টোবর সুয়েজ আক্রান্ত হল। পরের দিনই সোভিয়েত সরকার বান্দুং সম্মেলনের দেশগুলির নিকট এক জরুরী বৈঠকের আবেদন পাঠালেন। ২রা নভেম্বর বৃটেন ও ফ্রান্সকে এক লিপি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন ১৮৮৮ সালের আন্তর্জাতিক চুক্তি অমান্য ক'রে তারা সুয়েজ জলপথ অবরোধ করেছে, "মিশর ও অন্যান্য দেশগুলির উপর এই আক্রমণের সবরকম দায়িত্ব আপনাদের, তার ফলাফলও আপনাদেরই ভোগ করতে হবে।" ঐ দিনই দলে দলে "স্বেচ্ছাসেবক" মস্কোতে নাম লেখাতে লাগলো মিশরের সপক্ষে যুদ্ধ করবার ইচ্ছা জানিয়ে। ৫ই নভেম্বর বুলগানিন আইসেনহাওয়ারকে এক পত্রে জানালেন, আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাশিয়া মিশরের উপর এই অত্যাচার বন্ধ করতে তৈরী। যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রবল নৌবহর রয়েছে ভূমধ্যসাগরে। সোভিয়েত য়ুনিয়নেরও রয়েছে শক্তিশালী নৌ ও বিমান বহর। জাতিপুঞ্জের অনুমতি নিয়ে মার্কিন ও সোভিয়েত শক্তি যদি একত্রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবে মিশর ও অন্যান্য দেশের অন্যদের উপর এ আক্রমণ অতি সহজেই ব্যাহত হতে পারে। সোভিয়েত সরকার আপনার দেশকে অনুরোধ জানাচ্ছে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জের আদেশ নিয়ে মিলিত প্রতিরোধে অবতীর্ণ হতে। জাতিপুঞ্জের সেই উত্তেজিত দিনগুলিতে যোগদানে যতদূর সম্ভব সোভিয়েত প্রতিনিধি বৃটেন ও ফ্রান্সকে জর্জরিত ক'রে তুললেন।

সোভিয়েত সরকার অবশ্যই জানতেন যে, আইসেনহাওয়ার এই অভাবনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না। তাই একটি নতুন চরমপত্র তারযোগে গিয়ে পৌঁছল বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট। বৃটেনকে বুলগানিন স্মরণ করিয়ে দিলেন, সে আক্রমণকারী, জাতিপুঞ্জে বার বার সে ধিক্কৃত। তারপরে এলো সেই ঐতিহাসিক সতর্কবাণী:

"আজ যদি বৃটেন তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী কোন রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হয়, যার হাতে রয়েছে যুদ্ধের আধুনিকতম অস্ত্র, তবে ইংরাজের মনোভাব হবে কেমন? এমনও দেশ আজ আছে যাদের বৃটেনের উপকূলে নৌ বা বিমান বাহিনী পাঠাতে হবে না, অন্য উপায়ে, যথা রকেট যন্ত্রেই, তাকে ঘায়েল করতে পারবে।......বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এক্ষুণি এ আক্রমণ প্রত্যাহার করুক, এই আমাদের দাবী।......আক্রমণকারীকে শায়েস্তা ক'রে বাহুবলে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি পুনঃস্থাপনে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

এই চরমপত্র লণ্ডনে পৌঁছবার বারো ঘণ্টার মধ্যে বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

(ক্রমশঃ)

ট্রেন থেকে নেমে শংকর চক্রবর্তী এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন, কই শ্যামলেন্দু ত' স্টেশনে আসেনি। যাই হোক মিনিট দুই-তিন অপেক্ষা করা যাক।

মফঃস্বল শহরের স্টেশন, বেশ ছোট, কিন্তু সেই তুলনায় প্রচুর ভিড়। শংকর ভাবলেন, লোক ত' কম নয় এখানে, ভাল করে অর্গানাইজ করলে পার্টির কাজ বেশ জমে উঠবে।

কিন্তু দাঁড়িয়ে ভাববার জায়গা প্ল্যাটফর্ম নয়, মুটেদের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়লেন শংকর, মালপত্র ধরে টানাটানি ঝগড়াঝগড়ি শুরু করে দিয়েছে। একটা জোয়ান মত ছোকরাকে শংকর বললেন, তুই-ই নে বাবা, প্ল্যাটফর্মের এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতে হবে, তুই শক্ত সমর্থ আছিস, দৌড় ঝাঁপ করতে পারবি।

চার আনা পয়সা বেশি লাগবে বাবু।

তাই দেব রে বাবা, নে তোল, বেডিংটা তার মাথায় তুলে দিলেন শংকর।

প্ল্যাটফর্মের এমুড়ো থেকে ও'মুড়ো পর্যন্ত খোঁজাই সার হ'ল, শ্যামলেন্দুর একগাছি চুলও দেখা গেল না। মনে মনে হাসলেন শংকর, বিয়ে করে শ্যামলেন্দুটা একেবারে গেছে, পাংচুয়ালিটি কর্তব্যজ্ঞান সব শিকেয় তুলেছে।

আর এই এক জ্বালা হয়েছে, এই লোকের চাউনি, তাঁকে দেখেই লোকে কেমন চমকে ওঠে, কোথায় দেখেছি না ভদ্রলোককে? কিছুক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে চলে যায়। কোথায় আবার দেখেছেন, কাগজে দেখেছেন। নাম বললে এখুনি চিনবেন, তখন আবার উলটো ফ্যাসাদ, পাঁচ হাজার কথা আর প্রশ্ন—সেদিন ফুড মিনিস্টারকে যা বেচালে ফেলেছিলেন, তা ঠিকই করেছেন, এটাই দরকার, কিংবা আপনার সেমবরের স্টেটমেন্টটা পড়লুম, ওয়াণ্ডারফুল, পার্টির লোকদের শুধু কর্মী হলেই চলবে না, সৎ কর্মী হতে হবে। অত্যন্ত সত্যি কথা, আমাদের ইণ্ডিয়ান অ্যাটিটিউডটা আপনি ভোলেন নি, আমি আপনার অগুনিত অনুরাগীর একজন, বাস্তবিক অ্যাডমায়ারার অফ ইয়োর ক্যারাক্টার অ্যাণ্ড পারসোনালিটি।

তবু ভাল, তাঁর পারসোনালিটিই হোক আর যাই হোক, শংকর ভাবেন, পার্টিটা দাঁড়িয়ে গেলেই তিনি বাঁচেন।

টিকিট দেখিয়ে বাইরে এলেন শংকর। রিকশ স্ট্যাণ্ডের কাছে আসতে দেখেন প্রবল বেগে দৌড়তে দৌড়তে একটা রিকশ এসে দাঁড়াল আর তার থেকে লাফিয়ে নামলেন শ্যামলেন্দু।

সামনেই শংকরকে দেখে হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন শ্যামলেন্দু, এস ভাই এস, আই অ্যাম এক্সট্রিমলি সরি, পাঁচ মিনিট লেট হয়ে গেল। এই তোমার বউদির জন্যেই ত', মেয়েদের নিয়ে কোথাও বেরুতে আছে, এই হচ্ছে এই হচ্ছে করতে করতে আধঘণ্টা কাটিয়ে দিল।

রিকশর দিকে ফিরে চাইলেন শ্যামলেন্দু, কই গো নেমে এস না, তোমার সবেতেই ঢিমেতেতালা। গলার স্বরটা রাগের, কিন্তু তার মধ্যে একটু প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ের সুর আছে বলেও শংকরের মনে হল।

শংকর হাসতে হাসতে বললেন, আহা, ও'র ওপর দোষ নাই বা চাপালে। স্টেশন থেকে এটুকু আসতে আমার কোনও অসুবিধে হবার কারণ নেই। বরং এখন যদি তোমরা না আসতে অসুবিধেতে পড়তুম, কোনদিকে যাব ভেবে পেতুম না।

শ্যামলেন্দুর স্ত্রী সাইকেল রিকশ থেকে নেমে এসেছেন। শংকরের দিকে চেয়ে হাত জোড় করলেন, আতিথেয়তার ত্রুটি মার্জনা করুন।

নমস্কার করে হাসতে হাসতে শংকর বললেন, দেখুন, আতিথেয়তা বস্তুতে চলবে না, শ্যামলেন্দুর বাড়িতে আমি কোনদিনই অতিথি নই, বাড়ির লোক। হস্টেলে আমরা এ ওর জামা পরতাম, এ ওর টাকা পর্যন্ত নিতাম অপরকে না জানিয়ে। আজ না হয় ওর ঘরসংসার হয়েছে, তাবলে সে বাড়িতে অতিথি হতে হবে?

এই ত, এই কথা[illegible]কে একটু বুঝিয়ে দাও ত, শ্যামলেন্দু হাসতে থাকেন, চিঠি পাওয়া থেকে ত' ভয়েই অস্থির। এমন নামজাদা লোক আসবেন, কেমন করে যে ঠিক ঠিক যত্ন আর সম্মান রাখা যায়। আমি যত বলি ও নামজাদা নেতা নয়, শংকর মাত্র, কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। খবরের কাগজে নিত্য নাম বেরোনোর মাহাত্ম্য আছে বলতে হবে।

শ্যামলেন্দুর স্ত্রী একটু লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করলেন। শংকর একবার তাঁর দিকে

চাইলেন, ঝকঝকে মাজা তামাটে রঙ, ফরসা রঙেই মনে হয়, ভারী মিষ্টি মুখটা, দোহারা গড়ন, বছর বাইশ তেইশ বয়স বোধ হয়, বেশ বউ হয়েছে শ্যামলেন্দুর।

আপনার সংকুচিত হবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই; মুটের দাম মেটাতে মেটাতে শঙ্কর বললেন, আর যদি নিতান্তই সংকোচ বোধ করেন, বাড়িতে তা কাটিয়ে নেবেন এক পেয়ালার জায়গায় তিন পেয়ালা চা দিয়ে।

কি ওরকম করে চাইছেন যে? শঙ্কর আবার বলে, তিন পেয়ালা চায়ের কথা বলেছি বলে? শ্যামলেন্দুটা মুখে শঙ্কর মাত্র বলেছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছে, শঙ্করবাবু পরম চরিত্রবান ব্যক্তি, কোন রকম অমিতাচার করে না।

শ্যামলেন্দু দূরের টিউবওয়েলটার দিকে চাইতে চাইতে বললেন, কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই। এরমধ্যে তুমি কতখানি পালটে গিয়েছ কি করে জানব। লোকমুখে তোমার কথা শুনি, তুমি নাকি আচারে ব্যবহারে পরম সংযত ব্যক্তি, তোমার সুখসুবিধেগুলো ত দেখতে হবে।

একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল শঙ্করের মুখে, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখটা ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ওপর ঘষতে ঘষতে যেন নিজের কাজকে সমর্থন করার ভঙ্গিতে বললেন, আমাদের দিনরাত দৌড়-ঝাঁপ করে বেড়াতে হয় তাতে শরীরের ওপর এমনিতেই অত্যাচার হয়। তাই খাওয়া-দাওয়াগুলোতে একটু রেগুলারিটি রাখতেই হয়, না হলে শরীর ভেঙে পড়বে।

শ্যামলেন্দুর স্ত্রী সমর্থনে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, ঠিকই ত, ঠিকই ত, লোকে শুধু বাইরের সংযমের বাড়াবাড়িটাই দেখে, কিন্তু যে কাজ করছে সে যে একজন মানুষ, কড়াকড়ি না করলে তার শরীরই টানতে পারবে না, সেটা ত' কেউ ভেবে দেখে না।

শঙ্কর একবার বড় বড় চোখে শ্যামলেন্দুর স্ত্রীর দিকে চাইলেন, তারপর বেডিংটা হাতে তুললেন।

শ্যামলেন্দু বললেন, হ্যাঁ, যাওয়া যাক, তারপর নিজেদের সাইকেল রিকশটাকে ডাকলেন। আরও একটাকে।

একটা রিকশায় শঙ্করের বেডিংটা রেখে তাতে অঞ্জলিকে উঠতে বললেন, আর একটিতে নিজে আর শঙ্কর উঠলেন, অনেক দিন পর দুই বন্ধুতে গল্প করতে করতে যাবেন।

আগের কথার জের টেনেই শ্যামলেন্দু বললেন, তোমার কথা শুনলে হাসি পায়। যেন শুধু শরীরের জন্যেই তোমার এই ছুঁই ছুঁই অভ্যাস, আসলে তোমার মনের পরিবর্তন হয়েছে। তোমার হাল আমলের লেখাগুলো আমি পড়েছি।

শঙ্কর কেমন অস্বস্তি বোধ করেন, রাস্তার ধারের টেলিগ্রাফের তারগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে বলেন, তুমি আমার রকম দেখে হয়ত হাসছ শ্যামল, কিন্তু আমার মত অবস্থায় পড়লে...

শ্যামলেন্দু হো হো করে হাসেন, আমি কোনদিন তোমার মত হতে পারব না। আজিমুদ্দিন কলেজে অধ্যাপনা করেই আমার দিনগুলো কেটে যাবে।

শঙ্কর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাঠের দিকে চেয়ে রইলেন। সদ্য কাটা ক্ষেতে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ঝুড়ি করে ঝরা ধান কুড়োচ্ছে, দুটো কালোর ছোপ দেওয়া সাদা কুকুর তাদের চারপাশে দৌড়চ্ছে, তাদের পায়ের তলা দিয়ে গলে যাচ্ছে, কতকগুলো ছোট্ট ছোট্ট রঙীন পাখি লাফিয়ে লাফিয়ে উড়ছে মাঠের ওপর।

শ্যামলেন্দু শঙ্করের দিকে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসেন, তারপর বলেন, জীবনটা কি অদ্ভুত, নয়? হোস্টেলে তুমি কি হৈচৈ করতে, আর আমি পরম ভালো ছেলে ছিলুম। আর আজ আমি বকেই চলেছি, তুমি শান্ত হয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে আছ। কত বড় মহৎ জীবন তোমার সামনে, তবুও দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলছ, এই আক্ষেপ আমার কি হবে? আমি ত' তোমাকে ছেলেবেলা থেকে চিনি, তাই আমার সাধারণ লোকের চেয়েও বেশি বিস্ময় লাগে তোমাকে দেখে কি আশ্চর্য পরিবর্তন, ফুটবল মাঠের গুণ্ডা ক্যাপ্টেন থেকে নেতা! প্রতিভা অবশ্যই ছিল তোমার মধ্যে, কিন্তু কি করে হল বল দেখি এই বিরাট পরিবর্তনটা? মনে হয় তোমার মনের ভেতর একটা ইতিহাস লেখা হয়ে গিয়েছে, ইচ্ছা হয়, আবিষ্কার করে পাঠোদ্ধার করি।

ইতিহাসই ত, নির্মম ইতিহাস, বেরিয়ে আসছিল শঙ্করের মুখ থেকে, কিন্তু সামলে নিয়ে হেসে বললেন, ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে সর্বত্রই ইতিহাসের উপাদান খুঁজে বেড়াচ্ছ, কিন্তু মানুষের মনের কি আর ইতিহাস হয়? বাবার জমিদারী ত' তাঁর আমলেই লাটে উঠেছিল, সুতরাং এম এ পাশের পর চাকরি একটা জুটিয়ে নিয়েছিলাম বস এণ্ড থ্যাকার্সে, কাজ তেমন কিছু ছিল না, অফিস টিমের হয়ে খেলতুম সেটাই আসল। তারপর বসন্ত হল, এই চোখটা গিয়েছে, (নিজের কালো চশমার ডান দিকের গ্লাসটায় আঙুল দিলেন শঙ্কর), তখন চাকরি গেল। শরীরটাও ভারী খারাপ হল, গিরিডিতে গেলুম। সেখানে পার্টির নেতা বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ হল, তাঁর কাছেই পড়াশুনো, তাঁর কাছেই কাজের শুরু।

ঘটনা হিসেবে অনেকখানিই সত্যি বলা হল, অসুখ করেছিল তবে সে ত' ছেলা-বেলায় একবার হয়ে ছিল। গিরিডিতে যাননি, লিলুয়ার বস্তিতে ছিলেন। কিন্তু মনের সেই ইতিহাস, সে ত কোনওদিনই বলা চলবে না, পরমতম বন্ধুকেও না। এক মুহূর্তে দপ করে গোটা জীবনটা শঙ্করের চোখের সামনে জ্বলে উঠল, সেই হতাশায় ভরা দিনগুলো, সেই যন্ত্রণায়

কাতর রাত্রিগুলো, শিলুয়ার বস্তিতে আত্মহত্যার সংকল্প, হঠাৎ মনে হওয়া যেটুকু জীবন আছে, তা' পরের জন্য প্রদীপ করে জ্বালিয়ে তুলতে হবে, তারপর একচক্ষু নিয়ে সেই দিবারাত্র পড়াশুনো, বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় আস্তে আস্তে পার্টির পত্রবাহক থেকে নেতৃত্বের পদে উন্নতি। অনেকদিনের অনেক পরিশ্রম, তা শুধু মনের আগুনকে ভোলাবার জন্যে।

কিন্তু ছেলেবেলার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে শ্যামলেন্দু। আচ্ছা, আর একবার ছেলেবেলাটা ফিরে পাওয়া যায় না, যখন মনে হয় জীবনটা নিজের ইচ্ছামত গড়ে তুলব? নেতা হয়েছেন, কিন্তু ইচ্ছায় তিনি নেতা হননি, জীবনকে জ্বালিয়ে তুলেছেন লোকের সামনে, আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে, কিন্তু তিনি যে পুড়ছেন, কেউ চোখের জলে সেই আলো নিভিয়ে দিতে পারে না? ভাবতে ভাবতে শঙ্কর একবার শ্যামলেন্দুর স্ত্রীর রিকশার দিকে চাইলেন, তারপর শ্যামলেন্দুর দিকে চেয়ে বললেন, ছেলেবেলাটা বেশ ছিল, না? কেমন হৈ হৈ করে খেলে বেড়াতাম, ভাবনা চিন্তা কিছু ছিল না।

কেন, এখনই বা খারাপ কি আছে, এত মানসম্মান প্রতিপত্তি। জীবনে লোকে যা পায় না, তা' তুমি পেয়েছ। অবশ্য যোগ্য লোকই পেয়েছে। তোমার লেখার মত ইনস্পায়ারিং লেখা আমি খুব কমই পড়েছি।

সে যাক-গে, কিন্তু সেই ঘটনাটা তোমার মনে পড়ে শ্যামল, সেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে নাজেহাল করা?

মনে আবার নেই, পুরোন দিনের সেই হাসির ঘটনাটা মনে পড়তে হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল শ্যামলেন্দুর মুখ, তোমার মাথায় খেলতও বটে। বাবাঃ, সেই সাড়ে তিনশ জোড়া খড়মের আওয়াজ।

পরীক্ষার সময় রাত জেগে পড়তেই হবে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এগারোটার পর আর আলো জ্বালতে দেবেন না। কাজে হস্টেলে ভূত এল। উঃ সাড়ে তিনশ জোড়া খড়ম ভাড়া করাতে কি কম কষ্ট হয়েছে? কি কাণ্ডই না হয়েছিল সেই রাত্রে, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট একতলা থেকে শোনেন দোতলায় ছাদ পেটা হচ্ছে। দোতলায় গিয়ে দেখেন সেখানে কেউ কোথাও নেই। তেতলায় ছাদ পেটা হচ্ছে, তেতলায় গিয়ে দেখেন না দোতলায়, দোতলায় এসে দেখেন একতলায়, শুধু পাগল হতে বাকি ছিল সুপারিনটেণ্ডেণ্টের।

পুরোন দিনের সেই মজার ঘটনা মনে করে হো হো করে ছেলেমানুষের মত গা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগলেন দুই বন্ধু।

রিকশা দুটো দাঁড়িয়ে গিয়েছে, চৌমাথায় হাত দেখিয়েছে পুলিস। শঙ্কর ... তোমাকে চিনতে পেরেছে রাস্তার লোকে, রিকশার পাশে ভিড় জমতে শুরু করেছে।

হাসিটা গিলে নিয়ে বিরক্ত হয়ে শঙ্কর রাস্তার দিকে চাইলেন। ছোট ভাঙ্গা ফুটপাথে লোকেরা তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে, আশে-পাশের দোকান থেকে বাড়ির জানলা থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে লোকে। কতকগুলি ছোকরা এগিয়ে এল, হাতজোড় করে বললে, নমস্কার স্যর।

চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী শঙ্করের দুটো হাত বুকের কাছে উঠলো, মুখে একটুকরো হাসি ফুটল, নমস্কার।

আপনার মিটিং ত' কাল, আমরা কাল আপনাকে রিসিভ করবার জন্যে স্টেশনে যাব ঠিক করেছিলাম, গাড়ির বন্দোবস্তও হয়ে গেছে। আপনি কাউকে না জানিয়ে আজ হাজির হলেন, আর এই রিকশায় করে সকলের অজ্ঞাতে শহরে ঢুকছেন?

শঙ্কর একটু হেসে বললেন, আপনারা জানেন না এই শহরে আমার এক বন্ধু থাকেন, (শঙ্কর শ্যামলেন্দুর দিকে আঙুল দেখালেন), আজ আমি তাঁর বাড়িতে এসেছি। কাল আমি রাজনীতির জন্যে আপনাদের কাছে হাজির হব।

আচ্ছা স্যর আচ্ছা স্যর। ছেলেগুলি যেন কৃতার্থ হয়ে চলে গেল।

মোড় পেরিয়ে এগিয়ে চলল গাড়ি।

শ্যামলেন্দু বললেন, সমস্ত মানুষের চোখের সামনের এই উজ্জ্বল জীবন ছেড়ে দিয়ে তুমি ছেলেবেলার সেই গণ্ডীর মধ্যে ফিরে যেতে চাও কেন বুঝি না। মানুষ হাতের কাছে পেলে দামী জিনিসের কদর বোঝে না।

সত্যই, শঙ্কর হাসলেন, সেই তুমি, তোমার সুখের সংসারটা যে একজনের কাছে একটা অমূল্য আনন্দের জীবন বলে মনে হতে পারে তা তুমি ভাবতে পার কি?

সুখের সংসার আর কি, বিয়ে ত সবাই করে, সংসারও করে, এতে আর নতুনত্ব কি আছে। বিনয়ের আধিক্যে দুটো জীবন সমান করে দেখো না শঙ্কর।

বোঝান যাবে না, তাই শঙ্কর চুপ করলেন, রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাস্তার দু' একজন তাঁকে চিনতে পারছে, নমস্কার করছে, শঙ্করও প্রতিনমস্কার করছেন।

শহরের অপর প্রান্তে নদীর ধারটিতে কলেজ। তার পাশেই কোয়ার্টার। পুরোন আমলের বেশ ভাল দোতলা বাড়ি। সব দেখে শুনে শঙ্কর বললেন, অধ্যাপকদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ... নিয়ে আর আমি কোন বক্তৃতা দেব না। এই রকম হালে থাকতে পারলে কিং খালেদও আজিমুদ্দিন কলেজে চাকরি নিতেন।

শ্যামলেন্দু বললেন, বাড়িটি অবশ্যই ... জুটেই পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু

শুধু বাড়ি পেলেই হয় না, পাশের অধ্যাপকদের বাড়ি গিয়ে দেখো। আসলে বাড়ির লোকেদের—শ্যামলেন্দু অঞ্জলির দিকে চাইলেন। অঞ্জলি তাড়াতাড়ি 'চা আনি' বলে লজ্জানত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেইদিকে চাইতে চাইতে শংকর বললেন, বুঝেছি, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

শংকর হাসতে লাগলেন, তোমার স্ত্রী ভাগ্য ভাল।

কথাটা শুনলে আনন্দ হবেই, একটু বুকটান করে দাঁড়ালেন শ্যামলেন্দু, তারপর ঈষৎ উপদেশাশ্রিত স্বরে বললেন, এবার কাজ থেকে একটু সময় করে নিয়ে তুমিও একটা বিয়ে করে ফেল, আর তাঁর শুধু গৃহিণী হলেই চলবে না গৃহিণী সচিব মিথ—

শংকরের মুখটা ঈষৎ পাংশু হয়ে গেল, চোখে চশমা, না হলে দেখা যেত নষ্ট হওয়া চোখটাও ভারী হয়ে উঠেছে। তাঁর বন্ধু ডাঃ সোমের কথা মনে পড়ল, ওয়েল জেণ্টলম্যান, ইউ শুড রিমেমবার দিজ থিংগস্, ইফ হ্যাভ কনসায়েন্স—ইউ নো, ইউ নো কিন্তু শংকর চক্রবর্তী তর্জনী সংকেতে হাজার হাজার লোকের নতুন সমাজ গড়ে তুলতে পারেন, স্ত্রীপুত্রের একটি ছোট সংসার গড়ে তুলতে পারেন না? মুখে ফুটে ওঠা একটা কাতর উক্তি করতেও অহংকারে বাধে শংকর চক্রবর্তীর, ঠোঁটে মুখে একটা তৈরি-করা হাসির প্রলেপ বুলিয়ে অল্প মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, করব ত' ভাবি, বয়স ত বেড়েই চলেছে, কিন্তু এত কাজ, বুঝলে শ্যামল, কিছুতেই সময় করে উঠতে পারি না।

কিন্তু ওর মধ্যেই সময় করে নিতে হবে।

হ্যাঁ, তাই ভাবছি।

জলখাবার নিয়ে এলেন অঞ্জলি। শংকরকে বললেন, দেখুন, এক কাপের বেশি চা দিই নি, আর এই দুটো সন্দেশ আর রসগোল্লা দিয়েছি। সমস্ত বাড়িতে তৈরি, সুতরাং আপনার আচার ব্যাহত হবে না।

হিন্দু বিধবা নয়, পুরুষ মানুষ, আচারশীল বলার মধ্যে যেন প্রাচীনপন্থী বলে গাল দেওয়ার মত একটা খোঁচা থাকে। এখানেও সেই কথা শুনে শংকর যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, মৃদু অনুযোগের দৃষ্টিতে চাইলেন অঞ্জলির দিকে।

অঞ্জলি বোধ হয় বুঝলেন সেটা। বললেন, আমার বাবাও খাওয়াদাওয়া থাকা সম্বন্ধে অত্যন্ত নিষ্ঠাশীল ছিলেন। তাতে দেখেছি, অনেক বয়স পর্যন্ত তাঁর শরীর সুস্থ ছিল।

শংকরের মুখে অনুযোগ আর রইল না, কিন্তু একটা অস্বস্তিভরা বিষণ্ণতা লেগেই রইল সারাক্ষণ।

অঞ্জলির বেশ লাগল স্বামীর এই বন্ধুটিকে। কত যে নাম শুনেছেন তাঁর, তাঁর সম্বন্ধে কত গল্প শুনেছেন স্বামীর কাছে থেকে, পড়েছেন কাগজপত্রে। শংকর চক্রবর্তীর মধ্যে বুদ্ধির আর চরিত্রের নাকি অপূর্ব সংমিশ্রণ হয়েছে। বাইরে থেকে এর নানা ব্যাখ্যান শুনে কেমন যেন একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছিল মানুষটির সম্বন্ধে। কাছ থেকে দেখলেন ধৈর্যে আর সংযমে আসল মানুষটি মধুর।

রাত্রে খাবার টেবিলে অঞ্জলি বললেন, আপনার বেডিংএর ভেতর বাসনপত্র পর্যন্ত ছিল, আমি কিন্তু তাইতেই আপনার খাবার দিয়েছি। যাই বলুন, নিজের জিনিসপত্র ব্যবহার করার মধ্যে একটা 'চার্ম' আছে।

শ্যামলেন্দু বললেন, সে কি, এই বাড়িতে বসে নিজের জিনিসপত্র ব্যবহার করবে কি? তুমি কি অতিথি সৎকার শিখেছ? আর শংকর, তোমার বুদ্ধিটাই বা কি, এতো তোমার ভিলেজ টুর নয় যে কখন কোথায় আস্তানা পাবে ঠিক নেই, এখানেও ঐসব ঝঞ্ঝাটগুলো বয়ে এনেছ কেন?

অভ্যাস, শংকর মৃদু হেসে বললেন। তারপর কৃতজ্ঞতাভরা চোখে চাইলেন অঞ্জলির দিকে, আশ্চর্য বুদ্ধিমতী, অন্য কোন জায়গায় হলে এই সমস্ত আমার নিয়ে টানাহেঁচড়ার অবধি থাকত না।

রাত্রে শুতে গিয়ে শংকর দেখলেন, অঞ্জলি তাঁর বিছানার মশারি খাটিয়ে দিচ্ছেন।

শংকরের মুখ থেকে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে গেল, আপনি আবার কেন এই রাত্রে এত খাটাখাটি করছেন, ছেলেটির মা?

রাত্রে, ছেলের মা, অঞ্জলি কিছু বলতে পারলেন না, খাটের বাজুতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এক মিনিট, তারপর হঠাৎ তাঁর কি মনে হল, হেসে বললেন, ও, কিন্তু আপনার বেডিংয়ে ত' পাজেলের আসন নেই, আচ্ছা, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি একটা। বলে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

শংকর কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পুজো তিনি কোন জন্মে করেন না। অঞ্জলি এমন উল্টো মানে বুঝলেন। এইজন্যেই ক্যাম্প বা হোটেলে থাকতে তিনি ভালবাসেন, যা ইচ্ছা তাই চাকরকে স্পষ্ট অর্ডার করা যায়, ভদ্রতার বালাই কোন পক্ষেরই থাকে না।

একটি চাকর এসে একটা আসন দিয়ে গেল। শংকর সেটা এককোণে রাখতে বললেন, ফিরিয়ে দিলে আরেক প্রস্থ ঝামেলা বাড়বে। কিন্তু অঞ্জলি কি সোজা এখান থেকে গিয়ে খোকার গায়ে হাত দিয়েছেন না হাত পা ভাল করে ধুয়েছেন? বলে দেবেন চাকরকে দিয়ে ভাল করে হাত পা ধুতে? ইতস্তত করতে করতে দেখেন চাকরটি চলে গিয়েছে। সারাক্ষণ অস্বস্তি খচ খচ করতে লাগল মনে, আইনত কিছুই হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ছোটছেলে, ছোটছেলের কোন ক্ষতি হয় কি না তাও তিনি ভাবেন নি আগে।

পরের দিন গোটা দিনটা যে কিভাবে কেটে গেল তা টেরই পেলেন না শংকর, সকাল বেলায় অ্যাসোসিয়েশন হলে লেক্‌চারের মিটিং, কোন রকমে স্নান খাওয়া সেরে নিয়ে,

গোটা দুপুরে লোকেদের ইণ্টারভিউ, বিকেলে চড়কতলার মাঠে বিরাট মিটিং। শুধু সমস্ত কাজের মধ্যে একটা জিনিস অনুভব করছিলেন, এরকম পরিশ্রম তিনি বহুবার করেছেন, কিন্তু কাজের মধ্যে এমন স্বাচ্ছন্দ্য তিনি কখনও অনুভব করেন নি। কখন কি প্রয়োজন তাঁকে আর ভাবতেই হচ্ছে না, পেছন থেকে দুটো হাত যেন তা বাড়িয়েই রেখেছে, স্নানের পরে নতুন জবাকুসুমের শিশি থেকে মিটিং-এ বেরুবার আগে কাগজপত্রের তাড়াটা পর্যন্ত। সন্ধ্যেবেলা নিজের ঘরের জানলা থেকে গংগা দেখতে দেখতে সেই কথাই ভাবছিলেন তিনি।' একটা নতুন আনন্দের অনুভূতি আসছে মনে, কিন্তু শংকরের মনে হল কী গভীর যন্ত্রণার।

ওয়াণ্ডারফুল, ওয়াণ্ডারফুল, এণ্ড ইয়েট ওয়াণ্ডারফুল, সোচ্ছ্বাসে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুকলেন শ্যামলেন্দু, কী অসাধারণ তুমি শংকর। এতগুলো লোককে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলে। রাজনগরে আগামী মাসেই তুমি তোমার পার্টির সেণ্টার গড়ে তুলতে পারবে। রাস্তায় ঘাটে সর্বত্র শুনে এলুম সেই একই আলোচনা।

বুকের মধ্যে একটা আনন্দ জ্বলে উঠল, আজকের মিটিংটা একটা বিরাট সাফল্য। কিন্তু থেমে গেলে চলবে না, আরও আরও খাটতে হবে। জানলায় ঠেস দিয়ে শংকর ভাবতে লাগলেন, কী ভাবে অর্গানিজেশনের প্রসার ঘটাবেন। কাজ, কাজ, অনেক কাজ করতে হবে। আবার শংকরের চোখের সামনে ভেসে উঠল আজকের মিটিংয়ের সেই উদ্বেলিত জনতার দৃশ্য, লোকের প্রশ্নের পর প্রশ্ন, তাঁর উত্তরের পর উত্তর। মনে আসতে লাগল আজকের খুঁটিনাটি ঘটনা, কি পরিশ্রমই না গিয়েছে। আবার মনে পড়ল সেই দুটো হাতের কথা, যা নিঃশব্দে তাঁর সমস্ত কিছু জুগিয়ে এসেছে আজ সারাদিন, তিনি কিছু ভাববার আগেই। হঠাৎ শংকরের মনে হল অসহ্য ক্লান্ত তিনি, একটা কুটো আর কোনও দিন তুলতে পারবেন না। তেল বিনা অনেকদিন জ্বলেছে সলতে, কিন্তু অনেক, অনেক দিন জ্বলেছে।

মুখেও ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল শংকরের। শ্যামলেন্দু বললেন, তুমি বড়ই টায়ার্ড হয়ে গেছো। হবারই কথা, সারাদিন যা খাটুনি গিয়েছে। চল চা-টা খেয়ে নিয়ে একটু গংগার ধারে বেড়িয়ে আসা যাক।

সেই ভাল, শংকর শ্রান্তভাবে বললেন।

চায়ের টেবিলে অঞ্জলি দুঃখ করে বললেন, এমন একটা বক্তৃতা শুনতে পেলুম না, আপসোসের সীমা নেই আমার। ছেলেটা একটু বড় না হওয়া পর্যন্ত আমার এক জ্বালা হয়েছে।

বলুন, আপনার অনুরোধে এই চায়ের টেবিলেই একটা বক্তৃতা দিয়ে দিই। শংকর ঠাট্টার স্বরে বললেন, কিন্তু একটু পরেই তাঁর স্বর গম্ভীর হয়ে গেল, কি হবে বক্তৃতা শুনে, বক্তৃতায় যা বলেছি, মানুষের সুখের কথা সুবিধের কথা, তা'ত এখানেই আছে। ঐ দোলনাতে জ্বালা নেই সে আপনি মনে মনে জানেন।

শ্যামলেন্দুর মনে হয় এগুলো শংকরের অতিরিক্ত বিনয়। অঞ্জলি ভাবেন, শংকরবাবু কী বলতে চান?

যাই হোক চা-খেয়ে গংগার ধারে বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। এই শহরে গংগার ধারে কলকারখানা নেই। একটা সরু পীচের রাস্তা চলে গেছে। তার একদিকে কোথাও কোথাও দোকান কোথাও কোথাও খোলা জমি, খেলার মাঠ, আর একদিকে সবুজ ঘাসে ভরা ঢালু জমি নেমে গিয়েছে নদীর মধ্যে। দোকানের আলোতে কাছের একফালি জল চিকচিক করছে, তারপর জমাট অন্ধকার, অনেক দূরে দূরে একটা আলো জ্বলছে, সেটা নদীর ওপারে। আজ রাত্রে হু হু করে হাওয়া উঠেছে, কাপড় চোপড় বিপর্যস্ত করে তুলছে, চুল উড়ছে, কিন্তু ভারী আরাম। অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে দক্ষিণ দিকে হেঁটে চললেন দুই বন্ধু।

এক জায়গায় এসে রাস্তাটা গংগার ধার ছেড়ে শহরে ঢুকে পড়েছে। শ্যামলেন্দু বললেন, অনেকদূরে এসে পড়েছি। এদিক দিয়ে ফিরে গেলে অনেক রাত হয়ে যাবে। তার চেয়ে চলো শহরের ভিতর দিয়ে শর্টকাট দিই।

কিন্তু আবার লোকেরা ভিড় করবে।

না, একটা রিকশ করব। রিকশর ভেতরে আর এই রাত্রে কারও নজর পড়বে না।

তবে তাই চল।

রিকশ স্টাণ্ডে যাবার রাস্তাটা একটু সরু, দু'পাশে সেলুন, পানের দোকান, একটা দুটো মদের দোকানও চোখে পড়ল। দোকানের ফাঁকে ফাঁকে খুব সরু সরু গলি গিয়েছে, মাঝে মাঝে একটা দুটো লোক ঢুকছে, রাস্তা থেকেই চোখে পড়ে সাজগোজকরা মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে দরজা ধরে। শংকরের নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

শ্যামলেন্দু বললেন, এটা শহরের খারাপ পাড়া। জায়গাটার নাম ঘোলাডাঙা।

সে ত দেখছি। একটা উদগত বমিকে যেন সামলে নিয়ে শংকর বললেন।

শ্যামলেন্দু হাসতে হাসতে বললেন, বাবাঃ, তুমি যে দৃশ্যটাই সইতে পারছ না। অবশ্য তোমার মত চরিত্রবান ব্যক্তি ঐগুলোর কল্পনাও করতে পারে না। বাট হিয়ার ইজ লাইফ, হার্ড এণ্ড ট্রু।

হিয়ার ইজ লাইফ, কে না বোঝে, শংকরের কানা চোখটা জ্বালা জ্বালা করে উঠল, তাঁর চেয়ে ভাল বোঝে কেউ? চরিত্রবান ব্যক্তি এগুলোর কল্পনাও করতে পারে না? কিন্তু চরিত্রবান ব্যক্তিকে দিবানিশি এই কথাই ভাবতে হয় সে কথা কি জানেন শ্যামলেন্দু চৌধুরি? হার্ড এণ্ড ট্রু, তা শ্যামলেন্দু নভেলের লেখকের মত কথা বললে। হার্ড এ ট্রু-র ধারণা শ্যামলেন্দুর স্বপ্নেরও বাইরে। গভীর রজনীতে কোমল শয্যায় শিশু ক্রোড়ে নিমীলিত নয়নে নিদ্রিতা স্ত্রীকে দেখে আর মনে মুক্তোর মত নিটোল আনন্দ টলমল করে ওঠে। হার্ড কথাটার মানেই জানে না ও; দিবারাত্র তার কাজের পেছনে দুটো নরম হাত কাজ করে চলেছে, জাল বুনেছে আশ্বাসের, আনন্দের শান্তির সে জানবে কি করে ট্রুথ কত কদর্য তার ভয়ানক, তার দুশ্চিন্তার পাহাড় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে একটা দুর্বল শিশু-হাতের তাড়নায়, সে বুঝবে কেমন করে হার্ড এণ্ড ট্রুথের দুঃখ কোথায়? চরিত্রবান লোকের

ওপর সাংঘাতিক ক্রোধ হয় শংকরের, মনে হয় এই কথাটি বলে লোকে তাঁকে ঠাট্টা করে। কিন্তু লোকের দোষ কি, সত্যিই ত নিখুঁত সুন্দর চরিত্র, কিন্তু সুন্দর চরিত্র লোকটির কোষে কোষে যে দিবারাত্র ঐ খারাপ পাড়ার মেয়েদের বীভৎস অট্টহাসি উঠছে তা'ত তাঁরা শুনতে পায় না। আবার শংকরের চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই পুরোন দিনের ছবিগুলি, নষ্টপ্রায় চোখটি পরীক্ষা করে বন্ধু ডাঃ সোমের সেই বিস্ময়াহত দৃষ্টি, শংকর তুমি—? বাবার সংগে সেই বীভৎস ঝগড়া, লোকচক্ষু এড়ানোর জন্যে লিলুয়ার বস্তিতে বাস, দুঃসহ যন্ত্রণাকাতর দিবারাত্রি। শংকরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে কপালটা ভিজে গেছে।

শ্যামলেন্দু বললেন, কি হে তুমি যে থেমে গেলে।

শংকরের চোখে একটা খর, ক্রুর দৃষ্টি ফুটে উঠেছে, প্রচণ্ড জোরে ঠোঁটটা কামড়ে ধরে বললেন, আমি কী যে ঘৃণা করি।

একটু ঘাবড়ে গিয়ে শ্যামলেন্দু বললেন, আমারই ভুল হয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে আসা উচিত হয় নি।

সেদিন রাত্রে খাবার টেবিলে ভাল করে কথা বললেন না শংকর, সারাক্ষণ কী এক গভীর চিন্তায় ডুবে রইলেন।

শোবার সময় গোটা ঘটনাটা স্ত্রীকে বলে শ্যামলেন্দু বললেন, শক্‌ড্ হয়েছে ভীষণ, দেবতার মত মানুষ, কিছুতেই সইতে পারছে না এর কদর্যতা।

ওদিকে বিছানায় শুতে শুতে শংকর ভাবছিলেন, বিষাক্ত দেহমনকে সুন্দর জীবনযাত্রার ফুলে ফুলে ঢেকে দিয়ে তিনি কি মানুষের কাছে মিথ্যাচারী হচ্ছেন? কিন্তু এ'ছাড়া বাঁচবার আর কোন উপায়ই নেই তাঁর। হয় দেবতার মত বাঁচো নয় পাঁকের কীট হয়ে মৃত্যুবরণ কর। অনেকদিন পর লিলুয়ার বস্তির মত একটা রাত্রি এল, মনের ভেতর পর্যন্ত পাক খেয়ে উঠছে নিজের জীবনের ওপর একটা প্রবল ঘৃণায়। মিথ্যে হয়ে গেল আজকের সারাদিনের সেই প্রভূত সাফল্য।

বিছানা ছেড়ে মেঝেতে পায়চারী করতে লাগলেন শংকর, মাথাটা দপ্ দপ্ করছে, সারাদিনের পরিশ্রমের পর রাত্রে ঘুম না হলে শুধু পাগল হতে বাকি থাকে।

জানলা দিয়ে দেখলেন ও'পাশে শ্যামলেন্দুর শোবার ঘরে একটা মৃদু সবুজ আলো জ্বলছে। বাচ্চা ছেলের জন্যে সারারাত আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। শংকর জানলার শিক ধরে অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত চেয়ে রইলেন সেই সবুজ আলোয় ভরা জানলার দিকে। এ'ঘরে দুটো দেবতা বাস করে, ও'ঘরে শান্ত সুখী মানুষ বাস করে। অনন্তকাল ধরে কামনা করলেও দেবতা মানুষের মত বাঁচতে পারবেন না। শংকর কোমরটা চুলকোলেন, না ঘাগুলো আর নেই, ওষুধটা ভালই কাজ করেছে, কিন্তু ডাঃ সোম নিজেই বলেছেন, ইফ ইউ আর কনসায়েনসাস নেভার ম্যারি, একেবারে সারাতে আমি পারবো না। কিন্তু আজ এই নির্জন রাত্রে ও-পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে শংকরের মনে হল আবার তিনি ফুটবল মাঠের সেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ক্যাপটেন হয়েছেন। পরক্ষণেই কানা চোখটা জ্বালা জ্বালা করে উঠল, ঐ চোখটায় জল পড়ে না, কান্নায় জ্বালা করে।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে অঞ্জলি বললেন, আপনার কি কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি শংকরবাবু, কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে, আপনাকে?

না, ঘুমিয়েছি ত, তবে ফেটিগটা হয়ত যায় নি।

শ্যামলেন্দু বললেন, আজ তোমায় আমরা যেতে দেব না। তুমি দু' একদিন এখানে বিশ্রাম কর। তোমার কাজের পরিমাণ ত আমরা দেখলাম। ও'রকম করে খেটে কি মানুষ বাঁচতে পারে? ফেটিগ ত' যাবেই না।

কিন্তু কলকাতায় অনেক কাজ আটকে আছে।

থাকগে, চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিতে দিতে অঞ্জলি বললেন, আগে ত আপনার শরীরটা। এখানে আর কোথাও বেরুবেন না, দু'দিন চুপচাপ শুধু ঐ বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে থাকুন আর গংগার হাওয়া খান। রিফ্রেশড্ হয়ে গেলে দেখবেন ওখানকার কাজ আরও ভালভাবে করতে পারছেন।

দু' একবার আপত্তি করেও শেষ পর্যন্ত অঞ্জলির কথা ফেলতে পারলেন না শংকর।

কতদিন পরে একটা আলস্যমধুর দিন পাওয়া গেল। কাজ নেই ঘোরা নেই প্রশ্ন নেই উত্তর নেই চিন্তা নেই: শুধু ইজিচেয়ারে চোখ বুজে পড়ে থাকা আর মাঝে মাঝে চোখের সামনে দুপুরের গংগার উজ্জ্বল স্থির চিত্রটি চোখে চোখে দেখা। মাঝে মাঝে কানে আসছে অঞ্জলির পায়ের শব্দ, এ'ঘর থেকে ও'ঘরে যাতায়াত করছেন, কোন ঘরটা গুছোচ্ছেন, ছেলের দুধ গরম করছেন, ছেলেকে দোলনায় ঘুম পাড়াচ্ছেন। নিঃস্তব্ধ দুপুরের পটভূমিকায় সুখী জীবনের স্বল্প কয়েকটি ছবি আর শব্দ নেশায় জড়িয়ে দিল শংকরের চোখ আর কানকে, কাল রাত্রের স্নায়ুজাল ছিন্নভিন্ন করা চিন্তার অবসাদের ওপর গভীর ঘুমের শান্তি নেমে এল।

ঘুম ভেঙেই মনে হল খুব ভোরেই উঠেছেন ত। সূর্য ওঠেনি এখনও, পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙল, সূর্য ডুবে গিয়েছে। বোধ হয় এই ছ' বছর পরে দিবানিদ্রা দিলেন শংকর, শরীরটা কিরকম ভারী ভারী লাগছে, কিন্তু মনটা কিরকম হালকা হয়ে গিয়েছে। আফিস আর লেকচারও ছাড়া একটা দুপুরের কথাও ভাবতে পারেন না শংকর, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সব মিথ্যে, এই তন্দ্রালস প্রসন্নতাটাই যেন চিরদিন তাঁর মনে ছিল।

অঞ্জলি এসে সামনের চেয়ারটায় বসলেন। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভাল ঘুম হয়েছে?

প্রচুর, খুব আরামের সংগে পরিহাস মিশিয়ে শংকর বললেন।

আমিও দেখেছি, অঞ্জলি মাথাটা অল্প দোলাতে দোলাতে বললেন, পাঁচ-ছ'বার এসেছি, সববারেই দেখি আপনি ঘুমোচ্ছেন।
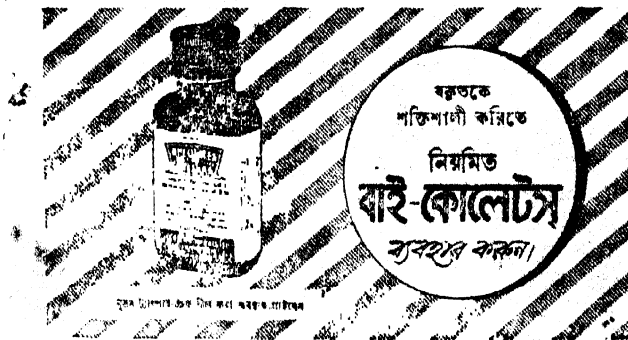
পাঁচ-ছ'বার এসেছেন? শংকরের মনে হল আরামটা স্নায়ুতে স্নায়ুতে সঞ্চারিত হচ্ছে। মুখে বললেন, একটা দুপুরে নতুন মানুষের মত মনে হচ্ছে নিজেকে। গভীর কৃতজ্ঞতার সংগে শংকর চাইলেন অঞ্জলির মুখের দিকে। অঞ্জলি কোমল চোখে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে।

ঘেমে নেয়ে শ্যামলেন্দু হাজির হলেন কলেজ থেকে। সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে শংকর বললেন, বোস।

বসতে বসতে শ্যামলেন্দু বললেন, কেমন দুপুর কাটল?

খুব ভাল, ঘুমিয়ে, ঘুমিয়ে। তারপর তোমার কাজ কতদূর এগোল?

আর বল কেন, বলতে বলতে শ্যামলেন্দু অঞ্জলির দিকে ফিরে বললেন, এই অঞ্জলি

একটু হাওয়া কর না, তারপর শঙ্করকে বললেন, লাইব্রেরীতে বসে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে অস্থির, তার ওপর এক্‌স্‌কাভেশনে পাওয়া মূর্তিগুলোর অর্ধেক আজও এসে পৌঁছায়নি, কালই দুর্গাবিসন্তপুরে ছুটতে হবে তার খবর নিতে। রিসার্চটা হাতে নিয়ে ঝামেলায় পড়া গেছে।

হাওয়া করতে করতে অঞ্জলি বললেন, নতুন ধরনের অ্যাপ্রোচ দেবে, তার জন্যে বেশী খাটতে ত হবেই। ঝামেলা আর কী?

আজ ঘুম থেকে উঠেই শঙ্করের মনটা কেমন কোমল আর দুর্বল ছিল। মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল, অঞ্জলির দিকে চেয়ে মনে হল শ্যামলেন্দুটা আছে বেশ, তাঁকে নিজে শ্যামলেন্দুর পাঁচ গুণ খাটতে হয়, কিন্তু—। মনটা খারাপ হয়ে গেল শঙ্করের।

শ্যামলেন্দুর দিকে চেয়ে শঙ্কর বললেন, কাল ক'টার ট্রেনে যাবে তুমি? আমিও ঐ সঙ্গেই যাব, একটা ট্রেন ধরব।

হাঁ হাঁ করে উঠলেন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই, তা হতেই পারে না, পরশু সকালেই ফিরে আসবেন শ্যামলেন্দু, পরশু দুপুরে একটা জাঁকজমক করে খাওয়া হবে সেদিন বিকেলে ওরা নিজেরা গিয়ে তুলে দিয়ে আসবেন তাঁকে। শঙ্করের কাজের বেশি ক্ষতি তাঁরা করতে চান না।

পরদিন সকালবেলায় বারান্দায় দাঁত মাজতে মাজতে শঙ্কর দেখলেন, অঞ্জলি ইতিমধ্যেই চান করে ফেলেছেন, এলোচুল পিঠে মেলে দিয়ে একবার রান্নাঘর, একবার ভাঁড়ারঘর করছেন, সাড়ে সাতটায় ট্রেন শ্যামলেন্দুর, তার মধ্যেই ভাত দিতে হবে। রেলিঙে ঠেস দিয়ে শঙ্কর কি একটা বললেন। ওপর দিকে চেয়ে মাথায় একটু কাপড় তুলে একটু হেসে অঞ্জলি বললেন, আমার অভ্যেস আছে। তারপর রান্নাঘরে চলে গেলেন।

আজ অঞ্জলির অনুরোধ উপরোধে পড়ে খাওয়াটা একটু ভারী হয়ে গেছে। ইজি-চেয়ারে গা দিতে না দিতেই তন্দ্রা এলো। কিন্তু ভাল করে ঘুমিয়ে পড়বার আগেই পায়ের শব্দে চটকা ভেঙে গেল। শঙ্কর দেখেন, অঞ্জলি চলে যাচ্ছেন। ডাকলেন, আজ আমি ঘুমোইনি।

অঞ্জলি এসে বসলেন পাশের চেয়ারটায়। বললেন, আমার পায়ের শব্দেই ঘুম ভেঙে গেল ত।

আজ বেশিক্ষণ ঘুমোতে আমি পারতুম না। দুপুরে করে আমি ঘুমিয়েছি?

না, শুনুন, অঞ্জলি গিন্নীর মত হাত নাড়েন, খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবেন। এতে শরীর ভাল থাকবে।

আমাদের আর শরীরের কি আছে? আর তাকে যত্ন করেই বা লাভ কি? শঙ্করের কথার ভঙ্গীতে এই প্রথম অঞ্জলির মনে হল এতদিন যেটাকে বিনয় বিনয় বলে মনে হত, তার মধ্যে কেমন একটা হতাশার সুর প্রচ্ছন্ন আছে।

আজ দুপুরে একটু বসে ভাল করে গল্প করবার মত সময় পাওয়া গেল। খোকনও ঘুমিয়েছে। অঞ্জলি একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। অঞ্জলির মনে হয়েছে, শঙ্করবাবু মানুষটি অত্যন্ত ভাল, কিন্তু একটু দূরত্ব থাকে সব সময়ে তাঁর। তিনি শুনেছেন, বড়ো মানুষদের নাকি ওরকম থাকে, কিন্তু তিনি অনুভব করেন, শঙ্করের দূরত্বটা সে রকম নয়, কেমন যেন বিষণ্ণ দূরত্ব। অত্যন্ত কাছাকাছি রয়েছেন, তাই বড়োমানুষটির বড়োমানুষীটির অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মানুষটাকে জানবার মেয়েমানুষী কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠেছে। সেলাইটা কোলে রেখে বললেন, বলেন কি, আপনাদের শরীরের যত্ন করে লাভ কি? তবে কি আমাদের মত লোকের যত্ন করতে হবে? তারপর মৃদু হেসে একটু টেনে বললেন, আপনার মা—?

শঙ্কর গঙ্গার দিকে চাইলেন, না, মা নেই?

বাবা?

আছেন, তবে না থাকলেই ভালো হত। বলেই শঙ্কর একটু সচেতন হয়ে উঠলেন, কিন্তু তার আগেই অঞ্জলি প্রশ্ন করে ফেলেছেন, কেন?

কি আর বলব, নিজের বাবা, শঙ্করের গলার স্বর ভারী হয়ে উঠল, পঞ্চাশ বছর বয়স হল, কিন্তু আজও বাবার স্বভাব-চরিত্র শোধরাল না।

ভীষণ যেন খারাপ কথা বলা হয়েছে একটা, অঞ্জলির মুখ রক্তাভ হয়ে উঠল, কি বলবেন ভেবে না পেয়ে সেলাইটা হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগ দিলেন।

শঙ্করই ঘুরিয়ে দিলেন কথাটা, গঙ্গার দিকে চেয়ে বললেন, কি আশ্চর্য সুন্দর গঙ্গা আপনাদের এখানকার, মনে হয় দিনের পর দিন চুপচাপ এখানে বসে থাকি আর সুর ভাঁজি। আমার আবার সুর আসে না। আপনি গান জানেন?

অল্পস্বল্প, অঞ্জলি মুচকে হাসলেন।

শোনান না একটা, শঙ্কর প্রস্তাব করে বসলেন।

অঞ্জলির একটু অস্বস্তি লাগল, ফাঁকা বাড়ি, কেউ কোথাও নেই, চাকরটাও নিজের বাড়ি গেছে, শুধু তাঁরা দুজনে, অঞ্জলির মনে হল কেমন খারাপ দেখায়। কিন্তু কেমন যেন দুর্বলতা জেগে গেছে শঙ্করের ওপর। পাশ কাটিয়ে যেতে ইচ্ছে হল না অঞ্জলির, একটু ইতস্তত করে খাটো গলায় চাপা সুরে শুরু করলেন,—

মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি—

সেইটা শেষ হলে শঙ্কর বললেন,

আর একটা। এবার অঞ্জলির মনে হল, এতে সংকোচ করার কি আছে। একটার পর একটা গান গেয়ে চললেন। শংকর মৃদু মাথা দোলাতে লাগলেন আর টেবিলের ওপর টোকা দিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে অঞ্জলির টেবিলের ওপর রাখা বাঁ হাতটার ওপর টোকা পড়ছিল, ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত বোঝা গেল না। অঞ্জলি কিছু মনে করলেন না। মাঝে মাঝে গান থেমে গল্প হচ্ছিল, যা ইচ্ছা তাই জিজ্ঞেস করছিলেন অঞ্জলি, স্পষ্ট উত্তর দিচ্ছিলেন শংকর। অনেকদিন পর নিরালা মুহূর্তে মনকে একটা সহানুভূতিমাখা মনের কাছে খুলে ধরেছেন। শংকরের মনে হচ্ছিল, একটি করে কথা বলছেন আর একটি করে পাথর নেমে যাচ্ছে মন থেকে। আর অঞ্জলি যেন একটা গুহায় ঢুকেছেন, বাইরে থেকে একটা বিরাট পাহাড় দেখেছেন, ভেতরে দেখেন রাশি রাশি অন্ধকার গর্ত, ভয় করছে, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে আরেকটু এগিয়ে যাই। গানে আর গল্পে প্রলাপমুখর নির্জন মুহূর্তগুলো কি করে যে কেটে গেল কারোর খেয়াল নেই, দুপুর পেরিয়ে বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যে নেমে এল।

গঙ্গার জলের ওপর রক্তমেঘের ছায়া পড়েছে, জেলে-নৌকাগুলো বাড়ি ফিরছে, দাঁড়ের মাথায় লাল জল ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সেইদিকে চাইতে চাইতে অঞ্জলি বললেন, বাড়িতে আপনার বাবার সংগে শান্তি নেই, আপনি বিয়ে করেন না কেন শংকরবাবু?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল শংকরের, কোনও দিন করব না। তারপর হঠাৎ যেন কিসের আক্রোশে অভিমানে প্রত্যাশায় নিজের অজ্ঞাতেই বলে ফেললেন, আমার রক্ত ভাল নয়। হ্যাঁ, বিষ......পয়জন্‌......

অঞ্জলি স্তব্ধ। ঠিক কিছু বুঝছেন না ......অথচ বিস্ময়, কৌতূহল। যেন কথা বলার জন্যে বললেন, শরীরের ওপর আপনার এত নজর এই জন্যে?

হ্যাঁ, এই জন্যে, কিন্তু পরের জন্যে, আমি নিজে ও গেছিই।

অঞ্জলি কেমন অবুঝবু হয়ে রইলেন।

যতদূর সম্ভব স্থির হয়ে শংকর বললেন, আই টেক অল সর্টস অব প্রিকশান। এত জায়গায় থাকতে হয়, ডাক্তারের উপদেশ না মেনে আমি চলব কি করে?

কিন্তু, কিন্তু,—কি যেন বলতে চান অঞ্জলি, কিন্তু গলায় আটকে যাচ্ছে।

অ্যাঁ, অ্যাঁ, শংকর বোকার মত প্রশ্ন করেন।

এমন সময়ে ঘরের মধ্যে খোকা কেঁদে উঠল। আসছি, বলে ঘরের মধ্যে হন-হন করে চলে গেলেন অঞ্জলি।

অন্ধকার বারান্দায় উন্মাদের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন শংকর, সারাজীবন ধরে নীলকণ্ঠের মত বিষ হজম করেছেন, কিন্তু কণ্ঠের নীলটিও চাপা দিয়ে দিয়ে এসেছেন, দুঃখ সইবে, কিন্তু অসম্মান সইবে না। আজ সমস্ত বিষ নগ্ন অবারিত হয়ে পড়েছে একজনের কাছে। কিন্তু সে সব জানুক, তারপর বাঁচায় বাঁচাক, মরায় মরাক।

কয়েক মিনিট কি ভাবলেন শংকর, তারপর অঞ্জলিদের ঘরে ঢুকলেন, অঞ্জলি দোলার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ছেলের গায়ে হাত দেবেন কি না ভাবছেন, মাকে দেখে ছেলে আবার ঘুমিয়েছে হয়ত।

শংকর অঞ্জলির পেছনে এসে দাঁড়ালেন। অঞ্জলি।

আড়ষ্ট হয়ে অঞ্জলি পেছন ফিরে তাকালেন। শংকর দেখলেন, অঞ্জলির চোখে জল। তাঁর মনে হল, অঞ্জলি বুঝেছে, বুঝবেই ত, এত সহানুভূতি কার কাছে কবে পেয়েছেন শংকর? আর কিছু বলবার নেই।

তবু যেন কি বলার একটা বাগ্রতা অনুভব করছিলেন শংকর। অদ্ভুত ইচ্ছা। মনে হচ্ছিল মুখ ফুটে বলে ফেলেন, তুমি আমায় একটা ভিক্ষে দেবে অঞ্জলি? শুধু তুমিই দিতে পারো। তুমি আমায় একটু বাঁচিয়ে দাও অঞ্জলি, অন্তত পার্টির কাজটুকু শেষ করতে দাও। একটিমাত্র কামনা। আজ রাতে একবার তুমি ওখানে বস, ঐ ছেলেটিকে দুলাতে দাও দোলায়। আমি একবার শুধু তোমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে তোমায় বউ বলব, ঐ ছেলেটিকে ছেলে বলব। আমার জীবনের কি গভীর তৃষ্ণা তোমায় কি বলে জানাব, অঞ্জলি। কান্নায় কালো ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল শংকরের।

অঞ্জলি পাথরের মত দোলনার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। টপ্‌ টপ্‌ করে চোখ দিয়ে জল পড়ছে। অঞ্জলি কি ভয়ে অনুতাপে কাঁদছেন? নাকি শুধু ভয়ে? খোকার ভয়ে।

পিছন থেকে ঝুঁকে পড়লেন শংকর, বাঁ হাতে দোলনায় ঠেস দিয়ে ডান হাত দিয়ে অঞ্জলির হাতটা ধরতে গেলেন। হঠাৎ ঝটকা দিয়ে শংকরকে ঠেলে দিলেন অঞ্জলি। আপনি যান, আপনি যান।

যেন ছেলেকে রক্ষা করবার জন্যে আগলে ধরলেন দোলনাটাকে। বিকৃত কণ্ঠে বললেন, আপনি কি? লজ্জা নেই, কতবার এর আগে এ'রকম করেছেন?

এক একটা কথা যেন অ্যাসিডের ফোঁটার মতন পড়ছে গায়ে বুকে মুখে। শংকর পাগলের মত দরজার দিকে দৌড়লেন, শুধু আহত কুকুরের কান্নার মত একটি গলার স্বর শোনা গেল।

কখন সন্ধ্যে হয়েছে। ছুটে ছুটে হয়রান শংকর সেই খারাপ গলির খারাপ বাড়িতে হাজির।

চোখ বন্ধ করে গিয়ে বসলেন জাজিমটার মাঝখানে। সোডার বোতল খুলছিল মেয়েটি, একটানে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সেটা। মেয়েটি কুৎসিত ভঙ্গিতে হেসে উঠল, আঃ—এ আবার কি নতুন রঙ্গ। শংকর কাছে টেনে আনলেন মেয়েটিকে, গাটা ঘুলিয়ে উঠল, তবু জোর করে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। বউ।

পরের দিন শেষ রাতে শংকর চক্রবর্তী আত্মহত্যা করেছিলেন।

ত্রিদিব চৌধুরী

পর্তুগীজ রাজত্বের থানা-পুলিসের নানান কথা

পিত্রিম কুয়ার্টেলে তেইশ চব্বিশ দিন আমাকে আটক রাখার পর, আমায় যে মানিকোনের পাগলা গারদে বদলি করিয়া দেওয়া হয় সেকথা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু এই তেইশ চব্বিশ দিনের ভিতরেই গোয়াতে, এবং শুধু গোয়াতেই নয়, খাস পর্তুগাল সহ সমগ্র পর্তুগীজ সাম্রাজ্যে, সালাজারী শাসনের স্বরূপ কী তাহা ভাল-ভাবে সমঝিয়া লইতে আমার কোনো অসুবিধা হয় নাই।

পঞ্জিম কুয়ার্টেল খালি গোয়ার নয়, গোটা পর্তুগীজ ভারতের পুলিস হেড্ কোয়ার্টার—Quartel Geral da Policia do Estado da India। এখানকার পুলিস কমাণ্ডাণ্ট গোটা পর্তুগীজ ভারতের পুলিসের বড় কর্তা। উপরে গোয়ার ভূতপূর্ব পুলিস কমাণ্ডাণ্ট ক্যাপ্টেন রুম্বার কথা বলিয়া আসিয়াছি। আমি যখন গোয়ার ভিতরে প্রবেশ করি সে সময় রুম্বা সেখানে ছিল না। গোয়াতে গুজব ছিল নতুন গভর্নর-জেনারেল, জেনারেল বের্নার্দ গেদীসের সঙ্গে রুম্বার বনিবনাও হইতেছিল না। এ সম্পর্কে আমি যাওয়ার পর দুই রকমের গুজব শুনিয়াছি। এক নম্বর, বের্নার্দ গেদীস কিছুটা লোক ভালো, ভদ্রগোছের লোক; তিনি নাকি গোয়াতে আসিয়া রুম্বার দমননীতি এবং একচ্ছত্র কর্তৃত্ব পছন্দ করেন নাই এবং সেইজন্যই দুজনের মধ্যে খিটিমিটি বাধে। অনেকের আবার মত ছিল যে তা নয়, দুজনের মধ্যে আসল গণ্ডগোল ছিল কর্তৃত্ব লইয়া। রুম্বা পদমর্যাদায় গভর্নর-জেনারেলের অনেক নীচে হইলেও গোয়াতে অনেক আগে হইতে সে ছিল বলিয়া গোয়ায় তাহার দল বল বেশী ভারী ছিল। জেনারেল গেদীসের পূর্ববর্তী গভর্নর-জেনারেলরা আন্দোলন দমানোর ভার পুলিসের ও রুম্বার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কাজে কাজেই রুম্বার কথার উপর কথা বলিতে পারে এমন লোক গোয়াতে পর্তুগীজ বা মিস্তী সমাজের মধ্যে বা সরকার ঘেঁষা গোয়াবাসী ক্রিশ্চিয়ান অভি-জাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় বেশী কেহ ছিল না। কিন্তু পাউলো বের্নার্দ গেদীস প্রথমত ছিলেন 'আর্মি' বা মিলিটারীর লোক এবং 'আর্মি'-ই হইতেছে সালাজারের একচ্ছত্র শাসনের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ। তাছাড়া, সালাজারের সঙ্গে যে সমস্ত অফিসারের দহরম-মহরম খুব বেশী গেদীস্ তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইতিমধ্যেই ১৯৫৮ সালের পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কে তাঁহার নাম প্রস্তাব হইবে বলিয়াও শোনা যাইতেছে। গেদীসের সঙ্গে পাল্লা দিয়া রুম্বার জিতিবার কোনই আশা ছিল না। গেদীস্ গভর্নর-জেনারেল হইয়া গোয়ায় আসাতে গোয়া এবং পর্তুগীজ ভারতের পুলিসের বড়কর্তা হিসাবে তাহার আগেকার মত একচ্ছত্র আধিপত্য আর চালানর সুবিধা হইবে না। একথা বুঝিয়াই হয়ত রুম্বা গোয়া হইতে বিদায় নেওয়াই তাহার পক্ষে মঙ্গলের হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া রুম্বা-গেদীস সংঘর্ষের প্রধান কারণ রুম্বার দমননীতি সম্পর্কে গেদীসের বিরাগ বা আপত্তি, এরূপ মনে করারও কোন সংগত কারণ আছে বলিয়া আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতে আমি বুঝি নাই। রুম্বা চলিয়া যাওয়ার পর গেদীসের আমলে গোয়াতে পর্তুগীজ দমননীতির প্রকোপ বাড়িয়াছে ছাড়া কমে নাই বা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। ১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্ট যেদিন ২২ জন নিরস্ত্র ভারতীয় সত্যাগ্রহীকে গোয়া সীমান্তের কাছে পর্তুগীজ সৈন্যেরা গুলী করিয়া হত্যা করে, তখন পুলিস কমাণ্ডাণ্ট রুম্বা উপস্থিত ছিল না, জেনারেল বের্নার্দ গেদীসই তখন গোয়ার সর্বময় শাসনকর্তা এবং আইনত পর্তুগীজ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বা কমাণ্ডার-ইন চীফ। আর শুধু ১৯৫৫ সালের ১৫ই আগস্টের কথাই নয়, তাহার প্রায় এক বছর পরেও যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন একেবারে থামিয়া গিয়াছে, তখনও রাজনৈতিক সন্দেহভাজনদের উপর মনটেইরো-অলিভেইরা কোম্পানীর অত্যাচার ও নির্যাতন আগের মতই চলিয়াছে। পর্তুগীজ আইনে প্রাণদণ্ড নাই; কিন্তু হাজতে পুলিস যত রাজনৈতিক বন্দীকে শুধু পিটাইয়া মারিয়াছে তাহা ঘটিয়াছে জেনারেল বের্নার্দ গেদীসের আমলেই।

তবে এ সম্পর্কে জেনারেল গেদীসের দায়িত্ব যাই থাকুক, দোষ সবটাই তাঁর নয়। তিনি নিজে মিলিটারীর লোক হওয়া সত্ত্বেও এবং সালাজারী শাসনে মিলিটারীর হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিলেও তাহাদের ক্ষমতা ডাঃ সালাজারের গেস্টাপো 'পিদে'-র উপরে নয়। পঞ্জিম কুয়ার্টেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর যে নৃশংস নির্যাতন আমি নিজের চোখে দিনের পর দিন দেখিয়াছি; তাহার হোতা ছিল প্রধানত 'পিদে' বা সালাজারের ইণ্টারন্যাশনাল পুলিস এবং গোয়া পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ, অর্থাৎ ইন্সপেক্টর অলিভেইরা এবং

মন্তেইরো। কুয়ার্তেলের ভিতরে তাহাদের উপর কথা বলিতে পারে, এমন ক্ষমতা-সম্পন্ন কোন লোক ছিল না। গভর্নর-জেনারেল বেনোদ গেদীস্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াই যে কুয়ার্তেলে রাজনৈতিক বন্দীদের তক্তাপেটা করা হইত, এরূপ মনে করারও কারণ নাই। গোয়ার রাজনৈতিক বন্দীদের অনেকের কাছে শুনিয়াছি, হাজতে তাহাদের পুলিসের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে কোন অভিযোগ তাহাদের আত্মীয়স্বজনেরা যদি কোনমতে গেদীসের কাছে পেশ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে অনেক সময় তাহার প্রতীকার হইত। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের আত্মীয়স্বজনের পক্ষে একেবারে খোদ গভর্নর-জেনারেলের কাছে গিয়া নালিশ জানানো বা তাহার তদ্বির করা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই যে সম্ভবপর হইত না, তাহা না বলিয়া দিলেও চলে। তবু তাহারই ভিতর একটু অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত ক্যাথলিক ক্রিশ্চয়ান পরিবারের লোকেদের কিছুটা সুবিধা ছিল। তাহাদের আত্মীয়স্বজনেরা কোন কোন সময় চার্চের পাদ্রী সাহেবদের ধরিয়া দুই একটি ক্ষেত্রে যে এভাবে তদ্বির করিয়া ফল পান নাই তাহা নয়। কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

আমি যখন গোয়ার ভিতরে প্রবেশ করি, তখন কমাণ্ডাণ্ট হিসাবে রুম্বার 'একটিনী' করিতেছেন, রুম্বা আমলের এ্যাডজুটাণ্ট-কমাণ্ডাণ্ট। ভদ্রলোকের নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। প্রায় পঞ্চাশের কাছে বয়স; পেটমোটা নাদুস-নুদুস চেহারা। পুলিস ইউনিফর্মের মিলিটারী কোট, ক্রসবেল্ট, স্টার, জরী দেওয়া বারান্দাওয়ালা মিলিটারী টুপী। এসবের সঙ্গে ক্যাজুয়াল পাম্প-শু এবং রেশমী মোজা পরা; একটু থপ্ থপ্ করিয়া হাঁটার অভ্যাস—লোকটি মানুষ হিসাবে খুব মন্দ ছিলেন না। তাঁহার পদমর্যাদা অনুযায়ী সমীহ করিয়া কথা বলিলে খুবই খুসী হইতেন। কিন্তু গোয়ার ভিতরে কোথাও কেহ 'সত্যাগ্রহ' করিতেছে, ইহা শুনিলেই আর তাঁহার মেজাজ ঠিক থাকিত না; নিজেই লাঠি কাঁধে করিয়া সশরীরে সেখানে গিয়া হাজির হইতেন। চটিয়া গেলে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। গোয়ার ভিতরকার অনেক সত্যাগ্রহী—যাঁহারা গোয়ার ভিতরে প্রকাশ্যে সত্যাগ্রহ করিয়াছেন—এই ভদ্রলোকের হাতের চড়-চাপড় কিল-গুঁতো বহু খাইয়াছেন। জনৈক আমেরিকান সাংবাদিকের কাছে বিনা বিচারে মাসের মাস আটক থাকা এবং রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি পুলিসের দুর্ব্যবহারের সম্পর্কে অভিযোগ জানানোয় হেনরী ডি সুজাকে কিভাবে মার-ধর খাইতে হইয়াছিল, সেকথা উপরে বলিয়াছি—হেনরীর প্রহারকদের মধ্যে এই এ্যাডজুটাণ্ট সাহেবও একজন ছিলেন। হতভাগা 'কানেকো' আর 'কানারি'-রা* কিনা পর্তুগালের বিরুদ্ধে এবং ডাঃ সালাজারের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে চায়! —এ ধারণাটাও এই পেটমোটা দারোগা সাহেবের কাছে অসহ্য বলিয়া মনে হইত। কিন্তু রাগটা পড়িয়া গেলে ভদ্রলোক আবার বেশ নরম মেজাজের হইয়া যাইতেন এবং তখন সময় বুঝিয়া তাঁহার কাছে ছোটখাটো সুযোগ-সুবিধার জন্য নালিশ জানাইলে সে দরখাস্ত সহজেই মঞ্জুর হইয়া যাইত। বলিতে বাধা নাই, আমি নিজেও দু-একবার তাঁহার এই ভালোমানুষির সুযোগ নিয়াছি।

আমরা যখন পাঞ্জিম কুয়ার্তেলে ছিলাম, তখন কুয়ার্তেলের হাওয়া বেশ সরগরম। এই আগস্টের গণ-সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে কি করা যায় না যায়, তাহার জল্পনা-কল্পনায় পুলিস, মিলিটারী বড় বড় পদস্থ কর্মচারীরা সকলেই খুব ব্যস্তসমস্ত হইয়া আছেন। মোটরবাইকে করিয়া, জীপে করিয়া দলে দলে নানারকম ইউনিফর্ম পরা পুলিস, মিলিটারীর লোক (বা সশস্ত্র পুলিসের লোক), সিকিউরিটি পুলিস, সাধারণ পর্তুগীজ কনেস্টবল থানার ভিতরে অনবরত আসা-যাওয়া করিতেছে। 'পিদে'র লোকেরা সবচেয়ে ভালো এবং জাঁকালো পোষাক পরিয়া গম্ভীরভাবে আমাদের বারান্দা দিয়া হাঁটাহাঁটি করিতেছে। মন্তেইরো চট্‌পট্ আসিতেছে, চট্‌পট্ চলিয়া যাইতেছে—আমাদের এক নম্বর হাজতে বসিয়াই সব কিছু দেখিতে পাইতেছি। কুয়ার্তেলে পুলিসের লোক হোক, রাজনৈতিক বন্দী হোক, কে আসিল কে গেল আমরা জানিতে পারিতামই; কারণ আমাদের হাজত ঘরটা কুয়ার্তেলের দেউড়ীর সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল। আমাদের ঘরের পাশেই পর পর কয়েকটা অন্ধকূপ হাজত। দুই নম্বর হাজতঘরে ভারতীয়দের রাখা হইয়াছে—রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও জনসঙ্ঘের বিশিষ্ট নেতা জগন্নাথরাও যোশী সেই ঘরে আটক আছেন। তাহার পরে আর সব কয়টি অন্ধকূপ ঘরে আমাদের ঘরের মতই গাদাগাদি করিয়া ২৫ জন ৩০ জন করিয়া গোয়াবাসী রাজনৈতিক বন্দীকে আটক রাখা হইয়াছে। তাহার পর 'পিঞ্জরা' বা খাঁচা-হাজত। সেখানে মহিলা রাজনৈতিক বন্দীদের রাখা হইয়াছিল,—আর ছিলেন সাতারার কম্যুনিস্ট কর্মী শ্রীরাজারাম পাতিল এবং মাপসার জাতীয়তাবাদী কর্মী শ্রীসিরসাট। ৯—১০ জন মহিলা বন্দী এই সময় কুয়ার্তেলে ছিলেন। শ্রীযুক্তা সুধাবাই যোশী ও শ্রীযুক্তা সিন্ধু দেশপাণ্ডের নাম তাঁহাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরিচিত।

* পর্তুগীজ ভাষায় 'নেটিভ'দের অবজ্ঞাসূচক নাম—'Caneco' বা 'Canarim'

তা'ছাড়াও কয়েকজন হিন্দু ও কয়েকজন ক্রিশ্চিয়ান মহিলা তাঁহাদের সংগে ছিলেন। সুধাবাই গোয়ার মেয়ে, কিন্তু তাঁহার বিবাহ হইয়াছে পুণায়। সিন্ধু দেশপাণ্ডে পুণার প্রজাসোস্যালিস্ট পার্টির নামকরা মহিলা কর্মী। ১৯৫৪ সালেও একবার তিনি আত্মগোপন করিয়া গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের সংগঠন গড়ার কাজে সাহায্য করার জন্য গোয়াতে আসিয়া ধরা পড়েন। পর্তুগীজ পুলিস তাঁহাকে তখন গ্রেপ্তার করিয়া গোয়ার বর্ডারে আনিয়া ছাড়িয়া দেয়। তিনি তাহার কিছু পরেই আবার আত্মগোপন করিয়া গোয়ার ভিতরে যান এবং প্রায় মাস ছয়েক আত্মগোপন করিয়া সমস্ত গোয়াতে ঘুরিয়া সংগঠনের কাজ করার পর দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার হন। এবার আর পুলিস তাঁহাকে ছাড়ে নাই। মিলিটারী ট্রাইবুনালে বিচারের জন্যে হাজতে আটকাইয়া রাখে। সিন্ধু দেশপাণ্ডের আমাদের অন্যান্য সকলের মতই—অর্থাৎ ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের মত—দশ বছর ও দুই বছর অর্থাৎ একুনে বারো বছর সাজা হয়। এই বছর ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের সংগে ছাড়া পাইয়া তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাঙলাদেশের বিপ্লবী যুগের মেয়েদের ছাড়া আমি সচরাচর সুধাবাই ও সিন্ধু দেশপাণ্ডের মত অকুতোভয় সাহস-সম্পন্না তেজস্বিনী মহিলা কর্মী কম দেখিয়াছি। বিশেষ করিয়া সিন্ধুর মত। লেশমাত্র ভয়ডর না রাখিয়া অবলীলাক্রমে পাহাড়-পর্বত জংগল পার হইয়া, দুর্বল ছিপছিপে গড়নের মৃদুভাষিণী এই মেয়েটি ভারতের বুক হইতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া ফেলার সংকল্প নিয়া লড়ার জন্য গোয়ায় ছুটিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়বার আবার তিনি গোয়ায় লুকাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, এ খবর পর্তুগীজ পুলিসের কাছে পেঁছানোর সংগে সংগে মন্তেইরো এবং অলিভেইরা তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। মন্তেইরোর দেশী গোয়ানীজ গোয়েন্দা চরদের, সিকিউরিটি পুলিসের, 'পিদে'র (অর্থাৎ ইণ্টারন্যাশনাল পুলিসের), সশস্ত্র পুলিস মিলিশিয়া—সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া সিন্ধু গ্রামের পর গ্রাম শহরের পর শহর ঘুরিয়াছেন। তাঁহার একটু সুবিধা ছিল এই যে, তিনি বেশ কোঙ্কনী ও ক্রিশ্চিয়ান কোঙ্কনী (পর্তুগীজ শব্দ মিশ্রিত কোঙ্কনী) বলিতে পারিতেন। কখনো দিশী ধরনের শাড়ী পরিয়া, কখনো গোয়াতে ক্রিশ্চিয়ান মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ফ্রক পরিয়া তিনি গোয়ার প্রায় সর্বত্র ঘুরিয়া কর্মীদের নিয়া গোপন বৈঠক করিয়াছেন, সংগঠন গুছাইয়াছেন, ভারতের সংগে বেলগাঁও-পুণা-বোম্বাইয়ে যোগ [illegible] যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৫৪'র শেষ দিক হইতে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তিনি গোয়াতে এভাবে না গেলে এবং না কাজ করিলে গোয়ার ভিতরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন কতদিন চলিত, বলা কঠিন।

সুধাবাই অবশ্য গোয়া গিয়াছিলেন কিছু পরে প্রকাশ্যভাবে। তিনি সংগঠনের কাজের সংগে খুব জড়িত ছিলেন না। তিনি গিয়াছিলেন মাপসায় গোয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়া। পুত্র-কন্যাকে স্বামীর কাছে রাখিয়া তিনি স্বামীর অনুমতি নিয়া গোয়াবাসীদের মুক্তি-সংগ্রামের পাশে গিয়া দাঁড়াইতে চান। তিনি যাওয়া মাত্রই যে পর্তুগীজ পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হইবেন এবং হয়ত লম্বা মেয়াদের সাজাও হইবে—একথা জানিয়াও তিনি গোয়াতে যান। আজ তাঁহার ষোলো বছরের সাজা হইয়াছে। গোয়াতে তাঁহার পিতৃগৃহ বলিয়া তিনি পর্তুগীজ আইনে পর্তুগীজ প্রজা: তাঁর দুই ভাইও এখন আগুয়াদা দুর্গে লম্বা মেয়াদের সাজা খাটিতেছেন। আমি পঞ্জিম কুয়ার্তেলের এক নম্বর হাজতে যখন ছিলাম, সে সময় অনেকদিন ভোরে পুলিস পাহারায় বাহিরে হাত-মুখ ধুইতে যাওয়ার পথে বারান্দায় মহিলা বন্দীদের সংগে এক-আধবার দেখা হইয়া যাইত। সিন্ধু ও সুধাবাই ছাড়াও সে সময় আরও সাত-আটজন মহিলা বন্দী সে সময় কুয়ার্তেলে ছিলেন—তাঁহারা সকলেই পিঁজরা হাজতে ছিলেন। তাঁহাদেরকেও আমাদের মতই হাত-মুখ ধোয়ার জন্য এবং স্নানের জন্য আলাদা বাথরুমে লইয়া যাওয়া হইত; আমরা অবশ্য যাইতাম কুয়াতলায়। সেই সময় পথে কোন কোনদিন মেয়েদের সংগে দেখা হইত। সংগে ভদ্র গোয়ানীজ পাহারাওয়ালা থাকিলে এক আধটি কথা বলা বা খবরাখবর নেওয়ার অসুবিধা হইত না। পর্তুগীজ পুলিসদের সম্পর্কে একটা কথা এখানে না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে যে, এক 'পিঁজরা-হাজতে' রাখা ভিন্ন মহিলা বন্দীদের সংগে তাহারা হাজতে বা জেলে কোনপ্রকার অসম্মান বা অপমানসূচক ব্যবহার করে নাই। জাতি হিসাবে পর্তুগীজ-দের একটি বড় সদ্‌গুণ এই যে, সাধারণ পক্ষে তাহারা মহিলাদের সম্পর্কে কিছুটা শালীনতাবোধসম্পন্ন এবং বিবেচনাশীল। রাজনৈতিক বন্দীদের মহিলা আত্মীয়স্বজন বা পত্নীরা তাঁহাদের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিলে পুলিস বা জেল কর্তৃপক্ষের কাছে অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ-সুবিধা পাইতেন। পুরুষ আত্মীয়স্বজনের অবশ্য সে সুবিধা ছিল না। আমরা হাজতে থাকিতে নানাভাবে মহিলা বন্দীরা কোথায় কি অবস্থায় আছেন, তাহা খোঁজ নিতে চেষ্টা করি। পিঁজরা হাজতে অন্ধকার খাঁচার মত ঘরে তাঁহাদের মাসের পর মাস রাখা হইয়াছে, এছাড়া অভিযোগ করার মত বা প্রতিবাদ জানানোর মত বিশেষ কিছুই পাই নাই। মহিলা বন্দীদের গ্রেপ্তারের সময় দু-একটি ক্ষেত্রে কিছু গালাগালি করা ছাড়া বা অল্প কিছু রুক্ষ ব্যবহার ছাড়া কোন মার-ধর করা হয় নাই।

শুনিয়াছি মাপসায় গোয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিতে গিয়া সুধাবাই যখন গ্রেপ্তার হন, তখন তাঁহাকে কিছু ধাক্কা ও চড়-চাপড় খাইতে হয়। কিন্তু হাজতে আণ্ডার ট্রায়াল বা 'ঘুস্‌পেইত' হিসাবে থাকার সময় পুরুষ বন্দীদের যেমন নিয়মিতভাবে পিটুনী-ঘরে নিয়া গিয়া তক্তাপেটা করা হইত, মহিলা রাজনৈতিক বন্দীদের কখনও সেটা সহ্য করিতে হয় নাই। সুধাবাই ও সিন্ধু দেশপাণ্ডের তেজস্বিতা ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে গোয়ান পুলিসদের তো বটেই, আমি দু' একজন সুবু শেফ্ ও উচ্চপদস্থ পর্তুগীজ পুলিস অফিসারকেও সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলিতে বা আলোচনা করিতে শুনিয়াছি। মিত্রা কাকোড়কর (গোয়া মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা পুরুষোত্তম কাকোড়করের ভগ্নী), শালিনী, কুমুদিনী, ইভা, সোলিনা প্রত্যেকের সম্পর্কেই এ কথা বলা যাইতে পারে। তবে ইঁহাদের সকলের মধ্যে সুধাবাই ও সিন্ধুই নেতৃস্থানীয়া ছিলেন। আমরা পঞ্জিম কুয়ার্তেলে থাকিতে থাকিতেই ইঁহাদের মধ্য হইতে মিত্রা ও শালিনীর সাজা হইয়া যায়। গোয়াতে ইঁহারা দুজনই রাজনৈতিক কারণে প্রথম দণ্ডিতা মহিলা-বন্দী। ট্রাইব্যুনালের মিলিটারী জজেরা যখন তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করেন—'তোমরা কি বাড়িতে ফিরিয়া যাইতে চাও না জেলে যাইতে চাও?'—দুজনেই বিনা দ্বিধায় এক সঙ্গে উত্তর দেন—"গোয়া বিদেশী পর্তুগীজদের দখলে থাকিতে সমস্ত গোয়াটাকেই আমরা একটা বড় আকারের জেল ছাড়া কিছু মনে করি না"। মিলিটারী আদালতে প্রথম মহিলা আসামী বলিয়া বোধহয় তাঁহাদের একটু কম করিয়া চার বছর আর দুই বছর, অর্থাৎ ছয় বছর করিয়া সাজা হইয়া যায়। ইঁহাদের পরে যে সমস্ত মহিলা সত্যাগ্রহীকে ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করা হয় তাঁহাদের আর কাহাকেও অবশ্য সালাজারের বীর মিলিটারী জজেরা কোনো খাতির দেখান নাই। ফলে প্রত্যেকেরই দশ, বারো বছর করিয়া এবং সুধাবাইয়ের ষোলো বছর সাজা হইয়া গিয়াছে।

কুয়ার্তেলে পিঞ্জরা হাজতের পর ছিল পর্তুগীজ মিলিটারী সৈনিকদের হাজত। সৈন্যদলের কোনো লোক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিলে বা অন্য কোন অপরাধ করিলে তাহাদের আনিয়া এইসব ঘরে রাখা হইত। এইসব ঘরে সাধারণত কোন গরাদ দেওয়া বা দরজা বন্ধ করিয়া তালা দেওয়া থাকিত না। তাহারা প্রত্যেকেই খাট বিছানা পাইত, পুলিস কুয়ার্তেলের এলাকার ভিতর ইচ্ছা মতন ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিত। তাহাদের খাবার আসিত পর্তুগীজ পুলিসের মেস হইতে। আমরা কুয়ার্তেল হইতে বদলি হইয়া যাওয়ার পর অল্পকিছু পর্তুগীজ সৈন্যদলের লোকেদের এখানে আনিয়া দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া তালা দিয়া আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহারা নাকি ১৫ই আগস্ট সীমান্তে ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চালাইতে অস্বীকার করে। পরে শুনিয়াছি, তাহাদের সকলকেই লম্বা সাজা দিয়া পর্তুগালে জেলে পাঠানো হইয়াছে। এ সংবাদ আমরা পাই মিলিটারী গার্ডদের কাছেই মানিকোম্ পাগলা গারদে বসিয়া।

আগেই বলিয়াছি, কুয়ার্তেলের ব্যাক্ ইয়ার্ডে কয়েকটি নূতন বানানো ছোট ছোট সেল—যতদূর মনে পড়ে, মোট চারটি সেল সেখানে ছিল। তাহার একটিতে শ্রীযুক্ত গোরে ও বন্ধুবর শ্রীধর পুরুষোত্তম লিমায়েকে রাখা হইয়াছিল। তাঁহাদের পাশের সেলে ফাবিয়ান দা কস্তা এবং পোখ্‌ড়ে ও গোখ্‌লে নামে দুইজন ভারতীয় সত্যাগ্রহী ছিলেন। তৃতীয় সেলটিতে ছিলেন গোয়া মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ও গোয়ার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ দুভাষী। ডাঃ দুভাষী গোয়ার সম্ভ্রান্ত অভিজাত বংশের লোক বলিয়া হাজতে শোওয়ার [illegible] একটি খাট পাইয়াছিলেন; আর গোরে ও লিমায়ের কপালে ভারতীয় কন্সাল জেনারেলের চেষ্টা ও তদ্বিরের ফলে একটি করিয়া খাট ও মশারি জুটিয়াছিল। ফলে এই তিনজন অন্যান্য বন্দীদের তুলনায় হাজতে অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেলগুলি একেবারে পাইখানার কাছাকাছি থাকাতে তাঁহাদের সময় সময় বিকট দুর্গন্ধের আবহাওয়ায় থাকিতে হইত। পর্তুগীজ পুলিসের কিছুটা পরিচ্ছন্নতা বোধ থাকিলে হয়ত এটা হইত না; কারণ সবগুলি পাইখানাই ছিল আধুনিক ধরনের ফ্লাশ পাইখানা। কিন্তু এগুলি ব্যবহার করিত প্রধানত থানার পর্তুগীজ ও গোয়ান কন্‌স্টেবলেরা। আমি আমার অভিজ্ঞতায় পর্তুগীজদের মত অপরিষ্কার স্বভাবের ইউরোপীয় জাতি দেখি নাই। উত্তর ইউরোপীয়দের তুলনায় দক্ষিণের লাতিন জাতের লোকেরা কিছু অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন হয়। আপেক্ষিক আর্থিক দারিদ্র্যও বোধহয় ইহার একটি কারণ। নিরক্ষর কৃষিজীবী সমাজের অনগ্রসরতার প্রভাবও ইহাতে হয়ত আছে—কিন্তু কৃষিজীবী সমাজের লোক হইলেই অপরিষ্কার হয় না। পর্তুগীজ শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যেও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাবোধের অভাব ঐ শ্রেণীর ইংরাজ বা উত্তর ইউরোপীয়দের তুলনায় অনেক বেশী বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। তবে কারণ যাই হোক, গোরে প্রভৃতি ব্যাক্ ইয়ার্ডের সেলে বন্দী রাজনৈতিক কয়েদীদের পক্ষে তাহার ফল নিতান্ত মারাত্মক হইয়াছিল; বারংবার অভিযোগ জানাইয়াও ডাঃ দুভাষী বা গোরে-রা ইহার কোনো প্রতিকার করাইতে পারে নাই। ১৯৫৬ সালে বোধ হয় অক্টোবর নভেম্বর মাস হইতে এক-দিনের জন্য একবার আমরা কয়েকজন আগুয়াদা দুর্গের জেল হইতে পঞ্জিম কুয়ার্তেলে আসি। তখন দেখি, এইসব পায়খানাগুলি ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে আর তাহার জায়গায় খুব আধুনিক ধরনের "বক্স-সেল" হাজতের জন্য "বাক্স"-কুঠুরী তৈয়ারী হইয়াছে। সে সময় ঘণ্টা কয়েকের জন্য আমি নিজেও একটি "বক্স-সেলে" থাকিয়া গিয়াছি—সেখানে ঐ ধরনের পাইখানার দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু তাহাতে পর্তুগীজ পুলিসদের পরিচ্ছন্নতাবোধের কিছু উন্নতি দেখা গিয়াছে কিনা বা তাহাদের অপরিষ্কার স্বভাবের পরিবর্তন হইয়াছে কিনা তাহা বলিতে পারি না। আগুয়াদা দুর্গে দিনের পর দিন পর্তুগীজ সৈন্য, সার্জেণ্ট ও অফিসারদের চাল-চলন দেখিয়া সেরূপ মনে করার কোনো কারণ পাই নাই।

ব্যাক্ ইয়ার্ডেও আমাদের রোজ সকাল-বেলায় একবার আসিতে হইত হাত মুখ ধোওয়ার জন্য এবং প্রত্যেকের নিজের নিজের চব্বিশ ঘণ্টার জমানো প্রস্রাবের বোতল বা টিনের কৌটা সাফ করিয়া নেওয়ার জন্য। যে যা করিতে চায় সবকিছু আধ ঘণ্টার মধ্যে সারিতে হইবে। সারাদিনে সেই সময় আমাদের একবার করিয়া পাইখানা যাওয়ার হুকুম ছিল। প্রত্যহ ভোরে সেই আমাদের একবার করিয়া গোরে লিমায়ে ও ডাঃ দুভাষীর সঙ্গে চোখে চোখে দেখা হইত। কথা বলার হুকুম ছিল না—মেয়েদের বেলায় পুলিস যেটুকু খাতির করিত, এক্ষেত্রে তাহা হওয়ার কোনো উপায় ছিল না। তবে ভরসার মধ্যে আমার পনেরো-ষোলো বছর বৃটিশ জেলে অর্জিত অভিজ্ঞতাটুকু ছিল। সালাজারের ফ্যাসিস্ট পুলিসের বা 'পিদে'র দৃষ্টি এড়াইয়া থাকা-কালীন ভারতীয় সহবন্দীদের সঙ্গে সামান্য-সামান্য কথা বলার সুযোগ না থাকিলেও অন্যভাবে যোগাযোগ স্থাপন করার কোনো বাধা হয় নাই। (ক্রমশ)
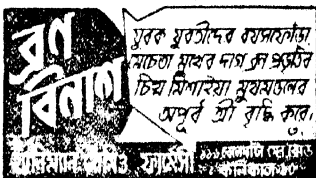
একথা বলাই বাহুল্য যে, নিজেরা স্বাধীনতার জন্য না লড়লে ইন্দোনেশিয়ানরা স্বাধীন হতে পারত না। তাহলেও শেষ পর্যায়ে, ১৯৪৯ সালে, ইউনোর মধ্যস্থতা—যার পিছনে বিশেষ করে ভারতের আগ্রহ এবং আমেরিকার চাপ ছিল—ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে অনেকটা সহায়ক হয়েছিল। পরিতাপের বিষয় এই যে, সেই ইউনো'রই কর্তব্যপরাঙ্মুখতার ফলে আজ ইন্দোনেশিয়ান ও ডাচের মধ্যে গুরুতর অশান্তি দেখা দিয়েছে—অন্তত বাহিক সেইরকমই দেখা যাচ্ছে।

১৯৪৯ সালে যখন ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় তখন পশ্চিম ইরিয়ান অর্থাৎ নিউগিনির ডাচ্-অধিকৃত অংশ সম্বন্ধে কোনো মীমাংসা হয় নি। পশ্চিম ইরিয়ান ডাচদের দখলেই থেকে যায় কিন্তু কথা থাকে যে, এবিষয়ে নিষ্পত্তির আলোচনা চলতে থাকবে। কিন্তু অনতিকাল পরেই দেখা যায় যে, ডাচদের কিছু করার মতলব নেই এবং শেষ পর্যন্ত ডাচরা আলোচনার সূত্র পর্যন্ত ছিন্ন করে দেয়। অবশ্য কেবলমাত্র এ ব্যাপারেই যে মতবিরোধ হয় তা নয়। ১৯৪৯ সালের ডাচ-ইন্দোনেশিয়ান চুক্তির ব্যাখ্যা নিয়েও পরে অনেক মতভেদ হয় এবং অনেকটা যে যার ইচ্ছা এবং সুবিধা মত চলে। ফলে ১৯৪৯ সালের চুক্তির অর্থনৈতিক ও সামরিক অনেক সর্তই বাস্তবে বাতিল হয়ে যায়। এর একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে, ডাচরা বাহ্যত ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েও ভিতরে ভিতরে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সামরিক প্রভাব এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি কায়েম রাখবার চেষ্টায় ছিল। যখন ইন্দোনেশিয়ানরা সেটা বরদাস্ত করতে আপত্তি করল তখন ইন্দোনেশিয়ানদের মধ্যে বিভেদের অগ্নিতে ডাচরা ইন্ধন জোগাতে কসুর করেনি।

তিন সহস্রাধিক ছোট বড় দ্বীপে ছড়ানো ইন্দোনেশিয়ান জাতির ঐক্য রক্ষা একটা সহজ কাজ নয়, গত কয়েক বছরে তাতে নানারকম বিঘ্নও উপস্থিত হয়েছে। জাকার্তার শাসনের জোর ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র সমান, একথা এখনো বলা যায় না। গভর্নমেণ্ট এবং সৈন্যবাহিনীর নেতাদের মধ্যেও মত ও মনের মিল সর্বক্ষেত্রে নেই এবং দু' এক জায়গায় সামরিক নেতারা অনেকটা স্ব স্ব প্রধানভাবে চলেছেন এরকম সংবাদও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এরকম অবস্থায় ডাচরা স্বভাবতই ভেবেছে যে, পশ্চিম ইরিয়ান সম্বন্ধে ইন্দোনেশিয়ানদের দাবী উপেক্ষা করাও চলে, কারণ তারা ভেবেছে যে, ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান আভ্যন্তর অবস্থায় ইন্দোনেশিয়ানরা বিশেষ কিছু করতে পারবে না। সুতরাং বছরের পর পর ইরিয়ান সম্পর্কে ইন্দোনেশিয়ানদের কথা তারা কানে তোলার দরকার বোধ করেনি। ইন্দোনেশিয়ার সরকার ব্যাপারটাকে ইউনোতে তুলে এইটুকু চেয়েছিলেন যে, পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে ডাচ ও ইন্দোনেশিয়ান কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা কর্তব্য অন্তত এই সুপারিশটুকু ইউনো করবে।
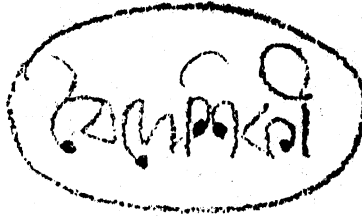
কিন্তু তাও হলো না। ইউনোতে এই সম্পর্কে যে-প্রস্তাব আনা হয়েছিল তার পক্ষে ভোট অর্ধেকের বেশি হয়েছিল বটে, কিন্তু দু-তৃতীয়াংশের কম ছিল। সুতরাং প্রস্তাব বাতিলের সমান হয়ে গেল। ইউনোর সেক্রেটারী-জেনারেলের সহযোগিতায় দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা চালাবার জন্য এরূপ প্রস্তাবের পক্ষে ইউনোতে দুই তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া গেল না—এতে ইউনোরই লজ্জা ও অপমান। কারণ এর দ্বারা ইউনোর মূল নীতি—আলোচনার দ্বারা সমস্যা সমাধানের নীতিই—খণ্ডিত হ'ল।

এর জন্য ডাচদের চেয়ে অস্ট্রেলিয়া ও বৃটেনকেই বেশি দোষ দিতে হয়। নিউ-গিনির পশ্চিমাংশ থেকে ডাচ দখলের অবসান হলে অন্য অংশে বর্তমান অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃত্বের অবসানের দাবীও একদিন

উঠতে পারে এইজন্য অস্ট্রেলিয়া ইরিয়ানের ডাচ-অধিকৃত অংশ সম্পর্কেও কোনো কথা উঠতে দিতে রাজী নয়, যদিও ডাচ ও ইন্দোনেশিয়ানদের মধ্যে পশ্চিম ইরিয়ানের সমস্যার অস্তিত্ব আন্তর্জাতিকভাবে ১৯৪৯ সাল থেকে স্বীকৃত। বিষয়টা নিয়ে ইন্দোনেশিয়ানদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়ে আসছে। সমস্যাটা সদ্য সদ্য না মিটলেও অন্তত কথাবার্তা আরম্ভ হলেও ইন্দোনেশিয়ায় উত্তেজনা কিছু কমত। ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃপক্ষ তাই চেয়েছিলেন কিন্তু অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি তাতেও বাদ সাধল। একথা ঠিক যে, পশ্চিম ইরিয়ান থেকে ডাচ কর্তৃত্ব বিদায় হলে অন্য অংশে কাদের কর্তৃত্ব হওয়া উচিত সেকথাও পরে উঠত। কিন্তু এখনই কেউ অস্ট্রেলিয়াকে হয়ত ঘাটাতে অগ্রসর হ'ত না। তাছাড়া, এব্যাপারে হল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে তফাৎ আছে। নিউগিনির এক ধার অস্ট্রেলিয়ার খুব কাছে, মধ্যেকার সমুদ্রের ব্যবধানটা খুব কম। সেইজন্যই প্রথম মহাসমরের পরে নিউগিনির জার্মান-অধিকৃত ভাগ "ম্যানডেটেড" অঞ্চল হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার শাসনাধীন করা হয়। "ম্যানডেটেড" অঞ্চলগুলি কাদের ভোগ্য হয়েছে সেকথা সকলেই জানে। যাই হউক, নিউগিনিতে ডাচদের কর্তৃত্ব থাকার চেয়ে নিউগিনির অস্ট্রেলিয়ার নিকটস্থ অঞ্চলে অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃত্ব থাকা কম বিসদৃশ এবং ইন্দোনেশিয়া এব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে সহসা সংঘর্ষ বাধাতে যে ইচ্ছুক নয় সেটা ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃপক্ষের ঘোষণাদি থেকে বুঝা গিয়েছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া পুরোপুরি ডাচ পক্ষ সমর্থন করেছে। ডাচ অধিকৃত পশ্চিম ইরিয়ানে তেল আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেই ব্যবসায়ে ডাচ, অস্ট্রেলিয়ান ও ব্রিটিশ স্বার্থ সংযুক্ত হয়েছে। নিউগিনির অর্থনৈতিক নিষ্কাসন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। যদি এর তৈলবাহী অংশ ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃত্বে যায় তবে সেখানকার উন্নতির জন্য ইন্দোনেশিয়া পশ্চিমা ছাড়া অন্য শক্তির কাছ থেকেও অর্থনৈতিক বা অন্যরকম সাহায্য নিতে পারে। তাহলে পৃথিবীর ঐ অঞ্চলে পশ্চিমাবিরোধী শক্তির "নাক গলানো"র সম্ভাবনা হবে, এটাও বোধহয় অস্ট্রেলিয়া ও হল্যান্ড অনেককে বুঝিয়েছে। সম্প্রতি জাভায় বিভিন্ন নাগরিক অঞ্চলের ইলেকশনে কম্যুনিস্টদের অগ্রগতির প্রতিও হয়ত দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কম্যুনিস্টদের প্রতি প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের ভাবটাও কারো কারো ভালো লাগতে না পারে।

কিন্তু ভয় যাই থাক, পশ্চিম ইরিয়ানের সম্বন্ধে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত বলব না, এরকম গোঁ ধরার যে-ফল দেখা যাচ্ছে সেটা কি কারো পক্ষে কম দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে? ইউনোতে প্রস্তাব বাতিল হবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচদের বিরুদ্ধে সে-সব প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হবার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু অতিরঞ্জন থাকা অসম্ভব নয়। হয়ত ডাচরাই ইন্দোনেশিয়ানদের দোষী করার জন্য অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রচারের উস্কানি দিচ্ছে। তাহলেও মোটের উপর যে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সম্পত্তি বিপন্ন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু জনতা কর্তৃক ডাচদের হাত থেকে এতো প্রতিষ্ঠান কেড়ে নেবার সংবাদের মধ্যেও কিন্তু এখন পর্যন্ত একটিও ডাচের জীবনহানি হয়েছে বলে সংবাদ আসে নি। তাই ঘটনাগুলির ঠিক রকমটা এখনো বুঝা যাচ্ছে না।

ইন্দোনেশিয়ায় ডাচদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য নাকি হল্যান্ড ভারত সরকারকে ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য অনুরোধ করেছেন। আবার ওদিকে NATO-র কাছেও হল্যান্ড আবেদন পেশ করেছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। NATO-কে এর মধ্যে টানার চেষ্টাটা খুব ভালো কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে মস্কো থেকে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সম্পত্তির জবর দখলের সমর্থন করে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং "কোল্ড ওয়ারের" আর একটা ফ্রন্ট খুলল; তাতে ভারত সরকারের পক্ষে গোলমাল শান্ত করার চেষ্টা আরো একটু কঠিন হবে।

ছোট গল্প

রূপহলুদ—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দু'টাকা।

জীবনের অনাড়ম্বর প্রকাশের মধ্যেও যে গল্পের উপাদান আছে, বিভূতিভূষণের চেয়ে বেশি নিষ্ঠা নিয়ে বাংলার অন্য কোনো আধুনিক গল্পকার বোধহয় সে প্রসঙ্গ প্রমাণ বা উদ্ঘাটন করেননি। 'রূপহলুদ'-এর মোট দশটি গল্পের প্রত্যেকটির মধ্যে সেই সহজ, সাধারণ, সংশয়হীন স্বাভাবিকতা তো আছেই, তাছাড়া নিপুণ গল্প-লেখক যে কৌশলে পরিচিতকে বিস্ময়কর করে তোলেন, অভ্যস্তকে অপ্রত্যাশিতের গৌরব দেন এবং অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলি একে একে লোকচক্ষুর অধিগম্য করে পাঠককে শ্রদ্ধান্বিত ও [illegible] হবার সুযোগ দেন, এই দশটি গল্পের সবার সেই সৃষ্টিনৈপুণ্যের পরিচয় আছে। এই গুণের কথা সাধারণভাবে তাঁর সমস্ত গল্পের প্রসঙ্গেই স্বীকার্য। কিন্তু 'রূপহলুদ'-এর দশটি গল্পের মধ্যে সবগুলিই যে একটিমাত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলবে, তা নয়। 'ননীবালা' গল্পে গরীব বিধবা ননীবালার মেয়ে 'নাড়ু' অদৃষ্টের অনুগ্রহে [illegible] দারিদ্র্যের কবল থেকে ছাড়া পেয়েছে, [illegible] চক্রবর্তী প্রেতাত্মার অলৌকিক রহস্য ঘনিয়ে তুলেছেন, 'ভূতো হাজরা কথা কয়' লেখাটির মধ্যে মৃত্যুরহস্য ও নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান কামনার করুণ সত্যের উপর [illegible] অলৌকিক শক্তি বিলাসে অপরূপ এক আবেগ ফুটে উঠেছে। 'কাশী কবিরাজের গল্প'-তেও অনুরূপ রহস্য সমাবেশ দেখা যায়। 'ছোটনাগপুরের জঙ্গলে' কিন্তু বিভূতিভূষণের আর একরকম বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ। পাহাড়-নদী-জঙ্গলের মাঝখানে মানুষের মনে যে আশ্চর্য অধ্যাত্মরস জেগে ওঠে, সৃষ্টির গভীর, বিপুল রহস্যের সামনে মানুষের মনে যে [illegible] দেখা দেয়, এই লেখাটির মধ্যে বিভূতিভূষণের সেইসব প্রবণতার প্রকাশ ঘটেছে। একালে গল্পের আদর্শ এবং আঙ্গিক বদলেও নানান দৃষ্টান্তের মধ্যে তাঁর নিজস্ব এই বিশেষ ভঙ্গীটি বিশেষ স্মরণীয় এবং স্বভাবতই তাঁর এ গল্প পড়তে পড়তে বারবার তাঁরই 'আরণ্যক'-এর কথা মনে পড়ে।

'রূপহলুদ'-এর প্রধান ঝোঁক এই অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টির দিকে। সে অলৌকিকতার বিশ্লেষণ করলে একদিকে যেমন 'মায়া' গল্পের ভৌতিক আবহাওয়া এবং সেই সূত্রে কাশী কবিরাজের গল্প ইত্যাদি মনে পড়ে,—অন্যদিকে আবার ছোটনাগপুরের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে লেখকের সঙ্গে বলতে ইচ্ছে করে "সেই শালবনে বসে ভগবানের এই অপূর্ব বিশ্ব-সৃষ্টি দেখে মনে মনে কেবলি বলতে লাগলুম, বাবলু বড় হয়ে যেন এই শিল্প দেখে—দেখে উপভোগ করে।"

এযাবৎ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত বিভূতিভূষণের এই গল্পগুলি গ্রন্থস্থ করে প্রকাশক আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। ৩৫৮।৫৭

রাঙ্গা শাঁখা—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী। মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম আড়াই টাকা।

বর্তমান বইখানি সাতটি ছোট গল্পের সংকলন এবং পুনর্মুদ্রণ। অনুরূপা দেবীর লেখার ধরন ও বৈশিষ্ট্য এ গল্পগুলিতে সুপরিস্ফুট। অর্থাৎ প্রাচীনপন্থী ভাব ও ভাষা আর জীবনের পবিত্র আদর্শ, এক কথায় 'প্লেন লিভিং' ও 'হাই থিঙ্কিং'। আধুনিক কালের পাঠক-পাঠিকার কাছে এদের আবেদন কেমন হবে জানি না। বর্তমান সমাজ-দৃষ্টিতে লেখিকার বক্তব্য কতদূর বাস্তব এবং গ্রাহ্য, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তবে আজ থেকে চল্লিশ বছরেরও কিছু আগে বাংলা কথা-সাহিত্যে কি রকম বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গী নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব ছিল, তার একটা নমুনা পাওয়া যায় বটে। 'রাঙ্গা শাঁখা' নামক প্রথম গল্পটির শেষ এইভাবে:—

পরিতুষ্টদেবের স্মীর মুখে চাহিয়া চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "অন্নপূর্ণা! বাংলার প্রতি ঘরে তোমার অধিষ্ঠান হোক! সত্যিই হীরের বালার চাইতে তোমার হাতে এই রাঙ্গা শাঁখা দুগাছি অনেক বেশি মানাচ্ছে—এ যে দেবীর হাত!" এই রকম উঁচু ভাব ও ভাল ভাল কথা দিয়ে বালিকা বধূর সঙ্গে বাক্যালাপ কোন স্বামীই এখন কল্পনা করতে পারবেন না। পারলেও কোন স্ত্রী বরদাস্ত করবেন কি না সন্দেহ। তাই 'পীরিয়ড-পীস' হিসেবে এ সব গল্প ইন্টারেস্টিং। 'কুন্তলীন' পুরস্কারপ্রাপ্ত 'মিলন' গল্পটি ১৩১৩ সালে লেখা হলেও বরং কৌতূহল উদ্রেক করতে পারে। নইলে বাকি গল্প সবই যাদুঘরের সামগ্রী এবং সেখানে হয় প্রেম, নয় ঘৃণা, হয় খুব ভালো, নয়তো একেবারে মন্দ, একদিকে ভোগ, অপর দিকে চরম ত্যাগ আর শেষ পর্যন্ত মন্ত্রশক্তির মাহাত্ম্যে স্বামীর পদতলে স্ত্রীর হার-স্বীকার। অনুরূপা দেবী সংস্কৃতজ্ঞা বলেই জানি। তাই

দশম পৃষ্ঠায় 'দৈন্যতায়' কথাটি দেখে আশ্চর্য লাগল। (৫২৭।৫৭)

কেরালার গল্পগুচ্ছ: অনুবাদক বি বিশ্বনাথম্‌। দ্বিতীয় সংস্করণ। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

চার মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন থেকেই এ গল্পগুচ্ছের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। রাজনীতি ছাড়াও সাহিত্যের আসরে কেরালার যে বিশিষ্ট দান আছে, তার সাক্ষ্য এই চৌদ্দটি ছোট গল্প। অনুবাদকের কাজ সফল হয়েছে। তিনি গল্প বাছাই করতে জানেন এবং অন্য ভাষায় তাদের রূপান্তর করতেও পারেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। (৫৩৩।৫৭)

উপন্যাস

ধুলো মাটি : ননী ভৌমিক। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম ছয় টাকা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাস। ইতিপূর্বে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে বহু উপন্যাস লেখা হয়েছে তবু প্রকাশভঙ্গির বিশেষত্ব আর যুগজীবনের চিত্র সম্পর্কে লেখকের সচেতনতা 'ধুলো মাটি'কে একটা স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে সেকথা স্বীকার করতেই হবে। সাধারণ একটি মধ্যবিত্ত পরিবার। সে-পরিবারের ছোট ছেলে বীরুকে নিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত ও সমাপ্তি। স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তেজনা, ইংরেজ শাসনের ও অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া, পারিবারিক ও সামাজিক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বেড়ে চলেছে বীরু। তার এই বেড়ে চলার পথে আমাদের সামনে এসেছে তার ঠাকুর্দা আদর্শবাদী রাম-চন্দ্রবাবু, দিদিমা, বাবা পূর্ণচন্দ্র, মা মোহিনী দেবী, দাদা শিবু আর প্রতিবেশিনী কিশোরী প্রতিমা। এসেছেন জমিদার, ইয়াসিন জাহাজী। সকলকে ছাড়িয়ে যায় মোহিনী দেবী আর প্রতিমা। বাঙালী পরিবারের বধূ হিসেবে আমরা দেখেছি মোহিনী দেবীকে। যে যুগে, যে সমাজে ও পরিবেশে তার গতিবিধি, তার মন, তার ধ্যান, তার স্বপ্নময়তা থেকে থেকে কেবলই তাকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধার যে চাকাটা মোহিনী দেবীর বাইরের বধূ জীবনকে বালিকা বয়স থেকে প্রৌঢ়ত্বে গড়িয়ে নিয়ে গেল, সেটা তার নারীমনকে জুড়াতে পারল না কোনদিন—এটাই তার চরিত্রকে পরিবারের আর পাঁচজনের মধ্যে বিশেষ করে তুলেছে। ওদিকে শিবুর জন্যে প্রতিমার প্রতীক্ষা কাতর চোখ তাকে একেবারে পাঠকের কাছে নিয়ে আসে। কেরানীর ঘরে যার জন্ম—বিনা প্রতিবাদে লক্ষ্মী মেয়ের মতো যার জীবন কাটিয়ে দেবার কথা—কোথা থেকে কোন অপ্রত্যাশিত প্রেরণা তারই অনুভূতিকে ভীষণ-ভাবে নাড়া দিয়ে সাধারণের মধ্যে তাকে খাপছাড়া অদ্ভুত করে তোলে—তবু শেষ পর্যন্ত অসাধারণত্বের মর্যাদা দিয়ে যায় প্রতিমা তারই অবিস্মরণীয় উদাহরণ।

হৃদয়ের আবেদনে 'ধুলো মাটি'র ভাষা পাঠককে বিভোর করে রাখলেও, আর বিরাট সম্ভাবনার স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকলেও শেষ অবধি উপন্যাসটি বোধহয় লেখকের অনুশীলনের অভাবে সর্বাঙ্গীণভাবে দানা বাঁধতে পারে নি। তবু 'ধুলো মাটি' ননী ভৌমিকের প্রথম উপন্যাস এবং পরবর্তীকালে লেখক নিশ্চয়ই এমন ব্যাপক পরিধিতে সার্থক মহৎ উপন্যাস রচনা করতে সমর্থ হবেন।

দেবকন্যা—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং; ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য চার টাকা।

গ্রন্থকার ইতিমধ্যে কথাসাহিত্যে একটি নিজস্ব ও নির্দিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার গল্প ও উপন্যাসের পরিবেশটি কিছু নূতন, কখনও অ-ভারতীয়, কখনো বা দাক্ষিণ ভারতীয়। বর্তমান উপন্যাসখানির ঘটনাস্থল ও পাত্রপাত্রী সবই দাক্ষিণাত্যের। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্যই বোধ হয় উপন্যাস এত সত্য ও বাস্তব হইতে পারিয়াছে। যেটুকু কল্পনা, সেটুকু ঘটনায় এবং চরিত্র-চিত্রণে। এবং তাহাও যে উজ্জ্বল, সে কথা স্বীকার করিতে হইবে। একটি অঞ্চলের সভ্যতা, তার স্থানীয় চিত্র ও বর্ণ, রীতি ও নীতিকে এমন শোভন ও সঙ্গত-ভাবে পরিস্ফুট করা কৃতিত্বের কথা। মন্দিরে দেবদাসীর নৃত্য, তাহার শিক্ষা-দীক্ষার কথা সকলেরই কিছু শোনা বা জানা আছে। কিন্তু সেই দেবকন্যার জীবন-কথা, তাহার সুখ দুঃখ, আশা-ভরসা, বঞ্চনা ও বেদনার কথা এমন সুন্দর-ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে মনে হয় কোন্ডা আর লছমী, নাগমণি আর কৃষ্ণবেণী এবং সব শেষে চিত্রাঙ্গদীর জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করা যাইতেছে। আর এ কাহিনীর নায়ক সোমনাথ এবং নেপথ্যের সূত্রধর পার্বতী-মাও পাঠকের চিত্ত জয় করিবে। পবিত্র গোদাবরীর তীরে একটি অনগ্রসর সমাজের পতিত নর-নারীদের লইয়া সহানুভূতির রসে সিক্ত এমন একখানি নিদোষ সুপাঠ্য উপন্যাস পড়িলে মনে আশা ও আনন্দ জাগে। রোমাণ্টিক উপন্যাসখানি একেবারে দুর্বলতাহীন নয়। কিন্তু সহৃদয় পরিবেশনের গুণে সামান্য ত্রুটি-গুলি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। (১৪৪।৫৭)

বিবিধ

মেষ লগ্নের সব কোষ্ঠি বিচার : জ্যোতিঃশাস্ত্রী শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য। [illegible] জ্যোতিষাগার, ১৩৬, শহীদ দীনেশ গুপ্ত রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪। মূল্য [illegible]।

[illegible] একটি গ্রন্থ সম্পর্কে [illegible] পুস্তকে দেওয়া হয়েছে। [illegible] এই [illegible] বলা হয়েছে। [illegible] ঐ [illegible] বিশেষ কিছুই মিলবে না। কাজেই এই ধরনের পুস্তক সাধারণের পক্ষে বিশেষ কাজে আসবে বলে মনে হয় না। তবে যাঁরা জ্যোতিষ নিয়ে চর্চা করেন, গবেষণার দিক দিয়ে তাঁদের পুস্তকখানি কাজে লাগতে পারে।

পুস্তকখানির মোট পৃষ্ঠা ১২২। মূল্য আরো কিছু কম হলে ভালো হত।

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

মালা—শ্রীলতা চট্টরাজ।
সমুদ্র থেকে আকাশ—অমিতাভ দাশগুপ্ত।
বক্তৃতা—দ্যুতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
উদয় তীর্থ—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সাহিত্য সন্দর্শন—শ্রীশচন্দ্র দাশ।
মুর্শীর দেশে—রবিদাস সাহা রায়।
JAWAHARLAL NEHRU — A BIRTH GIFT.—(Tagore Society, 32/8, Beadon Street, Calcutta).
ASHUTOSH COLLEGE MAGAZINE—Vol. XXXII—1957.
LITERATURES IN MODERN INDIAN LANGUAGES—Edited by V. R. Gokak.
AUTOBIOGRAPHY OF A JOGI—Paramhansa Jogananda.
CHARACTER SKETCHES—Bepin Chandra Pal.
OUR MASTER SRI SRI SITARAMDAS ONKARNATH — Sada nanda Chakrabartti.
যোগে মুক্ত ব্রাহ্মবাদের ভূমিকা—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ গুহ রায়।
পাথেয়—শিতিপতি সেনগুপ্ত।
পালিয়ে চল—ত্রৈলক্য বিশ্বাস।

১৫ নম্বর পার্ক স্ট্রীট-এ গত সপ্তাহে 'ক্যালকাটা গ্রুপ' শিল্পী গোষ্ঠীর সভ্য সুনীলমাধব সেন কৃত ছবির একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

ছবিতে জড়জগতের কোনও বস্তুর নিখুঁত প্রাকৃত রূপ দেখতে অবশ্যই ভাল লাগে। কিন্তু এ ছবি এঁকে শিল্পী তাঁর কারিগরির বাহাদুরি দেখালেও, নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতির পরিচয় দিতে পারেন না। আধুনিক শিল্পীরা তাই সাদৃশ্য সত্য ছেড়ে আঁকা আরম্ভ করেছেন এমন সব রূপ যা অন্যদের

সাঁওতালী মেয়ে ও মাদল বাজনা

চোখে পড়ে না এবং তাঁদেরও চোখে পড়ে না। এ কেবল তাঁরা যা ভাবেন, যা অনুভব করেন, যা কল্পনায় দেখেন এবং যা বিশ্বাস করেন। সুনীলবাবুর চিত্রকলাও এই জাতের। ইনি প্রথাগত চিত্ররচনার ব্যাকরণ মানেন না। যদিও বাস্তব জ্ঞানকে আশ্রয় করেই এবং প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই এঁর কল্পনার উৎপত্তি, তা হলেও ইনি আপন রুচিমত এমন সব আকৃতির সৃষ্টি করেছেন যার সঙ্গে প্রাকৃত রূপের কোনও সাদৃশ্য নেই। শিল্পীই শিল্পের স্রষ্টা সুতরাং তাঁর অধিকার আছে ইচ্ছামত বিকৃত আকৃতি রচনা করার। তবে ইচ্ছামত আকৃতির বিকৃতি করলেই তা আর্ট হিসেবে গণ্য হবে কিনা সেইটে হল প্রশ্ন। ছবি নন্দনতত্ত্বের বিচারে তখনই পাসপোর্ট পাবে যখন তার বর্ণিকা দর্শনেন্দ্রিয়ে সুখকর অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারবে, উপাদানগুলির সংস্থিতি দর্শকের রুচিকে প্রীত করতে পারবে এবং আকৃতির অনুরঞ্জন বা অতিরঞ্জন থেকে শিল্পীর মনের ভাব অন্যের মনে প্রবেশ করতে পারবে। সুনীলমাধব বাবুর চিত্রকলায় এ সব কটি গুণই বর্তমান, তাই ছবিগুলির আবেদন অগ্রাহ্য করা যায় না।

এঁর ছবিতে ইউরোপের নানান মডার্নিস্ট স্কুলের প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। সবচেয়ে স্পষ্ট পিকাশোর বর্ণ প্রকরণ এবং কিউবিজম; গত বছরে অনুষ্ঠিত পরিতোষ সেনের চিত্র-প্রদর্শনীতে যে প্রভাব আমরা প্রথম লক্ষ্য করি। পরিতোষবাবুর ছাগলের ছবি এবং সুনীলবাবুর ছাগলের ছবির খুব মিল। পিকাশোর ছাগলের প্রভাব এঁদের দু'জনকার ওপরই অত্যন্ত প্রকটভাবে পড়েছে। সুনীলবাবুর কয়েকটি মুখাকৃতি এবং অন্য ছবিতেও পিকাশোর ছবির লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কিছু ছবিতে, বিশেষ করে কিউবিস্টিক প্রথায় যে ছবিগুলি রচিত সেগুলিতে রঙের যে স্বচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে তা ছবিগুলিকে সত্যই রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে। আগেই বলেছি এঁর ছবি ইউরোপের নানান মডার্নিস্ট স্কুলের লক্ষণ বহন করে—সুরিয়ালিজম বাদে ফভিস্টদের পরবর্তীকালের আর প্রায় সব রকম স্কুলেরই কিছু কিছু লক্ষণ বিভিন্ন ছবিতে দেখা গেল। পূর্বপুরুষেরা যে পরিশ্রম এবং চিন্তা করতেন চিত্রের বিষয়টির প্রতিটি খুঁটিনাটি প্রকাশ করতে, আধুনিক শিল্পীরা ততটাই পরিশ্রম এবং চিন্তা করছেন,
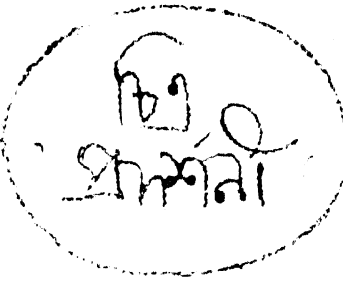
স্মোকার

খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে বিষয়কে সরল করতে। মাঝে মাঝে এঁরা এত বেশী সরল করে ফেলেন যে অনেকের চোখে তা মনে হয় শিশুর আঁকি বুঁকি কাটার মত—তখন দর্শক বলেন, 'যে কেউ এ ছবি আঁকতে পারে।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিশুর মত নির্মল দৃষ্টি ফিরে পাওয়া খুবই কঠিন। আধুনিক শিল্পীরা মনে করেন তাঁদের চিত্রকলা নির্ভেজাল 'আর্ট' হবে তখনই যখন তাঁরা শিশুর মত নিষ্পাপ দৃষ্টি ফিরে পাবেন। সুনীলবাবুর চিত্রকলার মধ্যে শিশুর রচনার মত সরল রচনা একাধিক লক্ষ্য করা গেছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এগুলি রসোত্তীর্ণ হিসাবে যাই হোক, এ প্রদর্শনীর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছবি—'স্ট্রাইক', 'গোটস', 'ডিসট্যান্ট সিগনাল', 'ম্যান প্লেইং ফ্লুট', 'টেকিং বাথ', 'টু হেডস', 'এণ্ড লেস ওয়ে', 'রূপকথার রাজা', 'আর্ট' এবং 'হর্স'হেড'।

শিল্প শিক্ষার্থীদের এ প্রদর্শনী অবশ্যই দেখা উচিত ছিল, যাঁরা দেখেছেন তাঁরা যেন এ আর্ট আয়ত্ত করার চেষ্টা না করেন। যথার্থই পরিণত বিচারবুদ্ধি না থাকলে মডার্ন আর্ট সম্ভব নয়। নাম করা সব মডার্ন শিল্পীরা কেউই রাতারাতি মডার্নিস্ট হয়ে বসেননি। অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা এবং অনেক অভিজ্ঞতা আছে তাদের চিত্রকলার পেছনে।

এ প্রদর্শনী মাত্র পাঁচ দিন ছিল, যার ফলে অনেক কলারসিকই দেখার সুযোগ পান নি। এটা পরিতাপের বিষয়। যাঁরা দেখেছেন এবং উপভোগ করতে পেরেছেন তাঁরা অবশ্যই তাঁকে অভিনন্দন জানাবেন।
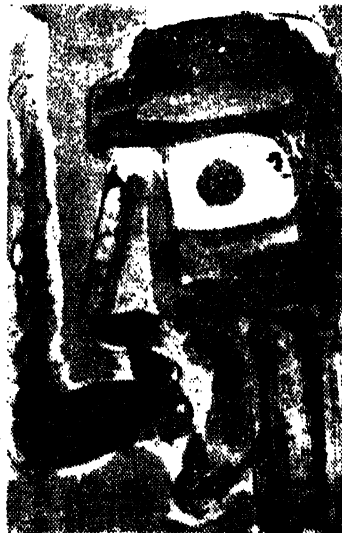
—শৌভিক—

ছবির প্রচার

ছবির জন্যে যে খরচ ধরা হয় তার অনেকটা খেয়ে যায় প্রচারের ব্যয় মিটতে। প্রচার অবশ্য প্রয়োজনীয় তো বটেই, তাছাড়া ওর একটা মুখ্য ভূমিকাও রয়েছে ছবির সাফল্য নিয়ে আসায়। ভুল অভিনয়ে যেমন চরিত্র মাটি হয়ে যায়, তেমনি ভুল প্রচারে ছবির দর্শক আকর্ষণ ক্ষমতা ব্যাহত হয়। এমন কি, ছবি ভাল হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ প্রচার না হওয়ার দরুণ যতো দর্শক আকর্ষণ করা উচিত তা না হতে পারার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আবার ছবির গুণানুসারে যতো দর্শক আশা করা যায়, প্রচারের গুণে তার চেয়ে বেশী টানা সম্ভব হয়েছে, সে নিদর্শনেরও অভাব নেই। চলতি কথায় প্রচারকে বলা হয় ঢাক পেটানো। কিন্তু ঢাকে কাঠিটা যদি তালে তালে না পড়ে, অর্থাৎ যে প্রকৃতির ছবি তার সঙ্গে তাল রেখে যদি না চলে তাহলে সে ঢাকের আওয়াজ যতোই হোক, ছবির তাতে কোন সুসার হয় না। ছবির গুণটা কোনখানে বা কি ব্যাপারে রয়েছে, আকর্ষণই বা কি নিয়ে, সেইটেই যদি স্পষ্টভাবে ধরিয়ে দেওয়া না গেল, তাহলে প্রচারের আর সার্থকতা থাকে কিসে। শুধু তাই নয়, ছবির মৌলিকত্বই বা কোন বিষয়ে সেটাও প্রচারের মৌলিকত্বের মধ্যে দিয়েই চিত্রামোদীদের মনে ধরিয়ে দিতে না পারলে সেটা অপপ্রচারেরই সামিল হয়ে দাঁড়ায়। আজকালকার অধিকাংশ ছবিকেই এই অপপ্রচারেই ভুগতে দেখা যায়।
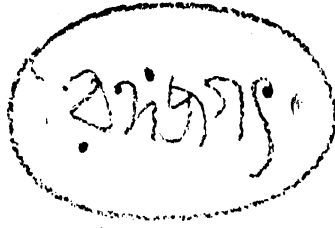
* * * *

সম্প্রতি যেমন ঘটতে দেখা গেল "জন্ম-তিথি" ছবিখানির ক্ষেত্রে। ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্যে ছবি, কিন্তু প্রচারের ধরন থেকে তা বুঝতেই পারা যায়নি ছবিখানি দেখে না আসা পর্যন্ত। ঠিক এরই বিপরীতে উল্লেখ করা যায় রাসবিহারী এভিন্যুর মোড়ে লাগানো "পরশ পাথর"-এর একটি ব্যানারের কথা। দেখলেই বোঝা যায়, কি ধরনের ছবি আসছে এবং একটা যে মৌলিক কিছু আসছে তাও বোঝা যায়। বাস্তবিকই প্রচারের ধরন দেখে আজকাল বোঝার উপায়ই থাকে না কোনটা সামাজিক, কোনটা পৌরাণিক, কোনটা রূপক, কোনটা ক্রাইম ড্রামা আর কোনটা রোমাণ্টিক ড্রামা। সবরকমের ছবির ক্ষেত্রেই একই ধরনের ভাষা ব্যবহার, একই ধরনের বিজ্ঞাপন আঁকা। কোন ছবিতে কোনরকম মৌলিকত্ব আছে কিনা, থাকলেও সেটা কেমন ধরনের তা বিজ্ঞাপনের ধরন দেখে বোঝবার উপায় থাকে না। একটা বাঁধা ছকের মধ্যে আটকে পড়েছে সবাই। ছবির প্রকৃতিটা আগে থেকেই সম্ভাব্য দর্শকদের মনে ধরিয়ে দিতে পারলে তারা ছবিখানিকে সেই মতো গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত হয় এবং ছবি দেখবার সময় দোষ বাছাইয়ের চেয়ে গুণ খুঁজে নেবার ওপরেই, মৌলিকত্বটা অনুভব করতেই, দৃষ্টিটা নিয়োজিত হবার ঝোঁকই বেশী থাকে। এতো ভেবে প্রচারের ব্যবস্থা হয় কম ক্ষেত্রে। ফলে, বোঝবার উপায় থাকে না, ছবি মার খেয়ে গেলে প্রচার তার জন্যে কতোটা দায়ী বা ছবি জনপ্রিয়তা অর্জন করলে প্রচারের কৃতিত্ব তাতে কতোখানি। ভালভাবে প্রচার বলতে দেখা যায়, প্রায় সবায়েরই ধারণা, কাগজে বড়ো বড়ো এবং বেশী বেশী বিজ্ঞাপন, অনেক পোস্টার, অনেক বড়ো বড়ো ব্যানার ইত্যাদি। কিন্তু ভাল প্রচার এক কথা, আর যথাযথ প্রচার আর এক কথা। মুড়ি আর মিছরি, দুয়েরই বিজ্ঞাপন যদি একই ধরনের হয়, তাহলে কোনটার কি বৈশিষ্ট্য যেমন বোঝা যাবে না, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ছবির ক্ষেত্রে প্রচারেও ছবির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মৌলিকত্ব না থাকলে প্রচারের সার্থকতাও থাকে না। বর্তমানে এই হয়ে চলেছে ছবির প্রচার বিষয়ে।
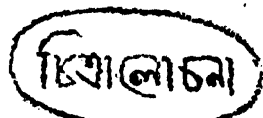
মন না রাঙায়ে

অগ্রদূতে নামের সার্থকতা উপলব্ধি করা গেল এবার "পথে হলো দেরী" প্রসঙ্গে। অগ্রদূতেই প্রথম বাঙলা ছবিকে বর্ণময় করে তোলায় এগিয়ে এসেছেন। "পথে হলো

দেরী" তাই বাঙলা চিত্র ইতিহাসে একটি নতুন পর্যায়ের পথপ্রদর্শকরূপে পরিগণিত হয়ে থাকবে। বাঙলা ছবি এর আগে রঙীন করা সম্ভব ছিল না তা নয়, আসলে সাহস ক'রে কেউ এগিয়ে আসেনি। অগ্রদূত সেই সাহসটা যে দেখাতে পেরেছেন, সেইটেই হচ্ছে বড়ো কথা। ছবিখানির প্রচারে স্বাভাবিকতই রঙের ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে বেশী, সুতরাং আলোচনাটা আগে এই প্রসংগেই এসে পড়ে। কথাটা হচ্ছে, মনোরঞ্জন, অর্থাৎ মনকে রঞ্জিত করা বা রঙীন করে তোলা। দৃষ্টির সামনে রঙ তুলে দিলেই তাই দেখে মন রঙীন হবার নয়, ভাবের বিচিত্র স্পর্শে মন আপনা থেকেই পছন্দমত রঙ ধরিয়ে নেয়। সেই রঙ ধরানোটা কথার দ্বারাও হতে পারে, সুরের দ্বারাও হতে পারে, কোন কিছু দেখে মোহিত হয়েও হতে পারে। আসলে অনুভূতিকে রঙীন ক'রে তোলা এবং দৃষ্টিতে রঙের প্রয়োগ রঙীন অনুভূতি এনে দেওয়ার একটি সহায়ক মাত্র। "পথে হলো দেরী"র রঙ কিন্তু অনুভূতিকে রঙীন করে তোলার সহায়ক নয়। সৎ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েও অগ্রদূত ভুল করেছেন রঙের উপযোগী কাহিনী নির্বাচনেও যেমন, তেমনি রঙ প্রয়োগের যৌক্তিকতা নির্ধারণে দৃশ্য পরিকল্পনায়ও। ছবিখানি দেখে বোঝা গেল যে, রঙের বাহিক প্রয়োগের ওপরই যতো ঝোঁক, মনকে রাঙাবার চেষ্টাই হয়তো হয়নি, আর হয়ে থাকলেও তা ব্যর্থ হয়েছে। কবির কথাই মিলে যায় এখানে হুবহু। মন না রাঙিয়ে বসন রাঙানোর ভুলটাই এ'রা করে বসেছেন। সত্যিই যতো রঙ চাপানো হয়েছে বসন ভূষণেরই ওপরে। নায়িকা মল্লিকাকে প্রথম দেখা গেল এক রঙের শাড়ি ব্লাউজ গহনায়, ক্ষণিক পর দ্বিতীয় আবির্ভাবে আর এক রঙের সাজে, তৃতীয়বার আবির্ভাবে অন্য রঙের সাজে। তখনো দৃষ্টিতে কোন বিসদৃশতা ঠেকে না, কিন্তু তিন-চার বার বসন-ভূষণে রঙের পরিবর্তন দেখতে দেখতে মনের কৌতূহল নায়িকার সাজ-পোশাকে বিভিন্ন রঙের খেলার ওপরই নিবদ্ধ হয়ে পড়ে, দৃষ্টি চলে যায় শুধু ঐ দিকেই। এবং অবাক হয়ে দেখতে হয় যে, মল্লিকা বাড়ি থেকে বের হয় একরকম রঙের সাজ পরে, বাড়িতে ফেরে আরেক রঙের সাজে, সদর দিয়ে প্রবেশ করে ভিন্ন একটি রঙের সাজে, অন্দরে প্রবেশ করতেই অন্য এক রঙের সাজ, এ ঘরে একরকম রঙের সাজ, ওঘরে ঢুকতেই সাজের রঙ আরেকরকম। যতোবার মল্লিকার আবির্ভাব, ততোবারই এক এক রঙের সাজ। নায়িকার এই অনর্গল সাজের বাহার চোখের সামনে একটা মজা সৃষ্টি করে যায় বটে, কিন্তু মনের কোণে কেবল বিরক্তিই জমা করে যায়। বিসদৃশ ব্যাপার আরো এইজন্যে যে, দার্জিলিঙের ঠান্ডায় সবাই যখন মোটা গরম পোশাকে আবৃত, কেবল মল্লিকাই পরে চলেছে পাতলা জালের শাড়ি!

• • •

ওয়াল্টেয়ারের সমুদ্রকূল থেকে ঘটনাস্থল চড়িয়ে তোলা হয়েছে দার্জিলিঙে পাহাড়ের ওপরে, কিন্তু এমন একটুকরো দৃশ্যও পাওয়া গেল না যেটা রঙের প্রয়োগ সার্থক বলে মনে করিয়ে দেয়। দীর্ঘ (১৪১৩৫ ফিট) ছবিখানির বারো আনা ভাগই ঘরের কোণ, তাই দেয়াল আসবাবের ইটকাঠেও নানা বর্ণের সমাবেশ, আর সেইসব রঙ যাতে দৃষ্টি থেকে ঢাকা না পড়ে সেজন্যে কোন দৃশ্যে দুটি একটি ছাড়া চরিত্রই রাখা হয়নি আগাগোড়া সারা ছবিখানিতে। বাকি চার আনার যা বহির্দৃশ্য তারও অনেকখানি স্টুডিওতে তৈরী করে নেওয়া, কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্যও বাদ পড়েনি এবং সেটা বুঝতেও পারা যায়। সীমাবদ্ধ এক এক টুকরো দৃশ্যে শুধু নায়ক-নায়িকা, রঙ পাছে চাপা পড়ে যায় এইজন্যেই যেন আর কারুর অবতারণা নেই। ভেতরে বা বাইরে রঙের নির্বাচনও সর্বথা সন্তোষজনক নয়, আর সমতাও রক্ষিত হয়নি। কোথাও ফ্যাকাশে হয়েছে, কোথাও অতি গাঢ়। নায়িকা চরিত্রে সুচিত্রা সেনকে চমৎকার দেখিয়েছে অনেকবারই, আবার বিশ্রীও দেখতে হয়েছে। অনবরত ওয়াইপের সাহায্যে দৃশ্যান্তরও আরেক বিরক্তি। তাই ছবি শেষ হতে দেখা যায় যে, যেভাবে গল্পটি সাজানো তাতে রঙের প্রয়োজন ছিল না তাই শুধু নয়, বরং রঙের মাখামাখি একটা উপদ্রবের মতোই হাজির হয়েছে। নাট্যরস সৃষ্টির জন্যে যেমন আবহ সংগীতকে একটা বিশিষ্ট ভূমিকায় নিয়োগ করা হয়, তেমনভাবে এখানে রঙকে তার যোগ্য ভূমিকাতে নিয়োজিত করা হয়নি। গল্পই সাজানো হয়নি মনে রঙ ধরাবার মতো করে, শুধু বাইরেটা রঙীন করলে তাতে ধিই-বা সার। বাঙলা ছবিতে রঙ চড়লো এইটেই যা আনন্দের, কিন্তু যেভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তাতে উল্লসিত হবার নয়।

• • • •

মূল কাহিনীর রচয়িতা প্রতিভা বসুর চেয়ে ছবিতে যেভাবে গল্পটি পাওয়া যায় তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী চিত্রনাট্য রচয়িতা হিসাবে অগ্রদূত। এ গল্পের প্রতিপদেই কৃত্রিমতা। আরম্ভ সমুদ্রের তটদেশে। একটা বাঙলোতে রয়েছে এক রোগিণী, ওষুধ খাবে না, কোন কথা শুনবে না, কেবলই চীৎকার করে নিজের মৃত্যুকামনা করে। আর এক যুবক ডাক্তার, পরিশ্রান্ত হলেও রোগিণীকে বাঁচিয়ে তোলায় দৃঢ়পণ। সমুদ্রের ধারে ভাবতে বসে সে তার অতীত দিনের কথা। দার্জিলিঙে এক নার্সিং হোমে ডাক্তার হয়ে গেল। নাম তার জয়ন্ত মুখার্জি। "নার্সিং হোম-এ এসে কাজের

মধ্যে ডুবে যায় ডাক্তার। দৈনন্দিন কাজের আড়ালে একদা ভেসে আসে—পাশের আকাশচুম্বী বিরাট সৌধ—ব্যানার্জি ম্যানসন্-এর ভেতর থেকে কোন এক মধুকণ্ঠীর মধু-কণ্ঠের অপরূপ ঝংকার। ডাক্তারের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির ওপর চোখ মেলে, নার্সিং হোমের স্টাফ্ নার্স জানিয়ে দেয়—গায়িকা পাশের বাড়ির বিখ্যাত ধনকুবের শ্রীপতি ব্যানার্জির একমাত্র নাতনী—মল্লিকা। ডাক্তারের দেখবার সুযোগ হয় মল্লিকাকে। প্রস্ফুটিতা প্রভাতী মল্লিকার মতই বিকশিতা—মল্লিকার রূপে মুগ্ধ হয় ডাক্তার। অতর্কিতে একদিন ডাক্তারের ডাক পড়ে ঐ পাশের ম্যানসন্-এ। মল্লিকার ছোট ভাই রণুর এক আকস্মিক দুর্ঘটনার সূত্রে ডাক্তারকে সারারাত থাকতে হয় তার পরিচর্যায়। কথাচ্ছলে নিজের অজ্ঞাতসারেই জয়ন্ত ডাক্তারের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে তার বড়ো হবার কথা। তরুণের জীবন-স্বপ্ন সার্থক হবার পথে যে বিরাট বাধা, তারও ইঙ্গিত পায় মল্লিকা! নার্সিংহোমের

অন্যতম চিকিৎসক ডাক্তার চ্যাটার্জি পরদিন জানতে পারেন সমস্ত ঘটনাটি। তাঁকে খবর না দেওয়ার জন্য তিরস্কার করেন জয়ন্তকে। বড়লোক মক্কেলদের তিনি সর্ব উপায়ে খুশী রাখতে কোনদিন ত্রুটি করেন না। মল্লিকাকে ভয় দেখিয়ে রণুর ভাঙ্গা হাত সেট করা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে ডাক্তার চ্যাটার্জি রণুকে নিয়ে চলে যান কলকাতায়—সেখানকার বিখ্যাত বোন-স্পেশ্যালিস্ট কর্নেল চৌধুরীর চেম্বারে। কিন্তু কর্নেল চৌধুরী তাঁর প্রিয় ছাত্র জয়ন্তর কাজের প্রশংসা করে অকপটে প্রকাশ করেন—তিনি নিজেও বোধ করি এত নিখুঁতভাবে ভাঙ্গা হাত সেট্ করতে পারতেন না। রণু টেলিফোন করে দিদিকে। উচ্ছ্বাসের মুখে বেরিয়ে পড়ে সরল সত্য! নিশ্চিন্ত হয় মল্লিকা, কিন্তু বুঝতে পারে কত বড়ো অন্যায় ও অবিচার করেছে জয়ন্তর উপর। মল্লিকা জয়ন্তর কাছে ক্ষমা চেয়ে মোটা পারিশ্রমিক দেবার প্রস্তাব করে। অভিমান-আহত তরুণ ডাক্তার অতি সহজভাবেই তা প্রত্যাখ্যান করে। অপমানিত হয়ে মল্লিকা ফিরে আসে ম্যানসনে। অসুস্থতার অজুহাতে জয়ন্তকে আবার ডেকে পাঠায় স্বপ্নসৌধের অভ্যন্তরে—যেখানে মল্লিকার প্রতি জয়ন্ত তার গোপন দুর্বলতার পরিচয় জানিয়ে ফেলে। সাধারণ মানুষ জয়ন্ত ডাক্তার এই অসাধারণ ধনীর দুলালীর জীবনে তো নিজেকে জড়াতে চায়নি কোনদিন। কিন্তু প্রিয়ার চোখের জল প্রেমিকের হৃদয়কে কি স্থির থাকতে দেয়? ভুলে যায় দুজনেই তাদের অবস্থা-বৈষম্যের কথা। কথা হয় দুজনে—জয়ন্ত যাবে বিলেতে এফ্-আর-সি-এস্ হয়ে ফিরে আসতে। তারপর মল্লিকাকে নিয়ে গড়ে তুলবে সেই জীবন, যে জীবন মল্লিকার দাদু শ্রীপতি ব্যানার্জির কাঞ্চন কৌলিন্যের দাম্ভিকতায় ও উন্নাসিক আস্ফালনে মলিন হবে না। গোধূলির গৈরিক রাঙা গিরিরাজ হিমাদ্রীর মৌন আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শপথ করে দুজনে দুজনকে স্বামী-স্ত্রী ব'লে। প্রতিশ্রুত হয়—যতদিন না জয়ন্ত সাগর পারের আকাঙ্ক্ষিত চাপরাশ নিয়ে ফিরে আসে—ততদিন একথা গোপন থাকবে।

* * *

"এদিকে মল্লিকার দাদু শ্রীপতি ব্যানার্জি তাঁর বন্ধু-পুত্র প্রমথেশের সঙ্গে মল্লিকার বিয়ের সব পাকাপাকি করে ফেলেন। প্রমথেশ বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে ফিরে এলেই শুভকার্য সম্পন্ন হবে। ওদিকে জয়ন্ত প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেনিং-এর জন্য লণ্ডন থেকে দেশে ফিরবার পথে আসে ভিয়েনায়। সেখানে দেখা হয় প্রমথেশের সঙ্গে আর পরিচয়টা অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয় তার বান্ধবী আরতির সঙ্গে। জয়ন্ত তার সাফল্যের সংবাদ আর তার দেশে ফেরবার কথা টেলিগ্রাম ক'রে জানায় মল্লিকাকে।

কিন্তু দাদু শ্রীপতির ষড়যন্ত্রে জয়ন্ত পায় দারুণ আঘাত। সে জানতে পারে মল্লিকা স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে প্রস্তুত হয়েছে প্রমথেশকে। প্রমথেশও সে কথা সমর্থন করে—আর তার জন্যেই দেশে ফিরে যায় প্রমথেশ। আশাভঙ্গের অন্তহীন বেদনা নিয়ে দেশে ফেরে জয়ন্ত। সঙ্গে আসে আরতি। কলকাতায় ফিরে মল্লিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শ্রীপতির কাছে দারুণ অপমানিত হয় জয়ন্ত। জয়ন্তর জীবন থেকে হারিয়ে যায় তার অত্যন্ত সাধের প্রভাতী মল্লিকা। কর্নেল চৌধুরীর স্ত্রী মিসেস চৌধুরীর বাৎসল্যে আর আরতির অকৃত্রিম সহানুভূতির প্রাবল্যে ভাঙ্গা মন জোড়া লাগাতে চায় জয়ন্ত। বোটানিক্যাল গার্ডেনে এক পিকনিকের সমারোহের মাঝে জয়ন্তকে বলে আরতি—"আমি তোমার জীবনে সেই ভালবাসার বিশ্বাস এনে দেব জয়ন্ত!" জয়ন্ত একটু হেসে বলে, "তাহলে একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করবো।" আদরিণী বোন আরতির ভবিষ্যৎ স্বামী-সৌভাগ্যে খুশী হয় আভা মৈত্র। বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ফেরবার পথে জয়ন্তকে একটা ছোট্ট অনুরোধ জানায় আভা। আভার মেয়ে বেবীর গানের শিক্ষয়িত্রী আজ কয়েক মাস যাবৎ কঠিন রোগে ভুগছে। একটা অতি সাধারণ ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে ওরা ওপরে আসে। ছোট্ট ঘরটাতে ঢুকেই জয়ন্তর মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসে—"মলি!" শীর্ণ, ক্লান্ত, নিঃসাড় মল্লিকা—রাজার দুলালী এ কি অভিশাপ বহন করছে! প্রমথেশের সঙ্গে মিলন অসম্ভব জেনে, বিয়ের রাত্রে বাড়ি ছেড়ে চলে আসে মল্লিকা—জয়ন্তর কাছে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের আশঙ্কায়। আর্তনাদ মল্লিকাকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে জয়ন্ত।"

* * *

অতীত দিনের কথা ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত আসে বাঙলোতে। এই সেই তার মল্লিকা। জয়ন্ত বোঝাবার চেষ্টা করে যে, জীবনে মলি ছাড়া আর কোন মেয়েকে চায়নি, কিন্তু মল্লিকা বিশ্বাস করতে চায় না সেকথা। জয়ন্ত একবার তাকে বিলেতে লেখা শ্রীপতি ব্যানার্জির চিঠিখানা দেখালে যাতে মল্লিকা স্বেচ্ছায় প্রমথেশকে বিয়ে করছে বলে জয়ন্তকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরো দেখালে মল্লিকাকে লেখা তার চিঠিগুলো যেগুলি ফেরৎ চলে এসেছে। ক্ষোভ নিয়ে জয়ন্ত বেরিয়ে গেল। দাদুর চিঠিটা শুনেই মল্লিকার যেন সম্বিৎ ফিরলো। নিজেকে এতোদিনে দাঁড় করাতে পারলে মল্লিকা। এরপরই এলো জয়ন্তর নামে একখানা চিঠি, জয়ন্তর গুরু ডাঃ চৌধুরীর স্ত্রীর লেখা, যাতে মল্লিকার জন্য জয়ন্তর ত্যাগের কথা লিখে মল্লিকার আরোগ্যের আশা পোষণ করা হয়েছে।
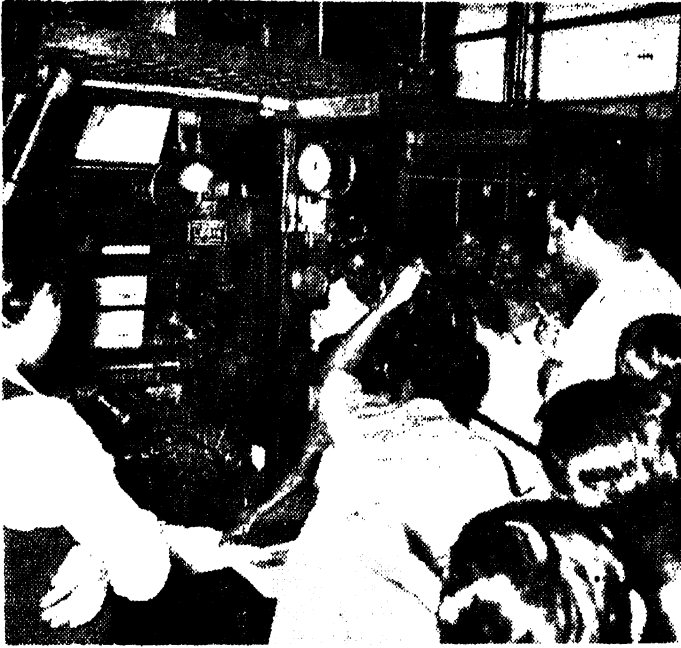
আনন্দবাজার পত্রিকা - হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড - দেশ' পত্রিকার রোটারি মেসিনে "পরশ পাথর" ছবিখানির জন্য কাগজ ছাপার দৃশ্য গ্রহণ করছেন সত্যজিৎ রায় (সর্বদক্ষিণে)

মল্লিকার মনের এতোদিনের ভুল ভেঙে গেল, সব সংশয় দূর হলো। জয়ন্তর দুঃখেরও অবসান হলো।

* * *

গল্পের আরম্ভ শেষ দিক থেকে, উন্মাদিনী মল্লিকাকে সমুদ্রের তীরে বাঙলোতে এনে চিকিৎসা করা থেকে। ফ্ল্যাশব্যাকে কাহিনীর অবতারণা, কিন্তু সমুদ্রতটে জয়ন্তর বসে থাকা থেকে দার্জিলিংএর দৃশ্য এমন হঠাৎ এসে পড়ে যে, গল্পটা ফ্ল্যাশব্যাকে বিবৃত হতে আরম্ভ হয়েছে, সেটা ধরা পড়ে কিছুক্ষণ পর। পুরনো ধাঁচের ছক বাঁধা বিন্যাস—সেই কথার বিতর্ক সৃষ্টি করে নায়ক-নায়িকার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের সৃষ্টি। বাছা বাছা শব্দে ভাল ভাল কথা, কিন্তু কথা অনেক। সোজা সহজ কথা বলে না এ গল্পের কোন চরিত্র; কেবলই বাঁকা বাঁকা কথা এবং প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী বেশী কথা। কথার জোগান দিতে নিতাই ভট্টাচার্য কৃতী এবং তার সেই কৃতিত্বকে অগ্রদূত কাজেও লাগিয়েছেন বেশী করে। কথা যেখানে নেই সেখানে আছে চিঠি। চোখের সামনে ঘটবার মতো নাটকীয় পরিস্থিতি পরিকল্পনার অক্ষমতাকে ঢাকা দেবার একটি ছল যেমন সংলাপ দিয়ে জমে তোলা, চিঠিও তাই। যতোদিন জয়ন্ত ও মল্লিকা কাছাকাছি ছিল ততোদিন কেবলই সংলাপ, জয়ন্ত বিলেত যেতেই আরম্ভ হয় চিঠি। চিঠির পর্যায়েই যাতে সংঘাত পাকিয়ে তোলা যায়, তাই হঠাৎ রুণুকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জার্মানীতে যাতে মল্লিকাকে লেখা জয়ন্তর চিঠি শ্রীপতি ব্যানার্জীর হাতে পড়তে পারে, কারণ এতোদিন রুণুই দিদির চিঠিগুলো এনে দিতো। শেষে চিঠিতেই হয় সংঘাতের নিষ্পত্তি, জয়ন্তকে লেখা দাদুর চিঠিখানি শুধু নয়, জয়ন্তকে লেখা ডাঃ চৌধুরীর স্ত্রীর চিঠিখানি না হলে নিষ্পত্তির পথ যেন আর ছিল না। বোঝা গেল না যে, দার্জিলিঙে থাকতেই, মল্লিকা প্রমথেশকে বিয়ে করবে বলে যে ধাপ্পা দিয়ে শ্রীপতি জয়ন্তকে হটিয়ে দিতে চেয়েছিল, বিলেতে থাকতে চিঠিতে শ্রীপতি সেই একই ধাপ্পা দিতেই জয়ন্ত তা বিশ্বাস করে নিলো কি করে! বিশ্বাস করাবার জন্যে অবশ্য হঠাৎ ভিয়েনাতে প্রমথেশকে হাজির করা হয়েছে, কিন্তু সেটা অচল। সংঘাতের ঘোর পাকিয়ে তোলবার জন্যে ভিয়েনায় আরতি ও জয়ন্তর পরিচিত হয়ে ওঠাও যেমন আকস্মিক, তেমনি জয়ন্তর সঙ্গে আরতির বিয়ের সম্বন্ধ পাকিয়ে মল্লিকার জীবনে হাহাকার সৃষ্টি করার ধরণটাও তেমনি কৃত্রিম। মল্লিকা দারুণ মানসিক রোগে আক্রান্ত, জয়ন্তই তার চিকিৎসা করছে, তবুও এটা কি করে দেখানো গেল যে, যে মল্লিকা একটু আগে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে অসাড় হয়ে পড়েছিল, সেই মল্লিকাকে একটা ইনজেকশন দিয়েই এবং তার জ্ঞান না ফিরতেই জয়ন্ত চীৎকার করে তার ক্ষোভ প্রকাশ করে চিঠির তাড়া মল্লিকার মুখের

নীতীন বসু পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ"এর একটি দৃশ্যে রীতা রায়, উৎপল দত্ত, অমর মল্লিক ও বসন্ত চৌধুরী

ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতে পারে কি করে! লণ্ডন মানে একখানা ঘর, ভিয়েনা মানে আর একখানা ঘর, বিচিত্র কল্পনা! জয়ন্ত কলকাতায় আসার পর হঠাৎ দেখা নিউ মার্কেটে আরতি ও তার দিদির সঙ্গে। আরতিরা জয়ন্তকে পিকনিকে নিমন্ত্রণ করলে—পিকনিক কোথায় করে হবে, কেউ কারুর ঠিকানাও জিগ্যেস করলে না, কিন্তু দেখা গেল জয়ন্ত পিকনিকে ঠিক হাজির। আরতির দিদি আভা জয়ন্তকে নিয়ে গেল তার মেয়ের গানের শিক্ষয়িত্রীর অসুখ দেখাতে এবং সেখানে গিয়ে প্রথম কথাতেই বললে, "শুনেছো, আরতির সঙ্গে যার বিয়ে হচ্ছে, সেই ডাক্তার মুখার্জী এসেছেন তোমায় দেখতে"—অদ্ভুত সম্বোধন, ওভাবে কেউ কথা পাড়ে না,—মল্লিকা ও জয়ন্তর সাক্ষাৎকে নাটকীয় করার আর কোন উপায় কি ভাবা যেতো না!

*

নতুন দিকের একটা প্রচেষ্টা, কিন্তু কাহিনীর বিন্যাসই এমন যে রঙ ধরিয়ে যে ফল লাভ করা গিয়েছে, রঙ না থাকলে কোন তারতম্য ঘটতো না। এক একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা, এইভাবে দৃশ্যের গাঁথুনি। পরিচালক অগ্রদূত গোষ্ঠির অন্যতম বিভূতি লাহা নিজেই আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ করেছেন এবং শব্দগ্রহণ করেছেন যতীন দত্ত। রবীন চট্টোপাধ্যায় গানে এবং আবহসঙ্গীতে বেশ খানিকটা রঙ ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, কিছু ভালও লাগবে। রঙের সঙ্গে ছবির প্রধান আকর্ষণ মুখ্য চরিত্রাভিনয়ে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন। রঙের জন্য চেহারার সৌন্দর্য অবশ্যই খুলেছে, তেমনি প্রতিবন্ধক হয়েও দাঁড়িয়েছে। বর্ণময় পোশাকের বাহার চরিত্রের আঙ্গিক অভিব্যক্তিকে অনেকাংশে চাপা দিয়েছে, বিশেষ করে সুচিত্রা সেনের ক্ষেত্রে। তাই মল্লিকা চরিত্রের অভিনয়টা ভাল পাওয়া যায় রুগ্নাবস্থায়, যখন বাহারে পোশাক নেই। তার চেয়ে জয়ন্ত চরিত্রে উত্তমকুমারের অভিনয়ই বেশী মনোজ্ঞ। বেশ খানিকটা আমোদ দিয়ে যায় রুণুর চরিত্রে অনুপকুমার। শ্রীপতি ব্যানার্জীর চরিত্রে জয়ন্তকে বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথায় জেরা করে তাকে মল্লিকার পথ থেকে সরিয়ে দেবার একটি অতি উপভোগ্য দৃশ্য গড়ে তোলেন ছবি বিশ্বাস। পরেও সামান্য সামান্য আবির্ভাবেও নাটকীয়তা সৃষ্টি করেন। শেষের দিকের নাট্যগাম্ভীর্যকে একটু সরস করে তোলেন আরতির দিদি ও তার স্বামীর চরিত্রে যথাক্রমে ভারতী দেবী ও শ্যাম লাহা। ছোট চরিত্রগুলির মধ্যে আছেন জহর গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল, মিহির ভট্টাচার্য, শিশির বটব্যাল, গোপাল মজুমদার, অনিল ভট্টাচার্য, বিনয় লাহিড়ী, চন্দ্রাবতী, শোভা সেন, চিত্রিতা মণ্ডল প্রভৃতি।

মনে লাগার মতো একখানি ছবি

প্রচারের ধরনে বোঝবার উপায় ছিল না যে, "জন্মতিথি" ছোটদের নিয়ে ছোটদের উদ্দেশ্যে তোলা মন্দ না লাগার মতো একখানি ছবি হতে পারবে। একখানা খুব উঁচুদরের ছবির অনেক গুণেরই অভাব রয়েছে এতে, কিন্তু ছবিখানি দেখা শেষ হলে অসন্তোষ নিয়ে উঠে আসতে হয় না। প্রশান্ত চৌধুরী ও জয়ন্ত চৌধুরীর লেখা গল্পটি হচ্ছে দুটি অনাথ ছেলেকে নিয়ে। একটা অনাথ আশ্রম থেকে কাহিনীর যাত্রারম্ভ। পল্টু ও ভেবলা সমবয়সী না হলেও অভিন্নহৃদয়। প্রতিভাধর ছেলে, কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ওরা বড়ো দুষ্টু। তাই ওদের প্রায়ই লাভ করতে হয় বেত্রাঘাত। এই সময়েই আশ্রম পরিদর্শনে আসেন এক ভূপর্যটক। তাঁর কথায় পল্টু ও ভেবলা আকৃষ্ট হয়। আশ্রমের প্রধান শিক্ষকের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ওরা একদিন আশ্রম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওরা ঘটনাচক্রে আশ্রয় পেয়ে যায় এক নিঃসন্তান দম্পতির গৃহে। নিজেদের পরিচয় অবশ্য ওরা গোপন রাখলে। এই প্রথম ওরা মাতৃস্নেহের পরিচয় পেল। ছেলের মতোই থাকে ওরা, কিন্তু দুষ্টুমি আগের মতোই। একদিন না বলে একজনদের পুকুর থেকে একটা মাছ নিয়ে আসায় সেই প্রথম ওরা ওদের মাসীমার কাছ থেকে তিরস্কার লাভ করলে। মাসীমাকে ওদের জন্যে পাড়ার লোকে কথা শুনিয়ে যাওয়ায় ওদের মনে বড়ো লাগলো, একদিন ওরা পালালো একখানা চিঠিতে নিজেদের সত্যিকার পরিচয় ব্যক্ত করে। সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে আসতে আসতে মাঝপথে চেকার ওদের নামিয়ে দিলে। গ্রামের ভিতরে ঢুকতেই যাত্রাদলের একজন ওদের দলের ছেলে বলে ভুল করে ধরে নিয়ে গেল। 'নন্দদুলাল' পালা জমিদার বাড়িতে গাইতেই হবে; কানাই-বলাইয়ের জন্য যে ছেলে

দুটি ছিল, তারা পালিয়েছে। অধিকারী পল্টু ও ভেবলাকে পেয়ে খুসীই হলো। ওরা দুজনে গেয়ে একেবারে মাৎ করে দিলে সবাইকে। অধিকারী ওদের দুজনকে নিয়ে কলকাতায় এলো। হাওড়ায় পৌঁছতেই ওরা দল ছেড়ে পালালো। ঘুরতে ঘুরতে এক পার্কের ধারে উপস্থিত। কতকগুলো ছেলে ডাণ্ডাগুলি খেলছিল। একধারে ক্রিকেট নিয়ে গবেষণায় রত সোমনাথ। সোমনাথের আক্ষেপ ক্রিকেটে দাঁড়াবার মতো হাতের জোর নেই ছেলেগুলোর। পল্টু ভিড়ে গেল খেলাতে, ওর একটা মারে গুলিটা এসে লাগলো সোমনাথের কপালে। কপাল ফাটলেও সোমনাথ খুসী হলো পল্টুর হাতের জোর দেখে। সেই থেকে পল্টু ভেবলা সোমনাথের বাড়িতেই আশ্রয় পেল। সোমনাথের পাত্রী ঠিক হয়ে ছিল অনিতা। অনিতার জন্মদিনে পল্টু ও ভেবলারও নিমন্ত্রণ। পল্টু হাজির হতেই অনিতার মা তার হারানো ছেলের সন্ধান পেলেন। ভেবলা ঐ আনন্দ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে চলে গেল। পল্টু ভেবলাকে না পেয়ে ছুটলো ওদের সেই মাসীর কাছে। সেখানে দেখলে ভেবলা মাসীমার আঁচলের নীচে শুয়ে আছে।

• • •

গল্পটা ভাল, যাতে সততা, সাহস, বন্ধুবাৎসল্য, বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে ছোটদের প্রেরণা দেবার রসদ আছে। বেশ পরিচ্ছন্ন ছবিও। সাজিয়ে বলার দোষে অনেক ব্যাপার অবশ্য কৃত্রিম হয়ে পড়েছে, তাহলেও অনেকগুলি দৃশ্য আছে, যা ছোট-বড়ো সকলকেই বেশ আমোদ উপভোগের সুযোগ দেবে। দুটো ছেলে আশ্রম থেকে পালালো, অথচ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা একজন অতি মহৎ ব্যক্তি হয়েও ছেলে দুটির কোন খোঁজই হলো না, এটা কেমন যেন বিসদৃশ ব্যাপার। তেমনি একটু বিসদৃশ লাগে ওদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশ্রয় পাইয়ে দেবার ব্যাপার। তবে ছেলে দুটির কাণ্ড দেখে এইসব বিসদৃশতা মনে লাগে না। শেষে অনিতার মায়ের হারানো সন্তান বলে পল্টুকে খাড়া করার ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়। ওদের পাথেয় পাইয়ে দেবার জন্যই যেন হঠাৎ সিনেমার সামনে কানের দুল পাওয়া এবং সেটা ফিরৎ দেওয়ায় অর্থ পুরস্কার লাভ। তেমনি, অনিতার জন্মদিনে এই ব্যাপারটা ঘটলো বলে ছবির নাম "জন্ম-তিথি"—ওটাও মোটেই মেলে না। আর শেষে ভেবলার চলে যাওয়াটা—যেভাবে ও চলে গেল, সেটা বড়ো জোর করে সাজানো, যেমন ওর খোঁজে মোটর নিয়ে একেবারে সটান মাসীমার বাড়িতে পল্টুকে হাজির করে দেওয়া—যেন আগে থেকেই পল্টুর সঙ্গে ভেবলার ঐরকম কথা হয়েই ছিল। বিশেষ করে আমোদ পাওয়া যায় ওদের লোকঠকানো দুষ্টুমিগুলো দেখে। কিছু কিছু বিসদৃশতা থাকলেও আমোদ পাওয়া যায়। ওদের পালাবার খবর বেরিয়েছে কিনা, তা দেখবার জন্য খবরের কাগজের খোঁজ করতে করতে একটা বাড়ির রোয়াকে বসে সেই বাড়িরই কাগজখানা হাতিয়ে তারপর নিজেদের কাজ শেষে ফিরৎ দিয়ে চলে যাওয়া; 'উৎকৃষ্ট' মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে গিয়ে সিঙাড়ার বদলে কচুরি, কচুরির বদলে জিলিপি নিয়ে খেয়ে দাম মিটে যাওয়া বুঝিয়ে দেওয়া; একটা রিটার্ন টিকিট কিনে দুজনে যাবার যুক্তি দেখানো; যাত্রার দলের লোকের হাতে ভুল করে ধরা পড়া; ভেবলার প্যাণ্ট খুলে চান করতে নামা, আর সেই প্যাণ্ট নিয়ে কুকুরের পালানো; বুদ্ধি খাটিয়ে মাসীমা পাতিয়ে আশ্রয় জোগাড় করে নেওয়া; ক্ষেতে গিয়ে জীবন্ত কাগতাড়ুয়া সেজে বুড়ো চাষীকে উল্টে ভয় দেখিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কতকগুলো দৃশ্য ওদের দুষ্টুমির সঙ্গে বুদ্ধি খেলাবার পরিচয় দেয়, আর তাই খুবই ভাল লাগবে ছোটদেরও। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়।

• • •

বিভু আর বাবুয়া, ওরাই দুজনে ছবিখানিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে পল্টু আর ভেবলার চরিত্রে। ওদের ভাল না লেগে পারে না। মাঝে মাঝে ওদের কথাবার্তা একটু যেন বেশী পাকা: একটু খটকা লাগে: তবে সেটা লেখকের দোষ। এরা ছাড়াও বড়োদের চরিত্রগুলিতেও অভিনয় বেশ জমেছে। বিপিন গুপ্তের কড়াশাসক হেডমাস্টার, পাহাড়ী সান্যালের সহৃদয় আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা, জহর গাঙ্গুলীর গ্রাম্য স্টেশন মাস্টার, তুলসী চক্রবর্তীর আর এক মাস্টারবাবু, মলিনার মাসীমা, অনুপকুমারের সোমনাথ, শ্যাম লাহার যাত্রার দলের বোকা লোক ছবিখানিকে উপভোগ করায় সহায়ক হয়েছে। প্রায় বিশ বৎসর অনুপস্থিতির পর এতে এক বুড়ো চাষীর চরিত্রে দেখা গেল তারক বাগচীকে; নির্বাক অভিব্যক্তিতে কাগতাড়ুয়ার ভয়ে পালানোর একটা দৃশ্য সৃষ্টি করে হুল্লোড় বাধিয়ে তোলেন। তেমনি পাওয়া যায় যাত্রাদলের অধিকারীর চরিত্রে নৃপতি চট্টোপাধ্যায়কে। এছাড়া সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বাণী গাঙ্গুলী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতিও আছেন। সঙ্গীত পরিচালনায় কালীপদ সেনের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কতকগুলি দৃশ্য আবহসঙ্গীত প্রয়োগে সুকল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। গানগুলিও ভাল, বিশেষ করে যাত্রায় কানাই-বলাইয়ের এবং বৈরাগীর গানখানি কানে লেগে থাকবে। আলোকচিত্রগ্রহণে ধীরেন দে মাঝে মাঝে বেশ ভাল কাজ দেখিয়েছেন, প্রশংসার যোগ্য। শব্দগ্রহণ করেছেন নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ।

১৯৫৮ সালের নাট্যোৎসব

গত তিন বছর ধরে থিয়েটার সেণ্টার উদ্যোগিত নাট্যোৎসবে কলকাতার বিভিন্ন

দল ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় নাটক পরিবেশন করে আসছেন। নব নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত বা যাঁরা এই আন্দোলনে বিশ্বাসী তাঁরা প্রতি বছর সাগ্রহে এই বার্ষিক উৎসবটির প্রতীক্ষায় থাকেন। এই বছরও থিয়েটার সেণ্টার তাঁদের চতুর্থ বার্ষিক নাট্যোৎসবের কথা ঘোষণা করেছেন। এবার বেশী লোককে দেখবার অভিপ্রায়ে মহাজাতি সদনে এই নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হবে ১০ই জানুয়ারী থেকে ২০শে জানুয়ারী পর্যন্ত।

গত তিন বছরের অভিজ্ঞতার ফলে থিয়েটার সেণ্টার এ বছর সিদ্ধান্ত করেছেন যে, নাটকের সংখ্যা বা বিভিন্ন ভাষার ওপর জোর না দিয়ে, নাটকের উৎকর্ষের ওপরেই তাঁরা নজর দেবেন বেশী। তাই এ পর্যন্ত যে নাটকগুলি তাঁরা বেছেছেন, তার সব কটিই দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। সাজঘরের "মৌচোর" নাট্যোৎসবে দেখানো হবে। লিটল থিয়েটার এই প্রথম নাট্যোৎসবে যোগদান করছেন। উৎপল দত্তের পরিচালনায় তারা [illegible] 'অনুবাদ' 'নীচের মহল' পরিবেশন করবেন। নবীন সংস্থা 'অনামী' নাট্যোৎসবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনামিকা হিন্দী নাটক দিচ্ছেন 'চা পার্টি'—নিখিল ভারত হিন্দী নাটক প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত নাটক। এছাড়া তৃতীয় একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী—দেবরাজের 'এক পশলা বৃষ্টি' ও অভ্যুদয়ের 'দুলদুল' এই উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ। অন্ধ এসোসিয়েশনের পুরস্কারপ্রাপ্ত [illegible] একাংক নাটক 'ইসনস্নোরম'ও থাকবে। দুটি নতুন নাটক এই বছরের নাট্যোৎসবের বিশেষ আকর্ষণ হবে। বাঙলা, তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যগোষ্ঠী 'বহুরূপী' প্রতি বছরই এই নাট্যোৎসবে নতুন নতুন নাটক পরিবেশন করেন। এবারেও শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় একখানি নতুন নাটকের প্রথম অভিনয় তাঁরা করছেন এই নাট্যোৎসবে।

দ্বিতীয় নাটক 'সুযোগ'এর নিবেদন 'রূপোলীচাঁদ'। বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পী সমন্বয়ে গঠিত এই দলটি গত বছর ধনঞ্জয় বৈরাগীর "এক মুঠো আকাশ" পরিবেশন করে খ্যাতিলাভ করেছে। এদের দ্বিতীয় নাটকটিও ঐ একই নাট্যকারের লেখা এবং পরিচালনা করছেন তরুণ রায়। এছাড়াও আরও দু'তিনটি নাটক এবারের নাট্যোৎসবে অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে থাকবে একটি বিখ্যাত নৃত্যনাট্য।

নৃত্য ও সঙ্গীত

পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলন

"প্রায় তিরিশ বছর আগে পূর্ব কলিকাতায় "নবমিলন" সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। সেদিনের যুগোপযোগী পরিবেশে সমিতি সমাজসেবা করবার প্রয়াস পেয়েছিল; সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ তখন এই পল্লীর অধিবাসী ছিলেন; কবি নজরুলও আসতেন সেখানে। "নবমিলন" সেই কল্লোল যুগ থেকে তাঁদের সহযোগিতা পেয়েছিল। প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সাংস্কৃতিক সমাজচেতনা বোধ গড়ে তোলবার কর্মসূচী তার কার্যতালিকায় ঠাঁই পেয়েছিল। বাৎসরিক উৎসবে বাঙলা তথা ভারতের বহু জ্ঞানী-গুণী সুধীজনকে আমন্ত্রণ করে আনা হ'তো। আজও সমিতি বিভিন্ন ভাগের মাধ্যমে সেবা এবং সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলবার কাজে নিয়োজিত আছে। সংস্কৃতির প্রসার এবং প্রচারও কার্যসূচী হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সম্মেলনের এবার হবে দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন। অনুষ্ঠানসূচীতে লোকসংগীত, সাহিত্য, কাব্য, নাটক এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের আয়োজন হয়েছে। সম্মেলনের মূল সভাপতি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ। অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করেন অধ্যক্ষ [illegible] গাঙ্গুলী ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। প্রধান পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর ও জগন্নাথ কোলে অন্যতম। ২১শে ডিসেম্বর থেকে ২৮শে ডিসেম্বর সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। ২১শে ও ২২শে ডিসেম্বর এই দুই রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে আলোচনা করবেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন পণ্ডিত [illegible], ওস্তাদ আমীর খাঁ, ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ প্রভৃতি এবং বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে আসছেন [illegible] বেহালাবাদক [illegible]। তিনি শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের প্রথম ছাত্র। এছাড়াও স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে যোগ দিচ্ছেন প্রখ্যাত রূপক গায়ক অমর ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, কল্পনা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বসু, উৎপলা ঘোষ হাজরা—, অরুন্ধতী দেবী রায়, রাধারমণ বসাক, কানাই দত্ত, মনোমোহন মিশ্র, রামনাথ মিশ্র ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ নাটকাভিনয়। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও সম্প্রদায় ২২শে ডিসেম্বর রবিবার "মাইকেল মধুসূদন" নাটক অভিনয় করবেন। শ্রেষ্ঠাংশে থাকবেন—শিশির ভাদুড়ী, রেবা, নিবেদিতা দাস ইত্যাদি।

২৬শে ডিসেম্বর—কথাকলি ভারতনাট্যম নৃত্য পরিবেশন করবেন পিনাকী ও সম্প্রদায়।

২৮শে ডিসেম্বর—প্রহ্লাদ দাসের পরিচালনায় ব্যালে কথক নৃত্যও একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।

২০শে ডিসেম্বর—"বঙ্গ সংস্কৃতি দিবস" অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রসংগীতে অংশ নেবেন সুচিত্রা মিত্র। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীত, নৃত্য পরিবেশন করবেন ডাঃ ভূপেন হাজারিকা, গম্ভীরা পরিষদ, পূর্ণদাস বাউল, দাশরথী রায়ের পাঁচালী গান "কাশীখণ্ড" গাইবেন জ্যোতিষ বিশ্বাসের পরিচালনায় "পাঁচালী ভারতী" সম্প্রদায়—কীর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন প্রখ্যাত শিল্পী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেবী প্রডাকসন্সের প্রথম ছবি 'লটারির' কাজ কিছুকাল বন্ধ থাকার পর আবার টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে সংগীত পরিচালক সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আরম্ভ হয়েছে। অভিনয়াংশে আছেন অনুপকুমার, সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন মৈত্র ও নবাগতা কৃষ্ণকুমারী।

* * *

শ্যামসুন্দর বাণীচিত্রের প্রথম ছবি 'কাঁটা-কানার' চিত্রগ্রহণ কাজ সতীশ দাশগুপ্তের পরিচালনায় সমাপ্তপ্রায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ ভট্টাচার্য, অনুপকুমার, সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী, রেণুকা রায়, নিভাননী, নীলিমা দত্ত প্রভৃতি।

হলিউডের অস্কার প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত ছবি

হলিউডের একাডেমী অফ আর্টস এণ্ড সায়েন্সের পক্ষ থেকে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার স্বরূপ 'অস্কার' প্রদান করা হয়। এতকাল পুরস্কার কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের ছবিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। গত বছর থেকে পুরস্কারের একটা দ্বিতীয় বিভাগ খোলা হয়েছে, যে বিভাগে বিদেশী ছবিকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা হয়েছে। ভারতকেও এবার এই বিদেশী ছবির প্রতিযোগিতা বিভাগে ছবি পাঠাবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। একখানি মাত্র ছবি ভারত থেকে পাঠানো হবে এবং সে ছবিখানি বাছবার জন্য চলচ্চিত্রের আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকে দু'খানি করে ছবি বেছে পাঠাতে বলেছেন ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া। জানা গেল, এই প্রতিযোগিতার জন্য বাঙলা ছবি মনোনয়ন করে পাঠানো হচ্ছে 'কাবুলিওয়ালা' ও 'পরশপাথর'।

জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় উত্তর প্রদেশের খেলোয়াড় ত্রিলোকনাথ শেঠ এবার জাতীয় ব্যাডমিণ্টনে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে উপর্যুপরি তিন বছর শুধু চ্যাম্পিয়নশিপ লাভেরই গৌরব অর্জন করেননি, আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টনে নিজ প্রদেশকেও দান করেছেন বিজয়ীর সম্মান। আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টনের ফাইন্যালে উত্তরপ্রদেশ ৩—০ খেলায় বাঙলাকে পরাজিত করেছে আর জাতীয় ব্যাডমিণ্টনের ফাইন্যালে ত্রিলোকনাথ শেঠ পরাজিত করেছেন দিল্লীর কীর্তিমান খেলোয়াড় অমৃত দেওয়ানকে। 'সিডিং' অর্থাৎ খেলোয়াড়দের যোগ্যতা নিরূপক বাছাই তালিকায় ত্রিলোক শেঠই ছিলেন প্রথম স্থানের অধিকারী, অমৃত দেওয়ানের স্থান ছিল দ্বিতীয়। সেমি ফাইন্যালে ত্রিলোক শেঠ তার নিজ প্রদেশের খেলোয়াড় পি কে মজুমদারকে এবং অমৃত দেওয়ান উত্তর প্রদেশের খেলোয়াড় পি এস চাওলাকে পরাজিত করেন। সুতরাং সেমি ফাইন্যালে উত্তর প্রদেশেরই তিনজন খেলোয়াড়কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যায়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম রাউণ্ড থেকে ফাইন্যাল পর্যন্ত ত্রিলোক শেঠ কারো কাছে একটি গেমও হারেননি, সমস্ত খেলাতেই স্ট্রেট গেমে বিজয়ী হয়েছেন।

মহিলাদের বিভাগে বিজয়িনী হয়েছেন বাঙলার প্রাক্তন এবং বোম্বের বর্তমান ব্যাডমিণ্টন পটিয়সী মিসেস প্রেম পরাশর। ফাইন্যালে তিনি উবের কাপের ভারতীয় খেলোয়াড় বোম্বের মিসেস সুশীলা কাপাদিয়াকে পরাজিত করেন। বয়েজ সিঙ্গলসে উত্তর প্রদেশের সুরেশ গোয়েল এবং গার্লস সিঙ্গলসে দিল্লীর কুমারী বাসন্তী চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। এখানে বলা প্রয়োজন জাতীয় ব্যাডমিণ্টনে গার্লস সিঙ্গলসের খেলা এ বছর থেকেই প্রথম প্রবর্তন করা হয়েছে। পাতিয়ালার মহারাণী গায়েত্রী দেবী এই প্রতিযোগিতার জন্য একটি কাপ দান করেছেন।

হায়দরাবাদের ফতে ময়দানস্থ রাজস্থান স্টেডিয়ামে এবার জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টনের এবার ছিল ১৩তম এবং জাতীয় ব্যাডমিণ্টনের ২২তম অনুষ্ঠান। এবারকার প্রতিযোগিতায় যত বেশী রাজ্য এবং যত বেশী খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছে, এর আগে কোনবার এত বেশী রাজ্য এবং এত বেশী খেলোয়াড় জাতীয় ব্যাডমিণ্টনে অংশ গ্রহণ করেনি। প্রতিযোগিতায় এ বছর নতুন যোগদানকারী রাজ্যগুলির মধ্যে মহীশূর, মাদ্রাজ ও কেরালার নাম করা যেতে পারে। বোম্বের খ্যাতনামা
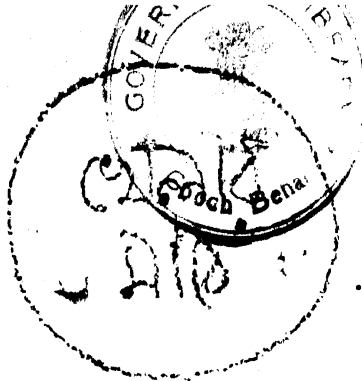
একলব্য

খেলোয়াড়, প্রাক্তন ভারত চ্যাম্পিয়ন নন্দু নাটেকারের অনুপস্থিতি অবশ্য বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

বাঙলার সিনিয়র খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রণব বসু, বিক্রম ভাট, রঞ্জিত ব্যানার্জি, গজানন হেমাডি ও পঙ্কজ গুহ, জুনিয়র খেলোয়াড়দের মধ্যে গোরা ঘোষ ও সুকুমার দেব এবং মহিলা খেলোয়াড়দের মধ্যে মিসেস নীলিমা ভিকস এবার জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিক্রম ভাট বোম্বের প্রাক্তন খেলোয়াড়। এখন বাঙলায় বাস করছেন। আর মিসেস নীলিমা ভিকস বাঙলার খেলাধুলা পটিয়সী অলিম্পিক অ্যাথলীট নীলিমা ঘোষেরই বিবাহিত জীবনের নামকরণ। নীলিমা ঘোষ কিছুদিন আগে জার্মানীর ক্রীড়াবিদ মিঃ ভিকসের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় বাঙলা মহীশূর, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বেকে একে একে পরাজিত করে ফাইন্যালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেও ফাইন্যালে বাঙলাকে উত্তর প্রদেশের কাছে ৩—০ খেলায় পরাজয় স্বীকার করতে হয়। নন্দু নাটেকারের অনুপস্থিতিতে বোম্বে দল খুবই শক্তিহীন হয়ে পড়ে। ফলে সেমি ফাইন্যালে বোম্বে বাঙলার কাছে পরাজয় স্বীকার করে ৩—১ খেলায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৬৫ সাল থেকে বোম্বে প্রতি বছরই আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায়

বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে আসছে। ১৯৫৪ সালে অবশ্য আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতার খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। যাই হোক, দীর্ঘ ৯ বছর আন্তঃরাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের পর বোম্বেকে এবারই সেমি-ফাইন্যালে পরাজয় স্বীকার করতে হল। জাতীয় ব্যাডমিণ্টনে বাঙলার কোন খেলোয়াড়ই বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। বিক্রম ভাট কোয়ার্টার ফাইন্যাল পর্যন্ত উঠে অমৃত দেওয়ানের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন আর বাঙলার অধিনায়ক প্রণব বসু চতুর্থ রাউণ্ডে পরাজয় স্বীকার করেন দিল্লীর আর এন মজুমদারের কাছে। ডাবলসের খেলায় গজানন হেমাড়ি ও বিক্রম ভাট অবশ্য সেমি ফাইন্যালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। বয়েজ সিঙ্গলসের খেলায় গোরা ঘোষ ও [illegible] কুমার দেবকে কোয়ার্টার ফাইন্যালে যথাক্রমে এস গোয়েল ও এম ম্যাথুজের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়দের যে ক্রমপর্যায় রচনা করা হয়েছে, তাতে পুরুষদের মধ্যে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ত্রিলোক শেঠ প্রথম এবং অমৃত দেওয়ান দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন। মহিলাদের মধ্যে ক্রমপর্যায়ে প্রথম স্থানের অধিকারিণী হয়েছেন উত্তর প্রদেশের কুমারী মীনা শাহা। র‍্যাঙ্কিং অর্থাৎ ক্রমপর্যায় নিরূপণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করায় প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন নন্দু নাটেকার, মহিলা চ্যাম্পিয়ন মিসেস প্রেম পরাশর, মিসেস সুশীলা কাপাদিয়া বা উবের কাপের ভারতীয় অধিনায়িকা মিসেস মমতাজ লোটাওয়ালার যোগ্যতা বিচার করা হয়নি।

নিচে আন্তঃরাজ্য এবং জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলাগুলির ফলাফল এবং পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় তালিকা দেওয়া হল—

আন্তঃরাজ্য ফাইন্যাল

ত্রিলোকনাথ শেঠ (উত্তর প্রদেশ) ১৫—৫ ১৫—৮ পয়েণ্টে বিক্রম ভাটকে (বাঙলা) পরাজিত করেন।

পি এস চাওলা (উত্তরপ্রদেশ) ১৫—৫ ও ১৫—৮ পয়েণ্টে বিক্রম ভাটকে (বাঙলা) পরাজিত করেন।

কুমারী মীনা শাহা (উত্তর প্রদেশ) ১১—১ ও ১১—৪ পয়েণ্টে মিসেস নীলিমা ভিকসকে (বাঙলা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

ত্রিলোকনাথ শেঠ (উত্তর প্রদেশ) ১৫—৭ ও ১৫—৩ পয়েণ্টে অমৃত দেওয়ানকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

মিসেস প্রেম পরাশর (বোম্বে) ১১—৬ ও ১১—৭ পয়েণ্টে মিসেস সুশীলা কাপাদিয়াকে (বোম্বে) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল

আর ডি ভীমাওয়ালা (বোম্বে) ও ডি এন ডোংগাড়ে (বোম্বে) ১০—১৫, ১৮—১৩ ও ১৫—১১ পয়েণ্টে পি এস চাওলা (উত্তরপ্রদেশ) ও অমৃত দেওয়ানকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইন্যাল

মিসেস প্রেম পরাশর ও মিসেস সুশীলা কাপাদিয়া (বোম্বে) কুমারী মীনা শাহা ও কুমারী ভোসলেকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল

মিসেস সুশীলা কাপাদিয়া ও সি ডি দেওয়ান ১৫—৭ ও ১৫—১০ পয়েণ্টে মিসেস প্রেম পরাশর ও ডি এন ডোংগাড়েকে পরাজিত করেন।

বালিকাদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

সুরেশ গোয়েল (উত্তরপ্রদেশ) ১৫—১১, ৯—১৫ ও ১৫—১০ পয়েণ্টে ডি কে থাপ্পাকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

কুমারী বাসন্তী (দিল্লী) ১২—৯ ও ১১—৮ পয়েণ্টে কুমারী সুনীতা আপ্তেকে (মধ্যপ্রদেশ) পরাজিত করেন।

পুরুষ খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায়

১ম—ত্রিলোকনাথ শেঠ (উত্তরপ্রদেশ)
২য়—অমৃত দেওয়ান (দিল্লী)
৩য়—সি ডি দেওয়ান (বোম্বে)
৪র্থ—প্রণব বসু (বাঙলা)
৫ম—টি ডি এল সিন্ধে (মহারাষ্ট্র)
৬ষ্ঠ—পি এস চাওলা (উত্তরপ্রদেশ)
৭ম—পি কে মজুমদার (উত্তরপ্রদেশ)

মহিলাদের ক্রমপর্যায়

১ম—কুমারী মীনা শাহা (উত্তরপ্রদেশ)
২য়—কুমারী ফরিদা বেগ (অন্ধ্র)

*   *   *   *

দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতার গতবারের রানার্স ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। দিল্লী ক্লথ মিল ট্রফি লাভ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে অবশ্য নতুন সম্মান নয়। ইতিপূর্বে ১৯৫০ এবং ১৯৫২ সালেও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। এবার নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তিনবার দিল্লী ক্লথ মিল ট্রফি ঘরে তুললো। দিল্লী ক্লথ মিল অবশ্য বেশী দিনের ফুটবল প্রতিযোগিতা নয়। দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতা সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা হিসাবে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের অনুমোদন লাভ করলেও আভিজাত্যে এখনও আই এফ এ, রোভার্স বা ডুরাণ্ডের কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারেনি। তবুও দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতার সাম্প্রতিক নামডাক কম নয়। প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনাও আভিজাত্যগর্বী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার চেয়ে অনেক ভাল।

ইস্টবেঙ্গল, রাজস্থান এবং রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব—কলিকাতার এই তিনটি ক্লাব দিল্লী ক্লথ মিলে খেলবার অভিপ্রায় জানালেও রাজস্থান ক্লাব শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করেনি। ভারতীয় ফুটবলের প্রধান কেন্দ্র কলিকাতার বাকি দুটি ক্লাব ইস্টবেঙ্গল এবং রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবই ফাইন্যালে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ইস্টবেঙ্গল বিজয়ীর পুরস্কার এবং রেলদল বিজিতের পুরস্কার লাভ করেছে। দুই দলের প্রথম দিনের খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হবার পর দ্বিতীয় দিনের ফাইন্যাল খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ২—০ গোলে রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে মুসা ও এস ঘোষ একটি করে গোল করেন। এর আগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দিল্লী চ্যাম্পিয়ন ইয়ং মেনস ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পেয়ে কোয়ার্টার ফাইন্যালে ওঠে। কোয়ার্টার ফাইন্যালে পরাজিত করে বাঙ্গালোরের আর্টিলারী এম সি সেণ্টার দলকে ৪—০ গোলে। সেমি ফাইন্যালে বোম্বে চ্যাম্পিয়ন ইণ্ডিয়ান নেভিকে ১—০ গোলে হারিয়ে ফাইন্যালে ওঠে। রেলওয়ে স্পোর্টস তাদের প্রথম খেলায় দিল্লীর লীগ রানার্স প্রেসিডেণ্টস এস্টেটকে ৪—১ গোলে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইন্যালে ওঠে। কোয়ার্টার ফাইন্যালে ১—০ গোলে পরাজিত করে গত দু বছরের ট্রফি বিজয়ী ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স দলকে। সেমি ফাইন্যালে জলন্ধরের খালসা স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে দুই দিন অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করার পর
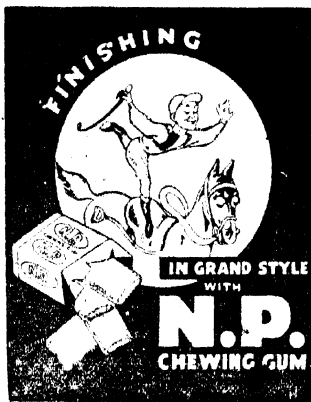
তৃতীয় দিন ২—১ গোলে খালসা স্পোর্টিংকে হারিয়ে ফাইন্যালে ওঠে। নীচে দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতার পূর্ববর্তী বিজয়ী ও বিজিত দলের তালিকা দেওয়া হল—

আগের বিজয়ী ও রানার্স দলের তালিকা

বিজয়ী	রানার্স
১৯৪৫—নিউ দিল্লী হিরোজ,	কে ও ওয়াই এস আই
১৯৪৯—রাইসিনা স্পোর্টিং	সিটি ক্লাব, লক্ষ্মৌ
১৯৫০—ইস্টবেঙ্গল ক্লাব	৫৮ গুর্খা দল
১৯৫১—রাজস্থান ক্লাব	৫৮ গুর্খা দল
১৯৫২—ইস্টবেঙ্গল ক্লাব	৫৮ গুর্খা দল
১৯৫৩—এরিয়ান জিমখানা	ই আই আর অ্যাকাউন্টস
১৯৫৪—জিওলজিক্যাল সার্ভে	হায়দরাবাদ এফ এ
১৯৫৫—ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স	ডি এস এ, এলাহাবাদ
১৯৫৬—ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স	ইস্টবেঙ্গল ক্লাব

• • • •

দিল্লী রাজ্য লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যাল খেলায় ভারত চ্যাম্পিয়ন আর কৃষ্ণণ গ্রেট ব্রিটেনের উদীয়মান খেলোয়াড় বিলি নাইটকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। বিলি নাইট ও তার সতীর্থ টনি পিকার্ড লাভ করেছেন ডাবলসের চ্যাম্পিয়নশিপ। বলা বাহুল্য, গ্রেট ব্রিটেনের এই দুই খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের অংশ গ্রহণের ফলে দিল্লী লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের আকর্ষণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং সিংগলস ফাইন্যালে কৃষ্ণণ ও নাইটের খেলা দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিতেও সক্ষম হয়। বিলি নাইট ইংলণ্ডের তরুণ খেলোয়াড়। বয়স মাত্র ২১ বছর। ডেভিস কাপে ইনি গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এর বাঁ হাতের সার্ভিস ফেরানো খুবই কষ্টকর। হাতে মারও আছে সবরকম। গ্রেট ব্রিটেনের জনসাধারণের নাইটের উপর যথেষ্ট আশা। টেনিস ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেনের হৃত সম্মান নাইট কিছুটা ফিরিয়ে আনলেও আনতে পারেন। বর্তমানে ইংলণ্ড টেনিস ক্রমপর্যায়ে বিলি নাইটের স্থান চতুর্থ।

যাই হোক, ফাইন্যালে এক নাইট ও আর কৃষ্ণণের খেলা ছাড়া আর কোন খেলাতেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। নাইট ও কৃষ্ণণের খেলা ঠিক একশ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে দুই দেশের দুই কৃতী খেলোয়াড় টেনিস কেতাবে যত রকমের মারের উল্লেখ আছে, তার সব রকমের মারের নমুনা দেখিয়ে দর্শকদের জুটি কৃষ্ণণ ও উদয় কুমারকে ব্রিটেনের দুই সফরকারী খেলোয়াড় নাইট ও পিকার্ডের কাছে স্ট্রেট সেটে হার স্বীকার করতে হয়েছে। ভারতের মহিলা চ্যাম্পিয়ন মিসেস খান্নাম সিংকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করে ভারতের দুই নম্বর মহিলা খেলোয়াড় মিসেস জে বি সিং মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। নিচে ফাইন্যাল খেলার ফলাফল দেওয়া হল—

সিংগলস ফাইন্যাল—আর কৃষ্ণণ ৬—৩ ৭—৯, ৬—০ ও ৯—৭ সেটে গ্রেট ব্রিটেনের বিলি নাইটকে পরাজিত করেন।

ডাবলস ফাইন্যাল—গ্রেট ব্রিটেনের বিলি নাইট ও টনি পিকার্ড ৭—৫, ৬—৪ ও ৬—২ সেটে ভারতের আর কৃষ্ণণ ও উদয় কুমারকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইন্যাল—মিসেস জে বি সিং ৬—২ ও ৬—২ সেটে মিসেস কে সিংকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল—আর কৃষ্ণন ও মিসেস জে বি সিং ৬—২ ও ৬—৩ সেটে উদয় কুমার ও মিস লীলা পাঞ্জাবীকে পরাজিত করেন।

জুনিয়র সিংগলস ফাইন্যাল—প্রদীপ নারাং ৬—৪ ও ৬—৪ সেটে বিনয় ধাওয়াকে পরাজিত করেন।

• • • •

নিখিল ভারত পুলিস স্পোর্টসের পূর্বাঞ্চলের সপ্তাহব্যাপী খেলাধূলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিবেষ্টিত ব্যারাকপুরের ব্রিগেড প্যারেড মাঠে শেষ হয়ে গেছে। আসাম, বিহার, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাংলা পুলিসের ক্রীড়াবিদদের এই খেলাধূলায় যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া পাওয়া যায়। পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে মণিপুর পুলিস এবারকার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেনি।

ফুটবল, হকি, মল্লক্রীড়া, ভলিবল ও জিমন্যাস্টিকস—এই পাঁচটি বিষয়ে পূর্বাঞ্চল পুলিস স্পোর্টসের খেলাধূলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে এক জিমন্যাস্টিকস ছাড়া আর চারটি বিষয়েই পশ্চিম বাংলা পুলিশ বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। জিমন্যাস্টিকসে বিহার পরাজিত করেছে পশ্চিম বাংলাকে।

আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার বিজয়ী দলকে নিখিল ভারত পুলিস স্পোর্টসের মূল খেলাধূলার অনুষ্ঠানে এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে বোম্বাইতে মূল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের কথা। নিচে পূর্বাঞ্চলিক প্রতিযোগিতার ফলাফল দেওয়া হল—

ফুটবল—(প্রথম রাউণ্ড) বিহার (৪) : আসাম (১); (সেমি ফাইন্যাল) পশ্চিম বাংলা (২) : উড়িষ্যা (১); বিহার (২) : ত্রিপুরা (০); (ফাইন্যাল) পশ্চিম বাংলা (৩) : বিহার (০)।

হকি—(প্রথম রাউণ্ড) উড়িষ্যা (৭) : ত্রিপুরা (০); (সেমি ফাইন্যাল) বিহার (৩) : আসাম (০); পশ্চিম বাংলা (৩) : উড়িষ্যা (১); (ফাইন্যাল) পশ্চিম বাংলা (৩) : বিহার (০)।

কুস্তি—পশ্চিম বাংলা (১৭ পয়েন্ট) : বিহার (১৫ পয়েন্ট)।

ভলিবল—(সেমি ফাইন্যাল) পশ্চিম বাংলা ১৫—৮ ও ১৫—৩ পয়েন্টে আসামকে এবং উড়িষ্যা ৬—১৫, ১৫—১০ ও ১৫—৮ পয়েন্টে বিহারকে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে ওঠে। (ফাইন্যাল) ফাইন্যালে পশ্চিম বাংলা উড়িষ্যাকে পরাজিত করে ১৫—০, ১৪—১৬ ও ১৫—৪ পয়েন্টে।

জিমন্যাস্টিকস—বিহার (১৩৬·৬৫ পয়েন্ট : পশ্চিম বাংলা (১৩০·৫) পয়েন্ট।

দেশী সংবাদ

৩রা ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিরোধী দলের নেতাকে বেতন দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া যে বিলটি আনিতে যাইতেছেন তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে প্রবল আন্দোলন উঠিয়াছে এবং ইহার প্রতিক্রিয়া নানাভাবে পশ্চিমবঙ্গে কমুনিস্ট পার্টির উপর প্রতিফলিত হইতেছে।

৪ঠা ডিসেম্বর—সম্প্রতি হরিপাল সাব রেজিস্ট্রি অফিসে স্ত্রীকে ৭০০, টাকা দিয়া দলিল রেজেস্ট্রি করিয়া জনৈক ভদ্রলোক বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। প্রকাশ, যুবতী স্ত্রীও ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন।

হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ হাওড়া শহরের উন্নয়নের জন্য বিমান পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য 'আনুষঙ্গিক' তথ্যাদি সংগ্রহের নিমিত্ত ১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৫ই ডিসেম্বর—অদ্য লোকসভায় নিবারক নিরোধ আইনের মেয়াদ আরও তিন বৎসরকাল বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে একটি সরকারী বিল উত্থাপনের প্রস্তাব করা হইলে বিরোধী দলের সদস্যগণ প্রতিবাদ স্বরূপে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

অদ্য রাজ্য বিধান সভায় কারাগারে বেত্রদণ্ড ও দ্বীপান্তরের প্রথা রহিতের জন্য আনীত "কারাগার (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) বিলটি"র আলোচনাকালে কারা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা শীঘ্রই কারা-বিধি সংস্কার করিতেছেন। তখন বিরোধী পক্ষ যেসব প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া হাতকড়া ও ডাণ্ডাবেড়ী নিয়োগ সীমাবদ্ধ করার বিধান উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। বিলটি বিনা বাধায় গৃহীত হইয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেলগাছিয়াস্থিত বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজটিকে হরিণঘাটায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই জন্য ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

৬ই ডিসেম্বর—ভারত সরকার এবং বার্মা অয়েল কোম্পানী ও আসাম অয়েল কোম্পানীর মধ্যে দুই বৎসরের অধিককাল ব্যাপী আলাপ-আলোচনা চলিবার পর উভয়পক্ষের মধ্যে এক্ষণে যে চুক্তি হইয়াছে তদনুসারে আসামের অন্তর্গত নাহারকাটিয়া, হুগরিজান এবং মোরান অঞ্চল হইতে উত্তোলিত অপরিশোধিত তৈল পরিশোধনের জন্য দেশে সরকারী শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে দুইটি তৈল শোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

লাইফ ইন্সিওর কর্পোরেশন, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন এবং সরকারী কোম্পানীসমূহের কর্মচারীদের দুর্নীতি নিরোধ আইনের আওতাভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ অদ্য লোকসভায় একটি বিল উত্থাপন করেন। এই বিলের দ্বারা ভারতীয় দণ্ডবিধি, দুর্নীতি নিরোধ আইন এবং ফৌজদারী বিধি আইন সংশোধন করা হইবে।

৭ই ডিসেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু মাদ্রাজে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, দ্রাবিড় কাজাঘাম নেতা শ্রী ইউ ভি রামস্বামী নাইকার "হত্যা করা উচিত, ভারতের সংবিধান পোড়াইয়া ফেলা উচিত" ইত্যাদি যে সব কথা

প্রচার করিতেছেন তাহা দেশদ্রোহীর কথা এবং সমগ্র ভারতের প্রতি চ্যালেঞ্জ।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন গতকল্য লোকসভায় বলেন : "পতিতাবৃত্তি, খাদ্যে ভেজাল ও অন্যান্য সমাজবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সম্ভবত আমাদিগকে বিশেষ আদালত গঠন করিতে হইতে পারে।

৮ই ডিসেম্বর—গান্ধী গ্রামের দশম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ প্রাতে এখানে পৌঁছিয়া এখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে একটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র এই দুইটি নূতন সংস্থার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

রাণাঘাটস্থিত কুপার্স ক্যাম্পে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের ৩ দিনব্যাপী চতুর্থ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে (অদ্য) উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে ৮ দফা দাবী সম্বলিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ দাবী সরকার গ্রহণ না করিলে সমগ্র রাজ্যব্যাপী এক ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করার কথাও প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।

৯ই ডিসেম্বর—অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী আজ লোকসভায় বলেন যে, কারেন্সী নোট ছাপার জন্য বৎসরে প্রায় ১,৪৫০ টন কাগজ লাগে।

বিদেশী সংবাদ

৩রা ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে গতকল্য সুইডেন কর্তৃক সংশোধিত পঞ্চশক্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহাতে ডাঃ ফ্রাংক গ্রাহামকে পুনরায় কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে সালিশী করিবার জন্য ভারতে পাঠাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভোটদানে বিরত থাকে। পাকিস্তান এই প্রস্তাব সরকারীভাবে গ্রহণ করে, কিন্তু ভারত উহা প্রত্যাখ্যান করে।

ইন্দোনেশীয়ার শ্রমিকরা অদ্য ইন্দোনেশীয়ার ডাচদের অন্যতম বৃহত্তম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রয়েল ডাচ ইণ্টার-ইনসুলার শিপিং কোম্পানীটি দখল করিয়া লয়। শ্রমিক জনতা কোম্পানীর অতি বৃহৎ সদর কার্যালয়ে রক্ত পতাকা উত্তোলন করে।

৪ঠা ডিসেম্বর—আজ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ভূকম্পজ্ঞাপক যন্ত্রে সাম্প্রতিককালের প্রচণ্ডতম কম্পন ধরা পড়ে। কিন্তু কোথায় যে এই ভূমিকম্প হইয়াছে, সে সম্পর্কে মতৈক্য হয় নাই। কম্পনের চাপে হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূকম্পজ্ঞাপক যন্ত্রটি ভাঙিয়া যায়। হিমালয় পর্বতমালায় ভূমিকম্প হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

ইন্দোনেশীয়ার কর্মিগণ অদ্য বলেন যে, তাঁহারা ওলন্দাজ নেদারল্যাণ্ডস্ ট্রেডিং সোসাইটি দখল করিয়া লইয়াছে। নেদারল্যাণ্ডস্ ট্রেডিং সোসাইটি ইন্দোনেশীয়ার প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম ব্যাংক।

৫ই ডিসেম্বর—ডাচ নিউগিনির (পশ্চিম ইরিয়ান) উপর ইন্দোনেশীয়ানদের দাবীর সমর্থনে ইন্দোনেশীয়া আজ একটি নূতন ব্যবস্থা হিসাবে সহস্র সহস্র ওলন্দাজ নাগরিককে ইন্দোনেশীয়া ত্যাগ করার আদেশ দিয়াছে।

আওয়ামী লীগ নেতা শ্রী এইচ এস সুরাবর্দী আজ ঢাকাতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন প্রথা অনুযায়ী যে এলাকায় হিন্দুগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবে, সেই এলেকা তাহাদের স্বতন্ত্র বাসভূমি বলিয়া দাবী করিবার এবং উহা ভারতের সহিত সংযুক্ত করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাহারা পাইবে।

৬ই ডিসেম্বর—শ্রী খ্রুশ্চেভ অদ্য পাশ্চাত্য সাংবাদিকগণের নিকট বলেন, প্রথম সোভিয়েট উপগ্রহবাহী রকেটটি গত ১লা ডিসেম্বর তারিখে মার্কিন এলেকায় পড়িয়াছে।

যে ভানগার্ড রকেটটির আমেরিকার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি লইয়া শূন্যলোকের দিকে পাড়ি দিবার কথা ছিল, তাহা অদ্য যাত্রার নির্দিষ্ট সময়ের তিন মিনিট পূর্বে যাত্রাস্থলেই বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এ দুর্ঘটনায় কেহই হতাহত হয় নাই।

৭ই ডিসেম্বর—পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রী এইচ এস সুরাবর্দী এবং আওয়ামী লীগের ১০ জন কর্মী যখন গতকল্য সৈয়দপুরের পথে যাইতেছিলেন, সেই সময় বোনারপাড়া এবং গাইবান্ধা স্টেশনে কয়েকজন লোক তাহাদের প্রতি ইষ্টক বর্ষণ করিলে কয়েকজন আহত হয়।

আমেরিকার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহবাহী রকেটটিকে শূন্যমার্গে প্রেরণের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আজ বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার এবং রকেট বিশেষজ্ঞগণ পূর্ণোদ্যমে এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

নেপালের ৩টি প্রধান জাতীয় দল লইয়া গঠিত নেপাল গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট অদ্য ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে সারা নেপালব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিয়াছেন।

৮ই ডিসেম্বর—ইন্দোনেশিয়ার সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'পিয়া' গতকল্য রাত্রিতে জানাইয়াছেন যে, ইন্দোনেশীয় কর্মিগণ ডাচ জাহাজী কোম্পানী 'রটারডামস্ লয়েডে'র অফিস দখল করিয়া লইয়াছে।

ফিনিস দূতাবাসে অনুষ্ঠিত এক সম্বর্ধনা সভায় শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ গত রাত্রিতে বলেন, পঃ জার্মানী হইতে ন্যাটো-সৈন্য অপসারিত করা হইলে পূর্ব জার্মানী হইতে নিজেদের সৈন্য সরাইয়া আনিতে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রস্তুত রহিয়াছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১১ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।